চিত্র-সূচী

চিত্র-সূচী

লেখক ও তাঁহাদের রচনা

লেখক ও তাঁহাদের রচনা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৩০

১ম সংখ্যা

উৎসবের কন্‌সার্ট্

মাথার উপরে আকাশপথ সম্পূর্ণ খোলা, কাজেই সে পথ দিয়ে দিন-রাতের আলো আঁধারের, এক ঋতু থেকে আর-এক ঋতুর নানা সুর, নানা উৎসবের খবরাখবর ছোট্ট এই পৃথিবীতে কবিদের কাছে, শিল্পীদের কাছে এসে পৌঁছবার একটুও বাধা হয় না—তা তারা সহরেই থাক বা বনে উপবনে যেখানেই থাক্। কিন্তু প্রকৃতিদেবীর এই উৎসবে, সমস্তের নিমন্ত্রণ যা মনের রাস্তা ধরে' বাতাসের উপরে আলো-দিয়ে-লেখা রঙীন চিঠির মতো আসে, সবার কাছে সে-সব চিঠি তো পৌঁছবার সুবিধে পায় না। কতক মানুষকে কাজ নিয়ে থাকতেই হয় বাধ্য। মাসই সহরে, সেখানকার আকাশের দৌড় পদে পদে আফিস-বাড়ী-গুলোর ছাতের আল্‌সেতে বাধা পেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, এমন কি যে মানুষের মন বাতাসেরও আগে দৌড়োয়, সেও বসন্ত-বাড়ির ঘেরটা টপ্‌কে যদি ওবাড়িতে যেতে চায় তবেও পুলিশের হাতে মার খেয়ে ফিরে আসে। প্রত্যেকের কাজের মধ্যে, সুখ-দুঃখ-আনন্দের মধ্যে একটা ...র' প্রাচীর আমাকে তাকে বিভক্ত করে'ই রাখে, সম্পূর্ণ-...বে মিল্‌তে দেয় না কিছুর সঙ্গে কারু সঙ্গে আনন্দ গাছ, সেও বিশ্বজোড়া উৎসবের নিমন্ত্রণ সহরের মানুষ-গুলোর চেয়ে আগে পেয়ে যায় এবং বেরিয়ে আসে ফুল-পাতার সাজে সেজে উৎসব করতে, কিন্তু মানুষ আমাদের কাজের এমনি তাড়া যে সেই এতটুকু গাছের একটুখানি সাজগোজের দিকে নজর দেবার সুবিধে হয়ে ওঠে না। আমরা যদি উৎসব করতেও চলি তবে তারও মধ্যে কাজের কথা আসে, প্রেসিডেন্ট্ আসে, সেক্রেটারি আসে, রিপোর্ট্ আসে! এত হিসেব করে' উৎসব হয় না, উৎপাত করা হয়। আকাশ-পথে এই বসুন্ধরা ঘিরে' যে-সব বড় বড় উৎসব রং আর সুরের স্রোত নিয়ে বয়ে চলেছে পলে পলে, শুধু গুণীদের বীণার তারেই তারা ধরা পড়ে' যাচ্ছে,—সুরে ছন্দে রং-এ রেখায়। কাজের বন্দীশালার দ্বারে আসছে ছুটির খবর উৎসবের খবর রঙে রাঙানো হয়ে কথায় গাঁথা হয়ে, কিন্তু তবু খোলে না ফাটক, কেন বন্ধ থাকে আগল! আফিসের সাহেব সেও বলে—যাও পাল-পার্ব্বণে ছুটি দিলেম; কিন্তু মনের খিল কাজের মরচে ধরে' শক্ত হয়ে বসে' গেছে, সে খিলের চাবিটা অকেজো বলে' কবে ফেলে দিয়েছিলেম [illegible]

সহরের মানুষ আমরা মুক্তি চেয়ে নানা দিকে নানা পথ খোল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি উৎসাহের সঙ্গে, কিন্তু আসল যেটা বিশ্বজগতের উৎসবের সুরে সুরে গিয়ে মেল্‌বার মুক্ত করা, সুরীদের সুরে সুর ধরা, সে দিকটায় কারোরেই নজর দিচ্ছিনে। এ যেন বিবাহ-কার্য্য হচ্ছে, কিন্তু বাঁশী নেই রং নেই শাঁখ-বাজানো নেই আলো নেই! সারো কাজ কোন দিন আমাদের কোন সার্থকতা পাব না যতই সঙ্গীত-সমাজ বেঁধে বসি না কেন, সেগুলো স্মৃতি-সভার শ্রাদ্ধ-সভার মতনই হ'য়ে উঠ্‌বে। যে-কোন উপায়ে হোক সুরের আসা-যাওয়ার পথ কর্‌তেই হবে আমাদের। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত এদের মধ্যে দিয়ে শুধুই কাজের কথা আর মিটিং ও লেকচারের ফন্দিটাই নিয়ে আনন্দের সঙ্গে মিল্‌তে চল্লে সে মিলন তো সার্থক হবে না, সে হবে কাজের কলের ধোঁয়ার সঙ্গে আলোর মিলনের মতো বিশ্রী জিনিস। সহরে সহরতলিতে পাড়ায় পাড়ায় শত শত উৎসব আমি দেখেছি, কিন্তু একটাও কোন বিশেষত্ব দেখালে না আমাকে, সেই সভাপতি সেক্রেটারি তার রিপোর্ট্ এবং বাঁধা ধরা গানের ফন্দ, যার সঙ্গে উৎসবের কাল ও স্থানের কোন যোগাযোগ নেই; বসন্তের উৎসব কি শীতের, অথবা উৎসব কি না তা পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে হয়, হাতের বিজ্ঞাপনটা পড়ে'। এ যেন ছবি দেখে কিছুই বুঝ্‌লেম না, ক্যাটালগের ছাপা নামটা দেখে বুঝ্‌লেম ছবির ব্যাপারটা কি!

আগেকার তাদের ফাগুনের উৎসব ফাগে রাঙা গোলাপের পিচ্‌কারিতে সুবাসিত স্ত্রীপুরুষের সম্মিলিত সুরে সুরিলা হয়ে বিনা বিজ্ঞাপনেই জানিয়ে দিত কিসের উৎসব হচ্ছে; আর এখন আমাদের উৎসব সেটা উৎসব কি উৎপাত সেটিও জান্‌তে দেয় না, শুধুই বলে আমি উৎসব হয়ে উঠ্‌তে চাচ্ছি কিন্তু হতে পার্‌ছিনে, সুর পেতে গিয়ে পাচ্ছিনে, সুর বেসুর কাজ অকাজ সুকু মিলে খানিকটা গোলমাল হয়ে উঠ্‌ছে, অনর্থক উৎসাহ অর্থহীন উন্মাদনা বই আর কিছুরই রূপ ধর্‌তে পার্‌ছিনে! উৎসব-গুলো আমাদের জমে' উঠ্‌তে চায় না কেন? আমাদের সমাজের গতিকে পুরুষদের উৎসব খালি পুরুষদের নিয়ে একলা একলাই পরিপূর্ণ হতে চাচ্ছে, এতে করে' যে ধরণের উৎসব হচ্ছে তাতে শ্রী থাক্‌ছে না, শ্রীল-গুলো মিলে হযবরল হচ্ছে! আর কোন দেশে উৎসবের এমনতরো ব্যবস্থা নেই, এমন কি আগেকার দিনে আমাদের দেশেও এ ব্যবস্থা ছিল না। সে কালের তাঁরা যে ভাবে সুনিয়মে সমস্ত জিনিষ উপভোগের ব্যবস্থা করে' গেছেন তা দেখ্‌লে বোঝা যায় কাজের দিনের মধ্যে অনেকগুলো ফাঁক তাঁরা রাখ্‌তেন উৎসবের জন্য—যক্ষরাত্রি, কৌমুদীজাগর, সুবসন্তক, সহকারভঞ্জিকা, অভ্যূষখাদিকা, নবপত্রিকা, উদকক্ষেড়িকা, পাঞ্চালানুযান, একশাল্মলী-কুসুমনির্ভর, কদম্বযুদ্ধ, এ-সব উৎসব একা একা পুরুষদের উৎসব নয়, এ যে দেশের ছোটলোক বা বয়াটে ছোঁড়ারা মিলে করত তাও নয়, এ ভদ্রঘরেও চল্‌ত, কেননা ব্যবস্থা রয়েছে দেখি—"যদি কেহ সাধারণের সহিত না মিশিয়া এরূপ উৎসব-ক্রীড়াদি করিতে ইচ্ছুক হয় তবে সে নিজের অবস্থানুসারে সখা ও সখীগণের সহিত উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিতে পারে।" "লোক-মনোহারী ক্রীড়াদি যে গোষ্ঠীর মুখ্য কার্য্য তাদৃশ গোষ্ঠীর সহচর হইলেই যথার্থ সুখলাভ ঘটে।"

উৎসবের মধ্যে থেকে স্ত্রী-জাতির সম্পূর্ণ নির্ব্বাসন শুধু যে উৎসব থেকে শ্রীর নির্ব্বাসন করা তা নয়, আমাদের নিজেদের সুসভ্যতার সুভব্যতারও ব্যাঘাতজনক সেটা—মানুষ যখন ভয়ঙ্কর রকম বর্ব্বর, শিক্ষা দীক্ষা চাল চোল সব দিক্ দিয়ে পুরুষগুলো হয়ে উঠেছে যখন মেয়েদের সঙ্গে ভদ্রভাবে মেল্‌বার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, সেই তথাকথিত সভ্যতার দিনে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে উৎসবের শেষ অঙ্কে যবনিকা পড়ে এবং এসে উপস্থিত হয় ধার-করা কন্‌সার্ট্।

আমাদের সমাজ-সংস্কার হঠাৎ যেমন করতে পারা শক্ত, তেম্নি উৎসব-ক্ষেত্রে শ্রীও আনা শক্ত। নিজের ঘরের মধ্যেও নিজের লোকদের নিয়ে স্ত্রী-পুরুষে একসঙ্গে উৎসব, তাতেও সমাজ যখন চোখ রাঙিয়ে ধমক দেয়, পাড়ার পাঁচজন ইট-পাটকেল ছোঁড়ে, তখন সাধারণ উৎসব-ক্ষেত্রে তার চেয়ে ভয়ানক উৎপাত উপস্থিত হবে—শ্রীকে আন্‌লে, তা জানা কথা। শাস্ত্রের বচন লোকের বচন সে তো ঘর-পর বাছে না, তোমার আমার সুখদুঃখ বাছে না, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বাছে না, মেয়েদের ধমকে দিচ্ছে তারা

ওদিকে, পুরুষদের ধমকে দিচ্ছে এদিকে, আর বল্‌ছে উৎসব কর আনন্দ কর ঐক্যতানের সঙ্গে! একাএকা উৎসবের আমাদের অদ্ভুত রকম ঐক্যতান, যার সুর থাকে পদ্মার কোন্ পারে তার ঠিক নেই, তাল পড়ে জোরে জোরে এপারে উৎসাহে আহূত অনাহূত জনসঙ্ঘের মাথায়।

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জয়ন্তী

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

নূরপুরে

মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দীনকে পূর্ব্ব প্রদেশের সুবাদার গোপনে পত্র লিখিয়াছেন যে বাদ্‌শাহ মৃত্যুশয্যায়, তাঁহার মৃত্যুর পর দুই শাহজাদার বিবাদ অবশ্যম্ভাবী, অতএব এই বেলা হইতে এক জনের পক্ষ সমর্থন না করিলে ভবিষ্যতে বিপদ্ ঘটিবে। তাঁহার মতে শাহজাদা রুস্তমই সিংহাসন অধিকার করিবেন, কারণ তাঁহার ক্ষমতা ও বুদ্ধি অধিক, শাহজাদা হাতিম তাঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিবেন না।

এখন, দিল্লীতে যাহার ঘরে জলালুদ্দীন মানুষ হইয়াছিলেন সেই বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা শাহজাদা হাতিমের মাতার নিকট আসা-যাওয়া করিতেন। সেইজন্য মন্‌সব্‌দার কতকটা হাতিমের পক্ষপাতী। উপরন্তু শাহজাদা হাতিমের গুপ্তচর আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল আপনি শাহজাদাকে সাহায্য করুন, তিনি বাদ্‌শাহ হইলে আপনাকে একটা সুবা দেওয়া হইবে। সুবাদারের পত্র পাইয়া মন্‌সব্‌দার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

ওদিকে বিহারীলালেরও নিকট পত্র আসিল। স্বাক্ষর নাই, কিন্তু বিহারীলাল বুঝিতে পারিলেন যে পত্র গৌরীশঙ্করের আদেশে লিখিত। তাহাতেও সংবাদ মন্‌সব্‌দারের পত্রের ন্যায়, কিন্তু পরামর্শ অন্য রকম। পত্রলেখকের মতে শাহজাদা রুস্তম সাম্রাজ্য অধিকার করিবেন তাহাতে সংশয় নাই। পত্রের শেষাংশ এইরূপ — 'এখন সুবাদার মন্‌সব্‌দার সকলেই মুসলমান। শাহজাদা রুস্তম বাদশাহ হইলে [illegible] নিযুক্ত হইবে। আপনার মত উপযুক্ত লোক কম আছে। আপনি কি কেবল জমিদারী করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবেন? দেশের লোকের কাজ করিতে চাহেন না, রাজপুরুষ হইয়া সুশাসন করিতে চাহেন না? আপনি শাহজাদা রুস্তমের পক্ষে হইলেই উচ্চপদে নিযুক্ত হইবেন। আপাততঃ দুই-হাজারীর ফর্ম্মান যাইতেছে, এ দুই হাজার সৈন্য আপনি নিজে সংগ্রহ করিবেন। রায় অযোধ্যানাথের সহিত যাহারা সেদিন রাত্রে আপনার গৃহে গিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে। জয়ন্তপ্রসাদ —তাহাকে কি আর কখন অন্য বেশে দেখিয়াছিলেন?— এ কাজে সামিল আছেন।'

এ কেমন প্রলোভন? জয়ন্তীর সহিত কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অপেক্ষা বিহারীলালের পক্ষে আর কি সুখের হইতে পারে? গৌরীশঙ্করের সঙ্গীরা কোথায়? বিহারীলাল এই সকল কথা ভাবিতেছেন এমন সময় গৌরীশঙ্কর যাহাকে রঘুনন্দন বলিয়া বিহারীলালের সহিত আলাপ করিয়া দিয়াছিলেন তিনি আসিয়া উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি গুরুদেবের পত্র পাইয়াছেন?"

"পাইয়াছি।"

"আপনার কি মত?

"আমি ত ইতিপূর্ব্বেই আপনাদের সহিত যোগ দিয়াছি। এখন শাহাজাদার পক্ষ অবলম্বন করিয়া, দুই হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিব।"

"শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আজ একবার আমাদের শিবিরে আসিবেন?"

[illegible]

"বিচিত্র কি! জয়ন্তপ্রসাদকেও জয়ন্তীর রূপে দেখিতে পাইবেন। যদি স্ত্রীলোক পুরুষ সাজিতে পারে, তাহা হইলে উদাসী ফকীর সিপাহী সাজিবে না কেন?"

বিহারীলাল উঠিয়া কহিলেন, "আপনার সঙ্গে যাইব?"

হাস্যমুখে রঘুনন্দন কহিলেন, "না, সন্ধ্যার পর আসিলেই ভাল হয়। অরণ্যের বাহিরে মন্দিরের নিকট আমাদিগকে দেখিতে পাইবেন।"

রঘুনন্দন চলিয়া গেলেন। দিবাভাগের অবশিষ্ট বিহারীলালের পক্ষে অস্থিরতায় কাটিল। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই পুণ্ডরীককে লইয়া বনের দিকে চলিলেন।

পুণ্ডরীক কহিল, "আবার!"

"দোষ কি?"

"ঐ বনই ত সব নষ্টের গোড়া!"

"কি রকম?"

"কখন বনদেবী, কখন বহুরূপী, কখন বাঘের বাসা,—সবই ত ঐ বনের ভিতর আছে! আমি ভাবিয়াছিলাম বুঝি বা বনের হাঙ্গামা ফুরাইল।"

"সে কথা ঠিক, বনে আর কিছু নাই।"

"তবে আবার কেন সেখানে?"

"এবার বনে নয়, বনের বাহিরে।"

"আঃ বাঁচা গেল! দিনের বেলা বাঘ-ভাল্লুককে ডরাই না, কিন্তু রাত্রে? দানো দৈত্য ব্রহ্মদৈত্য কি আছে, কে জানে? রাম, রাম!"

বিহারীলাল হাসিয়া ফেলিলেন, "পুণ্ডরীক, ওকথা আমি বিশ্বাস করি না। তোমার ভয় নাই, ভূত-প্রেতকেও নয়।"

"কে বলিল? দেখাও দেখি আমাকে একটা ভূত, দেখ ত আমার দাঁতকপাটি লাগে কি না?"

"ভূত দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই ত ভয়, দেখিলে আর কে ভয় পায়?"

পুণ্ডরীক অন্য কথা পাড়িল। "আচ্ছা লালজী, তুমি যেখানে যাইতেছ সেখানে লড়াই-টড়াইয়ের কিছু সুবিধা আছে? একটা নাকি ভারি লড়াই বাধিবে।"

"সে কথা ঠিক। তোমারও লড়াই করিবার সুযোগ হইতে পারে। হয় ত তুমি অনেক সিপাহীর সর্দ্দার হইবে।"

"বল কি, লালজী! এমন কথা যে কখন শুনি নাই।" পুণ্ডরীক আহ্লাদে উরু চাপ্‌ড়াইতে লাগিল।

বিহারীলাল গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "পুণ্ডরীক, সম্মুখে কিছু দেখিতে পাইতেছ?"

"বাশ্‌ রে, কন্ধকাটা ভূত না কি? না, এ কি এ? এ যে তাবু! এক, দুই, তিন, দশ, বিশ, পঞ্চাশ! এ যে লস্কর, ফৌজ, অক্ষৌহিণী! হুঁ, এবার আর কোন গলদ নাই, গল্প নয়, তোফা টাটকা কটকটে লড়াই! যুদ্ধং দেহি! যুদ্ধং দেহি!"

"আরে হনুমান্‌, চুপ কর, নইলে বিনা যুদ্ধেই একটা গুলি খাইবে আর ক্ষুধা-তৃষ্ণার হাত একেবারে এড়াইবে।"

প্রহরী হাঁকিল, "কে?"

"চৌধুরী বিহারীলাল।"

সম্মুখের শিবির হইতে তিন চারি জন বাহির হইয়া আসিলেন—রঘুনন্দন, বংশীধর, আরও কয়েক জন। তাঁহারা বিহারীলালকে অত্যন্ত সমাদরপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিলেন। বিহারীলালের চক্ষু তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া শিবিরের দিকে গেল।

তাঁবুর দ্বারে দাঁড়াইয়া অস্পষ্ট রমণীমূর্ত্তি। জয়ন্তী!

তাবুতে প্রবেশ করিয়া বিহারীলাল দেখিলেন, জয়ন্তী নাই!

জয়ন্তী তাবু হইতে বাহির হইয়া গিয়া একটু দূরে অন্ধকারে দাঁড়াইলেন। বিড়াল যদি বাঘের মাসী হয় তাহা হইলে পুণ্ডরীক তাহার খুড়তুত ভাই হইবে, যেমন আলোকে তেমনি অন্ধকারে দেখিতে পায়। সে গিয়া জয়ন্তীর পাশে হাজির। সে জয়ন্তীকে অত সমীহা করিত কিন্তু সেই হোলির রাত্রির বহুরূপী মূর্ত্তি দেখিয়া পর্য্যন্ত তাহাকে গ্রাহ্যই করিত না; বলিল, "দাড়ী কি ধোপার বাড়ী গিয়াছে? তা আজকাল অমন হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে ধোপার বাড়ী দেওয়া ভাল।"

জয়ন্তী কপট রাগ করিয়া কহিল, "তোমার দিন দিন স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে।"

"দিন-দিন? কয় দিন? আজ, কাল, পরশু? সে—"

রাত আর এ—ই দিন ! দিন দিন কেমন করিয়া হইল ?"

জয়ন্তী হাসিতে লাগিল।

তাঁবুর ভিতরে বসিয়া বিহারীলাল বলিতেছিলেন, "আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাকে যে ভার অর্পিত হইয়াছে আমি তাহা গ্রহণ করিয়াছি। কল্য হইতে আরম্ভ করিব। এক পক্ষের মধ্যে দুই সহস্র সৈন্য আমার অধীনে প্রস্তুত থাকিবে। আমাকে আর কি করিতে হইবে ?"

রঘুনন্দন কহিলেন, "দুই এক দিনে জানিতে পারিবেন। সম্প্রতি এই মহকুমা আপনার অধীন হইবে, তাহার পর আবশ্যক হয় আপনাকে স্বসৈন্যে শাহজাদার সহিত যোগদান করিতে হইবে।"

"আদেশ প্রাপ্ত হইলে আমি সেই দণ্ডে যাত্রা করিব। আপনাদের কি অভিপ্রায় ?"

"আমরাও আপনার সঙ্গে থাকিব। আপনি সেনাপতি।"

"আমি অযোগ্য, যুদ্ধের আমার কি অভিজ্ঞতা আছে ?"

"সে কথা যাহারা আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন।"

বিহারীলাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "আপনাদের সঙ্গে আর-একজন হোলির সময় গিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। জয়ন্তপ্রসাদ কোথায় ?"

অল্প হাসিয়া রঘুনন্দন কহিলেন, "একটু মুস্কিল হইয়াছে। তখন তিনি পুরুষ ছিলেন, এখন স্ত্রীলোক।"

"সে কথা আমি জানি। পুরুষ সাজিবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল।"

"তবে এ দিকে আসুন।"

রঘুনন্দন পথ দেখাইয়া তাঁবুর বাহিরে গেলেন। বাহিরে অল্প অন্ধকারে জয়ন্তী দাঁড়াইয়া ছিল। বিহারীলাল দ্রুতপদে গিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন। দুই জনে কথা কহিতে কহিতে শিবিরের বাহিরে চলিলেন। রঘুনন্দন পিছাইয়া পড়িলেন। পুণ্ডরীক কোথায় গেল দেখা গেল না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যোৎস্নালোকে

শিবির একটা উপবনের মধ্যে। সেইজন্য সেখানে অল্প অন্ধকার। বাহিরে জ্যোৎস্না, বড় মধুর বড় মায়াময়ী। বাতাস থাকিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু বহিতেছে। শিবিরের শব্দ স্তব্ধ হইয়া আসিল। কখন কোন পক্ষীর রব, আবার চারিদিক্ শব্দশূন্য। অদূরে অন্ধকার অরণ্য।

পূর্ব্বদৃষ্ট মন্দির সম্মুখে আসিল। বিহারীলাল জয়ন্তীর হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন। যেখানে জয়ন্তী অশ্বে আরোহণ করিয়াছিল বিহারীলাল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হৃদয়ের আবেগপূর্ণ-স্বরে বিহারীলাল ডাকিলেন, "জয়ন্তী !"

জয়ন্তী নিরুত্তর।

"মনে পড়ে এইখানে তুমি অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলে ?"

"পড়ে।"

"সেই প্রথম হস্তে হস্তে স্পর্শ ?"

"পড়ে।"

"দোলের রাত্রি ?"

"মনে পড়ে।"

"পুরুষ সাজিয়াছিলে কেন ?"

"গৌরীশঙ্করের আদেশ। এ বেশে যাইতে পাইতাম না।"

"তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা আমাদের দেখা হয় ?"

"কি জানি !"

"গৌরীশঙ্কর তোমার কে ?"

"তিনি আমার পিতৃতুল্য। আমার পিতা মাতা নাই, তিনি আমাকে লালন পালন করিয়াছিলেন। এই লোক-সেবা-ব্রতেও তিনি আমাকে দীক্ষিত করেন।"

"আমি তোমার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করি নাই, আজ রঘুনন্দন আর সকলে ইচ্ছা করিয়া তোমাকে আমার সঙ্গে আসিতে দিলেন। ইহার অর্থ এই যে আমাদের মিলনে কাহারও আপত্তি নাই।"

জয়ন্তী আবার নিরুত্তর।

দুই জনে দূর্ব্বাসনে উপবেশন করিলেন। এমন আসন কোথায় আছে?

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই কথা!

"জয়ন্তী, মনে পড়ে?"

"পড়ে।"

"সেই বনে প্রথমে দেখা, সেই বনদেবীর আবির্ভাব?"

"পড়ে।"

"আমার হৃদয় তখনই চঞ্চল হইয়াছিল। আর তোমার?"

জয়ন্তীর মস্তক নত হইল—নত হইয়া, কোন অপূর্ব্ব চুম্বকে আকৃষ্ট হইয়া, বিহারীলালের স্কন্ধে রক্ষিত হইল। ক্ষুদ্র, তপ্ত নিঃশ্বাসের ন্যায় বিহারীলালের কর্ণে শব্দ প্রবেশ করিল, "আমারও।"

"মনসবদার তোমাকে তাহার বেগম করিতে চাহিয়াছিল?"

"তাহার কথায় কাজ নাই।"

"তুমি আমারই।"

"আমি তোমারই।"

বিহারীলালের স্কন্ধে মস্তকের ভার গুরু হইল।

"জীবনে মরণে, জন্মে জন্মে, যুগে যুগে তুমি আমার।"

জয়ন্তীর বলয়িত বাহুলতা বিহারীলালের কণ্ঠে লগ্ন হইল, কম্পিত কোমল কণ্ঠে উত্তর আসিল, "অনাদি অনন্ত কালে, জীবনে মরণে, জাগরণে শয়নে, সুখে দুঃখে, ভোগে ত্যাগে আমি তোমার! বল তুমি আমার!"

চির পুরাতন, চির নূতন এই প্রথম প্রণয়ের লীলা! সেই একই কথা শত শত বার, সেই কম্পিত করে করে স্পর্শন, সেই ঢল ঢল সিক্ত নয়নে নয়নে মিলন! সেই হৃদয়ের আবেগ, সেই গুরু গুরু দুরু দুরু থর থর বক্ষ, সেই আশা, সেই ভয়, সেই মিলনের অতৃপ্তি! পুরুষ ও রমণীর প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ! হৃদয়ের সকল তন্ত্রী একত্রে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, নিখিল বিশ্বে সপ্ত স্বরে প্রেমসঙ্গীত ভাসিয়া বেড়ায়! এক মুহূর্ত্তে বিশ্বচরাচরের মূর্ত্তি নূতন হইয়া যায়, উদ্বেলিত প্রেমতরঙ্গ সর্ব্বত্র আঘাত করে! হৃদয় হইতে অঞ্জলিপূর্ণ প্রেম দিকে দিকে বিতরণ করে, এক নিমেষে কাঙ্গাল কুবের হয়! এই নরনারীর যুগ্ম রূপ, দুইয়ে এক, একাধারে হরগৌরী! প্রেমের এই আলাপ, মিলনের এই সম্ভাষণ, বহু পুরাতন আবার নিত্য নূতন!

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পুণ্ডরীকের পদোন্নতি

পর দিন প্রভাতে চৌধুরীদের সিংহদ্বারে নহবত বাজিল না, তাহার বদলে ডঙ্কা বাজিল। সেই দুন্দুভি-নিনাদে গ্রামের লোক চমকিয়া উঠিল। কত বৎসর, হয়ত দুই এক পুরুষ কেহ এ শব্দ শুনে নাই। গুড়ু গুড়ু গুম্, গুড়ু গুড়ু গুম্! মেঘগর্জ্জনের ন্যায় এ শব্দের অর্থ কি? পূর্ব্বে না শুনিলেও তাহার অর্থ সকলে বুঝিতে পারিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, জমীদার-বাড়ীতে নাগরা বাজে কেন?"

উত্তর, "কেন আবার জানিসনে? যুদ্ধ হবে। ঘরে কি অস্ত্র শস্ত্র আছে, বাহির কর্।"

"যুদ্ধ ত বাদ্‌শাহের বেটারা করিবে, তার এখানে কি?"

"আরে পণ্ডিতের পুত, মাঝ দরিয়ায় ঢেউ উঠ্‌লে ডাঙ্গায় লাগে কেন? আর কিনারায় কাছী-বাঁধা ডিঙ্গীই বা ঝপাস্ ঝপাস্ ক'রে আছাড় খায় কেন? এখন বুঝ্‌লে ঢেঁকিরাম? বাদ্‌শাহী দরিয়া বড় দরিয়া! সেখানে উঠ্‌লে তুফান দেশটা হবে খান খান। কেউ রক্ষা পাবে না।"

"তাই ত! এখন উপায়?"

উপায় যা পূর্ব্ব পুরুষে করত তাই। লাঠি সোঁটা, বর্শা, তলওয়ার যা আছে নিয়ে আয়।"

চারিদিকে ভারি হৈচৈ পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত জমিদারীতে খবর হইয়া গেল। যে যাহা অস্ত্র পাইল লইয়া জমিদার-বাড়ী ছুটিল। 'যায় প্রাণ যাবে লড়াইয়ে, তা বলে' কি পুরুষপদ্ধতি ভুলবে'—মুখে মুখে এই কথা। বিহারীলালের বাড়ীর সম্মুখের বৃহৎ মাঠ ভরিয়া গেল। নায়েব গোমস্তা রসদের সরঞ্জাম করিতে ছুটিল, যত গ্রামের বেনের দোকান খালি হইতে লাগিল।

বিহারীলাল মাঠের চারিদিকে ঘুরিয়া প্রজাদিগকে বলিলেন, "তার আসিয়া পড়িল, অস্ত্র শস্ত্রও আসিতেছে।

যুদ্ধ যে হইবেই এমন কোন কথা নাই, তবে প্রস্তুত হওয়া ভাল। আমি তোমাদিগকে শিখাইব।"

"লড়াই হয় হবে হুজুর, আমরা কি কেউ পিছপা? আর মরণ ত এক দিন আছেই, কি বল পরামাণিক ভায়া?"

পুণ্ডরীক বিহারীলালের পিছনে পিছনে, দেখিয়া শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। মাঠ হইতে ফিরিতে বিহারীলাল তাহাকে কহিলেন, "পুণ্ডরীক।"

"হুজুর!" পুণ্ডরীকের রসিকভাব কৌটাটা হঠাৎ খালি হইয়া গিয়াছিল।

"যদি যুদ্ধ হয় তাহা হইলে তোমাকেও যাইতে হইবে।"

"যেখানে তুমি সেখানে আমি।" পুণ্ডরীকের বুদ্ধি ফিরিয়া আসিতেছিল। "আমার কি ঘরে স্ত্রীপুত্র আছে যে আমি মরিলে কাঁদিবে?"

"তুমি উত্তম সিপাহী হইবে। যুদ্ধে দক্ষতা দেখাইলে আমার নীচে একটা সেনাপতির মত হইতে পার।"

"আমি নায়েব সেনাপতি—আমি!" পুণ্ডরীকের বুক ফুলিয়া মাছের পটকার মত হইল।

"এখনি নয়। তবে আমার সঙ্গে তুমি কতক কতক সৈন্যশিক্ষার ভার লইতে পার।"

পুণ্ডরীক ভারি খুসী। যাহাকে তাহাকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে বিহারীলালের পরেই সে ছোট সেনাপতি হইবে। বোঝা বোঝা অস্ত্র যখন আসিয়া পড়িল তখন তাহার ব্যস্ততা দেখে কে! বিহারীলাল যদি অস্ত্র শিক্ষা দেন এক ঘণ্টা, ত সে শিখায় আড়াই ঘণ্টা। যুদ্ধ ত দূরের কথা, পুণ্ডরীকের শিক্ষার চোটে গরিব প্রজাদের প্রাণ যায়! তাহার তর্জ্জন গর্জ্জন, তাহার বিকট মুখভঙ্গী, তাহার আস্ফালন দেখিয়া শুনিয়া নূতন সৈন্যদের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। আবার যখন তাহাদিগকে শিখাইবার জন্য পুণ্ডরীক তলওয়ার খেলা করে, বিদ্যুতের মত অসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন চাষাভূষা সৈন্যেরা ডাকাত পড়িয়াছে মনে করিয়া বিশ হাত দূরে পলায়ন করে। তাহার হুঙ্কারে তাহাদের প্রীহা চমকিয়া উঠে। এক দিন হঠাৎ বিহারীলাল আসিয়া দেখেন পুণ্ডরীক বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তরবারি-হস্তে লাফাইতেছে। তাঁহাকে সে দেখিতেই পায় নাই। বিহারীলাল কহিলেন, "পুণ্ডরীক, এ কি?"

পুণ্ডরীক থমকিয়া দাঁড়াইল। লজ্জিত হইয়া অসি নামাইল। কহিল, "আজ্ঞে, তরবারি যুদ্ধ শিখাইতেছি।"

"প্রথমে ত শায়েস্তা কর, তার পর যুদ্ধ। আর সৈন্যের মাঝখানে কি তরবারি খেলা করা যায়?"

বিহারীলাল সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, একত্রে অগ্রসর হইতে, পিছু হটিতে, ব্যূহ রচনা করিতে শিখাইলেন। সেদিনকার মত শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পুণ্ডরীককে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। পথে তাহাকে বলিলেন, "আমি যেমন শিখাই সেইরূপ শিখাইবে। সৈন্যদিগকে তাহাদের অসাধ্য অস্ত্র কৌশল শিখাইবার চেষ্টা করিও না। প্রথম হইতেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করাইলে তাহারা কিছুই পারিবে না।"

পুণ্ডরীকের মুখ চুন হইয়া গেল। কহিল, "এবার হইতে ঠিক তোমার মত শিখাইব।"

বিহারীলাল সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন ও তাহাদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেছেন এ কথা মনসব্‌দারের জানিতে বিলম্ব হইল না। তিনি প্রথমে মকদুম শাহকে পাঠাইলেন। শাহজী আসিয়া বিহারীলালকে বলিলেন, "চৌধুরী সাহেব, আপনি এ কি করিতেছেন?"

বিহারীলালের পূর্ব্বের সে অলস ভাব, আলস্যজড়িত কথা একেবারেই নাই। এখন কর্ম্মীর ন্যায় সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট কথা। কহিলেন, "যাহা বলিবার স্পষ্ট করিয়া বলুন।"

"আপনি কাহার আদেশে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন? ইহা ত বিদ্রোহের ব্যাপার।"

"আমি কি গোপনে কিছু করিতেছি? আপনি কি এ কথা মনসবদার সাহেবের পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

"তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

"তাঁহাকে বলিবেন যে আমি আদেশ পাইয়াই এরূপ করিতেছি। আর যদি কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে তাহা হইলে যেন তিনি নিজে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন।"

"তাহাই হইবে," খাপা হইয়া মকদুম শাহ্ চলিয়া গেলেন।

সৈন্যের আয়োজন তেমনি চলিতে লাগিল। একদিন মন্‌সব্‌দার চল্লিশ জন অশ্বারোহী লইয়া আগমন করিলেন। মেজাজ গরম, মুখে নিষ্ঠুরতার চিহ্ন আরও স্পষ্ট। না বসিয়াই তিনি বলিলেন, "বিহারিলাল চৌধুরী, আগুন লইয়া খেলা করিলে হাত পুড়িবে ইহাতে বিচিত্র কি? আমি তোমার নিকট উপকৃত তাহা ভুলি নাই, কিন্তু যাহার নিমক খাই তাহার কাছে নিমকহারামী করিতে পারি না। তুমি বিদ্রোহীর আচরণ করিতেছ, অতএব তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। এ মহকুমার শান্তির জন্য আমি দায়ী।"

বিহারীলাল স্মিতমুখে মনসব্‌দারের কথা শুনিতেছিলেন। কহিলেন, "আপনি কি আমার গ্রেপ্তারির আদেশ পাইয়াছেন?"

"কাহার আদেশ? এখানে হুকুম ত আমার। ইচ্ছা করিলে তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি, ইচ্ছা করিলে ফাঁসি দিতে পারি।"

"বটে? বাহিরে কে আছ? পুণ্ডরীক!"

পুণ্ডরীক তৎক্ষণাৎ উপস্থিত, বিহারীলালের মুখ দেখিয়া অসিমুষ্টিতে হাত দিল। বিহারীলালের মুখের হাসি তখনও মিলায় নাই, কিন্তু মুখের ভাব বড় কঠিন, নিশিত খড়্গের ন্যায় চক্ষু জ্বলিতেছিল।

"পুণ্ডরীক, বাহিরের অশ্বারোহীদিগকে ঘেরাও কর। যদি বল প্রকাশ করে, কাটিয়া ফেল।"

পুণ্ডরীকের শিক্ষা হইয়াছিল ভাল। দরজার দিকে এক পদ আগাইয়া বাঁশী বাহির করিয়া বাজাইল। দেখিতে দেখিতে এক শত অশ্বারোহী উলঙ্গ অসি হস্তে মন্‌সব্‌দারের অশ্বারোহীদিগকে ঘিরিল।

মনসব্‌দারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বিহারীলাল কহিলেন, "ইহাকে গ্রেপ্তার কর!"

পুণ্ডরীক কলের মত ঘুরিয়া মন্‌সবদারের পাশে গিয়া তাঁহার স্কন্ধে হাত দিল।

বিহারীলাল বজ্রকঠিন স্বরে, অথচ ধীরে, কহিলেন, "জলালদ্দীন মনসবদার, এখন যদি তোমাকে আমার বাড়ীর বাহিরে গাছে লট্‌কাইয়া দিই, তাহা হইলে কে তোমাকে রক্ষা করে?"

মন্‌সব্‌দার ভীরু প্রকৃতির লোক নহেন আর সত্য সত্যই যে বিহারীলাল তাঁহাকে ফাঁসি দিবেন সে আশঙ্কাও তাঁহার হয় নাই, তবে অপমানে ও ততোধিক লজ্জায় তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি সে অঞ্চলের প্রধান রাজকর্ম্মচারী, বিহারীলাল ধনী হইলেও রইয়ত, তাঁহার শাসনের অধীন। তাঁহার তুলনায় বিহারীলাল বালক। সে কি না একটা সামান্য ভৃত্যের সমক্ষে তাঁহাকে এমন করিয়া অপমান করে, প্রাণদণ্ডের ভয় দেখায়। ক্রোধ সম্বরণ করিয়া মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "তুমি আমাকে আজ যে অপমান করিলে তাহার শাস্তি বাদ্‌শাহ দিবেন।"

বিহারীলাল কহিলেন, "বাদ্‌শাহ কে? আজ এক বাদ্‌শাহ, কাল অন্য বাদ্‌শাহ। যিনি বাদ্‌শাহ হইবেন তাঁহার আদেশে আমি ফৌজ জড় করিতেছি, এ কথা আপনি জানেন?"

মন্‌সব্‌দার চিন্তিত হইলেন। তবে ত বিহারিলালের পিছনে শাহজাদা রুস্তম আছেন! বাদ্‌শাহ এতক্ষণ জীবিত আছেন কি না তাহাই বা কে জানে? মন্‌সব্‌দার নিজে ত এ পর্য্যন্ত কোন্ ভাইয়ের দিকে হইবেন স্থির করিতে পারেন নাই। ভাল করিয়া ভিতরের কথা না জানিয়া বিহারীলালকে এ রকম করিয়া ভয় দেখান ভাল কাজ হয় নাই। জলালুদ্দীন সুর বদ্‌লাইলেন। নরম হইয়া কহিলেন, "তুমি যে শাহজাদা রুস্তমের আদেশে এই-সকল আয়োজন করিতেছ তাহা আমি জানিতাম না।"

"কেন, আমি ত মকদুম শাহকে বলিয়াছিলাম যে আমি আদেশ-মত এইরূপ করিতেছি। শাহজাদা কিংবা আর কাহারও নাম নাই বা বলিলাম।"

"আমার বুঝিতে ভুল হইয়াছিল, তুমি কিছু মনে করিও না। এখন যাহা হইয়াছে, ভুলিয়া যাও।"

সরলভাবে হাসিয়া বিহারীলাল কহিলেন, "আমি কোন কথা মনে রাখিব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

মন্‌সব্‌দার বিহারীলালের হাত ধরিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বৈদিক দেবগণের একত্ব

বেদসংহিতার অধিকাংশ ঋষিই বহুদেববাদী ছিলেন। সংহিতার কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে দেবগণের সংখ্যা ৩৩।* ইঁহাদিগের মধ্যে ১১জন দ্যুলোকে, ১১জন অন্তরীক্ষে এবং ১১জন পৃথিবীতে বাস করেন।† কোন কোন স্থলে নির্দ্দিষ্ট এক দেবতার সহিত ৩৩জন দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে।‡ এই-সমুদায় অংশ পড়িলে মনে হয় দেবগণের সংখ্যা ৩৪। এইরূপ ব্রাহ্মণ-আরণ্যকাদিতেও কোন স্থলে দেবগণের সংখ্যা ৩৩, কোন স্থলে বা ৩৪। রামায়ণ ও মহাভারতে ৩৩জন দেবতার কথা বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের দুই স্থলে§ এবং বাজসনেয় সংহিতার এক স্থলে¶ বলা হইয়াছে দেবগণের সংখ্যা ৩৩৩৯ (৩৩ + ৩০৩ + ৩০০৩)।

সংহিতায় যে-সমুদায় দেবতার নাম করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা গণনা করিলে ৩৩ কিংবা ৩৪ অপেক্ষা বেশী নাম পাওয়া যায়। সুতরাং দেবগণের সংখ্যা কত তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কিন্তু দেবগণ যে বহু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ঋষিগণ সাধারণতঃ বহু দেবতারই উপাসনা করিতেন। কিন্তু কেহ কেহ দেবগণের একত্বও অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে-ভাবে একত্ব অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

১। বহুর শক্তি একই।

ঋগ্বেদের একটি সূক্তে (৩।৫৫) ২২টি ঋক্ আছে। প্রত্যেক ঋকেরই শেষভাগে উক্ত হইয়াছে :—

মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্।

মহৎ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্। অর্থাৎ দেবগণের মহৎ অসুরত্ব একই।

সংহিতা-যুগের প্রথম ভাগে দেবগণকেও অসুর বলা হইত। "অসু" শব্দ হইতে অসুর শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। "অসু" শব্দের অর্থ "প্রাণ" "ক্ষমতা" ইত্যাদি। যাহার প্রাণ বা শক্তি আছে তিনিই অসুর। 'দেবগণের অসুরত্ব' অর্থ "দেবগণের শক্তি"।

পূর্ব্বোক্ত সূক্তে বলা হইয়াছে যে দেবগণের যে অসুরত্ব তাহা একই। দেবগণের ক্ষমতা একপ্রকার, কার্য্য একপ্রকার, সুতরাং প্রকৃতিও একপ্রকার। এক শ্রেণীর জ্ঞানবাদী আছেন, যাঁহারা বলেন—"যদি দেখি দুইটি বস্তুর গুণ কার্য্য ও প্রকৃতি একই, তাহা হইলে, সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, সে দুইটি বস্তু দুইটি বস্তু নহে, তাহারা যে কেবল কার্য্যতঃই এক তাহা নহে, তাহা বস্তুতঃও এক।" এই যুক্তি অবলম্বন করিলে ঋষিগণও বলিতে পারিতেন যে, দেবগণের কার্য্য যখন একপ্রকার, ক্ষমতা একপ্রকার এবং প্রকৃতিও একপ্রকার, তখন এ-সমুদায় দেবতা ভিন্ন ভিন্ন নহেন, ইঁহারা একই। তাঁহারা একপ্রকার সিদ্ধান্ত করেন নাই, কিংবা করিতে পারেন নাই। ক্ষমতার একত্বের দিকেই তাঁহাদিগের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল। সেইজন্য কেবল বলিয়া গিয়াছেন "দেবগণের মহৎ অসুরত্ব একই।"

২। একই বহু।

কোন কোন ঋষি বহুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া একত্ব দর্শন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বা প্রথমেই একত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহার পরে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বহুত্ব কি প্রকারে আসিল। এই সংক্রান্ত কয়েকটি মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(ক)

দীর্ঘতমা নামক ঋষি একস্থলে বলিয়াছেন—

জ্ঞানিগণ ইঁহাকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ এবং অগ্নি বলিয়া থাকেন। তিনি স্বর্গীয় ও সুন্দর-পক্ষ-বিশিষ্ট গরুৎমান্। ইনি এক হইলেও জ্ঞানিগণ ইঁহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন—ইনিই অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা।

---

* ৮।২৮।১, ৮।৩০।২ ঋগ্বেদ ; ১০।৭।১২,২৩,২৭ ইত্যাদি অথর্ব্ব।

† ঋঃ ১।১৩৯।১ ; অথর্ব্ব ১৯।২৭।১১—১৩।

‡ ঋঃ ১।৪৫।২ ; ৩।৬।৯ ; ৮।৩৫।৩, ৯।৯২।৪ ইত্যাদি।

§ ৩।৯।৯, ১০।৫২।৬।

¶ ৩৩।৭।

— ১।১৬৪।৪৬।

(খ)

সধ্র নামক এক ঋষি এক স্থলে বলিয়াছেন—

সেই পক্ষী এক হইলেও মেধাবী কবিগণ তাঁহাকে বাক্য দ্বারা বহুরূপে কল্পনা করিয়া বর্ণনা করেন। —১০।১১৪।৫।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি ঋকে একই কথা বলা হইল। দেবতা একই; বর্ণনা করিবার সময় বহুরূপে কল্পনা করা হয়।

(গ)

এই তত্ত্ব ঋষিগণ অন্যভাবেও প্রকাশ করিয়াছেন। ত্রিশিরা ঋষি এক স্থলে অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

হে অগ্নি!···তুমিই বরুণ।—১০।৮৫।৫।

(ঘ)

বসিষ্ঠ ঋষি একস্থলে বলিয়াছেন—হে অগ্নি! তুমিই বরুণ, তুমিই মিত্র।—৭।১২।৩।

(ঙ)

বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন—

অগ্নি যখন সমিদ্ধ হন, তখন মিত্র হন। সেই মিত্রই হোতা এবং বরুণ। ৩।৫।৪।

(চ)

বসুশ্রুত বলিয়াছেন—

হে অগ্নি! যখন তুমি উৎপন্ন হও, তখন তুমি বরুণ। যখন তুমি সমিদ্ধ হও, তখন তুমি মিত্র। ······সমস্ত দেবগণই তোমাতে। তুমিই ইন্দ্র,······তুমি কন্যাগণের নিকট অর্য্যমা।—৫।৩।১,২।

(ছ)

গৃৎসমদ বলিয়াছেন—

হে অগ্নি! তুমিই ইন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মণস্পতি, তুমিই রাজা বরুণ, তুমিই মিত্র, তুমিই অর্য্যমা, তুমিই অসুর রুদ্র, তুমিই পূষা, তুমিই সবিতা, তুমি ভগ, তুমি অদিতি···তুমি হোতা, ভারতী, তুমি ইলা, তুমি সরস্বতী।—২।১।৩—১১।

(জ)

অথর্ব্ববেদের একস্থলে আছে—

সায়ংকালে অগ্নি বরুণ হন, প্রাতঃকালে উদিত হইয়া মিত্র হন, সবিতা হইয়া অন্তরিক্ষে গমন করেন, তিনি ইন্দ্র হইয়া আকাশের মধ্যস্থলে উত্তাপ প্রদান করেন। —১৩।৩।১৩।

(ঝ)

অথর্ব্ববেদের অপর একস্থলে এই প্রকার আছে—

সবিতা স্বর্গলোকে গমন করেন, মহেন্দ্ররূপে গমন করেন; তিনি ধাতা ও বিধর্ত্তা; তিনি বায়ু, তিনি অর্য্যমা, তিনি বরুণ, তিনি রুদ্র, তিনি মহাদেব, তিনি অগ্নি, তিনি সূর্য্য, তিনি মহাযম। যাহারা প্রাণবান্, যাহারা প্রাণবিহীন, সে-সমুদায়কেই তিনি দর্শন করেন···তিনি এক, একবৃৎ, কেবল একই। সমুদায় দেবতা ইহাতে একবৃৎ হয়।···তাঁহাকে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বলা হয় না, পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তমও বলা হয় না··· তিনি এক, একবৃৎ, কেবল একই; সমুদায় দেবতা ইহাতে একবৃৎ হয়। তিনি মৃত্যু, তিনি অমৃত; তিনি অভ্ব, তিনি রক্ষ, তিনি রুদ্র।—১৩।৪।১—২৬।

ইহার কয়েকটি মন্ত্রের পরই দেবতাকেই সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে:—

হে মঘবন্ (=দাতা)! এই-প্রকার তোমার মহিমা, তোমার তনু শত, তোমার তনু শতকোটী এবং সহস্র কোটী (১৩।৪।৪৪, ৪৫)।

এই মন্ত্রে দেখা যাইতেছে যে একই দেবতা বহু রূপে প্রকাশিত হন, বহু রূপ ধারণ করেন এবং বহু নামে পরিচিত হন।

গোতম ঋষি ঋগ্বেদের একটি ঋকে এই প্রকার বলিয়াছেন—

অদিতিই দ্যৌ, অদিতি অন্তরিক্ষ, অদিতি মাতা, তিনিই পিতা, তিনিই পুত্র, অদিতিই বিশ্বদেব, এবং পঞ্চ শ্রেণীর মানব। যাহার জন্ম হইয়াছে তাহাও অদিতি, আর যাহার জন্ম হইবে তাহাও অদিতি।—১।৮৯।২০।

এই স্থলে অদ্বৈতবাদের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

৩। অন্যোন্যাশ্রয়ে একত্ব।

ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদে অতি আশ্চর্য্য কয়েকটি মন্ত্র আছে—

(ক)

একস্থলে উক্ত হইয়াছে—

অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন এবং দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন।—ঋগ্বেদ ১০।৭২।৪।

(খ)

অন্য একস্থলে আছে—

পুরুষ হইতে বিরাট্ জন্মিলেন এবং বিরাট্ হইতে পুরুষ জন্মিলেন।—১০।৯০।৫।

(গ)

আর-একস্থলে ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—

"তুমি মাতা ও পিতাকে একসঙ্গে স্বদেহ হইতে উৎপাদন করিয়াছ।"—ঋঃ ১০।৫৪।৪।

দ্যৌ ও পৃথিবী দেবগণেরও পিতা ও মাতা। এই স্থলে এই দ্যৌ ও পৃথিবীকেই পিতা ও মাতা বলা হইয়াছে।

এই মন্ত্র হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে ইন্দ্র দ্যৌ ও পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং দ্যৌ ও পৃথিবী ইন্দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

(ঘ)

অথর্ববেদেও অনুরূপ ভাব রহিয়াছে। সবিতাকে লক্ষ্য করিয়া ঋষি বলিতেছেন—

তিনি দিবস হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং দিবস তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি রাত্রি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং রাত্রি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি অন্তরিক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং অন্তরিক্ষ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং বায়ু তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি দ্যৌ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং দ্যৌ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি দিক্‌সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং দিক্‌সমূহ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি ভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ভূমি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং অগ্নি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং জল তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি ঋক্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ঋক্ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যজ্ঞ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।—১৩।৭।২৯—৩৯।

ঠিক ইহার পরেই আছে—"তিনি যজ্ঞ, তাঁহারই যজ্ঞ, এবং তিনিই যজ্ঞের মস্তক।"—১৩।৪।৪০।

এই-সমুদায় মন্ত্রে দেখা যাইতেছে যে দেবগণ পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়, পরস্পর পরস্পর হইতে উৎপন্ন।

কিন্তু এ-সমুদায়ের অর্থ কি? অনেকেই বলিবেন এ-সমুদায় অসম্ভব ও অর্থশূন্য কথা। এ-প্রকার বলিবার কারণও যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু এই-সমুদায় বৈদিক মন্ত্র যে নিতান্তই অমূলক তাহা নহে।

যাস্ক ঋগ্বেদের ১০।৭২।৪ অংশ (পূর্ব্বোক্ত "ক" অংশ) উদ্ধৃত করিয়া এই প্রকার বলিতেছেন—

"ইহা কি-প্রকারে সম্ভব? (উত্তর) (১) এতদুভয়ের (অর্থাৎ দক্ষ ও অদিতির) সমান জন্ম হইতে পারে; (২) কিংবা দেবধর্ম্ম অনুসারে ইঁহারা পরস্পর পরস্পর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; পরস্পর পরস্পর হইতে স্বপ্রকৃতি লাভ করিয়াছেন।" ১১।২৩; ৭।৪ অংশও দ্রষ্টব্য।

আমাদিগের মনে হয় পূর্ব্বোক্ত অংশসমূহে ঋষিগণের মৌলিক মনোগত ভাব দেবগণের একত্ব। যাস্কও ইহাই বলিয়াছেন। সমুদায় দেবতাই যদি এক হয়, তাহা হইলে যে দেবতা সৃষ্ট, সেই দেবতাই স্রষ্টা। এখানে একটি বাক্য গ্রহণ করা যাউক—

অদিতি হইতে দক্ষের সৃষ্টি (ক)। স্বীকার করা যাউক যে অদিতি = দক্ষ, এবং দক্ষ = অদিতি।

যদি (ক) বাক্যে 'অদিতি' স্থলে 'দক্ষ' এবং 'দক্ষ' স্থলে 'অদিতি' বসান হয় তাহা হইলে (ক) বাক্য পরিবর্ত্তিত হইয়া এই প্রকার হইবে—

"দক্ষ হইতে প্রজাপতির উৎপত্তি।"

সুতরাং একত্ব স্বীকার করিলে এতদুভয়ই বলা যায় যে 'অদিতি হইতে দক্ষের উৎপত্তি' এবং 'দক্ষ হইতে অদিতির উৎপত্তি'।

ঋষিগণ যে ভাষা ও ভাব এই ভাবেই বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন আমরা তাহা বলিতেছি না। আমাদের বক্তব্য এই—সম্ভবতঃ ঋষিগণ একত্ব অনুভব করিয়াই পূর্ব্বোক্ত ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। যদি সর্ব্বত্রই একত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, জনক-জননীর সহিত সন্তানের

পারে যে প্রত্যেক দেবতাই অপর দেবতা হইতে উৎপন্ন কিংবা প্রত্যেক দেবতাই অপর দেবতার উৎপাদক।

অন্য-ভাবেও এই একত্ব ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। একই সত্তা একই সময়ে অদিতি ও দক্ষরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এই অদিতি ও দক্ষ পরস্পর সম্পর্কিত, একের প্রকৃতি অপরের দ্বারা নিয়মিত, একের উৎপত্তি না হইলে সেই সময়ে অপরের উৎপত্তি হইত না। এই ভাবেই বলা যাইতে পারে যে অদিতি হইতে দক্ষের জন্ম এবং দক্ষ হইতে আদিতির জন্ম। যাস্কও ইহা বলিয়াছেন।

আমরা পরোক্ষভাবে যাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম, এক স্থলে তাহা প্রত্যক্ষ-ভাবেও বলা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের এই অংশ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে—

"তিনি যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যজ্ঞ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনিই যজ্ঞ।"—১৩।৪।৩৯,৪০।

এখানে প্রথমে বলা হইল দেবতা ও যজ্ঞ—পরস্পর স্রষ্টা ও সৃষ্ট; তাহার পরে অতি স্পষ্ট ভাবে বলা হইল যে দেবতাই যজ্ঞ অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্ট একই সত্তা।

স্রষ্টৃদেবতা ও সৃষ্ট দেবতা যে একই দেবতা এবং একই প্রকৃতির, তাহা অন্যপ্রকার (এবং আপাত-বিপরীত-অর্থ-প্রকাশক) মন্ত্র দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। অথর্ব্ববেদের একস্থলে (১১।৮।৮) এই প্রশ্ন করা হইয়াছে—

"কোথা হইতে ইন্দ্র, কোথা হইতে সোম, কোথা হইতে অগ্নি? কোথা হইতে ত্বষ্টা উৎপন্ন হইল? কোথা হইতে ধাতা জন্মগ্রহণ করিল?

ইহার পরের মন্ত্রে ইহার এইপ্রকার উত্তর দেওয়া হইয়াছে—

ইন্দ্র হইতে ইন্দ্র, সোম হইতে সোম, অগ্নি হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে। ত্বষ্টা হইতে ত্বষ্টা এবং ধাতা হইতে ধাতা উৎপন্ন হইয়াছে।—১১।৮।৯।

আমরা দুই শ্রেণীর মন্ত্র পাইলাম—

(১) প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রে বলা হইয়াছে, দেবগণ পরস্পর পরস্পর হইতে উৎপন্ন; যেমন অদিতি হইতে দক্ষ এবং দক্ষ হইতে অদিতি উৎপন্ন।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে দেবত আপনা হইতেই অর্থাৎ স্ব-রূপ হইতে উৎপন্ন; যেমন ইন্দ্র হইতে ইন্দ্র উৎপন্ন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রে স্রষ্টা ও সৃষ্টদেবতার একত্ব প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর মন্ত্র দ্বারা কেবল যে স্রষ্টা ও সৃষ্টের একত্ব প্রমাণিত হইতেছে তাহা নহে, এই সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব দেবতার একত্বও প্রমাণিত হইতেছে।

এই প্রবন্ধে ত্রিবিধ একত্ব দর্শনের কথা বলা হইল।

(১) প্রথমতঃ, কোন কোন ঋষি কেবল দেবগণের ক্ষমতারই একত্ব দর্শন করিয়াছেন।

(২) দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ মনে করিতেন বহু দেবতা একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বা ভিন্ন ভিন্ন নাম।

(৩) তৃতীয়তঃ, কেহ কেহ বলিয়াছেন দেবগণ পরস্পর পরস্পর হইতে উৎপন্ন। ইহাতেও দেবগণের একত্ব প্রমাণিত হইতে পারে।

ঋষিগণ এই ভাবে একত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু এই একত্ব একেশ্বরবাদ নহে। তাঁহারা একেশ্বরবাদের দিকে আরও কতটুকু অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং একেশ্বরের কতটুকু আদর্শ পাইয়াছিলেন তাহা পর প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

পথ-চাওয়া-দীপ

পথ-চাওয়া-দীপ বধূর হাতে
সাঁঝের আঙিনায়,
রঙীন হিয়ায় যায় যে কয়ে
কোন্ কথাটি হায়!

সেই আলোতে বিকায় সুধা,
মিটায় তরুণ প্রাণের ক্ষুধা,
দূর পথিকের উদাস কানে
ডাক সে দিয়ে যায়!

শ্রী রমেশচন্দ্র দাস

বলিদান

এক

খাদের নীচে সমস্ত দিন কয়লা কাটিয়া গোধূলি-ধূসর অপরাহ্ণ বেলায় লাকু মাঝি ধাঁওড়ায় ফিরিতেই দেখিল, তাহার স্ত্রী টগরী শিশু সন্তানটিকে একটা পত্রবিহীন শীর্ণ কুলগাছের নীচে শোয়াইয়া রাখিয়া, অড়হর-ক্ষেতের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে।

লাকু কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই, টগরী ক্ষেতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—হ্যাগ্ মাঝি, ক্ষেতের বোঙা (দেবতা) আমাদের উপর রাগ করেছে, তা না হ'লে বল্ দেখি গাছে একটিও শুটি ধর্‌লো নাই কেনে?

ছেলেটা এতক্ষণ মাটিতে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিতেই টগরী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল,—কাল বোঙাকে মুর্‌গী না দিলে সে ঠাণ্ডা হবেক্ নাই, বুঝ্‌লি মাঝি?

সারাদিন পরিশ্রমের পর লাকু বেশ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কুল গাছটার নীচে সবুজ ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। বলিল,—তাই হবেক্ টগরী।… অদূরে ক্ষেতের পাশে ছোট বড় কয়েকটা মোরগ ইতস্তত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহারের অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে বড় মোরগটা দেখাইয়া বলিল,—তুর্ ওই লছ্‌মনিয়াকে কাট্‌লেই হবেক্,…কি বলিস্?

লছ্‌মনিয়ার নাম করিতেই টগরী হঠাৎ ক্রুদ্ধ-ভাবে উত্তর দিল,—হঁ, তা বৈ কি? উয়াকে কাট্‌বি নাই কেনে?—বাহারে?…

বোঙাবুড়ির পূজায় লছমণিয়াকে বলি দিবার প্রস্তাব করাটাই যে তাহার অন্যায় হইয়াছে তাহা সে বুঝিল। কারণ সে জানিত, দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের একটা পুত্রসন্তান হইয়া মারা যাইবার পর হইতে টগরী আদর করিয়া তাহার মৃতপুত্রের নামানুসারে এই মুর্‌গীটার নামকরণ করিয়া তাহাকে ছেলের মতই পালন করিতেছিল। মায়ের প্রাণে এ আঘাতটা যে কত বেশী বাজিবে তাহা সে বুঝিতে না পারিয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। কথাটা পাল্টাইয়া লইয়া লাকু বলিল,—তবে তুর্ যাকে খুসী, তাকেই দিস্।……চারটি ভাত দে দেখি,—বড় ক্ষিদা লেগেছে…আমি চট্ করে' গা ধুয়ে আসি।

ধাওড়ার পাশেই খাদ্-পুকুরে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ের এক প্রান্ত দিয়া বড় বড় কোঁকড়ানো একমাথা চুল মুছিতে মুছিতে লাকু উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। ধূলি-মলিন প্রান্তরের উপর গাছগুলা তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল।

শীতের সন্ধ্যায় স্নান করায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁপন্ ধরাইয়া দিয়াছিল। কাপড়টা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে পরিষ্কার উঠানের একপাশে লাকু ভাতের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

তিন নম্বর খাদের আগুন হু হু করিয়া জ্বলিতেছিল। ধ্বসিয়া-যাওয়া স্থানগুলার উপর চালের পাথরগুলা পর্য্যন্ত পুড়িয়া পুড়িয়া রক্তের মতন লাল হইয়া উঠিয়াছে। অগ্নি ও ধূমের সর্পিল গতি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া দূরে আম, অর্জ্জুন ও বোয়ান্ ঝোপের সারির উপর প্রতিফলিত হইতেছিল।

টগরী ফেনসমেত ভাতের থালাটা তাহার সুমুখে ধরিয়া দিয়া, একটা কেরোসিনের ল্যাম্প্ জ্বালিয়া, কোলের ছেলেটাকে আদর করিতে করিতে তাহার নিকট বসিয়া পড়িল।

পেটের জ্বালায় লাকু ফেন মাখাইয়া নুন দিয়া ভাত-গুলা গোগ্রাসে গিলিতেছিল; টগরী ছেলের মাথার কুঞ্চিত কেশের উপর একবার হাত দিয়া, একবার তাহার সুগোল হাত-পায়ের দিকে তাকাইয়া বলিল,—মাঝি, হ্যাগ্ হ্যাগ্, আমার সোনিয়ার হাত-পায়ের কেমন গড়ন।…… দেখে লিস্, ই মাল্-কাটার সর্দ্দার হবেক্।

পিতার স্নেহ-কোমল দৃষ্টি লইয়া লাকু একবার পুত্রের হাস্যোজ্জ্বল মুখের পানে তাকাইল, বলিল,—না টগরী, মাল্ কাটার যে কত কষ্ট তা তুই জানিস্ না। উয়াকে কয়লা কাট্‌তে দিব নাই……লেখাপড়া শিখাব,—দেখ্‌বি উ কয়লাকাটির বাব হবেক।……লয় রে সোনিয়া?

হাত দিয়া ছেলের গালে একটা টোকা মারিতেই সোনিয়া তাহার ছোট-ছোট হাত দুইটি তুলিয়া পিতার থালার দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

সমস্তদিনের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের ক্লান্তি তাহারা ভুলিয়া গেল। আশা ও আনন্দে তখন এই অনার্য্য স্বামী-স্ত্রীর বুক দুইটা কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে!

দুই

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া লাকু বলিল,—অড়র্-ক্ষেতের বোঙার পূজা দিতে হবেক্—আজ আর খাদে যাব নাই। কি বল্ টগরী?

টগরী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—হঁ।

তাহারা পূজার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় একটা লাঠি হাতে লইয়া কয়লা-কুঠির গোমস্তা-বাবু আসিয়া ডাক দিল,—লাকু মাঝি,—অ লাকু মাঝি!

—কি বল্‌ছিস্ বাবু?

—চল্—চল্ সব। চার নম্বরে আগুন দেখা দিয়েছে,—তোদের সব লাগ্‌তে হবে সেখানে।......চল্ টগরী, তুইও চল্।......আজ সব ডবল হাজ্‌রি।

পেটের দায়ে যাহারা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়া মরে, তাহাদের পক্ষে এই ডবল হাজ্‌রির প্রলোভনটা দমন করা বড় শক্ত কাজ। লাকু বলিল,—চল্ তাহ'লে টগরী, সাঁঝ্ বেলায় পূজা দিলেই হবেক্।

উত্তরে টগরী জানাইল যে তাহাদের আজ কোন প্রকারেই খাদে যাওয়া হইতে পারে না। যখন সে বোঙা, বুড়ির পূজা দিবে বলিয়াছে তখন আজ দিতেই হইবে।

টগরীর অসম্মতি জানিয়া গোমস্তাবাবু একটু রাগিয়া হাতের লাঠিটা মাটিতে ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল,—যাব না বল্‌লেই হ'ল কি না? ম্যানেজার সাহেবের হুকুম,—মান্‌তে বাধ্য। যেতেই হবে।......

পরে তাহার মুখ দিয়া আরও যে কয়েকটা কথা বাহির হইল, তাহা বলিবার নয়।

অগত্যা যাইতে হইল। লাকুর পশ্চাতে সোনিয়াকে কোলে লইয়া টগরীও চলিল।

চার নম্বর খাদের শেষ সীমানার গায়ের দেওয়ালের মধ্যে কয়েকস্থানে তিন নম্বরের আগুন ও ধোঁয়া ফুটি বাহির হইতেছিল। জায়গাটায় অবিশুদ্ধ গ্যাস্‌ও হই ছিল যথেষ্ট; কাজেই সে ভয়াবহ স্থানে ফুঁটা বন্ধ করিব জন্য ফায়ার্-ক্লে (আগুন-নিভানো মাটি) ছুড়িতে কে যাইতে রাজি হইতেছিল না, এবং সেইজন্য কুলি কামি দিগকে দ্বিগুণ হাজ্‌রির প্রলোভন দেখানো হইয়াছিল।

প্রত্যহ যেমন রাখিয়া যায় তেম্‌নি-ভাবে টগরী তাহ পুত্রসন্তান সোনিয়াকে একটা বোয়ান্-ঝোপের ছায় তলে কাপড় বিছাইয়া শোয়াইয়া দিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী কুলি কামিনদিগকে দয়া করিয়া তাহার প্রতি একটু নজ রাখিতে বলিয়া, অন্যান্য সকলের সঙ্গে খাদের নীচে নামি গেল।

অন্ধকার খাদের নীচে নামিয়া সকলেই দেখিল, দূ হইতে দেওয়ালের গায়ে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে আগুনে শিখা ও ধূম নির্গত হইতেছে। কয়েকজন সাঁওতাল কু সাহস করিয়া অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু তীব্র গ্যাসের ঝাঁ সহ্য করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিল। আলো হা লইয়া সেখানে যাইবার উপায় ছিল না, কারণ সেগুল আপনা হইতেই নিভিয়া যাইতেছিল। অদাহ্য গ্যা লাগিয়া খাদ-সর্‌কার-বাবু একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মু খুব সাহস দিতে লাগিলেন।

এই অসভ্য অনার্য্য জাতির শিরায় শিরায় এখনও বো হয় আদি-মানবের উগ্র রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাই তাহারা সমূহ বিপদের মাঝেও ক্ষুদ্র প্রাণের ভ কোনদিন পিছু হাটিয়া আসে না। লাকুর উন্নত স্ফী বক্ষ উৎসাহবাণী পাইয়া বার বার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে ছিল; সস্নেহে টগরীর হাতটা ধরিয়া বলিল,—টগরী, আমি যাই।

টগরী অনুনয়ের সুরে বলিল,—কাজ নাই লাকু।

লাকু তাহার কথা শুনিল না। একটা কেরোসিনের ল্যাম্প্ হাতে লইয়া প্রাণপণে ছুটিয়া গেল। টগরী উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

খাদ্-সর্‌কার দূরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে উৎসাহ দিল,—বা রে লাকু!

সে-খাতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই লাকুর হাতের আলোটা ফস্ করিয়া নিভিয়া গেল। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই একতাল মাটি হাতে লইয়া সেই ছিদ্রপথে ছুড়িয়া দিতেই ছিদ্র বন্ধ হইল। আরও কয়েক তাল মাটি জোর করিয়া সেই স্থানে লাগাইয়া আগুনের পথটা রুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু বিষাক্ত গ্যাস তখন তাহার নাকে মুখে ঢুকিয়া গিয়াছিল। লাকু 'মা গো' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যেই মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়া গেল।

উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল টগরী উৎকর্ণ হইয়াই ছিল; তাহার কর্ণে স্বামীর আর্ত্তস্বর পৌঁছিতেই, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সেই বিষ-বাষ্প-পরিপূর্ণ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ছুটিয়া প্রবেশ করিল। লাকুর মূর্চ্ছাহত দেহটা অন্ধকারেই খুঁজিয়া লইয়া, প্রাণপণ চেষ্টায় বুকে তুলিয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ স্থানে লইয়া আসিল। নিকটে দাঁড়াইয়া খাদ-সরকার-বাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতেছিল। টগরী তাহার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া করুণকণ্ঠে কহিল,—বাবু গো······

আর কোন কথাই সে বলিতে পারিল না, মাথা ঘুরাইয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া পড়িয়া গোঙানি সুরু করিল।

খাদ-সরকার-বাবু এই অর্দ্ধমৃত স্বামী-স্ত্রীকে অন্যান্য সমবেত কুলিদের হেফাজতে রাখিয়া তাড়াতাড়ি ম্যানেজার-সাহেবকে খবর দিবার জন্য উপরে উঠিয়া আসিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল; বলিল,—নান্‌কু, লখী, মাত্‌লা, সর্দ্দার, তোরা এদের দ্যাখ, আমি সাহেবকে ডেকে আনি।

দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া খাদ-সরকার উপরে উঠিয়া আসিয়া ম্যানেজার-সাহেবের বাঙ্‌লোর দিকে ছুটিল।

দূর হইতে দেখিল, সদ্য প্রাতরাশ সমাপন করিয়া সম্মুখে বারান্দার উপর ইজি-চেয়ারে হেলান্ দিয়া সাহেব খবরের কাগজ পড়িতেছে।······সাহেবের বাঘা কুকুরটার ভয়ে কেহই তাহার বাঙ্‌লোর ভিতর ঢুকিতে সাহস করিত না, কাজেই সে দূর হইতে ডাকিল,—বেয়ারা!

কণ্ঠস্বর শুনিয়া সাহেব কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার

সাহেব কুকুরটার দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া বলিল,—You bloody, stop!

কুকুরটা চুপ করিয়া হাঁপাইতে লাগিল; সাহেব হাতের ইসারায় সরকারকে কাছে ডাকিয়া কহিল,—কি খবর আছে বাবু?

সরকার-বাবুর মুখ-চোখ তখন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বলিল,—চার নম্বর খাদে সাহেব, দুজন হুজুর, গ্যাসে হুজুর—একেবারে dead like. আমার সঙ্গে একবার হুজুর kindly come.

প্রত্যুষেই এই অশুভ সংবাদ শুনিয়া এবং সরকার-বাবুর মুখ-চোখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সাহেব একটুখানি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি লাঠিটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িল। কুকুরটাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

আফিসঘর সাহেবের বাঙ্‌লো হইতে বেশী দূরে ছিল না। তাহারই একটা চুন-সুর্কি-খসা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কয়েকটা ভাঙা আল্‌মারি নানাবিধ শিশি বোতল ও ঔষধ ইত্যাদিতে সাজানো থাকিত। একজন ডাক্তার-বাবুও আছেন। তিনি পূর্ব্বে কোন্-এক এল্-এম্-এস্ ডাক্তারের নিকট কয়েক-বৎসর কম্পাউণ্ডারী করিয়া সম্প্রতি হাত পাকাইয়া কয়লা-কুঠির ডাক্তার হইয়াছেন। কয়েকজন বাউরী কুলি-কামিনের সহিত রঙ্গ রহস্য করিতে করিতে একটা ভাঙা টেবিলের উপর বসিয়া তিনি তখন খোরাকির টিপ্ করিতেছিলেন এবং সজোরে একটা বিড়ি টানিয়া টানিয়া ঘরটাকে ধোঁয়ায় মশ্‌গুল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সাহেবের কুকুরটা দরজায় ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিতেই, ডাক্তার-বাবু তটস্থ হইয়া ঝুপ্ করিয়া টেবিল হইতে নামিয়া সম্মুখে তাকাইতেই দেখিল, ম্যানেজার সাহেব! তাড়াতাড়ি বিড়িটা টপ্ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া জুতার নীচে চাপিয়া ধরিয়া লম্বা এক সেলাম ঠুকিয়া কহিয়া উঠিল,—Good morning, হুজুর!

সাহেব ঘরে ঢুকিয়াই বলিল,—Eucalyptus oil, জল্‌দি একশিশি ইউকেলিপ্‌টাস্।

ডাক্তার-বাবু তাড়াতাড়ি আল্‌মারিটা খুলিয়া, উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত একবার এটা একবার সেটা দেখিয়া

দিল,—হুজুর, ইউকেলিপ্‌টাস্ no stock. সেদিন সাহেব sixty rupees medicine list I has given you, but you never minded. তার ভিতর there was Eucalyptus.

সাহেব রাগিয়া বলিল,—Damn it. টোম্ লোক্ কুছ্ কাম্‌কা নেহি।

ডাক্তারবাবু হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিল,—সাহেব, there is Tincture Iodin enough stock,—Fever mixture, Turpentine. Take if you wanting, হুজুর।

উত্তরে সাহেব একটা কুৎসিত কথা বলিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সরকার-বাবুকে বলিল,—টোম্ জল্‌ডি যাও হামারা বাঙ্‌লোমে। যাকে বেয়ারাকো পুছো, এক phial ইউকেলিপ্‌টাস্ অয়েল হামারা bed-roomমে হায়,—লে আও।—যাও man জল্‌দি······hurry up!

খাদ-সরকার-বাবু প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরেই ইউক্যালিপ্‌টাসের শিশি লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিতেই, সাহেব বলিল,—চলো।

······সাহেব দ্রুতপদে আগে আগে যাইতেছিল। কুকুরটা তাহার পশ্চাতে এদিক্-ওদিক্ দৌড়িতে দৌড়িতে এটা-সেটা শুঁকিতে শুঁকিতে চলিতে লাগিল,—তাহার পশ্চাতে ক্লান্ত-চরণে সরকার-বাবু।

চার নম্বর খাদের পাশে, 'সাইডিং লাইন'এর উপর গাড়ী-বোঝাই হইতেছিল। ডিপো-সরকার একটা নিমগাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া আরাম করিতেছিলেন। সাহেবকে আসিতে দেখিয়া, এদিক্-ওদিক্ ছুটিয়া চীৎকার করিয়া কর্ম্মব্যস্ততার ভান দেখাইয়া দিলেন। কুলি-কামিন সকলে হুই-হাই করিয়া আপন আপন কাজে মন দিল।

সাহেব ও সরকার-বাবু খাদের মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই, দূরে সাইডিংএর পাশে একটা বোয়ান্-ঝোপের নিকট হইতে একটা শিশুকণ্ঠের অস্ফুট চীৎকার শোনা গেল,—সঙ্গে সঙ্গে একটা খস্ খস্ শব্দ!

কুকুরটাকে দেখা যাইতেছিল না। সাহেব শিশ দিয়া ডাকিল,—Tiger, Tiger!

বাঘের মত কুকুরটা রক্তমাখা মুখ লইয়া ঝোপ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল,—তখনও টস্ টস্ করিয়া তা মুখে রক্ত ঝরিতেছে।

সাহেব ও সরকার-বাবু দুজনেই ছুটিয়া সেই ঝোপা নিকটে যাইতেই দেখিল, মাংসস্তূপের মত এক মান সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মাখিয়া মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে,—কি কুকুরটা তাহার ঘাড়টা চিবাইয়া ছিন্ন ভিন্ন কর দিয়াছে।

সরকার-বাবু চক্ষু দুইটা যথাসম্ভব উর্দ্ধে তুলিয়া চীৎ করিয়া উঠিল,—ইস্, সাহেব সাহেব হুজুর,—এ-এ-এ ব ছেলে, কার ছেলে! ইঃ! ইঃ! dead একেব dead sir!

সাহেবের মুখখানাও ঈষৎ লাল হইয়া উঠি তাড়াতাড়ি ইউক্যালিপ্‌টাসের শিশিটা সরকারের হ হইতে প্রায় ছিনাইয়া লইয়া বলিল,—চিল্লাও মৎ you fool!

শীতের দিনে সরকারের গায়ে একখানা রঙীন কাপ জড়ানো ছিল। সাহেব কাপড়টা টানিয়া লইয়া, নিে হাতেই মৃত ছেলেটাকে তাহারই একপ্রান্তে বেশ কর বাঁধিয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি কহিল,—যাও, তোম্ ইস্‌ লেকে চুপ্‌সে হামারা বাঙ্‌লোমে যাও। চিল্ল মৎ,······কিসিকো মৎ বোল্‌না—যাও।

প্রভুর আদেশে সরকার মুহূর্ত্তে সেখান হইতে দৌড়ি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সাহেব জুতা দিয়া রক্তের শেষ দাগটুকুও মাটি হই মুছিয়া ফেলিয়া খাদের মুখে গিয়া দাঁড়াইল। একজ কুলিকে কুকুরটা বাঁধিয়া রাখিবার হুকুম দিয়া ঘণ্ ওয়ালাকে বলিল,—নামাও।

সাহেব নীচে গিয়া দেখিল, লাকু ও টগরীকে ঘিরি দাঁড়াইয়া কুলি-কামিনগণ হল্লা করিতেছে। টগরী তখন অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল, লাকু আপনা হইতে জাগিয়া নিশ্বাস লইতেছে ও চোখ মেলিয়া চাহিতেছে।

সাহেব ইউকেলিপ্‌টাসের শিশি খুলিয়া নিজের রুমা ঢালিয়া দিয়া তাহাদের নাকে খানিকক্ষণ ধরিতেই সং ফিরিয়া আসিল।

টগরী চোখ খুলিয়া কেমন যেন হতভম্বের মত চীৎকার করিতেছিল,—সোনিয়া সোনিয়া,—আঃ!

ধীরে ধীরে তাহাদের উভয়কে ধরিয়া উপরের ফাঁকা আলো-বাতাসে আনিবামাত্র টগরী সোনিয়াকে বোয়ান্‌-ঝোপের নিকট হইতে তুলিয়া আনিবার জন্ম উঠিবার চেষ্টা করিল।

সাহেব বলিল,—চোপ্‌ রাও, বেবিকো বাঙ্‌লোমে লে গিয়া।

লাকু ও টগরীকে ধীরে ধীরে তাহার বাঙ্‌লো-বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্ম কয়েকজন সাঁওতালকে আদেশ দিয়া সাহেব তাহার প্রিয় কুকুরটাকে লইয়া চলিয়া গেল।

সাহেব বাসায় ফিরিয়া দেখিল,—খাদ-সরকার-বাবু দাঁড়াইয়া আছে।—জিজ্ঞাসা করিল, all right?

অদূরে খানসামার ঘরটা দেখাইয়া দিয়া—বলিল, ওই ঘরে there I keep it, your honour Sir.

কিয়ৎক্ষণ পরে, লাকু ও টগরী আসিয়া পৌঁছিলে, অন্যান্ত সাঁওতালদিগকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহাদের বিশেষ কিছুই কষ্ট হয় নাই, কিছুক্ষণ অজ্ঞান হইয়া ছিল মাত্র। টগরী তখনও ছেলেটাকে না দেখিতে পাইয়া অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। সাহেবকে মিনতিব্যগ্র স্বরে বলিল,—আমার সোনিয়াকে দে সাহেব!

সাহেব কি ভাবিয়া তাহাকে ও লাকুকে খানসামার ঘরের ভিতর লইয়া গেল। সরকার-বাবু বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

সাহেব কি যে বলিবে কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিল না, ডাকিল,—সরকার!

সরকার ভিতরে যাইতেই সাহেব নিজের পকেট হইতে দুইখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল,—ইস্‌লোক্‌কো সব সমঝায় দেও, আউর ওই বক্‌শিশ্‌ দে দেও।……বলিয়া সাহেব বাহিরে চলিয়া আসিল।

সরকার নিজে বক্‌শিশ পাইবার লোভে, লাকু ও টগরীকে তাহাদের পুত্রের অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদ দিয়া পায়ে হাতে ধরিতেও কসুর করিল না। টগরী ও লাকু স্বচক্ষে বস্ত্রাবৃত সোনিয়ার দুর্দ্দশা দেখিয়া স্তম্ভিত নির্ব্বাক্‌-ভাবে মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল।

লাকুর চোখ দিয়া জলের পরিবর্ত্তে আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল, সে হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—উয়াকে মারবো বাবু!

সরকার সবিস্ময়ে বলিল,—কাকে রে?

লাকুর মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না, অতিকষ্টে বলিল,—তুর সাহেবকে।

সরকার তাহার হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিয়া ব্যাকুল-ভাবে বলিল,—এঁ্যা, এঁ্যা—বলিস কি, বলিস কি মাঝি! অমন কথা মুখেও আনিস্‌ না। ই—ই——সাহেব, সায়েব রে,—বড় সাহেব যে!……না, না, অমন্‌ করিস্‌ না লাকু, নে ভাই নে, এই টাকা নে,—ছেলে আবার কত হবে।

লাকু নোট দুইটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল,—চল্‌ টগরী চল্‌।

টগরী পুত্রের মৃতদেহটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া সজল চোখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সরকার সাহেবকে সংবাদ দিল,—তারা টাকা না লইয়া যাইতেছে।

সাহেব দশটা টাকা ফিরিয়া লইয়া সরকারকে বলিল,—তোম্‌ লে লেও ten rupees. উস্‌কো সাথ যাও, দেখো থানামে মৎ লে যায়।

Don't fear সাহেব, থানায় নিয়ে যাবে কি? আমি চল্লাম্‌।—বলিয়া সরকার তাহাদের পিছু পিছু বাহির হইয়া গেল।

তিন

ম্যানেজার সাহেব অফিসঘরের একটা কক্ষে বসিয়া কি কাজ করিতেছিল, এমন সময় বড়বাবু তাহাকে একখানা রেজেষ্ট্রী চিঠি দেখাইয়া বলিল,—আমাদের লাকু মাঝির ধাওড়াঘর যেখানে আছে, সেটা পিটার্‌সন্‌ কোম্পানীর জায়গা, নয়?

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—হাঁ্যা, কেন?

সাহেবের টেবিলের উপর চিঠিখানা নামাইয়া দিয়া বড়বাবু বলিল,—পিটারসন্ কোম্পানী এই চিঠিখানা রেজেষ্ট্রী করে' পাঠিয়েছে, বলেছে তাদের জায়গায় 'পিলার্ কাটিং' সুরু হয়েছে, এ সময় যেন উপরের ধাওড়া-ঘরটা তুলে নেওয়া হয়, কারণ, জায়গাটা যে কোনদিন subside করে যেতে পারে। লাকুকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া বিশেষ দরকার হয়েছে আমাদের।

সাহেব মুখ তুলিয়া বলিল,—তুমি তো আচ্ছা বেকুব আছে বাবু! আমাদের এই সময় ওইসব খরচ করবার সময়?……আমার নামে সেই five thousand advance আগে anyhow make up কর, তার পর ও-সব।……হামি assurance দিচ্ছি, ও জায়গা subside হ'তে আভি বহুৎ দের্ আছে।……যাও।

বড়বাবু আর অধিক কিছু বলিতে পারিল না। ধীরে ধীরে একটা সেলাম করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এদিকে ঠিক সেই সময়টায় অড়হর ও বড়ধনা ক্ষেতের মাঝামাঝি একটা স্থানে ছেলেটাকে একটা গর্ত্ত করিয়া মাটি চাপা দিয়া, লাকু ও টগরী ঘরের উঠানে চুপ করিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিল।

লাকুর মনে হইতেছিল, সে যেন নেশা করিয়াছে এবং যাহা-কিছু করিতেছে, সবই যেন নেশার ঝোঁকে।

সমস্তদিন কিছু না খাইয়া তাহার ক্ষুধাও পাইয়াছিল। ছেলেই মরুক্ আর যা-ই হোক্, যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, পেট তো সে কথা শুনিবে না!

টগরী তখনও ঠিক তেম্‌নিভাবে বসিয়া ছিল, তাহাকে রাঁধিবার কথাটা বলিতে লাকুর কেমন ভয় হইতেছিল; তথাপি বলিল,—ভাত-টাত কিছু রাঁধ টগর, আর যে পারি না!

টগরী চোখের অশ্রু মুছিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—হঁ রাঁধি।—বোঙাকে যখন বলেছি, তখন একটা মুরগী তাকে তো দিতেই হবেক্, ওই ছুটু মুরগীটা দে।

লাকু ছুটিয়া ছুটিয়া ছোট মোরগটা ধরিয়া আনিয়া বোঙার উদ্দেশে বলি দিল। প্রণাম করিয়া বলিল,—রাগ করিস্ না বোঙা, তুকে আরও এনেক্ কিছু দিথম্, মদ দিথম্, ভাত দিথম্,—কত কি দিথম্। কিন্তুক্ আজ আমার সোনিয়া নাই রে—তাকে কেনে লিলি ঠাকুর বাবা?… বলিতে বলিতে লাকুর চোখ দিয়া দর্‌দর্ করিয়া জল গড়াইয়া আসিল।

…দিন দুই পরে, একদিন অড়হর-বাড়ীর ধারে, মাটির মধ্যে একটা ফাটল্ দেখা দিল, কিন্তু সেটা যে কিসের, লাকু তাহা বুঝিতেও পারিল না—গ্রাহ্যও করিল না।

পরদিন অপরাহ্ণে টগরী মাটির কলসী লইয়া বাঁধে জল আনিতে গিয়াছিল। লাকু অড়হর-ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গাছগুলা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল, ক্ষেতের বোঙার রাগ ভাঙিল কি না! এমন সময় একটা বিকট শব্দ হইল। কোথা হইতে যে শব্দটা আসিল, লাকু কিছুই বুঝিতে পারিল না। পায়ের নীচের মাটিটা ভূমিকম্পের মত টল্‌মল্ করিয়া উঠিল। লাকু ক্ষেতের ভিতর হইতে বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় চারিদিকের খানিকটা স্থান জুড়িয়া অড়হর গাছগুলাকে লইয়াই নীচের কোন্ পাতাল-গহ্বরে সমস্তটা ক্ষেত বসিয়া গেল। উঠিবার আশায় আকুল আগ্রহে লাকু প্রাণপণ চেষ্টায় পাশের একটা মাটির ঢিপি আঁক্‌ড়াইয়া, পায়ের জোরে অগ্রসর হইতে যাইতেছিল, পুনরায় আর-একটা প্রকাণ্ড মাটির চাংড়া ঝড়াশ্ করিয়া তাহার মাথার উপরে ছাড়িয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত আশা ভরসা জন্মের মত ফুরাইয়া গেল।…

টগরী জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার বাড়ীর সম্মুখে অড়হর ক্ষেতটাকে লইয়া সেখানের সমস্ত মাটিটাই নীচে বসিয়া গেছে। বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল! ডাকিল,—মাঝি, মাঝি, লাকু!

সে ডাক সমাধিস্থ লাকুর নিকট পৌঁছিল কি না, কে জানে? টগরী প্রাণপণে চীৎকার করিয়া চারিদিক্ তন্ন-তন্ন করিয়া লাকুর অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না! তবে,—তবে কি তাহার লাকুও চলিয়া গেল!

টগরী কাঁদিতেও পারিতেছিল না। কি করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। উঠানে একবার চুপ করিয়া

বসিল।—ঠাকুর-বাবা! পূজা দিয়েও তুর্ রাগ ভাঙাতে লাক্লম্ রে?—

সেই ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে বসিয়া থাকিতে তাহার আর মন সরিতেছিল না।···সন্ধ্যা তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে।

লছমনিয়ার সঙ্গে আরও তিনটা মুরগী ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করিতে করিতে তাহার নিকট অগ্রসর হইতেছিল।

টগরী লছমনিয়াকে কোলে তুলিয়া লইয়া বুকের মধ্যে বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিল। এতক্ষণে তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিল।

লছমনিয়াকে কোলে লইয়া টগরী সে স্থান হইতে উঠিল। যে স্থানে অড়হর-ক্ষেতটা ছিল,—সোনিয়াকে যেখানে মাটি-চাপা দিয়াছে,—সেইদিকে একবার শেষ চাওয়া চাহিতেই তাহার বুকের বেদনা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।···না,—না, সেদিকে তাকানো যায় না গো—!

······টগরী রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে তাহাদের ম্যানেজার-সাহেবের বাঙ্‌লোর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সাহেব বাড়ীতে ছিল না। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিতেই বেয়ারা আসিয়া বলিল,—কি চাস?

টগরী তাহার অঞ্চলের ভিতর হইতে লছমনিয়াকে বাহির করিয়া বেয়ারার হাতে দিয়া বলিল,—লে।

বেয়ারা মোরগটা একবার বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল,—বাঃ, কত দাম?

—না রে না, দাম নাই—ওর দাম নাই!···

টগরী বাহির হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় বুটজুতার গর্জ্জন করিতে করিতে শিশ দিতে দিতে সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়াই সাহেব বলিয়া উঠিল,—কেয়া মাংতা?

স্বামী-পুত্রহন্তার মুখের পানে তাকাইতে টগরীর ইচ্ছা হইতেছিল না। সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।

বেয়ারা মুরগীটাকে দেখাইয়া বলিল,—এহিঠো দেনেকো লিয়ে আয়া থা।

সেদিনের কথা সাহেব তখনও দয়া করিয়া ভুলিয়া যায় নাই। টগরীর দিকে একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইল।

টগরী উন্মাদিনীর মত অশ্রুহীন চোখে বলিল,—উয়াকে কেনে ছাড়্‌বি সাহেব?···সোনিয়াকে লিয়েছিস্, আমার লাকুকে লিলি, লছমনিয়াকেও লে। লে সাহেব, আমার মাথার কিরা।···

সে আর কিছু বলিতে পারিল না। তাহার শেষ অবলম্বনটুকুও সাহেবের হাতে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেল। ···বাহিরে আসিয়া সোজা পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।···রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে ঘন হইয়া আসিতেছে!···বাঙ্‌লো হইতে সাহেবের কুকুরটার ঘেউ-ঘেউ শব্দ তখনও শোনা যাইতেছিল।

বেয়ারা তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। ঈষৎ দন্তবিকাশ করিয়া সাহেবকে বলিল,—ফাউল্‌ঠো খুব বঢ়িয়া হ্যায় হুজুর।

সাহেব হাসিয়া বলিল,—All right, রোষ্ট্ বনাও।

শ্রী শৈলজা মুখোপাধ্যায়

অভাগিনী

দিয়াছিল স্বামী সকলি ত মোরে,
অদেয় কিছু না ছিল;
হায়, এ অভাগী তেয়াগিয়ে সুখ
দুঃখ যে বেছে নিল!

প্রিয়গৃহে গিয়ে সঙ্গ তাঁহার
ভাল ত মোর লাগেনি;
তিনি ছাড়া যত আর সব মিছে,
বুঝেনি হতভাগিনী।

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

সাঁওতালী ভাষা

সাঁওতালজাতিকে আমরা জংলী বলে' জানি। কিন্তু জংলী হ'লেও এদের ক্ষুদ্রভাষার মধ্যে একটা পদ্ধতি আছে, এদেরও ভাষা একেবারে ব্যাকরণকে ছাড়াতে পারেনি। তারা কারও কাছে কথা ধার করে' নেয় নি। তাদের বেষ্টনীর মধ্যে যেটুকু জ্ঞান ছিল তা প্রকাশ কর্‌তে তাদের ভাষার অভাব হয় নি। কিন্তু এখন সভ্যতার যেটুকু সংস্পর্শ পেয়েছে, তার মধ্যে আর তাদের নিজস্ব কিছু নেই—সব আম্‌দানী-করা কথা। এখন এদের ভাষার মধ্যে অনেক বিজাতীয় কথা আশ্রয় পেয়েছে। ভারতের যেখানেই সাঁওতাল আছে, তাদের সকলেরই ভাষা এক, তবে হয়ত একটু প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হতে পারে।

তারা চিরদিন পাহাড়, জঙ্গল, গাছ, পাতা প্রভৃতি দেখে আস্‌ছে, সেইজন্য তাদের ভাষায় ও-সব কথার অভাব হয় না।

যেমন—

গাছ=দারে জঙ্গল—বীর মেঘ—রিমিল
পাতা=সাকাম্‌ পাহাড়—বুড়ু চাঁদ—চাঁদোবোঙ্গা
কাঠ=সাহান্‌ আকাশ=সেরমা,
ফুল—বাহা নক্ষত্র=ইপিল্‌

তাদের ব্যবহার্য্যের মধ্যে ছিল লোহা, সোনা রূপা ছিল না, তাই লোহার সাঁওতালী নাম 'মেড়্‌হেন'। কিন্তু সোনা-রূপাকে তারা সোনা-রূপাই বলে।

অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তারা লোহার জিনিষই ব্যবহার কর্‌ত আর তাতে অনেক রকম জিনিষ হ'ত,

যেমন—

টাঙ্গি—কাপি কুড়ুল—বুড়িয়া
বর্শা—বর্ছি কাটারি=দাতরুম্ (সং দাত্র - দা)
গাঁইতি=কাকুয়া কোদাল—কুড়ি

তাদের খাদ্যও তখন অতি সাদাসিধা ধরণের ছিল। ধানের চাষ তারা জান্‌ত, কিন্তু এখনকার মত এত-রকম তরকারি তাদের ছিল না। খাদ্যের মধ্যে তেঁতুল, নুন, মাছ, মাংস, ভাত, বুনোআলু, নানাপ্রকারের শাক। তাদের তরকারির নাম—

বেগুন=বৈঙ্গার মাছ=হাকু, শাক=আড়া
তেঁতুল=বঙ, মাংস=জীল, ভাত=দাকা
নুন=বুলুং ডিম=বিলি তরকারি=উতু।

কিন্তু ডাল, পান, সুপারি, কপি ইত্যাদির নাম তাদের ভাষায় নেই। বোধ হয় শুদ্ধ কলাই সিদ্ধ করে' খেত, তাই কলাইএর সাঁওতালী নাম উপি।

তাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে গাই, বলদ, ঘোড়া, ভেড়া আর মহিষ ছিল, কারণ এগুলির নাম সাঁওতালী ভাষায় পাওয়া যায়।

গাই=ডাংরি ঘোড়া=সাদোম কুকুর=সীতা
বাছুর—মিত ছাগল—মেরম্‌ মহিষ—কাড়্‌হা
বলদ=ডাংরা ভেড়া=মেড়্‌হি

তাদের জঙ্গলের মধ্যেও যে-সব জান্‌ওয়ার দেখ্‌তে পেত তারও নাম এদের ভাষায় পাওয়া যায়।

ব্যাঘ্র—তারুপ্‌
শৃগাল=তুইয়্‌
হনুমান্‌=গোড়ি
ইত্যাদি।

এদের পরিধানের শুদ্ধ কাপড় ছাড়া আর কিছু ছিল না, কারণ আর কিছুর সাঁওতালী নাম আমরা পাই না। কাপড়=লুগরি। এ ছাড়া আমরা জামার একটা সাঁওতালী কথা 'দত' পাই। আমার মনে হয় এটা—সাঁওতালরা এক রকম গাছের ছালকে পিটিয়ে গেঞ্জির মত করে' পরে, তা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এখন তাদের মধ্যে জুতা ছাতা প্রভৃতির চলন হয়েছে, কিন্তু তার সাঁওতালী কথা জুতোম্‌ আর ছাতোম্‌।

তেলের মধ্যে এরা সরিষা, কোঁচড়া আর রেড়ীর তৈলই দেখে এসেছে, সুতরাং এই ক'টারই কথা পাওয়া যায়।

তেল=সুনুম, কোঁচড়া—কুহুণ্ডি
সরিষা=তুড়ি রেড়ী=জারা

এরা বোধ হয় বরাবরই চাষ করত, তাই ধান সংক্রান্ত সব কথা এদের ভাষার মধ্যে পাওয়া যায়।

ধান=হড়, পাছড়ান=গুম্
জমি=বৈহাড়, ধান ঝাড়া=কোতার
ধানের শিষ=হড়গেলে, ধানের আগড়া=পেটেই।

এদের মধ্যে আগে বোধহয় কোন যানের ব্যবস্থা ছিল না, তাই কোন গাড়ীর কথা এদের ভাষায় পাওয়া যায় না। আরও বোধহয় এরা পূর্ব্বে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করতে জান্ত না, তাই লাঙ্গলের কোন সাঁওতালী কথা নাই।

ঘরের মধ্যে এদের সব কুঁড়ে-ঘর। সুতরাং তারই কথা এদের ভাষার মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু পাকা ঘরের বা ইঁটের কথা এদের ভাষায় পাওয়া যায় না।

ঘর=ওড়া
দড়ি=বাবের
বাঁশ=মাচট্

এদের শোবার জিনিষের মধ্যে শুধু এক খাটিয়া আর যদি থাকে ত কাঁথা। কিন্তু কাঁথাও বোধহয় তাদের নিজস্ব নয়। কারণ সাঁওতালী খান্তা কথাটা প্রায় কাঁথারই কাছাকাছি।

খাট=পারকোম্,
কাঁথা=খান্তা

এরা মেয়ে-পুরুষ সকলেই বড় সঙ্গীতপ্রিয়। যখন এদের মেয়েরা সারাদিন পরিশ্রমের পর, স্তিমিত সন্ধ্যালোকে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে গান গাইতে গাইতে বাড়ী যায়, তখন এদের সেই শান্ত হাস্যময় মুখছবি দেখে মনে হয় এরাই বুঝি জগতে সুখী। পুরুষেরা মুখে গান খুব কমই গায়, তারা শুধু বাঁশীতে আর একতারায় গান করে।

গান=সেরেঁই বাঁশি=তিরিও।
একতারা=বাণাম্।

বর্ত্তমানকালে এদের সব কথায় কাণা যোগ হয়ে থাকে, যথা—

যাচ্ছে=চলাকাণা
খাচ্ছে=জোম্‌কাণা
নিচ্ছে=ইদিকাণা

ভবিষ্যৎ কালে 'য়া' যোগ হয়ে থাকে, যথা—

যাবে=চলায়া
খাবে=জোম্‌য়া
নিবে=ইদিয়া

অতীত কালে অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক ক্রিয়া অনুসারে 'এনা' ও 'কেয়া' যোগ হ'য়ে থাকে যথা—

গিয়েছিল=চলাওলেনা (অকর্ম্ম)
খেয়েছিল=জোমকেয়া
নিয়েছিল=ইদিকেয়া।

কাউকে কিছু করতে বল্‌বার সময় (অনুজ্ঞায়) 'মে' যোগ হয়ে থাকে, যথা—

যা=চলামে
খা=জোম্‌মে
নে=ইদিমে

প্রথম পুরুষের ভবিষ্যৎ কালে 'আঁই' যোগ হয়ে থাকে, যথা—

যাব=চলা যাঁই
খাব=জোম আঁই
নোব=ইদি আঁই

একবচনে ও বহুবচনে সব এক। কিন্তু কাউকে আজ্ঞা কর্‌বার সময় বর্ত্তমানকালে দ্বিবচনে বিন ব্যবহৃত হয়, যথা—

ঠেল=চাকারবিন্।

বিশেষ্য ও 'কাণা' যোগে ক্রিয়া হ'য়ে থাকে, যথা—

তরকারি=উতু। তরকারি করছে=উতুকাণা

আমাদের যেমন 'থেকে', ওদের তেমনি সেই স্থলে 'খন্' ব্যবহৃত হয়। যথা—

পাহাড় থেকে আন্‌ছি বুড়ুখন্ আগুকাণা

আমাদের 'তা হ'লে' অর্থে ওদের 'খান' ব্যবহৃত হয়, যথা—

কাজ কর নৈলে অনুপস্থিত করব,
কামিমে বাংখান্ নাগা মিয়াই।
ধান শুকালে ভাত হবে, হড় রোহয়লেনখান দাকা হইউয়া

এদের গানের চরণে মিল না থাকলেও একেবারে ভাবের অভাব থাকে না। হাসির গানও এদের মধ্যে যথেষ্ট আছে।

সেদায় ইঞ্জায় তিকিন্, সেদায় নাপুণ তিকিন্
তোয়াতাবিন্ তিকিং হারালিদিয়াকিণ্।

'আর বছর আমার বাবা ছিল, মা ছিল, দুধ চিঁড়া ছিল। এ-বছর কে আমায় খেতে দিবে?'

হাসির গান—

পুড়ুরে সিং আড়া, দাড়েঁগে বাং
কচারে লাবোয় গিয়ে তেঞ্জাংগে বাং

'পাহাড়ে সজিনার শাক আছে, তুল্‌তে পার্‌ছি না। ঘরের কোণে মুর্‌গীটা রয়েছে, ভগ্নীপতি নেই যে মেরে দেয়।' . . .

এ গানটা শুন্‌লে এরা হেসে অস্থির হ'য়ে পড়ে।

মোটের উপর আমরা যা দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে এই ভাষাটাকে বেশ একটা লিখ্‌বার ভাষায় পরিণত কর্‌তে পারা যায় যদি অক্ষরগুলো তৈরী হয়।

অক্ষর-তৈরী সম্বন্ধেও একটু গোল আছে। আমাদের অক্ষরে লিখ্‌লে, সব কথার উচ্চারণ ঠিক হবে না। দু-একটা অক্ষর বদ্‌লাতে হবে। যেমন 'পেয়েছিস্—ঞাম্‌লেয়া?' এর বানান 'ঞ' দিলে কতকটা হয়, কিন্তু এরা যে নাকের ভিতর থেকে একটা সুর বা'র করে, তা হয় না।

শ্রী কালীপদ ঘোষ

রাজপথ

[১]

ভাদ্র মাসের শেষ। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সূর্য্য অস্তমিত হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বাকাশে সুবৃহৎ গোলাকার চন্দ্র উঠিতেছিল। বিভিন্ন দুইদিক্ হইতে আকাশপ্রদীপ-দ্বয়ের দ্বিবিধ কিরণসম্পাতে শিবপুরের সব্‌জিবাগ (বোটানিকাল গার্ডেন) সহসা পরীরাজ্যের মত বিচিত্র হইয়া উঠিল।

বিমানবিহারী মুগ্ধনেত্রে ক্ষণকাল উদয়োন্মুখ চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "বাঃ, আজ যে পূর্ণিমা তা' ত মনে ছিল না! আর খানিকটা থেকে জ্যোৎস্নাটা একটু উপভোগ কর্‌লে হয়।"

বিমলা উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "হাঁ বিমানদা, তাই করুন। জ্যোৎস্না ভাল করে' উঠ্‌লে খানিকটা বাগান বেড়িয়ে তবে যাওয়া যাবে।"

সন্ধিক্ষণের অপূর্ব্ব রমণীয়তায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল; তথাপি সুমিত্রা কহিল, "কিন্তু গেট্ যদি বন্ধ করে দ্যায়?"

সুরমা কহিল, "তা কখনো দেবে না। গেটে আমাদের মোটর রয়েছে; আমরা না বেরুলে কখন গেট বন্ধ করে' দিতে পারে?"

বিমানবিহারী সহাস্যে কহিল, "যদিই দেয়, গেট্ খুলিয়ে নিলেই হবে। বন্দী হ'য়ে সমস্তরাত বাগানে কাটাবো না, তা নিশ্চয়।"

এইটুকু বিচার-বিতর্কে সন্তুষ্ট হইয়া সকলে সাম্‌না-সাম্‌নি-রাখা দুইখানি বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতে বাগানটি সর্ব্বদিকেই জনশূন্য হইয়া আসিতেছিল, বিশেষতঃ গেট হইতে সুদূর এ অঞ্চলে বিমান ও তাহার সঙ্গিনীত্রয় ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণীর চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না।

এই তিনটি তরুণী পরস্পর সম্পর্কে সহোদরা ভগিনী। ইহাদের পিতা প্রমদাচরণ ঘোষ অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট, পেন্সন লওয়ার পর হইতে কলিকাতার গৃহে বাস করিতেছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরমার তিনবৎসর বিবাহ হইয়াছে; বিমানবিহারী তাহার দেবর। বিমানবিহারী একজন নবনিযুক্ত ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং অবিবাহিত। বিমানের সহিত প্রমদাচরণের মধ্যমা কন্যা সুমিত্রার বিবাহের কথা কিছুদিন হইতে চলিতেছে। এই সঙ্কল্পিত বিবাহে উভয় পক্ষে প্রায় সকলেরই ইচ্ছা আছে, তবে পাত্রপক্ষে স্বয়ং পাত্রের এবং কন্যাপক্ষে কন্যার মাতা জয়ন্তী দেবীর আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

অন্ধকার বোট্যানিকাল গার্ডেন ভ্রমণ ব্যাপারে বিমান-বিহারীর প্রণয়পীড়িত মনেরও পক্ষে আনন্দের উপাদান কম ছিল না; কিন্তু তাহার উৎসাহব্যাকুল হৃদয়, ধনীগৃহে ভোজে আহূত দরিদ্রের মত, কিছুতেই সীমার মধ্যে সংরুদ্ধ থাকিতে পারিতেছিল না। তাই বেঞ্চে বসিয়াই সে হৃষ্ট-চিত্তে কহিল, "বিমলা, সেই গানটি গাও ত—সন্ধ্যা এল ঘনাইয়া দিনের আলো আঁধার করি'—"

একটু পীড়াপীড়ি করিলে বিমলা কি করিত বলা যায় না, কিন্তু তাহার অবসর পাওয়া গেল না। সুরের পথে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবার পূর্ব্বেই সুরকির পথে অসুরের মত এক মূর্ত্তি সহসা কোথা হইতে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং আনত হইয়া সকলকে দীর্ঘ সেলাম করিয়া বিমানকে বলিল, "বাবুজী' কুছ চন্দা দিন্।"

পরীর রাজ্যে প্রেতের মত সহসা এই মূর্ত্তির আবির্ভাবে মোহাবেশটা এক মুহূর্ত্তেই ছিন্ন হইয়া গেল। প্রথমটা চারিজনেই ভীতিবিহ্বল হইয়া নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল; তাহার পর বিমানবিহারী একটু সংযত হইয়া কহিল, "কিসের চাঁদা ?"

সেই যমদূতের মত মূর্ত্তি একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, "হিন্দুস্থানের জন্য; স্বরাজের জন্য।"

হিন্দুস্থানের বেদনায় বিদ্ধ কোন্ স্বদেশসেবক সন্ধ্যা-সমাগমে হঠাৎ বোট্যানিকাল গার্ডেনের নিভৃত প্রদেশে উপস্থিত হইল এবং কি অধিকারে কোন্ সমিতির পক্ষ হইতে সে চাঁদা চাহে, এই প্রকার বহুবিধ কৈফিয়ত তলব করা যাইতে পারিত। তাহা ছাড়া, সন্তোষজনক কৈফিয়ত থাকিলেও, যেখানে-সেখানে যখন-তখন স্বদেশসেবার জন্য চাঁদা দিবার প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি বিমানবিহারীর ছিল না। তথাপি চাঁদাসংগ্রহকারীর নিকষকৃষ্ণ দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে-সকল বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে তাহার প্রবৃত্তি না হইয়া সহজে তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার ইচ্ছা হইল। তাই আর কোনও বিতণ্ডা না করিয়া পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া বিমান একটি টাকা দিতে গেল।

"আপনি রাজা মানুষ, একটাকা কি দিবেন ?" বলিয়া নিমেষের মধ্যে সেই ব্যক্তি বিমানের হস্ত হইতে মনিব্যাগটা কাড়িয়া লইয়া নিজের বুক-পকেটে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর সুমিত্রার দিকে ফিরিয়া কহিল, "মায়ী তুমি কিছু দান করবে না ? তোমার হারটি খুলিয়া দাও মায়ী, তোমার বহুত বহুত পুন্ হোবে।

সুমিত্রার কণ্ঠে একটি বহুমূল্য জড়োয়া কণ্ঠী ছিল।

অবস্থা যে অতিশয় বিপজ্জনক তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। সুমিত্রা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া অস্ফুটোক্তি করিয়া উঠিল, এবং বিমান তন্দ্রাকরুদ্ধ কণ্ঠে—"পুলিশ পুলিশ" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

তখন সেই গুণ্ডা বিমানের দিকে ফিরিয়া কহিল, "কেন বাবুসাহেব, ঝুটফুস্ হুজ্জোৎ করছ ? হামি সিটি দিয়ে দিলে তুরন্ত হামার তহশীলদার খাজাঞ্চি সব হাজির হোয়ে যাবে, তখন তোমাদের বহুত তখ্লিফ্ হোবে। পুলিস বাগিচায় আজ আছে না।" বলিয়া দুর্ব্বৃত্ত উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। সেই বিকট হাস্যরবে স্তব্ধ বাগান চকিত হইয়া উঠিল এবং দুর্ব্বহ আশঙ্কা ও চিন্তায় বিমান ও তাহার সঙ্গিনীগণের কণ্ঠ রুদ্ধ ও হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিল।

"তুমি যদি খুসিসে না দিবে মায়ী, হামি আপনি উৎ-রিয়ে লেবে।" বলিয়া দস্যু সুমিত্রার কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচিত করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু ঠিক সেই সময় তথায় আর-এক ব্যক্তি দ্রুতপদে উপস্থিত হইল; সে পুলিশও নহে অথবা গুণ্ডার খাজাঞ্চি তহশীলদারও নহে; অল্পবয়স্ক একটি বাঙ্গালী যুবক।

সে আসিয়া একেবারে গুণ্ডা ও সুমিত্রার মধ্যবর্ত্তী হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "খবরদার শয়তান ! স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়ো না।"

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় দস্যু ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল হইয়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই সহসা বস্ত্রমধ্য হইতে বৃহৎ শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া নবাগতকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সেই যুবক অদ্ভুত কৌশলে ছুরিকাঘাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া ক্ষিপ্রবেগে গুণ্ডার পশ্চাৎদিকে সরিয়া গিয়া তাহাকেই আক্রমণ করিল। তাহার পর ক্ষণকালের জন্য কাড়াকাড়ি মারামারি একটা ভীষণ ব্যাপার চলিল। অবশেষে উভয়ে পরস্পর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া সশব্দে ভূমিতে পড়িয়া গেল। প্রথমটা সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু ক্ষণকাল পরে সহসা নবাগত যুবক গুণ্ডার হস্ত হইতে ছুরি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার বুকের উপর উঠিয়া বসিল এবং তাহার গ্রীবা সবলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "সাবধান ! জোর করলেই গলা টিপে মেরে ফেল্‌ব্ !" তৎপরে গুণ্ডার গাত্রাবরণের কিয়দংশ তাহার মুখগহ্বরে পূরিয়া দিয়া

ক্ষিপ্রবেগে মুখখানা বাঁধিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট অংশ দিয়া বেঞ্চের সহিত তাহার হাত-পা দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দিল।

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া বিমান এই অদ্ভুত ব্যাপার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত শুধু নিরীক্ষণই করিতেছিল; বিস্ময়ে ও ত্রাসে সে এমনই অভিভূত হইয়া গিয়াছিল যে তাহাদের পরিত্রাতাকে তাহার গুরুতর বিপদে সাহায্য করিবার শক্তি, এমন কি চেতনা পর্য্যন্ত, তাহার ছিল না। এতক্ষণে আশ্বস্ত হইয়া সে অপরিচিত যুবককে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং অধীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আপনিই আজ আমাদের রক্ষা করেছেন!"

যুবককে কোনো কথা কহিবার অবসর না দিয়া সুরমা ভয়বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, "ঠাকুরপো, চল চল, আমরা এখান থেকে আগে বেরিয়ে পড়ি! এখনি যদি ওর সঙ্গীরা এসে পড়ে তখন আবার বিপদে পড়্‌তে হবে।"

আতঙ্কে সুমিত্রার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরিত হইতেছিল না, এবং বিমলা শীতার্ত্তের মত ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

অপরিচিত যুবক বিমানের প্রতি চাহিয়া কহিল, "সে কথা ঠিক। গুণ্ডারা প্রায়ই দলবদ্ধ হয়ে থাকে। চলুন আমি গেট পর্য্যন্ত আপনাদের পৌঁছে দিই" বলিয়া গুণ্ডার ছুরিখানা তুলিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, "এটা অন্ততঃ গেট পর্য্যন্ত হাতে থাক, কি জানি যদি কাজেই লাগে।"

তখন আর সময় নষ্ট না করিয়া সকলে উদ্বিগ্ন-দ্রুতপদে গেটের দিকে অগ্রসর হইল। বলা বাহুল্য বিমান গুণ্ডার পকেট হইতে তাহার অপহৃত মনিব্যাগটি উদ্ধার করিতে ভুলে নাই।

গেটে পৌঁছিয়া গেটরক্ষককে সংক্ষেপে গুণ্ডার কাহিনী জানাইয়া অপরিচিত যুবক ছুরিখানা তাহার জিম্মা করিয়া দিল।

গেটম্যান পকেট হইতে কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া কহিল, "হুজুর, আপকা নাম ঔর পতা লিখা দিজিয়ে, ক্যা জানে পুলিসকা দরকার হোয়ে।"

অপরিচিত যুবক একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "পুলিসের দরকারের জন্ত আমি ব্যস্ত নই। তবে তোমার দরকার হ'তে পারে। লিখে নাও—নাম সুরেশ্বর মিত্র; ঠিকানা—নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।"

সুরেশ্বরের নাম ও ঠিকানা গ্যাসালোকের সাহায্যে লিখিয়া লইয়া বিমানবিহারীকে সম্বোধন করিয়া গেটম্যান কহিল, "হুজুর, আপকা ভী লিখা দিজিয়ে।"

বিমানবিহারী কহিল, "নাম বিমানবিহারী বোস; পতা—নং বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।"

নাম ও ঠিকানা লেখা হইলে সুরেশ্বর বিমানের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল।

বিমান কোনো কথা কহিবার পূর্ব্বে সুরমা ব্যগ্রভাবে কহিল, "না, না, ঠাকুরপো, ওঁকে একলা এখানে ছেড়ে দেওয়া হবে না, উনি আমাদের সঙ্গে চলুন, আমরা বাড়ী পর্য্যন্ত ওঁকে পৌঁছে দেবো।"

বিমান সজোরে কহিল, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! ওঁকে ফেলে আমরা কখনও যেতে পারিনে!"

বিমানের প্রতি চাহিয়া সুরেশ্বর নম্রকণ্ঠে কহিল, "আমার জন্তে আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি শিবপুরে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে তার পর বাড়ী ফিরব।"

ত্রাসের বিহ্বলতা হইতে এতক্ষণে অনেকটা মুক্ত হইয়া সুমিত্রার মন তাহার উদ্ধারকর্ত্তার প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় এমনই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে অপরিচয়ের কোনো সঙ্কোচ না করিয়া সে সনির্বন্ধে কহিল, "বন্ধুর সঙ্গে আর-একদিন দেখা কর্‌বেন, আজ বাড়ী ফিরে চলুন।"

সুমিত্রার প্রস্তাবে আপত্তি করিতে গিয়া, সুরেশ্বর বিনয়-স্মিতমুখে সুমিত্রার প্রতি শুধু একবার সসঙ্কোচে দৃষ্টিপাত করিয়াই নিরুত্তর হইয়া গেল। যেটুকু উপকার সে করিয়াছে তৎপ্রসূত কৃতজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়াই যে উপকৃতের দল ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া বাদানুবাদের সাহায্যে তাহার কৃতিত্ব ও অপর পক্ষের কৃতজ্ঞতা এই উভয়কে সুপ্রকাশ করিয়া তুলিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

বিমান কহিল, "আপনি আপনার বন্ধুর জন্ত যতই ব্যস্ত হোন না কেন, আজ আমরাও আমাদের বন্ধুকে ছাড়্‌চি নে। যে অপরিমেয় উপকার আপনি করেছেন

তার জন্যে এই একবিন্দু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ আমাদের না দিলে নিষ্ঠুরতা হবে।"

এই উপকার স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুস্পষ্ট উল্লেখের বিরুদ্ধেও সুরেশ্বর একটি কথা বলিল না। স্তুতি ও প্রশংসা, নিঃশব্দে সেবন করিতে সে যেমন অপটু, সশব্দে উদ্গিরণ করিতেও তাহার তেমনি বাধে, তাই কোনোপ্রকার অপ্রয়োজনীয় বিনয় প্রকাশ না করিয়া সে মৃদু হাসিয়া কহিল, "এমনই যদি হয়, তা হ'লে না হয় ফেরাই যাক্।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমান হৃষ্টচিত্তে সোফারকে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে আদেশ করিল।

এতক্ষণ যাহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, গ্যাসালোকে সহসা তাহা দেখিতে পাইয়া সুমিত্রা সভয়ে বলিয়া উঠিল, "ঈশ, আপনার হাত যে ভয়ানক কেটে গেছে!"

সুরেশ্বর তাহার দক্ষিণ হস্ত চক্ষের নিকট তুলিয়া দেখিয়া স্মিতমুখে কহিল. "না, তত বেশী কাটে নি। ছুরিখানা কেড়ে নেবার সময় একটু লেগে গিয়েছিল।"

বিমান ব্যস্ত হইয়া সুরেশ্বরের হস্ত নিজ হস্তে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল, "এ একেবারেই একটু নয়! এখনও রক্ত বন্ধ হয় নি; যতক্ষণ ভাল ব্যবস্থা না করা যাচ্ছে ততক্ষণ অন্ততঃ একটা জলপটি দেওয়া যাক্।"

ক্ষতটা যে নিতান্ত উপেক্ষা করিবার মত সামান্য নহে, তাহা সুরেশ্বরও বেদনা ও রক্তপাতের দ্বারা বুঝিতে পারিতেছিল। তাই জলপটি দিবার প্রস্তাবে সে আপত্তি করিল না।

জল নিকটেই ছিল, শুধু একটা পটি পাইলেই হয়। বিমান নিজ পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল, "না চল্‌বে না, এ একটু অপরিষ্কার হ'য়ে গেছে, ক্ষতি হ'তে পারে।

বিমানের কথা শুনিয়া সুমিত্রা তৎক্ষণাৎ নিজ রুমাল বিমানের হস্তে দিয়া কহিল, "আমার রুমাল নিন্, একেবারে ধোপার বাড়ীর পাটভাঙা।"

সুমিত্রার রুমাল হস্তে লইয়া দেখিয়া বিমান বলিল, "হ্যাঁ, এ বেশ চল্‌বে; আসুন সুরেশ্বর-বাবু ভাল ক'রে বেঁধে দিই।"

সুরেশ্বর বিমানের হস্ত হইতে সুমিত্রার রুমালখানা লইয়া দুই অঙ্গুলীর স্পর্শে নিবিষ্টচিত্তে তাহা পরীক্ষা করিয়া বিমানকে প্রত্যর্পণ করিল। তাহার পর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া সবিনয়ে কহিল, "আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জান্‌বেন, কিন্তু আপনার মূল্যবান্ আইরীশ লিনেনের কোন দরকার নেই, দেখুন আমি সহজেই ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছি।" বলিয়া তাহার পরিহিত উত্তরীয়ের একপ্রান্ত হইতে খানিকটা বস্ত্র ছিঁড়িয়া বিমানের হস্তে দিয়া বলিল, "এই দিয়ে বেঁধে দিন্।"

বিমান দুঃখিত-স্বরে বলিল, "আহা চাদরটা ছিঁড়ে ফেল্‌লেন! রুমালখানা দিয়ে বাঁধ্‌লেই ত হ'ত।"

রুমাল দিয়া বাঁধিলে কেন হইত না তাহা বিমান না বুঝিলেও সুমিত্রা বুঝিতে পারিল। পরীক্ষা করিয়া রুমালখানা বিদেশী কল্পনা করিয়াই যে সুরেশ্বর তাহা গ্রহণ করিল না, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কিছু না থাকিলেও, সুমিত্রা নিঃসংশয়ে তাহা অনুমান করিল। সুরেশ্বরের প্রত্যাখ্যান-বাণীর মধ্যে "মূল্যবান্" কথাটা যে কেবলমাত্র সান্ত্বনা এবং "আইরীশ লিনেন" কথাটাই যে পরিনির্দেশক সত্য, তাহা বিনা বিতর্কেই বুঝিতে পারিয়া সুমিত্রা বিমানের সহিত দুঃখপ্রকাশে কোনপ্রকার যোগ না দিয়া নিরুত্তর রহিল। সদ্যপ্রাপ্ত উপকারের জন্য সুরেশ্বরের প্রতি অমিত কৃতজ্ঞতা বহন করিয়াও সে এই প্রচ্ছন্ন আঘাতে মনে মনে ঈষৎ ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না।

জলপটি বাঁধা হইলে মোটরে করিয়া সকলে কলিকাতা রওনা হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রমলা

(৩৫)

এই অগ্নিকাণ্ডে কারখানা যেমন পুড়িয়া গেল, যতীনের মনও তেমনি ঝল্‌সিয়া গেল; কলগুলি যেমন ভাঙিয়া গেল, যতীনের বলিষ্ঠ দেহও তেমনি ভাঙিয়া গেল। ক্ষতি কয়েক লক্ষ টাকা হইয়াছিল, তাহার মত অর্থপতির নিকট বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু সে আর এ যন্ত্রের বোঝা বহিতে, এ, অর্থের দাসত্ব করিতে অসমর্থ। কিছুদিন হইতেই এ শক্তির দোলায় দুলিয়া দুলিয়া সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সমস্ত দিন কলের মত খাটা,—আফিস হইতে কারখানা, কারখানা হইতে রাস্তার ব্যাঙ্ক, সর্ব্বদাই এ অর্থের মজুরী করিয়া জীবন যেন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। আর সে টাকা জমাইয়া সুখ পায় না। টাকার জন্য সে এ কলকারখানার কাজে লাগে নাই, বুকের মধ্যে কোন শক্তি তাহাকে ইঞ্জিনের মত চালাইয়াছে, সে শক্তির আগুন যেন নিভিয়া যাইতেছে।

সেদিনকার অগ্নিকাণ্ডে যতীনের দেহ বিদগ্ধ হয় নাই, কপালে শুধু একটু ক্ষত হইয়াছিল, ঘোর মানসিক অশান্তির পর এরূপ অগ্নিদৃশ্যে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার পর এ কি অশান্তি তাহার বুকে বাসা বাঁধিয়াছে, কিছুই তাহার ভাল লাগে না। এই কলকারখানা, এই ঘর-বাড়ী, এই পুঞ্জিত শক্তি, ধনের স্তূপ, সব অর্থহীন, তাহার সমস্ত জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে। কিসের জন্য সে খাটিয়া মরিতেছে? Science, civilization, humanity,—মানব-সভ্যতার কতটুকু উন্নতি সে করিয়াছে? দেশের সে কি কল্যাণ করিয়াছে? এই অগ্নিকাণ্ডে যে কুলীবালক পুড়িয়া মরিয়াছে তাহার কথা মনে হইলে তাহার দেহ শিহরিয়া উঠিত। কুলীদের পোড়া-বস্তির সংস্কারের জন্য সে নিজের পকেট হইতে টাকা দিয়াছে। কিন্তু, সেই কুলী-বালকের জীবনের জন্য কে দায়ী?

দিনটা কোনরকমে আফিসে, ব্যাঙ্কে, কারখানায় ভূতের মত ঘুরিয়া সব নূতন করিয়া গড়িবার ব্যবস্থা দিতে দিতে কাটিয়া যাইত, কিন্তু দুঃস্বপ্নময় রাত্রি অসহ্য হইত। কোন রাতে সে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিত,—আগুন, আগুন, পালাও, পুড়লো—বাঃ! তাহার চোখের সামনে রাঙা আলো জ্বলিয়া উঠিত, এক বিদগ্ধ বালকের আর্ত্তনাদ কানে আসিত, অর্দ্ধরাত্রে প্রলয়ঙ্করের ডমরুধ্বনিতে জাগিয়া উঠিয়া জান্‌লা খুলিয়া সে অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত, আর ঘুম হইত না।

স্বামীর ব্যথাভরা মুখের দিকে মাধবী করুণ নয়নে চাহিয়া থাকিত। দেহের ক্ষত সে কত সেবা করিয়া সারাইয়াছে; কিন্তু মনের এ অশান্তি, এ জ্বালা, সে কি করিয়া দূর করিতে পারে! প্রতিদিন সে বড়-বড় সাহেব ও বাঙালী ডাক্তার ডাকিয়া স্বামীকে দেখাইত। কি হইয়াছে? মাথা কি বিকল হইয়া যাইবে?

সবাই এক কথা বলিত,—victim of modern civilization, complete nervous breakdown. কি চিকিৎসা হইবে, কি টনিক, কি ওষুধে সারিবে? সবাই এক উত্তর দিত,—কোন টনিক, কোন ওষুধ নয়। এই নগরজীবন ও সভ্যতার দুর্ব্বহ বোঝা ছাড়িয়া শ্যামা-বসুন্ধরার স্নিগ্ধ কোলে ফিরিয়া যাইতে হইবে, পৃথিবীমাতার সৌন্দর্য্যসুধাভরা স্তন্যরস পান করিয়া চিন্তাহীন মুক্ত জীবন যাপন করিতে হইবে; এই দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, হিংসা, অর্থশক্তির জন্য হানাহানি নয়, সূর্য্যের উদার আলো, নির্ম্মল জল, শ্যামল মাটির টনিক, প্রকৃতির আপন হাতের জীবনসুধা পান করিতে হইবে।

যতীন ভাবিত, জীবনের দুই ক্ষুধা,—অন্নের জন্য ও অন্তরের জন্য। অর্থ আর সে চায় না, সে যথেষ্ট অর্থ পুঞ্জীকৃত করিয়াছে, সে প্রেমের জন্য তৃষিত। তাহার স্ত্রী কি সত্যই তাহাকে ভালবাসে না? আগুন হইতে সে বাঁচাইয়া আনিয়াছে, তাহাকে কি স্নেহ ও নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছে। কিন্তু এ মাতার সেবা নয়, সে প্রিয়ার প্রেম চায়। এই অর্থ ছাড়িয়া, স্ত্রী ছাড়িয়া, এই যন্ত্রশক্তি ও বিংশশতাব্দীর সভ্যতা ছাড়িয়া, এই সূর্য্যালোকদীপ্ত পুষ্পবর্ণময় নদী-মেখলা বনচ্ছায়াস্নিগ্ধ সুন্দরী ধরণীর মুক্ত

ক্রোড়ে এক নগ্ন বর্ব্বর উন্মুক্ত জীবনের জন্য সে তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সহজ সরল বন্যজীবনে প্রাণের নবশক্তি দিয়া বাঁচিয়া থাকিবার নিছক আনন্দ উপভোগ করিতে সে চায়।

তাহার যে যান্ত্রিক প্রতিভা ছিল, তাহা ত মানব-সভ্যতার উন্নতির কাজে সে লাগায় নাই, সে শক্তির ব্যভিচার করিয়াছে ; যে নব যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া মানবের কর্ম্মশক্তি বাড়াইতে পারিত, সে বণিক্ হইয়া স্বর্ণের নিগড় গড়িয়াছে। এ যন্ত্রের দাসত্ব, স্বর্ণের দাসত্ব আর নয়, সে বিদ্রোহী, এ আর ভাল লাগে না।

যতীন ড্রয়িংরুমে খোলা জানালার কাছে এক ইজি-চেয়ারে শুইয়া সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল। মাধবী তাহার পাশে সোফায় আসিয়া বসিল, ধীরে বলিল, —আজ ডাক্তার কি বল্‌লে।

মাধবীর দিকে না চাহিয়া যতীন বলিল—কি আর বল্‌বে, victim of machine, neurasthenia.

ধীরে কপালে ক্ষতের দাগের উপর একটু হাত বুলাইয়া মাধবী বলিল,—কি ভাব্‌ছ ? কি করবে ?

—তাই ভাব্‌ছি, জীবনটায় কি করবার আছে।

একটা দম্‌কা বাতাসে পথের ধূলাবালি ঘরে উড়িয়া আসিল। মাধবী শার্শী বন্ধ করিয়া দিতে উঠিলে যতীন বলিল,—না, না, থাক্ জানালাটা খোলা, ঝড়ের মেঘ-গুলো ভারি সুন্দর দেখ্‌তে।

ধীরে আবার পাশে বসিয়া মাধবী বলিল,—অত নিরাশ হোয়ো না।

—হাঁ, এস, কিছু করা যাক্, কি করা যায় বল ত !

—ক্ষতি ত বিশেষ কিছু হয় নি, এত দমে' পড়েছ কেন ?

—না, ও ক্ষতির জন্য ভাব্‌ছি না। কিন্তু ও-জীবন আর নয়, শুধু শক্তির সাধন করতে গিয়ে প্রলয়াগ্নি জ্বলে' উঠ্‌ল। দেখ, কি করলুম, মানুষগুলোকে ভূতের মত খাটিয়ে পশুর মত রাখা !

—সবাইকে বাঁচ্‌তে হবে ত, খেতে হবে ত।

—কিন্তু আনন্দ কৈ. কিন্তু দেশের কাজ সমাজের

—কিন্তু—

—না কিন্তু নয়, হাঁ কিন্তু, আমরা কে যে পরের জীবন নিয়ে খেলা করব, চালাতে গিয়ে উল্টো হবে, আবার এম্‌নি অগ্নিকাণ্ড—

—কিন্তু কিছু করতে হবে ত।

—না, সেটা ভুল। আগে ঠিক করতে হবে জীবনের উদ্দেশ্য কি, আমাকে দিয়ে কি কাজ হ'তে পারে, কিসের জন্য আমার সৃষ্টি, সে কাজ যতই তুচ্ছ যতই সামান্য হোক, সে কাজ করাই আমার ধর্ম্ম—জীবনের সত্যি কাজ আমরা খুঁজি না—

—সবাইয়ের কাজ কি সমান—

—তা নয়, কিন্তু আমার শক্তি দিয়ে আমি পৃথিবীর কি কল্যাণ করে' যেতে পারি,—আমার শক্তি,—না শক্তি নয়, প্রেম দিয়ে, প্রেম—

প্রেম, এই কথাটি উচ্চারণ করিয়া যতীন করুণ চোখে কালো মেঘস্তূপের দিকে চাহিয়া রহিল। মাধবীর মনও উদাস হইয়া উঠিল ! প্রেম,—তাহাদের প্রতিদিনের জীবনে কতটুকু প্রেম আছে ?

মাধবী ভাবিল, স্বামী যে অসুখী, তাহা কি তাহার দোষে ? সে ত একদিন প্রেমের সুধাপাত্র হাতে করিয়াই স্বামীর জীবনপথে আসিয়াছিল, তখন স্বামী শক্তির রথে জয়যাত্রায় চলিয়াছে, তাহার দিকে চাহে নাই। সেও তাই শূন্য পাত্র কতরকমে ভরিয়া রাখিতে চাহিয়াছে, কত রকমে সে সুখ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে, কিন্তু হৃদয় ত পূর্ণ হইল না। আজ এই ঝড়ের অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তাহারা কি আবার নূতন করিয়া বোঝাপড়া করিয়া লইতে পারিবে, নবপ্রেমের জীবন আরম্ভ করিতে পারিবে ?

ধীরে সে উঠিয়া গেল। বাতাস আরও উদ্দাম, অন্ধকার আরও নিবিড় হইয়া আসিতে লাগিল।

যতীন ভাবিতে লাগিল, সত্যই সে কি এতদিন বৃথা কাজ করিতেছে, এই যন্ত্রপূজার কি কোন সার্থকতা নাই ? আছে বৈ কি। মানবের সভ্যতার উন্নতির জন্য যন্ত্রেরও দরকার। কিন্তু প্রথমে যে হৃদয়ের দরকার, প্রেম চাই, একথা যে সে ভুলিয়া গিয়াছে। আজ তাহার সমস্ত দেহে

মেঘের আবগুলি [illegible]

মানব-সভ্যতার নাড়ীতে নাড়ীতে কিসের ব্যথা, কি ক্ষুব্ধ তৃষ্ণা, কি করুণ আর্ত্তনাদ। শক্তির সহিত শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে হিংসা-স্বার্থের আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে, শান্তি নাই, আনন্দ নাই।

পরদিন সমস্ত বিকাল মাধবী বৃহৎ বাড়ীর সব ঘর আনমনা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার তাসের আড্ডা ভাঙিয়া গিয়াছে, কোথাও বাহির হইতেও ভাল লাগে না, সাজানো শূন্য ঘরগুলি ঘুরিয়া আপন সাজসজ্জার ঘরে আসিয়া আল্‌মারীর আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল, কোন্ বেদনার আগুনের ঝল্‌কায় তাহার দেহও শুকাইয়া কালো হইয়া গিয়াছে।

চোখগুলি আয়নার অতি কাছে আনিয়া আঙুল দিয়া টানিয়া মুখখানি দেখিতে লাগিল। সহসা পিছনে এক ঝাঁকুনি খাইয়া সে চমকিয়া উঠিল। যতীন তাহার ঘাড়ের কাছে নীল ব্লাউসটা ধরিয়া তাহাকে ঝাঁকা মারিতেছে।

অবাক্ হইয়া সে যতীনের দিকে ফিরিয়া চাহিল। ঝড়ের ঝাপট-খাওয়া ছেঁড়া-মাস্তুল ভাঙা-নোঙর জাহাজের মত যতীন দাঁড়াইয়া, তাহার শুষ্ক মুখ, রুক্ষকেশ, বিশৃঙ্খল কাপড়। মাধবী ঘুরিতে তাহার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মাধবীর হাত ধরিয়া তাহার সমস্ত দেহ নাড়াইয়া যতীন গম্ভীর স্বরে বলিল,—শোন, তোমার কি চাই?

অবাক্ হইয়া মাধবী বলিল,—কি চাই?

হায়, তাহার কি চাই, সে কি করিয়া বলিবে? এতদিন পরে কি যতীনের খোঁজ করিবার সময় হইল? মাধবীর চোখের দিকে চাহিয়া যতীন আশ্চর্য্য হইল, ও যেন বরফের চোখ, রক্তের একটু লেশ নাই।

মাধবী ম্লান হাসিয়া বলিল,—কি বলছ?

ধীরে যতীন বলিল,—বলছি তোমার কত টাকা চাই?

—কত টাকা?

—হাঁ কত টাকা হ'লে তোমার চল্‌বে।

মলিন দৃষ্টিতে সে ভীত হইয়া যতীনের দিকে চাহিল। তাহার কান্না আসিল। তাহার স্বামীর কি সত্যই মাথা খারাপ হইতেছে।

ম্লান হাসিয়া সম্মুখের কাপড়ের আল্‌মারী খুলিয়া নানারঙের শাড়ীগুলি দেখাইয়া মাধবী বলিল,—আচ্ছা তুমি suggest করনা, কি পর্‌ব, আমার ঠিক কর্‌তে এত দেরী লাগে।

যতীন থাকে থাকে সাজান শাড়ীগুলি একবার হাত দিয়া ঘাঁটিল, তার পর মাধবী যে শাড়ীখানি পরিয়া ছিল, তাহার দিকে চাহিল, একটু ব্যঙ্গের স্বরে বলিল,—ও সব শাড়ীই সমান, যেটা ইচ্ছে পর।

—ওগো!

—হাঁ, এস তুমি, কত টাকা তোমার চাই, দিয়ে যাই।

ধীরে যতীন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, মাধবীও তাহার পিছন পিছন ম্লানমুখে চলিল।

দুইজনে লাইব্রেরীতে দুই চেয়ারে মুখোমুখি বসিল। স্থিরনেত্রে মাধবীর পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া যতীন বলিল,—দেখ, আমি আজ চলে' যাচ্ছি।

—কোথায়?

—তা জানি নে, এ-সব ছেড়ে যেখানে হয়, যে-কোন বন-জঙ্গলে, পাহাড়ে—

ভীতবিস্মিত নয়নে মাধবী স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। মুখ গম্ভীর, দৃঢ়, বেদনার ছায়া যেন কাটিয়া যাইতেছে। কান্নার স্বরে সে বলিল,—সত্যি? কোথায় যাবে?

—হাঁ সত্যি যাব। তোমার খরচের জন্য কত টাকা রেখে যাব বল।

ড্রয়ার হইতে চেক্‌বুকটা সে বাহির করিল।

ভাঙা-গলায় মাধবী বলিল,—আমিও যাব।

চেক্‌বুকটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে একটু হাসির সুরে যতীন বলিল,—তুমিও যাবে?

মৃদুস্বরে মাধবী বলিল,—হাঁ। আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল, যেখানে হয়, আমারও এ-সব আর ভাল লাগ্‌ছে না—

উৎসাহের সঙ্গে যতীন বলিয়া উঠিল,—পার্‌বে? সুন্দরবনের জঙ্গলে যেতে?

মাধবীর পাণ্ডুর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; সে বলিয়া উঠিল,—সুন্দর বন! শিকার করতে?

—না, শিকার করতে নয়, বাস করতে।

ছোট মেয়ের মত মাধবী উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া দ,—হাঁ, আমিও যাব।

চেক্‌বুকটা ঘরের কার্পেটে ফেলিয়া দিয়া যতীন বলিল,—আচ্ছা, তবে এস, আমি ষ্টিমলাঞ্চ্‌টা ঠিক করে' রাখ্‌তে বলেছি।

খোলা জানলা দিয়া মেঘের ভ্রূকুটির দিকে চাহিয়া মাধবী ধীরে বলিল,—এক্ষুনি? ঝড় আস্‌ছে যে।

দাঁড়াইয়া উঠিয়া যতীন বলিল,—তবে থাক, আমি চল্‌লুম।

মাধবী যতীনের দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—না, না, আমিও যাব, দাঁড়াও।

মাধবীর পিঠ চাপ ড়াইয়া যতীন বলিল,—শীগ্‌গির এস, কিছু সাজ করতে হবে না, শুধু কয়েকখানা কাপড় নিয়ে এস।

ছোটমেয়ের মত লাফাইতে লাফাইতে মাধবী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নিজের ঘরে ছুটিয়া গিয়া, সম্মুখে যে-কাপড়জামা পাইল, তাহাই এক সাদা আলোয়ানে জড়াইয়া পুঁটলী করিয়া বগলে চাপিয়া নাচের তালে চুল দোলাইতে দোলাইতে বাহিরে ছুটিয়া আসিল।

দ্বারের কাছে শচী তৃষিতের মত দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া মনে পড়িল, তাহার সহিত বায়স্কোপ যাইবার কথা ছিল বটে।

শচী অবাক্‌ হইয়া বলিয়া উঠিল,—কি মাধবী দি, এত ছুটোছুটি? দিন পুঁটুলীটা।

মাধবী মধুর হাস্তে পুঁটুলী দোলাইয়া বলিয়া উঠিল,—Oh Sachi! wild life! forest!

হতভম্ব হইয়া শচী মাধবীর দিকে চাহিল। তাহার গালে দুই টুস্‌কি মারিয়া সিংহের গর্জ্জনের নকল করিয়া মাধবী ডাকিয়া উঠিল,—ঘাঁউ, ঘাঁউ,—জঙ্গলে চল্‌লুম, ta—ta—

স্নিগ্ধ চোখে তাহার দিকে চাহিয়া মাধবী স্বামীর পাশে মোটরে লাফাইয়া গিয়া বসিল। হীরাসিং মোটর ছুটাইল। শচীর বিদায়করুণ তরুণ মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চাহিয়া হাতের রুমালখানি নাড়িতে নাড়িতে মাধবী অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। মেঘঘন আকাশ প্রেমিকের সজল দৃষ্টির মত শূন্যবাড়ীর উপর চাহিয়া রহিল।

(৩৬)

আবার হাজারিবাগের সেই বাড়ীতে। বহুদিনের অযত্নে বাড়ীখানি পোড়ো দেখাইতেছে, রক্তের মত লাল রং ঝরাপাতার মত কালো হইয়া আসিয়াছে, সমস্ত বাড়ীখানি যেন কোন মধুরদিনের উদাসস্মৃতি—কোথাও গাছ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কোথাও বালি খসিয়া গিয়াছে, লাল কাঁকরের পথে ঘাস জন্মিয়াছে, ফুলের বাগান আগাছা-পরগাছায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ঘরে ধুলো জমিয়াছে, কার্পেট ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দেওয়ালের রং মলিন হইয়া গিয়াছে।

রজতেরা প্রায় দিন পনের হইল এই বাড়ীতে আসিয়াছে। দোতলার ধূলোভরা ঘরগুলো তালাবন্ধই রহিয়াছে, সেই ঘরগুলির সুপ্রচুর ধূলা ঝাঁটিয়া পরিষ্কার করিতে রমলার খুব ইচ্ছা থাকিলেও তাহার আর সে শক্তি নাই। নীচের বড় ড্রয়িং-রুমটা পরিষ্কার করিয়াই বসিবার শুইবার খাইবার ঘর করা হইয়াছে। শুধু কাজীসাহেব তাঁর পুরাতন দরে গেছেন।

সুন্দর সকালবেলা। ড্রইং-রুমটা মধুর উজ্জ্বল আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে। পিয়ানোর ঠিক উল্টোদিকের কোণে এক ছোট মার্ব্বেল টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া খাওয়া হইতেছিল। রমলার এক পাশে রজত, আর-এক পাশে খোকা বসিয়া; তাহার উল্টাদিকে কাজীসাহেব খুকীকে কোলে করিয়া।

কাজীসাহেবের চেহারার খুব বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই, শুধু কোঁকড়ান দীর্ঘ চুলগুলি সব প্রায় পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে, শ্মশ্রু দীর্ঘ শুভ্রবর্ণ, চোখের জ্যোতি একটু তীক্ষ্ণ, পক্ক আম্রের মত মুখের লাবণ্য, রক্ত যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। তিনি খুকীকে কোলে করিয়া ফিডিং বোতল ধরিয়া দুধ খাওয়াইতেছিলেন।

রজতের দেহ শীর্ণ হইয়াছে, কপালে কয়েকটি চিন্তার দুঃখের রেখা টানা, চোখের কোলের কালি চশ্‌মার কাচ দিয়া দেখা যাইতেছে, হাত-পাগুলি একটু সরু হইয়াছে, গলায় কয়েকটি ধমনী স্ফীত দেখা যাইতেছে। রমলার

তনুখানি সূর্য্যাস্তের আকাশের মত করুণ সুন্দর, তাহার হীরার মত জলজলে মুখ নীলার মত স্নিগ্ধ, বিদ্যুতের মত দীপ্তিভরা চোখ এখন সুদূর পথহারা তারার আলোর মত চাহিয়া আছে। খোকার নিকারবকারের খোলা বোতাম লাগাইয়া সে একটু নাক সিঁটকাইয়া দুধের পেয়ালা টানিয়া লইল।

রজত মুচ্‌কিয়া হাসিয়া রমলার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া বলিয়া উঠিল,—বাসি লুচি, O lovely! কিন্তু দুধটা—আঃ!

সাত বছর আগে এই বাড়ীতে এম্‌নি এক স্নিগ্ধ মধুর প্রভাতে রমলা রজতকে এই কথাগুলি বলিয়াছিল।

রাগের ভান করিয়া রমলা বলিয়া উঠিল,—দেখ, অমন করলে আমি কিছুতেই দুধ খাব না।

—বা, খাবে না, ডাক্তার বলেছে—

—ডাক্তারেরা অমন ছাইপাঁশ কত কি বলে।

খোকা মায়ের দিকে হাসিয়া চাহিয়া বলিল,—বা, মা, আমাদের বেলায় খোকা শীগ্‌গির দুধ খা, আর নিজের বেলায় আঁটিছুঁটি—

রজত খোকার পিঠ-চাপ্‌ড়াইয়া বলিল,—বলত বাবা, বল ত।

খোকা সম্মুখের দুধের পেয়ালা সরাইয়া বলিল, তুমি দুধ না খেলে' আমিও খাব না।

খুকীও ফিডিং বোতল হইতে মুখ সরাইয়া বলিয়া উঠিল,—তাজী!

কাজী হাসিয়া বলিলেন,—এই দেখ, খুকীও বল্‌ছে আমিও না।

রজত দুষ্টামিভরা চোখে রমলার দিকে চাহিয়া দুধের পেয়ালা হাতে তুলিয়া দিল। রমলা মুখটা একটু বিকৃত করিয়া কুইনাইন খাওয়ার মত দুধ খাইতে লাগিল। সেই ঈষৎবিকৃত প্রিয়মুখের অপূর্ব্ব সুষমার দিকে রজত মুগ্ধচোখে চাহিয়া রহিল। কোনমতে দুধ খাইয়া রমলা পেয়ালা টেবিলে রাখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তলায় একটুখানি পড়িয়া রহিল।

রজত বলিল,—ওটুকুন্‌?

—আর আমি কিছুতেই পারব না, সরের কুচি

খাওয়া শেষ হইলে রজত রমলার হাত ধরিয়া উঠাইল। সেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহার সর্দ্দিজ্বর হইয়াছিল; এখানে আসিয়া একটু সারিয়াছে বটে, কিন্তু দুর্ব্বলতা একেবারে যায় নাই। রজতের হাতে মৃদু ভর করিয়া রমলা ঘর হইতে বাহির হইল। দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া নামিয়া এক বড় গাছের তলায় গিয়া থামিল। এই গাছের তলাটাই মাধবীর প্রিয় স্থান ছিল; এখন সে গাছ আরও বড় হইয়াছে, চারিদিকে নানা আগাছা জন্মিয়াছে। গাছের ছায়ায় দোলান-চেয়ারে রমলাকে বসাইয়া রজত নীচে ঘাসের উপর তাহার পাশে বসিল। রমলা অতি মৃদু হাসিয়া তাহার দিকে চাহিল। এই রোগশীর্ণ প্রিয়ার মুখে করুণসুন্দর প্রেমের আভামণ্ডিত হাসিটির প্রতি রজত বিমুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। ধীরে মাথাটা রমলার চেয়ারে ঠেকাইয়া হাতের বইখানা খুলিয়া রজত বলিল,—কোন্‌ গল্পটা পড়্‌ব বলত, The Thousand Dollar Smile!

রমলার পাণ্ডুর মুখ রাঙা হইয়া গেল, সে ধীরে বলিল,—বই থাক। এস গল্প করা যাক, আচ্ছা জীবনটা কি মজার নয়? সাত বছর আগে এই বাড়ীতে কেমন এসেছিলুম, আবার এ কেমন এলুম!—হাসি পায়।

রজত রমলার হাতটা টানিয়া লইয়া বলিল,—হাঁ দেখ্‌তে গেলে মজার বটে। কিন্তু ভাব্‌তে গেলে, বুঝ্‌তে গেলে মনটা ভারী হ'য়ে আসে। আচ্ছা, সেই সন্ধ্যে বেলা, তোমার মনে পড়ে, মোটরকারে তোমায় প্রথম দেখি?

রমলা মৃদু হাসিয়া বলিল,—আমি কিন্তু সত্যি রুমাল ওড়াইনি, আমি মুখ মুছ্‌ছিলুম।

— ও, দুষ্টু! আচ্ছা তোমার বেশ লাগ্‌ছে এখন, চলে' আস্‌তে কোন কষ্ট হ'ল না!

—না, এবার নেহাৎ মর্‌লুম না দেখ্‌ছি।

ধীরে রজত পাঞ্জাবীর বুক-পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া রমলাকে একটু দেখাইয়া বলিল;—আচ্ছা, এটা কি পাগলামী হয়েছিল?

—ওমা, ওটা কোত্থেকে পেলে? দাও, দাও, শীগ্‌গির, আমি ছিঁড়ে ফেলি।

– আচ্ছা, কি বলে' লিখেছিলে

—সত্যি, কল্‌কাতায় অসুখের সময় এত ভয় হয়েছিল, মনে হয়েছিল আমি আর বাঁচ্‌ব না। ওটা ছিঁড়ে ফেল, দাও আমায়।

—না।

দুইজনে হাতে হাত দিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এ যেন কোন পবিত্র মুহূর্ত্ত, মনের সব কথা ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া নীরবতার অতল সাগরে হারাইয়া গিয়াছে।

চিঠিখানি রমলা কলিকাতায় রোগশয্যায় লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল—

"আমি যদি মরি, তুমি খুব কষ্ট পাবে জানি। কিন্তু খুব দুঃখ কোরো না, তা হ'লে আমি পরলোকে গিয়ে শান্তি পাব না। তোমার মত স্বামী পেয়েও যদি মরি, সে আমার পরম দুর্ভাগ্য, আর তোমার কোলে মাথা রেখে মর্‌ব এমন সৌভাগ্য আর কি আছে। মরার পর মানুষ বেঁচে থাকে কি না জানি না, আমার বোধহয় থাকে, আমার আত্মা তোমার ভালবাসা পরজন্মে গিয়েও ভুল্‌বে না। জানি তোমার খুব কষ্ট হবে, কিন্তু যিনি প্রেমের দেবতা, আমাদের মিলন ঘটিয়েছেন, তিনি তাঁর শান্তি-মঙ্গলময় কোলে টেনে নেবেন, তোমার কোল ছেড়ে আমি তাঁর কোলেও যেতে চাই না, কিন্তু জীবনে ত আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না।

"তুমি খোকাকে শুধু দেখো, আর মাধবী যদি খুকীকে মানুষ কর্‌তে চায়, তাকে দিয়ে দিও, ও তার godmother হ'তে চেয়েছিল। ও আমাদের খুবই ভালবাসে। এবার ও বদ্‌লে যাবে, ও সত্যি খুব ভাল মেয়ে। কিন্তু জীবন ওকে ব্যঙ্গ করেছে বলে' ও জগৎকে ব্যঙ্গ কর্‌তে চায়; ভাগ্য ওকে কাঁদিয়েছে বলে' ও ভাগ্যের সঙ্গে তাল ঠুকে হাস্‌তে গেছে, কিন্তু এবার ও সত্যি ভাল হবে।

"দেখ, আমার সব গয়না খোকার বউকে দিয়ে গেলুম, আর সব জামাকাপড় খুকীকে; শুধু মুক্তার হারছড়া তুমি ললিতের বউয়ের জন্য রেখ। ললিতকে আমার ফাউন্‌টেন্ পেন্‌টা, কাজীকে আমার হাতীর-দাঁতের বাক্সটা আর হাফেজের বইখানা, যতীনবাবুকে আমার দোলানো চেয়ারটা আর মাধবীকে আমার পিয়ানো আর ভেল্‌ভেটে-বাঁধান খাতাটা দিও। এ-সব জিনিষ তুমি রাখ্‌লে, রোজ দেখে তোমার কষ্ট হবে। আমার নামে জমানো যা টাকা আছে, তা কোন বালিকা-ইস্কুলে মামাবাবুর নামে দান কোরো।

"তোমাকে ত আমি আমার দেহ-মন সমস্ত জীবনই দিয়েছি, মৃত্যুর পর তোমারই থাকব। তোমাকে প্রথম দিন দেখেই আমার দেহ-মন ফুলের মত ফুটে উঠেছিল, আজ তোমারই পায়ের তলায় সে ঝরে' পড়ছে। তোমার প্রেম পেয়ে আমার জীবন সার্থক হয়েছে, যিনি প্রেমের দেবতা, জন্মমৃত্যুর নিয়ন্তা, তাঁকে বার বার প্রণাম করে' খোকাখুকীদের তোমার কাছে রেখে আমি সুখে মর্‌ছি, জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়তম তুমি।"

এই চিঠিখানি রজত কতবার চোখের জলে ভিজাইয়া পড়িয়াছে। ধীরে চিঠিখানি পকেটে রাখিয়া সুদূর-দিগন্তের নীল-পাহাড়ের-দিকে-চাওয়া রমলার মুখখানির দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল,—কি সুন্দর!

মৃদু হাসিয়া রমলা বলিল—কি?

—তুমি, বলিয়া রজত তাহার গালে তিলের উপর চুমো খাইল।

রমলা ধীরে বলিল,—আচ্ছা, দেখ, ঐ পাহাড়টা, খুব বেশী দূর? নদী পেরলেই পৌছান যাবে?

—তোমার যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে?

—ভারি ইচ্ছে করে পাহাড়ের শালবনে গিয়ে ঘুর্‌তে।

—আচ্ছা সেরে ওঠ।

—বা, বেশ ত সেরেছি। আচ্ছা, মাধবীর চিঠিখানা কি তোমায় দেখিয়েছি?

—দেখেছি।

—দিব্যি আছে তারা জঙ্গলে। লিখেছে, তাদের নতুন জীবন আরম্ভ হয়েছে। আহা, দেখ, কি সুন্দর কচি ঘাস!

চেয়ার হইতে নামিয়া রমলা রজতের পাশে বসিয়া ঘাসগুলির উপর হাত বুলাইতে লাগিল, যেন তাহারা কোমল সুকুমার শিশুর দল। রসহীন রুক্ষ রুদ্র প্রান্তরে শুষ্ক ভূমি ভেদ করিয়া জীবনের জয়ধ্বনির মত এই সবুজ শিশুগুলি আলোর দিকে মাথা তুলিয়া চাহিয়া আছে, সবাইকার পায়ের তলার পেষণে-পেষণেই তাহাদের যাত্রা;

তবু এই ঘাসগুলি শালগাছের চেয়েও, নবমুকুলভরা আম-গাছের চেয়েও, গোলাপ-ঝাড়ের চেয়েও, মধুর রহস্যময়।

রমলা ঘাসে হাত বুলাইয়া বলিল,—দেখ, এই ঘাস কি তুচ্ছ বোধ হয়, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এর মধ্যে অনন্ত অফুরন্ত জীবন রয়েছে। বাস্তবিক পৃথিবীতে কিছুই তুচ্ছ নয়, আচ্ছা প্রত্যেক জীবনের একটা সার্থকতা নিশ্চয় আছে।

—নিশ্চয় আছে

—আমরা যা ভাবি ব্যর্থ, তা ব্যর্থ নয়; যেখানে মনে করলুম হেরে গেছি, হয়ত সেখানেই জিতেছি; মনে করলুম যে লোকটা বৃথা মরল, হয়ত সেই সবচেয়ে বেশী বেঁচে গেছে।—দেখ কি সুন্দর দেখাচ্ছে কাজীকে! আ, কি মিষ্টি খোকার হাসি!

বারান্দায় কাজী খোকাখুকীকে লইয়া খেলা করিতেছিল, তাহাদের কলহাস্যে রমলা দাঁড়াইয়া উঠিল। কাজীর কোলে খুকী ও পিঠে খোকা। এই পক্ককেশ শুভ্রশ্মশ্রু গেরুয়া-রংএর আলখাল্লা-পরা মুসলমানটি দুই গোলাপের মত শিশুকে জড়াইয়া বসিয়া আছে, নবকিশলয়-ভরা প্রাচীন গাছের মত সুন্দর দেখাইতেছে।

রজত রমলার আঙুল-আঙুল টানিয়া বলিল,—কি, উঠছ? না, রান্নাঘরে যাওয়া হবে না।

অনুনয়ের সুরে রমলা বলিল,—না, দেখ, আজ ভাল আছি। আচ্ছা, খোকা ঝুরি আলুভাজা খেতে কি ভালবাসে আর ডিমের বড়া, ও খানসামাটা কিছুতেই করতে পারবে না।

—খুব পারবে।

—আচ্ছা, আমি যেদিন করে' দি, দেখেছ ত, কি আনন্দের সঙ্গে খায়।

—না, লক্ষ্মীটি বস।

রমলা করুণ মিনতির চোখে রজতের দিকে চাহিল। রজত ধীরে উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—আচ্ছা চল, কিন্তু ওই দুটো হয়ে গেলেই চলে' আস্তে হবে।

—আচ্ছা, তাই হবে—বলিয়া রজতের হাত ছাড়াইয়া রমলা রান্নাঘরের দিকে চলিল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

ব্যথিতের প্রেম

ফুল ফুটেচে ব্যথিত-বুকের
গহন-গভীরে,
দেখ্‌বি যদি—মনের নয়ন
মেলিস্ কবি রে!

ফুল ফুটেচে প্রেমের গোলাপ,
কাঁটায় কাটা রক্ত-বিলাপ,
বড়ই কোমল বড়ই করুণ
মোহন ছবি রে!

ফুল ফুটেচে ব্যথিত-বুকের
গহন-গভীরে,
পাস্‌নে আভাস?—একটু দাঁড়া!
যাস্‌নেকো ফিরে।

ঐ যে উদাস দীর্ঘশ্বাসে
গন্ধ সে তার ভেসেই আসে,
পরাগ যে তার অশ্রু হয়ে
পড়চে ঝরি রে!

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পুরাণের কথা

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কথা আমাদের বিশেষ জানা নাই। জানিবার ততটা আবশ্যকও হয় নাই। আমরা আমেরিকা এবং ইউরোপের সভ্যতা লইয়া ব্যস্ত, অহরহ তাহাদের কথা শুনিয়াও থাকি; কিন্তু তার মধ্যে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কথা বড় একটা উঠে না। কিন্তু হিসাব খতাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াও সকলের সঙ্গে একজন হইয়া উঠিয়াছে; সুইডেনের দিয়াশলাই আমরা সকলেই ব্যবহার করিয়াছি, ষ্টক্‌হল্‌ম্‌ আমাদের অজানা নয়, যে কড্‌লিভার-অয়েল সেবন করিয়া অবস্থাবিশেষে আমাদের জীবনীশক্তি রক্ষা করিতে হয় তাহাও প্রধানতঃ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ারই সামগ্রী। আমরা ইব্‌সেন, বিয়র্ন্‌সন্‌ প্রভৃতির সাহিত্যের পরিচয় পাইয়াছি, নোবেলের দান বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িতেছে—তাহার এক কণিকা আমাদের দুয়ারেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে, স্বেন হেডিনের মত বিশ্বপর্য্যটক স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া হইতেই বাহির হইয়াছেন। তার পরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা। আমরা কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলিয়া গৌরব করি। বাস্তবিক কাশ্মীরে গিরিনদীবনের অপূর্ব্ব সম্মিলন এবং ফলপুষ্পের সম্পদ্-বৈচিত্র্য দেশটাকে নন্দনকানন করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু তার উপরেও যদি এইরূপ দৃশ্যপটের পশ্চাতে জলধির উন্মুক্ত বিস্তার দেখিতে হয়, তবে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াই তাহার স্থান। এদেশের পার্থিব দৃশ্যের উপরে ঋতুভেদে চন্দ্র-সূর্য্য-কিরণের বিচিত্রতায় এবং অরোরা-বোরিয়েলিসের এক অপার্থিব দীপ্তিতে যে দৃশ্যের অবতারণা হয় জগতে তাহার তুলনা নাই—যেন মানুষের চক্ষে সৌন্দর্য্যের পরমা অভিব্যক্তি। এমন দেশে বাস করিয়া যে জাতি গড়িয়া উঠে তাহারা সৌন্দর্য্যবিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে না।

সকল দেশেই মানুষ জাতীয়-শৈশবকালে তাহার চারিদিকে গিরিনদীসাগর-বন-উপবনের পার্থিব শোভা, উপরে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রের দীপ্তি এবং বৃষ্টি বায়ু বজ্র বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির খেলা দেখিয়া জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে যে ধারণা করে, তাহার মনে সহজবুদ্ধিতে যে-সকল ভাবের উদয় হয়, তাহা হইতেই পৌরাণিক সাহিত্যের উৎপত্তি; দেশে দেশে ঋতুভেদের বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক পদার্থের অসমতা এবং তার উপরে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের কল্পনাশক্তির অব্যাহত অভিব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পৌরাণিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যেও বেশ একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়;—গ্রীক পুরাণের সঙ্গে এবং আরও ঘনিষ্ঠভাবে হিন্দু পুরাণের সঙ্গে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পুরাণের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পুরাণে দেশের লোকের ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দেখা যায় না, বরং শেষের দিকে যেন প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে থাকার দরুন তাহাদের পৌরাণিক সাহিত্য কাব্যকলা হিসাবেই অভিব্যক্ত হইতেছিল। এক সময় দেশে রাজার অত্যাচারে পীড়িত হইয়া কতকগুলি লোক আইস্‌ল্যাণ্ডে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। যে কাব্যপ্রতিভার বীজ দেশে অঙ্কুরিত হইতেছিল, নূতন দেশে আসিয়া তাহা আরও বিকশিত হইয়া উঠিল। যখন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াতে বৈদেশিক প্রভাবের সংমিশ্রণে দেশের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, আইস্‌ল্যাণ্ডে উহার মূল-ধারা তখনও অব্যাহত রহিল। বস্তুতঃ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পুরাকালের অনেক কবিই আইস্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসী।

দেশে খৃষ্টীয় সভ্যতার স্রোত আসিয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক এবং রোমীয় পুরাণ ও সাহিত্যের নূতন প্লাবনে দেশের পুরাণের এবং সাহিত্যের অনেকটা হতাদর হইতে লাগিল। একদিকে ইহাদের নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাসে দৃঢ়তা ছিল না, অপরদিকে গ্রীক বা রোমীয়দিগের ন্যায় ইহাদের পুরাণেও একটা সুন্দর পরিকল্পনা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুচিন্তিত ধারাবাহিকতা ছিল। এই-সকল কারণে ইহাদিগকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য যেন প্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছিল। অন্যদিকে ইউরোপীয় সাহিত্য এবং রীতি-নীতির উপরে ইহাদের প্রভাবও বড় কম হয় নাই—বিশেষভাবে ইংরেজী সাহিত্যের উপরে। গ্রীসের প্রভাব ন্যায় অতটা স্পষ্ট না হইলেও, ইহার প্রভাব একে

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। খৃষ্টানদিগের সুপরিচিত ইষ্টার উৎসবে ইহাদের ইষ্টার দেবীরই স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—নামটি পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই দেশের পুরাণের প্রধান কথা—প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে মঙ্গল এবং অমঙ্গলের বিরোধ, অর্থাৎ আমাদের দেশেরই মত দেবাসুরের চিরন্তন সংগ্রাম। এই শীত ও তুষারের দেশে শীতকালে আবার কয়েক মাস নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারই থাকে। ইহাতে উহারা স্বভাবতঃই বরফ এবং শৈত্যকে অমঙ্গলরূপী বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছে; সেই হিসাবেই উত্তাপ এবং আলো ইহাদের কাছে মঙ্গলের নিদান। সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা এইরূপ—আদিতে এক মহাপরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বিশ্বপিতা বলিয়া পরিচিত। ইনি অনাদি এবং নিরাকার, ইঁহার ইচ্ছাশক্তিতে সকল ঘটনার সংঘটন হইত। বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে এক অতি গভীর অতল সাগরের ব্যবধান, তাহার উত্তরে নিফ্‌ল্‌হেইম্ কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকারের দেশ; দক্ষিণে মুস্পেল্‌হেইম্ আলো ও উত্তাপের দেশ। নিফ্‌ল্‌হেইমের মধ্যস্থলে একটি প্রস্রবণ (হ্বেরগেল্‌মির্) ছিল। সেই প্রস্রবণ হইতে বারটি ঝরণা (এলিবাগার) বাহির হইয়াছে। এই ঝরণার জল বাহিরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া স্তূপাকার বরফে পরিণত হইত; ক্রমে এই বরফের স্তূপগুলি বজ্রনিনাদে সেই অতল সাগরে গিয়া পড়িত। মুস্পেল্‌হেইমের সীমান্তে সুরৎর্ নামে এক দৈত্য বসিয়া পাহারা দিত। তাহার অগ্নিনির্ম্মিত তরবারি সঞ্চালনে প্রকাণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সেই সাগরগর্ভে বরফের উপরে গিয়া পড়িত। এইরূপ শীত ও উত্তাপের ক্রিয়ায় এবং সম্ভবতঃ সেই বিশ্বপিতার ইচ্ছাধীনে এক বিশালাবয়ব জীবের সৃষ্টি হইল, তার নাম হইল ইমির্ অথবা বরফের দৈত্য—দেশের জমাট সমুদ্রের মূর্ত্ত-বিগ্রহ।

এই ইমির্ খাদ্যের অন্বেষণে বাহির হইয়া দেখিতে পাইল এক গাভী অউধমূলা; তার চারিটি বাঁট হইতে অজস্রধারে দুধ বাহির হইতেছে। ইমিরের অভাব পূরণ হইল। ঐ গাভী খাদ্যের অন্বেষণে বাহির হইয়া একটা বরফের পাহাড় লেহন করিয়া তাহার লবণের অংশটুকু গ্রহণ করিতে লাগিল। এই-প্রকার ক্রমাগত লেহনে সেই বরফের পাহাড় হইতে প্রথমে কয়েক গাছি চুল, তার পরে ক্রমে ক্রমে পূর্ণাবয়ব এক দেবমূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল। ইঁহার নাম হইল বুরি (উৎপাদনকারী)।

ইতিমধ্যে ইমির্ ঘুমাইয়া পড়িল, নিদ্রিত অবস্থাতে তাহার কক্ষতলের স্বেদবিন্দু হইতে এক পুত্র এবং কন্যা এবং তাহার পা হইতে থ্রুড্‌গেল্‌মির্ নামে এক দৈত্য জন্মগ্রহণ করিল—এই থ্রুড্‌গেল্‌মিরের ছিল ৬টি মাথা। এই থ্রুড্‌গেল্‌মির্ তাহার নিজের জন্মের অল্পকালের মধ্যেই বেরগেল্‌মির্ নামে এক দৈত্যকে জন্মদান করিল। এই বেরগেল্‌মির্ সমস্ত অমঙ্গলরূপী তুষার-দৈত্যের আদিপুরুষ।

বুরি নামে সেই দেবতাও বোর্ নামে এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। দৈত্যেরা দেবতাদের কথা জানিতে পারা মাত্রই দুই দলে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যুগযুগান্তর ধরিয়া যুদ্ধ চলিল, কোন ফল হয় না। তখন বোর্ দেবতা বেষ্ট্‌লা নামে এক দৈত্যকন্যাকে বিবাহ করিলেন। এই দৈত্যকন্যার গর্ভে মহাপরাক্রমশালী তিন পুত্রের জন্ম হইল—ওডিন্ (আত্মা), ভিলি (ইচ্ছাশক্তি) এবং ভে (পবিত্রতা)। এই তিন পুত্র পিতার সহিত একত্রিত হইয়া ইমিরকে বধ করিল। ইমিরের প্রকাণ্ড অবয়ব ভূপতিত হইলে তাহার শরীরের রক্তধারা বাহির হইয়া এক মহাপ্লাবনের সৃষ্টি করিল। তাহাতে এক বেরগেল্‌মির্ ও তাহার পত্নী ছাড়া ইমিরের সমস্ত বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। দেবতারা এইরূপে যুদ্ধশান্তি করিয়া একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার দিকে মনোযোগ দিলেন। অনেক বিবেচনার পর বোরের পুত্রগণ ইমিরের শবদেহটাকে সেই অতল সাগরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহার শরীরাংশ হইতেই জগৎ সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তাহার শরীরের মাংস হইতে হইল মিডগার্ড। এই মিডগার্ড্ই পৃথিবী। ইহা অনেকটা আমাদের পুরাণের মধুকৈটভের মেদ হইতে মেদিনী উৎপত্তির কাহিনীর অনুরূপ। পৃথিবী সমস্ত বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হইল, এই পৃথিবীর চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিল ইমিরের স্বেদরাশি ও রক্ত; এই হইল মহাসাগর। তার দন্ত এবং অস্থি হইল গিরিপর্ব্বত; তার চুল হইল গাছ এবং

উদ্ভিজ্জগং। তার মস্তিষ্কের খুলিটা পৃথিবীর উর্দ্ধে বসাইয়া দেওয়া হইল—সেই হইল আকাশ, আর তার মস্তিষ্ক চারিদিকে ছড়াইয়া দিলে তাহা হইতে মেঘের সৃষ্টি হইল। আকাশটা উর্দ্ধে ধরিয়া রাখিবার জন্য নরদ্রি, সুদ্রি, আউষ্ট্রী, এবং ওয়েষ্ট্রী নামে চারিজন বলশালী বামনকে নিযুক্ত করা হইল—তাহারা চারিজন চারিদিকে দাঁড়াইয়া আকাশটাকে কাঁধের উপর ধরিয়া রাখিবে। বলা বাহুল্য ইহাদের নাম হইতেই ক্রমে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম দিকের নামের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে আলোকদান করিবার জন্য মুস্পেলহেইম হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ আনিয়া আকাশে গাঁথিয়া দেওয়া হইল—এগুলিই গ্রহ নক্ষত্র। সবচেয়ে বড় বড় অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমূহ রাখিয়া দেওয়া হইল, সেগুলি হইতে চন্দ্র-সূর্য্যের সৃষ্টি হইবে।

এ-দিক্‌কার বন্দোবস্ত শেষ হইলে চন্দ্রসূর্য্যের জন্য দুই রথের বন্দোবস্ত হইল। সূর্য্যের রথের জন্য আরভাকর এবং আলশ্বিন্ নামে দুই অশ্ব নিযুক্ত হইল—এই আলশ্বিন শব্দের সহিত আমাদের অশ্বিনী শব্দের আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। চন্দ্রের রথের জন্য একটি অশ্ব নিযুক্ত হইল। সৃষ্টি-নাশ করিবার জন্য শয়তানের চেষ্টা সকল স্থলেই বিরাজমান। এই চন্দ্র-সূর্য্যকে গ্রাস করিবার জন্য পিছনে পিছনে দুই নেকড়ে বাঘ সর্ব্বদা ধাবমান, ইহারাই রাহু এবং কেতু, ইহারাই চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ ঘটায়।

যতক্ষণ এই-সব সৃষ্টি চলিতেছিল, ততক্ষণ ইমিরের শবদেহে কতকগুলি ক্রিমিকীটের জন্ম হইল। দেবতারা ইহাদিগকে আকার দান করিয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটাইয়া দুই-প্রকার জীবের সৃষ্টি করিলেন।—একপ্রকার হইল বামনাকার, ইহারা পাতাল-পুরীতে প্রেরিত হইল। আর-একদল হইল পরীরা (অপ্সরী, কিন্নরী, ইত্যাদি)—ইহারা স্বর্গমর্ত্ত্যের মাঝখানে বিচরণ করিবে, ইহাদের ইচ্ছামত পৃথিবীতে আসিয়া বিচরণ করিবারও স্বাধীনতা রহিল।

মানুষের সৃষ্টির ইতিহাসে বিশেষ কোন রমণীয়তা নাই। একদিন দেবতারা কয়েকজন সমুদ্রতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে দুটি গাছ দেখিতে পাইলেন—গাছ দুটির আকার ছিল অনেকটা মানুষের মত। তাঁহারা গাছ দুটির দিকে তাকাইয়া ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিলেন কিরূপে ইহার সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে। তখন একজনে ইহাদের মধ্যে আত্মার প্রতিষ্ঠা করিলেন, একজনে ইন্দ্রিয়াদি এবং গতিশক্তি প্রদান করিলেন এবং আর-একজনে দেহে রক্ত সঞ্চালন করিলেন। পরে ইহাদিগকে বাক্‌শক্তি চিন্তাশক্তি এবং কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল, আশা স্নেহ প্রেম ইত্যাদি বৃত্তি দেওয়া হইল। সর্ব্বশেষে জন্মমৃত্যুর অধীন করিয়া ইহাদিগকে পৃথিবীতে যথেচ্ছ রাজত্ব করিতে দেওয়া হইল। ইহারাই প্রথম মানব ও মানবী; ইহাদের বংশধরেরাই ক্রমে পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল। নিজেদের সৃষ্ট জীব বলিয়া ইহাদের উপরে দেবতাদের খুবই সুনজর ছিল। তাঁহারা আবশ্যকমত নানাপ্রকারে ইহাদের সাহায্য করিতেন।

বিশ্বপিতা তার পরে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের সৃষ্টি করিলেন। ইহার নাম ইগ্‌ড্রাসিল। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জুড়িয়া ইহার বিস্তৃতি। ইহার শাখার উপরে একটি ঈগল পাখী বসিয়া, ঈগলের দুই চক্ষুর মাঝখানে এক শ্যেন পক্ষী বসিয়া তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা ত্রিভুবনের সকল খবর সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে। এই বৃক্ষের নীচে যে কয়েকটি হরিণ চরিয়া বেড়ায়, তাহাদের শৃঙ্গের স্বেদনির্গম হইতে পৃথিবীর বৃষ্টিধারার সৃষ্টি। নিধুগ্ নামে এক দৈত্য এই বৃক্ষের বিনাশসাধন করিবার জন্য নিয়তই চেষ্টা করিতেছে, কারণ এই বৃক্ষই সময়ের পরিমাপক, ইহার ধ্বংসেই দেবতাদের অধঃপতনের সূচনা।

নিফ্‌লহেইমের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মিড্‌গার্ড বা পৃথিবীর উর্দ্ধদেশে জল অগ্নি এবং বায়ুতে প্রস্তুত এক পুণ্যসেতু বিক্রষ্ট্ আছে। বলা বাহুল্য ইহাই রামধনু। এই সেতুর উপর দিয়া দেবতারা সকলে যাতায়াত করিতেন—এক বজ্রের দেবতা থর্ ছাড়া; পাছে তাঁহার ভীমপদক্ষেপে অথবা তাঁহার বিদ্যুতের উত্তাপে সেতুর কোন অনিষ্ট হয় এই ভয়ে থর্ সেই সেতু দিয়া যাতায়াত করিতেন না।

দেবতাদের মধ্যে প্রধান ওডিন্। ইনি বিশ্বপিতা-রূপেও কল্পিত হইয়াছেন। স্বর্গরাজ্যে একটা বিশিষ্ট উচ্চ-স্থানে তাঁহার সিংহাসন; সেখানে বসিয়া তিনি সমস্ত

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে নজর রাখিতে পারিতেন। তিনি সিংহাসনে বসিলে তাঁহার কাঁধের উপরে দুটি দাঁড়কাক বসিত—ইহাদের মধ্যে একটি চিন্তাশক্তি, আর-একটি স্মৃতিশক্তি। এই পাখী দুটি প্রতিদিন সকালে বাহির হইয়া সমস্ত বিশ্বজগতে যাহা দেখিতে পাইত বা শুনিতে পাইত সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর নিকটে সমস্ত নিবেদন করিত।

ওডিন্ দেবতাদের মধ্যে প্রধান বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকারে তাঁহার কল্পনা হইয়াছে। পুরাকালে এ দেশের লোকেরা যুদ্ধবিগ্রহের খুব আদর করিত, শৌর্য্যবীর্য্যই ছিল তাহাদের প্রধান ধর্ম্ম। এইজন্য তাহারা ওডিন্‌কে প্রধানতঃ যুদ্ধের দেবতা বলিয়া পূজা করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, যাহারা যুদ্ধে হত হইত তাহাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য দূত আসিত। এই কার্য্যের জন্য কয়েকজন দেবকন্যা নিযুক্ত ছিল, তাহারা ভ্যাল্‌কির নামে পরিচিত। ইহারা ঘোড়ায় চড়িয়া স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে যাতায়াত করিত। পৃথিবীতে যাহারা যুদ্ধে হত হইত, ইহারা আসিয়া অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহাদিগকে ঘোড়ায় তুলিয়া লইয়া যাইত। তাহাদের অবস্থানের জন্য ভ্যাল্‌হালা নামে এক প্রাসাদ ছিল, সেখানে স্বয়ং বিশ্বপিতা তাহাদের অভ্যর্থনা করিতেন। এখানে আসিয়া ভ্যাল্‌কিরদের সেবায় এবং খাদ্যপানীয়ের রাজভোগে তাহাদের সময় সুখেই কাটিত। এই স্বর্গ-সুখের কল্পনায় যুদ্ধে মৃত্যুই ছিল এদেশের লোকের চিরজীবনের আকাঙ্ক্ষা। কথিত আছে যে যদি যুদ্ধে মৃত্যু না ঘটে তবে ইহারা মৃত্যুর সময়ে অন্ততঃ নিজের অস্ত্র দ্বারাও শরীরে আঘাত করিয়া লয়।

ওডিনের আর-এক রূপ বায়ুর দেবতা। লোকের বিশ্বাস ছিল যে মৃত ব্যক্তির আত্মা বাতাসে ভর করিয়া স্বর্গে যায়। সেই হিসাবে তিনি ছিলেন সমস্ত অশরীরী আত্মার নেতা। বায়ুর দেবতা বলিয়া ঝড়-তুফানে তাঁহারই গতির বিকাশ। এই মূর্ত্তিতে তিনি বন্যশিকারী নামে পরিচিত। শীতে এবং শরৎকালে যখন ঝড়ের বেগ খুব প্রবল হয়, লোকের বিশ্বাস ওডিন্ দেবতা এই সময়েই শিকারে বাহির হন। এই বন্যশিকারী রূপে বিশ্বাস ফ্রান্স, জার্ম্মানী এবং ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং ইহা এতই লোকপ্রিয় হইয়াছিল যে মধ্যযুগে যখন দেবদেবীতে বিশ্বাস প্রায় ছিল না তখনও বন্যশিকারীর কথা তাহারা ভুলিতে পারে নাই। তখনকার বন্য-শিকারী আর ওডিন্ ছিল না, তখনকার বন্যশিকারী হইল শালেমাঞ, ফ্রেডারিক্ বারবারোসা, রাজা আর্থার, ইত্যাদি। ইংরেজী সাহিত্যে ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ এবং সার্ ওয়াল্টার স্কটের কাব্যে বন্যশিকারীর কথা আছে। শ্রীমতী হেমান্সের বন্যশিকারী নামে কবিতা সুপরিচিত।

মধ্য যুগের কাহিনীতে হ্যামলিনের বিচিত্র সাজের সানাইদার নামে এক গল্প প্রচলিত আছে—রবার্ট ব্রাউনিং-এর প্রসাদে অনেকেই উহার সহিত পরিচিত। অনেকের মতে ওডিন্‌ই ছিলেন সেই সানাইদার; বাঁশীর সুর আর কিছুই নয়, তাঁহার গতিতে বাতাসেরই শব্দ, আর সেই ইঁদুরের দল ছিল তাঁহারই অনুগত মৃত ব্যক্তিদের আত্মা।

এই-সব কাহিনী ছাড়া আরও বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ওডিনের পূজা হইত। অনেকস্থানে ওডিনের কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি ছিল। এই ওডিনই স্যাক্সনদের ভাষাতে ওডেন রূপে পরিণত হইয়াছে। এই ওডিন বা ওডেন নাম হইতেই ইংরেজী ওয়েড্‌নেস্-ডে (বুধবার) নামের সৃষ্টি।

অনেকস্থলে এরূপও ঘটিয়াছে যে রাজভক্তির বাহুল্যে দেশের লোকেরা রাজাতে দেবতার সমস্ত গুণাবলী আরোপ করিতে করিতে রাজাকে দেবতা বলিয়াই কল্পনা করিয়া লইয়াছে। পরে ক্রমে ক্রমে রাজাতে এবং দেবতাতে পার্থক্যজ্ঞান হারাইয়া, রাজার ব্যক্তিত্বের কথাও ভুলিয়া গিয়া ওডিন দেবতাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়াও প্রচার করিয়াছে।

ওডিন বহুপত্নীক বলিয়া পরিচিত। তাঁহার প্রথমা পত্নী ইয়োর্ড্ বা এর্ডা। এর্ডা অর্থ পৃথিবী, ইংরেজী আর্থ্ শব্দের সহিত ধাত্বর্থে এক; ইঁহারই গর্ভে বজ্রদেবতা থরের জন্ম। ওডিনের দ্বিতীয় এবং প্রধানা পত্নী ফ্রিগ্‌গা, ইঁহাকে সভ্যতার প্রতিমূর্ত্তিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; ইঁহার গর্ভে হার্মড্,

টির্ এবং বসন্তের দেবতা বলডার দেবতার জন্ম। তৃতীয় পত্নী রিণ্ডা, ইহার গর্ভে হ্বালির জন্ম ইত্যাদি। ফ্রিগ্‌গা ছিলেন বায়ুমণ্ডলের অথবা বিশেষভাবে মেঘের দেবী। তিনি অনেক সময় স্বামীর সঙ্গে সিংহাসনে বসিতেন, কিন্তু প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায় তিনি একটা চর্‌কা হাতে স্বর্ণসূত্রে জাল বুনিতেছেন। সেই জাল আর কিছুই নয়, উজ্জ্বলকিরণমণ্ডিত মেঘের স্তর। ছবিতে এই অবস্থায় তাঁহার যে মূর্ত্তি দেখা যায় তাহাতে টেনিসনের লেডি অভ শ্যাল্‌টের কথা মনে পড়ে। ওডিনের ন্যায় ফ্রিগ্‌গাও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। ইনিই স্যাক্সান্‌দের এষ্ট্রে দেবী, ইষ্টার উৎসবে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়; ইনি বসন্তের দেবীরূপে ফ্রিগ্‌গারই রূপান্তর।

বজ্র এবং বিদ্যুতের দেবতা থর্। ওডিনের পরেই ইহার স্থান—নরওয়েতে অনেকে ইহাকেই সর্ব্বপ্রধান দেবতা বলিয়া গণ্য করিত। ওডিনের মন্ত্রীসভার দ্বাদশরত্নের মধ্যে ইনি অবশ্যই একজন। অন্য সব দেবতাদের মত তিনি অশ্বারোহণে যাইতেন না। তাঁহার বাহন ছিল এক রথ—রথ ছাগলে টানিত। তাঁহার রথের ঘর্ঘর রবই বজ্রের নিনাদ; ছাগলের খুরের অথবা দাঁতের ঘর্ষণে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইত তাহাই বিদ্যুৎ। ভিন্ন ভিন্ন দেশে থরের পূজাও বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল। ওডিনের ন্যায় স্থানে স্থানে তাঁহারও কাষ্ঠমূর্ত্তি শোভা পাইত এবং তাহার জন্য অনেকস্থলে মন্দিরও প্রস্তুত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে খৃষ্টীয়দের ইউল-টাইড উৎসবের সময়ও তাঁহাকে স্মরণ করা হইত। এই থর্ দেবতার নাম হইতেই ইংরেজী থার্স্‌ডে (বৃহস্পতিবার) শব্দের উৎপত্তি।

টির্ বা টিউ ছিলেন রণদেবতা। ইনিও ওডিনের পুত্র, এবং দ্বাদশ রত্নের মধ্যে একজন। ইহার তরবারিই ছিল প্রধান সম্বল। এই তরবারি যাহার হাতে যাইত তিনি সর্ব্ববিজয়ী হইতেন। এই তরবারির অনেক বিস্তৃত কাহিনী আছে। রণদেবতা বলিয়া ইঁহারও খুব প্রতিপত্তি ছিল। দেবতাদের মধ্যেও ওডিন্ এবং থরের পরেই ইঁহার স্থান। ইহার নামেও সপ্তাহের একটি দিনের নামকরণ হইয়াছে; টিউস-ডে টিউ দেবতার দিন (মঙ্গলবার)।

লোকি এই পুরাণের শয়তান। ইহার চরিত্র খুবই জটিল—শয়তানের কাহিনী বোধ হয় সকল দেশেই এইরূপ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধেই নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না। কাহারও মতে সৃষ্টির প্রারম্ভকালে প্রথমে ইমির নামে যে দৈত্যের উদ্ভব হয় লোকি তাহারই সন্তান। কেহ বলেন যে লোকি আর কেহই নয়, ইমিরের পৌত্র হ্বের্গেল্‌মিরই লোকি। অনেকের মতে সে প্রথমতঃ দেবতাদের মধ্যেই একজন ছিল, ইহার রূপ ছিল অগ্নি বা প্রাণ-দেবতা, কারণ কোন কোন মতে সেই প্রথম মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন করিয়া প্রাণের স্পন্দন আনিয়াছিল।

অনেক ব্যাপারে লোকিকে থরের সহযোগীরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই হিসাবে পৃথিবীর লোকে মনে করিত যে মানবের হিতের জন্য উভয়েরই সমান প্রয়োজন। কিন্তু উভয়ের চরিত্র বিভিন্ন প্রকার ছিল। থর যেখানে কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, লোকি সেখানে রহস্যের সৃষ্টি করিতেই তৎপর। এইরূপ অমঙ্গলের সৃষ্টি করিতে করিতে তাহার চরিত্রে সৎগুণ যাহা কিছু ছিল তাহা অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া শয়তানের পূর্ণ প্রকট মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। সে দেবতাদের সকল কাজে বাধা জন্মাইয়া কত প্রকারে যে তাঁহাদের বিপন্ন করিয়াছিল তাহার অনেক কাহিনী আছে। ক্রমে অবস্থা এমনই চরমে উঠিল যে তখন পাপেই তাহার প্রবৃত্তি, পাপেই তাহার আনন্দ। মিল্টনের প্যারাডাইস্ লষ্টের শয়তান বলিয়াছে—"Ever to do ill my sole delight"—লোকির চরিত্রে তাহার অভিব্যক্তি খুব স্পষ্ট। কিন্তু একটু বিশেষত্ব এই ছিল যে লোকি নিজের পাপমূর্ত্তি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বাহ্যতঃ সজ্জনের ন্যায় সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারিত। এইরূপে দেবতাদিগকে পর্য্যন্ত প্রতারিত করিয়া তাঁহাদের মন্ত্রীসভাতেও লোকি স্থানলাভ করিয়াছিল। কথিত আছে দেবতারা যখন বুঝিতে পারিলেন যে কত বড় একটা শয়তানকে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে স্থান দিয়াছেন তখন তাঁহারা উহাকে মর্ত্ত্য-ধামে নির্ব্বাসিত করিলেন। যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রতারিত করিতে পারিয়াছে সে যে মানুষের মধ্যে পাপের বীজ ছড়াইয়া দিবে তাহাতে আর

আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। এইরূপে পৃথিবীতে পাপের সৃষ্টি। লোকি তাহার এই মূর্ত্তিতে মায়া বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। মধ্যযুগের মায়ার অবতার লুসিফার ইহারই দ্বিতীয় সংস্করণ।

লোকি অমঙ্গলের প্রতিরূপ বলিয়া লোকে তাহাকে ভয় ছাড়া ভক্তির চক্ষে দেখিত না। তাহার জন্য কোন মন্দিরেরও সৃষ্টি হয় নাই, তাহার জন্য কোন পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠানও ছিল না। সপ্তাহের শেষ দিনটা লোকির নাম অনুসারে ল্যাঙ্গারডাগ্ হইয়াছিল। ইংরেজী স্যাটারডে (শনিবার) নামকরণ হয় সাটাইরি নাম হইতে—এই সাটাইরি নাকি লোকিরই আর-এক বিগ্রহ।

যখন স্বর্ণযুগের অবসানে স্বর্গরাজ্যেও পাপ প্রবেশ করিল, সেই সময়ে সেই বিশ্বব্যাপী ইগ্‌ড্রাসিল বৃক্ষের নীচে তিন ভগ্নী আসিয়া দেখা দিলেন, ইহারা নোরাস বা অদৃষ্ট-দেবী। কাহারও কাহারও মতে ইঁহাদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল দেবতাদিগকে ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া, বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহারে তাঁহাদিগকে তৎপর করা এবং অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে উপদেশ গ্রহণে প্রবৃত্ত করা।

এই নোরাসদের দৃশ্যতঃ প্রধান কাজ জাল-বোনা, অর্থ এই যে কর্ম্মসূত্রে সকলের অদৃষ্টজাল তৈয়ারী হইতেছে। এই তিন ভগ্নী অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালের প্রতিমূর্ত্তি। দেবতারা ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য ইঁহাদের কাছে আসিতেন, এমন কি ওডিনও।

মধ্যযুগে এবং তার পরেও অনেক কথা-কাহিনীতে এই নোরাসদের কথা পাওয়া যায়, সে-সব স্থলে ইহারা ফেয়ারি বা পরী বা ডাইনী ইত্যাদি রূপে বর্ণিত। সেক্‌স্‌-পীয়রের ম্যাক্‌বেথের তিনটি ডাইনীও ইহাদেরই ছায়া।

এস্থলে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পুরাণের প্রধান প্রধান কয়েকটি ব্যক্তি এবং বিষয়ের উল্লেখ করা হইল। সমস্ত বিস্তৃত কাহিনীর ইহা সামান্য আভাস মাত্র। স্বর্গের দেবতা, যজ্ঞের দেবতা, এবং বনদেবতার কথা যেমন উল্লেখ করা হইল, তাহারই সঙ্গে কবিতা এবং সঙ্গীতের দেবতা ব্রাগি ও তাঁহার পত্নী চিরযৌবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইডুনের কথা, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের দেবী ফ্রেয়া, শীতের দেবতা, সাগরের দেবতা ইত্যাদির কথা, বস্তারের সুন্দর কাহিনী, স্কালি এবং হিভারের কথা—এরূপ কত কথাই যে আছে এস্থলে তাহার উল্লেখ মাত্র করাও সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া আমাদের পুরাণের মত এদেশের পুরাণেও দেব দানব, যক্ষ রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরী কিন্নরী, জলদেবী বনদেবী কিছুই বাদ যায় নাই।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পুরাণের একটা বিশিষ্টতা এই যে দেবতারা অমর নয়, দেবতাদের উৎপত্তি-ব্যাপারে দেবতার সঙ্গে দানবের সংমিশ্রণ ছিল—সেইখানেই মৃত্যুর বীজ উপ্ত হইল, আর যেখানে জন্মের কল্পনা আছে সেখানে মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। দেবতারা যে নিয়তির অধীন ছিলেন তাহাও পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে, কারণ তাহা না হইলে স্বয়ং ওডিন্ পর্য্যন্ত নিয়তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী নোরাসদের নিকটে আনাগোনা করিতেন না।

এই পুরাণের কাহিনী একখানা সুন্দর কাব্য বা নাটকের মত নানারূপ ঘটনার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া একটা পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই অভিব্যক্তি ষোলকলা পূর্ণ করিবার জন্যই যেন শয়তানের আবির্ভাব। শয়তান প্রথমে মায়ারূপে আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। দেবতারা প্রথমে প্রতারিত হইয়াছিলেন, পরে যখন বুঝিতে পারিলেন তখন আর কোন উপায় ছিল না—ইহাই নিয়তি।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। দেব-দানবের প্রলয়কারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবতারা সব একত্র হইলেন। পৃথিবীর যত যোদ্ধা এবং বীর ভ্যাল্‌হালাতে আশ্রয় পাইয়াছিল; তাহারা দেবতাদের সঙ্গে যোগদান করিল। ওদিকে বিশ্বের যেখানে যেখানে যত-প্রকার দানবশক্তি ছিল সকলে আসিয়া জুটিল। প্রকৃতিতে বিপ্লব আরম্ভ হইল। বিশ্বের চারি কেন্দ্র হইতে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল, তীব্রবেগে হিম বায়ু বহিতে লাগিল, পৃথিবী বরফে আচ্ছন্ন হইল। চন্দ্রসূর্য্যের পিছনে যে দুটি নেকড়ে বাঘ ধাবমান হইয়াছিল তাহারা এতকাল নরহন্তা এবং ভ্রষ্টাচারীর মেদমাংস ভক্ষণে পুষ্ট হইতেছিল। পাপের স্রোত যতই প্রবলবেগে বহিতে লাগিল হত্যাকারী এবং ভ্রষ্টাচারীর সংখ্যাও ততই বাড়িতে লাগিল, কাজেই

এই নেকড়ে দুটির পুষ্টি অসম্ভব-রূপেই বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন তাহারা অনায়াসেই চন্দ্রসূর্য্যের রথের অশ্বগুলিকে ধরিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাহাদের চোয়াল হইতে রক্তধারা ছুটিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে ডুবাইয়া দিল। এই বিপৎপাতে সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল, গ্রহনক্ষত্রসমূহ স্তম্ভিত হইয়া তাহাদের কক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল, সমগ্র বিশ্বজগৎ আলোড়িত হইয়া উঠিল, দেবদানবের যত শক্তি শতসহস্ররূপে আবির্ভূত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। নিয়তির বিধানে দেবতাদের পরাজয় নির্দ্দিষ্ট ছিল, কাজেই এত সম্পদ ঐশ্বর্য্য বলবীর্য্য কিছুতেই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। এই ভয়াবহ যুদ্ধের শেষ অঙ্কে সুরটুরের দীপ্ত হুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমাদের এই পৃথিবী জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া গেল।

কিন্তু এই ধ্বংসে সৃষ্টির পরিসমাপ্তি নয়—সৃষ্টিকার্য্যে নির্ব্বাণের কথা নাই। তাহাদের বিশ্বাস ছিল পাপের অঙ্কুর নির্ম্মূল হইয়া গেলেই আবার নূতন জগৎ পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে। এই বিশ্বাসমতে পৃথিবী অগ্নিসংস্কৃত হইয়া এবং সাগরজলে যেন স্নানে পরিশুদ্ধি লাভ করিয়া নূতন রূপে ফুটিয়া উঠিল; আবার নূতন করিয়া চন্দ্রসূর্য্যের আবির্ভাব হইল। একটি মানব ও একটি মানবী পলায়ন করিয়া কোন সুদূর দেশে আশ্রয় পাইয়া নিদ্রামগ্ন হইয়া এই প্রলয়-ব্যাপার অজ্ঞাত ছিল। তাহারা শিশিরসিক্ত হইয়া নবজীবন লাভ করিল। সমস্ত ধ্বংসের পরে দেবতাদের মধ্যে বল্ডার এবং হিমডার—প্রকৃতির অবিনশ্বর শক্তির প্রতিমূর্ত্তিরূপে—আবির্ভূত হইল; আলো এবং উত্তাপের শক্তিরূপে বল্ডার আবার জাগিয়া উঠিল। আবার স্বর্গরাজ্য গড়িয়া উঠিবে।

যখন কালক্রমে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এদেশে প্রভাব বিস্তার করিল, তখন ইহাদের পুরাণ-সাহিত্যের উপরেও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভাব ও কল্পনার ছায়া পড়িল। সে কাহিনীর অভিব্যক্তিতে যে প্রলয় ঘটিল, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে পাপের বিনাশ এবং পুণ্যের জয় প্রচারিত হইতেছে। পরবর্ত্তীকালে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-কাহিনীরই অলক্ষিত প্রভাবে তাহাদের মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রকাশ পাইল যে শেষকালে এমন এক দেবতার আবির্ভাব হইবে যাঁহার মহিমা এখনও ধারণা করা যায় না। তিনিই শেষকালে সকলের পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেন। হয়ত ইনিই যুগে যুগে বা ত্রাণকর্ত্তারূপে অবতীর্ণ হইবেন।

শ্রী সত্যভূষণ সেন

পচা

ট্রেন থাম্‌লো। মোটে এক মিনিট, তারি মধ্যে ষ্টেশনে লোক নাম্‌লো প্রায় একশো। পৌষ মাস। সকলেরই মাথা মুখ র‍্যাপারে ঢাকা, দেখা যায় কেবল চোখদুটি। কে যে কে তা বোঝ্‌বারই জো নেই। চারিদিকে চাইছি পচার সন্ধানে, তার আর দেখা নেই। প্যাসেঞ্জারের দল যেমন তাড়াতাড়ি নেমেছিল তেমনি তাড়াতাড়ি মেঠো পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। ডেলি প্যাসেঞ্জারের পায়ে আছে জানা, তাদের চলা উড়ে-চলা। তার উপর আছে হিমের ভয়, অন্ধকারের ভয়, সাপ-খোপ ভূত-প্রেত কত-কিছুর ভয়; অল্প যে কজন ভাগ্যবানের লণ্ঠন আছে তাদের পিছু পিছু ধাওয়া না কোরে উপায় কি! তারা যে আঁধারের কাণ্ডারী!

শূন্য প্লাট্‌ফরমের উপর উবু হয়ে ব'সে ছোট হাত-লণ্ঠনটা জ্বাল্‌লুম। তার পর ভাব্‌লুম একবার শেষ চেষ্টা করা যাক। তারস্বরে ডাক্‌লুম—পচা, ও পচা! দূরের অন্ধকার থেকে 'যাই বাবু' আর একটা অন্ধকারের মতনই কালো মনুষ্যমূর্ত্তি ছুটে বেরিয়ে এল।

তাকে বল্লুম—কি রে দেরী কেন?

সে বল্লে—আজ্ঞে আমাদের তো আর ঘড়ি নেই… টেরেনের সময় তো আর ঠিক জানা থাকে না…বড়বাবু

বল্‌লেন আটটার গাড়ীতে আস্‌বে। গাছ কেটে ফিরে এসে সন্ধ্যের সময় একটু নেশা ক'রে তারপর বেরুলুম। ঐ মাঠ থেকে দেখি গাড়ী আস্‌চে, তখনি দৌড়তে দৌড়তে এলুম। ইষ্টিশান-মাষ্টার আমাদের কাছ থেকে আর টিকিস্ চায় না…বাবুদের মোটমাট বই দেখে কিনা। তবে রেলে চড়্‌লে আমাদের টিকিস্ করতে হয়! আগে আগে শিরামপুরে রস নিয়ে যেতুম…এখান থেকে উঠে পড়্‌তুম…সেখানে গিয়ে টিকিস্-বাবুর হাতে ভাড়ার অর্দ্ধেক পয়সা গুঁজে দিতুম…ঐ দিলেই আর কিছু কথা হয় না…আবার সেখান থেকে আস্‌বার সময় এখানে অর্দ্ধেক পয়সা দিয়ে দিতুম। একদিন যাবার সময় গাড়ীতে ইনিস্‌পেক্‌টর উঠেছে…টিকিস্ তো নেই…ইনিস্‌পেক্‌টর চন্দনপুর থেকের ভাড়া চাইলে…পয়সা তো আমাদের কাছে ছেল না…তারপর বাবু, বেলুড়ে গিয়ে আমাদের নেবিয়ে দিলে…ইষ্টিশান-মাষ্টারের হাতে জিম্মে ক'রে দিয়ে তারা তো চ'লে গেল। মাষ্টারের হাতে পায়ে ধ'রে সেবার তো অনেক কষ্টে ছাড়া পেলুম! মাষ্টার বল্‌লে, তোরা রোজ যাওয়া আসা করিস্, ইনিস্‌পেক্‌টর দেখে উঠিস্ না কেন? সেইদিন থেকে বাবু টিকিস্ করি……সেই অপমানকে অপমান হওয়া আর সেই পয়সা গচ্ছা দেওয়া!

পচা মোট মাথায় তুল্‌লে। পথে বার হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—রোজই নেশা করিস না কি?

—একটু নেশা না করলে চৌপরদিন গাছে গাছে ঘুরতে পারি কি বাবু!

রোজ ক'পয়সার নেশা করিস?

পচা একটু হাস্‌লে। বল্‌লে—পয়সা দিয়ে কি আর নেশা করতে পারি! গাছ কাটতে কাটতে ঝোপে-টোপে দু-এক ভাঁড় সরিয়ে রাখি। তাই দিয়েই নেশা হয়… পুলিসের যে কড়াকড়ি…

ঘুটঘুটে অন্ধকার। সরু মেঠো পথ নির্জ্জন। দুধারে চাষের ক্ষেত। অন্ধকারের আব্‌ছায়ায় আখের গাছগুলো মনে হচ্ছে যেন পায়ে ফেটিবাঁধা সেপাইয়ের দল এক কদম বাড়িয়ে দিয়ে সারবন্দি দাঁড়িয়ে আছে—হুকুম পেলেই চল্‌তে সুরু করবে। অন্ধকারে পচা একবার হোঁচট খেলে। জিজ্ঞাসা করলুম—কি রে মোট ভারি নাকি?

পচা বল্‌লে নাঃ এমন আর ভারি কি! আগে কত মোট বয়েছি…তখন গায়ে জোরও ছেল তেমনি! আপনাদের বাড়ীর কার যেন ছাপাখানায় কাজ ছেল। চারটে লোহার পেঁট্‌রা—বড় বড় পেঁট্‌রা বাবু—কাগজপত্তরে একেবারে বোঝাই—ভারিও এক একটা হবে দু মণ আড়াই মণ। জহর-বাবু আগে তিন চার জনকে ডেকেছেল—কলাছড়া ইষ্টিশানে নিয়ে যাবার জন্যে…তারা এসে পেঁট্‌রা চাগাতেই পারে না…তারপর আমাকে ডেকে আন্‌লে…জহর-বাবু বল্‌লে, এগুলো ইষ্টিশানে দিতে হবে, পার্‌বি পচা? আমি বল্‌লুম ভারি আছে নাকি? জহর-বাবু বল্‌লে, ভারি আর কি, একমণ সওয়ামণ ক'রে হবে বোধ হয়। আমি বল্‌লুম, আপনাদের আশীর্ব্বাদের জোর থাক্‌লে তা পারব বৈ কি। চাগিয়ে দেখ্‌লুম খুব ভারি, মাথায় তুল্‌লে একেবারে দেবে যেতে হয়। সেই চারটে পেঁট্‌রা বাবু, চার বারেতে কলাছড়া ব'য়ে দিয়ে এলুম। ত[illegible] দিয়েছিল আমাকেও বাবু…দেড়টি টাকা আমায় 'জ[illegible] খাস' ব'লে দিয়ে গেল। তখনকার দিনে বাবু খেতে[illegible] পেতুম বেশ। বাবুদের বাড়ী কাজে বার [illegible]…ব[illegible] সরার—যাতে পায়রা পোষে সেই সরার একসরা [illegible]চিগুড়ে[illegible] সন্দেশের গুড়ো, জিলিপির ভাঙা পাপড়ি এম্‌নি কত [illegible] খুব মেরে দিতুম। তারপর আবার দুপুরে পাত পে[illegible] বস্‌তুম…তখন ভাত তরকারি…এই ডাঁই…তাও মে[illegible] দিতুম। তখন খাওয়া ছেল বেশ… শরীরে জোরও ছেল এখন আর খেতে পাই না…সে সময়ও নেই। তখন ব[illegible] বাবু একলাই রোজ্‌গার ক'রেছে…তখন কাজেকম্মে [illegible] বটেই, এম্‌নি রোজ পাঁচ ছয় জন লোক ভাত তরকা[illegible] খেয়ে এসেছে। তবুও কত্তার আমলে একলার রোজ্‌গ[illegible] …এখন তো ছেলেরা সবাই রোজ্‌গার করছে…অথচ [illegible] জিনিসটি নেই! এখন যদি একটু পেসাদ পেতে হয়, সকা[illegible] গিয়ে ব'লে আস্‌তে হয়,—মা একটু পেসাদ পেতে চা[illegible] সবাই রোজ্‌গার করলে কি হবে, এখন যে যার নিজে[illegible] বুঝ্‌তে শিখেছে!

পচা একদমে এতখানি ব'কে দম নেবার জন্যে যেই একটু থেমেছে সেই অবসরে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—বাবুদের বাড়ী কাজ করতিস্ নাকি?

পচা বললে—তা আর করিনি, দশ দশ বছর কাজ করেছি। কেবল ছোটবাবুর বে দিইনি, আর বড়বাবুর বের পরে গেছলুম, তা ছাড়া মেজবাবু, সেজবাবু, সবায়ের বে আমি দিয়েছি।

—তোর বাড়ীতে কজন লোক খেতে?

—তা আর বল কেন! আমার ছ ছেলে। পাঁচজন ত্রো বছর দেড় দুই ক'রে বেঁচে বেঁচে ম'রে গেল! একটা বেঁচে ছেল...সেটাকে পড়াচ্ছিলুম...অসুখ হ'ল। একদিন একটু ভালো দেখে কাজে গেছি...সেখানে একজন লোক গিয়ে বললে, পচা, তোর ছেলের ভারি অসুখ। গিয়ে দেখি তার কলেরা হয়েছেন। রাজেন-বাবু আর যতীন-বাবুকে ডেকে আনলুম। তারাও চারটি টাকা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুলো, আর এদিকেও শেষ হ'ল! বাড়ী ফিরে অবধি আর তার জ্ঞান হ'ল না! সেদিন আপনাদের বাড়ীতে যাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেছলুম সেটাকে আমি মানুষ করেছি...সে আমার ছেলে নয়।

জিজ্ঞাসা করলুম—সে তবে কার ছেলে?

পচা বললে—যখন ছেলেপুলেগুলো মারা গেল, বাবুরা আমার হাতে কলকেতায় সাড়ে তিনশো টাকা পেঠিয়েছেল...আমারই হাতে টাকাকড়ি পাঠায় কিনা...সবাইকে তো বিশ্বাস হয় না...আমি বলি—বাবু, আমি যদি একদিন টাকা নিয়ে পেলিয়ে যাই...বাবুরা বলে, তুই পালাবি কোথা, তোকে জল ছেঁকে বার কর্'ব!...আহিরিটোলায় টাকা জমা দিয়ে ওতোর-পাড়ার ঘাট দিয়ে আসছি...তখন বিকেল হয়ে গেছে...গঙ্গার ঘাটে লোকজন বেশী নেই...হাতপা মুখ ধুচ্ছি, এমন সময় দেখলুম একটা ছোট্ট ছেলে বালির ওপর প'ড়ে আছে, তার মুখ দিয়ে গেঁজা উঠ্‌চে। আমি বলি কে ফেলে দিয়ে গেল, এখুনি তো ম'রে যাবে! ঘাটের ওপর উঠে উড়ে বামুনদের জিজ্ঞেস করলুম...তারা বললে, ও কৈবর্ত্তর ছেলে। ওর বাপ মা আজ তিন দিন হ'ল কলেরায় মরেছে...ওর মাসীর হাতে ছেলেকে দিয়ে গেছলো...মাসী রাখতে না পেরে ওখানের এক মেয়ে-লোকের হাতে দিয়ে যায়, সেই বোধ হয় ফেলে দিয়ে গেছে! শুনেছিলুম চণ্ডীতলার থানার দারোগা-বাবু ওতোরপাড়ায় বদলি হয়েছে...আমি সোজা থানায় চ'লে গেলুম! দারোগা-বাবু তো আগে থেকেই আমায় চিনতো...বললে, কি রে পচা! আমি বল্লুম, এজ্ঞে, গঙ্গার ঘাটে একটা ছেলে ফেলে দিয়ে গেছে, আমি সেটাকে নিতে চাই। তিনি বললে, তুই কি মানুষ করতে পারবি? আমি বল্লুম, হ্যাঁ খুব পারবো। দারোগা বললে, তাহলে তুই নিয়ে যা। তারপর আমি গঙ্গার ঘাটে ফিরে এলুম...আসবার পথে দু'পয়সার তালের মিছরি কিনলুম। ঘাটে এসে গামছা প'রে কাপড়টা ছেড়ে ছেলেটাকে তুলে নিলুম, নিয়ে এক কোমর জলে গিয়ে গঙ্গার জলে বেশ ক'রে ছেলেটাকে নেইয়ে দিলুম। কোশা ক'রে গঙ্গার জল একটু মুখে দিলুম, ছেলেটা একটু মুখ নাড়লে। তখন বুঝলুম ছেলেটা বাঁচবে বোধ হয়। জল থেকে উঠে এসে গামছার খোঁটে একটু মিছরি বেঁধে সঙ্গের কাটারি দিয়ে গুঁড়ো ক'রে গঙ্গার জলে ভিজিয়ে মুখে ধরলুম...ছেলেটা তখন চকচক ক'রে খেতে লাগলো। তখন বুঝলুম না খেতে পেয়ে ছেলেটা মরার মত হয়ে ছেল...আর ঘণ্টাখানেক না তুললে ম'রেই যেত!......

মেঠো পথ ছেড়ে গাঁয়ের পথ দিয়ে চলেছি। সেই পোড়ো বাড়ী, সেই পচা ডোবা, পানাপুকুর, বাঁশঝাড়, বনজঙ্গল সমস্তই ঠিক আছে—বারো বছরে একচুল এদিক্ ওদিক্ হয়নি। মনে হচ্ছে যেন কাল দেখে গেছি। পতিতপাবন পল্লী এই সুদীর্ঘকাল সকল আবর্জ্জনাকেই পরমাগ্রহে বুকে ধ'রে রেখেচে, কাউকে বর্জ্জন করেনি! নিকটের জঙ্গল থেকে একদল শেয়াল ডেকে উঠলো। তাদের কোলাহল ও পচার বকুনি থামলে পচাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তখন ছেলেটার বয়স কত?

পচা বললে—মোটে চার দিন। হওয়ার পরই ওর বাপমা ম'রে গেল। ছেলেটাকে কোলে ক'রে ঘাট থেকে উঠে এলুম...ভাবলুম হেঁটে গেলে আর তাকে বাঁচানো যাবে না। আড়াইটি টাকা দিয়ে

কালীপুর পর্য্যন্ত একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে এলুম। বাড়ীতে তো ছেলেটাকে নিয়ে এসে দিলুম। বউ জিজ্ঞেস কর্‌লে, একে কোথায় পেলি? বল্‌লুম, ওতোরপাড়ার ঘাটে পোড়ে ছিল, এটাকে নিয়ে এসেছি, মানুষ কর্‌বো। ছেলেটাকে তো আর দুধ না খাওয়ালে বাঁচে না···তখন আমার এক গাই বিইয়েছিল···কিন্তু দুধ খাওয়াই কি ক'রে? তখন বাবুদের বাড়ী গিয়ে বল্‌লুম, এই রকম ছেলে এনেছি···আপনাদের একটা ম্যানা-বোতল দিতে হবে। তাঁরা বল্লেন, ম্যানা-বোতল তো আছে কিন্তু তার রবাট নেই। আমি বল্‌লুম, একটা রবাট আমি কিনে নেব 'খন। তখনি নারাণ-বেনের দোকানে গিয়ে দশ পয়সা দিয়ে একটা বোঁটা কিনে নিলুম। বাড়ীতে এসে বোতলটা বেশ ক'রে ধুয়ে, বাড়ীতে দুধ ছিল তা গরম ক'রে বোতলে পুরে বোঁটাটা পরিয়ে দিলুম। ছেলেটার মুখে বোঁটা ধর্‌তেই ছেলেটা চক্‌চক্ চক্‌চক্ ক'রে খেতে লাগ্‌লো। ছেলেটার কিন্তু পয় আছে বাবু···ছেলেটার দুধের বরাত খুব! সেই সময়েই তো একটা গাই বিইয়েছিল···সেটার যতদিন দুধ রইলো খুব ভরপেট খেলে···তারপর তোমাদের পুন্ন-বাবুর সেই সময় একটা বক্‌না ছিল···সেটাকে আমাকে এক বিয়েনে মানুষ কর্‌তে দিলে···

—তার মানে?

—প্রথম বিয়েনের পর দুধ আর বাছুর আমি পাবো, তারপর আবার গাবিন হয়ে দুধ বন্ধ হ'লে গরু ফেরৎ দিতে হবে। ঐ গরুটা বিয়োনোর পর খুব দুধ হ'তে লাগ্‌লো, তারপর গাবিন হবার পরও অনেক দিন দুধ দিলে। সব দুধই ছেলেটা খেয়েছে! তা না হ'লে আমরা কি আর দুধ কিনে খাওয়াতে পারি বাবু, না ভুসি খোল দিয়ে গরু পুষতে পারি! এধার ওধার চরিয়ে নিয়ে খাওয়াই। এখন ছেলে আড়াই বছরের হয়েছে···গোড়ায় গোড়ায় বউ ওর গু মুত কাট্‌তো না···আমিই কর্‌তুম সব···আর এখন একদণ্ড সেটাকে চোখের আড়াল কর্‌বে না! কোলে নিয়েই যেখানে যাবে সেখানে ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ ক'রে নিয়ে যাবে···ছেলেটাই কি ভোগাচ্ছে কম! এই সেদিন জরবিকার হয়েছিল···তোমাদের পোবোধ-বাবু দেখে ওষুধ দিলে···আঠারো দিন পরে তবে জর ছেড়েছে। এই দেখনা পরের ছেলে নিয়ে মানুষ কর্‌ছি···বড় হয়ে মান্‌বে কি না মান্‌বে···নিজের ছেলেই তো আজকাল মানে না! তা যাই হোক, প্রাণ ত দিয়েছি আমি···একটা প্রাণ তো বাঁচালুম···তা ওর ধর্ম্মে যা হয় তাই করবে···

বাড়ীতে মোট নামিয়ে দিয়ে পচা বিদায় হ'ল। রাত্রে বিছানায় শুয়ে ভাবছিলুম, নিরক্ষর কেওরার ছেলে পচা—সে কি ছোটলোক?

শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমন্ত্রণ

(কবীর)

দূত কহে, "সাধু, বিশ্বপতির
আজি যে মহোৎসব,
তাঁহার সভায় হে অতিথি তব
এই আবাহন-রব!
বিরাট্ পত্র ছড়ায়ে দিয়েছি
তাই ব্যোম-পরিমাণ;
যেখানেই থাক, নয়ন তোমার
পাবে তার সন্ধান।"
সাধু ভাবে মনে দীনের অভাবে
তাঁরো কি অচল হয়?
তাই তারে খুঁজি ভিখারীর বেশে
ভ্রমেন কি দয়াময়?

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

টিকি-চোর

ক্লাসে ঢুকেই পণ্ডিতমশাই বিষম রকমে ভ্রূকুটি করে' আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্জ্জন করে' উঠ্‌লেন—"নিধে, তুই কান ধরে' বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাক,—গুপী, তুই একপায়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে' দাঁড়া—" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—"বাড়ীতে আমার সোনার চাঁদ যেন ভিজে বেরালটি—ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না, আর স্কুলে এলেই একেবারে নৃসিংহ-অবতার—দাঁড়া তুই নিধের পাশে—হতভাগা বাঁদর বেল্লিক কোথাকার—"

আমি ত একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম। পণ্ডিতমশাইয়ের কথাগুলি ঠিকমত বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি এমন সময় টেবিলের উপর প্রকাণ্ড এক চড় মেরে পণ্ডিত মশাই গলা সপ্তমে চড়িয়ে কট্‌মট্‌ করে' আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"দাঁড়া হতভাগা, দাঁড়া শীগ্‌গির বেঞ্চের উপর।"

এই অকারণ গালাগালি খেয়ে সত্যি আমার ভয়ানক কান্না পাচ্ছিল। পণ্ডিতমশাইয়ের রাগের কারণ কিছুতেই ঠাওর কর্‌তে পার্‌লাম না—লক্ষ্মীছেলের মত নিধের পাশে দাঁড়িয়ে পড়্‌লাম।

আমাদের ক্লাশে আমরা তিনজন খুব বিশেষ বন্ধু ছিলাম। নিধিরাম গুপীনাথ আর আমি। সারা স্কুলে আমাদের যতটা বদ্‌নাম হয়ে গিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে আমরা ততটা খারাপ ছিলাম না। পরীক্ষাতে আমরা কেউই খুব বেশী নম্বর পেতাম না বটে, তবে কোন বিষয়ে কেউ ফেলও কর্‌তাম না।

কারুর যদি কোনো কারণে একবার বদ্‌নাম রটে যায়, তবে যা-কিছু হবে সব দোষ সেই বেচারীর ঘাড়ে পড়্‌বে। "যত দোষ নন্দ ঘোষ।" আমাদেরও ঠিক তাই হয়েছিল। স্কুলে কোনো জিনিষ ভাঙ্‌লে কি নষ্ট হ'লে সকলে বল্‌বে আমাদেরই কর্ম্ম। সেদিন কপাটি খেল্‌তে খেল্‌তে আশু ঘোষের ছেলেটা পড়ে' পা ভেঙে ফেল্‌লে, স্কুলসুদ্ধ ছেলে হেড্‌মাষ্টার মশাইয়ের কাছে বল্‌লে আমারাই নাকি পরামর্শ করে, তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছি অথচ সে নিজে স্বীকার কর্‌লে যে সে একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে পড়ে' গেছে। আর বছরে যেদিন স্কুলের আফিসঘরের কাঁচে-বাঁধানো দামী ছবিখানা মাটিতে পড়ে' কাঁচখানি একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে গেল—সে দিন ত সবাই আমাদেরই সন্দেহ করেছিল। হেড্‌মাষ্টার ত বেত নিয়ে আমাদের মার্‌তে পর্য্যন্ত উঠেছিলেন—কিন্তু যখন ফোর্থ্‌ মাষ্টার বল্‌লেন যে যে সময় ছবিখানা ভাঙে সে সময় আমরা তাঁর কাছে ব্যাকরণ পড়্‌ছিলাম আর তার উপর আফিসের কেরাণী যখন বল্‌লেন একটা ধুম্‌সো কালো বেড়াল উঁচু থেকে লাফাতে গিয়ে ছবিখানা ফেলে দিয়েছে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, তখন আমরা রক্ষা পেয়ে গেলাম।

যাহোক বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা অনুমান করে' নিলাম এ-রকম কিছু একটা কাণ্ড হয়েছে আর তার জন্যে পণ্ডিত মশাই আমাদের উপর এরকম শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু কি কাণ্ড ঘটেছে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি পিছনের বেঞ্চে হরিদাস বইয়ে মুখ লুকিয়ে হাসছে।

হরিদাসকে সবাই ভাল বলে' জান্‌লেও আমরা বিলক্ষণ জান্‌তাম ছেলেটা একটা ভীষণ ডান্‌পিটে। লেখাপড়ায় ভাল ছিল বলে' শিক্ষকরা তাকে স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তেন। পণ্ডিত মশাইও তাকে বিশেষ ভাল বাস্‌তেন। ছেলেটার একটা গুণ ছিল সে খুব ভাল "এ্যাক্‌টিং" কর্‌তে পার্‌ত।

ঢং ঢং ঢং করে' টিফিনের ঘণ্টা বেজে গেল—পণ্ডিত

মশাই আফিস-ঘরে চলে' গেলেন। তিনি যাবার সময় আমরা বেশ লক্ষ্য করে' দেখ্‌লাম তাঁর সুদীর্ঘ লম্বা টিকিটি আর তাঁর মাথায় নেই। ব্যাপারটা যেন বুঝ্‌তে পার্‌লাম, —আর এও বুঝ্‌লাম আমাদের উপর কেন এরকম শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে। পণ্ডিত মশাই যে আমাদের উপরেই সন্দেহ করেছেন ঐ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই রইল না। প্রকৃতপক্ষে আমরা দোষী ছিলাম না।

টিফিনের ঘণ্টায় আমি নিধে আর গুপী পরামর্শ আঁটতে লাগ্‌লাম কেমন করে' প্রকৃত অপরাধীকে ধরা যেতে পারে। আমাদের সকলের সন্দেহ হ'ল ঐ হরিদাসের উপর। কাল যখন সংস্কৃত ক্লাশে আমরা সবাই পণ্ডিত মশাইকে ঘিরে "হোম-টাস্ক্" দেখাচ্ছিলাম আর তিনি একমনে সেগুলি দেখ্‌ছিলেন তখনই নিশ্চয় হরিদাস এই কাজ করেছে। নইলে আজ যখন আমরা বেঞ্চে দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন ও হাস্‌ছিল কেন? কিন্তু প্রমাণ না পাওয়ায় চুপ করে' থাক্‌তে হ'ল।

সরস্বতী-পূজা উপলক্ষে আমাদের ইস্কুলে থিয়েটার হবে। তাই তার ধুম পড়ে' গেছে। দুবেলা 'রিহার্সাল' চল্‌ছে। পালা চন্দ্রগুপ্ত। হরিদাস স্বয়ং চাণক্যের 'পার্ট' নিয়েছে।

এক সপ্তাহ আগেই আমাদের ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল। ইস্কুলের ফুটবল ফিল্ডে "ষ্টেজ্" বাঁধা হচ্ছে। ছুটোছুটি, হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, বকাবকি,—একেবারে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার।

থিয়েটারের দিন বিকেল ৪টা থেকে লোক আস্‌তে আরম্ভ করেছে। গেম্‌স্ টিচার স্বয়ং "প্রোগ্রাম" বিলি কর্‌ছেন। ছেলেদের উৎসাহের আর সীমা নেই।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রকাণ্ড জায়গা একেবারে লোকে ভরে' গেল। 'কন্‌সার্ট' সুরু হ'ল। সাজ-ঘরে সকলে সাজ পোষাক করে' প্রস্তুত।

হরিদাসকে চাণক্যের পোষাকে বড় সুন্দর মানাচ্ছিল। গায়ে সিল্কের একখানি চাদর, পরণে থানের কাপড়, পায়ে খড়ম, গলায় ধবধবে শাদা পৈতে, আর মাথায় কাঁচাপাকা একখানি আধহাত লম্বা টিকি।

সুরু হবার আধঘণ্টা আগে পণ্ডিতমশাই সাজঘরে এলেন আর সকলকে উৎসাহ দিতে লাগ্‌লেন। "তুমি এম্‌নি করে' বল্‌বে, তুমি ওম্‌নি করে' বল্‌বে, হরিশ, তুমি অত তাড়াতাড়ি বোলো না, রমেন, তুমি একটু চেঁচিয়ে বল্‌বে—" তার পর, হরিদাসের পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্‌লেন "বাঃ তোকে ত বেশ মানিয়েছে দেখ্‌ছি—" বলেই ভীষণ চম্‌কে উঠ্‌লেন আর সঙ্গে সঙ্গে কান ধরে' দুই থাপ্পড়। আমরা সাজ-ঘরেই ছিলাম। সকলে ব্যস্ত হয়ে হাঁ হাঁ করে' উঠ্‌লাম। সবাই বলে "ব্যাপার কি—ব্যাপার কি!"

পণ্ডিতমশাই গর্জ্জন করে' উঠ্‌লেন—"অ্যাঃ পাষণ্ড অর্ব্বাচীন! তোমার এই কর্ম্ম, আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী হতভাগা! আমার টিকি আমি চিন্‌তে পার্‌ব না মনে করেছিস্—বেল্লিক ছুঁচো নরাধম কোথাকার—" পণ্ডিত মশাই আরো কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে সবাই মিলে শান্ত কর্‌লাম। পণ্ডিতমশাই রাগে গজ্‌গজ্ কর্‌তে কর্‌তে বাড়ী চলে' গেলেন।

সে দিন চাণক্যের অভিনয় ভাল জম্‌তে পার্‌ল না।

শ্রী সুনির্ম্মল বসু

—

ভোঁদড়

(গ্রীমের গল্প অবলম্বনে)

এক জনের তিন ছেলে। ছোট ছেলেটি নিতান্ত বোকা। লোকে তাকে বলে ভোঁদড়। বড় ছেলেটি একদিন বনে কাঠ কাটতে যাবে। তার মা তাকে এক ঘটী সর্‌বৎ আর কতকগুলো ভাল খাবার দিলেন। সে বনের ভিতর ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই এক বামন এসে তাকে বল্‌লে—"ভাই, বড় খিদে পেয়েছে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তোমার সঙ্গে যে খাবার ও সর্‌বৎ আছে তার কিছু আমায় দাওনা।" সে বল্‌লে—"আমারই কুলোবে না তোমাকে কি দেবো"। বামন চলে গেল। তারপর সে যেই গাছ কাটতে আরম্ভ কর্‌লে, অমনি কুড়ুলটা পিছ্‌লে এসে তার পায়ে পড়্‌ল। পা'টা গেল কেটে। আর গাছ কাটা হ'ল না। বাড়ী ফির্‌তে হ'ল।

তারপর মেজ ছেলে তেম্‌নি খাবার ও সর্‌বৎ নিয়ে বনে চল্‌ল। বামন এসে আবার তারও কাছে খাবার ও সর্‌বৎ চাইলে। সে বল্‌লে—"তোমাকে দিলে আমার

নিজের ভাগ কমে' যাবে। গাছ কাট্‌তে গিয়ে পা কেটে সেও বাড়ী ফিরলো।

এখন পড়্‌ল ভোঁদড়ের পালা। সেও খাবার ও সরবৎ নিয়ে বনে গেল। বামন এসে তার কাছেও খাবার ও সরবৎ চাইলে। ভোঁদড় বল্‌লে, "দেখ ভাই, আমার কাছে দুজনের মত খাবার নেই, তবু এস দুজনে ভাগ করে' খাই।" আর পর দুজনে খেতে বস্‌ল। খাওয়া শেষ হবার পরে বামন একটা গাছ দেখিয়ে ভোঁদড়কে সেই গাছটা কাট্‌তে বলে' চলে' গেল। গাছটা কাটা হ'লে পর ভোঁদড় দেখ্‌লে গাছের নীচেটা ফোঁপ্‌রা। আর সেইখানে একটা সোনার হাঁস রয়েছে। তাই দেখে ত তার খুবই আহ্লাদ। হাঁসটি নিয়ে সেদিন আর সে বাড়ী ফির্‌লো না। রাস্তায় একটা সরাইএ রইল।

সরাইওয়ালার ছিল তিনটি মেয়ে। সোনার হাঁস দেখে তারা খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল। হাঁসের একটি পালক নিতে তাদের খুব ইচ্ছে হ'ল। ভোঁদড় যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সরাইওয়ালার বড় মেয়ে একটা পালক নেবার জন্যে হাঁসের গায়ে হাত দিলে, কিন্তু আর তার হাত ছাড়িয়ে নিতে পার্‌লে না। তার পর এল মেজ মেয়ে। সে এসে যেই তার বড় বোনের গায়ে হাত দিলে, সেও তার বোনের সঙ্গে লেগে রইল। তার পর এল ছোট মেয়ে। তার বোনেরা তাদের গায়ে হাত দিতে বারণ কর্‌লে। ছোট বোন ভাব্‌ল তার বোনেরা নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছে, তাকে দেবে না বলে তাদের ছুঁতে বারণ করছে। আর যেই সে তাদেরকে ছুঁয়েছে সেও তাদের সঙ্গে লেগে রইল। এদিকে খুব শীত, বেচারাদেরকে ঠাণ্ডাতেই রাত কাটাতে হ'ল।

পরদিন সকালে ভোঁদড় হাঁসটি নিয়ে বেরোল। তার পিছনে তিনটে মানুষ যে লেগে রয়েছে সেদিকে তার হুঁস নেই। সে নিজের মনে চল্‌তে লাগ্‌ল। একটা মাঠের মাঝ দিয়ে সে যাচ্ছে। এমন সময় এক বামুনের সঙ্গে দেখা হ'ল। মেয়ে তিনটেকে সে বল্‌লে—"তোমাদের কি লোকটার পেছু ধরে' ধরে' যেতে লজ্জা করে না?" এই বলে' সে যেই তাদেরকে ছাড়াতে যাবে অমনি সেও গেল তাদের সঙ্গে লেগে। তারা কিছু দূর যেতে না যেতেই বামুনের চাকরের সঙ্গে দেখা। চাকর তার প্রভুকে অমনি করে' যেতে দেখে' বল্‌লে, "আপনি কোথায় চলেছেন?" এই বলে' সে যেই তার প্রভুকে ধরেছে, সেও গেল তাদের সঙ্গে লেগে।

এই সময় ভোঁদড়ের মনে হ'ল সে একবার দেশ-ভ্রমণে বেরোবে। ভোঁদড় নিজের হাঁসটি নিয়েই বেরোল। অনেক দেশ ঘুর্‌ল। বামুন, মেয়ে তিনটি আর বামুনের চাকরকে ভোঁদড়ের পেছু পেছুই যেতে হ'ল। কারণ, তাদের হাত আর হাঁসের গা থেকে ছাড়্‌ল না। শেষে ভোঁদড় এক রাজ্যে এসে শুন্‌লে, সেই দেশের রাজকন্যা হাসে না। আর রাজার সে একই মেয়ে, রাজার আর ছেলে মেয়ে ছিল না। তাই রাজা পণ করেছেন, যে রাজকন্যাকে হাসাতে পার্‌বে, রাজকন্যা তাকেই বিয়ে কর্‌বে। এই শুনে ভোঁদড় রাজবাড়ীতে গেল। রাজকন্যা এল। অনেক লোক জড়ো হ'ল। তখন ভোঁদড় তার সেই মানুষের লেজটি নিয়ে হাজির হল।

তাই দেখে সবাই ত হেসে খুন, রাজকন্যারও খুব হাসি। তার পর খুব ধুমধামে ভোঁদড়ের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। রাজা যখন মরে' গেলেন, ভোঁদড় তখন রাজা হয়ে সুখে রাজ্য কর্‌তে লাগ্‌ল।

প্রতিভা

—

গরুর গাড়ীর গান

ঐ চলেছে গরুর গাড়ী মাঠের পাশে,
কাঠের চাকার ক্যাঁচোর কোঁচোর শব্দ আসে।
গাড়োয়ানটা পাগ্‌ড়ী-মাথে পড়্‌ছে ঢুলে,
আপন মনে চল্‌ছে গরু লেজুড় তুলে।
প্রকাণ্ড মাঠ রোদের তাপে তপ্ত ঝামা,
মাথার উপর আগুন ঢালেন সূর্য্য মামা।
ধারে কাছে কোথাও নাহি একটু ছাওয়া,
শন্‌শনিয়ে ছুটছে বেগে গরম হাওয়া।
একটি-দুটি ধানের জমি মাঠের ধারে,
রোদের তেজে করছে খাঁ খাঁ একেবারে;
স্তব্ধ দুপুর দিক্-বিদিকে নাইক সাড়া,
এই দুপুরে রৌদ্রে পুড়ে যাচ্ছে কারা?
গরুর গাড়ীর চাটাই-ছাওয়া ছাউনি তলে
নতুন বধূ শ্বশুরবাড়ী ঐ যে চলে।

পর্দ্দা তুলে'   পিছন হ'তে   দেখ্‌ছে চেয়ে
ডাগর চোখে   নতুন বধূ,   ছোট্ট মেয়ে।
শীর্ণ রোগা   শ্রান্ত কাতর   বলদ দুটি
মারের চোটে   ঊর্দ্ধশ্বাসে   চল্‌ছে ছুটি।
গরুর গাড়ী   চল্‌ছে দুলে   মাঠের মাঝে,—
টুং টুং টুং   গরুর গলায়   ঘণ্টা বাজে।
অনেক দূরে   মাঠের শেষে   গ্রামের কাছে
ঝাঁকড়া মাথায়   তালের সারি   দাঁড়িয়ে আছে।
ঐ গ্রামেতেই   নতুন বধূর   শ্বশুরবাড়ী, —
ঐ গ্রামেতেই   চল্‌ছে ছুটে   গরুর গাড়ী।
মাঠ ছাড়িয়ে   ছোট্ট নদী   শীর্ণকায়া'
তার তীরেতে   তেঁতুল গাছের   শীতল ছায়া ;
গরুর গাড়ী   ঢালু পথের   বাঁকটি ধরে'
নদীর কাছে   এল এবার   বহুৎ পরে।
তৃষ্ণা-কাতর   বলদ দুটি   নদীর জলে
চুমুক্ দিয়ে   তৃষ্ণা মিটায়   আবার চলে ;
উঠ্‌তি পথে   উঠ্‌ছে গাড়ী   নদীর পাশে,
কাঠের চাকার   ক্যাঁচোর কোঁচোর   শব্দ আসে।
বাঁশের ঝাড়ে   বায়স ডাকে   বিকট স্বরে ;
ঘূর্ণী হাওয়া   বন্‌বনিয়ে   চল্‌ছে ঘুরে ;
পশ্চিমেতে   ঢুল্‌ল রবি,   কম্‌ল বেলা,
পুঁটুলী কাঁধে   পথিক চলে   ঐ একেলা।
মাঠ ফুরাল,   ঐ যে মাঠের   শেষ সীমানা,
ঐ দেখা যায়   নান্দীপুরের   গোসলখানা।
ঐ কাছারি,   ঐ যে গ্রামের   পাঠশালাটা,—
অশথ্‌তলায়   চণ্ডী-পূজার   আটচালাটা।
পথের পাশে   শ্যাওলা-পড়া   ময়লা দীঘি,—
জীর্ণ ঘাটে   বাসন মাজে   বাগ্‌দিনী ঝি ,
গরুর গাড়ীর   ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর   শব্দ পেয়ে
কাজ ফেলে'   সে কৌতূহলে   দেখ্‌ছে চেয়ে।
ছেলের দলে   জট্‌লা করে   হল্লা তোলে,—
বটের ডালে   দোল্‌না করে'   দোদুল দোলে।
গরুর গাড়ী   ঢুকল এবার   গ্রামের মাঝে,
নতুন বধূ   ঘোম্‌টা টানে   বেজায় লাজে।

শ্রী সুনির্ম্মল বসু

ফলের বর্ণ

ফুলের বর্ণের মত ফলের বর্ণেরও উদ্দেশ্য আছে। ফুলের উপর আমাদের দাবী না থাকিলেও ফলের উপর নিঃসন্দেহ আছে। ফলের উদ্দেশ্য বীজকে রক্ষা করা ও তাহাকে সুবিধা-মত স্থানে অঙ্কুরিত হইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া। গাছগুলি চলিতে পারে না, তাই তাহারা স্থাবর। কিন্তু গাছে যে বীজ জন্মে, তাহাদের যদি স্থানান্তরিত না করা হয়, তবে তাহারা তলায় ঝরিয়া পড়িবে ও সেই-খানেই অঙ্কুরিত হইবে, কিন্তু তাহাতে ত সুবিধা হয় না, এক জায়গায় কতকগুলি গাছ জন্মিলে লাভ কি? সেই জন্য ফলের জন্ম হইয়াছে।

ফলের শাঁস বা 'শস্য' প্রায় মধুর ও সুস্বাদু, এবং পশু-পক্ষী-মানুষের প্রিয়। ফলের শাঁসের সহিত ছোট ছোট বীজগুলি জীব জন্তুরা প্রায়ই গিলিয়া ফেলে। কিন্তু বীজ সাধারণতঃ অবিকৃত অবস্থায় জীবের পাকস্থলী হইতে মলের সহিত বাহির হইয়া আসে ও অঙ্কুরিত হয়। পশু-পক্ষীগণ গাছ হইতে ফল খাইয়া বিভিন্ন স্থানে চলিয়া যায় ও তথায় মলের সহিত বীজগুলি ত্যাগ করে ও তথায় তাহারা অঙ্কুরিত হয়। এইরূপে পাখীর দ্বারা বট অশ্বথ-গাছের বীজ বাড়ীর ছাদে আসে ও তথায় গাছ জন্মে। কেবল যে জীব জন্তুরা উদরে করিয়া বীজ স্থানান্তরিত করে তা নয়, অনেক সময়ে পাখী ও পশু নিজ সন্তানের জন্য ফলগুলি মুখে করিয়া লইয়া যায়, ইন্দুর ও কাঠ-বিড়ালী অনেক শস্য চুরি করে। মানুষের ত কথাই নাই, সে কত দেশ-বিদেশ হইতে ফল আনিতেছে। এইরূপে স্থাবর বস্তু গতি পায়।

ফল না পাকিলে বীজ পরিপুষ্ট হয় না, ও পরিপুষ্ট বীজ না হইলে গাছ জন্মে না। ফল যখন কাঁচা থাকে তখন প্রায় সবুজ বর্ণের থাকে, তাহাদিগকে পাতার মধ্য হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বীজ পরিপুষ্ট হইলে ফল পাকে ও তাহাদের রং বদ্‌লাইয়া যায় ও মিষ্ট গন্ধ বাহির হয়, জীবগণ তখন ফলের সন্ধান পায়।

আমাদের দেশে অধিকাংশ ফল পাকিলে হলুদে রঙের হয়—যেমন আম, কাঁঠাল, বেল, পেয়ারা, ইত্যাদি। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে ফল পাকিলে প্রায় লাল রঙের হয়,—

যেমন আপেল, পীচ, বেদানা ইত্যাদি। হুকার সাহেব দেখাইয়াছেন যে বিলাতে ১৩৪টি ফলের মধ্যে ৬৮টি লাল, ৪৫টি কাল, ১৪টি হলুদে ও ৭টি সাদা ফল হয়। আমাদের মত গরম দেশে কিন্তু এরূপ নহে। এখানকার প্রখর রৌদ্রে কাঁচা ফলের সবুজ রং পাকিলে হলুদে হয়। অবশ্য এদেশেও লাল ফল—লিচু কুল কামরাঙ্গা তেলাকুচা প্রভৃতি, কাল ফল—জাম, তাল, ফলসা ইত্যাদি, সাদা ফল—জামরুল ফুটিও প্রচুর জন্মে; তবুও হলুদের তুলনায় অনেক কম। আবার দেখিতে সুন্দর হইলে সকল ফল সুস্বাদু হয় না; যেমন মাকাল ফল।

কোন কোন ফল দেখিতে সুন্দর কিন্তু ভয়ানক বিষাক্ত। কোন পণ্ডিত বলেন যে লাল ফল দেখিয়া জীব এই ফল খায় ও খাইয়া মরিয়া যায়। ফলবীজ সেই জীবের পাকস্থলীতে থাকে ও তথায় অঙ্কুরিত হয়। ঐ জীবের মৃতশরীর এই গাছের সারের কাজ করে!

শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

বাগ্‌দাদ

আরব্য উপন্যাসের বিচিত্রকুহকময় গল্পরাজির কৃপায় বাগ্‌দাদ নামটি পৃথিবীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশেরই পরিচিত। খলিফা হারুণ-অল্-রসিদের রাজধানী

"Baghat's shrines of fretted gold,
High-walled gardens green and old,"

অনেকেই বাল্যস্বপ্নে কল্পনার চক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।" বাগ্‌দাদ নাম আছে, কিন্তু তাহার সে ঐশ্বর্য্য নাই—একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। তবুও রাজনৈতিক হিসাবে বাগ্‌দাদ এসিয়ার, বিশেষতঃ পশ্চিম এসিয়ার—যাহাকে ইউরোপীয়েরা Near East বলেন—একটি অতি প্রধান সহর। বাগ্‌দাদ তাহার কদাকার ও জরাজীর্ণ বেশ সত্বেও, রাজনৈতিক জগতে বিশেষ একটি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীন গৌরবের ও বর্ত্তমানের strategical বিশেষত্বের জন্য এখনও বাগ্‌দাদ সকলের আলোচনার বিষয়।

বাগ্‌দাদ মেসোপটেমিয়ার রাজধানী এবং এই দেশের মধ্যস্থলে সমুদ্র হইতে নদীপথে ৫৬০ ও সোজা স্থলপথে ৩৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। নদীতীরে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বাগান থাকিলেও বাগ্‌দাদ হইতে একটু দূরে আসিয়া যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়—মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে; সমতলভূমি কাঁটাগুল্মে ভরা।

বাগ্‌দাদ যে একটি অতি প্রাচীন নগর, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দে এখানে ব্যাবিলনীয় নগর ছিল। নেবুকাদনেজারের (৬০৫-৫৬২ খ্রীঃ পূঃ) নাম খোদিত কতকগুলি ইটও এখানে ভূগর্ভে পাওয়া গিয়াছে। ইহুদিদিগের তাল্‌মুদেও নাকি বাগ্‌দাদু নামক একটি নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জনৈক আরব ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, খলিফার প্রসিদ্ধ নগর স্থাপিত হইবার এক শতাব্দী পূর্ব্বে এখানে একটি নগর ছিল! ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে খলিফা ইব্‌ন্ ওয়ালিদ্ ঐ নগর আক্রমণ করেন। পারসিক অধিকারের সময়ে বাগ্‌দাদ সাম্রাট্ কেস্‌রা অন্থশিরভানের গ্রীষ্মাবাস ছিল। বাগ্‌দাদের আভিধানিক অর্থ নাকি "ন্যায়বিচারের উদ্যান"। পারস্য-রাজ বাদ্‌শা নওসেরোঁয়া নাকি এখানে উদ্যান-মধ্যে প্রতি সপ্তাহে উৎপীড়িত প্রজাদের সম্বন্ধে বিচার করিতেন এবং তাহা হইতেই এই নগরের বাগ্‌দাদ বা ন্যায়বিচারের উদ্যান নাম হইয়াছে।

৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে আব্বাসবংশীয় দ্বিতীয় খলিফা জাফর অল্-মন্‌সুর তাইগ্রিসের পশ্চিমতীরে ভুবনবিখ্যাত খলিফা-নগর বাগ্‌দাদ স্থাপন করেন। ঐ নগর বৃত্তাকার তিনটি দেওয়ালের দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি দুর্গবিশেষ ছিল ও উহাতে চারিটি তোরণ ছিল। প্রথম স্থাপনার সময়ে উহা মাত্র এক মাইল বিস্তৃত ছিল। ক্ষুদ্র হইলেও সে বাগ্‌দাদ শোভায় ও ঐশ্বর্য্যে অতুলনীয় ছিল। শীঘ্রই বাগ্‌দাদ, নদীর উভয় তীরে, বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং বিশাল আকার ধারণ করে। উহার সমৃদ্ধির সময়ে

বাগ্‌দাদে নাকি কুড়িলক্ষ লোক বাস করিত। প্রথম স্থাপিত বাগ্‌দাদেই ৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খলিফা মন্‌সুর, হারুণ-অল্‌-রসিদ ও মামুন্‌ রাজত্ব করেন। ঐ নগরের বর্ত্তমানে কোনও চিহ্ন নাই।

৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজধানী বাগ্‌দাদে ছিল না। পুনরায় যখন বাগ্‌দাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হইল, তখন প্রধানতঃ তাইগ্রিসের পূর্ব্বতীরে এক প্রকাণ্ড নগর গড়িয়া উঠিল। ইহার চতুর্দ্দিকে দেওয়াল ও পরিখা ছিল। বর্ত্তমানে তাহার চিহ্নস্বরূপ ইহার চতুর্দ্দিকে একটি উচ্চ বাঁধের মত রাস্তা ও তাহার পার্শ্ব দিয়া শুষ্ক খাত দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে দেওয়ালেরও কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, যে-সব গুণে ইউরোপ আজ দিন দিন অধিকতর উন্নতি করিতেছে, এ নগরে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। ইহার বিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির নাম আজিও অমর হইয়া রহিয়াছে; ইহার দর্শন এই উন্নত যুগেও পুরাতন হইয়া যায় নাই। এখানকার পণ্ডিতেরা শুধু নিজেরাই নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, গ্রীক ও হিন্দু সভ্যতার নিকট হইতেও তাঁহারা বহুতর সম্পদ্‌ আহরণ করিয়াছিলেন। ওদিকে করডোভা ও এদিকে বাগ্‌দাদ তখনকার সভ্য জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ছিল।

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে আব্বাসী খলিফাগণ তুর্কী শরীর-রক্ষীর একটি দল গঠন করেন। খলিফাগণের দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে এই শরীর-রক্ষীরা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতে থাকে এবং কিছুকাল পরে ইহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে বাগ্‌দাদের শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠে। এই সময়ে তুগ্রিল্‌বেগের অধীনে সেলজুক তুর্কীরা বাগ্‌দাদে আগমন করে। তখনকার খলিফা নির্ব্বিবাদে তুগ্রিল্‌বেগের হস্তে বাগ্‌দাদ ও তদধীন দেশসমূহের যথার্থ শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন। এই সময় হইতে খলিফা নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হন।

১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গলজাতীয় (মোগল) হুলাকু খাঁ বাগ্‌দাদ আক্রমণ করে ও তদানীন্তন খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাকে পরাজিত ও হত্যা করিয়া নগর অধিকার করে। হুলাকুর অধিকারের সঙ্গে বাগ্‌দাদের আরব অধিকার ও খলিফতের শেষ হয়। কিন্তু হুলাকু আরব-শাসন শেষ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; বাগ্‌দাদ, তথা মেসোপটেমিয়ার যাহাকিছু গৌরবের বা সম্পদের বিষয় ছিল—ইহার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পুস্তকাগার, কলাশিল্প, রত্নরাজি ও সুন্দর সুন্দর হর্ম্ম্য এবং সর্ব্বোপরি ইহার গৌরব ও সম্পদের মূলীভূত বহুপ্রাচীন জলনালিগুলি—সমস্তই হুলাকুর হস্তে ধ্বংস হইয়াছিল। ইহার পর ইরাক আর পুনরায় কখনও তাহার পূর্ব্বসম্পদ্‌ পায় নাই। যে সমস্ত স্থান একদিন জলসরবরাহের সুন্দর বন্দোবস্তের গুণে আশ্চর্য্যজনক উর্ব্বরতাশক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা মরুভূমিতে পরিণত হইল, লোকালয় জনশূন্য ও শ্রীহীন হইয়া পড়িল; নগরগুলি ভগ্নস্তূপে পরিণত হইল; জ্ঞানবিজ্ঞান অন্তর্হিত হইল। এক বাগ্‌দাদেই নাকি ২০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৬ লক্ষ তরবারি-মুখে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

ইহার পর কিছুদিন (চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে) বাগ্‌দাদ তৈমুরলঙ্গের অধীন হয়। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা উহা অধিকার করে। কিন্তু শীঘ্রই তাহাদিগকে সা-আব্বাস নামক জনৈক পারসিকের নিকট পরাজিত ও বিতাড়িত হইতে হয়। পারসিকেরা মাত্র ৩৫ বৎসর (১৬০৩-১৬৩৮) এখানে রাজত্ব করে। তাহার পর পুনরায় ইহা তুর্কীদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শা একবার বাগ্‌দাদ আক্রমণ করে ও বহুলোক হত্যা করিয়া নানা উৎপাত করে; কিন্তু ইহা তাহার অধিকারভুক্ত হয় নাই।

১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা যখন বাগ্‌দাদ পুনরধিকার করে, তখন তথায় মাত্র ১৫০০০ লোকের বসতি ছিল। ১৮১৭ সালে দায়ুদ পাশা বাগ্‌দাদের ওয়ালি (শাসনকর্ত্তা) নিযুক্ত হন। এ পর্য্যন্ত বাগ্‌দাদ ক্ষুদ্র ছিল। ইহার সুশাসনে বাগ্‌দাদ পুনরায় অনেকটা সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু ১৮৩১ সালে প্লেগ, প্লাবন ও দুর্ভিক্ষে ইহার ১৫০,০০০ অধিবাসীর প্রায় ৬০,০০০ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার পর বাগ্‌দাদের যে-সমস্ত ওয়ালি নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মিধাৎ পাশার নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। মিধাৎ (১৮৬৯-১৮৭২ খ্রীঃঅব্দ) বাগ্‌দাদের

নিনেভা নগরের ধ্বংসাবশেষ—বাগ্‌দাদের নিকট

প্রাচীন, জীর্ণ প্রাচীরগুলি ধ্বংস করেন এবং তাহাতে যে উন্মুক্ত স্থান পাওয়া যায়, তথায় সাধারণের জন্য উদ্যান ইত্যাদি নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করেন। তিনি বাগ্‌দাদের আরও অনেক উন্নতি সাধন করেন। নাজিম পাশা (১৯০৯) একবৎসরেরও কম বাগ্‌দাদের শাসনকর্ত্তৃত্ব করেন। তিনিও ইহার কিছু কিছু উন্নতি সাধন করেন। তৎপরে শেষ ওয়ালি খলিল পাশার দ্বারাও বাগ্‌দাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ১৯১৬ সালে খলিল পাশা বাগ্‌দাদের উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত একটি বড় রাস্তা তৈয়ার করেন। ইহার জন্য অনেক গৃহাদি নষ্ট হওয়ায় ইনি লোকের অপ্রিয় হইয়া পড়েন। ইনি এই রাস্তা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৯১৭ সালে বাগ্‌দাদ অধিকার করিয়া ইংরেজেরা ইহা শেষ করেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাগ্‌দাদ তুর্কীদিগের শাসনাধীন ছিল। এই সালের ১১ই মার্চ্চ ইংরেজ সৈন্য বাগ্‌দাদ অধিকার করে। বর্ত্তমানে ইংরেজের পুতুল, হেজাজের রাজপুত্র রাজা ফয়জল সিরিয়া হইতে বিতাড়িত হইয়া আসিয়া বাগ্‌দাদে ইংরেজের অধীনে খেলাঘরের রাজত্ব করিতেছেন।

বর্ত্তমান বাগ্‌দাদ তাইগ্রিস্ নদীর উভয়তীরে অবস্থিত। পূর্ব্ব তীরেই প্রধান সহর ও সমস্ত সরকারী গৃহাদি। পশ্চিমতীরে প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ ক্ষুদ্র সহর; বর্ত্তমানে অফিসাদির জন্য অনেকটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই দুই সহর দুইটি পুলের দ্বারা সংযুক্ত, একটি ইংরেজদের দ্বারা নির্ম্মিত, বিস্তৃত ও সুন্দর। অপরটি প্রাচীন তুর্কী পুল, অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ও অসুন্দর। তুর্কী আমলে ইহার দক্ষিণে আর-একটি পুল ছিল। নাজিম পাশা বাগ্‌দাদের ওয়ালি থাকার সময়ে একটা বড় ও সুন্দর লৌহনির্ম্মিত পুল তৈয়ারীর চেষ্টা করিয়াছিলেন।

নদীপথে বাগ্‌দাদের দিকে অগ্রসর হইবার সময়ে দূর হইতে মনে হয় যেন নগরটি উদ্যানশ্রেণীর মধ্য হইতে উঠিয়াছে। নদীর ধারে ধারে খেজুর, কমলালেবু, বেদানা প্রভৃতি নানা-প্রকার ফলের বাগান থাকায় নগরটিকে বেশ সুন্দর দেখায়। প্রথম যখন ষ্টীমার-যোগে বাগ্‌দাদ গমন করি, তখন দূর হইতে তাহার এই শোভা দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে আরব্য উপন্যাসের পরীরাজ্যে কতই না সৌন্দর্য্য দেখিবার আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু একবার ভিতরে প্রবেশ করিলে, তাহার প্রাচীন জরাজীর্ণ কুৎসিত বেশ দেখিয়া আরব্য উপন্যাসের স্বপ্ন কোথায় উড়িয়া গেল।

আব্দুল কাদির গিলানীর মসজিদ্—বাগ্‌দাদ

প্রাচীনকালে পূর্ব্ব-বাগ্‌দাদে ৪টি ও পশ্চিম-বাগ্‌দাদে ৩টি তোরণ ছিল। বর্ত্তমানে ইহার মধ্যে বাব্-এল্ সরখি ও বাব্-এল মুয়াজ্জাম নামক দুইটি তোরণের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন বাব্ এল্ তালিজ্‌ম্ ও বাব্-এল্-ওয়াস্তানিরও কিছু কিছু চিহ্ন আছে।

বাগ্‌দাদে বসতি অত্যন্ত ঘন। ইহাকে একটি গলির

সুন্দরী রঙীন ওড়্না উড়াইয়া, জালের অবগুণ্ঠনের তল হইতে অস্ফুট সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া, চলিয়া যায়, তখন স্বপ্ন ও বাস্তবে ভ্রম জন্মিয়া যায়।

বাগ্‌দাদের বাড়ীগুলি সমস্তই ঈষৎ হল্‌দে রঙের ইটে নির্ম্মিত। এখানকার অধিকাংশ বাড়ীই ব্যাবিলন, টেসিফোন্ ও ওয়াসিতের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত ইটের দ্বারা নির্ম্মিত। বাড়ী-গুলি প্রায়ই দ্বিতল। নীচের তলায় সাধারণতঃ 'সারদাব্', রান্নাঘর ও ভাণ্ডার থাকে। প্রত্যেক বাড়ীতে গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর যাপন করিবার জন্য ভিত্তির কয়েক ফুট নীচে একটি গৃহ থাকে; ইহারই নাম 'সারদাব্'। গলিপথের বাড়ীগুলির কোনও বহিঃসৌন্দর্য্য নাই; তবে উপর তলায় ভিতরের

কাজিমায়েঁর মস্‌জিদের অভ্যন্তর—বাগ্‌দাদ

গোলকধাঁধা বলিলেও চলে। ইহাতে বর্ত্তমানে খলিল-পাশার নির্ম্মিত "খলিল" বা নিউ ষ্ট্রীট্ ও নাজিম পাশার নির্ম্মিত রিভার ষ্ট্রীট্ মাত্র এই দুইটি বড় রাস্তা আছে। সংকীর্ণ, নীচু, অন্ধকার গলির দুইপাশে ঘনসন্নিবিষ্ট বাড়ী, আর সে বাড়ীর না আছে জানালা, না আছে বড় দরজা; আবার তাহার উপর প্রত্যেক বাড়ীর আছে ঝুল-বারান্দা—উপর হইতে যে আলো প্রবেশ করিবে, সে পথও একরূপ রুদ্ধ। এই গলিতে প্রবেশ করিলে মনে হইবে, যেন দেওয়ালে ঘেরা আরব্য উপন্যাসের কোনও হারেমে প্রবেশ করিয়াছি—গোপন মিলন ও গুপ্তহত্যা, যেন হারুণ-অল্-রসিদের সময় হইতে এখানকার বাতাসকে ঘন করিয়া রাখিয়াছে, যেন প্রতিপদেই কোনও বাগ্‌দাদ-সুন্দরী—

Serene with argent-lidded eyes
Amorous, and lashes like to rays
Of darkness, and a brow of pearl
Tressed with redolent ebony,
In many a dark delicious curl,
Flowing beneath her rose-hued zone—

চক্ষের সম্মুখে রূপের পসরা খুলিয়া ধরিবে; আর সত্যই যখন সেখানে কোনও দ্রুতগামিনী ইহুদী বা কাল্‌দীয়

মার্‌জান্ মস্‌জিদ্—বাগ্‌দাদ

পারসিক ফকির

বালক ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছিলেন, "রেতে মশা, দিনে মাছি; এই নিয়ে কল্‌কাতায় আছি।" একবার যদি গ্রীষ্মকালে তিনি আরব্য উপন্যাসের দেশ ভ্রমণে যাইতেন, তাহা হইলে তিনি কি বলিতেন বলিতে পারি না। গ্রীষ্মকালে মেসোপোটেমিয়ায় যেরূপ ভীষণ মাছি ও মশার উৎপাত হয়, তাহা না দেখিলে বোঝা যায় না। এখানকার অধিবাসীরা এসময় দুপুর বেলা 'সারদাবে' যাইয়া বাস করে। 'সারদাব্'গুলি জানালাবিহীন ও অবিরত জল ছিটানর জন্য স্যাঁৎসেতে থাকে। রাত্রিকালে সব বেশ ঠাণ্ডা হইয়া যায়, এবং তখন সকলে ছাদে আহারাদি করে ও নিদ্রা যায়। মধ্য রাত্রের পর ছাদে একটু একটু শীত করে। এদেশে সকল সময়ে বেশ বাতাস বহিতে থাকে বলিয়া গরম সহ্য করা যায়; নতুবা বাস অসম্ভব হইয়া পড়িত। শীতকালে আবার ভয়ঙ্কর শীত পড়ে। একালে অনেক সময়ে থার্মোমিটারে পারা ২৪ ডিগ্রীরও নীচে নামিয়া যায় এবং বাহিরে জল থাকিলে, তাহা জমিয়া যায়। শীতকালে আবার এখানে বৃষ্টি হয়; বর্ষাকাল পৃথক্ নাই। শীতের দিনে বর্ষা হইলে বাগ্‌দাদের রাস্তায় চলিতে যে কি কষ্ট, তাহা বর্ণনাতীত; একে তো

দিকে দৃষ্টি পড়িলে দেখা যাইবে—মূল্যবান্ সুন্দর কার্পেটে সমস্ত ঘরগুলি মোড়া। নদীতীরে যে-সমস্ত বাড়ী আছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই ছোট-খাট একটা বাগান আছে। প্রত্যেক বাড়ীরই ছাদ আমাদের দেশের ছাদের ন্যায় সমতল এবং তাহার চারিপার্শ্বেই উঁচু করিয়া ঘেরা, যাহাতে প্রতিবেশীর পাপদৃষ্টি না পড়ে। যে-কোনও উঁচু বাড়ীর ছাদে উঠিলে সমস্ত বাগ্‌দাদ সহরটা দেখা যায়। আর দেখা যায় অনেক বাড়ীরই ছাদে বড় বড় সারস-দম্পতি বাসায় বসিয়া তাহাদের বৃহৎ ঠোঁটের দ্বারা ঠক্-ঠক্-ঠক্-ঠক্ একটা বিকট শব্দ করিতেছে।

বাব্-এল-মুয়াজ্জাম হইতে বাগ্‌দাদের দৃশ্য

বাগ্‌দাদে শীত গ্রীষ্ম উভয়ই অত্যন্ত প্রখর। গ্রীষ্মের সময় ১১২ ডিগ্রী হইতে ১২২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত গরম উঠে।
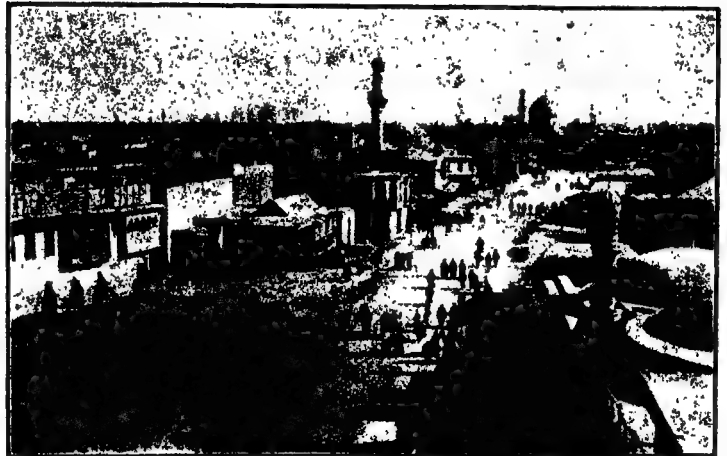
কন্‌কনে ঠাণ্ডা, তাহার উপর আধহাঁটু কাদা, রাস্তা চলিবার নাম হইলেই ভয়ের সঞ্চার হয়, এরূপ অবস্থায় হাঁটু পর্য্যন্ত gum bootএর ভিতর না দিয়া চলাচল একরূপ দুঃসাধ্য।

বাগ্‌দাদের সাধারণ স্বাস্থ্য বেশ ভাল; বিশেষতঃ শীতকালে। কিন্তু আরবদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকায় এবং সহরে স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ কোনও বন্দোবস্ত না থাকায়, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ একবার দেখা দিলে ভীষণ কাণ্ড বাধিয়া যায়। তবে আমাদের দেশের স্থায় সেখানে প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যমদূতেরা স্থায়ী আস্তানা গাড়ে নাই। বাগ্‌দাদের স্থায়ী উৎপাতের মধ্যে 'বাগ্‌দাদী ঘা'। উহা প্রায় সমস্ত অধিবাসীরই একবার না একবার হইয়াছে, অনেক অতি সুন্দর মুখও ইহাতে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে দেখিয়াছি। এই ঘা একবার বাধিলে সহজে সারে না, কিন্তু মেসোপটেমিয়া ত্যাগ করিলে আপনা হইতেই সারিয়া যায়।
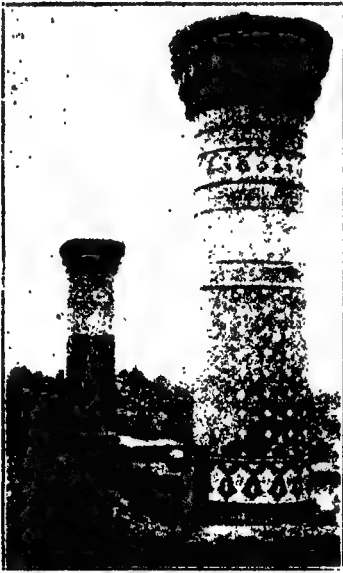
আস্‌-সাফায়া মস্‌জিদের মিনার—বাগ্‌দাদ

সহরে জল সরবরাহের বিশেষ সুবন্দোবস্ত নাই। ভিস্তিরা মোশকে করিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে জল দিয়া যায়, রাস্তায়ও ছিটায়। কিছুকাল হইল জলের কল বসিয়াছে; কিন্তু তাহাতে জল পরিষ্কার করিবার বন্দোবস্ত হয় নাই—তাইগ্রিস ঘোলা পরিষ্কার যাহা দেয়, কলে তাহাই সরবরাহ করে। সহরের সমস্ত ময়লা নদীতে ফেলে এবং সেই ময়লা-ফেলা জায়গা হইতে আবার জল তুলিয়া আনে। বর্ত্তমান ইংরেজ সরকারের ডিপার্ট্‌মেণ্ট্‌গুলি,

জোবায়দার সমাধিমন্দির—বাগ্‌দাদ

তাহাদের নিজেদের অধিকারের সমস্ত ময়লা পুড়াইয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। পূর্ব্বে সমস্ত বাগ্‌দাদের রাস্তাগুলি ভেদ করিয়া অনেকগুলি জলনালি চারিদিকের বাগানসমূহে জল সরবরাহ করিত; বর্ত্তমানে তাহার একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। এখানকার মিউনিসপাল ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এই ব্যবস্থা ভাল হইলে বাগ্‌দাদ যে এখনও একটি অতি স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর নগরে পরিণত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাগ্‌দাদের সরকারী গৃহাদি কোনটাই বিশেষ সুন্দর নহে। ইহার উত্তর তোরণের নিকট কেল্লা বা সৈন্যাবাস একটা বিখ্যাত দ্রষ্টব্য স্থান। ইহার মধ্যে বর্ত্তমানে মাত্র কতকগুলি খিলান-করা ঘর ও একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আছে। অনেকের মতে ইহা আব্বাসী খলিফাগণের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বর্ত্তমানে দেওয়াল জীর্ণ হইয়া খসিয়া পড়িতেছে। ইহার তোরণের নিকট একটি প্রকাণ্ড তুর্কী কামান আছে। আরবদের বিশ্বাস মানুষের প্রার্থনা
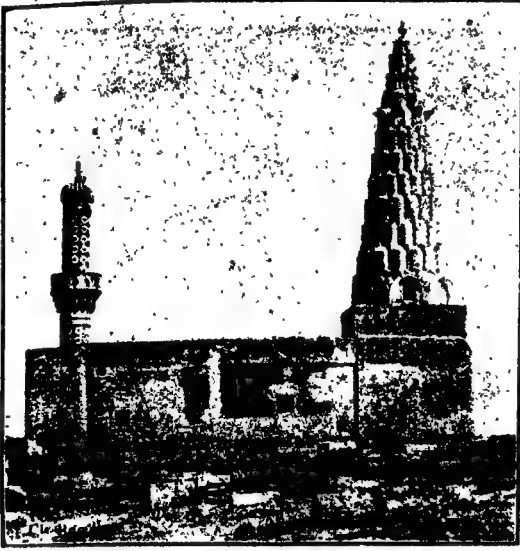
শেখ ওমারের সমাধিমন্দির—বাগ্‌দাদ

পূর্ণ করিবার ক্ষমতা এই কামানের আছে এবং সেই বিশ্বাসের বশে তাহারা এখানে আসিয়া ইহা লাল নীল কাপড়ের দ্বারা সজ্জিত করিয়া ইহার নিকট মানৎ করিয়া যায়।

কেল্লার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বাজার পার হইয়া, সেরাই বা তুর্কী গভর্ণরের প্রাসাদ। ইহা যে একটা গভর্ণরের প্রাসাদ হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে জানা না থাকিলে কেহ ধারণা করিতে পারিবেন না। প্রাসাদটি আয়তনে বিশেষ ক্ষুদ্র না হইলেও ইহা জীর্ণ শীর্ণ ও কদাকার। এই প্রাসাদটি মিধাৎ পাশার শাসনকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমি বাগ্‌দাদ ছাড়িয়া আসিবার কিছু পূর্ব্বে এখানে Ministry of Interior-এর আস্তানা বসিয়াছিল। শুনিয়াছি বর্ত্তমানে ইহা রাজা ফয়জুলের রাজ-প্রাসাদে পরিণত হইয়াছে।

সেরাইয়ের দক্ষিণপার্শ্বে তৎসংলগ্ন ঘড়ীঘর ও ব্যারাক বাগ্‌দাদের একটি দ্রষ্টব্য। ইহা নদীর উপর একটি বৃহৎ চৌকের তিনদিকে নির্ম্মিত। এই বাড়ীটি দ্বিতল ও বৃহৎ, প্রায় ৩,০০০ হাজার লোক ইহাতে বাস করিতে পারে। তুর্কী আমলে ইহা পদাতিক সৈন্যের আবাস ছিল; গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী সৈন্য বাহিরে আর-একটি বৃহৎ ব্যারাকে বাস করিত। আমি এখানে সমর-বিভাগের কয়েকটি আফিস দেখিয়া আসিয়াছি।

ক্লক-টাওয়ার ব্যারাকের পর সেরাই বাজার নামক একটি বৃহৎ বাজার। এই বাজার পার হইলে "কোটা ব্রিজের" অনতিদূরে তুর্কী চুঙ্গীঘর। ১২৩৩ অব্দে আব্বাসী খলিফা মুস্তান্‌সির্ বিল্লা এখানে একটি মাদ্রাসা বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মুস্তান্‌সিরির মাদ্রাসা সেকালে পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। বর্ত্তমানে সেই মাদ্রাসার বৃহৎ বাটীটির সামান্য সামান্য ধ্বংসাবশেষ মাত্র আছে। আমি এখানে একটা গুদাম দেখিয়া আসিয়াছিলাম। যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইত, আজ সেখানে গুদাম; সরস্বতীর চরণকমলে সমাগত মধুপদলের মধুচক্র আজ ভারবাহী পশুর বিচরণ-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

বাগ্‌দাদে যুদ্ধের পূর্ব্বে অনেক দেশেরই কন্‌সাল বা প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ রেসিডেণ্ট্‌ই ছিলেন সকলের সেরা—প্রতাপেও যেমন, জাঁকজমকেও তেম্‌নি।

বাগ্‌দাদে মস্‌জিদের সংখ্যা বিস্তর। মস্‌জিদগুলির গঠনসৌন্দর্য্য বিশেষ কিছু নাই, নিম্নদেশ প্রায়শঃই জীর্ণ

নজফ নগরে আলির সমাধিমন্দির - বাগ্‌দাদ

ও কদাকার। কিন্তু ইহার গুম্বজ ও মিনারগুলি নয়ন-রঞ্জক; সুন্দর নীল রংয়ের টালিতে প্রস্তুত ও নানা কারুকার্য্যে শোভাময়। দূর হইতে এই গুম্বজগুলি রৌদ্রে ঝল্‌মল্ করিতে থাকে। বহুতর মস্‌জিদের মধ্যে আবদুল কাদের গিলানীর মস্‌জিদ ও কাজ্রিমায়েঁর মস্‌জিদ সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত—দুইটিই মুসলমানগণের প্রসিদ্ধ

তীর্থস্থান। ইহা ভিন্ন মুয়াজ্জামের আবুহানিফার মস্‌জিদ, মারজান্ মস্‌জিদ, হায়দরখানা মস্‌জিদ, সুক্-এল্-খাজলের খলিফার মস্‌জিদ্ এবং মারুফ্-অল-কার্খির মস্‌জিদ্ বাগ্‌দাদ-প্রবাসীদের নিকট পরিচিত।

আবদুল কাদের গিলানীর মস্‌জিদ্ কাদেরী, দরবেশ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, সুফী সাধু আবদুলকাদের গিলানীর সমাধির উপর স্থাপিত। গিলানী ১০৭৭ হইতে ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

আরবী পোষাক

পশ্চিম বাগ্‌দাদের উপকণ্ঠ হইতে কাজিমাঁয় পর্য্যন্ত প্রায় ৭ মাইল পথ একপ্রকার দ্বিতল ঘোড়ার ট্রাম যাতায়াত করে। এই ট্রাম ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মিধাৎপাশা তীর্থযাত্রীগণের সুবিধার জন্য নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ট্রামে যাইতে এ পথে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। গিলানীর মস্‌জিদ সুন্নীগণের, কাজিমাঁয়ের মস্‌জিদ সিয়াগণের তীর্থস্থান। এখানে সিয়াগণের সপ্তম ইমাম মুসা-ইব্‌ন্-জাফর-এল্-কাজিম্ এবং তাঁহার পৌত্র নবম

বাগ্‌দাদের মহেলা নৌকা

ইমাম মহম্মদ-ইব্‌ন্-আলি-এল-জাওয়াদের সমাধি হইয়াছিল। দেশবিদেশের শিয়া মুসলমানেরা, বিশেষতঃ পারস্যের মুসলমানেরা, এখানে তীর্থ করিতে যাইয়া থাকেন। অনেক ধর্ম্মপ্রাণ শিয়া মুসলমান এখানে স্থায়ী বসবাসও করেন এবং এইরূপে কাজিমাঁয় বিদেশী, প্রধানতঃ ইরাণী, মুসলমানগণের উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে। কাজিমাঁয়ের মস্‌জিদটি যেমন সুন্দর, তেমনি বৃহৎ। ইহার নিকট বোধ হয়, বিখ্যাত কার্‌বালার মস্‌জিদও ম্লান হইয়া যাইবে। এই মস্‌জিদের জন্য পারস্যের শা নিয়মিত অর্থ দান করিয়া থাকেন। ইহার ২টি বৃহৎ গুম্বজ ও ৪টি সুউচ্চ মিনার সোনার পাতে (কেহ বলেন ১ ইঞ্চি পুরু, আবার অন্য কেহ কেহ বলেন ½ ইঞ্চি পুরু) মোড়া। কাজিমাঁয়ের মস্‌জিদে মুসলমান ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই; এখানকার লোকেরা এত গোঁড়া ও হিংস্র প্রকৃতির যে গুপ্তভাবে বা মিথ্যা পরিচয়ে প্রবেশ করাও বিপজ্জনক। সমস্ত বাগ্‌দাদে এরূপ আর কিছু দেখিবার নাই।

কাজিমাঁয়ের নিকট তাইগ্রিস পার হইলে মুয়াজ্জাম

নামক পল্লী। পূর্ব্বে এখানেও একটি নৌসেতু ছিল। মুয়াজ্জাম পল্লীটি নদী হইতে দেখিতে অতীব সুন্দর। এই পল্লীতে হানাফি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবু হানিফার সমাধি সুন্নীসম্প্রদায়ের তীর্থস্থান। আবুহানিফা ৬৯৯ হইতে ৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১০৬৩ অব্দে বাগ্দাদের শাসনকর্ত্তা তাঁহার সমাধির উপর একটি মস্জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন ও তাহার পার্শ্বে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাগ্দাদ পুনরধিকারের সময় তুরস্কের সুল্তান মুরাদ ঐ মস্জিদ ও মাদ্রাসা পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৮০২ অব্দে বাগ্দাদের ওয়ালি সুলেমান পাশা এগুলির সংস্কারসাধন করেন ও মিনারটি কারুকার্য্যখচিত করেন। ১৮৭১ অব্দে সুল্তান আবদুল আজিজের মাতা মস্জিদটির নানারূপ উন্নতি-সাধন ও ছাত্র এবং দরিদ্র তীর্থযাত্রীগণের জন্য কতকগুলি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বর্ত্তমান মস্জিদটি দেখিতে সুন্দর।

মুয়াজ্জাম হইতে বাগ্দাদ প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পথে কমলা লেবু, বেদানা, ষ্ট্রবেরী, আঙ্গুর প্রভৃতির অনেকগুলি সুন্দর বাগান, বাগ্দাদ স্পোর্টিং-ক্লাবের বিস্তীর্ণ মাঠ ও গৃহাদি, ইহুদিদিগের হাস্পাতাল এবং উত্তর তোরণের কাছাকাছি আসিয়া তুর্কী ঘোড়-সওয়ারদের বৃহৎ বাটী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নিউ ষ্ট্রীট দিয়া উত্তর তোরণ হইতে দক্ষিণ তোরণে যাইতে অর্দ্ধপথে প্রথমে হায়দরখানা মস্জিদ ও তাহার কিছু পরে মার্জান্ মস্জিদ। হায়দারখানা মস্জিদটি নেহাৎ ক্ষুদ্র নহে। ইহার উঠান রাস্তা হইতে কয়েক ধাপ নীচে। উঠানটি বৃহৎ—কয়েক হাজার লোক সমবেত হইতে পারে। ১৯২০ সালে যখন বেদুইন আরবেরা বিদ্রোহী হয়, তাহার পূর্ব্বে এই মস্জিদে অনেক সময় বাগ্দাদের নেতাদের ও সাধারণ অধিবাসীদের সভা হইত। এই সভায় প্রায়ই আরবেরা যে ইংরেজদের চাহে না, তাহাই জোরাল ভাষায় ঘোষিত হইত। একদিন রাত্রিতে এইরূপ এক সভার শেষে যখন সকলে মস্জিদ্ ত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, তখন হঠাৎ কলের কামান লইয়া বিনা কারণে তাহাদিগকে আক্রমণ করা হয় এবং তাহাতে একটি লোক হত ও কয়েকটি লোক আহত হয়। সে এক ছোটখাট জালিয়ানওয়ালা বাগ আর কি! পরদিন সহরবাসীরা হত লোকটিকে ফুলে পাতায় সজ্জিত করিয়া মিছিল করিয়া সমাধি-ক্ষেত্রে লইয়া যায়। বিদ্রোহের সময়ও এখানে সভা হইত।

হায়দরখানা মস্জিদ্ ছাড়াইয়া কিছুদূরে গেলে একটি চতুষ্পথ—বর্ত্তমান নাম এক্সচেঞ্জ্ স্কোয়ার্, ইহার বাম-দিকে শোরজা বাজার নামক একটি দীর্ঘ বাজার ও তাহার গায়ে মারজান্ মস্জিদ। এই মসজিদটি বর্ত্তমানে ধ্বংসপ্রায়। ১৩৫৭ সালে মারজান্ ইব্‌ন্,
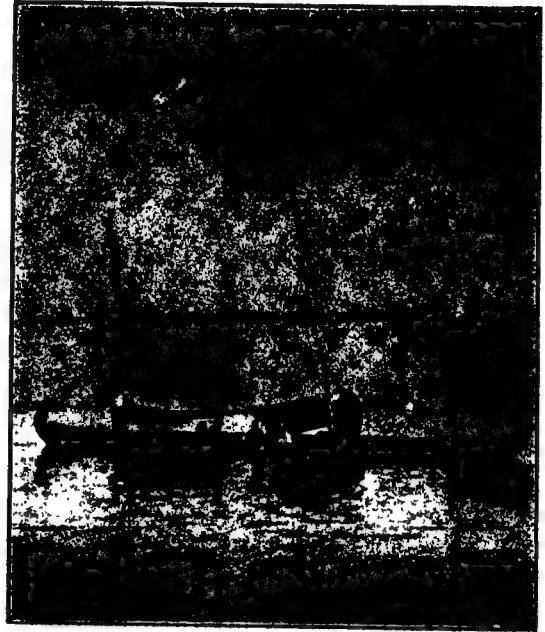
বাগ্দাদের বেলাম নৌকা

আবদুল্লা ইব্‌ন্, আবদুল রহমান নামক তুর্কী-জঙ্গী সুলতানগণের জনৈক স্বাধীনতা-প্রাপ্ত ক্রীতদাস কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মার্জান্ বাগ্দাদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া একবার বিদ্রোহী হন; কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত করিয়াও সুল্তান তাঁহাকে ক্ষমা করেন এবং স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্জানের মৃত্যু হইলে তাঁহাকে এই মস্জিদে সমাহিত করা হয়। এই মস্জিদে ইহার প্রতিষ্ঠার তারিখ প্রভৃতি খোদাই করা আছে।

সহরের পূর্ব্বদিকে সুক্-এল্-ঘাজ্‌ল্ বা সুতার বাজার। এখানে আব্বাসী খলিফাগণের একটি প্রকাণ্ড মস্‌জিদ ছিল। সেই মসজিদের বর্ত্তমানে একটি সুবৃহৎ মিনার মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই মস্‌জিদে অনেক খলিফা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। মস্‌জিদ্‌টি সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মারুফ্-অল্-কাখির মস্‌জিদ পশ্চিম বাগ্‌দাদের একেবারে পশ্চিমে সহরের বাহিরে নির্জ্জন সমাধি-ক্ষেত্রে অবস্থিত। এই মসজিদটি একজন সাধুপুরুষের সমাধির

বাগ্‌দাদের গুফা নৌকা

উপর ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। আরবেরা বলিয়া থাকে, যে, এই মস্‌জিদের মধ্যে যে একটি কূপ আছে, তাহা মক্কার বিখ্যাত জম্‌জমা নামক কূপের সহিত সংযুক্ত এবং তাহারই ন্যায় পবিত্র। তাহারা আরও বলে, এই মস্‌জিদের ভিতর হইতে মক্কা পর্য্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ ছিল; তুর্কীরা বাগ্‌দাদ ত্যাগ করিবার সময় নাকি সেই সুড়ঙ্গ বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছে। বাগ্‌দাদ হইতে মক্কার দূরত্ব বিবেচনা করিলে কথাটা যে আরব-মস্তিষ্কে আরক্ (খেজুর হইতে নির্ম্মিত আরবীমদ) পানের ফলে জন্মিয়াছিল, তাহা সহজেই বোঝা যায়।

মারুফ্-অল্-কাখির মস্‌জিদ যত না খ্যাত, তাহার নিকটে অবস্থিত জোবায়দার সমাধি তদপেক্ষা অনেক বেশী বিখ্যাত। আরব্য উপন্যাসের পাঠকমাত্রেই জোবায়দার নাম জানেন। ইনি খলিফা মনসুরের পৌত্রী এবং হারুণ-অল্ রসিদের প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। সমাধিটি দেখিলে কিন্তু নিরাশ হইয়া যাইতে হয়। দশ বার হাত উচ্চ একটি অষ্টভুজ গৃহের ভিত্তির উপর একটি আনারসের আকৃতির নাতিউচ্চ গুম্বজ। সত্যই ইহা জোবায়দার সমাধি-মন্দির নহে। হয়তো কোনও কালে এখানে সেই অমরীর সমাধি ছিল। জোবায়দা ৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন; কিন্তু বর্ত্তমান মন্দিরটি দেখিলেই নূতন বলিয়া মনে হয়। জনৈক লেখক বলিয়াছেন, তিনি এখানে খোদিত দেখিতে পান, যে, বাগ্‌দাদের তাৎকালীন শাসন-কর্ত্তার স্ত্রী আয়েসা খাতুমকে ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মহীয়সী জোবায়দার সমাধির উপর সমাহিত করা হয়। ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দেও একবার ওয়ালি হাসান্ পাশা এই মন্দিরটির পুনঃসংস্কার করিয়া, এখানে তাঁহার স্ত্রীকে সমাহিত করেন।

পশ্চিম বাগ্‌দাদের পশ্চিমে সমাধিক্ষেত্রে যেরূপ জোবায়দার সমাধিমন্দির আছে, সেইরূপ পূর্ব্ব বাগ্‌দাদের একান্ত পূর্ব্বে সমাধিক্ষেত্রে সহাব-অল্-দীন্ উমর সুহ্‌রাওয়াদ্দি বা সেখ উমরের সমাধি। উমর একজন বিখ্যাত সুফী ছিলেন; ১২৩৪ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সমাধিটি অনেকাংশে জোবায়দার সমাধিরই অনুরূপ। ইহার এক পার্শ্বে একটি মিনার আছে, জোবায়দার সমাধিতে তাহা নাই। এখানকার সমাধিক্ষেত্রটি তত বড় নহে।

সেখ উমরের সমাধির অদূরে বাব-এল্-ওয়াস্তানির ধ্বংসাবশেষ এবং তথা হইতে বাঁধের উপর দিয়া পূর্ব্বদিকে কিছুদূর গেলে "বাব্-এল তালিজ্‌মের" চিহ্ন দেখা যায়। এখান হইতে আব্‌দুল কাদের গিলানীর মস্‌জিদ দৃষ্টি-গোচর হয়।

বিদেশী ব্যবসায়ী ও পর্য্যটকগণের বসবাস এবং বাণিজ্যদ্রব্যাদি মজুত করিবার জন্য বাগদাদে গুদামের বড় বড় অনেকগুলি (২৫।৩০টি হইবে) বাড়ী আছে; ইহাকে খান্ বলে। খান্‌গুলির দৃশ্য, গন্ধ এবং স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নহে। একস্‌চেঞ্জ্ স্কোয়ারের মারজান মস্‌জিদের নিকট অংমাহ্ খান সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বিখ্যাত; এটি ১৩৫৯ অব্দে মারজান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া মস্‌জিদের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল।

বাগ্‌দাদে বাজারের সংখ্যা অনেক; আর এক-একটা

বাজার দৈর্ঘ্যেও কম নহে (প্রস্থে সর্ব্বত্র বেশী নহে)। সেরাইয়ের নিকট সেরাই বাজার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বাজারগুলি সমস্তই ছাদ-দেওয়া এবং কোনও দিকে বড় একটা ফাঁক না থাকায় অনেকটা অন্ধকার। গ্রীষ্মকালে বাজারের ভিতর দিয়া গতায়াত আরামদায়ক। কিন্তু শীতকালে, বিশেষতঃ যেদিন বৃষ্টি হইয়া পথঘাট দধি-সমুদ্র হইয়া থাকে, বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলে বাগ্দাদের চরণে নমস্কার করিয়া দূরে থাকিতে ইচ্ছা করে। বাগ্দাদের বাজারগুলি সমস্ত রকম দ্রব্যে পরিপূর্ণ। বাজারের মধ্যে অনেক সময় নিলামে পুরাতন দ্রব্যাদি বিক্রী হয়।

বাগ্দাদে স্নানাগার বিস্তর, কিন্তু একটিও সুন্দর বা সুব্যবস্থিত নহে। স্নানাগারে আট আনা পয়সা দিয়া প্রবেশ করিলে, সাবান, গামছা, পরিয়া স্নান করিবার কাপড় সমস্তই পাওয়া যায়; তবে সমস্তই নোংরা। এখানে একটি ঘর বাষ্পের দ্বারা গরম করিয়া রাখা হয় এবং তাহাতে ঠাণ্ডা ও গরম দুই রকম জলের পাইপ থাকে। বেশী পয়সা দিলে একজন লোক শরীর মর্দ্দন করিয়া দেয়। এখানে যতক্ষণ ইচ্ছা থাকা যায়; কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিলে অনেকের বাহিরে আসিবামাত্র মূর্চ্ছা হয়। সামরিক বিভাগের লোকেদের এখানে বিনা পাশে প্রবেশ নিষেধ।

বাগ্দাদে সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যায় বেশী নাপিতের দোকান। বোম্বেতে যেরূপ প্রতিপদে "রেস্তোরাঁ", এখানে সেইরূপ প্রতিপদে নাপিতের দোকান। নাপিতের দোকানগুলি সুসজ্জিত বটে। একবার কামাইবার জন্য চারি আনা এবং চুল কাটিতে হইলে বার আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত গ্রহণ করে। "রেস্তোরাঁ"ও এখানে সংখ্যায় কম নহে; তবে কোনটিই নাপিতের দোকানের মত সজ্জিত নহে বা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন নহে। আর সংখ্যায় বেশী—এখানে "আরকের" দোকান। মুসলমানের রাজধানীতে এ ব্যবস্থা এত বেশী কেন, তাহা খোদাই জানেন। যেমন আরকের দোকান, তেমনি থিয়েটারও বাগ্দাদে অনেকগুলি আছে। থিয়েটারে কোনও দিন প্রবেশ করি নাই। তবে শুনিয়াছি, এখানে ষ্টেজের উপর সুন্দরী মিশরী বা আরবী নর্ত্তকীরা পর্য্যায়ক্রমে অশ্লীল ভঙ্গীতে নাচে এবং "মিউ মিউ" করিয়া নাকি সুরে গান করে ও তাহাকে ঘিরিয়া একদল বাদক নানারকম বাজনা বাজায় এবং মধ্যে মধ্যে "গাওয়া" (ঘন কাল রংয়ের কাফি) পান করে—সময়ে সময়ে আরকও চলে। দর্শকবৃন্দ মধ্যে মধ্যে সুন্দরী নর্ত্তকীর উদ্দেশ্যে "লিরা" (তুর্কী গিনি) নোট প্রভৃতি বৃষ্টি করে। ইহাতে কোনও নাটক অভিনয় বা পট পরিবর্ত্তন প্রভৃতি কিছুই নাই। নিউ ষ্ট্রীটে এইরূপ দুইটি বড় বড় থিয়েটার আছে। রাস্তা দিয়া যাইতে অনেক সময় দেখিয়াছি, এই থিয়েটারের দ্বারদেশে সুন্দরী যুবতীরা লোক আকর্ষণ করিবার জন্য বসিয়া থাকে। এখানেও মিলিটারী লোকদের বিনা পাশে প্রবেশ নিষেধ।

বাগ্দাদে গাড়ী-ঘোড়ার আমদানী অনেক। সাধারণ লোক চলাচলের জন্য ফিটন গাড়ী ব্যবহৃত হয়। আরবীতে এই গাড়ীকে "আরবানা" বলে। মালপত্র বহিবার জন্যও একরকম ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহৃত হয়; আমাদের দেশের ন্যায় গরুর গাড়ী এখানে নাই। গাধা এবং আরবী ঘোড়াও এখানে ভারবহনের জন্য বহু-পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঘোড়া যেন এখানে অত্যন্ত সস্তা—প্রায়ই ২টির জায়গায় ৪টি এবং ৪টির জায়গায় ৮টি ব্যবহৃত হয়। মধ্যে মধ্যে ভারবহনের জন্য উটও দেখিতে পাওয়া যায়; তবে উট সাধারণতঃ বাহির হইতে আসে। এখানে রাস্তায় বাহির হইলেই আরবানা-চালকের এবং ভারবাহী গাধা- ও ঘোড়া-চালকের "বালক, বালক" (সাবধান, সাবধান) শব্দে বিরক্ত হইয়া যাইতে হয়। ইংরেজ অধিকারের পর এখানে মোটরের উৎপাতও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। নদীতে এখানে সাধারণতঃ দুইরকম যান ব্যবহৃত হয়—বেলাম ও গুফা। বেলাম জলিবোটের মত ও গুফা গোলাকার। ইহা ভিন্ন মালপত্র বহন করিবার জন্য "মহেলা" নামক বড় নৌকা আছে। সকল রকম নৌকাই এখানে ঘন "বিটুমেন্" দিয়া লেপা। বর্ত্তমানে বাগ্দাদে মোটর-বোটের সংখ্যাও কম নহে। ভারতগাভীকে দোহন করিয়াই এই-সমস্ত মোটরকার ও মোটর বোট পাওয়া গিয়াছিল।

১৯১৭ সালে একবার বাগ্‌দাদের লোকসংখ্যা গণনা করা হয়। তাহাতে উহার অধিবাসীর সংখ্যা ১৬০,০০০ স্থিরীকৃত হয়। এখানকার অধিবাসীদের দুইতৃতীয়াংশ আরব মুসলমান—কতকগুলি কুর্দ্দী ও পারসিক মুসলমানও আছে। বাকী এক তৃতীয়াংশের পঞ্চাশ হাজার ইহুদি ও নয় হাজার খ্রীষ্টান। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া এবং সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের সংখ্যাই প্রায় সমান। শিয়াগণ প্রধানতঃ পশ্চিম বাগ্‌দাদে বাস করেন। খ্রীষ্টানগণের মধ্যে অনেকগুলি সম্প্রদায় আছে; যথা, কাল্‌দীয় ক্যাথলিক, সিরীয় ক্যাথলিক, আর্ম্মেণীয় ক্যাথলিক, রোমান ক্যাথলিক, গ্রীক ক্যাথলিক, গ্রিসোরীয়ান ও প্রোটেষ্টাণ্ট। ইহাদের মধ্যে কাল্‌দীয়দের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহাদের সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গির্জ্জা আছে। কতকগুলি ভারতীয় মুসলমান তীর্থ হিসাবে বাগ্‌দাদে স্থায়ী বসবাস করিতেছেন।

যেখানে এতগুলি লোকের বাস, সেখানে শিক্ষার কোনও সুবন্দোবস্ত ছিল না, এবং এখনও নাই। দু'চারিজন মুসলমান বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোরান পাঠ করিয়া বিদ্যা সাঙ্গ করে, অধিকাংশ একেবারেই অক্ষরজ্ঞানবর্জ্জিত থাকে। ইহুদিগণ ব্যবসায়ী জাতি; বাহিরের নানাজাতির সংশ্রবে আসিয়া এবং নানা-দেশ দেখিয়া, তাহারা শিক্ষার প্রয়োজনটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে; তাহারা বালক ও বালিকাদের জন্য দুইটি স্কুল চালাইতেছে। ফরাসী মিশনারীগণও একটি স্বতন্ত্র স্কুল চালান। ইংরেজ-সরকার যথারীতি শিক্ষাবিভাগ স্থাপন এবং তাহাতে অনেকগুলি ইংরেজের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষার নামে আমাদের দেশের ন্যায় সেখানেও দাসভাবাপন্ন, দুর্ব্বল ও কাপুরুষ কেরাণী তৈয়ারী হইতেছে। পূর্ব্বের স্কুল কয়েক-টিতেও অবশ্য ইহার অধিক কিছু হইত না। পূর্ব্বে যাহারা ভাল বা উচ্চশিক্ষালাভ করিতে চাহিতেন, তাঁহারা বেরুতে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে, অথবা সক্ষম হইলে ইউরোপে বা আমেরিকায় গমন করিতেন; অনেকে বোম্বেতেও অধ্যয়ন করিতেন শুনিয়াছি। আমি বেরুৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক মুসলমান গ্র্যাজুয়েটকে "ইস্তকলাল" (স্বাধীনতা) নামক একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

শ্রী বিজয়কুমার ভৌমিক

বঁধুর মধুর দৃষ্টি রে

বঁধুর মধুর দৃষ্টি রে,
মাণিক-ঝরা নীল পাথারের
অঝোর আলোর বৃষ্টি রে!
ঝল্‌মলিয়ে আঁখির পাতায়,
যে রূপ জলে কে ধরে তায়,
পুলক-জাগা চমক-লাগা
বড়ই তাহা মিষ্টি রে!

বঁধুর মধুর দৃষ্টি রে,
মন্ টানা কোন্ ফুল বাগানের
রঙীন স্বপন সৃষ্টি রে!
একটি গোপন চাওয়ার দানে,
দ্রাক্ষা-দলী সরাব আনে,
ফিনিক্-ফোটা হৃদয়-লোটা
পিক-পাপিয়ার শিশ্‌টি রে!

শ্রী রমেশচন্দ্র দাস

কবি-জুবিলি

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

মিছিল্

প্রথম মুরৎ—স্বর্গদূত

উর্ব্বশী মোরে দিয়েছে পাঠায়ে
স্বর্গ-ভুবন হ'তে,
কবিরে পরাতে মন্দার-মালা
এসেছি মরাল-রথে !
জননী, জায়া, কি-কন্যার মত
ভকতি কি স্নেহ, প্রেম-
দেয় নি সে ; দেছে স্মৃতির নিকষে
চির-উজ্জ্বল হেম !

জীবন-ভোরের সঞ্চয় সে যে,
সে যে গো দিব্য দান,
ক্ষয় অপচয় হয় না তাহার
হয় না কখনো ম্লান ।
অমরার সার মন্দার-হার
পর এ মর্ত্ত্যে বসি'
মর্ত্ত্যের কবি ! এ মালা তোমারে
পাঠায়েছে উর্ব্বশী ॥

দ্বিতীয় মুরৎ—প্রকৃতি

বরষার বেণী এলাইয়া দাও,
শীতেরে কাঁদাও ফুলের ঘায়ে ;
ভাসাও গো সাদা মেঘের ভেলাটি
শরতের সাথে গগন-গায়ে !
ফাল্গুনী ফুলে নামহারা কোন্
নায়িকার নাম দেখ গো লেখা,
অতীতের পুরে পশি হের কার
আঁচলে হংস-মিথুন আঁকা ,
পুষ্পের সাথে পুলকিয়া ওঠ,
ঝঞ্ঝার সাথে দাও গো দোলা ,
কিবা সে অতীত কিবা অনাগত
তব তরে সব দুয়ার খোলা !
দীপ্ত-লোচন লুপ্ত-বচন
তাপস গ্রীষ্ম ভীষণ-ছবি,
তাহারেও কথা কহাও গো তুমি,
ভাষা দাও তুমি তারেও, কবি !
অনাগত আর অতীতের মাঝে
বাঁধিয়া তুলিছ মানসী সেতু,
অচেত চেতনে মিলায়ে যতনে
উড়ায়ে দাও হে বিজয়-কেতু !

বায়ু বহে' যায় ধীরে অতিধীরে
কানে কহে' যায় তোমারি শুধু,
ওগো গগনের চির-আত্মীয়,
ওগো জগতের পুরাণো বঁধু !
মৌন মাটিরে বাস তুমি ভালো—
মূক বলে' তারে কর না ঘৃণা .
মুগ্ধ প্রকৃতি হৃদয়ের প্রীতি
নিবেদিছে তাই বচন-হীনা।

তৃতীয় সুরৎ—বালক

বাজিয়েছিলাম পাতার বাঁশী
রথের মেলায় গিয়ে,
আপনি নাকি তাই লিখেছেন
ছাপার হরফ দিয়ে ?
আমার ভেঁপুর আওয়াজ, সে কি
সবের উপর ওঠে ?
সোরগোল আর খোল করতাল
ছাপিয়ে উধাও ছোটে ?
সব চেয়ে কম বেশী আমায়
জানে হাবুল্ টেঁপু :
আপ্‌নি নাকি বাঁশী বাজান ?
আমিও বাজাই,—ভেঁ—পু !

চতুর্থ সুরৎ—বঙ্গের 'হাসি' 'তাতা'

বরষে বরষে সারা দেশ জুড়ি'
বলির রক্ত ছোটে,
সারা দেশ জুড়ি শিশুহিয়াগুলি
শিহরি শিহরি ওঠে।
দেবতা দেখিতে দেখে বিভীষিকা,
ঘুমাতে পারে না রাতে,
স্বপনে গড়ায় রক্তের ধারা
মোছে তারা দুই হাতে !

সঙ্কোচে সারা প্রাণ ভরে' ওঠে,
ঘোচে না রক্তরাশি,
নিষ্ঠুর খেলা খেলে প্রবীণেরা
শিশুর শুকায় হাসি।
ওগো কবি ! ওগো তরুণ-হৃদয়,
করুণ তোমার গাথা—
করিছে স্মরণ অশ্রুনয়ন
বঙ্গের 'হাসি' 'তাতা' !

পঞ্চম সুরৎ—ভিখারিণী মেয়ে

ছুটে এসেছিনু মা-হারা বালিকা
মায়ের মায়ার লোভে,
পূজা-বাড়ী নাকি মা এসেছে, শুনি ;
ভরা ঘট দ্বারে শোভে।
অচল প্রতিমা ফিরে চাহিল না,
কথা কহিল না কেহ :
ক্ষুণ্ণ ফিরিয়া চলেছি ;- সহসা
তুমি ডেকে দিলে স্নেহ !
যাহা দিলে, ওগো ! ভিক্ষা সে নয়,
সে নহে অনুগ্রহ ;
মমতায় করে' নিলে আপনার
আমারে,— ম্লানিমা সহ।
দেবতার মত ভালবাস তুমি,
নাহিক তোমার তুলা,
সকলের সাথে তোমারে নমি হে
ভিখারী—পথের ধূলা।

ষষ্ঠ সুরৎ—বঙ্গবধূ

বালিকা-বয়সে মার কোল ছাড়ি
পর-বাসে বাঁধে যেজন গেহ,
পরশ যাহারে করে গো সবাই,
শাসন করে গো, করে না স্নেহ।

আগমনী শুনি ভিখারিণী-মুখে
মন ছুটে যায় বাপের ঘরে,
কুণ্ঠিত সেই বঙ্গের বধূ
হে কবি ! তোমারে প্রণাম করে।
মূক বেদনারে ভাষা দেছ তুমি.
হাল্‌কা করেছ মনের ব্যথা.
মনে মনে তাই নিবেদি' চরণে
মালা এ অশ্রু সলিলে গাঁথা।

*

সপ্তম মূরৎ—উপেক্ষিত

মরিয়া যে শুধু দিতে জানে, হায়,
জীবনের পরিচয়,—
চোর নয় তবু চুরি যে করেছে
ভুলিয়া লজ্জা ভয়,—
'আপদ' বলিয়া দূর হ'তে যারে
লোকে করে বর্জ্জন,—
ভালবেসে কবি তাদেরো ফুটালে !
করি তোমা বন্দন।

*

অষ্টম মূরৎ—ভৃত্য

চুরি অপবাদ ভূষণ যাহার,
ক্রটি অপরাধ নিত্য,
ঘোর নির্ব্বোধ, দেখিলেই যারে
রাগে জলে' যায় পিত্ত,—
উম্‌শেই বল, কেষ্টাই বল,—
যা খুসী বলিয়া ডাক,
উত্তর দিবে, হইবে হাজির,
মোটে সে চটিবেনাক।
পোষা জন্তর মত পোষ-মানা
সদা প্রফুল্ল-চিত্ত,
দেউড়িতে এসে গড় করে আজ
সেই পুরাতন ভৃত্য !

হইতে পারে সে ক্ষেত্রবিশেষে
মোহন কি শঙ্কর,—
অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে, তবু
নিরেট ভয়ঙ্কর।

*

নবম মূরৎ—খুড়া মহাশয়

ছ'কুড়ি ও দশ ?--তোমার বয়স ?
তুমি আরো ঢের বুড়া !
তোমার অনেক পরে জন্মেছে
চক্রবর্ত্তী খুড়া।
তারি গোঁফ চুল ভুরু পেকে গেল,
টাকে মুড়াইল চূড়া ;
ছ'কুড়ি ও দশ ? মোটে ? ভুল ! তুমি
ব্রহ্মার চেয়ে বুড়া।

*

দশম মূরৎ—বৃদ্ধ

রায় বসন্ত দিয়েছে পাঠায়ে
এই অদন্ত বুড়ারে হেথা,
সেই মানুষটি দেখিতে এসেছি
ফাঁস করে যেই বুড়ার কথা !
শাদা মন আর শাদা মাথা নিয়ে
এসেছি অনেক দিনের পরে,
শুনে মধুবাণী দেখে হাসিখানি
ফিরে চলে' যাব দেশান্তরে !
আল্‌বোলা আর তব্‌লা সিতার
পাল্কীতে হোথা এসেছি রেখে,
হেসে হেসে আর বাঁচিনে রে ভাই
বুড়ার নকল নাকাল দেখে।
(আমুদে বুড়ার নকল দেখে !)

*

একাদশ মূরৎ—গৌরাঙ্গভক্ত

জনম অবধি মোরে
গালি দেওয়া !
লাঞ্ছিত [illegible]

বিদ্রোহী করিয়া তোলা ?
আমার সে
ভগ্নীপতি-ভ্রাতা যত শালী,
না হয় গৌরাঙ্গে মজি
ভজি তারে ;
অভদ্র বিদ্রূপ তাই বলি' ?
জোন্স্-স্মিথ্-টম্সন-
নামাঙ্কিত
উপহার দেওয়া নামাবলী ?
সিঁদুর মাথায়ে বুটে
হায় হায় !
মাথা হেঁট—অপমান করা ?
হায়রান শুধু শুধু
পাঠাইয়া
হাকিমের মিথ্যা হরকরা !
কংগ্রেসে দিলাম চাঁদা,
তবু মিছে
ছল ধরা ? গেছি আমি চটে,
তোমাদের হুজুগেতে
আমি—আমি—
আমি যোগ দিবনাক মোটে।

*

দ্বাদশ মুরৎ—অপরূপ-রূপা বাংলা

বাংলা দেশের হৃদয়ের মাঝে
যেজন বিরাজ করে,
ডান হাতে যাঁর খড়্গ জলিছে
বাঁ হাত শঙ্কা হরে,
ললাট-নেত্রে বহ্নি যাঁহার,
স্নেহ-বিভা দু'নয়নে,
হে কবি ! তোমারে দেছেন প্রসাদ
তিনি প্রসন্ন-মনে।
দেউলের দ্বার খুলেছে তাঁহার,
মিলেছে মিলেছে দিশা,
তাঁর ইঙ্গিতে, সঙ্গীতে তব
হে কবি ! পোহায় নিশা।

ত্রয়োদশ মুরৎ—বিশ্বযোগী—ভারত-মহিমা

বিতরিলে ব্রহ্মবিদ্যা ; মিশাইলে সীমায় অসীমে !
রচিলে ভাবের সেতু যুক্ত করি পূরবে পশ্চিমে !
সমীপে আনিলে স্বর্গ ; স্বদেশেরে জানিলে সুন্দর,
স্বর্গ হ'তে গরীয়ান্ !—মূর্ত্ত যেন দেবতার বর !
প্রতিষ্ঠা করিলে প্রাণে ভারতের প্রাচীন সাধনা,
বহুর মাঝারে এক,—জগতের চির-আরাধনা !
সপ্তর্ষির পুণ্য-জ্যোতি সমর্পিলে বাঙালীর ভালে ;
সত্যের নিষ্কাম ভায় লুপ্ত করি' দিলে দেশ-কালে !
বিশ্ব-যোগে যুক্ত হ'লে—বিশ্বনাথ প্রেরিল বারতা !
জগতে ঘোষিত হ'ল বিশ্বমানবের আত্মীয়তা !
"জ্যোতিষ্ক কুটুম্ব" যত হেরি তোমা' আনন্দিত-মন,
নক্ষত্র-অক্ষরে * লিখি' পাঠাইল তোমারে লিখন !
কর্ম্ম-ক্লিষ্ট কোলাহল মন্ত্রে যেন শূন্যে গেল মিশি ;
মহাশান্তি এল নামি'† তব পুণ্যে ; হে কবি ! হে ঋষি !

*

চতুর্দ্দশ মুরৎ—কাবুলিওয়ালা

প্রকাণ্ড এই চেহারাটায়
প্রকাণ্ড যে হৃদয় আছে,
বাংলাদেশের ওগো কবি !
গোপন সে নেই তোমার কাছে !
ভুষো-মাখা পাঞ্জাখানি
ছাপা ছিল পাঁজর পরে,
কারেও তো সে দেখাইনিক,
দেখ্‌লে তুমি কেমন করে' ?
বাংলা মুলুক যাদুর মুলুক,
তুমি যাদুগিরের রাজা,
তোমার তরে বাবুসাহেব !
এনেছি এই আঙুর তাজা।

*

* পাঠান্তর—জ্যোতির অক্ষরে।
† পাঠান্তর—দিব্যশান্তি এল মর্ত্ত্যে।

পঞ্চদশ মুরৎ—সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী

জীবন তিক্ত হ'য়ে উঠেছিল
　　সার্কাস করি শূন্যে ;
পুরাণো গরিমা ফিরিয়া পেয়েছি
　　হে কবি ! তোমারি পুণ্যে ।
পুরাণো গরিমা সহজ মহিমা
　　প্রাণের রং-মহালে,
সার্থক ফিরে হ'ল এ জীবন
　　প্রাণের গভীর তালে ।
সুরে ও কথায় মিলিয়া লতায়
　　নির্ঝরে রবিরশ্মি !
পল্লবগ্রাহী পণ্ডিত শুধু
　　করিতেছে 'হা হতোঽস্মি' !
পরাণের মাঝে জনম লভিয়া
　　সহজে পরাণে পশি,
আজিকে আবার চলনে আমার
　　শত চাঁদ পড়ে খসি' ।

ষোড়শ মুরৎ—দাসী

বাণী নই, তবু রাজার প্রসাদ
　　মাথায় ধরেছি আমি,
সৌরভে তাঁর ভরি' আছে মম
　　জীবনের দিনযামী ;
আঁধারে শুনি সে চরণের ধ্বনি,
　　আঁধারে একেলা হাসি,
বাসক-সজ্জা করি আমি তাঁর
　　আঁধার ঘরের দাসী ।

*

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

বন্দনা

কীর্ত্তি-গগন-সূর্য্য হে !
বঙ্গ-ভুবন-পূজ্য হে !
　　প্রতিভা তোমার
　　করিল প্রচার
আঁধারে যা ছিল উহ্য হে !
　　পূজ্য হে !
যা' ছিল অজানা তুচ্ছ হে,
কর কটাক্ষে উচ্চ হে,
　　জগতের কবি-
　　সভা-মাঝে কবি
বাজাও বঙ্গ-তূর্য্য হে !
　　পূজ্য হে !

দেশবিদেশে প্রাপ্তপূজা রবীন্দ্রনাথ

জুবিলি

রাজার যদি হয় জুবিলি
কবির হ'তে পারবে সে,—
রাজার পূজা আপন রাজ্যে,
কবির পূজা সব দেশে !
চাণক্যের এই প্রাচীন বাক্য
লক্ষ কথার এক কথা,
রাজার যদি হয় জুবিলি
কবির হ'তে পারবে তা।
নজীর খুঁজে নাই যদি পাই
নাই তাতে ভাই দুঃখলেশ,
পর্শ্বা নূতন করবে স্বজন
রঙ্গভরা বঙ্গদেশ !
রাজার প্রভাব আপন রাজ্যে
কবির প্রভাব সব দেশে,
রাজার যদি হয় জুবিলি
কবির হ'তে পারবে সে।
বিধান দিলাম পাঁতি লিখে
সই করিলাম নিম্নে তার ;
কবির সেরা বঙ্গরবি
জানাই তাঁরে নমস্কার ॥

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বেনো-জল

এক

অন্ধকার !… ‥

আশে-পাশে আগে-পিছে, উপরে-নীচে,—কোনোদিকে একটু অবকাশ নেই, প্রাণপণে তাকাতে গেলেও দৃষ্টি আহত হয়ে ফিরে আসে।

কোথায় কোন্ তেপান্তর মাঠের পারে, অমাবস্যার রহস্য-ঢাকা গহন-বনের গোপন অন্তরালে, তিমির-দৈত্যের চির-স্তব্ধ পাথর-পুরীর কারাগারে, এতকাল ধ'রে যত কুয়াশা, যত আবছায়া বন্দী হয়ে ছিল, আজ যেন তারা হঠাৎ দরজা-খোলা পেয়ে হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে সারা-পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

অন্ধকার !……

সহরের পথে আজ আর পথিকরা চল্‌ছে না, একখানা গাড়ীর শব্দও শোনা যাচ্ছে না,—এমন নিবিড় কুয়াশা জীবনে কেউ কখনো দেখেনি। কুয়াশা যে এত জমাট, এত কালো হ'তে পারে, একথা কল্পনা করাও অসম্ভব। সারি সারি লোহার থামের উপরে, শত শত গ্যাসের

আলো জ্বল্‌ছে, কিন্তু পাঁচ হাত তফাৎ থেকেও তাদের অস্তিত্ব বুঝ্‌বার উপায় নেই।......মাঝে মাঝে ভীত প্যাঁচার তীব্র চীৎকারে সেই অনন্ত তিমির-সাগরের বুক যেন বিলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ছে। সেই থম্‌থমে আঁধার-নিশীথে সে চীৎকার যেন হাড়ের ভিতরটা মড়ার মতন ঠাণ্ডা ক'রে দেয়!

এম্‌নি এক কুয়াশা-ঢাকা, শীতার্ত্ত, অন্ধরাতে একটি লোক কষ্টে পথ চল্‌ছে। প্রতি পদেই সে হোঁচট্‌ খাচ্ছে, তবু সাম্‌নের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে সোজা এগিয়ে যাচ্ছে। যেন কোন্ নিরুদ্দেশের যাত্রী!

এম্‌নি ক'রে সে পথের পর পথ পার হ'য়ে গেল—কতবার আশ-পাশের দেয়ালের উপরে গিয়ে প'ড়ে তার দেহ আঘাতের পর আঘাত পেলে, কিন্তু সে-সব আঘাত আজ আর তাকে ব্যথা বা বাধা দিতে পার্‌লে না। মনের কোন্ অবস্থায় এমন রাতে, এমন ভাবে মানুষ পথ চল্‌তে পারে, তা কেবল সেই পথিকই জানে, আর জানেন অন্তর্যামী।

.........অদূরে জল-কল্লোল শোনা গেল। পথিক বুঝ্‌লে, সে গঙ্গার ধারে এসে পড়েছে।......একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে ধীরে ধীরে গঙ্গাগর্ভে নাম্‌তে লাগ্‌ল।

কুয়াশার আব্‌ছায়া সেখানে আরো ঘন হয়ে জমেছে—জলের আভাস পর্য্যন্ত দেখ্‌বার জো নেই—কেবল গঙ্গার জলস্রোতের ধ্বনি অতল পাতালের কাতর কান্নার মতন কানে এসে বাজ্‌ছে।

পিছল নদী-তীরে পথিক পা হড়্‌কে প'ড়ে গেল। তখনো সে আর্ত্তনাদ করলে না, বরং একটা অস্বাভাবিক স্বরে হেসে উঠে, সেই ভিজে মাটির ঠাণ্ডা বুকের উপরে চুপ ক'রে শুয়ে রইল—অনেকক্ষণ!

......তারপর সে উঠে আরো কয় পা এগিয়ে যেতেই গঙ্গার কন্‌কনে জল এসে তার পায়ের উপরে উছ্‌লে পড়্‌ল। পায়ে জল লাগ্‌তেই সে কেমন শিউরে উঠ্‌ল। অন্ধকারের যবনিকা ভেদ ক'রে একবার সাম্‌নের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলে;—কিন্তু দেখ্‌লে শুধু সেই নিরবকাশ অন্ধকার, আর অন্ধকার আর অন্ধকার! এ অন্ধকার দেখ্‌লে সন্দেহ হয়, পৃথিবীতে আর-কখনো চন্দ্র-সূর্য্যের মুখ দেখা যাবে না!......একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জলের ভিতরেই সে আবার ব'সে পড়্‌ল।

অন্ধকারে, গঙ্গাগর্ভে, শীতের শীতল রাত্রে, কে এই পথিক? এ কি পাগল, না বিকারের রোগী?

পথিক নিজের মনে, অস্ফুট স্বরে বল্‌তে লাগ্‌ল, "উঃ! কি কন্‌কনে জল! আমার হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে আস্‌চে!...চারদিক কি চুপচাপ! সুখীরা এখন গরম বিছানায় শুয়ে, গরম লেপ মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে...আমিই বা আর জেগে থাকি কেন? আমিও ঘুমুতে যাই! কালো কুয়াশার মশারি-ঢাকা ঐ তো আমার সুখের বিছানা পাতা রয়েচে!—কাঙালের শেষ আশ্রয় জলের বিছানা! পড়্‌ব আর ঘুমুব—এ ঘুম আর ভাঙ্‌বে না—রাত কাট্‌লেও নয়, পাখী ডাক্‌লেও নয়, সূর্য্য উঠ্‌লেও নয়!..."

সে আরো গভীর জলের ভিতরে এগিয়ে গিয়ে বস্‌ল। জল এবার তার কোমরের উপরে, বুকের তলা পর্য্যন্ত উঠে, হৃৎপিণ্ডের তালে তালে দুল্‌তে লাগ্‌ল।

"আর দু পা এগুলেই জল আমার গলা পর্য্যন্ত উঠ্‌বে। তার পর আমার মাথার উপরে...তার পর...তার পর কি হবে? ঘুমিয়ে পড়্‌তে কতক্ষণ লাগ্‌বে? পাঁচমিনিট? ছ'মিনিট? সাত মিনিট?...আমি ভেসে যাব, না একেবারে তলিয়ে যাব?"

সে মানস নেত্রে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, প্রথমে তার দেহ ডুবে গেল, সে ভয় পেয়ে বারকতক এলোমেলো ভাবে হাত-পা ছুঁড়্‌লে, শ্বাস বন্ধ হয়ে তার বুকটা ফেটে যাবার মত হ'ল, কিন্তু কোন উপায় নেই—সে তো সাঁতার জানে না—হাঁ ক'রে নিঃশ্বাস টান্‌তে গিয়ে তার মুখের ভিতরে শীতল মৃত্যু-স্রোতের মত হুসহুস্ ক'রে জল ঢুকে গেল, তার দুই বিস্ফারিত চক্ষু আর নাসারন্ধ্র দিয়ে রক্ত ছুটে বেরুতে লাগ্‌ল, অসহায় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে তার দেহ একবার উপুড় হয়ে পড়্‌ল, আর একবার চিৎ হয়ে গেল—তার পর...তার পর সব শেষ!......

পথিকের গলা দিয়ে ঘড়্‌ঘড়ি উঠ্‌ল—তার মনে হ'তে লাগ্‌ল, সে যেন বাস্তবিকই আর বেঁচে নেই—জীবন্মৃত অবস্থাতে আড়ষ্টভাবে ইহলোকের পরপারে ব'সে ব'সে

সে যেন দেখ্‌তে পেলে, তার মৃতদেহ গঙ্গাজলে ভেসে যাচ্ছে! চারিদিক্ থেকে নানা-জাতের মাছ দলে দলে এসে তার গা থেকে মাংস খুব্‌লে খাচ্ছে। একটা মাছ তার আধ-খোলা স্থির চোখের উপরে এক কামড় বসিয়ে দিলে—

—পথিক সচমকে নিজের চোখের উপরে হাত রেখে যাতনায় চেঁচিয়ে উঠ্‌ল! তখনি সে নিজের ভ্রম বুঝ্‌তে পার্‌লে, কিন্তু তখনো সেই ভীষণ দৃশ্যের উপরে যবনিকা পড়্‌ল না। অন্ধকারের ভিতরে চোখ চালিয়ে সে আবার দেখ্‌তে লাগ্‌ল—ভোর হ'ল। তার দেহ তখনো যেন পূর্ব্বাকাশ-চ্যুত চিতার অগ্নি-শিখায় জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে ভেসে চলেছে। জলচর জীবেরা ততক্ষণে তার দেহকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিয়েছে, স্থানে স্থানে তার গায়ের চাম্‌ড়া উঠে ভিতরকার টক্‌টকে লাল পেশীগুলো বেরিয়ে পড়েছে।...একখানা ষ্টিমার আস্‌ছে! ষ্টিমারখানা একেবারে তার দেহের উপরে এসে পড়্‌ল। তার পর—

—বিদ্যুতের মত দাঁড়িয়ে উঠে, দু-হাত তুলে পথিক সভয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "থামাও, থামাও! আমার দেহ, আমার দেহ!"

—তার পর; ষ্টিমারখানা সোজা চ'লে গেল! তার আঘাতে শবের মাথার একপাশ গুঁড়ো হয়ে গিয়ে, ভিতর থেকে পিণ্ডের মত কি-কতকগুলো বেরিয়ে পড়্‌ল।

—তার পর পথিক দেখ্‌লে, জল-পুলিসের লোক আস্‌ছে। তার মন কতকটা আশ্বস্ত হ'ল, এতক্ষণে তার দেহ তবু কিছু নিরাপদ্ হবে! আর তা স্রোতের মুখে অথই জলে ভেসে যাবে না, আর তাকে মাছে খুব্‌লে খাবে না।

নৌকার লোকেরা জালে ক'রে তার দেহকে জল থেকে টেনে তুল্‌লে।

পথিকের সুমুখ থেকে দৃশ্যপট উল্টে গেল। একটা লম্বা ঘর—হাসপাতালের শব-ব্যবচ্ছেদাগার। সারি সারি কতকগুলো টেবিল—তাদের উপরে কতকগুলো মড়া উর্দ্ধমুখ হয়ে শুয়ে আছে। একটা টেবিলের উপরে তার নিজের মৃতদেহ! টেবিলের গায়ে লেখা—১১! এখন তার দেহের অন্য কোন নাম নেই, অন্য কোন নামে এখানে কেউ আর তাকে চিন্‌বে না—পৃথিবীতে এখন সে এই "এগারো নম্বর" ব'লেই পরিচিত!

নিজের দেহের দুর্দ্দশা দেখে নির্ব্বাক্ দুঃখে সে কেঁদে ফেল্‌লে। যে দেহকে সে কত যত্ন কর্‌ত, কত সাবধানে রাখ্‌ত, যার উপরে কেউ একটি টুস্‌কি মারলেও তার ব্যথা লাগ্‌ত; সেই কত আদরের দেহের আজ এ কী হ'ল!...মাথার খানিকটা উড়ে গেছে, চোখ আর জিভ বেরিয়ে পড়েছে, সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় ক্ষত, পেটটা ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, গায়ে একটুক্‌রো ন্যাক্‌ড়া নেই—এ কী ভয়ানক, এ কী মর্ম্মভেদী!

ও কি, ও কি! একজন লোক কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে ঘরের ভিতর ঢুক্‌ল। সে বল্‌লে, "এগারো নম্বরকে ব্যবচ্ছেদ কর!"

ছাত্রেরা কতকগুলো অদ্ভুত আকারের ভীষণ-দর্শন চক্‌চকে অস্ত্র-শস্ত্র গোছাতে লাগ্‌ল। এতগুলো মানুষের দেহ অস্বাভাবিক উপায়ে প্রাণহারা হয়ে, এই ঘরে তাদের সুমুখে হাত-পা ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে, কিন্তু তাদের কারুরই মুখের ভাবে এতটুকু ভয় বা কৌতূহলের ছায়া নেই! তারা দিব্য সহজ ভাবেই পরস্পরের সঙ্গে হাসিমুখে ঠাট্টা তামাসা গল্প কর্‌ছে! মানুষ হয়ে মানুষের সম্বন্ধে এতটা অসাড়তা! কী হৃদয়হীন এরা!

অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তারা "এগারো নম্বরে"র কাছে এসে দাঁড়াল। এইবার তারা এই দেহটাকে কেটে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌বে!.........সে দৃশ্য কল্পনা ক'রে পথিক শিউরে উঠে চোখ মুদ্‌লে।.........

চোখ মুদেও সে নিস্তার পেলে না। তার বন্ধ চোখের সাম্‌নে, নিবিড় তিমির-পটের উপরে, রক্তের মত রাঙা আগুনের অক্ষরে ফুটে উঠ্‌ল, সেই সাংঘাতিক "এগারো নম্বর"!—এগারো, এগারো নম্বর—এই দুনিয়ায় তার সর্ব্ব-শেষ নাম!......মোহগ্রস্তের মত চোখ মুদে সে যে কতক্ষণ ধ'রে সেই এগারো নম্বরের দিকে চেয়ে রইল, তা সে নিজেই জানে না।.........

সে চোখ খুলে দেখ্‌লে, পৃথিবীর মুখ থেকে কুয়াশার ঘোম্‌টা খ'সে পড়েছে, অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে গঙ্গার জল দোদুল গতিতে বয়ে যাচ্ছে।

পথিক ভয়ে গঙ্গার দিকে তাকাতে পারলে না, তার মনে হ'ল সাম্‌নে এ যেন এক জল-রূপী মৃত্যু নির্দ্দয় স্বরে তাকে ঘন ঘন আহ্বান কর্‌ছে।

সে চোখ ফিরিয়ে আকাশের দিকে তাকালে।... চাঁদের মুখ মড়ার মত পাণ্ডু!......পথিক স্তম্ভিত নেত্রে দেখ্‌লে, চাঁদের উপরে কালো কালো রেখায় কে লিখে দিয়েছে—"এগারো নম্বর"!

সে এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল—তার পর পাগলের মতন তীব্র এক আর্ত্ত চীৎকারে রাত্রির অখণ্ড স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ ক'রে দিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল!

ছুটতে ছুটতে সে পথের উপরে এসে পড়্‌ল। তখনো সে থাম্‌ল না—তেম্‌নি ভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে সে-পথও পার হয়ে গেল। একটা চৌমাথার কাছে আস্‌তেই বাঁদিকের একটা পথ থেকে একখানা মোটর-গাড়ী তীরের মত বেরিয়ে এসে তাকে এক ধাক্কা মার্‌লে। আর্ত্তনাদ ক'রে সে পথের উপরে খানিক তফাতে গিয়ে ছিট্‌কে পড়্‌ল।

গাড়ীখানাও থেমে গেল। ভিতর থেকে সাহেবী-পোষাক-পরা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁর পকেট থেকে একটি বুক-পরীক্ষার যন্ত্র বাইরে উঁকি মার্‌ছিল—নিশ্চয় তিনি ডাক্তার।

আহত লোকটি তখন নিশ্চেষ্ট হ'য়ে পথের উপরে পড়েছিল। তিনি এগিয়ে গিয়ে তাকে পরীক্ষা ক'রে, একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, "না, বিশেষ চোট্ লাগে নি। দু-চার দিনেই সেরে যাবে।" তার পর গাড়ীর চালককে ধমক্ দিয়ে বল্‌লেন, "এ তোমার দোষ। কেন তুমি 'হর্ণ' দাও-নি?"

—"আজ্ঞে, এত রাতে এ লোকটা যে পথ দিয়ে এমন ক'রে ছুটে যাবে—"

—"যাও, যাও, বাজে বোকো না। এখন এদিকে এস, দুজনে মিলে একে গাড়ীতে তুল্‌তে হবে।"

"কোথায় যাব, মেডিক্যাল কলেজে?"

—"না, না, তাতে গোলমাল হ'তে পারে। পুলিস-হাঙ্গামা, খবরের কাগজে নাম ওঠা—এ-সব আমি পছন্দ করি না। সিধে বাড়ীতে চল। আমি দু-দিনেই একে সারিয়ে, কিছু বখ্‌সিস্ দিয়ে বিদায় ক'রে দেব।"

(ক্রমশঃ)

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রবাসীর আত্মকথা

(পিয়ের-লোটির ফরাসী হইতে) *

প্রাভাতিক সর্‌কারী কাজে

২৭ আগষ্ট, ১৮৮৩

এখন প্রভাত। উপকূলের এক উপসাগরের মধ্যে, আমরা "আন্নাম" † প্রদেশে; বার-দরিয়ায় আমাদের জাহাজ নঙ্গর ফেলিয়া আছে। ঐখানে কোন-এক স্থানে "ভুয়ান" নামে একটি ক্ষুদ্র নগর আছে; সর্‌কারী কাজের আহ্বানে সেইখানে আমাকে যাইতে হইবে।

কাজটা এই:—প্রধান "মান্দারীন্‌কে" আমাদের জাহাজে আনিতে হইবে। তিনি আসিয়া আমাদের সহিত বন্ধুতা-জ্ঞাপক সাক্ষাৎকার করিবেন। তাহার পর, আমাদের সহিত এই প্রদেশের মৈত্রী-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। পূর্ব্বেই, এই প্রদেশ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত আমাদিগকে প্রদত্ত হয়।

উপসাগরটি সুন্দর ও বিস্তীর্ণ। ইহা তিনটা কৃষ্ণবর্ণ উচ্চ পর্ব্বতের দ্বারা পরিবেষ্টিত; কেবল পশ্চাৎ-সীমান্তে, একটা সমতল সৈকতভূমির মেখলা;—উপসাগরটি শেষ করিবার উদ্দেশে, আর-কিছু বেশী ভাল খুঁজিয়া না পাওয়ায় যেন ভিন্ন দেশের এক টুক্‌রা ওখানে আনিয়া ফেলা হইয়াছে।

মনে হইতেছে, ঐ পশ্চাদ্‌ভাগের ভূখণ্ডে, ঐ সমতল ক্ষেত্রে, এক নদীর ধারে এই "ভুয়ান্"কে দেখিতে পাইব। কিন্তু এখনও ঐ নদীর প্রবেশ-মুখ দেখা যাইতেছে না।

---

* "পিয়ের-লোটি" ছদ্ম-নাম। আসল নাম Viaud। ফরাসী ঔপন্যাসিক ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক। তিনি একজন "impressionist"। এই ক্ষেত্রে তিনি খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। একটা কোন পদার্থ দেখিলে হঠাৎ মনে যে-একটা সাদৃশ্যের আভাস উপলব্ধি হয় এবং তদনুরূপ ঐ পদার্থের যেরূপ বর্ণনা করা হয় তাহাই "আভাস-গ্রাহী" লেখকের বর্ণনার বিশেষত্ব। —শ্রী জ্যো

† কোচিন-চাইনার অন্তর্গত প্রদেশ। আন্নামের উত্তরে টং-কিং; পূর্ব্বে চীন-সমুদ্র; দক্ষিণে কোচিন-চীন ও কাম্বোদিয়া এবং পশ্চিমে শ্যাম-দেশ। প্রধান বন্দর "ভুয়ান"। চীনের সহিত ১৮৮৬ সালের সন্ধিসূত্রে এই প্রদেশ ফরাসীদিগের রক্ষণাধীন হইয়াছে। জনসাধারণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী; শিক্ষিত লোকেরা কংফুচ-ধর্ম্মাবলম্বী। —শ্রী জ্যো

আমাকে বাছিয়া লইতে বলায়, আমি ৬জন মাথালো মাথালো লোক বাছিয়া লইলাম। উহারা এই দুঃসাহসিক কাজে আমাদের সঙ্গে যাইবে।

ইহারা সদ্বংশজাত পাকা নাবিক, অঙ্গে আবার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত; এসিয়ার একটা সমগ্র নগরের উপর চাপিয়া বসিবার পক্ষে এই কয়েকটি লোকই যথেষ্ট।

দিনের আলো দেখা দিয়াছে। আমরা একটা তিমি-মৎস্যের নৌকায় উঠিয়া যাত্রা করিলাম।

আমাদের মধ্যে কেহই "তুরান" দেখে নাই। তাই, এই অজ্ঞাত দেশে আমরা এইরূপ শাসন প্রচার করিতে যাইতেছি মনে করিয়া আমাদের খুব আমোদ হইতেছে।

পর্ব্বতগুলার মাথায়, কালো গম্বুজের আকারে, মেঘ লাগিয়া আছে। ঊর্দ্ধদেশে আমাদের মাথার উপর, গুরুভার অন্ধকার স্তূপাকার হইয়া আছে।

পক্ষান্তরে, হোথায়, এই নিম্ন ভূখণ্ডের উপর যেখানে আমরা যাইতেছি, আকাশের একটা আলোকোজ্জ্বল গভীর ফাঁক দেখা যাইতেছে। তা ছাড়া, একটা অসংলগ্ন খাপছাড়া জিনিসের ছায়া-ছবি মাটির উপর অঙ্কিত রহিয়াছে; ইহা "মার্বেল-পর্ব্বত"; ইহার সহিত আর কিছুরই সাদৃশ্য নাই; এই গঠনটি, সমতল-ক্ষেত্রের মধ্যে, দূরে পৃথক্‌ভাবে একাকী মাথা তুলিয়া আছে। রঙের প্রখর উজ্জ্বলতা; এই বালুকারাশির মধ্যে, ইহা যেন একটা সৃষ্টিছাড়া জিনিস্; খুব একটা বড় ধ্বংসাবশেষ, না, একটা এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়? ইহার মধ্যে, কোন্‌টা তা কে জানে। এইটের উপর সকলেরই নজর পড়ে, এটা যেন এখানকার ভূদৃশ্যের একটা অপূর্ব্ব চীনা-পুতুলের খেলনা।

ঘণ্টাখানেক যাত্রার পর, জায়গাটা অনেকটা কাছাকাছি হইয়া পড়িল। প্রথম দৃষ্টিতে যাহা সাদামাটা সচরাচর জিনিস বলিয়া মনে হইয়াছিল, এখন তাহার সমস্ত খুঁটিনাটি নজরে পড়িল; এক-সারি, সমপরিমাণ নিম্ন বালুকাস্তূপ, তাহার উপর আমাদের দেশের ন্যায় গাছপালা। নদীর মুখটা এখন দেখা যাইতেছে, দুই বালুময় বিন্দুর মাঝে একটা প্রবেশ-পথ; প্রবেশ-পথের ধারে একটা ক্ষুদ্র গৃহ। এই জায়গাটায় কতকটা "গাস্‌কইন" কিংবা "স্যাতোঙ্গের" ভাব আছে, এবং দূর হইতে বেশ মনে করা যাইতে পারে, যেন ফ্রান্স্ দেশের কোন ছোটখাটো বন্দরে আসিতেছি। যাত্রা-পথে, কখন কখন এই বিভ্রমটা মনে আনিতে ভাল লাগে।

কিন্তু গৃহটা যখন আরও কাছাকাছি হইল, তখন উহাকে একটা অদ্ভুত আকারের বলিয়া মনে হইল, যেন মুখ-ভ্যাঙাইতেছে। উহার বক্র-রেখাঙ্কিত ছাদের উপর নানা-প্রকার কদর্য দৈত্য-দানব খোঁচা বাহির করিয়া আছে, উহাদের শিং আছে, উহাদের বক্রনখযুক্ত থাবা আছে,এবং উহার মধ্যস্থলে মন্দির-সুলভ একটা বৃহৎ পদ্ম...আছে... আ!...এই ত বুদ্ধ!...এই ত প্রাচ্যিক এসিয়া!... কিছু পূর্ব্বে প্রবাসের কথাটা ভুলিয়া ছিলাম, আবার সহসা প্রবাসের ভাবটা, বহু-যোজন-ব্যাপী ব্যবধানের কথাটা মনে পড়িল। এই নিস্তব্ধ পুরাতন মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পাণ্ডুবর্ণ মুসব্বর-তরু সর্ব্বত্র কণ্টক উঁচাইয়া রহিয়াছে। ইতস্ততঃ ছোট ছোট জীর্ণ বেঞ্চের উপর ধূপাধার স্থাপিত আছে—এই বেঞ্চগুলি বৌদ্ধ চৈত্য। মন্দিরের রাস্তাটা প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য, সম্মুখে, জলের ধারে, পর্দ্দার ন্যায় একটা চৌকোনা দেওয়াল গাঁথা হইয়াছে। এই দেওয়ালের গায়ে বিকটাকার থাবা-বিশিষ্ট একটা কাল্পনিক পশুর রঙিন্ উৎকীর্ণ খোদাই-কাজের মূর্ত্তি রহিয়াছে—উহা ভীষণ বক্রদন্ত বাহির করিয়া হাসিতেছে। দেওয়ালের কার্ণিসের নিম্নাংশে, একটা লম্বা ভীষণ বাদুড় পাখবের পাখা মেলিয়া দিয়া আমাদের দিকে রক্তবর্ণ জিহ্বা-বাহির করিয়া আছে। ভূতলে, একটা চীনা-মাটির কচ্ছপ মাথা তুলিয়া আমাদের পানে চাহিয়া আছে। ইহা ছাড়া, অন্যান্য ক্ষুদ্র বিকটাকার জীব দেখা যাইতেছে; উহারা নিশ্চল; শীকার করিবার সময় হিংস্র পশু যেরূপ লাফ দিবার উদ্যোগ করে, সেইরূপ ভঙ্গীসহকারে দেহ সঙ্কোচ করিয়া যেন লম্ফ প্রদান করিতে উদ্যত। এই সমস্ত মূর্ত্তি অতি পুরাতন; কালপ্রভাবে ও ধূলার আক্রমণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে; কিন্তু উহাদের মুখে একটা জীবন্ত ভাব আছে—দুষ্টামির ভাব আছে; যেন আমাদিগকে বলিতেছে— বহুকাল হইতে আমরা এই নদীর প্রবেশ-পথ আগ্‌লাইয়া রহিয়াছি; যাহারা এই পথ দিয়া যাইবে, তাহাদের আমরা সর্ব্বনাশ করিব।

বলা বাহুল্য, ইহা সত্ত্বেও, আমরা প্রবেশ করিলাম। কোথাও জনমানব নাই। একটা মহানিস্তব্ধতা, এবং একটা পরিত্যক্ত-ভাব বিরাজ করিতেছে।

এই দেশ কতকগুলা কামানের গাদা। (এগুলা ফরাসী হাউইট্‌জার কামান, দেখিলেই চেনা যায়। ১৮৭৪ সালের সন্ধিসূত্রে এগুলা রাজা তু দুককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।) এখানে বালুরাশির মধ্যে, চালা-ঘরের নীচে উহারা উল্টাইয়া পড়িয়া আছে, কোন কাজে আসিতেছে না। তাছাড়া, কতকগুলা নোঙ্গর ও লোহার শিকল একস্থানে গাদা হইয়া রহিয়াছে। মনে হয় আমাদের নদীর পথ রোধ করাই উহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ইহার পরেই বুরুজ-ওয়ালা একটা বড় কেল্লা। বুরুজের কামান বসাইবার মাটির রন্ধ্রস্থানগুলা ঘাস, বুনো আনারস ও মনসা-গাছে আক্রান্ত। একটা দণ্ডের প্রান্তদেশে, গিল্‌টিকরা একটা কাঠের বিকট জীবের মূর্ত্তি; তাহার মুখের ভিতর, আন্নাম দেশীয় একটা পটমণ্ডপ;— এই মূর্ত্তিটা, নিশ্চল ও উষ্ণ বায়ুর মধ্যে, দুলিতেছে না, শুধু ঝুলিয়া আছে। সবে-মাত্র সূর্য্য উঠিয়াছে; ইহারই মধ্যে অনলবর্ষী প্রচণ্ড উত্তাপ। এ স্থানটা বরাবরই জনমানবশূন্য। অবশ্য, এখন প্রভাত, লোকেরা এখনও ঘুমাইতেছে।

কিন্তু একি? একজন শান্ত্রী পাহারা দিতেছে! আমাদের একজন নাবিক আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইল,—ঐ লোকটা আমাদের মাথার উপর, কাঠের চার-পায়া-ওয়ালা এক-রকম ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে উবু হইয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশে বিপদ-সঙ্কেত করিবার জন্য একটা ঢাক রহিয়াছে। তাহার আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা; দেখিলে মনে হয় যেন একটা কদাকার বুড়ী - তাহারই মত পরিচ্ছদ, তাহারই মত মাথায় ঝুঁটি খোপা।

লোকটা আমাদিগকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—পুতুলের মত নিশ্চল; মাথা না নাড়িয়া শুধু চোখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল।

নদীর মুখটা আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল—বেশ সিধা, বেশ একটু চওড়া। উচ্চোত্থিত গলুই, ও দীর্ঘ-মাস্তুল-বিশিষ্ট কতকগুলা নৌকা হোথায় নদীর দুইধারে নঙ্গর করিয়া আছে; তুরান-নগর এখনও একটু দূরে দেখা যাইতেছে। টালি কিংবা পাতা-ছাওয়া ঘর গাছপালার মধ্যে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে; একটা যষ্টির মাথায় লাগানো চীনা 'সাইনবোর্ড', কতকগুলা বাঁশঝাড়, কতকগুলা "মিরাদর", (নহবৎখানা) কতকগুলা মন্দির। এই সমস্ত আমাদের নিকট ক্ষুদ্র ও নিতান্ত দীনহীন বলিয়া মনে হইল। এ কথা সত্য, গাছপালার মধ্য দিয়া নগরটা আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাতে কিছু আসিয়া যায় না—আমরা আশা করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড় নগর দেখিব।

নদীর উচ্চ পাড়ের উপর কে-একজন লোক আপনাকে আপনি হাত-পাখায় বাতাস করিতেছে এবং বেশ একটু দরদ দেখাইয়া হাতের ইসারা করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।

হাত পাখা নাড়িয়া এমন সুন্দর ভঙ্গীসহকারে কে আহ্বান করিতেছে?

পুরুষ, না রমণী ? এদেশে তাহা জানিবার জো নাই। একই রকম পরিচ্ছদ, মাথায় একই ধরণের ঝুঁটি-খোঁপা, একই রকম কুৎসিত চেহারা…

কিন্তু না ! এ যে মোসিয়ো হোয়ে—উভচরজাতীয় মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি-বিশেষ—যিনি অনতিবিলম্বে তুরানের সহিত আমাদের সন্ধি-সম্বন্ধ স্থাপনের কাজে একটা প্রধান স্থান গ্রহণ করিবেন ; পাদ্রির মত আলখাল্লা-পরা, বানরের মত মুখ, মাথায় খুব উচ্চ একটা খোঁপা-ঝুঁটি ; তাহার উপর দিয়া একটা রুমাল বাঁধা ;—মনে হয় যেন একজন বৃদ্ধ লোক বিছানায় শুইতে যাইতেছে। সে "চিন্‌চিন্‌" বলিয়া নতশিরে নমস্কার করিল—তাহার পর "গাইডের" ভাব ধারণ করিয়া ফরাসী ভাষায় বলিল "বোঁ জুর্‌ ম্যসিয়" ! তখন আমার ডিঙ্গি-ডিঙ্গিটা সবেগে বালির উপর আনিয়া ফেলিলাম, এবং তীরে ভিড়াইলাম।

মোসিয়ো হোয়ে আবার আমাদের প্রত্যেককে সাত বার নতশিরে নমস্কার করিয়া, উপাধি সহ নিজের নাম ঘোষণা করিলেন—"মহাশয় আমি মোসিয়ো হোয়ে, আত্রান্‌ ক্যালেজের পুরাতন ছাত্র, এবং মহামহিম রাজশ্রী তু-দুকের সরকারী দোভাষী।" এই কথা বলিয়া আমাদের দিকে একটা ছোট কদাকার হাত বাড়াইয়া দিলেন—হাতটা আঁচিলে ভরা ; চীনীয় সাহিত্যিকদের মত হাতের নখগুলা—যেন উহার বৃদ্ধি এখনো শেষ হয় নাই। এইবার তিনি আমাদের পাশে আসিয়া বসিলেন।

বোধ হইতেছে, "মান্দারীন", ঐ ওদিকে একেবারে প্রান্তভাগে থাকেন। আমরা আমাদের নদী-পথে বরাবর চলিতে লাগিলাম।

নদীর ধার দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম, বুনো গোলাপ-গাছে গুচ্ছগুচ্ছ গোলাপ-ফুল, এবং অনেক প্রকার ফুল গালিচার মত ভূতলে বিস্তৃত—ইহারও রং লাল।

বৃক্ষের শাখাপল্লব সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল বর্ণের—চীনারা এইরূপ উজ্জ্বল বর্ণের শাখাপল্লব চিত্র করিতে ভালবাসে ; ধুতরা, মনসা ; একটু খর্ব্বকায় কিন্তু খুব তাজা ঝোপঝাড় ; সবুজ পালকের মত নারিকেল গাছ ইতস্ততঃ রোপিত ; শীর্ণকায় বাঁশঝাড় অন্য বৃক্ষাদি অপেক্ষা উচ্চ—তৃণ জাতীয় উদ্ভিজ্জসুলভ স্বীয় সৌকুমার্য্য বজায় রাখিয়া, বুনো-ছোলার মত খুব হাল্‌কা-ভাবে নুইয়া পড়িয়াছে।

এই সুন্দর হরিৎ-শোভার মধ্যে, গৃহগুলা কদাকার, মানুষগুলা ততোধিক কুৎসিত। এইবার ঝুঁটি-বাঁধা পুরুষ দেখা যাইতে আরম্ভ করিয়াছে—আমাদিগকে দেখিবার জন্য উহারা ছুটিয়া আসিতেছে।

তুরানের কাছাকাছি স্থানগুলা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। পাতলা গেঁকি কুকুরগুলা আমাদের পিছনে ভেউ-ভেউ করিতেছে। কালো-কালো কতকগুলা শূকর মুখে বেশ একটা সজীব স্ফূর্ত্তির ভাব—মাটিতে পেট ছুঁয়াইয়া চলিয়াছে—উহাদের পিছনে কতকগুলা লাল-ককুদ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রকায় গরুও চলিয়াছে। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড মহিষ—আকারে জলহস্তীর মত—উচ্চ ঘাসের ভিতর মজ্জিত হইয়া আছে। উহাদের আর্দ্র নাসা প্রায় মাটি ছুঁইয়া আছে ; উহাদের শৃঙ্গ অতি ভীষণ ; আমাদের গন্ধ পাইয়া নাক তুলিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছে—যেন আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত।

এইবার একটা সহরতলীর মত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। নদী তটের ধারে কতকগুলা পর্ণ-কুটীর।

কতকগুলি পীতবর্ণ রমণী—অতি কদাকার—কুটীর হইতে বাহির হইল এবং জলে পা ডুবাইয়া, আমাদিগকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য অগ্রসর হইল। উহারা প্রভাতের সাজসজ্জায় সজ্জিত। অশ্বপুচ্ছের ন্যায় কর্কশ কৃষ্ণ কুন্তলরাশি বাঁকাইয়া ধরিয়া আমাদের সম্মুখে এলো-থবণের খোঁপা বাঁধিল। উহারা পান ও সুপারী চিবাইতেছে। ইচ্ছা করিয়াই ছোট ছোট হাই তুলিয়া উহাদের বহিরুদ্‌গত লম্বা দন্তপংক্তি আমাদিগকে দেখাইতেছে। দাঁতগুলা মিশ্‌ কালো। (আনাম প্রদেশে তাবুনে মেয়েরা লাক্ষার প্রলেপ দিয়া এইরূপ কৃত্রিম রঙে দন্ত চিত্রিত করে।)

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, উহারা তুরানের "বসন্তসেনার" দল ! মুখের উপর এই-সব দাগ, আহ্বানের এই-সব মুচ্‌কি হাসি—একটু পরে আমরা এই সব আরও দেখিতে পাইব ; কারণ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই একই জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়।

মোসিয়ো হোয়েকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি চোখ নীচু করিয়া উত্তর করিলেন—"হাঁ, এ সেই অঞ্চলই বটে।" এই কথা শুনিয়া আমার খালাসিরা হাসিয়া উঠিল। অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে সলজ্জভাবে হোয়ে মহাশয় এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। "হাঁ মশায়, তাই বটে—হাঁ মশায়, ওরা বাস্তবিকই তাই।"

তথাপি, পুরো-মাস্তলের খালাসী দনিষ্ঠ ধরণে তুইতোকারি প্রয়োগ করিয়া স্বীয় মনোভাব গুজ গুজ করিয়া চাপা স্বরে উহাদের নিকট ব্যক্ত করিল।

—তোরা ত বাঁদ্‌রী—তোরা আবার হাব্‌ভাব দেখাচ্ছিস—রূপের বড়াই করছিস…আমি যদি বাঁদর হতুম তাহলে বটে…কিন্তু যা দেখ্‌ছি—না, কতকগুলা বাঁদ্‌রী।—না, না, কখনই না।"

তটভূমির সবুজ ঝোপঝাপের মধ্যে, কোন কোনটায় সাদা ফুলের গুচ্ছ—গজদন্তের মত সাদা—কন্দ-মূল জাতীয় উদ্ভিজ্জের আকার। আর কতকগুলায় অগ্নিশিখার মত জ্বলন্ত টক্‌টকে লাল ফুল। উহার পাপড়িগুলা শিখের মত উর্দ্ধে উঠিয়াছে। ইহা যেন চীনা আতস্‌বাজির মত, হরিৎ উদ্ভিজ্জের মধ্যে ইতস্ততঃ, জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

বড় বড় প্রজাপতি, খুব বড় বড় মাছি এই-সব ফুলের উপর বিচরণ করিতেছে—অনেকগুলা প্রজাপতি একেবারেই কালো, ডিগ্‌বাজি খাইয়া উল্টাইয়া উল্টাইয়া পড়িতেছে ; পাখা বেশী ভারী বলিয়া উহারা আপনাদিগকে সাম্‌লাইতে পারিতেছে না। দেখিলে মনে হয় যেন মখমলের পাখা।

সমস্ত প্রাচ্য এসিয়ার ন্যায়, এ দেশে মৃগনাভির গন্ধ সর্ব্বত্র পাওয়া যাইতেছে। যতই অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করা যাইতেছে ততই মৃগনাভির এই তীব্র গন্ধ আরও তীব্ররূপে অনুভূত হইতেছে। ইহার সঙ্গে এই-সব গাছপালা-নিঃসৃত সুরভিশ্বাসে, প্রখর সূর্য্যের কিরণে, উত্তপ্ত মনুষ্য-বিষ্ঠার গন্ধ মিশ্রিত হইয়াছে।

এখন আমরা উর্দ্ধোত্থিত-গলুই কতকগুলা নৌকার সম্মুখ দিয়া যাইতেছি। প্রত্যেক নৌকায় দুইটা দুইটা রং-করা চোখ ; নৌকার পুরোভাগটা মাছের মাথার মত। সমস্ত মৎসজীবী জেলিয়া এইখানে উপস্থিত ;—নৌকার উপর, ছোট ছোট মাটির উনানে পূতিগন্ধময় ভাত ও চিংড়ির ঝোল রান্না হইতেছে। কতকগুলি নগ্ন শিশু—আপাদ মস্তক পীতবর্ণ, লম্বা চুল,—সমস্ত নৌকাময় পিলপিল করিয়া, কিল্‌বিল্‌ করিয়া বেড়াইতেছে ; দাঁড়ের উপর বসিতেছে, লঙ্গরের মধ্য-দণ্ডের উপর বসিতেছে, একটা সতর্কতা ও স্থৈর্য্যতার ভঙ্গীসহকারে আমাদিগকে দেখিতেছে। উহার মধ্যে সদ্যোমাত্র জন্মিয়াছে এইরূপ খুব ছোট-ছোট শিশুও আছে ; উহারা পাছার উপর স্বীয় হস্তমুষ্টি রাখিয়া পেট বাহির করিয়া "বুদ্ধংদেহি" ভাব ধারণ করিয়াছে।

নদীর দক্ষিণ তীরে, কোন দুর্লভ জীব-বিশেষ চরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা আমাদিগকে দেখাইবার জন্য হোয়ে মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ—একটা ঘোড়া। এ ঘোড়াটা সাদা ; আর-একটা কালো ঘোড়াও আছে (তুরানে লোকে পাল্কী করিয়াই বেড়ায়)।—"ধন্যবাদ মোসিয়ো হোয়ে, কিন্তু অন্য দেশেও আমরা এই জাতীয় জানোয়ার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।"

তুরানের প্রথম বাড়ীগুলা আমাদের চোখের সামনে দিয়া যাইতেছে—বেশীর ভাগ বাঁশের পর্ণকুটীর—খুবই ক্ষুদ্র, ফেরিওয়ালা দোকানের মত শুধু তাহার তিন দিক্ আছে। রাত্রে, সহজে-নাড়ান-যায় এইরূপ বেতের কপাট দিয়া বন্ধ করা হয়; কিন্তু দিনের বেলা ওদের কাজকর্ম্ম সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এখন উহারা কালো-রং-করা দন্তের সাহায্যে প্রাতর্ভোজনে ব্যাপৃত; একটা চীনা-মাটির বাটিতে উহাদের সেই চিরন্তন ভাত ও মাছ। এই বাটির গায়ে নীল রংএ দৈত্যদানব আঁকা।

সর্ব্বত্রই উহারা ভোজনে ক্ষান্ত হইয়া, কৌতূহল ও উদ্বেগ সহকারে আমাদিগকে দেখিতেছে।

এখন আমরা খুব আস্তে আস্তে চলিতেছি—এই-সব লোকদিগকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়া আমাদের খুব আমোদ হইতেছে। নদীর ধার দিয়া যে সরু পথটা গিয়াছে, সেই পথে এখনই লোক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকলেরই গায়ে আঁটাসাঁটা একই রকমের জোব্বা; কিন্তু রংএর বৈচিত্র্য আছে। গরীব লোকদের ময়লা ধূসর রংএর পাশে জর্দ্দা ও সবুজ রং;—শেষোক্ত এই দুই রং সুবেশী সৌখীন লোকদিগের পছন্দসই। খড়ের টুপি;—যত রকম মাপের টুপি আমাদের জানা আছে ইহা তাহার বহির্ভূত। স্ত্রীলোকদের কানা-বাহির-করা টুপি বাস্ক-প্রদেশের প্রকাণ্ড চাকের মত। পুরুষদের টুপি কোণালো ও সূচালো—যেন একটা প্রকাণ্ড বাতির ফানুস। উহারা নীল ও লাল রংএর পরিচ্ছদ পরিয়া কেজো লোকের মত মুখের ভাব করিয়া, হেলিয়া দুলিয়া গদাইলস্করী চালে নদীর ধার দিয়া চলিয়াছে—এই সাজসজ্জা ও চলিবার ভঙ্গী যে কতটা হাস্যজনক, সে বিষয়ে উহারা সম্পূর্ণ অচেতন। সকলে একই স্থানে আসিয়া সমতল "ভক্" নৌকায় উঠিয়া ওপারে যাইতেছে। যাত্রাকালে আরও কতকগুলি ছোট ছোট পুরাতন জীর্ণ মন্দির দেখিতে পাইলাম। উহাদের গায়ে-চিত্রিত দৈত্যদানব সমস্তই কাল-বশে ও ধূলার ঘর্ষণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তাহার পর, এক জায়গায়—যেখানে তীরভূমি একটু উন্নত—একটা সবুজ গড়ানে মাটি। মোসিয়ো হোয়ে একটা সরু পথের সম্মুখে আমাদিগকে থামাইলেন; আমরা তখন একটা নৌকায় গা ঘেঁসিয়া আমাদের সাদা তিমি-নৌকাটা নোঙ্গর করিলাম। নোঙ্গর করিয়া বালুর উপর লাফাইয়া পড়িলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মায়ের কাছে

ফিরে এলাম তোমার কোলে
আবার এলাম ফিরে,
অনাথিনীর বেশে মা গো
আকুল আঁখি-নীরে।
চন্দ্রহারা কোজাগরে
জাগ্‌তে এলাম তোমার ঘরে,
সোনালি মেঘ সজল হয়ে
ঘিরলো অবনীরে।

পরের ঘরে পাঠাতে মা
কেঁদেছিলে বড়,
আজকে কেঁদে ফিরে এলাম
মা গো কোলে কর।
রেখেছিলাম বক্ষে চাপি,—
হারিয়ে এলাম সিঁদুর ঝাঁপি,
পাগলিনী অভাগিনী
কাঁকণ হানি' শিরে।

প্রতিমা যা সাজিয়েছিলে
রাংতা সোনা দিয়ে,
আজকে কাঁদো ভাসান-শেষের
কাঠামো তার নিয়ে।
নিভে গেছে শানাই বাঁশী,
আতস-বাজি, আলোর হাসি,
ঝরে' গেছে মণির মালা
আঁধার নদীতীরে।

ভোরের মিঠে আমেজ গেছে,
সমীর গেছে বয়ে,
উষা তোমার এলো এবার
গোধূলি যে হয়ে।
বুকে দারুণ সায়ক ঢাকি
এলো ফিরে তোমার পাখী,
গোলাপ যে আজ কাঁটা হয়ে
কাঁদায় জননীরে।

কোলের মেয়ে কোলে এল
দেখ মা চোক্ মেলি,
গৈরিকে আজ কে ছোপালে
কমলাফুলি চেলী।
সাঙ্গ হলো সে ফুলসাজ,
ফুলদানী হায় ধুনাচী আজ,
কুশী করে' কে রাখিল
কাজললতাটিরে।

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইনসংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন্ জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১)

বর্ণাশ্রম বিভাগ

"ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ লোহিতঃ, বৈশ্যস্য পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা"—পুরাণাদিতে ভারত ও অন্যান্য বর্ষের শ্বেত, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ জাতিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে প্লক্ষদ্বীপে আর্যক, কুরু, বিবিংশ এবং ভাবী জাতি যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া কথিত হয়। শাল্মলীদ্বীপে কপিল, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণ এই যে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ বাস করেন ইঁহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। কুশদ্বীপে দমী, শুষ্মী, স্নেহ ও মন্দেহগণ ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এবং ক্রৌঞ্চদ্বীপে পুষ্কর, পুষ্কল, ধন্য ও তিষ্য নামক লোকেরা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া কথিত হয়।

বৃহদারণ্যকীয়া শ্রুতিতে এবং মহাভারতে লিখিত আছে যে পূর্ব্বে আর্য্য-সমাজের সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহা হইলে রক্ত (Red Indian), পীত (মঙ্গোল) ও কৃষ্ণ বর্ণের দ্রাবিড় জাতিরা যাঁহারা পরে আর্য্য সমাজে মিলিত হয়েন, তাঁহারাই কি ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া কথিত হইতেন?

গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণ বিভাগ চারি বর্ণের সংমিশ্রণের পরে নয় কি?

শ্রী লক্ষ্মীকান্ত দেব

(২)

রাজা গৌরগোবিন্দের রাজধানী

শুনা যায় রাজা গৌরগোবিন্দের রাজধানী শ্রীহট্ট সহরেই ছিল। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে তাহা কোন্‌খানে ছিল এবং বর্ত্তমানে ইহার কোন চিহ্ন আছে কি না?

শ্রী কিরণময় চৌধুরী

(৩)

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বাংলার রাজা

বুদ্ধদেব যখন রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবের মুক্তির কামনায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন্ তখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা কে ছিলেন?

শ্রী সুরেন্দ্রকুমার দত্ত রায়

(৪)

বারভূঞা সাঁতৈরের ইতিবৃত্ত

বারভূঞা সাঁতৈরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত কি? প্রথম ও শেষ রাজা কে? উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল? ধ্বংসের কারণ কি? কাহার দ্বারা কোন্ সময়ে এই ঘটনা হয়। তখন বঙ্গের নবাব এবং দিল্লির বাদ্‌সাহ কে ছিলেন? রাজা মহম্মদ কর্ত্তৃক সাঁতৈর লুট ও ধ্বংস হওয়া সত্য কি না?

হরিপুর (পাবনা) সাঁতৈরের সামন্ত রাজ্য থাকা সত্য কি না? প্রবাদপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও তৎবংশধর রামতোষণ তর্কালঙ্কার সাঁতৈর-রাজার পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহাদের বাড়ী হরিপুর এবং তাঁহাদের বংশধর এখনও বর্ত্তমান হরিপুরেই আছেন ইহা সত্য কি না? প্রবাদ আগমবাগীশের অভিশাপে সাঁতৈর-বংশ ধ্বংস হয় এবং তৎবংশ হইতেই "পাঁচুরিয়া" মেলের উৎপত্তি হয়। ইহা সত্য কি না?

যাদবানন্দ চৌধুরী কে ছিলেন? তাঁহাকে চৌধুরী উপাধি কে দেয় এবং কিজন্য?

শ্রী গদাধর কাব্যব্যাকরণতীর্থ

(৫)

ধৃতরাষ্ট্রের পিতামহ ও পিতামহী

ধৃতরাষ্ট্রের পিতামহ ও পিতামহীর নাম কি?

শ্রী বিধুপ্রসাদ শুকুল

(৬)

ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধ ?

কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী লালমাই পাহাড়ে মানুষের হাড়ের মত এক

[illegible] প্রভৃতি এই হাতে চতীর সঙ্গে ত্রিশূলাদেশ [illegible] ইহার লৌকিক মূল কি ?

শ্রী স্নেহাংশুভূষণ বক্সী

(৭)

শিবের গাজন

বঙ্গদেশে এই চৈত্রমাসে নানা স্থানে শিবের গাজন হয়। গাজন মানে কি ? কে ইহার প্রথম প্রচলন করেন ?

শ্রী সারদাপ্রসাদ কর

(৮)

এলুমিনিয়ামের বাসন মেরামত ও বদল

এলুমিনিয়ামের তৈজসাদি ফুটো হইয়া গেলে কোন প্রকার ঝালের দ্বারা সারা যাইতে পারে কি না ? আর ঐ-প্রকম ভাঙ্গা সামগ্রী কোন স্থানে বিক্রয় করা বা বদল পাওয়া যায় কি না ?

শ্রী বলাইচাঁদ দে

(৯)

জাপানে কাচ তৈয়ারী শিক্ষা

জাপানে কাচ তৈয়ারী শিক্ষা করিবার কোন বন্দোবস্ত আছে কি না। ও থাকিলে কি খরচ পড়ে এবং কি Qualification লাগে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রী শিশিরদাস গুপ্ত

(১০)

বহির্ভারতে হিন্দু প্রতিষ্ঠান

ভারতবর্ষের বাহিরে কোথায় কোথায় হিন্দু ধর্ম্মের মঠ মন্দির বা অন্য কোনরূপ প্রতিষ্ঠান আছে ? তাহাদের সহিত পত্রাদি ব্যবহার করিতে হইলে কোথায় কিরূপ খরচ পড়িবে এবং বিশেষ নিয়মাদিই বা কি ?

শ্রী নন্দনন্দন ব্রহ্মচারী

(১১)

কৃষ্ণের মথুরা যাত্রার সময়

৺গায়ক মহাত্মা নীলকণ্ঠ বিরচিত একটি বারমাস্যার প্রথম চরণে আছে—

"মাঘে মাধব করিলেন মথুরায় গমন,
নাথ বিনে শূন্য দেখি এ তিন ভুবন।"

এই মাঘ মাসে মাধবের মথুরা গমনের কোন পৌরাণিক ভিত্তি আছে কি ? এবং যদি থাকে তবে তাহা কি ?

শ্রী শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য

(১২)

চক্ষুস্পন্দন

পুরুষের দক্ষিণ চক্ষু নৃত্য ও স্ত্রীলোকের বাম চক্ষু নৃত্য করিলে লাভ এবং উহার বিপরীতে লোক্সান—এরূপ প্রবাদের মূল কি ?

শ্রী গোলগোবিন্দ মিত্রী

(১৩)

কপালকুণ্ডলার মন্দির

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম-বাবুর 'কপালকুণ্ডলায়' উল্লিখিত হিজলীকাথীর অন্তর্গত রসুলপুর নদীর অনতিদূরে এবং বর্ত্তমান 'বঙ্কিমস্মৃতিস্তম্ভের' নিকটবর্ত্তী যে কালী-মন্দির আছে তাহা 'কপালকুণ্ডলার মন্দির' বলিয়া পরিচিত। কাথাসহর হইতে রসুলপুর নদী [illegible] প্রায় তিন চার [illegible] অবস্থিত। এই সহরের 'দরিয়া' মহদাবে অবস্থিত কালী-মন্দিরও 'কপাল-কুণ্ডলার মন্দির' বলিয়া পরিচিত। ইহাদের মধ্যে [illegible] আছে, কেনই বা ইহাদের 'কপালকুণ্ডলার মন্দির' বলে, এই মন্দির [illegible] কোন্‌টি বঙ্কিমবাবুর 'কপালকুণ্ডলায়' উল্লিখিত [illegible] ?

শ্রী [illegible]

(১৪)

পাবনার জোড় বাংলা

পাবনার সাংরতলী কালাচাঁদ পাড়ায় যে প্রাচীন "জোড় বাংলা" আছে, উহা কোন্ সময় কাহার দ্বারা স্থাপিত ?

মোহম্মদ মনসুর উদ্দীন শাহজাদপুরী

(১৫)

শাকদ্বীপী ও সরযূপারী ব্রাহ্মণ

শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও সরযূপারী ব্রাহ্মণ বলিয়া যে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দেখা যায়—উঁহাদের উক্ত নাম হইবার কারণ কি ? তাঁহারা কোন্ সময়, কেমন ভাবে এই জম্বুদ্বীপে আসিলেন ? ইহার মূলে কোনও ঐতিহাসিক কিংবা পৌরাণিক তত্ত্ব থাকিলে তাহা কি ? ভারতে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথা কোন্ পুস্তকে কোথায় পাওয়া যাইবে ?

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য

(১৬)

মোমবাতি প্রস্তুত

বঙ্গদেশের কোনও স্থানে মোমবাতি প্রস্তুত হয় কি না ? ঘরে বসিয়া ব্যবহারোপযোগী মোমবাতি প্রস্তুত করিবার কোনও সহজ উপায় আছে কি ?

শ্রী সুরথকুমার সরকার

(১৭)

বাঙ্গলা পুস্তকে ছবি

বাঙ্গলা সাহিত্যে কোন্ সময়ে ও কোন্ লেখকের দ্বারা বাঙ্গলা পুস্তকে বা মাসিকে সচিত্রতা (illustration) প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ?

শ্রী বলাইচাঁদ দে

(১৮)

লোহার আঁক

ঘরের মেঝের লোহার দ্বারা আঁক কষিলে নাকি গৃহবাসীর ঋণ হয়। এ প্রবাদের অর্থ কি ?

শ্রী শান্তিভূষণ চৌধুরী

(১৯)

হাঁসের ডিম লম্বালম্বি ভাঙা

অনেকেই হয়ত দেখিয়াছেন যে, হাঁসের ডিমকে ঠিক লম্বাভাবে রাখিয়া যত ইচ্ছা চাপ দিলেও ভাঙিতে পারা যায় না। ইহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি কি ? কি পরিমাণ চাপেই বা উহা ভাঙিতে পারে ?

শ্রী কুঞ্জলাল দত্ত

(২০)

বাংলার প্রথম মহিলা লেখক কে ? পদ্মপুরাণ-রচয়িতা ৺ দ্বিজ বংশী-দাসের কন্যা ৺ চন্দ্রার লেখা এখন পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার পূর্ব্বে কোন মহিলা বাংলা ভাষায় কিছু লিখিয়াছেন কি ? বর্ত্তমান যুগে (ইংরেজ আমলে) প্রথম মহিলা লেখক কে ?

শ্রী ভূপেন্দ্রকুমার অধিকারী

এই পদ্যটি হেঁয়ালি নহে। চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া বিশ্বাস হয়। বহুদিন পূর্ব্বে হিতবাদী কিম্বা বসুমতীতে এইরূপ ধরণের একটি পদ চণ্ডীদাসের ভণিতা সহ বাহির হইয়াছিল। এই পদটি কৃষ্ণের জন্মের কথা।

শ্রীকৃষ্ণ কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন।—যে সময় আমার জন্ম হয় তখন আমার মাতা পিতা কেহই ছিলেন না। আমার বয়স অনেক হইলে আমার দাদা বলরাম আমাকে অবলম্বন করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমার ভগ্নীর জন্মের বহু পূর্ব্বে আমার ভাগ্নে সুধাকর (অভিমন্যু) জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এখন আমি অনিত্য কুলেতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমাকে পুত্র পুত্র বলিয়া সকলে সম্বোধন করিতেছে। বাস্তবিক আমার মাতা পিতা খুড়া জেঠা কেহই নাই। যখন জগৎ নিরাকার ছিল, দিবস রজনী কিছুই ছিল না, তখন আমি মনে মনে জানিতাম কত দিনে এ বিশ্বের সৃষ্টি করিব। তৎপরে ইচ্ছা-শক্তির বশীভূত হইয়া আমি সেই একার্ণবে কারণ-বারির উপর বিশ্ব-সৃজন করিবার মানসে ধ্যান করিয়াছি। আমার শ্বশুর শাশুড়ী যখন জন্মগ্রহণ করেন নাই তাহার পূর্ব্বে লক্ষ্মীর সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। প্রত্যেক দেহেতে আমি গুপ্তভাবে বসিয়া রহিয়াছি, কিন্তু কেহ আমাকে বুঝিতে পারিতেছে না।

শ্রী শ্যামাচরণ বিশ্বাস

(১৫৫)

মাঘ মাসে মূলা ভক্ষণ

শীতের শেষে মূলা বয়োবৃদ্ধির ফলে ক্রমশঃ শক্ত হইয়া যায় এবং অতিশয় দুষ্পাচ্য হইয়া পড়ে। তখন মূলা খাদ্যোপযোগী থাকে না। এইজন্যই তখন মূলা খাওয়া নিষেধ। ইহা সাধারণ যুক্তিতেই বুঝা যায়। ইহাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিও বলা যাইতে পারে।

'প'

(১৫৬)

গালি দিতে আঙ্গুল মট্‌কান

Psychology মতে মনের যে tripartite division করা হইয়াছে, Feeling তাহার অন্যতম এবং আদি বিভাগ। Secondary feelingকে emotion বলা হয়। ভয়, ক্রোধ, হিংসা, সহানুভূতি প্রভৃতি এই secondary feeling অর্থাৎ emotionএর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মনে যখন কোন emotion এর উদয় হয় তখন নানা ভাবে তাহার অস্তিত্বের পরিচয় দিই। অঙ্গপরিচালনও এই emotion বাহিরে প্রকাশ করিবার অন্যতম উপায়। তজ্জন্যই দেখিতে পাই কোন প্রসিদ্ধ বক্তাও বক্তৃতা দিবার সময় নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত প্রবল emotionএর পরিচয় দেন।

নারীর feeling পুরুষ হইতে সর্ব্বদাই প্রবল। তজ্জন্যই নারীর emotion পুরুষ হইতে অধিক। পুরুষ যে স্থানে অবলীলাক্রমে নিজকে সম্বরণ করিতে পারে, নারী সে স্থলে বিচলিত হইয়া পড়েন। আভ্যন্তরীণ ক্রোধ যদি বাহিরে প্রকাশ করিবার কোন সুযোগ না থাকে কিম্বা তাহা মিটাইবার কোন উপায় না থাকে তবে তাহা motor centreগুলিতে সংক্রামিত হয় এবং যতক্ষণ না তাহার কোন সদ্ব্যবহার হয় ততক্ষণ ইহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে। অতঃপর তাহা outgoing nerve current দ্বারা বাহিরে পরিচালিত হইয়া মনকে ইহার নির্য্যাতন হইতে মুক্তি দেয়। এই কারণেই ব্যর্থ ক্রোধে স্ত্রীলোকেরা আঙ্গুল মট্‌কাইয়া গালি দেন।

শিশিরেন্দ্রকিশোর দত্তরায়

(১৫৮)

ভূমিকম্প

পৃথিবীর উপরিভাগের কঠিন আবরণ অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের নিম্নে ইহার উৎপত্তিস্থান। ভিতর আলোড়িত হইয়া উপর পর্য্যন্ত এই কম্পন বিস্তৃত হয়। উৎপত্তি-স্থান হইতে যত দূরে আসে সঙ্গে সঙ্গে প্রকোপ কমে। যে কারণে (চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণে) জোয়ার-ভাঁটা হয়, ভূমিকম্পেরও তাহাই কারণ অধুনা নির্ণীত হইয়াছে। তবুও কেহ কেহ বলেন ভূমিকম্পের উৎপত্তির সঙ্গে চন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রী সুজয়গোপাল দত্ত

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত গরম। ১০।১২ হাত গভীর গর্ত্ত খুঁড়িলেই আমরা পৃথিবীর ভিতরের তাপ অনুভব করিতে পারি। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে—পৃথিবীর উপর অপেক্ষা ২৪ ফুট ভিতরের তাপ ১ ডিগ্রি বেশী। এবং প্রত্যেক ২৪ ফুট অন্তর এই তাপ এক ডিগ্রি করিয়া বাড়িয়া যায়। তাঁহারা আরও স্থির করিয়াছেন যে ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০ মাইল নীচে উত্তাপ এত অধিক যে উহা ঠিক জলন্ত আগুনের ন্যায়। পৃথিবীর উপর যে বৃষ্টি হয় তাহার অধিকাংশ জলই পৃথিবীর ভিতর শুষিয়া যায়। এই বৃষ্টির জল যখন পৃথিবীর ভিতর ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ঐ জলন্ত আগুনের নিকট পৌঁছে তখন উহা বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্প বদ্ধ থাকিতে চায় না, বিস্তৃত হইবার ইচ্ছাই ইহার প্রকৃতি। এই বদ্ধ বাষ্প ভূগর্ভ হইতে এত জোরের সহিত উদ্‌গিরিত হয় যে ইহার উপরস্থ ভূমি আলোড়িত হইয়া যায়। ইহাই ভূমিকম্প। ভূগর্ভস্থ বাষ্প সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরির মুখ (crater) দিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করে। তাই আগ্নেয়গিরির নিকট ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী।

শ্রী রাধামোহন দে মজুমদার

এই পৃথিবীর নীচে সর্ব্বদাই কম্পন হইতেছে। কিন্তু উহা আমরা বুঝিতে পারি না। কেননা উহা অতি ক্ষীণ কম্পন। যখন এই কম্পন অত্যধিক মাত্রায় হইতে থাকে তখন উহা আমরা বুঝিতে পারি এবং উহাকে ভূমিকম্প বলি। এখন এই কম্পনের কারণ কি? মাটির ভিতরে বহু দ্রব গলিত ধাতু আছে। সকলেই জানেন মাটিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। জল ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া চুঁয়াইয়া পড়ে ও উষ্ণ ও শীতল দ্রব্যের সংমিশ্রণে বাষ্পে পরিণত হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ সঞ্চিত বাষ্পরাশি মাটি ঠেলিয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করে এবং উহাতে যে কম্পন হয় তাহাকেই ভূমিকম্প কহে। অন্য কারণেও ভূমিকম্প হইয়া থাকে। যথা— মাটির তলদেশে যে-সমস্ত বড় বড় চাঁই বা পাথর থাকে তাহা ধসিয়া পড়িলে অব্যবহিত উপরের মাটিগুলিও পড়িয়া যায়, আরও উপরের মাটিগুলি কাঁপিতে থাকে এইরূপ কখন কখন ভূমিকম্প হয়। অধিকাংশ সময়েই প্রথম কারণের জন্য ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

(১৬২)

বামা-কণ্ঠ

আমাদের মুখ হইতে কেমন করিয়া শব্দ-তরঙ্গের (sound waves) উৎপত্তি হয় বুঝিতে পারিলে স্ত্রী-স্বর চিনিবার কারণ অনেক পরিমাণে সহজ হইয়া যাইবে। মানুষের শব্দ-পরিস্ফুটন-যন্ত্রটি অনেকটা ডবল রীড (double reed) যন্ত্রের ন্যায়। কণ্ঠ-নালীর (larynx) ভিতরে খুব পাতলা পর্দার মত দুইটি বাক্‌তন্ত্রী (vocal cords) আছে। কণ্ঠনালীর দুই পাশে এই বাক্‌তন্ত্রী দুইটি সংলগ্ন আছে। মাঝখানে (straight edge slitএর মত) একটু ফাঁক আছে।

কথা বলিবার সময় মাংসপেশীর জোরে আমরা পরদা দুইটিকে আঁটিয়া ধরি। এই সময়ে আমাদের কণ্ঠনালী প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এবং ফুসফুস্ হইতে জোর করিয়া শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিলে বাক্‌তন্ত্রী দুইটি কম্পিত হয়। এই কম্পন মুখগহ্বর ও নাসিকাতে প্রতিধ্বনিত হইয়া কণ্ঠস্বরের সৃষ্টি করে।

সাধারণতঃ পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের কণ্ঠনালী ছোট এবং বাক্‌তন্ত্রীও খুব পাতলা। সেইজন্য শব্দতরঙ্গ (frequency of sound) খুব বেশী। কিন্তু পুরুষের বাক্‌তন্ত্রী একটু পুরু বলিয়া শব্দতরঙ্গও সেই অনুযায়ী কম। কাজেই পুরুষের কণ্ঠস্বর একটু গম্ভীর (deep) হইয়া থাকে। এইজন্য পুরুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরের এত বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সময় সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

শ্রী হৃষীকেশ সেনগুপ্ত

(১০৩)

গার্শী ব্রত

যশোহর জেলার অধীন নড়াইল মহকুমায় প্রত্যেক হিন্দুর বাটীতে কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন শেষ রাত্রে গার্শীব্রত হইয়া থাকে। এবং খুলনা জেলার অধীন বাগেরহাট মহকুমা অঞ্চলে ঐ ব্রত দেখা যায়। এখানে শেষ রাত্রে সকলে (স্ত্রী, পুরুষ) উঠিয়া শুষ্ক পাট গাছ দিয়া আগুন জ্বালান এবং সকলে সেই আগুনের চারিধারে বসেন এবং ওষ্ঠে ঘি, তেঁতুল প্রভৃতি দিয়া যার যার কাজে যান। উহা করার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে শীত কালে কাহারও ওষ্ঠ ফাটে না। সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন। এই ব্রত নদীয়া জেলার কিয়দংশে দেখা যায়।

কালিদাস বিশ্বাস

পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জায়গায় 'গার্শী' ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিবস অতি প্রত্যুষে, কোন কোন স্থলে দ্বিপ্রহরে পুরমহিলারা এই ব্রত করিয়া থাকেন। 'অলক্ষ্মী'র একটা মূর্ত্তি মাটি দিয়া তৈয়ার করিয়া তাহার নাক কান কাটা হয়। লক্ষ্মীকে বরণ করিয়া গৃহে লওয়া হয়। ব্রতকথা বলা হইলে ব্রত শেষ হয়। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে এই ব্রতকে 'গারশী' বলে। ঢাকা, নোয়াখালীরও অনেকাংশে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ব্রতদিবসে, চিনার চাউল খাওয়ার নিয়ম আছে।

শ্রী ভূপেন্দ্রকুমার অধিকারী

বিক্রমপুর অঞ্চলে গার্শীব্রত আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন মধ্যাহ্নে হইয়া থাকে।

শ্রী রাইমোহন দে মজুমদার

গারশী (গার্হস্থ্য শব্দের অপভ্রংশ) পর্ব্ব আশ্বিন সংক্রান্তির দিবস অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম-ঢাকা, দক্ষিণ-ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা সর্ব্বজনবিদিত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, রাত্রি থাকিতে, বালক-বালিকারা অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া পাট-কাঠির ধূম পান করে। পরমেশ-প্রসন্ন-বাবুর "মেয়েলি-ব্রতকথা" নামক পুস্তকে সবিশেষ বিবরণ আছে।

শ্রী পুরন্দর গুপ্ত

চৈত্র মাসের প্রবাসীর বেতালের বৈঠকে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস মহাশয় পাবনা জেলায় গার্শী-ব্রতের কথা উল্লেখ করিয়া উহা আর কোন জেলায় প্রচলিত আছে কি না জানিতে চাহিয়াছেন। আমরা বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের কথা জানি—এই দুই জেলায় সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুনারীরা এই ব্রত করিয়া থাকেন। ব্রতের কথা আছে, পূজাও হয়। সাধারণতঃ ইহা লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা-বিশেষ। ব্রতের কথায় তাহাই বুঝায়। ব্রতের কথা সাঙ্গ হইলে পুরোহিত লক্ষ্মী-পূজা করেন। খেঁসারি ডাইল, কলা, নারিকেল, তালের শাঁস, সাপনা, বর্ষা কুমড়া, উড়ি বা বোরর চাল—পূজার উপকরণ। ব্রতের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে হলকর্ষণজাত কোন কৃষিদ্রব্য দেওয়া যায় না। এজন্য ইক্ষুগুড়ও পূজায় দেয় না। ব্রতকথা ও পূজা হইলে, ব্রতীরা ঐ চাল ডাল শাক রাঁধিয়া খায়।

ফরিদপুর জেলায় কোটালীপাড়ার বিলে উড়ি নামে ধান্যজাতীয় একপ্রকার ঘাসে ধান জন্মে। তাহাতে সরুখোরার ন্যায় অতি মিহি চাউল হয়। তথাকার লোকেরা এই চাউলের মিষ্টান্ন করে ও নবান্নে নারিকেল গুড় দিয়া চাউল মাখিয়া খায়। ইহা অতি উপাদেয় জিনিস ; আক্ষেপের বিষয় বিল আবাদ হওয়ায় ইহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কৃষকেরা উড়িঘাস কাটিয়া গরুকে খাইতে দেয়, তজ্জন্য চাউল দুর্ল্লভ হইয়াছে।

ব্রতের নাম গার্শী হইল কেন? আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন কেন করে। লাঙ্গলোৎপন্ন কোন কৃষিদ্রব্যই বা খায় না কেন? ইহার কোন ইতিহাস পাই নাই।

শ্রী কালীপ্রসাদ সেনগুপ্ত

আঁস্তাকুড়ে

আঁস্তাকুড়েতে ফেলে চলে' গেছে
　　আধফোটা ওই গোলাপ-ফুল,—
কোন্ অকরুণ অকবি জনের
　　জানি না এ হায় মনের ভুল!
জানিত না সে কি ওরি ভাই বোন
　　সুরভি ঢালে যে পূজার ফুলে,
বাসর জাগে যে প্রণয়ীর সাথে
　　প্রেয়সীর কালো চিকণ চুলে!
প্রেমের মালিকা ওরাই যে গাঁথে,
　　ওরাই যে হয় গলার হার,
ও যে একজন তাদের দলের
　　এ কথা কি জানা ছিল না তার!
ধূলিতে রয়েছে কাদায় মাখান
　　তবু ও দেখ না কেমন হাসি,
আবর্জ্জনারে ধন্য করিয়া
　　এখনও ছড়ায় হাসির রাশি!
ও যেন রে হায় রমণী-জাতির
　　কোন একজন রূপসী আহা
পথ ভুল করে' বিপথে গিয়েছে
　　কিন্তু এখনও বোঝেনি তাহা!

"বনফুল"

পৃথিবীর অভ্যন্তর—

ছেলে-বেলা অনেকেই চারুপাঠে পড়িয়া থাকিবেন যে "অবনীর পৃষ্ঠদেশ হইতে ১৫।১৬ ক্রোশ নিম্নস্থিত সমুদায় স্থান অত্যুষ্ণ তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। নারিকেলের মধ্যগত জলভাগ যেমন কঠিন আবরণে আবৃত, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তরল বস্তুরাশিও সেইরূপ কঠিন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত।"

[(১) নং চিহ্নিত অংশে অধুনাপরিত্যক্ত মতানুসারে অন্তর্দ্রবময়ী পৃথিবীর চিত্র। (২) নং চিহ্নিত অংশে ওয়াশিংটন সাহেবের মতে স্বর্ণ-হৃদি ধরণীর যে চেহারা দাঁড়ায় তাহার চিত্র। (৩) নং চিহ্নিত অংশে ধাতু ও পাষাণময় পদার্থে-সম্পিণ্ডিত পৃথিবী-গোলকের চিত্র। উপরের ছবিটি ডক্টর ওয়াশিংটনের, নীচেরটি ডক্টর হব্‌সের।]

কিছু কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের ধারণা এইরূপই ছিল বটে, কিন্তু এখন আর এরূপ মত তাঁহারা পোষণ করেন না। এখন তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এই পৃথিবী-গোলক আগাগোড়াই কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত। এমন কি তাঁহারা মনে করেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তর পাষাণদ্রবে পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, ইস্পাতের চেয়েও শক্ত কোন পদার্থে (খুব সম্ভবতঃ কোন ধাতব পদার্থে) একেবারে ঠাসা।

কিন্তু এই ধাতু যে কি ধাতু তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন নাই। তাঁহারা এসম্বন্ধে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যুক্তিমূলক অনুমান করিয়াছেন মাত্র। তন্মধ্যে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব-বিদ্যার অধ্যাপক হব্‌স্ সাহেবের অনুমান হইতেছে এই যে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে প্রায় নিরেট লোহারই এক চাপ রহিয়াছে। এত পরিমাণে লৌহের অস্তিত্বের কথা শুনিয়া অনেকে বিস্ময় অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের কথা এই যে বৈজ্ঞানিকদের আধুনিকতম মতে পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডটি একেবারে একটি সোনার পিণ্ড। ইংরেজি কাব্য সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা এখানে মহাকবি মিণ্টনের প্যারাডাইস লষ্ট কাব্যের প্রথম সর্গে শয়তানের অনুচরবর্গের দ্বারা পাতালপুরীতে স্বর্ণনির্ম্মাণের কথা স্মরণ করিবেন, কিন্তু নরকপুরীতে স্বর্ণের অস্তিত্বের হেতু দেখাইয়া মহাকবি লোকের বিস্ময় নিবারণের জন্য যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন সে যুক্তি এখানে খাটে না, কারণ তাহা নিছক্ কবি-কল্পনা। বৈজ্ঞানিক যখন বলেন যে পৃথিবীর মধ্যস্থলে লক্ষ লক্ষ মণ সোনা রূপা তামা প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি ভারী ধাতু আছে, তখন তিনি শুধু এলোমেলো আন্দাজের কথা বলেন না; কিন্তু ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকার খুব তন্ন তন্ন করিয়া রাসায়নিক পরীক্ষালব্ধ ফলের সাহায্যে অঙ্কপাত দ্বারা নির্ণীত বিজ্ঞান-সম্মত অনুমান করেন। আমেরিকার ওয়াশিংটন কার্ণেগি ইন্‌ষ্টিটিউটের ডক্টর হেনরি ওয়াশিংটন ভূতত্ত্ববিদ্যায় জগতের মধ্যে বিশেষ পারদর্শী। তিনি প্রায় ৫০০০ জায়গার মাটির রাসায়নিক পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন যে এই সব মৃত্তিকাতে সাধারণতঃ খুব হাল্কা ধাতুই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারী ভারী ধাতুর অংশের অনুপাত খুবই কম; সোনার অনুপাত শতকরা এক ভাগেরও লক্ষভাগ। আজকাল ভারী ধাতুগুলির এত বেশী অভাব পরিলক্ষিত হইলেও, ধরাপৃষ্ঠ চিরদিনই যে সেগুলি হইতে বঞ্চিত আছে ইহা সম্ভব নহে। যে সব ধাতু যে পরিমাণে পৃথিবীতে থাকিবার কথা, সে-সব ধাতুকে ধারণ করিয়া তাঁহার বসুন্ধরা নাম হইয়াছে, সেগুলি তাহা হইলে কোথায় গেল? তাহারা কি তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত কোনস্থানে পৃথিবীর সুদূর কোন কন্দরে আত্ম-গোপন করিয়া আছে? ডক্টর ওয়াশিংটনের বিশ্বাস যে সত্য-সত্যই সেগুলি ধরণীর অন্তস্তলে ডুবিয়া আছে। তাঁহার মতে সমস্ত পৃথিবীটাই একদিন দ্রবময়ী ছিল। তখন ভারী ভারী ধাতুপদার্থগুলি তলাইয়া ডুবিয়া যায়, আর হাল্কাগুলি উপরে ভাসিতে থাকে। কাজেই তিনি মনে করেন যে লক্ষ লক্ষ মণ হারান ধাতুপদার্থগুলি পৃথিবীর ভিতরে রহিয়াছে। তাঁহার অনুমান অনুসারে ধাতুস্তরগুলির বিন্যাস এইরূপ—পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রদেশে যত ভারযুক্ত ধাতুর সমাবেশ,—যথা প্ল্যাটিনম, সোনা, অ্যাণ্টিমনি, ওস্‌মিয়াম (সর্ব্বাপেক্ষা ভারী ধাতু, ফাউণ্টেন পেনের সোনার নিবের ধাতুমিশ্র ইরিডোস্‌মিয়াম্ এই ওসিমিয়ম্ ও ইরিডিয়াম মিশ্রণে প্রস্তুত হয়)। এই অন্তরতম বহুমূল্য ধাতুময় প্রদেশের অব্যবহিত পরেই অপেক্ষাকৃত কম গুরু ধাতুর স্তর। এইখানেই তামা রূপা ও সীসা পাওয়া যায়। ভূমধ্যে যদি লৌহের স্তর থাকে তবে তাহা এ-সব ধাতুস্তরেরও উপরে আছে। ডক্টর ওয়াশিংটন্ মনে করেন যে পৃথিবীর ভিতর এরূপ একটি লৌহের স্তরও আছে। পৃথিবীর সর্ব্বোপরি যে স্তর তাহা প্রস্তর ও অন্যান্য হাল্কা ধাতুর দ্বারা গঠিত; আমরা তাহারই উপর বাস করি।

তাহাই যদি হয়, তবে খনি হইতে আমরা যে সোনা রূপা তামা প্রভৃতি পাই তাহা কোথা হইতে আসিল? তাহার যে উত্তরটি সাধারণতঃ পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা এই যে, অন্তস্তরের জলপ্রবাহের সহিত ধাতু পদার্থ কিছু কিছু মিশিয়া যায়। পরে যখন জলধারা চোয়াইয়া চোয়াইয়া চাপে উপরে আসিয়া পড়ে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ধাতুময় পদার্থগুলিও সকল স্তরেই কিছু কিছু ছড়াইয়া থাকে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে এইরূপ স্বর্ণাদি ধাতুর অস্তিত্বের কথাটা কিন্তু একটা অনুমান মাত্র, প্রত্যক্ষগোচর সত্য নয়। যদি ভিতরটা স্বর্ণাদি ধাতুর নাও হয়, তবুও ভূপৃষ্ঠে ও পাহাড়ে পর্ব্বতে আমরা যে-সব পাথর দেখিতে পাই তাহার চেয়ে ভারী কোন পদার্থ যে পৃথিবীর ভিতরে আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবী মাপিয়া দেখিয়াছেন যে পৃথিবী নিরেট পাহাড়ের তৈরি হইলে তাহার যত ওজন হইত তাহার চেয়ে পৃথিবীর ওজন বাস্তবিক পক্ষে বেশী।

পৃথিবীকে ওজন করা হইয়াছে শুনিয়া অনেক পাঠকই হয়ত স্তম্ভিত হইবেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীকে সত্যসত্যই একরকম দাঁড়ি পাল্লায় চড়াইয়া ওজন করিয়া জানিয়াছেন যে পৃথিবীর ওজন প্রায় দুহাজার লক্ষ লক্ষ লক্ষ টন। পৃথিবীর অন্তস্তল যদি সাধারণ পাথরে বোঝাই হইত তাহা হইলে তাহার ওজন কখনই এত হইতে পারিত না। ইহা হইতে এটুকু বোঝা যায় যে পৃথিবীর ভিতরটা, বাহিরে যে সব উপাদান পাওয়া যায় তাহা হইতে ভারী বস্তুতে ভরা, আর এ-বস্তু ধাতু ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ একমত, এই ধাতুগুলি যে তরল অবস্থায় নাই, কঠিন অবস্থাতেই আছে এবিষয়েও তাঁহারা একমত।

পৃথিবীকে ওজন করিবার একটি কৌশল

[প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্কটলণ্ডদেশে প্রথমে পৃথিবীকে মাপা হয়। একটি ছোট পাহাড়ের দুই ধারে দুটি plumb bob অর্থাৎ সীসার গোলক কড়িতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। চারিদিকে গর্ত্ত খুঁড়িয়া আগে হইতে পাহাড়ের ওজন নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। পার্শ্বস্থ পাহাড়ের আকর্ষণে সীসের গোলা দুটির ঝুলন-রজ্জু পৃথিবীর কেন্দ্রের সহিত সমসূত্রে না থাকিয়া ঈষৎ হেলিয়া পড়ে। এইরূপে হেলিয়া পড়াতে যে কোণের সৃষ্টি হয় তাহা ধরিয়া গণনা শুরু করিয়া পৃথিবীর মাপ অঙ্কপাতের দ্বারা বাহির করা সম্ভব হইয়াছিল। পৃথিবীর মাপের তুলনায় পাহাড়টির মাপ যত সেই অনুপাতে রজ্জুটি হেলিয়া পড়ে। এইভাবে পৃথিবীর মাপ বাহির করিয়া দেখা গেছে যে আগাগোড়া পাথর থাকিলেও পৃথিবীর যত মাপ হইত তাহার চেয়ে পৃথিবীর গণনা লব্ধ মাপ অনেক বেশী।]

পণ্ডিতেরা এককালে বলিতেন পৃথিবীর অন্তর্দ্দেশে তরল পদার্থ আছে। তাহার কারণ তাঁহারা এই দেখাইতেন যে আগ্নেয়গিরির পাষাণ দ্রবোদ্গার দেখিয়া ইহাই স্বভাবত মনে হয় যে পৃথিবীর তলায় এইরূপ গলিত প্রস্তরের একটি কটাহ আছে। তাহা ছাড়া তখনকার দিনে পণ্ডিতেরা পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে "নীহারিকাবাদে" (nebular hypothesis-এ) বিশ্বাস করিতেন। এই "নীহারিকাবাদ" অনুসারে এককালে ধরিয়া ও মানিয়া লওয়া হইত যে পৃথিবী এক সময়ে অত্যুষ্ণ তরল অবস্থায় ছিল ও কালক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া কঠিন অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই নীহারিকাবাদ পৃথিবীর অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনার সঙ্গে মিলে না, তাই ইহা ভ্রান্ত মত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতেরও অন্য ব্যাখ্যা আজকাল পাওয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকেরা আরো এমন দুএকটি তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা দ্বারা অন্তর্দ্রবময়ী পৃথিবীর কল্পনা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যেমন, ইহা দেখা গেছে যে ভূমি-কম্পের বেগ পৃথিবীর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইবার সময় তাহাতে কঠিন পদার্থের লক্ষণগুলিই দেখা যায়, তরল পদার্থের কোন ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয় না। দ্বিতীয়ত, পৃথিবী গতিকালে লাটিমের মত ঘুরিবার সময়ও ঘন কঠিন পদার্থের ঘূর্ণন নিয়ম অনুসারেই চলে, তরল পদার্থের নিয়ম মানে না। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় জোয়ার-ভাটার ব্যাপার হইতে।

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড কেলভিন দেখাইয়াছিলেন যে পৃথিবী যদি ভিতরে কিছু জলযুক্ত কঠিন পদার্থ হইত তাহা হইলে সূর্য্যচন্দ্র তাহার যে আকর্ষণে জোয়ার-ভাঁটা হয় তাহার টান পৃথিবী যেরূপে সহ্য করে সে-ভাবে সহ্য করিতে পারিত না। লর্ড কেলভিন অঙ্কপাত করিয়া এই টানের জোর মাপ করিয়া দেখাইয়াছেন। সে টান এত প্রচণ্ড যে পৃথিবীর মাত্র ৩০৯০ মাইল ব্যাপী কঠিন বহিরাবরণ তাহা সহ্য করিতে পারিত না। দিনের মধ্যে দুইবার করিয়া ভিতরের পাষাণ-দ্রবসমুদ্রে শত শত ফুট উচ্চ ঢেউ উঠিত ও বাহিরের কঠিন আবরণ ভাঙিয়া চুরিয়া শেষ করিয়া ফেলিত। মাধ্যাকর্ষণের ফলে সমুদ্রের ন্যায় পৃথিবীর স্থলভাগের উপরেও এইরূপ তরঙ্গ উত্থিত হয়। এই তরঙ্গ-গুলি শত শত ফুট উচ্চ না হইয়া মাত্র কয়েক ইঞ্চি উচ্চ হয়। পৃথিবী অন্তঃসলিলা হইলে যেরূপ হইত সেরূপ না হইয়া অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থে যেরূপ তরঙ্গ হইতে পারে সেইরূপই হয়। ইহা হইতে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি যে মোটের উপর পৃথিবী একটি বৃহৎ গোলক এবং সব চেয়ে ভাল ইস্পাত দিয়া তাহা আগাগোড়া নির্ম্মিত হইলে যত দৃঢ় হইত তাহার চেয়েও বেশী দৃঢ়। ডক্টর ওয়াশিংটনের মতন যদি ভাবা যায় যে পৃথিবী বহুযুগ পূর্ব্বে এক কালে তরল অবস্থায় ছিল, তাহা হইলেও অনুমান করিতে হইবে যে কালক্রমে শীতল হইয়া তাহা আগাগোড়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধ্যাপক হবস্ কিন্তু মনে করেন যে পৃথিবী বরাবরই এখনকার মত কঠিন ও দৃঢ় অবস্থায় আছে। এই পৃথিবীর উৎপত্তির সম্বন্ধে তাঁহার মত এইরূপ—এককালে সূর্য্য এখনকার চেয়ে একটু বড় আকারে আকাশে একমাত্র নক্ষত্ররূপে বিরাজ করিতেছিল। তাহার চারিদিকে কোন গ্রহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল না। কালক্রমে আর-একটি নক্ষত্র তাহার পথে আসিয়া হাজির হইল ও এই দুইটি নক্ষত্র এত কাছাকাছি আসিয়া পড়িল যে মাধ্যাকর্ষণী শক্তির টানে অনেক জিনিষ সূর্য্যদেহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এই বিক্ষিপ্ত অংশগুলিও সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। পরস্পর সংঘর্ষে আসিয়া তাহারা জড়াইয়া পড়িয়া পিণ্ডীভূত হইয়া রহিল। এইরূপেই গ্রহগুলির উৎপত্তি হয়। পৃথিবীও এইরূপ একটি পিণ্ড।

যে অতিথিটি সূর্য্যমণ্ডলে আসিয়া এরূপ কাণ্ড ঘটাইলেন, তিনি কালক্রমে চলিয়া গেলেন ও সূর্য্যের চারিপাশে ঘূর্ণায়মান বস্তুপিণ্ডের ধূলি উড়াইয়া পাপিয়া গেলেন। অনেক শিশু গ্রহ এই ধূলিমেঘে ভাসিতে ছিল। তাহার মধ্যে অন্য সকলের চেয়ে একটু বড় একটি আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্র স্বরূপ হইল। সূর্য্যমণ্ডলে ভ্রমণশীল অন্যান্য অনেক ছোট ছোট পিণ্ড আকর্ষণের বেগে এই পৃথিবীর গায়ে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ বৎসরে পৃথিবী নিকটবর্ত্তী প্রায় সব শিশু গ্রহগুলিকেই আত্মসাৎ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। যে দুচারিটি তখন ছাড়া পাইয়াছিল তাহারাই এখন উল্কারূপে পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে উল্কাপিণ্ডগুলি দুই শ্রেণীর —কতকগুলি লোহার, আর কতকগুলি পাথরের। অধ্যাপক হবস্ মনে করেন—অতি পুরাকালে শূন্য হইতে যে বস্তুপুঞ্জ খসিয়া আসিয়াছিল তাহার অর্দ্ধেক অংশ ছিল উল্কাপিণ্ডগুলিতে যে-প্রকারের লোহ পাওয়া যায় সেই-প্রকারের লোহের ও আর অর্দ্ধেক অংশ প্রস্তরময় উল্কাপিণ্ডের মত পাথরের। ঝড়ে বালুকণা যেমন পরস্পরের গায়ে ঠোকাঠুকি করে প্রথম প্রথম এই বস্তুগুলি সেইরূপ সংঘর্ষ করিয়া ছুটাছুটি করিত। গঙ্কপাত করিয়া অধ্যাপক মহাশয় দেখাইয়াছেন যে বড় বস্তুপিণ্ডটি আমাদের পৃথিবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট পিণ্ডগুলিকে আত্মসাৎ করিবার সময় মোটের উপর সমান-সমান-সংখ্যক প্রস্তরময় পিণ্ড ও লৌহময় পিণ্ড আত্মসাৎ করিত। কিছুকাল পরে যখন চতুষ্পার্শবর্ত্তী ভ্রমণশীল বস্তুপুঞ্জের ভিড় অনেক কমিয়া আসিল, তখন বেশীর ভাগই লৌহময় উল্কাগুলি আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পড়িতে লাগিল। আরো পরবর্ত্তী কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবী শুধু পাথরের উল্কাই টানিয়া লইতেছে, লোহার উল্কা পাওয়া যায় না বলিলেই হয়।
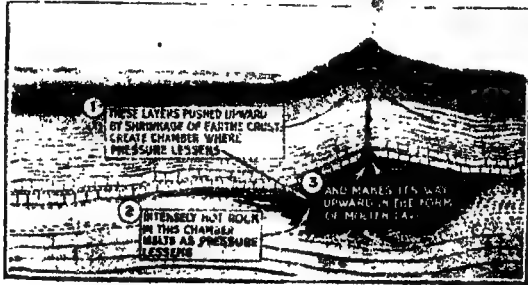
কিরূপে আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি হয়

[(1) নং চিহ্নিত স্তরগুলি সঙ্কুচিত হইয়া উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠে ও মাঝখানে গহ্বর সৃষ্টি করে। (২) নং চিহ্নিত স্তরে অত্যুষ্ণ প্রস্তরখণ্ডগুলি চাপ কমিয়া যাওয়ায় গলিয়া যায়। (3) নং চিহ্নিত অংশে দেখান হইয়াছে কেমন করিয়া এই গলিত পাষাণ ধারা বাহিয়া ঊর্দ্ধগামী হয়।]

অধ্যাপক হবসের মত যদি ঠিক হয় তাহা হইলে পৃথিবীর দেহের স্তরবিন্যাস এইরূপ—একেবারে কেন্দ্রস্থলে হইতেছে আদিম আধারভূত বস্তুপিণ্ডটি। তাহার পর আসিতেছে আধা-লোহা আধা পাথরের একটি বেষ্টনী। তাহার পরের বেড়টি শুধু লোহার, আর বাহিরে রহিয়াছে এই পরিদৃশ্যমান উপরিভাগ; তাহা প্রধানতঃ পাথরেই গড়া।

কিন্তু এইরূপে ব্যাখ্যাত মত-অনুসারে আগ্নেয়গিরিগুলির অগ্ন্যুৎপাতের কোন প্রাচীন ব্যাখ্যা প্রমাণসহ হয় না। এখনো অনেক জায়গায় লক্ষ লক্ষ মণ গলিত প্রস্তর পৃথিবীর অন্তর্দ্দেশ হইতে উদ্গীর্ণ হইতেছে। পৃথিবীর ভিতর যদি তরল পাষাণ নাই থাকিবে, তাহা হইলে এ সব দ্রব পদার্থ আসে কোথা হইতে?

ইহার উত্তরে হবস সাহেব আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি সম্বন্ধে এক অভিনব ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে ভূপৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি যে-সব প্রস্তর আছে তাহাই হঠাৎ কোন একটি গহ্বরে গলিয়া উপরে বাহির হইয়া আসে। পৃথিবীর ভিতরে তাপ খুব বেশী। এমন কি ৫০১৬০ মাইল দূরে অর্থাৎ কেন্দ্র পর্য্যন্ত দূরত্বের আটভাগের একভাগ দূরে পাথরগুলি এমন উষ্ণ অবস্থায় আছে যে উপরের চাপ কমিয়া গেলেই তাহা গলিয়া যাইতে পারে। ষ্টীম বয়লারে যেমন উপরে চাপ থাকাতে সব জল একেবারে বাষ্প হইয়া যায় না, এবং বয়লারের উপরিভাগ খুলিলেই চাপ কমিয়া গিয়া সব জল একেবারে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, পৃথিবীর উপরের স্তর যদি কিছুমাত্র সরাইয়া ফেলা যায় তাহা হইলে ভিতরের পাথরগুলি তাড়াতাড়ি গলিয়া যাইবে।

পৃথিবী অতি ধীরে ধীরে অনবরতই সঙ্কুচিত হইতেছে। এই সঙ্কোচনের ফলে পৃথিবীর উপর পাহাড়গুলি জাগিয়া উঠিতেছে। নীচের পাথরগুলির উপর চাপ এইরূপে কমিয়া যায় ও সেগুলি অবিলম্বে গলিয়া যায়। এই দ্রবীভূত পাষাণ যেখান দিয়া পথ পায় সেখান দিয়া উপরে উঠিয়া আসে। এইরূপেই নূতন নূতন আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়।

উপরি বিবৃত অনুমান দুটির যেটিই সত্য হউক না কেন,—পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে লোহই থাকুক আর স্বর্ণই থাকুক—আমরা এই জানিয়া নির্ভয়ে ধরাবক্ষে বিচরণ করিতে পারি যে আমাদের পায়ের তলায় খুব কঠিন জিনিসেরই ভিত্তি আছে, আর আগ্নেয়গিরির উৎপাতগুলি স্থানিক উৎপাত মাত্র, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কোন অগ্নিময় সমুদ্রের উদ্গার নহে।

অ

সিনেমার সংখ্যা—

সিনেমা থিয়েটার বা বায়োস্কোপের চলন ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২২ সালে যে সিনেমা সেন্সাস্ লওয়া হইয়াছে তাহার রিপোর্ট পাঠে জানা যায় সমগ্র পৃথিবীতে ৪৭০০০ সিনেমা থিয়েটার (বা বায়োস্কোপ) আছে। নীচে বিভিন্ন মহাদেশ ও দেশের সিনেমা থিয়েটারের সংখ্যা দেওয়া হইল।

(ক) আমেরিকা মহাদেশ	২০৪৫০
(১) ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্	
(২) দক্ষিণ আমেরিকা	
(৩) কানাডা	
(৪) সেণ্ট্রাল আমেরিকা	
(খ) ইউরোপ	১৮৩৯৩
(গ) আফ্রিকা, এসিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও ওসিয়ানিয়া	৮১৫৭

ইউরোপের দেশসমূহে যত সিনেমা থিয়েটার* আছে তার মোটামুটি হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

(১)	জার্ম্মানী	৩৭৩১
(২)	রুষিয়া	৩৫০০
(৩)	গ্রেটব্রিটেন (ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও ওয়েলস্)	৩০০০
(৪)	ফ্রান্স	২৪০০
(৫)	ইটালি	২২০০
(৬)	অষ্ট্রীয়া	৮০০
(৭)	বেলজিয়াম	৭৭৮
(৮)	স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া	৭০৩
(৯)	পোলাণ্ড	৩০০
(১০)	হল্যাণ্ড	২৩৭
(১১)	হাঙ্গেরী	১৮০
(১২)	স্পেন	১৫৬
(১৩)	চেকোশ্লোভাকিয়া	১২৩
(১৪)	সুইজারল্যাণ্ড	১২৩
(১৫)	জুগোশ্লাভিয়া	১১৭
(১৬)	তুরস্ক	৩২
(১৭)	বল্কানরাজ্য	২৩

গ্রীস, ডেনমার্ক, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, সার্ভিয়া—এই কয়টি দেশের সংখ্যা জানা যায় নাই।

একা আমেরিকার যুক্তরাজ্যেই আঠার হাজার সিনেমা আছে। বিভিন্ন দেশের সংখ্যা হিসাবে যুক্তরাজ্য সর্ব্বপ্রধান। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে জার্ম্মানী।

—

প্রাণীদেহে বিষের ক্রিয়া—

বিষের ক্রিয়া সকল প্রাণীদেহে সমান নহে, যে পরিমাণ বিষ খাইলে মানুষের মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা অনেক ইতর প্রাণীকে খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে তাহাতে উহাদের শরীরে বিষক্রিয়াজনিত কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে না ও প্রাণহানি হয় না।

যে পরিমাণ মর্ফিয়া খাইয়া একহাজার লোকের মৃত্যুঘটিবার সম্ভাবনা, একটি পূর্ণবয়স্ক ছাগল একলা তাহা খাইয়া হজম করিতে পারে। বিড়ালের শরীরেও মর্ফিয়ার কোনরূপ বিষক্রিয়া ঘটে না; অধিক পরিমাণ মর্ফিয়া বিড়ালকে খাওয়াইয়া কেবলমাত্র উৎকট উত্তেজনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

একটি গৃহ-পারাবতকে ১৫ দিনের মধ্যে খাদ্যের সঙ্গে আটশত গ্রেন মর্ফিয়া খাওয়ান হইয়াছিল, উহাতে উহার প্রাণহানি হওয়া দূরে থাকুক শরীরেরও কোন অনিষ্ট হয় নাই।

খরগোস বেলেডোনা গাছের পাতা ও ছাল এত অধিক পরিমাণে খাইয়া থাকে যে তজ্জন্য উহাদের মাংস ভয়ানক বিষাক্ত হইয়া যায়। অনেক সময় এইরূপ বিষাক্ত খরগোসের মাংস খাইয়া অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

১ গ্রেন্ ক্যান্থারাইডিন খাইলে মানুষের মৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু এক চামচ ক্যান্থারাইডিন সজারুকে খাওয়াইলে উহাদের কিছুই হয় না দেখা গিয়াছে।

কেবল আর্সেনিক ও নিকোটিন বিষের ক্রিয়া সকল প্রাণীদেহে সমান। এই উগ্রবিষ দুইটি খাইয়া হজম করিবার উপায় কাহারও নাই।

—

"চাবুক মাছ—"

সমুদ্রে একজাতীয় বৃহদাকার মাছের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ঐ মাছের লেজ ঠিক চাবুকের মত দেখিতে বলিয়া উহার নাম চাবুক মাছ (Whip-Ray)। শঙ্কর-মাছ অনেকটা এই জাতীয়।

চাবুক-মাছের লেজ ঠিক ধারাল ছুরির স্থায়। লেজের ধারগুলি করাতের স্থায় খাঁজ-কাটা ও লেজের ডগাটি ছুঁচের মত সরু। ঐ লেজের এক ঝাপটা পাইলে আর রক্ষা নাই। একটি চাবুক-মাছ ওজনে ২০ মণের উপর। উহাদের প্রাণ ভীষণ কঠিন ও শীঘ্র উহাদের মৃত্যু হয় না। একবার একটি বৃহদাকার চাবুক-মাছকে চারিবার গুলি করা হইয়াছিল, তাহাতেও না মরাতে কুড়ালির দ্বারা স্থানে স্থানে কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল। পরে লেজ ও তলপেটের ৬ ইঞ্চি পুরু মাংস কাটিয়া লওয়ার পরও উহা বাঁচিয়া ছিল।

—

কাঁচ-ঘড়ি—

বোহেমিয়ার একজন কাঁচ পালিশওয়ালা একটি কাঁচের ঘড়ি তৈয়ারী করিয়াছে। মেন স্প্রিং ছাড়া ঘড়িটার সমস্তই কাঁচের তৈরী। কাঁচ খুদিয়া ঘড়ির চাকা, স্ক্রু, মায় দম দিবার চাবিটি পর্য্যন্ত তৈয়ার করা হইয়াছে। নিপুণতার সহিত প্রত্যেক অংশ আলাদা তৈয়ারী করিয়া জোড়া দেওয়া হইয়াছে। এই ঘড়িটির দোষের মধ্যে কেবল ভারসাম্যকারী চাকাটি অন্য ঘড়ি অপেক্ষা বেশী ভারী।

—

ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের সংগৃহীত ডাকটিকিট

ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ পৃথিবীর মধ্যে একজন বিখ্যাত পুরাতন ডাকটিকিট সংগ্রাহক। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সকল রকম বিভিন্ন ডাকটিকিট তাঁহার সংগ্রহে আছে।

বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের একটি বৃহৎ কক্ষ তাঁহার সংগৃহীত ডাকটিকিটের এলবামে পূর্ণ। লণ্ডনের রয়াল ফিলাটেলিক্ সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার ই ডি বেকন সাহেব এই রাজকীয় এল্‌বাম-গৃহের তত্ত্বাবধায়ক।

তিনি শৈশবকাল হইতে ডাকটিকিট সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন— তাঁহার সংগৃহীত টিকিটসমূহের দাম আজকাল কত নির্দ্ধারণ করা কঠিন। বাল্যকালে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি ইউরোপ ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময় তিনি একদিন গান গাহিয়া একখানি ডাকটিকিট এল্‌বাম উপহার পাইয়াছিলেন। অধুনা ঐ এল্‌বামখানি তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে একখানি দামী ও বিরল টিকিটপূর্ণ এল্‌বাম। ঐ এল্‌বামখানিতে সার্ রোলাণ্ড হিল ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে চ্যান্সেলার অফ্ দি এক্সচেকার্‌কে ইংলণ্ডের প্রথম ডাকটিকিটের ডিজাইনের যে খসড়া করিয়া পাঠাইয়াছিলেন সেই ডিজাইনখানি আছে।

তাঁহার ডাকটিকিট সংগ্রহে এত বেশী ঝোঁক ছিল যে, যেখানে পুরাতন ডাকটিকিট সম্বন্ধে আলোচনা হইত নিজের পদমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া রবাহূতের স্থায় সেখানে উপস্থিত হইতেন। পরে ইংলণ্ডের ডাকটিকিট সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি "লণ্ডন ফিলাটেলিক সোসাইটীর" সহকারী সভাপতি ও পরে উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহে তাঁহার টিকিট-সংগ্রাহক বন্ধুরা একখানি বিরল-টিকিট-পূর্ণ এল্‌বাম তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন।

তাঁহার সংগৃহীত অন্যান্য মূল্যবান্ ডাকটিকিটের মধ্যে মরিসাসের প্রথম কয়েক বৎসরের ডাকটিকিট উল্লেখযোগ্য। মরিসাসের ঐ টিকিট-গুলিতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিলিপি ব্যঙ্গচিত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল, তথাপি ঐগুলির মধ্যে কমলালেবু রঙের ১-পেনী ও নীল রঙের ২-পেনী টিকিট টিকিটবিজ্ঞানবিদ্‌দের নিকট খুব মূল্যবান্। প্রথমবার ছাপা মরিসাসের ডাকটিকিটগুলিতে বামদিকের উপরে "Post Office" এই কথাগুলি লেখা ছিল; পরবর্ত্তীবার "Post Office" বদলে "Post Paid" ছাপা হইয়াছিল। প্রথমবার "Post Office"-ছাপা টিকিট একহাজার খানি মাত্র ছাপা হইয়াছিল; তন্মধ্যে ২৭ খনির মাত্র অস্তিত্বের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মহারাজা পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার এক পেনী "Post Office" ছাপা টিকিটখানি আরল অফ্ কিন্‌টোরসের পুরাতন টিকিট সংগ্রহ হইতে ৮৫০ পাউণ্ড মূল্যে কিনিয়াছিলেন। দুই পেনীর খানি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশ্য নিলামে ১৪৫০ পাউণ্ড মূল্যে তাঁহার জন্য কেনা হইয়াছিল। আজকাল "Post Office" ১ পেনী ও ২ পেনী টিকিটের প্রত্যেকটির দাম দুই হাজার পাউণ্ড।

বেডেন-পাওয়েল টিকিটের উল্টা ছাপওয়ালা টিকিট তাঁহার আর একখানি অদ্ভুত সংগ্রহ। এই উল্টাছাপ টিকিট ৭খানি মাত্র ছাপা হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার হাঁসের ছবিওয়ালা উল্টালাইন-মারা ৪-পেনী টিকিট ও অষ্ট্রেলিয়ার অর্দ্ধেক অংশ ছাপা ৪-পেনী টিকিট তাঁহার অদ্ভুত টিকিট সংগ্রহের আর-দুইটি নমুনা। অষ্ট্রেলিয়ার উল্টালাইনমারা হাঁসের ছবিওয়ালা টিকিটখানি ইংলণ্ডেশ্বর ৮০০ পাউণ্ড মূল্যে কিনিয়াছিলেন।

পঞ্চম জর্জ্জের টিকিট সংগ্রহ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রতিবৎসর তিনি স্বয়ং তাঁহার নূতন সংগ্রহ লণ্ডনের রয়াল ফিলাটেলিক্ সোসাইটীর মেম্বরদিগকে দেখাইয়া থাকেন।

—

মজ্জনোদ্ধার আয়োজন—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্ণিয়ার সমুদ্রতাবে প্রত্যেক সপ্তাহে এক লক্ষেরও বেশী স্নানার্থীর সমাগম হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে এতবড় স্নানের উপযোগী স্থান আর নাই। গরমের সময় লোকের সমাগম আরো বেশী হয়। তখন প্রত্যেকদিন বৈকালে প্রায় ৭০,০০০ লোকে

মজ্জনোদ্ধার আয়োজন

স্নানের জন্য এইখানে আসে। যেখানে এতলোক স্নান করে সেখানে অনেক লোক জলে ডুবিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। এই সহরের মিউনিসিপ্যালিটি, স্নানার্থীদের কি ভাবে রক্ষা করা যায়, এইসমস্যা বহুদিন ধরিয়া সম্যক্ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বে, তীরে নৌকা এবং একদল ভাল সাঁতারী রাখা হইত, তাহারা কোন লোককে জলে ডুবিতে দেখিলেই নৌকা লইয়া তাহার সাহায্যের জন্য যাইত। ইহাতে অনেক কাজ হইলেও, তেমন ভাল কাজ হইত না। সমুদ্রের ঢেউ ভাঙিয়া গিয়া লোক বাঁচানো ভয়ানক শক্ত ব্যাপার। এখন একপ্রকার নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে। সমুদ্র-উপকূলকে কয়েকভাগে ভাগ করা হইয়াছে—প্রত্যেক ভাগে একদল লোক সব সময়েই কড়া পাহারা রাখে। কোন লোককে বিপন্ন দেখিলেই পাহারাওয়ালারা ধোঁয়াভরা বোমা সমুদ্রের দিকে ছুড়িয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বোমাটি মজ্জমান ব্যক্তির মাথার কিছু উপরে ফাটিয়া যায়। সমুদ্রের জলের উপরে (তীর হইতে কয়েকশত গজ দূরে) ষ্টীম-লঞ্চ থাকে। এই লঞ্চ থাকিবার জন্য বাঁধানো খুব ছোট একটি জেটি আছে। ধোঁয়া লক্ষ্য করিয়া তীরের উদ্ধারকারী দলও তীরের দিক্ হইতে যাত্রা করে—সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের বাহির দিক্ হইতে উদ্ধারকারী জাহাজও আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখা গিয়াছে তীরের দিক্ হইতে না গিয়া বাহির সমুদ্রের দিক্ হইতে খুব তাড়াতাড়ি এবং সহজেই ডুবন্ত লোককে বাঁচানো যায়। ডুবন্ত লোকের জন্য যদি ডাক্তার দরকার হয় তবে লঞ্চ হইতে শাদা পতাকা দেখানো হয়। খুব কম সময়ের মধ্যে ডাক্তার আসিয়া রোগীকে সাহায্য দান করিতে পারেন এরূপ ব্যবস্থাও আছে।

আমাদের দেশেও অনেক স্থানে সমুদ্রে লোকে স্নান করে। তাহাদের রক্ষার এবং সুবিধার কোনপ্রকার বন্দোবস্ত নাই। পুরীতে প্রত্যেক বছর অনেক লোক মারা যায়। ইহার প্রতিকারের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি বা গবর্ণমেণ্ট্ হইতে বিশেষ কিছুই করা হয় না।

—

নূতন ধরণের চিরস্থায়ী কালি—

এক ধরণের নূতন কালি আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা কোন-প্রকার আরকেই উঠিয়া যাইবে না। ইহার পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে—একখানি ব্যাঙ্কের চেকে খানিকটা কালি ঢালিয়া তাহার উপর এই কালি দিয়া লেখা হয়—তাহার পর বিশেষ কোন আরক দিয়া কালি উঠাইয়া দেখা গেল নূতন কালির লেখা বেশ স্পষ্টই রহিয়াছে, তাহা একটুও খারাপ হয় নাই।

কানাডার হরিণ—

কানাডার ইউকন্ প্রদেশে এবং আলাস্কাতে হরিণের খুব বসতি আছে। এই-সমস্ত হরিণের পাল যখন ইউকন নদীতে সাঁতার দিয়া একপার হইতে অন্য পারে যায়, তখন জাহাজের চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা জাহাজকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। এই-সমস্ত হরিণরা যখন নদী পার হয় জাহাজ হইতে অনেকে বন্দুকের সাহায্যে ইহাদের হত্যা করে। এই হরিণের পাল জলে বড়ই অসহায়।

ইউকন প্রদেশের এই হরিণের (caribou) সহিত বল্গা-হরিণের (rein deer) খুব নিকট সম্বন্ধ আছে। আলাস্কাতে বল্গা-হরিণ পালন করা হয়। বল্গা-হরিণদের পাল রক্ষক দ্বারা সব সময় খুব সাবধানে রক্ষা করিতে হয়। অন্য হরিণের পাল কাছ দিয়া যাইতে দেখিলে বল্গা-হরিণের পাল ভয়ানক চঞ্চল হইয়া উঠে এবং অনেক সময় পলাইয়া গিয়া বন্য হরিণের পালে যোগদান করে। ইউকন প্রদেশের হরিণের যে পাল আছে, তাহাদের এখন পর্য্যন্ত কেহ পোষ মানাইতে পারে নাই। এই-সমস্ত হরিণকে
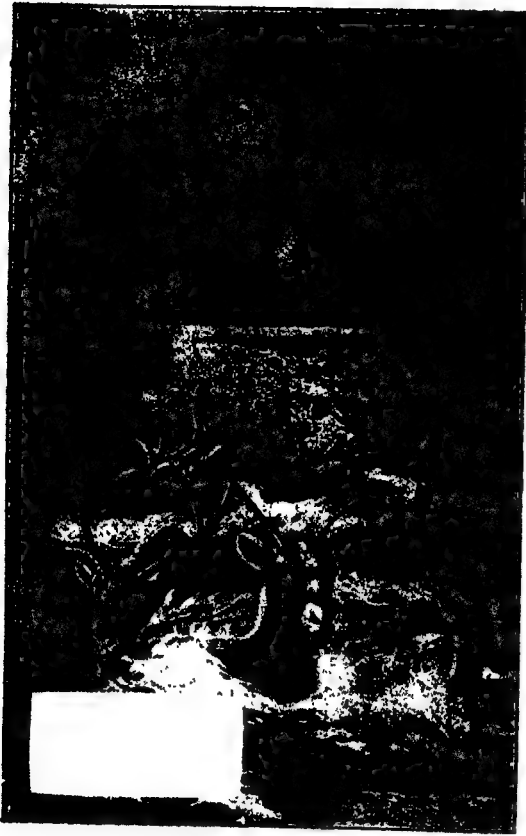
হরিণ পালের নদীপার

কাজে লাগাইবার আয়োজন হইতেছে। মানুষের খাদ্যের অভাব ইহারা অনেকটা পূরণ করিবে। এই হরিণদের হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস টিনবন্দি করিয়া দেশ বিদেশে চালান দেওয়া হইবে।

হেমন্ত

—

প্রকৃতির সাজা—

মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে মুখের চেয়েও সুন্দর যে কিছু আছে তাহা, মোটামুটি দেখিতে গেলে, কবির কল্পনার বহির্ভূত। কিন্তু এই পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে, যেখানে কবি, মুখের চেয়েও পায়ের সৌন্দর্য্যে অধিকতর আকৃষ্ট। উহা এই প্রাচ্য ভূখণ্ডের অন্তর্গত চীনদেশ। সেখানে রমণীগণ স্বাভাবিক পদকে ছোট করিবার জন্য অতি শিশুকাল হইতেই একরকম লোহার জুতা পরিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের পা অত্যন্ত ছোট হইয়া যায় এবং যাঁহার পা যত ছোট তাঁহার সৌন্দর্য্যের পরিমাণ তত বেশী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। লোহার জুতা পরিয়া পায়ের গঠন কিরূপ ভীষণ বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহার একখানি ছবি এক্স-রে যন্ত্র দ্বারা তুলিয়া দেখান হইতেছে। এক্স-রে* যন্ত্রের বিশেষত্ব

চীন মহিলার পায়ের এক্স্‌রে ছবি

স্বাভাবিক পায়ের এক্স্‌রে ছবি

এই যে হাড়ের ছবি খুব স্পষ্ট উঠে ও মাংসের ছবি ছায়ার মত হাড়ের চারিপাশে দেখা যায়। অবশ্য যখন চিত্রটি তোলা হয়,—তখন রমণী লোহার জুতার পরিবর্ত্তে চামড়ার জুতাই পরিয়াছিলেন। পাঠক ইহাতে দেখিতে পাইবেন যে পায়ের গোড়ালি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া আছে এবং গুল্‌ফ বা গোড়গাটের নিকট হইতেই আঙুল-গুলির গোড়া এরূপভাবে বাঁকিয়া আছে যে তাহাতে পায়ের তলা কেবল পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হইয়াছে। বৃদ্ধাঙ্গুলি ভিন্ন অন্য সব আঙুল

* এক্স-রে সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে হইলে ১৩২৯ সালের পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষ' দ্রষ্টব্য।

বৃত্তাকারে গোড়ালির দিকে চলিয়া গিয়াছে। তুলনা করিবার জন্য পায়ের একটি স্বাভাবিক অবস্থার ছবিও দেওয়া হইল। পাঠক দুইটি ছবি পাশাপাশি করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে স্বাভাবিক পায়ের তলা যে স্থলে দশ ইঞ্চি লম্বা, চীন মহিলার পায়ের তলা সেস্থলে মোটে পাঁচ ইঞ্চি। এই সংকীর্ণ পাঁচ ইঞ্চি পায়ের তলার উপর তাঁহাদের সমস্ত দেহের ভার ন্যস্ত ও চলাফেরা দৌড়াদৌড়ি ইত্যাদি অন্যান্য কার্য্যও করিতে হয়। সমস্ত শরীর যেন কেবল কয়টি অঙ্গুলের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়া আছে। সুতরাং প্রাণীবিজ্ঞান-মতে ঘোড়ার ন্যায় খুব দ্রুত দৌড়াইবার ক্ষমতা বোধ হয় তাঁহাদেরও থাকা উচিত ছিল; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম।

চীন মহিলার পা যদিও চর্ম্মপাদুকাসমেত এক্স-রে যন্ত্র দ্বারা তোলা হইয়াছে, তথাপি চিত্রে জুতার চিহ্নই নাই; কিন্তু কি আশ্চর্য্য জুতার তলায় ও গোড়ালিতে যে অসংখ্য পেরেক মারা হইয়াছিল তাহা কিরূপ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। জানি না পায়ের এইরূপ বিকৃতাবস্থা দেহের কতদূর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃতির যে কি কঠোর শাস্তি হয় তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

খড়্গী গাছ—

যাহার খড়্গ আছে তাহাকেই 'খড়্গী' বলা যায়। গণ্ডারের খড়্গ আছে বলিয়া ইহার এক নাম খড়্গী।

কোন কোন গাছেরও যে কতকটা গণ্ডারের মত খড়্গ আছে তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। উত্তর-আমেরিকায় ট্যাক্সোডিয়ম্ ডাইষ্টিকম্ (Taxodium distichum) নামক এক-প্রকার গাছ আছে, ইহার শিকড়গুলি সাধারণ গাছের শিকড়ের মত মাটির ভিতরে লুক্কায়িত না থাকিয়া কতকটা খড়্গ বা ককুদের (=ষাঁড়ের ঝুঁটির) আকার ধারণ করিয়া মাটি ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। ছবিতে এইরূপ কয়েকটি খড়্গ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।
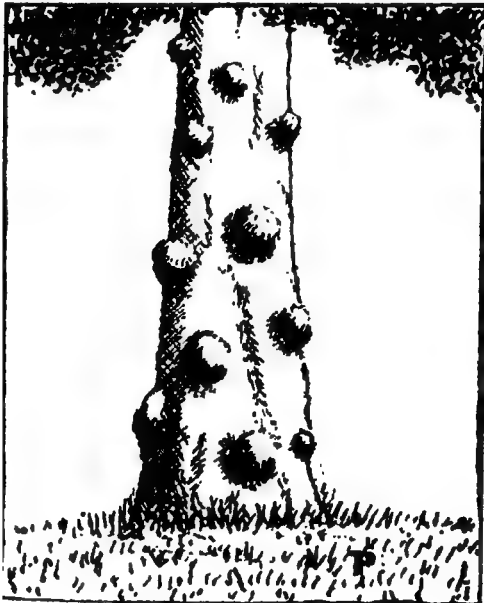
খড়্গী গাছ

এ খড়্গগুলির কার্য্য কি এবং প্রয়োজনীয়তাই বা কি, তাহা আজ পর্য্যন্তও সঠিক স্থিরীকৃত হয় নাই। গণ্ডারের খড়্গ আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য, কিন্তু এ খড়্গ কিসের জন্য তাহা আজও সঠিক জানা যায় নাই। প্রকৃতির রাজ্যে কত অদ্ভুত জিনিষই আছে। এই খড়্গাকার শিকড়গুলি গত অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে "বাঁণা-গাছের বিচিত্র শ্বাস-যন্ত্র" প্রসঙ্গে উল্লিখিত বায়বীয় খাদ্য সংগ্রাহক বিশেষ-প্রকার শিকড়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কোম্পানি বাগানে হাওড়া-ফটক হইতে তাল-গাছের সারির ভিতর দিয়া মরসুমী ফুলের (season flower) বাগান ও তন্নিকটস্থ বিশ্রাম-ঘরের দিকে যাইবার পথে একটা খালের উপর 'পাল্‌মাইরা ব্রিজ' (Palmyra Bridge) নামে যে পুল পাওয়া যায় সেই পুলের খুব কাছে খালের বামদিকে এই গাছ একটি আমরা বহুদিন হইল দেখিয়াছি। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য পাঠকপাঠিকাগণ এই গাছ সেখানে দেখিয়া আসিতে পারেন।

কোম্পানি বাগানের 'কাউ' জাতীয় 'গার্সিনিয়া লিভিংষ্টোনিয়াই' (Garcinia Livingstonei) নামক আর-একপ্রকার গাছ দেখিয়াছি, তাহার কাণ্ডে কতকটা এই খড়্গের মত কঠিন স্ফীতি দেখা যায়। সম্ভবতঃ শৈশবাবস্থায় ভগ্নশাখার মুলদেশের ক্ষতের উপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স্থুল চর্ম্মাবরণ (Callus) হইতেই এ গাছে এরূপ খড়্গ বা ঢালের মত স্ফীতির উৎপত্তি হয়। এ গাছ আফ্রিকার।

"পিয়েমডি"

রাক্ষুসে ওলকোপি

রাক্ষুসে ওলকোপি—

গত বৎসর দাশকুড়িয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে নূতন ছাত্রাবাসের উদ্যানে ছাত্রদিগের আন্তরিক পরিশ্রমে কতকগুলি দেখিবার মত

ফুলকোপি উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার একটির বিবরণ ও ফোটো দেওয়া হইল।

আকার -পরিধি—একফুট ২ ইঞ্চি
উচ্চতা—১১৷৷০ ইঞ্চি

ওজন - .৩৷৷০ সের

উপাদান—নূতন দোআঁশ মাটি, সংকিঞ্চিৎ গঙ্গলের সার ও সকলের আন্তরিক যত্ন।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সাউ

মহাপণ্ডিত তথাগতরক্ষিত

যে-সব পণ্ডিতের সমবেত চেষ্টায় বিক্রমশিলার মঠটি বাংলাদেশের একটি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে মহাপণ্ডিত তথাগতরক্ষিতের নাম উল্লেখ-যোগ্য। তিব্বতী বই থেকে আমরা জান্‌তে পারি যে মহাপণ্ডিত তথাগতরক্ষিতের বাড়ী হচ্ছে উড়িষ্যায়। সেখানে এক কায়স্থ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তবে এ কায়স্থ বংশের পেশা ছিল চিকিৎসা (Cordier's Catalogue, II, p. ৩২)।

লামা তারানাথ ভারতের বৌদ্ধধর্মের যে ইতিহাস লিখেছেন, তাতে মহাপণ্ডিত তথাগতরক্ষিতের সম্বন্ধে খুব সামান্য কথাই বলেছেন। তারানাথ কেবল বলেছেন যে তিনি একজন বড় তন্ত্রাচার্য্য ছিলেন এবং তাঁর সময়ে জ্ঞানপাদ, দীপঙ্করভদ্র, শ্রীধর, ভবভদ্র ও আর আর পণ্ডিতেরা ছিলেন। তথাগতরক্ষিত বিক্রমশিলার মঠে কৃষ্ণসমাজবজ্রের পরে এসেছিলেন। (Anton Schiefner-এর Taranath, পৃঃ ২৫৯ দ্রষ্টব্য।)

মহাপণ্ডিত তথাগতরক্ষিতের আর-একটি উপাধি ছিল, সেটি হচ্ছে উপাধ্যায়। তিনি নিজে সংস্কৃত ও তিব্বতী ভাষায় খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তিব্বতে গিয়ে তিব্বতী ভাষা শিখেছিলেন কি না বলা কঠিন, সম্ভবতঃ বিক্রমশিলার মঠে থাক্‌তেই তিনি তিব্বতী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি নিজের ও অন্যের লেখা অনেক বই তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করে' তিব্বতী বৌদ্ধ সাহিত্যের পুষ্টি করেছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এইটুকু যে তাঁর বা অন্যের রচিত সংস্কৃত বইগুলি যদিও আর পাওয়া যাচ্ছে না, তবুও তার তিব্বতী অনুবাদ এখনও তিব্বতে ত্রিপিটকের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

নীচের বইগুলি উপাধ্যায় তথাগতরক্ষিত নিজে প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন, আবার পরে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন—

(১) কুদৃষ্টিদূষণ (Cordier's Cat. II, p. ১১৬)
(২) শূন্যতা ভাবনা („ „)
(৩) স্রগ্ধরা সাধন („ „)
(৪) বিদ্যা-বর্দ্ধন („ „)
(৫) মৃত্যু-কাপটা („ „)
(৬) চৌর-বন্ধ („ „)
(৭) যোগিনী-সংচার্য্য-নিবন্ধ („ II p. ৩২)

এগুলি ছাড়া তাঁর নিজের সংস্কৃত ভাষায় লেখা আর দুখানা বই ছিল—

(১) শ্রী-বজ্র-ভৈরব-হস্ত-সিহন-বিশুদ্ধি-নাম (২য়, পৃঃ ১৭৪)
(২) চতুর-মুখ-সময়-সিদ্ধি-সাধন-নাম (৩য়, পৃঃ ১৯৬)

অন্যের লেখা নীচের সংস্কৃত বইগুলিও তিনি তিব্বতীতে অনুবাদ করেছিলেন -

(১) শ্রী-হেরুকাভ্যুদয়-মহা যোগিনী-গীত-তন্ত্ররাজ কতিপয়াক্ষর-পঞ্জিকা (২য়, পৃঃ ৩১)।
(২) অভিষেক-প্রকরণ (২য়, পৃঃ ১৫৫)।
(৩) শ্রী-বজ্র-ভৈরব-তন্ত্র-টিপ্পনী-নাম (২য়, পৃঃ ১৬৮)।
(৪) বজ্র-ভৈরব-তন্ত্র-পঞ্জিকা (২য় পৃঃ ১৬৯)

এসব বইয়ের মধ্যে তন্ত্রের বই খুব বেশী। সেটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ তিনি নিজে একজন তন্ত্রাচার্য্য ছিলেন, আবার থাক্‌তেন বিক্রমশিলায় যেটি বৌদ্ধতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু
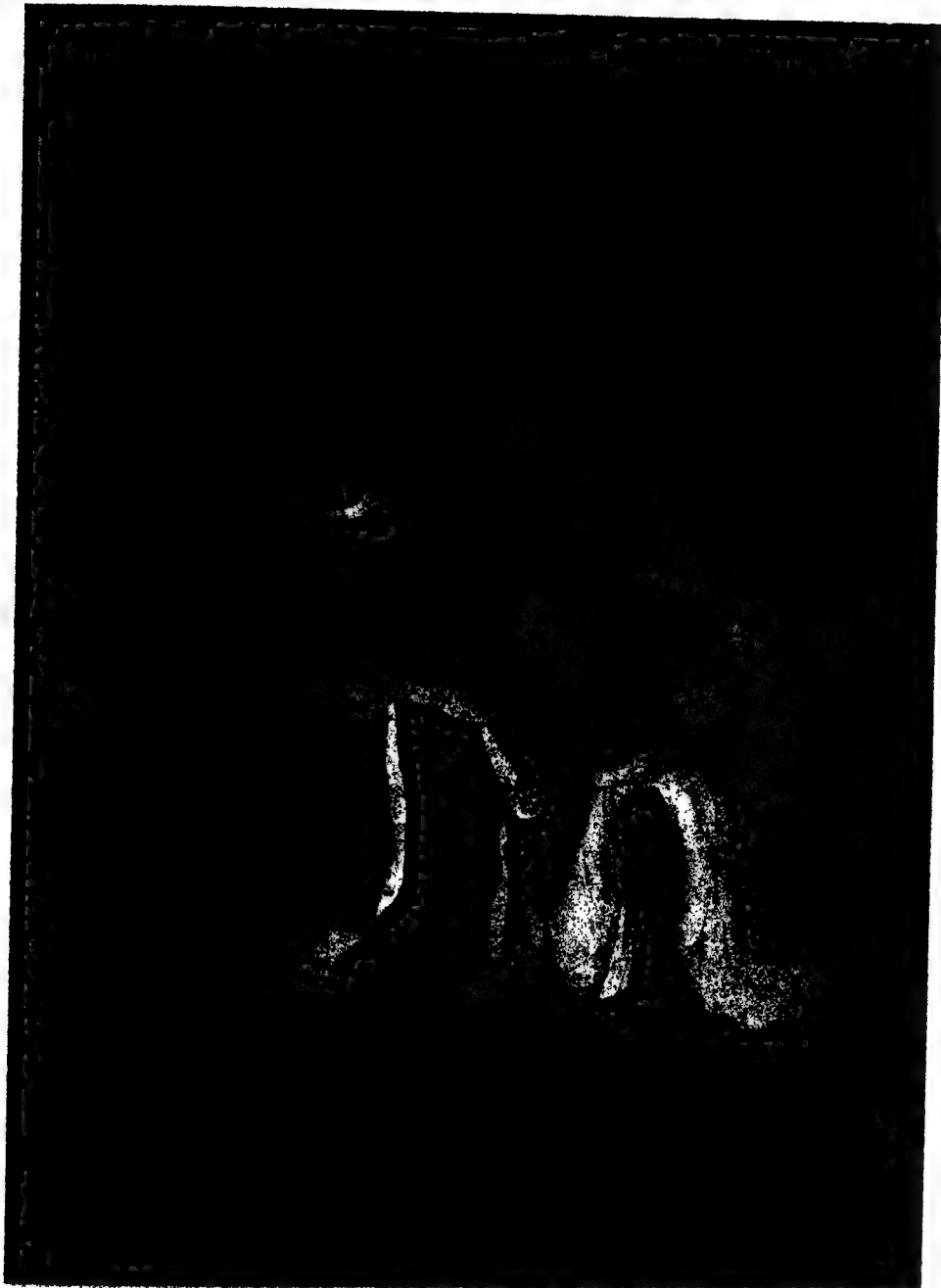
বিল্বমঙ্গল
চিত্রকর শ্রীঅশ্বিনীকুমার রায়

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

পাঠকগণ অবশ্যই লক্ষ্য করে' থাক্‌বেন যে স্বরবৃত্ত ছন্দের যে-সমস্ত ধারায় প্রতিপাদের অন্তর্গত স্বরগুলোর লঘুত্ব-গুরুত্বের হিসাব রাখা হয় সে-সমস্ত স্থলে প্রতিপাদেও মাত্রা-পরিমাণ ঠিক থাকে। যেমন আদিগুরু, মধ্যগুরু, কিংবা অন্ত্যগুরু ত্রিস্বর ছন্দের প্রতি পাদেই চার মাত্রা থাকে। আবার ত্রিস্বর-পাদ ছন্দের যে-সমস্ত শাখায় দুটো স্বর গুরু থাকে কিংবা চতুঃস্বর-পাদ ছন্দের যে-সমস্ত শাখায় একটি গুরু স্বর থাকে সে-সমস্ত স্থলে প্রতিপাদে পাঁচটি করে' মাত্রা পাওয়া যাবে। তেম্‌নি সর্বগুরু ত্রিস্বর-পাদ কিংবা দ্বিগুরু চতুঃস্বর-পাদ কিংবা একগুরু পঞ্চস্বর-পাদের প্রতিপাদে মাত্রা-পরিমাণ ছয়। কিন্তু এ-সব ছন্দে মাত্রা-পরিমাণ স্থির থাকলেও এ-সব ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলা সঙ্গত নয়। কেন না প্রতিপাদের স্বর-সংখ্যা এবং তাদের লঘু-গুরু ক্রমের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ-সব ছন্দ রচিত হয়. মাত্রা-পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে নয়। মুখ্যত স্বর-সংখ্যা এবং তাদের লঘুগুরু-ক্রমের উপর দৃষ্টি রাখ্‌লেই গৌণত মাত্রা-পরিমাণও নিয়মিত হয়ে যায়। তাই এ-সব ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত নাম দেওয়া সঙ্গত মনে করি না। সংস্কৃত অক্ষর বৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধেও এ কথা অবিকল খাটে। সংস্কৃত অক্ষর-বৃত্তেও প্রত্যেক স্বরের লঘুত্ব-গুরুত্বের হিসাব রাখা হয় বলে' প্রতি চরণের মাত্রা সমান থাকে, কিন্তু তাই বলে' এ ছন্দকে জাতি বা মাত্রা-ছন্দ বলা হয় না। যা হোক্‌, বাংলায় অধিকাংশ সময়েই স্বর-সংখ্যা ঠিক রেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতি স্বরের ওজন হিসাব করে' ছন্দ রচনা করা সম্ভবপর হয় না। তাই কবিরা অনেক সময় কেবল স্বর সংখ্যা ঠিক রেখেই ছন্দ রচনা করেন। এইটেই খাঁটি স্বরবৃত্ত ছন্দ ; এ ছন্দে মাত্রা-পরিমাণ স্থির থাকে না। আবার অনেক সময় তাঁরা কেবল মাত্রা-সংখ্যা ঠিক রেখেই কবিতা রচনা করেন। এইটেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ; এ ছন্দে স্বর-সংখ্যা স্থির থাকে না। যথা—

"রুদ্র মোদের | হাঁক দিয়েছে | বাজিয়ে আপন | তূর্য।
মাথার পরে | ডাক দিয়েছে | মধ্যদিনের | সূর্য।"

এখানে প্রতি পাদের স্বর-সংখ্যা চার, কেবল শেষ দুই পাদে দুই। কিন্তু মাত্রা-সংখ্যার স্থিরতা নেই। কাজেই এ ছন্দ স্বরবৃত্ত। আবার

"ফাগুন | চঞ্চল | ফোটা ফুল | রয় না |
অবহেলে | দেয় ফেলে | পুষ্পের | গয়না |"

এখানে প্রতিপাদের স্বর-সংখ্যার কোনো মিল পাওয়া যায় না। অথচ প্রতিপাদে মাত্রা-সংখ্যা চার, কেবল প্রতি ছত্রের শেষ পাদে তিন তিন মাত্রা। কাজেই ছন্দ মাত্রাবৃত্ত।

এক্ষণে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের শ্রেণী-বিভাগে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রতি-পাদের মাত্রা-সংখ্যা এবং প্রতি ছত্রের অন্তর্গত পাদ-সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রেখে এ ছন্দের শ্রেণী-ভাগ করতে হয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রতিপাদে চার মাত্রা, পাঁচ মাত্রা, ছয় মাত্রা এবং তিন চার কিংবা চার-তিনের মিশ্রণে সাত মাত্রা করে' থাকতে পারে। সুতরাং এদিক্‌ থেকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে চতুর্মাত্র-পাদ, পঞ্চমাত্র-পাদ, ষণ্মাত্র পাদ এবং সপ্তমাত্র-পাদ এই চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই প্রতিপাদের অন্তর্গত মাত্রাসংখ্যার দ্বারাই এ ছন্দের ভিতরের গঠন নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার প্রতি ছত্রের অন্তর্গত পাদসংখ্যার দিক্‌ থেকে এ ছন্দকেও দ্বিপদী ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি নাম দেওয়া যেতে পারে। এই শ্রেণী-বিভাগ ছন্দের বহির্গঠনকে নিয়মিত করে। অনেক সময় এ ছন্দের শেষ একটি পাদ এক, দুই, তিন, চার, এমন কি পাঁচ মাত্রার অভাবে অপূর্ণ থাকতে পারে। সে স্থলে এ ছন্দকে অপূর্ণ দ্বিপদী, অপূর্ণ ত্রিপদী প্রভৃতি নাম দেওয়া যাবে।

১। চতুর্মাত্রিক বা চতুর্মাত্র-পাদ (বাংলা পজ্‌ঝটিকা) —

খুলে যায় | মুক্ত আজ | অন্তর | দৃষ্টি |
অবচন একি শ্লোক ! অপরূপ সৃষ্টি।
সাম্যের একি সাম ! পূত হ'ল চিত্ত।
নিত্যের ইঙ্গিত এ মিলন-তীর্থ !
টুটে ভেদ নিষেধের শিলাময় জগ্‌দ্দল,
জয়তু যমুনা জয় ! জয় জয় গঙ্গা।

সত্যেন্দ্রনাথ
(অপূর্ণ চৌপদী)

২। পঞ্চমাত্রিক বা পঞ্চমাত্র-পাদ—

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।
বহে না চল মন্দানিল লুটিয়া ফুল-গন্ধভার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ, ফুটে না বনে কুন্দ-নীপ,
ছুটে না কল-কণ্ঠ-সুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার।
নন্দ-পুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

কালিদাস রায়

৩। ষণ্মাত্রিক বা ষণ্মাত্র-পাদ—

মেঘ-দুর্দ্দিন দুর্য্যোগে আজি গর্জ্জিছে বারিধার;
সঙ্কটময় পঙ্কিল পথ, শঙ্কিল চারি ধার;
যে থাকে যেথায়, আজিকে সেথায় মিলিতে সবাই হবে,
বিশ্বনাথের ডঙ্কা বেজেছে মেঘ-ভৈরব রবে।

সতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

৪। সপ্তমাত্রিক বা সপ্তমাত্র-পাদ—

(ক) তিন-চারের মিশ্র

আজি ধ্বনিছে দিগ্বধূ শঙ্খ দিকে দিকে,
গগনে কারা যেন চাহিয়া অনিমিখে,
ওই ধূ ধূ ধূ হোমশিখা জ্বলিল ভারতেরে
ললাটে জয়টীকা প্রসূন-হার গলে,
চলে রে বীর চলে।
সে কারা নহে কারা যেখানে ভৈরব রুদ্র-শিখা জ্বলে॥

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

(খ) চার-তিনের মিশ্র

সংগ্রামে আজি যে দুন্দুভি বাজিছে,
প্রাণদান করিতে সত্যই রাজি কে?
নির্ভীক হৃদয়ে দুঃখে না ডরিয়া
গৌরব নিবি কে মৃত্যুরে বরিয়া?
কে জ্বালিবি তিমিরে মুক্তার দীপ্তি
ভেদ করি যত না মিথ্যার শুক্তি?
কে ধরিবি বুকেতে দীন-অসহায়েরে,
আয় ছুটে আজিকে আয় ছুটে আয় রে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দ্বিপদী ত্রিপদী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের পংক্তির সমাবেশে বাংলা কবিতায় সর্ব্বদাই বহু ছন্দোবন্ধ দৃষ্টিগোচর হ'য়ে থাকে। সুতরাং বিভিন্ন ছন্দোবন্ধের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অনাবশ্যক। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মুক্ত-বন্ধ কবিতা দেখা যায় না, তথাপি এই ছন্দেও যে মুক্তবন্ধ কবিতা রচনা করা যায় তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মুক্তবন্ধ কবিতার অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাংলার উদীয়মান কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের "বিদ্রোহী" নামক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

এস্থলে আরেকটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদিও বাংলার স্বরবর্ণগুলো বিশুদ্ধ সংস্কৃত রীতিতে উচ্চারিত হয় না, তথাপি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মাঝে মাঝে (প্রায়ই সঙ্গীতে) সংস্কৃত উচ্চারণ-রীতি অবলম্বন করে'ও কবিতা রচনা করা হয়। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

(১) ষণ্মাত্র-পাদ—

দেশ দেশ | নন্দিত করি | মন্দ্রিত তব | ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি'।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই,
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সবজন-পশ্চাতে,
লউক বিশ্ব-কর্ম্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে
জাগ্রত ভগবান্ হে।

রবীন্দ্রনাথ

(২) সপ্তমাত্র-পাদ—

এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয় পুণ্য-সৌরভ,
এস তেজঃ সূর্য্য উজ্জ্বল কীর্ত্তি অম্বর মাঝে হে!
বীর-ধর্ম্মে পুণ্য কর্ম্মে বিশ্ব-হৃদয়ে রাজ হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
জয় জয় নরোত্তম পুরুষসত্তম
জয় তপস্বী-রাজ হে!

রবীন্দ্রনাথ

(৩) অষ্টমাত্র-পাদ—

ক। পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে
শ্যাম-বিটপি-ঘন তট-বিপ্লাবিনি ধূসর-তরঙ্গ-ভঙ্গে।
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি চরণ-যুগ মাই,
কত নর নারী ধন্য হইল তব সলিলে অবগাহি;
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি
করি সুশ্যামল কত মরু-প্রান্তর পুণ্য-শীতল-তরঙ্গে।

দ্বিজেন্দ্রলাল

খ। "রে সতি রে সতি!" কাঁদিল পশুপতি পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যতদিন ততদিন না ছিল ক্লেশ॥
শব-হৃদি আসন শ্মশান-বিচরণ জগত নিরূপণ জ্ঞানে
ভিক্ষুক, বিষধর, তিরপিত অন্তর, আশ্রম-রতি-নিরবাণে!

হেমচন্দ্র

অনেক সময় মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সংস্কৃত উচ্চারণ ও বাংলা উচ্চারণ যথেচ্ছ ভাবে মিশ্রিত করা হয়। কিন্তু এ রকম যথেচ্ছ উচ্চারণ সঙ্গীতে দোষাবহ না হ'লেও সাধারণ কবিতায় দোষাবহ বটে।

"জ্যোৎস্না-হসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরে ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে।"

এখানে চিহ্নিত স্থান তিনটিতে সংস্কৃত নিয়মে দীর্ঘ-

উচ্চারণ কর্‌তে হবে। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত কবিতায় অতি বিরল।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ শ্রেণী-ভাগ করা বিশেষ সহজ নয়। কেননা বাংলার কবিগণ শত শত বৎসর ধরে' এ-ছন্দে কবিতা লিখে' আস্‌ছেন এবং তার ফলে এ-ছন্দে অসংখ্য ও অদ্ভুত অদ্ভুত রূপবৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। কবিরা নিজের ইচ্ছা-মতেই কোথাও এক অক্ষর বেশী বা কোথাও এক অক্ষর কম ব্যবহার করে'ই মনে করেছেন এই একটি নূতন ছন্দ হ'য়ে গেল এবং নিজ কল্পনা থেকে এর একটি স্বতন্ত্র নাম দিয়ে ফেলেছেন। এমনি করে' এ ছন্দে অসংখ্য প্রকার ভেদ ও অসংখ্য নামের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই শ্রেণীভাগ ও নামকরণ নিছক খামখেয়ালি বই আর কিছুই নয়। তাছাড়া অক্ষরবৃত্তের নামে অনেক কবিতা চলে' আস্‌ছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেগুলো অক্ষরবৃত্তের এলাকায় পড়ে না; আসলে সেগুলোর ধ্বনি ও গতিভঙ্গী মাত্রাবৃত্তের ন্যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এ ছন্দে নানা রকম অদ্ভুত প্রকার-ভেদ দেখা দিচ্ছিল। বোধ করি অবশেষে রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে' এ ছন্দ তার স্বরূপ প্রকাশ কর্‌তে পেরেছে। তিনি এর কতগুলোকে অক্ষরবৃত্তের এলাকারই রেখেছেন, আর কতগুলোকে মাত্রাবৃত্তের অধিকারের মধ্যে নিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উদ্ভাবয়িতা। পূর্ব্ব কবিদের খাম-খেয়ালির একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

"প্রখর রবির কর শিরে সহ্য হয় হে,
তার তেজে বালি তাতে, পদে নাহি সয় হে।"

এখানে যদি প্রতি ছত্রের শেষ অক্ষরটা না থাকৃত তাহ'লেই এ ছন্দটা হ'ত পয়ার। কিন্তু যেহেতু শেষে একটি 'হে' যোগ করে' দেওয়া হয়েছে সেজন্য এইটে আর পয়ার রইল না, সম্পূর্ণ বদ্‌লে গিয়ে তার নাম হল "মালতী" ছন্দ। কিন্তু এই মালতীর আগে যদি আর দুটো অক্ষর বসানো যায় তাহলেই এ ছন্দ হয়ে যাবে "মালতীলতা"! যথা—

তুমি আপনার দোষ কভু দেখিতে না পাও হে।
দেখি, পাইলে পরের দোষ শত মুখে গাও হে।"

যাহোক, এ-সমস্ত খামখেয়ালির বিস্তৃত আলোচনা করার স্থান আমাদের নেই। সুতরাং প্রাচীন শ্রেণীভাগ ও "কুসুম-মালিকা", "চম্পক" "মালঝাঁপ" প্রভৃতি কাল্পনিক নাম ছেড়ে দিয়ে সাধারণ ভাবে আধুনিক ছন্দের শ্রেণীভাগ ও নামকরণ কর্‌ব।

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পাদ-বিন্যাস সাধারণত স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তের মতো একভাবেই চলে না। এর পাদবিন্যাসের অনেক বৈচিত্র্য আছে। সুতরাং আমাদের পূর্ব্বপ্রণালী অনুসারে এ ছন্দকে চতুরক্ষর-পাদ, অষ্টাক্ষর-পাদ প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত না করে' একেবারেই দ্বিপদী, ত্রিপদী প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা সমীচীন মনে করি; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপাদের অক্ষর-সংখ্যা দিয়ে গেলেই প্রত্যেক ধারার বিশিষ্ট স্বরূপটি চোখে পড়্‌বে।

১। দ্বিপদী (৬+৫)—

হে নভোমণ্ডল, বল স্বরূপ
কে দিল তোমাবে এরূপ রূপ;
এ ভব-ভবনে যেদিকে চাই
সেদিকে তোমারে দেখিতে পাই।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

ষড়ক্ষর-পাদ, অপূর্ণ দ্বিপদী;
প্রাচীন নাম—একাবলি।

২। দ্বিপদী (৬+৬)

আজি শচীমাতা কেন চমকিলে?
ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া বসিলে;
লুণ্ঠিত অঞ্চলে নিমু নিমু বলে'
দ্বার খুলি মাতা কেন বাহিরিলে ?

শিবনাথ শাস্ত্রী

ষড়ক্ষর-পাদ, পূর্ণ দ্বিপদী;
প্রাচীন নাম—দীর্ঘ একাবলি।

৩। দ্বিপদী (৮+৬)

সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধা জননি,
রেখেছ বাঙালী ক'রে মানুষ করনি।

রবীন্দ্রনাথ

প্রাচীন নাম—পয়ার।
অষ্টাক্ষর-পাদ, অপূর্ণ দ্বিপদী।

৪। দ্বিপদী (৮+৮)

"যেই দিন ও-চরণে ডালি দিনু এ-জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।

* * *

হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুখিনী জনমভূমি, মা আমার, মা আমার।"

অষ্টাক্ষর-পাদ, পূর্ণ দ্বিপদী।

৫। দ্বিপদী (৮+১০)

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হ'তে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড় পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কি বাণীর সন্ধানে।

রবীন্দ্রনাথ

৬। দ্বিপদী (১০+১০)

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব ?
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখে বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।

রবীন্দ্রনাথ

দশাক্ষর পাদ, পূর্ণ দ্বিপদী।

৭। ত্রিপদী (৪+৪+৬)

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল-আভা
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥

কাশীরাম দাস

এর প্রাচীন নাম তরল পয়ার। আসলেও এ ছন্দ পয়ারই, তফাৎ এই যে একেবারে আট অক্ষরের পর যতি না পড়ে' এখানে প্রতি ছত্রেই চার অক্ষরের পর আর-একটা অতিরিক্ত যতি পড়েছে। অর্থাৎ পয়ারের প্রথম পদটাকে ভেঙে ছটো করা হয়েছে।

৮। ত্রিপদী (৬+৬+৮)

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর যক্ষবিদ্যাধর অপ্সরোগণের বাস॥

ভারতচন্দ্র

প্রাচীন নাম লঘু ত্রিপদী। এ রকম ত্রিপদী অক্ষর-বৃত্তের চাইতে মাত্রাবৃত্তেই সুন্দর হয়।

৯। ত্রিপদী (৮+৬+৬)

একদা তুলসীদাস জাহ্নবীর তীরে নির্জ্জন শ্মশানে।
সন্ধ্যায় আপন মনে একা একা ফিরে মাতি নিজ গানে॥

রবীন্দ্রনাথ

লঘু ত্রিপদীর পদগুলোকে উল্টিয়ে নিলে অথবা পয়ারের সঙ্গে ছ' অক্ষর যোগ করে' দিলেই এ ছন্দ পাওয়া যায়।

১০। ত্রিপদী (৮+৮+৬)

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন এক মনে
জপিছেন নাম,
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।

রবীন্দ্রনাথ

১১। ত্রিপদী (৮+৮+১০)

বসিয়া প্রভাতকালে সেতারার দুর্গভালে
শিবাজী হেরিলা এক দিন।
রামদাস গুরু তাঁর ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন।

রবীন্দ্রনাথ

১২। ত্রিপদী (৮+১০+৬)

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গণিব না দিন ক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

রবীন্দ্রনাথ।

১৩। ত্রিপদী (৮+১০+১০)

মোরে কর সভাকবি ধ্যান-মৌন তোমার সভায়,
হে শর্ব্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা,
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।

রবীন্দ্রনাথ

১৪। চৌপদী (৬+৬+৬+৫)

চিরসুখিজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

ষড়ক্ষর পাদ, অপূর্ণ চৌপদী।

১৫। চৌপদী (৮+৮+৮+৬)

অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি | কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি |
স্পর্শ লভেছিল যার | এক পল ভর, |
বাকি অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।

রবীন্দ্রনাথ

অষ্টাক্ষর পাদ, অপূর্ণ চৌপদী।

১৬। চৌপদী (১২+১২+১২+৩)

"প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী, কে রয়েছ জাগি'"
অনাথ-পিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-
নিনাদে।

রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দকেই দীর্ঘ-চৌপদী বলা উচিত। কেননা এর প্রথম তিন পদের মধ্যস্থলে একটি করে' যতি আছে। আসলে তিনটে দ্বিপদী ছত্র ও একটি অপূর্ণ পদ নিয়ে এ-ছন্দ রচিত হয়েছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কেবল প্রধান প্রধান কয়েকটা প্রকার-ভেদই দেখানো গেল ; এ ছন্দের আরও অনেক প্রকার-ভেদ রয়েছে। বাহুল্য-ভয়ে আর দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল না। এ ছন্দের উদ্ধৃত নমুনাগুলো থেকেই পাঠক অনায়াসে বাকি প্রকার-ভেদগুলোর শ্রেণী-ভাগ ও নাম অনুমান করে' নিতে পারবেন। যাহোক্ উক্ত দৃষ্টান্ত-গুলো থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রতি পাদে চার, ছয়, আট, এবং দশটি করে' অক্ষর থাক্‌তে পারে। অন্য কোন সংখ্যক অক্ষর নিয়ে এ ছন্দে পদ রচনা করতে গেলে পদগুলো খোঁড়া হয়ে যাবে। জীব-মাত্রেরই দুই, চার, ছয়, আট, প্রভৃতি জোড়-সংখ্যক পা আছে বলেই তারা চল্‌তে পারে, বিজোড়-সংখ্যক পা নিয়ে খোঁড়াতে হয়। এ ছন্দেরও তাই. তিন, পাঁচ, সাত প্রভৃতি সংখ্যক অক্ষরে এ ছন্দ চল্‌তেই পারে না। এ ছন্দের এই বিশেষ প্রকৃতিটি বজায় রেখে অক্ষরবৃত্তে দুটো উপায়ে অতি স্বাধীন ভাবে কবিতা রচনা করা যায়-- একটি অমিত্রাক্ষর ছন্দ, আরেকটি মুক্তবন্ধ ছন্দ। সকলেই জানে চোদ্দর পরে মিল না দেওয়াটাই অমিত্রাক্ষরের বিশেষত্ব নয়। "মহাভারতের কথা সমান অমৃত" লিখ্‌লেই মহাভারত অমিত্রাক্ষর হয়ে যেত না। আসলে প্রতি ছত্রের পরে মিল থাক বা না থাক যতি-স্থাপনের বৈচিত্র্যই অমিত্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্য. নানা ভঙ্গীতে চার, ছয়, আট, দশ অক্ষরের পর যতি স্থাপন করে' অর্থাৎ এ ছন্দের প্রতিপাদগুলোকে বহু বিভিন্ন পরিমাণের করাতেই এ ছন্দের গাম্ভীর্য্য-গরিমা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রতি ছত্রে চোদ্দ অক্ষর রাখা কিংবা চোদ্দর পরে মিল না দেওয়াটা অবান্তর মাত্র। সুতরাং এ দুটো অনাবশ্যক বাঁধাবাঁধিকে না মেনে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যে কবিতা রচনা করা যায় তাকেই মুক্তবন্ধ ছন্দ বলা যায়। মুক্তবন্ধ ছন্দে প্রতি ছত্রে দুই থেকে দশ পর্য্যন্ত যে-কোনো জোড়-সংখ্যক অক্ষর-বিশিষ্ট এক বা দুটো পাদ থাকে, এই তার বিশেষত্ব। ছত্রের শেষের দিকের মিলগুলো কবির ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র কতকগুলো কবিতাই বাংলা অক্ষরবৃত্তের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

যে ঐশ্বর্য্যশালী অহোরাত্র ঐশ্বর্য্যের হাওয়াতে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হয়ে ওঠে সে তার সহজলব্ধ সম্পদের প্রাচুর্য্য সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। বাংলার মতো নদীমাতৃক দেশে যাদের জীবন পরিপুষ্ট, তারা বাংলার নদীগুলোর প্রকৃত মাধুর্য্য সজাগভাবে অনুভব করে না, কিন্তু অলক্ষ্যে তাদের মধুধারাতেই বাঙালীর জীবন মধুময় হয়ে ওঠে। তেমনি বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রেও ছন্দের গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, এই তিন ধারা কেমন করে' বাঙালীর জীবনকে সরস সবল ও সতেজ করে' তুল্‌ছে রসমুগ্ধ বাঙালী সহজে তা অনুভব করতে পারে না। কিন্তু যখন চোখ খুলে বিভিন্ন দেশের ছন্দের ক্ষীণধারাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় তখন নিজের মাতৃভাষার এই অপূর্ব্ব সম্পদ্ দেখে হৃদয় গৌরবে পূর্ণ হয়ে ওঠে। কোন্ ভাষায় ছন্দের এমন তিনটে বিশালধারা আছে, আর কোন্ ভাষায় এক ধারা থেকে এমন বহুধারা নির্গত হয়ে সমগ্র কাব্যক্ষেত্রকে এমন শ্যামল সুশীতল করে' তুলেছে তা তো জানিনে। জানি এই যে বাংলা ভাষার ছন্দের ভাণ্ডার রিক্ত নয়, তাতে অপরিমেয় ধনরত্নরাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে আছে এবং নিঃস্ব যে বাঙালী, সেই আজ তার অধিকারী। এইটেই আমাদের গৌরব।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

শ্যামরাজ্যে ফরাসী দৌত্য

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এসিয়ার শ্যামদেশে ফ্রা নারাই নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজত্বের সময় শ্যামদেশ নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর রাজধানীকে বড় বড় সোনার চূড়াওয়ালা মন্দির ও সুন্দর সুন্দর বাগান দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন। ফ্রা নারাই নিজেও খুব বিলাসী ছিলেন। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাক্‌তে ভালবাস্‌তেন। বৎসরে একদিন মাত্র প্রজাদের দেখা দিতেন। আর সেইদিন রাজধানীতে খুব ধুমধামের সঙ্গে উৎসবের আয়োজন করা হ'ত। কিন্তু বিলাসের মধ্যে ডুবে থাক্‌লেও ফ্রা নারাই খুব ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন, এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেও রাজ্যের সমস্ত বিষয়েই তাঁর খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

এই সময়ে পৃথিবীর আর-এক কোণে ফ্রান্সদেশে চতুর্দ্দশ লুই রাজত্ব কর্‌ছিলেন। চতুর্দ্দশ লুই কি রকম বিলাসী এবং কি ক্ষমতাশালী রাজা হয়ে উঠেছিলেন তা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, তিনি সমস্ত ইউরোপটাকেই নিজের শাসনাধীনে এনে ফেলেছিলেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই দুই ক্ষমতাশালী রাজা শিক্ষা দীক্ষা ও ধর্ম্মে একেবারে পরস্পর বিরোধী হ'লেও তাঁরা কেমন ক'রে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন, এই প্রবন্ধে সেই ইতিহাস বর্ণিত হ'ল।

১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মঁসেইয়ব্‌ পালু এবং মঁসেইয়ব্‌ দ্য লা মৎ-লাঁব্যার্‌ চীন ও তার নিকটবর্ত্তী দেশ-সমূহে ধর্ম্মপ্রচার এবং সেই দেশের লোক দিয়েই তাদের মধ্যে যাতে প্রচারের সুবিধা করা যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে একটি মিশন স্থাপন করেন। ফ্রা নারাই ধর্ম্মমত সম্বন্ধে খুবই উদার ছিলেন। এই প্রচারকরা ক্রমে শ্যামদেশেও তাঁদের মিশনের একটি শাখা খোলেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে এই শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভ্য ইউরোপ তখন নিজেদের ধর্ম্মমতকে প্রাধান্য দেবার জন্য নিজেদের মধ্যে ঘোরতর হাঙ্গামা সুরু করেছিল; ঠিক সেই সময়েই ফ্রা নারাই নিজে বৌদ্ধ হ'য়েও তাঁদের বিরোধী ধর্ম্মমত প্রচার কর্‌বার জন্য আদর ক'রে তাঁর রাজ্যে ক্যাথলিক পাদ্রীদের স্থান দিয়েছিলেন।

ক্রমে এই ক্যাথলিক প্রচারকদের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ দেখে ফ্রা নারাই সন্তুষ্ট হ'য়ে তাদের গির্জ্জা এবং থাক্‌বার বাড়ীর জন্য জমি এবং গৃহ নির্ম্মাণের জন্য জিনিষপত্র দিয়েও সাহায্য কর্‌তে লাগ্‌লেন। শ্যামদেশে ক্যাথলিক-দের এই মিশন স্থাপিত হবার পর আঠার বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে, মিশন তাঁদের প্রচারের কাজে চল্লিশ জন প্রচারক নিযুক্ত ক'রে ফেল্লেন। এ ছাড়া এই আঠারো বৎসরের মধ্যে তাঁরা সেখানে চারটি মন্দির, তিনটি বিদ্যালয় স্থাপন ও সেই দেশের ভাষায় তাঁদের অনেকগুলি ধর্ম্মপুস্তক তর্জ্জমা করেছিলেন।

এই-সকল ফরাসী প্রচারকেরা রাজার কাছেও যাওয়া-আসা কর্‌তেন এবং তাঁর সঙ্গে ধর্ম্মকথা ছাড়া রাজ-নীতিরও আলোচনা কর্‌তেন। ওদিকে চতুর্দ্দশ লুইয়ের ক্ষমতা বাড়্‌তে বাড়্‌তে তিনি যখন প্রায় সমগ্র ইউ-রোপের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হ'য়ে দাঁড়ালেন, তখন শ্যাম-রাজের অনুগৃহীত এই ফরাসী ধর্ম্মপ্রচারকেরা তাঁদের দেশের রাজার সঙ্গে ফ্রা নারাইয়ের একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। তাঁরা দিবারাত্র ফ্রা নারাইয়ের কাছে চতুর্দ্দশ লুইয়ের ক্ষমতা ও তার গুণাগুণ বর্ণনা ক'রে এই বেলা তাঁকে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ কর্‌বার পরামর্শ দিতে লাগ্‌লেন। এঁদের পরামর্শের ফলেই ১৬৮০ থেকে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রা নারাই চতুর্দ্দশ লুইয়ের কাছে দু'বার দূত প্রেরণ করেছিলেন। এই দূতদের সঙ্গে তিনি ফ্রান্সের রাজাকে হাতী, বাঘ, গণ্ডার ও নানারকমের মূল্যবান্‌ উপঢৌকন পাঠিয়ে-ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঝড়ে জাহাজ-ডুবি হওয়ার জন্য প্রথমবারের দূত ফ্রান্সে পৌছতে পারে নি। এই জাহাজ যে কোন্‌খানে ডুবেছিল তার খোঁজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়

শ্যামদেশের রাজদূত কর্ত্তৃক ফরাসী রাজা চতুর্দ্দশ লুইকে উপঢৌকন প্রদান

ন। দ্বিতীয়বারে দূত ও উপঢৌকন ভার্সেইয়ে পৌঁছেছিল।

রাজা চতুর্দ্দশ লুই শ্যামরাজ্যের এই দূতদের খুব খাতির যত্ন করেছিলেন। জেসুইট পাদ্রিরা দূতদের রাজার কাছে নিয়ে যাবার আগে সেখানে কি কায়দায় কথা বলতে হবে, কেমন ক'রে কুর্ণিশ করতে হবে ইত্যাদি দরবারের সমস্ত আদব কায়দা শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিলেন। রাজার কাছে দূতেরা কি বলবে, তাও তারা তাদের মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্যামদূতেরা চতুর্দ্দশ লুইয়ের দরবারে গিয়ে তাদের রাজার প্রেরিত উপহারসম্ভার লুইকে দিয়ে জানালে যে, তাদের রাজা বহুদিন ধরে' খৃষ্টানদের পালন করছেন, খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁর খুব ভক্তি আছে। এমন কি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করতে তাঁর তেমন আপত্তিও নেই। ফ্রান্সের রাজা যদি দূত পাঠিয়ে শ্যামরাজকে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করতে অনুরোধ করেন, তা হ'লে তিনি নিশ্চয়ই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা নেবেন। পাদ্রীরা নিজেদের মতলব অনুসারে যে তাদের ঐ-সব কথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

চতুর্দ্দশ লুই শ্যাম-রাজ এবং তাঁর দূতদের কথা ও সৌজন্যে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। তার ওপর তিনি ভেবে চিন্তে দেখলেন যে, ওলন্দাজেরা জাভায় দিব্যি আড্ডা গেড়ে বসেছে এবং সেখান থেকে তারা মালাক্কা দ্বীপসমূহেও নজর দিচ্ছে। এই সময় যদি শ্যাম-রাজকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করতে পারা যায়, তাহ'লে প্রাচ্যখণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা তো হবেই, তা ছাড়া ভারত প্রদেশেও ব্যবসার পথ প্রসারিত হবে। এই-সব নানা দিক ভেবে তিনি শ্যাম-রাজ ফ্রা নারাইয়ের কাছে দূত প্রেরণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বলে' ঠিক করলেন।

চতুর্দ্দশ লুই শ্যাম-রাজার নিকটে যে মিশন প্রেরণ করেছিলেন তার কর্ত্তা ছিলেন শেভালিয়ার্ দ্য শোমোঁ। ইনি ম্যসিয় দা ফোর্‌বাঁ নামক একব্যক্তিকে তাঁর সহকারী ও জাহাজের কাপ্তেন নিযুক্ত করলেন। এই ব্যক্তি পরে ফরাসী নৌবহরের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী হয়েছিলেন। এই দুই জন ছাড়া প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে সেখানকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দু জন বড় বড় লোককে মিশনে নেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে একজন আবে দা শোজী এবং অপর ব্যক্তি পেয়ার তাশার্-আবে দ্য শোজী অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন; যেমন তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, লোকজনকে আলাপ-পরিচয়ে মোহিত

শ্যামদেশের রাজসভায় ফরাসী রাজনীতিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিগণ

করে' ফেল্‌বার ক্ষমতাও ছিল তাঁর অদ্ভুত। ধর্ম্মযাজক হ'লেও তিনি জুয়া-খেলা ও তার আনুষঙ্গিক ব্যসনগুলিতে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। আবে দা শোজী দেখিতে অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন, এবং হাজার রকম খেয়ালের মধ্যে স্ত্রীলোকের বেশ ভূষা প'রে আত্মগোপন ক'রে বেড়ানও তার একটা প্রধান সখ ছিল। স্ত্রীলোকের পোষাক পরার খেয়ালে তাঁর অনেক অর্থ ব্যয় হ'ত। মধ্যে মধ্যে তিনি স্ত্রীলোক সেজে কোনো কোনো হোটেলে গিয়ে থাক্‌তেন। এই সময় কত পুরুষ এসে যে তাঁর কাছে তাদের প্রেম নিবেদন করত তার ঠিকানা নেই। শ্যামদেশে যাত্রা করবার সময় তিনি তাঁর সঙ্গে এইসব পোষাক ও সরঞ্জাম নিতে ভুলে যান নি।

ফরাসী দূতদের শ্যাম-রাজ্যে যাত্রার খুব দীর্ঘ বিবরণ পাওয়া যায়। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ্ তারিখের সকাল আটটার সময় ওয়াজো (পাখী) জাহাজ ফরাসী দূতেদের নিয়ে শ্যাম রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ওয়াজোতে ছেচল্লিশটি কামান ছিল। এখানি ছাড়া তাদের সঙ্গে মালিঞ্‌ নামে একটি ছোট যুদ্ধজাহাজও ছিল। এই জাহাজে চব্বিশটি কামান, জনকয়েক সামরিক কর্ম্মচারী ও একদল যুবক ছিল। এই যুবকের দল নিজের ইচ্ছায় সেই বিপদসঙ্কুল কাজে অগ্রসর হয়েছিল। এরা ছাড়া ছয়জন বৈজ্ঞানিক, জ্যোতির্ব্বিদ ও আরো কয়েকজন পণ্ডিত লোক এই মিশনে যোগ দিয়েছিলেন। এঁরা কয়েকটা বড় দূরবীক্ষণ, তিনটি বড় ঘড়ি, কতকগুলি আয়না, অণুবীক্ষণ-যন্ত্র ও বিস্তর বই ও সঙ্গে নিয়েছিলেন।

৩রা মার্চ্চ্ তারিখে যাত্রা ক'রে পথে অনেক বিপদ্ আপদ্ কাটিয়ে তাঁরা সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি শ্যাম-রাজ্যের উপকূলে গিয়ে পৌঁছেন। পথের মধ্যে একবার ঝড়ে তাঁদের জাহাজ প্রায় নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল, তা' ছাড়া তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই রোগে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়েছিল। জাহাজ যখন জাভায় গিয়ে পৌঁছল তখন তাদের মধ্যে স্কার্ভি রোগ দেখা দিলে। এই রোগে জাহাজের প্রায় একশ লোক মারা যায়।

১৬৮৫ অব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে ওয়াজো ও মালিঞ্‌ মেনাম নদীতে প্রবেশ করে। কিন্তু নদীতে ঢুকে সহরের দিকে কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যাবে তারই বন্দোবস্ত করতে প্রায় পনেরো দিন তাদের এক জায়গায় জাহাজ নঙ্গর ক'রে রাখ্‌তে হয়। তাদের আগমন উপলক্ষে নদীর মোহানা থেকে আর রাজধানী পর্য্যন্ত কয়েক মাইল সাজান হয়েছিল। মধ্যে মধ্যে এক-একস্থানে এই ফরাসী অতিথিদের জন্য বাঁশের বাড়ী তৈরি ক'রে রাখা হয়েছিল। মাঝে মাঝে জাহাজ থেকে নেমে তাঁরা

এই-সব বাড়ীতে বিশ্রাম করতে করতে সহরের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। সহরের কাছে গিয়ে তাঁদের কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কারণ, তাঁরা যেদিন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন, সে দিনটা নাকি তেমন শুভদিন ছিল না। বৌদ্ধ পুরোহিতেরা গুণে' ঠিক করলেন যে, ৯ই অক্টোবর তারিখ তীরে অবতরণ করবার পক্ষে শুভদিন, ঠিক হ'ল ফরাসী দূত এবং তাঁর দলবল সেইদিনই শ্যামরাজ্যের রাজধানীতে পদার্পণ করবেন।

এই মিশনের মধ্যে ফ্রান্স্ থেকে কোন কবি আসেন নি বটে, কিন্তু কবি না হ'লেও তারা সকলেই শ্যামের গ্রাম ও তার প্রাকৃতিক শোভা দেখে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। শুদ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, সহরের বড় বড় প্যাগোডা আর বৌদ্ধ পুরোহিতদের সাজসজ্জা এবং উৎসবের আমোদ-প্রমোদ, সবই তাদের চোখে একটা নূতনত্ব জাগিয়ে তুলেছিল।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, শ্যামরাজ বছরে একবার মাত্র সাধারণের কাছে দেখা দিতেন। তার প্রাসাদ ও তার চারপাশে খানিকটা নিয়ে রাজার জন্য একটি সহর তৈরি করা হয়েছিল। এই সহরের চারদিক প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। অত্যন্ত জরুরী কাজ না পড়লে খাস রাজার সহরে বাইরের কারো প্রবেশাধিকার ছিল না।

১৪ই অক্টোবর তারিখে ফ্রান্সের দূত শোমেঁকে রাজার খাস সহরে প্রধান দরজার কাছেই একটা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। তখনো রাজার দেখা দেবার সময় হয় নি, কাজেই ফরাসী দূতের বিশ্রামের জন্য আগে থাকতেই সেখানে একটা বাড়ী তৈরি ক'রে রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে ফরাসী দূতকে কি ভাবে রাজ দরবারে হাজির করা হবে, এবং গিয়ে তাকে সেখানে দরবারের কোন্ কোন্ কায়দা মেনে চল্‌তে হবে, তাই নিয়ে আলোচনা চল্‌তে লাগ্‌ল।

এই সময় শ্যাম-রাজার দরবারে কন্‌স্‌তান্তা ফাল্‌কোন্ নামে একজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ইতিহাসে ম্যসিয় কন্‌স্‌তাঁস্ নামে খ্যাত। এই লোকটির চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। কেউ বলেছেন যে, তাঁর মত ধার্ম্মিক, বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কেউবা বলেছেন যে, তিনি যেমনি ভণ্ড তেমনি অবিশ্বাসী ও বদ্‌ লোক ছিলেন। কেউবা বলেন যে, তিনি বিষ খাইয়ে নরহত্যা করবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাঁকে খুব সজ্জন বলে' উল্লেখ করা হয়েছে।

ম্যসিয় কন্‌স্‌তাঁস্ গ্রীসের সেফালোনি নগরে এক বনিয়াদী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন যে, তার পিতা এক হোটেলের মালিক ছিলেন।
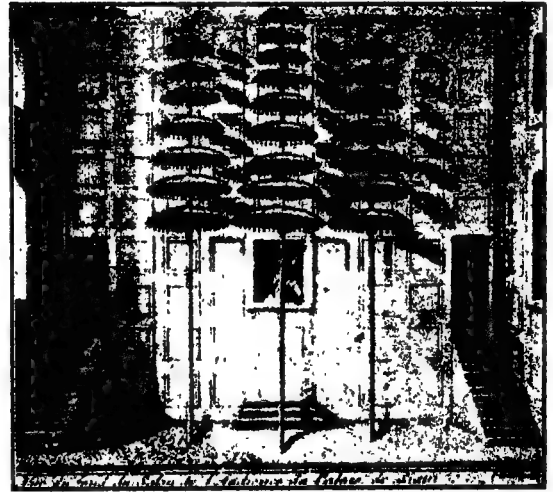
শ্যামদেশের রাজপ্রাসাদে রাজসাক্ষাৎকারভবনের একটি অংশ

দশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর স্বদেশ স্বজন ছেড়ে ইংরেজদের এক জাহাজে চাকরী নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হন। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে একটি চাকরী জোগাড় করেন। এই চাকরী-সূত্রেই তিনি শ্যামদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এখানে এসে তিনি স্বাধীনভাবে পোষাকের ব্যবসা শুরু করলেন। ক্রমে একটা জাহাজ কিনে নিকটবর্ত্তী দেশগুলিতেও তিনি ব্যবসা চালাতে আরম্ভ করে' দিলেন। এই ব্যবসায়ে কন্‌স্‌তাঁস্ বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন করছিলেন, এমন সময় একবার মালাবার উপকূলের কাছে ঝড়ে তাঁর জাহাজ ডুবে গিয়ে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন। জাহাজ-ডুবি হওয়ার পর তিনি দু-হাজার একিউ (ফরাসী রৌপ্যমুদ্রা) ভরা এক থলি নিয়ে কোনো রকমে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় কূলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ
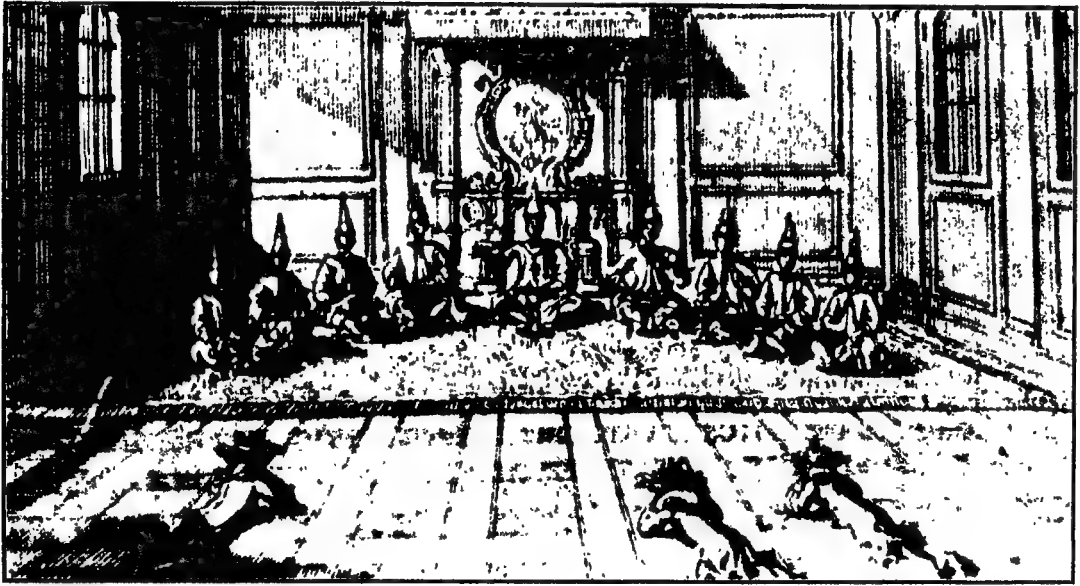
ফরাসী রাজদূতগণ শ্যামদেশের রাজাকে অভিবাদন করিতেছেন

করে' তাঁর শরীর এমন অবসন্ন হ'য়ে পড়ল যে, আশ্রয়ের জন্য আর কোথাও যেতে না পেরে সেইখানেই অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় পড়ে' রইলেন। এইখানে, এই অবস্থায় তিনি একদিন ও একরাত্রি পড়ে' ছিলেন। পরদিন ভোর-বেলায় জ্ঞান হবার কিছু পরে তিনি একজন লোককে দেখ্‌তে পেলেন। এই লোকটিও আর একখানি জাহাজ ধ্বংস হওয়ায় কোনো রকমে তীরে এসে পৌঁছেছিল। তার সঙ্গে কথা বল্‌তেই কন্‌স্তাঁস্ তাকে শ্যামদেশের লোক বলে' চিন্‌তে পার্‌লেন। শেষে তিনি জান্‌তে পার্‌লেন যে, সে শ্যামরাজের দূত হ'য়ে পারস্যে যাত্রা করেছিল, পথে জাহাজ ডুবে যাওয়ায় তারও এই দুর্দ্দশা হয়েছে।

কন্‌স্তাঁস্ সেই অর্থ দিয়ে একখানা ছোটখাট জাহাজ কিনে সেই লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে শ্যাম দেশে ফিরে এলেন। এই ব্যক্তি কন্‌স্তাসের উপকার ভোলে নি। রাজদর্‌বারে তার খুব খাতির ছিল, দেশে ফিরেই সে কন্‌স্তাঁস্‌কে রাজার কাছে নিয়ে যায়। এবং রাজার সঙ্গে পরিচয় হবার পর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি রাজার একজন প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠ্‌লেন। কন্‌স্তাস শ্যামরাজ্যে খুব প্রতিপত্তি করেছিলেন, এবং নিজের অধ্যবসায়ের জোরে প্রভূত অর্থও উপার্জ্জন করেছিলেন। এই সময় মান্দারিনেরা তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র ক'রে তাঁকে হত্যা করে।

কন্‌স্তাসের জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে শ্যাম দেশের যে-রাজার কাছে তিনি কাজ করতেন সেই রাজারও কিছু কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়। ইতিহাসে এই রাজাকে ফ্রা-নারাই অথবা ফ্রা-চৌ-চম্পক বলা হয়েছে। এই রাজা ত্রিশ বৎসরের বেশী রাজত্ব করেছিলেন। তিনি খুব উদার ছিলেন এবং সমস্ত বিষয় শেখ্‌বার তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। রাজ্যের সমস্ত ব্যাপারেই তার লক্ষ্য থাক্‌ত এবং ইউরোপ ও এসিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করতেন। ফ্রা-নারাইয়ের রাজত্বের সময় যদিও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনেক বর্ব্বর শাস্তির প্রচলন ছিল, কিন্তু সে-সকল শাস্তির তুলনায় তার শাস্তির ব্যবস্থা আরও কঠিন ছিল। তিনি মিথ্যাবাদীদের জিভ কেটে ফেল্‌তেন এবং নিন্দুক রমণীদের মুখ সেলাই করে' দিতেন। একদিকে তিনি প্রজাদের অন্যায়ের জন্য যেমন কঠিন সাজা দিতেন, তেমনি আবার ভাল কাজের জন্য তাদের পুরস্কৃত করতেন।
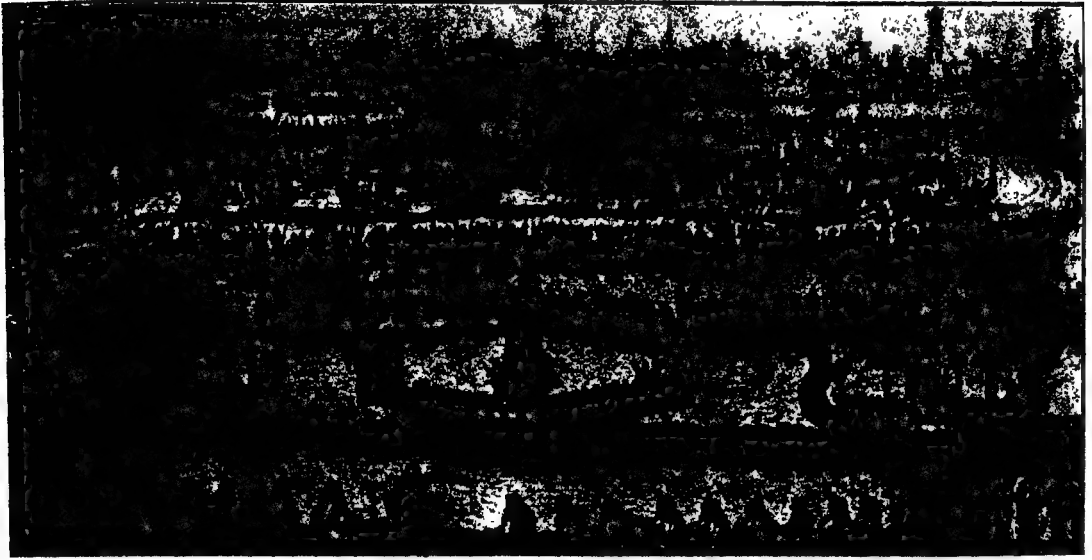
শ্যামদেশের রাজধানীর অভিমুখে ফরাসী রাজদূতগণকে বহন করিয়া সাম্পান্ নৌকাগুলির সমারোহ-যাত্রা

একবার একজন বৌদ্ধ পুরোহিত রাজাকে গিয়ে বলেন যে, তিনি এই কঠিন সাজার ব্যবস্থা করেছেন বলে' প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের সূচনা হয়েছে এবং তারা রাজার বিরুদ্ধে নানা কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছে। রাজা ধীর ভাবে পুরোহিতের কথা শুনলেন এবং তখন তাঁকে কিছু না বলেই বিদায় দিলেন। কয়েকদিন বাদে তিনি সেই পুরোহিতের বাড়ীতে এক সাংঘাতিক বাঁদর পাঠিয়ে দিয়ে বলে' পাঠালেন যে, যতক্ষণ অন্য কিছু আদেশ প্রেরিত না হচ্ছে, ততক্ষণ সেই বাঁদর তাঁর বাড়ীতে যা ইচ্ছা তাই করে' বেড়াবে, তাতে বাধা দেবে না। পুরোহিত বেচারা রাজার প্রেরিত বাঁদরকে সম্মানের সঙ্গে গৃহে স্থান দিলেন। বাঁদর বাড়ীতে ঢুকেই পুরোহিতের জিনিষপত্র ভেঙ্গে তচনচ করে' ফেল্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে সে বেচারা রাজাকে গিয়ে তাঁর বাঁদরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বল্‌লেন। রাজা তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লেন—"কি! তুমি একটা বাঁদরের অত্যাচার তিন চার দিন সহ্য কর্‌তে পারছ না? আর তুমি আশা কর যে, আমি এই বাঁদরের চেয়ে সহস্রগুণ বদ্‌মাইস প্রজাদের অত্যাচার সমস্ত জীবন ধরে' সহ্য করব?" তার পর নানারকম উপদেশ দিয়ে তিনি পুরোহিতকে বিদায় দিলেন।

যাক্, আমরা আসল কথা থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি। চতুর্দ্দশ লুইয়ের দূত শ্যামরাজের প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন, আর কি ভাবে তাঁদের দর্‌বারে নিয়ে যাওয়া হবে তারই বন্দোবস্ত চল্‌তে লাগ্‌ল। এই সম্পর্কে মাসিয় কনস্‌তাঁসের সঙ্গে মাসিয় দ্য শোমোঁর কথাবার্ত্তা চল্‌তে লাগ্‌ল। ফ্রান্সের রাজা দূতের হাতে শ্যাম-রাজকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন সেই চিঠিখানা শ্যামরাজের হাতে কি ভাবে দেওয়া হবে প্রথমে তারই আলোচনা সুরু হ'ল। মাসিয় দ্য শোমোঁ বল্‌লেন যে, তিনি সোজাসুজি দর্‌বারে গিয়ে রাজার হাতে সেই চিঠিখানা দেবেন। কিন্তু রাজকর্ম্মচারীরা এ ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ কর্‌তে লাগ্‌ল। প্রথমতঃ রাজার অত নিকটে যাওয়া শ্যামদেশের প্রথার বিরোধী, দ্বিতীয়তঃ রাজার কাছে গিয়ে তাঁর হাতে চিঠি দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ দর্‌বারে তিনি এত উঁচু জায়গায় বস্‌তেন যে, নীচে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সেখানকার লাগাল পাওয়া যেত না। বিদেশী দূতদের অভ্যর্থনা করার জন্য রাজ-প্রাসাদে যে দর্‌বার-ঘর ছিল তারই একদিকের দেওয়ালে উঁচু জায়গায় একটা জানালা ছিল। রাজা ভিতর থেকে এসে সেই জানালার সম্মুখে বস্‌তেন। তার পর তিনি জানালার

শ্বেত-হস্তীপৃষ্ঠে শ্যামদেশের রাজা

পর্দা সরিয়ে দিয়ে সেইখানে বসে' দূতকে দেখা দিতেন। অনেক কথা-কাটাকাটির পর স্থির হ'লো যে, একটা লম্বা সোনার হাতলের ডগায় একটা সোনার বাটি বসিয়ে দেওয়া হবে, আর সেই বাটিতে চতুর্দ্দশ লুইয়ের চিঠিখানা থাকবে। ফরাসী দূতের জন্য একটা উঁচু জায়গা করা হবে, তিনি সেই হাতলটা রাজার দিকে এগিয়ে ধর্‌বেন আর রাজা সেই বাটি থেকে চিঠিখানা তুলে নেবেন। ফরাসী দূতের সঙ্গে আর যে-সব লোক দর্‌বারে যাবে তারা সেখানে গিয়ে কি ভাবে বস্‌বে বা দাঁড়াবে তাই নিয়েও অনেক তর্কাতর্কি চলেছিল। ফরাসী দূত বল্‌লেন যে, তাঁর অনুচরেরা তাঁর সঙ্গেই রাজসভায় প্রবেশ করবে এবং রাজাকে ফরাসী কায়দায় সেলাম করবে। শ্যামরাজের কাছে থেকে চতুর্দ্দশ লুইয়ের দর্‌বারে যাদের পাঠান হয়েছিল, তারা দর্‌বারে গিয়ে মাটিতে উপুড় হ'য়ে পড়ে' সেলাম করেছিল, কিন্তু ফরাসী দূত এই ভাবে শ্যামরাজকে সেলাম দিতে ভয়ানক আপত্তি জানালেন। অবশেষে ঠিক হ'ল যে, ফরাসী দূতের অনুচরদের বস্‌বার জন্য মাটিতে আসন পেতে দেওয়া হবে, কিন্তু এমন কায়দায় তাদের বস্‌তে হবে যে, জুতোর তলা যেন দেখ্‌তে না পাওয়া যায়। এই-সব ব্যবস্থা ঠিক হ'য়ে যাবার পর জ্যোতিষীরা দিনক্ষণ দেখে ঠিক করে' দিলেন যে, ১৮ই অক্টোবর রাজার সঙ্গে দেখা কর্‌বার পক্ষে বিশেষ শুভদিন। ঠিক হ'ল সেই দিনেই ফরাসী দূতের অভ্যর্থনার আয়োজন করা হবে।

ফরাসী রাজসভায় শ্যামদেশের রাজদূত

১৮ই অক্টোবর তারিখের প্রাতঃকালে শ্যামরাজ্যের দু-জন বড় রাজকর্ম্মচারী ফরাসী দূতকে দর্‌বারে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর বাড়ীতে এসে দেখা দিলেন। এঁদের সঙ্গে চল্লিশ জন মান্দারিন এসেছিল। ফরাসী দূত একটা সোনার বাক্সে সেই চিঠিখানা রেখে বাক্সটা একটা লম্বা সোনার হাতায় বসিয়ে ঠিক হ'য়েছিলেন। মান্দারিনরা এসে সেই চিঠির সম্মুখে শুয়ে প'ড়ে ফ্রান্সের রাজার প্রতি সম্মান জানালে। অবশেষে ফরাসী দূত আবে দ্য শোয়াজীর হাতে চিঠির আধারটি দিলেন। পরে মহা-সমারোহে শোভাযাত্রা করে' তাঁদের প্রাসাদের দিকে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

এই শোভাযাত্রা নদীপথে প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হ'ল। চতুর্দ্দশ লুইয়ের চিঠি একটা বড় শাম্পানে নিয়ে গিয়ে রাখা হ'ল। চিঠি রাখ্‌বার জন্য আগেই সেই শাম্পানে একটা উঁচু বেদী তৈরি করা হয়েছিল। এর পিছনেই ম্যসিয় দ্য শোমোঁ ও তারপরে আবে দ্য শোয়াজীর শাম্পান চল্‌ল। এদের শাম্পান ছাড়া শ্যাম-রাজ্যের অনেক কর্ম্মচারীই সুন্দর সুন্দর সুসজ্জিত শাম্পানে গিয়ে দূতকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন, তাঁরাও এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের পরেই ফরাসী দূতের অনুচর ও জাহাজের কর্ম্মচারীদের শাম্পান; তার পরেই একশত শাম্পান কেবল মান্দারিনদের নিয়ে তাদের অনুসরণ করতে লাগ্‌ল। এই শোভাযাত্রায় নাকি ইংরেজ, ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ, চীন, জাভা প্রভৃতি চল্লিশটি ভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দিতে এসেছিলেন। শোভা-যাত্রা দেখ্‌বার জন্য নদীর দু-দিকে বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, আর তারা সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে ফরাসী রাজের চিঠির প্রতি তাদের গভীর সম্মান জানিয়ে-ছিল।

শাম্পানগুলি ঘাটে গিয়ে থাম্‌বার পর ফরাসী রাজের চিঠিখানা নামিয়ে একটা তিনতলা সাজান গাড়ীতে রাখা হ'ল। তার পেছনে ম্যসিয় দ্য শোমোঁ এক গদী-মোড়া চেয়ারে বসে' দশ বেহারার কাঁধে উঠ্‌লেন, তাঁর পশ্চাতেই আবে দ্য শোয়াজীর চেয়ার। আবের চেয়ার আটজন লোকে বইতে লাগ্‌ল। আবে তাঁর এক বন্ধুকে এই শোভাযাত্রার সমারোহের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে,—আমি জীবনে এরকম শোভাযাত্রা কখনো দেখি নি, আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে, আমি যেন পোপ হয়েছি।" ফরাসী দূতের অনুচরেরা ও শ্যামরাজ্যের কর্ম্মচারীরা এই শোভাযাত্রার পশ্চাতে ঘোড়ায় চড়ে' অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল।

প্রাসাদের বাহিরের দরজার কাছে এসে সেই বিরাট্‌ শোভা যাত্রা দাঁড়াল। তার পর ম্যসিয় দ্য শোমোঁ তাঁর চেয়ার থেকে নেমে গাড়ী থেকে সেই চিঠিখানা নিয়ে এসে আবে দ্য য়োজরর হাতে দিলেন। তার পর তাঁরা প্রাসাদের মধ্যে ঢুকলেন। প্রাসাদের মধ্যে গোলক-ধাঁধার মত গলিপথ পার হ'য়ে তাঁরা একটা বড় উঠানে এসে পড়্‌লেন। এই উঠানের দুই দিকে সারবন্দি ভাবে সোনার ঢাল নিয়ে হাঁটু গেড়ে সৈন্যেরা বসেছিল, তার মধ্যে দিয়ে তাঁরা পার হ'য়ে গেলেন। আরও কিছু-ক্ষণ চলার পর তাঁরা আর-একটা বড় উঠানে এসে পড়্‌লেন। এই উঠানের চারিদিকে সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে তিনশত সৈন্য ও একশত হাতী দাঁড় করান হয়েছিল। এদের মধ্যে দিয়ে চলে' গিয়ে তাঁরা আর একটা বড় উঠানে এলেন। এই উঠানের ঠিক মাঝখানে শ্যামদেশের চির-বিখ্যাত পবিত্র একটি শ্বেত-হস্তীকে সাজিয়ে রাখা হয়ে-ছিল। তাঁরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'তেই শ্বেতহস্তী তাঁদের সেলাম জানালে। এই হাতীর চারদিকে চারজন মান্দারিন পাখা হাতে নিয়ে তার গায়ে বাতাস করছিল ও মাছি তাড়াচ্ছিল। পাছে হাতীর গায়ে রদ্দুর লাগে, সেজন্য প্রকাণ্ড একটা ছাতার নীচে তাকে দাঁড় করান হয়েছিল। হাতী শুঁড় তুলে ফরাসী দূতকে সেলাম জানালে। ফরাসী দূত ও তাঁর অনুচরেরা এর পরে আরো দুটো বড় বড় উঠান পার হ'য়ে গেলেন। এই উঠানে শ্যামরাজ্যের বড় বড় কর্ম্মচারীরা তাঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এখান থেকে তাঁরা শেষে রাজার খাস দরবারগৃহে প্রবেশ করলেন।

দরবারগৃহে ফরাসীদের প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন ঠিক করা ছিল। ম্যসিয় শোমোঁ এবং আবে ছাড়া সকলেই নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়ে সিংহাসনের দিকে মুখ করে' বস্‌লেন। তার পর সব চুপ্‌চাপ্‌। হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে ভেঁপু বেজে উঠ্‌ল; সঙ্গে-সঙ্গেই নানা-রকম বাজনা বাজিয়ে রাজার আগমনের সময় ঘোষণা করা হ'ল। রাজা আস্‌ছেন শুনে, ফরাসীরা পা ঢাকতে লাগ্‌ল, ওদিকে মান্দারিনেরা গড়াগড় উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়্‌ল। মান্দারিনদের হঠাৎ সেইভাবে শুয়ে পড়া ও তটস্থ ভাবভঙ্গী দেখে ফরাসীদের পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা নাকি দুষ্কর হ'য়ে উঠেছিল।

মাঝে মাঝে থেমে থেমে ছ-বার সেই রকম বাজনা বাজার পর দরবার-ঘরে যে জানালায় রাজা দেখা দিতেন সেই জানালার পর্দা সরে' গেল—রাজা দেখা দিলেন।

রাজার মাথায় মণিমুক্তা-খচিত একটি মুকুট, অঙ্গে দামী লাল রেশমের উপর সোনার-কাজ-করা পোষাক। কোমরে একটি মুক্তার কোমরবন্ধ, তাতে একটি ছোরা ঝোলানো, মণিবন্ধে ও আঙুলে হীরার গহনা।

রাজা দর্শন দেবার একটু পরেই ফরাসী দূত ও তাঁর পশ্চাতে আবে ঢুক্‌লেন। ম্যসিয় দ্য শোমোঁ ঘরে ঢুকেই ফরাসী কায়দায় রাজাকে গভীর সম্মান জানালেন। আবের হাতে সোনার পাত্রে সেই চিঠিখানা ছিল, কাজেই তাঁকে দাঁড়িয়েই থাক্‌তে হ'ল। শোমোঁ দরবার-গৃহের মাঝামাঝি গিয়ে রাজাকে আর-একবার সম্মান জানিয়ে, রাজার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শেষ কর্‌লেন। বক্তৃত শেষ হ'য়ে যাওয়ার পর তিনি টুপি খুলে ফেলে তাঁর রাজার চিঠিভরা সেই পাত্র হাতল ধরে' রাজার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। এই সময় একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল। ফরাসীদূত সেই হাতলটা উঁচু করে' ধর্‌লেন বটে, কিন্তু হাতলটা ছোট হওয়ায় সেটা রাজার কাছে পৌছল না। শোমোঁ ইচ্ছা কর্‌লেই আর-একটু উঁচু হ'য়ে চিঠিখানা একেবারে রাজার কাছ অবধি এগিয়ে ধর্‌তে পার্‌তেন, কিন্তু তিনি হয়ত মনে কর্‌লেন যে, তা কর্‌লে তাঁর সম্মানের হানি হবে, তাই তিনি কেবল হাতলটা এগিয়ে ধরেই রইলেন। কন্‌স্তাঁস্ তাঁর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, অবস্থা সঙ্গীন দেখে তিনি চীৎকার করে' বল্‌লেন—"আরও একটু উঁচু করে' ধরুন।" ইতিমধ্যে রাজা একটু ইতস্ততঃ করে' হাস্‌তে হাস্‌তে জান্‌লা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে' চতুর্দ্দশ লুইয়ের চিঠিখানা তুলে নিলেন।

শ্যামরাজ পার্চ্চমেণ্ট কাগজের সেই চিঠিখানা তুলে নিয়ে কপাল অবধি হাতখানি তুলে চিঠির প্রতি সম্মান জানালেন। তার পর মধুরভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে ফরাসী দূতকে বল্‌লেন যে, ফ্রান্সের সঙ্গে চিরশান্তি ও চতুর্দ্দশ লুইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করার চেয়ে উচ্চ বাসনা তাঁর আর নেই। তিনি দূতকে ধন্যবাদ জানিয়ে বল্‌লেন যে, এই পত্রের উত্তর তিনি দূত মারফতে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেবেন। শোমোঁর পরে শোয়াজী রাজাকে সম্মান জানিয়ে রাজাকে লুই-প্রেরিত উপহারসম্ভার দিলেন। রাজা তাঁকেও এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্‌লেন। এর পরে সভাস্থল নীরব হ'ল। আবার তূর্য্যধ্বনি ও সেইরকম বাজ্‌না বেজে উঠ্‌ল। রাজা নিজে তাঁর সম্মুখের পর্দ্দা টেনে দিয়ে অন্তর্দ্ধান কর্‌লেন।

ফরাসী দূত ও তাঁর অনুচরবৃন্দ এর পরে শ্যামদেশের রাজধানীতে প্রায় তিন সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন। এর পরে তাঁরা রাজধানী থেকে কয়েক মাইল উত্তরে লোপবুরী নামক স্থানে গিয়েছিলেন। এই স্থানটিতে রাজার পল্লী-নিবাস ছিল। রাজা বৎসরের মধ্যে সাত আট মাস কাল এই স্থানেই বাস কর্‌তেন। ফরাসী দূতদের বাস, আহার ও আমোদ-প্রমোদের জন্য শ্যামরাজ প্রচুর আয়োজন করেছিলেন। তাদের আগমন উপলক্ষে আতস্-বাজী, নাচ, গান, অভিনয় ইত্যাদি অনেক রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ ছাড়া তাদের বাঘের লড়াই দেখান এবং তাদের নিয়ে হাতী শিকারেও যাওয়া হয়েছিল। হাতী শিকার ব্যাপারটা ফরাসীদের চোখে যেমন নূতন তেমনই অদ্ভুত ঠেকেছিল। রাজার হুকুমে তাঁরা মন্দিরের মধ্যে গিয়ে সোনার বুদ্ধমূর্ত্তি এবং রাজার বাড়ীর নানারকমের সোনার মূর্ত্তি দেখ্‌বারও সুযোগ পেয়েছিলেন।

সেখানকার দরিদ্র অধিবাসীদের সম্বন্ধে আবে লিখেছেন যে, তাদের বাড়ীতে পরিচ্ছন্নতা যেন মূর্ত্তিমন্ত হ'য়ে বিরাজ কর্‌ছে। তাদের বাড়ীতে গেলে একপাল ছেলেপিলে এসে তোমাকে ঘিরে দাঁড়াবে ও গৃহ-কর্ত্তা চা দিয়ে অতিথিকে অভ্যর্থনা কর্‌বে।

এত আনন্দ, হুজুক ও গোলমালের মধ্যেও কিন্তু শোমোঁ রাজাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করার কথা ভোলেননি। ফ্রা-নারাই শোমোঁর প্রস্তাব শুনে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁর অসম্মতি জ্ঞাপন করে' বল্‌লেন যে, তিনি যে ধর্ম্ম অবলম্বী, সে ধর্ম্ম দু-হাজার দুইশত উনত্রিশ বর্ষ কাল অপ্রতিহতভাবে এই রাজত্বে নিজের মহিমা প্রচার করে' এসেছে। এই ধর্ম্ম ত্যাগ করে' ফ্রান্সের রাজা কেন যে তাঁকে অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন কর্‌তে অনুরোধ কর্‌ছেন তার মর্ম্ম তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন না।

যাই হোক, শোমোঁ ফ্রা-নারাইকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত কর্‌তে না পার্‌লেও তিনি শ্যামের সঙ্গে

ফ্রান্সের বন্ধুত্বের বন্ধন খুব দৃঢ় করে' এলেন। দেশে ফেরবার সময় তিনি ফ্রা-নরাইয়ের কাছ থেকে তিন জন দূত ও বারোজন মান্দারিনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এ ছাড়া তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন যুবক ফ্রান্সে লেখা-পড়া শিখ্‌তে এসেছিল। শ্যামরাজ ফরাসী পাদ্রিদের তাঁর রাজত্বে বাস করতে এবং সেখানে তাঁদের ধর্ম্ম প্রচার করবার অধিকার দান করে' এক সন্ধিপত্র লিখে দিলেন। এ ছাড়া ক্যাথলিক মাত্রকেই তিনি কতকগুলি কর থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। পরে শ্যামদেশের সঙ্গে ফ্রান্সের ব্যবসা-সম্বন্ধেও এক সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে কাঁপাঞি দেজ্ অ্যাঁদ্‌কে (ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে) সেখানে ব্যবসার বিপুল সুবিধা দেওয়া হয়। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ম্যসিয় দ্য ফোর্‌ব্যাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্যাম দেশে এক কাজের ভার নিয়ে থাকতে হয়েছিল। ফোর্‌ব্যাঁকে যে পদে নিযুক্ত করা হ'ল সে পদের নাম ফ্রা সাহ্‌দি তুঙ্গক্রম রাজ সেনাপতি ও মীর-বহর। শ্যামরাজ্যের কোনো দিক দিয়েই যেন শত্রু আক্রমণ করতে না পারে এমন ভাবে রাজ্যটিকে সুরক্ষিত করে' তোল্‌বার ভার তাঁর উপর দেওয়া হ'ল।

শ্যাম ও ফ্রান্সের বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ শ্যামদূত ফ্রান্স থেকে তাঁদের দেশে ফরাসী সৈন্য ও ইঞ্জিনীয়ার নিয়ে এলেন। ১৬৮৭ অব্দে ফিল্ড্ মার্শাল দেফার্জের অধীনে দুই দল ফরাসী সৈন্য শ্যামরাজ্যে পাঠান হয়। এদের মধ্যে কিছু সৈন্য ব্যাঙ্কক এবং কিছু সৈন্য মাগুইতে রাখা হ'ল। এই স্থানটি ঠিক ভারতের পণ্ডিচেরী সহরের বিপরীত দিকে। এই ভাবে তারা নিজেদের রাজ্যের প্রধান দরজার চাবিগুলি ফরাসীদের হাতে বিশ্বাস করে' ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই দুই রাজ্যের মধ্যে যখন একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাকা হ'য়ে উঠ্‌বার চিহ্ন চারিদিক দিয়ে ফুটে উঠ্‌ছিল, ঠিক তারই দু-বছর পরে ফ্রান্সের রাজ-দরবারে একটা বিষম হাঙ্গামা বেধে ভবিষ্যতের অনেক আশাই একেবারে নির্ম্মূল করে' দিল।

শ্রী পরেশচন্দ্র শর্ম্মা

দূত

(জ্ঞানদাস বর্ণেলী)

সোনালী পোষাকে হে দূত যখন,
রজনী হইলে ভোর—
দেখা দিলে আসি সুরভিত শ্বাসে
চিত্ত জাগিল মোর।
মধ্য দিনের উজ্জল বেশে
আসিলে হে দূত যবে,
করিল উদাস মোর তনু মন,
তখন কি কথা হবে ?
গেরুয়া আকাশে ছড়াইলে যবে
সন্ধ্যার সুরজাল,
মরণের মত গম্ভীর অতি
এল সে রাত্রিকাল !
তার পর দূত বিরাট্ পত্র
দিলে মোরে কোন্ ছলে ;
অসিত-বরণ কাগজ তাহার,
জ্যোতির আখর জ্বলে !
তোমারে দেখিয়া ভুলেছিনু, দূত,
ভ'রেছিল মোর মন,
তুমি যার দূত পত্র দেখিয়া
বুঝিব কেমন জন ?

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

রাজার মাথায় মণিমুক্তা-খচিত একটি মুকুট, অঙ্গে দামী লাল রেশমের উপর সোনার-কাজ-করা পোষাক। কোমরে একটি মুক্তার কোমরবন্ধ, তাতে একটি ছোরা ঝোলানো, মণিবন্ধে ও আঙুলে হীরার গহনা।

রাজা দর্শন দেবার একটু পরেই ফরাসী দূত ও তাঁর পশ্চাতে আবে ঢুকলেন। ম্যসিয় দ্য শোমোঁ ঘরে ঢুকেই ফরাসী কায়দায় রাজাকে গভীর সম্মান জানালেন। আবের হাতে সোনার পাত্রে সেই চিঠিখানা ছিল, কাজেই তাঁকে দাঁড়িয়েই থাকতে হ'ল। শোমোঁ দরবার-গৃহের মাঝামাঝি গিয়ে রাজাকে আর-একবার সম্মান জানিয়ে, রাজার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। বক্তৃত শেষ হ'য়ে যাওয়ার পর তিনি টুপি খুলে ফেলে তাঁর রাজার চিঠিভরা সেই পাত্র হাতল ধরে' রাজার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। এই সময় একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল। ফরাসীদূত সেই হাতলটা উঁচু করে' ধরলেন বটে, কিন্তু হাতলটা ছোট হওয়ায় সেটা রাজার কাছে পৌছল না। শোমোঁ ইচ্ছা করলেই আর-একটু উঁচু হ'য়ে চিঠিখানা একেবারে রাজার কাছ অবধি এগিয়ে ধরতে পারতেন, কিন্তু তিনি হয়ত মনে করলেন যে, তা করলে তাঁর সম্মানের হানি হবে, তাই তিনি কেবল হাতলটা এগিয়ে ধরেই রইলেন। কন্‌স্তাঁস্ তাঁর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, অবস্থা সঙ্গীন দেখে তিনি চীৎকার করে' বললেন—"আরও একটু উঁচু করে' ধরুন।" ইতিমধ্যে রাজা একটু ইতস্ততঃ করে' হাস্‌তে হাস্‌তে জান্‌লা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে' চতুর্দ্দশ লুইয়ের চিঠিখানা তুলে নিলেন।

শ্যামরাজ পার্চ্চমেণ্ট কাগজের সেই চিঠিখানা তুলে নিয়ে কপাল অবধি হাতখানি তুলে চিঠির প্রতি সম্মান জানালেন। তার পর মধুরভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে ফরাসী দূতকে বললেন যে, ফ্রান্সের সঙ্গে চিরশান্তি ও চতুর্দ্দশ লুইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করার চেয়ে উচ্চ বাসনা তাঁর আর নেই। তিনি দূতকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন যে, এই পত্রের উত্তর তিনি দূত মারফতে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেবেন। শোমোঁর পরে শোয়াজী রাজাকে সম্মান জানিয়ে রাজাকে লুই-প্রেরিত উপহারসম্ভার দিলেন। রাজা তাঁকেও এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। এর পরে সভাস্থল নীরব হ'ল। আবার তূর্য্যধ্বনি ও সেইরকম বাজ্‌না বেজে উঠ্‌ল। রাজা নিজে তাঁর সম্মুখের পর্দা টেনে দিয়ে অন্তর্দ্ধান করলেন।

ফরাসী দূত ও তাঁর অনুচরবৃন্দ এর পরে শ্যামদেশের রাজধানীতে প্রায় তিন সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন। এর পরে তাঁরা রাজধানী থেকে কয়েক মাইল উত্তরে লোপবুরী নামক স্থানে গিয়েছিলেন। এই স্থানটিতে রাজার পল্লী-নিবাস ছিল। রাজা বৎসরের মধ্যে সাত আট মাস কাল এই স্থানেই বাস করতেন। ফরাসী দূতদের বাস, আহার ও আমোদ-প্রমোদের জন্য শ্যামরাজ প্রচুর আয়োজন করেছিলেন। তাদের আগমন উপলক্ষে আতস্-বাজী, নাচ, গান, অভিনয় ইত্যাদি অনেক রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ ছাড়া তাদের বাঘের লড়াই দেখান এবং তাদের নিয়ে হাতী শিকারেও যাওয়া হয়েছিল। হাতী শিকার ব্যাপারটা ফরাসীদের চোখে যেমন নূতন তেমনই অদ্ভুত ঠেকেছিল। রাজার হুকুমে তাঁরা মন্দিরের মধ্যে গিয়ে সোনার বুদ্ধমূর্ত্তি এবং রাজার বাড়ীর নানারকমের সোনার মূর্ত্তি দেখ্‌বারও সুযোগ পেয়েছিলেন।

সেখানকার দরিদ্র অধিবাসীদের সম্বন্ধে আবে লিখেছেন যে, তাদের বাড়ীতে পরিচ্ছন্নতা যেন মূর্ত্তিমন্ত হ'য়ে বিরাজ করছে। তাদের বাড়ীতে গেলে একপাল ছেলেপিলে এসে তোমাকে ঘিরে দাঁড়াবে ও গৃহ-কর্ত্তা চা দিয়ে অতিথিকে অভ্যর্থনা করবে।

এত আনন্দ, হুজুক ও গোলমালের মধ্যেও কিন্তু শোমোঁ রাজাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করার কথা ভোলেননি। ফ্রা-নারাই শোমোঁর প্রস্তাব শুনে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাঁর অসম্মতি জ্ঞাপন করে' বললেন যে, তিনি যে ধর্ম্ম অবলম্বী, সে ধর্ম্ম দু-হাজার দুইশত উনত্রিশ বর্ষ কাল অপ্রতিহতভাবে এই রাজত্বে নিজের মহিমা প্রচার করে' এসেছে। এই ধর্ম্ম ত্যাগ করে' ফ্রান্সের রাজা কেন যে তাঁকে অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করতে অনুরোধ করছেন তার মর্ম্ম তিনি বুঝ্‌তে পারলেন না।

যাই হোক, শোমোঁ ফ্রা-নারাইকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করতে না পারলেও তিনি শ্যামের সঙ্গে

ফ্রান্সের বন্ধুত্বের বন্ধন খুব দৃঢ় করে' এলেন। দেশে ফেরবার সময় তিনি ক্রা-নরাইয়ের কাছ থেকে তিন জন দূত ও বারোজন মান্দারিনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এ ছাড়া তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন যুবক ফ্রান্সে লেখা-পড়া শিখ্‌তে এসেছিল। শ্যামরাজ ফরাসী পাদ্রিদের তাঁর রাজত্বে বাস করতে এবং সেখানে তাঁদের ধর্ম্ম প্রচার করবার অধিকার দান করে' এক সন্ধিপত্র লিখে দিলেন। এ ছাড়া ক্যাথলিক মাত্রকেই তিনি কতকগুলি কর থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। পরে শ্যামদেশের সঙ্গে ফ্রান্সের ব্যবসা-সম্বন্ধেও এক সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে কঁাপাঞি দেজ্ অঁ্যাদ্‌কে (ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে) সেখানে ব্যবসার বিপুল সুবিধা দেওয়া হয়। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ম্যাসিয় দ্য ফোর্‌ব্যাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্যাম দেশে এক কাজের ভার নিয়ে থাকতে হয়েছিল। ফোর্‌ব্যাঁকে যে পদে নিযুক্ত করা হ'ল সে পদের নাম ক্রা সাহ্‌দি তুঙ্গক্রম রাজ সেনাপতি ও মীর-বহর। শ্যামরাজ্যের কোনো দিক দিয়েই যেন শত্রু আক্রমণ করতে না পারে এমন ভাবে রাজ্যটিকে সুরক্ষিত করে' তোল্‌বার ভার তাঁর উপর দেওয়া হ'ল।

শ্যাম ও ফ্রান্সের বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ শ্যামদূত ফ্রান্স থেকে তাঁদের দেশে ফরাসী সৈন্য ও ইঞ্জিনীয়ার নিয়ে এলেন। ১৬৮৭ অব্দে ফিল্ড্ মার্শাল দেফার্জের অধীনে দুই দল ফরাসী সৈন্য শ্যামরাজ্যে পাঠান হয়। এদের মধ্যে কিছু সৈন্য ব্যাঙ্কক এবং কিছু সৈন্য মার্গুইতে রাখা হ'ল। এই স্থানটি ঠিক ভারতের পণ্ডিচেরী সহরের বিপরীত দিকে। এই ভাবে তারা নিজেদের রাজ্যের প্রধান দরজার চাবিগুলি ফরাসীদের হাতে বিশ্বাস করে' ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই দুই রাজ্যের মধ্যে যখন একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাকা হ'য়ে উঠ্‌বার চিহ্ন চারিদিক দিয়ে ফুটে উঠ্‌ছিল, ঠিক তারই দু-বছর পরে ফ্রান্সের রাজ-দরবারে একটা বিষম হাঙ্গামা বেধে ভবিষ্যতের অনেক আশাই একেবারে নির্ম্মূল করে' দিল।

শ্রী পরেশচন্দ্র শর্ম্মা

দূত

(জ্ঞানদাস বর্ষেলী)

সোনালী পোষাকে হে দূত যখন,
রজনী হইলে ভোর—
দেখা দিলে আসি সুরভিত শ্বাসে
চিত্ত জাগিল মোর।
মধ্য দিনের উজ্জ্বল বেশে
আসিলে হে দূত যবে,
করিল উদাস মোর তনু মন,
তখন কি কথা হবে?
গেরুয়া আকাশে ছড়াইলে যবে
সন্ধ্যার সুরজাল,
মরণের মত গম্ভীর অতি
এল সে রাত্রিকাল!
তার পর দূত বিরাট্ পত্র
দিলে মোরে কোন্ ছলে;
অসিত-বরণ কাগজ তাহার,
জ্যোতির আখর জ্বলে!
তোমারে দেখিয়া ভুলেছিনু, দূত,
ভ'রেছিল মোর মন,
তুমি যার দূত পত্র দেখিয়া
বুঝিব কেমন জন?

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানে নবীনের স্থান

বিজ্ঞান-জগতে তরুণের স্থান বিশেষ সম্মানাস্পদ নহে—এইরূপ একটা ধারণা সাধারণের মনে বহুকাল হইতে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। বস্তুতপক্ষে ভূয়োদর্শন যাহার আবিষ্ক্রিয়ার মূলে বিদ্যমান তাহাতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করা অজ্ঞাতকুলশীলের পক্ষে যে বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু সর্ব্বত্র মনীষা যেমন নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাইয়া সাধারণ নিয়মের প্রমাণ দৃঢ় করিয়া দেয়, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নিউটন্ যে অতি অল্প বয়সেই অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সম্ভবতঃ কাহারও অজ্ঞাত নাই।

বর্ত্তমান বর্ষে যে দুইজন মনীষী পদার্থতত্ত্বমূলক শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গবেষণার জন্য নোবেল্ পুরস্কার পাইয়াছেন, কোপেন্‌হেগেন্-নিবাসী অধ্যাপক নীল্‌স্ বোর্ তাঁহাদের অন্যতম। ইনি অতি অল্প বয়সেই পদার্থশাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে বোর্ পদার্থশাস্ত্রবিৎ ইংরেজ পণ্ডিত রাদার্‌ফোর্ডের অধীনে তাঁহার পরীক্ষাগারে পরীক্ষামূলক গবেষণা করিয়াছিলেন। এই সময় প্রবীণ ইংরেজ পণ্ডিত সার্ জে জে টম্‌সন্ একটি নূতন আণবিক মতবাদ প্রচার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সার্ উইলিয়াম্ ক্রুক্‌স্, রণ্টজেন্ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের গবেষণার ফলে স্থির হয় যে বস্তুর চরম পরিণতি অবিভাজ্য পরমাণুতে নহে। পরমাণুতে বিশ্লেষণ করিয়া যাহাতে উপনীত হওয়া যায় তাহা স্বল্পভারবিশিষ্ট বিয়োগধর্ম্মী তড়িৎকণা মাত্র। এই ক্ষুদ্র কণিকাসমূহ ইলেকট্রন্ নামে অভিহিত হয়। পরমাণুর স্বতন্ত্র সত্তা কল্পনা করিলে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে সমগ্র পরমাণুতে বৈদ্যুতিক শক্তির অস্তিত্ব নাই। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই টম্‌সন্ সংযোগতড়িৎবিশিষ্ট পরমাণু-গোলকের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ ইলেকট্রনের পরিকল্পনা করিয়া পরমাণুর স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করেন। টম্‌সনের মতবাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে টম্‌সন্ পরমাণুর মধ্যে অসামঞ্জস্যের কল্পনা করেন নাই। সমগ্র গোলকটির মধ্যে সংযোগ-তড়িৎ সমভাবে বিলিপ্ত হইয়া রহিয়াছে ইহাই টম্‌সনের ধারণা। এই থিওরীর সাহায্যে টম্‌সন্ মেণ্ডেলীফের Periodic Law প্রমাণ করিতে সমর্থ হ'ন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ রুশ রাসায়নিক পণ্ডিত মেণ্ডেলীফ একটি নূতন নিয়ম আবিষ্কার করেন। সঙ্গীতের স্বরলিপিতে যেমন প্রথম সপ্তকের পর স্বরের পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে, মূল পদার্থগুলিকে আপেক্ষিক আণবিক ভার অনুসারে সাজাইয়া গেলে সেইরূপ দেখা যায় যে প্রথম সাতটি মূল পদার্থের পর পরবর্ত্তী মূল পদার্থে পূর্ব্বের গুণসমূহের পুনরাবির্ভাব হইতে থাকে। টম্‌সন্ সাধারণ ভাবে তাঁহার মতবাদের সাহায্যে মেণ্ডেলীফের এই নিয়ম প্রমাণ করিতে সমর্থ হ'ন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে মেণ্ডেলীফের নিয়ম যে সর্ব্বত্র অবিসংবাদে প্রযোজ্য এমন নহে। টম্‌সন্ তাঁহার থিওরীর সাহায্যে পরমাণুর আরো অন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করিতে পারিয়াছিলেন।

টম্‌সনের প্রিয় শিষ্য রাদার্‌ফোর্ড, অধ্যাপকের মতবাদ আলোচনা করিতে গিয়া এক বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। এই সময় নবীন যুবক বোর্ সবেমাত্র তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

রেডিয়মের সমধর্ম্মী বস্তু হইতে সাধারণতঃ তিন প্রকার শক্তির স্বতঃবিকিরণ হইয়া থাকে। পদার্থশাস্ত্রে ইহাদিগকে আল্‌ফা, বীটা এবং গামা রশ্মি বলা হইয়া থাকে। গামা-রশ্মিসমূহকে সংযোগ-তড়িৎযুক্ত হিলিয়ম্ নামক বাষ্পের পরমাণুর সমষ্টি মনে করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান। রাদার্‌ফোর্ড্ বস্তুর ভিতর দিয়া আল্‌ফা-রশ্মি পরিচালিত করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রশ্মির বর্ত্ম হঠাৎ বাঁকিয়া যাইতেছে। এই বক্রতা (Scattering of alpha particles) ব্যাখ্যা করিতে গিয়াই রাদার্‌ফোর্ড্‌কে

টমসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়। রাদারফোর্ড্ বলিয়া বসিলেন যে টমসন্ পরমাণু-গোলকের মধ্যে সংযোগ-তড়িতের সমবিভাজ্যতার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। তাঁহার মতে পরমাণুর মধ্যে একটি কোষ (Nucleus) বর্ত্তমান এবং ইহাতেই পরমাণুর সমগ্র সংযোগ-তড়িৎ সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। এই কোষকে কেন্দ্র করিয়া সৌরজগতের গ্রহের ন্যায় ইলেক্‌ট্রণগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ইহাই রাদারফোর্ড এবং বোরের প্রতিপাদ্য বিষয়।

দুঃখের বিষয় রাদারফোর্ডের মতবাদ পদার্থতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মনঃপূত হইলেও গণিতজ্ঞগণ ইহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। অগত্যা রাদারফোর্ড্‌কে বাধ্য হইয়া বলিতে হইয়াছে যে পরমাণু-গোলকের মধ্যে Electro-dynamicsএর নিয়মগুলি নির্দ্দোষভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

বোর্ কিছুদিন পরে দেশে ফিরিয়া গিয়া রাদারফোর্ডের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ জর্ম্মান পণ্ডিত প্ল্যাঙ্ক্ শক্তি বিকিরণের এক নূতন থিওরী (Quantum Theory of Radiatoin) বাহির করিয়া সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বোর্ প্ল্যাঙ্কের মতবাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া রাদারফোর্ডের থিওরী নূতন নূতন ক্ষেত্রে আরোপ করিতে আরম্ভ করেন। হাইড্রোজেন-বাষ্পের বর্ণচ্ছত্রে যে রেখাগুলি ইহার পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হয় নাই, বোরই সর্ব্বপ্রথম তাহাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

বোর্ যখন এই আবিষ্কার লোকসমাজে প্রকাশ করেন তখন তাঁহার বয়স আটাশ মাত্র। যুবকের পক্ষে এইরূপ সম্মান লাভ অভাবনীয় হইলেও যে একেবারে বিরল নহে তাহা নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি হইতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হইবে।

গত মহাসমরে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক-সমাজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় যুবক মোজ্‌লীর মৃত্যুতে। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে গ্যালিপলিতে যুদ্ধ করিতে গিয়া মোজ্‌লী ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। এই যুবক অতি অল্প বয়সে এক অতি মূল্যবান্ সত্য আবিষ্কার করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

ছাব্বিশ বৎসর বয়সে মোজ্‌লী X-ray spectograph সাহায্যে মূল পদার্থগুলিকে বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হ'ন, এবং এক পদার্থকে অন্য মূল পদার্থ হইতে একটি বিশিষ্ট সংখ্যা দ্বারা পৃথক্ করিতে প্রয়াস পান। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মেণ্ডেলীফ তাঁহার Periodic নিয়মের সাহায্যে যাহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রমাণ করিতে সমর্থ হ'ন নাই, মোজ্‌লী Atomic Numberএর সহায্যে তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছিলেন। পদার্থশাস্ত্রের নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে এই মনীষী অকালে শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। যুবা বয়সে মোজ্‌লী যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা অনেক প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যেও ঘটে না।

রসায়নের ছাত্রের নিকট আর্হিনিয়াসের (Arrhenius) পরিচয় দিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। সুইডেন-দেশবাসী এই মনীষী এক্ষণে পক্ককেশ বৃদ্ধ। পদার্থতত্ত্বমূলক রসায়নে ইঁহার গবেষণা এক বিশাল অধ্যায় অধিকার করিয়া রহিয়াছে। Ionic theory ইঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। আর্হিনিয়াস্ যখন এই মতবাদ প্রচার করেন তখন রাষ্ট্রনীতি অনুসারে তিনি সাবালকত্ব প্রাপ্ত হ'ন নাই। জলে লবণ দ্রবীভূত করিলে লবণের সংহতি কিরূপ ভাবে অবস্থান করে ইহা পূর্ব্বে এক মহা সমস্যার বিষয় ছিল। আর্হিনিয়াস্ই সর্ব্বপ্রথম বলিয়াছিলেন যে শ্রেণী বিশেষের পদার্থ জল বা দ্রব বিশেষে গুলিলে, পদার্থের অণু (molecule) দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত হইয়া যায়—এক অংশ সংযোগ-তড়িৎ গ্রহণ করে, অন্য অংশ বিয়োগ-তড়িৎ-সংযুক্ত হইয়া যায়। আর্হিনিয়াসের মতবাদ যে রাসায়নিক চিন্তার সমূহ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে ইহা নিতান্তই সুপরিচিত ব্যাপার।

জৈবিক রাসায়নিকের নিকট জার্ম্মান পণ্ডিত কে' (Kekule) নাম অতি সুপরিচিত। জৈবিক র' এত অধিকসংখ্যক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত ক' হইয়াছে তাহার অন্যতম মুখ্য কারণ কেকু

বেন্‌জীনের স্বরূপ গ্রহণ। বেন্‌জীনের অণুর বিষয়ে কেকুলে যখন গবেষণা আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বয়স আটাশ মাত্র।

ইংলণ্ডে যেমন পার্কিন ব্র্যাগ রলি প্রভৃতি পরিবারে বৈজ্ঞানিক মনীষা পিতা হইতে পুত্রে সঞ্চারিত হইয়াছে, ফরাসী দেশে বার্থেলো-পরিবারে সেইরূপ পিতা ও পুত্র উভয়েই বৈজ্ঞানিক খ্যাতি লাভ করেন। বার্থেলো যখন কার্য্যকারী রসায়নের চর্চ্চা আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বয়স চব্বিশ মাত্র।

সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান রাসায়নিক এমিল্ ফিসার্ যখন শর্করা জাতীয় পদার্থের বিষয় আলোচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন তখন তাঁহার বয়স তেইশ মাত্র। এমিল্ ফিসারের পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক। সভ্যজগতে সম্ভবতঃ অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা ফিসারের নাম শুনেন নাই।

ইংলণ্ডে কৃত্রিম রঞ্জন শিল্পের সূচনা করেন স্যার্ উইলিয়ম্ পার্কিন্ অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে। কৃত্রিম রঞ্জন শিল্পে জর্ম্মাণী যে অদ্ভুত প্রতিভা দেখাইয়াছে তাহা কাহারো অবিদিত নাই।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাস্তুর সাধারণ লোকের নিকট ক্ষিপ্তজন্তু দংশনের চিকিৎসা-প্রণালীর আবিষ্কারক বলিয়াই সমধিক পরিচিত। পরন্তু রসায়ন-শাস্ত্রে পাস্তুরের খ্যাতি অন্য কারণে। পাস্তুরই প্রথম আবিষ্কার করেন যে টার্‌টারিক্ এসিডের দানাগুলি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে কতকগুলি দানার আকারের সহিত অবশিষ্ট দানার আকারের প্রভেদ এই যে একটি অন্যটির ছায়ার অনুরূপ। পাস্তুর যখন এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন তখন তাঁহার বয়স বিশ মাত্র। পাস্তুরের প্রদর্শিত প্রভেদ সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত হয় ইহার বিশ বৎসর পরে। ল্য বেল্ এবং সুপ্রসিদ্ধ ফাণ্ট্ হফ্ একই সময়ে ইহার ব্যাখ্যা প্রচার করেন।

ল্য বেলের বয়ঃক্রম এই সময়ে মাত্র সাতাইশ এবং ফাণ্ট্ হফ্ বাইশ বৎসরের যুবক। ফাণ্ট্ হফের মনীষা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালেই প্রকাশ পাইয়াছিল—ছাত্রাবস্থায় একাদশ পৃষ্ঠাব্যাপী এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া ফাণ্ট্ হফ্ বয়োজ্যেষ্ঠগণের উপহাসস্পদ হ'ন।

বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পণ্ডিত আইন্‌ষ্টাইন্ অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার অভিনব যুগান্তরকারী মতবাদের পরিকল্পনা করেন এবং ছাব্বিশ বৎসর বয়সে প্রথম প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক না হইলেও অল্প বয়সে মনীষাস্ফুরণের এক অতি উত্তম দৃষ্টান্ত। যে বয়সে আমাদের দেশের বালকেরা বিদ্যালয়ে বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া থাকে সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষাকে বহুমূল্য রত্নরাজি দিয়া সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের পরলোকগত মনীষী রামানুজম্ অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন অতি তরুণ বয়সে।

আমাদের দেশেও অনেক অধ্যাপক ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বেই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত উদাহরণগুলি হইতে বুঝা যায় যে নবীনের অবসাদের কোনোই কারণ নাই—তরুণের জয়বাণী যে শুধু রবীন্দ্রনাথই বাংলাসাহিত্যে গাহিয়াছেন এমন নহে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, যাহাতে সাফল্য লাভের একমাত্র পন্থা একনিষ্ঠ সাধনা, তাহাতেও নবীন একেবারে অনাদৃত হয় নাই।

শ্রী সুবোধকুমার মজুমদার

প্রবাসী

স্বজন ছেড়ে হই প্রবাসী
হায় গো যখন দূর-বিদেশে
বুক-ভরা মোর দৈন্য-রাশি
কাঁদায় করুণ সুর চিতে সে,
শ্রান্ত স্মৃতির মন্দ দোলে
ক্লান্ত গীতির ছন্দ খোলে,
সন্ধ্যেবেলার অন্ধ ছায়া মর্ম্মে জাগায় তার কাহিনী,—
মনে পড়ে, বাংলা-দেশের মিষ্টি কোলের কী মোহিনী !

*

যখন দেখি, না-চেনা কোন্
ঘরের ভিতর সাঁঝের বাতি,
ঘুমের বুলি মানে না মন
পেরিয়ে গেলেও মাঝের রাতি ;
যখন শশী পূর্ব্বাকাশে
স্বপ্ন মাখায় দূর্ব্বা-ঘাসে ;—
খোকায় চুমু খায় গো যখন অজানা সব মা-ভগিনী,—
মনে পড়ে, বাংলা-দেশের মিষ্টি কোলের কী মোহিনী !

*

বিদেশী কোন্ গাঁয়ের বধূ
যখন পথে জল্‌কে চলে,
মধুর দখিন বায়ের মধু
মনকে রসে চল্‌কে তোলে,
চপল দুটি আঁখি-পাখী
চম্‌কে ওঠে থাকি' থাকি',
কলস-গলে কাঁকন দুটি বাজ্‌তে থাকে রিনিঝিনি,—
মনে পড়ে, বাংলা-দেশের মিষ্টি কোলের কী মোহিনী !

*

ইল্‌সেগুঁড়ির ছাট্-ছড়ানো
আসে যখন বাদল-বেলা,
সজল খেলা মাঠ-ভরানো,
বনে ছায়ার আঁচল ফেলা,
সোঁদা-মাটির গন্ধ-ঘোরে
ওঠে প্রাণের রন্ধ্র ভরে',
চোখে ভাসে কাশ-কেতকী, তাল-পুকুরের কমলিনী,—
মনে পড়ে, বাংলা-দেশের মিষ্টি কোলের কী মোহিনী !

*

দূর প্রবাসে দেখি যখন
ঘরের ছবি কল্পনাতে,
নীল-মাখানো সে কি গগন—
লিখ্‌চে জলদ গল্প যাতে !—
শিবালয়ের সোপান-তলে
গঙ্গারি শ্বেত পরাণ গলে,
প্রাণ-ভোলানি ধান-দোলানি,—বন-বিহগীর সুর সোহিনী—
মনে পড়ে, বাংলা-দেশের মিষ্টি কোলের কী মোহিনী !

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

বাংলা

ধানের কথা —

১৯২২-২৩ সালে বঙ্গদেশে ৫১৬০০০০ একর জমিতে আউশ ধান্য, ১৩১১০০০০ একর জমিতে আমন এবং ৫৮৩০০০ একর জমিতে বোরো ধান্য হইয়াছে। এ বৎসর ১৫৮৯০০০ টন আউশ ৭২৯৪০০০ টন আমন এবং ১৫৮০০ টন বোরো ধান্য জন্মিয়াছে। উহা হিসাব করিয়া দেখা যায় যে প্রতি একর জমিতে ৮ মণ ২৫ সের আউশ, ১২ মণ ২৪ সের আমন এবং ১১ মণ ২২ সের বোরো ধান্য জন্মিয়াছে। গত বৎসর ৫৬০৭০০০ একর জমিতে আউশ, ১৫৮৫০০০০ একর জমিতে আমন এবং ৩৭৫০০০ একর জমিতে বোরো ধান্য হইয়াছিল, তাহাতে ১৮৩৮০০০ টন আউশ, ৭২৭৮০০০ টন আমন এবং ১৫২০০০ টন বোরো ধান্য হইয়াছিল। ইহা হইতে হিসাবে দেখা যায় যে প্রতি একর জমিতে ৯ মণ ৭ সের আউশ, ১২ মণ ৩০৷০ সের আমন এবং ১১ মণ ২৮ সের বোরো ধান্য হইয়াছে। আসামে ৭২৭০০০ একর জমিতে আউশ, ৩৩৭০০০০ একর জমিতে আমন এবং ২২৩০০০ একর জমিতে বোরো ধান্য হয়, তাহাতে ১৮১০০০ টন আউশ, ১২২৭০০০ টন আমন এবং ৮৩০০০ টন বোরো ধান্য জন্মে, তাহা হইতে দেখা যায় যে প্রতি একর জমি হইতে আসামে ৬ মণ ৩৯ সের আউশ, ১০ মণ ৮ সের আমন এবং ১০ মণ ৩২ সের বোরো ধান্য জন্মিয়াছে।—সম্মিলনী

জলকষ্ট —

চৈত্র মাস আসিতে না আসিতেই জেলার নানা স্থান হইতে জলকষ্টের সংবাদ আসিতেছে। চর অঞ্চলে গত বৎসর দুগ্ধের দামে জল বিক্রয় হইয়াছিল, এবৎসরও বোধহয় অবস্থা সেইরূপই হইবে। জেলা-বোর্ড খবরের কাগজে কত বিজ্ঞাপন দিলেন, কিন্তু কাজের বেলা কিছুই হইল না! বিনা পয়সায় কেহ জেলাবোর্ডকে জমির স্বত্বও ছাড়িয়া দিলেন না, তাঁহারাও পানীয় জলের বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না!

— নোয়াখালি-সম্মিলনী

বাঁশদহা ও ভবানীপুরের সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত বাজর নদীটি বর্ত্তমানে শৈবালদামে পরিপূর্ণ হইয়া যারপরনাই পানীয়-কষ্ট উপস্থিত করিয়াছে। একমাত্র উক্ত বাজড় ব্যতীত অন্য কোন দীঘি বা পুষ্করিণী না থাকায়, আতপক্লিষ্ট তৃষিত জনগণ উক্ত দূষিত জল ব্যবহার করিয়া রোগশয্যা গ্রহণ করিতেছে! এই চৈত্র মাসেই যেরূপ খর রৌদ্র দেখা দিয়াছে, না জানি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই অভিশপ্ত পানীয়হীন দেশের কি শোচনীয় অবস্থাই হইবে। প্রতীকারার্থ আমরা কাহার কাছে কাঁদিব? স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন কি?

—খুলনাবাসী

সরকার ও দরকার—

জেলা বোর্ড সম্মেলনে বাংলার লাটসাহেব বলেচেন যে, এবার সফরে গিয়ে তিনি বাংলার পল্লীগুলির শোচনীয় অবস্থা নিজের চোখে দেখে এসেচেন। তিনি দেখে এসেচেন বাংলার পল্লীতে তৃষ্ণার জল নেই, রোগের ঔষধ নেই, চল্‌বার পথ নেই, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই—এক কথায় বাঁচতে হ'লে মানুষের রোজই যা দরকার তার কিছুই নেই।

দেড়শ বছর ধ'রে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে, সু-শাসনে দেশের সম্পদ্ বাড়িয়ে সোনার বাংলার শাসনকর্ত্তাকে আজ বল্‌তে হয়েচে, বাঁচতে হ'লে মানুষের যা দরকার, এ জাতির তা কিছুই নেই! লাট-সাহেব অবশ্য প্রজা-প্রীতির পরিচয় দেবার জন্যেই, বক্তৃতায় আসর জমাবার উদ্দেশ্যে ওকথা বলেন নি, কেননা কথা বলেই তিনি শুধু দরদ দেখান নি—কাজেরও ব্যবস্থা করেছেন। সে ব্যবস্থার কথা তাঁর মন্ত্রীর মুখেই প্রকাশ পেয়েছে। মন্ত্রী বলেচেন, সরকার তার তহবিল থেকে টাকা দিয়ে এ দুরবস্থা দূর করতে পারতেন, যদি না টাকার অভাবে সরকারকেই আজ নাজেহাল হ'তে হ'ত। সরকারের প্রাণ আছে কিন্তু টাকা নেই, তাই বাধ্য হয়েই সরকারকে অন্তরের করুণা-সিন্ধু পাষাণের বাঁধ দিয়ে বাঁধতে হয়েচে, পল্লীর দুরবস্থা দূর করবার জন্যে ট্যাক্সের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে! কিন্তু এব্যবস্থা করবার সময়েও সরকার দৃষ্টি রেখেচেন যাতে করে' এই গোলামের জাত আত্মনির্ভরশীল হয়ে স্বায়ত্তশাসনের সম্পূর্ণ উপযোগী হ'য়ে উঠতে পারে—অর্থাৎ জেলা-বোর্ড আর ইউনিয়ান বোর্ড গরুর গাড়ীর উপর, মেলার উপর, সেতুর সাহায্যে নদী নালা পার হবার লোকদের উপর সামান্য কর বসিয়ে, বোঝার উপর শাকের আঁটিটি চাপিয়ে নিজেদের অবস্থা উন্নত কর্‌তে পারেন।

কর্ত্তাদের অন্তরে করুণা আছে, কিন্তু তহবিলে টাকা নেই; সুতরাং টাকা সাহায্য করে' প্রজাকে কেমন করে' বাঁচিয়ে রাখবেন?

—বিজলী

বাঙ্গলার পুলিশের ব্যয়—

১৯১২—৬৭৩৭৫৮৬৲
১৯১৩—৭৫২৬৮১২৲
১৯১৪—৮৩০৬৬২২৲
১৯১৫—৮৭৮৬৯২১৲
১৯১৬—৯৩৮৩৬৫৫৲
১৯১৭—৯৯২২৬৫২৲
১৯১৮—১০৫৮৩০৯২৲
১৯১৯—১১৫৬১০৭৪৲
১৯২০—১৩১৬০৯৮০৲

ইহার পর বিগত তিন বৎসরে আরও ৪০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।—ময়মনসিংহ-সমাচার

শিশু-মৃত্যুর নমুনা—

মুর্শিদাবাদে শিশু-মৃত্যুর হার।—আমরা 'আনন্দবাজার' পত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম যে, মুর্শিদাবাদ জেলার ১৫ হাজার অধিবাসীর মধ্যে গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া নিভুর্লভাবে শিশুমৃত্যুর হিসাব রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯১৭ সালে হাজার করা ২০১ হইতে ১৯২১ সালে ২৮২ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল এবং পাঁচ বৎসর গড় ধরিলে হিসাবে ঐ স্থানে শিশুমৃত্যুর হার হাজারকরা ২৩৭ দাঁড়ায়। মুর্শিদাবাদে একস্থানে ৫০০০ পাঁচ হাজার অধিবাসীর মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৭০০ সাত শত পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। —প্রতিকার

মেয়েদের স্বাস্থ্য—

সম্প্রতি ১৯২১ সালের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় রিপোর্ট্ প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে কলিকাতার হেল্‌থ্ অফিসার্ ডাঃ এইচ এম ক্রেক বলিয়াছেন, "নারীদের ভিতর মৃত্যুর সংখ্যা যে এত বেশী তাহার একটি প্রধান কারণ হইতেছে পর্দ্দা-প্রথা। জনবহুল নগরগুলির বস্তিতে পর্দ্দা-প্রথা থাকার জন্ত পুরুষ অপেক্ষা নারীরা এত বেশী মারা যায়।"

কিছুদিন পূর্ব্বে যক্ষার বিশেষজ্ঞ ডাঃ মুথু লাক্ষ্ণৌ সহরে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতেও তিনি নারীদের মৃত্যুর সংখ্যাধিক্যের জন্ত এই পর্দ্দা-প্রথাকেই বিশেষভাবে দায়ী করিয়াছিলেন। জীবনের পক্ষে খাদ্য যেমন দরকার আলোবাতাসেরও তেমনি প্রয়োজন। পর্দ্দা-প্রথার জন্ত আমাদের দেশের রমণীরা আলোবাতাসের মুখ দেখিতে পান না। অথচ এই পর্দ্দার দ্বারা আমরা আমাদের রমণীদের অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া দিয়াছি। এদিকে কোনরূপ আন্দোলন হইলেও আমাদের সমাজপতিরা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। দেশের দুর্দ্দশা যে কত বেশী ও কত রকমের, এইগুলিই তাহার নমুনা। —স্বরাজ

শিক্ষা-প্রসঙ্গ—

১৯২০—১৯২১ সনে বঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৩৯ ও ছাত্রসংখ্যা ২৯১০৬ বাড়িয়াছে। এই বর্দ্ধিত সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৯ হিন্দু ও ৩·৬ মুসলমান। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় হইয়াছে ৪১ লক্ষ টাকা। ভারত-গবমেণ্ট-প্রদত্ত টাকা হইতেই এই ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সামান্ত একজন মজুর দৈনিক যাহা উপার্জ্জন করে ইঁহারা তাহাও পান না। যে পর্য্যন্ত এই শিক্ষকদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইবে সে পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের উন্নতির আশা করা দুরাশা। অসহযোগ আন্দোলনের জন্ত মধ্যশিক্ষারও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ১৯২০-১৯২১ সনে ৬৮টি মধ্য স্কুল উঠিয়া গিয়াছে এবং ছাত্রসংখ্যা ৩৮৩৯১ কমিয়া গিয়াছে। ৫টি নূতন উচ্চ ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু ৪৭টি মধ্যইংরেজী ও ২১টি মধ্যবঙ্গ-বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে। মধ্য-ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা হ্রাসের অন্ততম কারণ এই যে, কতিপয় মধ্য-ইংরেজী স্কুল উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। ২১টি মধ্য-বঙ্গবিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে, ইহার কারণ, জনসাধারণ কেবল বাঙ্গলা পড়িতে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। —শিক্ষাসমাচার

তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার—

গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষিত হইয়া জনসাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে এই বৎসরে মোট ১১২৯১৪০৭৲ টাকা প্রতিশ্রুত হয়। উহার মধ্যে এখনও ১০৯৮০৯২৲ টাকা আদায় হয় নাই; তবে দুই এক সপ্তাহ মধ্যেই বোম্বাই হইতে ২৬৩০০০৲ টাকা আদায় হইবে আশা করা যায়। আমেদাবাদে কলের মালিকগণের নিকট ৩০৬০০০৲ টাকা পাওনা আছে; ঐ টাকাটাও আদায় করিতে কোন কষ্ট হইবে না। বাঙ্গলা দেশে একটি শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্ত ১লক্ষ ও আয়ুর্ব্বেদ-কলেজ স্থাপনের জন্ত ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। ঐ টাকা এখনও আদায় হয় নাই। হিসাব-পরীক্ষক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আফিস খরচা এবং টাকা আদায়ের খরচা অতিরিক্ত কিছুই হয় নাই এবং বিভিন্ন কমিটিগুলির আর্থিক অবস্থা বেশ সন্তোষজনক। —স্বরাজ

তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার:—কলিকাতার স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র স্বরাজ্য ভাণ্ডারে ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। গত বৎসরও তিনি ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় জনৈক অন্ধ দেশীয় বালক একাকী ভিক্ষা করিয়া ১০০ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডারে দান করিয়াছে। কলিকাতার জনৈক স্বদেশ-প্রেমিক ভদ্রলোক নাম গোপন রাখিয়া ১ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। —জনশক্তি

যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—

জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের উদ্যোগে যাদবপুরে সম্প্রতি একটি জাতীয় শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি সভাস্থলে আগমন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত দানের অর্থ লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন—বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ৫ লক্ষ (বাৎসরিক আয় ২০০০০৲), মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য আড়াই লক্ষ (বাৎসরিক আয় ১০০০০৲ টাকা), সুবোধচন্দ্র মল্লিক ১ লক্ষ টাকা (বাৎসরিক আয় ৩৬০০৲ টাকা), সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের একখানা বাড়ী, এবং ৮৯২৩০০৲ টাকা মূল্যের অংশ ও ডিবেঞ্চার, (ইহা হইতে বৎসরে ২০০০০৲ টাকা আয় হইতেছে)। কিন্তু শীঘ্রই উহা হইতে ৫০০০০৲ টাকা করিয়া পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভবানীপুরের শ্রীযুত গোপালচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও কৃষি শিক্ষার জন্ত ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে যে একশত বিঘা জমির উপর বাড়ী তৈয়ার হইতেছে, উহা কর্পোরেশনের নিকট হইতে ৯৯ বৎসরের জন্ত মাসিক ২১০৲ টাকা জমায় ইজারা লওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান কলেজে ৩৩০ জন ছাত্র বিদ্যমান। স্থানাভাবে আর বেশী ছেলে কলেজ লইতে পারে না। প্রত্যেক ছাত্রের বেতন ৬৲, কিন্তু মাথাপিছু খরচ পড়ে গড়ে প্রায় ১৫৲ টাকা। এই কলেজটি মাসে মাত্র ৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে চালান হয়। যাদবপুরে স্কুলের বাড়ী, কারখানা, রসায়নাগার, ছাত্রাবাস ইত্যাদি তৈয়ার করিতে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। —আনন্দবাজার-পত্রিকা

দান ও সৎকর্ম্ম—

আগামী ১৯২৪ সালের বি-এ, বি-এস্-সি অনার্স্ পরীক্ষায় যে ছাত্র বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন, তাঁহাকে মাসিক ৪০৲ টাকা হিসাবে একটি বৃত্তি প্রদান জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে সার বিপিনকৃষ্ণ আট হাজার টাকার মূল্যের যুদ্ধ-ঋণের কাগজ প্রদান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে বৃত্তি প্রদান করা হইবে। বৃত্তি-প্রাপ্ত ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে এম্-এস্-সি অথবা এম্-এ অধ্যয়ন করিতে হইবে। —নীহার

সাত্ত্বিক দান।—বাঁকুড়া মহিলা সমিতির সভানেত্রী মিসেস্ দত্ত মহোদয়া বাঁকুড়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের রোগীদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা

জন্ত এই মাসে ৩০ টাকা পাঠাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে প্রতি মাসে মহিলা-সমিতি হইতে ৬০ টাকা দেওয়া হইবে। বাঁকুড়া-হাঁসপাতালে রোগীর সংখ্যা কম। এই টাকায় রোগীদের বিশেষ উপকার হইবে।

—স্বরাজ

সৎকার্য্য।—২৪ পরগণার অন্তর্গত আরবালিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত যদুনাথ নাগ চৌধুরী একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

—স্বরাজ

উদার-হৃদয় মহিলা।—প্রভাবতী ঘোষের পিত্রালয় বাঁশদহা গ্রামে। অদৃষ্টপীড়নে জীবনের প্রথমাঙ্কেই তিনি বৈধব্যদশাগ্রস্তা হন। তাঁহার বহুতর গুপ্ত দানে আর্ত্ত ও তাপিত বুক ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করে। গত বৎসর বাঁশদহার অর্দ্ধসমাপ্ত স্কুল-বিল্ডিং তাঁহারই দানে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। শুনিতেছি, এবার নাকি এতদ্দেশের জলকষ্ট-নিবারণ-কল্পে একটি "পাবলিক ট্যাঙ্ক" তিনি খনন করিবেন। ভগবান এই পুণ্যশীলা মহিলাকে শান্তি দান ও দীর্ঘজীবিনী করুন।

—খুলনাবাসী

চাঁদপুরে অবৈতনিক বিদ্যালয়।—স্থানীয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধন আশ্রমের উদ্যোগে চাঁদপুরে একটি এবং সহরের সন্নিকটবর্ত্তী বাবুরহাট নামক স্থানে একটি—এই দুইটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। প্রধানতঃ অনুন্নত শ্রেণীর বালকবালিকাদিগের শিক্ষার জন্তই এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হইয়াছে। —স্বরাজ

চৈতন্ত লাইব্রেরী।—কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ চৈতন্ত লাইব্রেরীর সাহায্যার্থে ১৫০ ্ টাকা দান করিয়াছেন।

—এডুকেশন গেজেট

প্রবলের অত্যাচার—

লাঠি নিষিদ্ধ হইল।—কলিকাতা-পুলিশের ডেপুটী কমিশনার কলিকাতা-খিলাফৎ সম্পাদকের নিকট একখানা নোটীশ দ্বারা জানাইয়াছেন যে, খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবকগণ কলিকাতার রাস্তায় লাঠি লইয়া বাহির হইতে পারিবে না। —স্বরাজ

ইউরোপীয়ানের কামরায় ভ্রমণে গেপ্তার :—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় ভারতীয় পোষাকে ইউরোপীয়ানদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া রেলওয়ে আইনে ১২২ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হন। ভূপেন-বাবু ৫ বৎসরকাল সরকারের বন্দী (State prisoner) ছিলেন। যে কর্ম্মচারী তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে, সে বলিল যে, ইউরোপীয় পোষাক পরা থাকিলে কোনও আপত্তি থাকিত না। ভূপেন-বাবু এই ব্যবস্থাটিকে জাতির পক্ষে অপমানজনক মনে করিয়া উহার প্রতিবাদকল্পে জামিন না দিয়া হাজতে গিয়াছেন।

—জনশক্তি

বধূ-নির্য্যাতন—

শ্রীযুক্ত রাইমোহন বয়াট 'সময়' পত্রে এক ভয়াবহ বধূ-নির্য্যাতনের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বিক্রমপুর গ্রামের একটি বধূ শাশুড়ী ও ননদীর অসহ্য যন্ত্রণায় সতত‍ই জর্জ্জরিত থাকিত। মধ্যে ৪ দিন অনাহারে ছিল। বধূটি অন্তঃসত্বা ছিল। এই অবস্থায় গত ১৬ই মাঘ সে যখন লবণ দিয়া কুল খাইতেছিল, বাঘিনী ননদী তখন কামড়াইয়া বধূর গায়ের খানিকটা মাংস ছিঁড়িয়া লয় এবং লবণ দিয়া কুল খাইয়া সংসারের যে মহা ক্ষতি করিয়াছে, এই কথা পিতার নিকট বিনাইয়া বলে। দুর্দ্দান্ত পিতা তখন ঐ গর্ভবতী পুত্রবধূর পার্শ্বদেশে পদাঘাত করে। তাহার ফলে বধূটি যখন অজ্ঞান হইয়া পড়ে তখন ঐ ব্যক্তিটি বধূর গলায় দড়ি বাঁধিয়া একটি টীনের চালা ঘরের নীচে ঝুলাইয়া রাখে। দারোগা কনষ্টেবল্ ইত্যাদি আগমন করিয়া, বধূ নিজ ইচ্ছায় গলায় দড়ি দিয়াছে এইরূপ লিখিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। উক্ত পত্রে প্রকাশ ওঅঞ্চলে আরও ৪।৫টি বধূ এইরূপ নির্য্যাতনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। লেখক রাইমোহন-বাবুর পিসিও শাশুড়ীর নোড়ার আঘাতে প্রাণ হারাইয়াছে। —স্বরাজ

নারীর উপর অত্যাচার—

বাঙালী মেয়ের উপরে ঘরেবাইরে যে রকম অবিচার ও অত্যাচারের মাত্রা সম্ভবপর হয়, জানি না আর-কোনও জাতের ভেতর তা হ'তে পারে কি না। ঘরে স্বামীর ও শাশুড়ীর নির্য্যাতন ত আছেই, কোন কোন স্বামী লাথি না মেরে কথা কন না। শাশুড়ীদের ত কথাই নেই। বউয়ের উপর জবরদস্ত না হ'তে পারলে, শাশুড়ী হওয়া সার্থক বলে' মনেই হয় না। সত্যবতী দেবী আশালতার মা। মেয়ের বিবাহ দেন ৩২।২ সার্পেন্টাইন্ লেনের একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলের সঙ্গে। ভগবতীভূষণ ভট্টাচার্য্য আমাদের সেই গুণধর ছেলে। তিনি, তাঁর মার সঙ্গে জুটে এমনভাবে স্ত্রীর লাঞ্ছনা করেছেন, যে সত্যবতী দেবীকে আশালতার উদ্ধারের জন্ত আদালতে আস্‌তে হয়েছে।

ঘরে ত এই ব্যাপার। বাইরেও রমণীদের লাঞ্ছনা কম নয়। এই সেদিন দ্বারভাঙ্গার অধিবাসী মাখন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে রাত্রির ট্রেনে চাঁদপুর থেকে যাচ্ছিলেন, মধ্যবর্ত্তী এক ষ্টেশনে তাঁর স্ত্রীকে কারা চুরি ক'রে নিয়ে যায়। এখনও পুলিশ তদন্ত করে' খোঁজ পায় নি। প্রাণে বেঁচে মেয়েটি যদি ফেরে ত সমাজের মানের চক্ষে তাকে মরতেই হবে।

এসব অত্যাচারের প্রতিকার এই রমণীদেরই হাতে আছে। সমাজের অধঃপতিত অবস্থার মোড় ফেরানো শুধু পুরুষ জাতির দ্বারাই সম্ভবপর কোন কালে কোন জাতের মধ্যে হয় নি, আর হবেও না। অপমানের হাত থেকে বাঁচবার অধিকার—কি ঘরে কি বাইরে, নারী জাতিরও আছে। তার শক্তিও আছে তাদের নিজেদেরই ভিতর। একথা বুঝিয়ে না দিয়ে প্রতিকারের কোনও ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব বলে'ই মনে হয়। —নবসঙ্ঘ

নোয়াখালি রামগঞ্জ থানার অধীন কাঞ্চনপুর গ্রামের কবিরাজ বিপিনবিহারী গুপ্ত এই মর্ম্মে একটি আবেদনপত্র দাখিল করেন যে, বেগমগঞ্জ থানার এলাকাধীন মাধবসিং-গ্রামনিবাসী তাঁহার জামাতা রাসবিহারী দাস, রাসবিহারী দাসের মাতা নবতারা ও ভাগিনেয় শচীন্দ্রমোহন গুপ্ত—তাঁহার কন্যা কাদম্বিনীর উপর নানা রকম অত্যাচার করিতে থাকে। গত ২২শে মার্চ্চ ১৮ বৎসর বয়সে কাদম্বিনী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্ব হইতে নাকি মেয়েটিকে কিছুই খাইতে দেওয়া হয় নাই এবং তদুপরি তাহাকে মারধর করা হইয়াছিল। ইহার ফলেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মেয়েটি আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্ত মৃত্যুর পর তাহাকে একটি গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়ার মত করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়। খবর পাইয়া থানার দ্বিতীয় অফিসার ঘটনাস্থলে যান এবং তদন্ত করিয়া তিনি নাকি শবটির সৎকার করিবার আদেশ দিয়া আসেন। ইতিমধ্যে বালিকার এক আত্মীয় এই সংবাদ পাইয়া সেই গ্রামে যান এবং বালিকার মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পান, বলেন। উক্ত আত্মীয় দারোগাকে বলেন যে-শবটিকে সৎকার করিতে না-দিয়া শব-ব্যবচ্ছেদাগারে পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দেওয়া হউক। এই সংবাদ পাইয়া ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্, সার্কেল ইন্স্পেক্টর মিঃ সরকারকে ঘটনাস্থলে তদন্ত করিতে পাঠান; কিন্তু তিনি যাইয়া দেখেন শবটি সৎকার করা হইয়াছে।

তদন্তের ফলে উক্ত জামাতা এবং ভাগিনেয়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং জামাতার মাতা সব্‌ডিভিসনাল্ অফিসারের এজ্‌লাসে আসিয়া হাজির হইয়াছে। জামাতার ভাগিনেয় এবং মাতাকে

যথাক্রমে ৩০০্ টাকা ও ৫০০্ টাকার জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। জামাতাকে জামিনে খালাস দেওয়া হয় নাই—সে এখন হাজতে আছে। —স্বরাজ

সামাজিক উদারতা—

নদীয়া জেলার দরিয়াপুর গ্রামে এক দরিদ্রা বিধবার কন্যার সহিত কোন ধনী-সন্তানের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। ধনীসন্তান বিবাহের দিন হঠাৎ এক দাঁও পাইয়া অন্য এক ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিতে গমন করেন। তখন বিধবা তাঁহার কন্যাকে লইয়া কিরূপ বিপদে পড়েন তাহা সকলেরই অনুমেয়। কিন্তু ইছামালী-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চৌধুরী নামক কোন সহৃদয় যুবক ঐ দিন ঐ বিধবার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার মান রক্ষা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে স্থানীয় যুবকগণের কার্য্য বিশেষ প্রশংসার্হ।

—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

বালিকার সাহস—

সাহসিকতার পুরস্কার।—বঙ্গীয় সরকারী প্রচার বিভাগ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, গত ১৯২২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে হাওড়া জেলার আমতা বালিকা-বিদ্যালয়ের জয়লাবণ্যপ্রভা তেন্‌রা নামে ৫ বৎসরের একটি বালিকা স্কুল-পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়া জলমগ্ন হওয়ায় উক্ত স্কুলের কমলাবালা দেবী নামে ১০ বৎসরের আর-একটি বালিকা প্রায় ১৫ মিনিট কাল সেই গভীর জলে সাঁতার দিয়া অনেক কষ্টে উক্ত বালিকাটিকে উদ্ধার করে। প্রায় এক ঘণ্টার পর জলমগ্ন বালিকাটির চৈতন্যসঞ্চার হইয়াছিল। এই বালিকাটিকে উক্তরূপ আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করার জন্য রয়াল্ হিউমান সোসাইটী কমলা-বালাকে তাহার সাহসিকতার পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

—নীহার

পতিতাদের কথা—

কলিকাতা সহরে পতিতা রমনীদিগের বসবাসের জন্য কলিকাতার বাহিরে একটি স্বতন্ত্র জায়গা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইজন্য প্রস্তাব তুলিবেন। এ দিকে কলিকাতার ভিজিল্যান্স কমিটি হইতেও এজন্য আন্দোলন চলিতেছে। সমাজে দুর্নীতি দূর করা যাইবে? যাহারা দশ বৎসরের মেয়ের বিয়ে দেয়, যাহারা দশ বৎসরের বিধবা মেয়েকে ঘরে রাখিয়া বাহাত্তর বৎসর বয়সে বিবাহ করিতে বাহির হয়, যাহারা এক স্ত্রী থাকিতেও অপর স্ত্রী ঘরে লইয়া থাকে, তাহারা আজও সমাজে আমল পাইতেছে। তাহাদের সায়েস্তা করিতে কি করিতেছ? দুর্নীতি-সাপকে তোমরাই যে দুধ কলা দিয়া ঘরে পুষিতেছ! 'শিরে কৈল সর্পাঘাত, কোথা বাঁধ্‌বি তাগা?' আগে শির সামলাও!

—শঙ্খ

স্বরাজলাভের উপায়—

১। কায়মনোবাক্যে অহিংসা ও সত্যপালন এবং সংযমসাধনপূর্ব্বক নিজ নিজ জীবন ধর্ম্মের উপর সংস্থাপন; নিজেদের সকল কাজ নিজেরা করা; পরস্পরের সহযোগিতা ও গ্রামে স্বরাজ-কেন্দ্র স্থাপন।

২। বাড়ীতে চর্‌কা চালাইয়া সেই সূতায় গ্রামেই কাপড় প্রস্তুত করা ও অন্নরক্ষা।

৩। নিজেদের বিবাদ-মীমাংসা; ঋণপরিশোধ; বিলাসিতা, মাদক ও বিদেশী বর্জ্জন।

৪। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষা, সমাজ-কল্যাণে সময় ও অর্থ নিয়োগ; তুলার চাস ও তুলসী সেবন।

৫। আপন আপন দায়িত্ব বুঝিয়া সকল কাজ এবং যথাসম্ভব অপরের বিনা সাহায্যে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজ করা।

৬। আমাদের দোষেই আমাদের দুর্গতি বুঝিয়া তাহা পরিহারের চেষ্টা ও উৎসাহ সহকারে উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ বা প্রায়শ্চিত্ত পালন।

৭। আত্মবঞ্চনা পরিহার করিয়া সাধ্যমত দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভার গ্রহণ।

৮। কর্ম্মশৃঙ্খলা ও ধারারক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে নিশ্চিন্ত মনে একনিষ্ঠভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখার ব্যবস্থা। কল্যাণকর্ম্মে যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ ও অপরের সুযোগ ও অধিকার প্রদান।

৯। শ্রদ্ধাসহকারে স্বধর্ম্ম ও সদাচার পালন ও অপরের ধর্ম্ম ও আচারের মর্য্যাদা-রক্ষণ।

১০। ক্লেশ সহিষ্ণুতা একাগ্রতা ও নিষ্ঠা সফলতা লাভের উপকরণ। ধৈর্য্য ও বিনয়ের সহিত তাহা লাভের চেষ্টা।

এই উপলক্ষে মহাত্মার এই কয়টি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়:—

১। আত্মনিয়মনই প্রকৃত স্বরাজ; স্বেচ্ছাচারিতা নহে।

২। শান্তিময় অসহযোগ তাহার সাধনা—ইহাই আত্মার বা প্রেমের বল।

৩। এই শক্তি প্রয়োগের জন্য সর্ব্বতোভাবে স্বদেশী হওয়া চাই।

৪। আমাদের এই স্বরাজ সাধনা—প্রতিশোধমূলক নহে—কর্ত্তব্য-ধর্ম্ম- ও কল্যাণ-মূলক।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক, শিক্ষাসংসদ্

যশোহরে দ্বিতীয় ভীমভবানী—

যশোহর জেলার অন্তঃপাতী মোহম্মদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্র সেন অসম্ভব শারীরিক বলশালী হইয়াছেন। এখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। এই বয়সে তিনি ৩০ অশ্বের বলশালী মোটর গাড়ী ধরিয়া রাখেন। ৩টন ওজনের যে কোন ভারী বস্তু অতি সহজে বুকের উপর ধরিতে ও রাখিতে পারেন। পূর্ণিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জের বিখ্যাত মাড়োবারী ব্যবসায়ী ভলগুকলাল সরোগী তাঁহার শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে একটি সোনার মেডেল দিয়াছেন এবং মাড়োয়ারী সমাজ তাঁহাকে 'রুস্তাম হিন্দ' (ভারতসিংহ) উপাধি দিয়াছেন।

—যুগবার্ত্তা

পূর্ণচন্দ্র দাস—

একে একে সকলকেই জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্চে; কিন্তু মাদারিপুরের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাসকে ছাড়্‌বার কি হ'ল? অনেকদিন থেকে শুনছি তিনি বহরমপুর জেলে অর্শরোগে কষ্ট পাচ্ছেন; শরীর এত দুর্ব্বল যে চল্‌তে কষ্ট হয়—অথচ তাঁকে ছাড়্‌বার কোন নাম গন্ধ নেই। তাঁর অপরাধ এই যে, মাদারীপুরে স্বেচ্ছাসেবকের দল তিনি এত সুন্দর ভাবে গড়ে' তুলেছিলেন যে বাঙ্গালার অন্য সমস্ত জেলার চেয়ে মাদারী-পুরেই অসহযোগ আন্দোলন খুব জোরে চলেছিল; সরকারী আদালতে মোকর্দ্দমা মামলা বেজায় কমে' গিয়েছিল। তাই আইনের প্যাঁচে ফেলে তাঁকে দু' বৎসর জেলে দেওয়া হয়। তারপর আবার সে মোকর্দ্দমা শেষ হবার পর করাচীর ফতোয়া সমর্থন করার অপরাধে তাঁর উপর আবার একটা মামলা চালান হয়। মজার কথা এই যে, সভায় তিনি ঐ ফতোয়া সমর্থন করেন সে সভায় আরও সাতজন লোক ঐ ফতোয়া সমর্থন

করেছিলেন ; কিন্তু আর সকলকে ছেড়ে দিয়ে সরকারী আক্রোশ গিয়ে পড়্‌ল পূর্ণবাবুর ঘাড়ে। বিচার যা হবার তা তো হয়ে গেছে ; এখনও কি কর্ত্তাদের প্রাণ ঠাণ্ডা হয় নি ?

—আত্মশক্তি

স্বরাজ দেশলাই—

এই দেশলাই প্রতি গ্রোস্ ২৸০ টাকা। কোন লোক আমাদের নিকট শিক্ষার জন্য আসিলে আমরা যত্নের সহিত তাহাকে শিক্ষা দিয়া থাকি। ফিঃ মাত্র ৫৲ টাকা। যাহারা দেশলাইর মেশিন ক্রয় করিতে অক্ষম তাহাদিগকে প্রস্তুত কাঠি ও বাক্সের কাঠ সাপ্লাই করিয়া থাকি। পল্লীগ্রামের অনেক বেকার ব্যক্তি আমাদের নিকট হইতে কাঠি ও কাঠ লইয়া দেশলাই প্রস্তুত করতঃ বিক্রয় করিয়া মাসিক ১০০৲ টাকা লাভ করিতে পারেন।

দেশলাই-শিক্ষা-পুস্তক আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি, মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

শ্রী ইন্দুভূষণ লাহিড়ী
ম্যানেজার,
২১, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

খদ্দরের প্রয়োজনীয়তা—

এক্ষণে দেখা যাউক এদেশে খদ্দর প্রচলনের সম্ভাবনা আছে কিনা। খদ্দর প্রচলন সম্বন্ধে যে-সকল বাধা বিঘ্ন তাহা স্বদেশ-প্রেমের প্রেমিক হইলে আদবেই থাকে না। ল্যাঙ্কাশায়ারের আপত্তি আমাদের স্বদেশ-প্রেমের অভাবের দরুণ। এক্ষণে দেখা যাউক যুদ্ধের পূর্ব্বেই বা কি পরিমাণে মিল-বস্ত্র ব্যবহার করিতাম এবং পরেই বা কি পরিমাণে ব্যবহার করিতেছি এবং তাহার কত দেশে প্রস্তুত হয় এবং কত বিদেশ হইতে আমদানী হয় :—

আমদানী কাপড়ের হিসাব

সন	কোরা কাপড় (Unbleached) মিলিয়ন গজ	ধোয়া কাপড় (Bleached) মিলিয়ন গজ	রং-করা ছোপান ও ছাপান কাপড় মিলিয়ন গজ	মোট
১৯১৩-১৪	১৫৩৪ ২	৭৯১ ১	৮৩১ ৮	৩১৫৯ ১
১৯১৪-১৫	১৩২০'২	৬০৪ ৮	৪৯৪'৮	২৪১৯'২
১৯১৫-১৬	১,১৪৮'২	৬১১'৪	৩৫৮'৭	২১১৮ ৩
১৯১৬-১৭	৮৪৭'০	৫৮৯ ৮	৪৫৪'৯	১৮৯১'৭
১৯১৭-১৮	৬২৫'৫	৫০২ ৩	৩৯৫'৬	১৫২৩ ৪
১৯১৮-১৯	৫৮৩ ৪	২৮৬'৬	২২৭'৩	১০৯৭'৩
১৯১৯-২০	৫৩৩'৩	৩২২'০	২০৮'৩	১০৬১'৬
১৯২০ ২১	৫৮০'২	৪২১'৮	৪৮৯'৩	১৪৯১'৩

ভারতবর্ষে নির্ম্মিত সূতা ও আমদানি সূতার তালিকা

সন	আমদানি সূতা সহস্র পাউণ্ড ওজন, (এক পাউণ্ডের ওজন অর্দ্ধসের)	ভারতীয় মিলে নির্ম্মিত সূতা সহস্র পাউণ্ড ওজন,	একুন সূতা সহস্র পাউণ্ড ওজন,
১৯১৩-১৪	৪৪ ১৭১	৬৮২,৭৭৭	৭২৬,৯৪৮
১৯১৪-১৫	৪২,৮৬৪	৬৫১ ৯৮৫	৬৯৪,৮৪৯
১৯১৫-১৬	৪০ ৪২৭	৭২২,৪২৫	৭৬২,৮৫২
১৯১৬-১৭	২৯ ৫৩০	৬৮১,১০৭	৭১০,৬৩৭
১৯১৭-১৮	১৯,৪০০	৬৬০ ৫৭৬	৬৭৯,৯৭৬
১৯১৮-১৯	৩৮,০৯৫	৬১৫,০৪০	৬৫৩,১৩৫
১৯১৯-২০	১৫,০৯৭	৬৩৫,৭৬০	৬৫০,৮৫৭
১৯২০ ২১	৪৭,৩৩৩	৬৬০,০০৩	৭০৭,৩৩৬

	যুদ্ধের পূর্ব্ব ৫ বৎসরের গড় ১৯০৯-১০ হইতে ১৯১৩ ১৪ সাল পাউণ্ড (= অর্দ্ধসের)	যুদ্ধকালীন ৫ বৎসরের গড় ১৯১৪-১৫ হইতে ১৯১৮-১৯ সাল পাউণ্ড (= অর্দ্ধসের)	১৯১৯-২০ পাউণ্ড	১৯২০-২১ পাউণ্ড
আমদানি সূতা	৪১,৭৯৪,০০০	৩৪,০৬৩,০০০	১৫,০৯৭,০০০	৪৭,৩৩৩০০০
দেশী মিলের সূতা	৬৪৬,৭৫৭,০০০	৬৬৬,২২৭,০০০	৬৩৫,৭৬০,০০০	৬৬০,০০৩,০০০
একুন সূতা	৬৮৮,৫৫১,০০০	৭০০,২৯০,০০০	৬৫০,৮৫৭,০০০	৭০৭,৩৩৬,০০০
রপ্তানি সূতা	১৯২,৮৪৪,০০০	১২৯,৬৮৫,০০০	১৫১,৮৭০,০০০	৮২,৫৩৫,০০০
ভারতে প্রয়োজনীয় সূতা	৪৯৫,৭০৭,০০০	৫৭০,৬০৫,০০০	৪৯৮,৯৮৭,০০০	৬২৪,৭৯৮,০০০

এক্ষণে ভারতে ব্যবহার্য্য কাপড়ের পরিমাণ কত তাহা দেখা যাউক—

	১৯১৩-১৪ সাল যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর মিলিয়ন গজ	১৯১৮ ১৯ মিলিয়ন গজ	১৯১৯-২০ মিলিয়ন গজ	১৯২০-২১ মিলিয়ন গজ
ভারতীয় মিল উৎপন্ন কাপড়	১,১৬৪'৩	১,৪৫০ ৭	১,৬৩৯'৮	১,৫৮০ ৮
আমদানি কাপড়	৩,১৯৮'১	১,১২২'০	১,০৮০'৭	১ ৫০৯'৩
মোট উৎপন্ন ও আমদানি	৪,৩৬১'৪	২,৫৭২'৭	২,৭২০'৫	৩,০৯০ ১
ভারতজাত রপ্তানি কাপড়	৮৯'২	১৪৯'১	১৯৬'৬	১৪৬ ৪
বিদেশী কাপড়ের রপ্তানি	৬২'১	১১৪'২	৮৬'৬	৬১'৪
মোট রপ্তানি	১৫১'৩	২৬৩ ৩	২৮৫'২	২০৭ ৪
ভারতে ব্যবহৃত কাপড়	৪,২০১'১	২,৩০৯'৪	২,৪৩৫'৩	২,৪৪২'৭
ভারতে আমদানি কাপড়ের মূল্য	লক্ষ টাকা হিসাবে	লক্ষ টাকা হিসাবে	লক্ষ টাকা হিসাবে	লক্ষ টাকা হিসাবে
কোরা	২৫,৪৫	২৩,৫৯	২২,৫৩	২৬,৪৫
ধোয়া	১৪,২৯	১১,১৩	১৫,৯৬	২১,৯০
রং করা ছোপান ও ছাপান কাপড়	১৭,৮৬	১১,৮২	১২,৭৫	৩৪,৫৭
সর্ব্ব রকমের ফেন্ট	৫৪	৮৬	৫৩	৮৬
মোট আমদানি কাপড়ের মূল্য	৫৮,২৪	৪৯,৪০	৫১,৭৬	৮৩,৭৮

গজ হিসাবে কাপড়ের মূল্য

	টা	আ	পা	টা	আ	পা	টা	আ	পা	টা	আ	পা
কোরা	০	২	৮	০	৬	৬	০	৬	৯	০	৭	৪
ধোয়া	০	২	১১	০	৭	৪	০	৭	১১	০	৮	৪
রং-করা ছোপান ও ছাপান	০	৩	৫	০	৮	৪	০	৯	১০	০	১১	৪

এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ১৯১৩-১৪ সালে ভারতে ব্যবহার-যোগ্য ৪২০,১০১ মিলিয়ন গজ কাপড় ছিল এবং ১৯২০-২১ সালে ২৪৪,২০৭ মিলিয়ন গজ কাপড় ছিল। এইজন্যই এদেশে এত অধিক কাপড়ের অভাব। ১৯১৩-১৪ সালে এদেশে ব্যবহার-যোগ্য ৪১৫,৭০৯,০০০ পাউণ্ড সুতা ছিল, ১৯২০-২১ সালে ৬২৪,৭৯৮,০০০ পাউণ্ড সুতা ছিল। এক পাউণ্ড সুতায় ৮ গজ কাপড় প্রস্তুত হইলেও ১৯২০-২১ সালে যে ১২৯,০৯১,০০০ পাউণ্ড সুতা ব্যবহার-যোগ্য ছিল, তাহাতে ১০৩২,৭২৮,০০০ অর্থাৎ ১০৩,২০৭ মিলিয়ন গজ কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা সত্বেও অনেক কাপড়ের অভাব ঘটা সম্ভব। এমন অবস্থায় চরকায় সুতা কাটা ও খদ্দর প্রস্তুত ব্যতীত কাপড়-সমস্যার কোনরূপ প্রতিকার হওয়া সম্ভব নহে। আমেরিকায় তুলা উৎপাদন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ব্যবহারযোগ্য মিলের কাপড়ে এবং মিলের সুতায় তাঁতে তৈয়ার কাপড়ে যখন কাপড়ের অভাব পূর্ণ হইতেছে না তখন দেশে তুলা জন্মাইয়া চরকায় সুতা কাটিয়া কাপড়-সমস্যার প্রতিকার করিতে কাহারও কোনরূপ আপত্তি হইতে পারে না। ইংরেজেরা যে দামে ৩ জোড়া কাপড় দিতেন সেই দামে ২ জোড়া দিলে বা ১ জোড়া দিলে কাপড়ের অভাব পূর্ণ হয় না, আমরা ৫৮ কোটী টাকার স্থলে ৮৭ কোটী টাকার কাপড় কিনিলেও কাপড়ের অভাব পূর্ণ হইতেছে না। এইসকল বিষয় আমাদের কাপড় প্রস্তুত ও কাপড় খরিদের শক্তি-হীনতারই পরিচয় দিতেছে। এইজন্য আমি অলস কর্ম্মকুণ্ঠ কর্ম্মশূন্য ও বেকার লোকদিগকে চরকায় সুতা কাটিতে ও তাঁতে কাপড় বুনিতে আহ্বান করিতেছি। ইহাতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনাও নাই। যখন বিলাতের মত মিল-শিল্প-প্রধান দেশে বেকার-সমস্যা, তখন আমাদের দেশে কুটীর-শিল্প ব্যতীত বেকার-সমস্যার আর কোন প্রতিকার নাই। আমি অলস, কর্ম্মকুণ্ঠ, বেকার ও কর্ম্মশূন্য ব্যক্তিগণকেই চরকায় সুতা কাটিতে বলি, তাঁতে কাপড় বুনিতে বলি, নিজের পরিধেয় নিজেকে যথাসম্ভব প্রস্তুত করিতে বলি, প্রত্যেক গৃহস্থকে যথাসম্ভব তুলার গাছ করিতে বলি। ইহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি করিবার নাই। ইহাতে আমাদিগকে আত্মনির্ভরতা শিখাইবে, ইহাতে আমাদিগকে পরনির্ভরতা হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত করিবে, ইহাতে আমাদিগকে Financial Autonomy পাইবার যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

শ্রী বামনচন্দ্র দাস
—দেশের বাণী

বঙ্গের কথা—

১৯১৯-২০ সালে এ দেশে যত সুতা তৈরী হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ছিল ৬৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড; ১৯২০-২১ সালে ছিল ৬৬ কোটি পাউণ্ড, ১৯২১-২২ সালে হইয়াছে ৬৯ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু অন্তর্বাণিজ্যে এই শিল্পটি বিস্তার লাভ করিলেও বহির্বাণিজ্যে ইহা বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশেই সুতা বিশেষ ভাবে চালান হয়। কিন্তু চীন বস্ত্রশিল্পের দিকে নজর দেওয়ায় ভারত-বর্ষের সুতার আমদানি চীনে বিশেষভাবেই কমিয়া গিয়াছে। কেবল মোটা সুতাই ভারতবর্ষ হইতে চীনে গিয়াছে, কিন্তু তাহাও সামান্য পরিমাণে। অল্প দিনের ভিতরেই চীন যেরূপভাবে এই শিল্পটিতে উন্নতি করিয়াছে, আমাদের তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিবার জিনিষ। বস্ত্র-শিল্পে চীনের এরূপভাবে উন্নতির বিশেষ কারণ, সে কেবল তাঁত ও চরকার উপরেই নির্ভর করিয়া বসিয়া নাই, কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠার দিকে তাহার ঝোঁক অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁত প্রভৃতিতেও চীন আধুনিক-বিজ্ঞানসম্মত ও উন্নততর ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কোনো শিল্পকে ব্যবসাক্ষেত্রে দাঁড় করাইতে হইলে প্রতিযোগিতায় তাহা টিকাইবার ব্যবস্থা করা দরকার; এইজন্য আধুনিক উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্য একেবারেই অপরিহার্য্য। —স্বরাজ

স্বাধীন ব্যবসার কথা—

রংয়ের কারখানা।—ডাঃ পি সি রায় মহাশয়ের রং প্রস্তুতের প্রণালী ও অন্যান্য রাসায়নিক পরীক্ষার ফলে বাবু সুরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে Try-luck (ভাগ্য পরীক্ষা) কোম্পানী নামে মল্লিক রোডের উপরে একটি রংয়ের কারখানা খোলা হইয়াছে। কাল, খাকী ও খয়েরি রং বেশ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। দোকানদার তাহাদের খদ্দর ও অন্যান্য কাপড় রং করাইয়া ও পাড় করাইয়া লইতেছে। উকিল-বাবুগণ আল্‌পাকার পরিবর্ত্তে এই খাকী কালো রংয়ের পোষাক পরিতে পারিবেন। যাহারা মাসে কিছুই রোজকার করিতে পারেন না বলিয়া দুঃখ করেন তাঁহারা এখানে এই রংয়ের কাজ শিখিতে পারেন। গত বৎসর একটি লোক মাত্র কাপড় ছাপার পাড় করিয়া ১০০০৲ এক হাজার টাকা রোজগার করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি এই নূতন প্রচেষ্টা সর্ব্বসাধারণের উৎসাহ প্রাপ্ত হইবে।

লিখিবার কালীও সুন্দর প্রস্তুত হইয়াছে। পরীক্ষার জন্য যে কেহ গেলে এক দোয়াত কালী বিনা পয়সায় প্রদত্ত হইবে। বাজার অপেক্ষা অনেক সুলভ দরে বিক্রয় করা যাইতে পারে। —বরিশাল-হিতৈষী

তেঁতুলের ব্যবসায়।—বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রচুর পরিমাণে তেঁতুল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন জেলার কোন কোন অঞ্চলে ইহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। অনেক স্থানে প্রয়োজনের অতি-রিক্ত তেঁতুল থাকায়, অনেক গাছের তেঁতুল গাছে পাকিয়া গাছেই শুকাইয়া যায়। তাহাতে পরবর্ত্তী বৎসরে তেঁতুল খুব কম ফলে। স্থানে স্থানে সুলভ মূল্যে তেঁতুল হাট-বাজারে বিক্রয় হয়। বিদেশে রপ্তানীর কোনও সুবন্দোবস্ত নাই। কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে তেঁতুল কাট্‌তি হয়; অবশ্য মফঃস্বলের অনেক জেলা হইতে তেঁতুল আমদানি এবং বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ইটালী দেশে প্রভূত পরিমাণে তেঁতুল রপ্তানী হইত। যে যে জেলায় বেশী পরিমাণে তেঁতুল আছে, এবং সেখানে উহা অযত্নে নষ্ট হয়, সেইসকল স্থান হইতে তেঁতুল সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান দিলে বেশ লাভবান্ হওয়া যায়। মণ প্রতি কম পক্ষে ১৲ টি টাকা লাভ হইলেও কম কথা নহে; ১০০/ মন তেঁতুল চালান দিয়া খরচ-খরচা-বাদ ১০০৲ টাকা লাভ পাইলে কম সুবিধা কি? যে যে জেলায় প্রচুর তেঁতুল-গাছ আছে, সেই সেই জেলায় গিয়া গাছগুলি ঠিকা চুক্তিতে ক্রয় করিলে বোধ হয় ২।৩ টাকাতেই প্রতিটা পাওয়া যাইবে। নিজের লোকের দ্বারা পড়াইয়া খোসা ছাড়াইয়া একটু শুকাইয়া চালান দিলেই হইল। সে অবস্থায় গড়ে প্রত্যেক মণের মূল্য ১৲—১।০ টাকা বা ২৲ টাকার বেশী পড়িবার সম্ভাবনা নাই। এ সুযোগ ছাড়া উচিত নহে। —নবযুগ

বাঁকুড়া জেলার স্থানে স্থানে খেজুর বৃক্ষের রস হইতে গুড় প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাল গাছের রস হইতে মিছরী, গুড়, চিনি ইত্যাদি প্রস্তুতের প্রণালী কেহ জানে না। তালের ন্যায় গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী শক্ত কাষ্ঠ এ জেলায় আর জন্মে না বলিয়া লোকে তাল-গাছ কাটিয়া গৃহনির্ম্মাণের কাষ্ঠ এবং জল-সেচনের জন্য "দন" ব্যবহার করিয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলার কৃষি ও হিতকরী সমিতি অবধারণ করিয়াছেন যে, তালের রস হইতে মিছরি গুড় ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিলে দেশে অর্থাগম হইবে। তাঁহারা সমিতি হইতে দুই জন "পাসী" আনাইতেছেন। তাহারা এ দেশের লোককে শিক্ষা দিবে কি প্রণালীতে তাল গাছ হইতে রস বাহির করা হয়। বাঁকুড়া জেলার যেসকল শাখাসমিতি সহরের এই প্রধান সমিতির

সহিত মিলিত হইয়াছেন তাঁহারা এই জেলা সমিতির সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে স্থানীয় লোককে এই কার্য্য শিক্ষা দিবার উপায় করিতে পারিবেন। শিক্ষাটা বাঁকুড়াতেই হইবে। বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগানে অনেক তাল-গাছ আছে। সেইখানেই শিক্ষা আরম্ভ হইবে।

লাক্ষা (লা) ব্যবসা এদেশে পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, কিন্তু যে-সকল বৃক্ষে লাক্ষা উৎপন্ন করা হয়, জঙ্গল ধ্বংসের সহিত সেইসকল বৃক্ষও অনেক পরিমাণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন লাক্ষার মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বহু লাক্ষা বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। এ সময় প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা উৎপন্ন করিতে পারিলে দেশে অর্থাগম হইতে পারে। লোকে জানে যে পলাশ, কুল, কুসুম বৃক্ষেই লাক্ষা আবাদ করা চলে। অড়হর গাছে প্রতি বৎসর প্রচুর লাক্ষা জন্মিতে পারে। আসামের গারো নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে অড়হর বৃক্ষে লাক্ষা আবাদ হয়।

—বাঁকুড়া-দর্পণ

বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে শিমূল তুলা।—শিমূল তুলাও বহু কাজে লাগে। ইহা দ্বারা বালিস, তোষক প্রভৃতি তৈয়ার হয়। বঙ্গের বহু জেলায়—বিশেষতঃ উত্তর-বঙ্গের কতিপয় জেলায় প্রচুর শিমূল তুলা জন্মে। চৈত্র মাসে শিমূল তুলা ফুটিয়া থাকে; সুতরাং আর সময় নাই। এখন হইতে চেষ্টা করিলে বহু শিমূল তুলা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কলিকাতায় বোধ হয় আজকাল শিমূল তুলার মণ ১৫৲—১৬৲ টাকার কম নহে। অথচ ১৲—১৲ টাকা মূল্যে গাছ কিনিয়া নিজের লোক দ্বারা গাছ হইতে উহা পাড়াইলে মণ প্রতি ৪৲—৫৲ টাকার বেশী খরচ পড়িবে না। প্যাকিং খরচ, গরুর গাড়ী ভাড়া, মুটে খরচ, রেল ভাড়া, লোক-জনের যাতায়াত খরচ, আড়তদারী প্রভৃতি সকল খরচ সহ ৭৲—৮৲ খরচ পড়িলেও, এই ব্যবসায়ে প্রায় দ্বিগুণ লাভ হইবার সম্ভাবনা। স্থানীয় মেলা-সমূহ হইতে ক্রয় করিয়া চালান দিলেও মণ প্রতি খুব কম পক্ষে ২৲—৩৲ লাভ হইবার সম্ভাবনা। এমন লাভজনক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করা কি প্রত্যেক হিন্দু-মুসলমানের কর্ত্তব্য নহে? আমরা জানি, বহু স্থানে শিমূল তুলা ফুটিয়া, বায়ুভরে উড়িয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়; অথচ কেহই উহার সদ্ব্যবহার করে না। এইরূপে দেশের সহস্র সহস্র টাকা বৃথা নষ্ট হইয়া থাকে।—নবযুগ

সেবক

ভারতবর্ষ

বিশাপুর জেলে অত্যাচার—

বিশাপুর জেল সম্পর্কীয় অভিযোগগুলি সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য বোম্বাই গবর্মেণ্ট একটি তদন্ত-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দুইজন সরকারী কর্ম্মচারী এবং একজন বে-সরকারী লোক লইয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল। ইঁহারা ইঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এই জেলটিতে যে কিরূপ অমানুষিক অত্যাচারের ব্যবস্থা আছে, এই রিপোর্টে কতকগুলি সংবাদের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রিপোর্টের তদন্ত-কমিটির সদস্যরা লিখিয়াছেন—

"পাঁচজন 'হায়' শৃঙ্খলা ভাঙার অপরাধে অল্প সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। তাহারা এই জেলে প্রেরিত হয়। ইহাদের এক ব্যক্তির নাম আলম। ২৯ শে জুলাই সে প্রহার লাভ করে। আমরা তাহাকে সাংঘাতিক ভাবে আহত অবস্থায় দেখিয়াছি। বেটনের গুঁতার চোটেই যে সে এত বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আর কয়েকজনের ভিতর দাস্তু নামক একব্যক্তি প্রহার লাভের কয়েক ঘণ্টা পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তৃতীয় জনের উপর এতটা মার-পিট চলিয়াছিল যে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তাহাকে হাসপাতালে থাকিতে হইয়াছে। চতুর্থ জনের আঘাত খুব গুরুতর না হইলেও ১১ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহাকে ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকিতে হইয়াছে।"

কয়েদীদিগকে সেখানে সপ্তাহে একবারের বেশী স্নান করিতে দেওয়া হয় না। পায়খানার বন্দোবস্ত অপূর্ব্ব।—তাহাদের সংখ্যা যেমন কম, আব্রুর সহিতও তাহাদের তেমনি কোন সম্পর্ক নাই।

কয়েদীদিগকে রাখিবার ব্যবস্থা আরো চমৎকার। প্রথম অবস্থায় কয়েদীদের ডবল শৃঙ্খল পরাইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর বরাবর এই দুটি শৃঙ্খলের ব্যবস্থাই চলিবে, না একটি কমাইয়া দেওয়া হইবে, তাহা ঠিক করিয়া দেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্। তদন্ত-কমিটির সদস্যরা যখন পরিদর্শনে গিয়াছিলেন তাঁহারা অধিকাংশ কয়েদীকে দুনো অলঙ্কারেই ভূষিত দেখিয়াছিলেন। দুইটিই হোক আর একটিই হোক কয়েদীদিগকে রাত্রিদিন উহা পরিয়া থাকিতে হয়। ইহার উপরে রাত্রিতে সমস্ত কয়েদীকে আর-একটি লম্বা শিকলিতে গোরু-ভেড়ার মত করিয়া গাঁথিয়া রাখা হয়।

সরকারী সদস্য দুইজন এই সম্পর্কে বলিয়াছেন—"এই শিকলিতে বাঁধিয়া রাখার ব্যবস্থা এবং রাত্রির আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলি আমরা পছন্দ করি না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে আমরা পাশবিক বা অমানুষিক বলিয়াও মনে করি না।" ইঁহাদের তাহা মনে না করিবার যথেষ্টই কারণ আছে। মানুষরূপী জীবের ভিতরকার মানুষটা যদি মরিয়া যায় তবে পরের দুঃখে হৃদয়কে ব্যথিত করিতে পারে না। এইজন্যই সরকারী কর্ম্মচারীদের মতের সঙ্গে মত মিলাইয়া বে-সরকারী সদস্যটি তাঁহার রিপোর্ট লিখিতে পারেন নাই। তিনি ভিন্ন রিপোর্ট পেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ মহিলা-বিদ্যালয়—

কাশীতে একটি আয়ুর্ব্বেদ মহিলা-বিদ্যালয় আছে। ময়মনসিংহের উকীল কাশীপ্রবাসী শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ বিদ্যালয়কে একখানি কুড়ি হাজার টাকা মূল্যের বাড়ী দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে সাহায্যও করিবেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ এই মহিলা-বিদ্যালয়টির স্থায়ী সভাপতি। সহকারী সভাপতি কবিরাজ শ্রীমতী প্রমীলাবালা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী। কবিরাজ নিশিকান্ত বৈদ্যশাস্ত্রী ইহার সম্পাদক।

পাটনার লোকহ্রাস—

'বেহার হেরাল্ড' পাটনার লোকসংখ্যা কিরূপ দ্রুতগতিতে কমিয়া চলিয়াছে তাহার একটা হিসাব নিকাশ খতাইয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহার সেই হিসাবটা এখানে তুলিয়া দিলাম।

সাল	লোকসংখ্যা
১৮৮১	১,৭০,৬৫৪
১৯০১	১,৫৩,৭৩৯
১৯১১	১,৩৬,১৫৩
১৯২১	১,১৯,৯৭৬

অর্থাৎ গত ৪০ বৎসরে পাটনার লোকসংখ্যা ৫০ হাজারের বেশী কমিয়া গিয়াছে। খতাইয়া দেখিলে ভারতের প্রায় সমস্ত স্থানেই হ্রাসের অঙ্কটা এমনই অদ্ভুত আকারে দেখা দিবে। দেশরক্ষার জন্য রাজস্বের অর্দ্ধেক সৈন্যবিভাগের বাবদ ব্যয় হয়, অথচ দেশের লোকের প্রাণ রক্ষার অর্থ জোটে না! অন্যদেশের লোকের কাছে এটা হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু আমরা জানি এটা পরাধীনতারই পরিণাম।

আইন-ব্যবসায়ে মহিলা—

ভারতীয় মহিলাদিগকে আইন ব্যবসায়ের অধিকার দিয়া ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল। কাউন্সিল অফ্ ষ্টেট্ ব্যবস্থাপক সভার এ ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন। কলিকাতার স্বর্গীয়া রেজীনা গুহ এই ব্যবসায়ের অধিকার চাহিয়া হাইকোর্টের অনুমতি পান নাই। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে রমণীদিগকে মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির সদস্য হইবারও অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকারও পাইয়াছেন। নারীদের অধিকার ক্রমেই ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করিতেছে। ইহা অতীব আনন্দের ও আশার কথা।

অসবর্ণ বিবাহ বিল—

ডাক্তার গৌর ভারতীয় পরিষদে অসবর্ণ বিবাহ বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ম একটি সিলেক্ট কমিটির হাতে ভার দেওয়া হয়। তাঁহারা আলোচনা করিয়া কতকগুলি ছাঁট কাট পরিবর্ত্তনের পর বিলটি আবার সভায় উপস্থিত করেন। গত ৭ই চৈত্র বিলটি ব্যবস্থাপক সভায় পরিগৃহীত হইয়াছে। বিলটি যে-আকারে সিলেক্ট্ কমিটির হাত হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে গোঁড়া এবং সংস্কারপ্রয়াসী সভ্যদের ভিতর একটা রফা হইয়া গিয়াছে। ইহাকে এখন আর কোনো প্রকারেই বাধ্যতামূলক বলা চলে না। যাঁহারা ইহার সাহায্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা অনায়াসেই ইহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। বিলের ভিতর হইতে খৃষ্টান মুসলমান ইহুদী ও পার্শীদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে; কেবলমাত্র হিন্দু, শিখ, জৈন ও বৌদ্ধদের উপরেই ইহার প্রয়োগ চলিতে পারিবে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের কোন ব্যক্তির বিবাহ এই আইন অনুসারে হইলে, তাহাকে পরিবার হইতে পৃথক্ করিয়া দেওয়া চলিবে। যাঁহারা এই আইন অনুসারে বিবাহ করিবেন তাঁহাদের অবস্থা 'কাষ্ট ডিস্এবিলিটি এ্যাক্ট' অনুসারে ধর্ম্মান্তরগ্রাহীদের উত্তরাধিকার বিষয়ে যে ব্যবস্থা আছে তাহা অপেক্ষা খারাপ হইবে না। উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন অনুসারেই নিয়মিত হইবে। ইহার দ্বারা লোককে বিবেকানুমোদিত পথে চলিবার সুবিধাও যেমন দেওয়া হইয়াছে তেমনি অন্যদিকে বিবাহকারীর পিতাকেও পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

বস্তুতঃ সিলেক্ট্ কমিটির হাতে যেমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাতে ইহাকে আগের বিলের খোলস বলিলেও বিশেষ কিছু অত্যুক্তি করা হয় না; কিন্তু সে যাহাই হউক, অবশেষে এরূপ একটি প্রস্তাব যে পরিগৃহীত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও মিঃ পটেল পূর্ব্বে এই অসবর্ণ বিবাহের প্রস্তাবটি লইয়া নাড়াচাড়া কম করেন নাই। তাঁহাদের মত ডাঃ গৌরের ভাগ্যে যে কেবল ব্যর্থতা লাভ হয় নাই এইটাই আমরা লাভ বলিয়া মনে করিতেছি। দেশের লোকের, তথা আমাদের প্রতিনিধিদের মনের সঙ্কীর্ণতার অবস্থা যেরূপ তাহাতে এরকমের একটা নির্দ্দোষ বিলও নামঞ্জুর হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না।

নোটের চেহারার পরিবর্ত্তন—

গবর্মেণ্ট্ বর্ত্তমান নোটগুলির চেহারার পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে টাকার পরিমাণ অনুসারে নোটের আয়তন ছোট বড় হইবে। কোন্‌খানা কত টাকার নোট লোকে যাহাতে তাহা সহজে বুঝিতে পারে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে। আপাততঃ তিন ধরণের দশ টাকার নোট আগামী মে মাসে বাহির করা হইবে। পরে অন্যান্য নোটও পরিবর্ত্তিত আকারে বাজারে দেখা দিবে। নূতন নোটগুলি যাহাতে সহজে জাল করা না যায় সে সম্বন্ধেও নাকি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ের বৃত্তি—

ভারতগবর্মেণ্টের নিযুক্ত সিলেক্ট্ কমিটির পরামর্শ-মত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের জামালপুর ওয়ার্কশপের এপ্রেণ্টিস শ্রীযুক্ত তারাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এস-সি-কে একটি বৃত্তি দান করা হইয়াছে। তারাপদবাবু বাৎসরিক ৩০০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইবেন। ইহা ছাড়া বাড়ীভাড়া বাবদেও তাঁহাকে বার্ষিক ৭০০৲ টাকা দেওয়া হইবে। তাঁহাকে তিন বৎসর কাল বিলাতে থাকিয়া ধাতুবিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও গবেষণা করিতে হইবে।

মেয়েদের উন্নতির প্রচেষ্টা—

পাটনার মিউনিসিপ্যালিটি স্থির করিয়াছেন—মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ীর আয়টা সম্পূর্ণরূপেই ঝাড়ুদার সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হইবে। আদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই এ অর্থ জমা দেওয়া হইবে রাইকুট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কে। প্রথমতঃ এই অর্থের দ্বারা উক্ত সম্প্রদায়ের সদ্যপ্রসূত শিশুদের ও মাতাদের সাহায্য করা হইবে; তাহার পর সম্প্রদায়ের অন্যান্য কল্যাণের কাজে তাহা ব্যয় করা হইবে। যে-সব ঝাড়ুদার মদ পান করিবে না এবং সূতা কাটিবে ও তাঁত বুনিবে এই ফণ্ড্ হইতে তাহারা সাহায্য পাইবে। অন্তঃসত্বাবস্থায় মাতাদিগকে পাঁচ টাকা হারে সাহায্য করা হইবে।

সহরের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিবার জন্য ঝাড়ুদার বা মেথর না হইলে একদিনও চলে না। ইহাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদের সম্বন্ধে আমরা বিচার করি না। আমরা ইহাদিগকে উপেক্ষা করি, ঘৃণা করি, ইহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করি না। এই চির-উপেক্ষিত জাতির প্রতি পাটনার মিউনিসিপ্যালিটি যে নজর দিয়াছেন ইহা তাঁহাদের ন্যায়বুদ্ধি এবং মহত্ত্বের পরিচায়ক।

অবনতদিগকে সাহায্য—

ত্রিচিনপল্লীতে কাথলিক সম্প্রদায় সম্প্রতি 'আনন্দ সমাজ' নামে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি বিধান করাই এই সভার উদ্দেশ্য। নিম্নশ্রেণীর উন্নতির জন্য খৃষ্টান সমাজ এ দেশে এমন অনেক কাজ করিয়াছেন যাহা বিশেষ ভাবেই প্রশংসার্হ। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্কীর্ণতা যে এদিক্ দিয়া অতিমাত্রায় বেশী তাহাও অস্বীকার করিবার জো নাই। এদেশের যে-সমস্ত লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের বেশীর ভাগই গ্রহণ করিয়াছে খৃষ্টানদের এই দিক্‌টার উদারতা এবং আমাদের নিজেদের এই দিক্‌টার সঙ্কীর্ণতার জন্য।

পুনায় সম্প্রতি অস্পৃশ্যতা লইয়া আলোচনা করিবার জন্য একটি সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সিন্ধে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মশালা, স্কুল, সভা-সমিতি, বাজার, কূপ প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতির লোকেরা সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকের মতই যাহাতে ব্যবহার করিতে পারে—এইসব ব্যাপারে জাতিগত বৈষম্য যাহাতে তুলিয়া দেওয়া যায় তাহা লইয়া সভায় যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগকে উচ্চসম্প্রদায়ের ছাত্রদের সহিত একত্র পড়িতে দেওয়া হয় না। এটা যে অত্যন্ত অসঙ্গত ব্যবস্থা তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। প্রস্তাব করা হইয়াছে, যে-সব স্কুল অস্পৃশ্য জাতির বালকদিগকে গ্রহণ করিতে নারাজ সে-সব স্কুলের সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবার জন্য গবর্মেণ্ট্‌কে অনুরোধ করা হইবে। এই সভার অন্যান্য প্রায় সকল

বিয়েই উন্নত সম্প্রদায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্ত দাবী মানিয়া লইলেও কূপ, পুকুর, পাইপের জল প্রভৃতির ব্যবহার সম্পর্কে ইঁহারা বিশেষ উদারতা দেখাইতে পারেন নাই।

অনাথ-আশ্রম—

সুরাটে অনাথ শিশুদের জন্য 'অনাথ হিন্দু আশ্রম' নামে একটি আশ্রম প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিশ বৎসর ধরিয়া আশ্রমটি অনবরত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, অনাথ বালক-বালিকাদের কেবল ভরণপোষণের জন্য নহে—তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য—তাহাদিগকে সেই-সব সুবিধা প্রদান করিবার জন্য যাহাতে তাহারা তাহাদের লুপ্ত নাগরিক অধিকারগুলিও ফিরিয়া পাইতে পারে।

স্বরাজলাভের মূল্য—

'স্বরাজ্যের' সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—গোদাবরীর কলেক্টর মিঃ ব্রোকেন নোটিশ দিয়াছেন—যে-সব ব্যক্তি বা পল্লী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দান করিবে তাহাদের ক্ষেত্রে সেচের জল জোগানো হইবে না।

রাজোল গ্রামে যে নোটিশখানা প্রচারিত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম—কোনো গ্রামে অসহযোগ আন্দোলন প্রবল হইলে সে গ্রামে তিন বৎসরের জন্য জল সরবরাহ বন্ধ করা হইবে—সে গ্রামে কাহাকেও বন্দুকের পাশও দেওয়া হইবে না।

আর-এক ধরণের হুমকির নমুনা দেখাইয়াছেন, মুঙ্গেরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি হুকুম দিয়াছেন—রাস্তায় কেহ কোনো প্রকার জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে পারিবে না, যে গানে রাজদ্রোহ প্রকাশ করে সেরূপ গান কেহ গাহিতে পারিবে না, কিন্তু প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির উদ্যোগে যে-সকল শোভাযাত্রা বাহির হইবে তাহাতে কেহ যোগদান করিয়া গান গাহিতে পারিবে না।

বালক-বালিকার সৎসাহস

লক্ষ্ণৌএর নিকট সীতাপুর বিদ্যালয়ের গুরুপ্রসাদ নামে একটি বালক গত এপ্রিল মাসে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া একটি বালিকাকে কূপ হইতে উদ্ধার করে। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর প্রধান স্কাউটরূপে তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছেন। হাওড়ার আমতা বালিকা-বিদ্যালয়ের কমলাবালা নাম্নী একটি ছাত্রীও সম্প্রতি এইরূপ একটি সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। একটি পাঁচ বৎসরের বালিকা জলে ডুবিয়া যাইতেছিল; কমলা নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বালিকাটিকে উদ্ধার করিয়াছে। রয়্যাল হিউমেন সোসাইটি কমলাবালাকে প্রশংসাপত্রের দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছেন।

দিল্লীতে কন্যাগুরুকুল—

কাংড়ীর গুরুকুলের আদর্শে আগামী ১লা বৈশাখ দিল্লীতে একটি কন্যাগুরুকুল খোলা হইবে। 'জ্যোতিঃ' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত বৈদ্যনাথ শেঠ এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিতে রাজি হইয়াছেন। তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী রাধারাণী দেবী তাঁহার সহিত যোগ দিয়া এই আশ্রমের কার্য্যপরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। ৩ বৎসর হইতে ১১ বৎসরের বালিকাদিগকে এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হইবে। বালিকারা যাহাতে ১০ বৎসর এখানে অধ্যয়ন করিতে পারে আপাততঃ সেই ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইতেছেন পাঞ্জাবের আর্য্য-সমাজের প্রতিনিধি-সভা। দিল্লীর বিখ্যাত ধনী শেঠ রঘুনাথ এই উদ্দেশ্যে সভাকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া প্রথম বৎসর বিদ্যালয়ের জন্য তিনি মাসে মাসে আরো ১৮ শত টাকা করিয়া দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা সম্পর্কে অন্যান্য খবর কাংড়ী গুরুকুলের অধ্যক্ষের নিকট চিঠি লিখিলে জানা যাইবে।

জব্বলপুরে সত্যাগ্রহ—

১৮ই মার্চ্চ হরতালের দিন জব্বলপুরে জাতীয় পতাকা লইয়া একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। অনুমতি না লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করার অপরাধে পুলিশ, শ্রীযুক্ত সুন্দরলাল-প্রমুখ নয় জন নেতা এবং শ্রীমতী সুভদ্রা দেবীকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু পরে আবার কি ভাবিয়া ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে। ইঁহারা মুক্তি পাইয়া জাতীয় পতাকা লইয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। শ্রীমতী সুভদ্রা দেবীর সহিত আরো অনেক মহিলা আসিয়া যোগ দিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপারের যবনিকা এখানেই পতন হয় নাই। মিউনিসিপ্যালিটিতেও ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। গত ২০ মার্চ্চ সদস্যেরা এক সভা আহ্বান করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন—ডেপুটি কমিশনার মিউনিসিপ্যাল-গৃহে জাতীয় পতাকা তুলিতে দেন নাই, ভারতের বিশিষ্ট নেতাদের অভিনন্দনে বাধা দিয়াছেন, অভিনন্দন-স্থলে পুলিশ পাহারা বসাইয়াছিলেন, বিনা অনুমতিতে টাউন-হলে সভা করিতে দেন নাই—এসব কার্য্যে সহরবাসীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। সুতরাং মিউনিসিপ্যাল কমিটির সদস্যদের পদত্যাগ করা উচিত।

এই প্রস্তাবের ফলে ১৪ জন সদস্য এবং সভাপতি পদত্যাগ করিয়াছেন।

রাজকোটের সংস্কার—

রাজকোট ষ্টেটে প্রতিনিধিমূলক শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করার উদ্দেশ্যে ৯০ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া একটি ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইয়াছে। একজন নির্ব্বাচিত বে-সরকারী সভ্য উক্ত সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। রাজ্যের সমস্ত প্রজাকেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। নূতন ব্যবস্থাপক সভায় দুইজন মহিলা সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ব্রিটিশ ভারতে নারীকে সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া লইয়াই আপত্তির অন্ত নাই। আর রাজকোটে মহিলাদের ভিতর হইতে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

—

বিদেশ

জগ্‌লুল পাশার কারামুক্তি—

যখন আবেদন নিবেদনে কোনও ফল না পাইয়া আদলীপাশার দল ভগ্নোৎসাহে দমিয়া যাওয়াতে মিশরে জাতীয় আন্দোলন নির্ব্বাপিত-প্রায় হইয়াছিল তখন জগ্‌লুল পাশা মিশরের মুক্তিকামী তরুণের দলকে সংঘবদ্ধ করিয়া মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগনীতি প্রচার করিলেন। জগ্‌লুলের ন্যায় প্রবীণ দেশনায়কের পরিচালনায় অল্পদিনেই অসহযোগের বার্ত্তা মিশরের ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িল। মুক্তির জন্য এই অভিনব আন্দোলন এত সহজে এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে, ইংরেজ প্রতিনিধি লর্ড অ্যালেনবি জগ্‌লুলকে তাঁহার স্বগ্রামে অন্তরায়িত থাকিবার আদেশ দেন। জগ্‌লুল দেশবাসীর আদেশ ভিন্ন দেশসেবার পবিত্র-যজ্ঞ হইতে বিরত থাকিতে অস্বীকার করিলেন। কাজেকাজেই লর্ড অ্যালেনবির আদেশে জগ্‌লুল ধৃত হইয়া জিব্রল্টারে নির্ব্বাসিত হইলেন।

জগ্‌লুলের নির্ব্বাসনের পর জগ্‌লুলের পত্নী অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বেশ ধীর ও শান্তভাবে স্বামীর আরব্ধ কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। দেশবাসীর নিকট এক আহ্বানপত্রে তিনি বলিলেন, "ইংরেজদিগকে অস্বীকার কর। তাহাদিগকে কোনও রকমে সাহায্য করিও না।"

মুক্ত স্বচ্ছ উজ্জ্বল স্বাধীনতার আলোক হস্তে যাহাতে নির্ব্বাসিত বীরগণ শীঘ্রই মিশরে ফিরিয়া আসিতে পারেন তজ্জন্য মস্‌জিদে মস্‌জিদে প্রার্থনা ধ্বনিত হইতে লাগিল। অসহযোগের বার্ত্তা মিশরে যে উৎসাহ সঞ্চার করিল তাহাতে রক্তপাতের পথে না চলিয়াও অভিনব এক মুক্তির পথে মিশরের স্বাধীনতা-লাভ সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে। জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে মিশরাধিপতি খেদিব ফুয়াদ জাতীয় দলের সহিত প্রকাশ্যে সহানুভূতি ঘোষণা করিলেন এবং এই দলের তওফিক নসিমের হস্তে মন্ত্রী-সভা গঠনের ভার দিলেন। নসিম কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই অন্তরায়িত দেশনায়কগণের মুক্তির দাবী জানাইলেন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ স্বরাট্ মিশরের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার ও কাজ করিবার যে জন্মগত অধিকার আছে তাহা ইংরেজের যে-সব রাষ্ট্রীয় দলিল পত্রে স্বীকৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে হেবিয়াস্ কর্পাস্ আইন সর্ব্বপ্রধান। এই দলিলে বিনা বিচারে প্রজার স্বাধীনতা হরণ করিবার ক্ষমতা লোপ করা হয়। কোনও ইংরেজ প্রজাকে বিনা বিচারে কয়েদী করা হইলে হেবিয়াস্ কর্পাস আইনের বলে সে মুক্তি পায়। জগ্‌লুলের পক্ষ হইতে প্রিভি-কাউন্সিলে হেবিয়াস্ কর্পাস্ আইনের সাহায্যে আপীল করা হয়। প্রিভি-কাউন্সিল জিব্রল্টারে ওই আইন বাহাল নাই বলিয়া আপীল প্রত্যাখ্যান করেন।

কিন্তু মিশরের আন্দোলন এমনই প্রবলবেগে চলিতে লাগিল যে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিক জগতেও তাহা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল। কমন্স্ মহাসভার ৯৭ জন সভ্য এক ইস্তাহার জারি করিয়া লর্ড্ অ্যালেন্‌বির শাসন-প্রণালীর তীব্র সমালোচনা করিলেন। ইঁহারা বলেন মিশরবাসীগণ যে শুধু স্বাধীনতা লাভের জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাহা নহে; শিক্ষা-দীক্ষায় তাহারা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে তাহারা শাসন-পরিষদের প্রধান প্রধান বিভাগগুলি বিদেশীয় শক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া এবং মিশরে বিদেশী সৈন্যের প্রভুত্ব বজায় রাখিয়া যে নামমাত্র স্বাধীনতা ইংরেজ তাহাদিগকে দিতে চাহিয়াছে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার বুদ্ধি তাহাদের হইয়াছে। প্রকৃত স্বাধীনতাই তাহাদের লক্ষ্য; ভুয়া স্বাধীনতার আশাতে তাহারা প্রলুব্ধ হইবে না। ইঁহারা আরও বলেন যে জগ্‌লুলের মুক্তি ভিন্ন মিশরে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইবার এবং মিশরের সহিত ইংলণ্ডের মিলন স্থায়ী হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

এই ইস্তাহার জারি হইবার পর অসুস্থতার অজুহাতে জগ্‌লুলকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। মুক্তিসংবাদ পাইয়া মিশরের নগরে নগরে উৎসব চলিতেছে। জগ্‌লুলের মুক্তি মিশরবাসীর নিকট মুক্তি-সংগ্রামে প্রথম জয়ের প্রতীক। শীঘ্রই পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবার আশায় মিশরবাসী আজ উৎফুল্ল!

ইংলণ্ডে ধনী ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব—

বিগত বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের সর্ব্বত্রই যে বিশৃঙ্খলা ও অর্থবৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রভাব হইতে ইংলণ্ডও মুক্তি পায় নাই। ইংলণ্ডের ধনবৈষম্য এতই বেশী হইয়াছে যে সর্ব্বত্রই একটা চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে যে অশান্তি দেখা গিয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে কয়লার খনির ধর্ম্মঘট, জাহাজের কুলির ধর্ম্মঘট, ডকের মজুরের ধর্ম্মঘট প্রভৃতিতেই প্রকটিত হইয়াছে। এখন সেই চাঞ্চল্য কৃষিজীবীদের মধ্যেও দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই কৃষককুল অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সরল। ইংলণ্ডের কৃষককুল এপর্য্যন্ত বেশ শান্তভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল। কিন্তু শ্রমিক-আন্দোলনের ঢেউ তাহাদিগকেও চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। নর্‌ফোক্‌শায়ারের কৃষি-মজুরেরা বেতনবৃদ্ধি এবং কর্ম্মের সময় সংক্ষেপের জন্য ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ব্যবসায়ের অবস্থা সুবিধাজনক নয় এই অজুহাতে কৃষকেরা বেতন বৃদ্ধির দাবী তো মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেই, অধিকন্তু তাহারা কর্ম্মের সময় বাড়াইয়া লইতে চাহে। কাজে কাজেই শ্রমিক এবং মালিকের দ্বন্দ্ব ক্রমশই বাড়িয়া উঠিয়া ধর্ম্মঘট অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করে। ব্যাপার এমনই ভীষণ হইয়া উঠে যে ইংলণ্ডের কৃষিকার্য্যের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া নরউইচের প্রধান ধর্ম্মযাজক (Bishop of Norwich) মধ্যস্থ হইয়া তিন মাসের জন্য উভয়ের মধ্যে একটা রফা করিয়া ধর্ম্মঘট স্থগিত রাখিয়াছেন। ইতিমধ্যে যাহাতে একটা পাকা বন্দোবস্ত হইয়া বিবাদ মিটিয়া যাইতে পারে তাহার চেষ্টা চলিতেছে। কৃষকদিগের সুবিধার জন্য যাহাতে ভূমিকর এবং কৃষকদের অন্যান্য স্থানীয় করের ভার লঘু হয় তাহার চেষ্টা চলিতেছে।

এদিকে দক্ষিণ ওয়েল্‌সের কয়লার খনিতে এক নূতন গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে। রণ্ডা উপত্যকার অধিকাংশ মজুরই শ্রমিক-সংঘের সভ্য; এই শ্রমিক-সংঘের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে মালিকের দল যাহাতে সংঘের বহির্ভূত মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য নানারূপ চেষ্টা অনেকদিন হইতেই করিয়া আসিতেছেন। রণ্ডা উপত্যকায় এইরূপে পাঁচহাজার সংঘ বহির্ভূত শ্রমিক কাজ করিতেছেন। ক্রমে ইহাদের দল বৃদ্ধি পাইলে সংঘশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া শ্রমিকসংঘ কর্ত্তৃপক্ষকে সংঘ-বহির্ভূত লোকদিগকে কর্ম্মে গ্রহণ করিতে নিষেধ করে এবং এই নিষেধে কর্ণপাত না করিলে সংঘ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়া মালিকদিগকে সংঘের আদেশ মানিতে বাধ্য করাইবে এইরূপ ভয় দেখান হয়। মালিকেরা সংঘের আদেশ অগ্রাহ্য করাতে রণ্ডা উপত্যকার শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ধর্ম্মঘট এমনই দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে যে রণ্ডা উপত্যকায় একটি কয়লার খাদেও কাজ চলিতেছে না। সওয়ান্‌সি প্রদেশেও ধর্ম্মঘট বিস্তার লাভ করিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

স্কট্‌ল্যাণ্ডে শ্রমিক-আন্দোলনের অপর একটি নূতন উপসর্গ দেখা গিয়াছে। সেখানকার মৎস্যজীবী ধীবরেরা অত্যন্ত বেশীদামে মৎস্যবিক্রয় করিয়া বেশ লাভ করিত। কিছুদিন হইতে জার্ম্মান ধীবরেরা মাছধরা-জাহাজে করিয়া আইস্‌ল্যাণ্ড্ হইতে মৎস্য আনিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ডের নানা স্থানে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। জার্ম্মানদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় হারিয়া স্কচ ধীবরেরা জার্ম্মান মৎস্যজীবীদিগকে গ্রেট্‌ব্রিটেনে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে। ইংরেজ-সরকার সেরূপ আইন করিতে স্বীকার না করাতে স্কচ্ ধীবরেরা নিজেরাই প্রতিকারের পন্থা খুঁজিতেছে। ইহারা কতকগুলি জার্ম্মান মাছধরা-জাহাজ পাথর ছুড়িয়া জখম করিয়াছে; কতকগুলি জাহাজে জোর করিয়া ঢুকিয়া সব মাছ জলে ফেলিয়া দিয়াছে। এবং জাহাজগুলিকে জার্ম্মানীতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে।

চারিদিকেই মহা অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রমিক-আন্দোলন এমনই প্রবলবেগে চলিতেছে যে শীঘ্রই ইহার একটা সুব্যবস্থা না হইলে ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু ধনী ও শ্রমিকের এই যে দ্বন্দ্ব ইহার শেষ কোথায়? স্বার্থের প্রতি একান্ত দৃষ্টি থাকিলে

এই দুই পরস্পর-বিরোধী দলের মিলন অসম্ভব। কিন্তু উভয়ের বিবাদ বাড়িতে আরম্ভ করিয়া পরস্পরের সংঘর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যে যে ক্ষতি হইতেছে তাহাতে ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

সোভিয়েট্-সরকার ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক—

সকল দেশেই ধর্ম্মযাজনের নামে পৌরোহিত্য এবং দেবসেবার নামে মোহন্তগিরি চলিয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মের নামে অর্থের এই যে গর্হিত অপব্যবহার চলে তাহা বন্ধ করিবার জন্ম আবার প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্রশক্তি কোনও না কোনও সময়ে চেষ্টা পাইয়া আসিয়াছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে বিরোধ, অর্থের এইরূপ অপব্যবহার দমনের জন্ম রাষ্ট্রশক্তির এই প্রয়াস হইতেই অনেকস্থলে তাহার উদ্ভব হইয়াছে। ইংলণ্ডে অষ্টম হেনরির সময় মন্‌ষ্টারিগুলি দমন, ফ্রান্সে বিপ্লবের সময় ধর্ম্মসমাজের ব্যয় বহন করিতে রাষ্ট্রের অস্বীকৃতি প্রভৃতি অনেক ব্যাপারই তাহার প্রমাণ।

রুশিয়াতে কিন্তু ধর্ম্মযাজকের মোহন্তগিরি এযাবৎকাল পুরাদস্তুর চলিয়া আসিয়াছিল। যুদ্ধের সময় যখন রুশিয়াতে বোল্‌শেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয় তখন হইতেই ধর্ম্মযাজকদিগের এইসকল ভূ-সম্পত্তির প্রতি রুশ-সরকারের নজর পড়ে। রণক্লান্ত ও অন্তঃ-প্রপীড়িত রুশিয়াতে যখন দারুণ দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ প্রাণী অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল, তখন রুশিয়ার রাজকোষ শূন্য। সোভিয়েট্-সরকার প্রাণপণ চেষ্টাতেও নিরন্ন প্রজাকে মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে অর্থের অনটন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। অর্থাভাবে বিপন্ন নরনারীর সেবা ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রজার জীবনরক্ষার অন্য উপায় না পাইয়া ধর্ম্মযাজক-দিগের নিকট সঞ্চিত অর্থ ভিক্ষা করা হইল।

ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া নিরাশ হইতে হইল। তখন সোভিয়েট্-সরকার মন্দিরের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া এক ঘোষণা-পত্র জারি করিলেন।

ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা সম্রাট্ হেন্‌রির সময়ে ইংলণ্ডের মন্দিরের সম্পত্তিহরণ গৌরবের বস্তু বলিয়া প্রচার করেন; কিন্তু রুশিয়ার এই কার্য্যে তাঁহাদের তীব্র আপত্তি দেখা যাইতে লাগিল এবং ধর্ম্মমন্দিরের প্রতি হঠাৎ মমত্ববোধ এমনই জাগিয়া উঠিল যে সোভিয়েট্-সরকারের এই হঠকারিতায় বাধা দিবার জন্য ইংরেজ-সরকারকে উদ্বুদ্ধ করিতে একদল লোক তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

রুশ ধর্ম্মযাজকেরাও আপনাদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সোভিয়েট্-সরকার যাহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহার জন্য গোপনে চক্রান্ত আরম্ভ করিলেন। কিন্তু চক্রান্ত বহুদিন আর গুপ্ত রহিল না। সোভিয়েট্-সরকার গুপ্ত চক্রান্তের সন্ধান পাইয়া চক্রান্তকারীদিগের দলপতি বুড়্‌কিয়েভিচ্‌কে গ্রেপ্তার করিলেন। সোভিয়েট্-সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অভিযোগে তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ইংরেজ সরকারের তরফ হইতে মিঃ হজ্‌সন এই আদেশের প্রতিবাদ করিলেন। সোভিয়েট্-সরকার উত্তরে জানাইলেন যে "রুশিয়ার রাষ্ট্রাধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও নাই এবং দেশদ্রোহী গুপ্তরহস্যভেদকারীদিগকে রক্ষা করিবার ইংরেজ-সরকারের প্রয়াসকে সোভিয়েট্-সরকার বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া মনে করেন। আয়ার্‌ল্যাণ্ড, ইজিপ্ট্‌ ও ভারতের হত্যাকাণ্ডের পর ইংরেজ-সরকারের মুখে মহামানবতার বাণী ও জীবপ্রীতির কথা শোভা পায় না।"

এই কড়া জবাব যেরূপ ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহা গ্রহণ করা ইংরেজ-সরকারের পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়া হজ্‌সন সাহেব সোভিয়েট্ সরকারের জবাব-পত্রটি ফিরাইয়া দিয়াছেন। সোভিয়েট্-সরকারের মুখপত্র ইস্‌ভেষ্টিয়া পত্র ইংরেজ-সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া বলিতেছেন, "Perfidious England, murderer of a hundred thousand Irishmen"। বোল্‌শেভিক রুশিয়ার প্রায় সব পত্রিকাই ইংরেজের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিতেছেন।

লর্ড্ কার্ণারভনের মৃত্যু—

ভূ-প্রোথিত প্রাচীন দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যে ইতিহাসের জীর্ণ কঙ্কালে রং ফলাইয়া প্রাচীন কালের সভ্যতার ইতি-হাসকে মনোজ্ঞ করিয়া সাধারণের সম্মুখে ইতিহাসকে সুখপাঠ্য সমাজ-বিজ্ঞানের অঙ্গরূপে উপস্থাপিত করাই প্রকৃত প্রত্নতাত্ত্বিকের কাজ। আসিরিয়া, ব্যাবিলন, ইজিপ্ট্, ভারত, বহির্ভারত, চীন, তাতার, পারস্য, গান্ধারের সভ্যতার ধারার অনেক তত্ত্বই এই-সকল প্রত্নতাত্ত্বিকের চেষ্টায় জগতে প্রচারিত হইয়াছে। মিশরের সুপ্রাচীন সভ্যতার অনেক তথ্যই ইঁহাদের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে ধরা পড়িয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধান করিবার মানসে মিশরের রাজাদের কবর খুঁড়িয়া সেখানকার প্রস্তরফলক, তাম্রফলক, আস্‌বাবপত্র, ভূর্জ্জ-পত্রের লেখমালা প্রভৃতির অঙ্গে প্রকটিত অনেক রহস্যের উদ্‌ঘাটন এ পর্য্যন্ত হইয়া আসিয়াছে। মিশরের ফ্যারোয়া-বংশের প্রায় সকল সম্রাটের কবরই ইঁহারা খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র তুতান্‌খেমেন, দ্বিতীয় থথমিস ও শ্নেনখারার কবর এযাবৎকাল খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। মিশর-অনুসন্ধান-সমিতি হইতে মিশরের সম্রাট্‌দিগকে যেস্থানে কবরস্থ করা হইত, নাইল উপত্যকার সেই অংশে অনুসন্ধান চলিতেছিল। লর্ড্ কার্ণারভন ও মিঃ হাওয়ার্ড্ কার্টার মিশরের এই কবরের উপত্যকায় খননকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাঁহারা তুতান্‌খেমেনের কবর আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের মধ্যে একটা নূতনত্ব আছে। এ পর্য্যন্ত যে-সব কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোথাও বিশেষ কোনও আস্‌বাবপত্র পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এই কবরের এক বৃহৎ গৃহে আস্‌বাবপত্র ঠাসা ছিল। সম্রাট্‌দিগের শয্যার পালঙ্ক, গৃহসজ্জার জন্য নানাবিধ আস্‌বাব, বহুকারুকার্য্যশোভিত নানাপ্রকার সাজসরঞ্জাম এই কুঠরীর মধ্য হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৃত সম্রাটের কবর হইতে এই-সব দ্রব্যসম্ভার পুরাতত্ত্বসংগ্রহশালায় প্রেরিত হইবার জন্য যখন নীত হইতেছিল তখন সেই সংগ্রহকার্য্য পরিদর্শন করিতে যাইয়া লর্ড্ কার্ণারভন একপ্রকার বিষধর কীটের দ্বারা দষ্ট হন। সেই বিষের ক্রিয়াতে কার্ণারভন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বিগত পাঁচই এপ্রিল তারিখে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

প্রবাদ আছে, যে সম্রাটের কবরে হস্তক্ষেপ করিলে সম্রাটের রোষে সর্ব্বনাশ হয়। কার্ণারভনের মৃত্যুতে এই সংস্কারটির প্রতি অনেকের বিশ্বাস এতই বাড়িয়া উঠিয়াছে যে কবর-সংক্রান্ত আরও নূতন অনুসন্ধান করিবার প্রচেষ্টাকে বাধা দিবার আয়োজন চলিতেছে। বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক মারি করেলি, সুবিখ্যাত গল্পলেখক কোনান্ ডয়েল, প্রথিত-নামা বৈজ্ঞানিক স্যার্ অলিভার লজ্ প্রভৃতি বিখ্যাত লোকেও এই প্রাচীন সংস্কারে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রেততত্ত্ব আলোচনা করিয়া তাঁহারা ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু হাওয়ার্ড্ কার্টার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন। কাজটি সুসম্পাদিত হইলে মিশরের সভ্যতার অনেক নূতন তথ্য প্রকাশিত হইবে। মিশরের সুকুমার কলা এবং কারুকার্য্যের ইতিহাস সম্বন্ধে এত নূতন বিষয় ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছে যে মিশরের আর্টের ইতিহাস আবার সম্পূর্ণ নূতনভাবে লিখিতে হইবে।

উড়োজাহাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—

ঋণভারপ্রপীড়িত ইউরোপের যখন যুদ্ধোদ্যমের ভার বহন করা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল তখন সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ ও নৌবহরের নির্ম্মাণের ব্যয় যাহাতে আর বৃদ্ধি না পায় তাহার উপায় চিন্তা করিবার জন্য শক্তিবর্গের বৈঠকের সংকল্প হয়। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে ইংরেজ, জাপান ও যুক্তরাজ্যের প্রাধান্য-বিস্তার লইয়া রেষারেষি থাকাতে সাহস করিয়া কেহই নৌবহর বৃদ্ধি স্থগিত রাখিতে পারিতেছিলেন না। অথচ নৌবহরের ব্যয়ভার অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য রাজ্যের আয় হইতে ব্যয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি পাওয়াতে রাজকোষে ঋণভার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জমা-খরচের হিসাবে আয়-ব্যয়ের সাম্য সাধনের বৃথা চেষ্টায় মন্ত্রীবর্গ মাথা ঘামাইয়া কূল পাইলেন না। এই সমস্যার প্রতিবিধানের জন্য যুক্তরাজ্যের ওয়াশিংটন সহরে নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্সের বৈঠক বসে। নৌবহর হ্রাস করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ এবং সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিবার প্রয়াস দরকার তাহা এই সূত্রে অনুভূত হয়। সেইজন্য নিরস্ত্রীকরণ-দরবার অনেক তর্ক-বিতর্কের পরে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে শক্তিবর্গ আপন আপন যুদ্ধোদ্যমের বিপুল আয়োজনের অনেকটা হ্রাস করিতে বাধ্য হইলেন।

এই বৈঠকে একটি বিষয়ে কিন্তু কোনও ব্যবস্থা হয় নাই এবং সেইজন্য একটি নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈঠকে উড়োজাহাজ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা হয় নাই। কাজে কাজেই শক্তিবর্গের যথেচ্ছভাবে আপন আপন যুদ্ধোপযোগী উড়ো জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার স্বাধীনতা রহিয়া যায়। ইহার ফলে উড়ো জাহাজ নির্ম্মাণে প্রতিযোগিতা বাড়িয়া উঠিয়া আবার নূতন করিয়া রেষারেষির সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশে ফ্রান্সের বাহুবল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক! ফ্রান্সের আকাশপথে এই শ্রেষ্ঠতার কথা প্রকাশ হওয়াতে ইংলণ্ডে মহা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে।

লর্ড বার্কেনহেড্ এই ব্যাপার লইয়া পার্লামেণ্ট মহাসভায় এক আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "যদিও ফ্রান্স্ ইংলণ্ডের মিত্র এবং ফ্রান্সের এই শ্রেষ্ঠতায় বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের কোনও ভয়ের কারণ নাই, তথাপি আপনার ভবিষ্যৎ বিপদের কথা স্মরণ করিয়া ইংলণ্ড্ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। আত্মরক্ষার জন্য ইংরেজকে প্রস্তুত হইতেই হইবে।" 'অবজারভার' পত্রিকা এই সূত্রে বলিতেছেন, "To create at any cost air equality, no more or no less, is an issue of public life second to none." ফ্রান্সের বিমানবল এতই বেশী যে ফ্রান্স্ ইচ্ছা করিলে লণ্ডন ও ইংলণ্ডের অন্যান্য বাণিজ্য-কেন্দ্র একদিনেই ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। ফ্রান্স যেরূপ দ্রুতগতিতে বিমান নির্ম্মাণ করিতেছে তাহাতে এক বৎসরের মধ্যে ফ্রান্স একাকী পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতিকে বিমানযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিবে। তাই ফ্রান্সের বিমানবলকে খর্ব্ব করিবার জন্য ওয়াশিংটন বৈঠকের মত আরেকটি বৈঠক ডাকিবার সংকল্প ইংরেজ করিতেছেন। এই ব্যাপার লইয়া ফ্রান্স্ ও ইংলণ্ডের মনোমালিন্য আরও বাড়িয়া উঠার সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্মৃতি

অয়ি স্মৃতি, অয়ি মত্তা মমতারূপিণী,
ভুবনের হাটে হাটে ফিরি' একাকিনী
কার লাগি' কি রতন আহরিছ নিতি?
এ বিশ্ব তোমারি দ্বারে প্রেমের অতিথি!
নিখিলের পথে পথে শত হারা-হিয়া
যুগে যুগে কেঁদে কারে ফিরেছে খুঁজিয়া?
অশ্রু-ধারে সারাপথ এঁকে এঁকে এঁকে
হৃদয়ের ক্ষত-চিহ্ন গেছে হায় রেখে!
এ বিশ্ব জানে না তার কোনই বারতা,
ওর মাঝে অনন্তের কি গভীর কথা;
উৎসবের কানে এর পশেনি ক্রন্দন,—
ব্যথা-দীর্ণ হৃদয়ের মৌন নিবেদন!
সবে ফিরায়েছে মুখ, চলে' গেছে সবে,
বিশ্ব-রাজপথ করি' পূর্ণ কলরবে!

তুমি শুধু আছ স্মৃতি, চির-সচেতন,
তুমি বোঝ কি-লেখা সে অশ্রু-আলিপন,
প্রেমেরি সে অভিজ্ঞান, সে মহান্ দুখে
তুমি ভোল নাই, স্মৃতি, নেছ তুলে বুকে,
প্রেমের যে অপমান তার অপমানে,—
তুমি জান প্রেমময়ী; তাই তব প্রাণে
সবা লাগি' আছে ঠাঁই,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম
তব প্রেমে সবে দীপ্ত, চির-অনুপম।
যা-কিছু হারায় তাই যতনে কুড়ায়ে
তুমি রাখ; আপনার হৃদয় বাড়ায়ে
সবারে আপন করি' কর আলিঙ্গন,
তব প্রেমে সবে তাই জিনেছে মরণ!
দুখেরে মধুর তুমি করেছ যে প্রেমে,
বেদনার বক্ষে তাই এল স্বর্গ নেমে।

শ্রী হৃষীকেশ চৌধুরী

বিবিধ প্রসঙ্গ

টাকা চাই

ঘর সংসার চালাইতে হইলে টাকার দরকার হয়। ধনী হইলেই যে মানুষ খুব সুস্থ সবল জ্ঞানী ও কর্ম্মিষ্ঠ হয়, তা নয়; কিন্তু ধন থাকিলে সুস্থ সবল হইবার ও থাকিবার, জ্ঞানলাভ করিবার ও কর্ম্ম করিবার অধিকতর সুযোগ হয়।

এরূপ কথার উত্তরে অনেকে সহজেই একরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিবেন, যে, বিস্তর গরীবের ছেলে সুস্থ সবল জ্ঞানী ও কর্ম্মী হইয়াছে। অতএব এবিষয়ের আলোচনা ভাল করিয়া করিবার আগে বুঝা দরকার, গরীব ও ধনী আমরা কাহাকে বলি। শরীরের ক্ষয় নিবারণ এবং দেহের বৃদ্ধির জন্য যে যথেষ্ট খাইতে পায়, আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহাকে গরীব্ বলিতেছি না, তাহাকে যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন বলিয়া মনে করিতেছি।

একজন গরীবের ছেলে খুব বিদ্বান্ হইতে পারে। হয় ত সে ছেলেটি বিনা বেতনে কোন কলেজে পড়িয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা প্রমাণ হইল না, যে, শিক্ষার জন্য ও জ্ঞান লাভের জন্য টাকার দরকার হয় না। কারণ, কলেজটি স্থাপন করিতে ও চালাইতে অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে। গরীব ছেলেটি টাকা না দিক, কিন্তু অন্যেরা দিয়াছে ও দিতেছে। ঐ ছেলেটি হয় ত কাহারো নিকট বহি ধার করিয়া কিম্বা কোন সাধারণ পুস্তকালয়ে গিয়া নানা রকম বহি পড়ে; তাহাতেও প্রমাণ হয় না, যে, বিনা পয়সায় বহি পড়া যায়; কেন না, সাধারণ পুস্তকালয়ের বহি পয়সা দিয়া কিনিতে হয়, যাহারা বহি ধার দেয়, তাহাদিগেরও বহি কিনিতে পয়সা লাগে। অনেক ক্ষুদ্র পুস্তকালয়ের পরিচালকেরা গ্রন্থকারদের নিকট পুস্তক চাহিয়া লন বটে, কিন্তু গ্রন্থকারদিগকে পয়সা খরচ করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া বহি লিখিতে ও বহি ছাপাইতে হয়।

আত্মচিন্তা দ্বারা অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু এরূপ আত্মচিন্তা সভ্য সমাজের সভ্য মানুষে করে। এবং একরূপ সভ্য অবস্থায় পৌঁছিতে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। সভ্য সমাজের কোন ব্যক্তি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া গেলেও সাধারণতঃ তাঁহাকে গৃহীর শ্রমলব্ধ খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। তিনি যদি অরণ্যবাসী হইয়া স্বভাবজাত ফলমূলের উপর নির্ভর করেন, তাহা হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে, তাঁহার পিতামাতা ও পূর্ব্বজগণ এবং প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে তিনি শারীরিক ও সামাজিক উত্তরাধিকার- (physical and social inheritance) সূত্রে যাহা পাইয়াছেন, তাহার জন্য তিনি ঋণী, এবং তাঁহার পূর্ব্বজ ও প্রতিবেশীদের পূর্ব্বজগণের সভ্যতা অর্থসাপেক্ষ ছিল।

সামাজিক নানাদিকের উন্নতির গোড়ার কথা আমূল আলোচনা বেশী করিয়া করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সময়ে ও আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যে দিকেই অগ্রসর হইতে চাই, কিছু অর্থের প্রয়োজন হইবে। এ কথা ব্যক্তিগত ভাবে সত্য, এক একটি পরিবারের কথা ধরিলে সত্য, আমাদের সমুদয় দেশ ও জাতির কথা ধরিলে সত্য। দেশ ও জাতির কথাই এখন আলোচনা করিতে চাই।

আমরা সবাই জানি, দেশে শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষার উন্নতির জন্য, গবেষণার জন্য, দেশকে স্বাস্থ্যকর করিবার জন্য, সমুদয় জাতিকে পুষ্ট ও সবল করিবার জন্য, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতির জন্য যত টাকা খরচ করা দরকার, আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাহা করেন না। অথচ বেশী খরচ না করিলে এসব দিকে আমাদের জাতির উন্নতি হইতে পারে না।

কিন্তু বেশী খরচ করা যায় কেমন করিয়া? ইহার সোজা উত্তর, গবর্ণমেণ্টের অনেক বাজে খরচ আছে; সে-সব ছাঁটিয়া ফেলিয়া শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি প্রভৃতির জন্য খরচ করা হউক। ব্যয়সংক্ষেপের অনেক উপায় সমগ্র ভারতের জন্য নিযুক্ত ইঞ্চ্‌কেপ কমিটি এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক কমিটি দেখাইয়াছেন। প্রধান এবং আসল উপায় দুটি তাহারা দেখান নাই, এবং তাঁহারা দেখাইবেন, এরূপ আশা করাও যুক্তিসঙ্গত হইত না। কোন দেশ

বিদেশীর অধীন থাকিলে এবং উহার সমস্ত বা প্রায় সমস্ত উচ্চ কাজ গুলি বিদেশীর হাতে থাকিলে শাসন কার্য্যের ব্যয় বেশী হইবেই। সুতরাং যতদূর সম্ভব ব্যয়সংক্ষেপ করিতে হইলে দেশকে স্বাধীন করিতে হইবে। এই গেল একটি প্রধান ও আসল উপায়। দ্বিতীয় উপায়, সরকারী কাজ দেশের লোকেই করুন বা বিদেশীই করুন, বেতনটা দেশের দারিদ্র্যের বা ধনশালিতার অনুরূপ হওয়া দরকার। অথচ এদেশে ব্রিটিশ শাসন কালে উচ্চপদস্থ দেশী সরকারী কর্ম্মচারীদিগকেও বেশী বেতন দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। "প্রবর্ত্তিত" বলিলে একটু ভুল হয়। কারণ, উচ্চপদস্থ লোকদিগকে বেশী টাকা দেওয়ার এবং নিম্নপদস্থ লোকদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষেও অযথেষ্ট টাকা দেওয়ার রীতি এখনও অনেক ভারতীয় দেশীরাজ্যে আছে, এবং ব্রিটিশ শাসনের আগেও ছিল। উচ্চ সরকারী কাজ করিলেই বেশী টাকা পাইতে হইবে, এই ধারণা ও রীতি বদলাইতে হইবে ; সরকারী কাজ দেশের সেবা, এই ধারণা জন্মাইতে হইবে ; এবং জাতীয় চরিত্রকে এরূপ উন্নত করিতে হইবে, যে, উচ্চতম কাজ করিয়া, এখনকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বেতন পাইলেও যোগ্য লোকেরা উৎকোচ ও তহবিল্ তছ্‌রূপ্ আদি দোষ হইতে মুক্ত থাকিবেন।

কিন্তু আমরা দেখাইতে চাই, যে, এই প্রকারে যথাসম্ভব ব্যয় সংক্ষেপ করিলেও, সমগ্র ভারতের এবং এক একটি প্রদেশের বর্ত্তমানে যে সরকারী আয় আছে, তাহাতে অন্য সব সভ্য দেশের সমকক্ষ হইবার জন্য যত ব্যয় করা আবশ্যক, তাহা আমরা করিতে পারিব না. সরকারী আয় বাড়াইতে হইবে। আয় বাড়াইবার উপায় প্রজাদের নিকট হইতে বেশী করিয়া ট্যাক্স আদায়। কিন্তু সমগ্র ভারতীয় বজেটে এবং বাংলাদেশের বজেটে দেখা গিয়াছে, যে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট ও বাংলা গবর্ণমেণ্ট নূতন ট্যাক্স বসাইয়া এবং কোন কোন পুরাতন ট্যাক্‌স্ বাড়াইয়া যত আয় হইবে মনে করিয়া ছিলেন, তাহা হয় নাই। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, যে, দেশের লোকের বর্ত্তমান আয়ে তাহারা আর বেশী ট্যাক্স দিতে অসমর্থ। তাহাদের ট্যাক্স দিবার সামর্থ্য বাড়াইতে হইলে তাহাদিগকে অধিকতর ধনী করিতে হইবে।

কোন দেশ ও জাতি যদি ধনী হইতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে (১) মাটীর উপরে যাহা জন্মে তাহা হইতে ধন আহরণ করিতে হইবে, (২) মাটীর নীচে যাহা সঞ্চিত আছে, তাহা লইতে হইবে, (৩) নদী ও সমুদ্র হইতে মূল্যবান্ পদার্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, (৪) বায়ু হইতে মূল্যবান্ জিনিষ লইতে হইবে। তাহার জন্য, (১) সাধারণ কৃষি, ফুল ফলের বাগান, ঘরবাড়ী আস্‌বাব জাহাজ-আদি নির্ম্মাণের উপযোগী কাঠের জন্য অরণ্য ও উদ্যান রচনা ও রক্ষা, মৌমাছির চাষ, দুধ ঘি প্রভৃতির ব্যবসা, গো মেষ মহিষ ছাগল ঘোড়া প্রভৃতি পশুপালন, ডিমের ব্যবসা, হাঁস মুরগীর ব্যবসা, প্রভৃতি আবশ্যক ; (২) খনি হইতে কয়লা, এবং লোহা প্রভৃতি ধাতু উত্তোলন ও তাহা হইতে নানাবিধ পণ্যদ্রব্য উৎপাদন আবশ্যক, এবং তজ্জন্য খনিজবিদ্যা ও তৎসম্পর্কীয় এঞ্জিনীয়ারিং জানা প্রয়োজন ; (৩) জলজ নানা উদ্ভিদ্ ও প্রাণী হইতে মানুষের ব্যবহার্য্য বহুলাভজনক পদার্থ সংগ্রহ করিতে হইবে ; (৪) রসায়নী বিদ্যার সাহায্যে বাতাসের নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজানকে চাষের সারে পরিণত করিতে হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে দেশকে ধনী করিতে হইলে কৃষি, পশুপক্ষী ও মধুমক্ষিকাপালন, পণ্যশিল্প এবং বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতি করিতে হইবে। ইহার জন্য দেশের সমুদয় পুরুষজাতীয় ও স্ত্রীজাতীয় লোকদের সাধারণ শিক্ষা দরকার। তা ছাড়া যাহারা যে যে কাজ দ্বারা উপার্জ্জন করিতে চায়, তাহাদিগকে কৃষি, পশ্বাদিপালন, পণ্যশিল্প বা বাণিজ্য শিখিতে হইবে। এই সব বহুবিস্তৃত জাতীয় শিক্ষা সরকারী ব্যয়ে ভিন্ন যথেষ্ট পরিমাণে হইতে পারে না।

কিন্তু শুধু শিক্ষাতেই হইবে না। সুস্থ ও সবল দেহ চাই। কারণ, শ্রম না করিলে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা কি করিতে পারে ? এবং অসুস্থ দুর্ব্বল লোকেরা শ্রম করিতে পারে না। শিক্ষালাভও স্বাস্থ্যসাপেক্ষ। সেই জন্য দেশকে স্বাস্থ্যকর করা চাই। এই কাজও সরকারী ব্যয়ে ভিন্ন আশানুরূপ হইতে পারে না।

অতএব, নানাদিকের অনাবশ্যক ব্যয় যাহা আছে, আপাততঃ তাহা ছাঁটিয়া দিয়া সাধারণ শিক্ষা ও কেজো

শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি এই দুদিকে খরচ বাড়ান হউক, এবং দেশের লোকেই যাহাতে জল স্থল আকাশ হইতে ধন সংগ্রহ ও উৎপাদন করিতে পারে, তাহার জন্য জাপানের ও আমেরিকার মত আইন ও সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হউক। এই উপায়ে দেশের লোকে এখনকার চেয়ে একটু ধনী হইলে, তাহাদের নিকট হইতে অধিকতর ট্যাক্স আদায় করিয়া শিক্ষাস্বাস্থ্যাদির জন্য আরও খরচ করা যাইতে পারিবে। তখন সেই উপায়ে দেশের ধন আরও বাড়িবে।

চরিত্র চাই

কেবল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য থাকিলেই দেশের ধন বাড়িবে না, ইহাও বলা আবশ্যক। চরিত্র সকল উন্নতির মূল। অসচ্চরিত্র, মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক কোন কোন লোক ধনী হইয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আছে। কিন্তু জাতির সমুদায় বা অধিকাংশ লোক অসচ্চরিত্র, মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক হওয়া সত্ত্বেও উহা স্থায়ীভাবে ধনী হইয়াছে ও ধনী থাকিয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ইতিহাসের কথা এইজন্য বলিতেছি যে, আপাততঃ আমাদের সমসাময়িক যে সব জাতিকে আমরা ধনী দেখিতেছি, তাহাদের ধন কত দিন টিকিবে, তাহা ভবিষ্যৎ বংশের লোকেরা দেখিবে। আমরা দেখিতেছি, অতীতের আসীরিয়া, বাবিলন, মিশর, ভারত, গ্রীস্, ফিনিকিয়া, রোম, স্পেন, ও পোর্টুগ্যালের ধনশালিতা অতীতের কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। চরিত্রহীনতা ইহার অন্যতম কারণ।

কোন বড় সাংসারিক কাজ মানুষ একা করিতে পারে না, পরস্পরের সাহায্যে বড় কাজ হয়। কিন্তু এক জন আর এক জনকে যদি বিশ্বাস করিতে না পারে, যদি প্রত্যেকে কর্ত্তব্যপরায়ণ না হয়, যদি প্রত্যেকের নিয়মনিষ্ঠা ও সময়নিষ্ঠা না থাকে, যদি প্রত্যেকে সাধারণ স্বার্থ ও সাধারণ হিতের জন্য নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা ও স্বার্থ কিছু ত্যাগ করিতে না শিখে, এবং যদি প্রত্যেকে অবিলাসী ও পরিশ্রমী না হয়, তাহা হইলে কোন বড় কাজ হইতে পারে না। ফাঁকি দিয়া, চালাকি করিয়া, লম্বাচওড়া কথা বলিয়া, স্বপ্ন দেখিয়া, কোন জাতি বড় হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না।

দেশ বিদেশের আয়ব্যয়ের তুলনা

১৯২৩-২৪ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের আয় ১৯৮ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহা কিন্তু খরচাবাদ, ঝাড়া, নিট (net) আয় নহে, গ্রোস্ বা মোট আয়। আগে আগে খরচাবাদ নিট্ আয় দেখান হইত। তদনুসারে ১৯২২-২৩ সালের আয় ১৩৩ কোটি ২৩ লক্ষ হইবে অনুমান করা হইয়াছিল, কিন্তু ঐ বৎসরে আয় হইয়াছে মোটামুটি ১২১ কোটি টাকা মাত্র। খৃষ্টীয় এক বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের ও সরকারী কাজের বৎসর ধরা হয়।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের লোকসংখ্যা ২৪,৭১,৩৮,৩৯৬; জাপানের লোকসংখ্যা ৫,৫৯,৬১,১৪০।

জাপান ম্যাগাজিন্ নামক কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, ১৯২৩-২৪ সালে জাপানের রাজস্বের পরিমাণ একশত পয়ত্রিশ কোটি ইয়েন্ হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এক ইয়েন্ মোটামুটি দেড় টাকার সমান। তাহা হইলে ১৯২৩-২৪ সালে জাপানের আনুমানিক রাজস্ব ২০২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হইবে। অর্থাৎ যে দেশের লোক-সংখ্যা ব্রিটিশ ভারতের সিকিরও কম, তাহার সরকারী আয় ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা বেশী। অথচ জাপান যে খুব উর্ব্বর দেশ, তা নয়। উহা পার্ব্বত্য এবং উহার একষষ্ঠাংশ জমি মাত্র চাষের উপযুক্ত। ভারতবর্ষের জমির ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী অংশ চাষের যোগ্য, এবং জাপান অপেক্ষা বেশী জমিতে চাষ এখানে হয়ও। জাপানে ভূগর্ভে যত রকম ও যে-পরিমাণ খনিজ দ্রব্য আছে, ভারতবর্ষে তাহা অপেক্ষা বেশী আছে। ভারতীয়েরা জাপানীদের চেয়ে কম বুদ্ধিমান্ নয়। কিন্তু জাপান স্বাধীন, জাপানী গবর্ণমেণ্ট্ প্রজাদিগকে পণ্যশিল্প এবং বাণিজ্যে অগ্রসর করিবার জন্য প্রভূত চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, জাপানে শিক্ষার বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ ভারতের চেয়ে বেশী, জাপানের স্বাস্থ্যও ভারতবর্ষ অপেক্ষা ভাল।

এইসব কারণে জাপানীরা ভারতীয়দের চেয়ে বেশী পরিশ্রম ও ধনোৎপাদন করিতে পারে।

জাপানে শিক্ষার বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ ভারতের চেয়ে বেশী হইবার নানা কারণ আছে। প্রথম কারণ, স্বাধীনতা। জাপানীরা নিজেই নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা এমন ভাবে করিয়াছে, যাহাতে সমুদয় জাপানী শিক্ষিত ও স্বদেশানুরাগী হয়। এই জন্য জাপানে নিম্নশিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক। তাহার ফলে জাপানের স্ত্রীলোকেরা প্রায় শতকরা নব্বইজন লিখিতে পড়িতে পারে, পুরুষেরা পারে শতকরা নব্বইয়েরও উপর। ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ১.০৫ অর্থাৎ হাজারে সাড়ে দশ জন, দশহাজারে ১০৫ জন লিখিতে পড়িতে পারে; পুরুষদের মধ্যে শতকরা ১০.৫৬, হাজারে ১০৫.৬ এবং অযুতে ১০৫৬ জন লিখিতে পড়িতে পারে। কোম্পানীর আমলে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ এদেশে সরকারী ব্যয়ে শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই; তাহার পর সামান্য ভাবে করেন—প্রথমতঃ তিনটি উদ্দেশ্যে; (১) কর্ম্মচারী পাইবার জন্য, (২) বিলাতী রুচি জন্মাইয়া বিলাতী জিনিষের কাট্‌তি বাড়াইবার জন্য, (৩) খ্রীষ্টিয়ানের সংখ্যা বাড়াইয়া রাজত্বের ও বাণিজ্যের ভিত্তি বিস্তৃত ও দৃঢ় করিবার নিমিত্ত। এই সব কথার ঐতিহাসিক প্রমাণসহ বিবরণ সার্জ্জন-মেজর বামনদাস বসুর একখানি বহিতে * আছে। তাহা হইতে অনেক তথ্য ও প্রমাণের উল্লেখ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার লাহোরের জাতীয় বিদ্যাপীঠের বক্তৃতায় সম্প্রতি করেন। কোম্পানীর আমল হইতে এখন পর্য্যন্ত ইংরেজদের বরাবরই ভয় আছে, যে, ভাল ও বেশী শিক্ষা পাইলে ভারতীয়দের চোখ খুলিতে পারে এবং তাহারা পরাধীনতায় অসন্তুষ্ট হইয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে পারে। শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে কেজো ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিলে ইংলণ্ডের শিল্পবাণিজ্যের ক্ষতি হইতে পারে, এই ভয়ও আছে। এই সব কারণে ভারতবর্ষে শিক্ষার সুবিস্তৃত ও উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত এপর্য্যন্ত হয় নাই। জাপানীরা স্বাধীন বলিয়া এইসব রকমের কোন ভয় না থাকায় সেখানে শিক্ষার সুব্যবস্থা হইয়াছে।

জাপানে শিক্ষার সম্যক্ বিস্তৃতি ও উৎকর্ষের আর একটি কারণ, জাপান শিক্ষার জন্য খুব খরচ করে। জাপানের শিক্ষার ব্যয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষার ব্যয়ের তুলনা করিবার পূর্ব্বে বিলাতের খরচের সঙ্গে বঙ্গের খরচের তুলনা করা যাক্। বঙ্গের সহিত তুলনা করিবার কারণ এই, যে, বাংলার লোকসংখ্যা ৪৫৪৮৩০৭৭ এবং গ্রেট্‌ব্রিটেন ও আয়াল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ৪৬১০০০০০—প্রায় সমান। বাংলা দেশে ১৯২৩-২৪ সালে দেশীলোকদের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট্ এক কোটি টাকার কিছু বেশী খরচ করিবেন। বিলাতে গবর্ণমেণ্ট্ ১৯২২-২৩ সালে লোক শিক্ষার জন্য ৫৫৪৮৭০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৮৩,২৩,০৫,০০০ (তিরাশি কোটির উপর) টাকা বরাদ্দ করেন। এই তুলনায় কথা উঠিবে, যে, বিলাত পাশ্চাত্য ধনী দেশ, তাহার সঙ্গে বাংলার তুলনা করা অন্যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিলাত ধনী হইল কেমন করিয়া? পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব্ বলিয়াছিলেন, যে, মুর্শিদাবাদ লণ্ডনের চেয়ে ধনশালী শহর। কেমন করিয়া বাংলার দশাবিপর্য্যয় ঘটিল, সকলে ভাবিয়া দেখুন ও প্রতিকারের চেষ্টা করুন।

যাহা হউক, পাশ্চাত্য ও ধনী বিলাতের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন প্রাচ্য জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সরকারী শিক্ষাব্যয়ের তুলনা করা যাক্। জাপান ম্যাগাজিনে দেখিতেছি ১৯২৩-২৪ সালের জন্য জাপানের গবর্ণমেণ্ট ৮৬০,০০,০০০ ইয়েন্ অর্থাৎ ১২,৯০,০০,০০০ টাকা (প্রায় তের কোটি টাকা) বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহা বাংলা গবর্ণ-মেণ্টের শিক্ষা ব্যয়ের মোটামুটি বার গুণ। সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট্ ১৯২০—২১ সালে ৭,১২,৭৭,৬১২ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। জাপানের লোকসংখ্যা ভারতের সিকিরও কম, অথচ উহার গবর্ণমেণ্ট্ শিক্ষার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রায় দ্বিগুণ খরচ করেন।

জাপানী গবর্ণমেণ্ট্ শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন বেশী; এবং সেই ব্যয়ে কাজ পান এখানকার চেয়ে ভাল ও বেশী; কারণ জাপানে ভারতবর্ষের মত বেশী বেশী টাকা বেতন দিতে হয় না। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। জাপানে

* *History of Education in India under the Rule of the East India Company.* By Major B. D. Basu, I.M.S. (Retired). Rs. 2-8-0. Modern Review Office, Calcutta.

পাঁচটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। উহার প্রেসিডেণ্ট্-দের পদ অনেকটা ভারতবর্ষের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়-সকলের ভাইস্-চ্যান্সেলারদের মত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার মাসে চারি হাজার, লক্ষ্ণৌয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার তিন হাজার,এবং এলাহাবাদের ভাইস্-চ্যান্সেলার তিন কিম্বা সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতন পান। জাপানের সরকারী (Imperial) বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির প্রেসিডেণ্টরা বেতন পান বৎসরে ৬৫০০ হইতে ৭০০০ ইয়েন্ অর্থাৎ ৯৭৫০ হইতে ১০৫০০ টাকা। মাসিক হিসাবে ইহা ৮১২৷৷০ হইতে ৮৭৫ টাকা হয়। দরিদ্র ভারতবর্ষে অনেক অধ্যাপক ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক বেতন পাইয়া থাকেন।

আগে বলিয়াছি, জাপানের স্বাস্থ্য ভারতবর্ষ অপেক্ষা ভাল বলিয়াও জাপানীরা বেশী শ্রম ও ধনোপার্জ্জন করিতে পারে। জাপানের স্বাস্থ্য যে ভারতের চেয়ে ভাল তার প্রমাণ, এই উভয় দেশের হাজারকরা জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা এবং লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি হইতে পাওয়া যায়। ১৯২০ সালে ব্রিটিশ ভারতের হাজারকরা জন্মের সংখ্যা ছিল ৩৩, মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩০·৮; ১৯১৯এ জন্মের সংখ্যা ছিল ৩০·২৪ কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা ছিল (তদপেক্ষা বেশী) ৩৫·৮৭। জাপানের ১৯১৭ সালের পরের অঙ্ক পাইতেছিনা; ঐ সালে হাজারকরা জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩২ ও ২১·৪১। অর্থাৎ জাপানে জন্মের সংখ্যা মোটামুটি ভারতবর্ষের সমান কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কম।

জাপানের স্বাস্থ্যের উৎকর্ষের আর একটা প্রমাণ এই, যে, ভারতবর্ষে লোকে গড়ে ২৩ বৎসর বাঁচে, জাপানে পুরুষেরা গড়ে বাঁচে ৪৩·৯৭ এবং স্ত্রীলোকেরা ৪৪·৮৫ বৎসর। ইহার সোজা মানে এই, যে, এক একজন জাপানী এক একজন ভারতীয় অপেক্ষা গড়ে কুড়ি বৎসর অধিক কাল বাঁচিয়া শ্রম ও ধনোপার্জ্জন করে।

জাপানী গবর্ণমেণ্ট্ জাপানের প্রাকৃতিক ধন জাপানেই রাখিবার ও জাপানীদেরই হস্তগত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। জাপানী আইন অনুসারে বিদেশীরা জাপানে জমির মালিক হইতে এবং ভূগর্ভ হইতে খনিজ পদার্থ উত্তোলন বিক্রয়াদির অধিকার লাভ করিতে পারে না। ভারতবর্ষে বিদেশীরা ভাল ভাল অনেক জমি ত পাইয়াছেই, অধিকন্তু প্রায় সমস্ত তাহাদের হস্তগত হইয়াছে; অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান্ কিছু খনি ভারতীয়দের হাতে আছে। যে সব জায়গায় মাটীর নীচে খনিজ জিনিষ আছে বলিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুমিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও খনি খোঁড়া হয় নাই, সেই সব জমিরও অধিকাংশ বিদেশীদের হাতে গিয়াছে। জাপানে, গবর্ণমেণ্ট্ নিজে আধুনিক উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যাঙ্কিং (অর্থাৎ মহাজনী) করিয়া প্রজাদিগকে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন; উৎকৃষ্ট আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিক্ষেত্র ও নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের কারখানা স্থাপনও জাপানী গবর্ণমেণ্ট্ প্রথমে নিজে করিয়া প্রজাদিগকে শিখাইয়াছেন। জাপানী বাণিজ্য-জাহাজ ও যুদ্ধ-জাহাজ উভয়েই নির্ম্মাণ ও ব্যবহারের পথ জাপানী গবর্ণমেণ্ট্ নিজে দেখাইয়াছেন। এ সব বিষয়ে ভারতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কৃতিত্ব নাই বা উল্লেখযোগ্য নহে। ভারতে বাণিজ্য-জাহাজ নির্ম্মাণ ও ব্যবহার ত কোম্পানীর আমলে ইংরেজদের চেষ্টাতেই বিনাশ পাইয়াছে। ভারতীয় বহুবিধ প্রাচীন পণ্যশিল্পের বিলোপের ইতিহাসও তাই।

জাপানীরা কি কি কারণে ভারতীয়দের চেয়ে বেশী শ্রম ও ধনোৎপাদন করিতে পারে, তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিলাম। জাপানী লোকেরা ধন উপার্জ্জন বেশী করে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট্‌কে ট্যাক্সও দিতে পারে বেশী। আবার সেই কারণে তাহাদের গবর্ণমেণ্ট্ও তাহাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতির জন্য বেশী খরচ করিতে পারে।

—

ভারতের ও জাপানের সামরিক ব্যয়

জাপান শিক্ষাক্ষেত্রে অল্প বেতন দিয়া যেরূপ উচ্চঅঙ্গের কাজ করিবার লোক পান, তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি। রাষ্ট্রীয় কার্য্যের অন্যান্য বিভাগেও কর্ম্মচারীদের বেতন এইরূপ কম। তাহার দৃষ্টান্ত স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধ বিভাগে পাওয়া যায়।

১৯২৩—২৪ সালের জাপানী বজেটে স্থলযুদ্ধ বিভাগের জন্য ২০,৫০,০০,০০০ ইয়েন্ এবং জলযুদ্ধ বিভাগের জন্য

২৭,৬৮,০০,০০০ ইয়েন্ বরাদ্দ আছে। অর্থাৎ স্থলযুদ্ধ-বিভাগের জন্ত ৩০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা এবং জলযুদ্ধ-বিভাগের জন্ত ৪১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ভারতবর্ষের নৌযুদ্ধ-বিভাগ নাই। স্থলযুদ্ধ-বিভাগের জন্ত ১৯২৩-২৪ সালের বরাদ্দ, কম করিয়াও, ৬২ কোটি টাকা। অর্থাৎ জাপান সরকার অপেক্ষা ভারতসরকারের আয় অনেক কম, কিন্তু ভারতের স্থলযুদ্ধ-বিভাগের ব্যয় জাপানের ঐ ব্যয়ের দ্বিগুণের কিছু বেশী।

আর একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। জাপান ৩০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করে কত বড় সৈন্যদলের জন্য? শান্তির সময়েও উহার সংখ্যা ২,১২,৭৩১ জন। কিন্তু যুদ্ধ ঘটিলে আরো সৈন্য চাই বলিয়া ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক আগে হইতে যুদ্ধে শিক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথমেই ৫,৩৯,৯২২ জনকে পাওয়া যায়, তাহার পর দরকার হইলে আরও পাওয়া যায় ১২,৫০,০০০। এত বড় সৈন্যদলের বার্ষিক খরচ ৩০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা এবং ইহার সাহায্যে জাপান পৃথিবীর বলবত্তম জাতির সমকক্ষ বলিয়া সম্মান ও ভয়ের পাত্র। ভারতবর্ষ বার্ষিক ৬২ কোটি টাকা (আগের বৎসর ছিল ৬৭ কোটি) খরচ করিয়া কত বড় সেনাদল রাখিয়াছেন? গোরা সৈন্য প্রায় ৭৬,০০০, এবং দেশী সিপাহী প্রায় ১,৭০,০০০, মোট ২,৪৬,০০০ জন। জাপানের দ্বিগুণ খরচ করিয়া ভারতবর্ষ বলবত্তম জাতির ভয় উৎপাদন করা দূরে থাক, উত্তরপশ্চিমসীমান্তের অর্দ্ধস্বাধীন অর্দ্ধ-সভ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠান জাতিদেরও ভয় উৎপাদন করিতে পারেন না।

ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয়ের আধিক্যের একটি প্রধান কারণ এই, যে, গোরাসৈন্য ও ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারী-দিগকে খুব বেশী বেতন ও ভাতা দিতে হয়। কোন্ শ্রেণীর সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে কত দিতে হয়, তাহা জানিবার জন্য আমাদের হাতের কাছে এখন কোন বহি নাই। কিন্তু কিছু তথ্য দিতেছি; তাহার সহিত জাপানের তুলনা করা যাইতে পারিবে। ১৯২৩ সালের হুইটেকারের টীকা অনুসারে সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর ব্রিটিশ সামরিক কর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষের কোন রেজিমেন্টে নিযুক্ত হইয়া আসিবামাত্র গোড়াতেই মাসিক ৪২৫ টাকা বেতন পান। জাপানের সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর সৈনিক কর্ম্মচারী সব-লেফ্‌টেন্যান্ট্‌রা পান মাসিক ১০৬৷০—ভারতের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর ইংরেজ সেনানীর সিকি! অন্যান্য শ্রেণীর জাপানী সেনানীদের বেতনও দিতেছি।

জেনারাল	৮৫৪৶০	লেফ্‌টেন্যান্ট্-কর্ণেল	৪১২৷৷০
লেফ্টেন্যান্ট্ জেনারেল	৮১২৷৷০	মেজর	৩২৫৲
মেজর জেনার‍্যাল	৭০০৲	ক্যাপ্টেন	২০০৲—২৫০৲
কর্ণেল	৫৭৫৲	লেফ্‌টেন্যান্ট	১২৬৷০—১৫০৲

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ভারতে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর ইংরেজ সেনানী জাপানের লেফ্‌টেন্যান্ট্ কর্ণেল অপেক্ষা বেশী বেতন পায়!

এক্ষণে একটা কথা উঠিতে পারে, যে, জাপানের স্থল-যুদ্ধ-বিভাগে ভারত অপেক্ষা কম খরচ হইলেও, উহার নৌযুদ্ধ-বিভাগে আরো ৪১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। কিন্তু তাহা ধরিলেও জাপানের মোট সামরিক ব্যয় ৭২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু ভারতেরও মোট সামরিক ব্যয় ১৯১৯—২০ সালে ৮৬ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭৫ হাজার হইয়াছিল। তাহাতে কি ভারতবর্ষ প্রবল পরাক্রান্ত হইতে পারিয়াছিল? তাহাতেও ভারতবর্ষকে ব্রিটিশসিংহের ল্যাজে বাঁধা থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু জাপান ৭২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া স্বাধীন ও প্রবল পরাক্রান্ত আছে, কাহারো ল্যাজে বাঁধা নাই।

জাপানের সমুদয় স্থলসৈন্য ও নৌসৈন্য, এবং সর্ব্ববিধ সামরিক কর্ম্মচারী জাপানী। তাহাদের প্রাপ্য বেতনাদি দেশেই খরচ হয় ও থাকে। যুদ্ধজাহাজ ও সর্ব্ববিধ যুদ্ধসম্ভার ও সরঞ্জাম জাপানীরা নিজেরাই করে, এবং তাহার লাভটা নিজেরাই ভোগ করে। এ অবস্থায় তাহারা সহজেই আমাদের চেয়ে বেশী ট্যাক্স্ দিতে পারে, এবং সামরিক ব্যয়ও ৭২ কোটি করিতে পারে। আমরা সকল বিষয়ে স্বাধীন হইলে এবং দেশের টাকা দেশে রাখিতে পারিলে, ৭২ কেন, ১০০ কোটি টাকা সামরিক ব্যয় করিতে পারি।

জাপানী প্রধান মন্ত্রী মাসিক ১৫০০ ও অন্যান্য মন্ত্রীরা মাসিক ১০০০ টাকা বেতন পান, ইত্যাদি কথা অনেকবার বলিয়াছি। এইরূপ কম বেতনে উচ্চঅঙ্গের কাজ জাপানে

হয় বলিয়া জাপানী গবর্ণমেণ্ট্ প্রায় ছয় কোটি লোকের শিক্ষার জন্য বৎসরে প্রায় তের কোটি টাকা খরচ করিতে পারেন। ভারতবর্ষে বাংলা দেশের লোকসংখ্যা সাড়ে চারি কোটি; জাপানের তুলনায় ইহার সরকারী শিক্ষাব্যয় মোটামুটি দশ কোটি টাকা হওয়া উচিত। কিন্তু এই প্রদেশে ১৯২০-২১ সালে রাজস্ব আদায় হইয়াছিল ৩৪ কোটি টাকা। এত টাকা আর কোন প্রদেশে আদায় হয় নাই। কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ ইহা হইতে শুষিয়া লইয়াছিলেন সাড়ে পঁচিশ কোটি টাকা; বাংলা-গবর্ণমেণ্টের হাতে ছিল সাড়ে আট কোটি টাকা। ইহা হইতে দশ কোটি টাকা শিক্ষায় ব্যয় কেমন করিয়া হইবে? ১৯২৩-২৪ সালেও বাংলার আয় এগার কোটি টাকার কম হইবে অনুমিত হইয়াছে, তাহা হইতেও দশ কোটি টাকা শিক্ষায় ব্যয় হইতে পারে না।

—

আমেরিকার ও ভারতের বেতন

আমেরিকা ভারতের চেয়ে ধনী, জাপানের চেয়েও ধনী দেশ, এবং তথায় লোকদের সাংসারিক ব্যয় আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। সেখানেও কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষের চেয়ে কম বেতন পান। সেখানে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ মাসে তিন হাজার টাকা বেতন পান। আমাদের প্রাদেশিক মন্ত্রীরা এর চেয়ে বেশী পান। তথাকার সুপ্রীম কোর্টের চীফ্ জষ্টিস্ পান বৎসরে ৪৫০০০ টাকা, মাসে ৩৭৫০। এখানকার চীফ্ জষ্টিসের ত কথাই নাই, হাইকোর্টের সাধারণ জজেরাও ইহা অপেক্ষা বেশী বেতন পান। এবার অনেক দৃষ্টান্ত দিবার স্থান নাই। আর একটা মাত্র দি। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ ৪৮টি প্রদেশের ও তিনটি টেরিটারীর সমষ্টি। প্রদেশগুলির মধ্যে ক্যান্সাস্ একটি। ইহার লোকদের প্রতিজনের গড়ে আমেরিকার অন্যান্য প্রদেশের লোকদের চেয়ে বেশী ধন আছে। ইহার আয়তন ৮২,১৫৮ বর্গ মাইল। ব্রিটিশশাসিত সমগ্র বাংলা দেশের আয়তন ইহা অপেক্ষা কম, ৭৮,৬৯৯ বর্গ মাইল মাত্র। ইহার গবর্ণর অন্য সকল কর্ম্মচারী অপেক্ষা বেশী বেতন পান; কিন্তু তিনিও পান মাসে সাড়ে বারশত টাকা মাত্র! বাংলার অনেক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার দ্বিগুণ বেতন পান। আমাদের দেশে যে শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি শিল্প বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায় না, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

—

চ্যান্সেলার ও ভাইস্-চ্যান্সেলারের চিঠিপত্র

সম্প্রতি, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার লর্ড্ লিটন এবং উহার (তাৎকালিক কিন্তু বর্ত্তমানে ভূতপূর্ব্ব) ভাইস্চ্যান্সেলার স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে যে চিঠি লেখালেখি হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেশব্যাপী উত্তেজনা ও হুজুকের সৃষ্টি হইয়াছে।

লর্ড্ লিটন স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন, যে, এপ্রিল মাসে তাঁহার ভাইস্-চ্যান্সেলারের কার্য্যকাল শেষ হইয়া গেলে পুনর্ব্বার ঐ পদ গ্রহণ করিতে তিনি সম্মত আছেন কি না, কিন্তু চ্যান্সেলার লাট সাহেব যে-ভাবে আশু-বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা সুবুদ্ধি ও সুবিবেচনা কিম্বা সৌজন্য, কোন দিক্ দিয়াই ঠিক হয় নাই। লাট সাহেব, অংশতঃ, লেখেন :—

As you know, the appointment has to be made not by the Chancellor but by the Local Government—that is to say, by the Governor and the Minister jointly, and we both wish to know to what extent we can count on your co-operation. I am anxious to retain your services in this post, because I feel that your powers and your attainments are of great value to the University and to the cause of higher education in Bengal. But if those powers and attainments are used in opposition to the Government in the belief that you are thus serving the interests of the University, your continued occupation of the post would be impossible.

You have seen our Bill, you have heard from me on more than one occasion that in framing it we are anxious to retain the largest measure of academic independence which can be secured for a university which is bound to Government in its origin and in its constitution and which is at present in need of financial assistance. I have asked for your suggestions, and I should welcome your criticism, provided it is offered as a fellow-

worker and not addressed to outside bodies. The continuance of the course you have followed during the last few months would entirely preclude my favouring your reappointment. Hitherto you have given me no help: you have on the contrary used every expedient to oppose us. Your criticisms have been destructive rather than constructive: you have misrepresented our objects and motives, and instead of coming to me as your friend and Chancellor with helpful suggestions for the improvement of our Bill, you have inspired articles in the Press to discredit the Government, you have appealed to Sir Michael Sadler, to the Government of India and the Government of Assam to oppose our Bill. All this has been the action not of a fellow-worker anxious to improve the conditions of co-operation between the Government and the University, but of an opponent of the maintenance of any connection between the two. I should not complain of this if you avowed yourself an open antagonist and said to me frankly: "In the interests of the University I am obliged to oppose your policy and cannot co-operate with you." But in that case, you could not expect the Government to retain you as a colleague and ask you to continue as Vice-Chancellor.

এই শেষোক্ত দুইটি বাক্য ন্যায়সঙ্গত। তাহার পর লাট সাহেব লিখিতেছেন :—

I invite you at this time when the Vice-Chancellor's office must be filled anew—a time which is also one of momentous consequence to the University—to assure me that you will exchange an attitude of opposition for one of wholehearted assistance, for in our co-operation lies the only chance of securing the public funds for the University without impairing its academic freedom. If you will do this, if you will work with us as a colleague and trust to your power of persuasion to get what you consider the defects in our Bill amended, if you can give an assurance that you will not work against the Government or seek the aid of other agencies to defeat our Bill, then I am prepared to seek the concurrence of my Minister to your reappointment as Vice-Chancellor and I am confident that we can produce a Bill which will both secure the approval of the Legislative Council and be of lasting benefit to the University. If you cannot conscientiously do this, you must make yourself free to oppose me by ceasing to be Vice-Chancellor.

এই চিঠির গোড়ার দিকে লাটসাহেব লিখিয়াছেন :—

I am well aware that this office has entailed upon you a heavy burden of work, and that though a post of honour and responsibility, it is not coveted by you for any reason except a wish to serve the University which you love, and to the welfare of which you have devoted your life.

ভাইস্-চ্যান্সেলারের কাজ সম্মানের পদ, এবং আশু-বাবু নিজের বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম ও কৌশল দ্বারা এই পদকে বহুলোকের উপর অসাধারণ প্রভাব-বিস্তারের উপায়ে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু, তাহা হইলেও ইহা চাকরী নহে, ইহা অবৈতনিক কাজ; ইহাতে অনেক শক্তি ও সময় ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে বলিতেই হইবে, যে, গবর্ণমেণ্ট আশু-বাবুকে এই পদ দিয়া ততটা বাধিত করেন নাই, আশু-বাবু এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরিশ্রম করিয়া গবর্ণমেণ্ট্‌কে যতটা বাধিত করিয়াছেন। কিন্তু লাটসাহেবের চিঠির মোটামুটি ভাব এবং উহার স্থানে স্থানে ভাষা এরূপ যেন আশু-বাবু একটি চাকরীর উমেদার। আশু-বাবুও ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার জবাবে লিখিয়াছেন—

"There are expressions in your letter which imply that I am an applicant for the post..."

ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নহে; সুতরাং একজন সম্মানিত অবৈতনিক কর্ম্মচারীকে ইংরেজীতে কি ভাষায় কি বলিলে অসৌজন্য হয়, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু আমরা যতটুকু ইংরেজী বুঝি, তাহাতে মনে হয়, অবৈতনিক ভাইস্-চ্যান্সেলারকে, "I am anxious to retain your services in this post," "আমি এই পদে আপনার খিদ্‌মদ্‌ বজায় রাখিতে উৎসুক," বলিলে তাঁহার সম্মান রক্ষা করা হয় না; কারণ বেতনভোগী

চাকুরিয়াকেই এইরূপ কথা বলা চলে। কতকটা এবম্বিধ কারণে লাটসাহেবের নিম্নলিখিত কথাগুলিও আপত্তি-জনক—

"[আশু-বাবু গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতা করিলে, তাঁহার] continued occupation of the post would be impossible."

"The continuance of the course you have followed during the last few months would entirely preclude my favouring your reappointment."

লর্ড লিটনের চিঠিতে নিম্নলিখিত কথাগুলির ব্যবহারে তাঁহার ট্যাক্টের (tactএর) অর্থাৎ সময়োচিত বাক্য-প্রয়োগে-বিচক্ষণতা ও কৌশলের অভাব সূচিত হয়—

"...which [*i. e.*, the Calcutta University] is at present in need of financial assistance."

"...in your co-operation lies the only chance of securing public funds for the university without impairing its academic freedom."

গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অর্থ সাহায্য করেন তাহা ভাইস্-চ্যান্সেলারের পকেটে যায় না বটে। তাহা হইলেও পরোক্ষভাবে লোভ দেখানটা ঠিক হয় নাই। ভাইস্-চ্যান্সেলার বেতনভোগী লোক হইলেও সম্ভবতঃ লর্ড লিটনের উক্ত কথাগুলি অশিষ্টাচারের পর্য্যায়ভুক্ত হইত।

আমরা বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও বাবু যতীন্দ্রনাথ বসুর বিশ্ববিদ্যালয়-বিল দুটি দেখিয়াছি, এবং তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশও করিয়াছি। গবর্ণমেণ্টের বিল্ আমরা দেখি নাই। সুতরাং লর্ড লিটন ও স্যার আশুতোষের তদ্বিষয়ক উত্তর প্রত্যুত্তর সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে পারি না।

স্যার্ আশুতোষ যদি বিরোধিতা ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করেন, তাহা হইলেই তিনি ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদে পুনর্নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে পদ-প্রদানের এইরূপ সর্ত্তসংযুক্ত প্রস্তাব করা সৌজন্য কিম্বা বুদ্ধিমত্তা কোন দিক দিয়াই ঠিক হয় নাই। কেহ বলিতে পারেন, "তবে কি আপনারা বলেন, যে, বিনা সর্ত্তেই তাঁহাকে পুনর্নিযুক্ত করা উচিত ছিল?" গবর্ণমেণ্ট, সত্যসত্যই আশু-বাবুর কাজ অবশ্যপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া থাকিলে তাহাই করা উচিত ছিল; তাহা না হইলে, তাঁহার পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত না করাই ভাল ছিল।

লর্ড লিটন রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোক নহেন। আশু-বাবু ও তাঁহার সমর্থকদের চা'ল এবং উদ্দেশ্য তিনি যে কেন বুঝিতে পারেন নাই, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। সুরেন্দ্র মল্লিক ও যতীন্দ্র বসু মহাশয়দের বিল্ দুটি সম্বন্ধে দুইপ্রকার মত সংবাদ-পত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, বিল্ দুটির উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর গবর্ণমেণ্টের অপ্রতিহত প্রভুত্ব স্থাপন; কেহ বলেন, শিক্ষিতসাধারণের আরও বেশী প্রতিনিধি সেনেটে প্রবেশ করান এবং অর্থব্যয় সম্বন্ধে উপযুক্ত তত্ত্বাবধান উহার উদ্দেশ্য; এমনও হইতে পারে যে, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করেন বলিয়া ব্যয় সম্বন্ধে কিছু ক্ষমতা চান এবং শিক্ষিতসাধারণের প্রতিনিধিদের অধিক পরিমাণে সেনেটে প্রবেশও চান। কাহার কি অভিসন্ধি তাহা বলা কঠিন—"পরচিত্ত অন্ধকার"। উদ্দেশ্য যাহাই হউক, লর্ড লিটনের বুঝা উচিত ছিল, যে, স্যার্ আশুতোষ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিনা বেতনে এত পরিশ্রম করেন, তাহার কিছু প্রতিদান ত তাঁহাকে পাইতে হইবে? সেই প্রতিদান প্রভুত্ব, প্রভাব, "এত বড় একটা কাজ আমার দ্বারা হইতেছে, আর কাহারো দ্বারা নহে," এবম্বিধ অনুভূতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব কিম্বা প্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব, যাহারই কর্তৃত্ব স্থাপিত হউক, তাহার দ্বারা স্যার্ আশুতোষের অপ্রতিহত প্রভাবে বাধা পড়িবে; তিনি ও তাঁহার দলের লোকেরা ইহাও অকপটে বিশ্বাস করিতে পারেন, যে, স্যার্ আশুতোষের অপ্রতিহত প্রভাব ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চলিতে পারে না। উল্লিখিত যে অনুমানই সত্য হউক, ইহা অবশ্যম্ভাবী, যে, আশু-বাবুর ঠিক নিজের মনের মত আইন অর্থাৎ নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার উপযোগী আইন ভিন্ন অন্য কোন আইনের বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তিনি অনুমোদন করিতে পারেন না। অতএব, বিরোধিতা পরিহার করিবার যে আহ্বান লর্ড লিটন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মানবচরিত্রজ্ঞান, রাজনীতিকুশলতা, ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

স্যার্ আশুতোষ যে জবাব দিয়াছেন, তাহার ভঙ্গী, ভাষা ও ধরণে প্রাচ্য সৌজন্য এবং ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদগৌরবের উপযুক্ত গাম্ভীর্য রক্ষিত হয় নাই। প্রাচ্য শিষ্টাচারের মানেই খোসামোদ নহে ; গাম্ভীর্য মানেই সত্য গোপন বা তাহার আংশিক অপলাপ নহে। এবং পরুষতা ও পৌরুষের মধ্যেও কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। ইহা খুব সম্ভব, যে, লর্ড্ লিটনের চিঠি পড়িয়া স্যার্ আশুতোষ উত্তেজিত হইয়াছিলেন, এবং সেই উত্তেজনার বশে এইরূপ চিঠি লিখিয়াছেন। তাহা করা উচিত হয় নাই।

গবর্ণ্মেণ্টের বিল্ আমরা দেখি নাই, এবং সে বিষয়ে উভয়পক্ষে কি কথাবার্ত্তা ও চিঠি লেখালেখি হইয়াছে, তাহাও জানি না। সুতরাং আশু-বাবুর তদ্বিষয়ক প্রতিবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না। তবে আশু-বাবু ভারত-গবর্ণ্মেণ্ট্‌কে আসাম-গবর্ণ্মেণ্ট্‌কে ও স্যার্ মাইকেল্ স্যাড্‌লারকে গবর্ণ্মেণ্ট্-বিল সম্বন্ধে যাহা জানাইয়াছেন, তাঁহার চিঠিতে তাহার সমর্থন যুক্তিযুক্ত মনে হইল।

লাটসাহেব বলেন, "you have misrepresented our objects and motives"। আক্ষরিক অর্থ করিলে এই "you" শব্দটির দ্বারা শুধু আশু-বাবুকেই বুঝায়। লাট-সাহেবের সঙ্গে স্যার আশুতোষের অপ্রকাশিত কথাবার্ত্তা বা চিঠিলেখালেখি কি হইয়াছে, জানি না। কিন্তু আশু-বাবু ও তাঁহার দলের অনেকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচকদের এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও যতীন্দ্রনাথ বসুর বিলদ্বয়ের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির কুব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা সত্য কথা।

লাটসাহেব বলিয়াছেন, "you have inspired articles in the press to discredit the Government"। ইহার উত্তরে স্যার্ আশুতোষ লিখিয়াছেন- "This is a libel and I challenge you to produce evidence in support of this unfounded allegation"।

ইহার উত্তরে লর্ড লিটন যদি বলিতেন, "লাইবেল হইয়া থাকিলে আপনি মানহানির মোকদ্দমা করিতে পারেন", তাহা হইলে কি হইত, জানি না।

আশু-বাবু স্বহস্তে প্রবন্ধ লিখিয়া কোন কাগজে প্রকাশার্থ পাঠান নাই, তিনি স্বহস্তে কোন কাগজের সম্পাদক সহকারী সম্পাদক বা লেখককে চিঠি লিখিয়া তাঁহার পক্ষসমর্থন ও গবর্ণ্মেণ্টের সমালোচনা করিতে অনুরোধ করেন নাই, একথা বিশ্বাসের অযোগ্য নহে। কিন্তু ইহাও খাঁটি সত্য কথা, যে, তাঁহার মনের মত কথা এবং তাঁহার পক্ষের তথ্য ভাব ভঙ্গী ও যুক্তিতে পূর্ণ অনেক লেখা তাঁহার সহচর অনুচরেরা অনেক বাংলা ও ইংরেজী কাগজে ছাপাইয়াছেন। অতএব, লর্ড্ লিটনের অভিযোগ যদি আক্ষরিক অর্থে মিথ্যা এবং স্যার্ আশুতোষের জবাব আক্ষরিক অর্থে সত্য হয়, তাহা হইলেও আমরা বিশ্বাস করি, যে, অভিযোগটা সম্পূর্ণ সত্য—যদি "you" শব্দটি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে প্রভুত্বশালী আশুবাবু-প্রমুখ দলকে বুঝাইতেছে বলিয়া মনে করা যায়, এবং সেরূপ মনে করা অন্যায় নহে। আশু-বাবুর প্রশংসাকারী সার্ভেণ্ট্ও লিখিতেছেন—

Indeed, the lady seems to protest too much. Let us see what the other lady does. Would she disclaim all knowledge even of the University press liaison officer or officers who danced attendance on sympathetic editors to inspire writings in favour of the University?

আশু-বাবু তাঁহার জবাবে অনেক স্পষ্ট কথা সাহসের সহিত বলিয়া ভালই করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে আত্ম-শ্লাঘা না থাকিলে ভাল হইত। এবং সেই আত্মশ্লাঘার মাত্রাটাও বেশী। যদি কাহারও প্রশংসা করিবার লোক না থাকে, অথচ তিনি ইচ্ছা করেন, যে, তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে নিজেই নিজের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ভিন্ন উপায় থাকে না। কিন্তু আশু-বাবুর "ভক্ত" সংবাদ-পত্র মহলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, হাইকোর্টে এবং অনেক স্কুল-কলেজে আছে। সুতরাং তাঁহার আত্মশ্লাঘার কারণ ছিল না। ছেলেছোক্‌রারা স্যার্টিফিকেট্ উদ্ধৃত করে। বিজ্ঞাপনেও তাহা চলে। কিন্তু ভাইস্-চ্যান্সেলারের পক্ষে ইহা অশোভন।

স্যার্ আশুতোষ "পক্ষপাতশূন্য সর্ব্বসাধারণের রায়" "the judgment of an impartial public" আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিতে রাজী আছেন বলিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এরূপ "সর্ব্বসাধারণ" এদেশে নাই, বিশেষতঃ

বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ; এবং তাহার কারণও কতকটা তিনি ও তাঁহার সহচর-অনুচরেরা।

ভাইস্ চ্যান্সেলারের পদগৌরব, পদমাহাত্ম্য, ("traditions of the high office") ইত্যাদি নানা কথা আশু-বাবু বলিয়াছেন, এবং তাঁহার জবাবের পাঠকদের (কারণ, ইহা বাহ্যতঃ লর্ড লিটনের জন্য লিখিত হইলেও বস্তুতঃ সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিত) মনে এই ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে, তিনি বরাবর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ও নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, কখনও গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুবর্ত্তিতা করেন নাই, এবং এই হেতু লিটন তাঁহাকে তাহা করিতে বলায় তাঁহার ক্রোধ হইয়াছে। অতএব জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যে, লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয়-আইন সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা কিরূপ করিয়াছিলেন এবং ভোট কিরূপ দিয়াছিলেন। একই রকম কি? রিজ্‌লী সার্কুলার যখন জারী হয়, তখন তিনি উহা প্রয়োগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন কি না? স্বর্গীয় আব্দুল রসুল, ডাঃ আবদুল্লা সুহ্রাওয়ার্দি এবং কাশীপ্রসাদ জায়সওয়াল্‌কে গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। অপ্রতিহত-প্রভাবশালী স্বাধীন আশুতোষ তাহা কেন সহ্য করিয়াছিলেন? অধ্যাপক কৃষ্ণকুমার মিত্র, ললিতমোহন দাস ও জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায়ের চাকরী কেন গিয়াছিল, এবং তাঁহাদের মতন কাজ করাতেও অন্য কাহারও কাহারও কাজ কি প্রকারে বজায় আছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণাদি বিষয়ক স্বাধীনতার (academic independenceএর) জন্য তিনি বরাবর যুদ্ধ করিয়াছেন এবং অধীনতা কখনও মানিয়া লন নাই, বলিতেছেন; কিন্তু আগেকার ইতিহাস ত তাহা বলে না।

—

ভাইস্-চ্যান্সেলার্, না গুপ্তচর?

স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জবাবের শেষের দিকে আছে:—

It may not be impossible for you to secure the services of a subservient Vice-Chancellor, prepared always to carry out the mandates of your Government, and to act as a spy on the Senate. He may enjoy the confidence of your Government, but he will not certainly enjoy the confidence of the Senate and the public of Bengal. We shall watch with interest the performances of a Vice-Chancellor of this type, creating a new tradition for the office.

এই কথাগুলি লেখা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। ইহাতে স্যার্ আশুতোষের আত্যন্তিক অহঙ্কার এবং অন্যদের সম্বন্ধে সাতিশয় হীন ধারণা প্রকাশ পাইতেছে। বাংলা দেশ কি এমনই মনুষ্যত্বহীন, যে আশু-বাবু ধরিয়া লইলেন, যে, যে-কেহ তাঁহার পর ভাইস্-চ্যান্সেলার্ হইবেন, তিনিই গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবেন এবং অধিকন্তু সেনেটের উপর গোয়েন্দাগিরি করিবেন?

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ত এখন ভাইস্-চ্যান্সেলার্ হইয়াছেন। তিনি কি গবর্ণমেণ্টের চিরকাল আজ্ঞানুবর্ত্তিতা করিয়াছেন, না কখনও গুপ্তচরের কাজ করিয়াছেন? বেঙ্গলীতে দেখিয়াছিলাম, ভূপেন্দ্র-বাবু নাকি আশু-বাবুকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজা রামমোহন রায়ের সমতুল্য লোক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই তুলনা আমাদের অসঙ্গত মনে হইলেও ইহাতে ভূপেন্দ্র-বাবুর কোন দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় না। কিন্তু আশু-বাবু যে তাঁহার পরবর্ত্তী যে-কোন ভাইস্-চ্যান্সেলারকে (ভূপেন্দ্র-বাবুকেও) গুপ্তচর মনে করিয়াছেন, তাহাতে কি প্রকাশ পায়? আমরা ভূপেন্দ্র-বাবুর দলের কিম্বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের লোক নহি; কিন্তু কোন দলের এমন কোন লোক নাই যাঁহার গুণ বা কৃতিত্ব সম্বন্ধে চোখ-কান বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও তাহার পূর্ব্ব হইতে ভূপেন্দ্র-বাবু তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক অনুসারে দেশের সেবা করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্টের খুব বিরোধিতাও বহুবার করিয়াছেন। এখন কয়েক বৎসর হইতে তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা টাকার জন্য নয়, সম্মানের জন্য নয় (তিনি "স্যার্" হন নাই, যাহা তাঁহার পদের অন্যেরা হইয়াছেন), গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা করিবার জন্যও নহে। চাকুরি লওয়ায় তাঁহার প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। পুত্রশোক-সত্ত্বেও

তিনি খাজ করিতেছেন। তাঁহার দলের লোকদের ধারণা এই, যে, ভারত-শাসন-সংস্কার-আইন অনুসারে দেশের কাজ হইলে ভবিষ্যতে ক্রমশঃ দেশের উপকার হইবে। এই আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে দেশের সেবা করিবার জন্য ভূপেন্দ্র-বাবু রাজকর্ম্মচারী হইয়াছেন, আমাদের ধারণা এইরূপ। ভূপেন্দ্র-বাবুর সঙ্গে একজন বড়লাট ও অন্যান্য লোকদের সঙ্গে খুব তর্কযুদ্ধও হইয়াছিল। মডারেটদের কোন ভ্রম সম্বন্ধে আমরা কখন অন্ধ হই নাই। ভবিষ্যতে তাঁহাদের বা ভূপেন্দ্র-বাবুর, আমাদের মতে, কোনও ভ্রম হইলে তখনও চোখ-কান বন্ধ করিয়া থাকিব না। কিন্তু তাই বলিয়া আশু-বাবুর আরোপিত জঘন্য দোষ ভূপেন্দ্র-বাবুর বা অন্য কাহারো সম্বন্ধে আগে হইতে মানিয়া লইতে পারি না।

স্যার্ আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ-সম্পর্কে, তাঁহার নিজের ও তাঁহার সহচর-অনুচরদের মতে, যতটা স্বাধীনতা দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাহা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, ইহাও সত্য, যে, বাংলাদেশের আরো অনেক শিক্ষিত লোক নানা কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার সমান ও তাঁহা অপেক্ষাও বেশী স্বাধীন-চিত্ততা দেখাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পর যে-কেহ তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হইবেন, তিনিই গুপ্তচর হইবেন ও গবর্ণমেণ্টের পদলেহন করিবেন এবং সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া ঐ পদ গ্রহণ করিবেন, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল না। বস্তুতঃ, আশু-বাবুর পক্ষাবলম্বী এবং অন্য কোন কোন কাগজে এই সংবাদ বাহির হইয়াছে, যে, ভূপেন্দ্র-বাবু কোন প্রকার সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করেন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর গোয়েন্দাগিরির প্রয়োজন স্বীকার

স্যার্ আশুতোষ বলিয়াছেন, যে, গোয়েন্দাগিরি করিতে রাজী ভাইস্-চ্যান্সেলার পাওয়া লর্ড লিটনের পক্ষে অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু এ সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরির কথাটা আশু-বাবুর মাথায় ঢুকিল কেমন করিয়া? ব্যবস্থাপক সভার উপর বা হাইকোর্টের কোন এজ্‌লাসের উপর গুপ্তচরের দরকার এবং তাহা পাওয়া যাইতে পারে, এমন কথা কেহ বলে না; কেন না, ব্যবস্থাপক সভার ও হাইকোর্টের এজ্‌লাস্‌গুলির কাজ প্রকাশ্যভাবে হয় ও সেখানে খবরের কাগজের রিপোর্টার ও অন্য লোকেরা গিয়া সব দেখিয়া শুনিয়া আসিয়া প্রকাশ করে ও করিতে পারে। ব্যবস্থাপক সভার সরকারী রিপোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারেরও রিপোর্ট কিনিতেও পাওয়া যায়। সেইরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সভ্যসমষ্টি ও কমিটির মিনিট্‌স্ ও প্রোসীডিংস্ (কার্য্যবিবরণ) বাহির হয় এবং তাহা ফেলো এবং অন্য কেহ কেহ পায় (যদিও এগুলি কিনিতে পাওয়া যায় না—আমরা দরখাস্ত করিয়াও পাই নাই)। যাহা হউক, খবরের কাগজে এবং স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে সেনেটের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় লোকের মনে এই ধারণাই আছে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোন কাজ হয় না, যাহা গোপনযোগ্য, যাহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে লজ্জার কারণ হইবে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গুপ্তচরের কার্য্যক্ষেত্র কোথায়? প্রয়োজনই বা কি? কার্য্যক্ষেত্র ও প্রয়োজন যখন নাই, তখন গবর্ণমেণ্ট ভাইস্-চ্যান্সেলাররূপী গুপ্তচর খুঁজিবেন কেন? কিন্তু আশু-বাবু বলিতেছেন, গুপ্তচরের কাজ করিতে রাজী ভাইস্-চ্যান্সেলার গবর্ণমেণ্ট পাইতে পারিবেন। তাহা হইলে কি ইহাই মনে করিতে হইবে, যে, আশু-বাবু মনে মনে জানেন, যে, তাঁহার আমলে বা আজ্ঞায় এমন কিছু কাজ হইত, যাহা গোপন করা হইয়াছে এবং যাহা ভাইস্-চ্যান্সেলার-রূপী কোন গুপ্তচর থাকিলে প্রকাশিত হইয়া যাইত? নতুবা গুপ্তচরের কথা কেন তিনি লিখিলেন, বুঝা কঠিন।

চিঠিগুলির প্রকৃতি

আশু-বাবুর জবাবের প্রত্যুত্তরে লর্ড লিটন তাঁহাদের পত্রব্যবহারকে সরকারী-কার্য্য-সংক্রান্ত ("official correspondence") বলিতেছেন। কিন্তু সরকারী-কার্য্য-সংক্রান্ত চিঠিপত্রও আধা-অফিশ্যাল (demi-official) এবং কন্‌ফিডেন্‌শ্যাল্ (confidential) হইয়া থাকে। লাট-

সাহেব তাঁহার চিঠি দুটি নিশ্চয় কনফিডেন্‌শ্যাল বলিয়া লিখিয়া দেন নাই; তাহা হইলে উহা প্রকাশিত হইত না। কিন্তু তাঁহার ও আশু-বাবুর চিঠির ধরণ ও লিখিত বিষয় (উভয়ের চিঠিতেই আশু-বাবুর পারিবারিক শোকের উল্লেখ আছে, যাহা কেজো প্রকাশ্য সরকারী চিঠিতে থাকে না) এরূপ, যে, সেগুলিকে প্রকাশ্য অফিশ্যাল্ চিঠিও বলা যায় না। চিঠিগুলি সেরূপ হইলে "স্যার্" দিয়া আরম্ভ এবং "I have the honour to be" ইত্যাদি কথা দিয়া শেষ হইত। লর্ড্ লিটন সাধারণ অর্থে চিঠিগুলিকে অফিশ্যাল্ মনে করিয়াছেন, এবং তৎসত্ত্বেও, "আশু-বাবু গবর্ণ্মেন্টের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখাইয়াছেন", তাঁহার পক্ষে প্রমাণাসাধ্য এই অভিযোগও তাহাতে করিয়াছেন, এদুটি জিনিষের পরস্পর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যে চিঠিতে এমন কথা থাকে, যাহা সত্য হইলেও লেখক প্রমাণ করিতে পারিবে না, এমন চিঠি বেকুব লোকেও গোপনীয় বলিয়া দাগ দিয়া দেয়।

যাহা প্রাইভেট্, বে-সরকারী, বা গোপনীয় এরূপ কথা ও চিঠিও বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যাহা প্রকাশ করেন, তাহাই প্রকাশযোগ্য ও প্রকাশের জন্য অভিপ্রেত মনে করা যায় না। এইজন্য আমাদের এই সন্দেহ ও প্রশ্ন মনে জাগিতেছে, যে, সম্পূর্ণ অফিশ্যাল চিঠি লেখালেখিও যদি কোন আফিস্ বা বিভাগের (departmentএর) প্রধান ব্যক্তির সহিত ঐ বিভাগের অপর কাহারও হয়, তাহা কি তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকে প্রকাশ করা চলে? এক পক্ষ যদি অবৈতনিক হন, তাহা হইলেও কি চলে? কোন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ যদি কোন বেতনভোগী ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করেন, তাহা হইলে কি উহা শেষোক্ত ব্যক্তিকে না জানাইয়া ছাপান দস্তুর? আমরা কখনও বৈতনিক বা অবৈতনিক সরকারী চাকরী করি নাই বলিয়া এইসব প্রশ্ন করিতে হইতেছে।

ইংরেজীতে একটা বিদ্রূপাত্মক কথা আছে, যে, দিনের আলোকে কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িলেই সেটা হয় পাপ! সে ভাবে, চিঠিগুলা ছাপা হইয়া যাওয়াতেই যতকিছু দোষ হইয়াছে মনে করিলে চলিবে না। গুণ দোষ যাহার যাহা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ চিঠি লেখাতেই হইয়াছে; প্রকাশ হওয়াতে তাহার বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই। অবশ্য, প্রকাশ করা সম্বন্ধেও দেশী লোকদের মধ্যেও মতভেদ হইয়াছে। যেমন, আশুতোষ-ভক্ত ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জার্ বলিতেছেন, "We too have our doubts on the propriety of the step"।

অতঃপর এই চিঠিগুলা প্রকাশের

উদ্যোগ-পর্ব্ব

সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সেনেটের যে অধিবেশনে উহা কথিত হয়, তাহা সাধারণ না বিশেষ অধিবেশন জানি না। তাহাতে অন্য কি কাজ হইয়াছিল, খবরের কাগজে তাহাও প্রকাশিত হয় নাই। তবে একথা প্রকাশিত হইয়াছে, যে, ঐ অধিবেশনের কার্য্যতালিকায় এই ব্যাপারটির কোন উল্লেখ ছিল না; এবং বেঙ্গলী এই সংবাদের প্রতিবাদ না করায় ইহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হইবে। প্রথম জিজ্ঞাস্য এই, যে, কার্য্যতালিকায় উহা কেন দেওয়া হয় নাই? আশু-বাবু নিজের চিঠিতে নিজেই নিজের নির্ভীকতার বড়াই করিয়াছেন। এজেণ্ডা অর্থাৎ কার্য্যতালিকায় এই ব্যাপারটির অনুল্লেখ সাহসের পরিচায়ক, না চাতুরীর পরিচায়ক?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, যে, যাহা কার্য্যতালিকায় নাই, এরূপ বিষয়ে হঠাৎ কোন ফেলো কোন প্রশ্ন করিতে পারেন কি না, ভাইস্-চ্যান্সেলার সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন কি না, এবং দিবার ওজুহাতে বিভাগীয় কর্ত্তার গোচরে তাঁহার ও তাঁহাকে লিখিত অফিশ্যাল চিঠি পড়িতে ও ছাপাইতে পারেন কি না? আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশ্যন্‌সে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ও উত্তর দিবার অধিকার সম্বন্ধে কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। যদি তাড়াতাড়িতে ইহা আমাদের চোখে না পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ যেন হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, এবং তাহাতে আশু-বাবু যেন হঠাৎ মুস্কিলে পড়িলেন,

অধিবেশনের বর্ণনায় এইরূপ লেখা আছে।* অথচ লম্বা লম্বা চিঠিগুলা আশু-বাবু সঙ্গে আনিয়াছিলেন। অধিবেশনের শেষে তাহার মুদ্রিত নকল প্রতিবেদক-দিগকে (reporters) দেওয়াও হইয়াছিল বলিয়া খবরের কাগজে প্রকাশ, এবং বেঙ্গলী ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। আগে হইতেই কাগজে বাহির হইয়া গিয়াছিল, যে, চমকপ্রদ (startling) কিছু-একটা এই অধিবেশনে হইবে! তাহার ফলে দর্শকদের গ্যালারী ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল; তাহাও নানা কাগজে বাহির হইয়াছে। সুতরাং সবই "হঠাৎ" হইলেও, আগে হইতেই এই অভিনয়ের সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক্ ছিল। এই অসত্যের অভিনয়, এই কপট আচরণ, ভাইস্-চ্যান্সেলারের পক্ষে গর্হিত হইয়াছে। কারণ সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ, চরিত্রগঠন এবং জ্ঞানের উন্নতি ও বিস্তৃতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি ইহার ছাত্রদিগকে মিথ্যাচরণ শিখাইতে চান?

৫ই এপ্রিলের সার্ভেন্টের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আশুবাবুর সাহস ও স্বাধীনচিত্ততার খুব প্রশংসা আছে। এবং উহার ঐ দিনের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইহাও আছে—

"*Anent* the announcement of the *Bengalee* regarding the publication of the letters, of which it must have known nearly twenty-four hours beforehand, why did Mr. Chanda try to make out that he did not know anything till he had read something in the *Patrika*? Was it merely a peg to hang a story upon, when the step was already decided upon? But why did Mr. Chanda forget to ask for the production of the letters before the Senate, for the action of the Vice-Chancellor went beyond the requirements of Mr. Chanda's questions? Sir Ashutosh has boldly asserted that he has all along acted constitutionally. Will some one justify the questions and answers given on Tuesday's meeting by referring to the Sections of the Regulations regarding the transaction of business in Senate meetings? Is there any provision for interpellations according to law?"

ইহা "অসহযোগী" কাগজের মন্তব্য বলিয়া যদি কেহ উড়াইয়া দিতে চান, তাহা হইলে "সহযোগী" একটি কাগজের মতও তাঁহাকে বিবেচনা করিতে হইবে। তাহা "সঞ্জীবনী"। "সঞ্জীবনী" "প্রবাসী"কে অপদস্থ করিবার জন্য বাবু কুঞ্জবিহারী ঘোষের পদত্যাগ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় আফিস হইতে অপ্রকাশিত রিপোর্ট ও সংবাদ পাইয়াছিলেন। সুতরাং এই সাপ্তাহিকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুবাবুপ্রমুখ কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন। ২২শে চৈত্রের সঞ্জীবনী লিখিতেছেন :—

"গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যদের এক অধিবেশন হইয়াছিল। কি কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য সেই সভা হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু কার্য্য নির্ব্বাহের পর বাবু কামিনীকুমার চন্দ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে সম্বোধন করিয়া বলেন যে অমৃতবাজারে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—গবর্ণর আপনাকে পুনরায় কোন কোন সর্ত্তে ভাইসচেন্সেলার নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি সে সর্ত্ত গ্রহণ না করাতে আপনাকে নিযুক্ত করা হয় নাই। আমরা তৎসম্বন্ধে আমূল বৃত্তান্ত জানিতে চাই।

"ভাইসচেন্সেলার সার আশুতোষ কামিনী-বাবুর প্রশ্নোত্তরে বলেন যে আপনি আমাকে বড় মুস্কিলে ফেলিলেন। কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পারিলাম না। গবর্ণর আমাকে কোন কোন সর্ত্তে ভাইসচেন্সেলার পদে পুনরায় নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু আমি সে সর্ত্তে নিযুক্ত হইতে অস্বীকার করিয়াছি। গবর্ণরের সহিত আমার যে পত্র-ব্যবহার হইয়াছে তাহা আমি আপনাদের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি।

"মঙ্গলবার সিনেটের সভা হয় কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই ইণ্ডিয়ান্ এম্পায়ারে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে মঙ্গলবারের সভায় অপ্রকাশিত পত্র প্রকাশিত হইবে। কামিনী-বাবু হঠাৎ একটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সার

---

* "After the business of the meeting was over, Mr. K. K. Chanda wanted to put a question to the Vice-Chancellor. He said that on his arrival in Calcutta that morning he had read in the "A. B. Patrika" a paragraph which was based on a paragraph in the "Bengalee" to the effect that the office of the Vice-Chancellor for another term coupled with certain conditions was offered to him, but he refused to accept it......It was a serious crisis in the history of the University and they desired to know if the offer was made to him and if he declined it and if so, why. He thought that the Senate had a right to get this information.

Sir Ashutosh said that though the questions which had been put to him placed him in a difficult position he could not decline to answer them." *The Bengalee*, April 4, 1923

আশুতোষ তাহার জবাবে গবর্ণরের পত্র ও প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা মনে করা যাইতে পারে না।

"আর একটা কথা এই, গবর্ণরের পত্র ও সার আশুতোষের প্রত্যুত্তর পূর্ব্বেই ছাপাইয়া আনা হইয়াছিল।" সুতরাং কামিনী-বাবুর প্রশ্নোত্তরে গবর্ণরের পত্র ও তাহার প্রত্যুত্তর প্রকাশ করা হইয়াছে, এমন কথা বলিবার কোন হেতু নাই।

"কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-সভার কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে মনে হয় কামিনী-বাবু হঠাৎ একটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আর সার আশুতোষ বাধ্য হইয়া গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়াছেন।"

লর্ড্ লিটনের শেষ চিঠি

লর্ড্ লিটনের প্রত্যুত্তর ছোট এবং সহৃদয় ভদ্র ভাষায় লিখিত। প্রথম চিঠির যথাযোগ্য নিন্দা আমরা করিয়াছি; সুতরাং শেষ চিঠিটি আমাদের মতে যে প্রশংসার যোগ্য তাহাও করিলাম।

এই চিঠি সম্বন্ধেও কিন্তু মতভেদ হইয়াছে। কএকটি ইংরেজদের কাগজে ইহার প্রশংসা আছে; আর একটিতে —ক্যাপিট্যালে—লাট সাহেবের, "Let me only hope that your recent ill health is a passing defect and that it has not been aggravated by your exertions of Saturday", এই বাক্যটিকে "ফেলো ব্যঙ্গ" ("cheap sneer") বলা হইয়াছে। ইংরেজদের কাগজেরই উল্লেখ করিবার কারণ এই, যে, ইংরেজী যাহাদের মাতৃভাষা আমাদের চেয়ে ইহার সূক্ষ্ম বক্রোক্তি তাহাদের বেশী বুঝিবার কথা। লর্ড্ লিটন এরূপ বক্রোক্তি করিয়া থাকিলে তাহা অনুচিত হইয়াছে।

স্যার্ আশুতোষের সাহস

স্যার্ আশুতোষের চিঠিটি সাহসের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার সম্বন্ধে অনেক অত্যুক্তি হইতেছে বলিয়া ইহার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের চেষ্টা করা আবশ্যক।

সাহসের মানে ভীত না হওয়া। ভয় দু রকমের, অমূলক ও সমূলক। মিথ্যা ভয়কে অতিক্রম করিয়া যিনি কাজ করিতে পারেন, তিনি বাহাদুর; সত্য ভয়কে অতিক্রম যিনি করিতে পারেন, তিনি তার চেয়েও বাহাদুর।

বঙ্গের লাটের অনেক ক্ষমতা আছে বটে; কিন্তু তিনি একটা কড়া চিঠি লেখার জন্য একজন হাইকোর্টের জজের "স্যার" উপাধি কাড়িয়া লইতে, চাকুরী ঘুচাইতে বা পেন্‌শ্যন্ বন্ধ করিতে পারেন না। তিরস্কার করিতেও পারেন না; কারণ তিনি হাইকোর্টের কেউ নন। অতএব, লাটসাহেবকে স্পষ্ট কথা শুনাইলে না-জানি কি হইবে, এইরূপ যে একটা অমূলক ভয়, আশু-বাবু তাহার অতীত বলিয়া বাহবা পাইবার অধিকারী। চ্যান্সেলার-রূপী লাটসাহেব তাঁহাকে পুনর্ব্বার ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত না করিতে পারেন, ইহা অবশ্য আশু-বাবু জানিতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার প্রভুত্ব-লোপের আশঙ্কা ছিল না। কেন না, তিনি ভাইস্-চ্যান্সেলার না থাকিলেও যে সর্ব্বে-সর্ব্বা তাহা অন্য ভাইস্-চ্যান্সেলারদের আমলে গত কয়েকবার দেখা গিয়াছে। লর্ড্ লিটন যেরূপ আইন চান, তাহা পাস্ হইলে, হয় ত, আশু-বাবুর প্রভুত্ব কতকটা কমিতে পারে, কিন্তু আইন পাস্ না-হওয়া বা হওয়া তাঁহার ভাইস্-চ্যান্সেলার থাকা বা না-থাকার উপর নির্ভর করে না। সুতরাং এইসব দিক্ দিয়াও তাঁহার ভয়ের কোন কারণ ছিল না।

অনেকের মনে এমন ভয়ও আছে, যে, লাট সাহেবকে কেন, যে-কোন একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে কিছু স্পষ্ট বা কড়া কথা বলিলেই, তাহা সিডীশ্যন্, রাজদ্রোহ, বা এইরূপ একটা-কিছু বেআইনী দণ্ডনীয় কাজ হইবে। আইনজ্ঞ আশু-বাবু জানেন, বিশ্ববিদ্যালয়-ঘটিত কোন ব্যাপার লইয়া চ্যান্সেলার-রূপী লাট সাহেবকে তিনি ভাইস্-চ্যান্সেলার রূপে কিছু কড়া কথা শুনাইলেও তাহা পেন্যাল কোডের কোন ধারার মধ্যে আসিবে না; সুতরাং তিনি এই অমূলক ভয়ে ভীত হন নাই। ইহার জন্য তারিফ্ তাঁহার ন্যায্য পাওনা।

তবে, যে, অত্যুক্তিপরায়ণ লোকেরা বলিতেছেন, ভারতে এমন সাহসের চিঠি আর কেহ কখনো লেখেন নাই, সেটা ভুল বা তাঁহাদের বিস্মৃতির ফল, কিম্বা আর কোন কারণে ঘটিয়াছে।

মিসেস্ বেসান্ট্ যে হোম্-রুল আন্দোলনের প্রধান পরিচালক ছিলেন, তাহা যখন খুব জোরে চলিতেছিল,

সেই সময় মান্দ্রাজের বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্ট জজ্ সুব্রহ্মণ্য আয়ার্ আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট্‌কে ব্রিটিশ গবর্ণ্‌মেণ্টের দোষ এবং ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদের দুর্দ্দশা যে চিঠিতে জানাইয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্ট কথা ও সাহসের খুবই পরিচয় ছিল। তাহাতে সত্য সত্যই ভয়ের কারণ ছিল। তাহার নিমিত্ত তাঁহাকে অনায়াসেই সিডীশ্যনের জন্য গবর্ণ্‌মেণ্ট্ ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতে পারিতেন, এবং তাঁহার দণ্ড হওয়াও আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না। এই চিঠির কথা পার্লেমেণ্টে আলোচিত হয়। তাঁহার পেন্স্যন্ বন্ধ করিবার কথাও ইংরেজরা তুলিয়াছিল। "স্যার্" উপাধি কাড়িয়া লইবার ইঙ্গিতমাত্র হওয়ায় তিনি উহা পরিত্যাগ করেন।

সত্য ভয়কে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রশংসা পাইতে পারেন।

পঞ্জাবে "সামরিক আইন" প্রবর্ত্তিত হইয়া লোকদের যে অপমান লাঞ্ছনা ও তাহাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হইতেছিল, তাহা অবগত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় লাটকে যে স্পষ্টবাদিতাপূর্ণ চিঠি লিখিয়া "স্যার্" উপাধি ত্যাগ করেন, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে পেন্যাল্ কোড্ প্রযুক্ত হইতে পারিত; তদপেক্ষা কম কথা বলাতেও অনেকের শাস্তি হইয়াছে। ১৯২০ সালের ১৩ই এপ্রিল বোম্বাইয়ে জাতীয় সপ্তাহের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে চিঠি পড়া হয়, তাহাও ঐ প্রকারের। উহা মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়ায় ছাপা হইয়াছিল এবং এস্ গনেশন্ প্রকাশিত ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ দ্বারা সম্পাদিত "ইয়ং ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকের ১১০-১১২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। রবীন্দ্রনাথের চিঠি দুটির সাহিত্যিক উৎকর্ষও খুব আছে।

আর দুটি চিঠির উল্লেখ করিব, যাহা নির্ভীকতা হিসাবে কোন চিঠি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, এবং যে-প্রকার রচনার পুঞ্জীভূত ফলে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ছয় বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছেন—বিশেষ করিয়া যে জন্য তাঁহার জেল হইয়াছে, তাহা উপলক্ষ্য মাত্র। চিঠি দুটি "ভারতের প্রত্যেক ইংরেজকে" (To Every Englishman in India) লিখিত। এই দুটি চিঠি পূর্ব্বোক্ত ইয়ং ইণ্ডিয়া পুস্তকের ৫৭৬ ও ৬৩৪ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে।

আমরা উপরে যে-কয়টি চিঠির উল্লেখ করিলাম, তাহা, লেখকদিগকে কেহ তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অপমান করিয়াছে বা তাঁহাদের আত্মাভিমানে আঘাত করিয়াছে বলিয়া, লিখিত হয় নাই। সবগুলিই সম্পূর্ণরূপে মানবের ও স্বজাতির কল্যাণের জন্য লিখিত। কোনটিতেই রূঢ়তা ও ব্যক্তিগত দম্ভ নাই। এবং যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বাংশে সত্য।

কোন কোন খবরের কাগজে এমন কথাও লিখিত হইয়াছে যাহাতে মনে হয়, যে, শুধু চিঠি নয়, ভারতে বা বাংলা দেশে কেহ কখন অন্য প্রকার এমন কোন লেখাও প্রকাশ করেন নাই, যাহাতে আশু-বাবুর মত সাহস দেখা গিয়াছে। ইহা ভুল। অনেক বিখ্যাত ও অবিখ্যাত সম্পাদক ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী সাহসের কথা সাধারণভাবে লিখিয়াছেন এবং ভারতসচিব হইতে বড়, মেজো, ছোট সর্ব্ববিধ লাটকে শুনাইয়াছেন, এবং তজ্জন্য অনেকে জেলেও গিয়াছেন, জরিমানা দিয়াছেন। দণ্ডিত ও অদণ্ডিত সম্পাদকেরা, শাস্তি পাইতে পারেন জানিয়াও, সত্য কথা লিখিয়াছেন।

কোন কোন কাগজে এমন কথাও বাহির হইয়াছে, যাহাতে এই বুঝায়, যে, সাহস দেখাইয়া "ভীরু" বাঙালী জাতিকে আশু-বাবু গৌরবান্বিত করিয়াছেন—যেন ইতি-পূর্ব্বে আর কেহ কখন কোন রকম সাহস দেখায় নাই। ইহা ভুল। এখানে আমরা কেবল সাহসের কথাই আলোচনা করিতেছি; যাহারা যে-প্রকারে সাহস দেখাইয়াছেন, তাহা সুবুদ্ধিপ্রসূত বা কল্যাণকর কি না তাহার বিচার করিতেছি না। সমুদয় বাঙালী জাতি মূর্ত্তিমান্ শৌর্য্য ও সাহস, ইহা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু কথায় কথায় বাঙালী জাতিকে ভীরু বলাও ঠিক্ নয়।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর প্রাণদণ্ড, নির্ব্বাসন, দ্বীপান্তর, জেল, বেত্রাঘাত, ইত্যাদি, কত লোকের হইয়াছিল। তাহারা ভীরু ছিল না। তাহারা সমূলক ভয়-সত্ত্বেও যাহার যাহা করিবার তাহা করিয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতে হাজার হাজার বালক যুবা প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ এবং কয়েকজন নারীও, সমূলক ভয়-সত্ত্বেও,

সাহসের কাজ করিয়া, জেলে গিয়া নানা প্রকার দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে। মুখোমুখি করিলেই যদি সাহস হয়, বালকেরা তাহাতেও কম নয়। দণ্ড দিতে সমর্থ ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনেকেই বলিয়াছে, "আপনার আদালতের, আপনার গবর্ণমেণ্টের আমাদের বিচার করিবার কোন অধিকার আমরা স্বীকার করি না, এবং আপনার কোন কথার জবাবও আমরা দিব না।" বস্তুতঃ, এক সময়ে এমন হইয়াছিল, ঠিক যেন দণ্ডগ্রহণ করিবার কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। অতএব, বাঙালী এই প্রথম সাহস দেখাইল, এমন নয়।

শান্ত ও ধীর সাহসিকতা

হুজুক ও উত্তেজনার সময় এবং ব্যক্তিগত বা জাতীয় অপমানের প্রতিশোধ দিবার ও প্রতিকার করিবার নিমিত্ত সাহস দেখান অপেক্ষাকৃত সহজ; যদিও সাধারণতঃ লোকে তাহা মনে করে না। কেননা, সব দেশেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়াটাই সাহসের চূড়ান্ত নমুনা বলিয়া সচরাচর গৃহীত হয়। কিন্তু বাস্তবিক যেখানে উত্তেজনা নাই, প্রতিশোধের ভাবও নাই, বাহবা পাইবার সম্ভাবনাও কম, সেখানে কেবল পরহিতার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হওয়া ও থাকাই সাহসের চূড়ান্ত আদর্শ; এবং তাহা মানবের সর্ব্বাংশে কল্যাণকর। অনেক বাঙালী এই সাহস দেখাইয়াছে। কিছু দিন আগেও চাঁদপুরে বহুসংখ্যক কুলির সমাগমে ওলাউঠার মারী হয়। তখন প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া অনেক বাঙালী ছেলে রোগীদের মলমূত্র বমন স্বহস্তে পরিষ্কার এবং সেবা করিয়াছিল। তাহাদের প্রত্যেকের নাম করিয়া কোন কাগজ জয়ঢাক বাজায় নাই। যে দুএকজন সেবা করিতে গিয়া স্বয়ং পীড়িত হয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদেরও নাম আমরা শুনি নাই, শুনিয়া থাকিলেও এখন ভুলিয়া গিয়াছি। অথচ ইহাদের চেয়ে বেশী সাহসের কাজ কয় জন করে?

আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের প্রয়োজন

আমাদের দেশে অল্পসংখ্যক স্থানে গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখেন ও দেখান, যে আধুনিক প্রণালী অনুসারে কৃষিকার্য্য করিলে কিরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঠিক ব্যবসা হিসাবে এইরূপ কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রণালীতে চাষ করিয়া কিরূপ লাভ হইতে পারে, তাহা বেসরকারী কোন লোক এখনও বিস্তৃতভাবে কাজ করিয়া দেখান নাই। অথচ ইহার খুব প্রয়োজন আছে। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস মানুষকে দলবদ্ধ ভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত কাজ করাইতে সুদক্ষ। দেশহিতার্থ খাটিবার ইচ্ছা এবং শক্তিও তাঁহার আছে। তিনি উক্তপ্রকার একটি কৃষিক্ষেত্র চালাইবার মানসে বাংলা দেশের লোকের নিকট একটি "নিবেদন" হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহা আমরা নীচে মুদ্রিত করিলাম।—

নিবেদন।

আমাদের এই কৃষি-প্রধান দেশে আধুনিক উন্নত প্রণালীর চাষবাসাদি প্রবর্ত্তন করার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলে দেশের অর্থ-সমস্যা যে বহু পরিমাণে মিটিতে পারে, সে বিষয় এক প্রকার নিশ্চিত। আমাদের দেশের লোকের ইহাতে এখনও বিশ্বাস জন্মে নাই; তাঁহারা এ বিষয়ে মান্ধাতা আমলের পুরাতন পদ্ধতি ও সাধারণ কৃষককুলের উপরেই নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন। সংঘবদ্ধতা, ব্যবসায়ের জ্ঞান ও সতর্ক কল্পনাশীলতা দ্বারা যে আধুনিক জগতের প্রতিযোগিতায়ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং উন্নত হওয়া যায়, সে বিষয় এখনও কেহ বড় ভাবিয়া দেখেন না।

ঐরূপ ভাবিয়াই আমি একটি কৃষি-সমবায় স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছি, এবং সেইজন্য কতকগুলি (প্রায় ৩ হাজার বিঘা) জমিও সংগ্রহ করিতেছি। যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা আমার নাই; দেশবাসীগণ অর্থদ্বারা আনুকূল্য করিলে এই অনুষ্ঠানটি সম্ভব হইতে পারে। আশা করি দেশবাসীগণ হইতে অর্থসাহায্য পাইতে বঞ্চিত হইব না। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে উৎসাহিত করিয়া ২৪শে ডিসেম্বর ১৯২২ তারিখে লিখিতেছেন:—

"Realising the great importance of organising a large scale farm on a commercial basis, in order to prove to our countrymen the efficacy of improved methods of agriculture, and knowing for certain that Mr. Pulinbihari Das is one of the most rare of our workers, who has the disinterested spirit of service and marvellous power of organisation necessary for guiding such a work into success, I promise to pay Rs. 500 as my contribution to the fund for which he appeals to the country.

RABINDRANATH TAGORE."

এ সম্বন্ধে অনুগ্রহপূর্ব্বক কেহ কিছু বিস্তারিত জানিতে চাহিলে আমি সাগ্রহে জানাইব। ইতি—

নিবেদক
শ্রী পুলিনবিহারী দাস,
৯০।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা

বাংলা দেশের বাহিরে অনেক স্থানে সরকার বাহাদুরের বাঙালীদের প্রতি যেরূপ মনের ভাব, তাহাতে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় যে বাংলা ভাষাকে একটা "দ্বিতীয় ভাষা" বলিয়া গণ্য করেন, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেই বাংলা যাহাতে বাস্তবিক ভাল বাংলা হয়, অশ্রুতপূর্ব্ব কোন প্রকার খিচুড়ি না হয়, সে দিকে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দিলে আরও কৃতজ্ঞ হই। ইহা কঠিনও নহে। কারণ, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে এমন বাঙালী অনেক আছেন, যাঁহারা ভাল বাংলা লিখিতে পারেন। না থাকিলেও, বাংলা দেশের কোন যোগ্য লোককে ভার দেওয়া কঠিন নয়। এক প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য প্রদেশবাসী যোগ্য লোককে পরীক্ষক নিযুক্ত করিবার দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

এবৎসর এলাহাবাদের ইন্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে বলা হয়—

সিংহল রত্নের জন্য চিরদিন প্রসিদ্ধ। উহার উপকূল হইতে সুন্দর সুন্দর মুক্তাও সংগ্রহ করা হয়। যে সকল উপকূলে মুক্তা থাকে, মুক্তা সংগ্রহকারী বোট সকল বড় বড় দল বাঁধিয়া সেই দিকে রওনা হয়; কিন্তু মুক্তা এত গভীর জলে থাকে যে, তাহাদিগকে ডুব দিয়া উপরে আনিতে হয়। ডুবুরীরা একের পর এক জন করিয়া নীচে যাবার পালা করে; প্রত্যেককেই পাথর বাঁধিয়া ভারী করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে সে শীঘ্র তলায় পৌছায়; সেখানে সে আধ মিনিট টাক জলের নীচে থাকতে পারে তার মধ্যে যতগুলি পারে ততগুলি মুক্তা কুড়াইয়া লইতে চেষ্টা করে। যখন সে আর নিশ্বাস আটকাইয়া রাখিতে পারে না, তখন সে একটি দড়ি টানিয়া বোটের উপরের লোকদিগকে সঙ্কেত করে এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে টানিয়া তোলে। প্রধান বিপদ হচ্ছে Shark নামক এক প্রকার জলজন্তু হইতে। প্রত্যেক বোট সেই জন্য একজন করিয়া সাক বশীভূত করিবার লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়; আর ঐ প্রকার অন্যান্য যাদুকরেরা কিনারায় দাঁড়াইয়া মন্ত্র আওড়াইতে থাকে এবং অদ্ভুত অদ্ভুত প্রক্রিয়া করিতে থাকে; তাহাতে নাকি সাক দূরীভূত হইয়া যায়। যদি সাক কোনও মতে ডুবুরীকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে সেদিন আর কাহাকেও জলে ডুবিতে লওয়ান দুষ্কর। ইহাতে দেখা যায় যে, তাহারা তাহাদের যাদুকরদিগকে পূর্ণ বিশ্বাস করে না।

সিংহল বাসীরা বলিষ্ঠ জাতি নয়। তাহাদের জলীয় ও গরম জলবায়ু তাহাদের শ্রমশীলতা ও উৎসাহ হরণ করিয়াছে। বিদেশীর পক্ষে তাহাদের সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, তাহাদের পুরুষদিগকে স্ত্রীলোকের ন্যায় এবং স্ত্রীলোকদিগকেও পুরুষের ন্যায় দেখায়। উভয়েরই লম্বা চুল থাকে। যতক্ষণ না পর্য্যবেক্ষণ কর যে, পুরুষেরা তাহাদের লম্বা চুল চিরুণী দিয়া বাঁধিয়া রাখে আর সাদা কোট পরে এবং স্ত্রীলোকেরা তাহাদের চুল কাঁটা দিয়া ঝুঁটি বাঁধিয়া রাখে এবং তাহাদের বিভিন্ন বর্ণের পোষাকের উপর লম্বা, ঢিলা সাদা জ্যাকেট পরিয়া থাকে, ততক্ষণ কে স্ত্রী কে পুরুষ বলা কঠিন।

"Shark নামক একপ্রকার জলজন্তুকে" যে বাংলায় হাঙ্গর বলে, পরীক্ষক তাহাও জানেন না! তাহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কলিকাতার একটি পুরাতন প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক গিনিপিগ্‌কে একরকম পাখী বলিয়াছেন! তাহা "সঞ্জীবনী" আফিসের উপর উড়িয়া বেড়ায়।

এলাহাবাদের ইন্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় উর্দ্দু হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করিবার জন্য যে বাক্যগুলি আছে, তাহাতে বাঙালীদের কিরূপ বর্ণনা আছে, তাহা পাঠকদিগকে পরে জানাইব।

—

ভারতবর্ষের আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা, প্রভৃতি স্থান হইতে তথাকার বাসিন্দা ভারতীয়দিগকে তাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে, এবং পরেও যাহাতে ভারতীয়েরা তথায় যাইতে না পারে, তাহারও চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টা অনেক বৎসর হইতে চলিতেছে। তাহাতে ভারতবর্ষবাসী ভারতীয়েরা (এবং তাহার মধ্যে বাঙালীরাও) অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া থাকেন, এবং খুব ক্রোধ প্রকাশ করেন। কিন্তু বাংলার ঠিক্ পাশেই যে বিহার ও ওড়িসা প্রদেশ, যাহাতে বাংলার অন্তর্গত বিস্তৃত ভূখণ্ডকেও জোর করিয়া সামিল্ করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে চাকুরিয়া বাঙালীকে তাড়াইবার যে অন্যায় চেষ্টা অনেক দিন হইতে হইতেছে, আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের সংবাদপত্র বা সার্ব্বজনিক সভা তাহাতে টুঁ শব্দও করিতেছেন না; এমন কি বাংলা দেশের বাঙালীদের নামজাদা ইংরেজী দৈনিকগুলিও কোন প্রতিবাদ করিতেছেন না। বিহার ও ওড়িষায় বাঙালীর ছেলেদের ইস্কুল-কলেজে পড়াশুনা করিবার সুবিধা বিহারী ও উৎকলীয় ছেলেদের সমান নয়। অথচ যদি বিহার-ওড়িষার কোন চাকুরিয়া বাঙালী শিক্ষার জন্য নিজের ছেলেদিগকে অন্যত্র পাঠান, অমনি সিদ্ধান্ত হয়, যে, তিনি বিহার-ওড়িষার স্থায়ী বাসিন্দা নহেন। পক্ষান্তরে,

যদি তিনি অসুবিধা সত্ত্বেও নিজের ছেলেদিগকে বিহার-ওড়িষাতেই পড়ান এবং ইহাও দেখান্ যে ঐ ঐ প্রদেশে তাঁহার নিজের বসত বাটি আছে, তাহা হইলেও উহা, তিনি যে স্থায়ী বাসিন্দা, তাহার একটি প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা হইবে না। অর্থাৎ তুমি যে পথ দিয়াই যাও, তোমাকে স্থায়ী বাসিন্দা বলিয়া গ্রাহ্য করা হইবে না। স্থায়িত্বের ব্যাখ্যাটা সরকারী নিয়মে বড়ই চমৎকার রকম করা হইয়াছে। তাহা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

If the applicant has no place of residence in the district where he claims to be domiciled or if he has sent his children to be educated in institutions outside the province, these are facts which require to be explained before the claim is admitted. But the contrary facts are not by any means in his favour; they have to be considered along with all the circumstances of the case and when the domicile claimed is of recent origin, their evidential value is much diminished.

Residence merely for the purpose of carrying on a business or trade or for the performance of the duties of a public office should not be regarded as establishing a claim to domicile. Permanence, too, requires evidence of the persistence of the intention over some period of time; the mere declaration of intention is not sufficient; there should be continuing evidence of actual effect having, in fact, been given to it.

Before giving a certificate the District Officer should, if the claim appears to him to be open to any reasonable doubt, ascertain the opinion of leading local residents on the subject.

কতদিনের বসবাস হইলে তাহা আধুনিক বিবেচিত হইবে না, তাহা লেখা নাই। কোন ব্যবসা বাণিজ্য বা সরকারী কাজ উপলক্ষ্যে কেহ কোথাও বাস করিলে তাহা স্থায়ী বাসিন্দার লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইবে না। তা ছাড়া, মানুষ এক চুরি-ডাকাতি করিবার জন্য থাকিতে পারে, কিম্বা গুলি খাইবার জন্যও থাকিতে পারে। কারণ, যদি কেহ চাষ-বাস বা জমিদারী করে, তাহাও ত একটা উপার্জ্জনের উপায় (business) বটে!

তাহার পর আবার বলা হইয়াছে, যে, সন্দেহস্থলে, স্থানীয় প্রধান প্রধান অধিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। বিহার-ওড়িষার গবর্ণমেণ্ট্ ভাল করিয়াই জানেন, যে, বিহারী ও উৎকলীয়েরা, কোন বাঙ্গালী স্থায়ী বাসিন্দা কিনা, তদ্রূপ প্রশ্নের উত্তর কি দিবে।

এরূপ কৌশলপূর্ণ নিয়ম না করিয়া, সোজাসুজি, বাঙালীদিগকে তাড়াইব, বলিলেই ঠিক্ হইত।

—

যশোরের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স্

যশোরের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের কাজ সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হয় নাই, বলিয়া কাগজে দেখিলাম। স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহার এবং তাহাদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধেও অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহা দুঃখের বিষয়।

সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুদ্রিত বক্তৃতা "সোনার বাংলা" নামক কাগজে বাহির হইয়াছিল। পরে নানা খবরের কাগজে দেখিলাম, যে, তিনি উহা পাঠ করেন নাই; মৌখিক যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা ও উহা ঠিক্ এক নহে।

শ্যামসুন্দর বাবু একটা কথার আভাস ঠিক্ দিয়াছেন। সহযোগিতা-বর্জ্জকেরা মনে করেন, যে, তাঁহারাই দেশভক্ত ও দেশসেবক, অন্যেরা নহে। তবে, এই দোষটি অসহযোগীদের একচেটিয়া নহে। "সহযোগী"দেরও এই অহঙ্কার আছে। আবার যাঁহারা কোন দলেরই নহেন, তাঁহাদেরও অহঙ্কার আছে। বস্তুতঃ, "আমি বা আমরা দেশের কাজ করিতেছি", এই রূপ ধারণা থাকা দোষের বিষয় না হইলেও, আর কেহই দেশহিতৈষী ও দেশসেবক নহে, এরূপ মনে করা বড়ই ভুল। নিজের নিজের জ্ঞান বিশ্বাস মতে সকলেই দেশের সেবা করিতে পারেন।

অনেকে মনে করেন, "অসহযোগিতা" এবং "সহযোগিতা" ঠিক পরস্পর বিপরীত পথ; অতএব এই উভয় পথের পথিকই কি প্রকারে দেশসেবক হইতে পারেন? একটু ভাবিলেই তাহারা বুঝিতে পারিবেন। জল ও আগুনের প্রকৃতি বিপরীত। জল ঢালিলে আগুন নিবিয়া যায়। কিন্তু জল ও আগুনের সমাবেশ বুদ্ধিপূর্ব্বক করিতে

পারায় বাষ্পীয় কলের সাহায্যে পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করিতেছে। আমরা প্রত্যেকেও ত রোজ আগুন ও জলের সাহায্যে রাঁধিয়া খাই। আমরা সবাই গরম গরম খাদ্য খাই এবং তাহার পর ঠাণ্ডা জলও খাই। বরফও অনেকে খান।

যশোরে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন, একজন "সহযোগী"। "সহযোগী" ও "অসহযোগীর" মধ্যে দাগ দিয়া একটা পার্থক্যের সৃষ্টি করা নূতন রকমের জাতিভেদ। যশোরে যে ইহা হয় নাই, ইহা খুব সুখের বিষয়।

এবারকার প্রধান প্রতিজ্ঞা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। এক জন বক্তা ঠিক্ই বলিয়াছেন, যে, দক্ষিণভারতে অস্পৃশ্যতার মানে যা, বাংলা দেশে সে অর্থে অস্পৃশ্যতা নাই; আমরা এখানে সবাই এক পুকুরে স্নান করি, এক কুয়ার জল বরাবরই খাই। বঙ্গে অস্পৃশ্যতা দূর করিতে হইলে, তাহার সূত্রপাত করিতে হইবে, তথাকথিত অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্যদের দেওয়া জল পান হইতে। এবং ইহা আরম্ভ মাত্র; পরে আরও অগ্রসর হইতে হইবে।

—

সংস্কার-আইনের মূল্য

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাকে বার বার অগ্রাহ্য করিয়া বড় লাট অনেক কাজ করিতেছেন। লবণের মাশুল দ্বিগুণ করিবার প্রস্তাব ঐ সভা (Legislative Assembly) বার বার অগ্রাহ্য করিলেন, বড়লাট তাহা বজায় রাখিলেন।

অনেকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাকে ভারতের পার্লেমেণ্ট্ বলিয়াছেন। পার্লেমেণ্টই বটে! আবার ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজে এমন যুক্তিও দেখা যায়, যে, বিলাতেও হাউস্ অব্ কমন্স্ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত বজেটের বড় কোন বরাদ্দ ত নামঞ্জুর করেন না; তোমরা কেন করিবে? বিলাতে তাহা করা হয় না, ইহা যদি মানিয়াও লওয়া হয়, তাহা হইলেও একটা তফাৎ যে ইঙ্গভারতীয় সম্পাদক ভুলিয়া যাইতেছেন। বিলাতের গবর্ণমেণ্ট্ মানে মন্ত্রীসংঘ; এবং এই মন্ত্রীসংঘ, ইংরেজদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে যে দল সংখ্যাভূয়িষ্ঠ, তাহাদেরই নেতা। সুতরাং পরোক্ষভাবে, তথাকার গবর্ণমেণ্ট্কে সে দেশের লোকেরা নির্ব্বাচন করে। আমরা গবর্ণর-জেনারেলের শাসন পরিষদের কাহাকেও নির্ব্বাচন করি কি? না, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু একটা নির্দ্ধারণ ব্যবস্থাপক সভায় স্থির হইলে বিলাতের গবর্ণমেণ্টের মত এখানকার গবর্ণমেণ্ট্ ইস্তফা দিতে বাধ্য হন?

গবর্ণর-জেনারেল ব্যবস্থাপক সভার মতকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন বিল মঞ্জুর করিতে চাহিলে তাঁহাকে লিখিতে হয়, যে, উহার উপর ব্রিটিশ ভারতবর্ষের শান্তি ও নির্ব্বিঘ্নতা (the safety or tranquillity of British India) নির্ভর করে। লবণের মাশুল দ্বিগুণ হওয়াতে ত ভারতবর্ষ অশান্ত হইয়াছে; কিন্তু বড় লাট বলিয়াছেন, তাহা না করিলে দেশের ঠাণ্ডা ভাব রাখা যাইত না। একই কথার কত রকম অর্থই হয়!

মেকিকে খাঁটি ও ভুয়োকে সারবান্ বলিয়া চালাইবার ভারতের মত দেশ আর দ্বিতীয় নাই। তার কারণ, এ দেশের লোক সহজেই কথায় ভুলে ও অপরকে বিশ্বাস করে। এই কারণেই সংস্কার-আইনকে অনেকে মস্ত কিছু একটা মনে করিয়াছেন।

—

প্লাবনপীড়িতের সাহায্যের হিসাব

উত্তরবঙ্গে জলপ্লাবনে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ যে কমিটি গঠিত হয়, তাহার আয়ব্যয়ের একটি হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কাগজে দেখিলাম। হিসাব প্রকাশ করিয়া কর্তৃপক্ষ ভাল কাজ করিয়াছেন। ইহার শুদ্ধাশুদ্ধতা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার উপায় নাই; কারণ উহা আমরা দেখি নাই। উহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহপ্রকাশও আমরা করিতেছি না। কিন্তু কমিটির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

যখন কমিটি গঠিত হয়, তখন প্রবাসীর সম্পাদককেও একজন সভ্য করা হইয়াছে বলিয়া একখানা চিঠি পাই। কিন্তু সেই আদি ও সেই অন্ত। কমিটির কোন অধিবেশন কখন হইয়াছিল কি না, জানি না; আমরা কখন কোন অধিবেশনের নোটিস্ পাই নাই। হিসাব প্রস্তুত হইলে কমিটি ডাকিয়া তাহার মঞ্জুরী লইয়া উহা প্রকাশ করিবার একটা রীতি আছে। সেই রীতি অনুসারে কাজ হইয়াছে কি না, জানি না; আমরা কোন চিঠি পাই

নাই। তাহার পর, কমিটির সভ্য বলিয়াও হিসাবের একটা নকল আমাদিগকে পাঠাইবার ভদ্রতা কর্ত্তৃপক্ষ রক্ষা করা দরকার মনে করেন নাই। কমিটি যখন খুব টাকা পাইতেছিলেন, এবং ছেলেরা খুব কাজ করিতেছিলেন, তখন উহার সভাপতি বলিয়াছিলেন, ইহাই ত স্বরাজ। নিজেদের দেশের কাজ নিজেরা করা স্বরাজ, তাহা বাস্তবিক অতি যথার্থ কথা। কিন্তু আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম, যে, স্বরাজটা গণতান্ত্রিক মতে হইবে। তাহার কি হইল?

আমাদের কাজ খুব কম, সময় কাটে না, সুতরাং কমিটির অধিবেশনে গিয়া গল্পগুজব করিতে চাই,—এ উদ্দেশ্যে এ সব কথা লিখিতেছি না। প্লাবনবিপন্নদের সাহায্যকারী কমিটি যে খুব মহৎ কাজ করিয়াছেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, ভাল জিনিষেরও একটা অসত্যের আচ্ছাদন দেওয়া উচিত নয়। যদি কমিটির দ্বারা কাজ করিতে ও করাইতে হয়, তাহা হইলেই কমিটি গঠন করা উচিত। কিন্তু কাজ হইবে পারিষদতান্ত্রিক মতে, এবং তাহার নাম হইবে গণতান্ত্রিক, আমরা ইহার বিরোধী।

বঙ্গে শিক্ষার ব্যয়

বঙ্গীয় বজেটে দেশী লোকদের শিক্ষার ব্যয় এক কোটি তের লক্ষ এক হাজার ধরা হইয়াছে; ইউরোপীয় ও এংলোইণ্ডিয়ানদের শিক্ষার ব্যয় ধরা হইয়াছে দশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপত্তি করিয়া বলেন, যে, ইউরোপীয় ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা ৪৫০০০; দেশী লোকদের সংখ্যা মোটামুটি সাড়ে চারি কোটি। অর্থাৎ হাজারের মধ্যে একজন ইউরোপীয় ইত্যাদি। তাহা হইলে দেশী লোকদের জনপ্রতি শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যত দেন, ইউরোপীয় প্রভৃতিদের জন্য তাহার একশত গুণ দেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সরকার পক্ষ হইতে বলেন, ওটা ওরকম ভাবে দেখিলে চলিবে না। ইউরোপীয় প্রভৃতিরা স্বাবলম্বী হইয়া নিজেদের শিক্ষার জন্য নিজেরা খুব টাকা তোলে; এইজন্য উহাদিগকে বেশী টাকা দেওয়া হয়। বেশ কথা। অনেক জায়গার বাঙালীরাও ত সম্পূর্ণ নিজেদের টাকায় নিজেদের ছেলেদের জন্য ইস্কুল চালায়। তাহাদিগকে সরকার টাকা ঢালিয়া দেন না কেন? সত্য কথা বলিবার সাহস না থাকিলে বাজে কথা বলা একটা রোগ। আসল কথা এই, যে, ইংরেজেরা দেশের মনিব ও এংলোইণ্ডিয়ানরা তাদের বংশজাত বলিয়া দাবী করে; সুতরাং তাহাদিগকে বেশী করিয়া টাকা দেওয়া চাই। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ এরূপ কিছু বলিবেন, এরূপ আশা কেহ করে না। কিন্তু তিনি চুপ করিয়া থাকিলে মন্দ হইত না।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের আত্মহত্যা

ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের সব প্রদেশের স্ত্রীলোক ও পুরুষদের আত্মহত্যার অনুপাত সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আমাদের ইচ্ছা আছে। এবার শুধু বাংলা দেশের কথা বলি।

বাংলাদেশের ১৯২০ সালের স্বাস্থ্যরিপোর্টে দেখিতে পাই, হাজার করা ৩৩৩ জন পুরুষ ও ৩২ জন স্ত্রীলোক ঐ সালে মরিয়াছিল; ১৯২১ সালে পুরুষ ৩০.৬ জন স্ত্রীলোক ২৯.৭ জন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, সাধারণতঃ পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের মৃত্যু কম হয়। কিন্তু আত্মহত্যার বেলা দেখিতে পাই অন্যরূপ। কোন্ সালে কতজন স্ত্রীলোক ও পুরুষ আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার তালিকা নীচে দিলাম।

সাল	পুরুষ	স্ত্রীলোক
১৯২০	১৫০৭	২০০২
১৯২১	১৩৯৮	১৮১৯

বঙ্গে এত বেশী স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে কেন? স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচারের যে সব ভীষণ কাহিনী আদালতে প্রকাশিত হয়, তাহা হইতেই কারণ বুঝা যায়। লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচার ও অন্য নানা দুঃখ হইতে উৎপন্ন মনঃপীড়াই নারীদের আত্মহত্যার কারণ। পাশ্চাত্য দেশসকলে নারীদের চেয়ে পুরুষরাই বেশী আত্মহত্যা করে। কারণ, পুরুষদের ঝঞ্ঝাট বেশী। প্রাচ্য জাপানেও তাই। ১৯২০-২১ সালের জাপান বর্ষপুস্তকে আত্মহত্যাকারীদের সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ আছে।

সাল	পুরুষ	স্ত্রীলোক
১৯১৪	৮০৭৮	৪৬২৭
১৯১৫	৭৯২৯	৪৬২৫
১৯১৬	৭২৩৯	৪৫৫৮

স্ত্রীলোকদিগকে মুখে দেবী বলিয়া ভণ্ডামি করিলে চলিবে না। সকল-দেশের চেয়ে আমাদের দেশেই নারীদের আত্মহত্যার কারণ বেশী আছে বলিয়াই তাহারা এত বেশী আত্মহত্যা করে। সেই-সব কারণ দূর করিতে হইবে। নতুবা দেশের নারীরা দেবী হইলেও পুরুষেরা পিশাচ বলিয়া গণ্য হইবে।

বারাণসীর ভাস্কর্য্য-পদ্ধতি

শিল্পতথ্যানুসন্ধানের জন্য যদি কোন শিল্পসমালোচক ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিল্পনিদর্শন দেখিয়া থাকেন, প্রত্নতত্ত্বের স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া থাকেন, এমন কি ভারতের বহির্দ্দেশেও—যাভা সিংহল কম্বোডিয়া নেপাল এবং তিব্বত—গমন করিয়া থাকেন, তথাপি যদি তিনি বারাণসী-শিল্পের কিছুমাত্র না দেখিয়া-থাকেন তাহা হইলে তাঁহার অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে। বারাণসী অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় জ্ঞানের কেন্দ্রভূমি, হিন্দুসভ্যতার মহানিকেতন, তিনটি মহাধর্ম্মের—ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের—মিলনভূমি, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইলে এইখানেই তাহার উদ্বোধন করিতে হইবে। প্রাচ্যবিদ্যার পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ দর্শন ও বিচার দ্বারা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, নানা শিল্পের প্রণালী নানা শিল্প ধর্ম্ম ও সভ্যতার স্থানে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এপর্য্যন্ত বারাণসীর ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের দিকে কেহই শিল্পের দিক্ হইতে সেরূপ মনোযোগ দান করেন নাই। তাহার ফলে এই আর্য্যধর্ম্মের কেন্দ্রভূমিতে যে একটি শিল্পপদ্ধতি ছিল তাহা এখনও প্রমাণ করিবার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে লেখক বারাণসীতে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে শিল্পনিদর্শন সম্বন্ধে যাহা-কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার দ্বারা এই বিষয়টির সামান্য মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

সারনাথের হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তির বিপুল সংগ্রহ, কুইন্‌স্ কলেজের পূর্ব্বতন সংগ্রহ এবং বর্ত্তমান লেখকের সভাপরিষদের প্রদত্ত সামান্য সংগ্রহ এবং আর আর অসংগৃহীত মূর্ত্তিসমূহ হইতে বারাণসী-ভাস্কর্য্যের স্বরূপ ও পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। এইসকল ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের পরীক্ষণের দ্বারা দুইটি প্রশ্ন উদিত হয়। প্রথম—এইসকল মূর্ত্তি কোন যুগের, এবং কি উল্লেখ-যোগ্য বিষয় তাহারা প্রকাশ করে? দ্বিতীয়—এই-সকল ভাস্কর্য্য ভারতের অন্যান্য ভাস্কর্য্য হইতে কি কি অংশে বিভিন্ন? বারাণসীর ভাস্কর্য্যের কাল, দেখা যায়, মৌর্য্য-সময় হইতে পাল-রাজত্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পরলোকগত ভিন্‌সেন্ট্ স্মিথ্ লিখিয়াছেন, "ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ইতিহাস অশোক হইতে মুসলমান যুগ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র সারনাথের সংগ্রহ হইতেই আহৃত হইতে পারে।" (Smith's A History of Fine Arts in India and Ceylon, page 148.)

এই দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া শিল্পীগণ আবির্ভূত হইয়াছিল এবং বারাণসীর অজ্ঞাত বিশ্বকর্ম্মশালায় নানাজাতীয় মূর্ত্তি খোদিত করিয়াছিল। অবশ্য আজ পর্য্যন্ত কেহই বলিতে সাহস করেন নাই যে, বারাণসী এবং সারনাথের এইসকল মূর্ত্তি অন্য কোন স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং পরে বারাণসীতে আনীত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ একটি কি দুইটি মূর্ত্তি ব্যতীত বারাণসীতে প্রাপ্ত সমস্ত মূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী চুনারের বালুকাবহুল প্রস্তরে খোদিত হইয়াছে। অশোকের অভিনব সিংহস্তম্ভটিও এই প্রস্তরে নির্ম্মিত। যে ভাবে সিকরীর রক্তপ্রস্তরখনি মথুরায় একটি বিশিষ্ট শিল্প-পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছিল, সেইভাবেই নিকটবর্ত্তী চুনার ও মির্জ্জাপুরের প্রস্তরখনি বারাণসীতে ভাস্করগণের কেন্দ্র স্থাপিত করিতে বিশেষ-

অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব

ভাবে সহায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। বারাণসীর মূর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শিল্প-সমালোচকগণ মূর্ত্তির দেহতত্ত্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাধারণ সত্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে এস্থলে বক্তব্য এই যে শিল্পসম্বন্ধীয় আকারের (types) বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি মূলতঃ শিল্পীর পারিপার্শিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য হইতে উৎপত্তি লাভ করে। "স্থানীয় বর্ণ" (Local colour) শিল্পের নানাবিভাগকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। বিশেষভাবে ভাস্কর্য্যের মধ্যে ইহার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ তাহাতে বলিতে গেলে বিশিষ্ট আকারের জাতি এবং ব্যক্তির চিত্র পাষাণে ফুটিয়া উঠে। এই "স্থানীয় বর্ণ" হইতে নানা শিল্পপদ্ধতির মৌলিক বিভিন্নতার উৎপত্তি হইয়াছে। ভাস্কর আত্মপ্রকাশ-দমনে অসমর্থ হইয়া অধিকাংশক্ষেত্রে অলক্ষিতে নিজকেই খোদিত করিয়া বসে—তাহার ব্যক্তিত্ব তখন তাহার জাতির মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে বাঙ্গালীর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি একটি মান্দ্রাজী অথবা মহারাষ্ট্রীয় শিল্পীর হাতে গড়া শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন। শারীরিক আকৃতি, দেহের গঠন, মুখের গঠন, বিস্তারের অনুপাতে উচ্চতা, কেশের বিন্যাস, অলঙ্কার ও বেশ ইত্যাদি, স্থানীয় ভাস্কর্য্যের বৈশিষ্ট্য দান করে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় লোকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণ গান্ধার-শিল্পের একটি পদ্ধতি, মথুরাশিল্পের পদ্ধতি, অমরাবতী শিল্পের পদ্ধতি, মাগধশিল্পের পদ্ধতি ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু কি হইতে এইসকল বিভিন্ন পদ্ধতির উৎপত্তি? তাহাদের বৈশিষ্ট্যেরই বা কারণ কি? আমার মনে হয় এসকল ভাস্কর্য্যশিল্পীগণ যে জাতির মধ্যে বাস করিত তাহাদেরই আকার প্রকার হইতে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আরও স্পষ্ট। আজিও সীমান্ত প্রদেশের লোকদের দৈহিক গঠন এবং পরিচ্ছদ হইতে মথুরার অধিবাসীগণের তথা পূর্ব্বদেশীয় অধিবাসীগণের দেহ-গঠন ও পরিচ্ছদের বিভিন্নতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। গান্ধার দেশ অথবা বর্ত্তমান কান্দাহারের অধিবাসীগণ বিশিষ্টভাবে দীর্ঘাকৃতি দীর্ঘ-করোটিবিশিষ্ট, প্রশস্তবক্ষঃ উন্নতপেশী উন্নতনাসা দীর্ঘকেশ, পরিধানে আলুলায়িত ও কুঞ্চিত পরিচ্ছদ। অবিকল এইসকল বিষয় আমরা তথাকথিত গান্ধার-পদ্ধতির ভাস্কর্য্যে দেখিতে পাই। নিম্নপ্রদেশ মথুরা-অঞ্চলের অধিবাসীগণ সীমান্ত প্রদেশের লোকের ন্যায় তাদৃশ পেশীবহুল দেহ ধারণ করে না। কিন্তু তাহাদেরও দীর্ঘ ছাঁদের দেহ আছে, নাতিবহুল পেশী

বুদ্ধমূর্ত্তি—জামালপুর স্তূপ হইতে

যাছে, প্রসিদ্ধ মথুরার চৌবে মল্লক্রীড়াকুশল, সুচারুন্যাস। প্রশস্তবক্ষ এবং কিঞ্চিৎ স্থূলোদর। মথুরা চিত্রশালার ভাস্কর্য্যপ্রদর্শনী একথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে। আরও নিম্নপ্রদেশে—পূর্ব্বদেশে—বাণারসী-অঞ্চলে আসিলে আমরা

কণিষ্কের আমলের বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি

মধ্যযুগের তারামূর্ত্তি

বিভিন্ন প্রকারের দেহাকৃতি লক্ষ্য করিব। মূর্ত্তিশিল্পেও তাহা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। বারাণসীর—প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন কাশীরাজ্যের—অধিবাসীগণ কতকটা ক্ষুদ্রাকৃতি গোলগাল পেশীশূন্য দেহযষ্টি বহন করে। তাহাদিগের বক্ষঃস্থল অপ্রশস্ত, মুখ গোলাকৃতি এবং তাহাতে তীক্ষ্ণ অংশ নাই, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি অতি গভীর, চিন্তাশীল মনের পরিচায়ক। সমস্ত দেহের গঠন শারীরিক অনুশীলন অপেক্ষা মানসিক অনুশীলনের অধিক সাক্ষ্য প্রদান করে। সারনাথ চিত্রশালায় এতদ্দেশীয় বৌদ্ধ-মূর্ত্তি-সমূহের সহজভাবে দাঁড়াইবার প্রণালীটি মথুরার বোধিসত্ত্বমূর্ত্তির ক্রীড়ামল্লের দাঁড়াইবার পদ্ধতির সহিত তুলনীয়। ইহা হইতে বারাণসীর ভাস্কর্য্য-শিল্পের পদ্ধতি কতকটা স্পষ্টীকৃত হইবে।

যখন আমরা বারাণসী-ভাস্কর্য্যের পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারের সহিত গান্ধার- ও মথুরা-মূর্ত্তির পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের তুলনা করি, তখন কতকগুলি অতি স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথম জলবায়ুর কারণ-বশতঃ বারাণসীর অধিবাসীগণ সাধারণতঃ অধিক পরিচ্ছদ পরিধান করে না। অপর পক্ষে তাহাদিগের বিশেষতঃ, নারীসম্প্রদায়ের, অলঙ্কারের উপর সাতিশয় অনুরাগ দেখা যায়। ইহার প্রমাণের জন্য দূরে যাইতে হইবে না। বারাণসীর মেলায় যদি কোন পরিদর্শক গমন করেন মুহূর্ত্তেই তিনি অলঙ্কারের ভারে প্রপীড়িত কতকগুলি নারীমূর্ত্তিকে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইবেন। অপর-পক্ষে গান্ধারের ন্যায় শীতপ্রধান দেশে দেহকে সাজাইবার জন্য অলঙ্কার অপেক্ষা পরিচ্ছদই অধিক উপযোগী। তাই

যেমন আমরা বারাণসীর অধিবাসীগণের মধ্যে,-তথা মূর্ত্তি-শিল্পে, পরিচ্ছদ অপেক্ষা অলঙ্কারের আধিক্য দেখিতে পাই, সেইরূপ অপর পক্ষে গান্ধারে আলুলায়িত এবং কুঞ্চিত আড়ম্বরহীন পরিচ্ছদ, অলঙ্কারের স্থান গ্রহণ করিয়াছে দেখা যায়। সেইরূপ আবার মথুরা-অঞ্চলে পোষাক এবং অলঙ্কারের একটা সমন্বয় অধিবাসীদের মধ্যে এবং শিল্পে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

কাজে কাজেই আমরা নৃতত্ত্ববিদের অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। নৃতত্ত্বের সাহায্য ব্যতিরেকে শিল্পের বিভিন্নপদ্ধতির সাধারণ তথ্য ও মূল স্থানীয় দৈহিক আকার-প্রকার হইতে পরীক্ষা করিতে পারা যাইবে না। এইভাবে আমাদের স্বল্প অনুসন্ধান দ্বারা লব্ধ সামান্য ফলগুলি যদি বারাণসী-স্থাপত্য-পদ্ধতির মূলতত্ত্ব ও ধর্ম্ম বুঝিতে কতকটা সাহায্য করে তাহা হইলে এই উদ্যোগ সার্থক হইবে।

শ্রী বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কবীরের খেদ

প্রেমের রঙেতে মন না রঙায়ে
কাপড় রঙাল যোগী,
আহার বিহার সকলি তেয়াগি
সাজিল সখের রোগী।
জীবে না তুষিয়া শিবে না ভজিয়া
পাথর পূজিল গৃহী,
ভক্তি না দিয়া দিল ধূপ দীপ
ফল জল মূল ব্রীহি।
প্রেম না বাড়ায়ে সাধু সন্ন্যাসী
বাড়াল জটা ও দাড়ী,
ইন্দ্রিয়কুলে পুড়ায়ে মারিল
দমন করিতে নারি।
না মুড়ায়ে ফেলে লালসা, বিরাগী
শুধু মুড়াইল মাথা।
দরদ না দিয়া দীনেরে, শুধুই
সিধা, ডেরা দিল দাতা।
কবীর কহেন প্রভুরে কেউ ত
করিল না প্রেমদান।
ভজিল না কেউ, করিল ভজন-
পূজনের শুধু ভান।

বেতাল ভট্ট

চিত্র-পরিচয়

প্রচ্ছদপটে বুদ্ধদেবের ছবিটি অজণ্টা গুহা-চিত্রের একটি ছবির আদর্শে অঙ্কিত।

বিল্বমঙ্গল ছবিতে শ্রীকৃষ্ণ অন্ধ বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে লুকাচুরি খেলা করিতেছেন।

কবি-জুবিলি নামক লেখার মধ্যে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ছবি তিনখানি আধুনিক—করাচীতে সম্বর্দ্ধনার সময় তোলা। শ্রীযুক্ত আডু এই ছবিগুলি তুলিয়া করাচী হইতে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। লেখাটি কিন্তু স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পুরাতন রচনা, এতদিন অপ্রকাশিত ছিল; কবিগুরুর বয়স পঞ্চাশপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে লেখা।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

উড়ো চিঠি—শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আর্য্য পাবলিশিং হাউস্, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ১৬৬ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। দেড় টাকা।

বর্ত্তমান যুগ-সমস্যা কতকগুলি চিঠির আকারে আলোচিত হইয়াছে। প্রথম চিঠিতে যুদ্ধ; দ্বিতীয় চিঠিতে মানুষ ও জাতের, অতীত ও বর্ত্তমানের, সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক; তৃতীয় চিঠিতে সাহিত্য; চতুর্থ চিঠিতে বাংলার উপর আধুনিক কালের প্রভাব ও কল্মস্রোত; পঞ্চম চিঠিতে মানুষ চেনা ও নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক; ষষ্ঠ চিঠিতে নেশান গড়ার সঙ্গে বৈরাগ্য ও ইহলোকে আসক্তির সম্পর্ক, সপ্তম চিঠিতে নন্‌কো-অপারেশন ও বিদ্যালয় ছাড়া; অষ্টম চিঠিতে যে আঘাত করিতে পারে সেই বড় নয় এবং পুরুষ ও নারীর স্বরূপ; নবম চিঠিতে ছেলেদের ভবিষ্যৎ প্রভৃতি বিষয় প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া বহু বিষয়ের আলোচনা এই চিঠিগুলিতে আছে। কোনোটিই একটি বিশেষ বিষয়কে অবলম্বন করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রবন্ধ নয়, কথা প্রসঙ্গে যে বিষয় আসিয়া পড়িয়াছে তাহারই আলোচনা করা হইয়াছে; এইজন্য এগুলিকে চিঠি এবং উড়ো চিঠি নাম দেওয়া হইয়াছে। এই শৃঙ্খলার অভাবে চিঠিগুলি উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে, কিন্তু বিশৃঙ্খল হয় নাই। এইজন্য লেখক নিজের নাম লইয়াছেন অশান্ত। চিঠিগুলি গভীর ভাবুকতায় ভরা; অথচ চিঠির ছাঁদে লেখা বলিয়া গুরুগম্ভীর না হইয়া বিষয়গুলি সরস ও সহজবোধ্য হইয়াছে। ভাষা সুন্দর সাবলীল, বিষয়বিন্যাস বিচিত্র এবং লেখকের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও গূঢ় অনুপ্রবেশের পরিচয় পংক্তিতে পংক্তিতে; বর্ত্তমান লেখকদের মধ্যে গ্রন্থকারের ভাবুক লেখক বলিয়া সুনাম আছে, তাহা এই পুস্তক দৃঢ়তর ও ব্যাপকতর করিবে।

চিঠি—শ্রী শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। প্রকাশক শ্রী রণজিৎ কাঞ্জীলাল, ৯৩।১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১২৩ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। পাঁচ সিকা।

এই পুস্তকেও চিঠির আকারে বহু বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা আছে। নারীর অবস্থা অধিকার ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই প্রধানতঃ চিঠিগুলি লেখা। চিঠিগুলি বেশ সরস সহজ ভাষায় ভাবুকতা ও বিচক্ষণতার সহিত লেখা। নারী-সমস্যাটিকে লেখক বহু দিক হইতে নিরপেক্ষ দরদীর ভাবে দেখিয়া বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই এই বইখানি পড়িয়া ভাবিয়া দেখিবার উপাদান পাইবেন।

The Social History of Kamarupa, Vol. I,— শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, ৯ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। ২৫০+১৩+৮+৪ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। সচিত্র। পাঁচ টাকা।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র-বাবু রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিয়াও এই বৃহৎ বইখানি লিখিয়া তাঁহার ইতিহাসানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। সরকারী অনালোচিত বহু দলিল দস্তাবেজ ও অন্যান্য উপকরণ হইতে তিনি কামরূপের সামাজিক ইতিহাস লিখিয়াছেন। তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৈদিক পণিগণ আর্য্য-আক্রমণে বিতাড়িত হইয়া ভারতের পূর্ব্বোত্তর কোণে গিয়া আশ্রয় লয় এবং পরে সেখান হইতে এক দল পণি জলপথে গিয়া ফিনিসিয়া দেশে উপনিবেশ করে; এই পণিদিগের দ্বারাই শিব-শক্তি-পূজা প্রবর্ত্তিত হয়—আমাদের অষ্টমাতৃকা দেবী ও ফিনিসিয়দিগের এস্টার্টে দেবী অভিন্ন। আমাদের শিবলিঙ্গের অবিকল অনুরূপ ফিনিসিয়া দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কামরূপের অধিবাসী মিশমী আবর দফলা মিরি গারো প্রভৃতি জাতিই প্রাচীন পণি বংশীয়; তাহারা পরাধীনতার ও মোঙ্গল প্রভাবের চাপে পড়িয়া আত্মবিস্মৃত অসভ্য বর্ব্বর জাতিতে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব প্রথার লুপ্তাবশেষ এখনো এইসব জাতির মধ্যে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়—তাহারা এখনো উপবীত ধারণ করে। ইহাদের উপর দ্রাবিড়, আসীরীয় বা অসুরীয় এবং ম্লেচ্ছ প্রভাবও তাহাদের রীতি নীতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এখনো ম্লেচ্ছজাতি মেচ নামে ও কোচ জাতি পণিকোচ নামে নিজেদের পরিচয় দেয়। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র, শিলালিপি, লেখমালা, নৃতত্ব, আধুনিক য়ুরোপীয় আবিষ্কার, প্রবাদ, প্রামাণ্য ইতিহাস প্রভৃতি মিলাইয়া ও বিচার করিয়া লেখক এই-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পরিশেষে কামরূপে কায়স্থ-সমাজ প্রতিষ্ঠা ও প্রাচীন ভারতে কায়স্থের মর্য্যাদা ও প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই ইতিহাস কেবলমাত্র ভারতের একটি বিশেষ প্রদেশের ইতিহাস নহে; ইহাতে সমগ্র ভারতের ও সমসাময়িক সুদূর দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচিত হইয়াছে। অনেক নূতন তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপিত হইয়াছে। এই সামান্য পরিসরে প্রচুর-নূতন-তথ্যপূর্ণ এই পুস্তকের পরিচয় কিছুই দেওয়া হইল না। ইতিহাসপ্রিয় কৌতূহলী পাঠকপাঠিকারা এই বইখানি পাঠ করিলে বহু নূতন বিষয় জানিতে পারিবেন।

ফুলের ব্যথা—শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়। বিচিত্রা প্রেস লিমিটেড, ৪৯এ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজি ১০০ পৃষ্ঠা। এক টাকা।

কবিতার বই। কবিতার যা-কিছু উপকরণ—ছন্দ ভাব মাধুর্য্য লালিত্য—সবই এই কবিতাগুলিতে আছে। আজকাল যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে নিজের একটি অধিকার কায়েমী করিয়া লইতেছেন এই কবি তাঁহাদের একজন। এই তাঁর প্রথম বই তাঁর কবি-খ্যাতি বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রচার করিবে।

প্রথম কবিতা ফুলের ব্যথার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার ভাবের আভাস পাওয়া যায়। তৎসত্ত্বেও ইহাতে নিজস্ব মৌলিকতার অভাব নাই।

বইখানির ছাপা ও মলাট মনোরম হইয়াছে। প্রচ্ছদপটখানি সুন্দর ব্যঞ্জনাভরা।

মুদ্রা রাক্ষস

নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রবাসী ১৩২৯ কার্ত্তিক—চৈত্র

২২শ ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়-সূচী

লেখক ও তাঁহাদের রচনা

চিত্র-সূচী

চিত্র-সূচী

প্রচ্ছদপট

ঈদের চাঁদ

চিত্রকর শ্রীযুক্ত মহম্মদ আবদর রহমান চাঘতাইয়ের সৌজন্যে

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

২য় সংখ্যা

বৈদিক একেশ্বরবাদ

সংহিতা যুগের অনেক ঋষি দেবগণের একত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। কেহ বিশ্বাস করিতেন—দেবগণের অসুরত্ব একই; কেহ কেহ বলিতেন—বহু একই; কেহ বা বলিলেন—একই বহু। এইরূপে ঋষিগণ নানা ভাবে একত্ব দর্শন করিয়াছিলেন। এই একত্বকে 'একদেববাদ' বলা যাইতে পারে। কিন্তু একদেববাদ এবং একেশ্বরবাদ এক বস্তু নহে।

বেদে ৩৩ জন দেবতার কথা বলা হইয়াছে। এক-দেববাদিগণ বলেন—এই ৩৩ জন দেবতা প্রকৃত ভাবে ৩৩ জন নহেন, ইঁহারা একই। ঋষিগণ দেবগণের একত্ব স্বীকার করিয়াছেন সত্য কথা, কিন্তু ইহাতে দেবপ্রকৃতির আদর্শ-বিষয়ে কোন নূতন কথা বলা হয় নাই। ৩৩ জন দেবতাকে ৩৩ জনই বল, আর একই বল, ইহাতে দেব-প্রকৃতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। কল্পনা কর বৈদিক মন্ত্র হইতে ৩৩ জনের নাম তুলিয়া দেওয়া গেল এবং সর্ব্বত্রই ইঁহাদিগকে এক নামে অভিহিত করা হইল। এস্থলে দেবগণের নামেরই কেবল পরিবর্ত্তন হইল, দেবপ্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হইল না। কিংবা মনে কর ৩৩ জন দেবতার মধ্যে ৩২ জনের মৃত্যু হইল। ইঁহাদিগের মৃত্যুতে অবশিষ্ট একদেবতার প্রকৃতির কি কিছু পরিবর্ত্তন হইল? অবশ্যই কোন পরিবর্ত্তন হইল না। সকলে জীবিত থাকিতে ইঁহার যে প্রকৃতি ছিল, এখনও ঠিক সেই প্রকৃতিই রহিয়া গেল।

বহুদেববাদে দেবতার যে প্রকৃতি, একদেববাদেও দেবপ্রকৃতি তাহাই। এই দেবতা (১) সীমাবিশিষ্ট, (২) জ্ঞাত, (৩) অশাশ্বত, (৪) সৃষ্টির বহির্ভাগে অবস্থিত, (৫) হিংসাবিদ্বেষাদির অধীন এবং (৬) বস্তুতঃ এই দেবতা অদ্বিতীয় নহেন; ইঁহার সমকক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় দেবতা কিম্বা কোন নিরপেক্ষ সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব নহে।

কিন্তু পরমেশ্বর (১) অসীম, (২) অজ্ঞাত, (৩) শাশ্বত, (৪) এই সৃষ্টির অভ্যন্তরেও প্রকাশিত এবং বহির্ভাগেও বর্ত্তমান, (৫) হিংসাবিদ্বেষাদির অতীত, (৬) এবং অদ্বিতীয়; ইঁহার সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় সত্তা বা কোন নিরপেক্ষ বস্তুর কল্পনা করা অসম্ভব।

কিন্তু সর্ব্বত্রই যে এই পার্থক্য রক্ষিত হইয়াছে তাহা

নহে; কোন কোন স্থলে 'একদেবতা'তেও পরমেশ্বরের গুণ অর্পিত হইয়াছে। কোন কোন ঋষি কোন কোন দেবতায় স্রষ্টৃত্ব, পাতৃত্ব এবং বিধাতৃত্বে বিশ্বাস করিতেন। বহুদেববাদই সংহিতার বিশেষত্ব। কিন্তু কোন কোন ঋষি একদেববাদেও উপস্থিত হইয়াছিলেন। আবার ইঁহারাও যে সকলেই একদেববাদে সন্তুষ্ট ছিলেন তাহাও নহে। কেহ কেহ একদেববাদকে অতিক্রম করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন ঋষি নূতন দেবতার কল্পনা করিয়া তাহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, কেহ বা এক অধিদেবতার কল্পনা করিয়া সমুদায় দেবতাকে তাঁহার অধীন করিয়াছিলেন। নিম্নে ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

১। হিরণ্যগর্ভ।

বৈদিক দেবগণের মধ্যে হিরণ্যগর্ভের স্থান অতি উচ্চে; ইনি একজন সাধারণ দেবতা নহেন। ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইনি অধিদেবতা। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১২১ সূক্তে ইহার বর্ণনা আছে। সূক্তটি এই:—

১। সর্ব্বাগ্রে হিরণ্যগর্ভ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জন্মগ্রহণ করিয়াই তিনি ভূতসমূহের একমাত্র অধিপতি হইলেন। (সেই) কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব? ২। যিনি আত্মদা, ও বলদা, সমুদায় প্রাণী এবং দেবগণ যাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করে, অমৃতত্ব যাঁহার ছায়া, মৃত্যুও যাঁহার ছায়া—সেই কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব? ৩। যিনি নিজ মহিমা দ্বারা প্রাণবিশিষ্ট, দর্শনশক্তিসম্পন্ন জঙ্গমদিগের একমাত্র রাজা হইয়াছেন, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদদিগের ঈশ্বর, সেই কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব? ৪। যাঁহার মহিমা দ্বারা এই হিমাবৃত পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে, রসানদী সহ সমুদ্র যাঁহার সৃষ্ট বলিয়া খ্যাত, দিক্‌সমূহ যাঁহার বাহু, সেই কোন দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব? ৫। যাঁহা দ্বারা দ্যৌ উগ্র হইয়াছে, এবং পৃথিবী দৃঢ়া হইয়াছে, যাঁহা দ্বারা স্বর্গলোক ও আকাশ স্থাপিত হইয়াছে, যিনি অন্তরিক্ষে থাকিয়া দিক্‌সমূহ পরিমাণ করিয়াছেন, সেই কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব? ৬। দ্যাবাপৃথিবী যাঁহার ক্ষমতাতে প্রতিষ্ঠিত, ইঁহারা কম্পিত অন্তরে যাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্য উদিত ও প্রকাশিত হয়, সেই কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব। ৭। গর্ভধারিণী ও অগ্নিজনয়িত্রী প্রভূতজল বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সেই জল হইতে (কিংবা সেই সময়ে) দেবগণের প্রাণস্বরূপ এক মাত্র (প্রভু) উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব? ৮। বলধারিণী ও যজ্ঞজনয়িত্রী জলকে যিনি নিজ মহিমা দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি দেবগণের মধ্যে একমাত্র অধিদেব হইয়াছিলেন, সেই কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব? ৯। তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন—যিনি পৃথিবীর জনয়িতা, যিনি সত্যধর্ম্মানুযায়ী আকাশকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আনন্দবর্দ্ধক জলসমূহকে প্রভূত পরিমাণে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব?

সর্ব্বশেষ মন্ত্রে ইহার উত্তর:—হে প্রজাপতি! তোমা ভিন্ন কেহ এই-সমুদায় উৎপন্ন বস্তুকে ব্যাপ্ত বা আয়ত্ত করিতে পারে না। আমরা যে কামনাতে তোমার হোম করিতেছি আমাদের সেই কামনা (সিদ্ধ) হউক। আমরা যেন ধনের অধিপতি হইতে পারি।

হিরণ্যগর্ভকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে ইনি স্থাবর-জঙ্গমদিগের রাজা, দ্যৌ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দেবগণের প্রভু এবং প্রাণ; ইনি দেবাধিদেব এবং এক।

তথাপি আমরা ইঁহাকে পরমেশ্বর রূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। কারণ ইঁহার জন্ম স্বীকার করা হইয়াছে। দুইটি স্থলে (১০।১২১।১ এবং ৮) 'সমবর্ত্তত' এবং এক স্থলে (১০।১২১।১) 'জাত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। একটি স্থলে বলা হইয়াছে ইনি জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন (১০।১২১।৭)। আর একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে ইনি অন্তরিক্ষে থাকিয়া দিক্‌সকল পরিমাপ করেন (১০।১২১।৫)। লোকে যে অর্থে সর্ব্বব্যাপী শব্দ ব্যবহার করে সে অর্থেও হিরণ্যগর্ভকে সর্ব্বব্যাপী বলা হইল না।

এই-সমুদায় কারণে হিরণ্যগর্ভকে পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম-রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

২। নাসদীয় সূক্ত

এই সূক্তে সৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সূক্তটির অনুবাদ এই :—

১। তৎকালে অসৎও ছিল না, সৎও ছিল না; অন্তরিক্ষ ছিল না এবং ঊর্দ্ধে প্রসারিত ব্যোমও ছিল না। কে সমুদায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছিল? কোথায় কাহার আশ্রয় ছিল? গহন গম্ভীর অম্ভ কি ছিল? ২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমৃতত্বও ছিল না, রাত্রি বা দিনের কোন চিহ্ন ছিল না। তখন "সেই এক" (বস্তু) বায়ু ব্যতিরেকে স্ব-ভাবে প্রাণন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিত; তাহা হইতে পৃথক্ অন্য কিছুই ছিল না। ৩। তখন অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আচ্ছন্ন ছিল। অগ্রে এই সমুদায়ই চিহ্ন-বর্জ্জিত (অপ্রকেত) সলিলরূপে বিদ্যমান ছিল। যাহা অবিদ্যমানতা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, "সেই এক" তপো-মহিমাতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ৪। তাহাতে কামনার আবির্ভাব হইল। এই কামই মন হইতে নিঃসৃত প্রথম বীজশক্তি। কবিগণ বুদ্ধি দ্বারা আলোচনা করিয়া হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন অসতেই সৎ-এর হেতু (বা বন্ধন)। ৫। ইহাদিগের রশ্মি (= সূত্র) তির্য্যক্-ভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু অধোভাগে না উপরিভাগে? রেতোধা অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল, স্বধা (= আত্মশক্তি) নিম্নদিকে ও প্রযতি (= প্রযত্ন = ইচ্ছাশক্তি) ঊর্দ্ধদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ৬। কেই বা প্রকৃত তত্ত্ব জানে? কেই বা বর্ণনা করিতে পারে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে সৃষ্টি হইল? এই সৃষ্টির পরে দেবগণের (সৃষ্টি)। সুতরাং কোথা হইতে আসিল তাহা কে জানে? ৭। কোথা হইতে এ-সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে? কেহ ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, বা করেন নাই তাহা তিনিই জানেন,—যিনি ইহার অধ্যক্ষ হইয়া পরম-ধামে আছেন; কিংবা তিনিও ইহা না জানিতে পারেন।

সমগ্র সূক্তের ব্যাখ্যা করা বা সমালোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। একেশ্বরবাদ ইহাতে কতটুকু আছে, তাহাই আমাদিগের বিচার্য্য।

ঋষির বক্তব্য এই :—

(১) অগ্রে সৎ বা অসৎ, মৃত্যু বা অমৃতত্ব, দিন বা রাত্রি, অন্তরিক্ষ বা ব্যোম—কিছুই ছিল না।

(২) কিন্তু তবুও কিছু ছিল। যাহা ছিল সে বিষয়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

(ক) এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তখন এপ্রকার ছিল না। ইহা ভেদাভেদরহিত, সর্ব্বপ্রকার-লক্ষণ-বর্জ্জিত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। এই অবস্থাকে অপ্রকেত সলিল বলা হইয়াছে।

(খ) তখন অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আচ্ছন্ন ছিল।

(গ) তখন "সেই এক" (তৎ একম্) অদ্বিতীয় বস্তু স্বশক্তিতে নিগূঢ়রূপে বিরাজিত ছিলেন।

(ঘ) তাহার পরে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশিত হইল এবং তিনি ব্যক্ত হইলেন, সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হইল।

(ঙ) ইহার পরে ঋষি বলিয়াছেন যে জগতের একজন অধ্যক্ষ আছেন। এই অধ্যক্ষ কে—তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। আমাদিগের মনে হয়, ঋষি পূর্ব্বে যে "সেই এক" সত্তার কথা বলিয়াছেন, সেই সত্তাই সৃষ্টির পরে ইহার অধ্যক্ষরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

এস্থলে এক অদ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা হইতে পৃথক কেহ নাই। এই বস্তু সৎও নহেন, অসৎও নহেন। ঋষি যখন স্বীকার করিয়াছেন যে ইহার কামনা আছে, তখন বলিতেই হইবে, ইনি আত্মার ন্যায় কোন এক বস্তু। এতদূর অগ্রসর হইয়াও ঋষি সন্দেহকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এ জগৎ কেহ সৃষ্টি করিয়াছে কি না, এ বিষয়ে ঋষি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যিনি জগতের অধ্যক্ষ তিনিও হয়ত সৃষ্টিতত্ত্ব অবগত নহেন।

যাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাদি বিষয়ে এতদূর সন্দেহ, তাঁহাকে আমরা পরমেশ্বর বলিতে পারি না।

৩। বিশ্বকর্ম্মা

ঋগ্বেদে দুইটি সূক্তে বিশ্বকর্ম্মার মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। এই বিশ্বকর্ম্মা জগতের স্রষ্টা। নিম্নে ইহার মহিমাসূচক কয়েকটি ঋক্ অনূদিত হইল।

"যখন বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্ম্মা নিজ মহিমা দ্বারা পৃথিবী উৎপন্ন ও দ্যৌ বিস্তারিত করিয়াছিলেন, তখন কোথায় তাঁহার অধিষ্ঠান ছিল? তখন তিনি কি অবলম্বন করিয়া কোথায় ছিলেন? (১০।৮১।২) সেই দেবতা এক; সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্র তাঁহার পদ। এই দ্যাবাপৃথিবী উৎপন্ন করিবার সময়, তিনি বাহুদ্বয় এবং পক্ষদ্বারা 'ধমন' কার্য্য করিয়াছিলেন। (ভস্ত্রার সাহায্যে কর্ম্মকারের কার্য্য করাকে ধমন কার্য্য বলে) (১০।৮১।৩)। সে কোন্ বন, সে কোন্ বৃক্ষ যাহা হইতে এই দ্যাবাপৃথিবীকে 'তক্ষণ' (অর্থাৎ প্রস্তুত) করা হইয়াছে? হে মনীষিগণ! একবার মনে করিয়া দেখ, তিনি কোথায় দাঁড়াইয়া এই ভুবনকে ধারণ করেন? (৪)

ঋষি এস্থলে কেবল প্রশ্নই করিয়াছেন। এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। সম্ভবতঃ ঐ যুগে ইহার উত্তর দিতে কেহ সমর্থও ছিলেন না। এই প্রশ্ন পুনরুত্থাপিত হইয়াছিল পরবর্ত্তিকালের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এবং এই স্থলে ইহার উত্তরও দেওয়া হইয়াছে (২।৮।৯।৬,৭)। উত্তর এই:—

"ব্রহ্মই বন, ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ যাহা হইতে এই দ্যাবা-পৃথিবী প্রস্তুত করা হইয়াছে। হে মনীষিগণ! আমি মন দ্বারা অনুভব করিয়া বলিতেছি, তিনি ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই বিশ্ব ধারণ করিয়াছিলেন।"

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ব্রহ্মকেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্ম্মার অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে; কিন্তু ঋগ্বেদে এ প্রকার কোন কথা নাই।

ঋগ্বেদে বিশ্বকর্ম্মাকে উদ্দেশ করিয়া আরও একটি সূক্ত রচিত হইয়াছে। তাহার অনুবাদ এই:—

যিনি চক্ষুর পিতা (অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তির কারণ), এবং ধীর, সেই (বিশ্বকর্ম্মা) মন দ্বারা জল সৃষ্টি করিলেন এবং জলে নিমজ্জিত দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। যখন সীমান্ত প্রদেশ সুদৃঢ় হইল, তখন দ্যাবাপৃথিবীকে বিস্তৃত করিলেন। তিনি মহামনা এবং মহাক্ষমতাশালী; তিনি ধাতা, বিধাতা ও সর্ব্বদ্রষ্টা।...সপ্তর্ষিরও পরপারে (সেই) এক (দেবতা) রহিয়াছেন। যিনি আমাদিগের পিতা, জনয়িতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সমুদয় স্থান জানেন, যিনি দেবগণকে (ইন্দ্র সবিতা ইত্যাদি) নাম দিয়াছেন, যিনি অদ্বিতীয় (একঃ এব) তাঁহাকে জানিবার জন্য অন্যান্য সকলে প্রশ্ন করিয়া থাকে। জল-সমূহ সে কোন্ গর্ভ ধারণ করিয়াছিল, যাহা পৃথিবীর পর-পারে, দ্যুলোকের পরপারে, যাহা দেব ও অসুরগণের পর-পারে এবং যেখানে দেবগণ আপনাদিগকে সম্মিলিত দর্শন করিয়াছিলেন? জলসমূহ প্রথমেই সেই গর্ভ ধারণ করিয়া-ছিল, যেখানে দেবগণ আপনাদিগকে সম্মিলিত দর্শন করিয়াছিলেন। যে বস্তুতে বিশ্বভুবন অবস্থিত, সেই এক বস্তু অজাত সত্তার নাভিতে স্থাপিত হইয়াছিল। যিনি এইসমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে জানিতে পার না। তোমাদিগের অন্তঃকরণ অন্য প্রকার। মন্ত্রো-চ্চারণকারিগণ কেবল জীবনভোগ লইয়াই তৃপ্ত, নীহার (অর্থাৎ কুজ্ঝটিকা) দ্বারা আবৃত হইয়া তাহারা কেবল জল্পনা করিয়াই বেড়াইতেছে। (১০।৮২)।

ঈশ্বরবাদ বৈদিক যুগেও যে কতদূর উন্নত হইয়াছিল, এই দুইটি সূক্তে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

৪। পুরুষসূক্ত।

পুরুষসূক্ত ঋগ্বেদের একটি প্রসিদ্ধ সূক্ত। এই সূক্তের নিম্নোদ্ধৃত অংশ আমাদিগের আলোচনার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক—

পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ। তিনি পৃথিবীতে সর্ব্বত্র পরিবেষ্টন করিয়া দশ অঙ্গুলী পরিমাণ ঊর্দ্ধে রহিয়াছেন। যাহা হইয়াছে, বা যাহা হইবে সকলই সেই পুরুষ। যে অমৃতত্ব অন্ন দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তিনি সেই অমৃতের অধিপতি। ইঁহার মহিমা এই প্রকার। কিন্তু পুরুষ ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বিশ্বভূত ইঁহার একপাদ; ইঁহার তিনপাদ দিব্যলোকে অমৃতত্বরূপে বর্ত্তমান। তিনপাদ লইয়া পুরুষ ঊর্দ্ধে উঠিলেন, আর একপাদ এইস্থানে রহিল। তদনন্তর তিনি ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (অর্থাৎ চেতন ও অচেতন) সমুদায় বস্তুতে পরিব্যাপ্ত হইলেন। (১০।৯০।১-৪)।

এখানে যে পুরুষের আদর্শ দেওয়া হইল, তাহা পর-মেশ্বরের অনুরূপ। ইনি দূরস্থিত দেবতা নহেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কিংবা অন্যান্য দেবতার ন্যায় স্বর্গবাসী নহেন। ইনি

পৃথিবীতে বর্ত্তমান, সর্ব্বভূতে—চেতন অচেতন সমুদায় বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। আবার এই সৃষ্টিতেই যে তাঁহার সত্তা নিঃশেষিত হইয়াছে, তাহা নহে। এ-সমুদায়কে অতিক্রম করিয়াও তিনি বর্ত্তমান। এই জগদতীত সত্তা বুঝাইবার জন্যই ঋষি বলিয়াছেন যে "তিনি পৃথিবীকে সর্ব্বত্র বেষ্টন করিয়া দশ অঙ্গুলী পরিমাণ ঊর্দ্ধে রহিয়াছেন,... বিশ্বভূত ইঁহার একপাদ, ইঁহার তিনপাদ অমৃতরূপে বর্ত্তমান, তিনি তিনপাদ লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিলেন।" এই পুরুষ বিশ্বাত্মা এবং বিশ্বাতীত উভয়ই। ইংরেজীতে বলিতে হইলে আমরা বলিব তিনি Immanent এবং Transcendent উভয়ই।

অথর্ব্ববেদের ঈশ্বরতত্ত্ব পরে আলোচিত হইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

সম্রাট্ অক্‌বর ও জৈনাচার্য্যগণ

ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন, যে, সম্রাট্ অক্‌বর যেমন নিরক্ষর ছিলেন, তদ্বিপরীত বিদ্বান্ পণ্ডিতদের গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার নূতন রাজধানী ফতেপুর-সীক্‌রীর ইবাদৎখানাতে পদধূলি দেন নাই সেকালে এমন বিদ্বান্ উত্তরভারতে কেহ ছিলেন না। অকবর স্বয়ং সুন্নি মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিদ্যামন্দিরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মুসলমান, নানা সম্প্রদায়ের হিন্দু শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, ইত্যাদি—ও ক্রিশ্চান, ইহুদী, পার্সী, সমান আদরে সম্মান লাভ করিতেন।

একদিন প্রাতে সম্রাট্ ফতেপুরের উচ্চ অট্টালিকার ঝরোকাতে কয়েকটি সভাসদ্ সহ বসিয়া ছিলেন, হঠাৎ বাদ্যোৎসব সহ শোভাযাত্রার শব্দ শুনিতে পাইলেন। এক জন চেলা সংবাদ আনিল—একটি হিন্দু মহিলা ছয়-মাস-ব্যাপী উপবাস করিয়া ছিল, আজ তাহার পারণ, সেইজন্য বাজনা বাজাইয়া মন্দিরে পূজা দিতে যাইতেছে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বোধ হইল না, অতএব একজন সভাসদকে সত্যসংবাদ লইতে পাঠাইলেন। তিনি সংবাদ আনিলেন—সত্য সত্যই চাঁপা নাম্নী এক হিন্দু মহিলা ছয় মাস উপবাসী ছিল। অক্‌বর চাঁপাকে দেখিতে চাহিলেন। চাঁপা রাজ-সকাশে উপস্থিত হইলে অক্‌বর জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগ্নী, এক দিবস আহার না করিলে প্রাকৃত মনুষ্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, শরীর রক্ষা অসম্ভব হয়; তুমি ছয় মাস অন্ন গ্রহণ না করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিয়া ছিলে?" চাঁপা জৈনধর্ম্মাবলম্বিনী বিদুষী রমণী ছিলেন। তিনি বলিলেন, "রাজন্, আমি চিকিৎসা-বিদ্যা জানি না, আহার গ্রহণ না করিলে শরীরে কি হয় না হয় বুঝি না, আমি কেবল আমার গুরুদেবের উপদেশ-মত সঙ্কল্প করিয়া উপবাস করিয়াছিলাম। যখন অত্যন্ত পিপাসা অনুভব করিতাম, তখন অল্প উষ্ণ জল পান করিতাম ও সকল সময়ে তপস্যাতে মন নিবেশ করিতাম। গুরুদেবের কৃপায় আমার কোনও কষ্ট হয় নাই।" সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ধর্ম্ম কি ও কিরূপ তপস্যা কর?" চাঁপা বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "রাজন্, আমি মূর্খা সামান্যা স্ত্রীলোক, আমি ধর্ম্ম অথবা তপস্যার গূঢ় মর্ম্ম আপনাকে বুঝাইবার ক্ষমতা রাখি না। আমার গুরুদেব এখানে থাকিলে তিনি বুঝাইতে পারিতেন।" এইরূপ নানা প্রশ্নোত্তরে অক্‌বর জানিতে পারিলেন যে চাঁপার গুরুর নাম হীরবিজয় সূরি, তিনি একজন জৈনাচার্য্য সাধু। সাধুদের নিয়ম-মত তিনি এক স্থানে বেশীদিন বাস করেন না। তবে গুজরাট্ দেশেই বেশীর ভাগ বিচরণ করিয়া থাকেন ও সে সময়েও গুজরাটের কোন নগরে বিচরণ করিতেছেন। সম্রাটের সভাসদ্ মধ্যে এ্যাৎমাদ্ খাঁ কিছুকাল গুজরাটে ছিলেন। তাঁহাকে আচার্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি বলিলেন, "আমি ঐ আচার্য্যকে কয়েকবার দেখিয়াছি। তাঁহাকে বিদ্বান্, সাধু ও প্রকৃত ফকীর বলিয়া বিশ্বাস করি।" একজন

মুসলমান সভাসদের মুখে এক হিন্দু ফকীরের সুখ্যাতি শুনিয়া সম্রাটের তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি গুজরাটের সে-সময়কার সুবাদার শিহাবউদ্দীন অহমদ খাঁকে পত্র দ্বারা আজ্ঞা করিলেন যে আচার্য্যকে উপযুক্ত সম্মানের সহিত হাতী, ঘোড়া, উট, পাল্‌কী ইত্যাদি সমস্ত ভ্রমণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া শীঘ্র ফতেপুরে পাঠাইবে। সেই পত্রবাহকের হাতে আচার্য্যের কাছেও এক বিনীত নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইলেন।

১৫২৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে গুজরাট্ প্রদেশের পালনপুর নগরে জৈন ওসওয়াল বংশে হীরজীর জন্ম হইয়াছিল। ওসওয়ালরা (অথবা ওসিয়াবাল) ক্ষত্রিয়, অধিকাংশ সোলঙ্কী-রাজপুত। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৫০র কাছাকাছি রত্নপ্রভু স্বরি নামক এক জৈনাচার্য্য সাধু (আধুনিক যোধপুর হইতে ৩০ মাইল দূরে এখনও বর্ত্তমান) ওসিয়া গ্রামে আসিয়াছিলেন। তখন এই রাজপুতেরা ওসিয়া নগরে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অধিকাংশ ক্ষত্রিয়দের জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অহিংসা ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ-ব্যবসায় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ও গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া জীবিকার জন্য বাণিজ্য অবলম্বন করিলেন। প্রথমে কেবল ওসিয়া-বাসী ক্ষত্রিয়েরাই ওসওয়াল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু পরে যে-কোন ক্ষত্রিয় জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে সেই ওসওয়াল হইয়া গিয়াছে। বহুকাল বাণিজ্য করিতেছে বলিয়া অনেকে উহাদের ওসওয়াল বণিক্ বলিয়া থাকে।

হীরজীর মাতা পিতা তিন শিশু রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর শ্বশুরালয় পাটন নগরে ছিল। তাঁহারা ছোট ভাইটিকে পাটনে আনিয়া বিদ্যাশিক্ষা করাইতে লাগিলেন। তাহার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতিভাবান্ ছাত্র অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ১৩ বৎসর বয়সে শ্রী বিজয়দান স্বরির কাছে হীর দীক্ষা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নূতন নাম হইল হীরহর্ষ। সেকালে মহারাষ্ট্রে দেবগিরি—আধুনিক অওরঙ্গাবাদের কাছে দৌলতাবাদ—সংস্কৃত ও ন্যায় শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। হীরহর্ষ দেবগিরিতে থাকিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি মারবার প্রদেশে নাওলাই গ্রামে পণ্ডিতদের এক সভাতে পরীক্ষা দিয়া "পণ্ডিত" পদ পাইলেন। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে শ্রীনেমিনাথের মন্দিরের সভাতে "উপাধ্যায়" পদ ও পর বৎসর মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে সিরোহী নগরে "স্বরি" (আচার্য্য) পদ পাইলেন। এইবার তাঁহার নাম হইল হীরবিজয় স্বরি। ইহার বার বৎসর পরে তাঁহার গুরুর তিরোধানে [১৫৬৬ খৃঃ] সমস্ত জৈন সঙ্ঘ তাঁহাকে "ভট্টারক" পদে ভূষিত করিলেন। এই ভট্টারক হীরবিজয় স্বরিকে সম্রাট্ অক্‌বর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

গুজরাটের সুবাদার শিহাবউদ্দীন অহমদ খাঁ সম্রাটের আজ্ঞা-পত্র পাইয়া ভয় পাইলেন। তিনি অক্‌বরের ধাত্রী মাহিম্ অংকা'র বন্ধু ছিলেন বলিয়া অক্‌বর তাঁহাকে সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু অক্‌বর বিদ্বান্ ও ফকীরদের অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না। ইতিপূর্ব্বে অনাবৃষ্টির সময়ে এক দিন একজন সামান্য লোক শিহাবউদ্দীনকে সংবাদ দিল যে দেশে যে বৃষ্টিপাত হইতেছে না তাহার কারণ জৈন সাধু হীরবিজয় কোনও রূপ তুক্‌তাক্ করিয়া বৃষ্টি বাঁধিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ সুবাদার তাহাই বিশ্বাস করিলেন ও তৎক্ষণাৎ সাধুকে ধরিয়া আনিয়া শাসন করিতে লাগিলেন। প্রহারের ভয় দেখাইলেন। তাহার শাসন অত্যাচার মৌখিক অপমান ছাড়াইয়া শারীরিক শ্রেণীতে উঠিবার পূর্ব্বেই কুমারজী নামক একজন গণ্যমান্য ধনবান্ নগরবাসী শ্রাবক তাহার জামিন হইয়া ছাড়াইয়া লইয়া গেলেন। সে সময়ে উৎপাত দূর হইল বটে কিন্তু সুবা নবাবের দ্বেষ দূর হইল না। তিনি মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার তুচ্ছ কারণে তাঁহাকে কষ্ট দিতে লাগিলেন। এ ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাধু একবার নগরে আসিয়াছিলেন, তখন একটি শ্রাবকের শিশুপুত্র মরণাপন্ন রোগে ভুগিতেছিল। শ্রাবক সাধুকে বলিয়াছিল আমার এ পুত্র যদি রক্ষা পায় তবে আপনাকে দিব। যে-কোনও কারণে হউক শিশু রক্ষা পাইল, সাধু চলিয়া গেলেন। যখন বালক ৮।৯ বৎসর বয়স্ক তখন তাহার বিবাহ স্থির হইল। বিবাহের পূর্ব্বেই ঘটনাক্রমে সাধু আবার নগরে আসিলেন। অনেকে ভাবিল সাধু বালককে কাড়িয়া লইয়া যাইবে। একজন প্রতিবাসী

নবাবকে সংবাদ দিয়া আসিল। নবাব কোনও অনুসন্ধান না করিয়াই সাধুকে ধরিয়া লইয়া গেলেন ও শাসন করিতে লাগিলেন। এবার সাধুকে ঐ বালকের বিবাহ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় একমাস লুকাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। এখন সুবা দেখিলেন সম্রাট্ সেই সাধুকে ভক্তিপূর্ণ বিনীত নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, সাধু নিশ্চয় পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ লইবেন।

যখন আচার্য্য সম্রাটের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলেন, তখন গুজরাটের শ্রাবকেরা আনন্দোৎসব করিতে লাগিল। তাঁহার সহিত ফতেপুর যাইবার জন্য বাছা বাছা অনেকগুলি বিদ্বান সাধু প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বৈয়াকরণ, কেহ নৈয়ায়িক, কেহ বাদী, কেহ ব্যাখ্যানী, কেহ আধ্যাত্মী, কেহ অষ্টাবধানী, কেহ শতাবধানী, কেহ কবি-আলঙ্কারিক, কেহ ধ্যানী ছিলেন। এইরূপে ৬৭ জন একত্র হইলেন, তন্মধ্যে ২৫ জন দিগ্বিজয়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। জৈন সাধুদের কোনও রূপ যান-বাহনে উঠিতে নাই, একমাত্র পদব্রজে গমনই তাঁহাদের পক্ষে প্রশস্ত। অতএব তাঁহারা সম্রাটের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াও সম্রাট্-দত্ত হাতী ঘোড়া ইত্যাদি কিছুই স্বীকার করিতে পারিলেন না। সুবা কতকগুলি রক্ষী ও ভারবাহী পশু সঙ্গে দিলেন। জৈন সাধুরা ত্যাগী সন্ন্যাসী, তাঁহাদের খাদ্য অথবা পাকের উপকরণ রাখিতে নাই। দুই প্রহরের সময় বা কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা জৈন গৃহস্থবাটীতে ভিক্ষা করেন; জৈন না থাকিলে বৈষ্ণব-বাটীতে ভিক্ষা করেন; কিন্তু আমিষাহারীর ভিক্ষা গ্রহণ করেন না।

গৃহস্থের নিজের জন্য প্রস্তুত শুদ্ধ খাদ্য যাহা কিছু পান, তাহা দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করেন। সাধুর জন্য কোনও মূল্যবান্ বা মুখরোচক বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিলে তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। নিমন্ত্রিত হইয়া কোনও গৃহস্থবাটীতে যাইতে পারেন না। দুগ্ধ ঘৃত ক্ষীর মিষ্টান্ন কখন কদাচিৎ পাইলে খাইতে পারেন, সচরাচর নহে। তাঁহারা কাঁচা জল পান করেন না। শ্রাবকেরা ২।৩ ঘণ্টা জল সিদ্ধ করিয়া শীতল করিয়া রাখে, তাহাই সাধুকে পান করে। সেই জল ছাড়া অন্য জলও পান করিতে পারেন না। যেখানে, যেদেশে শ্রাবক নাই, সেখানে সাধুদের বিচরণ করা অসম্ভব। বোধ হয় এই কারণে জৈন ধর্ম্ম ভারতের সীমা অতিক্রম করে নাই। দূর দেশে যাইবার সময়ে সাধুদের সহিত কয়েকটি শ্রাবক ভ্রমণ করেন ও পথে যদি শ্রাবক না থাকে তবে তাঁহারা ভিক্ষা দিয়া থাকেন। অর্থাৎ যেখানে দুই প্রহরের সময়ে আশ্রয় লইলেন সেইখানে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে (বা গাছতলায়) ৫।৭ জন শ্রাবক অন্ন পাক করিয়া বসিয়া থাকেন। সাধুরা দ্বারস্থ হইলে প্রত্যেককে মাধুকরী ভিক্ষা দান করেন। যদিও এটা ভিক্ষা গ্রহণের অভিনয় মাত্র, তথাপি তাঁহারা নিয়ম ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত নহেন। হীরবিজয় সূরির সহিত কয়েকজন শ্রাবক যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

আচার্য্য যখন নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলেন, তখন তিনি ভরুকচ্ছ নগরের কাছে গান্ধার নগরে ছিলেন। সেখান হইতে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বিহার করিতে করিতে রাজপুতানায় আধুনিক জয়পুরের কাছে সাঙ্গনের নগরে পহুঁছিয়া চারজন উপাধ্যায়কে সম্রাট্‌কে আপনার আগমন-সংবাদ দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এই উপাধ্যায়-চতুষ্টয় ফতেপুরে পহুঁছিয়া প্রথমে শেখ অবুল ফজলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, পরে তাঁহার মধ্যস্থতায় সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সম্রাট তাঁহাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ নির্ভীক স্পষ্ট বক্তৃতা শুনিয়া প্রীত হইলেন ও তাঁহাদের গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আরও আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশীর দিন হীরবিজয়সূরি ৬৭ জন সাধুর সহিত ফতেপুর নগরে প্রবেশ করিলেন। সম্রাট্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতি আনন্দিত হইলেন। অন্য অন্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী মোহান্তরা হাতী ঘোড়া পতাকা বাদ্য ইত্যাদি নানা রাজলক্ষণ লইয়া দেশ পর্যটন করিয়া থাকেন, তবে হীরবিজয় সুবা-দত্ত আড়ম্বর অস্বীকার করিলেন কেন, প্রথমে সম্রাট্ বুঝিতে পারিলেন না। যখন আচার্য্য জৈনদের নিয়মগুলি বুঝাইয়া দিলেন তখন তাঁহার সম্ভ্রম বাড়িয়া গেল।

সম্রাটের কাছে নানা প্রকার লোক আসিতেন, কেহ

বা সত্য সত্যই বিদ্বান্ বা সাধু, কেহ কেবল ঠকাইবার জন্য ফাঁদ পাতিতে আসিতেন। কেহ বুজরুগি দেখাইতেন, যোগবল মন্ত্রবল দেখাইতেন, আবার অনেকে ধরাও পড়িতেন, তখন ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। সম্রাট্ আচার্য্যকেও যাচাই করিতে ছাড়েন নাই। আচার্য্য সম্রাট-দত্ত হাতী ঘোড়া স্বীকার না করিয়া এত দূর পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন, আবার রাজ-অতিথি হইয়াও ফতে-পুরে দ্বারে দ্বারে মাধুকরী ভিক্ষা করিয়াছিলেন এই দেখিয়া সম্রাট চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তথাপি একদিন তিনি বলিলেন, "আমার এখন মন্দ সময় যাইতেছে। আপনি কোনওরূপ স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি করিয়া আমার গ্রহকষ্ট দূর করিতে পারেন কি? আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন আমি সেইরূপ ব্যয় করিব।" আচার্য্য বলিলেন, "রাজন্, আমি জ্যোতিষ জানি না, চিকিৎসক নই, তন্ত্র মন্ত্র জানি না, অতএব আমি কষ্ট দূর করিতে পারিব না। আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে জীবমাত্রকে আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, সর্ব্বজীবে দয়া করিয়া সিংহাসনে বসিয়া নিরপেক্ষ বিচার করিলে নিশ্চয় আপনার সকল কষ্ট দূর হইবে। আমি এইরূপ উপদেশ দান ছাড়া আর কিছুই পারি না ও পারিব না।"

সম্রাট্ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের প্রধান তীর্থ কোন্ কোন্ স্থান। আচার্য্য বলিলেন, "আমাদের অনেকগুলি তীর্থস্থান আছে; কিন্তু শত্রুঞ্জয়, গিরিনার, অর্ব্বুদ পর্ব্বত, সমেত শিখর (পার্শ্বনাথ পাহাড়) ও অষ্টাপদ শিখর (কৈলাস পর্ব্বত) এই কয়টি প্রধান তীর্থস্থান।"

একদিন সম্রাট্ আচার্য্যকে আপন চিত্রশালা দেখাইতে চাহিলেন ও সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। পথে এক প্রকোষ্ঠে গালিচা পাতা ছিল, তাহার উপর দিয়া সকলকে যাইতে হইবে দেখিয়া আচার্য্য নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলেন। সম্রাট্ বলিলেন, "আপনি আসিতেছেন না কেন? গালিচা ত পরিষ্কার, উহাতে কোনও জীব নাই।" আচার্য্য বলিলেন, "রাজন্, কেবল জৈনদের নহে, সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের জন্য মনুস্মৃতিতে [অধ্যায় ৬।৪৬ শ্লোক] আদেশ আছে 'দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদম্'; অতএব গালিচার নীচে কি আছে যখন দেখিতে পাইতেছি না তখন আমাদের এ-পথে হাঁটিবার অধিকার নাই।" সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ গালিচা তুলিতে আজ্ঞা করিলেন। ফরাসেরা গালিচা তুলিতেই দেখিতে পাইলেন তাহার নীচে সহস্র সহস্র কীট রহিয়াছে। সম্রাট্ এ ঘটনাকে আচার্য্যের একটি চমৎকার (miracle) বা অতিমানুষিক ক্ষমতার নিদর্শন বিবেচনা করিলেন। পরে তাঁহাকে চিত্রশালা ও পুস্তকাগার দেখাইলেন।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে আচার্য্য বলিলেন, "একখানি ঘর-নির্ম্মাণের সময় যেমন তাহার ভিত্তি প্রাচীর ও ছাদ এ তিনটিই ভাল করিতে পারিলে তবে ঘরখানি দৃঢ় হয়, নতুবা হয় না, সেইরূপ মনুষ্য-জীবনে দেব গুরু ও ধর্ম্ম এই তিনটি দৃঢ় করিতে পারিলে তবে মনুষ্য নির্ভয় হইতে পারে। দেব গুরু ও ধর্ম্মকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ও দর্শনে একই বস্তুকে নানা প্রকার নাম দিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; তাহাতে শব্দের ঝগড়া বিবাদ, কথা কাটাকাটি ছাড়া আর কিছুই নাই। ঈশ্বর ত জন্ম-জরা-মরণ-রহিত। তাঁহার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ নাই। তাঁহার রাগ-দ্বেষ-রোগ-শোক নাই, তিনি অনন্ত সুখ ও আনন্দের আকর। তাহার নানা গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে লোকে দেব, মহাদেব, শঙ্কর, শিব, বিশ্বনাথ, হরি, ব্রহ্মা, পরমেষ্ঠী, স্বয়ম্ভু, জিন, পারগত, ত্রিকালবিৎ, অধীশ্বর, শম্ভু, ভগবান্, জগৎপ্রভু, তীর্থঙ্কর, জিনেশ্বর, স্যাদ্বাদী, অভয়দ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, কেবলী, পুরুষোত্তম, অশরীরী, বীতরাগ, ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করিয়া থাকে!" এই কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "জৈন সাধুরা পঞ্চ মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। তাঁহারা কেবল মাত্র ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকেন ও সকল সময়ে আত্মচিন্তারূপ তপস্যা করিয়া থাকেন। যাহার কর্ম্ম এইরূপ পবিত্র, যে আপনার ধর্ম্মে দৃঢ়, যাহার বিদ্যা আছে, যে অন্য ব্যক্তিকে উপদেশ দিবার উপযুক্ত, ও উপদেশ দিয়া থাকে, সেই গুরু হইবার উপযুক্ত; ও বুদ্ধিমান্ জীবের এইরূপ গুরুর কাছে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। ধন

রত্ন স্ত্রী পুত্র ঐশ্বর্য্যাদি যেগুলি গৃহস্থের পক্ষে ভূষণ, সেইগুলিই সাধুর পক্ষে দূষণীয়। গৃহস্থানাম্ যদ্ ভূষণম্ তৎ সাধূনাং দূষণম্।" ইহার পর আচার্য্য শ্রাবকদের অনেকগুলি নিয়ম বলিয়া শেষে বলিলেন—"সকল শ্রাবক হয়ত নানা কারণে সকল নিয়ম পালন করিতে পারে না, কিন্তু তাহার অর্থ এরূপ হইতে পারে না যে যখন একটি নিয়ম ভঙ্গ করিতেই হইল, তখন আর অন্য নিয়মগুলি পালন করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রাবক যতগুলি নিয়ম পালন করিতে পারে তাহাই তাহার পালনীয়, যাহা পালন করিতে অশক্ত তাহা সে সময়ে ত্যাগ করিবে। পরে যদি কোনও সময়ে পালন করিতে পারে, তবে সে সময়ে অবশ্য পালন করিবে।"

একদিন কথা-প্রসঙ্গে সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি লোকের মুখে শুনিয়াছি 'হস্তিনা তাড্যমানোঽপি ন গচ্ছেজ্ জৈন-মন্দিরম্'। এ বচনটি কিরূপে উৎপন্ন হইল ?" আচার্য্য হাসিয়া বলিলেন, "রাজন্, এটা কোনও শাস্ত্রের বচন নহে। যেমন একজন এইরূপ বচন সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ প্রত্যুত্তরে অন্য ব্যক্তি বলিতে পারে, 'সিংহেন, তাড্যমানোঽপি ন গচ্ছেচ্ছৈব-মন্দিরম্'। উভয় বচনের উৎপত্তি একই প্রকারে ও একই স্থানে। সে-স্থানের নাম দ্বেষ ও পরনিন্দা। এ সকল বিষয়ে তর্ক করিবার ফল হাতাহাতি মারামারি ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই নহে।"

সম্রাট্ আচার্য্যকে ধন রত্ন জাগীর ইত্যাদি অন্ততঃ কিছু ভেট স্বীকার করিতে অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আচার্য্য কোনমতেই স্বীকার করিলেন না। সম্রাটের কাছে পদ্মসুন্দর নামক এক তাপস বিদ্বানের সংগৃহীত অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তক ছিল। অগত্যা তিনি আচার্য্যকে তাহাই স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। শেখ অবুল্ ফজ্‌ল্‌ও এই পুস্তকগুলি স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গৃহহীন পরিব্রাজক এত পুস্তক রাখিবেন কেমন করিয়া ? ইহা ছাড়া জৈন সাধুরা পুস্তকও সঙ্গে রাখেন না, কেননা এরূপ করিলে মনুষ্যের পুস্তকেও আসক্তি জন্মিতে পারে ? আচার্য্য এ-পুস্তকগুলি স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু আপনার কাছে রাখিলেন না। আগ্রাতে সম্রাটের নামে এক ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া সেইখানে রাখিয়া দিলেন। এ ভাণ্ডারের পরে কি দশা হইল বলা যায় না।

আমি চৈত্রের প্রবাসীতে (৮৫৫ পৃঃ) লিখিয়াছিলাম যে জৈন সাধুরা ভেট ও রাজসম্মান গ্রহণ করিয়া পতিত হইয়াছিলেন, এখন আবার সে প্রথা ত্যাগ করিয়াছেন। আমার এক জৈন বন্ধু আমার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। জৈনদের সাধু ও যতি দুইটি ভিন্ন বস্তু। সাধুরা কেশর দিয়া রঞ্জিত ঈষৎপীতাভ বস্ত্র ব্যবহার করেন। তাঁহারা কোনও কালে রাজসম্মান বা আড়ম্বর স্বীকার করেন নাই, এখনও করেন না। যতিরা শুভ্র শ্বেত বস্ত্র ব্যবহার করেন, তাঁহারা রাজসম্মান মোহান্তদের মত গদী ইত্যাদি স্বীকার করিয়াছিলেন ও এখনও করিয়া থাকেন। তাঁহারা রেল-গাড়িতে ভ্রমণ করেন। ইহাদের সম্মানেও যথেষ্ট প্রভেদ আছে। শ্রাবকেরা যতিকে দেখিলেই "বন্দনা" শব্দ উচ্চারণ করিয়া অভিবাদন করে, কিন্তু সাধুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে বাধ্য। কিন্তু যতিরা সাধুদের অন্য সকল কঠোর নিয়ম পালন করিয়া থাকেন।

কিছু কাল ফতেপুরে অবস্থানের পর আচার্য্য সম্রাট্‌কে বুঝাইলেন যে সাধুদের বেশী দিন এক স্থানে বাস করিতে নাই। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী গ্রামে এক রাত্রি ও বড় নগরে পাঁচ রাত্রির বেশী থাকিতেন না। অবশ্য বর্ষাকালের চাতুর্ম্মাস্য ছাড়া। আচার্য্য সম্রাটের অনুমতি লইয়া আগ্রা চলিয়া গেলেন। ফতেপুরে বাসের সময় প্রায় সকল রাজসভাসদের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল; কিন্তু আবুল্ ফজ্‌লের সহিত আলাপে তিনি যত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তত অন্য কাহারও সহিত আলাপে লাভ করেন নাই। আগ্রাতে তিনি চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিলেন। চাতুর্ম্মাস্যের মধ্যেই জৈনদের পর্য্যুষণ পর্ব্ব হয়। এই সময়ে ফতেপুরের জৈন অধিবাসীরা আচার্য্যের নামে সম্রাট্‌কে বলিলেন, "পর্য্যুষণ-পর্ব্ব জৈনরা অতি পবিত্র বিবেচনা করে। এ কয়দিন তিনি যে নগরে বাস করিতেছেন সেখানে জীবহত্যা নিবারণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।" সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ ফর্মান্

(আদেশপত্র) লিখিয়া আগ্রাতে আট দিন জীবহত্যা নিষেধ করিলেন। "বিজয়-প্রশস্তি" কাব্যে ১৬৩৯ সম্বতের পর্য্যূষণে আট দিন জীবহত্যা নিষেধের কথা আছে। কিন্তু কবি ঋষভদাস "হীরবিজয় সূরি রাসা"তে পাঁচদিনের উল্লেখ করিয়াছেন। আদত ফরমান্ অভাবে ঠিক কি হইয়াছিল জানা যায় না। মতান্তরে সম্রাট্ ফতেপুর হইতে আচার্য্যকে যাইতে দেন নাই। আচার্য্য বলিলেন, "আমাকে চাতুর্ম্মাস্যব্রত করিতে হইবে, তাহারই মধ্যে পর্য্যূষণ। পর্য্যূষণ-কালে আমাদের এমন নগরে বা গ্রামে থাকিতে নাই যেখানে বহু জীব হত্যা হয়।" এই কথা শুনিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে ফতেপুরে রাখিলেন ও পর্য্যূষণ-কালে জীবহত্যা নিষেধ করিলেন। পর্য্যূষণ-কাল শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন দিন ধরা হয়। উভয়েই ১২ দিন অতি পবিত্র বিবেচনা করেন। ইহার শেষদিন পবিত্রতম। এখন তাহাকে সম্বৎসরী (চলিত কথায় চমছরী) বলে। সে দিন জৈনরা আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব সকলকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। পুরাতন ঝগড়া বিবাদ দূর করিয়া প্রীতি স্থাপন করে। আজকাল ক্রিস্‌মস্ কার্ডের মত ছাপা পর্য্যূষণ-পত্র পাওয়া যায়, জৈনরা দূরদেশের বন্ধু-বান্ধবদের সেই পত্র পাঠায়। শ্রাবক অভিপাল (অভয় পাল) দোসী একজন সম্মানিত রাজ-সভাসদ্ ছিলেন। তিনি সম্রাটের ফরমান্ মস্তকে ধারণ করিয়া আচার্য্যের কাছে আনিলেন। নগরবাসী জৈনরা আনন্দোৎসব করিতে লাগিল। আচার্য্যের উপদেশে এই সময়ে ফতেপুরের ডাবর-তলাওতে মৎস্য-ধরাও নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

এক দিবস শেখ আবুল ফজল সম্রাট্‌কে বলিলেন, "আপনার এ-সকল আজ্ঞা ত পালিত হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু এমন কোনও আজ্ঞা দান করুন যাহা চিরকাল পালিত হয় ও ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিতে পারে।" সম্রাট্ বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে সমস্ত সাম্রাজ্যে যে কয়েকটি ঈদে (পর্ব্বে) মাংসাহার নিষেধ করা হইয়াছে সেই পর্ব্ব-তালিকার মধ্যে পর্য্যূষণ যোগ করিয়া দেওয়া হউক। এই আজ্ঞা-মত সম্রাট্ সমস্ত মোগল-শাসিত দেশে যে ফরমান্ * পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে মাংসাহার-নিষিদ্ধ দিবসের তালিকা এইরূপ লেখা হইয়াছিল :—

১। মাহ ফর্‌বরদী [অর্থাৎ সমস্ত ফর্‌বরদী মাস। ইরাণে প্রচলিত সৌর বৎসরের প্রথম মাস। সেকালে ১০ই মার্চ্চ, এখন ২১ মার্চ্চ, অর্থাৎ সায়ন মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ।]

২। মাহ আবান—সম্রাটের জন্মমাস [উপরোক্ত সৌর বৎসরের অষ্টম মাস। ১৫।১৬ অক্টোবর হইতে আরম্ভ হইত।]

৩। যে-সকল দিবসে সূর্য্যদেব এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে প্রবেশ করেন [সায়ন সংক্রান্তি।]

৪। ঈদের দিন ; যথা (ক) মেহেরের দিন (নওরোজ), (খ) প্রত্যেক মাসের রবিবার, (গ) দুইটি পর্ব্বদিন বা উপবাসের দিনের মধ্যের দিন, (ঘ) রজব মাসের সোমবার।

৫। দ্বাদশ পবিত্র দিবস—চান্দ্র শ্রাবণের শেষ ছয় দিন ও ভাদ্রের প্রথম ছয়দিন। এই বার দিন জৈনদের পর্য্যূষণ। প্রথমে আটদিন, পরে বার দিন অর্থাৎ পূর্ণ পর্য্যূষণ-কাল নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

মেহেরের দিন বা নওরোজ সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। মীরাতে-অহমদী মতে তেরদিন পার্ব্বণ। বোধ হয় ইহা হইতে প্রবাদ "বার মাসে তের পার্ব্বণ।" এই তের দিন ইরাণী সৌর মাসের নিম্নলিখিত তারিখ। ফর্‌বরদী—১৯। অর্দ্দিবহিশ্‌ৎ ৩। খুর্দ্দাৎ ৬। তীর ১৩। অমর্দাদ ৭। শহরবর ৪। মেহর ১৬। আবান ১০। আজর নাই। দ্যা ৮।১৫।২৩। বহমন ২। ইস্‌ফন্দার ৫। হায়দ্রাবাদে এই মাসগুলি প্রচলিত। সরকারী অফিসে এই মাস হিসাবে বেতন দেওয়া হয় ; কিন্তু স্থানীয় সুবিধার জন্য আজর মাসে (৭ অক্টোবর) বৎসর আরম্ভ ধরা হয়।

সম্রাট্ ফরমানের ছয়খানি নকল করাইয়াছিলেন। একখানি সৌরাষ্ট্রে, দ্বিতীয়খানি দিল্লী ফতেপুর প্রদেশে,

---

* এই ফরমানের আলোকচিত্র ভবনগরের শ্রীযশোবিজয় জৈন গ্রন্থমালার "সূরীশ্বর অনে সম্রাট" নামক গুজরাটী গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে।

তৃতীয়খানি অজমীর, নাগোর প্রদেশে, চতুর্থখানি মালব ও দক্ষিণ দেশে, পঞ্চমখানি লাহোর মুলতানে ও শেষখানি আচার্য্যকে দিয়াছিলেন। তখন (অর্থাৎ ১৬৩৯ সম্বতে ১৫৮২ খৃ) বঙ্গদেশে মোগল অধিকার হইয়াছিল কিন্তু বঙ্গ বিহারে ফরমান পাঠান হয় নাই। কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

সম্রাট্ আচার্য্যকে ডাকিয়া অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত একান্তে কথা বলিতেন। তাহাতে নানা লোকে নানা কথা রটাইত। একদিন সম্রাট্ বলিলেন, "আপনার উপদেশ-মত আমি আমার কয়েকটি সভাসদ্ অমীরদের মাংসাহার ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা বলিলেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা চিরকাল করিয়াছেন তাহা ত্যাগ করিতে পারি না ও ত্যাগ করাও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। হিন্দুদের শাস্ত্রেও নাকি ঐরূপ আদেশ আছে যে আপনার ধর্ম্মে মৃত্যুও ভাল কিন্তু পরের ধর্ম্ম কখনও গ্রহণ করিবে না। আমি তাঁহাদের বলিলাম আমার সপ্তম পূর্ব্বপুরুষের নাম তৈমুর। তিনি বালক-কালে তাতারের বনে ঘোড়া চরাইতেন, পরে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। তোমাদের যুক্তি গ্রহণযোগ্য হইলে আমার রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া মাঠে ঘোড়া বা ভেড়া চরান উচিত। তাহারা আর উত্তর দিতে পারিলেন না। আমি আপনার উপদেশ লাভ করিয়া যদিও সম্পূর্ণরূপে জীবহিংসা মাংসাহার ত্যাগ করিতে পারি নাই, তথাপি অনেক কমাইয়া দিয়াছি। আপনি শুনিয়া থাকিবেন আমি ফতেপুর হইতে অজমীর পর্য্যন্ত রাজপথের ধারে এক ক্রোশ অন্তর ১১৪টি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছি; ঐ-সকল স্তম্ভে প্রায় ৩৬০০০ হরিণের শিং সাজাইয়াছি। এগুলি আমার স্বহস্তে শিকার-করা হরিণের শিং। আমি এত জীবহিংসা করিয়াছি। আমার কৃত পাপের সীমা নাই। ইহা ছাড়া আমি প্রত্যহ নানা জীবের মাংস ছাড়া পাঁচশত পর্য্যন্ত চকলা (চড়াইপাখীর) জিহ্বা খাইতাম। আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রত্যহ কত জীবহত্যা করিতাম, এখন ভাবিলে শিহরিয়া উঠি। আপনার শ্রীমুখের উপদেশ লাভ করিয়া এখন আর আমার মাংসাহারে রুচি নাই। এখন প্রতিবৎসর ছয় মাস বা তদপেক্ষা বেশী সময় আমি মাংস খাই না।"

সম্রাটের সভাতে দেবীমিশ্র নামক এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি মহাভারত-অনুবাদকদের অর্থ বুঝাইয়া দিতেন। সম্রাট্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সূরিজী সম্বন্ধে কি বিবেচনা করেন?" মিশ্র বলিলেন, "আমি জৈন নহি, অতএব সূরিজীর সকল মত গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্তু সূরিজীর মত বিদ্বান্ মিষ্টভাষী, আদর্শচরিত্র, প্রকৃত সাধু আমি দেখি নাই।" একজন ভিন্নমতাবলম্বী বিদ্বানের মুখে এই প্রশংসা শুনিয়া সম্রাট্ আহ্লাদিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি ইঁহাকে যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে বোধহয় ইনি কেবল মাত্র জৈনদের গুরু নহেন,–ইঁহাকে 'জগৎগুরু' বলিলে অন্যায় হইবে না।" সম্রাটের মুখ হইতে যখন এই সম্মানসূচক শব্দ বাহির হইল তখন সূরিজীকে প্রকারান্তরে জগৎগুরু উপাধি দেওয়া হইল। এই সময়ের ও পরের ফরমানে "জগৎগুরু" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সম্রাট্ আলাপ শেষ করিবার সময়ে প্রায় বলিতেন, "আপনি আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা করুন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব, আপনি কিছুই স্বীকার করেন না তাহাতে আমি আন্তরিক দুঃখিত।" একদিবস আচার্য্য বলিলেন, "রাজন্, সত্যই যদি আমাকে কিছু দান করিলে সুখী হয়েন তবে আমি বলিতেছি শুনুন। সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুরা ধর্ম্মকে অতি প্রিয় বিবেচনা করে। আপনার বিশাল সাম্রাজ্যে হিন্দুদের অনেকগুলি তীর্থস্থান আছে। তীর্থস্থানে জিজিয়া কর ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থযাত্রীর পক্ষে কেবল কষ্টকর নহে, মর্ম্মান্তিক পীড়াদায়ক। এই কর রহিত করিলে সমস্ত তীর্থযাত্রীর উপকার হইবে, ইহাই আমার দান গ্রহণ।" সম্রাট্ ইতিপূর্ব্বে জিজিয়া তুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু গোঁড়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা সে আজ্ঞা অমান্য করিয়া কর আদায় করিত। এবার সম্রাটের আদেশে সম্পূর্ণ রহিত করা হইল।

১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে হীরবিজয় সূরি আপনার উপযুক্ত শিষ্য শান্তিচন্দ্র সূরিকে সম্রাটের ইচ্ছা-মত তাঁহার কাছে রাখিয়া স্বয়ং গুজরাটে চলিয়া গেলেন। পরে ভানুচন্দ্র সূরি, বিজয়সেন সূরি ইত্যাদি সম্রাটের কাছে ছিলেন।

১৬৮২ হইতে সম্রাটের কাছে একজন জৈন সাধু বা যতি থাকিতেন। এমন কি ভ্রমণের সময়ও থাকিতেন। বিজয় সেনের শিষ্য নন্দীবিজয় সূরি অষ্টাবধানী ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে "খুশ্‌ফহম" উপাধি দিয়াছিলেন।

একবার ব্রাহ্মণেরা সম্রাট্‌কে বলিল, "জৈনরা ঈশ্বর মানে না, তাহারা নাস্তিক, তাহাদের কথা শুনিয়া আপনি দোষী হইতেছেন।" সম্রাট্ এক বিচার-সভা আহ্বান করিলেন। বিচারে বিজয়সেন সূরি জয়ী হইলেন দেখিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে "সূরি সওয়াই" উপাধি দিলেন। "সূরি সওয়াই" শব্দের অর্থ সূরি বা আচার্য্যদের মধ্যে সওয়াগুণ বা ২৫ শতকরা প্রিমিয়ম সহ।

অকবরের মৃত্যুতে মোগলদরবারে জৈনদের প্রভাব অল্প কমিয়াছিল। জাহাঙ্গীর ১৬১১ খৃষ্টাব্দে এক ফরমানে পর্য্যুষনের বার দিন জীবহত্যা নিষেধ করিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের আর-একখানি পত্রের ফোটো ভাবনগরে জৈন সভা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে বোধ হয় তাঁহার অনুগ্রহ জৈনদের প্রতি সমান ছিল। শাহজহানের সময়ের ফরমান প্রবাসীর চৈত্র মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। অওরঙ্গজেবের মত সম্রাট্‌ও জৈনদের মন্দির ভাঙ্গেন নাই।

শ্রী অমৃতলাল শীল

জয়ন্তী

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

গৌরীশঙ্করের দৌত্য

রাত্রিকালে শিবিরের মধ্যে তাঁবুতে বসিয়া শাহজাদা রুস্তম্; সম্মুখে গৌরীশঙ্কর। গৌরীশঙ্কর বলিতেছেন, "শাহজাদা, বাদশাহ মুমূর্ষু, কেবল মনের জোরে এখনও বাঁচিয়া আছেন, কিন্তু আর এক সপ্তাহ কিছুতেই কাটিবে না। আপনি কি করিবেন, স্থির করিয়াছেন?"

"বাদ্‌শাহের মৃত্যুসংবাদ পাইলেই রাজধানীতে প্রবেশ করিব। সেখানে সিংহাসন অধিকার করিব।"

"আর শাহজাদা হাতিম?"

"তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব। যুদ্ধে আমার জয় স্থির।"

"যুদ্ধ ব্যতীত কি আর কোন উপায় নাই?"

"আর কি উপায়?"

"কেন, সন্ধি। যদি তাঁহাকে বুঝাইতে পারা যায় যে যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভের কোন আশা নাই তাহা হইলে সন্ধির প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইবেন না কেন?"

"তাঁহার যে তেমন বুদ্ধি আছে আমার ত মনে হয় না। বিশেষ, তিনি নিজের বুদ্ধিতে চলেন না, তাঁহার বুদ্ধিদাতা কতকগুলা নির্ব্বোধ চাটুবাদী।"

"যদি আপনি তাঁহাকে একটা সুবা ছাড়িয়া দেন, কিম্বা কোন অঞ্চলের প্রতিনিধি রাজা করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলেও কি তিনি বুঝিবেন না?"

"আমি তাঁহাকে কিছু ছাড়িয়া দিব কেন? আর যদি দিই তাহা হইলে তিনি অপরের বুদ্ধিতে মনে করিবেন আমি তাঁহার অপেক্ষা হীনবল, সন্ধির চেষ্টা করিতেছি।"

"সে আশঙ্কা আছে, তথাপি চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই।"

"কে চেষ্টা করিবে?"

"অনুমতি দেন ত আমি করি।"

"আপনার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আপনি চেষ্টা করুন, কিন্তু আমি পত্র অথবা অন্য কোন নিদর্শন দিব না।"

"তাহার প্রয়োজন নাই।"

শাহজাদা হাতিমের শিবির সেখান হইতে দুই দিনের

পথ। গৌরীশঙ্কর গিয়া হাতিমের সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শাহজাদার নিকট লইয়া গেলেন। শাহজাদা মোসাহেবদিগকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখনও তাঁহাকে কয়েকজন ঘিরিয়া ছিল। সেনাপতি কহিলেন, "ইনি শাহজাদা রুস্তমের নিকট হইতে আসিয়াছেন।"

শাহজাদা কহিলেন, "কি উদ্দেশ্যে ?"

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "শাহজাদা রুস্তমের ইচ্ছা যাহাতে ভ্রাতৃবিরোধ না হয়। আপনারা দুই জনই সম্রাট্ হইতে পারেন না। তবে সন্ধি করিলে যুদ্ধ বিগ্রহ নিবারিত হয়।"

"তিনি সন্ধি করিতে চান ?"

"আপনি রাজি হইলে। যুদ্ধে ও সন্ধিতে দুই পক্ষের প্রয়োজন।"

"তাঁহার প্রস্তাব কি শুনি ?"

"তিনি আপনাকে দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধি রাজা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন।"

"আর তিনি সম্রাট্ হইবেন ?"

মোসাহেবরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল, "এই ত সহজ মীমাংসা! শাহজাদা, আপনি দক্ষিণে ফিরিয়া চলুন!"

শাহজাদা বলিলেন, "যে প্রস্তাব রুস্তম্ করিয়াছেন মনে করুন সেই প্রস্তাব আমার পক্ষ হইতে করা হইল। তাঁহাকে আমি একটা সুবা ছাড়িয়া দিব।"

"এমন করিয়া সন্ধি হয় না।"

"সন্ধির কথা আমি তুলি নাই। আমি জ্যেষ্ঠ, সিংহাসন আমার।"

"যে বলবান্ সিংহাসন তাহার। শাহজাদা রুস্তম্ আপনার অপেক্ষা বলবান্।"

একজন মোসাহেব বলিল, "গুস্তাকি!"

হাতিম কহিলেন, "কে বলবান্ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রমাণিত হইবে। সন্ধিতে ছল থাকিতে পারে, বল নাই।"

"এই আপনার শেষ কথা ?"

"আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

গৌরীশঙ্কর ফিরিয়া আসিলেন।

শাহজাদা রুস্তম্ সকল কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম।"

—

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

মন্‌সব্‌দার কি স্থির করিলেন

মন্‌সব্‌দার কেল্লাতে ফিরিতেই একটা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। মন্‌সব্‌দার একটা দেশের শাসনকর্ত্তা, এমন কি বাদশাহের সমান বলিলেই হয়। তাঁহাকে কিনা দুই বিঘার আসামী একটা হিন্দু গ্রেপ্তার করে, তাঁহার সওয়ারদের ঘেরাও করে! সৈন্যেরা আস্ফালন করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "হুকুম পাইলে আমরা এখনি গিয়া সেই দুইটা লোকের মুণ্ড বর্শায় গাঁথিয়া আনি আর তাদের লাশ্ শকুনি দিয়া খাওয়াই।"

শুনিয়া মন্‌সব্‌দার মক্‌তুম শাহকে ডাকিয়া বলিলেন, "উহাদের গোলমাল করিতে বারণ কর। বুঝাইয়া বল যে গোলমাল করিলে সব ফাঁসিয়া যাইতে পারে। বল যে আমি সব ঠিক করিয়া, সময় বুঝিয়া পূরা বদলা লইব, ওই হিন্দুটা ও তাহার বানরটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিব, সৈন্যেরা বাড়ীর অওরতদের বেইজ্জত করিবে, বাড়ীর একখানা ইঁট থাকিবে না। কিন্তু হল্লা করিলে গোল বাধিয়া যাইবে

শিকারের দিন মন্‌সব্‌দারকে যখন বিহারীলাল সাক্ষাৎ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তখন শেখ জলালুদ্দীন সাহেব কি বলিয়াছিলেন মনে পড়ে ?

মক্‌তুম শাহ কথাটা খুব রংদার করিয়া সৈন্যদিগকে শুনাইলেন। তাহারা চেঁচামেচি বন্ধ করিল কিন্তু তাহাদের আস্ফালন বাড়িল। সব চেয়ে সুন্দরী অওরত কে লইবে এই কথায় ঘোর তর্ক বাধিল। কেহ বা কোমর হইতে ছোরা বাহির করিয়া কহিল, "এই দিয়া বিহারীলালের দিল্ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কুত্তাকে দিয়া খাওয়াইব।"

অন্দর মহল হইতে খোজা আসিয়া মন্‌সব্‌দারকে বলিল, "বেগম সাহেবারা হুজুরের ইন্তজারি করিতেছেন।"

মন্‌সব্‌দার বলিলেন, "যাইতেছি।"

বেগম-মহলেও একটা সোরগোল হইতেছে।

মনসব্‌দার বেগম-মহলে গিয়া দেখেন তিন বেগম একত্রে, কাহার মহলে যাইবেন বিচার করিবার প্রয়োজন হইল না।

ফাতেমা আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন, কহিলেন, "এখন রাগারাগির সময় নয়, কি হইয়াছে বল।"

মনসব্‌দার কহিলেন, "বিহারীলাল আমার অপমান করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত শাস্তি পাইবে, কিন্তু এ কথা লইয়া গোল করিবার আবশ্যক নাই।"

খদিজা কহিলেন, "আমরা স্ত্রীলোক, আমরা আবার কি গোল করিব? গোল করিতেছে অন্য লোক। আমরা ভয় পাইয়াছি। বিহারীলালের পিছনে কোন ক্ষমতাবান্ লোক না থাকিলে সে কোন্ সাহসে তোমার অপমান করিবে?"

"তাহার দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া। সে ত বিদ্রোহী হইয়াছে, বিদ্রোহীর পক্ষে কে হইবে?"

"তবু আমাদের মন স্থির হইতেছে না।"

"তোমরা মিছামিছি ভয় পাইতেছ। ভয়-ভাবনার কোন কারণ নাই।"

মনসব্‌দার বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। ফতেমা তাঁহার সঙ্গে দরজা পর্য্যন্ত গিয়া কহিলেন, "আমার অপরাধ ক্ষমা কর।"

মনসব্‌দার কহিলেন, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, আমার মনে আর কিছু নাই।"

"তবে আজ আমার মহলে আসিবে?"

"আসিব।"

বাহিরে আসিয়া মনসব্‌দার দেখেন শাহজাদা হাতিমের গুপ্তচর তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। চর সেলাম করিয়া তাঁহার হস্তে পত্র দিয়া কহিল, "জরুরি।"

পরোয়ানায় লেখা আছে, মনসব্‌দার এ পর্য্যন্ত কোন সাফ জবাব দেন নাই বলিয়া শাহজাদা নারাজ হইয়াছেন। বাদ্‌শাহ মৃত্যুশয্যায়, এ পরোয়ানা পঁহুছিবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যদি মনসব্‌দার সাহাজাদার মেহেরবানি ও নিজের পদোন্নতি চাহেন তাহা হইলে অবিলম্বে শাহজাদাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিবেন ও শত্রুপক্ষের সকলকে বন্দী করিবেন।

কে কাহাকে বন্দী করে? বিহারীলাল শত্রুপক্ষে, সে ত আজ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিল। মনসব্‌দার দূতকে কহিলেন, "হুকুম আমি তামিল করিব। তুমি গিয়া সুবাদার সাহেবকে জানাও।"

"আপনি জবাব লিখিয়া দিবেন না?"

"না, পথে শত্রু আছে, জবাব ধরা পড়িতে পারে, তোমারও প্রাণ যাইবে।"

গুপ্তচর চলিয়া গেল। মনসব্‌দার স্থির করিলেন পর দিবস বিহারীলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার মনের ভাব বুঝিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

—

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মনসব্‌দার ও বনবাসিনী

পর দিবস প্রভাতে মনসব্‌দার একজন মাত্র অনুচর সঙ্গে করিয়া বিহারীলালের গৃহে গমন করিলেন। বিহারী লাল বাড়ীতে নাই, দুই তিন ক্রোশ দূরে একটা বাগান-বাড়ীর মত ছিল সেইখানে ছিলেন। মনসব্‌দার ঘোড়া হাঁকাইয়া সেই দিকে চলিলেন।

প্রকাণ্ড ময়দানের মাঝখানে বাগান দিয়া ঘেরা বাড়ী। দূরে অসংখ্য তাঁবু পড়িয়াছে। সৈন্য-শিবির। বাড়ীর ফটকে দাঁড়াইয়া সিপাহী। সে মনসব্‌দারের পথ রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে প্রয়োজন?"

"চৌধুরী বিহারীলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

"ভিতরে যান," সিপাহী পথ ছাড়িয়া দিল। অনুচরকে কহিল, "তুমি এইখানে থাক, ভিতরে যাইবার হুকুম নাই।"

বাড়ীতে প্রবেশ করিবার দরজার সম্মুখে গৌরীশঙ্করের দলের কয়েকজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল। কেহ কিছু বলিল না। দরজা খোলা দেখিয়া মনসব্‌দার ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইলেন।

প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সেই বনবাসিনী! মুখে মৃদুমন্দ মধুর হাসি।

বিস্ময়ের অবসানে মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "তুমি এখানে ?"

"কোন আপত্তি আছে ?"

"এখানে ত বিহারীলাল থাকেন।"

"থাকেন না, আজ আসিয়াছেন ; অন্য লোকেরা থাকেন।"

"তুমি আর বিহারীলাল এক বাড়ীতে কেন ?"

"আপনি জিজ্ঞাসা করিবার কে ?"

"আমি তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য তোমাকে আনিতে পাঠাইয়াছিলাম। তুমি আমার লোকদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলে।"

"তাহাদের প্রভু থাকিলে তাঁহারও সেইরূপ সম্মান হইত।"

কথাটা মন্‌সব্‌দার কানেই তুলিলেন না, বলিলেন, "আমি এখনও তোমাকে বিবাহ করিতে রাজি আছি।"

"আমার কি সৌভাগ্য ! শাদি, না নিকা ?"

"শাদি।"

"আমাকে কল্‌মা পড়াইবে কে ?"

"মুল্লা, কাজি, যাহাকে বল। হিন্দু থাকিতে চাও, তোমার জুদা বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

"খুশ্‌নসীবের উপর খুশ্‌নসীব ! না জানি আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম !"

মন্‌সব্‌দার অনুরাগে অন্ধ, কর্ণও বধির। বিদ্রূপের প্রত্যেক কথা তাঁহার ধ্রুব সত্য মনে হইতেছিল।

মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "এখন আমার সঙ্গে যাইবে ?"

"ক্ষতি কি ? কাপড় ছাড়িয়া আসি।"

"আমি অপেক্ষা করিতেছি।"

জয়ন্তী আর-একটা দরজার দিকে চলিল, মন্‌সব্‌দার পিছনে পিছনে। জয়ন্তী দরজার চৌকাঠ পার হইয়া দাঁড়াইল, এবার মুখের হাসি অন্য রকম। কহিল, "মন্‌সব্‌দার সাহেব, উল্লু কাহাকে বলে জানেন ?"

"কেয়া ?"

"আর বেওয়কুফ্‌ ?"

"অয়সী বাত কেঁও ?"

"আপকা ইয়হ্‌ দো বহুৎ উম্‌দা নাম—উল্লু অওর বেওয়কুফ্‌।"

ঝনাৎ করিয়া জয়ন্তী দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আর-একটু হইলে মাথায় লাগিয়া মন্‌সব্‌দারের মাথা ফাটিয়া যাইত।

মন্‌সব্‌দারের মুখখানা তখন কি রকম হইয়া গেল ? ঠিক সেই সময় বিহারীলাল সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া মন্‌সব্‌দারের সেই মুখশ্রী দেখিলেন। বিহারীলাল বাগান-বাড়ীতে আসিয়াই শিবিরে চলিয়া গিয়াছিলেন। এই মাত্র ফিরিতেছেন। তিনি বলিলেন, "কি হইয়াছে, মন্‌সব্‌দার সাহেব ? আপনি যে এখানে ?"

অপমানে ক্রোধে মনসব্‌দার প্রায় বাক্‌শূন্য হইয়াছিলেন। আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, "আপনার সহিত বিশেষ কথা আছে।"

পূর্ব্বদিনের কথা স্মরণ করিয়া বিহারীলালের মনের ভাব একটু নরম হইয়াছিল। তিনি কহিলেন, "বসুন, কি বলুন ?"

"এখানে নয়, ঘরের বাহিরে চলুন।"

"আসুন," বিহারীলাল মন্‌সব্‌দারকে বাড়ীর পিছনে লইয়া গেলেন। সেখানে কেয়ারি-করা ফুলের বাগান। নানা রকম ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

মন্‌সব্‌দারের মুখের বিকট ভাব। মাটিতে লাঙ্গল চষিলে যেমন গভীর রেখা হয় মুখের রেখাগুলা সেইরূপ হইয়াছে, তাহার উপর ক্রোধ ও প্রতিহিংসার প্রবৃত্তিতে মুখ বিকৃত। বিহারীলালের সংশয় হইতেছিল লোকটার কোনরূপ মানসিক বিকার হইয়াছে।

মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে তাহা ভুলি নাই, তুমি কাল আমার অপমান করিয়াছিলে তাহা ভুলিয়াছি, কিন্তু এ নূতন অপমানের বিস্মৃতিও নাই, মার্জ্জনাও নাই।"

বিস্মিত হইয়া বিহারীলাল কহিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন ?"

"শিকারের দিন যে রমণীকে দেখিয়াছিলাম সে এখানে কেন ?"

"সে আপনার কে? তাহার উপর আপনার কিসের দাবী?"

"তাহাকে আমি বিবাহ করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। তুমি তাহাকে এখানে আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছ।"

"সাবধান! আমার মার্জ্জনার অতীত কোন কথা বলিবেন না।"

"আর কথায় কাজ নাই, যুদ্ধে আপনার প্রাণ রক্ষা কর। তুমি আমার পথে কণ্টক, তোমাকে সরাইলে আমি নিশ্চিন্ত হইব।"

"আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না।"

"ভীরু, কাপুরুষ, তবে বিনা যুদ্ধে মর," মন্‌সব্‌দার চীৎকার করিয়া উন্মত্তের ন্যায় কোষ হইতে অসি মুক্ত করিলেন।

মন্‌সব্‌দার ও বিহারীলালের মধ্যে একটা ছায়া পড়িল। সেই হাস্যমুখী বনবিহারিণী!

জয়ন্তী কহিল, "মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দীন সাহেব, দেখিতেছি আপনাদের একটা তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। আমি মধ্যস্থ হইতে আসিয়াছি। আমার শালিসী মঞ্জুর করুন।"

"তোমাকে লইয়াই বিবাদ। তুমি আমার সঙ্গে চল, আর কোন বিপদ্ থাকিবে না।"

"মন্‌সব্‌দার সাহেব, ইহার মীমাংসা সহজ। চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আপনি যুদ্ধ করিবেন কেন? যুদ্ধে আমাকে পরাজয় করিয়া আমাকে আপনার সঙ্গে লইয়া চলুন, আমি স্বেচ্ছায় আপনার অনুগামিনী হইব।"

বিহারীলাল ডাকিলেন, "জয়ন্তী!"

হাত তুলিয়া জয়ন্তী নিষেধ করিল। তাহার কটাক্ষে বিহারীলাল বুঝিলেন আশঙ্কার কোন কারণ নাই, আর কোন কথা কহিলেন না।

"জয়ন্তী! বড় মিঠা নাম! আমি বদলাইয়া বিবি জহুরন্ রাখিব।"

নামটা কুৎসিত। বিহারীলালের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি নীরব রহিলেন।

জয়ন্তী হাত বাড়াইয়া কহিল, "চৌধুরী সাহেব, আপনার তরওয়াল!"

বিহারীলাল বিনা বাক্যে কোটি হইতে অসি কোষমুক্ত করিয়া জয়ন্তীর হাতে দিলেন।

মন্‌সব্‌দার মনে করিলেন, জয়ন্তী রঙ্গ করিতেছে। গোঁফ দাড়ির মধ্য হইতে দাঁত বাহির করিয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ কে কোথায় শুনিয়াছে? আর বিবি, যুদ্ধে কাজ কি, আমি ত তোমার কাছে হারিয়াই আছি! তোমার কটাক্ষেই মরিয়া আছি।"

বিহারীলালের মুখ ম্লান হইয়া গেল। অধর দংশন করিয়া নীরব রহিলেন।

জয়ন্তী কহিল, "যদি বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার কর তাহা হইলে আমার সঙ্গে চল, আমার গোলাম হইয়া আমার ঘরে ঝাড়ু লাগাইবে।"

বিহারীলালের ললাট পরিষ্কার হইল। মন্‌সব্‌দার অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, "বেতমিজ অওরত!"

জয়ন্তী বার কয়েক তরবারি ঘুরাইল। সূর্য্যের প্রভাত-আলোকে অসি চমকিতে লাগিল।

ফুলে ফুলে চারিদিক্ ভরিয়া রহিয়াছে। এই কি রক্ত-পাতের স্থান!

মূঢ় মন্‌সব্‌দার দেখিলেন, এ তরবারি-চালনা ছেলেখেলা নহে, বিচিত্র শিক্ষার পরিচয়। এ ত ভয়ানক স্ত্রীলোক!

জয়ন্তী কহিল, "আসুন, আমি আপনার অপেক্ষা করিতেছি।"

মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "স্ত্রীলোকের সঙ্গে অসিযুদ্ধ! তুমি তরবারি ফিরাইয়া দাও।"

"তবে কি বিনা যুদ্ধে মরিবেন?"

মন্‌সব্‌দারও বিহারীলালকে এই কথা বলিয়াছিলেন। জয়ন্তী শুনিয়াছিল।

মন্‌সব্‌দার ভাবিতেছিলেন, লোকে এ কথা শুনিলে কি বলিবে?

জয়ন্তী বলিল, "কোন কোন ঘোড়া আপনি চলে, কোনটা বা চাবুক না খাইলে চলে না। আপনার চাবুক চাই?" বলিয়াই চক্ষের পলক না পড়িতে, জয়ন্তী তরবারির চ্যাপ্টা দিক্ দিয়া ধাঁ করিয়া মন্‌সব্‌দারের গালে আঘাত করিল। ঠিক যেন একটা প্রচণ্ড চড়। মন্‌সব্‌দারের গাল ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিল।

চাবুকের ফল তখনি ফলিল। মন্‌সব্‌দার অশ্রাব্য কটু গালি দিয়া, তরবারি টানিয়া জয়ন্তীকে এত বেগে আক্রমণ করিলেন যে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে জয়ন্তীর শিরশ্ছেদন হইত। সে অবলীলাক্রমে, হাসিমুখে মন্‌সব্‌দারের আঘাত ব্যর্থ করিল।

জয়ন্তীর অসি-চালনা দেখিয়া বিহারীলাল বুঝিয়াছিলেন যে জয়ন্তীকে পরাজয় করা সাধারণ কথা নয়। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

ক্রোধে অস্থির হইয়া মন্‌সব্‌দার বার বার জয়ন্তীকে আক্রমণ করিলেন, কখন মস্তকে, কখন স্কন্ধে, কখন হস্তে, কখন দক্ষিণে, কখন বামে আঘাত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোথাও স্পর্শ করিতে পারিলেন না। জয়ন্তীর মুষ্টিতে অসি অলাতচক্রের ন্যায় ঘুরিতেছিল। যেখানে মন্‌সব্‌দার লক্ষ্য করেন সেখানেই জয়ন্তীর তরবারি। মন্‌সব্‌দার বুঝিলেন যে শিক্ষায় জয়ন্তী তাঁহার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

তাহার পর একপদ অগ্রসর হইয়া জয়ন্তী মন্‌সব্‌দারকে আক্রমণ করিল। বিড়াল যেমন মূষিককে লইয়া খেলা করে মন্‌সব্‌দারকে লইয়া জয়ন্তী সেইরূপ ক্রীড়া করিতে লাগিল। ইচ্ছা করিলে শত বার তাঁহাকে শত স্থলে আঘাত করিতে পারিত, কিন্তু দুই একবার স্পর্শ করিল মাত্র। অবশেষে তরবারিতে তরবারি জড়াইয়া মুষ্টি ঘুরাইতেই মন্‌সব্‌দারের তরবারি তাঁহার হস্তমুক্ত হইয়া দূরে গিয়া পড়িল। মন্‌সব্‌দার নিরস্ত্র, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর। জয়ন্তীর চক্ষের দৃষ্টি বড় কঠিন, তাহার আর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কহিল, "কেমন, এখন আমার গোলামী স্বীকার করিবে?"

মন্‌সব্‌দার অধোবদন। আর কোন্ মুখে কথা কহিবেন?

জয়ন্তী কহিল, "এবার তোমাকে ক্ষমা করিলাম, তুমি বিদায় হও। কিন্তু আবার যদি তোমার মুখে স্পর্দ্ধার কথা শুনিতে পাই, তাহা হইলে তোমার জিহ্বা ছেদন করিব।"

মন্‌সব্‌দার তরবারি উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। বিহারীলালের সহিত পরামর্শ হইল না। কেল্লায় গিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন, বাদ্‌শাহ্ বিহিশ্‌তে এবং শাহজাদা হাতিম সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে যে বাদ্‌শাহ স্বীকার না করিবে সে বিদ্রোহী।

মন্‌সব্‌দার বিদায় হইলে জয়ন্তী বিহারীলালকে তরবারি ফিরাইয়া দিল। বিহারীলাল তরবারি মাথার উপর তুলিয়া কহিলেন, "জয়ন্তীর জয়, জয় জয়ন্তী!"

কে যেন জয়ন্তীর সকল তেজ, সকল বল, হরণ করিল; সে শিথিল আলস্যে বিহারীলালের গলায় হাত দিয়া বলিল, "আমাকে ভিতরে লইয়া চল।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তখ্‌ৎ তাউস

অপমানে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া জলালুদ্দীন যে কথা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য, না জানিয়া মন্‌সব্‌দার রটাইয়াছিলেন। বাদ্‌শাহ ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, হাতিমও আপনাকে বাদ্‌শাহ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজকে বাদ্‌শাহ বলা ও বাদ্‌শাহী হস্তামলকের মত হস্তগত হওয়ায় অনেক প্রভেদ। যতক্ষণ হাতিম ঘোষণাপত্র চারিদিকে প্রচার করিতেছিলেন রুস্তম ততক্ষণ রাজধানী বেষ্টন করিয়া সকল দরজা আঁটিয়া দিলেন। রাজধানীর ভিতর বাদ্‌শাহের মৃতদেহ—আর তখ্‌ৎ তাউস।

কোলাহলপূর্ণ মহানগরী এখন নিস্তব্ধ। মৃত্যুর অঞ্জীল যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া নগরীর উপরে বসিয়া আছেন, তাঁহার পক্ষতলে সব অন্ধকার। হাট বাজার সব বন্ধ, পথে লোকের চলাচল নাই। কেহ জোরে কথা কয় না, কোথাও হাসি শোনা যায় না। জঁহাপনাহ্—জগৎশরণ—নাই, আজ ধরণী অশরণ হইয়াছে।

বিশাল রাজপ্রাসাদ আজ শোকমগ্ন। দ্বারে প্রহরী প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিঃশব্দে দণ্ডায়মান। কর্ম্মচারীদের মুখে কথা নাই, অমাত্য ভৃত্য নিঃশব্দে যাতায়াত করিতেছে। শয়ন-প্রকোষ্ঠে বাদ্‌শাহের মৃতদেহ। বক্ষের উপর কোরাণ শরীফ, তাহার পাশে তসবী। শয্যাতলে মৃতদেহ রক্ষা করিবার আধার, দরিদ্র ভিক্ষুকের দেহ যাহাতে রক্ষা করা হয় সেইরূপ। মৃত্যুর পূর্ব্বে বাদ্‌শাহ এইরূপ

আদেশ করিয়াছিলেন। জীবিতাবস্থায় যিনি সকল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন, মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহ ভিক্ষুকের দেহের ন্যায় সমাধিস্থ হইবে।

নানা মণিমাণিক্যে খচিত, হীরকমণ্ডিত সিংহাসন আজ শূন্য। যিনি নির্ব্বিবাদে তখ্‌ৎ-তাউসে আসন গ্রহণ করিতেন তিনি ধরাধাম ছাড়িয়া গিয়াছেন, এখন রক্তস্রোত প্রবাহিত না করিয়া সে আসন কেহ অধিকার করিতে পাইবে না। এই মণিময় ময়ূরের পদ শোণিতে রঞ্জিত।

নগরে বা প্রাসাদে প্রবেশ না করিয়া শাহজাদা রুস্তম্ নগরদ্বারে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রাসাদে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে বাদ্‌শাহের দেহ তিনি নিজের স্কন্ধে বহন করিয়া সমাধি-স্থলে লইয়া যাইবেন।

শাহজাদা হাতিম আসিয়া দেখিলেন নগরের সকল দ্বার রুদ্ধ, মক্ষিকা প্রবেশের ছিদ্র কোথাও নাই। যাবৎ বাদ্‌শাহের সমাধি না হয় সে পর্য্যন্ত যুদ্ধের কোন কথাই হইতে পারে না। শাহজাদা হাতিম বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি বাদ্‌শাহের দেহ নিজের স্কন্ধে বহন করিতে চাহেন। শাহজাদা রুস্তমের জবাব আসিল যে শাহজাদা হাতিম পাঁচজন অনুচর লইয়া কফন হইবার কালে নগরে প্রবেশ করিতে পারেন। কেহ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিবে না, সেজন্য শাহজাদা রুস্তম্ স্বয়ং দায়ী। কিন্তু সমাধির পরে তাঁহাকে নিজের শিবিরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। হাতিম ইহাতে স্বীকৃত হইলেন।

বাদ্‌শাহের মৃতদেহের সম্মুখে দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইল। দুইজনের চক্ষে তখ্‌ৎ তাউস দুই জনকে সঙ্কেতে ডাকিতেছে। যখন তাঁহারা বাদ্‌শাহের দেহ বহন করিতেছেন তখনও তাঁহাদের মধ্যে তখ্‌ৎ-তাউস রুধির-রঞ্জিত চরণে দাঁড়াইয়া মণিময় চক্ষু দিয়া দুইজনকে আহ্বান করিতেছে! সমাধি সমাপ্ত হইলে দুই জনে নিজের শিবিরে চলিয়া গেলেন।

পর দিবস হাতিম রুস্তমকে আক্রমণ করিলেন। রুস্তম্ নগরদ্বার ছাড়িয়া দিয়া ময়দানে সৈন্য সাজাইয়াছিলেন। সারাদিন যুদ্ধ হইল। সন্ধ্যার সময় হাতিমের সৈন্যেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। হাতিম বন্দী হইলেন। দুর্গের ভিতর এই রকম সম্রাট্-বংশের বন্দী রাখিবার স্বতন্ত্র স্থান ছিল। সেইখানে হাতিম রাত্রি যাপন করিলেন।

মধ্যাহ্নের সময় আহারাদির পর কারারক্ষী হাতিমকে রুস্তমের নিকট লইয়া গেল। দরবার-ই আমে তখ্‌ৎ-তাউসে বসিয়া শাহজাদা রুস্তম্। তখ্‌ৎ-তাউসের কুহক! নীচে স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া গৌরীশঙ্কর। আর কেহ ছিল না। শাহজাদা রুস্তমের সেখানে বসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, প্রকাশ্যে বসিতেও পারিতেন না। মাতমের, লোকের অশৌচের কাল অতীত না হইলে বাদ্‌শাহ দরবারে বসিতে পারেন না। তিনি বসিয়াছিলেন কেবল মনের ও প্রতিহিংসার তৃপ্তির কারণে—তখ্‌ৎ-তাউসে বসিয়া মনের তৃপ্তি, আর শাহজাদা হাতিমকে দেখাইয়া প্রতিহিংসার তৃপ্তি।

বাদ্‌শাহের সমক্ষে কেহ বসে না। রুস্তম্ এখনও ন্যায়মত বাদ্‌শাহ হন নাই, যদিও প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া বাদ্‌শাহীর পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। গৌরীশঙ্কর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি দরবারে কখন প্রবেশ করিবেন না। তাই আজ বাদ্‌শাহ তাঁহাকে ডাকাইয়া বসাইয়াছিলেন। ইচ্ছা, হাতিমের সম্বন্ধে একটা দেওয়ানেও তাঁহার সাক্ষাতেই হয়।

হাতিমের সঙ্গে শুধু একজন প্রহরী ছিল। হাতিমকে রুস্তম্ বসিতে বলিলেন না, হাতিম দাঁড়াইয়া রহিলেন। রুস্তম্ নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তোমাকে বিনাযুদ্ধে রাজ্যের একাংশ দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম, তখন তুমি কর্ণপাত কর নাই। এখন?"

হাতিমের মুখ শুষ্ক, চক্ষের কোলে কালি পড়িয়াছে, বেশ অসংযত। কিন্তু চক্ষের দীপ্তি ম্লান হয় নাই, মুখের গর্ব্বিত ভাব দূর হয় নাই, মাথা তুলিয়া সগর্ব্বে ভ্রাতার প্রতি চাহিয়া ছিলেন। যে পিতার পুত্র রুস্তম্, সেই পিতার পুত্র হাতিম। তাঁহারও তাইমুর-বংশে জন্ম, মৃত্যুভয় নাই। তিনি সগর্ব্বে কহিলেন, "এখন? এখন তুমি তখ্‌ৎ-তাউসে, আমি মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। জয় পরাজয় যুদ্ধের নিয়ম, এ যুদ্ধে জিতিলে তখ্‌ৎ-তাউস, হারিলে মৃত্যু। ভাইয়ে ভাইয়ে চিরকাল এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বাল্যাবস্থা হইতে বিরোধ। হয় মায়ের স্নেহ,

না হয় বাপের আদরের জন্য কলহ। শৈশবে, কৈশোরে ঈর্ষা বিবাদ। সম্পত্তির জন্য, পিতৃসম্পত্তির অংশের জন্য ভ্রাতায় ভ্রাতায় কি না হয়? ইসাইয়ের ধর্ম্মগ্রন্থ জান? আদমের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে হত্যা করিল কেন? তাহাদের কি সম্পত্তি ছিল? পিতা বর্ত্তমান, কলহের কোন কারণ ছিল না, কেন ভ্রাতৃহত্যা করিয়া কেইন ললাটে আততায়ীর চিহ্ন ধারণ করিল? সম্রাটের সম্পত্তির জন্য ভ্রাতা ভ্রাতাকে হত্যা করিবে ইহাতে বিচিত্র কি? এখন? এখন তুমি তখ্‌ৎ-তাউসে, তোমার মস্তকে অসংখ্য হীরকের প্রভাশালী বাদ্‌শাহী তাজ; আর আমার ছিন্ন মুণ্ড তখ্‌ৎ-তাউসের নীচে ধূলায়! দেখ, দেখ, কুস্তম, তখ্‌ৎ-তাউসের নীচে রক্তপ্রবাহ, রক্তে চারিদিক্‌ ভাসিয়া যাইতেছে, তোমার পদদ্বয় রক্তে ডুবিয়া গিয়াছে! কেবল রক্ত, রক্ত, রক্ত, রক্তে সব ডুবিয়া গেল।”

হাতিম চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওষ্ঠে ফেন, চক্ষে উন্মত্ততা। কুস্তম্‌ শিহরিয়া তখ্‌ৎ-তাউস ত্যাগ করিয়া নীচে দাঁড়াইলেন, দৃষ্টি তখ্‌ৎ-তাউসের নীচে। ক্ষণেক পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কুস্তম্‌ কহিলেন, “উহাকে আমার সম্মুখ হইতে লইয়া যাও, আমি উহাকে আর দেখিতে চাহি না।”

এই কথায় হাতিমের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

গৌরীশঙ্কর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলেন। এখন উঠিয়া হস্ত দ্বারা প্রহরীকে যাইতে নিষেধ করিলেন। কহিলেন, “সম্রাট্‌, ভ্রাতৃহত্যা অপরাধে অপরাধী হইবেন না।”

কুস্তম্‌ রাগিয়া উঠিলেন, “আমি অপরাধী? আমি অপরাধীর বিচার করিয়া শাস্তি দিতেছি।”

“আপনি বিচার করিবার কে?”

“আমি সম্রাট্‌, কোটি প্রজার জীবন মৃত্যু আমার কথায় নির্ভর করে।”

“প্রজার। কিন্তু ভ্রাতার নয়।”

“ভ্রাতাও আমার আজ্ঞার অধীন।”

“সম্রাট্‌, আদমের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ললাট-চিহ্ন আপনিও ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন?”

অঙ্গে আঘাত যেরূপ লাগে, কুস্তমের মনে এই কথা সেইরূপ বাজিল। কহিলেন, “আপনার বড় স্পর্দ্ধা!”

“আপনার আত্মবিস্মৃতি হইতেছে। এই সাম্রাজ্য আমি স্বহস্তে আপনাকে দিয়াছি। আমি ইচ্ছা করিলে শাহজাদা হাতিম আপনার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে রাজধানীতে প্রবেশ করিতেন। যিনি সম্রাটের সম্রাট্‌ আমি তাঁহাকেই জানি।”

কুস্তম্‌ এ কথার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

গৌরীশঙ্কর কহিতে লাগিলেন, “সম্রাট্‌, আপনার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে এখনও এক সপ্তাহও হয় নাই। ইহারই মধ্যে আপনি ভ্রাতৃহত্যা স্বরূপ মহাপাপ করিতে প্রস্তুত, ভ্রাতার শোণিতে আপনার হস্ত কলুষিত করিতে চাহিতেছেন? সম্রাট্‌ হইয়া ইহাই কি আপনার উপযুক্ত প্রথম কার্য্য? ভ্রাতার রক্তে সিংহাসন রঞ্জিত করিবেন? সম্রাট্‌ কুস্তম্‌, এ অবসর উদারতার, প্রতিহিংসার নহে। হাতিমকে আপনি মুক্তি দিলে তিনি আপনার কি ক্ষতি করিতে পারেন? আপনার সন্ধির প্রস্তাব যেরূপ ছিল সেইরূপ থাকুক। দাক্ষিণাত্য ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিন। উনি আপনার আজ্ঞাকারী প্রতিনিধি হইয়া দেশ শাসন করুন। আমার কথা বিশ্বাস করুন, শাহজাদা হাতিম হইতে আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না।”

অবনত মস্তকে সম্রাট্‌ কুস্তম্‌ কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। তাহার পর গৌরীশঙ্করের হাত ধরিয়া কহিলেন, “আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, যেরূপ আদেশ করিবেন সেইরূপ করিব।”

“শাহজাদাকে মুক্ত করিয়া নগরে ঘোষণা করুন যে আপনার প্রতিনিধি হইয়া তিনি দাক্ষিণাত্য শাসন করিবেন। তাহা হইলে আপনার সিংহাসন তখ্‌ৎ-তাউসে নহে, প্রজার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবে। আপনার মঙ্গল হউক!”

সম্রাট্‌ কুস্তম ভ্রাতার নিকটে গিয়া তাঁহার দুই হস্ত ধারণ করিলেন। গদ্গদ স্বরে কহিলেন, “ভাই, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর!”

হাতিম কুস্তমকে আলিঙ্গন করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

তখ্‌ৎ-তাউসের রত্নরাশির জ্যোতি যেন ম্লান হইয়া গেল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দুর্ভিক্ষে রুশিয়ার নিজের চেষ্টা

রুশিয়ার সাধারণতন্ত্রের পনেরোটি প্রদেশ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের করাল কবলে নিষ্পেষিত হইয়াছে। এই প্রদেশগুলির অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। জগতের যে-সকল দেশ হইতে দুর্ভিক্ষের স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কাছে এ সংবাদটার হয়ত কোন বিশেষ অর্থই নাই। কেবল একটি দেশ এখনও এই সংবাদ শুনিলে মানসচক্ষে দুর্ভিক্ষ ও মারীপীড়িত দেশের ভয়াবহ অবস্থা দেখিতে পাইবে। সে রুশিয়ার দক্ষিণদিকের প্রতিবেশী ভারতবর্ষ! তাহার ধানের ক্ষেতে শস্যের অভাব নাই, কিন্তু বৈদেশিক আমলাতন্ত্রের অনুগ্রহে প্রতি বৎসরেই ক্ষুধার কঙ্কালসার মূর্ত্তি তাহার দ্বারে অতিথি হয়।

রুশিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর প্রদেশ ভল্গা ও উক্রেন, এই দুটিকে অনেকে ইউরোপের শস্যভাণ্ডার বলিয়া থাকেন। সাত-বৎসর-ব্যাপী যুদ্ধ ও বিপ্লবের ফলেই এখানে দুর্ভিক্ষের সূচনা হইয়াছিল, তাহার উপর গ্রীষ্মকালে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হওয়াতেই এই শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। দেশের উপর দিয়া যতগুলি সৈন্যদল গিয়াছে প্রত্যেকেই অধিবাসীদের নিকট হইতে কিছু না কিছু আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে, কারণ এই প্রদেশগুলি সমৃদ্ধ বলিয়া খ্যাত। যুদ্ধের ক্ষুধা মিটাইতে গিয়া ইহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, শস্য গোরু ঘোড়া প্রভৃতি কিছুই বাকি নাই। জার্ম্মান সৈন্য, শ্বেত প্রহরী (White Guard) এবং লালফৌজ (Red Army) নামক রাজতন্ত্রী ও বিপ্লববাদী সেনাদল ক্রমাগতই দেশের উপর দিয়া ঝড়ের মতন বহিয়া গিয়াছে, ছোট ছোট সহরগুলি সেই অবিশ্রাম যুদ্ধের দিনে কেবলই একদলের হাত হইতে আর-এক-দলের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া আবার নানা শ্রেণীর ডাকাতের দলের উপদ্রব আছে। তবুও সতর্ক কৃষকের দল বিপ্লবের দিকে দলাদলির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, বিপ্লবের কল্যাণে তাহারা যে জমি পাইয়াছে তাহাই আঁকড়াইয়া পড়িয়া ছিল, এবং পক্ষের উপায়, মাটির তলার কুঠরীতে বীজ জমাইয়া রাখিতেছিল। পরের বৎসর ভাল ফসল পাইবার তাহাদের আশা। এই উর্ব্বর মাটির দেশে এক বৎসর ভাল ফসল পাইলেই ত দুর্ভিক্ষের ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার পরেই আসিল অনাবৃষ্টি। শস্য-সকল শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল, এমনই প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ। সারাটোফের উত্তাপ হইল কাইরোর সমান। ধৈর্য্যশীল অবিচলিত-স্বভাব রুশ কৃষকের দল দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল চোখের সম্মুখে কেমন করিয়া তাহাদের সারা বৎসরের খাইবার সংস্থান, পরের বৎসরের চাষ করিবার বীজ, সবই বিনষ্ট হইয়া গেল। গোলাবাড়ীগুলি শূন্য খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। সম্মুখে দীর্ঘ শীতকাল তাহার অবিরাম তুষারপাত লইয়া দাঁড়াইয়া। ইহার সহিত যদি দুর্ভিক্ষ আসে তাহা হইলে মৃত্যু ভিন্ন উপায় নাই। "দুর্ভিক্ষ আসিতেছে" কথাটা ক্রমে ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে, প্রদেশে প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল। যে দেশ পূর্ব্বে অর্দ্ধেক ইউরোপকে এবং সমস্ত রুশিয়াকে রুটি জোগাইয়াছে, যুদ্ধ ও রাষ্ট্রবিপ্লব তাহার আর কণামাত্রও সম্বল রাখে নাই। জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর একই-ভাবে কাটিয়া গেল, বৃষ্টির নাম নাই, রৌদ্রের তেজ ভীষণ, মাঠ-সকল শূন্য, কৃষিকার্য্যের কোন চিহ্নই নাই। জুন মাসে যে দুর্ভিক্ষকে কল্পনা করিয়া লোকে শিহরিয়া উঠিতেছিল, সেপ্টেম্বর মাসে তাহাই ভয়াবহ সত্য হইয়া দাঁড়াইল। সাহায্যের জন্য রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে এবং সেখান হইতে বাহিরের জগতে সংবাদ পাঠানো হইল। কিন্তু সাহায্য আসিয়া পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই ভীত গ্রামবাসীরা সকল দেশ ছাড়িয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মস্কো, তুর্কিস্থান, ককেশাস্, সাইবিরিয়া, যেখানেই যাহার কোন আত্মীয় বন্ধু বা পরিচিত লোক ছিল সে সেখানেই পলায়ন করিল। হাজার মাইল দূরেও যদি খাদ্য পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিল ক্ষুধার্ত্তের দল সেই দিকে চলিল। হেমন্তকাল আসিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পলাতকের দল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল।

রাশিয়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত বালকবালিকাদিগের আশ্রয়স্থান

সহরে অস্বাভাবিক মূল্যে তখনও আহার্য্য বিক্রয় হইতেছিল, গ্রাম ছাড়িয়া দলে দলে লোক সহরে গিয়া জুটিতে লাগিল। প্রতি রাজপথে একই দৃশ্য দেখা যাইতে লাগিল। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ শিশু আপনাদের স্বল্লাবশেষ সম্পত্তি বহন করিয়া চলিয়াছে, কোথায় যে যাইতেছে, তাহা নিজেরাই অনেক সময় জানে না। ভারী ভারী গাড়ী তাহারা আপনারাই কোনও প্রকারে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, গাড়ীর ঘোড়া অনেক আগেই মরিয়াছে, না হয় তাহাদের মারিয়া খাইয়া ফেলা হইয়াছে। প্রতি রেলওয়ে-ষ্টেশনে মহা ভীড়; গৃহস্থ পরিবার, পরিত্যক্ত শিশু, অসহায় রোগা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল ষ্টেশনের চারিদিকের মাঠে পথে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া আড্ডা গাড়িয়া অসীম-ধৈর্য্য-সহকারে শুভক্ষণের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। কখন্ ট্রেনে তাহাদের জন্য স্থান হইবে আর তাহারা আপনাদের বাঞ্ছিত কোন কল্পলোকে, কোন সমৃদ্ধির দেশে গিয়া উপস্থিত হইবে। ইহাদের দুরবস্থা বর্ণনা করা ভাষার সাধ্য নয়। তাহাদের যাহা-কিছু ছিল, সবই অনিশ্চিত ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা ফেলিয়া পলায়ন করিতেছিল। এক সের কাল ময়দার পরিবর্ত্তে আসবাব-সহিত একখানা বাড়ী তাহারা স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া দিতেছিল। গরু ঘোড়া তাহাদের যে-কয়টা ছিল, অনেক দিন পূর্ব্বেই সেগুলিকে খাইয়া শেষ করিয়াছে। এখন তাহাদের খাদ্য আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা, ঘাস, গাছের বাকলগুঁড়ার রুটি অথবা তাহারই ঝোল। বৃদ্ধ এবং পীড়িতের দল সর্ব্বাগ্রে মরিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর শিশুর দল। তাহাদের মাতারা সন্তানের যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিতে না পারিয়া উহাদের ফেলিয়া পলাইতে লাগিল। যাহারা একান্ত শিশু, তাহারা অবিলম্বে মারা পড়িল। অল্প একটু বড় যাহারা, তাহারা পরস্পরকে জড়াইয়া ফিরিতে লাগিল, আবর্জ্জনাস্তূপ হইতে পচা মাছমাংসের টুক্‌রা খুঁজিয়া তাহাই ভাগ করিয়া খাইতে লাগিল এবং শেষে

পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। গ্রামে, পথে, রেলওয়ে-ষ্টেশনে প্রতিদিন পাঁচ ছয় শত করিয়া মানুষ মরিতে লাগিল। যাহারা বাঁচিয়া রহিল তাহারা আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কেবলই চলিতে লাগিল। পথে অনেকে মারা গেল, তবু হাজার হাজার লোক বড় বড় সহরগুলিতে, মস্কোতে, পেট্রোগ্রাডে এবং পূর্ব্বদিকে সাইবিরিয়া ও তুর্কিস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

নিজে কি করিতেছে তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। মানুষের হাতে যতপ্রকার সর্ব্বনাশের অস্ত্র আছে, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রবিপ্লব সকলকে জয় করিয়া এখন এই আশ্চর্য্য জাতি প্রকৃতির এই ভয়ানক বিপ্লবকে পরাজিত করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। রুশিয়ার 'কম্যুনিষ্ট' দল যুদ্ধের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া আপনাদের সমগ্র দলবদ্ধ শক্তি লইয়া যখন পুনর্গঠনের কাজে লাগিলেন, ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণদেশ হইতে বজ্রাঘাতের মত এই সংবাদটি তাঁহাদের

রুশিয়ার ভলগানদীতীরবাসী দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারী

রুশ কৃষকেরা যখন বাঁচিবার জন্য এইরূপ সংগ্রাম করিতেছে, তখন বাহির হইতে তাহাদের সাহায্যের আয়োজন চলিতে লাগিল, এবং সাহায্য আসিয়াও পৌঁছিল। সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ স্থানগুলিতে সর্ব্বাগ্রে সাহায্যদান করা হইতে লাগিল। কিন্তু বিদেশীরা রুশিয়ার জন্য কি করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। সে বিষয়ে অনেক কথাই নানা দেশে নানা ভাষায় লেখা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষপীড়িত রুশিয়ার জন্য রুশ

কাছে আসিয়া পৌঁছিল: পনেরোটি প্রদেশে অন্নাভাব, রুশিয়ার অন্নভাণ্ডারকে এই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী আক্রমণ করিয়াছে, সুতরাং শীতকালের ছয়মাস কাটিতে কাটিতে সমগ্র রুশিয়াতেই দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া পড়িবে। আর শীতকালে শস্য-বপনের সময়ে যদি বাহির হইতে বীজ সংগ্রহ না করা যায় তাহা হইলে আগামী বৎসরেও দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা। গত তিন বৎসর ধরিয়া ক্রমাগতই ত রুশিয়া অনাহারে কাটাইয়াছে। দেশে যতখানি খাদ্য ছিল সব সোভিয়েট

রুশিয়ার অসভায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগকে খাদ্যদান

গভর্মেণ্ট্‌ নিজ হাতে গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের ভিতর তাহাদের যোগ্যতা অনুসারে ভাগ করিয়া দিতেন। এই যোগ্যতার শ্রেণী-বিভাগ ছিল সাতটি। প্রথম চারিটি দলে ছিল—দেশের শিশুরা, পীড়িত ব্যক্তিরা, 'রেড' সৈন্যদল এবং শ্রমজীবীর দল,—ইহারাই গণতন্ত্রী রুশিয়ার প্রাণ-স্বরূপ। সর্ব্বশেষে ছিল অকর্ম্মণ্য, পরাসক্ত ভদ্রলোকের দল, ইহারা কাজ করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। ইহাদের সপ্তাহে এক জনকে একটি হেরিং মাছের বেশী খাদ্য দেওয়া হইত না। কিন্তু খাদ্যসংগ্রহ এবং বিতরণকার্য্যে অসাধারণ দক্ষতা দেখান সত্ত্বেও, জনসাধারণের প্রয়োজনানুসারে খাদ্য বিতরণের দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা সত্ত্বেও এবং অনাহারে অর্দ্ধাহারে আশ্চর্য্য রকম পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বপ্রকার বাধা বিপত্তি পার হওয়া সত্ত্বেও, প্রতি বৎসরের দীর্ঘ শীত কালের শেষে দেশে খাদ্যাভাব ঘটিতে লাগিল। দুর্ব্বল শরীরের মানুষ এই বিপ্লবের দিনের অসাধারণ কষ্ট, খাদ্যাভাব এবং শীতের প্রকোপ সহিতে না পারিয়া দলে দলে মরিতে লাগিল। গত সাত বৎসরে যুদ্ধে রুশিয়ার যত লোক প্রাণ দিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক মরিল ইউরোপ রুশিয়ায় খাদ্য আনয়নের সকল দ্বার রোধ করাতে এবং সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার গৃহবিপ্লবের আগুনে আহুতি দেওয়াতে। দেশে যখন খাদ্যের বা শক্তির কোনও প্রকার সঞ্চয় নাই, বিদেশী শত্রুর সহিত তিন-বৎসর-ব্যাপী যুদ্ধের জন্য পুনর্গঠনের সকল কাজ বন্ধ, সে সময়ে দুর্ভিক্ষের সাক্ষাৎ পাইলে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী গভর্মেণ্টও ভয় পাইয়া যাইত। কিন্তু রুশিয়ার 'কম্যুনিষ্ট' দল ত কেবল মাত্র গভর্মেণ্ট্‌ নয়। ইহা বিশ্বাসের বলে বলী যোদ্ধার দল। ক্রুসেডের সময়কার নাইট্‌দের অপেক্ষাও ইহাদের আপনাদের বিশ্বাসের প্রতি অনুরাগ ও নিষ্ঠা প্রবলতর; তাহাদের অবস্থাতে আশা করিবার মত কিছু ছিল না; কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে, যুডেনিচ্‌ ও কোল্‌চাকের সৈন্যদল যখন বিপ্লববাদীদের শেষ আশ্রয় মস্কো এবং পেট্রোগ্রাড অবরোধ করিল তখনই বা আশা করিবার কি ছিল?

অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া প্রাণপণ প্রয়াসে তাহাদের হটাইয়া দিল, রুশিয়াকে পুনর্ব্বার উদ্ধার করা হইল এবং 'রেড' সৈন্যদলকে ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধৃদলের পদ প্রদান করিল। মিত্রশক্তিবর্গ যখন রুশিয়া অবরোধ করিয়া খাদ্য আনয়নের সকল পথ বন্ধ করিয়া দিলেন, আহার্য্য-ও ঔষধ-অভাবে মানুষ যখন কীট-পতঙ্গের মত দলে দলে মরিতে লাগিল, তখনও ত ভবিষ্যৎ নিরাশার কুয়াসায় আচ্ছন্নই ছিল। ব্রেষ্ট্ লিটভস্কে যখন ট্রট্স্কি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বাধ্য হইয়া জর্ম্মানীর সহিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তখনও আশা করিবার কিছু ছিল না। কিন্তু চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত রুশিয়ার একদিকে অন্ততঃ শান্তির প্রয়োজন ছিল, যে-কোনও মূল্যে হউক তাহাকে উহা ক্রয় করিতে হইল। ধনিক-জগৎ যখন প্রথম সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্বেষে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং ব্যবসা বাণিজ্য রুশিয়ার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন ঐ বিদ্বেষকে পরাজয় করিবার কোন আশা রুশিয়ার ছিল না। কিন্তু 'কম্যুনিষ্ট' দলের বীরপুরুষেরা কখনও পৃথিবীতে অসম্ভব কিছু আছে তাহা স্বীকার করেন নাই, নিরাশার কাছেও কোনও দিন অবনতমস্তক হন নাই। তাঁহারা যে শক্তির বলে সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন, এবং বিদেশী শত্রু দ্বারের কাছে দেখিয়াও একমাত্র অদ্ভুত পরিশ্রমের ফলে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই শক্তিই তাঁহাদের দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে সাহস দিল। তাঁহারা বাহিরের জগতের কাছে সাহায্যের আবেদন পাঠাইলেন, তাহার পর নূতন সাধারণতন্ত্রের সামান্য সম্বলের সাহায্যেই তিন কোটি ক্ষুধার্ত্ত মানুষকে খাদ্য জোগাইবার সমস্যার মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইলেন।

রুশিয়ার সম্রাটের অধীনে রুশিয়া বিদেশীর কাছে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাকে আপনার ঋণ বলিয়া যদি সাধারণতন্ত্র স্বীকার করে তাহা হইলে সেই সর্ত্তে তাহাকে সাহায্য করা যায় কি না, এই লইয়া মিত্রশক্তিবর্গ পরস্পরের সহিত তর্ক আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে রুশিয়ার সাধারণতন্ত্র তাহার সকল শক্তি পুঞ্জীভূত করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশগুলি হইতে সুশৃঙ্খলে কর্ম্মক্ষম লোকদের সরাইয়া আনা হইতে লাগিল এবং পথের মধ্যে মধ্যে এই-সকল আশ্রয়হীন লোকদিগের থাকিবার স্থান দিবার ব্যবস্থা করা হইল। প্রত্যেক প্রদেশ, নগর বা জেলার 'কম্যুনিষ্ট' দল এই দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবার কার্য্যে কেন্দ্রস্বরূপ হইলেন। খাদ্যসামগ্রী আহরণ করা ও বিতরণ করার কাজ চলিতে লাগিল। কোন্ স্থানে কি প্রকার সাহায্য প্রয়োজন তাহার বিবরণ মস্কোতে প্রেরিত হইতে লাগিল। দেশের অবস্থা অনুসারে যাতায়াতের ব্যবস্থা এমন ভাবে করা হইল যাহাতে শিশু পীড়িত ও বৃদ্ধের দল জনাকীর্ণ স্থানগুলি হইতে সহজে বড় বড় সহরের সাহায্য-কেন্দ্রগুলিতে যাইতে পারে। বিভিন্ন সাহায্যের কেন্দ্রগুলিতে যাহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে খাদ্য, চিকিৎসক, ঔষধ প্রভৃতি পৌঁছিতে পারে সেজন্য কতকগুলি অতিরিক্ত 'স্পেশাল' ট্রেন দেওয়া হইল। কিন্তু দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে এই অভিযানকারীদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি এই যে—তাঁহারা আগামী বৎসরে যাহাতে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য প্রচুর শস্যের বীজ আনাইয়া ক্ষেত্রগুলিতে বপন করাইলেন। কৃষ-কৃষকেরা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করাটা স্বভাবসিদ্ধ, ফসল পাকিবার সময় অবধি বাঁচিয়া থাকিবার আশা না থাকিলেও তাহারা প্রত্যেকটি বীজ পরম যত্নে বপন করে। সেপ্টেম্বর মাস হইতে না হইতে সকল সাহায্য-কেন্দ্রগুলিতেই পূর্ণ উদ্যমে কাজ আরম্ভ হইয়া গেল।

'কম্যুনিষ্ট' দলের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব এই যে ঘোর বিপদের মাঝেও তাহারা আশ্চর্য্য ক্ষমতা বলে জনসাধারণকে একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে। সঙ্কটকালে দলবদ্ধভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা তাহাদের অদ্ভুত। এই দলের অধিনায়কত্বে এখন গভর্মেণ্ট্ অফিস, 'রেড' সৈন্যদল হইতে আরম্ভ করিয়া রুশিয়ার সকলপ্রকার প্রতিষ্ঠানই প্রধানতঃ এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের কাজই করিতেছে। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের ভিতরেই একটি করিয়া দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় কমিটি আছে, তাহারা 'কম্যুনিষ্ট' দলের নির্দ্দেশমত কাজ করে।

জনসাধারণের সকল শ্রেণীতে তাহারা সাহায্য বিতরণ করে। বড় বড় সহরগুলিতে সাহায্যদানের কাজ চির-প্রচলিত নিয়মমতই হয়। খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি ভিক্ষা করা হয়, সেলাইয়ের কেন্দ্র স্থাপন করা হয়, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া তাহার টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুর্ভিক্ষপীড়িতদের দান করা হয়। প্রত্যেক উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির মাসিক আয় হইতে শতকরা দশ টাকা হিসাবে কাটিয়া লওয়া হয়, প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট খাদ্যের অংশ হইতেও অংশ-বিশেষ গ্রহণ করিয়া সাহায্য-কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। অক্টোবরের একটি সপ্তাহের নাম দেওয়া হইয়াছিল, সাহায্য-সপ্তাহ। এই সপ্তাহে অনাহারক্লিষ্টের সাহায্যার্থে দেশের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা হয়। এই সপ্তাহে উৎপন্ন সমস্ত খাদ্যদ্রব্য দুর্ভিক্ষপীড়িতদের দান করা হইয়াছিল। শ্রমজীবীরা আপনাদের শ্রম দান করিল, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট্ খাদ্য প্রস্তুত করিবার সামগ্রী দিলেন, শত শত, সহস্র সহস্র স্থানে আমোদ-প্রমোদের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ চলিতে লাগিল। রুশিয়ার শক্তি ও ক্ষমতার কাছে অতিরিক্তরকম দাবী করিলেই অধিকতম সাড়া পাওয়া যায়। সাহায্য-সপ্তাহ ইহার একটি উদাহরণ মাত্র। আর-একটি অনুষ্ঠানের কথা শোনা যায়, সেটি বিশেষভাবে রুশীয়। সেটিকে তাহারা সাবোট্নিক্স্ এবং ভোস্ক্রেস্নিক্স্ বলিয়া থাকে। সারা সপ্তাহ ধরিয়া কাজ করার পর ছুটির দিন দুইটিতে দেশকে সাহায্য করার জন্য কয়েক ঘণ্টা খাটাই এই ব্যাপারটির উদ্দেশ্য। সাধারণতন্ত্রের ঘোরতর দুঃসময়ের দিনে এই প্রথাটিকে আহার্য্য উৎপন্ন করার জন্য খুব কাজে লাগানো হইয়াছিল এবং সম্প্রতি দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে আবার এটি দেখা যাইতেছে। কেবল শনি-রবিবারে ছুটির দিনে নয়, কাজের দিনেও অনেকে নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টার অনেক বেশী পরিশ্রম করিয়া দেশের উপকার করিতেছেন। শ্রমজীবী সমবায়ের ভিতর দিয়া এই কর্ম্মীদল কি ভাবে কাজ করিতেছেন, তাহা জানিবার বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ রেলওয়ের কর্ম্মীদের কথা বলা যায়। ইহারা ছুটির দিনে এবং কাজের দিনেও বেশী ঘণ্টা খাটিয়া ইঞ্জিন্ এবং গাড়ী মেরামত করিয়াছেন। এই গাড়ীগুলিতে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের এক স্থান হইতে আর-এক স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। মিভপেটোরিয়ার ছাপাখানার লোকেরা নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টার অধিক কাজ করিয়া দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেছেন। কোন একটি জেলার খনির শ্রমজীবীরা ছুটির দিনে কাজ করিয়া অনাহারক্লিষ্টের সাহায্যার্থে ১৪,৫০০ পুড্ কয়লা দিয়াছেন। বক্রুয়িস্কের শ্রমজীবী সমবায়গুলি জেলার সকল কারখানার জন্য একটি দিন স্থির করিয়াছিলেন, ঐ দিনের সকল শ্রমজীবীর পরিশ্রমের ফল দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে দান করা হয়। চিকিৎসক-সমবায় হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশগুলিতে চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণী প্রেরণ করা হয়। শিক্ষক-সমবায় শিশুদের ভিতর কাজ করিবার ভার গ্রহণ করেন। পেট্রোগ্রাডে অভিনেতা ও বায়স্কোপের কর্ম্মীরদল তাঁহাদের এক দিনের লাভ সমস্তই দান করেন। নিখিল-রুশীয় শিল্পীর দল এই নিয়ম করেন যে তাঁহাদের প্রত্যেক সভ্যকেই মাসের মধ্যে অন্ততঃ একদিন দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থে কৃত কোন আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতে হইবে। ভিটিব্স্কের কৃষি-সমবায় ভল্গা প্রদেশের ৫০০০ শিশুর ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য একটি নগরের শ্রমিক-সঙ্ঘও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশের কতকগুলি শিশুর ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ উদাহরণ আরো শত শত দেওয়া যাইতে পারে। রুশিয়ার লোকের স্বার্থত্যাগের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে হইলে রুশিয়ার সমসাময়িক ইতিহাসের কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। দেশে চার বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ চলিয়াছে। রুশিয়ার জনসাধারণকে এই ভীষণ শীতপ্রধান দেশে অবিশ্রাম অন্নবস্ত্রের ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও রুশিয়ার বিপ্লববাদীর দল নিরুৎসাহ হন নাই, জাতীয় জীবনের এই নূতন বিপদের সঙ্গে যুঝিবার শক্তি এখনও তাঁহাদের অবশিষ্ট আছে।

শ্রমিক-সমবায়ের মত রেড্ সৈন্যদলও এই অর্থ-সমস্যার যুদ্ধে দলবদ্ধভাবে কাজ করিতেছেন। যুদ্ধ-সভা আপনাদের ভিতর একটি দুর্ভিক্ষে সাহায্যদান-কমিটি স্থাপন করিয়াছেন। প্রধান কমিটির অধীনে অনেক ছোট ছোট কমিটি আছে। অশ্বারোহী সৈন্যদলকে খাদ্য সংগ্রহের অভিযানে প্রেরণ করা হয়। সংগৃহীত আহার্য্য

তখন সমস্ত কর্ম্মীদের হস্তে দেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষের প্রথম দুই মাসের ভিতর এই অশ্বারোহীর দল এবং রেড্ নৌ-সেনার দল যে পরিমাণে খাদ্য ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা ভাবিলে বাস্তবিক আশ্চর্য্য হইতে হয়। একটি সেনাবিভাগ আপনাদের রসদ হইতে বাঁচাইয়া খাদ্য প্রেরণ করিয়াছিল। আর-একটি দল আপনাদের ভিতর হইতে সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত দলস্থ সেনাদের যত সোনার ঘড়ী, আংটি, সৌখীন দস্তানা, জুতা প্রভৃতি ছিল সব পাঠাইয়া দেয়। শ্রমিক-সঙ্ঘ যেমন সাহায্য-ভাণ্ডারে একদিনের পরিশ্রম দান করেন, তেমনি প্রত্যেক সেনাবিভাগ মাসের ভিতর আপনাদিগের একদিনের খাদ্য দান করেন। মস্কোর অশ্বারোহী সৈন্যদের যে স্কুল আছে, তাহার ছাত্রগণ মাসে তিন দিন আপনাদের রুটি ও চিনি দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বিশেষ কোনো সৈন্য-দলের অনাথশিশুদের জন্য আশ্রম স্থাপন করাও দৈনিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ অনাথ শিশুগুলির সকল ভার তাহারাই গ্রহণ করে। সেনা-বিভাগের ধোবা নাপিতের দল জনসাধারণের কাজ করিয়া দেয়; এই উপায়ে যে টাকা পায়, তাহা দুর্ভিক্ষে দান করে।

যে-সকল গ্রামে দুর্ভিক্ষ হয় নাই, সেখানকার কৃষকরাও এই সাহায্য করিবার অনুপ্রাণনা লাভ করিয়াছে। গরুবাছুর ও খাদ্য দানই তাহাদের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু প্রেস্‌ভিয়েটের জাতীয় সঙ্ঘ যেমন নিয়ম করিয়াছিলেন যে সঙ্ঘের অন্তভুক্ত প্রত্যেক পরিবার এক-একটি করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত শিশু পালন করিবেন, এ প্রকার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। অরেলের কৃষকেরা স্থির করিল যে গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে খাদ্যের কর রূপে তাহারা যে শস্য দেয়, তাহাতে প্রতি চল্লিশ পাউণ্ডে এক পাউণ্ড করিয়া বেশী দিবে। অন্য এক গ্রামের কৃষকেরা ৬০০ পুড্ রাই দান করিল এবং তাহা ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবার ভারও নিজেরাই গ্রহণ করিল। খিরগিজ্‌দের নিকট হইতে অনেকগুলি ভেড়া গরু প্রভৃতি পাওয়া গেল। অল্টাইয়ের এক কৃষক-সভাতে, সভ্যগণ প্রস্তাব করিলেন যে দুর্ভিক্ষের সহায্যার্থে সর্ব্বস্ব দান করা হউক। ঐ প্রস্তাবটি উত্থাপন করার পূর্ব্বে সভাপতি এই মন্তব্য করেন—"আমরা কোল্‌চাকের উপর জয়লাভ করিয়াছিলাম, ক্ষুধার উপরেও জয়ী হইব।"

কিন্তু শিশুদের সাহায্য করিবার চেষ্টাই রুশ সাধারণতন্ত্র সর্ব্বাগ্রে করিতেছেন। ইহাদের দুর্গতির কথাই সর্ব্বাগ্রে প্রধান সাহায্য-কেন্দ্রগুলিতে আসিয়া পৌঁছায়। শিশুদিগের দুঃখ সহিতে না পারিয়া তাহাদের লইয়া পিতামাতারা ডুবিয়া মরিতে লাগিল। সন্তান বধ করিয়া তাহাদের যাতনার অবসান ঘটাইয়াছে, এমন পিতামাতাও দেখা গেল। মাঠে ঘাটে বনে ঘাস-পাতা খাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এমন শিশু দলে দলে দেখা যাইতে লাগিল। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর যে-সকল অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অতি দ্রুতবেগে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। পুরাতনগুলিতে স্থান সঙ্কুলান হইল না বলিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র কতকগুলি নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু তাহাও যথেষ্ট হইল না। এক প্রদেশে ২,১৮,০০০ ক্ষুধার্ত্ত শিশুর ভিতর মাত্র ২২০০০কে আশ্রয় দিতে পারা গেল। আর-এক প্রদেশে তিন মাসের ভিতর অনাথ-শিশুর সংখ্যা হইল ২,৮০,০০০। এইরূপ অবস্থায় কঠোর নিয়ম অবলম্বন করা ভিন্ন গতি রহিল না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের দেশ হইতে স্থানান্তরিত করাই স্থির হইল। খিরগিজ্ হইতে তুর্কিস্থানে ত্রিশ হাজার শিশু প্রথমে চালান করা হইল। এক হাজার মস্কোতে পাঠানো হইল। তবুও ভল্‌গা প্রদেশে ক্ষুধাপীড়িত ১,৪০,০০০ শিশু এবং ২০,০০০ অনাথ শিশু অবশিষ্ট রহিল। পেট্রো-গ্রাডে অনাথ-আশ্রমবাসী শিশু ভিন্নও ৮৫০০ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত শিশু আশ্রয়লাভ করিল। তাহাদের সর্ব্ব-প্রকার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য কমিটি গঠিত হইল। ক্ষুধাপীড়িত শিশুগুলি দুর্ভিক্ষের স্থল হইতে আসার পর তাহাদিগকে কিছুকাল বিচক্ষণ চিকিৎসকের অধীনে রাখার পর বিভিন্ন আশ্রমগুলিতে প্রেরণ করা হইতে লাগিল। তাতার প্রভৃতি স্থান হইতে যে-সকল শিশু আসিতে লাগিল, তাহারা রুশ ভাষা না জানাতে তাহা-দিগকে লইয়া বড়ই অসুবিধা ঘটিতে লাগিল।

দুর্ভিক্ষের কেন্দ্রে পাঁচখানি ট্রেন বোঝাইকরা খাদ্য

ঔষধাদি প্রেরিত হইল। যে-সকল মাতার দুগ্ধপোষ্য শিশু আছে তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে খাদ্য দান করা হইল। তার পর অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক শিশুদের দেওয়া হইল। অতঃপর অন্যান্য স্থানে সাহায্য বিতরণ করা হইল। ট্রেন হইতেই অনেক সময় খাদ্য বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ছোট ছেলেদের ঝোল, চিনি-মিশ্রিত কোকো, রুটি প্রভৃতি দেওয়া হয়। ট্রেনে যে চিকিৎসালয় আছে তাহাতে রুগ্ন শিশুদের চিকিৎসা করা হয়। এই ট্রেনগুলি গড়ে প্রতিমাসে ১,০০,০০০ অসহায় শিশুকে সাহায্য করে।

প্রাদেশিক মিউনিসিপাল দুর্ভিক্ষ সমিতিগুলি অসহায় শিশুদিগকে একত্রিত করিয়া যতগুলিকে সম্ভব নিজেরা আশ্রয় দেন, বাকীদের অন্যত্র প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্র তাহাদের ভার গ্রহণ করে। গরম কাপড় এবং দিনে অন্ততঃ একবার খাইতে তাহারা পায়। এই কাজের জন্য সমস্ত দেশ যথাসাধ্য দান করে। প্রত্যেক নগরে গ্রামে চাঁদা তুলিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হয়। এক সহরে কর্তৃপক্ষগণ সকল-প্রকার আহার্য্যদ্রব্যের উপর কর বসান। এই টাকা দুর্ভিক্ষে দান করা হয়। বিখ্যাত রুশ লেখক ম্যাক্‌সিম্ গোর্কি প্রত্যেক দুর্ভিক্ষ-সেবক-সমিতির নিকট এই আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন—"জগতে এবং বিশেষ করিয়া রুশিয়ায় যত বালকবালিকা আছে, সকলে অনাহার-ক্লিষ্ট শিশুদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হোক। অসংখ্য ক্ষুধার্ত্ত শিশু সাহায্যের জন্য চাহিয়া আছে। আপনাদের পীড়িত অসহায় বন্ধুদিগের আর্ত্তনাদে আজ জগতের সকল শিশু কর্ণপাত করুক। প্রত্যেক বালকবালিকার যথাসাধ্য করা কর্ত্তব্য। শুধু খাদ্য নয়, রুশ শিশুর আজ সকল জিনিষেরই অভাব। স্কুলের বালিকারা তাহাদের শিক্ষয়িত্রীদের পরিচালনায় এই-সকল বস্ত্রহীনদের জন্য সার্ট্ সেলাই করিতে পারে। যে-সকল স্কুলে হাতের কাজ করিবার ব্যবস্থা আছে, সেখানে এই-সকল বিপন্ন শিশুদের জন্য অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে। একলক্ষ শিশু প্রত্যেকে যদি একটি করিয়াও জিনিষ তৈয়ারী করিয়া দেয় তাহা হইলে অসম্ভব সম্ভব হয়। কে এ কাজের ভার লইবে? বালকবালিকাগণ আপনা হইতে কিছু আরম্ভ করিতে পারে না। তাহাদের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কর্ত্তব্য এই ব্যাপারটি গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করা।"

এই আবেদনের ফলেই যেন রুশিয়ার সর্ব্ব প্রদেশে শিশুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাহায্যসমিতির আবির্ভাব হইতেছে। অপেক্ষাকৃত প্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকার ত কথাই নাই, নিতান্ত শিশুরাও এ কাজে মহা-উৎসাহে যোগ দিতেছে।

এই মহাবিপ্লবের দেশে বাস করিলে, ইঁহাদের বিপদ্‌কে পরাজয় করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিলে, অবাক্ না হইয়া পারা যায় না। জনসাধারণের সকল শ্রেণীকে কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার এই দেশের আশ্চর্য্য শক্তি। পরস্পরকে দেখিয়া এই যে অনুপ্রাণনা লাভ করিবার ক্ষমতা ইহাই রুশ-বিপ্লবের মেরুদণ্ড। ইহারই বলে আজ তাহারা জগতে টিকিয়া আছে।

শ্রী শান্তি দেবী

মেঘলা সকাল

মেঘলা সকাল, সূর্য্য হারা, রোদটা শাদা ধোঁয়া,
দিনটা যেন ক্লান্ত আঁখি—ঘুমের-পরশ-ছোঁয়া;
পাশের বাড়ী শান্ত নীরব, নেইক কলকথা,
একটি চিলের করুণ ধ্বনি ভাঙিছে স্তব্ধতা;

একটি চড়ুই আস্তে ডাকে, কল থেকে জল ঝরে,
ফেরিওলার গলার আওয়াজ বাজের মত পড়ে!
ঘরে আছি চুপ্‌টি শুয়ে, বাইরে আঁখি ধায়,
শামুকেরি মতন মোরে গুটাই আপনায়।

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

রাজপথ

[২]

মুক্তারাম-বাবুর ষ্ট্রীটে একটি গৃহদ্বারে মোটর স্থির হইয়া দাঁড়াইলে সুরেশ্বর ঔৎসুক্যের সহিত বিমানকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে দাঁড়াল যে? আপনাদের বাড়ী বেচু-চ্যাটার্জ্জীর ষ্ট্রীটে বললেন না?"

বিমান কহিল, "আমার বাড়ী বেচু-চ্যাটার্জ্জীর ষ্ট্রীটে; এ হচ্ছে আমার দাদার শ্বশুর-বাড়ী। আজকের ঘটনার পর আপনি আমাদের চিরদিনের জন্য বন্ধু হলেন, অথচ এ পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে পরিচয় হ'ল না, এ বড় অন্যায় কথা।" বলিয়া পশ্চাতের আসনে উপবিষ্টা সুরমা সুমিত্রা ও বিমলার প্রতি ফিরিয়া কহিল, "ইনি হচ্ছেন আমার বউদিদি, আর এ দুজন হচ্ছেন বউদিদির দুই বোন, সুমিত্রা আর বিমলা।"

সুরেশ্বর পশ্চাতে ফিরিয়া যুক্তকরে সকলকে নমস্কার করিয়া তথা হইতেই বিদায় প্রার্থনা করিল।

সুরমা বিমানকে সম্বোধন করিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিল, "না না ঠাকুরপো, এখান থেকেই ওঁকে ছাড়া হবে না, একটু বসে' চা খেয়ে বাবার সঙ্গে আলাপ করে' তার পর যাবেন।"

মোটরে উঠিয়াই সুমিত্রার মন হইতে লঘু মেঘের মত ক্ষনস্থায়ী ক্ষোভটুকু অপগত হইয়া গিয়াছিল, কৌতুকের মৃদুহাস্য ওষ্ঠাধরের মধ্যে চাপিয়া সে কহিল, "চা হয় ত উনি খাবেন না, তার চেয়ে বরং একটু মিছ্‌রির পানা কিম্বা ডাবের জল—" কথা শেষ না করিয়াই সুমিত্রা থামিয়া গেল; দুরন্ত হাস্য ওষ্ঠাধরের সীমা অতিক্রম করিবার উপক্রম করিতেছিল।

সুমিত্রার কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বিমান কহিল, "এই রাত্রে ঠাণ্ডায় ডাবের জল মিছ্‌রীর পানা!—কি বলছ সুমিত্রা? আর উনি যে চা খাবেন না তাই বা তুমি কেমন করে' বুঝ্‌লে?"

তাহার বিষয়ে এই প্রকার অবাধ কৌতুকপ্রদ আলোচনা চলিতে দেখিয়া সুরেশ্বর পুলকিত হইয়া কহিল, "যে রকমেই বুঝুন, উনি ঠিকই বুঝেছেন, চা আজকাল আমি খাইনে; কিন্তু তাই বলে' মিছ্‌রীর পানা ডাবের জল খাওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই।"

বিমান সহাস্যে কহিল, "রাস্তার মাঝখানে বসে' এসব অপ্রাসঙ্গিক আর অসাময়িক আলোচনার আর প্রয়োজন নেই। অতএব চলুন সুরেশ্বর-বাবু, বাড়ীর ভিতরে যাওয়া যাক।"

সুরেশ্বর গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কহিল, "এঁরা যদি আমাকে অনুমতি দেন তা হলে আমি এখান থেকেই বিদায় নিই। আর যদি একান্ত না দেন তা হলে অবশ্য —"

বিমান কহিল, "এঁরা মনের ভাব যে রকম ব্যক্ত করেছেন, তাতে সে অনুমতি দেবেন বলে' একটুও ভরসা হয় না—অতএব চলুন একটু বসেই যাবেন।" বলিয়া সুরেশ্বরকে কতকটা টানিয়া লইয়া বিমান গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহ এবং গৃহোপকরণ দেখিয়া সুরেশ্বর বুঝিল, গৃহস্বামী একজন ধনী ব্যক্তি। এবং তৎপরে দ্বিতলে নীত হইয়া সুবৃহৎ ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিবার পর কক্ষের সজ্জা ও সম্ভার দেখিয়া গৃহস্বামীর সঙ্গতির সহিত সৌখিনতার পরিচয়ও অজ্ঞাত রহিল না। সমগ্র কক্ষতল উৎকৃষ্ট পুরু গালিচা দিয়া মণ্ডিত; মধ্যস্থলে মর্ম্মর-নির্ম্মিত একটি বৃহৎ গোলাকার টেবিল, তদুপরি একটি সুদৃশ্য সেণ্টর্-পীসে সদ্যাহৃত পুষ্পগুচ্ছ রক্ষিত; টেবিলের ধারে ধারে সুখপ্রদ গদি-আঁটা চেয়ার সাজান; দেওয়ালের পাশে পাশে বহুমূল্য আরামদায়ক সোফা; কক্ষের উত্তর সীমায় মধ্যস্থলে একটি কটেজ্-পিয়ানো এবং দক্ষিণে বিপরীত দিকে একটি আমেরিকান্ অর্গ্যান্। চতুষ্কোণে আবলুশ কাষ্ঠনির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত সূক্ষ্ম ত্রিপদের উপর এক-একটি মর্ম্মর-নির্ম্মিত নারীমূর্ত্তি এবং দেওয়ালে দেওয়ালে মূল্যবান্ ফ্রেমে আঁটা বড় বড় চিত্র।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে

সুরেশ্বর অপর পক্ষকে এবং অপর পক্ষ সুরেশ্বরকে ভাল করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার প্রথম সুযোগ পাইল। সুরেশ্বর দেখিল—গৃহকন্যা-তিনটি গৃহোপকরণের অনুক্রমেই মূল্যবান্ সজ্জায় সজ্জিত, তাহাদের সুন্দর দেহাবয়বকে সুন্দরতর করিবার প্রয়াসের মধ্যে অর্থব্যয়ের কোনো কার্পণ্য অথবা দেশী বিদেশী বিচারের কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল না। সূক্ষ্ম লেস ও ফ্রিল ভারতবর্ষ প্রস্তুত করে না, তজ্জন্য তরুণীদের পরিচ্ছদের যেমন কোন ক্ষতি হয় নাই, সুদৃশ্য বেনারসী সিল্কের তুল্য বস্ত্র ভারতবর্ষের বাহিরে পাওয়া কঠিন সে প্রমাণও তাহাদের সজ্জার মধ্যে তেমনি নিঃসংশয়ের সহিত ছিল।

অপর পক্ষ দেখিল সুরেশ্বরের পরিধানে খদ্দরের মোটা স্বল্পপরিসর ধুতি, অঙ্গে খদ্দরনির্ম্মিত মামুলী পিরান, দেহাবরণ খদ্দরের মোটা চাদর এবং পদদ্বয়ে রুক্ষ দেশী চামড়ার অচিক্কণ নাগ্‌রা জুতা। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি সে সময়ের পক্ষে এ সজ্জা বিশেষ কিছুই অসাধারণ বা অদ্ভুত ছিল না। তথাপি উভয় পক্ষের বহিরাবরণের এই বিরোধ ও অসঙ্গতি উভয় পক্ষকেই সামান্য আঘাত দিল।

সুমিত্রা পরক্ষণেই তাহার বিস্ময় হইতে মুক্ত হইয়া সাদরে এবং সাগ্রহে কহিল, "বসুন সুরেশ্বর-বাবু, আমরা বাবাকে খবর দিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আস্‌ছি।" তাহার পর বিমানের দিকে ফিরিয়া কহিল, "বিমান-বাবু, আপনি সুরেশ্বর-বাবুর কাছে ততক্ষণ থাকুন।"

অন্তঃপুরে প্রমদাচরণ তখন বারাণ্ডায় বসিয়া পত্নী জয়ন্তীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। তিনটি কন্যা তথায় উপস্থিত হইল, এবং তিনজনেই উত্তেজিত ভাবে অল্প অল্প করিয়া বোট্যানিক্যাল্ গার্ডেনের সমস্ত কাহিনীটা সংক্ষেপে বিবৃত করিল।

শুনিয়া বিস্ময়ে ও আতঙ্কে প্রমদাচরণ এবং জয়ন্তী অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

সুরমা কহিল, "বাবা, সুরেশ্বরবাবুকে আমরা ধরে' এনেছি; ঠাকুরপোর সঙ্গে ড্রয়িংরুমে রয়েছেন, তুমি দেখা করবে চল।"

সুরেশ্বর গৃহে উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া জয়ন্তী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাহার সমক্ষে বাহির হইয়া কথা কহিতে পারেন কি না তদ্বিষয়ে স্বামীর অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রমদাচরণ কহিলেন, "নিশ্চয়ই জয়ন্তী, নিশ্চয়ই! নিজের জীবন বিপন্ন করে' তোমার তিনটি মেয়েকে আর বিমানকে যে রক্ষা করেছে, তাকে তুমি নিজে অভ্যর্থনা না করলেই অন্যায় হবে।"

সুরমা কহিল, "ছেলেমানুষ মা; ঠাকুরপোর চেয়েও বোধ হয় কিছু ছোট হবে। আমিই ত এক রকম কথা কওয়ার মতই করেছি।"

জয়ন্তী কহিলেন, "তোমরা তাহলে এগোও, আমি চা আর খাবারের ব্যবস্থা করে' তার পর যাচ্ছি।"

সুমিত্রা সহাস্যে কহিল, "সে-সব চল্‌বে না মা। চা তিনি খান না, আর খাবার দেশী চিনির সন্দেশ, রসগোল্লা ভিন্ন কেক্ বিস্কুট চল্‌বে না; হাণ্ট্‌লী-পামারের ত নয়ই।"

জয়ন্তী সবিস্ময়ে কহিলেন, "কেন রে? ভারি গোঁড়া নাকি?"

সুমিত্রা কহিল, "গোঁড়া হিঁদু কি না তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু ভারি গোঁড়া স্বদেশী। পোষাক দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে। আগাগোড়া সব খদ্দর। বোধ হয় একজন নন্-কো-অপারেটার।"

কথাটা শুনিয়া জয়ন্তীর উৎসাহ অনেকখানি কমিয়া গেল। এই নবোদ্ভূত নন্-কো-অপারেটার সম্প্রদায়ের প্রতি তাহার কোনও সহানুভূতি বা করুণা ছিল না। যে সরকার বাহাদুরের বদান্যতায় তাঁহার স্বামী অবসর গ্রহণ করিয়াও মাসে মাসে মোটা টাকা পেন্সন্ পাইতেছেন, যদ্দ্বারা সুখে স্বচ্ছন্দে তাঁহার স্বামীপুত্রকন্যার দিনাতিপাত হইতেছে, এবং স্বামীর কার্য্যকালে যে সরকার বাহাদুরের প্রভাবে হাকিমগৃহিণীরূপে তিনি প্রভূত ক্ষমতা, দাবী ও অধিকার করিয়া আসিয়াছেন, সেই সরকার বাহাদুরের সহিত যাহাদের বিরোধ তাহাদিগকে তিনি কতকটা বিদ্বেষের চক্ষেই দেখিতেন। তথাপি যে ব্যক্তি আজ তাঁহার কন্যাত্রয়কে রক্ষা করিয়া গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, নন্-কো-অপারেটার হইলেও তাহাকে অভ্যর্থনা করা কর্ত্তব্য

বোধে জয়ন্তী তাহার জলযোগের ব্যবস্থা করিতে প্রস্থান করিলেন।

সুরমা ও বিমলা সহ দ্রুমিংরুমে উপস্থিত হইয়া প্রমদাচরণ সুরেশ্বরকে বিশেষরূপে সংবর্দ্ধিত করিলেন এবং তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—যে পরোপকার-প্রবৃত্তি ও নির্ভীকতার পরিচয় আজ সে দিয়াছে তাহা যেন ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল হইয়া একদিন দেশের মধ্যে তাহাকে বরেণ্য করে।

প্রমদাচরণের কথা শুনিয়া সুরেশ্বর সলজ্জ-স্মিতমুখে কহিল, "আপনার আশীর্ব্বাদ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। কিন্তু কর্ত্তব্যের বেশী কিছুই আমি করিনি যার জন্যে এতটা প্রশংসা পেতে পারি।"

প্রমদাচরণ সুরেশ্বরকে বাহুধারণ করিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিয়া নিকটস্থ একটা চেয়ারে বসিয়া সহাস্যে কহিলেন, "তা যদি বল তাহলে তোমার প্রশংসা একটুও কমে না, বরং বেড়েই যায়। সাময়িক উত্তেজনায় যে কাজ করে তার চাইতে কর্ত্তব্য-বোধে যে কাজ করে তার আসন অনেক উচ্চে।"

প্রশংসাবাদকে নিরস্ত করিতে গিয়া ফলে বিপরীত হইল দেখিয়া অগত্যা সুরেশ্বর নিজেই নিরস্ত হইল। প্রমদাচরণের কথার কোনো উত্তর না দিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

বিমান কিন্তু কথাটাকে এইখানে শেষ হইতে না দিয়া কহিল, "তা ছাড়া এর মধ্যে শুধু কর্ত্তব্য-পালনের কথাই নেই; সাহস এবং শক্তির কথা এমন আছে, যা সচরাচর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আপনি সুরেশ্বর-বাবুকে দেখ্‌ছেন পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে, বিশেষ যে শক্তি-শালী তা চেহারা দেখে বোঝ্‌বার কিছু নেই; ইনি সেই লম্বা-চওড়া যমদূতের মত গুণ্ডাটাকে অসঙ্কোচে আক্রমণ করলেন আর অনায়াসে হারিয়ে দিলেন। এ ব্যাপার আজ যারা স্বচক্ষে দেখেছে তারাই বুঝ্‌তে পারছে।"

বিমানের কথা বিশেষ ভাবে সমর্থন করিয়া সুরমা কহিল, "সত্যি কথা! সে কথা মনে হলে এখনও শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে! অদ্ভুত সাহস সুরেশ্বর-বাবু দেখিয়েছেন!"

বিমানের কথার উত্তরে সুরেশ্বর প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, মধ্যে সুরমা সে কথার সমর্থন করায় সে বিমলার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কিন্তু যতটুকু আমি করেছি ততটুক্ না করলেই যে কাপুরুষতা হ'ত। যে অবস্থায় আমি আপনাদের দেখ্‌তে পেলাম সে অবস্থায় আপনাদের মধ্যে গিয়ে পড়া ভিন্ন উপায় ছিল না।"

বিমান হাস্যমুখে কহিল, "আচ্ছা, সাহসের কথা না হয় উপস্থিত ছেড়েই দিচ্ছি; কিন্তু শক্তির কথা? সেটা ত আর অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই?"

সুরেশ্বর কহিল, "শক্তি, সেও মনের শক্তি; দেহের শক্তি নয়। আপনি কি মনে করেন বাস্তবিকই সে গুণ্ডাটার চেয়ে আমার শরীরে শক্তি বেশী আছে? কখনই নেই। সে যে আমার কাছে হেরে গেল তার প্রধান কারণ সে একটা অন্যায় কাজ কর্‌ছিল যার জন্যে তার কোনো নৈতিক শক্তি ছিল না।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমান হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "মনের শক্তি বা নৈতিক শক্তি যে নামই দিন না কেন, সেইটেই হচ্ছে সাহস। মনের শক্তির দ্বারা আমরা অগ্রসর হই, দেহের শক্তিতে আমরা জয় করি। তা যদি না হ'ত, তা হলে কোনো গুণ্ডাই কোনো সাধুলোককে কখনো জলুম কর্‌তে পার্‌ত না। আপনি যতই অস্বীকার করুন না সুরেশ্বর-বাবু এ অনায়াসে প্রমাণ কর্‌তে পার্‌ব যে দেহের শক্তিতেই বলুন বা মনের সাহসেই বলুন আপনি সে গুণ্ডাটার চেয়ে ওপরে, কারণ তাকে যে আপনি আজ পরাস্ত করেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

সুরমা বিমানের দিকে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আর তর্কে তুমি যে সুরেশ্বর-বাবুকে পরাস্ত করেছ সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই!"

মৃদুস্বরে বলিলেও সুরমার কথা সকলেরই শ্রুতিগোচর হইয়াছিল; শুনিয়া প্রমদাচরণ-বাবু হাসিয়া উঠিলেন, এমন কি সুরেশ্বর নিজেও তর্ক ছাড়িয়া দিয়া হাসিতেই লাগিল। প্রমদাচরণ কহিলেন, "তর্কে যেই হারুন না কেন, সুরেশ্বর যে কথা বল্‌ছিলেন সে কথাও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। নৈতিক কারণের বিরুদ্ধে শক্তিশালীও অনেক সময়ে শক্তি হারিয়ে বসে। এর ভারি সুন্দর একটা

উদাহরণ আমি স্বচক্ষে একবার দেখেছিলাম। সে অনেক দিনের কথা, তখন সুরমার বয়স তিন বৎসর হবে। জয়ন্তী প্রবোধ বিপিন আর সুরমাকে পাঞ্জাব-মেলের একটা কামরায় তুলে দিয়ে আমি হাওড়া-ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্‌মে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা কইছিলাম। গাড়ী ছাড়্‌বার তখন বেশী দেরী ছিল না। আমাদের পাশের কাম্‌রায় জান্‌লার ধারে একটি ষোল-সতের বছরের ইংরেজ মেয়ে বসেছিল; আর তার সাম্‌নে প্ল্যাট্‌ফর্‌মে দাঁড়িয়ে একটি পনের-ষোল বছরের ছেলে—বোধহয় মেয়েটির ছোট ভাই-ই হবে—তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কর্‌ছিল। লম্বাচওড়া একটা মাতাল গোরা সেই কাম্‌রার সাম্‌নে দিয়ে বার বার পায়চারী কর্‌ছিল আর বোধ হয় মধ্যে মধ্যে সেই ইংরেজ মেয়েটির প্রতি অশিষ্ট ইঙ্গিত কর্‌ছিল। ছেলেটি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল বলে' দেখ্‌তে পায়নি, কিন্তু মেয়েটি কয়েকবার লক্ষ্য করে' অবশেষে তার ভাইকে বলে' দিলে। তখন সেই পাতলা ছিপ্‌ছিপে পনের-ষোল বছরের ইংরেজ ছেলেটি কি কর্‌লে জান? পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে যাই সে গোরাটা আবার সেই কাম্‌রার সাম্‌নে এসেছে সে সাম্‌নে ফিরে এগিয়ে গিয়ে গোরাটার নাকের উপর সজোরে একটি ঘুসী বসিয়ে দিলে, তার পর আর কিছু না বলে' পিছন ফিরে আগের মত দাঁড়িয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে তার বোনের সঙ্গে কথা কইতে লাগ্‌ল, একবার ফিরে দেখ্‌লে না পর্য্যন্ত যে সে গোরাটা আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে কি না। আর গোরাটার কি হ'ল শুন্‌বে? সে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বার করে' নাক মুছ্‌তে লাগ্‌ল; আমরা দেখ্‌লাম দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার রুমালখানা রক্তে লাল হয়ে গেল—গলগল্ করে' তার নাক দিয়ে রক্ত পড়্‌ছিল। তার পর ছেলেটার দিকে চেয়ে বিড়্‌বিড় করে' কি গালাগালি দিয়ে একেবারে প্ল্যাট্‌ফর্‌ম থেকেই সরে' পড়্‌ল। এ কথাও কিন্তু নিঃসন্দেহ যে যদি সে গোরাটার সঙ্গে ছেলেটার মল্লযুদ্ধ হ'ত তাহলে গোরাটা ছেলেটিকে গুঁড়িয়ে দিতে পার্‌ত।"

এতক্ষণ বিমলা কোনো কথা কহে নাই, সে স্মিতমুখে কহিল, "এ গল্পটা বাবার মুখে আমরা বোধ হয় একশ' বার শুনেছি।"

সুরেশ্বর বিমলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে নম্রস্বরে কহিল, "আরও একশ বার শুন্‌লেও ক্ষতি নেই, গল্পটি এমন চমৎকার!"

সুরেশ্বরের এই শান্ত মৃদু তিরস্কারে অপ্রতিভ হইয়া বিমলা কহিল, "তা সত্যি!"

[৩]

জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাতে একটি জার্ম্মান্-সিল্‌ভারের ট্রের উপর দুই তিন রেকাব খাবার লইয়া সুমিত্রা প্রবেশ করিল। কন্যার দ্বারা খাবার লইয়া আসা জয়ন্তী একেবারেই পছন্দ করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল উদ্দিপরা খান্‌সামা-বালক খাবার বহন করিয়া আনে। কিন্তু সুরেশ্বরকে একটু বিশেষভাবে খাতির করিবার অভিপ্রায়ে, এবং সুরেশ্বরের প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির কতকটা পরিচয় পাইয়া সুমিত্রা ভৃত্য দ্বারা খাবার না আনাইয়া কতকটা জিদ্ করিয়া স্বয়ং বহন করিয়া আনিয়াছিল। তৎসত্ত্বেও জয়ন্তী খান্‌সামাকে লইয়া আসিতে ভুলেন নাই। সে একটি কাঠের টিপাই সুরেশ্বরের সম্মুখে স্থাপন করিয়া সুমিত্রার হস্ত হইতে ট্রে লইবার জন্য উদ্যত হইল। সুমিত্রা তাহার হস্তে না দিয়া নিজেই টিপাইয়ের উপর ট্রেখানি স্থাপন করিল।

জয়ন্তীকে নির্দ্দেশ করিয়া সুরমা কহিল, "সুরেশ্বর-বাবু! ইনি আমাদের মা।"

সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি উঠিয়া নত হইয়া যুক্তকরে জয়ন্তীকে প্রণাম করিল। জয়ন্তী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তুমি বাবা, আজ আমাদের যে উপকার করেছ তার জন্যে কি বলে' ধন্যবাদ দোবো তা জানিনে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

সুরেশ্বর কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বেই বিমান হাসিয়া কহিল, "ওঁকে ধন্যবাদ দেওয়া শক্ত। যেমন করেই দিন না কেন, উনি ঠিক ফিরিয়ে দেবেন।"

এই প্রসঙ্গে একটু পরিহাস করিবার লোভ সুমিত্রা কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিল না; মৃদু হাসিয়া কহিল, "ধন্যবাদটা ত' বিলিতী আম্‌দানী,—ওটা ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত।"

এবার সুরেশ্বর সুমিত্রার পরিহাসটুকু ধরিতে পারিল;

এমন কি কিছু পূর্ব্বে চা ও মিছ্রীর পানা লইয়া সুমিত্রা যেটুকু পরিহাস করিয়াছিল এই সদ্যলব্ধ সূত্রের সাহায্যে তাহার মর্ম্মও অবিদিত রহিল না। কিন্তু ইহা তাহার ভাল লাগিল না। সুমিত্রার এই স্বচ্ছন্দতা, এই কৌতুকরসপ্রিয়তা, দুই তিন ঘণ্টার পরিচয়েই একটা সপ্রতিভতা তাহাকে অসন্তুষ্ট করিল। তদুপরি, এই-সমস্ত পরিহাসের ভিতর স্বদেশীয়তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল মনে করিয়া সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সুমিত্রার প্রতি চাহিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সে কহিল, "বিলাতী আমদানী মাত্রই যে নির্ব্বিচারে ফেরত দেওয়া উচিত তা জোর করে' হয়ত বলা যায় না—বিশেষতঃ যখন দেখা যাচ্ছে যে বিলিতী কাপড়, এমন কি বিলিতী কাপড়ের টুক্রো পর্য্যন্ত, আমরা গ্রহণ কর্‌তে ছাড়্ছিনে!"

যতটুকু আঘাত সুরেশ্বর তাহার বাক্যের দ্বারা দিতে গেল তাহার সবটুকুই উপলব্ধি করিয়া সুমিত্রার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তিম হইয়া উঠিল; বিলাতী কাপড়ের টুক্‌রার উল্লেখে সুরেশ্বর যে তাহার আইরীশ লিনেনের রুমালই নির্দ্দেশ করিল তাহা বুঝিতে তাহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। কিন্তু সুরেশ্বরের নিকট তাহারা উপকৃত ও সুরেশ্বর তাহাদের অতিথি এ কথা স্মরণ করিয়া সুরেশ্বরের কথার কোনপ্রকার প্রতিবাদ না করিয়া সে স্মিতমুখে স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "বিলাতী কাপড়ের টুক্‌রা এবার থেকে না হয় ত্যাগ করলেই হবে, কিন্তু আপনাকে দেওয়া খাবারগুলির মধ্যে বিলাতীর নাম গন্ধ নেই; অতএব এগুলো অনুগ্রহ করে' গ্রহণ করুন।"

আঘাত দিয়াই একটা সূক্ষ্ম অনুতাপে সুরেশ্বর ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম দিনের পরিচয়ের মধ্যেই একজন মহিলার প্রতি মনে এবং বাক্যে বিরুদ্ধাচরণ করা অসঙ্গত এবং অসমীচীন বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। তাহার পর যখন সে দেখিল যে আহত হইয়াও সুমিত্রা আঘাতটা নিরুপদ্রবে এবং হাস্যমুখে পরিপাক করিল, এমন কি একপ্রকারে সুরেশ্বরের নিকট পরাজয়ই স্বীকার করিল, তখন সুরেশ্বর মনের মধ্যে অল্প বেদনা বোধ করিতে লাগিল; এবং কতকটা অপরাধ স্খালনের অভিপ্রায়ে হাসিয়া কহিল, "এগুলি যখন যত্ন করে' আপনারা দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই গ্রহণ করব, কিন্তু ক্ষমতা ও প্রয়োজনের অধিক হয়ে কিছু যদি পড়ে' থাকে তা হলে ক্ষমা করবেন।"

বিমানবিহারী সহাস্যে কহিল, "তা হলে আর-একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গে হওয়া দর্‌কার। ক্ষমতা ও প্রয়োজনের কম হয়ে যদি কিছু চাইবার দর্‌কার হয় তা হলে চেয়ে নেবেন।"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "অসঙ্কোচে নেবো।"

সুরেশ্বর আহারে প্রবৃত্ত হইলে বোটানিকাল্-গার্ডেনের ব্যাপারটা পুনরায় ধীরে ধীরে আলোচিত হইতে লাগিল। বিমান, সুরমা ও বিমলা ঘটনাটা অংশে অংশে বিবৃত করিতে লাগিল; জয়ন্তী দেবী, উদ্বেগের কারণ উপস্থিত অবর্ত্তমানেও, নিরতিশয় উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং প্রমদাচরণ পুনঃ পুনঃ সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন যে আপাততঃ দৃষ্টিগোচর না হইলেও অদাকার ঘটনার মধ্যে ভগবানের মঙ্গল হস্ত নিশ্চয়ই আছে যাহা অদূর ভবিষ্যতে একদিন নিশ্চয়ই বুঝা যাইবে।

পায়সের বাটিটা আরম্ভ করিতে সুরেশ্বর ইতস্ততঃ করিতেছিল দেখিয়া সুমিত্রা বলিল, "আপনি একমিনিট অপেক্ষা করুন সুরেশ্বর-বাবু, আমি একটা চামচ এনে দিচ্ছি।" বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

পোষাক-পরা চাকর বর্ত্তমানেও হাকিমের কন্যা হইয়া সুমিত্রা নিজে চামচ আনিতে ছুটিল ইহা জয়ন্তী একেবারেই পছন্দ করিলেন না এবং পাছে সুরেশ্বর মনে করে যে এমন সব ব্যাপার প্রত্যহই তাঁহার গৃহে হইয়া থাকে সেই আশঙ্কায় মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমার প্লেট্ বাটি ডিশ্‌গুলো আজ সুমিত্রা ভাঙ্‌বে দেখ্‌চি! কোনো দিনই ত এসব নিজে হাতে করে না। বয়্, তুই যা না, দেখিয়ে দিগে কোথায় আছে।"

প্রমদাচরণ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "করুক্, করুক্, বাধা দিয়ো না। আজ তার সমস্ত মনটা কৃতজ্ঞতায় এমন ভরে' আছে যে এম্নি করে' নিজহাতে সেবা না কর্‌লে তৃপ্তি হবে না।"

সুরমা হাসিয়া বলিল, "তা ছাড়া আসলে ধরতে গেলে সুরেশ্বর-বাবু সুমিত্রাকেই উদ্ধার করেছেন; ঠাকুরপোর পালা ত আগেই হয়ে গিয়েছিল। মাগো! সে কথা মনে পড়লে এখনও গা কেঁপে উঠছে! আর একমিনিট সুরেশ্বর-বাবুর আসতে দেরী হলেই গুণ্ডাটা সুমিত্রার গলা থেকে জোর করে' কণ্ঠিটা খুলে নিত। সুমিত্রা ত আতঙ্কে কেমন হয়ে গিয়েছিল।"

এই সময়ে সুমিত্রা প্রবেশ করিল। সুরমার কথার শেষ অংশ সে শুনিতে পাইয়াছিল; সুরেশ্বরের পায়সের পাত্রে চামচ রাখিয়া হাসিয়া কহিল, "আমার ত কেমন হয়ে যাওয়ার কথাই ছিল, কিন্তু তোমরাও যে বিশেষ সুস্থ ছিলে তা ত মনে হয় না।"

সুরমা হাসিমুখে কহিল, "সুস্থ? আমি বোধ হয় তোর আগেই ফিট্ হয়ে যেতাম!"

সুরমার এই অকপট আত্মপ্রকাশে সকলে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

বিমলা বলিল, "আচ্ছা, বিমানদা, সুরেশ্বর-বাবু না এলে আপনি কি করতেন?

অদ্যকার ঘটনায় বিমানবিহারীর পক্ষে অপৌরুষের যে হীনতাটুকু অপ্রকাশ থাকিয়াও কাহারও নিকট অগোচর ছিল না, বিমলা একটি অসতর্ক প্রশ্নের দ্বারা তাহাকে সহসা এমন প্রকট করিয়া দেওয়ায় সকলেই একটু বিব্রত হইয়া উঠিল; বিশেষতঃ বিমানবিহারী স্বয়ং। তিনটি স্ত্রীলোকের রক্ষক হইয়া বিপৎকালে সে এমন কিছুই করে নাই যাহা তাহার করা উচিত ছিল। শুধু তাহাই নহে, তাহার যে কি করা উচিত ছিল তাহা ঘটনাস্থলেই একজন অপরিচিত নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি দেহ বিক্ষত এবং জীবন বিপন্ন করিয়া প্রমাণ করিয়া দিল। সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের ব্যাপার এই যে যাহার সহিত অদূর ভবিষ্যতে তাহার বিবাহ হইবার কথা চলিয়াছে, দলের মধ্যে সে ছিল, এবং বিশেষ করিয়া তাহাকেই উদ্ধার করিবার অবস্থা উপনীত হইয়াছিল, কারণ সে-ই নিপীড়িত হইতেছিল। সুরেশ্বরের পরিবর্ত্তে তাহার হস্ত বিক্ষত হইলে আজ সকলের চক্ষে সে কতটা প্রশংসা-ভাজন হইতে পারিত তাহা ভাবিয়া সে মনে মনে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ছিল, তাহার উপর বিমলা এমন স্পষ্ট করিয়া কথাটা উত্থাপিত করায় সে বিমূঢ় হইয়া গেল।

বিমানবিহারী মানাইয়া গুছাইয়া একটা-কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই সুরেশ্বর বলিল, "হঠাৎ আক্রান্ত হলে প্রথমটা একটু অভিভূত হয়ে পড়তেই হয়; সেটা কেটে গেলে তখন উনিই গুণ্ডাটাকে আক্রমণ করতেন।"

আরও একটু ছেলেমানুষী করিয়া বিমলা কহিল, "বিমানদা যে রকম ভালমানুষ! তিনি কি গুণ্ডাটার সঙ্গে পেরে উঠতেন?"

বিমলার কথায় সুরেশ্বর হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তা হলে কি বলতে চান যে আমি একজন গুণ্ডা, তাই তার সঙ্গে পেরে উঠেছি?"

এবার সকলে—এমন কি বিমানবিহারী পর্য্যন্ত হাসিয়া উঠিল, এবং বিমলা যে অসুবিধার অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল, এই হাসির উপলক্ষ্যে তাহা অনেকটা কাটিয়া গেল।

হাসির কল্লোল থামিলে জয়ন্তী কহিলেন, "তুমি গুণ্ডাটাকে জানিয়ে দিলে না কেন বিমান, যে তুমি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট? তা হলে পালাতে পথ পেত না।" স্বামীর পদোল্লেখের সময়েও জয়ন্তী "ডেপুটি" শব্দটি সযত্নে বাদ দিয়া চলিতেন।

সহধর্ম্মিণীর এই বিচিত্র প্রশ্ন ও আত্মপ্রকাশে মনে মনে লজ্জিত হইয়া প্রমদাচরণ মৃদু মৃদু দুলিতে লাগিলেন, এবং সুরেশ্বর ম্যাজিষ্ট্রেটের অলীক মহিমার প্রতি জয়ন্তীর এই একান্ত বিমুগ্ধভাব দেখিয়া যথেষ্ট পুলকিত হইল।

সত্যের অনপলাপ ও জয়ন্তীর অভিমান, উভয়ের মধ্যস্থতা করিয়া বিমান কহিল, "গুণ্ডারা আজকাল আর হাকিম-টাকিম মানে না। দিনকাল একেবারে বদলে গিয়েছে।"

কাহাদের অবিমৃষ্যকারিতায় দিনকাল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে তদ্বিষয়ে একটু বক্তৃতা দিতে জয়ন্তীর লোভ হইতেছিল, সুরেশ্বরের উপস্থিতির জন্য ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কক্ষে একজন দীর্ঘকায় সাহেববেশধারী ব্যক্তি প্রবেশ করিল এবং মস্তক নত করিয়া সহাস্য মুখে কহিল, "গুড্-ইভ্নিং, কই আমার রুগী কোথায়?—"

আগন্তুকের প্রশ্নে সকলেই বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। প্রমদাচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "গুড্ ইভ্‌নিং আসুন ডক্‌টার চ্যাটার্জ্জি, আসুন। কিন্তু আপনার রুগী কি, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে ত!"

সুমিত্রা সহাস্যমুখে কহিল, "ডক্‌টার চ্যাটার্জ্জি, দয়া করে' দুচার মিনিট বসুন; একটু পরেই আপনার রুগী অবসর পাবেন।" তাহার পর সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া ঈষৎ কুণ্ঠা সহকারে কহিল, "সুরেশ্বর-বাবু, তাড়াতাড়ি কর্‌বেন না; খাওয়াটা শেষ করে' নিন্।"

সুমিত্রার কথায় সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। সুরেশ্বর আহার বন্ধ করিয়া বিস্মিত নেত্রে সুমিত্রার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনিই তাহলে ডাক্তার-মশায়কে খবর দিয়েছিলেন?"

আরক্ত মুখে সুমিত্রা কহিল, "যেই খবর দিক, খবর দেওয়ার দর্‌কার ছিল তাও কি আপনি অস্বীকার করেন?"

সুরেশ্বর দৃঢ় অথচ শান্তস্বরে কহিল, "করি বৈকি। সামান্য একটু কাটার জন্যে ডাক্তার ডাকার ত কোনো দর্‌কার ছিল না।"

বিমান বলিল, "ডক্টার চ্যাটার্জ্জি, এঁর হাতখানা আপনি পরীক্ষা করে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে কতটা কেটে গিয়েছে, আর আপনাকে ডাকা অন্যায় হ'য়েছে কি-না।"

সুরেশ্বর মনে মনে বিরক্ত হইয়া অপ্রসন্ন স্বরে কহিল, "সামান্য জিনিষকে বড় করে' তোল্‌বার আপনাদের আশ্চর্য্যরকম ক্ষমতা আছে।"

প্রমদাচরণ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "না, না সুরেশ্বর-বাবু, এরা কোনো সামান্য জিনিষকে বাড়িয়ে তুল্‌ছে না। তুমি যে সৎসাহসের পরিচয় আজ দিয়েছ তা একটুও সামান্য নয়, আর তাকে এরা অকারণ একটুও বাড়াচ্ছে না।" বলিয়া তিনি ডাক্তারকে বোটানিক্যাল-গার্ডেনের ঘটনা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন।

কাহিনী শেষ হইলে সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া ডাক্তার কহিলেন, "আসুন, আপনার হাতখানা একবার দেখি।"

সুরেশ্বর তখন আহার সমাপন করিয়া হাত ধুইয়া বসিয়া ছিল, ডাক্তারের আহ্বানে হাতখানা আগাইয়া দিল, আর আপত্তি করিল না। তাহার মনে হইল আপত্তি করিলে সুমিত্রার প্রতি একটু দুর্ব্যবহার করা হইবে।

সুরেশ্বরের হস্ত হইতে বস্ত্রখণ্ড উন্মোচিত করিয়া আলোয় ধরিয়া দেখিয়া ডাক্তার বলিল, "By Jove! এ যে দেখ্‌ছি খদ্দর! This is quite good for a patriot, but not for a patient."

ডাক্তারের কথায় একেবারে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়া সুরেশ্বর কহিল, "কিন্তু এ যদি Manchester rag হ'ত তাহলে বোধ হয় কোনো ক্ষতি হ'ত না!"

ডাক্তার হাসিমুখে কহিল, "Don't fight meaninglessly, my dear friend! তা হলেও ক্ষতি হোত। There must be difference between things and things. মহাত্মাজীর হাতে বোনা খদ্দর হ'লেও তা bandage হবে না যতক্ষণ না সেটা বিধিমত antiseptic করা হচ্ছে। খদ্দরকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি; ভাল করে' চেয়ে দেখুন আমার এ বিলিতী পোষাকের মধ্যেও খদ্দরের একেবারে অভাব নেই। কিন্তু মিছ্‌রী ভাল জিনিস বলেই ত নুনের কাজও কর্‌তে পারে না?"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "না, তা কখনই পারে না। আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন; আপনার কথার ভঙ্গীতে আমি মনে করেছিলাম যে আপনি বল্‌তে চান যে নুনের কাজ মিছ্‌রীর দ্বারা হয় না, কিন্তু ফট্‌কিরির দ্বারা হয়। তা যখন আপনি বল্‌ছেন না তখন আর বিরোধের কোনো কথা নেই।"

"না, বিরোধের কোনো কথা নেই। আসুন, আপনার হাতটা ভাল করে' ব্যাণ্ডেজ করে' দিই।" বলিয়া ব্যাগ হইতে সরঞ্জাম বাহির করিয়া ডাক্তার নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

সযত্নে সুরেশ্বরের হস্তের ক্ষত পরিষ্কার করিয়া ও বাঁধিয়া দিয়া ডাক্তার কহিল, "উন্‌ড্‌টা নিতান্ত সামান্য হয় নি, কয়েক দিন একটু সাবধানে থাক্‌বেন। নিষ্পাপ সুস্থ শরীর, দেহের মধ্যে চিনির কার্‌বার নেই; নইলে একটা injectionও দিয়ে দিতাম।" ডাক্তার তাহার দ্রব্যাদি ব্যাগে পুরিয়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা

তাহলে এখন চল্লাম, গুড্ বাই।" তাহার পর সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, "সুরেশ্বর-বাবু, নমস্কার!"

প্রমদাচরণ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "ডক্টার চ্যাটার্জি, একটু অপেক্ষা করুন আপনার ফি-টে এনে দিচ্ছে।" তাহার পর সুরমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "যাও ত মা, ডাক্তার মহাশয়ের ফি-টা এনে দাও ত।"

প্রমদাচরণের কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া সুরেশ্বর কহিল, "না, না, বলেন কি? আমি ওঁর ফি দিচ্ছি।" তাহার পর বিমানকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এঁর ফি কত?"

বিমান কোনো কথা কহিবার পূর্ব্বেই ডাক্তার বলিল, "আট টাকা। কিন্তু আমি বলি, আপনাদের উভয় পক্ষের কারও ফি দেবার প্রয়োজন নেই। এমন ত নিত্যই ফোড়া ঘা চিকিৎসা করে' পয়সা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি। আজ যখন এমন একটি পবিত্র ঘা চিকিৎসা করবার সৌভাগ্য পেলাম তখন পয়সাটা না হয় নাই নিলাম। ব্যবসাটাকে সময়ে সময়ে একটু অব্যবসার মত করে' নিলে তাতে একটু রস পাওয়া যায়।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

ডাক্তার চলিয়া গেলে সুরেশ্বর কহিল, "ভারি চমৎকার লোক ত!"

প্রমদাচরণ কহিলেন, "চমৎকার!"

জয়ন্তী সহাস্যে কহিলেন, "তোমরা ত চমৎকার বলবেই; আট-আটটা টাকা তোমাদের বেঁচে গেল!"

জয়ন্তীর কথায় সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

প্রমদাচরণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠিক বলেছ জয়ন্তী; ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি ভাল লোক ত বটেই, তার ওপর যখন টাকা নিলেন না তখন চমৎকার লোক!"

কিছু পরে সুরেশ্বর বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া সকলকে অভিবাদন করিল।

প্রমদাচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আজ এক বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে তোমাকে আমরা আত্মীয়ের মত লাভ করলাম। মাঝে মাঝে এসে আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা সাক্ষাৎ করো।" তাহার পর বিমানকে বলিলেন, "তুমি বিমান, মোটরে করে' ওঁকে বাড়ী পৌঁছে দাও।"

সুরেশ্বর ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, না, মোটরের দরকার নেই, আমি এটুকু হেঁটেই চলে' যাব।"

বিমান কহিল, "ক্ষতিও ত নেই, চলুন না আপনার বাড়ীটাও ত দেখে আসা যাবে।"

পুনরায় সকলকে অভিবাদন করিয়া সুরেশ্বর প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অবেলার ডাক

অনেক ক'রে বাস্‌তে ভাল পারিনি মা তখন যারে,
আজ অবেলায় তারেই মনে পড়্‌ছে কেন বারে বারে॥

আজ মনে হয় রোজ রাতে সে ঘুম পাড়াত নয়ন চুমে',
চুমুর পরে চুম্ দিয়ে ফের হান্‌ত আঘাত ভোরের ঘুমে।
ভাব্‌তুম তখন এ কোন্ বালাই!—
কর্‌ত এ প্রাণ পালাই পালাই।
আজ সে কথা মনে হয়ে ভাসি অঝোর নয়ন-ধারে।
অভাগিনীর সে গরব আজ ধূলায় লুটায় ব্যথার ভারে॥

তরুণ তাহার ভরাট্ বুকের উপ্‌চে-পড়া আদর সোহাগ
হেলায় দু-পায় দলেছি মা, আজ কেন হায় তায় অনুরাগ?
এই চরণ সে বক্ষে চেপে
চুমেছে, আর দুচোখ ছেপে
জল ঝরেছে, তখনো মা কইনি কথা অহঙ্কারে,
এমনি দারুণ হতাদরে করেছি মা বিদায় তারে॥

দেখেও ছিলাম বুক-ভরা তার অনাদরের আঘাত-কাঁটা,
দ্বার হতে সে গেছে দ্বারে খেয়ে সবার লাথি ঝাঁটা।

ভেবেছিল আমার কাছে
তার দরদের শান্তি আছে,
আমিও গো মা ফিরিয়ে দিলাম চিন্‌তে নেরে দেবতারে।
ভিক্ষুবেশে এসেছিল রাজাধিরাজ দাসীর দ্বারে॥

পথ ভুলে সে এসেছিল সে মোর সাধের রাজ-ভিখারী;
মা গো আমি ভিখারিণী, আমি কি তাঁয় চিন্‌তে পারি?
তাই মা গো তাঁর পূজার ডালা
নিই নি, নিই নি মণির মালা,
দেব্‌তা আমার নিজে আমায় পূজ্‌ল ষোড়শ-উপচারে।
পূজারীকে চিন্‌লাম না মা, পূজা-ধূমের অন্ধকারে॥

আমায় চাওয়াই শেষ চাওয়া তাঁর, মা গো আমি তা কি জানি?
ধরায় শুধু রইল ধরা রাজ-অতিথির বিদায়-বাণী!
ওরে আমার ভালোবাসা!
কোথায় বেঁধেছিলি বাসা
যখন আমার রাজা এসে দাঁড়িয়েছিল এই দুয়ারে?
নিঃশ্বসিয়া উঠ্‌ছে ধরা—'নেইরে সে নেই, খুঁজিস কারে!'

সে যে পথের চির-পথিক, তার কি সহে ঘরের মায়া?
দূর হ'তে মা দূরান্তরে ডাকে তাকে পথের ছায়া।
মাঠের পারে বনের মাঝে
চপল তাহার নূপুর বাজে,
ফুলের সাথে ফুটে বেড়ায়, মেঘের সাথে যায় পাহাড়ে,
ধরা দিয়েও দেয় না ধরা জানি না সে চায় কাহারে॥

মা গো আমার শক্তি কোথায় পথ-পাগলে ধ'রে রাখার?
তার তরে নয় ভালোবাসা, সন্ধ্যা-প্রদীপ ধরে ডাকার।
তাই মা আমার বুকের কবাট
খুল্‌তে নারল তার করাঘাত,
এ মন তখন কেমন যেন বাস্‌ত ভালো আর কাহারে।
আমিই দূরে ঠেলে দিলাম অভিমানী ঘর-হারারে॥

সোহাগে সে ধরতে যেত নিবিড় ক'রে বক্ষে চেপে,
হতভাগী পালিয়ে যেতাম, ভয়ে এ বুক উঠ্‌ত কেঁপে।
রাজ-ভিখারীর আঁখির কালো
দূরে থেকেই লাগ্‌ত ভালো,
আস্‌লে কাছে ক্ষুধিত তার দীঘল চাওয়ায় অশ্রুভারে
ব্যথায় কেমন মুষ্‌ড়ে যেতাম, সুর হারাতাম মনের তারে॥

আজ কেন মা তারই মতন আমারো এই বুকের ক্ষুধা
চায় শুধু সেই হেলায়-হারা আদর-সোহাগ-পরশ-সুধা!
আজ মনে হয় তাঁর সে বুকে
এ মুখ চেপে নিবিড় সুখে
গভীর দুখের কাঁদন কেঁদে শেষ করে' দিই এই আমারে!
যায় না কি মা আমার কাঁদন তাঁহার দেশের কানন-পারে?

আজ বুঝেছি এ জনমের আমার নিখিল শান্তি আরাম
চুরি করে' পালিয়ে গেছে চোরের রাজা সেই প্রাণারাম!
হে বসন্তের রাজা আমার!
নাও এসে মোর হার-মানা হার!
আজ যে আমার বুক ফেটে যায় আর্তনাদের হাহাকারে,
দেখে যাও আজ সেই পাষাণী কেমন করে' কাঁদ্‌তে পারে।

তোমার কথাই সত্য হ'ল পাষাণ ফেটেও রক্ত বহে,
দাবানলের দারুণ দাহ তুষার-গিরি আজকে দহে।
জাগ্‌ল বুকে ভীষণ জোয়ার
ভাঙ্‌ল আগল্ ভাঙ্‌ল দুয়ার,
মূকের বুকে দেব্‌তা এলেন মুখর মুখে ভীম পাথারে।
বুক ফেটেছে মুখ ফুটেছে—মা গো মানা করছ কারে?

স্বর্গ আমার গেছে পুড়ে তাঁরই চ'লে যাওয়ার সাথে,
এখন আমার একার বাসর দোসর-হীন এই দুঃখ-রাতে।
ঘুম ভাঙাতে আস্‌বে না সে
ভোর না হ'তেই শিয়র-পাশে,
আস্‌বে না আর গভীর রাতে চুমুচুরির অভিসারে।
কাঁদ্‌বে ফিরে তাঁহার সাথী ঝড়ের-রাতি বনের পারে॥

আজ পেলে তাঁয় হুমড়ি খেয়ে পড়্‌তুম মা গো যুগল পদে,
বুকে ধ'রে পদ-কোকনদ স্নান করাতাম আঁখির হ্রদে।
বস্‌তে দিতাম আধেক আঁচল,
সজল চোখের চোখ-ভরা-জল
ভেজা কাজল মুছাতাম তার চোখে মুখে অধর-ধারে;
আকুল কেশে পা মুছাতাম বেঁধে বাহুর কারাগারে॥
দেখ্‌বে মা গো তখন তোমার রাক্ষুসী এই সর্বনাশী
মুখ থুয়ে তাঁর উদার বুকে বল্‌ত 'আমি ভালবাসি।'
বল্‌তে গিয়ে সুখ-শরমে
লাল হয়ে গাল উঠ্‌ত ঘেমে,

...ক হতে মুখ আস্‌ত নেমে লুটিয়ে কখন্ কোল্-কিনারে।
দেখ তুম মা গো তখন কেমন মান ক'রে সে থাক্‌তে পারে॥

এমনি এখন কতই আশা ভালোবাসার তৃষ্ণা জাগে
তার ওপর মা অভিমানে, ব্যথায়, রাগে, অনুরাগে।
চোখের জলের ঋণী করে'
সে গেছে কোন্ দ্বীপান্তরে?
সে বুঝি মা সাত সমুদ্দুর তের নদীর সুদূর পারে?
ঝড়ের হাওয়া সেও বুঝি মা সে দূর-দেশে যেতে নারে?

তারে আমি ভালোবাসি সে যদি তা পায় না খবর,
চৌচির হয়ে পড়্‌বে ফেটে আনন্দে মা তাহার কবর!
চীৎকার তার উঠ্‌বে কেঁপে
ধরার সাগর-অশ্রু ছেপে,
উঠ্‌বে ক্ষেপে অগ্নিগিরি সেই পাগলের হুহুঙ্কারে।
ভূধর সাগর আকাশ বাতাস ঘূর্ণী নেচে ঘিরবে তারে?

ছি মা! তুমি ডুক্‌রে কেন উঠ্‌ছ কেঁদে অমন করে'?
তার চেয়ে মা তাঁরই কোন শোনা কথা শুনাও মোরে!
শুন্‌তে শুন্‌তে তোমার কোলে
ঘুমিয়ে পড়ি।—ও কে খোলে
দুয়ার, ওমা? ঝড় বুঝি মা তাঁরই মত ধাক্কা মারে?
ঝোড়ো হাওয়া! ঝোড়ো হাওয়া! বন্ধু তোমার সাগর পারে!

সে কি হেথায় আস্‌তে পারে, আমি যথায় আছি বেঁচে,
যে দেশে নেই আমার ছায়া এবার সে সেই দেশে গেছে!
তবু কেন থাকি' থাকি'
ইচ্ছা করে তারেই ডাকি!
যে কথা মোর রইল বাকী হায় সে কথা শুনাই কারে?
মা গো আমার প্রাণের কাঁদন্ আছ্‌ড়ে মরে বুকের দ্বারে!

যাই তবে মা! দেখা হলে আমার কথা ব'লো তারে,
রাজার পূজা—সে কি কভু ভিখারিণী ঠেল্‌তে পারে?
মা গো আমি জানি জানি
আস্‌বে আমার অভিমানী
খুঁজ্‌তে আমায় গভীর রাতে এই আমাদের কুটীর-দ্বারে;—
ব'লো তখন খুঁজ্‌তে তারেই হারিয়ে গেছে অন্ধকারে!

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

নরওয়ের পুরাণের কথা

কবিতার উৎপত্তি

একবার স্বর্গের দেবতা এসির (Aesir) এবং সাগর-দেবতা ও বায়ু-দেবতা ভনাসের (Vanas) মধ্যে যুদ্ধ হয়। দেবতাগণের মধ্যে যুদ্ধ—কাজেই ব্যাপারটাও ঘোরতর হইয়া উঠিল। উভয় দল হইতেই শত্রুদের লক্ষ্য করিয়া পাহাড় পর্ব্বত হিমশিলা ইত্যাদি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; ক্রমে যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে যুদ্ধ দ্বারা অমঙ্গল ছাড়া কখনও কল্যাণের সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহারা পরস্পর শান্তি স্থাপন করিলেন। শান্তির সর্ত্ত স্থাপনের সময় দুই দল একত্র হইয়া সকলে একটা পাত্রের মধ্যে থুথু ফেলিলেন। সেই লালা হইতে দেবতারা ক্বাসীর (Kvasir) নামে এক ব্যক্তির সৃষ্টি করিলেন। এই ক্বাসীর তাহার পাণ্ডিত্য এবং সত্ততার জন্য বিখ্যাত ছিল। পৃথিবীতে যে-কেহ তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দেওয়াই ছিল ক্বাসীরের কর্ম্ম। বামনেরা তাহার পাণ্ডিত্যের প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ একদিন নিদ্রিতাবস্থায় ক্বাসীরকে হত্যা করিল। হত্যার পরে তাহার শরীরের সমস্ত শোণিত নিঃশেষে সংগ্রহ করিয়া তিনটি পাত্রে রাখিয়া তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া এক অপূর্ব্ব পানীয় তৈয়ারী করিল। এই পানীয়ের এমন গুণ ছিল যে, যে-কেহ ইহার আস্বাদ গ্রহণ করিলেই কবিতাশক্তি এবং সঙ্গীত-বিদ্যায় অপূর্ব্ব পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিত। বামনেরা এই পানীয় নিজেদের জন্যই প্রস্তুত করিয়া একস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের নিজেদেরই হঠকারিতার দরুণ ইহা সুট্টুং (Suttung)

নামে এক দৈত্যের করায়ত্ত হইল। সুটুং তাহার কন্যা গুন্‌লডের (Gunlod) নিকট উহা গচ্ছিত রাখিয়া তাহাকে অত্যন্ত সতর্ক প্রহরায় রাখিল, যেন কোন দেবতা বা মানব এই পানীয়ের আস্বাদ মাত্রও না পায়। গুন্‌লড এক পর্ব্বত-গহ্বরে লইয়া গিয়া উহার প্রহরায় রহিল। কিন্তু তাহাদের শত সতর্কতা-সত্ত্বেও দেবতা-প্রধান ওডীনের (Odin) দৃষ্টিতে কিছুই এড়াইল না।

ওডীন অমনিই দেবতাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন; তথাপি এই পানীয়ের গুণের কথা শুনিয়া তিনিও ইহা লাভ করিবার জন্য দৈত্যদের দেশ ইয়টুন্-হেইমের (Jotun-heim) দিকে রওনা হইলেন। ইয়টুন্-হেইমে আসিয়া ছদ্মবেশ ধারণ এবং নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া তিনি পর্ব্বত-গহ্বরে গুন্‌লডের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া তিনি দেবরূপ ধারণ করিলেন এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই গুন্‌লডের প্রণয়প্রার্থী হইলেন। তাঁহার বিশেষ আকিঞ্চনে গুন্‌লড্ তাঁহার পত্নীত্বে স্বীকৃত হইলেন। ঐ অবস্থায় গুন্‌লডের সহিত তিন দিন পর্ব্বত-গহ্বরে বাস করিবার পর ওডীন সেই পানীয়ের তিন পাত্র হইতে তিন চুমুক মাত্র গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ওডীন তিন চুমুকেই তিন পাত্রের সমস্ত পানীয় নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন! এইরূপে কার্য্য-সিদ্ধি করিয়া ওডীন আবার স্বর্গের দিকে রওনা হইলেন। দৈত্য সুটুং ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল; কিন্তু ওডীনের নাগাল পাওয়া দূরে থাকুক দেবতাদের সম্মিলিত চেষ্টায় তাহাকে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতে হইল।

স্বর্গের দেবতারা ঐ পানীয় ধারণ করিবার জন্য পাত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ওডীন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া যখন সেই পাত্রের মধ্যে সমস্ত উদ্গিরণ করিতে গেলেন তখন তাহারই দুই চারি ফোঁটা মর্ত্ত্যভূমিতে গড়াইয়া পড়িল—ইহারই প্রসাদে জগতে কবিকুলের উদ্ভব। দেবতারা এই পানীয় বিশেষভাবে তাঁহাদের নিজেদের জন্যই রাখিলেন; সময়ে সময়ে তাঁহাদেরই প্রসাদে মরজগতের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত দুই একজন মাত্র ইহার আস্বাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইত। সেই দুই একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি তখন অলৌকিক সঙ্গীত-বিদ্যায় পৃথিবীতে অতুল কীর্ত্তি লাভ করিত। এইজন্য মানবেরা এবং দেবতারাও ওডীনকেই সঙ্গীত কবিতা বাগ্মিতার এবং দেশের চারণদেরও দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতেন।

ব্রাগী (Bragi)

যদিও ওডীনই ছিলেন কবিত্বশক্তির উদ্ভাবয়িতা, তথাপি তিনি নিজে ইহার সদ্ব্যবহার বড় একটা করিতেন না। ব্রাগীই উত্তরাধিকারসূত্রে এই শক্তি লাভ করিয়া সঙ্গীত এবং কবিতার দেবতারূপে পরিচিত। সমস্ত পৃথিবীকে সঙ্গীতে মোহিত করিবার জন্যই যেন ব্রাগীর আবির্ভাব। ব্রাগী ওডীন এবং গুন্‌লডের পুত্র। গুন্‌লডের সেই পর্ব্বতগহ্বরে ব্রাগী জন্মলাভ করিবামাত্রই বামনেরা মন্ত্রপূত একখানা স্বর্ণনির্ম্মিত বেহালা * দিয়া তাহাকে অভিনন্দন করিল এবং তাহাদেরই একখানা তরণীতে স্থাপন করিয়া তাহাকে বিশ্বরাজ্যে ছাড়িয়া দিল। তরণীখানা ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিল, ক্রমে পাতালপুরীর অন্ধকার রাজ্য ছাড়াইয়া মর্ত্ত্যভূমিতে ভাসিয়া উঠিল। ব্রাগী এ পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট অবস্থায় ছিলেন. এইখানে আসিলে সেই সুদর্শন ও নিষ্পাপ তরুণ দেবতা হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন এবং বেহালা টানিয়া লইয়া জীবনের সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সেই চমৎকার সঙ্গীতধ্বনি এক-একবার উঠিয়া স্বর্গরাজ্য পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া আসিতে লাগিল, আবার এক-একবার মৃত্যুর দেবী হেলের (Hel) রাজ্য পর্য্যন্ত নামিয়া যাইতে লাগিল। গীতধ্বনির তালে তালে সেই তরণী সূর্য্যকরোজ্জ্বল সলিলের উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে অবিলম্বে কূলে আসিয়া পৌছিল। তখন সেই সৌম্যকান্তি ও পাপলেশ-শূন্য তরুণ দেবতা ব্রাগী নিঃশব্দে ও রিক্ত বনভূমির মধ্য

---

* এই পুরাণের বামনেরা কারিগরিতে সিদ্ধহস্ত, দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং দেবীদের অভিনব অলঙ্কারাদি প্রায়ই ইহাদের তৈয়ারী। হিন্দুপুরাণের বিশ্বকর্ম্মা না হইলেও গ্রীকপুরাণের ভাল্‌কানের (Vulcan) সহিত এ বিষয়ে ইহাদের খুবই সাদৃশ্য দেখা যায়।

দিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গীতও চলিতেছিল। তাঁহার সঙ্গীতের মোহময় সুরে পথের দুইধারে বৃক্ষসকল নবপুষ্পপল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং পদনিম্নে তৃণ-শয্যাতেও ফুলের বাহার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

এইখানে বামন-কর্ম্মকার ইভাল্‌ডের (Ivald) কন্যা ঈডুন বা ঈডুনার (Idun ; Iduna) সহিত ব্রাগীর সাক্ষাৎ হয়। ঈডুন ছিলেন অক্ষয়-যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি বামনকন্যা হইলেও মাঝে মাঝে পৃথিবীতে আসিয়া বিচরণ করিতে পারিতেন; তখন তাঁহার আগমনে প্রকৃতিতে যেন নবজীবনের সাড়া পড়িয়া যাইত।

এইরূপে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে যাহা হইবার তাহাই হইল। ব্রাগী এবং ঈডুন পরস্পর বিবাহে বদ্ধ হইয়া স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিলেন—সেখানে দেবতারা, এমন কি ওডীনও, তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া লইলেন। শুধু তাই নয়, ওডীনের নির্দ্দেশ অনুসারে তখন হইতেই ব্রাগী স্বর্গরাজ্যের কবি গল্পকথক এবং চারণরূপে নিয়োজিত হইলেন।

ঈডুন বা ঈডুনা (Idun ; Iduna)

ঈডুন ছিলেন বসন্তকাল অথবা অক্ষয়-যৌবনের মূর্ত্ত বিগ্রহ। পূর্ব্বে তাঁহাকে বামন-কর্ম্মকার ইভাল্‌ডের কন্যা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কাহারও কাহারও মতে তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত, অর্থাৎ তিনি অনাদি ও অনন্তকাল স্থায়ী; কাজেই কোন ব্যক্তিবিশেষের কন্যারূপে তাঁহাকে কল্পনা করা যায় না।

আস্‌গার্ডে (Asgard) দেবতাদের বাসস্থানের জন্য উদ্যান-পরিবেষ্টিত ভিন্ন প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু ঈডুনার প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান এবং কুঞ্জসমূহ ছিল সকলের চেয়ে সুন্দর, ঈডুন যেমন ছিলেন বসন্তের দেবী তাঁহার উদ্যানেও তেমনি চিরবসন্ত বিরাজমান। বৃক্ষপত্রসমূহ নববসন্তের সুন্দর বরণে চিরনবীন, পুষ্পনিচয় প্রায়ই অর্দ্ধবিকশিত অবস্থায় শোভমান, তৃণ-শয্যাগুলি সদাই প্রভাত-শিশির-সিক্ত, বসন্তের বায়ু উদ্যানের বৃক্ষপত্র কাঁপাইয়া তৃণ-পুষ্পগুলিকে মৃদু আন্দোলনে দোলাইয়া যেন সমস্ত উদ্ভিজ্জগৎকে চির-যৌবনের আশ্বাস প্রদান করিয়া কুঞ্জ হইতে কুঞ্জে উদ্যানের দিকে দিকে প্রবাহিত হইত; বৃক্ষ-শাখা হইতে পাখীসবও যেন সেই সুরে সুর মিলাইয়া দশদিকে নব যৌবন ও চিরবসন্তের বার্ত্তাই ঘোষণা করিত; বাস্তবিকও উদ্যানটি সর্ব্বাংশে এরূপ সুন্দরভাবে পরি-কল্পিত বলিয়াই ঈডুনের ন্যায় সৌন্দর্য্য ও যৌবন-সম্পন্না দেবীরও উপযুক্ত হইয়াছিল। ঈডুনা দেবী এমনই সৌন্দর্য্যসম্পন্না ছিলেন যে কথিত আছে যখন তিনি তটিনীতটে গিয়া দাঁড়াইতেন তখন জলের মধ্যে সন্তরণকারী মৎস্যসমূহও থমকিয়া দাঁড়াইত যেন সলিলের উপরে ঈডুনা দেবীর যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা তাহাদের শরীর সঞ্চালনে বিনষ্ট না হয়!

ঈডুনাদেবী এরূপ সুন্দর আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিতেন, তাহার উপরে তাঁহার চিরসঙ্গী ছিলেন তাঁহার স্বামী ব্রাগী। ব্রাগী আবার গল্পকথক বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার গল্পের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত—কখনও শেষ হইবার নয়।

অনন্ত যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপা ঈডুনার সঙ্গে একটা সুবর্ণ-ঝুড়িতে আপেল ফল ছিল। এই আপেল আস্বাদনের ফল ছিল অনন্ত যৌবন ও সৌন্দর্য্য লাভ; এই হিসাবে ইহাকে অমৃত-ফল বলা চলে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যখন ঈডুন ব্রাগীর সহিত স্বর্গরাজ্যে প্রথম দেখা দিলেন তখন তাঁহারা উভয়ে দেবতাদের নিকট হইতে বিশেষ সমাদর লাভ করিলেন। ঈডুন যেন এই আদরটুকু নিশ্চিত রূপে স্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্যই দেবতাদের নিকট অঙ্গীকার করিলেন যে তিনি প্রত্যহ দেবতাদিগকে একবার করিয়া ঐ অমৃত-ফলের আস্বাদ প্রদান করিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে * যে এই দেশের দেবতারা অমর নন, কারণ তাঁহাদের জন্মকাহিনীতে মৃত্যুর বীজ উপ্ত ছিল। কাজেই এই অমৃত-ফল দেবতাদের নিকট অমৃতের মতই মূল্যবান্ হইয়া পড়িল। ইহার আর-একটু বিশেষত্ব ছিল এই যে, প্রতিদিন দেবতাদের ভোজন-কালে যখন ঈডুন এই অমৃত-ফল পরিবেষণ করিতেন

* পূর্ব্ব প্রবন্ধে—প্রবাসী বৈশাখ ১৩৩০, ৩৩ পৃষ্ঠা।

তখন তাঁহার ঝুড়ি হইতে তিনি যত ফলই দান করিতেন, ঝুড়ি আবার তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইয়া থাকিত —ঠিক যেন হিন্দু পুরাণের অন্নপূর্ণার চিত্র। এই অমৃত-ফল শুধু দেবতাদের ভোগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ইহার আস্বাদ লাভ করিবার জন্য বামন এবং দৈত্যদেরও আগ্রহ ও চেষ্টার ত্রুটি ছিল না; সে সম্বন্ধে অনেক কাহিনীও আছে।

থিয়াসী (Thiassi)

একদিন ওডীন, হীনির (Hoenir) এবং লোকী (Loki) এই তিন জনে পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইলেন। অনেক পথ আসিয়া তাঁহারা ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত্ত হইলে অন্য কোন খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তাঁহারা একটা বৃষ বধ করিয়া আগুনে চড়াইলেন। কিন্তু অনেক সময় অতীত হইলেও জলন্ত অগ্নিতেও মাংস একেবারে কাচা রহিয়া গিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তখন তাহারা স্বতঃই বুঝিতে পারিলেন যে নিশ্চয়ই কেহ ইহাতে কোনপ্রকার মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছে। চাহিয়া দেখিলেন এক বৃক্ষের উপরে মনুষ্যমুখাকৃতি একটা ঈগল-পাখী বসিয়া রহিয়াছে। পাখীটি তখন নিজেই স্বীকার করিল যে, সেই মন্ত্রপ্রয়োগ করিয়াছে, এবং বলিল যে যদি তাহাকে যথেচ্ছ পরিমাণ মাংসের ভাগ দেওয়া হয় তবে সে তাহার মন্ত্র প্রত্যাহার করিতে পারে। দেবতারা ইহাতে স্বীকৃত হইলে পাখীটি উড়িয়া আসিয়া নীচে পড়িল এবং তাহার ডানার বাতাসে অগ্নি প্রজ্জলিত করিল; তখন মাংস সিদ্ধ হইতে আর বিলম্ব হইল না। পাখীটি তখন পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে তাহার নিজের ভোগের জন্য সমস্ত মাংসের তিন-চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু লোকীর ইহা কিছুতেই সহ্য হইল না। সে একখণ্ড যষ্টি লইয়া পাখীটিকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। লোকী ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে পাখীটি মন্ত্রশক্তিতে সিদ্ধ; তখন দেখিতে দেখিতেই—লোকীও সভয়ে দেখিলেন—সেই যষ্টিখণ্ডের একদিক্ পাখীর পৃষ্ঠদেশে এবং অপরদিক্ লোকীর হস্তদ্বয়ে আঁটিয়া গেল। পাখী উড়িয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে লোকীও বাহিত হইয়া চলিলেন; পথে প্রস্তরে কণ্টকে আহত হইয়া এবং পাখীর আকর্ষণে ক্লান্ত হইয়া লোকী কৃপাভিক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় অগত্যা লোকী মুক্তিলাভ করিবার জন্য যে-কোন সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইলেন।

এই পাখীটি আর কেহই নয়—সে ছিল ঝড়তুফানের নায়ক দৈত্য থিয়াসী (Thiassi)। থিয়াসী তখন লোকীকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত অঙ্গীকার করাইয়া লইল যে লোকী থিয়াসীর জন্য ঈড়ুনাকে তাঁহার অমৃত-ফল সহ স্বর্গ হইতে ভুলাইয়া লইয়া আসিবেন। লোকী এইরূপে থিয়াসীর নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আবার ওডীন ও হীনিরের সহিত স্বর্গে ফিরিয়া আসিলেন। কি সর্ত্তে যে মুক্তি পাইয়াছিলেন সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। মিথ্যা প্রবঞ্চনায় লোকীর ন্যায় কৃতবিদ্য আর কেহ ছিল না—বরং ইহাতেই যেন তাঁহার অতুল আনন্দ। যখন দেবতারা তাঁহার খবর জানিতে চাহিলেন, তখন তিনি নিঃসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিলেন যে পাখীটা তাঁহাকে অন্য ব্যক্তি মনে করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং যখন সে জানিতে পারিল যে তাহার বন্দী স্বয়ং লোকী তখন সে কতপ্রকার অনুনয় বিনয় ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া তবে রক্ষা পায়। লোকী দেবতাদিগকে ত এই বলিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু মনে মনে তিনি কেবলই অভিসন্ধি খুঁজিতে লাগিলেন যে কি করিয়া ঈড়ুনকে থিয়াসীর হাতে সমর্পণ করিবেন।

ইহার কয়েকদিন পরে একদিন ব্রাগীর অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া লোকী ঈড়ুনাকে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং তাঁহাকে গিয়া বলিল যে ঈড়ুনের প্রাসাদেরই অনতিদূরে কতকগুলি আপেল-ফল জন্মিয়াছে, সেগুলিও একেবারে অবিকল ঈড়ুনের অমৃত ফলেরই মত। সেই আদিকালে একবার ইডেন উদ্যানে সর্পরূপী শয়তানের কথায় ভুলিয়া আদিজননী ঈভ আপেল-ফলের মোহে প্রতারিত হইয়াছিলেন। এস্থলেও যেন অবিকল তাহারই পুনরাবৃত্তি। এই দুই কাহিনীতে পাত্র পাত্রী এবং ঘটনার সাদৃশ্যও অতি চিত্তাকর্ষক। ইডেন উদ্যানের শয়তান এবং আস্‌গার্ডের লোকী উভয়েই গ্রীক-পুরাণের লুসিফারের প্রতিরূপ। ইহাদের দ্বারা প্রতারিতা নারী উভয় স্থলেই তত্তৎ সময়ের জন্য স্বামীসঙ্গহীনা, প্রতারণার মূল ভিত্তিও উভয়স্থলে

াপেলফলের মোহ লইয়া—তবে ঘটনার প্রকারান্তর বহুই আছে। ঈডুনও লোকীর কথায় প্রতারিতা হইলেন এবং স্ত্রীজাতিসুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের অমৃত-ফলের ঝুড়ি সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন—মিলাইয়া দেখিবেন যে তাঁহার নিজের ফলের মত এমন ফল আবার কোথায় ফলিতে পারে। এইরূপে লোকীর সহিত বাহির হইয়া ক্রমে আস্‌গার্ড্ ছাড়াইয়া আসিবামাত্রই লোকী সরিয়া পড়িল। অমনিই থিয়াসী উড়িয়া আসিয়া তাহার থাবাতে করিয়া ঈডুনাকে লইয়া তাহার নিজ বাসভূমে থ্রীম্‌হাইম-এর (Thrymheim) নির্জ্জন প্রদেশে আনিয়া ফেলিল।

স্বর্গরাজ্য ছাড়িয়া এমন দৈত্যদানবের দেশে কাহার মন টিকে—বিশেষ একজন স্বর্গের দেবীর পক্ষে। ঈডুন স্বর্গধামের এমন সুখের স্বপ্ন হইতে বিচ্যুত হইয়া বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় মলিন হইয়া যাইতে লাগিলেন। থিয়াসীর জানা ছিল যে ঈডুনের আপেলফল আস্বাদ করিতে পাইলে দেহের শক্তি সৌন্দর্য্য এবং যৌবন লাভ হয়। সেইজন্য সেই অমৃতফলের উপরে তাহার খুবই লোভ ছিল। কিন্তু থিয়াসী ঈডুনকে তাঁহার ফল হইতে থিয়াসীর জন্য বিন্দুমাত্র অংশ দিতেও স্বীকার করাইতে পারিল না। ঈডুন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া না দিলে থিয়াসীর সাধ্য ছিল না যে অমৃত-ফলের আস্বাদ লাভ করে, কারণ থিয়াসী আপেলের ঝুড়িতে হাত প্রবেশ করাইবামাত্রই ফলগুলি এমনই শুষ্ক শীর্ণ হইয়া ঝুড়ির সঙ্কীর্ণ স্থানে গিয়া পড়িয়া থাকে, যেখানে তাহার মত দৈত্যের অঙ্গুলি পৌঁছাইতে পারে না। তখন একমাত্র ঈডুনার শ্রীহস্তের স্পর্শে ফলগুলি আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

দেবতারা ঈডুনকে না দেখিতে পাইয়া প্রথমে মনে করিলেন যে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত কোথায়ও গিয়া থাকিবেন, যখন হয় আসিবেন। কিন্তু এরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে বেশী দিন চলিল না। তাঁহারা শেষবার যে ঈডুনের অমৃত-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার সুপ্রভাব ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহারা যেন জরার আগমন অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের যৌবন এবং সৌন্দর্য্য যে ম্লান হইয়া আসিতেছে তাহা যেন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন।

বসন্তের দেবী ঈডুনার অবর্ত্তমানে প্রকৃতিতেও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। উদ্যানের বৃক্ষপত্রসমূহ মলিন হইতে লাগিল, পরে বিবর্ণ হইয়া গেল, তার পরে শীর্ণ শুষ্ক হইয়া বাতাসের আন্দোলনে যেন শীতে কম্পান্বিত হইয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আকাশে বাতাসেও বসন্তের সে সতেজ ভাব আর নাই, যেন তাহার সুর বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এই নূতন সুর অভাবের সুর—যেন বায়ুভরে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত আস্‌গার্ড্ ছাইয়া ফেলিল। দেবতারা সকলে ভল্‌হল্লাতে (Valhalla ; Walhalla) সমবেত হইতেন, কিন্তু এখন আর তাঁহাদের মধ্যে গল্প কথকতা হয় না, গানও চলে না। সকলেই বিষণ্ণ, সকলের মুখেই একটা চিন্তার ছায়া ক্রমেই গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। ক্রমে ক্রমে বায়ুপ্রবাহেও যেন একটা শ্রান্তি ক্লান্তির ভাব, একটা জরার আভাস, একটা মৃত্যুর সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন দেবতারা দেখিলেন যে কে একজন আগন্তুক আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছে। তাহার শিরে মুকুট, হস্তে রাজদণ্ড, কাজেই দেবতাদের সভায় আসন পাইবার পক্ষে বাহ্যাবয়ব হিসাবে তাহার কোনপ্রকার অসঙ্গতি-দোষ ছিল না। কিন্তু যে অঙ্গুলিতে রাজদণ্ড ধরিয়াছিল সেগুলি ছিল শ্বেতবর্ণ এবং অস্থি-কঙ্কালসার আর মুকুটের নীচে শোভা পাইতেছিল মৃত্যুর দেবী হেলার (Hela) ভীষণ মূর্ত্তি।

দেবতাদের মধ্যে যেন একটা ভয়ের ছায়া পড়িল, তাঁহারা সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। একমাত্র ওডীনের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"লোকীর কন্যা, * আমার নির্দ্দেশ অনুসারে তুমি যে রাজ্যের শাসন-ভার পাইয়াছ তাহা ছাড়িয়া তুমি কোন্ অধিকারে এবং কোন্ সাহসে দেবতাদের সঙ্গে আসন গ্রহণ করিতে আসিয়াছ? তুমি জান দেবতারা কেহই তোমার মত ব্যক্তির সমকক্ষ নন।"

ইহার প্রত্যুত্তরে হেলা তাহার অস্থিকঙ্কালসার অঙ্গুলি

* হেলা ছিল লোকীর কন্যা।

দ্বারা দেবতাদের মধ্যে এক-একজনকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—"ইহার শুভ্র কেশ, উহার শীর্ণ মুখাবয়ব, অপরের শরীরের শ্রান্ত-ক্লান্ত ভাব, কাহারও চোখের অবসন্ন দৃষ্টি, এইসব আমাকে মৃত্যুর অন্ধকার রাজ্য হইতে আহ্বান করিয়া আনিয়া এখানে দেবতাদের সঙ্গে আসন গ্রহণ করিতে অধিকারী করিয়াছে। এই-সকল চিহ্ন দ্বারাই আমি তোমাদিগকে আমার ভবিষ্যৎ অতিথি-রূপে দাবী করিতে আসিয়াছি, আমার রাজ্যে তোমাদের সকলের জন্যই স্থান নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।"

হেলার এক-একটি শব্দ উচ্চারণে তাহার মুখ হইতে বিনির্গত তুষারশীতল বায়ুর স্পর্শে দেবতাদের ধমনীর রক্তপ্রবাহ পর্য্যন্ত যেন শীতে জমিয়া যাইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন আর মুহূর্ত্তমাত্রও এরূপ অবস্থা চলিলে তাঁহারা সকলে প্রস্তরে পরিণত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই হেলা উঠিয়া চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে দেখা গেল দুইজন আগন্তুক আসিয়া আস্‌গার্ডে বাসা লইয়াছে। ইহারা আর কেহই নয়—একজন জরা আর একজন দুঃখ। ইহারা হাত ধরাধরি করিয়া রাস্তায় বাহির হয়। আস্‌গার্ডে সকলেই ইহাদের প্রভাব স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।

দেবতারা তখন রীতিমত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং ঈডুনার সন্ধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হইল। অনু-সন্ধানে প্রকাশ পাইল যে ঈডুনাকে শেষবার দেখা গিয়াছে লোকীর সাহচর্য্যে। তখন ওডীন্ স্বয়ং লোকীকে ডাকা-ইয়া তাহার কৈফিয়ৎ চাহিলেন। দেবাদিদেবের রোষ দর্শনে লোকী স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে সেই প্রতারিত করিয়া ঈডুনাকে থিয়াসীর আয়ত্তে ফেলিয়া দিয়াছে।

মতান্তরে আছে যে অনুসন্ধানে ঈডুনার কোন উদ্দেশ না পাইলে ব্রাগী পরামর্শ দিলেন যে, উর্দ্দার ঝরণার (Urda) নিকটে নর্‌ন্‌স্ (Norns) বা ভাগ্যদেবীদের নিকট ঈডুনার সন্ধানের কথা জিজ্ঞাসা করা হউক; কারণ তাহারা ত সর্ব্বজ্ঞ। একবার সন্ধান পাইলে তখন তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। তখন ওডীনের নির্দ্দেশ অনুসারে ব্রাগী এবং বল্‌ডার (Balder) ভাগ্যদেবীদের নিকট গেলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে জানিয়া আসিলেন যে ইহা লোকীর কর্ম্ম এবং একমাত্র লোকীই আবার ঈডুনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। দেবতারা তখন সকলেই ক্ষেপিয়া উঠিলেন। লোকী বুঝিতে পারিল যে ইহার একটা পথ করিতে না পারিলে তাহার আর রক্ষা নাই। সে তখন সেই সংক্ষুব্ধ দেবমণ্ডলীকে আশ্বস্ত করিল যে সে যখন এই বিপদ্ ঘটাইয়াছে তখন সে-ই আবার ঈডুনাকে উদ্ধার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিবে না।

ফ্রেয়া (Freya) ছিলেন সৌন্দর্য্য ও প্রেমের দেবী। তাঁহার শ্যেন পক্ষীর ডানার মত একটা ডানার সজ্জা ছিল, সেই সজ্জা পরিধান করিলে পাখীর মত আকাশে উড়িয়া যাওয়া যায়। লোকী ঈডুনাকে উদ্ধার করিবার মানসে ফ্রেয়াদেবীর নিকট হইতে সেই ডানার সজ্জা লইয়া শ্যেনপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া বাহির হইল। থ্রীম্‌হেইমে গিয়া দেখিল যে ঈডুনা একাকী বসিয়া স্বামী (ব্রাগী) এবং স্বদেশের (স্বর্গ) জন্য দুঃখ করিতেছেন। তখন শ্যেনরূপী লোকী ঈডুনাকে একটা বাদামে (কাহারও কাহারও মতে একটা চড়ুই-পাখীতে) পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাকে লইয়া আস্‌গার্ডের অভিমুখে রওনা হইল। দৈত্য থিয়াসী মৎস্যশিকারের উদ্দেশ্যে উত্তর-সাগরে গিয়াছিল। ঘটনাক্রমে সেও ঠিক সেই সময়ে ফিরিয়া আসিল। থ্রীম্‌হেইমে আসিয়া দেখিল যে ঈডুনা সেখানে নাই। চারিদিকে চাহিয়া যখন দেখিল যে একটি শ্যেনপক্ষী উড়িয়া যাইতেছে তখন সে অনায়াসেই বুঝিতে পারিল যে এ নিশ্চয়ই কোন দেবতা পক্ষীরূপে আসিয়া ঈডুনাকে লইয়া পলাইতেছে। থিয়াসী তখন তাড়াতাড়ি নিজের ডানার সজ্জা লইয়া ঈগল-পাখীর রূপ ধরিয়া শ্যেনরূপী লোকীর পশ্চাতে ছুটিল। লোকীও শত্রু অনুসরণ করিতেছে জানিতে পারিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিল। দেবতারা সকলে স্বর্গের দ্বারে আসিয়া ব্যাকুল অন্তরে ঈডুনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। লোকী নিজের আপ্রাণ চেষ্টায় এবং দেবতাদের আশীর্ব্বাদে থিয়াসী তাহাকে ধরিয়া ফেলিবার পূর্ব্বেই কোনমতে আস্‌গার্ডের

সোমানার মধ্যে আসিয়া পড়িল। বেচারা থিয়াসী দেবতাদের আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া তাঁহাদের হাতে প্রাণ হারাইল। দেবতারা বসন্তদেবীর (ঈডুনার) অমৃতফলের প্রসাদে আবার শক্তি সৌন্দর্য্য এবং নবজীবন লাভ করিলেন।

এই কাহিনীর প্রাকৃতিক অর্থও এমন কিছু অস্পষ্ট নয়। ব্রাগী ছিলেন সঙ্গীতের দেবতা। শরৎকালে, ব্রাগীর অবর্ত্তমানে অর্থাৎ যখন বনভূমিতে পাখীদের সঙ্গীত নীরব হইয়া যায় তখন, বসন্তের দেবী ঈডুনা যিনি প্রকৃতিতে নবপত্রপুষ্পসজ্জার প্রতিরূপ তিনি, বাধ্য হইয়া চলিয়া যান। সেখানে থিয়াসী অর্থাৎ উত্তরের হিমবায়ু তাঁহাকে কিছুকালের জন্য সেখানে থাকিতে বাধ্য করে; সেখানে তাঁহার জ্যোতি মলিনতা প্রাপ্ত হয়। পরে লোকী (উত্তাপ) অর্থাৎ দক্ষিণের উত্তপ্ত বায়ু যাইয়া ঈডুনাকে লইয়া আসে। ঈডুনাকে আনিবার সময় তাঁহাকে ফলের বীজ অথবা চড়ুই-পাখীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া লয়—বীজ এবং চড়ুই-পাখী উভয়েই বসন্তের অগ্রদূত বলিয়া পরিচিত। ঈডুনের অমৃতফলের প্রভাবে শক্তি সৌন্দর্য্য এবং নবযৌবন প্রদানের অর্থ শীতাবসানে বসন্তকালে প্রকৃতিতে নবজীবন-সঞ্চার।

ঈডুনের পতন অর্থাৎ বসন্তের তিরোভাব একটা বাৎসরিক ঘটনা, আর এই ব্যাপারটা এমনই চিত্তাকর্ষক যে ইহা লইয়া অনেক প্রকার কাহিনী প্রচলিত থাকাই সম্ভব। ইহার মধ্যে একটা কাহিনী অনেক পুরাণকারের নিকটই শুনিতে পাওয়া যায়। ঈডুন একদিন ঈগ্‌ড্রাসিল (Yggdrasil) বৃক্ষের এক শাখার উপরে বসিয়া ছিলেন, হঠাৎ কোন কারণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন—পড়িতে পড়িতে একেবারে নিফ্‌লহাইমের (Nifl-heim) পাতালপুরীতে গিয়া পৌছিলেন। সেই মৃত্যুর রাজ্যে গিয়া তিনি নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া রহিলেন, কিন্তু কম্পিত-কলেবর, যেন তীব্র শীতে অভিভূত হইয়াছিলেন।

ঈডুন ফিরিতেছেন না দেখিয়া ওডীন, ব্রাগী হাইম্‌ডাল (Heimdall) এবং আরও একটি দেবতাকে তাঁহার সন্ধানে পাঠাইলেন। ওডীন দৈবশক্তি-বলে ঈডুনের অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ঈডুনকে শীত হইতে বাঁচাইয়া আনিবার জন্য উঁহাদের সঙ্গে একখানা শাদা নেকড়ে-বাঘের ছাল দিয়া দিলেন। ব্রাগী প্রভৃতি দেবতারা নিফ্‌লহাইমে গিয়া সেই ছাল দিয়া ঈডুনাকে আচ্ছাদিত করিলেন। ঈডুন তাহাতে বাধা দিলেন না, কিন্তু তিনি কিছুতেই সে-স্থান হইতে নড়িতে চাহিলেন না। তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; তাহা দেখিয়া ব্রাগী ধারণা করিয়া লইলেন যে নিশ্চয়ই ঈডুন কোন অমঙ্গলের আভাস পাইয়া থাকিবেন। ব্রাগী তখন তাহার সহযাত্রী দুই দেবতাকে আস্‌গার্ডে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যতদিন ঈডুন মৃত্যুর রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত না হন ততদিন তিনি নিজেও পত্নীর পার্শ্বেই থাকিবেন। ঈডুনের দুঃখ দেখিয়া ব্রাগী এতই কাতর হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার জীবনের প্রধান আনন্দ যে সঙ্গীত তাহাতেও তাঁহার আর উৎসাহ রহিল না; এবং যতদিন পর্য্যন্ত তিনি এই পাতালপুরীতে ছিলেন ততদিন তাঁহার বেহালাও নীরব হইয়া ছিল।

এই কাহিনীর প্রাকৃতিক অর্থও পূর্ব্ব কাহিনীরই অনুরূপ। শরৎকালে বৃক্ষপত্রসমূহ ঝরিয়া পড়ে—ঈডুনার পতন তাহারই প্রতিরূপ। ঈডুন নিফ্‌লহাইমে (অন্ধকার ও কুয়াসার দেশে) পড়িয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছিলেন, বৃক্ষপত্রসমূহও শীতল ভূমিতে পড়িয়া থাকে। ওডীন যিনি এক হিসাবে স্বর্গের প্রতিরূপ তিনি ঈডুনের জন্য শাদা নেকড়ে-বাঘের ছাল পাঠাইলেন। বৃক্ষপত্রসমূহও আকাশ হইতে তুষারপাতে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ব্রাগীর সঙ্গীতে বিরতি শীতাগমে বিহঙ্গ-কাকলীর নিস্তব্ধতার প্রতিরূপ।

শ্রী সত্যভূষণ সেন

অরুণিমা—শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—অল্ ইণ্ডিয়া পাব্লিশিং হাউস্, ৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও ইণ্ডিয়ান্ বুক্ ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১২৯ পৃষ্ঠা। বারো আনা।

কবিতার বই। আজকাল যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের মধ্যে এই কবির স্থান অনেক উচ্চে। এই কবির কবিতা-সংগ্রহ এই অরুণিমা। এই বইএর নাম কবি অরুণিমা রাখিয়াছেন বোধ হয় বিনয়বশতঃ; কারণ এই তাঁর প্রথম কবিতা-পুস্তক, এই তাঁর নবোদয়। কিন্তু এই কবিতাগুলিতে অরুণের ঐশ্বর্য্যও আছে—সৌন্দর্য্য ও স্নিগ্ধ তেজের অপূর্ব্ব সমাবেশ এই পুস্তকের কবিতাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বইখানিতে বড় ছাপার ভুল আছে।

ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র—শ্রী কুলদারঞ্জন রায়। ইউ রায় এণ্ড সন্স্, ১০০ গড়পার রোড, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ পেজি ১০৯ পৃষ্ঠা। সচিত্র। মুখপাতে একখানি রঙীন ছবি আছে। মূল্য কিন্তু খুব সস্তা—মাত্র আট আনা।

কুলদা-বাবু ছোট ছেলেদের বই লিখিয়া হাত পাকাইয়াছেন, চুলও পাকাইয়াছেন, কিন্তু মন পাকাইতে পারেন নাই, তাই এখনও তিনি শৈশবেই আছেন, শিশুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করাই তাঁর প্রধান পেশা।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বিষ্ণুশর্ম্মা ছেলেদের একসঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষা দিবার জন্য পঞ্চতন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। এই দেড়হাজার বৎসর এই গল্পগুলি সমান তাজা আছে, কারণ এগুলি শিশুর মানসক্ষেত্রে আনন্দের রস পাইয়া জীবিত আছে। এই গল্পগুলি সংস্কৃতের বেড়াতে এতদিন বদ্ধ ছিল; সংস্কৃত শিখিয়া এই গল্পের সঙ্গে পরিচয় করিতে যে বয়সে পৌঁছিতে হয়, সে বয়সে পশুপক্ষীর মুখে মানুষের কথা আর তেমন কৌতুক ও আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে না। সেই ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য বালকবন্ধু কুলদা-বাবু এই গল্পগুলিকে ছেলেদের নিজের ভাষায় কাল ও অবস্থার উপযোগী করিয়া রূপান্তরিত করিয়াছেন; এখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই চমৎকার গল্পগুলি অনায়াসে পড়িতে পারিবে এবং একই সঙ্গে জ্ঞান শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিবে, তাহাদের কল্পনা উদ্বুদ্ধ হইবে।

চামেলী—শ্রী নলিনীমোহন রায়চৌধুরী। রায় এণ্ড রায়-চৌধুরী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজি ১৮৪ পৃষ্ঠা। মুখপাতে একখানি রঙীন ছবি আছে। সুন্দর নকল-চামড়ায় বাঁধা। দাম এক টাকা দশ পয়সা।

প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক আলেক্জান্দার দুমা'র পুত্র ছোট দুমা'র প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'কামিল' হইতে এই চামেলী রূপান্তরিত হইয়াছে। এটি একটি পেশাকর রমণীর প্রণয় ও শেষে সেই প্রণয়ীর মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগের কাহিনী। বইখানির রূপান্তরিত কাহিনীটি সুলিখিত হইয়াছে; মূলের সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

প্রাচীন শিল্পপরিচয়—শ্রী গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ। প্রকাশক শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রাজসাহী। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কৃত ভূমিকা সংযুক্ত। ২১২ পৃষ্ঠা। রাজসংস্করণ ২।০ টাকা এবং সাধারণ সংস্করণ ২৲ টাকা।

ভূমিকায় মৈত্রেয় মহাশয় শিল্প কাহাকে বলে ও ভারতের শিল্পের ইতিহাস তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেজস্বী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে যে-সব বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার সূচী ছোট অক্ষরে চার-পৃষ্ঠা-ব্যাপী। প্রাচীন ভারতের বস্ত্র, বস্ত্র-পরিধান-প্রণালী, অলঙ্কার, পাদুকা, ছত্র, চিত্রবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, প্রতিমা-গঠন, প্রসাধন-দ্রব্য, নৌকা, আসন, শয্যা, রত্ন ইত্যাদি বহু বিষয় অসাধারণ অনুসন্ধান গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের সহিত আলোচিত হইয়াছে। বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সকল প্রবন্ধই আমরা মাসিক পত্রিকায় আগ্রহের সহিত পাঠ করি। এই পুস্তকে সেইসব চমৎকার প্রবন্ধের কতকগুলি মাত্র স্থান পাইয়াছে। এই পুস্তকখানি বাংলা সাহিত্যের ও পুরাতত্ত্বের অলঙ্কার। বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের অপর প্রবন্ধগুলিও শীঘ্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

এই ২১২ পৃষ্ঠার বইখানি ছাপিবার জন্য গ্রন্থকারকে ছ-য় ছ-য় জন বড় বড় জমিদারের দ্বারস্থ হইয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হইয়াছে। ইহা ঐ ছয় জন জমিদারের প্রত্যেকের লজ্জার কথা; বঙ্গদেশেরও লজ্জার কথা; তাঁহারা প্রত্যেকেই এতবড় ধনী ও বদান্য সৎকর্ম্মানুরাগী যে একজনেরই এই পুস্তকের মুদ্রণব্যয় বহন করা উচিত ছিল; পুস্তকে আরো বহু বহু চিত্র দিয়া প্রাচীন শিল্পের পরিচয় লাভের সুযোগ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। আমরা আশা করি ও অনুরোধ করি, বেদান্ত-তীর্থ মহাশয়ের পরবর্ত্তী পুস্তক-প্রকাশের ভার ইঁহাদের মধ্যে যে-কেহ একজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লইবেন এবং পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে প্রার্থনার দুঃখ ও লজ্জা হইতে অব্যাহতি দিয়া পাণ্ডিত্যের সম্মান করিবেন ও বিদ্যানু-রাগের পরিচয় দিবেন। এইরূপ পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহায্য করাতে ব্যক্তিবিশেষের উপকার করা হয় না, বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গবাসীর উপকার করা হয়; বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা হয়।

কাশ্মীর ও জাম্মু—শ্রী নরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, কালীপুর, ময়মনসিংহ। প্রকাশক শ্রী কালীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কানিহারী, ময়মনসিংহ। ১২০ পৃষ্ঠা+ক+।৶০+।৶০ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। সচিত্র। আড়াই টাকা।

ভ্রমণ-কাহিনী। কাশ্মীরের সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

স্রোতের ঢেউ—শ্রী হরিহর শেঠ। চন্দননগর পুস্তকাগার ছোট আড়ার ৪৮ পৃষ্ঠা। সুন্দর তলতলে বাঁধা। দাম লেখা নাই।

কতকগুলি ছোট ছোট উপদেশ-সমষ্টি। লেখক 'নিবেদন' করিয়াছেন—"এই সামান্য বইখানি মহাত্মাদের উপদেশমালার অনুকরণে হয় নাই। সংসারের পথে চল্‌তে চল্‌তে যখন যেটা দেখেছি বা দেখে ঠেকেছি এবং শিখেছি তখনই সেগুলি মনের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে যত্ন করে' সংগ্রহ করে' রেখেছি।" একের অভিজ্ঞতা অপরকে জানাইলে তাহার সহজে অভিজ্ঞতা জন্মে। এইজন্য এই ক্ষুদ্র বইখানি মূল্যবান্।

শিখগুরু—শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র। সুলভ গ্রন্থমালা কার্য্যালয়, শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা। ৯০ পৃষ্ঠা। শক্ত কাগজের মলাট। ।৵৹ আনা।

অমর শিখগুরুদের অমৃত কাহিনীর বই। চিরকালই উপাদেয়। ধর্ম্ম ও দেশহিতৈষণার সংমিশ্রণসাধনের জন্য শিখগুরুরা প্রসিদ্ধ। এই গুরুদিগের পবিত্র কাহিনী বারংবার আবালবৃদ্ধবনিতার পড়া উচিত।

মণিমোহন-জীবনী—শ্রী রামকুমার নাথ সঙ্কলিত। প্রকাশক শ্রী বনবিহারী নাথ, ৬ শীতলাতলা লেন, নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা। ২০৭ পৃষ্ঠা। সচিত্র। এক টাকা।

যোগীসম্প্রদায়ের মধ্যে মণিমোহন নাথ একজন মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিত এই পুস্তক। ইহার মধ্যে যোগী-জাতির উৎপত্তি ও অভ্যুদয়ের ইতিহাসও আছে। মণিমোহন স্বজাতি-সেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া বহু মহৎ কার্য্য করিয়া জাতির উন্নতির পথ প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। ইনি সমাজসংস্কারক ও আদর্শচরিত্র ব্যক্তি ছিলেন।

রুদ্রাক্ষ-মাহাত্ম্য—শ্রী কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সঙ্কলিত। কাশী ব্রাহ্মণ-রক্ষা সভা। দুই আনা।

তুলসী-মাহাত্ম্য—ঐ।

গঙ্গোদক-মাহাত্ম্য—ঐ। দাম তিন আনা।

শিবার্চ্চন-তত্ত্ব—শ্রী অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ। কাশী ব্রাহ্মণ-রক্ষণ সভা। ছয় আনা।

ত্রিসন্ধ্যা-তত্ত্ব—মহামহোপাধ্যায় শ্রী যাদবেশ্বর তর্করত্ন। ব্রাহ্মণ-রক্ষা সভা, কাশী। চার আনা।

এই পাঁচখানি পুস্তকের নাম হইতেই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক পুস্তকেই বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের শাস্ত্রজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বাসীদিগের নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য।

মানস-বিকাশ বা পাগলের পাগলামি—শ্রী যোগেশ্বরচন্দ্র দত্ত দরিপা। প্রকাশক শ্রী তেজপাল কানোড়িয়া, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দশ আনা।

এই পুস্তকে এই ছয়টি বিষয় আলোচিত হইয়াছে—(১) আমি, (২) জীবন-চৈতন্য, (৩) ভক্তি, (৪) মনুষ্যত্ব, (৫) স্বপ্ন ও ভালবাসা, (৬) ভজন।

মোকামের বাণিজ্য-তত্ত্ব, দ্বিতীয় ভাগ—শ্রী সন্তোষনাথ শেঠ সাহিত্যরত্ন। দাসগুপ্ত কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৭৪ পৃষ্ঠা। দুই টাকা।

কতকগুলি স্থানে কি কি বাণিজ্য-দ্রব্য পাওয়া যায় ও কিরূপে তাহার ব্যবসা করা যায় তাহারই বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। অনেকের ব্যবসা করিবার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে কোন্ ব্যবসা অবলম্বন করিবেন স্থির করিতে পারেন না। এই পুস্তক পাঠ করিলে তাঁহারা বিশেষ সাহায্য লাভ করিবেন। বঙ্গের যুবকদের এ ব্যবসার দিকে এখন ঝোঁক পড়া আবশ্যক। বাণিজ্য ব্যতীত দেশের লক্ষ্মীশ্রী-লাভ হইবে না।

প্রতীকার—তারকচন্দ্র রায়। আর্ট প্রেস, ১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা। ডিমাই অষ্টাংশিত। ১২০ পৃষ্ঠা।

এই পুস্তকখানিতে সমবায় ও যৌথ কারবার সম্বন্ধে মোটামুটি তত্ত্ব ও কার্য্যপ্রণালী কথাবার্ত্তার ছলে সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার সমবায় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ইহা পাঠ করিয়া গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করা উচিত। সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলে গ্রামের চাষী মজুর প্রভৃতির দৈন্য ঘুচিবে, তাহারা আত্মরক্ষা ও আত্মনির্ভরপরায়ণ হইবে।

মুদ্রারাক্ষস

স্রোতের তৃণ বা স্বরাজ আশ্রমে আট মাস—শ্রী বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রণীত। প্রকাশক শ্রী গোপীনাথ ভারতী, ৭৩, হরিশ্চন্দ্র মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, ১৩২৯।

এই বইখানির বেশীর ভাগ প্রেসিডেন্সি জেলে এবং সেণ্ট্রাল্ জেলে লিখিত। গ্রন্থকার ইহাতে দেখাইতেছেন তিনি কেমন করিয়া স্রোতের তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে গিয়া জেলে ঢুকিয়াছিলেন। লেখকের মনের অবস্থার কথা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। জেলের ভিতরের অনেক খবর ইহাতে জানা যায়। সে-সময়ের যে-সব কথা বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে সে-সব কথার কোন উল্লেখ দেখিলাম না। লেখা মন্দ নয়। একজন স্বদেশসেবক কিরূপ কষ্ট পাইয়াছেন তাহার ইতিহাস সব সময়েই পাঠযোগ্য।

অ

বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস—শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত ও শ্রী রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থল সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২৮৮। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲।

এই তিন খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচিত হইয়াছে।—বেদান্ত বলিতে কি বুঝি ? ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর মত ; বৈদিক কাল ; ব্রহ্মসূত্রের কাল নির্ণয় ; দার্শনিক সূত্র-সকলের সমসাময়িকতা ; ব্রহ্মসূত্রের কালনির্ণয়োপসংহার ; বেদান্তের বিশেষত্ব ; ভারতীয় মতের প্রভাব ; দার্শনিকতার উদ্ভব ; দর্শনের বিভাগ ; ব্রহ্মসূত্রের বিবরণ ; শঙ্কর দর্শন—ভূমিকা ও কালনির্ণয় ; গৌড়পাদাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের জীবন, গ্রন্থ ও মত ; আচার্য্য পদ্মপাদ ; সুরেশ্বরাচার্য্য ; সুরেশ্বরাচার্য্য; সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি ; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা শিবাদ্বৈতবাদ ; শ্রীকণ্ঠাচার্য্য (অসম্পূর্ণ)। গ্রন্থকার বলেন অন্ততঃ ৪০০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে বৈদিক সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার মতে "পাণিনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। হইতে পারে তিনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১০ম বা ৯ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন (পৃঃ ১০)। ব্রহ্মসূত্র পাণিনির বহুপূর্ব্বে এবং মহাভারতের সমসাময়িক। মহাভারতের যুদ্ধকাল খৃঃ-পূঃ ২৫০০ বৎসরের পরে নহে। যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভকাল ৩১০২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ। সম্ভবতঃ ৩১০২ খৃঃ-পূঃ অব্দ হইতে ২০০০ খৃঃ-পূঃ অব্দে মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছিল (পৃঃ ৩৬)। তাঁহার মতে গৌড়পাদাচার্য্য খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে এবং শঙ্করাচার্য্য খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (পৃঃ ১৪৩, ১৬৮)।

এই-সমুদায় বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই, কিন্তু আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ। গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইহা এখনও অসম্পূর্ণ, সম্ভবতঃ আরও ১০।১২ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। যে-প্রকার দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় সম্পূর্ণ হইলে ইহা একখানি

অতি উপাদেয় গ্রন্থ হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন ভাষাতে এপ্রকার গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব।

বুদ্ধ-বোধ বর্ণপরিচয়—প্রথমভাগ—শ্রী যোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। জগৎপুর-সেয়াপালা-নিবাসী শ্রী রঘুনাথ জ্যোতীরত্ন দ্বারা প্রকাশিত। পৃঃ ৫২। মূল্য ।৵০।

গ্রন্থকার বলেন, প্রত্যেক নামের প্রত্যেক বর্ণেরই এক-একটি মূল্য আছে। নামের দ্বারা লোকের প্রকৃতি, সত্বাদিগুণ প্রভৃতি নির্ণয় করা যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম—প্রথম খণ্ড। শ্রী উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (অধ্যক্ষ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুচবিহার) কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রাপ্তিস্থল Students Stall, Cooch Behar। পৃঃ ৫৯। মূল্য ।৵০।

আলোচ্য বিষয় :—(১) কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি (পৃঃ ১—১৫) ; (২) বৈধী বা সাধন ভক্তি (পৃঃ ১৬—৫৯)।

বৈষ্ণব-ভাবে এই সমুদায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

উপমা সংগ্রহ—প্রথম ভাগ। শ্রী উমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা সংগৃহীত ও প্রকাশিত। পৃঃ ৩২। মূল্য চারি আনা। প্রাপ্তিস্থল—গ্রন্থকার, গ্রাম ভাটেরা, জিলা শ্রীহট্ট।

শ্রীমৎ আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থাবলী হইতে ১৪৭ টি উপমা সংগৃহীত হইয়াছে। উপাদেয়।

গীতার আভাস—শ্রী হরিপ্রসাদ বসু, এম-এ, বি এল, প্রণীত। পৃঃ ১২২। মূল্য ৸০। প্রাপ্তিস্থল বোলপুর, বীরভূম, গ্রন্থকারের নিকট।

যাঁহারা গীতার অনুরাগী ও গীতা পাঠ করিতে আগ্রহবান্ কিন্তু সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী নহেন তাঁহাদিগের জন্যই গ্রন্থকার এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন। আশা করা যায় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

এই পুস্তকে গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের ভাবার্থ দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরে দেওয়া হইয়াছে—

(১) গীতোক্ত উপদেশের স্থূল মর্ম্ম।
(২) মানবের সুখান্বেষণ।
(৩) পথের সম্বল।

শেষ দুইটা প্রবন্ধ 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

সালোমে—শ্রী শৈলেশনাথ বিশী, বি-এল প্রণীত। দি বুক কোম্পানী, ৪।৪ এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

অস্কার ওয়াইল্ডের একাঙ্ক নাটকের অনুবাদ। বইখানি সমস্তই পড়িয়াছি—এক রকম মন্দ লাগে নাই ; তবে অনুবাদ বলিয়া মাঝে মাঝে বড় বেশী বুঝিতে পারা যায়। অনুবাদের দোষ যাহাই থাকুক, বইখানি একবার আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারা যায় না।

ছেলেদের গল্প—শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। সিটিবুক সোসাইটি, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ছয় আনা।

ইংরেজি 'মাষ্টারম্যান রেডি' নামক পুস্তকের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ—অবশ্য পুস্তকের কোথাও এই কথার উল্লেখ নাই। অনুবাদ খুব সুন্দর হইয়াছে। ছেলেদের খুব ভাল লাগিবে। পুস্তকের শেষে একটি কবিতায় গল্প আছে।

তৃণগুচ্ছ—শ্রী গিরিবালা দেবী প্রণীত। চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ। ১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ১৷০।

গল্পের বই। গল্পগুলি এক রকম চলনসই। গ্রামের চিত্র লেখিকার হাত দিয়া বড় স্নিগ্ধ এবং করুণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বিধির বিচার—শ্রী নলিনাক্ষ হোড় প্রণীত। বোস এণ্ড কোং, ১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৷০।

উপন্যাস। ভাল লাগিল না। প্লটের মধ্যে অতিরিক্ত যা-তা বোঝাই করা হইয়াছে, তাহাতে বইখানির মধ্যে কোন-কিছুই ভাল করিয়া ফুটিতে পারে নাই।

গ্রন্থকীট

আত্ম-সমর্পণ

ওগো দুঃখ, ওগো আমার বিজয়ী সম্রাট্,
আত্ম-দানের লিপিখানি এনেছি আজ ব'য়ে—
নম্রশিরে করব তাহা পাঠ।
বিরাম-বিহীন সুখের মোহে মগ্ন ছিল প্রাণ ;
হঠাৎ তুমি কখন এসে আমার হৃদয়-দেশে
করলে চরণ দান,
তখন প্রভু, তোমায় আমি চিন্‌তে পারি নাই,
বিপুল বলে পথ আগলি দাঁড়িয়েছিলাম তাই,—
রুদ্ধ ক'রে দিয়েছিলাম যা' ছিল পথ-ঘাট॥

সত্যিকারের তুমিই রাজা, তোমারি সব দেশ,
সুখ ছিল সে হৃদয় জুড়ে, মিথ্যা তাহার বেশ—,
এত বড় সত্য কথা বুঝিনি এক লেশ !
হঠাৎ সে ভুল ভেঙে গেছে, বুঝেছি আজ থির—
এই জীবনে তোমার ছিল অধিকারের দাবী,
তুমিই জয়ী বীর !
ক্ষমা কর ধৃষ্টতা মোর, দাও চরণে ঠাঁই,
আইন-মানা প্রজা আমি—বিদ্রোহ আর নাই !
এখন তুমি যেমন খুশী বিছাও রাজ্য-পাট॥

গোলাম মোস্তফা

প্রবাসীর আত্মকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঘরের নামিবামাত্রই খুব গরম বোধ হইতে লাগিল; ঐ গরমটা একটু বেশী গুরুভার—ভিজা ভিজা। চীনা-পর্দ্দার হাল্‌কা বাঁশগুলা একটা চলন্ত কম্পমান ছায়া বিস্তার করিয়াছে; এই উষ্ণ ছায়ায় না পাওয়া যায় আরাম, না পাওয়া যায় বিরাম। কতকগুলা পাথরের ধাপ দিয়া আমরা উপরে উঠিলাম; "মান্দারীন" অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মচারীর দ্বারপ্রকোষ্ঠ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইল; ইহার ফাটক ভারতীয় ধরণের; ফাটকের মাথায় নহবৎখানার মত একটা ঘর, সেই ঘরে প্রহরীর একটা কুলঙ্গী আছে, আর একটা ঢাক আছে।

মনে হইতেছে যেন এই গৃহের সকলেই এখনো নিদ্রাভিভূত—যদিও প্রাতঃসূর্য্য এরই মধ্যে স্বীয় দারুণ জ্বলন্ত কিরণে দিগ্‌বিদিক্ আলোকিত করিয়াছে।

একা আমরাই শুধু এই ক্ষুদ্র বাগানটিতে রহিয়াছি। বাগানটি একটু পুরাতন ধরণের—কিম্ভূতকিমাকার ধরণের। বাগানের মধ্যস্থলে অলঙ্কারস্বরূপ একখণ্ড চৌকোণা দেয়াল অবস্থিত—আনাম্ প্রদেশে এই-রূপ ইমারতি অলঙ্কারের খুব রেওয়াজ আছে। আর একটা খুব প্রাচীন "বাস্ রিলীফ" মূর্ত্তি পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান।

চীনামাটির ফলকের উপর চিত্রহরিণ এবং অন্যান্য কাল্পনিক পশুর মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; চীনী ধরণের গাছের তলায় উহারা অবস্থিত, গাছের পাতাগুলা সবুজ ঝিনুকে গঠিত। ছোট ছোট পথ আড়া-আড়ি ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। বালু-মাটির উপর পেরিউইঙ্ক্‌ল্ ফুল, ডালিমের ফুল, ঘোর কালো রঙের অতি ক্ষুদ্রকায় বঙ্গীয় গোলাপ ফুটিয়া আছে। একটা নিস্তব্ধতা ও সূর্য্যের প্রখর তাপে দিগ্‌বিদিক্ অভিভূত। গুরুভার কালো কালো প্রজাপতি উড়িয়া বেড়াইতেছে। উদ্যানের পশ্চাদ্ভাগে একটা গৃহ। গৃহ একেবারেই রুদ্ধ।

হোয়ে মহাশয় স্বীয় বানর-কণ্ঠস্বরে ডাক দিতেছেন, কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন, চীৎকার করিতেছেন। তখন কতকগুলা নীচাশয় ভৃত্য ভীতভাবে তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দিল। আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। এই উদ্‌ঘাটিত গৃহ এক্ষণে একটা গভীর-পরিসর চালাঘরের মত মনে হইল। জনপ্রাণী নাই;—অন্ধকার।

ভৃত্যেরা মান্দারীন্‌কে জাগাইতে গেল। আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে এই স্থানটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। না জানি কোন্ সুদূর অতীত যুগের কতকগুলা অকেজো স্থাবর জিনিস, রাজকীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের জিনিস, রাজবৈভব প্রদর্শনের জিনিস, কতকগুলা চামর, কতকগুলা রাজছত্র, কতকগুলা পাল্‌কী, অন্ধকার চাঁদোয়া-ছাদের গায়ে, মাকড়সার জাল ও ধূলারাশির মধ্যে, হুকে ঝোলানো রহিয়াছে। একটা তালপাতার পর্দ্দার আড়ালে, ঘরের একটা কোণে, তুরানের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক সমস্তই রহিয়াছে—দাঁড়িপাল্লা, কল্‌সী, শাস্তির দণ্ডকাঠ, পা পিষিবার জন্য শক্ত কাঠের সাঁড়াশী, প্রেতাত্মাদিগকে আবাহন করিবার জন্য ঘণ্টা, প্রহার করিবার জন্য কতকগুলা বেত।

আবাসগৃহের মধ্যস্থলে, একটা সম্মানের টেবিল; টেবিলের চারিধারে খোদাই-কাজ-করা পুরাতন বেঞ্চের উপর বসিয়া আমরা মান্দারীনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মান্দারীনের শুভাগমন কখন হইবে কে জানে।

পরিশেষে, একটা পিছনের দরজা দিয়া, চওড়া-আস্তিন-ওয়ালা নীল ক্রেপের পরিচ্ছদ-পরিহিত একজন অতি বৃদ্ধ খুব কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। থাব্‌ড়া-থোব্‌ড়া এশিয়া-খণ্ডসুলভ মুখশ্রী সত্ত্বেও, মুখখানা দেখিতে মন্দ নয়। চুলের উপর যেন সাদা বরফের গুঁড়া ছড়ানো এবং তাহার এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো ছাগলে-দাড়ি মোঙ্গলীয় ধরণে ছাঁটা; মনে হয় যেন একটা হলদে রংয়ের মুখসে লাগানো এক গুচ্ছ সাদা বালাখি ঝুলিতেছে।

তিনি খুব ঘাড় হেঁট করিয়া চিন্‌চিন্ অভিবাদন করিলেন; তাহার পর আমার প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিয়া শান্তি স্থাপনের নিদর্শন স্বরূপ, ভীতিবিস্ময়সহকারে হস্তমর্দন করিলেন। তাহার পর, টেবিলের চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে-সব নাবিক আমার সহিত একত্র বসিয়াছিল সকলেরই হস্ত মর্দ্দন করিলেন। তাঁহার লম্বা লম্বা নখের দরুন এবং চওড়া আস্তিনের ভাঁজের দরুণ, এইরূপ হস্তমর্দ্দন করিতে তাঁহার একটু বাধো-বাধো ঠেকিতেছিল।

এই বড় অন্ধকেরে ঘরটা ক্রমে ক্রমে লোকে ভরিয়া গেল; তাহারা নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া, কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকগুলি বৃদ্ধ 'মমি'র মত পিঙ্গলবর্ণ, পরিচ্ছদ অতি দীন ধরণের; চোকা মাথা; হূনজাতিসুলভ মুখমণ্ডল। একদল চীনা, মুখে ধূর্ত্তামীর ভাব, প্রথম শ্রেণীর মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া আমাদের নিকট পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়াছে। তা ছাড়া, আনাম্ প্রদেশের বিদ্রোহ উত্তেজক অনেক বদমায়েসও উপস্থিত আছে। এই-সব এশিয়া-সুলভ মুখগুলার পশ্চাতে, গৃহের শেষ প্রান্তে এখন স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে—কতকগুলা ভাঙ্গা-চোরা কিম্ভূতকিমাকার জিনিস সর্ব্বত্র ঝুলানো রহিয়াছে, যথা—ঢাক ঢোল, কতকগুলা ন্যাক্‌ড়া কাপড়, কতকগুলা পাঙ্খা যাহা পূর্ব্বকালে সোনার দৈত্যদানবের মূর্ত্তিতে বিভূষিত ছিল, এক্ষণে এই-সমস্ত ধূলার ঘর্ষণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। মৃত জগতের এই-সমস্ত পুরাতন পুতুলের মধ্যে আমার নাবিকেরা বিজয়সুলভ খাতির-নদারদ্‌ভাবে বসিয়া আছে, মুখে বেশ জীবন্তভাব, গর্ব্বোন্নত ভাব, অবাধ সহজ ভাব।

যখন আমি "তুয়ান-আন্"এর খণ্ডযুদ্ধের কথা, আমাদের জয়লাভের কথা, ও্যের রাজার সহিত আমাদের সন্ধিস্থাপনের কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন সকলে নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। দো-ভাষী আমার কথাগুলা ধীরে ধীরে ভাষান্তর করিতে লাগিল; আমাদের চারিপাশে হাত-পাখা ও চামর ব্যজনের লঘু শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনা যাইতেছিল না। তথাপি, উহাদের মনোযোগপূর্ণ মুখে কোন-প্রকার আবেগের চিহ্ন দেখা গেল না। খুব সম্ভব পরাজয়ের খবরটা উহারা পূর্ব্বেই রাজার বার্ত্তাবাহকের মুখে শুনিয়াছিল। এখন কেবল উহাদের মধ্যে ইসারা বিনিময় চলিতেছে, উহাদের উপরদিকে-তোলা ছোট-ছোট চোখের চোখ-টেপাটিপি চলিতেছে,—যেন আপনাদিগের মধ্যে এই কথা চলিতেছে—"ভালই হয়েছে; যা আমরা শুন্‌লেম তা ভালই মনে হচ্ছে; ওঁর বর্ণনাটা খুব ঠিক।"

অবশেষে, যখন আমার দেখা-সাক্ষাতের কাজ শেষ হইল, তখন বৃদ্ধ মান্দারীন্ ভীত হইয়া পড়িল। ফরাসী জাহাজের উপর উঠিতে হইবে এই কথা মনে করিয়া বৃদ্ধ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

প্রথমে সে একটু তর্কবিতর্ক করিল, তাহার পর অনুনয় করিতে লাগিল।—যখন যাইতেই হইবে তখন অবশ্যই যাইবে ; কিন্তু বন্দীর ন্যায় আমাদের সহিত একলা, আমাদের সাদা জাহাজে উঠিবে না। এই কথা মনে করিয়াই তাহার ভয় হইতেছিল, কষ্ট হইতেছিল আপনার বাঁচোয়ার জন্য ; এবং জাঁকজমকের উদ্দেশে ও সুবিধার হিসাবে—যদি আমরা তাহার কথার উপর বিশ্বাস করি—আমাদের একঘণ্টা পরে অনুচরবর্গের সহিত ছত্রাদি লইয়া সবৈভবে নিজের নৌকা করিয়া যাইবে বলিল।

তাহার পলিত কেশ ও মুখের অকপট ভাব দেখিয়া আমি তাহার সমস্ত কথাতেই সম্মত হইলাম। এখন আমরা একেবারেই বন্ধুর সামিল হইয়া পড়িলাম। তখন সহকারী কর্ম্মচারীরা,—আর কিছুই শুনিবার নাই দেখিয়া, নিম্নস্বরে কথা কহিতে কহিতে, "চিন্‌চিন্‌" ও নতশিরে অভিবাদন করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

তথাপি, উহারা আমাদের জন্য বেশ সুস্বাদু চা প্রস্তুত করিয়াছে, যাইবার আগে এই চা আমাদিগকে পান করিতে হইবে। নীলরঙের ছোট ছোট চীনামাটির পেয়ালায় মান্দারীন্‌ নিজহস্তে চা পরিবেশন করিতে লাগিলেন। পেয়ালা খালি হইবামাত্রই আবার ভরিয়া দিতে লাগিলেন। চায়ের থালাটা প্রজাপতি ও কীট-পতঙ্গের আকারের ঝিনুকে খচিত—অতি চমৎকার ; চা-দানীটা পুরাতন চীনা বাসনের ; তাঁবার কাত্‌লীটা যেন চিত্রশালার কতকগুলা খণ্ড ; কিন্তু আমাদের ৭ জনের জন্য কেবল একটা সীসার চামচ ;—চিনি ঘুঁটিবার জন্য ঐ একই চামচ সকলের কাছে ফেরানো হইতে লাগিল। কোণালু আকারের সূচ্যগ্র সিগারেট, হাতে গুটাইয়া তাড়াতাড়ি আমাদিগকে দিল। কারণ, এই সময় বিদায় লইবার জন্য আমরা উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য মান্দারীন বাহির হইয়া স্বীয় সূর্য্যদগ্ধ উদ্যানের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন। আদব-কায়দার নিয়মানুসারে এক ভৃত্য তাঁহার সম্মুখে একটা কালো ছাতা ধরিল—ছাতাটা নিনিভা-নগরের একটা বাস্‌-রিলীফের মত। মনে হইতে লাগিল যেন প্রাচীন এসিয়ার না জানি কোন্‌ সুদূর অতীত যুগের একটা স্মৃতি সমস্ত পদার্থের মধ্যে আকাশে বাতাসে চরিয়া বেড়াইতেছে ; বর্ত্তমান শতাব্দীর ধারণাটা আমাদের মন হইতে ক্ষণকালের জন্য বিলুপ্ত হইল।

বাঁশঝাড়ের নীচে একটা সরু পথে কতকগুলা লোক নিঃশব্দভাবে খুব ছোট ছোট গোল খাঁচার ভিতর কতকগুলা মুরগ-মুর্গী পুরিয়া আমাদিগের নিকট বিক্রয় করিবে বলিয়া অপেক্ষা করিতেছে। তার পর ডিম, কলা, পাতিহাঁস ও নেবুও বিক্রয়ার্থ রাখিয়াছে। মাসিয় হোয়ে আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কোনও জিনিষ কিনিতে হইলে লোক এই বাজারে আসে।" আমরা দেখিয়াছি নদীর অপর পারে সমস্ত লোক আসিয়া থাকে।

শীঘ্রই আমরা নদী ছাড়াইয়া গেলাম। এক্ষণে আমরা তুরানের জনতার সহিত মিশিব। আমাদের খুব আমোদ হইবে। তা ছাড়া, জাহাজের পীড়িত লোকদিগের জন্য ডিম ফল ও অন্যান্য তাজা আহার-সামগ্রী পাঠাইতে হইবে।

কিন্তু এই দেখ, আমাদের সেই পুরোমাস্তুলের নাবিক যখন তার দাঁড়ে বসিতে যাইবে সেই সময় হঠাৎ তার মন বদলিয়া গেল—একটু পূর্ব্বে সেই রমণীদের সম্বন্ধে তার যে মনোভাব ছিল, হঠাৎ সেই মনোভাবে একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। এই নদীর তীর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আবার তাহাদের সহিত একবার দেখা করিবার জন্য আমার নিকট অনুমতি চাহিল। বড়মাস্তুলের নাবিকও তাহার সঙ্গে যাইবে বলিল।

একটা ছোট পুষ্পিত পথ দিয়া উহারা সেখানে শীঘ্রই উপস্থিত হইল। সেখানে খুব অল্পক্ষণ থাকিয়া উহারা একটা ঝাপান-নৌকা করিয়া ফিরিয়া আসিল।

—"আঃ না—না—এই গ্যালাণ্ট্রী বড়ই বিপদ্‌জনক ; এতে খুবই অনিষ্ট হবার কথা। কতকগুলি মানবাত্মা আমার হেপাজতে আছে ;—আমি খুব রাগ প্রকাশ করে' অস্বীকার করলেম।"

এই বাজারটা অতি জঘন্য—কত পোকা মাকড় কিল্‌বিল্‌ করিয়া বেড়াইতেছে।

একটা চৌকোণা খোলা জায়গায় বাজারটা বসিয়াছে। মাথার উপর প্রখর রৌদ্র। বাজারের প্রত্যেক ধারে ডবল-সারি চালা-ঘর ; সেই-সব চালা-ঘরে বিক্রেতারা বসিয়াছে। শেষ একটা প্রান্তে মন্দির-প্রাচীর ; এই প্রাচীরের উপর চীনামাটির পুরাতন ক্ষুদ্রাকৃতি বিকট জীব-সকল উপবিষ্ট।

চা-প্রস্তুতকারীরা দৈত্যদানা-চিত্রিত নীল রঙের পেয়ালায় সকলকে গরম-গরম চা পরিবেশন করিতেছে। তাহার পর মেঠাইওয়ালা কিম্ভূতকিমাকার চীনা-পুতুলের বিক্রেতা, মূর্ত্তিবিক্রেতা—ইহারাও আছে, সবুজ পাতায় রক্ষিত কিমাই করা মাংসের ছোট ছোট গুলি, মাছির ডিমে তৈরী আমলেট ; ধূম-বাসিত, ছাপ-দেওয়া, কড-মৎসের ধরণে চ্যাপটা-করা কতকগুলা শুকানো কুকুর ; গোটা শূকর কতকগুলা বেতের ভিতর আবদ্ধ রাখা হইয়াছে—এবং ধরিবার জন্য একটা মুষ্টি-হাতল তাহাতে লাগানো আছে। যে-সব জিনিস দেবতাদের কাজে আসে ;—যথা লাল চর্ব্বির বাতি ও ধূপ-কাঠি প্রভৃতি রহিয়াছে। লোকগুলা অতি নোংরা, সকলেরই দীন দশা, আর পরস্পরের মধ্যে কেবলি গালিগালাজ চলিতেছে।

মাথার উপর সূর্য্যের প্রখর কিরণ। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর দল হস্ত প্রসারিত করিয়া লোকদিগকে বিরক্ত করিতেছে। পাঁচড়া-গাত্র ভিক্ষুকেরা বানর-সুলভ দক্ষতা সহকারে গা চুল্‌কাইতেছে। কতকগুলো লোকের দেহ কুষ্ঠক্ষতে আচ্ছন্ন ; মুখ ঘায়ে ভরা ; কতকগুলা বুড়ীর ঠোঁট নাই, চোখের পাতা নাই ! এবং নাকের পরিবর্ত্তে একটা ছিদ্র মাত্র আছে—যেন মৃত্যুকে আঘ্রাণ করিতেছে।

প্রথমে, যেন কি-একটা ভয়ে উহারা আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল ; এখন আবার আমাদিগকে দেখিবার জন্য নিকটে আসিল। এই জনতার মধ্যে কতকগুলি শিশু, উহাদের অদ্ভুত রকমের ছোট ছোট মুখ, সুন্দর জ্বলজ্বলে চোখ, একেবারে নগ্ন, মাথায় উঁচু করিয়া ঝুটি বাঁধা। কতকগুলি তরুণী, উহাদিগকে সুশ্রী বলিলেও চলে ; লম্বা চুল, গ্রীক্‌ধরণে বাঁধা ; বিড়ালের মত চোখ। দাঁত সর্ব্বদাই কালো রঙে রংকরা ; চুন-দেওয়া পান চিবাইতেছে, তাহাতে করিয়া ঠোঁটের উপরেও একটা লালের পোঁচ পড়িয়াছে। কতকগুলি অল্পবয়স্ক যুবক ; বক্ষদেশ নগ্ন, ছিপ্‌ছিপে সুবঙ্কিম গঠন ; স্ত্রীলোকের মত সুন্দর কেশগুচ্ছ ; কিন্তু পরে পরিণত বয়সে ইহারা কুৎসিত দেখিতে হইবে ; তখন উহাদের দাড়ির চুল গজাইতে সুরু করিবে—seal মৎস্যের ঠোঁটের লোমের মত—১০।১২টা কর্কশ লম্বা লোম ঝুলিয়া পড়িবে।

এই-সকল মুখ বড় বড় টুপির ছায়ায় আচ্ছন্ন ; এই টুপির প্রত্যেক পাশ হইতে, ঘণ্টা নাড়িবার দড়ির মত এক-একটা ঝাপ্পা ঝুলিতেছে ; এই ঝাপ্পাগুলা ঝিনুকের ফুলের দ্বারা বিভূষিত ; ঝিনুকে প্রায়ই বাদুড়ের মূর্ত্তি অঙ্কিত। যখন বাতাস বহিতে থাকে তখন উহারা দুই হাতে দুই ঝাপ্পা ধরিয়া থাকে, পাছে বাতাসে উড়িয়া যায়।

ক্রমে অল্প অল্প করিয়া, বড় বড় মুর্গী ও খুব সুন্দর সুন্দর কদলীতে আমাদের তিমি-জাহাজ ভরিয়া গেল।

আমরা সজ্জনের মত খরিদপত্র করিলাম—মন কি মূল্যও খুব

বেশী বেশী করিয়া দিলাম। নাবিকেরা বার-দরিয়ার দীর্ঘকালব্যাপী খাদ্যের অভাব ভোগ করিবার পর, এক্ষণে পেট ভরিয়া ফল খাইতে লাগিল এবং নিকটস্থ রমণীদিগকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার জন্য টপি উঠাইতে লাগিল। তা ছাড়া এক্ষণে নাবিকেরা ধনাঢ্য। সাপেক (এক প্রকার ছিদ্র করা মুদ্রা ;—ছিদ্রের ভিতর দিয়া রজ্জু চালাইয়া দেওয়া হয়) মুদ্রার কয়েক সারি বা নহর উহাদের কোমরে মালার মত জড়ানো রহিয়াছে। এক্ষণে ডাঙ্গায় নামিবার আনন্দে এবং এতগুলা কলা খাইতে পাইয়াছে বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, যে মূল্যই উহাদের নিকট বিক্রেত্রীরা চাহিতে লাগিল তাহাই নাবিকেরা যদৃচ্ছাক্রমে উহাদিগকে দান করিতে লাগিল ; নাবিকেরা উহাদিগকেই হিসাব করিতে বলিল এবং উহাদের ইচ্ছামত উহারা নিজেই নাবিকদিগের কটিবন্ধ হইতে মুদ্রা খুলিয়া লইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে যাহারা একটু ভাল দেখিতে ও তরুণবয়স্কা তাহারা এই অধিকার আরও বেশী করিয়া লাভ করিল।

আমাদের আর আধঘণ্টা সময় আছে। আমরা সকলে মিলিয়া এই-বার তাড়াতাড়ি তুরান্ দেখিবার জন্য যাইতেছি।

সরু সরু বালুময় পথ ; উহার ধারে ধারে খুব সবুজ ঝোপ-ঝাড় অথবা বাঁশের বেড়া। এই পথ ধরিয়া আমরা সারি বাঁধিয়া চলিয়াছি। ঝোপ্‌ঝাড়ের মধ্যে কতকগুলা চাপ্পর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ; এবং কুঞ্চিত-পত্র-বিশিষ্ট খুব ছোট ছোট সুপারী-গাছ দেখা যাইতেছে—খাগড়ার ডাটার প্রান্তভাগে যেন সামরোক্ পাখীর পালকের গুচ্ছ। এখানে উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য্য, কিন্তু একটিও বড় গাছ নাই।

যতগুলা বাড়ী ততগুলা মন্দির। অতি ক্ষুদ্রাকৃতি পুরাতন মন্দির ; ভিতরের সমস্ত কদাকার মূর্ত্তিগুলি সমেত উহাতে ৫।৬ জন লোক ধরে কি না সন্দেহ। মন্দিরকে বিভূষিত করিবার জন্য মনে হয় যেন পুরাকালে নরকের সমস্ত কল্পনা উহার উপর পুঞ্জীভূত করা হইয়াছিল। সকল প্রকার ভীষণ ও বীভৎস জিনিস্ উহার ছাদে ও দেওয়ালে চিত্রিত খোদিত ও উৎকীর্ণ রহিয়াছে - যথা কাঁকড়া ও বিছার মালা ; বলয়াকার কীটসমূহের পরস্পর জড়াজড়ি—মনে হয় যেন কতকগুলা কেঁচো ; থাবা-ওয়ালা শিং-ওয়ালা লম্বা লম্বা কতকগুলা শুঁয়া-পোকা ভীষণভাবে চোখ পাকাইয়া আছে ; ছোট ছোট বিকটাকার জীব—অর্দ্ধকুকুর অর্দ্ধদানব – একই রকম অবর্ণনীয় ভাবে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। সর্ব্বগ্রাসী সূর্য্যকিরণ, সাগরোত্থিত মলিন কুয়াসা, "টাইফুন" ঝটিকার প্রলয়ঙ্কর বাতোচ্ছ্বাস, এই-সকল জিনিসকে গুঁড়াইয়া দিয়াছে, ফাটাইয়া দিয়াছে, প্রচ্যুত করিয়াছে, তথাপি বহু শতাব্দীর ধূসর প্রলয়ভস্ম গায়ে মাখিয়া, একটা তীব্র জীবন্ত ভাব এখনও উহারা বজায় রাখিয়াছে। উহারা খাড়া হইয়া আছে, বক্রভাবে নুইয়া আছে, কাঁটা-খোঁচা উঁচাইয়া আছে এবং প্রবেশ-পথে আড়চোখে-আড়চোখে দেখিতেছে ; যেন, যে-কেহ দুঃসাহসী হইয়া এখানে আসিবে, অমনি প্রচণ্ড রোষভরে তাহার উপর উহারা লাফাইয়া পড়িবে।

চারিদিকে বালুময় ছোট ছোট বাগান ; এই বাগানের অদ্ভুত গাছগুলা উত্তাপে ও আলোকে মূর্চ্ছিতপ্রায় ; কতকগুলা খালি দেরের ভিতর—অন্যান্য অনির্দ্দেশ্য পশু মৃত্যুকে যেন মুখ ভেঙাইতেছে। এবং রাস্তার ধারে ধারে সেই একই রকমের প্রস্তর-যবনিকা স্থাপিত। যবনিকাগুলা অদ্ভুত রকমের মালাভূষণে বিভূষিত, ভীতিপ্রদ দেত্যদানবের মূর্ত্তিতে আচ্ছন্ন।

মন্দিরের অভ্যন্তরে জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্য মূর্ত্তিমান্ ; ধূলা ও যবক্ষারের প্রভাবে দেয়ালের পুতুল ও ঝিনুকের উৎকীর্ণ লিপিগুলা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার দেবালয়ের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিতেছে ; ইহার আলোকে কীটদষ্ট-শ্মশ্রুশোভিত বিকটাকার দৈত্যদানবদিগকে ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না। একটা ধূপধুনার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে, গুহাগহ্বরসুলভ একটা ছাতা-ধরা গন্ধ পাওয়া যাইতেছে ; এবং শেষ প্রান্তে, একটা বেদীর উপর, আধো-আঁধারের মধ্যে লম্বোদর, অশ্লীল বুদ্ধ, প্রতীকস্বরূপ কতকগুলা বক ও কতকগুলা কচ্ছপের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে অট্টহাস্য করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাঙা পরী

সবুজ রঙের রঙীন মহলে
রাঙা পরী এক গান করে
উষার অরুণ-কিরণ-মাখান
শিশিরের জলে স্নান করে !

রূপের ঝর্ণা, হাসির কমল
শোভা সুষমায় সদা টলমল
বুকভরা তার মধু পরিমল
অকাতরে সে যে দান করে !

প্রবীণ পাচক ক্ষুব্ধ হবেন
হয়ত এ কোন রূপকথা
দোহাই আমার সঙ্গে আসুন
মেটাব আমি সে ক্ষুব্ধতা !

ওই যে আড়ালে সবুজ পাতার
রাঙা গোলাপটি কেমন বাহার—
আপন খেয়ালে ফুটেছে কেমন
দেখুন না চেয়ে প্রাণ ভরে'—
সবুজ রঙের রঙীন মহলে
রাঙা পরী ওই গান করে !

"বনফুল"

কাব্য-কথা

কাব্যের আদর্শ ও কবিতা-বিচার

আজকালকার দিনে কবি ও কাব্যের সংখ্যা নেই, কিন্তু রীতিমত কাব্যবিচার নেই বল্‌লেই হয়। আগে কোনো কোনো মাসিকপত্রে কাব্যের বিচার—নিন্দাই হোক প্রশংসাই হোক—কখনো কখনো দেখা যেত, বড় বড় দুই-একখানি মাসিকে মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনার প্রসঙ্গে কবিতার দোষ-গুণ দেখানো হ'ত; আজকাল তাও বড় একটা দেখা যায় না। এক-আধখানা মাসিকে এখনো এই ধরণের আলোচনা সময়ে সময়ে চোখে পড়ে, সেও সেই আগেকার মত—কেবল নিন্দা-প্রশংসা, ভাল-মন্দ লাগার কথা ছাড়া আর কিছু নয়; বরং যেটুকু যুক্তি-বিচারের চেষ্টা মাঝে মাঝে করা হয়, তাতে কাব্যবস্তুকে বেশী করে' অপমান করাই হয়—নিতান্ত প্রচলিত সংস্কারেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। হয়ত কোনোদিকে তার কিছু উপকারিতাও আছে। নবীন কবিযশঃপ্রার্থীদের রচনায় শব্দ অর্থ ও ব্যাকরণস্বত্বের যে ব্যভিচার ঘটে, অন্ততঃ সেগুলি সংশোধন কর্‌বার চেষ্টা এ-সকল সমালোচনায় আছে, এঁরা কবি পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাজ করেন। আজকালকার মাসিকপত্রগুলিতে কবিতার যে একটি আরণ্য বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়, তাতে মালীর হাতের কাঁচি ও কড়ুলের কাজটা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ কাজটা অনেকটা হাতের কাজ—জন-মজুরের বৃত্তি। কাব্য-কাননের মালীর পক্ষে কবিতার শুধু বাইরের দিকটা ছাড়া, কাব্যশাস্ত্রের জ্ঞান কতকটা না থাক্‌লে, যাঁদের ব্যাকরণশিক্ষার ভার তাঁরা নিয়েছেন—তাঁদের মনের মধ্যে সেই সম্ভ্রমের অভাব হবে, যা হলে সমালোচনার উদ্দেশ্য মোটেই সিদ্ধ হয় না। তার পর, আমার মনে হয়, এইসব সমালোচনা প্রায় নিজের সীমানা রক্ষা করে' চলে না, লেখকের নিজের মনগড়া থিওরিগুলি নিখিলকাব্যকলাসম্মত সুন্দর-বিজ্ঞানের মূলে আঘাত করে এবং সমালোচনার ভাষায় শিষ্টতার অভাবও দেখা যায়। কাব্য-সমালোচনার মধ্যে যদি একটি বিশেষ ব্যক্তির রুচি, একটা কোনো বিশেষ আদর্শ, একটা কোনো উদ্দেশ্যের উপযোগী মাপকাঠির পরিচয় থাকে, তবে সেই ব্যক্তিত্বের অভিমান দুর্ভর হয়ে পড়ে। সমালোচকের দায়িত্ব যে কত বড়, তার জন্যে যে কতখানি সাধনা ও স্বভাবগুণের প্রয়োজন, তা আমাদের দেশে এখনো ভালো করে' বুঝে দেখ্‌বার সময় আসে নি। এ কথা বল্‌লে ভুল হবে না যে—কেবল কাব্য-শরীরেরই পরীক্ষা করা চলে, কাব্যপ্রাণের ব্যবচ্ছেদ চলে না; appreciation বা রস-প্রকটনই কাব্যসমালোচকের একমাত্র সঙ্গত অধিকার। আগেই বলেছি, সমালোচকেরা যদি নবীন কবিদের গুরু-মশায়ের কাজ করেন সে ভালো, কিন্তু ওই কাজ কর্‌তে গিয়ে যদি রস-বিচারের উচ্চকথা অমন ছোট করে' প্রচার করেন, তবে কাজের মধ্যে অকাজের অংশই বাড়্‌বে। রস-বিচারটা বিচার নয়, সেটা আস্বাদন। রস অজ্ঞাপ্য, সে অবস্থায় জ্ঞানী ও জ্ঞেয় এক হয়ে যায়। এজন্যে আমাদের রসশাস্ত্রে একে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' বলা হয়েছে। কাব্য 'লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণ'; যাঁরা সৌভাগ্যবান্ তাঁরাই এর আস্বাদ পান, এতে অধিকার সকলের নেই। 'পুণ্যবন্তঃ প্রমিণ্বন্তি যোগিবৎ রসসন্ততিম্।'

এজন্যে কাব্যসমালোচনায় একটা বিশেষ আদর্শ খাড়া করা চলে না। এই এই গুণ থাক্‌লে তবে কবিতা সুকবিতা হবে, এমন কথা বলা চলে না। অলঙ্কার বা রীতির আলোচনা কর্‌লেও কাব্যের প্রাণবস্তু ধরা পড়ে না—'বেদ্যঃ সহৃদয়ৈরয়ম্,' 'সকল-সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদন-সাক্ষিক', 'সকল-সহৃদয়-সংবাদভাজা প্রমাত্রা গোচরীকৃতঃ।' যত যুক্তি দিন, আর যতই বহিরঙ্গ নিয়ে নাড়াচাড়া করুন, রস-প্রমাতা হওয়া বড় শক্ত। যাঁর যেটুকু বোধশক্তি তিনি সেই শক্তি-অনুসারে কাব্যের দোষগুণ আলোচনা করুন ক্ষতি নেই—তাঁর কথার যেটুকু মূল্য তা তা-থেকেই ধরা পড়্‌বে। 'ভাল লাগ্‌ল না' বল্‌বার অধিকার

সকলেরই আছে, সে রকম বলাতে কবিতার নিজস্ব দোষগুণের উপচয়-অপচয় হয় না। কিন্তু ঐ সঙ্গে যদি আপন-আপন ব্যক্তিগত রুচির অনুযায়ী এক-একটা আদর্শ খাড়া করা হয়, তবে নানা আদর্শের সংঘাতে সাহিত্যক্ষেত্র মল্লভূমিতে পরিণত হবে, দর্শকদের আমোদ হবে, সাময়িক উত্তেজনার সস্তা হাততালিতে আসর সরগুরম হবে মাত্র।

রসের কথা আমি ছেড়ে দিলাম—ও কথা নিয়ে যুক্তি-বিচার চল্‌বে না, মাসিকের পৃষ্ঠায় ও-জিনিষের স্থান হতেই পারে না। রসিকজনের নিভৃত মিলনে কেবল উপভোগ ও আস্বাদের আনন্দেই রসের পরিচয় পাওয়া যায়। রস শিক্ষা দেওয়া যায় না, আলোচনা কর্‌তে গেলে ওটা উবে যায়। এই প্রসঙ্গে আমি একটি ফার্‌সী রুবাই উদ্ধৃত কর্‌বার লোভ সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লাম না। এই রসাবস্থার কথাতেই এক ফার্‌সী কবি বল্‌ছেন,

সুরায় আমার আয়ু যে ফুরাই—দূষিও না মোরে তাই,
রুষিও না সখা,—পেয়ালা ও প্রেম এক যে করিতে চাই;
শাদা-চোখে বসি যাদের সমাজে, তারা যে সবাই পর,
নেশায় বেহুঁশ হ'লে তবে পাই বন্ধুরে মোর ঠাঁই।

—ওই যে শাদা চোখ, ও-অবস্থায় বিচার-বিতর্ক চলে, 'সবাই তখন পর'; কিন্তু 'নেশায় বেহুঁশ' না হলে বন্ধুর সাড়া পাওয়া যায় না। তাই বল্‌ছিলাম, রসের আলোচনায় কাজ নেই। শাস্ত্র-বিচারই একটু করা যাক্।

সমালোচনা কর্‌বার সময় কবিতার বহিরঙ্গ নিয়ে যে নিন্দা-প্রশংসা হয়, তাতে সকলের মতের মিল না থাক্‌লেও কারো আপত্তি নেই। কিন্তু ওই আলোচনা-প্রসঙ্গে এমন সকল কথা মাঝে মাঝে খুব জোর করে' বলা হয়ে থাকে, যা একেবারেই যথার্থ নয় বলে মনে করি। ঐ রকম দু-একটি প্রধান ভুল-কথার আলোচনা আমি কর্‌তে চাই। আমি আমার ব্যক্তিগত মত প্রচার কর্‌ছিনে; যা বিজ্ঞান-সম্মত ও যুক্তিযুক্ত, যা জ্ঞানবান্ ব্যক্তির অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই এবং যা রসজ্ঞ পণ্ডিতসমাজ কাব্যবিচারে প্রণিধানযোগ্য বলে' স্থির করেছেন, আমার কথা তার বিরোধী নয়। যে রচনায় আনন্দ পাই সে রচনা আমার কাছে সত্য, যাতে আনন্দ পাই নে তা আমার কাছে সত্য নয়—এ-কথা মান্‌তেই হবে। তাই কাব্যবিচারে কোনো বাইরের মাপকাঠি নিয়ে না বস্‌লেও ভিতর থেকে অজ্ঞাতে একটা মাপকাঠি গড়ে' উঠ্‌বেই। এই 'আমি'টাকে কতক পরিমাণে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে না পার্‌লে সুন্দর-বস্তুর পরিচয়ে ব্যাঘাত ঘটে। হৃদয়বান্ হলেই কাব্যবিচারের পক্ষে যথেষ্ট নয়; আমার হৃদয় আমারই, তার একটা সঙ্কীর্ণতা আছেই। 'সকল-সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদ-ভাক্' না হ'তে পার্‌লে ত কাব্যের প্রাণটি ধরা পড়্‌বে না! এর জন্যে আমাদের রসবিদ্ পণ্ডিত যা বলেছেন, সেই 'সাধারণীকৃতি' চাই, universal sympathyর দর্‌কার। মানব-সাধারণের প্রাণের অনন্ত ভাববৈচিত্র্যবোধ যাঁর মধ্যে 'বাসনা'রূপে বিদ্যমান, তিনিই রসজ্ঞ। এই বাসনা স্বাভাবিকী, তবু জীবনের নানা অবস্থার পরিচয়, অধ্যয়ন-অনুশীলন, বোধশক্তির বহুল বিকাশ (culture) প্রভৃতি দ্বারা এর উন্মেষ হওয়া চাই। এই বোধশক্তির অভাবে এক শ্রেণীর সমালোচকের নিকট অনেক ভালো কবিতা প্রসাদ-গুণের অভাবে মাটি হয়ে যায়, কবিতার ভাষা তাঁদের কাছে দুর্ব্বোধ হয়, এবং অনেকস্থলে 'ভাবসংহতি' বা ভাবসঙ্গতিও তাঁরা খুঁজে পান না। প্রসাদগুণ বা স্বচ্ছতার উদাহরণ দেবার জন্যে তাঁরা যে সকল কবিতার উল্লেখ করেন তাতে আমার বেশ মনে হয়, তাঁরা ওই গুণটাকে বড় বেশী করে' ধরেছেন। সে-রকম প্রসাদগুণকে যদি সুকবিতার লক্ষণ বলা হয়, তাহ'লে গতযুগের ইংরেজ কবিদের মধ্যে বায়রন্, টেনিসন্ ও উইলিয়ম্ মরিস্ ছাড়া আর ত কেউ সুকবি হতে পারেন না। ভাবে বা ভাষায় শেলী, ব্রাউনিং, সুইন্‌বার্ন্—কেউ প্রসাদগুণের জন্যে এইসব সমালোচকের সার্টিফিকেট্ পেতে পারেন না। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের ভাষা যেমন হোক, ভাব বোঝা ত যার-তার কর্ম্ম নয়, হেমচন্দ্রের 'লজ্জাবতী লতা'র মত কবিতা লিখে তিনি যশস্বী হন নি। আমাদের বিহারী-লাল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়ালও বাদ যান না। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মগুলি কি আধুনিক কাব্য সম্বন্ধে খাটে? মানুষের মনের যে বিকাশ আধুনিককালে হয়েছে, জগৎ ও জীবনে যে জটিলতা ও গভীরতা দেখা দিয়েছে, তার রূপটি আধুনিক সকল কলাশিল্পেই প্রতিফলিত হবে। আগেকার

লোক যাতে তৃপ্ত ছিল, এখনকার লোক তাতে তৃপ্ত নয়। রসের স্বরূপ সব কালে এক থাকলেও, সেই রসসৃষ্টির জন্যে কত নূতন উপকরণ, কত নূতন আয়োজনই না আমরা দেখ্‌ছি—রীতির কত বৈচিত্র্য, কল্পনার কত বিভিন্নতা! প্রত্যেক কবি-ব্যক্তির বিশিষ্ট শক্তি—সাহিত্যে কত নূতন রস রূপ, কত নব-নব আদর্শের সৃষ্টি করছে। সকল রূপ, সকল আদর্শকে মিলিয়ে নিয়ে রসের অখণ্ডতা প্রমাণ করাই শক্তিমান্ সমালোচকের কাজ। প্রসাদগুণ বলে' একটা বিশেষ গুণের কোনো মূল্যই নেই। খুব সহজ হবে, সাধারণের সুখবোধ্য হবে, সেইটেই রচনার একটা বড় গুণ—একথা বলা চলে না। তাই বলে' সহজ হ'লে বা দুর্ব্বোধ না হ'লে, কবিতার গুণহানি হয় একথাও দাঁড়ায় না। ওয়াল্টার পেটার্ তাঁর Style শীর্ষক অমূল্য প্রবন্ধের এক জায়গায় বল্‌ছেন,

"The literary artist is of necessity a scholar. ...His appeal again is to the scholar ... A scholar writing to the scholarly, will, of course, leave something to the willing intelligence of the reader... To really strenuous minds there is a pleasureable stimulus in the challenge for a continuous effort on their part, to be rewarded by a more intimate grasp of the author's sense."

যিনি সাহিত্যের সৃষ্টি করেন তিনি ত নিজে পণ্ডিত; আবার পণ্ডিত সমাজের জন্যেই সাহিত্য। এর জন্যে লেখক সব কথাই নিজে না ব'লে বুদ্ধিমান পাঠকের খাতিরে কিছু কিছু বাদ রেখে যান। কোনো লেখা বোঝ্‌বার জন্যে এই যে একটা চেষ্টার প্রয়োজন কেবলি হ'তে থাকে, তাতে সপ্রতিভ পাঠকের মনে বেশ একটু ধাক্কা লাগে; আর এই চেষ্টার পুরস্কারস্বরূপ লেখকের মনোগত ভাবটি ভালো করে' আয়ত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একরকম আনন্দের উদ্রেক হয়।

এ বিষয়ে উপস্থিত আমি আর বেশী কিছু বল্‌ব না।

ভাষার অস্বচ্ছতার কথা ছাড়া, কবি ও কবিতার সম্বন্ধে আর-একটা গুরুতর দোষের কথা শোনা যায়; সেটা হচ্ছে প্রাণের অভাব, অর্থাৎ হৃদয়হীনতা, ভক্তিহীনতা। 'প্রাণের অভাব' কথাটার একটা অর্থ হয়—কৃত্রিমতা; কবির কল্পনা যদি নিজের না হয়, ধার-করা বা জোর-করা হয়, তবে সে কবিতা দুর্ব্বল ও বিশেষত্বহীন হয়, সে কবিতা পড়ে' কারো মনে কোনো ছাপ পড়ে না, রসোদ্রেক হয় না। কিন্তু কবিতায় যদি কোনো শক্তির পরিচয় থাকে—তা সে যে শক্তিই হোক্, যদি তা পড়ে' প্রাণে কোনো একটি বিশেষ ভাবের স্ফুরণ হয়—তা সে যে রকম ভাবই হোক, তা'হলে সে কবিতার আদর্শ ও রুচি যাই হোক, সেটা যে কৃত্রিম তা বলা যায় না। আসল কথাটা হচ্ছে এই, আধুনিক কাব্যকলায় কবিহৃদয় নয়, কবিমানসটাই আলোচনা কর্‌বার জিনিষ—ভক্তি নয়, কবির শক্তিটাই আসল কথা। সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, বিষয়ের জাতি-বিচার নেই—সেটা কুড়ানীর ব্যথাই হোক, আর ক্লিওপেট্রার হৃদয়হীন রূপই হোক। এমন কোনো বিষয় নেই, যা দিয়ে রসোদ্দীপন হয় না—কবির যে-শক্তির উপর সেটা নির্ভর করে, সাধারণ লৌকিক সুখদুঃখ-সংস্কারের অতীত হ'তে না পার্‌লে, তা সম্ভব হয় না। কবির পক্ষে কোনো চরিত্র, কোনো বস্তু, কোনো বিষয়ই নিষিদ্ধ নয়। যে কল্পনার বলে কবি এগুলিকে কাব্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন, সে কল্পনা—শুধু পরিচিত নয়—অপরিচিতেরও পরিচয় সাধন করে, অশ্লীলকে শ্লীল করে, জড়কে চিন্ময় করে, পাপকে রসবৎ করে' তোলে। এ কাজ কর্‌তে হ'লে দেশ কাল ও পাত্রের সঙ্কীর্ণতা তাঁকে অতিক্রম কর্‌তে হয়। এক দিকে তাঁর যেমন ব্যক্তিত্ব থাক্‌বে, তেমনি personal feelings বা ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসও কিছু থাক্‌বে না। একটা অ-সঙ্গতা (aloofness) না হ'লে, জগতের হাসি-কান্নার বাইরে দাঁড়াতে না পার্‌লে, কাব্য-সৃষ্টির পক্ষে যা সবচেয়ে বড় জিনিস—সেই কল্পনার স্ফূর্ত্তি হয় না। আগেই বলেছি, কাব্য জিনিষটা 'লোকোত্তর-চমৎকারপ্রাণ'—উৎকৃষ্ট রচনার মধ্যে এই লক্ষণ থাকা চাই। কেবল হাসাতে কাঁদাতে পারা—মানুষমাত্রেরই অতি-সুলভ অনুভূতি উদ্রেক করাই কাব্যের সার্থকতা নয়, তাতে কবিকে popular বা জনপ্রিয় করে মাত্র। যিনি রসিক, যার 'বাসনা' আছে—অর্থাৎ, সেই culture ও taste আছে,

তিনি এই-রকম প্রাণের পরিচয়েই তুষ্ট হবেন না। সকল যুগে, সকল দেশেই তাঁদের সংখ্যা কম। উদীয়মান কবিকে বরণ কর্‌বার জন্যে তাঁরা সব যুগেই বিদ্যমান; আবার অস্তগত কবির যশোরশ্মি চিরদিন উত্তরোত্তর উজ্জ্বল করে' তোলাও তাঁদেরই কাজ। কবির গৌরব তাঁর প্রতিভায়, তাঁর কল্পনাশক্তিতে; তাঁর ভক্তি বা হৃদয়বত্তায় নয়। তাই বলে' কবি যে সহৃদয় নন, এমন কথা বল্‌লে হাস্যাস্পদ হতে হবে। কিন্তু সে সহৃদয়তা কল্পনাশক্তিরই নামান্তর। লৌকিক অর্থে কবিরা সত্যই হৃদয়হীন, সে অর্থে সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্‌ও হৃদয়হীন। এই বিষয়ে ব্রাউনিং-জায়ার একটি সুন্দর কবিতা আছে, অনেকেই পড়েছেন। 'প্যান্‌'-দেবতা একটি বাঁশী তৈরি কর্‌বেন বলে' নদীতীরে শরবনে নেমে গেলেন; নদীর নির্ম্মল জল ঘুলিয়ে, সমস্ত স্থানটি বিপর্য্যস্ত করে' দিয়ে একটি শর ভেঙে নিয়ে ডাঙায় উঠে বস্‌লেন। তার পর সেই শরগাছটির পাতাগুলি সব ছিঁড়ে ফেলে, সেটিকে কেটে-কুটে ছোট করে' ফেল্‌লেন; তাকে ফাঁপা কর্‌বার জন্যে তার হৃদয়টি কুরে-কুরে সব শাঁসটুকু বার করে' ফেল্‌লেন; শেষে তার গায়ে গোটা-কয়েক গর্ত্ত করে' বাঁশী বানিয়ে নিলেন। তারপর বাঁশী-বাজানো সুরু হ'ল। সুরলহরীতে আকাশ-বাতাস ভরে' উঠ্‌ল, নদীর জল আবার স্থির হ'ল, আবার সেখানে গাং-ফড়িঙেরা এসে জুট্‌ল। বাঁশী তৈরি হ'ল বটে, কিন্তু সেই শরগাছটি আর তেমন করে' শরবনে তার সাথীদের সঙ্গে দুল্‌বে না। তার সেই সরল সুদীর্ঘ তনুযষ্টি, সেই পাতা-গুলি, সে হৃদয় আর নেই! 'প্যান্‌'-দেবতা পুরা-দেবতা নয়—অর্দ্ধেক দেবতা অর্দ্ধেক পশু, তাই এ ব্যাপারে তার একটুও দুঃখ হ'ল না। কিন্তু আসল দেবতা যাঁরা, তাঁরা যখন মানুষ দিয়ে কবি তৈরি করেন, তখন তাঁরাও এম্‌নি নিষ্ঠুর কাজ করেন বটে, কিন্তু ব্যথাও পান।

এই 'প্রাণ' কথাটা যে অর্থে কাব্যসমালোচনায় ব্যবহার হয়, তাতে কাব্যের আদর্শ ও কাব্যের আত্মার সম্বন্ধে একটা বড্ড স্থূল ধারণা প্রকাশ পায়। কাব্যের 'আত্মা' বল্‌তে যে কি বোঝায়, তা নিয়ে আমাদের প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রেও অনেক বাদানুবাদ আছে; কতক-গুলি সূত্রের সৃষ্টিও হয়েছে, কিন্তু তার ভাষ্য করতে গিয়ে বহু মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে। পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান এ-বিষয়ে এখনো একমত হ'তে পারে নি—কোনো বিজ্ঞানই তা পার্‌বে না। তবু এইসব আলোচনার ফলে উভয়ত্র এমন কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আবিষ্কার হয়েছে, যাতে এই ব্যাপারটার চূড়ান্ত মীমাংসা না হলেও, সাহিত্যের আসরে কাব্য সম্বন্ধে যা-তা বলা আর চলে না। কাব্যের প্রাণ বল্‌তে যে জিনিষটি বোঝায় তার প্রধান গুণ হচ্ছে—লোকোত্তর-চমৎকার রসাবেশ; কাব্য যে আনন্দ দান করে তার একটা বিশেষ উপাদান—'বৈচিত্র্য' 'চারুতা' বা 'বিচ্ছিত্তি'। কাব্যের মধ্যে রসিক যে রসাস্বাদ করে' থাকেন, তার মধ্যে এমন একটি অনুভাব বিদ্যমান, যা লৌকিকতার স্পর্শশূন্য বলেই চিত্তচমৎকারী। কবির কল্পনা বাস্তবকে আশ্রয় করেই কাব্যসৃষ্টি করে, বাস্তবকে একেবারে বাদ দেবার জো নেই, কিন্তু তাঁর কল্পনার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি এমন, যে, বাস্তব অবাস্তবের ভেদ আর থাকে না, থাক্‌লে চিত্তচমৎকার ঘট্‌ত না। এই জন্যে কাব্যবস্তুটাই (content) বড় নয়, কবির যে ওই শক্তি—যাকে 'প্রজ্ঞা' 'প্রতিভা' প্রভৃতি অনেক নাম দেওয়া হয়েছে—ওই শক্তির লীলা বা স্ফূর্ত্তিই কাব্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষের কারণ। এই প্রজ্ঞা 'অপূর্ব্ববস্তু-নির্ম্মাণক্ষম'। এই অপূর্ব্বতাই সেই লোকোত্তর-চমৎকার, indefinable charm বা অবর্ণনীয় মোহিনীর কারণ। কবির 'প্রজ্ঞা'ই সব, কবিতার বিষয়নির্ব্বাচন যেমনই হোক। এই দৃষ্টির সাহায্যে ক্ষুদ্রতম বস্তুর মধ্যেও অপূর্ব্ব রস আস্বাদ করা যায়—একটি ছোট নগণ্য ফুলের মধ্যেও এমন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—যা "too deep for tears"—এত গভীর যে চোখের জলে ধরা দেয় না। এই রস হর্ষ-বিষাদ প্রভৃতি লৌকিক অনুভাবের অতীত, কারণ ওর মধ্যে লোকোত্তর-চমৎকারিতা রয়েছে। কবি যখন বলেন, এই রস একটি 'দীনতম পুষ্পের' মধ্যেও অনুভব করা যায়, তার অর্থ—রস উপলব্ধি কর্‌তে হ'লে সেই দৃষ্টতা চাই যা বস্তুনিরপেক্ষ; তার মানে এ নয়, যে, কেবল ছোট ছোট জিনিসের মধ্যেই তা আছে। এই দৃষ্টতা, চারুতা এবং এই লোকোত্তরচমৎকার উদ্রেক কর্‌বার জন্যে উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় ভাবপন্থী কবিরা কত কাণ্ডই

করেছিলেন!—তাঁদের সেইসব কীর্ত্তির মধ্যে সাফল্যের পরিচয় আছে। যা prose (গদ্য) বা reasonএর (যুক্তিতর্কের) অনুগত, যে মনোভাব অতি-পরিচয়-দূষিত, তাকে এড়িয়ে যাবার কি চেষ্টা! অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধিনিষেধ উড়িয়ে দেওয়া, ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশীর জয় ঘোষণা, অনির্দ্দিষ্ট দেশকালের আরাধনা, অসম্ভব ও অপ্রাকৃতের সম্বর্দ্ধনা—এম্‌নি কত উচ্ছৃঙ্খল আচরণই যে তাঁরা করেছেন, তা আমাদের দেশের ইংরেজীকাব্যপ্রিয় পাঠকমাত্রেই জানেন। জর্ম্মান রোমাণ্টিক (Tieck) টীকের সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলেছেন, "He welcomed every rebuff to coherence and probability, every violation of prose as *ipso facto* a gain for poetry." অর্থাৎ "তাঁর মতে, যা কিছু অসংলগ্ন, অসম্ভব ও গদ্যের পরিপন্থী তাই—ঠিক ঐ ঐ কারণেই—কাব্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।" ঐ লেখকই ফরাসী নব্য সাহিত্যিকদের কথায় বলেছেন, "Their most rebellious and defiant work was a revelation of the beauty lurking in neglected and proscribed forms of art." "তাঁদের সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ ও দুঃসাহসের কাজ ছিল—যে-সব রচনারীতি নিষিদ্ধ ও অপ্রচলিত তাদের ভিতরকার মাধুরী প্রকটিত করা।" সাহিত্যরচনার এই নূতন রীতি আলোচনা করলে বেশ বোঝা যায়, যে ওই 'লোকোত্তর-চমৎকার'—যাকে ইংরেজী রসশাস্ত্রে wonder-spirit বলা হয়েছে—ওইটিকে তাঁরা খুব বেশী করে' আঁকড়ে ধরেছিলেন। এইজন্যে বাস্তবকে অবাস্তব ও অবাস্তবকে বাস্তব করে' তোল্‌বার ভার অনেকে নিয়েছিলেন। কাব্যের এই অন্তর্গত ভাব—এই Spiritএর মূল্য যে কাব্যবস্তুর চেয়ে বেশী, এটা আমাদের দেশের প্রাচীন রসিকেরা যেমন স্বীকার করেছেন, বিদেশী রসজ্ঞানীরাও তেম্‌নি স্বীকার করেছেন। কাব্যের কোথায় সেই বাস্তবতা, কোথায় সেই লৌকিক জীবনের প্রত্যক্ষ সুখ-দুঃখ-বোধ, কোথায় সুপরিচিতের পরিচয়—কেবলমাত্র এইসকলের সন্ধান করতে গেলে এবং তাকেই কাব্যের প্রাণ বলে' প্রচার করলে, কাব্যের আত্মাকে অস্বীকার করা হয়। এসব যে কাব্যের বিষয় হ'তে পারবে না—এমন কথা আমি বল্‌ছি নে, 'প্রজ্ঞা'র সাহায্যে এগুলির মধ্যেও দিব্যসুন্দর অনুভূতির সঞ্চার করা যায়, কিন্তু সেই অতিমাত্র লৌকিকতা লুপ্ত হওয়া চাই, নইলে কবিকল্পনা রসে পরিণত হবে না। জীবনের এই প্রত্যক্ষ পরিচয়ের দিক্‌টি কাব্যের নিকৃষ্ট দিক্। কবির Spirit বা অন্তঃপ্রকৃতি এই প্রকৃতিপারবশ্য থেকে মুক্তি চায় ও পায় বলেই, তাঁর প্রতিভা "নবনবোন্মেষ-শালিনী"। সেইজন্যে আমি আগেই বলেছি—ভক্তি নয়, এই দিব্যশক্তি দিয়েই কবি ও কাব্যের বিচার করতে হবে। গোলাপ-কুন্দের বিবাদ সেখানে চলে না, বাণীর প্রকৃত পূজায় জাতিধর্ম্মের ছুৎমার্গ নেই, নিজ গ্রাম-সমাজের গণ্ডীও নেই; সে সাধনা বীরাচারী তান্ত্রিকের সাধনা—সকল গণ্ডী, সকল সঙ্কীর্ণতা, সকল সংস্কার বর্জ্জন করে' তবে সেই সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়। গঙ্গোদক নয়—বিশ্বমানবের অকূল অতল চেতনসমুদ্রে অবগাহন করে' সর্ব্বজনীন রস আস্বাদন করে', তবে কবির মুক্তি হয়।

কবি ও কাব্যকে এই দিক্ দিয়ে না দেখে যদি তথা-কথিত 'প্রাণের' সন্ধান নিতে যাই, তা'হলে কোনো উৎকৃষ্ট কবিতা পড়ার পর শুধু "চমৎকার! সুন্দর!" বলা ঠিক হবে না; বল্‌তে হবে, "ঠিক! ঠিক্!" "আহা!" "ওহো!" "হায়, হায়!" ইত্যাদি, এবং সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রু-পতনও চাই। ভালো কবিতা পড়্‌তে পড়্‌তে ঐ রকম উচ্ছ্বাস যে না হয় তা বল্‌ছিনে, যাদের রস-বোধ অপরিণত তাঁদের ঐ রকম অবস্থাই হয়; কিন্তু তাই দিয়ে কবির কাব্য বা পাঠকের রসজ্ঞতার যাচাই হয় না। সেই অনুভূতি—যা 'too deep for tears'—তা যে এই রকমের লৌকিক সহানুভূতি নয়, তা ওই কবিবাক্যের প্রয়োগস্থল থেকেই বোঝা যায়। কবি বলেছেন, একটি সামান্য ফুল দেখেও তাঁর ঐ-রকম রসাবেশ হয়। ফুলের সঙ্গে সেই মানবীয় সহানুভূতি, সেই 'প্রাণের' সম্পর্ক ত নেই-ই, বরং আধুনিকতম বাংলা কবিতার 'কুড়ানী' 'কৃষাণী' প্রভৃতি কাব্যবধূ-("Brides of Song")-দের সঙ্গে সে সম্পর্ক আছে। তাই মনে হয়, এই-সকল সমালোচকদের রসবিচারের খুব গোড়ার দিকে একটা ভুল আছে।

শুধু ফুল কেন, ফুলের তবু একটা জীবনধর্ম্ম আছে এবং ওটা প্রাকৃতিক বস্তুও বটে। কিন্তু প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অনুকৃতি—এই দুয়েরই বহির্ভূত কত বস্তু রয়েছে, যা থেকে আমাদের অতি সত্যকার সুন্দর-সংবেদনা হয়। সঙ্গীত বা সুর-রচনায় কেবল সুর আছে, কথা নেই—সে জিনিষ আমাদের মুগ্ধ করে কেন? শিল্পসৃষ্টির মধ্যে সমালোচক মহাশয়রা যে 'প্রাণের' সন্ধান করেন, সেই প্রাণ—সেই হৃদ্-স্পন্দনের কারণ-বস্তু—সঙ্গীতের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিছক সঙ্গীতের মধ্যে একটি নির্ব্বিশেষ ভাব থাকে, বাস্তব জীবনের বস্তু বা ব্যক্তি-পরিচয়ের নাম-গন্ধ তাতে নেই। সঙ্গীতের কাজ শ্রোতার মনে ভাবান্তর (mood) উদ্রেক করা—একটি অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞাপ্য রস-বিহ্বলতার সঞ্চার করা। সে অবস্থায় প্রাণের মধ্যে যে আকুলি-ব্যাকুলি হয়, মন তার স্পষ্ট কারণ খুঁজে পায় না; যা কখনো অনুভব করিনি, যার নাম জানিনে, যা 'মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে' লুকিয়ে ছিল, তাই যেন মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌তে উঠে আসে, তাকে ধরা যায় না। সঙ্গীতের এই গুণটিই উচ্চতর সুন্দর-সংবেদনার প্রকৃত সহায় বলে' কোনো কোনো আধুনিক রসজ্ঞানীর মতে সঙ্গীতই সকল শিল্পকলার আদর্শ—শিল্পমাত্রেই সঙ্গীতাত্মক। কেউ কেউ আবার কাব্য-চিত্র-ভাস্কর্য্যের উপরে কারু-শিল্পের (decorative art) স্থান নির্দ্দেশ করেছেন। স্থপতিশিল্পের কারুকলায় যে বৈচিত্র্য বা চারুতা প্রকাশ পায়, তার মধ্যে কোন্ শ্রেণীর 'প্রাণ' খুঁজ্‌তে হবে? আল্‌পনা বা চিত্রক-রচনা থেকে আরম্ভ করে', আরব-পারস্যের গালিচাশিল্পের পরিকল্পনা পর্য্যন্ত যে এত বড় একটা সুন্দর-রচনা-রীতি মানুষের মনোহরণ করে' আস্‌ছে, তার মধ্যে প্রাণ কোথায়? গালিচা প্রভৃতির চিত্ররচনায় যে ফুলপাতা জীব-জন্তুর নক্‌সা থাকে—সে-গুলি স্বভাবের অনুকরণ নয়, তার মধ্যে শিল্পীর খেয়াল-খুশীর একটি স্বাধীন লীলা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এইসব রচনার রেখাবিন্যাস, বর্ণবৈচিত্র্য প্রভৃতি কারুকার্য্য এমন একটা কিছু ফুটিয়ে তোলে, যা দিয়ে লৌকিক হৃদয়বৃত্তির উত্তেজনা হয় না, একটি শান্ত নিরুদ্বেগ আক্ষেপ-হীন সুন্দর-বোধ (যাকে ইংরেজীতে pleasure without intere-t বলে) জেগে ওঠে। খাঁটি সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দিক্ থেকে আলোচনা কর্‌লে স্পষ্টই বোঝা যায়, কাব্য চিত্র সঙ্গীত প্রভৃতি যাবতীয় শিল্পকলার চরম উদ্দেশ্য এক, অন্তর্গত ভাব সকলের মধ্যেই সমান। এক পরম-সুন্দরের অনুভূতি নানা উপকরণ ও উপাদান আশ্রয় করে' নানা রূপে ফুটে ওঠে। এই সুন্দর-চেতনা উদ্রেক কর্‌বার নানা উপায় আছে। কাঠ, মাটি, পাথর; রেখা ও রং; কথা, ছন্দ, সুর; রেশম, পশম, সূতা;—এগুলি ত উপাদান। তেম্‌নি উপকরণও কত! প্রাকৃত বস্তু-বিজ্ঞান, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সুপরিচিত চিত্র, ইতিহাসের ঘটনা, ("familiar matter of today" কিম্বা "old unhappy far-off things") মানুষের ভিতর ও বাহিরের চেহারা· এম্‌নি কত উপকরণ। সুন্দর-আস্বাদ কত রকমে কত দিক্ দিয়ে যে হ'তে পারে তার সংখ্যা নেই। রসজ্ঞানীদের যত কিছু বিচারণার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই-সব উপাদান ও উপকরণের সঙ্গে পরম-সুন্দরের সম্বন্ধটি ঠিক কোথায় এবং কিরূপ তাই স্পষ্ট করে' তোলা। যা এত বিচিত্র তার মধ্যে সেই 'এক' কোথায়?—সেই একটি পরমরমণীয় অনুভূতি যা' বস্তুবিজ্ঞানের সঙ্গে জেগে ওঠে, অথচ বাস্তব নয়, অলৌকিক! সেই পরমরহস্যময়ের উদ্দেশেই ঋষিরা বলেছিলেন, "রসো বৈ সঃ"। মানুষ যার দ্বারা অবশে অজ্ঞানে আবিষ্ট হচ্ছে, কবি যাকে প্রতিভার বলে সৃষ্টি কর্‌ছেন, তার নিয়ম-কানুন আজও ঠিক করে' ধরা গেল না। সে যে লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণ, নিয়তিকৃতনিয়মরহিত—এ ধারণা জেগেছে অনেক দিন, তবু বোঝাতে গেলে বাদ-বিসম্বাদের অন্ত নেই!

আমার বক্তব্য এই, যারা কাব্য-সমালোচনার ভার নিয়েছেন বা নেবার ইচ্ছে করেছেন, তাঁরা যেন সমালোচনার ভিত্তিটা আরও উদার ও প্রশস্ত করেন। কবির 'অহং' মার্জ্জনীয়, সমালোচকের 'অহং' বড় অনিষ্টকর। 'আমাদের ভালো লাগে না,' 'অমুক কবির সঙ্গে আমাদের প্রাণের অন্তরঙ্গতা নেই'—এই-সব যথেচ্ছ উক্তি সমালোচনা নয়। অন্তরঙ্গ সুহৃদ্-সজ্জনের বৈঠকে যে ব্যক্তিগত রুচির অসংযত উচ্ছ্বাস হয় ত স্বাভাবিক, সেটা সাহিত্যের প্রকাশ্য দর্‌বারে সমালোচনা নাম দিয়ে জাহির করা রসজ্ঞতার

প্রমাণ নয়, সুরুচিসঙ্গতও নয়। তাতে আন্তরিকতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু সত্য-সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় শুধু আন্তরিকতা নয়, সূক্ষ্মদৃষ্টি .ও ধ্যান-ধারণার দরকার। কবিত্ব জিনিষটা প্রাক্তন সংস্কার, সহজাত শক্তি; কাব্যরসগ্রাহিতাও তাই; এই সহজ শক্তিরও উন্মেষ হওয়া চাই, এটারও মার্জ্জনা ও সংস্কার করতে হয়। সাময়িক সাহিত্যে রুচি ও আদর্শের যে অধোগতি দেখা যাচ্ছে, তা'তে সত্যনিষ্ঠ ও সুন্দরসাধক না হ'য়ে সমালোচনার কাজে হাত দিলে অনাচার আরও বেড়ে যাবে। ভালো লাগ্‌লেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা, মন্দ লাগ্‌লেই কটূক্তি করা যাঁদের স্বভাব, ব্যক্তিগত রুচির অহঙ্কার যাঁরা ত্যাগ করতে পারেন নি, যাঁদের সমালোচনা করবার প্রবৃত্তি আছে কিন্তু যোগ্যতা নেই, সেই-সব স্বয়ংসিদ্ধ সমালোচকেরা যেন মনে রাখেন, কাব্যসমালোচনাও এক রকমের সত্যনির্ণয়, এও সাধনার অপেক্ষা রাখে, এবং সকল সাধনাতেই বৈজ্ঞানিকের মত সত্যজিজ্ঞাসা, নির্ভীকতা, আত্মসংযম ও নিষ্ঠা চাই। একাজের জন্যেও বহুদর্শী হ'তে হবে, নানা তত্ত্বের আলোচনা অনুশীলন করতে হবে, রাগদ্বেষ-বর্জ্জিত হতে হবে। যদি কেউ নিজের মধ্যে এই-সকল গুণের নিশ্চিত পরিচয় পেয়ে থাকেন তবে শুদ্ধ ও শুচি হয়ে সাহিত্য-সমালোচনায় অগ্রসর হোন, তাতে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে, নিজেও পুণ্য সঞ্চয় করবেন।

শ্রী সত্যসুন্দর দাস

পূর্ব্বস্মৃতি

চাঁদের আলো! বনের কুসুম! দখিন বায়!
তোমরা আমার কে হও আজি বল্‌বে তায়?
সুধার ধারে মাতাল করে কুমুদনাথ!
মলয়-অনিল সুবাস গানে ভরাও রাত।
গুল্ করবী! শোভায় বিভোর করলে চোখ!
তোমরা আমার কোন্ জনমের আপন লোক?
বেল চামেলী! আমের মুকুল! বসন্ত!
অরুণ-রাঙা অশোক আধেক ফুটন্ত!
বকুল-বনের পরাগ-মাতা মধুপ-কুল!
যূঁই মাধবী! স্বর্ণলতা! নেবুর ফুল!
শিশির-ভেজা নবীন তৃণ হরিৎবন!
আপন দানে ভরলে কেন আমার মন?
আল্‌তা-রাঙা নতুন পাতা! মেঘের লাল!
কোকিল! নব দেবদারু তাল! শিরীষ শাল!
দীঘীর শীতল গভীর সলিল! গ্রামের পথ!
রাখাল-ছেলের বাউল সুরের বাঁশীর গৎ!
পল্লী-বাটের নদীর ঘাটের সকাল সাঁঝ!
তোমরা আমার কে হও তা কি বল্‌বে আজ?

শিউলী টগর! কুন্দকলি! কাশের ফুল!
শরৎকালের সোনার আলো! সাগর-কূল!
তোমরা আমায় বাঁধ্‌লে প্রাণে কোন্ টানে?
কোন্ জনমে ছিলাম প্রিয় কোন্ খানে?
কোন্ কুহকে করালে কোন্ মদির পান?
কোন কারণে বাস্‌লে ভালো আমার প্রাণ?
আষাঢ় দিনের সজল কাজল বাদল মেঘ!
ঝিলিক্-ঝলস্! দেয়ার গুরু! ঝড়ের বেগ!
কদম কেয়া কূটজ! বারির অঝোর পাত!
সিক্ত মাটির গন্ধ! ওগো শ্রাবণ-রাত!
ভগ্ন কুঁড়ের পবন-কাঁপা মৃদুল দীপ!
কাজরী-গানের ঝুলন-বাঁধা ফুলন্ নীপ!
ভাদর-গাঙ্গের উজান-ভরা উছাস্ বান!
খেয়া বাওয়ার ঐ তরণী! মাঝির গান!
দম্‌কা হাওয়ার ঝাপ্‌টা-লাগা মুক্ত দ্বার!
বিজন পথে ওই যে ফুলের ছিন্ন হার!
স্মৃতির মাঝে জড়িয়ে তোরা চিরন্তন!
তোমরা আমার কোন্ জনমের আপন জন?

শ্রী লীলা দেবী

ভারতের উপাস্য-বৈচিত্র্য

পূজা ও উপাসনা পাইবার জন্য হিন্দুদের যেমন অসংখ্য দেব-দেবী আছেন, বোধ হয় এক চীনা ছাড়া জগতের মধ্যে আর কোন জাতির এত অধিক উপাস্য দেবতা নাই। ভারতবর্ষের তীর্থাদিতে একই দেব-দেবী যে কত বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে বিরাজ করিতেছেন, তাহারও সংখ্যা করা সুকঠিন। ছোট বড় সমস্ত তীর্থের সংখ্যাও বড় কম নহে, এবং তাহা ভারতের সুগম ও দুর্গম স্থানে সর্ব্বত্রই বিক্ষিপ্ত। এই তীর্থ-সকলে মূর্ত্তিধারী হাজার হাজার দেব-দেবী ত আছেনই; কিন্তু সে-সকল ভিন্নও হিন্দুদিগের পূজা বা ভক্তি পাইয়া থাকে এমন যে কত প্রকৃতি বা মানব-সৃষ্ট সরোবর, কূপ, কুণ্ড, পর্ব্বত, ঝরণা ও বৃক্ষাদি বিদ্যমান আছে, তাহার কথা ভাবিলে, তাহাদের উৎপত্তি ও তৎসংসৃষ্ট কিংবদন্তী-সকলের আলোচনা করিলে বা সংখ্যা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে বিস্মিত হইতে হয়। সেই-সকল আরাধ্য বৃক্ষ-সরোবরাদির কথা বলিবার অভিপ্রায়েই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বিখ্যাত পূত বৃক্ষসকল

অশ্বত্থ- ও বট-বৃক্ষকে সাধারণতই হিন্দুগণ ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে কতকগুলি সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ বিশিষ্ট বৃক্ষ আছে তাহারা যথার্থই দেবতার মত পূজা পাইয়া থাকে। এই-সকলের মধ্যে গয়ার 'অক্ষয় বট' বোধ হয় প্রথম উল্লেখ করিবার যোগ্য। কথিত আছে সীতাদেবীর দশরথকে পিণ্ডদানের সাক্ষ্য দেওয়ায় দেবী প্রসন্ন হইয়া বটবৃক্ষকে "অক্ষয় হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করায় উহা অমর হইয়া রহিয়াছে। মহর্ষি গৌতম এই বৃক্ষতলে বসিয়া ৬০ হাজার বৎসর মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন।

পুরী এবং ব্রজমণ্ডলের মধ্যেও দুইটি বটবৃক্ষ আছে যাহা "অক্ষয় বট" নামে খ্যাত। উহাও তীর্থ-সেবক-দিগের ভক্তির পাত্র। প্রয়াগের দুর্গাভ্যন্তরে পাতালপুরী শিবমন্দিরে আর-একটি প্রাচীন গাছের গুঁড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নামও 'অক্ষয় বট'। কথিত আছে ১৫০০ বৎসরেরও অধিক কাল উহা জীবিত রহিয়াছে। স্থানটিতে উপযুক্ত আলোর অভাবে এবং স্থানীয় পাণ্ডারা যে-ভাবে উহার নিম্নাংশ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া থাকে তাহাতে, উহা শুষ্ক কি সরস তাহা দেখিয়া ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, মুকুন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী অজ্ঞাতসারে দুগ্ধের সহিত গো-লোম গলাধঃকরণ করায়, সাধুদিগের বিচারে যবনত্ব প্রাপ্ত হইলে তিনি যবনশ্রেষ্ঠ হইবার মানসে তথায় অবস্থিত শিবের আরাধনা করিয়া ঐ বটবৃক্ষ হইতে স্বেচ্ছায় পতিত হইয়া দেহত্যাগ করেন। তিনিই পরজন্মে সম্রাট্ আকবর নামে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। মুসলমান সম্রাট্গণ উহা যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে ইংরেজরাও উহা বিনষ্ট না করিয়া স্থানীয় পাণ্ডার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছেন।

অক্ষয় বট
(গয়া)

বৃন্দাবন-মধ্যে 'শৃঙ্গার-বট' 'বংশী-বট' ও 'অদ্বৈত-বট' নামে আর তিনটি বট-বৃক্ষ আছে। এই তিনটি বৃক্ষই শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার সম্পর্কে মহিমাময় হইয়া আছে। বংশী-বট-মূলে বসিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বংশী-ধ্বনিতে গোপীদের মনঃপ্রাণ আকর্ষণ করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

ব্রজধামে গোবর্দ্ধন-তীর্থে দোহনকুণ্ড-তীরে একপ্রকার অদ্ভুত তরু আছে, উহার পত্র ঠোঙার ন্যায়। প্রকাশ,

বংশী বট
(বৃন্দাবন)

শ্রীকৃষ্ণ ঐ পত্র-ঠোঙায় গোপীদিগের নিকট হইতে ননী লইয়া খাইতেন। বন-ভ্রমণ-কালে আর-একটি আশ্চর্য্য বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহার ফলগুলি ঠিক নূপুরের মত আকৃতি-বিশিষ্ট, উহা শুকাইলে ঠিক নূপুরের ন্যায় শব্দ হইয়া থাকে। কালীয়-হ্রদের তীরে একটি কেলী-কদম্বের বৃক্ষ আছে; পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন, ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেন। বৃন্দাবনস্থিত নিধুবন মধ্যে শালগ্রাম-গাছও প্রসিদ্ধ; শ্রীরাধা-কুণ্ডের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ননী খাইয়া যে-সকল গাছে হাত মুছিয়াছিলেন, তথায় এখনও কতকগুলি গাছে ভগবানের হস্ত-লেপন-চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে বলিয়া ভক্তেরা বিশ্বাস করেন।

দ্বারকার নিকট ভালকা-কুণ্ডে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ-বৃক্ষ আছে। কিংবদন্তী—এই তরুতলে যাদবপতি তাঁহার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। কথিত আছে মহাভারতে যে অশ্বত্থ বৃক্ষের উল্লেখ আছে ইহা সেই মহাতরু।

ব্যাস-কুঞ্জের নিকট বটুক-বৃক্ষ নামে এক অদ্ভুত বৃক্ষ আছে। প্রবাদ, ব্যাসদেব এই বৃক্ষমূলে বসিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ায় মহাবোধি-নামক তরুবরও এইরূপে শাক্যসিংহের তপস্যা-প্রভাবে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

নীলাচলের 'সিদ্ধ বকুল' আর-একটি প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। ইহার মূলদেশে বসিয়া কাহারও তপস্যা করিয়া সিদ্ধি-লাভের কথা না শুনা যাইলেও, শ্রীচৈতন্যদেব, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ইহার তলদেশে বসিয়া ভগবান্ জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেন। এই বৃক্ষটি যিনিই দেখিবেন তিনিই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, সন্দেহ নাই। উহার কাণ্ড ফোঁপ্‌রা, অর্থাৎ কেবলমাত্র বৃক্ষ-ত্বকের উপর উহা দাঁড়াইয়া আছে। কথিত আছে, কোন এক সময়ে নব-রথ-নির্ম্মাণের জন্য কাষ্ঠের অভাব হওয়ায় রাজাদেশে ঐ বৃক্ষ কাটিবার জন্য কাঠুরিয়াগণ বৃক্ষসমীপে গমন করিয়া দেখিল, রাত্রের মধ্যে গাছের নিরেট গুঁড়িটি ফোঁপ্‌রা হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই অসম্ভব ঘটনা জগন্নাথদেবের একটি লীলা বুঝিয়া রাজা এবং সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন এবং তদবধি এই বৃক্ষকে সকলেই ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া আসিতেছেন।

বৃন্দাবনে শেঠেদের ঠাকুর-বাড়ীতে সোনার তাল-গাছের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন। রামেশ্বর দেবের নাটমন্দিরের সম্মুখে ঐরূপ আর-একটি সোনার তালগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ

সিদ্ধ বকুল
(পুরী)

রৌপ্য ও তাম্র-নির্ম্মিত আর দুইটি গাছ অন্যত্র আছে। প্রকৃতপক্ষে ঐগুলির নাম গরুড়-স্তম্ভ, ইহার সহিত তালগাছের কি সম্পর্ক তাহা বুঝা যায় না, কিন্তু তালগাছ বলিয়াই খ্যাত।

মাদ্রাজের নিকট কাঞ্চীপুর নামক স্থানে একাম্র-নাথ দেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি পুরাতন আম্রবৃক্ষ আছে; উহার চারিদিকে চারিটি শাখায় অম্ল মিষ্ট কটু ও তিক্ত এই চারি প্রকার আস্বাদের ফল হইয়া থাকে। এইরূপ জন-প্রবাদ, যে, পূর্ব্বে সারাবৎসর প্রত্যহ এই বৃক্ষ হইতে একটি করিয়া সুপক্ক আম্র পাওয়া যাইত এবং উহা দেবতার ভোগে লাগিত। এক্ষণে আর প্রত্যহ আম না হইলেও ঐ বৃক্ষে পূর্ব্বেরই মত বিভিন্ন স্বাদের ফল উৎপন্ন হইয়া আজিও দেব-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে।

মহিমা-মণ্ডিত অন্য কোন আম্র বা অপর ফলবৃক্ষের উদাহরণ কুত্রাপি আছে বলিয়া শুনা যায় না। ভুবনেশ্বরের আর-একটি নাম একাম্র-কানন। এইস্থানে কোন সময় একটি মাত্র আম্রবৃক্ষ থাকায় ঐ নাম হয়, কিন্তু এই নামের সহিত কোন দেবমাহাত্ম্যের কথা জানিতে পারা যায় না।

আমাদের তীর্থ-সকলের মধ্যে মাহাত্ম্যপূর্ণ অনেক কানন বা বনভূমিও দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণাদি-বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ নিধুবন ও নিকুঞ্জকাননের কথা কে না জানেন। উহা ব্রজ-মণ্ডলের অন্তর্গত। সমগ্র বৃন্দারণ্যের মধ্যে মধুবন, তালবন, কুমুদবন, মহাবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন, ভদ্রবন, ভাণ্ডিরবন, খেলনবন, লৌহ-বন ও বৃন্দাবন নামক দ্বাদশটি বিখ্যাত বন আছে। উহার কোন কোনটি এক্ষণে সহরে পরিণত হইলেও পূর্ব্বে বনই ছিল। উহার সকলগুলিই শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-স্থান। এখনও তথায় সেই প্রেমময় ও প্রেমময়ীর বহু লীলা-চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন তথায় বেল্লবন, কোটবন, কোকিল-বন, মাঠবন প্রভৃতি আরও কতিপয় বন আছে।

হিন্দুস্থানের অপরাপর অংশেও জয়পুরের খাণ্ডব বন, গোদাবরী-নদীতীরে পঞ্চবটী বন ও বৈদ্যনাথ ধামের তপোবন বা পঞ্চবট বনের ন্যায় পবিত্র স্থানের অভাব নাই। কথিত আছে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বনবাস-কালে এই তপোবনে সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ সহ কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

খ্যাতনামা পবিত্র গিরিশৃঙ্গাদি

গিরিরাজ হিমালয় হইতে বৈদ্যনাথের ক্ষুদ্র তপোবন-পাহাড় পর্য্যন্ত যে-সকল পবিত্র পাহাড় আছে, তাহার মধ্যে চন্দ্রনাথ ও বিন্ধ্যাচলের ন্যায় অনেকগুলি একেবারে তীর্থ স্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। গয়ার ব্রহ্মযোনি, ব্রজমণ্ডলের গোবর্দ্ধন, পুষ্করের সাবিত্রী পাহাড়ের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে।

বিখ্যাত গিরি গোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অধিক বলিবার কিছু নাই। ইহা সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ বলিয়া খ্যাত। ইহাকে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন। দর্শন ও প্রদক্ষিণ করাই এই তীর্থের কার্য্য।

ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতের উপর-দিক্
(গয়া)

সাবিত্রী পুষ্করতীর্থে অবস্থিত। ইহা একটি উচ্চচূড় পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের উপর মন্দির-মধ্যে সাবিত্রী দেবীর শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এই পর্ব্বত প্রাকৃতিক শোভায় অতি রমণীয়।

গয়াধামে রামশিলা, ব্রহ্মযোনি ও প্রেতশিলা এই তিনটি পাহাড়ই প্রধান। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের শিখরদেশে সাবিত্রী গায়ত্রী ও সরস্বতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে ব্রহ্মা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়া যে গো-দান করিয়াছিলেন সেই গোষ্পদ-চিহ্ন আজিও দেখিতে পাওয়া

ফল্গুতীর হইতে প্রেতশিলা পর্ব্বত
(গয়া)

যায়। তদ্ভিন্ন পাহাড়ের একস্থানে ব্রহ্মযোনি নামে একটি গুহা আছে। প্রবাদ এইরূপ ঐ গুহায় একবার প্রবেশ করিলে পরজন্মে জঠর-যন্ত্রণা-হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

রামশিলা পাহাড়ের উপর একটি শিবমন্দির ও শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা দেবীর পদরেণু-স্পর্শে এই স্থান পবিত্র হইয়াছিল বলিয়া বিদিত আছে। প্রেতশিলাও একটি উচ্চ পাহাড়। ইহা ভিন্ন ভীম পাহাড় ও সীতাতীর্থ নামে আর-দুইটি প্রসিদ্ধ পাহাড় আছে, ইহাও ভক্তদিগের চক্ষে পবিত্র স্থান। সকলগুলিতেই পিণ্ডদানের নিয়ম আছে। ভীম-পাহাড়ের উপর যে গভীর গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়, কথিত আছে ভীমসেন পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে পিণ্ড-প্রদান করিতে আসিলে, তাঁহার দেহভরে ঐ স্থানে গহ্বর হইয়া যায়।

জয়পুর সহরের চারি মাইল দূরে একটি পরম রমণীয় উপত্যকা আছে, উহার নাম গল্‌তা পাহাড়। পুরাকালে এখানে গালব ঋষির আশ্রম ছিল। তিনি যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা আজিও বহুযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই হোমাগ্নি দর্শন ও স্পর্শ মানসেই ভক্তগণ বহুদূর হইতে এই তীর্থে আগমন করিয়া থাকেন।

মাদ্রাজে কাঞ্চীপুরের নিকট সাতটি-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট এক উচ্চ পর্ব্বত আছে। এই সাতটি শৃঙ্গের নাম স্বামী-তীর্থ, আকাশগঙ্গা, পাপনাশিনী, পাণ্ডবতীর্থ, ডুম্বীরকোণা কুমারবারিকা ও গোগর্ভতীর্থ। এখানে বালাজীউ নামে প্রসিদ্ধ দেবতা আছেন। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র সীতা দেবী লক্ষ্মণ সহ এখানে আসিয়া বালাজীর পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে-স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন সেই স্থানটি স্বামীতীর্থ নামে খ্যাত রহিয়াছে। দ্বাপরে পাণ্ডবগণ একবৎসর কাল এই পর্ব্বতে বাস করিয়া বালাজীর পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে শৃঙ্গে বাস করিয়াছিলেন উহারই নাম পাণ্ডবশৃঙ্গ।

রামেশ্বরদ্বীপে গন্ধমাদন পর্ব্বতের নাম অনেকের নিকটই বিদিত। শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্ব্বাদে এই পর্ব্বত একটি মহাতীর্থে পরিণত হয়। হিন্দুদিগের বিশ্বাস—এখানকার পবিত্র বায়ু অঙ্গে লাগিলে মহাপাতকীও মুক্তি পাইয়া থাকে। এই পর্ব্বতে পূর্ব্ব-পুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে।

দেবতার পদরেণু-লাভে তীর্থে পরিণত হইয়াছে এরূপ আরও ক্ষুদ্র-বৃহৎ গিরিশৃঙ্গ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

দেবাদির চিহ্নময় স্থান

দেবদেবীর বিহার বা লীলার প্রত্যক্ষ চিহ্ন বর্ত্তমান থাকার জন্য যে-সকল স্থান অদ্যাপিও মহাপুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে গয়াধাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বিষ্ণু-মন্দিরের মধ্যে গদাধরের শ্রীপদ-চিহ্ন স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হিন্দু-মাত্রেই পরম ভক্তিভরে ইহার পূজা ও এই স্থানে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। হরিদ্বারে কুশাবর্ত্ত ঘাটের সন্নিকটে যে চরণ-চিহ্ন দেদীপ্যমান রহিয়াছে, উহাও শ্রীবিষ্ণুর চরণ-চিহ্ন বলিয়া খ্যাত। ব্রহ্মপুত্রতীরে উমানন্দ পাহাড়ের সন্নিকটে উর্ব্বশীকুণ্ড নামক স্থানে শ্রীবিষ্ণুর পদ-চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এস্থানটিও তীর্থক্ষেত্র। উক্ত সকল স্থানেই পিতৃপুরুষদিগের মুক্তি কামনায় লোকে পিণ্ডদান করিয়া থাকে। বৃন্দাবনেও চরণ-চিহ্ন নামে একটি পবিত্র স্থান আছে।

দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণে সতীর দেহত্যাগের পর শোক-বিহ্বল মহাদেবের অবস্থা দর্শনে সৃষ্টিনাশের আশঙ্কায় বিষ্ণু কর্ত্তৃক সেই মৃতদেহ একান্ন খণ্ডে ছিন্ন-

বিচ্ছিন্ন হইয়া যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, তাহাই যেমন পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ ভক্তের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ বা দেহাংশ পতিত হইয়া কোন কোন স্থান বরেণ্য হইয়াছে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে বৈষ্ণবচূড়ামণি গয়াসুরের দেহপাতকালে গয়াতে মস্তক, বৈতরণীতে নাভি এবং গোদাবরীতটে পিঠাপুর নামক স্থানে পাদদ্বয় অবস্থিত হওয়ায় এই-সকল স্থান পবিত্র তীর্থ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। শেষোক্ত স্থান পাদগয়া নামে প্রসিদ্ধ। গয়াতীর্থের উৎপত্তি ও গয়াসুর সম্বন্ধে যে-সকল বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহা শ্রবণে বেশ আনন্দ-লাভ হইয়া থাকে। বাহুল্য-ভয়ে তাহা লিখিতে বিরত হইলাম। বৈদ্যেশ্বর-তীর্থে জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য যে চুল্লী প্রস্তুত হইয়াছিল, উহা একটি কূপে পরিণত হইয়াছে। উহাও একটি তীর্থকূপ। পুরীতে আঠারনালা সেতুও একটি এই শ্রেণীর স্থান।

পুরাকালের প্রসিদ্ধ দৈত্য-দানবাদির দেহ সম্পর্কেও কোন কোন স্থান চিরবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। বৃন্দাবনের "কেশী ঘাট" ও বক্‌সারের "তাড়ক নালা" কেশী দৈত্যের ও তাড়কা রাক্ষসীর পতনের স্থান বলিয়া বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। দশানন-ভগ্নী শূর্পণখার লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নাসিকা-ছেদের জন্য নাসিকের তীর্থখ্যাতি। রামেশ্বরের চক্রতীর্থও, ঐরূপ বিষ্ণু-কর্ত্তৃক চক্র দ্বারা দুদ্দম নামক রাক্ষস বধ হওয়ায়, প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। উক্ত সকল স্থানই যে পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে তাহার কারণ, ঐসকল দৈত্যাদির সংহারকারী দেবতাদের চরণস্পর্শে উহা পূত হইয়াছে।

দেবদেবী ও মহাপুরুষদের লীলাক্ষেত্র বলিয়া, মথুরার বিশ্রাম-ঘাট হইতে আমাদের পার্শ্বস্থ বৈদ্যবাটীর নিমাইতীর্থের ঘাট পর্য্যন্ত কত যে প্রসিদ্ধ পবিত্র স্থান আছে তাহার সংখ্যা নাই। আবার পক্ষান্তরে কয়েকটি অপবিত্র বিখ্যাত নদী ও গিরি দেখিতে পাওয়া যায়। দশাননের প্রস্রাব হইতে উৎপন্ন বৈদ্যনাথের কর্ম্মনাশা নদী এবং চট্টগ্রামের মৃতনদী এই শ্রেণীর। ইহার জল কোন দেবকার্য্যে ব্যবহার হয় না। কামরূপে উমানন্দ দেবীর মন্দিরের নিকট কর্ম্মনাশা নামে এক গিরিশৃঙ্গ আছে। কথিত আছে উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তথাকার সমস্ততীর্থফল নষ্ট হইয়া যায়।

পাষাণময় মানবেতর জীবমূর্ত্তি

দেবদেবীর বাহন-রূপে আমরা বহু প্রকার জন্তুর কথা অবগত থাকিলেও, তাহারা সে-কারণে আমাদের কাছে কোন পূজা পায় না। কিন্তু দেবানুগ্রহে পতিত হইয়া মানবেতর কোন কোন নির্দ্দিষ্ট জীব মানুষের চক্ষে ভক্তির পাত্র হইয়া আছে। পুরীধামের রোহিণী-কুণ্ডে 'ভুশুণ্ডীকাক', কাশীর জ্ঞানবাপীর পার্শ্বে ও রামেশ্বরে নন্দী নামক প্রস্তরময় বৃষমূর্ত্তি, নেপালে সুবর্ণ-মণ্ডিত নন্দী অর্থাৎ বৃষ-মূর্ত্তি এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তটে অশ্বক্রান্তা দেবালয়ে অশ্বদিগের পাষাণ-মূর্ত্তি তীর্থপর্য্যটকদিগের চক্ষে আরাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কাশীর কালভৈরবের বাহনরূপে তথায় মন্দিরে একটি কুক্কুর-মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মহাবীর হনুমানের মূর্ত্তি বহু স্থানেই নিয়মিত পূজা পাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ভুবনেশ্বরে ও অন্যত্র আরও অনেক বৃষ-মূর্ত্তি মহাদেবের স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

আকাশরূপী দেবতা

সুপ্রসিদ্ধ চিদম্বরম্-নামক দেবালয় স্থাপত্য-শিল্পে অতুলনীয়। স্বয়ং ব্রহ্মার অভিপ্রায়-মত এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, এই অপূর্ব্ব মন্দিরে কোন দেব-মূর্ত্তিই ভক্তগণের নয়নগোচর না হওয়ায় তাঁহারা নৈরাশ্যে ব্যথিত হন। এখানে আকাশরূপী ভগবান্ বিরাজমান। অভ্যন্তরে একটি প্রাচীর-গাত্রে "আকাশ-লিঙ্গ" এই কথাটি মাত্র লেখা আছে, উহাই একখানি পর্দ্দার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে ঐ যবনিকা উত্তোলন করিয়া লেখাটি দেখাইয়া থাকেন।

প্রাকৃতিক অস্বাভাবিকতা

হিন্দুদিগের তীর্থমধ্যে বহুতর বিচিত্র প্রকারের দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জানি না এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যই উহাদের পূজা পাইবার কারণ কি না। চন্দ্রনাথের অন্তর্গত গুরুধুনী তীর্থ নামে এক অদ্ভুত স্থান আছে। এখানে গিরি-গাত্র হইতে সর্ব্বদাই অগ্নিশিখা নির্গত হইতে দেখিতে

পাওয়া যায়। এই অগ্নি স্পর্শ ও প্রণাম করা ভিন্ন এখানে অন্য কোন কার্য্য নাই। ব্রহ্মকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, লবণাক্ষ, কুমারী-কুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড নামে কয়েকটি অদ্ভুত উষ্ণজল-বিশিষ্ট কুণ্ডও ঐ স্থানে বিদ্যমান আছে।

প্রভাসতীর্থে নর্ম্মদার জলপ্রপাতের নিম্নে ধুঁয়াধার নামক চক্রাকার আবর্ত্তন একপ্রকার কোমল পাথরে আচ্ছন্ন দেখা যায়। কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন-কালে, সীতা দেবীর ঐ স্থানে পার হইবার সময় পাছে কোমল চরণে আঘাত লাগে, এই কারণে গিরিরাজকে কোমল ভাব ধারণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের আল্‌তা-পাহাড়ী সম্বন্ধেও শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণের অলক্তের সহিত কি-একটা প্রবাদ আছে বলিয়া শুনিয়াছি।

পবিত্র কুণ্ড ও সরোবরাদি

সমগ্র ভারত মধ্যে কত যে পুণ্যসলিল সরোবর, হ্রদ, কুণ্ড ও কূপাদি আছে তাহার সংখ্যা করা কঠিন। এই-সকলের বিবরণ, ও যে-সব পুরাতন গল্প বা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহা মনোরম হইলেও, বাহুল্য-ভয়ে সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব।

রামেশ্বর, হরিদ্বার, ব্রজমণ্ডল, পুরী, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থেই অধিক সংখ্যক কুণ্ডাদি দেখা যায় এবং ঐ-সকল কুণ্ড জনগণের নিকট অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। রামেশ্বরে সর্ব্বসুদ্ধ প্রায় ৫৭টি তীর্থ পুষ্করিণী কুণ্ড ও কূপ আছে। তন্মধ্যে শিবতীর্থ, চক্রতীর্থ, মাধব-তীর্থ, রামতীর্থ, লক্ষ্মণতীর্থ, ব্রহ্মকুণ্ড, অমৃতবাপিকাতীর্থ, সীতাসরতীর্থ, অগস্ত্যতীর্থ, হনুমৎকুণ্ড, মঙ্গলতীর্থ, জটাতীর্থ, লক্ষ্মীতীর্থ, অগ্নিতীর্থ, শঙ্খতীর্থ, মানসতীর্থ, সাধ্যামৃততীর্থ, গঙ্গাতীর্থ, যমুনাতীর্থ, গয়াতীর্থ, ধনুষ্কোটীতীর্থ, সুদর্শনতীর্থ প্রভৃতিই প্রধান।

কথিত আছে শিবতীর্থ ও চক্রতীর্থ স্বয়ং মহাদেব ও ধর্ম্মের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। ব্রহ্মকুণ্ড ব্রহ্মার নামে উৎসৃষ্ট। গ্রীষ্মকালে ইহার জল শুষ্ক হইয়া যাইলে, তখন ইহার মধ্যে ভস্মের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা অতি পবিত্র-জ্ঞানে যাত্রীগণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই কুণ্ডে স্নান করিলে মিথ্যাদোষ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অমৃতবাপিকা-তীর্থের আর-একটি নাম রামনাথ-ক্ষেত্র। প্রবাদ এইরূপ—শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান্ প্রভৃতি এই স্থানে বসিয়া রাবণ-বধের মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণতীর্থ ও হনুমৎকুণ্ডে যজ্ঞ করিলে নিঃসন্দেহ অপুত্রকের সৎপুত্র লাভ হইয়া থাকে। বুদ্ধগয়ার পদ্ম নামক সরোবর ও ভুবনেশ্বরের মরীচ নামক কুণ্ডও এই একই কারণে বিখ্যাত। অগ্নিতীর্থ-সমীপে জানকী সর্ব্বজন-সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা দিয়াছিলেন। শঙ্খতীর্থে স্নান করিলে গুরুজনদিগের অপমান-কারক ও কৃতঘ্ন ব্যক্তির মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। সাধ্যামৃততীর্থে স্নান করিলে বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ধনুষ্কোটিতীর্থ সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে—সাগর সেতু দ্বারা আবদ্ধ থাকাতে শৃগাল কুক্কুর

শ্রী শ্যামকুণ্ড
(ব্রজমণ্ডল)

পর্য্যন্ত তাহাকে অবলীলাক্রমে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইত বলিয়া রঘুবীরের নিকট চিরবন্ধন মোচনের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করায়, অগ্রজের আদেশে লক্ষ্মণ স্বীয় ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা সেতুটি তিনখণ্ডে বিভক্ত করিয়া দ্যান; তদবধি ঐ স্থানের নাম ধনুষ্কোটিতীর্থ হইয়াছে। এই স্থানের মাহাত্ম্য অত্যন্ত অধিক, এখানে বিধিপূর্ব্বক স্নানাদি করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞ, চতুর্ব্বিধ মুক্তি এবং সহস্র গোদানের ফললাভ ভিন্ন বিশ্বাসঘাতকতা-জনিত পাপের মোচন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

সমগ্র ব্রজমণ্ডলেও বিবিধ মাহাত্ম্যপূর্ণ বিস্তর কুণ্ডাদি

বিদ্যমান আছে। মাহাত্ম্যহিসাবে স্থান নির্ণয় করিতে হইলে কোন্ তীর্থের কোন্‌টি বড় কোন্‌টি ছোট তাহা নিরাকরণ করা সহজ নহে, যেহেতু সকলগুলিই আপন আপন মহিমা ও গৌরবে সমৃদ্ধ। তথাপি এখানকার শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, মানসীগঙ্গা, কুসুম-সরোবর প্রভৃতি সরোবরগুলি মাহাত্ম্যের সহিত আকার ও সৌন্দর্য্য-সমন্বয়ে অন্যান্যগুলি অপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রাধাকুণ্ড শ্রীরাধারাণীর অভিলাষে খোদিত হয়। উহা বহু তীর্থের বারি দ্বারা পরিপূরিত। শ্যামকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের বংশী দ্বারা প্রস্তুত হয় এবং তাঁহার ইচ্ছায় পাতালের

শ্রী রাধাকুণ্ড
(ব্রজমণ্ডল)

ভোগবতীর জলে উহা পূর্ণ হয়। বোম্বাইয়ে সমুদ্রের অতি নিকটে একটি পূত সরোবর আছে, উহাও শ্রীরাম চন্দ্রের শরে বিদ্ধ হইয়া পাতালের ভোগবতীর জলে পূর্ণ হয়। সমুদ্রের নিকট থাকিলেও ইহার জল লবণাক্ত নহে। মানসী-গঙ্গাও শ্রীকৃষ্ণের মানসেই আবির্ভূত। এখানে চক্রেশ্বর বা চালকেশ্বর নামে এক মহাদেব আছেন। এই হ্রদ গোবর্দ্ধনের সন্নিকটে অবস্থিত। শ্রীরাধাকুণ্ডের পথে কুসুম-সরোবর আর-একটি অতি মনোরম সরোবর। প্রাকৃতিক শোভায় ইহা অতুলনীয়। গোবর্দ্ধন হইতে দেড় ক্রোশ দূরে চন্দ্রসরোবর নামে আর-একটি সুবৃহৎ সুন্দর পবিত্র সরোবর আছে।

ব্রজধামে উক্ত কয়েকটি ভিন্ন ললিতাকুণ্ড, লুকালুকি-কুণ্ড, প্রেমসরোবর, বিশাখাকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, ক্ষীরসাগর,

মানসী গঙ্গা
(গোবর্দ্ধন)

মানসরোবর, ব্রজমোহনকুণ্ড, মহ্লারকুণ্ড, শ্রীকুণ্ড, শান্তন-কুণ্ড, কালীয়হ্রদ, গোবিন্দকুণ্ড প্রভৃতি আরও অনেকগুলি কুণ্ড আছে। এইসকলের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্রাকার এবং বর্ত্তমানে তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইলেও, এখনও ভক্তিমান্‌দের নিকট উহারা পরম পবিত্র স্থান। তাঁহারা বিশেষ-ভক্তিসহকারে উহাদের জল স্পর্শ করিয়া থাকেন এবং পাণ্ডাদের মুখে উহাদের উৎপত্তি-ও মাহাত্ম্যকথা শুনিয়া থাকেন। ললিতাকুণ্ড সেবাকুঞ্জে অবস্থিত। রাত্রিকালে কেহই এখানে থাকিতে পান না। ব্রহ্মকুণ্ড প্রজাপতি ব্রহ্মার অশ্রু হইতে সৃষ্ট হয়। সেইরূপ বৃষভানুনন্দিনী মান করিয়া তাঁহার নয়নজলে মান-

কুমুদ সরোবর
(বৃন্দাবন)

কালীয়-হ্রদ, শ্রী মদনমোহনের পার্শ্বস্থ টিলা হইতে
(বৃন্দাবন)

সরোবর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শান্তন-কুণ্ড-তীরে বসিয়া শান্তনুমুনি তপস্যা করিয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়াছিলেন; তদবধি এই তীর্থের নাম শান্তনকুণ্ড হইয়াছে। কালীয়-হ্রদে কালীয় নামক সুপ্রসিদ্ধ নাগের বাসস্থান ছিল বলিয়া কথিত আছে। কালীয়দমনের উপাখ্যান অনেকেই জ্ঞাত আছেন।

মথুরার মধ্যে কৃষ্ণগঙ্গা এবং গোকুলে মধুকুণ্ড ও পোৎরাকুণ্ড নামক কুণ্ডই বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ বৎসাসুর বধ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হওয়ার মানসে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়া তাহাতে স্নান করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই কৃষ্ণ-গঙ্গার উৎপত্তি। মধুকুণ্ড নামক কুণ্ডটি এক সময়ে এক দৈত্য-সঞ্চিত মধুর দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত; বলদেব ঐসমস্ত মধু পান করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তীর্থবারিতে উহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন; তদবধি উহা মধুকুণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার নিকটে এক উচ্চ টিলার উপর ধ্রুবের তপস্যাস্থান এখনও বর্ত্তমান আছে। পোৎরাকুণ্ড গোকুলবাসীদের নিকট অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর সূতিকাগৃহের বস্ত্রাদি ঐ কুণ্ডে প্রক্ষালিত হইয়াছিল।

দ্বারকায় গোমতী, সাগরতীর্থ, নারায়ণপুষ্করিণী, সপ্তকুণ্ড ও গঙ্গাতীর্থ বিখ্যাত। এই নারায়ণপুষ্করিণী ভারতের চারি ধামের মধ্যে সর্ব্বত্রই পূজনীয়। গৌহাটিতে ব্রহ্মকুণ্ড, সৌভাগ্যকুণ্ড, উর্ব্বশীকুণ্ড, অপূর্ণভর ও বরাহ-কুণ্ড নামে পাঁচটি খ্যাতনামা কুণ্ড আছে। ব্রহ্মকুণ্ডের মাহাত্ম্য অসীম। পরশুরাম এই কুণ্ডে স্নান করিয়া মাতৃহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী আছে এই কুণ্ড হইতেই ব্রহ্মপুত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। আসামের শিবসাগরও একটি রমণীয় পবিত্র সরোবর।

পুরী ও ভুবনেশ্বরে অনেকগুলি পবিত্র ও সুন্দর সরোবর আছে। তাহার সংখ্যা মোটামুটি প্রায় পঁচিশটি। ইহাদের মধ্যে ভুবনেশ্বরের বিন্দুসরোবর, পুরীর নরেন্দ্র-সরোবর বা চন্দন-পুকুর অতি সুন্দর ও বৃহৎ। বিন্দুসরোবরের মত সুদীর্ঘ পুষ্করিণী খুব কমই আছে। এই উভয় সরোবরের মধ্যে একটি করিয়া দেবালয় আছে। বৈশাখ মাসে চন্দন-যাত্রার সময় ভুবনেশ্বরের প্রতিনিধি চন্দ্রশেখর দেব এবং জগন্নাথের প্রতিনিধি মদনমোহনজীউ ঐ মন্দিরে অবস্থান করেন। বিন্দুসরোবরের উৎপত্তি বিষয়ে একটি সুন্দর কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। দেবী বিন্দুবাসিনীর নামে মহাদেব কর্ত্তৃক এই নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। এই দুইটি সরোবর ভিন্ন রোহিণীকুণ্ড, শ্বেতগঙ্গা, মার্কণ্ড, ইন্দ্রদ্যুম্ন, চক্রতীর্থ, পার্ব্বতী-সরোবর, ব্রহ্মকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, ললিতা-কুণ্ড, রামকুণ্ড, মরীচিকুণ্ড, কপিলহ্রদ, কোটীতীর্থ ও পাপনাশিনী তীর্থ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে পাপনাশিনী তীর্থ, কপিলহ্রদ, ও কোটীতীর্থের মাহাত্ম্য অধিক। পুরীর নরেন্দ্র, ইন্দ্রদ্যুম্ন, সমুদ্র, মার্কণ্ড ও চক্রতীর্থ এই পাঁচটিকে পঞ্চতীর্থ বলে। তীর্থযাত্রীরা ভক্তিসহকারে ইহার জল স্পর্শ ও পূজাদি করিয়া থাকেন। মার্কণ্ডহ্রদতীরে বসিয়া মার্কণ্ডেয়-ঋষি তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া উহা এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার আয়তন বিশাল। যথানিয়মে এখানে সঙ্কল্প, পূজা ও তর্পণাদি করিলে সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। সমুদ্রের তীরে ষ্টেশনের নিকট একটি স্থান আছে, উহাকেই চক্রতীর্থ বলে। একখণ্ড বালুকাময় চড়া উহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক করিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উহার জল আদৌ লবণাক্ত নহে। ব্যাস-কাশীতে চক্রতীর্থ নামে আর-একটি পুণ্য পুষ্করিণী আছে, স্বয়ং বিষ্ণু চক্র দ্বারা উহা খনন করিয়া স্বীয় অঙ্গগলিত স্বেদ-

জল দ্বারা উহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসর কাল ঐ স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন।

শিবগঙ্গা—(বৈদ্যনাথ)

বৈদ্যনাথে শিবগঙ্গা, গয়ায় সূর্য্যকুণ্ড; কাশীতে দুর্গাকুণ্ড, হরপাপহ্রদ; অযোধ্যায় ব্রহ্মকুণ্ড বা পাপহরণ, হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ড, ভীমঘোড়া ও গৌরীকুণ্ড; আজমীরে অন্নসাগর ও বিশাল-সাগর; কাঞ্চীপুরে কোটিতীর্থ; বুদ্ধ-গয়ায় সূর্য্যকুণ্ড; বালাজীতে কপিলা-পুষ্করিণী ও স্বামীতীর্থ; চিদম্বরমে হেমতীর্থ; বৈতরণীতে যজ্ঞকুণ্ড; গোদাবরীতে বিয়ৎগঙ্গা; বদরীকেদারে অমৃতকুণ্ড, উদককুণ্ড, হংসকুণ্ড, রেতঃকুণ্ড, তপ্তকুণ্ড, ঋষিগঙ্গা, কূর্ম্মধারা, প্রহ্লাদধারা, নারদ ধারা, সূর্য্যকুণ্ড ও গরুড়-গঙ্গা; এবং কুম্ভকোণমে মহামোক্ষম্ উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত প্রত্যেকটিই পরম পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। উহার মধ্যে কতকগুলি বেশ সুদৃশ্য, অবশিষ্টগুলি শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। বৈদ্যনাথের শিবগঙ্গা ও কাশীর দুর্গাকুণ্ড সুন্দর বাঁধান বৃহৎ সরোবর। হরপাপহ্রদের অপর নাম হংসতীর্থ, মধুস্রবাগঙ্গা, গৌরীকুণ্ড ও মানসতীর্থ। বশিষ্ঠদেব এই হ্রদে স্নান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অযোধ্যার ব্রহ্মকুণ্ড সম্বন্ধে প্রবাদ, শ্রীরাম-

চিদম্বরম্—মান্দ্রাজ
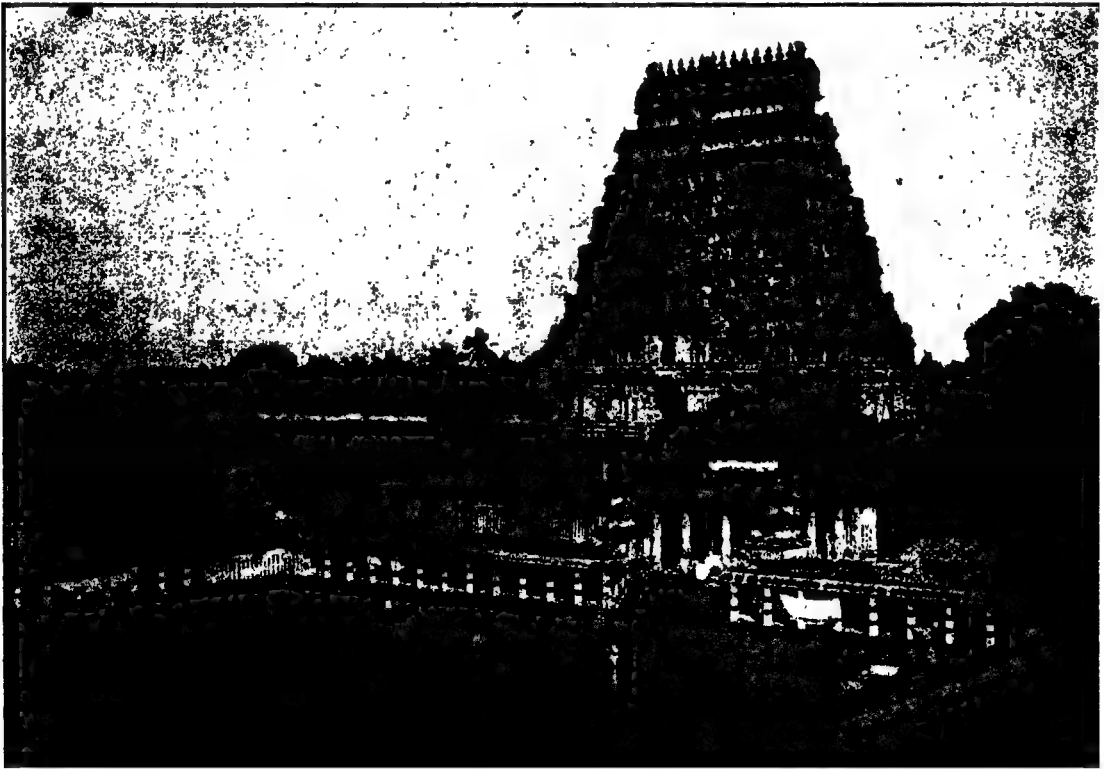
চন্দ্রকে রাবণবধজনিত ব্রহ্মহত্যা পাপ স্পর্শ করিলে তাঁহার হস্ত-তালুতে একটি কাল দাগ হয়। তিনি বিধিমত চেষ্টা করিয়াও ঐ দাগ উঠাইতে সক্ষম হন নাই, অবশেষে নৈমিষারণ্যে এই কুণ্ডে হস্ত-প্রক্ষালনমাত্র দাগ অদৃশ্য হয়। তদবধি উহার অপর নাম পাপহরণ। ভীমঘোড়া নামক তীর্থটি অশ্বখুরাকৃতি একটি জলাধার। ভীমসেনের অশ্বখুর হইতে উহার উৎপত্তি এইরূপ জনপ্রবাদ। আজমীরের পর্ব্বতের উপত্যকায় অনসাগর ও বিশাল-সাগর নামক হ্রদ দুইটি আয়তনে বৃহৎ এবং দেখিতেও সুন্দর। কাঞ্চীপুরের কোটীতীর্থ একটি দীঘির আকারের। এই সহর মধ্যে রবিতীর্থ, সোমতীর্থ ইত্যাদি সাতটি বারের নামে আর সাতটি বিভিন্ন মাহাত্ম্যপূর্ণ জলাশয় আছে। যে যে নামের যে তীর্থ সেই সেই দিনে উহাতে স্নান করিলে ভিন্ন ভিন্ন ফল পাওয়া যায়।

ভারতের চারিধারে যেমন চারিধাম প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ চারি দিকে মানস, বিন্দু, নারায়ণ ও পম্পাসরোবর নামে চারিটি প্রসিদ্ধ সরোবর আছে। কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর নিকটে পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে পরম রমণীয় পম্পাসরোবর অবস্থিত। উহার নিকটে মাতঙ্গসরোবর নামে আর-একটি পুণ্যতোয় সরোবর আছে।

চন্দ্রনাথ তীর্থে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ কুণ্ড আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি কিছু বিচিত্র প্রকারের। সীতাকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, লবণাক্ষকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড ও কুমারীকুণ্ড নামে কুণ্ড কয়টির বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের জল উষ্ণ এবং কোনটি হইতে সর্ব্বদা বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেছে, কোনটি একেবারে অগ্নিময় জলন্ত জলকুণ্ড, কোনটির জল লবণাক্ত। বাড়বানলতীর্থ নামে আর-একটি চতুষ্কোণাকৃতি আশ্চর্য্য কুণ্ড আছে, উহার এক কোণ হইতে একটি অগ্নিশিখা সর্ব্বদা দপ্‌ দপ্‌ শব্দে প্রজ্বলিত হইতেছে। লবণাক্ষ-কুণ্ডটি এক প্রস্রবণ বিশেষ, উহার জল লবণাক্ত এবং উহার এক স্থান হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইয়া থাকে। বাড়বানলকুণ্ডের গভীরতা এ পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, পুষ্করতীর্থের ন্যায় ইহা নাকি অতলস্পর্শী। কথিত আছে কুণ্ডটি পাতালের সহিত সংলগ্ন আছে। এখানে ব্যাসকুণ্ড, রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড ও বাসি-কুণ্ড নামে আর চারিটি কুণ্ড আছে। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড প্রসিদ্ধ।

বিধাতৃবিহিত পুষ্করতীর্থের কথা কে না জানেন? এই সত্যযুগের তীর্থটির মাহাত্ম্য অসীম, ইহাও অতলস্পর্শী। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ নামে দুইটি পুষ্কর দেখিতে পাওয়া যায়। উহার জল নির্গত হইয়া পার্শ্বের যে জলাভূমিতে পতিত হইতেছে, তাহার নাম সরস্বতী। এই সরস্বতী কুরুক্ষেত্রে অদৃশ্য হইয়া পুষ্করে সুপ্রভা, সুধা, কনকা, নন্দা ও প্রাচী পঞ্চনদী নামে অধিষ্ঠিত। কথিত আছে, এক সময় সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব ইহার গভীরতা বিষয়ে সন্দেহ করিয়া তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ায়, দেবরোষ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বাধ্য হইয়া পুষ্করের নিকট নিজ অপরাধ মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন এবং তৎপরে বাহান্ন হাজার বিঘা দেবোত্তর ভূমি দান করেন। এই তীর্থের সম্বন্ধে বিস্তর কিম্বদন্তী আছে।

বদরিকাশ্রমে ব্রহ্মকুণ্ড ও কুশাবর্ত্ত নামে যে দুইটিকে কুণ্ড বলে, তাহা প্রকৃতপক্ষে কুণ্ড নহে, দুইটি বাঁধা ঘাট। জরাব্যাধ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রক্তাক্ত চরণ-কমল যে কুণ্ডে ধৌত করিয়াছিলেন তাহার নাম পদমকুণ্ড। ইহার নিকটে ভালকাকুণ্ড নামক পবিত্র কুণ্ডটি অবস্থিত। থানেশ্বরের নিকট একটি হ্রদ আছে, প্রবাদ কুরুরাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এই হ্রদে লুকাইয়া ছিলেন।

তীর্থ-কূপ

কুণ্ড ও সরোবরাদির ন্যায় নানা স্থানে বহু পবিত্র কূপ ও ঝরণা দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থসকলে যে-সব কূপ আছে তন্মধ্যে খ্যাতনামা কয়েকটি কূপের কথা নিম্নে লিখিত হইতেছে। কাশীতে কালকূপ ও জ্ঞানবাপী প্রসিদ্ধ। কালকূপের উপরের ভিত্তিগাত্রে এমন একটি ছিদ্র আছে যাহার ভিতর দিয়া প্রতিদিন ঠিক মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যরশ্মি জলে পতিত হয়। জ্ঞানবাপীর কথা অনেকেই জানেন, ইহা বিশ্বেশ্বরের ত্রিশূল দ্বারা গণপতিকৃত একটি কূপ। ইহার সেবার্চ্চনা করিলে দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া লোকে অন্তে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হয়।

অযোধ্যায় জনক রাজর্ষির কূপ ও বশিষ্ঠাশ্রমে যে কূপ আছে তাহাই উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত কূপসান্নিধ্যে শ্রীরামচন্দ্র বাল্যকালে ভ্রাতৃগণ সহ ক্রীড়া করিতেন।

কুরুক্ষেত্রে অমৃতকূপ ও চন্দ্রকূপ নামে দুইটি কূপ আছে। চন্দ্রকূপ, নামে কূপ হইলেও উহা একটি জলাশয়ের মত। বৈতরণীতে সতীর নাভিদেশ পতিত হইয়া যে কূপের সৃষ্টি হইয়াছে, উহা নাভিগয়া নামে প্রসিদ্ধ। দ্বারকায় নৃপকূপ নামে একটি প্রসিদ্ধ কূপ আছে।

খ্যাতনামা পবিত্র প্রস্রবণ

যে-সকল প্রস্রবণ বা ঝরণা পবিত্র ও বিশেষভাবে জ্ঞাত, তন্মধ্যে বশিষ্ঠাশ্রমের প্রস্রবণটি অতি মনোরম।

বশিষ্ঠাশ্রম

উহা হইতে সন্ধ্যা ললিতা ও কান্তা নামে যে তিনটি ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা ত্রিধারা গঙ্গা নামে খ্যাত। চন্দ্রনাথে মন্মথনদ লবণাক্ষ ও সহস্রধারা নামে তিনটি ঝরণা আছে। ইহার মধ্যে সহস্রধারার দৃশ্য অপূর্ব্ব। প্রায় ৩০০ ফুট উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে প্রচণ্ড বেগে নিক্ষিপ্ত জলরাশি শিলাখণ্ডে বাধা পাইয়া সহস্রধারে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে, এই কারণ ইহার সহস্রধারা নাম হইয়াছে। নর্ম্মদার জগদ্বিখ্যাত জলপ্রপাত তীর্থের হিসাবে যত না হৌক শোভায় তুলনাহীন। অবশ্য পুণ্যসলিলা নর্ম্মদার মাহাত্ম্য অপর্য্যাপ্ত। এই স্থানের বিশেষত্ব এই; উৎকলের বিন্দুসরোবরের ন্যায় এখানে পিতৃমাতৃকুল ব্যতীত শ্বশুরকুলকেও শ্রাদ্ধ তর্পণাদিতে তৃপ্ত করিতে হয়। কাবেরী নদীর জলপ্রপাতের প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি রমণীয়। ইহাও একটি পবিত্র স্থানের মধ্যে পরিগণিত।

টিনেভেলির পাপনাশম নামক জলপ্রপাতও পরম পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কথিত আছে—ঐ পবিত্র বারি সর্ব্ব পাপ বিধৌত করিতে সক্ষম।

বহু পুণ্যতোয় সরোবর কুণ্ড ও কূপাদির কথা উল্লিখিত হইলেও অনেকের কথা বলিতে পারি নাই। এই প্রবন্ধ মধ্যে কর্ম্মনাশা নদী ও কর্ম্মনাশা গিরিশৃঙ্গ এবং মৃত নদী ভিন্ন আর যাহা-কিছুর বিষয় বিবৃত হইয়াছে, সকলগুলিই হিন্দুর চক্ষে পবিত্র ও আরাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সকলগুলির উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যের কথা বিশদভাবে বলিতে হইলে, একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে, সেই কারণ এক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। প্রচলিত জনশ্রুতিগুলির সমস্ত সত্য বলিয়া মনে না হইলেও বা অনেক অসংলগ্ন বোধ হইলেও যেরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে সেই মতই বিবৃত হইল। যে-সকল তীর্থাদির কথা লিখিত হইল, তাহার অধিকাংশই আমি স্বচক্ষে দেখি নাই, উহা প্রত্যক্ষদর্শী অন্যের নিকট বা পুস্তকাদি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ফোটোগুলির অধিকাংশই নিজের গৃহীত হইলেও কয়েকখানি অন্যত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রী হরিহর শেঠ

নাকে দেখা এবং আঙুলে শোনা—

সকলে হয়ত বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু ১৭ বছরের বালিকা—অন্ধ এবং বধির—সত্য সত্যই, নাকের সাহায্যে চোখের, এবং অঙ্গুলীর দ্বারা কানের, সমস্ত কাজ করে। এই বালিকা এমন সমস্ত কতকগুলি শক্তির অধিকারী হইয়াছে, যাহাতে মনে হয় যে তাহার পিছনে বুঝি দুটি চোখ আছে। চোখ এবং কান না থাকিলেও যে মানুষ তাহার অন্য কোন অঙ্গের দ্বারা সে অভাব পূর্ণ করিয়া লইতে পারে, একথা আমরা ভাবিতে পারি না, অন্ততঃ যাহাদের চোখ এবং কান আছে। কিন্তু এই বালিকা শিশুকাল হইতেই দৃষ্টি এবং শ্রবণ শক্তি হারাইয়া, তাহার নাক এবং আঙ্গুলের দ্বারা চোখ এবং কানের কাজ চালাইয়া লয়। এই বালিকার নাম উইলেটা হাগিন্স। এর বিবরণ অন্যে পরাদীতে দেওয়া হইয়াছে।

উইলেটা বক্তার মাথার উপর লম্বা ছাতা রাখিয়া তাহার কথা বুঝিতেছে
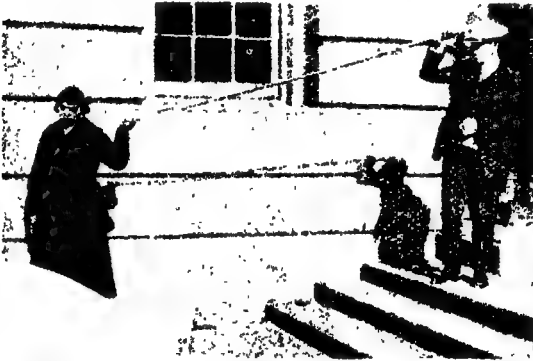
উইলেটা শুঁকিয়া রং চিনিতে পারে এবং কেহ কোন কথা বলিলে তাহার গলায় আঙ্গুলের ডগা রাখিয়া কথা বুঝিতে পারে। ঘরের মধ্যে বিড়াল নিঃশব্দে আসিয়া যদি পর মুহূর্ত্তেই সেই ঘর ত্যাগ করে, উইলেটার কাছে তাহাও ধরা পড়ে। বৈজ্ঞানিক এবং ডাক্তারেরা উইলেটার এই শক্তির পরিমাণ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেছেন—তাহা এখনও শেষ হয় নাই। তবে এই বালিকার শক্তি যে অসামান্য তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

নয় বছর বয়সে উইলেটার মাতাপিতা মারা যান। তাহার পর নূতন সে উইস্কন্সিন্ অন্ধ-বিদ্যালয়ে (জানেস্‌ভিলে) যায়। এই সময় সে খুব সামান্য দেখিতে পাইত কিন্তু প্রায় কালা ছিল। পাঁচ বছরের মধ্যে সে দৃষ্টি- এবং শ্রবণ-শক্তি একেবারে হারাইয়া ফেলে। এত দুঃখের মধ্যে পড়িয়া সে কেমন যেন মন-মরা গোছের হইয়া যায়। তার পর তার হঠাৎ পরিবর্ত্তন হয় এই সময় তাকে হেলেন কেলারের (Helen Keller's method of hearing) পদ্ধতিতে, লোকের ওষ্ঠে আঙ্গুল দিয়া তাহার কথা বুঝিতে, শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়।

এক রাত্রির মধ্যেই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। উইলেটা লোকের ঠোটে আঙ্গুল না দিয়া তাহার গলায় আঙ্গুল দিয়া কথা আরো ভাল করিয়া বুঝিতে পারে দেখাইল। ক্রমশঃ তাহার এই শক্তি এত বেশী প্রখর হইল যে চারিদিকে তাহার নাম ছড়াইয়া পড়িল। শেষে ১৯২২ সালের ২৮এ এপ্রিল চিকাগো সহরের চিকিৎসক-মণ্ডলীর সম্মুখে তাহার পরীক্ষা হইল।

কানে লাগাইবার যন্ত্রমুখে আঙুল দিয়া উইলেটা টেলিফোনের কথা শুনিতেছে

উইলেটা বলে—সে কথা শুনিতে একেবারেই পায় না, সে কথা স্পর্শ দ্বারা অনুভব করে। বক্তার বুকে একটা ছড়ির এক প্রান্ত দিয়া, অপর দিক্ সে স্পর্শ করিয়া, বক্তার সমস্ত কথা বুঝিতে পারে। টেলিফোনের কানে লাগাইবার চোঙার পাতলা আবরণের উপর আঙুল দিয়া উইলেটা সমস্ত কথা বুঝিতে পারে। এইরূপে সে সঙ্গীত এবং বাদ্য সবই উপভোগ করিতে পারে। তাহার নিজস্ব টেলিফোন যন্ত্রের সাহায্যে সে যে কোন কান ওয়ালা ব্যক্তির সঙ্গে খুব সাধারণ এবং সহজ ভাবেই কথা-বার্ত্তা বলিতে পারে। উইলেটা খবরের কাগজের বড় হরফে লেখা হেডিং আঙ্গুল বুলাইয়া পড়িতে পারে। সে বলে, সে সবই অনুভব করিয়া বলে। কয়েকখানা কমবেশী দামের কাগজের (টাকার) নোট তাহার হাতে দিলে সে কোনটা কত দামের তাহা বলিয়া দিতে পারে। শিকাগোতে তাহার যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে সে ত্রিশটি দ্রব্যের ঘ্রাণের দ্বারা তাহাদের যথার্থ রং বলিয়া দেয়। এইগুলি সে হাত দিয়া স্পর্শ করে নাই – একটি ৪ ইঞ্চি লম্বা কাঁচের নলের এক প্রান্তে এগুলিকে রাখা হইয়াছিল।

অনেকে বলিতেছেন উইলেটা সত্যই অন্ধ বা বধির নয়—তাহার মাথার কোন দোষ আছে, যাহার জন্ত উইলেটার দৃঢ় বিশ্বাস সে সে অন্ধ এবং বধির। এই ধারণা তাহার মনে এত দৃঢ়-ভাবে বসিয়াছে যে উইলেটা কোন জিনিসকে দেখিলে তাহা চোখ দিয়া দেখিতেছে বলিয়া মনে করে না। এই রকম ব্যাপার অনেকবার সত্যই ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কারণ তাহার চোখে কাল চশমার ভিতর তুলা ভরিয়া বেশ ভাল করিয়া বাঁধিয়া কম করিয়া ত্রিশটা বিভিন্ন রঙের, কাপড়ের রং তাহাকে বলিতে আদেশ করা হয়। উইলেটা তাহা একেবারে ঠিক ঠিক বলিয়াছিল।

অধ্যাপক গর্ট এই ব্যাপার সম্বন্ধে নানা প্রকার তথ্যের আলোচনা করিতেছেন। তিনি দুইজন লোক আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারা ঘ্রাণ করিয়া দুইটি কাপড়ের টুক্‌রা এক-রঙের কি না বলিতে পারে।

—

গাছের বয়স—

ঝড়ে একটি গাছ উপড়াইয়া পড়িয়া যায়। তাহার গোড়ার ব্যাস ১৪ ফুট। এই গাছটি যে কত পুরাণো তাহা বুঝাইবার জন্য গাছটিকে এড়োভাবে কাটা হয় এবং তাহার মধ্যে কয়েকটি বৃত্ত কাটিয়া দেওয়া হয়। গাছটি কি রকম ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা এই বৃত্তগুলিতে বুঝা যায়। এই বৃত্তিগুলি ইতিহাসের এক-একটি বিশেষ বছরের উপর দেওয়া হইয়াছে। ছবি দেখিলেই ব্যাপারটি বেশ পরিষ্কার বোঝা যাইবে।

হাজার বছরের বৃদ্ধ গাছের কাণ্ড

যে উদ্যানে এই গাছটি হাজার বছরেরও উপর বাস করিতেছিল, সেখানে আরো এমন গাছ আছে যাহার গোড়ার ব্যাস সাড়ে ২৯ ফুট এবং বয়স ৪০০০ বছরের কম নয়।

—

কাঁদন-গ্যাস—

গত বছরের 'প্রবাসী'তে কাঁদন-গ্যাসের বিষয় উল্লেখ করা হয়। এই গ্যাসের বোমা কাহারও গায়ে ছুড়িয়া মারিলে বোমা ফাটিয়া গিয়া একপ্রকার গ্যাস বাহির হয়, সেই গ্যাস নাকে প্রবেশ করিবামাত্র লোকে ভয়ানক কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে—কিন্তু বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না বা লোক মরিয়া যায় না। ইহাতে চোর-ডাকাতকে হত্যা বা জখম না করিয়া পাক্‌ড়াও করা যায় এবং অসহায় জনতার উপর আকাশ হইতে বোমা ফেলিয়া বা রুদ্ধ স্থানে বন্দী করিয়া বন্দুকের গুলিতে হত্যা না করিয়াও তাড়াইয়া দেওয়া যায়।

এখন কাঁদন-গ্যাসের বোমা না ব্যবহার করিয়া এক বিশেষ বন্দুকের মধ্যে কাঁদন গ্যাস ভরিয়া ওয়াশিংটনে পুলিসে লইয়া বেড়ায়। বন্দুকের একটি পাম্প টিপিয়া গ্যাস অনেক দূরে ছড়াইয়া ফেলা যায়।

ঘণ্টায় ৪০০ মাইল—

যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও প্রদেশের অধ্যাপক হ জে কুন্টি একখানি গাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাহার গতি নাকি ঘণ্টাপ্রতি ৪০০ মাইল হইবে। গাড়ীর মাত্র একখানি চাকা থাকিবে সেই একমাত্র প্রকাণ্ড চাকার মধ্যে গাড়ীর কলকব্জা এবং চালকের বসিবার স্থান হইবে। চাকার

ঘণ্টায় চারশ' মাইলগামী গাড়ী।
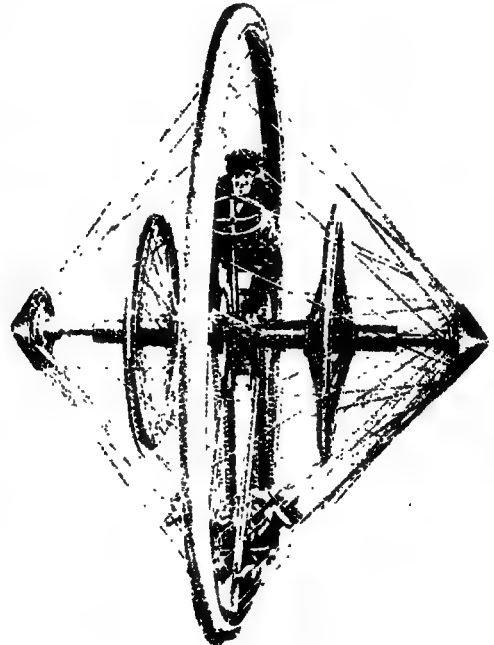
দুই পাশে দুইখানি করিয়া ছোট ছোট চাকা থাকিবে তাহাতে গাড়ী চলিবার সময় সোজা হইয়া চলিলে, এই দুইটি চাকাও সমান জোরে ঘুরিয়া গাড়ীর চলার তাল ঠিক রাখিবে। গাড়ীর দুইপাশের ওজনের কমবেশী করিয়া গাড়ী ডাইনে বাঁয়ে ঘুরাইবার ফিরাইবার বন্দোবস্ত আছে। ছবি দেখিলেই গাড়ীখানির রূপ ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। গাড়ীখানি যদি বাস্তবে পরিণত হয় তবে সবচেয়ে বেশী গতিশীল রেসিং মোটরকার এক নিমেষের মধ্যে তাহার কোন্ পিছনে পড়িয়া থাকিবে।

—

সমুদ্র-স্নানের সুবন্দোবস্ত—

অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্র-উপকূলে লোকে হাঙ্গরের ভয়ে স্নান করিতে পারে না। সেইজন্ত, যাহাতে লোকে নিভয়ে সমুদ্রে স্নান করিতে পারে, সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটিরা তাহার নানারূপ আয়োজন করিয়াছেন। নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের গুজিগু নামক স্থানে হাঙ্গরের হাতে অনেক লোক মারা যায়। এ সহরে এখন সমুদ্রের জলে ইস্পাতের মোটা মোটা তারের বেড়া দেওয়া হইয়াছে। এই বেড়া ভেদ করিয়া মনুষ্যভুক্ কোন জানোয়ার আসিতে পারে না। কুইন্‌সল্যাণ্ডে সব চেয়ে বড় জল-বেড়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ১৫০ ফুট চওড়া এবং ৩৩০ ফুট লম্বা। এই বেড়ার মধ্যে ১০০০ লোক আরামে এবং নিভয়ে স্নান করিতে পারে।

—

মাটির ঘর —

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে কিরডি-মাসা নামক স্থানের লোকেরা একপ্রকার ঘর কাদা দিয়া তৈয়ার করে, তাহা দেখিতে ঠিক উই-ঢিপির মতন। কাঠের ফ্রেম করিয়া লইয়া তাহার উপর স্তরে স্তরে কাদা লেপিয়া দেওয়া হয়। তার পর তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া যায়। এই কাদার ঘরের উপরে নানা প্রকার আঁক-জোঁক কাটা থাকে—একজনের আঁক-জোঁক অন্ত কেহ নকল করিলে তাহার মৃত্যুদণ্ড হয়। বিশেষ প্রকারের আঁকজোঁক দেখিয়া কুটীর-স্বামীর পরিচয় পাওয়া যায়। যে দিক্ দিয়া বেশীর ভাগ সময় হাওয়া বয়, সেই দিকে কুটীরের দুয়ার থাকে। দুয়ার খুব বড় হয় না—কষ্টে একজন লোক প্রবেশ করিতে পারে। গরমের সময়েও এই-সব কাদার তৈরী ঘর বেশ ঠাণ্ডা থাকে, কারণ মাটির লেপ ভেদ করিয়া সূর্য্যের তাপ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না।

ঘরের কাঠামো

কাঠামোর উপর কাদালেপা ঘর

কাদার ঘরের দুয়ারের সামনে বসিয়া সংসারের কাজে ব্যস্ত আফ্রিকাবাসী

চিত্রে চরিত্র বর্ণন—

পাকা পাকা বদমায়েস চোর, দিনেল, খুনী, ইত্যাদির ছবি পুলিসের কাছে থাকে। এই-সমস্ত ছবির বই হইতে ১০ খানি করিয়া

উপর হইতে—জুয়াচোর, সিঁদেল, ঘর পোড়ানে

উপর হইতে—পকেটমারা, খুনী, ডাকাত

ছবি বৈজ্ঞানিক ভাবে মিশাইয়া এক একখানি করিয়া বিশেষ বিশেষ প্রকারের ছবি তোলা হইয়াছে। যেমন, ১০ জন খুনির ছবি মিশাইয়া খুনির মুখ মোটামুটি কেমন হয় তাহার একখানি ছবি তোলা হইল। এমনই ভাবে চোর, ডাকাত, সিঁদেল ইত্যাদির ছবিও তোলা হইয়াছে।

এই ছবিগুলি কোনটিই খুব কুৎসিত নয়। কয়েকটি মুখকে বেশ সুন্দর এবং বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে হয়।

—

আলোকযুক্ত হাতিয়ার—

এখন হইতে মিস্ত্রিদের রাত্রির অন্ধকারে কোন আলো না লইয়াও কাজ করা চলিবে। হাতিয়ারের হাতলের কাছে একটি বিদ্যুতের বাতি লাগানো থাকে। বাতিটি হাতলে লাগাইলে তাহা ধরিতে কোন-প্রকার কষ্ট হয় না—কারণ তাহা হাতলেরই অংশের মত হইয়া যায়। সুইচ টিপিয়া দিলেই যেখানে স্ক্রু-ড্রাইভার বা রেঞ্চ লাগাইতে হইবে, সেখানে বেশ জোর আলো পড়িবে। প্রায় সব রকম, মোচড়াইবার,

সিন্দুক ভাঙা সিঁদেল

নোট, টাকা জালিয়াত

দোম্‌ড়াইবার, স্ক্রু লাগাইবার, বেঞ্চ ইত্যাদি, হাতিয়ারেই এই বাতি লাগানো যায়। খরচ সাধারণ বাতি জ্বালা অপেক্ষা কম পড়ে। সিঁদেল চোরদের জন্য আইন করিয়া এই বাতি হাতিয়ার বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

জালিয়াত

বরফ-পাত হইতে ফল রক্ষার প্রণালী—

আমেরিকার অনেক স্থানে শীতকালে বেশ বরফ পড়ে এবং তাহাতে গাছের ফল, শাক সবজী ইত্যাদি এক রাত্রির মধ্যেই সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হয়।
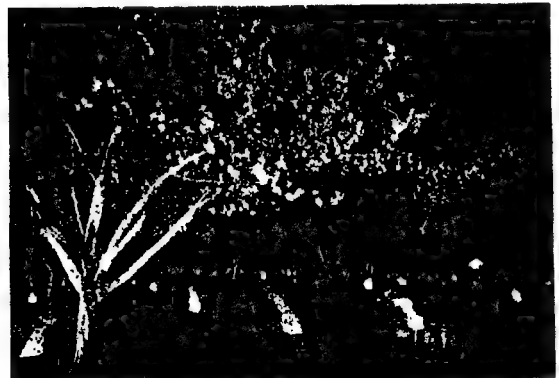
আপেল গাছের তলায় তেলের পাত্র জ্বলিতেছে

অনেক রকম চেষ্টা করিয়া শেষে ফল রক্ষা করিবার এক উপায় বাহির করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের কলরাডো প্রদেশে আপেলের চাষ খুব বেশী হয়। তুষারের হাত হইতে ফল রক্ষা করিবার জন্ত একপ্রকার তেল বিশেষভাবে তৈরী এক-একটা পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। রাত্রে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পাহারা থাকে। তাহারা বরফ পড়িবার সূচনা দেখিলেই সঙ্কেত করে। সঙ্কেত পাইবামাত্র চাষীরা সেই-সমস্ত তেলের পাত্রে আগুন ধরাইয়া দেয়। তাহাতে হাওয়া গরম হইয়া উঠে এবং বরফ গাছে পড়িবার পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে ফলের কিংবা গাছের কোন অনিষ্টই হয় না। সঙ্কেত না পাইলেও বৈদ্যুতিক থারমোমিটার দেখিয়াও চাষীরা তেল জ্বালিতে হইবে কি না বুঝিতে পারে।

পিপীলিকা-ভুক্ প্রাণী—

এই লম্বা ল্যাজওয়ালা জন্তুটিকে আফ্রিকার এক জঙ্গলে পাওয়া গিয়াছে। এই জন্তুটির সমস্ত অঙ্গ এক প্রকার আবরণে ঢাকা থাকে তাহা প্রথম দেখিলে হাড় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আসলে তাহা খুব ঘন চুলের বোনা বস্ত্র বলিলেও হয়। পিপীলিকা খাওয়াই ইহাদের একমাত্র কাজ। বিপদে পড়িলে ইহারা ল্যাজ অঙ্গের চারিদিকে গুটাইয়া লয়, তখন ইহারা দেখিতে ঠিক একটা বলের মত হয়। এই রকম অবস্থাতেও ইহারা বেশ গড়াইয়া গড়াইয়া বিপদ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারে। ইহাদিগকে প্যাঙ্গোলিন বলে। ইহাদের জাতিকে দুই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। লম্বাতে ইহারা এক হইতে তিন ফুট পর্যন্ত হয়। আত্মরক্ষা করিবার জন্ত ইহাদের থাবাতে বেশ ধারাল নখ আছে।

প্যাঙ্গোলিন (লম্বা ল্যাজ দেখুন)

ল্যাজ গুটান প্যাঙ্গোলিন

মোটর চালকের বিপদ্—

কোন মোটরচালানেওয়ালা যদি কোনপ্রকার নিয়মভঙ্গ করে, তবে পুলিসে তাহার গাড়ীর নম্বর লিখিয়া লয় এবং পরে তাহার নামে সমন যায়। আমাদের দেশে এবং বিলাতেও এই হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এখন হইতে পুলিসকে আর আইনভঙ্গকারীর নামে সমন পাঠাইতে হইবে না। মোটরের গায়ে একটি বিশেষ ধরণের একটি ধাতু-নির্ম্মিত কৌটার মধ্যে পুলিস সমন বন্ধ করিয়া দেয়। এই কৌটার উপর লেখা থাকে "২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিস সদর আফিসে হাজির হইবে।" ইহাতে সমন হারাইবার কোন ভয় নাই। এবং অপরাধী যে সমন পায় নাই, তাহাও সে বলিতে পারিবে না। কৌটার চাবি পুলিসের নিকট থাকে—কৌটার মধ্যে সমন থাকে।

—হেমন্ত

হংসাকৃতি রাঙা আলু
চন্দননগর হইতে শ্রী হরিহর শেঠ কর্তৃক প্রেরিত।

নায়ক-নায়িকা

একটা চমৎকার গল্পের প্লট পাওয়া গেছে।···দিশেহারা হয়ে গল্পের নায়ক-নায়িকার নাম খুঁজ্‌চি, কিন্তু হাতড়ে হাতড়ে একটা আন্‌কোরা একেবারে নূতন কবিত্বময় নাম কিছুতেই মনে আস্‌চেনা।···

রাত তখন বারোটা প্রায় হয়ে এল, কেবল ভাব্‌চি, মনোমত নাম কিছুতেই মিল্‌চে না, এ যেন তীর্থ-কাকের মতন ধর্ণা-দিয়ে পড়ে' থাকা!

হঠাৎ আমার মনে হ'ল আমার খোলা জান্‌লার সুমুখে কে একটা কালো বলিষ্ঠ লোক অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে পরুষ কণ্ঠে বল্লে—আমাকে তোমার গল্পের নায়ক করো!

আমি আঁৎকে উঠ্‌লাম—তোমাকে নায়ক করব? কি তোমার নাম?

লোকটা দৃঢ়কণ্ঠে বল্লে—বামাচরণ।

—বামাচরণ? আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লাম।

লোকটা কঠিনভাবে জান্‌লার শিকটা ধরে' বল্লে—কেন, আমার নাম তোমার পছন্দ হচ্ছে না? তোমার উপন্যাসের নায়ক হবার যোগ্যতা কি আমার একটুও নেই? চিরকালই তুমি আমাকে কেবল চাকর, দরোয়ান বাজার-সরকার আর দেওয়ান করবে? কেন আমাকে নায়ক কর্‌লে তোমার উপন্যাসের কাট্‌তি কি অনেক কমে যায়?

আমি লোকটার মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লুম।

লোকটা বল্লে—আমার জন্য কেবল রেখেছ হুঁকো আর গাঁজা। কেন, আমি কি ভালোবাস্‌তে পারিনা? আমার প্রেমের উপাখ্যান কি তোমার গল্পের খাতায় লেখা যায় না, না, আমার প্রেমটা এতই খেলো আর বাজে, যে তার মূল্য একটুও নেই? আমি বি, এ এম্‌, এ পাশ করি না, প্যাঁস্‌নে চশমা পরি না, সিগারেট্‌ খাই না, টেড়ী কাটি না, বাঁশী বাজাই না, মার্কেটে ঘুরি না—তাই কি আমি নায়ক হবার যোগ্য নই? আমার নাম বামাচরণ—এই কি আমার চরম অপরাধ?

আমি হাসি চেপে বল্লুম—কিন্তু তোমার সঙ্গে নায়িকা হবে কে?

লোকটা হাত-ছানি দিয়ে কাকে যেন ডাক্‌তে লাগ্‌ল। খানিকবাদে একটি অদ্ভুত স্থূলতনু কালো রমণী তার পাশে এসে দাঁড়াল। মাথার চুলগুলি টেনে কষে' ঝুঁটি করে' বাঁধা, কপাল ও চুলগুলি দুর্গন্ধ তেলে চপ্‌চপ্‌ কর্‌চে, নাকে সুদর্শন-চক্রের মতো একটা নৎ, দু-কাণে প্রায় গোটা কুড়ি মাক্‌ড়ি, দাঁতে অমাবস্যা-রাতের মতন মিশি মাখানো, গলায় একটা লোহার হাঁস্‌লি, পরণে একটা লাল পাছা-পেড়ে শাড়ী তাতে চ্যাপ্‌সা হলুদের দাগ লাগানো, দু-পায়ে দুটো রুপোর মল—বয়স এই ত্রিশ বত্রিশ হবে।

রমণী স্থিরকণ্ঠে বল্লে—আমি তোমার গল্পের নায়িকা হব।

আমি কৌতূহলী হয়ে বল্লুম—তোমার নাম কি?

মেয়েটি বল্লে—আমার নাম? আমার নাম···। হাস্‌তে হাস্‌তে আমার পেটে খিল পড়ল। জগদম্বা? তা হলেই হয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ!

রমণী বিরক্ত হয়ে বল্লে—আমার এই চেহারায় ও নামে কিছুতেই তোমার উপন্যাসের নায়িকা হতে পারব না? লেখা, প্যাপ্‌ড়ি, যূথিকা, হাস্নাহানা—এম্‌নি ঢং-করা বিবিয়ানার নামই তোমার পছন্দ হয়, এখন ঠাকুর-দেবতার নাম মনে ধরে না? আমি আনারসী-বারাণসী শাড়ী পড়ি না, এলানো চুলে কাঁসগেরো দিয়ে কান ঢেকে চুল বাঁধি না, উচু হীল্‌-ওয়ালা জুতো পরে' দুল্‌তে-দুল্‌তে চলি না ও আছাড় খাইনা, পুডিং কাট্‌লেট্‌ রাঁধ্‌তে পারি না, তাই কি আমি তোমার নায়িকা হবার অযোগ্য? আমার এ কালো বুকে তোমার গল্পের সুন্দরী শিক্ষিতা নারীর মতনই প্রেম জাগে না, কবিতা উথ্‌লে ওঠে না?

আমার হাসির মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

দেখি বামাচরণ আর জগদম্বা খোলা জান্‌লাটা পেরিয়ে

আমার ঘরে এসে ঢুকল। কি করবে রে বাবা! ঐ শক্ত কালো দু-হাতে দু-গালে দু-চাটি বসিয়ে দেবে না তো? না না ওগো, তোমাদেরই আমি গল্পের নায়ক-নায়িকা করব।...

আমার ঘরের দেওয়ালের এক নিরালয় কোনে রাধা-কৃষ্ণের যামিনী-মিলনের একটি বর্ণবহুল সুন্দর ছবি ছিল। কিন্তু তার ওপর আমার কোনো মোহ বা আকর্ষণ ছিলনা, হয়ত আমার আধুনিক রুচির সঙ্গে এই ছবিটা একটুও খাপ্ খেত না বলে'। দেখি, বামাচরণ আর জগদম্বা বেশী কিছু নামসুলভ উপদ্রব না করে' ধীরে ধীরে সেই ছবিটার মধ্যে লীন হয়ে গেল।...

যাঃ, কি এতক্ষণ বাজে আবোল-তাবোল্ স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম! মনে-মনে খানিকক্ষণ হাস্‌লুম। গল্পলেখা আর এগোলইনা। আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

মাঝ-রাতে মনে হ'ল সেই ছবির কৃষ্ণ সেই কদমশয়ন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাধাকে বল্লে—চল, এই কারাগার থেকে মুক্তি নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি! এই তরুণ কবি দিনান্তেও আমাদের মুখের পানে চোখ তুলে চায় না, আমরা যে গোপনে এখানে ভালোবাসার অভিনয় কর্‌চি তার একটুও মর্ম্মগ্রহণ করতে পারে না, তার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার নাম খুঁজে মরে; আর, আমরা যে তার বুকের আগারে বন্দী হয়ে দিন কাটাচ্চি এত নিকটে থাকি, আমাদের কথা সে একটুও ভাবে না, অতি-পুরোণো বলে' সে আমাদের অবহেলা করে ফেলে দ্যায়! চল, আমরা এই ভণ্ড পূজারীর মন্দির থেকে বেরিয়ে যাই।...

বলে' কৃষ্ণ তার বাঁশী তুলে' নিলে, আর রাধিকা তার অগোছাল কেশ-বাস বিন্যস্ত করে' কৃষ্ণের পাশে-পাশে চল্‌তে লাগ্‌ল মেঘের পথে-পথে চাঁদ্‌নী আলোর স্নিগ্ধ রূপার দেশে!

কৃষ্ণ ঘাড় হেলিয়ে বাঁশী বাজাচ্চে আকুলকরা সুরে, আর রাধিকা তার বাঁ হাতের ভঙ্গিমাটিকে বেঁকিয়ে কৃষ্ণের গ্রীবাটি বেষ্টন করে' চলেচে ভাষাহীন আনন্দ-ছন্দে!

কতদূর এগিয়ে গেলে মনে হ'ল—ওরা যেন সেই গোকুলের কৃষ্ণ-রাধা নয়, আমাদেরই পাড়ার পচা বস্তির বামাচরণ আর জগদম্বা, অনন্ত অভিসারের পথে নূতন রূপ নিয়ে সত্যিকারের প্রণয়ী-প্রণয়িনী, চিরযুগের কবির কল্পনার নায়ক-নায়িকার যুগল-মূর্ত্তি!

শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গান

কুহুধ্বনির ঝড় ওঠে শোন্
    নিফুট আলোর কূলে কূলে.
শিথানে মুখ লুকিয়ে কেন
    কান্না রে আজ ফুলে' ফুলে'?

বাসন্তী এই কোজাগরী
    কিসের ব্যথায় উঠ্‌ল ভরি',
কী ব্যথা সে কী ব্যর্থতা
    বিষের হাওয়া হিয়ায় বুলে!

প্রাণের মেলায় মায়ার খেলায়
    হঠাৎ বেসুর বাজ্‌ল কোথায়,
হারিয়ে গেল কী নিধি মোর
    অশ্রুজলের আঁধার সোঁতায়?

সারা বুকের পাঁজর-তলে
    রাঙা আঙার ফুঁপিয়ে জ্বলে,
সপ্তপদীর শেষ হল কি
    জীবন-ভরা ভুলে ভুলে!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

এরারুটের চাষ

এরারুটের চাষ একটি বেশ লাভজনক ব্যবসা। বহুদিন যাবৎ আমি একাজে বিশেষভাবে লিপ্ত থাকিয়া হাতে-কলমে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাতে এবিষয়টি আমাদের দেশের কৃষক-সম্প্রদায়কে জানান অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। পাটের চাষকে এখন আমাদের দেশের কৃষকেরা একটা খুব লাভের ব্যবসা মনে করে, এবং কোন কোন চাষী এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, অত্যধিক লাভের আশায় ধান্যের জন্য একতোলা জমিও না রাখিয়া সমস্ত জমিতে পাট দিয়া শেষে কতই না বিপদে পড়ে। আজকাল অনেকেই স্বাধীন জীবিকার অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহারাও যে ইহার চাষ দ্বারা বিশেষ লাভবান্ হইতে পারেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। ইহার চাষের প্রণালী অনেকটা আদা-হলুদেরই মত। উচ্চ ভূমি এবং দোআঁশ মাটিতেই ইহার চাষ ভাল হয়। চৈত্র, বৈশাখ মাসই ইহার চাষের উপযুক্ত সময়। মাঘ ফাল্গুন মাস হইতেই জমি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবে। জমির মাটি খুব গভীর ভাবে ওলট পালট করিয়া দিতে হইবে। প্রথমতঃ কোদাল দ্বারা কোপাইয়া পরে লাঙ্গল দ্বারা বার বার চাষ দিবে। গোবর পচাপাতা ছাই ইত্যাদি ইহার উত্তম সার। চৈত্র মাসে অল্প বৃষ্টি হইয়া গেলে পর প্রতি দেড় হাত অন্তর এক হাত উচ্চ করিয়া লম্বালম্বিভাবে বেদী প্রস্তুত করিবে, এবং প্রতি হাতে ছয়টি করিয়া বীজ পুঁতিয়া দিবে। বীজগুলি যেন বেদীর আট দশ অঙ্গুলীর বেশী নীচে না যায়। বেদী ভালরূপ প্রস্তুত হইলে ইহাতে আর মাটি দেওয়া বা নিড়াই খরচ কিছুই লাগিবে না। ছায়া-যুক্ত স্যাঁৎ-সেঁতে জমিতেও ইহার চাষ হইতে পারে। ফসল উঠাইবার সময় জমির মাটি খুব নীচ পর্য্যন্ত ওলটপালট হয় বলিয়াই বোধ হয় একই জমিতে উপর্য্যুপরি ৫।৭ বার আবাদ করিলেও জমির উর্ব্বরতা-শক্তি নষ্ট হয় না, বরং প্রথমবারের চেয়ে ফসল বেশী হইতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে প্রতি বিঘায় বৎসর কিরূপ আয় হইতে পারে নিম্নে তাহার একটি মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল।

এক বিঘা জমির খাজনা	২৲
জমি প্রস্তুত ও বেড়া দেওয়ার খরচ	৮৲
বীজ দুই মন ১০৲ টাকা দরে	২০৲
ফসল তোলার খরচ	৫৲
পেষাই ও মাল প্রস্তুত খরচ	১৫৲
মোট খরচ	৫০৲

প্রতি বিঘায় গড়ে ৬০/ মন ফসল জন্মে এবং ইহা হইতে ন্যূন পক্ষে ২৫/ এরারুট প্রস্তুত হইবে। এগুলি অন্ততঃ ১৮৲ টাকা মন দরে বিক্রয় করা স্বচ্ছন্দে চলে। এই হিসাবে—

২৫/ মন এরারুটের মূল্য	৪৫০৲
বাদ খরচ	৫০৲
মোট	৪০০৲

কাগজ কিম্বা টিনের কৌটায় ভরিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে আরও অনেক বেশী লাভ হইতে পারে।

গাজিহাটা পোষ্ট,
ময়মনসিংহ

শ্রী পূর্ণেন্দুভূষণ দত্ত রায়

ভারতীয় রঞ্জক পদার্থ

দেশীয় রঞ্জক শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধক দুইটি—যথেষ্ট মাত্রায় রঞ্জক দ্রব্যের অভাব ও রংওয়ালাগণের বংশগত অভিজ্ঞতার বিলুপ্তি। বৈজ্ঞানিক প্রথায় ও ব্যবসায়ের হিসাবে রং-উৎপাদক গাছ-সমূহের চাষ ও সংগ্রহ করিয়া প্রথম প্রতিবন্ধকের এখনও প্রতিকার হইতে পারে; কিন্তু যে নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা ও কার্য্যবিধি দুই চারিটি সামান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে জগতের বিস্ময়োৎপাদক রং-সমূহের সৃষ্টি করিতে পারিত তাহা প্রায় চলিয়া গিয়াছে। আবার সেই দক্ষতার স্তরে আসিতে এখনও অনেক সময় লাগিবে।

প্রাচ্যে পীতের যথেষ্ট আদর। কোন কোন মাঙ্গলিক ব্যাপারে হলদে কাপড় না হইলেই চলেনা। সেইজন্য অপরাপর রং অপেক্ষা হলদে রঙের সংখ্যা কিছু অধিক। ভারতে ও ব্রহ্মদেশে যে কয়েকটি পীত রঙের এখনও চলন আছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্যতম—১। কাঁঠাল-কাঠ, ২। দারুহরিদ্রা-কাঠ, ৩। টুন-কাঠ, ৪। জাফ্রান, কেশর, ৫। হলুদ, ৬। মেদী-পাতা, ৭। কমলা-গুঁড়ি ৮। চাঁপা, ৯। সিউলি-ফুল।

রেশমী বস্ত্রের পক্ষে কমলাগুঁড়ি উৎকৃষ্ট রং। ক্ষারজল ব্যবহার হইলে কমলা-গুঁড়ির রং খুব পাকা হয়। সিউলি-ফুল হইতে বাদামী হইতে আরম্ভ করিয়া কমলানেবুর মত রং পাওয়া যায়।

মেদী-পাতার রঞ্জক উপাদান—লসন্ (Lawsone): ইহা দানা বাঁধে এবং ইহার জলীয় দ্রাবণ পীতাভ। ফুটাইলে বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। রেশম ও পশম সহজে এই রং শোষণ করে, কিন্তু চামড়ায় ইহা খুব পাকা হয়। পুরাকালের মিশরীয়েরা হেনার রঞ্জকগুণ অবগত ছিল।

পূর্ণ পীত রং উৎপাদন করিতে হইলে প্রথমতঃ বস্ত্র অথবা সূত্রকে গরম হলুদ-ভিজান জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়; তৎপরে শুকাইয়া আবার ফট্‌কিরির জলে ভিজাইয়া উত্তমরূপে কাচিয়া ফেলা দরকার। প্রক্রিয়ার বিভিন্নতায় অনেক হলদে রং হইতেই লাল রং পাইতে পারা যায়।

অনেক দেশীয় রঞ্জক পদার্থ রক্তবর্ণ প্রস্তুতের উপযোগী; তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়—১। পলাশ-ফুল, ২। লক্ষা ৩। আলমূল, ৪। চে মূল, ৫। তাম্বা নাগকেশর, ৬। দাড়িম-ছাল, ৭। মঞ্জিষ্ঠা-ছাল ও কাঠ, ৮। লোধ-ছাল ও মূল। এক সময়ে মঞ্জিষ্ঠা বিশ্ববিখ্যাত রং ছিল।

ক্ষার সংযোগে পলাশ ফুল হইতে চমৎকার লাল রং পাওয়া যায়। টাটকা পলাশ-ফুলের রস অথবা শুষ্ক ফুলের কাথ হইতে ছবি আঁকিবার উত্তম জলীয় রং (water colour) পাওয়া যায়।

মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় চে-মূল হইতেও পাকা লাল রং পাওয়া যায়। ইহাতে সামান্য নীলের আভা আছে।

কুসুম-ফুলের রং অতি প্রাচীন। মিশরদেশের শব-দেহের বস্ত্র কুসুম-ফুলের রঙ্গে রঞ্জিত।

লট্‌কানের বীজের গাত্রে যে রক্তাভ পদার্থ দেখা যায় তাহা হইতে উৎকৃষ্ট রং হয়। রং প্রস্তুত করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত পদার্থ শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া লইতে হয়। তৎপরে জল দিয়া উক্ত রং বাহির করিয়া সামান্য পরিমাণে সোডা অথবা পটাশ-কার্ব্বনেট দিতে হয়। এই জল ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহাতে সূতা ভিজাইয়া দেওয়া দরকার। তার পর ক্ষীণ অম্ল-যুক্ত জলে ভিজাইয়া ধুইয়া লইলেই রং পাকা হইল।

নীল-আভাযুক্ত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হরিতকী ও বহেড়া হইতে পাওয়া যায়। গরম হরিতকী-ভিজান জলে সূতা ভিজাইয়া উত্তমরূপে নিঙ্‌ড়াইয়া চুনের জলে দিয়া কষ রং পাকা করিয়া লও। তৎপরে ঐ সূতা লৌহযুক্ত জলে ভিজাইলেই গাঢ় কাল রং হইবে। যদি লৌহযুক্ত জলের পরিবর্ত্তে ফট্‌কিরির জল দেওয়া যায় তাহা হইলে মলিন পীতাভ খাকি রং পাওয়া যাইতে পারে। বকম-কাঠ হইতে সুন্দর ও উজ্জ্বল নীলাভ কাল রং প্রস্তুত হয়; কিন্তু উহার দোষ এই যে কিছুদিন বাদে উহা ফিকে হইয়া যায়।

নীল প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী সকলেই জানেন।

ধূসর রঙ্গের মধ্যে খদিরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রক্ত-চন্দন ইউরোপে প্রধানতঃ পশমী বস্ত্র রক্তাভ ধূসরবর্ণে রঞ্জিত করিতে ব্যবহৃত হয়। হরিতকী-রং প্রস্তুতের অনুরূপ কোন প্রথায় রক্ত-চন্দনের উত্তম রং প্রস্তুত হইতে পারে।

ভারতে প্রতিবৎসর যে পরিমাণ অ্যানিলিন রং আসে তাহার মূল্য প্রায় ১২০ লক্ষ টাকা।

কৃষক, ফাল্গুন

সর্পতত্ত্ব

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক যুগ গিয়াছে যখন ভূমণ্ডলে, জলে ও স্থলে, সরীসৃপেরই রাজত্ব ছিল। তাহার কোটি কোটি বৎসর পরে মানুষের আবির্ভাব। বর্ত্তমান সর্পবংশ সেই বিশাল, ভূব্যাপী সর্পকুলের অবশিষ্টাংশ মাত্র।

জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের উপখ্যানের মূলে যাহাই থাকুক, এক সময়ে ভারতে সর্পের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল ও সর্পবংশ ধ্বংসের জন্য প্রভূত চেষ্টা হইয়াছিল। এখনও ৩২০ জাতীয় সর্প ভারতে বাস করে। ভারতের বর্ত্তমান সর্পাঘাতে বাৎসরিক মৃত্যুসংখ্যা গড়ে ২০ হাজার। সুখের বিষয় যে বিষধর জাতির সংখ্যা মোটে ৬৮ মাত্র; তাহার মধ্যে আবার ২৯টি সমুদ্রবাসী।

অধিকাংশ জাতীয় সাপ নিরীহ। বানরেরও সাপের ভয় কম নয়; তাহা হইতে বোধ হয় যে সর্পভীতিটা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি। পোষ মানাইলে সাপ সহজেই পোষ মানে। সাপের বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখিবার জিনিষ। ইহারা সমধিক দ্রুত বেগে চলিতে পারে এবং শরীর এত প্রকারে বাঁকাইতে পারে যে আর কোন প্রাণীর পক্ষে সেরূপ সম্ভবপর নয়। সর্পের এইরূপ অসাধারণ শরীর-সঞ্চালনের ক্ষমতার মূলে ইহার অস্থি-বিন্যাসের বিশেষত্ব। ইহার বহুসংখ্যক পঞ্জরাস্থি আছে এবং সেগুলি সম্মুখে আলগা, অর্থাৎ মানুষের ন্যায় সর্পের বক্ষের অস্থি নাই। সর্পের ফণাও গ্রীবাদেশের আলগা চামড়া পঞ্জরাস্থি দ্বারা প্রসারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অধিকন্তু একটি পঞ্জরাস্থি তন্নিম্ন পঞ্জরাস্থির

সহিত একাধিক স্থানে সংযুক্ত। সেইজন্যই নানা প্রকারে শরীর বাঁকাইলেও ইহাদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায় না। এই-সমুদয় পঞ্জরাস্থি ও অনেক স্থলে গাত্রস্থ শল্ক সর্পের দ্রুতগতির সহায়তা করে। সর্পকে দ্বিজিহ্ব বলে। ইহার জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বিখণ্ডিত। জিহ্বার দ্বারা ইহারা স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে।'

সর্প তাহার মুখাপেক্ষা বৃহত্তর প্রাণী ভক্ষণ করিতে পারে। ইহার প্রধান কারণ এই যে ইহাদের প্রায় সকল জাতিরই নিম্ন-চোয়ালের দুই অংশ অস্থি দ্বারা জোড়া নয়, মাংস-পেশী দ্বারা জোড়া। আবার অনেক জাতির উপরের চোয়ালের গড়নও ঐরূপ। ইহাদের দন্ত অন্তর্দ্দিকে বক্র। সুতরাং একবার শিকার ধরিলে তাহা ছাড়াইয়া যাওয়া শক্ত। বস্তুতঃ সাপ ঠিক শিকার গলাধঃকরণ করে না, বরং নিজেকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ শিকারের উপর টানিয়া লয়। অজগর প্রভৃতি সর্প ছোঁ মারিয়া শিকার ধরে এবং কুণ্ডলী দ্বারা তাহাকে নিষ্পেষণ করিয়া মাংসপিণ্ডবৎ করিয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত পরিমাণ লালা নিঃসরণ করিয়া উক্ত মাংসপিণ্ডকে পিচ্ছিল করিয়া ফেলে। তাহাতে গ্রাস করা অনেকটা সহজ হয়।

বিষধর সর্পের বিশেষত্ব এই যে ইহাদের উপরের চোয়ালের দুই দিকে দুইটি বড় দন্ত আছে। উক্ত দন্তদ্বয় হয় ফাঁপা নলের ন্যায়, অথবা গভীর নালী যুক্ত। বিষকোষ চক্ষুর পশ্চাতে ও নিম্নদেশে অবস্থিত। দংশন করিলেই উক্ত নল কিংবা নালী বাহিয়া বিষ আসিয়া ক্ষত-স্থানে প্রবেশ করে। কোন কোন সর্পের বিষকোষ অত্যন্ত বৃহৎ, এমন কি হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বৈজ্ঞানিক হিসাবে বিষকোষ ও বিষ যথাক্রমে লালাকোষ ও লালার রূপান্তর মাত্র। পিঁপ্‌ড়ে বোল্‌তা কাঁকড়া-বিছা প্রভৃতির বিষের ন্যায় ফর্ম্মিক্ এসিড সর্প-বিষেরও একটি উপাদান। কিন্তু অন্যান্য উপাদানও আছে, যাহার জন্য সর্পবিষ এত মারাত্মক।

ভারতের স্থল-ভাগে ৩৯ জাতীয় বিষধর সর্প বাস করে। গোক্ষুরা ও কেউটিয়া একই জাতির 'প্রকার'-ভেদ মাত্র। সাধারণতঃ ফণায় একটি নয়নতারা সদৃশ দাগ-যুক্ত 'প্রকার'কে কেউটিয়া ও উক্তরূপ দুটি দাগ-যুক্ত প্রকারকে গোক্ষুরা বলে। এই জাতীয় সকল-প্রকার সাপেরই ফণা আছে। 'পাতরাজ' অথবা 'শঙ্খচূড়' গোক্ষুরা শ্রেণীস্থ সর্পের অন্যতম। বিষধর সর্পসমূহের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০ হাতের উপর পর্য্যন্তও হয়। ইহারও ফণা আছে, যদিও শরীরের অনুপাতে ফণা স্বল্প-বিস্তৃত। বিষ গোক্ষুরার ন্যায়ই তীব্র। জঙ্গলেই ইহার বসবাস। পাতরাজ অন্য জাতীয় সর্প ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা না পাইলে পক্ষী, ক্ষুদ্র প্রাণী, ভেক প্রভৃতিই ইহার জীবনধারণের উপায়।

'ফুর্সা' বঙ্গদেশে কচিৎ দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ শুষ্ক, জলহীন প্রদেশে ইহার সমধিক প্রাদুর্ভাব, কিন্তু সামান্য জঙ্গলাবৃত স্থানেও ইহার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ফুর্সা দৈর্ঘ্যে এত হাত কিম্বা কিঞ্চিদধিক। ইহার বর্ণ বালির ন্যায়। স্থান-ভেদে গাঢ় অথবা ফিকে। মস্তকে পক্ষীপদ-সদৃশ একটি দাগ আছে। ইহার বিষ গোক্ষুরার ন্যায় তীব্র না হইলেও এই জাতীয় সর্পাঘাতে বৎসরে যে অনেক লোকের মৃত্যু হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

'চন্দ্রবোড়া' সাপের বর্ণ ফিকে ধূসর; পৃষ্ঠে লম্বালম্বি তিনটি রেখায় গোলাকার কতকগুলি দাগ আছে ও মাথায় V সদৃশ একটি দাগ আছে। ইহার দৈর্ঘ্য তিন হইতে সাড়ে তিন হাত। ইহার বিষ মারাত্মক।

"রাজসাপ"—অন্য নাম 'শাঁখনি ও রাখা' সাপ। সমস্ত দেহে হল্‌দে ও কাল বর্ণের বলয়াকার দাগ থাকায় ইহাকে সহজেই চিনিতে পারা যায়। লম্বায় ইহা চারি হাতের উপরও হইয়া থাকে। ইহার বিষ গোক্ষুরার ন্যায় তীব্র নয় ও ইহার দংশনে হঠাৎ মৃত্যু ঘটিবার ইতিহাসও বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে জ্বালা যন্ত্রণা ও ঘা হইয়া অনেকে কষ্ট পাইয়া থাকে।

"করেত"—বঙ্গদেশে ইহাকে 'কাল চিতি' ও 'শমন চিতি' বলিয়া থাকে। ইহার রং চকচকে কালো ও তাহার উপর [illegible] জোড়া জোড়া শ্বেত রেখা আছে। বিষের তীব্রতা গোক্ষুরা বিষের দ্বিগুণ।

সর্প-বিষের তীব্রতা এত শীঘ্র কার্য্য করে যে ঔষধ প্রয়োগের সময় পাওয়া যায় না। তথাপি নানা দেশে কত প্রকার দ্রব্যই সর্পবিষের ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যাহা হউক সর্প-দংশনের পরে অব্যবহিত ব্যবস্থা, দষ্ট স্থানের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে দৃঢ়ভাবে ১টি ২টি বাঁধন দেওয়া। ব্রান্টন সাহেবের আবিষ্কৃত প্রতিকার—পটাশ পারম্যাঙ্গানেট, দষ্ট স্থান চিরিয়া অবিলম্বে ঘষিয়া দিতে পারিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। ইহার জন্য একপ্রকার বিশেষ রকমের ছুরীও আজকাল পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ—'অ্যান্টিভেনিন'। প্রথমে প্যারী সহরের পাস্তর ইনষ্টিটিউটের বিখ্যাত জীবাণুতত্ত্ববিৎ কামেট দ্বারা ইহা আবিষ্কৃত হয় এবং এক্ষণে এতদ্দেশেও উপযুক্ত বিশেষজ্ঞগণের তত্ত্বাবধারণে ইহা প্রস্তুত হইতেছে। ইহা গৌণভাবে সর্প-বিষ হইতেই প্রস্তুত। একটি অশ্বকে অতি সামান্য মাত্রায় বিষ প্রয়োগ করিয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ উহার মাত্রা এত অধিক করিয়া লইতে পারা যায় যে সে পরিমাণ বিষ প্রয়োগে ২০টি অশ্বের মৃত্যু হইতে পারিত। এই বিষ-সহিষ্ণুতার কারণ এই যে ক্রমশঃ বিষ প্রয়োগে অশ্বের রক্তে এমন কতকগুলি উপাদান জন্মাইতে থাকে যে-সমুদায় সমধিক পরিমাণে বিষের ক্রিয়াও রোধ করিতে পারে। এইরূপ বিষক্রিয়াসহ অশ্বের রক্ত হইতে 'অ্যান্টি-ভেনিন' প্রস্তুত। দষ্ট স্থানের উপরে কোন উপযুক্ত ধমনীতে ইহা সূচিকা দ্বারা চালিত করিয়া দিতে হয়। সূচিকাভরণ-প্রক্রিয়া সাধারণ লোকেও অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারে।

(কৃষক, ফাল্গুন)

—

মানুষের গুপ্ত শত্রু

আমাদের ঘরে-ঘরে যে প্রাণীরা রোগের বাহন স্বরূপ বিরাজ করে, সকলে তাহাদিগকে চিনেন না, তাই তাহাদিগকে চিনাইয়া দিবার জন্য, সেই শত্রুগুলির তালিকা দিলাম—

গরু—গোদুগ্ধ ও মাংস হইতে ক্ষয়কাশ হইতে পারে।

ঘোড়া—আস্তাবলে ধনুষ্টঙ্কারের বীজ পাওয়া যায় এবং ঘোড়ার গ্লাণ্ডার্স্ রোগ মানুষেরও হয়।

বিড়াল—হইতে ডিপথেরিয়া (কণ্ঠনালীর) রোগ হইতে পারে।

কুকুর—কামড়াইলে জলাতঙ্ক হাইড্রোফোবিয়া হয়।

ভেড়ার—লোম পশম হইতে অ্যাক্‌টিনোমাইকোসিস বা অ্যান্‌থ্র্যাক্স্ হয়।

ইন্দুর—গায়ের মাছি কর্ত্তৃক প্লেগ ছড়াইয়া পড়ে।

ছারপোকা—দ্বারা কালাজ্বর ছড়াইয়া পড়ে।

মশক—দ্বারা ম্যালেরিয়া, বাতশিরার জ্বর, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি ছড়াইয়া পড়ে।

মাছি—কর্ত্তৃক আমাশয়, ক্ষয়কাশ, কলেরা, টাইফয়েড জ্বর ছড়াইয়া পড়ে।

পিপীলিকা—কর্ত্তৃক আমাশয়, ক্ষয়কাশ, কলেরা, টাইফয়েড রোগের বীজ ব্যাপ্ত হয়।

(স্বাস্থ্য)

স্তন্যপায়ী জন্তুগণের আদি উৎপত্তি-স্থল

সম্প্রতি American Museum of Natural History নামক পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সভা হইতে ডাঃ রায় চ্যাপ্‌ম্যান (Dr. Roy Chapman) ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ স্তন্যপায়ী জন্তুদের আদি-উৎপত্তি-স্থলের অনুসন্ধানে মধ্য-এসিয়াতে যাত্রা করিয়াছিলেন। চীন রাজ্যের গোবি মরুভূমির (Gobi desert) মধ্যে তাঁহারা এই আদি উৎপত্তিস্থল আবিষ্কৃত করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। এই স্থানে আদি স্তন্যপায়ী জন্তুগণের এবং তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকাণ্ড সরীসৃপগণের কঙ্কালসমূহ ভূগর্ভের স্তরে স্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই-সমস্ত কঙ্কাল দেখিয়া পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত স্থানই পশুকুলের আদি-উৎপত্তিস্থল ছিল। পূর্ব্বকালে এসিয়ার সহিত উত্তর-আমেরিকার, এবং দক্ষিণ-আমেরিকার সহিত অষ্ট্রেলিয়ার সংযোগ ছিল। দক্ষিণ-এসিয়াও অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার সহিত সংযুক্ত ছিল। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, পশুকুল মধ্য-এসিয়াতে জন্মগ্রহণ করিয়া কালক্রমে ধীরে ধীরে ইয়োরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অধ্যাপক অস্‌বর্ণ (Prof. Henry Fairfield Osborn) বলেন যে এই আবিষ্কারটি বৈজ্ঞানিক জগতে একটি যুগান্তর উপস্থিত করিবে।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে বৃক্ষবাসী মূষিক জাতীয় একপ্রকার স্তন্যপায়ী জন্তু (বাদুড় ?) (Pentailed tree shrew) লক্ষ লক্ষ বৎসরে বিবর্ত্তিত হইয়া মানবাকার প্রাপ্ত হয়। বানরের সহিত মানবের খুব সাদৃশ্য আছে বটে ; কিন্তু এই বানরও পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষবাসী জীব হইতে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারও কঙ্কাল উক্তস্থানের উচ্চ ভূস্তরে পা য়া গিয়াছে।

কোটি বৎসর পূর্ব্বে এই-সমস্ত জন্তুর আবির্ভাব হয়। মানবের আবির্ভাব ১৫।২০ লক্ষ বৎসরেরও বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল।

গোবি মরুভূমিতে মানবের কোন কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই। ইহা যখন বর্ত্তমান সময়ে বালুকাময়ী মরুভূমি, তখন কোনও সময়ে ইহা যে সমুদ্র ছিল, বা অগভীর জলরাশিতে সমাচ্ছন্ন ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তখন সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে প্রকাণ্ড সরীসৃপগণ বাস করিত। পরে জল শুকাইয়া গেলে, এইস্থানে স্তন্যপায়ী জন্তুদের আবির্ভাব হইয়া থাকিবে। সর্ব্বশেষে ইহা যখন মরুভূমিতে পরিণত হয় তখন স্তন্যপায়ী জন্তুগণ পৃথিবীর চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ বানরজাতীয় জীবগণ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। কেননা এসিয়া আমেরিকা ও আফ্রিকার দক্ষিণভাগেই বানর জাতীয় জীবগণ অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি প্রসিদ্ধ মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সার্ আর্থার কীথ্ (Sir Arthur Keith) প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশে সম্ভবতঃ মানবের প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল। কেন না এই প্রদেশে বহু মানবাকৃতিবিশিষ্ট বানরজাতীয় জীবের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এত কঙ্কাল পৃথিবীর আর কোনও প্রদেশে পাওয়া যায় নাই। ঋগ্বেদ আর্য্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ। এই ঋগ্বেদে কিম্বা পরবর্ত্তী বেদসমূহে ও শাস্ত্র-গ্রন্থে কোথাও এরূপ উল্লেখ নাই যে আর্য্যগণ অন্য দেশ হইতে আততায়ীরূপে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাহা হইলে, এই প্রদেশেই আর্য্যজাতির উদ্ভব ও বিকাশ হয়। পরে ইহাঁদের কতিপয় অসভ্য শাখা ইয়োরোপে পরিব্যাপ্ত হয়, এইরূপ অনুমান করাই সুসঙ্গত।

(গন্ধবণিক্, চৈত্র)

—

ভাষাতত্ত্বের মুখবন্ধ

ঋগ্বেদের অধিকাংশ সূক্তই তৎকালপ্রচলিত ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল ; খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে উত্তর-ভারতে যে-সমস্ত আর্য্যভাষা ব্যবহৃত হইত, সেগুলি বৈদিক সূক্তসমূহের রচনাকালবর্ত্তী প্রাচীন ভাষা-সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবে এই ভাষা-সমূহের মধ্যে একটি ভাষা হইতে বিশুদ্ধ সংস্কৃতের বিকাশ হয়।

বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে প্রচলিত আর্য্যভাষাগুলি 'প্রাকৃত' বলিয়া খ্যাত ছিল। 'প্রাকৃত' শব্দের অর্থ—যাহা স্বাভাবিক ও কৃত্রিমতাদোষপরিশূন্য ; 'সংস্কৃত' শব্দে মার্জ্জিত বুঝায়। বৈদিক সূক্তগুলি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হইয়াছিল ; সুতরাং সেই সময়ের চলিত ভাষাসমূহকে 'প্রাকৃত' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সেইগুলি প্রথম স্তরের 'প্রাকৃত'। আবার সেইগুলি হইতে যে-সমস্ত সংস্কৃত আর্য্যভাষার বিকাশ হইয়াছিল, তাহাদিগকে দ্বিতীয় স্তরের 'প্রাকৃত' বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃত হইতে আধুনিক যে-সমস্ত ভাষা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহাদিগকে তৃতীয় স্তরের প্রাকৃত বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃত অশোকের শিলালিপিতে পাওয়া যায়। প্রথম স্তরে ভাষা Synthetic থাকে ; ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রুতিকঠোর সমাবেশ ইহাতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় স্তরের ভাষাও Synthetic থাকে। তবে ইহাতে প্রথম স্তরের ন্যায় ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রুতিকঠোর সমাবেশ খুব অল্পই থাকে। দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃতের যখন সাহিত্য-হিসাবে সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তখন উহা অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল ছিল। তৎকালে স্বরবর্ণের ব্যবহারই বেশী ছিল—ব্যঞ্জনবর্ণ কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত। ইহার ফল এই হইয়াছিল যে, তৃতীয় স্তরে অত্যধিক স্বরবর্ণের সমাবেশ একেবারেই ছিল না ; প্রথম স্তরের ন্যায় ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহারই সমধিক দেখা যাইত ; কিন্তু ইহাদের সমাবেশ নূতন ধরণের ছিল। এসময়ে ভাষা Synthetic না হইয়া Analytic হইয়াছিল।

অশোকের কালীন আর্য্যভাষার দুইটি প্রধান শাখা ছিল—একটি পশ্চিমী প্রাকৃত, অপরটি পূরবী প্রাকৃত। দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃত এক্ষণে পালি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক্ষণে প্রাকৃত বলিলে পালি অপেক্ষা উন্নততর ভাষাকেই বুঝায়।

কিছুকাল পরে, কবিতা। ধর্ম্মগ্রন্থ ও নাটকাদি প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে বা তৎপরবর্ত্তীকালে প্রাকৃতের ব্যাকরণ লিখিত হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পর প্রাকৃতভাষা-সমূহের আর প্রচলন দেখা যায় না।

পশ্চিমী প্রাকৃতকে 'সুরসেনী' বা সুরসেনের ভাষা বলা হইত ; পূরবী প্রাকৃত 'মাগধী' বা মগধের ভাষা বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। পশ্চিমী ও পূরবী প্রাকৃতের মাঝামাঝি আরও একটি ভাষা ছিল ; তাহা অর্দ্ধমাগধী নামে প্রচলিত ছিল। প্রবাদ আছে যে জৈন অর্হৎ মহাবীর এই ভাষায় জৈনধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পুরাতন জৈনধর্ম্মগ্রন্থসমূহে ইহা ব্যবহৃত হইত। মারাঠী ভাষার সহিত এই ভাষার খুব নিকট সম্বন্ধ। প্রাকৃত কাব্যগুলি অধিকাংশ স্থলেই এই মারাঠী ভাষাতে লিখিত হইত। অধস্তন প্রাকৃত ভাষার পরবর্ত্তী স্তর 'অপভ্রংশ' নামে অভিহিত। অপভ্রংশ অর্থে 'দুষ্ট' বা 'বিকৃত' বুঝায়। কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে এই শব্দ প্রযুক্ত হইলে 'উন্নত' বা 'বিকশিত' অর্থ বুঝায়। যে-সকল চলিত ভাষার উপর প্রাকৃত ভাষা প্রতিষ্ঠিত, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে 'অপভ্রংশ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অপভ্রংশের উন্নতিক্রমে অপভ্রংশ

তাহার অনেক গ্রন্থাদিও রচিত হইয়াছিল। অপভ্রংশ-সাহিত্যে আমরা তৎকালীন কথিত ভারতীয় ভাষাসমূহের অনেক নিদর্শন পাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত পদ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরে বোধ হয় এ ভাষার আর প্রচলন ছিল না। আধুনিক ভাষা সমূহের বা তৃতীয় স্তরের প্রাকৃতের নিদর্শন আমরা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাই। অতএব স্থূলতঃ বলিতে পারা যায় যে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে আধুনিক আর্য্য (Indo-Aryan) ভাষাসমূহের প্রচলন আরম্ভ হয়। অপভ্রংশ হইতেই এগুলির বিকাশ হইয়াছে।

সিন্ধুনদের নিম্ন চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশে 'ব্রাচড়' নামে একপ্রকার অপভ্রংশ প্রচলিত ছিল। ইহা হইতে সিন্ধী ও লহণ্ডা ভাষার উৎপন্ন হইয়াছে। কোহিস্তানী ও কাশ্মীরী ভাষাদ্বয় কোন্ ভাষা হইতে উৎপন্ন, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। তবে, ঐ ভাষার সহিত ব্রাচড় ভাষার যে বহু সাদৃশ্য ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। নর্ম্মদা উপত্যকার দক্ষিণে আরবোপসাগর হইতে ওড়িশা পর্যান্ত প্রদেশে অনেকগুলি ভাষা ব্যবহৃত হইত। এইগুলির সহিত অপভ্রংশ বৈদর্ভীর খুব নিকট সম্বন্ধ। বৈদর্ভীও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অপভ্রংশভাষাসমূহ হইতে আধুনিক মারাঠী ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে এদিকে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত অপভ্রংশ 'ওড্রী' বা 'উৎকলী' প্রচলিত ছিল। ইহা হইতে বর্ত্তমান 'ওড়িয়া' ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ওড্রীর উত্তরে বিহার, ছোটনাগপুর ও যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বার্দ্ধে মাগধী ভাষা প্রচলিত ছিল; ইহা হইতে বর্ত্তমান বিহারী ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। এটি একটি প্রধান ভাষার মধ্যে পরিগণিত ছিল; পূর্ব্বের প্রাকৃতের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্যও বিদ্যমান ছিল। ওড্রী, গৌড়ী ও ঢক্কী ভাষাসমূহ ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মাগধীর পশ্চিমে প্রাচ্য অপভ্রংশ বা গৌড়ী প্রচলিত ছিল; বর্ত্তমান মালদহ জেলার অন্তর্বর্ত্তী গৌড়ই ইহার কেন্দ্রস্থল ছিল। ইহা দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্বে বিস্তৃত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। আরও পূর্ব্বে ইহা ঢাকার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এ স্থানে ইহা 'ঢক্কী' নামে অভিহিত হইত। ময়মনসিংহ, ঢাকা, শ্রীহট্ট ও কাছাড় প্রদেশে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, ইহা তৎসমুদয়ের আদি। গৌড়-অপভ্রংশ পূর্ব্বদিকে আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; উত্তর-বঙ্গ ও আসামের ভাষা ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

সৌরসেনী হইতে পশ্চিমী হিন্দী ও পঞ্জাবী ভাষাদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। 'আবন্তী'ও ইহাদের মধ্যে আর-একটি ভাষা। আবন্তী বর্ত্তমান উজ্জয়িনীর চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশে ব্যবহৃত হইত; 'রাজস্থানী' ভাষা ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বিশুদ্ধ সংস্কৃত কোন মূল প্রাকৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পাণিনি ও অন্যান্য বহু বৈয়াকরণের পরিশ্রমে এই ভাষা ইহার বর্ত্তমান আকারে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এই ভাষা দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃত হইতে যথেচ্ছভাবে শব্দ গ্রহণ করিয়া স্বীয় কলেবর পুষ্ট করিয়াছিল। পক্ষান্তরে প্রাকৃতও সংস্কৃত হইতে অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের বৈয়াকরণগণ 'দেশজ' নামে আর এক প্রকার শব্দের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যে-সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত হইতে হয় নাই সেই-গুলিকে ঐ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল।

দ্রাবিড়ীয় মুণ্ডা ভাষাসমূহ হইতেও কতকগুলি শব্দ পাওয়া গিয়াছে; ইহাদের অধিকাংশ শব্দই প্রাচীন সংস্কৃত হইতে ব্যুৎপন্ন ভাষাসমূহ হইতে আসিয়াছে। এগুলিই প্রকৃত পক্ষে 'তদ্ভব'। বিদেশী শব্দগুলি বাদ দিলে এই ভাষাসমূহের শব্দসমষ্টিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়; যথা—তৎসম, অর্দ্ধ-তৎসম ও তদ্ভব। তদ্ভব শব্দগুলি মূল প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আধুনিক তৎসম ও অর্দ্ধ-তৎসম শব্দগুলি সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে।

(মাধবী, চৈত্র) শ্রী জলধর সেন

—

কলিকাতার কথা

কলিকাতার মিউনিসিপালিটি ১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া পাকা রাস্তা আরম্ভ করিয়াছিল। সেকালে লটারির দ্বারাই কলিকাতার উন্নতি ও টাউন-হল প্রভৃতি গৃহ তৈয়ারি হইত। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে লটারির দ্বারা কলিকাতার মিউনিসিপালিটির অর্থ সংগ্রহ করা বিলাতের হুকুমে বন্ধ হইয়াছিল। বাড়ী ঘর ট্যাক্সে ও মদের লাইসেন্সাদিতে মিউনিসিপালিটির বার্ষিক আয় (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে) প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ছিল; ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে উহা তিন লক্ষ টাকা মাত্র হইয়াছিল। কোম্পানিকে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার অভাব পূরণ করিতে হইত। তখন পুলিশ ও রাস্তাদি সাফ করিবার খরচা বার্ষিক সওয়া পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপালিটি কলিকাতাকে চারভাগে বিভক্ত করিয়াছিল ও ট্যাক্স শতকরা ৫৲ টাকা হারে ছিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সাতজন বেতনভোগী কর্ম্মকর্ত্তারা কলিকাতার মিউনিসিপালিটির কার্য্য করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনজনকে কোম্পানি ও চারজনকে সাধারণ করদাতৃগণ মনোনীত করিতেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সেই সাতজন স্থলে চারজন হইয়াছিল। কোম্পানি ও সাধারণে দুইজন করিয়া মনোনীত করিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের মাহিনা আড়াইশত টাকার বেশী ছিল না। ট্যাক্সের হার প্রায় ডবল হইয়াছিল। রাস্তায় আলো দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আবার চারজন কমিয়া তিনজন হইয়াছিল, তাহাদিগকে কোম্পানিই নিযুক্ত করিত।

ডালহাউসির আমলে ডুপয়সায় চিঠিবিলি, টেলিগ্রাফ, রেল, ইউনিভারসিটি, কলেজ, দীর্ঘ রাজপথ, খাল, কৃষি-বাণিজ্যাদির বহুতর সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। তাঁহারই আমলে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার প্রথম লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণর পদের সৃষ্টি হইয়াছিল ও তজ্জন্য সার্ ফ্রেড্‌রিক হ্যালিডে মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ভারতের আইনানুসারে গবর্ণর জেনারেলের সভার তিনজন সভ্যের মধ্যে একজন বাঙলার ডেপুটি-গবর্ণরী করিতেন, তাহার জন্য তিনি কোন অধিক বেতন পাইতেন না। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে একজন ছোট-লাটের অধীনে শাসন আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলেন্‌বরা বাঙলার শাসন ও পূর্ত্তবিভাগের যাবতীয় কার্য্য পৃথক্ করিয়া দিয়া যান। সুদূর পিনাং, মালাক্কা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতির ব্যবস্থাভার বাঙলার অধীন ছিল।

হ্যালিডে সাহেব সকলের বড় প্রিয় হইয়াছিলেন। চড়কে কাঁটা বিঁধাইয়া ঘোরার প্রথা তুলিয়া দিবার তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারই আমলে কলিকাতা হইতে কর্ম্মনাশা পর্য্যন্ত পথ সম্পূর্ণ ও অজয়নদ পর্য্যন্ত রেল খোলা হয়। তাঁহারই আমলে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কলেক্টারের হাতে শাসন ও রাজস্বভার পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই মে কলিকাতায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় শিক্ষা-সমিতির সভাপতি বেথুন সাহেব খুলিয়াছিলেন। কৃষ্ণ বন্দ্যো ১৮৩২ খৃঃ নবেম্বর মাসে খৃষ্টান হইয়াছিলেন, লালবিহারী দে ডাক্তার ডফের স্কুলে পড়িয়া ২৩শে জুলাই ১৮৪৩ খৃঃ খৃষ্টান হইয়াছিলেন।

জেনারেল এসেম্‌ব্লির ভিতপত্তন ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট্ ডি-ম্যাক্‌ফারলেন করিয়াছিলেন।

সেকালের কলিকাতার ইংরেজি খবরের কাগজে বড় কিছু এদেশের-

খবর থাকিত না, ইউরোপের খবরেই ভরা থাকিত; ঐ-সকল খবর চিঠিতে জাহাজে আসিত। সেকালের ইংরেজি কাগজের মধ্যে কলিকাতা-গেজেটে বিজ্ঞাপন ও গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীদের নিয়োগ অবসরাদি ও বিলাতের খবর থাকিত। ইণ্ডিয়া-গেজেটেও সেইরূপ। জন বুল, বেঙ্গল হর্‌করা, মিরার, ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া সেকালের হালচাল লইয়া দু'কথা বলিত। আদালতের খবর ও বাঙ্‌লা সমাচার-চন্দ্রিকা তিমির-নাশক বঙ্গদূত, কৌমুদী প্রভৃতির অনুবাদ কোন কোন খবরের কাগজ করিত, তাহাতেই সেকালের অনেক কথা জানা যায়। সামুয়েল কোম্পানি ১নং হেয়ার ষ্ট্রীট হইতে বেঙ্গল হর্‌করা ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাস হইতে প্রতি মঙ্গলবারে বাহির করিত ও ২০এ এপ্রেল ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে উহা দৈনিক হইয়াছিল। আর বাঙ্‌লা সমাচার-চন্দ্রিকা ২৩ নং কলুটোলা হইতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি সোমবার প্রাতে ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাহির করিতেন। ইহা ধর্ম্মসভার মুখপত্র ছিল। মাসিক চাঁদা এক টাকা ছিল, বিজ্ঞাপনের হার প্রতি লাইন চার আনা। গ্রাহক কলিকাতায় চারশত, মফঃস্বলে পঞ্চাশ জন মাত্র ছিল। জে প্রিচার্ড্ সাহেব দৈনিক জন্ বুল, যাহা এখন ইংলিসম্যানে পরিণত হইয়াছে, ক্যাল্সি লেন ও কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট হইতে বার্ষিক অগ্রিম আশী টাকা ও মাসিক আট টাকা চাঁদায় বাহির করিত। আর রবিবারে ওরিয়েণ্টল অব্‌জারভার জন বুলের গ্রাহকগণের নিকট মাসিক এক টাকা ও অপর সাধারণের নিকট দুই টাকা চাঁদায় বাহির হইত। উহার বিজ্ঞাপনের হার প্রতি লাইন দুই আনা ছিল। পাদ্রীদের মুখপত্র ইংরেজী ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া ও বাঙ্গালা সমাচার-দর্পণ ছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কোম্পানির কাগজ জাল হওয়ায় বড়ই ভয়ানক গোলমাল হইয়াছিল। ইহাতে দেশের লোকের প্রায় এক কোটি টাকা গিয়াছিল। চুঁচুড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদার, রাজকিশোর দত্ত প্রভৃতির সাজা হইয়াছিল। রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের যৎপরোনাস্তি বেইজ্জত ও অর্থ নষ্ট হইয়াছিল। কিছুদিন আগে ভূকৈলাসের বিখ্যাত জয়নারায়ণ ঘোষালও এক জাল মামলায় ঐরূপ নাকাল হইয়াছিলেন। ঐ সময় কলিকাতার ব্যবসাদারদিগকে বাঁচাইবার জন্য ইন্‌সলভেন্সি আইন জারি হইয়াছিল। ইন্‌সলভেন্সি আইন জারি হওয়ায় কলিকাতা খোট্টারা এই কথা বলিত :—

"নালিশ হুয়া ত্যাগাদা ছুটা
ঘর ঘর রূপেয়া বাটো,
বরে ভাগসে ডিগ্রী হুয়া
কাগজ লেকে চাটো।"

এই ইন্‌সলভেন্সি আইন জারী হওয়ায় কলিকাতায় মাড়য়ারী মহাজনের আমদানী হইয়াছিল ও দেশের মহাজনেরা তাহাতে কাজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহায্যে ও উৎসাহে ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ হিন্দুসমাজে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বহু অর্থব্যয় করিয়া মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সাধারণে তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের টিকি কাটিলেন বলিয়া উপহাস করিত ও তিনি অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন বলিয়া এই বলিয়া ঠাট্টা করিত :— "ম্যাজিষ্ট্রেট্ হয়েছে কালী সিংহি সেতখানার।" এইরূপে উত্যক্ত হইয়া তিনি হুতোমপ্যাঁচার নক্সা রাখিয়া গিয়াছেন। সেকালের বাঙ্গালী অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটেরা পাইখানা পরিষ্কার ও রাস্তা পরিষ্কার যাহাতে থাকে তাহাই বিচার করিত, সেইজন্য সিংহ মহাশয়কে এরূপ বিদ্রূপ করা হইয়াছিল।

(সুবর্ণবণিক্ সমাচার, চৈত্র) রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর

রুদ্র

নিরুক্তবিৎ পণ্ডিতগণের মতে তিনটি দেবতা। তাহার মধ্যে অগ্নি-দেবতার স্থান পৃথিবী, বায়ু বা ইন্দ্র-দেবতার স্থান অন্তরীক্ষ এবং সূর্য্য-দেবতার স্থান দ্যুলোক। এই তিন দেবতাই তাঁহাদের মহৎ ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া বেদে নানা নামে অভিহিত ও স্তুত হইয়া থাকেন। যাস্ক তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই তিন দেবতাই আবার এক দেবতার অবস্থান-ভেদ ও ভিন্ন দেবতা-সকল এই মহান্ দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। নিঃ ৭।৪.৮, ৯। ঘট-শরাবাদির আকারগত ভেদ থাকিলেও যেরূপ মৃত্তিকা-রূপে তাহারা অভিন্ন, অগ্নি বায়ু ও সূর্য্য দেবত্রয়ের কার্য্যাদিগত ভেদ থাকিলেও সেইরূপ তাঁহারা স্বরূপতঃ (মহান্ আত্মরূপে) অভিন্ন (দুর্গাচার্য্যঃ)।

নিঘণ্টু গ্রন্থে রুদ্রদেব মধ্যমস্থান-দেবতার অন্তর্গত। বায়ু বা ইন্দ্র মধ্যমস্থান-দেবতা, সুতরাং রুদ্রদেব বায়ু বা ইন্দ্র-দেবতার অবান্তর ভেদ। যাস্ক বলেন, অগ্নি, ইন্দ্র বা বায়ু, ও সূর্য্য এই তিন দেবতা তাঁহাদের মহৎ ঐশ্বর্য্য-হেতু বহুনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নি ৭।৫।৩। ইন্দ্র বা বায়ু-দেবতার কর্ম্ম শিশির ও বৃষ্টির প্রবর্ত্তন, বৃত্রবধ (মেঘ হননপূর্ব্বক বৃষ্টির নিরোধ দূরীকরণ) ও অন্য সর্ব্বপ্রকার বলপ্রকাশক কার্য্য। নি ৭।১।২। রুদ্র যখন ইন্দ্র বা বায়ু দেবতার রূপভেদ, তখন তাঁহার কার্য্যও ইন্দ্র বা বায়ু-দেবতার তুল্য বুঝিতে হইবে। রুদ্র-শব্দের অর্থ যাস্ক ও দুর্গাচার্য্যের বৃত্তি অনুসারে এইরূপ—শব্দ করেন বলিয়া অর্থাৎ মেঘশব্দ উৎপাদন করেন বলিয়া তিনি রুদ্র, অথবা মেঘমধ্যস্থ হইয়া বারংবার শব্দ করিয়া গমন করেন বলিয়া তিনি রুদ্র, অথবা শত্রুগণকে রোদন করান্ বা দুঃখ প্রদান করেন্ বলিয়া তিনি রুদ্র। কাঠক ব্রাহ্মণে ও হারিদ্রব ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রুদ্র। যাঁহারা বেদবর্ণিত ইতিহাস অবলম্বন করিয়া বেদের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে তিনি পিতা প্রজাপতিকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া অনুতপ্ত হইয়া রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া রুদ্রনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সায়ণাচার্য্য বলেন যে, বেদে বর্ণিত আছে যে কোন সময়ে দেবাসুর সংগ্রামে অগ্নিস্বরূপ রুদ্র (অগ্নাবৈ রুদ্রঃ) দেবগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ধন অপহরণ করিয়া প্রস্থান করেন (নিরগাৎ)। অসুর-গণকে জয় করিয়া দেবগণ ইঁহাকে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পান ও তাঁহার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করেন। তখন রোদন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রুদ্র। তৈত্তিরীয়কে এইরূপ আছে।

রুদ্রের পত্নী রোদসী, রুদ্রের পুত্র মরুদ্গণ। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য বলেন—রুদ্রের পত্নী অর্থে রুদ্রের বিভূতি (ঐশ্বর্য্য বা শক্তি) বুঝিতে হইবে।

যাস্ক বলেন, বেদে অগ্নিও রুদ্রশব্দে কথিত হইয়া থাকেন (অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে)। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য এইস্থানে অথর্ব্ব বেদ হইতে একটি ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া যাস্কের সমর্থন করিয়াছেন। অগ্নিকে রুদ্র বলিবার কারণ এই যে অগ্নি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক, এই তিন লোকেই ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত, এইরূপভাবে বেদে বর্ণিত। পৃথিবী-লোকে পার্থিবাগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষলোকে বিদ্যুদগ্নিরূপে ও দ্যুলোকে আদিত্যরূপে তিনি বিরাজিত রহিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে কোন সময়ে ইন্দ্র অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন; তাহাতে অসুরমাতা দিতি দুঃখিত হইয়া ইন্দ্রকে বধ করিতে সমর্থ এইরূপ পুত্র কামনা করিয়া তপস্যা দ্বারা স্বীয় ভর্ত্তা কশ্যপকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে গর্ভলাভ করেন। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইন্দ্র বজ্রহস্তে সূক্ষ্মরূপে দিতির উদরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার গর্ভ সপ্তভাগে বিদারিত করেন। পরে সেই সপ্তভাগের এক এক ভাগকে

পুনরায় সপ্তভাগে খণ্ডিত করেন। গর্ভের এই অংশসকল তখন উদর হইতে বহির্গত হইয়া রোদন করিতে থাকে। এক সময়ে পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর লীলা-হেতু ভ্রমণ করিতে করিতে এই গর্ভাংশসকলকে দেখিতে পান। তখন পার্ব্বতী পরমেশ্বরকে বলিলেন, 'যদি আপনার আমার প্রতি প্রীতি থাকে, তাহা হইলে এই মাংসখণ্ডগুলি প্রত্যেক অংশই যাহাতে এক একটি পুত্র হয়, এইরূপ আপনি বিধান করুন।' তখন পরমেশ্বর সেই মাংসপিণ্ডগুলিকে সমানরূপ সমানবয়স্ক ও সমান-অলঙ্কার-যুক্ত পুত্র সম্পাদন করিয়া, 'এইগুলি তোমারই পুত্র হউক,' বলিয়া পার্ব্বতীকে সমর্পণ করিলেন। এই জন্যই সমস্ত মারুত-সূক্তে মরুদ্‌গণ রুদ্রপুত্ররূপে স্তুত হইয়া থাকেন ও রৌদ্র সূক্তে রুদ্র মরুদ্‌গণের পিতা বলিয়া স্তুত হইয়া থাকেন।

বেদে বহুবচনান্ত রুদ্রশব্দ রুদ্রগণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সৃষ্টি-প্রবর্ত্তন-ব্যাপারে প্রকৃতির যে-শক্তি বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে, সেই সেই শক্ত্যধিষ্ঠাতৃপুরুষ বা চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতাভাবে স্তব করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নিজ নিজ অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সমস্ত শক্তির কেন্দ্রীভূত, সমস্ত শক্তির উৎস, সমস্ত শক্তির প্রেরক বা সমস্ত শক্তির অধিষ্ঠাতৃ পুরুষকেও রুদ্র হইতে অভিন্ন বোধ করিয়া রুদ্রনামেই তাঁহাকে তাঁহাদের স্তবের ও ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন। এই বৈদিক রুদ্রদেবই পরবর্ত্তীকালে শিব ও মহাদেবরূপে ভারতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

(বামাবোধিনী-পত্রিকা, চৈত্র) শ্রী সাতকড়ি অধিকারী

বেনো-জল

দুই

মিঃ বিনয় সেন কল্‌কাতার একজন নামজাদা ডাক্তার। দিন-রাত তাঁকে রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌তে হয় এবং এইভাবে দিন-রাত ব্যস্ত থেকে আজ কল্‌কাতা সহরে তিনি দুইখানি প্রাসাদের মতন অট্টালিকা, দুইখানি মোটরকার (একখানা মিনার্ভা ব্রুহাম, আর একখানা 'এইচ সি-এসে'র সিডান) ও প্রচুর অর্থের একমাত্র মালিক হ'তে পেরেছেন।

তাঁর গুণপনার কথা আমরা ঠিকমত জানি না। তবে এইটুকু বল্‌তে পারি যে, অন্যলোকের দেহে ধারালো ছুরি মার্‌বার ও গলায় তেঁতো ঔষধ ঢাল্‌বার কায়দাটা রীতিমত আয়ত্ত কর্‌বার জন্যে, তিনি সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে বিলাতে যেতেও ক্ষান্ত হন নি। আর জাত্-ভীরু বাঙালী রোগীরাও যখন তাঁর কবলে প'ড়ে পটল তুল্‌তে ভয় পায়না, তখন তাঁকে ভালো ডাক্তার ব'লে মান্‌তেই হবে।

ডাঃ সেন পুরা-দস্তুর সাহেবী মেজাজের লোক—ঘরে-বাইরে কেউ তাঁকে ধুতি-চাদর পর্‌তে দেখে নি। তাঁর বাড়ীতে রোজ-সন্ধ্যায় যে বৈঠকটি বসে, সেখানেও দেশী পোষাকের আবির্ভাব বড়-একটা ঘটে না এবং তার আসল কারণ হচ্ছে এই যে, সে-আসরে ব'সে নিত্য যাঁরা চা-চুরুট ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করেন, তাঁদের প্রায় সকলেই "হোমে" অর্থাৎ বিলাতে গিয়ে কিম্বা না-গিয়েই প্রথম শ্রেণীর 'সাহেব' হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

ডাঃ সেনের গৃহিণীকে আমরা কি নামে পরিচিত কর্‌ব, ভেবে পাচ্ছিনা। ডাঃ সেন যখন বয়সে তরুণ যুবক তখন তিনি এক গোঁড়া হিন্দুর ঘরে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর শাশুড়ী-ঠাকরুণ উপর-উপর চারটি মেয়ের মা হয়ে ভয় পেয়ে শেষ-মেয়েটির নাম আন্নাকালী রেখে, অত্যন্ত সেকেলে উপায়ে মা-কালীর কাছে নিজের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সেই আন্নাকালীই এখন ডাঃ সেনের অর্দ্ধাঙ্গিনী। স্ত্রীর এমন বিশ্রী সেকেলে নামের জন্যে ডাঃ সেন যে বিশেষরূপে লজ্জিত এবং দুঃখিত, তা বলা বাহুল্য। আবার, এ নামে কেউ সম্বোধন কর্‌লে ডাঃ সেনের গৃহিণীও যে বিশেষরূপে আপ্যায়িত হন, এমন কথা বল্‌লেও সত্যের অপলাপ করা হবে। কাজেই আমরা তাঁকে সেন-গিন্নী ব'লেই ডাকা নিরাপদ মনে কর্‌ছি।

সেন-গিন্নীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু চল্লিশের চেয়েও তাঁকে বেশী বড় দেখায়। তাঁর রং ফর্সা, মুখ-চোখ চলন-সই, দেহ দোহারা। বাড়ীতে তাঁর কথার প্রতিবাদ করে এমন কেউ নেই—স্বামীর উপরে তাঁর অখণ্ড প্রতাপ।

পরিবারে সন্তানের সংখ্যা তিনটি। প্রথমটি পুত্র,

নাম সন্তোষকুমার, বয়স বাইশ, এ-বৎসর এম-এ দেবে।

আর দুটি মেয়ে। বড়টির নাম সুনীতি, বয়স সতেরো। ছোটটির নাম সুমিত্রা,—পনেরো উৎরে সবে ষোলোয় পা দিয়েছে। বড় মেয়েটি বেথুন কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়্ছে এবং ছোটটি সবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। মেয়ে-দুটির এখনো বিবাহ হয়-নি। ডাঃ সেন নব্য-তন্ত্রের লোক, মেয়েদের বিবাহের জন্যে তিনি কিছুমাত্র ব্যস্ত নন। কিন্তু সেন-গিন্নী সম্প্রতি স্বামীর এই অটল নিশ্চেষ্টতাকে আর আমল দিতে না পেরে, মেয়েদের যোগ্য বর সন্ধানের জন্যে বেশ একটু উৎসাহ প্রকাশ করছেন।

সেদিন সকালে সেন-পরিবারের সকলে একসঙ্গে ব'সে 'প্রভাতী চা' পান করছেন। বিনয়-বাবু (মিঃ বা ডাঃ সেনের পরিবর্ত্তে আমরা চুপিচুপি এই নামই ব্যবহার করব) চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুকটি দিয়ে, স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্লেন, "কাল রাতে সেই কলেরার কেস্টা দেখে ফেরবার মুখে ভারি একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে গেছে।"

সেন-গিন্নী কৌতূহলী চোখ তুলে বল্লেন, "কি দুর্ঘটনা ?"

—"একজন লোককে আর-একটু হ'লেই চাপা দিয়েছিলুম," এই ব'লে বিনয়-বাবু পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উক্ত ঘটনাটি ধীরে ধীরে বর্ণন করলেন।

সেন-গিন্নী দুঃখিত স্বরে বল্লেন, "আহা, সে এখন কোথায় ?"

—"আমাদের নীচেকার একটা ঘরে।"

—"ভদ্রলোক ?"

— "চেহারা দেখে তাই মনে হয়।"

—"বুড়োমানুষ ?"

—"না, ছোক্রা।"

সুমিত্রা এতক্ষণ চুপ ক'রে সব শুন্ছিল। এখন সে 'ন্যাপ্‌কিন্' দিয়ে মুখ মুছে বল্লে, "বাবা, তুমি মোটর-গাড়ী চড়া ছেড়ে দাও।"

বিনয়-বাবু হেসে বল্লেন, "কেন মা ?"

—"রোজই খবরের কাগজে একটা-না-একটা মোটরের দুর্ঘটনা পড়ি। কোন্‌দিন তুমিও দেখ্‌চি মানুষ মারবে।"

সন্তোষ বোনের কথার প্রতিবাদ ক'রে বল্লে, "মানুষ তো আমরা আর সাধ ক'রে মারি না। তারা যদি গাড়ীর তলায় এসে পড়ে, আমরা কি করব ?"

সুমিত্রা বল্লে, "আমরা মোটর চড়া ছেড়ে দিলেই তো সব গোল চুকে যায়! ঘোড়ার গাড়ীতে তো এত লোক মরে না! আমি বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, ভিড়ের ভিতর দিয়ে আমরা যখন মোটরের ভেঁপু বাজিয়ে আসি, সকলেই তখন আমাদের একটা বিদ্‌কুটে উৎপাতের মতন ভাবে। তখন তাদের চোখ-মুখ দেখ্‌লে মনে হয়, তারা যেন আমাদের খুনীর মতন ভাব্‌চে, আর মনে মনে শাপ দিচ্ছে,—"

সন্তোষ তাকে বাধা দিয়া বল্লে, "সুমি, তুই 'ফিলজফি' পড়্‌বি ?"

—"হঠাৎ তোমার এ প্রশ্ন কেন ?"

—"তোর কথার সুর 'ফিলজফারে'র মতন। তোর 'ফিলজফি' শেখাই উচিত।"

সুমিত্রা একটু রাগের স্বরে বল্লে, "আচ্ছা, উপদেশের জন্যে তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ। এখন তুমি থামো।"

বিনয়-বাবু উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "তোমরা ঝগ্‌ড়া কর, আমি এখন লোকটিকে দেখ্‌তে চল্লুম।"

সুমিত্রা বল্লে, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব বাবা!"

সুনীতি বল্লে, "আমিও।"

—"আয়" ব'লে বিনয়-বাবু মেয়েদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মায়ের পানে তাকিয়ে সন্তোষ বল্লে, "এদের সব-তাতেই আগ্রহ! কোথাকার কে তার ঠিক নেই—হয়ত একটা গরিব ভবঘুরে—ওরা অমনি তাকে দেখ্‌তে ছুট্‌লেন!"

সেন-গিন্নী বল্লেন, "ছিঃ সন্তোষ, গরিবরা কি মানুষ নয় ? তোমার বাবাও গরিবের ঘরে জন্মেচেন।"

… … …

নীচের একটা ঘরে জান্‌লার কাছে একটি বিছানার উপরে কাল্‌কের সেই আহত লোকটি শুয়ে ছিল।

ভোরের আলো তার মুখের উপরে এসে পড়েছে। তার বয়স পঁচিশের বেশী হবে না। মুখখানি সুন্দর, কিন্তু দারিদ্র্য আর দুর্ভাবনার চিহ্ন তাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে।... ...

হঠাৎ ঘরের ভিতরে পায়ের শব্দ শুনে, সে মুখ তুলে দেখ্‌লে, কাল রাতের সেই মোটরের আরোহী তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর সঙ্গে দুটি বালিকা। অত্যন্ত সঙ্কুচিতের মত তাড়াতাড়ি সে উঠে বস্‌ল।

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "উঠ্‌তে হবে না, উঠ্‌তে হবে না, —তুমি যেমন ছিলে তেম্‌নি শুয়ে থাকো।"

সে বল্‌লে, "ডাক্তার-বাবু, আমি এখন ভালো আছি। আর আমার এখানে থাক্‌বার দরকার হবে না।"

বিনয়-বাবু তাকে পরীক্ষা ক'রে বল্‌লেন, "তোমার আঘাত সাংঘাতিক নয় বটে, কিন্তু এখনো দু-চার দিন তোমাকে আমরা বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে দেব না।"

ম্লান হাসি হেসে যুবক বল্‌লে, "আমার জীবনের মূল্য কিছুই নেই ডাক্তার-বাবু! আমি মরি, বাঁচি, তাতে দুনিয়ার কোনোই লাভ কি লোক্‌সান নেই,—আমাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দিন।"

বিনয়বাবু স্থির-চোখে নীরবে খানিকক্ষণ যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সদয় স্বরে বল্‌লেন, "তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাকো, মনকে অশান্ত কোরো না।"

যুবক তেম্‌নি ব্যথিত-স্বরে বল্‌লে, "জানেন ডাক্তার-বাবু, কাল রাতে আমাকে মোটর-চাপা দিলেও আপনার কোনো পাপ হোতো না? আমি কাল মরতেই গিয়েছিলুম। কিন্তু [illegible]ার জলে নেমে, মরণকে সাম্‌না-সাম্‌নি দেখে, ভয়ে আমি মরতে পারিনি—কাপুরুষের মতন পালিয়ে এসেচি!"

সুনীতি আর সুমিত্রা অবাক্ হয়ে যুবকের মুখের দিকে [illegible] রইল।' বিনয়-বাবুর মনে সন্দেহ হ'ল, লোকটা পাগল নয় তো? তিনি নাকে-চাপা চশমাখানা নাকে [illegible] যুবককে ভালো ক'রে আর-একবার দেখে, [illegible] নাম কি?"

—"রতন[illegible]"

—"তুমি কোথায় থাকো?"

—"পথে, ঘাটে, আকাশের তলায়।"

—"তার মানে?"

—"আমার মাথা গোঁজ্‌বার ঠাঁই নেই। একটা মেসে থাক্‌তুম, কিন্তু দু-মাসের ভাড়া বাকি পড়াতে, তারা আমাকে সেখান থেকেও তাড়িয়ে দিয়েচে।"

—"তোমার দেশ নেই?"

—"ছিল। কিন্তু মা আর বাবার কাল হওয়ার পর থেকে দেশে আর যাই না। আমার বাবাও গরিব ছিলেন, আমার জন্যে কিছু খোরাক রেখে যান-নি।"

—"তুমি কতদূর পড়েচ? চাক্‌রি করতে পারো না?"

—"কলেজে কিছুকাল পড়াশুনো করেচি—চাক্‌রিও আগে করতুম। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে আমাদের আপিস উঠে যায়, তারপরে অনেক চেষ্টা ক'রেও আর কাজ পাই-নি।"

রতনের কথাবার্ত্তা শুনে বিনয়-বাবুর মনটা দয়ায় ভিজে গেল।

সুমিত্রাও বাবার হাত ধ'রে বল্‌লে, "বাবা, তোমার তো অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ আছে, এই ভদ্র-লোকটির একটি কাজ ক'রে দাও না!"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "আচ্ছা রতন, আমি চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব, তোমার জন্যে কি করতে পারি। আপাতত আমি তোমাকে কিছু অর্থসাহায্য করব, যতদিন-না চাকরি হয়, সেই টাকাতে চালিও।"

বিনয়-বাবুর চোখের উপরে চোখ রেখে রতন শান্ত স্বরে বল্‌লে, "ডাক্তার-বাবু, আমি গরিব বটে, কিন্তু ভিখিরি নই—আপনার টাকা আমি নেব কেন? ভিখিরি হ'লে আজ আমার এ দশা হোতো না, আমার মামা খুব ধনী—কিন্তু আমার দারিদ্র্যের গর্ব্বে আঘাত লাগ্‌বে ব'লে আমি তাঁরও গলগ্রহ হই-নি।"

বিনয়-বাবু বিস্মিত চোখে আবার খানিকক্ষণ রতনের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টি প্রশংসায় ভ'রে উঠ্‌ল। মনুষ্যত্বকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, এই গরিব যুবকের কথায় মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখে তিনি খুসি হলেন।

এই যুবক অর্থাভাবে আত্মহত্যা করতে চায়, তবু তাঁর অযাচিত দান গ্রহণে তার আপত্তি! আত্মীয়ের কাছে হাত পাত্‌তেও এ নারাজ! হাঁ, একেই বলি মানুষ!···

······কিন্তু কথায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ না ক'রেই বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "বেশ, আমার টাকা তুমি নিও না। কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ, এখন দিন-কয়েক তুমি বিছানা ছেড়ে উঠো না। আমার জন্যেই তোমার এই দশা হয়েচে—তোমার ভাল-মন্দের জন্যে আমিই এখন দায়ী।"

রতন বল্‌লে, "আচ্ছা।"

—"আমি এখন চল্‌লুম, বেলা হোলো, রোগীরা আমার অপেক্ষায় ব'সে আছে।"—এই ব'লে বিনয়-বাবু মেয়েদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রতন ব'সে ব'সে আনমনে কি ভাব্‌তে লাগ্‌ল।····· তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়্‌ল।

তিন

সুমিত্রার কাছে রতন একটি নতুন মানুষের মতন দেখা দিলে।

জীবনে আমরা নতুন মানুষ হয়তো রোজই দেখি। কিন্তু তারা শুধু নামেই নতুন। বিশগজ থান থেকে কেটে-নেওয়া একইঞ্চি নমুনা দেখ্‌লেই যেমন সমস্ত থান্‌টা দেখা হয়, আমাদের এই নিত্য-দৃষ্ট নতুন লোকগুলিও অনেকটা সেইরকম—তারা প্রত্যেকেই সাধারণ ও বৃহৎ মনুষ্য-জাতির এক-একটি টুক্‌রো নমুনামাত্র; কারণ অধিকাংশ স্থলে তাদের একজনকে দেখ্‌লেই আর-সকলকে দেখা হয়।

বয়সে তরুণী হলেও সুমিত্রা বেশ বুঝ্‌লে যে, তার-দেখা আর আর নতুন লোকের সঙ্গে রতনের ঠিক তুলনা চলে না, এই লোকটি বাস্তবিকই একটু নতুন ধরণের। এ লোকটি খেতে না পেয়ে জলে ডুবে মর্‌তে যায়, তবু নিজের মামার সাহায্যও নেয় না! এর এই গরিবানা চালে বীরত্ব আছে, গর্ব্ব আছে, শক্তি আছে—আর-পাঁচজনের চরিত্রে যার অত্যন্ত অভাব!

তারপর, রতনের কথাবার্ত্তা কইবার ভঙ্গী, তার হতাশ দুঃখের সুর, এত বিপদেও তার স্থির প্রশান্ত দৃষ্টি, এগুলিও সুমিত্রার মনের ভিতরে গিয়ে স্পর্শ করেছিল।

পরের দিন সুমিত্রার সামান্য একটু জ্বর-ভাব হ'ল। তাই সেদিন সে মা আর দিদির সঙ্গে বেড়াতে বেরুল না। বিকাল-বেলায় একলাটি ব'সে থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ তার মনে একটা আগ্রহ হ'ল, রতন কেমন আছে দেখে আস্‌বার জন্যে।

সুমিত্রা রতনের ঘরে ঢুকে দেখ্‌লে, সে চুপ ক'রে চোখ মুদে শুয়ে রয়েছে, তার বুকের উপরে একখানা খোলা বই।······সুমিত্রার পায়ের শব্দে রতন চোখ খুল্‌লে।

সুমিত্রা বল্‌লে, "এই অবেলায় ঘুমোবার চেষ্টা করচেন?"

রতন লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে বল্‌লে, "না, আমি একটানা বই পড়্‌তে পারি না, মাঝে মাঝে পড়ি আর মাঝে মাঝে চোখ মুদে ভাবি।"

—"ওখানা কি বই?"

—"Russia : From the Vasangians to the Bolsheviks.—আপনার বাবার কাছে থেকে চেয়ে নিয়েচি।"

সুমিত্রা বল্‌লে, "আপনার ও-সব বই ভালো লাগে?"

রতন বল্‌লে, "হ্যাঁ, খুব ভাল লাগে। এখন এই-সব বইই তো আমাদের পড়া উচিত। রুসদেশের সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষের ভারি একটা মিল আছে। দুই-ই কৃষিপ্রধান দেশ, আর দুই দেশই উচ্চ সম্প্রদায়ের অত্যাচারে জর্জ্জরিত। আমার বিশ্বাস, এসিয়ার মধ্যে সব-চেয়ে আগে ভারতের লোকরাই বোল্‌শেভিক হয়ে উঠ্‌বে।"

সুমিত্রা বল্‌লে, "আমার কিন্তু ও-সব বই ভালো লাগে না। আমার খালি কবিতা গল্প আর উপন্যাস পড়্‌তে ভালো লাগে। বাঙ্‌লা বই তো সব শেষ ক'রে ফেলেচি বল্‌লেই চলে, ইংরিজী গল্পের বইও অনেক পড়েচি।"

—"কার লেখা আপনার বেশী ভালো লাগে?"

—"কার আবার, যাঁর লেখা সকলের ভালো লাগে,—রবিবাবুর।"

—"ইংরিজীতে কার লেখা আপনি পছন্দ করেন ?"

—"অনেকের। কিন্তু যে-সব বইএ খুব রহস্য আর নানাদেশের কথা আছে, সেই-সব বই পড়্‌তেই আমি বেশী ভালোবাসি।... ..পড়্‌তে পড়্‌তে আমারও সাধ হয়, আমিও তাদের সঙ্গে নানা দেশে ঘুরে বেড়াই,—কখনো আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে, কখনো সাহারার ধূ-ধূ বালুকা-রাজ্যে, কখনো উত্তর-মেরুর তুষার-জগতে ! আমারও ইচ্ছা হয়, সমুদ্রের মাঝখানে কোনো পাহাড়-ঘেরা নির্জ্জন দ্বীপে যাই, সেখানে বোম্বেটেরা একটা গিরিগুহায় গুপ্তধন ডাঁই ক'রে রেখেচে, গুহার ভিতরে সব নরকঙ্কাল প'ড়ে রয়েচে, সেই গুপ্তধনের সন্ধানে গিয়ে অসভ্যদের হাতে বন্দী হই, প্রথমে তারা আমাকে বধ করতে চাইবে তারপর "She"র মত আমাকে তাদের রাণী করবে—"

রতন মনে মনে হেসে সুমিত্রার মুখের পানে তাকিয়ে তার এই উদ্ভট কল্পনার উচ্ছ্বাস শুন্‌ছিল।

সুমিত্রা হঠাৎ তার নির্জ্জন বোম্বেটে দ্বীপের বর্ণনা বন্ধ ক'রে বল্‌লে, "আপনি আমাকে পাগল ভাব্‌চেন ?"

রতন প্রাণপণে গম্ভীর হয়ে বল্‌লে, "না, পাগল ভাব্‌ব কেন, তবে ও-সব বই আপনি বেশী পড়্‌বেন না।"

সুমিত্রা বল্‌লে, "আমার মা আর বাবাও উপন্যাস পড়্‌তে মানা করেন।"

—"তবে পড়েন কেন ?"

সুমিত্রা দোষীর মত অনুতপ্ত স্বরে বল্‌লে, "আমি কারুর কথা শুনি-না, আমি যে ভারি অবাধ্য !"

সুমিত্রার সরল মুখের দিকে রতন তাকিয়ে রইল।

সুমিত্রা বল্‌লে, "অমন চুপ ক'রে চেয়ে আছেন কেন ? আমি বাজে বকৃচি ব'লে আপনি বুঝি বিরক্ত হচ্চেন ?"

রতন অপ্রস্তুত স্বরে বল্‌লে, "না, না, তা নয়। জান্‌লা দিয়ে আপনার মুখে পড়ন্ত রোদের সোনালী আভা এসে পড়েচে, ঐ আলোর সঙ্গে আপনার মুখ ছবিতে ফোটাতে পার্‌লে কেমন দেখাবে, আমি তাই ভাব্‌ছিলুম।"

—"আপনি কি ছবি আঁক্‌তে পারেন ?"

—"পারি।"

—"আঃ, ছবি আঁক্‌তে পারেন ? আমি তো পারি না !"

—"শিখ্‌লেই পার্‌বেন।"

—"আচ্ছা রতন-বাবু, একখানা ছবি আঁকুন না !"

—"কাগজ আর পেন্সিল দিন।"

সুমিত্রা একছুটে বেরিয়ে গেল এবং কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে তখনি ফিরে এল।

রতন বল্‌লে, "আপনি আমার সাম্‌নে দাঁড়ান। আমি আপনার মুখের একখানা স্কেচ এঁকে নেবো।"

সুমিত্রা খুব খুসি হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। রতন ক্ষিপ্রহস্তে গোটাকতক রেখায় তার মুখের এক পাশের একখানা নক্সা এঁকে নিয়ে বল্‌লে, "হয়েচে।"

সুমিত্রা আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "এরি মধ্যে হয়ে গেল ! কৈ, দেখি দেখি !" ব'লেই রতনের হাত থেকে কাগজখানা টেনে নিয়ে আগ্রহ-ভরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তারপর অনুনয়ের স্বরে বল্‌লে, "রতন-বাবু, আপনি আমাকে ছবি আঁকা শেখাবেন ?"

রতন ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

এমন সময়ে বাড়ীর দরজার কাছে গাড়ী দাঁড়ানোর শব্দ হ'ল। সুমিত্রা বল্‌লে, "ঐ, ওঁরা সব বেড়িয়ে ফির্‌লেন। বাবাকে আপনার ছবি দেখিয়ে আসি"—ব'লেই সে ছুটতে ছুটতে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রতন ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগল, সুমিত্রার কথা। এর বয়সে সাধারণ হিন্দু-ঘরের মেয়েরা খোকা-খুকির মা ও পাকা গিন্নী হয়ে দাঁড়ায়। সুমিত্রা কিন্তু ঠিক বালিকাই আছে—তেম্‌নি সরল, তেম্‌নি চপল ! কচি-বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে সহজ-সরল বাল্য-ধর্ম্ম থেকে আমরা তাদের বঞ্চিত করি,—জীবনের সচেতন আনন্দ নিশ্চিন্তভাবে দুদিন ভোগ না করতেই বেচারীদের দেহ যায় ভেঙে আর মন যায় বুড়িয়ে !

তার ভাবনায় বাধা পড়্‌ল। বিনয়-বাবু দুই মেয়ের সঙ্গে ঘরের ভিতরে ঢুকে বল্‌লেন, "রতন, তোমার আঁকা

ছবি আমি দেখলুম। তুমি যে একজন উঁচুদরের আর্টিষ্ট, তোমার স্কেচের প্রত্যেকটি লাইন দেখে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

সুনীতি বল্লে, "রতন-বাবু, আমার বাবার প্রশংসার মূল্য আছে জানবেন। তিনি প্রশংসায় বড় কৃপণ।"

রতন সলজ্জ বিনয়ে মাথা নামিয়ে বল্লে, "এ আমার সৌভাগ্য।"

বিনয়-বাবু জান্‌লার কাছে গিয়ে দিনান্তের ম্লান আলোতে ছবিখানা আর-একবার দেখে, দুঃখিত স্বরে বল্লেন, "আশ্চর্য্য! এমন যার হাত, এদেশে তাকেও পেটের ভাবনা ভাবতে হয়!"

রতন ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত স্বরে বল্লে, "কিন্তু ভেবেও কোনো উপায় হয় না! সৃষ্টিকর্ত্তার উচিত, বাংলা দেশে আর্টিষ্টের সৃষ্টি না করা! মরুভূমিতে ফসলের বীজ ছড়িয়ে লাভ কি? সবুজ হবার আগেই যে তা শুকিয়ে যাবে! কবি এখানে কেন কাব্য লিখবেন, গায়ক এখানে কেন গান গাইবেন, শিল্পী এখানে কেন অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করবেন? আর্টিষ্টকে তোমরা দুটো অন্ন দিতেও নারাজ! আর্টিষ্টরা তোমাদের মনের ক্ষুধা নিবারণ করচেন, তোমাদের কাছে আনন্দ বিতরণ করচেন, কিন্তু তাঁদের সামান্য দেহের ক্ষুধার দিকেও তোমাদের দৃষ্টি নেই—আনন্দ পেতে চাও তোমরা বিনামূল্যে—গরিব আর্টিষ্টদের ঠকিয়ে। ফুলের তৃষ্ণা মেটাতে তোমরা একটু জলও দেবে না, তবে সেও বা গন্ধ দেবে কেন?"

বিনয়-বাবু খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বল্লেন, "রতন, তুমি আমার মেয়ে-দুটিকে ছবি আঁকা শেখাবে?"

রতন বল্লে, "আমি তো আগেই রাজি হয়েচি।"

বিনয়-বাবু বল্লেন, "কিন্তু খালি রাজি হ'লেই তো চল্‌বে না, এজন্যে তুমি কত পারিশ্রমিক চাও, সেটাও আমার জানা দর্‌কার যে!"

রতন বল্লে, "ডাক্তার-বাবু, আমি এত গরিব যে, টাকার কদরও ভালোরকম জানি না। টাকা না পেলেও আমি এঁদের শেখাতে প্রস্তুত আছি।"

বিনয়-বাবু বল্লেন, "দেখ, এখানে আর্টিষ্টদের দুর্গতির জন্যে কেবল দেশের লোকই দায়ী নয়—আর্টিষ্টরা নিজেরাও সেজন্যে কতকটা দায়ী। তারা অনাহারে হাহাকার করে, কিন্তু তবু টাকা দাবি করতে পারে না। এও একটা মস্ত দুর্ব্বলতা। এ দুর্ব্বলতাকে আমি প্রশ্রয় দেব না। কাল আমি যখন তোমাকে অর্থসাহায্য করব বল্লুম, তখন তুমি তা নাও নি। আমিই বা তোমার দান নেব কেন? আমারও তো আত্মসম্মান আছে!"

রতন মৃদু হেসে বল্লে, "বেশ, তবে মূল্যই দেবেন।"

বিনয়-বাবু বল্লেন, "কত পেলে তোমার চল্‌বে?"

রতন বল্লে, "কত পেলে আমার চল্‌বে, আমি তা হিসেব ক'রে বল্‌তে পারব না। হিসাব-নিকাশের ভার আমি আপনার হাতেই দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।"

বিনয়-বাবু বল্লেন, "মাসে একশো টাকা পেলে তোমার চল্‌বে?"

রতন বিস্ময়ে প্রায়-অবরুদ্ধ স্বরে বল্লে, "একশো টাকা! এ-যে আমার কাছে এখন একটা সাম্রাজ্যের দাম—স্বপ্নেরও অগোচর!"

বিনয়-বাবু বল্লেন, "বেশ, তবে এই কথাই রইল।"

ক্রমশঃ

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

দূর-দেশী সেই রাখাল ছেলে

(গান)

দূর-দেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায়
সারাবেলা গেল খেলে'॥
গাইল কি গান সেই তা জানে,
সুর বাজে তার আমার প্রাণে,
বলো দেখি তোমরা কি তার
কথার কিছু আভাস পেলে॥

আমি তারে শুধাই যবে—
"কি তোমারে দিব আনি",
সে শুধু কয়,—"আর কিছু নয়,
তোমার গলার মালাখানি।"
দিই যদি ত কি দাম দেবে,—
যায় বেলা সেই ভাবনা ভেবে,
ফিরে এসে দেখি,—ধূলায়
বাঁশিটি তার গেছে ফেলে॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদায়

(গান)

ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়
বিদায়ের পাত্রখানি।
মিলনের উৎসবে তায়
ফিরায়ে দিয়ো আনি॥
বিষাদের অশ্রুজলে
নীরবের মর্ম্মতলে
গোপনে উঠুক ফলে'
হৃদয়ের নূতন বাণী॥

যে পথে যেতে হবে
সে পথে তুমি একা,
নয়নে আঁধার র'বে,
ধেয়ানে আলোকরেখা।
সারাদিন সঙ্গোপনে
সুধারস ঢাল্‌বে মনে
পরাণের পদ্মবনে
বিরহের বীণাপাণি॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাখী ও চাঁপা

(গান)

পাখী বলে—"চাঁপা, আমারে কও
কেন তুমি হেন নীরবে রও?
প্রাণ ভরে' আমি ঢালি যে গান
সারা প্রভাতেরি সুরের দান,
সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও?
কেন তুমি তবে নীরবে রও?"
চাঁপা শুনে বলে,—"হায় গো হায়,
যে আমারি গাওয়া শুনিতে পায়,
নহ নহ পাখী সে তুমি নও।"

পাখী বলে,—"চাঁপা, আমারে কও
কেন তুমি হেন গোপনে রও?"
ফাগুনের প্রাতে উতলা বায়
উড়ে যেতে সে যে ডাকিয়া যায়,
সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও?
কেন তবে হেন গোপনে রও?
চাঁপা শুনে বলে,—"হায় গো হায়,
যে আমারি ওড়া দেখিতে পায়
নহ নহ পাখী সে তুমি নও।"

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প,বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্কোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত ; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(২১)

বর-কনের নাম

বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যদি বরের মায়ের নাম আর কনের নাম একই হয়, তবে সেই কনেকে বরের বিয়ে করা নিষেধ ; ইহা কি কুসংস্কার, না শাস্ত্রের নিষেধাজ্ঞা ?

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সাহা

একা নদী দশ-ক্রোশ

"একা নদী দশ ক্রোশ" এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি ?

শ্রী বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(২৩)

বিবাহে 'সাত পাক'

(ক) বিবাহের সময় "সাত পাক" ও "গাঁট-ছড়া বাঁধা" সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত কোন বিধি আছে কি না ?

(খ) বাঙ্গলা ছাড়া আর কোন্ কোন্ দেশে এই প্রথা প্রচলিত আছে ?

(গ) কোন্ সময় কোন্ জাতির মধ্যে ইহার প্রথম প্রচলন হয় ?

শ্রী বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(২৪)

চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম

চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে তথায় কিরূপ ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল ? শুনা যায় প্রাচীন চীনে কনফিউসিয়াস (Confucius) নামক এক ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাব-কাল কোন্ সময় এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের স্বরূপ কি ? কোন্ গ্রন্থ পড়িলে উপরোক্ত বিষয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান পাওয়া যাইতে পারে ?

শ্রী অনন্তকুমার সেনগুপ্ত

(২৫)

জোরওয়াষ্টার

পারসী প্রচারক জোরওয়াষ্টার (Zoroaster) কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী অবগত হওয়ার উপায় কি ?

শ্রী অনন্তকুমার সেনগুপ্ত

(২৬)

হিন্দুনারী ও স্বামীর নাম

হিন্দুনারীকে স্বামীর নাম বল্‌তে নাই কেন ? অথচ রামায়ণের ঋষি বাল্মীকি সীতাহরণকালে সীতা-দেবীর মুখ দিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করাইয়াছিলেন।

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সাহা

(২৭)

বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকগণ

বাঙ্গলার দ্বাদশ ভৌমিকগণের নাম কি কি ? তাঁহাদের কি কি উপাধি ছিল ? ইহাদের কর্ত্তা কি কি ছিল ?

শ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

(২৮)

বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম পঞ্জিকা

বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম কে পঞ্জিকা প্রচলন করেন ? উহা কোথায় মুদ্রিত হয় ?

শ্রী সারদাপ্রসাদ কর

(২৯)

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীগণ মাতাকে কি বলিয়া সম্বোধন করেন ?

শ্রী সারদাপ্রসাদ কর

(৩০)

নোবেল-প্রাইজ

পৃথিবীর কোন্ কোন্ লেখক কোন্ কোন্ লেখার জন্য আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন ?

শ্রী সিদ্ধেশ্বর দে

(৩১)

লুথার বার্‌বাঙ্ক

লুথার বার্‌বাঙ্ক কৃত "seed selection" বিষয়ক কোন পুস্তক আছে কি? যদি থাকে তবে তাহার মূল্য কত?

(৩২)

বীজশূন্য ফল

কি উপায়ে বীজশূন্য (stoneless) পেঁপে ও কুমড়া প্রস্তুত করা যায়?

(৩৩)

পোকার চাষ

কোন্ জাতীয় পোকা দ্বারা বেগুনগাছের পোকা ধ্বংস হয়? এবং কি উপায়ে ক্ষেতের মধ্যে সেই পোকার চাষ করা যাইতে পারে?

শ্রী রামজীবন গুছাইত

(৩৪)

আষাঢ়ে গল্প

কেহ কোন অসম্ভব ঘটনার উল্লেখ করিলে তাহা "আষাঢ়ে গল্প" বলিয়া অভিহিত করা হয়। আষাঢ়ে গল্পর তাৎপর্য্য কি?

শ্রী অনন্তচন্দ্র বাগ

(৩৫)

আলুক্ষেত-ধ্বংসকারী পোকা

শ্রীহট্ট অঞ্চলে আলুক্ষেতে একপ্রকার কাল লম্বা-লম্বা পোকা জন্মে। উহা ফসলের ক্ষেত্রসমুহ বিনষ্ট করে। যদি কেহ এই পোকা নিবারণের কোনও উপায় জানেন তবে জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

শ্রী দীনেশরঞ্জন সাহা

(৩৬)

মহাদেবের জটায় গঙ্গা

উল্লেখ আছে যে মহাদেব জটায় গঙ্গাধারণ করেন। কখন্ ও কেন জটায় ধারণ করেন?

শ্রী গোপীবল্লভ রায়

(৩৭)

কাগজ ছেঁড়া

একখণ্ড পরিষ্কার কাগজ নিন্। কাগজখানা যেন ভাঁজ করা বা নোংরা না হয়। টান ঠিক্ সমান রাখিয়া দুহাতে বিপরীত দিক হইতে খুব জোরে টানিলেও, উহা ছেঁড়া যায় না কেন?

শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(৩৮)

এক গাছে ভিন্ন স্বাদের ফল

একটি আম-গাছের দুই ডালে দুই রকম আম হয়। একটি টক্ ও অন্যটি মিষ্ট। ইহার বিশেষ কোন কারণ আছে কি?

শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(৩৯)

কলির আবির্ভাব

কোন জার্ম্মান পণ্ডিতের একখানা ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তথ্যপূর্ণ ধর্ম্মবিষয়ক বিখ্যাতগ্রন্থে দেখিলাম, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন, যে, তাঁহার মৃত্যুর ৩৬ বৎসর পরে কলির আবির্ভাব হইবে। এ বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি?

হতাশ

(৪০)

বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি

বিক্রমপুর একটি ইতিহাসোক্ত বহু পুরাতন স্থান। ইহার নামোৎপত্তির ইতিহাস কি? অনেকে বলেন বিক্রমাদিত্য রাজার নামানুসারে বিক্রমপুর নাম হইয়াছে। ইহা কতদূর সত্য?

শ্রী কামিনীমোহন দাস

(৪১)

বাদুড়

সূর্য্যাস্তের পরে বা সময়ে বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে 'বাদুড়গুলিকে' পশ্চিমে যাইতে দেখা যায় কেন?

শ্রী শঙ্করাচার্য্য মৈত্রেয়

(৪২)

জলের ভিতরের জিনিষ

জলে হাত বা অন্য কোন বস্তু ডুবাইয়া ধরিলে, তাহা স্বাভাবিক আকার হইতে কিছু বিভিন্ন দেখা যায় কেন?

শ্রী জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

—

মীমাংসা

(৫)

ধৃতরাষ্ট্রের পিতামহ ও পিতামহী

ব্যাসদেবের ঔরসে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম। বিচিত্রবীর্য্য সত্যবতীর গর্ভজাত শান্তনু রাজার পুত্র। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের পিতামহের নাম শান্তনু রাজা এবং পিতামহীর নাম সত্যবতী; পরন্তু জন্মদাতা পিতা হিসাবে ব্যাস-পিতা পরাশরমুনি ধৃতরাষ্ট্রের পিতামহ; পিতামহী সর্ব্বাবস্থাতেই সত্যবতী।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(৯)

জাপানে কাচ তৈয়ারী শিক্ষা

শ্রী শ্যামাচরণ কর নামক একটি ভদ্রলোক জাপানের অন্তর্গত তোকিয়ো এবং য়োকোহামা সহর দুইটিতে দুইটি কাচের কারখানা খুলিয়াছেন। তিনি তাঁর কারখানায় কাজ শিখাইবার জন্য মাঝে মাঝে লোক লইয়া থাকেন। তাঁর দমদমাতেও একটি কাচের কারখানা আছে। কাচ-নির্ম্মাণ-কার্য্য শিখিতে হইলে সেই ভদ্রলোকটির নিকট সমস্ত খবর পাওয়া যাইতে পারে। তাঁর ঠিকানা নিম্নে লিখিত হইল—S. C. Carr, Esq , care of

Glass Factory
Dumdum
E. B. Ry.

শ্রী হরিপদ রায়

(১২)

চক্ষুস্পন্দন

মাৎস্যে আছে চক্ষু নৃত্য করিলে ভৃত্যলাভ হয়; 'ভৃত্যলব্ধি শ্চাক্ষি-দেশে।' দক্ষিণ ও বাম অঙ্গবিশেষে উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে।

"অঙ্গদক্ষিণভাগে তু শস্তং প্রস্ফুরণং ভবেৎ।
অপ্রশস্তং যথা বামে পৃষ্ঠস্য হৃদয়স্য চ॥"

ইতি মাৎস্যে।

কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহার বিপরীত ফললাভ হয়।

"বিপর্য্যয়েন বিহিতং সর্ব্বং স্ত্রীণাং বিপর্য্যয়ম্।"

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(১১)

কপালকুণ্ডলার মন্দির

বৈশাখ মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় "দরিয়াপুরের" বঙ্কিম-স্মৃতিফলকের সন্নিহিত কপালকুণ্ডলার ও দারুয়ার কপালকুণ্ডলার কথা লিখিয়াছেন। উক্ত দরিয়াপুরে গিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম যে ঐস্থানে কপালকুণ্ডলার মন্দিরই নাই, বহুবৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত জয়চণ্ডী দেবীর মন্দির রহিয়াছে। উহাকে "কাপালিকের চণ্ডী"ও বলে। বর্ত্তমান সময়ে কেবল মাত্র দারুয়া গ্রামেই অল্পদিন-প্রতিষ্ঠিত কপালকুণ্ডলার মন্দির দৃষ্ট হয়। দরিয়াপুরে "বঙ্কিম-স্মৃতি-ফলকের" নিকট একটি মহাদেবের মন্দির আছে।

বঙ্কিম-বাবুর ভ্রম বশতঃই এইরূপ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

শ্রী সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য

(১৫)

বঙ্গীয় শাকদ্বীপি ও সরযূপারি ব্রাহ্মণ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

বেদ উপনিষদ্ পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে জানা যায় সৃষ্টির আদিতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল-ভুবন-বীজ জ্যোতির্ম্ময় একমাত্র পরব্রহ্ম বিরাজিত ছিলেন। তিনি অদিতি বা পরাশক্তি নামেও অভিহিত হইতেন। তাঁহা হইতে সাতটি খণ্ড বাহির হইয়া পৃথিবী ও চন্দ্রাদি ছওটি গ্রহ নামে কথিত হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই পরব্রহ্ম ভগবান্ আদিত্য মার্ত্তণ্ড সূর্য্যাদি নামে আখ্যাত হইয়াছেন। (আদিত্যো ব্রহ্ম ইতি শ্রুতিঃ)। এই সূর্য্যই গ্রহ-নক্ষত্রাদির কেন্দ্র-স্বরূপ এবং দিন-রাত্রি-বিধানকারী।

অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্যে জাতা স্তন্বস্পরি।
দেবা উপপ্রৈৎ সপ্তভিঃ পরামার্ত্তণ্ড মাস্যৎ॥৮॥
সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতি রূপপ্রৈৎ পূর্ব্বং যুগং।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎ পুনর্মার্ত্তণ্ডমাভরৎ॥৯॥

ঋগ্‌বেদ ১০। ৭২। ৮।৯

চন্দ্র ঋক্ষ গ্রহাঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়াঃ সূর্য্যসম্ভবাঃ।

মৎস্যপুরাণ, ১২৮ অধ্যায়।

তস্য যে রশ্ময়ো বিপ্রাঃ সর্ব্বলোকপ্রদীপকাঃ।
তেষাং শ্রেষ্ঠা পুনঃ সপ্তরশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ॥

কূর্ম্মপুরাণ।

আমাদের এই পৃথিবীও একটি গ্রহ। বহুকাল পরে পৃথিবী ক্রমশঃ তেজোহীন হইয়া জলমগ্ন হয়। (অগ্নেরপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী ইতি শ্রুতিঃ)। তৎপরে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টি করিবার জন্য জলমধ্যে বীজ নিক্ষেপ করেন। এই বীজ অণ্ডাকারে (গোলাকারে) সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া বিকৃত প্রাপ্ত হয়। এই অণ্ডের (পৃথিবীর) নাভি বা মেরু পর্ব্বতে ভগবান্ সূর্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া আদিত্য; ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ পাঠ করিতে করিতে জাত বলিয়া ব্রহ্মা নামে অভিহিত। সর্ব্বলোক-পিতামহ এই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতেই দেবলোক অসুরলোক ও মনুষ্যলোক এই তিনলোক উৎপন্ন হইয়াছে। (মৎস্যপুরাণ, ২ অধ্যায়)।

এই চতুর্ম্মুখ ভগবান্ ব্রহ্মা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে সাঙ্গবেদ, পুরাণাদি শাস্ত্র ও বেদপাঠনিযুক্ত দশটি মানসপুত্র উৎপন্ন হয়। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ—এই দশজন ঋষি ব্রহ্মার মানস পুত্র। মৎস্যপুরাণ, ৩ অধ্যায়।

ব্রহ্মার অনুমতি অনুসারে এই ঋষিগণ—দেব, পিতৃদেব, প্রজাপতি, অসুর,মনুষ্য প্রভৃতি—বিবিধ প্রজার সৃষ্টি করেন। ভগবান্ সূর্য্যও নিজের দেহার্দ্ধ হইতে উৎপন্না শতরূপা শতেন্দ্রিয়া ব্রহ্মবাদিনী গায়ত্রী-দেবীর গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুকে উৎপাদন করেন। কালক্রমে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত নামক রাজা তাঁহার সাতটি পুত্রকে নিজ রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। এই সাতটি রাজ্যখণ্ড সাতটি দ্বীপ নামে অভিহিত হইতে থাকে। প্রিয়ব্রত অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপে,মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপে, বপুকে শাল্মলিদ্বীপে, জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপে, দ্যুতিমান্‌কে ক্রৌঞ্চদ্বীপে, হব্যকে শাকদ্বীপে এবং সবন নামক পুত্রকে পুষ্করদ্বীপে রাজত্ব প্রদান করেন। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৩৩ অধ্যায়)। প্রসিদ্ধ পর্ব্বত বা প্রসিদ্ধ বৃক্ষের নামানুসারে এইসকল দ্বীপের নামকরণ হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মেরুপর্ব্বতে (মধ্য-এসিয়াস্থ পর্ব্বত-বিশেষে) ভগবান্ সূর্য্য প্রথম আবির্ভূত হন। এই পর্ব্বতের দক্ষিণে নিষধ, উত্তরে নীল, পূর্ব্বে মাল্যবান্ এবং পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্ব্বত অবস্থিত। এই মেরুর দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বতের উত্তরস্থ জম্বুবৃক্ষ-চিহ্নিত দেশ জম্বুদ্বীপ নামে অভিহিত হইত। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৩৯ অধ্যায়)।

এইরূপ মেরু-পর্ব্বত ও তাহার পশ্চিমে প্রবাহিত চক্ষুনদীর তীরস্থ শাকবৃক্ষ-চিহ্নিত দেশ শাকদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। চক্ষুনদী ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ইক্ষুমতী, চক্ষু, সরযূ, বঙ্ক্ষু নামেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম অকসাস্ বা সরযুদরিয়া। এই নদী মেরুর পশ্চিমদিক্ হইতে উৎপন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া কাস্পিয়ান্ সাগর ও আরলহ্রদে মিশিয়াছে।

শাকদ্বীপে ভগবান্ সূর্য্যের উপাসনা হইত। ইনি জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম ভগবান্ সূর্য্যদেবের অবতার। প্রিয়ব্রত রাজার পুত্র শাকদ্বীপেশ্বর হব্য, শাকদ্বীপে সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই দ্বীপে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণই ছিল। ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্য রাজা ব্রাহ্মণ পাইবার জন্য সূর্য্যদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে সূর্য্যদেব নিজ শরীর হইতে "মগ" নামক ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে সূর্য্যপূজায় নিযুক্ত করিবার উপদেশ দেন। বহু পুরাণ উপনিষদাদি হইতে জানা যায়, মেরু-পর্ব্বত ভগবান্ সূর্য্যের রাজ্য ছিল। ইহা দিব, আদিত্য, সূর্য্য নামেও অভিহিত হইত।

দ্যৌরাদিত্যো ভবতি। দ্যৌরাসিৎ পূর্ব্বচিত্তিঃ ইত্যাদি।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ, ৬২।৩।

বোধ হয় মেরু-পর্ব্বত হইতে সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণের শাকদ্বীপে আগমনই রূপকচ্ছলে সূর্য্যদেহ হইতে নিঃসৃত বর্ণিত হইয়াছে।

কোন কোন পুরাণ হইতে জানা যায় বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে দর্শনযোগ্য করিবার জন্য যন্ত্র দ্বারা সূর্য্যকে কুঁদাইয়া দেন। এই সময়ে সূর্য্য-দেহ হইতে শাকদ্বীপে ব্রাহ্মণ পতিত হয়।

শাকদ্বীপেই যন্ত্র দ্বারা গ্রহদর্শনের রীতি প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল ও বোধ হয় ইহাই কোন ঋষি রূপকচ্ছলে এরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বল্লালচরিতেও বর্ণিত হইয়াছে—

"মগাস্তু ব্রাহ্মণাঃ পূর্ব্বং নিঃসৃতা সূর্য্যমণ্ডলাৎ।
জ্বলদর্কপ্রতীকাশাঃ শাকদ্বীপমবাতরন্॥

শাকদ্বীপের অন্তর্গত বাহ্লীক দেশে কর্দ্দম নামক ঋষি বাস করিতেন ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কর্দ্দম ঋষির একটি কন্যা অত্রি ঋষির সহিত বিবাহিত হন। আত্রেয় ঋষিগণ গ্রহগণনায় পটু ছিলেন।

যং বৈ সূর্য্যং স্বর্ভানুস্তমসা বিধ্যদাসুরঃ।
অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্নহ্যন্যে অশক্নুবন্‌।
ঋক্‌ সংহিতা ৪র্থাষ্ট ২ অধ্যায় ১২ বর্গ।

গ্রহবেধ না করিতে পারিলে সূর্য্যগ্রহণ গণনার নিয়ম আবিষ্কৃত হইতে পারে না। বায়ু-পুরাণাদিতেও গ্রহ-বেধের উল্লেখ আছে।

এই দ্বীপের ব্রাহ্মণগণ দিব্য দেশে বা সূর্য্য-শরীর হইতে উৎপন্ন বলিয়া দিব্য-ব্রাহ্মণ নামে প্রত্যহ যথাবিধানে সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিয়া সেই নৈবেদ্য ভোজন করিতেন। এজন্য ভোজক ব্রাহ্মণ নামে, "ম" শব্দ-বাচ্য সূর্য্যদেবের পূজার জন্য মগ ব্রাহ্মণ নামে, শাকদ্বীপে বাস নিবন্ধন শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত ছিলেন। ইহাঁদিগের রক্ষক ক্ষত্রিয়গণও সূর্য্যের বংশধর বলিয়া সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, শাকদ্বীপে বাস নিবন্ধন শাক্য নামে, দিব্য ব্রাহ্মণগণের শিষ্য বলিয়া দিব্য মানুষ নামে খ্যাত ছিলেন। এই দেশের ব্রাহ্মণগণ মগ, ক্ষত্রিয়গণ মাগধ, বৈশ্যগণ মানস এবং শূদ্রগণ মন্দগ নামেও অভিহিত হইত।

কালক্রমে বৈবস্বত মন্বন্তরে বৈবস্বত মনুর দশটি পুত্র জন্মে। প্রথম পুত্র ইল ইলাবৃত বর্ষে, দ্বিতীয় পুত্র ইক্ষাকু মধ্যদেশে (বাহ্লীক দেশে) রাজত্ব প্রাপ্ত হন। ইক্ষাকু বংশীয় রাজগণ কেহ কেহ মেরুর উত্তরে, কেহ কেহ মেরুর পশ্চিমে, কেহ কেহ মেরুর দক্ষিণে উপনিবিষ্ট হন। ককুৎস্থ নামক রাজা তাঁহাদের পুরোহিত, জ্যোতিশাস্ত্রপারদর্শী দিক্‌-দেশ কালজ্ঞ বশিষ্ঠ ঋষির নেতৃত্বে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করিলে অযোধ্যায় "শাকেত নামে" ও অযোধ্যাপ্রান্তবাহিনী নদী শাকদ্বীপস্থ সরযু নদীর নামানুসারে সরযু নামে আখ্যাত হইতে থাকে। ভগবান্‌ রামচন্দ্রও "শাকেত লোকনাথ" নামে বিশেষিত ছিলেন। এইরূপ সূর্য্যবংশীয় বহু রাজগণ আসিয়া ভারতের নানা প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের পুরোহিত সূর্য্যোপাসক ভোজক ব্রাহ্মণগণও এদেশে আগমন করেন। দিব্যদেশ সূর্য্যের বংশধরগণের অধ্যুষিত, পরে পৃথিবী বা ভারতবর্ষ সূর্য্যবংশীয় রাজগণের দ্বারা অধিকৃত থাকায় দিব্‌ ও পৃথিবী সূর্য্যের এই দুই স্ত্রী বর্ণিত হইয়াছে। শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণও দিব্য ব্রাহ্মণ বা দিব্য ভোজক এবং ভৌম ব্রাহ্মণ বা ভৌম ভোজক নামে অভিহিত হইয়াছেন। সূর্য্যদেবের প্রীতির জন্য এই দুই-প্রকার ভোজক ব্রাহ্মণেরই দক্ষিণার সহিত ভোজনাদির ব্যবস্থা হেমাদ্রিপ্রভৃতি, কল্পতরু, ভবিষ্যপুরাণাদিতে দেখা যায়। বশিষ্ঠ পৃথিবীতে আগমন করায় পৃথিবীর গর্ভে সূর্য্যদেব হইতে বশিষ্ঠের জন্ম ভবিষ্য-পুরাণে ব্রাহ্মপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।—

সূর্য্যদেব পৃথিবীকে বলিলেন—আমি তোমার গর্ভে নিজের যোগ্য সুপুত্র বেদপারগ বশিষ্ঠ নামক পুত্র দিতেছি। যাঁহার মহৎ বংশ এই ভূতলে বাস করিবে। বশিষ্ঠের বংশধরগণ মমাঙ্গ-সম্ভূত, মহাত্মা, ব্রহ্মবাদী, আমার নাম-গায়ক, আমার পূজক, আমার ভক্ত, মৎপরায়ণ হইবে। সূর্য্যদেব এই বলিয়া পৃথিবীকে আশ্বস্ত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পৃথিবীও পুত্ররত্ন লাভে আনন্দিত হইলেন। দিব্য দেশ এবং ভৌম দেশ এই এই ভাগে পৃথিবী বিভক্ত ছিল বলিয়াই

"দিবি চেহ চ বিখ্যাতা উত্তরাঃ কুরবঃ সদা।
কেতুমাল ইতি খ্যাতো দিবি চেহ চ সর্ব্বশঃ॥

ইত্যাদি বহু প্রয়োগ নানা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে যে মৎস্য-পুরাণে অণ্ডের উৎপত্তি, দিব্‌ ও ভূমি দুইভাগে বিভক্তের কথা বর্ণিত আছে, তাহাও দুইভাগে বিভক্ত পৃথিবীর বর্ণনা।

ভারতবর্ষ পৃথিবী নামে, তাহার উত্তরস্থ দেশ দিব্‌ বা স্বর্গ নামে অভিহিত হইত। কালক্রমে দিব্যদেশ হইতে ভারতবাসীর আগমন-বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া ভারতবাসিগণ সমস্ত পৃথিবীকে পৃথিবী ও শূন্যদেশ আকাশকে স্বর্গ বলিয়া মনে করিয়াছে। "আকাশ-প্রভবো ব্রহ্ম"—(রামায়ণ) আকাশে ব্রহ্মার উৎপত্তি। হেমাদ্রি প্রভৃতিতে আকাশের যে মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় এই আকাশ মেরুপর্ব্বত, ইহা ভগবান্‌ সূর্য্যের রাজ্য।

দিব্য দেশে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির (শিব ও আগ্নেয়-দেবতা) উপাসনার প্রাধান্য ছিল। এজন্য ব্রাহ্মণগণ আদিত্য ব্রাহ্মণ, সৌম্য ব্রাহ্মণ এবং আগ্নেয় ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতেন।

"আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ সৌম্যো হি ব্রাহ্মণঃ। এতে খলু বাব আদিত্যা যৎ ব্রাহ্মণাঃ।" তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়গণও অগ্নিবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় এবং সূর্য্যবংশীয় নামে খ্যাত।

সূর্য্যবংশীয় রাজগণের ন্যায় চন্দ্রবংশীয় রাজগণও ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইল রাজা ইলাবৃতবর্ষে মেরু প্রদেশে রাজত্ব করিতেন; তাঁহার পুত্র পুরূরবা প্রতিষ্ঠান-পুরে (এলাহাবাদে), উৎকল নামক পুত্র উৎকলে, গয়-নামক পুত্র গয়ায় উপনিবিষ্ট হন। চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির অধস্তন বংশ ভোজবংশ নামে প্রসিদ্ধ; ইহাঁরাও ভারতে নানা-স্থানে রাজত্ব করিতে থাকেন। এইরূপে অগ্নিবংশীয়গণও ভারত আসিয়া নানা স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত ভিন্ন ভিন্ন উপাসক ব্রাহ্মণগণও ভারতে আসিয়াছেন। আদিত্য হইতে উৎপন্ন এই-সমস্ত বংশধরগণের দেশ ভারত নামে অভিহিত। (ভরত আদিত্যঃ ইতি সায়ণ ব্যাখ্যা)। ভারতবর্ষ নয়টি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্‌, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান্‌, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বারুণ, সাগরসংবৃতদ্বীপ। এই নবখণ্ডে প্রাচীন ভারত বিভক্ত ছিল। কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত এই বর্ত্তমান ভারতবর্ষই পূর্ব্বকালে সাগরসংবৃতদ্বীপ নামে অভিহিত হইত।

দ্বাপর যুগে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র সাম্ব, কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হইলে নারদের পরামর্শে সূর্য্যোপাসনা করিয়া রোগমুক্ত হন। পরে তিনি পঞ্জাবের অন্তর্গত চন্দ্রভাগা-নদীতীরস্থ মূলতানে সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া শাকদ্বীপ হইতে সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এবং ইহাদিগকে বহু ধনসম্পত্তি প্রদান করিয়া সূর্য্যমন্দিরের পূজায় নিযুক্ত করেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউএনসিয়াং মূল সাম্বপুর নামে (মু-লো সন-পু লো) এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এই স্থানের স্বর্ণময়ী সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। (Journal Asiatique (Paris), 1887, tome X, p. 70)

এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিতেও ইহার বিবরণ আছে।

(i) Alberuni's India, translated by E. Sachaw, Vol. I, p. 121.

(ii) Cunningham's Ancient Geography of India, p. 233.

(iii) Cunningham's Archaelogical Survey Reports, Vol. III.

(iv) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণ কাণ্ড—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু

ক্রমশঃ ভারতের অন্যান্য নৃপতিগণও সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ভোজক ব্রাহ্মণদিগকে সূর্য্যমূর্ত্তির পূজায় নিযুক্ত করেন। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ ভারতের নানা দেশে সূর্য্যপূজায় নিযুক্ত হইয়া স্থানীয় সূর্য্যের নামানুসারে নানা গাঞি বা থাকে বিভক্ত হইয়া পড়েন। রঘুনাথ-মিশ্র-বিরচিত "দিব্যানন্দ-চন্দ্রোদয়" গ্রন্থে ৭২ গাঞি এবং কৃষ্ণদাস মিশ্র রচিত "মগব্যক্তি" নামক প্রাচীন গ্রন্থে শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের ২৪ আর বা পুর, ১২ আদিত্য, ১২ মণ্ডল, ৭ অর্ক এই ৫৫ গাঞের উল্লেখ আছে।
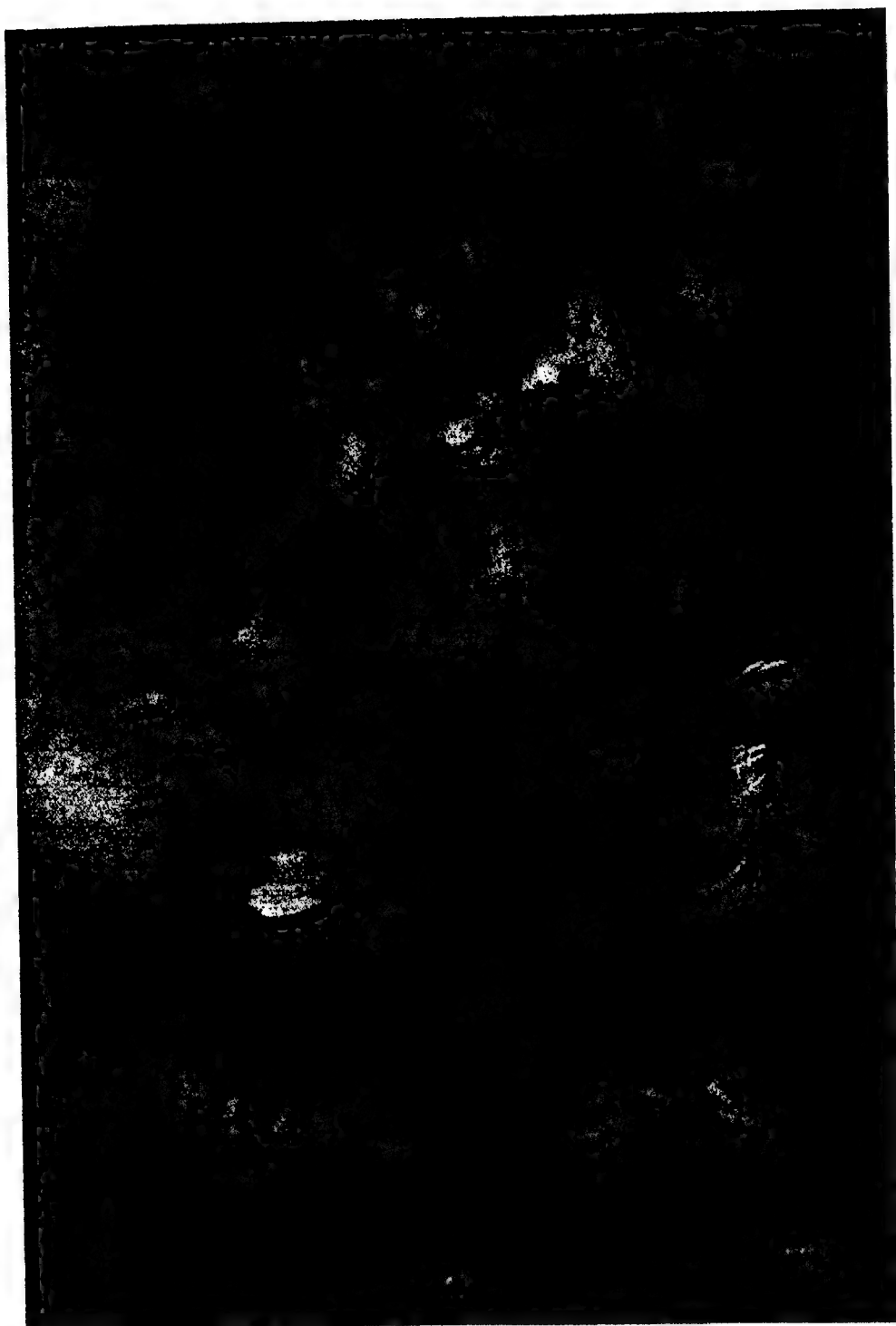
এই মগব্যক্তি-গ্রন্থে বঙ্গদেশের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সূর্য্য-মন্দিরের পূজক "প্রৌণ্ড্রার্ক" সম্প্রদায়ের শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের ও উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ কোণার্ক নামক সূর্য্যমন্দিরের পূজক কোণার্ক শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মূর্ত্তিপূজার প্রচলন ছিল না। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণই এ দেশে মূর্ত্তি-পূজার প্রচলন করেন, এজন্য সূর্য্যমন্দির ও অন্যান্য দেবমন্দিরে শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণই পূজক নিযুক্ত হইতেন। শিব, অগ্নিদেবতা, অগ্নির উপাসকদিগের সহিত চিরন্তন শত্রুতাবশতঃ শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ শিবমন্দিরে পূজক নিযুক্ত হইতেন না।

দেবালয়েষু সর্ব্বেষু বর্জয়িত্বা শিবালয়ং।
দেবানাং পূজনে রাজন্ অগ্নিকার্য্যেষু বা বিভো।
অধিকারঃ স্মৃতো রাজন্ ভোজকানাং ন সংশয়ঃ।
এতে মৎপূজনে যোগ্যাঃ প্রতিষ্ঠাসু চ সর্ব্বশঃ।
অধিপা ভোজকাঃ সর্ব্বে নান্যে বিপ্রাদয়ো নৃপ।
দেবপর্ব্বোৎসবে শ্রাদ্ধে পুণ্যেষু দিবসেষু চ।
তাম্বুং সংপূজ্য বিধিবদ্ ভোজকান্ ভোজয়েৎ ততঃ।
ভবিষ্য-পুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব্ব।

ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতেও শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের সম্মান ও বহু ভূমিদানের প্রমাণ পাওয়া যায়। গয়া জেলার গোবিন্দপুর হইতে যে বৃহৎ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, মানরাজগণের এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশের শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের সহিত বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়ের রাজসভার মন্ত্রিবংশের বিবাহসম্বন্ধ ছিল। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চেষ্টায় আবিষ্কৃত গরুড়-স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় জমদগ্নি-গোত্র রামগুরব মিশ্র ও তাঁহার বংশধরগণ পাল-রাজগণের মন্ত্রী ছিলেন। বিগ্রহপাল প্রভৃতির মুদ্রা দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে পালরাজগণ শাকদ্বীপি ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের এই মন্ত্রিবংশ জ্যোতিষে অভিজ্ঞ, শান্তিকার্য্যে পটু ছিলেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ হইলেও বিজয়-কামনায় অবনত-মস্তকে ইঁহাদের শান্তিজল গ্রহণ করিতেন। পালরাজগণের রাজত্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে শাকদ্বীপি বা আচার্য্য ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ইঁহারাই দেশের ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণের পৌরোহিত্য ও গুরুতা করিতেন। সেনরাজ-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পালরাজগণ তাঁহাদের রাজকার্য্যে নিযুক্ত কায়স্থাদি জাতিতে আত্মগোপন করিয়াছেন। তাঁহাদের সময়ের শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণগণও কেহ কেহ সপ্তশতী নামক কৃত্রিম নামে রাঢ়ী বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা নিজ বৈশিষ্ট্য হারাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন তাঁহারা জ্যোতিষ-শাস্ত্রাবলম্বনে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ গ্রহবিষয়ক শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, গ্রহযজন, গ্রহযাজন, গ্রহদান ও গ্রহোদ্দেশে দত্ত দ্রব্যের প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণোচিত এই ষড়্‌বিধকার্য্যহেতু সাধারণতঃ গ্রহবিপ্র বা আচার্য্য ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। সূর্য্যোপাসক শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বশিষ্ঠ, গর্গ, ভৃগু প্রভৃতির জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। গর্গ যদুবংশের কুল-পুরোহিত ছিলেন; তিনি দৈবজ্ঞ নামে খ্যাত ছিলেন।

"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ দৈবজ্ঞান্ জাতকর্ম্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥
কারয়ামাস বিধিবৎ। ইত্যাদি—ভাগবতে কৃষ্ণজন্মে।

এদেশেও শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ দৈবজ্ঞব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত। শাস্ত্রে জ্যোতির্বিদ্‌গণের পূজ্যতা ও প্রশংসা বর্ণিত আছে। বঙ্গদেশে বহু রাজগণ ইঁহাদিগকে বহু দেবত্র ও ব্রহ্মত্র ভূমি দান করিয়াছেন। বঙ্গদেশে তিন প্রকার গ্রহবিপ্র বা শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ দেখা যায়।

(১) অতি প্রাচীনকালে পৌণ্ড্রদেশে সমাগত ও পৌণ্ড্রার্ক শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।

(২) গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক বা নরেন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রহশান্তির নিমিত্ত সরযূনদীর তীর হইতে আনীত যাঁহারা সরযূপারি-গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত।

(৩) মধ্যদেশ হইতে রাঢ় দেশে সমাগত। বঙ্গদেশের গ্রহবিপ্রগণের মধ্যে কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, সাবর্ণ, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, ঘৃতকৌশিক, স্বর্ণ-কৌশিক, চন্দ্রকৌশিক, পরাশর, গৌতম, আত্রেয়, বশিষ্ঠ, গর্গ, জামদগ্ন্য, আঙ্গিরস, পৌলস্ত্য, মিহির, আলম্যান, মৌদ্গায়ন, মৌদ্গল্য, অগ্নিবেশ্য, বৈয়াঘ্রপদ্য, কাণ্বায়ন, উপমন্যু, প্রভৃতি গোত্র দেখা যায়।

আচার্য্য, পাঠক, উপাধ্যায়, গটক, জোশী, বৃহজ্জোশী, মিশ্র, দীক্ষিত, কাশ্যপাটী, ওঝা, ব্রহ্মচারী, অধিকারী, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ইঁহাদের প্রাচীন উপাধি।

মুসলমান-রাজত্ব-কালে নবাবগণের প্রদত্ত মুন্সী, রায়, মজুমদার, প্রভৃতি উপাধিও কোন কোন বংশে দেখা যায়।

গ্রহবিপ্রদীপিকা, গ্রহবিপ্রসংহিতা, আচার্য্য-ব্রাহ্মণ, শাকদ্বীপি-ভাস্কর, দিবানন্দ-চন্দ্রোদয়, দুর্জ্জনাস্য-চপেটিকা, মগব্যক্তি প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় লিখিত ব্রাহ্মণ-ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড প্রভৃতি পুস্তকে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বিবরণ জানা যায়।

মৎপ্রণীত "গ্রহবিপ্র-ইতিহাস" নামক পুস্তকে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ, শিলালিপি, ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রভৃতির সাহায্যে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ইতিবৃত্ত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রী রাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ
জ্যোতিষাধ্যাপক সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা

(৯৭)

ডাহ্লন মিশ্র

"ডাহ্লনমিশ্র" (ইংরেজীতে "ডহ্লন") নিবন্ধসংগ্রহ নামে সুশ্রুতের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। মথুরার নিকটবর্ত্তীস্থানে স্থানপালের রাজত্বে তিনি বাস করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বে গয়াদাস, ভাস্কর, মাধব এবং জেজ্জাটা সুশ্রুতের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।"

পৃথিবীর ইতিহাস, পৃঃ ২২৭, দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত।

(১০৮)

জলের তলের দ্রব্য

"একটি কাচের গ্লাসে অল্প-পরিমাণ জল ঢালিয়া তাহাতে একটি তেঁতুলের বীজ অথবা একটি কুইনাইনের পিল ফেলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা জল স্পর্শকরতঃ গ্লাসের উপর দিকে তাকাইলে নিক্ষিপ্ত বীজ কিম্বা পিলটি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বড় দেখায় না। কাচের গ্লাসের তলটি দর্পণের (polished reflecting surfaceএর) ন্যায় মসৃণ। এই গ্লাসে একটি তেঁতুল-বীজ বা কুইনাইন-পিল রাখিয়া অল্প-পরিমাণ জল ঢালিলে গ্লাসের তলটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ দেখায়, সঙ্গে সঙ্গে তেঁতুল-বীজ বা কুইনাইন-পিলটিও তাহার প্রকৃত অবস্থান হইতে কিছু উচ্চে দেখা যায়। তেঁতুলের বীজটি বা কুইনাইনের পিলটি জলের নীচে থাকায়, ইহা হইতে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মিসকল

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের চক্ষে পৌঁছে। ফলে তেঁতুলের বীজটি বা কুইনাইনের পিলটি ইহার প্রকৃত আকৃতি হইতেও চ্যাপ্‌টা দেখায়। গ্লাসের জলের মধ্যে অঙ্গুলি ডুবাইয়া পিলটির দিকে চাহিলে বীজটি বা পিলটি তুলনায় পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় দেখায়। অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দেওয়ায় এরূপ তুলনার সুবিধা হয়। বীজটি বা পিলটি কম পুরু বা কম স্থূল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহার surface area সমানই থাকে। কাজেই পূর্ব্ব অবস্থার সহিত তুলনায় এক্ষণে এই পিলটি বা বীজটি বড় বলিয়া মনে হয়। একই কারণে নৌকার তল চ্যাপ্‌টা এবং ছড়ি বা বায়ুপূর্ণ কোন কাচের নলও পূর্ব্বাপেক্ষা খাট ও মোটা দেখায়।

মনে করুন দুইজন ভুঁড়িওয়ালা লোক আছেন,—একজন বামন, অপরজন লম্বা; ভুঁড়ির মাপ দুজনেরই সমান ধরিয়া লওয়া গেল। এ দু'জনের মধ্যে কাহার ভুঁড়িটি বড় লাগিবে? বামন লোকটির ভুঁড়ি অপর জন অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হইবে। প্রকৃত পক্ষে ভুঁড়ির মাপ দুজনেরই সমান। কিন্তু তুলনায় একজনকে বড়, অপর জনকে ছোট-ভুঁড়িওয়ালা বলিয়া মনে হয়। পিলটি ও বীজটির আয়তন সম্বন্ধেও এইরূপ তুলনার কথা। বীজটি বা পিলটির আয়তন বরাবরই সমান আছে। কিন্তু যখন গ্লাসে জল ঢালিয়া দেওয়া হইল তখন বীজটি ও পিলটিকে পূর্ব্বাপেক্ষা কম পুরু বলিয়া মনে হয়। বীজটির বা পিলটির surface area সমানই আছে, শুধু দেখিতে কম পুরু হইয়াছে। সেইজন্য দ্বিতীয় অবস্থায় বীজটি বা পিলটি যেন একটু বড় বড় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাদের আয়তন সমানই আছে। শুধু ইহাকে গ্লাসের তল হইতে কিছু উচ্চে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। কত উচ্চে তাহা আলোকতত্ত্ব পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। আলোকরশ্মির পরাবৃত্তিই (refraction) ইহার মূল কারণ। আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণের (reflectionএর) প্রভাবও ইহাতে আছে।

শ্রী শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১৩২)

ভূতের ব্যাগার খাটা

মানুষ কাজ করিয়া তাহার প্রতিদান চাহিয়া থাকে। কেহ অর্থ, কেহ ভালবাসা, কেহ বা পুণ্য কামনা করিয়া থাকে। নিঃস্বার্থ কর্ম্ম সংসারে অতি বিরল। স্বেচ্ছাসেবকগণও প্রতিদানে যশ, আশীর্ব্বাদ অথবা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। বিনা লাভে অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া অথবা বাধ্য হইয়া কাজ করাকে ব্যাগার-খাটা বলা যাইতে পারে। ভূত পাঁচটি। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে অণু পরমাণু কিম্বা ক্রুক্‌স্ সাহেবের আবিষ্কৃত "ইলেক্‌ট্রন" আমাদের প্রাচীন ঋষিদিগের পঞ্চভূতকে বেদখল করিলেও এস্থলে ভূত শব্দে ক্ষিতি অপ তেজ বায়ু ও ব্যোমকেই বুঝিব।

মানুষ ভূমির উপর যত অত্যাচার করে এবং দৈনন্দিন ইহার রত্নরাজি যে ভাবে আত্মসাৎ করিতেছে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। এইজন্যই বোধ হয় পৃথিবীর এক নাম সর্ব্বংসহা। মানুষ জলকেও কম খাটাইতেছে না। এ হিসাবে তাপ, আকাশ ও বাতাসের খাটুনিও কম নহে। ইহারা স্বরূপে অথবা রূপান্তর গ্রহণ করিয়া অহরহ মানবের কল্যাণ সাধন করিতেছে; কিন্তু প্রতিদান কিছুই ফিরিয়া পায় না। তাই বোধ হয় সংসার-যাত্রায় কর্ম্মক্লিষ্ট মানব কর্ম্মের অণুমাত্রও প্রতিদান না পাইয়া মনের ক্ষোভে বলিয়া থাকে "ভূতের ব্যাগার খাটিতে আসিয়াছিলাম, ভূতের ব্যাগার খাটিয়া গেলাম।"

পল্লীগ্রামে অনেক ভূত-প্রেত-সিদ্ধ লোকের গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তাহারা নাকি মন্ত্রবলে ভূত ধরিয়া আনিয়া নৌকা-চালন, পাল্কী-বহন, বৃক্ষ-ছেদন, জলাশয়-খনন প্রভৃতি অনেক বড় বড় কাজ বিনা পয়সায় করাইয়া লইত। "ভূতের ব্যাগার খাটার" সঙ্গে এই গল্পের কোন সম্পর্ক আছে কি না বলিতে পারা যায় না। এই পাড়াগাঁয়ে ভূতসিদ্ধগণের গল্পে ফ্রাঙ্কলিন, কেল্‌ভিন, জেম্‌স্ ওয়াট্ প্রভৃতি ভূতসিদ্ধগণের ক্ষুদ্র সংস্করণের ইঙ্গিত নিহিত আছে কি না কে বলিবে।

শ্রী জগচ্চন্দ্র পোদ্দার

(১৩৭)

ছায়া-রহস্য

সূর্য্যরশ্মি বাধা প্রাপ্ত হইয়া ছায়ার সৃষ্টি করে। এই ছায়াকে ছায়া না ভাবিয়া একটি জিনিষ (object) ভাবিয়া লইলাম। এখন ইহার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে "ছবি-বহা নাড়ী" (optical nerve) একই দিকে অনেকক্ষণ কাজ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে; ফলে জিনিসটির ছবি ক্রমশঃই অস্পষ্ট ও আবছায়া হইয়া উঠে। সেজন্য মস্তিষ্কের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে (visual area) জিনিষটির ছবিটির (image) একটি সুস্পষ্ট ও সুপ্রকটিত (distinct and well-defined) প্রতীতি (impression) জন্মাইতে পারে না, এবং আমরাও একটি অস্পষ্ট ছবি দেখি। এই অবস্থায় যদি শূন্যে দৃষ্টিপাত করা যায় তাহা হইলে আমরা পূর্ব্ব দৃষ্ট জিনিষটিরই ছবি তখনও দেখিতে পাই। কারণ পূর্ব্বদৃষ্ট জিনিসটির প্রতীতি তখনও আমাদের মানসপটে অবস্থিতি করে। ওই জিনিসের অস্পষ্ট ছবিটিকে তখন আমরা একটা "সাদা রকমের" অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপ অস্পষ্ট রকমের, দেখিতে পাই এবং ক্রমে কিছুক্ষণ শূন্যে চাহিয়া থাকিলে সেই অস্পষ্ট ছবিটি ক্রমে আরও অস্পষ্ট হইয়া মানসপট হইতে বিলীন হইয়া যায় এবং তার পর আমরা আকাশেরই ছবি দেখিতে পাই। "ছবি-বহা নাড়ীর" অত্যন্ত আয়াসই এ দৃশ্যের (phenomenonএর) কারণ।

শ্রী শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১৫৫)

মাঘ মাসে মুলা খাওয়া নিষেধ

বৃদ্ধ মুলা গুরুপাক ও ত্রিদোষজনক। মাঘ মাসে মুলা বৃদ্ধ হইয়া যায়, সেইজন্য স্বাস্থ্যতত্ত্বানুসারে ঐ সময় মুলা অভক্ষ্য। শাস্ত্রানুসারেও মাঘমাসে মুলা অভক্ষ্য।

"মকরে মূলকঞ্চৈব সিংহে চালাবুকস্তথা।
কার্ত্তিকে পুরণঞ্চৈব সদ্যো গোমাংসভক্ষণম্॥"

ইতি কর্ম্মলোচনম্।

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(১৫৭)

সাত সমুদ্র তের নদী

"লবণেক্ষু সুরা সর্পি র্দধি দুগ্ধ জলন্তকাঃ"। হিন্দু মতে লবণ ইক্ষু সুরা ঘৃত দধি দুগ্ধ ও জলন্তক বা জলার্ণব এই সপ্ত সমুদ্রের নাম পাওয়া যায়। অধুনা পাশ্চাত্য ভূগোলবিদ্‌গণ ভূমণ্ডলের জলরাশিকে ছয়টি কাল্পনিক মহাংশে বিভক্ত করিয়া ভৌগোলিক মহাসাগর সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। পৃথিবীর জলরাশিকে সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়া আরব সাগরকে সপ্ত মহাসাগরের মধ্যে গণনা করিলে পাশ্চাত্য মত ও প্রাচ্য ভারতীয় এবং আরবীয় মতের সামঞ্জস্য হয়। এই বিভাগ-নিয়ম নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন আরবীয়গণ পৃথিবীকে "সাত দরিয়ায়" বেষ্টিত মনে করিতেন। স্বীয় জন্মভূমির উপকূল

খৌতকারী বিস্তীর্ণ সলিলরাশিকে "সাত দরিয়ার" অন্যতম "দরিয়া" মনে করা তাঁহাদের পক্ষে বিচিত্র নহে। "সাত সমুদ্র তের নদীর পার" কথাটি দূরত্ব ও বৈদেশিকতাব্যঞ্জক। সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে কোম্পানীর আগমন-সময়ে ইহা প্রথমতঃ ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি বৈদেশিক বণিক্‌গণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল। যাঁহারা কথাটা প্রথমে প্রয়োগ করেন তাঁহারা বোধ হয় পুরাণাদিতে বর্ণিত অতিবিশ্রুত নদীগুলির কথাই মনে করিয়াছিলেন। ভারতে অতিপুণ্যতোয়া নদী সাতটি। দেবপূজাদির প্রারম্ভে জলশুদ্ধি করিতে এই সপ্ত নদীকে আহ্বান করা হয়, যথা—"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু"। অন্য একটি অতিপুণ্যতোয়া নদী দৃষদ্বতী। মনুসংহিতায় ইহাকে দেবনদী বলা হইয়াছে। করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্র নদের বারি যোগ-সময়ে অতিপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। স্নান মন্ত্রে করতোয়াকে সরিৎশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, যথা—"করতোয়ে সদানীরে সরিৎশ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে। পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে॥" রামায়ণে সরযূ ও কণ্ডর নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। বাকী নদীটি বোধ হয় গঙ্গার শাখা পদ্মা। পদ্মা যেরূপ বেগবতী ও বিশালা তাহাতে তাহাকে তের নদীর মধ্যে অনায়াসে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

শ্রী জগচ্চন্দ্র পোদ্দার

(১৬০)

অম্বুবাচী

অম্বুবাচীর মধ্যে অগ্নিপক্ক দ্রব্য ভক্ষণের বিরুদ্ধে এইরূপ শাস্ত্রোক্ত বচন উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

"রজোযুক্তাম্বুবাচী চ রৌদ্রাদ্য পাদগে রবৌ।
তস্মাৎ পাঠো বীজবাপো নাহি ভীরু ধ্বপানতঃ॥
যতিনো ব্রতিনশ্চৈব বিধবা চ দ্বিজস্তথা।
অম্বুবাচী-দিনে চৈব পাকং কৃত্বা ন ভক্ষয়েৎ॥
স্বপাকং পরপাকং বা অম্বুবাচী দিনে তথা॥
ভোজনং নৈব কর্ত্তব্যং চাণ্ডালান্নসমং স্মৃতং॥

এই প্রমাণ অনুসারে পাকদ্রব্য ভক্ষণ শুধু বিধবা কেন যতী, ব্রতী ও দ্বিজদিগের পক্ষেও নিষিদ্ধ; অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ তাঁহাদের পক্ষে অগ্নিপক্ক জিনিষ বৈধ নহে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কোন কারণ ইহাতে বর্ত্তমান আছে বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা অম্বুবাচীর মধ্যে ভোজন করেন তাহাদের কাহারও স্বাস্থ্যের হানি ঘটিয়াছে এরূপ দেখা যায় না; দুই একজনের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইলেও পাকদ্রব্য ভোজনকেই তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে যাঁহারা ভোজনে বিরত থাকেন তাঁহারের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতিও পরিলক্ষিত হয় না। তবে ইহা শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিবিশেষের উত্তেজনা ঘটাইয়া ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায় হইতে পারে, সেই-জন্যই বোধ হয় ইহা যতী, ব্রতী, দ্বিজ ও বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ।

প্রাকৃতিক বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এ অনুমান অনেকটা সত্য বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্যের গতি-ভেদে ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, এবং এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এবং প্রাণী-সকলের শারীরিক ও মানসিক অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

দ্বাদশ মাসে সূর্য্য ১০৮ পাদে বিভক্ত ২৭টি নক্ষত্রে অবস্থান করে। আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে সূর্য্য ৩ দিন ২০ দণ্ড অবস্থান করে। এই স্থিতিকালই অম্বুবাচী বলিয়া খ্যাত। অম্বুবাচী শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ বর্ষারম্ভ-কাল। "অম্বু বাচয়তি তদ্বর্ষণং সূচয়তি ইতি অম্বুবাচী"—যে সময় বর্ষণের সূচনা করে তাহাই অম্বুবাচী। শাস্ত্রমতে পৃথিবী এই সময় ঋতুমতী হয়। প্রাণীজগতের কথা ছাড়িয়া দিয়া তরুলতাদির জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় সকলেরই ফল পুষ্প ধারণের একটা বিশেষ সময় আছে। আমাদের বসুন্ধরা যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত এমন বোধ হয় না। ভচক্র-পথে সূর্য্যের অবস্থান-ভেদেই এই সময় সূচিত হয়। সূর্য্যের আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে স্থিতিকালে ধরিত্রী বর্ষাসারে অতি সিক্ত হইয়া উর্ব্বরারূপে জননশক্তিশালিনী হইবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। এই বর্ষণবহুল সময়ে বোধ হয় মানবের বৃত্তিবিশেষ সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুরিত হইয়া উঠে। এ সময় সংযমের প্রতিকূল আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করা সংযমীর পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। পাকদ্রব্য এই বৃত্তি স্ফুরণের অনুকূল, অথবা অনশন কিম্বা অর্দ্ধাশন মানবের বৃত্তিনিচয় সংযত রাখে বলিয়া ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিধবার পক্ষে অম্বুবাচীতে ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রী জগচ্চন্দ্র পোদ্দার

বৈশাখের গান

চলে ধীরে! ধীরে! ধীরে!
অনিবারা মৃদুধারা ঘিরে ঘিরে ধরণীরে!
ধীরে! ধীরে! ধীরে!
খর রৌদ্রে বায়ু মূর্চ্ছে জলে জালা.
চির স্বপ্নে রহে চম্পা চির-বালা,
তবু আলা চলে যাত্রী, ওড়ে ধূলি ঘুরে ফিরে!
ধীরে! ধীরে! ধীরে!

গলে সূর্য্য, ঝরে বহ্নি, মরে পাখী,
মেলে জিহ্বা মরু-তৃষ্ণা মোছে আঁখি,
ছায়া কাঁপে খর তাপে, বুকে চাপে মরীচি রে!
ধীরে! ধীরে! ধীরে!
দিশাহারা চলে ধারা পথ বাহি,'
দিন রাত্রি নাহি তন্দ্রা, ত্বরা নাহি,
নাহি ক্লান্তি, শ্যাম কান্তি ঢালে শান্তি তীরে তীরে!
ধীরে! ধীরে! ধীরে!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রমলা

(৩৭)

রমন্তের ডায়েরী হইতে—

জীবনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে; রূপের স্রোত, বর্ণের ধারা,- হে অরূপ, তোমা হইতেই এই অপরূপ রঙের ঝর্ণা অহর্নিশি ঝরিয়া পড়িতেছে; এই সুধার ফোয়ারা জগৎচিত্রের নদী।

কিশলয়ের মত শিশু জন্মে, ফুলের মত ফোটে, গানের সুরের মত আসে, পাতার মত ঝরিয়া পড়ে। তারা জ্বলিয়া উঠে, তারা নিবিয়া যায়; মানুষ জন্মগ্রহণ করে, মানুষ চলিয়া যায়; এই রূপের জগতে বস্তুপুঞ্জ কোন্ প্রাণের আবেগে ভাঙিতেছে, গড়িতেছে, গলিতেছে, ঝরিতেছে, শূন্যে মিলাইয়া আবার নব নব রূপে আবর্ত্তিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হে অরূপ, তোমার তুলির টানে নব নব রূপরেখা আঁকিয়া মুছিয়া আবার নূতন রঙে আঁকিয়া তুমি চলিয়াছ, এক একটি পৃথিবী তোমার হাতের সৌন্দর্য্যশতদলের একটি পাপ্‌ড়ির মত ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ে। অনন্ত নীলাকাশের কোটি কোটি তারার ঝলমল চন্দ্রাতপতলে সূর্য্যচন্দ্রের গমনাগমনের ছন্দে সমুদ্রগুনিত সুন্দরী ধরণীর পটে কত বর্ণের কত ছবি—বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা, আষাঢ়-মেঘের ঘন সমারোহ, শরতের সোনার প্রভাত, শীতের রৌদ্রোত্তপ্ত মধ্যাহ্ন, মাধবী জ্যোৎস্নারাত্রি —ঋতুর পর ঋতু ফুলে ফুলে পা ফেলিয়া জলে স্থলে কত রঙের উত্তরীয় উড়াইয়া তোমার যাত্রা!—হে অপরূপ, তোমাকে নমস্কার!

আমার চোখের সম্মুখে কত সুখ, কত ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে—খুকীর হাসি, ছেলেদের খেলা, প্রিয়ার চাউনি, গায়িকার সুরালোকদীপ্ত আননপদ্ম, বন্ধুর প্রেমের হাসি; শালবনে প্রেমিকপ্রেমিকা, নগরের জনস্রোত, কারখানার কুলীমজুর, ষ্টেশনের যাত্রী, জ্যোৎস্না রাতে তরুণ তরুণী, মানবজীবনের সুখদুঃখের কত চিত্র তুমি আঁকিতেছ! শিল্পী তোমাকে নমস্কার!

পৃথিবীর এই নানা রূপের পুরীতে শুধু আমাকে আমন্ত্রিত কর নাই, এই রূপকথালোকের সোনার কাঠি আমার হাতে তুলিয়া দিয়াছ! সৌন্দর্য্য-মাণিক্যের স্পর্শে জগৎ লাবণ্যে ভরিয়া গিয়াছে। তোমার হাতের একটি তুলি আমার হাতেও দিয়াছ, এই রঙের ঝর্ণাতলায় বসিয়া আমার এ ছোট হৃদয়ের পাত্র ভরিয়া সবাইকে বার বার তোমার আনন্দসুধা পান করাই! অফুরন্ত তোমার রূপের ফোয়ারা, অফুরন্ত আমার হৃদয়-পেয়ালা, আমি ধন্য হইলাম।

বিশ্বলীলাকমল হাতে করিয়া কোন্ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া তুমি হাসিতেছ। এ জ্যোৎস্না-রাতে তোমার প্রসন্নমুখের হাসি দেখিয়া নয়ন মুগ্ধ সার্থক হইল। তোমার এই কোটি কোটি রূপের প্রদীপজ্বালা বিশ্বমন্দিরে আমারও তুলি দিয়া প্রাণের শিখায় পৃথিবীর অঙ্গনতলে একটি রঙের আরতিপ্রদীপ জ্বালাইয়া ধন্য হইলাম। বিশ্বশিল্পী, তোমাকে নমস্কার!

(৩৮)

সাত বছর কাটিয়া গিয়াছে।

হাজারিবাগের সেই বাড়ীখানি আর ভাঙা-পোড়ো হইয়া নাই, আবার সেখানি রঙীন সুন্দর সুসজ্জিত হইয়াছে, তাহার চারিদিকে নূতন ফুলের গাছে ভরা বাগান নানারঙে ঝলমল করিতেছে।

পুরাতন হাস্নাহানা ঝাড়টির স্থানে আর-একটি নূতন প্রকাণ্ড হাস্নাহানার ঝাড় জন্মিয়াছে। তাহার চারিদিকে বিকাল বেলায় একটি মেয়ে ও দুইটি ছেলে লুকোচুরি খেলিতেছে, ঝাড়ের ধারে বারান্দায় এক চেয়ারে কাজীসাহেব খেলার বুড়ী হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি এখন অতিবৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, এখন আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটিয়া খেলিতে পারেন না, বুড়ী হইয়াই থাকিতে হয়। তাঁহার কোলে কতকগুলি ছবি, খেলনা, পুতুল; সেগুলি তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখিয়া ছেলেরা খেলিতেছে। দীর্ঘ শুভ্র দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি উদাস দৃষ্টিতে পশ্চিমের ধূসর গিরিমালার

উপর পুঞ্জীভূত মেঘস্তূপে অস্তমিত সূর্য্যের বর্ণমাধুরীলীলা দেখিতেছিলেন। তাঁহার জীবনসূর্য্যও শীঘ্রই অস্তমিত হইবে। সূর্য্যের আলো যেমন সম্মুখের ফুলগুলির উপর ঝিকিমিকি করিতেছিল, তেমনি দীপ্তনেত্রে তিনি রহস্যময় শিশুগুলির খেলা দেখিতেছিলেন।

হাস্নাহানা-ঝাড়ের মাথায় দোতলার জানলা হইতে রমলা তার ছেলেমেয়েদের খেলা দেখিতেছিল আর মাঝে মাঝে একবার বাগানের মধ্যে রজতের দিকে তাকাইতেছিল। ছোটখোকাকে তার দিদির লুকানোর জায়গাটা একটু বলিয়া দেওয়াতে সবাইয়ের কাছে বকুনী খাইয়া রমলা উচ্চ হাসিয়া উঠিল। বাগানের মধ্যে এক ইজি-চেয়ারে বসিয়া রজত কি আঁকিতেছিল, রমলার হাসির শব্দে একটু মুখ ঘুরাইয়া মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিল। এখন রজত এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, দেশে ও বিদেশে তাহার যথেষ্ট নাম ও সম্মান। ছেলেদের হাসি ও খেলা চলিতে লাগিল। রমলা শালবনের মাথায় পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাইয়া যেন নবস্বপ্নের জাল বুনিতে লাগিল।

সহসা ছেলেমেয়েদের কলহাস্য থামিয়া গেল, তাহাদের সম্মুখে ধূসর ছায়ার মত এক নিঃশব্দচারী মূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইতে তাহারা একটু ভীত বিস্মিত স্তব্ধ হইয়া কুঞ্জের কোণে কোণে দাঁড়াইল। সন্ধ্যার আলোর মত ম্লান সে মূর্ত্তিটি খুকীর দিকে অগ্রসর হইল। খুকী তার মায়ের মত চাহিয়া কোঁকড়া চুল দুলাইয়া একটু সরিয়া গেল। চিনিয়াও তাহাকে যেন চিনিতে পারিতেছে না। সে যতীন। সে আসিয়া পড়াতে খেলা থামিয়া গেল দেখিয়া একটু লজ্জিত বিষণ্ণ হইয়া মৃদুস্বরে যতীন বলিল - "তোমার মা কোথায় খুকী ?"

"মা, ওই যে ওপরে", বলিয়া পেঁয়াজীরঙের ফ্রকটা ঘুরাইয়া খুকী কাজী-সাহেবের দিকে চলিল।

উপরের দিকে চাহিয়া যতীন দেখিল রমলা রঙীন স্বপ্নের মত দাঁড়াইয়া আছে। সে কিছু বলিতে পারিল না।

ছোট খোকা ডাকিয়া উঠিল—মা।

নীচের দিকে চাহিতেই রমলা যতীনকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, অশ্রুস্নিগ্ধচোখে চাহিয়া ভাঙা গলায় বলিল—কে ? আপনি ! যাচ্ছি।

যাচ্ছি বলিল বটে, কিন্তু কি করিয়া যাইবে, সিঁড়িতে আসিয়া সে ভাবিয়া পাইল না। অর্দ্ধেক সিঁড়ি নামিয়া ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া এই প্রিয়ামৃত্যুব্যথিত বন্ধুটিকে সে সান্ত্বনা দিবে। তিন মাস হইল, মাধবী সুন্দরবনে তাহাদের দ্বীপে মারা গিয়াছে।

যতীন তাহার কলকারখানা ও ব্যবসায়-জীবন একেবারে ছাড়ে নাই বটে, কিন্তু এ সাত বছর ধরিয়া সে এক নূতন সৃষ্টির স্বপ্নে মত্ত হইয়াছে। সুন্দরবনে অনেক জমি কিনিয়া সেখানে নূতন আদর্শে নূতন নূতন গ্রাম বসাইয়াছে, গঙ্গার মোহানার কাছে একটি ছোট দ্বীপ লইয়া সেখানে পল্লী-নগরের প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করিয়াছে। তাহাতে দেশের ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত গ্রামের বহু লোককে বিনামূল্যে জমি দিয়া বসবাস করাইয়াছে। এ দ্বীপটির নামকরণ মাধবীর নামে হইয়াছে। এই নব উদ্যোগে মাধবী তার বন্ধু, সহায়, শক্তি ছিল। আজ তার সুন্দরবনের জায়গা যখন সুন্দর গ্রাম হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার কর্ম্মসঙ্গিনী প্রিয়া চলিয়া গেল।

ছেলেদের খেলায় আর বাধা না দিবার জন্য যতীন কুঞ্জটি পার হইয়া গেল, সমস্ত বাড়ীখানি ঘুরিল, তার পর যে গাছের তলায় মাধবী পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত, তাহারি তলায় পশ্চিমের সূর্য্যাস্তের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাহাড়ে প্রান্তরে সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রমলা রজতকে সঙ্গে করিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ধীরে বলিল,—ভিতরে আসুন, কেমন আছেন ?

ম্লান হাসিয়া যতীন বলিল,—আছি ভালই। হ্যালো রজত !

রজত ধীরে যতীনের হাতখানি ধরিয়া বলিল,— বাড়ীতে এস ভাই।

তিনজনে প্রায় নীরবেই ড্রয়িংরুমে আসিয়া পৌঁছাইল। রমলা ধীরে বলিল,—আপনার দ্বীপের সব ভাল ত ?

—হাঁ, ভালই।

—এবার পূজার সময় আমরা নিশ্চয় যাবো।

—বেশ, নিশ্চয় যাবেন।

বাহির হইতে কাজীসাহেবের একতারার ঝঙ্কার ও ছেলেমেয়েদের কলহাস্যধ্বনি আসিতেছে।

কোণের বড় নূতন পিয়ানোর দিকে চাহিয়া যতীন বলিল,—বেশ পিয়ানো ত! ও! অনেকদিন আপনার পিয়ানো শুনিনি!

এ পিয়ানোটি ললিত জার্মানী হইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। সে এক ফরাসীদুহিতাকে বিবাহ করিয়া জার্মানীতে বসবাস করিতেছে।

রমলা বলিল,—বাজাব? শুন্‌বেন?

যতীন কিছু বলিল না।

রমলা পিয়ানো খুলিয়া বিটোবেনের ninth symphony বাজাইতে আরম্ভ করিল।

রজত বিমুগ্ধ নেত্রে পিয়ানোবাদিনীর দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে পড়িল এই প্রিয়াকে—যাহাকে সে এইরূপ এক অপরূপ সন্ধ্যায় প্রথম পিয়ানো বাজাইতে দেখিয়াছিল। সেই মদের মত তীব্র আবেগময় রূপ নাই বটে, কিন্তু এ শান্ত স্নিগ্ধ রূপটি তার চেয়েও মধুর সুন্দর পবিত্র।

যতীন আবার রমলার সুরদীপ্ত মুখের দিকে চাহিল, তার পর বাহিরের সন্ধ্যার অন্ধকারের দিকে চাহিল। মাধবী-দ্বীপের ছবিখানি তাহার চোখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার চাষা-মজুরদের পরিবারের শান্তিময় গৃহগুলিতে সন্ধ্যার দীপ জলিয়া উঠিয়াছে, কোথাও বাঁশি বাজিতেছে, কোথাও সাঁওতালেরা নৃত্য সুরু করিয়াছে; কোথাও ছেলেমেয়েদের লইয়া মা গল্প বলিতেছে। তাহার চাষা মজুর ছেলেমেয়েদের জন্য তাহার প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিল। ইহাদের মাধবী কত ভাল বাসিয়াছে, কত যত্ন করিয়াছে!

বাহিরে পূর্ণিমার চাঁদের আলো ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছগুলির মধ্যে ঝরিয়া পড়িয়া লালপথে অভ্রগুলির উপর ঝিকিমিকি করিতেছে, ঘরে রমলা পিয়ানো বাজাইয়া চলিয়াছে, সুরপরীরা সমস্ত ঘর ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে, রজত তন্ময় হইয়া বসিয়া আছে।

যতীন ধীরে উঠিল, ঘর ছাড়াইয়া, বারান্দা পার হইয়া রাজপথের দিকে চলিল। গেটের কাছে আসিয়া একবার বাড়ীখানির দিকে চাহিল। জ্যোৎস্নার আলোয় লাল বাড়ীখানি রূপকথার পুরীর মত, পিয়ানোর সুর পুষ্পগন্ধভারাক্রান্ত বাতাসে মৃদু ভাসিয়া আসিতেছে। সমুদ্রগীতমুখর জ্যোৎস্নালোকধৌত শান্তকুটীরাচ্ছন্ন মাধবী-দ্বীপের ছবি তাহার চোখে আবার ভাসিয়া উঠিল। পিয়ানো বাজান শেষ করিয়া উঠিয়া রমলা আর কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না।

(সমাপ্ত)

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

জীবন ও মরণ

জীবন হ'চ্চে কর্ম্মশালা—
ক্লান্ত ক'রে যাই কাজের ক্ষণে,

মরণ সে যে প্রিয়ার চুমা—
এলিয়ে পড়ি আলিঙ্গনে।

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

ছবিখানির তলায় অনুপমের হাতে লেখা—নবজীবন।

খানিকক্ষণ মুগ্ধনেত্রে ছবিখানি দেখিয়া যমুনা কহিয়া উঠিল—ভারি সুন্দর। এ ভাবটি কোত্থেকে আপনার মাথায় এল ?

অনুপম প্রসন্নমুখে কহিল—এই পাশের বাড়ী থেকে ?

বিস্মিত হইয়া যমুনা বলিল—কি রকম !

অনুপম বলিতে লাগিল—এই পাশের বাড়ীটি মুসলমানদের। ৭০।৮০ বছরের এক বুড়ো এইবাড়ীতে ছিল। এই দুবছর ধরে' সে উত্থানশক্তিরহিত হয়েছিল। তাকে ধরে' উঠাতে ধরে' বসাতে তার অতিনিকট আত্মীয়রাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মাঝে মাঝে কি রকম একটা যন্ত্রণাও তার হ'ত আর সেটা হ'ত বেশীর ভাগ রাত্রির দিকে। যাদের রাত্রে উঠ্‌তে হ'ত বা এই চীৎকারে শান্তিভঙ্গ হ'ত, তারা যে তেমন খুসী হ'ত না তা তাদের সেই সময়কার বিরক্তি ও কঠোর বাক্যেই বোঝা যেত। কদিন থেকে তার যন্ত্রণা বেশী হয়েছিল। সেদিন তার সব যন্ত্রণার অবসান হয়ে গেল। সে যে কি শান্তি পেল তার পরেই আমি ঠিক বুঝেছিলাম। পূর্ব্বদিকের এই মস্‌জিদটির সাম্‌নে তাকে একখানা কাপড় ঢাকা দিয়ে নামালে এবং সবাই খানিকক্ষণের জন্য সেখানে উপাসনা করলে। তাদের ভাব দেখে মনে হ'ল বৃদ্ধ বয়সে তারা এর প্রতি যেটুকু অনাদর করেছে এর মৃত্যুর দিনে যেন সবাই মিলে অতিরিক্ত সমাদর করে' তার প্রায়শ্চিত্ত করছে। মৃতের পানে চেয়ে মনে হ'ল—আজ ও বেঁচে গেছে। পশ্চিম দিক্‌কার প্রসন্ন আকাশের দিকে চেয়ে তখন মনে হয়েছিল ব্যথিত আজ শান্তি পেয়েছে—ওই ওপারে এর মুক্ত আত্মা নবজন্ম লাভ করে' সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করেছে।

করুণা হাসিয়া বলিল—আপনি রাতে না ঘুমিয়ে বুঝি এই-সব করেন !

জাহ্নবী একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—এই-সব রাজ্যের আজগুবি ভাবনা মাথায় পূরে শেষটা আপনি মাথা খারাপ করে' না বসেন।

যমুনা ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিল—এই রকম মাথা খারাপ যদি পৃথিবীতে কারু না হ'ত তা হ'লে পৃথিবীটা এতদিন শুধু চাল-ডাল ও লোহা-লক্কড়ের দোকানে ভরে যেত।

এবং তাহলে বহরমপুর ইত্যাদি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জায়গা একেবারে কাণা পড়ে যেত।—বলিয়া জাহ্নবী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

অনুপমের মুখখানা ম্লান হইয়া আসিল। ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া যমুনার পানে চাহিতে তাহার মুখখানিতে আবার প্রসন্নতা ভরিয়া উঠিল। যমুনা তাহার অতি সুন্দর চক্ষু দুটিতে অকৃত্রিম প্রশংসা ফুটাইয়া সমাপ্তপ্রায় ছবিখানির পানে চাহিয়া ছিল।

জাহ্নবী কোন কথা বড় একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিত না—তাই কথাগুলি প্রায়ই অতিরিক্ত রূঢ় হইয়া যাইত। সুধীর কথাটাকে একটু মোলায়েম করিবার জন্য বলিল—সে দিন যে শেক্‌স্‌পীয়ারে পড়া হচ্ছিল না—

Poet, philosopher and mad men
Are by imagination all compact,—

জাহ্নবী সেই কথাটাই বল্‌ছে আর কি। ...তার পর সে কবিতাটা শোনাও অনুপম।

অনুপম মাথা তুলিয়া বলিল—ভারি তো সে কবিতা, থাক্ সে।

না তা হ'তে পারে না। কবিতাটি সত্যি আরও সুন্দর হয়েছে। সেটা শোনাতেই হবে। দেখি কোন্ খাতায় আছে ?—বলিয়া সুধীর অনুপমের কবিতার বই খুঁজিতে উদ্যত হইল।

অনুপমের কত গোপন কথাই ঐ কবিতার খাতার পাতের মধ্যে লুকান আছে। এখনি হয় ত সে-সব দেখিয়া তদন্ত সুরু হইবে আশঙ্কা করিয়া অনুপম আপনিই একখানা খাতা খুলিয়া পড়িল।

রচনা একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা। কিন্তু সেই চৌদ্দটি ছত্রের মধ্যেই ছবিটি পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মরণ-সমুদ্রে স্নান করিয়া অপর পারে বৃদ্ধ তাহার দুঃখ-দৈন্য ত্যাগ করিয়া নূতন জীবন ও সৌন্দর্য্যের

পরিপূর্ণ সত্তার লইয়া অতি অপরূপ শ্রীতে বিকশিত হইয়াছে—এই ভাবটি ছবির চেয়েও যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

করুণা ও সুধীর কবিতাটির বিশেষ প্রশংসা করিল। জাহ্নবী নিন্দা করিবার কিছু বুঝি চট্ করিয়া খুঁজিয়া পাইল না; কাজেই চুপ করিয়া রহিল। যমুনা "দেখি" বলিয়া খাতাখানি হাতে লইয়া কবিতাটি একবার আপন মনে পড়িল। তার পর খাতা ফিরাইয়া দিয়া শেষ ছত্র-দুটি আপন মনে আবৃত্তি করিয়া বলিল—ভারি সুন্দর! কবিতাটি ছবির চেয়েও সুন্দর হয়েছে।

তার পর আরও খানিকটা উপদ্রব করিয়া ভাইবোন কটি উঠিয়া পড়িল। অনুপম তাদের নীচে পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল।

তুলিটি রঙের মধ্যে ৬।৭ বার ডুবাইয়াও একটি রেখাও সে ছবির গায়ে টানিতে পারিল না। যমুনার মুখের প্রশংসাবাক্য কয়টি তাহার কানে কবিতার চেয়ে শতগুণ মধুর হইয়া বাজিতে লাগিল, বিশ্বসাহিত্যের নোবেল প্রাইজ পাইয়া কোনো কবি বা সাহিত্যিক তাহার চেয়ে অধিক উন্মনা ও হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিলেন অনুপমকে এসময়ে দেখিলে কেহ তাহা মনে করিতে পারিত না—অন্ততঃ সে তো তাহা কিছুতেই ভাবিতে পারিত না। কোকিলের কুহুতানের মত "ভারি সুন্দর" কথা দুটি তাহাকে মাতাইয়া তুলিল।

৩

ডাক্তার সরকারের বড় জামাতা বি এম্ সিংহ বিলাত হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলে দিন কয়েক ডাক্তার-ভবনে উৎসব পড়িয়া গেল। মিঃ সিংহ সেখান হইতে যে-সকল ডিপ্লোমা ও প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া এবং সেখানে তিনি কি ভাবে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা শুনিয়া সকলেরই মনে যুগপৎ ঈর্ষা ও সম্ভ্রমের উদয় হইয়াছিল। মজ্‌লিসে উপবিষ্ট প্রায় সকলেরই কাছে মিষ্টার সিংহ প্রশংসা আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—কিন্তু একটা গৌরবর্ণ একহারা ও মোলায়েম চেহারার লোক যে কেনো কোনো দিন মজলিসে যোগদান না করিয়া এক কোণে চুপচাপ বসিয়া থাকিত ইহা মিঃ সিংহের ভাল [illegible] না। সরকার সাহেবের সন্নিধি ছাড়া তিনি প্রা[illegible] সময়ে নিজের কৃতিত্ব নিজ-মুখে ঘোষণা করিয়া জয়জয়কার অর্জন করিতেন। কিন্তু একটা লোক যে মুখ থাকিতেও তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া চুপ্‌চাপ বসিয়া থাকিবে ইহা তিনি বেশীদিন সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রথমে যখন উভয়ের পরিচয় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তখন সিংহ সাহেব শুধু জানিয়াছিলেন লোকটি সুধীরের সতীর্থ ছিল। সুধীর এখন বি-এ পাশ করিয়া এম্-এ পড়িতেছে; কিন্তু ঐ লোকটি বি-এ'র গণ্ডী অতিক্রম না করিতে পারিয়া সেইখানেই স্থিরচিত্তে বিদ্যার সীমারেখা টানিয়া দিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজকাল নাকি শুধু ছবি আঁকে ও ছড়া লেখে—যে দুটি জিনিষের বন্যায় তখন বাংলা দেশ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যার পর সিংহ সাহেব অনুপমের সম্মুখেই সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা আপনার বন্ধু তো দেশী ছবি আঁকেন?

"হাঁ", সুধীর হাসিয়া বলিল, "উনি যখন এদেশের লোক, তখন বিলেতের ছবি আর কি করে' আঁক্‌বেন?"

কোথায় পাঠান—কালীঘাট না পুরী? অথবা আজ-কালকার বাংলা মাসিকপত্রে?—এই তিন স্থান নইলে অমন দুর্লভ ছবি আর কোথায় স্থান পাবে?—বলিয়া সিংহ সাহেব মৃদু হাসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকে হাসিয়া উঠিল।

অনুপম একটু অসহায়ভাবে এদিক্ ওদিক্ তাকাইতেই দেখিল—যমুনা ঈষৎ বিরক্তভাবে সিংহ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া কি বলিতে যাইতেছে। অনুপমের অসহায় দৃষ্টি দেখিয়াই সে হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—অনুপম-বাবু, আপনি যদি নিজের আঁকা ছবির পক্ষে একটি কথাও না বল্‌তে পারেন তো আপনার ছবি আঁকা ছেড়ে' দেওয়া উচিত।

অনুপম শুধু একটু ম্লান হাসি হাসিয়া খোলা জানালা দিয়া বাহিরের পানে চাহিল। ভাবটা এই —তুমিও যদি ও-কথা বল তো কার পানে চাইব?

সুধীর বলিল—কবির কথায় আমি একটু অনুপমের পক্ষ সমর্থন করি—

'কত বড় আমি' কহে নকল হীরাটি।'
তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি॥

মনে আছে তো?

কথাটা যমুনার কথার প্রতিবাদ হইলেও যমুনার মন ইহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া হৃষ্ট হইয়া উঠিল। শুধু সিংহ সাহেবের মুখখানি একটু গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি বুঝিলেন,—ওই শান্ত চিত্রকর আর তাঁহার অসহিষ্ণু শ্যালিকার ভিতর কোনো গোলযোগ জমিয়া উঠিতেছে যাহার প্রতিকার এখনি করা দরকার।

সেই দিন সন্ধ্যায় তিনি সরকার সাহেবের সহিত নির্জ্জনে দেখা করিয়া প্রথমে নিজের পৃথক্ বাসের ব্যবস্থাটা তুলিলেন।

—আচ্ছা বেশ আগে একটু গুছিয়ে নেও, তার পর সে ব্যবস্থা হবে। এখানে থাক্‌লে কি মাষ্টারের সঙ্গে আছ বলে' এখনও মনে হয়?—বলিয়া সরকার সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। সরকার সাহেব মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং বিবাহের আগে সিংহ সাহেব সরকার সাহেবের কাছে পড়িয়াছিলেন, এই সূত্রে উভয়ের আনুগত্য হইয়াছিল এবং সরকার সাহেবের বাড়ী যাতায়াতের ফলে সিংহ সাহেব জাহ্নবীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তার পর বিবাহের পর শ্বশুরের অনুরোধে ও অর্থে সিংহ সাহেব বিলাত হইতে আপনাকে অধিকতর কৃতবিদ্য করিয়া ফিরিয়াছিলেন।

তাই সরকার সাহেব মাষ্টারীর প্রসঙ্গ তুলায় মিষ্টার সিংহ লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—আজ্ঞে না।

সিংহ সাহেবের আপাততঃ বাসা করিবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না—কারণ এখানে তাঁহার অসুবিধা কিছুই ছিল না—বরং সুবিধা ছিল নানাবিধ।

কথাটা তিনি তুলিয়াছিলেন শুধু অন্য কথার ভূমিকা-স্বরূপ এবং জানিতেন বলিয়া যে সরকার সাহেব কিছুতেই এখন তাঁহাকে পৃথক্ বাস করিতে দিবেন না।

সরকার সাহেব তখন কিসের একটা experiment লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আবার সে দিকে মনোনিবেশ করিতে সিংহ সাহেব বলিলেন—আর-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

সরকার সাহেব কথাটা প্রথমে ভাল শুনিতে পান নাই, জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বল্‌লে?

সিংহ সাহেব কথাটার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

সরকার সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—ইংল্যাণ্ড্ থেকে তুমি ভয়ঙ্কর বেশী polite manners শিখে এসেছ। কি জিজ্ঞাসা করবে কর।

—আচ্ছা, যমুনার সঙ্গে কারু কি কোন engagement হয়েছে? ওর তো বিবাহের বয়স হয়েছে বল্‌তে হবে।

—তা বটে। কিন্তু ওর এখন সেদিকে কোনো ইচ্ছে আছে বলে' মনে হয় না। ও যেন আরো কিছুদিন এখনও লেখাপড়া ইত্যাদি নিয়ে থাক্‌তে চায়। সে-রকম কারো সঙ্গে মেশেই না। engagementএর কথা তো ছেড়েই দাও।

—But who is that fellow—I mean the gentleman with that feminine face—ওই যিনি কবিতা লেখেন, না ছবি আঁকেন?

—You mean, with that enviously charming face? ছেলেটি সত্যি কবি। ইংরেজী সাহিত্যে ওর অসাধারণ অধিকার। বাংলার কথা তো ছেড়েই দাও—he has got a passion for it. তোমার যদি ছবিতে taste থাকে ওর ছবি দেখ্‌তে পার—তাতে তোমার সময় বাজে নষ্ট হবে না। তবে আমরা যাকে লেখাপড়া বলি তা হ'ল না, অর্থাৎ বি-এ এম্-এ, এসব পাশ করতে পার্‌লে না। একবার বি-এ ফেল করেই কলেজ ছেড়ে দিলে।

'তার পর আর্থিক অবস্থা কি রকম—কবিত্ব করে' চল্‌বে কি না?

অবস্থা তেমন সুবিধার নয় বল্‌তে হবে। তবে তার একটা history আছে। অনুপমের ছোট এক বোন হবার পর অনুপমের মা হঠাৎ রুগ্ন হয়ে পড়েন, পূর্ব্বের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য তিনি আর ফিরে পান না। বাপ এলাহাবাদের খুব বড় উকিল ছিলেন, স্ত্রীর ভগ্নস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে ফের বিবাহ করেন। অনুপমের মার

বুকে সে আঘাতটা বড় বেশীই লাগে। তিনি তার কিছু দিন পরেই মারা যান। অনুপম তার পরেই বাড়ী ছেড়ে এক বস্ত্রে চলে' আসে। ও বলে—সেখানে গেলে বা থাকলে মার দুঃখে আমি পাগল হয়ে যেতুম। এখন অনুপমের বাবা মারা গেছেন। তাঁর এ-পক্ষের ছেলেরাই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিক।"

—এখন এর কি করে' চলে—আপনি বুঝি সাহায্য করেন?

—না। অনুপমের এক মামা আছেন, তাঁর কলকাতায় এক বাড়ী আছে। তার উপরের অংশে অনুপম থাকে, আর নীচের অংশের যা ভাড়া পায় তাতেই খরচপত্র চালায়। তিনি বলেছেন-যতদিন না অনুপম নিজে উপার্জ্জন করতে পারে ততদিন এই ব্যবস্থা থাকবে।

—মামার বুঝি খুব অবস্থা ভাল?

—মোটেই নয়। তিনি এক স্কুলের হেড মাষ্টার, একটু কবি ধরণের। বাড়ী তাঁর শ্বশুরের ছিল, মেয়েকে দিয়ে গেছেন।

—তা হ'লে অনুপম-বাবুর নিজের কিছুই নেই। ঐ অবস্থায় ওঁকে যোগ্য পাত্র বলে' মনে করেন?

—অনুপম যখন অর্থহীন তখন সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় আর কি করে' ওকে তা বলা যায়।

—কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় ওঁদের দুজনের এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়েছে—He proposed and—

—অসম্ভব। তুমি অনুপমকে জান না। আমাকে না জানিয়ে সে ও-প্রসঙ্গ কখনও তুলতে পারে না।

—আচ্ছা ধরুন যদি উনি এখন আপনার কাছে ও-কথা তোলেন। কি করবেন?

—সেটা একেবারে হঠাৎ বলা একটু শক্ত। বর্ত্তমান অবস্থায় হয় ত আমি রাজী হব না।

—তা হ'লে এ-অবস্থায় ওদের দেখা-শুনাটা আপনি ভাল মনে করেন? যেখানে একটা অনুরাগের আশঙ্কা রয়েছে?

—তা হ'লে তুমি বলতে চাও এমন লোকের সঙ্গে মেয়েদের মিশতে দাও যাদের দেখে তারা শুধু ঘৃণা করবে বা যাদের উপর বিরক্ত হবে? সেটা কি একটা শাস্তি হবে না? যমুর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আছে, অনুপমের literary productionকে শ্রদ্ধা করে, এই পর্য্যন্ত। এতে ভাবনার কিছু নেই।

সিংহ সাহেব আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু শ্বশুরের সরল মনোভাব দেখিয়া তিনি দ্বিগুণিত চিন্তা লইয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

একটু গম্ভীরভাবে সরকার সাহেব একটা পেন্‌সিল লইয়া একখণ্ড কাগজের উপর ঘন ঘন রেখা টানিতে লাগিলেন। কোনো বিষয়ে গভীর চিন্তা করিয়া মীমাংসা করিতে গেলেই সরকার সাহেব এইরূপ করিয়া থাকেন।

(৪)

অপরাহ্ণে অনুপম একটু ম্লান মুখে সুধীরদের বাড়ীতে আসিয়া জানাইল—সে কাল বোম্বাই যাত্রা করিবে।

"বোম্বাই! হঠাৎ—এমন অসময়ে?"—সুধীর জিজ্ঞাসা করিল।

—সেখানে একটা চাকরি পেয়েছি—এক পার্সীকে ছবি আঁকা শেখাতে হবে।

"কত মাইনে জিজ্ঞাসা করতে পারি?"—মিষ্টার সিংহ নম্রতার ব্যর্থ প্রয়াসের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনুপম ধীরে ধীরে উত্তর দিল—একশো টাকা।

"তা আমাদের দেশের ছবির পক্ষে যথেষ্ট বলতে হবে"—জাহ্নবীর দিকে একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সিংহ বলিলেন।

কেহ এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলিল না। যমুনা দূর হইতে অনুপমের মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি নত করিল।

যেদিন সিংহের সহিত ডাক্তার সাহেবের অনুপম-যমুনা-প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়, সেইদিনই রাত্রে সুধীর পিতার কাছে যমুনার সহিত অনুপমের বিবাহের কথা তুলে। যমুনার প্রতি অনুপমের আন্তরিক অনুরাগ ও অনুপমের চরিত্রমাধুর্য্যের দোহাই দিয়া সুধীর পিতাকে অনুরোধও করিয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার সাহেব এ বিবাহ অনুমোদন করিতে পারেন নাই এবং অনুপমকেও আশা ত্যাগ করিবার জন্য বলিতে এক প্রকার বলিয়াছিলেন। তাহার কয়েক দিন পরেই অনুপম চাকরীর সংবাদ লইয়া আসিল।

বন্যা-রিলীফ্ কমিটির কার্য্যপ্রণালী

২৫শে এপ্রিল, ১৯২৩।

সবিনয় নিবেদন,

গত বৈশাখের প্রবাসীতে বন্যারিলিফ্ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখিলাম। রিপোর্ট্ ও হিসাব ওয়ার্কিং-কমিটি পাস করিয়া প্রকাশ করিবার আদেশ দিলে উহা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত রিপোর্ট্ আপনার নিকট পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে ; রিপোর্ট্ প্রত্যহই কিছু কিছু করিয়া ডাকে পাঠান হয়। এখনও পাঠান হইতেছে। একজন কর্ম্মী অন্য দশ কাজের মধ্যে রিপোর্ট্গুলি ছাড়িতেছেন। অবশ্য কমিটির মেম্বরদিগকে সর্ব্বাগ্রে প্রেরণ করা উচিত ছিল। কর্ম্মচারী মহাশয় ভুলিয়া তাহা করেন নাই, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

কমিটি গঠিত হইয়াই সমস্ত কার্য্যভার ওয়ার্কিং-কমিটির উপর ন্যস্ত করেন। ওয়ার্কিং-কমিটিতে প্রায় ৬০ জন সভ্য আছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক মাড়োয়ারী ভাটিয়া এবং ইংরেজ আছেন। অন্যান্য সেবা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিও আছেন। ওয়ার্কিং-কমিটি প্রায় প্রতি মাসে একবার বসে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ওয়ার্কিং কমিটিতে নাই বলিয়া পত্রাদি তাঁহার নিকট যায় নাই। বজেট-কমিটি কর্ত্তৃক ব্যয়ের বজেট্ প্রস্তুত হইলে ওয়ার্কিং-কমিটি তাহা অনু-মোদন করেন এবং তদনুযায়ী ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি মেডিকেল কমিটি আছে, তাহার সভাপতি ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়। চিকিৎসা-সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপার তাঁহার কমিটির যোগে দাস মহাশয় সম্পন্ন করেন। যে ওয়ার্কিং-কমিটির সভ্য প্রায় ৬০ জন, যাহাতে বিভিন্ন সেবা ও রিলিফ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আছেন, তাঁহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানকে "পারিষদতন্ত্র" বলা যায় না। বড় কমিটি এ পর্য্যন্ত আর আহ্বান করা আবশ্যক হয় নাই।

এক বৎসর কর্ম্ম করিয়া বাৎসরিক রিপোর্ট্ ও হিসাবাদি গ্রহণ ও পাস করিবার জন্য বড় কমিটি আহ্বান করিবার ইচ্ছা আছে। তবে যদি ইতিপূর্ব্বে কমিটির সভ্যদিগের মধ্যে কেহ সভা আহ্বান করিতে বলেন তবে সে প্রস্তাব অবশ্য বিবেচিত হইবে। আপনি যে অসত্যের আরোপ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় সমস্ত বিষয়টি না জানার দরুণ। ইতি

বিনীত

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

সম্পাদক, বন্যা-রিলীফ্ কমিটি।

সম্পাদকের মন্তব্য

আমি বন্যারিলীফ্ কমিটির সভ্য মনোনীত হইয়াছি বলিয়া চিঠি পাইয়াছিলাম। এইজন্য আমি মনে করিয়াছিলাম, যে, ঐ কমিটির সভ্য বলিয়া একখানা রিপোর্ট্ যথাসময়ে পাইব। যাহা হউক, শ্রীযুক্তপ্রফুল্ল-চন্দ্র মিত্র স্বীকার করিতেছেন, যে, ভ্রমবশতঃ আমাকে রিপোর্ট্ পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে। কিন্তু শুধু ঐ কমিটির সভ্য বলিয়াই যে একখানা রিপোর্ট্ আমার নিকট প্রেরিত হওয়া উচিত ছিল, তাহা নহে ; আমি মডার্ন্ রিভিউ ও প্রবাসী নামক দুখানা মাসিক পত্রের সম্পাদক। এই দুখানা কাগজে বন্যায় বিপন্ন লোকদের সাহায্যের প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য অনেক ছবি ছাপা হইয়াছিল, এবং লেখাও প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার বোধ হয় অন্য কোন কাগজ অপেক্ষা এই দুটি কাগজ এবিষয়ে কম অর্থব্যয় করে নাই। তথাপি, বন্যারিলীফের রিপোর্ট্ প্রকাশিত হইবার পর যখন অন্য সম্পাদকদের নিকট উহা প্রেরিত হইল, তখন মডার্ন্ রিভিউ ও প্রবাসীর সম্পাদকের নিকট উহা কেন প্রেরিত হইল না, তাহা জানিতে চাই। আমার পাঠ্য সংবাদপত্র, রিপোর্ট্, পুস্তক, প্রভৃতির অভাব ঘটায় আমি এ অভিযোগ করিতেছি না ;—কারণ এবিষয়ে আমি খুব সৌভাগ্যবান্ (কিম্বা দুর্ভাগা)। আমার বিস্ময়ের কারণ এই, যে, সাধারণ কমিটির সভ্যরূপেও আমার অস্তিত্ব কর্ম্মীদের স্মৃতিপথে উদিত হইল না, আবার সম্পাদকরূপেও আমার অস্তিত্ব তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন। যদি তাঁহারা বিস্মৃত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও, সভ্যদিগকে পাঠাইবার সময়ও আমাকে পাঠাইতে বিলম্ব হইল, আবার সম্পাদকদিগকে পাঠাইবার সময়ও আমাকে পাঠাইতে বিলম্ব হইল, ইহার কারণ কি ?

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র বলিতেছেন, যে, "কমিটি গঠিত হইয়াই সমস্ত কার্য্যভার ওয়ার্কিং-কমিটির উপর ন্যস্ত করেন", এবং "রিপোর্ট্ ও হিসাব ওয়ার্কিং-কমিটি পাস্ করিয়া প্রকাশ করিবার আদেশ দিলে উহা প্রকাশ করা হয়।"

ইহা হইতে ইহাই বুঝায়, যে, সাধারণ কমিটি গঠিত হইবার পর একটি ওয়ার্কিং-কমিটি গঠিত হয়। এই ওয়ার্কিং-কমিটি কে গঠন করিল ? নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর রীতি অনুসারে ওয়ার্কিং-কমিটির গঠন করিবার অধিকার ও ক্ষমতা সাধারণ কমিটিরই আছে। কিন্তু সাধারণ কমিটির কোন্ অধিবেশনে কখন্ কোথায় ওয়ার্কিং-কমিটি গঠিত হইয়াছিল, লেখক তাহা বলেন নাই। আমি সাধারণ কমিটির সভ্যরূপে এরূপ কোন অধিবেশনের নোটিস্ পাই নাই। এক্ষেত্রেও কি দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বাদ পড়িয়া গিয়াছিলাম ? না, ওয়ার্কিং-কমিটি পারিষদতন্ত্র দ্বারা বা "কর্ত্তার ইচ্ছা" অনুসারে গঠিত হইয়াছিল ?

কিন্তু ওয়ার্কিং-কমিটি সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর প্রশ্ন এই, যে, রিপোর্টের কোথাও ইহার নাম মাত্রও নাই, সাধারণ কমিটি যে ইহাকে কাজের ভার দিয়াছেন তাহার উল্লেখ নাই, কবে ইহা গঠিত হইল তাহার উল্লেখ নাই, সাধারণ কমিটির ও ওয়ার্কিং-কমিটির সভ্যদের নাম নাই, ইত্যাদি।

"সমস্ত বিষয়টি না জানার দরুণ" আমার ভুল হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কর্ম্মীরা লোককে জ্ঞান দান করিবার চেষ্টাও যে খুব করিয়াছেন, সেরূপ ধারণাও ত জন্মিতেছে না।

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,

২১শে বৈশাখ, ১৩৩০ প্রবাসীর সম্পাদক

অদিতি শব্দের অর্থ

গত বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঋগ্বেদের ১০।৭২।৪ ঋকের অর্থ সম্বন্ধে ১১ পৃষ্ঠায় যাস্কের মতের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—

" 'অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন এবং দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন' ইহার অর্থ দেবগণের একত্ব অর্থাৎ দক্ষ হইতে প্রজাপতির উৎপত্তি। অথবা অন্যভাবে একই সত্তা একই সময় অদিতি ও দক্ষরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এই অদিতি ও দক্ষ পরস্পর সম্পর্কিত, একের প্রকৃতি অপরের দ্বারা নিয়মিত, একের উৎপত্তি না হইলে সেই সময়ে অপরের উৎপত্তি হইত না। এই ভাবেই বলা যাইতে পারে যে, অদিতি হইতে দক্ষের জন্ম এবং দক্ষ হইতে অদিতির জন্ম। যাস্কও ইহা বলিয়াছেন।"

এই মত ঠিক হয় নাই। যাস্ক এই স্থানের প্রকৃত অর্থ করিতে পারেন নাই। তাই গোলযোগ করিয়াছেন। আমি গত ১৩১৮ সালে আমার "পৃথিবীর পুরাতত্ত্বের" সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্ব-নামক ১ম খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায় এই ভ্রম-সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ আলোচনা করিয়াছি।

ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৭২ সূক্তের দ্রষ্টা বৃহস্পতি ঋষি এই সূক্তে পঞ্চভূত ও পৃথিব্যাদি গ্রহসৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি চতুর্থ ঋকে বলিয়াছেন—

অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্দিতিঃ পরি

অর্থাৎ অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন এবং দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন। ইহা অতি সরল অর্থ। কিন্তু এই দুই অদিতি এক নহে। এক অদিতি অর্থ "তেজ", অপর অদিতি অর্থ "ক্ষিতি"। অর্থাৎ অদিতি (তেজ) হইতে দক্ষ (জল) জন্মিলেন। এবং জল (দক্ষ) হইতে অদিতি (ক্ষিতি) জন্মিলেন।

এই ঋকের অর্থ সম্ভবতঃ যাস্কের পূর্ব্ব হইতেই বিকৃত হইয়াছে। ৺রমেশ-বাবু যাস্কের নিরুক্তের সাহায্যেই অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার অর্থ—"অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন (অতএব অদিতি দক্ষের কন্যা এবং দক্ষ আবার অদিতির পুত্র)।"

যাস্ক নিরুক্তে প্রশ্ন করিয়াছেন, "দক্ষকে আদিত্য অর্থাৎ অদিতির পুত্র বলা হইয়াছে এবং আদিত্যাদিগের মধ্যেও তাঁহার স্তুতি করা হয়। এবং অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিয়াছেন, আর দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিয়াছেন। এই ঋক্ অনুসারে অদিতিকে দাক্ষায়ণী অর্থাৎ দক্ষের কন্যা বলা হইয়াছে তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?" যাস্ক এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন যে, "তাঁহাদের সমান জন্ম হইতে পারে। কিম্বা দেবধর্ম্মানুসারে তাঁহারা উভয়ে পরস্পর হইতে জন্মিয়া থাকিবেন এবং পরস্পরের প্রকৃতি পাইয়া থাকিবেন।" যাস্কের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে তিনি এই ঋকের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পূর্ব্ব হইতেই দেবচরিত্র বুঝা ভার হইয়াছে এবং বেদ দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে।

আমি এই ঋকের যে অর্থ করিয়াছি তাহাতে এইরূপ প্রশ্নের আবশ্যক হয় না; কারণ, এই ঋকের প্রথম অদিতি শব্দের অর্থ অং সতত গমন করা ইতি অর্থাৎ তেজ বা তড়িৎ। দক্ষ শব্দের অর্থ দক্ অর্থে জল—য অবশেষ (element)। দ্বিতীয় অদিতি অর্থ অ-দো ছেদন করা তি (ক্তি) অর্থ যাহাকে ছেদন করা যায় না অর্থাৎ অখণ্ডনীয়া পৃথিবী বা ক্ষিতি বা solid matter (element)। অতএব "তেজ (অদিতি) হইতে জল দক্ষ, জল দক্ষ হইতে ক্ষিতি অদিতি জন্মিয়াছে" এই অর্থ হইবে। সুতরাং "অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন এবং দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন" এই অর্থ অসম্পূর্ণ।

সায়ণাচার্য্য অদিতি অর্থ ভূমি করিয়াছেন—ঋগ্বেদ ১।৪৩।২ ঋক্। ১।৮৯।১০ ঋকের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন "অদিতিরদীনা অখণ্ডনীয়া বা পৃথিবী।" ৪।৬২।৮ ঋকের "অদিতি" অর্থ অখণ্ডনীয়রূপ সমস্ত ভূমি। ১০।৬৩।৩ ঋকের "দ্যোরদিতি" অর্থ আকাশের অদিতি অর্থাৎ তেজ।

অদিতি শব্দ লইয়া বেদ পুরাণ প্রভৃতিতে যেরূপ গোলযোগ হইয়াছে, তাহাতে এখানে আর-একটু বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা অদিতির তিনটি অর্থ করিয়াছি—(১) অন্তরীক্ষ, তেজ, (২) পৃথিবী, (৩) দেবমাতা কশ্যপপত্নী অদিতি।

বিশ্বকোষ-কর্ত্তা লিখিয়াছেন, "প্রথমে অদিতি শব্দ অন্তরীক্ষ বুঝাইত। কালক্রমে উহার রূপক অর্থ সকলে পরিত্যাগ করিলেন, তখন অদিতি শব্দে দেবতার মাতা বা ঋষিপত্নীকে বুঝাইতে লাগিল। সমস্ত দেবতা অদিতির পুত্র। সমুদ্রমন্থনের সময় অমূল্য রত্নকুণ্ডল পাওয়া গিয়াছিল। ইন্দ্র সেই কুণ্ডল লইয়া অদিতিকে দিয়াছিলেন।"

পুরাণকর্ত্তা হইতে বিশ্বকোষ-কর্ত্তা পর্য্যন্ত সকলেই একটা ভুল করিয়াছেন। আকাশের চাঁদ ক্রোড়স্থিত শিশুকে দেখাইয়া চাঁদ বলিয়া ডাকিলাম। পাড়ার চন্দ্র নামে একটি বালক ছিল, সকলে তাহাকে চাঁদ বলিয়া ডাকে, সে আমার ডাক শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল। রাস্তা দিয়া চাঁদ মহম্মদ যাইতেছিল, সে ডাক শুনিয়া দাঁড়াইল। এখন আমি শিশুকে কোন্‌টা দেখাইব? বলিলাম এই দেখ আরও দুই চাঁদ আসিয়াছে। শিশু তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিল না, তাহাদের দিকে ফিরিয়াও দেখিল না, আকাশের চাঁদের দিকে ক্ষুদ্র হস্ত বিস্তার করিয়া বলিল, ঐ চাঁদ!

অদিতি সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে। অদিতি অর্থ তেজ, অদিতি অর্থ পৃথিবী, অদিতি দেবমাতা কশ্যপপত্নী, ইঁহার ১২টি পুত্রের একটির নাম দক্ষ, ইনি আবার বাস্তবিকই দক্ষরাজার কন্যা। আকাশের চাঁদ যেমন পার্থিব চাঁদ বা চাঁদ মহম্মদ হইতে পারে না—আন্তরীক্ষ-তেজ তেমনি পৃথিবী বা দেবমাতা হইতে পারে না—পৃথিবীও তেমনি আন্তরীক্ষ-তেজ বা দেবমাতা হইতে পারে না। অথচ অদিতি বলিয়া ডাকিলে তিন জনেই উত্তর করিবে। অতএব নাম এক হইলেই, এক নামের বহু পদার্থ এক হইতে পারে না। এক করে—যে বুঝে না সে। সে দোষ, যিনি নাম রাখিয়াছেন তাঁহার নহে, পরবর্ত্তীগণের বুঝিবার ত্রুটি।

পরবর্ত্তী কালে বৃহস্পতি ঋষি এই পার্থক্য বলিয়াই দিয়াছেন—

অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব (১০।৭২।৫)

"হে দক্ষ (জল)! যে অদিতি তোমার কন্যা"—সুতরাং বুঝিতে হইবে, যে অদিতি দক্ষের মাতা, তাহার কথা এখানে বলা হইতেছে না। এত স্পষ্ট উক্তি থাকিতে যাস্ক কেন যে এই গোল করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। তবে অনুমান হয়, এই সময় বেদের প্রকৃত অর্থ কেহ বুঝিতে পারিত না।

শ্রী বিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন

'অদিতি' শব্দের কি কি অর্থ, এস্থলে তাহার আলোচনা করা সম্ভব নহে। বেদরত্ন মহাশয় প্রবাসীতে প্রকাশিত অনুবাদের যে সমালোচনা করিয়াছেন সে বিষয়ে বক্তব্য এই :—

(১) ঋগ্বেদের ১০।৭২।৪ অংশের অবিকল অনুবাদ এই :—"অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন এবং দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন।"

(২) এই অনুবাদই সরল সহজ স্বাভাবিক এবং শিষ্টানুমোদিত।

(৩) এই অর্থ অর্থশূন্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ঋগ্বেদে ও অথর্ব্ববেদে এই-প্রকার ভাবের অসদ্ভাব নাই। মূল প্রবন্ধে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

(৪) আর, এই অর্থ যে অর্থশূন্যও নহে, তাহাও ঐ প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

(৫) সুতরাং উক্ত অংশের অন্য অর্থ করিবার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না।

বেদরত্ন মহাশয়ের ব্যাখ্যা বিষয়ে আমাদের মন্তব্য এই :—

(ক) বেদরত্ন মহাশয় বলেন—"দ্যৌরদিতি অর্থ আকাশের অদিতি অর্থাৎ তেজ"। তিনি "দ্যৌ" শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তি কোথা হইতে পাইলেন? দ্যৌরদিতি (১০।৬৩।৩) দ্যৌঃ+অদিতিঃ। দুইটি শব্দেরই প্রথমা বিভক্তি। 'অদিতি' শব্দ 'দ্যৌ' শব্দের বিশেষণ। এস্থলে "অদিতি" অর্থ 'অসীম', 'অনন্ত'। বেদরত্ন মহাশয় ব্যাকরণের বিভক্তি বুঝিতে ভুল করিয়াছেন, সেইজন্যই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "দ্যৌরদিতি অর্থ আকাশের অদিতি অর্থাৎ তেজ।"

(খ) বেদরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"সায়ণাচার্য্য অদিতি অর্থ ভূমি করিয়াছেন"। ইহা সমর্থন করিবার জন্য দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তিনটি। এস্থলে তিনটি দৃষ্টান্ত হইতেই কি একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়? ঋগ্বেদে অদিতি শব্দ ১৫৮ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৫৫ স্থলে সায়ণাচার্য্য কি কি অর্থ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা উচিত ছিল। ইহা সত্য যে অনেক স্থলে সায়ণ 'অদিতি'কে ভূমি অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আরও অনেক দেবতা যে 'অদিতি' তাহাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। অশ্বিদ্বয় (১০।৩৯।১১ ভাষ্য), দেবমাতা (১৮৯।৩ ভাঃ), নদী (৭।১৮।৮ ভাঃ), বরুণ (৭।৮৭।৭ ভাঃ), গো (৯।৯৬।১৫ ভাঃ) ইত্যাদিকেও সায়ণ অদিতি বলিয়াছেন।

(গ) বেদরত্ন মহাশয় ১০।৭২।৪ ঋকের এই অর্থ করিয়াছেন—"তেজ (অদিতি) হইতে জল (দক্ষ) জল (দক্ষ) হইতে ক্ষিতি (অদিতি) জন্মিয়াছে।"

একই ঋকে এক অদিতির অর্থ 'তেজ' এবং অপর অদিতির অর্থ 'ক্ষিতি'—ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। এই ঋকে 'অদিতি' অর্থ ক্ষিতি হইতে পারে না, কারণ ঐ ঋকের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে—

ভূঃ জজ্ঞে উত্তানপদঃ অর্থাৎ উত্তানপদ হইতে ভূমি জন্মিয়াছে। এখানে ভূমির উৎপত্তির কথা বলা হইল; দ্বিতীয়বার আবার ভূমির উৎপত্তির কল্পনা কেন?

বেদরত্ন মহাশয় "দ্যৌরদিতি" অংশের অর্থ বুঝিতে ভুল করিয়াছেন, সেইজন্যই ১০।৭২।৪ অংশের অনুবাদে অদিতির অর্থ করিয়াছেন তেজ।

(ঘ) বেদ-রত্ন মহাশয়ের প্রণালী অবলম্বন করিলে প্রত্যেক বাক্যেরই বহু অর্থ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ১০।৭২।৪ অংশের এই অর্থ করা যাইতে পারে—"দ্যৌ (অদিতি) হইতে অগ্নি (দক্ষ) জন্মিলেন, এবং অগ্নি (দক্ষ) হইতে বরুণ (অদিতি) জন্মিলেন।"

অধিক মন্তব্য অনাবশ্যক।

— মহেশচন্দ্র ঘোষ

ইটো কুমারের পূজা

বর্ত্তমান মাসের প্রবাসীতে পাবনা জেলায় অনুষ্ঠিত "গার্সি" ব্রতের উল্লেখ দেখিলাম। বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় নানা প্রকার মেয়েলী ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ক্রমে ক্রমে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে উহার কতকগুলি লোপ পাইয়াছে ও পাইতেছে। এই-সব ব্রত-কথা সংগ্রহ করিলে গ্রাম্য ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগ্রহ হইতে পারে। পাবনা জেলায় ঐ প্রকার আর-একটি ব্রতের নাম "ইটো কুমারের পূজা"। এই ব্রত বা পূজা পাবনা ও নদীয়ার কতক অংশে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি। অন্য কোথাও হয় কি না জানি না। এই পূজা বা ব্রত কেবল মাত্র বালিকা ও কুমারীগণেরই অনুষ্ঠেয়। বিবাহিতা বালিকাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই পূজায় পুরোহিত প্রয়োজন হয় না, বালিকা ও কুমারীগণ স্বয়ং এই পূজার পুরোহিত।

আমার অনুমান হয় এই ব্রত প্রাচীন বসন্তোৎসবের গ্রাম্য সংস্করণ। যখন মাঘ মাসের সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত শীতের অবসানে সরস বসন্ত আসিয়া দেখা দেয়, তরু ও গুল্ম চারিপার্শ্বে নবকিশলয়ে নবীন বাসে সুশোভিত হয়, মলয়-পবন যখন পুষ্প-সৌরভে চারিদিক্ পুলকিত করিতে থাকে সেই মধুময় বসন্ত-সমাগমে গ্রাম্য কুমারীগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে যখন মানব-মনে অলক্ষিতে ধীরে ধীরে নব নব ভাবের উন্মেষ হইতে থাকে, তখন শিক্ষিত অশিক্ষিত বিভিন্ন সমাজে একই ভাব নানা প্রকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে। এই ব্রতোৎসবও, আমার মনে হয় গ্রাম্য অশিক্ষিতা কুমারীগণের সময়োপযোগী মনোভাবের বাহ্য বিকাশ।

"ইটো কুমার" ইষ্ট কুমারের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। ফাল্গুন মাসে বসন্তসমাগমে নানা বালিকা ও কুমারীগণ নব-কিশলয়ে-বিকশিত ফুলের একটি শাখা সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যায় শান্ত শোভায়, নিভৃত চাঁচতলায় প্রস্ফুটিত শিমুল পলাশ প্রভৃতি বন্য কুসুমে তাহাদের ইষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করে।

এই ব্রতের মন্ত্রগুলি প্রায়ই অর্থহীন গ্রাম্য মেয়েলী ছড়া। নানা স্থানে নানা প্রকার ছড়া প্রচলিত। তন্মধ্যে প্রথম উদ্বোধন ও শেষ পূজা সমাপ্তির পর প্রণামের ছড়া সর্ব্বত্রই এক। এই দুইটি ছড়ার অর্থে এই ব্রতোৎসবের উদ্দেশ্য অনুমিত হয়। এই উৎসব ফাল্গুন মাসের প্রথম দিবস হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া প্রতি সন্ধ্যায় সম্পন্ন হয়। শেষ ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিবস পায়সান্ন ভোগ হইয়া রোপিত ফুল-শাখার বিসর্জ্জন হয়।

এই ব্রতের প্রথম উদ্বোধন-মন্ত্র

"ইটো কুমারের মা লো ভিটে বেঁধে দে,
তোর ছেলের যে হবে বাজনা এনে দে॥"

হিন্দু কুমারী বিবাহিতা না হইলে কুল পায় না, তাই অশিক্ষিতা গ্রাম্যকুমারীগণ ফুলের শাখায় দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহার নিকট তাহাদের ইষ্ট কুমারের (ভাবী বরের) মাতার উদ্দেশ্যে তাহার পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

শেষ প্রণামের মন্ত্র—

"এবার যাও ঠাকুর ফোট পাচড়া বয়ে।
আর বার এসো তুমি শঙ্খ সিঁদুর লয়ে॥"

হে দেব! তুমি এবারে "ফোট পাচড়া" অর্থাৎ আমাদের আপদ্ বিপদ অমঙ্গলগুলি লইয়া যাও, আগামী বর্ষে আমাদের জন্য শাঁখা-সিঁদুর লইয়া আসিয়ো। বিবাহিত জীবনের জন্য ইষ্ট প্রার্থনা।

এই ব্রত কোন্ কোন্ জেলায় কতদিন হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে? এই ব্রতের উদ্দেশ্য ও অর্থ কি? কেন ইহা একমাত্র কুমারীগণেরই অনুষ্ঠেয়? ইহা কি প্রাচীন বসন্তোৎসবের গ্রাম্য সংস্করণ নহে? ভরসা করি এসম্বন্ধে যদি কাহারও কিছু জানা থাকে এই বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া সুখী করিবেন।

— শ্রী কুঞ্জলাল সাহা

চীনা বিশেষণের অর্থ

ফাল্গুন মাসের ১৩৬নং প্রশ্নের উত্তরে চৈত্র মাসে শ্রী শ্যাম ভট্ট মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে চীনা বিশেষণটি চিনির শুভ্রতা লক্ষ্য করিয়া হইয়া থাকিবে। তাহা সম্পূর্ণ ভুল। চীনে বাদাম, চীনে আলু, চীনে মাটি প্রভৃতি ঐ নামধেয় দ্রব্যগুলি যে সর্ব্বপ্রথম চীন দেশ হইতে আনীত হইয়াছিল সে বিষয়ে অকাট্য ও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ আছে। আবশ্যক হইলে কেবলমাত্র George Watt-এর Economic Products of India দেখা যাইতে পারে। শুধু আমাদের দেশে

কেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও চীনা বাদাম ও চীনা আলু চীন দেশ হইতে নীত হইয়া চাষ আবাদ হইতেছে। এখনও চীন দেশের পূর্ব্বাংশে ঐ বাদাম এত উৎপন্ন হয় যে অন্য কোথাও তত পরিমাণ হয় না। চীনা মাটি বা china clay হইতে চীন জাতি অতি পুরাকাল হইতেই porcelain তৈয়ারী করিতেছে। উহা পাশ্চাত্যে chinaware নামে পরিচিত। এই শিল্পে উহারাই অন্যান্য জাতির পথ-প্রদর্শক।

এই সূত্রে বলিয়া রাখি যে মানব-সমাজ রেশম এবং চায়ের জন্যও প্রধানতঃ চীন দেশের নিকট ঋণী।

শ্রী জীবনতারা হালদার

—

"সাঁওতালী ভাষা"

বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রী কালীপদ ঘোষ মহাশয় "সাঁওতালী ভাষা" নামধেয় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কালীপদ-বাবুর প্রবন্ধোক্ত কোন কোন সাঁওতালী শব্দের সহিত বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শব্দের আশ্চর্য্য জনক সাদৃশ্য রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। চির-অসভ্য বুনো সাঁওতালীদের ভাষার শব্দের সহিত বাঙ্গলা ও সংস্কৃতের এরূপ অপূর্ব্ব সাদৃশ্য কোথা হইতে কি প্রকারে সংঘটিত হইল তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। আমরা ভাষাতত্ত্ববিদদের সুবিধার্থে এস্থানে কালীপদ-বাবুর প্রদত্ত কোন কোন শব্দের আলোচনা করিতেছি।

বাঙ্গলা	সাঁওতালী	সংস্কৃত
গাছ	দারে	দারু
কাটারি (দা)	দাত্রম্	দাত্র
কাঁথা	খান্তা	কন্থা
খাট	পারকোম্	পর্য্যঙ্কম্
ব্যাঘ্র	তারূপ	তরক্ষু

বাঙ্গলা	সাঁওতালী
কোদাল (কুড়াল)	কুড়ি
বেগুন	বেঙ্গার
চাঁদ	চাঁদোবোঙ্গা
যাব (চলে যাইব)	চলা যাঁই
বর্শা (বল্লম)	বরৃছি

বিশুদ্ধ বাঙ্গলা	সাঁওতালী	দেশজ বাঙ্গলা (পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত)
গাই	ডাংরি	দামৃরি
বলদ (গোরু)	ডাংরা	দামৃরা
ভেড়া	মেড়্হিঁ	মেড়া

সাঁওতালগণ ছাগলকে "মেরম্" বলে; পূর্ব্ববাঙ্গলায় ভেড়াকে "মেড়া" এবং ভেড়ীকে "মেড়ী" বলিয়া থাকে। পাহাড়কে সাঁওতালীরা "বুড়ু" বলে; পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত কোন-কিছুর উচ্চতা ও বিস্তৃতিজ্ঞাপক "বুউড়া" ও "বুউড়" শব্দের সহিত "বুড়ুর" সুন্দর মিল রহিয়াছে। ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে উলুস্তূপ, মাটির টিলা অথবা অন্য কোন জিনিষের স্তূপকে সময় সময় "বুউড়" বা "বুউড়া" বলে। যথা—"ঐ উলুর বুউড়াটা অত্যন্ত উঁচু" "ওখানে একটা ধানের বুউড় দিয়াছে।" অথবা "বুউড়" শব্দ "ভূমি" শব্দের রূপান্তর কি না তাহা সুধীবর্গের বিচার্য্য।

সাঁওতালীরা বাঁশকে "মাচটু" বলে; আমরা বাঁশকে "মাচট্" না বলিলেও, বাঁশের দ্বারা "মাচা" বা "মাচান" তৈয়ার করি।

জঙ্গলকে সাঁওতালীরা "বীর" বলে। ফার্সীতে কোন পতিত, অনাবাদী, মনুষ্যসমাগমরহিত, পারত্যক্ত অথবা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানকে "বীরান" বলে। ঘোড়াকে সাঁওতালীরা "সাদোম্" বলে; ফার্সীতে বোধ হয় "সাতক" বলে। যথা—"সে সাতক দৌড়ায়।"

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী

যোগি-জাতি

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন দেবনাথ, শ্রীযুক্ত রমেশ্রমোহন নাথ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ নাথ ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার ভৌমিক "যোগিজাতি" প্রবন্ধের প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই যোগীদের উৎপত্তি বা সমাধিপ্রথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদগুলি এত অবান্তর কথায় দীর্ঘ যে, সমস্ত ছাপিবার স্থান প্রবাসীতে হইল না। উহাতে অনেক স্ববিরোধী কথাও আছে, যেমন—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার ভৌমিক লিখিয়াছেন যে, "যোগিগণ যোগীর ব্রাহ্মণ নহে, কেন না নোয়াখালী ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্য কোথাও যোগীর ব্রাহ্মণ নাই ও ছিল না।" লেখক নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, তিনটি জেলায় আছে। আমার প্রবন্ধে আমি স্পষ্টই লিখিয়াছি—"যোগিজাতি আপনাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'একটি' বিবরণ দিয়া থাকে।"—৭৬০ পৃষ্ঠা, ১ম কলম। এই 'একটি' শব্দের অর্থ যে অন্যতম তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। "১৮৮৩ সালে ডাক্তার ওয়াইজ মৃতের সৎকার-পদ্ধতি এইরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আর সকল জায়গায় রীতিও একরূপ নয়।" —৭৫৯ পৃষ্ঠা ১ম কলম। ১৩৩০ সালের বৈশাখসংখ্যা সৌরভের ১১০ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত তারিণীকান্ত মজুমদার "যোগীজাতি" শীর্ষক আলোচনায় লিখিয়াছেন—

"যোগীজাতি ধর্ম্মচর্চ্চা হারাইয়া অধঃপতিত হওয়ার পরে ন্যূনাধিক শতবৎসর মধ্যে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। ইহারা শবদেহের সমাধির পরিবর্ত্তে দাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, একথা ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বেও অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনা গিয়াছে। এখন অনেক স্থানে সমাধি-প্রথা প্রচলিত আছে।"

১৩২৮ সালের ১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা "যোগিসখা" পত্রে "সমন্বয় সমস্যা" নামক প্রবন্ধে শ্রী অরবিন্দবন্ধু নাথ, এফ্-টি-এস্ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গবাসী যোগিগণ যে মৃতের সমাধি-প্রথা পালন করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই,—"এ বিষয়ে বোধ হয়, আমাদের পূর্ব্ববঙ্গীয় ভ্রাতাগণ সমাধিপ্রথা পালন করিয়া তাহার শ্রাদ্ধাদি বৈদিক ক্রিয়া অশাস্ত্রীয় কার্য্যই করিয়া থাকেন।" যোগিসখা, ১৮শ বর্ষ, ২য় সং, ১২০ পৃঃ। পূর্ব্ববঙ্গবাসী যোগিগণ-মধ্যে সমাধি প্রথা প্রচলিত না থাকিলে অরবিন্দবন্ধু-বাবু—তিনি নিজে একজন যোগী—এমন কথা বলিবেন কেন? যদিও তাঁহার মতে ইহা অশাস্ত্রীয় কার্য্য, তথাপি পূর্ব্ববঙ্গীয় যোগিগণ যে উক্ত প্রথা পালন করেন, ইহা তিনি স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

যোগীরা স্থানবিশেষে এবং মতভেদে ক্বচিৎ কোথাও শবদাহ করিলেও, সাধারণতঃ তাঁহারা যে তাঁহাদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যোগীদের মাটি-দেওয়ার প্রথা এক অদ্ভুত রকমের; তাঁহাদের সহিত মুসলমানদের কবর দেওয়ার প্রথার কোন ঐক্য নাই। যোগীরা একটি গোলাকার গর্ত্ত করিয়া এবং তন্মধ্যে তাঁহাদের মৃতকে পদ্মাসন করিয়া বসাইয়া মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখেন। ইহা অনেকটা গুঁজিয়া রাখার ন্যায়। যোগীদের মাটি দিবার এই অদ্ভুত প্রথাকে অবলম্বন করিয়া বিক্রমপুরে ও ত্রিপুরা প্রভৃতি জিলায় লোকে ক্রোধবশে বা দুঃখে কাহাকেও গালি বা অভিশাপ দিতে হইলে বলিয়া থাকে—"তোকে যোগি-মাটি দিব।" বস্তুতঃ ইহা কতকটা নিষ্ঠুরতা-পরিজ্ঞাপক বিধায় অধুনা পূর্ব্ববাঙ্গলায় তাহা গালিরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী

[এ বিষয়ে বাদানুবাদ বন্ধ হইল।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

বাংলা
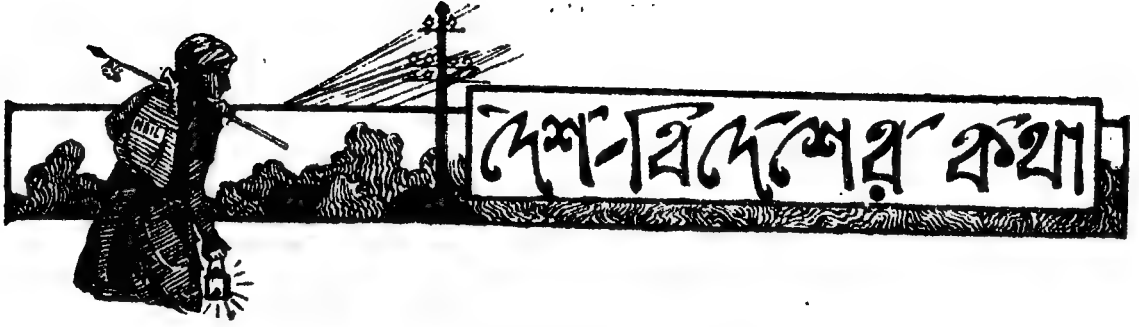
বাঙালীর জন্মমৃত্যুর তালিকা—

১৯২০-২১ সালের সরকারী স্বাস্থ্য-বিবরণে পঞ্চ বিভাগের শতকরা হ্রাসবৃদ্ধির মোটামুটি হিসাব এই :—

বর্দ্ধমান—৪০৯ (হ্রাস)
প্রেসিডেন্সি—২০৩ (বৃদ্ধি)
রাজসাহী—২০০ (বৃদ্ধি)
ঢাকা—৬০৩ (বৃদ্ধি)
চট্টগ্রাম—১১৯ (বৃদ্ধি)

১৯২০-২১ সালে সমগ্র বঙ্গের জন্মমৃত্যুর সংখ্যা ও হার এই :—

	জন্ম	মৃত্যু
১৯২০ সালে—	১৩৫৯৯১৩	১৪৮১৬১২
১৯২১ সালে—	১৩০১০০১	১৪০৩০০০

অর্থাৎ ১৯২০ সালে বাংলা দেশে জন্মমৃত্যুর হারের তুলনা করিলে হাজার-করা জন্মের কোটায় পড়ে ৩০০০ ও মৃত্যুর কোটায় পড়ে ৩২০৭ এবং সেইরূপ ১৯২১ সালে পড়ে যথাক্রমে ২৮০০ ও ৩০০১।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনা করিলে বাংলায়ই জন্মের হার কম এবং মৃত্যুর হার বেশী দাঁড়ায়। ১৯২১ সালেরই বিলাতের মৃত্যুহার দেখা যায় যখন মাত্র ১২০১ তখন বাংলার মৃত্যুহার হইয়াছে ৩০০১ অর্থাৎ আড়াই গুণ বেশী।

—বঙ্গবাণী

উত্তরবঙ্গের বন্যা—

উত্তরবঙ্গ-সাহায্য-সমিতি :—বর্ত্তমানে ত্রয়োদশটি কেন্দ্রে সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে। কয়েক হাজার পরিবারকে চাউল প্রস্তুত করিবার জন্য ধান্য দেওয়া হয়। লোকের দুর্দ্দশা এখনও এত বেশী যে ৩ মাইল দূর হইতেও লোক ধান্য লইতে আসে। গবাদি পশুরও খাদ্যের খুব অভাব হইয়াছে। সাহায্য-সমিতি দশ হাজার টাকার পশুখাদ্য ক্রয় করিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়াছেন। পতিসার অঞ্চলে প্রায় ৬০০ বিঘা জমি কলের লাঙ্গলের দ্বারা চাষ করান হইয়াছে। কালিকা-পুরের বাঁধ সমিতির পক্ষ হইতে সংস্কার করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। তাহা হইলে প্রায় ছয় হাজার বিঘা জমি আত্রেয়ীর বন্যা-প্লাবন হইতে রক্ষা পাইবে।

ঔষধ দানের কার্য্যও সুন্দররূপে চলিতেছে। স্থানে স্থানে কলেরার আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু সত্বর প্রতিবিধান করায় তাহা ব্যাপক হইতে পারে নাই। পানীয় জলের অভাবের জন্য প্লীহা আমাশয় আদি ব্যারাম হইতেছে। আত্রাইএ একটি টিউব ওয়েল বসান হইয়াছে। আরও বসাইবার আয়োজন হইতেছে। বস্ত্রাদির অভাব এখনও খুব বেশী। অনেক স্ত্রীলোক বস্ত্রাভাবে ঘরের বাহির হইতে পারিতেছে না।

—সত্যবাদী

বাঙ্গালার জলকষ্ট—

চতুর্দ্দিক হইতে জলকষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, গ্রামবাসীগণ কর্দ্দমাক্ত জল পান করিয়া ম্যালেরিয়া, কলেরার কবলে পতিত হইতেছে, ইহার কি কোন স্থায়ী প্রতিকার নাই? কিছুদিন পূর্ব্বে যে জেলা-বোর্ড-সমূহের প্রতিনিধিগণকে লইয়া কলিকাতায় এক সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে স্থির হইয়াছে যে ইউনিয়ান্ বোর্ড সকল ট্যাক্স্ আদায় করিয়া নূতন পুষ্করিণী খনন এবং পুরাতন পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার করিবে। শুনিতে বেশ, কিন্তু প্রজা ত আর পারে না, প্রজার অবস্থা চরমে উঠিয়াছে, তাহারা আর এক পয়সা অতিরিক্ত কর দিতেও অশক্ত। এখন জলকষ্ট দূর করিতে হইলে জমিদার, ধনী ও গবর্ণমেণ্টের সমবেত চেষ্টা চাই, গরীবের উপর ভার দিলে চলিবে না। যদি গবর্ণমেণ্ট অন্ততঃ এক কোটী টাকার (ঋণ করিয়া হইলেও) দ্বারা শৈবালদলে আচ্ছন্ন পুরাতন পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার করিয়া দেন এবং জেলার প্রধান রাজপুরুষগণ প্রজার জলকষ্ট নিবারণের জন্য জমিদার ও ধনীবৃন্দকে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে ১০ বৎসরের মধ্যে যে বাঙ্গালাদেশ হইতে জলকষ্ট দূর হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জেলা-বোর্ডগুলিরও উচিত কিছুদিন রাস্তাঘাটের, এমন কি শিক্ষার, ব্যয় হ্রাস করিয়াও জলকষ্ট দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা। লোক বাঁচিলে ত রাস্তায় হাঁটিবে বা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবে। আগে বাঁচিতে দিন, পরে অন্য কথা।

—যশোহর

বাংলার ব্যাধি—

বাঙ্গলার নানা স্থান হইতে কলেরার সংবাদ আসিতেছে। আকাশে মেঘের চিহ্নটি পর্য্যন্ত নাই—রৌদ্রে মাটি পুড়িয়া পুড়িয়া পাথর হইতেছে। পল্লীগ্রামে পুকুর, খানা, ডোবা যাহা ছিল তাহা শুকাইয়া হয়ত কোথাও একবিন্দু জল রহিয়াছে। জলাভাবে লোকে তাহা পান করিয়াই যে অনেক ক্ষেত্রে কলেরা-রোগাক্রান্ত হইতেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কলেরা কিছুতেই বন্ধ হইবে না। স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে এখনই উৎপর হউন। গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করাই এখন দরকার। এজন্য যে টাকার প্রয়োজন, অন্য দিকে খরচ কমাইয়া তাহা দেওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা লোকের মৃত্যু অনিবার্য্য।

—রায়তবন্ধু

কালাজ্বর এখন আসামের গণ্ডী ছাড়িয়া বাঙ্গালার পূর্ব্ব-সীমান্ত হইতে পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত দখল করিয়া বসিয়াছে। ম্যালেরিয়া-জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া প্লীহা যকৃৎ স্ফীত হইয়া কালাজ্বরে পরিণত হয়। বঙ্গদেশে দশ লক্ষাধিক লোক প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া-জ্বরে

মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তন্মধ্যে অন্তত অর্দ্ধেক লোক কালাজ্বরে মারা যায়। কালাজ্বর একপ্রকার ক্ষয় রোগ। কালাজ্বরাক্রান্ত রোগীগণকে দেখিলে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। ইহার কি প্রতিকার নাই? কলিকাতায় গিয়া ইন্‌জেক্‌শন দেওয়ার মত শক্তি দরিদ্রের নাই। গবর্ণমেণ্ট্‌ দেশবাসী এবং দেশের চিকিৎকগণ সত্বর অবহিত হউন। তাঁহারা সত্বর কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন।

—যশোহর

বাংলার কত লোক যক্ষ্মারোগে প্রতি বছর আক্রান্ত হয়,—

১৯১৫ সালে—৬৬০৮

১৯১৯ সালে—৬৯৮৮

—সনাতন

ভারতবর্ষে অন্ততঃ ১০ লক্ষ কুষ্ঠী আছে। ভিতরে ভিতরে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে অথচ বাহিরে ব্যাধি পুরাকমে প্রকাশ পায় নাই—এরূপ লোকের সংখ্যাও এদেশে নিতান্ত কম নহে। ডাক্তার মুয়ার বলেন, এ ব্যাধি দরিদ্র এবং রাজাদের ব্যাধি। দরিদ্রেরা উপযুক্ত খাদ্যাভাবে যখন হীন-স্বাস্থ্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, রোগের জীবাণুকে বাধা দিবার ক্ষমতা তখন আর তাহাদের থাকে না। আর রাজাদের বেলায় তাহাদের নিষ্কর্ম্ম অলস জীবন তাহাদের দেহকে এই ব্যাধির অনুকূল করিয়া তুলিয়াছে। ডাক্তার মুয়ারের মত, কলিকাতার বাসীন্দাদের অপেক্ষা কলিকাতায় যে-সব লোক মফঃস্বল হইতে দুই চার দিনের জন্য আসে তাঁহাদেরই এ ব্যাধির ছোঁয়াচে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বেশী। কারণ কলিকাতার যাহারা থাকে তাহাদের দেহ এই রোগের সংস্রবে আসিতে আসিতে রোগটাকে বাধা দিবার একটা শক্তি অর্জ্জন করে। কিন্তু মফঃস্বলের লোক এ ব্যাধির সংস্রবে বেশী আসে না, সুতরাং বাধাদানের শক্তিও তাহারা অর্জ্জন করিতে পারে না। এই ব্যাধিটি রাস্তার ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুকদের অপেক্ষা অন্যান্য জিনিষের মারফৎই আমাদেরই দেহের ভিতর সহজে প্রবেশ করে। মাখন, অন্যান্য খাদ্য প্রভৃতি কুষ্ঠ রোগের বিশেষ বাহন। কুষ্ঠ রোগ দুর্নিবার্য্য ব্যাধি নহে, চেষ্টা করিলে এই ব্যাধিটিকে অনায়াসেই বাধা দেওয়া যায়। ডাক্তাররা যদি এই রোগটা লইয়া অনুশীলন করেন এবং অনুশীলনের ফল প্রকাশ করেন, জনসাধারণ যদি স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি জানে ও পালন করিয়া চলে, তবে এ ব্যাধিটার আক্রমণ নিবারণ করা যায়, ইহাই ডাক্তার মুয়ারের অভিমত। প্রমাণ স্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন—ইউরোপীয়ানরা এই স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বেশী খবর রাখে বলিয়াই এত বেশী কুষ্ঠীর মধ্যে থাকিয়াও রোগাক্রান্ত হয় না। কেবল মাত্র কুষ্ঠ নয়, প্রায় সমস্ত ব্যাধিই যে ভারতবর্ষে এত রুদ্র মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইবার সুবিধা পায়, তাহার কারণ স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মগুলি সম্বন্ধে আমাদের অপরিসীম অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা ঘুচাইতে পারিলে ভারতের অনেক বড় বড় সমস্যারই যে সমাধান হয় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

—স্বরাজ

বঙ্গে অপরাধের তালিকা—

খুন

১৯২২ সালের অক্টোবর নবেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গলাদেশে মোট ১৩০টি খুনের খবর পাওয়া গিয়াছে। ১৯২১ সালের এই তিন মাসে মোট ১২০টি এবং ১৯২২ সালের জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে মোট ১৪৫টি খুন হইয়াছে।

ডাকাতি

১৯২২ সালের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ১৫৬টি ডাকাতি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর এই তিন মাসের ও ১৯২২এর অক্টোবরের পূর্ব্ব তিন মাসের ডাকাতির সংখ্যা যথাক্রমে ১৩৩ এবং ১১০।

দাঙ্গা

১৯২২ সালের শেষ তিন মাসে ৬৮৪টি দাঙ্গা সংঘটিত হইয়াছে। ১৯২১ সালের এই তিন মাসে ৩৭৮ এবং ১৯২২ সালের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসে মোট ২৯২টি ডাকাতি হইয়াছে।

চুরি

১৯২২ সালের শেষ তিন মাসে ১৫,২৩৭টি চুরি হয়। ইহার পূর্ব্ব তিন মাসে ১৫,৩২২টি এবং ১৯২১ সালের শেষ তিন মাসে ১৪,৮৮৭টি চুরি ঘটিয়াছে।

মোটের উপর অপরাধের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের শেষ তিন মাস অপেক্ষা বেশী হইয়াছে।

—স্বরাজ

বিগত মার্চ্চ মাসে বাঙ্গলা দেশে সর্ব্বসমেত ১৩৮টি ডাকাতি হইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব মাসের ডাকাতির সংখ্যা হইতেছে ৮৭। পূর্ব্ব বৎসর আগষ্ট্‌ মাসে ডাকাতি হইয়াছিল ১৪২টি। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ডাকাতি রাহাজানি এ-সমস্ত উৎপাত-উপদ্রব দিনের পর দিন যেমন বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে ধন-প্রাণ লইয়া নিরাপদে বাস করা লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। সহরের ত কথাই নাই এখানে ঐ-সমস্ত অত্যাচার একরূপ দৈনন্দিন ব্যাপারেই পরিণত হইয়াছে।

—বন্দে মাতরম্‌

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পরিবর্ত্তন—

বঙ্গীয় প্রজা-ভূম্যধিকারী বিষয়ক আইনের পরিবর্ত্তন জন্য যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে তাহা লইয়া দেশের সকল লোকই একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই আইনের পরিবর্ত্তন দ্বারা বঙ্গদেশের প্রায় সকল ব্যক্তিরই স্বার্থের পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভবপর। কাজেই এই উপলক্ষে দেশের লোকের ব্যতিব্যস্ত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে।

নূতন খসড়া দ্বারা এই আইনের পরিবর্ত্তনের যে-সকল প্রস্তাব হইয়াছে তাহার মধ্যে তিনটি বিষয় প্রধান—

প্রথম, প্রজাকে সরাসরি জোতস্বত্ব বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান। দ্বিতীয়, কোর্ফা প্রজাকে সরাসরি জোতস্বত্ব প্রদান। তৃতীয়, বর্গাদারকে বর্গার ভূমিতে প্রজাস্বত্ব প্রদান।

প্রজাকে সরাসরি জোতস্বত্ব বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান সম্বন্ধে সাধারণতঃ প্রজাশ্রেণীর লোক অনুকূলে এবং ভূম্যধিকারী-শ্রেণী উহার প্রতিকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু জোতস্বত্ব বিক্রয়ের জন্য যে একটা আকাঙ্ক্ষা প্রজাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান আইনের অধীনে থাকিয়াও নানা-প্রকার কৌশলে যে প্রজাগণ উহা কার্য্যতঃ বিক্রয় করিতেছে, তাহা ভূম্যধিকারী-সম্প্রদায়ও স্বীকার করিয়াছেন। সাধারণ প্রজা ও ভূম্যধিকারী ব্যতীত দেশের অন্যান্য শ্রেণীর লোকের মতও জোতস্বত্ব বিক্রয়ের অনুকূলে বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। তবে নজরের পরিমাণ কি হইবে, কি প্রকারে উহা আদায় হইবে ইত্যাদি বিষয়ে মতের বিশেষ বিভিন্নতা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কোর্ফা প্রজাকে সরাসরি জোতস্বত্ব প্রদান করা হইবে কি না তৎসম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ প্রকাশিত হইয়াছে। সকল কোর্ফা-প্রজাকে যে এই স্বত্ব প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে তাহা প্রায় সকলেই বলিতেছেন। তবে যে-সকল কোর্ফা-প্রজা দীর্ঘদিন যাবৎ গৃহাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক সপরিবারে কোনও ভূমিতে বসবাস করিতেছে তাহাদিগকে যাহাতে উপরিস্থ মালিক ইচ্ছা করিলেই যখন ইচ্ছা তখন ঐ ভূমি হইতে উচ্ছেদ করিতে না

পারেন তাহার কোনও ব্যবস্থা থাকা উচিত বলিয়া অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোর্ফা-প্রজাকে সরাসরি জোতস্বত্ব প্রদান করিলে তাহার উপরিস্থ সরাসরি জোতস্বত্বের মালীকের যে কিয়ৎ-পরিমাণে স্বত্বের খর্ব্বতা হয় তাহাও অনেকে অনুভব করিতেছেন। তজ্জন্যই এই বিষয়ে আইনের জটিলতা লক্ষ্য করিয়া কেহই বিশেষ নিঃসন্দিগ্ধরূপে মতামত প্রদান করিতেছেন না।

যে-সকল লোক অন্যের ভূমি বর্গা-চাষ করিয়া থাকে তাহাদিগকে ঐ ঐ ভূমিতে প্রজাস্বত্ব প্রদান করা সম্বন্ধে দেশের লোক প্রায় একবাক্যে বলিয়াছেন যে বর্গাদারদিগকে বর্গার ভূমিতে প্রজাস্বত্ব প্রদান করিলে সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের পক্ষেই অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। যাঁহারা জমি বর্গা-পত্তন দিয়া শস্য ভোগ করিয়া থাকেন তাঁহারা এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থা দ্বারা বিশেষ অসুবিধায় পতিত হইবেন। যাহারা বর্গাসূত্রে জমি চাষ করিয়া থাকে তাহারাও এই প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন দ্বারা তাহাদের সামান্য জীবিকার সংস্থান হইতে বঞ্চিত হইবে এই আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। জমির মালীকগণ আর তাহাদের নিকট সহজে জমি বর্গা দিতে চাহিবেন না এবং নিজেরাই চাষাবাদের আয়োজন করিবেন ইহা বুঝিতে পারিয়া বর্গাদারগণও এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছে। দেশের প্রজা, ভূম্যধিকারী ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর লোকেই বর্গা সম্বন্ধে প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। —চারুমিহির

চালের কথা—

বাংলা আসাম উড়িষ্যা মান্দ্রাজ এবং মহারাষ্ট্রের প্রধান খাদ্য চাউল—প্রায় সাড়ে সাতের কোটি লোকের জীবন চাউলের উপরই নির্ভর করে। এই-সকল লোকের জন্য ৩,৩৫,১০,০০০ টন (এক টন ২৭ মন) চাউলের আবশ্যক, কিন্তু গড়ে মাত্র ৩,২০,২০,০০০ টন চাউল পাওয়া যায়। অতএব আবশ্যক অনুসারে চাউলের পরিমাণ অপ্রচুর। প্রয়োজন অপেক্ষা ১০,০০,০০০ টন চাউল কম উৎপন্ন হয়। রেঙ্গুন হইতে চাউল না আসিলে আমাদের অনুপায়। অথচ প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র মণ চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। এই রপ্তানীর জন্যই চাউল এত দুর্ম্মূল্য। এক চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইলেই সমুদয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। —স্বরাজ

হুগলী জেলে অনশন-ব্রত—

সার্চ্চেন্ট্ সংবাদপত্রে প্রকাশ যে হুগলী জেলে আবদ্ধ নেতৃবৃন্দের সকলেরই শরীরের ওজন কমিয়া যাইতেছে। খাদ্য অতি নিকৃষ্ট। সকলেই উদরাময় রোগে ভুগিতেছেন। অধিকাংশ নেতৃবৃন্দই অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। ধূমকেতু-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কাজী নজরুল ইসলামও এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। মৌলবী সিরাজুদ্দীনের অবস্থা নাকি খুবই সংকটজনক।

—সত্যবাদী

গরুর বংশলোপ—

গো-হত্যা—সারা ব্রিটিশ ভারতে বছরে কমবেশ এক কোটি গো-হত্যা হয়। প্রতিবছরেই গরুর সংখ্যা কমে' যাচ্ছে।

—সনাতন

কৃষকের অবস্থা—

আমরা যত দূর বুঝিয়াছি—আমাদের দেশের অভাবগ্রস্ত দরিদ্র কৃষকগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সমবায় সমিতির বহল গঠন ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এদেশের অজগররূপী কুসীদজীবিগণ কৃষকগণের দ্বিতীয় কালস্বরূপ। ইহাদের কবলিত হইয়া কৃষক-সমাজ অনুদিন ধ্বংসের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। ইহাদের দ্বারা বাংলার সহস্র সহস্র কৃষক-পরিবার জোত-জমা-ভিটা-মাটী-হারা হইয়া পথের ভিখারী হইতে বাধ্য হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষকগণের জোত-জমা-সকল মহাজনের পেটে ঢুকিয়াছে। বাংলার কৃষক-সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রত্যেক কৃষক-পল্লীতে সমবায়-সমিতি গঠন করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে মহাজনরূপী মহাকালের ঋণ-নিগড় হইতে রক্ষা করিবার উপায় করিতে হইবে। —যুগবার্ত্তা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতিরক্ষা—

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, সি-আই-ই মহোদয় কান্দি মহকুমার হিন্দু এবং মুসলমানদিগের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র পান্থনিবাস এবং তাহার সম্মুখে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিয়া উহার স্থায়িত্ব বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

—মোহাম্মদী

দান—

মহিলার দান— অত্র জিলার অন্তর্গত কাকরধা-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা মনোরমা ঘোষজায়া প্রায় সহস্র টাকা মূল্যের তদীয় গাত্রালঙ্কার স্থানীয় স্বরাজফণ্ডে প্রদান করিয়াছেন। প্রসন্ন-বাবু বরিশালের বিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত শরৎকুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হন। পূর্ব্বে শরৎ-বাবুর পত্নীও তদীয় মূল্যবান অলঙ্কারসমূহ স্বরাজফণ্ডে দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ও প্রসন্নকুমার ঘোষ ধনবান্ ব্যক্তি নহেন, কিন্তু তাঁহারা দেশের দৃষ্টান্তস্থল হইলেন।

—কাশীপুর-নিবাসী

স্যার রাজেন্দ্রের দান—স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার জন্মস্থান ভ্যাবলা গ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ ও পরিচালনার জন্য তিনি ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

—কাশীপুর-নিবাসী

নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক সম্মিলন—

নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক-সম্মিলনীর অধিবেশনে শিক্ষকগণের উন্নতি-বিধায়ক অনেকগুলি নির্দ্ধারণ গৃহীত হইয়াছে। এ স্থলে নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—(১) এই সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন যে, শিক্ষকগণের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত বঙ্গের হাইস্কুল ও কলেজসমূহের গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আপনাদের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করুন। (২) মেট্রিকুলেশন পরীক্ষকদের শতকরা ৭৫ জনকে সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত করা হউক। (৩) কার্য্যকরী-সমিতিকে অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহারা যেন স্কুলসমূহের ম্যানেজিং-কমিটি, প্রেসিডেণ্ট্, ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট্, সেক্রেটারী এবং হেড্‌মাষ্টার ইঁহাদের কাহার কি কার্য্য তাহা নির্দ্ধারিত করেন, যাহাতে শিক্ষকগণের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। (৪) গভর্ণমেণ্ট্‌কে আবেদন করা হউক তাঁহারা যেন শিক্ষা-বিভাগীয় ডাইরেক্টার মহোদয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে শিক্ষকগণের জন্য সত্বর প্রভিডেণ্ট্ ফণ্ডের ব্যবস্থা করেন। (৫) এই সম্মিলন বঙ্গীয় ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটীর সুপারিশগুলির সমর্থন

করেন এবং গভর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহ হইতে সরকারী সম্পর্ক যত শীঘ্র সম্ভব তুলিয়া লইয়া এবং পরিদর্শন-বিভাগের খরচ কমাইয়া এই অর্থ বঙ্গের সমুদায় প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী স্কুলের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হউক। (৬) পাঠ্যনির্ব্বাচন-সমিতি দ্বারা উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইতেছে, অতএব এই কমিটী তুলিয়া দেওয়া হউক।

—ঢাকা-প্রকাশ

সমাজ-সংস্কার—

বিধবা বিবাহ :—মেদিনীপুর সহরে অল্পদিন মাত্র হইল একটি বিধবা-বিবাহ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত সমিতির চেষ্টায় আগামী শনিবার শাঁকোটি গ্রামে একটি ব্রাহ্মণ জাতীয়া বাল-বিধবার বিবাহ প্রদত্ত হইবে। বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্ম প্রায় দুই শতাধিক টাকার প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই একশত কুড়ি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এখনও প্রায় আশী টাকা অসংকুলান রহিয়াছে। দেশের অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক; আশা করি তাঁহাদের বদান্ততায় এই শুভ অনুষ্ঠানটি নিশ্চিতই সম্পন্ন হইবে। এই উদ্দেশ্যে যিনি অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক তিনি সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত ভাগবতচন্দ্র দাশ উকীল মহাশয়ের নিকট তাহা প্রেরণ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

—সত্যবাদী

সেবক

—

বিদেশ

স্লাভজাতির ভাগ্য-বিপর্য্যয়—

ইতিহাসের ধারায় পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে স্লোভাক জাতির যে বিচিত্র অভিযান-নাট্য চলিয়াছে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহার একটি অঙ্কের অভিনয় শেষ হইয়া গেল। ছিন্নভিন্ন স্লোভাক জাতির বহুযুগ-সঞ্চিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা বিশ্বযুদ্ধের ফলে হঠাৎ সফল হয়। সন্ধিসূত্রে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে একটি ও মধ্য-ইউরোপে একটি স্লোভাক রাজ্যের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। মধ্য-ইউরোপে বোহিমিয়া, মোরাভিয়া ও অষ্ট্রিয়ান সাইলেসিয়া প্রদেশত্রয় লইয়া চেকো-স্লোভাকিয়া রাজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের সার্ভিয়া, মণ্টিনিগ্রো, ক্রোসিয়া, ড্যালমেসিয়া, ষ্ট্রিরিয়া, কার্‌নিওলা, বোস্‌নিয়া প্রভৃতি অঞ্চল লইয়া যুগোস্লাভিয়া রাজ্যের পত্তন হইল। স্লোভাক জাতির মিলনের স্বপ্ন সফল হইল। এক জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে কলহ-বিবাদের ফলে ইউরোপীয় জাতিসমূহ সবল হইতে পারিতেছে না বুঝিতে পারিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্ম্মান দার্শনিকগণ টিউটন জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে সখ্য স্থাপনের জন্য সর্ব্ব-জার্ম্মান আন্দোলনের (Pan Germanism) সৃজন করেন। বিখ্যাত জার্ম্মান দার্শনিক হারডার (Herder) এই আন্দোলনের ঋষি। তাঁহার দার্শনিক আলোচনার ফলে ইউরোপে যে চিন্তা তরঙ্গের সৃষ্টি হইল তাহার ফলে সর্ব্ব-ইটালীয় (Pan Latin), সর্ব্ব-স্বাণ্ডিনেভীয় (Pan Scandinavian) প্রভৃতি নানা আন্দোলনের উৎপত্তি হইল। কলা, সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি জীবনের সকল বিভাগে মিলনের জয়গান বাজিয়া উঠিতে লাগিল। মহামানবের মিলন-গীতি তখন ইউরোপে বাজিয়া উঠে নাই, কিন্তু স্বাজাত্যবোধের বোধন সমস্ত ইউরোপে তখন ঝঙ্কৃত হইতেছিল। মিলনের সেই প্লাবন স্লাভজাতিরও চিত্ততটে আঘাত করিল। কিন্তু স্লাভজাতি এতই ছিন্ন ভিন্ন ও দুর্ব্বল ছিল যে রাষ্ট্রীয় মিলনের কল্পনা তখন তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই স্লাভ দার্শনিকগণ এক লিপি ও এক ভাষা প্রচলনের জন্য নূতন লিপি ও ভাষা সৃজনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবং পরস্পর ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিয়া আর্থিক দুর্গতি হইতে মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। স্লাভদিগের একটি শাখা রুশিয়ানরা কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক শক্তিরূপেই আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই প্রবল পরাক্রান্ত স্লাভ রাজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠযোগ স্থাপন করিতে পারিলে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের স্লাভ জাতির মঙ্গল হইতে পারে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ডব রোভস্কি রুশপ্রীতি (Russophilism) প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। স্লাভ জাতির মধ্যে রুশপ্রীতির বন্যা বহিতে আরম্ভ করিল। আপনার রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পক্ষে এই রুশপ্রীতি ক্ষতিকর ইহা বুঝিতে পারিয়া অষ্ট্রীয়া-সরকার স্লাভনিক আন্দোলনকে দমন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। চণ্ডনীতির চাপে স্লাভ আন্দোলনের বেগ অনেকটা মন্দীভূত হইল। তখন স্লাভ-কালচারের উৎকর্ষ সাধন করিয়া ইউরোপীয় কালচারে স্লাভ-প্রভাবের প্রতিষ্ঠার দ্বারা চিন্তারাজ্যে স্লাভ জাতির সর্ব্বময়ত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া কোলার, সাফারিক, ইয়ুঙ্গম্যান প্রভৃতি স্লাভমনীষীরা স্লাভ-প্রতিভার বিকাশের জন্য নানারূপ প্রচেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের চেষ্টার ফলে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রাগ্ সহরে স্লাভ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। সেই বৎসরই অষ্ট্রীয়ান শাসন-পরিষদে ম্যাগিয়ার-প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করিয়া স্লাভ-প্রভাবের প্রতিষ্ঠার মানসে বিখ্যাত স্লাভ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ গাই (Gai) ইলিরিয়বাদের প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্ট্রীয়ান স্লাভগণকে একমন্ত্রে দীক্ষিত করাই ইলিরিয়বাদ অথবা অষ্ট্রোস্লাভবাদের মূল উদ্দেশ্য। অষ্ট্রীয়ার রাষ্ট্রশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক নব স্লাভরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এই দলের অভিপ্রায় ছিল না। ইঁহারা স্লাভজাতিকে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত করিয়া অষ্ট্রোহাঙ্গেরি রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

চেকো স্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রনীতিক ম্যাসারিকের অধিনায়কত্বে এই ইলিরিয়দল অল্পদিনের মধ্যে খুব প্রভাবশালী হইয়া উঠিল। দর্শন ও বিজ্ঞান রাজ্যে ও রাষ্ট্রতন্ত্রের সকল বিভাগেই ম্যাসারিকের প্রভাব দেখা যাইতে লাগিল। ম্যাসারিক্ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই স্লাভ জাতির অধিনায়ক হইয়া চিন্তাজীবনের সকল বিভাগের পথ-প্রদর্শক হইয়া উঠিলেন। সেই সময় চেকোস্লোভাক জাতির সহসা এইরূপ শক্তিসঞ্চয় সম্ভবপর এরূপ ধারণা হইবার কোনও সম্ভাবনা না থাকায় এবং জার্ম্মানজাতির সহসা এইরূপ দুর্গতি হইবে ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব হওয়াতে ম্যাসারিক্ ঘোষণা করেন :—

"The Czechs must be under no illusion as to their strength. I consider that a population of ten million Bohemians face to face with seventy million Germans, must look to cultural and economic forces for the maintenance of a substantial independence."

রাষ্ট্রীয় অবস্থার প্রতি তাঁহার এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির জন্য তাঁহাকে বাস্তববাদী (Realist) এবং তাঁহার দলকে বস্তুতান্ত্রিকদল (Realist party) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ম্যাসারিক্ এবং তাঁহার প্রিয় ছাত্র বেনিসের চেষ্টায় প্রাগ্ সহরস্থ চেক বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর একটি নামজাদা শিক্ষাশালায় পরিণত হয় এবং কালচারের বিস্তারের একটি নূতন কেন্দ্র হইয়া উঠে। বিশ্বযুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করাও যখন চেক্ জাতির পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিল তখন ম্যাসারিক্ চেক্ সাধারণতন্ত্রের সভাপতি এবং তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র বেনিস্ প্রধান

মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইলেন। ম্যাসারিক্ ও বেনিসের চেষ্টায় চেকরাজ্য ইতিমধ্যেই বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে এবং অষ্ট্রিয়াকেও তাহার বর্ত্তমান দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য চেকরাজ্যের প্রয়াস অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছে। ইঁহাদের কৃতিত্বে ধ্বংসের মুখ হইতে মধ্য-ইউরোপের উদ্ধার সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের স্লাভরাজ্যের অবস্থা কিন্তু অন্তরূপ। যুগো-স্লাভিয়া রাজ্যের দুর্ভাগ্য এই যে সেখানে ম্যাসারিকের ন্যায় কোনও চিন্তাবীর বর্ত্তমান নাই। তাই প্রথম হইতেই যুগোস্লাভিয়া কয়েকটি মারাত্মক ভুল করিয়া বসিয়াছে। জার্ম্মানীকে খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে যখন মিত্রশক্তিবর্গ অধিবাসীবর্গের স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিবার দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া মধ্য-ইউরোপকে বল্‌কান্‌রাজ্যসমূহের ন্যায় বেতালা করিয়া ফেলিবার মৎলবে উড্রো উইল্‌সনের চতুর্দ্দশদফার দফারফা করিয়া সন্ধিসর্ত্তসকলের খস্‌ড়া খাড়া করিতেছিলেন, তখন রাজ্যলোলুপ সার্ভিয়ার লোভ এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে আপনার মিত্র মন্টিনিগ্রো রাজ্যকেও গ্রাস করিতে সে দ্বিধাবোধ করে নাই। গ্রীসের অভিমুখে জার্ম্মান অভিযান বন্ধ করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে গিয়া মন্টিনিগ্রো সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, তথাপি জার্ম্মানীর নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই। আপনার রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট এই বীর জাতিকে বলি দিতে মিত্রশক্তিবর্গ কুণ্ঠিত হইলেন না। মন্টিনিগ্রোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সার্ভিয়ার সহিত ইহাকে যুক্ত করিয়া দিয়া যুগোস্লাভিয়া রাজ্যের পত্তন হইল। যুগোস্লাভিয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখিয়া যদি একটি কেন্দ্রীয় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইত তাহা হইলেও বা যুগোস্লাভিয়ার স্থায়িত্ব লাভের আশা থাকিত। সার্ভিয়ান রাষ্ট্রনীতি-বিদেরা কিন্তু আপনাদের স্বার্থ ও প্রভুত্ব পুরামাত্রায় বজায় রাখিবার জন্য ইহাকে একটি রাজতন্ত্রে পরিণত করিলেন।

তাই যুদ্ধের অবসাদ কাটিয়া যাইতেই যুগো-স্লাভিয়াতে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হইয়াছে। ধর্ম্মগত, ভাষাগত ও লিপিগত বিভেদ লইয়া উক্ত রাজ্যের স্লাভজাতির দুইটি শাখা ক্রোট্‌স্ ও সার্‌বদিগের মধ্যে কলহ বাধিয়াছে। ক্রোট্‌গণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত; সার্‌বগণ অর্থডক্স্ সম্প্রদায়ভুক্ত।

সার্‌বগণ সিরিলিক লিপি (Cyrillic script) ব্যবহার করেন, ক্রোট্‌গণ রোমান অক্ষর (Roman script) ব্যবহার করেন। সার্‌বগণের ইচ্ছাতে, যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেল্‌গ্রেড্ সহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ক্রোট্‌গণ আগ্রামে রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। আগ্রামের সহিত যেমন ক্রোটজাতির বহু পুরাতন স্মৃতি জড়িত আছে, সেইরূপ সার্‌বজাতির অতীত গৌরবের কাহিনী বহন করিয়া বেল্‌গ্রেড নগর ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এইসব নানা কারণে উভয় জাতির মধ্যে মনোমালিন্য এমনই বাড়িয়া উঠিয়াছে যে যুগোস্লাভিয়া রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিবার উপক্রম হইয়াছে। যুগোস্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্যাসিকই এই বিবাদের জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

অষ্ট্রীয়ার অধীনে যখন ক্রোসিয়া ছিল তখন ক্রোসিয়াতে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব ক্রোসিয়াতে বেশ দেখা যাইত। রাশিয়া, সার্ভিয়া প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রান্তিক স্লাভদেশের সভ্যতার ধারা অনেকটা প্রাচ্যধারা অনুসরণ করাতে ইউরোপে রাশিয়া ও সার্ভিয়াকে প্রাচ্যদেশ বলিয়া পরিগণিত করা হয়।

সার্ভিয়ার এই প্রাচ্য রীতিনীতি ও রাষ্ট্রীয় ধারা ক্রোসিয়ার উপর জোর করিয়া চাপাইবার উদ্দেশ্যে ক্রোসিয়ার স্বায়ত্ত শাসনের বিলোপসাধন করার চেষ্টা যুগোস্লাভিয়ার প্রধান মন্ত্রী প্যাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল।

পাশ্চাত্যতন্ত্রের প্রধান পুরোহিত ক্রোসিয়ার সর্ব্বপ্রধান পুরুষ র‍্যাডিচ্ সার্ভিয়ার এই নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপাপন করিলেন। ম্যাগিয়ার জাতির প্রভাব খর্ব্ব করিয়া ক্রোট্-প্রভাব স্থাপনের সহায়তা করিয়া র‍্যাডিচ ক্রোট্ জাতির একচ্ছত্র নেতা হইয়া পড়েন। প্যাসিক-মন্ত্রীসভা র‍্যাডিচকে বিদ্রোহী ঘোষণা করিয়া র‍্যাডিচকে নানা-রূপে অপমানিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। র‍্যাডিচের সত্তর জন অনুচর যুগোস্লাভিয়ার মহাসভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। ফলে মহাসভায় নব নির্ব্বাচনের সূত্রপাত হয়। নির্ব্বাচনের ফলে প্যাসিকের দলের চেয়ে র‍্যাডিচের দলভুক্ত লোকই বেশী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

এখন কৃষাণদল (agrarians) যে দিকে যোগ দিবেন তাঁহাদেরই জয় হইবে। একদল কিন্তু অন্যদলের আদেশ মানিয়া লইবেন এরূপ বোধ হয় না।

আগ্রাম সহরকে রাজধানী করিয়া একটি স্বাধীন ক্রোট রাজ্যের স্থাপনা করিবার উদ্যোগে ক্রোসিয়ার জাতীয়দল চেষ্টা করিতেছেন। যুগোস্লাভিয়াতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠা কিছু বিচিত্র নহে।

অ্যাঙ্গোরা ও রাষ্ট্রনীতিক চালবাজী—

অ্যাঙ্গোরার সহিত একটা রফানিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য নূতন করিয়া সন্ধি-সর্ত্তের আলোচনা করিবার জন্য একটি বৈঠক বসিবার উদ্যোগপর্ব্ব চলিতেছে। মিত্রশক্তিবর্গ "প্রেষ্টিজে"র খাতিরে নানারূপ চাল চালিবেন; কিন্তু পাকা খেলোয়াড় ইস্মৎপাশাকে চালবাজীতে পরাস্ত করা বড় সহজ হইবে না। কাজে কাজেই এই আলোচনার ফল যে কি হইবে তাহা স্থির করিয়া বলা শক্ত। অ্যাঙ্গোরায় কিন্তু কামালের বিরোধী একদল উগ্রপন্থী লোক আপনাদের অধিকার ষোল আনা বজায় রাখিতে চাহেন। যত গোঁড়া মৌলবীরা এই দলের পাণ্ডা, ইঁহারা কামালের সামাজিক মতামত বড় পছন্দ করেন না। কামাল স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী; ইঁহারা তাহার ঘোর বিরোধী। ধর্ম্মমত-সম্বন্ধেও এই দুইদলের মধ্যে মতবিরোধ বড় কম নহে। কামালের বিপক্ষদলের নেতা চুকরী-বে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছেন। গুপ্ত ঘাতকের এই কীর্ত্তিতে কামালের দলের প্রতি গোঁড়াদলের বিদ্বেষ অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাই বিপক্ষদল ভূতপূর্ব্ব সুল্‌তানের পদচ্যুতির বিরুদ্ধে এক আন্দোলন তুলিয়া কামালকে জব্দ করিবার চেষ্টায় ছিলেন। অ্যাঙ্গোরা পার্লামেণ্টে সুল্‌তানের পদচ্যুতি সম্বন্ধে যে সরকারী ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার সমালোচনা রাজদ্রোহের সামিল বলিয়া ঘোষণা করাতে বিপক্ষদলের এই চাল আর টিকিল না। নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে কামালেরই জয় হইয়াছে।

এদিকে কিন্তু এক নূতন গোলযোগের সূত্রপাত ঘটিয়াছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে তুরস্ক সরকারের সহিত ফ্রান্সের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে একটা সন্ধি হয়। ইহাতে এসিয়া-মাইনরের উন্নতির জন্য বন্দর, শহর, রাস্তাঘাট, রেলপথ প্রভৃতি নির্ম্মাণের ভার ফ্রান্সকে দেওয়া হয়। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই এই ব্যবস্থা নাকচ করা হয়। অ্যাঙ্গোরা-সরকার এসিয়া-মাইনরের শ্রীবৃদ্ধিসাধন-সম্বন্ধে অ্যাড্‌মিরাল চেষ্টার নামক একজন নামজাদা মার্কিন ব্যবসায়ীর সঙ্গে এই সম্পর্কে একটা বিলি ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার সর্ত্তানুসারে চেষ্টার অ্যাঙ্গোরা সহরটিকে নূতন করিয়া গড়িয়া দিবেন। তার পর রেল-লাইন বসাইয়া কৃষ্ণ-সাগরোপকূলস্থ সকল সহরের সহিত অ্যাঙ্গোরার ঘনিষ্ঠযোগ সাধন করিবেন। এই কাজ করিয়া দিবার পরিবর্ত্তে চেষ্টার কতকগুলি খনি ভোগদখল করিবার অধিকার পাইয়াছেন। মার্কিনের এই সুবিধায় ফ্রান্স হিংসায় জ্বলিয়া যাইতেছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে সন্ধি

হইয়াছিল তাহা বাতিল না হইয়া এখনও বজায় আছে বলিয়া তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন এবং সেই বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান বন্দোবস্ত চলিতে পারে না বলিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। ফ্রান্স এখন হইতে অ্যাঙ্গোরা-সরকারের পক্ষে যে পূর্ব্বের মত লড়িবেন এরূপ বোধ হয় না, কিন্তু চেষ্টারের সহিত বন্দোবস্ত করার দরুন্ মার্কিন-সরকারকে হাত করিয়া এক বড় কিস্তি জিতিয়া লইয়াছেন। মার্কিন-সরকারের আজকাল যেরূপ প্রতিপত্তি, তাহাতে তাহাকে সহায় পাইলে যে কত সুবিধা হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়া কূট-রাষ্ট্রনীতিবিদ্ কামাল এই চালটি চালিয়াছেন। ফ্রান্স কিন্তু এই ব্যবস্থার জন্য অ্যাঙ্গোরা-সরকারের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছেন। ভার্সাই-সন্ধিসর্ত্তে সিরিয়ার উপর খবরদারী করিবার ভার ফরাসীর উপর ন্যস্ত হয়। ১৯২১ সালে সিরিয়ার হাইকমিশনর বিখ্যাত ফরাসীসেনানায়ক জেনারেল পেল্ এবং বার্ত্তা-শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ফ্রাঙ্কলিন বুলোঁর চেষ্টায় কামালের সঙ্গে ফরাসীর একটি রফানিষ্পত্তি হয়। সেই নিষ্পত্তি-অনুসারে ফরাসী সিসিলিয়া এবং সিরিয়ার কতক অংশ অ্যাঙ্গোরা-সরকারকে ফিরাইয়া দেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে এসিয়া-মাইনরের হারচিট উপত্যকায় রৌপ্য ও লৌহের খনি-সকল চালাইবার অধিকার পাইলেন।

এই বন্দোবস্তের অন্তরালে ছিল ইংরেজ ও ফরাসীর পরস্পর-বিরোধী সাম্রাজ্যলিপ্সা এবং পরস্পরের হিংসাপ্রসূত বিদ্বেষ। তুরস্ক-প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে প্রাচ্যে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি বজায় থাকিবে মনে করিয়া তুরস্ক-প্রভাব অটুট রাখিবার জন্যই ফ্রান্স ম্যাণ্ডেট্-লব্ধ রাজ্যের অনেকটাই অ্যাঙ্গোরাকে ফিরাইয়া দেন। ফ্রান্সের এই আচরণে আস্কারা পাইয়া তুরস্ক আরব ও মেসোপোটেমিয়া ফিরিয়া চাহিয়া বসিলেই ইংলণ্ডের আর নিরুপদ্রবে ম্যাণ্ডেট্-লব্ধ রাজ্য ভোগ করা চলিবে না বুঝিয়া ইংরেজ-সরকার এই বন্দোবস্তের তীব্র প্রতিবাদ করেন। জাতিসমূহের সংঘের অনুমতি ব্যতিরেকে ফ্রান্সের খবরদারী-প্রাপ্ত স্থান ফেরত দিবার অধিকার নাই এই অজুহাতে ইংলণ্ড গোলযোগ আরম্ভ করিলেন। ইংরেজ বলিলেন যে, ফ্রান্স এই সন্ধি-পত্রের দ্বারা কার্য্যত জাতিসংঘকে উপেক্ষা করিয়াছেন। লৌহ, তৈল ও কয়লার মালিকানা লইয়া ফ্রান্স ও ইংরেজের মধ্যে তখন ভিতরে ভিতরে এমনই রেষারেষি চলিতেছিল যে ফ্রান্স তখন ইংরেজের কোন কথাই শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন না। চতুর কামাল ইংরেজ ও ফরাসীর মনোমালিন্যের সন্ধান পাইয়া নিজের বেশ খানিকটা সুবিধা করিয়া লন। এখন কিন্তু ফ্রান্স মার্কিনের কাছে হারিয়া স্বেচ্ছায় দান ফিরাইয়া লইবার চেষ্টায় আছেন। আর্ম্মেনিয়ানদিগের সঙ্গে মুসলমানদিগের বৈরীভাব অনেক দিনের। ফ্রান্স আর্ম্মেনিয়ান্-দিগকে তুরস্কের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন বলিয়া তুরস্কের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশ। ফরাসী আর্ম্মেনিয়ানদিগকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সুসজ্জিত করিতেছেন এই সংবাদ রটনা করিয়া দিয়া অ্যাঙ্গোরা-সরকার সিরিয়ার সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ব্যাপার বিপজ্জনক বুঝিয়া ফরাসী-সরকার ২৫০০০ সৈন্য সমেত জেনারেল্ ওয়েগোকে সিরিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন।

সিরিয়া-সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করা কামালের একটি চাল। সিরিয়াতে কিছু গণ্ডগোল পাকাইয়া লোজান-বৈঠকে কতকটা সুবিধা করিয়া লওয়া ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়।

আইরিশ প্রসঙ্গ—

ভিন্নমার্গাবলম্বী দুইদল আইরিশ স্বাধীনতা-প্রয়াসীদের পন্থা লইয়া বিরোধ এতই তীব্র হইয়া উঠিয়াছে যে হত্যালীলা, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি আয়ার্ল্যাণ্ডে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতা-প্রয়াসী এই উভয় দলের বিরোধ যে ভ্রাতৃ-বিরোধে পরিণত হইয়া আয়ার্ল্যাণ্ডকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আয়ার্ল্যাণ্ডে শান্তিস্থাপনের জন্য রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিত আর্চ-বিশপ হার্টি অনেক চেষ্টা করেন। তাঁহার চেষ্টায় ডি-ভ্যালেরার দল অনেকটা নরম হয়, কিন্তু ফ্রি ষ্টেট দলের দলপতি কস্‌গ্রেভ্ ডি-ভ্যালেরার দলকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিতে চাওয়াতে হার্টির চেষ্টা বিফল হয়। তাহার পর রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু পোপ আয়ার্ল্যাণ্ডে শান্তি স্থাপনের জন্য তাঁহার বিশিষ্ট অনুচর লুজিয়োকে আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রেরণ করেন। লুজিয়ো নিজে আইরিশ এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে সর্ব্বপ্রধান ক্যাথলিক বিদ্যাপীঠ মেনুথ কলেজের ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে পূর্ব্বে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। কস্‌গ্রেভ্ কিন্তু ইঁহার মধ্যস্থতা মানিতে নারাজ। সাধারণতন্ত্রীদলের লোক ছিন্নভিন্ন হইয়া চারিধারে ছড়াইয়া পড়াতে তাহাদিগকে দমন করা স্বরাজপন্থীদিগের সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে। তাই কস্‌গ্রেভ্ আপোসে মিটমাটের কোনই প্রয়োজন মনে করেন না। নিজেদের মতটি ষোলআনা বজায় রাখিবার জন্য কস্‌গ্রেভ্ লুজিয়োর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

এদিকে সাধারণতন্ত্রীদলের মাথার উপর দিয়া মহা বিপদ্ বহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণতন্ত্রীদলের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য সাধারণতন্ত্রীদলের প্রধান আস্তানা ক্রুনমেল অঞ্চলে এক পাহাড়-তলীতে ডি-ভ্যালেরা তাঁহার দলের প্রধানদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে-ছিলেন। এই গোপন বৈঠকের সংবাদ পাইয়া স্বরাজপন্থী সেনাদল তাঁহাদের ঘেরাও করে। এই বিপদ্ হইতে দলপতিকে বাঁচাইবার আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া সাধারণতন্ত্রী সেনাপতি লায়াম্‌লিঞ্চ্ অমিতবলে স্বরাজপন্থীদলকে আক্রমণ করিলেন। আক্রমণের গতিকে প্রতিহত করিতে স্বরাজপন্থীদলকে খুবই বেগ পাইতে হইয়াছিল এবং লিঞ্চ্ যখন স্বরাজপন্থীদলকে এইরূপে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন তখন সুযোগ পাইয়া ডি-ভ্যালেরা কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সহ পলায়ন করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। ডি ভ্যালেরাকে পলাইবার এই সুযোগ করিয়া দিতে গিয়া লিঞ্চ্ নিহত হন। লিঞ্চের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। লিঞ্চের সৎকারের দিন মৃত আত্মার প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনের মানসে সৎকারস্থানে মেরী ম্যাক্‌সুইনি, কাউণ্টেস্ মার্কেভিচ্, কাউণ্ট প্লান্‌কেট প্রভৃতি সাধারণ-তন্ত্রী নেতা ধৃত হন। ইহার কিছু দিন পরে সংবাদ আসিয়াছে যে, গণতন্ত্রীদলের বুদ্ধিদাতা অষ্টিন্ ষ্ট্যাক্‌ও ধরা পড়িয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত এক ডি-ভ্যালেরাই আত্মগোপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে স্বরাজপন্থীরাই বোধ হয় জয়লাভ করিবেন। সুবিধাচারের নিকট পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী হয়তো আয়ার্ল্যাণ্ডে টিকিবে না। কিন্তু অখণ্ড পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য গণতন্ত্রীদলের এই যে প্রয়াস, বিদেশীর অধীনতা-পাশ হইতে আয়ার্-ল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিবার জন্য আইরিশ জননায়কদের এই যে আত্মত্যাগ ইহা বিফল হইবে না। মুক্তিকামী স্বাধীন আত্মার এই যে বার্ত্তা তাহা যুগে-যুগে আয়ার্ল্যাণ্ডকে অনুপ্রাণিত করিবে; নিশ্চল নির্ব্বীর্য্যবাহু কর্ম্মকীর্ত্তিহীন পঙ্গুকেও বল দিবে, ছায়াভয়চকিত মূঢ় ভীরুকাপুরুষকে সাহস দিবে। স্বাধীনতাপথের এই যাত্রা কখনও নিষ্ফল হইবে না।

মিশরের নূতন শাসনতন্ত্র—

ইংরেজ-সরকারের সহিত একটা রফানিষ্পত্তি করিয়া মিশরের শাসনদ্বৈতের বিলোপ এবং স্বরাট্ মিশরের স্থাপন এতদিন পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। ইংরেজ-সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া

করিয়া উঠিতে না পারিয়া একে একে মিশরের অনেকগুলি মন্ত্রীসভার পতন হইল। এদিকে জাতীয় দল অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়া হাঙ্গামা বাধাইতে লাগিলেন; মিশরে অসন্তোষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ব্যাপার কঠিন বুঝিতে পারিয়া ইংরেজ প্রতিনিধি অ্যালেন্‌বি একটু নরম হইলেন এবং স্বরাট্ মিশরের অস্তিত্ব সম্ভব হইল।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই আর একটি নূতন বিপদ্ আসিয়া জুটিল। স্বরাট্ মিশরের শাসন-পদ্ধতি কিরূপ হইবে তাহা লইয়া রাজশক্তির সহিত প্রজার বিবাদ বাধিয়া উঠিল। সুল্‌তান ফুয়াদ রাজশক্তি অব্যাহত রাখিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন; কিন্তু মন্ত্রীসভা তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া গণপ্রভাব বাড়াইয়া দিবার চেষ্টায় রহিলেন। বিপরীত-গামী এই দুই রাষ্ট্রধারার সংঘর্ষে শাসনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিতেছিল না। প্রধান মন্ত্রী রশ্‌দি পাশা যে শাসন বিধির খস্‌ড়া প্রস্তুত করিলেন তাহাতে প্রজাশক্তির প্রাধান্য অসম্ভবরূপে বাড়াইবার চেষ্টা হয়। সে খস্‌ড়াতে সুল্‌তান ফুয়াদ ঘোরতর আপত্তি জানাইতে রশদি পদত্যাগ করেন। তাহার পর নশিম পাশা প্রধান মন্ত্রী হইয়া যে খসড়া প্রস্তুত করিলেন তাহাতে রাজশক্তির ক্ষমতা এত অধিক ছিল যে মন্ত্রীসভা তাহা গ্রহণ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। এই খস্‌ড়া লইয়া মন্ত্রীসভার অন্যান্য সভ্যদের সহিত নশিমের বিবাদ হওয়াতে নশিমের পদত্যাগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

তারপর যেহিয়া পাশার নেতৃত্বে মন্ত্রীসভার সহিত সুল্‌তান ফুয়াদের একটি মীমাংসা আপোষে হইয়া গিয়াছে। তাহারই ফলে মিশরে একটি নূতন শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইল। এই শাসন ব্যবস্থার ধারা মোটামুটি এইরূপ—

মিশর একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয়শাসনে আর ইংরেজের হাত থাকিবে না। মিশরে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজ্যশাসনের অধিকার স্বীকৃত হইবে এবং মিশরের শাসনতন্ত্র রাজতন্ত্র হইবে। ইস্‌লামধর্ম্ম মিশরের রাজকীয় ধর্ম্ম ও আরবী ভাষা রাজভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইবে। যুদ্ধঘোষণা, শান্তি স্থাপন ও মিত্রতা-সাধন করিতে সুল্‌তানকে মিশরের জনসভার মত লইতে হইবে। মিশরের মহাসভা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া মিশরে দ্বিধাবিভক্ত শাসনতন্ত্র (icameral system) প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পুনর্গঠনের অভিপ্রায়ে চেম্বার ভাঙিয়া দিবার, মন্ত্রীমনোনয়ন ও প্রয়োজন হইলে মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা রাজার হস্তে ন্যস্ত রহিল। মিশরে সর্ব্বত্র অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্পও এই খস্‌ড়াতে স্বীকৃত হইয়াছে।

আদ্‌লী পাশা এই ব্যবস্থাগুলিতে সন্তুষ্ট হইয়া সুল্‌তান ফুয়াদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু জগলুল পাশার অনুচরগণ এই ব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা বলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত সামরিক আইন মিশরে বজায় থাকিবে এবং শাসনতন্ত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না স্বীকৃত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত মিশর শান্ত হইবে না। ফাঁকা স্বাধীনতার বুলিতে মিশর আর ভুলিতেছে না। সুতরাং যতদিন আত্মপ্রতিষ্ঠ স্বরাট্ মিশরের সম্ভাবনা সফল না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত জাতীয় দল আন্দোলন হইতে বিরত হইবে না।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

—

ভারতবর্ষ

প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয়—

বারাণসীর নূতন মিউনিসিপ্যাল বোর্ড্ নূতন বৎসরের বজেট পাশ করিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এই বজেটে ৭০ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ১লা মে হইতে প্রাথমিক শিক্ষা সেখানে অবৈতনিক করা হইয়াছে।

বারাণসীর মত একটা মিউনিসিপ্যালিটিতেও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হয়—আর বাংলার রাজধানী কলিকাতা এ উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকার বেশী ব্যয় করিতে পারেন না। অথচ এই বাংলাই নাকি শিক্ষার দিক্ দিয়া ভারতের সকল প্রদেশের সেরা প্রদেশ!

মুল্‌শীতে সত্যাগ্রহ—

মুল্‌শীতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন দিনের পর দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রত্যেক রবিবারেই সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিতেছেন। হনুমান জয়ন্তী দিবসে ৮ জন স্বেচ্ছাসেবককে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করার জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইঁহাদের ভিতর ৪ জন স্ত্রীলোকও আছেন। প্রত্যেক রবিবার মুল্‌শী গ্রামে যাইয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন করা হইবে।

রাষ্ট্রকর্ম্মে রেঙ্গুনের দান—

শ্রীযুক্ত বাজাজ, শ্রীযুক্ত পটেল এবং শ্রীযুক্ত মণিলাল কোঠারী ব্রহ্মদেশে কংগ্রেসের বার্ত্তা প্রচার করিতে গমন করিয়াছিলেন। তিনদিনে তাঁহারা রেঙ্গুন-প্রবাসী গুজরাটী বণিক্‌গণের নিকট হইতে তিলক-স্বরাজ্য তহবিলের জন্য একলক্ষ টাকা আদায় করিয়াছেন। ব্রহ্মের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

'হিন্দু'র সম্পাদকের কারাদণ্ড—

সিন্ধু প্রদেশে 'হিন্দু' পত্রিকার ৮ম সম্পাদক শ্রীযুক্ত চৈৎরাম ভেলেচা ১০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। সুক্কুরের স্বরাজ পত্রের সম্পাদক থাকা কালীন এই একই অপরাধে তাঁহাকে আ'রো এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে।

শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার—

মহাত্মা গান্ধীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রের মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া জরিমানা হইয়াছিল তাঁহার এক হাজার টাকার। গত ১৭ই এপ্রিল তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মুক্তির পূর্ব্বেই জরিমানার দায়ে তাঁহার মোটর গাড়ীখানি নীলামে বিক্রী হইয়া গিয়াছে। দুই হাজার আটশত টাকার দশ হাজার টাকার আন্‌কোরা নূতন গাড়ীখানি বিক্রয় করা হইয়াছে।

বরদারাজুলু নাইডু—

সালেমের প্রসিদ্ধ অসহযোগী কর্ম্মী বরদারাজুলু নাইডু খাজনা দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহার পাঁচ একর পরিমিত জমি নিলামে বিক্রী হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এই একই অপরাধে তাঁহার একখানা মোটরকারও নিলামে চড়ানো হইয়াছিল।

নারী-শিল্প-বিদ্যালয়ে দান—

লাহোরে হিন্দু-শিল্প-বালিকা-বিদ্যালয়ে স্যার গঙ্গারাম একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

মন্ত্রীর ত্যাগ—

বিহার ও উড়িষ্যার স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গণেশ দত্ত সিংহ তাঁহার মাহিনার চারি হাজার টাকার ভিতর হইতে তিন হাজার টাকা দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য দান করিতেছেন।

আমরা ইঁহার ত্যাগ এবং দেশের প্রতি মমত্ববোধের প্রশংসা করি। এ অধ্যায়টা এ দেশের মন্ত্রীদের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন।

চৌরীচৌরার বিচার—

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতিরা চৌরী-চৌরা মামলার রায় দিয়াছেন, ১৯ জন আসামী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ইহারাই নাকি হত্যাকারীদের দলপতি এবং পুলিশের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে প্রধানতঃ দায়ী। কেবলমাত্র তিনজন আসামীকে দাঙ্গাহাঙ্গামার অপরাধে দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। হত্যা এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য ১১০ জন আসামীর প্রতি বিচারপতিরা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিলেও ১৪ জন ব্যতীত বিচারপতিদ্বয় ১৯ জনের ৮ বৎসর, ৭ জনের ৫ বৎসর এবং ২০ জনের তিন বৎসর করিয়া কারাদণ্ডের জন্য গবর্মেণ্টের কাছে সুপারিশ করিয়াছেন। ৩৮ জন আসামীকে মুক্তি দান করা হইয়াছে।

যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণর বিচারপতিদের সুপারিশ মঞ্জুর করিয়াছেন।

সাইকেলে কাশ্মীর—

স্কাউট এক জে দাভার, মিঃ কে ও পঞ্চনি-য়ালা, এবং জি কান্তিরাম সাইকেলের পিঠে চড়িয়া বোম্বাই হইতে কাশ্মীরে পাড়ি জমাইয়া-ছেন। ১৮ই মার্চ্চ বোম্বাই হইতে রওনা হইয়া ৭ই এপ্রিল সাইকেল তাঁহাদিগকে শ্রীনগরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। এই ৩১ দিনে তাঁহারা ১৩৬৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের দৈনিক গতি ছিল, ৬০ হইতে ৭০ মাইল পর্য্যন্ত।

শিবাজীর মর্ম্মরমূর্ত্তি

মিউনিসিপ্যালিটিতে খদ্দর—

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যালিটির একটি অধিবেশনে স্থির হইয়াছে এখন হইতে মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারীদের 'ইউনিফর্ম্ম' বা উর্দ্দি খদ্দরের দ্বারা প্রস্তুত করা হইবে। কেবল মাথার পাগড়ী খদ্দরের হইবে না।

যতই দিন যাইতেছে খদ্দর-প্রীতি লোকের ততই শিথিল হইয়া আসিতেছে। অথচ দেশের একটা বড় শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্যই এ প্রীতিটাকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার। দেশের মিউনিসি-প্যালিটিগুলি চেষ্টা করিলে কেবল মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারীদের পোষাকের ব্যবস্থা করিয়াই নহে আরো অনেক উপায়ে এই শিল্পটিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারেন।

শিবাজীর মর্ম্মরমূর্ত্তি—

গত ১৯শে এপ্রিল পুনায় শিবাজী-মন্দিরে শিবাজীর একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করা হইয়াছে। এই শিবাজী-মন্দিরটি স্বর্গীয় গণপৎ রাও গোখেল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লোকমান্য তিলক, অধ্যাপক লিমাই এবং মিঃ কেলকারকে তিনি ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের উপর শিবাজীর মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ভার অর্পণ করিয়া যান। শিল্পী মিঃ ফড়কে এই মূর্ত্তিটি তৈরী করিয়াছেন।

নাগপুরে সত্যাগ্রহ—

নাগপুরে সত্যাগ্রহ সুরু হইয়া গিয়াছে। গত ২রা মে শ্রীযুক্ত তুলসীরাম লোদীর নেতৃত্বে ১১ জন স্বেচ্ছাসেবক জাতীয় পতাকা হস্তে বাহির হইয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বিচারে ইঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি দুইমাস সশ্রম এবং একমাস অশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বিচারের সময় এই প্রথম দলের দলপতি বলিয়াছেন—যে গবর্মেণ্ট মানুষের জন্মগত সাধারণ অধিকার নষ্ট করে সে গবর্মেণ্টের আদেশ তিনি পালন করিতে পারেন না। অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণও তাঁহার কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

ইহার পরেও স্বেচ্ছাসেবকেরা জাতীয় পতাকা হস্তে বাহির

হইয়া পুলিশের হাতে বন্দী হইতেছেন। পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষ ইস্তাহার বাহির করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন—স্বেচ্ছাসেবকদলের ৫০ হাত ব্যবধানের ভিতর যাহারা থাকিবে, তাহাদিগকেও বে-আইনীদলের লোক বলিয়া গ্রেপ্তার করা হইবে। সরকারী কর্মচারীরা কাছাকাছি থাকিলে তাঁহাদিগের শুভ হইবে না বলিয়া ভয় দেখানো হইয়াছে।

পাটনায় গোহত্যা নিষেধ—

পাটনা সহরের মিউনিসিপ্যালিটি স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাদের এলাকার ভিতর আর কেহ গোহত্যা করিতে পারিবে না। মিউনিসিপ্যালিটির ১৪ জন সদস্য গোহত্যার বিরুদ্ধে এবং ৬জন সপক্ষে ভোট দিয়াছেন।

আইন অমান্যের ইস্তাহার—

জর্জ্জ জোসেফ, পি বরদারাজুলু নাইডু এবং কে সন্তানম্ এক ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন রাজপ্রতিনিধি বিশেষ ক্ষমতার ব্যবহার করিয়া লবণ-শুল্ক বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে স্বরাজ আন্দোলনের পক্ষে এক সুন্দর সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। লবণ-ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করিয়া কংগ্রেস যে কেবল রাজকর্মচারীদের খামখেয়ালেই বাধা দিতে পারিবেন তাহা নহে—ইহার দ্বারা ভারতের জন-সাধারণেরও উপকার করা হইবে। লবণ ট্যাক্স ক মলে সকলেরই সুবিধা। যদি হাজার হাজার ভারতবাসী তাহাদের প্রাপ্য অধিকারের জন্য আইন অমান্য করিয়া জেলে যায় তাহা হইলে পরের অনেক বাধা সহজ হইয়া আসিবে। স্থানে স্থানে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া অকালীদের মত নিয়মিতভাবে এবং শৃঙ্খলার সহিত আইন অমান্য করিতে হইবে। এইরূপভাবে তিনটি মাস যদি কাজ করা যায়, তবে দেশের চেহারা ফিরাইয়া দেওয়া অসম্ভব হইবে না।

লবণ-শুল্কের প্রতিবাদ—

বড় লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতায় লবণের শুল্কটা দ্বিগুণ করিয়া দেওয়ার ফলে আমাদের বড় ব্যবস্থা-পরিষদের অনেক সদস্যের চোখ ফুটিতে সুরু হইয়াছে। যে সভাটাকে জনসাধারণের প্রতিনিধি-সভা বলা হয় সেখানে প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিত্বের জোর যে কতটুকু তাহা এই ব্যাপারে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেই যাঁহাদের আত্মসম্মানের জ্ঞান আছে তাঁহারা খসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। শোনা যাইতেছে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯জন সদস্য নাকি এই ব্যবস্থার প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করিবেন। ইতিমধ্যেই শ্রীযুক্ত হরচন্দরায় বিষণদাস, ও মিঃ সাহানী এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী তাঁহাদের পদত্যাগ-পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। মুন্সী ঈশ্বরশরণ ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী পার্লামেন্টের দরবারে প্রতিকার-চেষ্টা ব্যর্থ হইলেই পদত্যাগ করিবেন বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিলাতে ইহা লইয়া আন্দোলন চালাইবেন শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত কামাট, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস দ্বারকাদাস, শ্রীযুক্ত সমর্থ প্রমুখ কয়েকজন। স্যার মণ্টেগু ওয়েবও বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনিও ইঁহাদের সহিত মিশিয়া দলটাকে জোরাল করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

এইসব আবেদন নিবেদন, উষ্মা প্রকাশের ফল কি হইবে জানি না। তবে ইহার প্রত্যক্ষ ফল বিশেষ কিছু না থাকিলেও, পরোক্ষ ফল হয়তো কিছু আছে। এবং এক্ষেত্রে সেইটাই যা কিছু লাভ।

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি ও খদ্দর—

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীদিগকে খদ্দর ব্যবহার করিতে হইবে এই মর্ম্মে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটিতে মিঃ যমুনাদাস মেটা এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন খদ্দর সস্তা এবং টেকসই। বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীদের পোষাক বাবদ প্রতি বৎসর প্রায় ৩০,০০০ টাকা খরচ হয়। খদ্দর প্রচলিত হইলে ঐ খরচা অনেক কম পড়িবে। রাজনীতির সহিত তাঁহার এ প্রস্তাবের কোনো সম্বন্ধ নাই। মিঃ শেঠনা এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া একটি সংশোধন-মূলক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম্ম—মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীদের জন্য খদ্দর নহে, যথাসম্ভব দেশী কাপড়ের পোষাকের ব্যবস্থা করা সঙ্গত। ভোটে মিঃ মেটার প্রস্তাব বাতিল ও মিঃ শেঠনার সংশোধনমূলক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পাঞ্জাবে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ—

পাঞ্জাবে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ একটা স্থায়ীরকমের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছে। এ বিদ্বেষ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। অল্প-দিনের ভিতরেই অনেকগুলি দাঙ্গা হাঙ্গামাও হইয়া গিয়াছে। পাঞ্জাবের অমৃতসর, মুলতান, যুক্তপ্রদেশের চান্দৌসী, হায়দ্রাবাদের সিন্ধু প্রভৃতি স্থান হইতে যে সব খবর আসিয়াছে তাহা রীতিমত আশঙ্কাজনক। খুন-জখম নারীর প্রতি অত্যাচার এসব একান্ত বেপরোয়াভাবে চলিতেছে। এই-সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে সম্প্রদায়গত বয়কট সুরু হইয়া গিয়াছে। অনেক স্থলেই হিন্দুরা মুসলমানদের দোকান হইতে কোনো জিনিষ ক্রয় করে না, এবং মুসলমানেরাও হিন্দুদের দোকান বয়কট করিয়াছে। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের চাকর প্রভৃতি তাড়াইয়া দিতেছে। কংগ্রেস ও খেলাফৎ নেতারাও সমস্যা সমাধানের কোনো পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

পাঞ্জাব গবর্মেণ্টের একখানি ইস্তাহারে প্রকাশ, মোট ২০৩ জন লোককে এক অমৃতসর হাঙ্গামা সম্পর্কেই সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসা করা হইয়াছে।

মন্ত্রীদের পদত্যাগ—

এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান্ প্রেস ক্রয়ের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার স্যার ক্লদ ডি লা ফস ঘুস গ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ একটা সংবাদ প্রচারের জন্য স্যার ক্লড পণ্ডিত একবালনারায়ণ গুর্টু নামে মানহানির মামলা আনিয়াছিলেন। মিঃ চিন্তামণি যুক্ত-প্রদেশের শিক্ষা-সচিব। এই মামলা আনিবার সময়ে তাঁহার অনুমতি লওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্যার ক্লড তাঁহাকে ডিঙাইয়া গবর্ণরের অনুমতি লইয়া মামলা দায়ের করিয়াছিলেন। গবর্ণরও এ ব্যাপারে শিক্ষা-মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। মন্ত্রীর এই অধিকারের উপর অসঙ্গত হস্তক্ষেপের জন্য শ্রীযুত চিন্তামণি পদত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত জগৎনারায়ণও তাঁহার কাজে ইস্তফা দিয়াছেন।

এই ধরণের ব্যবস্থার ভিতর অধিকারকে খর্ব্ব করাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বস্তু নহে, ইহাতে অপমানের চাপও নেহাৎ কম নহে। চাকরীর মোহে আত্মসম্মান অকাতরে জবাই করে এরূপ লোক ভারতবর্ষে অসংখ্য। কেবলমাত্র অভাবের তাড়নাতেই যে আমরা এরূপ মনুষ্যত্ব হারাইতেছি তাহা নহে—যাঁহাদের অভাব নাই তাঁহারাও অপমান অক্লেশে হজম করিয়া চাকরীটা বাঁচাইয়া রাখেন। দেশের এই দুরবস্থার সময় যুক্ত-প্রদেশের মন্ত্রীদ্বয়ের এই ইস্তফা বিশেষভাবে সময়োপযোগী হইয়াছে।

সম্পাদকের দণ্ড—

পাটনার মাদারল্যাণ্ড পত্রের মানহানি মোকদ্দমার বিচারের রায়

বাহির হইয়াছে। জনৈক অসহযোগী বন্দীর উপরে অত্যাচার করিবার অভিযোগ করিয়া বক্সার জেলার জেলাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য এই মানহানির মামলা দায়ের করা হয়। বিচারে সম্পাদক মিঃ মজরুল হকের প্রতি ১৫ টাকা অর্থদণ্ডের অথবা আদালত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আদালতে আটক থাকিবার শাস্তি প্রদত্ত হইয়াছে। পত্রিকার প্রকাশক শ্রীযুক্ত যদুনন্দন লাল চৌধুরী একমাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

তীর্থযাত্রীদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা—

বদরীনাথ ও কেদারনাথে তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করিবার জন্য সদাব্রত ফাণ্ড্ নামে একটি ফাণ্ড্ আছে। গাড়োয়ালের ডেপুটি কমিশনার এই ফাণ্ডের তত্ত্বাবধায়ক। ফাণ্ডের আয় বৎসরে মোট ৪১,৫০০ টাকা। ইহার ১৬,০০০ টাকা পাওয়া যায় ধর্ম্মকার্য্যে জন্য সম্পত্তি হইতে। বাকি ২৫৫০০ টাকা আসে যুক্ত-প্রদেশের গভমেণ্টের নিকট হইতে। বর্ত্তমানে হাঁসপাতালের খরচ, ঔষধ, ও অন্যান্য জিনিষপত্রের দাম যেরূপভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এই টাকায় সব ব্যয় নির্ব্বাহ সম্ভবপর নহে, অথচ যুক্ত-প্রদেশের গবর্মেণ্টও সাহায্য বাড়াইতে নারাজ। গাড়োয়ালের ডেপুটি কমিশনার ভারতের সকল স্থানের হিন্দুদিগের কাছে এজন্য সাহায্য যাচ্‌ঞা করিয়াছেন। হিন্দুদের যে মুক্তহস্তে সাহায্য করা উচিত তাহা বলাই বাহুল্য।

অকালী বন্দীদের মুক্তি —

অমৃতসরে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গার সময় গুরুদ্বার-প্রবন্ধক-কমিটির উপদেশমত অকালীরা দাঙ্গা নিবারণ করিতে গবমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। এই ব্যাপারে অকালীদের সদাচরণ স্মরণ করিয়া সপারিষদ গবর্ণর গুরু-কা-বাগ হাঙ্গামায় দণ্ডিত কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কেবল জেলে অবস্থিতির কালে কারানিয়ম ভঙ্গ করিয়া যাহারা অপরাধের গুরুত্ব বাড়াইয়াছে তাহারাই মুক্তি পায় নাই। লাহোর ও মুলতান জেল হইতে প্রায় ১৩ শত অকালী মুক্তি পাইয়াছে। এই কারামুক্ত কয়েদীদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অমৃতসরে এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণ তাহাদিগকে পদ্দর ও অন্যান্য সম্মান-চিহ্ন দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছে।

সুন্দরলালের মামলা—

জব্বলপুরের বিখ্যাত নেতা শ্রীযুক্ত সুন্দরলালের মামলার রায় গত ১৬ই এপ্রিল প্রকাশিত হইয়াছে। জাতীয় পতাকা সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা আনা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে তাঁহাকে ছয় মাস শান্তি রক্ষা করিয়া চলার জন্য একখানি একশত টাকার জামিননামায় স্বাক্ষর করিতে বলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় অবশেষে ছয় মাসের জন্য তাঁহাকে অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ছিন্ন কোরান-বার্ষিকী—

মাইজভাগ গ্রামে ছিন্ন কোরানের বার্ষিকী উপলক্ষে জনসাধারণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। জনশক্তির সম্পাদক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবার কোরানের অপমান—

শ্রীহট্টের নটেশ্বর গ্রামের মহম্মদ মোয়াবালী চৌধুরী সম্প্রতি করিমগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একজন গুর্খা ও দুইজন কনষ্টেবলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩ এবং ২৯৮ ধারা অনুসারে এক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ, আসামীরা নটেশ্বর গ্রামে কৃষি-ঋণ আদায় করিতে গিয়াছিল। তাহারা আলিম নামক এক মুসলমানের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া টাকা চায়, কিন্তু টাকা না পাইয়া একটা কাঠের বাক্স খুলিবার জন্য উহার উপরে পুনঃ পুনঃ লাথি মারিতে থাকে। বাক্সের ভিতর কোরান ছিল। সুতরাং মোয়াবালী গুর্খাদের এই কাজের প্রতিবাদ করেন। ইহাতে একজন গুর্খা মোয়াবালীকে প্রহার করিয়াছে। মোয়াবালী এই বৃত্তান্ত সবডেপুটি কলেক্টারের গোচর করিয়াছিলেন, কিন্তু গুর্খা কলেক্টারের সম্মুখেই তাহাকে বন্দুকের কুঁদা দিয়া প্রহার করিয়াছে। মামলা চলিতেছে।

আহ্‌মদাবাদের ধর্ম্মঘট—

আহমদাবাদের ধর্ম্মঘটের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। শ্রমিক বা কলওয়ালা কেহই হটিতে রাজি নহেন। প্রায় অর্দ্ধেক শ্রমিক পল্লী অঞ্চলে ফিরিয়া গিয়া চাষ-আবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সহরে যে-সব শ্রমিক আছে তাহাদের অনেকে রাস্তায় রাস্তায় নানা জিনিষের ফেরি করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে। মোটের উপর এ পর্য্যন্ত কাহাকেও কলের কাজের অভাবে বিশেষ বিপন্ন হইতে হয় নাই। শ্রমিকদের ধনভাণ্ডার নাকি এখনও এতটা স্বচ্ছল আছে যে আরো দুই তিন মাস ধর্ম্মঘটকে টিকাইয়া রাখিতে তাহাদিগকে খুব একটা বেশী রকমের বেগ পাইতে হইবে না। শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার কলওয়ালাদের সমিতির সভাপতি শেঠ মঙ্গলদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সাক্ষাতের ফলে ধর্ম্মঘটের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই।

কলওয়ালাদিগকে জব্দ করিবার অস্ত্র ধর্ম্মঘটের মত আর দুটি নাই। কিন্তু ধর্ম্মঘট সফল করিয়া তুলিতে হইলে সুনিয়ন্ত্রিত চেষ্টা, শ্রমিকদের দৃঢ়তা এবং পিছনে অর্থের জোর থাকা চাই। এগুলি ইউরোপে আছে, তাই শ্রমিকেরা সেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জয়লাভ করে।

প্রাথমিক শিক্ষা—

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় পরিগৃহীত একটি প্রস্তাব অনুসারে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সর্ব্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাই সহরে আর-একটি আইনের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল। কিন্তু গোটা প্রদেশের জন্য এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন ভারতবর্ষের ভিতর বোম্বাই প্রদেশেই সর্ব্বপ্রথম হইল। এবং আর কোনো ভারতীয় প্রদেশে এখন পর্য্যন্তও উহা অবলম্বিত হয় নাই।

জেলে অত্যাচার—

মুলশী সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত কেল্‌কার, শ্রীযুক্ত তাপীদাস প্রভৃতি বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পুনার একটি সাধারণ সভায় শ্রীযুক্ত কেল্‌কার বলিয়াছেন—য়ারবেদা জেলের ভিতর মুলশী সত্যাগ্রহীদের উপর নানা প্রকারের অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছে। জল তুলিবার পাম্পে কার্য্য করিতে না পারায় শ্রীযুক্ত দেশমুখ বাপাত প্রমুখ ৪ জন বন্দীকে ৩০ ঘা করিয়া বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে।

এই বর্ব্বর দণ্ডটি প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই নিষিদ্ধ ব্যবস্থা হইলেও এদেশে অতি অনায়াসেই চালানো হয়। অপরাধী কোন্ শ্রেণীর বা অপরাধের গুরুত্ব কতখানি তাহা বাছাইয়া দেখা হয় না।

পাঞ্জাবে হত্যাকাণ্ড—

পাঞ্জাবের জলন্ধর এবং হোসিয়ারপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি কয়েক জন লোককে হত্যা করা হইয়াছে। গবমেণ্ট্ মনে করিতেছেন, "বাব্বর অকালী জাঠা" নামে একদল বিপ্লব পন্থীর দ্বারা এই হত্যা-কার্য্য সংসাধিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে জলন্ধর কংগ্রেস কমিটির শ্রীযুক্ত লালা হংসরাজ এক বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—এপর্য্যন্ত সাতটি লোক নিহত হইয়াছে। জনরব, এই হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে প্রথমে একখানা বিজ্ঞাপন বাহির করা হয়। তাহাতে কতকগুলি লোককে নির্দ্দেশ করিয়া বলা হয়, তাহারা অন্যায়ভাবে সরকারকে সাহায্য করিতেছে। কাজেই তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। হত্যার পূর্ব্বে নাকি এই-সব লোকের উপরেও মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করা হইয়াছিল।

আদমপুর থানার মান্কো গাড়িয়াল নামক স্থানের এই ধরণের একটি হত্যাকাণ্ডের পর সেখানে মিলিটারী পুলিশ বসানো হইয়াছে। অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও কোথাও যাইতে দেওয়া হয় না। এমন কি আহার করিতে যাইবার অনুমতিও অতিকষ্টে সংগ্রহ করিতে হয়। লোকজন সব নজরবন্দী হইয়া আছে। গবমেণ্ট্ অনেক গ্রামেই নাকি এইরূপ সৈন্য ও পুলিশ স্থাপন করিয়াছেন। এ অঞ্চলের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে।

শুদ্ধি কার্য্যে বাধা—

পাঞ্জাবের রাজপুত সেবা মিশনের সম্পাদক জানাইয়াছেন, আগ্রার সন্নিহিত চারিটি গ্রামের উপর ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে। এই কয়েকটি গ্রামেই শুদ্ধি-কার্য্য অত্যন্ত জোরের সঙ্গে চলিতেছিল। কিন্তু শুদ্ধিক্রিয়া-সম্পর্কে এখন আর কাহাকেও এই-সব গ্রামে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে না। একজন মৌলবীকে একদিন প্রায় ১২ ঘণ্টা কাল আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। একটি মালেকান পরিবারের ৮০ জন লোক হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। কিন্তু পুলিশের নিষেধাজ্ঞার জন্যই তাহারা দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। এ সম্বন্ধে তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে জানাইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত জবাব পায় নাই।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

'তার-ঘরে'

টক্কা টরে টরে
টরে টরে টক্কা,
সিগ্‌নেল পলকেতে
মস্কো কি মক্কা।
হাম্‌বার্গ্ মাল্টা
হংকং পাল্টা
সিড্‌নী কি সাংহাই
মালদ্বীপ, লঙ্কা।

রে টরে টক্কা রে
টরে টরে টক্কা,
এ যে দূত বিদ্যুৎ
পারাবত লক্কা।
হেরে গেল বুর্‌রা
'হুর্‌রা' 'হুর্‌রা',
স্মার্ণায় মার খেয়ে
গ্রীক পেলে অক্কা।

টরে টরে টরে টরে
টরে টরে টক্কা,
আরে ভাই কিছু নাই
এ জীবন ফক্কা।
পাস হলো পুত্র,—
বিবাহের সূত্র,
কনেদের পিতা দেবে
টাকা লুচি ছক্কা।

টক্কা টরে টরে
টক্কা টক্কা,
কোন্ দেশে প্লেগ এলো
কোন্ দেশে যক্ষ্মা।
কোথা লাগে যুদ্ধ,
কেটা অবরুদ্ধ,
এলো দুর্ভিক্ষ—
আর নাই রক্ষা।

টক্কা টরে টরে
টরে টরে টক্কা,
'হকি' কাপ্ জিতে এসে
বাজাইছে ডঙ্কা।
টর্‌পেডো ভাস্‌লো,
ড্রেড্‌নট্ ফাঁস্‌লো,—
সংবাদ ছুটে আসে
রাখে কার তক্কা।

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিবিধ প্রসঙ্গ

হিন্দী সাহিত্যিক পুরস্কার

বৎসর দুই পূর্ব্বে কলিকাতা-নিবাসী বাবু গোকুলচাঁদ হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনকে চল্লিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ এই সর্ত্তে দেন, যে, উহার আয় হইতে ১২০০ টাকার একটি বার্ষিক পুরস্কার তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতা বাবু মঙ্গলাপ্রসাদের নামে স্থাপিত করিতে হইবে, এবং ঐ পুরস্কার হিন্দীতে লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক বা ঐতিহাসিক গ্রন্থের লেখককে দিতে হইবে। এই পুরস্কার সর্ব্বপ্রথমে এই বৎসর পণ্ডিত পদ্মসিংহ শর্ম্মাকে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার বাড়ী নায়ক-নাগ্‌লা, চাঁদপুর, জেলা বিজনোর। তিনি হিন্দী কবি বিহারীর "সাতশই" কাব্যের আলোচনা করিয়া যে বহি লিখিয়াছেন, তাহার জন্য এই পুরস্কার পাইয়াছেন। শর্ম্মা মহাশয় সংস্কৃত, হিন্দী, প্রাকৃত ও উর্দ্দূতে পণ্ডিত। বার বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে যখন তিনি "ভারতোদয়" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তখন দক্ষ সমালোচক বলিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের সেবক-দিগের জন্য এইরূপ পুরস্কার আর আছে কি না, জানি না; বাংলার সাহিত্যিকদিগের জন্য নাই। হিন্দী যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদের হিন্দীর প্রতি অনুরাগ অসামান্য; "হিন্দীপ্রেমী" তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রশংসাবাচক শব্দ।

ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতায় যত হিন্দীভাষী লোক আছেন, হিন্দুস্থানী কোনও শহরে তত লোক নাই। কলিকাতার হিন্দীভাষীদের মধ্যে যেরূপ ধনশালী যত লোক আছেন, হিন্দুস্থানী কোন শহরে সেরূপ ধনশালী তত লোক নাই। এইজন্য, কলিকাতার কোন হিন্দুস্থানী যে হিন্দী সাহিত্যের উন্নতির জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে;—বরং দুঃখের বিষয় এই, যে, এখানকার ক্রোড়পতি হিন্দুস্থানীরা যথোচিত বিদ্যোৎসাহী নহেন।
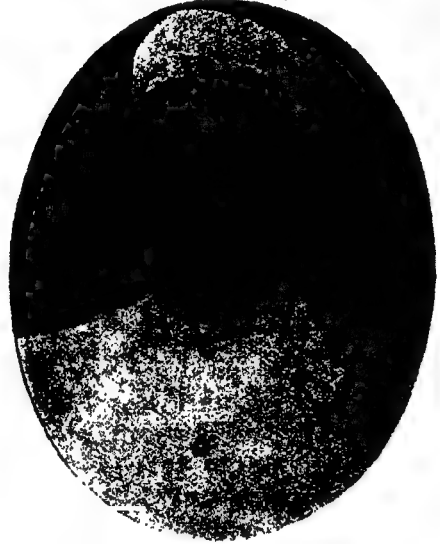
পণ্ডিত পদ্মসিংহ শর্ম্মা

তবে, পুঁথিগত বিদ্যার চর্চ্চা করিলে, যে, টাকা রোজ্‌গার করিবার ক্ষমতা বাড়ে না, তাহা হিন্দুস্থানীদের স্বদেশবাসী বাঙালীদের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিয়া, ব্যবসাদার হিন্দীভাষীরা যদি বিদ্যার প্রতি বিমুখ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, অর্থোপার্জ্জনের দিক্ দিয়া, তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনই জীবনের শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; এবং এমন বিদ্যাও বিস্তর আছে, যাহা লাভ করিলে টাকা রোজ্‌গার করিবার ক্ষমতা বাড়ে।

—

"শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দু বালিকাবিদ্যালয়"

আমরা পূর্ব্বে এই আশ্রম ও বিদ্যালয়টির বিষয় একবার লিখিয়াছিলাম। ইহা এখন, ৫ বি, রাধাকান্ত

স্কিউ ষ্ট্রীট, ধনিয়াবাগান (উল্টাডাঙ্গা), কলিকাতা, এই ঠিকানায় অবস্থিত। ইহার উদ্দেশ্য—

"১। হিন্দুবালিকা ও মহিলাবৃন্দের হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত এবং সমাজোপযোগী শিক্ষা প্রদান।

২। নানাপ্রকার শিল্পচর্চ্চার সাহায্যে এবম্বিধ কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান—যাহাতে মাতৃজাতি অন্যের গলগ্রহ না হইয়াও সদুপায়ে স্ব স্ব উপার্জ্জন দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন।

৩। হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত শিক্ষাদানের নিমিত্ত উপযুক্তা শিক্ষয়িত্রী গঠন।

৪। অসহায়া মহিলাবৃন্দের শিক্ষা এবং আশ্রয় প্রদান।

৫। প্রার্থী গৃহীকে গার্হস্থ্য জীবনের পূর্ণতা, পরাশান্তি এবং আনন্দলাভের উপায় জানিতে সহায়তা করা।

৬। ভারতীয় হিন্দু সমাজের সর্ব্বত্র এই আশ্রম ও বিদ্যালয়ের অনুরূপ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।"

"বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বেদান্ত, গীতা, উপনিষৎ প্রভৃতি এবং হিন্দী ও ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। শিল্পচর্চ্চার মধ্যে বর্ত্তমানে সেলাইকার্য্য, সূতাকাটা এবং বস্ত্র বয়নের উপযুক্ত বন্দোবস্ত রহিয়াছে; ক্রমে অন্যান্য গৃহশিল্প শিক্ষার বন্দোবস্তও হইবে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সুশিক্ষিতা ব্রহ্মচারিণীগণই বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।" "আশ্রম হইতে প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী রূপে ম্যাট্রিকুলেশন, আই এ, বি-এ, ও সর্ব্ববিধ সংস্কৃত পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত আছে। কয়েকটি ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের

আশ্রমের মেয়েরা নির্দ্দিষ্টরূপে কতক বই পড়িতেছে, কতক চরকায় সূতা কাটিতেছে ও সেলাইর কলে কাজ করিতেছে

আশ্রমসম্পাদিকা,	আশ্রমপ্রতিষ্ঠাত্রী	প্রধানাশিক্ষয়িত্রী
শ্রীশ্রীদুর্গাপুরী দেবী	আবাল্যসন্ন্যাসিনী	ব্রহ্মচারিণী
ব্যাকরণতীর্থা	শ্রীশ্রীগৌরীমা	শ্রীমতী সুতপা দেবী

প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী কুমারী শ্রী দুর্গাপুরী দেবী বর্ত্তমানে সম্পাদিকা ও সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে সর্ব্ববিধ কার্য্যপরিচালনা করিতেছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ও সংস্কৃতে ব্যাকরণতীর্থ উপাধিপ্রাপ্তা।"

আমরা অবগত হইলাম,

"আশ্রমপ্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীগৌরীমায়ের বর্ত্তমান বয়স আশী বৎসরেরও অধিক। অদ্যাবধি আশ্রম ভাড়াটে বাড়ীতেই আছে। তাঁহার জীবন-কাল মধ্যে আশ্রমের নিজস্ব বাড়ী তৈরী না হইলে তাঁহার অভাবে আশ্রম হইতে দেশের উপকার সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, আশ্রমের অবস্থাই যে কি শোচনীয় হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইতিমধ্যে অনেক মাতৃজাতি-সেবক ও দানশীল মহৎ ব্যক্তিদের দানলব্ধ অর্থে

আশ্রমের মেয়েরা তাঁত বুনিতেছে

আশ্রমের গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য শ্যামবাজার বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে সাড়ে চারি কাঠা জায়গা ক্রয় করা হইয়াছে। যথোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার দরকার। আজ পর্য্যন্ত গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারে মাত্র নগদ তিন হাজার টাকা ও কোন কোন ভক্তিমতী মায়েদের দেওয়া কয়েক শত টাকা মূল্যের স্বর্ণাভরণাদি পাওয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরী-

মায়ের বার্দ্ধক্য ও ব্যাকুলতাহেতু এবং ধর্ম্মপ্রাণা, দয়ার্দ্রহৃদয়া, মাতৃজাতির হিতৈষিণী, অনাথাদের জননীস্বরূপা জনৈকা মহিলা বাড়ীর একতলা অংশের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায়, আশ্রম-গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য সত্বর আরম্ভ করার আয়োজন হইতেছে। দেশবাসী নরনারীর যথোচিত দানের উপর নির্ভর করিয়াই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। সাহায্যাদি—৫ বি. রাধাকান্ত জিউ ষ্ট্রীট, পোঃ শ্যামবাজার কলিকাতা,—আশ্রম-ভবনে, সম্পাদিকা শ্রীশ্রীদুর্গাপুরী দেবী ব্যাকরণ-তীর্থার নিকট প্রেরিতব্য।"

বঙ্গে কালা-জ্বর

কালা-জ্বর আসামের সাংঘাতিক ব্যাধি। সেখান হইতে উহার বিষের সংক্রমণে বাংলা দেশে ঐ রোগ অল্পসংখ্যক লোকের হয়, বাঙালীদের ধারণা এইরূপ। কিন্তু বাস্তবিক এই রোগ বাংলা দেশে হাজার হাজার লোকের হয়, এবং হাজার হাজার লোক ইহাতে মারা পড়ে। বঙ্গের স্বাস্থ্য-বিভাগের যে বার্ষিক রিপোর্ট্ বাহির হয়, তাহার মধ্যে ১৯২০ সালের রিপোর্টে ইহার সামান্য উল্লেখ এবং ১৯২১ সালের রিপোর্টে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু এসব রিপোর্ট সাধারণতঃ কোন কোন খবরের কাগজের সম্পাদকের নিকটেই আসে, তাহারাও অনেকে পড়েন না; অন্য শিক্ষিত লোকেরা ত খবরই রাখেন না।

কিছুদিন হইল, বারাসত মহকুমার অন্তর্গত দোগাছিয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী রাওতাড়া গ্রামে কালাজ্বর চিকিৎসার কেন্দ্র দেখিবার জন্য যখন ডাঃ নীরদবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সৌজন্যে তাঁহার সঙ্গে যাই, এবং দেখিয়া ফিরিয়া আসি, তখন কৌতূহল হয়, এ বিষয়ে বার্ষিক স্বাস্থ্যরিপোর্টে কিছু আছে কি না, দেখিবার জন্য। ১৯২১ সালের রিপোর্টে দেখিতে পাইলাম, যে, ঐ বৎসর সমগ্র বঙ্গে ১৫৫২ জন কালা-জ্বরে মারা পড়ে। ইহা আমরা মে মাসের মডার্ন্ রিভিউয়ে লিখিয়াছিলাম; তাহার পর এ বিষয়ে সরকারী জ্ঞাপনী (communique) অনেক কাগজে বাহির হইয়াছে। ১৯২১এর স্বাস্থ্য-রিপোর্টে আরো যাহা আছে, তাহার কিয়দংশ পরে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

দোগাছিয়ায় স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্ত্তৃক কালাজ্বরের রোগীদিগের চিকিৎসা

আমরা রাওতাড়া গিয়া দেখিলাম, কয়েকটি আম-গাছের তলায় অনেক শত লোক একত্র হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সব বয়সের স্ত্রী ও পুরুষজাতীয় লোক আছে। অনেক মাইল দূর হইতে গরুর গাড়ী করিয়া অনেকে আসিয়াছে। যাহারা পীড়া বশতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহাদের সঙ্গে সুস্থ আত্মীয়েরা
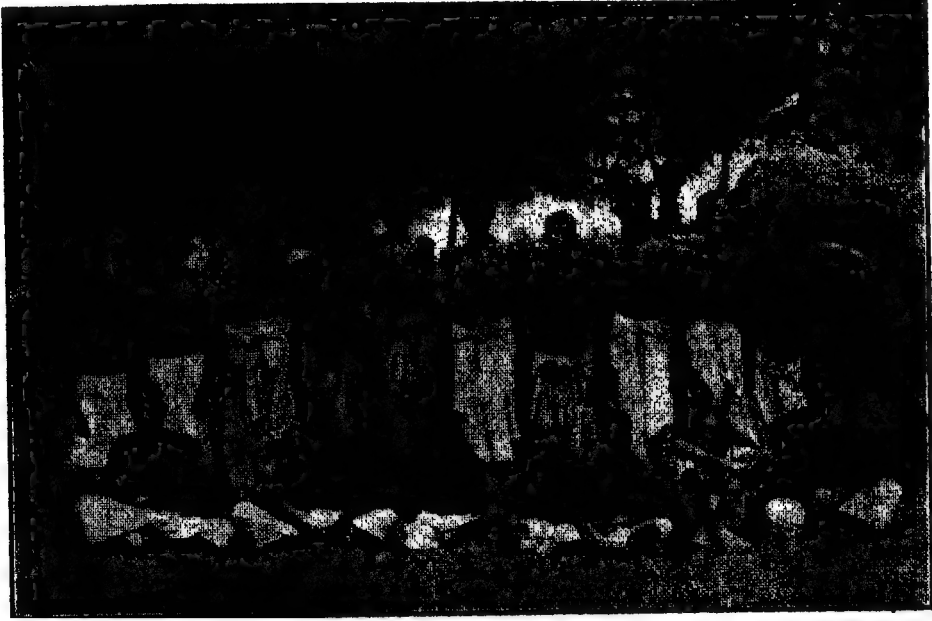
দোগাছিয়ায় কালাজ্বরাক্রান্ত রোগীগণ

আসিয়াছে। রোগীদের শীর্ণ, অস্থিচর্ম্মসার, রক্তহীন, বিবর্ণ চেহারা দেখিয়া প্রাণে সাতিশয় অবসাদ উপস্থিত হয়। এই সোনার বাংলা!

ডাক্তার নীরদবন্ধু ভট্টাচার্য্য, ডাঃ সেন, রাওতাড়ার একজন স্থানীয় ডাক্তার এবং অনেকগুলি স্বেচ্ছাসেবক মেডিক্যাল ছাত্র, প্রায় চারিমাস হইতে পারিশ্রমিক বা ঔষধের মূল্য কিছুই না লইয়া এই চিকিৎসার কাজ করিতেছেন। সপ্তাহে এক দিন এই আম-বাগানে, এবং আর-একদিন দোগাছিয়ার নিকটবর্ত্তী আর-একটি জায়গায় চিকিৎসা করা হয়। এক এক দিন পাঁচ ছয় শত রোগীর চিকিৎসা হয়; সপ্তাহে প্রায় দেড় শত নূতন রোগী আসে। প্রথমে রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়, যে, রোগ ম্যালেরিয়া না কালা-জ্বর। যদি কালা-জ্বর বলিয়া স্থির হয়, তাহা হইলে রোগীর শিরার ভিতর পিচ্‌কারী দ্বারা আন্টিমনী (antimony) নামক ধাতবদ্রব্য প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়। কয়েকবার ঔষধ প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ রোগী আরোগ্যলাভ করে বলিয়া ডাক্তারেরা বলেন।

ম্যালেরিয়াতে জ্বর হয় এবং প্লীহা-বৃদ্ধি হয়, কালা-জ্বরেও জ্বর ও প্লীহা-বৃদ্ধি হয়। ডাক্তারেরা বলেন, যে, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বলিয়া চিকিৎসিত যে-সব রোগীর কুইনাইনে কোন ফল হয় না, তাহাদের কালা-জ্বর হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ আছে। এইরূপ সন্দেহ হইলে তাহাদের রক্ত পরীক্ষা করা উচিত। ইহার সহজ উপায় আল্‌ডিহাইড্‌ (aldehyde) নামক রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা পরখ করা।

সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ কয়েকবৎসর হইতেই কালা-জ্বর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। ১৯২০ সালের রিপোর্টে ইহার উল্লেখ আছে, কিন্তু লিখিত হইয়াছে, যে, কোথাও খুব বেশী রোগী দেখা যায় না ("no large number of cases being discovered in any one locality")। ১৯২১এর রিপোর্টে লেখা হইয়াছে, যে, যদিও মোটে ১৫৫২ জন রোগীর মৃত্যু কালা-জ্বরে হইয়াছে বলিয়া গণনায় দেখান হইয়াছে, তথাপি ইহা প্রায় নিশ্চিত বলা যায়, যে, ঐ বৎসর অন্যূন পঞ্চাশ হাজার লোকের ঐ রোগ হইয়াছিল এবং তাহাতে অন্যূন দশহাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। ১৯২১ সালে মৈমনসিং, মালদহ, নদিয়া, বাখরগঞ্জ, ঢাকা,

দোগাছিয়ায় কালাজ্বরের রোগী

দোগাছিয়ায় কালাজ্বরের রোগী

বৰ্দ্ধমান, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, ফরিদপুর ও চট্টগ্রাম জেলার ২৮০৭টি গ্রামে কালাজ্বরের অনুসন্ধান হয়, এবং ৬৩৯টিতে ঐ রোগ দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ শেষোক্ত গ্রামগুলিতে গ্রাম প্রতি গড়ে দুটির বেশী রোগী পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এক্ষণে বারাসত মহকুমার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে রোগীর সংখ্যা যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্বাস্থ্যরিপোর্টে লিখিত সংখ্যা অত্যন্ত কম বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, বারাসতের সন্নিহিত স্থানসকল যে কালাজ্বরের কেন্দ্র, তাহা স্বাস্থ্য-বিভাগের রিপোর্টেও দৃষ্ট হয়। বৰ্দ্ধমান জেলার কাল্না ঐরূপ আর-একটি কেন্দ্র। ১৯২২ সালের স্বাস্থ্যরিপোর্ট এখনও বাহির হয় নাই। তাহাতে কি লেখা আছে, পরে দৃষ্ট হইবে।

আমরা যেদিন রাঙতাড়া গিয়াছিলাম, সেই দিন ট্রপিক্যাল স্কুল অব্ মেডিসিনের অধ্যাপক ও কালাজ্বরের গবেষক ডাক্তার নেপিয়ারও গিয়াছিলেন। তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহার বিবরণ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। তিনি গণনা করিয়াছেন, যে, ডা- ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের দৃষ্ট প্রায় ১৫০০ রোগীর মধ্যে শতকরা ৮০ জন কালাজ্বরগ্রস্ত। তিনি আরও বলেন, যে, দোগাছিয়ার নিকটবর্ত্তী ৮০ বর্গ-মাইল পরিমিত স্থানে যত গ্রাম আছে, তাহার প্রতি বর্গমাইলে এই কয়মাসে ২০ জন করিয়া রোগী পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার অনুমান এই, যে, চব্বিশ-পরগণা জেলায় যত কালাজ্বর-রোগী আছে, অন্যান্য জেলায় তাহা অপেক্ষা কম আছে মনে করিবার কোন কারণ নাই।

গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে সমুচিত প্রতিকার হইবে না। বঙ্গের অধিবাসীদিগকে, সমিতি গঠন করিয়া, চাঁদা তুলিয়া ও কর্ম্মীর দল সংগ্রহ করিয়া, সব জেলায় এই কাজ করিতে হইবে। এইরূপ সমিতি গঠিত হইতেছে। কলিকাতাতেও চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গের সব জেলায় কাজ করিতে হইবে, এবং অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করা আবশ্যক। দোগাছিয়ার নিকট যে দুই কেন্দ্রে এই মহৎ কার্য্য হইতেছে, তথাকার স্বেচ্ছাসেবকদেরই আরও সহকর্ম্মী প্রয়োজন। সুতরাং সমগ্র বঙ্গের জন্য যে খুব বড় দল চাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

বাংলা দেশের স্বাস্থ্য

১৯১১ সালের সেন্সস্ অর্থাৎ লোকগণনায় বাংলা দেশের মানুষের সংখ্যা যত হইয়াছিল, ১৯২১এর গুন্তিতে তার চেয়ে সামান্যই বেশী হইয়াছে। বেশী যাহা হইয়াছে, তাহার কতটা স্বাভাবিক বৃদ্ধি অর্থাৎ বঙ্গের অধিবাসীদের গৃহে শিশুর জন্মের দরুন বৃদ্ধি, এবং কতটাই বা অন্যান্য প্রদেশ হইতে বঙ্গে মানুষ আসার জন্য বৃদ্ধি, তাহা সেন্সাসের রিপোর্ট বাহির না হইলে বুঝা যাইবে না। ইতিমধ্যেই জানা গিয়াছে, যে, অনেক জেলায় মানুষ বাড়ার পরিবর্ত্তে কমিয়াছে।

১৯১১-১৯২১, এই দশ বৎসরের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা এক এক বৎসরের জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব ধরি, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে ১৯২০ ও ১৯২১ দুই বৎসরেই বাংলাদেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু বেশী হইয়াছে। ১৯২০তে মানুষ জন্মিয়াছিল ১৩৫৯৯১৩, মরিয়াছিল ১৪৮১৬১২, অর্থাৎ যত জন্মিয়াছিল, তার চেয়ে এক লক্ষেরও অধিক মানুষ মরিয়াছিল। ১৯২১ সালে জন্মিয়াছিল ১৩০১০০১, মরিয়াছিল ১৪০৩০৩০, অর্থাৎ এই বৎসরেরও জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশী। এই সংখ্যাগুলি যে নির্ভুল, তা নয়। কিন্তু সম্ভাবিত ভ্রম সংশোধন করিয়াও স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর বলিতেছেন, যে, জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেশী। সুতরাং বাংলা দেশের স্বাস্থ্য যে খুব খারাপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে বাংলা দেশই সকলের চেয়ে বেশী অস্বাস্থ্যকর নহে। মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের হার বেশী হইলে লোক-সংখ্যার যে স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়, তদনুসারে দেশ, প্রদেশ ও স্থানের স্বাস্থ্য নির্ণীত হয়। ১৯২১ সালে ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রদেশে হাজারকরা মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম কত বেশী হইয়াছিল, তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল।

পঞ্জাব	১১.৪
ব্রহ্ম	৮.৪
মাদ্রাজ	৬.৮
বোম্বাই	৬.৬
আসাম	৩.২
বিহার ও উড়িষ্যা	১.৮

নিম্নলিখিত প্রদেশগুলিতে জন্ম অপেক্ষা হাজারকরা মৃত্যু যত বেশী হইয়াছিল তাহা দেখান হইল।

বাংলা	২.১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪.৩
আগ্রা-অযোধ্যা	৫.১
মধ্যপ্রদেশ	৬ ১

যে-সব প্রদেশকে আমরা বাল্যকাল হইতে খুব স্বাস্থ্যকর বলিয়া জানিয়া আসিতেছি, তাহার অনেকগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে।

—

বাংলার জেলাগুলিতে জন্ম-মৃত্যু

সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যের খবর লওয়া আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। প্লেগের আরম্ভ বোম্বাইয়ে হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর উহা ন্যূনাধিক সকল প্রদেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আসামের কালা-জ্বর বাংলা দেশকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ অপেক্ষা বাংলার, সমস্ত বাংলা অপেক্ষা নিজের নিজের জেলার, সমস্ত জেলা অপেক্ষা নিজের নিজের শহর বা গ্রামের স্বাস্থ্যের খবর রাখিয়া তাহার উন্নতি করা আমাদের পক্ষে অধিক সহজ। এইজন্য আমরা নীচে ১৯২১ সালে বাংলার জেলাগুলির জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা দিতেছি; ১৯২২এর রিপোর্ট এখনও বাহির হয় নাই। সংখ্যাগুলি নির্ভুল নহে, কিন্তু আপেক্ষিক ভাবে নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে; অর্থাৎ, দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন জেলায় ঠিক ১৮০০০ জন্ম ও ২১০০০ মৃত্যু না হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক হইয়াছে, ইহা সম্ভবতঃ সত্য মনে করা যাইতে পারে।

জেলা	জন্ম	মৃত্যু
বর্দ্ধমান	৩৯৪৩৯	৫২৫৩২
বীরভূম	২৮৩৪২	৩২৫৪৮
বাঁকুড়া	৩২১৩৪	৩৯০৩৫
মেদিনীপুর	৭০৬৫৫	৮২৪৬২
হুগলী	২৭৫৪৩	৩৪৯৯৯
হাবড়া	২৬৫১৮	২৮৬৯৫
চব্বিশ পরগণা	৫৩৬৮৭	৭২৫১২
কলিকাতা	১৭৩০৮	৩০৩৯৫
নদীয়া	৪৬৫৩১	৬২১০৯
মুর্শিদাবাদ	৪৯৫৪৭	৪৯৩৭৮
যশোহর	৪৪৩৩৬	৬৪৪০৯
খুলনা	৪৩৩২৭	৩৭৪৭৫
রাজসাহী	৪৯৪১৭	৬৩২৪০
দিনাজপুর	৬৪১২০	৬১৩০০
জলপাইগুড়ি	৩০১১৫	২৮৮২১
দার্জিলিং	৮৩৬৮	১২১৯২
রংপুর	৭৭৭৪২	৬৭৪৮৭
বগুড়া	২৩৯৮৮	৩৪১৯০
পাবনা	৩৪০২৭	৪২৭২৮
মালদহ	৩৪৮৯৫	২৮৬৭০
ঢাকা	৭৯৯০৪	৮৮৭৫৯
মৈমনসিং	১৩২৫৮৬	১২৬৫৮৮
ফরিদপুর	৪৯৮৮২	৬৮৭৭৫
বাখরগঞ্জ	৮১১৪১	৭২৫৪৩
চট্টগ্রাম	৫০৩৩১	৩৮৬৫০
নোয়াখালি	৪৩১৮৪	৩৫০৮১
ত্রিপুরা	৬২২৩৪	৪৭৪৫৭

—

বঙ্গে কালা-জ্বর

বারাশত মহকুমায় কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে সকল কাগজেই কিছু না কিছু লেখা হইয়াছে। এই নূতন বিভীষিকায় কেবল ভীত না হইয়া প্রতিকারের চেষ্টাও করিতে হইবে। সকল জেলার গ্রামে ও শহরে এই রোগ হইতেছে কি না, এবং যদি হইতেছে, তাহার খবর লইতে হইবে।

১৯২১ সালের সরকারী স্বাস্থ্য-রিপোর্টে দেখা যায়, যে, ঐ বৎসর, শহরগুলি বাদে, কেবল গ্রামে, বর্দ্ধমান জেলায় ২১ জনের, বাঁকুড়া জেলায় ২৪৪, মেদিনীপুর জেলায় ১৯২, চব্বিশ-পরগণা জেলায় ৬৮, নদীয়া জেলায় ৩৪, যশোর জেলায় ২৯, রাজশাহী জেলায় ২৯, দিনাজপুরে ২, জলপাইগুড়িতে ২,৹বগুড়ায় ২৮, মালদহে ৩, ঢাকায় ১, মৈমনসিংহে ১১৭, ফরিদপুরে ১০০, বাখরগঞ্জে ৩৭, চট্টগ্রামে, ৯, এবং ত্রিপুরাতে ১০ জনের এই রোগে মৃত্যু হইয়াছে। শহরের মধ্যে কোথায় কতজন কালা-জ্বরে মরিয়াছে, তাহার তালিকা দিতেছি। কাল্না ৪, আসানসোল ১, হাবড়া ৮, বালী ১, মাণিকতলা ২, বরানগর ৬, জয়নগর ৩, পানিহাটী ২, উত্তর ব্যারাকপুর ১, টিটাগড় ১২৪, নৈহাটী ১, ভাটপাড়া ১, বারাসত ১, কলিকাতা ২০৪, বহরমপুর ২, নাটোর ৪ দিনাজপুর ৬, দার্জ্জিলিং ২, রংপুর ১, নবাবগঞ্জ ১, ঢাকা ২৪৩, জামালপুর ৭, কিশোরগঞ্জ ১। এই সংখ্যাগুলি প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। অনেকের মৃত্যু কালাজ্বরে হয়, কিন্তু অজ্ঞতা-বশতঃ তাহা ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু বলিয়া পরিগণিত হয়।

—

জন্মমৃত্যুর সংখ্যার বিশ্বাসযোগ্যতা

কোন দেশের, জেলার, শহরের বা গ্রামের স্বাস্থ্য কিরূপ, তাহা জানিতে হইলে উহার জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যাগুলি নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য হওয়া উচিত। এইজন্য, যাঁহাদের বাড়ীতে জন্ম বা মৃত্যু হয়, তাঁহাদের সেই সংবাদ যথাস্থানে সরকারী কর্ম্মচারীকে দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের লোকেরা ইহা বুঝেন না কিম্বা আলস্য, ঔদাসীন্য বা অন্য কোন কারণ বশতঃ এ বিষয়ে কর্ত্তব্য পালন করেন না। সেইজন্য এ দেশের জন্মমৃত্যুর সংখ্যাগুলির উপর নির্ভর করা যায় না—যদিও মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে, যে, কোথাও জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু বা মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম বেশী হইতেছে কি না, তাহা সংখ্যা দেখিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে; কারণ জন্ম ও মৃত্যুর সংবাদ দেওয়ায় বা সংবাদ লেখায় মোটের উপর প্রায় সমান অবহেলা বা অসাবধানতা হয়, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

১৯২১ সালের সংখ্যাগুলি অনুসারে বঙ্গে হাজারকরা ২৮ জনের জন্ম ও ৩০·১ জনের মৃত্যু হইয়াছিল, গণনায় এইরূপ দাঁড়ায়। কিন্তু স্বাস্থ্য-ডিরেক্টর ডাঃ বেণ্ট্‌লী অঙ্কগুলি সংশোধন করিয়া বলিতেছেন, যে, ঐ বৎসর বাস্তবিক জন্মের হার ৩৮·৩ এবং বাস্তবিক মৃত্যুর হার ৪০·৮ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, বিস্তর জন্ম ও মৃত্যুর সংবাদ সরকারী আফিসে দেওয়া হয় নাই, রাখা হয় নাই, বা লেখা হয় নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মোটের উপর ভ্রমপূর্ণ অসংশোধিত অঙ্কগুলি হইতেও এই সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যে, উল্লিখিত বৎসরে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু হাজারকরা দুটি বেশী হইয়াছিল।

কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে। জন্মমৃত্যুর ঠিক্ সংখ্যা জানা খুব দরকার। ইহার উপর বাস্তবিক আমাদের জাতির জীবনমরণের সমস্যার সমাধান কতকটা নির্ভর করিতেছে। ঠিক্ সংখ্যাগুলি না জানিলে আমরা কেমন করিয়া বুঝিব, যে, আমরা, সুস্থ সবল সঙ্গতিপন্ন চরিত্রবান্ জ্ঞানবান্ জাতির যেমন বাড়া উচিত, সেরূপ বাড়িতেছি কি না? যদি না বাড়িতেছি, বরং সংখ্যায় কমিতেছি, তাহা হইলে হ্রাসের পরিমাণ দেখিয়া আমরা অধিকতর সাবধান হইয়া চরিত্রে জ্ঞানে আর্থিক সচ্ছলতায় শক্তিতে ও স্বাস্থ্যে জাতীয় উন্নতি সাধনে তৎপর হইতে পারি।

জন্মমৃত্যুর ঠিক্ সংবাদ ও সংখ্যা দেওয়া ও লেখা সম্বন্ধে এদেশে যে ঔদাসীন্য, অসাবধানতা ও অবহেলা লক্ষিত হয়, তৎসম্বন্ধে স্বাস্থ্য-ডিরেক্টর ১৯২১ সালের রিপোর্টে লিখিয়াছেন:—

"An improvement in the registration of vital occurrences is needed even more urgently in towns, where the Registration of Birth and Deaths Act is now largely a dead letter, and the recording of both births and deaths appears to be getting progressively worse instead of better."

তিনি অন্যত্র লিখিতেছেন:—

"The condition of birth registration in towns is

most disheartening. During 1921 only 36 towns out of 117 recorded birth-rates exceeding 20 *per mille*. These low birth-rates do not reflect the real condition of affairs, but are due to sheer neglect to administer the law. Attention has repeatedly been called to this matter, and every possible effort been made by the Department of Public Health to bring about an improvement but without any permanent effect. This is the seventh year in succession in which attention has been called to the matter in the annual report and matters are now even worse than they were formerly. It is certain that nothing short of an entire remodelling of the existing legislation to ensure the appointment of proper registrars, who will have a direct personal interest in securing an accurate record of vital occurrences, will suffice to remedy the existing condition of things. This is the most urgent sanitary reform that can be undertaken, in respect to Bengal towns, because in the absence of a reasonably accurate record of vital occurrences, it is impossible to estimate the effect of any measure which may be undertaken for the improvement of the public health.

In view of the deplorable condition of birth registration in municipal areas outside Calcutta no useful purpose will be served by attempting to draw any conclusion from the birth rate of towns in Bengal."

ডিরেক্টর বলিতেছেন, যে, বাংলার শহরগুলির স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী কাজ জন্মমৃত্যুর ঠিক্ সংখ্যা নিরূপণ, কারণ, তাহা না হইলে, স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যাহা কিছু করা হউক না, তাহার কোন ফল হইতেছে কি না, তাহা বুঝিবার কোন উপায় থাকে না। এইজন্য আইনের পরিবর্ত্তন করিয়া এইরূপ রেজিষ্ট্রার নিয়োগ আবশ্যক যাহাদের কর্ত্তব্য ও স্বার্থ হইবে জন্মমৃত্যুর ঠিক্ সংবাদ ও সংখ্যা সংগ্রহ ও রক্ষা করা।

যে যে শহরে অবহেলা বশতঃ খুব কম জন্ম-সংবাদ লিখিত হইয়াছে, ঔদাসীন্যের মাত্রা অনুসারে তাহাদের নাম—কামারহাটী, ভাটপাড়া, বজ্‌বজ্‌, ঝালকাটি, ভদ্রেশ্বর, সাতক্ষীরা, দিনাজপুর, পাবনা, মহেশপুর, বর্দ্ধমান, ব্যারাক্‌পুর, বরিশাল, গারুলিয়া, সিউড়ী, যশোর। অতএব এ বিষয়ে যশোর সর্ব্বাধম

মৃত্যুর সংখ্যা লিখন সম্বন্ধেও অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটীতে অত্যন্ত ঔদাসীন্য ও অসাবধানতা লক্ষিত হয়। এ বিষয়ে অপকৃষ্টতার ক্রম অনুসারে ডিরেক্টর নাম করিয়াছেন—সিরাজগঞ্জ, মেহেরপুর, যশোর, রংপুর, পাবনা, ভদ্রেশ্বর, খড়দহ, কিশোরগঞ্জ, বাদুড়িয়া, ঝালকাটি, টালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, কৃষ্ণনগর, দিনাজপুর, পিরোজপুর, বাজিতপুর, নৈহাটি, ব্যারাকপুর, চাঁদপুর, ভাটপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, বরিশাল, কমিল্লা, ভোলা, গারুলিয়া, এবং সিউড়ী। এ বিষয়ে সিউড়ী সর্ব্বাধম। ডিরেক্টর বলিতেছেন :—

"Seven of the worst offenders, it may be observed, are the head-quarter stations of their respective districts. It is obvious to the sanitarian from the facts recorded regarding birth-rates and death-rates in Bengal towns that communities that continue to take so little interest in the health conditions under which they live as to neglect so flagrantly the elementary duty of recording the vital occurrences that take place among them are not fit to enjoy the privilege of municipal government. Village communities which depend upon the services of illiterate choukidars are infinitely better off in respect to the recording of vital occurrences than three-fourths of the towns of Bengal. The only method by which this continued negligence can be checked is the drastic revision of the law in such a way as to ensure the summary punishment of those responsible for every dereliction of duty. Until this has been accomplished there is not much hope of seeing an improvement in the public health administration of the towns in the province."

ইহা শহরের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে খুবই লজ্জার বিষয় যে তাঁহারা এমন সব লোককে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্ব্বাচন করেন, যে, তাহারা শহরের জন্মমৃত্যুর সংবাদ, এবং কোন্ পীড়া হইতে কত লোক মরিল, ইত্যাদি সংবাদ সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন ও কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, যে, তাঁহাদের ত্রুটির জন্য ডিরেক্টরকে বলিতে হইতেছে, যে, যে সকল লোকসমষ্টি স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে, পুনঃপুনঃ নিন্দিত হওয়া সত্ত্বেও, এরূপ উদাসীন, তাঁহারা মিউনিসিপ্যাল স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাইবার অযোগ্য। ইহা আরও লজ্জার বিষয়, যে, পাড়াগাঁয়ের নিরক্ষর

চৌকীদারেরা এ বিষয়ে শহরের শিক্ষিত বাবুদের চেয়ে বেশী কর্ত্তব্যপরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য।

পল্লীগ্রাম অঞ্চলে হাজারকরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জন্মসংখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছে নিম্নলিখিত চক্রগুলিতে—সোণামুখী (বাঁকুড়া) ৬৯.১, শমশেরগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) ৫০.৬, ইংরেজবাজার (মালদহ) ৪৯, সুতী (মুর্শিদাবাদ) ৪৮, পীরগঞ্জ (দিনাজপুর) ৪৬.৯, আসাসুনী (খুলনা) ৪৫.৪।

জামালপুর, মুর্শিদাবাদ, খীরপাই, রামজীবনপুর ও চন্দ্রকোণার মৃত্যুর হার সহরগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। গত দশ বৎসর প্রথম চারিটি শহরে এইরূপ উচ্চ মৃত্যুর হার দৃষ্ট হইতেছে।

—

জন্মমৃত্যু-সংখ্যা সম্বন্ধে "অসহযোগীদের" কর্ত্তব্য

"সহযোগী" ও "অসহযোগী" এবং যাহারা কিছুই নহেন, সকলেই দেশের অধিবাসী, দেশের উন্নতি-অবনতির জন্ম সকলেই দায়ী, তাহার হিতসাধন সকলেরই কর্ত্তব্য। তথাপি বিশেষ করিয়া "অসহযোগীদেরই" কর্ত্তব্যের উল্লেখ করিবার কারণ এই, যে, তাঁহারা দাবী করেন, যে, তাঁহারা অন্য সকলের চেয়ে বেশী দেশহিতৈষী। ইহা সম্পূর্ণ সত্য, যে, তাঁহারা গত কয়েক বৎসর রাজনৈতিক কারণে অন্য সকল দলের লোকদের চেয়ে বেশী দুঃখ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের আত্মোৎসর্গও সাতিশয় প্রশংসনীয়। কংগ্রেসের নীতি অনুসারে মিউনিসিপ্যালিটি ডিষ্ট্রিক্ট্‌বোর্ড্‌ প্রভৃতির নির্ব্বাচিত সভ্য হওয়া নিষিদ্ধ নহে। তদনুসারে অনেক অসহযোগী আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের অনেক মিউনিসিপালিটির অধিকাংশ সভ্যের পদ দখল করিয়াছেন। বঙ্গেও তাঁহারা এইরূপ করুন। কিন্তু শুধু দখল করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কাজ করিতে হইবে। তার প্রথম কাজ, স্থানিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সত্য ধারণা লাভ। তাহা করিতে হইলে জন্ম মৃত্যু, ভিন্ন ভিন্ন পীড়া প্রভৃতি সম্বন্ধে ঠিক্‌ খবর লইয়া লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে হইবে। স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির উপর আর সব কিছু নির্ভর করে। মানুষগুলা যদি সব অকালে মরিয়াই যায়, যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারা যদি চিররুগ্ন দুর্ব্বল অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকে, যদি সুস্থ ও সবল যথেষ্ট শিশু জন্মগ্রহণ না করে, তাহা হইলে জাতীয় উন্নতি কাহাদের হইবে, কাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, কে শিক্ষিত হইবে, জ্ঞানে ধর্ম্মে চরিত্রে উন্নত কে হইবে? স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে উহার বর্ত্তমান অবস্থাটা জানা চাই, এবং জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা না জানিলে তাহা নির্ণীত হইতে পারে না।

--

কলিকাতার ছাত্রদের স্বাস্থ্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কল্যাণসাধন-চেষ্টার সম্পর্কে তাহাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা নিরূপণার্থ দৈহিক পরীক্ষা ১৯২০ সালের ২৮শে মার্চ্চ্‌ আরম্ভ হয়। এই হিতকর চেষ্টার সূচনা ও আরম্ভ হয় ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় ভাইস্‌চ্যান্সেলার থাকিবার সময়। সম্প্রতি ছাত্রকল্যাণসাধন-কমিটির তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্ট্‌ বাহির হইয়াছে। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য অবগত হইয়া মন যেমন দমিয়া যায়, এই রিপোর্ট্‌ পড়িয়াও সেইরূপ অবসাদ জন্মে। কিন্তু প্রতিকূল ও অবসাদজনক অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাতেই মনুষ্যত্ব। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা যতই ক্লেশকর হউক না, তাহা ভাল করিয়া জানিতে হইবে, ও তাহার প্রতিকার করিতে হইবে।

কমিটি এ বৎসর ৫৩৩৬ জন ছাত্রের শরীর পরীক্ষা করিয়াছেন; চোখ, কান, দাঁত, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্‌, প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং অন্যান্য রকমের ৬৫ দফা পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ হয়। সুতরাং কমিটির অনুসন্ধান হইতে ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিস্তর খাঁটি তথ্য জানিতে পারা যায়।

সাতটি কলেজের ছাত্রেরা পরীক্ষিত হইয়াছে। যথা, স্কটিশ্‌ চার্চেজ্‌, বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগ, সিটি, প্রেসিডেন্সী, বিদ্যাসাগর, সি এম্‌ এস্‌ ও বঙ্গবাসী। ১৮ বৎসর বয়সের ছাত্র সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তার পর

যথাক্রমে ১৯, ১৭, ২০, ২১, ২২ বৎসরের। সাঁইত্রিশ বৎসরের একটি ছাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েন বা পড়িতেন। পরীক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ব্রাহ্মণ ত্রিশ জন, কায়স্থ আটাশ, মুসলমান ছয়, বৈদ্য আট। ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদির নানা শাখা-প্রশাখার কত ছাত্র পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহার তালিকা দিয়া অনর্থক কাজ বাড়ান হইয়াছে। এরূপ তালিকা আবো থাকিলে তাহা ছাটিয়া ফেলা উচিত।

শরীরের গড়ন বাঁধন অনুসারে ছাত্রদিগকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বেশ বলিষ্ঠ গড়ন শতকরা সাড়ে আট জনের মাত্র, মোটা অথচ বলিষ্ঠ নয় প্রায় সাড়ে ছয় জন, মাঝারি রকমের সাড়ে চুয়ান্নজন, এবং পাত্‌লা ক্ষীণ চেহারা ত্রিশ জনের উপর। বঙ্গবাসী কলেজে সকলের চেয়ে শীর্ণ ও স্কটিশ্‌চার্চেজে সকলের চেয়ে বলিষ্ঠ গঠনের ছাত্র লক্ষিত হইয়াছে। মাংশপেশীর যথোপযুক্ত বিকাশ হয় না পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এবং যথাযোগ্য ব্যায়ামের অভাবে। স্কটিশ্‌চার্চেজ্‌ ও প্রেসিডেন্সীতে সুপুষ্ট মাংসপেশীবিশিষ্ট ছাত্র বেশী দেখা যায়—এই দুই কলেজে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার ছাত্রেরা পড়ে, এবং এখানে ব্যায়ামেব বন্দোবস্তও অপেক্ষাকৃত ভাল।

একুশ বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেদের শরীরের বিকাশ ও বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। অল্পবয়স্ক ছেলেদের মধ্যে শীর্ণ চেহারার প্রাচুর্য্য দুঃখের বিষয়।

শতকরা সাতচল্লিশ জন ছাত্রের চেহারা ন্যুব্জ অর্থাৎ সাম্‌নের দিকে অবনত, খাড়া নহে। এই দোষ গত বৎসর অপেক্ষা বেশী লক্ষিত হইয়াছে। যাহাদের বয়স যত কম, তাহারা তত নুইয়া চলে বসে। কোন্‌ কলেজের শতকরা কত ছাত্র খাড়া ও কতজন ন্যুব্জদেহ, তাহার তালিকা নীচে দিতেছি :—

কলেজ	খাড়া	ন্যুব্জ
স্কটিশচার্চেজ্‌	৬৯·২	২৯·৮
পোষ্টগ্রাজুয়েট্‌	৭৮·৬	১৯·৩
সিটি	৫৪·৪	৪৫·৬
প্রেসিডেন্সী	৫২·৪	৪৭·৬
বিদ্যাসাগর	৪৫·৬	৫৪·৪
সি এম্‌ এস্‌	৫৩·৪	৪৬·৬
বঙ্গবাসী	৪১·৪	৫৮·৫
মোট	৫১·৩১	৪৭·১

পরীক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৩৮ জনের পোস্‌ প্রভৃতি চর্ম্মরোগ আছে। শিক্ষিত ও শিক্ষাধীন লোকদের এরূপ অপরিষ্কার থাকা লজ্জার বিষয়।

ছাতির মাপ লইয়া দেখা গিয়াছে, যে, দ্বিতীয় বৎসর অপেক্ষা তৃতীয় বৎসরের পরীক্ষায় গড়ে ছাতির বেড় কম।

শতকরা ৬৬ জন ছাত্রের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক। গত বৎসরের অঙ্ক অপেক্ষা ইহা কিছু ভাল। কমিটি কোন লাভ না লইয়া ঠিক কেনা দামে চস্‌মা দিতে চাওয়াতেও, যাহাদের চোখের দোষ আছে, তাহাদের অনেকে চস্‌মা লয় না, ইহা ভাল নয়।

স্বাস্থ্যসম্বন্ধে বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রদের খুব নিন্দা রিপোর্টে রহিয়াছে; তাহার পর বিদ্যাসাগর কলেজের। দারিদ্র্য কি ইহার কারণ?

শতকরা একষট্টি জনের দাঁত স্বাভাবিক। যাহাদের দাঁত ভাল নয়, তাহাদের শরীরের বাঁধন এবং বিকাশও ভাল নয়।

আরও অনেক শারীরিক দোষের বিষয় রিপোর্ট্‌টিতে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহাদের দেহের কোন-না-কোন দোষ আছে, এরূপ ছাত্রের সংখ্যা শতকরা একাত্তর। আজকাল কলিকাতায় ছাত্রদের বেতন সমেত বাসা-খরচ ত্রিশ টাকার কম হয় না। বঙ্গের অধিকাংশ গৃহস্থ পুত্রের শিক্ষার জন্য মাসে ত্রিশ টাকা খরচ করিতে পারে না। যাহারা পারে, তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোক মনে করিতে হইবে। ইহাদের বাড়ীর ছেলেদের দেহের অবস্থা এইরূপ কেন? ঘোর দারিদ্র্য তাহার প্রধান কারণ নহে; কারণ কলিকাতার অধিকাংশ ছাত্রের অভিভাবকদিগকে দেশের দরিদ্রতম শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায় না। দরিদ্রতার জন্যই ছাত্রদের শরীর খারাপ এরূপ মনে না করিবার আর-একটি কারণ এই, যে,

শরীরের কোন-না-কোন দোষ আছে, এরূপ ছাত্রের শতকরা সংখ্যা প্রেসিডেন্সী কলেজেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং তাহাদের অভিভাবকদের অবস্থা সকলের চেয়ে ভাল। এরূপ ছাত্র কোন্ কলেজে কত আছে দেখুন।

স্কটিশ চার্চেজ্	শতকরা	৬৪
পোষ্টগ্রাজুয়েট্ শ্রেণীসমূহ	"	৭৭
সিটী কলেজ	"	৬৪
প্রেসিডেন্সী	"	৯১
বিদ্যাসাগর	"	৮০
সি এম্ এস্	"	৭২
বঙ্গবাসী	"	৭৫

অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন লোকদের ছেলেদেরও শরীর খারাপ হইবার কারণ অনেক আছে। দেশের জলহাওয়া ভাল নয় বটে। কিন্তু কলিকাতার স্বাস্থ্য মফঃস্বল অপেক্ষা মন্দ নহে। ছাত্রাবাসের সব বাড়ী ভাল নয়। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোকেদের বাড়ী ইহা অপেক্ষা খুব খারাপ। মেসের রান্না ভাল নয়; কিন্তু তাহার উন্নতি ছাত্রদের নিজের চেষ্টা থাকিলে কতকটা হইতে পারে,—যদিও ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের প্রতিকার তাহারা করিতে পারে না। জলখাবার তাহারা যাহা খায়, তাহাতে পীড়া হওয়াই স্বাভাবিক। মিউনিসিপালিটীর খাদ্যপরীক্ষকেরা কি করেন? অধিকাংশ খাবারের দোকানের খাদ্যে ধূলা পড়ে ও মাছি বসে। শহরে চা, চপ্, কাট্‌লেট্ প্রভৃতির দোকান বাড়িয়া চলিতেছে। চা একজন খাইয়া গেলে সেই পেয়ালা একটি বাল্‌তিতে ডুবাইয়া ধুইয়া আর একজনকে তাহাতে চা দেওয়া হয়। এই প্রকারে, বাল্‌তিটির জল অধিক পরিমাণে জলমিশ্রিত লালা ও নিষ্ঠীবন হইয়া দাঁড়ায়। তাহাতেই বার বার পেয়ালা ধোওয়া হয়। এবং সেইজন্য তাহার সঙ্গে নানা রোগের বীজ থাকিয়া যায়। চপ্ কাট্‌লেট্ আদি কোন্ প্রাণীর কি অবস্থার মাংসে প্রস্তুত হয়, তাহা বলিতে পারি না; সে সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা কয়। খাবারের দোকানের পানীয় জলের জালা কতদিন, সপ্তাহ বা মাস অন্তর বদ্‌লান হয়, তাহা গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করা আবশ্যক। তাহাতে গেলাস বা ঘটী ডুবাইয়া ডুবাইয়া জল তোলা হয়; সঙ্গে সঙ্গে উত্তোলকের আঙুল এবং হাতও জালার জলে ডুবে। তাহার কোন চর্ম্মরোগ বা অন্য রোগ আছে কি না, এবং হাত সম্পূর্ণ পরিষ্কার কি না, তাহা কেহ দেখে না। বিজ্ঞানসঙ্গত প্রণালীতে প্রস্তুত খাদ্য মানুষের হাতের দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। ছাত্রদের যথেষ্ট অঙ্গচালনের অভাব আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া ফুটবল খেলা দেখিলে তাহাতে দর্শকদের শারীরিক উন্নতি হয় না। পড়াশুনার জন্য বরাবর নিয়মিত পরিশ্রম করিলে শরীর খারাপ হয় না; কিন্তু অনেক ছাত্র তাহা না করিয়া পরীক্ষার আগের কয়েক মাস গুরুতর পরিশ্রম করে। তাহাতেও শরীর খারাপ হয়। পরীক্ষার প্রণালীটাই খারাপ। ছাত্র সারা বৎসর কিরূপ পড়াশুনা করিল, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া প্রধানতঃ তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে কৃতিত্বের নিদর্শন দেওয়া উচিত। এক, দেড়, বা দুই বৎসর পরে পরীক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করায় ছাত্রদের পরিশ্রম ও উদ্বেগ গুরুতর হয়, এবং অনেকে পীড়িত হয়। এইরূপ পরীক্ষা-প্রণালীতে ছাত্রদের প্রতি সুবিচার হয় না, তাহাদের কল্যাণও হয় না। রাত্রি জাগিয়া দূষিতবায়ুপূর্ণ থিয়েটার-গৃহে অভিনয় দর্শন স্বাস্থ্যহানির আর-একটি কারণ। একেই ত বাল্যমাতৃত্বের দরুন আমাদের জাতির শারীরিক বুনিয়াদটাই কাঁচা। তাহার উপর ছাত্রজীবনের আদর্শ যে ব্রহ্মচর্য্য, তাহা অনেক স্থলেই রক্ষিত হয় না। সুতরাং স্বাস্থ্যহানি মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

স্বাস্থ্যসম্বন্ধে ছাত্রদের ঔদাসীন্য সাতিশয় দুঃখের বিষয়। চোখের দোষ থাকা সত্ত্বেও চস্‌মা না লইলে শুধু যে চোখই খারাপ হয়, তাহা নয়; অন্য রোগও জন্মে। অথচ অনেক ছাত্র সস্তায় চস্‌মা পাইলেও লয় না। দাঁতের অসুখ থাকায় অজীর্ণ রোগ হয় বিস্তর ছাত্রের; অথচ তাহারা চিকিৎসা করায় না।

ছাত্রদিগকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ করিয়া তোলা দরকার, এবং স্বাস্থ্যপরীক্ষক ডাক্তারদের সংখ্যা ও পারিশ্রমিক বাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।

স্বাস্থ্য সকল উন্নতির মূল

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এত বেশী করিয়া লিখিবার কারণ এই, যে, ইহা সকল উন্নতির মূল। বহুবৎসর সম্পাদকতা করিয়া এ জ্ঞান আমাদের জন্মিয়াছে, যে, খুব উন্মাদনা ও উত্তেজনা যাহাতে হয়, এরূপ কড়া কড়া লম্বা চওড়া রকম কিছু লিখিলে পাঠকেরা খুব বাহবা দেন, আজকাল যদি স্বরাজের বিষয়ে অনেক পুনরুক্তি করা যায়, তাহার দ্বারাও বাহবা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাস্থ্য না থাকিলে স্বরাজ অর্জ্জন করিবে কে? এবং স্বরাজ লব্ধ হইবার পরও স্বাস্থ্য চাই। অবশ্য, স্বাধীন দেশের লোকেরা সকল দিকে ও সকল বিষয়ে উন্নতি করিবার জন্য যত রকম সরকারী চেষ্টা করিতে পারে, পরাধীন আমরা তাহা পারি না। এইজন্যও স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্বারা শরীর ও মন সতেজ ও কর্ম্মক্ষম করিতে না পারিলেও আবার স্বাধীনতালাভের আশা সুদূরপরাহত। অতএব, পরাধীন

অবস্থাতেও, যতদূর সম্ভব, আমাদিগকে স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। এবং স্বরাজলাভের চেষ্টাও যে সর্ব্বপ্রযত্নে করিতে হইবে, তাহাও বলা বাহুল্য।

যাহার স্বাস্থ্য খুব ভাল নয়, এমন লোক, এমন কি চিররুগ্ন লোকও ধার্ম্মিক, চরিত্রবান্, জ্ঞানী, বা ধনী হইয়াছে; সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন বা ইতিহাসে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে;—এরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইহাও সকলেই জানে, যে, পালোয়ান কুস্তিগীরেরা কোথাও কখনও কোন জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই, কোন বিষয়ে নেতৃত্ব লাভ করে নাই। কিন্তু স্বাস্থ্য-হীন জাতি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, শক্তিতে, ঐশ্বর্য্যে, ধর্ম্মে, চরিত্রে, জ্ঞানে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, ইতিহাসে, দর্শনে বরণীয় হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে নাই, থাকিতে পারে না। স্বাস্থ্য সর্ব্বপ্রকার জাতীয় কৃতিত্ব ও মহত্ত্বের ভিত্তি। এই-জন্য স্বাস্থ্যসম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

—

শিবাজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

হিন্দুজাতির ইতিহাসে, বিশেষতঃ মরাঠাদিগের ইতিহাসে, শিবাজীর স্থান অনন্যসাধারণ। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার প্রণীত শিবাজীর ইংরেজী জীবনচরিত পড়িলে শিবাজীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে ঠিক্ ধারণা জন্মে। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। বই পড়িয়া কিছু শিখেন নাই। রাজ-পরিবারে তাঁহার জন্ম হয় নাই। কোন রাজদরবার, সভা নগর, বা সুশৃঙ্খল সৈনিকশিবির দেখিবার সুযোগ পাইবার পূর্ব্বেই তিনি নিজের প্রতিভা ও শক্তির বলে রাজ্য স্থাপন ও সংগঠন এবং শাসনপ্রণালী রচনা করেন। এই কার্য্যে তিনি কোন অভিজ্ঞ মন্ত্রী বা সেনাপতির সাহায্য বা পরামর্শ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে মরাঠারা দাক্ষিণাত্যের নানা রাজ্যে ছড়াইয়া বাস করিত। তিনি তাহাদিগকে একটি দৃঢ় সুসংহত জাতিতে পরিণত করেন। তিনি মোগলসাম্রাজ্য, বিজাপুর রাজ্য, পোর্ত্তুগীজ্ ভারত, এবং জঞ্জিরার হাব্সী রাজ্য, এই চারিটি প্রবল শক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রীয় শক্তিকে জয়যুক্ত করেন।

তিনি স্বজাতির নবজীবনদাতা। তিনিই প্রথমে তাহাদিগকে শিক্ষা দেন, যে, তাহাদের পক্ষে স্বাধীন হওয়া সম্ভব। দাক্ষিণাত্যে তিনিই প্রথমে বিজাপুর ও দিল্লীকে "যুদ্ধং দেহি" বলিতে সাহসী হন। তিনিই তাঁহার যুগে প্রথমে দেখান, যে, হিন্দু স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারে; গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগের কাজ চালাইতে পারে; স্থলযুদ্ধে ও জলযুদ্ধে নৈপুণ্য প্রদর্শন ও জয়লাভ করিতে পারে; শত্রুকে পরাজিত করিতে পারে; বাণিজ্য ও রণতরীসমূহ নির্ম্মাণ ও চালনায় বিদেশীদের সমকক্ষতা করিতে পারে; স্ব-রাজ্য রক্ষা করিতে পারে; সাহিত্য ললিতকলা বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের উন্নতি ও সংরক্ষণ করিতে পারে।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার একটি উপমা দ্বারা হিন্দুর জীবনীশক্তি পরিস্ফুট করিয়াছেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ প্রয়াগের অক্ষয়-বট আমূল কাটিয়া, তাহার ভূমিসংলগ্ন কাণ্ডের মাথায় উত্তাপে রক্তবর্ণ একটা লৌহকটাহ হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়া দেন, এবং মনে করেন, যে, বট-বৃক্ষটির প্রাণ বধ করিয়াছেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই গাছটি আবার বাড়িতে আরম্ভ করে, ও উহার মাথার উপর বৃদ্ধির বাধা-স্বরূপ যে কটাহটি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ঠেলিয়া ফেলে! শিবাজী সেইরূপ দেখাইয়াছেন, যে, হিন্দুর জীবনবৃক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই; কিন্তু ইহা বহু শতাব্দীর রাজনৈতিক দাসত্বের বোঝা ঠেলিয়া ফেলিয়া, আকাশের মুক্ত বাতাসে ডাল-পালা মেলিয়া মাথা তুলিতে সমর্থ।

শিবাজী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ এবং সকল ধর্ম্মের সাধুব্যক্তিদের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তিনি নারীজাতিকে সম্মান করিতেন, নিজে সচ্চরিত্র ও সংযত ছিলেন, এবং সৈনিক-শিবিরেও সকলকে সুনীতির সম্মান এরূপ রক্ষা করিতে বাধ্য করিতেন, যে, তাঁহার শত্রুপক্ষীয় খাফী খানের মত ঐতিহাসিকও এইজন্য তাঁহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

হিন্দুদের নবজীবনদাতা এই পুরুষপ্রবরের আবক্ষ-মূর্ত্তি সম্প্রতি পুনার শিবাজী-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাকার পরলোকগত গণপৎরাও গোখলে মহাশয় এই মন্দির স্থাপন করেন, এবং এই অনুরোধ করিয়া যান, যে, ইহাতে যেন ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের একটি আবক্ষ-মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। মূর্ত্তিটি ভাস্কর ফাড্‌কে মহাশয় দ্বারা খোদিত।

শিবাজীর জীবনের দৃষ্টান্ত হইতে হিন্দুরা যেমন অনুপ্রাণিত হইতে পারেন, তেমনি ইহাও উপলব্ধি করিতে পারেন, যে, কি কারণে মরাঠা-সাম্রাজ্য ভারতব্যাপী ও স্থায়ী হইল না। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার উভয়ে এ বিষয়ে একমত। জাতিভেদ-প্রথা থাকায় হিন্দুসমাজের সংহতি নাই, উহা নানাভাগে বিভক্ত। এক এক বর্ণেরই নানা শাখা উপশাখা আছে। এক এক প্রদেশের সকল ব্রাহ্মণরাও পরস্পরকে সমান মনে করে না। অন্যান্য জা'তেরও এই দশা। এই যে বংশগত উচ্চ-নীচ-বোধ, আচরণীয় অনাচরণীয় স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের ভেদ, ইহা হিন্দুসমাজকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে।

বন্যায় বিপন্নের সাহায্য

উত্তরবঙ্গে বন্যায় বিপন্ন লোকদের সাহায্যদাতা কমিটি সম্বন্ধে গত মাসের প্রবাসীতে মন্তব্য প্রকাশিত হইবার পর, কমিটির কর্ত্তৃপক্ষ তাহা পড়িয়া উহার রিপোর্ট্ আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

রিপোর্টে বন্যায় বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য দিবার যেরূপ বন্দোবস্ত ও প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট। কমিটি খুব মহৎ ও প্রয়োজনীয় কাজ করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন। বন্যায় যে-সকল লোকের ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে বা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সকলের জন্য গৃহনির্ম্মাণ করা কমিটির সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহারা নিতান্ত অসহায় ও নিঃস্ব, কেবল তাহাদের জন্য দশহাজার কুঁড়ে ঘর তৈয়ার করিয়া দিবার ভার কমিটি গ্রহণ করেন। এই কাজটি হইয়া গেলে কমিটির হাতে এক লক্ষের কিছু উপর টাকা থাকিবার কথা। নূতন ফসল না-হওয়া পর্য্যন্ত আঠার শত বর্গমাইল পরিমিত স্থানের নিরন্ন লোকদের অন্নাভাব দূর করা, তাহাদের জমীতে লাঙ্গল দিবার বন্দোবস্ত করা, তাহাদিগকে বীজ যোগান, তাহাদের মধ্যে সাধারণ পীড়া বা মারী হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা—এই সব কাজের জন্য এক লক্ষ টাকা মোটেই যথেষ্ট নহে। অতএব কমিটি দেশের লোকদের নিকট হইতে আরো টাকা চাহিতেছেন, এবং তাহা তাঁহাদের পাওয়া উচিত। ৯২ নং অপার সার্কুলার রোড ঠিকানায় স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের নামে সর্ব্ববিধ সাহায্য প্রেরিতব্য। তিনি দারুণ গ্রীষ্মেও উত্তরবঙ্গে বিপন্ন লোকদের অবস্থা দেখিবার জন্য এবং সাহায্যদানের ব্যবস্থা অনুসারে কাজ কেমন হইতেছে পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত গিয়াছিলেন, এবং এখনও বাগেরহাট অঞ্চলে স্থানে স্থানে খদ্দর প্রচার আদি অত্যাবশ্যক কার্য্য করিতেছেন।

কমিটি যে-প্রকার মহৎ কাজ করিতেছেন, কেবল যশের জন্য তাহাতে কেহ প্রবৃত্ত হন না—বিশেষতঃ যাঁহারা নেতা নহেন তাঁহারা। যুদ্ধেও নাম করিয়া খ্যাতি বটে সেনাপতিদের; সাধারণ সৈনিকেরা প্রায় সকলেই অশ্রুতকীর্ত্তি থাকিয়া যায়, যদিও তাহারা বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গে সেনাপতিদের চেয়ে কম নহে।

অতএব, কমিটির রিপোর্টে আমরা যে দু-একটি অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করিতে যাইতেছি, তাহা কাহারও নাম জাহির করিবার বা করাইবার জন্য নহে। বস্তুতঃ আমাদের বিবেচনায় আরও যাঁহাদের নাম থাকা উচিত ছিল, তাঁহারা কেহই আমাদিগকে এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই, এবং আমরাও তাঁহাদের নাম করিব না। যে ন্যায্য নীতি অনুসারে এরূপ কাজের রিপোর্ট্ লিখিত হওয়া উচিত, তাহারই অনুরোধে আমরা দু-একটি কথা বলিতেছি।

রিপোর্টের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আছে—

"THE CALCUTTA OFFICE. The Calcutta office was situated in the various professors' rooms and classes of the University College of Science. The sitting rooms of the learned professors were used either as paying-in counters or stores and the professors themselves took up the new duty that devolved upon them of conducting the office business. On the reopening of the College after the Pujah vacation the office was removed to a tent in the compound of the Science College."

বিজ্ঞান-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ও তাহার অধ্যাপক মহাশয়েরা সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু রিপোর্ট্ হইতে উদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে এইরূপ ধারণা জন্মে, যেন, কলিকাতার প্রধান প্রধান কাজ কেবল তাঁহারাই করিয়াছেন। আমরা যতদূর জানি, যাঁহারা বিজ্ঞান-কলেজের অধ্যাপক নহেন, এরূপ অধ্যাপক, এবং যাঁহারা কোন শিক্ষালয়েরই অধ্যাপক নহেন, এরূপ লোকও প্রথম অবস্থায়, যখন পরিশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল তখন, খুব পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের ২।১ জন এক একটা দিকের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী ছিলেন। অতএব, বিজ্ঞান-কলেজের সহিত সম্পর্কহীন লোকেরাও যে এরূপ কাজ করিয়াছিলেন, তাহার কিছু স্পষ্ট উল্লেখ বা আভাস থাকিলে ভাল হইত।

রিপোর্টের চতুর্থ পৃষ্ঠায় আছে—

"The responsibility of conducting the business of the Base station, which practically amounts to carrying on the entire relief work, devolved on Mr. Subhas Chandra Bose in the first days. After efficient and distinguished work for about 1½ month Mr. Subhas Bose came back to Calcutta and the work is now being ably conducted by Dr. Indra Narayan Sen Gupta who is now in charge of both the ordinary and medical relief operations."

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় আছে—

"MEDICAL RELIEF It stands separately as a special work with Dr. Sundarimohan Das at its head as President of the Medical Committee."

ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। কাজের প্রথম অবস্থায় আরও দুইজন ডাক্তার খুব পরিশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। তাহার অন্ততঃ কিছু ইঙ্গিতও যদি রিপোর্টে থাকিত, তাহা হইলে ভাল হইত।

হিসাবের মধ্যে একটি কৌতুকাবহ অথচ ক্লেশকর কথা এই দেখিলাম, যে, কমিটি চারিশত বিরাশী টাকা নয় আনার মেকি মুদ্রা পাইয়াছেন। এত মেকির চলনে বুঝা যাইতেছে, যে, মুদ্রা জাল করিবার লোক দেশে অনেক আছে। তদপেক্ষা শোচনীয় (এবং হাস্যকর) ব্যাপার এই, যে, অনেক লোক দান করিতে গিয়াও মেকি মুদ্রা চালাইয়া মেকি পুণ্য লাভ করিয়াছে। দাতাদের অজ্ঞাতসারে এতগুলা মেকি টাকা ও রেজকি কমিটির হাতে আসিয়া পড়িয়াছে মনে করিতে পারিতেছি না; কারণ যাহারা ব্যবসা-সূত্রে বৎসরে একলাখ দেড়লাখ টাকা সাধারণের নিকট হইতে পায়, দুই চারি বৎসরেও তাহারা এত মেকি মুদ্রা দেখিতে পায় না।

—

অর্থকরী বিদ্যা

রাণীভবানী স্কুলের ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে বক্তৃতা করেন, তাহার নানাপ্রকার সমালোচনা হইয়াছে।

তিনি আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর দুইপ্রকার দোষ দেখাইয়াছেন। আগে আগে বাঙালীর ছেলেরা সমুদয় ভারতবর্ষের ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যেরূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিত, এখন তাহা করে না। কথাটা ঠিক্; কিন্তু ইহার কারণ অনেক হইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাস্ করা আগেকার চেয়ে খুব সোজা হওয়ায়, ছেলেরা জ্ঞানলাভে আগেকার মত যত্নবান্ হয় না, ইহা একটা কারণ হইতে পারে; এবং আমাদের বিশ্বাস, যে, ইহা অন্যতম কারণ বটে। আর একটা কারণ এই হইতে পারে, যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষা পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃততর ও উৎকৃষ্টতর হওয়াতে বাঙালী ছাত্রদের পূর্ব্ব প্রাধান্য বজায় থাকিতেছে না। আরও একটি কারণ এই হইতে পারে, যে, এখন অনেক বাঙালী মেধাবী ও প্রতিভাশালী ছাত্র গবর্ণমেণ্টের বড় চাকরী করা জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন না। সকল কারণই ন্যূনাধিক সত্য।

ভূপেন্দ্রবাবু আর-একটি কথা তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, যে, আমাদের ছেলেরা হাজারে হাজারে পাস্ করিতেছে, কিন্তু অন্য দেশ ও প্রদেশের লোকেরা আসিয়া আমাদের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে। তাহারা ধনী হইতেছে, আমরা অনশনে অর্দ্ধাশনে কাল কাটাইতেছি। কথাটি সত্য; কিন্তু এই অবস্থার কারণ একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

বিদেশী যে-সব লোক এদেশে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হইয়া আসে, তাহাদের বিষয়ে এখন আমরা আলোচনা করিব না;—আমরা তাহাদের চেয়ে বেশী শিক্ষিত ও জ্ঞানবান্ হইলেও তাহারা রাজনৈতিক কারণে ঐ-সকল পদ পাইত। বড় বড় কারবারে ব্যাপৃত বা নিযুক্ত বিদেশী লোকদের কথাও ধরিব না। বঙ্গের বাহির হইতে বঙ্গে আসিয়া যে-সব ভারতীয় লোক রোজ্গার করে, আমরা তাহাদের বিষয়েই আলোচনা করিব।

বাংলায় যে-সব অবাঙালী রোজ্গার করে, তাহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে সংখ্যায় বেশী কলকারখানার মজুর, রাস্তা ঘাট ষ্টেশনের মুটে, বাড়ীর চাকর, প্রভৃতি দৈহিক-শ্রমজীবী লোক। ইহারা আসে প্রধানতঃ বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও আগ্রা-অযোধ্যা হইতে। ইহারা যে-সব কাজ করে, তাহা করিবার জন্য বাঙালী পাওয়া যায় না কেন? নিরন্ন অনশনক্লিষ্ট বাঙালী লক্ষ লক্ষ আছে। তাহারা কেন এসব কাজ করে না? বলিবেন, বাঙালী জ্বরে জর্জ্জরিত ও অবসাদগ্রস্ত। কিন্তু সরকারী রিপোর্টে দেখিতেছি, বঙ্গে ১৯২১ সালে হাজারকরা ২৩ জন জ্বরে মরিয়াছিল, বিহার-ওড়িষায় ২২.৬ জন,—সামান্যই তফাৎ। অন্যদিকে বাংলার চেয়ে বিহারে প্লেগে মৃত্যু হয় ঢের বেশী। ১৯২১ সালে পঞ্জাবের মোট মৃত্যুর হার বাংলার সমান ছিল, মধ্যপ্রদেশ, আগ্রা অযোধ্যা, বিহার ওড়িষা ও উত্তরপশ্চিমসীমান্তপ্রদেশের মৃত্যুর হার বাংলার চেয়ে

বেশী ছিল; এই সকল প্রদেশেই বাংলার চেয়ে প্লেগ বেশী হয়। সুতরাং আগেকার কথা যাহাই হউক, বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশে উত্তর ও মধ্য ভারতের প্রদেশ-সকলের চেয়ে রোগ বেশী হয় না। কিন্তু ইহা হইতে পারে, যে, বঙ্গদেশের জলীয়বাষ্পপূর্ণ বাতাস ও উত্তাপের সম্মিলনে শরীরের যে অবসাদ জন্মে, অন্যান্য প্রদেশে তাহা জন্মে না। কিন্তু মানসিক বল দ্বারা এই অবসাদ যথেষ্ট পরিমাণে দূর করা যায়।

দৈহিক শ্রম সম্বন্ধে আমাদের নিকৃষ্টতার আর-একটা কারণ এই, যে, বাঙালী যত পুরুষ ধরিয়া ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে, অন্যান্য প্রদেশে তত দীর্ঘকাল ধরিয়া ম্যালেরিয়া বিদ্যমান নাই। বঙ্গে ম্যালেরিয়ার (এবং কালাজ্বরের) প্রতিকার হওয়া একান্ত আবশ্যক। নতুবা বাঙালী শ্রমের ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া লোপ পাইবে। মনে রাখিতে হইবে, যে, দৈহিক শ্রমজীবীরাই দেশের অধিকাংশ লোক; তাহাদের অবনতিতে জাতির অবনতি, কয়েকজন বঙ্গবিখ্যাত, ভারতবিখ্যাত, বা জগদ্বিখ্যাত লোকের অস্তিত্ব এই অবনতি ও ক্ষয় নিবারণ করিতে পারে না।

দৈহিক শ্রমের ক্ষেত্রে বাঙালীর না যাইবার আর-একটা কারণ, বাঙালীরা লম্বা-কোঁচা-বিশিষ্ট "ভদ্রলোক'দের অনুকরণে কিম্বা অন্য কোন কারণে দৈহিক শ্রমকে "ছোট"লোকের কাজ মনে করে। বামুনের তো নিজের হাতে চাসকরা নিষিদ্ধ—কেন, তা জানি না। অন্য কোন কোন "উচ্চ" জাতিরাও নিজে চাষ করেন না। মাথায় ও কাঁধে করিয়া মোট বহা সর্ব্বাধম "ছোট" লোকের কাজ; বগলদাবা করিয়া বা হাতে ঝুলাইয়া মোট বহা তার চেয়ে একটু কম "ছোটলোকের" কাজ। দৈহিকশ্রম সম্বন্ধে যে-যত অসহায়, অক্ষম, পরনির্ভরশীল, সে তত "মান্যগণ্য বেক্তি"। এমন দেশের লোকের যদি অন্ন না জোটে, সেটা বিধাতার দোষ নয়, আগন্তুক অন্যস্থানের লোকদেরও নয়।

বাঙালীরা বুদ্ধিতে অন্য কাহারো চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু তাহা হইলেও সব রকম মিস্ত্রীর ও কারিগরীর কাজ হইতে বাঙালী হটিয়া গিয়াছে কেন? তাহার কারণ দুটি। প্রথম বাঙালীর শ্রমবিমুখতা, দ্বিতীয় দৈহিক শ্রমের কাজ না করিলেই "ভদ্রলোক" হওয়া যায়, এই হাস্যকর ও শোচনীয় ধারণা। এখন অনেক শিক্ষিত লোক হাত পা ও মস্তিষ্কের সম্মিলিত শ্রমের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা সুলক্ষণ; কিন্তু আগে যে-সব শ্রেণীর বাঙালী মিস্ত্রীর কাজ করিত, "ভদ্রলোকত্ব" সম্বন্ধে তাহাদের অদ্ভুত ধারণা এখনও বজায় আছে।

প্রধানতঃ বা কতকটা দৈহিকশ্রম যাহাতে আছে, এরকম নানা কাজ হইতে বাঙালী কেন হটিয়া গিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। বাঙালীকে যাহারা হটাইয়াছে, তাহারা অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছে বটে; কিন্তু তাহারা সেখান হইতে তাহাদের সমশ্রেণীর বাঙালী-দের চেয়ে কোন উৎকৃষ্টতর স্কুলকলেজী শিক্ষা পাইয়া আসে নাই। ঐ শ্রেণীর বাঙালীরাও স্কুলকলেজের শিক্ষার বড় ধার ধারে না। সুতরাং বঙ্গে রোজগারী অধিকাংশ অ-বাঙালীর সম্বন্ধে এই কথা বলা যায়, যে, তাহাদের জয় ও বাঙালীদের পরাজয়ের সহিত স্কুলকলেজের শিক্ষার সম্পর্ক নাই।

অন্য যে-সব অ-বাঙালী বঙ্গে রোজগার করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক উপার্জ্জন করে। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পারসী, দিল্লীওয়ালা মুসলমান, পঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, কাশ্মীরী, নেপালী, প্রভৃতি নানা প্রদেশের লোক বাংলায় আসিয়া ধনশালী হয়। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশ স্কুলকলেজী শিক্ষা পায় নাই, ইংরেজী লিখিতে পড়িতে পারে না। সুতরাং তাহারা আমাদের চেয়ে বেশী "শিক্ষিত" বলিয়া বেশী রোজগার করে, তাহা নহে। তাহারা বহুকাল হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিয়াছে, ও তজ্জন্য মূলধন তাহাদের হাতে আসিয়াছে, এবং তাহারা প্রথম প্রথম স্বয়ং কাপড়ের বোচকা বহিয়া বিক্রী করিতে প্রস্তুত থাকে, এইজন্য তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। আমরা চাকরী ওকালতী প্রভৃতিতে মন দিয়াছি, কিছু টাকা আসিলে বাণিজ্য না করিয়া জমী কিনিয়া থাকি, আমরা দৈহিক শ্রম করিতে চাই না, আমরা আয় সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা সহ্য করিতে পারি না, ইত্যাদি কারণে, এবং বোধ হয় অন্য জাতিদের চেয়ে হিংসুটে এবং পরস্পরকে বিশ্বাস কম করি

বলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে আমাদের কৃতিত্ব নাই। কিন্তু এই দিকে মন দিলেই কৃতিত্ব হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু এইসব ব্যবসাদার অ-বাঙালীকে জ্ঞানহীন মনে করিলে নিতান্ত ভুল করা হইবে। তাঁহারা অনেকে বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ের, জিনিষের ও পণ্য-শিল্পের এবং দেশবিদেশের এত খবর রাখেন যে, আমরা বি-এ, এম্-এ, পি-এইচ্ ডি, ডি-এস্ সি পাস্‌করা বাঙালীরা তাহা রাখি না। সুতরাং চলিত অর্থে তাঁহারা "শিক্ষিত" না হইলেও, তাঁহাদের নিজের কাজের উপযোগী স্বোপার্জ্জিত বিদ্যা যথেষ্ট আছে এবং আমাদের চেয়ে বেশী আছে।

বাঙালীর হাজার হাজার ছেলে পাস্ হয় ও চাকরী খোঁজে বা উকীল হয়। সকলের পক্ষে চাকরী পাওয়া বা ওকালতীতে পসার হওয়া অসম্ভব। অতএব, সে হিসাবে এত পাস হওয়াটা দেশের পক্ষে ভাল নয়। কিন্তু মনে করুন, শতকরা ৬০।৭০।৮০ জন পাস্ না করিয়া যদি বিশ্ববিদ্যালয় কম পাস্ করিতেন, তাহা হইলে পাস্-করা ছেলেদের চেয়ে ফেল্ ছেলেরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরীর বেশী উপযুক্ত হইত মনে করিবার কোন কারণ নাই। অবশ্য বেশী বেশী ফেল্ হইলে ক্রমশঃ হয়ত স্কুলকলেজে ছেলে কমিত। কিন্তু স্কুলকলেজে কোন শিক্ষা না পাইলেই যে ছেলেরা ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে লায়েক হইয়া উঠিত বা উঠিবে, তাহাও সত্য নয়। এসব ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিতে হইলে, ওগুলা যে ভদ্রলোকের কার্য্যক্ষেত্র এবং ঐরকম কাজ করিতে গিয়া দৈহিক শ্রম করা যে "ছোট লোকের" কাজ নয়, সেই বোধ আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবিষ্ট হওয়া দরকার। ষাটবৎসর আগে যখন জাপানে নূতন যুগের আরম্ভ হয় নাই, তখন সেখানকার সামাজিক মত এই ছিল, যে, ব্যবসাবাণিজ্য দোকানপসার কারিগরী ভদ্রলোকের কাজ নয়। কিন্তু কয়েকবৎসরের মধ্যেই নবজাপানের নেতারা তাঁহাদের জাতির সে ধারণা বদ্‌লাইয়া দিতে সমর্থ হন, এবং সেইজন্য এখন জাপান বাণিজ্য- ও পণ্যশিল্প-ক্ষেত্রে ইউরোপ-আমেরিকার সমকক্ষতা করিতেছে।

আমাদের বিবেচনায়, বঙ্গে শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করা উচিত নয়, বরং বাড়ানই উচিত। কিন্তু প্রধানতঃ "সাহিত্যিক" যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা উৎকৃষ্টতর রূপে দেওয়া উচিত, এবং ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্কন, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন অবশ্যশিক্ষণীয় করা উচিত। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রের শিক্ষা শুধু "সাহিত্যিক" না হইয়া অধিকন্তু আরও এই-প্রকারের হওয়া দরকার যাহাতে তাহারা নানারকমে উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারে। কেবল জ্ঞানের জন্য জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক এবং জ্ঞানান্বেষণ করিবার উপযুক্ত লোকের সংখ্যা কোন দেশেই বেশী নাই;—কোথাও বিদ্যার্থীদের অধিকাংশ ত সে-প্রকারের নহেই। আমাদের ছেলেরা টাকা রোজ্‌গারের জন্য লেখাপড়া শিখে, ইহা নিন্দার কথা নহে। দোষের বিষয় এই, যে, তাহারা যে শিক্ষা পায়, তাহাতে অত লোকের অন্ন হইতে পারে না। কিন্তু এই দোষটা শিক্ষাপ্রণালীর, তাহাদের নহে। রোজ্‌গার করাটা যে শিক্ষার একটা অনুমোদনযোগ্য উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে লর্ড্ হ্যাল্‌ডেনের উক্তি একবার মডার্ণ্ রিভিউতে উদ্ধৃত হইয়াছিল। এক্ষণে শিক্ষা সম্বন্ধে লর্ড্ মর্লীর কতকগুলি কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

"The best thing that I can think of as happening to a young man is this: that he should have been educated at a day school in his own town; that he should have opportunities of following also the higher education in his own town; and that at the earliest convenient time he should be taught to earn his own living.

"The Universities might then be left to their proper business of study. Knowledge for its own sake is clearly an object which only a very small portion of society can be spared to pursue; only a very few men in a generation have that devouring passion for knowing, which is the true inspirer of fruitful study and exploration. Even if the passion were more common than it is, the world could not afford on any very large scale that men should indulge in it: the great business of the world has to be carried on."—*Address delivered at Birmingham on October 5, 1876, as President of the Midland Institute. Critical Miscellanies*, vol. iii, *s. v.* "Popular Culture."

সিবিল সার্বিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা

গত জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদে সমগ্র ভারতবর্ষের সিবিল সার্বিসের যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে যে নয়জন ছাত্র চাকরী পাইবে স্থির হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম হইয়াছে একজন মান্দ্রাজী, এবং দ্বিতীয় একজন বাঙালী। প্রথম ১১৭৯ এবং দ্বিতীয় ১১৫৬ নম্বর পাইয়াছে। তা ছাড়া তৃতীয়, অষ্টম ও নবম বাঙালী; চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম আগ্রা-অযোধ্যার; ষষ্ঠ মান্দ্রাজী। বোম্বাই, পঞ্জাব, বিহার-ওড়িষা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশের কোন ছাত্র প্রতিযোগিতায় নির্ব্বাচিত হয় নাই। অনির্ব্বাচিত ছাত্রদের মধ্যে বাংলা হইতে উনিশ, আগ্রা-অযোধ্যা হইতে আট, মান্দ্রাজ হইতে চৌদ্দ, বোম্বাই হইতে চার, বিহার-ওড়িষা হইতে আট, পঞ্জাব হইতে পাঁচ, আসাম হইতে দুই এবং মধ্যপ্রদেশ হইতে চার জন ছাত্র যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে সমগ্র ভারতের প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রেরা যেরূপ স্থান অধিকার করিতেছিল, এবার তাহা অপেক্ষা তাহারা অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

—

"শুদ্ধি"

বাহ্য কোন ক্রিয়া দ্বারা কাহাকেও "শুদ্ধ" করা যায়, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। কোন মানুষ নামে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, য়িহুদী, পারসী, খৃষ্টিয়ান, মুসলমান, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী প্রভৃতি যে ধর্ম্মের অন্তর্ভূতই হউক, তাহার চরিত্র উন্নত পবিত্র ও উদার এবং আত্মা নির্ম্মল না হইলে, নামের ছাপের জন্যই তাহাকে ভাল বলা যায় না। এবং কোন নামের দ্বারা তাহার অন্তর ভাল করা যায় না। সুতরাং বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা কোন একদল বাড়ে, অন্যদল কমে মাত্র—যদি সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন না হয়। অবশ্য, বাহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাও হইতে পারে। এক ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার রীতি চলিত আছে। সুতরাং বৈধ উপায়ে তাহা করিবার অধিকার সকলেরই সব সময়ে আছে। বলা হইতেছে বটে, যে, এখন মালকানা রাজপুতদিগকে "শুদ্ধ" করিয়া হিন্দু করিবার "উপযুক্ত" সময় নহে। কিন্তু "উপযুক্ত" সময়কে "অনুপযুক্ত" করিবার উপায় এবং লোক ভারতবর্ষে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকায় "উপযুক্ত" সময় খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন।

অকালী-দলন

গুরু-কা-বাগ সংপৃক্ত ঘটনায় কারারুদ্ধ অকালীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার পর সাংঘাতিক প্রহার জঘন্য কাপুরুষতা হইয়াছে। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের কৈফিয়ৎ নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। মিলিটারী ও পুলিসের ব্যবহার ঠিক্ এইরূপ হইয়াছে, যেন তাহারা অকালীদিগকে উত্তেজনা দ্বারা প্রতিশোধ লইতে প্রবৃত্ত করিয়া বধ করিবার অভি-প্রায়ে তাহাদিগকে প্রহার করিয়াছিল। অকালীরা অতি সাহসী শ্রেণীর লোক। তাহারা প্রতিশোধের চেষ্টা না করিয়া অসাধারণ সংযম ও বীরত্ব দেখাইয়াছে।

—

কৌন্সিল-প্রবেশ

কৌন্সিলগুলা যখন আছে, এবং তাহাদের দ্বারা অল্প কিছু কাজ যখন হইতে পারে ইহাও আমাদের বরাবর ধারণা, তখন সেগুলা খুব সাহসী ও খুব স্বাধীনচিত্ত লোকে পূর্ণ হওয়া ভাল (সেরূপ লোক তাহাতে বর্ত্তমানে অল্পসংখ্যক আছেন)। কিন্তু কৌন্সিল-প্রবেশ অসহযোগের সমতুল্য বা তাহার স্থানীয় হইতে পারে না। কৌন্সিলের বাহিরে অসহযোগের খুব প্রয়োজন আছে। অসহযোগ প্রবল না থাকিলে কৌন্সিলের সভ্যদেরও জোর এবং মর্য্যাদা কমিয়া যায়। লবণের বর্দ্ধিত মাশুল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা বার বার অগ্রাহ্য করা সত্ত্বেও বড়লাটের তাহা ধার্য্যকরণ ইহার আধুনিকতম দৃষ্টান্ত। ইহাও খুব সম্ভব, যে, ট্যাক্স না-দেওয়া এবং অন্যান্য প্রকার অসহযোগ ভিন্ন স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে চাই, হিন্দুমুসলমানের ঐক্য ও অস্পৃশ্যতাদি দূরীকরণ। হিন্দুমুসলমানের মিল সম্বন্ধে বর্ত্তমান লক্ষণ নৈরাশ্যজনক হইলেও আমরা নিরাশ হই নাই। এই মিলের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা প্রচার ও কার্য্যতঃ স্বীকার করেন, এরূপ মুসলমান নেতাদের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে।

গল্প-পুরস্কার

আমাদের নির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুসারে পুরস্কার দেওয়া যায়, এমন বিশিষ্টগুণসম্পন্ন গল্প পাওয়া যায় নাই। প্রায় ৩০০ গল্পের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া আমরা কতকগুলি গল্প গ্রহণ করিতেছি; সেগুলির মধ্যে তিনটি শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে—ক-শ্রেণী, খ-শ্রেণী ও গ-শ্রেণী। এই এক এক শ্রেণীর গল্পগুলির মধ্যে পরস্পর তারতম্য এত অল্প যে তাহাদের মধ্যে স্থান নির্ব্বাচন করা দুষ্কর। এজন্য আমরা মনোনীত গল্পগুলিকে প্রায় একই প্রকার সম্মান দিয়া পুরস্কৃত করিলাম; কারণ আমাদের প্রকাশিত নিয়মের মধ্যেই ছিল—

"৬। যদি কোন গল্প প্রথম পুরস্কারের উপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে আমরা অধিক-সংখ্যক গল্পের মধ্যে পুরস্কার বণ্টন করিয়া দিব।

"৭। ইহা ছাড়া, উপযুক্ত গল্পের অভাবে নিকৃষ্ট গল্পের লেখকদিগকে পুরস্কার দিবার আমাদের কোন বাধ্য-বাধকতা রহিল না। যে-কোন পুরস্কারের উপযুক্ত গল্পের অভাবে, আমরা উক্ত পুরস্কার কাহাকেও দিব না, অথবা বড় পুরস্কার বণ্টন করিয়া অধিক-সংখ্যক গল্পলেখককে দিব।"

ক-শ্রেণী

	গল্পের নাম	লেখক	দক্ষিণা
১।	অশোক	শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু	২৫৲
২।	অনুপম	শ্রী মাণিক ভট্টাচার্য্য	২০৲
৩।	নির্ব্বাসিতের আত্মকথা	শ্রী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	২০৲
৪।	সুরের রেশ	শ্রী প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৲
৫।	বিদায় বরণ	শ্রী মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৲
৬।	ছন্ন-ছাড়া	শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়	২০৲
৭।	মৌরী-ফুল	শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৲

খ-শ্রেণী

	গল্পের নাম	লেখক	দক্ষিণা
১।	বৌদির মৃত্যু	শ্রী হেমন্তকুমার বসু	১৫৲
২।	ভৈরবে	শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৫৲

গ-শ্রেণী

	গল্পের নাম	লেখক	দক্ষিণা
১।	কষ্টিপাথর	শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র বসু	১০৲
২।	অদৃষ্টচক্র	শ্রী রণজিৎকুমার ভট্টাচার্য্য	১০৲
৩।	বুলাকিলালের ইজ্জৎ	শ্রী কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	১০৲
৪।	মেঘে রৌদ্র	শ্রী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲
৫।	মেঘমল্লার	শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲
৬।	মায়ের ছেলে	শ্রী নির্ম্মলকুমার রায়	১০৲
৭।	আমোদ	শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১০৲

ভ্রম সংশোধন

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩০

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	২	২৬	প্রজাপতির	অদিতির
৩৭	২	১৪	শয়তান বলিয়াছে	শয়তান-চরিত্রে একটা কথা আছে
৩৮	১	৩২	বনদেবতার	রণদেবতার
৩৯	২	৪	প্রলয়-ব্যাপার অজ্ঞাত	প্রলয়-ব্যাপার সম্বন্ধে অজ্ঞাত
৩৯	২	৯	গড়িয়া উঠিবে	গড়িয়া উঠিল
৩৯	২	১৯	যুগে যুগে বা	যুগে যুগে

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

প্রবাসীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬৷৷০। প্রতি সংখ্যা ৷৷০। ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

কৌতূহল
চিত্রকর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৩০

৩য় সংখ্যা

ডঙ্কা-নিশান

প্রথম পরিচ্ছেদ

সবাই-রাজার-দেশ

বাইশ শো বছরের কথা! সুপ্ত স্মৃতির বাইশ কোটোর ভিতরকার জিনিস। সাত পুরুষের বহু পূর্ব্বের, তোমার আমার সত্তর পুরুষ আগেকার কাহিনী। আকাশে সপ্তর্ষি তখন পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে, আর, মর্ত্ত্যে আর্য্যাবর্ত্তে, মগধের সিংহাসনে, আদ্য শূদ্র মহাপদ্ম নন্দের সন্তান, মহারাজ দশসিদ্ধিক নন্দ, তখন মহামহিমায় বিরাজ করছেন। চার-লাখী শহর পাটলিপুত্র তাঁর রাজধানী। বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী থেকে চম্পা-নগরের চাঁপার জঙ্গল পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্য। তিন লাখ তাঁর সৈন্য, আর দোর্দ্দণ্ড তাঁর প্রতাপ।

আমরা যে সময়কার কথা বল্‌ছি তখন এই দশসিদ্ধিক নন্দের চতুরঙ্গ সেনার ডঙ্কাধ্বনিতে চির-বিদ্রোহী ও চির-স্বাধীনতাপ্রিয় বৈশালী নগরের দ্বার-গ্রাম পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আর, চীনাংশুকের তৈরী—রক্তমাখা চিলের ডানার মতন—মগধসম্রাটের বিজয়োদ্ধত নিশান-গুলো যেন বৈশালীবাসীদের শেষ স্বাধীনতাটুকু মাংসের টুক্‌রোর মতন ছোঁ দিয়ে কেড়ে' নেবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে। নগর ঘেরাও করে' মগধের সেনা থানা পেড়েছে। আর অপর পক্ষ ক্রমাগত হট্‌তে হট্‌তে, পদে পদে হার মেনে', শেষে বৈশালী রাজ্যের স্বয়ম্প্রভুতার শেষ আশ্রম দুর্ভেদ্য বজ্রক-দুর্গের ভিতর আশ্রয় নিয়ে, তার চার তোরণে ইন্দ্রকীলক এঁটে দিয়ে, মৃত্যু বা জয়ের প্রতীক্ষায় দিন গুন্‌ছে।

দুর্গের চারিদিকে ত্রিশ হাত চওড়া বিশ হাত গভীর পরিখা, পরিখায় পোষা কুমীরের দঙ্গল। তার পর কাঁটার বেড়া। তার পর জাণুভঞ্জনী ত্রিশূলের বেড়া। এত সত্ত্বেও মগধ-সৈন্যের চেষ্টার ত্রুটি নেই। নগরবাসীরা তাদের উপর কখনো বা যন্ত্র-সাহায্যে যমদণ্ডের মতন গুরুভার লোহার সজারু দেবদণ্ড নিক্ষেপ করে' একসঙ্গে অনেককে জখম কর্‌ছে, কখনো বা উপর থেকে তপ্ত তেল ঢেলে' মনের ঝাল মেটাচ্ছে, আবার কখনো বা রাশি রাশি এঁটো পাতা ছুঁড়ে দিয়ে ব্যঙ্গ কর্‌ছে। আর তার জবাবে মগধসেনা যে অস্ত্রবৃষ্টি কর্‌ছে তা দেওয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করে' ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কুড়িয়ে নিচ্ছে এবং সময় বুঝে প্রয়োগ কর্‌তেও ত্রুটি কর্‌ছে না।

দিনের পর দিন, এম্‌নি করে' আশী দিন কেটে গেল;

মগধ-সেনা বজ্রক-দুর্গের চল্লিশ হাত চওড়া কোমর-কোঠার একখানা পাথরও খসাতে পার্‌লে না। কত দূরন্দাজ কত যন্ত্রপাষাণ প্রয়োগ কর্‌লে, কত তীরন্দাজ তীর বৃষ্টি কর্‌লে। সব ব্যর্থ হ'ল। কিন্তু তাই বলে' মগধ-পল্টনের ঘাঁটি ওঠাবার লক্ষণও দেখা গেল না।

এদিকে দুর্গের ভিতরে দুর্ভিক্ষ উঁকি দিতে সুরু করেছে, সঞ্চিত খাদ্যের অবশিষ্ট আছে অতি অল্পই। দুর্গের ভিতরকার তালের-গুঁড়িবিছানো গোটা-কয়েক রথ্যার তাল-গাছের তৈরী পাঁজরা খুলে' ফেলে' সেখানে ধানের চাষ দেওয়া হয়েছিল, জলের অল্পতায় তা শুকিয়ে গেছে। নগরের মেয়েরা স্বেচ্ছায় একাহারব্রত গ্রহণ কর্‌লে; তার পর বৃদ্ধেরা; তার পর সকলেই ঐ ব্রতে ব্রতী হ'ল। দেশাত্মবোধ যাদের জেগেছে তাদের এই ধারা। দেশের কল্যাণে এই সবাই-রাজার-দেশের প্রত্যেক লোকই স্বেচ্ছায় কষ্ট বরণ করে' নিলে, তবু দুর্গের দরজা খুল্‌তে রাজী হ'ল না।

মগধের চর তীরের মুখে চিঠি পাঠিয়ে অনেক প্রলোভন দেখিয়েও ও-কাজে কাউকে সম্মত কর্‌তে পার্‌লে না। কারণ বৈশালী সবাই-রাজার-দেশ, এখানে সবাই মাথা উঁচু করে' চলে, বল্‌বার কথা স্পষ্ট বলে, কর্‌বার কাজ সহজেই কর্‌তে জানে। সবাই জানে এ-দেশ আমার। এর অভ্যুদয়ে আমার উন্নতি, এর আদর্শে আমার উল্লাস, এর গৌরবে আমার নিজেরই গৌরব। সে গৌরবের চেয়ে বড় কিছু লোভের সামগ্রী মানুষে যে মানুষকে দিতে পারে সে কথা এরা বিশ্বাস করে না। তাই মগধের পক্ষ থেকে প্রলোভনের চেষ্টা একেবারেই নিষ্ফল হয়ে গেল। যুদ্ধের সময় এরা সবাই মিলে যুদ্ধ করে, লুটের ধন সবাই মিলে ভাগ করে' নেয়। শান্তির দিনে সবাই মিলে চাষ করে, সবাই মিলে তাঁত বোনে, আবার সবাই মিলে পঞ্চায়তের সন্থাগারে বসে' প্রয়োজন-মত বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন-পরিবর্ত্তনও করে। এদের রাজা নেই; তাই বলে' অরাজক বল্‌তে যে বিশৃঙ্খলা বোঝায় বৈশালীর সর্ব্বরাজক-তন্ত্রের শাসনে তার নাম-গন্ধও নেই। নগর-জ্যেষ্ঠকে এরা রাজার মতন মানে। সকলের সম্মতিতে ইনি নির্ব্বাচিত হন। তাই এঁর আর-এক নাম মহাসম্মত। মহাসম্মতের একলার ইচ্ছায় কোনো কাজ হয় না। কারণ এ সবাই-রাজার-দেশ, সকলেরই মতামত জান্‌তে হয়, মান্‌তে হয়। মতভেদ হ'লে এরা নাম-গুটিকার সাহায্যে সংবহুল করে, অর্থাৎ সম্যক্‌ রূপে বহুলোকের মত যে পক্ষে, সেই পক্ষের মতই গ্রহণ করে। যে পক্ষ হেরে' যায়, সংবহুল করার রীতিকে মান্য করে বলে', তারাও অধিকাংশের মতকেই শিরোধার্য্য করে' নেয়। তাই দলাদলি বড় একটা ঘটে না, রেষারিষির বড় একটা অবকাশ নেই। তাই এরা দুর্জ্জয়, ঐক্যের বলে দুর্জ্জয়, অবস্থার সাম্যে দুর্জ্জয়, ব্যবস্থার গুণে দুর্দ্ধর্ষ। শাক্য বুদ্ধ এদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্‌তেন, অজাতশত্রু এদের জয় করেছিলেন মাত্র, বশ কর্‌তে পারেন নি। তাঁর পর থেকে মগধের সিংহাসনে যিনিই বসেছেন, এই সবাই-রাজার-দেশের স্বদেশনিষ্ঠ স্বাধীন-চেতা মানুষ-গুলিকে বাগ মানাতে তাঁদের সকলকেই বেগ পেতে হয়েছে। অজাতশত্রুর সময়েও যেমন, দশসিদ্ধিক নন্দের সময়েও তেম্‌নি। এরা পাহাড়ীদের মগধের বিরুদ্ধে টুইয়ে দেয়, বনচরদের ক্ষেপিয়ে তোলে। দু'দুটো শতাব্দী কেটে গেছে। বৈশালীর মতি-গতির তবু পরিবর্ত্তন হয় নি। এদের সৈন্যবল অল্প, কিন্তু মনের তেজ অপ্রমেয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বজ্রক-দুর্গে

বজ্রক-দুর্গের দক্ষিণ প্রাকারে যাম্য-তোরণের উপর-কার প্রহরা-ছত্রীর ছত্রাকার গম্বুজের সাম্‌নে গভীর রাত্রে ভিড় জমে' গেছে। দণ্ড-দীপ হাতে দুর্গরক্ষীর দল শিরস্ত্রাণের লোহার ঘোম্‌টা খুলে' ফেলে' একটা মূর্চ্ছিত লোককে একটু কাছে থেকে ভালো করে' দেখ্‌বার লোভে ঠেলাঠেলি কর্‌ছে। লোকটা নাকি অন্ধকারে দেওয়াল বেয়ে' দুর্গে ঢুক্‌ছিল। প্রহরীদের প্রহারে সম্প্রতি সংজ্ঞাহীন।

বন্দীকে হাত পা বেঁধে দুর্গ-পরিখার পোষা কুমীরের দঙ্গলে ফেলে' দেওয়া হবে, কি প্রভাতে দণ্ড-নায়কের দরজায় হাজির করা হবে, এই নিয়ে প্রহরা-কুটের প্রহরী এবং ইন্দ্রকোষের তিন জন তীরন্দাজে যখন তুমুল তর্ক

বেধেছে, ঠিক সেই সময়ে বৈশালী-রাজ্যের সাত হাজার সাত শো সাতাত্তর জন সন্তের সম্মিলিত সম্মতিতে যিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা, সেই মহাসম্মত ধনুগ্রহের পুত্র, সেনানায়ক বলগুপ্ত, কালো ঘোড়ার পিঠে কালো কম্বলের আস্তরণ চড়িয়ে, চল্লিশ হাত চওড়া দুর্গপ্রাচীরের উপর ময়ূরসঞ্চারী গতিতে ঘোড়া চালিয়ে, সে রাতের মতন নগর-পরিক্রমা সমাপ্ত করে' কৌমারী-মণ্ডপের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ প্রহরীদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কানে পৌছোতেই ঘোড়া ফিরিয়ে একেবারে তাদের মাঝখানে গিয়ে হাজির হলেন। ভিড় ফাঁক হয়ে গেল। বুকে-লৌহপট্ট-আঁটা প্রহরী ও তীরন্দাজের দল তর্কের তোড় থামিয়ে হাত জোড় করে' নমস্কার জানালে। প্রতিনমস্কার করে' বলগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন—"কি সমাচার ? ভিড় কিসের ?"

একজন প্রহরী নগ্নপ্রায় মূর্চ্ছিত লোকটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্‌লে—"এই লোকটা দুর্গে ঢুক্‌ছিল, একে বন্দী করেছি।"

"দুর্গে ঢুক্‌ছিল ? তোমরা কি ঢুল্‌ছিলে ?"

"আজ্ঞে, না, দেখ্‌তে পেয়ে ওৎপেতে ছিলুম। লোকটা প্রাকারের উপরকার ছাঁটা পাথরের থরকাটা হস্তিনখের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল।"

"তার পর ?"

"ভাবলুম শড়্‌কীর খোঁচায় সাবড়ে দিই, কিন্তু আপনার আদেশ বন্দী করা, তাই টপ্‌কে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে' রইলুম। যেমন ভিতরে আসা অম্‌নি তূর্য্যধ্বনি করলুম, তীরন্দাজরা এসে পড়্‌ল। সহজেই বন্দী করা গেল। তার পর আলো নিয়ে তীর ছুঁড়ে পাথর ফেলে দেখ্‌লুম, আর কেউ দেওয়াল বেয়ে উঠ্‌ছে কি না ; দেখ্‌লুম কেউ না, লোকটা একলাই।"

ভিড়ের ভিতর থেকে একজন বলে' উঠ্‌ল—"লোকটা দুঃসাহসী !"

আরেকজন বল্‌লে—"পাগল !"

বলগুপ্ত বল্‌লেন—"পাগল কিসে ?"

লোকটা বল্‌লে—"নইলে কষ্ট করে' গা' ছড়ে' প্রাচীর বেয়ে' উঠে' শেষে বিনা বাক্যব্যয়ে ধরা দেয় ?"

প্রহরীর দিকে ফিরে বলগুপ্ত বল্‌লেন—"তোমরা যখন বন্দী কর, লোকটা বাধা দ্যায় নি ?"

প্রহরী একটু ইতস্তত করে' বল্‌লে—"না।"

"তবে মূর্চ্ছা গেল কি করে' ?"

প্রহরী চুপ করে' রইল।

প্রহরীকে নিরুত্তর দেখে বলগুপ্ত বল্‌লেন—"সহজেই যখন ধরা দিলে, তখন অত মারাটা ভালো হয় নি।··· যাক্, এখন ওকে সেবা-ঘরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করো, আঘাত বোধ হয় গুরুতর নয়, মূর্চ্ছা ভাঙ্‌তে বিলম্ব হবে বলে' মনে হচ্ছে না।···যে দুঃসাহসী দুষ্প্রবেশের ভরসা রাখে, তার কাছ থেকে দুর্লভসংবাদের আশা দুরাশা না হওয়াই সম্ভব। লোকটাকে চাঙ্গা করে' তুল্‌তে হবে।··· যাও, ওকে সেবাঘরে পাঠিয়ে দাও।" কথা শেষ হ'লে বলগুপ্ত প্রথম প্রহরীর হাতে নিজের নামাঙ্কিত একটা অভিজ্ঞান-মুদ্রা দিয়ে হরিণসঞ্চারী গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

এই গভীর রাত্রে আবার সেবাঘর পর্য্যন্ত দৌড়োতে হবে শুনে' প্রহরীর সমস্ত রাগ পড়্‌ল ঐ মূর্চ্ছিত লোকটার ঘাড়ে। সে নিজে আর একজন তীরন্দাজে মিলে লোকটাকে ঝাঁকি দিয়ে শূন্যে তুলে' খানিক ঝুলিয়ে, খানিক বা হেঁচ্‌ড়িয়ে নারকোল-বোঝাই বস্তাটার মতন টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চল্‌ল। বন্দীর ঝুলে-পড়া মাথাটা যে প্রাকার-পথের কয়েৎ-বেলের মতন পাথরগুলোর উপর প্রতি-পদেই ঠোক্কর খাচ্ছে সেদিকে কেউ ভ্রূক্ষেপও করলে না।

(ক্রমশঃ)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ইউরোপের বনাম ভারতের জ্ঞানপন্থা

ইউরোপের দান হইয়াছে সায়ান্স্ অর্থাৎ জিনিষের গতি সম্বন্ধে জ্ঞান, কার্য্যকারণ-পরম্পরার জ্ঞান। কোন জিনিষ লইয়া জিজ্ঞাসা উঠিলে ইউরোপীয় মনীষীরা তাহাকে দুই রকমে দেখিবার, তাহার মধ্যে দুইটা দিক্ পৃথক্ করিয়া লইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন—একটা হইতেছে চলন (process) বা তাহার কর্ম্মের ধারা, আর একটা হইতেছে গড়ন (content) বা তাহার আধারের উপাদান বিশ্লেষণ. একটা হইতেছে তাহার "কি রকমে" (how), আর একটা হইতেছে তাহার 'কি' (what)। জিনিষের এই দুইটি দিকের কথা বলিলেও, ইউরোপ তাহার প্রতিভা দেখাইয়াছে বিশেষভাবে "কি রকমের", কর্ম্মপ্রণালীর আলোচনায়,—"কি"র উত্তর, বস্তু-সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান যাহা তাহা আসিয়াছে ঐ আলোচনার অনুষঙ্গী হিসাবে। জড় (matter) কি, বিদ্যুৎ (electricity) কি, ইউরোপীয় বিজ্ঞান তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারে না, তবে যে জিনিষটা সে পারে তাহা হইতেছে ইহাদের কার্য্য-প্রণালীর কথা। আর সেইজন্যই, ইউরোপের তত্ত্বশাস্ত্রে (metaphysics)—যে শাস্ত্রের বিশেষ উদ্দেশ্য হইতেছে জিনিষের মূল সত্তা বা গড়ন (content) সম্বন্ধে জ্ঞান, তাহা খুব উচ্চদরের নয়, সেখানে—ইউরোপের মন কেমন ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে (physics)—যেখানে পাই জিনিষের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা সেখানে—ইউরোপ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

ভারতের প্রতিভা ইহার ঠিক উল্টা রকমের। জিনিষটা কি, তাহার মধ্যে বস্তু কি, ভারতীয় মন বিশেষ-ভাবে এই দিক্‌টাই লইয়া মগ্ন—আমরা চাহি "দ্রব্যজ্ঞান", কিন্তু জিনিষটা কি রকমে আসিল, কেমন করিয়া চলিয়াছে, সেই কর্ম্মশৃঙ্খলার পরম্পরার উপর আমাদের নজর তেমন পড়ে নাই। তাই ভারতে তত্ত্বজ্ঞান যতখানি দেখি, তন্ত্রজ্ঞান সেই অনুপাতে পাই না। ইউরোপ দেখিতেছে জিনিষের কলকব্জা, যাহার মধ্যে রহিয়াছে তাহার কর্ম্মের—তাহার জাতির রহস্য ; ভারতবর্ষ দেখিতেছে কি উপাদান বা ধাতু দিয়া জিনিষ গঠিত, সে যেন চাহিতেছে জিনিষের যে সত্তা বা স্থিতি তাহার রহস্য। কি করিলে কি হয় তাহার ধরণটি (Science বা Mechanism) সম্বন্ধে ভারতের মন উদাসীন : এই করিলে এই হয়, ইহাতেই ভারতবর্ষ সন্তুষ্ট—সে চায় কি করিতে হইবে, তার ফল কি হইবে ; মাঝের রাস্তার খুঁটিনাটি তাহাকে বড় ব্যতিব্যস্ত করে না।

যে কোন বিষয়েই হউক না কেন আমাদের শাস্ত্র বা সূত্র বা বচন এই কথারই প্রমাণ দিতেছে। আমরা আমাদের জ্ঞানের ফলটিকে শাস্ত্রে সূত্রে বা বচনে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু সেই জ্ঞানের প্রণালীটি মুছিয়া ফেলিয়াছি ; আমরা আবিষ্কার করিয়াছি অনেক জিনিষই, কিন্তু যাহা আবিষ্কার করিলাম তাহাই মুখ ফুটিয়া বলিয়াছি, কি রকমে যে তাহা আবিষ্কার করিলাম বা অন্যে সেটি কি রকমে আবার আবিষ্কার বা পরীক্ষা করিতে পারিবে সেই পথটা, সেই পথের অন্ধিসন্ধি সম্বন্ধে আমরা প্রায়শই নির্ব্বাক্। এই যেমন একটা বৈজ্ঞানিক সত্য আমরা সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছি—

চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি

ইহার হেতুবাদটা কি ? অথবা যে কথাটা লইয়া ইউরোপীয় মনীষী-মহলে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা চলিতেছে, ইউরোপীয় মনীষীদের পথ অবলম্বন করিয়াই আমাদের জগদীশচন্দ্র যাহার সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য বাহির করিতেছেন—উদ্ভিদেরও প্রাণ বা অনুভূতি আছে—সেই কথাটা মোটামুটি আমরা বহু পূর্ব্বেই সুস্পষ্ট বলিয়া দিয়াছি—

অন্তঃসংজ্ঞাভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ

কিন্তু কি রকমে, কি ধরণে, কোন্ কোন্ শক্তির সমাবেশে এই ঘটনাটি হয়, এই ব্যাপারটির বিচিত্র ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কোন কৌতূহল ছিল কি না সন্দেহের বিষয়। ভাস্করাচার্য্য বলিয়া দিয়াছেন পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতের পরিমাণ কি—ইউরোপীয় গণিতজ্ঞেরা

আশ্চর্য্য হইয়া যান, যে, এর value নিরূপণ করিতে তাঁহাদের এত মাথা ঘামাইতে হইয়াছে, তাঁহাদের বহুপূর্ব্বে তাঁহাদের অপেক্ষাও ঠিক ঠিক ভাবে প্রাচীন ভারত সে জিনিষটি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে ! কিন্তু কি প্রণালীতে (process) যে এই অঙ্কটির সমাধান করা হইয়াছে তাহা যিনি সমাধান করিয়াছেন তিনি কিছুই বলিয়া যান নাই। সর্ব্বত্রই এই-রকম, খনার বচন হইতে গণিত জ্যোতিষ আয়ুর্ব্বেদ সকল স্থানেই আমরা দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথের কথায়, উক্তির প্রাদুর্ভাব, যুক্তিটা প্রায়ই উহ্য বা লুপ্ত। উক্তিটা যতই সত্য হউক না কেন, যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া তাহাকে আমরা কেবল মানিয়াই লইতে পারি—প্রমাণের জন্য আমাদের ইউরোপেরই দ্বারস্থ হইতে হয়, ইউরোপের সায়ান্সের আলোকে তাহার মর্য্যাদার পরিমাপ করিতে হয়।

যাঁহারা মানিতে চাহেন না যে জড়বিজ্ঞান বা আধিভৌতিক বিষয়েও ইউরোপের কাছে ভারতের কিছু শিখিবার আছে, যাহারা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত যে অপরাবিদ্যাতেও, পার্থিব সৃষ্টিতেও ভারত ইউরোপেরই সমকক্ষ ছিল, তাঁহাদের মনোযোগ আমরা বিশেষরূপে এই কথাটির উপর আকর্ষণ করিতে চাই। আমরাও স্বীকার করি না যে ভারত কেবল অপার্থিব আত্মার মধ্যে ডুবিয়াছিল ; ভারতের প্রতিভা খেলিয়াছে শুধু পরমার্থ তত্ত্ব লইয়া, জীবনের সামগ্রী সম্বন্ধে তাহার কোন জিজ্ঞাসাই ছিল না বা এ-বিষয়ে সে কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। অপরাবিদ্যার, চৌষট্টি কলার, জড়বিজ্ঞানের অনেক রহস্যই সে আবিষ্কার করিয়াছে, শুধু আবিষ্কার করে নাই, জীবনের ভোগৈশ্বর্য্যে তাহাদিগকে ব্যবহার করিয়াছে, ফলাইয়াছে। কিন্তু কথাটা এই যে, কি কি বস্তু ইউরোপের তুলনায় আমাদের জানা ছিল বা না ছিল, ইউরোপের চেয়ে কত বেশী সামগ্রী কত সুস্পষ্টতররূপে আমরা জীবনের কাজে লাগাইয়াছি বা না লাগাইয়াছি সেটা উভয়ের মনের পার্থক্য ততখানি দেখায় না, যতখানি দেখায় কি উপায়ে কি ধরণে আমরা সেই সেই বস্তু বা সামগ্রী পাইয়াছি, তাহাদের সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছি। ভারতের সমস্ত লক্ষ্য নিহিত যেন বস্তুর বা সামগ্রীর উপর ; ইউরোপ নজর দিয়াছে তাহার ধরণ-ধারণটির উপর, তাহার হেতুবাদ, তাহার সায়ান্স্ বা মেকানিজ্‌মের উপর। ভারতবর্ষ বস্তুকে সামগ্রীকে পাইয়াছে মনে হয় যেন একটা নৈসর্গিক প্রতিভার বলে—instinct সহজ সংস্কারও বলিতে পার, Intuition সূক্ষ্মদৃষ্টিও বলিতে পার ; যাদুবিদ্যাও বলিতে পার ; অথবা ঘটনাচক্রে, একটা আকস্মিক অতর্কিত মিলের ফলে ; কিম্বা যদি সেখানে কোন তর্কবুদ্ধির, যুক্তির, পরীক্ষার প্রয়াস কিছু থাকিয়া থাকে তবে আবিষ্কারকরা সে কথা একেবারে বাদ দিয়া দিয়াছেন ; সিদ্ধান্তটি আমরা পাইয়াছি কিন্তু হেতুর অঙ্গগুলি আমাদের আবার নূতন করিয়া তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। এ যেন বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়। দেশীয় ভেষজবিদ্যায় আমরা জানি মাত্র এই ঔষধে এই ফল, কিন্তু কেমন করিয়া, তাহার ভিতরের প্রক্রিয়াটি, তাহার কেমিষ্ট্রি কি, তাহা আমাদের জানা নাই। রোগের নিদান কি সে সম্বন্ধে আমরা বায়ু পিত্ত কফ এই তিনটি মূলবস্তু লইয়াই সন্তুষ্ট। ইউরোপ কিন্তু এই ক্ষেত্রে রোগের বীজাণু পরমাণু আবিষ্কার করিতে করিতে ব্যাক্‌টেরিওলজি নামে একটা পৃথক্ বিজ্ঞানই তৈয়ার করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। তাই ত অনেক বৈজ্ঞানিক বলিতে কুণ্ঠিত হন না যে আমাদের বিজ্ঞান হইতেছে empirical, ইউরোপের বিজ্ঞানই কেবল scientific অর্থাৎ প্রতিক্ষেত্রে ফল না দেখিয়াও ইউরোপ বলিয়া দিতে পারে ফল এই হইবে, আমাদের কিন্তু "ফলেন পরিচীয়তে" ছাড়া গত্যন্তর নাই। ইউরোপের জিজ্ঞাসাবৃত্তি কার্য্যকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই, এমন কি কার্য্যের পিছনে কারণে পৌঁছিয়াই সে থামিয়া যায় নাই, সে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছে কারণ ও কার্য্যের সংযোগ-সেতুটা। নেপচুন গ্রহকে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রে না দেখিয়া তাহার অস্তিত্বের কথা আগে হইতেই যে অনুমিত হইয়াছিল অথবা পরমাণুদের সংমিশ্রণের নিয়ম (Periodic law) হইতে যে নূতন নূতন মূলপদার্থের (element) অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অব্যর্থ ভবিষ্যৎবাণী সম্ভব হইয়াছে, ইউরোপের পক্ষে ঠিক পূর্ব্বোক্ত কারণের জন্যই তাহা খুব আশ্চর্য্যের নহে।

আপ্ত-বাক্যই যেখানে প্রধান প্রমাণ, প্রমাণের হেতু-বাদটা যেখানে তেমন গণ্য করা হয় না, সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবস্থায় দুটি লক্ষণ আমরা দেখি। প্রথমতঃ সে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ফুটিয়া উঠে একটা স্থিতিশীলতার ভাব (static)—নূতন নূতন আবিষ্কার, প্রতিদিন নব নব রহস্যের উদ্‌ঘাটন আর সম্ভব হয় না; যে সত্য একবার পাইয়াছি তাহারই প্রয়োগে চর্ব্বিত চর্ব্বণে, তাহার যে-সকল উপসত্য এমন কি যে-সব সত্যাভাস তাহাদের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া চলি—অভিনব পথ একটা কাটিয়া আর সহজে বাহির হওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ দেখি জ্ঞান-বিজ্ঞান সর্ব্বসাধারণে ছড়াইয়া পড়ে না, তাহা আবদ্ধ থাকে একটা বিশেষ শ্রেণীর বা সঙ্ঘের মধ্যে গুপ্তবিদ্যারূপে—ফলে ক্রমে সেটা লুপ্ত বিদ্যা হইয়া পড়ে। ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে কতটা যে এই রকম ঘটিয়াছিল, তাহার হিসাব প্রত্নতাত্ত্বিকেরা দিতে পারিবেন। ইউরোপও তাহার মধ্য যুগে এই ধরণের অবস্থার ভিতর দিয়া আসিয়াছে—তখন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল অরিস্ততলের বাক্যের অনুবাদ টীকা ভাষ্য, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা আবদ্ধ ছিল খৃষ্টীয় চর্চ্চের যতীদের মধ্যে। কিন্তু ইউরোপের মনের উপর এই কালোপদ্দা রেনাসেন্স আন্দোলন আসিয়া এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিল—ইউরোপ পাইল তাহার নিজের প্রকৃতি। ইউরোপে যেটা ছিল ব্যতিক্রম, ভারতবর্ষে দেখি সেইটাই যেন নিয়ম।

ইউরোপের স্বভাব এই যে কোন সত্যকে বস্তু হিসাবে চিরন্তন সনাতন বলিয়া ধরিয়া থাকিতে পারে না। আমরা একটা সত্যকে পাইলে, তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে চাই, তাহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ; ইউরোপ কিন্তু তাহাকে মানিয়া লয় আপাততঃ সাময়িক ভাবে working hypothesis হিসাবে। কোন সত্যকে পাকাপাকি করিয়া লইবার ব্যস্ততা ইউরোপের নাই; সে আনন্দ পায় কেবল যেন experiment করিতে, সত্যকে নিত্য ভাঙ্গিতে চুরিতে, সে চাহিতেছে সত্যের রূপ নয়, কিন্তু সত্যের ভঙ্গীটি। গীতার বাক্য "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" ভারত অপেক্ষা ইউরোপই যেন সম্যক্ পালন করিয়া আসিতেছে। আমাদের লোভ ফলের দিকে, একটা ধরাবাঁধা সত্যের দিকে, একটা কিছু সুস্পষ্ট বা নিরেট বস্তুর দিকে, যাহাকে ভর করিয়া চলা-ফেরা যায়—সে সত্য নির্ভুল হইলে ত কথাই নাই, নির্ভুল না হইলেও একেবারে বিষম প্রমাদ না হইলেই আমরা সেটিকে যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লই। বাহিরে হাজার pragmatic হইলেও ইউরোপের মন কিন্তু ঠিক সে ধরণের নয়, ফল সম্বন্ধে পরিণাম সম্বন্ধে নিত্য সত্য সম্বন্ধে, ইউরোপের মন সম্পূর্ণ খোলা, ফলে পরিণামে নিত্য সত্যে কি করিয়া পৌঁছান যায় সেই মাঝের কথাটা, উপায়ের, কর্ম্মের কথাটাই তাহার পক্ষে আসল। এই যেমন আমাদের তীর্থস্থান সব—কি দুর্গম দুরাসাদ্য স্থানে সে-সকল প্রতিষ্ঠিত—তীর্থস্থান আমরা করিয়াছি কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার রাস্তাটা সম্বন্ধে আমরা একেবারে উদাসীন, রাস্তাটা কিছুই নয়, যেন তেন প্রকারেণ একবার লক্ষ্যে পৌঁছিলেই সব গোল চুকিয়া গেল। ইউরোপের ধরণ কিন্তু অন্যরকম, সে দেখে আগে রাস্তাটা, দেখিয়া শুনিয়া জরীপ করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া আগে সে তৈয়ার করিয়া লয় পাকা সড়ক—গতিবিধির সুবিধা করিয়া লইয়া তবে সে শহরের গম্যস্থানের দিকে নজর দেয়। যে দিকে ভাল রাস্তা চলে না, সে দিক্ হইতে বরং সে শহর উঠাইয়া লইবে, কিন্তু ভাল রাস্তা বিনা শহর বসাইবে না। জ্ঞান-সম্বন্ধে, সত্য-সম্বন্ধেও তাহার সেই এক কথা—তাহাতে পৌঁছিবার রাস্তাটা বেশ আঁটাবাঁধা কি, না সেখানে ঝম্প দিয়া পৌঁছিতে হয়? যে জ্ঞানে যে সত্যে চলিবার নিবিড় নিরেট কার্য্যকারণ ধারা নাই বা দেখান হয় নাই, সে জ্ঞান সে সত্য যত বড় জ্ঞান যত বড় সত্য হউক না কেন—তাহা ব্রহ্মেরই হউক আর স্বর্গেরই হউক সে জ্ঞান সে সত্য ভারতের জ্ঞান ভারতের সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইউরোপের জ্ঞান ইউরোপের সত্য নয়।

শুধু অপরাবিদ্যা আধিভৌতিকের জ্ঞান নহে, এমন কি পরাবিদ্যা অধ্যাত্মের জ্ঞান—যেটা হইতেছে ভারতের প্রতিভার বিশেষ দান—সেখানেও পর্য্যন্ত ভারতের যে মনের ধারার কথা আমরা বলিলাম তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার ভাণ্ডার যে উপনিষদ্ তাহা সমস্তখানিই হইতেছে উপলব্ধির ফল-

সমষ্টি, ঋষিরা যে-সকল সিদ্ধ অনুভূতি পাইয়াছিলেন তাহাদের আমরা তালিকা-সংগ্রহ বলিতে পারি। অবশ্য উপলব্ধিগুলি, অনুভূতিগুলি তাঁহারা সুচারুরূপে সাজাইয়া গুছাইয়াই বলিয়াছেন, তালিকাটি এলোমেলো লিষ্টি নয়, তলাইয়া দেখিলে সেখানে একটা লজিকেরই শৃঙ্খলা পাওয়া যায়; তবুও সে-সব হইতেছে গোটা বস্তুর কথা, বস্তুর গড়নের কথা, বস্তুর ভিতরকার কল-কব্জার কথা নয়, বস্তুর ভিতরকার শক্তি-সকলের ঘাত-প্রতিঘাতের ধারার কথা নয়। যেখানে পাই জ্ঞেয়ের তত্ত্ব, জ্ঞানের তত্ত্ব সেখানে যথেষ্ট মিলে না। সেখানে প্রশ্ন, কি বিজিজ্ঞাসিতব্য; বিজ্ঞান কি রকমে, প্রশ্ন তাহা নয়। তুরীয় অবস্থা কাহাকে বলি অর্থাৎ তাহার উপাদান কি কি, ব্রহ্মজ্ঞের লক্ষণ কি কি, তাহা জানিলেই যেন আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তির নিবৃত্তি হয়। আমাদের জানিতে তেমন কৌতূহল হয় না, সাধারণ অবস্থার আর তুরীয় অবস্থার মাঝের সেতুটা কি, সাধারণ অবস্থাটা কি রকমে পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত হইতে হইতে তুরীয় অবস্থায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, তুরীয় অবস্থার যে ধর্ম্ম কর্ম্ম তাহা শক্তির কি রকম খেলায় নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত হইতেছে; ব্রহ্মজ্ঞের হালচাল কি? সেটা হইতেছে বাহিরের কথা; ভিতরের কথা হইতেছে ব্রহ্মজ্ঞানের ধারাটা, তাহার dialectic কি রকমের—এটি আমাদের শাস্ত্রের প্রধান কথা নয়। ইউরোপের পরিভাষায় আমরা বলিতে পারি আমাদের দর্শন মূলতঃ ontological, আর ইউরোপীয় দর্শনের প্রধান কথা epistemological.

আমাদের এই সিদ্ধান্তে অনেকে হয়ত ইতস্ততঃ করিবেন—তাঁহারা বলিবেন, উপনিষদ্ সম্বন্ধে উহা খাটিলেও খাটিতে পারে, কারণ উপনিষদের উদ্দেশ্যই ছিল ঐরকম, কিন্তু উপনিষদের পরে দার্শনিক যুগের ষড়্দর্শন ও সে-সকলের বিপুল টীকা ও ভাষ্যাদি সম্মুখে রাখিয়া কে ও-কথা জোর করিয়া বলিতে পারে? থিওরী হিসাবে সাংখ্যে যে মানবমনের যন্ত্রপাতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে, প্রয়োগ হিসাবে যোগে যে অন্তঃকরণে রূপান্তরের ধারার রহস্য পাই—সে-সব কি জিনিষের mechanismএর কথা নয়, ইউরোপের সায়ান্স্ সে-সকলের মধ্যে জিজ্ঞাসার ফাঁক আর কি কিছু পাইতে পারে? উত্তরে আমরা বলিতে চাই, ভারত যেখানে জিনিষের—mechanism—কলকব্জার কথা বলিয়াছে, সেখানে কলকব্জার অংশগুলি খুলিয়া খুলিয়া দেখাইয়াছে কেবল—এই এতগুলি চাকা, এতগুলি স্ক্রু, এতগুলি বোল্টু, এতগুলি স্প্রিং; কিন্তু অংশগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত কি নিয়মে সংযুক্ত, কোন্ কার্য্য-পরম্পরার ফলে মোট জিনিষটার ধর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সেই law of causalityর কথা সেখানে তেমন পাই না—সেখানে পাই laws of being; কিন্তু laws of becoming আর-এক ধরণের জিনিষ। আমাদের প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রেই বস্তুর চুল-চেরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হদিস আছে—তা সে অন্তর্জগতের বস্তু হউক আর বহির্জগতের বস্তু হউক; কিন্তু সে-সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বস্তুনির্দ্দেশ মাত্র, প্রত্যেককে চিনিবার একটা সংজ্ঞা খাড়া করিয়াই যেন আমরা খালাস। কিন্তু তাহাদের ক্রম-পরিণতির ধারা, তাহাদের অন্তঃস্থিত শক্তিরাজির লীলাগতি আমাদের জিজ্ঞাসাকে তেমন প্রবুদ্ধ করিতে পারে নাই।

যোগ-সাধনায় আমাদের মনে শক্তির একটা সূক্ষ্ম লীলার রহস্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সত্য কথা। কিন্তু এখানেও লক্ষ্য ছিল শক্তির ফলের দিকে, সিদ্ধির দিকে; রূপান্তরের কার্য্যটার উপরই বিশেষ জোর আমরা দিয়াছি, রূপান্তরের কারণটার অন্ধি-সন্ধি তলাইয়া দেখিবার প্রয়োজন আমরা বোধ করি নাই। আমাদের বলা হইল—চিত্ত স্থির হইলে সেখানে ফুটিয়া উঠে আত্মার স্বরূপ। চিত্ত কি রকম বস্তু তাহারও ব্যাখ্যা দেওয়া হইল; আত্মা কি ধরণের জিনিষ তাহাও যতদূর সম্ভব বুঝাইয়া দেওয়া হইল; কি উপায়ে চিত্ত স্থির করিতে হইবে, তাহার পর্য্যন্ত আটঘাট (অষ্টাঙ্গমার্গ) বাঁধিয়া দেওয়া হইল। এই পন্থা অনুসরণ করিয়া ব্যবস্থামত ফলও আমরা লাভ করিলাম। কিন্তু এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটির রহস্য কি, কেমন করিয়া যে ইহা ঘটিল, সে সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ববৎ অজ্ঞই রহিলাম। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, এই দুইটি পৃথক্ বস্তুকে একটি কাঁচের পাত্রে একত্র করিলাম আর তাহার ভিতর দিয়া একটা

বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালাইয়া দিলাম - ফলে পাইলাম জল; কিন্তু এ ঘটনার কেমিষ্ট্রিটা কি সে দিকে নজর দিলাম না। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-মত আমরা আম-বাগানে ঢুকিয়া আম খাইয়াই সন্তুষ্ট, কিন্তু সেখানে কয়টা কতরকমের কি রকমের আম-গাছ আছে সেটা জানা আমরা নেহাৎ অবান্তর জিনিষ বলিয়া মনে করি।

যোগে অষ্টসিদ্ধি বা ঐশ্বর্য্যের কথা আছে। দূরশ্রবণ, দূর-দর্শন, শরীরকে ইচ্ছামত হাল্কা বা ভারী করা প্রভৃতি নানারকম অদ্ভুত শক্তি যোগসাধনায় হয়, - অন্ততঃ এইরকম বলা হইয়াছে। অনেক যোগী এ-রকম সম্পদ্ যে লাভ করিয়াছেন তাহারও প্রমাণ যে সব সময়ে উড়াইয়া দিবার উপযুক্ত এমনও বলা চলে না। কিন্তু কেন এ-রকম হয়, যোগসাধনায় শরীরের কি কি পরিবর্ত্তন কি রকমে ঘটিতে বাধ্য, আর এই-সব পরিবর্ত্তনের ফলে কি রকমে পূর্ব্বোক্ত অসাধারণ অত্যদ্ভুত শক্তি অব্যর্থভাবে ফুটিয়া উঠে—এ-সকল কথার সদুত্তর আমাদের যোগী-ঋষিরা যে দিতে পারিবেন তাহা মনে হয় না। তাঁহারা হয়ত শুধু বলিবেন—সূর্য্য উঠিলেই আলো হয়, ইহার আবার ব্যাখ্যা কি, ইহা ত অবিসম্বাদী স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু এই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারেরও যে কি রকমে ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহার নিদর্শন ইউরোপ দিতেছে। "ভূতুড়ে কাণ্ডের" বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লইয়া ইউরোপে আজকাল যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, তাহার সংবাদ অনেকেই জানেন নিশ্চয়; আর এই রকমে তাঁহারা যে কত অদৃষ্ট-পূর্ব্ব তথ্যের আবিষ্কার করিতেছেন তাহা দেখিয়া শুনিয়া স্তব্ধ হইয়াই যাইতে হয়।

অথবা ধরুন মন্ত্রশক্তির কথা। মন্ত্রের যে একটা শক্তি আছে, শব্দের যথাযথ সংযোজনের ধ্বনির যথাযথ উচ্চারণের যে একটা সৃজনের রূপ-গড়নের সামর্থ্য আছে সে তথ্য আমাদের প্রাচীনেরা পাইয়াছিলেন, এ তথ্যটি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাঁহারা করিয়াছেন, ইহার প্রয়োগ অনেক দেখাইয়াছেন, কিন্তু উহাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্যভাবে ধরিয়া; গোড়ায় ওটিকে যেন মানিয়া লইয়া তবে উহার ডালপালা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। এ তথ্যটি যে সত্য, ইহার গোপন রহস্য যে একটা অব্যর্থ কার্য্য-কারণ-পরম্পরায় বাঁধা তাহার প্রমাণটি আমরা আজ-কাল পাইতেছি ইউরোপের ধ্বনি-বিজ্ঞান (Accoustics) হইতে; ইহার সমস্ত ব্যঞ্জনা উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়া ইউরোপই ভারতের এই উপলব্ধির মূল্য ও মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিতেছে।

ইউরোপ জিনিষের ফিজিওলজি খুঁজিতেছে বলিয়া জিনিষের এনাটমি সম্বন্ধে গবেষণা আর তাহার শেষ হইতেছে না; তাই সে ফিজিক্সের তথ্য খুঁড়িতে খুঁড়িতে কেমিষ্ট্রির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারের মধ্যে তলাইয়া যাইতেছে। জিনিষের মূল পদার্থের জন্য আমরা পঞ্চভূত লইয়াই সন্তুষ্ট; ইউরোপেরও আগে ছিল পঞ্চ নয় চারিটি ভূত মাত্র। কিন্তু এই চারিভূত ভাঙ্গিয়া তাহারা বাহির করিল বাহাত্তরটি মৌলিক পদার্থ (chemical elements); সম্প্রতি আবার এই মৌলিক পদার্থের পরমাণুকেও (atom) ভাঙ্গিয়া সে বাহির করিয়াছে ইলেক্‌ট্রন্। আমরা হয়ত এই পর্য্যন্তই আসিয়া থামিয়া যাইতাম, বলিতাম ইহাই যথেষ্ট; ইউরোপে কিন্তু থামার চিহ্নও দেখি না, সে আরও চলিয়াছে। ইলেক্‌ট্রন্‌গুলির ওজন কত, তাহারা কি রকমে সজ্জিত, তাহাদের গতিবেগ কত—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের যে অঙ্কশাস্ত্র তাহাই ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার আধুনিকতম সমস্যা। জগতের জিনিষের কলকব্জার রহস্য বুঝিতে ইউরোপ যে আরও কোথায় কতদূর চলিবে তাহার ঠিক ঠিকানা কি?

ইউরোপের সায়ান্স্ বলিতে আসলে বুঝায় মনের বুদ্ধির এই ধরণটা, যাহার বশে সে চলে জিনিষের শৃঙ্খলা-সূত্রের ধারাবাহিক আঁকবাঁক অনুসরণ করিয়া। ইউরোপের সায়ান্সের বিশেষত্ব জড়ের জ্ঞান নয়, নূতন নূতন পদার্থের আবিষ্কার নয়—ইউরোপের সায়ান্সের বিশেষত্ব হইতেছে scientific method—বৈজ্ঞানিক প্রণালী। এই প্রণালীর দুইটি মোটা কথা—প্রথম এই যে, facts বা বস্তু সংগ্রহ করিতে হইবে যতদূর যতরকমের পারা যায়—আর দ্বিতীয় এই যে, বস্তুতে বস্তুতে নিবিড় সম্বন্ধের সূত্রটা খুলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে সায়ান্সের ঝোঁক বিশেষভাবে হইতেছে শেষোক্তটির উপর। ইউরোপ বস্তু যোগাড় করিতেছে, ঐ সম্বন্ধের

লীলাভঙ্গী বুঝিবার জন্য, ঐ সম্বন্ধেরই লীলাভঙ্গী উদাহরণের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া ধরিবার জন্যই সে বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

তবে ইউরোপীয় সায়ান্সের অথবা Scientific methodএর সঙ্কীর্ণতা এইখানে যে সে জিনিষের সম্বন্ধের খোঁজ করে দেহেরই মধ্যে। স্থূল সম্বন্ধে সন্তুষ্ট না হইয়া যতই সে সূক্ষ্ম সম্বন্ধের খোঁজে চলিয়াছে ততই সে শুধু দেহকেই কাটিয়া কাটিয়া দেহেরই অণু হইতে অণুর দিকে চলিয়াছে। নূতনতর নিবিড়তর সম্বন্ধ আবিষ্কারের জন্য সে যে-সব বস্তু নাড়িতেছে চাড়িতেছে তাহা সবই দেহাত্মক বস্তু। এই দেহাত্মজ্ঞান ইউরোপীয় সায়ান্স্ ছাড়াইয়া উঠিতে পারিতেছেও না, চাহিতেছেও না। সায়ান্সের দৃষ্টি চলিয়াছে বাহিরের দিকে, ভিতরের দিকে ডুবিতে ডুবিতেও তাই আবার ভাসিয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। দেহকে কাটিয়া কাটিয়া সে এমন- একটা জায়গায় পৌঁছিয়াছে যে সেখান হইতে আরও চলিলে তাহাকে দেহাতিরিক্ত আর-একটু কিছু বস্তুজগতের মধ্যে যাইয়া পড়িতে হয়—কিন্তু জড়মন লইয়া ইউরোপীয় সায়ান্স্ সে ধাপ আর পার হইতে পারিতেছে না, দূর হইতেই সেই দেহাতিরিক্ত প্রতিষ্ঠানের লীলাখেলা অনুমানে ধরিতে চাহিতেছে, দৈহিক সত্যের ছাঁচে সেগুলিকে ঢালাই করিতেছে।

জ্ঞানের পথে ইউরোপ চলিয়াছে দুইটি আলোকবর্তিকা লইয়া—দুইটি বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া (১) স্থূল ইন্দ্রিয় আর (২) তর্কবুদ্ধি। স্থূল ইন্দ্রিয় দিতেছে বস্তু বা facts আর তর্কবুদ্ধি দিতেছে বস্তুশৃঙ্খলার সূত্র। কিন্তু স্থূল ইন্দ্রিয় যে বস্তুরাশি জ্ঞানগোচর করিয়া ধরে তাহা একদিকে সসীম সঙ্কীর্ণ, আর একদিকে কাটা-কাটা ছাড়া-ছাড়া। স্বভাবতই ও সহজেই তাই ইউরোপ সেগুলির শৃঙ্খলার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের দিকে ঝোঁক দিতে পারিয়াছে।

ভারত বস্তুর শৃঙ্খলা-সূত্রের, কার্য্য-কারণ-পরম্পরার রহস্যের দিকে তেমন মনোযোগ দিতে পারে নাই, তাহার কারণ এই যে—জ্ঞানের জন্য সে এমন একটা বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াছে, যাহার সম্মুখে বস্তু অসংখ্য অজস্র ধারায় কেবলই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই নব নব বস্তু আবিষ্কারের আনন্দে সে এত মজিয়া মত্ত হইয়া গিয়াছে যে অন্য দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া তাহার পক্ষে ঘটিয়া উঠে নাই। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি ভারত জ্ঞানের পথে চলিয়াছে যেন কি একটা সূক্ষ্ম সহজাত অনুভবের প্রেরণায়—সেই কথাটাই একটু বিশদ করিয়া বলিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইবে।

একটা জিনিষ সকলেরই নজরে পড়িবে—পড়িয়াছেও—যে আমাদের দেশে সকল শাস্ত্র—নিতান্ত আধিভৌতিক বিষয়ের শাস্ত্র পর্য্যন্ত—আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সকল বিদ্যাকে—অপরা বিদ্যাকেও—ব্রহ্মবিদ্যা বা পরা বিদ্যারই উপায় বা সোপান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রই বল আর জ্যোতিষ-শাস্ত্রই বল অথবা আয়ুর্ব্বিদ্যাই বল—তাহারা কি প্রকারে মোক্ষপ্রদ, এই ভণিতা দিয়া সকলেরই ব্যাখ্যান সুরু করা হয়। ইহার অর্থ এই যে কোন জ্ঞানকেই একান্ত লৌকিক (secular) দৃষ্টি দিয়া আমরা দেখি না। সকল জ্ঞানই আমরা লাভ করিতে চাই পার্থিব অনুভব দিয়া নয়, কিন্তু একটা অতীন্দ্রিয় আলোকের ব্যঞ্জনায়। পক্ষান্তরে দেখি ইউরোপ তাহার সায়ান্স্‌কে ইন্দ্রিয়বদ্ধ ইহমুখী—যতদূর পারে secularই—করিয়া রাখিতে চায়। অতীন্দ্রিয়ের বা অধ্যাত্মের জগৎ হইতে বিজ্ঞানের জগৎ সে একেবারে আলাদা করিয়া তবে পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণা করিতে চায়। তাহার মতে অতীন্দ্রিয়ের অধ্যাত্মের কোন-রকম ভাবভঙ্গী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্যে আনিয়া ফেলা হইতেছে—ভেজাল দেওয়া, দুইটি বিভিন্ন রকমের বস্তুকে মিশাইয়া গোলমাল সৃষ্টি করা।

ভারতের পথটি আমরা যে ধরণের বলিলাম, তাহার নিদর্শন দেখি আর-এক ব্যাপারের মধ্যে। ভারতের যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা আবার সাধক অর্থাৎ তাঁহারা কেবল মস্তিষ্কেরই চালনা বা চর্চ্চা করেন না, তাঁহারা জীবনকেও কোন না কোন রকম তপশ্চর্য্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গঠিত করিতে চেষ্টা করেন। আমাদের দেশে যোগী-ঋষিরাই জ্ঞানী। আধিভৌতিক বিষয়েও যাঁহারা জ্ঞান দিয়াছেন, শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও ছিলেন যোগী ঋষি সাধক। আধুনিক কালেও দেখিতে পাই ভারতের

প্রাচীন জ্ঞান লইয়া যাঁহারা আছেন, ভারতের প্রাচীন জ্ঞানের পথে যাঁহারা চলিতেছেন, সেই ব্রাহ্মণদিগের (এবং কবিরাজদিগের) মধ্যেই পূর্ব্বতন ধারার চিহ্ন কিছু বর্ত্তমান আছে। সেখানেও অন্তরের সাধনা বোধ হয় লোপ পাইয়াছে, কিন্তু বাহিরের আচার ক্রিয়া এখনও তাঁহারাই বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন; এবং শ্রেণী হিসাবে এখনও বোধ হয় তাঁহাদেরই মধ্যে বেশী ও বিশেষভাবে পাই একটা শুদ্ধ সাত্ত্বিকতার আভাস।

আমাদের জ্ঞানীরা ছিলেন আচারসম্পন্ন, ক্রিয়াবান্ নিষ্ঠাবান্। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আবার শ্রেষ্ঠ তাঁহারা ছিলেন যোগী ও সাধক। তাই তাঁহারা ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ তাঁহাদের আধার ধৌত পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের মনবুদ্ধি একটা প্রশান্ত স্বচ্ছতায় ভরিয়া গিয়াছিল, তাই সেখানে দেখা দিয়াছিল একটা সূক্ষ্মতর বৃত্তি, বাহ্যিক ইন্দ্রিয় বা যন্ত্রের সাহায্য বিনাও যাহা সহজে ও সোজাসুজি ভাবে জিনিষের তথ্য নির্ণয় করিয়া দিত। এই সূক্ষ্মতর বৃত্তির আধুনিক নাম হইতেছে Psychic perception—বাংলায় আমরা বলিতে পারি "তন্মাত্রিক অনুভূতি" অথবা শুধু সূক্ষ্মদৃষ্টি। ইহা আধ্যাত্মিক দিব্যদৃষ্টি নয়, ইহা হইতেছে এক-রকম একাগ্র চেতনা, তীক্ষ্ণ ধারাল মনন-শক্তি। এই রকমের একটা জিনিষ এখনও মাঝে মাঝে আমরা দেখিতে পাই যাহাদিগকে বলা হয় Prodigies বা বালক জ্ঞানী তাহাদের মধ্যে। এমন শিশু বা বালকের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি যাহারা অঙ্কশাস্ত্রে কোন-রকম শিক্ষা না পাইয়াও—এমন কি অপরিণত বুদ্ধি লইয়াও—শুধু মুখে-মুখে বা মনে-মনে কঠিন এবং বৃহৎ অঙ্ক-সব অবলীলাক্রমে কসিয়া দিয়াছে। তাহারা অঙ্কের ফলটা অল্প সময়ের মধ্যে হুবহু ঠিক বলিয়া দিতে পারে—কিন্তু প্রণালীর বেলায় চলে একটা অভিনব সংক্ষিপ্ত পথ ধরিয়া। আমরা যাহাকে psychic perception নাম দিয়াছি, আমাদের জ্ঞানীরা জ্ঞানের জন্য যে পথে চলিতেন তাহারও ধরণ কতকটা ঐ রকমেরই ছিল। তাঁহাদের অনুভূতি সোজাসুজি, যেন তড়িৎ-বেগে, জ্ঞানের ফলের দিকে ধাইয়া চলিত; এই চলার একটা বিশেষ ধারা (process) থাকিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা থাকিত অন্তর্লীন গুপ্ত ধারার মত (concentrated and involved)। তাই সেখানে জোরটা পড়িত ফলের বা বস্তুর উপর, প্রণালীর বা চলনের উপর নয়।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীরা সব জ্ঞানই আহরণ করিতেন এই সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে। আধিভৌতিক অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক বিষয়েও এই বৃত্তিটির আশ্রয় তাঁহারা লইতেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাতে-কলমেও পরীক্ষণ পরীক্ষাদি (observation and experiment) যে করিতেন না তাহা নয়। এ বিষয়েও তাঁহাদের যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে সূক্ষ্ম অনুভূতির ধারা ও ধর্ম্ম তাঁহাদের মনের উপর এমন একটা ছাপ দিয়া গিয়াছিল যে হাতে-কলমের স্থূল ক্ষেত্রেও তাঁহারা সেই ধারায় ও সেই ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া চলিতেন। এ-ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পথেও তাই তাঁহাদের দৃষ্টি ফলের উপর যতখানি গিয়া পড়িয়াছে, সেই ফলটা যে আসিল কেমন করিয়া তাহার প্রণালীর উপর ততখানি পড়ে নাই। তাই তাঁহাদের সিদ্ধি দেখিয়া আমরা চমকিত হইয়া পড়ি, কারণ সাধনার ধারার রহস্যটি তাঁহারা একেবারে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, লোপ করিয়া দিয়াছেন।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পন্থা হইতে ভারতের এইটুকু শিখিবার, আয়ত্ত করিবার আছে। ইউরোপের বিজ্ঞানের মত জড়মুখী ইন্দ্রিয়াবলম্বী হইয়া ভারতের কোন লাভ নাই। ভারতের সেই প্রাচীন সূক্ষ্ম অনুভূতি সজাগ রাখিতে হইবে—কিন্তু তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সেই কার্য্য-কারণ-পরম্পরা ধরিবার—প্রকট করিবার—প্রতিভা। বৈদিক ঋষিগণ যাহাকে ঋতম্ বলিতেন অর্থাৎ জিনিষের নামরূপ নয়, এমন কি তাহার সত্যটিও নয়, কিন্তু নামরূপের পিছনে সে সত্যের যে সত্য ছন্দ, যে নিবিড় গতিভঙ্গী তাহাকে বিশ্বলীলার মধ্যে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে সেইখানেই রহিয়াছে সকল উত্তম রহস্য। এই দিব্য ছন্দতত্ত্ব অধিকার করিতে হইলে চাই ভারতের অন্তর্দৃষ্টি আর সেই অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে চাই ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ভঙ্গী।

শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত

একজন লজ্জা ও ধরা পড়িবার আনন্দ ও অপরে বিস্ময় প্রশংসা ও কৃতার্থতার ভাব চক্ষে ভরিয়া লইয়া ছবিখানির প্রতি চাহিল।

ছবিখানি যমুনার। আলোকোদ্ভাসিত কক্ষের মুক্ত বাতায়ন-পথে দয়িতের দিকে মুখ ফিরাইয়া সে দাঁড়াইয়া। তাহার সদ্যসমাপ্ত সঙ্গীত এখনও যেন কণ্ঠে ওষ্ঠে লাগিয়া রহিয়াছে। মধুর কণ্ঠের সঙ্গীতের তরঙ্গ এই মাত্র যেন শান্ত হইয়াছে, যাহার কম্পন ঈষদ্‌বিভিন্ন সূক্ষ্ম ওষ্ঠাধরে এখনও যেন লাগিয়া রহিয়াছে। চক্ষু দুটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে অবিচল সুবিশুদ্ধ প্রেম, যাহা অমৃত হইতেও মরণজয়ী, চন্দ্রকিরণের চেয়েও স্নিগ্ধ, প্রণয়ের ব্যক্ত বাণীর চেয়েও মধুর। আঁখি দুটি যেন বলিতেছে তুমি যেখানে যাইবে যাও। আমি চিরকাল অন্তরে প্রেমের দীপ জ্বালাইয়া তোমারই প্রতীক্ষায় জাগিয়া রহিব। নীচে অনুপমের হাতে লেখা—

বঁধু কি আর বলিব আমি!
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হোয়ো তুমি!

তেমন ছবি প্রকৃত প্রেম লাভ না করিলে কেহ আঁকিতে পারে না।

যমুনা মুগ্ধনেত্রে বিহ্বল-হৃদয়ে আপনার ছবির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—দূর দূরান্তরে তাহার দয়িত তাহারই চোখের একটা ইঙ্গিতে একটি কথার ভরসায় দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি তাহার বিনিদ্র চক্ষু লইয়া অক্লান্ত তুলি দিয়া কত না যত্নে কত না প্রাণ দিয়া—বুঝি বা হৃদয়ের রক্ত দিয়া—ছবিখানি সম্পূর্ণ করিয়াছে।

আজ তাহার অন্তরনিহিত প্রণয় তাহাকে আর স্থির থাকিতে দিল না। কি সুকৃতি তাহার ছিল যে এই অপার্থিব সম্পদ্, এই দুর্লভ সৌভাগ্য ভগবান্ তাহার জন্য সঙ্গোপনে রাখিয়াছিলেন।

দুজনেই দাঁড়াইয়া ছবিখানির প্রতি চাহিয়াছিল। কম্পিত দুটি সুন্দর বাহু দিয়া যমুনা অনুপমের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহার বক্ষের উপর মাথা রাখিয়া অশ্রুধারে বক্ষস্থল সিক্ত করিয়া দিয়া বলিতে চাহিয়াছিল—"আমি তোমার যোগ্য নই।"

অনুপম যমুনার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া অতি ধীরে অতি সাবধানে পাছে আঘাত লাগে যেন এই ভয়ে তাহার পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠদুটি একবার চুম্বন করিল।

জীবনে এই প্রথম দুজন দুজনকে স্পর্শ করিল।

তখন বিপুল বিশ্ব তাহাদের মাঝে হারাইয়া গিয়াছিল।

শ্রী মাণিক ভট্টাচার্য্য

সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা

মানুষ যখন সৃষ্টির কোনো একটা অংশকে বিশেষ করে' চিন্‌বার জন্যে, জান্‌বার জন্যে, তার চিন্তাশক্তিকে নিযুক্ত করে, তখন তার উদ্দেশ্য হয় শুধু জ্ঞানের জন্যে জ্ঞান-লাভ, নয় কোন কার্য্য সাধন উদ্দেশ্যে জ্ঞানলাভ। সৃষ্টি বল্‌তে শুধু একটা বস্তুসমষ্টি বুঝায় না; প্রাণহীন ও প্রাণবান্ বস্তুসমুদায়ের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ ও ব্যবহারও তার অন্তর্গত। দার্শনিক যখন, সৃষ্টি কোথা হ'তে এল, কোথায় যাচ্ছে ও কেন যাচ্ছে, এই নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য কোন কার্য্যসিদ্ধি নয়। আবার, মানুষের শরীর কেটে কুটে যখন কেউ শরীর-বিজ্ঞান চর্চ্চা করেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য একটা কার্য্যসিদ্ধি, অর্থাৎ রোগ-চিকিৎসা সহজ করে' আনা। অনেক স্থলে অবশ্য শুধু জ্ঞানলাভ-চেষ্টার ফলে যা পাওয়া যায়, তাও মানুষের প্রয়োজনসিদ্ধি কর্‌তে পারে। কাজেই সর্ব্বত্র দুয়ের মধ্যে খুব একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা টেনে দিয়ে বলা যায় না, যে, এইটির কোনো প্রয়োজনসিদ্ধি করার ক্ষমতা নেই ও এইটির আছে।

তার্কিক বল্‌বেন, যে, শুধু জ্ঞানলাভে যে আনন্দ, সেটিও আনন্দ, আবার মূল্যবান্ কাপড় পরে' যে আনন্দ, সেটিও আনন্দ; তবে মূল্যবান্ কাপড় তৈরী করার জন্যে

যে ব্যক্তি বয়নবিদ্যা নিয়ে মাথা ঘামায়, তার কাজটা প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বলা হবে কেন, আর যে ঈশ্বরের হিংসা বা ভালবাসা আছে কি না এই নিয়ে ব্যস্ত, তার কাজটা প্রয়োজনসিদ্ধি কর্‌ছে বলা হবে না কেন? গোলমালটা উঠ্‌ছে, "প্রয়োজনসিদ্ধি" কথাটি নিয়ে। দুই ক্ষেত্রে "প্রয়োজন" কথাটির মানে বিভিন্ন। আমরা যে "প্রয়োজনসিদ্ধির" কথা বল্‌ছি, সেটি বাহ্য-বস্তুতন্ত্রের কথা, আর তার্কিকের "প্রয়োজনসিদ্ধি' হচ্ছে জ্ঞানতন্ত্রের কথা। অর্থাৎ কিনা, আমাদের প্রয়োজন-সিদ্ধি হ'লে তা দেখা যাবে, ছোঁয়া যাবে, এক কথায় ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে তাকে বোধ করা যাবে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের মনের মধ্যেই শুধু যদি কোন "প্রয়োজন-সিদ্ধির" সাড়া পড়ে এবং অপরে যদি সেটা প্রত্যক্ষ কর্‌তে না পারে, তবে সে জিনিষটির মূল্য জ্ঞান-তান্ত্রিকের কাছে থাক্‌লেও বস্তুতান্ত্রিকের কাছে নেই।

বাহ্যবস্তুতন্ত্র ও জ্ঞানতন্ত্র পরস্পর বিরোধী নয়। একই মানুষের মধ্যে দুইটি থাক্‌তে পারে ও সচরাচর থাকে। দার্শনিক যদি বলেন, "ছাদে ফুটা থাক্‌লে ছাদের কার্য্য-সিদ্ধি হয় না," অথবা, "একই জিনিষ এক স্থলে আট আনা ও অপর স্থলে চার আনা মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে দেখ্‌লে, অসুবিধা না হলে আমি চার আনা দিয়েই জিনিষটা কিন্‌ব", তা হ'লে তিনি অদার্শনিক হয়ে যাবেন না। যন্ত্রব্যবসায়ী যদি বলেন, "ভোরের বেলায় পাখীর গান আমার প্রাণে কি একটা অবর্ণনীয় আনন্দ যে এনে দেয়, তা বুঝাব কি ক'রে?" তবে তাঁর যন্ত্রজ্ঞান অসাড় হয়ে যাবে না। মাড়বার-নন্দন যে সময় সময় ভজনানন্দে মেতে যান, তাতে অন্য সময় তাঁর ভোজনা-নন্দের কোন ব্যাঘাত হয় না। একই মানুষের প্রাণে নানান্ রসের আবির্ভাব হয়, নানান্ চিন্তার ধারা বয়ে' যায়। সকল প্রকার চিন্তা ও ভাবের আধার মানুষ, কাজেই এটা আশ্চর্য্য কিছুই নয়। নাক দিয়ে হেঁটে বেড়ান যায় না, বা পা দিয়ে ঘ্রাণ করা যায় না, অথচ একই শরীরে নাক ও পা রয়েছে। এতে আমরা আশ্চর্য্য হই না। তবে একই ব্যক্তি যদি কার্য্যসাধন-চেষ্টা ও জ্ঞানলাভ-চেষ্টা করে, তা হ'লেই বা অবাক্ হবার কি আছে? অথবা একই অনুসন্ধিৎসা যদি জ্ঞানলাভ ও কার্য্যসাধন এই উভয় ক্ষেত্রেই সাহায্য করে, তাতেই বা আপত্তির কি আছে?

অনুসন্ধিৎসার দুই উদ্দেশ্য হ'তে পারে। এক হচ্ছে, অনুসন্ধানের বিষয়টি যে প্রকার, সেই প্রকার **কি করে'** হ'ল; যেমন উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান আমাদের দেখিয়ে দেয়, কেমন করে' বীজ থেকে বৃক্ষ হয়, কেমন করে' মাটি বাতাস ও সূর্য্য থেকে বৃক্ষ তার পুষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করে, ইত্যাদি। আবার অন্য প্রকার অনুসন্ধিৎসার উদ্দেশ্য, কি করে' অনু-সন্ধানের বিষয়কে কোনো বিশেষ প্রকার করা যায়। অর্থাৎ বিষয়টি যদি নৌকা হয়, তা হ'লে কেমন করে' নৌকা তৈরী করা যায়, এই হবে অনুসন্ধানের বিষয়। প্রথম ধরণের অনুসন্ধিৎসা হচ্ছে বিজ্ঞান ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিদ্যা। কেমন করে' মানুষের দেহ এ-প্রকার হয়েছে ও রয়েছে, শরীরবিজ্ঞান আমাদের তা জানাচ্ছে; কেমন করে' অস্বাভাবিক দৈহিক অবস্থাকে স্বাভাবিক করে' আনা যায়, তা আমাদের জানাচ্ছে চিকিৎসাবিদ্যা। বিজ্ঞান ও বিদ্যার মধ্যে এই পার্থক্যের সৃষ্টিতে কারুর কারুর আপত্তি থাক্‌তে পারে, কিন্তু প্রয়োজনীয়তার খাতিরে এটা কর্‌তে হবে। অবশ্য তলিয়ে দেখ্‌লে অনেক সময় দেখা যাবে যে বিজ্ঞান ও বিদ্যা দুইটিই একই জিনিষ জানাচ্ছে; কেবল বিজ্ঞান বল্‌ছে, "এই রকম করে' হ'ল," আর বিদ্যা বল্‌ছে, "এই রকম করে' কর।" তা ছাড়া বিজ্ঞান জিনিষটাকে যত খুঁটিয়ে দেখ্‌বে, বিদ্যা ততটা নাও দেখ্‌তে পারে। কাজটা সমাধা (ভবিষ্যৎটাও অবশ্য চোখের সাম্‌নে থাক্‌বে) কর্‌তে হ'লে যতটুকু জ্ঞান দর্‌কার, বিদ্যার কেবল সেইটুকুর দিকেই নজর থাকবে; কিন্তু বিজ্ঞান জিনিষটাকে এমন ভাবে দেখ্‌তে পারে, যে, কাজের দিক্ থেকে তার অন্ততঃ সেই সময়ের মত কোনই দাম না থাক্‌তে পারে।

মানুষকে নিয়ে মানুষ চিরকালই চিন্তা করে' আস্‌ছে। ব্যক্তি নিজে শারীরিক ভাবে ও মানসিক ভাবে কি, তা নিয়ে অনেকগুলি বিজ্ঞান ব্যস্ত থাকে; যথা শরীরবিজ্ঞান বা প্রাণীবিজ্ঞান (উচ্চতর প্রাণীদের ক্রমবিকাশ এর মধ্যে পড়ে) এবং মনোবিজ্ঞান।

বর্ত্তমান মানবসমাজকে বুঝ্‌তে হ'লে মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক বিচিত্র সম্বন্ধকেও বুঝ্‌তে হবে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ও বিরোধের বহু রূপ ও ক্ষেত্রকে বুঝ্‌তে হবে। বর্ত্তমান যুগের মানুষ যে এই রকম হয়েছে, তারও একটা কারণ আছে এবং সেই কারণ মানবসমাজের ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায়। মানুষ যে এক এক দেশে এক এক রকম ভাবে বাস করে, তার রীতিনীতি শিল্পকলা প্রভৃতিও যে নানান্ দেশে নানান্ রকম, তারও কারণ আছে। এই-সব বুঝ্‌তে হ'লে সামাজিক বিজ্ঞানগুলির চর্চ্চা প্রয়োজন।

এই সামাজিক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে একটি বিজ্ঞান অনুসন্ধান করে—কি করে' মনুষ্যসমাজে সুখস্বাচ্ছন্দ্য আসে; যে-সব জিনিষ ও যে-অবস্থা পেলে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয়, সে-সকল জিনিষ ও অবস্থার প্রতি তার আকর্ষণ মানুষ কি ভাবে প্রকাশ করে; কোনো ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য বাড়্‌লে বা কম্‌লে তা কি কারণে বাড়ে বা কমে; কোনো স্বাভাবিক (অর্থাৎ মনুষ্যসৃষ্ট নয়) নিয়ম অথবা নিয়মসমষ্টির উপর মানবসমাজের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে কি না, এবং যদি করে ত সে নিয়মগুলি কি কি? এই বিজ্ঞানকে সামাজিক-স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞান, কল্যাণ-বিজ্ঞান অথবা শ্রীবৃদ্ধি-বিজ্ঞান বলা যেতে পারে (The Science of Social Welfare or Economics)। মানুষ ও তার আর্থিক ও বৈষয়িক ব্যবহারই হচ্ছে এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। এ-বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অনেকটা হাটে বাজারে। এতে এর দাম হয় ত অনেক হাট-বাজার-সুদ-ও-খাজনা-বিদ্বেষীর কাছে কমে' যাবে; কিন্তু মনে রাখ্‌তে হবে, যেমন মানুষকে সুস্থ রাখতে হ'লে রোগ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা দরকার ও সহর পরিষ্কার রাখ্‌তে হ'লে ময়লা নর্দ্দমা সম্বন্ধেও জ্ঞান অর্জ্জন কর্‌তে হয়, সেই রকম মনুষ্যসমাজকে আরও সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে হ'লে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহায়গুলির সঙ্গে অন্তরায়গুলিকেও নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে হবে। তা ছাড়া আর-একটা কথাও ভাব্‌তে হবে। অনেক বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের মনে নানারকম বিরুদ্ধ ভাব আছে কেন? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই-সব বিষয়ে আমাদের আংশিক জ্ঞান ইহার জন্য দায়ী। কোনো একটা বৈষয়িক ব্যাপারের একটা দুষ্ট অবস্থার পরিচয় মাত্র পেয়ে আমরা ব্যাপারটার ভাল মন্দ সমস্তটা সম্বন্ধেই এক কথায় সিদ্ধান্ত করি। বৈজ্ঞানিকভাবে সব জিনিষটা খুঁটিয়ে দেখ্‌লে হয় ত আমাদের অনেক কুসংস্কার ও ভ্রান্ত সংস্কার কেটে যেতে পারে।

আমাদের দেশের দুঃখ অনেক ও দারিদ্র্য ভীষণ। এসব দূর করতে হবে এবং তার জন্যে ভালমন্দ সব কিছু দেখ্‌তে হবে, ছুঁতে হবে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক কোঁৎ (Comte) বলেছেন, 'হৃদয় আমাদের সমস্যাগুলি অনুভব করায়, আর বুদ্ধি করে তার সমাধান।' হৃদয় আমাদের আজ ভাল করেই সমঝিয়ে দিচ্ছে, যে, দেশের সর্ব্বাপেক্ষা নিদারুণ সমস্যা তার দারিদ্র্য। স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও চর্চ্চার ফল অনুসারে কাজ করা এ দারিদ্র্য দূর করবার একমাত্র পথ।

স্বাচ্ছন্দ্য একটা মানসিক অবস্থা মাত্র। কিন্তু কতকগুলি মানসিক কারণ বা কারণসমষ্টি হ'তেই স্বাচ্ছন্দ্যের উৎপত্তি, এই যদি আমরা মনে করি, তবে ভুল করব। বাহ্যবস্তুগত কারণেই অধিকাংশ স্থলে স্বাচ্ছন্দ্যের আবির্ভাব হয়; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই একই বাহ্য কারণবিশেষ উপস্থিত থাক্‌লেই স্বাচ্ছন্দ্য না থাক্‌তে পারে। যেমন, এক ব্যক্তিকে এক সের সন্দেশ দিলে তার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়্‌তে পারে, অথচ স্বাদজ্ঞান-হীন রুগ্ন ব্যক্তির কাছে তার কোনও মূল্য না থাকতে পারে। ফিরিঙ্গিকে হ্যাট কোট টাই প্রভৃতি সরবরাহ করলে তার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হ'তে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাতে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত এবং ব্যাকুলই হয়ে উঠ্‌বেন। কাজেই দেখ্‌তে পাচ্ছি, বাহ্যবস্তুর স্বাচ্ছন্দ্যদানের ক্ষমতা গ্রহণকারীর মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

স্বাচ্ছন্দ্য মানসিক অবস্থামাত্র হ'লেও আমরা দেখ্‌ছি, যে, সেটা বাহ্য বস্তু বা অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। বিজ্ঞানের একটা অঙ্গ যে 'মাপজোখ' তা আমরা জানি। যে-সব জিনিষ মাপা যায় না, যে-সব

জিনিষ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না, সে-সবের বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার হওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞান থেকে কতকগুলি আবছায়া ভাবের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে বাদ দিতে হয়। বিভিন্ন মানুষের মনে ছোট বড় সামান্য ও অসামান্য নানা কারণে নানা রকম সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব হ'তে পারে; বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে তা ধরা অসম্ভব। একটা জাতির কতটা স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব পরাধীনতার জন্যে হয়, তা ঠিক মেপে কে বল্‌বে? কোনো জাতিবিশেষকে দিয়ে এর পরীক্ষা করা ত চলে না; কেন না, এই একই কারণে সব জাতির স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব সমান না হ'তে পারে, এবং এত সূক্ষ্ম কোনো বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি নেই, যা মানুষের কিম্বা মনুষ্যজাতির কোনো একটা মানসিক অবস্থাকে নিক্তির ওজনে কার্য্যকারণে বিভাগ করে' দিতে পারে। কাজেই পরাধীনতা কি ভাবে স্বাচ্ছন্দ্যকে কমিয়ে দেয়, সে সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত। মা তাঁর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে' যে সুখ পান, তাকেও কোনো মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। স্বাস্থ্য জিনিষটির ঠিক কতটা স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার ক্ষমতা আছে, তাও মাপা যায় না। স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি মাত্র একটি আছে। সেটি হচ্ছে ধন। এটা যে কিছু একটা নিখুঁৎ সঠিক রকম মাপ-কাঠি, তা নয়; তবে এ ছাড়া আর অন্য মাপকাঠির অভাবে ধনকে দিয়েই কাজ চালাতে হবে। টাকা দিয়ে কি করে' স্বাচ্ছন্দ্য মাপা যায়? ধরা যাক্ এক জন লোক এক জোড়া জুতা ও একখানি কাপড়, এই দুইটির জন্যেই দশ দশ টাকা দিতে প্রস্তুত, তার বেশী নয়। এতে বোঝা যাচ্ছে, যে, সেই জুতা-জোড়া ও সেই কাপড়খানির স্বাচ্ছন্দ্য-দান-ক্ষমতা তাঁর কাছে সমান।

(এতে প্রমাণ হচ্ছে না যে জুতা ও কাপড়ের প্রয়োজনীয়তা সমান। শুধু এই জানা যাচ্ছে, যে, কোনো ব্যক্তি কোনো অবস্থা-বিশেষে এক জোড়া জুতার স্বাচ্ছন্দ্য-দান-ক্ষমতা একখানা কাপড়ের ঐ ক্ষমতার সমান মনে করেছেন। কোন জিনিষের বাজার-দর, শুধু তার প্রয়োজনীয়তা দিয়ে ঠিক হয় না—বিক্রেতার জিনিষটি তৈরী কর্‌তে বা জোগাড় কর্‌তে কি পরিমাণে কষ্ট হয়েছে এবং জিনিষটি কি পরিমাণে পাওয়া যায়, দর তার উপরেও অনেকটা নির্ভর করে।)

এ ছাড়া, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘের আয় ব্যয় প্রভৃতিও টাকায় মাপা হয়। কি করে' হয়, তা আমরা পরে দেখ্‌ব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে, স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞান সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের শুধু সেই অংশটুকু নিয়েই আলোচনা কর্‌বে, যেটুকুকে টাকার মাপকাঠি দিয়ে কোনো না কোনো রকমে মাপা যায়। অবশ্য ঠিক্ এইটুকুকে মাপা যায় আর এই টুকুকে মাপা যায় না, এমন কিছু একটা সূক্ষ্মরকম ভাগাভাগি করা সম্ভব নয়। তবে এটা বলা যায়, যে, এইগুলিকে সহজে মাপা যায়, এইগুলিকে একটু কষ্ট করে' মাপা যায় এবং এইগুলিকে মাপা প্রায় অসম্ভব। এই পরিমেয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যটুকু নিয়েই আমাদের বিজ্ঞান। তা ছাড়া যা, সেটুকুকে **অপরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য** বল্‌তে হবে। এখানে অপরিমেয় অর্থে অনন্ত বুঝাচ্ছে না; পরিমেয় নয়, শুধু এইটুকুই বুঝাচ্ছে। অপরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য,—যেমন স্বাস্থ্য, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, স্নেহ, ঈশ্বরে বিশ্বাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবোধ ইত্যাদি; এবং পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য অর্থাৎ যা টাকার মাপ-কাঠিতে মাপা যায়; এই দুই প্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের সমষ্টি হচ্ছে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য। [পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য বাড়্‌লে বা কম্‌লেই যে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়্‌বে বা কম্‌বে, এমন কোন কথা নেই। মানুষ **পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য** বা তার উপকরণ সৃষ্টি কর্‌তে গিয়ে নিজের **অপরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য** এতটা কমিয়ে ফেল্‌তে পারে, যে, হয় ত ফলে **সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য** কম্‌বে বই বাড়্‌বে না।]

শুধু পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দিয়ে মানুষ তার সৌন্দর্য্যবোধ হারিয়ে ফেল্‌তে পারে, তার মধ্যে ভালবাস্‌বার, স্নেহ কর্‌বার বা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর্‌বার ক্ষমতা চলে' যেতে পারে। এক কথায় বাহ্যবস্তুর উৎপাদন-চেষ্টার ফলে নিজেকেই মানুষ নষ্ট করে' ফেল্‌তে পারে, তার মানসিক বৃত্তিগুলি ভোঁতা হয়ে যেতে পারে। আগেই বলেছি, স্বাচ্ছন্দ্য একটা মানসিক অবস্থা, এবং ব্যক্তির বোধশক্তির উপরেই তার পরিমাণ অনেকটা নির্ভর

করে, কাজেই মানসিক দারিদ্র্য অনেক সময় বাহ্যবস্তুর প্রাচুর্য্যকে চাপা দিয়ে কোন কোন জাতির বা সংঘের সুখস্বাচ্ছন্দ্য কমিয়ে দিতে পারে ;—পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য অপরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্যকে নানাভাবে কমাতে বা বাড়াতে পারে।

প্রথমতঃ, পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য কি ভাবে উপার্জ্জিত হচ্ছে তার উপর অপরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটা নির্ভর করে। কেন না, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর মানুষের জীবনের উৎকর্ষ বিশেষরূপে নির্ভর করে। মানুষ কি কার্য্য করছে, অনেকটা তার উপর মনের উৎকর্ষ নির্ভর করে। ভৃত্য, কৃষক, সৈনিক, সঙ্গীতাচার্য্য, অধ্যাপক ও সুদখোর মহাজন, এদের সকলেরই মনের অবস্থা এদের জীবিকার দ্বারা অনেকটা স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। যে সমাজের সকল লোকেরই মনের অবস্থা দাসব্যবসায়ী অথবা জল্লাদের মত, সে সমাজের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। আবার যন্ত্রের যুগের (Industrial revolution) গোড়ার থেকে শ্রমজীবীকে অনেক সময় তার পরিবার ছেড়ে কার্‌খানায় থাকতে হচ্ছে। এতে তার পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য (মাহিনা বা উপার্জ্জিত বস্তুর পরিমাণ) বেড়ে থাকলেও, নিজের পরিবারের সঙ্গচ্যুত হওয়ায় বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও খোলা হাওয়ার অভাব অনুভব করায়, তার অপরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটা কমে' এসেছে। অবশ্য অনেক দেশে শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয়, চিত্রশালা, ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতি করা হয়েছে এবং তাদের কাজ করবার নির্দ্দিষ্ট সময় বেশ কম বলে' অনেক ক্ষেত্রে এতে তারা অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। মনের উৎকর্ষ সাধনের বন্দোবস্ত থাকা ত দূরের কথা, শ্রমজীবীদের অবস্থা সবদিক্ দিয়েই এদেশে অত্যন্ত শোচনীয়। এসব ছেড়ে দিলেও আরো দেখ্‌বার আছে। মানুষ যদি একটা বিশাল যন্ত্রের অংশরূপে কাজ করে অর্থাৎ তার ব্যক্তিত্ব যদি একটা যন্ত্রের আড়ালে একেবারে চাপা পড়ে' যায়, তা হ'লে তার মানসিক অবনতি হয়। কাজেই বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বত্রই শ্রমজীবীদের যতদূর সম্ভব বড় বড় কার্‌খানার বাইরে রেখে কাজ চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। **মানুষ যে শুধু বস্তু উৎপাদনের উপায় মাত্র নয়, বরং তার উদ্দেশ্যই,** এ কথাটা আজ চিন্তাশীল জগৎ বুঝেছে। ফুলের বাগান কর্‌তে গিয়ে যদি নিজেই অন্ধ ও ঘ্রাণশক্তিরহিত হয়ে যেতে হয়, তা হ'লে বাগান করে' লাভটা কোন্ খানে ?

বস্তু উৎপাদনার্থে মানুষে মানুষে কি প্রকার সম্বন্ধ সৃষ্ট হয়, তাও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্ থেকে জানা প্রয়োজন। উৎপাদনের যে প্রণালী অবলম্বনের ফলে দারুণ প্রতিযোগিতা জন্মে, তাতে বস্তু উৎপাদন বেশী হ'লেও সামাজিক সদ্ভাব কমে' যাওয়ায় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যও কমে' যায়। এ স্থলে সে প্রণালীর পরিবর্ত্তে সমবায় (Co-operation) অবলম্বনে অনেক লাভ আছে। সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ ব্যক্তির হৃদয়বৃত্তিগুলির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। কোন একটা সুরের সৌন্দর্য্য বা তাহার অভাব যেমন সুরের অংশগুলির পরস্পরের সুনিয়ন্ত্রিত সম্বন্ধের বা তার অভাবের উপর নির্ভর করে, তেমনই মানুষের সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য্য বা কদর্য্যতা সমাজমধ্যস্থ ব্যক্তিদিগের পরস্পরের সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। এদিক্ থেকে দেখ্‌লে ধনিক (capitalist) ও শ্রমিকে (labourer) ঝগ্‌ড়া একটি বিশাল সমস্যা।

দ্বিতীয়তঃ, উপার্জ্জিত পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য লাভের উপকরণ কিভাবে ভোগ করা হয়, তার উপরও অপরিমেয় ও তৎসঙ্গে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটা নির্ভর করে। অত্যধিক মদ খাবার জন্য যদি কিছু ব্যয় করা যায়, তা হ'লে তার ফল, লেখা পড়া শেখার জন্য বা পুস্তক ক্রয় করার জন্য ব্যয় করার ফলের চেয়ে অনেক খারাপ হবে। দুষ্ট আমোদ-প্রমোদে কিছু ব্যয় করা এবং উচ্চ-শ্রেণীর সঙ্গীত শ্রবণে সেটুকু ব্যয় করায় অনেক প্রভেদ।

রাজস্ব যদি চিত্রশালা, বিদ্যালয়, প্রদর্শনী প্রভৃতি রক্ষার্থে ব্যয়িত হয়, তবে তাতে সামাজিক জীবনের উপর এক প্রকার ফল হয় ; আর যদি তা ঘোড়-দৌড়ের মাঠ বা জুয়া-খেলার কাসিনো নির্ম্মাণার্থে অথবা নীচ ও অসভ্য লোককে সৈনিকের পোষাক পরিয়ে নিরপরাধীকে উত্যক্ত করে' ব্যয়িত হয়, তবে তার ফল হয় অপর ও নিকৃষ্ট প্রকারের। শরীর সুস্থ সবল ও মন উন্নত প্রফুল্ল এবং

মার্জ্জিত রাখ্‌বার ইচ্ছায় স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পরিচ্ছদ, বিদ্যাশিক্ষা, খেলাধূলা ও ব্যায়াম, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর বাসস্থান প্রভৃতির জন্য যদি কোন গৃহস্থ তাঁর উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করেন, তা হ'লে তাঁর পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য হবে এক প্রকার; আর কদর্য্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানে ও অশিক্ষিত অবস্থায় পরিবারকে রেখে যে ব্যক্তি জুয়া খেলা ও মদ্য-পানকে ব্যয়ের কেন্দ্র করে, তার পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য হবে আর-এক প্রকার। দ্বিতীয় পরিবারের আয় প্রথম পরিবার অপেক্ষা কিছু অধিক হ'লেও দ্বিতীয় পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ব্বের মতই হবে। এই কথাটি সরকারী ব্যয় সম্বন্ধে বেশী রকম খাটে। সরকারী ব্যয় কোন্ ভাবে হয়, তার উপর একটা জাতের স্বাচ্ছন্দ্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। যদি কোন জাতের আয়ের অধিকাংশ অপব্যয়িত হয়, তা হ'লে সে জাতের স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষ-রকম কমে' আস্‌বে। সরকারী অপব্যয় কাকে বলে তা নির্দ্দেশ কর্‌তে হ'লে অল্প কথায় এই বলা যায় যে, যে, ব্যয়টি অন্য ভাবে হ'লে অধিক পরিমাণ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হ'ত, তাই অপব্যয়। যথা, অপরজাতীয় কোন ব্যক্তি অল্পকাল বাস কর্‌বেন, এই জন্য যদি কোন দেশের খরচে একটি বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মিত হয় এবং যদি সেই দেশের সহস্র সহস্র লোক পশুশালা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বাস-স্থানে বাস করে, তা হ'লে সামাজিক অথবা জাতীয় দিক্ থেকে অট্টালিকা নির্ম্মাণ-রূপ ব্যয়টি একটি মারাত্মক রকম অপব্যয়। সুপুষ্ট ব্যক্তিকে অসাধারণ রকম সুপুষ্ট কর্‌বার জন্য যে ব্যয়, তা কৃশকায় ব্যক্তিকে সাধারণ রকম পুষ্ট কর্‌বার জন্য যে ব্যয়, তার তুলনায় অপব্যয়।

কেউ যেন না ভাবেন, যে, পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য (economic welfare) বাড়াবার চেষ্টা কর্‌লেই অপরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য (non-economic welfare) এবং তৎসঙ্গে মোট সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য (total social welfare) কমে' যাবে, এই প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই এতখানি লেখা হয়েছে। প্রথমতঃ, কিছুদূর অবধি পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য না থাক্‌লে, স্বাচ্ছন্দ্য বলে' মোটে কিছু থাকেই না। সূক্ষ্মভাবে পারিবারিক ভালবাসার মর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বার ক্ষমতা ও অবসর তখনই লোকের বিকাশ পায়, যখন পরিবারের লোককে ভরণপোষণ করে' রাখ্‌বার ক্ষমতা তার থাকে। দূরে কারখানায় চলে' গেলে পারিবারিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বটে, কিন্তু ঘরে বসে যদি কেউ স্ত্রীকে বা সন্তানকে না খেয়ে, বা ঠাণ্ডা লেগে, বা বিনা চিকিৎসায় মরে' যেতে দেখে, তাতে যা স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ঘটে, তার তুলনায় বিরহ প্রায় মধুময়। ঘরে বসে' যদি কেউ সমান বা অধিক অশিক্ষিত থাকে, তা হ'লে তার পক্ষে শিক্ষার-বন্দোবস্ত-বিশিষ্ট সহরের কারখানায় যাওয়াই শ্রেয়। সেখানে বরং দেখে শেখ্‌বার অনেক কিছু আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করার ক্ষমতা অনাহারে বা রোগ-ভোগের ফলে দৃষ্টিশক্তির অভাব হলে থাকে না। খোলা হাওয়াও খালি পেটে ভাল লাগে না। তা ছাড়া মানসিক উৎকর্ষ সাধনের কথা তখনই উঠে, যখন শরীর তার জন্যে প্রস্তুত থাকে। যাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ষোল ঘণ্টা দৈহিক শ্রম করতে হয়, তার মানসিক উৎকর্ষ সাধন অসাধ্যসাধন। **মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রধান সহায় অবসর ;** এই কথা এরিস্টট্‌ল্ আজ প্রায় দুই হাজারের বেশী বৎসর আগে বলে' গিয়েছেন। মনের উপর হাড়ভাঙা খাটুনির যে কি ফল, তা আমরা চার দিকেই দেখ্‌তে পাই। দেহ ধারণের বাস্তব উপকরণ প্রয়োজন-অনুযায়ী না থাক্‌লে অভাবগ্রস্ত মানুষের উচ্চতর বৃত্তিগুলি ভোঁতা হয়ে যায়। কাজেই যতক্ষণ মানুষ সেই প্রয়োজনীয় বস্তুসমষ্টি না পাচ্ছে, ততক্ষণ তার পক্ষে অন্য চিন্তা করা নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ। পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার চেষ্টার পথে চলে' যতক্ষণ সমাজের বা জাতির সকলে বা অধিকাংশ লোক জীবন-ধারণার্থে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বস্তুসমষ্টি না পাচ্ছে, ততক্ষণ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে একাভিমুখী হবে—অর্থাৎ দ্বিতীয়টি বাড়্‌লে বা কম্‌লে প্রথমটিও বাড়্‌বে বা কম্‌বে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যা অবস্থা, তাতে পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টার ফলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়্‌বে নিঃসন্দেহ। অবশ্য কল্পনাশক্তির সাহায্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, যাতে পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টায় শুধু কুফলই ফল্‌বে। কিন্তু সত্য বলতে গেলে

যতদিন দেশের সব লোক অন্তত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি না পাচ্ছে, তত দিন ঐ-জাতীয় আশঙ্কার কোনই হেতু নেই। বাস্তব ঐশ্বর্য্য আপাততঃ আমাদের এত কম, যে, তা বাড়াতে গিয়ে অসুবিধা হ'লেও মোটের উপর লাভই হবে। আমাদের দেশ সম্বন্ধে একথা বিশেষ ভাবে সত্য। কোন কাল্পনিক উদাহরণের মূল্য শুধু কল্পনাজীবীর কাছেই আছে।

আর-একটা কথা বলে' রাখা দরকার। পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্যের কোন পরিবর্ত্তন হ'লেই যে অপরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্যের সাক্ষাৎভাবে কোন পরিবর্ত্তন হবে, এমন কোন স্থিরতা নেই। অনেক স্থলেই সে রকম হবে না। মোট কথা এই, যে, বিপরীত রকম বিশেষ প্রমাণ না পেলে, **পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্ত্তন ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্ত্তন এক প্রকারই হয়ে থাকে** বলে' ধর্‌তে হবে ; অর্থাৎ যদি কেউ উল্টা কথা বলেন ত তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ কর্‌বার ভার তাঁরই উপরে। প্রমাণ না পেলে আমরা ধরে' নেব, যে, পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য অথবা বাস্তব ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বর্ত্তমানে এখনও অনেক কাল বেড়ে চল্‌বে।

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসীর আত্মকথা

২

…জাগিয়া উঠিয়া, যে তাজা শৈবালের উপর ঘুমাইয়া ছিলাম সেই শৈবালগুলা দেখিতে লাগিলাম।—আমাদের ফ্রান্সের শৈবালের মত দেখিতে : এক রকম গন্ধ তৃণও ছিল ; আমার পরিচিত বনভূমির তৃণকে মনে করাইয়া দিল—তৃণগুল্ম জন্মাইবার অনুকূল পাথুরে মাটির উপর, বড় বড় ওক গাছের ছায়ায় এই জাতীয় তৃণ দেখা যাইত। আমার শৈশবে ঐ বনভূমিতে বাস করিয়াছি…

একটা পুরাতন ছোট প্রাচীরের পাদদেশে, একটা খুব ছায়াময় কোণ — এই জায়গায় আমি ঘুমাইয়া ছিলাম।

এই প্রাচীরের নিম্নদেশ যাহার গায়ে আমার মাথা ঠেস্ দিয়া ছিলাম —ইহাও অপরিচিত বলিয়া মনে হইল না। উহা আমাদের গ্রামাদির ছোট ছোট গৃহের দেওয়ালের মত ; সেকালে পল্লীগ্রামের ধরণে এক পোঁচ চুনের কলি দিয়া সাদা করা হইয়াছিল—এক্ষণে সমস্ত সবুজ ; গর্ত্তগুলার মধ্যে পাতা বাহারের গাছ জন্মিয়াছে…তরুময় প্রদেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত কোন এক পরিত্যক্ত কুটীরের এই প্রাচীর সন্দেহ নাই (ইহার চতুর্দ্দিকে ঘন নিবিড় হরিৎ-পুঞ্জ)।

দুই সেকেণ্ড ধরিয়া, স্বদেশের ভাব—একটা সম্পূর্ণ স্বদেশের ভাব অনুভব করিলাম— আমাদের ফ্রান্সের গ্রীষ্মসুলভ রমণীয় শোভাসৌন্দর্য্য অনুভব করিলাম। আমাদের কোন কোন বনভূমিতে সংঘটিত আমার শৈশব-জাগৃতির বিভ্রম উপলব্ধি করিলাম…

…তথাপি বৃক্ষশাখার মধ্য দিয়া এই যে জোর বাতাস বহিতেছিল, ক্রমাগতই বহিতেছিল, এই বাতাসটা খুবই গরম, উহার সহিত অপরিচিত সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল…তাহার পর আমার নিকটেই সমুদ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—এবং আমার মাথার উপর আর-একটা শব্দ,—সুদূর বেলাভূমিতে তরঙ্গাঘাত-শব্দ শুনিতে পাইলাম—এই সব শব্দ হঠাৎ আমাকে অন্যত্র এক বিমিশ্রস্মৃতির জগতে লইয়া গেল…তখন আমি উপর দিকে চাহিয়া দেখিলাম…এই আকাশের অপর্য্যাপ্ত আলোকের মধ্যে স্বকীয় দীর্ঘ বৃন্তের উপর আরূঢ় হইয়া একটা নারিকেল-গাছ তাহার অঙ্গুলায়িত বড় বড় পালোকগুলা ফুটাইয়া আছে…

এই বিষাদময় শব্দটা সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জবর্ত্তী বেলাভূমির বিশেষ-ধরণের শব্দ ; আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে ওটাহিটির অনেক কথা মনে করাইয়া দিল যে-সব কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম—স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছিল…আমি মনে মনে ভাবিলাম আমি কি এখন সেইখানে আছি ?…

কিন্তু না, যে প্রাচীরটা ফ্রান্সের গ্রামের কথা মনে করাইয়া দিয়াছিল সেই ক্ষুদ্র প্রাচীরের উপরটা আমার চোখে পড়িল ; দেখিলাম, উহা অদ্ভুতভাবে মাল্যাকারে বিভূষিত ; শিং ও বক্র-নখ-থাবায় এবং কালবশে ক্ষয়প্রাপ্ত, এবড়ো-খেবড়ো নানাপ্রকার মূর্ত্তিতে গিস্‌গিস্ করিতেছে ; এবং চীনা মাটির একটা বিকট জীব ছাদের কানার উপর বসিয়া, আমার দিকে চাহিয়া আছে ও চীনা ধরণে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে…

চীন ! দূরবর্ত্তী চীন। তা হ'লে আমি চীনদেশে আছি ! বৃহৎ "স্বর্গীয় রাজ্যের" কোন একটা কোণে আমি তা হ'লে ঘুমাইতেছিলাম — শান্তভাবে ঘুমাইতেছিলাম—সেই গ্রীষ্মসুলভ নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম…

ওঃ। তখন আমাদের ফ্রান্সের সুরম্য গ্রীষ্মদিনের কথা, সেই সুন্দর বৎসরগুলার কথা, যাহা কিছু ভালবাসি, যাহা কিছু ভালবাসিয়াছি তাহা হইতে বহু দূরে, যে যৌবনটা সম্ভবতঃ এখানে অতিবাহিত করিতে হইবে সেই যৌবনের শেষ বৎসরগুলার কথা মনে করিয়া বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

…পুরাতন মন্দিরটার নিকটে নিদ্রা গিয়াছিলাম ; এই মন্দির আমার নিকট এখন খুব পরিচিত —হরিৎ শ্যামল দ্বীপের মধ্যে বিচ্ছিন্ন-ভাবে অবস্থিত ; এইখানে, মৎস্যজীবীরা, যাহাতে তাহাদের জাল মাছে ভরিয়া যায়, এইজন্য বুদ্ধদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে আসে।—এবং চোখ না খুলিয়াও আমার মনোদর্পণে দেখিতে পাইতেছি সেই বৃহৎ উপসাগর, সেই অন্ধকারময় পর্ব্বতগুলা যাহার দ্বারা এই হরিৎ শ্যামল

দ্বীপটা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। তা ছাড়া আরও দেখিতে পাইতেছি এই কাঠনির্ম্মিত মন্দিরের অভ্যন্তরদেশ, সেই-সব পুতুল, সেই তিন চারিটা ক্ষুদ্র বিকট মূর্ত্তি, সোনায় ভরা কতকগুলা ভূতপ্রেত—সকলেই এই আর্দ্র অন্ধকারের মধ্যে নিদ্রা যাইতেছে।

কেমন করিয়া এখানে আসিলাম? এই তুরান্ দেশে, চৈনিক সাগরের ধারে?…আর, এই প্রবাস হইতে না জানি আমি কখন্ বাহির হইতে পারিব?

আমার এখন স্মরণ হইতেছে…সেটা শীঘ্রই ঘটিয়া ছিল:—কোন এক রমণীয় বসন্তের দিনে, একটা বজ্রপাতের মত, প্রস্থানের আদেশ আসিয়া পৌঁছিল। এই অঞ্চলে একটা যুদ্ধ বাধিয়াছে; এখন সমস্ত ছাড়িয়া ছুড়িয়া "ব্রেষ্ট" বন্দরে গিয়া জাহাজে উঠিতে হইবে—পিছনে না তাকাইয়া বিনাআক্ষেপে প্রস্থান করিতে হইবে। আয়োজন-উদ্যোগ বিদায়-সম্ভাষণ প্রভৃতিতে এক সপ্তাহ ব্যস্তভাবে কাটিয়া গেল, তাহার পর পাড়ী দিবার দিন উপস্থিত হইল; জাহাজের উপর প্রস্থানের গম্ভীর আহ্বান ধ্বনিত হইল—"ব্রেটনের" উপকূল আমাদের পশ্চাতে সুদূর অনন্তের মধ্যে বিলীন হইল।

তাহার পর, সমুদ্র আরও নীল হইল, আকাশ আরও স্বচ্ছ হইল, সূর্য্য আরও উষ্ণ হইল; আল্‌জেরিয়া সম্মুখে দেখা দিল,—আল্‌জেরিয়া পূর্ব্বেরই মত আমাকে মাতাইয়া তুলিল।

এসিয়ার পীতবর্ণ নরকে পৌঁছিবার পূর্ব্বে, এই আল্‌জেরিয়ার বিশ্রামসুখের দিনটা অতীব ক্ষণস্থায়ী, অতীব অস্থির বলিয়া মনে হইল। এই চিত্তবিমোহন আল্‌জেরিয়ার সহিত আমার অতীত জীবনের কত স্মৃতিই জড়িত। তা ছাড়া, এই আলোকে, বাতাসে, আফ্রিকার কি এক অপূর্ব্ব সৌরভ বিচরণ করে, তাহা অবর্ণনীয়—তাহা ধরা-ছোঁয়া যায় না।

দিনের বেলা, ছায়াতলে অলসভাবে ভ্রমণ করিতাম, অথবা পূর্ব্বের মত বন্ধুবর সৈ-মহম্মদের সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতাম। আর রাত্রে উচ্চদেশে জ্যোৎস্নাধবল রহস্যময় মুরজাতীয় নগরের মধ্যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া, ছোট ছোট আরবী বাঁশীতে সেই চিরন্তন বিষাদময় সুর ধ্বনিত হইতেছে আর সেই সঙ্গে খুব সজোরে ঢাক বাজিতেছে শুনিতাম। ঐ সঙ্গীত এখনও আমাকে মুগ্ধ করে। মার্জ্জিত সঙ্গীত শুনিয়া শুনিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

তাহার পর "পোর্ট্ সৈয়দ্" পর্য্যন্ত আবার আমরা প্রশান্ত নীলজল-রাশির উপর দিয়া চলিলাম—পোর্ট্ সৈয়দে য়ুরোপীয় সমস্ত জাতির একটা খিচুড়ি পাকিয়াছে;—কিন্তু বনিয়াদ্‌ট ইজিপ্টের;—অসীম বালুকার রাজ্য।

দ্রুত পার হইয়া গেলাম—সুয়েজের যোজকভূমি, মসার দেশের ঝিক্‌মিকে বালুরাশি, মরীচিকাদি, নদীর উঁচু পাড়ের উপর সার্থবাহের দল;—তাহার পরেই লোহিত সাগরে অবতরণ করিলাম।

উত্তাপ বাড়িয়া উঠিল, আকাশের নীলিমা বালুর সংস্পর্শে ম্লান হইয়া গেল। আমাদের শ্বাসরোধ হইয়া আসিল। তখন জুলাই মাস; উনানের তপ্ত বায়ু প্রবলবেগে পিছন হইতে আমাদিগকে ঠেলা দিতেছে। রাত্রে, তারার বদল হইল, "cross of the south" নক্ষত্র আস্তে আস্তে আকাশে উঠিল; ঐ নক্ষত্রকে আমি সুদূর-স্মৃতির আবেগে অভিবাদন করিলাম।

পরিশেষে, ভারত-সাগরে প্রবেশ করিলাম। বাতাস সমানভাবে বহিতেছে। হাওয়া কবোষ্ণ ও নির্ম্মল। বিদায়-বিচ্ছেদের দারুণ যন্ত্রণার পর, মনের ভিতরে এখন একটু শান্তি আসিয়াছে। দূরত্বের ব্যবধান ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে…

আকাশ কৃষ্ণবর্ণ, ঝড়ের মত বাতাস সবেগে বহিতেছে; পরমাশ্চর্য্য-সিংহলদ্বীপ উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে…তত্রত্য বিস্তৃত বিশাল তরুমণ্ডপ হইতে রাশি রাশি পত্র পুষ্প পতিত হইয়া ঐখানকার ভূমিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং বৃষ্টির প্লাবনে ভিজাইয়া দিয়াছে; ওখানকার রাত্রি-গুলা উষ্ণ ও ঘোরতমসাবৃত এবং মৃগনাভির তীব্র গন্ধে বাতাস ভরপুর। ডাগর ডাগর ভারতীয় চোখ, রূপার কলসী-কাঁখে, লালশাড়ী পরা রমণীরা সায়াহ্নের অন্তরে একটা গুরুতর ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ উৎপাদন করিয়া, দেবীর মত প্রশান্তভাবে চলিয়াছে…

তাহার পর, আবার সাগর সুলভ স্বাস্থ্য ও বিশ্রামদায়িনী জীবন-লীলা আরম্ভ হইল; একটা উদার শান্তি আসিয়া সমস্ত বিক্ষোভ-চাঞ্চল্য মুছিয়া দিল। আমরা মালাক্কার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রতিদিনই সেই একই রকম চমৎকার নির্ম্মল আকাশ, সেই একই রকম আলোকের মোহিনী মায়া।

একদিন রাত্রে, একটার সময়, এই বঙ্গ-উপসাগরের মধ্যস্থলে আমাকে জাগাইয়া দিবার জন্য, জাহাজের হালধারীদের উপর আদেশ জারি করা হইয়াছিল—সেদিন আদেশ দিবার পর পোয়া ঘণ্টাও অতীত হয় নাই। আমরা হিসাব করিয়া সেই দিক্ পানে চলিতে লাগিলাম যে-জায়গায় আমার ভাইকে সাগর-জলে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল। আমি জাগিয়া উঠিয়া আমার চারিদিকে, সাগর ও যামিনীর নীলাভ স্বচ্ছতা দেখিতে লাগিলাম।

এই রাত্রিতে সমস্তই শান্ত-প্রশান্ত; চন্দ্রমা একটু অবগুণ্ঠিত। দক্ষিণদিকের দিগ্‌বলয়টা খুবই গভীর। পক্ষান্তরে উত্তর দিকে, ঐ কবর-স্থানের দিকে, ঘননিবিড় কতকগুলা মেঘ জলরাশির উপর চাপিয়া বসিয়াছে—তাহার ছায়া বিশাল পর্দ্দার মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মৌসুমের বাতাস, যাহা ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে ঠেলা দিতেছিল, বিষুবরেখার কাছাকাছি আসিয়াই মরিয়া গেল। তাহার পর একদিন সায়াহ্নকালে আচেম্ রাজ্যের ট্যাঁকের মাথাটা স্বর্ণোজ্জ্বল আলোকের মধ্যে, আমাদের নেত্রসমক্ষে উপস্থিত হইল। এখন জল আরও গরম হইয়া উঠিয়াছে—এই উষ্ণ জলের উপর, বাদুড়ের কোঁচ্‌কান ডানার মত পাল তুলিয়া, কতকগুলা মাছ-ধরিবার ডিঙ্গি প্রথম দেখা দিয়াছে। আমরা প্রান্তিক এসিয়ায় উপনীত হইয়াছি, আমরা পীত নরকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি। শিঙ্গাপুরে, বিষুব-মণ্ডল-সুলভ বড় বড় গাছের নীচে, আমাদের চতুর্দ্দিকে, রগের-উপর-টানা চোখ, মুণ্ডিতমস্তক, বেণী-ঝোলানো নোংরা চীনাদের জটলা ও কপি-সুলভ চাঞ্চল্য আরম্ভ হইয়াছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমের মৌসুম বাতাসের ঠেলায় আমরা চীনসাগরে দ্রুত আসিয়া পড়িলাম।

আকাশ অন্ধকার, মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে, এই সময়ে কিনা আমরা টংকিনে পৌঁছিলাম! কি ভয়ানক! ঐদিন আমি সর্দ্দিগর্ম্মি হইতে সবেমাত্র সারিয়া উঠিয়াছি, তখনও খুব দুর্ব্বল। এই সর্দ্দিগর্ম্মি আমার জীবনের একমাত্র গুরুতর পীড়া—পূর্ব্বে একবার মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। এখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছে। আমার নাবিক সিল্‌ভেষ্টার—যে আমাকে জাগাইয়া দিয়াছিল, সে যখন দেখিল আমি চোখ খুলিয়াছি তখন সে আমাকে এই কথা বলিল:—"কাপ্তেন সাহেব আমরা টংকিনে পৌঁছিয়াছি।" আমাদের জাহাজ বরাবর সমান চলিয়াছে, কিন্তু আমার ক্যাবিনের খোলা পার্শ্ব-ছিদ্রপথ দিয়া, একেবারে নূতন ধরণের কতকগুলা অসম্ভব জিনিস অস্পষ্টরূপে দেখিতে লাগিলাম:—ড্রুইড্ যুগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধূসরবর্ণের প্রস্তর-স্তম্ভ সমুদ্রের সকল স্থান হইতেই উঠিতেছে। এইরূপ হাজার হাজার পাথর একটার পর একটা সারি দিয়া চলিয়াছে—এইসব দাঁড়ানো পাথরে বীথি নির্ম্মিত হইতেছে, সাকাস্ নির্ম্মিত হইতেছে, মেজের শাম নির্ম্মিত হইতেছে। আমার মনে হইল, এখনও আমি খেয়াল

দেখিতেছি, নানা প্রকার কাল্পনিক জিনিস দেখিতেছি। তখন আবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম।

কিন্তু না, এ যে হা-লঙের উপসাগর। এস্থানের আকার-প্রকার পৃথিবীর মধ্যে বেশ একটু অনন্যসাধারণ। মরিবার মত বেশী না হইলে, এই সর্দ্দিগর্ম্মির আবেশ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। তার পর দিন, আবার কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম; এই দেশটা বাস্তব বলিয়া তখন আমার প্রতীতি হইল।

তাহার পর এই নোঙ্গর্ স্থান ছাড়িয়া হুয়ে নদীতে প্রবেশ করিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এই হাড়ভাঙ্গা সূর্য্যের নীচে, ঘটনাগুলা দ্রুত চলিতে লাগিল। তিন দিনের গোলাবর্ষণের পর, যুদ্ধের পর থুয়ান আন দখলে আসিল। এবং এই সমস্ত প্রচেষ্টার পর, আমাদের প্রবাসের শাস্তি তুরান্-এ আরম্ভ হইল। এই শাস্তি, বিষাদময় প্রখর উত্তাপে অভিভূত; আন্নামের কোন্ এক অজ্ঞাত কোণে, অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এই যে শাস্তি, ইহা নির্ব্বাসিতের শাস্তি।

বন্দরগুলাসমেত এই সমস্ত প্রদেশটা আগ্‌লাইবার জন্য আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। এখন এই আব্ হাওয়ার সহিত অভ্যস্ত হইতে হইবে; বোধ হয় এই শীতকালটা এইখানেই কাটাইতে হইবে। হায়! এক্ষণে ইহাই আমার বহুদূরস্থ অজানা সমাধিস্থান!

যেখানে আমাদের জাহাজ নোঙ্গর করিয়াছে, এই বৃহৎ উপসাগরের চারিদিকে কতকগুলা উচ্চ কালো কালো পাহাড়। ওদিকে, দূর পশ্চাতে একটা নদীর মুখ—উহার প্রথম বাঁকেই পুরাতন ভগ্নদশাগ্রস্ত একটা গ্রাম শীর্ণকায় বাঁশঝাড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাঁশগুলা বড় বড় পুষ্পিত ছোলাগাছের মত দেখিতে।

কিন্তু এখন এই গ্রামের সহিত আমি এত ভালরকম পরিচিত, উহার ভিতর দিয়া "ইস্পার উদ্পার" করিয়া এতবার বেড়াইয়াছি, শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি, খোঁজ করিয়াছি যে এখন আমার কাছে উহা বাসি বলিয়া মনে হয়, নিতান্ত সাদামাটা বলিয়া মনে হয়। প্রথম কৌতূহলের আগ্রহটা চলিয়া গিয়াছে, এখন আর এই দেশ আমার কখনই ভাল লাগিবে না, এই বিষণ্ণ পীতবর্ণ জাতির লোকদিগকে ভাল লাগিবে না; আমার পক্ষে এটা বাস্তবিকই নির্ব্বাসিতের দেশ; এখানকার কিছুই আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না—আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না।

এখন আমি এই হরিৎ শ্যামল দ্বীপটিকে, এই মন্দিরের ছায়ায় বরণ করিয়া লইয়াছি। নিস্তব্ধ জীবন উপভোগ করিবার জন্য, তরুলতার শৈত্য উপভোগ করিবার জন্য, মধ্যাহ্নের প্রখর উত্তাপের পর, যখন সূর্য্য অস্ত যায় সেই সন্ধ্যার সময় আমি এখানে আসিয়া থাকি। ডিঙ্গির নাবিকদের লইয়া আমি এক্‌লাই আসিয়া থাকি। উহাদেরও খুব আমোদ হয়।—যদিও এই বনভূমে শুধু কতকগুলা লতাগুল্ম ও যুঁথি জড়াজড়ি করিয়া আছে, আর বাসিন্দার মধ্যে আছে কেবল কতকগুলা বানর।

এই চিরপরিত্যক্ত মন্দিরের সহিত ইহারই মধ্যে আমরা খুব পরিচিত হইয়া পড়িয়াছি। বিশেষত মন্দিরটা আমাদের স্নানাগার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মন্দিরের অন্ধকারের মধ্যে যে-সকল ভূত প্রেত, সে-সকল পুরাতন ক্ষুদ্র ভীষণ বিকট জীব পাহারা দিতেছে, আমাদের কাপড়চোপড় তাহাদের জিম্মায় রাখিয়া আমরা স্নান করিতে যাই।

যাহাই হউক, এই সমস্ত সত্ত্বেও, এই বৌদ্ধ মন্দির আমাদের একটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। উহার কোন জিনিসই আমরা স্থানচ্যুত করি না এবং ঐখানে আমরা খুব মৃদুস্বরে কথা কহি।

মন্দিরটা অন্ধকার; এই-সব স্থানে কত কাল ধরিয়া কত লোকে পূজা-অর্চনা করিয়াছে, কত অপরিচিত ধূপ-ধুনার সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইয়াছে। খুব প্রাচীন কালের "ব্রেটন্" প্রদেশের গির্জ্জার মধ্যে, পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন ধর্ম্মমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই একটা অতিপ্রাকৃতের ভাব আসিয়া আমার চিত্তকে পীড়ন করে।

(৩)

কি গোলমালের কারখানা আমার এই জাহাজের কাম্‌রাটা! নানাপ্রকার অদ্ভুত জিনিসে, লম্বোদর বুদ্ধমূর্ত্তিতে, হাতীতে, ঝিনুকে-খচিত কবাটে, চা-য়ে, আতপত্রে ভরা। তা ছাড়া তিনটা কটকটে ব্যাং - বেশ জীবন্ত কট্‌কটে ব্যাং একটা খাঁচার ভিতরে। ইঁদুরগুলা আমার দস্তানা ও বুটজুতা আক্রমণ করিত; ইঁদুর তাড়াইবার এই ফন্দিটা ইংরেজ নাবিকেরা আমাকে শিখাইয়া দিয়াছে। (রাত্রে সিল্‌ভেষ্টার্ নাবিক এই খাঁচাটা আমার কামরায় রাখিয়া দেয়। মনে হয়, ব্যাঙের ভয়ে ইঁদুর আর ঘরে ঢোকে না।)

সর্ব্বোপরি, কতকগুলা ফুল, তোড়ার আকারে, আঁটি-বাঁধা। এই-সব ফুল "পারীর" সুন্দরীরা তাহাদের উষ্ণ উদ্ভিদ্‌গৃহে কখনও চক্ষে দেখে নাই, উহাদের সৌরভ কখনও আঘ্রাণ করে নাই, ওরূপ ফুলের অস্তিত্ব আছে বলিয়া সন্দেহও করে নাই; এই-সকল ফুল উহাদের নিকট একটা অপরিচিত ধারণা বহন করিয়া লইয়া যাইবে। কৃত্রিম রঙের নামহীন অনেক কীটাকৃতি পরগাছা; রং যথা:—ননি-ধবল, তাহাতে একটু সবুজের আভা; ম্লান অরুণ-নীলে পর্য্যবসিত;—চীনেদেশের এক প্রকার ক্রেপ্-কাপড়ের মত। তার পর পত্রপল্লব ও কতরকম দুর্লভ সুগন্ধ! এই-সব সৌরভের মধ্যে, আমার নাবিক সিল্‌ভেষ্টার কোন এক প্রভাতে যখন আমাকে জাগাইতে আসিবে, তখন আসিয়া দেখিবে আমি মরিয়া কাঠ হইয়া পড়িয়া আছি—আমার মত কৃপাপাত্র সাগর-পর্য্যটকের অন্তিম দশাটা খুবই কবিত্বপূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই।

আমার নাবিকেরাই মিঠা জলের ধারে গিয়া প্রতিদিন আমার জন্য এই-সকল পুষ্পগুচ্ছ তুলিয়া আনে। এখানকার পাহাড়ের ঝোপঝাড়ে এই সকল ফুল ফোটে। আমাদের দোভাষী হোয়ে মহাশয় বলেন, এই পাহাড়ে অল্পস্বল্প বাঘ "মহাশয়" আছেন, অনেক কুকুর-মুখো বানর "মহাশয়"ও আছেন।

গতকল্য, তুরান্-এ উপর দিয়া একটা বড় রকম "টাইফুন" ঝড় বহিয়া গিয়াছিল; সমস্ত ওলটপালট্ করিয়া দিয়াছে, বৃক্ষসমেত গৃহের ছাদ প্রভৃতি নীচে আছ্‌ড়াইয়া ফেলিয়াছে। অনেক লোক মারা গিয়াছে। সমস্ত স্থান উজাড় হইয়া গিয়াছে।

অধিকাংশ গৃহই ভূপতিত হইয়াছে; বুদ্ধমূর্ত্তি ও পুতুলগুলার ভাঙ্গা টুক্‌রা কুড়াইয়া লইয়া, লোকেরা ঘাসের উপর বাস করিতেছে। একটা বড় পাহাড়ের আড়ালে আমাদের জাহাজটা কোন রকমে টিকিয়া ছিল, কিন্তু কয়েক ঘণ্টাকাল, উহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; মধ্যরাত্রে ঝড়টা চলিয়া গেল; তার পর আর কিছুই দেখা গেল না। কেবল একটা ভীষণ গর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল; এবং সমুদ্র, বায়ুর দ্বারা বিক্ষোভিত ও চূর্ণীকৃত হইয়া তপ্ত ফুটন্ত জলের মত ধুঁয়াইতে লাগিল।

আজ আবার সব শান্ত হইয়া গিয়াছে। জলমগ্ন জীবজন্তু ও ধ্বংসাবশেষ বহন করিয়া নদী শান্তভাবে সাগরাভিমুখে চলিয়াছে।

এখন সন্ধ্যা; যখন রাত্রি হয়, তখন মনে হয় যেন এখানে আসিয়া সবই হারাইয়াছি, চিরকালের মত নির্ব্বাসিত হইয়াছি।

হায়! এখান হইতে পৃথিবীর অবশিষ্ট দেশ কত-কত যোজন দূরে! এখানকার গোধূলিকালের রং অতি অপূর্ব্ব ও হিমপ্রধান দেশেরই মত; এই উষ্ণ দেশে এইরূপ গোধূলি হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয়। পীতাভ, সীসবর্ণ আকাশের গায়ে, ধূসর অথবা মসীকৃষ্ণ পাহাড়গুলা খুব উচ্চদেশে স্বীয় তীক্ষ্ণাগ্র কঠিন দন্তপংক্তির কাটা কাটা রেখা-ছবি আঁকিয়া দিয়াছে। এই সময়ে এই পাহাড়গুলাকে খুব প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হয়।

এবং ইহা হইতে কোন-কোন চীনা চিত্রকরের কলা-কৌশল, তাহাদের অঙ্কিত ভূদৃশ্যচিত্রের ভাব টা বুঝা যায়। উহাদের চিত্রের গভীর পরিপ্রেক্ষিতগুলা স্বাভাবিক রঙে চিত্রিত নহে—অন্য রঙে চিত্রিত। এবং তাহার ভিতর যে একটা আজগুবি রকমের পরিকল্পনা আছে তাহা বিষাদময় ও ভীতিপ্রদ।

আজ প্রাতে, আমার ৩টা ব্যাঙের মধ্যে একটা ব্যাং মরিয়া গিয়াছে—দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। আমার নাবিক সিল্‌ভেষ্টার তার বেটন প্রদেশের উচ্চারণ সহ অন্ত্যেষ্টিকালে এই সংক্ষিপ্ত স্তুতিবাদ করিল :—এই "নোংরা জীবদের মধ্যে একটা ইহলীলা সম্বরণ করিল, কাপ্তেন"; এই কথা বলিয়া মৃত ভেকটাকে একটা চিমটা দিয়া উঠাইয়া তাহার অন্তিম নিবাস সাগরজলে নিঃক্ষেপ করিল।

এই সময়টা আমাদের সকলেরই বড় খারাপ লাগিতেছে—আমাদের মধ্যে যেন একটা অবসাদের ভাব আসিয়াছে। ফ্রান্স হইতে যেসব চিঠিপত্র আসে তাহা পড়িতে আমরা সকলেই উৎসুক—কিন্তু আমরা ফ্রান্সে এখন আর নাই—উত্তর দিবে কে? এটা আমরা জানি, এবং পূর্ব্বেও এইরূপ কষ্ট আমরা অনুভব করিয়াছি। সুদূর পদার্থসমূহের উপর আস্তে আস্তে একটা আবরণ পড়িয়া যাইতেছে; সূর্য্য, একঘেয়ে জীবন, অবসাদ, ঔদাস্য—এই সমস্ত আমাদিগকে বিনাশের অভিমুখে লইয়া যাইতেছে...

৪

আজ প্রাতে "সাওন" জাহাজখানা খুব তাড়াতাড়ি এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমাদের অর্দ্ধেক সরঞ্জাম, লোকজন, কামান প্রভৃতি এই জাহাজে উঠাইয়া দিতে হইবে, এইরূপ সরকারের হুকুম আসিয়াছে। আরও যাহা কিছু ভাল জিনিস আমরা দিতে পারি ঐ জাহাজ তাহাও লইবে। আরও এই কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—রাত্রেই এইসব লোকজন ও সরঞ্জাম এই নবাগত জাহাজে উঠাইয়া দিতে হইবে; এবং আন্নামবাসীরা এই যাত্রার কথা বিন্দুবিসর্গ যেন জানিতে না পারে, আমাদের জাহাজ এতটা খালি হইয়া পড়িয়াছে তাহা যেন তাহাদের গোচরে না আসে। ডেক্ পরিষ্কারের কাজ হইয়া গেলে, উহারা চলিয়া গেল;—অন্ধকার রাত্রে। গম্যস্থান অজ্ঞাত। তাড়াতাড়ি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, বোচ্‌কা বুচ্‌কি গুছাইয়া লইয়া, খাদ্য-সামগ্রী সঙ্গে লইয়া যখন উহারা গেল, তখন উহাদিগকে দেখিয়া আমরা যার পর নাই ব্যথিত হইলাম।

আমার উচ্চ-মাস্তুলের বেচারী নাবিকেরা, যাহারা আমার জন্য ফুল তুলিয়া আনিত তাহারা, সবাই চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের মা-দের জন্য, বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনীদের জন্য, তরুণী ভাযাদের জন্য, আমাকে ছোটখাটো কত-কি ফরমাইস করিয়া গিয়াছে। কেহ বা টাকাকড়ি, কেহ বা ঘড়ি, কেহ বা ছোটখাটো মূল্যবান্ জিনিস আমার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছে, তাহারা জানে না তাহাদের ভাগ্যে কি আছে।

তাহাদের সঙ্গে কেবল একজন নৌ-কর্ম্মচারী গিয়াছে; পাঠশালায় যখন পড়িতাম তখন হইতেই আমাদের দুজনের মধ্যে বেশ জানাশুনা ছিল; আমরা দুজনে সহৃদয় সহচরের মত একসঙ্গে থাকিতাম—আমাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের বেশ শ্রদ্ধা ছিল। যখন তাহার নিকট হইতেও ফরমাইস পাইলাম, বিদায়-চুম্বন পাইলাম, তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমাদের মধ্যে ভালবাসার কিরূপ পাকা ভিত্তি ছিল, আমরা পরস্পরের প্রতি কতটা আসক্ত ছিলাম।

আঁধার রাতের মাঝখানে, ডিঙ্গি করিয়া যখন উহারা গেল, ডিঙ্গিগুলা জনপূর্ণ বোঝাই হইয়া খুব গাদাগাদি হইয়া ছিল। একবার অস্ত্রশস্ত্রের ঝনৎকার, তাহার পরই নিম্নস্বরে বিদায়-সম্ভাষণ। কোন চীৎকারের শব্দ নাই, কোন জয়ধ্বনিও নাই;—ইহা প্রকৃত বীরজনোচিত প্রশান্ত যাত্রা। তাহার পর বাতাসের শব্দ ও সমুদ্রের কল্লোল ছাড়া আর কিছুই নাই। এবং যাহারা এইমাত্র দূরে চলিয়া গেল তাহারা এই ঘোড়ো রাতের ঘোর অন্ধকার মাথায় করিয়া গিয়াছে, উহারা সকলে কোথায় যাইতেছে? উহাদের মধ্যে কে-কে না জানি আর ফিরিয়া আসিবে না?...

উহাদের প্রস্থানের পর, আমি দুই ঘণ্টাকাল ঘুমাইয়াছি; জাহাজের একজন হালধারী একটা মোমবাতী জ্বালাইয়া আমার কামরায় প্রবেশ করিল এবং আমাকে বলিল,—সেই চিরন্তন বাক্য যাহা এত বৎসর ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি! "বারোটা (রাত) বাজ্‌তে আর পোয়া ঘণ্টা বাকি"। তখন আমি দেখিলাম, আমার সারি-বাঁধা বুদ্ধমূর্ত্তিগুলা বাতির আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। জাগিবার পর হইতে, প্রবাসের ভাব টা, প্রান্তিক এসিয়ার কথা আমার মনকে দখল করিয়া বসিল। মন বিষাদে আচ্ছন্ন - হৃদয় বেদনায় কাতর। আমার জাহাজ অর্দ্ধেক খালি হইয়া গিয়াছে—কোন প্রকারে এই পোয়া ঘণ্টা কাল জাহাজের উপর অতিবাহিত করিতেছি।

পোয়া ঘণ্টা কাল জাহাজ নোঙ্গর করিয়া আছে—আবার সব শান্ত হইয়া গিয়াছে; এখন আর কিছুই করিবার নাই।

"কর্ম্মচারীদের ডাক দাও"! - আমাকে উত্তর দিল এখানে কোন কর্ম্মচারীই আর নাই। ঠিক কথা, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কোন প্রকার যোগাযোগ করিয়া কর্ম্মচারীর অভাব পূরণ করিলাম। তাহারা যখন কাজে হাজির হইল, তখন আত্মবিনোদনের জন্য 'লৈলা হানুম' নামক এক নবপ্রকাশিত গ্রন্থ হাতে লইলাম। ইস্তাম্বুলের কথা আছে বলিয়া আমার বন্ধুরা এই পুস্তক আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

এই গ্রন্থপাঠ করিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, আমি কখনই পুস্তক পাঠ করি না। কিন্তু হঠাৎ এই গ্রন্থের একটা জায়গায় আমার নজর পড়িল—এই অংশটা অতি মনোরম। ইহা পাঠ করিয়া একটা স্মৃতির যন্ত্রণা আমার মনে জাগিয়া উঠিল।

"...কোন এক বসন্তপ্রাতে 'নক্তিবে' অবগুণ্ঠিত হইয়া একাকী সুলতান আখমেতের নিকটে গেল; এই সুরম্য ঋতুতে রাস্তার কোণে কোণে সৌরভপূর্ণ নার্গেশ চাঁপা বিক্রীত হইয়া থাকে..."

হাঁ, বাস্তবিকই—আমার স্মরণ হইতেছে—সেইসব ফুলের ব্যাপারীদের কথা—সেই সুরম্য বসন্তঋতুর কথা।—ঠিক এই সময়েই আমাকে তুর্কদেশ ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল—আর এখন দেখ এই, লৈলাহানুম গ্রন্থের এই মধুর বাক্যটি দূরাগত মৃত্যুঘণ্টার মত আমার মাথার ভিতর ধীরে ধীরে অনুরণিত হইতেছে। ওঃ! ইস্তাম্বুল হইতে আমার সেই প্রস্থান-কাল! তখন আমার মনে যে-সব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কি করিয়া বর্ণনা করিব,—উহার সহিত এত রকম জিনিস মিশ্রিত রহিয়াছে; আমাদের ভালবাসার হৃদয়ভেদী ভীষণ যন্ত্রণা, এই ইস্‌লাম মহানগরীর জন্য দারুণ মৃত্যুশোক, সেই আসন্ন নববসন্তের রমণীয় শোভা, সেই পরিত্যক্ত ছোট ছোট রাস্তার ধারে গাঁচগাছের লাল লাল ফুল...জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে সেই শেষ-দিনগুলা, সেই সুন্দর সময়টা, সেই নববসন্তে যখন নার্গেশ চাঁপার মধুর সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হয়, যখন সেই চম্পক পুষ্প ইস্তাম্বুলের রাস্তার কোণে কোণে বিক্রীত হইয়া থাকে—এইসব কথা আমার মনে আসিল।

তার পর আমি বইটা বন্ধ করিয়া আবার ডেকের উপর উঠিলাম। জাহাজ এখন অপেক্ষাকৃত নিস্তব্ধ, রাত্রিটা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও প্রশান্ত।

কোন এক হতভাগ্য আতুরাশ্রমে যকৃৎ-রোগে শয্যাশায়ী হইয়া ক্রমাগত আর্ত্তনাদ করিতেছে, এখন কেবল সেই আর্ত্তনাদের শব্দই শুনা যাইতেছে। যকৃৎবিস্ফোটক—এই গ্রীষ্ম দেশের একটা প্রচলিত ব্যাধি।

(ক্রমশঃ)

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতীর আরতি

ভকতি-তৈল পুরিয়া প্রদীপে
এনেছি, হে মাত, চরণ-সমীপে ॥
এনেছি ধুনাচি তাপিত হিয়া।
জ্বালাইতে নারি ফুঁ দিয়া দিয়া ॥
অনুশোচনায় পড়িয়া মারা,
শঙ্খের মুখে সরিছে না রা ॥
কৃপাকটাক্ষ পড়িলে তব,
সকলই পাইবে জীবন নব ॥
ধ্বনিবে শঙ্খ মন-আনন্দে।
ভরিবে সমীর পুণ্যগন্ধে ॥
বাসিত হইবে সপত দ্বীপ।
নব অনুরাগে জ্বলিবে দীপ ॥
দূরে ঠেলি' ফেলি' কলুষ-তম।
ঘোষিবে ঘণ্টা "নমো-ওঁ নমঃ!"
—"নমো-ও নমঃ!" "নমো-ও নমঃ!"
উপরে মানুষ নাহি রে কেউ,
বাতাসে বাতাসে আসিছে ঢেউ—
"নমো-ও নমঃ!" "নমো-ও নমঃ!"
জয় মা ভারতী! বিশ্বময়
বিশ্বমাতার গাও রে জয়!

—

বিশ্বভারতীর

চরণবন্দনার ফল ॥

বিশ্বমাতার চরণ-অব্জে
তনু মন প্রাণ সপিয়ে সব যে
করয়ে অপার শান্তিলাভ,
ঘুচি যায় তার সব-অভাব ॥
আপনা পাসরি দ্বিজ সে নিঃস্ব
প্রেমগুণে বাঁধে নিখিল বিশ্ব ॥

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শান্তিনিকেতন ও শ্রেয়সী, বৈশাখ)

—

গান

হাটের ধূলা সয় না যে আর কাতর করে প্রাণ।
তোমার সুর-সুরধুনীর ধারায় করাও আমার স্নান।
জাগাক তারি মৃদঙ্গ-রোল
রক্তে তুলুক তরঙ্গ-দোল
অঙ্গ হতে ফেলুক ধুয়ে সকল অসম্মান।
সব কোলাহল দিক্ ডুবায়ে তাহার কলতান।
সুন্দর হে, তোমার ফুলে গেঁথেছিলেম মালা,
সেই কথা আজ মনে করাও, ভুলাও সকল জ্বালা।
তোমার গানের পদ্মবনে
আবার ডাকো নিমন্ত্রণে,
তারি গোপন সুধাকণা আবার করাও পান,
তারি রেণুর তিলক-লেখা আমায় কর দান ॥

২ চৈত্র ১৩২৯ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শান্তিনিকেতন ও শ্রেয়সী, বৈশাখ)

—

গান

কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে
ডাইনে বাঁয়ে দুইহাতে;
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে
নিত্য নূতন সংঘাতে!
বাজে ফুলে বাজে কাঁটায়
আলোছায়ার জোয়ার-ভাঁটায়,
প্রাণের মাঝে ঐ যে বাজে
দুঃখে সুখে শঙ্কাতে ॥
তালে তালে সাঁঝ-সকালে
রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
শাদাকালোর দ্বন্দ্বে যে ঐ
ছন্দে নানান্ রং জাগে ॥
এই তালে তোর গান বেঁধে নে,
কান্না-হাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল শোন মরণ বাঁচন
নাচন-সভার ডঙ্কাতে ॥

৩০ চৈত্র ১৩২৯ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শান্তিনিকেতন ও শ্রেয়সী, বৈশাখ)

—

প্রাচীন হিন্দু জাতির যুদ্ধবিদ্যা

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন হিন্দুগণ যুদ্ধে যথেষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতেন এবং সৈন্যসমাবেশ ও ব্যূহনির্ম্মাণ-কৌশলে বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতিগণ অপেক্ষা হীন ছিলেন না।

হিন্দুগণ সাতটি বিভিন্ন প্রণালীতে সৈন্য-সমাবেশ করিতেন। যথা—(১) উরস্ (centre) (২) কক্ষ (flanks) (৩) পক্ষ (wings) (৪) প্রতিগ্রহ (reserves) (৫) কোটি (vanguards) (৬) মধ্য (centre behind the breast) (৭) পৃষ্ঠ (back).

বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থে নিম্নলিখিত ব্যূহসমূহের উল্লেখ আছে—(১) মধ্যভেদী (one which breaks the centre) (২

(that which penetrates between its division) (৩) মকরব্যূহ (৪) শ্যেনব্যূহ (৫) শকলব্যূহ (৬) অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহ (৭) গোমূত্রিকা (echelon) (৮) মণ্ডল (hollow circle) (৯) তোজ (column) (১০) সূচিমুখ (needle-point array)।

হিন্দুগণ যুদ্ধে নিম্নলিখিত অস্ত্রসমূহ ব্যবহার করিতেন—

(১) যন্ত্রমুক্ত (missiles thrown with engines).

(২) হস্তমুক্ত (hurled by hand).

(৩) মুক্তামুক্ত (ত্রিশূল, বর্শা প্রভৃতি).

(৪) ভিন্দিপাল, তোমর, কৃপাণ, ক্ষেপণি, নারাচ, রিষ্টি, প্রভৃতি।

গ্রীক্ লেখক ফেমিষ্টিয়াস্ বলেন—"ব্রাহ্মণগণ বহুদূর হইতে বজ্র ও বিদ্যুৎ-সাহায্যে যুদ্ধ করিতেন।" "বজ্র ও বিদ্যুৎ" শব্দে কামানই প্রতিপন্ন হয়।

উইলসন্ সাহেব লিখিয়াছেন—"The Hindus, we find from their medical writings, were perfectly well acquainted with the constituents of gun-powder—sulphur, charcoal, and saltpetre"—অর্থাৎ হিন্দুগণের আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে তাঁহারা বারুদের ব্যবহার ভালরূপ জানিতেন।

রামায়ণে লিখিত আছে যে, দুর্গপ্রাকারসমূহে বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রসকল রক্ষিত হইত। এগুলি কামান অথবা কামানের ন্যায় আগ্নেয়াস্ত্র বলিয়াই অনুমিত হয়।

অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে 'শতঘ্নী' ও 'নালিক' অস্ত্রের উল্লেখ আছে। 'শতঘ্নী' অর্থে যাহার দ্বারা শত ব্যক্তির প্রাণনাশ হয়। ইহা কামান ছাড়া আর কি হইতে পারে?

লাসেন্ সাহেব লিখিয়াছেন—"That the Hindus had something like "Greek fire" is also rendered probable by Ctesias, who describes their employing a kind of inflammable oil for the purpose of setting hostile towns and forts on fire." অর্থাৎ শত্রুপক্ষের নগর ও দুর্গে অগ্নিসংযোগের উদ্দেশ্যে প্রাচীন হিন্দুগণ একপ্রকার সহজ-দাহ্য তৈল ব্যবহার করিতেন।

গত ইউরোপীয় মহাসমরে জার্ম্মানগণ যেরূপ শ্বাসরোধকারী gas (গ্যাস) ব্যবহার করিয়াছিলেন, হিন্দুগণও যে ঐরূপ কোনও বস্তু ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। কর্ণেল অলকট্ লিখিয়াছেন—"Astur Vidya, a science of which our modern professors have not even an inkling, enabled its proficient to completely destory an invading army, by enveloping it in an atmosphere of poisonous gases, filled with awe-striking shadowy shapes and with awful sounds."

(বিকাশ, ফাল্গুন) শ্রী চণ্ডীদাস মজুমদার বিদ্যারত্ন

—

প্রাচীন ভারতে নগর-বিন্যাস

আধুনিক য়ুরোপে মনস্বী নেপোলিয়ন্ অসাধারণ দূরদৃষ্টিবলে ইহার উপযোগিতা দেখিতে পাইয়া তাঁহার বিখ্যাত কোডে নগর-বিন্যাস-বিদ্যা সম্বন্ধে বহু বিধি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীক রোমীয় যুগে নগর-বিন্যাস-পদ্ধতি কথঞ্চিৎ জানা ছিল, ভিট্রুভিউস্ পড়িলেই তাহা জানা যায়। পরে, মধ্যযুগে তাহা বিলুপ্ত এবং নবযুগের উন্মাদনায় তাহা অবজ্ঞাত হইয়া যায়। বর্ত্তমানযুগে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে এবং বিজ্ঞানের উন্নতিতে, নগরে জনসমাগমের আধিক্যে ও যানবাহনাদির বাহুল্যে, নগরবিন্যাস-বিদ্যা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে এই নগরবিন্যাস একটা বিশিষ্ট বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, নীতি- ও অর্থ-শাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত এবং জ্যোতিষ গ্রন্থাদিতে এই বিষয়ে বিস্তর নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে। নগরবিন্যাস-পদ্ধতি শিল্পশাস্ত্রের অন্তর্গত বাস্তুবিদ্যার অঙ্গীভূত। বাস্তু শব্দ সংস্কৃত বস্ (বসা বা বাস করা) হইতে নিষ্পন্ন। যাহাতে দেব ও নরগণ বসেন বা বাস করেন, তাহাকে বাস্তু বলে। ধরা, হর্ম্ম্য, যান ও পর্য্যঙ্ক বাস্তুর নানা অঙ্গ। আবার হর্ম্ম্য বলিতে প্রাসাদ, মণ্ডপ, সভা, শালা, প্রপা ও রঙ্গ এই ছয় শ্রেণীবিভাগ বুঝায়। এই ধরা ও হর্ম্ম্যই নগরনির্ম্মাণ-শাস্ত্রের মুখ্য বিষয়। পরে বাস্তুবিদ্যা কেবল বাসগৃহ নির্ম্মাণে পর্য্যবসিত হওয়াতে নগর-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি সাধারণতঃ শিল্পশাস্ত্রের বিষয়ীভূত হইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মা হইতে নগর বিন্যাসপদ্ধতির উদ্ভব। বিশ্বকর্ম্মাই এই শাস্ত্র জগতে প্রচার করেন। 'বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ' পুস্তকে দেখা যায়, ব্রহ্মা গর্গমুনিকে এই শাস্ত্র শিক্ষা দেন; গর্গমুনি পরাশরকে ইহা অর্পণ করেন; পরাশর বৃহদ্রথকে ইহা শেখান্। বৃহদ্রথেরই শিষ্য বিশ্বকর্ম্মা তদীয় শিষ্য বসুদেবকে এবং সাধারণে ইহা জ্ঞাপন করেন। অদ্যাবধি দাক্ষিণাত্যের শিল্পীগণ ইহা পরিজ্ঞাত আছেন এবং পুরুষানুক্রমে এই শিল্পশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া যাইতেছেন।

বৈদিক যজুর্বেদীর উপর অঙ্কিত জ্যামিতিক চিত্র ও 'স্বস্তিক', 'সর্ব্বতোভদ্র' প্রভৃতি চিত্রের সহিত নগরের পরিকল্পনার (plan) ও পরিলেখের (diagram) যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। প্রায় সকল স্থপতিই যজ্ঞের পুরোহিত বা যজ্ঞকর্ম্মে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আবার নগর বা গ্রাম প্রতিষ্ঠায় নানা যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইত।

বেদে 'অশ্মময়ী' (প্রস্তর-নির্ম্মিত), 'আয়সী' (লৌহময়ী), শতভুজি (অর্থাৎ শতপ্রাকার-পরিবেষ্টিত), 'পৃথ্বী' (বৃহৎ) ও 'উর্ব্বী' (আয়ত) পুরীর ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। গ্রাম এবং মহাগ্রামের বর্ণনাও বেদে পাওয়া যায়। যাঁহারা লৌহময় দুর্গ, শতস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ কিংবা মহাগ্রাম রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা নগরবিন্যাসের কিছু কিছু জানিতেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর রচনা। তাহাতে নগর-বিন্যাসের যেরূপ পরিপাটী বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতেও এই শাস্ত্রের অতিপ্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

পথ, বীথী, রথ্যা, উপরথ্যা, পৌরজনের বাসস্থান (সর্ব্বজনগৃহাবাস), রাজপ্রাসাদ, ধর্ম্মাধিকরণ, হাট-বাজার (আপণ), দেবালয়, প্রাচীর, পরিখা, তোরণ, প্রপা, আরাম, পুষ্করিণী, এমন কি বারবনিতার বাসস্থান ইত্যাদির পরিস্থাপনা ও পরিরচনা লইয়া নগরনির্ম্মাণ পদ্ধতি। (১) ভূপরীক্ষা, (২) স্থান-নির্ব্বাচন (ভূমিসংগ্রহ), (৩) দিক্‌নির্ণয় (দিক্-পরিচ্ছেদ), (৪) নির্ব্বাচিত ভূমির-পরিভাগ (পদবিন্যাস), (৫) বাস্তু-দেবতার অর্চ্চনা (বলিকর্ম্মবিধান), (৬) গ্রাম-বিন্যাস বা নগর-বিন্যাস, (৭) হর্ম্ম্য-গৃহ ও তাহার তলাদি নির্ণয় (ভূমি-বিধান), (৮) নগরদ্বার-নির্ম্মাণ (গোপুর-বিধান), (৯) দেবালয়-নির্ম্মাণ (মণ্ডপ-বিধান), এবং (১০) রাজপ্রাসাদ-নির্ম্মাণ (রাজবেশ্ম-বিধান), নগর-নির্ম্মাণ-শাস্ত্রের এই দশ অঙ্গ। হরিবংশে আছে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারবতী নির্ম্মাণের জন্য স্থপতিগণকে বলিতেছেন—ইহাতে এই এই চিহ্ন ও আয়তন করিতে হইবে। বেশ্মবাস্তু গ্রহণ কর, ত্রিকচত্বর কল্পনা কর। রাজমার্গাদির পরিমাণ কর, প্রাসাদাদির গতি (orientation) নির্ণয় কর।

নদী- ও সমুদ্রতীর, হ্রদ- ও সরোবরতীর অথবা শৈলশিখরই নগর-স্থাপনের পক্ষে প্রশস্ত স্থান। "নানা বৃক্ষলতাকীর্ণ, পশুপক্ষিগণাবৃত, সুবহূদকধান্ত, তৃণকাষ্ঠসুখপূর্ণ, আসিন্ধুনৌগমাকুল পর্ব্বতের অনতিদূরে, সুরম্যসমভূদেশে রাজধানী" প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত শুক্রাচার্য্যের উপদেশ। অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে জীবনধারণের উপযোগী সমস্ত দ্রব্য যেখানে পাওয়া যায়, নদীপথে সমুদ্রপথে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার সুবিধা যেখানে আছে, খনিজদ্রব্যেরও অভাব নাই, তেমন স্থানে নগর স্থাপন বিধেয়।

ক্ষীরী বৃক্ষ, খদির, কদম্ব, নিম্ব, চম্পক, পুন্নাগ, আমলক, পটল, সপ্তপর্ণ, নিশুণ্ডী, পিণ্ডিত, সহকার প্রভৃতি বৃক্ষরাজির যথারীতি রোপণ করিতে হইত।

মানসার এবং ময়মত শিল্পশাস্ত্রের মতে ভূমির বর্ণ, গন্ধ, রস, আকার, দিক্, শব্দ, স্পর্শ পরীক্ষা করিয়া তাহার নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ভোজের মতে স্থানটির মধ্যভাগ উন্নত (মধ্যস্থানসমুন্নত) হওয়া চাই। কিন্তু ময়মতে কচ্ছপোন্নত ভূমি বর্জ্জ্য বলিয়া লেখা আছে। উত্তর কিংবা পূর্ব্বদিকে ঢালু (ঐন্দ্রোত্তরপ্লব) হইয়া গেলে সেই স্থান শুভ—ইহা সর্ববাদিসম্মত। কোন্ কোন্ স্থল বর্জ্জনীয়, তাহারও একটা সবিস্তর বিবরণ শিল্পশাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। ভূমির দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্ত কাশ্যপীয় এবং অন্যান্য গ্রন্থে নিম্নলিখিত প্রণালী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক বর্গ হাত আয়ত ও এক হাত গভীর একটি গর্ত্ত খুঁড়িয়া আবার তাহাতে সেই মাটি ফেলিয়া দিলে, যদি মাটি বেশী হয় তাহা হইলে সেই ভূমি উত্তম। ভূমির উর্ব্বরতা পরীক্ষার নানা উপায়ের বর্ণনাও পাওয়া যায়।

ভূমি নির্ব্বাচন শেষ হইলে, দেববলি প্রদান, স্বস্তিবাগ্‌ঘোষণ, হালকর্ষণ, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি দ্বারা স্থপতিকে ভূমি পবিত্র করিতে হয়; তার পর নগরের মান নির্ণয় করিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের মতে ৮ যোজন (১ যোজন=৮×১০০০×১৭১/২ হাত) দীর্ঘ ও ৪ যোজন প্রস্থ নগরই প্রশস্ত। অগ্নিপুরাণের মতে নগরের পরিমাণ ৪ কিংবা ৮ বর্গ-মাইল হওয়া বিধেয়। মানসার এবং ময়মতে নগরভেদে ছোট বড় বহু পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছে।

ইহার পর স্থপতির কাজ প্রাকার ও পরিখা রচনা। প্রাচীন নগর মাত্রেই পরিখা ও প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত হইত। অযোধ্যা 'প্রাংশু-প্রাকার-বসনা', 'সাট্টপ্রাকার-তোরণা', 'পরিখাকুল-মেখলা' ছিল। প্রাচীরের বাহিরে এবং অনতিদূরে পরিখা খনন করা হইত। স্থানের প্রয়োজনানুসারে (ভূমিবশাৎ) পরিখার সংখ্যা এক হইতে আট পর্য্যন্ত ছিল। কৌটিল্যের মতে চারি হাত অন্তর অন্তর তিনটি পরিখাই যথেষ্ট। পরিখার পার্শ্বদেশ ইষ্টকনির্ম্মিত হওয়া চাই। কৌটিল্যের কার্য্যক্ষেত্র পাটলিপুত্র নগরের বর্ণনায় মেগাস্থিনিস লিখিয়া গিয়াছেন—সত্য সত্যই পাটলিপুত্র নগরের চতুর্দ্দিকে এবম্বিধ তিনটি পরিখা ছিল। মহা-উম্মাগ্‌গ জাতকে বর্ণিত আছে, মিথিলার রাজা তাঁহার রাজধানীর চারিধারে, জলপরিখা, পাকপরিখা এবং সিকতাপরিখা—এই তিনটি পরিখা খনন করাইয়াছিলেন। পরিখার বিস্তৃতি ও গভীরতার পরিমাণও শিল্পশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। মেগাস্থিনিস লিখিয়া গিয়াছেন, পাটলিপুত্রের পরিখা ৪০০ হাত বিস্তৃত এবং বিশ হাত গভীর ছিল। পরিখার জল 'স্থির' বা 'অস্থির' দুই রকমেরই থাকিত। কিন্তু সাধারণতঃ পরিখায় অস্থির বা প্রবাহী জলেরই বন্দোবস্ত থাকিত। কৌটিল্যের মতে, যাহাতে সর্ব্বদা জলস্রোত প্রবাহিত থাকে, কিম্বা নিকটস্থ অন্ত কোন জলাশয় হইতে জলাগমে পরিখা সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে, (তোয়ান্তিকীঃ আগন্তুতোয়পূর্ণা বা সপরিবাহাঃ), তাহার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। এইজন্ত নদীস্রোত যাহাতে পরিখায় আসিয়া পড়ে, সেইজন্ত পরিখার সহিত নদীর সংযোগ করা উচিত। (স্রোতসা সহ নিখাতং, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, অষ্টম অধ্যায়, ১১শ পঙ্‌ক্তি)। যেস্থলে নদীর সহিত সংযোগ হইয়াছে, সেইস্থলে মুখ্য পরিখাদ্বার নির্ম্মিত করিবে। তাহাতে এমন যন্ত্র স্থাপন করিবে, যাহাতে প্রয়োজন হইলে সমগ্রপুরী পরিপ্লাবিত করা যাইতে পারে। (সঙ্কেতপূর্ব্বকৈর্ব্বৈ পরিখাদ্বারমীপ্সিতম্, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড, ১০৩ অধ্যায়ের ১২৮শ পঙ্‌ক্তি)। (সঙ্কটদ্বারাণি সুচরচ্ছ্রাণার্থং পুরস্ত চ। শান্তিপর্ব্ব, ৬৯ম অধ্যায়, ৮ম পংক্তি।) নগরের জল-নির্গম-প্রণালীর সহিত এই পরিখা সংযুক্ত থাকিত—যাহাতে সহরের জল আসিয়া তাহাতে পড়িতে পারে, এবং নদীস্রোতে মলাবর্জ্জনাদি ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে। (খাতিকারচিতং কার্য্যং প্রণালীভিঃ সমন্বিতম্, দেবীপুরাণ, ৭২ অধ্যায়, ৫৫শ পঙ্‌ক্তি)।

পরিখার বাহিরে ঘন জঙ্গল রোপণ করিয়া স্থানটি আরও দুর্গম করা হইত। নগরের রক্ষাবিধান ছাড়াও পরিখার অন্ত উপযোগিতা ছিল। খাতের মাটি দিয়া নিম্নস্থান বা জলাভূমিগুলি ভরাট করিয়া নগরকে সমতল, অথবা 'ঐন্দ্রোত্তরপ্লব' অথবা 'মধ্যস্থানসমুন্নত' করা হইত। সেই মাটি দিয়া আবার সহরের চারিধারে চয় বা বপ্র (rampart, কাঁচা মাটির মোটা বাঁধ) তোলা হইত।

এই বপ্রের উপরেই ইষ্টক-প্রাকার নির্ম্মিত হইত। প্রাকারের সংখ্যাও এক কিংবা বহু ছিল। প্রাচীন পাটলিপুত্রে তিনটি কাষ্ঠময় প্রাচীর ছিল বলিয়া শোনা যায়।

ঢাকার রামপাল গড়ে আটটি প্রাচীর ও আটটি পরিখার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায় শুনিয়াছি। এই প্রাচীরের উপর আবার বহু সাল বা অট্টালক (turret বা tower) নির্ম্মিত হইত। পাটলিপুত্র নগরের এই রকম ৫৭০টি অট্টালক ছিল বলিয়া মেগাস্থিনিস্ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রত্যেক নগরের অনেক দ্বার বা তোরণ ছিল। তাহার উপর প্রাগুক্ত অট্টালকের ন্যায় নানাকারুকার্য্যখচিত গৃহ নির্ম্মাণ করা হইত। তাহাকে গোপুর বলে। এই গোপুর শুধু নগরের দ্বারে নয়, দেবমন্দির অথবা রাজা বা ধনীর গৃহদ্বারেও নির্ম্মিত হইত। নগরের উত্তর দ্বারকে ব্রাহ্ম (ব্রহ্মাকে উৎসৃষ্ট) দ্বার, পূর্ব্ব দ্বারকে ঐন্দ্র (ইন্দ্র বা উদীয়মান সূর্য্যকে উৎসৃষ্ট) দ্বার, পশ্চিম দ্বারকে সৈনাপত্য এবং দক্ষিণ দ্বারকে যাম্য (যমাধিষ্ঠিত) দ্বার বলা হয়।

(নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ) শ্রী বিনোদবিহারী দত্ত

—

চারি আর্য্য সত্য

ভগবান্ বুদ্ধ জগতের দুঃখ বিমোচনের উপায় স্বরূপ চারি আর্য্য সত্যের উপদেশ দান করিয়াছেন (দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায় বা মার্গ)। যোগশাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি ভবব্যাধি হইতে জীবের মুক্তির বিষয় বর্ণনপ্রসঙ্গে সংসার, সংসার-হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষের উপায় বর্ণন করিয়াছেন।

কিরূপে জগতে দুঃখের উৎপত্তি হয়, এই তথ্যের বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক তিনি দেখিলেন যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানই দুঃখের কারণ, এই অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (ছয় ইন্দ্রিয়), ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, এবং জাতি হইতে জরামরণ শোকপরিদেবদুঃখদৌর্ম্মনস্য ইত্যাদি। অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞান) বা অজ্ঞানই সকল দুঃখের কারণ, এই অবিদ্যার

ধ্বংসই সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এই কারণেই উহাদের পরস্পরকে প্রতীত্য-সমুৎপাদ ধর্ম্ম বলা হয়, অর্থাৎ একটির সংযোগে অন্যটির উৎপত্তি। ইহারই আর এক নাম দ্বাদশ-নিদান। জাগতিক দুঃখকষ্টের মূল কারণ নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক তাহার উচ্ছেদ-সাধন করাই এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ বা দ্বাদশ নিদানের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেমন ব্যাধির কারণ নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক তাহার প্রতিবিধান করাই চিকিৎসা-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, সেইরূপ জন্ম জরা ও মৃত্যুরূপ ব্যাধির কারণ নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক তাহা হইতে জীবকুলকে মুক্তিপ্রদান করাই এই দ্বাদশ নিদানের ধর্ম্ম। এই জন্যই ভগবান্ বুদ্ধকে জরামরণ-বিঘাতী ভিষকবর বলিয়া বৌদ্ধগ্রন্থমধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে।

উদীচ্য বৌদ্ধগ্রন্থমধ্যে এই দ্বাদশ নিদানধর্ম্মের ব্যাখ্যা বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। পরবর্ত্তী কালে মানবজীবনের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর সহিত এই দ্বাদশ নিদানের সাদৃশ্য স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে। অজন্তাগুহার চিত্রাবলীমধ্যে এই দ্বাদশ নিদানের এক চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিব্বতীয় গ্রন্থমধ্যেও এইরূপ চিত্র দৃষ্ট হয়; তিব্বতীয় লামাগণ ইহাকে জীবনচক্র বা সংসারচক্র বলিয়া থাকে। এই চক্রের কেন্দ্রস্থলে কপোতরূপী রাগ, সর্পরূপী দ্বেষ এবং শূকররূপী মোহ বিদ্যমান আছে। এই রাগ, দ্বেষ, ও মোহের দ্বারাই সংসারচক্র বিঘূর্ণিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-কষ্টের মূলীভূত কারণ হইতেছে অবিদ্যা। মানবজীবনের উপর এই অবিদ্যার প্রভাব প্রতিপন্ন করাই এই-সকল বর্ণনা বা চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহাই প্রতীত্য সমুৎপাদধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। একমাত্র প্রজ্ঞা দ্বারাই এই অবিদ্যার নাশ বা ধ্বংস সম্ভব।

অবিদ্যার নাশ বা ধ্বংস দ্বারাই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, ও দুঃখের নিবৃত্তি হইলেই নির্ব্বাণ লাভ হয়। গৌতম বুদ্ধ বলিয়াছেন—আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ-নিরোধের একমাত্র উপায়। তিনি এই অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রবেশের উপায়স্বরূপ দশটি অকুশল কর্ম্ম পরিহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন, মহাবস্তু নামক প্রাচীন গ্রন্থে এ-বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

প্রাণাতিপাতো অধর্ম্মো, প্রাণাতিপাত বৈরমণো ধর্ম্মো, অদিন্নাদানো অধর্ম্মো, অদত্তাদান বৈরমণো ধর্ম্মঃ, কামেসু মিথ্যাচারো অধর্ম্মো, কামেসু মিথ্যাচার বৈরমণো ধর্ম্মো, সুরামৈরেয় মদ্যপানং অধর্ম্মো, সুরামৈরেয় মদ্যপানাতো বৈরমণো ধর্ম্মো, মৃষাবাদো অধর্ম্মো, মৃষাবাদাতো বৈরমণো ধর্ম্মো, পিশুনা বাচো অধর্ম্মো, পিশুনা বাচাতো বৈরমণো ধর্ম্মো, মিথ্যা দৃষ্টি অধর্ম্মো, সম্যগ দৃষ্টি ধর্ম্মো। দশ কুশলা কর্ম্মপথা ধর্ম্মো, দশহি মহারাজ অকুশলেহি কর্ম্মপথেহি সমন্নাগতাঃ সত্তা নরকে থুপ পদ্যন্তি। মহাবস্তু।

প্রাণাতিপাতঃ, অদত্তাদান, কামমিথ্যাচার, মৃষাবাদ, পৈশুন্য (পরনিন্দা), পারুষ্য (অপ্রিয়ভাষণ), সম্ভিন্ন প্রলাপ (অসংলগ্ন বাক্য), অভিধ্যা (পরদ্রব্যে লোভ) ও মিথ্যা দৃষ্টি।—এই দশটি অকুশল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে রাগ, দ্বেষ ও মোহ দূরে যাইবে। পালি বৌদ্ধগ্রন্থে এই দশবিধ নিষেধবিধি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে দশশীল নামে প্রচলিত আছে :—

১। পাণাতিপাতো বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি

প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম।

২। অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

অদত্তগ্রহণ হইতে—অর্থাৎ পরদ্রব্য গ্রহণ হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৩। কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

কামসমূহে মিথ্যাচার হইতে, দোষযুক্ত কামাচার হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৪। মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

মুসাবাদা (মৃষাবাদ) অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম।

৫। সুরামেরেয় মজ্জ পমাদট্‌ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

মত্ততার কারণস্বরূপ সুধামৈরেয় প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করিব না—এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৬। বিকাল-ভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

দিবা দ্বিপ্রহরের পর হইতে পরদিন সূর্য্য-উদয় পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কিছু আহার করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৭। নচ্চ-গীত-বাদিত্র-উৎসব-দর্শন হইতে বিরত থাকিব এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৮। মালা-গন্ধ-বিলেপন ধারণ মন্ডক-বিভুসনট্‌ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

মালা ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহার, অলঙ্কারাদি ধারণ, শরীরের শোভার নিমিত্ত শরীর-মার্জ্জনা প্রভৃতি হইতে বিরত থাকিব—এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৯। উচ্চসয়নঃ মহাসয়না বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

উচ্চশয্যা বা মহাশয্যা ব্যবহার করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। পরিমাণে একফুট অপেক্ষা উচ্চ খাট পালঙ্ক কিম্বা তুলাভরা শয্যায় শুইব বা বসিব না এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

১০। জাতরূপ রজত পটিগগহনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

স্বর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

দশবিধ অকুশল ধর্ম্মের পরিহার বা দশ শীল পালন, অষ্টমার্গ পালনের সহায়স্বরূপ। এই দশশীল বা দশবিধ কুশল ধর্ম্ম, কায় বাক্য ও মনের উপর সংযম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার মধ্যে গৌতম বুদ্ধের বিশেষত্ব কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষীয় প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কায় বাক্য- ও মনঃ সংযমের বিভিন্ন উপদেশ-প্রণালী প্রচলিত আছে। কায় মন ও বাক্যের উপর সংযমের চিহ্ন-স্বরূপ এ দেশের ব্রহ্মচারিগণ—ত্রিদণ্ড ধারণ করিতেন, এখনও এ-প্রথা প্রচলিত আছে।

(উদ্বোধন, বৈশাখ) শ্রী চারুচন্দ্র বসু

প্রেম
চিত্রকর শ্রীযুক্ত মহম্মদ আব্দুর রহমান চাঘতাই

রাজপথ

[৪]

পরদিন প্রাতে সুরেশ্বর তাহাদের বাটীর ভিতর নিম্নতলার বারাণ্ডায় বসিয়া তাহার ভগিনী মাধবীকে দিয়া ক্ষত পরিষ্কার করাইয়া লইতেছিল এবং অদূরে বসিয়া তাহার বিধবা জননী তারাসুন্দরী দেখিতেছিলেন এবং গল্প করিতেছিলেন।

গরম জলে বোরিক্ পাউডার মিশাইতে মিশাইতে মাধবী বলিল, "কিন্তু দাদা, অতটা দুঃসাহসের কাজ করা তোমার উচিত হয় নি।"

সুরেশ্বর সহাস্যে কহিল, "তা হ'লে কি করা উচিত ছিল শুনি? দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে গুণ্ডাটাকে বক্তৃতা দেওয়া, না পরদিন খবরের কাগজে আন্দোলন করা? অবিবেচক হওয়া উচিত নয়? কিন্তু সুবিবেচক সব সময়েই হ'তে হয়। তখন বিপন্নদের রক্ষা করতে চেষ্টা করা ছাড়া আর অন্য কিছুই করা যেতে পার্‌ত না।" তাহার পর তারাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তুমি কি বল মা? আমি যা করেছি তার মধ্যে কিছু অন্যায় হয়েছিল কি?"

সৎসাহস ও সহৃদয়তা এই দুইটি গুণের জন্য সুরেশ্বর যদি কাহারও কাছে ঋণী হয় ত সে তাহার জননীর নিকট। পিতা ছিলেন একজন অবসরবিহীন বিখ্যাত ডাক্তার, তিনি তাঁহার রোগী ও ডাক্তারী লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন; সুরেশ্বর মানুষ হইত তারাসুন্দরীর নিকট। আকাশে বায়ু ও আলোর মত, তারাসুন্দরীর প্রসারিত হৃদয়-ক্ষেত্রে এই দুইটি গুণ ভরিয়া ছিল; তিনি তাহারই আবহাওয়ায় পুত্রকে মানুষ করিয়াছিলেন। তাই সুরেশ্বর যখন তাঁহার মত চাহিল, তখন তাঁহাকে হাসিমুখে বলিতেই হইল, "না, তা হয় নি।" কিন্তু পাছে তাঁহার অনুমোদনের দ্বারা প্রশ্রয় পাইয়া সুরেশ্বর ভবিষ্যতে নিজেকে কোনও প্রকার বিপদমূলক অবস্থায় লইয়া যাইতে ইতস্ততঃ না করে এই আশঙ্কায় তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই কহিলেন, "কিন্তু শক্তি ও ক্ষমতার বাইরে গিয়ে নিজেকে অনর্থক বিপদের মধ্যে ফেলাও অন্যায় কথা সুরেশ।"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "তা ত নিশ্চয়ই মা; কিন্তু শক্তি আর ক্ষমতা মেপে নিয়ে তার পর কাজে প্রবৃত্ত হওয়াও ভারি কঠিন কথা। তাই সময়ে সময়ে শক্তির ঠিকমত আন্দাজ কর্‌তে না পেরে কষ্ট পেতেই হয়। বিবেচনা না করে' এগিয়ে যাওয়া যেমন গোঁয়ার্ত্তমী, অতি-বিবেচনায় ইতস্ততঃ করা তেমনি কাপুরুষতা। ঠিক নয় কি মা?"

তারাসুন্দরী পুত্রের যুক্তির নিকট মনে মনে হার মানিয়া কহিলেন, "সে কথা ঠিক। আমি বল্‌ছিলাম, তুমি যখন বেশ জান্‌ছ যে কোন একটা কাজ তোমার শক্তির বাইরে, তখন তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ায় কোনও সুবুদ্ধি নেই। ধর একটি ছোট ছেলে জলে পড়ে' হাবুডুবু খাচ্ছে, তুমি একেবারেই সাঁতার জান না। এ অবস্থায় তোমার কি করা উচিত? জলে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত? —না, লোক ডাক্‌বার জন্যে ডাঙাতেই দৌড়দৌড়ি করা উচিত?"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "এ খুব সহজ কথা মা। কিন্তু ধর আমি যদি এমন একটু সাঁতার জানি যে ছেলেটিকে তুলে আন্‌তেও পারি, অথবা না পেরে নিজেও ডুবে যেতে পারি। তখন আমার কি করা উচিত? জলে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত, না, ডাঙায় দৌড়দৌড়ি করা উচিত?"

তারাসুন্দরী কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে মাধবী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "বোলো না মা, কিছু বোলো না! দাদার সাহস বেড়ে যাবে।"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "তুই ত আচ্ছা দেখ্‌ছি মাধবী? তুই কি চাস যে আমার সাহস কমে' যায়?"

মাধবী হাসিতে হাসিতে কহিল, "একটু চাই। তুমি সময়ে সময়ে এমন সব কাণ্ড করে' বস যে শুনে' আমাদের রক্ত শুকিয়ে যায়!"

ভ্রাতাভগিনীর দ্বন্দ্বের সুযোগে সুরেশ্বরের কঠিন প্রশ্ন হইতে অব্যাহতি লাভের অভিপ্রায়ে তারাসুন্দরী কহিলেন,

"হ্যা রে সুরেশ, ওদের বাড়ী গিয়ে পেট ভরে' খেয়ে ত এলি, তারা কি রকম লোক তা ত কিছু বল্‌লি নে ?"

তারাসুন্দরী সুরেশ্বরকে কখন তুমি এবং কখন তুই বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "লোক ?—বেশ লোক—বড়মানুষ, সৌখীন, সভ্য-ভব্য, কায়দা-দুরুস্ত !"

পুত্রের কথা কহিবার ভঙ্গী হইতে তারাসুন্দরী বুঝিতে পারিলেন যে তাহাদের প্রতি পুত্র খুব যে প্রসন্ন তাহা নহে। হাসিয়া কহিলেন, "আর সে মেয়েটি কেমন, যার গলা থেকে হার খুলে নিচ্ছিল ?"

সুরেশ্বর কহিল, "কি কেমন, খুলে' না বল্‌লে কেমন করে' বলব মা কি রকম ?"

তারাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, "দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন তাই প্রথমে বল্‌ না।"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল, "দেখ্‌তে ত বেশ ভালই, কিন্তু শুন্‌তে সব সময়ে খুব ভাল নয় মা! মেয়েদের কি বল্‌তে হয় ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে, ছেলে হ'লে বল্‌তাম একটু ফাজিল, কিন্তু তাই বলে' অমার্জ্জিত নয়, বেশ ভদ্র।"

"গিন্নী কেমন মানুষ রে ?"

এবার সুরেশ্বর হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "বেশ মানুষ মা! অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ চিনে ফেল্‌বার অভিজ্ঞতা বা শক্তি হয়েছে বলে স্পর্দ্ধা করতে পারি নে, কিন্তু তবুও গিন্নীটিকে যে ঠিক চিন্‌তে পেরেছি তা অসঙ্কোচে বল্‌তে পারি। বেশ মানুষ; সাদাসিধে, নিজের মনের ইচ্ছাটুকু একটু ঢেকে-ঢুকে বা আট্‌কে রাখ্‌তে কোনো প্রবৃত্তি নেই। পাছে তুমি ভুল করে' ভাব যে দেশের দশজনের মত তিনিও একজন, তাই পদে পদে নিজের অবস্থা তোমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত।"

সুরেশ্বরের বর্ণনার ভঙ্গিমা দেখিয়া তারাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, "তা হ'লে ত বেশ লোক রে। বড় মেয়েটি কেমন ?"

এমন সময়ে বাহিরের দ্বারে কড়া-নাড়ার শব্দ শুনা গেল। তারাসুন্দরী কহিলেন, "অবনী-ঠাকুরপো এসেছেন বোধ হয়। যা ত মাধবী, দোরটা খুলে' দিয়ে আয় ত।"

মাধবী উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল অবনী নহে, একজন অপরিচিত ব্যক্তি পথে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। একটু ভিতরের দিকে সরিয়া আসিয়া মাধবী মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আপনি কাকে চান ?"

অপরিচিত ব্যক্তি কহিল, "সুরেশ্বর-বাবু কেমন আছেন আমি তাই জান্‌তে এসেছি। তিনি বাড়ী আছেন কি ?"

মাধবী কহিল, "তাঁর হাত খোলা হয়ে ধোয়া হচ্চে। ভালই আছেন।"

আগন্তুক ব্যগ্র হইয়া কহিল, "যদি অসুবিধা না হয় খোলা অবস্থায় আমি তাঁর হাতটা দেখ্‌তে চাই। আমার নাম বিমানবিহারী বসু। তিনি কাল বোটানিকাল গার্ডেনে আমাদের—"

বিমানের অসমাপ্ত কথার মধ্যেই মাধবী বলিল, "বুঝ্‌তে পেরেচি। আপনি বাইরের ঘরে বসুন, আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।"

বিমান ভিতরে প্রবেশ করিলে তাহাকে বৈঠকখানা ঘর দেখাইয়া দিয়া মাধবী অন্দরে গিয়া সুরেশ্বর ও তারাসুন্দরীকে জানাইল যে, অবনী নহে বিমান আসিয়াছে, এবং সে মুক্ত অবস্থায় সুরেশ্বরের হাত দেখিতে চাহে।

সুরেশ্বর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "মা, তুমি না হয় একটু সরে' যাও, এইখানেই বিমান-বাবুকে ডেকে আনা যাক্‌।"

তারাসুন্দরী কহিলেন, "তা আমি সরে' যাচ্ছি। যা মাধবী, তাঁকে ডেকে নিয়ে আয়।"

একজন অনাত্মীয় অপরিচিত যুবকের নিকট বারবার যাইতে মাধবীর সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, কিন্তু একমাত্র ভৃত্য কানাই বাজারে গিয়াছে এবং হাতের বাঁধন খুলিয়া সুরেশ্বর নানা-প্রকারে বিব্রত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে বলিয়া অগত্যা সে বিমানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে অন্দরে আহ্বান করিল।

মাধবীকে অনুসরণ করিয়া বিমান সুরেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইল। সুরেশ্বর নিজেই বাম হস্ত দিয়া অল্প অল্প করিয়া গরম জল ঢালিয়া ব্যাণ্ডেজ ভিজাইতেছিল;

বিমানকে দেখিয়া সাগ্রহে কহিল, "আসুন আসুন বিমান-বাবু, বসুন এই চেয়ারটাতে।"

সে কথায় মনোযোগ না দিয়া তারাসুন্দরীকে অন্তরালে সরিয়া যাইতে দেখি। বিমান উৎসুক নেত্রে সুরেশ্বরকে প্রশ্ন করিল, "মা ?"

সস্মিত মুখে সুরেশ্বর উত্তর দিল, "হাঁ, মা।"

তখন তারাসুন্দরীর দিকে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া বিনীতস্বরে বিমান কহিল, "কাল থেকে সুরেশ্বর-বাবুর সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক হয়েছে, তাতে ত মা আপনার আমাকে দেখে' সরে' যাবার কথা নয়।"

সুরেশ্বরের প্রতি বিমানের পূর্ব্ব প্রশ্ন শুনিয়াই তারা-সুন্দরী দাঁড়াইয়াছিলেন, এবার তাঁহাকে ফিরিতে হইল। সলজ্জ-স্মিতমুখে বিমানের প্রতি চাহিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "এস বাবা এস।"

বিমান অগ্রসর হইয়া তারাসুন্দরীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

তাহার পর সুরেশ্বরের নিকট আসিয়া বিমান প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, রাত্রে কেমন ছিলেন, এখন কেমন আছেন, রক্ত একেবারে বন্ধ হইয়াছে কি না, বেদনা আছে কি না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সংক্ষেপে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "দেশ যখন ক্ষত বিক্ষত হয়ে নানা রকম দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে বিমান-বাবু, তখন একজন নগণ্য দেশবাসীর সামান্য ক্ষত নিয়ে এতটা ব্যস্ত হবেন না।"

বিমান হাসিয়া কহিল, "তাই যদি ঠিক হয়, তা হ'লে কাল সামান্য দু-চার জন দেশবাসীকে লাঞ্ছিত হ'তে দে'খে আপনি অত ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন তা বলুন ?"

সুরেশ্বর কহিল, "বেশী ব্যস্ত ত হইনি; যতটুকু হওয়া দরকার ততটুকুই হয়েছিলাম। তা ছাড়া দেশবাসীদের জন্য ব্যস্ত হইনি, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যস্ত হয়েছিলাম। যদি দেখ্‌তাম কুস্তির আখড়ায় আপনার সঙ্গে সেই গুণ্ডাটার কুস্তি চলেছে আর সে আপনাকে চেপে ধরেছে, তা হ'লে ত কখনই আপনার সাহায্যে যেতাম না।"

মাধবী সরঞ্জাম লইয়া ঘা ধুইয়া দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে বুঝিতে পারিয়া বিমান কহিল, "এ নিয়ে তর্ক পরে কর্‌লেই চল্‌বে, আগে ঘাটা ধুয়ে নিন্।" তাহার পর তাড়াতাড়ি সুরেশ্বরের নিকট গিয়া বসিয়া কহিল, "আমি ধুয়ে বেঁধে' দেবো ?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "না মাধবীই করে' দিচ্ছে।"

বিমান কহিল, "আজকের দিনটা অন্ততঃ একজন ডাক্তার দিয়ে করে' নিলে ভাল হ'ত।"

মাধবীর দিকে চাহিয়া সুরেশ্বর হাসিমুখে কহিল, "এ-রকম ছোটখাট ব্যাপারে মাধবীই আমাদের ডাক্তারী করে। বাবা ডাক্তার ছিলেন; মাধবীই তাঁর কাছ থেকে অনেক বিদ্যে শিখে নিয়েছে।" তাহার পর হাসিয়া কহিল, "শুধু কি অ্যালোপ্যাথী ?—ও আবার একটি হোমিপ্যাথিক ডাক্তার! কাল রাত্রে দুবার আমাকে ওষুধ খাইয়েছে। কি ওষুধ মাধবী ? ফস্‌ফোফাইলম না ডল্‌কামারা ?"

নিজের বিষয়ে এরূপ অবাধ আলোচনায় মাধবীর মুখ সঙ্কোচে আরক্ত হইয়া আসিতেছিল; তন্মধ্যে সহসা সুরেশ্বরকে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে এমন গভীর ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিতে দেখিয়া সে কৌতুকে অনুচ্চস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। তারাসুন্দরী হাসিতে লাগিলেন। এমন কি সদ্যপরিচিত বিমানবিহারীও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

তারাসুন্দরী সস্মিতমুখে কহিলেন, "কিন্তু যাই বল বাপু, মাধবীর হোমিওপ্যাথিক ওষুধে উপকার বেশ পাওয়া যায়।"

সুরেশ্বর সহাস্যে কহিল, "তা পাওয়া যায়; তবে কিনা মাঝে মাঝে সর্দ্দি—নিউমনিয়ায়, আর পেটের অসুখ—কলেরায় দাঁড়ায়।"

পুনরায় একটা যুক্ত হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

সুরেশ্বর কহিল, "আচ্ছা বিমান-বাবু, হোমিওপ্যাথিক ওষুধে আপনার আস্থা আছে ?"

বিমানের কিছুমাত্র আস্থা ছিল না; কিন্তু তাহা বলিলে পাছে মাধবীর প্রতি কোনোপ্রকার রূঢ়তা প্রকাশ পায় এই আশঙ্কায় সে বলিল, "তা সময়ে সময়ে বেশ উপকার পাওয়া যায় বই কি।"

সুরেশ্বর হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "দৈব ওষুধের মত ? হাজারকরা একটা ?"

মাধবীর কৌতুকোজ্জল মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিমানবিহারী কহিল, "না না হোমিওপ্যাথিকে অতটা অবহেলা করা চলে না, আপনি বড় বাড়াবাড়ি কর্‌ছেন।"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া তারাসুন্দরী মৃদু হাস্যে কহিলেন, "তুমি ওর কথা শোন কেন বাবা? হোমিও-প্যাথী ভিন্ন অন্য কোনও ওষুধ সুরেশ এক ফোঁটা খায় না। শুধু মাধবীকে ক্ষ্যাপাবার জন্য ও-সব কথা বল্‌ছে!"

তৎপরে তারাসুন্দরী একে একে বিমানবিহারীর ও তাহার সংসারের পরিচয় লইতে লাগিলেন এবং তদবসরে মাধবী সুরেশ্বরের হস্ত ধৌত করিয়া ব্যাণ্ডেজ্‌ বাঁধিয়া দিল।

বিমানবিহারী তারাসুন্দরীর সহিত কথোপকথন করিতেছিল কিন্তু তাহার দৃষ্টি ও মনোযোগ ছিল সুরেশ্বরের হস্তের প্রতি। যেরূপ পরিচ্ছন্নভাবে মাধবী ক্ষত ধৌত করিয়া দিল ও যেরূপ নিপুণতার সহিত ব্যাণ্ডেজ্‌ বাঁধিয়া দিল তাহা দেখিয়া বিমানবিহারী বিস্মিত হইল এবং নিজের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও কিছু পূর্ব্বে এই কার্য্যের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অগ্রসর হইয়াছিল ভাবিয়া মনে মনে লজ্জিতও হইল। সে প্রশংসমান চক্ষে সস্মিতমুখে কহিল, "এখন আমি বুঝ্‌তে পেরেছি সুরেশ্বর-বাবু, এ-কাজের জন্যে ডাক্তার ডাক্‌বার দরকার ছিল না। কোনো ডাক্তারই এর চেয়ে বেশী কিছু কর্‌তে পার্‌ত না।"

সুরেশ্বর মাধবীর আরক্ত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে কহিল, "তবে আর কি মাধবী, এত বড় সার্টিফিকেট পেলি, এখন বিমান-বাবুকে কিছু খাবার আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইয়ে দে।"

বিমান ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, না, খাবারের কোনো দরকার নেই,—আমি খেয়ে বেরিয়েছি, অনর্থক ব্যস্ত হবেন না।"

তারাসুন্দরী কহিলেন, "ব্যস্ত কি বাবা? আজ প্রথম বাড়ীতে এলে একটু মিষ্টিমুখ কর্‌বে বই কি। মাধবী ঘরে খাবার তৈরী করে' রেখেছে, তাই একটু খাও।"

বিমান মৃদু হাসিয়া কহিল, "মিষ্টিমুখ করা যদি সম্পর্ক পাতানর একটা বিধি হয়, তা হ'লে নিশ্চয়ই মিষ্টিমুখ কর্‌ব'। ছেলে-বেলাতেই যে হতভাগ্য মা হারিয়েছে, মা-পাওয়ার অনুষ্ঠানে সে বিন্দুমাত্র খুঁৎ রাখ্‌তে রাজী নয়। কিন্তু মা, নিয়মপালন যেন নিয়মপালনের বেশী কিছু না হয়।"

বিমানের মাতৃহীনতার এইটুকু সকরুণ মর্ম্মস্পর্শী উল্লেখে স্নেহশীলা তারাসুন্দরীর নিত্যোদ্যত মাতৃহৃদয় চকিত হইয়া উঠিল; এবং সুরেশ্বর ও মাধবী তাহাদের অতৃতীয়-ভাজ্য মাতৃস্নেহে বিমানকে এমন নির্ব্বিকল্প অধিকার সঞ্চার করিতে দেখিয়া অনাস্বাদিত আনন্দে সপুলকে চাহিয়া রহিল।

কলিকাতার গৃহাভ্যন্তর হইলেও আলোকে ও বাতাসে শরৎকালের অনাবিল মাধুর্য্য এমন একটা অনুকূল অবস্থা রচনা করিয়াছিল যাহার মধ্যে দেখিতে দেখিতে এই সদ্য-স্থাপিত সম্পর্কের চেতনা মনোরম ও বন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠিল এবং কিছু পরে জলযোগ করিয়া বিমান যখন তারাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিল, তখন তারাসুন্দরীর হৃদয় নব-নিষিক্ত বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইয়া গেল।

[৫]

অপরাহ্ণে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া আকাশ নির্ম্মল ও বায়ু শীতল হইয়া গিয়াছিল। তরুপল্লব-বিরল কলিকাতা সহরেরও আকৃতি, প্রথমে বর্ষাজলে স্নাত, পরে রৌদ্র-করে উদ্ভাসিত হইয়া, সিক্তনেত্রপল্লব কিন্তু হাস্যোৎফুল্ল-মুখ বালকের মত বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রমদাচরণ তাঁহার বসিবার ঘরে একটা ইজি-চেয়ারে শয়ন করিয়া লাল নীল পেন্সিলের দাগ কাটিয়া গীতা অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এবং পত্নী জয়ন্তী অদূরে একটা চেয়ারে বসিয়া সম্ভবতঃ কোনও বাংলা উপন্যাস-কাহিনীতে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এমন সময়ে সুরমা প্রবেশ করিয়া কহিল, "বাবা, সুরেশ্বর-বাবুর খবর ত আজ একবারও নেওয়া হ'ল না। ঠাকুরপো সকালে গিয়েছিলেন কি না তাও জানা গেল না।"

প্রমদাচরণ ধীরে ধীরে নাসিকা হইতে চশ্‌মা খুলিয়া খাপের মধ্যে ভরিয়া রাখিয়া সুরমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বিমান কি আজ সকালে আসেন নি?

সুরমা কহিল, "না।"

শুনিয়া প্রমদাচরণ অনাবশ্যক গভীরভাবে চিন্তাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, এবং জয়ন্তী স্বামীর গবেষণা ও মন্তব্যের জন্য ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া নিরতিশয় সহজ ভাবে কহিলেন, "ভালই আছে।"

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া সুরমা অপ্রসন্ন স্বরে কহিল, "কিন্তু সেটা জানা চাই ত!"

কন্যার মৃদু ভর্ৎসনায় এই অর্থহীন অকারণ নিরুদ্বেগ প্রকাশের জন্য ঈষৎ লজ্জিত হইয়া জয়ন্তী কহিলেন, "তা না হলে খবর দিত।"

কিন্তু এ কৈফিয়তে সুরমা কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইল না। কারণ ইহার মধ্যে যুক্তির কোনো সংশ্রব ছিল না। সে জয়ন্তীর কথার কোনো উত্তর না দিয়া প্রমদাচরণকে বলিল, "বাবা, আমাদের শোফার ত সুরেশ্বর-বাবুর বাড়ী দেখেছে, তার হাতে একটা চিঠি পাঠিয়ে খবর নিলে হয় না?"

এবারও স্বামীর মতামতের জন্য অপেক্ষা না করিয়া জয়ন্তী কহিলেন, "তাতে আর ক্ষতি কি? পাঠিয়ে দাও না।"

প্রমদাচরণ কিন্তু কহিলেন—শোফারকে পাঠাইবার পরিবর্ত্তে বৈকালে শ্যামবাজার যাইবার পথে স্বয়ং সুরেশ্বরের সংবাদ লইবেন।

কিন্তু তিনি যখন সুরেশ্বরের গৃহে উপস্থিত হইলেন তখন সুরেশ্বর গৃহে ছিল না। সুরেশ্বর ভাল আছে তাহা তাহার ভৃত্য কানাইয়ের মুখে অবগত হইয়া, এবং তাহাকে নিজ নাম ও পরিচয় প্রদান করিয়া প্রমদাচরণ গন্তব্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

প্রমদাচরণের প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই বিমানবিহারী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রত্যুষে সুরেশ্বরের গৃহে গিয়া সে যাহা দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিল।

শুনিতে শুনিতে সুরমা সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেশ্বর-বাবুর বোনের পরণে কি কাপড় দেখলে ঠাকুরপো? মিহি শাড়ী, না খদ্দর?"

বিমান সহাস্যে কহিল, "খদ্দর। শুধু কি বোনের খদ্দর? মার খদ্দরের থান; চাকরটা বাজার থেকে এল—তার খদ্দরের ধুতি; এমনকি বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড়, দোরের পরদা, সমস্তই খদ্দর।"

সসন্তোষ বিস্ময়ে সুরমা কহিল, "বাঃ, বেশ ত!"

সুরেশ্বরের স্বাদেশিকতা প্রথম হইতেই সুমিত্রাকে এমন একটু বিচিত্র কারণে বিঁধিতেছিল যে, বিমানের মুখে এই খদ্দরের কাহিনী শুনিয়া সে বিশেষ সন্তুষ্ট না হইয়া ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "বেশ বটে, কিন্তু বাড়াবাড়িটাও একটু বেশ।"

সুরমা ব্যগ্রভাবে কহিল, "না, না, বাড়াবাড়ি আবার কি সুমিত্রা? খদ্দর যে ব্যবহার করবে সে ত সমস্ত জিনিষই খদ্দরের ব্যবহার করবে। প্রতিজ্ঞা ক'রে বিলিতি জিনিষ যে ত্যাগ করেছে সে ত আর খদ্দরের সঙ্গে দুচারটে বিলিতি জিনিষ ব্যবহার করতে পারে না!"

সুমিত্রা মৃদু হাসিয়া কহিল, "কিন্তু বিবেচনা ত আর জাহাজ-বোঝাই হয়ে বিলেত থেকে আসে না যে খদ্দরের সঙ্গে তা ব্যবহার করা চলে না? হাত কেটে রক্ত-ধারা বইছে, তখনও রক্ত বন্ধ করবার জন্যে আইরিশ্ লিনেন ব্যবহার করব না এ বাড়াবাড়ি নয় ত কি?"

সুরেশ্বরের কোনো আচরণই এ পর্য্যন্ত বিমানের চক্ষে অসঙ্গত বা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয় নাই; এমন কি তাহার উগ্র অব্যাহত স্বদেশপ্রিয়তাই সর্ব্বাধিক তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এখন কিন্তু প্রেমিকোচিত শিষ্টাচার রক্ষার্থেই হউক বা অপর যে কোনো কারণেই হউক, সুমিত্রাকে সমর্থন করিয়া সে কহিল, "তা সত্যি। ভাল জিনিষও বিচার-বিবেচনার গণ্ডী ছাড়িয়ে যতটুকু বেড়ে যায় ততটুকুই বাড়াবাড়ি আর ততটুকুই মন্দ। ঔষধার্থে যদি সুরাপানের আদেশ থাকতে পারে তা হলে রক্তপাত বন্ধ করবার জন্যে আইরিশ লিনেন্ কোনো অপরাধ করে নি।"

বিমানের কথা সুমিত্রার কথাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করিলেও সুমিত্রা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের সূক্ষ্ম ও অপরিজ্ঞাত যে বিশেষ তন্ত্রীটি আহত হইয়া সুরেশ্বরের প্রতি এই অনিরূপণীয় এবং অনির্দ্দিষ্ট বিরূপতা সঞ্চার করিয়াছিল

বিমানের মধ্যে হেতুগত তাহার কোনো যোগ না থাকায় উভয়ের কথা এক হইলেও তদ্দ্বারা কোনোপ্রকার ঐক্য প্রসূত হইল না।

সুমিত্রার নিকট হইতে কোনো প্রকার উত্তর না পাইয়া ঈষৎ ভগ্নোৎসাহ হইয়া বিমান সুরমাকে বলিল, "তুমি কি বল বউদিদি? ঠিক নয় কি?"

সুরমা মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা হয়ত ঠিক; কিন্তু যেখানে দুধ খেলেই রোগ সারতে পারে সেখানে সুরাপান না করাই ত ভাল। আইরিশ্ লিনেন্ ছাড়াও যখন অন্য জিনিস হাতের কাছে রয়েছে যা দিয়ে কাজ চালান যেতে পারে তখন আইরিশ্ লিনেন্ ব্যবহার না করলে কি আর অপরাধ হচ্ছে?"

সুরমার কথার উত্তরে বিমানকে কোনও কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া সুমিত্রা ব্যগ্র হইয়া কহিল, "না, না, অপরাধের কোনো কথা নিশ্চয়ই কিছু নেই; সকলেরই নিজ নিজ মতে আর পথে চল্‌বার অধিকার আছে। কিন্তু চলাটা একটু সহজভাবে চল্‌লেই দেখায় ভাল। হাত পা আছে বলেই যে চল্‌বার সময়ে হাত পা বেশীরকম নাড়্‌তে হবে এমন কি কথা আছে?"

সুমিত্রার কথায় একটু ব্যথিত হইয়া সুরমা সবিস্ময়ে কহিল, "কিন্তু সুরেশ্বর-বাবু কি হাত পা বেশী নাড়েন?"

শান্ত স্মিতমুখে সুমিত্রা কহিল, "একটু নাড়েন বই কি। সুরেশ্বর-বাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধার অভাব নেই, তাঁর দ্বারায় আমরা সকলেই উপকৃত; কিন্তু সত্যি কথা না বল্‌লে চল্‌বে কেন?"

সুরমা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "হাত পা নাড়্‌তে কখন দেখ্‌লি শুনি?"

সুরমার ক্রোধ দেখিয়া সুমিত্রা হাসিতে হাসিতে বলিল, "দুবার,—একবার বোটানিক্যাল-গার্ডেন থেকে বেরিয়ে, আর-একবার ডাক্তার চ্যাটার্জির সাম্‌নে।"

সুরমা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "আর বোটানিক্যাল-গার্ডেনের ভিতর গুণ্ডাটার সঙ্গে হাত পা নাড়া সেটা বুঝি এরি মধ্যে ভুলে গিয়েছিস্?"

সুমিত্রা পুলকিত হইয়া সহাস্যমুখে কহিল, "একটুও ভুলি নি দিদি, সেদিন দৈবক্রমে সুরেশ্বর-বাবু এসে না পড়্‌লে মেয়েমানুষগুলির কি যে দশা হ'ত তা ভেবেও গা শিউরে ওঠে!" কিন্তু বিমানবিহারী যে মেয়েমানুষের মধ্যে গণ্য নহে, পরক্ষণেই তাহা স্মরণ করিয়া সুমিত্রা অপ্রতিভ হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "সুরেশ্বর-বাবু এসে না পড়্‌লে শেষকালে আপনাকেই গুণ্ডাটার সঙ্গে হাতাহাতি করতে হ'ত।" কিন্তু এরূপভাবেও আলোচনা বিমানের পক্ষে রুচিকর হইবে না মনে করিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সুমিত্রা সহসা অন্য প্রসঙ্গে গিয়া পড়িল; বলিল, "আচ্ছা, সুরেশ্বর-বাবুর বোনের বিয়ে হয়েছে?"

একটু চিন্তা করিয়া বিমানবিহারী কহিল, "ঠিক বল্‌তে পারিনে; কিন্তু যতদূর আন্দাজ হয়, হয় নি।"

বিমানের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিয়া সুরমা কহিল, "আন্দাজ কি ঠাকুরপো? সীঁথেয় সিঁদুর ছিল কি না দেখ নি?"

"তখন হয়ত দেখেছিলাম, এখন মনে পড়্‌ছে না।"

"মাথায় কাপড় ছিল?—না মাথা খোলা ছিল?"

চিন্তা করিয়া বিমানবিহারী কহিল, "খোলা ছিল বলেই ত মনে হচ্ছে।"

উচ্ছ্বসিত হাস্য কোনোপ্রকারে রোধ করিয়া সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, "চুল খোলা ছিল, না বাঁধা ছিল?"

বিমান স্মিতমুখে বলিল, "বোধহয় বাঁধা ছিল।"

সুরমা হাসিতে হাসিতে কহিল, "সেটি সুরেশ্বর-বাবুর ভাই না বোন্ তা মনে আছে ত ঠাকুরপো?"

এবার বিমান উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল এবং তৎসহিত সুমিত্রাও হাসিতে লাগিল।

বিমানবিহারী হাসিতে হাসিতে কহিল, "ও রকম করে' আমি যদি জিজ্ঞাসা করি তা হলে তোমরাও আমাদের মত উত্তর দাও।"

সুরমা স্মিতমুখে কহিল, "আচ্ছা একটা জিজ্ঞাসা করই না, দেখ কি রকম উত্তর দিই।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিমান কহিল, "আচ্ছা বল ত সুরেশ্বর-বাবুর জামার হাত বোতাম-আঁটা ছিল, না ঢিলা ছিল?"

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সুরমা কহিল, "ঢিলা ছিল।"

"আচ্ছা পায়ে জুতা শ্‌ ছিল, না স্লীপার ছিল ?"

এবারও অবিলম্বে সুরমা কহিল, "শ্‌ও ছিল না, স্লীপারও ছিল না; শুঁড়ওয়ালা দেশী নাগ্‌রা জুতো ছিল।"

সুরমার বিষয়ে হতাশ হইয়া বিমান সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা সুরেশ্বর-বাবুর পরণে ধুতি ছিল না থান ছিল বল দেখি ?"

সুমিত্রা স্মিতমুখে কহিল, "ধুতি ছিল, সরু লাল পাড়। বলুন ঠিক হয়েছে কি না ?"

বিমান বিরসমুখে কহিল, "তা আমি বল্‌তে পারিনে; যদি চালাকি করে' বানিয়ে বলে' না থাক তা হলে ঠিক হয়েছে।"

সুরমা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কি দুঃখের কথা ঠাকুরপো! ঠিক হ'ল কি না তাও বোঝ্‌বার উপায় তোমার নেই ?"

আজ প্রাতঃকালে দিবালোকে সুরেশ্বরের মুখমণ্ডলে একটা জিনিষ বিমান বহুবার লক্ষ্য করিয়াছিল. যাহা তখনও স্পষ্টভাবে তাহার স্মরণ ছিল। রাত্রির অনুজ্জ্বল আলোকে সুমিত্রা কখনই তাহা লক্ষ্য করে নাই, মনে মনে আশা করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বল ত সুরেশ্বর-বাবুর মুখের মধ্যে কালো দাগ কোথাও আছে কি না ?"

বিস্ময়-চিন্তিত মুখে সুমিত্রা কহিল, "কালো দাগ ? কই কালো দাগ কিছু ত মনে পড়ে না।" তৎপরক্ষণেই উৎফুল্ল নেত্রে কহিল, "সুরেশ্বর-বাবুর কানের পাটায় একটা বড় কালো তিল আছে—আপনি তারই কথা বল্‌ছেন কি ?"

তাহারই কথা যে বিমানবিহারী বলিতেছিল তদ্বিষয়ে অস্বীকার করিবার কোনো উপায় ছিল না। একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে—কোন্‌ কর্ণে—দক্ষিণে না বামে; কিন্তু গুরুতর পরাজয়ের আশঙ্কায় নিরস্ত হইল।

সুরমা পুলকিতমুখে কহিল, "কি ? ঠাকুরপোর মুখে যে আর কথাটি নেই ? আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে না কি ?"

বিমানবিহারী হাসিয়া কহিল, "যথেষ্ট হয়েছে, আর না; সুরেশ্বর-বাবুর জামার বোতামে কটা ফুটো ছিল, জিজ্ঞাসা করলে, তাও বোধ হয় তোমরা বলে' দিতে পার!"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া সুরমা ও সুমিত্রা হাসিতে লাগিল।

শ্যামবাজার হইতে প্রমদাচরণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ড্রয়িংরুমে সকলে মিলিত হইয়া পুনরায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। বিমানবিহারী নিয়মিত প্রতি সন্ধ্যায় এই পারিবারিক সম্মিলনে আসিয়া যোগ দিত। কোনো কারণে কোনো দিন উপস্থিত হইতে না পারিলে পরদিন জয়ন্তী চিঠি লিখাইয়া বা লোক পাঠাইয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইতেন। প্রথমতঃ জামাতার সহোদর; দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যৎ জামাতা; এবং তৃতীয়তঃ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট; এই তিনটি প্রবল অধিকারের শক্তিতে এই সম্মিলনের সকলের নিকট হইতেই, বিশেষতঃ জয়ন্তীর নিকট হইতে, বিমানবিহারী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সম্মান এবং মনোযোগ অর্জ্জন করিত। কতকটা এই পরিবারের নবতান্ত্রিকতার গুণে এবং কতকটা বিমানবিহারীর ক্রমবর্দ্ধিত পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতার প্রশ্রয়ে বিবাহের কল্পনা ও কথা সত্ত্বেও সে সকলের সমক্ষেই অনেকটা অসঙ্কোচে সুমিত্রার সহিত মিশিত; এবং সুমিত্রাও, পাছে সঙ্কোচের দ্বারা সঙ্কোচ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে এই আশঙ্কায়, যথাসাধ্য সঙ্কোচ পরিহার করিয়াই চলিত।

রাত্রে আহার সমাপন করিয়া বিমান যখন প্রস্থানোদ্যত হইল, তখন সুমিত্রা তাহাকে বলিল, "যদি অসুবিধা না হয়, কালও একবার সুরেশ্বর-বাবুর হাতের খবরটা নেবেন।"

বিমান প্রতিশ্রুত হইল সংবাদ লইবে। কিন্তু পরদিন প্রাতে চা পান করিয়া সুরেশ্বরের গৃহে যাইবার জন্য বাহির হইবে এমন সময়ে সুরেশ্বরই তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুরেশ্বরকে দেখিয়া বিমান সানন্দে বলিল, "বাঃ, বাসনাগুলো যদি এমনি পায়ে হেঁটে দোরে এসে উপস্থিত হয় ত মন্দ হয় না! আমি ত আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম!"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "বিলক্ষণ! আমিই ত আপনার কাছে ঋণী রয়েছি: কাল দয়া করে' গিয়েছিলেন, তার পাল্টা শোধ দিতে এলাম।"

বিমান প্রত্যুত্তরে হাসিয়া কহিল, "তা হচ্ছে না! আমাদের চল্‌তি কার্‌বার এখন থেকে বরাবর চল্‌বে। দেনা-পাওনা চুকিয়ে হিসাব বন্ধ কর্‌লে চল্‌বে না।"

সুরেশ্বর একটু ইতস্ততঃ করিয়া স্মিতমুখে কহিল, "কার্‌বার চলতি রাখ্‌তে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু দেউলের সঙ্গে কার্‌বার চালাতে গিয়ে দেখ্‌বেন যেন লোক্‌সান করে' বস্‌বেন না।"

শুনিয়া বিমানবিহারী হাসিয়া কহিল, "লোক্‌সানের ভয় কর্‌তে গেলে লাভের সম্ভাবনা থাকে না। তা ছাড়া লাভ-লোকসানের ভেদ নির্ণয় করাও সহজ নয়। কিন্তু সে কথা পরে হবে। আপনার হাতের অবস্থা কেমন বলুন?"

হাতের অবস্থা ভালই ছিল; সংক্ষেপে সে কথা শেষ করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "যদি অসুবিধা না হয়, ত চলুন প্রমদা-বাবুর ঋণটাও শোধ করে' আসি। তিনি কাল বিকেলে আমাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন।"

বিমান হাসিয়া কহিল, "চলুন; কিন্তু সেখানেও কার্‌বার বন্ধ হবে না; সেখানে আপনার অনেকগুলি খাতক। প্রমদা-বাবু আপনার ঋণ শোধ কর্‌তে যান নি, সুদ দিতে গিয়েছিলেন।" বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সিনেমা-শিল্পে লোক-শিক্ষা

(১)

জার্ম্মানির সিনেমা (কিনো) থিয়েটারগুলায় আজ-কাল অতি উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ফিল্‌ম্ দেখানো হইতেছে। ভিয়েনার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ষ্টাইনাক্ মানুষের যৌবন বাড়াইয়া দিবার এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। বহুদিন হইতে তাঁহার ল্যাবরেটারিতে এইদিকে পরীক্ষা চলিতেছিল। এই পরীক্ষাগুলা আলোক-চিত্রের সাহায্যে জনসাধারণের গোচর করা হইতেছে।

অস্ত্রচিকিৎসা, শরীরবিদ্যা, অস্থিতত্ত্ব এবং পশুবিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্র যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরীক্ষাগৃহের ভিতরকার জটিলতাগুলা বেশ বিশেষরূপেই অবগত আছেন। সেইগুলার ছবি তোলা এবং ছবি তুলিয়া নাটকের আকারে প্রচার করা যার-পর-নাই বাহাদুরির কথা সন্দেহ নাই।

ষ্টাইনাকের যৌবন-বৃদ্ধি-প্রণালী দেখিতে আসিয়া জার্ম্মান্ নরনারীরা জীবজন্তুর জীবন গঠনরীতি সহজেই বুঝিতে পারিতেছে। বুড়া পশুগুলাকে নেহাৎ অকর্ম্মণ্য অবস্থা হইতে কেমন করিয়া চাঙ্গা করিয়া তোলা হইয়াছে তাহার সচিত্র বিবরণ অতি সরলভাবে বুঝানো হইতেছে। কয়েকজন মানুষও ষ্টাইনাকের অস্ত্রচিকিৎসার প্রভাবে সুফল লাভ করিয়াছে। বৃদ্ধাবস্থায় তাহারা কিরূপে আবার যৌবনের শক্তি ও স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে ফিরিয়া পাইয়াছে তাহাও ফিল্‌মের দৃশ্যাবলীতে "অভিনীত" হইতেছে।

ফিল্‌ম্-শিল্পের আলোকচিত্রের সাহায্যে এতদিন জগতের সর্ব্বত্র নানাদেশের প্রাকৃতিক ভৌগোলিক এবং সামাজিক দৃশ্য দেখানো হইতেছিল। জনসাধারণের ভিতর শিক্ষা প্রচারের কাজে সিনেমা-থিয়েটার অনেক সাহায্য করিয়াছে। এক্ষণে উচ্চতম এবং দুরূহতম বিজ্ঞানের অনুসন্ধানগুলাও "রাস্তার লোকের" সেবায় লাগিতে চলিল। অধিকন্তু ইস্কুল-কলেজের ল্যাবরেটারিতে যে-সকল ছাত্র ছাত্রী বিজ্ঞান শিখিতেছে, তাহাদের পক্ষে সিনেমার চিত্রগুলা পরম সুহৃৎ বিবেচিত হইবে।

(২)

রাইন্-জনপদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ একে একে জার্ম্মান্দের হাতছাড়া হইতেছে। রুর অঞ্চল জার্ম্মান্‌রা ফিরাইয়া পাইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এ দিকে সম্প্রতি আবার দক্ষিণ রাইনের উপরকার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ

শিল্প-নগর এবং বাণিজ্য-কেন্দ্র মান্‌হাইম্ ইত্যাদি শহরও বিজেতাদের দখলে আসিল।

কাজেই জার্ম্মান্-সমাজে রাইন-প্রেম জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সিনেমা-শিল্পের সাহায্যে আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে সেই আগুন আরও জ্বালাইয়া তোলা হইতেছে। আলোক-চিত্রে জার্ম্মান্‌রা জার্ম্মানীর পুরাণা ইতিহাস দেখিতেছে। রোমান সাম্রাজ্যের যুগে জার্ম্মান্‌রা কোথায় কিরূপ ভাবে বাস করিতেছিল তাহার চিত্রও প্রদত্ত হইতেছে। তাহার পর যুগে যুগে রাইন-দরিয়ার আশে পাশে জার্ম্মান্ ও বিদেশী সভ্যতার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। সেই সংঘর্ষগুলাও দেখানো হইতেছে।

গে'টের সমসাময়িক বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক আর্ন্‌ড্‌ট্ শিখাইয়া গিয়াছিলেন—"রাইন্ জার্ম্মানির একটা সীমানামাত্র নয়। এই দরিয়া জার্ম্মান সভ্যতার এক নাড়ী বিশেষ। ইহার দুইধারকার সুদূর-বিস্তৃত জনপদগুলি সবই জার্ম্মান জাতির জীবন-কেন্দ্র।" এই-সকল দৃশ্য দেখাইবার সময় স্বদেশী গান গাওয়া হইতেছে।

রাইন্-ফিল্‌মে ঐতিহাসিক তথ্যই একমাত্র দৃশ্য বস্তু নয়। আল্‌প্‌স্ পাহাড়ে রাইনের উৎপত্তি, পরে জার্ম্মানিতে পতন এবং হল্যাণ্ডে মোহনা ইত্যাদি ভূগোল এবং ভূতত্ত্বের অনেক কথাই আলোকচিত্রে আলোচিত হইতেছে। অধিকন্তু রাইনের উপরকার প্রত্যেক শহরের ফ্যাক্টরি, বন্দর, শিল্পসম্পদ্, বিদ্যাগৌরব সবই চক্ষুগোচর হইতেছে। স্বদেশপ্রীতি জাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা-শিল্পীরা জনগণের জ্ঞানের সীমানা বাড়াইয়া দিতেছেন।

(৩)

কিনো-থিয়েটারগুলায় একসঙ্গে বহুবিধ সুকুমার শিল্পের সমাবেশ দরকার। ভেনীস্ শহরের ইহুদি শাইলকের গল্প সিনেমায় দেখাইবার জন্য এক জার্ম্মান্-ফিল্‌ম্ কোম্পানী আয়োজন করিতেছে।

শাইলক সম্বন্ধে ইতালীতে, ফ্রান্সে এবং ইংল্যাণ্ডে যে-সমুদয় কাহিনী অথবা নাটক আছে সেইগুলা হইতে মিলাইয়া মিশাইয়া একটা নাটক খাড়া করিবার জন্য কবি ও নাট্যকার বাহাল হইয়াছেন। এই গেল সাহিত্য-শিল্পের কাণ্ড।

পরে এই নাটকটাকে থিয়েটারে অভিনয় করা হইবে। তাহার জন্য একটা রঙ্গমঞ্চ দরকার। সেই রঙ্গমঞ্চে নট-নটীরা যথারীতি পালাটা অভিনয় করিবে। বলা বাহুল্য এ এক দস্তুর-মতন নাট্য-শিল্পের ফরমায়েস। অবশ্য অন্যান্য নাটকের মতন এই নাটক জনসাধারণের সম্মুখে অভিনীত হইবে না। নাটকের দৃশ্যের পর দৃশ্যগুলার ফটোগ্রাফ তোলার জন্যই এই নাটকের ব্যবস্থা হইবে। নাটক এ ক্ষেত্রে সিনেমা-শিল্পের মশালা বিশেষ।

বুঝা যাইতেছে, ফটোগ্রাফী-শিল্পটাই ফিল্‌ম্-নাট্যের অতি প্রধান শিল্প। যে-সকল যন্ত্রের সাহায্যে আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হয় সেই যন্ত্রসমূহ তৈয়ারী করিবার কারখানাগুলার কথাও এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে। নামজাদা ক্রুপ্ কোম্পানী ড্রেস্‌ডেন্ শহরে সেই-সকল যন্ত্র তৈয়ারি করিবার বিরাট্ ফ্যাক্টরি কায়েম করিয়াছে। জার্ম্মানির অনেক স্থানেই সিনেমা-সংক্রান্ত যন্ত্রাদি তৈয়ারি হইয়া থাকে।

শাইলকের কাহিনীর জন্য ইতালীয় আব্‌হাওয়া দরকার। ফিল্‌ম্ কোম্পানীর ফটোগ্রাফারগণ ভেনীস ইত্যাদি শহরের নানা দৃশ্য ফটোতে তুলিবার জন্য মোতায়েন আছে। অনেক সময়ে দূর বিদেশের অথবা দূর অতীতকালের ঘরবাড়ী রাস্তাঘাটগুলা বার্লিনেই তৈয়ারি করিয়া লওয়া হয়। এইজন্য ইতিহাস এবং ভূগোলবিদ্যার পণ্ডিতগণের সাহায্য লইয়া বাস্তু-শিল্পী ইঞ্জিনিয়াররা ইমারত পথ শড়ক প্রস্তুত করিয়া দেন। ভিন্ন ভিন্ন কাহিনীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শহর এবং ভিন্ন ভিন্ন আবেষ্টন গড়িয়া তোলা হয়। সেইগুলার ফটো তোলা হইয়া গেলে পর ভাঙিয়া ফেলা হইয়া থাকে।

(৪)

এতগুলা শিল্পের একত্র সমবায়ে কিনো-থিয়েটারের সৌষ্ঠব সাধিত হইতেছে। ভারতবর্ষের সিনেমায় "স্বরাজ" কায়েম করিতে হইলে এই ধরণের বহুবিধ

বিজ্ঞানে এবং সুকুমার শিল্পে বহুসংখ্যক ওস্তাদ নরনারীর দেখা পাওয়া চাই। বুঝিয়া রাখা উচিত যে, ভারতে আজকাল যে-সমুদয় আলোক-চিত্রের থিয়েটার চলিতেছে তাহাতে ভারতীয় নরনারীর অকর্ম্মণ্যতা এবং শিল্পকর্ম্মে দেউলিয়া অবস্থা প্রমাণিত হইতেছে।

প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও হয়ত গোটা ভারতের নটনটী, চিত্রকর, ফটোগ্রাফার, বাস্তুশিল্পী, এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিক একটা খাঁটি "স্বদেশী" সিনেমা জগতে হাজির করিতে পারিবেন না। ভারতে যাঁহারা স্বরাজ প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, তাঁহারা জাতীয় শিক্ষার সহায় স্বরূপ এই কিনো-শিল্পকে স্বদেশী করিয়া তুলিতে চেষ্টিত হইবেন কবে?

বোধ হয় অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু একটা সোজা কথা এখনও আমাদের দেশের লোকের মাথায় বসিতেছে না কেন? শুনিতেছি, ভারতের নানা শহরে পার্শী মহাজনদের তাঁবে কতকগুলা কিনো-থিয়েটার চলিতেছে। লোকও নাকি হয় খুব বেশী। হইবারই কথা। কিন্তু আলোকচিত্রের পরদায় যে-সকল কথা লেখা থাকে সেগুলা মারাঠা, গুজরাতী, বাঙ্গালী, যুক্তপ্রদেশবাসীরা পাঠ করে ইংরেজিতে! ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে বিদেশী বয়কটের অ আ ক খ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে এখনও সুরু হয় নাই।

(৫)

কিনো-শিল্পের ব্যবসায়ীরা জার্ম্মানিতে এক নয়া আন্দোলন সুরু করিয়াছে। প্রাচীন এবং আধুনিক জার্ম্মান্-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ নাটকগুলা ফিল্‌মে দেখানো হইতেছে। এই উপায়ে জার্ম্মানির সাহিত্যবীরগণের সকল রচনাই আলোক-চিত্রের অভিনয়ে দেখিতে পাওয়া যাইবে। "আল্‌ট্ হায়ডেলবার্গ" নামক যুবক-জার্ম্মানির প্রিয় নাটক ইতিমধ্যে ফিল্‌মে স্থান পাইয়াছে। শিলারের "ভেল্‌হেল্‌মটেন্"কে ফিল্‌ম্ করিবার জন্য ওস্তাদ্‌রা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। স্বয়ং শিলারের জীবন-কাহিনীও ফিল্‌মে দেখা দিয়াছে। ইহাতে কবিবরের যৌবন-কথাই চিত্রিত হইতেছে।

এই লাইনের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ কিনো-নাটকের নাম 'নাথান্ ডার্ হ্বাইজে' (অর্থাৎ "মহাত্মা নাথান")। নাট্যকারের নাম লেস্‌সিঙ্। জর্ম্মান নাট্য-সাহিত্যের প্রপিতামহ স্বরূপ লেস্‌সিঙ জার্ম্মানিতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

"নাথান" নাটকে লেস্‌সিঙ্ রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কলম ধরিয়াছিলেন। ইহুদি নাথান্‌কে জ্ঞানী এবং ধর্ম্মসমন্বয়-সাধকরূপে দেখানো হইয়াছে। মুসলমান (তুর্ক্) সুল্‌তানকেও নাট্যকার পরধর্ম্মসহিষ্ণু করিয়া আঁকিয়াছেন। জেরুজেলেমের এক লঙ্কাকাণ্ড এই নাটকের ঐতিহাসিক ভিত্তি।

সিনেমা-শিল্পের ওস্তাদেরা দৃশ্যগুলাকে যার-পর-নাই চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছেন। দেড়শ বৎসর পূর্ব্বেকার রচিত মধ্যযুগ সম্বন্ধীয় এই নাটকটা বিংশ শতাব্দীর নয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে এক অপূর্ব্ব নবজীবন লাভ করিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্ম্মান্‌রা সাহিত্য ও শিল্পের সকল বিভাগেই ফরাসী-সভ্যতার গোলামী করিতেছিল। তখন ইয়োরোপে চলিতেছিল হ্বল্‌টেআরের যুগ। সেই গোলামীর বিরুদ্ধে যে-কয়জন শিল্পী প্রতিবাদ সুরু করেন তাঁহাদের মধ্যে লেস্‌সিঙ্ অন্যতম এবং সর্ব্বপ্রধান। যুবক-জার্ম্মানির প্রাণপ্রতিষ্ঠায় এবং জার্ম্মান্ স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাতে লেস্‌সিঙের সাহিত্যসেবা সকল যুগেই স্মরণীয় বস্তু।

লেস্‌সিঙ্ জার্ম্মানজাতিকে "ঘর-মুখো" করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে জার্ম্মান্ রোমান্টিকতার এবং স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার যে শক্তি শিলারে মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছিল সেই শক্তির মূল ফোয়ারা ছিল লেস্‌সিঙ, সমগ্র লেস্‌সিঙ সাহিত্য। এক হিসাবে লেসসিঙকে জার্ম্মানির রামমোহন রায় বলা যাইতে পারে। জার্ম্মান-সমালোচনায় শিলার স্বাধীনতার যীশুখৃষ্ট, আর লেস্‌সিঙ্ যীশুর অগ্রদূত সেইন্ট জন।

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(৪৩)

বাণিজ্য-সংক্রান্ত পুস্তক

বাণিজ্য-সংক্রান্ত কি কি উত্তম পুস্তক বাজারে চলিত আছে? কোন্ কোন্ পুস্তকে কাঁচা মালের সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বিদেশী বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন পুস্তক আছে কি না?

জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(৪৪)

দেবীগণের প্রতিকৃতি

দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, প্রভৃতি দেবদেবীগণের প্রতিকৃতি সর্ব্বপ্রথম কাহার দ্বারা এবং কবে প্রচারিত হয়?

শ্রী নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৪৫)

মৌমাছি পালন

মৌমাছি পালন শিক্ষা করিবার কোন বাংলা বই আছে কি না, যদি থাকে তবে কোথায় পাওয়া যায় এবং দাম কত?

শ্রী রমণীমোহন কর

(৪৬)

বিবাহিতা কন্যার বাড়ী অন্নগ্রহণ

বিবাহিতা মেয়ের বাড়ীতে সুসন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত পিতা আহার করে না—এরূপ একটা প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ইহার কারণ কি?

শ্রী ধীরেন্দ্রশঙ্কর দত্ত

(৪৭)

রাত্রে কেশবিন্যাস

রাত্রে চুল আঁচড়ান নিষেধ কেন?

শ্রী অমিয়া ঘোষ

(৪৮)

ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও রাজর্ষি জনক

বৃহদারণ্যকের ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও রামায়ণের রাজর্ষি জনক কি অভিন্ন ব্যক্তি?

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(৪৯)

রুদ্রাক্ষ ও তাম্রমুদ্রা

একটি তাম্রমুদ্রার উপর একটি রুদ্রাক্ষ রাখিয়া তাহার উপর অন্য একটি তাম্রমুদ্রা ধরিলে রুদ্রাক্ষটি ঘুরিতে থাকে। ইহার কারণ কি?

শ্রী সুকুমার মিত্র

(৫০)

চীন ও জাপানে ভারতীয় সঙ্গীত

চীন ও জাপানে ভারতীয় সঙ্গীত কোন্ সময় কাহার দ্বারা প্রথম প্রচারিত হয়? ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর আবিষ্কর্ত্তা কে এবং তিনি কোন্ সময়ের লোক?

শ্রী নরেন্দ্রচন্দ্র ভদ্র

(৫১)

শিরিশ আঠা

শিং হইতে কি উপায়ে শিরিশ আঠা তৈয়ার করা যায়। ভারতবর্ষের কোথায় ইহা তৈয়ার হয়?

শ্রী সুরেশচন্দ্র বসু

(৫২)

জন্ম ও মৃত্যু অশৌচ

বংশে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু হইলে, হিন্দুগণ (ক্ষৌরকর্ম্ম না করিয়া, নূতন বস্ত্র পরিধানাদি না করিয়া) অশৌচ পালন করেন কেন? অশৌচান্ত দিবসেই বা ক্ষৌরকর্ম্মাদি করিবার রহস্য কি? আর ব্রাহ্মণাদি বর্ণ অনুসারে অশৌচ-পালন-কালের বিভিন্নতা কেন?

শ্রী অপর্ণাচরণ সোম

(৫৩)

বাংলাভাষায় নাস্তিক্যবাদের গ্রন্থ

বাংলা ভাষায় নাস্তিক্যবাদের কোন গ্রন্থ আছে কি? যদি থাকে কোথায় পাওয়া যায়?

মোহাম্মদ মনসুর উদ্দিন শাহজাদপুরী

(৫৪)

তাজমহল নির্ম্মাণ

আগ্রার বিখ্যাত তাজমহল নির্ম্মাণের ব্যয় সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক যদুনাথ-বাবুর মতে—তাজের নির্ম্মাণ-ব্যয় মোট ৫০ লক্ষ টাকা। দেওয়ান-ই-আফ্রিদি গ্রন্থে দেখা যায় ৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। আবার ম্যানডাস্‌ন সাহেবের মতে তাজ নির্ম্মাণ করিতে মোট ৪ কোটি ১১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮২৬।৶৬ পাই ব্যয় হইয়াছিল। এই তিন প্রকার মতের মধ্যে কোন্ মতটি সত্য?

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(৫৫)

নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির বাংলা পরিভাষা কি?

(ক) I rise to a point of order.
(খ) I rule you out of order.
(গ) I am in the possession of the House.
(ঘ) I press for division.
(ঙ) Ex-officio.
(চ) Secretary, Joint Secretary.
(ছ) President, Chairman.
(জ) Executive Committee, Cabinet.
(ঝ) Vote.
(ঞ) Whip.
(ট) Debate Meeting.
(ঠ) Mover.
(ড) Opposer.
(ঢ) To Second, to Support, to Amend a Resolution,
(ণ) Motion, Resolution, Bill, Act.

আব্দুল মোনেম চৌধুরী

(৫৬)

দালানে বটের চারা

পাকা বাড়ীর দেওয়ালে ও আলিসার পাশে যে বটের চারা জন্মায় তাহার সমস্ত শিকড় যদি তুলিয়া ফেলা অসম্ভব ও ব্যয়সাপেক্ষ হয় তবে ঐ গাছ বিনষ্ট করিবার উপায় কি? এমন কোন জিনিস আছে কি যাহা দ্বারা ঐ গাছ বিনষ্ট করা যায়?

শ্রী তারাপদ বিশ্বাস

(৫৭)

মেঘের রং

মেঘের স্বাভাবিক রং কি? সময় সময় ইহা লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি রঙে রঞ্জিত হয়। তাহার তাৎপর্য্য কি? এবং ইহার প্রমাণ কোন শাস্ত্রে আছে কি?

শ্রী পঞ্চানন দাস

(৫৮)

লক্ষ্মী ও কার্ত্তিককে প্রণাম

লক্ষ্মী ও কার্ত্তিককে প্রণাম করিতে নাই কেন?

শ্রী কিরণময় চৌধুরী

(৫৯)

বাতাবী লেবু সুমিষ্ট ও সরস করিবার উপায়

বাতাবী লেবু গাছের ফল 'কাপাসে' (রসহীন বা অল্পরসাল) কিম্বা তিক্ত বা অম্ল-রস-প্রধান হইলে, তাহার প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি না? ফল খুব সরস ও সুমিষ্ট করিবার উপায় কি?

শ্রী সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(৬০)

পশ্চিম বঙ্গে দুর্গা প্রতিমা

পশ্চিম বঙ্গে দুর্গাপ্রতিমার বামদিকে কার্ত্তিকের এবং দক্ষিণে গণেশ-মূর্ত্তি গঠিত হয়, তাহা শাস্ত্রসম্মত, না পূর্ব্ববঙ্গে যে দুর্গাপ্রতিমার বাম-পার্শ্বে বিদ্যাদেবীর পার্শ্বে গণেশ এবং দক্ষিণে ধনদেবীর পার্শ্বে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকের স্থান, তাহা শাস্ত্রসম্মত?

শ্রী মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(৬১)

কানে আঙুল দিলে শব্দ

আঙুল দিয়া কান বন্ধ করিলে একটা শব্দ হয় কেন, তাহা লইয়া ত কিছুদিন বেতালের বৈঠকে আলোচনা হইতেছে। যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদিগকে ইহারই একটা আনুষঙ্গিক বিষয়ের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করি। কানের কাছে একটা বড় শামুক অথবা একটা শাঁক ধরিলে সোঁ সোঁ শব্দ শুনা যায় কেন?

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(৬২)

হিন্দু বিবাহাদিতে হলুদ

হিন্দু বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে গায়ে হলুদ মাখান হয় কেন? ইহার উপকারিতা কি? কতদিন হইতে এই প্রথা ভারতে প্রচলিত?

শ্রী রমেশচন্দ্র রায়

(৬৩)

৺ কাশীর পোড়ামাটীর জিনিস

৺ কাশীর পোড়ামাটীর জিনিস কিনিয়া অন্যদেশে নিতে নাই কেন?

শ্রী সুহাসিনী দেবী

—

মীমাংসা

(৪)

বারভূঞা সাঁতৈরের ইতিবৃত্ত

বাঙ্গালা ও বেহারের নবাব সম্‌সুদ্দীন ৭৪৬ হিজরীতে দিল্লির সম্রাটের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া "শাহ" উপাধি গ্রহণ করেন। এবং "গৌড়বাদশাহ" নামে খ্যাত হন। সে সময়ে সাঁতৈর রাজ্যের স্থাপয়িতা দামনাশের শিখাই (শিখিবাহন) সান্যাল তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। সে সময়ে সেনাপতিদিগের "খাঁ" উপাধি হইত। শিখাই সান্যালেরও "খাঁ" উপাধি হইয়াছিল; কিন্তু তিনি বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের শ্রেষ্ঠ

কুলীন এবং কুলপতি ছিলেন ; তজ্জন্য তাঁহার কুলাভিমান বড় বেশী ছিল। তাঁহার এই কুলাভিমানই তাঁহাকে "খাঁ" উপাধি ব্যবহার করিতে দেয় নাই ; এবং তিনি ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক রাজা উপাধিও ব্যবহার করেন নাই ; সান্যাল উপাধিই ব্যবহার করিতেন।

তাজনীর ভাদুড়ী বংশের সুবুদ্ধি ভাদুড়ী প্রভৃতি তিন ভ্রাতা এবং শিখাই সান্যালের সহায়তায় নবাব সমসুদ্দীন স্বাধীন হইয়া গৌড়-বাদ্‌শাহ্ হওয়াতে ভাদুড়ীদিগকে এবং শিখাই সান্যালকে পদ্মানদীর উত্তরস্থ চলন-বিলের উত্তরে এবং দক্ষিণে ১ লক্ষ টাকা করিয়া মুনাফার দুইটি বৃহৎ জায়গীর প্রদান করেন। ভাদুড়ীদিগের জ্যেষ্ঠ সুবুদ্ধি খাঁ রাজা হইয়া চলন-বিলের উত্তরে রাজধানী স্থাপন করেন। এবং শিখাই সান্যালের বাসস্থান ছিল চলন-বিলের দক্ষিণাংশে সাঁতৈর গ্রামে। চলন-বিল উত্তর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সাঁতৈরের পূর্ব্বনাম ছিল "সান্যালনগর।" এই "সান্যালনগর"ই "সাঁতোর" এবং পরে "সাঁতৈর" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। শিখাই সান্যাল "রাজা" উপাধি ব্যবহার না করিলেও তাঁহাকেই "সাঁতৈরের" আদি রাজা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার প্রথম পুত্রই "সাঁতৈরের" প্রথম রাজা।

শিখাই সান্যালের তিন পুত্র। প্রথম বলাই "সাঁতৈরে" রাজা হন। দ্বিতীয় কানাইলাল কুলপতি। তৃতীয় সত্যবান্ বা প্রিয়দেব ফৌজদার ছিলেন। সেই সত্যবানের পুত্র রাজা কংসরাম গৌড়-বাদ্‌শাহ্ সমসুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র ময়েজউদ্দীনের অভিভাবক হইয়া রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। তখন ইঁহাকে লোকে "গৌড়-বাদ্‌শাহ্" বলিত। এই কংসরামের পুত্র জনার্দ্দন একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। গৌড়-বাদ্‌শাহদের পক্ষ হইতে ব্রহ্মদেশের মগরাজাকে পরাজয় করিয়া ইনি "বজ্রবাহু" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ময়েজউদ্দীন সাবালক হইলেও রাজা কংসরাম তাঁহার অভিভাবকত্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার হাতে রাজ্যভার ছাড়িয়া না দেওয়াতে ময়েজ-উদ্দীন রাজা কংসরামকে গুপ্তভাবে হত্যা করেন। তৎকালে রাজা কংসরামের পুত্র জনার্দ্দন বজ্রবাহু পাটনায় নবাব ছিলেন। তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত ময়েজউদ্দিনকে আক্রমণ করেন। ময়েজউদ্দিন পরাজিত হইয়া কূটবুদ্ধি মধুখাঁর শরণাপন্ন হইলে মধুখাঁ যুদ্ধে জনার্দ্দনকে পরাজয় করা অসাধ্য দেখিয়া সন্ধির জন্য একদিকে যুদ্ধ স্থগিত করিতে এবং অপর দিকে জনার্দ্দনের মনে তাঁহার সেনাদিগের প্রতি অবিশ্বাস উৎপাদন জন্য সেনাগণ বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে এরূপ ভাবের পত্র জনার্দ্দনের হস্তগত করাতে, জনার্দ্দন তাহাতে বিশ্বাস করিয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া ৩০০ বিশ্বাসী অনুরক্ত সেনা সহ আরাকানে প্রস্থান করেন। মগরাজ মৌসং তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া আপন কন্যা তুপপার সহিত বিবাহ দেন। এই মগরাজের সহায়তায় জনার্দ্দন বজ্রবাহু সিংহাসন জয় করিয়া তথায় রাজত্ব করেন। এই জনার্দ্দন বজ্রবাহুই সিংহলবিজয়ী বাঙ্গালী বীর অধুনা "বিজয় সিংহ" নামে খ্যাত (?)।

ময়েজউদ্দীন রাজা কংসরামকে হত্যা করিয়া "সাঁতৈর"-রাজের খাঁ উপাধি এবং জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া জায়গীরের ১৪ সহস্র টাকা কর ধার্য্য করেন। তদবধি সাঁতৈর "বারভূঁইয়া" শ্রেণীভুক্ত হয়। কিন্তু তখনও সাঁতৈরের অধিপতির রাজা উপাধি ছিল না। সাঁতৈরের শেষ রাজা রামকৃষ্ণ সান্যাল। ইনি অত্যন্ত মাতাল এবং বিলাসী ছিলেন। ইঁহা হইতেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পাঁচুরিয়া অবসাদ এবং ভবানীপুরিয়া পটী সৃষ্টি হয়।

সাঁতৈরের রাজা রামকৃষ্ণ সান্যালের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী রাণী সর্ব্বাণী ক্রমে সূর্য্যকান্ত ও তাঁহার মৃত্যুর পর চন্দ্রকান্তকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। নিঃসন্তান দুইজন দুই পত্নী রাখিয়া লোকান্তরিত হইলে রাণী সর্ব্বাণীই সাঁতৈর রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার লোকান্তরের পর নাটোরের প্রথম রাজা রামজীবন সাঁতৈর রাজ্য ওয়ারিসবিহীন মনে করিয়া নায়েব-নাজীম শাহ্‌জাদার নিকট ঐ রাজ্য প্রার্থনা করিলে তিনি নাটোরের রাজাকে ঐ রাজ্য প্রদান করেন। নাটোর-রাজ তাঁহার সহায়তায় সাঁতৈর রাজ্য আক্রমণ ও দমন করিয়া আনিতে পারিলেন রাজা রামকৃষ্ণের দত্তক রাজা চন্দ্রকান্তের পত্নী সত্যবতী ওয়ারিস জীবিত আছেন। রাণী সত্যবতী দত্তক রাখিতে পারিবেন না এই নিয়মে তাঁহাকে সাঁতৈর নগর এবং বার্ষিক ১২ সহস্র টাকা বৃত্তি প্রদান করিয়া সাঁতৈর রাজ্যের অবশিষ্ট স্বরাজ্য-ভুক্ত করিয়া লন। নাটোররাজ রামজীবনই সাঁতৈর রাজ্য ধ্বংসের কারণ। সে সময় ঔরঙ্গজীব দিল্লীর সম্রাট্ এবং তাঁহার পৌত্র শাহ্‌জাদা আজিম-ওস্‌সান বাঙ্গালা ও বেহারের নবাব ছিলেন।

রাজা মহম্মদ কর্ত্তৃক সাঁতৈর লুণ্ঠন হওয়া এবং কোন সামন্ত রাজা থাকা জানা যায় না।

গৌড়-বাদ্‌শাহের সেনার রসদ জোগাইয়া পুটিয়ার ঠাকুর কমলাকান্ত বাগ্‌ছি লস্করপুর নামক পরগণা চাকরাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর রাজা রামচন্দ্র রায় অত্যন্ত মদ্যপ এবং লম্পট ছিলেন, তিনি এবং তাঁহার বন্ধু সাঁতৈরের রাজা রামকৃষ্ণ সান্যাল মধু রায়, ভাকু রায় এবং অরবিন্দ রায় সুরাপানে মত্ত হইয়া কালীপূজাতে মহিষের পরিবর্ত্তে গরু বলি দিয়াছিলেন। তজ্জন্য পুরোহিত এবং রাজসভা তিরস্কার করায় ইঁহারা তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন। ইঁহারা পাঁচজন মাতাল হইয়া গোবধ, স্ত্রীহত্যা এবং ব্রহ্মহত্যা করাতে ইঁহাদের "পাঁচুরিয়া" অবসাদ হয়। এবং করতোয়ার তীরবর্ত্তী ভবানীপুর নামক পীঠস্থানে ঐ-সকল মহাপাতক অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইঁহারা ভবানীপুরিয়া "পটী" নামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণী বলিয়া পরিগণিত। সাঁতৈরের রাজা রামকৃষ্ণই গোবধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে "ধেনুয়া রামকৃষ্ণ" বলিত। (বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস দ্রষ্টব্য।)

আগমবাগীশ ও তদ্বংশধর রামতোষ তর্কালঙ্কারের বংশধর হরিপুরে থাকা ও যাদবানন্দ চৌধুরী সম্বন্ধে কোন কথা "বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাসে" পাওয়া গেল না।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

(৭)

শিবের গাজন

গাজন শিবের উৎসব। চৈত্র সংক্রান্তিতে বাণরাজ কর্ত্তৃক ইহা অনুষ্ঠিত হয়। সেই অবধি পর্ব্বরূপে অনেক স্থানে চলিয়া আসিতেছে। (১৩২৯ কার্ত্তিক মাসের মাহিষ্য-সমাজে প্রকাশিত "গম্ভীরাউৎসব" প্রবন্ধ অথবা পৌষ মাসের প্রবাসীর কষ্টিপাথর দ্রষ্টব্য।)

শ্রী কিরণময় চৌধুরী

(৮)

এলুমিনিয়ামের বাসন মেরামত ও বদল

এলুমিনিয়মের তৈজসাদি ফুটা হইয়া গেলে মেরামত করা যায় না। ভাঙ্গাফুটা বাসন দোকানে অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় বা নূতন তৈজসাদির সহিত বদল করিতে পারা যায়।

শ্রী ইলা রাণী

(১৩)

কপালকুণ্ডলার মন্দির

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলার" কালীমন্দির সম্বন্ধে প্রশ্নের এই মীমাংসা করা যাইতে পারে যে,—"কপালকুণ্ডলার" কালীমন্দির হিজলীর অরণ্যমধ্যে অবস্থিত, কাপালিক সমুদ্রতীরবাসী। "কপালকুণ্ডলা" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যখন নবকুমার ও

কপালকুণ্ডলা কাপালিকের নিকট হইতে পলাইয়া আসিয়া কালীমন্দিরে উপস্থিত হন তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, কপালকুণ্ডলা দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করাতে অধিকারী জাগরিত হন, তাঁহারা সন্ধ্যার পরই সমুদ্রতীর হইতে রওনা হইয়াছিলেন। সমুদ্রতীর হইতে বর্ত্তমান "বঙ্কিম-স্মৃতিস্তম্ভের" নিকটবর্ত্তী কালীমন্দির মাত্র ২।৩ মাইল, কপালকুণ্ডলা অরণ্যপথ বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন, সুতরাং এই দুই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে কপালকুণ্ডলার ন্যায় বন্যপথাভিজ্ঞার কখনও রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে পারে না। আরও এই মন্দির হইতে "মেদিনীপুর রাস্তা" অতি নিকটবর্ত্তী। "কপালকুণ্ডলা" গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যখন প্রত্যুষে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা বিবাহের পর স্বদেশে যাত্রা করেন, তখন অনেক বেলা হইলে মেদিনীপুরের পথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে প্রমাণিত হয় যে 'মেদিনীপুর রাস্তা' উক্ত মন্দির হইতে দূরে অবস্থিত। কিন্তু দারুয়া ময়দানস্থিত কালীমন্দির সমুদ্রতীর হইতে ৪।৫ মাইল দূরে, আর উক্ত দারুয়া ময়দানস্থিত মন্দির হইতে 'মেদিনীপুর রাস্তা' কিছু দূরে অবস্থিত। ইহা হইতে প্রতিপন্ন করা যায় যে দারুয়া ময়দানস্থিত কালীমন্দিরই "কপালকুণ্ডলার" উল্লিখিত কালীমন্দির।

(১৪)

পাবনার জোড় বাংলা

বৈশাখের "প্রবাসীতে" মোহম্মদ মনসুর উদ্দীন পাবনার জোড় বাংলা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর তিনি ১৩২১ সালের আশ্বিন মাসের "প্রবাসীর" ৭৮০;৭৮১ পৃষ্ঠায় শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিত "রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের ১৩১২-১৩১৯ বর্ষাষ্টকের বিবরণ" সমালোচনায় দেখিতে পাইবেন। তাহা হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"এই জোড় বাঙ্গলা সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, পাবনাবাসী ব্রজমোহন রায় ক্রোরী (ক্রোরপতি) নামক জনৈক ব্রাহ্মণসন্তান বাঙ্গলার নবাব সিরাজদ্দৌলার সময় এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীশ্রী ৺রাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।"

শ্রী রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(১৫)

শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্র সরযূপারী ব্রাহ্মণ

গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণগণের কুলপঞ্জিকাতে লিখিত আছে ভগবান্ রামচন্দ্র লঙ্কাধিপতি রাবণকে বধান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে অনেকেই রামচন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত জানিয়া অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যাঁহারা রামচন্দ্রকে ভক্তি করিতেন তাঁহারা সরযূ-নদীর তীরে অযোধ্যায় থাকিয়া যান, তাঁহারাই সরযূপারী ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হন। গৌড়-সম্রাট্ শশাঙ্কদেব গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ পীড়াগ্রস্ত হইলে সরযূতীর হইতে ১২ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই শশাঙ্কদেবের গ্রহশান্তি-যজ্ঞে গ্রহদান গ্রহণ করিয়া গ্রহবিপ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহা শশাঙ্কদেবের রাজত্বকালে ৬৫ শকাব্দে হইয়াছিল। তিনি ৫২ শকাব্দে (৬৩০ খৃষ্টাব্দে) গয়াক্ষেত্রে বোধি-দ্রুম উন্মূলিত করিয়াছিলেন। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্কদেবের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাং পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কামরূপ, সমতট, ও তাম্রলিপ্ত পরিভ্রমণ করিয়া শশাঙ্কদেবের রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণে উপস্থিত হন। অতএব ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের যে কোন সময়ে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ গৌড়মণ্ডলে পৌরোহিত্য করিতে আসিয়া আচার্য্য আখ্যায় অভিহিত হন।

গ্রহবিপ্রগণের বালি-ময়ূরেশ্বর সমাজ গঙ্গাতীরস্থ বালিগ্রাম হইতে বাঁকুড়া জেলার ময়ূরেশ্বর গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইঁহারা আপনাদিগকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। শাম্বপুরাণে ও মহাভারতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাম্ববতী-তনয় শাম্ব দেবর্ষি নারদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করায় তাঁহার ষড়যন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত হন। শাম্বের সর্ব্বাঙ্গ কুষ্ঠরোগে বিকৃত হইল। পরে শাম্ব ঋষির ক্রোধাপ-নয়ন করিলে তাঁহার উপদেশে সূর্য্যের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার তপস্যা করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেবের উপদেশে পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া গরুড়ের সাহায্যে শাকদ্বীপ হইতে সূর্য্যোপাসক মগ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া সূর্য্যের পূজায় ব্রতী করেন, মিত্রবনে নিজনামে শাম্বপুর নগর স্থাপন এবং তথায় স্বর্ণমন্দির এবং তন্মধ্যে সুবর্ণের সূর্য্যপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

"শাকদ্বীপাৎ সুপর্ণেন চানীতা দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
শাকদ্বীপীতি বিখ্যাতাঃ জম্বুদ্বীপে বভুব হ।"

শাম্ব-পুরাণ

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এই মন্দির ও দেবমূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছেন। শাম্বের আনীত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ পরে ভারতের চতুর্দ্দিকে বসবাস করিয়া নানা আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। ব্রহ্মযামলে ১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

"শাকদ্বীপে চ বেদাগ্নিং শাকদ্বীপে চ সিদ্ধকঃ।
ভূমধ্যে চ ব্রহ্মচারী দৈবজ্ঞো দ্বারকাপুরে।
দ্রাবিড়ে মৈথিলে চৈব গ্রহবিপ্রেতি সংজ্ঞকঃ।
অঙ্গদেশে ধর্ম্মবক্তা পাঞ্চালে শাস্ত্রি-সংজ্ঞকঃ।
সারস্বতে শুভমুখো গান্ধারে চিত্র-পণ্ডিতঃ।
তীরোহোত্রে তিথিবিপ্রো নাটকে শুক-সূচকঃ।
উদ্যানে জ্যোতিষীবিপ্রো ব্রহ্মজ্ঞে বিধিকারকঃ।
বঙ্গাটে যোগবেত্তা চ নিটালে দেবপূজকঃ।
রাঢ়দেশে চ উপাধ্যায়ো গয়ায়াং ত্রয়ধারকঃ।
কলিঙ্গে তালবিপ্রঃ স্যাৎ আচার্য্যো গৌড়দেশকে।"

(শ্রী হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত 'ভ্রান্তি-বিজয়' দ্রষ্টব্য)

শ্রীআদিত্যচরণ চক্রবর্ত্তী

(৪১)

বাদুড়

জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত শঙ্করাচার্য্য মৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "সূর্য্যাস্তের পরে বা সময়ে বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাদুড়গুলিকে পশ্চিমে যাইতে দেখা যায় কেন?" কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া আমাদের মনে হইল না। আমাদের লাইব্রেরীর সম্মুখেই একটা বড় পুকুর-পাড়ে কয়েকটি বাঁশঝাড়ে প্রায় চারি পাঁচ শত বাদুড় দলবদ্ধ হইয়া বহুদিন যাবৎ আড্ডা করিয়াছে। ইহাদের গতিবিধি আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাই, এবং ইহাদের একতা ও দলবদ্ধভাবে বাস ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক সময় আমাদের ভিতর বেশ আলোচনা চলে। ইহারা যে নিজেদের মধ্যে একটু আধটু ঝগড়া-ঝাটি না করে তাহা নয়, কিন্তু দিনের বেলায় কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ কোথায়ও যায় না। সূর্য্যাস্তের পর তাহারা কিচ্‌মিচ্ করিয়া কিছুক্ষণ নিজেদের বাসার উপর মণ্ডলাকারে ঘুরিতে থাকে ও ক্রমে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। সবগুলিকে কেবল পশ্চিমদিকে যাইতে আমরা কোন দিনই দেখি নাই, বরং পশ্চিমদিকে অল্প সংখ্যক বাদুড়কেই যাইতে দেখা যায়, কারণ সূর্য্যাস্তের সময় পশ্চিমদিক্ খুব রাঙা হইয়া উঠে। বাদুড় চামচিকা ইত্যাদি নিশাচর জীবদের নিকট আলো মোটেই প্রীতিকর নয়, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন।

পচিহাটা পাব্‌লিক লাইব্রেরীর মেম্বারগণ

জয়ন্তী

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মন্‌সব্‌দারের মৃত্যু

মন্‌সব্‌দার জলালুদ্দীন হাতিমকে বাদশাহ ঘোষণা করিয়াই যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিহারীলাল, জয়ন্তী, দুই জনেই তাঁহার শত্রু, দুই জনকেই বিনাশ করিতে হইবে। বিহারীলাল তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু জয়ন্তীকে হরণ করিয়া তিনি জলালুদ্দীনকে কৃতজ্ঞতাপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। মন্‌সব্‌দারের বিবেচনাশক্তি তিরোহিত হইয়াছিল। মনে মনে তিনি জয়ন্তীকে যে কতবার খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলেন তাহার সংখ্যা নাই। এত রকম উৎকট সঙ্কল্প তাঁহার চিত্তে উদয় হইতে লাগিল যে তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। কেমন করিয়া প্রতিশোধ পূর্ণ হইবে, কেমন করিয়া তিল তিল করিয়া পিশাচীকে হত্যা করিবেন? শুধু হত্যা? তাহা ত কিছুই নহে, মৃত্যুর অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আরও গুরুতর শাস্তি আছে। জলালুদ্দীনের পৈশাচিক প্রকৃতি তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু জয়ন্তী ও বিহারীলাল ত এখনও তাঁহার হস্তগত হয় নাই। যুদ্ধ ত হইবেই, কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে কোন কৌশলে এই দুই জনকে ধরা যায় না?

মকদুম শাহের সহিত মন্‌সব্‌দার পরামর্শ করিলেন। বিহারীলালের সৈন্যসংখ্যা কত? দুই হাজার হইবে। মন্‌সব্‌দারের এক হাজারের উপর সৈন্য মজুত, অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করিলে আরও এক হাজার হইবে। তাহারা কয় দিনে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে? মকদুম শাহের অনুমান দুই দিনে সকল সৈন্য একত্রিত করা যায়। অগত্যা মন্‌সব্‌দার দুই দিন অপেক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। সকল সৈন্য সংগৃহীত হইলে মন্‌সব্‌দার স্থির করিলেন রাত্রে বিহারীলালকে আক্রমণ করিবেন। প্রথমে পাঁচ শত সৈন্য লইয়া, বিহারীলালের বাগান-বাড়ী ঘেরাও করিয়া, বিহারীলাল ও জয়ন্তীকে বন্দী করিয়া আনিবেন। বাকি সৈন্য পিছনে থাকিবে। যুদ্ধ হইলে মন্‌সব্‌দারের জয় নিশ্চিত, কারণ তাঁহার সৈন্য শিক্ষিত, কতবার যুদ্ধ করিয়াছে; বিহারীলালের সৈন্য চাষা, লাঙ্গল দেওয়া তাহাদের কাজ, ইতিপূর্ব্বে কখন যুদ্ধ করে নাই।

মন্‌সব্‌দারের হিসাব ও খবর পাকা হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার হিসাব সমস্তই ভুল। বিহারীলাল বা জয়ন্তী দুই জনের কেহই বাগানবাড়ীতে ছিলেন না। বাগানবাড়ীতে ছিল পুণ্ডরীক, তাহাও বাড়ীর ভিতর নয়, বাহিরে পাঁচ শত সৈন্য লইয়া বনে লুকাইয়া ছিল। অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া বিহারীলাল আর-এক দিকে গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন। বিহারীলাল মন্‌সব্‌দারের সকল সন্ধান রাখিতেন, মন্‌সব্‌দার কিছুই জানিতেন না। অন্ধকার রাত্রে মন্‌সব্‌দার যখন পাঁচশো সৈন্য লইয়া বাগান-বাড়ী ঘিরিলেন, তখন সেখানে কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না। থাকিবার মধ্যে এক বুড়া আর বুড়ী। মন্‌সব্‌দার রাগিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিলেন।

ওদিকে পুণ্ডরীক বন হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া মন্‌সব্‌দারের পাঁচ শো সৈন্যকে বেষ্টন করিল। বাকী দেড় হাজার সৈন্য লইয়া বিহারীলাল মন্‌সব্‌দারের অবশিষ্ট সৈন্যের পথ রোধ করিলেন। অন্ধকারে অল্পস্বল্প যুদ্ধ হইল, কিন্তু উভয় পক্ষ প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

প্রভাত হইলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যে চাষাদের মন্‌সব্‌দার তাচ্ছিল্য করিতেন, বিহারীলাল ও পুণ্ডরীকের শিক্ষায় তাহারা উত্তম সৈনিক হইয়া উঠিয়াছিল। মন্‌সব্‌দারের সৈন্যেরা তাহাদের সম্মুখে হটিতে লাগিল। মন্‌সব্‌দার নিজে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন সম্মুখে পুণ্ডরীক।

মন্‌সব্‌দার কহিলেন, "এ বানরটা কোথা হইতে আসিল? ইহাকে কাটিয়া ফেল।"

পুণ্ডরীক অদ্ভুত কৌশলে তরবারির অগ্রভাগ দিয়া

মন্‌সব্‌দারের পাগড়ি তুলিয়া লইয়া কহিল, "সাহেব, বানরের লেজ দেখিয়াছ ?"

মন্‌সব্‌দার পুণ্ডরীকের স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিলেন। তরবারি তাঁহার নিজের পাগড়িতে জড়াইয়া গেল। পুণ্ডরীক কহিল, "আগে লেজ গুটাইয়া লও, তাহার পর যুদ্ধ।"

যুদ্ধ অল্পক্ষণ হইল। দুই চারিবার অসি চালনা হইতেই পুণ্ডরীক মন্‌সব্‌দারের মাথা কাটিয়া ফেলিল। মন্‌সব্‌দার নিহত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহার সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মুক্তি ও বন্ধন

বিহারীলালের বাগানবাড়ীতে একটি ঘরে একা বসিয়া গৌরীশঙ্কর। জয়ন্তী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "এই যে জয়ন্তী। কিছু বলিবার আছে ?"

"আজ্ঞে, হাঁ। এখন ত নূতন বাদশাহ হইলেন, সুবাদার ও মন্‌সব্‌দারও নূতন। আমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা কি উদ্‌যাপিত হইয়াছে ?"

"আমাদের আর কোন কর্ম্ম নাই, সকলকে ইচ্ছামত সংসার-আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিয়াছি।"

"আমার সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন ?"

"কেন, তুমি যেমন আমার কন্যার মত আছ সেই রকম থাকিবে। আর তোমাকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইবে না।"

জয়ন্তীর হস্তে একটা গোলাপ-ফুল ছিল, সে তাহার পাপড়ী ছিঁড়িতে লাগিল, মুখে আর কথা নাই।

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "দাঁড়াইয়া রহিলে যে ? আর কিছু বলিবার থাকে ত বল না কেন ?"

জয়ন্তী কহিল, "যেমন আছি তেমনি থাকিব ? সংসার-আশ্রম কি আমার পক্ষে নিষিদ্ধ ?"

"কে বলিল ?"

"না, তাহাই বলিতেছিলাম।"

"তোমার মনে কি আছে স্পষ্ট করিয়া বল না কেন ? গোপন করিবার প্রয়োজন কি ?"

জয়ন্তী নীরব। সে ফুলের পাপ্‌ড়ী ছিঁড়িতেই নিযুক্ত।

গৌরীশঙ্করের মুখে হাসি দেখা দিল। কহিলেন, "বিহারীলাল বাহিরে আছেন ?"

"আছেন।"

"তাঁহাকে ডাক।"

জয়ন্তী বিহারীলালকে ডাকিয়া আনিল। দুইজনে পাশাপাশি গৌরীশঙ্করের সম্মুখে দাঁড়াইল।

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "বিহারীলাল, তুমি জয়ন্তীর পাণিগ্রহণ করিতে চাও ?"

"আপনার অনুমতির অপেক্ষা।"

"তোমরা দুইজনে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, অনুমতির অপেক্ষা কেন ?"

"আপনি জয়ন্তীর পিতৃস্থানীয়।"

"সত্য কথা। শুন বিহারীলাল। আমার ইচ্ছাতেই তোমাদের দুইজনের সাক্ষাৎ হয়। জয়ন্তী সর্ব্বাংশে তোমার উপযুক্ত ভার্য্যা। জাতিতে, কুলে, শীলে তোমার সমান। তুমি বীর, জয়ন্তী বীররমণী, আশীর্ব্বাদ করি দুই জনে চিরসুখী হও।"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কালচক্র

গিরনার পর্ব্বতে একটি গুহার সম্মুখে বসিয়া দুই ব্যক্তি—বালানন্দজী ও গৌরীশঙ্কর। পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হইয়াছে।

গৌরীশঙ্করকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বালানন্দজী কহিলেন, "প্রজার সেবা কি পূর্ণ হইল ?"

"এ কার্য্যের পূর্ণতা নাই, তবে আপাততঃ ত আর কিছু করিবার নাই, অনুমতি হয় ত আমিও নিকটে কোথাও কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করি।"

"অতি উত্তম কথা। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া পরমার্থ চিন্তা কর।"

"আপনার যেরূপ আদেশ আমার নিজেরও সেইরূপ অভিরুচি। এই পুণ্যভূমির ভবিষ্যতে কি হইবে, কবে

আবার এই ঋষিনিবাস জ্ঞানের শান্তির আলয় হইবে? যুগ পরিবর্ত্তনের কত বিলম্ব?"

"ত্রিকালদর্শী নহিলে ভবিষ্যৎ জানিবার সম্ভাবনা নাই, এখন ত্রিকালদর্শী কে, সে দেশকালভেদী যোগবল কোথায়? ভবিষ্যতের কল্পনা আমাদের পক্ষে অনুভব অনুমান মাত্র, কেন না পূর্ব্বকালের সে একাগ্র তন্ময়তা আমাদের নাই। সামান্য সাধনায়, সামান্য বুদ্ধিতে ভবিষ্যৎ নিতান্ত জটিল বিবেচনা হয়। ঋষিদিগের কালে কি সমগ্র ভারতে কোন সম্রাটের একচ্ছত্র রাজ্য ছিল, না ভবিষ্যতে কোন কালে থাকিবে? রাজা, রাজবংশ, সম্রাট্, সাম্রাজ্য কালস্রোতে জলবুদ্বুদ মাত্র, অথচ ইহাদের ক্ষণিক চাকচিক্যে লোক মুগ্ধ হয়, সর্ব্বদাই ইহাদের কথা কল্পনা করে। প্রজা নিত্য, কারণ মানব-জাতি লুপ্ত না হইলে প্রজা ধ্বংস হইবে না। কিন্তু জাতির কল্যাণে প্রজা কত কাল উদাসীন থাকিবে কে বলিতে পারে? তুমি যে কার্য্যে লিপ্ত ছিলে তাহা পূর্ণ হওয়াতে তোমার বিবেচনা হইতে পারে যে বহুকাল প্রজার ও দেশের মঙ্গল রক্ষিত হইবে। তাহাই হউক, কিন্তু সে বহুকাল কতদিন? পূর্ব্বে ব্যসন, বাসনা, প্রলোভন ছিল সঙ্কীর্ণ, ত্যাগের, নিবৃত্তির, সাধনার প্রসার ছিল অবারিত। রাজ্যের জন্য এখন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হইতেছে, ভবিষ্যতে জাতিবিচ্ছেদ হইবে। এখন যে দুর্দ্দৈব এক দেশে হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহা সর্ব্বত্র হইবে। জাতিবিচ্ছেদে যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল, রাজা ও জাতিবিরোধে রাজ্য ও জাতিনাশ হইবে। যুগ-বিপ্লবের ইহাই সূচনা। ভবিষ্যৎ জানিবার উপায় কি? না, অতীতের প্রগাঢ় আলোচনা। অতীতের ছায়া ভবিষ্যতের উপর পড়ে, সেই ছায়া যে দেখিতে পায় তাহার চক্ষের সমক্ষে ভবিষ্যতের আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায়। সে কত সাধনার ফল! ভবিষ্যদ্বাণী অজ্ঞের মুখ হইতেও দৈবাৎ বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু ভবিষ্যৎ জানে কে, ভবিষ্যৎ দেখিতে পায় কে? কালচক্র আবর্ত্তিত হইতেছে আমরা কেবল তাহাই দেখিতেছি। এ মহাকাব্যের, এই মহাগ্রন্থের শেষ নাই, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় কালের রচনা, আবার নূতন পৃষ্ঠা, আবার নূতন লিখন। যে রচনারই সমাপ্তি নাই তাহা কে সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া উঠিতে পারে? যে ভবিষ্যৎ অনন্ত, তাহাকে সান্ত করিয়া কে নির্দ্দেশ করিতে পারে? কালচক্রের ঘূর্ণন-শব্দ তোমার শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে? কালের মহাকাব্যের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইবার শব্দ শুনিতে পাইতে? তাহাতেই ভবিষ্যৎ নিহিত আছে।"

সমাপ্ত

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

ভূমিকা

"শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম্মসাধনম্।" শরীর সুস্থ না থাকিলে মন সুস্থ থাকে না। মন সুস্থ না থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ হয় না। বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ না হইলে জ্ঞানবল জন্মিতেই পারে না। জ্ঞানবল না থাকিলে উন্নতিলাভও অসম্ভব। অনুন্নত অবস্থায় পতিত হইয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

আবার চরিত্রবল একটি প্রধান বল। চরিত্রের অভাবে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, গুণ ও যোগ্যতা বিনষ্ট হইয়া যায়; চরিত্রবলের অভাব হেতুই অনেক যোগ্য ব্যক্তিও তাঁহাদের যোগ্যতা দেশের ও জগতের গুরুতর অনিষ্ট-সাধনে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ছাত্রজীবনে ও যৌবনের প্রারম্ভে অনেকে না বুঝিয়া কুসংসর্গে পড়িয়া চরিত্রবল হারাইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ ও সমস্ত যোগ্যতা বিনষ্ট করিয়া ফেলে। যাহাতে ছাত্রগণ ও যুবকবর্গ কুসংসর্গে না পড়িতে পারে, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন দেশহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ ও যুবকবৃন্দই ভবিষ্যতের আশাস্থল।

যাহাদের চরিত্রবল নাই, তাহারা সাধারণত ভীরু ও

কাপুরুষ হইয়া থাকে। আবার আত্মরক্ষার শক্তির অভাব হেতু যাহারা সর্ব্বদাই ভয়ে ভীত হইয়া জড়সড় হইয়া থাকে, তাহারা জীবিত থাকিয়াও মৃত। তাহাদের উন্নতি কোথায়, সুখ কোথায়, আনন্দ কোথায়, এবং জীবন-ধারণের সার্থকতাই বা কোথায়?

শরীর ও মনের সুস্থতাসাধন এবং চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা হেতু বিভিন্ন ব্যায়াম-কৌশল ও শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা অন্যতম। আমার বিশ্বাস—সমস্ত নিয়ম-প্রণালী, প্রতিজ্ঞা ও গুরুর শাসন (discipline) প্রতিপালন করিয়া বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা অভ্যাস করিলে অন্যান্য ব্যায়াম-পদ্ধতি অপেক্ষা অতি অল্প সময়ে ও অতি সহজে শরীরের লঘুতা, মনের প্রফুল্লতা, চরিত্র ও চিত্তের দৃঢ়তা এবং সাধারণ স্বাস্থ্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা অর্জ্জন করিয়া মানুষ নির্ভীক্ ও কল্যাণ-সাধনের উপযোগী হইতে পারে।

"ভীম" কিম্বা "স্যাণ্ডো"র ন্যায় স্বাভাবিক বা অর্জ্জিত শারীরিক বল সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না; কিন্তু চেষ্টা ও অনুশীলন দ্বারা অধিকাংশ লোকেই কৌশল আয়ত্ত করিয়া আত্মরক্ষার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে; এমন কি শিক্ষার কৌশল দ্বারা অকৌশলী "ভীম" কিম্বা "স্যাণ্ডো"র ন্যায় বলশালীকেও নিরস্ত করা অসম্ভব হয় না।

এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই লাঠিখেলা ও অসি-শিক্ষা সম্বন্ধে আমার সামান্য অভিজ্ঞতাটুকু ব্যক্ত করিতে অগ্রসর হইলাম। সহৃদয় দেশবাসীগণের মধ্যে যদি কাহারো এবিষয়ে সামান্য মনোযোগও আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। এসম্বন্ধে জ্ঞানীগণ কোনও নূতন তত্ত্ব জানাইয়া দিলে, কিম্বা ভ্রম ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া দিলে নিতান্তই বাধিত হইব।

পূর্ব্বাভাস

অতি পুরাকালে, যে সময়ে গুণহীন ও অযোগ্য অসুর-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ স্বাভাবিক শারীরিক বলে দৃপ্ত হইয়া স্পর্দ্ধা-সহকারে গুণী ও যোগ্য দেবপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের সমান অধিকার এবং তাঁহাদের যোগ্যতালব্ধ ফলে পূর্ণ ভোগের দাবী করিয়া, আধিপত্য হেতু নানারূপ অত্যাচার ও উৎপীড়নে রত হইয়া পৃথিবীতে ধারাবাহিক উচ্ছৃঙ্খলতার সূত্রপাত করিতেছিল, তখন ঐ-সমস্ত দেবপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত নানা আয়ুধ ও অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার করিতেছিলেন। তদুপলক্ষেই অসিও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রয়োজন-সাধন-সম্পর্কিত বিভিন্ন আকৃতি অনুযায়ী অসির বিভিন্ন নাম হইয়াছিল, যথা—অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণ-ধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্ম্মপাল। বিভিন্ন নামের অস্ত্রের বিভিন্ন প্রকারের বিশিষ্টতা নির্ণয় করা বর্ত্তমানে অসম্ভব।

দূর হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে শরাসন, নালিক, শতঘ্নী, কামান, বন্দুক, প্রভৃতি যেরূপ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ জনসঙ্ঘমধ্যে পতিত হইলে কিম্বা প্রতিপক্ষের অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইলে অসি ও গদা প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ। আবার গদাধারী অপেক্ষা বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে সুশিক্ষিত পবিত্রতা-সম্পন্ন সুকৌশলী অসিধারীই শ্রেষ্ঠ, কারণ অসিচালন অপেক্ষা গদাচালনে সহজেই ক্লান্তি আনয়ন করিয়া দেয়।

শ্রমদমসম্পন্ন মন্ত্রাভিজ্ঞ (মন্ত্র অর্থে গুপ্ত কৌশল) অসিধারী একাকী অসিপাণি হইয়া দ্রুতপদে বিচিত্ররূপে বিচরণ করিতে থাকিলে প্রতিপক্ষগণ তাহাকে সহস্রবৎ জ্ঞান করিতে থাকে এবং অসিবেগে প্রভগ্ন হইয়া কেহ কেহ ছিন্নবাহু, কেহ কেহ ছিন্নোরু, কেহ কেহ ছিন্নবক্ষা এবং কেহ কেহ ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে থাকে; আবার কেহ কেহ বা অসিঘাতে প্রপীড়িত হওয়াতে ভ্রষ্টবুদ্ধি ও প্রমাদগ্রস্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অব্যক্ত কিম্বা অন্ধকারময় দেখিতে থাকে এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি আক্রোশ করতঃ স্বপক্ষীয়গণকেই প্রহার করিতে থাকে।

এরূপ ঘটনা যাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাঁহারাই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

দুষ্টলোক, চোর, ডাকাত প্রভৃতি হইতে সাধুজনের রক্ষা এবং ধর্ম্মতঃ সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ব রকমে দেশের উন্নতি ও কল্যাণসাধন জন্য নানারূপ বাধা, বিঘ্ন, উৎপাত, উৎপীড়ন ও অত্যাচার দূর করিবার নিমিত্তই লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যেরূপ সিংহের গুহা হইতে বন্য পশু দূরে পলায়ন করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ যে নগরে একটি মাত্র প্রসিদ্ধ অসিধারী থাকে, সে নগর হইতে ভীত হইয়া ক্ষুদ্রাশয় জন-শত্রুগণ দূরে চলিয়া যায়। কিন্তু যে স্থানে অসিধারী পুরুষ রাজকোপে নিগৃহীত, কিম্বা জন-শত্রুগণ অপর কোনও শক্তি দ্বারা সমর্থিত, তথায় অবশ্যই অন্য কথা।

বৌদ্ধযুগের শেষভাগে "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" এই বাক্যের নানারূপ বিকৃত ব্যাখ্যার ফলে এক দিকে যেমন তথাকথিত বিবেকের তাড়নায় তথাকথিত ধার্ম্মিক ও জ্ঞানীগণ কীট পতঙ্গ হিংস্রপশু প্রভৃতির প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইতেছিলেন এবং মানুষের যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইয়া মানুষের রক্ত দ্বারা ছারপোকার আহার যোগাইতে-ছিলেন, তেমনই প্রতিক্রিয়ার ফলে অপর দিকে এক সম্প্রদায়ের তথাকথিত উপাসকগণ নরবলি নরহত্যা হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ অত্যাচার-উৎপীড়নে দেশকে জ্বালাতন করিতেছিল।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে ক্ষত্রিয়সমাজ পুনর্গঠিত ও ঐ-সমস্ত অত্যাচার-উৎপীড়ন বাহ্যতঃ ক্ষান্ত হইলেও দুর্বৃত্তগণ অরণ্য ও পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দস্যুবৃত্তি ও কাপালিক-বৃত্তি অবলম্বন করিল। কিন্তু "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" এই বাক্যের বিকৃত ব্যাখ্যার প্রভাব ভারতবর্ষ হইতে দূর হইল না। তথাকথিত ধার্ম্মিক ও জ্ঞানীগণ তথাকথিত জ্ঞানচর্চ্চার আতিশয্য হেতু সংসার অনিত্য দেখিতে লাগিল এবং আত্মরক্ষা ও দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্পর্কে সর্ব্ব রকমে উদাসীন হইয়া পড়িল; তাহাদের প্রভাব ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য সমাজে পতিত হওয়ায় দেশ ক্রমে নিস্তেজ ও নির্বীর্য্য হইয়া বৈদেশিকগণের করকবলিত হইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে অসিবিদ্যা ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি জনসমাজ হইতে ক্রমে লোপ পাইয়া গেল। কিন্তু তখনও কতিপয় দস্যুসঙ্ঘ স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া লাঠি, অসি, গদা, ধনু, ছুরিকা প্রভৃতির অভ্যাস করিতেছিল।

কালক্রমে তাহাদের মধ্য হইতে "ঠগ" নামে এক প্রবল সম্প্রদায় গঠিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল। দেশ, কাল ও পাত্রের সম্পর্কে বিজড়িত হওয়াতে, এই পদ্ধতির বর্ণনায় সংস্কৃত, রামাশী, উর্দ্দু ও বিভিন্ন প্রাদেশিক নানা জাতীয় ভাষার সংমিশ্রণে নানারূপ সাঙ্কেতিক শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। ঐ-সমস্ত শব্দের প্রকৃতিগত বিশ্লেষণ এ-স্থানে অসম্ভব। শব্দগুলি ও তাহাদের সাঙ্কেতিক অভিপ্রায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

প্রথম শিক্ষার্থীগণের পক্ষে অসি লইয়া অভ্যাস করা নিতান্তই বিপজ্জনক। প্রথম প্রথম তাহাদের লাঠি লইয়াই অভ্যাস করিতে হইবে। শিক্ষার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে লাঠি ও অসি পরিচালনে সমানরূপ দক্ষতাই জন্মিয়া থাকে। লাঠির আঘাতে শরীর গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়, অসির আঘাতে শরীর কাটিয়া যায়। অসি লইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিচরণ করা অসম্ভব; কিন্তু লাঠি সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিলে অধিকাংশ স্থলেই আত্মরক্ষা সম্ভবপর হয়, এবং অন্যান্য নানারূপ প্রয়োজনও সাধিত হয়। লাঠি ও অসিশিক্ষার প্রণালী ও পদ্ধতি সম্পূর্ণই একরূপ। তাই এই প্রবন্ধের নাম লাঠিখেলা ও অসি-শিক্ষা হইল।

উপক্রমণিকা

স্থান নির্দ্দেশঃ—

পবিত্র, সমতল, ও ছায়াপ্রধান স্থানই শিক্ষাপ্রদানের জন্য শ্রেষ্ঠ। দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে বায়ুপথ উন্মুক্ত থাকিলেই ভাল হয়। স্থানটি যেন এরূপ না হয় যে মস্তক সূর্য্যকিরণে এবং পদ ছায়াতে থাকে, কিম্বা অন্য কারণে মস্তকে উত্তাপ অধিক ও পদে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা অধিক লাগিতে পারে। প্রথম শিক্ষারম্ভকালে সম্পূর্ণ ছায়াপূর্ণ স্থানই শ্রেষ্ঠ। ক্রমে কষ্টসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ রৌদ্রমধ্যে ধীরে ধীরে অভ্যাস করাই সঙ্গত।

শিক্ষাপ্রদান-স্থানে প্রবেশ করিয়া অবিশ্বাসী ও অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ যাহাতে নানারূপ কূট দৃষ্টি নিক্ষেপ কিম্বা কূট বাক্য প্রয়োগে প্রথম শিক্ষার্থীগণের চঞ্চলতা ও প্রমাদ উৎপাদন করিতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতারও নিতান্তই প্রয়োজন। শিক্ষার্থীগণ শিক্ষায় কতক দূর অগ্রসর হইলে এবং একবার এই বিদ্যার প্রতি আসক্তি জন্মিলে, আর দুষ্টগণের দুষ্ট চেষ্টা কোন ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে পারিবে না।

সময় নির্দ্দেশ :—

সাধারণত প্রাতঃকাল এবং বৈকাল বেলাই শিক্ষা-লাভের প্রকৃষ্ট সময়; একেবারে খালি-পেটে কিম্বা পূর্ণ-ভোজনের অব্যবহিত পরেই শিক্ষালাভ করিতে নাই। অতি শীত ও অতি গরম মুহূর্ত্ত প্রথম শিক্ষার্থী-গণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সময় নহে। শিক্ষায় কতক দূর অগ্রসর হইলে ক্রমে কষ্টসহিষ্ণুতা আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত অল্পে অল্পে অতি শীত ও অতি গরমে পুরাতন পাঠ অভ্যাস করা যাইতে পারে। "হঠাৎ অভ্যাস ধরা-ছাড়া, দু'এতেই হয় দেহের পীড়া।" বৃষ্টির মধ্যে কিম্বা মানসিক অবসাদ ও চঞ্চলতার অবস্থায়, কিম্বা যে সময়ে নৈসর্গিক অথবা আকস্মিক যে-কোন কারণেই মনের একাগ্রতা সাধন করা যাইবে না, সে-সময়ও শিক্ষা-লাভের শ্রেষ্ঠ সময় নয়।

প্রথম শিক্ষার্থীগণের অতিপরিশ্রম কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়। প্রথম প্রথম বগলে ঘর্ম্ম উৎপন্ন হইলেই শিক্ষায় বিরত হওয়া কর্ত্তব্য; কতিপয় দিবস পরে মস্তকে ও কপালে ঘর্ম্ম দেখা দিলে শিক্ষায় বিরত হওয়া সঙ্গত; ক্রমে অভ্যাস দ্বারা সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইলেও অবসন্নতা আসিবে না। ক্রমে সমস্ত দিন খেলায় ও শিক্ষায় রত থাকিলেও কোনরূপ কষ্ট বোধ হইবে না। কিন্তু ক্রমাগত চালনা করিতে করিতে হস্তদ্বয় অবসন্ন হইয়া পড়িলে তখনই খেলায় ও শিক্ষায় ক্ষান্ত হওয়া বিধেয়।

শিক্ষাগুরু- ও আচার্য্য-লক্ষণ :—

যাহারা অসিশিক্ষা-সম্বন্ধীয় সমুদায় বিভাগ, অঙ্গ ও বিশেষত্ব সম্পর্কে সর্ব্ব রকমে অভিজ্ঞ ও সর্ব্বরূপ-সংশয়-পরিশূন্য এবং উপযুক্ত শিক্ষার্থী-নির্ণয়ে ও সর্ব্ব বিষয় পরিব্যক্ত-করণে সুদক্ষ; শম, দম, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা-সম্পন্ন; কদাচ কোনও নিন্দনীয় কর্ম্মে লিপ্ত হন না; সর্ব্বদাই মধুরভাষী; আদিগুরু ও আচার্য্যগণের প্রতি ভক্তি-সম্পন্ন, এবং লাঠিখেলা ও অসি-শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহাদের প্রিয় ও হিতকর কর্ম্মে লিপ্ত থাকেন; তাঁহারাই উপযুক্ত আচার্য্য ও শিক্ষাগুরু।

শম—সর্ব্ব রকমে মন ও চিত্তকে সংযত রাখিবার শক্তি।

দম—সর্ব্ব অবস্থাতে বাহেন্দ্রিয় ও সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং শারীরিক চেষ্টা সংযত রাখিবার শক্তি।

নিষ্ঠা—সর্ব্ব বিষয় ও সর্ব্ব কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন করিবার প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা।

শিক্ষাগুরুগণ সুপরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত শিক্ষার্থীগণকেই শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন; লোভী, ধূর্ত্ত, কৃতঘ্ন (উপকারহন্তা), মন্দবুদ্ধি (মূর্খ) ব্যক্তিকে কদাচ অসিশিক্ষা দান করেন না।

শিক্ষার্থী-লক্ষণ :—

যে-সমস্ত শিক্ষার্থী শুদ্ধবংশ, তরুণ-বয়স্ক; শীল, শৌর্য্য, শৌচ, আচার, বিনয়, শক্তি, বল, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, মতি ও প্রতিপত্তি-বিশিষ্ট; যাহাদের জিহ্বা, ওষ্ঠ ও দন্তাগ্র সূক্ষ্ম,—মুখ, চক্ষু ও নাসিকা সরল; চিত্ত, বাক্ ও চেষ্টা বিশুদ্ধ এবং যাহারা কষ্টসহিষ্ণু, তাহারাই শ্রেষ্ঠ; এবং যাহারা ইহার বিপরীত-গুণান্বিত তাহারাই অধম। মানুষ কখনও সর্ব্ব রকমে সর্ব্বগুণসম্পন্ন হয় না; তাই গুণ ও দোষের তারতম্য বিচারে গুণাধিক্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াই শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। যাহাদের মধ্যে দোষের আধিক্য তাহারাই পরিবর্জ্জনীয়। যাহারা অবাধ্য, অমনোযোগী, গুরুদ্রোহী ও নিন্দাকারী; যাহারা প্রবঞ্চক, লোভী, কপটাচারী ও নিয়ম-শাসনের অবমাননাকারী, তাহারা সর্ব্বতোভাবেই অযোগ্য ও অস্পৃশ্য।

শুদ্ধবংশ—যে-বংশে কোনরূপ নিন্দনীয় ও জঘন্য কর্ম্মের সম্পর্ক নাই।

শীল—সৎ স্বভাব।

শৌর্য্য—নির্ভীক কর্ম্মতৎপরতা।

শৌচ—অস্বাস্থ্যকর ও অপবিত্র আহার বিহার ও মানসিক চিন্তা পরিত্যাগ।

আচার—প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-শাসনে ভক্তি, বিশ্বাস ও অনুরক্তি।

বিনয়—নম্রতা ও গুরুজনগণের আদেশ-পালনে তৎপরতা।

শক্তি—পরিশ্রম-ক্ষমতা।

বল—শারীরিক সামর্থ্য।

মেধা—এক সঙ্গে ও এক সময়ে বহু বিষয় মনে ধারণা করিয়া তৎসম্পর্কে বিচার ও আলোচনা করিবার ক্ষমতা।

ধৃতি—বহু পুরাতন বিষয়ও স্মরণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা।

স্মৃতি—উপযুক্ত মুহূর্ত্তে ও অবিলম্বে প্রয়োজনীয় বিষয় স্মরণ করিবার ক্ষমতা।

মতি—ঐকান্তিকতা; প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা।

প্রতিপত্তি—নিশ্চিত জ্ঞান ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি।

চিত্ত—অনুভব-শক্তি; অভিনিবিষ্টতা; যে শক্তি মনকে কোন বিষয় সম্পর্কে চেতনাযুক্ত করিয়া রাখে।

চেষ্টা—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গণের হাব, ভাব, ভঙ্গী।

সমস্ত শিক্ষার্থীগণকেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অভিমান, অহঙ্কার, ঈর্ষ্যা, কর্কশতা, পিশুনতা, মিথ্যাকথন, আলস্য ও অযশস্কর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে; আহার বিহার ও পরিধান সম্পর্কে পবিত্রতা অবলম্বন করিতে হইবে। অবশ্য সত্য-ব্রত ব্রহ্মচর্য্য ও অভিবাদনপরায়ণ হইতে হইবে; আদিগুরু ও আচার্য্যগণের প্রিয় ও হিতকর্ম্মে রত থাকিয়া তাহাদের আদেশ ও উপদেশ প্রতিপালনে সচেষ্ট থাকিতে হইবে এবং তাহাদের অনুমতি অনুসারেই লাঠি ও অসিবিদ্যা সম্পর্কিত কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে।

কাম—হিতাহিতবিচারশূন্য হইয়া বাসনা-কামনার পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য ঐকান্তিক আসক্তি।

মোহ—কোনও রূপ উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া হিতাহিত বিচারশূন্য ভাব।

অভিমান—কল্পিত নিজ গৌরবের অবহেলা অনুভবে যে ক্ষোভের উদয় হয়।

অহঙ্কার—নিজের কল্পিত শ্রেষ্ঠত্বের যে অভিব্যক্তি কিম্বা সংস্কার।

ঈর্ষ্যা—অন্যের শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে অসুখানুভব।

কর্কশতা—কঠোর ব্যবহার ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ।

পিশুনতা—কুটিল ব্যবহার।

পবিত্রতা—নির্দ্দোষ অথচ বিলাসিতা সম্পর্ক শূন্য হিতকর ও প্রীতিকর অবস্থা।

ব্রহ্মচর্য্য—যাহা চিরস্থায়ী ও চিরসত্য তাহাই ব্রহ্ম; সেই চিরসত্যের অনুভূতি ও সম্পর্ক লাভ নিমিত্ত যে-সমস্ত উপায়, কৌশল, শিক্ষাপদ্ধতি ও কর্ম্মচেষ্টা, তাহার সমষ্টিভূত নিয়ম প্রণালীর অনুসরণই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্ম অর্থাৎ চিরসত্য সম্পর্কিত যে চর্য্যা অর্থাৎ আচরণ তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।

অভিবাদন প্রয়োজন:—

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, গুণী ও গুরুজনের অভিবাদনে মানব বিনয়ী হইয়া থাকে এবং মন হইতে ক্রমে অভিমান অহঙ্কারাদি লোপ পাইতে থাকে; আবার উহাতে গুণীগণের গুণের প্রতিও সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাহারা গুণ ও গুণীর সম্মান করে না তাহারা জগতের শত্রু।

শিক্ষাগুরু ও আচার্য্যগণ সমস্ত শিক্ষার্থীগণকেই পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনে বাধ্য রাখিবেন। যাহারা ইহার অন্যথা করিবেন কিম্বা যে-সমস্ত শিক্ষার্থী ঐ সকল প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনে অবহেলা করিবে, তাহাদের অধর্ম্ম হইবে, বিদ্যা নিষ্ফলা হইবে ও তাহা প্রকাশ পাইবে না; এবং তাহারা সর্ব্ব রকমে স্বদেশ, স্বজাতি স্বধর্ম্ম ও সমগ্র মানবজাতির শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

পশ্চিম তিব্বতে

(১)

বিগত দশ বৎসর ধরিয়া আমি হিমালয়ের পশ্চিম প্রদেশগুলি মাঝে মাঝে ভ্রমণ করিয়া থাকি। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রভাগা নদীর উৎপত্তি-স্থলে ইংরেজ-অধিকৃত লাহোলের উপকণ্ঠস্থ বারালচা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া আরও ১৫ মাইল পথ পর্য্যটন করি। হিমালয়ের দক্ষিণস্থ প্রদেশগুলির তুলনায় ঐ প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য এতই সুন্দর যে আমি তখনই পশ্চিম হিমালয়ের অন্য অংশগুলি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হই। ১৯২০ সালের গ্রীষ্মকালে আমার ঐ বাসনা কার্য্যে পরিণত করি। এই বৎসর কতিপয় বন্ধুর সহিত লাডক্ প্রদেশ প্রদক্ষিণ করিয়া জোজিলার পথে কাশ্মীরে ফিরিয়া আসি। লাডক্ বর্ত্তমানে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থান হিসাবে ইহাকে তিব্বতের অঙ্গ বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে ৮০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা তিব্বত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই প্রদেশের চিত্তাকর্ষক নৈসর্গিক শোভা, হিমালয়ের দক্ষিণস্থ ভূখণ্ডের সহিত এই-সকল স্থানের বৈসাদৃশ্য, এখানকার চমৎকার আব্‌-হাওয়া এবং এই প্রদেশবাসীর নূতন ধরণের জীবনযাত্রা-প্রণালী আমার সুপ্ত ভ্রমণ-বাসনাকে জাগ্রত করিল। আমি এই রহস্যময় প্রদেশটি আরও ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

বেণী-নাগে তিব্বত-যাত্রীদল

অবশেষে আমি পশ্চিম তিব্বতের অন্তর্গত মানস-সরোবর ও কৈলাস-পর্ব্বতমালার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশগুলি ভ্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। এই প্রদেশ যুগ যুগ ধরিয়া শুধু যে ভারতীয় ও তিব্বতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃকই পূজিত হইয়া আসিতেছে তাহা নহে, পৃথিবীর অন্যদেশের লোকেও শত শত বর্ষ ধরিয়া এই বিস্ময়পূর্ণ স্থানটি শ্রদ্ধা- ও আগ্রহ সহকারে পরিদর্শন করিয়া থাকে। এই প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং পবিত্রতা শুধু প্রাচীনতম সংস্কৃত গ্রন্থসমূহেই বিশদরূপে বর্ণিত নাই—যে-সকল বিদেশী-পর্য্যটক এই পূতসলিল সরোবরটি দেখিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই শতমুখে প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-লীলার স্তবগান করিয়াছেন।

প্রত্যেক ভক্ত হিন্দুই চতুর্ধাম যাত্রাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। এই চারটি প্রধান ধাম বা তীর্থ ভারতের চারি কোণে অবস্থিত। দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ, পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র, পশ্চিমে দ্বারকা ও উত্তরে বদরিকাশ্রম। বর্ত্তমান গাড়ওয়াল বা উত্তরাখণ্ড (গঙ্গার উৎপত্তি-স্থল) সকল হিন্দুরই পুণ্য তীর্থ। প্রথম তিনটি তীর্থে যাতায়াতের সবিশেষ সুবিধা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শেষ তীর্থ বিভিন্ন-স্থানে-অবস্থিত অনেকগুলি মন্দিরের সমষ্টি—এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থান হেতু সেখানে যাতায়াতও দুরূহ। এই রাস্তায় গ্রীষ্মকাল ব্যতীত যাতায়াত করা যায় না।

উত্তরাখণ্ডের প্রত্যেক তীর্থমন্দিরগুলির সহিত এক-একটি পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক তথ্যের সম্পর্ক আছে। কোনটি বা মহাদেবের ধ্যানস্থল, কোনটি বা শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়া রহিয়াছে, আবার কোনটি বা পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই কারণেই প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ ও বদরীনাথের মন্দিরসমূহে সমবেত

হয়। তুষারাবৃত-পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত এই স্থানটি পবিত্র-সলিলা গঙ্গা-নদীর উৎপত্তিস্থল বলিয়া একটি পুণ্যতীর্থ-রূপে গণ্য। হিমালয়ের উত্তর-পার্শ্বস্থিত মানস-সরোবর ও কৈলাস পর্ব্বতমালাকে লোকে অধিক পবিত্র বলিয়া মনে করে। সেখানকার মনোরম প্রাকৃতিক শোভা বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু সেখানে যাওয়া সুকঠিন।

তিব্বত-ভ্রমণের বন্দোবস্ত করিবার সময় সেখানকার জ্ঞান সঠিক করিবার জন্য কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সঙ্গে লইতে ইচ্ছুক হইলাম। এই প্রদেশটি সরকারী জরীপ-বিভাগ কর্ত্তৃক জরীপ করা হয় নাই এবং এখানকার উদ্ভিদ্, জীবজন্তু ও ভৌগোলিক তত্ত্বসমূহ অধিকাংশ লোকে জ্ঞাত নহে। তিব্বতে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইব কি না সে সম্বন্ধেও সন্দিহান ছিলাম। যদিও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসর্ত্তানুযায়ী ব্যবসায়ী ও তীর্থযাত্রীদের নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া তিব্বতে যাতায়াতের কোনই বাধা ছিল না। তথাপি আমি সন্দেহমুক্ত হইবার জন্য চেষ্টিত হইলাম। আমি ভারতসরকারের নিকট আবেদন করিলাম যে তাঁহারা পশ্চিম তিব্বতে ভ্রমণাভিলাষী একদল বৈজ্ঞানিক অন্বেষণকারীকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা প্রদানের জন্য তিব্বত সরকারকে অনুরোধ করিবেন কি না। তদুত্তরে ভারতসরকার জানাইলেন যে, ইয়াটাং, গয়াস্তসী এবং গারটক্ বাণিজ্য-কেন্দ্র তিনটিতে যাইবার রাস্তা ভিন্ন অন্য কোন পথেই তিব্বতীয়েরা বিদেশীদিগকে যাইবার অনুমতি দিবে না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকারী-দিগের পক্ষে এ নিয়ম বিশেষরূপে কঠোর। সুতরাং গবমেণ্ট্ আমাদের দলকে কোনরূপ সাহায্য করিতে অসমর্থ। কাজেকাজেই আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার সখ অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

পরে আমাদিগকে তিনপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। প্রথম শারীরিক কষ্ট, দ্বিতীয় রাজনৈতিক বাধা, তৃতীয় দস্যু-তস্করের ভয়। শারীরিক কষ্টের কথা মনে করিয়া আমি বিচলিত হইলাম না, কারণ এবারকার পথ চন্দ্রভাগা উপত্যকার পথ হইতে সুগম। লাডকের শীত অপেক্ষা তিব্বতের শীত বেশী নহে এবং পথের রসদাদি পূর্ব্ববারের ন্যায় সঙ্গে লওয়াই স্থির করিলাম। তৎপরে ভাবিলাম রাজনৈতিক বাধা। তিব্বতসরকার যদি আমাদিগকে ফিরিতে বাধ্য করান? তবুও হিমালয়ের অপরপার্শ্বের কিছুদূর ত ভ্রমণ করিতে পারিব, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম। তৃতীয় ভয় দস্যু-তস্করের। অনেকদিন হইতেই এ প্রদেশে দস্যু-তস্করের ভয় আছে। তাহারা অসহায় পথিকদিগকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত করে, এমন কি তাহাদের প্রাণহানি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহাদের অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনী ল্যাণ্ডর (১৮৯৬) শেরিং (১৯০৫) স্বেন হেডিন্ (১৯০৭) ও সত্যদেব (১৯১৫) প্রভৃতি আধুনিক পর্য্যটকগণও বর্ণনা করিয়াছেন। তিব্বতসরকার ইহাদিগকে দমন করিতে অসমর্থ। ইহাদের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন—এমন কি ভারতসরকারের দূত শেরিংও ইহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পান নাই। পথে তাঁহার ঘোটকাদি অপহৃত হয় এবং তিনি বহুকষ্টে দ্রব্যগুলি উদ্ধার করেন। যদিও আমার সঙ্গে পিস্তল ও বন্দুক ছিল, তবুও আমি নির্ভয় হইতে পারিলাম না; কারণ প্রত্যেক তিব্বতীয়দের ন্যায় ইহাদের কাছেও বন্দুক ও পিস্তল প্রভৃতি থাকে।

এইবার আমার সঙ্গী হইলেন অধ্যাপক চরণসিংহ, অধ্যাপক বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক কাশ্মীরা সিংহ ও অধ্যাপক হরকিষণ সিংহ। ইঁহারা সকলেই খালসা-কলেজের অধ্যাপক। ইঁহারাও সঙ্গে একটি বন্দুক লইলেন।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি উদ্ভিদ্‌বিদ্যার ছাত্রও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছুক হইল। কিন্তু এতগুলি ছাত্র সঙ্গে লইয়া তিব্বত-রাজ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব। কাজেকাজেই আমাদের সঙ্গে কিছুদূর তাহাদিগকে লইয়া গিয়া আবার ফেরৎ পাঠাইয়া দিব স্থির করিলাম। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে পাঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া স্যার জন্ মেনার্ড শিক্ষিত সমাজের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

এক্ষণে আমাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আরম্ভ করা যাক। আমরা স্কন্দপুরাণের নির্দ্দেশানুযায়ী পথে তিব্বতে প্রবেশ করিব স্থির করিলাম। এই পথ কর্ণালী নদীর

তীর ধরিয়া কুমাউনের ভিতর দিয়া গিয়াছে। পরে এই পথ পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহের মধ্য দিয়া হ্রদের দিকে গিয়াছে ও তৎপরে পশ্চিমে বাঁকিয়া পুনরায় হিমালয় অতিক্রম করিয়া গাড়ওয়ালের ভিতর দিয়া বদরীনাথে আসিয়াছে। শেরিংও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিব্বত যাইবার সময় এই পথে গিয়াছিলেন। কিন্তু ফিরিবার সময় তিনি পশ্চিম দিকের বিভিন্ন পথ দিয়া সোজা কুমাউনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সুলিখিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সহিত এই প্রদেশের দুখানি সুন্দর সুন্দর মানচিত্র পাওয়া যায়। ঐ মানচিত্রে থোলিং-মঠের স্থাননির্দ্দেশ ভুল হইয়াছে।

আমরা ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন লাহোর পরিত্যাগ করিয়া তৎপরদিন কাঠগুদামে পৌছি। সেই দিনই ২২ মাইল পথ মোটরে অতিক্রম করিয়া নৈনিতালে যাই। ১৫ই তারিখে আমরা আলমোড়াতে পৌছি। আলমোড়া নৈনীতাল হইতে ৮৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে যানবাহনের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত দুইদিন অপেক্ষা করিলাম। এখান হইতে কয়েকখানি পরিচয়পত্র ও বনবিভাগের ডাকবাঙ্গালাগুলিতে থাকিবার অনুমতি-পত্র যোগাড় করিলাম। মালপত্র বহন করিবার জন্য ১৬টি খচ্চর ঠিক করা হইল। রাস্তার গাছ-গাছড়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিব বলিয়া আমরা আপাততঃ পদব্রজে যাওয়াই স্থির করিলাম।

গাঙ্গুলীহাট হইতে ছাত্রবন্ধুরা ভিন্ন-পথে আলমোড়া ফিরিবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। এই স্থানটি চাবাগিচা শোভিত বেনী-নাগ হইতে অল্প দূরে অবস্থিত। পথে আমরা নানাপ্রকার লতাগুল্মের নমুনা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি। পরে সেগুলি অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্যবহার করা হইয়াছে। বংশ গাঙ্গুলীঘাট হইতে ১০ মাইলের পথ। পথটি বড়ই দুর্গম—যেমন উঁচু রাস্তা তেমনই গরম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে আমরা বংশে পৌছিলাম। জিনিষপত্র অনেক পরে আসিল। এখান হইতে ৭ মাইল পথ চলিয়া আমরা পিথোরা-গড়ে পৌছি। পিথোরা-গড় শোর-পট্টির প্রধান নগর। স্থানটি জনবহুল কৃষিকার্য্যোপযোগী উন্মুক্ত মাঠেরও এখানে অভাব নাই।

আসকোট পৌছিবার কিছু পূর্ব্বে আমরা হিমালয়ের প্রসিদ্ধ চূড়া নন্দাদেবী (২৫৬৮৯ ফুট উচ্চ) খুব স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম। আকাশের অবস্থা ভাল থাকিলে এই শৃঙ্গটি আলমোড়া হইতেও দেখা যায়। রামগঙ্গার

রিঙ্গাঘাটে যাত্রীদল
বামদিক হইতে—অধ্যাপক বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়, লেখক, অধ্যাপক চরণসিংহ, অধ্যাপক কাশ্মীরা সিংহ ও অধ্যাপক হরকিষণ সিংহ

পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ার জন্য আমাদিগকে ঘোরা পথে আসকোট আসিতে হইল।

১লা জুলাই আমরা আসকোটে পৌছি। স্থানীয় বাসিন্দা কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ ও তাঁহার পিতার নামে পরিচয়পত্র ছিল। তাঁহারা ডাকবাঙ্গালাতে আমাদের সহিত দেখা করিলেন। কালী ও গৌরী নদীর

সঙ্গমস্থল এখান হইতে বেশী দূরে নহে। এখানে পরগাছা আলোকলতা ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছের অভাব নাই। এখান হইতে রওনা হইয়া বালাকোটে পৌঁছি। বালাকোটে পৌঁছিতে পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া গেল। কুলীদের অসাবধানতায় খচ্চরগুলিও পথ ভুল করিয়া অগম্য স্থানে গিয়া পড়িল। অবশেষে কুলীরা বহুকষ্টে মালগুলি বহন করিয়া আনিল। সে রাত্রে আর আহার হইল না এবং পরদিনও প্রাতরাশ ঠিক সময়ে হইল না।

৩রা তারিখে আমরা ধরচুলা পৌঁছি। এই গ্রামে একটি ভাল পাঠশালা আছে। এই পথ দিয়া তিব্বতে যে-সকল বাণিজ্য-সম্ভার যায় তাহার তালিকা করিবার জন্য এখানে একটি আফিস আছে। গারব্যাং এখান হইতে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে যাইবার নিমিত্ত কুলী নিযুক্ত ও অন্যান্য বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমাদিগকে এখানে তিন দিন অপেক্ষা করিতে হইল। এই পথে খচ্চর বা ঘোড়া চলে না; কারণ সুপ্রসিদ্ধ নিরপানী গিরিপৃষ্ঠকে সকলেই ভয় করে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কুলী পাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।

এখানেই আমরা একজন দ্বিভাষী নিযুক্ত করিলাম। চৌদানের ভোটিয়ারা (ভুটিয়া নহে) ও পার্শ্বস্থ গ্রামের বায়ানরা সর্ব্বদাই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য তিব্বতে যায়। এখানকার লোকে খুব ভাল তিব্বতী ভাষা জানে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দ্বিভাষী হইলেন একজন রমণী। তাঁহার নাম রুমাদেবী। তিনি একটি সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা এবং ৺ রায় সাহেব পণ্ডিত গোবীরিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্রী। রুমাদেবী চিরকুমারী এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সৎকার্য্যে দান করিয়া তিনি জনসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। তিব্বতযাত্রীদিগকে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন কর্ম্মী ও তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে চারবার মানস-সরোবর ও কৈলাশ দর্শন করিয়াছেন। ধরচুলাতে তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। বাণিজ্য-ঘাটীর মুন্সীজির অনুরোধে তিনি আমাদের সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিব্বতের ভীষণ শীত ও পথের নানাপ্রকারের কষ্ট তিনি যেরূপভাবে সহ্য করিতেন তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি কোনক্রমেই তাঁহার ফটো তুলিতে দিলেন না। তাঁহার ২০ বৎসর পূর্ব্বে তোলা একখানি ছবি দেওয়া হইল। ধনী তিব্বতীয় মহিলারা কিরূপ বস্ত্রাদি ও অলঙ্কার পরে তাহা ঐ ছবি হইতেই বোঝা যাইবে।

গারব্যাং গ্রামনিবাসী রুমাদেবী
(২০ বৎসর পূর্ব্বের গৃহীত ছবি)

ধরচুলা ছাড়িয়া কিছুদূর গেলেই অনেকগুলি উষ্ণ উৎস দেখা যায়। নিকটেই একটি ছোট নদী আছে। নদীতীরে আমরা প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলাম। ৭ই

জুলাই ধরচুলা হইতে রওনা হইয়া ১০ই তারিখে আমরা নিরপানী গিরিপৃষ্ঠ অতিক্রম করিলাম। পথে এক বিন্দু জল পাইবার উপায় নাই বলিয়াই ইহার নাম নিরপানী হইয়াছে। পথটি দুর্গম—বহুবার খাড়াই ওঠা নামা করিতে হয়। পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি ধাপ আছে—তাহারই সাহায্যে অতিকষ্টে অগ্রসর হইতে হয়। জলাভাবে ভারবাহী কুলীদের অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইল। এই প্রদেশের অধিবাসীরা অত্যন্ত শ্রমশীল ও কষ্টসহিষ্ণু।

কালী নদীর শাখার জলপ্রপাত

ক্রমে আমরা একটি নদীর নিকট আসিয়া পৌছিলাম। সকলেই নদীতীরে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কুলীরা প্রাণ ভরিয়া জলপান করিল। নদীটি কালী নদীর সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে একটি চমৎকার জল-প্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে। তিনটি বিভিন্ন স্থান হইতে প্রপাতটির ছবি লইলাম। এইরূপ ছোট বড় জল-প্রপাত হিমালয়ে অনেক দেখা যায়। কালী-নদীর কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে আর-একটি প্রপাত দেখিলাম। কর্ণেল ট্যানার এই প্রপাতটির একটি বিশদ বিবরণ তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দিয়াছেন। প্রকৃত-পক্ষে এগুলি জল-প্রপাত নহে। পাহাড়িয়া-নদী হঠাৎ গতিপরিবর্ত্তনকালে সমতার পার্থক্য হেতু এইসকল প্রপাত সৃষ্টি করে। দুরারোহ নিরপানী গিরিপৃষ্ঠ যাহাতে অতিক্রম করিতে না হয় সেইজন্য নদীর তীর দিয়া একটি রাস্তা হইতেছে। কিন্তু নদীর উপরকার একটি সেতু ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আমাদিগকে এই দুর্গম পথেই অগ্রসর হইতে হইল।

নদীর তীরে মাল্‌পা নামক একটি ছোট গ্রামে আমরা তাবু খাটাইলাম। এখানে নদীটি দুইটি পাশাপাশি পর্ব্বতের মধ্যস্থিত অপ্রশস্ত উপত্যকার ভিতর দিয়া প্রবাহিত। দক্ষিণতীরে পর্ব্বতগাত্রে কতকগুলি গুহা আছে। গুহা-গুলিতে পথিকরা রাত্রিযাপন করে। পরদিন আমরা বুধিগ্রামে আসিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলাম। বুধিগ্রাম মাল্‌পা হইতে ৩ ক্রোশের পথ। বিচক্ষণ হিমালয়-পর্য্যটক কর্ণেল ট্যানার বলেন—"আমি হিমালয়ের অন্তর্গত যতগুলি পার্ব্বত্য গ্রাম দেখিয়াছি তন্মধ্যে বুধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" সত্যসত্যই এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। রাস্তার ধারে গাছপালা-ঘেরা একটি ছোট মাঠ আছে। সেখানে আমরা তাঁবু খাটাইলাম। শুনিলাম গ্রামের ভিতরকার রাস্তাঘাটগুলি অতিশয় অপরিষ্কার। গ্রামের গলিগুলি দুর্গন্ধ কর্দ্দমে পরিপূর্ণ এবং তাহাতে চলাফেরা করা কষ্টসাধ্য।

আমার নিকট ঔষধ আছে খবরটি প্রচার হইয়া গিয়াছিল। দলে দলে লোক আমার নিকট ঔষধ লইতে আসিতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিয়াই বুঝিলাম যে বুধিগ্রাম ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর। প্রতিবারই পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিবার সময় আমি কতকগুলি প্রয়োজনীয় ঔষধ সঙ্গে রাখি। আমার চিকিৎসাশাস্ত্রে কিছু জ্ঞানও আছে। আমার ঔষধে অনেকের উপকার হইল।

বুধিগ্রাম হইতে তিন মাইল খাড়া পথ অতিক্রম করিবার পর বিভিন্ন বর্ণের ফুলফল-শোভিত একটি সমতল ভূমি আমাদের নয়নগোচর হইল। এতখানি কষ্টসাধ্য ও দুর্গম পথ চলিবার পর এরূপ সুন্দর স্থানটি দেখিয়া আমরা পথের কষ্ট ও অবসাদ ভুলিয়া গেলাম। উপত্যকার

গারব্যাং উপকণ্ঠস্থ ঝাউবন

সুশীতল বায়ুতে আমাদের ক্লান্তি দূর হইল। এই স্থানটির উচ্চতা ১১০০০ ফুট। নিকটেই ঝাউ ও দেবদারুর সুন্দর বন। এই বৃক্ষসমূহের ফল হইতে স্থানীয় অধিবাসীরা লিখিবার কালী প্রস্তুত করে। এখানে নানা প্রকার নূতন নূতন লতা-গুল্মাদিও দেখিলাম। এই উপত্যকার শেষ

গারব্যাংএ প্রাপ্ত ফার্ণ

প্রান্তে গারব্যাং গ্রাম। গ্রামটি নদী হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত। গারব্যাং দূর হইতে একখানি ছবির মত দেখায়। এখান হইতে নেপালের তুষারমণ্ডিত হিমালয় দেখা যায়। কালীনদী ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের ও নেপালের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। কালী ও গৌরী নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল হইতে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কালীনদীর অপর পারস্থ নেপালের পাহাড়গুলি ততই আমাদের দৃষ্টিপথে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। এই গ্রামে আমরা আমাদের পথপ্রদর্শক ও দ্বিভাষী রুমাদেবীর সুন্দর ও সুসজ্জিত গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তাঁহার বাড়ীর ঘরগুলি অন্যান্য পার্ব্বত্য গৃহের ন্যায়ই নীচু কিন্তু বেশ আরামপ্রদ। মিঃ ল্যাণ্ডর যখন গারব্যাং আসিয়াছিলেন তখন তিনি এই বাড়ীর ঠিক পার্শ্বের বাড়ীতে (রুমাদেবীর পিতৃব্যের বাড়ীতে) ছিলেন।

আমরা তিব্বতে প্রবেশের অনুমতি পাইব কি না এই আশঙ্কায় খুব উৎকণ্ঠার সহিত সময় যাপন করিতেছিলাম। ভয়ের কারণ—তিব্বতবাসীরা সহজে তাহাদের দেশে বিদেশীদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না। রাস্তাতেও এই প্রদেশের অনেক লোক আমাদিগকে ঐ কথা বলিয়াছিল। আমার বন্ধুরা বারংবার আমার বিদেশীয়ত্বের পরিচায়ক সোলার টুপিটা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বিনা কারণে এইরূপ দরকারী জিনিসটিকে ত্যাগ করিতে রাজী হইলাম না। গারব্যাং পৌছিয়া নিশ্চিতরূপে অবগত হইলাম যে আমাদের তিব্বত প্রবেশের পথে কোনই বাধা নাই। অনেকে বলিল যে আমার সোলাটুপিটি রাস্তায় খুব কাজে আসিবে, কারণ দস্যু ও তস্করেরা হ্যাটধারী লোককে সহজে আক্রমণ করে না। তাহাদের বিশ্বাস যে হ্যাটধারী লোকের নিকট বন্দুক থাকে। সুতরাং টুপিটি রাখাই স্থির করিলাম।

গারব্যাং অবস্থান-কালে আমি তথাকার অধিবাসীদের রীতি নীতি ও জীবনযাত্রা-প্রণালী ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে আমাদের অবস্থান-কালে আমাদের এক প্রতিবেশীর পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় তাহাদের জন্ম-উৎসব দেখিবার সুযোগ পাইলাম।

গাব্‌ব্যাং গ্রামের একটি উৎসবমত্ত পরিবার

সিমী, একটি ভোটিয়া পুরুষ

বাড়ীর লোকে উৎসব-বেশ পরিধান করিয়া দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিল। তৎপরে সকলেই গৃহজাত মদ (জান) আনন্দসহকারে পান করিল। আমি এই উৎসবমত্ত পরিবারের একখানি ছবি লইলাম। প্রসূতি কস্তুরীমৃগের দন্ত-নির্মিত হার এবং প্রবাল প্রভৃতির অলঙ্কার ধারণ করিল। অন্য সকলে তাহাদের উৎকৃষ্ট পোষাক পরিধান করিল। প্রত্যেকেই পৃথক্‌ভাবে ফটো তুলিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু আমার সঙ্গে বেশী প্লেট না থাকায় আমি একসঙ্গে সকলের ছবি লইলাম।

আসল ভোটিয়াদের প্রতিরূপের নিদর্শন গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে আমি ভোটিয়া পুরুষ ও রমণীর আরও দুখানি ছবি লইলাম। পুরুষটির নাম সিমী। সে দুই বৎসর নেপালে ব্যবসা করিয়া দেশে ফিরিবার পথে আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল। তাহার নিকট হইতেই তাহাদের আচার-ব্যবহারের অনেক কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনিয়া লইলাম। সে একদিন আমাকে তাহাদের গ্রাম্য-আড্ডা রামবাগে লইয়া গেল। সেখানে যুবক-যুবতীরা পান ভোজন ও নৃত্যগীতাদি করে। সিমী লোকটি বেশ আমুদে ও বুদ্ধিমান্।

যে স্ত্রীলোকটির ছবি লইয়াছি তাঁহার নাম সীনলতি ইনি আমাদের আশ্রয়দাত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। সীনলতি অন্যান্য ভোটিয়া রমণীর ন্যায় অলঙ্কার পরেন। রুমাদেবী আরও দুটি ভগ্নীর কথা বলিলেন। একটির কুটি গ্রামের মণ্ডলের সহিত বিবাহ হইয়াছে। অপরটির নাম নাথ্‌লী। মিঃ ল্যাণ্ডর তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে নাথ্‌লীর খুব প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু সে কিছুদিন হইল মারা গিয়াছে। ইহারা সকলেই বেশ বিনয়ী ও ভদ্র। এ গ্রামেও যথাসাধ্য ঔষধ বিতরণ করিলাম। অনেক পুরাতন রোগী ঔষধ লইতে আসিল। তাহাদের কিছুই করিতে পারিলাম না।

অবশেষে আমাদের যানবাহন ও একমাসের উপযুক্ত রসদ সংগ্রহ করা হইল। কিছু কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমরা নিম্নভূমি হইতে সঙ্গে আনিয়াছিলাম। এ প্রদেশের হাটে প্রচুর পরিমাণে মেষ-মাংস পাওয়া যায়। আমরা

সীনর্মাতি, কুটি গ্রামের একটি রমণী

নিজেদের জন্য একটি করিয়া টাট্টু ঘোড়া ও জিনিস বহিবার জন্য কতকগুলি খচ্চর লইলাম। মোট কুড়িটি জানোয়ার সঙ্গে লওয়া হইল।

এবারে লিপুলেখ গিরিবর্ত্মের অপরপার্শ্বস্থ তাকলাকোট গ্রামে থামিব স্থির করিলাম। তাক্‌লাকোটে তিব্বতের একটি প্রধান হাট বসে। স্থানটি প্রায় ১৬৭৮০ ফুট উচ্চ। পথে কুটি গ্রাম দেখিবার ইচ্ছা হইল। সঙ্গীদিগকে তাক্‌লাকোটের দিকে অগ্রসর হইতে বলিয়া ১৫ই জুলাই একটি পথপ্রদর্শক ও কুলী লইয়া আমি কুটি গ্রামের পথে রওনা হইলাম। কুটিগ্রাম কালীনদীর উৎপত্তিস্থলের অতি নিকটে অবস্থিত। পথে খুব কষ্ট পাইলাম। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও তুষারপাতের দরুন্ নদীগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। একস্থানে ঘোড়া সহ যাওয়া অসম্ভব হইল। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এইস্থানেই গ্রামের মণ্ডলের (রুমাদেবীর ভগ্নীপতির) সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার অনুচরের নিকট ঘোড়া রাখিয়া একটি ভগ্ন বাঁশের সেতুর সাহায্যে কোন প্রকারে নদী পার হইলাম। পথে আরও একটা নদী পার হইতে হইল। সময়-সংক্ষেপ বলিয়া আমি জলের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইলাম। সন্ধ্যার পর যখন কুটিগ্রামে পৌছিলাম তখন আমার আপাদমস্তক সিক্ত। মণ্ডলের বাড়ীতে আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিলাম। আমাদের আশ্রয়দাতা ও তাহার পত্নী সাধ্যানুসারে আদর-যত্নের ত্রুটি করিলেন না। পরের দিনও বৃষ্টি থামিল না বলিয়া এখানকার সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির ছবি লইতে পারিলাম না। এস্থানে বহু প্রস্তরীভূত অস্থি দেখিলাম। নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলি সঙ্গেও লইলাম। কুটি গ্রামখানি বাস্তবিকই অতি মনোরম। এই গ্রামের চমৎকার প্রাকৃতিক শোভা, নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর পুষ্পোদ্যান, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরীভূত অস্থি-সমূহ পর্য্যটকদিগের চিত্ত হরণ করে। এখানকার কুটিখার নামক স্থানের ভগ্নাবশেষও দ্রষ্টব্য। কিন্তু গ্রাম্য পথটির অবস্থা অতি শোচনীয়।

প্রায় ১৮ মাইল অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হইয়া আমি ১৭ই তারিখে অপরাহ্ণে আবার সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইলাম। আসিয়া শুনিলাম আমার সঙ্গীদের সহিত খচ্চরবাহীদের একটা গোলমাল হইয়া গিয়াছে। খচ্চরবাহীরা মদ খাইয়া মাত্‌লামি করার দরুনই এই সংঘর্ষ ঘটে। যাহা হউক গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে। পথের উভয়পার্শ্বেই নানারঙের বন্য গোলাপগুচ্ছ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

১৯শে তারিখে আমরা অপর একটি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিলাম। গিরিবর্ত্মটি উভয়পার্শ্বে ঢালু এবং বেশী উচ্চ নহে। এখানে এক নূতন প্রকার গুল্ম দেখিতে পাওয়া যায়। এই কোমল গুল্মগুলি বরফে ঢাকা মাটির উপরেও দেখা যাইতেছিল। এখানে আর কোনও উল্লেখযোগ্য দৃশ্য নাই। স্যার্ সিডনি বারার্ডের মতে

এই গিরিবর্ত্মটি ও নিকটস্থ অন্যান্য বর্ত্মগুলি হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্ভুক্ত নহে। এগুলি হিমালয়ের পার্শ্বস্থ জাস্কর গিরিমালার অন্তর্গত। এই গিরিমালা তিব্বতকে ভারতবর্ষ হইতে বিভক্ত করিয়া দণ্ডায়মান আছে। গঙ্গানদীর অনেকগুলি শাখা এই গিরিমালা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া হিমালয় ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। মিঃ বারার্ড হিমালয়-পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গগুলির অবস্থান ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ও যথারীতি ভৌগোলিক প্রমাণ দিয়া তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন।

ঐ দিন অপরাহ্নে আমরা তাক্‌লা-কোটে (১৩৩০০ ফুট উচ্চ) উপস্থিত হইলাম। তাক্‌লাকোট কর্ণালী নদীর তীরে অবস্থিত। নদীটি জাস্কর পর্ব্বতমালার উত্তরস্থিত লাডক্ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া নেপালের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে গঙ্গা-নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই স্থানটি একটি ব্যবসা-কেন্দ্র। এই হাটে ভোটিয়ারা ও বায়ানরা তিব্বতীয়দের সহিত ক্রয়-বিক্রয় করে। তিব্বতীয়রা সাধারণতঃ পশম, সোহাগা ও লবণ বিক্রী করে। ভোটিয়া ও বায়ানরা কার্পাস-বস্ত্রাদির ব্যবসা করে; তিব্বতীয়রা খাদ্য-শস্যও ক্রয় করে। পশ্চিম তিব্বতে তাক্‌লাকোট এবং অপর কয়েকটি ঢালু জায়গায় চাষ-আবাদ হয়, কারণ এ-সকল স্থানে জল পাওয়া যায়। এখানে যব, মটর ও সরিষা জন্মে। পশ্চিম তিব্বতে বহু পতিত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ সকল স্থানে চাষ-আবাদ করা অসম্ভব। শৈত্যাধিক্য, জলাভাব ও অল্পকালস্থায়ী গ্রীষ্ম ঋতু—এই তিনটি কারণে উচ্চ স্থানে চাষ-আবাদ হয় না। এ-প্রদেশে ভবঘুরেরাই বাস করিতে পারে, কারণ আবাদ হয় না বলিয়া স্থায়ীভাবে কেহই বাস করিতে চাহে না।

আমরা একটি গভীর নদীর তীরে তাঁবু খাটাইলাম। নদীর অপর পাশে হাট বসে—সেখানে ভোটিয়ারা তাঁবু ফেলিয়াছে। কিছু দূরে তিব্বতীয়দের তাঁবুও দেখিলাম। বাজার হইতে কিছু উচ্চে অবস্থিত—তাক্‌লাখার অর্থাৎ ভিক্ষুদের মঠ ও তিব্বতীয় রাজকর্ম্মচারীর আফিস। কর্ম্মচারীটির পদবী জংপেন অর্থাৎ তহশিলদার। একটি ব্যবসায়ী লাসা হইতে আসিয়াছিল—তাহার নিকট হইতে কতকগুলি ছোট ছোট কার্পেট কিনিলাম।

স্থানটি ভাল করিয়া দেখিবার ও অন্যান্য বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত এখানে চারি দিন অপেক্ষা করিলাম। একদিন ভিক্ষুদের মঠ দেখিতে গেলাম। অন্যান্য তিব্বতীয় মঠের ন্যায় এখানেও অন্ধকার কুঠরী, প্রার্থনা-চক্র, প্রস্তরমূর্ত্তি, মুখোস, শিঙ্গা, দেওয়াল-চিত্র প্রভৃতি দেখিলাম। তহশিলদার মহাশয়ের সহিতও দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার পত্নী গৃহদ্বার হইতে আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। এই সুশ্রী ও মিষ্টস্বভাবসম্পন্না মহিলাটির সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হইলাম। তিব্বতীয়দের মধ্যে লাসার লোকেরাই দেখিতে সুশ্রী। তহশিলদার মহাশয় এই বৎসরই এখানে আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার কার্পেটমণ্ডিত দরবার-গৃহে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঐ গৃহে নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র
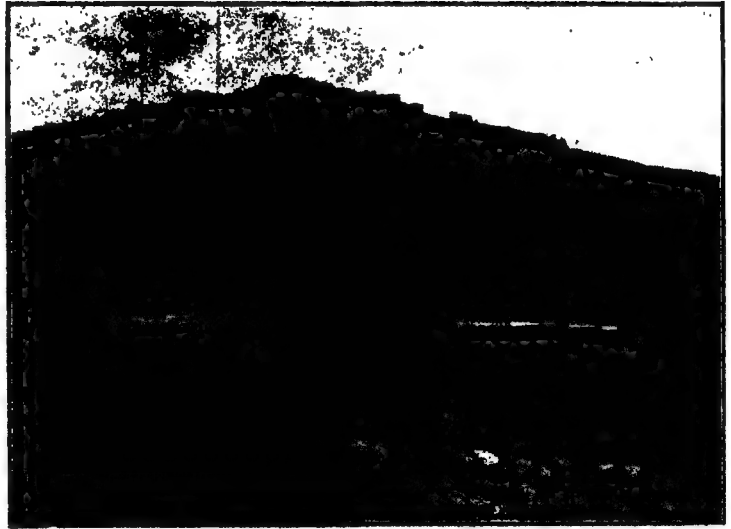
তাক্‌লাকোটের ভিক্ষুদের মঠ
নীচে ভোটিয়া সদাগরদের তাঁবু দেখা যাইতেছে

ঝুলান রহিয়াছে দেখিলাম। আমরা সেই গৃহে প্রবেশ করিতেই তিনি তাঁহার মঞ্চোপরিস্থ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সম্মুখে অনেকগুলি তিব্বতীয় মুদ্রা (তঙ্কা—প্রত্যেকটি প্রায় পাঁচ আনা) পড়িয়া ছিল। ঘরটি বেশ পরিষ্কার ও সুসজ্জিত—মঠগুলির ন্যায় অপরিষ্কার নহে। ঘরে অনেকগুলি লোক ছিল। তিব্বতীয়দের দাড়ি গোঁফ না থাকায় কে পুরুষ কে স্ত্রীলোক স্থির করা কঠিন। একটি লোককে খুব সুশ্রী দেখিয়া আমাদের কৌতূহল হইল। শুনিলাম তিনি তহশিলদার মহাশয়ের একজন কর্ম্মচারী। দ্বিভাষীর সাহায্যে আমরা তহশিলদার মহাশয়ের সহিত কিছুক্ষণ
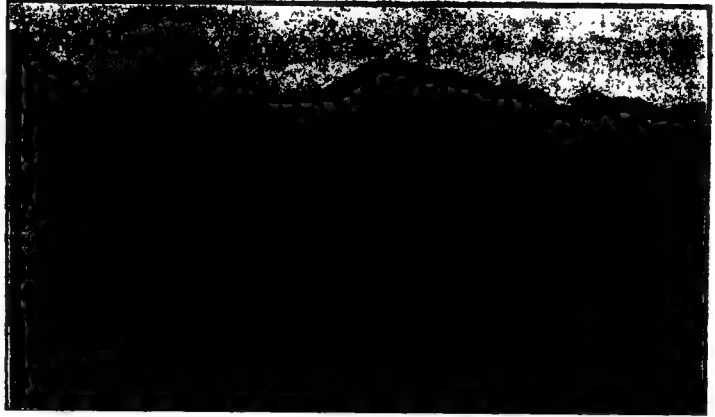
খেচরনাথের মন্দির, দূরে হিমালয়-পর্ব্বত দেখা যাইতেছে

খেচরনাথের একজন বিশিষ্ট লামা

আলাপ করিলাম। তিনি আমাদিগকে কতকগুলি ফল খাইতে দিলেন। আমরাও আসিবার সময় তাঁহার পুত্রকে কিছু উপহার দিলাম। ফিরিবার সময় আবার তহশিলদার-পত্নী তাঁহার স্বভাবসুলভ সৌজন্যে আমাদিগকে দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া গেলেন।

খেচরনাথের মন্দির তাকলাকোট হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা অশ্বারোহণে সেখানে গেলাম। মন্দিরে অনেকগুলি বড় বড় মাটির মূর্ত্তি দেখিলাম। নানা প্রকারের পিতলের মূর্ত্তিও মন্দিরাভ্যন্তরে দেখিলাম। সম্ভবতঃ এগুলি প্রাচীন নেপালী শিল্পের নিদর্শন। ভারতবর্ষের তীর্থস্থানের পাণ্ডাদের ন্যায় এখানকার পুরোহিতরাও তীর্থযাত্রীদের নিকট হইতে যথাসাধ্য আদায় করিবার চেষ্টায় থাকে। এখানে এই প্রদেশের একজন শ্রদ্ধাস্পদ লামার সাক্ষাৎ পাইলাম।

এইবার আমরা জ্ঞানিমা রওনা হইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। জ্ঞানিমা এই প্রদেশের একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র। এস্থান হইতে মানস-সরোবর ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ২৪শে জুলাই অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় আমরা তাকলাকোট হইতে রওনা হইলাম। সেদিন আমরা মাত্র ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম। তাকলাকোট হইতে দুই মাইল দূরে শিখ নেতা জোরাওর সিংহের সমাধিস্থল দেখিতে পাইলাম। তিনি লাসা অভিযানের পথে সসৈন্যে এখানে মারা যান।

জ্ঞানিমা হাট

পথে আমাদের সহিত তিন দল নেপালী তীর্থযাত্রীর সাক্ষাৎ হইল। তাহারা তীর্থদর্শনান্তে বাড়ী ফিরিতেছিল। মানস-সরোবর হইতে প্রত্যাগত দুইটি ভারতীয় তীর্থ-যাত্রীর সহিত আমাদের পথে দেখা হইল। ইঁহাদের একজন কুমাউনের ওভারসিয়ার, অপরজন একটি বেহারী। পথে আমাদের সহিত আরও তিনজন ভারতীয় সাধুর সাক্ষাৎ হয়—ইহা ছাড়া আমাদের সহিত আর কোন ভারতবাসীর সাক্ষাৎলাভ ঘটে নাই।

বনের মধ্যে একটি ছোট নদীর তীরে আমরা তাঁবু খাটাইলাম। হঠাৎ একজন বলবান্ তিব্বতী পুরুষ সস্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটি আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আমরা তাহার কথা কিছুই বুঝিতে না পারায় তাহারা চলিয়া গেল। উহারা দস্যু—বোধ হয় আমাদের সংখ্যাধিক্য ও বন্দুক দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল। এ স্থানটিতে ভয়ঙ্কর শীত; বাতাসও অত্যন্ত ঠাণ্ডা। যাহাতে শরীরের অনাবৃত অংশগুলি না ফাটে সেইজন্য সাবধান হইলাম। এখান হইতেই অনুমান করিলাম তিব্বতে কি ভীষণ শীত।

২৬শে তারিখে আমরা গুরুলা গিরিবর্ত্ম দিয়া লাডক্ পর্ব্বত (১৬২০০ ফুট উচ্চ) অতিক্রম করিলাম। দক্ষিণে গুরুলা-মান্ধাতা পর্ব্বত। প্রবাদ যে রাজা মান্ধাতা এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম গুরু-মান্ধাতা। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ লংষ্টাফ্ এই পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে গিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছিলেন। আমাদের পশ্চাতে হিমালয়-পর্ব্বত দেখা যাইতে লাগিল।

বেলা দশটার সময় আমরা গিরিবর্ত্মটির সর্ব্বোচ্চস্থানে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতেই আমরা এক ঝলক্ কৈলাস-পর্ব্বতের তুষারমণ্ডিত ত্রিকোণ চূড়াটি দেখিতে পাইলাম। এই বিশাল এবং মহিমাময় পর্ব্বতটির সন্দর্শন লাভ করিবার জন্যই আমরা এত শ্রম স্বীকার করিয়া এতদূর আসিয়াছি। আরও এক দিনের পথ অতিক্রম করিলে আমরা কৈলাস-পর্ব্বতের সন্নিকটে যাইব। বাতাসের লঘুত্ব হেতু এ প্রদেশের দূরত্ব ঠিক করা যায় না। এই পর্ব্বত হইতে আমাদের বামদিকে রাক্ষস তাল। মানস-সরোবর এখনও দেখিতে পাই নাই। কৈলাস-পর্ব্বত গুরুলা-পর্ব্বত হইতে উচ্চতায় ছোট। এই মহিমামণ্ডিত বিশাল পর্ব্বতটির সহিত অন্য কোন পর্ব্বতের তুলনা করা যায় না; কারণ সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া লোকে ইহাকে মহাদেবের আবাসস্থল বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে। মহাদেবের যে মূর্ত্তিকে হিন্দুরা
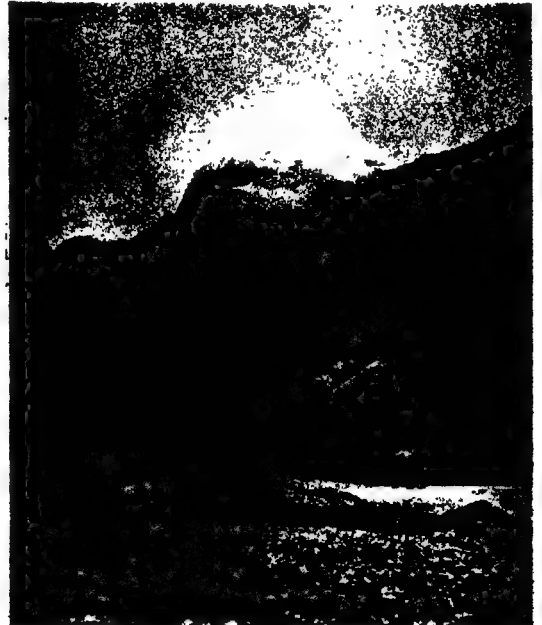
কৈলাস-চূড়া

পূজা করে, কৈলাস-পর্ব্বতের আকৃতি অনেকটা সেইরূপ; এই কারণেই বোধ হয় এই পর্ব্বতটির সহিত মহাদেবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

কিছুদূর অগ্রসর হইলেই রাক্ষস-তাল ও তন্মধ্যস্থ দ্বীপগুলি দৃষ্টিপথে পড়ে। একটি দ্বীপে স্তূপীকৃত শ্বেত পদার্থ দেখিলাম। লোকে বলে ঐগুলিই পূর্ব্বকালের রাজহাঁসের ডিমের ভাঙ্গা খোলস। আমরা চলিতে চলিতে চারিদিকের ঝোপ হইতে খরগোসগুলিকে নির্ভীকভাবে বিচরণ করিতে দেখিলাম। এই পুণ্য তীর্থে কেহ উহাদিগকে মারিবার চেষ্টা করে না বলিয়াই উহারা মানুষ দেখিয়া ভীত হয় না। লোকে এখানে আসিয়া অহিংসাপরায়ণ হয়, শুধু খাদ্যের একান্ত অভাবে মেষ বধ করে। এখানে ডাকাতের ভয় আছে। এই জনশূন্য প্রদেশে পেশাদার ডাকাতের দল বাস করে না। কোন কোন ব্যবসায়ী ও মেষপালক এই উপায়ে নিজেদের উপার্জ্জন বৃদ্ধি করে। অল্পক্ষণ চলিবার পর আমরা এই হ্রদটিকে বেশ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইলাম। দূর হইতে পর্ব্বতবেষ্টিত হ্রদটিকে একটি জলপূর্ণ বাটির ন্যায় দেখা যাইতেছিল। হ্রদটির উত্তরে তুষারমণ্ডিত কৈলাস-পর্ব্বত, দক্ষিণে বিশাল গুরুলা-পর্ব্বত। অপরাহ্ণ ৪টার সময় হ্রদতীরে তাঁবু খাটাইলাম। আমি হ্রদে নামিয়া পড়িলাম। এখানে যেন শান্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। হ্রদে আধঘণ্টা তৃপ্তিসহকারে অবগাহন করিলাম। ক্রমে দলের অন্য লোকেও হ্রদে নামিয়া স্নান করিতে লাগিল। হঠাৎ একদল লোককে আমাদের দিকে আসিতে দেখিলাম। আমাদের বন্দুকাদি দেখিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

আমরা গোম্বুল মঠের অর্দ্ধমাইল দূরে তাঁবু খাটাইলাম। আমাদের দ্বিভাষী, দুগ্ধ, বন্যহাঁসের ডিম ও জ্বালানী কাঠ আনয়ন করিল। পরদিনও আমরা এই অপরূপ হ্রদতীরে বাস করিলাম। এই হ্রদের পদ্মফুল সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে। হ্রদের মধ্যে পদ্মফুলের ন্যায় একপ্রকার পীতাভ পুষ্প দেখিতে পাইলাম। জলে আরও নানা প্রকারের ফুল দেখিলাম। পর্য্যটক স্বেন্ হেডিন্ তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই সুন্দর হ্রদটির বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুগণ এই হ্রদ দেবতাদিগের লীলাস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। স্কন্দপুরাণে মানস-সরোবরের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি আখ্যান আছে। ব্রহ্মার পুত্রগণ কৈলাস-পর্ব্বতে তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহারা দেহ-শুদ্ধির জন্য জলাশয় খুঁজিয়া না পাওয়ায় ব্রহ্মা মনে মনে এই হ্রদটি সৃষ্টি করিলেন। এই কারণে হ্রদটির নাম মানস-সরোবর হইয়াছে।

মানস-সরোবর

মানস-সরোবরের আকৃতি একটি ডিম্বের ন্যায়। ইহার আয়তন প্রায় ১৩৩ বর্গ-মাইল, পরিধি ৪৫ মাইল ও ব্যাস ১৬ মাইল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে হ্রদটি ১৫০৯৮ ফুট উচ্চে অবস্থিত। স্বেন্ হেডিনের বর্ণনায় দেখা যায় যে হ্রদটির তলদেশ একখানি রেকাবীর আকৃতি ও একস্থানে ইহার গভীরতা ২৬৮·৪ ফুট। মানস-সরোবরে কোন দ্বীপ নাই। অনেকগুলি নদী এই হ্রদে পতিত হইয়াছে। জলে অনেক বন্য কুক্কুট সাঁতার কাটিতেছে দেখিলাম। হ্রদের তীরদেশে ৮টি মন্দির আছে।

রাক্ষস-তাল দেখিতে আরও সুন্দর। আঁকা-বাঁকা তীরভূমি ও মধ্যস্থিত দ্বীপগুলি তাহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কিন্তু ইহার উত্তরে ও দক্ষিণে পঙ্কিল ভূমি

গৌরীকুণ্ড হ্রদ

যোগ আছে কি না এই বিষয় লইয়া যুগ যুগ ধরিয়া নানা তর্ক বিতর্ক হইয়া আসিতেছে। দুইটি হ্রদের সংযোজক নালাটির সম্বন্ধে পরস্পর-বিরুদ্ধ অনেক বিবরণ পাঠ করা যায়। এই স্থানে চারটি পর্ব্বত পরস্পরের অতি সন্নিকটে দণ্ডায়মান। দক্ষিণে অভ্রভেদী হিমালয়-পর্ব্বত; তাহারই শাখা-স্বরূপ কিছুদূরে লিপুলেক্ গিরিবর্ত্মের নিকট হইতে জাস্‌কর পর্ব্বতমালা উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া দণ্ডায়মান। ইহার কিছু উত্তরে লাডক্-পর্ব্বত। হ্রদের ঠিক দক্ষিণে সুপ্রসিদ্ধ কৈলাস-পর্ব্বত। এস্থানে চারিটি নদীও আছে।

থাকার দরুন্ লোকে ইহাকে মানস-সরোবরের ন্যায় নিখুঁত বলে না। মানস-সরোবর হইতে এই হ্রদটি ৫০ ফুট নিম্নে অবস্থিত।

দুইটি হ্রদের জলই শীতকালে জমিয়া যায়। তখন লোকে হাঁটিয়া হ্রদ দুইটি পার হইতে পারে। তিব্বতীরা মানস-সরোবরকে মাবাং ও রাক্ষস-তালকে লাগাং নামে অভিহিত করে।

২৮শে জুলাই আমরা এই সৌন্দর্য্যময় স্থান হইতে রওনা হইয়া কৈলাস-পর্ব্বত অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কৈলাসের রাস্তা হ্রদের তীরদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া কিছু দূরে গিয়া পশ্চিমদিকে বক্র হইয়া গিয়াছে। পথে আমরা একটি হ্রদের তীরে তরঙ্গবিক্ষিপ্ত মৎস্য দেখিতে পাইলাম। তীর্থযাত্রীরা এইরূপ মৎস্য ভক্তিসহকারে সঙ্গে লয়। ঐ মৎস্য হইতে নানাপ্রকার ঔষধ হয় বলিয়া শুনা যায়।

পথে আমরা গোম্বুল মঠ দর্শন করিলাম। এখানকার স্মৃতি-চিহ্ন রাখিব মনে করিয়া একটি তাম্রমূর্ত্তি ক্রয় করিলাম। লামারা সাধারণতঃ এ-সকল মূর্ত্তি বিক্রয় করে না। ক্রমে আমরা রাক্ষস-তাল ও মানস-সরোবরের মধ্যস্থিত নালা অতিক্রম করিলাম। এখন নালাতে জল দেখিলাম না। নালার মধ্যে কয়েকটি উষ্ণোৎস আছে।

মানস-সরোবরের সহিত এই অঞ্চলের নদীগুলির কৈলাসের উত্তর দিকের নদীগুলি সিন্ধুনদের সহিত মিলিত হইয়াছে। হ্রদের উত্তরের পর্ব্বতমালা হইতে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হইয়াছে। লাডক্-পর্ব্বতের দক্ষিণ হইতে কর্ণালী নদী উৎপন্ন হইয়া হিমালয় অতিক্রম করিয়া গঙ্গানদীর সহিত মিশিয়াছে। হ্রদের পশ্চিম দিক্ হইতে শতদ্রু (সত্‌লজ্) নদী প্রবাহিত। ভারতবর্ষে ও ইউরোপে বহু লোকের ধারণা যে গঙ্গানদী মানস-সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ও সত্‌লজ নদী গঙ্গানদীর একটি অংশ। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে বাংলা-সরকার গঙ্গানদীর উৎপত্তিস্থল ঠিক করিবার উদ্দেশ্যে একদল কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন। তাঁহারা গঙ্গোত্রীকেই গঙ্গানদীর উৎপত্তিস্থল বলিয়া নির্ণয় করেন। সম্রাট্ আক্‌বরের প্রেরিত রাজকর্ম্মচারীরাও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন। সত্‌লজ্-নদীর এই হ্রদের সহিত সম্পর্ক আছে। ভূমিতলের অধঃস্থ প্রদেশ ভিন্ন মানস-সরোবরের জল-নির্গমের কোন পথ আছে বলিয়া অবগত হওয়া যায় না। অতিবৃষ্টি হইলে মানস-সরোবরের জল পূর্ব্বোক্ত ৬ মাইল লম্বা নালাটি দ্বারা রাক্ষস-তালের সহিত এক হয়। রাক্ষস-তালেরও জল-নির্গমের কোন পথ নাই। বোধ হইল মাটির নীচ দিয়া ইহার জল পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়, কারণ এই হ্রদটির পশ্চিম-

দিকে অনেকগুলি ঝরণা দেখিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শক নানা যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে উক্ত ঝরণাগুলি মানস-সরোবরের সহিত যুক্ত আছে। ইহা ঠিক ধারণা নয়। সত্‌লজ্‌-নদী এই-সকল ঝরণা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যদি ইহা সত্য হয় যে এই-সকল ঝরণার সহিত রাক্ষস-তালের যোগ আছে, এবং পূর্ব্বকথিত নালাটি ও মাটির নীচ দিয়া মানস-সরোবর ও রাক্ষস-তালের সহিত যুক্ত (স্বেন্‌ হেডিনের মতানুযায়ী), তাহা হইলে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণ হইতে যে-সকল নদী প্রবাহিত হইয়া মানস-সরোবরে পতিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কোন একটি হইতে সত্‌লজ্‌ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

এই স্থানটির একটি তিব্বতী চিত্র আমি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। যদিও চিত্রখানি নির্ভুল নহে তবুও তাহাতে এই জলপূর্ণ নালাটি বেশ দেখা যায়।

২৮শে জুলাই আমরা বর্‌খা-প্রান্তরে তাঁবু খাটাইলাম। এই প্রান্তরে মাত্র দুই ঘর লোকের বাস আছে। এখানে একজন তিব্বতী রাজকর্ম্মচারী থাকেন। তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহকারী আমাদের যথেষ্ট সমাদর করিলেন। বর্‌খা-প্রান্তরে বহু চমরী বিচরণ করিতেছে দেখিলাম। স্থানে স্থানে তিব্বতীদের তাঁবুও দৃষ্টিগোচর হইল।

এখানে আমরা একজন বাঙ্গালী সাধুর সাক্ষাৎলাভ করিলাম। বরফের উপর দিয়া ক্রমাগত চলিয়া তাঁহার পায়ের কয়েকটি অঙ্গুলি বিনষ্ট হইয়াছে। তাঁহাকে নিতান্তই বিপন্ন অবস্থায় দেখিয়া আমরা যথাশক্তি সাহায্য করিলাম। পুনরায় থোলিঙ্গ মঠের নিকট এই সাধুটির সহিত দেখা হয়। তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তিও কম নহে। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন— ব্রহ্মদেশ, লঙ্কাদ্বীপ ও নেপাল দেখিতেও বাকী রাখেন নাই। লাসাতে তিনি কিছুদিন বাস করিয়াছেন। তিনি পাঁচবার কৈলাস-পর্ব্বত দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ধৈর্য্য ও শক্তি অসীম; ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা শীত তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। এবৎসর তিনি খালি পায়ে তীর্থদর্শন

উঠান, জ্ঞানিমার একটি তিব্বতী বালিকা

করিবেন বলিয়া পণ করিয়াছেন ও তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কার্য্য করিতে সক্ষমও হইয়াছেন। এই শান্ত সৌম্য ও স্বাধীন চেতা সন্ন্যাসীটিকে দেখিয়া সত্য সত্যই ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। থোলিঙ্গ হইতে বদরীনাথ পর্য্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিয়া আমরা খুব আনন্দ পাইয়াছিলাম।

বার্‌খা হইতে তুষারকিরীটী কৈলাস-পর্ব্বত ভালরূপে দেখা গেল। এখান হইতে কৈলাসের ছবি না লইয়া অত্যন্ত ভুল করিয়াছিলাম। কারণ যতই পর্ব্বতটির নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই ওরূপ সুন্দরভাবে আর দেখিবার সুযোগ পাইলাম না। বোধ হয় কৈলাস-পতি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আর ভালভাবে আমাদিগকে দর্শন দিলেন না। যে কয় দিন এখানে ছিলাম প্রত্যহই আকাশে মেঘ-সঞ্চার হওয়ায় আর ভাল ছবি লইতে পারি নাই।

বার্‌খা হইতে মাত্র পাঁচ মাইল পথ সে দিন যাইতে পারিলাম। পথে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, বেশীদুর

গোলিঙ্গ মঠ

পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করে। এই উপায়ে কৈলাস দর্শন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। অদ্য আমরা কিছুদূর পদব্রজে গমন করিলাম। পথে সূর্য্যালোকে চোখ ঝল্‌সাইয়া যাইবার উপক্রম হইল। আমাদের সহিত চশ্‌মা ছিল—কিন্তু কুলীরা অত্যন্ত কষ্ট পাইল। ক্রমে আমরা দোলমালা পৌঁছিলাম। দোলমালা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮৫৯৯ ফুট্ উচ্চে অবস্থিত। ঠিক্ অপরপার্শ্বে গৌরীকুণ্ড-হ্রদ তুষারপাতে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। ঊর্দ্ধ হইতে শৈল-স্খলিত তুষার-স্তূপ এই হ্রদটিতে পড়িতেছে। স্বেন্ হেডিন এই হ্রদটিকে ২সো-কাবালা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এট্‌কিন্‌সন্ স্বরচিত হিমালয় সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, গৌরীকুণ্ড হ্রদ গুরুলা-পর্ব্বতের নিকটে অবস্থিত। কিন্তু সেখানে গৌরীকুণ্ড নামে কোন হ্রদ নাই। অনেকেই এই হ্রদটিকেই গৌরীকুণ্ড বলিল। আমরা এই হ্রদের দুই খানি ছবি লইয়াছি। ভক্ত তীর্থযাত্রীরা এই হ্রদে স্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে।

অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইল না। এবারে আমরা দ্বারচীনে তাঁবু খাটাইব। তিব্বতের সহকারী রাজকর্ম্মচারী আমাদের পথপ্রদর্শক হইলেন। আমরা প্রথমে কৈলাস-পর্ব্বতের সানুদেশ পরিক্রম করিব। কৈলাস-পর্ব্বতের চারদিকে চারিটি মন্দির আছে। প্রথম মঠটি দ্বারচীন গিরিপৃষ্ঠে অবস্থিত। এই গিরিপৃষ্ঠ হইতে কয়েকটি ছোট নদী উৎপত্তি লাভ করিয়া পর্ব্বতটিকে চক্রাকারে বেষ্টিত করিয়া রাক্ষসতালে পতিত হইয়াছে।

পরদিন আমরা দ্বারচীনে জিনিসপত্র রাখিয়া অপর একটি মঠের দিকে অগ্রসর হইলাম। সে মঠটি প্রদক্ষিণ করিয়া তৃতীয় মঠের সানুদেশে তাঁবু খাটাইলাম। পথে পর্ব্বতগাত্রে ভাঙ্গনের চিহ্ন দেখিলাম। দূর হইতে ভগ্ন অংশগুলি মন্দির দুর্গ প্রভৃতির ন্যায় দেখায়। শুনিলাম কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে ১০ জন লাডকের অধিবাসী দস্যুগণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। রাত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক অপর কয়টি তিব্বতী যাত্রীর সহিত মন্দিরের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পরদিন প্রাতে (৩১শে) জুলাই আমরা কয়েক মাইল চড়াই পথ অতিক্রম করিলাম। পূর্ব্বরাত্রে বৃষ্টি হওয়ার দরুন্ পার্ব্বত্য রাস্তাগুলি তুষারাবৃত হইয়াছিল। কৈলাস-পর্ব্বতে হিন্দুরা ও তিব্বতীরা অশ্বারোহণে যাওয়া পাপ-কার্য্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু আমরা তুষারাবৃত পথ অশ্বারোহণে অতিক্রম করিলাম। দ্বারচীনে একজন ধনী তিব্বতী বণিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি এক মাসে বারো বার পদব্রজে কৈলাস পরিক্রম করিয়াছেন। সময় সময় ভক্তিপরায়ণ তীর্থযাত্রী বার বার উঠিয়া ও শুইয়া এই

গৌরীকুণ্ড হইতে আমরা ক্রমে নামিতে আরম্ভ করিলাম। নামিবার সময় বেশী কষ্ট হইল। সে রাত্রিতে আমরা চতুর্থ মঠটির নিকট তাঁবু খাটাইলাম।

পরদিন (১লা আগষ্ট) আমরা পুনরায় দ্বারচীনে পৌঁছিলাম। আমাদের ভ্রমণ শেষ হওয়ায় এইবার দেশে ফিরিবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা যে পথে আসিয়াছি, ফিরিবার সময় সে পথে যাইব না স্থির করিলাম; কারণ তাহা হইলে পথ চলিতে আনন্দ পাইব না। এইবার আমাদের জ্ঞানিমা দেখিবার ইচ্ছা হইল। জ্ঞানিমা তিব্বতের একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ও এখান হইতে তিন দিনের পথ।

পথে একটিও গ্রাম দেখিলাম না। লাডক্-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ৪ঠা আগষ্ট্ জ্ঞানিমা পৌঁছিলাম। জ্ঞানিমাতে ঘর-বাড়ী দেখিলাম না—সমস্তই তাঁবু। হাটে প্রায় তিন শত তাঁবু দেখিলাম। এখানে বৎসরে দুই মাস হাট বসে। তৎপরে লোকজন এখান হইতে উঠিয়া গিয়া গার্‌টকে বাস করে। এই হাটে সাধারণতঃ

দর্মা ও জোহরের ভোটিয়ারা ক্রয়-বিক্রয় করিতে আসে। জোহরের ভোটিয়ারা খুব ধনী। ভারতীয় জরীপ-বিভাগের কর্ম্মচারী পণ্ডিত কিষণ সিংহ ও পণ্ডিত নয়ন সিংহ জোহরের অধিবাসী ছিলেন। তাকলাকোটের হাটে যে-সকল জিনিস ক্রয়-বিক্রয় হয় এখানেও সেই-সকল দ্রব্যই দেখিলাম। একটি জিনিসের দর-দস্তর লইয়া ভোটিয়া ও তিব্বতীদের মধ্যে কলহ বাধিয়া উঠিল। তিব্বতীরা ভোটিয়াদের উপর গুলি বর্ষণ করিতে উদ্যত হইল। ইতিমধ্যে তিব্বতী রাজকর্ম্মচারীগণ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া গোলমাল থামাইয়া দিলেন। এখানে কয়েকজন তিব্বতীর সহিত দেখা হইল, তাঁহারা ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেশ হিন্দী বলিতে পারেন। চিত্রের বালিকাটির পিতাও ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছেন। বালিকাটিও হিন্দুস্থানী জানে। তাহার নাম উটান। তাহার ফোটো তুলিতে চাহিলে সে জিজ্ঞাসা করিল—"কেয়া বক্‌শিস্ মিলেগা!" আমি সঙ্গে কিছু অল্পদামী অলঙ্কার ও খেলনা আনিয়াছিলাম। তাহাকে একটি হার উপহার দিলাম। সেই হারটি গলায় দিয়া বালিকাটি ছবি তুলিয়াছে। রাস্তায় অনেকস্থলে খেলনা দিয়া দুগ্ধ মাখম ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়াছি। পার্ব্বত্য দেশে সব সময়ে টাকা পয়সা দিয়া জিনিস সংগ্রহ করা দুষ্কর।
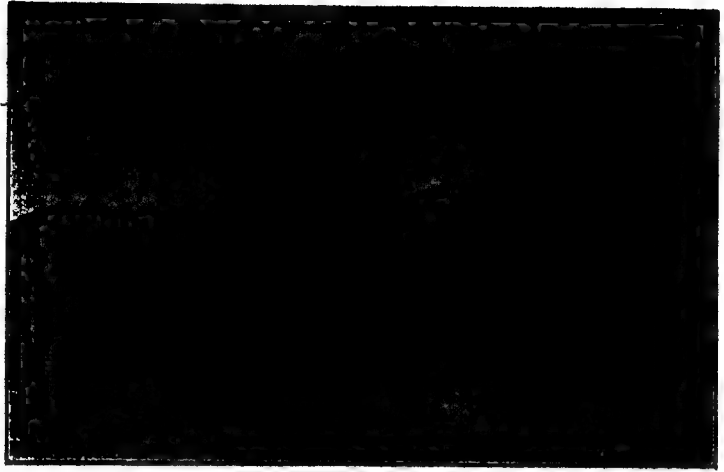
দাবা গ্রাম ও মঠ

বদরীনাথপুরীর উপকণ্ঠ

এখানে আমাদিগকে নূতন করিয়া যান-বাহনাদির বন্দোবস্ত করিতে হইল। আমার ইচ্ছা ছিল যে প্রথমে গারটকে যাইয়া সেখান হইতে হিন্দুস্থান-তিব্বত রাস্তা দিয়া সিমলা যাইব। কিন্তু আমার বন্ধুদের সময়াভাব। সুতরাং আমরা বিখ্যাত থোলিঙ্গ্ মঠ প্রদক্ষিণ করিয়া বদরীনাথে যাইব স্থির করিলাম।

থোলিঙ্গ মঠ দর্শন করিয়া আমরা বদরীনাথ যাত্রা করিবার বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। একজন ভোটিয়া সদাগর এবিষয়ে আমাদের সাহায্য করিলেন।

বদরীনাথে যাইতে হইলে মানা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিতে হয়। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক য়্যাণ্টনিও দ্য আঁদ্রাদো অতিকষ্টে এই বর্ত্মটি অতিক্রম করিয়াছিলেন। পথে নিতি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিলাম।
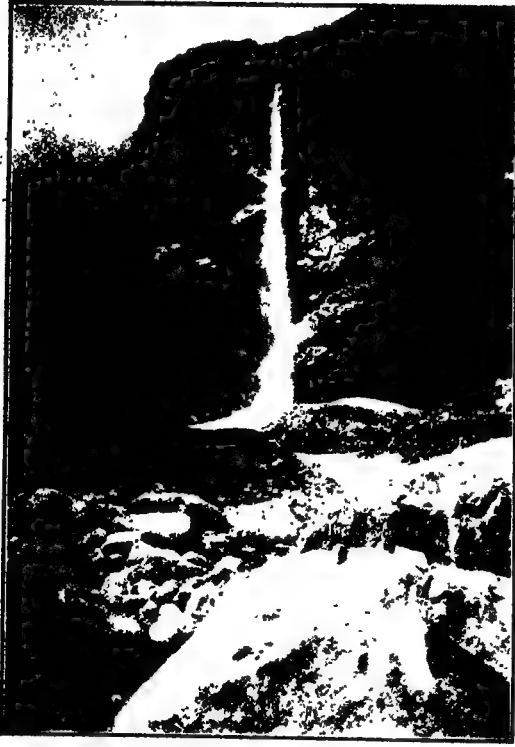
বসুধারা জল-প্রপাত

মানা গ্রামের নিকট আমরা সরস্বতী নদীর কূল ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। এখানেই সরস্বতী অলকনন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। অলকনন্দার এক অংশ বিষ্ণুগঙ্গা নামে অভিহিত।

বদরীনাথের চার মাইল দূরে বসুধারা জল-প্রপাত। এই প্রপাতটি একটি তীর্থ বলিয়া পূজিত হয়।

বদরিনাথের মন্দির অতি প্রাচীন। এটি একটি বিষ্ণুমন্দির। শঙ্করাচার্য্য ইহার সংস্কার করিয়াছিলেন। মন্দিরটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০২৮৪ ফুট উচ্চে। প্রতি বৎসর ৫০।৬০ সহস্র তীর্থযাত্রী এই মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করেন।

বিষ্ণু প্রয়াগের নিকট ধাউলি নদীর সহিত বিষ্ণুগঙ্গা মিলিত হইয়াছে। ক্রমে আমরা কেদারনাথে উপস্থিত হইলাম। কেদারনাথ গ্রামখানি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। ইহা ১১৭৫৩ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানেই শঙ্করাচার্য্য ৩২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। কেদারনাথের প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দিরটি শিবের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

অলকনন্দা ও ভাগীরথী দেব প্রয়াগে মিলিত হইয়াছে। এখানে বদরীনাথের পাণ্ডারা বাস করেন। এখানে ভাগীরথীর উপর একটি দড়ির পুল আছে। শুনিলাম এখানে শীঘ্রই একটি ঝুলান পুল নির্ম্মিত হইবে।

রুদ্রপ্রয়াগ হইতে আমরা শ্রীনগরে আসিলাম। এখান হইতে রেলপথে আমরা লাহোর যাত্রা করিলাম।

শ্রী শিবরাম কাশ্যপ

(২)

থোলিঙ্ মঠ

মানস-সরোবর ও কৈলাস দর্শন করিয়া আমরা পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলাম। যে-সকল যাত্রী ভারতবর্ষ হইতে এই তীর্থ দর্শন করিতে আসেন তাঁহারা তিব্বতে প্রবেশ করিয়া কেবল কৈলাস ও মানস-সরোবর

বদরীনাথের মন্দির

দেখিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া যান। আমাদের কিন্তু পশ্চিম-তিব্বত ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল, সুতরাং সোজাপথে দক্ষিণ দিকে না গিয়া কৈলাস হইতে নামিয়া আমরা সত্‌লজের তীরে তীরে পশ্চিম দিকে যাওয়া মনস্থ করিলাম। মানস-সরোবরের পার্শ্বস্থ রাক্ষস-তাল নামক প্রকাণ্ড হ্রদ হইতে বাহির হইয়া সত্‌লজ (শতদ্রু) পশ্চিম তিব্বতের ভিতর বহুদূর গিয়া

পরে হিমালয় ভেদ করিয়া সিম্‌লার নিকট পাহাড় হইতে নীচে নামিয়াছে।

১লা আগষ্ট্ (১৯২২) আমরা কৈলাসের সানুদেশে দ্বারচীন নামক তিব্বতী পল্লী হইতে রওয়ানা হইয়া তিনটি খরস্রোতা নদী পার হইয়া সন্ধ্যার সময় একটি সুন্দর ঝিলের কাছে তাঁবু খাটাইলাম। এই ঝিলই সত্‌লজের উৎপত্তিস্থল। প্রবাদ, এই ঝিলের জল রাক্ষস-তাল হইতে মাটির নীচে দিয়া আসে। এই ঝিল হইতে একটি ক্ষুদ্র তটিনী বাহির হইয়াছে—এত ছোট যে লাফ দিয়া পার হওয়া যায়। এইটিই সত্‌লজ্, আর কিছু দূর গিয়া তিব্বতের মধ্যেই এক বিশাল নদে পরিণত হইয়াছে। তিব্বতীরা এই জায়গাকে লন্‌্গিংতো বলে। পরদিন আমরা ছোট একটি গিরিমালা অতিক্রম করিবার

কেদারনাথের মন্দিরের উপকণ্ঠস্থ প্রদেশ

কেদারনাথের মন্দির

সময় কৈলাসের শেষ দেখা পাইলাম। তার বিপরীত দিকে আবার অনেকদিন পরে হিমালয়ের দর্শন পাওয়া গেল। আমাদের একজন সঙ্গী বলিলেন যে পার্ব্বতী নিশ্চয়ই এইখান দিয়া বাপের বাড়ী হইতে কৈলাসে যাইতেন। এইখানেই মান্ধাতা-পর্ব্বতের সঙ্গে শেষ দেখা। মান্ধাতার অভ্রভেদী তুষারধবল শিখর যেন সমস্ত পূর্ব্ব দিক্‌টা জুড়িয়া আছে।

৩রা আগষ্ট্ আমরা বহুকষ্টে জ্ঞানিমা পৌছিলাম। পশ্চিম তিব্বতে জ্ঞানিমা সর্ব্বাপেক্ষা বড় মণ্ডি বা হাট। এইখানে আল্‌মোড়া জেলার ভোটিয়া সদাগরেরা (ইহারা ভুটানি নহে) ভারতবর্ষ হইতে কার্পাস বস্ত্র, ছাতু, গুড় প্রভৃতি লইয়া আসে। তিব্বতীরা পশম, সোহাগা, লবণ, চামর, লাসার আসন ও গালিচা জ্ঞানিমায় বিক্রয় করিবার জন্য চারিদিক্ হইতে সমবেত হয়। এইখানে সহস্রাধিক তাঁবু দেখা গেল। নাগা সন্ন্যাসী নিজানন্দ—যাঁহাকে মানস-সরোবর হইতে কৈলাসে যাইবার সময় দেখিয়াছিলাম—এখানে আবার দেখা দিলেন ও আমাদের তাঁবুতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি আমাদের বলিলেন যে, হিন্দুস্থান-তিব্বত রোড্ দিয়া সিম্‌লা হইয়া ফিরিতে বড় ঘুর পড়িবে, বিখ্যাত থোলিঙ্গ্ মঠ দর্শন করিয়া মানা-পাস দিয়া হিমালয় পার হইয়া বদরীনাথের পথে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে ও সময়ও কম লাগিবে। আমরা সকলেই তাঁর এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলাম।

৮ই আগষ্ট্ আমরা জ্ঞানিমা হইতে থোলিঙ্গ্ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পশ্চিম-তিব্বতের বড় নদী-সকল হিমালয় হইতে নামিয়া তিব্বতের অধিত্যকার মধ্য দিয়া গভীর পরিখা খনন করিয়া কৈলাস-পর্ব্বতমালার (Trans-Himalaya) দিকে প্রবাহিত হইয়াছে ও শেষে সিন্ধু এবং

সত্‌লজের সঙ্গে মিশিয়াছে। তিব্বতের এই-সকল অধিত্যকা সমতল হইলেও প্রায়ই ১৫ হাজার ফুট উচ্চ। নদী পার হইবার সময় ২।৩ হাজার ফুট নামিয়া আবার খাড়া চড়িতে হয়। চড়াই নাবাই দুই এত কঠিন যে ঘোড়া ও চমরী হইতে নামিয়া পদব্রজেই যাইতে হয়। প্রত্যহ আমাদের এই রকম দুই একটি নদী পার হইতে হইত।

১২ই আগষ্ট্ আমরা এইরূপ এক নদীর ধারে দাবা নামক বৌদ্ধ মঠে পৌঁছিলাম। দাবার মঠ ও মন্দির পিছনের পাহাড়ের রঙের সঙ্গে এমন মিলিয়া গিয়াছে যে অতি নিকট হইতেও লোকের বসতি বলিয়া বোধ হয় না। আমরা পরদিন গয়ার এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে মন্দির দর্শন করিলাম। এই সন্ন্যাসীর পায়ের আঙুলগুলি বরফে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দাবার মঠ ও মন্দির অন্যান্য তিব্বতী 'গুম্ফার'ই মত। দেওয়ালে সুন্দর রঙ্গীন ছবি আঁকা। এখানে এক মূষিক-বাহন দেবতার চিত্র দেখা গেল—কিন্তু তিনি গণেশ নন। এখান থেকে এক বধির ও মূক তিব্বতী ভিখারী আমাদের পথ দেখাইয়া নদীর উপরের সমতলভূমি পর্য্যন্ত লইয়া গেল। সেদিন আমরা সন্ধ্যার সময় একটি সবুজ মাঠে তাঁবু খাটাইলাম। এরূপ হরিৎ ক্ষেত্র তিব্বতে অতি বিরল। সেই মাঠে দলে দলে কিয়াঙ (তিব্বতের জঙ্গলী ঘোড়া) চরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদের অনতিদূরে অনেক গৃহ-পালিত চমরীও চরিতেছিল। সেই রাত্রে সন্ন্যাসী ঠাকুর তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িয়া আমাদের শুনাইলেন।

১৫ই আগষ্ট্ আমরা সত্‌লজের তীরে উপস্থিত হইলাম। তিন হাজার ফুটেরও অধিক নামিতে হইল বলিয়া এখানে আমাদের বেশ গরম বোধ হইল। এখানে সত্‌লজ আর ছোট নাই, খুব চওড়া ও খরস্রোত। নদীর জল নিজের রাস্তা কাটিয়া দুই দিকে ঠিক যেন মাটির মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছে। যতদূর দেখা যায় ততদূর প্রকৃতির স্বহস্তে নির্ম্মিত এইরূপ সহস্র সহস্র মন্দির। তিব্বতী 'ছরটেন' সমাধিগুলি ঠিক এই স্বাভাবিক মন্দিরের নকল—সুতরাং নিকটে গিয়া না দেখিলে কোন্‌টি কৃত্রিম, কোন্‌টি স্বাভাবিক বুঝা যায় না।

সত্‌লজের বাম তীরে প্রসিদ্ধ থোলিঙ্ মঠ ও মন্দির। এককালে ইহা সমৃদ্ধ নগর ছিল, এখন মন্দির ও মঠ ছাড়া আর কিছু নাই। প্রবাদ, প্রাচীন মন্দির ৬।৭ শত বৎসর পূর্ব্বে তুর্কীদের হাতে নষ্ট হইয়া যায়, তার পর পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা মন্দিরের প্রাচীরের বাহিরে তাঁবু খাটাইলাম। এইখানে আমাদের নূতন করিয়া ঘোড়া ও চমরীর বন্দোবস্ত করিতে হওয়ায় অনেকদিন থাকিতে হইল।
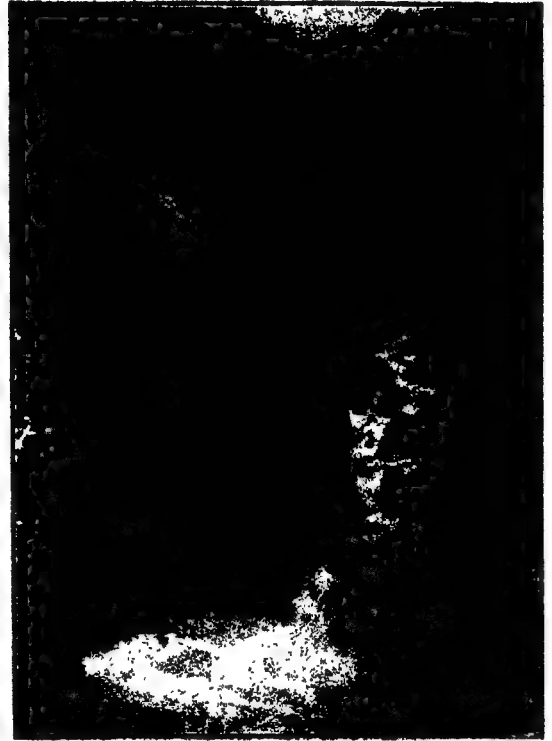
মন্দাকিনী নদীর জল-প্রপাত

পরদিন আমরা বড় মন্দিরটির ভিতর গেলাম। মন্দিরের দেউড়িতে চারিটি বৃহৎ মূর্ত্তি দেখিলাম। আমাদের সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন—সেগুলি চারি যুগ (সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি)। ভিতরে ঢুকিয়া দরজার দুইদিকে দুই প্রকাণ্ড দ্বারপালের মূর্ত্তি। তাহারা নাকি জয় ও বিজয়। মন্দিরের এই প্রথম ঘরের এক পৃথক্‌কৃত অংশে ফুল্ল শতদলে আসীন ধ্যানী বুদ্ধের এক বিরাট্ মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি ১৫।১৬ ফুট উচ্চ, মুখে

ও অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে এমন এক সুন্দর স্নিগ্ধ ভাব যে দেখিলে নয়ন মন তৃপ্ত হয়। মুখটি স্বর্ণপ্রতিম-তাম্র-নির্ম্মিত ; অবশিষ্ট দেহ বোধ হয় মাটীর। চারিদিকে নাগ-নাগিনীরা করযোড়ে উপাসনা করিতেছে। সন্ন্যাসী বলিলেন যে ইঁনিই আদি বদ্রী। দেওয়ালের গায়ে বিচিত্র ছবি, তাহাতে ভারতীয় শিল্পেরই বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। তার পর আর-একটি কক্ষে প্রবেশ করিলাম। এখানে মধ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মা ও চারি-দিকে অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখা গেল। মৃন্ময়-মূর্ত্তি বটে, কিন্তু বড় সুন্দর কাজ। এই কক্ষের চারিধারে ছোট ছোট ঘর। সেগুলিতে আরও অনেক দেবমূর্ত্তি আছে। এখানে বীণাপাণির এক চমৎকার বিগ্রহ নয়নগোচর হইল। তাঁহার পার্শ্বে বনমালা-গলে সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি। দুই একটি বজ্রপাণি মূর্ত্তিও দেখা গেল—সবই মনোরম ও সুশ্রী। এইসকল কক্ষের প্রাচীর-গাত্রেও নিপুণ তুলিকায় আঁকা ছবি আছে। একটি বোধ হইল রাধিকা ও
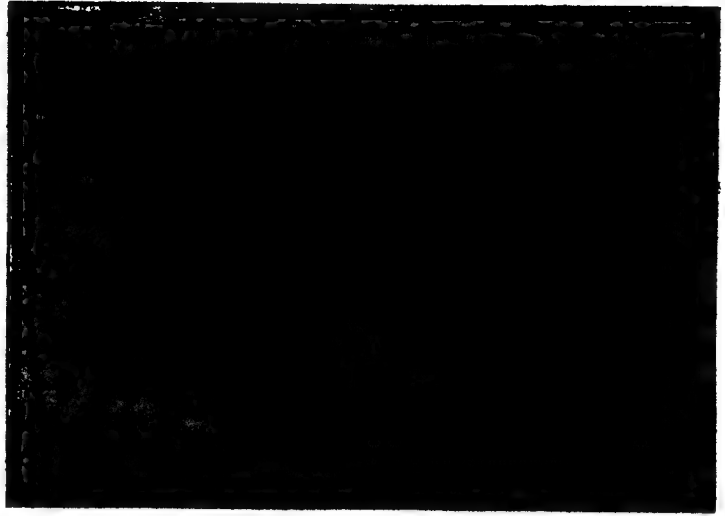
দেব-প্রয়াগ, (মন্দাকিনীর ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থলে)

ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে দেব-প্রয়াগের ঝিল

গোপীদের লীলা। অজন্তার 'আর্টে'র সহিত এ-সকল চিত্রের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। আজ পর্যন্ত যত তিব্বতী গুম্ফায় (monastery) লাসা-শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র দেখিয়াছিলাম তাহাতে চীনের প্রভাব বেশ লক্ষিত হইত। থোলিঙ্গে কিন্তু ভারতীয় প্রভাবই বেশী। কবে ও কিরূপে এই দুর্গম স্থানে ভারতীয় উচ্চ শিল্পের আবির্ভাব হইয়াছিল বোধ হয় সে তথ্য আর জানিবার উপায় নাই। মন্দিরের পরিক্রমা অতিক্রম করিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট কক্ষ। সেগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, পিতল ও তাম্রনির্ম্মিত অনেক বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি। কতকগুলি জৈন বলিয়া বোধ হইল। বাস্তবিক বৌদ্ধ, হিন্দু ও বোধ হয় জৈন ধর্ম্মের এরূপ অদ্ভুত সমাবেশ অন্য কোথাও নাই। এই কক্ষগুলিতে অনেক প্রাচীন পুঁথির পাতা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা গেল। এইখানকার তিব্বতী লামারা নিতান্তই অলস, কারণ অন্যান্য গুম্ফাতে পুঁথি সকল কাঠে বাঁধাইয়া অতি

কেদারনাথ হইতে হিমালয় পর্ব্বতের দৃশ্য

লামারা মুখোশ পরিয়া এইখানে তিব্বতে প্রসিদ্ধ ভূতের নাচ (Devil Dance) নাচেন।

আমাদের একজন সঙ্গী মন্দিরের এক ক্ষুদ্র তাম্রমূর্ত্তি স্পর্শ করায় মন্দির-রক্ষকগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল এবং অতঃপর আমাদের আর কোন মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। এই তিনটি মন্দির ছাড়া থোলিঙ্গে একটি বড় মঠ আছে। এখানে অনেক ভিক্ষুর নিবাস—মাঝে মাঝে উপাসনার ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল। মঠে একটি ত্রিতল চূড়া আছে। শুনা যায় এই মঠটি বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত।

যত্নে আল্‌মারিতে রাখা আছে দেখিয়াছিলাম। তিব্বতী বর্ণমালা বাঙ্গালার সঙ্গে খানিক মেলে, ইহা ভারতবর্ষ হইতেই আনীত। একটি কক্ষে এক বৃহৎ দণ্ডায়মান মূর্ত্তি দেখা গেল, তাহার হাতে সূর্য্যমুখী ফুল। নিত্যানন্দ বলিলেন এইটি সূর্য্যদেব। প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত কোন ব্যক্তি যদি কখনও থোলিঙ্গে আসেন তাহার নিকট হইতে বহির্জ্জগৎ অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবে।

যে-সকল সন্ন্যাসী বদরীনাথ দর্শনান্তে হিমালয় অতিক্রম করিয়া পশ্চিম তিব্বতে প্রবেশ করেন, তাহারা বলেন যে থোলিঙ্গ্ মন্দিরই আদি বদরীনাথ। শঙ্করাচার্য্য যখন দেখিলেন যে তিব্বতে ভারতীয় তীর্থযাত্রীর আসা বড়ই কষ্টকর তখন তিনি বদরীর মন্দির হিমালয়ের এপারে (ভারতবর্ষে) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বড় মন্দির দেখিয়া আমরা আর-একটি মন্দির দেখিতে গেলাম। এটি সাধারণ তিব্বতী গুম্ফাবই মত—একটি বৃহৎ অন্ধকার হল্, মেঝেয় সারি সারি গদি পাতা, তার উপর ভিক্ষুরা বসিয়া উপাসনা করেন, একধারে প্রকাণ্ড ত্রিরত্ন (বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ), তাহার সম্মুখে বড় বড় পিতলের বাটিতে মাখনের প্রদীপ জ্বলিতেছে। লাসার শিল্পী কর্ত্তৃক রেসমে অঙ্কিত বৌদ্ধ দেব-দেবীর চিত্র কাঠের থাম হইতে ঝুলিতেছে। শুনা যায় শীতকালে

এই-সব মন্দির ও মঠের মহন্তের উপাধি 'ছাংস্থ'। ইনি লাসা হইতে দালাই লামা দ্বারা নিযুক্ত হইয়া প্রেরিত হন। ইনি মহন্তের কাজ ছাড়া সদাগরীও করেন। আমরা ইহার সহিত দেখা করিয়াছিলাম।

দড়ির পুল

তিব্বতে ঢুকিয়াই খেচরনাথে যে বৃদ্ধ লামার দর্শন পাওয়া গিয়াছিল—ছাংস্থর চেহারা সে-রকম জমকাল নয়। ইহার কাছে মিষ্ট কথা ছাড়া আর-কিছু সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

খোলিঙ্গ্ মঠের ভিক্ষুদের দেখিয়াও ভক্তি চটিয়া যায়। অনেক ভিক্ষু আমাদের তাঁবুর কাছে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাদের চেহারায় ও ব্যবহারে ভদ্রতার বিশেষ পরিচয় পাই নাই। একজনের কাছে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাই। যেমন শুনিয়াছিলাম ঠিক তেমনি লিখিয়া লইয়াছিলাম।

নমো নমো বঙ্গাবর্তে অবরসিতা পুনি
আয়রজনা সুম্বিনিচিতা জিঙ্গারণজায়া
অর্হতায়া সম্মেয়া সম্বুদ্ধয়া তয়থা ওঁ
পুনি পুনি মহাপুনি অবরসিতা পুনি
মহায়ানা পরিয়োরেয়ে স্বাহা
নমো বনটোয়ায়া নমো আর্য্যা জানা সংখ্যা বোরন
যায়া তথাগতায়া সম্মায়া সম্বুদ্ধয়া তয়থা ওঁ
দারা দারা দিরি দিরি ডুরু ডুরু এঠে ওঠে
পরচলে পরচলে কুসুমে কুসুমে হোরে
ইলি মিলি চিতি জোলা মবানায়ে স্বাহা।

এ ছাড়া "নমো গুরবে নমো বুদ্ধায় নমো ধম্মায় নমো সঙ্ঘায়" মন্ত্রও অনেকেরই মুখে শুনিয়াছিলাম।

আমরা প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে অনেক কষ্টে দ্বিগুণ মূল্য দিয়া ভারবাহী খচ্চর ও চমরীর জোগাড় করিলাম। দুইদিন হাঁটিয়া আমরা সত্লজের গভীর খাত হইতে বাহির হইয়া আবার খোলা ময়দানে উঠিলাম। পথে একজন লাসার লামার সঙ্গে দেখা হইল। তাঁর যেমন সুশ্রী চেহারা, তেমনি ভদ্র ব্যবহার। লাসার লোকেরা পশ্চিম-তিব্বতীদের অপেক্ষা অনেক সভ্য ও সুশ্রী। তাঁহার কাছে আমরা মাখন-দেওয়া লোনতা তিব্বতী চা পান করিলাম ও লাসার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠের গল্প শুনিলাম। অবশ্য কথাবার্ত্তা সব দোভাষীর সাহায্যে হইল, কারণ আমরা তিব্বতী ভাষা জানি না। রুমাদেবী নাম্নী এক ভোটিয়া মহিলা আমাদের দ্বিভাষী ছিলেন। ইঁহার সাহায্যে অসংখ্য কৈলাসযাত্রী এই দুষ্কর যাত্রা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করে। ইনি হিমালয়ের ক্রোড়ে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর কাছে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি প্রায়ই কলিকাতায় মিশন-সংক্রান্ত কার্য্যে আসেন। ইনি অনেকবার তিব্বতে গিয়াছেন ও তিব্বতী ভাষা বেশ বলিতে পারেন।

২২শে আগষ্ট আমরা হিমালয়ের ঠিক উত্তরে একটি অতি মনোরম স্থানে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সুদূর বিস্তৃত সবুজ মাঠ, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে হিমালয়ের শুভ্র শিখরগুলি এই জায়গাটিকে যেন ঘিরিয়া আছে। কিছু দূরে ২৬ হাজার ফুট উচ্চ কামেত মহাপর্ব্বত অন্যান্য তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলিকে অতিক্রম করিয়া বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছে। দুই তিনটি তুষারনদী (glacier) উপর হইতে নামিয়া তদনন্তর বরফ গলিয়া যাওয়াতে স্বচ্ছ তরল স্রোতের ধারা হইয়া এই প্রান্তরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। শত শত কিয়াও (তিব্বতী বন্য ঘোড়া) ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়াইতেছে। আমরা একটি নির্ম্মলসলিলা তটিনীর ধারে তাঁবু লাগাইলাম। এই সুন্দর জায়গাটির নাম শিপু।

তার পরদিন ঝড়, বৃষ্টি ও অল্প অল্প তুষারপাতের মধ্য দিয়া আমরা মানা-পাসের (গিরিসঙ্কটের) পাদমূলে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই আমাদের তিব্বতে শেষ রাত্রি। প্রায় ১৭ হাজার ফুটের উপর বড় ঠাণ্ডা বোধ হইল।

২৩শে আগষ্ট—অনেকটা চড়াই চড়িয়া আমরা মানা-পাসের (গিরিবর্ত্মের) মাঝামাঝি আসিয়া পড়িলাম। আকাশ পরিষ্কার ছিল, এত উচ্চে ইহা প্রায়ই ঘটে না। সুতরাং আমরা হিমালয়ের এক বিরাট দৃশ্য দর্শন করিতে পাইলাম। সম্মুখে বিস্তৃত তুষারাচ্ছন্ন গিরিপথ—দুইদিকে ভীমদর্শন হিমশৃঙ্গ, চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে বরফ, কাল কাচের চশমার ভিতর দিয়াও চক্ষু ঝল্সিয়া যায়। খানিক-ক্ষণ পরে নামিতে লাগিলাম, তাহাতে বোঝা গেল যে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছি—তবে এখনও মাঝ-হিমালয়ে আছি। আর কিছুদূর নামিয়া দুইটি ছোট সরোবর দেখিতে পাওয়া গেল। নীল জল ও সাদা বরফের একত্র সমাবেশ বড়ই মনোহর বোধ হইল। বৈকালে এক তুষার-নদীর (glacie) পাশে সেইদিনকার বাসোপ-যোগী স্থান বাছিয়া লওয়া হইল। এ নদীতে জল নাই, বরফ যেন ঢেউখেলান রহিয়াছে।

তার পরদিন চলিবার বড়ই অসুবিধা হইল। চারি-

দিকে বরফগলা জল ও বড় বড় পাথর। এক পাথর হইতে আর-এক পাথরে লাফাইয়া চলা ছাড়া গতি ছিল না। সেই রাত্রে আমাদের আহার্য্যসামগ্রী ফুরাইয়া গেল। প্রাতে দুগ্ধ ও শর্করা-বিহীন চা' পান করিয়া আমরা বদরীনাথের দিকে নামিতে লাগিলাম। সেদিন যদি বদরী না পৌঁছিতে পারি ত অনাহারে থাকিতে হইবে। আমরা এবার ছত্রভঙ্গ হইয়া ছুটিলাম। এখন বরফের দেশ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি। চারিদিকে ফুলের মেলা—নীল আফিঙের ফুল, দোপাটি আর অসংখ্য অজানা ফুল চারিদিক্ আলো করিয়া রহিয়াছে। লিপু-পাসে (গিরিবর্ত্মে)—যেখান দিয়া আমরা তিব্বতে ঢুকিয়াছিলাম—যেমন গোলাপের বাহার দেখিয়াছিলাম, এখানে তাহা দেখা গেল না; কারণ, গোলাপের সময় হইয়া গিয়াছে। তবে পেঁজা তুলোর বড় বলের মত ফুল এখানেও অনেক দেখা গেল। দুইটি জায়গায় বরফের সেতু পার হইয়া সরস্বতীর তীরে উপনীত হইলাম। আর কিছু দূর গিয়া সরস্বতীর এক ভীষণ জলপ্রপাত দেখা গেল। শত শত ফুট উচ্চ হ'তে নদীর জল নীচে পড়িয়া ভূগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, ও সেখান থেকে একটু দূরে বাহির হইয়া আবার প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। এই জলপ্রপাতের ঠিক সাম্‌নেই নদী পার হইতে হয়, পার হইবার সময় ভয়ে শরীর কণ্টকিত হয়। এই স্থান হইতে বদরীনাথ চার মাইল নিম্নে। বৈকালে বদরীনাথ পৌঁছিয়া মনে হইল যেন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছি। সুদূর তিব্বতের পর বদরীর রাস্তাঘাট, লোকজন যেন চিরপরিচিতের মত বোধ হইল। আর ১৮ দিনে আমরা লাহোরে ফিরিয়া আসিলাম। এই কৈলাস-ভ্রমণে আমরা সাড়ে ছয় শত মাইল পদব্রজে, অশ্বারোহণে বা চমরী-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়াছি। ইহাতে আমাদের প্রায় তিন মাস সময় লাগিয়াছিল, তন্মধ্যে দেড় মাস আমরা পশ্চিম-তিব্বতে ছিলাম।

শ্রী বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়

মূর্ত্তি-মেখলা

বিশ্বদেবের দেউল ঘিরিয়া
মূর্ত্তি-মেখলা রাজে—
কত ভঙ্গীতে কত না লীলায়
কত রূপে কত সাজে,
দিকে দিকে আছে পাপ্‌ড়ি খুলিয়া
সোনার মৃণাল মাঝে!

বিশ্বরাজের শত ঝরোখায়
আলোর শতেক ধারা,
শতেক রঙের অভ্রে ও কাচে
রঙীন হয়েছে তারা,
গর্ভগৃহেতে শুভ্র আলোক
জ্বলিছে সূর্য্য-পারা।

বিশ্ববীজের বিপুল বিকাশ
আকাশ-পাতাল জুড়ি'
অনাদি কালের অক্ষয় বটে
কত ফুল কত কুঁড়ি,
ঊর্দ্ধে উঠেছে লাখ লাখ শাখা
নিম্নে নেমেছে ঝুরি।

বিশ্ববীণায় শত তার তবু
একটি রাগিণী বাজে,
একটি প্রেরণা করিছে যোজনা
শত বিচিত্র কাজে,
বিশ্বরূপের মন্দির ঘিরি'
মূর্ত্তি-মেখলা রাজে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বুলাকিলালের ইজ্জৎ

(১)

বুলাকিলাল আমার সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন অবধি পড়েছিল। মর্নিংস্কুলের দিনে দুপুর-বেলা আমার পড়্‌বার ঘরে বসে' হয় ত মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছি, এমন সময় বুলাকি এসে হাজির হ'ল—রদ্দুরে তার মুখ পাণ্ডাশবর্ণ ধারণ করেছে, পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলো, গায়ের পনর-দিন-আগে-ধোপার-বাড়ীর-ফেরত কোর্ত্তাটি ঘামে টস্‌টস্ কর্‌ছে, টুপির ধার দিয়ে ধার দিয়ে নেড়া মাথাটির ঘাম কপাল দিয়ে গড়িয়ে নাকে ঝরে' পড়্‌ছে!

আমি বল্‌লাম, "একি বুলাকি, এই রদ্দুরে!"

বুলাকি জবাব দিল, "আরে ভাই, তুমি কি কর্‌ছ দেখ্‌তে এলাম। আমায় এক লোটা জল দাও না, ভাই।"

আমি বুলাকিকে বসিয়ে চাকরকে জোরে জোরে পাখা টান্‌তে বল্‌লাম। খানিক জিরিয়ে, জল খেয়ে শান্ত হ'য়ে বুলাকি বল্‌ল, "ওখানা কি বই পড়্‌ছ, সুরেন?"

আমি বল্‌লাম, "এটা একটা মাসিকপত্র।"

লালজী বুঝ্‌তে পার্‌ল না, খানিক হাঁ ক'রে থেকে বল্‌ল, "আউট্ বুক?"

আমি তাকে বোঝাতে লাগ্‌লাম, এতে দেশের কথা, সমাজের কথা, স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা, এই-সব আছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার কথার নাম শুনে সে চম্‌কে উঠে বল্‌ল, "স্ত্রী-স্বাধীনতা? সে আবার কি? মেয়েরা স্বামীর অধীনে থাক্‌বে না! মেমের মত রাস্তায় বেরুবে! সর্ব্বনাশ!"

বুলাকির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এই রকমই ছিল।

থার্ড্ ক্লাসে পড়্‌বার সময়ই বুলাকির বিয়ে হয়েছে। আমি কিনা তার সবচেয়ে "best friend"—অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাই আমায় সে বলেছে যে তার স্ত্রী লেখাপড়া জানে। শুনে আমি বল্‌লাম, "কই, তোমার চিঠি-পত্র আস্‌তে দেখি না ত?"

বুলাকি আমার এই প্রশ্নে এতদূর আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল যে, তার মুখ গহ্বরের পরিমাণটা যে কতখানি, আমায় তা' ঠাউরে ঠাউরে আন্দাজ কর্‌বার অনেকক্ষণ অবসর দিল, তার পরে বল্‌ল, "সে কি, সুরেন? বউ চিঠি লিখ্‌বে—তার হাতের লেখা পিওন, পোষ্টমাষ্টার—যত পরপুরুষে দেখে ফেল্‌বে—আরে রাম, রাম!

(২)

ম্যাট্রিকুলেশান পাশ ক'রে আমি মেডিকেল স্কুলে পড়েছি। বুলাকি বেচারীর প্রতি হৃদয়হীন ইউনিভারসিটি ন্যায়-ব্যবহার করে নি। বুলাকি এমন সুবিচারের অভাব দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিল,—তারা পড়্‌বার জন্যে বই ঠিক ক'রে দেয় এক, আর এক্‌জামিন করে যত "আউট বুক" থেকে! গরীবের উপর বড়লোকের চিরকালই অত্যাচার,—এই দেখ না অত বড় শ্রীরামচন্দ্রজী যেই গরীবের মত পোষাকে বনে গিয়েছেন, অমনি রাবণ রাজা সীতা মাইকে চুরি ক'রে নিয়ে গেল। শ্রীরামচন্দ্রজী অযোধ্যায় রাজা থাক্‌লে কি এমন অত্যাচার তাঁর উপর কর্‌তে রাবণ সাহস পেত! রেগে বুলাকি ইম্‌তাহানের উপর চ'টে গিয়ে কোথায় যে 'দেহাতে' চ'লে গেল, তা' চার বছরের মধ্যে আমি আর জান্‌তে পারি নি।

মেডিকেল স্কুল থেকে পাশ ক'রেই, পাটনার কাছাকাছি এক সহরে আমি একটা পোষ্ট্ পেলাম। সেখানে মাসখানেক আছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন আবার তার সঙ্গে দেখা হ'ল। আমি কোর্টের কাছে একটা রোগী দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। দেখি বুলাকির মত কে একজন আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে—আমি তাকে দেখে চিন্‌তে পেরে বল্‌লাম, "আরে, লালজী নাকি! আদাব, আদাব।"

বস্তুতই সে আমাকে ভালবাস্‌ত। দেখা হওয়ায় ভারি খুসী হ'ল। আমি ডাক্তার হয়েছি শুনে তার আহ্লাদ দেখে কে; সে হেসে বল্‌লে, "সুরেন, আমি ত বল্‌তামই তুমি একটা মস্ত লোক না হয়ে যাও না! দেখ্‌লে ত আমার কথা ফল্‌ল কি না?"

হাঁ, মস্ত লোকই হ'য়ে গিয়েছি বটে!

শুন্‌লাম বুলাকিলাল কোর্টেই সেরেস্তাদারের অধীনে চাক্‌রী করে, টাকা বিশেক মাইনে পায়।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হবার পর সে বল্‌ল, "ভাই, আমার বউটি 'বেমার', মাসখানেক থেকে ভুগ্‌ছে।"

"তুমি তাকে ওষুধ টষুধ খাওয়াও ত?" আমার ভয় হচ্ছিল, কি জানি লালাজী হয়ত পরপুরুষের ছোঁওয়া ওষুধ তার বউকে দিতে পারে না—পাছে বউএর ইজ্জৎ যায়!

সে বল্‌ল, "হাঁ, ওষুধ ত খাওয়াচ্ছি কালীবাবু ডাক্তারের কাছ থেকে। কই, তিনি ত সারাতে পারলেন না?"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "তোমার বউয়ের অসুখটা কি?"

"ভাই অসুখটা কি, তাই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। খনও জ্বর থাকে, আবার সেরে গিয়ে তার পরদিনই আবার জ্বর আসে। এত অসুখ যে, জ্বর যখন থাকে, তখন ভাত নিয়ে আমি হাজার সাধাসাধি করলেও কিছুতেই খায় না!"

"জ্বর থাকলে কি ভাত খেতে পারে? জ্বর হ'লে ভাত দিতেই নেই, সাগু বার্লি দিতে হয়। আচ্ছা একমাস হ'য়ে গেল তবু সার্‌ল না, তা' কালীবাবু কি বলেন?"

"আরে সুরেন, তাঁর কথা আর বল কেন, তিনি ভয়ানক পাজি লোক; তিনি সেদিন বলেন কিনা, তোমার স্ত্রীর চিকিৎসা এ রকম ক'রে করা যায় না, চল আমি দেখে আসি।—আরে ছি, ছি, আমি কানে আঙ্গুল দিয়ে চ'লে এলাম! আমার স্ত্রীকে দেখ্‌বে! আমার ইজ্জৎ মাটি কর্‌বে!"

"সে কি বুলাকি, তোমার বউকে ডাক্তার দেখাও নি! অম্‌নি ওষুধ খাইয়েছ! চল, আমাকে দেখাতে বোধ হয় তোমার বাধা নেই?"

সম্মুখে সাপ দেখ্‌লে অন্যমনস্ক পথিক যেমন ক'রে চম্‌কে উঠে, বুলাকিলাল ঠিক তেমনি ক'রে উঠ্‌ল— "সুরেন, তুমি আমার দোস্ত্‌ হ'য়ে এমন ছোটলোকের মত কথা বল্‌ছ।—"

আমি দেখ্‌লাম, এর সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করলে চল্‌বে না। আমার মনটা গৃহবদ্ধা পীড়িতা অপরিচিতাটির জন্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। হায় হায়, এত নিরুপায় জানকীর দেশের নারী!

আমি বল্‌লাম, "আরে চটো কেন বুলাকি? চল, তোমার বাড়ী যাই, আমি বাইরেই থাক্‌বো এখন। একে একে যা' জিজ্ঞেস কর্‌ব, তুমি বাড়ীর ভিতর থেকে পুছে এসে আমায় বাতাবে। কেমন, রাজি আছ?"

যাক্‌, লালজী রাজি হ'ল। আমার হাতে আরও রোগী ছিল, কিন্তু অসহায়া এই রোগিণীটির ব্যবস্থা না ক'রে আমি থাক্‌তে পার্‌ছিলাম না।

বুলাকি আমায় নিয়ে চল্‌ল। কিছুদূর গিয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখি, সহরের বাইরে মাঠের পথে যাচ্ছি।

"একি বুলাকি, তোমার বাড়ী কত দূর?"

"এখান থেকে ক্রোশ খানেক হবে।"

আমি ভেবেছিলাম, বুলাকি বুঝি তার বউকে সহরের মধ্যে এনেছে। কিন্তু দেখ্‌ছি আমি যা' ভয় করেছিলাম, তাই; লালজীর বউ কি সহরে আস্‌তে পারে? ইজ্জৎ যাবে না!

বুলাকি দন্ত বিকশিত ক'রে বল্‌ল, "সুরেন, আমার নিজের বাড়ী এখান থেকে মাত্র এক ক্রোশ। তাই ত আমার চাকরী কর্‌বার সুবিধা হয়েছে, বউকে এক্‌লা দেশে ছেড়ে কোথাও যাওয়া নিরাপদ্‌ নয়—আর আমরা তোমাদের মত পরিবারকে রেলগাড়ীতে চড়াতেও পারি না, বা সহরের পথেও বার করতে পারি না।"

আগে শুন্‌তাম, বুলাকিদের বিয়ের সময়ে এই হয় এক বিষম সমস্যা—পেটের দায়ে বিদেশে যেতে হবে, বউকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব—ইজ্জৎ যাবে, আর বাড়ীতে রেখে যাওয়াও নিরাপদ্‌ নয়। এখন চোখের উপরে কথাটার সত্যতা প্রমাণ হ'য়ে গেল।

সহরের মধ্যেই কোথাও বাসা মনে ক'রে আমি যেতে চেয়েছিলাম। এখন দেখ্‌ছি, ক্রোশখানেক রাস্তা হাঁট্‌তে হবে। বেলা চারটে বেজে গিয়েছে, ফির্‌তে হয় ত রাত হ'য়ে যাবে।

আমি নীরবে মাঠের পথ ভাঙ্‌তে লাগ্‌লাম। যব, গম, ছোলা, কাটা হ'য়ে গিয়েছে। মাঠগুলোর মূর্ত্তি সন্তানহারা জননীর মত শোকাচ্ছন্ন—উদাস। মাঝে

মাঝে 'খলিয়ান' হচ্ছে, কৃষকপত্নীরা কুলায় শস্যগুলি ঝেড়ে খলিয়ার মধ্যে পুর্‌ছে।

বুলাকি এতদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় প্রাণের উৎস খুলে দিয়ে ব'কে যাচ্ছিল—কোন্‌টে ছোট্টুর ক্ষেত, কোন্‌টে হরুয়ার ক্ষেত। আমি তার উপরে চ'টে ছিলাম, বেশী কথা বল্‌ছিলাম না।

বেলা পাঁচটার সময় গ্রামে পৌঁছলাম। বসন্তের বেলা, সূর্য্য ডুব্‌তে তখনও ঘণ্টাখানেক দেরী।

বুলাকি আমায় তার বাড়ীতে নিয়ে চল্‌ল। গ্রামের অধিকাংশ ঘর মাটির দেওয়ালে খাপ্‌রায় ছাওয়া; তার মাঝে মাঝে দু' একটা পাকাবাড়ী। আমায় দেখে গ্রামের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ ক'রে তেড়ে এল, কিন্তু বুলাকিলাল তাদের ঠাণ্ডা কর্‌ল।

অবশেষে বুলাকির খাপ্‌রার বাড়ীটিতে এসে পৌঁছলাম। বারাণ্ডায় একটা খাটিয়ায় আমাকে বসিয়ে বুলাকি বাড়ীর ভিতর গেল, তার স্ত্রীকে দেখ্‌তে। আমি খাটিয়ায় ব'সে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, বুলাকির বাড়ীর সাম্‌নের উঠানটি মোটেই ঝর্‌ঝরে তর্‌তরে নয়। ঝাঁট দিয়ে যত জঞ্জাল একদিকে জড়ো করা হয়েছে, আর একদিকে একটা কূয়ো—তার চারধারে জল প'ড়ে প'ড়ে পাঁক জ'মে গিয়েছে—সেই সঙ্গে মুখ-ধোওয়া দাঁতন-কাঠিগুলো রাশীকৃত ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে দু' একটি গ্রাম্য নারী মাটির ঘয়লা আর দড়ি বাল্‌তি নিয়ে সেই পাঁকের মধ্য দিয়ে জল ভর্‌তে এসে আমায় অবাক্‌ হ'য়ে দেখ্‌ছে। তাদের মাথার চুলে ক' বৎসর তেল পড়ে নি তা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় বটে, পরণের রঙীন কাপড় আর গায়ের কোর্ত্তাগুলো বোধ হয় প্রদর্শনীতে পাঠাতে মনস্থ করেছে—সে প্রদর্শনীতে যার কাপড় সবচেয়ে মলিন, এমন কি কোন্‌ রংএর চেনা যায় না, তাকে স্বর্ণপদক দেওয়া হবে।

এইসব দেখে খাটিয়ায় ব'সে ব'সে আমার মনে ঘৃণা হ'তে লাগ্‌ল।

বউ ছাড়া লালজীর আর তিন কুলে কেউ নেই, মা বাপ দূরের কথা, ভাই বোন অবধি নেই—প্লেগের কৃপায় একটি জলজলে ছবি বুলাকির বাড়ী।

কতক্ষণ পরে সে বাইরে এসে আমায় বল্‌ল, "ভাই সুরেন, বউ আমার জেগে আছে—জেগে বেচারী দিন রাতই থাকে, এই বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে উঠ্‌তে ত আর পারে না, তা তুমি কি জিজ্ঞেস্‌ কর্‌তে বল্‌ছ?"

রোগীর অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় তা' তার কথা শুনেই বুঝ্‌তে পার্‌লাম! ডাক্তারি প্রথামতে কেমনভাবে যে তাকে জিজ্ঞেস্‌-পড়া করি, তাই আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম না।

অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে আমি বল্‌লাম, "আচ্ছা বুলাকি, তোমার বউএর কি খেতে ইচ্ছা করে জিজ্ঞেস্‌ ক'রে আস্‌তে পার?"

খাওয়ার প্রতি রুচি কেমন আছে তা থেকে যদি অবস্থা কিছু বুঝ্‌তে পারা যায়। বুলাকি বুঝিয়ে নিজে কিছুই বল্‌তে পারে না, আর নিজে গিয়ে দেখি তারও উপায় নেই। প্রাণ যায়, তবু স্ত্রীর মুখ পরপুরুষে দেখ্‌বে না। ভারতবাসীর ইজ্জৎ নেই, এর পরেও এ কথা বলে, এমন সাহস কার?

খানিক পরে সে বাহিরে এসে বল্‌ল, "কিছুই তো বলে না, অনেক জিজ্ঞেস্‌ করাতে আস্তে আস্তে বল্‌ল—যদি গঙ্গাজল পায় ত তাই একটু মুখে দেয়।"

যা বুঝ্‌বার বুঝ্‌লাম। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "আচ্ছা, তুমি বল্‌তে পার তোমার স্ত্রীর প্লীহা বা লিভারের দোষ আছে কি না?"

আগেই যা' ভেবেছিলাম, তাই ঠিক; বুলাকি বল্‌ল, "তা ত আমি বল্‌তে পারি না।"

আমি তার হাত আমার পেটে দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, কি ক'রে লিভারের দোষ আছে কি না ধর্‌তে হয়। জিব, চোখ সব দেখে আস্‌তে বল্‌লাম।

বুলাকিলাল গৃহে প্রবেশ কর্‌ল, আমি দোরের দিকে চেয়ে ব'সে রইলাম। ডাক্তারি কর্‌ছি বটে, বড় হাসি পেল, বাড়ী ফির্‌লে যখন জিজ্ঞেস্‌ কর্‌বে কোথায় গিয়েছিলাম, আমি বল্‌ব, "রোগী শুন্‌তে!" মিথ্যে কথা আমি বল্‌তে পার্‌ব না।

বুলাকি আসেই না! আমি মনে মনে হাস্‌তে লাগ্‌লাম, বুলাকিলাল বোধ হয় গভীরভাবে ডাক্তারি

কর্‌ছে। কিন্তু বড় দেরী হচ্ছে দেখে অধীরও হ'য়ে পড়্‌ছিলাম, এমন সময় ভিতর থেকে কাতরস্বরে বুলাকি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"একি হ'ল! একি হ'ল!" শুনে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম, আর থাক্‌তে পা্‌রলাম না, দৌড়ে ভিতরে ঢুকে পড়্‌লাম।

জানালা-হীন একটা অন্ধকার ঘরে গিয়ে অতি কষ্টে যা' দেখ্‌লাম, তাতে আমার চক্ষু স্থির! বারো-হাতী ছিটের সাড়ী আর কোর্ত্তায় জড়ান একটি বালিকা শেষ নিশ্বাস ফেলে সকল অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে—তার বুকের উপর বুলাকিলাল মূর্চ্ছিত।

ইজ্জতের প্রাপ্য চুকাতে প্রকৃতির কাছে যা' দেনা করা হয়েছিল, আজ নির্ম্মমভাবে আমার চোখের সাম্‌নে প্রকৃতি সেটা আদায় ক'রে নিলেন। ক্ষোভে, দুঃখে, রোষে, আমি অন্ধকার ঘরের মেঝেতে ব'সে পড়্‌লাম। ততক্ষণ বাইরেও হয় ত অস্তগামী সূর্য্যের মুখখানির মৃদুহাসি আকাশের কোলে মিশিয়ে গেল।

শ্রী কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

স্মৃতির মালা

কোথায় কারে দেখেছি কবে সে স্মৃতি আজি ক্ষণে ক্ষণে
জাগিছে আমার মনে মনে—
ভরা-বাদরে করকাপাতে পিছল পথে নদীর ধারে
ভিজিয়া চলে কাঁপিয়া টলে' শিহরি উঠে দেখেছি কারে,—
আজিও আমার মানস-মেঘে
দামিনীসম চমকি' ঘন নয়নরম আছে সে জেগে।

আশিনে যবে সবুজরঙে ছোপানো হলো ক্ষেতের শাড়ী
প্রমোদে ভরা সকল বাড়ী,
পথের পাশে দূর্ব্বাঘাসে ভরিয়া আনি মাথার ঝুড়ি
এসেছে সে কে তুলিয়া তালে বাজায়ে হাতে রেশমী চুড়ি,
মানস-সীমা জুড়িয়া মম
শ্যামলীরূপে বাজে সে আজো সহজ শোভায় স্ফূরতি সম।

ফাগুনী ঊষায় আগুন-ভূষায় ধরণী সেদিন সাজিল ভালো,
করিল রাঙা সকল কালো।
মাধুরী-মাখা সবুজে-ঢাকা মুঞ্জরিত আমের বনে
দেখেছি কারে, আবেশ-আনা উদাস দিঠি নয়ন-কোণে,—
(মুকুলরূপে) আজিও আমার মানস-শাখে
জাগিয়া সে যে মঞ্জরীপ্রায়, ভাবনা-অলি ঘেরিছে তাকে।

বোশেখী দিনে রোদের ঘায়ে নেতিয়ে-পড়া অশোক-শাখে
শালিক-শিশু তৃষায় ডাকে;
চমকে অনল মাঠের পারে অনেক দূরে দিকের শেষে
অধীর পায়ে কলসী লয়ে তটিনী-জলে নামিল কে সে,—
আমার বুকের সাহারা চিরি'
আজিও সে যে নদীটি সম বহিয়া চলে ধীরি ধীরি।

আঘনে যবে বসুধা বুকে সোনার আঁচল পাতিয়া রমা
হাসিয়া রাজে মাতৃ সমা,
গ্রামের শেষে সবার সাথে মাঠের পানে চলেছে কে সে
খেলিছে বায়ু শিথিল কেশে ভানুর আলো ঝলিছে হেসে,—
আমারি এ মন করিয়া চুরি
আজি সে বালা পুরিয়া দিল সোনারি ধানে ভূরি ভূরি!

কোথায় কবে দেখেছি তারে হায় সে কেমন কিসের বনে,
কিছুই যে মোর নাহি রে মনে,
আজিকে পোষে বাতাস জুড়ে বাব্‌লা-ফুলের গন্ধ কাঁদে
আকুল মম মনের তটে অচিন বালা তরণী বাঁধে,
কহে সে মোরে বারে বারে—
তোমারে আমি লইব সাথে সেই অজানার সাগর-পারে।

শ্রী শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

মা।
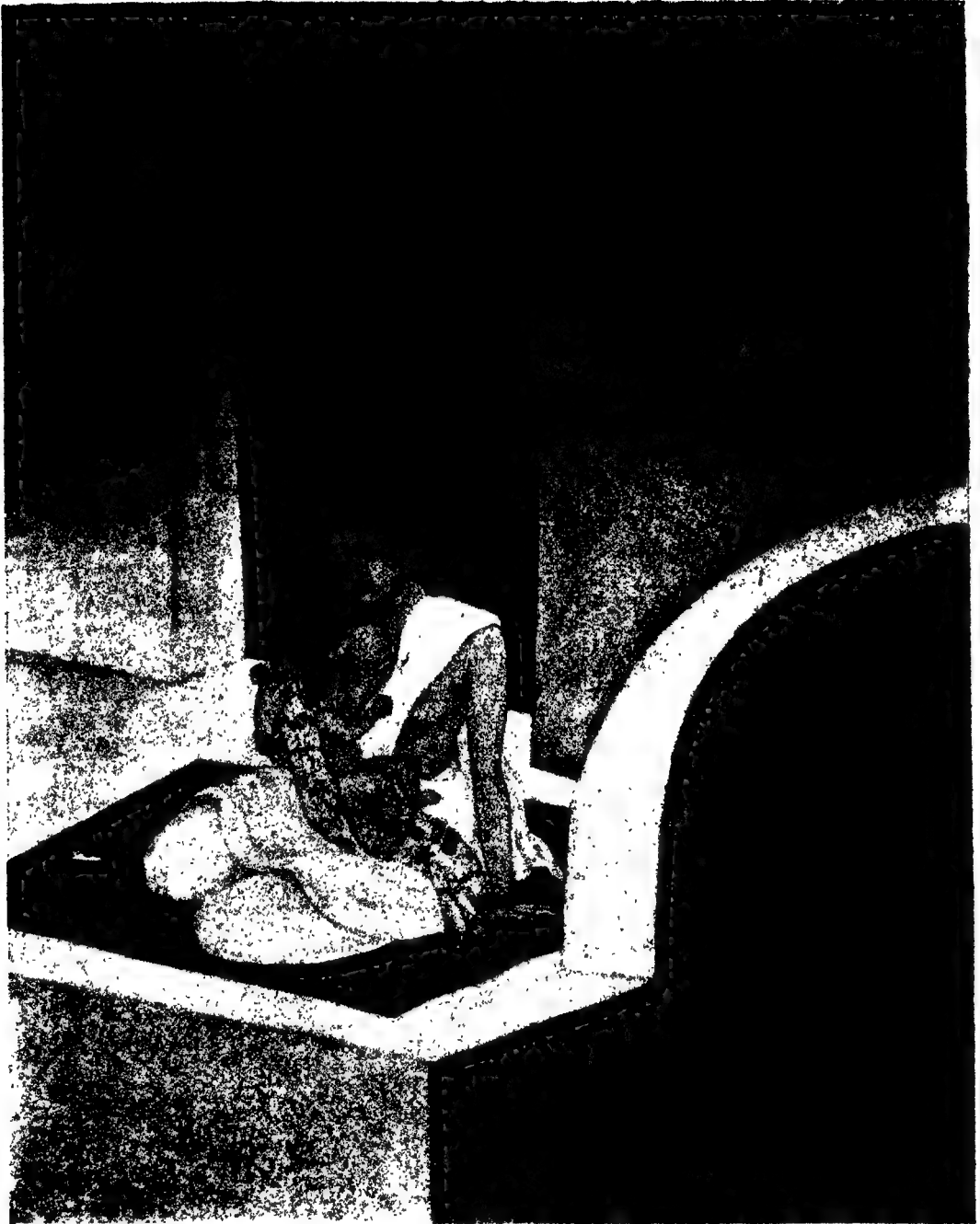
চিত্রকর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"ভৈরবে"

(১)

প্রিয়নাথের বয়স যখন ১২ কি ১৩, তখন দুর্ল্ভ বাগ্‌দীর পুত্র ভৈরব ৭।৮ বৎসরের শিশু মাত্র। বয়সের মধ্যে এতটা পার্থক্য থাকায় তাহাকে প্রিয়নাথের বাল্যসখা মোটেই বলা চলে না—সে দরকার পড়িলে ঘুঁড়িটা উড়াইয়া দেওয়া, ডাব পাড়া হইলে কাটারিটা চুরি করিয়া আনা, মাছ ধরিবার জন্য কাঠপিঁপড়ার বাসা খুঁজিয়া ফিরা ইত্যাকার ফরমাইসগুলা খাটিত মাত্র। কাজগুলি সুসম্পন্ন হইলে তাহার বিশেষ কোন পুরস্কার ছিল না; ত্রুটি হইলে কিলটা চড়টা ঘাড় পাতিয়া লইতে হইত। ইহাতেও সে কেন যে ছায়ার মত তাহার নিত্যসঙ্গী হইয়া থাকিত বলা যায় না।

এ-সব অনেক দিনের কথা; ক্রমে প্রিয়নাথ খেলা ছাড়িয়া সুশীল হইয়াছে, গ্রাম্যস্কুলে পড়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে এবং পরে কলিকাতা হইতে ডাক্তারী পড়িয়া সম্প্রতি চাকরী লইয়া বিদেশে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

ভৈরবের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই যে কতকগুলা বৎসর তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে তাহার দাগ, না তাহার রোগপাণ্ডুর দেহে না তাহার চির-বিষণ্ণ মনে—কোনখানেই অঙ্কিত হয় নাই। প্রিয়নাথ ছুটি পাইলেই আসিত, ভৈরব খবর পাইত; ভাল থাকিলে দেখা করিতে আসিত—অর্থাৎ বাড়ীর আশেপাশে ঘুরিয়া নজরে পড়িবার চেষ্টা করিয়া ফিরিত; অসুখে পড়িয়া থাকিলে এটুকুও অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিত না—অদর্শনের ব্যথাটা বুকে চাপিয়া পড়িয়া থাকিত; "বামুনদাদা" তো আর বাড়ী আসিয়া দেখা দিয়া যাইতে পারে না।

দেখা হইলে, প্রিয়নাথের মনটা যদি প্রসন্ন থাকিত, সে মুরুব্বির মত দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করিত, নচেৎ শুধু "কি রে, ভৈরবে নাকি?" বলিয়াই ক্ষান্ত হইত। ভৈরব যে ইহাতেই পরিতৃপ্ত হইত এরূপ বলা যায় না, তবে ইহার বেশি পাইবার উচ্চাশাও তাহার মনে ছিল না।

'বামুনদাদার' ডাক্তার হইবার খবর যখন তাহার কাছে প্রথম পহুঁছিল, অনির্ব্বচনীয় এক হৃদয়াবেগের বশে রোগ-শয্যা ত্যাগ করিয়া সে তাহার বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল! কোট-প্যাণ্ট পরিয়া ঔষধের বাক্স হাতে তাহাকে কেমন দেখায় তাহা দেখিতে হইবে তো?—ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা আর চলে না। প্রিয়নাথ ইহার পূর্ব্বেই চাকরী-স্থানে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং হতাশ হইয়া ভৈরবকে ফিরিয়া আসিতে হইল। জ্বরটা ২।৩ দিন একটু প্রবল হইল।

নূতন বাসার জন্য কয়েকটা জিনিষপত্র লইতে প্রিয়নাথ বাড়ী আসিল। ভৈরবের মা আসিয়া জানাইল ভৈরবের অসুখটা একটু বাড়িয়াছে, আর সে প্রিয়নাথ ভিন্ন কাহারও কাছে চিকিৎসা করাইতে নারাজ।

নূতন ডাক্তার ইহাতে একটু গর্ব্ব অনুভব করিল। হাতে কাজ না থাকিলেও বৈকালের পূর্ব্বে তাহার "অবসর" হইয়া উঠিল না। নূতন-কেনা সুট পরিয়া পকেটে অর্দ্ধেক বাহির করিয়া ষ্টেথোস্কোপ ও হাতে একটা ব্যাগ লইয়া যখন সে ভৈরবের কুটীরে উপস্থিত হইল, তখন ভৈরব বিছানা হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল।

গম্ভীরভাবে রোগীটিকে নাড়াচাড়া করিয়া প্রিয়নাথ তাহার হাঁসপাতালের একটা 'ফরম' বাহির করিয়া তাহাতে রোগীর নাম, ঔষধ ও তাহার সেবনবিধি ও অবশেষে নিজের দস্তখৎটি পর্য্যন্ত যথাপদ্ধতি লিখিল, পথ্যনির্ণয় করিয়া দিল এবং রোগীর ঘরটির সমস্ত দোষ-গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ও আদর্শ রোগীনিবাস সম্বন্ধে খানিকটা উপদেশ দিয়া চলিয়া গেল।

সেই সময় পরীক্ষা করিলে জানা যাইত ভৈরবের জ্বর এইটুকু সময়ের মধ্যেই অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। সে মাকে বলিল, "হ্যাদা, বামুনদা ডাক্তার হওয়ায় যেন বাঁচা গেল, না?"

কর্ম্মস্থানে যাইবার পূর্ব্বে প্রিয়নাথ আর-একবার স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া ভৈরবকে দেখিতে আসিয়াছিল এবং নিজের ডাক্তারীর আস্ফালনটা বিনা দেখিনা অনক্কার হাসিহাসিনা

বলিয়াছিল, "এই সামান্ত জ্বরে ভৈরবে এতটা দিন ভুগলে! কে দেখ্‌ছিল দুলে-বউ ?"

তাহার এই আত্মপ্রসাদে সাহস পাইয়া ভৈরব তাহার বহুদিনের পোষিত একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তোমার চাকরীর জায়গায় আমায় নিয়ে যাবে, বামুনদা ?"

সে জবাব পাইয়াছিল, "একটু রোস, সেখানে জমিয়ে বসি আগে।"

(২)

যাইবার দিন ষ্টেশনে প্রিয়নাথ দু'একবার ভৈরবকে দেখিতে পাইল—যেন একটু গা ঢাকা দিয়া বেড়াইতেছে। বিশেষ তাড়াতাড়ি বলিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

গন্তব্য ষ্টেশনে নামিয়া প্রিয়নাথ কুলি ডাকিতেছে, এমন সময় পিছন হইতে ভৈরব আসিয়া ট্রাঙ্ক্‌টার নিকট হেঁটমুখে দাঁড়াইল, বলিল, "কুলি আর ডাকতে হবে না, বামুনদা।"

প্রিয়নাথ একেবারে থ হইয়া গেল; জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এখানে ?"

ভৈরব শুধু স্নেহাবেগের টানে ঘুরিতেছে, তাহার একটা অলীক জবাব গড়িয়া রাখা হয় নাই। কিছু উত্তর দিতে পারিল না, মূঢ়ের মত নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রিয়নাথ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে ভৈরবে ?"

ভৈরব একবার চক্ষু তুলিয়া কাতরভাবে বলিল, "তুমি একলা রয়েছ, বামুনদা, বিদেশ বিভুঁই—"

প্রিয়নাথ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "তাই বুঝি তুই আগ্‌লাতে এসেছিস্?—মস্তবড় পালোয়ান! এখন নে, তোল্; পরের কথা পরে হ'বে। তোর মাকে বলে' এসেছিস্ তো? তোর গুণে ঘাট নেই।"

ভৈরব কিছু উত্তর দিল না, ট্রাঙ্ক্‌টা তুলিয়া লইল।

দুই জনে বাসার দিকে চলিল।

পহুঁছিয়া বোঝামাথায় উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভৈরব একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—গতিক দেখিয়া বেশ উৎসাহ বোধ হইল না। দেওয়াল দিয়া ঘেরা প্রকাণ্ড হাতার মধ্যে হাঁস্‌পাতাল ও কয়েকখানা বাসাবাড়ী, সযত্নরক্ষিত ফুলের বাগান ও কয়েকটা কূয়া। তীরভাঙা নদী, বড় বড় পুকুর, আগাছায় ভরা বড় বড় বাগান প্রভৃতি যে-সব ক্ষেত্রে যে-ভৈরব প্রিয়নাথের দক্ষিণ হস্ত ছিল, এখানে তাহার যেন কোন কাজ নাই বলিয়া বোধ হইল। এই নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাহার প্রথম মনে হইল—বামুনদাদা ও তাহার মধ্যে অনেকটা ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে।

এই সময় ময়লা-কাপড়-পরা একটা হিন্দুস্থানী চাকর আসিয়া তাহার মাথা হইতে ট্রাঙ্ক্‌টা নামাইয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।

ভৈরবের চক্ষের সাম্‌নে হইতে ঝাঁ করিয়া আর-একটা পরদা সরিয়া গেল—ওঃ সে যে বাগ্দী, অস্পৃশ্য; বাড়ীর বারান্দায় উঠিবার তাহার অধিকার নাই যে! আসিবার সময় এই কথাগুলা সে ভুলিল কিরূপে ?

প্রিয়নাথ জামা জুতা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। ভৈরবকে মৌনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "ওপরে উঠে আয়না রে, এখানে অত বিচার নেই।"

ভৈরবের মনটা একটু হাল্‌কা হইল বটে; কিন্তু জাতি-গত সংস্কার ঠেলিয়া আর সে-সময় সে দাওয়ায় উঠিতে পারিল না। প্রিয়নাথের এই কথাটুকুতে বেশ পরিতৃপ্ত হইয়া সিঁড়ির নীচে বসিয়া এ-কথা সে-কথার পর, তাহার বামুন-দাদার সেপাই হইবার বহুদিন-পোষিত ইচ্ছা ও বর্ত্তমানে কত বাধা এড়াইয়া এখানে ভালয় ভালয় আসিয়া পহুঁছান প্রভৃতি বিষয় লইয়া সে গল্প জুড়িয়া দিল।

হাজরী দিবার জন্য প্রিয়নাথ হাঁস্‌পাতালে চলিয়া গেল ভৈরব হিন্দুস্থানী চাকরটার সহিত বাঙ্গলাভাষায় বলিয়া ও হিন্দি ভাষায় শুনিয়া যতটা ধৈর্য্য রহিল গল্প করিল এবং তাহার পর বেলা বাড়িয়া যাওয়াতে ও মার কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় মৌন হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রিয়নাথ বাড়ী আসিয়া ভৈরবকে সেই একইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া একটু রাগিয়া বলিল, "হয়েচে! তোর নিজের শরীরেরই খবর নেই, তুই আবার আমায় আগ্‌লাবি! এতক্ষণ নেয়ে ধুয়ে নিতে পার্‌তিস্ নি ?"

দাওয়ার এককোণে একটা ছোট কামরার তালা খুলিয়া দিয়া প্রিয়নাথ কহিল, "নে উঠে আয়, এই ঘরটাতে থাক্‌বি তুই।"

চাকরটার দিকে একবার চাহিয়া সঙ্কোচ-পীড়িত

পদক্ষেপে ভৈরব ঘরটাতে প্রবেশ করিল। প্রিয়নাথ চাপা গলায় বলিয়া দিল, "খবরদার, ও বেটাকে বলিস নি যেন যে তোর ঘরে দোরে ঢোকা মানা।"

মর্ম্মস্থলে আহত হইয়া—কি-একরকম হইয়া গিয়া ভৈরব বলিল "ও জানে।"

(৩)

ভৈরব যে তাহার অনুমতির বিরুদ্ধেও আসিয়াছে প্রিয়নাথ ইহার জন্য তাহাকে কিছু বলিল না। দূরবিদেশে অবসর সময়ে দু'টো কথা কহিবার লোক জুটিল, ইহাতে সে বেশ নিশ্চিন্ত হইল। পূর্ব্বেই ভাবিয়াছিল একটু পসার জমাইয়া বসিতে পারিলে ভৈরবে কি অন্য কাহাকেও তাহার পেয়াদা করিয়া কেতা-দুরস্তভাবে থাকিবে। এখন ভাবিল—এই ঠিক হইয়াছে; ডাক্তার, উকিল প্রভৃতির কায়দাটাই আগে, না হইলে পসার জমে না।

সমস্তদিন উর্দ্দি চাপরাস্ জড়াইয়া বসিয়া থাকিলেও ভৈরবকে কাজ বেশি করিতে হইত না। প্রিয়নাথের সহিত যথাসময়ে আফিসে যাইত, ঘরের চৌকাঠে ঠেস দিয়া বসিয়া বসিয়া ঝিমাইত—এবং কালে ভদ্রে প্রিয়নাথের দু'একটা ডাক পড়িলে বিশেষ উৎসাহের সহিত ব্যাগটা হাতে করিয়া ও ছাতাটা ডাক্তার-বাবুর মাথায় ধরিয়া চাকরীর ও ফলতঃ নিজের জীবনটার সফলতা অনুভব করিত। সেরূপ দিনগুলা তাহার দেমাকে কাটিত।

কয়েকটা মাস এইরূপে কাটিল। ইহার মধ্যে প্রিয়নাথ একবার ছুটি লইয়া দেশে আসিয়াছিল। তাহাতে ভৈরবের গ্রাম-সমক্ষে নিজের পদগৌরব ও রোগমুক্ত সবল সুস্থ দেহটা দেখাইবার অনেক দিনের সাধটা পূর্ণ হইয়াছিল। ফিরিবার সময় বিষয়-সম্পর্কে তাহার কিছু বিলম্ব হওয়ায় প্রিয়নাথ একলাই ফিরিয়াছিল।

মাস খানেক পরে ভৈরব যখন ফিরিল, দেখিল তাহার কর্ত্তব্যের একটু বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রতি ২।৩ দিন অন্তর তাহাকে সদরে যাইতে হইবে। সিভিল্ সার্জ্জন্ মিঃ রয়ের বাঙ্লাতে যাইয়া তাঁহাকে প্রিয়নাথের সেলাম দিতে হইবে এবং মিস্ রয়ের নিকট ফুলের তোড়া পহুঁছাইতে হইবে। রবিবারে রবিবারে প্রিয়নাথ স্বয়ংই হাজরী দেয় এবং সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া এই দিনটির জন্য বিশেষ আয়োজন চলিতে থাকে।

ভৈরব আন্দাজে আব্ছাওয়া আব্ছাওয়া যাহা একটু বুঝিল, চাকর-খানসামার সঙ্গে মিশিয়া তাহা বেশ সুস্পষ্ট করিয়া লইল। প্রথম একটা তীব্র চোট খাইল; এবারে বাড়ীতে বিবাহের কথা উঠিলে প্রিয়নাথ গুছাইয়া উঠিবার অছিলায় তাহা স্থগিত রাখিয়া আসিয়াছে, আর এখানে এই বিজাতীয় ব্যাপার! একেবারে ক্রিশ্চানের সহিত বিবাহ! মাথাভার, বুকব্যথা প্রভৃতির ভাণ করিয়া সে, ৩.৪ দিন ফুল পহুঁছান বন্ধ দিল, কিন্তু দেখিল যে এরূপ করায় সে যাহা ভোগ করিতেছে তদপেক্ষা চতুর্গুণ যন্ত্রণায় 'বামুনদা' অস্থির হইয়া পড়ে। সমস্ত দিনে আহার একরূপ করেই না, 'কল্' আসিলে "বাবুর অসুখ" বলিয়া ফিরাইয়া দিবার আদেশ ভৈরবের উপর থাকে; শুধু মিস্ সাহেবের জন্য কেনা পুষ্পরাশি ও মিস্-সাহেব-প্রদত্ত কুকুরটার সহিত সমস্ত দিনটা কাটাইয়া দেয়।

ভৈরব ধর্ম্ম ও সমাজের দিক্ দিয়া ব্যাপারটা আলোচনা করিয়া দেখুক্ আর নাই দেখুক, 'বামুনদাদার' মলিন মুখ দেখা তাহার অসহ্য হইয়া পড়ায় ৩।৪ দিন বাদে আর অনিচ্ছার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিল না, পরন্তু পরম আগ্রহসহকারেই এই পুষ্প-উপহার পহুঁছাইবার কর্ত্তব্যটা নিজের হাতে উঠাইয়া লইল।

ক্রমে তাহার সংস্কার-জাত বিদ্বেষটাও তিরোহিত হইয়া গেল। 'ডাক্তার-দাদার' প্রেমের পাত্রীর উপর তাহার একটা সহজ সরল ভক্তি ও আত্মীয়তা দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার বৈচিত্র্যহীন জীবনে একজনকে মাত্র সে ভালবাসিয়াছিল—সে প্রিয়নাথ; এখন তাহার অজ্ঞাতসারে সেই প্রেমপ্রবাহিণীর আর-একটি ধারা এই নারীটির চরণ-প্রান্তে আসিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

প্রিয়নাথের প্রণয়-ব্যাপারটা যতই ঘোরাল হইয়া আসিতেছিল, স্বদেশবাসী, অল্পভাষী এই ভৃত্য-অভিভাবকটির নিকট প্রিয়নাথ ততই যেন সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল। ভৈরব একটু-আধটু লিখিতে পড়িতে পারিত; কিন্তু সে যে এই কথাটা চিঠির সাহায্যে বাড়ী পহুঁছিয়া দিবে এরূপ কোন ভয় প্রিয়নাথের ছিল না, ভয় ছিল তাহার ব্যক্তিত্বকে। মুখে রা নাই,

অসীম বাধ্যতার সহিত সমস্ত আদেশ নির্ব্বিচারে পালন করে, অথচ প্রিয়নাথের তাহাকে লইয়া একটা দুর্ব্বহ অস্বস্তিতে থাকিতে হইত ; তাহার নিকট নিজের প্রত্যেক গতিবিধির একটা যুক্তি দেখান প্রয়োজন বলিয়া বোধ হ'ত। সেইজন্যই একদিন থাকিয়া থাকিয়া অহেতুক ভাবে প্রিয়নাথ বলিয়া উঠিল, "দেখ্ ভৈরবে, ব্রাহ্ম কাদের বলে জানিস্?"

ভৈরব বলিল, "না, বামুনদাদা।"

"তারা আসলে হিন্দু ; তবে মেয়েপুরুষে লেখাপড়া জানে, আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাই ক্রীশ্চান বলে' বোধ হয়।" তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "যেমন এই মিস্ রয়রা।"

ভৈরব চুপ করিয়া রহিল ; বুঝিতে পারিল না এই মিথ্যাটুকু বলিবার উদ্দেশ্য কি।

(৪)

পূর্ব্বরাগের ব্যাপারটা বেশ জমিয়া আসিতে লাগিল। এক রবিবার সন্ধ্যায় প্রিয়নাথ খুব উৎফুল্লভাবে মিঃ রায়ের বাড়ী হইতে ফিরিল, মিস্ রয়ের কুকুর-বাচ্চাটাকে সাধারণ পাওনার ঢের বেশি আদর করিল এবং সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর উঠানে আরাম-কেদারায় শুইয়া ভৈরবকে বুঝাইতে লাগিল—এখানে 'ক্যাম্বেল'-পাশকরা বিদ্যা লইয়া পঞ্চাশ টাকায় পড়িয়া থাকা কতটা মূর্খতা এবং বিলাতে গিয়া একটা বিশিষ্ট ডাক্তার হইবার সুবিধা পাইলে তাহা জাতিধর্ম্মের খেয়ালে ত্যাগ না করা কতটা সুবুদ্ধির পরিচায়ক।

এইরূপ অনেক কথা সে বলিয়া যাইতে লাগিল। সে যে একটা মদির স্বপ্নে আবিষ্ট হইয়া আছে তাহার একটা অচেষ্টাপ্রসূত বর্ণনা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। আরাম-কেদারায় নিজকে সম্পূর্ণরূপে এলাইয়া দিয়া সে বৈশাখী চন্দ্রের দিকে চাহিয়া আছে, ভৈরব তাহার পা টিপিয়া দিতেছে আর নিবিষ্টমনে শুনিয়া যাইতেছে—অসংখ্য আলোকমালায় শোভিত ইন্দ্রালয়তুল্য বিলাত যাইবার জাহাজটা কি বা, আর বিশাল সমুদ্রের নীলাম্বুরাশি ঠেলিয়া এই জাহাজ যে বিলাতে প্রিয়নাথকে উত্তীর্ণ করিবে তাহাই বা কি অপরূপ! তাহার পর যখন প্রিয়নাথ কপালে যশের টীকা পরিয়া ফিরিয়া আসিবে এবং চিরবাঞ্ছিতা রয়-দুহিতার সহিত মিলিত হইয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইবে, সে মুহূর্ত্তই বা কি মহিমাময়! যে ভৈরব ডাক্তার-দাদার মধ্যে নিজের সত্তা লুপ্ত করিয়া দিয়াছে সে প্রভুর এই বিপুল সার্থকতার বাহিরে নিজকে কোনখানে দেখিতে পাইল না।

তাহার মনে সামান্যও দ্বিধা আপত্তি কি নিয়মলঙ্ঘনের ব্যথা উদয় হইল না ; মনের মধ্যে তাহার একটি ছবি স্পষ্ট হইয়া উঠিল সৌভাগ্যের আসনে সস্ত্রীক আনন্দমূর্ত্তি ডাক্তার-দাদা আর পদতলে আপন-ভোলা সে স্বয়ং।

সকালের রীতি অনুযায়ী ভৈরব ডাক্তারখানায় ঘরের দুয়ারে বসিয়া ছিল ; প্রিয়নাথ ডাক্তারী পড়িতে যাইবার গল্প করিতেছিল। একটা রোগীকে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ দিয়া প্রিয়নাথ বলিল, "তা হ'লে ভৈরবে, আমি তো এই দুমাস বাদে রওয়ানা হলুম, তুই আর মাথা বাড়িয়ে কি করছিস্? আর কি জানিস্ ভৈরবে, ওদের এ সময় একটু মন যুগিয়ে চলাই ভাল, আমি ভাব্‌ছি এই সময় একটা ক্রীশ্চান 'বয়' রাখ্‌ব, দুটো লোক রাখ্‌বার তো আর আমার অবস্থা নয়—"

কথাটা ভৈরবকে শেলের মত বিদ্ধ করিল। তাহার মনটা ইদানীন্তন নূতন অবস্থার মধ্যে নিজকে মানাইয়া লইয়া আসিতেছিল ; কিন্তু তাহার মন এই নূতনতর আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, ভাঙিয়া পড়িল।

প্রিয়নাথ তাহার পানে দৃষ্টিপাত করিল এবং বোধ করি একটু ব্যথিতও হইল। ভাবের আবেগে বলিতে লাগিল, "দেখ্, অদ্ভুত তোদের এই হিন্দুধর্ম্ম, প্রাণের টানকে একেবারে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। এই দেখ্‌না, তুই আমায় এত ভালবাসিস্, অথচ সর্ব্বদাই দূরে দূরে থাক্‌তে হয়—এ'টা ছুঁতে পাবে না, ওখানটা মাড়াতে পাবে না—ছোট ঘরে জন্মেছিস্ বলে' আর দোষের সীমা নেই। মিস্ রয়দের ধর্ম্ম দেখ্ দিকিন্, কি ছোট, কি বড়, সকলকে ভাই ভাই করে' রেখেছে! সত্যি বল্‌তে কি ভৈরবে, আমি যে ক্রীশ্চান হ'তে যাচ্ছি তাতে আমার

মোটেই আপ্‌শোষ নেই, বয়ঙ্ক তুইও যদি হ'তিস্ তো বুঝ্‌তে পার্‌তিস্ ডাক্তার-দাদা তোর কত আপন হ'য়ে পড়ে। আর মিস্ রয়ও ক্রীশ্চানের বড় পক্ষপাতী; আমি যদ্দিন বিলেতে থাকব চাইকি তোকে তাঁদের—"

প্রিয়নাথ হঠাৎ চাহিয়া দেখিল ভৈরবের চক্ষু দুইটা ছলছল করিতেছে। প্রিয়নাথ একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল। হাসিয়া বলিল, "তোকে কি আমি ক্রীশ্চান হ'তে মাথার দিব্বি দিচ্ছি, যে কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে উঠ্‌লি? তবে আমি যে শিগ্‌গিরই হ'তে যাচ্ছি এটা ঠিক, না হ'লে বুড়ো আঙ্গুলে পইতে জড়িয়ে মন্ত্র আউড়ে মিস্ রয়কে বে কর্‌ব?—হ্যাঁরে ভৈরবে?"

এটুকুতে কিন্তু ভৈরবের মনটাকে শান্ত করিতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল প্রিয়নাথ যেন তাহাকে দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছে এবং এই কথাটাই আজ কয়েকদিন ধরিয়া নানাভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মনটা তাঁহার ভীত, সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িল; এবং এই সন্দেহ ও জাতিচ্যুতির ভয় এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে আর মনটাকে মানান তাহার অসম্ভব হইয়া উঠিল। বামুনদাদার প্রতি ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস সমস্তই এক মুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হইয়া এক দারুণ অবিশ্বাস, বিতৃষ্ণায় পরিণত হইয়া গেল। ভৈরবের মনে হইতে লাগিল যে এ স্থানটাতে নিশ্বাস-বায়ুর অভাব ঘটিতেছে।

ভৈরব দুই দিন অন্যমনস্কভাবে পাগলের মত কাটাইল। তৃতীয় দিন রবিবার ছিল; প্রিয়নাথ সকালে উঠিয়া দেখিল ঘরটা শূন্য পড়িয়া আছে—'ভৈরবে' নাই।

প্রিয়নাথের অন্তরে একটু আঘাত লাগিল; কিন্তু সেদিন রবিবার—মিলন-আশার আনন্দ লইয়াই সে উঠিয়াছিল, এই ক্ষুদ্র বিচ্ছেদটির দিকে তেমন মন গেল না।

(৫)

ভৈরবের অন্তরে অন্তরে একটা ঝড় বহিতেছিল, তাহাই যেন ধাক্কা দিয়া তাহাকে লইয়া চলিল। সে ষ্টেশনের অভিমুখে চলিল, পহুঁছিয়া একটা রাস্তার উপর অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিল। যখন গাড়ী আসিল তখন একটা কামরায় উঠিয়া বসিল—টিকিট করিবার কথাটা তাহার মনেও পড়িল না। গাড়ী চলিতে লাগিল।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ কানের কাছে ঠক্‌ঠক্ শব্দে জাগিয়া উঠিল—

"টিকিট, টিকিট?"

ভৈরব পকেটে হাত দিতে যাইতেছিল, মনে পড়িয়া গেল টিকিট কেনা হয় নাই; টিকিট-বাবুর মুখের পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বেশি কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় ছিল না, টিকিট-কালেক্টর দরজা খুলিয়া ভৈরবকে নীচে নামাইয়া ফেলিল।

পরমুহূর্ত্তে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

আবার প্রশ্ন হইল, "টিকিট?"

ভৈরব উত্তর দিল, "ভুলে গেছি।"

"ভাড়া দাও।"

"কত?"

টিকিট-কালেক্টর একবার চকিতে এদিক্-ওদিক্ দেখিয়া লইল, বলিল, "কোথা থেকে আস্‌ছিস্?—তা যেখান থেকেই আসিস্ জংশন থেকে চার্জ্জ্ হবে, রাখ দুটো টাকা।"

টাকা বাহির করিতে ভৈরব পকেটে হাত দিল; হাতটা পকেটের মধ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।

ভৈরব কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। আদায় হওয়ার কোন আশা নাই দেখিয়া চাপা গলার বদলে টিকিট-কালেক্টর হুঙ্কার করিয়া উঠিল—দম্‌বাজি হচ্ছে আমার সঙ্গে, দে এক্সেস্ ফেয়ার, পুলিস—"

একটু জনতা হইয়া পড়িল, একজন পাদ্রী-সাহেব গাড়ী হইতে নামিয়াছিল, ভীড়ের মধ্যে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কি হইয়াছে বাবু? টিকিট কিনে নাই বুঝি?" সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবের কর্ত্তিত পকেটের ভিতর সংবদ্ধ হাতখানা দেখিয়া ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল "কত চাহি, ইহার তো পকেট কাটা পড়িয়াছে।"

টিকিট-কালেক্টর আড়ে চাহিয়া একটু রসিকতা করিয়া বলিল "হ্যাঁ এবার এও কাটা পড়্‌বে, তুমি বাঁচাচ্ছ নাকি? তা' হ'লে রাখ দু টাকা।

পাদ্রী-সাহেব পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিল। টিকিট-কালেক্টার একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। কিছু না বলিয়া পকেট হইতে একটা রসিদ-বহি বাহির করিল, একটা রসিদ্ লিখিল, তাহার পর সাহেবের একটা টাকা টানিয়া লইয়া ও রসিদ্‌টা ছিঁড়িয়া দিয়া রাগত-ভাবে গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল।

পাদ্রী-সাহেব ভৈরবকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিয়া টাকো?"

ভৈরব বাক্যটার অর্থগ্রহণ করিতে না পারিয়া পাদ্রীর মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

একজন ভদ্রলোক বলিল, "কি করিস্ রে ব্যাটা বল্‌না তাই।"

ভৈরব বলিল, "কিছুই করি না এখন।"

সাহেব প্রশ্ন করিল, "আমার চাপ্‌রাশী হইবে?"

ভৈরব ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

সাহেব হস্তস্থিত একটা ভারী ব্যাগ বাড়াইয়া ধরিল। ভৈরব উঠিল এবং সেইটা হাতে লইয়া সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

সাহেবের চাপরাশী হইয়া সে সাহেবের কাছে রহিল। কাজ এমন কিছু বেশি নয়—ভৈরব প্রায় বসিয়াই থাকিত। এই বসিয়াই থাকা তাহার জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিল। প্রিয়নাথ ও তাহার মধ্যে ব্যবধানটা যেমন বর্দ্ধিত হইয়া পড়িল, তাহার অন্তরটা টানের বেদনায় ততই টন্‌টন্ করিতে লাগিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিবার যথেষ্ট সময় পায় —সেই সময়টাতে ঐ একটি মাত্র চিন্তাকে পরিস্ফুট করে। যেটুকু সময় সে কর্ম্মে লিপ্ত থাকে সেটুকুও বড় অন্যমনস্ক হইতে পারে না। মনে হয় ডাক্তার-দাদার সমর্পিত তাহার জীবনের বাঁধা কর্ম্মে পাদ্রী-সাহেবের কার্য্যগুলা কেবলই অনধিকার প্রবেশ করিতেছে; সকালে বিকালে সন্ধ্যায় একটা ফর্‌মাস তামিল করিতে গেলেই মনে পড়িয়া যায় এ-সময় ডাক্তার-দাদার জন্য কি কার্য্য করিতে হইত।

পাদ্রী-সাহেব সন্ধ্যার সময় ভৈরবকে লইয়া একটু বসিত। প্রথম প্রসঙ্গক্রমে যিশুর কথা আনিয়া ফেলিতে লাগিল, ক্রমে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বাইবেল আওড়ান সুরু করিয়া দিল। ভৈরবের মনটা সাহেবের গল্পে কতটা সংবদ্ধ থাকিত বলা যায় না; কারণ মাস দেড়েক পরে একদিন জমাট গল্পের মাঝেই সে হঠাৎ বলিয়া বসিল, "বাবা, আমার আর মন লাগ্‌ছে না, ভাব্‌ছি যাব।"

পাদ্রী-সাহেব বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোটায়?

ভৈরব বলিল, "আমার মনিবের কাছে, ডাক্তার-দাদার কাছে।"

পাদ্রী বলিল, "যাইবে যাও, আমি ভয় করি না; শুডু টোমার জন্ত ভাবি—সে টোমায় আর ষ্টান ডেবে?"

"সে আমি ঠিক করেছি। ডাক্তার-দাদা এদ্দিন ক্রীশ্চান হয়েছে নিশ্চয়; আর ৪।৫ দিনের মধ্যেই বিলেত যাবে। তাকে একবার দেখিগে; যদ্দিন না ফিরে আসেন, রয়-সাহেবদের বাড়ী থাকবো'খন বাবা। আমায়ও তুমি মন্তর পড়িয়ে নেও—আর তুচ্ছু ধর্ম্মের জন্যে ডাক্তারদাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারিনে; ডাক্তারদা ভিন্ন আমার আর এ সংসারে কেউ নেই, বাবা—" পাদ্রী সাহেবের পা জড়াইয়া ভৈরব হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

* * * *

তিন দিন পরের কথা।

সন্ধ্যা হব-হব। কাজকর্ম্ম সারিয়া প্রিয়নাথ বাড়ীর সাম্‌নে ঘাসের উপর আরাম-কেদারায় দেহ ছড়াইয়া শ্যামা-বিষয়ক এক গান লইয়া গুন্‌গুন্ করিতেছিল।

পাদ্রীর দেওয়া ঢিলা-ঢালা কোট-প্যাণ্টালুন পরিয়া ভৈরব-সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রিয়নাথ প্রথমটা তাহাকে চিনিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

ভৈরব কাঁদিতেছিল, ভাঙা গলায় উত্তর করিল, "আমি, ডাক্তারদা, আবার ফিরে এসেছি।"

বিস্মিতভাবে প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তা ত বুঝ্-লুম, কিন্তু এ-বেশ কেন?"

ভৈরবের বুকটা একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় ধক্‌ধক্ করিতে লাগিল। প্রিয়নাথের মুখের উপর কোটরগত বড় বড় চক্ষু দু'টা রাখিয়া প্রশ্ন করিল, "মিস্ রয়ের সঙ্গে বে —ইয়ে—তোমার বিলেত যাওয়ার কি হ'ল ডাক্তারদা?"

প্রিয়নাথ তাচ্ছিল্যের সহিত বলিয়া যাইতে লাগিল, "আবে মারো ঝাড়ু, ওসব দিকে আবার মানুষে যায়! আর

ঐ ক্রীশ্চানগুলোর নাম সন্ধ্যের সময় মুখে আনিস্ নে ; না কথার ঠিক আছে, না ধম্মের ঠিক আছে,—আর ধম্মের ঠিক থাক্‌বে কি, ওটা কি একটা ধম্ম ?—খেয়ালের মাথায় কি ভয়ানক ব্যাপারটাই করে' বসেছিলুম একটু হ'লে ; নে, তুই ওই বাঁদুরে পোষাক ছাড়্, সব বল্‌ছি পরে ; দু'চক্ষের বিষ ওগুলো—"

অবসন্নভাবে ভৈরব বসিয়া পড়িল ; মৃতের মত ভাব-লেশহীন নয়নে প্রিয়নাথের পানে চাহিয়া বলিল, "আমি যে সব খুইয়ে এসেছি তোমার একটু দয়া, আদরের জন্যে ডাক্তারদা'—"

শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

চিঠি

তোমায় আমি লিখ্‌বো চিঠি,—একি হ'ল দায়,—
এই তো আমার হাতের কিনারায়
থরে থরে সাজানো সব, এই যে নানা বরণ
পত্র লেখার রঙীন উপকরণ,
ফিরে ফিরে যতই বসি নিয়া,
কথার পরে কথায় পাতা পূর্ণ করি' দিয়া,
ক্ষণ পরেই 'হ'ল না হায়' ব'লে
ছিন্ন ক'রে দিই ফেলে তায় অবশেষে আবর্জ্জনার তলে।

দিবস যে রে অবশ আজি—অবসরের অবসাদের ভারে,
ব'সে ব'সে একলা খোলা বাতায়নের ধারে
লিখ্‌ছি চিঠি, আজকে আমার আখরের এই জাল
কোনো-মতেই সেই কথাটির পায় না যে নাগাল
কত রাতের জাগন-ঝরা অশ্রুজলে মাখা
যে কথাটি তোমার তরে আছে আমার মরম-তলে ঢাকা।

অবসরের অলসতায় অনায়াসের আয়োজনের মাঝে,
চিত্তে আমার তড়িৎ খেলে না যে,
বাধা যতই সহজ হ'ল, মনের তত বেড়ে চলে লাজ,
একি হ'ল আজ !
অশ্রুহারা কান্নাতে মন উছসিয়া উঠে,
অনায়াসের বঞ্চনাতে সাধন যে তার বেদন হ'য়ে লুটে।

তার পরে হায় নিশ্বসিয়া কয় সে আপন মনে—
জন্ম যদি হ'ত আমার নিরালা এক হারা গ্রামের কোণে
পথ-সীমার শেষে,
এমন কোনো মরু-পারের দেশে,
একটি ভূর্জপাতার লাগি দিনে যেথায় হ'ত পুরস্কার
খুলে আপন সোনার কণ্ঠহার,—
যেথায় কিছু নেই উপাদান, চিঠি তোমায় লিখ্‌তে হ'ত এই
পাঞ্জর-তলে তুফান-তোলা বুকেরি রক্তেই !

শত লোকের শত চোখের দৃষ্টি হ'তে যেথায় আড়াল-করা,
ত্রস্ত অধীর অন্তরেরি রাত্রিদিনের আকুল আবেগ-ভরা
আস্‌তো যবে একটি শুভক্ষণ,—
পরাণ-মাঝে তুলে নিবিড় পুলক-কম্পন
সেই কাঁপনের বেগে,
বুকের তটে দারুণ আঘাত লেগে,
জন্ম-যুগের জমাট-বাঁধা বেদন আমার ফাটি
এক নিমেষে শিহরিয়া ফুট্‌তো যে কথাটি
একান্ত উৎসুক,
সেই যে রে হায় রাঙা হ'য়ে ভর্‌তো আমার
পত্রখানির বুক।

শ্রী সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

লম্বকর্ণ-খরগোসছান—

নীচে একটি লম্বা কানওয়ালা খরগোস-ছানার ছবি দেওয়া হইয়াছে। এই ছানাটির বয়স যখন দশ মাস সেই সময় এই ছবিটি তোলা হইয়াছিল।

লম্বাকান-ওয়ালা খরগোসছানা

লম্বা কানের জন্য এই খরগোস শিশুটি ইংলণ্ডের বিভিন্ন পশু প্রদর্শনীতে কুড়ি টাকা পুরস্কার পাইয়াছে। ছানাটির দাম ৫০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত নিলামের ডাকে উঠিয়াছে।

অলক

বিদ্যুতের সাহায্যে মামি করা—

এতদিন ইজিপ্টেই কেবল মামি পাওয়া যাইত। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের লোক মৃতদেহকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিকৃত অবস্থায় রাখিবার মাল-মসলার সন্ধান জানিত না। সম্প্রতি এক বৈজ্ঞানিক
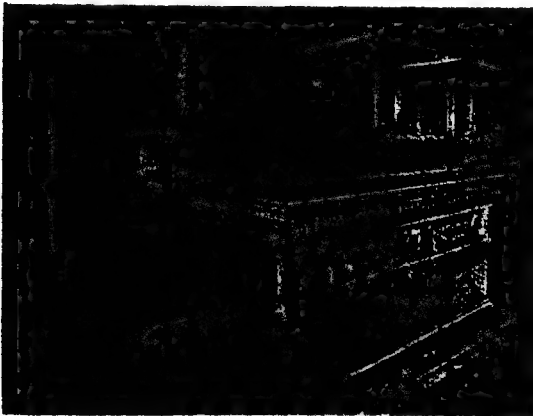
মৃতদেহের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ চালাইয়া "মামি" করিবার কল

একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার ভিতর একটি তামার পাতের উপর লাস রাখা হয়—এবং তাহার মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চালান হয়। তড়িৎপ্রবাহে শরীরের মধ্যে এমন সমস্ত রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটায়, যাহাতে মৃতদেহ অবিকৃত অবস্থায় বহুকাল রাখা চলিবে। এইরূপ করিলে অনেক আপাত-মৃত ব্যক্তির পুনরায় জীবন পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। প্রথম কুকুর বিড়ালের উপর এই পরীক্ষা হয়। তাহার পর বন্দুকের গুলিতে নিহত এক ব্যক্তির উপর এই পরীক্ষা কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের সামনে হয়। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, এইরূপ পদ্ধতিতে মৃতদেহ মামির মত বহুকাল রাখা চলিবে। এই প্রথাতে মৃতদেহের ওজন ½ কমিয়া যায়, আর কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

বাতি মাছ—

আলস্কাতে এক প্রকারের মাছ পাওয়া যায় তাহা শুকাইয়া লইয়া তাহার ল্যাজে আগুন ধরাইয়া দিলে ঠিক মোমবাতির মত জ্বলে। এই মাছের শরীরে তেলের অংশ খুবই বেশী আছে। ঐ দেশের লোকেরা এই মাছ খাইতেও খুব ভালবাসে। অনেক সময় তাহারা এই "ছলিগ্যান্" মাছের উপর গরম পাথর ফেলিয়া তেল বাহির করিয়া লয়। এই মাছের তেল চর্ব্বির মত জমিয়া যায়, এবং তাহা বহুকাল সঞ্চয় করিয়া রাখা যায়।

বাতি-মাছ

টেনিস্-কোর্টের সহর—

যতদূর দেখা যায় সবগুলিই টেনিস্ খেলিবার ময়দান। একসঙ্গে এবং একই সময়ে ৫০টি দল এখানে টেনিস্ খেলিতে পারে। এই টেনিস্-কোর্টের সহরটি অষ্ট্রেলিয়ার হোয়াইট সিটিতে অবস্থিত। পৃথিবীর মধ্যে এই টেনিস্ খেলিবার ময়দানটি সবচেয়ে বড় বলিলেও চলে। এই খানেই অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা খেলা অভ্যাস করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হন।

ডাক-টিকিটের তৈরী ছবি

২৫০০০০ ব্যবহৃত ডাকটিকিটের সাহায্যে এই ছবিখানি প্রস্তুত হয়। ছবিখানির নাম দেওয়া হইয়াছে "ফিলাটেলিয়া।" ডাবলিউ রিচেণ্ট নামে এক ভদ্রলোক এই ছবিখানি তৈরী করিয়াছেন। এই ভদ্রলোকের দেশ চেকোশ্লোভাকিয়ায়। ছবিখানিতে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ডাক টিকিট আছে। বিভিন্ন প্রকারের রংএর খেলা দেখাইবার জন্য নানা প্রকারের ডাকটিকিটের প্রয়োজন হইয়াছে। ১০০ বছরের পুরাণো ছাবিও ব্যবহৃত হইয়াছে। ছবিখানি চুরি হইবার
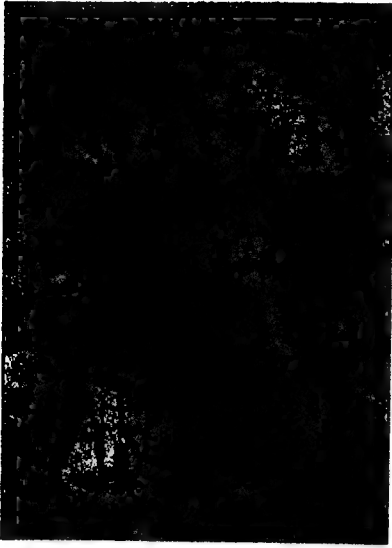
ডাকটিকিটের তৈরী চমৎকার ছবি

ভয়ে প্রায় ৪০০০০০ টাকার বীমা করা আছে। ছবিখানি বর্ত্তমানে নিউ ইয়র্ক সহরে আছে।

অদ্ভুত জানোয়ার—

সম্প্রতি দশ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী এক স্থান (নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্) হইতে এক প্রকার জানোয়ার আনা হইয়াছে। এই জানোয়দের মজা হইতেছে—ইহারা ডিম পাড়ে অথচ সন্তানদের স্তন্যপান করায়। এই অদ্ভুত জীব নাকি পৃথিবীর আদিকালের কোন এক প্রকার বিশেষ জীবের বংশধর। ইহারা জলপক্ষী এবং স্তন্যপায়ী জীবের সংমিশ্রণ বলিলেও হয়। ইহাদের হাঁসের মত চওড়া ঠোঁট আছে—পাও হাঁসের

অদ্ভুত জন্তু　হাঁসের মতন ঠোঁট—সাঁতার কাটে অথচ স্তনপায়ী

মতন এবং সেই জন্যই ইহারা সাঁতার কাটিতে পারে এবং মাটিতে হাঁটিতেও সক্ষম। ইহাদের শরীর গাঢ় ধূসর লোমে আবৃত ; ইহারা প্রায় ১½ ফুট লম্বা। ল্যাজেও যথেষ্ট লোম আছে—সাঁতার দিবার সময় এই ল্যাজ অনেকটা হালের কাজ করে। অষ্ট্রেলিয়ার শিকারীরা লোমের জন্য এইরূপ হাজার হাজার জন্তু হত্যা করে।

বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা ১২ ঘণ্টায় পূর্ণতা লাভ করে—

এক প্রকারের বিষাক্ত ছাতা মাটিতে প্রথম ফুটিবার ১২ ঘণ্টা পরে সম্পূর্ণ পূর্ণতা লাভ করে। দেখিতে বিশেষ বড় না হইলেও ইহা ভয়ানক বিষাক্ত। ভুলক্রমে ইহা খাইয়া ফেলিলে ভেদ-বমি হইতে হইতে অবশেষে মৃত্যু হইবে। এই বিষাক্ত ছাতা মাটি ছাড়া অন্য কোথাও হয় না—মেঠো জমিতেই বেশী হয়। এই ছাতা চিনিবার উপায় এই যে ইহার টুপীর নীচে আরো কতকগুলি সছিদ্র পাতা থাকে।

—

র‍্যাডিওর খেলা—

সি ফ্রান্সিস্ জেঙ্কিন্স নামে একজন বৈজ্ঞানিক একপ্রকার র‍্যাডিও যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার সাহায্যে দূরের কোন ঘটনা বায়স্কোপের চিত্রের মত অন্য কোন স্থানে একই সময়ে পর্দ্দায় প্রতিফলিত করা চলিবে। মনে করুন কলিকাতার মোহন-বাগানের খেলা হইতেছে—একদল লোক সেই খেলা বর্দ্ধমানে বসিয়া বায়স্কোপের মত
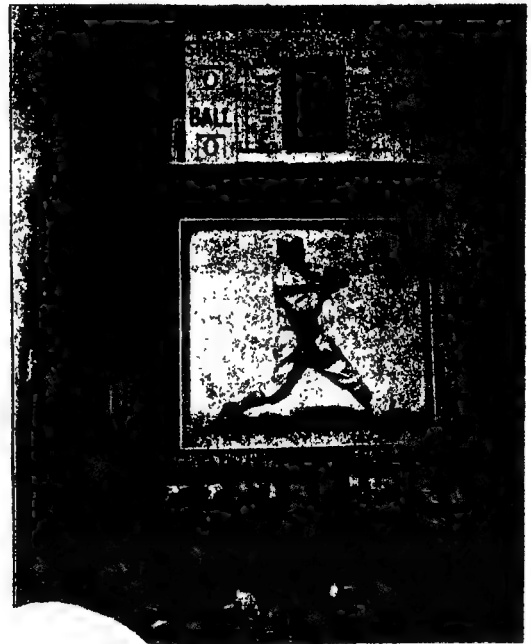
র‍্যাডিওর সাহায্যে, মাঠের খেলা সহরের বিশেষ বিশেষ স্থানে একই সময়ে পর্দ্দার উপর প্রতিফলিত হইতেছে

চলন্ত ছায়াচিত্রে দেখিতেছে। বায়স্কোপের সঙ্গে ইহার তফাৎ এই যে যে মুহূর্ত্তে খেলা হইতেছে, সেই মুহূর্ত্তেই ইহা ছায়াচিত্রে প্রতিফলিত হইবে। ছবিতে দেখুন অনেক দূরে কোথায় বেস্ বল খেলা হইতেছে —তাহার প্রতিচ্ছবি দূরের কোন এক সহরে একদল লোক ছায়াতে দেখিতেছে। এইরূপ হইলে, খেলার মাঠে লোকের ভিড় ক্রমে ক্রমে অনেক কমিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

কাচের তৈরী সমুদ্রের ফুল—

ছবির ফুলটিকে দেখিলে একটি আসল ফুল বলি। ভ্রম হইবে; কিন্তু আসলে ইহা কাচের তৈরী। হারমান্ মুলার্ নামে একজন পাকা কাচের মিস্ত্রী অনেক কাল চেষ্টা করিয়া এই কাচের সমুদ্রের ফুলটি তৈরী করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই ফুলটির উপর নানা রংএর খেলা দেখানো হইয়াছে। এই পাকা মিস্ত্রী সামুদ্রিক নানা

কাচের তৈরী সামুদ্রিক ফুল এবং মাছের অবিকল নকল

প্রকার লতাপাতা ফুল এবং জীব, কাচ দিয়া তৈরী করিতেছেন। দেখিতে সবগুলিই অবিকল আসল জিনিসের মতনই। নিউ ইয়র্কের প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণাগারে এই সমস্ত দ্রব্য প্রদর্শনী-গৃহে রক্ষিত আছে। এই সমস্ত কাচের ফুলের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে এমন কতকগুলি দ্রব্য কেমব্রিজের পিবডি প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণাগারে আছে।

—

বৃষ্টি উৎপাদন করা সম্ভব কি না—

বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের বলে মানুষ বোধ হয় ইচ্ছামত রৌদ্র এবং বৃষ্টি উৎপাদন করিতে পারিবে। দুইজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে মেঘকে তাড়াইয়া দিয়া সূর্য্যকিরণকে আনিতে পারেন, অথবা সূর্য্যকিরণকে ঢাকিয়া মেঘ আনয়ন করিতে পারেন। এই দুজন বৈজ্ঞানিকই যুক্তরাষ্ট্রের, একজন কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ উইওার ডি বার্নক্রফ্ট এবং অন্যজন ফ্রান্সিস্ ওয়ারেন্। তাঁহারা সত্যই মেঘ নষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং মেঘের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি-সম্পন্ন বালু ছড়াইয়া তুষারপাত করিতেও সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারা রসায়নের সাহায্যেই এই কার্য্য করিয়াছেন।

এই ক্ষমতা যদি সত্য-সত্যই মানুষের কাজে লাগানো যায় তবে মানুষের কতবড় উপকার যে হইবে তাহার কল্পনা করা যায় না। বৃষ্টির

বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন বালুকণা ছড়াইয়া মেঘ তাড়ানো হইতেছে

অভাবে, দরিদ্রের একমাত্র ভরসা, শস্যক্ষেত্র শুকাইয়া যাইবে না, অপর দিকে অতিবৃষ্টির জন্য প্রবল বন্যাতে দেশ ডুবিয়া যাইবে না। যুক্ত-রাষ্ট্রের লোকেরা এই ক্ষমতা কতদূর কার্য্যকরী হয়, তাহা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন।

একখণ্ড মেঘের মধ্য দিয়া নানাদিকে ক্রমাগত একখানা আকাশ-জাহাজকে চালাইয়া মেঘখণ্ডকে একেবারে তাড়াইয়া দেওয়া যায়। এই দুইজন বৈজ্ঞানিক এইভাবে এক খণ্ডের পর আর এক খণ্ড মেঘকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত আকাশকে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেঘশূন্য করিয়া ফেলিতে পারেন।

বৃষ্টিপাত করিতে হইলে, আকাশ-জাহাজকে মেঘের উপরে তুলিতে হইবে, এবং তাহার পর মেঘের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন বালু ছড়াইতে হইবে। এই বালুকণাস্থিত তড়িতের সাহায্যে জলকণা সমূহ একত্রীভূত হইবে এবং বৃষ্টিরূপে মাটির উপর পড়িবে। মেঘ যত গাঢ় হইবে, বৃষ্টিও তত বেশী হইবে।

টেলিফোন এবং র‍্যাডিও জগতের যত উপকার করিয়াছে এই নূতন আবিষ্কারের উপকার তাহা অপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম হইবে না। কত

মেঘ উৎপন্ন করিয়া বৃষ্টি তৈরী করিবার উপায়

মরুপ্রান্তর এই কৃত্রিম বৃষ্টির আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ফল ফুলের বৃক্ষ লতাদিতে আচ্ছাদিত হইয়া সজীবতা লাভ করিবে। কৃষকদেরও আর দৈবদয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে না।

এই মেঘ এবং কুয়াসা দূরীকরণের ক্ষমতায় আর একটি বিশেষ উপকার হইবে। সমুদ্রে অনেক সময় ঘন কুয়াসার জন্য জাহাজের চলাচল বন্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু এই কুয়াসা দূর করার কার্য্য উত্তমরূপে করিতে পারিলে, জাহাজের চলাচলের আর কোন অসুবিধাই হইবে না—এবং তাহাতে অনেক অঘটন এবং অর্থক্ষতি বাঁচিয়া যাইবে—এরোপ্লেন সম্বন্ধেও এইরূপ একই কথা বলা যায়।

মিঃ ওয়ারেন্ বলিতেছেন, আগুন যেমন একটা বস্তুর এক প্রান্তে ধরাইয়া দিলে তাহা সমস্ত বস্তুটাকে ক্রমে আচ্ছন্ন করে, তেমনিতর আকাশের এক স্থানে কিছু বেশী পরিমাণে মেঘ উৎপাদন করিয়া বৃষ্টিসঞ্চার করিতে পারিলে ক্রমে তাহা আকাশের অনেক-পরিমাণ স্থানে ছড়াইয়া পড়িবে। এই বিষয়ের পরীক্ষা আটলান্টিক মহাসাগরের উপর হইবে। দেখা যাক কতদূর কি হয়।
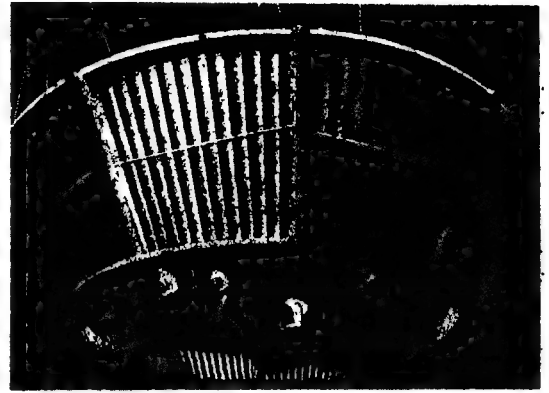
সাইকেলের খেলা—

আমরা সার্কাসে দেখিয়াছি, একটা কাঠের গোল ঝুড়ির ভিতর দিকে সাইকেল-ওয়ালারা কাত হইয়া সাইকেল চালায়। জার্ম্মানিতে এক সার্কাসে একটি অদ্ভুত সাইকেলের খেলা দেখান হয়। কাঠের

কাঠের ফ্রেম শূন্যে ঝুলিতেছে—তাহার মধ্যে সাইকেল দৌড়িতেছে

ফ্রেমের গায়ে যখন সাইকেল ঘোরে তখন ফ্রেমটিকে ধীরে ধীরে অনেক উপরে শূন্যে তুলিয়া লওয়া হয়—তার পর কিছুক্ষণ বাদে আবার নামাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বিপদ্ যথেষ্ট আছে। সামান্য একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই পতন হইতে পারে এবং তাহার ফলে মৃত্যু নিশ্চয়। ছবি দেখিলে ব্যাপারটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

হেমন্ত

জার্ম্মানিতে ভারতীয় ছাত্র

গত ফাল্গুন মাসের "প্রবাসীতে" জার্ম্মানির Technical Education-এর খরচ সম্বন্ধে শ্রী শিশিরকুমার দত্ত রায় যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রায় সমস্তই ভুল খবর দিয়াছেন। এখানকার মাসিক খরচ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, এখানে ৪০।৪৫ টাকাতে খুব স্বচ্ছন্দে থাকা যায়। কিন্তু ঐ টাকাতে এখানকার ভারতীয় ছাত্রদের খাওয়া এবং বাসা-ভাড়াও হয় না, শুধু খাওয়া দাওয়া ও বাসা-ভাড়াতে ৪ পাউণ্ড্ লাগে। উহার উপর কলেজের বেতন প্রতিমাসে প্রদেশ অনুসারে এক পাউণ্ড্ বা উহা হইতে একটু কম লাগে। তাহার উপর কলেজের প্রত্যেক লেক্চারের জন্ত ভিন্ন মাহিনা দিতে হয় এবং ল্যাবোরেটরিতে যে সব রাসায়নিক মাল-মশলা ইত্যাদি খরচ হয় তাহারও দাম দিতে হয়। শুধু কলেজেই প্রতিমাসে পৌনে ২ পাউণ্ড্ হইতে ২ পাউণ্ড্ খরচ পড়ে। সমস্ত খরচ ধরিলে মাসিক ছয় পাউণ্ডের কমে কোন ছাত্রের চলে না। বাসা-ভাড়া ও খাওয়া-দাওয়া যে ৪ পাউণ্ডে সম্পন্ন হইবে তাহাও জার্ম্মান্ মার্কের ওঠা-নামার জন্ত কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না; এমন কি মাসের প্রথমে কোন ছাত্রই বলিতে পারে না যে, তাহার এমাসে কত খরচ পড়িবে। কারণ এখানকার জিনিষপত্রের দাম ও বাসাভাড়া মার্কের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে ও মার্কের ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কমে। কিন্তু পতনের সঙ্গে সঙ্গে দাম, বাড়ার অনুপাতে কমে না। যদি মার্কের দাম উঠিতে থাকে তবে খরচ আরও বাড়িয়া যাইবে। সেজন্ত মাসিক খরচ আগে হইতে আন্দাজ করা অসম্ভব। তবে এ-পর্য্যন্ত ভারতীয় ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়া ও বাসাভাড়ার খরচ মাসিক ৪ পাউণ্ডের বেশী লাগিতে দেখা যায় নাই।

টেক্‌নিক্যাল্ হাই স্কুলগুলিতে (Technischen Hochschulen) ভারতীয় ছাত্রদের ভিড় বলিয়া ভারত হইতে পূর্ব্বেই প্রবেশ-পত্র লইয়া আসিতে বলা হইয়াছে; কিন্তু এইসব স্কুলে ভারতীয় ছাত্রদের ভিড় মোটেই নাই। জার্ম্মানিতে সর্ব্বশুদ্ধ এগারটি টেক্‌নিকাল হাই স্কুল আছে, তাহা ছাড়া লোয়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের টেক্‌নিক্যাল্ ইনস্টিটিউট্‌ও ৪০।৪৫টি আছে। উহার মধ্যে শুধু বার্লিন, ডারম্‌স্টাট্ ও ড্রেস্‌ডেনের টেক্‌নিকাল হাইস্কুলগুলিতে ভারতীয় ছাত্র আছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও অধিক নয়। বার্লিন্ হাই স্কুলে ১২ জন, ডারম্‌স্টাটে ৮ জন ও ড্রেস্‌ডেনে ১ জন। তবে অন্যান্য বিদেশী ছাত্রদের ভিড় যে খুব বেশী তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই বিদেশী ছেলেরা প্রায় এক সেমেষ্টার পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মানিতে আসিয়া ভর্ত্তি হইবার চেষ্টা করে ও জার্ম্মানির ভাষা শিখে। বিদেশী ছাত্রদের জার্ম্মানির ভিতরেই এত ভিড় হয় বলিয়া জার্ম্মানির বাহির হইতে ভর্ত্তির জন্ত যে-সব আবেদন-পত্র আসে তাহার উপর নজর দিবার অবকাশ কর্ত্তৃপক্ষের আদৌ হয় না। এইরূপ বিদেশাগত আবেদনপত্র-সকল রেক্টর্-অফিস্ হইতে মিনিষ্টার্-অফিসে প্রায়ই পাঠান হয় না। এখানে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ফেরৎ-ডাকে প্রবেশ পত্র পাওয়ার আশা করা বৃথা। সেজন্ত এখানে যাঁহারা পড়িতে চান তাঁহারা এইরূপ চেষ্টা না করিয়াই এখানে আসিতে পারেন, এখানে আসিলে প্রবেশলাভের জন্ত কাহাকেও বেগ পাইতে হইবে না। কারণ বার্লিনের Indian News and Information Bureau (Indische Nachrichten und Information Buero) ভারতীয় ছাত্রদিগকে জার্ম্মানির সর্ব্বত্র ইউনিভার্সিটি টেক্‌নিক্যাল হাইস্কুল ও কাষ্টরীতে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। জার্ম্মানির ভিতর এই বুরোর বেশ একটু প্রতিপত্তি আছে। অনেকে মনে করেন জার্ম্মানির Visa পাওয়া যায় না এবং প্রবেশপত্র দাখিল করিতে না পারিলে Visa পাওয়া যাইবে না। কিন্তু নিম্নলিখিত স্থান হইতে এসব ব্যতীতও অতি সহজে Visa পাওয়া যায়—

(a) Naples (Italy)
(b) Innsbruch (Austria)
(c) Amsterdam (Holland)

শ্রী জ্ঞানচন্দ্র বসু

—

বিক্রমপুরে গার্শিব্রত

বৈশাখ (১৩৩০) মাসের "প্রবাসী" পত্রের "বেতালের বৈঠক" বিভাগের ১৭৩ নম্বর মীমাংসায় গার্শিব্রতের আলোচনা দেখিলাম। বিক্রমপুরের গার্শিব্রতের কথা এখানে আলোচনা করিলাম। বিক্রমপুরে গার্শিব্রতকে "গারু ব্রত" বলা হইয়া থাকে। "গারু" শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে তাহা আমরা বলিতে পারি না। আশ্বিনমাসের সংক্রান্তির দিবসে ঐ ব্রত হইয়া থাকে। সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন শেষ-রাত্রিতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে ঘুম হইতে উঠিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে থাকে, এবং পাঁকাটিতে আগুন জ্বালাইয়া গৃহের ভিতর চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া আসে এবং বৃদ্ধারা মুখে মুখে বলিতে থাকে,—

"জোঁক পোঁক বাহির হ'
লক্ষ্মী আসুক ঘরে।"

এই মন্ত্র পড়িয়া সমুদয় ঘরে আগুন লইয়া যায় এবং পরে শয়ন-গৃহের মেজেতে আগুন স্থাপন করিয়া তাহাতে কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া থাকে এবং ঐ তেঁতুল-পোড়া সকলে ঠোঁটে মালিশ করিয়া থাকে; ইহাতে নাকি শীতকালে ঠোঁট কাটে না। কেহ কেহ পাঁকাটির আগুন লইয়া সিগারেটের মত ধূমপান করিয়া থাকে। প্রভাতে সকলেই গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া থাকে। এবং মধ্যাহ্নে "গারুব্রত" করিয়া থাকে। এই ব্রতের কথা শুনিলেই ব্রতের উদ্দেশ্য বুঝা যায়। আমরা সংক্ষেপে এখানে বিক্রমপুরের (গার্শি) গারুব্রতের কথা লিখিতেছি। স্ত্রীলোকগণ সকলে একত্র বসিয়া এই কথা শুনিয়া থাকে। একজন বৃদ্ধা এই ব্রতকথা বলিয়া থাকে,—

লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী দুই ভগিনী। এক গৃহস্থ লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়া সংসারে আনিয়াছে, কিন্তু গৃহস্থ লক্ষ্মীকে দেখিতে পারে না, লক্ষ্মী স্ত্রী সর্ব্বদা সদাচার দ্বারা গৃহ পরিষ্কৃত রাখে, কিন্তু গৃহস্থ তাহা ভালবাসে না, সে অনাচার করিতে ভালবাসে। লক্ষ্মীর ভগিনী অলক্ষ্মীও গৃহে আসিতে চাহে, কিন্তু লক্ষ্মীর দরুন্ আসিতে পারে না;

গৃহস্থকে রাত্রিতে অলক্ষ্মী দেখা দিয়া যায়। এই গৃহস্থের একটি পুত্র ছিল। কালক্রমে পুত্রের বিবাহ দিয়া গৃহস্থ সংসারের ভার পুত্র-বধূর উপর দিয়াছিল। কিছুদিন পরে লক্ষ্মীর মৃত্যু হইল, গৃহস্থ বেচারা পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। এদিকে লক্ষ্মী মৃত্যু-সময়ে পুত্রবধূকে বলিয়া যায়, 'ওগো মা! তুমি সর্ব্বদা সদাচার করিয়া ঘরে ধুপ প্রদীপ দিবে, নতুবা ঘরে অলক্ষ্মী আসিবে।' কিন্তু লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর বধূর শ্বশুর বধূকে সর্ব্বদাই অনাচার করিতে বলে। বধূ শাশুড়ীর উপদেশ-মত গোপনে সদাচার করে, কিন্তু শ্বশুরকে বুঝাইবার জন্য সামান্য কদাচারের ভাণ করিয়া থাকে।' একদিন এই সংক্রান্তির দিন বধূর শ্বশুর-ঠাকুর সন্ধ্যাকালে বিকটাকার অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি দেখিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার চীৎকার শুনিয়া বধূ তথায় যাইয়া শ্বশুরের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইল। অনেক কষ্টে বৃদ্ধের জ্ঞানসঞ্চার হইল, এবং বধূকে অলক্ষ্মী দর্শনের কথা বলিল। [illegible] অনাচারের ভাণ করিতেছে [illegible] শ্বশুরকে জানাইল। সেই দিন হইতে বৃদ্ধ শ্বশুর আর বধূকে অনাচার করিতে বলে নাই, এবং যাহাতে অলক্ষ্মী গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য লক্ষ্মীর পূজা দিয়া থাকে।"

গারুব্রতের দিন বিক্রমপুরের হিন্দুগণ জাল দিয়া ধৃত মাছ ভক্ষণ করে না—হলকর্ষিত শস্যাদি ভোজন করে না। সেদিন খেসারী-ডাইল ও "শালুক" ভক্ষণ করিয়া থাকে, এই প্রকার না করিলে অলক্ষ্মী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করে, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। এইদিন সন্ধ্যাকালে হিন্দুরমণীগণ বাড়ীর চতুর্দ্দিকে আলোক (প্রদীপ) দান করিয়া থাকে। গারুব্রত লক্ষ্মীর পূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রী নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চোখের আড়াল

যখন তুমি বিদায় নিয়ে উঠ্‌লে গিয়ে নায়ে
বাজ্‌ল কত করুণ সুরে নূপুর দুটি পায়ে;
আঁচলখানি উঠ্‌ল কেঁপে শাড়ীর পাটে পাটে
ঘনিয়ে-ওঠা বিষাদরাশি ছড়িয়ে দিয়ে ঘাটে;
বসন-কোণে ক্ষুণ্ণ মনে ঝুল্‌ছিল যে চাবি,
আজ্‌কে যেন অধীর সেও বিদায়-বেলা ভাবি'!
ললাট-পটে টিপ্‌টি তোমার মলিন হ'য়ে দুখে,
তীক্ষ্ণ কাঁটা বিঁধ্‌ছিল গো দীর্ণ আমার বুকে!
শোণিত-রাঙা ব্যথার আগুন জমাট বেঁধে যেন,
সিঁথেয় জ্বলে সিঁদুর হ'য়ে অনল-শিখা হেন!
তোমার কেশের সুবাস সখী দীর্ঘশ্বাসের সম
আকুল হ'য়ে আস্‌ছে ভেসে হৃদয়-কূলে মম!
আল্‌তা-পরা তোমার দু'টি চরণ ঘিরে ঘিরে
গুম্‌রে'ওঠে গভীর বেদন বুকের বাঁধন চিরে;
তোমার হাতের কাঁকণ যে গো কাঁদন গেয়ে চলে;
অশ্রু কত কর্‌বে গোপন নয়ন মোছার ছলে!

মৌন মুখে পড়্‌শিনীরা দাঁড়িয়ে বাতায়নে,
তরু-লতার তরুণ পাতাও বেপথ্‌ আজ বনে;
আষাঢ়-মেঘে মগ্ন আকাশ আঁধার-মুখে চায়,
সজল-আঁখি আজকে পাখীর কণ্ঠ নাহি গায়;
তরণী ঐ নারাজ হের উজান ব'য়ে যেতে,
অবোধ নদী দাঁড়ের আঘাত সইছে মাথা পেতে;
তবুও তার ঊর্ম্মিবাহু চায়না দিতে ঠেলে
তোমায় নিয়ে যে তরী যায় আমায় একা ফেলে!
নদীর বুকে তরীর কোলে ঘোম্‌টাখানি খুলে
নীরব নত নয়ন দুটি বারেক শুধু তুলে'
যখন তুমি চাইলে ফিরে আমার পানে হেসে'
তোমার চোখে দুখের বারি উথ্‌লে এলো ভেসে!
হায় গো রাণী, সেই যে ছবি এলেম আমি দেখে
সে যে আমায় ঘুমের ঘোরেও চম্‌কে তোলে ডেকে!
ছিলে যখন কাছটিতে মোর পাইনি কিছু টের—
তোমার অভাব কতখানি—কী যাতনার ফের!

শ্রী নরেন্দ্র দেব

মহিলা-মজলিস্

ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীর অধিকার—

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদিগকে পুরুষদের ন্যায় সমস্ত অধিকার দেওয়া হয় না। লর্ডস্ সভা সম্প্রতি এই বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পুরুষ ও নারীর বৈষম্য উঠাইয়া দিয়াছেন কিন্তু কেম্ব্রিজে এই বৈষম্য এখনও বর্ত্তমান। লর্ড হ্যালডেন বলেন, যে, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হয়, সুতরাং পার্লামেণ্ট উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে নারীদিগের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করিতে বাধ্য করিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে এই ভয়ে, অনেকে এই যুক্তি সমর্থন করেন নাই। তবে এই ব্যাপারটি লইয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত কর্ত্তৃপক্ষকে লর্ড সভা এই সমস্যা পুনরায় বিবেচনা করিতে এবং জন-মতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নারী ছাত্রীদের অধিকার যাহাতে স্বীকৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইংলণ্ড যে নারীদের সম্পর্কে সাম্যের আদর্শ খুব মানিয়া চলে, এসব ব্যাপার দেখিয়া তাহা মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নারীদের ও পুরুষদের সমান অধিকার নাই—আইনব্যবসা করিবার অধিকারও বহু তর্কবিতর্কের পর সম্প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে। কাজে কাজেই ইংলণ্ডের পুরুষরাও প্রায় এদেশের মতই রক্ষণশীল। কিন্তু সে দেশের নারীরা ভারতবর্ষের নারীদের অপেক্ষা স্বাধীনচিত্ত ও স্বাবলম্বী। এই কারণেই তাঁহারা পুরুষদের যথেচ্ছাচারিতা মানিয়া লন না। তাঁহারা পুরুষদের এই খামখেয়ালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিজেদের পাওনা আদায় করিবার চেষ্টা করেন।

মিশরের মহিলা জাগরণ—

মিশর-রমণীগণ পুরুষদের সহিত প্রবলবেগে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাইতেছেন। গভর্মেণ্টের দমন-নীতিতেও ইঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। মিশরের সকল রমণী যাহাতে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিতে পারেন সেইনিমিত্ত একটি বিরাট মহিলা-মহামণ্ডল স্থাপন করিবার চেষ্টা হইতেছে। রোমনগরে বিশ্ব-মহিলা কন্‌ফারেন্সে মিশরের রমণীগণ নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া মহিলা জাগরণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মিশরের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিবার জন্য শীঘ্র একটি মহিলা-সমিতির অধিবেশন হইবে। তদ্ব্যতীত মিশরের মহিলা-সমিতিগুলিকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টাও করা হইতেছে।

মহিলা-প্রগতি

ইংলণ্ড—

বিলাতে নিয়ম হইয়াছে যে, যে-সকল স্ত্রীলোক শিক্ষকতা করিবেন তাঁহারা চাকরী গ্রহণান্তে বিবাহ করিলে পদচ্যুত হইবেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে রণ্ডার আর্বান্ সভা কয়েকজন বিবাহিতা শিক্ষয়িত্রীকে পদচ্যুত করিয়াছেন। পদচ্যুত মহিলাগণ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই আইন বিবাহের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। দেখা যাক্ আদালত কি মীমাংসা করেন। এই আইনের ফলে লণ্ডনে ৪০০০ মহিলা-শিক্ষক পদচ্যুত হইবেন।

সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে ইংলণ্ডের রেলসমূহে ৭,৬৬,৩৮১, জন লোক কাজ করে; তন্মধ্যে ৭,৩৭,৯৪৬ জন পুরুষ আর বাকী ২৮৪৩৫ জন নারী। মেয়েরা অনেক কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক কার্য্য করিতেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন শান্টার, ২০ জন ষ্টেশন-মাষ্টার, ৭ জন ফোরম্যান, ৬ জন রেল-পুলিশ ও ১৬৫ জন যন্ত্রপাতির কার্য্য করিতেছেন।

বারউইক বিভাগ হইতে অভিনেত্রী শ্রীমতী ফিলিপসন্ পার্লামেণ্টে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান পার্লামেণ্টে আরও দুইজন নারী সদস্য আছেন।

জাপান—

ইয়েন্-সুজোকি নামে একজন জাপানী-মহিলা ব্যবসায়ী মেয়েদের মধ্যে শীর্ষস্থান লইয়াছেন। তিনি বিধবা। বর্ত্তমানে তাঁহার ৪৪ কোটি টাকা ব্যবসাতে খাটিতেছে। তাঁহার নিজের অনেকগুলি ষ্টীমার আছে, তাহা ছাড়া এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার নানা স্থানে তাঁহার কারখানা ও ব্যবসা কেন্দ্র আছে।

আমেরিকা—

কুমারী ম্যাকডাউল শিকাগো সহরের মন্ত্রণা পরিষদের সদস্য হইয়াছেন। তিনি অনেকদিন হইতেই মহিলা শ্রমজীবীদের উন্নতি ও নারীর অধিকার সম্পর্কিত আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

কুমারী মার্টিনস্ মিশিগান্ প্রদেশের নিউগোর দলিল রেজিষ্ট্রার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মেক্সিকোর আইন-পরিষদে শ্রীমতী বার্থা প্যাক্সটন্ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতায় সকলেই সন্তুষ্ট।

শ্রীমতী টারউইলজার্ পোর্ট জার্ভিস্ বণিক্-সভার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে ঐ সভার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

নিউজিল্যাণ্ড—

টরেস্ প্রণালীর বাড্ দ্বীপ বর্ত্তমানে একজন মহিলার শাসনাধীন। শ্রীমতী যাকল এখানকার গবর্ণর। তিনি এই দ্বীপে মাদক দ্রব্য আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। চরিত্রহীন লোকেরা এ দ্বীপে টিকিতে পারে না। দ্বীপটির শাসন ব্যয় এখানকার বাজস্ব হইতেই পরিচালিত হয়।

আফ্রিকা—

দক্ষিণআফ্রিকার মহিলাদের ভোট দিবার অধিকার প্রস্তাবটি এক ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে। তথাকার নারীরা নিজেদের অধিকার না পাওয়া পর্য্যন্ত খাজনা প্রদান করিবেন না বলিয়া আন্দোলন চালাইতেছেন।

রুশিয়া—

ম্যাডাম্ কোলেন্‌টাই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নরওয়েতে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার ছিলেন।

ফিলপাইন দ্বীপপুঞ্জ—

ফিলিপাইনের আইন-পরিষদ মহিলাদের ভোট দানের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রাহ্য করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ—

কুমারী কনট্রাক্টর, বি-এ, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইয়াছেন। তিনি একটি স্কুলের লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কুমারী নির্ম্মলাবালা নায়ক সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও ফ্যাকাল্টি অব্ এডুকেশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি একজন ওড়িয়া মহিলা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ, ও বি-টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ভারত সরকারের মনোনয়নে বিলাত যান। সেখান হইতে ডিপ্লোমা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। কুমারী নির্ম্মলাবালা বর্ত্তমানে কটক র‍্যাভেন্‌সা বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

প্রতিভা—নাটক। শ্রী হরিহর শেঠ—চন্দননগর পুস্তকাগার হইতে প্রকাশিত। এক টাকা।

সমস্ত নাটকখানি পড়িয়া গেলে গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল'র ছায়া বলিয়া মনে হয়। প্লটু প্রায় একই ধরণের—মাঝে মাঝে বিষম রকমের ঐক্য আছে। নাটকটির মধ্যে কতকগুলি একেবারে অসম্ভব দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে, আমাদের দেশে তাহা এখনও সম্ভবপর হয় নাই-এই নাটকেই তাহার প্রথম সূচনা দেখিতে পাইলাম। একটি উদাহরণ—দ্বিতীয় অঙ্কের, দ্বিতীয় দৃশ্য, পৃঃ ৪৩। উমানাথ নামে ভদ্রলোকটি প্রতিভা নাম্নী ভদ্রকন্যার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। চাকর আসিয়া প্রতিভাকে উমানাথের আগমন-সংবাদ দিবামাত্র, উমানাথকে ঘরের মধ্যে আনিবার আদেশ হইল। উমানাথ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রতিভা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া চেয়ারে বসাইলেন। অথচ ইহার পূর্ব্বে কেহ কাহাকেও দেখেন নাই এবং আলাপও কোন দিন হয় নাই। প্রতিভা বয়স্থা। উমানাথের কবিতা পড়িয়াই তাঁহার প্রেমে পড়িয়া যান। কোন ভদ্রলোকের কন্যা একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে পত্র লিখিতে পারেন না (অন্ততঃ আমাদের ধারণা এইরূপ), গৃহে আসিয়া একলা দেখা করার কথা ছাড়িয়া দিলাম। শুধু আমাদের দেশে কেন, বিলাত প্রভৃতি 'সভ্য'দেশেও ভদ্র মেয়েরা এত দূর অগ্রসর এখনো হন নাই। তার পর প্রতিভা তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর অগাধ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া উমানাথের গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে মেয়ে-স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ লইলেন। অথচ উমানাথ এসব কিছুই জানিতে পারিলেন না। তার পর একদিন প্রতিভা উমানাথের শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া নিদ্রিত উমানাথকে দেখিতেছিলেন এমন সময় উমানাথের স্ত্রী আসিয়া দেখিয়া ফেলিলেন—তার পর বিষম ব্যাপার। প্রতিভা কর্ম্মত্যাগ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন এবং মৃত্যুর একটু পূর্ব্বে উমানাথের সঙ্গে তাঁহার ক্ষণিক মিলন হইল, উমানাথের স্ত্রীও তাহা দেখিয়া ধন্য হইলেন। এই-সব শাখা-প্লটগুলি বাদ দিলে মূল প্লটটি 'প্রফুল্ল'র সঙ্গে বেশ মিলিয়া যায়। তবে বইখানির বাঁধাই ভাল। ছাপা চলন সই।

শ্রীভরত—শ্রীমতী মানময়ী দেবী। ১৭নং শিকদার বাগান ষ্ট্রীট। দাম ১৷৹

বইখানি দশরথ-পুত্র ভরতের চরিত্র সমালোচনা। উপন্যাস না হইলেও অতি সুখ-পাঠ্য। এই বইখানি পড়িয়া রামায়ণের শ্রেষ্ঠ চরিত্র ভরতের যথার্থ পরিচয় বেশ সহজ এবং সরলভাবে পাওয়া যায়। লেখিকার লিখন-ভঙ্গী অতি সুন্দর, কোথাও জড়তা বা আড়ষ্ট-ভাব নাই—বইখানির ভাষা এবং ভাবের একটি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য ও মিল আছে। ছাপা এবং বাঁধাই ভাল।

ক্ষত্র-নন্দিনী (নাটক)—শ্রী ষষ্ঠীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রী শ্যামাচরণ বসাক কর্ত্তৃক ২।২ গঙ্গানারায়ণ দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত—দাম ১৷৹ টাকা। বসাক এণ্ড সন্স, ১২৭ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

"স্বাধীন মণিপুরের ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত।" নায়ক নায়িকা সহজভাবে কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ মাঝখানে কবিতায় কথা বলিয়া উঠিতেছে। প্লট ভাল জমে নাই। ছাপা ও বাঁধাই মন্দ নয়।

হানিফের গুরুদক্ষিণা (সচিত্র)—শ্রী হেমেন্দ্রলাল পালচৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান ৯৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, অথবা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বইখানি উপন্যাস। গ্রন্থকারের একটি ছবি গোড়াতেই দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পুস্তকের সৌষ্ঠববৃদ্ধি একটুও করে নাই। পড়িতে একঘেয়ে। একেবারেই ভাল লাগিল না।

সোনার ফুল—শ্রী গোকুলচন্দ্র নাগ। শিশির পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম নাই।

বড় গল্প। শেষের অধ্যায় ছাড়া সমস্তই বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হয়। শেষ অধ্যায় বঙ্গবাণীর পরিচালকেরা কেন যে ছাপাইলেন না তাহা বুঝিতে পারিলাম না। গল্পটি সমাজ-চিত্র। বেশ ঝরঝরে হইয়া ফুটিয়াছে। আশা করি সকলেরই ইহা পড়িতে ভাল লাগিবে।

অনুরাগ—শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী। ১৭নং শিকদার বাগান ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত; দাম ১৷৹।

কবিতার বই। বাঁধাই ও ছাপা বেশ ভাল। দাম একটু বেশী হইয়াছে।

রাণাকুম্ভ—শ্রী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। ৫৯।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৷৹।

"ঐতিহাসিক নাটক—চিতোর ইতিবৃত্ত।" পড়িতে এক রকম লাগে, তবে অভিনয়ে কেমন দাঁড়াইবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিছু ছাঁট-কাট করিলে অভিনয়ও একরকম চলিতে পারে। এই ক্ষুদ্র কাগজের মলাটের বহির দাম পাঁচ সিকা অত্যধিক বলিয়া মনে হয়।

কর্ম্ম-মন্দির—শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বেঙ্গল লাইব্রেরি, ৮নং গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

উপন্যাস। আজকাল যে রকম উপন্যাস বাজারে বাহির হইতেছে, তাহা অপেক্ষা কিছু ভাল। পড়িতেও একরকম ভাল লাগে। তবে উপন্যাসখানিকে আরো ছোট করিলে বইখানি বেশ সুখ-পাঠ্য হইত বলিয়া মনে হয়। অনেক স্থানে অনাবশ্যক বাড়ানো হইয়াছে, তাহাতে বইখানি একটানা পড়িবার পক্ষে অসুবিধা হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক যদি এই দিকে দৃষ্টি রাখেন তবে ভাল হয়। বইখানির মধ্যে একটি জিনিষের অভাব দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, সেটি অসহ্য ন্যাকামো অর্থাৎ ভালবাসার নাকি কান্না। ছাপা বাঁধাই বেশ ভাল।

মনোয়ারা—মোহম্মদ কোরবান আলী। ওসমানিয়া লাইব্রেরি, ১১নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

উপন্যাস। লেখকের এই প্রথম গদ্য লেখা। তাহার তুলনায় বই-

খানি ভালই হইয়াছে। পড়িতেও মন্দ লাগিল না। ইস্‌লামীয় শব্দ ব্যবহারে পুস্তকখানি পড়িতে একটুও খারাপ লাগে না। এই পুস্তকখানিতেও প্রেমের নামে অবিশ্রাম স্ত্রীকামোর বক্তা নাই বলিয়া বইখানি সুখ-পাঠ্য। ছাপা এবং বাঁধাই বেশ ভাল।

আশাপথে—শ্রী মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী ৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৲ টাকা।

উপন্যাস। বইখানি পড়িতে মন্দ লাগিল না। কোনখানে ভাবের এলোমেলো ভাব নেই—তবে মাঝে মাঝে ভাষার অসামঞ্জস্য আছে। কথিতভাষার সহিত কেতাবী-ভাষা জড়াইয়া গিয়াছে। বইখানি পড়িতে সকলেরই ভাল লাগিবে বলিয়া আশা করা যায়। ছাপা এবং বাঁধাই আশুতোষ লাইব্রেরীর উপযুক্তই হইয়াছে—কোন খুঁত চোখে পড়িল না।

গ্রন্থকীট

নূরনবী—মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী। মোহসিন কোং, কলিকাতা। মূল্য ১॥০ টাকা।

"সোনার চাঁদ শিশুগণের" চিত্তবিনোদন ও আদর্শ চরিত্র-গঠন উদ্দেশ্যে সরল ও সুন্দর ভাষায় রচিত ইস্‌লাম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের সচিত্র জীবনী। ইতিহাস ও রূপকথার মালমশলা দিয়ে চৌধুরী সাহেব যে অপূর্ব্ব ভোগ প্রস্তুত করেছেন তা যে উপভোগ্য, গ্রন্থের দ্বিতীয় স্করণই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শান্তিধারা—শ্রী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী। মোহসিন কোং, কলিকাতা। মূল্য ৸০ আনা।

ইসলামের স্বরূপ, ইস্‌লামের ধারা প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে গ্রন্থকার ইস্‌লামের ভিতরকার কথাটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। লেখকের ভাষা প্রাণস্পর্শী ও রচনাকৌশল প্রশংসার্হ। ধর্ম্মের ভিতরকার কথা কিছু সম্প্রদায়-বিশেষের নিজের কথা নয়, তাই মনে হয় কেবল মাত্র মোস্‌লেম নয়, বাংলা ভাষার সহিত পরিচিত ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি মাত্রের কাছে এ গ্রন্থের আদর হবে। এয়াকুব আলী সাহেবের রচনা দেখে আশা হয় যে বাংলা ভাষাই বাংলার হিন্দু-মোস্‌লেমের মিলন-প্রাঙ্গণে পরিণত হবে।

কমলা—শ্রী ভবানীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, এম-এ প্রণীত। শিশির পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ১॥০ মাত্র।

স্কুল-মাষ্টার-রচিত পূর্ব্ব-রাগ-মূলক উপন্যাস। প্রথম রচনার অজুহাতে গ্রন্থকারের সমালোচকের কাছে সহানুভূতি আশা করা ছোট-ছেলের পক্ষে বাহাদুরী চাওয়ার মত মনে হয়, অথচ সে রকম কিছু আশা করবার তিনি কোন কারণই দেন নি। প্রেম যে ব্যাধি এবং তা যে মানসিক তা সবারই বোধ হয় জানা আছে, কিন্তু তা যে মারাত্মক রোগের বীজাণু তা এ গ্রন্থে জানা গেল। চরিত্র-সৃষ্টি, গল্পাংশ বা ভাষা কোনটাই আশানুরূপ নয়; তবে গ্রাম্য দৃশ্য ও কথা-বার্ত্তা অনেক স্থলে গতানুগতিক হ'লেও ভারি সহজ ও সময়োপযোগী। কেবলমাত্র খেয়াল চরিতার্থ করবার বা বাজারে কাটতি হবার আশায় দেশের হেড্ মাষ্টার মহাশয়রা যদি এই-সব নিরর্থক রচনায় মন দেন, তবে সেটা দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের নিদর্শন।

শ্রী আনন্দসুন্দর ঠাকুর

জাপান—শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক রায় এণ্ড্ রায়চৌধুরী, ২৪ নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ৩২৩ পৃষ্ঠা। বহু চিত্রে ভূষিত। সুন্দর সুদৃশ্য বাঁধা। দাম ৯ সিকা।

সুরেশবাবু এখন প্রসিদ্ধ লেখক। কিন্তু জাপান তাঁহার প্রথম বই। এই বই তাঁহাকে প্রসিদ্ধ করিয়াছে। এই বই যখন প্রকাশিত হয় তখন প্রত্যেক কাগজে ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বাহির হইয়াছিল—আমরাও প্রশংসা করিয়াছিলাম। সেই বইয়ের এতদিনে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পাকা হাতের প্রসাধনে ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছে, অল্প খুঁৎ যাহা ছিল তাহা সংশোধিত হইয়াছে; অনেক নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। জাপানের রাষ্ট্র, সমাজ, সংসার, ব্যক্তি, দৃশ্য, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান সাহিত্য আর্ট শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় নিজে দেখিয়া ও প্রত্যক্ষদর্শী অপর লেখকদের অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া মনোরম করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বস্তু-চিত্রে ও বাক্য চিত্রে মিলিয়া সমস্ত জাপান দেশটা যেন প্রত্যক্ষগোচর হইয়া উঠে। জাপান অসাধারণ দেশ; সেই দেশের পরিচয় জানিবার ঔৎসুক্য অনেকেরই আছে; যাঁহারা জাপানকে জানিতে চান, তাঁহারা নিশ্চয় 'জাপান' পড়িবেন। জাপানযাত্রীদের ত পাঠ করা একান্ত আবশ্যক।

নারীর মূল্য—শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২এ হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা। ১৩৩ পৃষ্ঠা। পাঁচ সিকা।

'যমুনা' মাসিক পত্রে অনিলা দেবী ছদ্মনামে যখন এই প্রবন্ধগুলি দশ বৎসর আগে বাহির হয়, তখনই আমরা আগ্রহের সহিত পড়িয়াছিলাম, ও লেখিকার রচনাশক্তি, স্বজাতির অধিকার দাবীর ওকালতী করিবার ক্ষমতা, পুরুষের স্বার্থপরতার প্রতি তীব্র বিদ্রূপ করিবার পটুতা, নারীর প্রতি পুরুষের সমাজের অবিচার অত্যাচার ও নির্য্যাতনের চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার কৌশল দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম এবং শক্তিমতী লেখিকার পরিচয় জানিতে ব্যগ্র হইয়াছিলাম। পরে জানিতে পারি ইহা প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। লেখকের ছদ্মতা প্রকাশিত হইয়া যাওয়াতে রচনা-পটুতা-জনিত বিস্ময় কাটিয়া গিয়াছিল—ওস্তাদ্ লোকের লেখা ত এমন হইবেই; কিন্তু বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছিল—একজন নারী স্বজাতির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন না, আসামীদলভুক্ত একজন পুরুষ নারীর মূল্য কষিয়া নিজের স্বার্থান্ধ স্বজাতিদের বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার মধ্যে ওকালতীর ঝাঁজ ও অত্যুক্তি থাকিলেও কথাগুলা বড় খাঁটি, বড় মর্ম্মস্পর্শী আজকাল যে চারিদিকে পুরুষ ও নারী বহু লেখকলেখিকা বহু পত্রে নারীর অধিকার সাব্যস্ত ও আদায় ও নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার কারণও এই "নারীর মূল্য"। শরৎবাবু সুপ্ত আত্মবিস্মৃত সমাজকে আঘাত করিয়া চেতনা দিয়া প্রবুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। নারী ও পুরুষ উভয়েরই এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সমাজকে আবার একবার গুছাইয়া লওয়ার সময় আসিয়াছে। "নারীর মূল্য" পাঠ করিয়া নারী নিজের মূল্য বুঝুন, পুরুষের নিকট হইতে নিজের ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করিতে যত্নবতী হোন। "নারীর মূল্য" পাঠ করিয়া পুরুষ নারীর মূল্য বুঝুন, এতদিনের সঞ্চিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নারীকে সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারিণী করুন।

উচ্ছ্বাস-পঞ্চক—শ্রী জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত ও প্রকাশিত, ৭৭।১ হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৭২ পৃষ্ঠা। বারো আনা।

এই পুস্তকে ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক পাঁচটি প্রবন্ধ আছে—বিশ্বসমস্যা, হিন্দুর সাধনা, হিন্দুর পূজা, বাসুদেব, ঔঁকার মন্ত্র। ভগবদারাধনার পথ-

নির্দেশক প্রবন্ধ-পঞ্চক, সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রবিশ্বাস অনুসারে লিখিত। প্রবন্ধগুলিতে লেখকের ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে।

বাঙ্গালা শব্দসাগর অভিধান—পণ্ডিত রাধা-গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ম্যাক্‌মিলন এণ্ড কোং লিমিটেড, ২৯৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০৫৪ পৃষ্ঠা। পাঁচ টাকা।

সংস্কৃত শব্দের বাংলা অভিধান। ইহাতে কেবল তৎসম শব্দই আছে; তদ্ভব, অপভ্রংশ, দেশজ, বিদেশী প্রভৃতি যেসব শব্দ বাংলাভাষায় প্রচুর প্রচলিত, তাহাদের একটারও সাক্ষাৎ ইহাতে পাওয়া যাইবে না। স্বর্গীয় রামকমল বিদ্যালঙ্কারের প্রসিদ্ধ 'প্রকৃতিবাদ অভিধান' বা ছোটর মধ্যে 'শব্দসার' বা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা অভিধান' থাকিতে এই ছোট্ট অভিধান এত দাম দিয়া কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি কিনিতে চাহিবে না। সঙ্কলয়িতা ও প্রকাশক উভয়েরই উদ্দেশ্য ব্যর্থ ও পণ্ডশ্রম হইয়াছে। ম্যাক্‌মিলান কোম্পানী ধনী প্রকাশক; তাঁহাদের উচিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গলা অভিধান অপেক্ষাও সম্পূর্ণতর প্রকৃত বাংলাভাষার অভিধান একখানি সঙ্কলন করাইয়া প্রকাশ করা। আমরা তাঁহাদিগকে একটু সন্ধানও দিতে পারি—কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৫।১৬ বৎসর একাগ্র সাধনায় অবিশ্রাম অভিধান প্রণয়নে নিযুক্ত আছেন—সেই অভিধানখানি প্রকাশ করিবার ভার তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লইলে তাঁহারা লাভবান্ হইবেন বলিতে পারি। বঙ্গদেশের বহু অর্থ তাঁহারা প্রত্যেক বৎসর পকেটস্থ করেন, তাহার বদলে ঐ অভিধান প্রকাশ করিলে বঙ্গভাষার ও বঙ্গদেশের একটি বিশেষ উপকার সাধন করা হইবে।

মহাত্মা গান্ধীর কারাকাহিনী—শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত সঙ্কলিত। ইণ্ডিয়ান্ বুক্ ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, দোতালা কলিকাতা। ৭৫ পৃষ্ঠা। আট আনা।

ভূমিকায় জানানো হইয়াছে ইহাতে মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনবার কারাবাসের বৃত্তান্ত তাঁহার নিজের লেখা হইতে ভাষান্তরিত করা হইয়াছে।

কে একজন নির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায় এই বইএর ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন—তিনি ভূমিকায় উত্তম পুরুষের বহুবচনে জানাইয়াছেন যে "আমরা বইটির হুবহু অনুবাদ করি নাই, ইত্যাদি।" তিনিও কি অনুবাদ-কার্য্যে প্যারী বাবুর সহযোগী ছিলেন? যদি তাহা ছিলেন তবে সঙ্কলয়িতা একা প্যারী-বাবু বলিয়া ছাপা হইয়াছে কেন? আর যদি তিনি সহযোগিতা না করিয়া থাকেন তবে তিনি পরের কৃতিত্বের ভাগী হইবার লোভ রাখেন কেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

সে যাহা হোক, ভূমিকায় মহাত্মা গান্ধীর কারাবাস করিবার কারণ ও গ্রন্থমধ্যে কারাবাসের অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত মহত্ত্ব যাঁহারা জানিতে উৎসুক তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে মহাত্মার প্রতি ভক্তি সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে পারিবেন।

নব্য তুর্কী ও মুস্তাফা কামাল পাশা—শ্রী গোপেন্দ্রলাল রায়। ইউনিভারস্যাল বুক ডিপো, কলিকাতা। ১৩০ পৃষ্ঠা। শক্ত কাগজের মলাট। বারো আনা।

নব্যতুর্কীর নবজাগরণ ও কামাল পাশার অদ্ভুত স্বদেশপ্রেমের ইতিহাস এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। য়ুরোপীয় খ্রীশ্চানজাতিদিগের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র নিষ্ফল করিয়া একজন লোকের প্রতিভা কেমন করিয়া নব্যতুর্কী গঠন করিয়া তুলিয়াছে এই পুস্তকে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। নূতন জাতিগঠনপ্রয়াসী বঙ্গবাসী নরনারীর এইরূপ পুস্তক পাঠ করা উচিত।

ভক্তজীবনী—প্রথম খণ্ড—শ্রী মাধবীলাল গোস্বামী ভক্তি-বিনোদ কর্তৃক সঙ্কলিত। ডেমরা পোষ্ট, পাবনা। ২৪ পৃষ্ঠা। দু আনা।

পাবনা জেলার তিনজন ভক্ত সাধু বৈষ্ণবের জীবনকথা—নীলাম্বর, রায় প্রভু, সুবলচন্দ্র। সাধু-ভক্তের জীবনকথা আলোচনায় সর্ব্বদাই লাভ আছে।

হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা—শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়। ঢাকা, রায়পুরা। ১১০ পৃষ্ঠা। এক টাকা।

পৃথ্বীরাজের সঙ্গে মহম্মদ ঘোরীর যুদ্ধ ও রাণী সংযুক্তার বীরত্ব অবলম্বন করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে একাদশ সর্গে রচিত মহাকাব্য।

মুদ্রারাক্ষস

এস্‌রার-তরঙ্গ—নারাজোলাধিপতির সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। প্রথমভাগে এস্‌রার যন্ত্রের বিবরণ, দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতির সঙ্কেত, স্বরসাধন-প্রণালী এবং প্রথম-শিক্ষার্থীর গৎ প্রভৃতি আছে। দ্বিতীয় ভাগে আরও কতকগুলি ভাল ভাল গৎ ও গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। এস্‌রার শিক্ষার পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী। বেহালা-যন্ত্র বঙ্গদেশে এতটা প্রচলিত যে অনেকে জানেন না,—ইহা বিদেশের আমদানী। কিন্তু এস্‌রার—খাঁটি দেশী যন্ত্র। অতিরিক্ত কতকগুলা তারের "রেশে" উহার স্বরও খুব মধুর হইয়াছে। বেহালা অপেক্ষা ইহা শেখাও সহজ—কেন না, ইহাতে বাঁধা পর্দ্দা আছে। আমাদের রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি ইহাতে যেরূপ ফুটাইয়া তোলা যায়—হারমোনিয়মে তাহা পারা যায় না। আমাদের সঙ্গীতে এই যন্ত্রই বেশী উপযোগী। শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গুণী লোক। উঁহার রচিত এই এসরার শিক্ষার গ্রন্থ, ওস্তাদের অভাব অনেক পূরণ করিবে, সন্দেহ নাই। স্বরলিপি-পদ্ধতি "সে-কেলে" হইলেও, ইহা আড়ম্বর ও জটিলতা-বর্জ্জিত। ছাপা বেশ পরিষ্কার। মূল্য বেশী নহে—২ টাকা মাত্র।

শ্রী জ্যো—

বাঙ্গলায় বিপ্লববাদ—শ্রী নলিনীকিশোর গুহ, দাম পাঁচ সিকা, প্রাপ্তিস্থান—শ্রী নরেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য, ১২ নং ঝামা-পুকুর লেন, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহর 'বাঙ্গলায় বিপ্লববাদ' বাংলার অভূত-পূর্ব্ব বিপ্লব-প্রচেষ্টার যুগের ইতিহাস। এ যুগের ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে আরো কয়েকখানি বাহির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ-সম্বন্ধে এত কথা বলার আছে যে দুই-একজনের অভিজ্ঞতায় তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নহে। ইঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্র এত গোপনে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং ইঁহাদের কাজ এত সন্তর্পণে শেষ হইয়াছে, যে, কোন একজন লোকের পক্ষে সমস্ত কথা জানিবারও সুযোগ হয় নাই। সুতরাং বাংলার বিপ্লববাদের ইতিহাস বিপ্লব-সংশ্লিষ্ট সুলেখকের হাত দিয়া যখনই বাহির হইয়া আসিতেছে তখনই তাহা ভাবিবার বুঝিবার এবং পড়িবার মালমশলায় ভরাট হইয়া উঠিতেছে।

এ-সম্বন্ধে যে-সব বই লিখিত হইয়াছে তাহা অল্পাধিক পরিমাণে কর্ম্মীদের ব্যক্তিগত জীবনেরই আলোচনা। কিন্তু 'বাঙ্গলায় বিপ্লববাদে' বিপ্লবপন্থীদের ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা বিপ্লববাদের ভাবের

দিক্‌টাই বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভারতের এতগুলি জাতির ভিতর হইতে হঠাৎ বাংলার মনই কেন বিপ্লবের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, বিপ্লবের চেতনা এবং প্রেরণা তাহারা কোথা হইতে লাভ করিয়াছে, ইহার বনিয়াদ কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিল, 'নূতনের নেশায় পুরাতনকে ভাঙ্গিবার', 'মুক্তির আশায় বন্ধনকে ছিঁড়িবার' এই যে উন্মাদনা ও আগ্রহ ইহার মূল কোথায়, বাংলার সমাজ ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতিতে বিপ্লব কেমন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং জাতির জীবনে কোথায় তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে, বিপ্লববাদীরা একধাপ হইতে আর-এক ধাপে কেমন করিয়া উঠিয়াছেন এবং নামিয়াছেন, একটির পরে আর-একটি পথে নামিয়া দাঁড়ানো কেমন করিয়া তাঁহাদের পক্ষে একেবারে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, জয়-পরাজয়ের ভিতর দিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম পন্থা কিরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাহার এরূপ সুশৃঙ্খল এবং সুসামঞ্জস্য আলোচনা বিপ্লববাদের আর কোনো বাংলা পুঁথিতে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বইখানি বুকের দরদ দিয়া লেখা, কিন্তু দরদের খাতিরেও ঘটনাগুলি অতিরঞ্জিত হইতে পারে নাই, পক্ষপাতিত্বের ছাপ সত্যকে ক্ষুণ্ন করিতে পারে নাই।

এরূপ বই লেখা নানা কারণেই সহজ নহে। ইহাতে একদিকে যেমন চিন্তাশীলতা এবং দূরদৃষ্টির দরকার, অন্যদিকে আবার তেমনি সংযম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন। তাহা ছাড়া পথে অন্য রকমের বাধাও বড় অল্প নাই। এত বাধা সত্ত্বেও বইখানি যে বেশ ভাল হইয়াছে—কেবল কতকগুলি কর্ম্মীর জীবনী হিসাবে নহে, বিপ্লববাদের গল্প হিসাবে নহে, বিপ্লববাদের ভাবের ইতিহাস হিসাবে, পড়িলেই সে কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু ভিতর ভাল হইলেও, বাহিরের দিক্ দিয়া বইখানিতে ত্রুটির অভাব নাই। ইহার ছাপা ভাল হয় নাই, পুঁথিতে মুদ্রাকরের প্রমাদও অসংখ্য রহিয়া গিয়াছে।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

ভদ্রা—শ্রী অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৩০ (বৈশাখ)। ১৭৬ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

এখানি নাট্যকার অপরেশ-বাবুর লিখিত একখানি উপন্যাস। নায়ক অজয় প্রথমা স্ত্রী নীহারিকা বর্ত্তমানে নানা বাধা সত্ত্বেও গোপনে ভদ্রাকে বিবাহ করে। ঘটনাক্রমে নীহারিকার সহিত ভদ্রার দেখা হয়। ফলে স্বামীর প্রতারণায় ক্ষুণ্ন হইয়া ভদ্রা নিরুদ্দেশ হয়। নীহারিকার ধনী মেসোমহাশয় একরূপ জোর করিয়াই নীহারিকাকে স্বামী-গৃহ হইতে লইয়া যায়। অজয়ও গৃহত্যাগ করে। বার বৎসর পরে আবার অদ্ভুত ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়া নীহারিকার সহিত অজয়ের মিলন হয়। অল্পকাল পরেই ভদ্রার সহিত অজয়ের সাক্ষাৎ ঘটে ও ভদ্রার অধঃপতন দেখিয়া মর্ম্মাহত হওয়াতে অজয়ের মৃত্যু হয়। বইখানির শেষের দিক্‌টা বড়ই এলোমেলো। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীর আশ্রম, আত্মহত্যা প্রভৃতি কিছুই বাদ যায় নাই। বইখানির কাগজ ও বাঁধাই চমৎকার, কিন্তু ছাপার ভুল নির্মূল হয় নাই।

প্রভাত

বাল-বিধবা

ওরা কহে মোর নিভিয়া গিয়াছে নিশার উজল বাতি,
জীবনের পথে এসেছে নামিয়া স্তব্ধ গভীর রাতি;
সঙ্গীত মোর গিয়াছে ডুবিয়া ক্রন্দনে হাহাকারে,
হারায়ে গিয়াছে বাজিত যে সুর জীবন-বীণার তারে।
তোমরা বলনা সত্য করিয়া এত কি হয়েছে মোর,
হাস্য করিতে নিষেধ কেন বা কেনই ফেলিব লোর?
কেন না তুলিব বনফুল আর কেন না গাঁথিব মালা,
কেন গো আমার হিয়ার মাঝারে সহিব দহন-জ্বালা?
উজল আলোকে কেন বা সকল আঁধার হেরিব আজি,
হাহাকার কই, কেনই বা তাহা উঠিবে মরমে বাজি?
উষার আলোকে পাখীকুল কই ভোলে নি ক সুখ-গান,
আকাশ ভরেছে সোনার কিরণে, মাতিয়া উঠিছে প্রাণ;
সরসীর নীরে আগেকারি মত পদ্ম রয়েছে ফুটি,
অধিকার মোর নাহিক আজিকে তাহারে লইতে টুটি?
ঝরা বকুলের মালাটি গাঁথিতে হাত কাঁপে না ত মোর,
তবে কেন বল অঘটন বড় ঘটেছে কপালে তোর?
ভয় কেন মোরে দেখাও তোমরা, ভয়ের হয়েছে কি?
বুড়া গেছে মারা? বিরক্তি হইতে আমি ত বাঁচিয়াছি।
বাবা-মায়ে ছেড়ে যেতে নাহি হবে ভিন্-গাঁয়ে মোরে আর,
পুঁটি টেঁবি সনে হল আজি বড় সুবিধা যে খেলিবার।
শেফালির তলে ফুল কুড়াইতে ছুটাছুটি হবে কত,
বাঁচা গেছে দায়—পাকাচুলো বুড়ো কত কি যে শুনাইত,
কুঁজো কেশো সে যে আসিলে নিকটে লাগিত পরাণে ভয়,
আজিকে যে ছুটি—বেড়াব ছুটিয়া সারাটি পল্লীময়।
মোর যাতে খুসী, তোমরা তাহাতে কেঁদে কেন হও সারা?
দূর ছাই! যাই পুতুল দেখিগে, যেতে হবে বোস্-পাড়া।

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কবি-বিদ্রোহীর প্রতি

মাথায় তোমার কৃষ্ণমেঘের নিশান দোলে!
নহে ত অশ্রু!—তরল তড়িৎ চোখের কোলে!
ওকি ও পিপাসা! নিদারুণ আশা বক্ষে ধরি'
ঘোষিছ প্রলয়-ডমরু-নিনাদ বজ্ররোলে!

মানস-আকাশে রক্ত-সাগরে ডুবিছে রবি?
কাল-নিশীথিনী বধূ কি তোমার, মরণ-লোভী?
এতটুকু আলো কোথাও নাহি রে!—সৃষ্টি শেষ!
চিতায় চিতায় ফুৎকারি' তাই ফিরিছ কবি!

যুগান্তরের বহ্নি-আহবে মশাল জ্বালি'
করোটি-কপালে বিষ-অভিশাপ-আসব ঢালি'
একি সুধাপান! ভয়ঙ্করের একি এ নেশা!
উদ্যত-ফণা ফণীর সমুখে কি করতালি!

তবু যে তোমার ললাটে জ্বলিছে উদয়-তারা!
কণ্ঠে তোমার প্রভাতী-রাগিণী দেয়ে যে সাড়া!
নব জীবনের নবীন নবনী মুঠায় ভরি'—
কোন্ পুতনার স্তনপান করি' আত্মহারা!

ওরে উন্মাদ, চিরশিশু, তোর একি এ খেলা!
কি স্বপন তুই দেখেছিস্ বল্ রাত্রিবেলা?
সে যে শশিকলা, ছুরিকার ফলা নহে সে নহে!
রোজ-কিয়ামত নয়, সে যে নওরোজের মেলা!

আমি জানি, ওই কণ্ঠে তোমার অমৃত রাজে;
বিষ যদি থাকে থাক্ না সে ওই বুকের মাঝে!
তার জ্বালা, সে যে জীবনের দাহ, সঞ্জীবনী—
তাহারি দহনে চিত্ত-গহনে দীপক বাজে।

হাজার বছর মরে' আছে যারা তাদের কানে
কি বাণী দানিবে ঘূর্ণীহাওয়ার নৃত্য-গানে?
জাগরণ নয়!—দণ্ড দু'য়ের দানোয়-পাওয়া!
তার পর? ছি ছি, মড়ার উপরে খাঁড়া কি হানে!

তুমি নির্ভীক, তুমি দুর্দ্দম, ঝড়ের সাথী;
তুমি সমীরণ, ফুলেদের সনে কাটাও রাতি;—
জীবন-মরণ দুই সতীনেরে করেছ বশ—
যখন যাহারে খুশী হয়, দাও চুমা কি লাথি!

রক্ত যাদের নেই এক ফোঁটা দেহের মাঝে—
খুন-খারাবী ও মন্ত্র তাদের দেওয়া কি সাজে?
পচা-দেহে যার কিল্‌বিল্ করে শতেক ক্রিমি,
কোনো আগুনের তাপ তারে কভু লাগিবে না যে!

কারা সে করিবে মরণের মহাগরল পান?
বিষ-নিশ্বাসে আপনা দহিবে—কোথা সে প্রাণ?
যারা মরে' আছে তারা কি আবার মরিতে পারে!
ভেবে দেখ নিজে, ত্যাগ কর বৃথা এ অভিমান।

চেয়ে দেখ দেখি পূর্ব্ব-তোরণে কিছু কি জাগে—
নিশীথের নীল আঁচলে আলোর ছোপ্ কি লাগে?
ও নহে রক্ত!—শতেক ভক্ত ছেয়েছে হোথা
উদয়ের পথ হৃদয়ের প্রেম-পদ্মরাগে!

তুমি গেয়ে চল ওই পথে পথে আপনা-হারা,
জন্ম-বাউল! আলোকের দূত!—পথিক পারা,
চুলগুলি তুলি' চূড়া বাঁধি' লও, খঞ্জনীতে
ঝঙ্কার তুলি' জাগাও সারাটি ঘুমের পাড়া।

তুমি শুধু ডাকো—'জাগো সবে জাগো, আলোক জাগে!
হিরণ-কিরণ প্রাণের দুয়ারে প্রবেশ মাগে!
মোর মুখে তোরা চেয়ে দেখ্ দেখি, অবিশ্বাসী!
এমন হাসিটি দেখেছিস্ কোনো গোলাপ-বাগে?

'ওরে কেটে গেছে চিরতরে ঘোর দুঃস্বপন!
কাঁটা যেথা ছিল দেখ্ রে সেখানে ফুলেরি বন!
মহা-আশ্বাস ছায় নীলাকাশ—দেবতা জাগে!
সাগর-সিনানে যাবি যদি—এই পরমক্ষণ!

'শুধু একবার ডেকে বল্ তোরা—মরি নি মোরা!—
মরণ!—সে যে গো মহাকাল-হাতে রাখীর ডোরা!
জীবনেরি মোরা পরমাত্মীয়, চিনেছি তারে!
জীবনেই জয়, প্রেমেই অভয়—বল্ গো তোরা!

'মারিয়া যে বাঁচে—বাঁচা তার নয়, সেই ত মরে!
বাঁচাতে যে মরে, মরণ তাহারে প্রণতি করে।
যুগে যুগে এই মহাবাণী, এই অমৃত-গীতা
গেয়েছেন যাঁরা—জন্মেছি মোরা তাঁদেরি ঘরে!'

হে কবি নবীন, জীবন তোমার মুক্তধারা!
তুমি গাও গান—শুনিবে সকলে নিদ্রাহারা।
দাও বিশ্বাস, দাও আশ্বাস—অভয়-বাণী,
আলোক-আঘাতে ভেঙে দাও এই আঁধার-কারা!

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

ইংরেজ ও ফরাসী—

পরাক্রান্ত জার্ম্মানির নিকট ব্যবসায় এবং সাম্রাজ্যের ক্ষতি আশঙ্কা করিয়া তাহার শক্তিকে খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ ও ফরাসীর মিতালীর সূত্রপাত হয়। এই দুইটি জাতির যুগযুগান্তের প্রতিযোগিতা বাহিরের চাপে কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিয়া মৌখিক সদ্ভাবের পরিচয় জাহির করিবার খুব একটা চেষ্টা দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু প্রয়োজনের এই যে মিলন তাহা কখনও গভীর এবং স্থায়ী মিলন হইতে পারে না। তাই ভিতরে ভিতরে বরাবরই নিজের নিজের সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা উভয়েই করিয়া আসিয়াছেন। ইহাদের মিতালীর প্রকৃত স্বরূপটি ইংরেজদের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রচার-বিভাগের কর্ম্মচারী আর্নল্ড্ টয়েন্‌বি বেশ অল্প কথায় সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,

"The entente between France, Great Britain and Russia against Germany has been the shortest and strongest grouping of all. Its direct motive was covetousness and it rested locally on nothing more substantial than the precarious honour among thieves who find their business threatened by a vigorous and talented competitor. Some of the thieves, at any rate, never got out of the habit of picking their temporary partner's pocket. (Vide page 46, The Western Question in Greece and Turkey)

গুপ্তসন্ধি এবং গোপন ষড়যন্ত্র বন্ধ করাই নাকি বিশ্বযুদ্ধের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সোজাসুজি সরলভাবে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করাই মিত্র-শক্তির লক্ষ্য ছিল বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম হইতেই গোপন সন্ধি এবং রাজনৈতিক চালবাজি মিত্র-শক্তির মধ্যে বেশ চলিয়া আসিয়াছে। রুশিয়াকে প্রলুব্ধ করিবার জন্যই ইংরেজ ও ফরাসী স্তাম্বুল রুশিয়াকে দিতে মুখে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে রুশিয়ার শক্তি যাহাতে পশ্চিম অভিমুখে বাড়িতে না পারে সে চেষ্টা চলিতে লাগিল।

আরবের জাতীয় দলকে তুরস্কের বিরুদ্ধে উস্কাইয়া তুলিবার জন্য হেজ্জাজের আমির হুসেনের কাছে আরবকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে ইংরেজ ও ফরাসী ১৯১৫ সালে স্বীকৃত হন। অথচ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ফরাসী তরফে ম্যসিয় জর্জ্ পিকো এবং ইংরেজ তরফে স্যার মার্ক্ সাইক্‌সের মধ্যে একটি বন্দোবস্ত হয়। এই সাইক্‌স্-পিকো-সন্ধিসূত্র অনুসারে হেজ্জাজ ব্যতীত সমস্ত আরব দেশটাই ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লওয়া হয়। প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি আরব প্রদেশের সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি নির্দ্ধারণ মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে হইয়া গেল, কিন্তু তাহা ইতালী ও হেজ্জাজ সরকারের নিকট হইতে গোপন রাখা হইল। কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গের দুর্ভাগ্যক্রমে এই গুপ্তসন্ধি আর বেশীদিন গোপন রহিল না। ইহার কিছুদিন পরেই রুশিয়াতে বোল্‌শেভিক বিপ্লব ঘটিয়া যায় এবং বোল্‌শেভিক শাসনপরিষদ্ সরকারী দপ্তরের গুপ্ত কাগজ-পত্র সাধারণে প্রকাশ করিয়া দিলেন। সেই সূত্রে সাইক্‌স্-পিকো সন্ধিপত্রও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। হুসেন এই সংবাদ অবগত হইয়া এমন মর্ম্মাহত হন যে তিনি ইংরেজ-সরকারের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং সেভার্স-সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন। এদিকে কালনেমির লঙ্কা ভাগের ন্যায় এসিয়া-মাইনরের ভাগ-বাটোয়ারাও প্রায় ঠিক হইয়া যায়। প্যালেষ্টাইন ইংরেজ পাইবেন; সিলিসিয়া, আনাটোলিয়ার অধিকাংশ পশ্চিম কুর্দ্দিস্থান ফরাসীর হইবে; এবং আর্ম্মেনিয়া রুশের অধিকারে যাইবে;—এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত হয়। যখন গোপনে এইরূপ ভাগ-বাটোয়ারা চলিতেছিল ঠিক সেই সময়ে ইংরেজ পররাষ্ট্র-বিভাগ কিন্তু আর্ম্মানিদিগের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়া মস্ত আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। অথচ গোপনে রুশিয়ার হস্তে আর্ম্মেনিয়ার ভাগ্য সমর্পণ করিয়া দিতে ভিতরে ভিতরে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ইতালীর গুপ্তচরের দল কিন্তু এই গোপন সন্ধিপত্রের সন্ধান জানিতে পারে; কাজে কাজেই গোলমাল পাকাইয়া উঠে। ইতালীকে শান্ত করিবার জন্য লণ্ডন সহরে এক বৈঠক হয়, তাহাতে মিত্রশক্তিবর্গ তুরস্কের আদালিয়া প্রদেশ ইতালীকে দিতে স্বীকৃত হন। ইতালী কিন্তু এত অল্পে সন্তুষ্ট হইতে নারাজ হওয়াতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্যাঁ জ্যন্ দ মেরিয়েন্ নগরে ইংরেজ ফরাসী ও ইতালীর প্রধান মন্ত্রীগণ এক বৈঠকে সম্মিলিত হন এবং মিত্রশক্তিবর্গ ইতালীকে কোনিয়া এবং স্মার্না প্রদেশ প্রদান করিতে অঙ্গীকৃত হন। ভূমধ্যসাগরে ইতালীর প্রভাব ইংরেজের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। আড্রিয়াটিকে ইতালীর প্রভাব যুদ্ধের ফলে অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহার উপর আবার স্মার্না ও কোনিয়া প্রদেশ ইতালীর হস্তে আসিলে ভূমধ্যসাগরে ইতালী সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়ায়। তাই ইংরেজের চেষ্টায় সেভার্স্ সন্ধিপত্রে স্মার্না গ্রীসকে দেওয়া হইল। ফরাসীর কিন্তু ইংরেজের এই চালটি পছন্দ হয় নাই। তাই গ্রীসশক্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য ভিতরে ভিতরে তুরস্ককে ফ্রান্স্ সাহায্য করিতে আরম্ভ করে। তুরস্কপ্রভাব বাড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যে সিলিসিয়া ও আনাটোলিয়ার কতকাংশ ফরাসী তুরস্ককে ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হন।

অ্যাঙ্গোরা-পক্ষে ইউসুফ কামাল ও ফরাসীপক্ষে ফ্রাঙ্ক্‌ল্যাঁ বুইয়োঁ'র যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল তাহা ইংরেজের অজ্ঞাতসারে সুসম্পন্ন হয়। সেই সময়কার রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্বন্ধে টয়েন্‌বি বলেন,

"France was backing Poland vigorously and

Hungary tentatively against Germany and Russia; and she was backing Turkey tentatively against Russia and vigorously against Greece because Greece had been backed by Great Britain. Great Britain was backing Greece against Turkey because an aggrandised Greece dependent on British support would save Great Britain the trouble of herself imposing her Eastern peace terms. Italy was backing Turkey against Greece as payment on account for prospective economic concessions in Anatolia." P. 42.

মুসলমান প্রজার মুখ চাহিয়া ইংরেজ প্রকাশ্যভাবে গ্রীসের সহায়তা করিতে পারিলেন না। ফরাসী ও ইতালীর সহায়তা লাভ করিয়া গ্রীসকে পরাভূত করার অ্যাঙ্গোরা-সরকারের খুব সুবিধা হইল। প্রাচ্য সমস্যায় ফরাসীর চালবাজীর নিকট এইরূপে পরাস্ত হইয়া ইংরেজ প্রতিশোধের চেষ্টায় রহিলেন। কয়লা, লৌহ, খনিজ তৈল এবং আমদানী-রপ্তানী কারবারের মালিকানা লইয়াও উভয়ের মনোমালিন্য ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। যান্ত্রিক সভ্যতার এইগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। তাই প্রবল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এইসকল বস্তুর মালিকানা লইয়া প্রবল প্রতিযোগিতা চলে। বর্ত্তমান কালের প্রায় সকল যুদ্ধবিগ্রহ ও সকল রাজনৈতিক মনোমালিন্যের মূলে এইগুলি। মেক্সিকোর রাষ্ট্রীয় প্রভাব লইয়া ইংরেজ ও মার্কিনের এবং পারস্যের রাষ্ট্রীয় প্রভাব লইয়া ইংরেজ ও রুশের যে বিরোধ ঘটে তাহার মূলে আছে খনিজ তৈলের মালিকানা লইয়া এইসব রাষ্ট্রশক্তির রেষারেষি। মোজলের তৈলখনি, হারচিট্‌ উপত্যকার লৌহের খনি, রুর ও সারের কয়লার খনি এবং লংউইর লৌহের খনি লইয়া ইংরেজ ও ফরাসীর মনোমালিন্য ক্রমশই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রাষ্ট্রধারা আর্থিক কারণে এখন বিপরীতপথগামী, তাই ইংরেজের সংবাদপত্রে এখন ফরাসী-বিদ্বেষ বেশ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যুদ্ধের সময় ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সভাপতি পঁয়াকারের প্রশংসা ইংরেজের মুখে আর ধরিত না। তাঁহাকে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া অভিহিত করিতেও ইংরেজ কুণ্ঠিত হন নাই। এখন কিন্তু আবার অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিতেও ইংরেজ-সংবাদপত্র ছাড়িতেছে না। "Fool" "Rash and negligent" "Pugnacious" প্রভৃতি অনেক প্রকার ভাষাই তাঁহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতেছে। ফ্রান্সের লোকেরাও ইংরেজকে খুব বেশী সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী ইতালীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ফ্রান্সের সংবাদপত্রে প্রকাশ যে এই ব্যাপার হইতে ফরাসীদের ধারণা যে, ইহার অন্তরালে ইংলণ্ডের গভীর মতলব আছে। সে মতলব এই যে ইতালীকে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম্‌ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া মিত্রশক্তিবর্গের মিতালী ভাঙ্গিয়া দেওয়া। ইংরেজ ও ফরাসীর কাগজে যে বিদ্বেষের স্বরটি ফুটিয়া বাহির হইতেছে তাহা হইতে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত গোপনে কত আবর্ত্ত পাকাইয়া তুলিয়াছে তাহা যদি সঠিক প্রকাশিত হয়, তবে বলিতে পারা যায় যে এই স্বার্থের পুঞ্জীভূত সংঘাতে নূতন কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

বোনার ল'র পদত্যাগ ও বল্ড্‌উইন্‌ মন্ত্রীসভা—

লয়েড্‌ জর্জ্জের পতনের পর যখন রক্ষণশীলদলের প্রভাব রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বাড়িয়া উঠিল তখন এই দলের কর্ণধার নির্ব্বাচিত হইলেন বোনার ল। পূর্ব্বে ইনি হাউস্‌ অব্‌ কমন্‌স্‌ সভাতে রক্ষণশীল দলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু দুই বৎসর পূর্ব্বে অসুস্থ হইয়া পড়াতে তিনি হাউস্‌ অব্‌ কমন্সের নেতৃত্বপদ ত্যাগ করেন। কিন্তু এই অক্টোবর মাসে রক্ষণশীল দলের প্রধানবর্গের একান্ত ইচ্ছাতে অপটু শরীর লইয়াও প্রধানমন্ত্রিত্বের গুরুভার গ্রহণ করিতে বোনার ল সম্মত হন। তাহার পর এই ছয় সাত মাসের গুরু পরিশ্রমে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; স্বরভঙ্গ রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসকের পরামর্শে কর্ম্মজীবন হইতে অবসর লইতে ইনি বাধ্য হইয়াছেন। অসাধারণ মনীষা বা অদ্ভুত বাক্‌চাতুর্য্যের জন্য ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। কিন্তু দৃঢ় চিত্তে কর্ত্তব্যপথে চলিয়া অদুর-প্রাচ্যের সমস্যাসমাধানে ইনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ইনি ইংলণ্ডের জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন; রুরের ব্যাপারেও যে ইংলণ্ড ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ না দিয়া দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাও ইঁহার অনুসৃত নীতির ফলেই। ইনি চরিত্রমাধুর্য্যে সকল সম্প্রদায়ের লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার এই বিপদে সকল দলের লোকই বেশ একটু বেদনা পাইয়াছেন। বোনার ল'র পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই কথা উঠিল তাঁহার স্থলে কে প্রধান মন্ত্রী হইবেন?

এই ব্যাপার লইয়া খবরের কাগজে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল। লর্ড কার্জ্জন, লর্ড্‌ ডার্ব্বী, অষ্টেন্‌ চেম্বারলেন্‌, ডিউক অব্‌ নর্‌দাম্বার্‌ল্যাণ্ড্‌, ষ্টান্‌লে বল্ড্‌উইন্‌ প্রভৃতি রক্ষণশীল নেতাদের ভক্তবর্গ নিজের নিজের দলের নেতার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। চেম্বার্‌লেনের সঙ্গে কয়েকটি বাছা বাছা কন্‌সার্ভেটিভ্‌ লয়েড্‌ জর্জ্জের অনুরাগী হইয়া রক্ষণশীল দল ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে এই সুযোগে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ও চেম্বারলেনকে প্রধান মন্ত্রী করিবার জন্য কেহ কেহ ঝুঁকিয়া পড়িলেন। এইসব ব্যাপার দেখিয়া রাজা তাঁহার খাস-মুন্সী লর্ড্‌ ষ্টাম্‌ফোর্ড্‌হ্যামকে রক্ষণশীল দলের নেতাদিগের নিকট হইতে মত সংগ্রহ করিতে পাঠাইলেন।

প্রাচ্যে গ্রীসের আনুকূল্য করিয়া লর্ড্‌ কার্জ্জনের বেশ একটু অখ্যাতি হইয়াছিল। ইস্‌মৎ পাশার নিকট চালবাজীতে হারিয়া যাওয়াতে তাঁহার সম্বন্ধে ইংলণ্ডের জনসাধারণের অপ্রীতি আরও বাড়িয়া উঠে।

কাজে কাজেই লর্ড্‌ কার্জ্জনের প্রধান মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্পই দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু প্রাজ্ঞ ও বহুদর্শী বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুনাম আছে, অপর দিকে ষ্টান্‌লে বল্ড্‌উইন্‌ প্রভৃতি নেতৃবর্গের রাষ্ট্রনীতিতে দীক্ষা অতি অল্পদিনের, সে জন্য তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত অল্প। কাজে কাজেই নেতৃনির্ব্বাচনব্যাপার বড়ই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে শ্রমিকদল এক ইস্তাহার জারী করিয়া নির্ব্বাচনের সুবিধা করিয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, হাউস্‌ অব্‌ লর্ড্‌সের সভ্যরা জন্মগত অধিকারে মহাসভার সভ্য। তাঁহারা যে প্রজার বিশ্বাসভাজন তাহার কোনই প্রমাণ নাই। যাঁহার প্রতি সাধারণ প্রজারা আস্থাবান্‌ তাঁহারই প্রধান মন্ত্রী হইবার দাবী আছে। যে পর্য্যন্ত না লর্ড-সভার কোনও সভ্য নিঃসংশয়ে সে প্রমাণ দিতে পারেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনও দাবীদাওয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং লর্ড-সভার কোনও সভ্যকে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিলে বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার অবসান ঘটাইতে শ্রমিকদল চেষ্টা পাইবেন।

তরুণ রক্ষণশীল দল এইসব ব্যাপার দেখিয়া ঘোষণা করিলেন যে, কমন্স্‌ সভা হইতে এমন একজনকে প্রধানমন্ত্রীপদে অভিষিক্ত করিতে হইবে, যিনি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও শ্রমিকদলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন। এই সিদ্ধান্তের কথা অবগত হইয়া রাজা পঞ্চম জর্জ্জ্‌ ষ্টান্‌লে বল্ড্‌উইন্‌কে ডাকাইয়া প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

ইনি ইতিপূর্ব্বে লোহার কারবার ও কয়লার খনি পরিচালন করিয়া যশস্বী হন। যুদ্ধের সময়ে ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হওয়াতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লয়েড্ জর্জ্জ্ তাঁহাকে মন্ত্রী-সভায় ডাকিয়া লন। তিনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বোর্ড্ অব্ ট্রেডের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বাণিজ্য-সচিবরূপে ইনি ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য পুনর্গঠনের সহায়তা করিয়া খুব সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাই বোনার ল'র মন্ত্রীসভাতে তিনি বাণিজ্যসচিব হইতে একেবারে অর্থ-সচিবের পদে উন্নীত হন। এই পদ লাভ করিয়া মার্কিন-সরকারের নিকট ইংরেজ-সরকারের যে যুদ্ধ-ঋণ ছিল তাহা অল্পে অল্পে পরিশোধের একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত মার্কিন্-সরকারের সহিত করিয়া তিনি খুব প্রসিদ্ধ হন। তাহার পর আয়-কর, চা-কর ও মাদক-কর কিছু কমাইয়া দিয়াও বজেটে ব্যয় হইতে আয়ের অঙ্ক বাড়াইতে সমর্থ হইয়া তিনি কর-প্রপীড়িত জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। এইসব কারণে তাঁহার নির্ব্বাচন বেশ লোকপ্রিয় হইয়াছে।

এই নির্ব্বাচনে একটি নূতন রাষ্ট্রধারাও স্বীকৃত হইল। তাহা এই যে, প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইতে হইলে প্রজার আস্থা যে পদ-প্রার্থীর উপর আছে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হওয়া দরকার। যদি কোনও যোগ্য ব্যক্তি জন্মগত অধিকারে হাউস্ অব্ লর্ডসের সভ্য থাকেন তবে তাঁহাকে সেই অধিকার ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইতে হইবে। নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে জয় লাভ করিলে তিনি প্রধান অমাত্যের পদ পাইতে পারেন, নতুবা নহে। এই বিধি ইংলণ্ডের আভিজাত্যের মূলে আঘাত করিয়াছে। পশ্চিমে জন্মগত আভিজাত্য যে ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ। ইংলণ্ডের শাসনবিধি অনুসারে মন্ত্রীবর্গ কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া প্রধান অমাত্যকে তাঁহার বিশ্বস্ত লোকদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার অধিকার দিলেন। বল্ড্‌উইন্ যে মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন তাহাতে দুই-একটি ক্ষেত্রে ব্যতীত, কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে লর্ড্ কার্জ্জন্ বল্ড্‌উইনের অধীনে কাজ করিতে সম্মত হইবেন না। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, লর্ড্ কার্জ্জন্ পররাষ্ট্রসচিবের পদেই বাহাল রহিলেন। নূতন অমাত্যদিগের মধ্যে রেজিন্যাল্ড্ ম্যাক-কেনা ও লর্ড্ রবার্ট সেসিলের নির্ব্বাচন উল্লেখযোগ্য। ম্যাককেনা পূর্ব্বে উদারনৈতিকদলের নেতা ছিলেন। কিন্তু লয়েড্ জর্জ্জের মন্ত্রিত্বের সময়ে ইনি ক্রমশই রক্ষণশীলমতাবলম্বী হইয়া পড়িতে থাকেন। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের সময় ইনি নির্ব্বাচনপ্রার্থী হন নাই। জীবনের বাকি সময়-টুকু ব্যবসাবাণিজ্যে নিয়োজিত থাকিতে ইনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বল্ড্‌উইন্ তাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিয়া বেশ শক্তিসঞ্চয় করিলেন। ম্যাক্‌কেনা অদ্ভুত বাগ্‌বিভূতির জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহার মত কূট-তার্কিকের সাহায্য লাভ করাতে শ্রমিক দলের সঙ্গে লড়া রক্ষণশীল দলের পক্ষে সম্ভব হইবে।

অর্থনীতি ও বার্ত্তাশাস্ত্রেও ম্যাক্‌কেনার দখল অসাধারণ। কাজে কাজেই অর্থসচিবরূপে ইংলণ্ডের আর্থিক সুব্যবস্থা করিতেও ইনি সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

লর্ড্ রবার্ট্ সেসিল্ চমকপ্রদ তার্কিক না হইলেও বেশ চিন্তাশীল বক্তা। দলের খাতিরে ইনি কোনও দিন মত বিসর্জ্জন করেন নাই এবং এই স্বাধীনচিন্তার জন্যই ইহাঁকে দল ছাড়িতে হইয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনচিত্ত মনীষীর সাহায্য পাইয়া বল্ড্‌উইন্ মন্ত্রীসভা যে বোনার ল'র মন্ত্রীসভা হইতে শক্তিশালী হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মন্ত্রীসভা কিন্তু স্যার রবার্ট্ হর্ণ্ প্রভৃতি লয়েড্‌জর্জ্জ্-ভক্ত রক্ষণশীল দলের প্রধান-দিগকে হাত করিতে পারে নাই। এক সার ল্যামিং ওয়ার্দ্দিংটন্ ইভান্স্ এই দলের লোক হইয়াও ডাকবিভাগের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া মন্ত্রী-সভায় যোগ দিয়াছেন। লয়েড্ জর্জ্জ্ এই মন্ত্রীসভার পতনসংঘটনের জন্য যে বেশ উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। শ্রমিক দলও ইংলণ্ডের শাসনভার স্বহস্তে আনিবার জন্য খুব চেষ্টা পাইতেছেন। কাজে কাজেই এই নূতন মন্ত্রীসভা কতদিন স্থায়ী হইবে কিছু বলা যায় না।

আর্ট্ ওব্রায়ানের মামলা—

পরাধীন প্রজার স্বত্বস্বাধীনতা লইয়া শাসকসম্প্রদায়ের বড় ব্যস্ততা দেখা যায় না, বরং রাষ্ট্রীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য "আইন ও শৃঙ্খলার" নামে নিষ্পেষণ-নিপীড়নের নূতন নূতন যন্ত্র সৃজন করিতে বেশ তৎপরতাই দেখা যায়। আইনের বেড়াজালে ফেলিয়া যে-কোনও আন্দোলন যখন ইচ্ছা বন্ধ করিয়া দিবার সুবিধা আমলাতন্ত্রের কর্ম্মচারীদিগের আছে। কিন্তু স্বাধীনদেশের ধারা অন্য রকম। এমন কি ইংরেজেরই নিজের দেশের আদালতের ধারা অন্য রকম। সরকারের স্বেচ্ছা-চারিতাকে সেখানকার আদালত নির্ব্বিচারে মানিয়া লয় না। সেখানকার প্রজা আপনার স্বত্বস্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য রাজদরবার হইতে অনেক দলিল আদায় করিয়া লইয়াছে। এইসকল দলিলপত্রের মধ্যে "হেবিয়াস্ কর্পাস্" আইন অন্যতম। এই আইনের বলে ইংরেজ প্রজার স্বাধীন মত প্রচারের জন্মগত অধিকার অটুট থাকে এবং বে-আইনি-ভাবে কোনও প্রজাকে আট্‌কাইয়া রাখিবার ক্ষমতা সরকারের হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়।

যুদ্ধের অজুহাতে এই আইনটিকে স্থগিত রাখিয়া রাজ্যসংরক্ষিণী আইনের (D. O. R. A.) সাহায্যে ইংরেজের বিদেশীয় প্রজাকে আট্‌কাইয়া রাখিবার যে চেষ্টা সরকারী তরফ হইতে হয়, ইংরেজের আদালত তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। আর্থার জ্যাডিগের মামলায় হাউস্ অব্ লর্ডসের বিচারপতি লর্ড্ শ অব্ ডানফার্ম্‌লিন্ (Lord Shaw of Dunfermline) এই বে-আইনী আইনের সম্বন্ধে যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা ইংরেজ আদালতের গৌরবের বস্তু। তিনি বলিতেছেন—"under this the Government becomes a committee of public safety. But its powers as such are far more arbitrary than those of the most famous committee of public safety known to history. * * The use of the Government itself as a committee of public safety has its conveniences, has its advantages. So had the Star Chamber. * * * There is the basic danger. And may I further emphatically observe that that danger is found in an especial degree whenever the law is not the same for all, but the selection of the victim is left to the plenary discretion whether of a tyrant, a committee, a bureaucracy or any other depository of despotic power. Whoever administers it, this power of selection of a class, and power of selection within a class is the negation of public safety or defence. It is poison to commonwealth * * * In my opinion the appeal should be allowed, the regulation challenged should be declared ultra vires and the appellant should be set at liberty." (Rex vrs. Halliday, Law Reports 1917 A.C. Part III, June I, pp. 260-308, 5 Geo 5. c—8. H. L.) ইংরেজ সরকারের শাসনতন্ত্রের আচরণের ইহা অপেক্ষা তীব্র সমালোচনা কি হইতে পারে?

লর্ড শ'র এই তীব্র মন্তব্যের পরেও শাসনতন্ত্রের চৈতন্য হয় নাই। ১৯২০ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডে শৃঙ্খলাপ্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজের আইন-মজলিস্ Restoration of Order in Ireland Act, 1920 নামে এক আইন জারি করেন। সেই আইনের জোরে কিছুদিন পূর্ব্বে গণ-তন্ত্রীদলের কয়েকজন নেতাকে ইংলণ্ডে বসিয়া ফ্রি ষ্টেটের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে ইংলণ্ড হইতে নির্ব্বাসিত করা হয়। এই নির্ব্বাসিত দলের নেতা হইলেন আর্ট ওব্রায়ান্। ওব্রায়ানের পক্ষ হইয়া বিখ্যাত শ্রমিক নেতা ও আইরিশ্ ব্যবহারাজীব প্যাট্রিক হেষ্টিংস্ "হেবিয়াস্ কর্পাস" আইনের সাহায্যে মুক্তি প্রার্থনা করিয়া আপীলকোর্টে মাম্‌লা রুজু করেন। মাম্‌লাতে ওব্রায়ান্ জয়লাভ করেন। বিপদ্ গণিয়া সরকার-পক্ষ হাউস্ অব্ লর্ড্‌সে আপীল করিলেন। সে আপীলও নামঞ্জুর হওয়াতে ওব্রায়ান্‌কে আয়ার্ল্যাণ্ড্ হইতে আনিয়া মুক্তি দিতে সরকারপক্ষ বাধ্য হন। মুক্তি লাভ করিয়া ওব্রায়ান তাঁহাকে বেআইনিভাবে আটক রাখিবার জন্য হোম সেক্রেটারির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া মোকদ্দমা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ওহারা নামক আরেকজন আইরিশ নেতাও আর-একটি মাম্‌লা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। শুধু ক্ষতিপূরণেই ইঁহারা সন্তুষ্ট থাকিবেন এরূপ মনে হয় না। ফৌজদারি দণ্ডবিধির সাহায্যে ফৌজদারি মোকদ্দমা দায়ের করিবার চেষ্টাও চলিবে। যে আইনের সাহায্যে এইসব মোকদ্দমা করিবার আয়োজন চলিতেছে তাহা রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের আমল হইতে ইংলণ্ডে বাহাল আছে। কিন্তু ইংরেজের দেশে বে-আইনি আটক বহুকাল না হওয়াতে এই আইন অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু পুরাতন আইন যতদিন পর্য্যন্ত না কোন নূতন আইনের সাহায্যে রদ্ হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাহা বাহাল থাকে। কাজে কাজেই হোম সেক্রেটারির অবস্থা বেশ সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাঁহাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ও আইরিশ নির্ব্বাসনব্যাপারে যাঁহারা লিপ্ত ছিলেন তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাড়াতাড়ি একটি আইন (Indemnity Bill) পাশের ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু শ্রমিক ও উদারনীতিক দল এইরূপ ব্যবস্থা-প্রণয়নের বিরোধী। তাঁহারা বলেন যে, এইরূপে একবার প্রশ্রয় পাইলে সরকারী কর্ম্মচারীদের হঠকারিতা এতদূর বাড়িয়া যাইতে পারে যে প্রজার স্বাধীনতাহরণ-ব্যাপার আম্‌লা-তন্ত্রের পক্ষে সহজ হইয়া পড়িবে এবং রাজরোষে পতিত হইয়া অনেক নির্দ্দোষী লোকও কষ্ট পাইবে। শ্রমিক ও উদারনীতিক দলের মিলিত বাধায় আইনটি পাশ নাও হইতে পারে। সরকার-পক্ষ কিন্তু অপর দিকে নিজেদের সাফাই গাহিবার জন্য ওব্রায়ান রাজদ্রোহের উদ্যোগ করিবার চেষ্টা করার অপরাধে দোষী বলিয়া প্রচার করিয়া একটি মাম্‌লা দায়ের করিয়াছেন এবং ওব্রায়ানকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়াছেন। মাম্‌লার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য ওব্রায়ানের পক্ষ হইয়া অনেকেই লড়িতে প্রস্তুত হইতেছেন। এই মোকদ্দমার সূত্রে ডার্নেলের মাম্‌লায় লর্ড কোকের বাণী স্বতই মনে হয়। —"If a free man of England might be imprisoned at the will and the pleasure of the king or by his command, he were in worse case even than a villein."

বাংলা

বাংলার কৃষি ১৯২১-২২—

১৯২১-২২ সালে বঙ্গদেশের উৎপাদিত ফসলাদি সম্বন্ধে যে বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সঙ্কলিত হইল :—

কুচবিহার, স্বাধীন ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্য বাদ দিয়া বঙ্গদেশের মোট বর্গফল ৫০৩ লক্ষ একারের কিছু অধিক। ইহার অর্দ্ধাংশের কম জমিতে অর্থাৎ ২৩৭ লক্ষ একারে চাষ হয়। জলাভাব যে এতদ্দেশে চাষের একটি প্রধান অন্তরায় তাহা সকলেই জানেন। বৃষ্টির জল ব্যতীত কূপ, তড়াগ ও খালই জলসেচনের অন্যতম উপায়। সরকারী বিবরণীতে দেখা যায় যে পূর্ব্বোক্ত চাষের জমির মধ্যে কেবলমাত্র কিছু কম ২০ লক্ষ একারে জলসেচনের ব্যবস্থা ছিল। তাহার মধ্যে ধানের জমি ১৫ লক্ষ একার। লক্ষাধিক একারে জল-সেচনের ব্যবস্থা শুধু মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি ও জলপাইগুড়িতেই আছে।

বাংলার ফসলের মধ্যে ধানই অবশ্য সর্ব্বপ্রধান। ইহার আবাদের জমি ২১৮ লক্ষ একারের উপর। তাহার নীচেই পাট—১৩ লক্ষ একার ও সরিষা ৮ লক্ষ একার। গোধুম, ছোলা, তিসি, তিল, ইক্ষু, চা, তামাক, প্রত্যেক জিনিষই লক্ষাধিক একারে উৎপাদিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তামাক ব্যতীত কোনটিরই চাষের জমির পরিমাণ আড়াই লক্ষ একারের বেশী নয়। ক্ষুদ্র ফসলের মধ্যে গাঁজা ও কুইনিন্ প্রস্তুতের জন্য সিঙ্কোনা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। নারিকেল বৃক্ষের আবাদী জমি ৭০০ একার বলিয়া ধরা হইয়াছে। তাহা নিতান্তই কম বলিয়া বোধ হয়।

১৯২১-২২ সালে বাংলার ২৮টি জেলার মধ্যে সাধারণ অথবা বিশেষভাবে ফসল উৎপাদনের যে হ্রাস দেখা যায় তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখযোগ্য :—মেদিনীপুর ও চব্বিশ-পরগণায় সময়োচিত বারিপাতের অভাবে লক্ষাধিক একার জমিতে ধানচাষ হয় নাই। রঙ্গপুর, ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলায় পাটের বাজার মন্দা থাকায় লক্ষাধিক একার পাটচাষের জমি কমিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে কোন জেলাতেই অধিক পরিমাণে কোন ফসলের জমি বৃদ্ধি দেখা যায় না। অবশ্য সেটেল্‌মেন্টের দরুণ জমির হ্রাস-বৃদ্ধির কথা এস্থলে বলা হইতেছে না। কেবলমাত্র রাজসাহী জেলায় আমনধান না জন্মানোর দরুণ লক্ষাধিক একার জমিতে আউশ ধানের চাষ হইয়াছিল।

তুলাচাষ সম্বন্ধে আজকাল অনেকেরই আগ্রহ দেখা যাইতেছে। কিন্তু বঙ্গদেশে তুলাচাষের অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নয়। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮৩০০ একার জমিতে তুলা চাষ হয়। তন্মধ্যে এক চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশেই ৪৪,৫০০ একার। বাঁকুড়ায় ২১০০ একার। মেদিনীপুর, মালদহ ও মৈমনসিংহে যথাক্রমে ৭০০, ১০০ ও ৮০০ একার। অন্য কোন জেলাতে তুলা চাষ হয় না। বঙ্গদেশে দেশীয় বস্ত্রপ্রচলনের প্রধান অন্তরায় স্থানীয় তুলার অভাব। যতদিন না তুলাচাষের প্রসার হয় ততদিন কুটিরশিল্প হিসাবে বস্ত্রবয়নের সমধিক প্রচলন হওয়া সম্ভবপর নহে।

বঙ্গদেশে বিবিধ খাদ্যশস্য উৎপাদনের জমির পরিমাণ ২৮২৯০০ একার, অন্যান্য শস্যের জমি ১২০,৪০০ একার। মোটের উপর দেখা যায় যে এতদ্দেশে এক পঞ্চমাংশের কিছু উপর জমিতে একাধিকবার ফসল হয়। বর্ত্তমান জগতের কৃষিবিষয়ক উন্নতির অন্যতম উপায় একই জমিতে বিশেষ প্রথায় ২।৩ বার ফসল উৎপাদন করা। সে হিসাবে আমাদের সামান্য উন্নতিই হইয়াছে বলিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন ইহা আরও দ্রষ্টব্য যে কতিপয় লাভজনক ফসল বঙ্গদেশে আর উৎপন্ন

হইতেছে না, অথবা অতি সামান্য পরিমাণে হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চীনেবাদাম ও রেড়ীর বিষয় বলিতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্তের জমি মোটে ৩০০ একার ও শেষোক্ত ফসল একেবারেই চাষ হয় না। অথচ এইরূপ ফসল উৎপাদন আদৌ কষ্টকর নহে। ফলতঃ ১৯২১-২২ সালে বঙ্গের কৃষি-সম্পদের বিশেষ কিছু বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয় না।—কৃষক।—ছোলতান

বাংলার ব্যাধি—

ম্যালেরিয়া কলেরা বসন্ত বাঙালী জাতকে ঘুমন্ত পেয়ে নিশ্চিন্ত আরামে তার রক্ত শোষণ করছে। বড় বেশী যখন ঘুমের ব্যাঘাত হচ্চে তখনই আমরা একটুখানি গা-মোড়া দিয়ে উঠ্‌চি। কিন্তু স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দিয়ে তখনই আবার ঘুমিয়ে পড়্‌চি। পল্লীর লোকের স্বাস্থ্য ভালো নেই, ইস্কুল-কলেজের ছেলেদের স্বাস্থ্য ভালো নেই, সহরে বাবুদের স্বাস্থ্য ভালো নেই, গর্ভের শিশুর অবধি স্বাস্থ্য ভাল নেই। আর আমরা, এইসব রুগ্ন অক্ষম লোকগুলো, স্বরাজের ইমারৎ গড়্‌বার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেচি যে আর কোন দিকেই নজর দিতে পার্‌চি নে।

—বিজলী

দেশ-রক্ষার উপায়—

দেশের অবস্থা কি? প্রতি বৎসর হাজারকরা সাড়ে ত্রিশজন লোক কালগ্রাসে পতিত হচ্ছে,—বাহ্যতঃ মহামারী ইহার হেতু হলেও, দারিদ্র্য যে মূল কারণ সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই।

সত্য দেশ-সাধক যাঁরা এখনও নানারূপ ভাঁওতায় আচ্ছন্ন হয়ে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছেন, আমরা তাঁদের দলবদ্ধ হয়ে এই ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে বলি। যখন আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে জাতি উপস্থিত, তখন আপাতঃকর্ত্তব্য মৃত্যুর মুখ থেকে দেশের মুখকে ফিরিয়ে দেওয়া; এ মৃত্যু-প্রবাহের গতিরোধ করে' মোড় ফিরিয়ে দিতে হলে শক্ত সংহতির দরকার, যে-সংহতি দেশের কৃষির উন্নতিবিধান করবে, গ্রামের খানা বিল পুকুর কাটিয়ে মাছের চাষ করবে, কাপাস বুনবে, আর ঘরে ঘরে চর্কা চালান'র ব্যবস্থা করে' দেবে।

পল্লীগঠনের একমাত্র এই পথ ধ'রে যদি একদল লোক দশটি বৎসর মুখ বুজে থাকে, নিশ্চয় করে' বলতে পারি, জাতির প্রাণে বিদ্যুৎ ঠিক্‌রে পড়্‌বে, এক হাজার বাঙ্গালীর প্রাণ যদি অসাধারণ চরিত্র নিয়ে উঠে দাঁড়ায় একাজ হাস্‌তে হাস্‌তে সম্পন্ন হবে; কিন্তু সে একনিষ্ঠ তপস্বী প্রাণ কোথায়, জাতির এই বৃহৎ কর্ম্মে, নামযশের প্রত্যাশা না রেখে যে উঠে দাঁড়াবে? আমরা তারই তপস্‌ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করে' এই সংহতি-জীবনের অপেক্ষায় দিন গুন্‌ছি। তরুণ সাড়া দাও।

—নবসঙ্ঘ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি—

গয়া সিদ্ধান্তের কার্য্য
১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা সংগৃহীত

	সভ্য	টাকা	স্বেচ্ছাসেবক
বরিশাল	১৭৯৩	১০,০০০৲	২২৫
বাঁকুড়া	৫৮৭	৩১১৫৲	৬৬
বগুড়া	১৪৪	৪৩০৲	৫০
বর্দ্ধমান	১১৬৭	৫৫৮৲	৪১
বীরভুম	৩০০	৫০৲	১০
উঃ কলিকাতা	৪৭১৪	৫১৪১৲	৬৫
মঃ কলিকাতা	১০৬৮	৪৪৬৲	৩২
চট্টগ্রাম	১৩১০	৮৩৪৲	১০৪
দিনাজপুর	১৩৪২	৭৫৮৲	৫৪
ফরিদপুর	৩৪৪	২৲	৩১
হুগলী	১০১৫	৩৭৫৲	২৩
ঢাকা	৫৩০০	৬০০০৲	১০৯
ময়মনসিংহ	৪১৩৪	৩৫৫৯৲	১৪৪
যশোহর	১৬৪২	২১৲	৫
জলপাইগুড়ি	২৫০	৫৭২১৲	—
খুলনা	৪০০	১০৭৲	৩
মুর্শিদাবাদ	৫৯৭	২০৪৲	২০
মেদিনীপুর	৬২৪	২৩৮৲	১৫০
মালদহ	১০৫৫	১১৫৮৲	১২
নোয়াখালি	১২৪৭	২৬২৲	২৫৫
পাবনা	৫২১	৮৫৭৲	—
রাজসাহী	৩৭২	—	—
রংপুর	৭২০	৯১৫৲	৬৮
শ্রীহট্ট	১১৫	২০৬৲	—
কুমিল্লা	১৬০০	৫৩৩৲	৩০৬
চব্বিশপরগণা	১৯৬৮	১১৩৪৲	৬২

সমস্ত খবর পাওয়া যায় নাই। মোট বাঙ্গলায় একলক্ষ পাঁচ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের প্রতিশ্রুত ২৫ হাজার টাকা এবং শেঠ যমুনালাল বাজাজ মহাশয়ের সংগৃহীত ৩০ হাজার টাকা আছে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বঙ্গীয়-প্রাদেশিক-স্বরাজ্য-সমিতি—

নিম্নলিখিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলিকে অর্থসাহায্য করা স্থির হইল।—

১। চুরাইন জাতীয় বিদ্যালয়, ঢাকা—৫০৲; ২। লক্ষীপুর জাতীয় বিদ্যালয়, নোয়াখালি—৫০৲; ৩। মুন্সীগঞ্জ জাতীয়বিদ্যালয়, ঢাকা—৫০৲; ৪। ভাঙ্গা জাতীয়-বিদ্যালয়, ফরিদপুর—৫০৲ (শ্রী প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় মারফৎ প্রেরিত হইয়াছে); ৫। খালিয়া জাতীয়-বিদ্যালয়, ফরিদপুর—৫০৲ (শ্রী প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় মারফৎ প্রেরিত হইয়াছে); ৬। ঢাকা জাতীয়-শিক্ষাশ্রম—৫০৲।

শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু
শিক্ষা-বিভাগ, স্বরাজ্য-পার্টি।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

স্বাধীন দেশ ও পরাধীন দেশ—

বাংলা ও জাপান—বাংলার আয় জাপানের আয়ের ২০ ভাগেরও ১ ভাগের কম। বাঙ্গলার প্রধান বিচারপতির মাইনে হচ্ছে মাসে ৬০০০৲ হাজারের বেশী আর জাপানের প্রধান বিচারপতির মাইনে হচ্ছে ৭৫০৲ টাকা মাত্র। বাংলার মন্ত্রী মশায়ের মাসিক মাইনে হল ৫০০০৲ হাজারের বেশী আর জাপানের প্রধান মন্ত্রীর মাসিক মাইনে হল মাত্র ১৫০০ টাকা।

বাঙ্গালী, স্বাধীনতার ও পরাধীনতার মর্ম্ম বোঝ।

—সনাতন

বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থী—

গত ১৯২০, ১৯২১ ও ১৯২২ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরীক্ষায় যত ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা

যথাক্রমে এইরূপ :—ম্যাট্রিকুলেশন—১৭৫৬৩, ১৯১২৫, ১৯১৫৩। আই-এ—৫৫৩২, ৪৮৫৮, ৩৭৪৭। আই-এস্‌সি—১৭৪৮, ১৮৫১, ১৯১১। বি-এ—৩৮২৭, ৩৯২৭, ২৭৯৯। বি-এস্‌সি—৬৩৬, ৬০৮, ৫০৫। এম-এ—৫০০, ৫৪৯, ৫২২। বি-এল (এক টার্ম)—৫৩৫, ৭৫৬, ৭২০। এই হিসাবে দেখা যায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সর্ব্বসমেত ১৯২০ সনে ২৯৭৪১, ১৯২১ সনে ৩১৬৭৫, ১৯২২ সনে ২০৩৫৭ এবং এই তিন বৎসরে মোট পরীক্ষার্থী ৯০৭২৩ জন। —ঢাকা-প্রকাশ

তুলার বীজ-রোপণ—

১। বর্ষার পূর্ব্বে বীজ বুনিতে হইবে।

২। উচ্চ জমিতে যেখানে জল না উঠে সেইখানে বুনিতে হইবে।

৩। ধানের জমির মত দুইবার চাষ দিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া ১ হাত অন্তর দূরে দূরে লাঙ্গলের দাগ দিবেন। ১ হাত স্কোয়ার হিসাবে বিঘা প্রতি ৩,৪ সের বীজ লাগিবে।

৪। মই দিয়া বীজ ঢাকিয়া দিতে হইবে।

৫। ৬ ইঞ্চি গাছ হইলে একবার নিড়াইতে হইবে।

৬। একফুট হইলে আবার নিড়াইতে হইবে।

৭। সম্ভব হইলে বীজ বুনিবার পূর্ব্বে চাষের সময় গোবর সার দিতে হইবে।

৮। চার মাসে (আশ্বিন মাসে) ফুল দেখা দিবে, অগ্রহায়ণ মাসে তুলা ফুটিবে। তিনবারে তুলা সংগ্রহ করা শেষ হইবে।

৯। আমাদের আফিসে জারি বীজ পাওয়া যায়। মূল্য মণপ্রতি ৭৲ টাকা। ভিঃ পিঃ খরচ পৃথক্।

১০। নীচু জমির জন্য বর্ষার পরে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে "চাঁদা জারীর" বীজ লাগাইতে হইবে।

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন দত্ত
সম্পাদক, স্বদেশী বোর্ড,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি
৩৮।১ বি সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—জ্যোতি

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—

নৈহাটীতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের সভাপতিত্বে ভাটপাড়া, কাঁঠালপাড়া, নৈহাটী, গরিফা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। উহাতে স্থির হইয়াছে যে, আগামী ৮ই ও ৯ই আষাঢ় তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান কাঁঠালপাড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের ১৪শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে নৈহাটী 'শাস্ত্রী লজ' এই ঠিকানায় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকগণের নিকট প্রতিনিধিদের নাম প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

—বাঁশরী

দান—

কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বরিশাল বানরীপাড়া গ্রামে গমন করিয়া "রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারীর কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া তত্রত্যা শ্রীমতী তরুলতা গুহ ঠাকুরতা মহাশয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ ২০০৲। ২২৫৲ টাকা মূল্যের বালা স্বরাজ ফণ্ডে দান করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে যতদিন স্বরাজ লাভ না হইবে ততদিন যাবৎ তিনি বালা পরিধান করিবেন না। —যশোহর

দেশহিতকর কাজ—

মুহূর্ত্তের প্রলোভনে যাহারা মাতৃত্বে বৃত হইয়ে পড়ে, সমাজে তাদের ত স্থান নেইই, তাদের আত্মীয়-স্বজনদেরও নেই। প্রায়ই দেখা যায়, সমাজের শাসনের ভয়ে গুরুতর পাপ দিয়ে পাপকে গোপন করার চেষ্টা হ'য়ে থাকে। ফলে, অসময়ে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে অনেক সময় মা-ও সন্তানের সঙ্গে জীবন দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। যখন এইরূপ চেষ্টা সত্ত্বেও অথবা এইরূপ চেষ্টা না করাতেও সজীব সন্তান জন্মলাভ করে, তখন মাতার স্বজনেরা যে-কোন উপায় উদ্ভাবনের দ্বারা সেই হতভাগা শিশুর জীবন নষ্ট করে' ফেলেন, না হয় পথের ধারে অথবা হাটে মাঠে তাকে ফেলে আসেন। কেবল তাই নয়; এত গোপন ক'রেও যখন তাঁরা পাপকে ঢেকে রাখ্‌তে পারে না, তখন এই হতভাগিনী মা-টিকেও অনিশ্চিতের পথে বিসর্জ্জন দিয়ে আসেন। আর সেই অবধি ভাগ্যহীনা মায়েরা সাধুজীবন যাপনের অবসর হ'তে বঞ্চিত হয়।

তখন কেউ বা নূতন প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে এবং অধিকাংশই সমাজের তাড়নায় পাপের পথ বরণ করে' নিতে বাধ্য হয়।

এই শিশু ও মাতৃ-হত্যা রোধের জন্য আমরা একটি শিশু-মঙ্গল আশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রেছি। শিশু-মঙ্গল আশ্রমে মায়েরা এসে সন্তান প্রসব করে' যেতে পারেন এবং শিশুর পিতা ও মাতার নাম না জেনেও আশ্রম শিশুটিকে গ্রহণ কর্‌তে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

যদি কোন মাতা লজ্জার তাড়নায় সংসারে ফিরে যেতে না চান, তবে তাঁকে আশ্রমে রেখে তাঁর জীবন উন্নত ক'রে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে সৎপথে থেকে তিনি যাতে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা এবং অবলা মেয়েদের শত্রুর হাত হ'তে রক্ষা করা আশ্রমের উদ্দেশ্য।

শিশু-মঙ্গল আশ্রমের সাহায্যার্থ যিনি কিছু দান করতে চান তাহা কার্য্যকরী সমিতিতে শ্রীযুত গোকুলচাঁদ বড়াল ৮ নং হিদারাম বানার্জ্জির লেন বহুবাজার ঠিকানায় পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

যাঁরা আশ্রমের বিষয় বিশেষভাবে জান্‌তে চান তাঁরা শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন রায় ১৯২ বি নং কর্ণওয়ালিশ-ষ্ট্রীট এই ঠিকানায় পত্র দিখে জান্‌তে পারেন। —২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

আজ প্রায় এক বৎসর হইল, শিলচরে নারী শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সূতাকাটা ও বস্ত্র-বয়ন-বিদ্যার সহায়তায় নারী জাতিকে স্বাবলম্বিনী করাই এই প্রতিষ্ঠানের অভিপ্রায়। এখানে আহারাদির ব্যয় বহন করিয়া অসহায়া বিধবাগণকে বস্ত্রবয়ন বিদ্যা ও সূতাকাটা শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বাড়ীতে গিয়া তাঁত বসাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, অপর একজন স্থানীয় নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁত-শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ১৫৫০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৫০৲ টাকা চাঁদা স্বরূপ পাইয়াছি, বাকী ১২০০৲ টাকা আমার পত্নীপ্রদত্ত। এখানে বর্ত্তমানে ৫ জন মহিলা আছেন। ইঁহারা টুইল, ডায়মণ্ড, জিন, জলতরঙ্গ, রুসিতন, ক্রাস প্রভৃতি বয়ন শিক্ষা করিয়াছেন। শীঘ্রই এণ্ডি মুগার কাজ শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায় আমাদের আছে। গত ৯ই বৈশাখের ঝড়ে আমাদের তাঁতের ঘরটা অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে। ততোধিক ক্ষতি করিয়াছে, টানার উপর ঘরের একটা বেড়া পড়িয়া বহু সূতা নষ্ট হওয়ায়। দেশবাসীর সহায়তা ছাড়া এই ক্ষতিপূরণের উপায় নাই। এবৎসর আমরা আরও পনর জন মহিলা গ্রহণ করিতে চাই। সুতরাং সূতার জন্য ১০০০৲ টাকা

আয়ের জন্য ৪০০০ টাকার একটি ধনভাণ্ডার ও গৃহনির্ম্মাণার্থ ৫০০০ টাকা চাই। সকলে ইহাতে সাধ্যানুসারে সহায়তা করুন ইহাই প্রার্থনীয়। যিনি যাহা দিবেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় দিলে সাদরে গৃহীত হইবে। এবং সংবাদপত্রে প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

দেশপ্রাণ কর্ম্মী যুবকবৃন্দকে সসম্মান আহ্বান করিতেছি—তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চাঁদা আদায়ে মনোযোগী হউন। যাঁহারা এই মাতৃসেবার ভার লইতে প্রস্তুত তাঁহারা নিজ পরিচয় সহ আবেদন করিলেই এতৎসম্পর্কীয় কাগজপত্র পাইবেন। ইতি

শ্রীরমেশচন্দ্র সাহিত্যসরস্বতী
পরিচালক—নারীশিল্পাশ্রম,
পোঃ শিলচর, জিঃ কাছাড়। —জনশক্তি

লবণ—

গত ১৯২১-২২ সালে বঙ্গদেশ ও আসামে ১২৩,৬০০০০ মণ লবণ আমদানী হইয়াছে। —যশোহর

দাঙ্গা-হাঙ্গামা—

সাঁওতাল হাঙ্গামা।—মেদিনীপুর জেলার শীলদা, বীণপুর, লালগড়, ঝাড়গ্রাম ও ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য অঞ্চলে—মেদিনীপুর, ময়ূরভঞ্জ ও সিংহভূম জেলার সীমান্তস্থলে বহুসংখ্যক সাঁওতাল বাস করে। সাঁওতালেরা সাধারণতঃ অজ্ঞ, সরল ও নির্ভীক বন্যজাতি। ইহারা চিরকাল বন-জঙ্গলের কাষ্ঠপত্রাদি আবশ্যক মত অবাধে ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী ও অন্যান্য জমিদারেরা আদালতে নালিশ করিয়া ক্রমে তাহাদের সেইসকল স্বাভাবিক অধিকার কাড়িয়া লওয়ায়, সাঁওতালেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া মাঝে মাঝে বিভ্রাট ঘটাইতেছে। প্রথমে শীলদা পরগণায় ও তারপর রামগড়ে সাঁওতাল বিভ্রাট ঘটে, সম্প্রতি ঝাড়গ্রামের অন্তর্গত চৌদ্দিগড়ে সাঁওতালরা ক্ষেপিয়া এক ভীষণ বিভ্রাট ঘটাইয়াছে। চৌদ্দিগড়ের এই বিভ্রাটে ময়ূরভঞ্জ ও মেদিনীপুরের প্রায় ১৫ হাজার সাঁওতাল ঝাড়গ্রামে জমায়েৎ হইয়াছে। সশস্ত্র পুলিশ ও গুর্খা সৈন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত। প্রকাশ যে, পুলিশ সাহেব ও অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ আহত হইয়াছেন। এই বিভ্রাট থামাইবার জন্য কোথাও কোথাও নাকি গুলি চলিয়াছিল। তাহাতে কয়েকজন সাঁওতাল আহত হইয়াছে। সাঁওতালেরা এখনও শান্ত হয় নাই। প্রত্যহ অনেক সাঁওতালকে গ্রেপ্তার করিয়া তথায় বিচার করা হইতেছে। সরাসরি বিচারে কতকগুলি সাঁওতালকে বন্দী করিয়া মেদিনীপুর জেলে পাঠান হইয়াছে। এই গোলযোগ থামাইবার জন্য নাকি ঝাড়গ্রামে গোরা সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে। —নীহার

ফরিদপুরে ভীষণ দাঙ্গা:—একটি জমির সীমানা লইয়া বামনডাঙ্গা নামক স্থানে নমঃশূদ্র ও মুসলমানদিগের মধ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। এই গণ্ডগোল ক্রমে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পর্য্যবসিত হইয়া বিবাদ-বিসম্বাদে পরিণত হইয়াছে। ১০।১২ দিন ধরিয়া উভয়পক্ষে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছে। প্রায় ৩০ জন লোক খুন হইয়াছে। নানাস্থান হইতে লোক আসিয়া উভয় দলের পুষ্টি করিতেছে। উভয়পক্ষে প্রায় ১০ হাজার দাঙ্গাকারী সমবেত হইয়াছে। —সত্যবাদী

বাঙ্গালীর সাহস ও স্বার্থত্যাগ—

সৎসাহসী যুবক।—কয়েকদিন হইল এক ভদ্রলোক সপরিবারে প্রায় তিন হাজার টাকার নোট লইয়া নৌকাযোগে মুন্সীগঞ্জ যাইতেছিলেন। শীতলক্ষা ও ধলেশ্বরীর মিলন-স্থানে ষ্টীমারের ঢেউয়ে নৌকাখানি ডুবিয়া যায়। ভদ্রলোক সাঁতার জানিতেন, কোনপ্রকারে ভাসিতে থাকেন। এমন সময় একটি যুবক ছোট খোলা নৌকায় আসিয়া ঐ ভদ্রলোকটিকে এবং মাঝিকে সাঁতরাইয়া উঠায়। পরে অনেকক্ষণ সাঁতার দেওয়ার পর তাঁহার স্ত্রীকে পাওয়া যায়। যুবকটিকে এই কার্য্যের জন্য ভদ্রলোক পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমান্ তাহা গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমানের নাম শ্রীসুকুমার রায়, জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজে পড়েন। —শান্তিবার্ত্তা

বাঙ্গালীর বীরত্ব।—শ্রীমান্ সমরেন্দ্রনাথ রায় সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই বীরত্বের নিমিত্ত যশোভাজন হইয়াছেন। সমরেন্দ্রের বয়স এখন ২২ বৎসর মাত্র; তাহার বাড়ী নদীয়া জিলার হৃদপুর গ্রামে। বিগত আফগানযুদ্ধের সময় লাণ্ডিকোটালের সমরক্ষেত্রে সমরেন্দ্রনাথ অসাধারণ সাহস ও শৌর্য্য প্রদর্শন দ্বারা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন; তাঁহার এই বীর্য্যবত্তার পুরস্কারস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট্ তাঁহাকে "কৈশর-ই-হিন্দ" পদক প্রদান করিয়াছেন। এত অল্প বয়সে এই পদকলাভ আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। —ঢাকাপ্রকাশ

বাঙ্গালী বীরের মৃত্যু।—হিমালয় পর্ব্বতস্থ চক্রাবনের নিকটবর্ত্তী টন নদীর মধ্যে চারিজন ভারতবাসীর জীবন বিপন্ন হওয়ায় বিভূতিভূষণ সরকার নামক একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাহাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। —এডুকেশন গেজেট

মহানুভব গাড়োয়ান।—বাঙ্গলার প্রচার বিভাগের এক সংবাদে প্রকাশ যে, রাজসাহী জেলার নওগাঁ হইতে দুই ব্যক্তি যমুনা নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। একজন সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠে। অপর ব্যক্তি পায়ে কাপড় জড়াইয়া ডুবিয়া যাইবার উপক্রম করে। তীরে বহু লোক ছিল, কেহ তাহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে নাই। সেই সময় রামসিচ ওঝা নামক এক গাড়োয়ান তথায় উপস্থিত হয়। সে এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্যে নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া লোকটিকে উদ্ধার করে। লণ্ডনের রয়াল্ হিউমেন সোসাইটি উক্ত গাড়োয়ানকে একটি প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। —শান্তিবার্ত্তা

যুবকের আত্মদান।—হাওড়ার আন্দুল মশিনার তুলসী মণ্ডলের গৃহে আগুন লাগিয়াছিল। বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক জনৈক যুবক তথায় ছুটিয়া যাইয়া বাড়ীর লোকজনকে আগুনের হাত হইতে রক্ষা করিতেছিল। একটা দেয়াল পড়িয়া যাওয়ায় বীরেন্দ্র গুরুতর ভাবে আহত হয়। সাত দিন পর এই সৎসাহসী যুবক ঐ আঘাতের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। —শান্তিবার্ত্তা

সমাজের অবনতি ও উন্নতি—

জাতিভেদের বিষম ফল।—ফরিদপুরের কোন বিশিষ্ট উকীলের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন বারুই জাতীয় এম্-এ বি-এল্ উকীল ছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যখন আহারে বসিলেন তখন এই ভদ্রলোকটিকে কায়স্থদের সহিত বসাইয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে কায়স্থদের এইদিকে নজর পড়ে, অমনি তাঁহারা এই বারুই জাতীয় ভদ্রলোকটিকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। যাঁহার মুখ দিয়া প্রথমে এই আদেশটি বাহির হইল তিনি নাকি শ্রীযুক্ত গান্ধীর একজন অনুগত শিষ্য বলিয়া গর্ব্ব করেন। উক্ত ভদ্রলোকটি নেহাৎ ভাল মানুষ বলিয়াই মনে হয়। কারণ এরূপ অভদ্র ব্যবহার সহ্য করিয়াও তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াই গিয়াছেন। অনেকে এরূপ অবস্থায় কিছুতেই আহারে রাজি হইতেন না।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক কর্ম্মীরা নাকি জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া

দিয়া জাতীয় একতার সৃষ্টি করিতে একান্তই উৎসুক। অথচ এদিকে দেখিতেছি শ্রীযুক্ত গান্ধীর একজন মহাভক্ত এমন অভদ্র ব্যাপার করিতে পারিলেন। এদেশে বারুই জাতি কায়স্থদের নিম্নস্থ আচরণীয় জাতিসমূহের অন্যতম। সুতরাং এই জাতীয় এক ভদ্রলোক এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিলে সামাজিক রীতিঅনুসারেও কাহারও জাতি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না। দেশের শিক্ষিত লোকদের চিত্তের সংকীর্ণতা দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়।

—সঞ্জীবনী

ঢাকায় বিধবাবিবাহ—গত ২১শে বৈশাখ শুক্রবার দিবস বরিশাল আমগ্রাজুরীনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একটি বিধবা কন্যার সহিত ময়মনসিংহ ধলানিবাসী শ্রীমান মন্মথনাথ বক্সী বি, এ, এর শুভপরিণয়কার্য্য ঢাকা পাতলাখার গলিতে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।—স্বরাজ

বিদ্যাসাগর-বাটী—

পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার বাটী ৬৫০০০৲ দেনার দায়ে নিলামে উঠিয়াছিল। সুখের বিষয় বাঙ্গালী জাতি স্বর্গগত মহাত্মার শেষজীবনের বাসস্থানের সম্মান ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই। বাঙ্গালী-পরিচালিত কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ সোসাইটী ৭৫০০০৲ টাকাতে এই বাড়ীখানা ক্রয় করিয়াছেন। জনসাধারণ চাঁদা তুলিয়া হিন্দুস্থান সোসাইটীর এই টাকা শোধ করিলে বিদ্যাসাগর-বাটী বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তি হইবে। আশা আছে, বাঙ্গালী আপনার জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবে।—জনশক্তি

— লেখক

—

ভারতবর্ষ

অকালীদের উপর অত্যাচার—

রাউল-পিণ্ডিতে পুলিশ অকালীদের উপরে যে অত্যাচার করিয়াছে শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি তাহার একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। কমিটি লিখিয়াছেন, কারামুক্ত অকালীদের ভিতর ৪২৩ জন জখম হইয়াছে। যে-সমস্ত লোক অকালীদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে গিয়াছিল তাহাদের ভিতরেও ৫ জন জখম হইয়া চিকিৎসাধীনে আছে। নিজেদের বাড়ীতে চিকিৎসিত হইতেছে এরূপ লোকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। বুটের লাথিতে এবং লাঠির ঘায়ে অনেকের শরীরের অভ্যন্তরেও জখম হইয়াছে। ১৪ জনের গায়ে সঙ্গীনের খোঁচা লাগিয়াছে। ৪ জনের শরীরের ভিতরে সঙ্গীন

বিদ্যাসাগর বাটী—এক দিক্

বিদ্যাসাগর বাটী—অপর দিক্

এরূপভাবে ঢুকিয়া গিয়াছিল যে তাহাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ৬ জনের বুকের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছে। ৩ জনের গলার অবস্থা এত খারাপ হইয়াছে যে তাহারা এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত খাইতে পারে না। এক জনের ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছে। প্রায় সকল অকালীকেই চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। অবশেষে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে যেয়া স্থান হইতে দূরে ফেলিয়া দিয়া আসা হয়। ৩৪ জনের চুলের গোছা উপ্‌ড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। এই চুলগুলি শিরোমণি কমিটির আফিসে এখনও রক্ষিত আছে।

এসম্বন্ধে একখানি সরকারী রিপোর্ট ও অবশ্য যথানিয়মে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই-সব অত্যাচারের কথা যে তাহাতে কিছুমাত্র স্বীকার করা হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। আম্‌লাতন্ত্রের চিরন্তন নিয়ম অনুসারে তাহা পুলিশ এবং সৈন্যদলের প্রশংসাতেই মুখর হইয়া উঠিয়াছে। সরকারী রিপোর্টের মতে পুলিশ ও সৈন্যেরা খুব সংযত হইয়া কাজ করিয়াছে। শান্তিরক্ষার জন্য যতটুকু বলপ্রয়োগ করার প্রয়োজন তাহার বেশী তাহারা কিছুই করে নাই। আহতদের সংখ্যা কত তাহা এখনো ঠিক জানা যায় নাই, তবে সম্ভবতঃ দুই একজন ছাড়া আর কেহ গুরুতররূপে আঘাত পায় নাই।

অকালীদিগকে এইরূপভাবে ছাড়িয়া দিয়া আবার তাড়িয়া ধরার অর্থ কি তাহা এখনও আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য হইয়া আছে। অকালীদিগকে যে-অপরাধের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল তাহাই আমাদের অদ্ভুত বলিয়া মনে হইয়াছে। তাহার পর এই যে নির্য্যাতন ইহা আরো অদ্ভুত। রিপোর্টের কথা না বলাই ভাল। কারণ এই ধরণের চুনকাম করার চেষ্টা গবর্মেন্টের পক্ষে এই নূতন নহে। এপর্য্যন্ত পুলিশের সহিত জন-সাধারণের যতগুলি বিবাদ-বিসম্বাদ হইয়া গিয়াছে তাহার সকলগুলিতেই এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা—

লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভার ১৯২২ সনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই রিপোর্টে দেখা যায় আলোচ্য বৎসরে ইঁহারা গোটা ভারতবর্ষে মোটের উপর ৪৫৩ জন বিধবার বিবাহ দিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভারতবর্ষে বিবাহযোগ্যা বিধবাদের সংখ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এই সংখ্যা এত অল্প যে ইহা উল্লেখযোগ্য বলিয়াই মনে হয় না। সাধারণতঃ ২৫ বৎসরের কম যাহাদের বয়স তাহাদিগকেই বিবাহযোগ্যা বলিয়া ধরা হয়। এই হিসাবে পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে ৩২,৮৭৭টি, যুক্তপ্রদেশে ১,৯৬,৯৭৩টি, বোম্বাই প্রদেশে ৯৩,৪৬৬টি, মান্দ্রাজে ১,৯৮,০১৪টি, বাংলা, আসাম, বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে ৫,৫৪,৬০৫টি বিবাহযোগ্যা বিধবা আছে। এই এতগুলি বিধবার ভিতর মোটে ৪৫৩টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে।

তবে একটি আশার কথা এই যে, ইহাদের কাজ যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে তাহার পরিচয়ও এই রিপোর্টের ভিতর আছে। এই রিপোর্টেই প্রকাশ, ১৯১৫ সালে ১২টি, ১৯১৬ সালে ১৩টি, ১৯১৭ সালে ৩১টি, ১৯১৮ সালে ৪০টি, ১৯১৯ সালে ৯০টি, ১৯২০ সালে ২২০টি, ১৯২১ সালে ৩১৭টি এবং ১৯২২ সালে ৪৫৩টি বিধবার বিবাহ ইঁহাদের চেষ্টায় সম্পন্ন হইয়াছে। ইঁহারা ক্রমেই ইঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রও প্রসারিত করিয়া তুলিতেছেন। ১৯২১ সালে ইঁহাদের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১১৩টি। ১৯২১ সালে এই সংখ্যা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ২৩৯টিতে। বাংলায় ইঁহারা একটি বিধবাকেও পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। ইহা বিদ্যাসাগরের দেশ কিনা।

আমেদাবাদের ধর্ম্মঘট—

গত ৪ঠা জুলাই সন্ধ্যাকালে আমেদাবাদ কলের মজুরগণের এক

সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় কলওয়ালাদের সঙ্ঘ এবং শ্রমিকের সঙ্ঘ উভয়ে মিলিয়া মিটমাটের যে সর্ত্তগুলি স্থির করিয়াছেন তাহা ঘোষণা করা হইয়াছে। সর্ত্তগুলি—

(১) কলওয়ালাদের সঙ্ঘ প্রথমে বলিয়াছিল মজুরদের মাহিনা শত করা ২০ৎ টাকা হিসাবে কমানো হইবে। এখন স্থির হইল মাহিনা কমিবে ২০ৎ টাকা নহে ১০ৎ টাকা হিসাবে।

(২) শেঠ মঙ্গল দাস প্রস্তাব করিবেন আগামী ছয় মাসের ভিতর কাহারো মাহিনা কমানো হইবে না।

(৩) শ্রমিক সঙ্ঘ এবং কলওয়ালাদের সঙ্ঘের উভয় পক্ষের নির্ব্বাচিত লোক লইয়া গঠিত একটি কমিটি ভাতা সম্বন্ধে সমস্ত গোল মিটাইয়া দিবেন।

কংগ্রেসের সদস্যপরিবর্ত্তন—

বোম্বাই-এর ২৭শে মের সংবাদে প্রকাশ, নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারী, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ (সেক্রেটারী), শ্রীযুক্ত যমুনা লাল বাজাজ (কোষাধ্যক্ষ), শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল, শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর, মিঃ মোয়াজ্জাম আলি ও শ্রীযুক্ত দেশপাণ্ডের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে ডাঃ আন্‌সারিকে প্রেসিডেন্টের পদে, পণ্ডিত জহরলাল নেহ্‌রু, শ্রীযুক্ত টি প্রকাশম্ এবং ডাক্তার মামুদ এই তিন জনকে সেক্রেটারীর পদে এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, সর্দ্দার তেজসিং, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস টাণ্ডন, পণ্ডিত শান্তনম, শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিং, ডাঃ বরদা রাজলু নাইডু এবং খাঁজি আব্‌দুল মজিককে সদস্যপদে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। যাঁহারা কংগ্রেসের দুই দলের কোন দলেরই গোঁড়া নহেন, নির্ব্বাচনে তাঁহাদের দিকেই বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। এই নীতির অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টের পদে ইস্তফা দিয়াছেন।

তিলক ও গান্ধীর তৈলচিত্র—

গত ৩১শে মে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মাদ্রাজের মহাজন সভা-গৃহে লোকমান্য তিলক এবং মহাত্মা গান্ধীর দুইখানি তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। এই চিত্র দুইখানি শ্রীযুক্ত ভোরাস্বামী আয়াঙ্গার এবং শ্রীযুক্ত বেঙ্কটরঙ্গ নাইডু উক্ত সভাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিবার সময় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন লোকমান্য তিলক সেই আদর্শের লোক ছিলেন, যাঁহারা মনে করেন দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে তাহার জন্য সমস্তরকম দুঃখ সহ্য করিতে এমন কি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করিয়া লইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ—রাজনীতিক্ষেত্রেও সত্যের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া চলিবে না। ইঁহারা উভয়েই বিরাট্ পুরুষ, জাতির জীবনে ইঁহারা চিরদিনই অমর হইয়া বাঁচিয়া থাকিবেন।"

ব্যবস্থাপরিষৎ-প্রস্তাব—

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের জনৈক বাঙ্গালী প্রতিনিধি (মিঃ কে, আহম্মদ) জানাইয়াছেন, সভার আগামী অধিবেশনে তিনি মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা হসরত মোহানী, মৌলানা মহম্মদ আলী এবং করাচী বিচারের অন্যান্য বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য এবং চৌরীচৌরার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অবশিষ্ট ১৯ জন আসামীর প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া অন্য দণ্ড দেওয়ার অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

এক্ষেত্রে রাম না জন্মিতেই রামায়ণ লেখা যায় অর্থাৎ প্রস্তাব পেশ করিবার পূর্ব্বেই প্রস্তাব পেশের ফল কি হইবে তাহা বলিয়া দেওয়া যায়।

মিউনিসিপ্যালিটির ব্যবস্থা—

এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলিতে সূতা কাটার জন্য এবং চর্‌কাপ্রচারের জন্য কিছু টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এইসব গৃহশিল্পের উন্নতি অনেক সহজে, অনেক অল্প আয়াসে হইতে পারে। দেশের শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির প্রতি কড়া নজর রাখা যে এইসব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির একটি বড় কাজ তাহাতে সন্দেহ নাই!

পাগ্‌লা-গারদে দান—

মুঙ্গেরের শ্রীযুক্ত রঘুনন্দনপ্রসাদ সিংহ ভাগলপুর পাগ্‌লা গারদে একটি নূতন ওয়ার্ড তৈরী করিবার জন্য এক থোকে বিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই ওয়ার্ডের জন্য তিন বৎসরে আরো নয়শত টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

কংগ্রেসের টাকা ও স্বেচ্ছাসেবক—

গত গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনের পর হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত কংগ্রেস কর্ম্মীগণ যত টাকা ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়াছেন সম্প্রতি তাঁহারা তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা এই কয়েকমাসের মধ্যে নিম্নলিখিত বিবরণ-অনুযায়ী মোট ১৫,০৬,৭০২ টাকা এবং ৮০৩১ জন স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রদেশের নাম	তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার	পূর্ব্ব জমা	মোট স্বেচ্ছাসেবক
১। হিন্দী মধ্য প্রদেশ	১৫৬০৯	২১৭৫২	২১০৭
২। রাজপুতানা এবং আজমীর	৯০১	৪৯৯০	৪৬
৩। কর্ণাটক	১৮৬৮২	১১৮৯৩	৭৫২
৪। গুজরাট	৩৩৮৫৮	৯১৫৪৯৮	৮৫৩
৫। বঙ্গদেশ	১০৫০০০	....	২০০০
৬। বোম্বাই	১৩০১৫	... ...	১১৫
৭। তামিল নাড়ু	৩৫২৫৩	৮৭৭৮৮	৮৮৭
৮। মারহাট্টা মধ্যপ্রদেশ	৫০৫৪১	....	৪৬০
৯। সিন্ধু	৮৫৪০০	....	২১০
১০। বেহার	৩৫০০০	৪০০০০	......
১১। মহারাষ্ট্র	৩৮০৮৯	.. ..	২১০
১২। অন্ধ্র	১২৩৪৯২	....	৪০০
নিখিল ভারতীয় কর্ম্মীসঙ্ঘ	৬৬১৯৬২	....	......
	১৫০৬৭০২		৮০৩০

লরেন্সের প্রতিমূর্ত্তি—

পাঞ্জাবের অন্তর্গত গোবিন্দপুর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সর্দ্দার অমৃক্‌সিং গত ১৫ই মে স্বহস্তে লাহোরের লরেন্স প্রতিমূর্ত্তি ধ্বংস করিবার জন্য হাতুড়ী বাটালী ইত্যাদি লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। অমৃক্‌সিংকে প্রথমে পাগ্‌লা-গারদে পাঠানো হয়। কিন্তু তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক প্রমাণ করিতে না পারায় অবশেষে তাঁহার প্রতি একবৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অমৃক্‌সিংএর পর আরো দুই জন এই প্রতিমূর্ত্তিটি ভাঙ্গিতে গিয়া পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বিচারে তাঁহাদেরও প্রত্যেকের প্রতি ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

লরেন্সের প্রতিমূর্ত্তি-সম্পর্কে লাহোর মিউনিসিপ্যালিটি প্রস্তাব করিয়াছেন বর্ত্তমানে প্রতিমূর্ত্তিটি যে-স্থানে আছে সে-স্থান হইতে তাহা

উঠাইয়া লইয়া যাইতে হইবে এবং তাহার স্থানে নরেন্দ্রের আর একটি মূর্ত্তি বসাইয়া দেওয়া হইবে। এই নূতন মূর্ত্তির উপর কোনপ্রকার আপত্তিজনক লেখা থাকিতে পারিবে না অথবা মূর্ত্তিটিকে আকারে ইঙ্গিতেও আপত্তিজনক করিয়া তোলা হইবে না। নূতন মূর্ত্তি তৈয়ী করিতেও যত টাকা ব্যয় হইবে তাহার তিনভাগের দুইভাগ দিবেন গবমেণ্ট্ এবং একভাগ মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে দেওয়া হইবে।

উরগাঁয়ের হোটেল—

উরগাঁওএ অস্পৃশ্য পঞ্চম জাতিদের জল আচরণীয় করিবার জন্য এবং তাহাদিগকে লইয়া সমাজে একত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করার একটি হোটেল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই হোটেলে পঞ্চম জাতিদের সহিত সকলেই আহার বিহার করিবে।

হোটেল, রেল-ষ্টিমার প্রভৃতি ছুৎমার্গনিবারণের বড় উপায় সন্দেহ নাই। কিন্তু সব কাজেরই গোড়ায় সাহসী একনিষ্ঠ কর্ম্মী থাকা চাই। এই হোটেলের দ্বারা অস্পৃশ্যতাব আবর্জ্জনা কতটা দূর হইবে তাহা দরদী কর্ম্মীদের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

৩০,০০০ টাকা পুরস্কার—

লাহোরের 'নেশন' পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, 'বব্বর অকালী জাঠা' সম্পর্কে জলন্ধরের প্রায় এক হাজার লোকের নামে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। ইতিমধ্যে আরো দুইজন লোককে হত্যা করা হইয়াছে। অপরাধীদিগকে ধরিয়া দিতে পারিলে পুলিশ ৩০,০০০ টাকা পুরস্কার দিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

গৌরীশঙ্করে অভিযান—

রয়াল্ জিয়গ্রাফিকাল্ সোসাইটিতে বক্তৃতাকালে লর্ড্ রোনাল্ড্শে বলিয়াছেন, ১৯২৪ সালে গৌরীশঙ্করের শীর্ষদেশে আরোহণ করিবার জন্য আবার চেষ্টা করা হইবে। গত বৎসর ২৫,৫০০ ফুট উঁচুতে উঠিয়া তাঁবু ফেলা সম্ভব হইয়াছিল, ইহাতে অনেকটা আশা পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এবারকার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপেই জয়-যুক্ত হইবে।

এই অকাজের কাজগুলি জাতিকে যে কি ঐশ্বর্য্য দান করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ঘর আমাদের সর্ব্বস্ব, তাই বাহিরের টানে মানুষ যে কেন দুঃখ-কষ্ট, এমন কি মৃত্যুকেও বরণ করিয়া লয়, তাহা আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য হইয়া আছে।

হিন্দুমহাসভার অধিবেশন—

হিন্দুসমাজকে একতাবদ্ধ করিবার জন্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে আগামী আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে বারাণসীতে হিন্দু মহাসভার একটি অধিবেশন হইবে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এই অধিবেশনের পূর্ব্বে গোটা ভারতবর্ষ একবার ঘুরিয়া আসিতে মনস্থ করিয়াছেন। হিন্দুদিগকে এইরূপভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলার কাজে তিনি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের বিশেষ সাহায্য পাইবেন বলিয়া আশা করিতেছেন।

ফ্রি-মেসন সোসাইটির বিশ্বপ্রেম—

শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী মন্দ্রাজের 'ফ্রিমেসন্' সোসাইটির সদস্য ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করিয়া বর্ত্তমান শাসন প্রণালীকে অগ্রাহ্য করায় অপরাধে 'ফ্রিমেসনরির' গ্রাণ্ড মাষ্টার তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। পদচ্যুত হইয়া তিনি বলিয়াছেন, এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য জনসাধারণের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। এখন যদি জন-সাধারণের কল্যাণের পরিবর্ত্তে ইংরেজদের হিতচেষ্টাই ইহার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের বন্যায় এইসব প্রতিষ্ঠানকে ভাসিয়া যাইতে হইবে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি—

বোম্বাই সহরে সম্প্রতি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্বরাজ্য পার্টির সহিত কংগ্রেসের গোঁড়া দলের আপোষের প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। সমিতির অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে গয়া কংগ্রেসের কাউন্সিল্ বর্জ্জনের জন্য আন্দোলন বন্ধ রাখিতে বলা হইয়াছে; স্থির হইয়াছে কাউন্সিল্ গমনের পথেও কেহ বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারী প্রভৃতি কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মোপ্লা সাহায্য-ভাণ্ডার—

মোপ্লা-বিদ্রোহে যে সব মোপ্লা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের সাহায্যের জন্য সেণ্ট্রাল খেলাফৎ কমিটি একটি সাহায্যভাণ্ডার খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। নেতৃবর্গকে বিদ্রোহস্থানে প্রবেশ করিতে না দিয়া গবমেণ্ট অন্যায় করিয়াছেন এই মর্ম্মেও একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

নাগপুরের সত্যাগ্রহ—

নাগপুরের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উৎসাহ দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ২৪শে মে ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। তার পর হইতে প্রত্যেক দিনই ২৪।২৫ জন করিয়া স্বেচ্ছাসেবক ধরা পড়িয়া জেলে যাইতেছে। নানা স্থান হইতে স্বেচ্ছাসেবকের দল আসিয়া নাগপুরে জড় হইতেছে। ইহাদের ভিতর বালক বৃদ্ধ যুবক সকল বয়সের লোকই আছে। শ্রীমতী সুভদ্রাদেবীও এই জাতীয় পতাকা-সম্পর্কে ধৃত হইয়াছেন তাঁহাকে আদালতে লইয়া যাইবার সময় তিনি বলেন—স্বরাজ-পতাকা হাতে না লইয়া তিনি আদালতে যাইবেন না। ফলে স্বরাজ-পতাকা হাতে দিয়াই তাঁহাকে আদালতে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। নাগপুরের মত জব্বলপুরেও স্বরাজ-পতাকা লইয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে। সেখানে টাউনহলের চূড়ায় স্বরাজ-পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া প্রত্যহ দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকেরা ধরা পড়িয়া জেলে যাইতেছে।

সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার্থী—

গত জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় নিম্নলিখিত পরীক্ষার্থীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১। বালকৃষ্ণ আয়ার (মান্দ্রাজ)
২। শৈবালকুমার গুপ্ত (বাংলা)
৩। এস্ বসু (বাংলা)
৪। রঘুবর দয়াল (যুক্ত প্রদেশ)
৫। বিষ্ণুসহায় (যুক্ত প্রদেশ)
৬। বালকৃষ্ণ পিলে (মান্দ্রাজ)
৭। জগদীশ্বর নিগম (যুক্ত প্রদেশ)
৮। জে এন তালুকদার (বাংলা)
৯। বি সি মুখোপাধ্যায় (বাংলা)

লবণশুল্কের প্রতিবাদ—

লবণশুল্কের প্রতিবাদকল্পে হাউস্ অব্ কমন্সে যে আবেদন পাঠানো হইয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত ১১ জন সদস্যগণও সহি করিয়াছেন।

১। রাজা প্রমদানাথ রায় (কাউন্সিল্ অব্ ষ্টেট্)

২।	স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	(ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ)	৭	মৌলবী আবদুল রহমান্	(ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ)
৩।	মিঃ জে এন্ মুখার্জ্জি	ঐ	৮	মিঃ আসরফ জামাল	ঐ
৪।	মিঃ কবিরুদ্দিন আহম্মদ	ঐ	৯	মিঃ জে চৌধুরী	ঐ
৫।	মিঃ জে এন্ বসু	ঐ	১০	মিঃ কে সি নিয়োগী	ঐ
৬।	রায় বাহাদুর শিবপ্রসাদ তুলসেন	ঐ	১১	রায় বাহাদুর টি পি মুখার্জ্জি	ঐ

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

বেনো-জল

চার

সন্ধ্যার কিছু আগে, সেন-গিন্নী ব'সে ব'সে তাঁর পোষা বিড়ালটির মাথায় আদর ক'রে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, আর সুনীতি রবীন্দ্রনাথের "কথা"র একটি কবিতা আবৃত্তি করছে।

এমন সময়ে সন্তোষ এসে খবর দিলে, "মা, দাদামশাই আসচেন।"

—"অ্যাঁঃ, বাবা!" সেন-গিন্নী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁর বাবা যে কোন খবর না দিয়েই এমন হঠাৎ কল্‌কাতায় এসে পড়বেন, সেন-গিন্নী তা জান্‌তেন না। আজ দশ বৎসর আগে তিনি একবার মাত্র কল্‌কাতায় এসেছিলেন, তার পর সেন-গিন্নী নিজেই মাঝে মাঝে পিত্রালয়ে গিয়ে বাপের সঙ্গে দেখা করেছেন, কিন্তু তিনি আর কখনো মেয়ের বাড়ীতে আসেননি।

হঠাৎ বাবা আসছেন শুনে সেন গিন্নীর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠ্‌ল। ছেলের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "বাবাকে কোন্ ঘরে বসিয়েচিস্?"

সন্তোষ বল্‌লে, "দাদামশাই বস্‌লেন না, একেবারে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আস্‌চেন!"

সেন-গিন্নী সুনীতির দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "সুনু, তাড়াতাড়ি পায়ের জুতো খুলে সরিয়ে ফেল্ বাছা,—বাবা যেন দেখ্‌তে না পান!" বল্‌তে বল্‌তে তিনিও নিজের পায়ের লতা-পাতা-তোলা চটিজুতো-জোড়া খুলে একটা আল্‌মারির তলায় লুকিয়ে রাখ্‌লেন। তাঁর এই বাবাটিকে সেন-গিন্নী বড়ই ভয় করতেন, কারণ তিনি একেবারে সেকেলে ধরণের লোক আর গোঁড়া হিন্দু, মেয়েমানুষের পায়ে জুতো দেখ্‌লে নিশ্চয়ই খুব খুসি হবার পাত্র নন!......

সেন-গিন্নীর বাবা এসে ঘরের ভিতরে ঢুক্‌লেন। তাঁর নাম হরিহর মজুমদার, বয়স সত্তরের ওপারে, কিন্তু এত-গুলো বৎসরের ভারেও তিনি একটুও নুয়ে পড়েননি—গৌরবর্ণ ছিপ্‌ছিপে দেহখানি পাকা বাঁশের মতই শক্ত-সমর্থ; চোখদুটির দৃষ্টি এখনো বেশ তীক্ষ্ণ, তাদের উপরে আজও চশমার ছায়া পড়েনি। মাথার ছোট-ক'রে-ছাঁটা পাকা-চুলের মাঝখানে একটি পরিপুষ্ট শিক্ষা সগর্ব্বে দোদুল্যমান হ'য়ে তার প্রচণ্ড হিন্দুত্বের পরিচয় দিচ্ছে।

হরিহরকে দেখেই সেন-গিন্নী গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো মাথায় নিলেন। তারপর সুনীতি প্রণাম করলে।

হরিহর হাতের তেলপাকা বাঁশের লাঠিটা ঠক্ ক'রে ঘরের এক কোণে রেখে বল্‌লেন, "তবু ভালো, তোরাও তা হ'লে প্রণাম করতে ভুলে যাসনি! আমার নাতি কিন্তু আমাকে সেলাম করেচে।"

সেন-গিন্নী আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লেন, "সন্তোষ আপনাকে সেলাম করেচে!"

হরিহর মৃদু হেসে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, তা বৈ আর কি! হাত দুটো জোড় না ক'রেই কপালের দিকে তুলে কি যে একটা করলে, আমার তো মনে হ'ল সেলাম!"

সন্তোষ লজ্জিত হ'য়ে ঘর থেকে স'রে পড়্‌ল।

সেন-গিন্নী বল্‌লেন, "বাবা, কোন খবর না দিয়ে এমন হঠাৎ এলেন যে! বাড়ীর সব ভালো ত?"

—"হ্যাঁ মা, খবর সব ভালো। একটা কাজে

কল্‌কাতায় এসেছিলুম, তাই সেইসঙ্গে একবার তোদের বাড়ীটাও ঘুরে গেলুম।··· ···কিন্তু কোথায় বসি বল্‌ দেখি ?"

সুনীতি তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলে।

হরিহর মাথা নেড়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "দূর পাগ্‌লী, ওতে আড়ষ্ট হ'য়ে বসা কি আমার পোষায়! একবার আমি অন্যমনস্ক হ'য়ে চেয়ারে ব'সে দুল্‌তে দুল্‌তে ধুপ্‌ ক'রে প'ড়ে গিয়েছিলুম, সেই থেকে চেয়ারে বসা ছেড়ে দিয়েচি! বাঙালীর ছেলে, দিব্যি আসনপিঁড়ি হ'য়ে বস্‌ব, তবেই না বলি আরাম! যা, যা,—একখানা আসন এনে পেতে দে!"

এমন সময়ে রতনের হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে সুমিত্রা ঘরের ভিতরে ঢুকে বল্‌লে, "মা, রতনবাবু কেমন গান গাইতে পারেন শোনো, উনি লজ্জায় আস্‌তে চাইচেন না, আমি জোর ক'রে ধ'রে—" বল্‌তে বল্‌তে হরিহরকে দেখে সে থেমে পড়্‌ল। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দাদামশাইকে সে দেখেনি।

সেন-গিন্নী সঙ্কুচিত ভাবে বল্‌লেন, "বাবা, এটি আমার ছোট মেয়ে—সেই ছোট-বেলায় একে আপনি একবার দেখেছিলেন।··· ··সুমি, ইনি তোর দাদামশাই, প্রণাম কর্‌।"

সুমিত্রা থতমত খেয়ে হরিহরকে দুইহাত তুলে ছোট একটি প্রণাম কর্‌লে।

হরিহর এই একেলে প্রণামে যে খুসি হলেন না তা বলা বাহুল্য। তার উপরে সুমিত্রার পোষাক আর পায়ের জুতোর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে তিনি আরো অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌লেন। মেয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লেন, "আম্না, তোরা যে একেবারে খৃষ্টান হ'য়ে উঠেচিস্‌ দেখ্‌চি! মেয়ের পায়ে জুতো, আবার জুতো প'রেই ঘরের ভেতরে ঢোকে! ছি, ছি!"

সেন-গিন্নী মুখ নামিয়ে বল্‌লেন, "বাবা, ওরা যে কলেজে পড়ে, সেখানে সবাই জুতো পরে।"

হরিহর আরো চ'টে বল্‌লেন, "কেন, মেয়েদের কলেজে পড়্‌বার দর্‌কার কি? ওরা কি কেরাণী হবে, না টোল খুলবে?"

সুমিত্রা বেশীক্ষণ অপ্রস্তুত থাক্‌বার পাত্রী নয়। চট্‌ ক'রে পায়ের জুতো খুলে' ফেলে', হরিহরের একখানি হাত ধ'রে কাঁচুমাচু মুখে বল্‌লে, "তুমি রাগ কোরো না দাদামশাই, এই দেখ আমি জুতো খুলে ফেলেচি!"

তার কাতর চোখদুটির দিকে হরিহর খানিকক্ষণ অবাক্‌ হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর রাগের ঝাঁঝটা ক'মে এল। আস্তে আস্তে বল্‌লেন, "আচ্ছা নাত্‌নী, আমি খুব খুসি হয়েচি।... ...এ ছেলেটি কে আম্না?" ব'লে তিনি রতনের দিকে চাইলেন।

রতনের সাম্‌নে আসল নাম ধ'রে ডাকার জন্যে সেন-গিন্নীর ভারি লজ্জা হচ্ছিল। কিন্তু ভয়ে কোন আপত্তি কর্‌তেও পার্‌লেন না।

এর মধ্যে সুনীতি একখানি আসন এনে পেতে দিলে। তার উপরে ব'সে হরিহর আবার বল্‌লেন, "আম্না, এ ছেলেটি কে? একে তো কখনো দেখিনি! বিনয়ের কেউ হবে বুঝি?"

সেন-গিন্নী বল্‌লেন, "না, উনি সুমিত্রার মাষ্টার, ছবি আঁকা শেখান।"

মাষ্টার! তা হ'লে বাইরের লোক! অথচ অত-বড় সোমত্ত মেয়ে সুমিত্রা কিনা একেই হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে বাড়ীর অন্দরে নিয়ে এল! হরিহরের মনে মনে আবার একটা রাগের ঝট্‌কা ব'য়ে গেল। খানিকক্ষণ গুম্‌ হ'য়ে থেকে তিনি বল্‌লেন, "দেখ আম্না, সর্ব্বদাই মনে রেখ যে, তুমি হিন্দুর মেয়ে। আমাদের এ সীতা-সাবিত্রীর দেশে বিবিআনাটা ভালো নয়। তোমার মেয়েদুটির বয়স হয়েচে, কিন্তু এখনো তাদের মাথায় সিঁদুর নেই দেখে আমার মনটা ছাঁৎ ছাঁৎ কর্‌চে! দিনে দিনে তোমরা হ'লে কি?"

সেন-গিন্নী বল্‌লেন, "কি করব বাবা, ওঁর অমতে আমি তো কিছু কর্‌তে পারিনে!"

হরিহর বল্‌লেন, "তোমার সোমত্ত মেয়েরা অবাধে পরপুরুষের সঙ্গে মেশামেশি করে, তাও আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি। আমার চোখে এ দৃশ্য অসহ্য।"

সেন-গিন্নী ও রতন, দুজনেরই বুঝ্‌তে দেরি হ'ল না, হরিহর পরপুরুষ বল্‌চেন কাকে! সেন-গিন্নী মাথা হেঁট

কর্‌লেন, রতন তাড়াতাড়ি হরিহরকে একটা প্রণাম ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হরিহরের কাঁধের উপরে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে সুমিত্রা বল্‌লে, "দেখ দাদামশাই, গল্পের বইয়ে আমি অনেক দাদামশাইয়ের কথা পড়েচি, তুমি তো তাদের কারুর মতই নও! কতকাল পরে নাত্‌নীদের কাছে এলে, কোথায় তাদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ কর্‌বে, ভালো-মানুষটির মতন ব'সে মাথার পাকা চুল তোলাবে, না খালি খালি রাগারাগি আর বকাবকি কর্‌চ! না, তোমার মতন দাদামশাই নিয়ে আমার চল্‌বে না দেখ্‌চি!"

সুমিত্রার কথা কইবার ধরণ দেখে হরিহর না হেসে থাক্‌তে পার্‌লেন না। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "আমাকে নিয়ে না চলে ভাই, বাজারে গিয়ে একটা ভালো দেখে দাদামশাই বাছাই ক'রে কিনে এন!"

সুমিত্রা বল্‌লে, "আঃ, বাঁচলুম! আমি ভেবেছিলুম দাদামশাই, তুমি বুঝি হাস্‌তে জানোনা! এতক্ষণে তবু যে একটু হেসেচ, তাইতেই আমার মনটা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে!"

হরিহর বল্‌লেন, "তোদের এখানে এসে আমার অবস্থা কি-রকম হয়েচে জানিস্? ঠিক যেন জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়েচি! সায়েব-মেম নিয়ে কখনো তো কার্‌বার করিনি ভাই, ধাতে কি ক'রে সইবে বল্! আচ্ছা, তোরা বামুনের হাতের রান্নাটাও অন্তত খাস্ তো? না, বাবুর্চ্চী রেখেচিস্?"

সুনীতি হেসে ফেলে বল্‌লে, "না দাদামশাই, আমরা অতটা এখনো অগ্রসর হ'তে পারিনি! বিশ্বাস না হয়, আপনি না-হয় আমাদের হাতের রান্নাই খাবেন।"

পাঁচ

রতন উপর থেকে নেমে, বৈঠকখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময়ে ঘরের ভিতর থেকে বিনয়-বাবু ডাক্‌লেন, "রতন, একবার ভেতরে এস তো!"

রতন ভিতরে ঢুকে দেখ্‌লে, সেখানে চারিদিকে টেবিল, চেয়ার, কৌচ, সোফার যেমন ভিড়, মানুষের ভিড়ও তেম্‌নি। সকলেরই পরনে বিলাতী পোষাক, অধিকাংশেরই মুখে পাইপ, সিগার বা সিগারেট, কেউ কেউ চায়ের পেয়ালায় চুমুক মার্‌চেন। সে আসরে যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ কারুরই অভাব নেই এবং সকলেই সমানভাবে সকলের সঙ্গে কথা কইছেন এবং এইটিই হচ্ছে বিনয়-বাবুর সান্ধ্য বৈঠকের প্রধান বিশেষত্ব।

ঘরের মধ্যে যাঁরা আছেন, তাঁদের কারুর কারুর পরিচয় দর্‌কার।

ঘরের এককোণে ঐ যিনি আরাম-চেয়ারে কাৎ হয়ে টেবিলের উপরে দুইখানি সবুট চরণ তুলে' দিয়ে অর্দ্ধ-মুদ্রিত নেত্রে ধূমপান কর্‌ছেন, উনি হচ্ছেন মিঃ ঘোষ,—বিনয়-বাবুর সমব্যবসায়ী, সমবয়সী বন্ধু এবং বিলাত-ফেরৎ। গল্প শুন্‌তে ভালোবাসেন, কিন্তু গল্প বল্‌তে নারাজ। এককোণে ব'সে থাকেন, সকলের কথা মন দিয়ে শোনেন, কিন্তু নিজে কথা কন কম। বিনয়-বাবুর কাছে এঁর মত বড় মূল্যবান্।

বিনয়বাবুর ঠিক সাম্‌নেই যে লোকটি ব'সে আছেন, তিনি মিঃ বাসু নামেই বিখ্যাত—কলিকাতা হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরীর একটি উজ্জ্বল অলঙ্কার। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, বিবাহ কর্‌বার ইচ্ছা মোটেই নেই—কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে প্রায়ই এই মতটি প্রকাশ কর্‌তেন—"Woman is like a shadow. Pursue her, she runs. Run from her, she pursues;—অতএব এমন যুক্তিহীন জীবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য!"

মিঃ বাসুর পাশে যিনি ঐ হাসি-হাসি মুখে ব'সে গোঁফে মোচড়ের পর মোচড় লাগাচ্ছেন, ওঁর নাম মিঃ চ্যাটো (চট্টোপাধ্যায়ের ফেরঙ্গ রূপান্তর)। কিন্তু আড়ালে ওঁকে সকলে মিঃ বাসুর 'প্রতিধ্বনি' ব'লে ডাকেন। উনিও চির-কুমার—তবে লোকে বলে, অনিচ্ছায়। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। বিলাতে যাননি, কিন্তু বিলাতী হাব-ভাব তাঁর চোখে-মুখে, সর্ব্বাঙ্গে।

মাঝখানকার গোল মার্ব্বেলের টেবিলের উপরে দুই কনুই রেখে যে যুবকটি ব'সে আছেন, তাঁর নাম কুমার নরেন্দ্র চৌধুরী—পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। বয়স সাতাশ-আটাশ, গড়নটি পাতলা ছিপ্‌ছিপে, রং

ফর্‌সা, মুখশ্রী সুন্দর। শীঘ্রই বিলাতে যেতে চান। মিঃ চ্যাটো এঁকে এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিয়েছেন। এঁর কোন পূর্ব্বপুরুষ নাকি আগে "রাজা" ছিলেন এবং সেই দাবীতে ইনি নিজের নামের আগে "কুমার" কথাটি ব্যবহার করেন। সেন-গিন্নী এঁকে নিজের জামাই-পদে প্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং সে-কথাটা ইনিও জানেন। এঁকে সবাই "কুমার বাহাদুর" ব'লে ডাকেন।

এই ক-জনের পরিচয়ই আপাততঃ যথেষ্ট।......

রতন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবামাত্র বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "আমি এই ছেলেটির কথাই আপনাদের বল্‌ছিলুম।"

সকলেই রতনের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। এতগুলো চোখের কৌতূহলী দৃষ্টির সাম্‌নে রতন জড়সড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে বেশ বুঝ্‌তে পারছিল, এই বিদ্যুৎ-আলোকে উদ্ভাসিত কক্ষে, এই সাজসজ্জা, জাঁক-জমকের মধ্যে আধ-ময়লা, মোটা খদ্দরের জামা-কাপড়-পরা তাকে নিতান্তই একটা অকিঞ্চিৎকর পদার্থের মতন দেখাচ্ছে।

একজন বল্‌লেন, "এই লোকটিই আপনার মোটরের তলায় পড়েছিল?"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "হ্যাঁ।"

আর-একজন একটু চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "ভো বিশ্ববাসী! তোমরা সকলে আশ্চর্য্য হয়ে নিরীক্ষণ কর, আধুনিক ডাক্তাররা নরহত্যাতেও অপারক! জ্যান্ত মানুষ তাঁদের হিংস্র মোটরের তলাতেও প'ড়ে বেঁচে ওঠে!"

সকলে হেসে উঠ্‌লেন।

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "না, আমার দ্বারা রতনের কোন অনিষ্ট যে হয়নি, এটা অত্যন্ত সুখের কথা। রতন, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো না।... ...আপনারা বোধ হয় জানেন না যে, রতন একটি জিনিয়াস?"

একজন বল্‌লেন, "কি রকম?"

—"রতন খুব ভালো ছবি আঁক্‌তে পারে, গান গাইতে পারে। আবার আমার এক বন্ধুর কাছে শুনলুম, সে নাকি একজন উঁচুদরের কবি—মাসিক পত্রে প্রায়ই তার কবিতা প্রকাশিত হয়।"

রতনের পোষাকের দিকে একবার আড়-চোখ বুলিয়ে নিয়ে, মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "বিলাতে যাদের বলে amateur poets, ইনিও বোধ হয় সেই দলেরই একজন?"

মিঃ বাসু বল্‌লেন, "ছবি বা কবিতা বোঝবার চেষ্টা আমি কোনদিন করিনি। তবে ইনি যদি একটি গান ধরেন, তবে আমি তা শুন্‌তে প্রস্তুত আছি। ওঃ, গান আমি ভারি ভালোবাসি"—ব'লেই তিনি চেয়ারের উপরে আড় হয়ে প'ড়ে শীস দিয়ে একটি ইংরেজী গানের সুর ধর্‌লেন—"The Bing Boys Hare ere!"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "আচ্ছা, গান-টান একটু পরে হবে অখন।... .. দেখুন মিঃ ঘোষ, রতন একজন ভালো আর্টিষ্ট, কিন্তু আর্ট তাকে পয়সা দেয় না।"

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "ওটা আর্টের দস্তুর—শুধু এখানে কেন, সব দেশেই!"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "কিন্তু বাঙ্‌লা দেশের মতন আর কোথাও আর্টিষ্টের দারিদ্র্য এতটা নিশ্চিত নয়। অন্য দেশে ক্যারুসোর মতন অনেক গায়ক, সার্জ্জেন্টের মতন অনেক চিত্রকর টাকার পাহাড়ের ওপরে ব'সে থাকেন। এল্লা হুইলার উইল্‌কক্স্‌ একজন নিম্নশ্রেণীর কবি ছিলেন, কিন্তু তিনিও যে টাকাটা রোজ্‌গার করতেন, খ্যাতির চরমে উঠেও আমাদের রবীন্দ্রনাথ কেবল বাঙ্‌লা কবিতা লিখে এখনো কি তেমন উপার্জ্জন করতে পার্‌চেন?"

একজন বল্‌লেন, "এর আসল কারণ বাঙালীর দারিদ্র্য। যারা নিজেরা খেতে পায় না, তারা আবার আর্টিষ্টকে খাওয়াবে কি ক'রে?"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "হ্যাঁ, দেশের দারিদ্র্য আর্টিষ্টের দুরবস্থার একটা কারণ বটে, কিন্তু এ-কারণের দোহাইও সব জায়গায় দেওয়া চলে না। এই তো ঘরে আমরা এতগুলো লোক রয়েচি, আমাদের যে শিক্ষা আর অর্থের অভাব আছে, তাও বল্‌তে পারি না। কিন্তু বাঙালী আর্টিষ্টের প্রাণরক্ষার জন্যে আমরা কতটুকু চেষ্টা করেচি?"

মিঃ বাসু দাঁতে একটা মোটা চুরুট চেপে ধ'রে বল্‌লেন, "য়ুরোপের আর্টের কথা যদি ধরেন, তা হ'লে বল্‌তে পারি—I am very fond of—"

বিনয়-বাবু বাধা দিয়ে হেসে বল্লেন, "Of course you are! So are we all! আমরা বিলাতী আর্টের ভক্ত, কিন্তু স্বদেশী আর্টের কদর বুঝি না।"

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, "তার কারণ এ দেশের আর্টিষ্টরা আর্ট নিয়ে যা করেন, তার নাম হচ্ছে ছেলে-খেলা। আমার মতে বাঙালী আর্টিষ্টকে প্রশ্রয় দেওয়া মহা পাপ ছাড়া আর কিছু নয়।"

মিঃ ঘোষ বিরক্তি-ভরে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালেন। শোনা-যায়-কি-না-যায় এমন মৃদু অস্পষ্ট স্বরে তিনি বল্লেন—"Vulgar hound!"

রতন এতক্ষণ পরে কথা কইলে। মিঃ চ্যাটোর দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লে, "আপনার যে একটা নিজস্ব মত আছে তা শুনে খুসি হলুম। অধিকাংশ ইঙ্গ-বঙ্গের তা থাকে না। তাঁদের মত আমদানি হয় সমুদ্রের ওপার থেকে।"

কুমার বাহাদুর টেবিলের উপরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়ে বল্লেন, "ঐ 'ইঙ্গ-বঙ্গ' কথাটায় আমার দস্তুর-মতন আপত্তি আছে।"

মিঃ চ্যাটো চ'টে বল্লেন, "How dare you insult me?"

রতন স্থিরভাবেই বল্লে, "না, আমি আপনাকে অপমান করিনি!"

মিঃ চ্যাটো চড়া গলায় বল্লেন, "Then what the hell do you mean—"

বিনয়-বাবু বাধা দিয়ে বল্লেন, "ছিঃ, মিঃ চ্যাটো! ভদ্রসমাজে এ-রকম ভাষা চলা উচিত নয়। তর্ক হচ্ছে, তর্ক হোক্—রাগারাগি কেন?"

রতন তেম্নি হাস্তে হাস্তে বল্লে, "চট্টোপাধ্যায় মশাই, আপনি মাতৃভাষায় কথা কইলেই আমি খুসি হব। অধিকাংশ বাঙালীর বিলাতী বুলি এখনো আমার ধাতস্থ হয়নি।"

মিঃ চ্যাটো মুখ বিকৃত ক'রে বল্লেন, "Stop your preaching!"

রতন বল্লে, "আমি এটা কিছুতেই বুঝ্তে পারি না, বাঙালীর ছেলে হ'য়ে কথাবার্ত্তায় আমরা এত ইংরেজী বুক্‌নি ব্যবহার করি কেন? এটা যদি শিক্ষার লক্ষণ হয়, তবে এ শিক্ষা তো ভালো নয়!"

মিঃ বাসু হা হা ক'রে হেসে উঠে' বল্লেন, "মিঃ সেন আপনি দেখ্‌ছি গান্ধীর একটি শিষ্যের পৃষ্ঠপোষক হয়েচেন!"

রতন উত্তেজিত স্বরে বল্লে, "বিনয়-বাবু, আমি এই মাত্র আপনার বাড়ীর ভিতর থেকে আস্‌চি। সেখানে আপনার শ্বশুর-মশাইকে দেখে এলুম। একালের আব-হাওয়ায় যেন সেকালের একটি মূর্ত্তিমান্ সংস্করণ। তিনি চেয়ারে বসেন না, মাথায় লম্বা টিকি রাখেন, মেয়েদের পায়ে জুতো দেখ্‌লে চটে' যান, নারীদের মধ্যে একটু স্বাধীনতা দেখ্‌লেই শিউরে ওঠেন, আপনার মেয়েকে আমার মতন কোন লোকের সঙ্গে একলা মিশ্‌তে দেখ্‌লে সর্ব্বনাশ মনে করেন! তাঁর মন এখনো সেই মনু-রঘুনন্দনের যুগেই বদ্ধ হ'য়ে আছে। আমি সইতে পার্‌লুম না, ভয়ে পালিয়ে এলুম। কিন্তু নীচে, এখানে এসে দেখ্‌চি আর এক উল্টো ব্যাপার। এখানে যাঁরা ব'সে আছেন, তাঁদের কারুর ভদ্রতায় আমি সন্দেহ প্রকাশ করচি না,—কিন্তু আসলে তাঁরা কি? আপনার শ্বশুর-মশাইকে বরং বোঝা যায়—কিন্তু এঁরা সকলেই এক-একটি মূর্ত্তিমান্ প্রহেলিকা! এঁরা না হিন্দু, না মুসলমান, না ক্রীশ্চান! এঁরা বাঙালীও নন, সাহেবও নন! বাঙালীও এঁদের নিজের সমাজে নেবে না, সায়েবরাও তাই। আপনি হয়তো আমার স্পষ্ট সত্য কথায় রাগ করচেন বিনয়-বাবু, কিন্তু উপায় নেই। আমি কখনো মন ঢাকা দিয়ে কথা কইতে শিখিনি। আমি বেশ বুঝ্‌চি, আপনার শ্বশুর-মশাই আর এই মিঃ চ্যাটো আর মিঃ বাসু প্রভৃতি, এঁদের কারুর দ্বারাই দেশের একতিল উপকারের সম্ভাবনা নেই। এঁরা সবাই আগাছার মত, বাঙ্‌লার উর্ব্বর জমিকে খালি পোড়ো ক'রে তুল্‌চেন মাত্র! এই মিঃ চ্যাটো বা মিঃ বাসুর কাছ থেকে আর কোন কথা আমি শুন্‌তে চাই না!"

রতনের মতন লোকের মুখ থেকে যে এমন তীব্র সত্য বেরুতে পারে, ঘরের মধ্যে কেউ তা কল্পনা করতে পারেন নি—এমনকি বিনয়-বাবুও না! সকলে স্তম্ভিতের মতন স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলেন।

কিন্তু সব চেয়ে ক্ষাপ্পা হয়ে উঠ্‌লেন, মিঃ বাসু। রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে একলাফে দাঁড়িয়ে, মুখের চুরোটটা একদিকে সজোরে নিক্ষেপ ক'রে তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, "You won't hear any more from me? Who in thunder are you, anyhow? A beggar! That is what you are! A beggar!"

বিনয়-বাবুও তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লেন, "Gentlemen! Gentlemen! Mr. Basu, sit down. রতন, you forget yourself."

রতন স্থিরকণ্ঠে বল্‌লে, "না, আমি নিজেকে ভুলিনি! আমি ভিক্ষুক নই। আপনার বাড়ীতে আমি ভিক্ষা করতে আসিনি। আমি সত্য বল্‌বই। আপনার আপত্তি থাকে, আজ থেকে আমি আর এখানে আস্‌ব না।" এই ব'লে রতন দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল।

বিনয়-বাবু ক্ষুণ্ণিতস্বরে বল্‌লেন, "রতন, আমি তো তোমাকে মন্দ কথা কিছু বলিনি! আমি জানি, তুমি ভিক্ষুক নও। তুমি নিজের পরিশ্রমেই জীবিকা অর্জ্জন কর। কেন তুমি আমার বাড়ীতে আসবে না?"

রতন বল্‌লে, "আমি গরিব। দারিদ্র্য কি অপরাধ? অন্তত আপনার ঐ ধনী বন্ধুদের কথা শুনলে তাই মনে হয়। ওঁরা টাকা দিয়ে মনুষ্যত্ব কিন্‌তে চান। কিন্তু মনুষ্যত্ব তো সরকারি খেতাব নয়, টাকার জোরে তাকে লাভ করা যায় না।"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "আমি তা জানি রতন, আমি তা জানি। তুমি আজ উত্তেজিত হয়েচ, আজ এখান থেকে যাও। কিন্তু কাল যদি আবার না আসো, আমি নিজে গিয়ে তোমাকে জোর ক'রে ধ'রে আন্‌ব। বুঝ্‌লে?"

মিঃ ঘোষ এতক্ষণে তাঁর আরাম-চেয়ার ছেড়ে উঠে' দাঁড়ালেন। হাতের পাইপটা একটা ত্রিপায়ার উপরে রেখে দিলেন। তার পর একটা হাই তুলে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বল্‌লেন, "রতন-বাবু, আপনি কাল বৈকালে একটু সময় ক'রে আমার ওখানে যাবেন?"

রতন বিস্মিত স্বরে বল্‌লে, "কেন?"

—"আপনার সঙ্গে আলাপ করব।"

—"আপনার কি কোন দরকার আছে?"

—"হ্যাঁ, আমি মানুষের সঙ্গে কথা কইতে ভালোবাসি।"

কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে রতন অবাক্ হ'য়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল।

মিঃ ঘোষ রতনের চোখের উপরে চোখ রেখে বল্‌লেন, "মনুষ্য-সমাজে আজকাল মানুষের বড় অভাব হয়েচে। ....তুমি কিন্তু নকল নও, একেবারে আসল, সত্যিকারের মানুষ। তাই আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।... ..কেমন, যাবে তো?"

মাথা নামিয়ে সলজ্জস্বরে রতন বল্‌লে, "যাব।"

(ক্রমশঃ)

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

সিংহবাহিনী

মরত-লোকে এলোকেশে ও কে এল তোরা যা দেখে।
বিজুলি-ছটা! বঙ্কিজটা সিংহ পরে পা রেখে!
নিখিল পাপ নিধন তরে
মৃণাল-করে কৃপাণ ধরে,
ঈষৎ হাসে শঙ্কা হরে, চিনিতে ওরে পারে কে!

তরুণ-ভানু-অরুণ-ঘটা নয়ন-তট ভূষিছে!
দম্ভ-দুর দৈত্যাসুর ভাগ্য নিজ দূষিছে!
শান্ত-জন-শঙ্কা-হরা
অভয়-করা খড়্গ-ধরা
আবির্ভূতা সিংহ-রথে মাভৈঃ বাণী ঘোষিছে!

দমন হয় শমন নামে শমিত যম-যন্ত্রণা!
ইন্দ্র বায়ু চন্দ্র রবি চরণ করে বন্দনা!
ইঙ্গিতে যে সৃষ্টি করে
গগনে তারা বৃষ্টি করে
প্রলয়-মাঝে মন্ত্র-রূপা! মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্রণা!

শকতিহীনে শক্তিরূপা সিদ্ধিরূপা সাধনে!
ঋদ্ধিরূপা বিত্তহীন-হৃদয়-উন্মাদনে!
আদ্যা! আদি-রাত্রি-রূপা!
অমর-নর-ধাত্রী-রূপা!
অশেষরূপা! বিরাজো আজি সিংহবর-বাহনে!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ফুলের পাপ্‌ড়ি

আমাদের নিকট ফুলের 'দল' বা পাপ্‌ড়িরই আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ফুলের মধুর্য্য ও মনোহারিত্ব এই পাপ্‌ড়ির উপর নির্ভর করিতেছে। দলহীন পুষ্পে আমাদের কোনও কাজ হয় না। ফুলের বর্ণ, গন্ধ ও মধু—অর্থাৎ যাহার জন্য ফুলের আদর, সে-সব ফুলের পাপ্‌ড়িতেই থাকে, আবার ফুলের যে বিভিন্ন আকার তাহাও দলের জন্যই সম্ভব।

নারী নিজ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে বহুকাল হইতে ফুলের দলের সাহায্য লইতেছেন। এখনও নানাবিধ বেশ-ভূষা, ধন-রত্নের মধ্যেও ফুলের আদর বড় কম নাই। পুরাকালে, 'মাল্যগ্রন্থন' অর্থাৎ মালা গাঁথা, 'পুষ্পাস্তরণ' অর্থাৎ ফুল দিয়া ঘর দোর সাজান, 'শেখরকা-পীড়-যোজন' অর্থাৎ ফুলের অলঙ্কারাদি সৃজন, প্রভৃতি বিদ্যা ৬৭ কলার অন্তর্গত ছিল এবং রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইত। এখনও বিবাহ-সভা সাজাইতে ফুলের আবশ্যক বড় কম হয় না। মানব ফুলের দলের এত আদর করিলেও আসল ফুলের উদ্দেশ্য ইহার দ্বারা সাধিত হয় না। ফুলের উদ্দেশ্য বীজ সৃজন করা। পাপ্‌ড়ি না থাকিলেও বীজ জন্মিতে পারে, এবং বৈজ্ঞানিকের ভাষায় 'ফুল' বলিলে একটি কেশরযুক্ত দলহীন উদ্ভিদের অংশকে বলা যাইতে পারে, প্রকৃতিতে এইরূপ গন্ধ-বর্ণ-হীন ফুলের অভাব নাই। অথচ মানুষের চেষ্টায় এমন ফুলও জন্মিয়াছে যাহাদের উজ্জ্বল বর্ণের মনোহর পাপ্‌ড়ি আছে কিন্তু পরাগ-কেশর বা গর্ভ-কেশর জন্মে না। ইহারা যথার্থ 'ফুল' নামে অভিহিত হইতে পারে না।

ফুলের দল বেশ-ভূষার মত বাহিরের অংশ। ইহারা বিভিন্নরূপে কীট-পতঙ্গকে আহ্বান করিবার জন্য সৃষ্ট।

ফুলের পাপ্‌ড়ি যে কত রকমের হইতে পারে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, এবং তাহাদের সংখ্যারও কোন স্থিরতা নাই। তবে সকল ফুলই 'শতদল' নহে, অর্থাৎ বহুদল-বিশিষ্ট হয় না। বেশীর ভাগ ফুলের দলই ৩, ৪, ৫ ও ৬ সংখ্যক হইয়া থাকে, আবার ৩ ও ৫ সংখ্যক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেক ফুলের দলগুলি একত্র মিলিয়া নল, ঘণ্টা বা নলিকার আকারের হয়। শুটি-বর্গের ফুলগুলি প্রায় প্রজাপতির মত দেখিতে—যেমন 'অপরাজিতা'। কীট-প্রিয় অর্থাৎ কীট-পতঙ্গ যাহাদের পরাগ বহন করে এমন ফুলের দলগুলি প্রায় অসমান হয়, ও কীটাদির বসিবার মত আসনের আকার ধারণ করে। 'অর্কিড্‌' ফুলের মত বিভিন্ন আকারের ও বর্ণের ফুল খুব কমই আছে, তাহাদের মূল্যও হাজার হাজার টাকা। ইহারাও কীট-প্রিয়। পতঙ্গের সাহায্য ব্যতীত ইহাদের বীজ জন্মিতে পারে না।

আবার কীট-পতঙ্গের আকারের সহিত কুসুমেরও আকারের সামঞ্জস্য থাকে, কীট বড় হইলে ফুলের মুখ বড় হয়, ছোট হইলে ছোট হয়।

আমাদের এই শ্রীমতী ধরা এত সুন্দরী কিসের জন্য একবার ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাই ফুল তাহার অনেক অংশের জন্য দায়ী। প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্য কুসুমে যত সম্ভব হয়, এক পক্ষী ও প্রজাপতি ছাড়া আর কোথাও তেমন নাই। ইহারাও কুসুমের সমতুল নহে। অবশ্য তরুণ তপন পূর্ণচন্দ্র বিদ্যুতের হাসি ও হীরকাদি রত্নরাজীও সৌন্দর্য্যে অতুল, কিন্তু আমি জীব-উদ্ভিদ্-জগতের কথাই বলিতেছিলাম।

শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিদ্যাসাগর-ভবন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র অনেক হাজার টাকা দেনা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জীবিতকালেই তিনি এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যে, দেনা পরিশোধের কোন উপায় হইলে তাহার পিতার বাসবাটীটিতে লোকহিতকর কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে তাহা উৎসর্গীকৃত হয়। তিনি বাঁচিয়া থাকিতে সেরূপ কোন চেষ্টা হয় নাই। তাহার মৃত্যুর পর তাহার একমাত্র পুত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৌত্র ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে তদ্রূপ কোন চেষ্টা হয় নাই। সুতরাং বিদ্যাসাগরভবন নীলামে উঠে। নীলামের ডাকে ৭২,০০০ টাকায় হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানী ঐ বাটী ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে চাঁদা তুলিয়া বাড়ীটি কোম্পানীর নিকট হইতে কিনিয়া লইয়া উহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয় কোন লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট উপায় হয়। কোম্পানী বাড়ীটি কিনিয়া রাখিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি কাজের দ্বারা শ্রদ্ধা প্রকাশের সুযোগ ও সময় দিয়া দেশের সমুদয় অধিবাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

দেশে এমন ধনী আছেন, যাঁহারা প্রত্যেকে লক্ষ টাকা দিতে পারেন। তাহাদের কেহ দিবেন কি না, তাঁহাদের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। কিন্তু ভাল কাজে টাকা দিবার ভার ধনীদের উপর অর্পণ করিয়া এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া, ও, আবশ্যক মত, কর্ত্তব্যে অবহেলা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া, আমরা কেহই নিজের নিজের কর্ত্তব্য হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি না। আগামী ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য দেশের ছোট বড় বহু গ্রামে নগরে অনেক সভা হইবে। সমুদয় সভার শ্রোতার সংখ্যা মোট এক লক্ষের কম হইবে না। শ্রোতারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভক্তি করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই—যদিও ঠিক্ কিসের জন্য করেন, তাহা সকলে হয়ত বলিতে পারিবেন না। তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকে যদি গড়ে এক টাকা করিয়া দান করেন, তাহা হইলে এক লক্ষ টাকা অনায়াসে উঠিতে পারে। তা ছাড়া, যাঁহারা কোন সভায় যাইবেন না, এমন বহু লক্ষ নারী ও পুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভক্তি করেন। তাঁহারাও টাকা দিবেন, আশা করা যায়। আদায় করিবার মানুষ জুটিলে টাকা নিশ্চয়ই উঠিবে।

বাড়ীটি বহু বৎসর বেমেরামত অবস্থায় থাকায় ভাল করিয়া মেরামত করা আবশ্যক হইবে; কোন কোন অংশ ভাঙিয়া গড়া দর্‌কার হইতে পারে। এইজন্য বাড়ীটির মূল্য ৭২,০০০ ছাড়া আরও অনেক হাজার টাকা—মোট এক লক্ষ টাকা আবশ্যক হইবে বোধ হয়। তা ছাড়া, উহাতে যে প্রতিষ্ঠানটি রক্ষিত হইবে, তাহারও ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এমন কিছু মূলধন দর্‌কার যাহার আয় হইতে ঐ খরচ চলিতে পারে। মূলধন কত চাই, তাহা প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃতি এবং ক্ষুদ্রতা বা বিশালতার উপর নির্ভর করিবে। বিধবাদের যাহাতে কল্যাণ হয়, এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

এই বৎসরের বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভাগুলির প্রধান কাজ হউক বিদ্যাসাগরভবনটি লোকহিতকর কার্য্যের জন্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ।

বিদ্যাসাগরভবন বাদুড়বাগানে একটি সংকীর্ণ গলিতে অবস্থিত। তা ছাড়া উহার হাতায় গাছ পালা অনেক। এই কারণে আমাদের জন্য বিশেষভাবে তোলা ছবি-দুটিতে বাড়ীটির অল্প অংশই দেখা যাইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা ফণ্ড্

১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা ফণ্ডের কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতিতে স্যার্ জগদীশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দিগের নাম অন্যতম সভ্যরূপে আছে বলিয়া প্রকাশিত হয়। আমরা তৎকালে তাঁহাদের প্রমুখাৎ অবগত হই এবং মডার্ন্ রিভিউ ও প্রবাসীতে লিখি, যে, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে, এবং ইহাতে তাঁহাদের মত নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ১৯২৩ সালে প্রকাশিত ১৯২২ ও ১৯২৩ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে (২১৬ পৃষ্ঠায়) তাঁহাদের নাম রহিয়াছে দেখিতেছি।

ইহার কারণ কি ?

—

"অসহযোগ" ও পাসের সংখ্যা

১৯২১ সালে বাংলা দেশে ছাত্রদের সরকারী বা সরকারের অনুমোদিত শিক্ষালয় পরিত্যাগ করিবার খুব একটা মরশুম পড়ে। যাহারা ছাড়ে নাই, আন্দোলনে অনেক শিক্ষালয় দীর্ঘকাল বন্ধ থাকায় এবং মন বিক্ষিপ্ত থাকায়, তাহাদেরও পড়াশুনার খুব ব্যাঘাত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পরীক্ষার ফল কিরূপ হইয়াছিল দেখুন। আমরা কেবল ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার তিন বৎসরের সংখ্যা নীচে দিতেছি। সংখ্যাগুলিতে কোন ভুল থাকিলে এ-বিষয়ে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিবেন।

বৎসর	পরীক্ষিতের সংখ্যা	উত্তীর্ণের সংখ্যা	শতকরা হার
১৯১৯	১৫,৯২২	১০,২৪১	৬৪ ৭
১৯২০	১৭,৪৬৬	১১,৭৯৫	৬৭.৫
১৯২১	১৭,৭৭৯	১৪,৫১৫	৮১ ৬

অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের হুজুক ও ব্যাঘাত সত্ত্বেও পাসের সংখ্যা এবং শতকরা পাসের হার, কমার পরিবর্ত্তে খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহার কারণ কি ? অসহযোগের জন্য ছাত্রেরা সে বৎসর হঠাৎ খুব বেশী পণ্ডিত হইয়া যায় নাই। সুতরাং দুটি কারণ অনুমান করা অন্যায্য হইবে না। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকার খুব দরকার অনেকদিন হইতেই চলিতেছে। এইজন্য পরীক্ষার্থীদিগকে ইস্কুল হইতে পরীক্ষা দিতে পাঠাইবার আগে যে টেষ্ট্ পরীক্ষা হয়, তাহা নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, এবং পরবর্ত্তী কয়েকবৎসর উচ্চতর পরীক্ষা-সকলে যাহাতে খুব বেশী ছাত্র জোটে তাহার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক খুব বেশী পাস্ করান হয়, এবং তাহার নিমিত্ত পরীক্ষকেরা যোগ্যতার মাপকাঠিটা একটু ছোট করিয়া ফেলেন। (২) বাঙালীর পাসের লোভ বড় লোভ। সহজে পাস্ হইবার লোভে ছাত্রেরা, "অসহযোগ" ছাড়িয়া যাহাতে "সহযোগ" অবলম্বন করে, তাহার জন্য সহজে পাসের প্রলোভন তাহাদের নিকট কার্য্যতঃ ধরা হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, বেশী পাসের মূলে ছিল দোকানদারী বুদ্ধি এবং রাজনৈতিক চাল। আমরা কিছুদিন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়সংসৃষ্ট বক্তৃতায় ও পুস্তিকায় দেখিতেছি, শিক্ষামন্ত্রী ও ব্যবস্থাপক সভার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক বা তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব থাকিলে, বিদ্যাপীঠ রাজনীতি নামক অপবিত্র জিনিষের ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হইবে। কিন্তু উপরে যাহা দেখান হইল, সেটা কি রাজনৈতিক লীলা নহে ? বিশ্ববিদ্যালয় যখন রিজ্‌লী-সার্কুলার অনুসারে শিক্ষালয়গুলিকে চলিতে বাধ্য করেন, তখন কি সেটা রাজনৈতিক ব্যাপার হয় নাই ?

—

আসাম ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আসামের ব্যবস্থাপক সভা চান, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কোন নূতন আইন হইলে উহার সেনেট, সীণ্ডিকেট এবং কৌন্সিল ও কমিটিগুলিতে আসামের উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধিরা যেন স্থান পায়। ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। আসামের প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ সমিতিতে কয় জন হইবে, তাহা স্থির করিতে হইলে অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। যথা, সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যত কলেজ আছে, তাহার কয়টি বাংলাতে ও কয়টি আসামে আছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত সমুদয় ইস্কুলগুলির মধ্যে বাংলায় কয়েকটি ও আসামে কয়েকটি আছে; বাংলা

হইতে কত ছাত্র পরীক্ষা দেয় ও আসাম হইতে কত ছাত্র পরীক্ষা দেয়; বাংলার ও আসামের ছাত্রদের প্রদত্ত ফীর টাকার পরিমাণ যথাক্রমে কত; আসামে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কি না; এবং সর্ব্বশেষে, এ পর্য্যন্ত বাংলাগবর্ণমেণ্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়কে কত টাকা দিয়াছেন ও ভবিষ্যতে কত দিবেন, এবং আসাম-গবর্ণমেণ্ট্ কত টাকা এ পর্য্যন্ত দিয়াছেন ও ভবিষ্যতে কত দিবেন। শেষোক্ত বিষয়টি উল্লেখের কারণ বলিতেছি। প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহ-প্রণালীর একটা নীতি আছে, যে, যাহাদের প্রতিনিধিরা কার্য্যনির্ব্বাহে মতামত প্রকাশ করিতে ও হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, তাহাদের নিকট টাকা চাওয়া উচিত নয়। তাহার উল্টা পিঠ্টাও সত্য; অর্থাৎ যাহারা টাকা দেয় না, তাহারা প্রতিনিধি পাঠাইবার দাবী করিতে পারে না।

—

বিজ্ঞান-চর্চ্চা ও স্বরাজলাভ-চেষ্টা

কাগজে দেখিলাম, যে, স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বিজ্ঞানচর্চ্চা অপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু স্বরাজলাভের চেষ্টা অপেক্ষা করিতে পারে না। যাহার যখন যে বিষয়ে উৎসাহ বেশী হয়, তখন তিনি স্বভাবতঃ সেই বিষয়টিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক মানুষের সকল রকম চেষ্টাই সব সময়ে দরকার। যাহার যোগ্যতা যে কাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তিনি সেই কাজ করিলে মানবজাতির উন্নতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। বৈজ্ঞানিকও কখন কখন যুদ্ধ করিতে যান। গত মহাযুদ্ধে কয়েকজন তরুণ আবিষ্কারক হত হওয়ায় বিজ্ঞান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বটে, তথাপি তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ প্রশংসনীয়। কিন্তু সকল বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ করিতে যান নাই। এইরূপ, কোন কোন কবি, ঐতিহাসিক, প্রভৃতিও যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত-বয়স্ক সব কবি ঐতিহাসিক প্রভৃতি যান নাই। কে কোন্ কাজ করিবেন, তাহা মানুষের যোগ্যতা, প্রবৃত্তি, প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যায়, যে, এমন অনেক কাজ আছে, যে, একটিতে মন প্রাণ দিয়া লাগিলে অন্যটি একাগ্রতার সহিত করা যায় না। সেইজন্য স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্বরাজলাভ-চেষ্টাকেই সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী কাজ মনে করিয়া যদি তাহাই কায়মনোবাক্যে করেন, তাহা দেশের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হইলেও, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে তাহা হইলে তিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চা একাগ্রতার সহিত করিতে পারিবেন না। সেরূপ অবস্থা ঘটিলে ছাত্রদের কল্যাণের জন্য তিনি অবশ্য নিজেই বিজ্ঞানকলেজের অধ্যাপকতা ছাড়িয়া দিবেন।

—

খদ্দর ও সর্কারের অনুরাগ-বিরাগ

স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় খুলনায় খদ্দর প্রদর্শনী খুলিবার উপলক্ষ্যে যে বক্তৃতা করেন, কাগজে দেখিলাম, তাহাতে ডেপুটি মুন্সেফ প্রভৃতিদিগকে ও অনুপস্থিত উকীল প্রভৃতিকে খুব এক হাত লইয়াছেন। পড়িলাম যে তিনি বলিয়াছেন, যে, মন্ত্রী নবাব নবাবআলী চৌধুরী খদ্দরের প্রচলন সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ লইয়াছিলেন, এবং খদ্দর পরেন, কিন্তু তাহাতে তো নবাব সাহেবের চাকরী যায় নাই; অতএব অন্যেরা কিসের ভয়ে খদ্দর প্রদর্শনীতে উপস্থিত হন নাই, ইত্যাদি। ভয়টাই যদি অনুপস্থিতির একমাত্র বা প্রধান কারণ হয়, তাহা হইলে তাহা যে অমূলক, এমন কথা বলিতে পারি না। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইতে উদ্ভূত স্বদেশী আন্দোলনের সময় বড়লাট পর্য্যন্ত নিজেকে "অনেষ্ট্ স্বদেশীর" ভক্ত বলিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অথচ ইহা সুবিদিত, যে, স্বদেশীর জন্য বহুসংখ্যক লোককে কারারুদ্ধ ও নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল। বিহার ও ওড়িষা গবর্ণমেণ্ট্ চর্‌খার ও খদ্দরের প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি ঐ প্রদেশে খদ্দরপরিহিত লোকদের উপর উপদ্রব কম হয় নাই। নবাব নবাবআলী চৌধুরী স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনিও কি কোন খদ্দর-সভায় কখন হাজির হইয়াছেন? এবং তিনি কি খদ্দর পরিয়া ব্যবস্থাপক সভায়, লাট সাহেবের মন্ত্রণাসভায় ও আফিসে যান? যখন যে জিনিষটার উপর দেশের লোকের খুব ঝোঁক হয়, তখন অবস্থাবিশেষে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরা তাহার মুরুব্বি বা পৃষ্ঠপোষক

সাজিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে গবর্ণ্‌মেণ্টের নীতির বাস্তবিক পরিবর্ত্তন কিছুই হয় না।

তা ছাড়া, বড় কর্ত্তারা যাহা করিলে বিশেষ দোষ হয় না, ছোট কর্ত্তাদের তাহাতেই দোষ হইতে পারে,—শেক্‌স্‌পীয়্যার তো বলিয়াইছেন -

"That in the captain's but a choleric word,
Which in the soldier is flat blasphemy."

স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্ঘাটিত কলিকাতার একটি প্রদর্শনীতে বহু লোকে জিনিস পাঠাইয়া অনেক লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল এবং উহার উদ্যোক্তাদের নামে নালিশ আদিও হইয়াছিল। কাশিমবাজারের মহারাজা উহার সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, এবং কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া নিজেকে দায়মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উল্লিখিত নিখিল ভারতীয় প্রদর্শনীতে পরে বাইনাচ, জুয়া খেলা, প্রভৃতিও হইয়াছিল। সুতরাং স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় কোন প্রদর্শনী খুলিলেই লোকে সভাস্থলে উপস্থিত হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য মনে না করিতে পারে। খদ্দরের আমরা খুব পক্ষপাতী; কিন্তু অন্য লোককে তিরস্কার করিয়া কোন লাভ নাই।

—

কার্‌মাইকেল মেডিক্যাল কলেজ

ইংলণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্ এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের মোট লোকসংখ্যা চারি কোটি পঁচাত্তর লক্ষ। বঙ্গের লোক-সংখ্যা চারি কোটি ছেষট্টি লক্ষ, বিহার-ওড়িষা ছোট-নাগপুরের তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ, এবং আসামের ছিয়াত্তর লক্ষ। ইংলণ্ড, প্রভৃতি উল্লিখিত চারিটি ইউরোপীয় দেশ উল্লিখিত ভারতবর্ষীয় প্রদেশগুলি অপেক্ষা খুব বেশী স্বাস্থ্যকর। ভারতবর্ষীয় এই প্রদেশগুলিতে নানা প্রকার ব্যাধির প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। এইজন্য এখানে চিকিৎসকের প্রয়োজনও খুব বেশী। ব্যাধি নিবারণ এবং ব্যাধির চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা গবর্ণ্‌মেণ্টের অন্যতম কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য গবর্ণ্‌মেণ্ট্ কিরূপ পালন করিতেছেন, তাহা অন্য দেশের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যাইবে।

উপরে দেখাইয়াছি, যে, ইংলণ্ড-আদি চারিটি দেশের লোকসংখ্যা বাংলা দেশের লোকসংখ্যা অপেক্ষা মাত্র নয় লক্ষ বেশী। বিহার ওড়িষা প্রভৃতি প্রদেশগুলি ধরিলে সবগুলির লোকসংখ্যা বিলাত অপেক্ষা অনেক কোটি বেশী হয়। বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্রবে চিকিৎসা শিখিবার জায়গা কতগুলি আছে দেখা যাক্। কেবল মাত্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবেই এরূপ সতেরটি শিক্ষার স্থান আছে। তা ছাড়া আরও পাঁচটি চিকিৎসা-শিক্ষালয় লণ্ডনেই আছে। ইহা ব্যতীত বিলাতের অন্যত্র আরও ৩৪টি চিকিৎসাশিক্ষালয় আছে। মোট চিকিৎসা-শিক্ষালয়ের সংখ্যা ৫৬টি।

বাংলা, বিহার, ওড়িষা, ছোটনাগপুর ও আসামে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা মোট দুইটি মাত্র। বিহারে আর একটি হইবে—দ্বারভাঙ্গার মহারাজার টাকায়। তা ছাড়া, গবর্ণ্‌মেণ্টের "জানিত" গুটি ছয়েক মেডিক্যাল স্কুল এই প্রদেশগুলিতে আছে। সুতরাং চিকিৎসা শিক্ষা দিবার জন্য আরও কত শিক্ষালয় আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য।

বাংলা-গবর্ণ্‌মেণ্ট ১৯১৫ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখের একটি সরকারী কাগজে বলেন, যে, [সরকারী মেডিক্যাল কলেজটি ছাড়া] আর-একটি মেডিক্যাল কলেজ না হইলে চিকিৎসাবিষয়ে উচ্চশিক্ষার্থীদের জন্য জায়গা করা যাইবে না, এবং এরূপ একটি কলেজ স্থাপন করিতে হইলে গোড়াতেই গবর্ণ্‌মেণ্টের এককালীন খুব সাহায্য চাই এবং বার্ষিক সাহায্যও চাই। কার্‌মাইকেল মেডিক্যাল কলেজের [বে-সরকারী] সংস্থাপকগণ উহা স্থাপন করিয়া গবর্ণ্‌মেণ্টের কর্ত্তব্যের ভার অনেকটা লঘু করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই কলেজকে যত টাকা দেওয়া উচিত ছিল, তাহা কলেজ এপর্য্যন্ত পান নাই। ১৯২২ সালে দুই লক্ষ এবং ১৯২৩ সালে দুই লক্ষ, মোট চারি লক্ষ টাকা এককালীন দান গবর্ণ্‌মেণ্ট্ করিয়াছেন; তা ছাড়া বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট্ দিয়া থাকেন। সরকারী মেডিক্যাল কলেজে এবং কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে গবর্ণ্‌মেণ্ট্ ১৯২১ সালে যথাক্রমে ১১,৫৬,৬৬১ টাকা এবং ৫০,০০০ টাকা দিয়াছিলেন। ঐ সালে সরকারী মেডিক্যাল

কলেজের ব্যয় হইয়াছিল ৬,৭৮,৫৩৭ টাকা এবং কার্‌মাইকেল মেডিক্যাল কলেজের ব্যয় হইয়াছিল ১,০৮,৯১৮ টাকা। সরকারী মেডিক্যাল কলেজের হাঁসপাতালে খরচ হইয়াছিল ৭,৩৭,১৭৭ টাকা; কার্‌মাইকেল মেডিক্যাল কলেজের হাঁসপাতালে খরচ হইয়াছিল ১,২০,৬৪২ টাকা। অতএব, দেখা যাইতেছে, যে, সরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও হাঁসপাতালের মোট খরচ হইয়াছিল ১৪, ৫,৭১৪, কারমাইকেল কলেজ ও হাঁসপাতালের ২,২৯,৫৬০। শেষোক্ত কলেজের খরচ এত কম হইবার প্রধান কারণ ইহার অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের স্বার্থত্যাগ। এই কলেজে গবর্ণমেণ্টের আরও অনেক টাকা দেওয়া উচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বসাধারণেরও বেশী করিয়া দান করা কর্ত্তব্য। রিপোর্টে দুটি প্রধান দানের উল্লেখ দেখিলাম। রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক দিয়াছেন এক লক্ষের উপর টাকা, স্বর্গীয়া মুক্তামালা দাসীর উইলের এক্সিকিউটরগণ দিয়াছেন সত্তর হাজার টাকা। কিন্তু নিশ্চয়ই কিছু কিছু টাকা দিতে সমর্থ লোক দেশে আরও আছেন।

সরকারী মেডিক্যাল কলেজে যত ছাত্র ভর্ত্তি হইতে চায়, তাহাদের মধ্যে শতকরা আট দশজন আন্দাজ স্থান পায়। কার্‌মাইকেল মেডিক্যাল কলেজেরও অবস্থা ঐরূপ। রিপোর্টে দেখিতেছি, ৩০৮৩ জন ছাত্র গত বৎসর ভর্ত্তি হইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কেবল ১১০ জনকে লইতে পারিয়াছেন। দেশে চিকিৎসকের অভাব খুবই আছে। কলেজ আরও বেশী ছাত্র লইতে পারিলে বড় ভাল হয়। কিন্তু তাহা পারা দূরে থাক্, হয় ত বা এখন যত ছাত্র লওয়া হয়, তাহাও কর্ত্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে লইতে অসমর্থ হইতে পারেন। কারণ, ছাত্রদিগকে কার্য্যতঃ শিক্ষা দিতে হইলে হাঁসপাতালে অনেক রোগী থাকা দরকার; কিন্তু এখন যতগুলি শয্যা আছে তাহার ব্যয়নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, হয় রোগীদের নিকট হইতে টাকা লইতে হইবে, এবং তাহা হইলে গরীব রোগীরা চিকিৎসা হইতে বঞ্চিত হইবে; নতুবা কোন কোন ওয়ার্ড্ বন্ধ করিয়া রোগীর সংখ্যা কমাইতে হইবে, ও তাহা হইলে ছাত্রও কম লইতে হইবে। একটি নূতন প্রসূতি-হাঁসপাতাল আবশ্যক। তাহা নির্ম্মিত না হইলেও ছাত্রের সংখ্যা কমাইতে হইবে। এই-সকল কারণে সর্ব্বসাধারণের এবং গবর্ণমেণ্টের কার্‌মাইকেল মেডিক্যাল কলেজে বেশী বেশী করিয়া টাকা দেওয়া উচিত।

—

মাল্‌কানা রাজপুতদের "শুদ্ধি"

প্রধানতঃ আগ্রা জেলার কতকগুলি গ্রামে মাল্‌কানা নামক এক শ্রেণীর রাজপুতদের বাস, যাহাদিগকে ঠিক্ হিন্দুও বলা যায় না, ঠিক্ মুসলমানও বলা যায় না। কথিত আছে, যে, খিলজী ও মোগল রাজত্বকালে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল; কিন্তু ইহারা তাহা সত্ত্বেও অন্য মুসলমানদের সঙ্গে ঔদ্বাহিক আদান-প্রদান না করায় স্বতন্ত্রই রহিয়া গিয়াছে। কিছুদিন হইতে ইহাদিগকে হিন্দুসমাজে পুনর্গ্রহণ-চেষ্টায় হোমাদি দ্বারা ইহাদিগকে "শুদ্ধ" করা হইতেছে। তাহাতে পশ্চিমের মুসলমানসমাজে উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে। মোপ্‌লা বিদ্রোহ, মুলতানের দাঙ্গাহাঙ্গামা, প্রভৃতি কারণে আগে হইতেই হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মন-কশাকশি ছিল; তাহার উপর এই "শুদ্ধি" কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় জাতীয় একতা উৎপাদনে ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। এবং তাঁহারা বলেন, যে, এখন এই "শুদ্ধি" কার্য্যটা এই কারণে স্থগিত রাখা উচিত। আমরা এরূপ যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। প্রতি বৎসর হাজার হাজার হিন্দুকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইতেছে, হাজার হাজার হিন্দুকে মুসলমান করা হইতেছে; তাহাতে ত কাহারও "উত্তেজনা" হয় না। এক্ষণে যদি সনাতনী হিন্দুরা কিম্বা আর্য্যসমাজী সংস্কারক হিন্দুরা এমন কতকগুলি লোককে স্বসমাজে আবার লইতে চান যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন, তাহাতে উত্তেজনা হওয়া উচিত নহে। অবশ্য একথা সত্য, উত্তেজনা জিনিষটা যুক্তিতর্ক মানে না; কিন্তু প্রত্যেক সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের যুক্তিতর্ক মানা উচিত, এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের অযৌক্তিক উত্তেজনা প্রশমিত করিবার চেষ্টা করা

স্বামী দয়ানন্দ মাল্‌কানা রাজপুতগণকে শুদ্ধি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন

মাল্‌কানা রাজপুতগণ

কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে "শুদ্ধি" বন্ধ রাখিয়া ভবিষ্যতে যখনই উহা আরব্ধ হইবে, তখনও ত সহজেই একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে; সুতরাং এখন প্রারব্ধ কার্য্য স্থগিত রাখিলে যে স্থায়ী কোন সুফল হইবে, ইহা আমাদের ধারণা নহে।

এ বিষয়ে আমাদের মত সম্বন্ধে কেহ যেন ভুল না বুঝেন। আমরা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টীয়, শিখ, ইহুদী, পার্সী, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী, প্রভৃতি কাহাকেও নামের ছাপ অনুসারে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ মনে করি না, এবং কোন মানুষ কোন বাহ্যক্রিয়াকলাপ সহকারে কাহারও

শুদ্ধি-অনুষ্ঠান

শুদ্ধি মণ্ডপ—এইখানে মাল্‌কানা রাজপুতগণকে হিন্দুধর্ম্মে ফিরাইয়া আনা হয়

নামের ছাপ বদ্‌লাইয়া দিলেই, সেই নামের জন্যই কেহ শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হইয়া যায়, তাহাও আমরা বিশ্বাস করি না। কে যে সাধু, কে যে অসাধু, কে শুদ্ধ, কে অশুদ্ধ, তাহার বিচারক অন্তর্দর্শী ভগবান্। তথাপি, প্রত্যেকেই যখন নিজের সম্প্রদায়কে ও উহার মতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তখন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে

নিজ সম্প্রদায়ে আনিবার অধিকার সকলেরই আছে। অবশ্য এই উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ বা প্রলোভন প্রদর্শন সম্পূর্ণ অবৈধ ও অবাঞ্ছনীয়।

আগ্রা অঞ্চলে উত্তেজনা হওয়ায় কংগ্রেসের একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান সভ্য, বাবু পুরুষোত্তম দাস টাণ্ডন এবং মৌলানা আজাদ সুভানী, কিছুদিন পূর্ব্বে স্বয়ং দুইটি মাল্‌কানা গ্রাম দেখিতে যান। ইঁহারা উভয়েই সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। লারাওণ্ডা গ্রামে

শুদ্ধিপ্রাপ্ত মাল্‌কানা রাজপুত

মাল্‌কানারা তখনও "শুদ্ধি" অনুষ্ঠান করে নাই, কিন্তু আগ্রহের সহিত উহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারা গত ৪।৫ বৎসরের মধ্যে অনেক বার হিন্দু রাজপুতদিগের পংক্তিভুক্ত হইবার জন্য সমাজনেতাদের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল। তাহারা বলে, যে, তাহারা অধিকাংশ হিন্দু আচার মানে, মাথায় টিকি রাখে, এবং তাহাদের নাম হিন্দুনাম—যথা রামসিং, তুলসী রাম, ভূপ সিং, ফুল সিং,

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ, প্রভৃতি

রঘুবীর, চরণ সিং, ইত্যাদি। তাহারা মুসলমানদের সঙ্গে আহার করে না, তাহাদের ছোঁয়া জল খায় না। বিবাহের সময় কাজীকে তাঁহার কুলক্রমাগত পাওনা পাঁচসিকা দেওয়া ছাড়া তাহারা অন্য কোন মুসলমান আচার মানে না। তাহারা স্বীকার করে, যে, দশবৎসর আগে পর্য্যন্ত তাহারা গোর দিয়া মৃতের সৎকার করিত, কিন্তু ঐ প্রথা রহিত হইয়াছে।

এই গ্রামের মুসলমান সাক্ষী বলেন, মাল্‌কানাদিগকে হিন্দু বা মুসলমান কিছুই বলা যায় না, কারণ তাহারা উভয় ধর্ম্মেরই কোন কোন অনুষ্ঠান করে। হিন্দু সাক্ষী বলেন, হিন্দুরা মাল্‌কানাদিগকে হিন্দু মনে করে এবং তাহাদের সহিত আহার করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহারা কোন কোন মুসলমান অনুষ্ঠান করিত বটে, কিন্তু এখন করে না। তাহারা হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে, এবং মিঞারও পূজা করে। গ্রামের অন্য হিন্দুদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাহাদেরও পুরোহিত।

কংগ্রেসের সভ্যদ্বয়ের সিদ্ধান্ত এই, যে, এই গ্রামের মাল্‌কানাদের মধ্যে হিন্দু আচার-ব্যবহারের চলন সম্বন্ধে মতভেদ নাই, কিন্তু কোন কোন মুসলমান আচার-ব্যবহারের চলন সম্বন্ধে হিন্দু সাক্ষী ও মুসলমান সাক্ষীর মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট বুঝা যায়, যে, মাল্‌কানারা নিজে পুরা হিন্দু বলিয়া বিবেচিত এবং হিন্দুসমাজে গৃহীত হইতে উৎসুক।

টাণ্ডন ও সুভানী মহাশয়দ্বয় খাণ্ডোয়াই নামক আর-একটি গ্রামে যান। তথাকার মাল্‌কানাদের এক দল শুদ্ধির পক্ষে, অন্যদল বিপক্ষে। এখানকার মাল্‌কানাদের মধ্যে হিন্দু ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি মুসলমান অনুষ্ঠানেরও প্রচলন দৃষ্ট হয়। বিবাহের সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিতে "বরোঠি" অনুষ্ঠান করেন, কাজী "নিকাহ্" পাঠ করেন। মৃতের সংকার গোর দিয়া করা হয়, কিন্তু মৃত্যুর পর ত্রয়োদশ দিবসে হিন্দুধর্ম্মসম্মত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয় এবং ব্রাহ্মণদিগকে দান করা হয়। যে-সব মাল্‌কানা শুদ্ধির বিরোধী, তাহারা আরও কোন কোন মুসলমান আচার পালন করে; যথা মস্‌জিদে গিয়া নমাজ পড়া এবং বাড়ীতে একখানি কোরান্ রাখা। কিন্তু এই দলের মাল্‌কানারাও মুসলমানদের সঙ্গে আহার করে না।

অনুসন্ধাতাদ্বয় বলেন, যে তাঁহাদের খাণ্ডোয়াই দর্শন কালে সেখানে হিন্দু প্রচারক ও মুসলমান মৌলবী দুই দলই নিজ নিজ মত প্রচার করিতেছিলেন, কিন্তু কোন উত্তেজনা বা অশান্তি ছিল না। তাঁহারা বলেন, যে, আগ্রা জেলায় হিন্দু ও মুসলমান কংগ্রেসওয়ালাদের খব জোরে কংগ্রেসের কাজ চালান উচিত, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মন ঐদিকে যাইবে, সম্মিলিত ভাবে কাজ করিবার একটি ক্ষেত্র মিলিবে, এবং "শুদ্ধি"-রূপ মানসিক তিক্ততাজনক বিষয়টিই একমাত্র কথাবার্ত্তা ও মনোযোগের বিষয় থাকিবে না। তাঁহারা আরও বলেন, যে, যাঁহারা এখন বাহির হইতে গিয়া আগ্রা জেলায় "শুদ্ধি" বা উহার বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহারা স্বস্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া মাল্‌কানাদিগকে নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিতে দিলে ভাল হয়। তৃতীয়তঃ, উভয়পক্ষের সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা যেন রাগারাগি ও বিদ্বেষবর্দ্ধক চিঠি না ছাপান। চতুর্থতঃ, উভয়পক্ষের কার্য্যের সাহায্যার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য সভা ও বক্তৃতাদি না করাই ভাল, এবং কংগ্রেসের সভ্যদের এই-সব সভায় যোগ দেওয়া উচিত নয়। পরিশেষে তাঁহারা বলেন, যে, শুদ্ধির অনুকূল বা প্রতিকূল তাঁহারা কিছুই বলিতেছেন না, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করিবার এবং অন্য লোককে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অধিকার সম্বন্ধেও কিছু বলিতেছেন না। তাঁহারা বলেন, "আমরা সম্পূর্ণ জাতীয়তার দিক্ হইতে প্রশ্নটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছি; এবং আমরা মনে করি, যে, আমরা যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছি, তদনুসারে কাজ হইলে, কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থে আঘাত লাগিবে না, এবং শান্তি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

—

"স্বর্গের আলো আমাদের পথপ্রদর্শক"

নূতন ধরণের যে দশ টাকার নোট গবর্ণ্‌মেণ্ট্ বাহির করিয়াছেন, তাহাতে, "Heaven's light our guide", "স্বর্গের আলো আমাদের পথপ্রদর্শক," এই মন্ত্রটি লিখিত আছে।

ইংরেজ রাজত্বকালে ভারতবর্ষের কোন উপকার হয় নাই, নিরপেক্ষ কোন লোক তাহা বলিতে পারেন না; অমঙ্গলও হয় নাই, তাহাও বলিবার জো নাই। কল্যাণ বেশী হইয়াছে, কি অকল্যাণ বেশী হইয়াছে, তাহার বিচার ক্ষুদ্র নিবন্ধিকায় করা যায় না। কিন্তু অতীত ও সমসাময়িক ইতিহাস সুস্পষ্টরূপে ইহাই বলে, যে, ইংরেজদের স্বার্থসিদ্ধির ভিত্তির উপর ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং এখনও সেই ভিত্তিতেই উহা প্রতিষ্ঠিত আছে। ইংরেজদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি ভারতবর্ষের কোন উপকার করা যায়, তাহাতে তাহাদের কোন আপত্তি নাই।

এ অবস্থায়, "স্বর্গের আলো আমাদের পথপ্রদর্শক", এই মন্ত্র নোটের উপর ছাপিয়া দেওয়ায় অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস হইতে লব্ধ সত্যের অপলাপ হইয়াছে। তবে যদি গবর্ণ্‌মেণ্ট্ ভবিষ্যতে কেবলমাত্র ভগবৎ-প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই সাধু সঙ্কল্পের প্রশংসা করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্কল্প অনুসারে কাজ করিতে পারিবেন কি না, তাহা পরীক্ষা না করিয়া সঙ্কল্পটি ঘোষণা করা বুদ্ধিমত্তার কাজ হইয়াছে, বলিতে পারি না। পৃথিবীতে এখন যত স্বাধীন ও পরাধীন দেশ আছে, কোথাকারও

গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকল বিষয়ে ভগবানের আদেশ অনুসারে চলিতে পারেন না। সুতরাং ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, যে, ভারতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই মন্ত্রটি জাহির করিয়া অবিবেচনা, নির্বুদ্ধিতা ও দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। এখানকার গবর্ণমেণ্ট যে খৃষ্টীয় গবর্ণমেণ্ট, তাহা অল্পদিন পূর্ব্বে আগ্রা-অযোধ্যার দেশী খৃষ্টীয়ানদের অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে তথাকার লাট মারিস্ সাহেব বলিয়াছিলেন; এবং খৃষ্টীয় শাস্ত্রেই আছে, "Do not take the name of God in vain," "পরমেশ্বরের নাম বৃথা লইও না।" আমাদের বিবেচনায় নোটে মন্ত্রটি ছাপায় এই আদেশ লঙ্ঘিত হইয়াছে। অধিকন্তু গবর্ণমেণ্ট সমালোচকদিগকে বিদ্রূপ করিবার একটি সহজ উপায়ও হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। কোন কিছু ভ্রম, অন্যায়, অত্যাচার, সরকারী লোকেরা করিলেই এখন লোকে বলিবে, "ইহাই কি স্বর্গের আলো?"

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ

কলিকাতায় সরকারী সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে একজন অধ্যাপককে শীঘ্র স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিতে হইবে। চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এম এ, পি এইচ ডি, সর্ব্বাংশে উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, ভারতবর্ষীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষজ্ঞ, অন্যান্য গ্রন্থ ব্যতীত ভারতবর্ষীয় দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে একটি ইংরেজী বহি লিখিয়াছেন যাহার প্রশংসা দেশবিদেশে হইয়াছে, যোগ সম্বন্ধীয় তাঁহার আরও একখানি ঐরূপ বহি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে, এবং শিক্ষাদান কার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। অধিকন্তু গৈলায় তাঁহাদের পারিবারিক চতুষ্পাঠীতে প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া প্রাচীন ও আধুনিক রীতি-অনুসারে সংস্কৃত নানা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া আসিতেছে, এবং তাহাতে ব্রাহ্মণ ছাত্রেরাও শিক্ষা পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু শুনা যাইতেছে, যে, তিনি বংশে ব্রাহ্মণ নহেন, বৈদ্য, এই কারণে তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইবে না। সেকালে প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কায়স্থ হইয়াও সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন। কাউয়েল সাহেব বিলাতে জন্মিয়া ও শিক্ষালাভ করিয়া এবং হিন্দু না হইয়াও ঐপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এখন কি গবর্ণমেণ্ট বা দেশের লোক বা দেশী মন্ত্রীরা আগেকার লোকদের চেয়ে অনুদার ও সঙ্কীর্ণমনা হইবেন? অধ্যাপক ম্যাক্স্-মূলার বিদেশ হইতে অনুবাদ সহ ঋগ্বেদ প্রকাশ করিয়া, বেদ কে পড়িতে ও পড়াইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কুসংস্কারের মূল উচ্ছেদ করিয়াছেন। এখন নূতন করিয়া, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ সংস্কৃত পড়াইতে বা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা করিতে পারিবে না, এইরূপ মনে করা সঙ্কীর্ণতা ও মূর্খতা ভিন্ন আর কিছু নয়।

সর্ব্বাপেক্ষা যুগপৎ হাস্যকর ও শোচনীয় গুজব এই, যে, একজন ইংরেজ অধ্যাপকের এই পদটি পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইনি বোধ করি সংস্কৃতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত—যদিও তাহার কোন প্রমাণ প্রকাশ পায় নাই। এবং সম্ভবতঃ ইনি জাতিস্মর, পূর্ব্বজন্মে বেদজ্ঞ ও কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, যদিও, সেই কারণে তিনি ব্রাহ্মণসভা কর্তৃক পাংক্তেয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন কি না, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

বেকার-সমস্যা

কিছুদিন হইতে বেকার-সমস্যা লইয়া বক্তৃতা ও লেখা-লেখি চলিতেছে। দেশভেদে বেকার-সমস্যার কারণ ও সমাধান বিভিন্ন হইবে। যদি দেখা যায়, যে, কোন দেশে কোন শ্রেণীর লোকই ধনী বা সচ্ছল অবস্থাপন্ন নহে, সেখানকার বেকার-সমস্যার কারণ ও প্রতিকার এক রকমের হইবে, কিন্তু যদি দেখা যায়, যে, কোন দেশের মূল বাসিন্দারা অন্ন পাইতেছে না, কিন্তু বিদেশ হইতে ও ভিন্ন প্রদেশ হইতে লোকেরা আসিয়া বেশ রোজগার করিতেছে, এবং কেহ কেহ লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইতেছে, তাহা হইলে সে দেশের বেকার-সমস্যা ও তাহার সমাধান অন্যবিধ হইবে।

আমাদের বাংলাদেশ শেষোক্ত প্রকারের দেশ। এখানে মধ্যবিত্ত ও গরীব লোকই বেশী, ধনী খুব কম। ধনী বলিয়া পরিচিত জমিদারদের অনেকে ঋণগ্রস্ত। এখানে বিদেশী স্কচ, ইংরেজ, ও অন্যান্য ইউরোপীয়েরা আসিয়া

ধনী হয়, ভিন্ন প্রদেশের মাড়োয়ারী ভাটিয়া কচ্ছী পাঞ্জাবী কাশ্মীরী মান্দ্রাজী দিল্লীওয়ালা ধনী হয়, মধ্যপ্রদেশ আগ্রা অযোধ্যা বিহার ওড়িষা ছোটনাগপুরের মজুর কুলি ও নানাবিধ মিস্ত্রী রোজ্‌গার করিয়া অন্ন পায় ও সঞ্চয় করে; কিন্তু মধ্যবিত্ত ও গরীব বাঙালী খাইতে পায় না। ইহার কারণ কি? অন্য দেশের ও প্রদেশের লোকেরা যে-সব কাজ করিতে সমর্থ ও ইচ্ছুক, আমরা সে-সব কাজ করিতে সমর্থ নহি কিম্বা ইচ্ছুক নহি, সাধারণভাবে বলিতে গেলে বেকার-সমস্যার ইহা একটি প্রধান কারণ। আর একটি কারণ এই, যে, বাঙালী ভদ্রলোকেরা যে-রকম কাজ চান সেরূপ কাজের ক্ষেত্রে কাজের সংখ্যার চেয়ে উমেদার হইয়াছে বেশী। কেরানীগিরি, শিক্ষকতা, ওকালতী বাঙালী ভদ্রলোকদের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় ও দোকানদারীতে পাস্ হয় এত বেশী, যে, বঙ্গে এত কেরানী শিক্ষক ও উকীলের কাজ জোটে না। তাহার উপর আর-এক কারণ এই হইয়াছে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সস্তা প্রথমশ্রেণীর পাসের সার্টিফিকেটের কৃপায় বাঙালী ছাত্রেরা ভাল ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে শিখে না; তাহাদের তরুণ-শিক্ষকেরাও আগেকার শিক্ষকদের চেয়ে এবিষয়ে নিকৃষ্ট। সুতরাং ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে অধিকতর অভ্যস্ত ও দক্ষ মান্দ্রাজী কেরানীরা বাঙালীদের জায়গা দখল করিতেছে।

বাংলাদেশে ইস্কুল পাঠশালার সংখ্যা আরও খুব বাড়িবার জায়গা আছে। তাহা বাড়াইলে ও পাঠশালার গুরুমহাশয়দের বেতন পর্য্যন্ত পল্লীগ্রামে গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে যথেষ্ট করিয়া দিলে অনেকের বেকার অবস্থা ঘুচিতে পারে। বাঙালীর ইংরেজী বলা ও লেখার শিক্ষা উৎকৃষ্টতর হইলে, বাঙ্গালায় যে-সব কেরানীগিরি অন্য-প্রদেশের লোকেরা পাইতেছে, তাহা বাঙালী পাইতে পারে। পুলিসের কাজ আগে হইতে এরূপভাবে চলিয়া আসিতেছে, যে, এখনও পুলিস্ বিভাগের বদ্‌নাম আছে। কিন্তু বস্তুতঃ পুলিসের কাজের আদর্শ যাহা, তদনুসারে কোন কর্ম্মচারী চলিতে পারিলে, অন্যসব ভদ্রলোকের মত তিনিও সম্মানার্হ। এমন কি, পুলিস্‌বিভাগ যদি ইংরেজের রাজনৈতিক প্রভুত্ব যে-কোন উপায়ে বজায় রাখিবার উপায় স্বরূপে ব্যবহৃত না হয়, এবং যদি কন্‌ষ্টেবল্ ও হেড্ কন্‌ষ্টেবল্‌রা উপরওয়ালাদের নিকট হইতে ভদ্র ব্যবহার ও বর্ত্তমান অপেক্ষা কিছু বেশী বেতন প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ইস্কুলকলেজে-পড়া ছেলেদেরও কন্‌ষ্টেবল্ হেড কন্‌ষ্টেবল্ হওয়াতেও কোন আপত্তি হওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে বিহার হইতে ঐসব কাজের জন্য লোক আম্‌দানী করিতে হয় না। ব্যাধিসঙ্কুল বঙ্গে আরও বিস্তর শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন। চিকিৎসাশিক্ষালয় বাড়াইয়া চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়াইতে পারিলে অনেকের রোজ্‌গারের উপায় হয়।

এসব গেল চাকরীর ও বিদ্যাসাপেক্ষ কাজের কথা। কিন্তু চাকরীর বা একপ কাজের সংখ্যা যতই বাড়ুক, তাহাতে বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে না। মাড়োয়ারী প্রভৃতি ভিন্ন-প্রদেশাগত ভারতীয়েরা বঙ্গে চাকরী করে না। তাহারা করে, ছোট বড় নানা রকমের ব্যবসা। বাঙালীকেও তাহা করিতে হইবে। তাহারা যে সবাই দশ বিশ হাজার বা দু লাখ পাঁচ লাখ টাকা মূলধন লইয়া কার্‌বার আরম্ভ করে, তাহাও নহে। খুব অল্প মূলধন, এমন কি সামান্য কয়েক-আনা পয়সা, লইয়াও অনেকে কাজ আরম্ভ করে, এবং পরে ধনী হয়। আসল কথা হইতেছে এই, যে, সামান্যভাবে কাজ আরম্ভ করিতে রাজী হইতে হইবে, সামান্য শারীরিক শ্রমের কাজকে অবজ্ঞা করিলে কিম্বা লজ্জাকর মনে করিলে চলিবে না। যদি বাড়ী বাড়ী কাপড় ফেরী করিতে হয়, নিজে কাপড়ের বোচ্‌কা বহিতে রাজী হইতে হইবে। সাধারণ কেরানী ও শিক্ষকদের চেয়ে রাস্তার ধারের পান লেমনেড সর্‌বৎ বিক্রেতারা বেশী রোজ্‌গার করে। বাঙালীর ছেলেরা এরকম কাজ করিলে দোকান ও জিনিষ বর্ত্তমান দোকানদারদের চেয়ে বেশী স্বাস্থ্যকর রাখিতে পারা উচিত। লজ্জা করিলে চলিবে না। দু-চার বার অকৃতকার্য্য হইলেও নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। বিনা বিচারে চিরাগত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া না-চলিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া চলা উচিত। কলম একটি লিখিবার যন্ত্র। কলম দিয়া লেখা দৈহিক পরিশ্রমের কাজ, যদিও কাজের প্রকৃতি অনুসারে ইহাতে অধিক বা অল্প

মস্তিষ্ক চালনাও করিতে হয়। কিন্তু নকল করার কাজে বেশী বুদ্ধি খাটাইতে হয় না। কলম নামক যন্ত্র দিয়া লিখিতে লিখিতে যেমন হাতে ব্যথা ধরে, তেমনি ছুতারের কোন যন্ত্র চালাইতে চালাইতেও হাতে ব্যথা ধরে, এবং ছুতারের কাজেও কাজের প্রকৃতি অনুসারে অধিক বা অল্প মাথা ঘামাইতে হয়। বর্ত্তমানে ভাল নকলনবীস্ অপেক্ষা ভাল ছুতার পাওয়া কঠিন, এবং তাহার বেতনও বেশী। অথচ নকলনবীসের কাজ ভদ্রলোকের কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়, ছুতারের কাজ ভদ্রলোকের কাজ বিবেচিত হয় না।

বহু বৎসর ধরিয়া তর্ক চলিয়া আসিতেছে, যে, তাজ-মহলের নক্সা কে আঁকিয়াছিল এবং কে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কয়েকদিন আগেও দৈনিক কাগজে এই তর্ক উঠিয়াছিল এবং একজন আর্ম্মানী লেখক লিখিয়া-ছিলেন, যে, উহা আর্ম্মানী স্থপতির কীর্ত্তি। এত তর্ক-বিতর্কের কারণ কি? কারণ এই, যে, তাজ নির্ম্মাণ এমন একটি অমর কীর্ত্তি যে নানা জাতির লোকে উহা নিজেদের বলিয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে। ইউরোপীয়েরা উহা ভারতীয়দের বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেছে না। কেন না, স্থাপত্যের এই আশ্চর্য্য নমুনা যাহাদের প্রতিভাপ্রসূত, তাহাদিগকে নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া অবজ্ঞা করা চলে না। স্থাপত্য সংস্কৃত কথা, শুনায় বেশ ভদ্রগোছের। কিন্তু উহার সোজা বাংলা রাজমিস্ত্রীর কাজ—তখন উহা আর "ভদ্র" থাকে না! সংস্কার এমনই প্রবল!

ছবি আঁকা পটুয়ার কাজ। অথচ ইউরোপের সেকালের এক এক পটুয়ার আঁকা এক একখানা ছবি লাখ লাখ টাকায় বিক্রী হয়। ভাগ্যে আমাদের বাংলায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্রেরা ছবি আঁকিতে আরম্ভ করেন, তাই লোকে "চিত্রশিল্পী"র কাজটাকে অবজ্ঞা করিতে পারেন নাই। পরে "প্রবাসী" চিত্রকর কথাটাও ভদ্রসমাজে চালাইয়াছে। যখন পটুয়া কথাটি চালাইবে, তখন আর যিনি যাহাই মনে করুন, ইহা নিশ্চিত, যে, রসিক অবনীন্দ্রনাথ খুসি হইবেন।

মানুষের যা কিছু আছে, সবই ভগবানের দেওয়া। তাহার মধ্যে দেহটাকে খাটাইলে তাহা হইবে "ছোট লোকের" কাজ (কিন্তু দেহের অংশ হাতের দ্বারা মসীযন্ত্র চালাইলে নহে), আর মনটাকে খাটাইলে তাহা ছোটলোকের কাজ হইবে না; এমন কি যদি কোন রাজনৈতিক, ব্যবহারাজীব, বা বণিক্ মস্তিষ্কের সাহায্যে মিথ্যাচরণ করেন, তাহাও ছোটলোকের কাজ হইবে না!

কেবল যে আমাদের দেশেই মধ্যবিত্ত লোকেরা দৈহিক শ্রমকে "ভদ্র" বিবেচনা করেন না, তা নয়; বিলাতেও এরূপ মনে করিবার লোক আছে, আমেরিকাতেও আছে—যদিও আমাদের দেশের মত এত বেশী নয়। আমেরিকার মধ্যবিত্ত লোকদের বেকার-সমস্যার কতক সমাধান কি প্রকারে হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্যাথলিক্ হেরাল্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া কাগজ নিউইয়র্কের সরকারী শ্রমিক বিভাগ (New York Labour Department) কর্ত্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট্ হইতে নিজের মন্তব্য সহ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

In this respect, the New York Labour Department has recently issued a very instructive and hopeful report. It declares that "unemployment for those who labour with their hands is now practically non-existent. Everywhere a shortage of workers is increasingly discernible.

"This gratifying condition, so strikingly in contrast with the state of affairs in Europe, is leading to a curious social revolution. The male clerk, abandoning his old-fashioned notions of respectability, is discarding 'the badge of the white collar' and donning in its stead overalls. After generations of well-clothed indigence, he has discovered that a manual occupation offers him a life infinitely more care-free and decidedly more prosperous than a seat at an office desk.

"The emancipation of the clerk is due to two factors the restriction of immigration and the competition offered by legions of capable girl stenographers and typists. It is evidenced by the sudden appearnace, in New York and other large cities, of numerous schools of training organized

by the Y. M. C. A., by the Knights of Columbus, and by the Bureau of Veterans.

"In these establishments may be seen thousands of clerks and small businessmen who are taking classes in electrical installation, plumbing, lighting, and other crafts. 'Learn trades that will pay you good wages,' is the advice given by the Vocational Advisory Board to the huge brigade of clerical workers."

এই পরামর্শ বঙ্গের যুবকদেরও শোনা উচিত।

চাষ করিবার পরামর্শও অনেকবার অনেকে দিয়াছেন। তাহাতে তরুণ ভদ্র বাঙালীরা মনে করেন, যে, অনেক শত বা হাজার বিঘা জমী লইয়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্র চালাইয়া ও মজুর খাটাইয়া কিছু করিতে পারিলে কাজের মত কাজ হয়। যাঁহারা ইহা করিতে পারিবেন, তাঁহারা করুন, ইহা ত ভালই। কিন্তু সামান্য জমী লইয়া নিজে মজুরের কাজ করিয়া কিছু করিব, তরুণ বাঙালী এই প্রতিজ্ঞা করিলে ও তাহা দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সহিত পালন করিলে তবে দেশের কল্যাণ হইবে। ফল আহার আজকাল খুব চলিত। কলা, পেঁপে, পেয়ারা, আম, বাজারে খুব কাটে। পটল, বেগুন, কুমড়া, শাক প্রভৃতি তরকারীরও কাট্‌তি বেশ। এসবই নিজে খাটিয়া এবং তাহার সঙ্গে মজুর লাগাইয়া আর্জান যায়। কিন্তু সাধারণ ধান কলাই প্রভৃতির চাষও ভদ্রলোকেরা নিজে করিতে পারেন।

ফিরিঙ্গী (Anglo-Indian or Eurasian) সমাজেও বেকার-সমস্যা খুবই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজদের একখানা দৈনিকে ইহার আলোচনা খুব চলিতেছে। সেই উপলক্ষে কেহ কেহ বলেন, যে, ফিরিঙ্গীরা নিজে মজুরী করিতে পারিবে না, মজুর খাটাইবে; সুতরাং যাহারা নিজের হাতে চাষ করে, তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিবে না। তাহাতে ক্যাথলিক্ হেরাল্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন—

"We know of one young Anglo-Indian, who, after six months' unemployment in Calcutta, got hold of three bighas of land along the E. B. Railway and to-day makes a decent living out of the vegetables he sends every morning into the city. He is a happy and healthy peasant now, and finds he can quite well do without taxis, and cinemas, and pegs and dances at the club. But it isn't the Anglo-Indian and Domiciled European Association that has done it for him, he has done it himself. And there is room for a few thousand more of these young bloods; by settling on the land, they would not only save themselves and their race but put some pep into the Bengal peasantry who are dying of staleness. Charity is the healthiest form of egoism, and the Anglo-Indian will save himself by forgetting all about himself and trying to save others."

আমরা শিক্ষিত ভদ্র তরুণ বাঙালীকে ঠিক্ এই কথাই বলিতে চাই।

আমাদের স্কুল-কলেজগুলিতে নানাবিধ বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয় না, পণ্যশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় না, ইত্যাদি অভিযোগ শুনা যায়। অভিযোগ সত্য, এবং এইরূপ শিক্ষা দিলে ভাল হয়, তাহাও সত্য। কিন্তু বঙ্গের বাহির হইতে যে-সব ভারতীয় লোক আসিয়া নানা ব্যবসা ও নানা রকম মিস্ত্রীগিরি করিয়া রোজগার করিতেছে, তাহারা স্কুল কলেজে তাহা শিখিয়া আসে নাই, কাজে লাগিয়া শিখিতেছে। আগে হইতে শিখিয়া আসিলে অবশ্য আরও ভাল হইত। আসল বাধা হইতেছে, বাঙালী এসব কাজ পছন্দ করে না, এবং আয়ের অনিশ্চয়তা সহ্য করিতে পারে না; তার চেয়ে একটি চেয়ারে বা টুলে বসিয়া কেরানীগিরি করিয়া মাসান্তে নিশ্চিত ১৫।২০।২৫ টাকা বেতনপ্রাপ্তি ভাল মনে করে। মনের এই অবস্থার পরিবর্তন না হইলে, এখন যদি কৃষিস্কুল-কলেজ, বাণিজ্যস্কুল-কলেজ, এবং নানা পণ্যশিল্পের স্কুল-কলেজ খোলা হয়, তাহা হইলে ছেলেরা তাহাতে শিক্ষা পাইবার পরও সেই চিরাগত চাকরীর উমেদারীর পথই অবলম্বন করিবে। তাহাতে বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে না।

সাধারণ অশিক্ষিত বাঙালীরা অন্য প্রদেশের ঐ শ্রেণীর লোকদের মত শ্রম করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ হইলে তবে তাহাদের বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে।

ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ

গয়ার কংগ্রেসে অধিকাংশ প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের বিরুদ্ধে মত দেন এবং অল্প অংশ উহার সপক্ষে মত দেন। ফলে চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতীলাল নেহ্‌রু, প্রভৃতি নেতাগণ "স্বরাজ্য দল" গঠন করেন, এবং ঐদলের লোকেরা যাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু তাঁহারা ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। গয়া কংগ্রেসের একটি প্রস্তাব অনুসারে ভোটারদিগকে এই পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল, যে, তাঁহারা যেন কৌন্সিলপ্রবেশার্থীদিগকে ভোট না দেন। এই প্রস্তাব অনুসারে যদি অসহযোগী সম্পাদকেরা কলম চালাইতে এবং অসহযোগী বক্তারা বক্তৃতা করিতে থাকেন, তাহা হইলে কৌন্সিলপ্রবেশার্থী স্বরাজ্যওয়ালাদের অভীষ্টসিদ্ধির পথে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। সেইজন্য তাঁহারা নিখিলভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে একটি প্রস্তাব ধার্য্য করাইয়াছেন, যে, কংগ্রেস দলের কেহ কৌন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে গয়ার নির্দ্ধারণ অনুসারে যেন কিছু না বলেন বা না লেখেন। কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ উহার কমিটির পক্ষে উঠাইয়া দেওয়া অবৈধ হইয়াছে। "কংগ্রেস-দলের দুই উপদলের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় উহার প্রভাব কমিয়া গিয়াছে; এই হেতু ঐ প্রভাবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা এবং উভয় উপদলের বিরোধে যে কর্ম্মশক্তির অপব্যয় হইতেছে, তাহা নিবারণ করিয়া কংগ্রেসের প্রকৃত কর্ম্মে সকলকে প্রবৃত্ত করা," নিখিলভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল! উদ্দেশ্য যে কিরূপ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা খবরের কাগজের পড়ুয়া মাত্রেই জানেন। উভয় উপদলের নেতা, উপনেতা, প্র-নেতা, প্রোপনেতা, অপনেতা, প্রভৃতিদের বক্তৃতা, লেখা প্রভৃতির জ্বালায় মানুষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। আসল যাহা দেশের কাজ তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। মডারেট্‌রা কৌন্সিল প্রবেশ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন; কিন্তু তদুপলক্ষ্যে এরূপ দক্ষযজ্ঞ তাঁহারা করেন নাই। অথচ স্বরাজ্যদলের লোকেরা কৌন্সিলে গিয়া মডারেট্‌দের চেয়ে বেশী কিছু করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

স্বারাজ্যিকেরা কৌন্সিলে গিয়া কি নীতি অনুসারে কাজ করিবেন, সে বিষয়েও তাঁহারা একমত নহেন। প্রথম প্রথম শোনা গিয়াছিল, তাঁহারা সরকারী বিল্ আদি যাহা কিছু সবগুলারই বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। তাহার পর শোনা যাইতেছে, তাঁহারা ব্যতিহার ও সহযোগিতা করিবেন; অর্থাৎ সরকার লোকহিতকর কিছু করিলে সহযোগিতা করিবেন, তাহা না হইলে প্রতিকূল আচরণ করিবেন। সব কিছুরই বিরুদ্ধাচরণ যে ন্যায়সঙ্গত নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। অবশ্য সরকারী ভাল বিল্ বা অন্যান্য প্রস্তাবেরও বিরুদ্ধাচরণ ধর্ম্মসঙ্গতভাবেও করা যায় এই বিশ্বাস থাকিলে, যে, গবর্ণ্‌মেণ্টের প্রধান এবং আসল অভিপ্রায় আমাদের হিত নহে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি, এবং সেই আসল অভিপ্রায়টাকে চাপা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ভাল কিছু কিছু জিনিষ প্রস্তাবিত হয়। এই বিশ্বাস যাঁহাদের আছে, তাঁহারা গবর্ণ্‌মেণ্টের সব কিছুর বিরোধিতা করিতে পারেন। কিন্তু গবর্ণ্‌মেণ্টের গূঢ় অভিপ্রায় যাহাই হউক, কোন কোন সরকারী আইন, নিয়ম ও কাজের দ্বারা লোকদের যে সুবিধা বা কল্যাণ হয়, সেই সুবিধা যদি বেসরকারীভাবে অসহযোগীরা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সরকারী সব কিছুর বিরোধিতা শোভা পায়। যাহা হউক, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত, যে, স্বারাজ্যিকেরা কৌন্সিলগুলির অধিকাংশ আসন দখল করিতে পারিবেন না, এবং সরকারী সব কিছুর বিরোধিতা করিতে চেষ্টাও করিবেন না, বা, করিলেও সিদ্ধকাম হইবেন না। তাহা হইলে বাকী থাকে, কোন কোন বিষয়ে সরকারের প্রতিকূলতা ও কোন কোন বিষয়ে সহযোগিতা করা। ইহাও বরাবরই মডারেট দলের সৎ ও স্বাধীনচেতা সভ্যেরা করিয়া আসিতেছেন। ইহার জন্য লেখার ও বক্তৃতার কথার কচকচিতে দেশটাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার কি দরকার ছিল?

আর একটা কথাও বলি। সরকারী ও সরকারের জানিত স্কুল কলেজ পরিহার, সরকারী আদালত বর্জ্জন,

এবং ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন, এই তিনটি অসহযোগের প্রধান অঙ্গ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।

হাজার হাজার ছেলে স্কুল কলেজ ছাড়িয়াছিল। তাহার পর তাহারা যখন নিরাশ হইয়া আবার সেই-সব স্কুল-কলেজে গেল, তখন বা তাহার পূর্ব্বে ত কংগ্রেসে বা তাহার কোন কমিটিতে তাহার সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রস্তাব ধার্য্য হয় নাই? তাহার কারণ বোধ হয় এই, যে, "শিক্ষা অপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু স্বরাজ অপেক্ষা করিতে পারে না," এবং সেইজন্য ছাত্রদিগকে বলি দেওয়া বা জবাই করায় কোন দোষ নাই!

অল্পসংখ্যক উকীল মোক্তার ব্যারিষ্টার আদালতে আইনের ব্যবসা করা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও আদালতে যাইতেছেন না। কিন্তু অনেকেই আবার আইনের ব্যবসাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তা ছাড়া, প্রায় প্রথম হইতেই অনেক অসহযোগী—এমন কি নেতৃস্থানীয় কেহ কেহও—আদালতে অভিযুক্ত হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন বা আইনজীবী লাগাইয়া সমর্থন করাইয়াছেন। যাঁহারা আইনের ব্যবসা আবার করিতেছেন, এবং যাঁহারা অভিযুক্ত হইয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন বা করাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে দোষ দিতেছি না, দোষ দিবার জন্য এসব কথা লিখিতেছি না। কেবল ইহাই বলিবার জন্য লিখিতেছি, যে, অসহযোগিতার আদালতবর্জ্জন-রূপ অঙ্গটি সম্বন্ধেও কংগ্রেসে ও তাহার কমিটিতে কোন প্রস্তাব ধার্য্য হয় নাই, বা দেশে তেমন কিছু বিতণ্ডা হয় নাই, যেমন কৌন্সিল প্রবেশ লইয়া হইয়াছে ও হইতেছে।

অসহযোগিতার দুটি অঙ্গ লইয়া দেশে ঝড় বহান হইল না; তৃতীয়টি লইয়া এত মাতামাতির একান্ত প্রয়োজন ছিল কি?

স্বারাজ্যিকেরা যদি সোজাসুজি কৌন্সিলে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেন, যেমন অসহযোগী ছেলেরা আবার স্কুল-কলেজে ঢুকিয়াছে ও অসহযোগী আইনজীবীরা অনেকে আবার নিজ নিজ ব্যবসা করিতেছেন, তাহা হইলে কোন বেদ বাইবেল কোরান অশুদ্ধ হইত কি? আমাদের অনুমান এই যে, তাহা হইলে দেশে এত ঝগড়া হইত না।

কৌন্সিল প্রবেশের ভালমন্দ, ফলাফল, প্রয়োজন বা অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা আগে আগে অনেক লিখিয়াছি। বেশী পুনরুক্তি করিব না। কৌন্সিলের সভ্যেরা জ্ঞানবান্ বুদ্ধিমান্ পরিশ্রমী সৎ ও সাহসী হইলে দেশের কাজ কিছু করিতে পারেন, এবং অনিষ্টনিবারণও কিছু করিতে পারেন; কিন্তু বেশী ও প্রধান ইষ্ট করিতে পারেন না, বেশী এবং প্রধান অনিষ্ট নিবারণ করিতে পারেন না। গবর্ণ মেণ্ট্ কে পুনঃপুনঃ ভোটে পরাজিত করিয়া সভ্যেরা দেশমতকে কার্য্যতঃ জয়ী করিতে পারেন নাই, গবর্ণ্-মেণ্ট্ কে অধিকাংশ সভ্যের মত অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য করিতে পারেন নাই। কারণ, ভারতশাসন-সংস্কার আইনটি এমন চাতুরীর সহিত বিধিবদ্ধ হইয়াছে, যে, শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব ঠিক পূর্ব্ববৎ বজায় আছে। এই-সব কথা জানিয়া বুঝিয়া যদি কেহ কৌন্সিলে যাইতে চান, যান। তাহা লইয়া এত চেঁচামেচির দরকার কি?

আমরা আগেই বলিয়াছি, যে, স্বরাজ্যিকেরা কৌন্সিলে গিয়া মডারেট্‌দের চেয়ে বেশী কিছু করিতে পারিবেন না। তাঁহারা যদি দলে পুরু হন, তাহা হইলে, মডারেট্‌রা গবর্ণ মেণ্ট্ কে যতবার ভোটে হারাইয়াছেন, তাঁহারা না হয় তার চেয়ে বেশী বার হারাইবেন। কিন্তু তাহাতে গবর্ণ্-মেণ্টের কি আসে যায়? গবর্ণ মেণ্ট্ হারিলেও অধিকাংশ সভ্যের মত অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য নহেন। ছেলে-দের বিতর্ক-সভার হার-জিতের অবসাদ-উল্লাসের অভিনয় বৃহত্তর ক্ষেত্রে হইলে দেশ খুব বেশী অগ্রসর হইবে না। দেশ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রসর হইত, কর্ম্মীদের যে শক্তি ও সময় বিরোধে, হুজুকে, পৌরুষ-প্রদর্শনে ব্যয়িত হইতেছে, যদি কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যে তাহার সহস্রাংশের এক অংশও ব্যয়িত হইত। কিন্তু তাহাতে নেতৃবৃন্দের ও অনুচরবৃন্দের তেমন মন নাই।

—

দুরকমের সাহস

চৌকস্ মানুষ বেশী নাই। যে-সব ভারতীয় মানুষ স্বরাজের জন্য অম্লানবদনে কারাদণ্ড, বেত্রদণ্ড, নির্ব্বাসন-দণ্ড ও আনুষঙ্গিক নানা ভীষণ যন্ত্রণা গ্রহণ ও সহ্য

করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি, বন্দনীয় মনে করি; তাঁহাদের সকলে যে বাহবার করতালির জন্ত এত সহিয়াছেন, তাহাও নহে। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে এত পৌরুষ থাকা সত্ত্বেও ইঁহাদের অধিকাংশ সমাজের ভয়ে ভীত। তাঁহাদেরই মত হাত-পা-আত্মা-বিশিষ্ট কোন কোন মানুষকে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ছুঁইতে পারেন না, তাহাদের ছায়া মাড়াইতে পারেন না, তাহাদের নিকটস্থ হইতে পারেন না, তাহাদিগকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারেন না, তাহাদের দেওয়া জল খাইতে পারেন না, তাহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে পারেন না। অথচ অস্পৃশ্যতা দূর করিবার প্রস্তাবের সপক্ষে ইঁহারা ভোটও দিয়াছেন।

অন্তদিকে, সমাজভয়ে ভীত নহেন, অহিতকর দেশাচারকে অগ্রাহ্য করেন, এমন বিস্তর লোক সমাজ দ্বারা খুব বেশী উৎপীড়িত হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ভীত না হইয়া অটল আছেন এবং সারা জীবন কুসংস্কার ও কদাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। ইঁহাদের যে সাহস আছে, পৌরুষ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইঁহাদেরও অনেকে রাজনিগ্রহকে অত্যন্ত বেশী ভয় করেন; রাজকর্ম্মচারীর ও আইনের ভয়ে যেন একেবারে তটস্থ।

যাঁহার যে-দিকে সাহস আছে, তাহার জন্তই তিনি প্রশংসার্হ। নানা কারণে সকল মানুষের সব দিকে সাহস থাকে না। কিন্তু বিচার দ্বারা এবং মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে সকল দিকে সাহসী হওয়া যায়। সাহস বা ভীরুতা কতটা স্বাভাবিক এবং কতটাই বা শিক্ষা, সংসর্গ, আবাল্য-প্রভাব প্রভৃতি হইতে জাত সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যায় না। কিন্তু অনুশীলন দ্বারা যে সাহস বাড়িতে পারে, তাহার সাক্ষ্য অনেকেই দিতে পারিবেন।

—

সম্মতির বয়স

বালিকারা যত বয়সে নিজেদের পার্থিব সম্পত্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা কম বয়সে অমূল্য নারীধর্ম্মনাশে সম্মতি দিতে পারে, ইহা বর্ত্তমান ব্রিটিশ-ভারতীয় আইনের একটি অদ্ভুত বিধি। এই বয়স বাড়াইবার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট লোকমত জানিতে চান। নারীর সম্মতির বয়স একুশের কম হওয়া উচিত নয়, ন্যূনকল্পে আঠার।

—

বিদ্যালয়ে শিশুপালন শিক্ষা

এদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীদের মধ্যে অনেকের এই চমৎকার ধারণা আছে, যে, পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা লিখিতে পড়িতে শিখিয়া কেবল আরামকুর্সীতে বসিয়া উপন্যাস পড়ে, বা পিয়ানো বাজায়, কিম্বা পোষাকের দোকানে গিয়া নূতন নূতন ফ্যাশ্যানের পোষাক কেনে। কেহ কেহ যে এই রকম করে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা

কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীলোক এরূপ করিলে পাশ্চাত্য দেশসকলের গৃহকর্ম্ম কে করিয়া দেয়? আমাদের দেশ হইতে ত কোটি কোটি ঝি তথায় যায় না। তা ছাড়া, সন্তানপালন আমাদের দেশের চেয়ে পাশ্চাত্য দেশ-সকলে যে ভালই হয়, তাহার একটা ভাল প্রমাণ এই, যে, শিশুমৃত্যু আমাদের দেশে যেরূপ ভীষণ, পাশ্চাত্য কোন দেশেই তেমন নয়।

আততায়ীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা

আমেরিকার অনেক কলেজে ছাত্রীদিগকে শিশুপালন কার্য্যতঃ শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে যে ছবিটি আমেরিকার একখানি কাগজ হইতে দেওয়া হইল, তাহা একটি সত্যিকার শিশু ও সত্যিকার ছাত্রীর। শিশুটির নাম জীন্ ক্রিষ্টি। ব্রুকিংস্ শহরের সরকারী কলেজের ছাত্রীদের যত্নে সে খুব সুস্থ আছে ও বাড়িতেছে। কলেজে একটি শিশু-ল্যাবরেটরী স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্রীরা ক্লাসে শিশুর যত্ন করা, শিশুমনস্তত্ব, গৃহস্থালি, শিশুকে খাওয়ান, প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা শিখে, এই ল্যাবরেটরীতে তাহা কার্য্যতঃ প্রয়োগ করে। এক এক টহ্‌রমে (term এ) জীন্ ছয় জন পালিকা "মাতা"র যত্নাধীন থাকে, অর্থাৎ তাহার এক এক "মা" প্রায় দুই সপ্তাহ ধরিয়া তাহার মাতৃত্ব করে। ছবিতে, তাহাকে ওজন করিয়া দেখা হইতেছে, যে, সে মোটা বা কৃশ হইতেছে কি না।

—

আত্মরক্ষা

ইংরেজের লেখা সব কেতাবেই পাওয়া যায়, যে, চোর-ডাকাতের উৎপীড়ন থেকে তারা ভারতবর্ষকে উদ্ধার ক'রে এদেশটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ করেছে। "আগে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যেতে হ'লে প্রাণ হাতে করে যেতে হ'ত, কিন্তু এখন......" ইত্যাদি। এই রকম বর্ণনার গুণে ইংলণ্ডের ইংরেজ ও অন্য পাশ্চাত্য দেশের লোকদের মনে হয়ত খুব আনন্দ হয়; কিন্তু তাতে গরীব ভারতবাসীর প্রাণ বাঁচে না। এ-গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়ার কথা দূরে থাকুক, এ-পাড়া থেকে আর-এক পাড়ায় যেতে গিয়ে গুণ্ডার আক্রমণে প্রাণ যায়—তাও রাজধানী কলিকাতায়! আর এদেশে ডাকাতির হিসাব রাখ্‌তে চেষ্টা করাও নির্ব্বুদ্ধিতা। অনেকস্থলে পুলিশ রক্ষক না ভক্ষক, এ বিষয়ে আমরা এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারিনি। আমাদের অন্যের উপর আশা না রেখে এখন স্বাবলম্বনই শ্রেয় মনে হয়। ছুরি-হাতে-গুণ্ডার হাত থেকে আত্মরক্ষা নানা উপায়ে করা যায়। কিন্তু সাহস ও ক্ষিপ্রতা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ছবিতে একটি উপায় দেখান হচ্ছে। ধরা যাক, গুণ্ডার ডান হাতে ছুরি। একটু বাঁ দিকে সরে' গিয়ে গুণ্ডার ছুরির হাতের মণিবন্ধে নিজের ডান হাতের মণিবন্ধ লাগিয়ে দিন। (১ম ছবি)। দ্বিতীয়তঃ নিজের বাঁ হাত তার হাতের

পিছন দিয়ে ঘুরিয়ে এনে নিজের ডান হাত ধরে ফেলুন। (২য় ছবি)। তার পর নিজের শরীরের ভর ও হাতের জোরে গুণ্ডাকে কাত করে ফেলুন। (৩য় ছবি)। ভাল করে' চাপ দিলে তার হাত ভেঙে যাবে। একজন বন্ধুর সঙ্গে এগুলি অভ্যাস করা দরকার। ছোরার বদলে এক টুক্‌রা কাঠ ব্যবহার করা যেতে পারে। অ. চ.।

—

জলকষ্ট

প্রতি বৎসরই বাংলাদেশে ভীষণ জলকষ্ট হয়। আগেকার কৃত্রিম জলাশয়গুলির কতক রাজাদের খনিত, কতক দেশের ধনী লোকদের খনিত। এখন যে জলকষ্টে লোকেরা ক্লেশ পায়, এবং নানাপ্রকার রোগ ভোগ করে, তাহার সমস্ত দোষটা দেশের লোকদের নহে, গবর্ণ্‌মেণ্টেরও নহে। আগেকার রাজারা যে বড় বড় হ্রদ, পুষ্করিণী, "বাঁধ" খনন ও নির্ম্মাণ করাইতেন, তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের সব প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়েও হায়দরাবাদের নিজাম, মৈসূরের মহারাজা প্রভৃতি নৃপতিরা রাজব্যয়ে সুবিশাল জলাশয় নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বাংলা দেশের কোথাও কোথাও আগেকার স্বাধীন নৃপতিদের খনিত জলাশয় দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলায় প্রাচীন মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরে যে "বাঁধ" নামক জলাশয়গুলি আছে, তাহা রাজাদের কীর্ত্তি। কালক্রমে বুজিয়া যাওয়া সত্ত্বেও ইহার অনেকগুলি দ্বারা এখনও বিষ্ণুপুরবাসীদের জলাভাব দূর হয়।

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় নৃপতিদের দৃষ্টান্ত অনুসারে ভারতীয় ব্রিটিশ গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ও জলকষ্ট দূর করিতে বাধ্য। এ বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব যতটা, তাহা তাঁহারা কাজের দ্বারা স্বীকার করেন না। ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড্, লোক্যাল বোর্ড্ এবং মিউনিসিপ্যালিটি-সমূহ এ বিষয়ে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্যক্‌রূপে পালনের চেষ্টা করেন না।

জাপানের সাধারণ মন্ত্রীরা বৎসরে বার হাজার টাকা বেতন পান; বঙ্গের মন্ত্রীরা পান চৌষট্টি হাজার। তাঁহারা বার হাজারে কাজ করিলে বাকী ৫২০০০এ বৎসরে ১৩টি করিয়া ছোট পুকুর হইত। তাহা হইলে তাঁহারা তিন জনে তিন বৎসরে ১১৭টি পুকুর দিয়া দেশের হিত করিতে পারিতেন।

আগে দেশের সম্পন্ন লোকেরা পুকুর দেওয়া একটি পুণ্যকর্ম্ম মনে করিতেন। ইহা কুসংস্কার নহে; পুকুর দেওয়া লোকহিতকর বলিয়া সত্যসত্যই পুণ্যের কাজ। বাংলা দেশের জমীদারেরা এখন আর পুকুর দেন না (২।৪ জন হয় ত দেন), পূর্ব্বপুরুষদের পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করান না, এমন কি প্রজারা পুকুর দিতে চাহিলে তাহাতেও আপত্তি! তাঁহারা অনেকে এখন কলিকাতার আরামই বেশী পছন্দ করেন। ভূমি সম্বন্ধে নূতন যে সংশোধিত আইন হইতেছে, তাহাতে এ বিষয়ে প্রজার অধিকার স্বীকার করিবার চেষ্টা হওয়ায় জমীদারদের পক্ষ হইতে আপত্তি হইয়াছে। সত্য বটে, যে, জমীদাররা অনেকে ঋণগ্রস্ত; কিন্তু তাহার জন্য দোষী প্রধানতঃ তাঁহারাই।

বোম্বাই অঞ্চলে যেমন খুব ধনী বণিক্ অনেক আছেন, বঙ্গে তাহা না থাকিলেও সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী, ব্যারিষ্টার, উকীল, চিকিৎসক প্রভৃতি আছেন। তাঁহারা নিজ নিজ পিতৃগ্রামে জলাশয় খনন ও রক্ষা করিলে লোকের জলকষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে দূর হয়।

গ্রামবাসীরা নিজেও দলবদ্ধ হইয়া পুকুর খনন ও পঙ্কোদ্ধার করিতে পারেন। কৃষি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যৌথ চেষ্টা করিবার উপায় একটি সরকারী আইন অনুসারে করা যায়। এরূপ চেষ্টা বাঁকুড়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে হইতেছে।

—

ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব

অনেক জেলায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। জলের অভাবে ইহা আরও বাড়িতে পারে। শীঘ্রই বর্ষা নামিবে, তাহার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। তাহাতে লোকে আশান্বিত হইবে।

জলাশয়সকলের ব্যবহার সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণ, অজ্ঞতা বা অন্য যে কারণেই হউক, বড় অসাবধান। কুয়া হইতে জল তুলিবার জন্য যে পাত্র ও দড়ি ব্যবহৃত হয়, তাহা

দূষিত হইয়াছে কি না, তাহা প্রায়ই দেখা হয় না। কূপের চারিদিকের নিকটস্থ জমি নানাপ্রকারে দূষিত করা হয়, তথায় ময়লা জল ঢালা হয়; সেই জল মাটির ভিতর দিয়া গিয়া কূপের জলে মিশিয়া তাহাকে দূষিত করে। পুকুরের জলে সকল রকমের রোগযুক্ত মানুষেরা স্নান করে, মুখ ধোয়, সকল রকমের ময়লা কাপড় কাচে, পুকুরের পাড় পায়খানা-রূপে ব্যবহৃত হয়, অন্য কারণেও পুকুরের জলের সঙ্গে বিষ্ঠামূত্র মিশ্রিত হয়; অথচ এই জলই আবার রন্ধনের ও পাকের জন্য ব্যবহৃত হয়! এইসব ঘৃণ্য ও ন্যক্কারজনক প্রথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মেরও বিরুদ্ধ। কিন্তু লোকে শাস্ত্রও মানে না, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মও মানে না। সুতরাং কোথাও কোন সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হইলে ও ভিন্নভিন্ন রকমের প্রয়োজনের জন্য ভিন্নভিন্ন জলাশয় না থাকিলে, তাহা বাড়িতে থাকে।

—

"স্বাস্থ্য"

ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর "স্বাস্থ্য-সমাচার" কয়েক বৎসর হইতে চলিতেছে। ইহা এখন বোধ হয় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহার পর ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী "স্বাস্থ্য" নাম দিয়া আর-একখানি মাসিক কাগজ বাহির করিয়াছেন। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তার আমাদের দেশে একান্ত আবশ্যক। ডাক্তার গাঙ্গুলীর কাগজটিরও বহুল প্রচার হইলে বাঙালী জাতির কল্যাণ হইবে।

—

আত্মোৎসর্গের মাপকাঠি

রাজনৈতিক আন্দোলন উপলক্ষ্যে গত কয়েক বৎসরে কয়েক জন ভারতীয় পুরুষ (প্রধানতঃ আইনজীবী) প্রভূত আয়ের পথ ছাড়িয়া দিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপৃত হইয়াছেন। এইরূপ স্বার্থত্যাগ সাতিশয় প্রশংসনীয়। মানুষ কোন প্রকার স্বার্থত্যাগ করিলে অপরের হৃদয়মনের উপর তাহার প্রভাব বিস্তৃত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ প্রভাবাধীন যাঁহারা হন, তাঁহারা স্বভাবতঃ মনে করেন, যে, স্বার্থত্যাগীদিগের কথার খুব মূল্য আছে, এবং তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করা ও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা লোকের কর্ত্তব্য।

কংগ্রেসের দুই উপদলের লোকদের মধ্যে যে তর্ক-বিতর্ক বাদপ্রতিবাদ চলিতেছে, তাহাতে এই মানসিক ভাবের আভাস পাওয়া যায়। এই বাদপ্রতিবাদে যোগ দিতে আমরা অনিচ্ছুক ও অসমর্থ। আমরা কেবল অন্য একটি কথার অবতারণা করিবার জন্য ইহার উল্লেখ করিলাম। সে কথাটি এই, যে, একজন মানুষ যে অগণিত মানুষের হৃদয়মনের উপর রাজত্ব করে, তাহা কি আর্থিক আয় ত্যাগের দ্বারা করে? আত্মোৎসর্গের এবং তজ্জনিত আধ্যাত্মিক প্রভাবের শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি কি আর্থিক ত্যাগ? অর্থাৎ যে যত টাকা বা টাকার আয় ছাড়ে, তাহার আত্মোৎসর্গের মূল্য—সুতরাং আধ্যাত্মিক প্রভাব—কি তত বেশী?

বুদ্ধদেব যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার আয় অপেক্ষা এখন অনেক বণিকের, জমিদারের, আইনজীবীর আয় বেশী। সুতরাং তাঁহার ত্যাগ আর্থিক হিসাবে খুব বেশী ছিল না। এবং আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া অগণ্য নরনারীর উপর তাঁহার অলৌকিক প্রভাবের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া কেহই স্থির করিতে চেষ্টা করেন নাই, যে, তিনি তাঁহার পিতা শুদ্ধোদনের উত্তরাধিকারী হইলে কত টাকাকড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তির অধিকারী হইতেন। তাঁহার মানসিক শক্তি, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, তাঁহার চরিত্র, তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহাকে মানবকুলে বরেণ্য করিয়াছে।

বাল্মীকি টাকাকড়ি খুব বেশী ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া ত মনে হয় না। অথচ সমগ্র-ভারতে বহুসহস্র বৎসর ধরিয়া তাঁহার কাব্য হিন্দুসমাজকে ও হিন্দুদিগকে গড়িয়া আসিতেছে।

তপোবনবাসী উপনিষৎকার অনেক ঋষির ত নামই জানা যায় না। কিন্তু মানবহৃদয়ের উপর তাঁহাদের রাজত্বের কখন অবসান হইবে না।

যীশুখৃষ্ট সংসারী হইলে ছুতারের কাজ করিয়া মাসে কয়েকটি টাকা রোজগার করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার চরণে অগণিত রাজা ও রাজাধিরাজ লুণ্ঠিত হইয়াছে।

মোহাম্মদ বরাবর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলে যীশুখৃষ্ট অপেক্ষা সম্ভবতঃ কিছু বেশী রোজ্‌গার করিতে পারিতেন। তাহা হইলেও তাঁহার আয় কলুটোলার ও মুর্গিহাটার অনেক দিল্লীওয়ালা মুসলমান সওদাগরের এবং বড়-বাজারের অনেক মাড়োয়ারী ব্যবসাদারের শতাংশের এক অংশও হইত না। কিন্তু মোহাম্মদের আধ্যাত্মিক প্রভাবের সহিত ইহাঁদের কাহারও প্রভাবের তুলনা হয় কি?

নানক পৈত্রিক দোকান চালাইলে, কবীর একাগ্রতার সহিত কেবল তাঁত চালাইলে, আজকালকার একজন উচ্চশ্রেণীর কেরানীর সমান আয়ও করিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহাদের আর্থিক ত্যাগের পরিমাণ তাঁহাদের প্রভাবের মাপকাঠি নহে।

চৈতন্য টোল করিলে ও সকলের চেয়ে বড় বিদায় পাইলেও আজকালকার কোন কোন কলেজের পণ্ডিতমহাশয়দের চেয়ে বেশী ধনী হইতে পারিতেন না। অধিকাংশ দিন হয় ত তাঁহাকে তিন্তিড়ীপত্রের ঝোল ও আতপতণ্ডুলের অন্নেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। সুতরাং তিনি যে প্রেমের বন্যা বহাইয়াছিলেন, তাহা পার্থিব সম্পত্তি ত্যাগের দ্বারা নহে, অপার্থিব ঐশ্বর্য্য সংগ্রহের দ্বারা। উৎকলের রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন যে জন্য, তাহা তাঁহার কোন কালের বাস্তবিক বা সম্ভাবিত আয় নহে।

যিনি যত বড় মানুষ হইয়াছেন, ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্ম-প্রীতি যাঁহার মধ্যে যত বিকশিত ও পরিস্ফুট হইয়াছে, মানুষের উপর তাঁহার প্রভাব তত গভীর, স্থায়ী ও বিস্তৃত হইয়াছে, এবং তাঁহার দ্বারা মানুষের তত কল্যাণ হইয়াছে।

—

বিরোধ ও শক্তি

আজকাল শোনা যাইতেছে, যে, বিরোধ না হইলে শক্তি জাগে না। কাগজে দেখিয়াছি, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এই কথা বলিয়াছেন। বিরোধ ঘটিলে বা ঘটাইলে এক রকম শক্তি জাগে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা অপেক্ষা বড় ও কল্যাণকর শক্তি জাগে, প্রেমে। মৈত্রী শক্তি অবশ্য সকলের মূলে। আমরা এখানে মানবীয় শক্তির বিষয়ই আলোচনা করিতেছি। মানুষদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের শক্তি যেরূপ প্রবল, স্থায়ী, গভীর ও ব্যাপক, আর কাহারও শক্তি সেরূপ নহে। এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের মধ্যেও যাঁহারা বিশেষরূপে মানবে ও অন্যজীবে প্রীতি প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রভাব অধিক।

অতএব প্রকৃত শক্তি জাগাইতে হইলে পতিতকে, হীনকে, অবনতকে, গরীব-দুঃখীকে ভালবাসিতে হইবে; রাজনৈতিক ভোট্‌-ধরা ফাঁদ নহে, প্রকৃত প্রেম চাই—যেমন বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্য প্রভৃতির ছিল। অবশ্য যদি শক্তিজাগরণের অভিনয় ও বাহ্য আড়ম্বর আবশ্যক হয়, তাহা বিরোধ হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা সত্য কথা, যে, আমাদের অধিকাংশ (প্রায় সব) রাজনৈতিক কর্ম্মী ইংরেজ গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে বা আম্‌লাতন্ত্রকে যতটা বিরোধিতার চক্ষে দেখেন, দেশের লোককে ততটা ভালবাসেন না। ভালবাসিলে দেশের চেহারা বদ্‌লাইয়া যাইত; এবং সর্ব্বাগ্রে সামাজিক অন্যায় অবিচার উৎপীড়ন লাঞ্ছনা দূরীভূত হইত।

যাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁহারা বিরোধের ভক্ত কেন, ন্যায়শাস্ত্রের ফাঁকি অনুসারে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা হইতে পারে। কিন্তু তাহা শুনিতে আমরা ব্যগ্র নহি।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠের "সঞ্জীবনী" "বিশ্ববিদ্যালয়-সঙ্কট" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা আজ ২৬শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি প্রধান দোষ। প্রথম দোষ ব্যক্তিবিশেষের একনায়কত্ব। দ্বিতীয় দোষ একনায়কত্বের ফলে অপব্যয়।

একনায়কত্বের দোষ দূর করিতে হইলে সিনেট-গঠন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। এখন শতকরা ৮০ জন সভ্য গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। ভাইস চেন্সেলার যাহাদিগকে পছন্দ করেন, কার্য্যতঃ তাঁহারাই গবর্ণ্‌মেণ্ট কর্ত্তৃক সিনেটের সভ্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ভাইস-চেন্সেলার সচরাচর এমন লোককেই সভ্য করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন যাঁহারা সকল বিষয়ে তাঁহাকেই সমর্থন করিবেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। সুতরাং একনায়কত্ব দূর করিতে হইলে শতকরা ৯০ জন সভ্য গ্রাজুয়েট,

কলেজের প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপক ও স্কুলের শিক্ষকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। শতকরা ১০ জনের বেশী গবর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হওয়া উচিত নয়।

বর্ত্তমান সময়ে সিণ্ডিকেটের অধিকাংশ সভ্য একের অনুগত। পোষ্ট্-গ্রাজুয়েট বিভাগের সমস্ত সভ্যই একের আজ্ঞাবহ। সুতরাং এক যাহা বলেন, সমষ্টি তাহাই মঞ্জুর করেন। সুতরাং আর্থিক অসচ্ছলতা কিছুতেই দূর হইতেছে না। একের রাজত্ব দূর করিতে পারিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কট দূর হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার করিবার জন্য এক আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে খসড়া আমরা দেখি নাই, জনসাধারণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ নাকি তাহা নামঞ্জুর করিয়াছেন; শুনা যায়, ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ নূতন এক খসড়া তৈয়ার করিয়াছেন। সেই খসড়ার দোষগুণ আলোচনার জন্য শিক্ষামন্ত্রী মিঃ প্রভাসচন্দ্র মিত্র এক মন্ত্রণাসভা আহ্বান করার প্রস্তাব করেন। সেই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন, ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন এবং শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁহার সেক্রেটারী মিঃ জে, এন, রায় উপস্থিত থাকিবেন, এইরূপ প্রস্তাব করা হয়।

সিণ্ডিকেট শিক্ষামন্ত্রীর পত্রোত্তরে লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার আয়ু শীঘ্র শেষ হইবে; এই ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন আলোচিত হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার বোঝা সহজ নহে। উহার আদ্যন্ত বুঝিতে অনেক সময় লাগিবে, অতএব বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভায় আইনের আলোচনা হইতে পারে না।

মন্ত্রী মহাশয় যে মন্ত্রণাসভা করিতে চাহিয়াছেন তাহাতে সিণ্ডিকেটের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সিণ্ডিকেটকে আগে জানাইতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়কে কত টাকা দিবেন। তাহা না জানিলে সিণ্ডিকেট মন্ত্রণাসভার আলোচনায় ভাল করিয়া যোগ দিতে পারিবেন না। গবর্ণমেণ্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের কিরূপ পরিবর্ত্তন করিতে চান, তাহাও জানাইতে হইবে। মন্ত্রণাসভার সভাপতিপদে একজন নিরপেক্ষ লোককে নিযুক্ত করিতে হইবে, নতুবা সভার কার্য্য নিয়মিত-রূপে হইতে পারিবে না। সিনেট হাউস বা ব্যবস্থাপক সভাগৃহে মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হওয়া উচিত।

সিণ্ডিকেটের চিঠিতে সার আশুতোষ প্রকট হইয়াছেন। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে সার আশুতোষ সিণ্ডিকেটের সভ্য হইয়াছেন। কিরূপে তিনি সিণ্ডিকেটের সভ্য হইয়াছেন, তাহার ইতিহাস চমৎকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার ভাণ্ডারকর সিণ্ডিকেটের সভ্য ছিলেন। তিনি উত্তরবঙ্গের এক বৌদ্ধস্তূপ দেখিতে মাঝে মাঝে গমন করেন। এই হেতুতে তাঁহাকে সিণ্ডিকেটের সদস্যপদ ত্যাগ করিতে বলা হয়। ডাক্তার ভাণ্ডারকর যে ফ্যাকাল্টির প্রতিনিধিরূপে সভ্য ছিলেন সার আশুতোষ ছিলেন তাহার সভাপতি; সুতরাং তিনি আপনাকে ডাক্তার ভাণ্ডারকরের স্থলে সিণ্ডিকেটের সভ্য নিযুক্ত করিলেন। সুতরাং সার আশুতোষই পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা হইয়াছেন। তাঁহার মতানুসারেই সিণ্ডিকেট লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণীত হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট্ কত টাকা দিবে, তাহা না জানিলে সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ মন্ত্রণাসভার নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিতে পারিবে না; যদি মন্ত্রণাসভা হয়, তাহার সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী হইতে পারিবেন না; মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন শিক্ষামন্ত্রীর কার্য্যালয়ে হইতে পারিবে না, উহা হয় সার আশুতোষের কার্য্যালয়ে না হয় ব্যবস্থাপক সভায় হইবে।

শিক্ষামন্ত্রী সিণ্ডিকেটের পত্রোত্তরে লিখিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট্ বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অর্থ দিতে পারিবেন গবর্ণমেণ্টের সেরূপ অবস্থা নয়। সাড্লার কমিশনের মতানুসারে বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইলে যত টাকার প্রয়োজন, তত টাকা গবর্ণমেণ্ট্ দিতে পারিবেন না। গবর্ণমেণ্ট সিণ্ডিকেটের সভ্যদের সহিত পরামর্শ করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, সেই উদ্দেশ্যেই মন্ত্রণাসভা আহ্বান করার প্রস্তাব হইয়াছে।

শিক্ষামন্ত্রীর পত্র আলোচনা করিবার জন্য ৮ই জুন সিণ্ডিকেটের ও ৯ই সিনেটের অধিবেশন হইবে।

সভায় যে গরম গরম বক্তৃতা হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আইন যাহাতে বর্ত্তমান বর্ষে না হইতে পারে তাহার জন্য যত প্রকার আয়োজন সম্ভব তাহাই করা হইবে। আসল কথা, কোন কাজ হইবে না। কেবল ঝগড়ার সৃষ্টি হইবে।

বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মিটমাটের জন্য দারজিলিং গিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈবেদ্যের মস্তকে বসিয়া আছেন বটে, কিন্তু আতপান্নগুলি তাঁহার অধীন নহে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহার মীমাংসার আশা নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবাদে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজ ছোট হইয়া গেল। পরস্পরের নিন্দাবাদে মানুষের মনে হিংসা- ও বিদ্বেষ-বহ্নি জাগিয়া উঠিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানোন্নতির স্থান না হইয়া দ্বন্দ্ব-কোলাহলের কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে।

আচার্য্য রায়ের কংগ্রেসে যোগদান

স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় খুলনায় জেলা কন্ফারেন্সের সভাপতিত্ব করিতে গিয়া কংগ্রেসের দলে প্রকাশ্যভাবে যোগ দিয়াছেন। তিনি বরাবরই "গরম" দলের লোক ছিলেন। এখন স্বরাজপ্রচেষ্টাকে বিজ্ঞানচর্চ্চার উপর স্থান দিয়া তিনি প্রকাশ্যভাবে নিজের মত ঘোষণা করিলেন। কংগ্রেস্ একজন বড় কর্ম্মী পাইলেন।

মধ্যপ্রদেশে পতাকার সংগ্রাম

আমাদিগকে দেশের জন্য কোন রাজনিগ্রহ সহ্য করিতে হয় নাই, ত্যাগও আমরা কিছু করি নাই। এই কারণে, যাঁহারা দেশের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতেছেন ও সাহস দেখাইতেছেন, তাঁহাদিগকে কখন ভ্রান্ত মনে করিলেও আমরা বিচারকের আসনে বসিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা করিতে পারি না। কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত আমাদের বক্তব্য না বলিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে বলিয়া বলিতেছি।

সাহস, উৎসাহ, আত্মোৎসর্গ ও স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা, এসব ভগবানের দান। এই-সকল গুণের ব্যবহার এমনভাবে করা উচিত, যাহাতে উপযুক্তরূপ স্থায়ী ফল পাওয়া যায়। যোগ্য ও দক্ষ সেনাপতি ও সৈনিকগণ কেবল সাহস দেখাইবার জন্য মৃত্যুকে বরণ করেন না; তাঁহারা কখন কখন, যেখানে

যুদ্ধ করিয়া কোন লাভ নাই, অপমান সহিয়া এমন স্থান হইতে হটিয়াও যান।

স্বরাজসংগ্রামেও আমাদিগকে সংগ্রামের বিষয়, কাল, উপলক্ষ্য, প্রভৃতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া নির্ব্বাচন করা দরকার। মধ্যভারতে যে জাতীয় পতাকা লইয়া সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে কোন্ পক্ষেরই বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে পারি না। জাতীয় পতাকা লইয়া যদি লোকেরা যে-সে রাস্তায় যাইতে পাইত ও যাইত, তাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উল্‌টিয়া যাইত না। সুতরাং সরকারী কর্ম্মচারীদের ইহাতে বাধা দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। অন্য দিকে, ভারতীয়েরা যদি সর্ব্বত্র জাতীয় পতাকা লইয়া রাস্তা দিয়া যাইতে পান, এবং মিউনিসিপাল আফিস্, টাউন হল প্রভৃতির চূড়ায় উহা উড়াইতে পারেন, তাহাতে কি আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক তিলও বাড়িবে? নূতন আইন করিবার, বর্ত্তমান আইন বদ্‌লাইবার রদ্ করিবার, ট্যাক্স্ বাড়াইবার কমাইবার বসাইবার উঠাইবার, সরকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত ও বরখাস্ত করিবার, কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়াইবার কমাইবার, সন্ধি বা যুদ্ধ ঘোষণা করিবার, সৈনিক বিভাগ সম্বন্ধে দেশের কল্যাণসঙ্গত ব্যবস্থা করিবার, বাণিজ্যশুল্ক বসাইবার উঠাইবার বাড়াইবার কমাইবার, বিদেশী জাহাজের অন্যায় প্রতিযোগিতায় বাধা দিয়া দেশী জাহাজ চালাইবার, রাজস্বব্যয়ের দেশহিতকর ব্যবস্থা করিবার, রেলভাড়া সম্বন্ধে দেশহিতকর ব্যবস্থা করিবার, স্বাস্থ্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবার, দৈহিক সাধারণ এবং কৃষিশিল্পবাণিজ্যবিষয়ক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার, ক্ষমতা একটুও বাড়িবে কি?

যাঁহারা অম্লানবদনে জেলে যাইতেছেন, তাঁহারা দেশ-হিতকর কাজের জন্য ইতিপূর্ব্বে জীবনের কত দিন কত ঘণ্টা সময় দিয়াছেন? হিন্দুমুসলমানের মিলনের জন্য, হিন্দু "উচ্চ" জাতি ও "নিম্ন" জাতির মিলনের জন্য, সামাজিক গোঁড়ামি কতটুকু কতদিন ধরিয়া ত্যাগ করিয়া কতটুকু সামাজিক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন? কাপাসের গাছ লাগাইয়া তূলা উৎপন্ন করিয়া চর্‌খা কাটিয়া খদ্দর প্রস্তুত করিবার ও করাইবার জন্য কি চেষ্টা করিয়াছেন? মদ্যপায়ীদিগকে সুপথে আনিবার কি চেষ্টা করিয়াছেন?

জাতীয় পতাকার অপমান প্রাণে লাগে বটে; কিন্তু কার্য্য-সিদ্ধির জন্য অনেক সময় ব্যক্তিগত ও জাতীয় অপমান সহিয়া যাইতে হয়। তা ছাড়া, ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, জাতীয় পতাকা হইলেই একজাতিত্ব জন্মে না। যাহাদের এক চতুর্থাংশ অনাচরণীয় বলিয়া বিবেচিত, তাহাদের একজাতিত্ব প্রমাণসাপেক্ষ।

আম্‌লাতন্ত্রেরও মহিমা অপার। জব্বলপুরের টাউন হলের উপর জাতীয় পতাকা উড়াইতে যখন মানুষ যায়, তখন তাহাদিগকে পুলিশ বাধা দেয় না। পতাকা উড়াইয়া নামিয়া আসিবার পর তাহাদিগকে গ্রেফ্‌তার করিয়া পরে জেলে পাঠান হয়। আগে বাধা দিলেই ত হয়; তাহা হইলে জেলে পাঠাইতে হয় না।

বেথুন স্কুলের ছাত্রীনিবাস

খুব ধীরে ধীরে হইলেও কলেজে পড়িবার ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িতেছে। কিন্তু গবর্ণ্‌মেণ্ট্ এই সামান্য বৃদ্ধির উপযুক্ত বন্দোবস্তও কবিতেছেন না। এত বড় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য মোটে একটি সরকারী কলেজ আছে। তাহাতে আবার ক্লাসে জায়গা কম, ছাত্রীনিবাসে স্থান আরও কম। যুদ্ধের আগে হইতে নূতন একটি ছাত্রীনিবাসের জন্য জায়গা কেনা হইয়া আছে, কিন্তু বাড়ী এখনও হইল না। সেই কারণে অনেক ছাত্রীর কলেজে পড়া হয় না, বা বিলম্বে হয়। এই বিষয়ে আমরা আগে আগে অনেক লিখিয়াছি। শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু সংবাদপত্রে চিঠি লিখিয়া ছাত্রীদের এই অসুবিধার বিষয় সর্ব্বসাধারণকে ও গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে আবার জানাইয়া ভাল করিয়াছেন, এবং ছাত্রীদের ও তাহাদের অভিভাবকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ইউরোপীয় নার্স্‌দের বাড়ীর জন্য অনেক লাখ টাকা জোটে, নূতন নূতন পুলিস থানা ও ব্যারাকের জন্য টাকা জোটে, কিন্তু ছাত্রীনিবাসের জন্য টাকা জোটে না। তার কারণ অবশ্য এই যে, গবর্ণ্‌মেণ্ট্ শিক্ষাকে অত্যাব-শ্যক মনে করেন না। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে—বিশেষতঃ নারীদের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে, শিক্ষিতসাধারণের ঔদাসীন্য (ও শত্রুতা বলিলেও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা হয় না) যে আর-

একটা কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেসরকারী অনেক কলেজের ছাত্রাবাসাদির জন্ত গবর্ণমেণ্ট্ অনেক লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন, কিন্তু মেয়েদের জন্ত একটি মাত্র সরকারী কলেজের নিমিত্ত ছাত্রীনিবাস নির্ম্মাণের টাকা জুটিল না! দরকার-মত, অপরকে খোঁচা দিবার জন্ত, স্ত্রীশিক্ষার বন্ধু সাজা সহজ; কিন্তু বন্ধুরা সব টাকাটা নিজেদের দিকে টানিতে কসুর করেন না। অনুকূল শিক্ষিতসাধারণের মতের চাপ গবর্ণমেণ্ট্ অনুভব করেন নাই বলিয়া, তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আরও বেশী উদাসীন আছেন।

আমাদের বিবেচনায় যতদিন পর্য্যন্ত ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছাত্রদের শিক্ষার সমতুল্য না হইতেছে, এবং যতদিন পর্য্যন্ত সার্ব্বজনিক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা না হইতেছে, ততদিন কেবল ছাত্রদের সাধারণ উচ্চশিক্ষার জন্ত সাহায্য একটাকাও বাড়ান উচিত নয়।

—

কক্স্বাজারে ঝড়

ঝড়ে কক্স্বাজার আবার বিধ্বস্ত হইয়াছে। সকলে অর্থসাহায্য করুন। ইহার বেশী কিছু লেখা অনাবশ্যক।

—

সমগ্র বঙ্গের স্বাস্থ্য-সমিতি

একা ম্যালেরিয়াতেই রক্ষা ছিল না, তাহার উপর আসামী কালা-জ্বর বঙ্গে খুব হইতেছে। অন্যান্ত রোগ ত আছেই। যে-দেশে নানা রকম জ্বরে বৎসরে ১৩।১৪ লক্ষ লোক মরে এবং (স্যার্ নীলরতন সরকারের মত অভিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তির মতে) অন্যূন এককোটি চল্লিশ লক্ষ লোক জ্বর ভোগ করে, যাহার জন্মসংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা বেশী, যে-দেশের লোকের গড় পরমায়ু ২৩ বৎসর (ইংলণ্ডের ৪৬, জাপানের ৪৪), সেখানে স্বাস্থ্য-সমিতির কাজ সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত পড়িয়া রহিয়াছে, করিতে পারিলেই হয়। সমগ্র বঙ্গের স্বাস্থ্যসমিতি গঠিত হইবার পর কমিটিও গঠিত হইয়াছে। কাজও হইতেছে। কর্ম্মী ও টাকা যত বাড়িবে, কাজও তত বিস্তৃত হইবে।

—

জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয়

শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন বঙ্গে এত বেশী, যে, অল্পসংখ্যক সরকারী বা সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত চিকিৎসা-শিক্ষালয় দ্বারা এই অভাব মোচন হইতে পারে না; স্বাধীন চেষ্টার যথেষ্ট স্থানও আবশ্যক আছে। জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয় এইরূপ স্বাধীন চেষ্টার ফল। ইহাতে যাঁহারা শিক্ষা দেন, তাঁহারা দেশে ও বিদেশে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে শিক্ষা পাইয়া তদনুসারে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়টি উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

—

বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুল

মেডিক্যাল কলেজগুলিতে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, সেরূপ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ পল্লীগ্রামকে নিজেদের কার্য্যক্ষেত্র করিতে চান না, এবং অপেক্ষাকৃত কম অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকদের দ্বারা পল্লীগ্রামের কাজ চলিতে পারে। এইরূপ শিক্ষা দিবার জন্ত বাঁকুড়ায় একটি মেডিক্যাল স্কুল খোলা হইয়াছে। ইহার অধ্যাপকগণ সকলেই কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং উপাধিকারী, এবং অবৈতনিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাঁকুড়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল্ ব্রাউন সাহেব। এইরূপ বিদ্যালয়ও সর্ব্বসাধারণের এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইবার উপযুক্ত।

—

মাতৃভাবের পরিচয়

বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের পত্নীর নেত্রীত্বে তথাকার মহিলাসমিতি হাঁসপাতালের রোগীদের আরাম ও সেবাশুশ্রূষার দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। তাঁহারা নিজে মধ্যে মধ্যে হাঁসপাতালে যান, এবং রোগীদের ব্যবহারের জন্ত বাসন দিয়াছেন।

—

লাহোরে লরেন্সের মূর্ত্তি

লাহোরে লর্ড লরেন্সের যে মূর্ত্তি আছে, তাহার ভঙ্গী ও খোদিত লিপি, "তোমরা কি তলোয়ারের দ্বারা না কলমের দ্বারা শাসিত হইতে চাও?" পঞ্জাবের দেশভক্তেরা

অপমানকর মনে করেন; তাঁহারা বলেন, আমরা নিজেরাই নিজেদের শাসনকর্ত্তা হইতে চাই, কলমের শাসন চাই না; তলোয়ারের ত চাই-ই না। মনের এই ভাব স্বাভাবিক এবং ইহা শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। কিন্তু কোন দেশের লোক যদি পরস্পরের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে, তাহা হইলে মানবসভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় তরবারির শাসন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে—সে তলোয়ারটা বিদেশীর হাতে থাক্ কিম্বা স্বদেশীরই হাতে থাক্। কারণ, ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হইত, পঞ্জাব যদি স্বাধীন হইত, তাহা হইলেও তথায় হিন্দুমুসলমানে খুনাখুনি করিলে, ভারতীয় স্বাধীন গবর্ণমেণ্টকেও পুলিশ বা সৈনিকের বলপ্রয়োগ দ্বারা দাঙ্গা থামাইতে হইত। অতএব, পঞ্জাবের লোকেরা বা অন্য কোন জায়গার লোকেরা যদি তলোয়ারের শাসন অপমানকর মনে করেন, তাহা হইলে তাহাদের ভদ্র- ও সভ্য-ভাবে পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে বাস করিতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

—

কচুরি পানা কমিটি

পূর্ব্ববঙ্গে কচুরি পানার উপদ্রবে খুব ক্ষতি হইতেছে। উহা বিনষ্ট না হইলে আরও ক্ষতি হইবে। গবর্ণমেণ্ট্ উহা বিনাশের উপায় নির্দ্ধারণ জন্য স্যার্ জগদীশচন্দ্র বসুকে সভাপতি করিয়া ও সাতজন সভ্য মনোনীত করিয়া এক কমিটি নিযুক্ত করেন। এবিষয়ে বসু মহাশয় অনেক গবেষণা করেন ও করান। গ্রিফিথ্স্ নামক দক্ষিণ আফ্রিকার এক ব্যক্তি বলে, যে, তাহার ঔষধ আছে, তাহার প্রয়োগে কচুরি পানা ধ্বংস হইয়া যায়। সে কয়েক লক্ষ টাকা পাইলে উহার উপাদান বলিয়া দিবে। পরীক্ষায় এই ঔষধের স্থায়ী কার্য্যকারিতা কোথাও প্রমাণিত হয় নাই। কমিটির পাঁচজন সভ্য ও সভাপতি বসু মহাশয় গ্রিফিথ্সের ঔষধের বিরুদ্ধে মত দেন। তথাপি কি কারণে জানি না, এত বড় বৈজ্ঞানিকের ও পাঁচ জন সভ্যের মত অগ্রাহ্য করিয়া কৃষিমন্ত্রী নবাব নবাবআলী চৌধুরী গ্রিফিথ্সের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। কে তাঁহাকে এইরূপ আচরণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছে? বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অবৈজ্ঞানিকের আস্পর্দ্ধা হাস্যকর হইলেও এক্ষেত্রে ইহা অসহনীয়; কারণ, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা বাধা না দিলে ইহার ফলে প্রজাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের বহুলক্ষ টাকা বাজে খরচ হইবে।

এই বিষয়টির বিশেষ বৃত্তান্তের জন্য জুন মাসের মডার্ন্ রিভিউ দ্রষ্টব্য।

—

স্যার্ নারায়ণ গণেশ চন্দাবর্কর্

জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে উন্নতি, প্রগতি ও সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ, এবং সমস্তই যুগপৎ হওয়া উচিত; আধুনিক ভারতে নিজের জীবন দ্বারা রামমোহন রায় প্রথমে এই নীতি ও মত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ইহার বিপরীত মতাবলম্বী রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা বরাবর দলে পুরু আছেন। তাঁহারা আগে চান স্বায়ত্ত শাসন, জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব, স্বরাজ্য বা স্বাধীনতা; তাহার পর সমাজ সংস্কার করিবেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন, অনেকে তাহাও বলেন না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তাঁহার কার্য্যতালিকায় প্রথম স্থান যে সংস্কার-কার্য্যটিকে দিয়াছেন, তাহা রাজনৈতিক নহে, সামাজিক; তাহা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। তাঁহার দলের অধিকাংশ লোকের মনের ভাব ও আচরণ যাহাই হউক, তাঁহারা প্রকাশ্যে এই কাজটিকে অনাবশ্যক বা অনিষ্টকর বলিতে পারেন নাই। হিন্দুমুসলমানের মিলন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একান্ত আবশ্যক হইলেও, গান্ধী মহাশয়ের কার্য্যতালিকার এই কাজটিও রাজনৈতিক উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহাও হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক গোঁড়ামি কতকটা পরিত্যাগ ও উদারতা অবলম্বনের উপর নির্ভর করে। সুতরাং, রামমোহন রায়কে যাঁহারা দেখিতে পারেন না, তাঁহাদিগকেও কার্য্যতঃ তাঁহার অনুসৃত নীতি অবলম্বন করিতে হইতেছে।

তাঁহার পথের পথিক বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রাণড়ে, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং প্রভৃতি। তাঁহাদের পরে, জীবনের সকল বিভাগে

যুগপৎ সংস্কারের আবশ্যকতায় বিশ্বাসী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্যার্ নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকর্ সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি সেকালের কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং উহার সভাপতি হইয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কার-ক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষীয় সমাজসংস্কার কন্‌ফারেন্সের সাধারণ সেক্রেটরী ছিলেন। সমাজসেবক সংঘের তিনি সভাপতি ছিলেন। অবনতশ্রেণীর লোকদের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল, এবং তাহাদের মধ্যে যে খাঁটি ভক্তিভাব আছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার লেখাগুলি মর্ম্মস্পর্শী। তিনি সুবক্তা ছিলেন। তিনি বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সভাপতি ছিলেন। তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের জজিয়তী হইতে অবসর লইবার পর কিছুকাল ইন্দোরের দেওয়ান ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার দেহমনের শক্তি অক্ষুণ্ণ এবং অধ্যয়নানুরাগ প্রবল ছিল। তিনি ভক্ত, ধর্ম্মপিপাসু, সহৃদয় ও সদালাপী লোক ছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক মতের সহিত সব বিষয়ে আমাদের মতের মিল ছিল না। সেইজন্য কখন কখন তাঁহার সমালোচনাও করিয়াছি। কিন্তু তাহার জন্য তাঁহার সহিত কখন অসদ্ভাব ঘটে নাই।

আমেরিকায় ভারতীয়

এ পর্য্যন্ত কয়েকজন ভারতীয় আমেরিকায় বাসিন্দা হইয়া পৌর অধিকার (citizenship) পাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তথাকার সুপ্রীম কোর্ট ভগৎ সিং ঠিন্দ নামক একজন পঞ্জাবীর বিরুদ্ধে এই রায় দিয়াছেন, যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা (নিম্নবর্ণের ত কথাই নাই) আমেরিকার পৌর-অধিকারবিশিষ্ট বাসিন্দা প্রজা হইতে পারে না। তথাকার আইনে বলে, যে, আফ্রিকার আদিম নিবাসীরা এবং "স্বাধীন শ্বেত মানুষ" (free white person) ভিন্ন অন্য কোন আগন্তুক ঐ অধিকার পাইতে পারে না। আগে আগে যে-সব ভারতীয়কে যখন ঐ অধিকার দেওয়া হয়, তখন ফ্রী হোয়াইট্ পার্সনের মানে ককেশীয় করা হইয়াছিল, এবং ধরা হইয়াছিল যে হিন্দুরা ককেশীয়। এখন বলা হইতেছে, যে, ফ্রী হোয়াইট্ পার্সনের মানে ককেশীয় নহে, এবং হিন্দুরা ফ্রী হোয়াইট্ পার্সন্ নহে।

যাহা হউক, এই আইনের মানে যাহাই হউক, ইহার মূলে ন্যায়ধর্ম্ম কিছুই নাই। নিগ্রোরা যে অধিকার পাইতে পারে, হিন্দুরা নিশ্চয়ই তাহার অধিকারী। সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ের ফলে কালিফর্ণিয়ায় ও অন্যত্র বিস্তর হিন্দু ভূম্যধিকারী ও চাষী বেদখল হইবে। অনেক আমেরিকান্ ব্যবসাদারের ও মিশনারী সমিতির ভারতে ভূসম্পত্তি আছে। সেগুলি হইতে তাঁহাদিগকে বেদখল করিলে কেমন লাগে? অবশ্য আমেরিকান্‌রা জানে ব্রিটিশ-বন্ধুরা থাকিতে ভারতীয়েরা এরূপ কিছু করিতে সমর্থ হইবে না।

ভগৎসিং ঠিন্দ্
ইঁহাকে সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আমেরিকা হইতে এই রায় সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান্ ডেলী নিউসে একটি চিঠি লিখিয়াছেন। তাহা বেশ বিশদভাবে লিখিত। এ বিষয়ে জুন মাসের মডার্ন্ রিভিউয়ে আমেরিকার অধ্যাপক সুধীন্দ্র বসুরও একটি প্রবন্ধ আছে।

আমেরিকায় প্রথম হিন্দু মন্দির : এই মন্দিরটি রামকৃষ্ণমিশনের সাহায্যে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ২১শে আগষ্ট তারিখে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে

ইন্দু-বাবুকে তাহার একজন আমেরিকান্ বন্ধু বলিয়াছেন, যে, সুপ্রীমকোর্টের জজেরা আমেরিকাস্থিত ব্রিটিশ রাজদূতবৃন্দের প্রভাবে এইরূপ রায় দিয়াছে। ইন্দু বাবু ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, যে, জজেরা এরূপ অপকর্ম্ম করিতে পারেন। জজদের নিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী লোকদের পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন বটে। কিন্তু আমেরিকানরা সকলে তাহাদের জজদিগকে নিরপেক্ষ মনে করে না। এবিষয়ে প্রমাণ আছে। তাহেব কাছে একটা প্রমাণ পাইলাম, উদ্ধৃত করিতেছি। ১৯২৩ সালের মে মাসের লিবারেটর্ নামক আমেরিকান্ মাসিকের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় আছে—

But some of the "reg'lar fellers" didn't have any papa in position to fix them up with the life's ease to which all upper-class guys are entitled. William H. Taft was in danger of having to work. After being chased out of the Presidency, where he had conducted an administration more reactionary than ever known before the lame-duck days of Harding, Taft was in the position of an orphan without any guarantee against having to work. But the sixty-four year old orphan found a father in the steel millionaire Andrew Carnegie, and was given a pension.

And so William H. Taft, the highest official in the United States Government, Chief Justice of the Supreme Court, which can and does annul any law it pleases over the heads of Congress and President, is receiving ten thousand dollars a year as a gift from the estate of Andrew Carnegie. It is a pension for life, given by one of the biggest builders of steel monopoly to the judge who, of all judges known to history, has done most to give into the hands of the oligarchy of Steel the power to rule and crush the American laboring masses. Taft as a Federal judge was the father of the American injunction he used to be known as "Injunction Bill." Taft as President of the United States managed to apply the anti-trust laws to the Steel Trust in such fashion that the said Trust became from that moment and remained for twenty years the most powerful monopoly on earth. Taft as Chief Justice of the Supreme Court of the United States is the highest official of the American Government. Taft's will is the chief factor in deciding all judicial questions between Capital and Labour. Taft is responsible for the famous Coronado decision which attempts to be the final death-warrant against organized labor, placed in the hands of Capital to use at will.

Taft receives $10,000 a year from the income of the Steel Trust as a gift.

Taft is honest. We must respect the Supreme Court. It is our most sacred institution, higher than any other: it is the collective Monarch of the United States. If we said anything disrespectful about it, we could probably be destroyed.

But the American bourgeoisie will yet regret having let the source of that judge's income be known. The defrauded masses will get sick of swallowing tales of men too honest to be influenced by the money they take from the other side.

এই ট্যাফ্‌ট্ সুপ্রীমকোর্টের চীফ জষ্টিস্। তাহার এবং সুপ্রীমকোর্টের বিরুদ্ধে আরও অনেক কথা ঐ কাগজখানিতে আছে। অন্য কাগজেও আমেরিকার জজদের

বিরুদ্ধে অনেক কথা পড়িয়াছি। আর-একটা আকস্মিক মিল এই, যে, সুপ্রীম কোর্টের জজেরা যাঁহার মুখ দিয়া নিজেদের রায় প্রকাশ করেন, জর্জ সাদার্ল্যাণ্ড্ নামক সেই দলের জজ নিজে ইংরেজ, ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম, আমেরিকায় বসবাস করিয়া আমেরিকান্ হইয়াছেন। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ইংরেজ-সুলভ বিদ্বেষ তাঁহার থাকা অসম্ভব নহে।

কয়েকজন ভারতীয় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে আমেরিকায় অনেক সত্য কথা প্রচার করায় ইংলণ্ড্ অসুবিধা বোধ করিতেছেন। ভারতবর্ষের পয়সায় ইংলণ্ড্ আমেরিকায় এই ভারতীয়দের কথার প্রতিবাদ করিবার জন্য লোক রাখিয়াছেন। অতএব, কোন ভারতীয় যাহাতে আমেরিকার প্রজা হইয়া তথায় স্থায়ী বসবাস করিতে না পারে, সে চেষ্টা করা ব্রিটিশ রাজদূতবৃন্দের পক্ষে অসম্ভব নহে, বরং স্বাভাবিক।

আমেরিকার শ্রমজীবীরাই জাপানী ও ভারতীয় লোকদের আমেরিকান্ হওয়ার দারুণ বিরোধী; কারণ—প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষ্যা।

—

আফ্রিকায় ভারতীয়

শ্বেতকায় লোকদের অনেক শক্তি ও গুণ আছে। কিন্তু সাধারণতঃ শ্বেতকায় জাতিদের (অবশ্য প্রত্যেক শ্বেতকায় ব্যক্তির নহে) কতকগুলি ঘৃণ্য দোষ আছে। ভণ্ডামি তাহার একটি। তাহারা যে দেশেই যাক্, এবং, দস্যু বণিক বিজেতা শাসক মিশনারী, যাহা হইয়াই যাক্, তোমাকে মানিতেই হইবে, যে, কেবলমাত্র সেই দেশের লোকদের কল্যাণের জন্য সেখানে তাহারা গিয়াছে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে। আফ্রিকায় বহু সুবিস্তৃত দেশের সমুদয় জমি হইতে তথাকার আদিমনিবাসীরা বঞ্চিত হইয়াছে, অনেক দেশের লোককে দাসের মত জোর করিয়া খাটান হয়, অনেক জাতি প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে;—সবই তাহাদের মঙ্গলের জন্য।

কিন্তু ভারতীয়রা কোথাও গেলেই অমনি তারস্বরে চীৎকার উঠিবে, তোমরা ত এদেশের লোকদের মঙ্গলের জন্য আইস নাই, তোমরা বাহির হও। পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয়েরা ইংরেজদের বহুশতাব্দী আগে হইতে যাতায়াত ব্যবসাবাণিজ্য করিতেছে; তখন ভারতে ইংরেজ প্রভু হয় নাই। ভারতীয়দের দ্বারাই উহা সভ্য মানুষের বাসের যোগ্য হইয়াছে; ভারতীয় মজুর ও মূলধনী সেখানে না গেলে তথাকার রেল ও ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইত না; ভারতীয় সৈন্য ব্যতীত উহা ইংরেজদের হস্তগত হইত না। কিন্তু এখন কাজ হাসিল হইয়া গিয়াছে, এখন নিকালো।

আফ্রিকার সব জায়গা হইতে ভারতীয়দিগকে নানা কৌশলে তাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। কারণ আর কিছুই নয়—ইংরেজ দোকানদারদের ঈর্ষা।

আমরা স্বদেশে কর্ত্তা না হইলে অন্য কোথাও মান-বোচিত অধিকার পাইব না। অতএব আত্মকর্তৃত্ব লাভের চেষ্টাকে এখানে সর্ব্বপ্রযত্নে জয়যুক্ত করিতে হইবে।

সেই অর্থে ইহা খুবই সত্য, যে, আর সব কিছু অপেক্ষা করিতে পারে, স্বরাজ পারে না। কিন্তু স্বরাজলাভের জন্যই যে অন্যদিকেও অগ্রসর হওয়া দরকার। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বদরবারে আমাদের জায়গা করিয়া দিয়াছেন। হয়ত বা পরোক্ষ-ভাবে তাহাতে স্বরাজলাভের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইতেও পারে। তা ছাড়া, রাসায়নী বিদ্যাটা বাণিজ্যিক ও অন্যবিধ চেষ্টা দ্বারা স্বরাজলাভে কি কিছুই কাজে লাগে না? স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় কি বলেন?

—

মাসের শেষ শনিবার

ব্যয়-সংক্ষেপ কমিটির প্রস্তাব-অনুসারে সরকারী আফিসে কেরানীদের মাসের শেষ শনিবারের ছুটি বন্ধ হইল। বড় বড় ব্যয়-সংক্ষেপের প্রস্তাবগুলার কি হইল? ডিবিজন্যাল্ কমিশনারদের অকেজো পদগুলা উঠাইয়া দিবার এবং এইরূপ আরো কয়েকটা মোটা মাহিনার অকেজো পদগুলা ছাঁটিয়া ফেলিবার প্রস্তাব কি শিকায় তুলিয়া রাখা হইল?

একটা খাম একাধিকবার ব্যবহার, প্রভৃতি ছোট ছোট উপায়েও কিঞ্চিৎ ব্যয়-সংক্ষেপের বিরোধী আমরা নহি; কিন্তু তাহাতে কত টাকা বাঁচিবে?

কলিকাতার হাইকোর্ট অবশ্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের

অধীন নহে। কিন্তু উহা বাংলা দেশে স্থিত। উহার জজেরা লম্বা ছুটি ছাড়া প্রতি শনিবারে ছুটি পান, আর এই বাংলাদেশেরই কেরানীরা মাসে একটা শনিবারের ছুটি হইতেও বঞ্চিত হইল, একই দেশে এই ভিন্ন ভিন্ন রকম ব্যবস্থার অসঙ্গতি চোখে ঠ্যাকে। কিছুদিন আগে শুনিয়াছিলাম, বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী ঘোষ শনিবারেও কাজ করেন। ইহা সত্য হইলে, অন্য জজেরা না পারিবেন কেন ?

—

বাঙালীর বাণিজ্যবিমুখতা

নিজেদের অকৃতকার্য্যতা, অধিকারশূন্যতা, বা কোন অসুবিধার দোষটা অন্যের ঘাড়ে বা কোন প্রতিকূল অবস্থার ঘাড়ে চাপাইতে পারিলে আমরা খুশি হই। সেই আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও, বাঙালীর আধুনিক বাণিজ্য-বিমুখতার সম্ভবতঃ একটা যে ঐতিহাসিক কারণ আছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। তাহাই একমাত্র কারণ, বা তাহাতে আমাদের বাণিজ্যবিমুখতা দোষ খণ্ডিয়া যায়, তাহা আমরা বলিতেছি না।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থায় তাহারা মুসলমান নৃপতিদের নিকট হইতে এই সুবিধা পাইয়াছিল, যে, যে-সব জিনিষ কোম্পানী বঙ্গে কিনিয়া ইউরোপে চালান করিবে, বা ইউরোপ হইতে আমদানী করিয়া এদেশে বিক্রী করিবে, তাহার উপর কোন শুল্ক দিতে হইবে না। তখন পণ্যদ্রব্যের কেনাবেচা ও ইতস্ততঃ চালানে শুল্ক লাগিত। কোম্পানীর এই সুবিধা কোম্পানীর জন্যই অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু উহার ইংরেজ কর্ম্মচারীরা এই সুযোগে নিজেরাও ব্যক্তিগতভাবে বিনা-শুল্কে ব্যবসা করিতে থাকে। তাহাতে বঙ্গের সুবাদারের রাজস্বের ক্ষতি হইতে থাকে। কোম্পানীর ভৃত্যেরা কেবল ইহাতেই সন্তুষ্ট হয় নাই। কোম্পানী বা তাহার ভৃত্যেরা এই দেশের অন্তর্বাণিজ্য বিনাশুল্কে করিবে, অর্থাৎ এই দেশেরই জিনিষ এই দেশে বিনাশুল্কে কিনিয়া বিনাশুল্কে দেশের নানা স্থানে চালান করিয়া বিনাশুল্কে বেচিবে, মুসলমান নৃপতিদের ফর্ম্মানে তাহাদিগকে কোন কালে এই অধিকার দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহারা তাহাই করিতে লাগিল। তাহাতে দেশী বণিক্‌দের খুব ক্ষতি হইতে লাগিল, তাহাদের ব্যবসা মাটি হইল; কারণ তাহাদিগকে কেনাবেচা ও চালান করিবার নিমিত্ত কর দিতে হইত। নবাবের রাজস্বেরও প্রভূত ক্ষতি হইল। কোম্পানীর ভৃত্যেরা ইহা অপেক্ষাও দুষ্কর্ম্ম এই করিল, যে, তাহারা তাহাদের প্রিয়পাত্র ও আজ্ঞাধীন দেশী লোকদিগকে কোম্পানীর ক্ষমতার আড়ালে বিনা করে অন্তর্বাণিজ্য চালাইবার অধিকার দিল। ইহা দিবার ক্ষমতা কোম্পানী বা তাহাদের ছিল না। ইহাতে, আগে হইতে যে-সব দেশী বণিক্ শুল্ক দিয়া ব্যবসা করিত, তাহাদের ব্যবসা উঠিয়া গেল। এই সব কারণে নবাব মীর কাসিম ইংরেজ ও ভারতীয় সকল জাতির ব্যবসার উপর শুল্ক উঠাইয়া দেন। কারণ, পয়সা যখন পাইবেনই না, তখন বাণিজ্য-শুল্ক বসানর বদনামটা থাকে কেন ?

কোম্পানীর ভৃত্যদের দুর্ব্যবহারের চরম সীমার উল্লেখ এখনও করা হয় নাই। তাহারা জোর করিয়া নিজেদের নির্দ্দিষ্ট দরে দেশের লোককে জিনিষ কিনিতে ও বেচিতে বাধ্য করিত। কেহ তাহাতে রাজী না হইলে, সিপাহী বরকন্দাজ পাঠাইয়া তাহাকে পাকড়াও করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইত ও অন্যপ্রকার যন্ত্রণা দেওয়া হইত। শুল্কসম্বন্ধীয় অন্যায় ব্যবহার ও এইপ্রকার অত্যাচার, মীর কাসিমের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধের একটি প্রধান কারণ।

কোম্পানীর ভৃত্যদের উল্লিখিত প্রকার ব্যবহার যে তাহাদের অধিকারবহির্ভূত ছিল, তাহা বিলাত হইতে বোর্ড্ অব্ ডিরেক্টর লিখিয়া পাঠান, এবং তাহা হইতে নিরস্ত হইয়া মীর কাসিমের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করেন। কিন্তু ঐ চিঠি যখন আসিয়া পৌঁছে, তাহার অনেক আগেই মীর কাসিমকে পদচ্যুত করিয়া কোম্পানীর ভৃত্যেরা মুর্শিদাবাদের মস্‌নদে মীরজাফরকে পুনঃস্থাপিত করিয়াছে।

ইহা হইতে পারে, যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গের বাণিজ্য ও বণিক্‌কুল যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহা সাম্‌লাইতে পারে নাই। কিন্তু জগতের ইতিহাসে দেখা

গিয়াছে, যে, এক একটা জাতি দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিয়া আবার শির উঁচু করিয়াছে। নষ্ট বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার তাহা অপেক্ষা সহজ কাজ। সুতরাং আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নহে। আমাদের মনোবাঞ্ছা এই, যে, অন্ততঃ পক্ষে আমাদের এই নিবন্ধিকাটি বাণিজ্যে বাঙালীর অলসতা ও নিরুদ্যমতাকে যেন প্রশ্রয় না দেয়। বরং আমরা মনে করি, যে, আমরা যে আগে বড় বণিক্ ছিলাম, ইহা এই বিশ্বাসেরই সমর্থন করিবে, যে, আমরা আবার বড় বণিক্ হইতে পারিব।

—

মোহনবাগানের জয়

বাঙালীদের মোহনবাগান ফুটবল ক্লাব যে আবার ইংরেজদের কলিকাতা ক্লাবকে হারাইয়া দিয়াছে, বাঙালী এরিয়ান ক্লাব যে হাইল্যাণ্ডার্ ক্যামেরন্‌দিগকে গোল্ দিয়াছিল, ইহা সুখবর। কিন্তু শতাধিক ক্যামেরন্ মারপিট আরম্ভ করায় হাজার হাজার বাঙ্গালী ফুটবল্ দর্শক পলায়ন করিয়াছিল, ইহা লজ্জার কথা। বাঙালী ফুটবল্ খেলোয়াড়দিগকে ইংরেজ ফুটবল্ খেলোয়াড়রা আঘাত করিলে, এই খেলোয়াড় বাঙ্গালীরা যখন মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়, তখন দর্শক বাঙালীরাও দৈহিক বল ও মানসিক সাহসের অনুশীলন দ্বারা নিশ্চয়ই মানুষ হইতে পারে। আমরা কাহাকেও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া মারামারি করিতে বলি না; কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য গায়ের জোরে ও প্যাঁচে দুর্বৃত্তকে কাবু করিবার অধিকার সকলেরই আছে।

—

হিন্দুধর্ম্ম ও পরাধীনতা

ক্যাথলিক হেরাল্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া লিখিতেছেন—

"...if India had been Christian, she would have been independent to-day. Hinduism, whatever it is, is certainly not the religion to give Indians the pep to throw out invaders; but Mahomedanism is, and Christianity still more. The difference, we suppose, lies in the dogmas, and if there are any of these in Hinduism, they are a caste privilege and have not descended to the masses."

কোন হিন্দুদেশ এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন নাই, এবং অনেক খৃষ্টিয়ান এবং কোন কোন মুসলমান দেশ স্বাধীন আছে বটে। কিন্তু আসল হিন্দু ধর্ম্মে পরাধীনতার জনক বা পোষক কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না, অন্ততঃ তাহা বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সামাজিক প্রথায় সামাজিক দাসত্ব বৃদ্ধি ও পোষণ করে; এবং মানবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন খোপে বিভক্ত নহে বলিয়া, যাহারা সামাজিক দাসত্ব সহ্য করিতে পারে, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা তাহাদের একান্ত অসহ্য বোধ না হইতে পারে।

ভারতবর্ষীয়েরা সকলে খৃষ্টিয়ান হইলেও কি হইত বলা যায় না; কিন্তু এপর্য্যন্ত যেসব ভারতীয় সশস্ত্র বা আইনসঙ্গত বা সাত্ত্বিক স্বাধীনতাসংগ্রাম করিয়া রাজনিগ্রহ ভুগিয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতীয় খৃষ্টিয়ানের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

—

৯ই জুনের সেনেট-সভা

"সঞ্জীবনী" অনুমান করিয়াছিলেন, যে, গত ৯ই জুনের সেনেটে গরম গরম বক্তৃতা হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। সেদিন স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন ফেলো ভূপেন-বাবুর মুখে বাগবাজারের রসগোল্লা তুলিয়া দিলেন, এবং ভূপেন-বাবু তাঁহার বিনিময়ে আশু-বাবুর মুখে ততোধিক রসগোল্লা তুলিয়া দিলেন। কেবলমাত্র দুশ্‌মন্ সুরেন্ মল্লিকের অদৃষ্টে কুইনাইনের ইঞ্জেকৃশ্যন্ জুটিয়াছিল। যতীন্-বাবু ভূপেন-বাবুর ভাইপো বলিয়া বোধ হয় তাঁহাকে ইঞ্জেক্ট্ করা হয় নাই; কিন্তু ন্যায়তঃ ন্যূনকল্পে আধ মাত্রা ইঞ্জেকৃশ্যন্ তাঁহার পাওনা ছিল। পরস্পরস্তুতি-সমিতির দ্বারা জাতীয় কল্যাণ সাধিত হয় না।—অবশ্য পরস্পর-স্তাবকতা যে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, তা বুঝা কঠিন নয়।

আজ ১১ই জুন প্রবাসী ছাপা হইয়া যাইবে। আজকার সেনেটের অধিবেশনে যাহা হইবে, তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা আমরা শ্রাবণের প্রবাসীতে বলিব।

—

বঙ্গে কালা-জ্বর

বাংলা দেশে কালা-জ্বর ত বাড়িয়া চলিতেছে। ইহা কি প্রকারে সংক্রামিত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করে, তাহা এখনও নিরূপিত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা নিরূপণ করিলে লোকে সাবধান হইতে পারিবে। রোগ হইবার পর চিকিৎসা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু রোগ না হওয়াটা তার চেয়েও বাঞ্ছনীয়। কোন রোগের উৎপত্তি, সংক্রামণ, প্রভৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান জন্মিলে, উহার প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করা যায়। সমগ্রবঙ্গের স্বাস্থ্যসমিতির উদ্দেশ্য রোগের চিকিৎসা ও প্রতিষেধ, দুই-ই। অতএব, আশা করা যায়, এই সমিতি কালা-জ্বরের উৎপত্তি, সংক্রামণ প্রভৃতির গবেষণা সম্বন্ধে বলিবেন না, যে, বিজ্ঞানের এই কাজটা স্বরাজলাভের পর করিলেই চলিবে।

গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ ঘাড় হেঁট করিয়াছিল কি না

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের মতে তাঁহার কারাবাস-কালে গর্ব্বিত ব্রিটিশ গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ ভারতীয়দের ইচ্ছাশক্তির নিকট মাথা নীচু বা ঘাড় হেঁট করিয়াছিল, এবং তিনি জেলে না থাকিয়া বাহিরে থাকিলে ভারতীয় জাতিকে সরকারী-বেসরকারী কন্‌ফারেন্সের সর্ত্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেন (খুব জবরদস্ত্‌ গণতান্ত্রিক বটে!)। কিন্তু সার্ভেণ্ট্‌ পত্রিকায় "কৃষ্ণদাস" নেতাদের সমুদয় টেলিগ্রাম ও অন্যান্য সংবাদ ছাপিয়া দেখাইয়াছেন, যে, লর্ড রেডিং, যুবরাজের অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে হরতাল বন্ধ করাইবার নিমিত্ত যে চা'ল চালিয়াছিলেন, তাহাতে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের যোগ ছিল, এবং সেই চা'লের দ্বারা চিত্তরঞ্জন আদি আর সকলকেই বড়লাট বোকা বানাইতে পারিয়াছিলেন, কেবল গান্ধী মহাশয়কে পারেন নাই। গান্ধী-রেডিং সংবাদ উপলক্ষ্যে গান্ধীর যে ভ্রম হইয়াছিল, এ-ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই।

—

মুস্তাফা কমাল পাশা ও তাঁহার স্ত্রী

ফ্রান্সের রাজধানী পারীর বিখ্যাত সচিত্র সাপ্তাহিক "ল্'ইলুস্ত্রাসিওঁ"তে জী একোল্ নামক একজন লেখক ইস্মত্‌ পাশার সহিত এঙ্গোরা যাত্রার তাঁহার নিজের ডায়েরীর (দৈনন্দিন লিপি বা রোজ্‌নাম্‌চার) কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এঙ্গোরায় তিনি লিখিতেছেন, "হোটেলে আসিয়া দেখিলাম, একজন হর্‌করা খবর আনিয়াছে, যে, মুস্তাফা কমাল পাশা বিদেশী সাংবাদিকদিগকে (journalists) এঙ্গোরার নিকটবর্ত্তী চান্‌কিয়া গ্রামস্থিত তাঁহার উদ্যানবাটিকায় পরদিন চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

মুস্তাফা কমাল পাশা ও তাঁহার স্ত্রী

"ফেব্রুয়ারী ২৫। সকলের চেয়ে ভাল কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা সওদাগরদিগের দলের মত মুস্তাফা কমালের বাসগ্রাম চান্‌কিয়া যাত্রা

করিলাম। পথে মাঝে মাঝে চাষারা আমাদের গাড়ীর মিছিলের দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি দিবার জন্ত থমকিয়া দাঁড়ায়। শীঘ্রই আমরা উদ্যান-বাটিকার নিকটবর্ত্তী হইয়া সান্ত্রীদের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলাম। এই প্রহরীরা কৃষ্ণ-সাগরের উপকূলবাসী স্বেচ্ছাসেবক—প্রত্যেকের খাসা পুরুষোচিত চেহারা, এবং প্রত্যেকেই আপাদমস্তক রণবেশে সজ্জিত।

"আমাদের কোচ্ম্যান সেনাপতির (কমাল পাশার) বাড়ী দেখাইল—তুর্কী স্থাপত্যরীতিতে শৈলরাশির উপর নির্ম্মিত বেশ বড় বাড়ী। মেজর ও এডিকং মামুদ্ বে আমাদিগকে দ্বারদেশে সুন্দর রকম প্রত্যুদ্গমন করিলেন, এবং আমরা একটি বৃহদায়তন প্রাচ্য বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম—তাহার মধ্যে একটি সরোবর। একটি দরজা খুলিল এবং আমরা পাশা মহাশয়ের খাস্ কামরায় প্রবেশ করিলাম। সেখানে তাঁহার পত্নী লতিফা খানুম এবং প্রধান মন্ত্রী রৌফ্ বে ছিলেন। রৌফ্ বে ইংরেজ ও আমেরিকান্ সাংবাদিকদিগের জন্ত দ্বিভাষীর কাজ করিবেন।

"সেনাপতির কথাবার্ত্তা এমন, যে, তাহাতে মন ডুবিয়া যায়। তিনি শান্ত ও গম্ভীরভাবে, প্রত্যেকটি কথা ও৲ন করিয়া, কথা বলিতেছিলেন, এবং নূতন তুরস্ক ও তাঁহার আশা সম্বন্ধে কথা কহিতেছিলেন। ইস্মেৎ পাশা আসিয়া পড়ায় আমাদের কথোপকথনে বাধা পড়িল। কিন্তু লতিফা খানুম খুব দ্রুত ইংরেজী ও ফরাসী বলিতে পারেন; তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে সুরু করিলেন, এবং তুরস্ক সম্বন্ধে, বিশেষতঃ তুর্কী নারীদের সম্বন্ধে, তাঁহার অনেক হৃদ্গত কথা বলিতে লাগিলেন। পাঁচটার সময় ভোজন-কক্ষে চা দেওয়া হইল। বাড়ীর কর্ত্রী স্বয়ং চা ঢালিয়া দিয়া, এটা ওটা খাইতে অনুরোধ করিয়া, আদর আপ্যায়ন করিলেন, এবং কেমন করিয়া কমাল পাশার সহিত ঔপন্যাসিকভাবে তাঁহার বিবাহ ঘটিয়াছিল, তাহাও বলিলেন। [তাহা নিম্নলিখিতরূপ।]

"স্মার্ণার চারিদিকের পাহাড়ে তুর্কদের কামান-গর্জ্জন শোনা যাইতেছিল। গ্রীক সৈন্যদল পলায়নপর হইয়াছিল—বিজয়ী সৈন্যদলের আগে আগে মুস্তাফা কমাল পাশা অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার পথরোধ করে, তাঁহার সাম্নে দাঁড়ায়, কাহার সাধ্য? একদিন প্রাতে তুর্ক ঘোড়সওয়ার সৈন্যদল স্মার্ণা প্রবেশ করিল। লতিফা খানুম স্মার্ণার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা, প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিকের মত মহানুভব সেনাপতির স্মার্ণা আগমনের জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন। তিনি নিজের পিতাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, যে, সেনাপতি মহাশয়কে যেন তাঁহাদের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করা হয়। লতিফা খানুম স্বয়ং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ-পত্র দিতে গিয়াছিলেন। তিনি ভয়ে ভয়ে অথচ প্রশংসমান হৃদয়ে নিমন্ত্রণ-পত্র দিলেন; কমাল পাশা তাহা গ্রহণ করিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে সেনাপতি তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইলেন।

"জয়লাভের পর দেশের সকল অঞ্চল হইতে সেনাপতি যে সব চমৎকার উপহার পাইয়াছেন, উদ্যানবাটিকা হইতে চলিয়া আসিবার পূর্ব্বে, তাহার উপর তাড়াতাড়ি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া লইলাম—সুন্দর সুন্দর গালিচা, মূল্যবান্ রত্নখচিত সোনার বাঁটযুক্ত ভাল ভাল তলোয়ার, ইত্যাদি। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সেনাপতি মহাশয় স্বয়ং দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদিগকে বিদায় দিলেন।"

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
প্রবাসীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬৷৹। প্রতি সংখ্যা ৷৹। ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুষ্পোপহার
চিত্রকর শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষাল

U. Ray & Sons, Calcutta

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৩০

৪র্থ সংখ্যা

বাংলা দেশের লৌকিক তথ্য

পঞ্চাশ বৎসরে বাংলা দেশের লোকসংখ্যা কিরূপ বাড়িয়াছে, নীচে তাহা দেখান হইল।

বৎসর	লোকসংখ্যা	দশবৎসরে শতকরা	বৃদ্ধি
১৮৭২	৩, ৪৬, ৮০,০০৩		
১৮৮১	৩, ৭০, ১৪, ৬২১	(১৮৭২-১৮৮১)	৬.৭
১৮৯১	৩,৯৮,০৫, ৫২৭	(১৮৮১-১৮৯১)	৭.৫
১৯০১	৪,২৮, ৮১, ৩৫৯	(১৮৯১-১৯০১)	৭৭
১৯১১	৪, ৬৩,০৫, ১৭০	(১৯০১-১৯১১)	৮ ·
১৯২১	৪,৭৫, ৯২, ৪৬২	(১৯১১-১৯২১)	২ ৮

কোন দেশের বসতি ঘন হইলে তাহার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়া যায়, এইরূপ একটি ধারণা থাকা স্বাভাবিক। কারণ, বিরলবসতি দেশের জলস্থল হইতে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ যত বেশী বেশী লোক জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে, ঘনবসতি দেশে লোকে তত পারে না। যদি ধরা যায়, যে, কোন একটি দেশের উৎপাদিকাশক্তি বিবেচনা করিয়া তথায় প্রতি বর্গ মাইলে ৭০০ লোক বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে, উহার বসতির ঘনতা এই অঙ্কের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে, উহার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ততই কমিয়া আসিবে। সেইজন্য, ১৯১১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বাংলা দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্ব্ব পূর্ব্ব দশবার্ষিক বৃদ্ধি অপেক্ষা কম হওয়ায়, এরূপ অনুমান সহজেই মনে আসিতে পারে, যে, বাংলা দেশের বসতি বড় ঘন হইয়া গিয়াছে, এই কারণে এখানে আর বেশী পরিমাণে মানুষের সংখ্যা বাড়িতেছে না। কিন্তু অন্য দেশের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যাইবে, যে, ঘন-বসতি বাংলা দেশের লোকসংখ্যা যথেষ্ট-না-বাড়ার কারণ নহে।

প্রতি বর্গমাইলে বঙ্গে ৫৭৯ জন এবং ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে ৬৪৯ জন মানুষ বাস করে। বাংলার চেয়ে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের বসতি ঘনতর। কিন্তু বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৯১১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে শতকরা ২.৮ জন বাড়িয়াছে; ঐ দশ বৎসরে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা শতকরা পাঁচজনের কিছু বেশী বাড়িয়াছে। ইহার কারণ কি? কারণ, পাশ্চাত্য ঐ দুই দেশের স্বাস্থ্য বাংলা দেশ অপেক্ষা অনেক ভাল, তথাকার লোকেরা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য প্রধানতঃ বা কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে না, তথায় সাধারণ শিক্ষা,

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও পণ্যশিল্পউৎপাদনবিষয়ক শিক্ষা, বাংলাদেশ অপেক্ষা খুব বেশী বিস্তৃত ও খুব বেশী উৎকৃষ্ট, ও এইজন্য তথাকার লোকেরা ধন উৎপাদনের নিমিত্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বনে সমর্থ, এবং তাহারা স্বাধীন বলিয়া জাতীয় দারিদ্র্য দূর করিবার এবং দেশকে স্বাস্থ্যকর করিবার ও রাখিবার সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন যথাসাধ্য করিতে পারে—যাহা আমরা পারি না।

যে দশ বৎসরের কথা হইতেছে, গত মহাযুদ্ধ তাহার মধ্যে পড়ে। তাহাতে বিলাতের ৫,৪৯,৯৬৭ জন সৈন্য মারা পড়ে, এবং ২৫৩৩৫৩ জনকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এই ৮,০৩,৩২০ জন বাদ না পড়িলে, তথাকার লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি শতকরা সাত জনের উপর হইত। বিলাতের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি এই দশ বৎসরে যাহা হইতে পারিত, তাহা আরও একটি কারণে হয় নাই। অনেক বিবাহিত ও বিবাহযোগ্য লোক যুদ্ধক্ষেত্রে থাকায় বিলাতের জন্মের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। দুই তিন বৎসরের সংখ্যা দিতেছি। ১৯১৪ অপেক্ষা ১৯১৬ সালে ৯৩,৫৭৬টি কম শিশু জন্মিয়াছিল, এবং ১৯১৭ সালে ১৯১৬ অপেক্ষাও ৬,৬৮,৩৪৬টি কম শিশু জন্মিয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, যুদ্ধের জন্য কম শিশু জন্মগ্রহণ করাতেও ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা যথেষ্ট বাড়িতে পারে নাই। কিন্তু এসব কারণ সত্ত্বেও এই দশ বৎসরে তথাকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বঙ্গের দ্বিগুণ হইয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসরে কোন্ দেশের লোকসংখ্যা কত বাড়িয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে আমাদের দুরবস্থা আরও ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

১৮৭২ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত মোটামুটি পঞ্চাশ বৎসরে বাংলার লোকসংখ্যা শতকরা ৩৭২ জন বাড়িয়াছিল। ১৮৭১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা শতকরা প্রায় ৬৭ জন বাড়িয়াছিল। এখানে মনে রাখিতে হইবে, যে, ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক এই পঞ্চাশ বৎসরে চিরকালের জন্য ইংলণ্ড্ ছাড়িয়া অন্য-দেশে বাস করিতে গিয়াছে; তাহা অপেক্ষা অনেক কম লোক বিদেশ হইতে ইংলণ্ডে বাস করিতে আসিয়াছে। এই পঞ্চাশ বৎসরে যুদ্ধে অনেক ইংরেজের মৃত্যু হইয়াছে এই দুই কারণ সত্ত্বেও পঞ্চাশ বৎসরে শতকরা ৬৭ জন মানুষ তথায় বাড়িয়াছে। বাংলাদেশের লোক ভারতবর্ষ ছাড়িয়া বিদেশে বাস করিবার জন্য খুব কমই যায়, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে বাস করিতেও অল্পসংখ্যক বাঙালীই যায়; বরং অন্য নানা দেশ ও প্রদেশ হইতে বাংলা দেশে তার চেয়ে অনেক বেশী লোক আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করে। যুদ্ধে বাঙালী খুব কম মরিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও বঙ্গের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি ইংলণ্ডের প্রায় অর্দ্ধেক। রুগ্নতা, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, উদ্যমহীনতা, বৈজ্ঞানিক এবং কৃষি ও পণ্যশিল্প বিষয়ক শিক্ষার ও সাধারণ শিক্ষার অভাব, অর্থকর নানা বৃত্তি সম্বন্ধে কুসংস্কার, সমুদ্রযাত্রাবিষয়ক কুসংস্কার, নানা সামাজিক কুপ্রথা, এবং, সর্ব্বশেষে, পরাধীনতা আমাদের সংখ্যা যথেষ্ট না বাড়িবার কারণ।

যদিও মোটের উপর সমগ্র-বঙ্গে লোক বাড়িয়াছে, কিন্তু অনেক জেলায় লোক কমিয়াছে। কোথায় শতকরা কত কমিয়াছে লিখিতেছি। বর্দ্ধমান ৬'৫, বীরভূম ৯'৪, বাঁকুড়া ১০'৪, মেদিনীপুর ৫.৫, হুগলী ০'৯, নদিয়া ৮, মুর্শিদাবাদ ৮, যশোর ১.২, পাবনা ২'৭, মালদহ ১'৮। বৃদ্ধির সংখ্যাও দিতেছি। হাবড়া ৫'৭, কলিকাতা ১'৩, চব্বিশ পরগণা ৮, খুলনা ৬'৭, বগুড়া ৬'৬, দার্জ্জিলিং ৬.৫, রংপুর ৫'১, জলপাইগুড়ি ৩'৭, দিনাজপুর ১, রাজশাহী ০.৬, ঢাকা ৮'৩, মৈমনসিং ৬'৯, ফরিদপুর ৪'৮, বাখরগঞ্জ ৮'২, ত্রিপুরা জেলা ৯'৭, নোয়াখালি ১৩, চট্টগ্রাম ৬'৮, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল ১২.৬, এবং ত্রিপুরা রাজ্য ৩২.৬। বাংলা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হারে বাড়িয়াছে।

কোন অঞ্চলের বসতি ঘন হইলেও, যদি তাহা স্বাস্থ্যকর হয় এবং তথাকার লোকেরা উদ্যমশীলতা-সহকারে জীবিকানির্ব্বাহের নানা উপায় অবলম্বন করিতে পারে, তাহা হইলে সেখানকার লোকসংখ্যা বিরলতর-বসতি, অস্বাস্থ্যকর ও জীবিকানির্ব্বাহের উপায়ের বাহুল্য-হীন স্থান অপেক্ষা, বেশী বাড়িতে পারে। ইহার প্রমাণ বাংলা দেশেই পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গমাইলে ৫৮১ জন লোক বাস করে, পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা বিভাগে ৮৬৬

জন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা শতকরা ৪·৯ কমিয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা বিভাগে শতকরা ৭.১ জন বাড়িয়াছে।

১৯১১ সালে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের লোকসংখ্যা অধিকতম ছিল। তাহার পরবর্ত্তী দশবৎসরে ঐ প্রদেশের লোকসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় ১৯২১এর গণনা অনুসারে বাংলার লোকসংখ্যা উহা অপেক্ষা দশ লক্ষ বেশী হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে বঙ্গের লোকসংখ্যাই সকল প্রদেশের মধ্যে অধিকতম। অথচ ভারতগবর্ণমেণ্ট্ বাংলাদেশকে বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্ব হইতে এত বেশী পরিমাণে বঞ্চিত করেন, যে, বঙ্গের প্রজাদের জন্য বাংলাগবর্ণমেণ্ট্ জন-প্রতি যত খরচ করিতে পারেন, তাহা অন্য সমুদয় প্রদেশ অপেক্ষা কম।

বাংলা দেশের হাজারকরা ৬৭ জন, অর্থাৎ মোট ৩২,-১১,৩০৪ জন, মানুষ শহরে বাস করে; বাকী প্রায় সাড়ে চারি কোটি লোক গ্রামে বাস করে। ইহারা আমাদের আহার যোগায়; অথচ আমরা ইহাদের কথা কমই ভাবি, এবং পাড়াগেঁয়ে বলিয়া ইহাদিগকে অবজ্ঞা করি।

কলিকাতা ও তাহার শহরতলীগুলি বাদ দিলে, বঙ্গের শতকরা ৪ জন মাত্র লোক শহুরে। সমগ্র ভারতে শতকরা ১০ জন নগরবাসী। অতএব, বাঙালীরা মোটের উপর অন্যান্য প্রদেশের ভারতীয়দের চেয়ে বেশী পাড়াগেঁয়ে। ইংলণ্ড্ ও ওয়েল্‌সের শতকরা ৭৯ জন অধিবাসী শহুরে, ২১ জন গ্রাম্য। ১৯১১-১৯২১ দশকে বঙ্গে নাগরিকেরা শতকরা ৮·২ বাড়িয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে জানপদ নগরগুলিতে (country towns) বাড়িয়াছে শতকরা ২ জন, কলিকাতা ছাড়া বাণিজ্যিক ও কারখানার শহরগুলিতে বাড়িয়াছে শতকরা ১৬·৯ জন। বাণিজ্যিক ও কারখানার শহর-গুলিতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব কম হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের বাহির হইতে কলকারখানায় কাজ করিবার জন্য হাজার হাজার পুরুষ মজুরের আগমন তাহার কারণ। জানপদ নগরগুলিতেও স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিছু কমিয়াছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হ্রাস হইলে পারিবারিক বা গার্হস্থ্য প্রভাবের হ্রাস হয়, এবং পুরুষেরা "গৃহস্থ" না থাকিয়া "বাসাড়ে" হইয়া পড়ে। যেখানে পারিবারিক প্রভাব কমিয়া যায়, তথায় পাপাচার বৃদ্ধি পায়। এই কারণে দেশে কলকারখানা যত বাড়িবে, প্রতিকার না হইলে, সামাজিক অপবিত্রতাও তত বাড়িবে। ইহার প্রতিকার প্রধানতঃ দুই প্রকারে হইতে পারে। (১) মজুর ও কারিগরদের বেতন এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে তাহারা "গৃহস্থ" হইয়া কলকারখানার নিকটে বাস করিতে পারে, এবং (২) কলকারখানার নিকটে তাহাদিগকে গৃহস্থের মত থাকিবার গৃহ কলকারখানার মালিকগণ দিতে আইন অনুসারে বাধ্য, এরূপ নিয়ম হওয়া চাই।

বাংলার জানপদ শহরগুলির অধিকাংশ অধিবাসীর জন্ম, শহরগুলি যে-জেলায় অবস্থিত, সেই জেলায় হইয়াছিল। কিন্তু ভাটপাড়া, টিটাগড়, শ্রীরামপুর ও ভদ্রেশ্বর, এই কলকারখানার শহরগুলির শতকরা ৬৯ জন অধিবাসীর জন্ম বাংলা দেশের বাহিরে। এইগুলিকে এখন আর বাঙালীর শহর বলা চলে না।

পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের যে-সব শহরে কলকারখানা নাই, সাধারণতঃ তাহাদের অধিবাসী কমিয়াছে; কিন্তু ভদ্রেশ্বর, বৈদ্যবাটী, চাঁপদানী, ভাটপাড়া, টিটাগড়, বজ্‌বজ্, গারু-লিয়া, নৈহাটী ও কামারহাটীর লোকসংখ্যা বেশ বাড়িয়াছে। ভদ্রেশ্বর, বৈদ্যবাটী ও চাঁপদানীর মোট লোকসংখ্যা শতকরা ৪১ জন, বজ্‌বজের ৪৩ এবং ভাটপাড়ার ৬০ বাড়িয়াছে। উত্তরবঙ্গের কোন কোন শহর খুব বাড়িয়াছে। রংপুরের লোক বাড়িয়াছে শতকরা ১৬, দিনাজপুরের ১৩, জলপাইগুড়ির ২৭, বগুড়ার ৩৫, এবং রেলওয়ে-কেন্দ্র সৈদপুরের ৬৩। ঢাকার লোকসংখ্যা ১,১৯,৪৫০; দশ বৎসরে শতকরা ১০জন বাড়িয়াছে। ১৯১২ সালে ইহা পূর্ব্ববঙ্গ-ও-আসাম প্রদেশের রাজধানীত্ব হারান সত্ত্বেও এই বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের পাটের বাণিজ্যের কেন্দ্র-গুলিও বড় হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জের অধিবাসী শতকরা দশ জন, মাদারীপুরের ৩৩ এবং চাঁদপুরের ১৯ বাড়িয়াছে। মৈমনসিংহের ২৭, বরিশালের ১৯, কমিল্লার ১৪ এবং চট্টগ্রামের ২৫ বাড়িয়াছে।

দিনের বেলা কলিকাতার অস্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা

খুব বেশী। প্রত্যহ ইহার অধিবাসীদের এক-পঞ্চমাংশ রেলে কলিকাতায় আসে ও রেলে বাড়ী ফিরিয়া যায়।

১৯১১-১৯২১ দশকে বঙ্গের বাহির হইতে ১৮,৩৯,০১৬ জন মানুষ বাংলায় আসে, এবং বাংলা হইতে কেবল ৬,-৮৬,১৯৫ জন অন্যত্র যায়। কোন্ প্রদেশ হইতে কত মানুষ বঙ্গে আসিয়াছে, তাহার তালিকা দিতেছি।

প্রদেশ বা দেশ	আগন্তুকের সংখ্যা
বিহার-ওড়িষা	১২,২৭,৫৭৯
আগ্রা-অযোধ্যা	৬,৪৩,০৯৫
আসাম	৬৮,৮০২
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৫৪,৮১০
রাজপুতানা	৪৭,৮৬৫
মান্দ্রাজ	৩২,০২৪
পঞ্জাব ও দিল্লী	১৭,৭১৫
সিকিম	৪,০৫৭
ব্রহ্মদেশ	২,৩৬১
নেপাল	৮৭,২৮৫
ইউরোপ	১৩,৩৫৬
চীন	৩,৮৫৬

বাংলা হইতে প্রধানতঃ কোন্ প্রদেশে কত লোক গিয়াছে, তাহার তালিকা দিতেছি:

আসামে	৩,৭৫,৫৭৮
ব্রহ্মদেশে	১,৪৬,০৮৭
বিহার-ওড়িষায়	১,১৬,৯২২

অনেক বৎসর হইতে বিহারে একটা চীৎকার শুনা যাইতেছে, যে, বিহারের যা কিছু সুবিধা (অর্থাৎ সরকারী চাকরী প্রভৃতি) সব বিহারীদের জন্য রাখিতে হইবে, আর কেহ যেন তাহা না পায়। এই চীৎকার কার্য্যতঃ কেবল বাঙালীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। যে-সব বাঙালী অনেক পুরুষ ধরিয়া বিহারে বাস করিতেছে, এমন কি বাংলাদেশে যাহাদের ঘর বাড়ী বা ভিটার চিহ্ন মাত্র নাই, তাহাদিগকেও সর্ব্বপ্রকার জীবনোপায় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য বাঙালীবিদ্বেষী বিহারীরা খুব উদ্যোগী হইয়াছে। তাহারা উপরের দুটি তালিকা হইতে দেখিতে পাইবে, বঙ্গদেশ কত বিহারীকে অন্ন দেয়, এবং বিহার তাহা অপেক্ষা কতগুণ কম বাঙালীকে অন্ন দেয়। অবশ্য বাংলাও দান করে না, বিহারও দান করে না; বঙ্গে বিহারীরা খাটিয়া খায়, বিহারেও বাঙালীরা খাটিয়া খায়।

বিহার হইতে এবং আগ্রা-অযোধ্যার বিহার-সন্নিহিত জেলাগুলি হইতে যাহারা বঙ্গে আসে, তাহারা কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী কলকারখানায় এবং তদপেক্ষা কম পরিমাণে বঙ্গের অন্যত্র অবস্থিত কলকারখানায় কাজ করে। ইহারা ছাড়া আগন্তুকদের অন্য অনেকে নিজ নিজ কৌলিক কাজ করে—যথা জুতা-সেলাই, গাড়োয়ানী, গোয়ালার কাজ, পাল্কী বহা, মাটী কাটা ও তোলা, ইত্যাদি। ওড়িষার সাগরতটবর্ত্তী জেলাসকল হইতে আগত লোকেরা দিন-মজুর, পাচক, প্রভৃতির কাজ করে।

১৯১১-১৯২১ দশকে বিকানীর ও জয়পুরের বণিক্-শ্রেণীর লোকদের কলিকাতা আগমন খুব বাড়িয়াছে। ১৯২১ সালের সেন্সসে (অর্থাৎ লোকসংখ্যা-গণনায়) দেখা গিয়াছে, বিকানীরের অধিবাসীদের হাজারকরা ১৭ জন এবং জয়পুরের অধিবাসীদের হাজারকরা ৪ জন কলিকাতায় বসবাস করিতেছে।

১৮৭২ সালের সেন্সসে আগরওয়ালা ও মাড়োয়ারী-দিগকে বঙ্গে একসঙ্গে গোনা হইয়াছিল এবং তাহাদের সংখ্যা ছিল ৪,৯১০। ১৯২১ সালের সেন্সসে কেবল মাড়োয়ারীর সংখ্যা ৪৭,৮৬৫। রাজপুতানার যেখানেই জন্ম হউক, সকলকেই বঙ্গে "মাড়োয়ারী" বলা হয়। বঙ্গে "মাড়োয়ারী"র সংখ্যা ৪৭,৮৬৫ অপেক্ষা বাস্তবিক অনেক বেশী, এই আটচল্লিশ হাজার কেবল সেই মাড়োয়ারীদের সংখ্যা যাহাদের জন্ম হইয়াছে রাজপুতানায়। যে-সব মাড়োয়ারীর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ আদি বঙ্গের বাসিন্দা হওয়ায় তাহারা বঙ্গেই জন্মিয়াছে, তাহারা এই আটচল্লিশ হাজারের অন্তর্গত নহে।

ধর্ম্ম অনুসারে ১৯১১ ও ১৯২১ সালে বঙ্গের লোকসংখ্যা ও ১৯১১-২১ দশকে তাহার শতকরা বৃদ্ধি বা হ্রাস নীচের তালিকায় দেখান হইল।

ধর্ম্ম	সংখ্যা		১৯১১-২১এ
	১৯২১	১৯১১	শতকরা বৃদ্ধি বা হ্রাস।
মুসলমান	২৫৪৮৬১২৪	২৪২৩৬৭৫৬	+ ৫ ২
হিন্দু	২০৮০৯১৪৮	২০৯৪৫৩৭৯	— ০.৭
ভূতপূজক	৮৪৯০৪৫	৭৩০৭৮০	+১৬ ২
বৌদ্ধ	২৭৫৭৫৯	২৪৬৮৬৬	+১১.৪
খৃষ্টীয়	১৪৯০৭৫	১২৯৭৪৬	+১৪.৯
জৈন	১৩৩৬৯	৬৭৮২	+৯৭.১
ব্রাহ্ম	৩২৮৪	২৯৫৮	+১১.০
শিখ	২৩৮০	২২২১	+ ৭.১
ইহুদী	১৮৫১	১৯৯৩	— ৭.৩
কংফুচীয়	১৪৪৩	১০৫৮	+৩৬ ৪
জরথুস্ত্র (পারসী)	৭৭০	৬১১	+২৬ ০
আর্য্যসমাজী	২১৪	১০	...

বাংলাদেশের শতকরা ৫৩·৫৫ জন অধিবাসী মুসলমান, ৪৩·৭২ হিন্দু,১·৭৯ ভূতপূজক এবং ০·৯৪ অন্যান্য সম্প্রদায়-ভুক্ত। লর্ড মিণ্টো বলিয়াছিলেন, যে, মুসলমানদের রাজনৈতিক গুরুত্ব ("political importance") বেশী বলিয়া তাহাদিগকে তাহাদের সংখ্যার অতিরিক্ত প্রতিনিধি দিতে হইবে। এবম্বিধ রাজনৈতিক কারণে হিন্দুর সংখ্যা কমাইয়া ভূতপূজকের সংখ্যা বাড়াইবার একটা ঝোঁক হয়; নতুবা বাস্তবিক অনেক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ভূতপ্রেত পূজা করে, সাঁওতাল কোল ভীলরাও করে; উভয়ের মধ্যে সীমারেখা টানা অসম্ভব। তা ছাড়া, আরও এক কারণে, সমগ্র ভারতে (এবং বঙ্গেও) হিন্দুর সংখ্যা যত, সেন্সাসে তাহা অপেক্ষা কম দেখা যায়;—অনেক জৈন, শিখ ও আর্য্যসমাজীর সহিত হিন্দুদের বৈবাহিক আদানপ্রদান হয়। তাহাদিগকে আলাদা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক বলিয়া ধরা উচিত নহে।

আরও একটি কারণে হিন্দু বাঙালীর সংখ্যা মুসলমান বাঙালী অপেক্ষা খুব কম মনে হয়। ইংরেজ-সরকার যাহাকে বাংলা দেশ বলেন, প্রাকৃতিক-বঙ্গের সীমা তদপেক্ষা বিস্তৃততর। বাঁকুড়া জেলা যেমন বঙ্গের অন্তর্গত, বিহারের অন্তর্ভুক্ত মানভূম জেলাও তেমনি বঙ্গের অন্তর্গত; কারণ, স্মরণাতীত কাল হইতে মানভূমের অধিকাংশ অধিবাসী বাঙালী, বাংলায় কথা বলে। পুরুষানুক্রমে বঙ্গভাষীর অধ্যুষিত এইরূপ আরও ভূখণ্ড বাংলার আশে পাশে আছে। প্রাকৃতিক-বঙ্গকে বাংলা দেশ বলিয়া ধরিলে হিন্দু বাঙালীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়।

যাহা হউক, ইংরেজ-সরকারের বঙ্গের সমুদয় ভূতপূজক, জৈন, শিখ, আর্য্যসমাজী প্রভৃতিকে হিন্দু বলিয়া ধরিলেও, বঙ্গে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশীই থাকিবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, এখন যে জেলাগুলিকে বঙ্গ বলা হয়, সেই জেলাগুলিতেই, হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী ছিল। ১৮৭২ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত দশ দশ বৎসর অন্তর বঙ্গের চারিটি ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা কিরূপ ছিল, নীচের তালিকায় তাহা প্রদর্শিত হইল।

বৎসর	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টিয়ান্	ভূতপূজক
১৮৭২	১৭০৫১৫৩৩	১৬৬১৯১৯১	৬৩৪৮২	......*
১৮৮১	১৮০৬৭৮১৬	১৮৩৯৫৪২৪	৭২২৮৯	৩১৩০৮৯
১৮৯১	১৮৯৭৪৫৭৪	২০১৭৩২০১	৮২৩৩৯	৩৬৪৮২০
১৯০১	২০১৫২৯৬১	২১৯৫০৮১৮	১০৬৫৯৬	৪৪২৫৯৪
১৯১১	২০৯৪৫৩৭৯	২৪২৩৬৭৫৬	১২৯৭৪৬	৭৩০৭৮০
১৯২১	২০৮০৯১৪৮	২৫৪৮৬১২৪	১৪৯০৭৫	৮৪৯০৪৫

১৮৭২ সালে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা কিছু কম ছিল। তাহার পর হইতে, হিন্দুরা যে-হারে বাড়িতেছিল, মুসলমানেরা তদপেক্ষা বেশী হারে বাড়ায়, ১৮৮১ সাল হইতে মুসলমানদের সংখ্যা বঙ্গে হিন্দুদের চেয়ে বেশী আছে; কিন্তু তাহা হইলেও হিন্দুরাও বরাবর বাড়িতেছিল। কেবল ১৯১১-২১ দশকে হিন্দুরা হ্রাস পাইয়াছে। তাহার কারণ, পশ্চিম-বঙ্গেই অধিকাংশ বাঙ্গালী হিন্দু বাস করে, এবং পশ্চিমবঙ্গ অস্বাস্থ্যকর বলিয়া সেখানেই মানুষ মরিয়াছে বেশী ও জন্মিয়াছে কম। হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের অধিক বংশবৃদ্ধির দুইটি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে; (১) তাহাদের মধ্যে পরস্পরবিবাহে বাধাজনক জাতিভেদ না থাকায় তাহাদের মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে কম, (২) তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকায় জননী হইবার বয়সের স্ত্রীলোকেরা, হিন্দুদের ঐ বয়সের

* ১৮৭২ সালে কাহাকেও ভূতপূজক বলিয়া ধরা হয় নাই।

স্ত্রীলোকদের চেয়ে, অধিকসংখ্যায় জননী হইয়া থাকেন। অন্য কারণও আছে। ভূতপূজকদের বংশবৃদ্ধি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের চেয়েই বেশী দেখা যাইতেছে। কিছু বেশী স্বভাবতঃ হইতে পারে। কিন্তু খুব বেশী হওয়ায় সন্দেহ হয়, যে, ১৯২১ সালের সেন্সসেও অনেক নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুকে ভূতপূজক বলিয়া গণনা করা হইয়াছে।

আলোচ্য দশকে জৈনদের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সর্কারী ব্যাখ্যা এই, যে, তাহারা প্রায় সকলেই মাড়োয়ারী আগন্তুক। কলিকাতাতেই তাহাদের ৫৫২৪ জনকে গোনা হয়; দশ বৎসর আগে কলিকাতায় তাহাদের সংখ্যা ১৭৯৭ ছিল। কলিকাতার বাহিরে উত্তরবঙ্গেই—বিশেষতঃ রংপুরে, তাহাদিগকে দেখা যায়। মুর্শিদাবাদেও অল্পসংখ্যক আছে।

মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি আলোচ্য দশকে শতকরা ৫·২ হওয়ায় মনে হয়, যে, এই বৃদ্ধি বংশবৃদ্ধিজনিত. অন্য ধর্ম্ম হইতে ইসলামে দীক্ষা দ্বারা সংখ্যাবৃদ্ধি বঙ্গে বিশেষ কিছু হয় নাই। খৃষ্টিয়ানরা সম্ভবতঃ দীক্ষা দ্বারা কিছু বাড়িয়াছে, যদিও বেশী নহে; কারণ মোটে তাহারা শতকরা ১৪·৯ বাড়িয়াছে। মোট দেড়লক্ষ খৃষ্টিয়ানের মধ্যে ২২৭৩০ ইউরোপীয়, ২২২৫০ ফিরিঙ্গী ও অন্যান্য, এবং ১০৪২১২ জন দেশী খৃষ্টিয়ান।

ব্রাহ্মদের সংখ্যা খুব কম। তাহারা শতকরা ১১ জন বাড়িয়াছে। তাহারা প্রায় সকলেই হিন্দুবংশোদ্ভূত; এইজন্য জাতিগত (racial) কারণে তাহাদের বৃদ্ধি হিন্দুদের মতই হইবার কথা। কিন্তু তাহারা হিন্দুদের চেয়ে বেশী হারে বাড়িয়াছে। তাহার কারণ, বোধ হয়, এই, যে, তাহাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোক অধিকাংশই শিক্ষিত বলিয়া স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান্ ও সমর্থ, এবং একেবারে বেকার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ তাহাদের মধ্যে বিরল। অবশ্য দীক্ষা দ্বারাও তাহাদের সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। কলিকাতাতেই তাহাদের সংখ্যা বেশী—১৭৫৯; ঢাকা জেলায় ২৩৪, মেদিনীপুরে ১৫৩, হাবড়ায় ১৫১, ত্রিপুরা জেলায় ১২৩, চট্টগ্রামে ১২৬, মৈমনসিংহে ১১০, বাখরগঞ্জে ১১৬, বর্দ্ধমানে ৩২, বীরভূমে ৬৮, বাঁকুড়ায় ৬, চব্বিশ পরগণায় ৮৪, নদিয়ায় ৬১, মুর্শিদাবাদে ৩২, যশোরে ১৫, রাজশাহীতে ১১, দিনাজপুরে ৪, জলপাইগুড়িতে ৮, দার্জ্জিলিঙে ৪০, রংপুরে ২১, বগুড়ায় ২৭, পাবনায় ১৬, মালদহে ৩, ফরিদপুরে ৬৮। কুচবেহার রাজ্যে ব্রাহ্মের সংখ্যা ৩২, ত্রিপুরা রাজ্যে ১৭। হুগলী, খুলনা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল, এই চারি জেলায় একজন ব্রাহ্মও গণিত হয় নাই।

সমগ্র বঙ্গে পুরুষদের গড় আয়ু ২৩·৯ বৎসর, স্ত্রীলোকদের ২৩·১। জাপানে ও ইংলণ্ডে ইহার প্রায় দ্বিগুণ। আমাদের চেয়ে ইংরেজ ও জাপানীদের কৃতিত্ব বেশী হইবার একটি প্রধান কারণ।

১৯১১ সালে প্রতি হাজার পুরুষে ৯৪৫ জন স্ত্রীলোক ছিল; ১৯২১ সালে প্রতি হাজার পুরুষে ৯৩২ জন স্ত্রীলোক। "প্রবাসী"র ভবিষ্যৎ কোন সংখ্যায় দেখাইব, যে, অন্যান্য কারণের মধ্যে এই কারণেও বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

১৯১১ সালের পর হইতে গড়ে বিবাহের বয়স বাড়িয়াছে, ইহা শুভ লক্ষণ। এই বিষয়ে ভদ্র শ্রেণীর হিন্দুরা, বিশেষতঃ বৈদ্যেরা, অগ্রসর। কিন্তু কোন কোন নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বালিকাদের বিবাহের বয়স কমিয়াছে, যদিও বালকদের কমে নাই। বালিকাদের বিবাহের বয়স হ্রাস কুলক্ষণ; বোধ হয় নিম্নশ্রেণীর এইসব লোক অল্পবয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া ভদ্রতার লক্ষণ মনে করে। যে-সব আদিমনিবাসী (aborigines) নিজেদের কৌলিক ধর্ম্মবিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে হিন্দুদের মত বালিকাদের শৈশববিবাহ প্রচলিত হইতেছে। ইহা দুঃখের বিষয়। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে হাজারকরা কোন্ বয়সের কত বিধবা আছে, নীচের তালিকায় তাহা দেখাইতেছি।

বিধবাদের হাজারকরা সংখ্যা।

বয়স	হিন্দু	মুসলমান
১৫-২০	৯৪	৪১
২০-২৫	১৫৪	৬১
২৫-৩০	২৩৬	১০৫
৩০-৩৫	৩৪৩	১৯৬
৩৫-৪০	৪৫৫	৩২১

বঙ্গে পাগল ১৯৫৬৪, কালা-বোবা ৩২০২৮, অন্ধ ৩৪২১৫, কুষ্ঠরোগী ১৫৮৯৭ আছে। কুষ্ঠের প্রাদুর্ভাব ৪০ বৎসর আগে যত ছিল, তাহা অপেক্ষা কম। কিন্তু বাঁকুড়া জেলায় কুষ্ঠীর সংখ্যা বাড়িয়াছে।

বাংলা দেশে ৮০টি ভাষার কোন না কোনটিতে কেহ না কেহ কথা বলে। শতকরা ৯২ জন বাংলা বলে। প্রতি দশ হাজারে কোন্ অঞ্চলে কত জন বাংলা বলে তাহার তালিকা এই :—

বঙ্গ	৯১৯৭
পশ্চিমবঙ্গ—বৰ্দ্ধমান বিভাগ	৮৭২৫
মধ্য বঙ্গ—প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৯০৩৫
উত্তরবঙ্গ—রাজশাহী বিভাগ ও কুচবেহার	৯৭৩৭
পূর্ব্ববঙ্গ—ঢাকা বিভাগ	৯৮৪৩
চট্টগ্রাম বিভাগ ও ত্রিপুরা রাজ্য	৯৫২২

বাংলাদেশে ১৮০৬৮৭৮ জন অর্থাৎ প্রতি দশ হাজারে ৩৮০ জন হিন্দী ও উর্দ্দু বলে।

যে চিঠি লিখিতে পারে ও তাহার জবাব পড়িতে পারে, সেন্সাসে তাহাকেই লিখনপঠনক্ষম বলিয়া ধরা হইয়াছে। বঙ্গে পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক লোকদের মধ্যে হাজারে ১০৪ জন লিখনপঠনক্ষম—পুরুষদের মধ্যে হাজারে ১৮১ জন, স্ত্রীলোকদের মধ্যে হাজারে ২১ জন। স্ত্রীলোক ও পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার এই প্রভেদ না ঘুচিলে মঙ্গল নাই। ১৯১১ সাল অপেক্ষা কিছু উন্নতি হইয়াছে। তখন হাজারে ১৬১ জন পুরুষ ও ১৩ জন স্ত্রীলোক লিখন-পঠনক্ষম ছিল।

হাজারে ব্রহ্মদেশে ৩১৭ জন লিখিতে পড়িতে পারে, বঙ্গে ১০৪, মান্দ্রাজে ৯৮, বোম্বাইয়ে ৮৩, আসামে ৬৩, বিহার-উৎকলে ৫১, পঞ্জাবে ৪৫, আগ্রা-অযোধ্যায় ৩৭।

বঙ্গে ধর্ম্ম অনুসারে লিখনপঠনক্ষমের হাজারকরা সংখ্যা :

	পুরুষ	নারী
হিন্দু	২৬৮	৩৬
মুসলমান	১০৯	৬
দেশী খৃষ্টিয়ান	৩১৭	১৬৪
বৌদ্ধ	১৬৯	১৯
ভূতপূজক	১৪	১

প্রেসিডেন্সী বিভাগে লিখনপঠনক্ষম হাজারে ১৪৩, বৰ্দ্ধমান বিভাগে ১২৭, চট্টগ্রাম বিভাগ ও ত্রিপুরা রাজ্যে ৯৩, ঢাকা বিভাগে ৯০, এবং রাজশাহী বিভাগ ও কুচবেহারে ৭৫।

পশুচারণ ও কৃষি চারি-পঞ্চমাংশ অধিবাসীর উপজীব্য। শতকরা ৭।০ জন কারিগরী, কলকারখানার মজুরী ও মূলধনী প্রভৃতি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহা হইতে দেশের দারিদ্র্যের একটি কারণ বুঝা যায়। শুধু কৃষিতে শতকরা ৮০ জনের দিনগুজরান্ হইতে পারে না। মাল ও মানুষ বহা দ্বারা শতকরা ১।০ এবং ব্যবসা দ্বারা শতকরা ৫ জন জীবিকানির্ব্বাহ করে। হাজারে ৪ জন পুলিস্ ও ফৌজে কাজ করে; অন্য দেশের তুলনায় ইহা খুব কম। অন্য সরকারী কাজে হাজারে ৩ জন লোক নিযুক্ত আছে। ইউরোপীয় দেশসকলের তুলনায় ইহাও খুব কম। অথচ আমাদের এই বদনাম ইংরেজ ও অন্যেরা করে, যে, আমরা কেবলই সরকারী চাকরী করি বা খুজি। বস্তুতঃ আমরা সরকারী চাকরী এত কম লোকে (হাজারে সাতজন মাত্র) করি, যে, উহা ছাড়িয়া দিলে দেশে হাহাকার পড়িবার সম্ভাবনা খুব কম। অথচ এই চাকরীগুলা হিন্দু কত পাইবে আর মুসলমান কত পাইবে, তাহা লইয়া কতই না ঈর্ষা ও মনোমালিন্য ও ঝগড়া। মাড়োয়ারীরা ত সরকারী চাকরী লইয়া ঝগড়া করে না; অথচ তাহাদের পুঁজি ও আয় বঙ্গের সমুদয় হিন্দুমুসলমান চাকুরেদের চেয়ে ঢের বেশী; যদিও সংখ্যায় তাহারা অতি সামান্য।

বাংলাদেশ যেরূপ দরিদ্র, তাহাতে এখানে যে শতকরা একজন মাত্র মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি গণিকাবৃত্তি বা অন্যবিধ অনুৎপাদক কাজ করে, ইহা অন্য অনেক দেশের তুলনায় ভাল বলিতে হইবে।

অধিবাসীদের জীবিকা সম্বন্ধে বাংলা দেশের সহিত বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর প্রভেদ আছে। বঙ্গে কৃষি ও পশুপালন প্রভৃতি শতকরা প্রায় আশী জনের উপজীব্য; বোম্বাইয়ে উহা ৬৪৮ জনের উপজীব্য। বঙ্গে কল-কারখানার কাজ ও পণ্যশিল্প শতকরা ৭।০ জনের উপজীব্য; বোম্বাইয়ে শতকরা ১২ জনের। পুলিস্ প্রভৃতি শান্তি-রক্ষকের কাজ, বাংলায় ০·৪, বোম্বাইয়ে ০·৯। অন্যান্য

সরকারী চাকরী বঙ্গে ০·৩, বোম্বাইয়ে ১·৮। ব্যবসা, বঙ্গে ৫, বোম্বাইয়ে ৭·৩। মাল ও যাত্রী বহা, বঙ্গে ১৷০, বোম্বাইয়ে ২। চিকিৎসা ওকালতী অধ্যাপকতা আদি বঙ্গে ১৷০, বোম্বাইয়ে ১·৯। গৃহভৃত্য, বঙ্গে ১৷০এর কম, বোম্বাইয়ে ২·৪। ভিক্ষাআদি অনুৎপাদিকা বৃত্তি, বঙ্গে প্রায় ১, বোম্বাইয়ে ১·৬। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, বোম্বাইয়ের লোকেরা বাংলা দেশের লোকদের চেয়ে চাষ অপেক্ষা বেশী পরিমাণে কলকারখানা, পণ্যশিল্প ও ব্যবসার উপর নির্ভর করে। এইজন্য তাহাদের মধ্যে নগদ-টাকা-ওয়ালা ধনী লোকের সংখ্যা বেশী। বঙ্গে কলকারখানা পণ্যশিল্প ও ব্যবসা যাহাদের উপজীব্য, তাহাদের মধ্যে বড় বড় মূলধনী ও ব্যবসায়ীরা প্রায় সকলেই অবাঙালী, এবং এই-সকল কাজে ব্যাপৃত শ্রমজীবীদেরও অধিকাংশ অবাঙালী। এই কারণে নগদ-টাকা-ওয়ালা বাঙালী ধনীলোকের সংখ্যা খুব কম।

বাংলায় শহরের সংখ্যা ১৩৫, গ্রামের ৮৯৫২৫। অধিবাসীদের মধ্যে পুরুষ ২,৪৬,২৮,৩৬৫, স্ত্রীলোক ২,২৯,-৬৪,০৯৭। কোন্ ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে পুরুষ কত ও স্ত্রীলোক কত তাহার তালিকা -

ধর্ম্ম	পুরুষ	স্ত্রীলোক
হিন্দু	১০৫৩৬১১৯	৯৬৬৭৪০৮
মুসলমান	১৩১০৪৩০৭	১২৩০৯৮১৭
ভূতপূজক	৪৩০২৯৩	৪১৮৭৫২
বৌদ্ধ	১৪০৬৫৯	১৩৫১০০
খৃষ্টিয়ান	৭৮৯১৪	৭০১৫৫
ব্রাহ্ম	১৭১০	১৫৭৪
শিখ	১৮২৪	৫৪৬
জৈন	২৫২৯	৮৪০
পার্সী	৫০২	৩৬৮
ইহুদী	৯১৬	৯৩২
অন্যান্য	১৩১৮	২৮৫

সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক কম। আগন্তুকদের মধ্যে স্ত্রীলোকের ন্যূনতা অধিক লক্ষিত হয়।

কোন দেশেই কোন জাতির বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকের প্রাকৃতিক মৌরসী পাট্টা নাই। সুতরাং সমুদয় বাঙালীর কিম্বা বিশেষ কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাঙালীর অন্য কাহাদেরও বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে বর্ত্তমান বাঙালীদের চেয়ে যোগ্যতর লোকেরা এদেশে আসিলে তাহারাই টিকিয়া থাকিবে, এবং ভবিষ্যতে তাহারাই বাঙালী বলিয়া পরিচিত হইবে। দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বর্ত্তমান বাঙালীদের টিকিয়া থাকিবার একমাত্র উপায়।

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

নব বর্ষা

ওগো আষাঢ়ের নব মেঘ তুমি
কোন্ যক্ষের বারতা বহ ?
কোন্ বিরহীর কাতর কাহিনী
মরমের মাঝে নীরবে কহ ?
কোন্ সে করুণ বেদনার ভাষ,
আকুল কামনা করহ প্রকাশ ?
দেশ দেশ ভ্রমি' কার কান্তার
সন্ধান তুমি গোপনে লহ ?

ওগো বরষার ধারা-জল তুমি
কার নয়নের সলিল-ধারা ?—
কোন্ বিরহিনী ফেলে আঁখিজল
শূন্য শয়নে দয়িত-হারা ?
এলায়িত কেশ, শিথিল কাঁকণ,
বিমলিন বেশ, সজল নয়ন,
কোন্ অভাগিনী জাগিয়ে যামিনী
প্রিয়-মুখ স্মরি' কাঁদিয়ে সারা ?

শ্রী পরিমলকুমার ঘোষ

ডঙ্কা-নিশান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্থাগার

শত্রু-সৈন্যের বেড়া-জালে ঘেরা রিক্ত-সঞ্চয় ক্ষুধার্ত্ত বৈশালীর ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্যে সে-দিন ভোর না হ'তেই সন্থাগারের আসন-শালা সন্থ বা সভ্যের দলে প্রায় ভ'রে উঠেছিল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাত হাজার সাত শো আসনই প্রায় পূর্ণ হ'য়ে গেল। মুখ্য আসনে মহাসম্মত ধনুগ্রর্হ, ডান পায়ের হাঁটুর মাথায় ডান হাতের কনুই রেখে মৃদুস্বরে সন্থ প্রভাস্বরের সঙ্গে কথা কইছিলেন। সুভদ্র, ভদ্রিয়, অনুরাধ, সহালীন প্রভৃতি প্রধান সন্থেরা উৎকর্ণ হ'য়ে তাঁদের কথা শুন্‌তে ব্যস্ত। সকলের মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন। ধনুগ্রর্হের দক্ষিণে একটি তরুণী সংবহুল-করণ্ডিকা থেকে নানা রঙের নাম-গুটিকা বা'র ক'রে রং হিসাবে সেগুলো আলাদা ক'রে রাখ্‌ছিল; আর তাঁর বাঁয়ে একজন প্রৌঢ়, ভাণ্ডাগারিকের লেখা প্রাত্যহিক খরচের অহোরূপ নামক খাতায় ঠিক্ দিয়ে, কোন্ সামগ্রীর ব্যয় কি পরিমাণে কমানো যেতে পারে, তারই একটা আঁচ ক'রে দেখ্‌ছিলেন।

সহসা শঙ্খের সঙ্গে ঢকা বেজে উঠ্‌ল। মহাসম্মত ধনুগ্রর্হ দেখ্‌লেন সমস্ত আসন পূর্ণ। কেবল বলগুপ্ত অনুপস্থিত। ভাণ্ডাগারের অবস্থা রিক্তপ্রায় ব'লে সেদিন আসনশালায় গন্ধমাল্য বা কর্পূরের মালা কিছুই টাঙানো হয় নি। সাত হাজারের মহা-সভায় ধূপ জ্বল্‌ছিল মাত্র দুটি।

সভার আরম্ভে মহাসম্মত নগর-দেবতা বৈশ্রবণ ও মহাশ্রীকে যুক্তকরে প্রণাম করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সাত হাজার মাথা অবনত হ'ল।

নমস্কার শেষ ক'রে মহাসম্মত সন্থ-মণ্ডলীকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন, "কুলপুত্রগণ! বৈশালীর দুর্জ্জয় কুলসঙ্ঘের আজ দুর্দ্দিন। অন্নের জন্যে আজ আমাদের শত্রুর শরণাপন্ন হ'তে হবে। ইন্ধন এবং খাদ্যের অভাবে আমরা দিন দিন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ছি। নগরে অকাল-মৃত্যু দেখা দিয়েছে, অনাহারে লোকক্ষয় হ'তে সুরু হয়েছে। তিন মাসের অবরোধে আমাদের সঞ্চিত শস্য ফুরিয়ে এসেছে। বাইরে নগর বেষ্টন ক'রে মগধের সৈন্য ঘাঁটি বসিয়েছে। সুতরাং বাইরে থেকেও খাদ্য পাবার আশা নেই। মগধের পল্টন মগধ থেকে রসদ পাবে, চার দিকের ক্ষেত লুট ক'রে সেনাভক্ত সংগ্রহ করবে, সুতরাং তিন মাস কেন তিন বৎসরও এখানে ব'সে থাক্‌তে ওদের আপত্তি হবে না। আমরা আজ দশদিন কাল একাহারে আছি। অহোরূপের খাতায় প্রাত্যহিক খরচের রূপ যা' দেখ্‌ছি তাতে বোধ হয় যে একবেলা আহারও আর অধিক দিন জুটবে না। অনুপ্রিয়-রাজ্য থেকে শস্য আস্‌বার কথা ছিল, তাও এল না। পায়রার মুখে খবর পাওয়া গেছে, সে শস্য মাঝ-রাস্তায় মগধের কবলে পড়েছে। আমাদের বড় আশায় ছাই পড়েছে। এদিকে ক্ষুধার্ত্ত শিশুদের চীৎকার। দুর্গদ্বার আমাদের এ অবস্থায় আর বেশী দিন বন্ধ রাখা চল্‌বে ব'লে বোধ হচ্ছে না। অজ্ঞাতশত্রুর ধৃষ্ট-প্রবেশের দিন থেকে, আজ প্রায় দু'শো আড়াই শো বছর, আমরা স্বাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে যে চেষ্টা বারম্বার করেছি, ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদে আমাদের সে চেষ্টা এবারও বোধ হয় ব্যর্থই হবে।...মগধের বিরুদ্ধে বনচরদের উত্তেজিত করবার পূর্ব্বে আমাদের খাদ্য-সংগ্রহের দিকে আর-একটু বেশী ক'রে মন দেওয়া উচিত ছিল। আমি গোড়াতেই সে কথা বলেছিলুম। কিন্তু বহুলোকের মতের কাছে আমাদের অল্প ক'জনের মত টিঁকল না। সংবহুল ক'রে বৈশালী উপযুক্ত শক্তিসঞ্চয়ের পূর্ব্বেই বিশাল মগধ-সাম্রাজ্যের যন্ত্র-হস্তীর সঙ্গে নিজের বল-পরীক্ষা করাটাই যুক্তিসঙ্গত ব'লে ঠিক করলে। তার ফল যা' হয়েছে তা' আমরা সকলেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। সে যা' হোক তা' নিয়ে অনুশোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বর্ত্তমানে আমাদের যে অবস্থা, সে অবস্থায় আমাদের কোন্ পথ অবলম্বন করলে

শ্রেয়ের দিকে অগ্রসর হ'তে পারা যাবে, আজ্‌কের বিচার্য্য সেই কথাই। বন্যা চৌকাঠ পর্য্যন্ত এসে দরজায় এখন ধাক্কা দিচ্ছে, এখন কি কর্ত্তব্য তা' আপনারা নির্দ্ধারণ করুন। ব্যক্তিগত হিসাবে অনশন-মৃত্যু বরণ কর্‌তে আমি প্রস্তুত। এখন সভার কি অভিপ্রায় তা' জান্‌তে ইচ্ছা করি। কারণ বহুবল্লভা বৈশালী সংবহুলের চির-পক্ষপাতিনী।"

মহাসম্মতের উক্তির শেষে অল্পক্ষণ শুদ্ধ থেকে লেলিহা-মুদ্রার দ্বারা বল্‌বার লোভ প্রকাশ ক'রে সন্ত সুভদ্র বল্‌লেন, "শুধু শুধু মৃত্যু বরণ ক'রে লাভ নেই। বৈশালীর আদর্শ রক্ষা করাই, আমার মতে, আমাদের যথার্থ বেঁচে থাকা। সে আদর্শ রক্ষার্থে মরাকে আমি মরা ব'লে স্বীকার করি নে। সে মৃত্যু স্পৃহণীয়, কারণ সে অনন্ত জীবনের সোপান। এখন বিচার কর্‌তে হবে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা অনশনে নগরসুদ্ধ লোক ম'রে গেলে, সে আদর্শ রক্ষিত হবে কি না। আমার মতে হবে না। কারণ মগধের সম্রাট্‌কে আর্য্যাবর্ত্তের মহাসম্মত কর্‌তে হ'লে বৈশালীর বেঁচে থাকা প্রয়োজন। আজ হোক, দু'দিন পরে হোক, বা দু'হাজার বছর পরেই হোক, বৈশালীর শাসনতন্ত্রের সর্ব্ব-সম্মতির বিশাল ভিত্তির উপরেই ভবিষ্যৎ ভারতের গণ-নায়ককে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে। এই হ'ল ভারতের ইতিহাসে বৈশালীর বিশেষ কাজ। আর সেই কাজ সাধনের জন্যে বৈশালীকে বেঁচে থাক্‌তে হবে, টিঁকে থাক্‌তে হবে। স্বল্পসৈন্য স্বল্পায়তন বৈশালী বাহুবলে যে সে কাজ কর্‌তে পার্‌বে এমন সম্ভাবনা অল্প। তবে মনের বলের তুল্য বল নেই; আমরা আদর্শের বলে জয়ী হব, এ বিশ্বাস আমি রাখি। তাই পরম-জয়ের প্রতীক্ষায় এখন পরাজয় স্বীকার কর্‌লেও চরমে আমরা জয়লাভই কর্‌ব, ক্ষতিগ্রস্ত হব না। আমাদের টিঁকে থাক্‌তে হবে, আমাদের আদর্শকে জয়-যুক্ত কর্‌তে হবে, বৈশালীর আদর্শের মানস-পুত্রকে আর্য্যাবর্ত্তের সম্মিলিত সম্মতির মহাসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে হবে। অনাহারে ম'রে গিয়ে আমরা একগুঁয়েমি দেখাতে পারি, কিন্তু বৈশালীর আত্মাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না। জাতীয়-আত্মাকে রক্ষা কর্‌তে হ'লে আমাদের বাঁচ্‌তে হবে। সুতরাং আমার মতে সন্ধিই এখন শ্রেয়।"

সুভদ্র নীরব হ'লে সন্ত সহালীন বল্‌লেন, "সে পথও একরূপ রুদ্ধ। আমরা বাণের মুখে চিঠি পাঠিয়ে মগধ-সেনাপতিকে শব-সৎকারের জন্যে নগরের বাইরে যাবার অনুমতি চেয়েছিলুম। তার উত্তরে বাণের মুখেই মগধ জানিয়েছে, যে, শব-সৎকারের অনুমতি চাওয়ার মানে পরাজয়-স্বীকার; বৈশালী যদি তাই স্বীকার করে, তবে আপত্তি নেই। সুতরাং এ অবস্থায় সন্ধির প্রস্তাব কর্‌লে সে-সন্ধি কপাল-সন্ধিতে পরিণত হবে। আমাদের মাথার খুলি বিক্রী ক'রেও সে সন্ধির টাকা শোধ হবে না। সে রকম সন্ধির চেয়ে নগরে আগুন দিয়ে মরিয়া হ'য়ে যুদ্ধ ক'রে মরাই ভাল। কারণ এখন সন্ধি কর্‌লে, মগধের পায়ে তেল জোগাতে ঘানির গোরু হ'য়েই আমাদের দেহ-পাত কর্‌তে হবে।"

সন্ত সহালীন বক্তব্য শেষ কর্‌তেই তাঁর ভাই সন্ত মহালী উত্তেজিত-স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন, "সন্ধি হবে না। মগধের সঙ্গে সন্ধি হ'তে পারে না। মগধ চায় সাম্রাজ্য, আমরা চাই স্বয়ম্প্রভুতা। মগধ কোনো দিন আমাদের আদর্শ নেবে না, সুতরাং আমাদের যুদ্ধই কর্‌তে হবে। আর তা' ছাড়া সন্ধি কর্‌তে হ'লে মগধ যদি আমাদের স্কন্ধে অর্থ-দণ্ড চাপায়, সে অর্থই বা আমরা দেব কোথা থেকে—বৈশালীর কোষাগারে যে অর্থ সঞ্চিত আছে, সে আমাদের প্রত্যেকের প্রদত্ত সকলের রক্ষা-বেতন। যিনি বা যাঁরা আমাদের সকল রকমে রক্ষা করেন, তাঁকে বা তাঁদেরি সেই রক্ষা-কর্ম্মের বেতন-স্বরূপ আমরা স্বেচ্ছায় এই রক্ষা-বেতন দিয়ে থাকি। সে অর্থ আমরা মগধকে দিতে পারি নে, কারণ মগধ আমাদের রক্ষক নয়। যারা দস্যুর মতন ধৃষ্ট-প্রবেশের দ্বারা বারম্বার আমাদের নগরের অপমান করেছে, রক্ষা-বেতনের অর্থ তাদের সমর্পণ কর্‌লে আমাদের অন্যায় হবে, অধর্ম্ম হবে।"

সন্ত মহালীর কথায় সাত হাজারী সন্থাগার সমুদ্রের মতন বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল। "সন্ধি চাইনে" "মগধ ধৃষ্ট" "তবে উপোষ" "তুমি থামো" "আহা সংবহুল করা হোক্‌ না।"—এই রকম নানা জনের নানা কথায়, সন্থাগার যখন অশান্তির আগার হ'য়ে উঠেছে, তখন সকলের গলা ছাপিয়ে, সন্ত পন্থক ব'লে উঠ্‌লেন,

"আরে! শ্রেষ্ঠী আম্রশক্কর যে! কবে আসা হ'ল! কেমন ক'রে এলে হে! তুমি তো নগরে ছিলে না!"

হঠাৎ সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি আম্রশক্করের উপরে গিয়ে পড়্‌ল। কলরব মুহূর্ত্তে থেমে গেল। দূরে একজন ব'লে উঠ্‌ল, "আম্রশক্কর! তা ভালো, বৈশালীর বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে শাকের সঙ্গে বালি না হ'য়ে আঁবের সঙ্গে শর্করা।" গম্ভীর আলোচনার মাঝখানে রঙ্গরসের পিচ্‌কারী-প্রয়োগে অনেকেরই চোখ গরম হ'য়ে উঠ্‌ছিল, এমন সময়ে আম্রশক্করের সঙ্গীকে লক্ষ্য ক'রে সন্ত তিষ্য ব'লে উঠ্‌লেন, "বলগুপ্ত! আপ্‌নি একে কোথায় পেলেন?" সন্তবর্গকে নমস্কার জানিয়ে আসনে বস্‌তে বস্‌তে বলগুপ্ত বল্‌লেন, "কাল রাতের নগর-পরিক্রমায় বেরিয়ে এঁকে পেয়েছি। শত্রুর চর ভেবে প্রহরীরা এম্‌নি প্রহার দ্যায় যে ইনি অজ্ঞান হ'য়ে যান। কাজেই তখন কোনো পরিচয় পাই নি। গায়ে মাথায় পরিখার পাঁক-মাখা, কাজেই চোখে দেখেও চেন্‌বার জো ছিল না। পরে সেবাঘরে এনে চৈতন্ত সম্পাদনের পর চিন্‌লুম যে ইনি আমাদের নগর শ্রেষ্ঠী আম্রশক্কর। বাকী কথা আপনারা এঁরই মুখেই শুন্‌বেন।"

—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আম্রশর্করের কথা

মাথায় পট্টি-বাঁধা আম্রশক্করের নমস্কারে প্রতি-নমস্কার ক'রে মহাসম্মত ধন্থগ্র্হ বল্‌লেন, "তাই ত, নগর-শ্রেষ্ঠী, আপনি আহত হয়েছেন, দেখ্‌ছি; সমস্ত গা ছ'ড়ে গেছে, তাই ত, বড় দুঃখের বিষয়, নিজের ঘরে এসে এই দুর্গতি!..."

কাল-শিরে-পড়া ফুলো ঠোঁট ফুলিয়ে শ্রেষ্ঠী বল্‌লেন, "বেঁচে আছি এই ঢের, স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখ্‌তে পেলুম, আপনাদের দর্শন পেলুম। প্রহরীদের কোনো দোষ নেই, তারা চিন্‌তে পারে নি, আর চিন্‌বেই বা কি ক'রে?...সর্ব্বাঙ্গে পাঁক,...প্রায় উলঙ্গ..."

অধীর-ভাবে মহাসম্মত ব'লে উঠ্‌লেন, "বাইরের খবরের জন্যে আমরা ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে আছি শেঠ্‌জী, যদি বেশী ক্লেশ বোধ না করেন তবে এই বন্দীগুলোকে বাইরের খবর কিছু দিন।"

"কোনো ক্লেশ হবে না, মহাসম্মত,...এ তো আনন্দের কথা,...আমার দুর্ভোগের ইতিহাস শোনাব ব'লেই তো মৃত্যুভয় অগ্রাহ্য ক'রে দুর্গপ্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে এসেছি।"

"তা হ'লে আরম্ভ করুন।"

"মহাসম্মতের আদেশ শিরোধার্য্য। আপনারা সকলেই জানেন যে প্রায় আট মাস পূর্ব্বে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি বণিক্‌-পথের পথিক হয়েছিলুম। তবে, যাত্রাটা যে মোটেই স্থলগ্নে হয় নি তা প্রায় গোড়া-গুড়িই টের পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমেই ত প্রয়াগ থেকে গাথীপুরে যাবার সময়ে যমুনার খেয়ায় পার হ'তে গিয়ে আংটি থেকে খরগোসের চোখের মতন স্থন্দর বহুমূল্য মাণিকটা কখন যে খুলে' প'ড়ে গেল তা' জান্‌তেও পার্‌লুম না। তার পর কুরুক্ষেত্রের কাছে দস্যু-কান্তারে লাঞ্ছনা। ভাগ্যে অন্য বণিকের শকট থেকে খাবার লুটে, তাই খেয়ে ডাকাতগুলো অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌ল, নইলে সেরেছিল আর কি। পরে শুন্‌লুম খাবারে বিষ ছিল, মাস-কতক আগে কতকগুলো দস্যু ঠিক ঐ জায়গাতেই ঐ বেনেদের সর্ব্বস্বান্ত করে, তাই, তারি প্রতিশোধের জন্যে এই ফিকির! সেদিনকার মতন প্রাণে প্রাণে বেঁচে চন্দ্রভাগার পারঘাটায় পৌছুলুম। সেখানে তক্ষশিলার দেশত্যাগী প্রজাদের মুখে যা শুন্‌লুম্‌ তাতে আর অধিক অগ্রসর হ'তে মন সর্‌ল না।"

মহাসম্মত বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লেন, "তক্ষশিলার প্রজারা দেশত্যাগী? কেন? বৃদ্ধবয়সে রাজা মহাপূষণ অত্যাচারী হয়েছেন নাকি?"

"না, মহাপূষণ স্বয়ং অত্যাচারী হন্‌ নি।"

"তবে?"

"তিনি নাকি একজন বিশ্ব-দস্যুকে জম্বুদ্বীপে ডেকে এনেছেন।"

"কে সে বিশ্বদস্যু?"

"তার নাম অলীকসুন্দর, শুনেছি সে জাতে যবন, ভয়ানক মাতাল, ভয়ানক দাম্ভিক, ভয়ানক নিষ্ঠুর। দেশে দেশে ধৃষ্ট-প্রবেশের ধ্বজা উড়িয়ে ধূমকেতুর মতন সে

বিজয়-যাত্রায় বেরিয়েছে। পারস্যের যে বণিকের কাছে তক্ষশিলায় প্রতিবৎসর মোতি কিন্‌তুম, তার সঙ্গে চন্দ্রভাগার তীরে দেখা হ'ল; তার মুখে শুন্‌লুম্ এই অলীক-সুন্দর পারস্য-ভূমিকে শ্মশানে পরিণত করেছে। রাজপ্রাসাদ শুধু কেড়ে নিয়েই তৃপ্ত হয় নি, বর্ব্বরের মতন অগ্নিসাৎ ভস্মসাৎ করেছে। পারস্যের ধর্ম্মগ্রন্থের পুঁথি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে আবর্জ্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করেছে।"

"এই অমানুষ ভারতে এসেছে?"

"হ্যাঁ, এসেছে। গান্ধার, কপিশা, কশ্যপপুর, হস্তিদুর্গ আজ তার পদানত। তক্ষশিলার পরশ্রীকাতর রাজা বিতস্তা-মণ্ডলের মহাপৌরবকে জব্দ করবার অভিপ্রায়ে এর সঙ্গে মিতালি করেছেন, ভেট পাঠিয়েছেন। হিন্দু প্রজার এই যবন-প্রীতির আতিশয্যে সমস্ত পঞ্চনদ আজ মহাপুষণের বৈরী। তক্ষশিলার সৈনিকেরা তলোয়ার ফেলে' দিয়ে অন্য রাজার কাছে চাক্‌রী নিতে চলেছে। ব্রাহ্মণেরা টোল বন্ধ ক'রে ছাত্র পুত্র নিয়ে দেশান্তরী হচ্ছে। বণিকেরা তলে তলে নিজেদের ধন-সম্পত্তি স্থানান্তরিত করছে। পঞ্চনদের সমস্ত লোকের দৃষ্টিই এখন মগধের দিকে। সকলের গতিই প্রাচ্যের অভিমুখে...ব্যাপার দেখে আমাকেও দেশের দিকে ফিরতে হ'ল। কপিশায় গিয়ে আপনার জন্যে দ্রাক্ষায়-তৈরী কপিশায়ন সুরা আর আনা হ'ল না।...ফির্‌তি-বেলায় শুন্‌লুম্ তক্ষশিলার কাছে সুলুক সন্ধান পেয়ে যোন-মণ্ডলের এই বিশ্ব-দস্যু পাণ্ডুকুলের চূড়ামণি জন্মেজয়ের বংশধর মহাকৌরবকে নাকি পরাজিত করেছে।...ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য স্মরণ ক'রে ধিক্কারে মন ভ'রে উঠ্‌ল।"

এই পর্য্যন্ত ব'লে আম্বশঙ্কর একটু থাম্‌তেই সকলে ব'লে উঠ্‌ল, "তার পর কি হ'ল? তারপর?"

"তার পর বৈশালীর দিকে ফিরে আস্‌ছিলুম্, পথে শুনলুম্ মগধের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ বেধেছে। বাঘের মুখ থেকে কুমীরের কবলে গিয়ে পড়্‌লুম। পাঁচ শো বয়েল-গাড়ীর ধুরো ঘুরিয়ে শত্রুর ব্যূহের বাইরে দিয়ে স'রে পড়্‌বার চেষ্টায় ছিলুম, কিন্তু হ'ল না, মগধের এক বণিক্-চরের ছলনায় ভুলে মগধের ঘাঁটিতেই গিয়ে পড়্‌লুম। শত্রুর হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌তে বাধ্য হ'য়ে নজরবন্দী হলুম। পাগ্‌ড়ীর ভিতর শুকপাখীর কণ্ঠ-রোমের মতন কতকগুলো সুন্দর পান্না লুকোনো ছিল, সেগুলো পর্য্যন্ত গেল।"

"তার পর?"

"তার পর আর কি? বৈশালীর দ্বারগ্রামে এসে স্ত্রী-পুত্রের মুখ না দেখে থাকা বড়ই অসহ্য বোধ হ'ল। তাই, ক'দিন ধ'রেই নগর-প্রবেশের সুযোগ খুঁজ্‌ছিলুম। শেষে সুযোগও পাওয়া গেল। আমার কাছ থেকে কেড়ে-নেওয়া 'প্রসন্না' মদ অধিকমাত্রায় পান ক'রে কাল রাত্রে আমার প্রহরী একটু অতিরিক্ত প্রসন্ন হয়েছিল। সেই অবসরে রাত্রের অন্ধকারে স'রে পড়্‌লুম। আমি জান্‌তুম্ শূর্পগ্রামের দিক্‌কার পরিখায় কুমীর নেই, তা' ছাড়া ওদিকে শ্মশান ব'লে বেতালের ভয়ে দুঃসাহসী তীক্ষ্ণ সৈনিকেরাও রাতে ওদিক্‌কার পথ বড়-একটা মাড়ায় না, তাই গুঁড়ি মেরে এক-রকম নগ্ন অবস্থায় চৈত্য-কুঞ্জের ধার দিয়ে দিয়ে পরিখার জলে নেমে পড়্‌লুম্। তার পর অতিকষ্টে প্রাচীর বেয়ে উঠে বৈশালীর বিশ্বস্ত প্রহরীদের বিনিদ্র সতর্কতার গুণে ধরা প'ড়ে প্রহারের চোটে সংজ্ঞা হারালুম্। যখন জ্ঞান হ'ল, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, জিজ্ঞাসায় জান্‌লুম্ আমি সেবা-ঘরে। যিনি আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সংজ্ঞা ফের্‌বার পূর্ব্বেই তিনি আমায় এক-রকম চিনে ফেলেছিলেন, পরে দু'চার কথায় সমস্তই পরিষ্কার হ'য়ে গেল। সেবা-ঘরের আমার সেই বন্ধুটি হচ্ছেন আমাদের সেনানায়ক বলগুপ্ত।"

আম্বশঙ্করের কথা শেষ হ'লে মহাসম্মত ধনুগ্র্হ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "মগধের শিবিরে আপনি ছিলেন ক'দিন?"

"তিন দিন।"

"ভাব-গতিক কিরূপ?"

"সৈন্য-ভোজ্যের কোনো অভাবই নেই, সুতরাং ছাউনী নাড়্‌বার কোনো তাড়াও নেই।...যোজনান্তর স্থানীয় দুর্গ বসিয়েছে। এই-সব থানা সৈনিকে পরিপূর্ণ। সুতরাং মগধ থেকে সৈন্য-ভোজ্য আস্‌বারও কোনো বিঘ্ন ঘটবে ব'লে বোধ হয় না। বুনো বা পাহাড়ীরা দাঁত ফোটাতে পারবে না।"

এইবার মহাসম্মত সন্তবৃন্দকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন, "আপনারা নগর-শ্রেষ্ঠীর মুখে বাইরের খবর সমস্তই শুন্‌লেন। এখন ভিতর-বাইরের সামঞ্জস্য ক'রে যা' কর্ত্তব্য তা' স্থির করুন।"

বলগুপ্ত কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মহাসম্মতের ইঙ্গিতে চুপ ক'রে গেলেন।

ডান হাতে প্রকাশনী-মুদ্রার ইঙ্গিতে বল্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে সন্ত সুভদ্র বল্‌লেন, "বহিঃশত্রু ধৃষ্ট-প্রবেশের দ্বারা ভারতবর্ষের সকলেরই পৌরুষে ধিক্কার দিয়েছে, আমাদের আত্ম-সম্মানকে অপমানিত করেছে, আমাদের আত্মাকে গ্লানির নরকে ডুবিয়ে ধরেছে। এ সময়ে তক্ষশিলার মহাপূষণের মতন ..."

ভিড়ের ভিতর থেকে কে একজন ব'লে উঠ্‌ল, "মহাপূষণ নয় মহাপিশুন!"

সন্ত সুভদ্র সে কথা কানে না তুলে ব'লে যেতে লাগ্‌লেন, "এ সময়ে তক্ষশিলার মহাপূষণের মতন ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে বিশ্বভারতের শত্রুর সঙ্গে মিত্রতার অভিনয় আমার মতে আত্মহত্যা। ব্যাধ যখন জালে পড়েছে তখন সব পায়রা যদি এক-জোটে একসঙ্গে জাল নিয়ে পালাবার চেষ্টা না করে তবে কেউ বাঁচ্‌বে না। দেবতা না করুন, যদি এই কাল-যবন বৈশালী পর্য্যন্ত অভিযান করে, বৈশালীর একার এমন সাধ্য নেই যে সে-আক্রমণ ব্যর্থ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে মগধের সঙ্গে সন্ধি করাই দূরদর্শিতার কাজ ব'লে মনে হয়। মগধের সাম্রাজ্য আছে, অপ্রমেয় সৈন্যবল আছে, ধনবল আছে। ধনের আকর স্বর্ণগ্রামসমূহ আছে। তা' ছাড়া বাইরের শত্রু যখন আক্রমণ করতে আস্‌ছে তখন হাজার বিবাদ থাকলেও কুরু-পাণ্ডবের মতন ভারতবর্ষের আমাদের সকল কলহ ভুলে এক-কাট্টা হ'য়ে লড়্‌তে হবে। যুধিষ্ঠিরের ভাষায়, এখন আমরা এক শো পাঁচ ভাই। এখন আমার মতে আত্মকলহ ভুলে', ছোটখাট ক্ষতি স্বীকার ক'রেও বড় ক্ষতির পথ রোক্‌বার জন্যে, আমাদের সন্ধি-বন্ধনে বদ্ধ হ'য়ে বৈশালী-মগধ, কুরু-পাঞ্চাল, কাশী-কোশল, গৌড়-বঙ্গ, গান্ধার-উদ্যান, অবন্তী-পঞ্চনদ, সকলকেই এক-প্রাণ এক-আত্মা হ'য়ে দাঁড়াতে হবে। আমার মতে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মগধের সঙ্গে সন্ধিই আমাদের একমাত্র গতি।"

সন্ত সুভদ্রের কথা সাঙ্গ হ'তেই উষ্মার ভাবটা চেষ্টা ক'রে চেপে দিয়ে সন্ত সহালীন বল্‌লেন, "ঝড়ের আগেই কলা-গাছের মতন শুয়ে পড়া আমার মতে সুমন্ত্রণা নয়। কোথায় যবন-প্লাবন আর কোথায় আমরা! তক্ষশিলা আমাদের শত্রুও না, মিত্রও না, উদাসীন রাজ্য। সেখানকার ম্লেচ্ছ-প্লাবনের সমাচার আমাদের বর্ত্তমান সমস্যায় একেবারে বাইরেকার কথা। সুদূরের ভাবনায় আমরা কাছের ভরসাটাকে যদি ফোঁপ্‌রা ক'রে ফেলি, তা হ'লে ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টই হ'তে হবে।"

সন্ত পঙ্ক তীব্রস্বরে ব'লে উঠ্‌লেন, "সে রকম হবার বিশেষ বাকীও নেই। নগরে অন্ন নেই, সেটাই কি একটা ভরসার কথা? যাঁরা সঞ্চয়ের হিসাব না রেখে মগধের প্রতিমল্ল হ'বার স্পর্দ্ধা করেন, তাঁরা কি দুর্গ-প্রাকারে ধান্য-রোপণের ভরসায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন?"

পঙ্কের কথা শেষ হ'তে না হ'তে "সাধু" "সাধু" শব্দে সন্থাগার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ল। যুগ-যুগান্তর ধ'রে যে বৈশালী মগধকে শত্রুজ্ঞানে ক্রমাগত অপদস্থ করবার চেষ্টা করেছে, বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভাবী-আশঙ্কায় তাদেরি সন্থাগারে আজ মগধের সঙ্গে মিতালির প্রস্তাব! সন্ত পঙ্কের উষ্মা সংক্রামক হবার উপক্রম হচ্ছে দেখে' এই সময়ে অনেকে "অক্রোধ" "অক্রোধ" ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। অনেকে আবার "সংবহুল" "সংবহুল" ব'লে চেঁচাতে লাগ্‌ল।

সভার ক্ষণিক বিশৃঙ্খলা শৃঙ্খলিত কর্‌বার জন্যে এইবার মহাসম্মত ধনুগ্র'হ সোনার 'বলংজন' দণ্ড ঊর্দ্ধে উদ্যত ক'রে ধর্‌লেন। সভা আবার শান্তভাব ধারণ কর্‌লে তিনি বল্‌লেন, "তর্কে যখন মীমাংসা হওয়া কঠিন ব'লে বোধ হচ্ছে, তখন সংবহুল করাই সমীচীন। আপনারা শলাকা গ্রহণ করুন, যাঁরা সন্ধির পক্ষপাতী তাঁরা শুভ্র-শলাকা দেবেন, আর যাঁরা যুদ্ধের পক্ষে তাঁদের রক্ত-শলাকা।"

তার পর তাঁর ডাইনের বালিকার দিকে ফিরে বল্‌লেন, "লজ্জালী! তুমি শলাকাগুলো হাতে হাতে চালিয়ে দাও।"

(ক্রমশঃ)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রনাথ

সৃজনের আদিযুগে অতীন্দ্রিয় অমৃত-লোকের
যে উদার উৎসমুখে বিশ্বভরা জমাট শোকের
কঠিন বেদনাভার, আনন্দের চঞ্চল ধারায়
প্রেমের পরশ লভি', টুটি রুদ্ধ অন্তর-কারায়
গলি' গলি' পড়িল ঝরিয়া, তোমার কবিতা-বধূ
হৃদয়ের পাত্রে তার, তাহারি কি তৃষাহরা মধু
রাখিল সঞ্চিত করি? নিল তার চরণ-নূপুর
বাঁধিয়া লীলার ভরে তারি চলকলনৃত্যসুর!

কী গীতি রচিলে কবি! একদিন বিশ্বসূচনায়
বেজেছিল যে রাগিণী গ্রহে গ্রহে মিড়ে মূর্চ্ছনায়
আবেগে বেপথুমতী, মূর্ত্তি ধরি' তারি গূঢ় বাণী,
তোমার চরণতলে দাঁড়াইল জুড়ি দুই পাণি;
কী ভাষা লিখিলে কবি! কী আশার সুধা-সঞ্জীবনী
তাহাদের বহালে কঙ্কাল-মাঝে, আচারের শনি
অন্তরে বাহিরে করি যাহাদের চিরদিন-মৃত
রেখেছিল ত্রিভুবনে উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত!

বুকে তার ভাবক্ষুধা, কণ্ঠে তার রসের পিপাসা,
ফিরেছিল দ্বারে দ্বারে দীনা হীনা কাঙালিনী ভাষা
স্তাবকের চাটুবাক্যে ছিল যারা বাণীর সভায়
শূন্যগর্ভ অহংকারে স্ফীতবক্ষে সঙ্কীর্ণ হিয়ায়
তাহাদের জনে জনে নিশিদিন সাধিয়া কাতরে
উন্মুখ আশার ভরে; পায় নাই তবু কারো ঘরে
হেন সুধা একবিন্দু হবে স্নিগ্ধ পরশে যাহার
দীর্ঘ অনশনক্লিষ্ট শুষ্ক তপ্ত অন্তর তাহার।

জ্বালাময়ী তৃষা লয়ে জানি না সে কোন্ শুভক্ষণে
তোমার সহায় মাগি' দীপ্তিহীন মলিন নয়নে
দাঁড়াইল অভাগিনী; চুমি' শুধু ব্যাকুল অধরে
তব ভাবপীযূষের মনোমদ মধুগন্ধভরে
সুবাসিত শুভ্র পাত্রখানি, নিঃশেষে মিটিল সুখে
আজন্মের বুভুক্ষা তাহার; উঠিল উথলি বুকে
সৌভাগ্যের নব ক্ষীরধারা; বিষাদের হিমরাতে
হরষের হেমসূর্য্য দিল দেখা মহামহিমাতে।

মুদিয়া আবেশভরে অস্বাদিত পুলকে নয়ন
বার বার করি পান তারি স্বচ্ছ সোহাগ-কিরণ
জীবনের নব বসন্তের, প্রেমের মদির তানে
মেতেছিল প্রীতি-পাখী নবীনের চিরজয়গানে,
তারি কান্ত আলোকের হিল্লোলিত রভস-পরশে
লালসা-বাড়ানো তারি প্রতি দীর্ঘচুম্বনের রসে
দিনে দিনে প্রাণপদ্ম উঠিয়াছে বিকশি' তাহার,
অনন্ত-ঐশ্বর্য্যময়ী—আজি সে যে রূপসীর সার।

সেই বিশ্ব-আলোকরা সব-হরা সব-ভরা রবি
উজলিয়া দেশান্তর ফেলিল যে খণ্ড প্রতিচ্ছবি
আভাসে ইঙ্গিতে তারি নিখিলের নরনারী-হিয়া
বক্ষোরক্তে লভি' দোলা, যাদুস্পর্শে উঠে সচকিয়া।
শুধু যেই জীর্ণপ্রাণ শীর্ণশক্তি অর্ব্বাচীন-দল
অর্থহীন ব্যর্থমন্ত্রে সৃজি' নিত্য নব ধর্ম্মছল
সে অচল-আয়তনে চাহিছে রাখিতে, আয়ু যার
অস্তমিত, তাহাদের ঘুচিল না নিবিড় আঁধার।

শুনেছিনু এতদিন গ্রাসে রাহু শশাঙ্ক-রবিরে,
আবরিয়া করজাল ভরে ধরা সহসা তিমিরে,
কভু তারে করে ত্যাগ, কভু ধরে অসহ আগ্রহে
সে বুঝি কন্দুক সম গণে মনে গ্রহে, উপগ্রহে;
আজি বুঝিয়াছি সত্য, জানিয়াছি মিথ্যা জনরব
দেখেছি আপন চক্ষে রবিগ্রস্ত জ্যোতিষ্কেরা সব,
মুক্তির নাহিক পথ, চারিদিকে ঝলে অনিবার
তারি বিশ্ববিজয়িনী উন্মাদিনী শিখা প্রতিভার।

একা তুমি ঘুচায়েছ স্বদেশের বহু অপবাদ,
একা তুমি হরিয়াছ মরমের দৈন্য অবসাদ,
চির-সবুজের মন্ত্র দেছ তুমি আমাদের কানে,
চির-রসধারা তুমি বহায়েছ মরুভূ-পরাণে,
বাঙলার বহু লজ্জা একা তুমি করেছ বারণ,
বাঙালীর এত গর্ব্ব—একা তুমি তাহারি কারণ।
নিখিল-মিলন-কেন্দ্র. প্রেম লেখা ললাটে তোমার,
ভক্তের প্রণাম দেব! লহ স্নেহে, লহ বার বার।

শ্রী গিরিজাকুমার বসু

ডাক-টিকিট সংগ্রহ

'খেল্‌তে জান্‌লে একটি কাণা কড়ি দিয়েও খেলা যায়'—এ প্রবাদ আমাদের মধ্যে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ডাক-টিকিট সংগ্রহের পক্ষে এ প্রবাদটি খুবই খাটে। সামান্য ক্ষুদ্র ব্যবহার-করা ডাক-টিকিটের মধ্যে কোনও প্রকার আমোদ থাকিতে পারে তাহা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ জানিত না। নিরীহ পাগল ব্যতীত ইহা আর কাহারও প্রয়োজনে আসিতে পারে তাহার ধারণা করাও তখনকার লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু প্রকৃষ্ট বিচারক 'সময়' ইহার প্রয়োজনীয়তা ভাল-রূপেই বুঝাইয়া দিয়াছে। ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ডাকটিকিট-সংগ্রহকারীদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী, অতএব ইহার সপক্ষে কাহারও কিছু বলিবার না থাকিলেও সংগ্রহকারীরা অন্তত পাগল নয় তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

যদি তাস দাবা প্রভৃতি খেলা মানুষের দৈনন্দিন অবসর কাটাইবার জন্য প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ডাকটিকিট সংগ্রহে ঐ সময় ক্ষেপণ করা যে অনেক বেশী উপকারী হইবে তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না, বিশেষত যখন এই বাতিক, ঐ খেলাগুলি অপেক্ষা বেশী আমোদজনক ও শিক্ষাপ্রদ। তবে ইহা অনেকটা মানুষের রুচির উপর নির্ভর করিতেছে।

মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রমের পর বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। অথচ আধুনিক চিকিৎসা-প্রণালী-মতে নিদ্রা ব্যতিরেকে অনুরূপ সম্পূর্ণ-বিশ্রাম হিতকারী নয়। তাহাতে মানুষকে জড় করিয়া দেয়। সেজন্য মানুষকে কোনও একটা ক্রীড়া অথবা অন্য কোনও চিত্তাকর্ষক বাতিকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কর্ম্মজনিত অবসাদ দূর করা এবং সঙ্গে সঙ্গে কোনও একটা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করাই প্রত্যেক খেলার প্রধান উদ্দেশ্য। যে-খেলায় এ দুইটা যত বেশী পরিমাণে করিতে পারিবে, সে-খেলা তত বেশী অধিক পরিমাণে গ্রহণীয় হইবে। এখন দেখা যাউক ডাকটিকিটে আমাদের এই দুই উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হয়।

ছেলেবেলার 'সাত সমুদ্র তের নদীর' গল্প যখন যৌবনের শিক্ষার তথ্যে পূর্ণ হইয়া শৈশবের কোমলতা নষ্ট করিতে উদ্যত হয় ও তথ্যগুলি কল্পনা-নিহিত বন্ধন হারাইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, এ বাতিকটা

২। গ্রীস—আইরিস্ রামধনুর রাণী, ৩। রুশি, ৪। অষ্ট্রেলিয়া—ক্যাঙ্গারু, ৫। কিয়া-কাকা, ৬। মাওরি-নামা আদিম জাতি, ৭। রুশ—ক্রেম্‌লিন, জারের অভিষেকস্থান। ডানদিকের প্রথম স্তম্ভের নীচে একটি ঘণ্টা আছে, তাহার ওজন চয়শত মণের উপর, ৮। তুর্কী—সেলুই মস্‌জিদ্ মুসলমানদের সর্ব্বাপেক্ষ বৃহৎ নমাজ পড়িবার স্থান, ৯। ইতালী—জর, ১০। লুক্সেমবুর্গ—গ্রাণ্ড্ ডাচেস শার্ল্ট য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের মধ্যে একজন, ১১। ইতালী—কবি দান্তে ইতালীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি, ১২। হার্‌মেস—দেবতাদের ডাকহরকরা

সে-সময় কল্পনাগুলিকে সজীব করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরে। যখন ডাকটিকিটের মধ্য দিয়া মন আমাদের ছোট চিরপরিচিত তরী বাহিয়া অষ্ট্রেলিয়ায়

উপনীত হইয়া গুলিভরের গল্পের ন্যায় কাকাকুর পিঠে চড়িয়া 'কিয়া-কাকা' পাখীর গান শুনিতে শুনিতে 'মাওয়ারির' আতিথ্য গ্রহণ করে, তখন ভ্রমণটি চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া সেরূপ ভ্রমণ হয় না। ভূগোলের সেই ভয়াবহ নামে আর আঁৎকাইয়া উঠিতে হয় না। সে-সব নাম আমাদের চিরপরিচিত হইয়া পড়ে।

আর দুইটি বড় জিনিষ যাহা আমরা এই টিকিটের মধ্যে পাই তাহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শিল্পের প্রতি অনুরাগ। এ দুইটা জিনিষের শিক্ষা আমরা একেবারে আয়ত্ত করিতে পারি না। ইহা দীর্ঘ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে ছবির মধ্য দিয়া প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে তাহার, যে কখন ছবি দেখে নাই এরূপ ব্যক্তি অপেক্ষা, শিল্প শিক্ষা করিতে অনেক কম সময় লাগিবে। কিছুকাল পূর্ব্বে রবি-বাবু তাঁহার এক অভিভাষণের মধ্যে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন তাহা হয় ত এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলেন, আমাদের ভারতীয় শিল্পশিক্ষার জন্য যে বাহিরে যাইতে হয়, তাহার কারণ আমরা দিন দিন নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছি। আমরা আমাদের ভাল জিনিষের প্রতি যত্ন করি না; আর্টিষ্টরা ও বাহিরের লোকেরা আসিয়া সে-সব ছবি লইয়া যায় এবং সে-সব ছবি যখন শিক্ষার স্থল হইয়া পড়ে আমরা তখন হায় হায় করি। আমার মনে হয় ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট জিনিষের প্রতি লক্ষ্য না করাও আর-এক কারণ। যখন কোন-জিনিষ বড় হইয়া পড়ে তখনই আমরা তাহার দিকে আকৃষ্ট হই এবং তাহাদের কোনটাকেই পাই না। বৈদেশিক যাঁহারা এখানে আসিয়া এই সংগ্রহকার্য্যে ব্রতী হন তাঁহারা প্রকৃত শিল্পের মর্য্যাদা বুঝিয়াই যে সংগ্রহ করেন ঠিক তাহা নয়, তবে এ সংগ্রহটা তাঁহাদের বাতিক মাত্র। অতএব এই-সব সংগ্রহের বাতিক যত অধিক পরিমাণে প্রসার পাইবে, আমাদের শিল্পের বাহিরে যাইবার সম্ভাবনাও ততই অল্প হইবে।

অনেকে টিকিটকে দেশের বিজ্ঞাপন বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন; এবং বাস্তবিক পক্ষে ইহা তাহাই। দেশের বিজ্ঞাপন অর্থে দেশের যে-সব স্থান দ্রষ্টব্য, যাহাদের শিল্প বিখ্যাত, সে-সব স্থানের ও তাহা ছাড়া সাধারণ অধিবাসী, পশু, পক্ষী ইত্যাদির চিত্র আমরা এই ডাক-টিকিটে পাই। অতএব এই টিকিট দেখিয়া সে-দেশের মোটামুটি ইতিহাস অতি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারি। পুস্তকের ভিতর দিয়া তাহা আয়ত্ত করিতে বিশেষ বেগ ও ক্লেশ পাইতে হয়।

পাশ্চাত্য শিল্পের কেন্দ্রভূমি যে ইটালি তাহা তাহার টিকিটের মধ্য দিয়াও বেশ বুঝা যায়। মহাযুদ্ধের অবসানে সেখানে যে একখানি টিকিট প্রকাশিত হইয়াছিল, সে টিকিটখানি সৌন্দর্য্য হিসাবে পৃথিবীর যাবতীয় ডাক-টিকিটের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।

শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অবুঝ

আজ কেন মা খাবিনে তুই ঠিক করে' তা' বল্—
ওকি! কেন, কেন মা তোর চোখ করে ছল্‌ছল্?
আমি খাব, দাদা খাবে, সবাই খাবে, আর
তুই কেন মা খাবিনে বল্, আজ না ত সোমবার।
আমায় যদি সাধিস্, মা গো, খাবার-দাবার খেতে,
রাগ করি না, বসি গিয়ে আগেই পাতা পেতে।
তোর আজ মা কি হয়েছে ঠিক করে' তা' বল্—
খাবার কথা কইলে কেনই চোখে আসে জল?
আমরা খাব, তুই খাবিনে, এই বা কেমন বলো,
তোর পাতে মা প্রসাদ পাব, রান্নাঘরে চলো।

রাতে খেলে অসুখ করে, তাই ত বলি না;
দিনের বেলা আজকে মা তুই কেন খাবি না?
এত সাধি, তবু মা তুই না খাস্ যদি, আর
আমিও তবে খাব নাক সাধ্‌লে শতবার।
আবার কাঁদিস্? কেন কাঁদিস্? কাঁদিস্ নেক আর,
বল্‌ব নাক খাবার কথা, ক্ষমা কর্ এবার।
দুষ্টুমি আর কর্‌ব নাক ঘাট্ হয়েছে মা,
(কিন্তু) তোর সাথে না খেতে পেলে পেট যে ভরে না।

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সাঁওতাল জাতি

আর্য্য ও অনার্য্যজাতির সমন্বয়েই ভারতের জাতীয়তার সৃষ্টি। সেই অনার্য্যজাতিরই একটা শাখা হচ্ছে এই সাঁওতাল জাতি। এদের বাসস্থান হচ্ছে সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থানে। এই-সব পার্ব্বত্যপ্রদেশের গভীর শালবনের মাঝেই এরা নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি রচনা করেছে। হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুকের দন্ত উপেক্ষা করে' এরা তাদের সঙ্গে এক জায়গায় বাস করছে। অসীম সাহসে এরা পাহাড়ের গভীর জঙ্গল চষে' বেড়াচ্ছে, পাথরের বুক চিরে' এরা নিজেদের আহার্য্য তৈরী করছে। আমরা এদের এখনও অসভ্য জংলী বলেই জানি, কারণ আমাদের মত সভ্যতার আলোক এরা এখনও পায়নি।

এদের গ্রামগুলি ঘনশ্যাম শালবনের মাঝে মাঝে, দূর থেকে দেখায় যেন এক-একখানি চমৎকার ছবি। গ্রামগুলি খুব ছোট ছোট, প্রায় বিশ-ত্রিশ ঘরের বেশী লোক কোন গ্রামেই নেই। তার মাঝে ছোট ছোট কুটীরগুলি লাল, কাল, সাদা প্রভৃতি রঙে রঙান। সেই কুটীরগুলি এত ছোট যে তাতে যে মানুষ বাস করতে পারে, তা ধারণা হয় না। ঘরগুলি, উঠানসুদ্ধ অতি পরিষ্কার, ঝর্‌ঝর্ তর্‌তর্ করচে। কোথাও আবর্জ্জনার লেশ-মাত্র নেই। এদের প্রত্যেক পরবেই এরা ঘরদুয়ার মাটি দিয়ে লেপে' পরিষ্কার করে। আর খড় পুড়িয়ে কাল রং, লাল সাদা মাটি দিয়ে লাল সাদা রং করে' তারা ঘরগুলিকে রঙায়। জংলী হ'লেও এদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান কম নয়।

এদের গায়ের রং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, শরীরের উচ্চতা মাঝারি ধরণের। এরা সত্যবাদী, সরল, অকপট, কষ্টসহিষ্ণু। সারাদিনের পরিশ্রমে এরা যা পায় তাই দিয়েই সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করে, পরের দ্রব্য অপহরণ ক'রে এরা খাবার সংস্থান করতে চায় না। ভবিষ্যতের ভাবনা এদের কল্পনায় আসে না, কোন গতিকে দৈনিক আহার্য্য জুটলেই এরা আর কিছু চায় না। এদের অভাব-অভিযোগও বিশেষ নেই, কারণ সভ্যতার স্পর্শ এরা এখনও পায়নি, তবে যাদের মধ্যে সভ্যতা ঢুকেছে তারাই বিগ্‌ড়ে গেছে।

এরা অসভ্যজাতি হ'লেও শান্তিপ্রিয়, কলহ-বিবাদের মধ্যে এরা বড় থাক্‌তে চায় না। এরা শাসন মেনে চলে। গবর্ণমেণ্ট্‌কে এদের জন্য কিছু কিছু পৃথক্ আইন তৈরী কর্‌তে হয়েছে। ময়ূরভঞ্জের সাঁওতালরা দেখেছি রাজকর্ম্মচারীদের খুব ভয় করে, কারণ পুলিসের অত্যাচার সেখানে বড় বেশী। সেখানকার প্রথা অনুসারে রাজার কাজে তাদের বেগার দিতে হয়, তাকে বলে 'বেঠিয়া'। সারাদিন না খেয়ে খাট্‌বে। দিনান্তে যদি একটা পয়সা পেলে ত খুব। এ রকম নিরীহ হ'লেও কিন্তু রাগ্‌লে তাদের জ্ঞান থাকে না, তখন কাউকে হত্যা করতে তাদের মোটেই বাধে না।

এদের মধ্যে পর্দ্দার ব্যবস্থা নাই, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রবল। ঠিক পাশ্চাত্য স্বাধীনতা না হ'লেও তার চেয়ে কিছু কমও নয়। এরা মেয়ে-পুরুষ উভয়েই খাটে। আমার মনে হয় পুরুষদের চাইতে বেশী খাট্‌তে পারে মেয়েরা। মেয়েরা দেখ্‌তে সুন্দর না হ'লেও সুশ্রী। গায়ের গাঢ় কৃষ্ণ রংটা বাদ দিলে এরা যে-কোন দেশের সুন্দরীর সঙ্গে তুলনীয় হ'তে পারে। এদের গড়ন অতি চমৎকার – নিটোল, নধর, কটিদেশ ক্ষীণ, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত। বোধ হয় এত খাটে বলেই এত সুন্দর এদের গড়ন। মেয়েদের মধ্যে পাত্‌লা খুব কমই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এদের পরিধানে এক মোটা ছোট কাপড়, হাঁটুর নীচে নামে না ; আর গায়ে ঢাকা দিবার জন্যে আর-একখানা ছোট কাপড়। মাথায় এরা কাপড় দেয় না। এদের চুল বাঁধা—মাঝে সিঁথি কেটে চুলের গোছা পেছনে ঘুরিয়ে চুলের মধ্যে গুঁজে রাখে। এইজন্যেই বোধ হয় চুলগুলি একহাতের বেশী বড় হয় না। তা না হ'লেও চুলগুলি যেমনি ঘন তেমনি কৃষ্ণবর্ণ। ফুল এরা অত্যন্ত ভালবাসে, ফুল পেলেই খোঁপায় গুঁজে রাখে। ফুল-অভাবে গাছের

বাহারে পাতাই গুঁজে গুঁজে রাখে। ধানের শীষের মত সবুজ পাতাগুলি খোঁপায় দুলিয়ে এরা যখন সারে সারে চলে তখন মনে হয় যেন হাস্যময়ী বনবালারা বেড়াতে চলেছে। এদের গহনার মধ্যে—হাতে শাঁখা, খাড়ু, পায়ে নূপুরের মত নিরেট কাঁসার মল, আর গলায় পলার মালা। কানে তাদের ছেঁদা থাকে, কিন্তু তাতে শুধু কাঠি গুঁজে রাখে, কোন গয়না পরে না। আমাদের গয়না পরা যেমন এয়োতের লক্ষণ, এদেরও তাই, তবে সধবা অবস্থায় হাত শুধু করতেও এদের কোন আপত্তি নেই,—এদের সিন্দুর পরাও ঠিক এই ধরণের। তবে বিধবারা শুধুহাতেই থাকে। এদের বর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু এই কৃষ্ণ আবরণের ভিতরে অতি সুন্দর হৃদয় আছে। এরা স্নেহময়ী, অতিথিপরায়ণা, অতি সরলা। কোন পুরুষের কাছে যেতে এরা সঙ্কুচিত হয় না, তাদের সঙ্গে অবাধে কথা কইতে পারে। এদের মুখে হাসিটি লেগেই আছে। শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও এদের সে হাসি ম্লান হয় না। সারাদিন পরিশ্রম করে' শান্ত গোধূলি-বেলায় যখন এরা পরস্পর হাত-ধরাধরি করে' মিহি সুরে গান গাইতে গাইতে ঘরে ফেরে, তখন এদের দেখ্‌লে মনে হয় না যে এরা অবসন্ন; হাসির উচ্ছ্বসিত বন্যায় যেন সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ কোথায় ডুবিয়ে দিয়েছে।

সাঁওতাল পুরুষরাও প্রায় সদানন্দময়। মনে হয় যেন দুঃখ এদের কিছু করতে পারে না। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর এরা রাস্তায় বাঁশী কিম্বা একতারা বাজাতে বাজাতে ঘরে ফেরে। পুরুষদের পরিধানের মধ্যে শুধু এক কাপড়, অনেকে আবার কৌপীন এঁটেই থাকে। এরা গলায় পলার মালা পরে, কেউ কেউ আবার হাতে সরু বালা পরে। আগে এরা মাথায় লম্বা লম্বা চুল রাখ্‌ত, এখন অনেকে আমাদের মত ছআনা-দশআনা চুল কাট্‌তে শিখেছে। জুতা, ছাতা, জামা এদের মধ্যে চল্‌তে সুরু হয়েছে। পূর্ব্বে এদের কাপড় ছিল, নিজেদের হাতে বোনা মোটা কাপড়; এখন অনেকে মিহি বিলাতী কাপড় পর্য্যন্ত পরতে সুরু করেছে। আমার মনে হয় চার পাঁচশ বছর পূর্ব্বে এরা সব উলঙ্গ অবস্থায় থাকৃত।

এদের ঘরের আস্‌বাবের মধ্যে দু একটা কাঁসার বাটি আর মাটির হাঁড়ি। শোবার বিছানার মধ্যে শাল-কাঠের রলার তৈরী আর বাবুই-দড়ির বোনা খাটিয়া, আর পাতার চাটাই কি কাঁথা। বালিস এরা ব্যবহার করতে জানে না।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে মহিষ, গরু, মুরগী, ছাগল, ভেড়া। মহিষ আর গরু শুধু চাষ করবার জন্য। এরা গাই-বলদে চষে। গাইএর দুধ কখনও দোয় না—এদের ধারণা, তা হ'লে বাছুর বাঁচ্‌বে না। মুরগী এদের খুব প্রিয় খাদ্য।

চা'ল থেকে এরা একরকম মদ তৈরী করে, তাকে এরা বলে 'হাঁড়িয়া'। এটা হচ্ছে সাধারণ মদ—আমাদের দেশের যেমন পাচুই মদ। হাঁড়িয়া ছাড়া, মহুয়া থেকে একরকম মদ হয়, তাকে এরা বলে 'পরুয়া'। এটা হচ্ছে চোয়ান মদ। 'পরুয়ার' চেয়েও এক রকম ভাল মদ এরা করে, তাকে বলে 'রসি'। আরও এক রকম মদ এরা করে, তাকে বলে 'ফুলি।' মদ এদের বড় প্রিয়, ভাতের চেয়েও এরা মদ বেশী ভাল বাসে। যদি কারু কাছে এরা পয়সা চায় তবে বল্‌বে না যে চা'ল কিন্‌ব, বল্‌বে হাঁড়িয়া খাব। মেয়ে-পুরুষ সমানভাবেই হাঁড়িয়া খায়, তাতে কোন সরমে বাধে না।

এদের নৃত্য, কলাকৌশলে পূর্ণ না হ'লেও মন্দ নয়। মেয়েরা একজনের পর আর-একজন পেছনে কোমরের কাছে দুহাতে দুদিকে দুজনের হাত ধরে' শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে নৃত্য করে। বাজনার মধ্যে মাদল আর একটা প্রকাণ্ড নাগার্চ্চি, তাকে এরা বলে 'ধুমসা'। সেই বাজনার সঙ্গে এরা তালে তালে পা তুলে' তুলে' নৃত্য করে। কি সুন্দর সে নৃত্য! সমুদ্র-তরঙ্গের মত অলস লীলায় ধেয়ে আসে, আবার যেন তখনই বেলাপহত হ'য়ে ধীরে ধীরে সাগর-গর্ভে নেমে যায়। এরা সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্য্যন্ত অশ্রান্তভাবে নৃত্য করতে পারে। এই নৃত্যের মধ্যেও যেন একটা বীরত্বের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। নৃত্য করে শুধু মেয়েরা, আর বাজ্‌না বাজায় পুরুষে। নৃত্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে গানও হয়। এদের গলা খুব মিহি—একেবারে বাঁশির সুরের সঙ্গে মিশে যায়। নৃত্যের সময় মেয়েরা মদ খায়, কারণ অশ্রান্তভাবে সারারাত নৃত্য

তা নইলে সম্ভব নয়। এদের একটা গুণ এই যে, মদ খেয়ে এরা মারামারি খুব কমই করে।

ভাতই এদের খাদ্য, আর ভাতের সঙ্গে তরকারি হচ্ছে তেঁতুল, নুন, লঙ্কা, শাকভাজা, বেগুনপোড়া কিম্বা এম্‌নি যা-হয়-একটা-কিছু। তবে যাদের নেহাৎ ভাত জোটে না তারা জঙ্গলের খাম-আলুর মত একরকম আলু সিদ্ধ করে' খায়। তাকে এরা বলে 'সাং'। গাছে যে লাল পিঁপ্‌ড়া হয়, সেই ভাজা এদের বেশ মুখরোচক। বাদলে-পোকার ডানা ছাড়িয়ে কাঁচাই এরা চিবিয়ে খায়, আর কখন বা ভেজে' মুড়ির সঙ্গে খায়। বনের একরকম পাত্‌লা গোল গোল ফল এরা পুড়িয়ে খায়, সেগুলো খেতে ঠিক বিস্কুটের মত চমৎকার। কেঁদ, পিয়াল, ভেলাই ত এরা খুবই খায়।

এরা জমি চাষ কর্‌তে শিখেছে। আমাদেরই মত বীজ বুনে রোওয়া-পোঁতা করে' চাষ করে। এদের লাঙ্গল-গুলি ছোট ছোট, ফলাখানিও এক ইঞ্চির বেশী চটাল হবে না। তাতেই যতদূর হয়, কিন্তু তাতেও ধান মন্দ হয় না। জমি ছেঁচ্‌বার জন্য আমাদের মত 'দুনি' এদের নেই, এরা হাত দিয়ে কোন-একটা-কিছু করে' ছেঁচে। ধান পাক্‌লে মেয়ে-পুরুষে গিয়ে ধান কেটে আনে। খড়ের 'পালুই' দিতে এরা জানে না। গোল করে' থাক্ দিয়ে রাখে। ধান ঝাড়ে আমাদেরই মত, কিন্তু মরাই বাঁধ্‌তে জানে না। 'পুড়োর' মধ্যে রেখে ঘরে তুলে রাখে।

অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তীর-ধনুকই প্রধান। পূর্ব্বে এরা অব্যর্থ-লক্ষ্য তীরন্দাজ ছিল, এখন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে সব ভুলে যেতে বসেছে। লোহা থেকে চার পাঁচ রকমের তীর এরা তৈরী কর্‌ত। এখনও কুড়ুল, টাঙ্গি প্রভৃতি এরা বেশ ভাল রকম তৈরী কর্‌তে পারে। এদের এই-সব অস্ত্র তৈরী কর্‌বার জন্য লোহা জার্ম্মানী বা স্কট্‌লাণ্ড থেকে আস্‌ত না, এরা নিজেরাই তৈরী করে' নিত।

এদের লৌহ-প্রস্তুত-প্রণালী :—

নদীর ধারে একটা কাদার ভাটি তৈরী কর্‌ত। সেটার প্রায় এক তৃতীয়াংশ কাঠের কয়লা দিয়ে পূর্ণ কর্‌ত, তার উপর এক তৃতীয়াংশ লোহার পাথর (iron ore) দিত, এবং বাকিটা বালী দিয়ে পূর্ণ কর্‌ত। তার পর নীচে আগুন দিয়ে হাপরের হাওয়া দিত। পাথর গলে' গিয়ে বালি ক্রমশঃ যখন নীচে নেমে যেত, তখন বুঝ্‌তে পার্‌ত যে লোহা তৈরী হয়েছে। সেই লোহা থেকে ইস্পাতও তৈরী কর্‌ত, এবং সেই ইস্পাত আজকালকার বিদেশী লোহার চেয়ে কোন অংশে হীন ছিল না। এখন এরা সে-সব ভুলে যেতে বসেছে।

পূর্ব্বে আগুন জালাতে এদের দেশলাইএর আবশ্যক হ'ত না। কাঠে কাঠে ঘষে' এরা আগুন জালাত। এখনও অনেক স্থলে এরা তাই করে। মাটিতে এক টুক্‌রো কাঠি রেখে আর একটুক্‌রো কাঠি হাতে করে' তার উপর ঘোরায়, আর কাঠিটা গরম হ'য়ে আগুন হয়। সব কাঠে এটা সহজে হয় না। যে-গুলোতে হয় তা এরা জানে।

এদের মাসের বা বারের কোন নাম নেই। এক এক মাসকে এরা 'চাঁদো' বলে, আর বছরকে বলে 'সের্‌মা'। এদের মাসে ৩০ দিন। এদের সংখ্যা-গণনা কুড়ি পর্য্যন্ত, তার উপর নেই।

'এক—মিট্, দুই—বার, তিন—পে, চার—পুন্, পাঁচ—মোরে, ছয়—তুরুই, সাত—এয়া, আট—ইরেল্, নয়—আরে, দশ—গেল্, কুড়ি—ঈশি! এর বেশী আর এদের নেই, কারণ এর বেশী গোন্‌বার সৌভাগ্য এদের হয় নি। এগার হ'লে,—এদের ভাষায় হবে—মিট্ গেল্ মিট্। ইত্যাদি।

এদের অসুখ খুব কম হয়। আর ডাক্তারি ওষুধও খুব কম খায়,—শক্ত ব্যারাম না হ'লে নয়। মাথা ধর্‌লে সমস্ত কপালে এরা ভেলার টিপ্ দেয়। অন্য অসুখেও এদের ওষুধ গাছগাছ্‌ড়া, আর সে ওষুধ দেয় সাঁওতাল বৈদ্য। এত পরিশ্রম করে বলেই বোধ হয় এদের মধ্যে অসুখ এত কম।

সামাজিক রীতি-নীতি

কোন ঘরে ছেলে হ'লে তাকে এরা বলে 'নোতা ঘর' বা কামান ঘর। ছেলে যখন হয় তখন এরা কিছু খায় না, নাপিত এসে কামিয়ে দিলে, নেয়ে এসে এরা খায়। আবার দশ দিন পরে নাপিত এসে কামিয়ে দেয়। সেদিন এরা স্বজাতিদের নিমন্ত্রণ করে' হাঁড়িয়া, মুরগী খাইয়ে দেয়।

এদের বিবাহে কনের বাপকে বা ভাইকে পণ দিতে হয়। সে পণ হচ্ছে দুটি গরু, একটা টাকা বা তারও বেশী, আর তিনটি কাপড়—একটি 'আয়ো লুগরী' বা মা-শাড়ী, একটা কনের বোনের জন্যে, আর একটা 'সিঁদুর লুগরী' বা সিঁদুরদানের শাড়ী কনের জন্যে। বরের বাপ কনের বাপের কাছে গিয়ে তার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে কি না সেইসব ঠিক করে। তার পর বিবাহের একটা দিন স্থির হয়। সেই দিন রাত্রে বর স্বজাতির সঙ্গে কনের ঘরে যায়। সেখানে 'হাঁড়িয়া' ও মুরগী দিয়ে ভোজ ও নৃত্য হয়। পরের দিন বরের ভাই বা ভগ্নীপতি কনেকে কোলে করে' ঘরে আনে ও সেখানে নৃত্য হয়, হাঁড়িয়া ইত্যাদি খাওয়া হয় ও কনের মাথায় সিঁদুর দেওয়া হয়। তার দিন দুই তিন পরে বরকনে আবার কনের বাপের ঘরে ফিরে যায়, আবার সেখানে দুদিন থাক্‌বার পর আবার কনে সুদ্ধ বরের ঘরে ফিরে আসে ও ঘর-কন্না করে। এদের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকই অবিবাহিত, কারণ এরা সহজে কেউ পণ দিয়ে বিয়ে কর্‌তে সমর্থ হয় না। বিবাহের আগে পর্য্যন্ত এদের মেয়েদের কোন অবরোধ নেই। মেয়েরা যে কোন যুবকের সঙ্গে ইচ্ছা কর্‌লে হাঁড়িয়া খেতে পারে, নৃত্য কর্‌তে পারে, ইত্যাদি। তাতে বাপ মা কোন বাধা দেয় না, বা এদের জাতিও যায় না। তবে অন্য জাতির সঙ্গে গেলেই জাতি যায়। জাতি গেলে আবার অতি সহজে জাতি ফিরেও পায়। স্বজাতিদের কিছু জরিমানা দিয়ে হাঁড়িয়া মুরগী খাইয়ে দিলেই জাতে ওঠা যায়।

ধারেও এদের বিবাহ হ'তে পারে। বিবাহ করে' পণ পরে দিবার কথা থাকে, কিন্তু পরে না দিতে পার্‌লে কনে বাপের ঘরে চলে' যায়। আবার তার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়।

আর একরকম বিয়ে এদের মধ্যে আছে, সেটা হচ্ছে, কোন যুবকের কোন যুবতীকে বিবাহ কর্‌বার ইচ্ছা হ'লে, কোন নৃত্যের সময় জোর করে' তার মাথায় সিঁদুর দিয়ে দেয়। তখন আর তাকে কেউ বিয়ে কর্‌তে পারে না। তার পর তার বাপ বা ভাইএর সঙ্গে পণ ঠিক হ'য়ে বিয়ে হয়। বিয়ের সময় লোহার খাড়ু কনেকে দিতে হয়। এইটাই এদের বিবাহের লক্ষণ।

যে-কোন সময়ে এদের বিয়ে ভঙ্গ হ'তে পারে, পরস্পর পরস্পরকে ছেড়ে দিতে পারে। যদি পুরুষ ছাড়্‌তে চায় তবে তাকে কুড়ি টাকা দিতে হবে, আর যদি মেয়ে ছাড়্‌তে চায় তবে তাকে পণের সমস্ত টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। সুতরাং কেউ কাউকে সহজে ছাড়্‌তে পারে না।

মড়ার সম্বন্ধে ব্যবস্থা।—মরে' গেলে অধিকাংশ স্থলে এরা পুড়িয়েই দেয়, কদাচিৎ সমাধি দেয়। মড়া পুড়ে গেলে তার হাড় একটা মাটির ডিবায় করে' নিয়ে আসে। তাকে এরা বলে 'চুকা'। সেই হাড় এরা দামোদরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়। দামোদরকে এরা বলে গঙ্গা। সেই গঙ্গার ঘাটে একটা শালের ডাণ্ডা পোঁতে, আর তার কাছে একটা লোহার খাড়ু আর চারটি পয়সা পুঁতে দেয়, সাঁওতালদের বামুন সেইখানে পূজা করে' সেগুলি তুলে নেয়। অস্থি দিয়ে ফিরে এলে ঘরের মেয়েরা তেল-জল দিয়ে তার পা ধুইয়ে দেয়। মড়া নিয়ে গেলে ঘরের সবাই নেয়ে আসে। একমাস পরে এদের শ্রাদ্ধ হয়। তখন কুটুম আসে, আর ভোজ হয়।

কারু ঘরে লোক মর্‌লে এদের প্রত্যেকের ঘর থেকে একজন করে' যায়।

এদের দেবতা বোঙ্গা, সে পাহাড়ে থাকে। এরা তারি পূজা করে' থাকে। বছরের মধ্যে এদের পাঁচটা পরব।—

পৌষ মাসে মকর—এইটাই এদের বড় পরব। নূতন কাপড় কেনে, আর হাঁড়িয়া ও মুরগী খেয়ে আমোদ করে।

ফাল্গুন মাসে শাল পূজা—এই সময় শালের নূতন পাতা হয়। এরা জাহেরাকে পূজা করে আর হাঁড়িয়া ও মুরগী খেয়ে আমোদ করে।

ভাদ্র মাসে বিঁধা পরব—যেখানে রাজা আছে সেই-খানেই এই পরবটা হয়। একটা মহিষকে বেঁধে তীর মারে। রাজা এসে আগে তীর মারে, তার পর অপর সকলে তীর মেরে তাকে মেরে ফেলে।

ভাদ্র মাসে গোমহা পরব—এই পরবে বোঙ্গার পূজা হয়।

আশ্বিনমাসে বাঁধনা পরব—এটা আমাদের দেশের
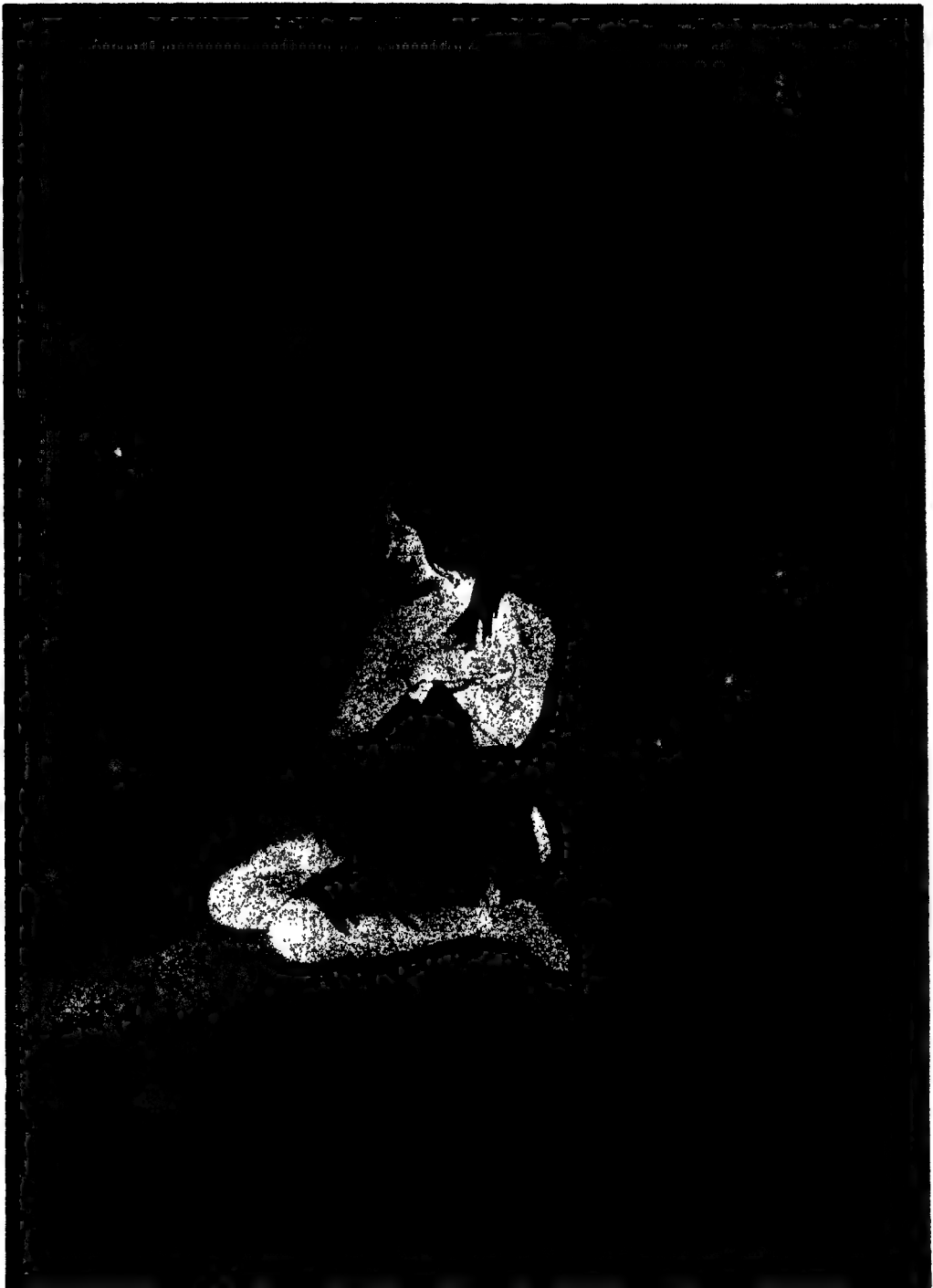
দময়ন্তী
চিত্রকর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন

গো-পার্ব্বণের মত। মুরগী, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু এরা পূজা করে।

অস্পৃশ্যতা এদের এক ভাত ছাড়া আর কিছুতে নেই। এরা মাথায় করে' হাঁড়িসুদ্ধ ভাত যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যায়, যেখানে ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সাঁওতাল ছাড়া অন্য জাতে ছুঁয়ে দিলেই সে ভাত তারা খায় না। তা হ'লেই তাদের জাতি যায়। অপর কোন জাতির ঘরে তারা ভাত খায় না, বা কারু এঁটো বাসন তারা মাজে না। পুরুষরা যদিও বামুন-ঘরে ভাত খায়, কিন্তু মেয়েরা কোথাও খায় না। সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে আমার মনে হয় এরা হিন্দুদের কাছ থেকে অনেক ধার করেছে, কারণ উপরোক্ত অনেক ব্যাপারই আমাদের সঙ্গে মিলে যায়।

এদের সরলতা, এদের ঔদার্য্য, এদের স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় দেয়। যতদিন এদের অভাব-অভিযোগ কম থাক্‌বে, ততদিন এরা এম্‌নি সরল, এম্‌নি মহৎ থাক্‌বে। ক্রমশঃ সভ্যতার সংস্পর্শে যতই আস্‌বে ততই এদের অভাব বাড়্‌বে, আর ততই হয়ত চুরি, জোচ্চোরি, ধাপ্পাবাজী এদের মধ্যে প্রবেশ কর্‌বে।

শ্রী কালীপদ ঘোষ

ভারতের প্রাচীন বিচারপদ্ধতি

প্রাচীনকালে পৃথিবীর অনেক দেশেই অদ্ভুত উপায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ অথবা নির্দ্দোষিতা নির্দ্ধারিত হইত। খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে জুরী-প্রথা-প্রবর্ত্তনের প্রারম্ভকালে জুররগণকে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ-প্রসঙ্গে বিচার করিতে হইত না। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ হইলে, তৎসম্বন্ধে বিচার হইবে কি না তাঁহারা শুদ্ধ তাহাই অবধারণ করিতেন। তাঁহারা বিচারের মত প্রকাশ করিলে, উত্তপ্ত জলপূর্ণ পাত্রে একখানি প্রস্তরখণ্ড রাখিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা হস্ত দ্বারা তুলিতে বলা হইত। তৎপরে সেই হস্তখানি সাত দিবস পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখার পর যদি দেখা যাইত যে ক্ষতস্থান আরোগ্য হইয়াছে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইয়া অব্যাহতি পাইত।* এইরূপ বিচারপ্রণালী ভারতেও অজ্ঞাত ছিল না। রামায়ণ-বর্ণিত সীতার অগ্নিপরীক্ষা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। পরবর্ত্তী কালেও আমরা যাজ্ঞবল্ক্য-প্রণীত মিতাক্ষরায় এইরূপ বিচারের ব্যবস্থা দেখিতে পাই। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের প্রারম্ভকালে মিতাক্ষরা-শাসিত প্রদেশসমূহে হিন্দুগণের মধ্যে নিম্নলিখিত নয়টির মধ্যে কোন একটি উপায় অবলম্বনে ফৌজদারি অভিযোগের বিচার হইত :—

(১) তৌল-পরীক্ষা, (২) অগ্নি-পরীক্ষা; (৩) জল-পরীক্ষা; (৪) বিষ-পরীক্ষা; (৫) কোষ-পরীক্ষা; (৬) তণ্ডুল-পরীক্ষা; (৭) উত্তপ্ততৈল-পরীক্ষা; (৮) উত্তপ্তলৌহ-পরীক্ষা; (৯) মূর্ত্তি-পরীক্ষা।†

(১) তৌল-পরীক্ষা দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিতে হইলে, সে ব্যক্তিকে ও তাহার পুরোহিতকে এক দিবস উপবাসী থাকিতে হইত। পরদিবসে তাহাকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া পুরোহিত হোমাদি যজ্ঞ ও দেবদেবীর পূজা করিতেন। এই-সমস্ত ব্যাপারের পর তৌলদণ্ডকে সম্বোধনপূর্ব্বক অভিযুক্ত ব্যক্তির বলিতে হইত :—

"হে তৌলদণ্ড, তুমি সত্যের আধার: প্রাচীনকালে দেবতারা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতএব হে সিদ্ধিদাতা, তুমি সত্য প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে সকল সন্দেহ হইতে বিমুক্ত কর। তুমি মাতৃসম পূজনীয়, আমি অপরাধ করিয়া থাকিলে আমাকে নিম্নে লইয়া যাও; যদি আমি নির্দ্দোষী হই তাহা হইলে আমাকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া দেও।"

* Vide The Groundwork of British History by G. F. Warner.

† Vide Asiatic Researches, Vol. I.

অভিযুক্ত ব্যক্তি এইরূপ প্রার্থনা করিলে তাহাকে ওজন করা হইত। তৎপরে পুরোহিত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত বিধি-অনুসারে মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ একখানি কাগজে অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া উহা তাহার মস্তকে বাঁধিয়া দিতেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাকে পুনর্ব্বার ওজন করা হইত। দ্বিতীয়বারের ওজনে সে পূর্ব্বাপেক্ষা ভারী হইলে অভিযোগের সত্যতা সাব্যস্ত হইত। ওজনে কম হইলে তাহার নির্দ্দোষিতা অবধারিত হইত। প্রথম ও দ্বিতীয় বারের ওজনে যদি সে ব্যক্তির ভারের হ্রাস বৃদ্ধি না হইত, তাহা হইলে তাহাকে তৃতীয় বার ওজন করা হইত। যদি তাহার দেহের গুরুত্ব-নিবন্ধন তৌল-দণ্ড ছিঁড়িয়া পড়িত তাহা হইলে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিত না।

(২) অগ্নি-পরীক্ষা। অগ্নি দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিতে হইলে, নয় হস্ত পরিমিত দীর্ঘ, এক হস্ত প্রশস্ত ও অর্দ্ধ হস্ত গভীর একটি খাদ খনন করিয়া উহা পিপলকাষ্ঠের অগ্নি দ্বারা পূরণ ক । হইত। তৎপরে সে ব্যক্তি অগ্নিকে প্রণাম করিয়া বলিত—

"হে অগ্নি, তুমি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান, সর্ব্বশুচি, ধর্ম্মা-ধর্ম্মের সাক্ষী ; অতএব তুমি সত্য প্রকাশ কর।"

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি নগ্ন পদে উহার উপর দিয়া বেড়াইত। তাহাতে যদি তাহার পদতলে অগ্নি স্পর্শ না করিত, তাহা হইলে সে নিরপরাধী, পদতল দগ্ধ হইলে অপরাধী সাব্যস্ত হইত।

(৩) জল-পরীক্ষা। জল পরীক্ষা দ্বারা ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতে হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে একটি জলাশয়ে লইয়া গিয়া নাভি-প্রমাণ জলে দণ্ডায়মান করান হইলে সে বরুণদেবকে প্রণাম করিয়া বলিত :—

"হে বরুণ, তুমি সত্য প্রকাশ করিয়া আমাকে রক্ষা কর।"

তখন জনৈক ব্রাহ্মণ যষ্টি-হস্তে জলে নামিত। তৎপরে একব্যক্তি ধনুকে গুণ দিয়া শুষ্ক ভূমির উপর তিনটি শর নিক্ষেপ করিত। উক্ত তিনটি শরের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা দূরে পড়িত, সেইটি আনিবার নিমিত্ত এক ব্যক্তি যাইত। সেই শরটি সে উঠাইয়া লইলে আর-এক ব্যক্তি শর উঠাইবার জন্য প্রেরিত হইত। তখন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যষ্টিধারী ব্রাহ্মণের যষ্টি কিম্বা পদ স্পর্শ করিয়া জলে ডুব দিতে বলা হইত। যে ব্যক্তিদ্বয় শর আনিতে যাইত, তাহারা প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি জলের উপরে মস্তক তুলিত, তাহা হইলে তাহার অপ াধ-প্রসঙ্গে সন্দেহের কারণ থাকিত না।

(৪) বিষ-প্রয়োগের দ্বারা অপরাধ নির্ণয় করিতে হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির হলাহলকে প্রণাম করিয়া বলিতে হইত :—

"হে হলাহল, তুমি ব্রহ্মার তনয়, তুমি ধর্ম্ম ও সত্য-পরায়ণ। যদি আমি সত্যকথা বলিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি আমার পক্ষে অমৃত-তুল্য হইয়া আমাকে এই গুরুতর অভিযোগ হইতে মুক্তি প্রদান কর।"

বিষ-পরীক্ষা নিম্নলিখিত দুই প্রকারে হইত :—

(ক) পুরোহিতগণ হোম-যজ্ঞ সমাপন করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্নান করান হইত। তৎপরে ২॥০ রতি পরিমাণ বিষনাগ (একপ্রকার বিষাক্ত শিকড়) অথবা সেঁকো বিষ ৫৪ রতি ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হইত। যদি তাহাতে শরীরে কোন প্রকারে বিষের ক্রিয়া দৃষ্ট না হইত, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিরপরাধ, অন্যথায় তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইত।

(খ) একটি গোক্ষুর অথবা কেউটিয়া সর্প একটি মৃণ্ময় কলসীর মধ্যে রাখিয়া তন্মধ্যে একটি অঙ্গুরীয় অথবা মুদ্রা নিক্ষিপ্ত হইত। অনন্তর সেই অঙ্গুরীয় অথবা মুদ্রাটিকে অভিযুক্ত ব্যক্তির হস্ত দ্বারা তুলিতে হইত। ঐরূপে তুলিতে গিয়া যদি সে সর্পদষ্ট না হইত তাহা হইলে তাহার নির্দ্দোষিতা সাব্যস্ত হইত। সর্পদষ্ট হইলে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিত না।

(৫) কোষ-পরীক্ষা। দেব-দেবীর মূর্ত্তি ধৌত করিয়া সেই জলের তিন কোষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পান করিতে হইত। তৎপরে চৌদ্দ দিবসের মধ্যে তাহার কোনরূপ শারীরিক অসুস্থতা হইলে সে অপরাধী সাব্যস্ত হইত, না হইলে তাহার নির্দ্দোষিতা নির্দ্ধারিত হইত।

(৬) তণ্ডুল-পরীক্ষা। কতিপয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে

চৌর্য্য-অপরাধের সন্দেহ বিদ্যমান থাকিলে একটি শাল-গ্রাম-শিলা দ্বারা তণ্ডুল ওজন করিয়া তাহা উহাদিগকে চর্ব্বণ করিতে বলা হইত। চর্ব্বিত হইলে, তাহারা এক-একটি পিপল-পত্রের উপরে উহা ফেলিত। যে ব্যক্তির মুখ হইতে শুষ্ক চাউল বাহির হইত, সে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অপর সকলে অব্যাহতি পাইত।

(৭) উত্তপ্ততৈল-পরীক্ষা। উত্তপ্ত তৈলের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিতে হইলে তন্মধ্যে তাহাকে একখানি হস্ত নিমজ্জিত করিতে বলা হইত। যদি তাহাতে তাহার হস্ত দগ্ধ না হইত, তাহা হইলে সে নির্দ্দোষী, দগ্ধ হইলে অপরাধী সাব্যস্ত হইত।

(৮) উত্তপ্তলৌহ-পরীক্ষা। একটি লৌহনির্ম্মিত বর্ত্তুল অগ্নিতে লাল করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির হস্তে দেওয়া হইত। যদি তাহাতে তাহার হস্ত দগ্ধ হইত, তাহা হইলে সে দোষী, দগ্ধ না হইলে নির্দ্দোষী বিবেচিত হইত।

(৯) মূর্ত্তি-পরীক্ষা। এই উপায়ে অপরাধ অথবা নির্দ্দোষিতা নির্দ্ধারিত করিতে হইলে রৌপ্যনির্ম্মিত একটি মূর্ত্তি এবং লৌহনির্ম্মিত একটি মূর্ত্তি একটি মৃণ্ময় কলসীর মধ্যে রাখিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে না দেখিয়া উহার একটি তুলিতে বলা হইত। যদি সে রৌপ্য-মূর্ত্তিটি তুলিত, তাহা হইলে সে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইত। লৌহ-মূর্ত্তিটি তুলিলে তাহার অপরাধ নির্দ্ধারিত হইত।

বৃদ্ধ, অন্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক অথবা অল্পবয়স্ক বালক বা বালিকা কোন অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে প্রথমোক্ত উপায়ে অর্থাৎ তৌলদণ্ডের সাহায্যে তাহার বিচার হইত। শূদ্র অভিযুক্ত হইলে অগ্নি-জল অথবা বিষ-পরীক্ষা দ্বারা তাহার বিচার হইত। কিন্তু যদি কোন অপরাধের ফলে অভিযোগকারীর সহস্র মুদ্রার কম ক্ষতি হইত, তাহা হইলে উত্তপ্ত লৌহ-বর্ত্তুল, বিষ অথবা তৌলদণ্ডের সাহায্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইত না।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসন-কালে ইব্রাহিম আলি খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি বেনারসের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সমক্ষে মিতাক্ষরার বিধান অনুসারে দুইটি ফৌজদারি অভিযোগের বিচার হইয়াছিল। কিরূপে বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা তৎপ্রদত্ত রিপোর্ট্ হইতে জানিতে পারা যায়। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের নিমিত্ত আমরা সেই রিপোর্টের সারাংশ নিম্নে প্রদান করিলাম:—

১৭৮৩ খৃঃ বেনারস নগরে উত্তপ্ত লৌহ-বর্ত্তুলের সাহায্যে একটি ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার হইয়াছিল। শঙ্কর নামক জনৈক ব্যক্তির নামে চৌর্য্য-অপরাধের অভিযোগ হয়। তাহাতে শঙ্কর বলে "অভিযোগটি মিথ্যা, আমি নির্দ্দোষী।" ফরিয়াদি অভিযোগের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত আইনসঙ্গত প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিয়া অগ্নি-পরীক্ষার দ্বারা বিচারের প্রার্থনা করায়, আসামী তাহাতে সম্মত হইল। আমি সমবেত বিচারক ও পণ্ডিতগণকে কোম্পানীর রীতিবহির্ভূত উপায় অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়া বলিলাম, "অগ্নি-পরীক্ষার পরিবর্ত্তে তামা তুলসী গঙ্গাজল অথবা একখানি হরিবংশ অথবা শালগ্রাম-শিলা স্পর্শ করিয়া উভয়পক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করুক।" কিন্তু কোন পক্ষই আমার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় উভয়ের প্রার্থিত প্রকারে বিচার-কার্য্য নিষ্পন্ন করা স্থির করিলাম। এরূপ পদ্ধতি অবলম্বনের চারিটি কারণ ছিল:—

(১) আসামীর অপরাধ অথবা নির্দ্দোষিতা অবধারণের অন্য কোন উপায় ছিল না।

(২) উভয় পক্ষ হিন্দু ছিল।

(৩) হিন্দুরাজাগণের রাজ্যসমূহে এইরূপ বিচার-প্রণালী প্রচলিত ছিল।

(৪) অগ্নির উত্তাপে আসামীর হস্ত দগ্ধ না হওয়া সম্ভব কি না ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম।

এই-সমস্ত কারণে আমি আদালতের নিযুক্ত পণ্ডিত-গণকে এবং বেনারসের অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতি এই মর্ম্মে আদেশ প্রচার করিলাম:—

"ফরিয়াদি ও আসামী উভয়েই হিন্দু। তাহারা উত্তপ্ত বর্ত্তুলের সাহায্য বিনা অন্য কোন প্রকার বিচারে সন্তুষ্ট হইবে না। অতএব মিতাক্ষরা-বর্ণিত প্রকারে উত্তপ্ত লৌহ-বর্ত্তুলের সাহায্যে আসামীর বিচার হউক।"

উপরি উক্ত আদেশ অনুসারে বিচারের আয়োজন হইলে আমি সৈন্তগণ, অধ্যাপকমণ্ডলী ও আদালতের কর্ম্মচারীবৃন্দ সমভিব্যাহারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া ফরিয়াদিকে নিরস্ত করিবার জন্ত তাহাকে বলিলাম, 'যদি আসামীর হস্ত দগ্ধ না হয় তাহা হইলে তোমার কারাদণ্ড হইবে," কিন্তু সে ব্যক্তি ঐরূপ ভয়প্রদর্শনে ভীত না হইয়া প্রার্থিত উপায় অবলম্বন করিতে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে বাধ্য হইলাম। অনন্তর পণ্ডিতগণ দেবদেবীর পূজা সাঙ্গ করিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলেন। তৎপরে গোময় দ্বারা মৃত্তিকার উপরিভাগে নয়টি বৃত্ত অঙ্কিত করা হইলে, আসামীকে গঙ্গা-স্নান করাইয়া সিক্ত-বস্ত্রেই আনয়ন করা হইল। পাছে কোনরূপ প্রতারণা করে এই আশঙ্কায় তাহার হস্ত দুইখানি পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া একখানি তালপত্রে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র সহ অভিযোগের বিবরণ লিখিয়া তাহার মস্তকে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। অনন্তর পণ্ডিতগণ ৭টি পিপল-পত্র, ৭টি দূর্ব্বাদল ও কয়েকটি পুষ্প এবং কয়েকটি যব দধিতে ভিজাইয়া ৭টি সাদা সূতায় বাঁধিয়া আসামীর হস্তদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। তখন একটি লৌহ-বর্ত্তুল প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে লাল করা হইলে উহা একটি চিম্‌টার দ্বারা ধরিয়া সেই হস্তদ্বয়ের মধ্যে স্থাপিত হইল। আসামী বর্ত্তুলটি হস্তে ধারণপূর্ব্বক গোময়-অঙ্কিত নয়টি বৃত্তের মধ্যে সাতটি পার হইয়া আসিয়া নবম বৃত্তের মধ্যে উহা নিক্ষেপ করিল। উক্ত ৭টি বৃত্ত উত্তীর্ণ হইতে আসামীর ৩।০ গজ পরিমিত স্থান পদচারণ করিতে হইয়াছিল। তখন পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইল যে তাহার হস্তদ্বয়ের কোন স্থলে অগ্নি স্পর্শ করে নাই। পরীক্ষাস্থলে সর্ব্বসমেত অনুমান পাঁচশত লোক উপস্থিত ছিল। আসামীর হস্ত দগ্ধ হইল না দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। আমিও স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু ভাবিলাম হয় ত আসামীর হস্তে কয়েকটি বৃক্ষপত্র ও অন্যান্য পদার্থ থাকা প্রযুক্ত অগ্নির উত্তাপ লাগে নাই। তদ্ভিন্ন আসামী বর্ত্তুলটি হস্তে ধরিয়া অতি অল্পক্ষণ পরেই উহা ফেলিয়া দিয়াছিল। সে যাহা হউক, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র উহার অন্ত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র বলে, এবং পণ্ডিতেরাও বলিয়া থাকেন, যে, যে-ব্যক্তি সত্যকথা বলে তাহার হস্ত অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। আসামীর হস্ত দগ্ধ হয় নাই তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম। আমি একা নহি। সেখানে যে-সকল ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও দেখিয়াছিলেন। বিচারের ফলে, আসামীর হস্ত দগ্ধ না হওয়ায় তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। ভবিষ্যতে অপর কোন ব্যক্তি এরূপ বিচারের প্রার্থনা না করিতে পারে এইজন্ত ফরিয়াদির প্রতি এক সপ্তাহ কারাবাসের আদেশ দিতে বাধ্য হইলাম। আমার বিশ্বাস যে যাঁহারা দর্শন-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন, অগ্নিতে কোন কোন ব্যক্তির হস্ত দগ্ধ হয় এবং কাহারও কাহারও বা দগ্ধ হয় না কেন?

"উত্তপ্ত-তৈল-পরীক্ষা নিম্নলিখিত প্রকারে হইয়া থাকে। পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট স্থানটি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে গোময় লেপন করা হইলে, পরদিবস সূর্য্যোদয়কালে পণ্ডিতগণ গণেশাদি দেবতার পূজা করিয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এক-খানি স্বর্ণ-রৌপ্য-তাম্র-লৌহ অথবা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রে একসের ঘৃত বা তৈল ঢালিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করেন, তৎপরে একটি বিল্ব অথবা পিপল পত্র তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যদি দেখা যায় যে পত্রটি পুড়িয়া গিয়াছে তাহা হইলে সেই উত্তপ্ত তৈলে একটি স্বর্ণ-রৌপ্য- তাম্র অথবা লৌহ-নির্ম্মিত অঙ্গুরীয় ফেলিয়া উহা মন্ত্রপূত করা হয়। তখন অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই অঙ্গুরীয়টিকে হস্ত দ্বারা উত্তোলন করে যদি তাহাতে তাহার হস্ত দগ্ধ না হয়, তাহা হইলে সে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হয়। হস্ত দগ্ধ হইলে সে ব্যক্তি অপরাধী বিবেচিত হয়। কৃষ্ণীশ্বর ভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রামদয়াল নামক জনৈক চিত্রকরের নামে চৌর্য্য-অপরাধের অভিযোগ করিয়াছিল। তদুত্তরে রামদয়াল বলিয়াছিল, 'আমি নির্দ্দোষী।' তখন কিরূপে অভিযোগের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইবে তৎসম্বন্ধে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হইয়া পরিশেষে এইরূপ স্থির হইল যে তৈল-পরীক্ষার দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইবে। আমি পক্ষদ্বয়কে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া উত্তপ্ত তৈলের সাহায্যে বিচার হওয়ার অনুমতি দিতে বাধ্য হইলাম। বিচার-কালে যে-সমস্ত পণ্ডিত উপস্থিত থাকিয়া

সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ভীষ্ম ভট্ট, নানা পাঠক, মণিরাম পাঠক, মণিরাম ভট্ট, শিব, অনন্তরাম ভট্ট, কৃপারাম, বিষ্ণুহরি, কৃষ্ণচন্দ্র, রামেন্দ্র, গোবিন্দরাম, হরিকৃষ্ণ ভট্ট, কালিদাস। শেষোক্ত তিন ব্যক্তি আদালতের নিযুক্ত পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিতগণ হোমাদি ক্রিয়া ও গণেশের পূজা সমাপনপূর্ব্বক আমাকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া পাঠাইলে আমি দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের দারোগাদ্বয় সহর-কতোয়াল এবং আদালতের কর্ম্মচারী ও বেনারসের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সমভিব্যাহারে বিচার-স্থলে পৌছিয়া তখনও রামদয়ালকে বলিলাম, 'তুমি এরূপ বিচারে সম্মত হইও না; কারণ যদি তোমার হস্ত দগ্ধ হয়, তাহা হইলে ফরিয়াদি যে-সমস্ত দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে, তৎসমুদায়ের মূল্য তোমাকে দিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে সকল সমাজেই তোমার অখ্যাতি প্রচার হইবে।' রামদয়াল আমার কথা শুনিল না, কিন্তু তৈল-পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া উত্তপ্ত তৈলে হস্ত নিমজ্জিত করা মাত্র তাহার হস্ত দগ্ধ হইল। তখন সমাগত পণ্ডিত-মণ্ডলীর মতামত জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন, 'আসামীর অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং অপহৃত দ্রব্যাদির মূল্য ফরিয়াদিকে দিতে সে বাধ্য। উক্ত মূল্য যদি পাঁচশত আশ্‌রফির অধিক হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রের বচন-অনুসারে তাহার হস্ত ছেদন করা বিধেয়। পণ্ডিতেরা এইরূপ মত প্রকাশ করিলে আমি রামদয়ালকে অপহৃত দ্রব্যের মূল্যস্বরূপ ফরিয়াদিকে সাত শত টাকা দিবার আদেশ করিলাম। কিন্তু আসামীকে অন্য কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া হইল না।"

এই দুইটি মোকদ্দমার কাগজপত্র কলিকাতায় কর্তৃপক্ষ-গণের নিকটে প্রেরিত হইলে, তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। গবর্ণর জেনেরল্ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সেই-সমস্ত কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া যে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আলি ইব্রাহিম খাঁর উত্তর সহ তৎসমুদয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রশ্ন। "হোম" শব্দের অর্থ কি ?

উত্তর। দেবতাগণকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে যে-সমস্ত উপহার দেওয়া হয় তৎসমুদয়ের নাম "হোম"। এই উপহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে।

অগ্নি-হোম করিতে হইলে পলাশ, খদির, রক্তচন্দন ও পিপল কাষ্ঠ, কুশর, কৃষ্ণতিল, যব, তণ্ডুল, ইক্ষু, ঘৃত, খর্জ্জুর এবং অন্যান্য দ্রব্য অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়।

প্রশ্ন। হোম কত প্রকারের হইয়া থাকে ?

উত্তর। ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হোম করিতে হয়, কিন্তু উত্তপ্ত লৌহ এবং তৈল পরীক্ষায় একই প্রকারের হোম হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। "মন্ত্র" শব্দের অর্থ কি ?

উত্তর। পণ্ডিতেরা ঐরূপ তিনটি শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন,—মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র। মন্ত্র অর্থে কতিপয় দেবতার নাম-সম্বলিত বেদ হইতে উদ্ধৃত শ্লোক। যন্ত্র অর্থে অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত কতকগুলি অঙ্কের প্রয়োগ। তন্ত্র শব্দের অর্থ একপ্রকারের ঔষধ, যাহা শরীরের কোন স্থলে প্রয়োগ করিলে সে স্থলে কোনরূপ আঘাত লাগিতে পারে না। এইরূপ শুনা যায় যে এই ঔষধ হস্তে মাখিয়া সেই হস্ত দ্বারা উত্তপ্ত লৌহ-বর্ত্তুল ধরিলে হস্ত দগ্ধ হয় না।

প্রশ্ন। যে আসামীর বিচার উত্তপ্ত লৌহ বর্ত্তুলের সাহায্যে হইয়াছিল, তাহার হস্তে কতগুলি যব দধিতে ভিজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ?

উত্তর। নয়টি মাত্র।

প্রশ্ন। তৎকালে সে ব্যক্তির মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল ?

উত্তর। তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ও বিবেচনা-শক্তি ছিল; কিন্তু সে একটুও উদ্বিগ্ন হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

প্রশ্ন। যে ব্যক্তির মোকদ্দমায় তৈল-পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল ?

উত্তর। সে প্রথমে ভীত হইয়াছিল, কিন্তু তৈল-পরীক্ষায় তাহার হস্ত দগ্ধ হওয়ার পরেও সে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিল "আমি নির্দ্দোষী।" কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে সে চুক্তি করিয়াছিল যে যদি তাহার হস্ত দগ্ধ হয়, তাহা

হইলে দাবীকৃত দ্রব্যাদির মূল্য ফরিয়াদিকে সে দিতে বাধ্য হইবে। সেইজন্য তাহাকে মূল্য-প্রদানের আদেশ করা হইয়াছিল।

প্রশ্ন। অগ্নি-পরীক্ষা, উত্তপ্ত-লৌহ পরীক্ষা, উত্তপ্ত-তৈল-পরীক্ষা এই তিনটির মধ্যে কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। তবে তিনটির স্বতন্ত্র নাম হইল কেন? তিনটিকেই অগ্নি-পরীক্ষা বলে না কেন?

উত্তর। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তিনটিই স্বতন্ত্র।

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

রাজপথ

[৬]

বোটানিকাল গার্ডেনের ঘটনা প্রায় একমাস অতীত হইয়াছে। সুরেশ্বরের হাতের ঘা একেবারে সারিয়া গিয়াছে এবং ইত্যবসরে কয়েকবার দর্শন ও আলাপের সুযোগে প্রমদাচরণ ও তাঁহার পরিজনবর্গের সহিত সুরেশ্বরের পরিচয় অনেকটা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই বিনান সন্ধ্যার সময়ে সুরেশ্বরকে সুমিত্রাদের বাটী ধরিয়া লইয়া যায়।

সকালে বৈঠকখানায় বসিয়া সুরেশ্বর কোনও দৈনিক পত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছিল, এমন সময়ে প্রমদাচরণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি উঠিয়া নমস্কার করিয়া একখানা চেয়ার আগাইয়া দিল।

প্রমদাচরণ ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে কহিলেন, "কাজের মধ্যে তোমাকে বিরক্ত কর্‌লাম, সুরেশ্বর।"

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "না, না, একটুও করেন নি। আপনি বসুন।"

চেয়ারে উপবেশন করিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন, "আস্‌ছে শনিবারে সুমিত্রার জন্মদিন; সেই উপলক্ষে তোমার নিমন্ত্রণ। সন্ধ্যার সময়ে যাবে আর সেইখানেই আহার কর্‌বে। ছেলে-মেয়েদের জন্মদিনের উৎসবে আমি বাইরের লোক কাউকে বড় বলিনে। কিন্তু তোমাকে আমরা বাইরের লোক বলে' মনে করিনে। সুমিত্রার জন্মদিনের উৎসবে তুমি উপস্থিত থাক্‌বে এ আমাদের সকলেরই ইচ্ছা।"

সুরেশ্বর সাগ্রহে কহিল, "নিশ্চয়ই থাক্‌ব।" তাহার পর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "শনিবারে তাঁর জন্ম-তিথি, না জন্ম-তারিখ?"

প্রমদাচরণ কহিলেন, "জন্মতারিখ। ১৯— সালের ৮ই অক্টোবর সকালে সুমিত্রার জন্ম হয়, আমি সেইদিন প্রথম ডিষ্ট্রীক্টের চার্জ্ পাই। সুমিত্রা আমার ভারি পয়মন্ত মেয়ে।" বলিয়া প্রমদাচরণ হাসিতে লাগিলেন।

সুরেশ্বর একটা বিশেষ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া অন্যমনস্ক হইয়া প্রমদাচরণের সহিত হাসিতে লাগিল। পরে প্রমদাচরণ প্রস্থান করিলে তৎক্ষণাৎ প্রমদাচরণ-কথিত সুমিত্রার জন্ম তারিখটা এক স্থানে লিখিয়া রাখিল। তাহার পর আলমারি খুলিয়া পুরাতন পাজি বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিল যে বাংলা তারিখের হিসাবে সুমিত্রার জন্মদিন সে বৎসর শনিবারে পড়ে না, পূর্ব্বদিন শুক্রবারে পড়ে।

মধ্যে মাত্র দুইদিন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া খাতাপত্র তুলিয়া রাখিয়া সুরেশ্বর গৃহমধ্যে মাধবীর নিকট উপস্থিত হইল। মাধবী তখন তাহার মাতার পূজার ঘরে পূজার পাত্র ও সাজগুলি ধুইয়া মুছিয়া তুলিয়া রাখিতেছিল, সুরেশ্বরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদা?"

সুরেশ্বর কহিল, "এখানকার কাজ শেষ হ'ল, মাধবী?"

"হাঁ, হ'ল।"

"তবে চল্ ত আমাকে খানিকটা সুতো দিবি।"

"চল দিচ্ছি।" বলিয়া মাধবী বাহিরে আসিয়া ঘরে শিকল লাগাইয়া দিল।

ভ্রাতা-ভগিনী উভয়ে দ্বিতলের একটা ঘরে উপস্থিত হইল। প্রবেশ-দ্বারে চৌকাঠের মাথায় সাদা খদ্দরের জমিতে লাল সূতা দিয়া বড় বড় করিয়া লেখা "পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে।" ঘরে প্রবেশ করিয়াই চোখে পড়ে ঠিক তেম্নি আর-একটি মন্ত্র, "আবার তোরা মানুষ হ'।" ঘরের মধ্যে পাঁচখানি চর্‌কা, খান পনেরো লাটাই, দুইটা বড় ধামাভরা তুলার পাঁজ এবং তিনটা আল্‌মারিতে বিবিধ প্রকারের কাটা সূতা ও অন্যান্য সামগ্রী সজ্জিত।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "খুব মিহি সূতা চাই মাধবী, রুমালের জন্য।"

"কটা রুমালের মত?"

"অন্ততঃ তিনটে।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া মাধবী কহিল, "তা বোধ হয় হবে।"

সুরেশ্বর কহিল, "না হ'লে কালকের মধ্যে কেটে দিতে হবে, যত মিহি পারিস্।"

মাধবী সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "অত মিহি সূতা কার দরকার দাদা? এত সৌখীন লোক কে?"

সস্মিতমুখে সুরেশ্বর বলিল, "শুধু সৌখীন নয় রে, ভারি কঠিন! ছুঁচের মত মিহি না হ'লে সেখানে বিঁধ্‌বে না। প্রমদা-বাবুর মেয়ে সুমিত্রাকে দিতে হবে।"

মাধবী সূতা অন্বেষণ করিতে করিতে সুরেশ্বরের সহিত কথা কহিতেছিল; সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "সুমিত্রাকে হঠাৎ রুমাল দিচ্ছ যে দাদা?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "হঠাৎ নয়; তার জন্মদিন উপলক্ষে এইমাত্র প্রমদা-বাবু নিমন্ত্রণ করে' গেলেন। ভাবৃছি তিনখানা রুমাল উপহার দেবো। কিন্তু ভারি কঠিন কথা,—আইরিশ্ লিনেনের সঙ্গে দেশী খদ্দরের প্রতিযোগিতা!—পেরে উঠ্‌ব বলে' ত ভরসা হয় না।"

মাধবী একটা টিনের বাক্স হইতে খানিকটা সূতা বাহির করিয়া সুরেশ্বরের হস্তে দিল।

সূতা দেখিয়া সুরেশ্বরের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে সানন্দে মাধবীর পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া কহিল, "বাঃ মাধবী বাঃ! দুশো বৎসর আগে তুই নিশ্চয়ই ঢাকাতে সূতো কাট্‌তিস। এত মিহি সূতো কবে কাট্‌লি রে?"

মাধবী হাসিয়া কহিল, "এ সূতো ব্যবহারের জন্যে ত কাটিনি দাদা, কত মিহি সূতো কাটা যায় দেখ্‌বার জন্যে মাঝে মাঝে এই সূতো কেটে জমিয়েছি। এতে তোমার তিনখানা রুমাল অনায়াসে হবে।"

"বেশী হবে," বলিয়া সূতা লইয়া সুরেশ্বর প্রস্থানোদ্যত হইল; তাহার পর পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "এ সূতো কাট্‌তে তোর যেমন কষ্ট হয়েছে মাধবী, পুণ্যও তেম্নি হবে। বাংলা দেশের একটি কঠিন পরিবারের সঙ্গে প্রথম এই দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করব ঠিক করেছি।"

মাধবী সহাস্যমুখে কহিল, "বেশ ত।"

সূতা লইয়া সুরেশ্বর মাণিকতলা ষ্ট্রীটে একটি জীর্ণ পুরাতন গৃহে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া অবনত হইয়া যুক্তকরে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কখানা তাঁত চলেছে অতুল?"

অতুল নম্রস্বরে কহিল, "আজ্ঞে পাঁচখানা।"

"দুখানা বন্ধ রয়েছে কেন?"

অতুল একবার নতদৃষ্টি হইয়া তারপর সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া কহিল, "টানা দেওয়ার লোকের অভাবে; আর দুজন লোক না হ'লে কিছুতেই চল্‌ছে না বাবু।"

"লোকের জন্যে তোমার বাড়ীতে লিখ্‌তে বলেছিলাম ত? লেখ নি?"

অতুল কহিল, "আজ্ঞে সেই দিনই লিখে দিয়েছি, কিন্তু এ পূজো মুখে করে' কেউ বাড়ী ছেড়ে আস্‌বে বলেও বোধ হয় না। আর দশ-পনের দিন পরে এসে পড়্‌বে।"

"কিন্তু পূজোর মুখেই যে কাজের চাপাচাপি অতুল?"

"আজ্ঞে তাত বটেই," বলিয়া অতুল নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটু চিন্তা করিয়া সুরেশ্বর সূতার বাণ্ডিলটা অতুলের হস্তে দিয়া বলিল, "দেখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যে এই সূতোয় তিনখানা রুমাল আমাকে বুনে দিতে হবে। পাড়ের চারিদিকে একটু ঘোর রঙের সূতোর অক্ষরে

নাম আর তারিখ এই রকমে লেখা হবে।" বলিয়া একখানা কাগজ অতুলের হস্তে দিল।

অতুল নিবিষ্টমনে সেই লেখা ও সুতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, "তা হবে।" তাহার পর প্রসন্ন দীপ্ত মুখ সুরেশ্বরের দিকে ফিরাইয়া স্মিতমুখে কহিল, "আমি জানি বলে' তাই বুঝ্‌তে পার্‌লাম এ সুতো দিদিমণির কাটা; আর কেউ দেখ্‌লে বল্‌ত বিলিতি সুতো।"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ সুতোটা ভারি চমৎকার কাটা হয়েছে।"

অতুল কয়েকপ্রকারের রঙের সুতা আনিয়া নির্ব্বাচনের জন্য সুরেশ্বরের হস্তে দিল। তন্মধ্যে যেটা সর্ব্বাপেক্ষা ঘোর রঙের সেইটা বাছিয়া দিয়া সুরেশ্বর কহিল, "এইটে হ'লেই বেশ চল্‌বে।"

অতুল নির্ব্বাচিত সুতার গোছটি সুরেশ্বর কর্ত্তৃক আনীত সাদা সুতার সহিত রাখিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "মন্দ হবে না। তবে বাজার থেকে খানিকটা বাদামী রঙের জাপান সিল্ক্ কিনে' এনে পাড় কর্‌লে খাসা দেখ্‌তে হ'ত।

অতুলের কথা শুনিয়া সুরেশ্বর সবিস্ময়ে কহিল, "জাপানী সিল্ক্ কি বল্‌ছ অতুল? বিলাতী সিল্ক্ চল্‌বে না, আর জাপানী সিল্ক্ চলবে এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে? আশ্চর্য্য! এ কথাটা তোমাদের কিছুতেই বুঝিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লাম না যে জাপানী জিনিস ব্যবহার করা আরও অন্যায় আমাদের পক্ষে। বিলাতী জিনিস ব্যবহার কর্‌ব না এ ত আমাদের পণ নয়! আমাদের পণ হচ্ছে বিদেশী জিনিস ব্যবহার কর্‌ব না।

রাজীব নামে আর-একজন তাঁতী দূর হইতে এই আলোচনা শুনিতেছিল; সে নিকটে আসিয়া প্রণাম করিয়া নম্রস্বরে বলিল, "কিন্তু বাবু জাপানের সঙ্গে ত আমাদের কোন ঝগড়া নেই।"

সুরেশ্বর রাজীবের দিকে ফিরিয়া কহিল, "তা হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌ছ এ ব্যাপারটা আমাদের ঝগড়ার নয়, এ একেবারে পুরোপুরি ভালবাসার ব্যাপার। দেশকে ভালবাসি তাই দেশের জিনিস ব্যবহার কর্‌ব। দেশ দরিদ্র তাই বিদেশের জিনিস ব্যবহার করে' দেশকে আরও দরিদ্র কর্‌ব না। এই ত সহজ কথা।"

এ সহজ কথা অতুল ও রাজীব কতদূর বুঝিল তাহা ভগবানই জানেন। কিন্তু মুখে তাহারা "তা বটে" বলিয়া পরস্পরের দিকে নিরাপত্তিভরে চাহিয়া রহিল।

[৭]

শুক্রবার প্রাতে চা পানের পর প্রমদাচরণের ড্রয়িংরুমে সকলে সমবেত হইয়াছিল। যথারীতি বিমানবিহারী ত ছিলই, তদুপরি দলের মধ্যে আজ একজন নূতন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। ইঁহার নাম সজনীকান্ত মিত্র, বয়স আনুমানিক চল্লিশ বৎসর। ইনি গৃহকর্ত্রী জয়ন্তী দেবীর কনিষ্ঠ সহোদর, সেই হেতু প্রমদাচরণের শ্যালক এবং আ-ভৃত্য বিমান পর্য্যন্ত সকলেরই মামাবাবু।

যশোহরের সব্‌জজের অফিসে ইনি বিশেষ এক দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে অধিষ্ঠিত। গৃহমধ্যে প্রচার, সমগ্র জেলার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, যাহা আদালতের অধিকারভুক্ত হয় বা হইতে পারে, ইঁহারই হস্তে ন্যস্ত; ইনি অভিলাষ করিলে যথেচ্ছা বিক্রয় বা বিক্রয় হইতে রক্ষা করিতে পারেন। মাসিক বেতন ইনি কত পান তাহা কেহ ঠিক অবগত নহে, তবে এমন একটা কথা সকলেরই শুনা আছে যে মাহিনা নামে যে টাকাটা ইনি মাসে মাসে সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে সেলামি পান গৃহে আসিবার পথে তাহার সবটা দান করিয়া আসিলেও ইঁহার পক্ষে বিশেষ লোক্‌সান হয় না।

পূজার ছুটির দীর্ঘ অবকাশ ভগ্নীর গৃহে অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে ইনি দুইদিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছেন। আসিবার সময়ে যশোহর হইতে দুই টাকার ছানাবড়া লইয়া আসিয়াছিলেন যাহা একদিনেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার আলোচনা কিছুতেই শেষ হইতে চাহে না। কথা হইতেছিল কলিকাতার রসগোল্লা ও যশোহরের ছানাবড়া এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি অধিকতর স্বাদু। আলোচকবর্গের মধ্যে কলিকাতার রসগোল্লার আস্বাদ সকলেরই পরিচিত; যশোহরের ছানাবড়ার আস্বাদ,—অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের দ্বারা,—তাহারা যেরূপ পাইয়াছিলেন মাত্র অতিথিকে

আঘাত দিবার আশঙ্কায় তাহা ব্যক্ত করিতেছিলেন না; তথাপি অব্যাহতি ছিল না।

সজনীকান্ত তাহার অর্দ্ধপক্ক গুম্ফের মধ্যে অবহেলার লঘুহাস্য টানিয়া কহিল, "তোমরা যাই বল বাপু, তোমাদের সহরের স্পঞ্জ রসগোল্লা, যার এত সুখ্যাতি তোমরা কর, কোন কাজেরই নয়; দাঁতে কচ্‌কচ্‌ করে।"

দাঁতে কচ্‌কচ্‌ করে বটে, কিন্তু মুখে দিলেই অন্তর্হিত হয়, তাও একটা নয় দুইটা নয়, দুই তিন গণ্ডা, তাহা এই দুই দিবসের মধ্যে সুমিত্রা স্বচক্ষে অন্ততঃ তিন-চারিবার দেখিয়াছে। এমন কি প্রথম দিন যখন কলিকাতার রসগোল্লার সহিত সজনীকান্তকে যশোহরের দুইটা ছানাবড়া দেওয়া হইয়াছিল তখন কলিকাতার রসগোল্লার প্রতিই তাহাকে সমধিক পক্ষপাত করিতে দেখা গিয়াছিল। তাই এই নির্লজ্জ কপট অস্বীকারোক্তি শুনিয়া সুমিত্রার যেমন রাগ হইল, এই সুপ্রকাশ অপলাপের লঘু শিশুত্ব উপলব্ধি করিয়া তেম্‌নি সে কৌতুকও বোধ করিল।

যদি চ সজনীকান্ত নিতান্ত অবতারণার হিসাবেই "তোমরা যাই বল বাপু," বলিয়া কথা আরম্ভ করিয়াছিল, কারণ এ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিবাদে কেহই কিছু বলে নাই, তথাপি এবার মুখরা সুমিত্রা তাহার উদ্যত রসনাকে কোনরূপে সংযত করিতে পারিল না। সে শান্তস্মিত-মুখে বলিল, "তোমাদের সহরের পাথুরে ছানাবড়া কিন্তু খুব কাজের মামাবাবু, একটা খেলেই পেটে কট্‌কট্‌ করে।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

এই আকস্মিক অতর্কিত আক্রমণে সজনীকান্ত একেবারে মূক হইয়া গেল, এবং অপর সকলে সুমিত্রার বাচালতা এবং অশিষ্টতা দেখিয়া বিস্মিত ও সংক্ষুব্ধ হইল।

এই পরিশোচনীয় ব্যাপারকে একটা সহজ সামান্য আকার দিবার অভিপ্রায়ে আরক্তমুখে জয়ন্তী কহিলেন, "মেয়ের ব তাতেই ঠাট্টা! সেবার উনি কাশী থেকে আস্‌বার সময়ে ফরমাস দিয়ে চম্‌চম্‌ করিয়ে আন্‌লেন, তা দেখে মেয়ের কি ব্যাখ্যানা! অথচ, বুঝ্‌লি কিনা সজু?—সকলে খেয়ে কত সুখ্যাতি!"

এই সান্ত্বনার বাক্যে কতকটা আশ্বস্ত হইয়া সজনীকান্তর মুখে হাসি ফুটিল। সে বলিল, "তা কি আর আমি বুঝি নি দিদি?—ও একটু তামাসা করছে। যশোহরের ছানাবড়ার নিন্দে কি করবার যো আছে?"

এবার প্রমদাচরণ তাঁহার চেয়ারে উঁচু হইয়া উঠিয়া বসিয়া মৃদুহাস্যের সহিত কহিলেন, "অত সহজ কথা নয় হে সজনী! কলিকাতার রসগোল্লার সঙ্গে প্রতিযোগিতা, ভাল করে' প্রমাণ করতে হবে। আমি বলি তুমি যশোর থেকে ফরমাস দিয়ে পাঁচ সের ছানাবড়া আনাও, আমরাও পাঁচসের রসগোল্লা ফরমাস দিই। তারপর সবাই মিলে সুবিধামত একটা বিচার-পদ্ধতি স্থির করলেই হবে।" বলিয়া প্রমদাচরণ, একটা বিশেষ কৌতুকপ্রদ পরিহাস করিয়াছেন ধারণা করিয়া, অমিতভাবে হাসিতে লাগিলেন।

এবার সজনী সম্পূর্ণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বিজয়দৃপ্ত-নেত্রে সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নকণ্ঠে তাহাকে বলিল, "বুঝ্‌তে পারছ ত সুমিত্রা, ঘোষ মশায় ছানাবড়া কি রকম পছন্দ করেন? এ খালি ফন্দী করে' আরও কিছু ছানাবড়া আনাবার মতলব।"

সুমিত্রা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল সুরেশ্বর আসিয়াছে।

প্রমদাচরণ সুরেশ্বরকে তথায় লইয়া আসিবার জন্য আদেশ দিলেন।

সজনী বুঝিতে না পারিয়া অনুসন্ধিৎসু নেত্রে জয়ন্তীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "কে দিদি?"

জয়ন্তী মৃদু হাসিয়া কহিল, "সেই ছেলেটি, বোটানিকাল গার্ডেনে যে—"

জয়ন্তীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সজনী বলিয়া উঠিল, "ওঃ, বুঝেছি। তোমাদের সেই বীরেশ্বর, সুরেশ্বর ত?"

সজনীকান্তের এই অহেতুক মন্তব্যে জয়ন্তী কোনো উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিলেন; প্রমদাচরণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু সত্যিই সে বীরেশ্বর!"

এবং সুরমা, সুমিত্রা এবং বিমান অসন্তুষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল।

ক্ষণকাল পরে সুরেশ্বর কক্ষে প্রবেশ করিল এবং সকলকে অভিবাদন করিয়া একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। তাহার হস্তে লাল-ফিতা-বাঁধা একটা কাগজের বাক্স।

সজনীকান্তকে নির্দ্দেশ করিয়া সুমিত্রা কহিল, "সুরেশ্বর-বাবু, ইনি আমার ছোটমামা, পরশু এসেছেন।" তাহার পর সজনীকান্তর দিকে চাহিয়া কহিল, "এঁর পরিচয় ত তুমি আগেই পেয়েছ মামাবাবু।"

বিশেষরূপে পরিচয়লাভের পর সুরেশ্বর পুনরায় যুক্ত-করে সজনীকান্তকে অভিবাদন করিল। তদুত্তরে কোন-প্রকার প্রত্যভিবাদনের লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া উপেক্ষা-তরলকণ্ঠে সজনীকান্ত কহিল, "তোমার কথা সব শুনেছি। সেদিনকার ব্যাপারটা ছোট করে' লিখে দিয়ো ত, আমাদের দেশের কাগজে ছাপিয়ে দোবো। সম্পাদক আমাকে খুব খাতির করে, বুঝেছ কি না, নিশ্চয় ছাপাবে।"

এই নিঃসঙ্কোচ নিরধিকার তুমি সম্বোধনে সকলেই, এমন কি জয়ন্তী পর্য্যন্ত, বিস্মিত হইয়া গেল। দলের মধ্যে একমাত্র বৃদ্ধ প্রমদাচরণ ভিন্ন সকলেই এ পর্য্যন্ত সুরেশ্বরকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিয়াছে। প্রমদাচরণের তুমি সম্বোধনের মধ্যে বয়সের অধিকার এবং স্নেহশ্রদ্ধার সরসতা ছিল। সদ্যপরিচিত সজনী-কান্তের মধ্যে তাহার কোনো সংস্রব না থাকায় এই অকারণ তুমি সম্বোধনের সহিত অযাচিত অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা-প্রকাশ সকলের কর্ণে অতিশয় অশিষ্ট এবং অসদৃশ সুরে বাজিল।

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া শান্তভাবে কহিল, "এ সামান্য ব্যাপার খবরের কাগজে বার ক'রে কি হবে?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সুরেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সজনীকান্ত বলিল, "তোমার নাম হবে হে! এই দিন যখন নিয়েছ, নামটা বেরুন চাই ত?"

এবার সুরমা, সুমিত্রা এবং বিমান তিনজনে এক-সঙ্গে হাসিয়া উঠিল। সুরমা বলিল, "তা হ'লেই সুরেশ্বর-বাবু লিখে দিয়েছেন! তুমি সুরেশ্বর-বাবুকে জান না, মামা-বাবু, নামটাকেই তিনি সব জিনিসের চেয়ে বেশী অপছন্দ করেন।"

শান্তনেত্রে সুরমার দিকে চাহিয়া সুরেশ্বর কহিল, "নাম অপছন্দ করি এত বড় দম্ভ কর্‌তে পারিনে, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে নাম নেওয়া কেউ ত পছন্দ করে না।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সজনীকান্ত উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল। হাসির শেষে পাছে কোন অসমীচীন মন্তব্যের দ্বারা সে সুরেশ্বরকে আহত করে এই আশঙ্কায় সুমিত্রা সহসা সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সুরেশ্বরকে প্রশ্ন করিল, "আপনার হাতে ও বাক্সটা কি সুরেশ্বর-বাবু?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া হাত বাড়াইয়া বাক্সটা সুমিত্রার হস্তে দিয়া নম্রস্বরে বলিল, "এটা আজ আপনার জন্মদিনে উপহার,—যদিও নিতান্ত সামান্য জিনিস।"

শুনিয়া সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু পর-ক্ষণেই "ওঃ তাই নাকি? ধন্যবাদ!" বলিয়া সে ধীরে ধীরে ফিতাটা খুলিতে লাগিল।

সম্ভবতঃ দিনের বিষয়ে সুরেশ্বরের ভুল হইয়াছে এই ভাবিয়া বিমান সহাস্যমুখে একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "সুমিত্রার জন্মদিন কবে বলুন ত সুরেশ্বর-বাবু?"

শান্ত-স্মিত-মুখে অতিশয় সহজভাবে সুরেশ্বর কহিল, "আজ।"

বিমানের প্রশ্নের উত্তরে সুরেশ্বর কি বলে শুনিবার জন্য সকলেই সৌৎসুক্যে অপেক্ষা করিতেছিল; সুরেশ্বরের উত্তরে একটা মৃদু হাসির হিল্লোল বহিয়া গেল।

বিমান সহাস্যে কহিল, "আপনার কথা থেকেই বুঝে-ছিলাম যে আপনি একটু ভুল করেছেন। জন্মদিন আজ নয়, কাল।"

জয়ন্তী স্মিত-মুখে সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন, "তাতে আর হয়েছে কি? একদিন না হয় ভুলই হয়েছে।"

জয়ন্তীর কথার উত্তর না দিয়া বিমানের দিকে চাহিয়া সুরেশ্বর তেমনি সহজ ভাবে কহিল, "আমি একটুও ভুল করছিনে বিমান-বাবু, আজই ওঁর জন্মদিন। ২১শে আশ্বিন আজ! কাল নয়।"

সুরেশ্বরের এই অবিচল শান্ত ভাবে সকলেরই মধ্যে

একমুহূর্ত্তে কৌতুকের ভাবটা অপসৃত হইয়া গেল। সকলেই বুঝিল যে জন্মদিনের উপহার লইয়া সুরেশ্বরের আজ আসা—ভুল করিয়া আসার মত—লঘু নহে; একটা উদ্দেশ্য বা রহস্য ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই আছে।

বিমান একটু বিমূঢ় হইয়া কহিল, "আপনি কি বাংলা হিসাব ধ'রে বল্‌ছেন?"

সুরেশ্বর ঠিক পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল,"আপনি কোন হিসাবে ধর্‌ছেন?"

যে ভঙ্গীতে সুরেশ্বর প্রশ্ন করিল তদুত্তরে কিছুতেই বলা চলিল না ইংরেজী হিসাবে। অধিকতর বিমূঢ়ভাবে বিমান কহিল, "আপনি কি ক'রে জান্‌লেন যে বাংলা হিসাবে জন্মদিন আজ পড়ে।"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল, "এটা কিন্তু আপনার অবান্তর প্রশ্ন হচ্ছে; জন্মদিন আজ পড়ে কি না এই হচ্ছে প্রশ্ন। আমি বল্‌ছি আজ পড়্‌ছে।"

সজনীকান্ত ততক্ষণ নীরবে শুনিতেছিল। এবার সে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "ওরে বাস্‌রে! তুমি দেখ্‌ছি একটি আস্ত নন্‌কোঅপারেটার!"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে সজনীকান্তের দিকে ফিরিয়া কহিল, "কিন্তু এর সঙ্গে ত নন্‌কোঅপারেশনের কোন সম্পর্ক নেই। তা হ'লে ৩১শে চৈত্র চড়ক-পূজা করাও নন্‌কো-অপারেশন, আর বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা করাও নন্‌কোঅপারেশন।"

বাক্সের ফিতা খুলিতে খুলিতে কথোপকথনের প্রতিই সুমিত্রার অধিক মনোযোগ ছিল। এতক্ষণে বাক্সটি খুলিয়া সে দেখিল তন্মধ্যে সযত্নে পাট-করা কয়েকখানি রুমাল। এই কাহিনী-যুক্ত অর্থময় উপঢৌকন দেখিয়া সুমিত্রার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনি আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া একখানি রুমাল বাহির করিয়া খুলিয়া দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "বাঃ চমৎকার ত! দেখ মা কি সুন্দর নাম লেখা!" বলিয়া রুমালখানা জয়ন্তীর হস্তে দিল।

জয়ন্তী রুমালখানা হাতে লইয়া দেখিয়া ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, "বেশ! রেখে দাও।"

কিন্তু রুমালের কাহিনী অত সংক্ষেপে শেষ হইল না। রুমালখানি সকলের হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল এবং সকলেরই নিকটে প্রভূত প্রশংসা লাভ করিল।

প্রমদাচরণ কহিলেন, "আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমি ত দুদিন হ'ল তোমাকে জানিয়ে এসেছি সুরেশ্বর,—এরমধ্যে কি করে' তৈরী করালে?—আর এমন সুন্দর?"

তখন সজনীকান্ত রুমালখানি দুই অঙ্গুলীর পেষণে নির্দ্দয়ভাবে পরীক্ষা করিতেছিল, সে বলিল, "তা কঠিন কথা কিছুই নয়, বড়বাজারে বিস্তর দোকান আছে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ছুঁচ্‌ দিয়ে ফুল তুলে দেয়, নাম লিখে দেয়।"

এ বিষয়ে দলের মধ্যে অভিজ্ঞতা-জ্ঞান যাহাদের ছিল না তাহারা চুপ করিয়া রহিল, যাহার ছিল সে কোনো কথা বলিবার প্রয়োজন দেখিল না।

রুমালখানা আরও কিছুক্ষণ মর্দ্দিত করিয়া, মাড় আছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য একটা কোণ অঙ্গুলীর পেষণে মলিন করিয়া দিয়া, সর্ব্বজ্ঞের মত সজনীকান্ত কহিল, "জাপানী মাল।"

শুনিয়া সুরেশ্বর কিছু বলিল না, কিন্তু বিশেষ কৌতুক বোধ করিল।

সুরেশ্বরকে মৌন থাকিতে দেখিয়া বিমান সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "জাপানী, সুরেশ্বর-বাবু?" তাহার মনে বিশ্বাস ছিল জাপানী জিনিস সুরেশ্বর সহজে ব্যবহার করিবে না।

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল, "নাঃ খাঁটি স্বদেশী।"

রুমালখানা সুমিত্রাকে ফিরাইয়া দিয়া সজনী সুরেশ্বরকে কহিল, "স্বদেশী বলে' তুমি কিনেছ ত? জাপানী ত জাপানী, আজকাল খাস বিলিতি জিনিসও স্বদেশী মার্কায় বিকচ্ছে।"

সুরেশ্বর একবার ভাবিল কোনো উত্তর দিবে না, কিন্তু মৌনতার দ্বারা সত্যকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; তাই ভবিষ্যতে আর কোনও প্রশ্ন যাহাতে উঠিতে না পারে সেইজন্য বলিল, "তা হয় ত বিকচ্ছে; কিন্তু এ রুমালগুলি খাঁটি স্বদেশী। এর তুলো আমাদের দেশের জমীতে হয়েছে, এবং এর সুতো আমার বোন

নিজের হাতে কেটেছে, আর রুমাল বোনা হয়েছে মাণিকতলা ষ্ট্রীটে আমার নিজের তাঁতে।"

সুমিত্রা সবিস্ময়ে কহিল, "এমন মিহি সুতো আপনার বোন কেটেছেন? আশ্চর্য্য ত!"

তখন রুমালের উপর আবার নূতন করিয়া সকলের মনোযোগ পড়িল। এবার তিনখানা রুমালই বাহির হইয়া সকলের হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল। প্রমদাচরণ, বিমান, সুরমা, এমন কি জয়ন্তী পর্য্যন্ত রুমালগুলির ও তৎসহিত মাধবী ও সুরেশ্বরের প্রভূত প্রশংসা করিলেন।

সুরেশ্বরকে কোনো প্রকারে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া এবং কয়েক প্রকারে তাহার নিকট অপদস্থ হইয়া সজনীকান্ত মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় সে কতকটা প্রতিশোধ লইবার পথ পাইল,—কহিল, "এ উপহারটি কিন্তু খুব ভাল হয়নি বাপু। মেয়েমানুষে রুমাল ব্যবহার করবে এটা কি তুমি নন্‌কো-অপারেটার হ'য়ে পছন্দ কর?"

সুরেশ্বরকে কোনো উত্তর দিবার সময় না দিয়া সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বলিল, "উনি জানেন যে আমি রুমাল ব্যবহার করি—তাই রুমাল দিয়েছেন।"

"তা জানেন, কিন্তু অন্য জিনিস ত দিতে পারতেন।" বলিয়া সজনী হাসিতে লাগিল।

সুমিত্রার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে একবার সুরেশ্বরের মুখের দিকে নিমেষের জন্য চাহিল, তাহার পর শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমি কিন্তু রুমালেই খুব খুসী হয়েছি।"

সুরেশ্বর প্রফুল্লনেত্রে সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মনসা

"জরৎকারুর্ জগদ্‌গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী।
বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা॥
জরৎকারু-প্রিয়াস্তীকমাতা বিষহরেতি চ।
মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড)

"ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে" বর্ণিত আছে—"মনসা দেবী কশ্যপ ঋষির মন হইতে উৎপন্না। * * আত্মারামা বৈষ্ণবী মনসাদেবী তিন যুগ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা দ্বারা যোগবলে সিদ্ধা হইয়াছিলেন। * * মনসাদেবী শিবশিষ্যা, অতএব শৈবী নামে খ্যাতা হইয়াছেন। মহাদেবের নিকট সিদ্ধ-যোগ লাভ করায় সিদ্ধযোগিনী, এবং তাঁহার উৎকৃষ্ট জ্ঞান অতিশয় গোপ্য ও তিনি মৃত মনুষ্যকে জীবিত করিতে পারেন, এই নিমিত্ত মহাজ্ঞান-যুতা।" মনসার দ্বাদশটি নাম—জরৎকারু, জগদ্‌গৌরী, মনসা, সিদ্ধযোগিনী, বৈষ্ণবী, নাগ-ভগিনী, শৈবী, নাগেশ্বরী, জরৎকারু-প্রিয়া, আস্তীকমাতা, বিষহরা এবং মহাজ্ঞান-যুতা।

(প্রকৃতি খণ্ড, পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়)

"পূর্ব্বে পৃথিবী-মধ্যে অতিশয় সর্পভয় উপস্থিত হইয়াছিল। যাহাকে একবার সর্পে দংশন করে, সে তৎক্ষণাৎ কাল-কবলে পতিত হয়। কশ্যপ মুনি ভীত হইয়া প্রজাহিতের নিমিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে বেদোক্ত বীজানুসারে মন্ত্র সৃষ্টি করিলেন। মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা ধ্যানকালে কশ্যপ-মুনির মন হইতে উৎপন্না হওয়ায় মনসা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। কুমারী মনসাদেবী উৎপন্না হইয়া মহাদেবের সমীপে গমন করিলেন, এবং কৈলাস-পর্ব্বতে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করতঃ স্তব করিলেন। সেই স্তবে আশুতোষ মহাদেব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইলেন, * * তাঁহাকে দিব্যজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করাইলেন এবং কল্পতরুস্বরূপ অষ্টাক্ষর কৃষ্ণ-মন্ত্র প্রদান করিলেন।"

"জরৎকারু ত্যাগ করিলে পর মনসা কৈলাসে প্রস্থান করেন, সেখানে আস্তীক ভূমিষ্ঠ হন। সেই পুত্র মাতৃগর্ভে নিবাসকালে পঞ্চাননের মুখোচ্চারিত মহাজ্ঞান শ্রবণ করিয়াছিলেন। আস্তীক ভূমিষ্ঠ হইলে মহাদেব আস্তীকের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করাইলেন, বেদাধ্যয়ন করাইলেন। আস্তীকের কল্যাণের জন্য মহাদেব তিন লক্ষ কোটি রত্ন এবং পার্ব্বতী এক লক্ষ গো ও বহুতর রত্ন ব্রাহ্মণকে দান করেন। তার পর মনসা পুত্র সহ কশ্যপাশ্রমে গমন করেন। কশ্যপ সানন্দে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

(প্রকৃতি খণ্ড, ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়)

সাম-বেদোক্ত বলিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের মনসার যে ধ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও দেবী মহাজ্ঞানযুক্তা-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। জানি না সামবেদে কিরূপ ধ্যান লিখিত আছে, এবং সায়ণ তাহার কি অর্থ করিয়াছেন। মহাজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অন্যরূপ। হিন্দুদের ব্রহ্মজ্ঞানের কথা চির-প্রসিদ্ধ, দিব্যজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানও আমাদের অপরিচিত নহে, কিন্তু মহাজ্ঞান বোধ হয় বৌদ্ধদেরই নিজস্ব সম্পত্তি। বৌদ্ধ-শাস্ত্রমতে ইহার অপর নাম "প্রজ্ঞাপারমিতা"—ময়নামতীর গানে আড়াই অক্ষর মহাজ্ঞানের উল্লেখ আছে। মনসাদেবী চাঁদ সওদাগরের নিকট হইতে যে মহাজ্ঞান হরণ করেন তাহাও আড়াই অক্ষরে রচিত ছিল। ইহার স্বরূপ "হুং" বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে অনেকেরই "উৎকৃষ্ট জ্ঞান অতিশয় গোপ্য" হইলেও এবং মৃত মনুষ্যকে জীবিত করিবার ক্ষমতা থাকিলেও হিন্দুশাস্ত্রে এক মনসা ভিন্ন অপর কেহই মহাজ্ঞান-যুতা বলিয়া বর্ণিত হন নাই। দৈত্যগুরু শুক্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত কচের সঞ্জীবনী-বিদ্যা ইহা হইতে পৃথক বলিয়াই মনে হয়। ইহার আর একটি বিশেষত্ব—একজনকে দান করিলে এই মন্ত্র পূর্ব্বাধিকারীর নিকট আর ফলপ্রদ হয় না, মঙ্গল-কাব্যে চাঁদ-সওদাগর তাহার প্রমাণ।

মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত আছে—চম্পাধীশ্বর চন্দ্রধর সওদাগর (চাঁদবেণে) যে চারিটি মূল্যবান্ সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন (মহাজ্ঞান, গন্ধেশ্বরী, নাখড়া-বন, হেঁতাল-লড়ি)—মহাজ্ঞান তাহার অন্যতম। চাঁদকে কোনো রকমে জব্দ করিতে না পারিয়া মনসা একদিন নেত-ধোপানীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। নেত ধোপার মেয়ে হইলে কি হয়, সচিব হিসাবে মনসার তিনি সর্ব্ব কার্য্যে সহায় ছিলেন, এবং মন্ত্রণায় তাঁহার সুনাম ছিল। নেত মন্ত্রণা দিলেন—

"যে কাটিতে পারে নাখড়ার এক পাত।
সেই কাটিতে পারে চাঁদবেণের মাথা॥"

মনসা সাঙ্গোপাঙ্গ সহ নাখড়ার বন কাটিতে গমন করিলেন, বন প্রায় নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইল। "বাগানী" গিয়া চাঁদকে সংবাদ দিল,—"রাজা তোমার দেশে বড় দুরাহি পড়িল হে, নাখড়া গোলা কাটিলেক সকল।" রাজা বলিলেন—"অর্দ্ধেক যখন কাটা হইল তখনো কেন সংবাদ দিলি না? যাউক যে বন কাটিতেছে তাহাকে কেমন দেখিলি?" "বাগানী" বলিল— "সে কন্যা মনুষ্য নয়, সে কন্যা দেবরূপী হয়। সে কন্যা উভু ক'রে বাঁধে ঝুঁটি, পরিধানে নেত ধটি, হান হান বলিছে ঘনে ঘন।" শুনিয়া রাজা "গন্ধেশ্বরীর বারি" হাতে করিয়া হুহুঙ্কার ছাড়িলেন। অম্নি নাখড়ার বনে কাটা গাছে সহস্র ডাল গজাইয়া উঠিল। মনসা ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিলেন। অতঃপর তিনি মানবী-মূর্ত্তিতে চন্দ্রধরকে ছলনা করিলেন। পরিচয় দিলেন, "আমি তোমার রাণী সনকার কনিষ্ঠা কনকা, বাল্যকাল হইতে শ্বশুরালয়ে ছিলাম, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় স্বামী তাড়াইয়া দিয়াছে, তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।" সওদাগর সুন্দরী শ্যালিকার মোহে ভুলিয়া তাঁহাকে "মহাজ্ঞান মন্ত্র" এবং গন্ধেশ্বরীর স্বর্ণ-নির্ম্মিত "বারি" চিরতরে দান করিলেন। মহাজ্ঞান অপহৃত হওয়ায় অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া সওদাগর যখন শ্যালিকার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতে-ছিলেন, সেই অবসরে দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। এইবার নাখড়া-বন সমূলে বিনষ্ট হইল, সওদাগরের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। চাঁদ তথাপি চ্যাংমুড়ি কাণীর পূজা করিলেন না, শেষ সম্বল হেঁতালের লড়ি গ্রহণ করিয়া দেবীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় দান না করিলে মহাজ্ঞান অপহৃত হইত না, এবং দান করিয়াছিলেন বলিয়া মন্ত্র আর ফলপ্রদ হয় নাই।

এখন এই মহাজ্ঞান হইতেই সন্দেহ হয় যে মহাভারতে মনসার যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বৌদ্ধ অধিকারের সুস্পষ্ট চিহ্ন ধারণ করিয়া তাহা ভিন্ন আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে সর্পবিষের প্রয়োগ-পদ্ধতি কতদিন প্রচলিত হইয়াছে জানি না। তবে বিষ লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে গিয়াই বিষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাটি যে বিষপ্রয়োগকারীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ, নাথ গুরুগণ, অথবা অপরাপর সিদ্ধাচার্য্য-গণের হাতে মনসার যদি কোনো রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

মঙ্গলকাব্যে চণ্ডীর সঙ্গে মনসার যে বিষম বিরোধের বিবরণ পাওয়া যায়, কি মহাভারত, কি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, কোনটিতেই তাহার মূল পাওয়া যায় না। তবে এই বিরোধের কথা আসিল কোথা হইতে? এদেশের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন একসময়ে বহুলরূপেই ছিল, আজিও তাহার ক্ষীণ আভাস বর্ত্তমান আছে। 'পেট-ব্যথা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সর্প-দংশন' পর্য্যন্ত এমন কোন ব্যাধি নাই যাহার মন্ত্র-চিকিৎসা প্রচলিত ছিল না। এই মন্ত্রগুলির মধ্যেও বিরোধের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। একই মন্ত্রে অনেক দেবতার প্রসঙ্গ আছে। স্থানে স্থানে ব্যাধি-গুলিকে ভয় দেখাইয়া খেদাইবার চেষ্টা যে নাই এমন নহে, তবে মিত্রভাবেরও অসদ্ভাব নাই। প্রাচীন বাঙ্গলার স্বরূপ সন্ধানে এগুলির কেহ আলোচনা করিয়াছেন কিনা জানি না, সুতরাং রচনারীতির কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু সিদ্ধান্ত দেখিয়া মনে হয় যে এই-সব মন্ত্র বেশ জানা-শুনা লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। 'মহাজ্ঞান' ধর্ম্মের নারীমূর্ত্তি প্রভৃতির কথা এই মন্ত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, এগুলির রচনার কাল মঙ্গলকাব্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়।

১। বিষনাশের মন্ত্র।—

জলধর কমল স্ফটিকের স্তম্ভ।
আলগ রথে বসিলেন ধর্ম্ম॥
ধর্ম্ম বলেন মুক্তি রাউলের ঝি।
চলিলেন শংকর আমি করিব কি॥
চলিলেন শংকর মহাদেবের শীষ।
ফুলজল দিঞে করিলাম নির্ব্বিষ॥
ওড় দেবী কালিকা মা সর্গে স্থিতি।
ঈশ্বর ডাকে মা বেগে ধা।
শুদ্ধভাবে পূজি মা তোমার দুই পা॥

২। ধূপ-পড়া।—

পশ্চিমে বন্দিব গয়া গদাধর।
পূর্ব্বে বন্দিব ভানু ভাস্কর॥
উত্তরে বন্দিব দক্ষিণে কালি।
কোন্ কালি মিত্রি মায়ের চরণ দুখানি॥
ধূপের মাতা ধূপের পাতা।
ধূপ খেঞে মাতিল মাতা॥
কেনে মাতা রেত রাতি।
উত্তরে মরেছে মড়া তা জিয়াইতে রেত রাতি॥
জানি বা না জানি বিস বাহনে এস॥

৩। জল-পড়া।—

বাপ বীর হনুমন্ত।
সর্গ মর্ত্ত পাতালে লাগিল ধন্দ॥
আস্য বাপু হনুমান্।
মেরু মন্দার যার না ধরে টান॥
ডাকিনী জুড়্যা ব্রহ্মজ্ঞান॥
লংকাপুরে হনুমন্ত জাগে।
মোর জল পড়া বাণে জর জ্বালা ভাগে॥
কার আজ্ঞা? কাঙুর কামিখ্যা মা হাড়ি ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা॥*

৪। বাণ-কাটা।—

বার বৎসর সেবা কল্যাও নৃসিংহ রাজার।
তিনি দিলেন সিন্দুরা চক্রবাণ॥

আসিতে কাটোঙ যাইতে কাটোঙ, সবা লোকের পূজা কাটোঙ, তার কুজ্ঞান কাটোঙ, বিজ্ঞান কাটোঙ তার খড়জ্ঞান কাটোঙ, তার মহাজ্ঞান কাটোঙ, মহাজ্ঞানের মধ্যে ছিল বাণ, শ্রীরামের চক্রবাণে কাট্যা করিলাম খান খান॥ কার আজ্ঞা বাপা অনাদি গুরু ধর্ম্মের আজ্ঞা।

এই মন্ত্রগুলি হইতে একদিকে যেমন বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তির একতম ধর্ম্মের সঙ্গে মনসার মিলনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তেমনি অন্যদিকে চণ্ডীর সঙ্গে কোন বিরোধের সূত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। মনসা-মঙ্গলের সৃষ্টিবর্ণন হইতেও ইহাই প্রমাণিত হয়। পশ্চিম-বঙ্গে বংশধর ভট্টাচার্য্য ও বিষ্ণু-পালের মনসা-মঙ্গল বহুল প্রচলিত। বংশীধর অপেক্ষা বিষ্ণুপাল প্রাচীন এবং

---

* এই-সমস্ত মন্ত্রে প্রধানতঃ মনসা, ধর্ম্ম, চণ্ডী, কালী, হাড়ি-ঝি, নরসিংহ, হনুমান্, রামচন্দ্র, গরুড়, শ্রীকৃষ্ণ, কাঙুর, কামিখ্যা মা, ক্ষেত্র-পাল প্রভৃতির দোহাই আছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই মনসার বেশ সদ্ভাব ছিল।

তিনি আজিও অপ্রকাশিত আছেন বলিয়া আমরা বিষ্ণুপালের মনসা-মঙ্গল হইতেই সৃষ্টি-বর্ণন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মন দিয়া সভাজন শুনহ সঙ্গীত।
যেইরূপে ধর্ম্ম জন্মিলা আচম্বিত॥
ভূর ভুব নাহি ছিল বসু রসাতল।
দিবস রজনী নাঞী অস্থির সকল॥
তখন অনাদি নামে ছিল দক্ষ পুরুষ একজন।
তার পুত্র হৈলা প্রভু অনাদি ধরম॥
অনাদ্যের উৎপত্তি জগত সংসার।
হস্ত নাঞী পদ নাঞী অণ্ড-আকার॥
শুন্যেতে আসন প্রভুর শুন্যেতে বৈসন।
শুন্যে ভর কর্যা প্রভু ফিরেন নিরঞ্জন॥
শুন্যেতে থাকিঞা গোঁসাই পাতিলেন মায়া।
আপনি সিরজিলেন গোঁসাই আপনার কায়া॥
চক্ষের মল লঞা প্রভু নিচুড়ে ফেলিল।
তাহাতে আসিয়া পক্ষ উলুক জন্মিল॥
উলুকের পৃষ্ঠে প্রভু আসন করিয়া।
চৌদ্দ চৌযুগ প্রভু বেড়ান ভ্রমিয়া॥
শুন শুন অরে বাছা উলুকের নন্দন।
কতযুগ যায় বাছা বল রে এখন॥
শুনিঞা উলুক পক্ষ হঞা গেল বক্তা।
নিরঞ্জন হয়্যা শুধায় যুগের বারতা॥
চৌদ্দ চৌযুগ গেল প্রভু ই ব্রহ্ম গেয়ানে।
সত্তি যুগ যেন সৃষ্টি কর নিরঞ্জনে॥
তখন ছিড়িঞা ফেলিল প্রভু কান্ধের পইতা।
একটী গোটা নাগের হইল সহস্র গোটা মাথা॥
নাগের নাম বাসুকী থুইল নিরঞ্জন।
তাহাকে সঁপিলা প্রভু ই তিন ভুবন॥
অঙ্গের মল লৈঞা কৈল তিল প্রমাণ।
বাসকীর চক্রে থুতে পৃথিবী হৈল নব খান॥
নবখান পৃথিবী সৃজিলা পশুপতি।
একটী যে কন্যা হৈল নাম বসুমতি॥
এস্য এস্য বসমতি হইয় চিরাই।
আমি যাকে জন্ম দিব তুমি দিয় ঠাঞী॥

*　　*　　*　　*

তখন চাপড় হানিয়া প্রভু সিরজিলেন বিম্বুক।
তায় ভর করি ফিরে অনাদ্দি নামে সিন্ধু॥
একলা ভাসেন প্রভু দোসর কেউ নাঞী।
ভাঁসিতে ভাঁসিতে প্রভু তুলে রাখে হাঞী॥
চণ্ডীকা জন্মিল রাতুল দুটী পা।
বাপ বল্যে অনাদ্দিকে সম্ভাসিতে যায়॥
অঙ্গে হাত দিতে তার নাঞী রঙ্গ রসে।
স্ত্রী নয় পুরুষ নয় চণ্ডীকা বলায় কিসে॥

অতঃপর নিরঞ্জন প্রভু চণ্ডিকাকে স্ত্রীমূর্ত্তি দান করিলেন এবং তাঁহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের উদ্ভব ইত্যাদি। এইবার রামাই পণ্ডিতের যুগের বিধান পাঠ করুন।

যে দিনেতে ভুজিতাব আছিল মণ্ডলে।
আদ্য বাসকী নাগের জন্ম সেই কালে॥
জোড় কর করি নাগে জিজ্ঞাসে বারতা।
এক মুণ্ডে ছিল তার সহস্রেক মাথা॥
হংসের নির্ম্মাণ কৈল মায়ার আওয়াসে।
আসন করিঞা প্রভু বসিলা হরিসে॥
জলেতে ডুবিল হংস আহার কারণে।
কিছু না পাইঞা ভাসে প্রভু সন্নিধানে॥
মুখের বিন্দু প্রভু তারে দিল।
বাসকী নাগ নিঃশ্বাস ছাড়িল॥
নাগের নিঃশ্বাসে হৈল ভাটার জোয়ার।
রাত্রি দিন সৃজিলেন অনাদ্যের ভার॥

*　　*　　*　　*

অঙ্গে বুলাইয়ে হাত সৃজিলেন পার্ব্বতী।
দেখিতে সুন্দর রূপ মনোহর অতি॥

*　　*　　*　　*

ব্রহ্মতালু দিয়া হৈল ব্রহ্মার জনম। ইত্যাদি

কবিতাগুলি কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কারণ বুদ্ধের ভৃঙ্গ-জন্ম প্রভৃতির সঙ্গে শাস্ত্রীয় সম্বন্ধ রহিয়াছে। বৌদ্ধ জাতকগুলিই তাহার প্রমাণ। বাসুকী নাগের জন্মও উপেক্ষার বিষয় নহে, কারণ নাগ ধ্যানী বুদ্ধের আসনরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। এই-সব কারণেই আমরা মনসা-পূজার সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্বন্ধের কল্পনা করিতেছি।

লৌকিক ধর্ম্মের উৎপত্তি ও ধর্ম্মকলহ সম্বন্ধে রায়-বাহাদুর দীনেশচন্দ্র প্রভৃতি নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উৎপত্তি যেরূপেই হউক, বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীর সাম্প্রদায়িক বিরোধ যে আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলিতে নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার কোনো হেতু নাই। তেমনি পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিই যে ইহার মূল তাহাও অস্বীকার করিলে চলিবে না। রাবণে ও বিভীষণে, যুধিষ্ঠিরে ও শিশুপালে যাহা দেখিয়াছি, মঙ্গলকাব্যগুলিতে তাহাই একটু উৎকট গ্রাম্যভাবে আকার পরিগ্রহ করিয়াছে মাত্র। কাশীখণ্ডে বেদব্যাসের উপাখ্যানও ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। পুরাণে বিরোধ এবং সামঞ্জস্য দুই-ই আছে, বরং সমন্বয়ের চেষ্টাই বেশী।

হরিহর, শিবরাম, হরগৌরী, প্রভৃতির মধ্যে ভেদবুদ্ধি (যেমন চণ্ডীমঙ্গলে শৈব ধনপতি সদাগর শক্তিদ্বেষী ছিলেন) যে পাপজনক, পুরাণ তারস্বরে তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের ধনপতি এবং চাঁদ সদাগরকে দেখিয়া শিবের সঙ্গে দুর্গার, দুর্গার সঙ্গে মনসার বিরোধ কল্পনা করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত বুঝিতে পারিতেছি না। কেহ ইহার মূলের সন্ধান দিলে উপকৃত হইব।

লৌকিক দেবতাগুলির পূজাকাঙালে ধরণ দেখিয়া অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। হিন্দুর সংস্কার লইয়া আলোচনা করিলে ইহার মধ্যে স্বার্থপরতার লেশ-মাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কারণ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিতেছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"
"যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণং"
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"

তখন যদি দোষের না হয়, তবে ঐ একই কথা মনসা বা চণ্ডী আপন ভক্তকে—একনিষ্ঠ উপাসককে-বলিলে তাহা দোষের হইবে কেন? আমাদের মনে হয় বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের,—তথা সমাজের আচার-ধর্ম্মের, পূজা পার্ব্বণের, আমোদ-উৎসব, খেলাধূলার এবং প্রবাদ-প্রবচনাদির মূলসূত্র আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। আবিষ্কার দুইএকজনের দ্বারা সম্ভবপরও নহে। এই কার্য্যে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংঘের প্রণালীবদ্ধ বৃহৎ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আশার কথা, বিক্ষিপ্তভাবে হইলেও উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সুরের রেশ

(১)

আশ্বিন মাস। প্রকৃতিদেবী বর্ষায় স্নান করে' এখন নূতন ভূষণে সজ্জিত হ'য়ে যেন চঞ্চলা বালিকার মত হাস্য করছেন। চারিদিকে পদ্মফুল ঘোম্‌টা-খোলা সুন্দরীর মুখের মত জলের উপর ফুটে' রয়েছে। মাঠে মাঠে ধান, ধরণী যেন দেবীর আবাহনের অর্ঘ্য ডালায় ডালায় সাজিয়ে রেখেছে।

সন্ধ্যা হয়েছে। পূজাবাড়ী থেকে পূরবীর করুণ সুর ভেসে এসে' প্রাণের তন্ত্রীতে আঘাত করে' কত রকমের প্রতিধ্বনি লোকের মনে জাগিয়ে তুল্‌ছে।

এক পস্‌লা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। সেইজন্যে একটু শীত বোধ হচ্ছিল। এই ঠাণ্ডার জন্যে আমাদের চায়ের মজ্‌লিস্ বেশ জমে' উঠেছিল। সকলেই চা ধ্বংসের দিকেই নিবিষ্ট ছিলাম, মধ্যে মধ্যে খোস্‌গল্পও দু-একটা চল্‌ছিল।

হঠাৎ আমাদের মধ্যে থেকে বিমল বলে' উঠ্‌ল—নরু, আজ তোমাকে তোমার কুমার-জীবনের ইতিহাসটা আমাদের শোনাতেই হবে। আজ আমরা না শুনে' কিছুতেই ছাড়্‌বো না।

এই কথা শুনে আমরাও চায়ের পেয়ালা রেখে' উৎকণ্ঠিতভাবে নরেনের উত্তর শোন্‌বার জন্যে চুপ করে' রইলাম। নরেনকে আমরা অনেকবার এই প্রশ্ন করেছি, কিন্তু উত্তরে কেবল একটু বুক-ভাঙা ম্লান হাসি পেয়েছি। সেইজন্যে আর বড়-একটা কেউ এই কথা তুলে' তাকে ব্যথিত কর্‌তাম না।

আজ অনেক দিন পরে হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে' নরেন কিন্তু চুপ করে' বসে' রইল। আজ আর সে হাসি তার মুখে ফুটে উঠ্‌ল না। কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে' ধীরে ধীরে সে বল্‌লে—তোমরা দেখ্‌ছি না জেনে ছাড়্‌বে না। জেনে কিন্তু দুঃখ ছাড়া আর কিছু পাবে না।

আমি তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লাম—তোমার যদি কষ্ট হয় বল্‌তে, ত বলে' কাজ নেই।

নরেন তেম্‌নিভাবে উত্তর কর্‌লে—না ভাই, আমিও

বুলবুল

চিত্রকর শ্রীযুক্ত আবদার রহমান চাঘতাই

U. Ray & Sons Calcutta.

আর এটাকে নিজের ভিতর চেপে রাখ্‌তে পারছি না। আমারও দরকার হ'য়ে পড়েছে কারো কাছে বলে' মনটাকে একটু হাল্‌কা করে' নেবার। তোমাদের কাছে এতদিন বলি নি কেবল তোমরা কষ্ট পাবে বলে'।— বলে' সে বাইরের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে তার জীবনের কাহিনী—যা' আমরা অনেক দিন অনেক সাধ্য সাধনা করে'ও কেবল ম্লান হাসিটুকু ছাড়া আর কিছুই জানতে পারি নি,—বল্‌তে আরম্ভ করলে—

অন্নসংস্থানের জন্যে এদিকে কোথাও চাকরি না পেয়ে পশ্চিমে এলাহাবাদে চাকরি নিতে হয়েছিল। সেখানে গিয়ে প্রথমে খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম। কোথায় থাকব তার ঠিক না করে' রওনা হয়েছিলাম বলেই এই অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। শেষে অনেক চেষ্টা করে' এক মেসে স্থান পেলাম। মেসে থেকেই চাকরি চল্‌তে লাগ্‌ল।

সেদিন বিকেল বেলা আফিস থেকে এসে খসরুবাগে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে বেড়াতে কি জানি কেন আমার খুব ভাল লাগ্‌ত। রোজই সেখানে বেড়াতে যেতাম।

সমস্ত দিনের ভ্রমণ-ক্লান্ত সূর্য্যদেব তখন সন্ধ্যার ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে বিশ্রামের জন্যে ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সন্ধ্যাদেবী তাঁর শান্তিদায়িনী হাত বিস্তার করে' তাঁকে সাদর সম্ভাষণ করবার জন্যে এগিয়ে আস্‌ছিলেন।

শাহজাদা খসরুর সমাধির একটি চাতালের উপর বসে' এই দিগন্তের কোলে হারাতে-চলা সূর্য্যকে দেখতে দেখতে কখন যে সেই পুরাকালের ঘটনাগুলো আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে' উঠে' মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল ও আমাকে সেই চিন্তাতেই তন্ময় করে' ফেলেছিল তা' ঠিক আমিও বল্‌তে পারি না।

আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে' উঠেছিল সেই অতীত কালের কোলে প্রায় হারিয়ে যাওয়া নবাবী আমলের ছবি। মনে হ'ল—আজ যাঁর সমাধির উপর ব'সে আছি তাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কথা। একদিন তাঁর একটু সেবা করবার জন্যে বা মুখের একটি মাত্র কথা শুনে' নিজেকে চরিতার্থ করবার জন্যে লোকে কতই না ব্যাকুল হ'ত। কি বিলাসেই না তিনি কাটিয়ে গেছেন তাঁর সমস্ত জীবনটা। কিন্তু আজ! হঠাৎ মনে হ'ল আমি যেন সেই নবাবপুরীতে ঢুকে' পড়েছি। শাহজাদা নিজে যেন এসে আমায় আদর করে' ভিতরে নিয়ে যাচ্ছেন। যেন বল্‌ছেন—এ-সব সুখ বেশী দিন থাকবে না। দুদিন পরেই সব মিলিয়ে যাবে স্বপ্নের মত।—বলে' আদর করে' পিঠে হাত বোলাতে লাগ্‌লেন। চমক ভেঙে গেল।

কখন যে সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক ছেয়ে ফেলেছে কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি। তখনো বোধ হচ্ছে সেই সমাধির প্রতি ইটখানি হ'তে আরম্ভ করে' তার প্রতি ক্ষুদ্রতম অংশটুকু পর্য্যন্ত কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে' ডেকে' বল্‌ছে—আয়, আয়, ওরে হতভাগা, আমাদের এই জীবনের দুঃখগুলোর বোঝা তুই শুনে' একটু হাল্‌কা করে' দিবি আয়!

হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন পিঠে হাত দিয়ে বল্‌ছে—বাবা, কি ভাবছ অত করে'? কখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, বাড়ী যাও।

ফিরে' দেখি আমার পাশে বসে' এক সৌম্য-মূর্ত্তি বৃদ্ধ আমাকে এই কথা বল্‌ছেন। তাঁকে দেখেই কি জানি কি একটা সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় আমার মনটা ভরে' উঠ্‌ল। আমি খুব নত হয়ে তাঁকে নমস্কার করলাম। তিনি আমার হাত ধ'রে সস্নেহে বল্‌লেন—বাবা, তোমার কাছে আমি বোধ হয় এক ঘণ্টা বসে' আছি; কি ভাব্‌ছিলে এত?

তার পর তিনি একটু একটু করে' আমার সমস্ত পরিচয়টুকু জেনে নিয়েছিলেন, আমি তাঁর কাছে কিছুই লুকোতে পারি নি।

তখনই মানুষ ধরা পড়ে যখন সে এমন লোকের সাম্‌নে পড়ে যার কাছে নিজেকে লুকোতে গেলে আরো বেশী করে' নিজেকে তার কাছে ধরা দিয়ে ফেলে। তখনই তার স্বরূপ ফুটে বেরোয়। সে আর নিজেকে সাম্‌লে রাখ্‌তে পারে না।

এই বৃদ্ধের মধ্যে এমন একটা জিনিষ ছিল যা'

অবহেলা করবার নয়—যা থাকলে মানুষ আপনি নিজে থেকে এসে তাঁর কাছে ধরা দিয়ে ফেলে। সম্ভ্রমে, ভক্তিতে, ভালবাসায় তাঁর কাছে—তাঁর পায়ের তলায়—আপনাকে লুটিয়ে দিয়ে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করে।

তার পর তিনি নিজের পরিচয় দিলেন, বল্লেন—আমার নাম রমেশচন্দ্র বোস। তুমি আমাকে জ্যাঠামশায় বলে' ডেকো। আমরা এখানে চাকরি-সূত্রে অনেক পুরুষ ধরে' বাস করছি। বাড়ী এখান থেকে বেশী দূর নয়। তুমি চলো বাড়ীটা চিনে আসবে।

গল্প করতে করতে আমরা বাইরে এসে পড়্‌লাম। বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। রমেশ-বাবু আমার হাত ধরে' গাড়ীতে তুলে' নিয়ে পাশে বসিয়ে কত কি গল্প করতে লাগ্‌লেন। আমার কিন্তু তখন গল্প করবার মত অবস্থা ছিল না।

আমি তখন ভাব্‌ছিলাম—এমন মানুষও থাকে যে মানুষকে এক মুহূর্ত্তে তার শত্রু করে' তুলতে পারে, আবার এমনও থাকে যে তার যত অপরিচিতই হোক না কেন তাকে আপনার করে' নিতে পারে। রমেশ-বাবুর সঙ্গে আমার জানাশোনা কিছুই ছিল না, তবুও তিনি এক মুহূর্ত্তের ভিতর তাঁর নিজের কাছে টেনে এনে আমাকে তাঁর আপনার করে' নিয়েছেন।

গাড়ী তাঁর বাড়ীর দোরের কাছে এসে থাম্‌ল। তিনি আমায় সঙ্গে করে' ভিতরে নিয়ে গিয়ে বস্‌তে বলে' ডাক্‌লেন—যূথী।

যাই মামাবাবু—বলে' একটি বালিকা দৌড়ে ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখেই লজ্জা-রক্তিম হ'য়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। রমেশ-বাবু একটু হেসে বল্‌লেন—এটি আমার মা।

বালিকা তাঁর পাশে এসে মুখ লুকিয়ে দাঁড়াল। রমেশ-বাবু তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বল্‌লেন—যূথী, তোমার দাদাকে প্রণাম কর।

বালিকা আমায় প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই রমেশ-বাবু বল্‌লেন—ভদ্রা আর অজিতকে ডেকে নিয়ে এস ত মা। তারা কোথায়?

দিদি আর অজিত ঘরে গল্প করছে, ডেকে আন্‌ছি।—বলে'ই বালিকা যেমনভাবে এসেছিল তেমনি দৌড়ে চলে' গেল।

বালিকা চলে' যেতেই রমেশ-বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন 'মাকে আমার এতটুকু বেলা থেকে মানুষ করছি। লেখা-পড়া শিখিয়েছি তার বয়সের চেয়ে ঢের বেশী।' তার পর একটু ম্লান হাসি হেসে বল্‌লেন—ওর এইটুকু বয়সের উপর দিয়ে কম ঝড়ঝাপ্‌টা যায় নি। আমার বাবা মা যখন পোনের দিনের ভিতর মারা গেলেন, তখন আমি আর আমার ছোট বোন অমলা ভিন্ন সংসারে পরস্পরকে দেখ্‌বার আর কেউ ছিল না। মা-বাবার শোকটা সাম্‌লেছিলাম অমলাকে বুকে করে'। সেই অমলার মেয়ে যূথিকা। অমলার স্বামী ছিল গোঁড়া হিন্দু। যূথিকা যখন সাত বছরের তখনই তার বিয়ে দিয়ে দেয় তার বাপ। আমি বারণ করেছিলাম, কিন্তু শোনে নি। তার পর একবছর যেতে না যেতেই মা আমার ঘরে ফিরে এলো সিঁথির সিঁদুর মুছে। ওর বাপমাও একে একে ওকে এক্‌লা ফেলে' পর পর চলে' গেল। সেই থেকেই ও এখানে আছে। আমিই ওকে মানুষ করছি, লেখাপড়া শেখাচ্ছি। আমি বাবা সেকেলে মানুষ হ'লেও মেয়েদের বেশী বয়সে বিয়ে দেওয়া আর লেখা-পড়া শেখানোর পক্ষপাতী। আমার মেয়ে ভদ্রাকেও সেইজন্যে এখনো লেখা-পড়া শেখাচ্ছি আর তার এখনো বিয়ে দিই নি যদিও সে যূথিকার চেয়ে বড়। আমার মতে বিয়ে করা সম্বন্ধে মেয়েদেরও একটা স্বাধীন মত আছে, তাতে আঘাত করা কিছুতেই উচিত নয়।

রমেশ-বাবুর কথা শুনে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-উন্মুখ মন শ্রদ্ধায় ভরে' উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

রমেশ-বাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি তরুণীর হাত ধরে' টান্‌তে টান্‌তে ঘরে ঢুকল যূথিকা, তাদের পেছনে একটি বালক। যূথিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে—মামা-বাবু, দিদি কিছুতেই আস্‌বে না, জোর করে' ধরে' নিয়ে এসেছি।—বলে'ই হেসে উঠ্‌ল।

ভদ্রার মুখ লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। আমিও কম অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়্‌লাম না। রমেশ-বাবু ভদ্রাকে

বল্‌লেন—মা, তুমি তোমার দাদার খাবার করে' নিয়ে এস তোমার মাকে বলে'।

ভদ্রা নিষ্কৃতি পেয়ে ঘর হ'তে চলে' গেল। যূথিকাও সঙ্গে গেল।

তারা চলে' যেতেই রমেশ-বাবু বালকটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আমায় বল্‌লেন—বাবা, তোমাকে আমার এই ছেলেটির পড়া-শোনার ভার নিতে হ'বে। আর তোমায় এইখানেই থাক্‌তে হবে, নইলে অজিতকে দেখা-শোনা ভাল হবে না। তোমার চাকরি যেমন কর্‌ছ তেম্‌নি কর্‌বে।—বলে' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। তিনি বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে আমায় শুধু থাক্‌তে বল্‌লে বোধ হয় নাও রাজী হ'তে পারি, তাই এই ছেলে-পড়াবার অছিলায় আমায় বাড়ীতে রাখ্‌তে চান।

আমার মন তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইল না। তবু মুখে বল্‌লাম—জেঠামশায়, আমার সঙ্গে ত দু' মিনিটের পরিচয়, আপনি ত জানেন না আমি কি চরিত্রের লোক। আমায় চট্ করে' ছেলে-পড়ানর ভার দিয়ে বাড়ীতে রাখাটা কি ঠিক হবে?

তিনি হো হো করে' হেসে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন—পাগল আর কি! লোক চিন্‌তে কি আর দু' দশ বছর যায় রে বাবা, দু' মিনিটেই চিন্‌তে পারা যায়। এই বুড়ো বয়সেও যদি লোক একবার দেখেই না চিন্‌তে পার্‌বো তবে এই মরণের দোরে এসে দাঁড়ানই যে মিথ্যে।—বলে'ই তেম্‌নি করে' আবার হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

আমার আর প্রতিবাদ কর্‌বার ক্ষমতা রইল না। আবার কি একটা সম্ভ্রমে আমার মনটা ভরে' উঠ্‌ল। ভাব্‌বার পর্য্যন্ত সময় পেলাম না যে, সেখানে থাকা ভাল কি মন্দ।

(২)

তার পর প্রায় দু' বছর পরের ঘটনা বল্‌ছি। এই দু' বছরে আমার জীবনটা এই পরিবারের সুখদুঃখের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে তাকে ছাড়াবার চেষ্টা করে'ও কোনো ফল পাই নি। আমি এখন এই পরিবারের একজন হ'য়ে পড়েছি। আমার সকল সঙ্কোচ লজ্জা কাটিয়ে এই পরিবারের দলভুক্ত হ'তে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল।

ভদ্রা আর যূথিকা এখন বেশ নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে মেশে। এতে কেউ কোনো আপত্তি করেন না। কেবল রমেশ-বাবুর স্ত্রী মধ্যে মধ্যে আপত্তি করেন যূথিকাকে মিশ্‌তে দিতে—অবশ্য সেটা আমার আড়ালে। তারাও আমার কাছে মধ্যে মধ্যে পড়া বলে' নেয়। আমারও আর তাদের কাছে কোনো সঙ্কোচ নেই।

ভদ্রা আর যূথিকা দু' জনে ছিল ঠিক উল্টো। ভদ্রার তরুণ দেহের উপর যৌবন যেন সুখের আবেশে ঢলে' পড়েছে—তার সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরে' যেন তার উচ্ছ্বসিত লীলার তরঙ্গ তুলে খেলা করে' বেড়াচ্ছে। অথচ সে স্থির ধীর। একটু ছিপ্‌ছিপে গড়ন। আর যূথিকা ছিল চঞ্চল সদা-হাস্যময়ী। যৌবন তাকে ছুঁই-ছুঁই করে'ও যেন নাগাল ধর্‌তে পার্‌ছিল না।

রমেশ-বাবুর স্ত্রী ছিলেন তাঁর স্বামীর ঠিক উল্টো। রমেশ-বাবু যেমন সম্পূর্ণ একেলে লোক, তাঁর স্ত্রী ঠিক তেম্‌নি সেকেলে ধরণের। এইজন্যে এঁদের দুজনের ঠিক খাপ্ খেত না, প্রায়ই মতের অমিল হ'ত—বিশেষতঃ যূথিকাকে নিয়ে। রমেশ-বাবু চাইতেন যে যূথিকাও ঠিক ভদ্রার মত অবাধে সকলের সঙ্গে মিশুক, কোনো রকমেই সে যেন বুঝ্‌তে না পারে যে সে বিধবা আর সে অন্য সকলের থেকে কোনো রকমে স্বতন্ত্র।

রমেশ-বাবুর স্ত্রী চাইতেন যূথিকাকে সব অধিকার হ'তে বঞ্চিত করে' ব্রহ্মচারিণী কর্‌তে। তাতে যে তিনি নিজে মনে মনে কষ্ট অনুভব কর্‌তেন না তা আমি মনে করি না। কষ্ট বোধ কর্‌লেও তিনি কর্ত্তব্যের খাতিরে তাকে সকল রকম বিলাস-বাসনা থেকে দূরে রাখ্‌তে চাইতেন। এর জন্যে প্রায়ই তাঁর রমেশ-বাবু ও ভদ্রার সঙ্গে মন-কষা-কষি হ'ত। ভদ্রা ছিল তার বাপের মত। সে সব সময়েই যূথিকাকে নিজের কাছে কাছে রাখ্‌ত। যেখানে যেত বা যা কর্‌ত সব তাতেই তাকে সঙ্গী কর্‌ত। কোনো রকমে এদের সাম্‌লাতে না পেরে রমেশ-বাবুর স্ত্রীর মেজাজটা কেমন খিট্‌খিটে হ'য়ে পড়েছিল।

মানুষের মন সরল-শান্ত-ভাবে চল্‌তে চল্‌তে যখনই

কোনো বাধা পায় তখনই সে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠে। তখন সে আর কিছুতেই নীতি বা নিয়মের গণ্ডীর ভিতর আস্‌তে চায় না, যত বাধা পায় ততই বাধা ঠেলে চল্‌তে চেষ্টা করে।

কিন্তু যূথিকা এই দোটানার মধ্যে পড়ে' কোন্ দিকে যাবে কার কথা শুন্‌বে কিছুতেই ঠিক কর্‌তে পার্‌ত না। যখন যে-দিকে টান বেশী হ'ত তখন সেই দিকেই ঝুঁকে পড়্‌ত। এই রকমে তার জীবনটা ক্রমশঃ লক্ষ্যহীন অনির্দ্দিষ্ট পথে চল্‌তে আরম্ভ করেছিল। সকলেই নিজের মতাবলম্বী কর্‌বার জন্যে তাকে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছিল যে, সে সব সময় বুঝ্‌তে পার্‌ত না যে তার নিজের কোনো একটা সত্তা আছে বা স্বাধীন মত আছে।

সন্ধ্যাবেলা। চন্দ্রদেব তাঁর হাসিটুকু জ্যোৎস্নারূপে সারা পৃথিবীর বুকের উপর ছড়িয়ে দিয়েছেন। কোথাও এতটুকু কৃপণতা করেন নি। বাগান থেকে বাতাস হাস্নুহানার গন্ধ চুরি করে' এনে নিজের জন্যে কিছু মাত্র না রেখে সবটাই চারি দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

অজিত পাশে বসে' পড়্‌ছিল, আমি জান্‌লার ফাঁক দিয়ে অনন্ত শূন্যের দিকে চেয়ে এই জ্যোৎস্নার প্লাবন দেখ্‌ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনটাও এই প্লাবনের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল তা' বল্‌তে পারি না। অজিতকে পড়ানোর দিকে আমার তত মন ছিল না। হঠাৎ চমক ভাঙ্‌ল যূথিকার ডাকে। ফিরে দেখি যূথিকা একরাশ জ্যোৎস্নার মত ঘরে ঢুকে' আমার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। খোলা জান্‌লা দিয়ে পাগ্‌লা জ্যোৎস্না তার সর্ব্বাঙ্গে পড়ে' তাকে আরো সুন্দর করে' তুলেছে। ভদ্রা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি মুখ ফেরাতেই যূথিকা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হেসে উঠে বল্‌লে—উঃ! আপনি এমন অন্যমনস্ক হ'য়ে বসে' ছিলেন যে আমরা এক ঘণ্টা ঘরে এসে দাঁড়িয়ে আছি তবু আপনার সাড়াই নেই। কি ভাব্‌ছিলেন বলুন ত?

আমার উত্তর দেবার আগেই সে আবার ঠিক প্রতিধ্বনির মত বলে' উঠ্‌ল—এমন জ্যোৎস্নাটা কি বৃথা যেতে দেওয়া ভাল হয়, তাই বোধ হয় ভাবছেন। কিন্তু একলা বসে' বসে' ভাবার চেয়ে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়্‌লে বোধ হয় সেটা আরো ভাল হয়। কি বলো দিদি?

ভদ্রা বল্‌লে—যাক্, তুই আমার সব কথাই ত বলে' ফেল্‌লি, বাকিটাও বল্।—বলে' সস্মিতমুখে যূথিকার দিকে চাইলে।

আজ আমরা এই জ্যোৎস্নাভিযানের সাথী কর্‌তে চাই আপনাকে। আপনি বোধ হয় এতে অমত কর্‌বেন না। আমরা মনে করেছি যমুনার পুলের উপর বেড়াতে যাবো। আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।—বলে'ই যূথিকা আমার হাতটা খপ্ করে' ধরেই টান্‌তে লাগ্‌ল।

বাবা মত দিয়েছেন। মারও অনেক করে' মত নিয়েছি, কিন্তু তিনি কিছুতেই যূথিকাকে নিয়ে যেতে মত কর্‌লেন না। ওকে লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে; তার পর যা হয় হবে। কেমন রাজী ত?—বলে' ভদ্রা আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আমিও বেড়াতে যাবার এমন সুযোগ উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না। বল্‌লাম—বেশ যাবো, কিন্তু মা যদি জান্‌তে পারেন যে যূথী তাঁর অমতে গেছে, তা হ'লে কিন্তু ভারী রাগ কর্‌বেন।

সে ভাবনা আমার। আয় যূথী, কাপড়গুলো বদ্‌লে নিই গে।—বলে' ভদ্রা যূথিকার হাত ধরে' একটু রাগত ভাবে—আমার প্রতিবাদ করার দরুণ—ঘর হ'তে চলে' গেল।

যূথিকা যাবার সময় একবার মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে যেন বলে' গেল আমি তাকে নিয়ে যেতে যেন অমত না করি।

আমি সব চিন্তা ত্যাগ করে' উঠে পড়্‌লাম। আর না উঠ্‌লেও এই তরুণীদের হাত হ'তে উদ্ধার পাবার রাস্তা ছিল না। বিশেষতঃ যূথিকার হাত থেকে। সে মা-ছোড়-বান্দা হ'য়ে হয় ত হাতে ধরে টান্‌তে টান্‌তেই নিয়ে চলে' যাবে। যূথিকাকে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত কি অনুচিত তা' বিচার কর্‌বার সময় পর্য্যন্তও দিলে না এরা।

আমি বাইরে এসে দাঁড়াবা-মাত্র যূথিকা চঞ্চলা হরিণীর মত ছুটতে ছুটতে এসে আমার হাত ধরে' টান্‌তে টান্‌তে

একেবারে গাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালে। রমেশ-বাবু বারান্দার উপর একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন, হেসে উঠে বল্লেন—ভাল এক পাগ্লীর হাতে পড়েছ, কিছুই স্থির হ'য়ে কর্তে দেয় না। আর একজন কোথায়?

দিদির এখনো কাপড় পরাই হয়নি—যা কুড়ে। আমার কিন্তু এক মিনিটেই সব হ'য়ে গেল। আর দেরী কর্লে বেড়াবই বা কতটুকু। ঐ যে দিদি আস্ছে এতক্ষণে।—বলেই যুথিকা মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে' ভদ্রাকে বলে' উঠ্ল—তোমার আর হয় না! দেখ দেখিনি কত দেরী হ'য়ে গেল।

ভদ্রা তাকে ধমক দিয়ে বল্লে—তুই থাম্। তোর আর পাকামো কর্তে হবে না।

যুথিকা মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর হ'য়ে বস্ল কিন্তু সে কিছুক্ষণের জন্যে। গাড়ী চল্তে আরম্ভ কর্তেই যুথিকা অনর্গল বক্তে লাগ্ল! ভদ্রা চুপ করেই বসে' ছিল, মধ্যে মধ্যে কেবল দু'একটা প্রশ্ন কর্ছিল।

গাড়ী পুলের কাছে আস্তেই যুথিকা তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে'ই ছুটে' গিয়ে একেবারে পুলের উপর হাজির হ'ল। আমি আর ভদ্রা তার পেছনে পেছনে গেলাম। পুলের উপর তখন জনমানব ছিল না। কেবল একজন ভিখারী পুলের মুখের কাছে দাঁড়িয়ে আছে আরো কিছু পাবার শেষ প্রতীক্ষায়। যুথিকা তাকে পয়সা দিতেই সে রাজরাণী হও বলে' আশীর্ব্বাদ কর্তেই যুথিকা ফিক্ করে' হেসে ফেল্লে, কিন্তু তখনই শ্রাবণের বাদলভরা মেঘের মত মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠ্ল। সে ধীরে ধীরে, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেইখানে এসে দাঁড়াল। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে' সে বলে' উঠ্ল—আচ্ছা, বিধবা হ'লে কি তার ভাল মন্দ কিছুই আশা কর্তে নেই। যে স্বামী কি জিনিষ তা' জানে না তার পক্ষেও এ নিয়ম কেন হয়েছে বলুন ত?—বল্তে বল্তেই তার চোখ সজল হ'য়ে উঠ্ল, স্বর রুদ্ধ হ'য়ে এল, সে আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। ভদ্রা তার করুণাভরা দৃষ্টি সান্ত্বনার মত ছড়িয়ে দিলে যুথিকার সর্ব্বাঙ্গে।

আমার মন এই দুই তরুণীর মনোবেদনায় পীড়িত হ'য়ে উঠ্ল। আমার অশ্রুভারাক্রান্ত চোখের দৃষ্টিকেও ছড়িয়ে দিলাম যমুনার উপর—যদি কিছু সান্ত্বনা পায় এই ভেবে।

যমুনা তখন জ্যোৎস্নায় স্নান করে' চঞ্চলা বালিকার মত ছুটাছুটি করে' বেড়াচ্ছিল। বোধ হয় তখনো সেই বৃন্দাবনের রাখাল ছেলের বাঁশীর সুরের রেশ তার কানের কাছে ধ্বনিত হচ্ছিল। সে সেই সুরের অধিকারীকে বোধ হয় খুঁজে না পেয়ে ব্যর্থ আশায় মনের আবেগে কূলের উপর আছাড় খেয়ে পড়্ছিল। চন্দ্রদেব উপর থেকে তার এই বিফলতা দেখে তাকে বিদ্রূপ কর্বার জন্যেই যেন তার সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিয়ে হাস্ছিলেন।

(৩)

আমরা বাড়ী ফিরে গাড়ী থেকে নাম্তেই দেখি সাম্নে দাঁড়িয়ে রমেশ-বাবুর স্ত্রী। তাঁর মূর্ত্তি তখন ঠিক শ্রাবণের বর্ষণোন্মুখ বজ্রভরা মেঘের মত স্থির। আমরা ধীরে ধীরে বারান্দার উপর আস্তেই তিনি আমার দিকে একটা জ্বলন্ত তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করে'ই যুথিকাকে হাত ধরে' টান্তে টান্তে ভিতরে নিয়ে গেলেন। ভদ্রাও চোরের মত পেছন পেছন চলে' গেল। আমি মূঢ়ের মত সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রমেশ-বাবুর স্ত্রী চীৎকার করে' যুথিকাকে বক্ছিলেন—এতবড় বুড়ো মেয়ে হ'ল যদি কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকে। মর্লে পর কি বুদ্ধি হবে? আমি যে আর বকে' বকে' পার্লাম না। হয় তুই মর্, নয় আমি মরি। বাপ-মাকে খেয়ে এখন আমায় খেতে এসেছিস্—হাড়জ্বালানী! লোকের কি বল্, তারা কেবল মজা দেখ্তেই আছে। ভুগ্তে হবে ত আমাকেই।—বলেই তাকে প্রহার কর্তে লাগ্লেন। তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা চাপা কান্নার মর্ম্মভেদ ধ্বনি গরম সীসের মত আমার কানের ভিতর এসে ঢুক্ল। তার পর গিন্নী ভদ্রাকে বল্তে লাগ্লেন—তোর আক্কেল হবে কবে শুনি? তুই নিজে যেমন ধিঙ্গী হয়েছিস্ সকলকেই সেই রকম কর্তে চাস, না? নিজে ত খুব পুরুষঘেঁসা হয়েছিস, সেই সঙ্গে

ওর পরকালটা সুদ্ধ নষ্ট করছিস। তোরা সব মনে করেছিস কি বল্ ত?

ভদ্রা বলে' উঠ্ল—পুরুষমানুষের সঙ্গে মিশ্লেই যদি খারাপ হ'য়ে যাই তা হ'লে উচিত যে মেয়েরা যাতে কোনো রকমেই পুরুষের সংস্পর্শে না আসে এই রকম করে' হাত পা বেঁধে' ঘরে ফেলে' রাখা। আমার ত মনে হয় যে মেয়েরা যতই পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করবে .যতই বাইরের সঙ্গে পরিচিত হবে ততই তারা নিজেদের আরো বেশী ক'রে ফুটিয়ে তুল্তে পারবে।

রমেশ-বাবুর স্ত্রী একটু শ্লেষের সঙ্গে বল্লেন—তোমার নিজেকে ফুটিয়ে তোল্বার যদি অত দরকার হ'য়ে থাকে ত তুমি গোল্লায় যাও। তাই বলে' ওকে ও-রকম করে' উচ্ছন্নের পথে টেনে নিয়ে যেতে পাবে না। তোমার সঙ্গে ত আর পেরে উঠব না। বাপের আদুরে ধিঙ্গী মেয়ে! তোমার যা খুসি করোগে।—বলেই যূথিকাকে একটা ঘরের ভিতর ঠেলে' ফেলে' দিয়ে সেখান হ'তে চলে' গেলেন। যূথিকা সেইখানে পড়েই কাঁদ্তে লাগ্ল। ভদ্রা এসে কাছে বসে' তার গায়ে হাত দিতেই সে আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠ্ল।

এই দুই বালিকার অবস্থা দেখে আমার মন একটা অজানিত অব্যক্ত বেদনায় ভরে' উঠ্ল। কে যেন বল্ছিল এদের কষ্টের মূল ত তুমিই। সঙ্গে সঙ্গে মনও এতে সায় দিয়ে উঠ্ল। সত্যই ত। আমি যদি আজ যূথিকাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে না চাইতাম তা হ'লে ত আর তাকে এতদূর নিগ্রহ ভোগ করতে হ'ত না। প্রতিজ্ঞা করলাম সাধ্যমত এদের বাঁচিয়ে চল্ব।

সেদিন রাত্রিটা অনিদ্রায় কেটে গেল। নৈশ বাতাস যখনই গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের মত ঘরে ঢুক্ছিল তখনই মনটা আরো হু হু করে' উঠ্ছিল—চোখ দিয়েও দু' এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়্ছিল। মানুষের মনের অভিপ্রায় যদি সব সময়ে পূর্ণ হ'ত তা হ'লে সে বোধ হয় নিজেকে ঠিক রাখ্তে পারত না বলেই ভগবান্ তা' হ'তে দেন না।

ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই ভারাক্রান্ত মনটাকে একটু হাল্কা করে' নেবার জন্যে বাগানে আস্তেই দেখি ভদ্রা একটি বেদীর উপর বসে' আছে। প্রভাতের আবীর-রাঙা প্রথম আলো তার মুখের উপর পড়ে' তাকে বড়ই সুন্দর করে' তুলেছে। বসন্তের প্রথম-সমীরণ-স্পর্শে ফুল যেমন আর নিজেকে সাম্লে রাখ্তে পারে না, তার স্বরূপ ফুটিয়ে তুলে বাইরের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়, ভদ্রার সৌন্দর্য্যও সেই রকম আর তার নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাক্তে পারছিল না, বাইরে ধরা দেবার জন্যে আকুলিবিকুলি করে' তার সারা দেহে লাবণ্যের ঢেউ তুলে' খেলা করে' বেড়াচ্ছিল। ভদ্রা অন্যমনস্ক হ'য়ে বসে' ছিল—কি যেন একটা গভীর চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে বাইরের সব কোলাহল হ'তে আলাদা হ'য়ে ছিল।

হঠাৎ আমার চোখ পড়্ল বাগানের এক কোণে এক শেফালী গাছের তলায়। যূথিকা হেঁট হ'য়ে ফুল কুড়ুতে ব্যস্ত ছিল। তাকে দেখেই আমার মনটাকে কে যেন একটা প্রচণ্ড হাতুড়ীর ঘা মেরে একেবারে গুঁড়িয়ে দিলে।

এক রাত্রির মধ্যেই জানিনা কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মায়ার স্পর্শে তার মধ্যে এতখানি পরিবর্ত্তনের ঝড় ব'য়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার বয়সটাও কে যেন অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছে। একখানি শুভ্র থান তার পরনে। হাত দুখানি শূন্য। তার মুখখানি দেখাচ্ছিল ঠিক যেন একটি বোঁটা-ছেঁড়া রোদের-তাতে-আম্লে-পড়া ফুটন্ত পদ্মফুলের মত। এক রাতের মধ্যে যে মানুষের মনের এবং দেহের এতটা পরিবর্ত্তন হ'তে পারে তা' আমি ধারণা করতেই পারিনি। একরাশ শিশির-ভেজা শুভ্র শেফালী-ফুলের মতই কিন্তু তাকে দেখাচ্ছিল এতখানি পরিবর্ত্তনের মধ্যেও।

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়্ল আমার দিকে। তার চোখ আমার উপর পড়্তেই এলো চুলের গুচ্ছ দুলিয়ে দৌড়ে আমার কাছে এসে আমার হাতখানা খপ্ করে' বেশ চেপে মুঠো করে' ধরে' হেসে সে বল্লে—কেমন দেখাচ্ছে বলুন ত আমাকে? আমার কিন্তু এ ভারি ভাল লাগ্ছে। বলে' খুব হাস্তে লাগ্ল। তার মুখে এই হাসি কিন্তু বেদনার অশ্রু হ'য়েই ফুটে' উঠ্ল।

ভদ্রা বল্‌লে—কাল মার কথায় ও সব খুলে ফেলেছে। এত করে' বারণ কর্‌লাম কিছুতেই শুন্‌লে না। মা যে ওকে কি করে' রাখ্‌বেন কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌ছেন না। আমি ত কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না যে তিনি ঠিক কি কর্‌তে চান ওকে। আমায় ওরকম কর্‌লে আমি কিন্তু কিছুতেই সহ্য করতাম না।

আমি বল্‌লাম—না ভদ্রা, তিনি ঠিকই কর্‌ছেন। বাইরের সঙ্গে মনের যে কতটা মিল তা' তিনি বুঝেছেন বলেই ওকে এই রকম করে' চালাতে চান।

আমার এই উত্তরটা বোধ হয় ভদ্রার মনের মত হ'ল না। সে আর কোনো উত্তর না দিয়েই একটু রাগত ভাবে যূথিকার হাত ধরে' তাকে বল্‌লে—রোদ উঠে পড়েছে, বাড়ীর ভিতর চল্।—বলেই তাকে একরকম জোর করে' ভিতরে টেনে নিয়ে গেল।

যূথিকার প্রতি রমেশ-বাবুর স্ত্রীর এই-সব ব্যবহার ভদ্রার বুকে বেশ একটু জোরেই আঘাত কর্‌ত। কিন্তু অনেক সময়ে সে আঘাতের গুরুত্বের পরিমাণ অনুভব কর্‌তে পার্‌ত না, সেইজন্যে সেটাকে একটু বেশীর দিকেই ঝুঁকিয়ে নিত। কারণ সে বাপের আদরে কোনো জিনিষকে ঠিক বিচার করে' কষে' মেজে' দেখ্‌বার মত ধৈর্য্য অভ্যাস কর্‌বার অবসর পায়নি। সেইজন্যে সে বড় একটা তার মার কাছে থাক্‌তে চাইত না। এর জন্যে অবশ্য রমেশ-বাবুকে দোষী করা যায় না। কারণ স্বভাবতঃ তিনি ছিলেন একটু বেশী স্নেহ-প্রবণ। তাঁর স্নেহ থেকে যে যূথিকা বঞ্চিত ছিল তা' নয়। বরঞ্চ তিনি ভদ্রার হ'তে তাকেই বেশী স্নেহ কর্‌তেন পিতৃমাতৃহীনা বলে'। কিন্তু রমেশ-বাবুর স্ত্রী তাঁর সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে তাকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছিলেন যে সে কিছুতেই এই স্নেহের গণ্ডীর ভিতর একেবারে আবদ্ধ হ'তে পারেনি।

রমেশ-বাবুর স্ত্রী যে যূথিকাকে আঘাত কর্‌বার জন্যে বা কষ্ট দেবার জন্যে এই-রকম ব্যবহার কর্‌তেন তা' নয়। তাঁর স্বভাবটাই ছিল একটু অসহিষ্ণু। আর তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ কর্‌লে তিনি কিছুতেই সইতে পার্‌তেন না। তখনই তাঁর মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ত। ভদ্রা বা রমেশ-বাবুকে তিনি এঁটে উঠ্‌তে পার্‌তেন না। সেইজন্যে তাঁর সব তাল পড়্‌ত যূথিকার উপর—সে কেন নিজের অবস্থা বুঝে চলে' না। তার কি আর অবুঝের মত চল্‌বার বয়স আছে, না কপাল আছে।

তাঁর এই কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ হৃদয়ের আড়ালে যে একটি স্নেহপ্রবণ মাতৃহৃদয় লুকিয়ে আছে তার অনুভূতি তিনি সময়ে সময়ে জান্‌তে পার্‌লেও সে প্রবৃত্তিকে বড় একটা আমল দিতেন না। তাঁর কাছে কর্ত্তব্যটাই ছিল সবচেয়ে বড়। কিন্তু তাঁর এই কর্ত্তব্যের আবর্ত্তনের ভিতর পড়ে' আর-একজনের যে কি অবস্থা হচ্ছে তা' দেখ্‌বার মত অবস্থা তাঁর ছিল না। থাক্‌লে তিনি দেখ্‌তে পেতেন যে তাঁর এই কর্ত্তব্যের পীড়নে যূথিকার সেই চঞ্চল হাস্যময় ভাব ক্রমশঃ ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। অবশ্য সেটা যে নিন্দনীয় বা অন্যায় তা' তিনি মনে কর্‌তেন না। বরং এতে তিনি মনে মনে খুসিই হ'তেন বেশী, তাঁর নিজের কর্ত্তব্যের শাসনের ফল দেখে।

তিনি যতখানি খুসি হ'তেন, রমেশ-বাবু ও ভদ্রা ঠিক ততখানি আহত হ'ত তাঁর এই কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখে। রমেশ-বাবু কোনো কথা কইতেন না, নীরবে সব সহ্য কর্‌তেন। ভদ্রার প্রতিবাদ কিন্তু সময় সময় একটু ভীষণ আকার ধারণ কর্‌ত। এততেও কিন্তু রমেশ-বাবুর স্ত্রীকে তাঁর কর্ত্তব্যের পথ থেকে একটুও কেউ সরাতে পারেনি।

(৪)

যূথিকা আজকাল আর আমার সাম্‌নে বড় একটা বেরুত না। আমিও তাকে আমার সাধ্য-মত এড়িয়ে চল্‌তাম। ভদ্রা কিন্তু তাকে মধ্যে মধ্যে জোর করে' বাইরে টেনে আন্‌ত। সেই সময় যদি আমার সঙ্গে কোনো দিন চোখো-চোখি হ'য়ে যেত তা' হ'লে তার চোখে কি এক ব্যগ্র মিনতিপূর্ণ চাহনি ফুটে' উঠ্‌ত যাতে বাধ্য হ'য়েই কি জানি কেন আমাকে সেখান থেকে সরে' যেতে হ'ত। সে চাহনির অর্থ আর যাই থাক্ আমার মনে হ'ত সে যেন আমাকেই তার সাম্‌নে থাক্‌তে বারণ কর্‌ত।

শীতের সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার তখন পৃথিবীর বুকের উপর তার জমাট বাসা বাঁধ্‌তে আরম্ভ করেছে। সেই মৌনতাকে আরও গাঢ় কর্‌বার জন্যে দু'একটি করে' তারা কুয়াসার ভিতর থেকে লাজনম্র মৌন বধূর মুখের মত ফুটে উঠ্‌ছিল। চারিদিকেই যেন বেশ একটা নীরবতা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে' ফেল্‌ছে।

আপিস থেকে বাড়ী ফিরেই নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরে ঢুক্‌তেই হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লাম। জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়ে যুথিকা। দেখে' বোধ হ'ল সে কাঁদ্‌ছে। আমার পা আর অগ্রসর হ'তে চাইলে না। বহুদিন পরে আমার ঘরে ঢুকে' তাকে কাঁদ্‌তে দেখে' আমি একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। তার এ কিসের কান্না! জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝ্‌তে পেরেছিল তার জীবনের ব্যর্থতা। তাই বোধ হয় তার নারীজীবনের সমস্ত ব্যর্থতা একত্র ঘনীভূত হ'য়ে অশ্রুরূপে ঝরে' পড়্‌ছে। সে নারীজীবনের ব্যর্থ বোঝা নিয়ে বিমুখ বিশ্বের রুদ্ধ দ্বারে এসে বিফল হ'য়ে ব্যর্থতার চাপে নুয়ে পড়েছে। তাই বোধ হয় তার এই নিদারুণ হাহাকার।

এম্‌নি সময় রমেশ-বাবুর স্ত্রী পিছন থেকে বলে' উঠ্‌লেন—ছি বাবা! ও যেন ছেলেমানুষ, তোমার কি এই রকম করে' এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়। লোকে কি বল্‌বে বল দেখি। তোমার ত একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকা উচিত।—বলেই আর কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি সেখান হ'তে চলে' গেলেন।

তাঁর এই স্থির গম্ভীর তীব্র তিরস্কার আমাদের চমক ভাঙিয়ে দিলে। তিনি যে কখন এসে আমাদের লক্ষ্য কর্‌ছিলেন আমরা কেউ তা' জান্‌তে পারিনি। তাঁর এই তীব্র শ্লেষ শুনে' আমার কণ্ঠ অসীম লজ্জায় রুদ্ধ হ'য়ে গেল। আমিও আর কোনো উত্তর দিতে পার্‌লাম না। আর উত্তরই বা কি দেবো। আমি ত ভুলেও কোনো দিন যুথিকার সম্বন্ধে অন্য কোনো রকম ভাবনা ভাব্‌তেই পারিনি। তবে কেন তিনি এরকম ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করে' তারই ঝাঁজে আমাদের দগ্ধ করে' গেলেন।

এই কথা শুনে' যুথিকার শরীরের সমস্ত রক্ত তার মুখের উপর এসে জম্‌ল—অসীম লজ্জায়। সে নিজেকে কোনো রকমে সাম্‌লে নিয়ে ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল। আমি সমস্ত লজ্জার বোঝা নিয়ে নির্ব্বাক্ হ'য়ে বসে' পড়্‌লাম।

অদৃষ্টের একি কঠোর পরিহাস! সব থেকে আমার বেশী লজ্জা বোধ হচ্ছিল যে রমেশ-বাবু যদি এই-সমস্ত শোনেন তা হ'লে তিনি কি মনে কর্‌বেন। তাঁর সরল বিশ্বাসের কি এই রকম করে'ই প্রতিদান দেবো। কেন আমি একথার প্রতিবাদ কর্‌লাম না। আমার এই চুপ করে' থাকাই ত আরো বেশী করে' প্রমাণ করে' দিলে আমাদের দোষ। কেমন করে' রমেশ-বাবুর সাম্‌নে বের হ'ব এই লজ্জাই আমাকে বেশী করে' পীড়ন কর্‌তে লাগ্‌ল। নিজের জীবনের উপর একটা ধিক্কার জন্মে' গেল।

উত্তেজিত মস্তিষ্ককে একটু ঠাণ্ডা কর্‌বার জন্যে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লাম। রাত্রি তখন বেশ জমাট বেঁধেছে। চারিদিক্ থেকে ঝিঁঝিঁ-পোকার তীব্র চীৎকার এক অপূর্ব্ব ঐক্যতানের সৃষ্টি কর্‌ছে। মধ্যে মধ্যে সারমেয়ের দূরাগত চীৎকার সেই নিস্তব্ধতাকে আরো ভীষণ করে' তুল্‌ছে। পৃথিবী যেন দিনের সমস্ত ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে রাত্রির অন্ধকার কালো শাড়ীর ঘোমটায় মুখ ঢেকে' ফেলেছেন। নিস্তব্ধতার মধ্যে এসে ভাবনা আরো বেশী করে' আমায় জড়িয়ে ধর্‌লে।

আস্তে আস্তে ফিরে' বারান্দায় আস্‌তেই দেখ্‌লাম রমেশ-বাবুর কাঁধের উপর মাথা রেখে' দাঁড়িয়ে যুথিকা। রমেশ-বাবু আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাঁর কাছে ডাক্‌লেন। অন্ধকারেও বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম তাঁর অশ্রুধারা যুথিকার মাথায় আশীর্ব্বাদের মত ঝরে' পড়্‌ছে। যুথিকাও তাঁর বক্ষ অশ্রুসিক্ত করে' তুলেছে। আমিও আমার উদ্বেলিত কান্নাকে আর চেপে রাখ্‌তে পার্‌লাম না। রমেশ-বাবুর অশ্রু ঝরে' পড়ে' আমাদের দু'জনকে যেন একসঙ্গে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে লাগ্‌ল। আমরা তিনজনেই নিঃশব্দ নীরব।

আমার মন যেমন একদিকে খুসি হয়ে উঠ্‌ল রমেশ-বাবুর সাম্‌নে বের হবার লজ্জা হ'তে নিষ্কৃতি পেয়ে, তেমনি আর-একদিকে নিজেকে এই সংসারের অশান্তির সৃষ্টি-

কারক ভেবে অসীম লজ্জায় ঘৃণায় ভরে' উঠে' আমার মন নিজেকে ছি ছি করতে লাগল!

মাকড়সার জালে পড়ে' মাছি নিজেকে জাল থেকে মুক্ত করতে গিয়ে যেমন আরো বেশী করে' নিজেকে জালের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে, আমিও তেমনি এদের সংস্পর্শ হ'তে মুক্ত হ'তে গিয়ে আরো বেশী করে' জড়িয়ে পড়ছিলাম—সুখ দুঃখ সব দিক্ দিয়েই।

সেই নিস্তব্ধতাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই যেন ঘড়ীতে টং টং করে' দুটো বেজে উঠল। রমেশ-বাবু আমাদের ঘরে যেতে বললেন। আমরাও তাঁর আদেশ-মত ঘরে ফিরে গেলাম।

সকলের মনের মধ্যেই যে একটা অশান্তির ঝড় ব'য়ে যাচ্ছিল তার ঝাপ্টায় সকলকেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'তে হচ্ছিল। ঝড়ের স্বভাবই হচ্ছে তাই। ঝড় যখন আসে তখন একটা প্রবল বেগে শান্ত পৃথিবীর বুকের উপর কিছুক্ষণের জন্যে প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করে' সমস্ত ওলোটপালোট করে' দিয়ে যায়। তার পর তার ক্ষতিগ্রস্ত সারা জীবন সেই দুঃখ-বেদনার স্মৃতি বুকের ভিতর পোষণ করতে থাকে। শেষ ফল দাঁড়ায় এই রকমই।

এক মুহূর্ত্তের একটি সামান্য ঘটনাই যে মানুষকে কতখানি অনুশোচনার তীব্র দাহনে দগ্ধ করতে পারে তা' ধারণা করতে পারা যায় না।

আমার সারা মনটা একটা গ্লানিতে পূর্ণ হ'য়ে রইল। রমেশ-বাবু যদি আমার চরিত্রকে সরলভাবে ভাল বিশ্বাস না করে' যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতেন বা তিরস্কার করতেন তা হ'লে বোধ হয় মনটা কথঞ্চিৎ সুস্থ হ'ত। তাঁর এই নীরব সান্ত্বনা কিন্তু আমার মনের গ্লানি দূর করতে পারলে না।

সমস্ত রাত বিনিদ্র অবস্থায় নানা চিন্তার মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা এসেছিল। এমন সময় রমেশ-বাবুর ব্যগ্র ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। দোর খুলে বাইরে আসতেই তিনি আমার হাতে একটা টেলিগ্রাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার বাড়ী হ'তে এসেছে?—বলে'ই আমার মুখের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। টেলিগ্রামটা হাতে পেয়েই মনে হ'ল যে বাঙালীর টেলিগ্রাম ত দুঃসংবাদ ছাড়া আর কিছুই বহন করতে জানে না। একটু ভয় হ'ল খুলতে। না জানি এর ভিতর কি দুঃসংবাদ আছে। এত দুঃখের মধ্যেও মনে মনে হাসি এল, জীবনের উপর দিয়ে আরও কত অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস বর্ষিত হ'তে পারে এই ভেবে।

আমি তাড়াতাড়ি সেটা খুলে ফেললাম, ভিতরে লেখা ছিল—মা ভয়ানক অসুস্থ, আমায় দেখতে চান। সমস্ত দেহটা ঝিম্ঝিম্ করে' উঠল। লেখাগুলো যেন চোখের সামনে ঝাপসা হ'য়ে উঠল। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। সেইখানেই বসে' পড়লাম।

(৫)

পল্লী-জননীর কোলে এসে যখন নামলাম তখন সবে মাত্র ফর্সা হ'তে আরম্ভ হয়েছে। ঊষা দেবীর মাথায়, নূতন বধূর মাথায় কুশণ্ডিকার দিনে সিঁদূর দেওয়ার মতই, কে যেন একথান সিঁদূর ঢেলে' দিয়ে গেছে। নববধূর লজ্জা-রক্তিম আভা তাঁর সারা দেহকে জড়িয়ে ধরেছে। চারিদিকেই জড়তা কাটিয়ে চেতনার রাজ্যে আসবার জন্যে সাড়া পড়ে' গেছে। সেই আবাল্যপরিচিত পথ দিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। রাস্তাঘাটগুলো পর্য্যন্ত যেন সজীব হ'য়ে আমাকে তাদের কোলে তুলে' নেবার জন্যে ব্যগ্র আবেগে রোমাঞ্চিত হ'তে লাগল।

ঘোষেদের নূতন পুকুরের ধার দিয়ে, হারাণ দুলের ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে, অভয় মোড়লের বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছলাম। দূরে আমাদের বাড়ীর চিলের ছাদের কার্ণিসটায় রোদ পড়ে' চোখের সামনে বেশ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠল।

পল্লীজননীর নীরব শোভায় মনটা যতটুকু খুসি হ'য়ে উঠল তার দ্বিগুণ দুঃখে ভরে' গেল বাড়ীর কথা মনে হ'তেই; না জানি মাকে গিয়ে কি অবস্থায় দেখব। যখন পিতৃহীন হই তখন স্নেহময়ী জননীর অঞ্চলের আড়ালেই পার্থিব কোনো দুঃখের আভাস জানতে পারিনি। প্রভাত-বায়ু যেন দুঃখের মর্ম্মবেদনায় গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে' হা' হা' করে' কানের কাছ দিয়ে বয়ে' যেতে লাগল।

দূরে দেখলাম আমাদের পাড়ার ময়রা-পিসী আসছে।

আমার বুকটা কেঁপে উঠ্‌ল—না জানি তার মুখে কি সর্ব্বনাশের কথা শুন্‌বো। সে কাছে এল—আমি ভয়পাংশু-মুখে তার মুখের দিকে চাইলাম, কিছু জিজ্ঞাসা করতে পার্‌লাম না। ময়রা-পিসী আমার মুখ দেখেই আমার প্রশ্ন বুঝ্‌তে পার্‌লে, বল্‌লে—ভয় নেই বাবা, মা তোমার জন্যেই এখনো প্রাণটুকুকে আঁক্‌ড়ে রয়েছে।

আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম ; এতক্ষণে আমার চোখে জল এল। আমি একরকম ছুটে' গিয়ে বাড়ী ঢুকে'ই মার রোগশীর্ণ বুকের উপর পড়ে' খুব খানিকটা কেঁদে নিলাম। মাকে আর চেনা যায় না। বিছানার উপর যেন একেবারে মিশিয়ে আছেন।

ওগো নিষ্ঠুর দেবতা! সামান্ত মানুষের প্রাণের উপর তোমার বজ্রকঠোর হাতের একি জালাময় স্পর্শ! একের খেলা যে অন্যের প্রাণঘাতী। সামান্ত জীবনে আর কত সয়। আমাকে অশান্তির প্রচারক করে' সৃষ্টি কর্‌বারই যদি ইচ্ছা ছিল তা' হলে প্রাণটাকেও তার উপযুক্ত করে' গড়নি কেন? দেখি তোমার খেলার শেষ কোথায়।

মা দিন দিন একটু ভালর দিকেই এগিয়ে যেতে লাগ্‌লেন। দেখে মনটা একটু খুসি হ'য়ে উঠ্‌ল। মার অসুখ দেখে' একটা দুর্ভাবনার বোঝা প্রাণের উপর ভারী পাথরের মত চেপে বসেছিল, সেটা নেমে গেল। একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে প্রাণটা কতকটা হাল্‌কা হ'য়ে গেল। মা যে ভাল হ'য়ে উঠ্‌বেন এ আশাই করিনি। কারণ দুঃখ যে আমার আমরণ সঙ্গী হ'য়ে পড়েছে।

ঝড়ের সময় নোঙর-বদ্ধ নৌকাকে ঝড় যতই টানাটানি করে' নোঙর ততই মাটির ভিতর তার ফলা ঢুকিয়ে দিয়ে দৃঢ়ভাবে মাটিকে আঁক্‌ড়ে ধর্‌তে থাকে। টানে কাছি-শিকল ছিঁড়ে যায়, তবু নোঙরের নখের খাম্‌চানি শিথিল হয় না। আমার দুঃখটাও আমার প্রাণের ভিতর তার নোঙর গেড়ে' দৃঢ়ভাবে আট্‌কে বসে' আছে। কিছুতেই তাকে ছাড়ানো যাচ্ছে না!

সেদিন দুপুর বেলা মা বাইরে দালানে বসে' আছেন। আমি তাঁর কোলের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে আছি। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি চোখ বুজে ভাব্‌ছিলাম এলাহাবাদের কথা। সেখানে আর কিছুতেই যেতে ইচ্ছে কর্‌ছিল না। এতে খেতে পাই আর না পাই। যদি ভগবান্ সেখান হ'তে বিচ্ছিন্ন করে' দিলেন তবে আবার কেন গিয়ে তাদের দুঃখের বোঝা বাড়াই। বিশেষতঃ বেচারী যুথিকার কথা মনে হ'তেই সমস্ত মনটা যেন ভীষণভাবে মাথা নেড়ে' বলে' উঠ্‌ল—না এ হ'তে পারে না। কিছুতেই যাওয়া হ'তে পারে না। কি অধিকার আছে তোমার একজনের শান্তিপূর্ণ সংসারের মধ্যে গিয়ে অশান্তির বিষাক্ত ধোঁয়া ছেড়ে সেটাকে বিষাক্ত করে' তোলা। যূথিকার সেই প্রথম-দেখা চঞ্চলতা ও হাস্যময়-ভাবের প্রতিমূর্ত্তিখানি আজ কোথায় এসে পৌঁছেচে। তাকে যে ক্রমে ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যের ভাঙনের ধারে এনে ফেলে' দিয়েছি আমিই। আমাকে উপলক্ষ্য করে'ই ত তার জীবনের উপর এই পীড়নের সূত্রপাত হ'তে আরম্ভ করেছে।

রমেশ-বাবুর স্ত্রী ত তাকে বকার ভিতর দিয়েই আমাকে সাবধান করে' দিয়ে এসেছেন বরাবর। কিন্তু আমি তাঁর সে ইঙ্গিতের মর্ম্ম অনুভব কর্‌তে না পেরে' এতদিন বেশ নির্ব্বিকারভাবে কাটিয়ে দিয়ে এসেছি। আমার কি অধিকার আছে এক শান্তিপূর্ণ সংসারের ভিতর অশান্তির ঝড় হ'য়ে প্রবেশ কর্‌বার। একবার যখন সেখান হ'তে বের হ'তে পেরেছি তখন আর সেখানে না যাওয়াই ভাল। কি কর্‌ব, ভেবে কিছু ঠিক কর্‌তে পার্‌লাম না। সব কেমন গোল পাকিয়ে গেল।

মাকে সব খুলে বলি কি না বলি এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে শেষ কালে খুলেই বল্‌লাম। কারণ সংশয়ে পরামর্শ-দাত্রী তাঁর মতন আমার আর কেউ ছিল না। তিনিও কিছুই ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌লেন না। আমাকে দিয়ে তিনি বেশ ভাল রকমই জান্‌তেন যে আজকালকার দিনে চাকুরি পাওয়া কি রকম দুঃসাধ্য। কি যে কর্‌ব কিছুই ঠিক কর্‌তে পার্‌লাম না। মনটা যাওয়া-না-যাওয়ার মাঝ-খানে পড়ে' দোল খেতে লাগ্‌ল।

সংশয়পীড়িত মনকে স্থির কর্‌বার আগেই হঠাৎ একদিন এলাহাবাদ থেকে একখানা চিঠি এল। রমেশ-বাবু লিখেছেন। চিঠিখানা খুলে দেখ্‌লাম তিনি অনেক

অনুরোধ করে' আমাকে সেখানে যেতে বলেছেন—ভদ্রার বিবাহ। সেই পত্রের মধ্যে আর-একটা আলাদা কাগজে ভদ্রাও লিখেছে, যূথিকাও তার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে।

জাহাজে উঠলেই সমুদ্রপীড়া হ'বে এই ধারণাতেই অনেকের উঠবার আগে থেকেই পীড়ার সূত্রপাত হ'তে থাকে। চিঠিখানা পেয়েই এলাহাবাদ যাবার ভয়ে আমিও তেমনি শিউরে উঠলাম। যে মনকে না যাবার দিকেই মত করিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম, আজ চিঠিখানি পেয়ে আবার সে বিরুদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াল। চিঠিখানার মধ্যে এমন একটা জিনিষ ছিল যা' আমাকে যাওয়ার দিকেই টানতে লাগল। ভাবলাম একি বিড়ম্বনা। আলাদা হ'য়েও আলাদা হবার উপায় নেই। আবার অলক্ষিতে কার হাতের ছোঁড়া জাল এসে আমাকে অষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে' ফেললে। কি করব, যাব কি না-যাব নিজে কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। মার কাছে পরামর্শ চাইলাম। তিনি কিন্তু যেতেই পরামর্শ দিলেন। তাঁর কথা অনুযায়ী রওনা হলাম।

(৬)

এলাহাবাদে এসে শুনলাম যে ভদ্রা প্রথমে বিবাহে অমত করেছিল। সেইখানকার এক বড় উকীলের ছেলের সঙ্গে অনেকদিন আগে তার বিবাহের ঠিক হয়। সেও আগে এতে মত দিয়েছিল। কেবল ছেলেটি বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়তে গিয়েছিল বলে' এতদিন বিবাহ হয়নি। এখন ফের বিবাহের কথা উঠতেই সে কিছুতেই রাজী হয়নি। কেউ তাকে বুঝিয়ে রাজী করতে পারেনি। কেবল যূথিকার অনুরোধে শেষে সে মত করেছে। যূথিকাকে সে খুব বেশী ভাল বাসত। সেইজন্যেই বোধ হয় পাছে যূথিকার মনে কষ্ট হয় যে সে বিবাহ করে' সুখী হবে আর যূথিকাকে আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হবে এই ভেবেই ভদ্রা সেই ছেলেটি ফিরে এলে ফের বিবাহের কথা উঠতে বিবাহে মত দেয়নি। অবশেষে যূথিকারই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাকে মত দিতে হয়েছে। হিন্দুধর্ম্মের শাসন ত সেইখানেই বেশী যেখানে যে যত বেশী দুর্ব্বল। যূথিকাকে সেই শাসন অতিক্রম করবার ক্ষমতা ত দেওয়া হয় নি। তবে কেন তার জন্যে ভদ্রা তার জীবনকে বিফলতায় পর্য্যবসিত করবে স্বার্থ ত্যাগ করে'।

ভদ্রার বিবাহের পর থেকেই যূথিকা আরো বেশী করে' গাম্ভীর্য্য ও মৌন অবলম্বন করলে। আগে সে মধ্যে মধ্যে দু'একবার বাইরে আসত, এখন তাও একেবারে প্রায় বন্ধ হ'য়ে গেল। ভদ্রা চলে' যাওয়াতেই বোধ হয় তার এই পূর্ণ পরিবর্ত্তন। ভদ্রাই ছিল তার সুখ-দুঃখের সাথী। এত বেশী করে' দু'জনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে' ছিল যে একের বিচ্ছেদ অন্যে যে কখন সইবে বা অন্যকে সইতে হবে তা' কেউ ভাবেওনি।

যূথিকার চরিত্রে বরাবরই লক্ষ্য করেছি যে সে নিজের অতৃপ্ত দৃপ্ত কামনাকে সব সময় কণ্ঠ রোধ করে' চেপে রাখতে চাইত। সব সময় সফল হ'তে পারত না, কিন্তু সেই দ্বন্দ্বের ভিতর পড়েই সে বেশী করে' নিজেকে আবর্ত্তনের ভিতর হারিয়ে ফেলত।

রবিবার। দুপুর বেলা ঘরে একলা চুপ করে' বসে' ভাবছিলাম। পশ্চিমের তাপদগ্ধ স্তব্ধ দুপুরে দূরাগত চাতকবধূর ফটিক-জল-প্রার্থনা চাপা কোমল সুরে ভেসে আসছিল। চারিদিকেই একটা ভয়ের নীরবতা বিরাজ করছে। গরম হাওয়া একএকবার বন্ধ জানলার একটু কোন্ ফাঁক দিয়ে এক ঝলক আগুনের হল্কার মত ঢুকে পড়ছিল। তাতেই মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত শরীরটা পুড়ে গেল।

অন্যমনে বসে' বসে' যা-তা' এলোমেলো ভাবছে ভাবতে হঠাৎ যূথিকার সম্বন্ধীয় ভাবনাগুলো যূথিকার ছায়ামূর্ত্তির সঙ্গে মনের মধ্যে ভেসে উঠল। ইদানীং সে আর বড় আমার সামনে বের হ'ত না। কিন্তু যখনই দৈবাৎ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়ে যেত তখনি লক্ষ্য করেছি তার চোখে মুখে সারা দেহের উপর দিয়ে কি একটা হর্ষের ঢেউ খেলে' যেত। চকিত উদ্‌গ্রীব চাহনি দিয়ে যেন আমায় অভিনন্দিত করত। কিন্তু তখনি সেই ভাবকে দমন করে' পাছে কেউ দেখে' ফেলে এই ভয়ে পীড়নের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে শঙ্কা-চকিত হ'য়ে সে সরে' যেত। তার সেই হর্ষচকিত ভাব আমার মনের

মধ্যেও একটা হর্ষের উচ্ছ্বাস তুলে' দিত। একটা অজানিত কিসের ধাক্কায় আমাকে যেন তার মনের কি একটা গোপন কথা বরাবরই জানাতে চেয়েছে। কি একটা কথার আভাস তার ঠোঁটের ভিতর পুষ্পিত হ'য়েই ফোট্‌বার আগেই ঝরে' পড়েছে।

হঠাৎ মনে হ'ল সে কি আমাকে ভালবাসে? সে কি আমাকেই তার অন্তরের সকল ভালবাসা দান করে' নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। কই এত দিন ত এসব কথা তলিয়ে বুঝ্‌তে চেষ্টা করিনি। আজ তার প্রতিদিন-কার প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয় বেশ পরিস্ফুট হ'য়ে আমার কাছে তার ভালবাসার নিদর্শন ফুটিয়ে তুল্‌লে। আমার মনের কোন্ অজানা সুরে কি একটা বেদনা কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। তার প্রতিদিনকার প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয় দিয়েও ত সে জানিয়ে দিতে চেয়েছে যে সে ভালবাসে—আমাকে ভালবাসে। কিন্তু আমি কি তাকে ভালবাসি? বাসি বই কি'; না বলে' অস্বীকার কর্‌বার উপায় ত নেই। অস্বীকার কর্‌লে যে নিজেকে নিজের কাছে ঘৃণ্য ছোট করা হয়, ছলনা করা হয়। এর আগে এ-সব কথা মনেও হয়নি—আর মনে কর্‌বার সময়ই পেয়েছিলাম কোথায়। কিন্তু আমার কি উচিত, যে নারী তার হৃদয়ের বুভুক্ষা মেটাবার আবেগের বিরুদ্ধে নিজেই নিজের সঙ্গে সর্ব্বদা দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ানো। যে তার জীবনের কামনাকে কণ্ঠরোধ করে' চেপে মার্‌তে চায় আমার কি উচিত তার সেই কামনাকে আরো দৃপ্ত উত্তেজিত করা।

তার কি দোষ। লতা যেমন অবলম্বন ভিন্ন থাক্‌তে পারে না—যখনি সে একটু বড় হয় তখনি সে তার মুখ বাড়িয়ে অবলম্বন খুঁজ্‌তে থাকে, প্রথমেই সাম্‌নে যে অবলম্বন পায় তাকেই নির্ভয়ে জড়িয়ে ধরে' বাড়্‌তে থাকে, নারীর স্বভাবও ঠিক সেই রকম। সে যখন অবলম্বন খুঁজে বেড়ায় তখন তার সাম্‌নে যে এসে পড়ে তাকেই তার অবলম্বন-রূপে নির্ভাবনায় আপনার নির্ভর করে।

আমারি ত দোষ। আমি কেন তার বুভুক্ষিত খোলা দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি—যদি না তার দানের প্রতিদান কর্‌তে পার্‌ব। সমস্ত ভাবনাগুলো একসঙ্গে তাল পাকিয়ে ঘুলিয়ে ধোঁয়ার মত হ'য়ে আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল।

আগ্নেয়গিরির অতল তলে তরল অগ্নি-স্রোত বইতে থাকে, কেউ তার ভীষণতা ধারণা কর্‌তে পারে না। তার পর হঠাৎ একদিন সেই অগ্নিস্রোত ভীষণ দৈত্যের আকার ধারণ করে' সকলকে ধ্বংস কর্‌তে উদ্যত হয়। আজও সেই রকম একটা প্রবল অগ্নির উচ্ছ্বাস আমাদের দগ্ধ কর্‌তে উদ্যত হয়েছে।

সেদিন কি জানি কেন খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গিয়ে-ছিল। তখনো বাড়ীর আর কেউ ওঠে নি। দোর খুলে বাইরে আস্‌তেই যূথিকার উপর চোখ পড়্‌ল। আমার দোরের কাছে দাঁড়িয়ে সদ্যস্নাত যূথিকা যেন আমারই প্রতীক্ষায়। দোর খুলে বাইরে আস্‌তেই যূথিকা আমার পায়ের কাছে এসে প্রণাম করে' দাঁড়াল। আমার মুখের দিকে তৃপ্তির হাসিভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লে—আজ আমার জন্মদিন। কি বলে' আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন বলুন ত?—বল্‌তে বল্‌তেই তার সেই হাসি ঠোঁটের মধ্যেই হারিয়ে গেল মরুভূমির ভিতর হারিয়ে-যাওয়া নদীর মত। সে চোখ নমিত করে' কোনো উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই চলে' গেল।

আমার চোখ সজল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে কি আমাকে স্বেচ্ছায় প্রথম প্রণাম করে' জানিয়ে দিয়ে গেল তার নারীত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও আমার অপৌরুষের হীনতা। নারী তার হৃদয়ের সকল অশ্রু ও বেদনাকে এক করে' আমায় ডালি দিতে আসছে, আমি কিন্তু এম্‌নি হতভাগ্য যে তার সেই দুঃখের ডালিও সাদরে গ্রহণ কর্‌বার ক্ষমতা—এমন কি মনুষ্যত্বটুকুও আমার নেই। আমি মূঢ়ের মত সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এই ঘটনার দিন চারেক পরে একদিন সকাল বেলা রমেশ-বাবু আমাকে ডেকে বল্‌লেন—বাবা, তোমায় একবার সূর্য্য ডাক্তারের কাছে যেতে হবে' যূথীর বড় জ্বর। আজ দু'দিন জ্বর একেবারেই ছাড়েনি। কেমন বেহুঁস হ'য়ে পড়ে' আছে, ভুল বক্‌ছে আর যেন কাকে খুঁজ্‌ছে।

মনটা কেমন চম্‌কে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি ডাক্তারের বাড়ী চলে' গেলাম।

ডাক্তার পরীক্ষা করে' বলে' গেলেন ডবল নিউমোনিয়া, জীবনের আশা কম। কল থেকে রস-বের-করা আকের ছিব্‌ড়ের মতই আমার মন থেকে কে যেন মুষড়ে তার সকল রস নিঙ্‌ড়ে বের করে' একেবারে শুষ্ক করে' দিলে।

সে কি তার জীবনযুদ্ধে এই রকম করে'ই আমাকে পেছনে ফেলে' জয়ী হ'য়ে যাবে। তাকে বল্‌বার ত কিছুই নেই। যুদ্ধে শত্রুকে নিষ্পেষিত করাই ত হচ্ছে জয়ীর কাজ। সে ত তখন মনে এতটুকুও দয়া স্থান দেয় না। কিন্তু তা' হ'লেও সেই হচ্ছে মহৎ যে পরাজিতকেও ক্ষমা করে। জীবনে সে অনেক কষ্ট দুঃখ পেয়েছে বলেই কি সে ক্ষমা করুণা সব ভুলে' গেছে। সেইজন্যেই কি আমার জীবনটাকে এই রকম করে' দলিত-মথিত করে' দিতে চলেছে। ভাব্‌তে ভাব্‌তে সব পেই হারিয়ে গেল। এমন সময় অজিত এসে বল্‌লে—মা আপনাকে ভিতরে ডাক্‌ছেন। দিদি আপনাকে বড় খুঁজ্‌ছে।

আমি তার সঙ্গে ভিতরে যে ঘরে যূথিকা শুয়ে ছিল সেই ঘরে আস্‌তেই রমেশ-বাবুর স্ত্রী আমাকে সেইখানে বস্‌তে বলে' ঘর হ'তে বেরিয়ে গেলেন। তিনিও বোধ হয় সব বুঝ্‌তে পেরেছিলেন বলে' এই শেষ সময়ে আর কোনো রকম বাধা দিলেন না, বরং সুযোগ দিয়ে গেলেন আমাদের একলা থাকতে।

আমি গিয়ে তার বিছনার উপর বসে' আস্তে আস্তে তার ক্ষীণ স্পন্দিত হাতখানি আমার হাতের মধ্যে তুলে নিলাম। তার হাতটা আমার মুঠোর ভিতর একটু কেঁপে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ মেলে' চাইলে। দু' ফোঁটা অশ্রু শীর্ণ পাণ্ডুর গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়্‌ল, যেন কি বল্‌তে চাইলে। সে আস্তে আস্তে আমার হাতটা তার বুকের উপর চেপে ধরলে তার শক্তি অনুযায়ী খুব জোরে, যেন কোনো পরম-আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বহু আরাধনার পর পেয়েছে এম্‌নিভাবে আমার হাতটাকে সে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে' রাখ্‌লে, কিছু বল্‌তে পার্‌লে না। আমারও চোখের জল ছাড়া আর কিছু দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবার ছিল না।

সেইদিন থেকেই তার কাছে থাক্‌তে আর কেউ অমত কর্‌লেন না। আমিও আমার সকল ক্ষমতাকে এক করে' তার সেবা কর্‌তে লাগ্‌লাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না, অক্লান্ত পরিশ্রম করে'ও তাকে কিছুতেই ভালর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারা গেল না।

সেদিন তার অসুখটা খুব বেড়ে উঠেছিল। আমি পাশে বসে' ছিলাম। রমেশবাবু ও তাঁর স্ত্রীও একটু দূরে বসে' ছিলেন, কখন কি হয় এই প্রতীক্ষায়। হঠাৎ যূথিকা ধড়্‌মড়িয়ে জোর করে' উঠে বসে' আমার গলাটা জড়িয়ে ধরলে, এবং ক্লান্ত হ'য়ে অসাড়ভাবে আমার বুকের ভিতর মাথাটা গুঁজে চোখ বুজে' রইল। আমি কোনো বাধা দিলাম না।

পর্ব্বতগাত্রনিঃসৃত ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী নিজের আবেগে এঁকে বেঁকে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ কোনো এক অন্ধকার পর্ব্বতগুহায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে; তখন ব্যর্থতার ক্ষুব্ধ অভিমানে ফুল্‌তে ফুল্‌তে হঠাৎ একদিকে পথ পেয়ে নিজেকে মুক্ত করে' উচ্ছ্বসিত তরঙ্গলীল ভঙ্গীতে কলনাদে পাথরের উপর আছাড় খেতে খেতে কোন্ অজানা প্রিয়ের উদ্দেশে চল্‌তে থাকে; শেষকালে একদিন তার সেই প্রিয়তমের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দিয়ে আর তার মধ্যে নিজের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে' পায় না, সে তখন তার সেই প্রিয়ময় হ'য়ে পড়ে। যূথিকার অবস্থাও এখন ঠিক সেই রকম।

তার প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে তার দেহের প্রতি অণু পরমাণু আমার দেহের সঙ্গে মিশে কি এক অজানিত শিহরণ জাগিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌ল।

হঠাৎ সে বুক থেকে মাথা তুলে' আমার মুখের দিকে কি এক আকুল চাহনি ফেলে' সোজা হ'য়ে বস্‌ল, যেন তার কোনো অসুখই হয়নি। কিসের জোরে যে সে সোজা হ'য়ে বসেছিল তা সেই জানে। খানিক এই রকম করে' কাট্‌বার পর তার মুখের ভাব যেন বদ্‌লে গেল। হঠাৎ মাথার কাছে রাখা একটি ঔষধের শিশি তুলে' নিয়ে আমার দিকে সজোরে ছুঁড়ে দিলে। সেটা এসে আমার বুকের উপর লেগে ঝন্‌ঝন্ করে' ভেঙে খানিকটা রক্ত বের করে' দিয়ে মেঝের উপর পড়ে' ছড়িয়ে গেল। সঙ্গে

সঙ্গে আমার রক্তাক্ত বুকের দিকে চেয়ে একটুখানি ম্লান হাসি তার ঠোঁটের উপর ফুটে উঠ্‌ল—পদ্মপাতার জল-বিন্দুর উপর যেন প্রথম সূর্য্যকিরণ চিক্‌চিক্ করে' উঠ্‌ল।

সেই হাসিটুকু ঠোঁটের কোণে মিলুতে না মিলুতে আমার বুকের উপর এলিয়ে পড়্‌ল যূথিকার হিমশীতল অসাড় দেহখানি।

সে সেই হাসিটুকু দিয়ে যেন বলে' গেল যে আমার এই আঘাত তোমার বুকে আর কতটুকু ক্ষত উৎপাদন করেছে। আমার হৃদয়ে আঘাত করে' তুমি যে ক্ষত উৎপাদন করেছ তার তুলনায় এ আঘাত ত কিছুই নয়। তোমার ঐ ঘা ত দু দিনে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু আমার ? কেবল একটু মনে থাক্‌বার জন্যে একটু দাগ করে' দিয়ে গেলাম।

আমি সেই স্মৃতির শেষ রেশটুকু ধরেই চলেছি জীবনের শেষ পারে পৌছতে।

এই পর্য্যন্ত বলেই নরেন চুপ করলে। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়্‌ছিল। বন্ধ জান্‌লায় রুদ্ধ বাতাস ব্যর্থ প্রণয়ীর দীর্ঘশ্বাসের মত কেঁদে কেঁদে হা হা করে' বেড়াচ্ছিল।

শ্রী প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

গোয়ালিয়র দুর্গ

প্রাচীনকাল হইতে এই অবধি "গোয়ালিয়র দুর্গে" বহু রাজবংশের উত্থান ও পতন হইয়া গিয়াছে। যে "গোয়ালিয়র দুর্গ" একদিন প্রবলপ্রতাপান্বিত বিশাল হিন্দু রাজত্বের গৌরবময় স্বাধীনতার ধ্বজা বক্ষে ধারণ করিয়াছিল—তাহার সম্পূর্ণ সত্য ইতিহাস এখনও কেহই অনুসন্ধান করিয়া লেখেন নাই। আশ্চর্য্য! যে 'গোয়ালিয়র দুর্গের' নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয়,—যে 'গোয়ালিয়র দুর্গ' প্রাচ্যের শিল্পেতিহাসেও একটি নূতন অধ্যায়ের সংযোগ করিয়া দিয়াছে, যে স্থানকে কেন্দ্র করিয়া বীর মহারাষ্ট্রীয় জাতি সমস্ত উত্তর ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, যে স্থানে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সিন্ধিয়াবংশ আজ দুই শতাব্দী হইতে শাসন করিয়া আসিতেছেন, সে দুর্গের প্রশংসা করিয়া সার্ হিউ রোজ্ বলিয়া গিয়াছেন, "One of the most important and strongest fortresses of India," এবং কানিংহামের মতে, "As a place of defence Gwalior has always been considered one of the most impregnable fortresses in upper India"।*

"গোয়ালিয়র দুর্গে" যে-সব গুহা ও মন্দির ও মূর্ত্তিরাজি সৌন্দর্য্যমণ্ডিত কারুকার্য্যের অতুল নিদর্শনরূপে বিদ্যমান আছে সে-সকলের সমাচার আমরা নিজেদের ভাষায় ভ্রমণকাহিনী * ও শিল্প-সংবাদে † বহু পূর্ব্বেই পাইয়াছি। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক তথ্য এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আমি নিজেই প্রবাসীতে ইহার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম, ‡ তাহা কিন্তু অতি অল্প ও অসম্পূর্ণ। মাত্র দুইটি গ্রন্থ—"গোপাচলাখ্যান" ও "গোয়ালিয়র-নামা" অবলম্বনে আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। এই দুইটি হস্তলিখিত বহুমূল্য গ্রন্থ অতীত যুগের যে-সব উজ্জ্বল চিত্র আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রাখিয়াছে তাহা যে কিংবদন্তী অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

"গোয়ালিয়র-নামা" একটি ফার্সী ভাষার গ্রন্থ, আর "গোপাচলাখ্যান" হিন্দু ভাষার একটি অপূর্ব্ব রত্ন। এই দুইটি একই বস্তু নয়, কিছু বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। "গোপাচলাখ্যান" তালপাতের উপর লৌহ কলম দ্বারা লিখিত এবং লিপিটি একাদশ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে।

* Cunningham's Reports of A. S. I., vol. II, p. 340.

* "প্রবাসী" আষাঢ় ১৩২৩, পৃ ২৪৫ দ্রষ্টব্য।

† "প্রবাসী" আষাঢ় ১৩২৩ পৃ ২৫৩ ও "মানসী" অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩২৬ পৃ ৪১১, ৫০৬ দ্রষ্টব্য।

‡ "প্রবাসী" ভাদ্র ১৩২৯ পৃ ৬৯৭ দ্রষ্টব্য।

"গোয়ালিয়র-নামা"ও তাই। ইহাদের প্রাচীন বর্ণনায় কিছু গোলযোগ আছে—তাহার কারণ অতি প্রাচীন কাল হইতে কালচক্রের আবর্ত্তনে "গোয়ালিয়র দুর্গের" ভাগ্যাকাশে শত শত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; কিন্তু আধুনিক সময়ের বর্ণনায় কিছুই গোলযোগ নাই, সব একসূত্রে লেখা; তাহা হইতে সহজে অনুমান করা যায় লিপি দুটি আধুনিক, প্রাচীন নয়। "গোপাচলাখ্যানের" কালনির্ণয় করা অতি সহজ। ইহা মহাদজী সিন্ধিয়ার রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছে (বিক্রম অব্দ ১৮৪৫), ইহার সম্পূর্ণ বর্ণনা অনেকগুলি কবি দ্বারা বর্ণিত। এই "নানা কবির" মধ্যে কবি খড়্গরায়ও একজন ছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই কবি খড়্গের জন্ম গোয়ালিয়রে হইয়াছিল। কানিংহাম * ও লুয়ার্ড † নিজেদের পুস্তকে ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ এমন কি কানিংহাম গোপাচলাখ্যানের কিছু চৌপাইয়ের চরণও পাইয়াছিলেন। ¶ "গোপাচলাখ্যানের" মূল লেখক ছিলেন গোয়ালিয়র-নিবাসী কবি ভৈরুলাল গৌড় ব্রাহ্মণ। "গোয়ালিয়রনামা"ও একজন ব্রাহ্মণের দ্বারা লিখিত হইয়াছে। ইনি "কিলেদার"দের সময় "গোয়ালিয়র দুর্গে" বাস করিতেন ও ফার্সী ভাষায় § পণ্ডিত ছিলেন।

যে পর্ব্বতের উপর "গোয়ালিয়র দুর্গ" অবস্থিত তাহা ইতিহাস ও পুরাণাদিতে এবং দুর্গস্থ প্রাচীন শিলালিপিতে গোপাদ্রি, গোপগিরি, গোপাচল, গোপাভায় ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে গোমন্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হোক এই পুস্তক হইতে বুঝিতে পারা যায় পর্ব্বতের এক নাম "গোপাচল" এবং তাহারই "আখ্যান" বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া কবি গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন "গোপাচলাখ্যান"।**

* Cunningham's A. S. I., vol. II, P. 372.

† Cunningham's A. S. I., vol. II, p. 371.

‡ Gwalior Gazetteer by Capt. Luard, p. 11.

¶ Cunningham's A. S. I., vol. II, p. 380.

§ আমি ভুলবশতঃ ফার্সী ভাষার স্থানে পূর্ব্ব প্রবন্ধে 'গোয়ালিয়র-নামা' উর্দ্দু ভাষার গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছি। পুস্তকটি ফার্সী ভাষার।—লেখক।

** "গোপাচলাখ্যান" বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বী আর ভালেরাও (Historical Researcher, Gwalior) দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দুর্গ নির্ম্মাণের পর রাজা সূর্য্যসেন দুর্গের নামকরণ করিয়াছিলেন 'গোয়ালিয়র' এবং তাহারই গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া ফার্সী কবি নিজের পুস্তকের নাম রাখিয়াছেন "গোয়ালিয়র-নামা"।*

"গোয়ালিয়র দুর্গ" একটি প্রশস্ত শৈলমালার উপরে অবস্থিত—ইহা দৈর্ঘ্যে দুই মাইল ও প্রস্থে ছয় শত হইতে দুই সহস্র আট শত ফুট।

রাজা সূর্য্যসেন সূর্য্যবংশের রাজা ছিলেন—তাঁহার বংশ অতিশয় শ্রেষ্ঠ ছিল। তাঁহার পূর্ব্ব রাজধানীর নাম ছিল কুন্তলপুরী। কেহ কেহ আবার ইহাকে কাতোয়ার বলেন। তিনি ধর্ম্মে অতি আস্থাবান্ ছিলেন। তাঁহার প্রথমা রাণীর নাম বক্কলদেবী ছিল। সেই প্রিয়তমা রাণীর নামে তিনি একটি শিবমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন ও তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন বক্কলমঠ।

একদা রাজা সূর্য্যসেন মৃগয়া অভিপ্রায়ে অশ্বপৃষ্ঠে নিজের রাজধানী কাতোয়ার হইতে কিয়দ্দুর গমন করিয়াছিলেন। মৃগয়া করিতে করিতে এক হরিণের পিছু তিনি নিজের অশ্ব পরিচালনা করিলেন। ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে তিনি গোপাচলের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। গ্রীষ্মের আতিশয্যে অত্যন্ত ক্লান্ত ও পিপাসিত হইয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দিকে জনবিরল অরণ্য আর তাহার মধ্যস্থিত সুবিশাল পর্ব্বতমালা কত যুগযুগান্তর হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া অটল অচল স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। প্রকৃতির এই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাজা সূর্য্যসেন মুগ্ধ হইলেন। সংসারের জালা সহ্য করিতে না পারিয়া পূর্ব্বকালে এই স্থানে এক ঋষি নিজের কুটীর স্থাপন করিয়া বাস করিতেন। রাজা জল অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই মহাত্মার (গালপা) কুটীরে উপস্থিত হইলেন ও কিঞ্চিৎ পানীয় প্রার্থনা করিলেন। গালপা কুটীরপার্শ্বস্থ কুণ্ড হইতে জল আনিয়া রাজাকে দিলেন।

* পুস্তকটি দুষ্প্রাপ্য। একটি মাত্র গ্রন্থ শ্রীযুক্ত প্রিন্স বলবন্তরাও সিন্ধিয়ার নিকট ছিল। অনুগ্রহ করিয়া তিনিই আমাকে পুস্তকটি দিয়াছেন। আমি সেই পুস্তকেরই সাহায্য লইলাম।—লেখক

আকাঙ্ক্ষিত সুশীতল বারি পাইয়া রাজা হস্ত ধৌত করিয়া তাহা আকণ্ঠ পান করিলেন। তাঁহার হাতে কুষ্ঠ ব্যাধি ছিল—হস্ত ধৌত করিয়াই তিনি লক্ষ্য করিলেন এক নিমেষে কোথায় তাঁহার কুষ্ঠ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে!

হাতের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া রাজার হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় শ্রদ্ধা এবং মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি গালপ্যের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। রাজার এইরূপ আনন্দ দেখিয়া গালপ্য সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদের বোঝায় তাঁহাকে আরও নত করিয়া দিলেন এবং বলিলেন :—"এই পর্ব্বতের উপর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া নিজের রাজধানী স্থাপন কর। রবিবার দিন এই কুণ্ডকে বড় করিয়া সূর্য্যকুণ্ড স্থাপন কর। যে কেহ রবিবার দিন এই 'সূর্য্যকুণ্ডে' স্নান করিবে সেই যমুনাস্নানের ফল লাভ করিবে। যতদিন তোমাদের নামের শেষে "পাল" শব্দ সজ্জিত থাকিবে ততদিনই তোমার বংশধরেরা নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিবে।" যোগী এই কথা কয়টি বলিয়া রাজাকে আর-একবার আশীর্ব্বাদ করিলেন ও সহসা অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

গোয়ালিয়রের মান-মন্দির ও তাহার ভিতরের দৃশ্য চক ও কাচারী বাড়ী

রাজা সূর্য্যসেন অতিশয় আনন্দিত হইয়া নিজের পরিবারবর্গ ও আর আর সকলকে লইয়া "গোপাচলে" আসিলেন এবং রবিবারের ত্রয়োদশীর দিন অনুরাধা নক্ষত্রে শুভ মুহূর্ত্ত দেখিয়া "সূর্য্যকুণ্ডের" প্রতিষ্ঠা করিলেন ও জ্যোতিষীদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী পুষ্যানক্ষত্রে শুভ দিন স্থির করিলেন। রাজা তখন বেদের বিধি অনুসারে 'গোপাচল' পর্ব্বতের উপর দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি মহাত্মা গালপ্যের অনুমতিক্রমে ঐ পর্ব্বতের উপর বিশাল দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন বলিয়া উক্ত মহাত্মার নামানুসারে উহার 'গোয়ালিয়র' নামকরণ করিলেন। "গোপাচলাখ্যানের" কবি দুর্গ নির্ম্মাণের সময় নির্দ্ধারিত করিয়া বলিয়াছেন :—"

"দ্বাপর অন্তজু কলিযুগ আদি।…"

অর্থাৎ দ্বাপরের শেষাশেষি ও কলিযুগের প্রারম্ভেই গোয়ালিয়র দুর্গ প্রস্তুত হইয়াছিল।

রাজা সূর্য্যসেন সূর্য্যপাল নাম ধারণ করিয়া 'গোয়ালিয়র দুর্গের' রাজসিংহাসনে বসিলেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই নিকটস্থ সব রাজা ও জমিদারদিগকে নিজের অধীন করিয়া লইলেন। তাঁহার জীবিত অবস্থায় দুর্গ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছিল। এইটি তাঁহার জীবনের প্রধান সুখের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার সময়ের "সূর্য্যকুণ্ড" এখনও বর্ত্তমান। তিনি ৩৬ বৎসর সুখে রাজত্ব করিয়া নিজের পুত্র সুমন্তপালকে রাজ্যভার দিয়া প্রাকৃতিক মৃত্যুতেই মরিলেন। রাজা সুমন্তপাল দানশীলতায় অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ৬৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার এই সুদীর্ঘ শাসনের পর পুত্র নরহরপাল রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিলেন। তাঁহারই সময় 'মহাদেবের মন্দির' নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি মৃগয়া খুব ভালবাসিতেন; শেষে এই মৃগয়াই তাঁহার মৃত্যুর কারণ ঘটিল। নরহরপাল একাদশ বৎসর অতি সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর অমরপাল রাজা হইলেন। তিনি ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়া শমন-সদনে গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র গঙ্গপাল একবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ের 'গঙ্গোলাতাল' এখনও আছে। রাজপাল এবং তাঁহারও মৃত্যুর পর ভোজপাল রাজ্যলাভ করিলেন। রাজা ভোজপালের সময়ের "চতুর্ভুজ-মন্দির" এখনও বর্ত্তমান। ইঁহার বিশেষত্ব এই যে পাহাড়ের গা কাটিয়া সম্পূর্ণ মন্দিরটি প্রস্তুত হইয়াছে। এইরূপে সূর্য্যপাল হইতে পালবংশের শেষ রাজা বুদ্ধপাল অবধি ৮৪টি নরপতি যথাক্রমে ৯৪৯ বৎসর "গোয়ালিয়র দুর্গের" সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় পূর্ব্বে আমাদের ভারতবর্ষে রাজারা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া প্রজাদের সুখে রাখিবার চেষ্টা করিতেন।

বুদ্ধপাল এই বংশের শেষ 'পাল'-উপাধিধারী রাজা। তাঁহার পুত্র তেজকরণ অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া "পাল" শব্দ ত্যাগ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঋষি গালপ্যের কথাও ফলিতে বিশেষ দেরী হইল না। তেজকরণের বিবাহ আমেরের (জয়পুর) কচ্ছবাহা রাজা বিক্রমের পরম রূপসী কন্যা রূপবতীর সঙ্গে হইয়াছিল। রাজা বিক্রমের অপর সন্তানাদি ছিল না। তিনি তেজকরণের নিকট প্রস্তাব করিলেন—যদি রাজা "গোয়ালিয়র দুর্গ" ত্যাগ করিয়া আমেরকে নিজের রাজধানী করেন তাহা হইলে আমেরের সমস্ত রাজত্ব তাঁহাকে দেওয়া হইবে। রাজা তেজকরণ সহজেই সম্মত হইলেন। বিবাহ করিতে যাইবার সময় তিনি নিজের ভাগিনেয় পরমলদেব পরিহারকে দুর্গের ভার দিয়া যান। পরমলদেব যখন দেখিলেন রাজা আর আসিবার নামটি করিতেছেন না—তখন তিনিও আর মামাকে দুর্গ প্রত্যর্পণ করিলেন না। এইরূপে 'পাল'-বংশের অবসান হইল ও 'পরিহার'-বংশ আরম্ভ হইল।

পরিহারগণ অতি উত্তমরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। রাজা পরমলদেব প্রজাদের সহিত মিত্রতা করিয়া নিজের প্রভাব বজায় রাখিয়াছিলেন ও শান্তি-সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি ৬৮বৎসর রাজত্ব করেন।

তাঁহার পর রামদেব রাজসিংহাসনে আসীন হইলেন।

গোয়ালিয়র দুর্গের পথে সুউচ্চ আদিনাথের মূর্ত্তি

এবং তাঁহারও পর সালমদেব, বিক্রমদেব, রতনদেব, ইত্যাদি সর্ব্বসুদ্ধ এই বংশের সাতজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর শেষ রাজার রাজত্বকালে গোয়ালিয়র-দুর্গ স্বাতন্ত্র্যবিচ্যুত হইয়া এক প্রবল সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইল।

দক্ষিণ জয় করিয়া আল্‌তামাশ দিল্লী যাইতেছিলেন। পথে আন্তরী নামক স্থানে ৯৬০০০ ফৌজ সহ তিনি নিজের শিবির স্থাপন করিলেন। সেই স্থানে হিন্দুদিগের অনেকগুলি প্রাচীন মূর্ত্তি অতি সুন্দর কারুকার্য্যের পরিচয় দিতেছিল। তিনি আরও শুনিলেন যে, অতি নিকটেই প্রসিদ্ধ গোয়ালিয়র দুর্গ অবস্থিত। তাঁহার তখন দুর্গ অধিকার করিবার ইচ্ছা প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল। লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রথমে তিনি

দুর্গাধিপতির নিকট দূত পাঠাইলেন; ইচ্ছা, দুর্গ যদি যুদ্ধ না করিয়া পাওয়া যায়। রাজা রাজ্ঞীর অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন; চৌহান-বংশের রক্ত রাণীর ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি বীর ভারতনারীর মতই বলিলেন, "হয় জয়শ্রীর টীকা মস্তকে লাগিবে, না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে। যুদ্ধ না করিয়া দুর্গ ত্যাগ করার অপেক্ষা মৃত্যুই শত সহস্র গুণে শ্রেয় ও বাঞ্ছনীয়!" তিনি আরও বলিলেন, "যদি

গোয়ালিয়রের জৈন-ভাস্কর্য্য

সত্য থাকে তাহা হইলে ধর্ম্মও থাকিবে, আর যদি ধর্ম্ম থাকে তাহা হইলে প্রাণে নিশ্চয়ই ধৈর্য্য থাকিবে, আর যদি সত্য ত্যাগ করা হয় তা হইলে জীবন শুষ্ক মরুভূমিতে ঝরা ফুলের মতন বোধ হইবে!"

আর্য্যের রক্ত ফুটিয়া উঠিল—তিনি ক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। আল্‌তামাসও কালহরণ করা অসমীচীন বিবেচনা করিয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। যখন সকলে যুদ্ধে মত্ত—সেই অবসরকালে আল্‌তামাশ অশ্বের উপর চাপিয়া দুর্গের অবস্থা দেখিবার জন্য দুর্গের চতুর্দ্দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিতে বাহির হইলেন। যে স্থানে বর্ত্তমান ঝিল্‌মিলি-কুয়া অবস্থিত, সেই স্থানে দেয়াল একটু কাঁচা দেখিয়া ফৌজ সহ ভিতরে প্রবেশ করিলেন ও রাজপুত-দিগকে সহসা আক্রমণ করিলেন। রাণা সারঙ্গদেব তাঁহার গতিরোধার্থে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হইল না। রাণা যখন দেখিলেন বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাকে ত্যাগ করিবার আয়োজন করিতেছেন, তখন তিনি শেষ বিদায়ের জন্য রাজ্ঞীদিগের নিকট গমন করিলেন। রাণাকে দেখিয়া তাঁহার প্রিয়তমা রাণীরা কর যুক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রথমে আমাদের চিরগৌরব জহরযজ্ঞে প্রাণাহুতি দিতে দাও, তাহার পর তুমি যুদ্ধে যোগ দিও।"

গোয়ালিয়র দুর্গের পথে ভাস্কর্য্য—ত্রিশালী ও তাঁহার পুত্র

যে স্থানে তাঁহাদের এই মধুময় করুণ স্মৃতি গাঁথা রহিল তাহার নাম হইল "জহরকুণ্ড" তাহা এখনও বর্ত্তমান।

যখন সারঙ্গদেব দেখিলেন যে, আল্‌তামাশের আর সাধ্যও নাই যে রাজ্ঞীদিগের কেশাগ্রও স্পর্শ করেন, তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে নিজের দেড় সহস্র সৈন্য সহ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। উভয়পক্ষের সেনাদল পরস্পরের সম্মুখীন হইলে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আল্‌তামাশের সৈন্য সংখ্যায় অধিক ছিল; সেই সৈন্য-সমুদ্রের মধ্যে রাণার দেড় সহস্র সৈন্য জলবুদ্‌বুদের মত কোথায় মিশিয়া গেল। রাণা সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। আল্‌তামাশ দুর্গ অধিকার করিলেন। সেই সন্ধ্যায় একটি মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইল; বিজয়ী মুসলমান সকলে মিলিয়া খোদার কাছে আনন্দ-গান গাহিলেন।
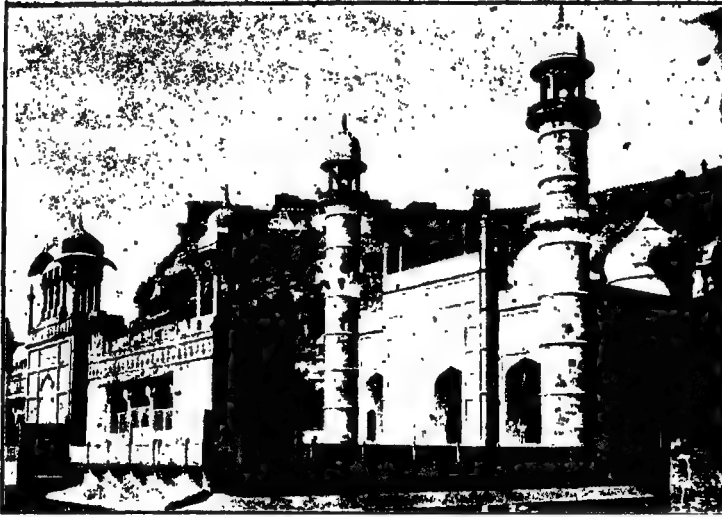
গোয়ালিয়রের মস্‌জিদ্—অউরঙ্গজেবের সময়ে মোতমিদ্ খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

দুর্গে মাত্র দুইটি তাল বা পুষ্করিণী—'সুরজকুণ্ড' 'গঙ্গোলতাল'—দেখিয়া সম্রাট্ দুর্গের বাহিরে অনেকগুলি তাল ও কূপ খনন করিয়া স্থানটি অতি সুরক্ষিত করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া দিলেন; ভবিষ্যতে যুদ্ধের সময় যাহাতে কখনও জলাভাব না ঘটে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঐসব জলাশয় করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের উরবাহি দরজা ও উচ্চ প্রাচীর তাঁহারই রাজত্বকালের পরিচয় দিতেছে। এইসব পুষ্করিণী ও কূপের জল এমন ঠাণ্ডা যে অতি গ্রীষ্মকালেও বরফের মত থাকে। জল অতি সুস্বাদু।

বাদ্‌শাহ্ দরবারের মীর নিয়াকুব নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি "গোয়ালিয়র দুর্গের" কিলেদার নিযুক্ত হইলেন। দিল্লী প্রত্যাগমনের দশ মাস পরে আল্‌তামাশ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ফিরোজ ও তাঁহার পর অন্যান্য সুল্‌তান দিল্লী-সিংহাসন পূর্ণ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু কেহই আর নিজেদের প্রতিনিধি দুর্গে পাঠাইলেন না। তজ্জন্য মীরনিয়াকুবের বংশধরেরাই বেশ আনন্দে দুর্গের কিলেদার হইয়া রহিলেন। যে-সময় আলাউদ্দীন ভারতের ভাগ্য-বিধাতা ছিলেন, সেই সময় দুইজন রাজপুত ভ্রাতা —পরমলদেব ও অধরদেব—সম্রাটের শরীররক্ষক সিকন্দর খাঁর অধীনে অন্যতম সেনানী ছিলেন। সম্রাট্ নিজের মহলে পদচারণ করিতে করিতে সহসা একটি খিড়কীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন ও বাহিরের দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। বাহিরে তখন চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধ ও নিঃঝুমের পালা, সকলেই নিদ্রায় অভিভূত শুধু দুইজন মহল-রক্ষক প্রহরায় নিযুক্ত।

সম্রাট্ তাহাদিগকে নিকটে ডাকিলেন ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন দুইজনকেই রাজপুত বলিয়া জানিলেন তখন হিন্দুদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান দেখিয়া সাতিশয় মুগ্ধ হইলেন, প্রীত হইলেন। তিনি আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের বলিলেন, "যাহা কিছু তোমাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে প্রকাশ কর, যেমন করিয়াই হউক পূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।" দুই ভ্রাতা তখন নিজেদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিলেন, তাঁহাদের পুত্র কন্যা সব গৃহাভাবে জঙ্গলে দিন-যাপন করিতেছে। বীর রাজপুতদিগের মতন নিজেদের বক্তব্য শেষ করিয়া পরিশেষে তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন যেন তাঁহাদের থাকিবার জন্য "গোয়ালিয়র দুর্গ" পারিতোষিক-স্বরূপ দেওয়া হয়। সুল্‌তান জবাব দিলেন, "কাল দরবারে তোমরা নিজেদের প্রার্থনা জানাইও—আমি পূর্ণ করিব।" পর দিবস মহানুভব সম্রাট্ তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন, দুই ভ্রাতা নিজেদের কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার পাইলেন।

তাঁহারা সম্রাটের আজ্ঞা দুর্গেশ্বর সৈয়দের নিকট আনিলেন—কিন্তু সৈয়দ সম্রাটের কথা গ্রাহ্য করিলেন না। ইহাতে তাঁহারা আশাহত হইলেন না। পার্ব্বত্য দুর্গ জয় করা অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহারা কৌশলে সৈয়দকে বন্দী করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং তদুদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই একটি বৃহৎ ভোজে সৈয়দকে পরিবারবর্গ সহ নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। খাদ্যের সহিত তাঁহারা মাদক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সৈয়দবংশের সম্মুখে পরিবেষণ করিলেন; তাঁহারা আনন্দের সহিত শেষ নিশির ভোজ

খাইয়া সব আপন আপন নির্ব্বাচিত তাঁবুতে শয়ন করিলেন। সেই নিশীথ যামিনীর ঘন অন্ধকারের মধ্যেই সকলকে হত্যা করিয়া ফেলা হইল। এক গায়ক সৈয়দের ভক্ত ছিল—সে এই দুঃখবারতা প্রচার করিয়া দিল। তড়িৎগতিতে এই শোক-সমাচার দুর্গে প্রবাহিত হইয়া সকলের হৃদয়-আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—তৎক্ষণাৎ সৈয়দের সৈন্য যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। রাজপুতের চেষ্টা ব্যর্থ হইল তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন বুঝি দুর্গের সৈন্যেরা তাঁহাদের চাতুর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়াছে, কিন্তু এখন দেখিলেন দুর্গের রুদ্ধ কপাট উন্মোচন করা তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য! তাঁহারা প্রথমে ভাবিয়াছিলেন সৈয়দের কোন আত্মীয় দুর্গ রক্ষা করিতেছে। কিন্তু পরে সমস্ত মর্ম্ম অবগত হইয়া গায়ককে পাঁচটি মাত্র গাঁ দিয়া বশ করিয়া দুর্গ নিজেদের অধীনে আনিলেন।

এই বংশের পাঁচজন রাজা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন না। ষষ্ঠ ডুঙ্গরসিং ভাস্কর্য্য অতিশয় ভালবাসিতেন। ডুঙ্গর-সিংহের সময় "গোয়ালিয়র" ভাস্করকার্য্যে অতি উচ্চে উন্নীত হয়। তাঁহারই সময়ে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত-মূর্ত্তিসকলের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। সমস্ত মূর্ত্তি অতি নিপুণতার সহিত খোদিত হইয়াছে—সর্ব্বত্রই সূক্ষ্ম-শিল্পের পরিচয় জাজ্বল্যমান। এখন বটে প্রায় সব মূর্ত্তিরই হস্তপদাদি ছিন্ন—দেখিলে মনে হয়- যেন, কোন ধর্ম্মদ্বেষী ব্যক্তি পরধর্ম্মের নির্য্যাতন করিবার জন্য মূর্ত্তিগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়াছে; কিন্তু যতই বিকৃত করুক— ঐসব মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ প্রাচীনকালের শিল্পসৌন্দর্য্য প্রকটিত করিয়া অদ্যাপি সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। বর্ত্তমান 'গণেশ দরওয়াজা'ও তাঁহারই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিসিংহ (অথবা করুণসিংহ) একটি অতি বৃহদাকার পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত "কীর্ত্তিমন্দির" এখনও তাঁহার স্মৃতি সজাগ রাখিয়াছে। কীর্ত্তিসিংহের পুত্র কল্যাণমল্ল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিশ্ব-বিশ্রুত রাজা মানসিংহ দুর্গেশ্বর হইলেন। তিনি সুন্দর-কারুকার্য্য-খচিত মন্দির ও অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য চির-প্রসিদ্ধ। ইঁহারই সময়ের "গুর্জ্জরীমহল" ও "মানমন্দির" অতীত গৌরবের পরিচয় দিতেছে। এই "মানমন্দিরের" ভিতরের প্রাচীরগাত্রে তিনটি গুপ্ত পথ ছিল, এখন তাহা গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তোরণ ও প্রাচীরের কারুকার্য্য পরস্পর পরস্পরের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক এবং সর্ব্বাংশে চিত্তরঞ্জক। নিম্নতলা সব পর্ব্বত কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন তাহা অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। দুতলার নিম্নে একটি দালানের কেন্দ্রস্থলে চতুষ্কোণাকার একটি কুণ্ড আছে—শুনিতে পাওয়া যায়—তাহাতে পূর্ব্বে কেশর গোলা হইত। "গুর্জ্জরীমহল" সম্প্রতি পুরাদ্রব্যশালায় পরিণত হইয়াছে।
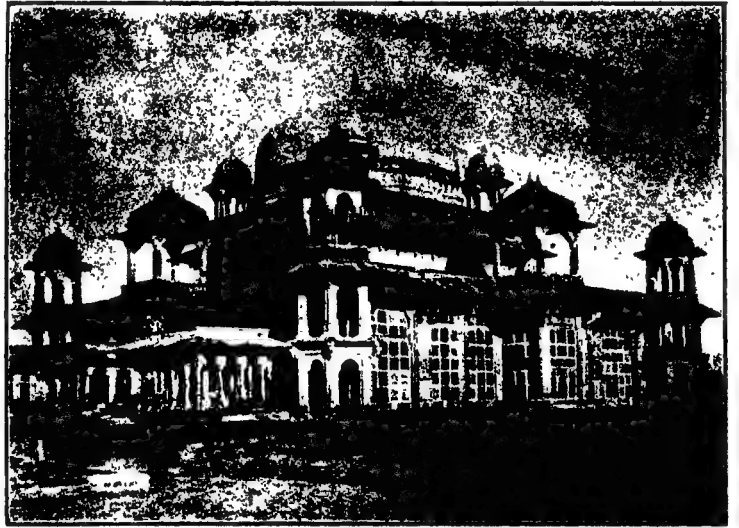
গোয়ালিয়রের মহম্মদ ঘৌসের সমাধি

রাজা মানসিংহ অতিশয় আমোদপ্রিয় ছিলেন। তিনি অনেকগুলি দুর্গ জয় করিয়া নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। একদা তিনি মৃগয়া-অভিপ্রায়ে বাহির হইলেন। ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে একটি পল্লীতে অকস্মাৎ তিনি রূপের ডালি একটি যুবতীকে
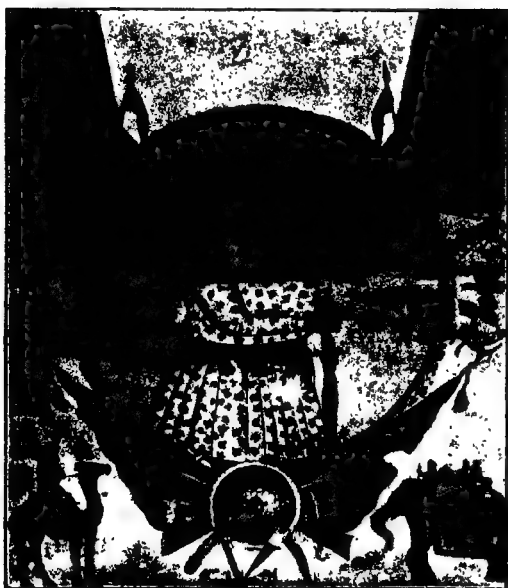
খণ্ডেরাও হরি, সিন্ধিয়ার প্রথম দুর্গের সেনাপতি

দেখিতে পাইলেন। তিনি মুগ্ধ হইয়া সেই যুবতীকে বিবাহ করিলেন। "গুর্জ্জরীমহল" তাঁহারই বাসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা মানের প্রিয়তমা রাণীর নাম ছিল মৃগণীলা; তাঁহারই নামের "রাণীতাল" এখনও বিদ্যমান আছে।

এই তোমোর-বংশীয় রাজার অধীনে যখন দুর্গ ছিল সেই সময় একবার মালবাধিপতি হোসেন শাহ (১৪২৪ খৃষ্টাব্দে) দুর্গ আক্রমণ করেন, কিন্তু বিফলযত্ন হইয়া ফিরিয়া যান। রাজা মান যখন উষার অরুণ-কিরণের ন্যায় সিংহাসনের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিলেন—সেই সময় দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন সুলতান বহলোল লোদী। তিনি কাল্পী জয় করিয়া ঢোলপুরের নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া গোয়ালিয়র-দুর্গেশ্বর মানকে নিজের দরবারে ভেট সহ হাজির হইতে বলিলেন। তাঁহার তাম্বু নিকটেই খাটান ছিল। তবুও রাজা মান স্বয়ং উপস্থিত হইলেন না—শুধু ৮০ লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিলেন। এ অপমানের অগ্নি বহলোলের পুত্র সিকন্দর লোদীর মনে অহরহ জ্বলিতেছিল; তিনি সিংহাসনে আসীন হইয়াই আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া বিপুল সৈন্যবাহিনী সহ দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও দুর্গটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। রাজা মান এই বিপুল সেনা-বাহিনীর বেগ প্রতিরুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া বহু ধনরত্ন দিয়া লোদী সম্রাট্‌কে শান্ত করিলেন।

ইঁহাদেরই সমৃদ্ধবংশে রাজা বিক্রম সর্ব্বশেষ রাজা ছিলেন। তিনি রাজা মানের পর সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন—তাঁহারই সময় ইব্রাহীম লোদীর সহিত তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাজা বিক্রম তাহাতে পরাভূত হইয়াছিলেন। ইব্রাহীম লোদী নিজের সেনাপতি আজিম হুমায়ূনকে "গোয়ালিয়র দুর্গের" প্রতি অভিযান করিবার আজ্ঞা দেন। হুমায়ূন আসিয়া "বদলগড়" গেটের

গোয়ালিয়র পর্ব্বতের পদতলে সিন্ধিয়ার প্রথম দুর্গের সেনাপতি খণ্ডেরাও হরি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কোটেশ্বর মন্দির

নিকট কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করিয়া আগুন ধরাইয়া দিলেন। অতি কষ্টে তিনটি ফাটক নিজেদের অধিকারে আনিয়া তাঁহারা চতুর্থের প্রতি অগ্রসর হইলেন—কিন্তু সহসা তাঁহাদের এক সেনাপতির মৃত্যু হওয়াতে সকলে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা বিক্রমও অধিক দিন যুদ্ধ পরিচালনা
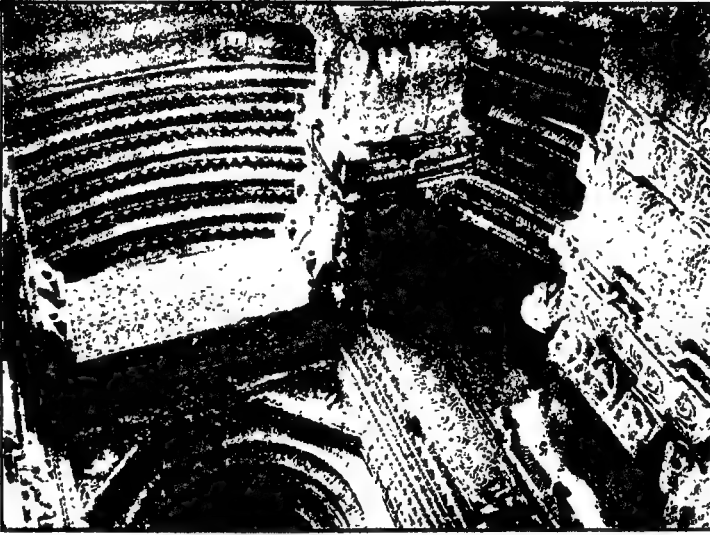
গোয়ালিয়রের বড় শাসবহুর মন্দিরের ভিতরের গুম্বজ ও ছাদ

করিবার অক্ষমতা দেখিয়া স্বেচ্ছায় হুমায়ুনের নিকট আসিয়া বন্দী হইলেন। তিনি বন্দীকে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন।—লোদী রাজার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যত্ন করিয়া পরগনা শমসাবাদ তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে দান করিলেন। আজীম হুমায়ুন দুর্গাধিপতি নিযুক্ত হইলেন। হিন্দুদিগের সৌভাগ্যসূর্য্য আবার দুর্গ হইতে অপসারিত হইল। মাঝে কেবল একবার মাত্র বিদ্যুৎ-প্রভার ন্যায় ক্ষণকালের জন্য দুর্গ-প্রাকারে মহারাট্টাদিগের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল; পরে পেশওয়াদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালিয়র দুর্গ হইতে স্বাধীনতা-সুন্দরী চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইলেন! রাজা পরমলদেব হইতে বিক্রম অবধি দশটি তোমোরবংশীয় রাজা ক্রমে ক্রমে ২০৫ বৎসর গোয়ালিয়র দুর্গের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

দিল্লীর সম্রাট্ সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন—এবং পরিশেষে সকলের উপর হইতে তিনি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন। আজীম হুমায়ুনকে সন্দেহবশতঃ হত্যা করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া হুমায়ুনের পুত্র সলেমখাঁ দুর্গ ত্যাগ করিয়া কাবুলে পলায়ন করিলেন ও সেখানে বাবরের সহিত যোগ দিলেন। অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বর্দ্ধিত হইল—লোদী বংশের প্রতাপ-বহ্নি আর অধিক দিন প্রজ্বলিত থাকিতে পারিল না। পাণিপথে যুদ্ধ হইল—বিজয়লক্ষ্মী বাবরকে অভ্যর্থনা করিলেন। সম্রাট্ ইব্রাহীম ও গোয়ালিয়রের ভূতপূর্ব্ব রাজা বিক্রম চিরদিনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বীরশয্যায় শয়ন করিলেন, তাঁহার

গোয়ালিয়রে বড় শাসবহু মন্দিরের থাম ও দরজা
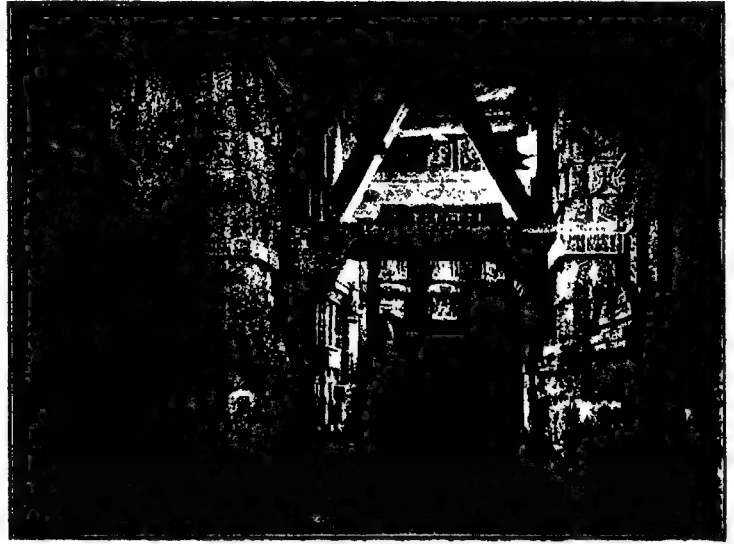
সঙ্গীরাও অনন্তকালের বক্ষে মাথা লুকাইলেন। বিজয়ী বাবর দিল্লী পৌঁছিয়াই রহীমদাদ্ খাঁকে দুর্গের ভার লইবার জন্য পাঠাইলেন। সে সময় লোদী দরবারের তাতার খাঁর অধীনে দুর্গ ছিল।

কিছু দিন পরে রহীমদাদ খাঁ সম্রাটের কুদৃষ্টিতে পড়িলেন; তিনি দুর্গের ভার নিজের অনুগত বন্ধু

পরমোকুন্দের স্কন্ধে চাপাইয়া মালবে পলাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সহসা সে কাজে বাধা পড়িল—একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ (ফেকীর) মহম্মদ গোশ গোয়ালিয়রে আগমন করিলেন। তাঁহাকে সম্রাট্ হইতে সকলেই মান্য ও ভক্তি করিতেন। রহীমদাদ খাঁর আর পালান হইল না—তিনি গোশ সাহেবের সেবায় মন দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের কৃপাদৃষ্টিও লাভ করিলেন। তাঁহার পর আবতুল ফতেহ "কিলেদার"নির্ব্বাচিত হইলেন। তাঁহারই সময় সম্রাট্ বাবর দুর্গে ভ্রমণ করিতে আসিলেন। গঙ্গোলা তালের

গোয়ালিয়রের ছোট শাস্‌বহুর মন্দির
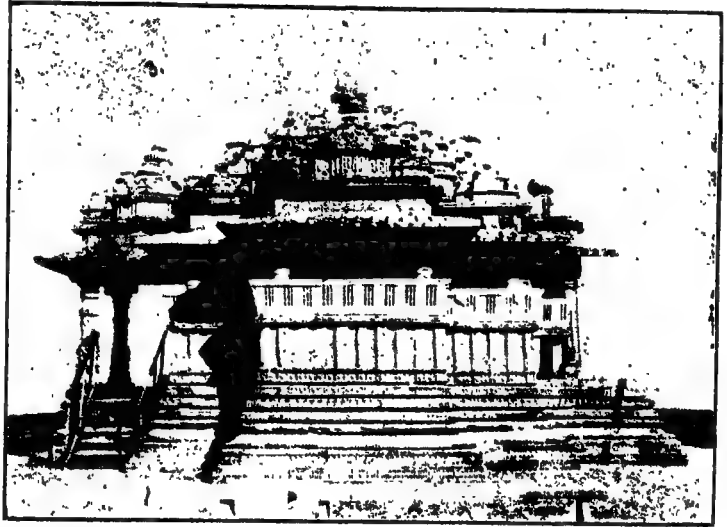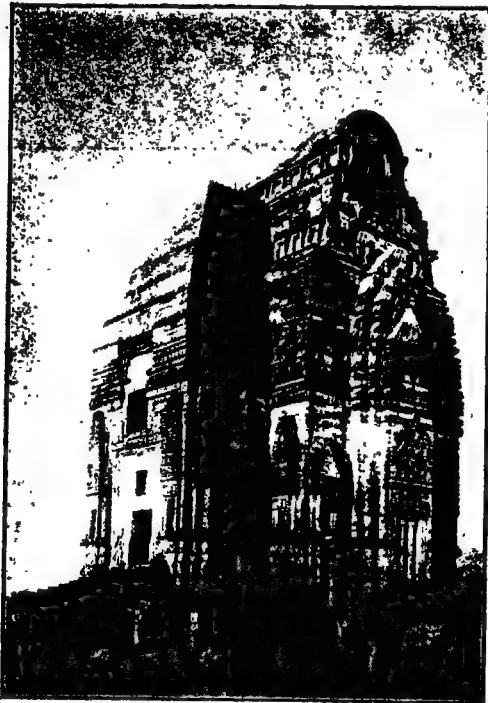
গোয়ালিয়রের তেলীর বা তৈলাঙ্গনা মন্দির

নিকট তিনি একটি বৃহৎ উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া পশুদিগের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুর্গে থাকিবার কালে তিনি একবার কানের যন্ত্রণায় ভুগিতে-ছিলেন। মহম্মদ গোশ সম্রাটের কর্ণ-কুহরে মন্ত্র ফুঁকিয়া সব জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন। বাবর গোয়ালিয়র পরিত্যাগ করিয়া আগ্রার দিকে রওয়ানা হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই হুমায়ুন দুর্গে পদার্পণ করেন ও "হুমায়ুন-মন্ধর" প্রস্তুত করাইয়া নিজের নামটি চিরদিনের জন্য দুর্গের সহিত জড়াইয়া গেলেন।

শেরসাহার সহিত সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া হুমায়ুন বহুকষ্টে জীবন লইয়া পলায়ন করেন। শেরসাহা তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন ও কিছুদিন পরেই দুর্গে নিজের পদধূলি দিলেন। "শের-মন্ধর" তাঁহারই আজ্ঞায় প্রস্তুত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র জমালের মৃত্যু এই দুর্গেই ঘটিয়াছিল।

সম্রাট্ আদিল খাঁর সময় দুর্গের শাসনভার সুরবলি নামক এক দাসের উপর ন্যস্ত হয়। আদিলশাহ লোদীর প্রাণত্যাগ করিবার পরে ও হুমায়ুন দিল্লী পুনরধিকার করিবার পূর্ব্বে ভারতে চতুর্দ্দিকেই কিছুকালের জন্য অরাজকতা ছিল। হুমায়ুন আসিয়া শাসনদণ্ড নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন—তাহার পর সব শান্ত হইল। বিশ্ববিশ্রুত সম্রাট্ আকবরের সময়ও সুরবলি দুর্গাধিপতি ছিলেন। সেই সময় রাজা বিক্রমের পুত্র

রাও রাজা স্যার্ দিনকর রাও সিন্ধিয়ার মন্ত্রী

স্যার্ মাধো রাও সিন্ধিয়া

রামসহায় কিছু রাজপুত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নিজের লুপ্ত রাজত্বের পুনরুদ্ধারের আশায় দুর্গে চড়াই করিলেন। আক্‌বরের এক সেনাপতি কেয়া খাঁ সৈন্য সহ আসিয়া পৌঁছিলেন, রামসহায় ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পলায়ন করিলেন; দুর্গ আক্‌বরের হাতে পড়িল। আক্‌বর ও তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাটেরা যে সময় হইতে দিল্লী সিংহাসনের শোভা-বর্দ্ধন করিয়া আসিয়াছেন সেই সময় হইতেই তাঁহাদের অধীনস্থ "কিলেদার" গোয়ালিয়র দুর্গে অবস্থান করিয়া শাসনকার্য্য পর্য্যালোচন করিয়াছেন।

আক্‌বরের পঞ্চদশ বৎসরের রাজত্বকালে কয়া খাঁ, আল্লা খাঁ, সৈয়দ খাঁ, রাজা অসকর্ণ ও তাঁহার পুত্র রাজা রাজসিংহ পরে পরে গোয়ালিয়র দুর্গের "কিলেদার" ছিলেন। জাঁহাঙ্গীরের সময় দ্বাবিংশতি বৎসরের মধ্যে আটজন প্রতিনিধি ক্রমে দুর্গ শাসন করিয়াছিলেন—শেখবাবা, নসীরউল্লা, এন্নার খাঁ, সুজাত খাঁ, মহব্বত খাঁ, হরনারায়ণ ও তাতার খাঁ।

মহব্বত খাঁ নিজের শাসনকালে জাঁহাঙ্গীরের নিকট একটি লিপি এই মর্ম্মে পাঠাইলেন যে তাঁহাদের "দুশ্‌মন" শের শাহর "শের-মণ্ডর" হুমায়ুন-মণ্ডরের অপেক্ষা অধিক সুন্দর ও মূল্যবান্। সম্রাট্ তাহা পড়িয়া আজ্ঞা দিলেন—যেন "শের-মণ্ডর" চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে সেইসব জিনিষের সাহায্যে একটি সুদৃশ্য "জাঁহাঙ্গীর-মণ্ডর" নির্ম্মাণ করান হয়। এই মহলটি দুর্গেশ্বর হরনারায়ণের পর্য্যবেক্ষণে তৈয়ার হইয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী "কিলেদার" তাতার খাঁ বিদ্বান্ ও সাধুভক্ত ছিলেন।

সম্রাট্ শাহাজাহানের সময় সৈয়দগণ এই দুর্গের "কিলেদার" নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সৈয়দের বীরত্বের প্রশংসা আমরা মুসলমান ঐতিহাসিকের নিকট খুব পাই। সৈয়দ মুজফ্‌ফার, সৈয়দ আলম, মীরনি সৈয়দ ও সৈয়দ মহব্বত খাঁ এই চারিজন মাত্র কিলেদার শাহ জাহানের সময় দুর্গে প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন।

ঔরঙ্গজেব খাজা আবদুল্লাখাঁকে দুর্গে পাঠাইলেন। সেই সময় এস্থানে চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ পড়িয়াছিল। খাজা

ঝাঁসীর রাণীর সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ

আবদুল্লা নিজের কর্ত্তব্য-বোধে—সরকারী ব্যয়ে 'সরাই' ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া—সব জিনিষের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যাহার যাহা প্রয়োজন হইত সময়ে সব পাইত। তিনি মাত্র দুই বৎসর দুর্গাধিকারী ছিলেন। পরে মোতাম্মিদ খাঁ তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইলেন। তিনি নিজের সাতবৎসরের শাসনকালে 'আলমগীর' গেট ও একটি রমণীয় 'মস্‌জিদ' প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই মস্‌জিদটি গোয়ালিয়র-তোরণের সন্নিকটে—দুর্গের বাহিরে—সংস্থিত। বর্ত্তমান মুরাবাদের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন ইনি। তাঁহার পর আসিলেন খিদ্‌মৎগর্ খাঁ—তিনি নিজের নামের উপযুক্ত লোক ছিলেন। সম্রাটের 'খিদ্‌মৎ' তিনি যেমন করিয়াই হউক করিতেন। তাঁহারই সময় 'গোয়ালিয়র দুর্গে' দারা শিকোহ, সুল্‌তান মহম্মদ ও মোরাদ বন্দীরূপে আসিয়াছিলেন। মোরাদকে 'মান-মন্দিরের' নিম্নতলার একটি অন্ধকার গৃহে বন্দী রাখা হয়। সে স্থানে মানুষ পাঁচ মিনিট থাকিতে পারে না—ভয়ে গা শিহরিয়া উঠে—গরীব মোরাদের অবস্থা মনে করিয়া দুই চোখ ফাটিয়া জল আপনিই গণ্ড বহিয়া নামিয়া আসে! খিদ্‌মৎগর্ খাঁ যাইবার সময় নিজের সঙ্গে দারা ও মহম্মদকে লইয়া গেলেন—আর সম্রাটের আজ্ঞামত তাঁহার স্নেহের ভাই হতভাগ্য মোরাদের সমাধি এখানেই নির্ম্মিত হইল! খিদ্‌মৎগর্‌খাঁ নিজের অবস্থানকালে বড় বেশী অত্যাচার করিয়াছিলেন—সকলেই তাঁহার ভয়ে শঙ্কিত থাকিত। তাঁহার স্থান পূর্ণ করিলেন মনোবর খাঁ, তিনি সকলের দুঃখমোচনের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। পরে সহসা তাঁহার জায়গায় সম্রাট্ নবাব সায়েস্তা খাঁকে পাঠাইলেন। পরে তাঁহাকে ডাকিয়া—বসন্ত শাহকে দুর্গের 'কিলেদার' পদে নিযুক্ত করিলেন।

ঔরঙ্গজেবের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে মোগলের বিশ্ব-বিখ্যাত বিপুল সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল—

তবুও মহম্মদ শাহ অবধি সম্রাট্‌গণ কিছুকাল তাল সাম্‌লাইয়াছিলেন। বসন্ত শাহর মৃত্যুর পূর্ব্ব অবধি তাঁহার স্কন্ধে রাজকার্য্য পরিচালনের ভার সমর্পিত ছিল। তিনি যখন লীলাসম্বরণ করিলেন—তাঁহার ভ্রাতা কসোর আল্লি খাঁর হাতে দুর্গের ভার ন্যস্ত হইল। তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন—তাঁহার সমাধি গোহাদের নিকট নির্জ্জন স্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরই সময় মোগলের সৌভাগ্যসূর্য্য একেবারে অস্তগমনোন্মুখ হইল—সেই সুযোগে 'গোয়ালিয়র দুর্গ' আবার স্বাতন্ত্র্য লাভের অবসর প্রাপ্ত হইল।

তৈমুরলঙ্গের বংশধরেরা ভারতবর্ষে এতদিন রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন,—মহম্মদ শাহর সময়ে সাম্রাজ্য একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। মহারাট্টা জাতি সমস্ত ভারতবর্ষে আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন। দক্ষিণ হইতে বিঠ্‌ঠল রাও বিনচুরকর আসিয়া শেষ কিলেদারকে পরাজিত করিয়া "গোয়ালিয়র দুর্গ" নিজেদের অধিকার-ভুক্ত করিলেন।

"কিলেদার" কসোর আলি খাঁ যখন দেখিলেন মহারাট্টাদিগের গতিরোধ করা দুঃসাধ্য—তিনি তখন গোহাদের রাণা ভীমসিংহের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। প্রায় আড়াই মাস কাল যুদ্ধ হইল। রাণা পরাভূত হইলেন—দুর্গে মহারাট্টাদিগের গৈরিক-বিজয়-পতাকা সর্ব্বপ্রথম উড্ডীন হইল। বিনচুরকরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গোবিন্দশ্যাম নিজের পিতারই ন্যায় সুশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় সকলেরই মনে আঘাত লাগিয়াছিল। গোবিন্দশ্যাম পূর্ব্বে দক্ষিণের সুবাদার ছিলেন। তাঁহার পর নৃসিংহ রাও পেশওয়ার প্রতিনিধিস্বরূপ দুর্গে রহিলেন। তাঁহার বিখ্যাত পুত্র রঘুনাথ রাওয়ের সময় দুর্গ গোহাদের রাণা ছত্রপতি দ্বারা অবরুদ্ধ হয়।

ছত্রপতি সিংহকে ভারতবর্ষে প্রায় সকলেই বিশেষ-রূপে জানিত—তাঁহার সহিত মহারাট্টাদিগের বহুদিন বৈরীভাব চলিয়া আসিতেছিল। রঘুনাথ রাওয়ের সহিত তাঁহার প্রায়ই যুদ্ধ হইত। তিনি প্রায় আড়াই মাস কাল দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখেন, কিন্তু দুর্গের তোরণ অবধি পৌছিতে আর পারিলেন না। অবশেষে তিনি ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পলায়ন করিলেন ও ইংরেজ-দিগের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। বাপুজী হোল্‌কার নামীয় এক পেশওয়ার সেনাপতি মহারাট্টাফৌজ সহ আসিয়া দুর্গাধিপতির সহিত যোগ দিলেন। যুদ্ধ হইল, মহারাট্টাগণ পরাজিত হইল, রাণা ইংরেজ সহ জয়ী হইলেন। ইংরেজ (বিক্রম অব্দ ১৮৩৩ শ্রাবণ মাস—ত্রয়োদশীর নিশীথে)—সেনাপতি পোফামের সাহায্যে দুর্গ জয় করিলেন।

"গোয়ালিয়র-নামা" এইখানে শেষ হইয়াছে।

একাদশ মাস অবধি দুর্গ নিজেদের অধিকারে রাখিয়া গোহাদের রাণাকে সেনাপতি পোফাম দুর্গ প্রত্যর্পণ করিলেন। ইংরেজ পেশওয়া মহাদজী সিন্ধিয়াকে পুরস্কার-স্বরূপ দুর্গ দান করিলেন—অথচ দুর্গ তখনও রাণার অধীনে! মহাদজী সিন্ধিয়া পুরস্কার লইবার জন্য নিজের সেনাপতি-দ্বয় অম্বোজী ইঙ্গলে ও খণ্ডেরাও হরির সহিত রাণার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইল। অবশেষে অতি কষ্টে সিন্ধিয়া বিক্রম ১৮৪০ সালে দুর্গ জয় করেন। খণ্ডেরাও হরি দুর্গের সুবাদার নিযুক্ত হইলেন।

এইখানে "গোপাচলাখ্যানও" শেষ হইল।

হরির মৃত্যুর পর সিন্ধিয়া অম্বোজী ইঙ্গলেকে তাঁহার স্থানে নির্ব্বাচিত করিলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দুর্গটি সেনাপতি হোয়াইটকে ছাড়িয়া দেন। সিন্ধিয়া যখন ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন, তখন মার্‌কুইস ওয়েলেস্‌লী দুর্গটি তাঁহাকে না দিয়া গোহাদের রাণাকে দেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই নিজের ভুল সংশোধনার্থ তিনি দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে দুর্গ প্রত্যর্পণ করেন। মহারাজপুর ও পণিহারের যুদ্ধের পর দুর্গে ইংরেজদিগের অধীনস্থ সিপাহীরা অবস্থান করিত—পরে সন্ধি অনুসারে ইংরেজ দুর্গ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। *

সিন্ধিয়াবংশ বেশ নির্ব্বিবাদে দুর্গে নিজের শাসন

* শেষাংশ মূল মারাঠী গ্রন্থ "মাঝা প্রবাস" বা "১৮৫৭ সালচী বণ্ডেচী হকীকতের" সাহায্যে লেখা। এই পুস্তকটির আলোচনা 'সাহিত্যে' (আষাঢ় ১৩১৭ পৃ ১৮১ ও শ্রাবণ ১৩১৭ পৃ ২১৮) শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। —লেখক

পরিচালনা করিতেছিলেন—এমন সময় সহসা ভারতগগনে মহামেঘের সঞ্চার হইল। নিদ্রায় অভিভূত মুষ্টিমেয় ভারতবাসী এই মহাঝটিকার বজ্রনিনাদে জাগিয়া উঠিলেন—সঙ্গে ঝাঁসীর রাণীও যোগ দিলেন। রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের সহিত ইংরেজ রাজপুরুষেরা যেরূপ গর্হিত আচরণ করিয়াছিলেন,—তাঁহারা যেভাবে তাঁহার আকুল প্রার্থনাকে অবজ্ঞাকূপে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন,—গঙ্গাধর রাওয়ের পবিত্র সুহৃৎ-প্রেমের যেরূপ তাঁহারা প্রতিদান দিলেন,—তাহা দেখিয়া ক্ষোভে, রোষে, অপমানে রাজ্ঞী জর্জ্জরিত হইতেছিলেন। এই সুযোগ পাইয়া তাহা উদ্দীপ্ত হইয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিল। ইংরেজের সহিত ঝাঁসীর যে সখ্যসূচক সন্ধি হইয়াছিল, তাহা "while the sun and the moon endureth" অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়া তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু হইল ঠিক তাহার বিপরীত—লর্ড্ ডাল্‌হৌসীর বজ্র-দণ্ডের আঘাতে ঝাঁসী গঙ্গাধর রাওয়ের পত্নীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। এই অবিচারে ও অবমাননায় তিনি সাতিশয় ব্যথিত হইলেন—তাঁহার হৃদয়গত ব্যথা কেবল নয়নজলেই ধুইলেন!—কিন্তু যে অবমাননার রেখা বীরজায়া বীরাঙ্গনার হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল—তাহা শুধু জলেই লুপ্ত হইল না। অবসরমত অন্তরের সঞ্চিত গুপ্ত অনল প্রকাশ পাইল—কিন্তু হায়! এই গোয়ালিয়রে আসিয়া তিনি নিজের অনলে নিজেই ভস্মীভূত হইলেন!

ঝাঁসীর রাণী বিদ্রোহীদলের সহিত গোয়ালিয়রে পৌছিলেন। সে সময়ে সুনীতিজ্ঞ শান্তপ্রকৃতি পরিণামদর্শী সার্ দিনকররাও গোয়ালিয়রের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রণায় স্যার্ জিয়াজীরাও যুদ্ধ করিলেন—যুদ্ধে বিদ্রোহীদলের জয় হইল। সিন্ধিয়া কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রীর মন্ত্রণায় আগ্রায় পলায়ন করিলেন। বিদ্রোহীদল "গোয়ালিয়র দুর্গ" দখল করিলেন। প্রথম নিশি "ফুলবাগের" "মতি-মহলে" যাপন করিয়া দ্বিতীয় দিন তাঁহারা সহরে প্রবেশ করিলেন।

আঠার দিন মাত্র 'গোয়ালিয়র দুর্গ' বিদ্রোহীদিগের হাতে ছিল। ইংরেজ সিন্ধিয়াসৈন্য সহ গোয়ালিয়র উদ্ধারের জন্য মোরারে উপস্থিত হইলেন—নিজাম-প্রেরিত সেনাদলও তাঁহাদের সহিত যোগ দিল। এত সৈন্যের সম্মুখে রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের মুষ্টিমেয় সৈন্য ধূলিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। শেষ সংঘর্ষে ভারতের স্বাধীনতা-রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। স্যার্ হিউ রোজ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। স্যার্ রোজের ভ্রাতা লেফ্‌টেনাণ্ট্ রোজ 'গোয়ালিয়র দুর্গ' তোপে উড়াইবার সঙ্কল্পে গোলন্দাজগণকে উৎসাহ দান করিতেছিলেন, ইত্যবসরে পশ্চাৎ হইতে একটা বন্দুকের গুলি আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে লাগিল, তিনি ভূপতিত হইলেন। একদল মাত্র বিদ্রোহী অনেক দিন দুর্গ বাঁচাইয়া রাখিল—অবশেষে স্যার্ রোজ ছলে দুর্গ নিজেদের অধিকারে আনিলেন।

মহারাজ জিয়াজী রাও ফিরিয়া আসিয়া গোয়ালিয়র-রাজাসনে অধিরূঢ় হইলেন—কিন্তু দুর্গ পাইলেন না। ঝাঁসী ইংরেজদিগকে দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তিনি দুর্গ লইলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র স্যার্ মাধো রাও সিন্ধিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন—"গোয়ালিয়র দুর্গ" এখন তাঁহারই অধীনে।

ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জৈন-দর্শনে 'ধ্যান'

আস্তিক-দার্শনিক মাত্রই আত্মা, তাহার পুনর্জন্ম-বিকাশ ও মোক্ষ-যোগ্যতা কোন-না-কোনভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বৈদিক, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিনটি প্রাচীন দর্শনে আত্মা সম্বন্ধীয় নানা প্রকার বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত তিনটি দর্শন শাস্ত্রে জড় ও চেতন এই উভয় বস্তুরই অস্তিত্ব এবং তাহাদের লক্ষণ, গুণ ও পর্য্যায়াদি সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। জৈন-দর্শনে আত্মা সম্বন্ধে বিশেষ সূক্ষ্ম বিচার থাকা সত্ত্বেও তাহার মূল গ্রন্থগুলি প্রাকৃত ভাষায় রচিত হওয়ায় ও সেগুলি রীতিমত বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় তৎসম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজের জানিবার আগ্রহ ও ঔৎসুক্য থাকিলেও অনেক সময়ে তাঁহারা সফলকাম হইতে পারেন না। সুখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এই উভয় দেশেই ক্রমশঃ জৈন দর্শন-গ্রন্থসমূহ সম্পাদিত হইতেছে। যদিও অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অধিক নহে তথাপি আশা করা যায় যে অচিরে অনেক গ্রন্থই অনায়াসলভ্য হইবে এবং উক্ত দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ হইবে।

কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তি-সকল নিরোধপূর্ব্বক মনকে ঈশ্বর বিষয়ে বা অন্য কোন উচ্চ-লক্ষ্যে অভিমুখী করতঃ চিন্তা করাকে সচরাচর ধ্যান বলে। বস্তুতঃ যে কোন বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতাই ধ্যান। জৈন মতে এই ধ্যান পূর্ব্বোক্তরূপ কেবল ঈশ্বরারাধনাদি বিষয়ে নিয়োজিত না হইয়া নানা প্রকার হীন-বিষয়েও হইতে পারে। সুতরাং এই "ধ্যানকে" শুভ ও অশুভ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং শুভ-ধ্যানই ক্রমশঃ উন্নত হইয়া শুক্ল-ধ্যানে পরিণত হয়।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে জৈন-দর্শনের ধ্যান সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করাও সম্ভবপর নহে, তবে নাম মাত্র যাহা বলা হইবে তাহা বুঝিবার জন্য জৈন-দর্শনে আত্মার স্বরূপ কিরূপ বর্ণিত আছে তাহা জানা আবশ্যক। তজ্জন্য প্রথমে আত্মা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত অবতারণা করা হইল।

বেদান্তাদি অন্যান্য দর্শনে পরমাত্মা জীবাত্মা হইতে পৃথক্। কিন্তু জৈন-দর্শনে অন্যরূপ—যাহা জীবাত্মা তাহাই পরমাত্মা। বেদান্ত-মতে প্রত্যেক জীবাত্মাই পরমাত্মার বিকাশ-মাত্র। ইহাতে জীবাত্মার অধিকারী জীবের তারতম্য-অনুসারে জীবাত্মার কোন ইতর বিশেষ হয় না। কিন্তু জৈন-দর্শনে জীবাত্মার এই অভেদ-ভাব নাই। উক্ত মতে প্রত্যেক জীবে নিহিত জীবাত্মা বিভিন্ন। এই ব্যক্তিগত পার্থক্য বাদ দিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতা বিষয়ে বেদান্ত ও জৈন-দর্শনের মত একই বলিয়া অনুমিত হইবে। যখন পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবই পরমাত্মার অধিকারী তখন তাহাদের মধ্যে মোহ ও অজ্ঞানতাদি দোষ থাকিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে জৈন-দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক জীবাত্মারই পরমাত্মা হইবার সামর্থ্য আছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সামর্থ্য প্রচ্ছন্নভাবে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা পরমাত্মা-ভাবে অনুভূত হয় না। এই বিষয় বুঝাইবার জন্য জৈন-দার্শনিকগণ আত্মার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি হইতে তাহাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা :—বহিরাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা। এই বিভাগ আত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশের ভাব ও অভাব হইতেই করা হইয়াছে। প্রথমতঃ যে আত্মা আধ্যাত্মিক বিকাশ-রহিত অর্থাৎ যে আত্মা জড়ত্বেই মাত্র আপনার অস্তিত্ব মনে করে ও যাহা জড়ের বশীভূত তাহাই বহিরাত্মা। দ্বিতীয়তঃ যে আত্মা জড়ত্ব হইতে আপনাকে পৃথক্ বিবেচনা করে ও জড়ের প্রভাবে সর্ব্বদা দলিত হয় না অর্থাৎ যাহা জড়-বিকারের ও বাসনার উপর নিজের অধিকার স্থাপন আরম্ভ করিয়াছে তাহাই অন্তরাত্মা। তৃতীয়তঃ যে আত্মা মোহ ও অজ্ঞানতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই পরমাত্মা। আত্মার এই প্রকার বিভাগের তাৎপর্য্য এই যে একই আত্মা যতক্ষণ অজ্ঞানতা ও বিকারের দাস থাকে ততক্ষণ বহিরাত্মা, আর যখন অজ্ঞানতা ও বিকারের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া

নিজের স্বাভাবিক জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করিবার প্রয়াস পায় এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হইয়া নিজের মধ্যেই আত্মার পবিত্র-মূর্ত্তি দর্শন করে তখনই তাহা অন্তরাত্মা নামে অভিহিত হয়। আবার যখন অন্তরাত্মা সাধক-দশা হইতে সিদ্ধ অবস্থায় উপনীত হইয়া পরমাত্মার ভাবকে প্রকাশিত করিতে পারে তখনই তাহার নাম পরমাত্মা। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, জীবাত্মাই আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্বারা পরমাত্মা-পদ প্রাপ্ত হয় এবং পরমাত্মা শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহার আবির্ভাব না হইলে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিকাশ না হইলে পরমাত্মা বহিরাত্মাই থাকিয়া যায়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে এই অবস্থায় কি কি সাধনের দ্বারা আত্মার আধ্যাত্মিক-বিকাশ সম্ভব হইতে পারে। ইহার উত্তরে জৈন-দর্শন-মতে প্রথম অবস্থায় আত্মা সর্ব্বদা প্রবৃত্তিতে মগ্ন থাকে এবং যখন আত্মা বাসনা ও তদুৎপন্ন আপাত-তৃপ্তিতে মগ্ন থাকে তখন আত্মার বিকাশ অসম্ভব। সেই অবস্থায় আত্মার চিন্তাকে জৈন-দার্শনিক-গণ অশুভ ধ্যান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই আত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশের অন্তরায় এবং পুনর্জ্জন্মাদি দুঃখ-রাশির বৃদ্ধিকারক। কিন্তু যখন শুভধ্যান আরম্ভ হয় তখন বহিরাত্মার ভাব ক্রমশ হ্রাস হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশের সূত্রপাত হয়। ফলতঃ জীবাত্মার শুভধ্যান অতিক্রম করিয়া শুদ্ধ-ধ্যান আরম্ভ হয়, তখনই আধ্যাত্মিক বিকাশের মাত্রা অতিশয় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে এই শুদ্ধধ্যানের পূর্ণতা হইবামাত্রই আত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে অশুভ-ধ্যান সংসার-বৃদ্ধির কারণ; শুভ-ধ্যান সংসার-হ্রাসের কারণ; এবং একমাত্র শুদ্ধ-ধ্যানই মোক্ষের কারণ। এই অশুভ-ধ্যানকে জৈন-দর্শনে আর্ত্ত ও রৌদ্র নামক বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং শুভ-ধ্যানকে ধর্ম্মধ্যান-রূপে ও শুদ্ধ-ধ্যানকে শুক্লধ্যানরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। হিংসা, হিংসা, অসত্য, কাম, বাসনা, ইষ্টবিয়োগজনিত শোক ও অনিষ্ট-সংযোগ-জনিত খেদাদি মানসিক বিকার আর্ত্ত ও রৌদ্র ধ্যানের অন্তর্গত; শাস্ত্র-চিন্তন ও তাত্ত্বিক বিচারাদি শুভ-ধ্যান ধর্ম্ম-ধ্যানের অন্তর্গত; এবং আত্ম-নিরীক্ষণ ও নির্ব্বিকল্পতাদি মানসিক ভাবগুলি শুক্লধ্যানের অন্তর্গত।

প্রাকৃত মূল জৈন সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী উভয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ধ্যান সম্বন্ধে তাঁহাদিগের গ্রন্থের নানাস্থানে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে "স্থানাঙ্গ"-সূত্র নামক তৃতীয় অঙ্গ ও "ঔপপাতিক"-সূত্র নামক প্রথম উপাঙ্গ প্রধান উল্লেখ-যোগ্য। জিনভদ্রগণিক্ষমাশ্রমণ-কৃত ধ্যান-শতক নামক প্রাকৃত গ্রন্থে, যাহা আবশ্যক-সূত্রের বৃত্তি-টীকায় পাওয়া যায়, তাহাতে, ধ্যানের সুন্দর ব্যাখ্যা আছে; তদ্ব্যতীত উমাস্বাতী-কৃত "তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্র" ও শুভচন্দ্রাচার্য্য-কৃত "জ্ঞানার্ণব" আদি গ্রন্থে চারি প্রকার ধ্যানের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। পাতঞ্জল যোগ-সূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ় এবং বিক্ষিপ্ত যে তিন ভূমিকা উল্লিখিত আছে তাহাই জৈন মতে আর্ত্ত ও রৌদ্র ধ্যান; উক্ত ভাষ্যে যে চিত্তের একাগ্রভূমিকা বলা হইয়াছে তাহাই ধর্ম্ম-ধ্যান; এবং তাহার যে নিরুদ্ধ-ভূমিকা তাহাই শুক্ল-ধ্যান। বৌদ্ধ-গ্রন্থ মজ্ঝিম-নিকায়, দীঘ-নিকায় আদি পাঠ করিলে যে ধ্যানের বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাই জৈন দর্শনের ধর্ম্ম- ও শুক্ল-ধ্যান এবং এই ধ্যানই প্রকৃত যোগ। মধ্যযুগে জৈনাচার্য্যেরা যোগের বিষয়ে যে গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যেও ধ্যান সম্বন্ধে বহুতর আলোচনা দেখা যায়। সচরাচর জৈন দার্শনিকগণ পূর্ব্বোক্ত অশুভধ্যান অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রভাবে তুচ্ছ চিন্তাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—আর্ত্ত ও ও রৌদ্র, এই আর্ত্ত-ধ্যান চারি প্রকার।

১। ইষ্ট-বিয়োগ আর্ত্ত-ধ্যান। ইষ্ট অর্থাৎ প্রিয় বস্তুর বিয়োগ-জনিত চিন্তা, শোক বিলাপাদি অর্থাৎ পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি স্বজন অথবা বন্ধু-বান্ধব-বিচ্ছেদ বা পশুপক্ষী প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী বা অন্য যে কোন বস্তু নষ্ট হইলে তজ্জন্য যে মানসিক দুঃখ ও সদাসর্ব্বদা একমাত্র তদ্বিষয়ের চিন্তা, তাহা এই আর্ত্ত-ধ্যানের বিষয়ীভূত।

২। অনিষ্ট-সংযোগ আর্ত্ত-ধ্যান। অনিষ্ট অর্থাৎ অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ বিষয়ের সংযোগ হইলে ইষ্ট-বিয়োগের ন্যায় সর্ব্বদাই তদ্গত চিন্তায় মগ্ন থাকাই দ্বিতীয় আর্ত্ত-ধ্যান।

৩। রোগ-চিন্তা আর্ত্ত-ধ্যান। শরীরম্ ব্যাধি-মন্দিরম্, অতএব এ বিষয় অনেকেই বিদিত আছেন যে শরীরে ব্যাধি উপস্থিত হইলে তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার চিন্তাই এই আর্ত্ত-ধ্যানের অন্তর্ভুক্ত।

৪। অগ্র-শৌচ আর্ত্ত-ধ্যান। ভবিষ্যৎ চিন্তাও সময় সময় এরূপ প্রবল হয় যে অন্যান্য শুভাশুভ চিন্তাকে নষ্ট করিয়া একাই আধিপত্য করে। অগ্র-শৌচ আর্ত্ত-ধ্যানের বিষয়-সংখ্যা অসীম, সাধারণতঃ কৃতকার্য্যের ইচ্ছামত ভবিষ্যতে ফল-প্রাপ্তি হইবে কি না, বিষয়-সুখ সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভবিষ্য কামনাদিতে তৃষ্ণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া চিত্তকে উপহত করিয়া জীবাত্মাকে এই অগ্র-শৌচ আর্ত্ত-ধ্যানে আবদ্ধ রাখে।

উপরি-উক্ত ইষ্ট-বিয়োগ, অনিষ্ট-সংযোগ, রোগজনিত বেদনাদি আর্ত্ত ধ্যানের বাহ্য লক্ষণ চারি প্রকারে বর্ণিত আছে। (ক) ক্রন্দনতা—চীৎকারাদি, (খ) শোচনতা—দীনতাপ্রকাশ, (গ) তেপনতা—অশ্রুবিমোচনাদি, (ঘ) পরিবেদনতা—পুনঃপুনঃ ক্লিষ্ট ভাষণাদি।

অশুভ-ধ্যানের পরবর্ত্তী বিভাগ রৌদ্র-ধ্যান। ইহাও চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১। হিংসানুবন্ধী অর্থাৎ প্রাণিঘাত অথবা বন্ধনাদি দ্বারা জীবকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার চিন্তাই হিংসানুবন্ধী রৌদ্র-ধ্যান।

২। মৃষানুবন্ধী রৌদ্র-ধ্যান। অসত্য ও মিথ্যা-কথনের ও ছল-কপটাদি অসৎ প্রবৃত্তিতে অধ্যবসায় যখন মানসিক বিচারে প্রবল থাকে সেই চিন্তাই মৃষানুবন্ধী রৌদ্র-ধ্যান।

৩। স্তেয়ানুবন্ধী রৌদ্র-ধ্যান। ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির বশে অপরের দ্রব্যাপহরণ অথবা প্রলোভনাদির দ্বারা অন্য জীবকে বঞ্চনা করিবার সর্ব্বদা চিন্তা করাই স্তেয়ানুবন্ধী রৌদ্র-ধ্যান।

৪। সংরক্ষণানুবন্ধী রৌদ্র-ধ্যান। নিজের অর্থাদি সাধন অপরের দ্বারা কোনরূপ নষ্ট না হয় ইত্যাদি মানসে অপরের অনিষ্ট চিন্তা করা এই বিভাগের অন্তর্গত।

উপরোক্ত রৌদ্র-ধ্যানের চারি প্রকার বাহ্য লক্ষণ,

(ক) ওসন্নদোষ অর্থাৎ হিংসাদি দোষে অবিশ্রান্ত প্রবৃত্তি।

(খ) বহুল-দোষ—বহুবিধ হিংসা অনৃতাদি দোষে প্রবৃত্তি।

(গ) অজ্ঞান-দোষ—কুশাস্ত্র-সংস্কার জন্য হিংসাদিতে প্রবৃত্তি;

(ঘ) আমরণান্ত-দোষ অর্থাৎ আমরণান্ত হিংসাদিতে প্রবৃত্তি।

এক্ষণে শুভ-ধ্যান অর্থাৎ যে চিত্তের একাগ্র চিন্তায় আত্মোন্নতি হয় তৎ সম্বন্ধে বলা হইতেছে—

এই শুভ-ধ্যানের প্রথমাবস্থা অর্থাৎ জীবাত্মার প্রথম বিকাশ ধর্ম্ম-ধ্যান নামে জৈন-দর্শনে অভিহিত আছে, ইহা চারি প্রকার—

১। আজ্ঞা-বিচয় ধর্ম্ম-ধ্যান। জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র এবং বৈরাগ্য ভাবনা দ্বারা বীতরাগের উক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, নিজের মতি স্বল্প, ভ্রমাত্মক কিন্তু কেবলী প্রভৃতি জ্ঞানীর উক্তি সত্য-পূর্ণ ইত্যাদি প্রকার চিন্তা করাই প্রথম ভেদ।

২। অপায়-বিচয় ধর্ম্ম-ধ্যান। অনুরাগ, দ্বেষ প্রভৃতি আশ্রব অর্থাৎ আত্মাকে কলুষিত করিবার নানা প্রকার চিত্তের বিকারগুলি ইহলোক-পরলোকের বিশেষ অনর্থ-কারী এইরূপ চিন্তা করাই দ্বিতীয় ভেদ।

৩। বিপাক-বিচয় ধর্ম্ম-ধ্যান। সাংসারিক নানা প্রকার সুখ-ভোগ ও শোক, পীড়া আদি দুঃখ ভোগ উপস্থিত হইলে তাহাতে হর্ষযুক্ত বা খিন্ন না হইয়া ভোগগুলি কেবল মাত্র পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল এইরূপ সর্ব্বদা চিন্তা করাই তৃতীয় ভেদ।

৪। সংস্থান-বিচয় ধর্ম্ম-ধ্যান। আকাশ, কাল, জীব, পরমাণু ধর্ম্মাস্তিকায় ও অধর্ম্মাস্তিকায় এই ষট্ দ্রব্যের লক্ষণ সংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বিচার ও চিন্তা করাই চতুর্থ ভেদ।

উপরোক্ত ধর্ম্ম ধ্যানের বাহ্য লক্ষণ চারি প্রকার, যথা :—

(ক) আজ্ঞা রুচি—বীতরাগ জিনের আজ্ঞা, উপদেশ ও ব্যাখ্যা নিযুক্তি প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা।

(খ) নিসর্গ রুচি—গুরূপদেশ ব্যতিরেকে তত্ত্বাদির স্বভাবতঃ জ্ঞান ও বীতরাগ ভাসিত দ্রব্যাদি তত্ত্বের নৈসর্গিক জ্ঞান।

(গ) সূত্র-রুচি—কেবলী অর্থাৎ জ্ঞানীজন-প্রণীত সিদ্ধান্ত পাঠে বা শ্রবণে শ্রদ্ধা।

(ঘ) অবগাঢ় রুচি—আগম-নিগমাদির নির্যুক্তি, ভাষ্য-চূর্ণী, টীকা প্রভৃতি বিস্তার বর্ণনায় শ্রদ্ধা।

এই ধর্ম্ম-ধ্যান রূপ সৌধে আরোহণার্থ চারি প্রকার অবলম্বনের বর্ণনা আছে। যথা :—

(ক) বাচনা—কর্ম্ম নির্জরার্থ দ্বাদশাঙ্গী প্রভৃতি সূত্রাদির দানাদি ক্রিয়া।

(খ) প্রতি প্রচ্ছনা—শাস্ত্রাদির শঙ্কা অপনোদনার্থ গুরুর নিকট জিজ্ঞাসাদি ক্রিয়া।

(গ) পরিবর্ত্তনা—সূত্রাদি পাঠের অবিস্মরণ জন্য অভ্যাসাদি ক্রিয়া।

(ঘ) অনুপ্রেক্ষা—সূত্রার্থ স্মরণ বা চিন্তন করার জন্য পর্য্যালোচনাদি ক্রিয়া।

এই ধর্ম্ম-ধ্যানের অনুপ্রেক্ষাও চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(ক) একানুপ্রেক্ষা—আমি একা অসহায় নিজ কৃত কর্ম্মকে একাকী ভোগ করিতে হইবে ইত্যাদি চিন্তা।

(খ) অনিত্যানুপ্রেক্ষা—শরীর অর্থ পরিবারাদি সমস্তই বিনশ্বর, কেবল জীবের মূল ধর্ম্মই অবিনশ্বর নিত্য, ইত্যাদি আলোচনা।

(গ) অশরণানুপ্রেক্ষা—জন্ম, জরা, মরণ, ভয়, হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র ধর্ম্মই সহায় ইত্যাদি চিন্তা।

(ঘ) সংসারানুপ্রেক্ষা—আমার আত্মা ভবভ্রমণ করিতে করিতে নানা প্রকার সম্বন্ধ, সুখ, দুঃখ, শত্রুতা-মিত্রতাদি সমস্ত অবস্থা অনুভব করিয়াছে ইত্যাদি সংসারের চতুর্গতি চিন্তা।

এই ধর্ম্ম-ধ্যানের চারি প্রকার ভাবনাও বর্ণিত আছে।

(ক) মৈত্রী ভাবনা—সর্ব্ব জীবের প্রতি সম দৃষ্টি মৈত্রীভাবের চিন্তা।

(খ) প্রমোদ ভাবনা—জীবের গুণে আকৃষ্ট হইয়া হর্ষ প্রকাশ, তৎপ্রতি প্রীতি দর্শনাদি বিষয়ে চিন্তা।

(গ) মাধ্যস্থ ভাবনা—ধার্ম্মিক পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, অধার্ম্মিকের প্রতি ক্রোধ, দ্বেষভাব ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া মধ্যস্থ ভাবে চিন্তা।

(ঘ) কারুণ্য ভাবনা—সর্ব্বজীবের প্রতি করুণা-দৃষ্টিতে অর্থাৎ কোন কারণে কোন জীবকে দুঃখী না করিবার অথবা তাহাদিগের দুঃখ দেখিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা চিন্তাই কারুণ্য-ভাবনা।

এইরূপে আত্মার বিকাশ প্রারম্ভের পর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে শুভ ধ্যানের দ্বিতীয় বিভাগ শুক্ল ধ্যান আরম্ভ হয়। শুক্ল ধ্যানের ক্রমবিকাশও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১। পৃথক্-বিতর্ক-সবিচার—প্রত্যেক দ্রব্যের উৎপাত, ব্যয় ধ্রুব এই তিন পর্য্যায়ের বিভিন্নতা চিন্তা করা, শব্দ হইতে শব্দান্তরে, অর্থ হইতে অর্থান্তরে, ও দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে ; মনোযোগ, বচন-যোগ, কায়-যোগ সম্বন্ধে এক হইতে অন্য যোগের বিষয় সংক্রমণ করা ইত্যাদি তত্ত্ব বিষয়ে গভীর চিন্তাই শুক্ল-ধ্যানের প্রথম ভেদ।

২। একত্ব-পৃথকত্ব-বিচার—উৎপাত, ব্যয়, ধ্রুবাদি পর্য্যায় স্মৃতি-পটে রাখিয়া নির্ব্বাত-স্থানে স্থিত দীপবৎ নিষ্প্রকম্পচিত্ত হইয়া সূক্ষ্ম বিচারে মগ্ন থাকাই—শুক্ল-ধ্যানের দ্বিতীয় ভেদ।

৩। সূক্ষ্ম-ক্রিয়া-অনিবৃত্তি। মনোযোগ, বচন-যোগ উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবলমাত্র কায়-যোগ সম্বন্ধ যখন অতি সামান্য থাকে,ও পূর্ব্বোক্ত বচন ও মনোযোগাতীত অবস্থায় সূক্ষ্ম চিন্তাই তৃতীয় ভেদ।

৪। ব্যুচ্ছিন্ন ক্রিয়া অপ্রতিপাতী। মন, বচন, শরীর, এই তিন প্রকারেই ক্রিয়া-বিচ্ছিন্ন হইবার পর মেরু-পর্ব্বতবৎ নিষ্কম্প অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াই আত্মার চরম-বিকাশ, ইহাই জীবাত্মার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা ও অচির-মোক্ষের কারণ-ভুক্ত বলিয়া জৈন-দর্শনে বর্ণিত আছে। ইহাই পাতঞ্জল দর্শনের নির্ব্বিকল্প-সমাধি-অবস্থা।

শুক্ল ধ্যানের লক্ষণ চারি প্রকার বর্ণিত আছে।

(ক) অব্যথা—উপসর্গাদি-জনিত ভয় অথবা চঞ্চলতাদির অভাব।

(খ) অসম্মোহ—দেবাদি কৃত মায়া-জনিত সূক্ষ্ম পদার্থ বিষয়ে মুগ্ধতার অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের জড়তার অভাব।

(গ) বিবেক—দেহ হইতে আত্মার ও আত্মা হইতে দেহের ও অন্যান্য সংযোগের বিবেচন ও চিন্তা।

(ঘ) ব্যুৎসর্গ—নিঃসঙ্গ হেতু দেহাদি উপ-করণের ত্যাগ।

শুক্ল-ধ্যানের আলম্বন চারি প্রকার, যথা :—(ক) ক্ষমা, (খ) নির্লোভতা, (গ) মার্দব—কোমলতা, (ঘ) আর্জব—সরলতা। এই-সকল আলম্বন সহায়ে আত্মা উৎকৃষ্ট-ধ্যানরূপ সৌধে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়।

শুক্ল-ধ্যানের অনুপ্রেক্ষা চারি ভাগে বিভক্ত—

(ক) অনন্ত বর্ত্তিতানুপ্রেক্ষা বা অনন্ত-বৃত্তিতানুপ্রেক্ষা। জীব অনাদি নরক তির্য্যক্ মনুষ্য দেবতাদি চারি গতিতে বহুবার ভ্রমণ করিতেছে ইত্যাদি বিবেচন।

(খ) বিপরিনামানুপ্রেক্ষা—দ্রব্যাদির বিবিধ প্রকার পরিণমনের বিবেচন।

(গ) অশুভানুপ্রেক্ষা—সংসারের অশুভত্ব অর্থাৎ জন্ম জরাদি দুঃখময় সংসারের বিবেচন।

(ঘ) অপায়ানুপ্রেক্ষা—ক্রোধ, মান মায়া, লোভাদি চারি কষায় দুঃখের মূলীভূত কারণ ইত্যাদি বিবেচন।

ধ্যানের আরও অন্য প্রকার চারিটি বিভাগ জৈন-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—(১) পদস্থ (২) পিণ্ডস্থ (৩) রূপস্থ (৪) রূপাতীত।

(১) জিনদেব-তীর্থঙ্করাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের গুণ স্মরণপূর্ব্বক পরমাত্মার চিত্তে ধ্যান করা পদস্থ-ধ্যান।

২। শরীরস্থিত নিজ আত্মায় পরমাত্মার গুণাদি চিন্তা করাই পিণ্ডস্থ ধ্যান, প্রাণায়ামাদি যোগ-ক্রিয়াগুলি এই ধ্যানের অন্তর্গত।

৩। স্থূল-বস্তুতে স্থিত হইলেও আমার আত্মা রূপ-শূন্য অনন্ত-শক্তি-ময় ইত্যাদি চিন্তাই রূপস্থ-ধ্যান।

৪। নিরঞ্জন, নির্ম্মল, সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত অভেদ চিদানন্দ অনন্তগুণ পর্য্যায়শালী ইত্যাদি আত্মস্বরূপ চিন্তাই রূপাতীত ধ্যান। এই ধ্যানই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মোক্ষের কারণভূত হইয়া থাকে।

এই প্রকারে জৈন দর্শনানুসারে ধ্যানের নামমাত্র অর্থ ও বিভাগাদি বলা হইল। ধ্যান সম্বন্ধে বহুবিধ জৈন দার্শনিক গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং আশা করি অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়াস করিলে অন্যান্য জৈন-দর্শনের তাত্ত্বিক বিষয়ের বিচার করিবার বহু সাধন প্রাপ্ত হইবেন, ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা।*

শ্রী পূরণচাঁদ নাহার

* চতুর্দ্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

প্রবাসীর আত্মকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

কতকগুলা গৃহ আমাদের সম্মুখে পড়িল। গৃহের ভিতর কি হইতেছে দেখিবার জন্য আমরা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অধিবাসীরা বাহিরে গিয়াছে; খুব সম্ভব বাজারে। কতকগুলা বুড়া ও কতকগুলি শিশু ছাড়া বড় একটা কাহাকে দেখিতে পাইলাম না। উহাদের পিছন দিকটা সমস্ত খোলা রাখিয়া উহারা লুকাইয়া ছিল; কেবল কতকগুলা শীর্ণকায় কুকুর আমাদের গা শুঁকিয়া তাহার পর লেজ নীচু করিয়া ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল।

এই দৈন্যদশাগ্রস্ত গৃহগুলা—সবই প্রায় এক রকমের। ইহাদের শুধু তিনটা পাশ আছে। লোকেরা একেবারে প্রান্তভাগে, এক প্রকার মঞ্চের উপর শয়ন করে; মাচানগুলা নল-খাগড়ার পর্দ্দা দিয়া আড়াল করা। সকলের মধ্যস্থলে, সম্মানের স্থানে, একটা বিশেষ পর্দ্দার পিছনে পারিবারিক বুদ্ধগণ একটা কুলঙ্গির ভিতর, গৃহের সমস্ত বহুমূল্য সামগ্রীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া সমাসীন; এই-সব সামগ্রীর মধ্যে আছে :—চীনীয় বা জাপানী গামলা, পর্দ্দা, ছোট ছোট কাঁসর ও ছোট ছোট হাত-ঘণ্টী।

নাবিকেরা সব দেখিতে দেখিতে, আমোদ করিতে করিতে, কোথায় ফলাদি পাওয়া যায়, কোথায় কি আছে—এই-সব সন্ধান করিতে করিতে একবার বামে, একবার ডাইনে বক্রগতিতে চলিয়াছে। উহারা হঠাৎ মুগ্ধ হইয়া কি একটা দেখিবার জন্য আমাকে ডাকিল। উহারা একজন ধনীর গৃহ আবিষ্কার করিয়াছে; উহারা বলিল, গৃহটি অতি সুন্দর।

এই ধনী-গৃহের ভিতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন; দুর্লভ কাঠের ভারী ভারী থাম ছাদের কাঠামটাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। থামগুলা অতি সূক্ষ্ম খোদাই কাজে আচ্ছন্ন। খুব ভিতর দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, বড় ফুকরওয়ালা কতকগুলা কার্ণিশ; চন্দন-কাঠের, আবলুস-কাঠের, মেহগনি-কাঠের জালি-কাজ—সোনা দিয়া বিভূষিত; তাহার পর লাক্ষার বড় বড় কাঠের কপাটের গিল্টি করা কতকগুলা উৎকীর্ণ-লিপি। ছাদের জড়ানো পাকানো কড়ি-কাঠে কতকগুলা ভাল ভাল সামগ্রী ঝোলান রহিয়াছে, যথা—ধূম-বাসিত শূকরের শুষ্ক মাংস, পিটাইয়া-চ্যাপ্টা-করা কুকুর, পেটানো পাতিহাঁস, শুট্‌কী মাছ; তাহার পর কতকগুলা অস্বাভাবিক মকল পশু,—গাছের ডালপালা দিয়া উহাদের থাবা গঠিত হইয়াছে, গাছের শিকড় দিয়া উহাদের চোখ নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপ ধনাঢ্যের গৃহে বুদ্ধের আবাসস্থান অবশ্য খুব ভাল হইবারই কথা। নাবিকেরা ২০ মিনিটের মধ্যেই এদেশের সমস্ত প্রথার সহিতও সুপরিচিত হইয়াছে; উহারা ঐ-সব বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিবার জন্য, একেবারে সিধা গিয়া মাঝখানের পর্দ্দাটা উঠাইল। মূর্ত্তিগুলা পর্দ্দার পিছনে অবস্থিত।

এক্ষণে মূর্ত্তিগুলা আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইল। উহারা বৃত্তাকারে বসিয়া আছে। সকলের গায়ে সোনা ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। যুগলমূর্ত্তিটা এক সুশিষ্ট ভিক্ষুণীর আকারে গঠিত।—ভিক্ষুণীর নিতম্বদেশ খুব উচ্চ। উহাদের চারিদিকে কতকগুলা পর্দ্দা রহিয়াছে; পর্দ্দাগুলা সবুজ ও গোলাপী রঙের ঝিনুকে আচ্ছাদিত; নীলরঙের চীনা-গামলার মধ্যে কতকগুলা ময়ূরপুচ্ছ এবং পূজার সময় লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত কতকগুলা রূপার কাঁসর রহিয়াছে।

মাথার ঝুঁটিটা সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে এইরূপ এক হাব্‌লা বৃদ্ধা আমাদিগকে মুগ্ধভাবে দেখিতে লাগিল;—মাটি পর্য্যন্ত অবনত হইয়া প্রণাম করিতে করিতে, একটা কোণ হইতে বাহির হইল। এবং করুণধরণের কতকগুলা শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল—মুখের ভাবে মনে হয় যেন আমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। এই ধনী লোকটা নিশ্চয়ই এই-সব জিনিষের অধিকারী। ৩১২ নম্বরের নাবিক ফরাসী ভাষায় উহাকে "বোঁ-জুর' বলিয়া অভিবাদন করিল। অতঃপর আমরা সেই দেবতাদের পর্দ্দাটা আবার নামাইয়া দিলাম; এবং তাহাদের আর অধিকক্ষণ উৎকণ্ঠিত না করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

বাহিরে, আবার সেই উজ্জ্বল আলোক। আমাদের মাথায় সাদা টুপি; টুপীর নীচে যেন আগুন জ্বলিতেছে। আমাদের রগ পুড়িয়া যাইতেছে এবং মাঝে মাঝে একটা গভীর বেদনা সমস্ত মাথাময় অনুভূত হইতেছে। সেই মৃগনাভির গন্ধ, সেই বিষ্ঠার গন্ধ আকাশে বিচরণ করিতেছে,—নিঃশ্বাস ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

নাবিকেরা আমার পিছনে পিছনে চলিয়াছে—পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ঢিমা চাল, এই উত্তাপে ক্রমেই উহারা অভিভূত হইয়া পড়িতেছে। যতই সূর্য্য ঊর্দ্ধে উঠিতেছে ততই উত্তাপের বৃদ্ধি হইতেছে। বালুর উপর চলিয়া নাবিকদিগের নগ্ন পা পুড়িয়া যাইতেছে—এবং মোটামোটা লতা-গুল্মের কাঁটায় পা ছিঁড়িয়া যাইতেছে।

যদৃচ্ছাক্রমে উহারা ঝোপের বেড়া হইতে মুঠা মুঠা ফুল তুলিয়া উহাদের কামিজে রাখিতেছে অথবা হাতে রগ্‌ড়াইয়া তাহার পর শিশুর ন্যায় ছুড়িয়া ফেলিতেছে। কখন-কখন, হাল্‌কা বাখারী-বেড়ার পিছনে মহিষের ধূসরবর্ণ একটা বড় মাথা দেখা যাইতেছে—তাহার স্কন্ধ প্রসারিত করিয়া আমাদিগকে আঘ্রাণ করিতেছে—নিশ্চল ও নির্ব্বোধ—তাহার আর্দ্র নাসারন্ধ্র হইতে একটা সাদা ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

তাহার পর মন্দিরের কোণে কোণে, যে-সকল চীনা-মাটির ছোট ছোট পুরাণ বিকট-মূর্ত্তি সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত, তাহারা স্বকীয় কাচ-নেত্র হইতে প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। চলিবার পথে উহারা যেন বলিতেছে, আমাদের মানুষ ও পদার্থসমূহ এবং উহাদের মানুষ ও পদার্থসমূহ—এই উভয়ের মধ্যে কি একটা গভীর অতলস্পর্শ ব্যবধান বিদ্যমান। আমরা বিভিন্ন আদিম অন্ধকার হইতে নিঃসৃত হইয়াছি—আমাদের গোড়ার উৎপত্তির মধ্যে কতই উৎকট বৈসাদৃশ্য।

আমরা আবার যখন দোকানগুলার মধ্যে, বিক্রেতাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম,—এইবার উহারা আমাদিগকে প্রত্যাগত বন্ধুর ন্যায় অভ্যর্থনা করিল। ইহা আমাদের প্রার্থনার অতীত; এবং কতকগুলা সাপেক-মুদ্রা মুক্তহস্তে বিতরণ করায় ভিক্ষুকেরাও আমাদের অনুযাত্রী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এখান হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, এই বাজারের অঙ্গন-ভূমির উপর তুরানের সবচেয়ে বড় যে মন্দিরটি অধিষ্ঠিত, সেই মন্দিরটি দেখিতে ইচ্ছা করিয়া, ঐ মন্দিরের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিলাম। জনতা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

মন্দিরটা প্রায় খালি,—ঠিক যেন পূর্ব্বদিকে সমস্ত দ্রব্য লুটপাট হইয়া গিয়াছে। কতকগুলা আনুষ্ঠানিক অস্ত্র এখনো দেওয়ালে ঝলানো রহিয়াছে; কতকগুলা পুরাকালের, জটিলধরণের অস্ত্র; ছুঁচালোতে ভরা, উহাতে দাঁত আছে—হাসি আছে; এবং সমস্ত চীনীয় সামগ্রীর মত, উহাতে পশুর আকৃতি, পশুর বিকৃত অঙ্গভঙ্গী অঙ্কিত। মাটির উপর রহিয়াছে—আতপত্র, লণ্ঠন, শব বহন করিবার নিমিত্ত দৈত্যাদানব-মূর্ত্তি-সমন্বিত ডুলী। এবং হোএ মহাশয় বিশ্বস্তভাবে আমাদিগকে বলিলেন—রাষ্ট্রনৈতিক হেতুবশতঃ বুদ্ধ, গাম্‌লা, সমস্ত বিকট-মূর্ত্তিগুলা স্থানান্তরিত করিতে গতকল্য সমস্ত দিন কাটিয়াছে—বহু দূরে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে উহাদিকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে।

ঘরের কোণে একটা প্রকাণ্ড ঢাক রহিয়াছে। উহা হইতে কিরূপ শব্দ বাহির হয় জানিতে উৎসুক হইয়া নাবিকেরা উহা বাজাইবার জন্য আমার অনুমতি চাহিল। আমিও উহার বাদ্য শুনিবার জন্য কম উৎসুক ছিলাম না। হস্তের প্রত্যেক তাড়নে শব্দ হইতে লাগিল:—বুম্! বুম্! বুম্! ভয়ানক শব্দ; কানে তালা লাগে। কি হইতেছে জানিবার জন্য সমস্ত বাজারের লোক ছুটিয়া আসিল। এবং আমাদের চারি দিকে ভয়ানক ভীড় জমিয়া গেল। এখান থেকে যাওরা যাক্, আর না।

কিন্তু উহারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। তন্মুণ্ডবলক সমস্ত ভিক্ষুকেরাই আমাদিগের প্রতি আসক্ত। যাহাদের মুখ ঘায়ে ভরা, যাহাদের গা পাঁচড়ায় আচ্ছন্ন, কতকগুলি রমণী যাহাদের নাক নাই—এই-সমস্ত লোক আমাদিগকে অনুসরণ করিতেছে, আমাদের আস্তিন ধরিয়া টানিতেছে, তাহার পর আমাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতেছে। এই প্রথম বার সাপেক-মুদ্রা বিতরণ করিতেই যত অনর্থ ঘটিল। এখন আমরা বিনা-গণনায় মুঠা-মুঠা পয়সা ছড়াইতে লাগিলাম। এ একটা হট্টগোল। উহারা আমাদিগকে বেষ্টন করিতেছে, স্পর্শ করিতেছে, আলিঙ্গন করিতেছে—নোংরা হাতে আমাদের গায়ে হাত বুলাইতেছে; আমরা খুব ঘেঁসাঘেঁসি ভাবে দল বাঁধিয়া পলাইতেছি; উহাদের স্পর্শের ভয়ে আমাদের হাত লুকাইয়া রাখিতেছি। দয়া করিতেও সাহস হইতেছে না, ঘৃণা করিতেও সাহস হইতেছে না, উহাদের দিকে তাকাইতেও সাহস হইতেছে না;—আমরা কেবল "দে-ছুট্ দে-ছুট্"! আমাদের পিছনে কেবল চীৎকারের ঘূর্ণি-পাক, আর লোকের গোলমাল।

সৌভাগ্যক্রমে এইখানেই আমাদের ডিঙ্গি-নৌকাটা আছে।—আমরা তাহার ভিতর লাফাইয়া পড়িলাম।—"ঠেলা দে"—"ঠেলা দে"। ঐ-সব জনতা তখন পিছাইয়া গেল—উহাদের গুঞ্জন নির্ব্বাপিত হইল। বাজারটা বাঁশঝাড়ের পিছনে, তীর-ভূমির পিছনে দ্রুত সরিয়া গেল। আবার আমরা প্রশান্ত জলের উপর আসিয়া পড়িলাম—স্রোতের টানে চলিলাম। যাক্ এ পালাটা সাঙ্গ হইল...

ঐ হোথায় যে সুন্দরীদিগকে প্রাতে দেখিয়াছিলাম, তাহারা এখনো তীরভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছে। এবার উহারা, আমাদিগকে আরও বেশী আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে, কতকগুলা পাতিহাঁস, ও কয়েক ছড়া কদলী আমাদিগকে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে;—দোকানদারের ভাব ধারণ করিয়াছে। যখন ইহাতেও কৃতকার্য্য হইল না তখন উহারা প্রতিশোধ লইবার জন্য, একটা বড় মুর্গীর ডিম আমাদের উপর ছুঁড়িয়া মারিল; উহা ৩১৫ নম্বর প্রথম মাস্তুলের নাবিকের পিঠে পড়িয়া চ্যাপ্‌টা হইয়া গেল।—"ওঃ! মাদাম, তুমি বড় অভদ্র!"

আমরা বড়-দরিয়ার বাঁকের মাথায় আসিয়া পৌঁছিলাম; একটা মন্দির, প্রবেশ-পথটা আগ্‌লাইয়া আছে। স্থানটি একেবারে নিস্তব্ধ, আলোকে পরিপ্লাবিত। সৈকত-ভূমির উপর, মুসব্বর-তরুর ঘেরের ভিতর প্রাচীন দৈত্যদানা-সকল অধিষ্ঠিত; আমাদের যাত্রা-পথে উহারা সেই একই রকম মুখভঙ্গী করিতেছে একই রকমের ভীষণ হাসি হাসিতেছে। তাহার পর আমাদের সম্মুখে, একটা বিশাল নোঙ্গর-স্থান উন্মুক্ত হইল—ম্লান-নীল জলরাশি; দীপ্তিময়, সূর্য্যদেবের যেন একটা

বিশাল দর্পণ। বায়ুশ্বাস লেশমাত্র নাই। সূর্য্যোদয়-কালে, যে মেঘজালে উহা তমসাচ্ছন্ন ছিল, সে মেঘজালের এখন চিহ্নমাত্রও নাই; আকাশের প্রখর উত্তাপে উহা গুঁড়া হইয়া গিয়াছে, গলিয়া গিয়াছে। দূরবর্ত্তী গিরিসমূহ—যাহা অন্তরীপ গড়িয়া তুলিবার জন্য, সমুদ্রের মধ্যে আগাইয়া আসিতেছে—উহারা এরূপ তীক্ষ্ণাগ্র ছুঁচালু, এরূপ মানানসই ভাবে কাটা-ছাঁটা যে উহাদের মুখে যেন একটা প্রকৃত চীনা ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু মনে হইতেছে যেন এই পাহাড়গুলাও এই প্রখর উত্তাপ-প্রভাবে একটু নীচু হইয়া গিয়াছে, একটু গলিয়া গিয়াছে; আর এই নোঙর-স্থানটা যেন আরও প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে।—আমাদের জাহাজটা এখনও অনেক দূরে; হায়! উহার ধূসর ছায়াচিত্রখানি প্রায় দিগন্ত স্পর্শ করিয়া আছে,—মরীচিকার মায়া উহাকে একটু ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়াছে। এই সূর্য্য ক্রমেই আকাশের ঊর্দ্ধে উঠিতেছে; সমুদ্র উত্তপ্ত; এই পথ ধরিয়া দুঘণ্টা কাল যাত্রা করিতে হইবে। বেচারা নাবিক—উহারা তাপ-অভ্যস্ত ও বেশ মজবুৎ হইলেও, উহাদের বাস্তব একটু অতিরিক্ত খাটুনী হইবে।

কিন্তু এই নোঙ্গর-স্থানটা এখন কেমন লোকাকীর্ণ; পূর্ব্বে আসিবার সময় যখন ইহা পার হইয়াছিলাম তখন উহা একেবারে খালী ছিল! এখন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি, মাছ ধরিবার কত নৌকা, কত ডিঙ্গি, এই নীল জলরাশির উপর মাছির ঝাঁকের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। না জানি উহারা কোথা হইতে বাহির হইল? লোকগুলার পীতবর্ণ বক্ষের উপর ভরপুর সূর্য্যের আলোক পড়িয়াছে, ফানুসের মত টুপির ছায়ায় উহাদের মাথা রহিয়াছে; চর্কি-কলের উপর বসানো পুতুলের মত খুব সহজভাবে চটুপট্ করিয়া উহারা কাজ করিতেছে। উহাদের লাল মৎস্য-জাল অবলীলাক্রমে নিক্ষিপ্ত হইতেছে; এবং লম্ফমান মৎস্যে পূর্ণ ঐ জাল ক্ষণে ক্ষণে আবার উত্তোলিত হইতেছে। দূর হইতে, ঐ মৎস্যগুলা ঝিনুকের ধূলার মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

তাহার পর, "কিয়েন চা" অন্তরীপের পাদদেশে, ঐ যে বড় বড় কতকগুলা অস্বাভাবিক আকারের পশুর দল সলিল-দর্পণে মুখ দেখিতেছে—উহারা কি?—নিশ্চয়ই রাজবাড়ীর জন্য চাউল বোঝাইকরা রাজকীয় "জঙ্ক" নৌকার বহর; ঐ চাউল হৈনান্ দ্বীপ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। উহাদের যেরূপ আকার-প্রকার, তাহাতে রাজকীয় নৌ-বহর ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না।—উহারা বার-দরিয়ার পশু; পীতাভ লোহিত বর্ণের দীর্ঘ পক্ষবিশিষ্ট; কোন কোন নৌকার বাছুড়ের পাখা; পাখার প্রসারিত ঝিল্লী-ত্বক্ অদ্ভুত রকমে কাটিয়া ছাঁটিয়া বাহির করা হইয়াছে। আবার কোন-কোন নৌকায় সুশোভন প্রজাপতির পাখা; সাদৃশ্যটা সম্পূর্ণ করিবার জন্য মধ্যস্থলে একটা মস্ত চোখ বসানো হইয়াছে। চীনাদিগের পাশবতার ভাবটা এত প্রখর যে উহারা যাহা কিছু করে, তাহাতে জীবজন্তুর আকার না দিয়া থাকিতে পারে না। নৌকাগুলা আসিয়া এইমাত্র নোঙর করিয়াছে; এবং খুব আস্তে আস্তে শ্রান্তভাবে পালগুলা আবার গুটাইয়া লইতেছে। উহাদের রক্তাভ বর্ণচ্ছটা সৌরকর-প্রতিবিম্বিত এই সমস্ত উজ্জ্বল নীলবর্ণকে খণ্ডিত করিয়াছে। দূরত্ব ও মায়াবিভ্রম-প্রভাবে, উহারা এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে; উহাদিগকে বৃহৎ বলিয়া মনে হইতেছে, লঘু বলিয়া মনে হইতেছে।

আমার এই নাবিক ভায়ারা এমন ভাল!—উহাদের মুখে একটুও অশান্তি বা বিরক্তির ভাব নাই; ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই! একটু সুরাপান করিবার জন্য, গায়ের কামিজ খুলিয়া ফেলিয়া একটু আরাম করিবার জন্য আমি উহাদিগকে ছুটি দিয়াছি। উহারা পরস্পরকে উৎসাহিত করিয়া, তাহার পর এই প্রচণ্ড তাপদগ্ধ আকাশের তলে, জলরাশি ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ধীরে ধীরে বালুর বিন্দুগুলা আবার রুদ্ধ হইল, আবার আচ্ছাদিত হইল এবং এই পুরাতন অদ্ভুত ধরণের নগরটা, নিম্ন বালুস্তূপের পিছনে একেবারে অন্তর্হিত হইল। বালু-স্তূপগুলাও দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, চ্যাপ্টা হইতে হইতে ক্রমে একটা রেখায় পরিণত হইল; আমরা এখন এই বিস্তৃত জলরাশির মধ্যস্থলে;—জল ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; উপর হইতে প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণ বর্ষিত হইতেছে।

আমাদের পশ্চাতে, একটা বড় জঙ্ক-নৌকা নদী হইতে বাহির হইল; লাল রঙ্গের ডোরা-কাটা একটা ছুঁচালো পটমণ্ডপ বহন করিয়া আসিতেছে। এই পটমণ্ডপের ভিতর দীর্ঘপরিচ্ছদবিশিষ্ট ও ছত্র-সমন্বিত কতকগুলি লোক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। স্বীয় অঙ্গীকার পালন করিবার উদ্দেশে, মান্দারীন আমাদের জাহাজে উঠিবেন বলিয়া আসিতেছেন। চল, যাওয়া যাক্। আমাদের কাজ যেটুকু বাকি ছিল, অন্ততঃ এইবার তাহা সম্পূর্ণ হইবে।

কিন্তু ম্লাননীল সাগর-পৃষ্ঠের উপর, আরও ঘোর-নীলবর্ণের কতকগুলা মণ্ডল অঙ্কিত হইয়াছে; মনে হয় যেন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ছুটিতেছে; উহারা বিড়াল-পুচ্ছের ন্যায় দীর্ঘ-প্রসারিত। আকাশের উপরেও পাত্‌লা মেঘগুলা সটানভাবে বিস্তৃত—একটু বাতাস উঠিবে বলিয়া জানাইয়া দিতেছে। এইমাত্র একটু ফুর্‌ফুরে বাতাস উঠিল… প্রথমে কতকগুলা ছোট ছোট দম্‌কা রকমের বাতাস উঠিয়া আমাদের সাদা চাঁদোয়াটাকে নাড়াইতে লাগিল; বাতাসটা একবার মরিয়া যাইতেছে, আবার বাঁচিয়া উঠিতেছে।

কিন্তু শীঘ্রই সমস্ত নঙ্গর-স্থানটা এই ঘোর বর্ণের দ্বারা আক্রান্ত হইল—যেন তেলের একটা প্রকাণ্ড কালো দাগ প্রসারিত। সমস্ত নঙ্গর-স্থানের উপর নীলরেখা পড়িল; মৃদু-মন্দ বায়ু বহিতে লাগিল, আমরা যেন আবার প্রাণ পাইলাম।

এই কিছু আগে, মাছের নৌকাগুলার ভিতরে সমস্ত জড়ভাবাপন্ন নিষ্পন্দ ছিল, এখন আবার একটা চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হইয়াছে। আবার জালগুলা আনা হইয়াছে; মন্ত্রের ন্যায় মাস্তুলের সংখ্যা সর্ব্বত্র বাড়িয়া গিয়াছে;—গাইটবিশিষ্ট লম্বা লম্বা খাবা; লম্বা-লম্বা শিং; লম্বা-লম্বা শুঁয়া। এবং মাদুরের পাল একটার পর একটা উদ্ঘাটিত হইল,—পাখীর ডানার যত রকম আকার হইতে পারে সেই-সমস্ত আকারেই উহা বিরচিত। দূর হইতে মনে হয় যেন কতকগুলা সমুদ্রের পাখী, কতকগুলা গুবরে পোকা, কতকগুলা প্রজাপতি; যেন কোনো পরী তাঁহার মায়া-দণ্ডের এক আঘাতে, এই-সব সুপ্ত গুটিপোকাদের ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এবং এই-সব আশ্চর্য্যজনক লোকেরা সজীব হইয়া উঠিয়াছে, সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, বার-দরিয়ায় মাছ ধরিবার জন্য মহানন্দে যাত্রা করিতেছে।

মৃদু মন্দ বায়ু অনবরত বহিতেছে। এই-সকল নৌকার মধ্যে কতকগুলা নৌকা স্বীয় উদ্দাম পাল-ভরে একেবারে নুইয়া পড়িয়াছে; উহাদের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া ঝোঁক সাম্‌লাইবার জন্য, উহাদের মাঝিরা, আপাত বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে কাঠের ফ্রেমের উপর, বাহির দিকে, বানরের মত পা ঝুলাইয়া বসিয়াছে। উহারা আমাদের ডান দিক্ দিয়া বাঁ-দিক্ দিয়া, গা-ঘেঁসিয়া চলিয়াছে; উহারা আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে—আমাদের আড়া-আড়ি চলিয়াছে…সোঁ সোঁ শব্দে হাল্কাভাবে চলিয়াছে;—জলের উপর একটু সাদা রেখা-চিহ্নও রাখিয়া যাইতেছে না। আমরাও আমাদের দাঁড় বাহির করিয়াছি; এবং যতটা পারা যায় পাল তুলিয়া দিয়াছি। আমরা নেহাৎ মন্দ চলিতেছি না; এই ফুর্‌-ফুরে বাতাস আমাদিগকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে। তথাপি এই-সব উড়ন্ত ছুটন্ত জিনিষের মধ্যে এই রকম থপ্‌থপে চালে চলার দরুণ কেমন বিরক্তি বোধ হইতেছে…।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

একটি মাঝির গান

পরাণ আমার সোতেরে দিয়া
ও আমায় ভাসাইল কোন্ ঘাটে!
আগে আঁধার, পাছে আঁধার, আঁধার নিশুইত ঢালা,
আঁধার-মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা;
তারার তলে কেবল চলে নিশুইত রাতের ধারা,—
সঙ্গে বাত্তি, সাথের সাথী, নাই কূল, নাই কিনারা।
অকূলের কূল গো,
দইরার সাগর গো,
আর কয় বাঁকে পাইমু তোমায়, আমায় লও গো আগাইয়া!

(তরুণ, জ্যৈষ্ঠ)

—

রামায়ণী যুগের তক্ষণ-শিল্প

রামায়ণে তক্ষণ-শিল্পকে বর্দ্ধকী-শিল্প বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্দ্ধকী বলে সূত্রধর বা ছুতারকে। তক্ষণ বলা হইয়াছে করাতিদিগকে। যথা:—

কর্ম্মান্তিকা স্থপতয় পুরুষা যন্ত্রকোবিদাঃ
তথা বর্দ্ধকয়শ্চৈব মার্গিনো বৃক্ষতক্ষণাঃ॥

কাঠের উপর উচ্চরকমের কারিকরিকে তক্ষণ-শিল্প বলা হইয়া থাকে। রামায়ণী যুগে এই শিল্পের প্রচুর আদর ছিল। অযোধ্যার প্রতি গৃহের কপাট-তোরণেই লতা-পত্র, ফল-পুষ্পাদি খোদিত ছিল, রাজগৃহের কপাটসমূহ মণিবিক্রমরাশিতে খচিত ছিল, এতদ্ব্যতীত নানা স্থানে—

সুকৃতেহা মৃগাকীর্ণ সুৎকীর্ণ ভক্তিভিস্তথা।

কাঠের উপর বিচিত্র চিত্র (ভক্তিচিত্র, আলিপনা) উৎকীর্ণ ছিল এবং স্থানে স্থানে মৃগগণের মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। ইহা উন্নত শিল্প-জ্ঞানের পরিচায়ক। বেদেও বর্দ্ধকী-শিল্পের অস্তিত্বের ও আদরের পরিচয় পাওয়া যায়। লঙ্কায় একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বিচিত্র ক্রীড়া-পর্ব্বত ছিল।

রামায়ণের নানা স্থানে বিচিত্র যানাদির উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে একখানা শিবিকার বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা গেল।

দিব্যাং ভদ্রাসনযুতাং শিবিকাংস্যন্দনোপমাম্।
পক্ষীকর্ম্মভিরাচিত্রাং দ্রুমকর্ম্মবিভূষিতাম্॥২২
আচিতাং চিত্রপর্ত্তাভিঃ সুনিবিষ্টাং সমন্ততঃ।
বিমানমিব সিদ্ধানাং জালবাতায়নাযুতাম্॥২৩
সুনিযুক্তাং বিশালাঞ্চ সুকৃতাং শিল্পিভিঃ কৃতাম্।
দারুপর্ব্বতকোপেতাং চারুকর্ম্মপরিষ্কৃতাম্॥২৪

(কিষ্কিন্ধ্যা—২৫ সর্গ)

এই শিবিকাখানা ছিল কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালীর। রাবণের পুষ্পকরথ বা বিমান-যানটি ছিল আর-একটি উচ্চ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। উহাতে সুবর্ণের মৃগ ও রত্ন-নির্ম্মিত বিহঙ্গসমূহ খোদিত ছিল এবং বিবিধ রত্নে খচিত ছিল।

(সৌরভ, জ্যৈষ্ঠ)

সমবায়ে স্ত্রীশিক্ষা

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কাজীপুর থানার অধীন বিগড়া গ্রামে একটি কো-অপারেটিভ গ্রাম্য-সমিতি গত ৬ বৎসর যাবৎ স্থাপিত হইয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষা অত্যাবশ্যকীয় স্থির করিয়া ঐ সমিতির মেম্বরগণ সমবেতভাবে উক্ত গ্রামে পাঁচ বৎসর হইল একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ছাত্রীরা সকলেই মুসলমান। দুইটি বিবাহিতা ও বয়োধিকা। ধন্য গ্রামিক প্রধানগণ। ইহারা যে মুসলমান সমাজের কঠিন বন্ধন সমূলে ছেদন করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে সকলের প্রশংসার্হ হইবে সন্দেহ নাই। জননী সুশিক্ষিতা না হইলে জাতীয় জীবন গঠিত হইতে পারে না, তাহা ইহারা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিতেছে। ভগবানের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, সকল স্থানেই এই-প্রকার স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার হইয়া অসার দেশ নূতন জীবন লাভ করুক।

(ভাণ্ডার, জ্যৈষ্ঠ) শ্রী উপেন্দ্রনাথ পাকড়াশী

—

প্রাচীনসাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ

বেদে কৃষ্ণ শব্দের উল্লেখ কয়েকবার আছে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৪ সূক্তের ৫ম ঋকে এক কৃষ্ণের কথা আছে—কিন্তু সেখানে শিকারী পক্ষী অর্থে কৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের (১১।২।২) এবং শাঙ্খায়ন আরণ্যকের (১২।২৭) দুই স্থানে এই অর্থেই কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। এইরূপ তৈত্তিরীয় সংহিতা (৫।২।৬।৫), (৬।১।৩।১) ও শতপথব্রাহ্মণে (১।১।৪।১; ৩।২।১।২৮) মৃগ অর্থে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ঋষি কৃষ্ণ। ইনি ৩য় ও ৪র্থ ঋকে আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

অনুক্রমণী-কার বলেন, এই কৃষ্ণ আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরার বংশ্য। ৮ম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের রচয়িতা কৃষ্ণের পুত্র 'কার্ষ্ণি' বা বিশ্বক। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে কৃষ্ণ শব্দ হইতে বৈদিক ব্যাকরণ অনুসারে 'কৃষ্ণিয়' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ মণ্ডলের ১১৭ সূক্তের ৭ ঋকে কৃষ্ণিয় আছে।

এই দুই ঋকে অশ্বিদ্বয় বিষ্ণাপুকে বিশ্বক কৃষ্ণিয়ের নিকট অর্পণ করিতেছেন। সুতরাং কৃষ্ণ বিষ্ণাপুর পিতামহ হইতেছেন। এই কৃষ্ণ এবং কৌষিতকী ব্রাহ্মণোক্ত কৃষ্ণ অভিন্ন। কৌষিতকী ব্রাহ্মণের কৃষ্ণ আঙ্গিরস—তবে ইনি আঙ্গিরস ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ঋত্বিক্ সম্পর্কে ইনি সান্ধ্য হোম দর্শন করিয়াছিলেন। ইনি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ উপদেশ করিয়াছেন—"অতঃপর আঙ্গিরস-বংশীয় ঘোর দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আর তিনিও পিপাসাশূন্য হইলেন। তুমি মরণকালে এই তিনটি মন্ত্রের আশ্রয় লইবে—এই তিনটি হইতেছে তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণ-সংশিত।"

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে কৃষ্ণকে পুরুষমন্ত্রের শান্তা উপদেষ্টা রূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও-বা তিনি পুরুষযজ্ঞের যজ্ঞপুরুষ, এরূপ আভাস পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলি আলোচনা করিয়া কৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা এই—

বেদবর্ণিত কৃষ্ণ বলিলে, তাঁহার অধিক কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। বেদে যে কয় বার কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাহাতে কৃষ্ণ বলিতে ঋষি মাত্র বুঝায়। দু'তিন স্থান ছাড়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ ঋষি বলিয়াই পরিচিত। ঋগ্বেদের খিলসূক্তে কৃষ্ণ পরমপুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন বলিয়া খিলসূক্তের ভাষ্যকারগণ মনে করিয়া থাকেন। খিলসূক্ত (১০।১) বলিতেছেন—"কৃষ্ণ বিষ্ণো বাসুদেব হৃষীকেশ নমস্তুতে"। ঋগ্বেদ, কৌষিতকী ব্রাহ্মণ, ও ছান্দোগ্য উপনিষদ কৃষ্ণকে আঙ্গিরস আখ্যা দিয়াছেন। পাণিনির ৪।১।৯৬ সূত্রে গণসম্পর্কে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ৪।১।৯৯ সূত্রে গণসম্পর্কে কার্ষ্ণায়ন ও রাণায়ন গোত্র নিষ্পত্তিকালে কৃষ্ণ ও রণ পদ দেওয়া হইয়াছে। কার্ষ্ণায়ন ও রাণায়ন, এ দুইটি বশিষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ গোত্র মাত্র।

বৌদ্ধগ্রন্থে 'কৃষ্ণ' এই নামটি "কণ্‌হ"রূপে পরিণত হইয়াছে। শব্দ-শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণ ও কণ্‌হ অভিন্ন। দীঘনিকায় নামক বৌদ্ধগ্রন্থে (৩।১।২৩) কণ্‌হায়ন গোত্র ও কণ্‌হ ঋষির নাম আছে।

দীঘনিকায়ের এই কণ্‌হ ঋগ্বেদের ঋষি হইতেও পারেন। তবে তিনি আমাদের কৃষ্ণ কি না তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। ঘট-জাতকে কৃষ্ণের যে কাহিনী আছে, তাহা যে বিকৃত আকারে আমাদের কৃষ্ণেরই কাহিনী, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। জৈন প্রবাদেও দেখা যায়, এই গল্পগুলি সাধারণের খুব প্রিয় ছিল। ইহাদের প্রাচীন গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে বাসুদেব ও বলদেবের নাম আছে। কৃষ্ণ বাসুদেবের মধ্যে কৃষ্ণ নবম ছিলেন [হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি, পৃঃ ১২৪, অন্তগদ দসাও, পৃঃ ১৩—১৫, ৬৭৮২] আর এই কৃষ্ণের দ্বারাবতী বা দ্বারকার সহিত সম্বন্ধও নিরূপিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কল্পে তিনি দ্বাদশ তীর্থঙ্কর হইবেন এবং তাঁহার বংশের দেবকী রোহিণী বলদেব ও জবকুমার পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থাপন্ন হইবেন। দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বাহিরেও কৃষ্ণকথা অতি প্রিয় ছিল।

এই গোত্রের কথাই জাতকের ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিয়া কৃষ্ণকে গোত্রনাম বলিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কার্ষ্ণায়ন গোত্র ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়াছে। তার পর ছান্দোগ্য উপনিষদের দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ এই নাম। ইনি আঙ্গিরস যে ঘোর, তাঁর শিষ্য। যদি কৃষ্ণও আঙ্গিরস হন, আর এইরূপ হওয়াও অসম্ভব নয়, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, কৃষ্ণ যে ঋষি ছিলেন, তৎসম্বন্ধীয় প্রবাদ বা কিংবদন্তী ঋগ্বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদের সময় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে কার্ষ্ণায়ন নামে গোত্রও জনশ্রুতি-মূলক ছিল। কৃষ্ণসমূহকে লইয়া কার্ষ্ণায়ন—এই-সমস্ত কৃষ্ণের মধ্যে যিনি আদিম কৃষ্ণ, তিনিই কৃষ্ণ-গোত্রের স্থাপয়িতা বা প্রবর্ত্তক। যখন বাসুদেব পরমপুরুষ-পদবাচ্য হইয়া উঠিলেন, তখন হইতেই এই কিংবদন্তী ঋষি কৃষ্ণের সহিত বাসুদেবের অভিন্নত্ব স্থাপন করিয়াছে। কৃষ্ণ ও বাসুদেব যখন অভিন্নই হইয়া গেল, তখন শূর ও বাসুদেবের ভিতর দিয়া বৃষ্ণিবংশে তাঁহারও স্থান হইয়া গেল। জাতকের কৃষ্ণগোত্র দ্বারাই কৃষ্ণ নামের কারণ কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কার্ষ্ণায়ন গোত্র যে কেবল বসিষ্ঠশ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-গোত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা নয়, মৎস্যপুরাণে ২০০ অধ্যায়ে ইহা পারাশর-পর্য্যায়েও ধৃত হইয়াছে।

আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের (১২।১৫) মতে ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞ-কারণ এইরূপ ব্রাহ্মণ-গোত্র ক্ষত্রিয় গ্রহণ করিতে পারে। ক্ষত্রিয়ের গোত্র এবং স্বত পূর্ব্বপুরুষদিগের গোত্রে তাঁহাদিগের সন্ধান পাওয়া যায়। ঘট-জাতক (৪৫৪ সংখ্যক জাতক) ও মহাউম্মগ্গজাতক খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বের রচনা।

ঘটজাতকে একটি উপাখ্যানে পাওয়া যায় যে, কংসের একজন ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম দেবগব্‌ভা। সম্ভবতঃ কেন, নিশ্চয়ই, দেবকীর নামের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকিবে। ইঁহার স্বামীর নাম ছিল উপসাগর। বসুদেব কিরূপে উপসাগরে পরিণত হইলেন, তাহা বুঝা গেল না। যাহাই হউক, ইঁহাদের দুই পুত্রের নাম বাসুদেব ও বলদেব। এই দুই পুত্রকে অন্ধকবেন্‌হু ও তদীয় পত্নী নন্দগোপার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। নন্দগোপা দেবগব্‌ভার সখী ছিলেন। নন্দগোপা নিশ্চয়ই নন্দগেহিনী যশোদা। অন্ধকবেন্‌হু দুইটি শব্দের সংযোগে নিষ্পন্ন—অন্ধক ও বৃষ্ণি—বৃষ্ণি অপভ্রংশ বেন্‌হু। এ দুইটি শব্দ দুইটি পৃথক্ জাতিকে বুঝায়। বলিতে পারি না, নন্দ কেমন করিয়া এই নাম পাইলেন। যাহা হউক, এই জাতকের কাব্যাংশে বাসুদেবের আরও দুইটি নাম আছে—কণ্‌হ ও কেশব। এই জাতকের ভাষ্যকারও খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের ব্যক্তি। তিনি বলেন—প্রথম কবিতায় বাসুদেব তাঁহার গোত্রনামে অভিহিত হইয়াছেন, কারণ, বাসুদেব কণ্‌হায়ন গোত্রগত ছিলেন। সুতরাং এ হিসাবে বাসুদেবই কৃষ্ণের প্রকৃত নাম; তাঁহার গোত্রনাম কার্ষ্ণায়ন গোত্রের বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। মহাউম্মগ্গ জাতকের ভাষ্যেও এই কথার পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বাসুদেব কণ্‌হের পত্নীর নাম জম্বাবতী বলিয়াছেন। স্বয়ং বাসুদেব কণ্‌হ কণ্‌হায়ন গোত্রীয়। বাসুদেবস্স কনস্স অর্থে তিনি বাসুদেবই প্রকৃত নাম বলিয়া কণ্‌হকে গোত্রনাম বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি পাণিনির উল্লিখিত কার্ষ্ণায়ন গোত্রের ঋত্বিক্ বা পুরোহিতের গোত্রই হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়দিগের এইরূপ ঋষি পূর্ব্বপুরুষগণ হয় মানব, না হয় ঐল বা পৌরূরবস হইবেন। ইঁহাদিগের নাম এক ক্ষত্রিয়-বংশ হইতে অন্য ক্ষত্রিয়-বংশের পার্থক্য সূচিত করিয়া দেয় না, তবে ঋত্বিক্‌দিগের গোত্র ও পূর্ব্বপুরুষগণের নামের দ্বারা এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। যদি কৃষ্ণকে গোত্র-নাম বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, বাসুদেব কার্ষ্ণায়ণ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যদিও এটি ব্রাহ্মণ ও পারাশর গোত্র।

এই কৃষ্ণ নামে বরাবর পরিচিত হইয়া আসিয়া প্রাচীন কৃষ্ণের বিদ্যাবত্তা ও অধ্যাত্মঘোষণাও তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে। দেবকীপুত্র হওয়াতেও কিংবদন্তী সহায়তা করিয়াছে।

পরযুগে বাসুদেবই কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির পর আমরা রামায়ণে কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। রামায়ণের সময়ে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন নাই। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ বাল্মীকি কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিতেছেন। বাল্মীকি যখন রাম না হইতে রামায়ণ লিখিতে পারিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণ না হইতেও কৃষ্ণনাম যে তিনি করিতে পারিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ১১৯ অধ্যায়ে বেদবিদ্ ব্রহ্মা কাকুৎস্থ রামকে বলিতেছেন—

লোকানাং ত্বম্ পরো ধর্ম্মো বিষ্বক্‌সেনশ্চতুর্ভুজঃ।
শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।
অজিতঃ খড়্গধৃগ্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ।

রামায়ণের যিনি ভাষ্যকার, তিনি কৃষ্ণ শব্দে সর্ব্বত্র "কৃষ্ণবর্ণ" বুঝিয়াছেন। সিদ্ধান্তীরা বলেন, ইহা ভবিষ্যদ্বাণী।

রামায়ণ আবার বলিতেছেন—

"সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দ্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।
বধার্থং রাবণস্য ত্বং প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্।

রামায়ণে সর্ব্বত্র রামকে বিষ্ণুর সহিত এক, তাঁহা হইতে অভিন্ন করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে মহাভারতেও কৃষ্ণকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে।

বিষ্ণু-, ভাগবত-, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণবগ্রন্থেও কৃষ্ণ ও বিষ্ণু এক বলা হইয়াছে। দুই এক স্থলে কৃষ্ণকে বিষ্ণু হইতে সামান্ত তত্ত্বতঃ পৃথক্ করা হইয়াছে, যদিও বিষ্ণু- ও ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণ দুই-একবার বিষ্ণুর অংশাবতার বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন, তথাপি তিনি সাধারণতঃ বিষ্ণুর সম্পূর্ণ অবতার ও পরব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ভাগবত-পুরাণ বলিতেছেন—

সংস্থাপনার্থায় ধর্ম্মস্ত প্রশমায়েতস্ত চ।
অবতীর্ণো হি ভগবান্ অংশেন জগদীশ্বরঃ।

মহাভারত বলেন—

যস্ত নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষাসীদ্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥

এইরূপ বিষ্ণুপুরাণও তাঁহাকে দুই-এক স্থানে অংশাবতার বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। মহাভারতের কৃষ্ণ কিন্তু বড়ই জটিল। মহাভারতের নানা স্থানে কৃষ্ণ নানাভাবে চিত্রিত হইয়াছেন। ভগবদ্‌গীতার দার্শনিক অংশে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার স্বরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের অন্যান্য স্থানে কোথাও বা তাঁহার ভগবত্তাকে ন্যূনীকৃত করা হইয়াছে, কোথাও বা ভগবত্তা সন্দিগ্ধ বা একেবারে অস্বীকৃত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে কৃষ্ণকে যোদ্ধা প্রভৃতি রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—ভগবত্তা যেন তাঁহাতে আদৌ আরোপিত হয় নাই। যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি সর্ব্বত্র মানুষের ভূমিকাই অভিনয় করিয়াছেন—কোথাও দেবভাবের পরিচয় দেন নাই। বন্ধুর সাহায্যে বা শত্রুবিনাশে তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় কোথাও নাই।

মহাভারতের বহুস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ মহাদেবকে পূজার্চ্চনা করিয়া তাঁহার সন্তোষবিধান করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে বিবিধ বর লাভ করিতেছেন। মহাদেবের নিকট হইতে বহু অস্ত্রও প্রাপ্ত হইতেছেন।

অনেক স্থলেই কৃষ্ণ ও ঋষি নারায়ণ এক বলা হইয়াছে। বেদের ঋষি কৃষ্ণের ঋষিত্বের স্মৃতি মহাভারত-যুগেও লুপ্ত হয় নাই। কারণ, মহাভারতের কৃষ্ণ ঋষি-নারায়ণ-রূপেও পূজিত হইয়াছেন। তাঁহাকে ঋষি নারায়ণ বলিলেও কোথাও তিনি মহাভারতে সাধারণ মানুষ-রূপে অঙ্কিত হন নাই। যখন তিনি ঋষি নারায়ণ, তখন তিনি যুগের পর যুগ ধরিয়া জীবিত থাকিয়া অতিমানবতার পরিচয় দিয়াছেন। যখন তিনি পাণ্ডবের সখা ছিলেন, তখন তিনি ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিশুপাল, দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শল্য কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য মহাভারত কোনরূপে ক্ষুণ্ণ করে নাই।

মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ব্বে বাসুদেব-কৃষ্ণের কথা আছে, কিন্তু গোপাল-কৃষ্ণের কথা কিছুই নাই। কেবল এই মাত্র লিখিত আছে যে, কংসনিসূদনের জন্য কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোকুলে তাঁহার অন্ত বাল্যলীলার কথা কিছুই নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হরিবংশ (শ্লোক ৫৮৭৬—৫৮৭৮), বায়ুপুরাণ (৯৮ অঃ—১০০-১০২ শ্লোক) ও ভাগবতপুরাণে (২।৭) লিখিত আছে যে, গোকুলে যে-সমস্ত অসুর আসিয়াছিল তাহাদের বধের জন্য এবং কংসধ্বংসের জন্য কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে (৪১ অঃ) শিশুপাল কৃষ্ণের প্রতাপের কথা বলিতে বলিতে পূতনাদি বধের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্ম যখন কৃষ্ণের প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন (৩৮ অঃ), তখন একবারও পূতনাদি বধের কথা বলেন নাই।

ভগবদ্‌গীতায় ও মহাভারতের অন্যান্য অংশে "গোবিন্দ" নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এটি খুব প্রাচীন নাম। পাণিনির ৩।১।১৩৮ সূত্রের বার্ত্তিক দ্বারা নিষ্পাদিত হয়। যদি কৃষ্ণের গোকুলদিগের সহিত সম্পর্ক থাকার জন্য তাঁহার গোবিন্দ নাম হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার গোবিন্দ-নামের ব্যুৎপত্তিগত সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ বরাহ আকারে জল আন্দোলন করিয়া জল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম গোবিন্দ হইয়াছে (অঃ ২১।১২)। আবার শান্তিপর্ব্বে দেখা যায় (৩৪২ অঃ ৭০)—বাসুদেব বলিতেছেন—দেবগণ আমাকে গোবিন্দ বলে, যেহেতু আমি পূর্ব্বে নষ্ট পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং গুহাবাসী ছিলাম। এই ব্যাপারও গোবিন্দ নামের কারণ হইতে পারে। কিন্তু সম্ভবতঃ "গোবিন্দ", যাহা ঋগ্বেদে গোসমূহের উদ্ধারকর্ত্তা-রূপে ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে, পরে বাসুদেব কৃষ্ণ দেবাদিদেব বলিয়া পূজিত হইলে তাঁহার নাম হয়। কেশিনিসূদন ইন্দ্রের অপর একটি নাম ছিল—ইহাও পরে বাসুদেব-কৃষ্ণের উপর আসিয়া পড়ে।

কবি ভাস চাণক্যের প্রায় সমকালবর্ত্তী। ইঁহার রচিত নাটকে শ্রীকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, নন্দ, যশোদা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ভাসও গোপালকৃষ্ণের বন্দনা করিয়াছেন। ভাসের কাব্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, গোপাল কৃষ্ণ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতেও পূজিত হইতেন। ইহার পর পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বাসুদেব কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই।

মহাভাষ্যের এই উক্তি হইতে চারিটি বিষয় প্রমাণিত হইতেছে।

১। কংসের মৃত্যুর কথা এবং বলির বন্ধনের কথা পতঞ্জলির সময়ে জনসাধারণ সকলেই জানিত। ইহাদের কাহিনী পতঞ্জলির সময়ে প্রচলিত ছিল।

২। এই আখ্যায়িকায় কৃষ্ণ বা বাসুদেবকে কংসহন্ত্যাকারী বলিয়া উক্ত আছে।

৩। পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে যেমন অভিনয় হইয়া থাকে, সেইরূপ এই-সমস্ত আখ্যায়িকা লইয়া নাটকাভিনয় হইত।

৪। কৃষ্ণের হস্তে কংসের হত্যা পতঞ্জলির সময়ে বহু প্রাচীন ঘটনা বলিয়া বিদিত ছিল। মাতুল কংসের সহিত কৃষ্ণের সদ্ভাব ছিল না। সঙ্কর্ষণ তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। অক্রূর কৃষ্ণ-আখ্যায়িকায় একজন বিশিষ্ট নায়ক ছিলেন।

সূত্রভাষ্যে পতঞ্জলি দেখাইয়াছেন যে, বাসুদেব যে শুধু ক্ষত্রিয় ছিলেন, তা নয়; তিনি দেবতারূপে পূজিত হইতেন। সূত্রপিটক বৌদ্ধ-দিগের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে কৃষ্ণের কথা আছে। সেই কৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ তথা বাসুদেব কৃষ্ণ। এই গ্রন্থখানি যে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বের গ্রন্থ, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ললিতবিস্তরের ১১ অঃ কৃষ্ণের কথা আছে। গাথাসপ্তশতী খৃষ্টীয় ১ম শতকের গ্রন্থ। ইহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে।

(যমুনা, জ্যৈষ্ঠ) শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

—

প্রাচীন ভারতে নগরবিন্যাস

স্থপতির (civic architect) অন্যতম মুখ্য কর্ম্ম পথবিন্যাস। পথের প্রয়োজন দ্বিবিধ; প্রথমতঃ তাহাতে লোকজন কিম্বা যানবাহনাদি চলাচল করে, দ্বিতীয়তঃ তদ্দ্বারা বসতিভূমি (building বা residential block) নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। পথগুলি আবার নগরের বায়ু-প্রবাহের প্রণালীস্বরূপ। কাজেই পথগুলিকে এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে, যাহাতে পুরস্থ গৃহাবলীতে বায়ু চলাচল এবং আলোকাগমের সুবিধা থাকে; সঙ্গে সঙ্গে, আপণ (বাজার), বিচারস্থান (court), সভাগৃহ (council), ব্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয়, পোতাশ্রয় (harbour), রেলষ্টেশন

প্রভৃতি পুরবাসিগণের সাধারণতঃ যে যে স্থলে সমাগম হইয়া থাকে এইরূপ এক কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে সহজে বা অল্পসময়ে যাতায়াতের যাহাতে সুবিধা হয়, পথবিন্যাসের সময় তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়। পথে কিংবা পথের মোড়ে (crossing) যাহাতে পথিকসঙ্ঘ কিংবা বিপরীতগামী যানাদির সঙ্ঘট্ট না হয়, পথবিন্যাসের সময় তাহাতেও লক্ষ্য রাখিতে হয়।

প্রাচীন ভারতের পুরনির্ম্মাণবিদ্‌গণের রথ্যাবিন্যাস, পদবিন্যাস, জনস্থাপনা, রাজগৃহ, রাজসভাদি বিন্যাসের সুকৌশলে প্রাগুক্ত বিধি-নিচয়ের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া যাইত। দেবী-পুরাণে (৭২ অধ্যায় ৭৭ম পঙ্‌ক্তি) আছে, রাজপথ চল্লিশ হাত বিস্তৃত করিবে যাহাতে মানুষ ঘোড়া গাড়ী হাতী প্রভৃতি পরস্পর ধাক্কা না খাইয়া সহজে চলাচল করিতে পারে (নৃ-বাজি-রথ-নাগানাম্-অসম্বাধ সুসঙ্কর:)। এইজন্য, বড় বড় সহরে ক্ষুদ্র বীথী কিংবা পন্থা (foot-way) স্থাপন করা শুক্রাচার্য্য পছন্দ করেন নাই। কৌটিল্য দুর্গনিবেশ প্রকরণে, 'রথপথ', 'পশুপথ', 'ক্ষুদ্রপশুমনুষ্যপথ' এবং তাহাদের বিস্তৃতিপরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে মাহীষ্মতীপুরীর বিন্যাসের কথায় লেখা আছে, রথ্যা (vehicular street), বীথী (avenue), নৃমার্গ, বন ও চত্বর স্থাপন করা হইল। একই নগরের বর্ণনায় বিভিন্ন পথের নির্দ্দেশে বিভিন্ন পথবাহীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ পথের ব্যবস্থা ছিল বলিয়া মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

সাধারণতঃ প্রধান প্রধান রাজমার্গগুলির প্রস্থ ষোল হাত হইতে চল্লিশ হাত পর্য্যন্ত করিবার বিধি ছিল। দেবীপুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে আছে, রাজপথ চল্লিশ হাত, শাখারথ্যা ষোল হাত, উপরথ্যা (গলি) তিন হাত, উপরথ্যিকা (ছোটগলি, bye-lane) দুই হাত, গৃহান্তর (দুইবাড়ীর মাঝখানে ফাঁক) দুই হাত, নালা বা নর্দ্দমা অবকরপরীবাহ ১ ফুট করা উচিত।

নগরের আয়তন অনুসারে কমবেশী পথের বিন্যাস করা বিধেয়। (পুরং দৃষ্ট্বা রাজমার্গান্ সুবহূন্ কল্পয়েন্ নৃপঃ।—শুক্রনীতিসার, প্রথম অধ্যায়, ৫২৬ম পঙ্‌ক্তি)। লম্বালম্বি তিন হইতে সতেরটি পর্য্যন্ত রাজমার্গ-বিন্যাসের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্থের দিকের প্রায় তত সংখ্যক পথরচনার কথা আছে। এমন ভাবে রাস্তা ফেলিতে হইবে যাহাতে সমস্ত সহরটা 'সুবিভক্ত' (symmetrically divided) হয়।

পথবিন্যাসের পদ্ধতি সতরঞ্চের ছকের মত। অর্থাৎ পথবিন্যাস করিলে সমস্ত সহরটি কতিপয় আয়ত বা বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত হইয়া যাইবে; অর্থাৎ দুইটি পথ সমকোণে কাটা চাই। বিদিক্‌স্থ বা কোণাকুণি রাস্তা যত কিছু তৈয়ার করিতে নাই। কাজেই রাস্তাগুলি উত্তরদক্ষিণ বা পূর্ব্বপশ্চিম দিকে প্রসারিত হওয়া দরকার। উহার পারিভাষিক নাম প্রস্তরা।

পথের সংখ্যা এবং পথিপার্শ্বস্থিত গৃহপঙ্‌ক্তি রচনার বিভিন্নতা-অনুসারে ভারতীয় নগরবৃন্দের পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ হইয়াছে। এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ময়মুনি—দণ্ডক, কর্ত্তরীদণ্ডক, কুটিকামুখদণ্ডক, কলকাবন্ধদণ্ডক, বেদীভদ্রক, মহাভদ্র, সুভদ্র, জয়াঙ্গ, বিজয় এবং সর্ব্বতোভদ্র এই কয় রকমের সহরের উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই-সমস্ত পথবিন্যাসপদ্ধতিরই বিভেদ মাত্র। পথবিন্যাস এবং পদবিন্যাসের (site-planning) বিভিন্নতা-অনুসারে, দণ্ডক, নন্দ্যাবর্ত্ত, সর্ব্বতোভদ্র, প্রস্তরা, চতুর্ম্মুখ, কার্ম্মুক, পদ্মক এবং স্বস্তিক এই অষ্টবিধ নগর বা নগরবিন্যাসের বর্ণনা মানসার করিয়াছেন। কামিকাগম আরও ছয়টি বেশী উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রত্যেক গলি বা রাস্তার মাথায় কবাট সহ তোরণ (গোপুর) নির্ম্মিত হইত।

মানসারের মতে, গ্রাম বা নগরকে (প্রাচীরের ভিতরে) বেষ্টন করিয়া যে মহামার্গ বিস্তৃত হয়, তাহাকে মঙ্গলবীথী [boulevard] বলে; পূর্ব্ব-পশ্চিম করিয়া বিস্তৃত পথকে রাজপথ বলে; যাহার দুই প্রান্ত-ভাগে দুই দ্বার আছে তাহাকে রাজবীথী বলে; যাহার সন্ধি আছে, তাহাকে সন্ধিবীথী বলে; যাহা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত তাহাকে মহাকাল বা বামন-পথ বলে। দুই মহামার্গকে সংযোগ করিয়া স্থিত বলিয়া উহার নাম সন্ধিবীথী।

কোণাকুণি [বিদিক্‌স্থ] রাস্তা ফেলা নিষেধ ছিল। কিন্তু একেবারে যে নিষেধ ছিল তাহা নহে। কারণ সুপর্ণ [গরুড়] দুর্গে কিংবা বৃত্তাকৃতি নন্দ্যাবর্ত্ত নগরে বিদিক্‌স্থ পথ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা আছে। গরুড়-দুর্গে অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত একটি এবং নৈর্ঋত কোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত আর-একটি পথ বিস্তৃত করা হইত।

দুই বা ততোধিক পথের সঙ্গমস্থলকে বিশিষ্টাকার করা হইত। ত্রিপথকে ত্রিকোণাকৃতি [ত্রিক], চতুষ্পথকে চতুষ্কোণাকৃতি [চত্বর] এবং বহুপথকে (cross se tion of many roads) বৃত্তাকৃতি করা হইত। এইজন্য আজকালের মত পথের কোণ কাটিয়া, সোজা করিয়া বা ঘুরাইয়া দেওয়া হইত। এই-রকম চৌমাথায় সভাবৃক্ষ কিংবা সভাগৃহ স্থাপন করা হইত। এইখানে গ্রাম বা নগরের অধিবাসীরা মিলিত হইত। প্রাচীন ভারতে চতুষ্পথে নগরের প্রধান সৌধসমূহ নির্ম্মাণ বিহিত ছিল। মৎস্যপুরাণে [২১৭শ অধ্যায়] আছে, রাজ-ধানীতে চারিটি বীথী রচনা করিবে; একটির প্রান্তভাগে দেব-মন্দির স্থাপন করিবে; আর-একটির শেষে রাজবেশ্ম বিধান করিবে; তৃতীয়টির পুরোভাগে ধর্ম্মাধিকরণ নির্ম্মাণ করিবে, এবং চতুর্থ বীথীর অগ্রভাগে গোপুর-বিন্যাস বিধেয়।

বড় বড় রাস্তার দুই ধারে সারি দিয়া বৃক্ষরোপণ করার কথাও আছে। অনেক রাস্তার দুই ধারে দেওয়াল থাকিত। সেই প্রাচীরে পুরাণেতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বন করিয়া সুচারু চিত্র অঙ্কিত হইত। আমি জয়পুরে এই প্রাচীর-চিত্র দেখিয়াছি। সহরের বাড়ীগুলি বিশৃঙ্খলভাবে নির্ম্মাণ করিতে দেওয়া হইত না। সমস্তই সুনিবদ্ধভাবে পঙ্‌ক্তিক্রমে নির্ম্মাণ করিতে হইত [পঙ্‌ক্তিকৃতানি গৃহাণি]। আজকালের মত রাস্তার মাঝখানটা উঁচু [কচ্ছপোন্নত] করা হইত—তাহাতে জল গড়াইয়া যাইবার পক্ষে সুবিধা হয়। রাস্তার দুই ধারে নর্দ্দমা ছিল। এমন কি আজকালের মত কোন কোন নগরে রাস্তার নীচেও জলপ্রণালী [sewers বা conduit sluices] স্থাপিত হওয়ার উল্লেখ আছে। ভাঞ্জী নগরে এই রকম জলপ্রণালী ছিল বলিয়া তামিল গ্রন্থকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন। মদুরা নগরের বর্ণনায় প্রতি রাস্তার মোহনায় একটি করিয়া আবর্জ্জনাভাণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। তামিল ভাষায় তাহার নাম পুরীমাম্ [dust bin]। এই সমস্ত পুরীমাম্ ইটের তৈয়ারী ও চুনকামকরা থাকিত।

রাজপথসমূহ বিস্তৃত হইলে, সমস্ত সহরটির কতকগুলি মহল্লার [wards, সংস্কৃত পরিভাষায় 'গ্রাম' বলা হয়] ভাগ হইত। নগর-বিন্যাসেও জাতিভেদ-প্রথা উপলক্ষিত হয়। কোন্ কোন্ স্থানে বা মহল্লায় কি কি জাতি বা ব্যবসায়ী অবস্থান করিবে, তাহা ঠিক করিয়া দেওয়া হইত। ইহাকে জাতিবিন্যাস [folk-planning] বলা যায়। অগ্নিপুরাণে লিখিত পদ্ধতি—সমস্ত নগরটি একটির ভিতর আর-একটি করিয়া তিনটি আয়তমণ্ডলে বিভক্ত করা হয়। বহির্ম্মণ্ডলের অগ্নিকোণে স্বর্ণকারগণ, দক্ষিণে নর্ত্তকীগণ, নৈর্ঋতে নট, চক্রিকাদি এবং কৈবর্ত্তাদি, পশ্চিমে রথ-আয়ুধ-কৃপাণ-ব্যবসায়ীগণ, বায়ুকোণে শৌণ্ডিক, কর্ম্মাধিকৃত ব্যক্তিগণ [ভৃত্য, অনুচর, চাকুরে প্রভৃতি], উত্তরে ব্রাহ্মণ, যতি এবং সিদ্ধবর্গ, ঈশানে বণিক্‌জন এবং ফলাদিবিক্রয়কারিগণ এবং পূর্ব্বদিকে

বলাধ্যক্ষগণ স্থাপন করিবে। দ্বিতীয় মণ্ডলের অগ্নিকোণে বিবিধ বল [সৈন্ত], দক্ষিণে বারবনিতা এবং সভাঙ্গনা [court women] প্রভৃতির অধ্যক্ষ, নৈঋ তে নীচজাতিবৃন্দ, পশ্চিমে মহামাত্যগণ, কোষপাল এবং কারুকগণ [artisans], উত্তরে দণ্ডনাথ [বিচারকগণ], নায়কবৃন্দ [পৌরপ্রধানগণ] এবং দ্বিজবর্গের বিনিবেশ করিবে। অন্তর্মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে ক্ষত্রিয়বৃন্দ, দক্ষিণে বৈশ্যগণ, পশ্চিমে শূদ্রগণ, কোণে কোণে চিকিৎসা-ব্যবসায়ীগণ এবং চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী পদাতিক স্থাপন করিবে। সহরের বহির্ভাগে পূর্ব্বদিকে চণ্ডলিঙ্গাদি, দক্ষিণে শ্মশানাদি, পশ্চিমে গোধন, উত্তরে কৃষকমুক্ত এবং কোণে কোণে ম্লেচ্ছবর্গকে ন্যস্ত করিবে। গ্রামেও এই রকম 'স্থিতি' হইয়া থাকে। এই রকম স্থিতিবিধান করিতে হইলে নগরে কাহারও নির্ব্যূঢ় স্বত্ব থাকিলে চলে না। কাজেই শুক্রাচার্য্যের মতে রাজা নগরের স্বত্বনিবর্ত্তন করিবে না, কেবল পুরবাসিগণের জীবনস্বত্ব থাকিবে।

প্রত্যেক নগরে কতকগুলি কর্ম্মচারী ছিল। স্থাপনার্হ, গণিতজ্ঞ, চিত্রজ্ঞ, সর্ব্বদেশজ্ঞ, বেদপুরাণেতিহাসবিদ্ এবং বাস্তুবিদ্যাব্ধিপারগ স্থপতি [civic architect] তন্মধ্যে প্রধান। স্থপতির অধীনে সূত্রগ্রাহী—ইনি জরিপ এবং পরিকল্পনার পারদর্শী [রেখাজ্ঞ]। স্থূল, সূক্ষ্ম তক্ষণকার্য্যে দক্ষ তক্ষক সূত্রগ্রাহীর আজ্ঞানুসারী ছিলেন। তাঁহার অধীনে ছিলেন বর্দ্ধকি—ইনি কাঠ ইট জোড়া লাগাইতে [joinery work] নিপুণ। এতদতিরিক্ত আরাম-কৃত্রিম-বনকারী, স্বর্গকারী, মার্গ কারক প্রভৃতিও ছিল। এই-সমস্ত কর্মচারিগণ রাজার গৃহাধিপতি নামক অন্যতম অমাত্যের [minister with the portfolio of civics] অধীনে ছিল। ইহাঁরাই Improvement Trustএর কার্য্য করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ একবার দ্বারাবতী নগর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণাকার করিয়া পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহাতে নগরীতে অতি প্রশস্ত আটটি মহারথ্যা, ষোলটি সুবৃহৎ চত্বর [cross sections] এবং একটি বিশাল নগরবেষ্টি মার্গ (boulevard) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। [হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৯৮ম অধ্যায়, ৫২—৫৬ পঙ্‌ক্তি]। নগরে প্রপা [পানীয়শালা], আরাম, উদ্যানাদিও রচনা করিতে হইত। বাপী-তড়াগাদিরও অভাব ছিল না।

(নব্যভারত, আষাঢ়) শ্রী বিনোদবিহারী দত্ত

—

রামায়ণীয় যুগের বয়ন-শিল্প

বৈদিক কালে কার্পাস দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা হইত এবং এই বস্ত্র বয়নে রমণীগণ পুরুষের সাহায্য করিতেন (ঋগবেদ ২।৩।৬)। ঋগ্বেদের একটি ঋকে আছে—বস্ত্রা পুত্রায় মাতরো বয়ন্তি (৫।৪৭।৬)।

কালে রামায়ণীয় যুগে আমরা বয়ন শিল্পের প্রভূত উন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হই। রামায়ণের বহুস্থানে ক্ষৌম ও কৌশেয় বসনের উল্লেখ আছে। তাহা কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র।

তিসির অন্ত নাম ক্ষুমা। ক্ষুমার তন্তু হইতে সে কালে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহা ক্ষৌম বস্ত্র নামে পরিচিত ছিল।

অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ আর্য্যেরা ভারতে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহারা তিসির সূত্রের বস্ত্র পরিধান করিতেন। আর্য্যদের যে শাখা পশ্চিম অভিমুখে গিয়াছিলেন তাঁহারাও পাশ্চাত্য দেশে যাইয়া তিসির সুতারই বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেন।

ইউরোপে এই বস্ত্র এখন সাটিন নামে পরিচিত। প্রাচীন মিশরীয়েরা তিসির বস্ত্রকে খুব পবিত্র বলিয়া মান করিত। সেজন্ত তাহারা মিশরের সমাধিমন্দিরগুলির গাত্রে তিসির গাছকে পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া সযত্নে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। তিসির কাপড়কে মিশরীরা পবিত্র বস্ত্র-(coffin cover) রূপে ব্যবহার করিত।

ক্ষৌম বাস অতি প্রাচীন কালে চীন দেশেও উৎপন্ন হইত। চীনারা ক্ষুমাকে বলিত 'চুমা'। এই চুমাবাসই চীনাংশুক নামে এদেশে পরিচিত ছিল। কবি কালিদাস চীনাংশুক বস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারত হইতে একদিন এই বস্ত্র-শিল্পটি উঠিয়া গিয়াছিল, তখন চীন হইতে ভারতে চীনাংশুক আমদানী হইত।

রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ বিবাহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদের মাতৃগণ ক্ষৌম বাস পরিধান করিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বধূদিগকে বরণ করিয়াছিলেন। (আদিকাণ্ড, ৭৭ সর্গ ১২ শ্লোক)।

ক্ষৌম বাস নানা বর্ণের ছিল। মন্থরা কৈকেয়ীর ধাত্রীকে পাণ্ডুবর্ণ-ক্ষৌম-বাস পরিহিত দেখিয়াছিল (অযোধ্যাকাণ্ড ৭ সর্গ ৭ শ্লোক)।

কৌশল্যা শুক্লবর্ণ ক্ষৌম বসন পরিধান করিয়া পুত্রের যৌবরাজ্যাভিষেকের জন্য মঙ্গলাচরণ করিতেছিলেন (অযোধ্যাকাণ্ড, ২০ সর্গ ১৫ শ্লোক)। সীতার বিবাহে জনক রাজা স্বীয় কন্যাদিগকে অন্যান্য দানসামগ্রীর সহিত বহু ক্ষৌমবস্ত্র, একোটী সাধারণ বস্ত্র ও বহুমূল্য কম্বল প্রদান করিয়াছিলেন।—কম্বলাঞ্চ মুখ্যানাং ক্ষৌমান্ কোট্যম্বরাণি চ। (বা – ৭৪ সর্গ)।

ডাঃ হিরেন্ তাঁহার Indian Research গ্রন্থে মুখ্য-কম্বলকে উৎকৃষ্ট শাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গান্ধারের উৎকৃষ্ট মেষলোম হইতে এই মুখ্য কম্বল প্রস্তুত হইত। গান্ধারের মেষলোমের উল্লেখ ঋগবেদেও আছে (১ মণ্ডল ১২৬ সুক্ত)।

কৌশের বসন কোশকীটের তন্তু হইতে প্রস্তুত হইত। এই কোশকীট ভারতের পূর্ব্বদিকস্থিত কোশকারভূমি নামক গুটিপোকার জন্মস্থানে উৎপন্ন হইত (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০ সর্গ ২৩ শ্লোক)।

কেহ কেহ আসাম প্রদেশকেই সেকালের কোশকারভূমি বলেন।

বর্ত্তমানেও আসাম প্রদেশে কোশকার পোকার তন্তু হইতে কৌশের বসন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সীতা কৌশেয় বসন পরিধান করিতেন। রামলক্ষ্মণ প্রভৃতি রাজপুত্রেরা সর্ব্বদা সাধারণ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতেন।

রামলক্ষ্মণ কৈকেয়ীর নির্দ্দেশ মত নিজ নিজ পরিধেয় সূক্ষ্মবস্ত্র ত্যাগ করিয়া মুনিঋষিদিগের পরিধানযোগ্য চীর গ্রহণ করিলেন।

সীতা সেরূপ করিতে লজ্জা বোধ করায় রাম

চীরং ববন্ধ সীতায়াঃ কৌশেয়স্যোপরি স্বয়ম্॥

সে কালের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া যজ্ঞক্রিয়াদি সম্পাদন করিতেন।

পর্য্যঙ্কের উপর শয্যাস্তরণরূপে তখন একপ্রকার চিত্রকম্বল ব্যবহৃত হইত (অযোধ্যাকাণ্ড ৩০ সর্গ)।

লঙ্কায় লোমজ কম্বল ব্যবহৃত হইত (লঙ্কাকাণ্ড ৭৪ সর্গ)।

তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অঙ্গে অঙ্গরক্ষা বা কঞ্চুকী ব্যবহার করিতেন। কঞ্চুকী আপাদগ্রীবা লম্বিত হইত।

তখন সূচ দ্বারা পট্ট ও কৌশেয় বস্ত্রাদির উপর ফুল পত্র চিত্রিত করা হইত। সাধারণ বস্ত্রকে স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত করিয়া (আজকালকার ঢাকাই জামদানীর ন্যায়) বিচিত্র করিয়া তুলিবার উল্লেখ রামায়ণে আছে (সুন্দরাকাণ্ড ১০ সর্গ ও অযোধ্যাকাণ্ড ৭০ সর্গ)।

"মণিকাঞ্চনভূষিতম্ পরমাসনম্।" ৩৪

তখন উষ্ণীষের প্রচলন ছিল, শতশলাকাযুক্ত ছত্র, ও চর্ম্মপাদুকার প্রচলন ছিল (অঃ ৯১ সর্গ)।

রামায়ণে রাজারাজড়াদের সাজপোষাকের কথা আছে। রাম ভরতকে বলিতেছেন—"তুমি রাজ বেশ পরিধান করিয়া রাজ-সভায় প্রবেশ করিয়া থাক তো!" কিন্তু কোন স্থানেই পোষাকের পৃথক্ পৃথক্ নাম নাই।

বাস্তবিক পক্ষে রামায়ণীয় যুগে সীবনশিল্প প্রচলিত ছিল এবং রামায়ণে প্রদত্ত শিল্পের তালিকায় সীবনকারের উল্লেখ আছে। যথা

"রজকাস্তুন্নবায়াশ্চ গ্রামঘোষমহত্তরাঃ।" ১৫

(অযোধ্যাকাণ্ড ৮৩ সর্গ)

তুন্নবায় অর্থ দর্জ্জী। রামায়ণে সূচির উল্লেখও আছে। যথা

বিব্যথে ভরতোঽতীব ব্রণেতুদ্যেবসূচিনা। ১৭

(অযোধ্যাকাণ্ড ৫৭ সর্গ)

দর্জ্জীর কার্য্য বৈদিক কালেও প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে সীবন-করা বস্ত্রের উল্লেখ আছে। তখন বস্ত্র কাটিয়া সূত্রের ও সূচের সাহায্যে যে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা হইত তাহা উইলসন্ সাহেব তাঁহার অনুবাদিত ঋগ্বেদে প্রতিবাদকারীদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন। Wilson's Rigveda II, page 29 & Vol. IV, page 60.

তখন মুঞ্জাতন্তু দ্বারাও বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ঊর্ণাতন্তু দ্বারাও সূক্ষ্মবসন ও উত্তরীয় বা ওড়না প্রস্তুত হইত (লঙ্কাকাণ্ড ৭৪ সর্গ)।

বল্কল হইতে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহার নাম ছিল অজিন।

রাক্ষসপুরী লঙ্কায় বোধ হয় চর্ম্ম-বসন ব্যবহারই অধিক হইত। তথায় শয্যায় নানাবিধ চর্ম্মাস্তরণ ব্যবহৃত হইত। অর্শভচর্ম্ম (সুন্দরাকাণ্ড ১ম সর্গ), রঙ্কু-চর্ম্মাসন (লঙ্কাকাণ্ড ১১২ সর্গ), ব্যাঘ্র চর্ম্মাসন (লঙ্কা ৭৪ সুন্দরাকাণ্ড ১০), প্রভৃতির উল্লেখ লঙ্কার বর্ণনায় অনেক স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃদুল ঊর্ণামৃগ-চর্ম্মের উল্লেখও আছে।

লঙ্কার প্রতি ঘরে মেঝের পরিমাণ-মত চতুষ্কোণ মেঝ-আস্তরণ ছিল (সু ৯)।

রাঙ্কব বা রঙ্কু-লোমজাত কম্বলেরও তখন যথেষ্ট প্রচলন ছিল।

(সৌরভ, আষাঢ়)

সংহতি

মানুষের একলা হবার প্রবৃত্তিই হচ্চে তার রিপু, সত্যভাবে মিলিত হবার সাধনই কল্যাণ। এই দুইয়ের বিরোধ নিয়ে কুরুক্ষেত্র লড়াই মানুষের ইতিহাসে চ'লে আসচে। এখনো মানুষ শান্তিপর্ব্বে এসে পৌঁছয় নি।

সংহতির মূল-প্রবর্ত্তনার ভিন্নতা-অনুসারে তার প্রকাশের ভিন্নতা ঘটে। এই মূল-প্রবর্ত্তনা যদি রাষ্ট্রিকতা (politics) হয়, পররাষ্ট্রের প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রকে শক্তিমান্ ও সম্পৎশালী ক'রে তোলবার চেষ্টা হয়, তবে তার দ্বারা যে সংহতি ঘটে সে হয় অহমিকার সংহতি। তার বাহ্যরূপে একটা মিলনের চেহারা দেখা যায়, কিন্তু তার মূলতত্ত্ব মিলনতত্ত্ব নয়, প্রধানতঃ সে হচ্চে দ্বন্দ্ব। সেই বিরাট্ অহমিকার মেদস্ফীত আত্মম্ভরিতাকে অস্ত্রেশস্ত্রে রত্নালঙ্কারে ভূষিত দেখে লুব্ধ মানুষ তার পূজায় প্রবৃত্ত হয়। এই পূজার প্রধান আয়োজন নরবলি।

সেই বলির মানুষ যে কেবলমাত্র পররাষ্ট্রের মানুষ তা নয়। আপন দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষকে যন্ত্রের মধ্যে ফেলে' খর্ব্ব না করলে এই রাষ্ট্রিকতার পুষ্টি হয় না। তার শক্তিমূর্ত্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে কেটে ছেঁটে জুড়ে তেড়ে সৈনিকরূপে নিজের জয়রথ তৈরী করে, যে পর্য্যন্ত না এই রথে করে'ই তার শ্মশানযাত্রা ঘটে। তার ধনমূর্ত্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে পঙ্গু করে' তাদের পিণ্ড পাকিয়ে নিজের জয়স্তম্ভকে অভ্রভেদী করে' তুলতে থাকে, যে পর্য্যন্ত না এই স্তম্ভ বিদীর্ণ করে' নৃসিংহ বেরিয়ে আসেন।

মানুষের ইতিহাসে এর আগে অনেক দুঃখ দুর্ঘটনা ঘটেচে। শক্তির লোভ ধনের লোভ চিরদিনই নররক্তপিপাসার পরিচয় দেয়। তার স্বর্ণলঙ্কায় চিরদিনই দেবতাদের হাতে হাতকড়ি পড়েচে। তার দশমুণ্ড বিশহাত দশদিকে ধর্ম্মকে উপেক্ষা করবার জন্য উদ্যত। তাই চিরদিনই তার স্বর্ণলঙ্কায় কোনো না কোনো সময়ে আগুনও লেগেচে।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের সহায়তায় এই রিপু যে-রকম কঠিন উপকরণে বিরাট্ আকারে আপনার গড় বেঁধেচে এমন কোনো দিন করে নি। এর তাড়কারাক্ষসীর দল জগৎসুদ্ধ লোককে তাড়না করে' অতিষ্ঠ করে' তুলেচে। অবশেষে আজ এই সংহতির চেলাদের মধ্যে কেউ কেউ কেঁদে বলচে, "শান্তি চাই, শান্তি চাই।" কেন না এবারকার লঙ্কাকাণ্ড ত্রেতাযুগকে হারিয়ে দিয়েচে।

কিন্তু রিপুও পুষব শান্তিও পাব—বিধাতার সঙ্গে এমনতরো চাতুরী ত চলে না। চোরাই মালে ঘর বোঝাই করে' বিচারকের কাছে মাপ চাইব এমন দরবার ত মঞ্জুর হবে না। আগুনের পর আগুন লাগবে যুদ্ধের পর যুদ্ধ বাধবে।

ইতিমধ্যে মানুষের ইতিহাসে অন্ধকার গুহার মধ্যে একটি উপেক্ষিত শক্তি গোপনে আপনার বেগ সঞ্চয় করছিল। পরোপজীবী হয়ে যে ব্যবস্থা আপনাকে পোষণ করে, একদিন তার উপজীবিকাই তার পরম শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার মত এমন দাসতন্ত্র সভ্যতা আর নেই। এই সভ্যতা উপকরণবায়ুগ্রস্ত। এই উপকরণের অধিকাংশই তার পক্ষে বাহুল্য। অথচ এ'কে তৈরি করতে, এ'র ভার বহন করতে, এ'কে রক্ষা করতে বহু দাসের দরকার। তাদের না হ'লে এ-সভ্যতার একদিনও চলে না। তার মানে হচ্চে, এইখানেই এর সকলের চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা। তার বিপুল ঐশ্বর্য্যের দ্বারাতেই এতদিন তার এই দুর্ব্বলতা ঢাকা পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে এইটে প্রকাশ হ'য়ে পড়চে।

যারা অত্যাবশ্যক, অত্যাবশ্যকতাই তাদের ঐশ্বর্য্য। যতদিন একথা তারা না জানে ততদিন নিজের মূল্য বোঝে না বলে'ই তারা এত শস্তায় বিকিয়ে যায়। বর্ব্বরের দেশে, শোনা যায়, সোনা, গজদন্ত শুধু পুঁতির মালার দরে বিকিয়ে গেছে। যখনি তারা বাজার-দরের খবর পেয়েচে তখনই দামও চড়ে' গেছে। তেম্নি এতদিন য়ুরোপের রাষ্ট্রিক প্রতাপ দাসের কাঁধে চড়ে' জগৎজয় করে' বেড়িয়েচে। দাসের দল ভেবেছিল যারা তাদের চালাচ্ছিল তারাই চালাক। অতএব কাঁধ পেতে দিতেই হবে। ইদানীং তারা এই সহজ কথাটা আবিষ্কার করেচে যে তারা না চালালে উপরওয়ালারা অচল। তারা অত্যাবশ্যক, অতএব বর্ত্তমানের ঐশ্বর্য্য তাদেরই হাতে। এই আবিষ্কারের জোরে বর্ত্তমান সভ্যতার বাহনের দল মাঝে মাঝে কাঁধঝাড়া দিতে আরম্ভ করেচে—আর উপরে যারা বসে' আছে তারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে। শক্তির সে-উপলব্ধি উপরে চড়ে' বসেছিল সেই উপলব্ধিটা নীচে বাহনের মধ্যে প্রবেশ করেচে।

এই বাহনদের সংহতিই যে মানুষের সকল সংহতির চেয়ে বড় তা আমি মনে করি নে। কেননা এখানেও দ্বন্দ্বের প্রভাব। শক্তি উপরে বসে'ও নখদন্ত চালনা করে, নীচে নেমেও সে বৈষ্ণব হ'য়ে ওঠে না। আমেরিকায় দক্ষিণআফ্রিকায় অষ্ট্রেলিয়ায় এসিয়াবাসীদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের যে অন্যায় বিরোধ দেখা যায়, তার মধ্যে কেবল যে ধনীদের হাত আছে তা নয়, ধনের বাহনদের হাতও আছে।

কিন্তু য়ুরোপে কর্ম্মজীবীদের যে দল বেঁধে উঠ্‌চে তার মধ্যে একটি বড় কথা আছে। সে হচ্চে এই যে, এই দল নেশনের বেড়াকে একদিন

সম্পূর্ণ অতিক্রম করবে এমন আশা দেখা যাচ্ছে। কারণ ধনের রথযাত্রায় যে দড়িটা ধরে' টান দিতে হচ্ছে সে দড়িটা সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে চলে গেছে, যারা টানচে তারা সকল দেশেরই মানুষ। এই দড়িটার ঐক্যেই তারা এক। তাই এই ঐক্যটাকে অবলম্বন করে'ই তারা সম্পূর্ণ আঁট বাঁধতে পারবে।

যদি এই আঁট বাঁধা সম্পূর্ণ হয় তা হ'লে পৃথিবীতে একদিন একটা অতি প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হবে। এই দুঃসহ শক্তির প্রলোভনই সোভিয়েট সম্প্রদায়কে বিচলিত করেছিল। তারা তাড়াতাড়ি এইটেকে জাগ্রত এবং অধিকার করতে লোলুপ হয়ে উঠেছিল। এবং সকল লোলুপতারই যে লক্ষণ, নিষ্ঠুরতা ও জবরদস্তি—তা সেখানেও দেখা দিয়েছিল।

যাই হোক্, শক্তির লীলা সমাজের উপরের স্তরে আপনার ভাঙাগড়ার কাজ অনেক দিন ধরে' করে' এসেচে। এই শক্তি এবার নীচের স্তরে আপনার কাজ করবে বলে' উদ্যোগ করচে। কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এই স্তরে যখন তার আধিপত্য দেখা দেবে তখনই যে মানুষের সকল পাপ মোচন হবে, আর শক্তি তার শৃঙ্খল রচনার চিরকেলে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে রাতারাতি মানুষের মুক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হবে একথা আমি বিশ্বাস করি নে। তবে এই কথা সত্য, যে, সুখ দুঃখ ভালোমন্দের প্রবল সংঘাতের দ্বারাতেই শক্তি সৃষ্টিকার্য্যের প্রয়োজন সাধন করে—ভূমিকম্প-দৈত্যদের হাতুড়ি পিটুনীর চোটেই আজকের দিনের এই পৃথিবী তৈরী হ'য়ে উঠেচে। সমাজের নীচের তলার যে-উপকরণভাণ্ডারে এতদিন শক্তির কারখানাঘর বসে নি আজ সেখানে যদি বসে, তা হ'লে মানুষ তাতে করে' নিছক সুখ পাবে না, তাকে অনেক নতুন নতুন ব্যথা সইতে হবে। সৃষ্টিকার্য্যে এই ব্যথার দরকার আছে। অতএব তার জন্যে প্রস্তুত থাকাই ভাল।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানুষের ইতিহাসের যে চেষ্টা আজ দেখতে পাচ্চি, ভারত তার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাক্‌লে বঞ্চিত হবে। নূতন শক্তির যে বিশ্বব্যাপী মন্দির তৈরী হচ্চে তার একটা সিংহদ্বার রচনার ভার ভারতকেও নিতে হবে।

(সংহতি, জ্যৈষ্ঠ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

ভাবিবার কথা

প্রত্যেককে মনে মনে বেশ বুঝিতে হইবে—যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া, সমস্ত জাতির কল্যাণ কামনা করিয়া, কাজ করিতে হইবে—সংহতির শক্তি সঞ্চালন করিতে হইবে ; কি কি করিলে আপাততঃ কার্য্য আরম্ভ করা যায় তাহার বিবরণ এই :—

(১) বিলাসিতা বা বাবুগিরি একেবারে ত্যাগ করিতেই হইবে।

(২) খদ্দর ছাড়া ও দেশ-শিল্পজাত জিনিস ছাড়া, পারত পক্ষে অন্য কোনও জিনিস ব্যবহার করিব না। ডাক্তারি করিব দেশী ঔষধ সাহায্যে ক্রমশঃ, এরূপ সংকল্প রাখিতে হইবে। আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়িতে হইবে।

(৩) গ্রামে যাহার যেখানে যেটুকু জমি আছে, সেটুকুতে চাস আবাদ করা, ও মধ্যে মধ্যে যাইয়া বাস করা চাই। গ্রামে নৈশ অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা চাই। যে শিক্ষক যে গ্রামে জন্মিয়াছেন তিনি যথাসাধ্য তথায় জ্ঞানবিস্তারে সাহায্য করিবেন। ছোট বড় বিচার বন্ধ করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক চিকিৎসক নিজ নিজ গ্রামে ঔষধের গাছগাছড়ার বিস্তার ঘটাইবেন—দেশী ঔষধের প্রচলন ঘটাইবেন, সময় ও সুযোগমত সকলকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, মাতৃতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে বারম্বার উপদেশ দিবেন এবং গ্রামে মহামারী উপস্থিত হইলে এমন কি অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করিবেন।

এই ভাবে চলিলে, আবার শনৈঃ শনৈঃ (১) আমরা সমাজবদ্ধ হইতে পারিব, (২) দেশের শিল্পোন্নতি ঘটাইতে পারিব, (৩) অর্থদাস থাকিব না, (৪) আপনাদের শিক্ষার ভার আপনারা বহন করিয়া দেশ হইতে অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্য, দৈন্য ও অশান্তি দূর করিতে পারিব।

একথা আজ সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, দেশ আমার, দেশের কাজ আমার, দেশের উন্নতি সাধন করাও আমার কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুবিধাকে ভুলিয়া, আজ সমস্ত জাতির কল্যাণে প্রত্যেককেই লাগিতে হইবে—নতুবা, চাহিয়া দেখ—ঐ আছে রসাতল!

(সংহতি, জ্যৈষ্ঠ) শ্রী রমেশচন্দ্র রায়

—

প্রাচীন ভারতে শ্রমিক সংঘ

সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করার প্রবৃত্তি অতি প্রাচীন কাল হইতেই মনুষ্য-সমাজে প্রচলিত।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই সংঘের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। সমাজের বিস্তার ও অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা শ্রেণীর সংঘের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাদিগকে মোটামুটি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা ধর্ম্ম-সংঘ, শাসন-সংঘ, সামাজিক-সংঘ ও অর্থকারী-সংঘ।

ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অনেকগুলি, যেমন বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি, সংঘবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিত। এই শ্রেণীর সংঘগুলিকে ধর্ম্ম-সংঘ বলা যাইতে পারে। রাজার ক্ষমতা বিধিবদ্ধ ও সুসংযত করার উদ্দেশ্যে এবং স্থানীয় শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংঘ থাকিত। ইহারা অনেকটা বর্ত্তমান যুগের কাউন্সিল, মিউনিসিপাল্ কর্পোরেশন্ ও গ্রাম্য ইউনিয়নের ন্যায়, তবে ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী ও কার্য্যকারী। ইহাদিগকে শাসন-সংঘরূপে অভিহিত করা যাইতে পারে। বিরাট হিন্দু-সমাজ যে-সমুদয় জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিল তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি ক্ষুদ্র সংঘ। এতদ্ব্যতীত সমাজের আরও অনেক প্রকার কার্য্য সংঘবদ্ধ প্রণালীতে নির্ব্বাহ হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিক্ষা-সংঘ, যেমন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, আমোদ-উৎসবের সংঘ, যেমন বর্ত্তমান ক্লাবের অনুরূপ প্রাচীন 'সমাজ' প্রভৃতি অনুষ্ঠানের নাম করা যাইতে পারে। অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত যে সমুদয় সংঘের সৃষ্টি তাহাদিগকে অর্থকারী সংঘ বলা হইয়াছে। যে-সমুদয় সংঘের সদস্যগণ নিজেরা কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন তাঁহাদিগকে শ্রমিকসংঘ এবং যাহার সদস্যেরা পরের শ্রমলব্ধ অর্থ উপভোগ করেন তাহাদিগকে ধনিক-সংঘ বলা যাইতে পারে।

শ্রমিক-সংঘের প্রাচীন নাম ছিল শ্রেণী। বৃহস্পতির মতে দুই কারণে শ্রেণীগঠন আবশ্যক—বাধা দূর করিবার জন্য ও ধর্ম্মকার্য্য সাধনের জন্য। ধর্ম্মকার্য্য বলিতে যে-শ্রমিকসংঘের যে-কার্য্য তাহার উৎকর্ষ-সাধন এবং মন্দির-প্রতিষ্ঠা, কূপ-খনন, অতিথিশালা-নির্ম্মাণ প্রভৃতি লোকহিতকর ও পুণ্য কার্য্যও বুঝায়। শ্রমজীবীগণ স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিলে উৎপন্ন দ্রব্যের পর্য্যাপ্ত মূল্য পায় না, অনেক সময় পণ্য বিক্রয় করিবার অসুবিধা হয়, পরস্পরের অবৈধ প্রতিযোগিতায় উভয়েরই অনিষ্ট হয়। এই-সমুদয় নিবারণ করিয়া যাহাতে সকলের সমবেত শক্তি ও উদ্যমের ফলে সকলেই লাভবান্ হইতে পারে ইহাই সংঘগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতীয়েরা এই মূল নীতিটি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, পর্য্যাপ্ত ধন উপার্জ্জন করিতে হইলে শ্রমিকদের দলবদ্ধ

হওয়া চাই, স্বতন্ত্র থাকিলে চলিবে না। বৃহদারণ্যকোপনিষদে ইহার মূল সূত্র আছে, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য তাহার টীকায় লিখিয়াছেন, 'প্রায়েণ সংহতা হি বিত্তোপার্জ্জন-সমর্থাঃ নৈকৈকশঃ'।

বৃহস্পতি লিখিয়াছেন

"কোষেণ লেখক্রিয়য়া মধ্যস্থৈর্বা পরস্পরম্।
বিশ্বাসং প্রথমং কৃত্বা কুর্য্যুঃ কার্য্যাণ্যনন্তরম্॥"

অর্থাৎ প্রথমে কোষ, লেখ-ক্রিয়া অথবা মধ্যস্থ দ্বারা পরস্পরের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া পরে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কোষ অর্থ এক রকম দৈব প্রক্রিয়া। নিজের ইষ্টদেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া ও তাহার পূজা করিয়া স্নান ও পূজাবশিষ্ট জল অঞ্জলি করিয়া তিনবার পান করিতে হইত। তৎপর তাহাকে, সংঘের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব না, সর্ব্বদা ইহার ইষ্ট চিন্তা করিব ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। তখনকার লোকের বিশ্বাস ছিল যে এইরূপ দেবতা সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করার পর যদি কেহ তাহা ভঙ্গ করে তবে তাহার ঘোরতর অনিষ্ট হইবে। সকলে হয়ত এইরূপ প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করিত না। এইজন্য অন্যবিধ উপায়ের কথাও লিখিত হইয়াছে। লেখ-ক্রিয়া ও মধ্যস্থ লেখ-ক্রিয়া অনেকটা এগ্রিমেণ্টের মতন। ইহাতে সংঘের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী, প্রত্যেক সদস্যের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব, অধিকার ও লাভালাভের কথা লেখা থাকিত। ইহাতে স্বাক্ষর করিলেই সদস্য হওয়া যাইত। অপরিচিত কোন লোক হইলে সম্ভবতঃ একজন তাহার প্রতিভূস্বরূপ হইত; ইহারই নাম মধ্যস্থ।

এইভাবে নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য রাখিয়া বিধিবদ্ধ প্রণালীতে এক-একটি শ্রমিকসংঘ অথবা শ্রেণী গঠিত হইত। প্রাচীন কালে প্রায় প্রত্যেক শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ই এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাস করিত।

সূত্রধর, কামার, কুমার, স্বর্ণকার, কাংস্যকার, মণিকার, চর্ম্মকার, ভাস্কর, চিত্রকর, বর্ণকার, মালাকর, হস্তিদন্তকার, ক্ষৌরকার, নাবিক, মৎস্যজীবী, তৈলিক, তন্তুবায়, এতদ্ব্যতীত আরও নানা শ্রেণীর শিল্পজীবীরা সংঘ গঠন করিত। যাহারা কোন শিল্পকার্য্য জানিত না কেবল মাত্র মজুর খাটিত তাহাদেরও 'শ্রেণী' ছিল।

এই সমুদয় শ্রেণীর একজন অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইতেন; তাঁহাকে জ্যেষ্ঠক, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত এই জ্যেষ্ঠকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত কয়েকজন 'কার্য্য-চিন্তক' নিযুক্ত হইতেন। সর্ব্বোপরি ছিল সংঘের সাধারণ সদস্যসমূহের সভা। আজকাল যেমন একজন প্রেসিডেণ্ট্ বা সভাপতি, একটি এক্‌জিকিউটিভ্ কাউন্সিল অথবা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি এবং সাধারণ সমিতি থাকে, প্রাচীন সংঘের গঠন-প্রণালী অনেকটা তদনুরূপ। প্রাচীন সংঘে লোকমতই খুব প্রবল ছিল এবং এইজন্য সাধারণ সভার প্রতিপত্তিও খুব বেশী ছিল। সভাগৃহে প্রায়ই সাধারণ সভার অধিবেশন হইত। সেখানে রীতিমত বক্তৃতা, বিচার, বিতর্ক ও আলোচনা হইত। মাঝে মাঝে এই সাধারণ সভার সহিত মুখ্যগণের অর্থাৎ সংঘের প্রধান ব্যক্তিগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। তখন রাজা বিবাদের মীমাংসা করিয়া উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনা করিতেন। কিন্তু রাজা যথেচ্ছভাবে এই সমুদয় ব্যাপারের বিচার করিতে পারিতেন না। প্রত্যেক শ্রেণীরই স্বীয় কার্য্যের সুবিধার জন্য কতকগুলি সুপ্রণীত নিয়মকানুন ও বিধিবদ্ধ আচার-ব্যবহার ছিল। রাজা এইসকল অনুসারেই বিচার করিতেন। যাহাতে এই সমুদয়-বিধিবিধানানুযায়ী কার্য্য হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও রাজার অবশ্য-কর্ত্তব্য ছিল।

প্রত্যেক শ্রেণীরই সভ্যগণের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। সভ্যগণের মধ্যে বিসংবাদ হইলে ইহারাই তাহার বিচার করিত এবং বিচারে দোষী নির্দ্দিষ্ট হইলে শাস্তির ব্যবস্থা করিত। কোন সভ্য শ্রেণীর নিয়ম ভঙ্গ করিলে অথবা অন্য কোন অনিষ্ট করিলে, এমন কি শ্রেণীর কার্য্য-চিন্তকগণ তাঁহাদের কার্য্যে অবহেলা করিলে শ্রেণী হইতেই তাহার শাস্তির ব্যবস্থা হইত। অনেক সময়ে সভ্যগণের পারিবারিক জীবনেও শ্রেণীর প্রভাব বিদ্যমান দেখিতে পাই। বিনয়পিটকে উল্লিখিত হইয়াছে যে কোন সভ্য তাহার স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিলে শ্রেণী তাহার মীমাংসা করিত; শ্রেণীর অনুমতি ব্যতীত কোন সভ্যের স্ত্রী বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক শ্রেণীই সাধারণ ধর্ম্মাধিকরণের কার্য্য করিত। দস্যুতা, নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য মোকদ্দমা শ্রেণীর নিকট বিচার হইত। অবশ্য শ্রেণীর বিচারে সন্তুষ্ট না হইলে লোকে আপিল করিতে পারিত।

শ্রেণী অথবা শ্রমিক সঙ্ঘ আধুনিক ব্যাঙ্কের কার্য্যও করিত। প্রাচীন ভারতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি এমন বিধিবদ্ধ প্রণালীতে কার্য্য করিত যে সাধারণে বিশ্বাস করিয়া ইহাদের হস্তে টাকা গচ্ছিত রাখিত। এই টাকার সুদ হইতে দাতার নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য হইত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১২০ খৃষ্টাব্দে শকরাজ নহপানের জামাতা ঋষভদত্ত গোবর্দ্ধনপুরের দুইটি তন্তুবায় শ্রেণীতে ৩০০০ কার্ষাপণ জমা রাখেন। প্রথমটিতে ২০০০ কার্ষাপণ শতকরা মাসিক এক কার্ষাপণ হার সুদে, দ্বিতীয়টিতে ১০০০ কার্ষাপণ শতকরা মাসিক চার ভাগের তিন ভাগ কার্ষাপণ হার সুদে। এই সুদের টাকা হইতে প্রতি বৎসর নাসিকের নিকটস্থিত কোন এক গিরিগুহায় যে সমস্ত বৌদ্ধভিক্ষুগণ বর্ষা যাপন করিবেন তাঁহাদিগকে বস্ত্রাদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হইবে, ইহাই ছিল দাতার অভিপ্রায়। এই সমুদয় দলিলের শেষে প্রায়ই লিখিত থাকে "যত দিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে ততদিন এই প্রণালীতে কার্য্য হইবে।" ইহা হইতে এই-সমুদয় 'শ্রেণীর' দীর্ঘ অস্তিত্ব, সুবন্দোবস্ত ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনেক সময় শ্রেণীগুলি এতদূর প্রভাবশালী হইত যে তাহারা নিজ ব্যয়ে সৈন্যবল গঠন করিত। ইহা দ্বারা আত্মরক্ষা হইত; যুদ্ধকালে এই-সমুদয় সৈন্য রাজার পক্ষে যুদ্ধ করিত। শ্রেণী-বল রাজার একটি প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে তাহার ভূয়সী প্রশংসা আছে।

প্রত্যেক শ্রেণীর জ্যেষ্ঠক অথবা শ্রেষ্ঠী রাজদরবারে সম্মানের আসন পাইতেন, রাজা শোভাযাত্রায় বাহির হইলে তাঁহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেন, আবশ্যক হইলে রাজবৈদ্য তাঁহাদিগের চিকিৎসা করিতেন। দুর্য্যোধন গন্ধর্ব্বদিগের হস্তে পরাভূত ও লাঞ্ছিত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে স্বীকৃত হইলেন না; তাঁহার মনে বিষম লজ্জা হইল যে ফিরিয়া গেলে শ্রেণীমুখ্যেরাই বা আমাকে কি বলিবেন, আমিই বা তাঁহাদিগকে কি বলিব। কৃষ্ণের সহিত কংসের অনুচরগণের মল্লযুদ্ধ উপলক্ষে যে বিরাট্ সভা-প্রাঙ্গণ সজ্জিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হয়। প্রত্যেক মঞ্চের উপর হইতে যে শ্রেণী যে শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত তাহার চিহ্নযুক্ত পতাকা উড়িতেছিল।

এই সমুদয় শ্রেণী অথবা শ্রমিক-সংঘ যে শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতায় পশ্চাৎপদ ছিল না তাহার বহু প্রমাণ আছে। মন্দাসোর নামক স্থানে একটি শিলালিপিতে এক পট্টবায় শ্রেণীর অদ্ভুত আখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহারা প্রথমে লাটদেশে বাস করিত, পরে দশপুর—প্রাচীন মন্দাসোরের রাজার গুণে আকৃষ্ট হইয়া—স্বজনগণ সহ তথায় বসবাস করিয়া থাকে।—সেখানে পট্টবস্ত্র বয়ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তাহারা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠে এবং এক বৃহৎ সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা

করে। তাহাদের মধ্যে কেহ ধনুর্ব্বিদ্যা, কেহ কথা-সাহিত্য, কেহ ধর্ম্মশাস্ত্র এবং কেহ বা জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করিত। প্রশস্তিকারের কবিত্বের সঙ্গে সঙ্গে দশপুরের ঐশ্বর্য্যের একটু নমুনা দিতেছি।—

"চলৎপতাকান্যবলাসনাথান্যত্যর্থ শুক্লান্যধিকোন্নতানি।
তড়িল্লতা-চিত্র-সিতাভ্রকূট-তুল্যোপমানানি গৃহাণি যত্র॥
প্রাসাদমালাভিরলঙ্কৃতানি ধরাং বিদার্য্যেব সমুত্থিতানি।
বিমানমালাসদৃশানি যত্র গৃহাণি পূর্ণেন্দুকরামলানি॥

প্রাচীন কালে শ্রমিক সঙ্ঘের মধ্যে কি পরিমাণ জ্ঞানচর্চ্চার ব্যবস্থা ছিল উক্ত মন্দাসোর প্রশস্তিই তাহার প্রমাণ। তাহাদের দয়া দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মপরায়ণতা ও শিল্পচর্চ্চার পরিচয়ও অন্যান্য অনেক লিপিতে পাওয়া যায়। তাহারা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিত, তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের জন্য কূপ খনন করিত, বৌদ্ধভিক্ষুর ব্যবহারের জন্য গিরিগাত্রে গুহা ক্ষোদিত করিত। এই-সমুদয় শ্রেণী যে প্রাচীন ভারতবর্ষের কর্ম্মজীবনে ও ধর্ম্ম-জীবনে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং ইহারা যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটি বিশিষ্ট অঙ্গস্বরূপ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(সংহতি, জ্যৈষ্ঠ) শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার

—

শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মিলন

শান্তিপুর অতি প্রাচীন স্থান। কত প্রাচীন, তা বলিতে পারি না। এক সময়ে যে এই স্থানটি জলমগ্ন ছিল, তার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আবার এক সময়ে যে ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। এমনও সময় ছিল, যখন শান্তিপুর একটি সামান্য পল্লী। ছিল শান্তিপুরের প্রাচীন ইতিহাস এখনও জানিতে পারা যায় নাই। যতটুকু জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে শান্তিপুর নামের একটা সূত্র টানিয়া বাহির করিতে পারা যায়।

নেপালের সঙ্গে বাঙলাদেশের বেশ একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়। মহারাজ অশোক নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করাইয়াছিলেন। ত্রিহুত ও বাঙলার সহিত নেপালের সংবাদের আদান-প্রদান অনায়াস-সাধ্য ছিল। নেপালে প্রাপ্ত সপ্তম শতকের এক শিলা-লিপিতে সাতটি শৈব, ছয়টি বৌদ্ধ এবং চারিটি বৈষ্ণবতীর্থের তালিকা পাওয়া যায়। একাদশ শতকে নাথসম্প্রদায় বরিশাল চন্দ্রদ্বীপ হইতে নেপালে গিয়া নিজেদের ধর্ম্ম প্রচার করে। সম্ভবতঃ ইহার শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান শান্তিপুর যেখানে, সেইখানে ও তাহার চারিদিকে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম প্রচণ্ডদেব। তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া সিদ্ধাচার্য্য হইলে তাঁহার নাম হয় শান্তিকর। তিনি নেপালে গিয়া স্বয়ম্ভুক্ষেত্র প্রকাশ করেন। এখন স্বয়ম্ভুক্ষেত্র নেপালী তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থস্থান।

অনেকে এই প্রাচীন সংবাদটি না জানিয়া শান্তিপুর নামের কারণ নানারূপে কল্পনা করিয়াছেন। কেহ বলেন, শান্তিপুরের দুই ক্রোশ উত্তরে বাবলায় শান্ত নামে এক বেদাচার্য্য থাকিতেন; তাঁর নামেই শান্তিপুর। এ শান্তি মুনি শ্রী অদ্বৈতের পিতার চেয়েও ছোট। কাজেই এঁর নামে নাম হওয়া অসম্ভব।

মুহম্মদ-বিন্-বক্তিয়ার শান্তিপুর ও বয়ড়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে গঙ্গা পার হইয়া নবদ্বীপের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। দ্বাদশ শতকে বঙ্গ-শাসন-কর্ত্তা রাজা গণেশের সময়ে শান্তিপুর নামের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনও নাম ছিল শান্তিপুর। শ্রী অদ্বৈতপ্রভুর জীবিতকালে শান্তি-পুর সহর এক কাজির অধীনে ছিল। কাজি গৌড়ের হুসেন শাহ্‌র নামে এই সহর শাসন করিত। শোনা যায়, মুগল শাসকেরা এক সময়ে শান্তিপুরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মৌলভী আব্‌দুল ওয়ালি সুতরাগড়, সারাগড় ও তোপখানার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। আক্‌বর শাহ শান্তিপুরের পশ্চিম-সীমান্তবর্ত্তী সুতরাগড়-নিবাসী এক খুন্দকারকে এই নগর খেলাত দেন। তার পর শান্তিপুর নদীয়াধিপতি-গণের হস্তগত হয়।

নদীয়াধিপতি রুদ্র রায়ের সময়েও শান্তিপুর জগদ্বিখ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই শান্তিপুর হইতে দেড় লক্ষ পাউণ্ডের সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রতি বৎসর বিলাতে রপ্তানি হইত।

পূর্ব্বে শান্তিপুর তন্ত্রপ্রধান দেশ ছিল। তন্ত্রের নামে সুরাপান ও ব্যভিচার যথেষ্ট হইত। মহাপ্রভুর সময় হইতে শান্তিপুর পবিত্র তীর্থে পরিণত হইয়াছে। এক সময়ে এখানে খুব সংস্কৃত-চর্চ্চাও হইত। চতুষ্পাঠী টোলও যথেষ্ট ছিল।

শান্তিপুরে অনেক পুরাণ জিনিস আছে। এখানকার তোপখানা, পাড়ার প্রাচীন মসজিদ, ঔরঙ্গজেবের সময় ১১১৫ হিজরীতে ইয়র মুহম্মদ কর্ত্তৃক স্থাপিত। রাজা রামকৃষ্ণের মাতার গোকুলচাঁদের মন্দির ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। বঙ্গসাহিত্যের সেবক জয়গোপাল গোস্বামী, বিহারী-লাল গোস্বামী, লালমোহন বিদ্যানিধি প্রভৃতির নাম সর্ব্বজনবিদিত। বেনোয়ারিলাল গোস্বামী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোজাম্মল হক্‌ এইসব সাহিত্যিক শান্তিপুরের অলঙ্কার। সাহিত্য বলিলে আমরা কি বুঝিব? সাহিত্য শব্দটি আমরা প্রথম পাই কামন্দকীর নীতিশাস্ত্রে। এ সাহিত্যের অর্থ কি, তাহা ঠিক বোঝা যায় না। বিজয়ধ্বজ একজন প্রাচীন টীকাকার। ইনি সাহিত্যের বেশ মনোজ্ঞ একটি অর্থ করি-য়াছেন। হিতের সহিত, মঙ্গলের সহিত যাহা বর্ত্তমান, তাহাই স-হিত। স-হিতের যাহা ভাব, তাহাই সাহিত্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যাহাতে সমাজের কল্যাণ হয়, তাহাই সাহিত্য। এই সাহিত্য জাতির উন্নতির মানদণ্ড। কোন্ জাতি কোন্ বিষয়ে কিরূপ উন্নতি করিয়াছে, সেই জাতির জাতীয় সাহিত্য হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে। সাহিত্য ব্যক্তির ও জাতির জীবনীশক্তি। উন্নত জাতিমাত্রেরই লিখিত সাহিত্য আছে। অসভ্য জাতির লিখিত সাহিত্য খুব কমই আছে; অনেক জাতির প্রচ্ছন্ন বা মৌখিক সাহিত্যই বর্ত্তমান।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের বিকাশের ধারার কতকাল পরে প্রাকৃত সাহিত্যেরই একাংশভূত বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। বাঙলা সাহিত্যের পরিপুষ্টির সহিত বৈষ্ণব সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বাঙালী যে নবজাগ্রত উন্নতিপ্রয়াসী জাতি, বাঙলা সাহিত্যের গতি স্থিতি ও পরিণতি লক্ষ্য করিলে তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। স্বজাতি ও স্বদেশকে মনে ও চরিত্রে, রাষ্ট্রে ও সমাজে শ্রেষ্ঠ করিয়া তোলাও সাহিত্যের কার্য্য। আবার জাতির কর্ম্মশক্তির পরিচয়ের নামও সাহিত্য। প্রথমোক্ত সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য, শেষোক্ত সাহিত্য সভ্যতার ধারার ইতিহাস মাত্র। সাহিত্যে সৌন্দর্য্যকলা প্রকৃতির রহস্যময় সৃষ্টি, উহা ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি করা যায় না। সাহিত্যে এই কলার আবির্ভাব চিরন্তন, কিন্তু ইহার আদর্শ সকল সময় সমান নহে। এখনকার সাহিত্য-কলা-কৌশলের কুশল শিল্পীরা সেকালের কলা-কৌশলকে কখনও প্রশংসা করেন, কখনও বা নিন্দা করেন। ইহার অর্থ কলার শাশ্বত মূর্ত্তির আলোচনা-মূলক এই নিন্দা বা প্রশংসা নহে, ইহা আদর্শমূলক আলোচনার পরিণতিমাত্র। সাহিত্যে এখন ব্যক্তিত্বের প্রভাব রসবস্তুকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে, এমনও কেহ কেহ মনে করেন; কিন্তু সাহিত্যে মতের প্রভাব, ব্যক্তিত্বের সমালোচনার প্রভাব বর্ত্তমান থাকিলেই রসবস্তুকে উপেক্ষা করিয়া, অবজ্ঞা করিয়া সাহিত্য বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ইহাও নিশ্চিত। সাহিত্য রস-সাধনার বস্তু, সাহিত্যিক এই তপস্যায় সিদ্ধ তপস্বী; সিদ্ধ তপস্বী ছাড়া

সাহিত্যের তপস্যায় সফলকাম হওয়া যায় না। এই হিসাবে সাহিত্যিকের দায়িত্ব যে কত বেশী, তাহা বলিয়া বুঝান সহজ নয়। সাহিত্যের দায়িত্ব কি, তাহা সাহিত্যিককে বুঝিতে হইবে। যা-তা লিখিয়া সাহিত্য-সেবার ফাঁকি দিয়া জাতিকে পঙ্গু অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিলে প্রত্যবায় আছে।

সাহিত্যের দায়িত্ব সাহিত্যিকের দায়িত্ব হওয়া উচিত। প্রকাশক বা পুস্তকবিক্রেতারও দায়িত্ব আছে। সাহিত্যে নিষ্ঠার অভাবে জাতির অধঃপতন হয়, সাহিত্যে গতানুগতিক পন্থায় জাতির শক্তি ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। অনুকরণে স্বাবলম্বনস্পৃহা কমিয়া যায়। সাহিত্য অনুকরণ নহে—সাহিত্য করণ। ইহা জাতির শক্তি, সামর্থ্য, সৃষ্টির পরিচয়।

শিল্প-সাহিত্য, কৃষিসাহিত্য, বাণিজ্য-সাহিত্যের পরিপুষ্টি বাঙলাভাষায় বেশী হয় নাই। অথচ শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি এখন নিরন্নের দেশ, এখানে বিশ্বের সকল জাতির অন্ন আছে, নাই শুধু বাঙালীর। শিক্ষায় সাহিত্যের পরিপুষ্টি হয়।

জাতির অস্তিত্ব নষ্ট হইলে জাতীয় সাহিত্যও পরমুখাপেক্ষী হয়, তখন জাতীয় সাহিত্যের স্বরূপ থাকে না, অন্য সাহিত্যের অংশমাত্র হইয়া পড়ে। পরে অন্য সাহিত্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া যায় যে, বহুদিন পরে তার আকৃতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করাও সুকঠিন হইয়া পড়ে।

সাহিত্যে অনুবাদেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু অনুবাদককেও নিজস্ব জাতীয় প্রকৃতির অনুসরণ করিতে হইবে, অনুকরণকেও করণ করিয়া লইতে হইবে। জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে তাহাকে শিল্প কৃষি ও বাণিজ্যের কেন্দ্রে দাঁড়াইতে হইবে। অন্নের সংস্থান হইলে অন্নময় কোষের প্রসন্নতা সাধন-শক্ত হইবে না। তখন সাহিত্যও জীবন্ত হইয়া উঠিবে।

যাঁহাদের মন সুস্থ ও সবল, তাঁহারাই নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিবলে সাহিত্যকে রসদান করিয়া সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন। শিক্ষা ও সাহিত্যে যাহাতে জাতির মধ্যে বিত্তসঞ্চয় হয়, তাহার চেষ্টা ও উপায় নির্দ্ধারণ করা সকল সাহিত্যিকেরই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

চরিত্রের অনুভূতির স্ফুরণ ও চিত্রণই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষ ও মনীষীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মনীষিগণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যত শীঘ্র ধরিয়া ফেলিতে পারেন, সাধারণ লোকে তাহা তত শীঘ্র পারে না। মানব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁহারা মনীষাবলে ধরিয়া ফেলিয়া সহমর্ম্মিতার অনিন্দ্য-সুন্দর তুলিকায় নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া, আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত করিয়া থাকেন। আর ঐরূপ সুন্দর চিত্র আর্টের সাহায্যে এরূপভাবে প্রকাশ করেন, যাহাতে পাঠকের মনে ধারণা হইয়া যায় যে, জীবনের এই সত্য তো আমি ধরিতে পারি নাই। আর্ট তাহাই যাহা অন্যের মনে সমভাবের ও সমানুভূতির উদ্রেক করিতে পারে। লেখক ও পাঠকের ভাবের সমতা আর্টের সাহায্যেই হইয়া থাকে। অধিকন্তু কলাবিদের তুলিকায় রঞ্জিত চিত্র এমন সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়, যাহা হইতে মানবচরিত্র সম্বন্ধে আমরা নূতন অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়া থাকি। রঙ্গমঞ্চ হইতে আমরা কেবল অনুভূতি লইয়া যেমন ফিরিয়া আসি না—নাটকের ফলশ্রুতিও গ্রহণ করি, সেইরূপ উপন্যাসের চরিত্র পাঠ করিয়া আমরা শুধু অনুভূতি পাই না, মানব-চরিত্র সম্বন্ধে নূতন তথ্য ও জ্ঞান লাভ করি।

মানব সৌন্দর্য্যের উপাসক। সুন্দরের ধারণা কতকটা ইন্দ্রিয়ের উপর ও কতকটা সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সত্য, কিন্তু অল্প পরিসরের ভিতর চরিত্র-বিশ্লেষণ বা চরিত্র-স্ফুরণ সুন্দরভাবে করা সহজ নয়। জীবনকে আদর্শ সর্ব্বথা যে পরিচালিত করে না, তাহা তো আমরা দেখিতে পাই। এইজন্য আর্টের আবশ্যকতা। কলাবিদ্ বা আর্টিষ্ট্ আমাদের সম্মুখে চরিত্রের সেই অংশটুকু ধরিয়া থাকেন বা সেই অংশটুকু বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দেন যাহা পাঠকদিগের মনের উপর কার্য্য করে—অনুভূতির উদ্রেক করিয়া দিতে সমর্থ হয়। তাই প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা একবাক্যে বলিয়াছেন—"All art is selection"।

চরিত্রের অনুভূতির বা ঘটনার ফিরিস্তি-সম্বলিত নাটক বা উপন্যাস প্রকৃত সাহিত্যপদবাচ্য নয়। রসই সাহিত্যের প্রাণ। রস-সৃষ্টি করিতে না পারিলে সাহিত্যে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না।

রস না থাকিলে আনন্দও পাওয়া যায় না। কলাবিদের কৌশলের উপর এই রসসৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। সমগ্র জীবনকে যে লেখক আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন, তিনি আর্টিষ্ট্ নহেন, তিনি নকল-নবীশ, পটুয়া বা photographer। আর্টিষ্ট্ তিনিই, যিনি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে ঘটনা বা অনুভূতির অল্প পরিসরের ভিতর ফুটাইয়া তুলিতে পারেন।

তাই বলিতেছিলাম, আধুনিক যুগসাহিত্যে এরূপ চরিত্র অঙ্কিত হওয়া উচিত, যাহাতে ধনাগমস্পৃহাকে আমরা সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসন না দিই—আর ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের সদ্ব্যবহারের চিত্রও যাহাতে ফুটিয়া ওঠে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান বাঙ্‌লা সাহিত্য যে প্রবাহে চলিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, কথা-সাহিত্যই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই কথা-সাহিত্য যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, Realism (বস্তু-তন্ত্র) কথা-সাহিত্যের উপর প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

মানুষ যখন সংসারে অত্যাচার ও উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হয়, তখন মানুষ মনোমধ্যে এক কল্পিত রাজ্য সৃষ্টি করিয়া, হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টা করে। এই ভাবে কল্পনা ও প্রবৃত্তিমূলক অনেক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। আবার অনেক সময় মানুষ বাহিরের জগৎকে মনের মত সুন্দর দেখিতে না পারিয়া, এক কল্পিত স্বর্গরাজ্য মনেতেই গঠন করিয়া ফেলে। এইরূপ সৌন্দর্য্যের সাধকের চেষ্টায়ও অনেক কল্পনামূলক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী এইরূপ উপন্যাসে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। সৌন্দর্য্য ও যাহা-কিছু সত্য, সবই জগতে আছে। জগতে যাহা নাই তাহা সত্যও নহে, এবং তাহার কোন যথার্থ অস্তিত্বও নাই। জগতে যাহা আছে তাহাতেই আমাদিগকে পরিতৃপ্ত হইতে হইবে। যাহা কল্পিত, তাহাই বিসদৃশ; যাহা যথার্থ ও বস্তুগত, তাহাতেই প্রকৃত চরিতার্থতা হয়, তাহারই সাধনায় মানব-সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল হয়।

বস্তুতঃ আমাদের যত কিছু ভাব, তাহা আমরা স্বভাব বা প্রকৃতি হইতেই পাই। আমাদের মনের সংস্কার প্রাকৃত জগৎ-জাত হইলেও তাহা ভ্রমাত্মক হইতে পারে, সুতরাং তাহা হইতে যে সাহিত্য গঠিত হয়, তাহাতে সমাজের মঙ্গলসাধন না করিয়া তাহা অমঙ্গলের নিদান হইতে পারে। সেই কারণে অনেকের মত, আমাদের সাহিত্য ও উপন্যাসে বাস্তব জগৎ ও জীবনের যথার্থ চিত্র প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

Realistic ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে যাঁহারা চরমপন্থী, তাঁহাদিগের উপন্যাসে অনেক সময়ে একটা দোষ আসিয়া পড়ে। তাঁহারা বস্তু ও জীবনের মাত্র একটা দিক্ দেখেন; অপর একটা দিক্ যে আছে, তাহার প্রতি তাঁহারা উদাসীন। প্রকৃত চিত্রকর তিনি যাঁহার তুলিকায় সমগ্রের চিত্র প্রতিফলিত হয়। অংশের পরস্পর সম্বন্ধে জগতের সৌন্দর্য্য সংরক্ষিত; সুতরাং চরমপন্থী realistic ঔপন্যাসিকের ধারণা অন্যরূপ। তাঁহারা তাঁহাদিগের উপন্যাসে, জীবনের যথাযথ চিত্র সন্নিবেশিত করিয়া কৃতকার্য্য হইবার প্রয়াস পান এবং তাঁহাদের মতে যাঁহারা জীবনের আংশিক সৌন্দর্য্য চিত্রিত করিতে পারেন তাঁহারাই চিত্রকর—তাঁহারা বিশেষজ্ঞের মত জীবনের একটা দিক্ পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে দেখাইয়া থাকেন।

সাহিত্যে ভাববাদের (idealism) প্রতিক্রিয়ায় বস্তুতন্ত্র-বাদের (realism) আবির্ভাব হয়।

জগতের সব জিনিসই আকার বদলায়, আকার বদলায় না কেবল সত্য। সত্য সকল অবস্থায় একরূপই থাকে। পরিবর্ত্তনশীল মানব-প্রকৃতির মূলে এমন একটা-কিছু আছে যাহার কখন কোন পরিবর্ত্তন হয় না। তাহারই সহিত সত্যের সম্বন্ধ। সাহিত্য সেই সত্যকে তাহার প্রচ্ছন্ন অবস্থা হইতে ফুটাইয়া বাহির করে। সাহিত্যের কাজ সত্যকে প্রকাশ করা। যে সাহিত্য তাহা না করে, তাহা প্রকৃত সাহিত্য নহে। সাহিত্য লোকশিক্ষার উপায়স্বরূপ, সুতরাং যে জাতির সাহিত্যে প্রাণ না থাকে, সে সাহিত্যে জাতির উন্নতি হইতে পারে না। অনেক সময়ে আমরা দেখি, উপন্যাস ও নাটক জনসাধারণের রুচির অনুবর্ত্তন করে। ব্যবসা হিসাবে সেই উপন্যাস ও নাটক ভাল হইলেও আসল কাজে ভাল হইতে পারে না। উপন্যাস ও নাটক সাহিত্যের অঙ্গ। সুতরাং বর্ত্তমান রুচির অনুবর্ত্তন করিয়া কেবল লোকরঞ্জন করাই উপন্যাস ও নাটকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। লোকশিক্ষার ভার যাহার উপর, তাহার সকল সময়ে লোকরুচির অনুবর্ত্তন করিলে চলিবে না। সাহিত্যিক খাঁটি সত্যটি তাঁহার লেখার প্রতিফলিত করিবেন—যাহা সকল দেশে সকল জাতিতে এক। যাহা মানব-প্রকৃতির সত্য ও স্বাভাবিক সৃষ্টি, তাহাই প্রকৃত আদরণীয়।

সুন্দরের উপাসক শিল্পীর চক্ষে পবিত্র অপবিত্র কিছুই নাই—পাপ ও পুণ্যের চিত্র সমভাবেই তিনি অঙ্কিত করিয়া থাকেন। পাপের চিত্র শিল্পী কিন্তু এমন ভাবে অঙ্কিত করেন, যাহাতে দর্শকের মনে ঐ চিত্রের প্রতি ঘৃণা জন্মে—মনে বিতৃষ্ণা আসে।

তাহাই সৌন্দর্য্য, যাহা মানবাত্মার আনন্দবিধান করে; যাহা হইতে আত্মা আনন্দলাভ করিতে পারে না তাহাকে সুন্দর বলিতে পারা যায় না।

(যমুনা, আষাঢ়) শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

—

শীলভদ্র

প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক যুয়ন্-চয়ঙ চিরমহিমামণ্ডিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মহাপুরুষের চরণ-তলে বসিয়া সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র, বেদ ও ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, যিনি বাঙ্গালীর গৌরব-স্থান ছিলেন এবং সমসাময়িক ভারতের পণ্ডিত-সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুধী ও বরেণ্য বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম আজ লুপ্ত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সপ্তমস্থবির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এই বাংলাদেশেরই একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম ছিল শীলভদ্র। ইনি সমতটের জনৈক অধীশ্বরের পুত্র। আবাল্য তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগবশে তিনি সমগ্র ভারত পর্য্যটন করেন এবং ত্রিংশবর্ষবয়ঃক্রমকালে নালন্দা বিহারে উপনীত হন। এ সময়ে বোধিসত্ব ধর্ম্মপাল নালন্দার সপ্তমস্থবির পদে নিযুক্ত ছিলেন। শীলভদ্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অত্যল্প কাল মধ্যে গুরুর সঞ্চিত বিদ্যার অধিকারী হইলেন।

তৎকালে জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধরাজের নিকট ধর্ম্মপালের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রস্তাব করেন। সদ্ধর্ম্মের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে মহামতি ধর্ম্মপাল রাজার আহ্বানে সম্মত হইলেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে শীলভদ্র এই বিপুল দায়িত্ব স্বয়ং বহন করিবার জন্য গুরুর নিকট সানুনয় আদেশ প্রার্থনা করিলেন।

গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া শীলভদ্র যখন তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার মানসে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন, পণ্ডিত তখন সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই বালক আমার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে?" কিন্তু এ দর্প তাঁহার ক্ষণস্থায়ী হইল।

শীলভদ্রের অসীম পাণ্ডিত্য ও সুনিপুণ তর্ককুশলতার পরিচয় পাইয়া মগধরাজ তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ একটি নগর প্রদান করিলেন।

সংসারবিরাগী শীলভদ্র নগরটি রাজপ্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহার রাজস্ব হইতে একটি সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিলেন।

তিনি বহুসংখ্যক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এইসকল পুস্তক সহজ, সরল ভাষায় লিখিত ও অসীমপাণ্ডিত্যপূর্ণ।

কনোজ-ঈশ্বর মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ শীলভদ্রকে বিপুল সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

কাশ্মীরের প্রধান পণ্ডিতমণ্ডলী যে-সকল জটিল বিষয়ের সমাধানে অসমর্থ হইয়াছিলেন, শীলভদ্র সে-সকল বিনা আয়াসেই মীমাংসা করিয়াছিলেন। মহাযানী বৌদ্ধ হইলে তিনি যাবতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মগ্রন্থপাঠেই কিন্তু তাঁহার বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। স্বয়ং পাণিনি অধ্যয়ন করিয়া প্রিয়শিষ্য যুয়ন-চয়ঙকে তৎকালে প্রাপ্ত সপ্তম টীকার সহিত উহা অধীত করাইয়াছিলেন। পাণিনি ব্যতীত যুয়ন-চয়ঙকে তিনি বেদ শিক্ষা দান করেন।

ঔদার্য্য তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিমাণেই ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নালন্দায় যে বৈপুল্য ও বৈভব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা শীলভদ্রের অধ্যক্ষতার সময়ে অটুট ও অম্লান ছিল।—Contributions of Bengal—Shastri.

(যমুনা, আষাঢ়) শ্রী হিরণকুমার রায়চৌধুরী

পাঁচুগোপাল ডিটেক্‌টিভ্‌

সে এক ব্যাপার! এখনও মনে করলে হাসি পায়। পাঁচুগোপালের পক্ষে বেখাপ্পা রকম কাজ করা অবশ্য কিছু একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়, কিন্তু সে-বার পাঁচু নিজেকেও হার মানিয়েছিল।

ছেলেবেলা থেকেই পাঁচুর মনে একটা বৈজ্ঞানিক ভাবের ধারা বইত। বৈজ্ঞানিক পাঁচু যে সারাক্ষণই খুব উঁচুদরের বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করতো তা নয়; এই যাকে বলে কিনা য়্যাপ্লায়েড্ সায়েন্স্ অর্থাৎ ফলিত বিজ্ঞান, তার উপরেই ছিল তার আসল ঝোঁক্। পাঁচুর একটা ধারণা ছিল, যে, পুরাণো কাজ নূতন রকমে ক'রে,

অথবা নিত্য নূতনতর কোন আবিষ্কার ক'রে জগতের উপকার করার জন্যই বিজ্ঞানের সৃষ্টি। কথাটা আশ্চর্য্য রকম নূতন কিছু নয়, কিন্তু সে কথা নেপথ্যে বলাই ভাল; পাঁচুর কানে গেলে আর রক্ষা নেই।

সব-কিছুই বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখা পাঁচুর স্বভাব ছিল এবং তার জন্য সে বিপদেও বড় কম পড়ে নি।

আমরা তখন কলেজে পড়ি এবং এক মেসেই থাকি। পাঁচু সপ্তাহ খানেক খুব গম্ভীর হ'য়ে কি ভাব্‌তো। অনেক সাধ্য-সাধনার ফলে সে বল্‌লে, যে, সে একটা নূতন জ্ঞান লাভ করেছে, এবং সেই জ্ঞান জগতে বিস্তার করাই সেই সময় থেকে তার জীবনের উদ্দেশ্য। সে নাকি বুঝ্‌তে পেরেছে, যে, মনুষ্য-জাতির ঘ্রাণশক্তি ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাচ্ছে এবং এর বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করে' সে জান্‌তে পেরেছে, যে, মানুষ ঘ্রাণশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার করে না বলেই তার এমন অমূল্য শক্তিটি হেলায় হারাচ্ছে। এই বিষয়ে চেষ্টা ক'রে সে কলেজে একটা বিতর্ক (debate) কর্‌লো। আমরাও মজা দেখ্‌বার জন্য তাকে খুব উৎসাহিত কর্‌লাম। বিতর্কে পাঁচু উঠে বল্‌লে,—If necessity is the mother of invention, she is the grandmother of existence—অর্থাৎ প্রয়োজন যদি উদ্ভাবনার মাতা হয়, তা হ'লে তা অস্তিত্বের মাতামহী। কথাটার মধ্যে পাঁচুর মতে সমস্ত দর্শন-বিজ্ঞানের সারাংশটুকু ছিল। এগার রাত্রি জেগে বিজ্ঞান-বারিধির ভিতর থেকে সে গুণীজনের মত এই ক্ষীরটুকু সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু কলেজের ছেলেরা তাঁর এমন ন্যায়ের প্যাঁচ্‌টা না বুঝে অযথা তার নাম grandfather of existence, অর্থাৎ অস্তিত্বের ঠাকুরদাদা দিয়ে দেওয়ায় পাঁচুর মনে বড়ই আঘাত লেগেছিল। আমাদের আশা সে ছেড়ে দিল। কিন্তু পাঁচু দম্‌বার ছেলে ছিল না, সে বল্‌লে—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল্‌ রে।" সে ঠিক্‌ কর্‌লে যে, যে-সব পশু ঘ্রাণশক্তি খুব ব্যবহার করে, তাদের মত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে সে নিজের ঘ্রাণশক্তি অসাধারণ রকম বাড়িয়ে ফেল্‌বে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যায়াম ক'রে যেমন সার্কাসের জোয়ালো-লোকরা অমানুষিক শক্তি সঞ্চয় করে, তেমনি পাঁচুও তার ঘ্রাণশক্তিকে ব্যায়াম করিয়ে শক্তিশালী ক'রে তুল্‌বে ঠিক কর্‌লো।

তখনও ছুটীর অনেক বাকি; কাজেই হঠাৎ ঘ্রাণ-শক্তির ব্যায়াম করা সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌লো না। এতে পাঁচুর মনে একটা চাপা উত্তেজনা থেকে গেল। সে ভাল ক'রে ঘুমোতে পার্‌তো না।

খগেন্‌ আমাদের মেসের গল্পবাজ ছিল। সে একটা কথা পাঁচুর নামে রটিয়ে দিল। অবশ্য তাতে পাঁচুর বিশেষ যায়-আসে নি। খগেন তার রুমমেট্‌ ছিল। সে একদিন সকালে উঠে চা খাবার সময় বল্‌লে, "কাল রাত দুটোর সময় পাঁচু কি করেছে জান হে?" আমরা জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লাম, "কি করেছে?" "হঠাৎ দুপুর রাতে এক লোমহর্ষক চীৎকার ক'রে পাঁচু তক্তার উপর সটান উঠে বস্‌লো। চুলগুলো খাড়া, মুখ লাল। আমি একেবারে ভড়্‌কে গিয়েছিলাম। একটু গোঁ গোঁ ক'রে ঘুমন্ত অবস্থাতেই ও বল্‌তে লাগ্‌লো—'কাইনীসিস্‌, কাইনীসিস্‌! ব্যায়াম ও ব্যবহারই অনন্ত উন্নতির চৌরঙ্গী। এমন দিন আস্‌বে যখন সমাজ গুপ্তঘাতককে শিক্ষিত ঘ্রাণ-শক্তির সাহায্যে তার গোপন আবাস থেকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে এনে সুবিচারের মমতাহীন কবলে আছ্‌ড়ে ফেলে দেবে। মানুষের মন অনন্ত ক্ষমতার আবাস। চাই জাগিয়ে তোলা—উন্মেষ—বিকাশ। কিসের এ বর্ত্তমান! কাইনীসিথেরাপী, অর্থাৎ সঞ্চালন-চিকিৎসায় মানব কি না হবে!' এই বল্‌তে বল্‌তে পাঁচু এতটা উত্তেজিত হ'য়ে গেল যে আমি ওর গালে সজোরে এক চড় বসিয়ে না দিলে কাল রাত্রে একটা অঘটন কুঘটন কিছু ঘ'টে যেত।" আমরা এক চোট হেসে নিলাম। পাঁচু সেখানে ছিল না। চাকরকে খোঁজ কর্‌তে বল্‌লাম। সে এসে বল্‌লে, "পাঁচু-বাবু মুখ হাঁ ক'রে ছাদে রোদ পোয়াচ্ছে। জিজ্ঞেস কল্‌লাম, চা খাবে নি বাবু? বাবু বল্‌লে, দাঁতের ব্যথার চিকিচ্ছে কর্‌ছে রোদ দিয়ে। হ্যাঁ বাবু, রোদে কি ব্যথা শুকোয়?"

সে-বার ছুটীর সময় পাঁচু তার ঘ্রাণশক্তি বাড়াবার বিশেষ চেষ্টা করেছিল। রোজ সে ঘরে নানা রকম শিশিতে নানা রকম জিনিষ রেখে চোখ বুজে কোন্‌টা কি

তা শুঁকে ঠিক কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তো। বাগানের গাছপালা সব শুঁকে চিন্‌বার চেষ্টা কর্‌তো। এতে তার সত্যিই অনেকটা উপকার হয়েছিল। কিছু দিন পরে সে চোখ বুজে, হামা দিয়ে চল্‌তো। ঘরে বাগানে নানা রকম জিনিষ রেখে দিত, আর শুঁকে পথ ঠিক কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তো। কখনও কখনও সে অচেনা গন্ধ পেত এবং তার অনুসরণ কর্‌তো। একদিন তাই ক'রে সে নাকি একটা খরগোস প্রায় ধ'রে ফেলেছিল। এতে তার উৎসাহ খুব বেড়ে গেল। কিন্তু আর-একদিন সন্ধ্যেবেলায় বাগানে শুঁকে শুঁকে একটা অজানা জানোয়ারকে বের কর্‌তে গিয়েই কিছু কালের মত তার উন্নতির পথে বাধা প'ড়ে গেল। কে একটা জাঁতিকল বাগানে পেতে রেখেছিল। চোখ বুজে যেতে যেতে তার নাকটা তাতে আট্‌কে গেল। ফলে ভীষণ গোলমাল ও ছুটোছুটি প'ড়ে গেল। নাকটা বাঁচ্‌লো বটে, কিন্তু নাকের ডগায় জাঁতিকল ঝুলিয়ে বৈজ্ঞানিক পুত্র যখন পিতৃসন্দর্শনে উপস্থিত হলেন, তখন পুত্রগৌরবে মুগ্ধ পিতা বল্‌তে বাধ্য হলেন, যে, ঐ রকম পাগ্‌লামো কর্‌লে তিনি তাকে ত্যাজ্যপুত্র না ক'রে পার্‌বেন না। অগত্যা মত না বদ্‌লালেও পাঁচু প্রকাশ্যে সুপ্ত শক্তিকে আর জাগাতে চেষ্টা কর্‌তো না। নাকের দাগটা তার অবশ্য গেল না, কিন্তু পাঁচু তাতে কিছু মাত্র লজ্জা বোধ কর্‌তো না।

এর থেকে বোঝা যায়, যে, পাঁচু সাধারণ মানুষ নয়। সে নিজেও তাই ভাব্‌তো।

এর পর সে বৈজ্ঞানিকভাবে মহাভারত বিশ্লেষণ সুরু কর্‌লো। ভারতবর্ষ জগৎকে একদিন যে জ্ঞান দিয়েছিল, সেই লুপ্তজ্ঞান আবার জগতে ফিরিয়ে আন্‌তে তার খুব একটা উৎসাহ দেখা গেল এবং ফলে আমাদের বাঁচা দায় হলো। তার উদ্ভাবনী-শক্তি হঠাৎ এত বেড়ে গেল, যে, এমন কি বৈজ্ঞানিক মেসে ঝি চাকর টে'কা দায় হ'য়ে উঠ্‌লো। নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র, ফাঁদ-কল ইত্যাদি সে তৈরী কর্‌তে সুরু কর্‌লো এবং মেসের সকলেরই হাত পা সেগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে এমন সচেতন হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, যে, কলিযুগের কুরুক্ষেত্র ঠেকিয়ে রাখা আমাদের পক্ষে এক সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ালো। অবশেষে যখন সে নাগপাশ অথবা অটোম্যাটিক মাল্টি-লুপ ল্যাসো (Automatic Multi-loop Lasso) তৈরী কর্‌ল, তখন আমরা অগত্যা একটা খারাপ রকম ষড়যন্ত্র ক'রে সেটা পুড়িয়ে তবে নিজ হস্তে রান্না বাজার ও বাসন মাজার হাত থেকে নিস্তার পেলাম। দেখে দেখে আমাদের চোখে ওসব এমন সয়ে গিয়েছিল, যে, প্রথমে যখন ছাদের উপর দড়ি দড়া কাঠ বাঁশ ইত্যাদির সাহায্যে সে আর-একটা কি তৈরী কর্‌লো তখন আমরা অতটা নজর দিই নি! কিন্তু একদিন স্নানের সময় আমরা চারজন ছেলে, দুজন চাকর ও ঝি গোবিন্দর-মা উঠোনের কলতলায় গিয়েছি, এমন সময় হঠাৎ ঝুপ ক'রে অনেকগুলি দড়ির ফাঁস আমাদের গায়ে পড়্‌লো এবং কোন গোলমাল কর্‌বার আগেই আমরা ফাঁসে বাঁধা অবস্থায় দশ বার হাত শূন্যে উঠে গেলাম।

হতভম্ব হ'য়ে ছাদের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম পাঁচু মন দিয়ে একবারটি আমাদের দেখ্‌লো এবং 'ঠিক হয়েছে' ব'লে একটা হাতল ঘুরিয়ে আমাদের নামিয়ে দিল। গোবিন্দর-মা শুধু টাল সাম্‌লাতে না পেরে চৌবাচ্চায় প'ড়ে গেল। ভিজে কাপড়ে বিস্ফারিত নেত্রে উপরে একবার তাকিয়েই সেই যে সে বাড়ী গেল, তার পর তাকে আর দেখি নি। এই নাগপাশ পুড়িয়ে দেওয়ায় পাঁচুর কি রাগ!

এর পরে সে অভিমন্যুর ব্যূহ-ভেদের মূলমন্ত্রটা একদিন হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌ল। এমন নাকি একটা উপায় আছে যা জান্‌লে অতি ভীষণ ভিড়ের মধ্যেও একজন মানুষ অবাধে ঢুকে যেতে পারে এবং তাও আবার কোন রকম অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্য না নিয়ে। টেবিলের উপর দেশলাই-কাটি সাজিয়ে আঁকজোখ কেটে পাঁচু কত রাতের পর রাত কাটিয়ে দিলে। তার পর একদিন ভোরবেলা সে চেঁচিয়ে বল্‌লে, যে, অভিমন্যুর গুপ্তজ্ঞান সে পুনরাবিষ্কার করেছে এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ভাষায় জিনিষটা জলগতি-বিজ্ঞানের (Hydrokinetics) মধ্যে পড়ে। খগেন বল্‌লে, "খুব বেশী ভিড় ভেদ ক'রে যাওয়া অবশ্য ঐ জাতীয় সমস্যা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।" পাঁচু মানে না বুঝে এতে খুব খুসি হয়েছিল।

আমাদের সকলের ফুটবল খেলা দেখার বেশ ঝোঁক্ ছিল। সে দিন মোহনবাগানের সঙ্গে ক্যাল্‌কাটার ম্যাচ্।

আমরা চারটা না বাজ্‌তেই যথাস্থানে হাজির,—কিন্তু তবু দেখি ভীষণ ভিড়। 'মোহনবাগান' নামটার মধ্যেই কিছু আছে কি না জানি না, কিন্তু ওদের খেলা দেখ্‌তে বাংলা দেশ ভেঙে পড়ে। আবার মজা এই যে, যে-মানুষ খেলা যত কম বোঝে, সে তত আগে খেলার জায়গায় ভিড় করে। ভিড় দেখে পাঁচু বল্‌লে, "আমার নিজের কোনই ভয় নেই, কেন না আমি অবাধে সাম্‌নে গিয়ে হাজির হব—তবে তোমাদের জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে"—ইত্যাদি। আমরা অবশ্য কিছু বল্‌লাম না। একটু দাঁড়িয়ে পাঁচু পকেট থেকে একটা টুক্‌-বই বের ক'রে একবার কি সব দেখে নিল, এবং বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে নিজের মনে দুর্ব্বোধ্য ইংরেজী কথা অনেকগুলি ব'লে নিল। তার পরেই দেখ্‌লাম, পাঁচু হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। অভিমন্যুর লুপ্তবিদ্যা পাঁচু তবে নিশ্চয়ই ফিরে পেয়েছে ভেবে আমরা মনে মনে পাঁচুকে হিংসা করছি এবং নিজেদের অক্ষমতাকে গাল দিচ্ছি, এমন সময় সাম্‌নে একটা ভীষণ গোলমাল উঠ্‌ল। গোলমালের মধ্যে কার একটা সরু মোটা স্বর মেশানো গলা পরিষ্কার শোনা যেতে লাগ্‌ল—"বেআক্কেলে—আমার পাঁজরে কনুয়ের গুঁতো দিয়ে সাম্‌নে যাচ্ছিল ; উঃ বাপ্‌! যা লেগেছে—মার···" তার পর সে গলাটা আর শোনা গেল না। খুব একটা মার্‌ মার্‌ ধ্বনি এবং অনেক সম্বন্ধ-বৈচিত্র্য-সূচক শব্দ মিশে এক তুমুল গোলমাল সুরু হ'ল। হঠাৎ এক জায়গায় ভিড়টা একটু ফাঁক্‌ হ'য়ে তার পরমূহূর্ত্তেই সেইখান দিয়ে পাঁচু ছিট্‌কে বেরিয়ে এল। গায়ের জামা তার ছেঁড়া, চুলও বোধ হয় কিছু কম, চটি জোড়ার একটা নেই ; হাতে কেবল সেই পকেট-বুকটা আঁকড়ে ধ'রে সে হুম্‌ড়ি খেয়ে এসে বাইরে পড়্‌লো। একজন বেশ কালো মোটা লোক বিকট হুঙ্কার দিয়ে, এক এক বারে প্রায় ১২।১৩ ইঞ্চি লম্বা লাফ দিয়ে দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আস্‌ছিলেন। উদ্দেশ্য—তাকে "শিক্ষা" দেওয়া। আমরা দেখ্‌লাম বেজায় বিপদ। যা শিক্ষা পাঁচু পেয়েছে তাতেই রক্ষা নেই, আরও পেলে সে নিশ্চয়ই ব্রহ্মশির কিম্বা পাশুপত অস্ত্র আবিষ্কার ক'রে একটা সর্ব্বনাশ করবে ; কাজেই আমরা সদলে পাঁচুকে বাঁচাতে ছুট্‌লাম।

মোটা লোকটি তখন তেইশ লাফে বাইশ ফুট জমি পার হয়ে ঘর্ম্মসিক্ত কলেবরে পাঁচুর ঘাড়ের উপর প্রায় এসে পড়েছেন। জয়ের আশায় তাঁর চিবুকের চার থাক নিষ্প্রয়োজন চর্ব্বি নিষ্ঠুর আনন্দে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল। অতি সূক্ষ্ম আদ্দির পাঞ্জাবীর অন্তরালস্থিত তাঁর তের-তলা ভুঁড়িটি সদর্পে দুলে দুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। পাঁচুর প্রাণ ওই ঘটোৎকচ-রূপীর আলিঙ্গনে পড়্‌লে মহাভারতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ইহজন্মের মত ওইখানেই শেষ হত। মরিয়া হ'য়ে এমন সময়ে খগেন্‌ তাঁকে একটি লেঙ্গি মেরে "অবস্থার গতি" সশব্দে ফিরিয়ে দিলে। একজন নিরপরাধ পাহারাওয়ালাকে জড়িয়ে তাঁর উপুড়াবস্থা-লাভটা সকলের চোখে এতই সরস লেগেছিল, যে, তখনকার মত পাঁচুর অস্তিত্বের প্রমাণ-গুলো তারা সম্পূর্ণ ভুলেই গেল। সুবিধা দেখে পাঁচুও ইত্যবসরে স'রে পড়্‌ল। মেসে ফিরে দেখি, পাঁচুর ঘরে খিল। রমেন্‌ ইয়ার বল্‌লে, "পাঁচু অভিমন্যুর দাদা, সে শুধু ব্যূহ ফুঁড়ে ঢুক্‌তেই শিখেছিল, কিন্তু পাঁচু নিষ্ক্রমণটাও আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে।"

(২)

এখন আসল গল্পটা বলি। এতক্ষণ পাঁচুর একটু পরিচয় দিচ্ছিলাম। পাঁচু আজকাল আর ছাত্র নয়। সে এম্‌-এস্‌সি ; বি-এল্‌ পাশ ক'রে ওকালতি করছে। অর্থাৎ পুলিশ-কোর্টের প্রত্যেকটি ইট পাথর আজকাল সে চিনে ফেলেছে। এ ছাড়া সে বর্ত্তমানে বিবাহিত। তার শ্বশুর সরকারী কাজে শিমলায় থাক্‌তেন, কিন্তু তাঁর পরিবারের অন্য সকলে কলকাতাতেই ছিলেন। পাঁচুর এতে কোনও আপত্তি ছিল না, কেন না সে শ্বশুরের চেয়ে স্ত্রীকেই বেশী প্রয়োজনীয় মনে করত। শ্বশুরের আবার বদ্‌রাগী ব'লে একটা দুর্নাম ছিল। কাজেই পাঁচুর শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ নেই ব'লে যে সে খুব কষ্টে ছিল, তা বলা যায় না।

আমরা সকলেই তখন নানা কাজে নানা জায়গায় ছিলাম। পরস্পরের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হত, কিন্তু অনেক কাল, খুব জমিয়ে আড্ডা দেওয়া হয় নি। এতে বড় দুঃখ হ'তো। খগেন তখন বর্দ্ধমানে ছিল। আমরা

ক-একটি বন্ধু মিলে' ঠিক্ করলাম, দিন কতক তার ওখানে গিয়ে আড্ডা জমাব। অবশ্য পাঁচু না হ'লে আমাদের দল ঠিক পূর্ণ হবে না, কাজেই তাকে অনেক ক'রে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বৈবাহিক, সামাজিক, আর্থিক বা বৈজ্ঞানিক কোন আপত্তিই তার শোনা হ'ল না।

ওকালতি সুরু করবার পর থেকেই সে তার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি অপরাধ-বিজ্ঞানের (criminology) চর্চ্চায় লাগিয়েছিল। সে বল্‌ত, অপরাধ জিনিষটা যে বেখাপ্পা একটা ঘটনা নয়, তারও একটা কারণ আছে, এটা প্রমাণ করা দরকার। আবার কারণটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধীর স্বভাবজাত, একথাটা বিশেষ ক'রে মনে রাখা প্রয়োজন। পাঁচু আরও বল্‌ত, যে, পৃথিবী তার অবিশ্রাম গতির পথে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে এক এক সময় যায়। সেই সময় পৃথিবীতে অপরাধাধিক্য দেখা যায়। অর্থাৎ ঐ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে মানুষের মন সামাজিকতা অবিচলিত রাখ্‌তে পারে না। কাজেই সে অসামাজিক কাজ করে। অপরাধ ও অসামাজিক কাজ একই কথা। বিদ্যুতের তাড়নায় না প'ড়েও অবশ্য বিশেষ ক'রে অপরাধ করতে পারে, এমন লোক অনেক জন্মায়, এবং তাদের ভাল ক'রে চিন্‌বার উপায় থাক্‌লে যথাসময়ে গারদ ব্যবহার ক'রে সমাজকে অনেক অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বাঁচান যায়। এইজন্য অপরাধীরা যে ধাঁচের মানুষ তাহার (the criminal type) বিশেষ চর্চ্চা প্রয়োজন। পাঁচুর মতে এমন দিন আস্‌তে পারে, যখন জন্ম রেজেষ্টারি করবার সময়েই অপরাধপ্রবণতা-নির্দ্দেশক কল (criminality indicator) দিয়ে সদ্যোজাত শিশু ভবিষ্যৎ কালে কি প্রকার লোক হবে তা ঠিক জানা যাবে এবং অপরাধী-জাতীয় শিশুদের গোড়ার থেকেই বন্ধ ক'রে রেখে জগৎ থেকে অপরাধ চিরকালের মত দূর ক'রে দেওয়া যাবে।

তার মতে যুদ্ধ জিনিষটা নাকি বড় ধরণের অপরাধ-উৎসব; আর যুদ্ধ বাধে ঠিক সেই সময়, যখন ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী কোন একটা খারাপ রকম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ভিতর এসে পড়ে। এই বিদ্যুৎ ঠিক্ কি ধরণের জিনিষ, এখনও জানা যায় নি, কিন্তু শীঘ্রই যাবে, এবং তার পর থেকে পণ্ডিতেরা ঠিক সময়ে জগৎকে যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে সাবধান ক'রে দিতে পারবেন। যখনই পৃথিবী কোন খারাপ রকমের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের কাছে আস্‌বে, তখন সকলে "বিদ্যুৎপ্রুফ্" (protective cloaks and masks) পোষাক ও মুখোস পরতে বাধ্য হবে। ফলে, বাইরের যুদ্ধ বা অপরাধ-বন্যা (war or crime wave) মানুষকে ছুঁতে পারবে না। বিজ্ঞানের এমনই কত উন্নততর অবস্থার কথা ভেবে পাঁচু ভাবে বিভোর হ'য়ে যেত।

যাই হোক, আমাদের বর্দ্ধমানে দিন কাট্‌ছিল মন্দ নয়। পাঁচু লম্ব্রোসোর ক্রিমিন্যাল টাইপ্‌স্ (Criminal Types) বইখানাকে একমাত্র-ছেলের-মত-সাদরে কোলে আঁকড়ে ব'সে থাক্‌তো, আর আমরা অবোধের মত তাস-খেলা বা বাজে বকায় সময়ের অপচয় করতাম। পাঁচু কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌ত না যে কতকগুলো নোংরা ও বিশ্রী মুখ আঁকা কাগজ হাতে ক'রে লোকে অত চেঁচায় কেন। সে আমাদের ভালর দিকে আন্‌বার চেষ্টা প্রায়ই করত। হতাশ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিতে তাকে কখনও দেখ্‌তাম না।

তাকে এবারে লম্ব্রোসো'তে পেয়েছিল। তাসব্যাধিগ্রস্ত আমাদের সে কি শ্রেণীতে ফেল্‌ত জানি নে, কিন্তু এ ব্যাধি থেকে মুক্ত ক'রে আমাদের লম্ব্রোসোগ্রস্ত করতে তার উৎসাহের অবসান কখনও দেখা যেত না। লম্ব্রোসো নাকি অসাধারণ লোক ছিলেন—তা নইলে যে পাঁচু কখনও তার কথা বল্‌ত না বা তাঁর বই পড়্‌ত না, তা বলাই বাহুল্য। অপরাধীমানবতত্ত্ব বিষয়ে লম্ব্রোসোর আবিষ্কার ও বিচার মহামূল্য এবং তাঁকে ঐ বিষয়ে যুগ-প্রবর্ত্তক বলা চলে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ দেখে অপরাধী ধাঁচের মানুষ চেনা যায়; এবং এ বিষয়ে বর্ত্তমান বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন, পাঁচুর, লম্ব্রোসোর মতে দৃঢ় বিশ্বাস, একতিলও তা'তে কমেনি। আমরাও এতে কোন আপত্তি করতাম না।

একদিন আমাদের আড্ডা বেশ জ'মে আস্‌ছিল। পাঁচুও তার লম্ব্রোসোখানা বন্ধ ক'রে একমনে ভাবের শাঁস খাচ্ছিল। এমন সময় এক গোলমাল উপস্থিত হ'ল। বাইরে দরজায় দুম্‌দাম্ ক'রে ঘা দিয়ে, মোটা গলায় কে

বললে, "বাবু, টেলিগ্রাম।" আমাদের সকলেরই মনে হ'ল, নিশ্চয় কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, নইলে টেলিগ্রাম কেন? পাঁচু শুধু নির্ব্বিকার হ'য়ে ভাব খেতে লাগ্‌ল। কিন্তু অদৃষ্টের ফের! দেখা গেল যে তারই শালার কাছ থেকে টেলিগ্রামটা আস্‌ছে। "পাঁচুর স্ত্রীর বেজায় অসুখ; এখনই তাকে যেতে হবে।" বেচারা পাঁচু প্রায় কেঁদে ফেল্‌লে। বৈজ্ঞানিক হ'লেও তার মনটা বড় নরম ছিল। আমি বল্‌লাম, আমিও তার সঙ্গে যাব এবং যদি মিসেস্ পাঁচুর তেমন কিছু না হ'য়ে থাকে, তা হ'লে তাঁর অসুখ সেরে গেলে দুজনেই আবার ফিরে' আস্‌বো।

তাড়া হুড়ো ক'রে পঞ্জাব-মেল ধরা গেল। ভীষণ ভিড়। বহুকষ্টে একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় একটু জায়গা ক'রে বস্‌লাম। গাড়ীতে প্রাণহীন বাক্স, প্যাঁট্‌রা ত অসংখ্য, এবং তা ছাড়া দুটি ফিরিঙ্গি, একজন পশ্চিম দেশীয় ভদ্রলোক এবং জনকতক বাঙালী। পাঁচু প্রথমটা চুপ ক'রে ব'সে ছিল, কিন্তু আমার মনে হ'ল যে সস্তা চুরুটের ও আক্রা এসেন্সের গন্ধে, আমার অশিক্ষিত ঘ্রাণশক্তিই আমার জীবনকে অতিষ্ঠ ক'রে তুল্‌ছে, না জানি বেচারা পাঁচুর অবস্থা কি সাংঘাতিক। কাজেই তাকে একটু প্রফুল্ল কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লাম। কাজটা খুব শক্ত হ'ল না। লম্ব্রোসোর কেতাবখানা পাঁচুর হাতেই ছিল এবং স্ত্রীর অসুখ সম্বন্ধে আমি তাকে কিছু আশা দেবার পরেই সে বেশ উৎসাহিত হ'য়ে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে নিযুক্ত হল।

একটি রোগা ফিরিঙ্গি নিজের শুঁট্‌কো আঙুলগুলি নিয়ে ক্রমাগত নিজের হাতের উপর চটাপট লাগাচ্ছিল। ঠিক যেন বাঁয়া-তবলা বাজাচ্ছে। পাঁচু খানিক নিরীক্ষণ ক'রে বল্‌লে, "ওর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে ওর পকেট-কাটা ব্যবসা, অথবা ও লোহার সিন্দুকের তালা খুল্‌তে ওস্তাদ।" আমি বল্‌লাম, "কেন হে, ওকে তো বেশ ভাল লোক ব'লেই মনে হচ্ছে।" পাঁচু আমায় খোঁচা দিয়ে সেই দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "আরে না, দেখ্‌ছ না, ওর আঙুলগুলি কেমন চঞ্চল; ক্রমাগতই নড়্‌ছে, একটুও স্থির হ'তে পার্‌ছে না। তার কারণ ওর আঙুলের স্নায়ুগুলি বেজায় শক্তিশালী। অর্থাৎ আঙুল দিয়েও খুব সূক্ষ্ম রকমের কাজ কর্‌তে পারে। ঐ ধরণের লোকেরাই পিক্‌পকেট্ ইত্যাদি হয় ভাল।"

আমি বেচারা চুপ্ ক'রে রইলাম। বইখানায় আবার খানিক ডুব মেরে একটু পরে মুখ তুলে চোখের ইসারা ক'রে একটি লোককে দেখিয়ে পাঁচু বল্‌লে, "আর ঐ যে ঠোঁট-পুরু, নাক-বাঁকা, টেরা-চোখ লোকটি, ও 'শক্তের ভক্ত নরমের যম' ধরণের লোক। ছিঁচ্‌কে চোর বা ছুরি-দেখানো-গুণ্ডা প্রায়ই ঐ ধরণের লোকেরাই হয়।"

আমি মেনে নিয়ে বল্‌লাম, "তা হবে, তুমিই ভাল বোঝ, কিন্তু দোহাই, একটু আস্তে চেঁচাও; ওরা তোমার বিশ্লেষণ শুন্‌লে খুসি হবে না নিশ্চয়ই।"

পাঁচু আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বল্‌লে, "যাদের চেহারায় সৌন্দর্য্য ও কদর্য্যতা মেশানো থাকে, অর্থাৎ কিনা যাদের হঠাৎ দেখ্‌লে সুন্দর মনে হয়, কিন্তু মন দিয়ে দেখ্‌লে খুবই খারাপ লাগে, তারা হচ্ছে বড় ভীষণ লোক। আবার যদি তাদের মুখের শিরা একটু ফোলা ফোলা হয়, আর মাথায় টাক থাকে, তা হ'লে ত নিশ্চিত ধ'রে নিতে পার, যে, সে ধরণের লোক হয় খুনে, নয় ষড়যন্ত্রকারী কিম্বা জালিয়াত্। খুনেদের মুখের মাংসপেশীগুলি সময় সময় নেচে ওঠে, এটা ভাল ক'রে মনে রাখা দর্‌কার। সে আরও অনেক কিছু ব'লে যেতে লাগ্‌ল; এখন আর সব কথা মনে নেই। অন্যে শুন্‌ছে কি না তা পাঁচু দেখ্‌ত না এবং অন্যে না শুন্‌লেও সে অনর্গল ব'কে যেতে পার্‌ত।

গাড়ীটা তখন প্রায় লিলুয়ার কাছে এসেছে। একজন ফিরিঙ্গি একটু উঠে গাড়ীর অন্যদিকে যাচ্ছিল। গাড়ীটা লাইন বদ্‌লাবার ঝোঁকে বেশ মাতালের মত টল্‌ছিল। এমন অবস্থায় যেতে গিয়ে সে না-দেখে সেই পশ্চিমদেশীয় লোকটির খালি পাখানা সজুতা বেশ ভাল ক'রেই মাড়িয়ে দিল। আর যায় কোথায়! "Blind idiot! Can't you stand on your OWN feet?" ব'লে সাংঘাতিক এক সিংহনাদ ক'রে সেই লোকটি তেড়ে উঠ্‌ল। ফিরিঙ্গি বেচারা একবার তাকিয়েই সেই লোকটির সুপুষ্ট বিশাল দেহ দেখে' অনায়াসে তার 'জাতীয়' গৌরব বিসর্জ্জন দিয়ে বল্‌লে, "I am so sorry, excuse me." কিন্তু সে

ব্যক্তি উত্তরোত্তর আরও চ'টে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—তার মুখের শিরাগুলি ফুলে' উঠ্‌ল এবং রাগে তার শান্ত মুখখানা বেশ বিশ্রী হয়ে উঠ্‌ল। ইংরেজী, হিন্দী এবং একটা অর্থহীন নিজস্ব ভাষায় সে বিকট চীৎকার করতে লাগ্‌ল। তার চীৎকারের সার-মর্ম্ম যা বোঝা গেল, তাতে বুঝ্‌লাম, বিনা পয়সাতেই সে সকলকে গাড়ীর থেকে বাইরে ফেলে' দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু সস্তায় পেলেও কেউ তাতে রাজি না হওয়ায় তার রাগ আরও বেড়ে যেতে লাগ্‌ল।

আমি পাঁচুকে বল্‌লাম, "ওহে দেখ, কেমন সুন্দর চেহারাটা কদর্য্য হ'য়ে আস্‌ছে; এ নিশ্চয় তোমার অপরাধীর্ধাঁচের মানুষ।" পাঁচু ওৎ পেতে ভাল ক'রেই দেখ্‌ছিল। ঠিক সেই সময় লোকটি রেগে চ'টে উঠে' দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্কে মাথা ঠেকে' তার পাগড়ীটা প'ড়ে গেল। দেখি বেশ বড় একটি টাক! যেন হারানিধি খুঁজে পেয়েছে এম্‌নি আনন্দে পাঁচু চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "দেখ্‌ছ, দেখ্‌ছ, একেবারে খুনে!"

কথাটা বাংলায় বলা সত্বেও সে ব্যক্তি বুঝ্‌তে পার্‌লে। রাগে তার মুখ প্রায় নীল হ'য়ে গেল। "What the devil do you mean?" ব'লে সে এক লাফে আমাদের দিকে ফিরে' দাঁড়াল। আমার তো ভয়ে প্রাণ উড়ে' যাবার জোগাড়! পাঁচু তার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে আমায় বুঝিয়ে বল্‌লে, "He must be a dangerous criminal." যেই না এই কথা শোনা, সে লোকটা হঠাৎ পাশের বেঞ্চি থেকে, অন্য কার একটা কমলালেবু তুলে' নিয়ে সজোরে পাঁচুকে ছুঁড়ে মার্‌লে। অকথ্য কয়েকটা কথাও সেই সঙ্গে সে পাঁচুর উদ্দেশ্যেই বর্ষণ করতে লাগ্‌ল। আশে-পাশের লোকেরা তাকে ধ'রে না ফেল্‌লে সে যে কি করত তা কে জানে! লেবুটা পাঁচুর কপালে লেগে' ফেটে' গেল আর তার মুখ বেয়ে রস পড়্‌তে লাগ্‌ল। সে এক তস্বীর! ঐ অবস্থাতেও আমি হেসে মরি! ভাগ্যে গাড়ীটা লিলুয়ায় পৌঁছে গেল, তাই রক্ষা! সে লোকটা তখনও আশে-পাশের লোকদের সঙ্গে চার হাত-পায়ে ধস্তাধস্তি করছিল। বয়স আন্দাজে তার গায়ে জোর বড় কম ছিল না।

আমাদের কাছে জিনিষপত্র ছিল না বিশেষ। গাড়ী থাম্‌তেই আমরা নেমে পলায়ন কর্‌লাম। আর, একটা গাড়ীতে ঢুকে' পাঁচুকে তার গাধামোর জন্য গাল দিতে লাগ্‌লাম। পাঁচু কিন্তু অপরাধবিজ্ঞান বিষয়ে তার কথা প্রায় সত্য হ'তে দেখে' কোন কথাই গায়ে মাখ্‌লে না। একটা অচল শান্তির ভাব তার মুখে ফুটে' উঠ্‌ল। যেন সে সব-কিছুর বাইরে। বহু সাধনার পর সিদ্ধি-লাভেই কেবল মানুষের মুখে এমন শান্তি ও তৃপ্তির ছায়া দেখা যায়। হাওড়ায় গাড়ী থাম্‌তেই আমরা নেমে পড়্‌লাম।

ধীরে সুস্থে একটা ট্যাক্সিতে চড়্‌তে যাব, এমন সময় একটি ছেলে এসে পাঁচুকে ডেকে বল্‌লে, "জামাই-বাবু, ট্যাক্সি নিচ্ছেন কেন, আমাদের সঙ্গেই চলুন। বাবা এলেন কিনা আজ শিমলা থেকে। ঐ যে মণ্টুর পাশে; ঐ বাবা।" 'বাবা'কে দেখেই পাঁচুর হাত থেকে লম্ব্রোসো-খানা একেবারেই প্ল্যাটফর্ম্মের ধুলোয় প'ড়ে গেল। জড়ান গলায়, "আমার একটু কাজ সেরে বিকেলে যাব", ব'লে সে ট্যাক্সিতে উঠে দুম্ করে দরজাটা এঁটে দিলে। আমাকেও ওঠ্‌বার অবসর দিলে না। ড্রাইভারকে বল্‌লে, "সিধা মৎ যাও, ঘুমা লেও।"

শুভগ্রহ

[এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণন আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(৬৪)

যুগ-কল্পনার সামঞ্জস্য

পৌরাণিক মতে যুগ চারিটি—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। বৈজ্ঞানিক মতেও Stratigraphical era বা group চারিটি; ভারতীয় ভূতত্ত্বে Archaean, Purána, Dravidian ও Aryan, আর ইউরোপে Precambrian, Palaeozoic, Mesozoic ও Cainozoic—এই চারি যুগ। উভয়ক্ষেত্রেই পাশাপাশি দুই যুগের সন্ধিস্থলে কথিত বা কল্পিত প্রলয় বিদ্যমান। যুগবিভাগের এই দুই system বা ধারাতে কোন সামঞ্জস্য আছে কি?

শ্রী ধীরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী

(৬৫)

গোকাগুনে

ফাগুন মাসের সংক্রান্তির দিনে গ্রামের ছেলের দল 'গোকাগুনে' উৎসব করিয়া থাকে। 'গোকাগুনে' শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি কি? ঐ তারিখে ছেলের দল মাঠে বন-ভোজন করে কেন?

তাহের আহম্মদ

(৬৬)

তারা-খসা

তারা-খসা দেখিতে নাই, দেখিলে অমঙ্গল হয়, কিন্তু দেখার পরে যদি ৫টি ব্রাহ্মণ সধবার ও পাঁচটি ফুলের নাম করিয়া অগ্নি, বরুণ ইত্যাদি দেবগণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করা যায় তবে দোষ কাটিয়া যায়—এ বিশ্বাসের হেতু ও মূল কি?

কল্যাণী

(৬৭)

মেবার-পতন

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লিখিত "মেবার পাহাড়" গানের নিম্নলিখিত দুইটি পঙ্‌ক্তির ঐতিহাসিক বিবরণ কি?

"চিতোর-দুর্গ হইতে যেথায় ম্লেচ্ছ রাজার গর্জ্জনীর
হরিয়া আনিল কন্যা তাহার বিজয়-গর্ব্বে বাপ্পাবীর।"

শ্রী শচীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

(৬৮)

গঙ্গার জোয়ার-ভাঁটা

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার গঙ্গায় পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিন ৬টার সময়ে ভাঁটা আরম্ভ হইত। সেইজন্য আমরা অমাবস্যা-পূর্ণিমায় প্রাতঃকালে গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতাম। কেননা নদী তখন জলপূর্ণ থাকিত, ইহা মনে আছে। দশমীর দিন ১০টার সময়ে ভাঁটা আরম্ভ হইত, ইহাও মনে আছে। তখনকার পঞ্জিকা দেখিলেও আমার কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে, কেননা পঞ্জিকায় জোয়ার-ভাঁটার সময় লেখা থাকে। কতদিন হইল জোয়ার-ভাঁটার সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে? এবং কেন হইয়াছে?

তখন চৈত্র ও বৈশাখ মাসে গঙ্গার জল খুব লোণা হইত। এখন আর হয় না। পূর্ব্বেই বা কেন হইত, এখনই বা কেন হয় না?

জলের কল হইবার পূর্ব্বে লোকে দশমীর দিন গঙ্গাজল তুলিয়া রাখিত, কেননা সেইদিন জল অপেক্ষাকৃত কম লবণাক্ত এবং কম অপরিষ্কার থাকিত। তাহাও আবার বেলা বা রাত্রি ৯|১০টার সময়ে। কেন এরূপ হইত?

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(৬৯)

হলুদ-চাষ

বঙ্গদেশে, বঙ্গদেশের বাইরে এবং ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন্ কোন্ স্থানে হলুদ উৎপন্ন হয়? হলুদ ভারতের বাইরে কোন্ দেশে রপ্তানি হয় এবং রন্ধন ব্যতীত আর কি কি কার্য্যে হলুদ ব্যবহার করা হয়? বর্ত্তমান বর্ষে হলুদের আবাদ কোথায় কিরূপ আছে? কোন্ কোন্ পত্রিকায় ফসলের উৎপন্ন এবং ব্যবসায় সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ জানিতে পারা যায়?

শ্রী কুঞ্জবিহারী সাহা

(৭০)

"মহাস্থান গড়"

বগুড়া সহরের ৭ মাইল উত্তরে করতোয়ার পাড়ে হিন্দু তীর্থস্থান "মহাস্থান গড়" অবস্থিত। গড়ের পাদদেশে "শীলাদেবীর ঘাট"।

"গড়"-ও "ঘাট"-সম্বন্ধে নানা প্রকার জনরব। প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব কি?

সৈয়দ শাহজাহান

(৭১)

তারহীন টেলিগ্রাফ

Wireless telegraphy শিখিবার ব্যবস্থা ভারতবর্ষে আছে কি না? যদি থাকে তাহা হইলে উক্ত বিষয়ে সবিশেষ খবর কোথায় পাওয়া যাইবে?

আনন্দগোপাল মজুমদার

(৭২)

"পঙ্কসাগরে বারাহী দেবী"

হিন্দু তীর্থক্ষেত্র ৫১ পীঠস্থানের বিবরণে দেখা যায় যে "পঙ্কসাগরে বারাহী দেবী" অধিষ্ঠিতা। এই পঙ্কসাগর কোথায় ও বারাহী দেবীর ইতিবৃত্ত কিছু পাওয়া যায় কি? সেই মূর্ত্তি ও তীর্থক্ষেত্রের উদ্ধার করা সম্ভবপর কি না?

শ্রী মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী

(৭৩)

পাথরের বাসন পরিষ্কার

সাদা পাথরের বাসন অনেক দিনের ব্যবহারে ময়লা হইলে কি উপায়ে ফর্সা করা যাইতে পারে?

শ্রী রুক্মিণীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭৪)

আলু রক্ষা

আলু সাল্‌ফিউরিক এসিড দিয়া কেমন করিয়া প্রিজার্ভ বা অনেকদিনস্থায়ী করা যায়?

শ্রী সুধীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

(৭৫)

আরসলা-নিবারণের উপায়

আরসলার উপদ্রব কিসে কমে?

সুহাসিনী দেবী

(৭৬)

কলের লাঙ্গলে কৃষিকার্য্য

ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাংলা দেশের কোন্ কোন্ স্থানে কলের লাঙ্গলের দ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পাদন হয় এবং সেখানে বাহিরের লোককে ঐ বিষয় সম্বন্ধে জানিবার সুযোগ দেওয়া হয় কি না এবং উহার বিশদ ঠিকানাদি কি?

শ্রী বরেন্দ্রকুমার মাইতি

(৭৭)

নীল চাষ

নীল-(indigo) চাষ আজকাল ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থানে হইতেছে? নীলের বীজ- ও আবাদ-সম্বন্ধীয় সঠিক বিবরণ পাইবার ঠিকানা কি?

শ্রী উপেন্দ্রকিশোর দাস

(৭৮)

দশচক্রে ভগবান্ ভূত

"দশচক্রে ভগবান্ ভূত" এই বাক্যটি অনেক সময় আমরা বলিয়া থাকি; ইহার অর্থ এবং তাৎপর্য্য কি?

শ্রী সুকুমার পৈত

(৭৯)

অর্থনীতি না ধনবিজ্ঞান

'অর্থ' শব্দের দ্বারা আমরা যাহা বুঝি তাহাতে Economicsএর অনুবাদ 'অর্থনীতি' হয় কি? আমার মতে Money=অর্থ; এবং Economics=ধনবিজ্ঞান লিখিলেই সুবিধা হয়। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মীমাংসা কি?

শ্রী নরেন্দ্রনাথ রায়

(৮০)

ভগবান্‌কে মাতৃসম্বোধন

হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মে ভগবান্‌কে মাতৃসম্বোধন করে কি না।

শ্রী তামসরঞ্জন রায়

(৮১)

"গৌরাঙ্গঃ ভগবদ্ভক্তঃ ন চ পূর্ণঃ, নচাংশকঃ।"

উল্লিখিত বাক্যটির প্রকৃত অর্থ কি? ইহা কাহার উক্তি।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

—

মীমাংসা

মীমাংসা (বর্ত্তমান বৎসরের)

(১)

অনেকে অনুমান করেন, অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ পাঞ্জাবে আগমন করেন (১)। কাহারও মতে ভারতসীমান্তেই আর্য্যদের উদ্ভব হইয়াছিল। পরে আর্য্যদের সঙ্গে দ্রাবিড়, সিদিয়ান, ও মোঙ্গলীয়দের সংঘর্ষ এবং সঙ্গে সঙ্গে সংমিশ্রণও ঘটে। ফলে, বর্ত্তমানে খাঁটি আর্য্য, দ্রাবিড়, সিদিয়ান, বা মোঙ্গলীয় কেহই নাই।

ভারতের আদিম-অধিবাসীদের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধি এবং যুদ্ধকৌশলে দ্রাবিড় জাতিই শ্রেষ্ঠ ছিল। অনেকে মনে করেন, তৎকালে যে-সমস্ত অসভ্য জাতি আর্য্যদের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিল—তাহারাই বর্ত্তমানে অন্ত্যজ বা শূদ্র নামে পরিচিত (২)।

বৈদিকযুগে দুই জাতি ছিল—আর্য্য ও অনার্য্য। অনার্য্যদিগকে আর্য্যগণ 'রাক্ষস' ও 'দস্যু' নামে অভিহিত করিতেন। ঋক্‌বেদের ১০ম মণ্ডলে একস্থলে "ব্রহ্মাণঃ" শব্দ আছে। সায়ণাচার্য্য উহার অর্থ ব্রাহ্মণ করিয়াছেন; কিন্তু পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী ও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা উহার অর্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। গুণকর্ম্মানুসারে চারি বর্ণ-বিভাগ যে আদিম-ভারতবাসীদের সঙ্গে আর্য্যদের সংমিশ্রণের পরে হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ করিবার উপযুক্ত কারণ দেখি না।

সকল আর্য্যই যে ব্রাহ্মণ একথা কেহ প্রমাণ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

প্রাচীন মতাবলম্বীগণ বলেন—ভগবান্, সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারি জাতির সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। চারি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋক্‌বেদে আছে—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ
বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ
পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

(ঋগ্বেদ, ১০।৯০।১২)

বেদে উক্ত জাতিচতুষ্টয়ের বিবৃত বিবরণ নাই। খৃঃ পূঃ ৪৫০০-২৫০০ বৈদিক সভ্যতার যুগে জাতি-বিভাগ থাকিলেও তাহা যে ধর্ম্মসংহিতা-যুগের স্থায় স্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই তাহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে (৩)।

ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হইবে, যাগযজ্ঞ লইয়াই ব্যাপৃত থাকিবে, আর ওদিকে ক্ষত্রিয় তার যুদ্ধ ও রাজ্যশাসন ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়া দিন কাটাইবে, এ ভাব এবং বুদ্ধিটা বৈদিকযুগের মানুষদের মাথায় খেলে নাই। এক ব্রাহ্মণই যজ্ঞের সময় যজ্ঞ করিতেন, রাজ্যশাসনে ও যুদ্ধে মন্ত্রী ও সৈনিক সাজিতেন, আবার নিজেই চাষের সময় চাষবাস করিতেন (৪)।

ধর্ম্মসংহিতা, স্মৃতি, এবং পুরাণাদিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

(মনুসংহিতা, ১০।৪)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি অর্থাৎ ইহাদের উপনয়ন-সংস্কার হয়; শূদ্র একজাতি অর্থাৎ ইহাদের উপনয়ন-সংস্কার হয় না। দেখা গেল, জাতি-বিভাগ অনেকটা নূতন আকার ধারণ করিতেছে। মনু খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর লোক (৫)।

বশিষ্ঠ-সংহিতায় গুণকর্ম্মানুসারে বিভক্ত চারি জাতির ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য আরও বিবৃত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (বশিষ্ঠ সংহিতা ২য় অধ্যায়।)

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(১) History of the Indian People—A. C. Mukerjee p. 9.
(২) History of India—Sastri, p. 3 (1896)
(৩) Do. —Do. p. 2 (Do.)
(৪) History of the Indian People—A.C. Mukerjee, p. 17.
(৫) History of India—Elphinstone, p. 13.

(২)

রাজা গৌরগোবিন্দের রাজধানী

রাজা গৌরগোবিন্দের রাজধানী শ্রীহট্টেই ছিল। সেই প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ শ্রীহট্ট সহরের অতি নিকটস্থ সুপ্রসিদ্ধ "মনারায়ের টিলার" উপর দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রী তপোধীরকৃষ্ণ রায় দস্তিদার

(২১)

বর-কনের নাম

যে-মেয়ের নাম মায়ের নামের সঙ্গে এক, সে মাতৃতুল্যা ; যে মাতৃতুল্যা তাকে বিয়ে করা চলে না। একে ঠিক কুসংস্কার বলা চলে না।

নলিনী

(২২)

কোনও স্থানে গমনকালে যদি ভীমা নদী কাহারও পথাবরোধ করে এবং নৌকা ব্যতীত যদি তাহা উত্তীর্ণ হইবার কোনই সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সেই নদী উত্তীর্ণ হইতে যে সময় লাগে সেই সময়ে বহুপথ অতিক্রম করা যায়, যদিও দশক্রোশ পথ না হইতে পারে। এইজন্যই লোকে বলে "একা নদী দশক্রোশ।" দশক্রোশ কেবল দূরত্ব বুঝাইবার জন্যই বলা হয়।

শ্রী—

(২৪)

'চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম'

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে 'তাও'-ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।—"We must define 'Taoism' as a universalism...... modelled and developed into a religious system containing the principal elements of heathen religions generally. It has a Pandemonium and Pantheon both composed of beings which actually are parts of the universe or its two souls, the "Yang" and the "Yin."

(Page 133)

'Taoism'এর পূর্ব্বে খৃষ্টপূর্ব্ব তিনশত বৎসরেরও পূর্ব্বে কন্‌ফুসিয়াসের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মই 'Confucianism'—"We may define Confucianism as a system of government, which has for its basis everything contained in the classics, which are the great and only guides for the "Tao" of man, embracing also the principles of ethics and religion."

(Page 101)

"Confucianism" সম্বন্ধে বিবৃত বিবরণ, নিম্নোদ্ধৃত গ্রন্থের chapter iv (pp. 89—131) পড়িলেই জানিতে পারিবেন।

Vide :—'The Religion of the Chinese' by J. J. M. Degroot, Ph. D.

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায়

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে চীনে কি প্রকার ধর্ম্ম ছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত ঠিক জানা যায় নাই। কংফুচীর (Confucius) আবির্ভাব-কাল লইয়াও একটা মতভেদ রহিয়া গিয়াছে। কংফুচীর ধর্ম্ম নিরীশ্বরবাদ, কেবলমাত্র সদ্‌গুণের উপাসনা। তাই এই ধর্ম্ম অবলম্বন করা সাধারণের পক্ষে কষ্টকর। চীনে আরও তিনটি ধর্ম্ম দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম, 'তেওস্ত' ধর্ম্ম বা বীরপূজা, এবং পূর্ব্বপুরুষ উপাসনা। এখন ধীরে ধীরে খৃষ্টধর্ম্মেরও প্রচলন হইতেছে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠে চীনাদের সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়:—

১। চীন-ভ্রমণ—ইন্দুমাধব মল্লিক।
২। চীনের প্রাচীর—"মাসিক বসুমতী" চৈত্র, ১৩২৯ সন
৩। গৃহস্থ—১৩২০ জ্যৈষ্ঠ, ৪৮৯ পৃঃ—৪৯৭ পৃঃ
৪। ঐ—ঐ আষাঢ় ৫৫৯ পৃঃ—৫৬৯ পৃঃ
৫। The Dawn—1910 May, pp. 73-78.
৬। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত —শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

কন্‌ফিউসিয়াসের চীনা নাম কংফুশিয়ো। তাঁহার আবির্ভাবের সময় ৫৫১ (খৃঃ পূঃ) সাল। তাঁহার ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য মোক্ষ—ঈশ্বরের সহিত নিজের আত্মার একত্বানুভূতি। কংফুশিয়ো অতিশয় পণ্ডিত ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি ব্যাসদেবের ন্যায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন। তিনিই বিক্ষিপ্ত চীন জাতিকে এক জাতিতে পরিণত করিয়াছেন। তাঁর স্বর্গ বা নরকের ভরভরসা নাই। তাঁর মতে কৃতকর্ম্মের ফল জীবদ্দশায় ভোগ করিতে হয়।

ইঁহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রবাসী ১৩১৭ শ্রাবণ ৩৩৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

অমলেন্দু বীর

চীনদেশের আদি. ধর্ম্মপ্রচারক কন্‌ফিউসিয়াস্ (Confucius)। তথায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারই ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল। "আমাদের দেশে যেমন মহর্ষি মনুর মত প্রচলিত, চীনদেশে সেইরূপ কন্‌ফিউসিয়াসের (কন্‌ফুচি, কংফুচি প্রভৃতি নামেও পরিচিত) মত মান্য হয়। কন্‌ফিউসিয়াসের জন্ম সম্বন্ধে অবশ্য মতান্তর আছে এবং ঐ নামে একাধিক মহাপুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, সাধারণতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কন্‌ফিউসিয়াসের আবির্ভাব-কাল খৃষ্টজন্মের সাড়ে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। লুরাজ্যে তাঁহার জন্ম হয়। একটি পুত্রসন্তান জন্মিবার পরই তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি চীনের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার দার্শনিক মত অধুনা পৃথিবীর এক অত্যুৎকৃষ্ট সম্পৎ মধ্যে পরিগণিত।

লেগ বলেন,—সেই প্রাচীন ধর্ম্মপ্রচারক স্পষ্ট করিয়াই ধর্ম্মপ্রচারের স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন—'আমি কোনও নূতন ধর্ম্ম-মতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহি; আমি কেবল প্রাচীন মত ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আমি কেবল প্রদান করিতে আসিয়াছি। আমি সৃষ্টি করিতে আসি নাই। কোনও নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি প্রাচীন মতেই বিশ্বাসবান্; আমি সেই মতেরই অনুরাগী।' (I only hand on; I cannot create new things; I believe in the ancients and, therefore, I love them.—Max Muller's Science of Religion).

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার সরকার

(২৫)
জোরওয়াষ্টার

"জোরওয়াষ্টার কোন্ সময়ে কোন্ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। জোরওয়াষ্টার নামে কত মহাপুরুষেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন—জোরওয়াষ্টার একজন এবং তিনি পারস্যবাসী। অন্যে আবার বলেন জোরওয়াষ্টার নামে ছয়জন প্রসিদ্ধ দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন নোয়ার পুত্র হাম, মোজেস, ওসিরিস্, মিথ্‌রাস এবং অন্যান্য মনুষ্য ও দেবতাগণ জোরওয়াষ্টার নামে পরিচিত ছিলেন।

"জোরওয়াষ্টারের আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধেও এইরূপ বহুমত প্রচলিত আছে। প্লিনি ও আরিষ্টটল্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'প্লেটোর মৃত্যুর ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জোরওয়াষ্টারের আবির্ভাব হয়'। গ্রন্থান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়,—বাহ্লীকদেশে মহর্ষি বেদব্যাসের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার বহু তর্কবিতর্ক হইয়াছিল।'—'Vyasa held a grand religious discussion with Zoroaster at Balkh.'—Hindu Superiority. ডাইওনিসাস জোরাটাস বলেন, ট্রয়যুদ্ধের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে (স্থইদাসের মতে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে) জোরওয়াষ্টার বিদ্যমান ছিলেন (পৃথিবীর ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ) কিন্তু আবার Dr. L. Schmitz কৃত Manual of Ancient Historyতে আমরা দেখিতে পাই যে ট্রয় যুদ্ধের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—'Some Greek authors state that he (Zoroaster) flourished about five thousand years before the Trojan war, according to which he would be a purely mythical being. Firdusi relates that he lived in the reign of king Gushtab, who adopted his doctrines, ordered his subjects to establish the worship of fire and diffused the Zend Avesta throughout his dominions. Some critics, identifying this Gushtab with Darius, the son of Hystaspes, believe that Zoroaster must have lived in the sixth century before the Christian Era. But there appears to be no good reason for regarding the Gushtab of Firdusi, and Darius, son of Hystaspes as the same person; and moreover if such a man had lived at that time the Greeks could hardly have left him unnoticed. The probability is, that Zoroaster flourished somewhere about the year 1000 B.C. * * * The Zend-Avesta does not describe Zoroaster as the original author of Fire worship, but only as a prophet who developed and completed the whole system. Hence he cannot be regarded either as a purely mythical personage nor be assigned to so late a date as of Darius'

Vide 'Manual of Ancient History' pp. 56 and 57 by Dr. L. Schmitz.

"যাহা হউক পারস্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, ডরিয়স হিষ্টাস্‌পসের সমসময়ে পারস্যে একজন জোরওয়াষ্টারের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কালে আর-একজন জোরওয়াষ্টার ব্যবিলোনিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া তদ্দেশবাসীকে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। গ্রীসদেশেরও আর দেশের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ পারস্যের জোরওয়াষ্টারের অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ পারস্যের জোরওয়াষ্টারের পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও অপর জোরওয়াষ্টার বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। তাঁহারা বলেন—'সেই প্রাচীনতম জোরওয়াষ্টার হইতে কাল্‌ডীয় দেশের জ্যোতির্বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। সেই জোরওয়াষ্টার হিষ্টাস্‌পসের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী কালে বিদ্যমান ছিলেন।' এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, এই-সকল আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়, কাল্‌ডীয় দেশেও জোরওয়াষ্টার নামে একমহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং পারস্যের জোরওয়াষ্টার ও তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি।"

(পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ) শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার

পারসী প্রচারক জোরোওয়াষ্টার ঠিক্ কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত হইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন মত নীচে দেওয়া গেল—

"Zanthus of Lydia (B. C. 470), the earliest Greek writer, who mentions Zoroaster, says that he lived about six hundred years before the Trojan war (which took place about 1800 B. C.). Aristotle and Eudoxus place his era as much as six thousand years before Plato, others five thousand years before the Trojan war (see Pliny: Historia Naturalis, XXX, 1-3). Berosus, the Babylonian historian, makes him a king of the Babylonians and the founder of a dynasty which reigned over Babylon between B. C. 2200 and B. C. 2000"

—Vide Hindu Superiority, pp. 130-31.

—By Har Bilas Sarda, F. R. S. L.

Zoroaster সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ Dastur Dr. H. N. Dhalla প্রণীত Zoroastrian Civilization নামক পুস্তকে অথবা

P. A. Wadia প্রণীত Introduction to the Avesta নামক পুস্তকে পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রী তপোধীরকৃষ্ণ রায় দস্তিদার

পারসী প্রচারক জোরওয়াষ্টারের আবির্ভাবের সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন যে জোরওয়াষ্টার নামে কোন ব্যক্তি আবির্ভূত হন নাই। কেহ কেহ তাঁহার আবির্ভাবের কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ১৮০০ হইতে ২০০০ বৎসরের মধ্যে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর এক দলের মত যে জোরওয়াষ্টার বাইবেল কোরানের এব্রাহিমের সমকালীন ব্যক্তি। প্রোফেসর জ্যাক্‌সন বলেন যে জোরওয়াষ্টার খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর লোক, খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮৩ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আব্বাসীয় খলিফা আল মোতাকিল্লের (৮৪৭-৮৬১) রাজত্ব-কালে তাঁহার আদেশে সামারার নিকটবর্ত্তী স্থানের একটি বৃক্ষ ছেদিত হয়। পারসীকেরা সে-সময় এই কার্য্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন ও বলেন যে এই বৃক্ষ জোরওয়াষ্টারের সহিত তাঁহার প্রথম ও প্রধান শিষ্য রাজা গুস্‌টাস্পের সাক্ষাতের চিহ্নের নিদর্শনরূপে ১৪৫০ বৎসর বিদ্যমান আছে। ইহাতে মনে হয় জোরওয়াষ্টার খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর লোক।

Professor William Jackson's "Zoroaster the Prophet of Ancient Iran" ও Browne's "Literary History of Persia". Vol. I এবং Lt. Col. Sykes' "History of Persia", Vol. I, পাঠে তাঁহার জীবনী অবগত হওয়া যায়।

সৈয়দ মহবুব আলী

জোরোয়াষ্টারের পুরা নাম জারাথাস্থ্র বা জের্‌দাস্ত জোরোয়াষ্টার। ইঁহার পারিবারিক উপাধি স্পিতামা (Spitama). ইনি পারসিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তার প্রণেতা। ইঁহার জন্ম সন সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকিলেও সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে ইহাই স্থির হইয়াছে যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৮০০ অব্দে ব্যাক্‌ট্রিয়ায় (Bactria, আধুনিক বোখারা Bokhara) ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার ধর্ম্মগ্রন্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা অসুর মজদেও (Ashur Mazdeo) এবং তাঁহার শত্রু আংগ্রো মৈনস্ (Angro Mainus)। সচ্চিন্তা, সদালাপ এবং সদাচারই ইঁহার প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। পবিত্র অগ্নির উপাসনাও পারসিক ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মনিই (Mani) নাকি সর্ব্বপ্রথম অগ্নি-উপাসনার প্রচলন করিয়াছিলেন। জোরোয়াষ্টার নাকি ইঁহারই প্রবর্ত্তিত মতের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন মাত্র। প্রশ্নকর্ত্তা নিম্নলিখিত বই তিনখানিতে জোরোয়াষ্টারের সম্বন্ধে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

(1) Darmesteter's edition of the Zend-Avesta (Sacred Book of the East Series).

(2) Mill's Zend-Avesta (S B. E. introduction only).

(3) Encyclopaedia Biblica, vol. iv, cols. 5428-5441.

পুরাতন প্রবাসীরও কোন এক সংখ্যায় Zend-Avesta সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বাহির হইয়াছিল।

শ্রী বীরেশ্বর বাগ্‌ছী

পার্শী-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক—জরথুস্ত্র, জোরোয়াষ্টার, জার্টষ্ট বা জোরওয়াষ্টার—পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিতের মতে, খৃঃ পূঃ ১৩শ শতাব্দীতে দরেজি-নদীতীরবর্ত্তী রথ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম "পুরুশস্প", মাতার নাম "দগ্‌দো" এবং স্ত্রীর নাম "হ্‌বোভি"। জরথুস্ত্র তিন মেয়ে ও তিন ছেলের পিতা ছিলেন; মেয়েদের নাম—ফ্রেণি, থ্রীতি, ও পুরুচিস্তি; ছেলেদের নাম—ঈষৎবাস্ত্র, উর্ব্বাৎনর ও হ্বরোচিত্র। ৭৭ বৎসর বয়সে বাল্মীক নগরে বরাতুর নামক এক তুরাণী কর্ত্তৃক জরথুস্ত্র নিহত হন। বাংলা সাময়িক পত্রে পার্শীদের ধর্ম্ম, সমাজাদি নানাবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আলোচনা হইয়াছে—নীচে কতক কতক আভাস দিলাম।

(১) প্রবাসী—১৩১৪—৮ পৃঃ
(২) প্রবাসী—১৩২৮—৭৭১ ও ৭৮০ পৃঃ
(৩) সাহিত্য—১৩শ বর্ষ—১৩১২, ৭৪১—৭৪৯ পৃঃ
(৪) সাহিত্য—১৩১১—১২৯ পৃঃ
(৫) ভারতী—১৩০৭, ২৪৯—২৬১ পৃঃ, ৫৩৪ পৃঃ
(৬) আমার বোম্বাই-প্রবাস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৭) উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—মালদহ, কার্য্যবিবরণ ৬০ পৃঃ
(৮) গৃহস্থ—১৩২১, ৭৫৭ পৃঃ (১০) সুপ্রভাত—১৩১৬, ৩৫৭ পৃঃ
(৯) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—১৩২০—৮২ পৃঃ

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(২৭)

বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকদিগের নাম ও উপাধি এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

পাঠান-বংশোদ্ভব বাদ্‌শাহদিগের সময়েই দ্বাদশ ভৌমিক বা বার ভূঁইয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এবং প্রথমে ভৌমিকের সংখ্যা দ্বাদশ জন হইলেও সকল সময়েই দ্বাদশ জন ছিল না। এবং সকলেই হিন্দু ছিলেন না। ভৌমিকের সংখ্যা সময় সময় কমবেশী হইত। এবং মুসলমানও এই ভৌমিকশ্রেণীভুক্ত হইতেন। সময় সময় এক ভৌমিক প্রধান হইয়া অপর ভৌমিকের রাজ্য যুদ্ধে জয় করিয়া লইতেন এবং ভৌমিক ব্যতীত অপর কেহ প্রবল হইয়া অপরের জমিদারী দখল করিয়াও ভৌমিক শ্রেণীভুক্ত হইতেন। একারণেই সময় সময় ভৌমিকের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হইত। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সমস্-উদ্দিন যখন দিল্লীর বাদ্‌শাহের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া "গৌড়-বাদ্‌শাহ" উপাধি গ্রহণ করেন, তখন দ্বাদশ জন ভৌমিকের ৪ জন হিন্দু, অবশিষ্ট ৮ জন ভৌমিক মুসলমান ছিলেন। তাঁহার লোকান্তরের পর তাঁহার পুত্র মবেজউদ্দিনের সময়ে ৯ জন হিন্দু ২ জন মুসলমান এই ১১ জন মাত্র ভৌমিক ছিলেন। গৌড়বাদ্‌শাহ সৈয়দ হোসেনের সময় ভৌমিকের সংখ্যা ১৪ জনের ৭ জন হিন্দু, ৭জন মুসলমান ছিলেন। মোগল-বংশোদ্ভব দিল্লীশ্বর আক্‌বর সাহ বাঙ্গালা দেশ জয় করিলে রাজা তোডরমল্ল বাঙ্গালার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দেশ জরিপ জমাবন্দী করিবার সময় বাঙ্গালাদেশে যে দ্বাদশ জন হিন্দু ভৌমিক ছিলেন তাঁহাদের এগারো জনের নাম ও উপাধি এবং কর্ত্তব্য লিখিত হইল।

১। ভাদুড়ী রাজা—ইহাকে ভাদুড়িয়া (ভাতুড়িয়াও) বলিত। ইহার প্রথম রাজা সুবুদ্ধি খাঁ। ইঁহারা ১৲ টাকা মাত্র নর্মা (নজর) দিতেন বলিয়া ইঁহাদিগকে "একটাকিয়া রাজা" বলিত। এই ভাদুড়ী রাজ্যের রাজা জগৎনারায়ণ খাঁ দ্বাদশ ভৌমিকের একজন। ইঁহারা বাঙ্গালাদেশের ঢাকা জেলার অধীন বলিয়াটীর ভাদুড়ী বংশোদ্ভব। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী তীর্থপর্য্যটন-সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নির্ব্বাসক সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যকে তর্কযুদ্ধে পরাজয় করাতে "শঙ্করঃ শঙ্করস্যাংশঃ" শঙ্কর শঙ্করের অংশমাত্র "উদয়নো নারায়ণঃ স্বয়ম্" উদয়নাচার্য্য স্বয়ং নারায়ণ বলিয়া পরিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহারা তাঁহারই বংশধর। কৌলিক উপাধি "ভাদুড়ী", বাদ্‌শাহপ্রদত্ত উপাধি "রাজা" এবং "খাঁ"।

২। সাতের বা সালনগড় পরে সাঁতের নামে খ্যাত হয়। ইহার আদি পুরুষ শিখাই (শিখিবাহন) সান্যাল গৌড়বাদ্‌শাহ হইতে জায়গীর এবং খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইলেও ইনি তাহা ব্যবহার করেন নাই। ইঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র সাতৈরের রাজা হইয়া "রাণা" উপাধি ব্যবহার করিতেন। এবং কৌলিক সান্যাল উপাধিও প্রচলিত ছিল। "খাঁ" উপাধি ব্যবহার করেন নাই। এই বংশের রাজা গদাধর সান্যাল দ্বাদশ ভৌমিকের

অন্যতম। কৌলিক উপাধি "সান্ন্যাল" এবং বাদ্‌শাহদত্ত উপাধি "খাঁ"।
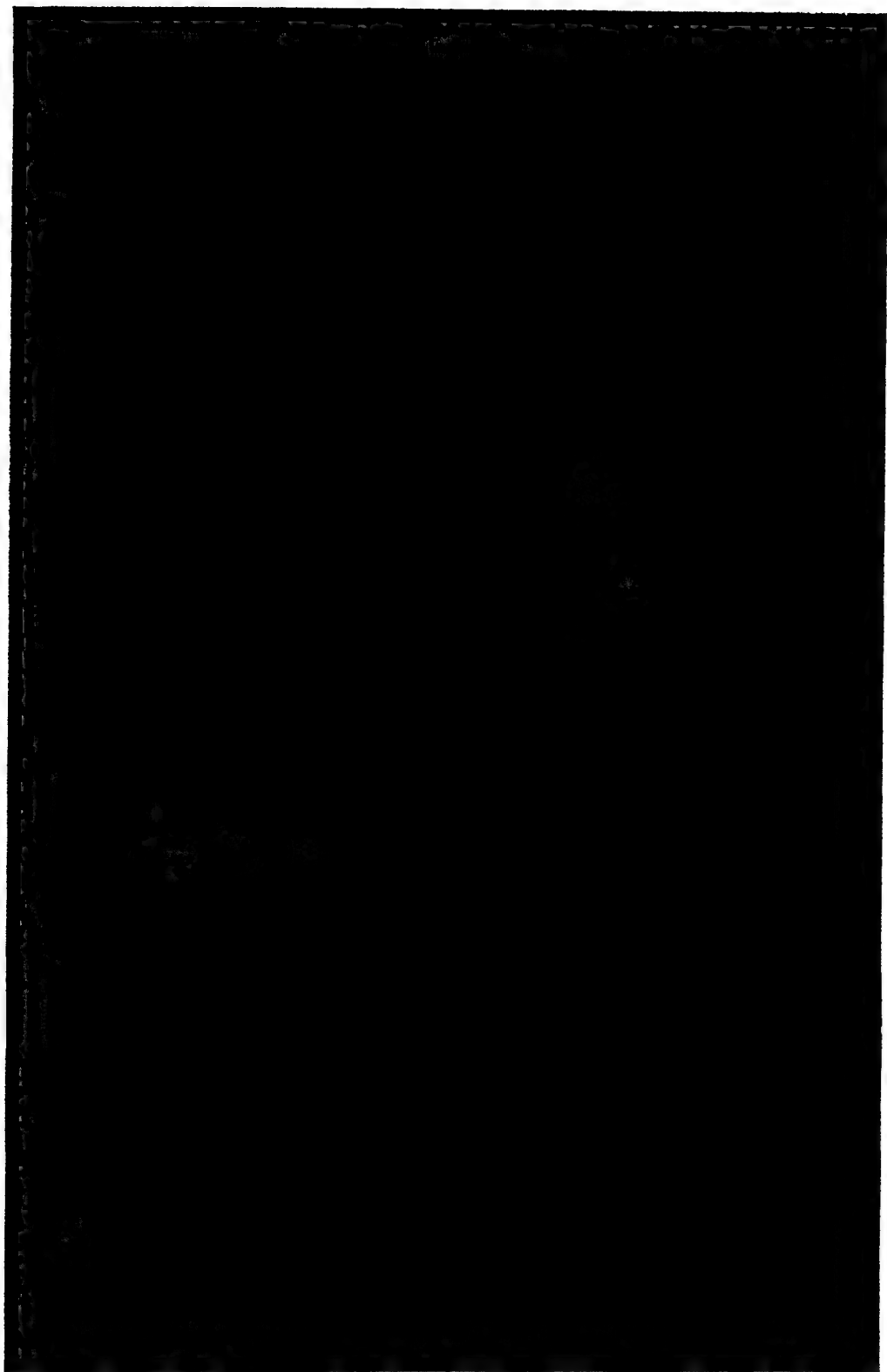
৩। বর্দ্ধমান—এই রাজ্যের রাজা লালজী রায় দ্বাদশ ভৌমিকের একজন। ইনি বর্দ্ধমান প্রদেশ ক্রয় করিয়া রাজা হন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষের উপাধি "রায়"।

৪। তাহিরপুর—রাজা কংস নারায়ণ রায় দ্বাদশ ভৌমিকের একজন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ উদয়নারায়ণকে গৌড়বাদ্‌শাহ "রাজা" এবং "রায়" উপাধি প্রদান করেন। ইঁহারা মনুসংহিতার সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার পণ্ডিতপ্রবর কুলুকভট্টের বংশধর।

৫। পুঁঠিয়া—রাজা রামচন্দ্র রায়। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ ঠাকুর কমলাকান্ত বাগ্‌চী গৌড়বাদ্‌শাহ হইতে জায়গীর এবং "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। কৌলিক উপাধি "বাগ্‌চী", গৌড়বাদ্‌শাহদত্ত উপাধি "রাজা" এবং "রায়"।

৬। সুসুং—রাজা সোমেশ্বর। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ কালীভক্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতার অনেক শিষ্য ছিল। সেই শিষ্যদিগের সহায়তায় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে গৌড়বাদ্‌শাহ তাঁহাকে সীমান্ত-রক্ষাকার্য্যে নিয়োগ করিয়া "রাজা" এবং "সিংহ" উপাধি প্রদান করেন।

৭। বাহিরবন্দ—বাঙ্গালার উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে আসাম ও কোচবিহারের সেনাগণের উপদ্রব নিবারণ নিমিত্ত গৌড়বাদ্‌শাহ জগৎরায় নামক একজন শ্রোত্রিয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, পাতিলাদহ এবং স্বরূপপুর পরগণায় করদ রাজা নিযুক্ত করেন। এই বংশের শেষ মালিক রাণী সত্যবতীর পর এই বংশ লুপ্ত হইয়াছে। এবং এই-সকল পরগণা যথাক্রমে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের পূর্ব্ব-মালিক, বলিহার-রাজা, কলিকাতার ঠাকুর এবং রাণী রাসমণির জমিদারীভুক্ত হইয়াছে।

৮। চন্দ্রদ্বীপ—আদিরাজা কানুরায়ের বংশধর দনুজমর্দ্দন রায় নিঃসন্তান লোকান্তর হইলে তাঁহার দৌহিত্র পরমানন্দ বসু উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা হইয়া "রায়" উপাধি গ্রহণ করেন।

৯। যশোহর—ভবানন্দ রায় গৌড়বাদ্‌শাহ হইতে তিন পরগণা প্রাপ্ত হইয়া "রাজা" এবং "রায়" উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা কাশীরায় রাজা হন। ইঁহাদের আদিপুরুষ, রামচন্দ্র গুহ। অতএব কৌলিক উপাধি "গুহ" ছিল। বাদ্‌শাহদত্ত উপাধি "রাজা" ও "রায়"।

১০। দিনাজপুর—দীনরাজ ঘোষ গৌড়বাদ্‌শাহ রাজা গণেশ খাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি ইঁহাকে 'রাজা" এবং "রায়" উপাধি প্রদান করেন।

১১। রাজসাহী—গৌড়বাদ্‌শাহের খাসমুন্সী রামগোবিন্দ রাজসাহীদিগর নামে ৪ পরগণার একচাক্‌লারূপে প্রাপ্ত হইয়া "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। সাঁওতাল, ধাঙ্গড়, ও চুয়ারদিগের আক্রমণ নিবারণ জন্য ইঁহাদের অনেক সৈন্য রাখিতে হইত, এজন্য ইঁহারা রাজস্ব কম দিতেন। ইঁহার পিতার নাম কেদারেশ্বর মুখুটি। ইনি বংশজ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। বাদ্‌শাহের এলাকায় যাঁহারা লেখাপড়ার কাজ করিত তাঁহাদিগকে "লালা" বলিত। কায়স্থরাই প্রায় লেখাপড়ার কাজ করিতেন বলিয়া তাঁহাদের "লালা" উপাধি হইয়াছে। রামগোবিন্দও বাদ্‌শাহের খাসমুন্সী রূপে লেখাপড়ার কাজ করিতেন বলিয়া ইঁহাকে "লালা রামগোবিন্দ" বলিত। ইঁহার বংশধর উদয়নারায়ণ মুর্শিদকুলী খাঁর অত্যাচারে রাজ্যচ্যুত হইলে এই জমিদারী এবং রাজা-উপাধি নাটোরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামজীবন রায় প্রাপ্ত হন। ইঁহার পিতার নাম কামদেব পাঠক। ইঁহার কৌলিক উপাধি "পাঠক" ছিল।

ভৌমিকেরা কেবল বাদ্‌শাহনির্দ্দিষ্ট নজর এবং কর প্রদান করিতেন। নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করিতেন না। এতদ্ভিন্ন সকল বিষয়েই সর্ব্বপ্রকার স্বাধীন এবং করদ মিত্র রাজার ন্যায় ছিলেন। প্রচুর সৈন্য রাখিতে হইত। সেই সৈন্য সহ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধকালে বাদ্‌শাহকে সহায়তা করিতে হইত। ইঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদিগের সঙ্গে স্বাধীনভাবে যুদ্ধ এবং সন্ধি করিতে পারিতেন।

বিশ্বকোষ নামক অভিধানে যে দ্বাদশ ভৌমিকের নাম দেওয়া আছে তাঁহারা বিভিন্ন সময়ের ভৌমিক। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সমসুদ্দিন দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া যে স্বাধীন হইয়াছিলেন ইহা আমরা উপরেই বলিয়াছি। তদবধি দিল্লীশ্বর আক্‌বরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশ স্বাধীন পাঠান রাজ্য ছিল। আক্‌বর বাঙ্গালা দেশ জয় করিবার পর রাজা তোডরমল্ল বাঙ্গালার জরিপ-জমাবন্দী করেন, কিন্তু কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই দিল্লীতে আহূত হওয়াতে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া কাগজপত্র দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন। ঐসকল কাগজপত্রে বিক্রমপুরের চাঁদ রায় কেদার রায় এবং ভাওয়ালের ঈশা খাঁর নাম নাই। বিশ্বকোষে ইঁহাদিগকে রাজা কংসনারায়ণের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং বিশ্বকোষে যে কয়জন গাজীকে ভাওয়ালের ভুঁইয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এই কয়জন গাজী বাঙ্গালার বৈদ্য-রাজত্বেরই অব্যবহিত পরবর্ত্তী, সুতরাং সমসাময়িক চাঁদ রায়, কেদার রায় এবং ঈশা খাঁর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। যশোহরের রাজা বিক্রমাদিত্যও এই চাঁদ রায়, কেদার রায় প্রভৃতির সমসাময়িক। ইঁহারা সকলেই মোগলসম্রাট্ আক্‌বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিভিন্ন সময়ের ভুঁইয়াদিগের নাম একই সময়ের বলিয়া উল্লেখ করিয়া বিশ্বকোষপ্রণেতা ভুল করিয়াছেন।

(বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস)।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

"যাঁহারা কোন না কোন প্রসঙ্গে মোগলপাঠানের সন্ধিযুগের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই দ্বাদশ ভৌমিকের পরিচয় দিতে বা তাঁহাদের সংখ্যা পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং নানা জনে নানা ভাবে এই সংখ্যা পূরণ করিয়াছেন। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বৎসরের উল্লেখ না করিলে, সেই বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ভৌমিকগণের নামোল্লেখ করা যায় না। বৎসরানুসারে সেরূপ হিসাব ইতিহাসে কোথাও নাই। পাইলেও সে সংখ্যা সব বৎসর বার জন হইত কি না সন্দেহ। বঙ্গের ইতিহাস তখন এমনভাবে নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছিল যে কোন বৎসর বারজন থাকিলেও দুই এক বৎসরের মধ্যে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইত। এইরূপে ভুঞা বা ভৌমিকদিগের প্রাদুর্ভাবের সময় সম্বন্ধে বিতর্ক আছে এবং থাকিতেও পারে ; তবে আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাঁহাদের কয়েকজনের সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই ; আবার উঁহারাই ভৌমিক শ্রেণীতে প্রধান। ভৌমিকগণের দ্বাদশ সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইলে, আমরা নিম্নলিখিত কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির নাম করিতে পারি। নতুবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌমিকের সংখ্যা বেশী ছিল।"

নাম ও উপাধি	পরগণা
১। ঈশা খাঁ মসনদ আলি	(খিজিরপুর বা কত্রাভু)
২। প্রতাপাদিত্য	(যশোহর বা চাঁদিকান)
৩। চাঁদ রায়, কেদার রায়	(শ্রীপুর বা বিক্রমপুর)
৪। কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায়	(বাক্‌লা বা চন্দ্রদ্বীপ)
৫। লক্ষ্মণ মাণিক্য	(ভুলুয়া)
৬। মুকুন্দরাম রায়	(ভূষণা বা ফতেহাবাদ)
৭। ফজল গাজী, চাঁদ গাজী	(ভাওয়াল ও চাঁদপ্রতাপ)

৮। হামীর মল্ল বা বীর হাম্বীর (বিষ্ণুপুর)
৯। কংসনারায়ণ (তাহিরপুর)
১০। রাজা রামকৃষ্ণ (সাতৈর বা সাঁতোল)
১১। পীতাম্বর ও রাজা নীলাম্বর (পুটিয়া)
১২। ঈশা খাঁ লোহানী ও ওস্‌মান খাঁ (উড়িষ্যা ও হিজলী)

"উক্ত ভূঞা বা ভুঁইয়াগণকে শুদ্ধভাষায় ভৌমিক বলিত। এখনকার হিসাবে উঁহাদিগকে জমিদার বলা যায়।

"এখন যেমন অস্ত্র-শস্ত্র-সৈন্যবিহীন রাজা মহারাজা স্বচ্ছন্দে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া নানাভাবে সদসৎ ব্যবহার করিতে পারেন, তখন সেরূপ হইত না ; তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষা বা রাজস্ব সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট সৈন্য রাখিতে হইত ; দুর্গ, অস্ত্র-শস্ত্র ও নৌবাহিনীর আয়োজন করিতে হইত। বীর বলিয়া ভূঞাগণের খ্যাতি হইত ; বীর বলিয়া প্রজারা তাঁহাদিগকে ভয়ভক্তি করিত। অধিকন্তু তাঁহাদের মধ্যে যিনি ধর্ম্মপ্রাণ বা প্রজারঞ্জক হইতেন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে নিত্য পুষ্পাঞ্জলি দিত। উহার ফলে তিনিও নিজেকে গৌড়েশ্বর বা দিল্লীশ্বর হইতে কম মনে করিতেন না।"

শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার
ও শ্রী জ্ঞানদা মজুমদার

বাঙ্গালার দ্বাদশজন ভৌমিক বা রাজা-উপাধিধারী জমিদার। আইন-ই-আক্‌বরী আক্‌বরনামা প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে এই সামন্তগণের কাহারও কাহারও উল্লেখ দেখা যায়। ইঁহারা কেহ কিছু অগ্রবর্ত্তী, অনেকেই প্রায় সম্রাট আক্‌বর সাহের সমসাময়িক। সেনাপতি মানসিংহ যখন বাংলা আক্রমণ করিতে আসেন তখন কাহারও কাহারও সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বের সেই উজ্জ্বল সময়েও এই দ্বাদশজন ভৌমিক অর্দ্ধস্বাধীনভাবে বাঙ্গালা শাসন করিতেছিলেন। এক সময়ে ১২ জন অধিপতির শাসনে বাঙ্গালারাজ্য পরিচালিত হইত বলিয়া সকলেই বঙ্গদেশকে "বার-ভূঁয়ে বাঙ্গালা" নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই বার জন ভৌমিকের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

নাম	যে স্থানের রাজা	জাতি
রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়	চন্দ্রদ্বীপ	বসুবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ
প্রতাপাদিত্য	যশোহর	গুহবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ
লক্ষ্মণ-মাণিক্য	ভুলুয়া	শূরবংশীয় ঐ
মুকুন্দরাম রায়	ভূষণা	দেববংশীয়
চাঁদ রায় ও কেদার রায়	বিক্রমপুর	ঘৃতকৌশিক গোত্র দেববংশীয়
চাঁদ গাজি	চাঁদপ্রতাপ	মুসলমান
গণেশ রায়	দিনাজপুর	উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ
হাম্বীরমল্ল	বিষ্ণুপুর	মল্লবংশীয়
কংসনারায়ণ	তাহিরপুর	বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ
ফজল গাজি	ভাওয়াল	মুসলমান
ঈশা খাঁ মসনদ আলি	খিজিরপুর	ঐ

উক্ত দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে রাজা কন্দর্পনারায়ণ, প্রতাপাদিত্য, লক্ষ্মণ-মাণিক্য, মুকুন্দরাম, চাঁদ রায় ও কেদার রায়, এই পাঁচজন বঙ্গজ-কায়স্থ। তাঁহাদের প্রত্যেকের দ্বারা এক-একটি সমাজ গঠিত হয়। বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভূষণা গ্রামে রাজা মুকুন্দরামের রাজধানী ছিল। তদ্বংশধর রাজা সীতারাম রায়ের অধঃপতনের পর নবাবী আমলে ভূষণা একটি বৃহৎ চাক্‌লায় পরিণত হয়। রাজা কন্দর্পনারায়ণ (চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় রাজা) রাজা মুকুন্দের সমসাময়িক ভৌমিক ছিলেন। কন্দর্পের পিতা রাজা পরমানন্দ বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনদিগের ৯ম সমীকরণ করেন। ঐ সময় চাঁদ রায়, কেদার রায় ও মুকুন্দরাম কুলীনদিগের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাঁহার সমীকরণ-কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করেন। চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় কায়স্থ রাজা কন্দর্পনারায়ণের সময় যশোহর নগরে প্রতাপের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় কর্ত্তৃক যশোহর-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতাপাদিত্য নিজের প্রতিভাবলে ঐ সমাজকে বিশেষ গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। এই রাজগণ যে এক সময়ে অর্দ্ধস্বাধীন থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের বীরত্ব-কাহিনী ও রণ-সজ্জা কাহারও অবিদিত নাই।

শ্রী সুধীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

(২৮)

কুলটীনিবাসী ৺ হলধর বিদ্যানিধি জ্যোতিঃ-সিদ্ধান্ত, স্যাণ্ডার কোং (Sander Co.) দ্বারা সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা পঞ্জিকা ছাপাইয়া প্রকাশ করেন। পূর্ব্বে যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন হাতেই পঞ্জিকা লিখিত হইত, তখন বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ ও রাশিচক্রে গ্রহদিগের অবস্থান ও সঞ্চার ও গ্রহণ মাত্র গণনা থাকিত।

শ্রী সুধীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্ম্মকার সর্ব্বপ্রথম পঞ্জিকা বাঙ্গালাভাষায় প্রচলন করেন। শ্রীরামপুরের কেরি সাহেব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোদয় প্রেসে ইহা মুদ্রিত হয়।

মন্মথনাথ চৌধুরী

(২৯)

দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সর্ব্বভাষায় এবং সর্ব্বজাতির ভিতরেই "মা" কথাটি ম অক্ষর দিয়া আরম্ভ—

বাংলা—মা
সংস্কৃত—মাতা
ভারতবর্ষ এবং এসিয়ার কতক অংশ
মা, মাতারি, মাতা

পারস্য	মাদর	
গ্রীক	মেটার	(Meter)
লাটীন	মাতের	(Mater)
ইটালীয়	মাদ্‌রে	(Madre)
স্পেন	মাদ্‌রে	(Madre)
ফরাসী	মেয়ার	(Mere)
ইংরেজী	মাদার	(Mother)
ডেন্‌মার্ক	মোডের	(Moder)
হলাণ্ড	মোয়েড্‌র	(Moedre)
আইসলাণ্ড	মোথের	(Mother)
ওয়েল্‌স্‌	ম্যাম	(Mam)
আইরিস্‌	মাথেয়ার	(Mathair)
বুল্‌গেরিয়া	মাটি	(Mati)
পোলাণ্ড	মাট্‌কা	(Matka)
লিথুয়ানিয়া	মোটি	(Moti)
সুইজারল্যাণ্ড	মোড্‌রে	(Modre)
জার্ম্মান্‌	মুটের	(Mutter)

শ্রী বীরেশ্বর বাগছী

(৩০)

নোবেল-প্রাইজ

সুইডেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌ এবং ডিনামাইটের আবিষ্কর্ত্তা।

আল্‌ফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল মৃত্যুসময়ে কতিপয় ট্রষ্টির হাতে ২৬২৫০০০০৲ টাকা রাখিয়া উইল করিয়া যান যে ঐ টাকার আয় হইতে প্রতি বৎসর যাঁহারা জগতের উন্নতিকল্পে প্রাণপণে পরিশ্রম করিবেন অথবা বিশ্বের হিতকর কিছুর অনুষ্ঠান করিবেন তাঁহাদের অথবা তাঁহাকে ১২০০০০৲ এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। জনহিতকর কাজগুলি নিম্নলিখিত কোন এক বিভাগের হওয়া চাই—(১) physics (২) chemistry (৩) medicine (৪) physiology (৫) literature (৬) prevention of warfare and establishment of peace in the world. স্ত্রীলোকের সম্বন্ধেও কোন বাধা নাই, উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাঁহারাও পুরস্কার পাইবেন। বৎসরে এক জনের বেশীও পাইতে পারিবেন। লিখিত প্রবন্ধ যে-কোন ভাষায় লিখিত হউক না কেন অন্ততঃ একটি ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ হওয়া চাই। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রথম পুরস্কার বিতরণ আরম্ভ হয়। সাহিত্য-বিষয়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পুরস্কার পাইয়াছেন।

১৯০১—ফরাসী কবি স্যুলি প্রুদোম, জন্ম ১৮৩৯, মৃত্যু ১৯০৩, "Stances et poems"এর জন্য।

১৯০২—জার্মান ঐতিহাসিক টেয়োডোর মম্‌সেন, জন্ম ১৮১৯—মৃত্যু ১৯০৩, History of Romeএর জন্য।

১৯০৩—নরওয়ের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং কবি বিয়র্ণষ্টার্ণ বিয়র্ণসন্, জন্ম ১৮৩২, মৃত্যু ১৯১০। নরওয়ের জাতীয় সংগীতের জন্য।

১৯০৪—(১) ফরাসীদেশের অন্তর্গত প্রোভাঁস প্রদেশের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং কবি ফ্রেডেরিক মিস্ত্রাল্। জন্ম ১৮৩০। প্রোভাঁসের চল্‌তি ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, বিশেষতঃ উক্ত ভাষায় Nerto নামক নভেলের জন্য। (২) স্পেনের বিখ্যাত নাট্যকার জো একাগেরে, জন্ম ১৮৩২, অদ্যাপি জীবিত।

১৯০৫—পোলাণ্ডের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হেনরিক্ সিয়েঙ্কিচ্। জন্ম ১৮৪৬। অদ্যাপি জীবিত। উপন্যাস—Quo Vadisএর জন্য।

১৯০৬—ইটালির কবি জিয়োসুয়ে কারডুচি। জন্ম ১৮৩৬, মৃত্যু ১৯০৭। বিখ্যাত কবিতা 'Satan'এর জন্য।

১৯০৭—রাড্‌ইয়ার্ড কিপ্লিং। ইংরেজ ঔপন্যাসিক এবং কবি, জন্ম বোম্বে নগরীতে ১৮৬৫, অদ্যাপি জীবিত। ভারতবর্ষ-বিষয়ক রচনাবলীর জন্য।

১৯০৮—আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের সুবিখ্যাত অধ্যাপক রুডল্‌ফ্ অয়কেন। ইনি জাতিতে জার্মান। দর্শনশাস্ত্রের একটি প্রবন্ধের জন্য নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন।

১৯০৯—সুইডেনের অসাধারণ প্রতিভাশালী, বিদুষী এবং সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক সেল্‌মা ল্যাগেরলফ্। জন্ম ১৮৫৮, অদ্যাপি জীবিত।

১৯১০—বিখ্যাত জার্মান ছোটগল্পলেখক পাউল হাইস, জন্ম ১৮৩০, অদ্যাপি জীবিত। ছোটগল্পের জন্য।

১৯১১—বেল্‌জিয়মের সুবিখ্যাত প্রবন্ধলেখক এবং নাট্যকার মরিস্ মেটারলিঙ্ক। জন্ম ১৮৬২, এখনও জীবিত। Blue Bird নামক নাটকের জন্য।

১৯১২—ইব্‌সেনের শিষ্য জার্মান নাটককার গেরহাট হাউপ্টমান, জন্ম ১৮৬২। এখনও জীবিত।

১৯১৩—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জন্ম, ১৮৬১, জীবিত। গীতাঞ্জলির অনুবাদের জন্য।

শ্রী বীরেশ্বর বাগ্‌চী

১৯০১ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর তারিখে খ্যাতনামা নোবেলের পঞ্চমবর্ষীয় মৃত্যু-উৎসব-উপলক্ষে প্রথম এই পুরস্কারের অনুষ্ঠান করা হয়। আধুনিক কালে নিম্নলিখিত লেখকেরা এই পুরস্কার পাইয়াছেন।

১৯১৪—এই বৎসর কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।

১৯১৫—রোম্যাঁ রোলাঁ। Romain Rolland

১৯১৬—ভি, ফন্ হাইডেন্‌ষ্টাম্ Heidenstam

১৯১৭—কে, জিয়েলেরুপ ও পন্‌টোপ্পিডান (K, Gjellerup & H, Pontoppidan)

১৯১৮—কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

১৯১৯—সি, স্পেট্টকার (C, Spettekar)

১৯২০—কে, হামসুন (K. Hamsun)

১৯২১—আনাতোল্ ফ্রাঁস্ (Anatole France)

১৯২২—জাসিন্তো বেনাভাঁৎ—স্পেন, Los Interesses Creado পুস্তক বিখ্যাত। প্রবাসী—চৈত্র ১৩২৯, পৃঃ ৮১৫ দ্রষ্টব্য।

শ্রী রামকিশোর রায়

পাশ্চাত্যদেশে বাগ্‌দেবীর ভক্তদিগকে উৎসাহ দিবার যত রকম পুরস্কার আছে, নোবেল পুরস্কারই তাহাদের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত। ইহা প্রতি বছরে ৫টি স্বতন্ত্রবিভাগে প্রদত্ত হইয়া থাকে। সাহিত্য ছাড়া অন্য বিভাগে পুরস্কার যাহাকে যাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

১৯০১

(১) পদার্থ-বিদ্যায়—জার্মাণ পণ্ডিত ডব্লিউ, সি, রন্টগেন্।

(২) রসায়নে—জার্মান অধ্যাপক জে, এচ্, ভ্যাণ্ট-হফ্।

(৩) ভেষজ বিদ্যায়—জার্মান কীটাণুতত্ত্ববিদ্ ই, ফন্ বেহরিঙ্গ মুস্কি প্রধোম্।

(৪) শান্তি-পুরস্কার—(ক) সুইজারল্যাণ্ডবাসী ডুনাণ্ট্ ও (খ) ফরাসী রাজনীতিক প্যাসী।

১৯০২

(১) পদার্থ-বিদ্যা—ওলন্দাজ

(ক) এচ্, এ, লরেঞ্জ

(খ) পী. জীমান

(২) রসায়ন—প্রুশিয়ার অধ্যাপক ই, ফিশার

(৩) ভেষজ-বিদ্যা—ইংলণ্ডবাসী রোনাল্ড্ রস্।

(৪) শান্তি-পুরস্কার—

(ক) সুইজারল্যাণ্ড-নিবাসী এলী, ডুকোমুন্,

(খ) সি, এ, গোবাট্

১৯০৩

১। পদার্থ-বিদ্যা—ফরাসী-পণ্ডিত

(ক) আঁতোয়ান আঁরি বেকেরেল

(খ) পিয়ার কুরি

(গ) পোল-রমণী এম্, এস্, কুরি

২। রসায়নে—সুইডেনবাসী স্বান্তে আরহিনাস্

৩। ভেষজ-বিদ্যা—ডিনেমার এন, আর, ফিনসেন্

৪। শান্তি-পুরস্কার—ইংলণ্ডের শান্তি-নায়ক ডব্লিউ, আর, ক্রেমার

১৯০৪

১। পদার্থ-বিদ্যা—ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লর্ড্ রেলে।

২। রসায়নে—স্কটল্যাণ্ডবাসী স্যার, উ, র‍্যামসে

৩। ভেষজ-বিদ্যা—রুশ চিকিৎসক আই, পি, পাওলো

৪। শান্তি-পুরস্কার—দি ইনিষ্টিটুট্ অভ্ ইণ্টার ন্যাশন্যাল ল নামক সভা এবছর পুরস্কার পায়।

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

(৩১)

লুথার বার্‌ব্যাঙ্ক

লুথার বার্‌ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ চাহিলে প্রবাসী ১৩১৮ ৫৬৯ পৃঃ দেখুন (চৈত্র) ।

অমলেন্দু বীর

(৩২)

"বীজশূন্য পেঁপে ও কুমড়া প্রস্তুত"

পেঁপে বা কুমড়া গাছে থাকিবার সময় একটুকু বড় হইলে বোঁটার বিপরীত দিকের নিম্নস্থান মাথাসরু ছুরি দ্বারা গোল আকারে (মূলের সঙ্গে কর্ত্তিত স্থানের এমন একটা চিহ্ন রাখিতে হইবে যেন পরে সেইভাবে জোড় দিতে বাধা না হয়) একটি টুকরা কাটিয়া লইলে যে ছিদ্র হইবে তাহার মধ্য দিয়া চিকণ একটি বাঁশের শলাকা প্রবেশ করাইয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া পেঁপে কি কুমড়ার ভিতরকার দানা ফেলিয়া পরে ঐ কর্ত্তিত খণ্ডখানা যথাস্থানে পুনরায় সংলগ্ন করিয়া দিতে হইবে। কুমড়ার কি পেঁপের যে স্বাভাবিক কষ বা আঠা কর্ত্তিত স্থানে থাকে তাহাতেই ঐ টুকরা আটক থাকিবে; তবু একখণ্ড ন্যাকড়া দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে ভাল হয়। এইরূপভাবেই বীজশূন্য পেঁপে বা কুমড়া প্রস্তুত করিয়া দেখা হইয়াছে। যত তাড়াতাড়ি ঐ প্রকার করিয়া বীজগুলি ফেলিয়া কাটা খণ্ডখানা যথাস্থানে লাগাইয়া রাখা যায়, ততই সহজে আট্‌কাইয়া যাইবে ও উদ্দেশ্য বিষয়ে পূর্ণ সফলতা লাভ হইবে। এই প্রকারে যে সময়-সময় ফল নষ্ট না হয় এমনও নয়। কাটিবার কালে যত ছোট করিয়া কাটা যায় ততই ভাল। কুমড়ার বুকা অংশ বীজ সহ ফেলা দরকার।

শ্রী মহেন্দ্রকুমার বাকছি
শ্রী রণজিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

[৩৫]

আলুর ক্ষেতের পোকা নিবারণ

আলুর ক্ষেতের পোকা নিবারণ করিতে হইলে, ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে হইবে। জমি প্রস্তুত করিবার সময়ই দেখিতে হইবে যেন ক্ষেতে কোন-রকম পচা ঘাস বা আগাছা না থাকে। আগাছা ইত্যাদির সঙ্গে নানা রকম পোকা থাকে এবং ক্রমশঃ উহারা বড় হইয়া শস্য নষ্ট করে। অনেক সময় (green manure) সবুজ সার দেওয়া জমিতে পোকার অত্যাচার খুব কম হয়, ইহার একমাত্র কারণ যে ক্ষেতের মাটি পরিষ্কার থাকে।

আলু গাছে ধরিতে আরম্ভ করিলে, গোড়ায় অল্প অল্প নাইট্রোজেন দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু নাইট্রোজেন দিবার সময় খুব সাবধান হইতে হইবে। গাছের পাতায় লাগিলে, গাছ মরিয়া যাইবে। শিকড় বা আলুর গায়েও যেন না লাগে। শিকড় হইতে অন্ততঃ এক ইঞ্চি দূরে নাইট্রোজেন দেওয়া আবশ্যক।

আলুক্ষেতের পোকার ধ্বংসকারী কোন "শত্রুপোক," একবার অনুসন্ধান পাইলে উহাদিগকে বিনাশ করে। ক্ষেতের পোকাগুলি রাত্রিবেলা জমির উপরে উঠে। পেঁচাও রাত্রে ক্ষেতের ভিতরে শিকার অনুসন্ধান করে। ক্ষেতের ভিতরে এক একটি কাঠির মাথায় পাট বা খড় জড়াইয়া পুতিয়া রাখিলে, ২।১ দিনের ভিতরে পেঁচা উহার উপর বসিতে থাকিবে এবং একবার সন্ধান পাইলে পোকার বংশ নির্ম্মূল না করিয়া ছাড়িবে না।

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

[৩৬]

"মহাদেবের জটায় গঙ্গা কেন ?"

দেবর্ষি নারদের বীণাবাদনযুক্ত গানশ্রবণে গোলোকপতি নারায়ণ মোহিত হন। ঐসময় তাঁহার শরীর হইতে যে স্বেদ বহির্গত হয় তাহার সমষ্টির ধারায় গঙ্গার উৎপত্তি। সাগরবংশ কপিলমুনির অভিশাপে ধ্বংস হয়। তাহাদের উদ্ধারের জন্য শঙ্করের বরে ভগীরথ জন্মগ্রহণ করিয়া উপদেশ মত গঙ্গাকে আনিবার জন্য স্বর্গে গমন করে। তথায় স্তবস্তুতি করিয়া দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া ভগীরথ অগ্রে অগ্রে শঙ্খ বাদন করিয়া চলিতে থাকেন। পিছনে পিছনে গঙ্গা চলিতে থাকেন।

স্বর্গ হইতে নামিবার সময় যে ধারা মর্ত্তে পড়িতে থাকে তাহার বেগ বসুমতী সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁপিতে থাকেন ও শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়া কায়মনে শঙ্করকে ডাকিতে থাকেন। শঙ্কর ভক্তের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া পর্ব্বত হইতে নামিবার ধারা নিজে বিশ্বরূপীমূর্ত্তিতে যোগাসনে বসিয়া শিরে ধারণ করিয়া ভক্ত বসুমতীকে যাতনা হইতে রক্ষা করেন। গঙ্গার ধারা অতি পবিত্র ও স্নিগ্ধ ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার ক্লেশনিবারিণী শক্তিতে সমুদ্ভাসিত ও সর্ব্বপ্রকারে আরামদায়িনী ও সর্ব্বসন্তাপহারিণী জানিয়া দেবাদিদেব শঙ্কর ভোলানাথ সগরবংশের প্রতি বর দেওয়া সত্ত্বেও তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজের জটায় ধারণ করিয়া রাখেন। লৌকিক প্রবাদ শঙ্কর গঙ্গাকে অতি সুন্দরী দেখিয়া ভগবতীর ভয়ে গঙ্গাকে তাঁহার প্রার্থনামত স্ত্রীত্বে স্বীকার করিয়া ভগবতীর অদৃষ্ট-স্থানে অর্থাৎ শিরে জটাকুণ্ডলী সৃজন করিয়া তাহার মধ্যে রাখিয়া দেন। গঙ্গাকে না দেখিয়া ভগীরথ স্তবস্তুতি করিতে থাকেন ও কান্নাকাটি করিতে থাকেন। তখন আশুতোষ এই বলিয়া ভগীরথের সঙ্গে গঙ্গাকে দেন যে ভগীরথের কার্য্য অন্তে তিনি গঙ্গাকে রাখিতে পারিবেন না। ভগীরথ তাহাতে সম্মত থাকিয়া এই কার্য্য উদ্ধারের সময় পর্য্যন্ত মহাদেবের নিকট হইতে গঙ্গাকে চাহিয়া লন।

শ্রী মহেন্দ্রকুমার বাগ্‌চি

(৩৮)

"এক গাছে ভিন্ন স্বাদের আম অর্থাৎ ডাল ভেদে পৃথক্ স্বাদের আম কেন হয় ?"

কলম-কাটার সময় যদি টক্ আমের চারার সঙ্গে কলম প্রস্তুত করা হয় অথবা মিষ্ট ও টক্ আমের চারা খুব ছোট-থাকার অবস্থায় দুইটিরই একধারের বাকল কাটিয়া পরে একত্র বাঁধিয়া রাখা যায়, তবে এক-দিকের ডালে মিষ্ট ও একদিকের ডালে টক্ আম হইবে।

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র বাক্‌ছি

(৪০)

বিক্রমপুর

বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। হান্টারের মতে বিক্রমপুর বিক্রমাদিত্যের নামানুসারেই হইয়াছে।—

'There is a tradition that the celebrated Hindu Raja Bickramaditya held his Court in the routhern portion of the district for some years, and gave his name to the Pargana of Bickrampur'.—Hunter's Statistical Account of Bengal, p. 118.

কিন্তু এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করেন। তাঁহারা বলেন যে "উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্য যে কখনও পূর্ব্বাঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন তাহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। এমন কি তাঁহার নাম- ও রাজত্ব-সম্বন্ধেও নানারূপ মতভেদ

বিদ্যমান। অতি প্রামাণিক, 'বিপ্রকুলকল্পলতিকা' পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে সেনবংশীয় রাজন্য বর্গের পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ নিভুসেন, বীর সেন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহাদের বংশধর বিক্রমসেনই বিক্রমপুর নগরের স্থাপয়িতা। আমাদের মতে ইহাই সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।" পাঠকের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য উক্ত গ্রন্থের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল।

দাক্ষিণাত্যবৈদ্যরাজশ্চৈকোঽশ্বপতিসেনকঃ।
তদ্বংশে জনিতশ্চন্দ্রকেতুসেনো মহাধনঃ॥
তস্য বংশে বীরসেনো ভূপঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।—
তদ্বংশে বিক্রমসেনো জাতঃ পরমধার্ম্মিকঃ
কৃতবান্ বিক্রমপুরীং স্বনাম্নাভিহিতাং সুধীঃ॥—

বিক্রমপুরের ইতিহাস।
শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার

বিক্রম-নামক রাজার বাস-হেতু এই স্থান বিক্রমপুর নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বকালে অর্দ্ধোদয় যোগের সময় রাজা কল্পতরু হইয়া ইছামতী নদীর তীরে স্বর্ণদান করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে তিনি দীনদরিদ্র ও ব্রাহ্মণ-দিগকে বহুধন দান করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে বহুতর বিদ্বানের বাস। এ স্থান পরতালরাজের প্রমোদস্থান বলিয়া খ্যাত। বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। প্রবাদ আছে যে উজ্জয়িনীপতি সুপ্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে আসিয়া নিজ নামে একটি নগর পত্তন করিয়া যান, তাহাই আদি বিক্রমপুর। কিন্তু বিক্রমাদিত্য নামক অপর কোন নৃপতি কর্ত্তৃক বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক উজ্জয়িনীপতির সহিত এই পূর্ব্ববঙ্গীয় বিক্রমপুরের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য বিক্রমপুর নামটি প্রাচীন, পালবংশের সময়ে বিক্রমপুর অতি প্রসিদ্ধ জনপদ বলিয়াই গণ্য ছিল। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ, শিলালিপি, বা তাম্রশাসনে বিক্রমপুরের কোন উল্লেখ নাই।

পালাধিকার-কালে বিক্রমপুর নগরে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ করেন। কেহ রামপাল ও কেহ সাভারে এই স্থান নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু প্রথম স্থানটি বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত হইলেও সেই আদি বিক্রমপুর নগর ঠিক কোনটি, তাহা নিঃসন্দেহে কেহ দেখাইতে পারে না। পাল ও সেনবংশীয়গণের অধিকারকালে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। সেন-বংশীয় মহারাজ দনৌজামাধবের সময় বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী চন্দ্রদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়। এসময়েও চন্দ্রদ্বীপের দক্ষিণ সীমায় প্রবাহিত সমুদ্র পর্য্যন্ত অবস্থিত স্থান বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। এই পরগণাতেই সর্ব্বাপেক্ষা ঘনবসতি ও লোকসংখ্যা অধিক, অধিকাংশই হিন্দু, হিন্দুর মধ্যে আবার ব্রাহ্মণই বেশী।

শ্রী সুধীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে বিক্রমপুরের নাম পাওয়া যায় না। বিক্রমপুর এই নামটি বহু পুরাতন নহে। বিক্রমপুরের প্রাচীন নাম সমতট। ফাহিয়ান বলেন —"সমতটের পরিধি ৩০০০ লি—উহার রাজধানী ২০ লি এবং ৩০টির বেশী বৌদ্ধমঠ এস্থানে ছিল." বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন হইতে বুঝা যায়, ঢাকা জেলার অনেকাংশ এবং ফরিদপুর জেলার কতকাংশকে সেন-রাজত্ব-সময়ে বিক্রমপুর বলা হইত।

(J. A. S. B. 1895)

ওয়াটার্সের মতে,—'সমতট' ঢাকার দক্ষিণে এবং ফরিদপুরের পূর্ব্ব-ভাগে অবস্থিত। বিক্রমাদিত্যের নাম হইতে 'সমতট' বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে—একথা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। (বিক্রমপুরের ইতিহাস, ১৩১৬ সন, ৫ পৃঃ)। বিক্রমসেনই 'বিক্রমপুর' নগরের স্থাপয়িতা। [ঐ ২১ পৃঃ]

"বিক্রমপুরের ইতিহাস"-লেখক যোগেন্দ্র-বাবুও বিক্রমপুর নামোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

[ক] "দিগ্বিজয়" নামক সংস্কৃতগ্রন্থে আছে—

"বিক্রমভূপবাসত্বাৎ বিক্রমপুরমতো বিদুঃ" অর্থাৎ বিক্রম নামক রাজার বাস হেতু বিক্রমপুর নাম হইয়াছে।

(খ] "বিপ্রকুলকল্পলতিকায়" আছে যে সেনবংশীয় রাজাদের পূর্ব্বপুরুষ নিভুজ সেন, বীরসেন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আসেন, তাহাদের বংশের বিক্রমসেনই বিক্রমপুর নগরের স্থাপয়িতা।

[গ] অনেকে বলেন যে "সেনবংশীয় নৃপতিগণ যে স্থানে বাস করিয়া রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তাহারা সেই সেই স্থানকেই বিক্রমপুর নামে অভিহিত করিতেন।"

শ্রী—
ও
শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(৪২)

আলোকরশ্মি এক জাতীয় স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে সরল-রেখাক্রমে চলে। কিন্তু একটি স্বচ্ছ স্তর [medium] হইতে আর-একটি স্বচ্ছ স্তরের ভিতর গমনকালে উভয়ের বিচ্ছেদক তলে পরাবর্ত্তিত হইয়া পুনরায় সরল-রেখায় চলে। উভয় স্তরের বিচ্ছেদক তলের উপর যদি একটি লম্ব রেখা [normal] কল্পনা করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে যে-সকল আলোক-রশ্মি উভয়ের সংযোগ-বিন্দুতে পরাবর্ত্তিত হয়, সেগুলি উভয় স্তরের গুরুত্ব [density] অনুসারে লম্বরেখার দিকে বা বিপরীত দিকে বাঁকিয়া যায়। ইহাকে পরাবৃত্তি বা refraction কহে। লম্ব-রেখার সহিত সম্পতিত আলোক-রশ্মিকৃত কোণের (angle of incidence) এবং পরাবর্ত্তিত আলোক-রশ্মিকৃত কোণের (angle of refraction) সাইনের অনুপাত-মানকে দ্বিতীয়স্তরের প্রথম স্তরানুযায়ী refractive index কহে (Sin i/Sin r = m)। ইহা কোনও দুইটি স্বচ্ছ পদার্থের পক্ষে স্থির রাশি (constant), কারণ আলোকরশ্মি যে কোণেই পতিত হউক না কেন উহা দ্বিতীয় পদার্থের প্রথমপদার্থানুযায়ী refractive index অনুসারে পরাবর্ত্তিত হইবে।

জলের ভিতর ডুবান পদার্থ হইতে বিকীর্ণ আলোকরশ্মি বিচ্ছেদক তলের উপর ভিন্ন ভিন্ন কোণে পতিত হইয়া বিভিন্ন কোণে পরাবর্ত্তিত হয়। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে জলস্তর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তেশিরা কাঁচ (prism) বা লেন্সের (lense) ন্যায় কাজ করে, সুতরাং পদার্থটি স্বাভাবিক আকার হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন দেখায়। কিন্তু যদি উহার পৃষ্ঠগুলি সমতল হয় এবং উহা বিচ্ছেদক তলের সহিত সমান্তর রেখায় রক্ষিত হয় তাহা হইলে বিভিন্ন দেখাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

শ্রী গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১৩২৯ সালের ১২)

কমলা লেবুর রং বা গন্ধ

কমলা লেবুর গন্ধ বাহির করাটা সহজসাধ্য, কিন্তু রং বাহির করা বোধ হয় যায় না। ছানা ও চিনির পাকের সঙ্গে কমলালেবুর ছিলকা বা খোসা দিয়া কমলা লেবুর সন্দেশ প্রস্তুত হয়। অন্য কোনও খাদ্য-দ্রব্যে কমলালেবুর গন্ধ পাইতে ইচ্ছা করিলে, ঐ ছিলকা বা খোসা দিয়া সিদ্ধ করিয়া লইলে খাদ্যে কমলালেবুর ন্যায় গন্ধ হয়, পরে ঐ ছিলকা বা খোসা ফেলিয়া দিতে হয়।

শ্রী মণিভূষণ ভট্টাচার্য্য

(১৩২৯ সালের ৯২)

কালীপূজা যে অমাবস্যা রাত্রিতে হয় তাহাকে দীপান্বিতা বলে। শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

তুলারাশি গতে ভানৌ দীপবাত্রাদিনেষু চ।
পূজয়েৎ কালিকাং দেবীং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥

অর্থাৎ ভাস্কর তুলারাশিগত হইলে দীপান্বিতা অমাবস্যায় ধর্ম্মকামার্থ-সিদ্ধির জন্য কালীপূজা করিবে।

দীপ-দেওয়ার নিয়ম আছে বলিয়াই কালী-পূজা-রাত্রির অমাবস্যাকে দীপান্বিতা বলে।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(১৩২৯ সালের ১১৮)

ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য রাজর্ষি ছিলেন। রাজ্যের জন্য ভাইয়ের মনে হিংসাকালকূট প্রবেশ করিয়াছে এরূপ অবস্থায় রাজ্য পরিত্যাগ করাই সকলের পক্ষে মঙ্গল ইহা ভাবিয়া 'রাজর্ষি' গোবিন্দ-মাণিক্য ত্রিপুরার ভার নক্ষত্র রায় বা ছত্রমাণিক্যের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজে চট্টগ্রামে ঋষির ন্যায় কালযাপন করিতে থাকেন। এসময় দিল্লীতে শাহজাহানের ছেলেদের মধ্যে বিষম মারামারি কাটাকাটি উপস্থিত। বাংলার শাসনকর্ত্তা সুজা আওরঙ্গজীব কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন, পরে অন্য কোনও পথ না পাইয়া, তিনি ছদ্মবেশে তিন কন্যা সহ ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম পলাইয়া যাইয়া গোবিন্দমাণিক্যের আশ্রয় লইলেন। চট্টগ্রাম হইতে মক্কা যাইবেন, ইহাই সুজার ইচ্ছা ছিল। বর্ষাকাল বলিয়া জাহাজ পাওয়া গেল না। সুজা সংবাদ পাইলেন আওরঙ্গজীব এখনও তাঁহার পিছন ছাড়েন নাই। গুপ্তভাবে রাখিবার উদ্দেশে, গোবিন্দমাণিক্য অনেক যান বাহন ও অনুচরাদি সহ সুজাকে বন্ধু আরাকান অধিপতির নিকট পাঠাইয়া দেন। বিশ্বাসঘাতক আরাকানরাজ সুজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। এদিকে ছত্রমাণিক্যের মৃত্যু হওয়ায় গোবিন্দমাণিক্য রাজ্য গ্রহণ করেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আরাকান যাইবার প্রাক্কালে বাংলার রাজা সুজা গোবিন্দমাণিক্যকে একখানা বহু-মূল্য তরবারি উপহার দিয়াছিলেন।

সুজার প্রতি আরাকানরাজের নৃশংসতা স্মরণ করিয়া গোবিন্দ-মাণিক্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। এবং সুজার নাম চিরস্মরণীয় করিবার ইচ্ছায় গোবিন্দমাণিক্য কুমিল্লাতে একটি উৎকৃষ্ট মসজিদ তৈয়ার করিয়া দেন। এ মসজিদনির্ম্মাণকার্য্যে গোবিন্দমাণিক্য সুজার উপহৃত তরবারির বিনিময়ে বহু অর্থ ব্যয়* করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহাই সুজা মসজিদ নামে বিখ্যাত।

এ সম্বন্ধে নীচের বইগুলি আলোচ্য :—

১। রবীন্দ্রনাথের—রাজর্ষি, শেষ তিন পরিচ্ছেদ।
২। ত্রিপুরার ইতিহাস—কৈলাস সিংহ।
৩। ষ্টুয়ার্টের—বাংলার ইতিহাস।
৪। যদু সরকারের—আওরঙ্গজীব (২য় খণ্ড)

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(৪৩)

বাণিজ্য-সংক্রান্ত পুস্তক

বাংলা ভাষায় বাণিজ্য-সংক্রান্ত পুস্তক অতি অল্পই আছে। তার কারণ বোঝা অতি সহজ। ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর স্থান কোথায়? নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠে ব্যবসা জানিবার, শিখিবার ও করিবার অনেক সাহায্য পাওয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার শেঠ প্রণীত

(১) প্রাথমিক ব্যবসা শিক্ষা—২৷৹
(২) মহাজন-সখা— ১৷৹
(৩) দোকানের বাণিজ্যতত্ত্ব—২৷৹
(৪) ব্যবসায়ের কূটতত্ত্ব— ১৷৹
(৫) ব্যবসায়ী—ইকনমিক কার্য্যেসি হইতে প্রকাশিত—৸৹
(৬) অল্পব্যয়ে ব্যবসা—শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন ঘোষ প্রণীত—৬৹

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম
ও মহম্মদ মনসুর উদ্দীন শাহজাদপুরী

(৫৫)

১। I rise to a point of order—আমি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উত্থান করিলাম। (দণ্ডায়মান হইলাম)

২। I rule you out of order—শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য আপনাকে শাসন-নিয়ন্ত্রিত করিতেছি।

৩। I am in possession of the House—আমি গৃহের (সমিতির) অধিকারাভুক্ত। (I have constitutional right to speak)

৪। I press for division—মতি (vote) নির্ণয় করা হউক।

৫। Ex-officio—যথোপস্থান। (office উপস্থান ; Ex-officio = by virtue of his office)

৬। * Secretary—"ব্যবহর্ত্তা।" Joint Secretary—সহ-ব্যবহর্ত্তা। সাধারণতঃ Secretaryকে সম্পাদক বলা হয়। কিন্তু অধ্যাপক রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর ব্যবহর্ত্তা সংজ্ঞা দিবার যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যার ভারতবর্ষে দ্রষ্টব্য।

৭। President—অধিপতি ; Chairman—অধ্যক্ষ

৮। Executive Committee—কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি ; cabinet—গূঢ় সমিতি

৯। * Vote—মতি

১০। Whip—বেত, চাবুক (অন্য অর্থ "সংকর্ত্তা" Parliamentary whip members)

১১। Debate meeting—হেতুবাদ সমিতি বা সমবায়

১২। Mover—উপক্ষেপকার

১৩। Opposer—বিরুদ্ধবাদী

১৪। * To second—অনুমোদন করা

১৫। * To support—সমর্থন করা, প্রতিপাদন করা

১৬। To amend—সংশোধন করা

১৭। * Motion—উপক্ষেপ

১৮। * Resolution—নির্দ্ধার

১৯। Bill—নিয়ামক পত্র (Any paper containing statements of particulars of a thing)

২০। Act—আইন (A Bill in action)

শ্রী গিরিজাশঙ্কর জোয়ার্দ্দার

(৫৬)

দালানে বটের চারা

দালানের গায়ে বট বা অশ্বত্থের চারা একবার বর্দ্ধিত হইতে

* চিহ্নিত শব্দগুলি অধ্যাপক রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর লিখিত "বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

পারিলে, তাহা নষ্ট করা বড়ই কষ্টসাধ্য। কাটিয়া ফেলিলে পুনরায় গজায় এবং খুঁড়িতে গেলে ব্যয়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। আমি যে উপায় বলিতেছি, ইহা একবার পরীক্ষা করিলে সুবিধা বুঝিতে পারা যাইবে। গাছ কাটিয়া উহার চতুষ্পার্শ্বের সুরকী ১।২ ইঞ্চি খুঁড়িয়া গোড়ায় নাইট্রিক অ্যাসিড্ ঢালিয়া দিলে যে পর্য্যন্ত ঐ অ্যাসিড প্রবেশ করিবে, সে পর্য্যন্ত গাছের শিকড় পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। চারা বট বা অশ্বথ বৃক্ষের প্রধান শিকড় (main root) নষ্ট হইলে, আর নূতন অঙ্কুর গজাইবে না। গজাইলে পুনরায় তার গোড়ায় অ্যাসিড্ প্রয়োগ করিলে গাছ নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

(৫৯)

লক্ষ্মী ও কার্ত্তিককে প্রণাম

লক্ষ্মীকে প্রণাম করিলে পাছে তিনি উহা বিদায়ের প্রণাম মনে করিয়া চলিয়া যান এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্মীকে প্রণাম করা হয় না।

কার্ত্তিককে প্রণাম করিলে বিবাহ হয় না বলিয়া আমাদের দেশে একটি ধারণা। এইজন্য অবিবাহিত ব্যক্তিরা কার্ত্তিককে প্রণাম করেন না। বিবাহিত ব্যক্তির প্রণাম করিতে আপত্তি নাই।

শ্রী ক্ষীরোদবাসিনী সেনগুপ্তা

দীওয়ান-ই-হাফিজ্

গজল—৭

[প্রথম ছয়টি গজলের কবিতায় অনুবাদ 'মোস্‌লেম ভারতে' বেরিয়েছিল। এগুলি হুবহু অনুবাদ নয়। ভাব অনুবাদ বলা যেতে পারে।]

ত্যজি' মস্‌জিদ কা'ল মুর্শিদ মম আস্তানা নিল মদ্‌শালা,
নেবে কোন্ পথ এবে পথ-রথ্ ওগো সুহৃদ্ সখি
পথ্ বালা!

আমি মুসাফির যত শারাবীর ঐ খারাবীর পথ মঞ্জিলে,
সখি মাফ্ চাই, বিধি এই রায় ভালে লিখেছিল
আমি জন্মিলে।

'কাবা শরিফের' পানে করি ফের মুখ কোন্ বলে আমি
কও সখি,
পীর শারাবের-পথ-মদ্‌রত যবে, আন্-পথে যাবে শিষ্য
কি?

জ্ঞান বোঝে যদি কেন বাঁধি হৃদি প্রিয়া-কুন্তল-ফাঁদে
সেধে সেধে,
যত জ্ঞানী পীর ঐ জিঞ্জির লাগি' দিওয়ানা হবে গো
কেঁদে কেঁদে।

মম ঠোঁটে ওগো বধূ 'আয়েত'-মধু যে ঢালে তব মুখ
'কোর্‌আনে',
তাই সুধা আর সীধু ফেটে পড়ে শুধু কবিতাতে আর
মোর গানে।

মম অগ্নি বর্ষী 'আহা'-শ্বাস আর একা-রাতে-জাগা
কাৎরাণী
তব মর্ম্মর-মোড়া মর্ম্মে কি দিল ব্যথা আঁকি' কোনো
রাত রাণী!

মন- ময়ূরীর লাগি' 'বিরহ'-ভুজগী ফেঁসেছিল ভালো
কেশ-জালে,
কেন খুলে দিয়ে বেণী 'বিচ্ছেদ'-ফণী ছেড়ে দিলে প্রিয়া
শেষকালে!

তব এলোচুলে বায়ু গেল বু'লে মম আলো নিভে গেল
আঁধিয়ারে,
ঐ কালোকেশে আমি ভালোবেসে শেষে দেশে দেশে
ফিরি কাঁদিয়া রে।

মোর বুক-ফাটা 'উহু'-চীৎকার-বাণ চক্কর মারে নভ চিরে,
দেখো হুশিয়ার মম প্রিয়তম, তীর-বাজপাখী উড়ে
তব শিরে!

মোর জ্ঞানী পীর আজ শারাবীর পথে, এস মোর সাথী
পথ-বালা,
ঐ হাফিজের মত আমাদেরো পথ প্রেম-শিরাজীরই
মদ্‌শালা।

কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

সূর্য্যগ্রহণের ফোটো—

সূর্য্যগ্রহণের প্রথম ফোটো গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯২২) অষ্ট্রেলিয়ায় তোলা হয়। ছবিটি একটি ৪০ ফুট মুখওয়ালা ক্যামেরার সাহায্যে তোলা হয়। সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যের আলোকিত অংশ (corona)
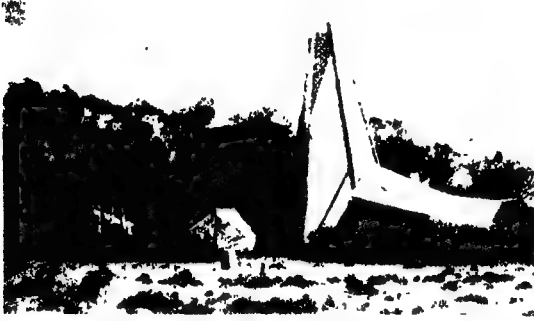
সূর্য্যগ্রহণের ছবি তুলিবার জন্য ব্যবহৃত অতিকায় ক্যামেরা

৪০,০০০ মাইল চওড়া বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। এই উদ্দীপ্ত স্থান হইতে আলোকরশ্মি সকল চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত হয়। এক-একটি আলোকরশ্মি (সূর্য্যের কেন্দ্র হইতে) ২০০০০০০ মাইল পর্য্যন্ত যায়। এই সূর্য্য-গ্রহণের ফোটোতে ৩০টি নক্ষত্রের ছবিও ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহাদের
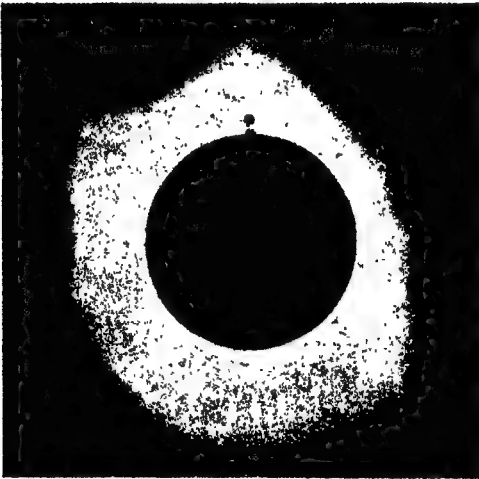
৪০-ফুট ক্যামেরায় তোলা সূর্য্যগ্রহণের ছবি

মধ্যে ২৩টির আয়তন মাপাও হইয়াছে। এই ফোটোতে অধ্যাপক আইন-ষ্টাইনের সূর্য্যসংক্রান্ত অনেক ভবিষ্যৎবাণী সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

—

পকেট-মাইক্রোস্‌কোপ্—

একপ্রকার ছোট চমৎকার পকেট-মাইক্রোসকোপ বাজারে আসিয়াছে। ইহার সাহায্যে বীক্ষণাগারের বহুদূরে বসিয়াও যে-কোন বৈজ্ঞানিক কোন দ্রব্য অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিতে পারিবেন। বিশেষ বিশেষ দ্রব্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় লেন্স বদ্‌লাইবার প্রয়োজন হইবে
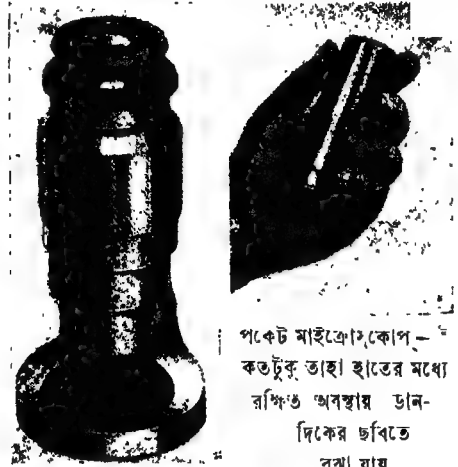
পকেট মাইক্রোস্‌কোপ—কতটুকু তাহা হাতের মধ্যে রক্ষিত অবস্থায় ডান-দিকের ছবিতে বুঝা যায়

না। চোঙ্গা ঘুরাইয়া সব ঠিক করা যাইতে পারে। ইহাতে একটা জিনিষকে ২০ হইতে ২২৫ গুণ বড় করিয়া দেখা যাইবে। ধুলা ইত্যাদি হইতে যন্ত্রটিকে রক্ষা করিবার জন্য ইহার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

—

আমেরিকা হইতে চীনে র‍্যাডিও-বার্ত্তা প্রেরণ—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে চীনের সাঙ্গাই সহরে একটি র‍্যাডিও-বার্ত্তা প্রেরণ করা হইয়াছে। এই সংবাদ-প্রেরণের জন্য সামান্য একটু বেশী জোরালো র‍্যাডিও-কল ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। হিল্‌সবরো হইতে সাঙ্গাই ৮৬০৯ মিটার দূর।

—

বৃক্ষাচ্ছাদিত মোটর-রাস্তা—

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়াতে ৬০০০ মাইল লম্বা যে মোটর চালাইবার পাকারাস্তা আছে, তাহাকে বৃক্ষচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৭০০ মাইল রাস্তার দুই পাশে বৃক্ষ লাগানো হইয়া গিয়াছে। সমস্ত রাস্তাটির ২৫ ফুট অন্তর (দুই ধারে) ১,২৬৭,২০০ গাছ লাগাইলে ৬০০০ মাইল পূর্ণ হইবে। রাস্তাটির স্থানে স্থানে পুরানো বৃক্ষও আছে। রাস্তাটি যে যে সহরের মাঝখান দিয়া বা পাশ দিয়া গিয়াছে, সেই-সকল সহরের মিউনি-সিপ্যালিটি এই বৃক্ষ-রোপণ-কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। এই

কার্য্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র বৃক্ষ-রোপণ- এবং রক্ষণ-বিভাগ খোলা হইয়াছে। ২১ একর জমি লইয়া বৃক্ষের চারা লাগান হইয়াছে। এই চারার সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ২,০০০,০০০। এই জমি হইতে চারা উঠাইয়া লইয়া রাস্তার দুই পাশে লাগান হইতেছে। নানা প্রকারের ঘন-পাতাওয়ালা বৃক্ষ এই কাজে লাগান হইতেছে। বাদাম-গাছই সব চেয়ে বেশী ব্যবহার করা হইতেছে।

—

কেলেমুখো-সিংহ শকারী—

যে জন্তুটির ছবি দেওয়া হইল, তাহা দেখিতে অতি ভীষণ! পৃথিবীর মধ্যে এই একমাত্র জন্তু—যে সিংহকে আক্রমণ করিতে

সিংহ-সংহারক জন্তু—ইহাদের এই একটিকে জীবন্ত বন্দী করা গিয়াছে। বর্ত্তমানে ইনি যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেল্‌ফিয়া সহরে বাস করিতেছেন

বিন্দুমাত্রও ভয় পায় না। ইহাকে পশ্চিম আফ্রিকা হইতে ধরিয়া আমেরিকার ফিলাডেল্‌ফিয়া সহরে কিছু দিন পূর্ব্বে আনা হয়। ইহার কোন বাংলা নাম নাই—ইংরেজি নাম Black-faced Drill.

—

নারিকেল-উৎসব—

সোলোমন দ্বীপের লোকেরা পূর্ব্বে নরখাদক ছিল—এবং তাহারা তাহাদের শিকারলব্ধ মানুষদের মাথা সারি সারি করিয়া টাঙাইয়া
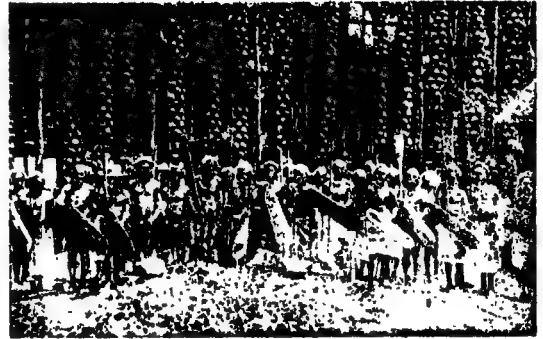
সোলোমন্ দ্বীপের অসভ্যদের নারিকেল-উৎসব, নৃত্য করিবার পূর্ব্বের ছবি

রাখিত। সভ্য জগতের লোকেরা তাহাদের নামে বেশ একটু আতঙ্ক অনুভব করিত। ক্রমশ তাহারা, শ্বেতাঙ্গ-প্রভাবের ভিতর আসিয়া সভ্য হইয়া উঠিতেছে। এখন তাহারা মানুষের মাথার বদলে নারিকেল সারি সারি করিয়া টাঙায় এবং তাহার চারিদিকে ভীষণ নৃত্য করে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মাদল বাজে। নাচের পর তাহাদের নারিকেল-ভোজন-উৎসব হয়। ছবিতে সোলোমন-দ্বীপবাসীদের নাচের ঠিক পূর্ব্বের দৃশ্য দেখানো হইতেছে।

—

ল্যাম্পপোষ্টের নীচে ডাকবাক্স—

প্যারিসে যেখানে সেখানে ডাকবাক্স থাকাতে বিদেশী এবং নূতন লোকে অনেক সময় চিঠি-পত্র ফেলিবার জন্য ডাকবাক্স খুঁজিয়া পাইত না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্যারিসে এখন এক প্রকার নূতন ডাকবাক্সের চলন হইয়াছে। আলো-থামের নীচে এই-সমস্ত ডাকবাক্স থাকিবে, তাহাতে সকল লোকেই কোন কষ্ট না করিয়াও ডাকবাক্স খুঁজিয়া পাইবে। বর্ত্তমানে এই রকম ৩০০০ ডাকবাক্স পথে পথে বসান হইয়াছে।

ডাক-বাক্স-যুক্ত রাস্তা-বাতি

—

সাপ-পোষা—

আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই সাপুড়েরা সাপ পোষে এবং সাপের খেলা দেখাইয়া বেশ দু পয়সা রোজ্‌গার করে। আমাদের দেশে রামায়ণ-মহাভারতের যুগেও সাপ খেলার প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায়; সেইজন্য সাপ-খেলা আমাদের

লস্ এঞ্জেলসের কৃত্রিম সর্পাবাস—ভদ্রলোক একটা সাপকে উপরে তুলিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন

দেশে খুব বেশী আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশে লস্‌এঞ্জেলেস্ (Los Angeles) প্রদেশে একজন সর্প-বিশারদ ভদ্রলোক সাপ পুষিবার এবং চাষ করিবার এক অভিনব আগার নির্ম্মাণ করিতেছেন। যেখানে সাপেদের আবাসভূমি তৈরী হইবে সেই স্থানটির পরিমাণ হইবে দুই একর জমি। আবাস-ভূমি মাটিতে গর্ত্ত করিয়া নির্ম্মিত হইবে এবং তাহার চারিদিকে কন্‌ক্রিটের উচ্চ দেওয়াল থাকিবে। দেওয়ালের উপর লোকের চলাফেরা করিবার মত স্থান থাকিবে। দর্শকদের সুবিধার জন্য সমস্ত আবাস-ভূমির মাঝে মাঝে এইরূপ দেওয়ালের উপর রাস্তার বন্দোবস্ত করা হইবে, তাহাতে সকলে এই সর্পাবাসের যে-কোন বিভাগ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে পারিবে। আমেরিকার প্রায় সকল প্রকার সাপ এবং সরীসৃপ (কুমীর ছাড়া) এইখানে রক্ষিত হইবে। এই আবাসের মাঝখানে একটি জলা যায়গা থাকিবে যেখানে সকল রকমের জলীয় বিষাক্ত সাপ, গোসাপ, গিরগিটি ইত্যাদি নির্ভয়ে এবং সপরিবারে বাস করিবে।

আমেরিকার ঝুমঝুমি-সাপের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে। এই (rattle-snake) ঝুমঝুমি-সাপের মত ভীষণ এবং বিষাক্ত সাপ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। আমাদের দেশের গোখরো সাপও ইহাদের কাছে হার মানে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০০ ঝুমঝুমি-সাপ জোগাড় করা হইয়াছে। ইহাদের একবারে ২৫ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত বাচ্চা হয়—বাচ্চাদের বড় হইতে পূর্ণ এক বছর সময় লাগে।

এইখান হইতে চলন্তচিত্রের জন্য সাপ সরবরাহ করা হইবে। আমেরিকার শিক্ষালয়সমূহেও সাপের দরকার হইলে এই স্থান হইতে লওয়া চলিবে। সাপের তেল এবং সাপের বিষ বাজারে চালান হইবে। সাপের তেল বাতের ঔষধ এবং যে-সমস্ত কারিগর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈয়ার করে, তাহাদেরও খুব কাজে লাগে। সাপের বিষ আজকাল অ্যালোপ্যাথিক ঔষধে নানা রকম কাজে লাগিতেছে। আট নয় দিন অন্তর সাপের বিষ বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে—তাহাতে সাপের কোন ক্ষতি হয় না।

সর্পাবাসের কাছে আরো অর্দ্ধ একার জমি লওয়া হইয়াছে—সেখানে ইঁদুর এবং ছুঁচো রাখা হইবে। এই-সমস্ত ইঁদুর এবং ছুঁচোর বাচ্চা হইবে—এবং তাহারা সর্পগড়ের অধিবাসীদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রথম প্রথম প্রত্যেক সপ্তাহে প্রায় দশ পনর হাজার করিয়া ইঁদুর এবং ছুঁচোর দরকার হইবে।

লস্ এঞ্জেলসের সর্পাবাস অধিকারী তাঁহার কয়েকটি প্রিয় সাপকে লইয়া খেলিতেছেন

এই সর্পাবাসে সর্পচরিত্র অধ্যয়ন করিতে খুব সুবিধা হইবে—কারণ যে-কোন সময়ে এবং অবস্থায় সাপকে পর্য্যবেক্ষণ করা চলিবে। যে ভদ্রলোক এই অভিনব কাজটি করিতেছেন—তিনি গত ৩৫ বৎসর সর্প-সম্বন্ধে নানা বিষয় অনুসন্ধান এবং পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাকে সর্প-চরিত্র-বিশারদ উপাধি দেওয়া উচিত। তাঁহার মতে র‍্যাট্‌ল্ সাপ সাপদের রাজা। ইহারা অনাবশ্যক কাহাকেও দংশন করে না। আঘাত পাইয়াও ইহারা আঘাতকারীকে পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় দেয়। অধিকাংশ সাপই দংশন করে বটে—কিন্তু তাহা ভয় পাইয়া, রাগিয়া নহে। খুব একটুতেই তাহারা ভয় পায়। বন্দী-অবস্থায় সাপ, অনেক সময়, একটুকাল পরেই মারা যায়—তাহাও অতিরিক্ত ভীতির জন্য। আমেরিকার "সিল্‌ভার রেসার" নামক সাপই কেবল বাঁশীতে পোষ মানে এবং খেলে। যে-কোন মিষ্ট বাদ্যযন্ত্রে এই সাপ মুগ্ধ হইয়া বাদকের খুব নিকটে আসে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বাদ্য বাজিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে থাকিবে।

সাপের মুখ হইতে বিষ ঝরান হইতেছে, পাত্রের নীচে একটু বিষ জমা হইয়াছে

এখন এই সর্প-বিশারদ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ইঁহার পিতার আইওয়া সহরে একটি কাম্ ছিল। এইখানে সাত বৎসর বয়সে তিনি একদিন একটা পাখীর ছানা ধরিতে গিয়া একটা গাছের কোটরে হাত ঢকাইয়া দেন। সেই সময় তাঁহার হাতে একটা সাপ জড়াইয়া ধরে। ভয় পাইয়া তিনি সাপের গলা টিপিয়া ধরেন এবং গাছ হইতে লাফ দিয়া মাটিতে পড়েন। তারপর এই সাপটিকে বাড়ীতে আনিয়া এক জায়গায় লুকাইয়া রাখেন। ক্রমে ক্রমে তিনি আরো অনেক সাপ-সংগ্রহ করেন। সাপ-সংগ্রহ তাঁহার কেমন একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইল। নূতন কোন সাপ সংগ্রহের জন্ম তিনি অনেক সময় গভীর জঙ্গলে এবং জলাভূমিতে একলা ভ্রমণ করিয়াছেন। তাহাতে অনেক সময় তাঁহার প্রাণসংশয়ও হইয়াছে। মেক্সিকোতেও অনেক জঙ্গলে তিনি মাসের পর মাস একলা

লস্ এঞ্জেলসের সর্প-বিশারদ জুনাই, ইণ্ডিয়ান সর্দ্দারের বেশ ধরিয়া, তাঁহার দুইটি প্রিয় সাপকে লইয়া সর্প-নৃত্য করিতেছেন

কাটাইয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ডেথ্ভ্যালিতে তিনি সময় সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাইয়াছেন। এই ডেথ্ভ্যালি (মরণ-ক্রোড়) পৃথিবীর সবচেয়ে গরম জায়গা। দিনের বেলায় এখানে ১৬০ ডিগ্রি গরম হয়—রাত্রে ১২০ ডিগ্রির নীচে নামে না। দিনের বেলায় মাটিতে খালি পায়ে চলা যায় না—পা পুড়িয়া ক্ষত হইয়া যায়। এখানে যে-সমস্ত খনি আছে, সেখানে কুলি-মজুরেরা প্রত্যহ দেড়শত মাইল রেল-গাড়ীতে করিয়া যাওয়া-আসা করে। এখানে কেহ বাস করিতে পারে না। এই ভীষণ স্থানেও তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ভীষণ কষ্ট সহ্য করিয়া বাস করিয়াছেন। বায়স্কোপের প্রথম যুগে তিনি তাঁহার প্রিয় একটি ২২ ফুট ৮ইঞ্চি লম্বা এবং ১৬০ পাউণ্ড ওজনের সাপ লইয়া চলন্ত-চিত্র তোলান। এই সাপটির নাম ছিল "হুগো"। খেলা দেখাইবার সময় মাঝে মাঝে হুগো তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিত। এই সময় সাপটি সামান্য একটু রাগিলে বা ভয় পাইলে তাঁহাকে একেবারে গুঁড়া করিয়া ফেলিতে পারিত। হুগোর আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইতে তাহার প্রায় ২০ মিনিট সময় লাগিত। হুগোর গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন ত্যাগ করাইতে হইত। এই ভদ্রলোক এখন হইতে এই সর্প-পালন-কার্য্যকে তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

—

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ মহাযুদ্ধ—

গত মহাযুদ্ধের মত এত বড় যুদ্ধ পৃথিবীতে কোন দিন হয় নাই—তবে হইবে কি না বলা যায় না। লক্ষ লক্ষ লোক এই যুদ্ধে মরিয়াছে এবং ক্ষতি যাহা হইয়াছে তাহার পরিমাণ করা যায় না। কিন্তু সাধারণ মানুষের অজ্ঞাতে আর-একটি মহাযুদ্ধ ঘনাইয়া আসিতেছে—এই যুদ্ধে হয় মানুষ পৃথিবীতে চিরকাল আরামে বাস করিবে আর না হয় তাহাকে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। তাহাতে তাহার মনে কষ্ট হইবে, কিন্তু উপায় নাই। কিন্তু এই মহাযুদ্ধ হইবে—মানুষে মানুষে

আলু-পোকা—বছরে কোটি কোটি টাকার আলু নষ্ট করে অর্থাৎ মাথাপিছু প্রত্যেক লোকের কাছ হইতে প্রায় একটাকা খাজনা বছরে আদায় করে। ছবিতে দেখানো হইতেছে, সারি সারি লোক যেন আলুপোকাকে খাজনা দিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে

নয়—মানুষের সহিত পোকামাকড়ের। কথাটা শুনিলে অনেকে হাসিয়া উঠিবেন। তাঁহাদের মনে হইবে—একটা মশা বা গুব্রে পোকা একটা মানুষকে আক্রমণ করিয়াছে—ইহা স্বপ্নে দেখা যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জগতে তাহা হইতেই পারে না। কিন্তু মনে করুন—৮২ কোটি মশা বা ৩৭ লাখ্ গুবরে পোকা আপনার বৈঠকখানাতে একদিন সকালে আসিয়া হাজির হইল এবং এক নিমেষে টেবিল, চেয়ার, খাট, পালঙ্ক সমস্ত ছাইয়া ফেলিল এবং সেই সঙ্গে আস্তে আস্তে আপনার এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলের নাকে এবং কানে এবং গালে কামড়াইতে সুরু করিল। অবস্থাটা যে তখন কি হইবে তাহার কল্পনা না করাই ভাল।

পৃথিবীর চারিদিক্ হইতে ক্রমশঃ নানা রকমের পোকা-মাকড়
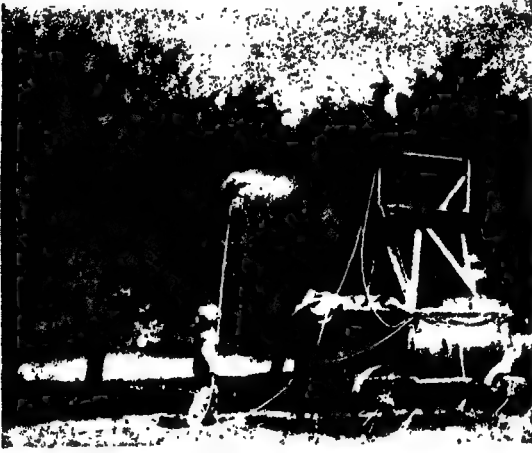
পোকাদিগের সহিত যুদ্ধে নিরত "ট্যাঙ্ক"—ইহা হইতে পাম্পের সাহায্যে ফলের গাছে ঔষধ ছড়াইয়া পোকা নষ্ট করা হয়

লোকালয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা ক্ষেতের পর ক্ষেত নষ্ট করিতেছে। এক একটা জঙ্গলকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বৃক্ষশূন্য করিয়া ফেলিতেছে। কামান বা বন্দুক দিয়া ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। ইহাদের সহিত হাতাহাতি করিবার উপায়ও নাই। পঙ্গপালের দল যখন দরিদ্র কৃষকের সমস্ত ক্ষেতের শস্য ভক্ষণ করিয়া চলিয়া যায় তখন কৃষক কেবল তাহাদের দিকে নিরাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে পারে, আর কিছুই করিতে পারে না। তুলার পোকারা গড়ে প্রত্যেক মানুষের নিকট বৎসরে প্রায় ১০৲ টাকা করিয়া খাজনা আদায় করে, অর্থাৎ ১০৲ টাকার বস্ত্র নষ্ট করে। আলুর পোকা বৎসরে মাথাপিছু প্রায় ১ টাকা আদায় করে। এইসমস্ত পোকামাকড়ের প্রাপ্য, তাহারা যেমন করিয়া পারে আদায় করে। তাহাদের দয়া নাই, মায়া নাই। তাহারা এখন তাহাদের এতদিনের অপ্রাপ্যের উপরেও লোভ করিতেছে, তাহারা সমস্ত জগৎ দখল করিতে চায়। এখন একদল বৈজ্ঞানিক এই-সমস্ত পোকামাকড়দের বিরুদ্ধে সোজাসুজি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—দেখা যাক কে হারে, কে জেতে। আমেরিকার ডাঃ এল ও হাওয়ার্ড এই পোকামাকড়দের বিরুদ্ধে তাঁহার বৈজ্ঞানিক সৈন্যদল চালনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—মানুষ নানারকম বাধাকে অতিক্রম করিয়া আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ প্রাণী। প্রাকৃতিক শক্তিকেও সে অনেক ক্ষেত্রে হারাইয়াছে—নানা প্রকার রোগকেও সে পরাজিত করিয়াছে। কিন্তু পোকা-মাকড়ের বিরুদ্ধে মানুষের যুদ্ধের ফল বড় খারাপ হইতেছে। মানুষ অপেক্ষা, পোকামাকড়রাই এই পৃথিবীতে বাস করিবার অধিক উপযুক্ত। তাহারা অতি সহজেই আত্মগোপন করিতে পারে এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে পারে। ইহারা নানাদিক্ হইতে মানুষকে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিতেছে। পোকামাকড়ের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে—তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মানুষকে আক্রমণ করিতে পারে।

অতীতকালে আমরা তাহাদিগকে শত্রুরূপে গণনার মধ্যেই আনি নাই, কারণ তখন তাহাদের সংখ্যা কম ছিল এবং লোকালয়ের বাহিরে তাহাদের যথেষ্ট খাদ্য ছিল। এখন সেই খাদ্য যত শেষ হইয়া আসিতেছে ততই ক্ষুধার্ত্ত পোকার দল লোকালয়ের নিকট আসিতেছে—এবং তাহাদের গতি এখন রোধ না করিতে পারিলে তাহারা একদিন সমস্ত লোকালয় গ্রাস করিবে। আমরা যত পোকা-মাকড়ের নাম জানি—তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। আমাদের অজ্ঞাত যে কত সহস্র শত্রু-পোকা-মাকড় আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বৈজ্ঞানিকেরা হাজার চেষ্টা করিয়াও শস্যখাদক পোকাদের ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না। তাহারা ধীরমন্থর গতিতে মানুষদের আবাসে প্রবেশ করিতেছে।

আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকদের (?) এই-সমস্ত বিষয় ভাবিবার সময় নাই। কিন্তু আমেরিকান্ বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয়ে আজকাল খুব বেশী রকম মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা ৭১৬ প্রকার অনিষ্টকারী পোকার নামের লিষ্ট্ করিয়াছেন।

এখন এই-সমস্ত পোকা মাকড়দের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি?—যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে পোকার রকমারি আছে, কাজেই যুদ্ধের পন্থা রকম-রকম করিতে হইবে। আমাদের দেশে যে-সমস্ত পোকা আছে তাহারা হয় ত আমেরিকা বা ইউরোপে নাই, কাজেই সেই-সমস্ত পোকা হত্যা করিতে হইলে আমাদের যুদ্ধের ভিন্ন প্রকার পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে; এই সমস্ত পোকার দলকে একেবারে সমূলে বিনষ্ট করিতে হইবে ও তাহা না হইলে তাহাদের সংখ্যা কোনদিনও কমাইতে পারা যাইবে না। বর্ত্তমানে মানুষের সবচেয়ে বড় বিপদ্ এই পোকামাকড়। এই নীরব যুদ্ধের কি ফল হয় বলা বড় শক্ত। মানুষের পরাজিত হইবার আশঙ্কা বড় কম নয়।

—

হিপপটেমাসের মুখের ভিতর—

ছবিতে দেখুন একজন লোক কেমন হাসিমুখে একটি সৌম্য এবং প্রিয়দর্শন হিপপটেমাসের মুখে নিজের শরীর প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্ব আছে বলিয়াই এইরূপ করা চলে।

হিপপটেমাসের মুখে চিড়িয়াখানা-রক্ষক

—

পুলিসের ইলেক্‌ট্রিক্ হাত-বাতি

অন্ধকারে ঝড়বাদলের দিনে পুলিস হাত বাড়াইলেও অনেক সময় গাড়োয়ান বা মোটরচালকেরা তাহা দেখিতে পায় না এবং তাহার জন্য সময় সময় নানা প্রকার বিপদ্ ঘটে। এখন (আমেরিকায়) একপ্রকার হাত-বাতির প্রচলন হইয়াছে। পুলিসের কোমরে পেটিতে ব্যাটারি থাকিবে এবং হাতের বাল্‌বের সহিত তাহা পাতলা তার দিয়া যুক্ত থাকিবে পুলিস হাত মেলিলেই জ্বলিয়া উঠিবে। এই আলোর বেশ জোর হইবে এবং লোক সহজেই দেখিতে পাইবে।

স্বল্পকায় মেজর ক্লারেন্স তিনজন অতিকায়কে টানিতেছেন

পুলিশের হাত-বাতি

হাতবাতির তোড়-জোড়

পায়ের ছাপ—
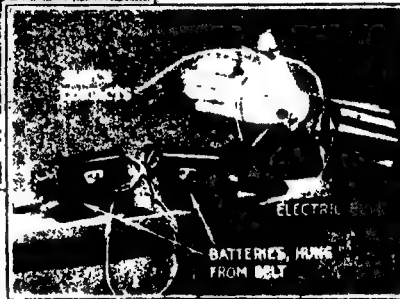
বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে শিশু-কালে যদি কাহারও পায়ের ছাপ লওয়া যায়, তবে তাহার সাহায্যে সেই শিশুকে পরে তাহার যৌবন বা বৃদ্ধ অবস্থায় পায়ের ছাপ লইয়া চিনিতে পারা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির পায়ের নীচে এমন কতকগুলি দাগ থাকে তাহা কোন দিনও নষ্ট হয় না এবং বৈজ্ঞানিকেরা তাহা বেশ সহজেই ধরিতে পারেন। আমেরিকাতে এখন শিশুদের জন্ম রেজেষ্টারি করিবার সময় পায়ের ছাপও একটি দিতে হয়—সে কাগজে পায়ের ছাপ থাকে তাহার এক পাশে শিশুর মাতারও একটি আঙ্গুলের ছাপ পড়ে। শিশু হারাইয়া গেলে বা চুরি হইলে বা অন্য কোন নামে একের শিশুকে অন্যের বলিয়া চালাইতে গেলে তাহা সহজেই ধরা পড়িবে। আজকাল অনেক হারানো ছেলে এই পায়ের ছাপের সাহায্যে উদ্ধার হইতেছে। নিউ ইয়র্কের নারী-পুলিস মিসেস্ মেরি, ই, হ্যামিল্টন এই কাজে খুব দক্ষতা দেখাইতে-ছেন। গোয়েন্দা বিভাগের কাজেও ইহা যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

১৮ ইঞ্চি মানুষ—

মেজর ক্ল্যারেন্স্ লম্বায় একহাত ওজনে সাড়ে আট সের। পৃথিবীতে এখন এত খর্ব্বাকৃতি বয়স্ক ব্যক্তি আর নাই। ইনি একটি কাঠের গাড়ীতে দণ্ডায়মান তিনটি "অতিকায়" মানুষকে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন। অতিকায়দের মধ্যে মাঝের জন সবচেয়ে ছোট—তার দৈর্ঘ্য সাতফুট চার ইঞ্চি।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

বেনো-জল

ছয়

পরদিন ঠিক্ সময়েই রতন মিঃ ঘোষের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল।

চাকর এসে রতনকে নিয়ে উপরে গেল। রতন কার্পেট-পাতা সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে দেখ্‌লে, সিঁড়ির দেয়ালের গায়ে যে-সব ছবি ঝোলানো রয়েছে, সেগুলি কেবল নামজাদা পটুয়াদের আঁকা নয়, সেগুলি যথার্থই সুনির্ব্বাচিত। প্রথমেই গৃহস্বামীর সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের এই পরিচয় পেয়ে সে বুঝ্‌লে, এখানে তার অবস্থাটা অন্ততঃ ডাঙায়-পড়া জলের মাছের মতন হবে না।

চাকর তাকে একেবারে ছাদের উপরে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে রতন অবাক্ হয়ে দেখলে, সমস্ত ছাদটাই অপূর্ব্ব এক বাগানে পরিণত হ'য়ে গেছে! কোথাও ছোট ছোট সবুজ ঘাস-জমি, কোথাও ঘাস-জমিতে মর্‌সুমী ফুল, কোথাও চমৎকার লতাকুঞ্জ, কোথাও বা আবার মাঝারি-গোছের গাছ পর্য্যন্ত রয়েছে। এ-সমস্ত উদ্ভিদ্ কাঠের পায়া-ওয়ালা দরকার-মত ছোট-বড় তক্তা বা নানা-আকারের কাঠের আধারের মধ্যে জন্মেছে, তাই ছাদের কোন ক্ষতি হয়নি বা বর্ষাকালে সেখানে জল-নিকাশেও কোন বাধা হয় না। তা ছাড়া, ছোট-বড়-মাঝারি টবেও যে কত রকমের ফুলগাছ সাজানো রয়েছে, তা আর গুণ্‌তিতে আসে না! হঠাৎ দেখ্‌লে মনে হয়, চারিদিকের এই শুক্‌নো ইটের মরু-ক্ষেত্রের মধ্যে যেন কার বিচিত্র কুহকে রামধনুকের রঙীন স্বপ্ন সজাগ হ'য়ে উঠেছে!

মিঃ ঘোষ একখানি কাঁচি হাতে ক'রে একটি ফুলগাছের অংশ-বিশেষ ছেঁটে দিচ্ছিলেন। মুখ তুলে' রতনকে দেখে বল্‌লেন, "এস রতন, এস!"

রতন তাঁকে নমস্কার ক'রে বল্‌লে, "আপনার ছাদ দেখে' আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি!"

মিঃ ঘোষ হেসে বল্‌লেন, "ছাদ দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছ? কেন? আমি কঠোর ডাক্তার, ব্যাধি আর মৃত্যু আর যন্ত্রণা নিয়েই আমার কার্‌বার, অথচ আমিই সম্রাট্-কবি সাজাহানের মত ছাতের ওপরে বাগান বানিয়েছি দেখে'ই তুমি বুঝি আশ্চর্য্য হয়েচ?"

রতন বল্‌লে, "সত্যি কথা বল্‌তে কি মিঃ ঘোষ, আপনার কাছ থেকে আমি এতটা কবিত্বের আশা করিনি।"

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "দেখ রতন, আমাদেরই মত লোকের অবসরকালে কবিত্ব উপভোগ করা উচিত। এদেশের লোক এই স্বাভাবিক সত্যটি জানে না, তাই তারা বিশ্রামের আসল সুখটুকুও ভোগ কর্‌তে পারে না। আমাদের দেশে বৈঠকখানাতেও ব'সে কেরাণী তার আপিসের গল্প করে, পণ্ডিত খালি পুঁথির কথা নিয়েই মেতে থাকেন, উকিল তার মাম্‌লার প্রসঙ্গই তোলে,—আর এইজন্যেই বাঙালীর বৈচিত্র্যহীন জীবন আরো বেশী একঘেয়ে হ'য়ে ওঠে। কার কি ব্যবসা, অবসর-কালে সেটা একেবারেই ভুলে যাওয়া উচিত, তা না হ'লে বিশ্রামের কোনই সার্থকতা থাকে না। বিশ্রামের সময়ে সম্পূর্ণ উল্টো বিষয়ের চর্চ্চা করা দরকার, নইলে মস্তিষ্ক শ্রান্ত হ'য়ে পড়্‌বে, মন বুড়িয়ে যাবে, কর্ম্মের শক্তি ক'মে আস্‌বে।"

রতন বল্‌লে, "ঠিক্ বলেচেন। কাজের সময় খেলা আর খেলার সময়ে কাজের কথা ভাব্‌লে, কাজ আর খেলা দুইই ব্যর্থ হ'য়ে যায়, আর সেই ব্যর্থতার সুযোগে অকাল বার্দ্ধক্য চুপিচুপি আমাদের মনের মধ্যে ঢুকে' পড়ে।"

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "হ্যাঁ, তাই আমি কর্ম্মক্ষেত্রে ডাক্তার, আর অবসরে ফুলের কবি। রতন, তুমি তো কবিতা লিখে' থাকো, কিন্তু বলো দেখি, আমার এই ফুলগুলির নরম বুকে, রাঙা হাসিতে আর তাজা গন্ধে তোমার কবিতার চেয়ে কি কম কবিত্ব আছে?"

রতন বল্‌লে, "ফুল হচ্চে বিশ্ব-কবির রচনা, ওর সঙ্গে আপনি আর আমার কবিতার তুলনা কর্‌বেন না!"

ছাদের মাঝখানে দুখানি বেতের আসন ছিল। মিঃ

ঘোষ তার একখানিতে রতনকে বসিয়ে, আর-একখানা আসনে নিজে ব'সে বল্লেন, "রতন, তুমি চা খাও?"

রতন বল্লে, "কখনো-সখনো। আমার অবস্থা কখনো আমাকে ও-নেশাটির বশীভূত হ'তে দেয় নি।"

—"তার মানে?"

—"মাঝে আমার অবস্থা এমন হয়েছিল যে, চা-খাওয়াকেও আমি দুর্লভ বিলাসিতা ব'লে ভাব্তুম; পেটে ভাত জুট্ত না, চা খাব কি?"

মিঃ ঘোষ বল্লেন, "অনেক গরীব নিজের গরীবানা ঢাক্বার চেষ্টা করে। কিন্তু তুমি দীনতাও দেখাও না, নিজের গরিবানাও লুকোও না, তোমার এই গুণটি আমার বড় ভালো লাগ্চে। তবে একটা কথা ভেবে আমি একটু আশ্চর্য্য হচ্চি। তোমার গান বা কবিতা বা ছবি তোমাকে পয়সা দিতে পারে না বটে, কিন্তু তুমি তো লেখাপড়া জানো, আপিসে একটি ছোটখাটো কেরাণীগিরিও তোমার জোটেনি কেন?"

—"একসময়ে কেরাণীগিরি করতুম। তার পর সে চাকরি যায়, আর নতুন কাজ জোটেনি।"

—"মুরুব্বির অভাবে?"

—"মুরুব্বির অভাব তো ছিলই, তার ওপরে আরো এক কারণ ছিল। শেষ যে-আপিসে কাজের চেষ্টায় যাই, সেখানকার বড়-সাহেবের সঙ্গে আমার কথায় কথায় বচসা হয়। সাহেব আমাকে আর বাঙালী জাত্কে সম্বোধন ক'রে কতকগুলো কুৎসিত গালাগাল দেয়, আমিও তার মুখের মত উত্তর দিই। তাইতেই ক্ষেপে' গিয়ে সাহেব রুল দিয়ে আমাকে মারে, আমিও তাকে তুলে' ধ'রে ছুঁড়ে ফেলে দি, সে একেবারে সিঁড়ির রেলিং টপ্কে দোতালা থেকে একতালায় গিয়ে প'ড়ে অজ্ঞান হ'য়ে যায়। তাই নিয়ে পুলিস-হাঙ্গামা হয়। তার পর আমি কোন গতিকে খালাস পেলুম বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে এমন বিখ্যাত হ'য়ে গেলুম যে, আর কোন আপিসে আমার চাক্রি জুটল না।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বছর-দেড়েক আগে খবরের কাগজে আমি এই ঘটনাটা পড়েছিলুম বটে। তুমিই কি সেই লোক? যে সাহেবের কথা বল্লে, তার নাম কি উড্ওয়ার্ড?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"উড্ওয়ার্ডকে আমি চিনি। তার আকার যে তোমার দ্বিগুণ, তাকে তুমি কি ক'রে ছুঁড়ে' ফেলে দিয়েছিলে? তোমার চেহারা দেখ্লে তো বোঝা যায় না যে, তোমার গায়ে এত জোর আছে!"

—"কিন্তু আমি রোজ ব্যায়াম করি।"

—"বটে, বটে! রতন, একটি বিষয়ে আমার বড়ই কৌতূহল হচ্চে!"

—"কি, বলুন।"

—"তোমার জামা খুলে' ফেল, আমি তোমার দেহটি একবার দেখ্তে চাই!"

রতন লজ্জিতভাবে বল্লে, "না, না, থাক্—"

—"এতে আর লজ্জা কি রতন? বিধাতার দান সুন্দর দেহ, বাঙ্লা দেশে যা দুর্লভ, তা যে একটি মস্ত দেখ্বার জিনিষ!"

অগত্যা রতন আস্তে আস্তে উঠে' দাঁড়িয়ে নিজের পাঞ্জাবী আর গেঞ্জিটা খুলে' ফেল্লে।

মিঃ ঘোষ দেখ্লেন, রতনের দেহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ, আর বলবান্ লোকের যা প্রধান লক্ষণ—তার দুই কাঁধের মাংসপেশীও খুব পরিপুষ্ট, কিন্তু তা ছাড়া তার শরীরে অসাধারণ শক্তির আর কোন স্পষ্ট ছাপ নেই।

মিঃ ঘোষ বল্লেন, "রতন, তুমি দেহকে শক্ত কর তো!"

রতন হাসি-হাসি মুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে বুক ও দেহের সমস্ত মাংসপেশী ফুলিয়ে দাঁড়াল। চকিতে কি পরিবর্ত্তন! রতন যেন আর সে মানুষ নয়—তার সমস্ত দেহটাই হঠাৎ যেন দুগুণ বেড়ে উঠ্ল, গলা, কাঁধ, বাহু, বুক—ও বিশেষ ক'রে পেটের উপরে লোহার মতন দেখ্তে, শক্ত, ডুমো ডুমো, দৃঢ়বদ্ধ, অসংখ্য পেশী আত্মপ্রকাশ করলে! রতনের পেটের উপর হাত দিয়ে মিঃ ঘোষের মনে হ'ল, সে-পেটের উপরে ছুঁড়লে থান-ইটও যেন ভেঙে টুক্রো টুক্রো হ'য়ে যাবে! এ যেন গ্রীক্-ভাস্করের গড়া অ্যাপোলোর মূর্ত্তি—হাল্কা ছিপ্ছিপে, কিন্তু সরল

সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্যে পরম রমণীয়! কতটা সাধনা থাকলে যে মানুষ এমনভাবে দেহকে গ'ড়ে তুল্‌তে পারে, শরীর-তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ মিঃ ঘোষের তা বুঝ্‌তে আর বিলম্ব হ'ল না!

মিঃ ঘোষ উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন, "চমৎকার!"

রতন আবার গায়ে জামা পর্‌তে লাগ্‌ল।

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "রতন, শুনেচি দারিদ্র্যের জন্যে তুমি একদিন আত্মহত্যা কর্‌তে গিয়েছিলে। কিন্তু এই কি দারিদ্র্যের মূর্ত্তি? রাজভোগেও যে এমন শরীর তৈরি হয় না!"

রতন বল্‌লে, "মিঃ ঘোষ, শরীর তৈরির জন্যে রাজভোগ চাই, এটা হচ্ছে এদেশী পালোয়ানদের মস্ত কুসংস্কার। অধিকাংশ কুলি-মুটের দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌বেন, রাজভোগে-পুষ্ট ধনীদের চেয়ে তাদের দেহ কতটা তৈরি, সুগঠিত আর পেশীবদ্ধ! কেবলমাত্র শারীরিক পরিশ্রমের গুণেই তাদের দেহ হয়েচে অমনধারা, অথচ তারা নিয়মিত, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে ব্যায়াম-হিসাবে কিছুই করে না, আর বেশীর-ভাগই খায় খালি ভাত আর নুন—বড়-জোর সেই সঙ্গে আলু-ভাতে বা অম্‌নিতরো একটা-কিছু। বাঙালীর দুর্ব্বলতার কারণ বলা হয় দারিদ্র্য। আমি তা মানি না। আসল কারণ, ব্যায়ামে অনিচ্ছা। সাধারণ গৃহস্থ-বাঙালী রোজ যা খায়, দেহ-গঠনের পক্ষে তাই যথেষ্ট। দামী খাবার কি অতিরিক্ত আহার শরীর পুষ্টির কারণ নয়।"

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "তোমাকে দেখে আমারও তাই মনে হচ্চে।...কিন্তু কথায় কথায় ভুলে যাচ্চি, রতন, আজ কি তোমার চা খেতে আপত্তি আছে?"

রতন বল্‌লে, "আমি নিজের পয়সায় চা খাই না। আপনি যখন খাওয়াতে চাইচেন, তখন আমার আপত্তি থাক্‌বার কোনই কারণ নেই।"

মিঃ ঘোষ ডাক্‌লেন, "পূর্ণিমা!"

ছাদের এক কোণের ঘর থেকে মৃদুস্বরে উত্তর এল—"যাই বাবা!"

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "অম্‌নি এলে হবে না মা, বেয়ারাকে—না, বেয়ারা নয়, তুমি নিজেই আমাদের দুজনের জন্যে চা নিয়ে এস!"

দুজনে খানিকক্ষণ কোন কথা হ'ল না। স্বল্পভাষী মিঃ ঘোষকে রতন যদি আগে থেকে চিন্‌ত তবে বুঝ্‌তে পার্‌ত যে, তাকে মিঃ ঘোষের বড়ই ভাল লেগেছে, নইলে তার সঙ্গে তিনি আজ কখনই এত বেশী কথা কইতেন না। বাড়ীর বাইরে মিঃ ঘোষ মুখ খোলেন খালি বিনয়-বাবুর কাছে, তাও তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে নয়।

একটু পরেই ছাদের ঘর থেকে চায়ের 'ট্রে' হাতে ক'রে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল, তার বয়স সতেরো আঠারোর বেশী হবে না।

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "রতন, এই আমার মেয়ে পূর্ণিমা—এ-ছাড়া সংসারে আমার আর কেউ নেই। পূর্ণিমা ইনি হচ্চেন রতনবাবু—আমার একটি নবীন বন্ধু। এঁর গায়ে যেমন, মনেও তেম্‌নি জোর। ইনি গান গাইতে পারেন, কবিতা লিখ্‌তে পারেন, ছবি আঁক্‌তে পারেন, আর—"

পূর্ণিমা হেসে বল্‌লে, "আর,—কি বাবা? থাম্‌লে কেন, আর কি পারেন?"

—"আর, কিছু বেচাল দেখ্‌লে আমাদের মুখের ওপরেই ইনি স্পষ্ট দু-কথা শুনিয়ে দিতেও পারেন!"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "তা হ'লে এরি মধ্যে আমার রীতিমত বেচাল হ'য়ে গেছে বাবা!"

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "কেন, এরি মধ্যে আবার কি বেচাল হ'য়ে গেল? গরম-জলে চা দিতে ভুলে গেছিস্ বুঝি?"

পূর্ণিমা ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "না, তা কেন, 'ট্রে' নিয়ে আমার হাত জোড়া, তুমি পরিচয় করিয়ে দিলে, রতন-বাবু আমাকে নমস্কার কর্‌লেন, কিন্তু আমি ওঁকে নমস্কার কর্‌তে পার্‌চি না তো!"

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "তাতে কি হয়েচে বাছা, রতনকে মন থেকে নমস্কার কর্। বাইরে, কপালে হাত ছুঁইয়ে যে লোক-দেখানো নমস্কার, সে তো আমরা ভদ্রতার খাতিরে শত্রুকেও ক'রে থাকি! তার মূল্য কি?"

পূর্ণিমা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "বেশ, আমি মন থেকেই নমস্কার কর্‌চি। কেমন রতন-বাবু, আপনি

বাবার ব্যবস্থা মান্‌লেন, না, মুখের ওপরে আমাকে স্পষ্ট দু-কথা শুনিয়ে দেবেন ?"

রতন সলজ্জ মুখে ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে, "না, না, মান্‌লুম বৈকি, মান্‌লুম বৈকি ! পূর্ণিমা দেবী, আপনার নমস্কার আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেচি ! আর, আমার স্পষ্ট কথার সম্বন্ধে আপনি যা শুন্‌লেন, ও-সব হচ্চে মিঃ ঘোষের অত্যুক্তি।"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "না, অত্যুক্তি নয়; কালকের ব্যাপারের কথা আমি যে বাবার মুখে সব শুনেচি। কিন্তু যাক্ সে কথা, চা এদিকে জুড়িয়ে গেল !"— এই ব'লে সে 'ট্রে'-খানা রেখে, একটা পেয়ালায় চা ঢেলে রতনকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "রতনবাবু, দুধ আর চিনি কতটা দেব ?"

রতন বল্‌লে, "ও-বিষয়ে আমি নির্ব্বিকার, আমার কোন মত নেই। চা বড়-একটা খাই না, চায়ের আদব-কায়দাও জানি না—যেমন দেবেন, তাইতেই আমি রাজি !"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "বুঝেচি। আপনাকে তা হ'লে দুধ আর চিনি বেশী ক'রে দিতে হবে।"

… …চা-পান শেষ হ'ল। রতন উঠে' দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "মিঃ ঘোষ, আজ তা'হ'লে আমাকে বিদায় দিন।"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "সে কি, এরি মধ্যে ! এখনো যে আপনার গান শোনা হয়নি !"

রতন বল্‌লে, "আমার গান যদি নিতান্তই শোন্‌বার যোগ্য ব'লে মনে করেন, তবে আর-একদিন এসে সে পরীক্ষা দেওয়া যাবে। বিনয়-বাবুর বাড়ীতে আমার একটি ছাত্রী এখন আমার অপেক্ষায় আছেন, আজ আমাকে দয়া ক'রে রেহাই দিন !"

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "আচ্ছা, আস্‌চে রবিবারে আমার এখানে তোমার রাত্রের-খাওয়ার নিমন্ত্রণ রইল। কেমন, আস্‌বে তো ? না, তোমার ঠিকানায় গিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে আস্‌ব ?"

রতন বল্‌লে, "আমি আপনার বাড়ীতে ব'সেই নিমন্ত্রণ নিতে পারি—কিন্তু এক সর্ত্তে। আমি আপনাকে আর 'মিঃ ঘোষ' ব'লে ডাক্‌তে পার্‌ব না—আমি চাই খাঁটি বাঙালী নামে আপনাকে ডাক্‌তে।"

মিঃ ঘোষ সহাস্যে বল্‌লেন, "বেশ তো, আমার তাতে একটুও অমত নেই।"

—"কিন্তু, দুখের বিষয়, আমি আপনার নাম জানি না !"

—"আমার নাম আনন্দপ্রসাদ ঘোষ।"

—"হ্যাঁ, আনন্দ-বাবু নামে ডাক্‌তে পেলে বাস্তবিকই আমার মনে আনন্দ হবে ! আপনাদের ঐ মিঃ অমুক, মিঃ তমুক শুন্‌লে, কেন জানি না, আমার গায়ে যেন জ্বর আসে !"

সাত

সন্তোষ ঘরে ঢুকে' বল্‌লে, "সুমি, রতন কোথায় ?"

সুমিত্রা আল্‌মারির বইগুলো গোছাচ্ছিল। মুখ তুলে' বিরক্ত স্বরে বল্‌লে, "বল রতন-বাবু।"

সন্তোষ একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্‌লে, "বেশ, ধর্ তাই।"

সুমিত্রা বল্‌লে, "তিনি এখনো আসেননি। হঠাৎ তাঁর খোঁজ কর্‌চ কেন ?"

সন্তোষ বল্‌লে, "তার সঙ্গে আজ আমার একটু বোঝাপড়া আছে।"

সুমিত্রা বল্‌লে, "তার মানে ?"

সন্তোষ বল্‌লে, "সে আমাদের কুমার বাহাদুরকে অপমান করেচে।

—"কবে ?"

—"কাল।"

—"ওঃ, সে কথা আমি শুনেচি। বাবা কাল মা'র কাছে রতন-বাবুর সৎসাহসের সুখ্যাতি কর্‌ছিলেন।"

—"সুখ্যাতি কর্‌ছিলেন ?"

—"হ্যাঁ।"

—"দেখ্‌চি ও-লোকটাকে নিয়ে বাড়ীসুদ্ধ সকলের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।"

—"হ্যাঁ, কেবল তুমি ছাড়া। তোমার ও-মাথা খারাপ হবার জিনিষ নয়।"

সন্তোষ এ ব্যঙ্গ গায়ে না মেখেই বল্‌লে, "একটা পথ-থেকে-তুলে-আনা কাঙালকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি কেন ? আজ যদি আমি তাকে পেতুম, তা-হ'লে নিশ্চয়ই এমন গোটাকতক কথা শুনিয়ে দিতুম, যা শুন্‌লে সুখ্যাতি ব'লে মনে হ'ত না।"

—"রতন-বাবুর ওপরে তোমার অতটা জোর কিসের বল দেখি ?"

—"সে আমাদের চাকর। চাকর, চাকরের মতন থাক্‌বে—তার মুখে অত লম্বা লম্বা কথা মানায় না।"

এমন সময়ে কুমার বাহাদুর ঘরের ভিতরে প্রবেশ কর্‌লেন—পিছনে পিছনে সুনীতি। কুমার বাহাদুর ঘরে ঢুকেই বল্‌লেন, "নিশ্চয়! আমিও তোমার কথায় সায় দি সন্তোষ! কালকের কথা হচ্ছে বুঝি ?"

সন্তোষ বল্‌লে, "হ্যাঁ। সে অসভ্যটা এখনো আসেনি।"

কুমার বাহাদুর বল্‌লেন, "বাস্তবিক, কাল আমার ধৈর্য্যশক্তি দেখে' আমি নিজেই অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলুম। একঘর লোকের সাম্‌নে একটা মাইনে-করা চাকর অত বড় অপমানটা—"

কুমার বাহাদুরকে বাধা দিয়ে, মুখ রাঙা ক'রে সুমিত্রা বল্‌লে, "দেখুন, আপনি যাঁর কথা বল্‌চেন, তিনি আমার শিক্ষক আর ভদ্রলোকের ছেলে। দয়া ক'রে এটুকু মনে রেখে কথা কইবেন।"

কুমার বাহাদুর সবিস্ময়ে অল্পক্ষণ সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর সুনীতির দিকে ফিরে বল্‌লেন, "আপনিও এই দলে নাকি ?"

সুনীতি বল্‌লে, "আমি দলাদলিতে নেই। আমি কেবল শ্রোতা।"

সন্তোষ ক্ষাপ্পা হ'য়ে বল্‌লে, "সুমি, তুই কি আমাদের চেয়ে সেই অভদ্র ছোটলোকটাকে বড় মনে করিস্ ? বেশ, তা হ'লে তাকে ব'লে দিস্ যে—"

সুমিত্রাও জ্ব'লে উঠে বল্‌লে, "রতনবাবুকে যা বল্‌বার, তুমিই বোলো। আমার যা বল্‌বার, আমি তা এখুনি বাবার কাছে গিয়ে বল্‌চি"—ব'লেই সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

সুনীতি তাড়াতাড়ি সুমিত্রার হাত ধ'রে বল্‌লে, "লক্ষ্মীটি, ঠাণ্ডা হ! বাবার কাছে আর এসব কথা বল্‌তে হবে না। দাদা, তুমি কি পাগল হ'য়ে গেছ ? তিলকে তাল ক'রে কেন মিথ্যে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলচ ?"

ঠিক এই মুহূর্ত্তেই রতন এসে উপস্থিত হ'ল।

কিন্তু বাবার নামে সন্তোষ তখন নরম হ'য়ে পড়েছে। সে আর কোন কথা না ব'লে তখনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে গেলেন কুমার বাহাদুরও। রতন হাসিমুখে তাঁদের নমস্কার কর্‌লে, কিন্তু তাঁরা যেন দেখেও দেখ্‌লেন না।

এটা সুমিত্রারও চোখ এড়াল না। এই অপ্রিয় ব্যাপারটাকে ঢাকা দেবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি সহজ গলায় বল্‌লে, "রতন-বাবু, আজ আপনার এত দেরি যে ?"

রতন সে কথার জবাব না দিয়ে আহত স্বরে বল্‌লে, "গরীবের নমস্কারও নগণ্য! বেশ, আমারও শিক্ষা হ'ল, এবার থেকে ধনীরা আগে নমস্কার না কর্‌লে আমিও কপালে হাত তুলব না!"

সুনীতি বল্‌লে, "আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না রতন-বাবু! ওঁরা নিশ্চয়ই আপনার নমস্কার দেখ্‌তে পাননি!"

রতন তেম্‌নি স্বরেই বল্‌লে, "দেখ্‌তে নিশ্চয়ই পেয়েচেন, কিন্তু গরীবকে প্রতি-নমস্কার করাটা ওঁদের মতে অনাবশ্যক।"

সুনীতি বল্‌লে, "দেখুন রতন-বাবু, এত ছোট ব্যাপার নিয়ে মন খারাপ কর্‌লে চল্‌বে কেন ?"

—"সুনীতি দেবী, ছোট ব্যাপার মাত্রই সামান্য নয়! সময়ে সময়ে ছোট ব্যাপারই মনকে বেশী রকম দোলা দেয়।"

—"আচ্ছা, মান্‌লুম। কিন্তু আজ যদি কোন গরীব লোক অন্যমনস্ক হ'য়ে আপনাকে প্রতি-নমস্কার কর্‌তে ভুলে যেত, তা হ'লে—"

—"তা-হ'লে খুসিও হ'তুম না বিশেষ, তবে এতটা দুঃখিতও হ'তুম না।"

—"কেন ?"

—"কারণ সে-ক্ষেত্রে নমস্কার না করার ভেতরে

আমাকে গরীব ব'লে হেয় জ্ঞান করবার ভাবটা লুকানো থাকত না। গরীবরা আর যাইই হোক্, আমারই স্বজাতি।"

—"আর আমরা আপনার পর? তা হ'লে আপনিও তো আমাদের কম ঘৃণা করেন না রতন-বাবু!"

—"ঘৃণার বিনিময়ে ঘৃণা পাওয়াই স্বাভাবিক।"

—"তা হ'লে আমার বাবাও আপনার ঘৃণার পাত্র?"

—"দেখুন, আলোচনাটা আপনি বড় ছোট গণ্ডীর ভেতরে এনে ফেলেচেন। ধনী মাত্রকেই আমি যে ঘৃণা করি, আপনার এ সন্দেহ অমূলক। অনেক ধনী আছেন, যাঁদের ধনের গর্ব্ব নেই। যেমন আপনার বাবা। আমার কাছে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র।"

—"আচ্ছা, আমার বাবা কোনদিন আপনাকে প্রতি-নমস্কার করতে ভুলে গেলেও তো আপনি ভাবতে পারেন, গরীব ব'লে তিনি আপনাকে অবহেলা করেচেন!'

—"না, তা ভাবব না। আপনার বাবা অচেনা হ'লে তাই ভাবতুম বটে, কিন্তু তাঁর স্বভাবের আসল রূপটি যে আমি আগেই দেখতে পেয়েচি!"

—"তবেই দেখুন, আপনার ভ্রমও হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও আপনি ভ্রমে পড়েচেন ব'লেই মনে করুন।'

—"অগত্যা। আপনি যে-রকম সুকৌশলে আমাকে কোণঠাসা করলেন, তাতে সত্যকেও মিথ্যা না ব'লে আমার আর উপায় নেই। ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে সাবধান হ'য়ে কথা কইব। ওঃ, কোন ভালো ব্যারিষ্টারও আমাকে এতটা কাবু করতে পারত না,—ধন্য আপনি!"

—"আচ্ছা, আপানার এই মৌখিক 'সার্টিফিকেট' নিয়ে আপাতত আমি বিদায় হচ্চি"—এই ব'লে সুনীতি হাসতে হাসতে চ'লে গেল।

এতক্ষণে সুমিত্রা মুখ খুললে। রতনের কাছে এসে মিনতি-মাখানো স্বরে বললে, "দোহাই রতন-বাবু, যতদিন না আমার ছবি-আঁকা শেখা শেষ হয়, অন্তত ততদিন পর্য্যন্ত আপনি যেন দয়া ক'রে আমাকে ধনীর মেয়ে ব'লে ঘৃণা করবেন না!"

রতন বললে, "ও, বড়'র পরে এইবার বুঝি ছোট'র পালা?"

সুমিত্রা বললে, "নিশ্চয়ই। আপনিই তো এইমাত্র বললেন—ছোট মাত্রই সামান্য নয়!"

—"বেশ, আমি আগেই হার মানচি।"

—"তা হলে আর কথাই নেই।... ...দেখুন দেখি, এ পদ্মটা কেমন আঁকা হয়েচে?"

রতন দেখে হেসে বললে, "এটা কি পদ্ম?"

সুমিত্রা গম্ভীর মুখে বললে, "আমার তো তাই বিশ্বাস।

—"আমার বিশ্বাস অন্যরকম। এটা কিম্ভূতকিমাকার।"

—"ধরুন তাই। কিন্তু কেমন আঁকা হয়েচে?"

—"কিম্ভূতকিমাকারের আর ভালো-মন্দ কি? আপনি কি সত্যই পদ্ম আঁকবার চেষ্টা করেচেন?"

—"কি যে আঁকবার চেষ্টা করেছিলুম তা জানি না। তবে এঁকে যা দাঁড়িয়েচে, তারই নাম দিয়েচি পদ্ম।"

—"তা বেশ করেচেন। কিন্তু আমি আপনাকে আজ গেলাস আঁকতে ব'লে গিয়েছিলুম, গেলাস এঁকেচেন কি?"

—"না রতন-বাবু, গেলাস আঁকতে ভালো লাগল না!"

—"আপনি এতটা স্বাধীন হ'লে তো আমার এখানে মাষ্টারি করা পোষাবে না সুমিত্রা দেবী! তা হ'লে আমার মনে হবে, আমি আপনার বাবাকে ঠকিয়ে মাইনে নিচ্চি!

সুমিত্রা কাচুমাচু মুখে বললে, "আমাকে মাপ করুন। আমি এখুনি গেলাস আঁকচি!" এই ব'লে সে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসল। কিন্তু খানিকক্ষণ চেষ্টা ক'রেই ব'ললে "আজকে আমাকে ছুটি দিন। আমার আঁকতে মন বসচে না।"

—"তা হ'লে আজ আমিও যাই।"

—"যাবেন কেন, বসুন না,—একটু গল্পস্বল্প করি"

—"গল্প করবার জন্যে আপনার বাবা আমাকে রাখেন নি।"

—"কেন, আপনি কি আমাদের বন্ধু নন?"

—"না। বন্ধু হ'লে আপনাদের কাছ থেকে মাইনে নিতুম না। আমি আপনাদের চাকর।"

সুমিত্রা মুখ ভার ক'রে বললে, "আপনি বড় শক্ত

শক্ত কথা বলেন রতন-বাবু! কবিদের কথা এতটা নিষ্ঠুর হওয়া উচিত নয়!"

রতন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে চুপ ক'রে রইল। মনে যা আসে, মুখে তাই ব'লে ফেলা তার চিরকেলে স্বভাব—এজন্যে অনেক বারই সে মুস্কিলে পড়েছে, তবু এ-স্বভাব শুধ্‌রাতে পারে-নি। ছুনিয়ার নিয়ম হচ্ছে, মুখের কথায় মনকে চাপা দেওয়া এবং এই লুকোচুরির খেলা যে যত ভালো ক'রে খেলতে পারে, পৃথিবীতে সে ততই ভালো লোক ব'লে নাম কেনে। রতন তা জান্‌ত, কিন্তু তা করতে পার্‌ত না।

সুমিত্রা বল্‌লে, "আপনাকে আমি একটি কথা বল্‌তে চাই। আপনি কুমার বাহাদুরের সঙ্গে মিশ্‌বেন না!"

রতন কৌতূহলী হ'য়ে বল্‌লে, "কেন বলুন দেখি?"

—"আপনার সঙ্গে তাঁর মোটেই বন্‌বে না।"

—"আপনি তা কি-ক'রে বুঝ্‌লেন?"

—"আমি জানি। যাদের টাকা নেই, তিনি তাদের ছোটলোক মনে করেন। তার ওপরে আপনি কাল কি-সব বলেছিলেন, তাই নিয়ে তিনি মা আর দাদার কাছে আপনার নামে লাগিয়েছেন।"

—"কি লাগিয়েছেন?"

সুমিত্রা একটু ইতস্তত ক'রে তার-পর বল্‌লে, "আপনি নাকি কুমার বাহাদুর আর আমার দাদামশাইকে গালাগাল দিয়েচেন।"

রতন উত্তেজিত হ'য়ে বল্‌লে, "গালাগাল দিয়েচি কি-রকম? আমি তো খালি বলেচি—এই ছু-দলের কারুর দ্বারাই দেশের একতিল উপকারের সম্ভাবনা নেই!"

—"কুমার বাহাদুর কিন্তু কথাগুলো এমন ঘুরিয়ে বলেছিলেন যে, মা ভারি রেগে উঠেছিলেন। তার-পর বাবা এসে সব বুঝিয়ে বল্‌বার পর মা একটু ঠাণ্ডা হয়েচেন। দাদা কিন্তু এখনো চ'টে আছেন। রাগের মাথায় দাদা যদি আপনাকে কোন অন্যায় কথা ব'লে ফেলেন, তা হ'লে আপনি যেন কিছু মনে করবেন না! দাদা ঐ-রকম মানুষ—ভারি কান-পাৎলা!"

রতন স্তব্ধ হ'য়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল। এরিমধ্যে তাকে নিয়ে এত কাণ্ড হ'য়ে গেছে! এইজন্যেই সে আজ প্রতি-নমস্কার থেকেও বঞ্চিত হয়েছে! সুমিত্রা বালিকা, তাই সরল মনেই ভিতরের কথা তাকে ব'লে ফেল্‌লে!… রতন বেশ বুঝ্‌লে, এই পরম-আধুনিক ধনী-পরিবারের সঙ্গে বনিবনাও ক'রে বেশীদিন টিঁকে থাকা তার পক্ষে সহজ হবে না! সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, "এই কুমার বাহাদুরের সঙ্গে আপনাদের কিসের সম্পর্ক?"

সুমিত্রা বল্‌লে, "মা তাঁকে জামাই করতে চান।"

—"আপনার দিদির সঙ্গে বুঝি তাঁর বিয়ে হবে?"

—"এইরকম তো কথা হচ্চে। আমি কিন্তু ওঁকে ছু-চোখে দেখ্‌তে পারি না!"

—"কেন?"

—"কেন তা জানি না। আমার ভালো লাগে না।"

হঠাৎ দরজার কাছ থেকে একটা বিরক্ত-কণ্ঠস্বর এল—"সুমিত্রা!"

ছুজনে মুখ তুলে দেখ্‌লে, দরজার কাছে হরিহর দাঁড়িয়ে আছেন।

হরিহর রতনের দিকে একবার অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে', গম্ভীরস্বরে বল্‌লেন, "সুমিত্রা! চলে এস!"

সকৌতুকে রতনের দিকে একবার তাকিয়ে, মুখ-টেপা হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে সুমিত্রা তার দাদামশাইয়ের কাছে উঠে গেল। হরিহর তার হাত ধ'রে অন্দরের দিকে যেতে যেতে বল্‌লেন, "দেখ, যে ক'টা দিন এই সেকেলে-বুড়োটা তোমাদের বাড়ীতে আছে, চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্তত সে ক'টা দিনও তোমরা যার-তার সঙ্গে মিশো না! আমি এ কিছুতেই সইতে পারি না—এ-সব চোখে-দেখাও পাপ!"

হরিহর এমন গলা চড়িয়ে নাত্‌নীর উপরে উপদেশ বৃষ্টি করলেন যে রতনও তা শুনতে পেলে। নিজের মনেই সে বল্‌লে—"আচ্ছা মুস্কিলেই পড়া গেল যা-হোক্! এই দোটানার মুখে প'ড়ে এখন প্রাণ যে যায়!"

ক্রমশঃ

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

"তোষলা বা তুষু পূজা"

গত বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রী যতীন্দ্রনাথ জানা মহাশয় 'তোষলা বা তুষু পূজা'-শীর্ষক আলোচনায় লিখিয়াছেন—"মেদিনীপুরে যমপুকুরব্রত প্রচলিত নাই ; এবং মেদিনীপুরের কোথাও 'ইউতি বা সাঁজুই কিংবা তোষলা' পূজার প্রচলন নাই।" জানা মহাশয়ের উক্ত সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কারণ আজিও মেদিনীপুরে 'যমপুকুর' ব্রত প্রচলিত আছে। সাঁজুই বা সিঁজুতি ও তোষলা পূজাও হইয়া থাকে। আজিও গ্রামে গ্রামে এইসকল ব্রত উদ্‌যাপিত হয়, ও বালিকাদের মুখের মধুর বোলে ছড়াসকল আবৃত্তি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন 'পুণ্যি পুকুর,' 'হরিচরণ', 'কুল কুলতি' ব্রতও হইয়া থাকে। অনাবশ্যক বিবেচনায় এইসকল ব্রতের ছড়াগুলি উদ্ধৃত করিলাম না।

শ্রী হরিসাধন পাইন

—

জাতীয় একতা ও স্যার্ সৈয়দ আহমদ

বিগত শতাব্দীর মুস্লিম ভারতের অবিসম্বাদিত নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ-সম্বন্ধে অনেকেই নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। গত মাঘ মাসের "প্রবাসীতে" "জাতীয় মহাসমিতি ও অন্যান্য সভা" শীর্ষক প্রবন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গের শ্রদ্ধেয় লেখক লিখিয়াছেন : "...বহুসংখ্যক মানুষ আত্মচেতনাবান্ হইলেও প্রত্যেকেই সার্ব্বজনিক সাধারণ দুঃখ, দুর্দ্দশা বা অধিকারহীনতা সম্বন্ধে সমান বেদনা অনুভব করেন না। স্যার্ সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে মুসলমানেরা বহু বৎসর কংগ্রেসে যোগ দেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও কল্যাণের উপায় ভারতবর্ষের অন্য অধিবাসীদের হইতে ভিন্ন মনে করিয়াছিলেন..." এতৎ-পাঠে অনেকে মনে করিতে পারেন সৈয়দ আহমদ বড়ই সাম্প্রদায়িক ছিলেন, যুগসঞ্চিত জ্ঞান বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কিন্তু প্রকৃত বিষয় তাহা নহে। তিনি যে মুসলমানের কংগ্রেসে যাওয়ার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মূলে রহিয়াছে সংরক্ষণ-নীতি। তিনি ও তদানীন্তন মুসলমান জননায়কগণ অপেক্ষাকৃত অবনত মুসলমান সমাজকে অন্যান্য শক্তিশালী সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই কিছু কালের নিমিত্ত (কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়া) গঠন-নীতি অবলম্বন প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন ; নচেৎ স্যার সৈয়দ আহমদ কখনও জাতীয় একতার বিরোধী ছিলেন না ; তিনি কখনও মুসলমানের কল্যাণের উপায় অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন মনে করিতেন না। তিনি জাতীয় কল্যাণ ও একতা সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ Hindoo পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন :—

"হিন্দু ও মুসলমানগণ একাত্মা ও একপ্রাণ হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন এবং মিলিতভাবে কার্য্য করিবেন। কারণ একতাবদ্ধ থাকিলে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে পারিবেন। নতুবা একের কর্ম্মফল অপরের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়া উভয়কেই ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে। হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা কি ভারতের সাম্রাজ্যের অধিবাসী? তোমরা কি একই ভূমিতে বাস কর না? একই দেশে জন্মগ্রহণ কর নাই? একই ভূমিতে দগ্ধ বা প্রোথিত হইবে না? তোমরা কি একই ভূপৃষ্ঠে বিচরণ কর না? একই দেশজননী কি তোমা-দিগকে প্রতিপালন করিতেছেন না? স্মরণ রাখিও "হিন্দু" ও "মুসলমান" এই দুইটি শব্দ কেবল ধর্ম্মগত পার্থক্য প্রকাশ করে মাত্র। নচেৎ ভারতের অধিবাসী মাত্রই এক অভিন্ন জাতি বা Nationএর অন্তর্ভুক্ত জাতি বলিতে আমি হিন্দু মুসলমান এবং ভারতের অন্যান্য অধিবাসি-বৃন্দ সকলকেই বুঝি ; কারণ Nation বা জাতি শব্দে ঐ অর্থই প্রকাশ করে। 'আমরা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী' তাহা আমার পক্ষে প্রণিধান-যোগ্য নহে। আমার অনুধ্যানের বিষয় এই যে—আমরা একই দেশের অধিবাসী—একই রাজশক্তির প্রজা—আমাদের মঙ্গলের মূলে রহিয়াছে একই শক্তি—আমরা করাল-দুর্ভিক্ষ-যাতনা ভোগ করি একই যোগে। সুতরাং তুল্যভোগ্য দেশের কল্যাণার্থ মিলিত হওয়া প্রত্যেকের সকলের উচিত। এসকল কারণে আমি ভারতের যাবতীয় জনসমাজকে 'হিন্দু' এই একই নামে অভিহিত করিয়া থাকি—এতদ্দ্বারা আমি বুঝাইতে চাই 'আমরা সকলেই হিন্দুস্থানের অধিবাসী।'

এতাদৃশ উদার অভিমত স্যার সৈয়দের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কোন জননায়কই প্রকাশ করেন নাই।

বাহার

—

"আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের প্রয়োজন"

উক্ত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস মহাশয়ের বক্তব্য বিষয় জ্ঞাত হ'লাম। দেশে চাষবাসের যে রকম ঢিলে ব্যাপার দাঁড়িয়েছে তাতে এ রকম উদ্যোগের বিশেষ প্রয়োজন। এবিষয়ে সাহায্যও বোধ হয় দেশবাসীদের কাছ থেকে কম পাওয়া যাবে না—কারণ এসময়ে একটা জাগরণের সাড়া পড়েছে। তবে সাহায্যকারীরা সম্ভবতঃ জানতে ইচ্ছুক হবেন, কিভাবে তাঁদের টাকাটা ব্যবহৃত হবে। সমবায়টি সাধারণের না ব্যক্তিগত? সাধারণের যে টাকাটা এই আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনে নিযুক্ত হবে তার দ্বারা সাহায্যকারীদের কি ভবিষ্যতে কোনও রকম ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনা আছে?

এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস মহাশয় তাঁর "নিবেদনে" জিজ্ঞাস্য বিষয়ের জন্য তাঁকেই লিখতে অনুরোধ করেছেন, কিন্তু "প্রবাসী"তে এবিষয়ে বিস্তারিত খবর বার হ'লে সাধারণের গোচর হবে এই আশায় প্রবাসীতেই লিখলাম।

শ্রী শ্যামাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

গয়া হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার কৃষি-সম্পর্কিত "নিবেদন" সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তদনুরূপ বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন প্রশ্ন আসিতেছে। সাক্ষাৎব্যতিরেকে সমস্ত উত্তর দেওয়া ঠিক সুবিধাজনক নহে, তবে মোটামুটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিয়া দিলাম।

যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে পরস্পর সহানুভূতি, সাহায্য কিম্বা সমবেত চেষ্টা ব্যতিরেকে দেশের কোনই উপকার হওয়া অসম্ভব ; এমন কি দেশবাসীগণের বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব হইবে। কর্ম্মীগণের কর্ম্মশক্তি, ধনীগণের অর্থসাহায্য, গুণীগণের বুদ্ধিপ্রভাব প্রভৃতির যথা-যোগ্য সমাবেশ না হইলে কোন অনুষ্ঠানেরই সম্যক্ বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি

হইতে পারে না। তাই ধনী ও গুণীগণের সহানুভূতি প্রত্যাশাতেই আমার "নিবেদনে" সমবায়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। সমবায় বলিতেই বুঝিতে হইবে ইহা সাধারণের, ব্যক্তিগত নহে।

দেশে কোনরূপ নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে, এবং উন্নত প্রণালীর কৃষিক্ষেত্র স্থাপন দ্বারা দেশের উৎপত্তির বৃদ্ধি হইলে, ও দেশের লোকে ঐ বিষয়ে উন্নত ধরণের শিক্ষালাভের অবসর পাইলে সমষ্টিভাবে দেশের যতটুকু মঙ্গল হইবে তাহাই প্রকারান্তরে দেশস্থ সাধারণের একটি প্রধান লাভ। আবার নূতন নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি দ্বারা দেশের বেকার-সমস্যা যদি কতক পরিমাণে মিটিতে পারে তবে তাহাও একটি শ্রেষ্ঠ লাভ। যাঁহারা সমবায়ের সভ্যশ্রেণীভুক্ত কিংবা অংশীদার কিম্বা কর্ম্মী হইবেন, তাঁহারাও সমবায়-সম্পর্কে তাঁহাদের প্রভাব, অংশ ও যোগ্যতার অনুপাতে সমবায়ের লাভের ভাগে ভাগী হইবেন; ইহাই সাধারণের ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনা। তদ্ভিন্ন, সমবায়ের আর্থিক অবস্থার সঙ্কুলান হইলে ক্রমে বিভিন্ন কল-কারখানা স্থাপন দ্বারা কাগজ, পেন্সিল, সাবান, রেশম, মধুমক্ষিকা, চর্ম্মপ্রস্তুতি, বস্ত্রাদিরঞ্জন, দিয়াশেলাই প্রভৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে পারিলেও দেশের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। ইহাতে পরস্পরের সাহচর্য্যে শ্রমের ও কর্ম্মচারী ও যন্ত্রাদি সম্পর্কে সমবায়ের অনেক সুবিধা হইবে এবং এক বিষয়ের পরিত্যক্ত পদার্থগুলি অন্য বিষয়ে অনেক কাজে লাগিবে। পশু ও যন্ত্রাদির পরিত্যক্ত পদার্থগুলিতে জমির সার হইবে, আবার জমির উৎপন্ন পরিত্যক্ত পদার্থে পশুর খাদ্য কিংবা যন্ত্রাদি পরিচালনের ইন্ধন হইবে। এইরূপে অধ্যবসায়ের সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে হয়ত ভবিষ্যতে এ দেশের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এ দেশেই উৎপন্ন হইবে এবং অতিরিক্ত জিনিষ বিদেশে প্রেরিত হইয়া এ দেশের অর্থসম্পত্তি বৃদ্ধি করিবে।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঝাড়গ্রামে একশত দশ বিঘা জমি রাখিয়াছি, তাহাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করিয়া দেশবাসীগণের বিশ্বাস উৎপাদন হেতু কাহারও নিকট হইতে ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য পাইলে নিতান্তই বাধিত থাকিব। কিন্তু যৌথপদ্ধতি-ব্যতিরেকে সাধারণের টাকা লইয়া কোনও অনুষ্ঠান আরম্ভ করা সম্ভবপর নয়। তাহাতে রেজিষ্ট্রেশন্ প্রভৃতি প্রাথমিক খরচই অনেক এবং কতকগুলি অতিরিক্ত খরচও আছে। তাই উপযুক্তরূপ আশ্বাস না পাইলে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা কিছুতেই সঙ্গত নয় যদি অন্ততঃ তিন লক্ষ টাকার অংশ বিক্রয় করা যাইবে এরূপ আশা পাওয়া যায় তবেই কোম্পানী গঠিত করিয়া রেজেষ্টারি করিয়া জমির বন্দোবস্ত লইয়া আবাদাদি আরম্ভ করিয়া কার্য্যারম্ভ করা যাইতে পারে। দেশে জাগরণের সাড়া পড়িয়া থাকিলেও অধিকাংশ স্থলেই হুজুগের প্রাধান্যই অধিক; তথাপি দেশের সদাশয় ব্যক্তি-গণের সহানুভূতির প্রতীক্ষায় রহিলাম। নিম্নে খরচাদি ও সম্ভাবিত লাভের একটা মোটামুটি হিসাব দিলাম :—

মূল খরচ (Capital expenditure)

১।	জমি বন্দোবস্ত (তিন হাজার বিঘা)	৩০,০০০৲
২।	আবাদ	৩০,০০০৲
৩।	একশত হেলে গরু	৮,০০০৲
৪।	চল্লিশটি দুগ্ধবতী মুলতানী গরু	১০,০০০৲
৫।	দুইটি বৃষ	৮০০৲
৬।	কৃষি-সম্পর্কিত সাধারণ যন্ত্রপাতি	৫০০৲
৭।	গৃহাদি	৫০,০০০৲
৮।	বিভিন্ন মজুর খরচাদি	৫০,০০০৲

মূল খরচ (Capital expenditure)

৯।	বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-পাতি	৩০,০০০৲
১০।	বিবিধ (যাতায়াত, যন্ত্রাদি প্রেরণ খরচ, রেজিষ্ট্রেশন্, ইত্যাদি)	১০,০০০৲
	মোট—	২,১৯,৩০০৲

বাৎসরিক খরচ (Recurring expenses)

১।	কর্ম্মচারীগণের বেতন	১২,০০০৲
২।	চাষ ও যন্ত্রাদি চালাইবার খরচ	৫০,০০০৲
৩।	পশু খাদ্য	১০,০০০৲
৪।	যন্ত্রাদির মেরামত ও পশ্বাদির চিকিৎসা	৫,০০০৲
৫।	বীজ	১০,০০০৲
৬।	খাজনা	১০,০০০৲
৭।	বিবিধ	৩,০০০৲
	মোট	১,০০,০০০৲

সম্ভাবিত লাভের হিসাব

১।	প্রতি বিঘায় অন্ততঃ ৫০৲ টাকা হিসাবে ৩,০০০ বিঘায় (তিন ফসলে)	১,৫০,০০০৲
২।	গোদুগ্ধ প্রভৃতি হইতে	১০,০০০৲
৩।	চাউলের কল, তৈলের কল, ইক্ষু চিনি প্রভৃতি হইতে	৫০,০০০৲
	মোট	২,১০,০০০৲
	বাদ বাৎসরিক খরচ	১,০০,০০০৲
	মোট লাভ	১,১০,০০০৲

সতর্কতার সহিত কর্ম্ম চালাইতে পারিলে মোট লাভ দ্বিগুণ হওয়াও অসম্ভব নয়। যৌথ পদ্ধতিতে সমবায় স্থাপন করিয়া, দশ টাকা মূল্যের এক এক অংশ বিক্রয়ের দ্বারা পাঁচ লক্ষ টাকা কি দেশ হইতে উঠিবে না ?

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

৯০।১, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অতঃপর এবিষয়ে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে তিনি লেখককে চিঠি লিখিয়া জানিবেন।—প্রবাসীর সম্পাদক

—

নদীয়া জেলায় গার্শিব্রত

আষাঢ় [১৩৩০] মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিক্রমপুরের গার্শিব্রতের কথা লিখিয়াছেন। নদীয়া জেলার প্রায় সকল স্থানেই উক্ত প্রথা আশ্বিনের সংক্রান্তিতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে সকলেই স্বেচ্ছামত নিজ নিজ ঈপ্সিত বস্তুকে 'জাগাইয়া' রাখে। কোন দ্রব্যে হাত দিয়া বলে,—'জাগ্ জাগ্ জাগ্, যে কর্ম্মে লাগাই তোরে সেই কর্ম্মে লাগ্' তারপর শেষ রাত্রিতে উঠিয়া এক-একখানি কুলা লইয়া একটা পাঁকাটি দিয়া কুলার পৃষ্ঠে অনবরত বাড়ি দিয়া বলিতে থাকে,—'এ বাড়ীর মশা মাছি ঐ বাড়ী যা' 'ও-বাড়ীর লক্ষ্মী-ঠাকরুণ এই বাড়ী আয়।' কেহ কেহ বলে,—'রাই সরিষা বেগুর ফুল, যা রে মশা গাঙের কূল।'

তারপর, একখানি বাঁশের চালুনের উপর একখানি 'মানের' পাতা পাড়িয়া একছড়া পাকা কলা, এক বাটি তেল, কাঁচা হলুদ, কাঁচা তেঁতুল, আয়না-চিরুণী, তালের আঁটির শাঁস ইত্যাদি রাখিয়া পাঁকাটি জ্বালাইয়া আগুন পোহাইতে থাকে। উহাতে কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া ঠোঁটে লেপন করিয়া থাকে, তেল মাখে, আয়না দিয়া মুখ দেখে, চুল আঁচড়ায়, একটা পাঁকাটির কাঠিতে আগুন ধরাইয়া লইয়া সিগারেটের মত টানিয়া ধূমপান করিয়াও থাকে।

লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী-সম্বন্ধে গল্প বলা কি মধ্যাহ্নে গারু ব্রত করা ইত্যাদি আর কোন অনুষ্ঠান নাই।

শ্রী গোপেন্দ্রনাথ সরকার

সূর্য্য-বন্দনা

[ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল ৫০ সূক্ত। সূর্য্য দেবতা। প্রস্কণ্ব কাণ্ব ঋষি।]

যে-জন সৃষ্টি-হেতু
উদিত তাহারি কেতু
সূর্য্য দৃষ্টি-সেতু।

চোর সম অপগত
রাত্রি সাথে তারা শত
হেরি' রবি জ্যোতিরত।

তার জ্বল কেতু ভাতি-টীকা
জনপদে দিকে লিখা—
যেন দীপ্ত অগ্নি-শিখা।

বিশ্ব-নয়ন রবি!
দ্রুতগ, জ্যোতির ছবি!
রুচিতে বিভাসো সবি।

দেবতা সমুখে হাসো,
মানুষ-সমুখে আসো,
বিশ্বে দিব্য জ্যোতিতে ভাসো।

তুমি পাবন দীপ্তি ভরা,
আলোকে পোষিছ ধরা,
সবি তব চোখে পড়ে ধরা।

বিপুল স্বর্গ-যাত্রা,
দিবা-রাতি-যোগ দাতা,
সব-জনমের ধাতা।

সাত হরিত অশ্বে রাখি'
রথ-মুখে, চল হাঁকি'—
তুমি জ্যোতিকেশ দূর-আঁখি।

সপ্ত অশ্বী যুতা
টানে রথ—রথ-সুতা,
চলে রবি, তারা দ্রুতা।

তম-শিরে জ্বলে জ্যোতি,
হেরি' অতুল শ্রেষ্ঠ অতি
তপন দেবতাপতি—
তার ধরিব পরম জ্যোতি।

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ভারতবর্ষ

লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যালিটির নির্ভীকতা—

গবর্মেণ্ট লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যালিটির উপর নোটিশ জারী করিয়াছিলেন যে, বড় লাট ও লাট সাহেব ব্যতীত অন্য কোনো লোকের অভিনন্দন-ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটির টাকা খরচ করিবার অনুমতি প্রদান করা হইবে না। সরকারের এই নোটিশের প্রতিবাদস্বরূপ লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যাল্ বোর্ড এই মর্ম্মে প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন যে, ভারত-গবর্মেণ্ট জাতীয় দাবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ভারতবাসীগণের বিশ্বাস হারাইয়াছেন। সুতরাং বড়লাট ও লাট উভয়ের কাহাকেও অতঃপর কোনোরকম সম্বর্দ্ধনা বা বিদায়ের অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হইবে না এবং তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কোনো-রকম অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হইবে না। তিনজন মাত্র সদস্য এই প্রস্তাবের প্রতিকূলে ভোট দিয়াছিলেন।

প্রস্তাবের তালিকায় আরো তিনটি প্রস্তাব ছিল, তাহার একটি হইতেছে, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু যখন লক্ষ্ণৌয়ে আসিবেন সেই সময় তাঁহার সম্বর্দ্ধনা ব্যাপারে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার জন্য এক আনা মঞ্জুর করা হইবে, দ্বিতীয়টির মর্ম্ম—মিউনিসিপ্যালিটির ছুটির তালিকায় যে-সব ছুটির দিন আছে, 'এম্পায়ার ডে'র ছুটি সেই তালিকা হইতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। তৃতীয় প্রস্তাব—লোকমান্য তিলকের মৃত্যুর স্মৃতিচিহ্নরূপে তাঁহার মৃত্যুর দিনে এবং মহাত্মা গান্ধীর জন্মতিথিতে মিউনিসিপ্যালিটির আফিস বন্ধ থাকিবে এবং মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারীগণ এই দুই তারিখের অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন। এই প্রস্তাব তিনটিও সদস্যদের ভোটের জোরে পরিগৃহীত হইয়াছে।

মিউনিসিপ্যালিটি যদি জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান হয় তবে জন-সাধারণের সম্মানার্হ ব্যক্তিদিগকে সম্মান দেখাইবার অধিকারও তাহার থাকা উচিত। গবর্মেণ্ট নোটিশ দিয়া সেই অধিকারটাই বন্ধ করিতে চান। লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যালিটি এই অন্যায় অসঙ্গত নোটিশের প্রতিবাদ যেরূপভাবে করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবেই প্রশংসার্হ। ইহার ভিতর দিয়া তাঁহাদের আত্মসম্মানজ্ঞান, নির্ভীকতা এবং যোগ্যতার পরিচয় অবিসংবাদিতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কারাগারে লালা লজপত রায়—

লালা লজপত রায়ের অসুস্থতার সংবাদ দেশের ভিতর রীতিমত উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং জেলে তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার চলিতেছে তাহা জানিবার আগ্রহও জন-সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক। সেণ্ট্রাল জেলের যে ব্যারাকে লালা লজপত রায়কে রাখা হইয়াছে সেই ব্যারাকেই লাহোর স্বেচ্ছা সেবক-বাহিনীর কাপ্তেন পণ্ডিত নাথুরামও আবদ্ধ ছিলেন। এক বৎসর কারাদণ্ডভোগের পর গত ৩০শে জুন তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। লালাজীর সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"লালাজীকে ইউরোপীয়ান্ ওয়ার্ডে আটক রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার গুরুতর অসুস্থতার জন্য তাঁহাকে জেলকর্তৃপক্ষ যতদূর সম্ভব সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধা করিয়া দিতেছেন। খস্‌খসের 'টাটি' দিয়া তাঁহার ঘরের দরজাজানালাগুলিকে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার উপর কিছুক্ষণ পরে পরেই জল ছিটাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহার ঘরে একটা টানা-পাখা টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সমস্ত দিন পাখা টানিবার জন্য দুইজন লোক নিযুক্ত আছে। তাঁহার আত্মীয়েরা জেলকর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ঘরে বিজলী পাখা খাটাইয়া দিয়াছেন। রাত্রিতে তিনি উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং জেলর (jailor) দিনে অন্ততঃপক্ষে দুইবার তাঁহাকে দেখিয়া যান। খাদ্যসম্বন্ধেও বিশেষ যত্ন লওয়া হইতেছে। লালাজী যত ইচ্ছা দুধ খাইতে পারেন।"

জেলকর্তৃপক্ষের ব্যবহার যে প্রশংসার্হ তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। কিন্তু জেলের ভিতরকার বন্দী-অবস্থাই মানুষের মনকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। সুতরাং জেলের ভিতর আদর-যত্ন যথেষ্ট হইলেও জেলের আবহাওয়া অসুস্থদেহকে শীঘ্র সুস্থ হইতে দেয় না। কর্তৃপক্ষ লালাজীর স্বাস্থ্যের এ অবস্থাতেও তাঁহাকে জেলে বন্দী করিয়া রাখিয়া হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতেছেন।

সন্তরণ-প্রতিযোগিতা—

গত ২৮শে জুন চুনার হইতে কাশী পর্য্যন্ত ১৫ মাইলের একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় ১৮ জন যুবক যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটের সময় চুনার হইতে যাত্রা করেন। কলিকাতার জীবন রক্ষা সমিতির (Life Saving Society) শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত ৭টা ১০ মিনিটের সময় কাশীর কেদারঘাটে পৌঁছিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ভারতবাসীরা যে এইসব প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেছে ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কারণ এইসব প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়া জাতির জীবনের ও জাগরণের একটা সাড়া পাওয়া যায়।

নাগপুরের সত্যাগ্রহ আন্দোলন—

নাগপুরের সত্যাগ্রহ আন্দোলন পুরা দমে চলিতেছে। স্বেচ্ছা-সেবকেরা প্রতিদিন জাতীয় পতাকা বহন করিতে যাইয়া পুলিসের হাতে গেপ্তার হইতেছেন। বিচারে ইঁহাদের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইতেছে। শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ প্রভৃতি অনেক দেশনায়কও এই উপলক্ষে পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া জেলে গিয়াছেন অথবা হাজতে আছেন। ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতে এই আন্দোলনকে তাজা রাখিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক প্রেরিত হইতেছে। করাচিতে একদল মহিলাও প্রস্তুত হইয়া আছেন। তাঁহারা শীঘ্রই নাগপুরে গমন করিবেন। গত ২রা জুলাই পর্য্যন্ত নাগপুরের জাতীয় পতাকা সংগ্রাম সম্পর্কে ১০০৮ জন স্বেচ্ছাসেবক বন্দী হইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা বাই আম্মার অভিযোগ—

আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা শ্রীযুক্তা বাই আম্মা দৈনিক 'হামদানে' তারযোগে জানাইয়াছেন যে, তিনি ও তাঁহার পুত্রবধূ রাজকোটে প্রায় এক সপ্তাহ বসিয়া থাকিয়াও মৌলানা শৌকত আলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। এমন কি জেল কর্তৃপক্ষ তাঁহার আবেদনের উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই। গত ১৪ মাস যাবৎ তাঁহারা মৌলানা শৌকত আলির কোনও সংবাদ পাইতেছেন না।

আরাকানে বন্যা—

আরাকান বিভাগের রামতিতে গত ২১শে জুন রাত্রে ভয়ানক বন্যা হইয়া গিয়াছে। বন্যার তোড়ে বহু কুঁড়ে-ঘর ভাসিয়া গিয়াছে এবং বহু দরিদ্র লোক গৃহহীন হইয়াছে। সমস্ত সহর জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। গো মহিষাদি গৃহপালিত পশু এবং বহু খাদ্যদ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে। একটি শিশু এবং একটি স্ত্রীলোক জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। ২৩শে জুন কমিশনার স্থানটি পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে কিরূপ সাহায্যদানের প্রয়োজন হইবে সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে।

চৌরী চৌরার আসামী—

চৌরী চৌরার মামলায় যে কয়জন আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল তাহারা বড়লাট লর্ড রেডিংএর নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিয়া আবেদন পত্র দাখিল করিয়াছিল। বড়লাট তাহাদের আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

চৌরী চৌরার অত্যাচারকে আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু এত-গুলি লোকের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাও যে ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা তাহাতেও সন্দেহ নাই। এরূপ ব্যবস্থার দ্বারা লোকের মনে ভয়ের অপেক্ষা অশ্রদ্ধাই বড় হইয়া জাগিয়া উঠে। লর্ড রেডিং এক্ষেত্রে এইসব হতভাগ্যদের প্রাণদণ্ডটা রহিত করিলে তাহাতে গবমেণ্টের গৌরব বাড়িত ভিন্ন কমিত না।

মহাত্মার মুক্তি—

শ্রীযুক্ত বেঙ্কটপতি রাজু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদানের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তিলাভের পর যাহাতে কাউন্সিল নির্ব্বাচনে যোগদান করিতে পারেন এই প্রস্তাবে সে কথারও উল্লেখ থাকিবে।

এ প্রস্তাবের ফল কি হইবে প্রস্তাব পাশ হইবার আগেই তাহা বলিয়া দেওয়া যায়। আমলাতন্ত্রের উদারতা এত বেশী থাকিলে জনসাধারণের মন তাঁহাদের প্রতি এমনভাবে অবিশ্বাসে ভরিয়া উঠিবার অবকাশ পাইত না।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি—

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দীর্ঘকালের জন্য বিদায় লওয়ায় স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান বিচারপতির পদে কাজ করিবেন।

বাংলার বাহিরে বাঙালীর এই উন্নতির সংবাদকে আমরা অন্তরের আনন্দের দ্বারা অভিনন্দিত করিতেছি।

যুক্ত কমিটি—

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসঙ্ঘ সম্পর্কীয় কর্ম্মীদের লইয়া আগামী বকর্-ঈদ পর্ব্বে যাহাতে কোনোরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা না হয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর একতার বন্ধন যাহাতে সুদৃঢ় হয় তাহার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিবার নিমিত্ত একটি যুক্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটি ধর্ম্মবিদ্বেষমূলক সকল-প্রকার প্রচার কার্য্য যাহাতে বন্ধ হয় তাহার জন্য রীতিমতভাবে চেষ্টা করিবেন।

নাথি বাই দামোদর থ্যাকর্সে কলেজ—

ভারতীয় নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বোম্বাই নাথি বাই দামোদর থ্যাকর্সে কলেজের নূতন বাড়ীর দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্প্রতি নানা সম্প্রদায়ের বহু সম্ভ্রান্ত নরনারীর সমক্ষে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার মহাদেও চোবল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কলেজের স্থানটি পুনার এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বোম্বাইএর মূলরাজ যতানের অনুগ্রহপ্রদত্ত ৩৫০০০ টাকায় প্রায় ৫০ জন ছাত্রীর আহার ও বাসস্থানের জন্য একটি নূতন হোষ্টেলও প্রস্তুত হইতেছে।

শুদ্ধি স্বেচ্ছাসেবকের বিপদ্—

পণ্ডিত নবসিংহ দাস নামে শুদ্ধি আন্দোলনের জনৈক প্রচারক ও স্বেচ্ছাসেবক যখন আজমীরে বক্তৃতা দিতেছিলেন তখনই জন কয়েক মুসলমান তাঁহাকে ছোরার আঘাতে হত্যা করিয়াছে। দিয়ার নামক স্থানে পণ্ডিত কৃষ্ণলাল শাস্ত্রী শুদ্ধি-বিষয়ে বক্তৃতাকালে মুসলমানের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে আজমীরের হিন্দুগণ ৯ই জুন সহরে সম্পূর্ণ হরতাল করিয়াছিলেন।

এরূপ উৎপীড়নের খবর এই একটি দুটি নহে আরো অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। হিন্দুদেরই সমস্ত আন্দোলন দমনীয় আর মুসল-মানেরা যে হিন্দুদিগকে মুসলমান করিবার জন্য কমিটি গড়িয়া, চাঁদার খাতা খুলিয়া, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়িয়া হেঁচৈ সুরু করিয়া দিয়াছেন তাহাতে কোনো দোষ হয় না। দুর্ব্বলতা যে কত বড় পাপ এইসব ব্যাপারেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মদের দোকানে পিকেটিং—

মাদ্রাজের ৩০শে জুন তারিখের পত্রে প্রকাশ, মাদুরা জেলার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে মদ, তাড়ি, গাঁজা ও আফিমের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করা হইবে।

একবার এইসব দোকানে পিকেট বসাইয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছিল তাহাকে কোন প্রকারেই উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং ভাল কর্ম্মী পাইলে মদের দোকানে পিকেটিংএর ফল যে খুবই ভাল হইতে পারে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। কাহারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা অনুচিত, কিন্তু অপকর্ম্মকারীকে অপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যে চেষ্টা তাহা সাধু।

দাতিয়া মহারাজার দান—

দাতিয়ার মহারাজা তিন বৎসর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করিবেন এবং ইন্দোরের কিং এডওয়ার্ড হাসপাতালে এক হাজার সাতশত টাকা সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

পল্লী-চিকিৎসায় ব্যয়—

বিহার উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভা বর্ত্তমান বাজেটে দুই লক্ষ টাকা পল্লীচিকিৎসার জন্য দান করিয়াছেন।

স্বাস্থ্যের দিকে কম বেশী সকলেরই নজর আছে, নাই কেবল বাংলার। তাই বাংলার সন্তান বাঙালী চিররুগ্ন, চির-দুর্ব্বল, পরের হাতে চিরদিন লাঞ্ছিত।

বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষা—

মাদ্রাজ গবর্মেন্ট্ মসলিপটম মিউনিসিপ্যালিটিতে এই জুলাই মাস হইতে অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের অনুমতি দিয়াছেন।

এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি—

লক্ষ্ণৌএর মত এলাহাবাদেও গবমেন্ট্ লাটসাহেব ভিন্ন আর কাহাকেও অভিনন্দনপত্র দিবার খরচ মিউনিসিপ্যাল ফণ্ড হইতে পাওয়া যাইবে না বলিয়া এক ইস্তাহার জারি করিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যগণ সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন, গবমেণ্টের এ আদেশ অনুযায়ী কাজ করা হইবে না। কারণ এ আদেশে মিউনিসিপ্যালিটির অধিকার ও ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। অভিনন্দনপত্র দেওয়া-না-দেওয়া-সম্বন্ধে এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি নিজের মতামত অনুযায়ী কার্য্য করিবেন।

ভারতের কয়লা—

১৯২২ সালে ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশ হইতে কত কয়লা খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসাম	৩, ৪৮, ৬৬০ টন
বেলুচিস্থান	৪০, ৬৩২ টন
বঙ্গদেশ	৪৬, ২৮, ৯৮৬ টন
বিহার-উড়িষ্যা	১, ২৭, ০৮, ৫২৭ টন
ব্রহ্মদেশ	১৭৭ টন
মধ্যপ্রদেশ	৬, ৭৫, ৮৪১ টন
পাঞ্জাব	৬১, ১৮০ টন

বিহার-উড়িষ্যার নূতন মহকুমা—

বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের সিংহভূম জেলার জমশেদপুরে একটি নূতন মহকুমা গত ১লা জুন হইতে স্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র ধলভূম পরগণা ও অন্যান্য নয়টি থানা লইয়া এই মহকুমা গঠিত হইল। ১লা জুন হইতে ফৌজদারী আদালত ও ট্রেজারি খোলা হইয়াছে। দেওয়ানী মামলার জন্য এখনো কোনো বন্দোবস্ত হয় নাই, শীঘ্রই হইবে। আর এক মাসের ভিতরেই নূতন কারাগারের নির্ম্মাণ-কার্য্যও শেষ হইবে।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

বিদেশ

প্যালেষ্টাইনে অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য।—

সন্ধির নির্দ্ধারণ-অনুসারে প্যালেষ্টাইনের খবরদারীর ভার ইংরেজের হাতে আসে। সেই ভার হাতে পাইয়া অধিবাসীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইংরেজ-সরকার নিজের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ পুরাপুরি বজায় রাখিয়া দেশবাসীর হস্তে নামেমাত্র স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিবার ব্যবস্থা করিয়া একটি শাসন-প্রণালী সৃজন করেন। ইংরেজের সে ব্যবস্থায় আরবগণ ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়। আরব জাতীয়দলের নেতারা বলেন যে, ইংরেজ যখন যুদ্ধের প্রারম্ভে আরবকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তখন আরববাসীগণের ন্যায়তঃ সেই অধিকার পাইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাঁহারা তাহা আদায় না করিয়া কিছুতেই শান্ত হইবেন না। ইংরেজ-সরকার কিন্তু আরবকে এতটা ছাড়িয়া দিতে নারাজ। যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনের চাপে যখন তাঁহারা আরবকে স্বাধীনতা দিতে স্বীকৃত হন তখন হইতেই সেটা একটা রাজনৈতিক চালবাজি বলিয়া তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন। সরলভাবে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করা তাঁহাদের কোনও দিন মতলব ছিল না। উড্রো উইলসনের চৌদ্দ দফার নির্দ্ধারণ মানিয়া চলিলে মধ্যআরবের সামন্তরাজ ইবন্ সাউদকেই আরব-সাম্রাজ্যের অধিনায়ক করা উচিত ছিল। কেননা আরবে তাঁহার ন্যায় পরাক্রমশালী সামন্তরাজ আর কেহই ছিলেন না। আরবের প্রজা সাধারণের অভিরুচি-অনুসারে আরবের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প ইংরেজ-সরকারের তরফ হইতে ইংরেজ মন্ত্রী ব্যাল্‌ফুর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এই ঘোষণা-পত্র Balfour Declaration নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আরব জাতীয় মহাসভার পক্ষ হইতে ইবন্ সাউদকেই আরবের নেতৃপদে বরণ করা হইয়াছিল। মুসলমানদিগের পুণ্য তীর্থগুলির সংরক্ষণভার মক্কার সরিফের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে ভারতীয় মুসলমান প্রজাবৃন্দের ধর্ম্মবিশ্বাস খুব বেশী ক্ষুন্ন হইবে না এরূপ ধারণা ইংরেজের ছিল। ইংরেজ দেখিলেন যে সাউদের প্রতিদ্বন্দ্বী মক্কার সরিফ হুসেনকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিলে ইংরেজের অধিকতর সুবিধা হয়, তাই তাহারা আরবের স্বেচ্ছাবৃত নেতাকে উপেক্ষা করিয়া হুসেনের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ইংরেজ ও ফরাসী আমীর হুসেনকে সমগ্র আরবের স্বাধীন নৃপতির পদে অভিষিক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হওয়াতে হুসেন তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এদিকে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে সাইক্‌স্ পিকো নিষ্পত্তি নামে অধুনা-প্রসিদ্ধ যে গুপ্ত নিষ্পত্তি হইয়া যায় তাহাতে হেজ্জাজ ব্যতীত সমস্ত আরবদেশটাই নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইলেন। অথচ ইংরেজ সরকার হুসেনকে সমগ্র আরবের অধীশ্বর করিবার প্রতিশ্রুতি করিতে বিরত হইলেন না। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসেও ইংরেজ মন্ত্রী ব্যাল্‌ফুর ঘোষণা করেন যে ইংরেজ-সরকার আরবে দেশবাসীর স্বেচ্ছাবৃত দেশজ রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিবেন। ইহুদিদিগের আদি জন্মভূমি প্যালেষ্টাইনে একটি ইহুদি-সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা ইহুদিগণ বহুদিন হইতেই পোষণ করিয়া আসিতেছেন। ইহুদিদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য প্যালেষ্টাইনে স্বাধীন ইহুদি-রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুতিও ইংরেজ-সরকার দিতে ছাড়িলেন না। প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া দখল করিতে পারিলে তাহা আপনার অধিকারে আসিবে মনে করিয়া হুসেনের পুত্র ফইজুল অমিত বিক্রমে তুরস্ক-সেনাকে আক্রমণ করিয়া মিত্রশক্তিবর্গের সৈন্যগণ পৌঁছিবার পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বেই বিরুৎ ও ডামাস্কাস্ দখল করেন। ফরাসী সেনাপতি কিন্তু বিরুতে পৌঁছিয়াই শরাফী পতাকা নামাইয়া ফেলিতে বলিলেন। ফইজুল ইংরেজের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মুখে ইংরেজরা অনেক আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু কাজে কোনই ফল হইল না। যুদ্ধের শেষে যখন জয়লব্ধ রাজ্যসমূহের ভাগ বাটোয়ারা লইয়া শেষ সিদ্ধান্ত হয় তখন আরবের প্রদেশসমূহ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার জন্য সানরেমো সহরে এক বৈঠক বসে। এই বৈঠকে সর্ব্ব-আরবীয় মহাসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিরিয়ার খবরদারীর ভার ফ্রান্সকে দেওয়া হয়, আর ইংরেজ-সরকার প্যালেষ্টাইন ও মেসোপটেমিয়ার খবরদারীর ভার প্রাপ্ত হন। হুসেনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার পুত্র ফইজুলকে মেসোপটেমিয়ার সিংহাসনে বসাইয়া ইরাকের সম্রাট্ বলিয়া ইংরেজ-সরকার ঘোষণা করিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শাসনভার সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ-প্রতিনিধি স্যার পার্সি কক্সের হস্তেই রহিয়া গেল। এইরূপ নামে রাজা হইয়া ফইজুল সন্তুষ্ট হইলেন না। হুসেন বলিলেন, "You speak to me continually of the British Government and British policy. But I see five Governments where you see one and the same number of

policies. There is a policy, first of your Foreign Office ; second, of your army ; third of your navy ; fourth of your protectorate in Egypt ; fifth, of your Government of India. Each of these British Governments seem to me to act on an Arab policy of its own." অর্থাৎ "আপনারা ক্রমাগত আমার নিকট ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি ও ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের কথা বলিয়া আসিতেছেন। আপনারা যেখানে একটিমাত্র শাসনতন্ত্রের কথা বলেন, আমি সেই স্থলে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র ও পাঁচটি ভিন্ন রাষ্ট্রনীতি দেখিতে পাই। আপনাদের পররাষ্ট্র-বিভাগের একপ্রকার নীতি। সৈন্য বিভাগের নীতি অন্যরূপ। তাহার পর আপনাদের নৌ-বহরের, মিশর-সরকারের ও ভারত সরকারের প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রনীতি ভিন্ন প্রকারের। এই পাঁচটি বিভাগের আরবনীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন।" বিপরীত স্বার্থের সংঘাতের মধ্য হইতে আপনার সুবিধাটুকু ষোলআনা আদায় করিয়া লইবার মতলবে ইংরেজ যে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিয়া রাজনৈতিক চাল চালিতেছিলেন সুচতুর হুসেনের দৃষ্টি তাহা এড়ায় নাই। হুসেন আরবে মহা অসন্তোষের আগুন জ্বালাইয়া তুলিলেন। কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া জয়লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া হুসেন অসহযোগ-নীতি প্রচার করিতে লাগিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই অসহযোগের বাণী সমস্ত প্যালেষ্টাইনে ছড়াইয়া পড়িল। আরবীরা ইংরেজের-দেওয়া শাসন-পরিষৎকে অস্বীকার করিল। শাসনপরিষদের সভাপদে নির্ব্বাচিত হইবার জন্য একজন আরবী প্রতিনিধিও নির্ব্বাচনপ্রার্থী হন নাই। কাজে কাজেই শাসন-পরিষদের নির্ব্বাচন প্রহসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আরববাসীগণ কেহ ভোট দিতে অস্বীকার করাতে নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ মূল্যহীন হইয়া পড়িল। তাই ইংরেজ-সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে সরকারী মনোনয়নে একটি শাসন পরিষদের হস্তে শাসনভার অর্পিত হইবে। এই ঘোষণা-অনুসারে ১০ জন বিশিষ্ট আরব নেতাকে ইংরেজ-সরকার পরিষদের সভ্য মনোনয়ন করিলেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সাতজন কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন ; তাঁহারা বলেন যে যখন আরবদেশের জাতীয় মহাসভা ইংরেজ-সরকারের প্রবর্ত্তিত শাসনব্যবস্থাটি গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই, তখন যতদিন পর্য্যন্ত না সেই ব্যবস্থাটি প্রত্যাহার করিয়া দেশবাসীর অভিরুচি-অনুসারে নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে ইংরেজ-সরকার প্রস্তুত হন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা শাসন-ব্যবস্থাতে ইংরেজ-সরকারের কোনওরূপ সহায়তা করিতে পারেন না। ইহার পর জুন মাসের প্রথম দিকে জাফা সহরে প্যালেষ্টাইনের প্রধান প্রধান নগর হইতে প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হইয়া এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে যদি সরকারপক্ষ মনোনীত প্রতিনিধি-বর্গের সহায়তায় কোনও প্রকারে শাসনকার্য্য পরিচালনের চেষ্টা করেন তবে তাহাতে বাধা দিবার জন্য খাজনা দেওয়া বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আরব মহাসভার ষষ্ঠ অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আরব-বাসীগণ ইংরেজ সরকারের ব্যবস্থায় বাধা দিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিবার বিরাট আয়োজন করিতেছেন।

এদিকে ইহুদি প্রজাবর্গও ইংরেজ-শাসনব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নহেন। সেখানকার ইহুদি সংবাদপত্রে প্রকাশ যে ইংরেজ-প্রেরিত শাসনকর্ত্তা স্যার হার্ব্বার্ট স্যামুয়েলের নিয়োগেও ইহুদিগণ সন্তুষ্ট নহেন। স্যামুয়েল ইহুদি হইলেও জাতিতে ইংরেজ এবং ইংরেজ-সরকার তাঁহাকে শাসন-কর্ত্তা-রূপে মনোনীত করিয়াছেন। কাজে-কাজেই ইহুদিরা মনে করেন যে স্যামুয়েল ইহুদিদিগের স্বার্থ অপেক্ষা ইংরেজের স্বার্থ বেশী দেখিবেন। তাই ইহুদিরা মনোনীত শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তে নির্ব্বাচিত সভাপতি লাভ করিবার দাবী জানাইয়াছেন। স্যামুয়েল মুসলমান ও ইহুদি উভয়েরই বিরাগভাজন হইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন না। তাই প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে ইংরেজ যদি পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি-মত ইহুদি-রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা না পান এবং ইহুদি-প্রাধান্য প্যালেষ্টাইনে বজায় না থাকে, তাহা হইলে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। ইংরেজ সরকার তাই মহা ফাঁপরে পড়িয়াছেন। কোন্ প্রতিশ্রুতি বজায় রাখা কর্ত্তব্য এই হইয়াছে সমস্যা।

সবুজ সাম্যতন্ত্রের পতন —

যুদ্ধের পর পৃথিবীময় যে অশান্তি ও অস্থিরতা দেখা দিয়াছে তাহার ফলে মানব-জীবনে এক মহা বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। এই বিপ্লবের মূর্ত্তিটি সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে রাষ্ট্রতন্ত্রে। যুদ্ধের পূর্ব্বে শ্রমিক-আন্দোলন ইতালী ও ব্যাভেরিয়াতে সবচেয়ে বেশী প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল, এখন তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ "নিয়ম ও শৃঙ্খলার" প্রতিপোষক ফ্যাসিষ্টি আন্দোলন এই দুই দেশে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স, রাজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া গণতন্ত্রের যুগের প্রতিষ্ঠা করে। এখন আবার সেই গণতান্ত্রিক ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে এবং পুরাতন রাজবংশের অনুরাগী Cameliot du Roi সম্প্রদায়ের প্রভাব ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে। রক্ষণশীল দেশ বলিয়া ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীর প্রসিদ্ধি ছিল। এখন শ্রমিক-আন্দোলন এই দুই দেশেই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অভিনব পরিবর্ত্তন হইয়াছে রুশদেশে ও বুল্‌গেরিয়াতে। সাম্যবাদের প্রচলন জগতে বহুদিন হইলেও এযাবৎ-কাল সাম্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কোথাও হয় নাই। যুদ্ধের সুযোগে রুশিয়া ও বুল্‌গেরিয়াতে যে বিপ্লব ঘটে তাহাতে এই দুই দেশে সাম্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। দুইটি দেশে প্রায় একই সময়ে সাম্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইলেও দুইটির মধ্যে আকৃতি- ও প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে বিস্তর।

রুশ সাম্যবাদীগণ রক্তপাতের মন্ত্রে দীক্ষিত। বাহুবলে নিজমত জগতে প্রচার করিবার জন্য ইঁহারা বদ্ধপরিকর। এইজন্য ইঁহারা রক্তের দল (Reds) বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের বিজয়-কেতনও রক্তবর্ণে রঞ্জিত। তাই পৃথিবীর নানা স্থানে রক্তাপতাকা সাম্যবাদের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে।

বুল্‌গেরিয়ার সাম্যবাদীরা কিন্তু শান্তিপ্রয়াসী। আপনাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া শান্তভাবে রাষ্ট্রবিপ্লব আনয়ন করিয়া রাষ্ট্রীয় প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে ইঁহারা অভিলাষী। এই দলের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। রুশিয়ার বল্‌শেভিক সম্প্রদায়ের প্রধান ভরসা যেমন সৈন্যদল, ইঁহাদের প্রধান ভরসা তেমনই কৃষাণকুল। সেইজন্য ইঁহারা সবুজ দল (Greens) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের নেতা স্টাম্বুলেস্কিও কৃষাণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বুল্‌গেরিয়া যখন বিশ্বযুদ্ধে জার্ম্মানীর সহায়তা করিতে উদ্যোগী হন তখন স্টাম্বুলেস্কি তাহার বিপক্ষতা করাতে কারাগারে অবরুদ্ধ হন। সেইজন্য যুদ্ধশেষে স্টাম্বুলেস্কি জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। যুদ্ধের অল্পদিন পরেই বিনা রক্তপাতে বুল্‌গেরিয়াতে একটি ক্ষুদ্র বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং তাহার ফলে সবুজ দলের প্রতি দেশশাসনের ভার অর্পিত হয়। স্টাম্বুলেস্কি প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত বুল্‌গেরিয়ার ভাগ্যচক্র নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকেন। গণতান্ত্রিক অনেকগুলি সংস্কার-কার্য্য অতি অল্পদিনের মধ্যেই সম্ভব করিয়া তোলাতে স্টাম্বুলেস্কি মন্ত্রীসভা খুব প্রতাপশালী হইয়া উঠেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায় এই যে

যাঁহাদের সাধনায় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভবপর হয়, সিদ্ধিলাভের পর তাঁহারাই গণ-মতকে উপেক্ষা করিয়া স্বয়ংপ্রভু হইয়া বসেন। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই এইরূপ স্বয়ংপ্রভুতার প্রয়োজন বলিয়া ইঁহারা ঘোষণা করিতে দ্বিধান্বিত হন না। বুলগেরিয়াতেও স্তাম্বুলেস্কি অত্যন্ত ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া উঠেন। জার্ম্মানীর সহিত যাঁহারা যোগ রাখিতে চাহেন তাঁহাদের স্তাম্বুলেস্কি নানা প্রকারে নির্য্যাতিত করিতেও ছাড়েন নাই। অন্যদিকে সাম্যবাদী দলের মধ্যে যাঁহারা সবুজ দলের মত না মানিয়া বল্‌শেভিকদিগের অনুরাগী হইয়া উঠেন তাঁহাদিগকে মানসিক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক (moral lepers) বলিয়া ঘোষণা করিয়া স্তাম্বুলেস্কি এক ইস্তাহার জারি করিলেন এবং নিয়ম হইল এই যে তাঁহারা নগর-মধ্যে বাস করিতে পারিবেন না। নগর-প্রান্তে তাঁহাদের আস্তানা থাকিবে। সহরের মধ্যে যদি কাহারও ভূসম্পত্তি থাকিয়া থাকে তবে তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। এই-সব নানা কারণে সবুজ দল ক্রমশই দেশবাসীর অপ্রিয় হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের হিতকার্য্যগুলির কথা লোকেরা ভুলিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় স্তাম্বুলেস্কি একটি মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। যুগোশ্লাভিয়াকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি ম্যাসিডোনিয়া-বাসীর স্বসংকল্পের ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করিয়া যুগোশ্লাভিয়ার খবরদারীর পোষকতা করিতে লাগিলেন। সুযোগ বুঝিয়া জার্ম্মান-অনুরাগী দল ম্যাসিডোনিয়ার সহায়ক হইয়া উঠিলেন। দেশের জনসাধারণ ও সৈন্যদল তাহাতে এই দলের সহায় হইয়া উঠে। ফলে একটি ছোট-খাট বিপ্লব ঘটিয়া স্তাম্বুলেস্কি মন্ত্রীসভার পতন হইয়াছে এবং জার্ম্মান-অনুরাগী দলের জাঙ্কফ প্রধান-মন্ত্রীর পদ অধিকার করিয়া দেশ-শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্তাম্বুলেস্কি পলাইয়া গিয়া পণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে এইরূপ একটি যুদ্ধে স্তাম্বুলেস্কি নিহত হইয়াছেন।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা

বাংলাদেশের নিম্নশিক্ষা—

নিম্নশিক্ষার অবস্থা।—১৯১১ খৃঃ অব্দে মহামতি গোখলে ভারতে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক নিম্ন-শিক্ষা প্রচলনের জন্য এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেকালের গবর্মেণ্ট-শাসিত ব্যবস্থাপক সভা তাহা কাজে পরিণত করিতে দেন নাই। তাঁহাদের আপত্তি ছিল এই—ভারতের প্রায় সমস্ত লোকই নিরক্ষর, সুতরাং এখন বাধ্যতামূলক নিম্ন-শিক্ষার প্রচলনের আইন করিলে জনসাধারণের বিরাগ-ভাজন হইতে হইবে, আইনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে। অতএব এখন প্রচুর টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া গ্রাম্য পাঠশালার বহুল প্রচলন করা হউক ; যখন লেখাপড়াজানা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, তখন এই আইন করিলে কাজ হইবে। তারপর ১৯১২ অব্দে মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জ যখন ভারতে আসিলেন, তিনি কলিকাতায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "ভারতের শিক্ষার উন্নতি আমি চিরদিনই অন্তরের সহিত কামনা করিতে থাকিব"। এই কথার পর বঙ্গে নিম্ন শিক্ষা কত দূর অগ্রসর হইয়াছে নিম্নলিখিত তালিকা দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইতেছে :—

	১৯১৫—১৬	১৯২০—২১
প্রাইমারী বালক স্কুল	৩১৬১৭	৩৫৭০৪
বালিকা স্কুল	৮৭৯৯	১২৬৯
প্রাইমারী স্কুলে ছাত্র সংখ্যা—		
বালক	১০,৬৭,৭৮২	১১,২৭,৯১
বালিকা	২৫৯৬৪০	৩২৯৭৫৪

পুরুষের সংখ্যার তুলনায় শতকরা কত বালক অধ্যয়ন করে—
৬ ৪ ৬·৬

স্ত্রীলোকের সংখ্যার তুলনায় শতকরা কত বালিকা অধ্যয়ন করে—
১·২ ১·৬

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যায় গত ৫ বৎসরে বালক শতকরা ·২ ও বালিকা শতকরা ·৪ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই হিসাবে যদি আমাদের শিক্ষার উন্নতি হইতে থাকে তবে সমস্ত দেশ শিক্ষিত হইতে বহুশত বৎসর আবশ্যক হইবে।

নিম্নশিক্ষা বিস্তারের জন্য বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভা ১৯১৯ সনে এক আইন প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ আইনে ৬ হইতে ১১ বৎসরের বালকের স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার নিয়ম প্রণীত হইয়াছে। বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যয় বহনের জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে ভার দেওয়া হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি শিক্ষা-কর স্থাপন করতঃ নিজ এলেকার শিক্ষাভার পাইয়াছে। কিন্তু লোক বিগড়াইবে ভাবিয়া মিউনিসিপ্যালিটি তাহা করিতেছে না। আবার আইনে গভর্মেণ্টকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই যদ্দ্বারা গভর্মেণ্ট কোন মিউনিসিপালিটিকে শিক্ষা-কর স্থাপনের জন্য বাধ্য করিতে পারেন। অতএব ঐ আইনের দ্বারা দেশে শিক্ষার উন্নতি হয় নাই।

বোম্বাইতে সম্প্রতি এই নিম্ন শিক্ষা বিস্তার-কল্পে এক আইন হইয়াছে। তাহাতে কোন মিউনিসিপ্যালিটি ইচ্ছা করুক আর না-ই করুক যদি গবর্মেণ্ট বুঝেন যে এই স্থানে নিম্ন-শিক্ষা-বিস্তার আবশ্যক, তবে মিউনিসিপ্যালিটিকে কর স্থাপন করতঃ প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে বাধ্য করিতে পারেন। ঐ আইনে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, কোন্ স্থানে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার করা আবশ্যক তাহা গবর্মেণ্ট স্থির করিয়া দিবেন। যদি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হয়, তবে তাহাতে এককালীন ও বার্ষিক যাহা ব্যয় হইবে, তাহার অর্দ্ধাংশ এবং জেলা বোর্ডের এলাকায় হইলে তাহার দুই-তৃতীয়াংশ গবর্মেণ্ট দান করিবেন।

বাঙ্গলা গভর্মেণ্টও শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি কতিপয় দেশহিতকর-কার্য্য বাঙ্গালার মন্ত্রীগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা যদি ঠিক এই ভাবে আপন দেশের মঙ্গলের জন্য উঠিয়া পড়িয়া না লাগেন তবে দেশের উন্নতি সুদূরপরাহত।

— নোয়াখালী-হিতৈষী

বাংলার শিশু-মৃত্যু—

আমার দেশ।

(সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত)

বঙ্গে শিশু-মৃত্যু।

বিভাগ			প্রতি সহস্রের মধ্যে মৃত্যুর হার
বর্দ্ধমান	...	...	২২০
প্রেসিডেন্সি	...	...	২১৮
রাজসাহী	...	...	২১০
ঢাকা	...	...	২০৬
চট্টগ্রাম	...	...	১৪৯

শিশু-মৃত্যুর শতকরা হার।

বিভাগ	এক মাসের অনধিক বয়স	ছয় মাসের অনধিক বয়স	৬ হইতে ১২ মাস বয়স
বর্দ্ধমান	৫১'৮	৩৬'৯	২১ ২
প্রেসিডেন্সি	৪০	৩৭ ৮	২২'১
রাজসাহী	৩৫'৪	৩৫'৫	২৪ ১
ঢাকা	৩৫ ৮	৪৫ ৮	১৯
চট্টগ্রাম	৩৫ ২	৪২ [illegible]	২১ ৮

উপরের তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে শিশুগণের মৃত্যু কম, কারণ তথাকার জনসাধারণের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগ তত বেশী নাই। বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী হওয়ায় তথাকার শিশু-মৃত্যুর হার বেশী।

তালিকা হইতে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে জন্মের কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিশুর মৃত্যু হয় এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে তাহা হয় না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া শিশুর মাতা রুগ্ন থাকে এবং তাহাতে শিশুর জন্মের সময়ে দৌর্ব্বল্যের আধিক্য হয় এবং তজ্জন্যই শিশুগণের মধ্যে মৃত্যুর হার এত বেশী হয়।

সহরে শিশু-মৃত্যু।

সহর	প্রতি সহস্রে মৃত্যুর হার
কলিকাতা	৩৩১
নদীয়া	২৫
বীরভূম	২৪৬
রাজসাহী	২৪৫
বর্দ্ধমান	২৩৭
বাঁকুড়া	২৩৯
দিনাজপুর	২২৭
ফরিদপুর	২২৭
বগুড়া	২২৪
ত্রিপুরা	১৩৩

১ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে মৃত্যুর হার

বিভাগ	প্রতি শতে বালক	প্রতি শতে বালিকা
বর্দ্ধমান	১৯ ৪	১৯ ২
প্রেসিডেন্সি	২৪ ৩	২৪'
রাজসাহী	২৭ ৪	২৬ ৫
ঢাকা	৩০'৩	২৮ ৪
চট্টগ্রাম	২৮ ২	২৮ ৪

বঙ্গে জন্মসংখ্যার হ্রাস।

সাল	জন্মসংখ্যা
১৯১৭	১৬,২৭,৮৭৩
১৯১৮	১৪,৮৯,১৩৫
১৯১৯	১২,৪৫,৩৯২
১৯২০	১৩,৫৯,৯১৩
১৯২১	১০,০১০০১

দশ জনের জন্ম, সাত জনের মৃত্যু।

মুর্শিদাবাদ জেলায় জন্মের তালিকা নির্ভুল রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার ফলে দেখা গিয়াছে, শিশু-মৃত্যুর হার প্রতি সহস্রে ২০১ হইতে ২০২ পর্য্যন্ত হয়। এমনও দেখা গিয়াছে যে কোন গ্রামে

অধিবাসীর সংখ্যা ৫ হাজার,
শিশুমৃত্যু প্রতি সহস্রে ৭ শত।

ভয়াবহ শিশু-মৃত্যুর হার।

	প্রতি শত শিশুর জন্মের ৪ সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুর হার	জন্মের ৬ মাসের মধ্যে অবশিষ্ট শিশুগণের প্রতি শতের মধ্যে মৃত্যুর হার
মুর্শিদাবাদে	৬১ জন	৮০ জন
কলিকাতায়	৫০ ৬	৭৬ ৮ জন
সমগ্র বঙ্গে	৪০ ১	৬২'০ জন

ইংলণ্ডে প্রতি সহস্রে ৮০ জন।

শিশুমৃত্যুর কারণ।

	শতকরা
দৌর্ব্বল্য	৫০ জন
ধনুষ্টঙ্কার	১১'৪ জন

অর্থাৎ সমস্ত বঙ্গে ৩০ হাজার শিশু মরে ধনুষ্টঙ্কার রোগে। এই রোগ হয় কেবল অপরিষ্কারের জন্য। কেবল অজ্ঞ ও অপরিষ্কার ধাত্রীই ইহার জন্য দায়ী। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিলে এই রোগ হয় না।

—বাঁকুড়া-দর্পণ

কুষ্ঠ-রোগের প্রতিকার—

পৃথিবীতে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা মোটামুটি ৩০ লক্ষ বলিয়া ধরা হইয়াছে। চীন দেশেই কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব অধিক; তন্নিম্নে আফ্রিকা, তন্নিম্নে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে ১ লক্ষ কুষ্ঠ-রোগী আছে, চীনে দশ লক্ষ, আফ্রিকায় চীনের অর্দ্ধেক। এই কুষ্ঠ ব্যাধির প্রতিকার চেষ্টায় ষ্ট্রসবার্গে এক আন্তর্জাতিক প্রতিকার-সমিতির অধিবেশন হইবে। স্যার লিওনার্ড রজার্স বলেন যে ইহার চিকিৎসার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তবে যদি উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ-সাহায্য পাওয়া যায় তাহা হইলেও এই ব্যাধি নির্ম্মূল করিবার জন্য ৩০ বৎসর সময় লাগিবে। ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহা ঠিক নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহা অপেক্ষা এই রোগগ্রস্ত লোকের সংখ্যা অনেক অধিক। যাহারা অত্যধিক ক্ষতগ্রস্ত ও অঙ্গহীন ব্যক্তি তাহারাই লোকগণনার সময় এই ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া লিপিবদ্ধ হয়। আমরা জানি বাঁকুড়া জেলার বহু লোক এই পীড়া লুকাইয়া রাখিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে। বিজ্ঞান দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানও বহু উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। দাতাগণের ইচ্ছায় অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হইলেও যে এই রোগ ৩০ বৎসরের মধ্যে বিতাড়িত হইবে সে আশা এখনও সকলের মনে বদ্ধমূল হইতেছে না।

এই রোগের প্রসার নিবারণের একটি উপায় আছে। এ ব্যাধি অত্যন্ত সংক্রামক। এই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির নিশ্বাসে সহস্র সহস্র বীজাণু ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে জন-সমাজে মিশিতে না দিলে এই রোগীর সংখ্যা আর অধিক বৃদ্ধি হইবে না। আমাদের সমাজ এখন নিতান্ত দুর্ব্বল আর পল্লীগ্রামের সমাজের নেতাদের বাড়ীতেও অনেক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা

সকল জলাশয়েরই জল দূষিত করিয়া থাকে। গ্রামের তালুকদার বা মণ্ডলগণের পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিকে নিষেধ করা দরিদ্র প্রজাসাধারণের সাধ্যাতীত। যদি বা কেহ নির্য্যাতনের ভয় উপেক্ষা করিয়া স্পষ্ট কথায় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির স্নানের জন্য পৃথক্ পুষ্করিণী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে বলেন তাহা হইলেও তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যে পরিণত হয় না। আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়া এবিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছি কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকল লোকেই আমাদিগকে বলিয়াছেন যে এসম্বন্ধে সরকার হইতে একটি আইন প্রবর্ত্তিত না হইলে এই সংক্রামক পীড়া দিন দিন প্রসারিত হইবে। আর প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই হইতেছে।

কি আইন চাই—

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুকগণ সর্ব্বত্র ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিতে না পারিলে এই ব্যাধির প্রসার কমিবে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। এইসকল ভিক্ষুককে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে পাঠাইবার আইন আছে এবং আদালত সেগুলিকে কুষ্ঠাশ্রমে পাঠাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু সেই ভিক্ষুকগণ কুষ্ঠাশ্রমে থাকিতে চায় না। ভিক্ষায় তাহাদের আয় বেশী; তাই তাহারা কুষ্ঠাশ্রম হইতে পলাইয়া আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। কুষ্ঠাশ্রমটি জেলখানা নয়, কাজেই কুষ্ঠাশ্রমের পরিচালকগণ তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিতে পারেন না। যদি এইরূপ একটি আইন হয় যে তাহাদিগকে জোর করিয়া আটক রাখিতেই হইবে তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় এই সংক্রামক ব্যাধির প্রসারের অনেকটা লাঘব হইতে পারে। আমরা আইনসভার সভ্যগণের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার উপায় চিন্তা করুন, ইহাই প্রার্থনা। —বাঁকুড়া-দর্পণ

মহিলা-শিল্পাশ্রম—

বাংলার মেয়েরা শুধু অবলাই নন, অসহায়াও বটে। এমন অবস্থায় দুর্দ্দিনে পড়্‌লে তাঁরা চারিদিকে শুধু আঁধারই দেখেন। দেশে দু'চারটি মাত্র অনুষ্ঠান আছে যা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরে' সেই দুঃসময়ে মেয়েদের সাহায্য করে। আমরা এম্‌নি একটি অনুষ্ঠানের পরিচয় পেয়েছি। আমরা নীচে তা প্রকাশ করলুম:—

৫৫নং গরিয়াহাটা রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন মহিলা-শিল্পাশ্রমের সমস্ত ভার শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর হাতে দিয়া তাঁহাকে যুক্ত-সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইল। ১লা আষাঢ় হইতে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী গ্রীষ্মাবকাশের পর নব উদ্যোগে মহিলা-শিল্পাশ্রমের সংলগ্ন বিধবাশ্রম বিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাস খুলিতেছেন। যে-কোন ভদ্রগৃহস্থের সধবা, বিধবা বা কুমারীকন্যাগণ এইস্থানে ছাত্রী-নিবাসে থাকিয়া লেখাপড়া করিতে ইচ্ছুক তিনি সে বিষয়ের সুচারুরূপে বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

ইংরেজী, বাংলা, অঙ্ক, সংস্কৃত, শিল্প, কাট-ছাঁট ও সৌখীন শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাহার উপর যিনি গান, সেতার, এস্রাজ এবং চিত্রকলা শিখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার জন্য সে ব্যবস্থাও থাকিবে।

দরিদ্র নিরাশ্রয় বিধবাদিগের জন্য কয়েকটি বৃত্তি দেওয়া হইবে। যাঁহারা বৃত্তিভোগিনী হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সম্পাদিকার নিকট পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। শিক্ষয়িত্রী বা কলেজের ছাত্রীগণ যদি ছাত্রীনিবাসে থাকিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় আবেদন করিবেন।

ঠিকানা—"তারাবাস", ৪৬ নং ঝাউতলা রোড,
পোঃ আঃ বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

—বিজলী

বাংলায় ডাকাতি—

১লা জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশে মোট ৩৮টি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বীরভূম, দিনাজপুর ময়মনসিংহ এবং পাবনার একটি করিয়া; বগুড়া, মালদহ, রাজসাহী ফরিদপুর, ঢাকা এবং ত্রিপুরার দুইটি করিয়া; নদীয়া জলপাইগুড়ি এবং বাখরগঞ্জে তিনটি করিয়া এবং চব্বিশ পরগণা ও বর্দ্ধমানে ৪টি করিয়া ডাকাতি হইয়াছে। —জ্যোতিঃ

খদ্দর—

বাংলায় খদ্দর তৈয়ারীর সুবিধার জন্য নিখিল ভারত খদ্দর বিভাগ ৫০ হাজার টাকা তিন বৎসরের জন্য বিনা সুদে ধার দিতে রাজি হইয়াছেন। স্বদেশী-সংসৎ অনুমোদন করিলে খদ্দরপ্রস্তুতকারীগণ ঐ টাকা হইতে ধার পাইতে পারিবেন। যাঁহারা টাকা নিবেন তাঁহারা সৎলোক ও কর্ম্মকুশল হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা মাসিক অন্যূন ২০০৲ টাকা মূল্যের খদ্দর প্রস্তুত করেন না, তাঁহারা ধার পাইবেন না। অর্দ্ধ-খদ্দর প্রস্তুত করিবার জন্যও টাকা ধার দেওয়া হইবে না। —সোনার বাংলা

মুসলমান অনাথ-আশ্রম—

কলিকাতা সহরে নিরাশ্রয় মুসলমান বালকগণের একমাত্র আশ্রয়-স্থল "এতিমখানা" ভূপতিত হইয়া ৪৩টি অনাথ বালক ইহলীলা সম্বরণ করিল, ১০।১৫টি বালক একেবারে বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িল এবং ৩০।৩৫টি বালক অল্লাধিক আহত হইল—এই শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে? —আনন্দপত্রিকা

দান—

বাবু অটলবিহারী মৈত্র এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলে মিলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৬০০০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। টেক্‌নোলজিক্যাল এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিদ্যার বিস্তারের জন্যই এই দান। যিনি ভারতে কিম্বা ভারতের বাহিরে টেক্‌নোল-জিক্যাল বা তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকে সম্পত্তির আয় হইতে বৃত্তি দেওয়া হইবে। —খুলনা

সৎকার্য্য—

গরীব ছাত্রদের সাহায্য।—৩৭নং বেনেটোলা ষ্ট্রীটের মিঃ শ্রীশচন্দ্র দত্ত তাঁহার পরলোকগত কন্যা বিপুলা দত্তের স্মৃতিরক্ষাকল্পে মফঃস্বলের অধিবাসী ও কলিকাতায় থাকিয়া দুই বৎসর কলিকাতার কোনও কলেজে পড়িতে ইচ্ছুক ৫ জন গরীব ছাত্রকে বিনা ব্যয়ে বাসস্থান ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। ৭নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে মিঃ ললিতমোহন পাল, বি-এস্‌সি মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। বি এন চৌধুরী, বি-এ, ডি-এস্‌সি, ও রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু আবেদনকারীদের দরখাস্ত সম্বন্ধে বিচার করিবেন। —স্বরাজ

পুলিসের অত্যাচার—

চরমানাইরে ভীষণ কাণ্ড।—ফরিদপুর জেলার এলাকাধীন চরমানাইর গ্রামে ডাকাতি-প্রসঙ্গে শিবচর থানার পুলিশকে গ্রামবাসীরা ডাকাত সন্দেহে লাঞ্ছিত করা এবং তৎপর চতুর্দ্দিক্ হইতে পুলিশ ফৌজ যাইয়া উক্ত গ্রামের নরনারীর প্রতি যে ভীষণ ও লোমহর্ষণ অত্যাচার এবং স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ করার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং ফরিদপুরে কংগ্রেস কমিটির তদন্ত বিভাগের ৭ জন সম্ভ্রান্ত সদস্য ব্যক্তির রিপোর্ট-মতে তাহা সত্য ঘটনা বলিয়া যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, বাস্তবিক আমাদের পক্ষে তাহা স্বপ্ন-কাহিনী বলিয়াই মনে হয়।

গ্রামবাসীরা যদি অন্যায়ভাবে পুলিশের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে এবং সেটা তাহাদের জ্ঞানকৃত অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হয় তবে তাহাদিগকে যথা-নিয়মে অভিযুক্ত করিয়া দণ্ডিত করিলে কাহারো কিছু বলিবার অধিকার থাকিত না। কিন্তু কয়েকজন দোষী ব্যক্তির জন্য যে সমগ্র গ্রামবাসী স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি অত্যাচার করা হইবে, ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরমার করা ও কিশোরী যুবতী ও প্রৌঢ়াদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করার কোন হেতু হইতে পারে মানুষে তাহা কল্পনায় আনিতে পারে না। শুনিতেছি একটি সরকারী তদন্ত চলিতেছে; তদন্ত-কমিটি কি কংগ্রেস-তদন্তকারী সদস্যদিগকে শামেল করিয়া তদন্ত করিতে প্রস্তুত হইবেন?

—ছোলতান

কংগ্রেস শিক্ষাপরিষৎ—

কংগ্রেস শিক্ষাপরিষৎ নিম্নলিখিত স্কুলসমূহে অর্থসাহায্য করিয়াছেন:—

ইদিলপুর (ফরিদপুর) ৩০০৲ বানরী (ঢাকা) ২০০৲ ফুরসাইল (ঢাকা) ১৫০৲ টাঙ্গিবাড়ী (ঢাকা) ২০০৲ হান্সারা (ঢাকা) ২০০৲ সানিহাটি (ঢাকা) ২০০৲ ময়মনসিংহ (সদর) ২০০৲ মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) ২০০৲ বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) ২০০৲ কলাগাছিয়া (মেদিনীপুর) ২০০৲ কাঁথি (মেদিনীপুর) ২০০৲ হাজীগঞ্জ (ত্রিপুরা) ২০০৲ ফিরোজপুর (বরিশাল) ২০০৲ চন্দ্রহার (বরিশাল) ২০০৲ রাজনগর (শ্রীহট্ট) ২০০৲ মোট ৩২০০৲।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
—বন্দেমাতরম্

গ্রামের স্বাস্থ্য—

বঙ্গদেশে ৮৪৭৪৮ খানা গ্রাম আছে তন্মধ্যে বৎসরে গড়ে ১১৫৯২ খানা গ্রামে কলেরা দেবীর আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং উক্ত রোগে বৎসরে ৪২৩৯৩ জন পুরুষ এবং ৩৮১৫৪ জন স্ত্রীলোক মোট ৮০৫৪৭ জনের মৃত্যু হইয়া থাকে, কি ভীষণ! গ্রামে গ্রামে জলকষ্টই ইহার অন্যতম কারণ নহে কি?　　—যশোহর

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্যোগে ও আয়োজনে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে নৈহাটীতে সম্পন্ন হইয়া গেল। এই সম্মিলনে আয়োজনও হইয়াছিল বিপুল, লোক-সমাগমও হইয়াছিল অনন্যসাধারণ। বোধ হয় সভামণ্ডপে ছয় হাজার লোকের কম হয় নাই; ঠিক বেলা দ্বিপ্রহরেই সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। এই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মাননীয় শ্রীযুত স্যার্ বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর। তাঁহার অভিভাষণটিও অতি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তিনি একটি কাজের কথা বলিয়াছেন। সেটি এই—"এইরূপ বাৎসরিক সম্মিলন সজাগ রাখাই যদি আমাদের অভিপ্রেত হয়, বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর প্রাণকে সজীব করাই যদি আপনাদের তপ জপ ও ব্রত হয়, তবে যাহাতে তাহার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়, তাহাই করা কর্ত্তব্য।

আমি চাই যে আমাদের এই দরিদ্র দেশে নোবেল প্রাইজের মত সাহিত্যিকগণের উৎসাহবর্দ্ধন জন্য কোন পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর না হইলেও প্রতি বৎসর চারি সহস্র মুদ্রা পরিমিত বা তদ্রূপ কোন পুরস্কারের আয়োজন করা নিতান্ত অসম্ভবপর হইবে না। এই পুরস্কার প্রয়োজন অনুসারে চারি বা ততোধিক সাহিত্য-শাখার বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি। বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া লইয়া এই চারিটি শাখার পুরস্কার কোন্ চারিজনকে দেওয়া হইবে, তাহা এই সমিতির দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।" প্রস্তাব অতিসুন্দর।

মহারাজাধিরাজ আরও কয়েকটি কাজের কথা বলিয়াছেন। আমরা তাহাও সাধারণকে, বিশেষতঃ সাহিত্যিকদিগকে, ভাবিয়া দেখিতে বলি। সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার রূপান্তর ও ভাবান্তর স্বতঃই সাধিত হয়, পরিষদের কর্ত্তব্য, সম্মিলনের কর্ত্তব্য তাহার মন্থরগতি বেগসংযুক্ত করা এবং উচ্ছৃঙ্খল গতি রোধ করা। কিরূপে এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহার ইঙ্গিত প্রদান করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য নহে। সাহিত্য পরিষৎই তাহা অন্যান্য সাহিত্য প্রচার সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া করিতে পারেন। আশা করি সাহিত্য-পরিষৎ এই দিকে দৃষ্টি প্রদান করিবেন।

সভাপতির অভিভাষণের পর সঙ্গীতাদি হয়, পরে সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে হাসির কথা ছিল, রসের কথা ছিল, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও কিছু ছিল, কিন্তু তাঁহার অভিভাষণ মুদ্রিত না হওয়ায় উহার আলোচনা করা অসুবিধাজনক হইয়াছে। তৎপরে ইতিহাসশাখার সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম্-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয় তাহার অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন। এই সময় শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাস্থ হন। তিনি এই সময়ে সভাপতির অনুরোধে এক বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপরে ডাক্তার লাহা তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। ইঁহার মুদ্রিত অভিভাষণ প্রায় ৬৫ পৃষ্ঠাব্যাপী। উহাতে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় আছে। তাহার পর দর্শন-শাখার সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় বক্তৃতা করেন। তাঁহার অভিভাষণ সম্পূর্ণ ছাপা হয় নাই, কাজেই তাহার আলোচনা অসম্ভব। তবে তিনি অতি সুন্দর ও সহজ-বোধ্য ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের জটিল কথাগুলি যেরূপ সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উপসংহারে তিনি গীতায় বেদের প্রতি আক্ষেপ আছে, এই উক্তির প্রতিবাদ করেন। তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রগাঢ় পরিচয় পাওয়া যায়। শেষে বিজ্ঞানশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পড়েন। ইহাতেও অনেক কাজের কথা ছিল। ইনি বলেন—"কেবল দেশের বালকবালিকাদের বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। শ্রমজীবী, চাষী, ব্যবসায়ী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত বয়স্ক লোকেরাও যাহাতে বিজ্ঞানের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে এবং বিজ্ঞানের নূতন খবরগুলি জানিতে পারে, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন।"

ফলে সম্মিলন সুন্দর হইয়াছে। লোকজনের আদর-আপ্যায়নেরও ত্রুটি হয় নাই। শাস্ত্রী-মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত আশুতোষ-বাবু সকলকে বিশেষভাবে পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। ভলান্টিয়ারেরা নানা কারণে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

—নবযুগ

আবেদন—

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গবাসী মাত্রেই অবগত আছেন যে, নর্ম্মদা মার্ব্বেল পাহাড়ের নিকট জব্বলপুর দুর্গ সন্নিকটে অমর বক্তা স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম হয়। হুগলী জেলার পল্লান ষ্টেশনের নিকট তাঁহার পৈত্রিক ভবন ছিল। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার বিশেষ লোকহিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের স্থান কলিকাতা। তাঁহার মিশনারী বন্ধুগণ বিডন উদ্যানে তাঁহার স্মরণার্থ একটি ট্যাব্‌লেট ও বসিবার স্থান স্থাপন করিয়াছেন,

কিন্তু তাঁহার হিন্দু ও খৃষ্টান ও অন্যান্যজাতীয় বন্ধুগণ আত্মীয় ও ছাত্রগণ তাঁহার দেহান্তের পর তাঁহার মেমোরিয়াল হল্ স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু মাত্র দুই তিন হাজার টাকা সংগ্রহ হয়। এখন কালীচরণের হিন্দু ও খৃষ্টান আত্মীয়গণ, তাঁহার বিপুল ছাত্রবৃন্দ ও তাঁহার বন্ধুবর্গের ইচ্ছা যে কলিকাতায় কালীচরণ স্মৃতি-মন্দির (Church of India) নির্ম্মাণ হয়। যন্মধ্যে একটি শিক্ষাভবন জব্বলপুরে একটি ট্যাবলেট, স্থাপন করিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষা হয়। এই শুভ-কার্য্যের সাহায্যের জন্য অনুমান ৫০০০০৲ খরচ হইবে তন্মধ্যে ১০৲ করিয়া ৫০০০৲ দাতব্য অংশ (Charity Shares) গ্রহণ করা যাইবে। অনুমান ১০০০০৲ টাকার অংশ উঠিয়াছে। ভারতের কেন্দ্রস্থল লক্ষ্ণৌ নগরে একটি অস্থায়ী কার্য্যালয় ভাড়া লইয়া বাকি সাহায্য-অংশের সংগ্রহ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কালীচরণের গুণগ্রাহী আত্মীয়স্বজন ছাত্র ছাত্রী বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার স্মৃতি এখনও মনে পোষণ করিতেছেন এবং এই কার্য্যে সাহায্যদানে নিজেদের যাঁহারা কৃতকৃতার্থ মনে করেন, কেবল তাঁহারাই যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রদ্বারা জানান যে কতটা পরিমাণে তাঁহারা সাহায্য করিতে পাবেন।

নিবেদক সম্পাদক
শ্রী মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়
পীরজলিল, লক্ষ্ণৌ

যমের খাতা—

গত ৫ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে সমগ্র ভারতে মৃত্যু সংখ্যা ৪৮২৮, তন্মধ্যে বঙ্গদেশে ৪৭৪। এই মৃত্যুর হার অন্যান্য দেশাপেক্ষা অধিক। বাঙ্গালী যে ধ্বংসের পথে।

—হিন্দুরঞ্জিকা

যশোহর জেলায় আত্মহত্যা—

যশোহর জেলায় আত্মহত্যা রোগ বড়ই সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তথায় ১১২ জন আত্মহত্যা করিয়াছে। আত্মঘাতী-দিগের মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগ স্ত্রীলোক। যাহা হউক, এই ব্যাপারটা সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে। সকলেই জানেন যে যশোহর জেলার স্বাস্থ্য বড় ভাল নহে, এই জেলাতেই প্রথমে ম্যালেরিয়া জ্বর আত্মপ্রকাশ করে। কলেরার জন্মও এই জেলার একটি মেলায়। রোগে শোকে ও দারিদ্র্যে এই জেলার লোক অতিশয় উৎপীড়িত। কাজেই এ জেলার লোক যে অধিকসংখ্যক আত্মহত্যা করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কিছুই নাই। অভাবগ্রস্ত লোক সকল পাপই করিতে পারে।

—নবযুগ

বাঙ্গালী মহিলার বীরত্ব—

গত ২৮শে জুন কুমারী মিত্র নাম্নি জনৈক বাঙ্গালী মহিলা কৃষ্ণনগর প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যাইতেছিলেন। নৈহাটী ষ্টেশন পরিত্যাগ করিবার পর তাঁহার কামরায় যে দুইটি গোরা ছিল তাহারা তাঁহার চশ্মা খুলিয়া লয় এবং মহিলাটির ব্যাগ লইয়া পলাইবার চেষ্টা করে। মহিলাটি বিপৎসূচক শিকল ধরিয়া টান দেওয়া মাত্র গোরা দুইটি ট্রেন্ হইতে লাফাইয়া পড়ে। মহিলাটিও তাহাদের পিছু পিছু গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলেন। বারাকপুর ক্যান্টনমেণ্ট-আদালতে গোরা দুইটির বিচার হইবে। প্রকাশ যে আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে মাত্র চুরির অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

শোক-সংবাদ—

গত ৯ই আষাঢ়, রবিবার, রাত্রি আট ঘটিকার সময় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। পণ্ডিত উমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন প্রকৃত জ্ঞানবান্ পুরুষ হারাইল। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, বৈদিক সাহিত্যে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত শুধু বাংলায় নহে, ভারতে আর দ্বিতীয় ছিল না বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হয় না। "মানবের আদি জন্মভূমি" ও "জাতি-তত্ত্ববারিধি" প্রভৃতি পুস্তকে তিনি যে গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতবর্গের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। পরলোকগত বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল "মন্দারমালা" নামে একখানা উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র পরিচালন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স আশী বৎসর হইয়াছিল— আজীবন তিনি দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া সাহিত্যচর্চ্চায় মগ্ন ছিলেন। আমরা তাহার পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সান্ত্বনা কামনা করি।

—যুগবার্ত্তা

জাতীয় উন্নতির কথা—

আজ দেশের চারিদিক্ হইতে আমরা হিন্দু-জাতির ক্লৈব্য ও অক্ষমতায় যে সব কাহিনী শুনিতে পাইতেছি, তাহা ঘোর জড়তা ও তামসিকতার লক্ষণ। জাতি একেবারে ধ্বংসের শেষ ধাপে না নামিলে এমন জড়তার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। দুর্ব্বৃত্তেরা হিন্দুর দেব-বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া দিতেছে, হিন্দু তাহা নির্বিকার চিত্তে দেখিতেছে, তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না, গুণ্ডারা হিন্দু বালিকাকে গভীর নিশীথে জোর করিয়া মায়ের নিকট ও স্বামীর কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে, সেই রোরুদ্যমানা হতভাগিনীকে কোন হিন্দু উদ্ধার করিতে পারিতেছে না; বদমাইসেরা অবলা হিন্দু নারীর সতীত্ব নষ্ট করিতেছে, কিন্তু তাহাদের স্বামী-পুত্র অক্ষম নিরুপায় মেষ-শাবকের মত তাহা নীরবে সহ্য করিতেছে; অ-বাঙ্গালী গুণ্ডারা নিরীহ, দুর্ব্বল হিন্দুর উপর অত্যাচার করিতেছে, তাহার জাতভাইয়েরা দর্শকের ভূমিকায় তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, হয় ত বা হাস্যপরিহাসও করিতেছে।

এই ক্লৈব্য, এই জড়তা কেবল দৈহিক দুর্ব্বলতার ফল নয়, আত্মার দীনতাও ইহাতে সূচিত হইতেছে। মনুষ্যত্বের মূল উপাদান যে বীর্য্য ও চরিত্র, হিন্দুর মধ্যে তাহা ক্রমশঃই লোপ পাইতেছে। বাঙ্গালীর বীর্য্যহীনতা ও চরিত্রহীনতাই তাহার ধ্বংসের প্রধান কারণ।

বাঙ্গালী হিন্দুর—তথা ভারতের সর্ব্ব-প্রদেশের হিন্দুর দ্বিতীয় দোষ —তাহাদের সঙ্ঘশক্তি নাই; আর যে জাতির মধ্যে সঙ্ঘশক্তির অভাব ঘটে, জাতিহিসাবে কখনই তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হউন—শক্তির আবাহন করুন, চরিত্রের দৃঢ়তা ও বীর্য্যের সাধনা করুন। হিন্দুজাতির আত্ম-রক্ষার ইহাই একমাত্র পন্থা; ভারতের মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত মিলনের ইহাই ভিত্তি। প্রবল ও সঙ্ঘবদ্ধ জাতির সঙ্গে—দুর্ব্বল ও বিশৃঙ্খল জাতির মিলন কখনই হইতে পারে না।

নব্য জাপানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কাউণ্ট ইটো স্বজাতিকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"ইস্পাতের মত দৃঢ়, উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ হও।" আমরা হিন্দু-জাতিকে জাপানী গুরুর সেই মহামূল্য বাক্য মন্ত্রের মত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

সেবক

কাসিমুদ্দীনের মার্কা ও নব পিকুইক্

আদি পর্ব্ব

পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, স্যর আলেক্জান্দার কানিংহামের আমলে কাসিমুদ্দীন নামে একজন লোককে কলিকাতার যাদুঘরে কেরানী রাখা হয়। তাহার কাজ ছিল যাদুঘরে রাখিবার কোন জিনিস আনা হইলে প্রথমেই সেই দ্রব্যটির তালিকা-অনুযায়ী নম্বর তাহার উপর সাদা তৈল-রং দিয়া লেখা; এবং সেইজন্য সে তাহার পিঠে দ্রব্যটির প্রাপ্তির তারিখ আঁচড়াইয়া রাখিত। ১৮৭৪ সালের ১৯এ জানুয়ারী একটি অতি প্রাচীন অসভ্যযুগের পাথরের

অসভ্যযুগের পাথরের কুঠার-ফলকে আধুনিক কাসিমুদ্দিনের মার্কা

কুঠার-ফলক যাদুঘরে আনীত হওয়ায় সে তাহার পিঠে ইংরেজীতে 19—1—74 আঁচড়াইয়া লেখে। কিন্তু তাহার ইংরেজী বিদ্যা অত্যন্ত কম ছিল। প্রবাদ আছে যে সে শুধু তিনটি ইংরেজী কথা বলিতে পারিত,—ইয়েস্ সার্, নো সার্, ও ভেরি গুড সার্; এবং একদিন কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ণেল ম্যাল্কক্ তাহাকে, "আজ কেন এত দেরী করিয়া আফিসে আসিয়াছ?" এই কথা রাগিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দেয়, "ভেরি গুড সার্!" কাজেই লোকটি মাসের সংখ্যার দুদিকে দুটি ছোট ছোট ড্যাশ্ দেয় নাই। কিন্তু ঐ পাথরের ছবি দেখিলেই বালকেও বুঝিতে পারিবে যে লেখা লাইনটা ইংরেজী তারিখ ১৯—১—৭৪, এবং তাহার নীচে ঐ দ্রব্যটির তালিকা-নম্বর ৮৯৬ সাদা রংএ অঙ্কিত আছে।

উদ্যোগ পর্ব্ব

পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পাথরটা মিউজিয়মে পড়িয়া ছিল। তাহার মধ্যে গণ্ডা গণ্ডা ইংরেজী ও ভারতীয় পণ্ডিত তাহা দেখিলেন, কিন্তু কাসিমুদ্দীনের এই লেখাটির কেহই আদর করিলেন না। কেনই বা করিবেন? তাঁহারা ত সাধারণ মনুষ্য; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট্-গ্রাজুয়েট বিভাগের রিসার্চ্ প্রফেসার নন, তাঁহারা জীবন্ত সরস্বতীকে নিত্যপূজা, জন্মদিনে বন্দনা প্রভৃতি করিয়া নিজ নিজ মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ এবং পকেট ভারাক্রান্ত করেন না; তাঁহারা কেহই কলিকাতার নব রিসার্চ্-পি-এইচ্-ডি হইবার উপযুক্ত নহেন। এমন সময় পুনা হইতে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভণ্ডারকর নামক একজন সংস্কৃতের এম্-একে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার পোষ্ট্-গ্রাজুয়েট বিভাগের কর্ত্তা এবং কারমাইকেল প্রফেসার করিয়া আনা হইল। লোকটির পাণ্ডিত্য এবং অন্যান্য সুবিধাজনক গুণগুলি এত বেশী যে যদিও ঐ পদের বেতন প্রথমে ৭৫০৲ মাত্র ঘোষণা করা হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ এখন তাঁহাকে মাসিক ১,৫০০ বেতন এবং ৪০০৲ টাকা ভাড়ার বাড়ী নাম মাত্র একশত টাকায় দেওয়া হইতেছে, অর্থাৎ নিট্ ১৭০০৲ মাসিক পারিতোষিক। তা ছাড়া পরীক্ষা, পুস্তকসম্পাদন প্রভৃতির দক্ষিণা আছে।

ভণ্ডারকরের অধীনে ঐ বিভাগে একজন রিসার্চ্-শিক্ষক আছেন, নাম শ্রী পঞ্চানন মিত্র। তিনি প্রথম বিভাগে এম্-এ পাস্, হাল ফ্যাসানের প্রেমচাঁদ স্কলার, এবং ইউনিভার্সিটি লেকচারার। ১৯১৮ সালে এই দুই মহাপণ্ডিত মিউজিয়মে ঢুকিয়া রিসার্চ্ আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমাদের মত সাধারণ লোক অতি

অপণ্ডিত; আমরা সাদাকে সাদা বলি, রাতকে রাত বলি। কিন্তু সাদাকে কাল প্রমাণ এবং রাতকে দিন বলিয়া না দেখিলে মৌলিক গবেষণা কোথায় হইল? এ ত সাধারণ লোকের মতই কাজ করা হইল। এই দুই রিসার্চ্-মহা-পণ্ডিত অমনি পাথরখানি উল্টা করিয়া ধরিয়া কাসিমুদ্দীনের লেখা তারিখটির উপর গবেষণা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাহার বর্ণনা অধ্যাপক-শ্রেষ্ঠ ভণ্ডারকরের ভাষায় করা যাউক—

"অধ্যাপক পঞ্চানন মিত্র একদিন হঠাৎ এই প্রাচীন পাথরগুলির উপর আসিয়া পড়িলেন, এবং সত্যই অনুমান করিলেন, যে, ইহার উপর কোন অক্ষর আঁকা আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আমার অফিস্-ঘরে গিয়া সেগুলি আমার সাম্‌নে পরীক্ষার জন্ত রাখিয়া দিলেন।"

পাঠক দেখিবেন, যে, এখানে কলিকাতার পোষ্ট্-গ্রাজুয়েট বিভাগের একবিধ রিসার্চ্-প্রণালী অতি সুন্দর সূচিত হইয়াছে—"হঠাৎ" এবং "ছুটিয়া গিয়া" সমস্ত কাজ করা, নব্য-পণ্ডিতদের কাজকর্ম্মই এইরূপ চট্‌পটে,—না জানি পাছে রিসার্চ্‌টা উড়িয়া যায়!

যাহা হউক, তখন বঙ্গবাসীদের টাকায় ১৭০০৲-বেতন-ভোগী, কলিকাতার ইতিহাসের এম্-এ ও Ph. D'দের মর্ত্ত্য হর্ত্তাকর্ত্তা ভণ্ডারকর মহা রিসার্চ্ দ্বারা বাহির করিলেন যে এই কাসমুদ্দীনের লেখার উল্টা দৃশ্যটা আর কিছুই নয়, "মিসর দেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অক্ষরগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ এক, এবং [তাহার চেয়ে পুরাতন মানবের প্রাচীনতম কীর্ত্তি] ক্রীট দ্বীপের শিলালেখের এক বংশের।"

ঢক্কা-নিনাদ পর্ব্ব

জোহরীই জোহর চেনে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন ভণ্ডারকরের গৌরব-গান (এবং তৎসঙ্গে নিজের স্ফীতমস্তক পোষ্ট্-গ্রাজুয়েট্ বিভাগের প্রশংসা) আরম্ভ করিয়া দিলেন,—শুধু ভণ্ডারকরের প্রশংসা, কারণ সেই দ্রুতপদ পঞ্চানন বেচারা ইতিমধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। সে ত আর হুজুরের সাল্‌গেরায় ভেট প্রদান, রৌপ্য-ফলকে বে-তাল নৃত্য-কারিণী (!!!) সরস্বতীর মর্ত্ত্যে জন্মের কাহিনী, প্রভৃতি দিতে পারে না।

এই মহা আবিষ্কারটি স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-"ডাক্তার হওনের" সিল্‌ভার্ জুবিল মেমোরিয়াল্ ভলুমগুলির তৃতীয়টিতে ছবি সহ প্রকাশিত করা হইয়াছে; তাহার সমস্ত খরচ বঙ্গের ছাত্রদের পিতা ও ট্যাক্স্‌পীড়িত প্রজারা দিয়াছে (আশু-বাবুও নহে, ভণ্ডারকরও নহে)। আমরা ঐ পুস্তক হইতে ছবিখানি ছাপিলাম। পাঠক নিজেই দেখিবেন। আশুবাবু যেমন সর্ব্ববিদ্যায়পণ্ডিত এবং তাঁহার অধীনস্থ ও অনুগৃহীত শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে যেরূপ চরিত্রের বল সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে ভণ্ডারকরের এই ভণ্ড-রিসার্চ্ যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন (memorial) হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

ঢক্কা-ভঙ্গ পর্ব্ব

কিন্তু বিধি বাম হইলেন। এখন শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মিউজিয়মের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। তিনি যদিও আশু-বাবুর অন্যতম মোসায়েব, তথাপি তিনি পাথরটা সোজা করিয়া ধরিয়া গত ৫ই জুন বঙ্গের এসিয়াটিক্ সোসাইটীর এক অধিবেশনে ভণ্ডারকরের গবেষণার অলীকত্ব প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে পটহ ছিন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু হইয়াছে কি না, পরে দেখা যাইবে।

শ্রী মনসাচরণ ভৌমিক

বিবিধ প্রসঙ্গ

নারীর উপর অত্যাচার

জগতের সভ্যতম দেশসকলেও মানুষ অনেক বিষয়ে বর্ব্বরতার অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই। একটি বিষয় এই, যে, দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ হইলে উভয় পক্ষের সৈন্যেরাই সুবিধা পাইলেই শত্রু জাতির স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করে। ইউরোপে গত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্র যে যে দেশে অবস্থিত ছিল, সেখানেই স্ত্রীলোকদের উপর পাশব আচরণের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যুদ্ধের সময়েই হউক, কিম্বা শান্তির সময়েই হউক, নারীর উপর এইরূপ অত্যাচার যখন আর হইবে না, তখন বুঝা যাইবে, যে, মানুষ পশুত্বের অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবত্ব লাভ করিয়াছে।

বস্তুতঃ, নারী যে-দেশে, অরক্ষিত অবস্থাতেও, যত নিরাপদ, সেই দেশকে তত সভ্য বলা যাইতে পারে। নারীর নিঃশঙ্ক অবস্থায় কালযাপন সভ্যতার একটি মাপকাঠি।

আমাদের দেশে একদল লোক আছেন, যাঁহারা আমাদের জাতির কোন দোষের আলোচনা করিলেই পাশ্চাত্য দেশসকলে সেই দোষ বা তাহার-মত অন্য কোন দোষের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, এবং মনে করেন, যে, তাহার দ্বারা প্রমাণ হইয়া গেল, যে, আমরা খুব ভাল। কিন্তু যদি কোন দোষ পৃথিবীর সকল দেশে থাকে, তাহা হইলেও তাহা দোষ; এবং তাহা আমাদের মধ্যে থাকিলে, তাহা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

আমাদের দেশে আগে আগে যখন যুদ্ধ হইয়াছে, তখন নারীর উপর অত্যাচার হইয়াছে। আধুনিক সময়েও মোপলা-বিদ্রোহের সময় এই প্রকার অত্যাচার হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া, আমাদের দেশে হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা প্রভৃতিতেও নারীর উপর অত্যাচার হয়। পুলিসের দ্বারা এরূপ অত্যাচার বিরল নহে। ডাকাইতরাও কখন কখন এইরূপ অত্যাচার করে।

নারীর উপর আর-একপ্রকার অত্যাচার আমাদের দেশে শান্তির সময়ে হয়, যাহা অন্য কোন সভ্যদেশে হয় কি না জানি না। হইলেও তাহার দ্বারা এ দেশের অত্যাচারী পুরুষদের পশুত্ব এবং লাঞ্ছিতা নারীদের আত্মীয়স্বজন ও সধর্ম্মীদের কাপুরুষতা প্রশংসনীয় গুণ বলিয়া প্রমাণিত হইবে না। বঙ্গে অনেক দুর্ব্বৃত্ত লোক ভয় দেখাইয়া ও বল প্রয়োগ করিয়া অনেক বিধবার সর্ব্বনাশ করে। কখন কখন আদালতের বিচারে এই নরপশুদের শাস্তি হয়; কিন্তু তাহাতে এই প্রকার পাপাচার কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দুর্ব্বৃত্ত লোকেরা পাশব আচরণে যেরূপ কুসাহস দেখায়, সৎ লোকেরা তাহা দমনে ও নিবারণে তাহা অপেক্ষা বেশী, অন্ততঃ তাহার সমান, সৎ সাহস না দেখাইলে ইহার প্রতিকার হইবে না। সমাজের মধ্যেও নূতন করিয়া প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। এখন যে-সব দুর্ব্বৃত্ত লোক এই-সব কাজ করে, তাহারা সমাজে পতিত হয় না, কিন্তু লাঞ্ছিতা নারীরা সমাজকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন। যে-সব দুর্ব্বৃত্ত লোক এইরূপ কাজের জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়, তাহারা পর্য্যন্ত বুক ফুলাইয়া সমাজে দশজনের সহিত অবাধে মেলামেশা করে। সমাজ-দেহে প্রাণ থাকিলে লাঞ্ছিতারা পতিতা বা পরিত্যক্তা হইতেন না, দুরাচার পশুরাই পতিত ও বহিষ্কৃত হইত।

একদিকে অসুরত্ব ও পিশাচত্বের এবং অন্যদিকে কাপুরুষতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে বার বার পাওয়া যাইতেছে। পতিগৃহ হইতে, পতির ও আত্মীয়স্বজনের সম্মুখ হইতে, জোর করিয়া স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধনের দৃষ্টান্ত আর কোন সভ্যদেশে পাওয়া যায় কি না, জানি না। এইরূপ ঘটনার বৃত্তান্ত

পড়িলে মুমূর্ষু বৃদ্ধেরও রক্ত গরম হইয়া উঠে, মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, এবং বুদ্ধদেব প্রভৃতি জগতের সাধুশিরোমণিগণের অহিংসার উপদেশ ভুলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু উত্তেজনায় উন্মাদগ্রস্ত হইয়া কোন লাভ নাই। প্রতিকার কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহাই ভাবিতে হইবে।

বাল্যকাল হইতে নারীগণকে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাঁহাদের দেহে বল ও মনে সাহস হয়, এবং যাহাতে তাঁহারা প্রাণ অপেক্ষা নারীধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে, প্রয়োজন হইলে, আততায়ীর প্রাণবধ করিয়াও ধর্ম্ম রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এইজন্য তাঁহাদিগকে অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখান উচিত। কোন কোন মহিলা আততায়ীর প্রাণ বধ করিয়া কিম্বা তাহাকে জখম করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন, এরূপ আধুনিক ঘটনার বৃত্তান্ত খবরের কাগজে অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন।

দৈহিক বল আবশ্যক বটে; কিন্তু তাহা অপেক্ষা মনের জোর আরও বেশী আবশ্যক। যে আত্মরক্ষায় মরীয়া, দুরাচার পালোয়ানও তাহাকে ভয় করে। মনের জোর বাড়াইতে হইলে নারীদিগকে স্বাধীনতায় অভ্যস্ত করিতে হইবে। স্বাধীনতায় বিপদের সম্ভাবনা আছে, জানি; কিন্তু সে বিপদ্ কাটাইবার একমাত্র উপায়ও স্বাধীনতা।

প্রতিকারের উপায়ের গোড়াতেই নারীদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতির কথা বলিলাম এই জন্য, যে, নারী নিজেই যদি নিজের রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রে ও সব সময়ে তাঁহার রক্ষা হইতে পারে না;—বিশেষতঃ এই বাংলা দেশে। সব বাঙালী ভীরু বা কাপুরুষ নহে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু সাহস অধিকাংশ বাঙালীর একটি জাতিগত গুণ, ইহাই বা বলি কি প্রকারে? কত বাঙালী সাহসী ও কত বাঙালী ভীরু, তাহার বিচার কে করিবে? করিয়া ফলই বা কি হইবে? বাঙালীর ভীরুতার দুর্নাম্ ঘুচান প্রত্যেক বাঙালীর কর্ত্তব্য। এই দুর্নাম এরূপ রটিয়াছে, যে, বঙ্গের বাহিরে ছাত্রদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও ইহা স্থান পাইতেছে। অনেক দিন হইল, এলাহাবাদের গত ইণ্টারমীডিয়েট্ পরীক্ষায় উর্দ্দু হইতে ইংরেজীতে অনুবাদের জন্য যতগুলি বাক্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আমাদের হস্তগত হয়। কিন্তু তাহা উদ্ধৃত করিতে এতদিন ইচ্ছা হয় নাই। এখন আবশ্যক বোধে দুটি উদ্ধৃত করিতেছি। "বঙ্গালী লোগ্ কোই মজ্‌বুৎ কৌম্ নেহী হ্যাঁয়" (বাঙালীরা একটা মজ্‌বুত্ জাতি নহে)।" "উন্‌কি এক আজিব্ বাত য়েহি হ্যায়, কি, মর্দ্দ আউরতোঁ কে তরেহ্ আওর্ আউরতেঁ মর্দ্দোঁ কে তরেহ্ মালুম্ হোতে হ্যাঁয়" (উহাদের সম্বন্ধে একটি আজব কথা এই, যে, উহাদের পুরুষদিগকে স্ত্রীলোকের মত ও স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের মত মালুম্ হয়)। এসব কথা কতটা বাহ্য আকৃতি সম্বন্ধে ও কতটা মানসিক গুণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এখানে কেবল ইহাই বক্তব্য, যে, বাঙালী পুরুষেরা যদি পৌরুষযুক্ত না হন, তাহা হইলে অন্ততঃ বাঙালী স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে উদ্ধৃত উর্দ্দু বাক্যটি যেন সত্য হয়।

যে-সব পুরুষজাতীয় মানুষ স্ত্রীলোকদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে না পারে, তাহারা ত কাপুরুষ বটেই; যে-সব নরপশু নারীর লাঞ্ছনা করে, তাহারাও কাপুরুষ। প্রকৃত পৌরুষ যাহাদের আছে, তাহারা ন্যায্য কারণে পুরুষের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহার পরিচয় দেয়।

প্রতিকারের দ্বিতীয় উপায়, বাল্যকাল হইতে পুরুষদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া যাহাতে তাহারা সুস্থ-সবলদেহ, সচ্চরিত্র, সাহসী ও দৃঢ়চিত্ত হইতে পারে, এবং নিজের প্রাণ দিয়াও, দুর্বৃত্ত নরপশুর প্রাণবধ করিয়াও, বিপন্না নারীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

স্ত্রীলোকের উপর যেরূপ অত্যাচারের কথা লিখিতেছি, খবরের কাগজে প্রকাশিত তাহার অধিকাংশ সংবাদে, অত্যাচারীরা মুসলমান, এইরূপ দেখা যায়। অতএব এ বিষয়ে ভদ্র ও শিক্ষিত মুসলমানদের কর্ত্তব্য তাঁহারা নিজেই নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে এ বিষয়ে কিরূপ উপদেশ আছে, তাহার প্রচার একান্ত আবশ্যক।

তৃতীয় উপায়, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে দুরাচার পুরুষগণের সামাজিক শাসনের সমুচিত ব্যবস্থা।

নারীর আর-একপ্রকার লাঞ্ছনার দ্বারা বাঙালী

সমাজ কলঙ্কিত। বহু স্বামীর দ্বারা বালিকা ও যুবতী স্ত্রীর উপর এবং অনেক শাশুড়ীর দ্বারা বালিকা ও যুবতী পুত্রবধূর উপর অকথ্য অত্যাচার হয়। কখন কখন শ্বশুর, ভাসুর, দেবর, ননদেরাও ইহাতে যোগ দেয়। ফলে অনেকে কাপড়ে আগুন লাগাইয়া বা অন্য উপায়ে আত্মহত্যা করে। কোন কোন অত্যাচারের কাহিনী আদালতে বিবৃত হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের গোচর হয়। কখন কখন এইসব পিশাচেরা দণ্ডিত হয়। বধূর উপর অত্যাচারের সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য ও ঘৃণ্য কারণ, তাহাকে পাপাচরণ দ্বারা রোজ্‌গারে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা ও সেই রোজ্‌গারের টাকা নিজেরা লইবার ইচ্ছা। এইরূপ অভিযোগও আদালতে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে?

বাড়ীর লোকেরা বালিকা বা যুবতী বধূকে বধ করিয়াছে, ও পরে তাহা আত্মহত্যা বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এরূপ ঘটনাও আদালতে উপস্থিত হইয়াছে!

যত প্রকারের যত অত্যাচার প্রকাশিত হইয়া পড়ে, বাস্তবিক তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অত্যাচার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যেমন করিয়াই হউক এবং যেরূপ অযোগ্য পাত্রের সহিতই হউক, প্রত্যেক বালিকার বিবাহ দিতেই হইবে, এই ধারণা ও রীতির উচ্ছেদ সাধিত না হইলে, এবং সুশিক্ষার দ্বারা নারীর ধর্ম্মশীলতা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সাহস, আত্মরক্ষণ-সামর্থ্য, উপার্জ্জন-ক্ষমতা ও স্বাবলম্বন-শক্তির বৃদ্ধি না হইলে কল্যাণ নাই। তাঁহাদিগকে "দেবী" বলিলে, এবং "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" ("যেখানে নারীরা পূজিত হন তথায় দেবতারা বিরাজ করেন"), এই শাস্ত্রীয় বচন বারবার উদ্ধৃত করিলে কেবল ভণ্ডামিই বৃদ্ধি পাইবে, যদি আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবহার আমাদের কথার অনুরূপ না হয়।

—

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দান

বঙ্গের ধনী লোকেরা শিক্ষার জন্য যত বড় বড় দান করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ (হয় ত সমস্তই) ইংরেজী স্কুল-কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য; প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দান বেশী দেখা যায় না। কলিকাতার রায় বাহাদুর শশিভূষণ দে ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী দে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, প্রশংসনীয় দান হিসাবে তাহা উল্লেখযোগ্য, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দান বলিয়া তাহা আরও উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই কারণে, যে, ঐ টাকায় যেমন বালকদের নিমিত্ত একটি বিদ্যালয় নির্ম্মিত হইয়াছে, বালিকাদের জন্যও তেমনি একটি বিদ্যালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। একটিতে ৩০০ বালক ও অপরটিতে ৩০০ বালিকা পড়িবে। বিদ্যালয় দুটি বৌবাজারের নেবুতলা গলিতে নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার জমীর দামের সিকি দে-মহাশয় দিয়াছেন, বাকী মিউনিসিপালিটি দিয়াছেন। অট্টালিকা দুটি নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয় দে-মহাশয় দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ইস্কুল দুটি চালাইবার জন্য মাসিক দুইশত টাকা জোগাইবার ব্যবস্থাও দে-মহাশয় করিয়াছেন। বাকী খরচ কলিকাতা মিউনিসিপালিটির। এবিষয়ে ও বিদ্যালয় স্থাপনে উহার চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের কার্য্য-তৎপরতা প্রশংসনীয়।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ে দান

শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত অটলবিহারী মৈত্র মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুমানিক একলক্ষ ষাটহাজার টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এই সম্পত্তির আয় হইতে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাদের আজীবন ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়া বাকী টাকায় ভারতবর্ষে বা বিদেশে পণ্যশিল্প শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে। দাতা এই দানের ও বৃত্তি অধ্যয়ন প্রভৃতির সর্ত্ত নিরূপণ করিবার ভার স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে দিয়াছেন। দাতা যেরূপ শিক্ষার জন্য টাকা দিয়াছেন, বঙ্গে এখন তাহার বিশেষ প্রয়োজন। তদ্বিষয়ে সাহায্য করিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

সাম্রাজ্য, বনাম অর্থ-নৈতিক প্রভুত্ব

মানুষের ইতিহাসে এমন সময় গিয়েছে, যখন, 'আমি জয়ী' বা 'আমার এত হাজার দাস আছে' কিম্বা 'আমি ১ লক্ষ লোকের মুণ্ডপাত করেছি', বলে' জগতের কাছে নিজেকে জাহির করে'ই মানুষ জীবন সার্থক মনে কর্‌ত। পুরাকালের অনেক বড় বড় রাজত্ব ও সাম্রাজ্যই হয়ত অর্থনৈতিক লাভের দিক্ থেকে বিশেষ সুবিধা-জনক ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানকালের মানুষ আত্ম-জাহিরকে খুব বেশী আমল দেয় না, বিশেষতঃ মেকি-খৃষ্টান পাশ্চাত্য জাতিগুলি 'আমরা জগতের জন্য আত্মত্যাগে সদাই প্রস্তুত এবং সচরাচর স্বার্থত্যাগ করে' থাকি', বল্‌তে পার্‌লে আর কিছুই চায় না। এও একপ্রকার আত্ম-জাহির, কিন্তু 'আমার প্রবল শক্তি আছে ও আমি মানুষ মার্‌তে পারি' ধরণের আত্ম-জাহির এ নয়। কিন্তু আসলে স্বার্থত্যাগী পাশ্চাত্য জাতিদের সাম্রাজ্যবিস্তার-ব্যাধির মূলে মানুষকে দাস করে' রাখার আনন্দ অথবা পরোপকার—এদুটির কোনটিই নেই। তাদের সাম্রাজ্যবিস্তার-চেষ্টার কারণ নিজেদের ঐশ্বর্য্যাগম। অন্য জাতিদের যদি গায়ের জোরে এমন অবস্থা করা যায়, যাতে তারা অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি প্রভুজাতির কাছে ছাড়া আর কোথাও না পায় এবং ফলে উক্ত জিনিসগুলি পাবার জন্য নিজেদের উৎপাদিত কাঁচা-মাল ধনসম্পদ্ বেশী মাত্রায় প্রভুজাতীয় বণিক্‌কে দিতে বাধ্য হয়, এবং যদি প্রভুজাতীয় অকেজো, অল্পকেজো ও বাড়্‌তি লোক করায়ত্ত দেশে সর্ব্বঘটে মোটা মাইনে, বুট ও হাণ্টারের সাহায্যে আরামে দিন কাটাতে পারে; তা হ'লে সাম্রাজ্যবিস্তার যে অবশ্যপ্রয়োজনীয়, তা বলাই বাহুল্য। এ কথাগুলি বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ নিয়মের মধ্যে পড়ে।

আমাদের দেশে যে পাশ্চাত্য জাতির সাম্রাজ্য আজ বহুকাল ধরে' বেড়ে উঠেছে, তারাও পরোপকার-মন্ত্র নিয়েই এদেশে বিদ্যমান। কিন্তু একথা সকলেই জানে, যে, সেই পরোপকারের ধাক্কায় আমরা আজ 'জলতোলা ও কাঠকাটা' জাতীয় কাজ করে' দিন গুজ্‌রান কর্‌ছি। স্বদেশী ও অসহযোগিতার ফলে ইংরেজ দেখ্‌লে, যে, পরোপকার ও জাতীয়তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এখন বেশী কথা না বলাই ভাল। সে আরও দেখ্‌লে, যে, তার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বজায় থাক্‌লে সে-সাম্রাজ্যের নাম যাই হোক না কেন তাতে তার টাকার থলির ওজন বাড়্‌বে বই কম্‌বে না। কাজেই আজকাল ইংরেজ-মহলে খুব চেষ্টা হচ্ছে যাতে এদেশের লোকেরা ইংরেজের পাহারার হাত থেকে বেরলেও, লোহার সিন্দুকের চাবিটা তার হাতেই রেখে বা'র হয়।

যখন অসহযোগিতার ধাক্কায় ইংরেজের তুলার সুতা ও কাপড়ের ব্যবসাতে বেশ ঘা পড়্‌ল এবং ইংরেজ দেখ্‌লে যে ও-ব্যবসাতে আর বেশী দিন ভারতবর্ষের উপকার করা চল্‌বে না, তখন তার চেষ্টা হ'ল অন্যান্য ব্যবসা এ-দেশে ভাল করে' বিস্তার করে' এ-দেশটাকে আর-একটু 'উন্নত' করা। বার্‌মিংহামের লোহা ও ইস্পাতের রাজারা, রথ্‌চাইল্ডের দলের সেনাপতিরা, ম্যান্‌চেষ্টারের কলওয়ালারা ও ছত্রপতি ইঞ্চ্‌কেপের জাহাজের ব্যবসাদার-মণ্ডলী—সকলে মিলে ঠিক করে' ফেল্‌লে যে, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার পূর্ণবিকাশ 'প্রয়োজন' এবং সেই 'প্রয়োজন'-সিদ্ধির দিকে মন না দিলে ভারতবর্ষের অশেষ বিপদ্। ফলে, ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্ট্ বাধ্য ছেলের মত মাথা নেড়ে বল্‌লে, 'তা বটেই ত'।

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ম্যান্‌চেষ্টারের কাপড়ের কল-ওয়ালাদের জন্য কোন পরোপকার-পন্থা খদ্দরের জন্য সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল না। দেখা গেল, এদেশের মিলওয়ালারাই 'ত্রাহি, ত্রাহি' ডাক ছাড়্‌চে, বাইরের লোকেরা মিল্ করবে কোথায়? কিন্তু অন্য সকলের বেশ সুবিধা হ'য়ে গেল।

ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্টের অনুসন্ধিৎসার ফলে রেল-কমিটিকে যা যা আবিষ্কার কর্‌তে বলা হয়েছিল, তাঁরা তার সবই আবিষ্কার কর্‌তে সমর্থ হলেন। তাঁরা আবিষ্কার কর্‌লেন, যে, ভারতের প্রায় সব রেল-লাইনেরই আগাগোড়া মেরামত 'দর্‌কার' এবং সেইজন্য ১৫০ ক্রোর টাকা ৫ বছর ধরে' খরচ করা হবে। ফলে রথ্‌চাইল্ড ও ভিবার্‌স্-এর ১৫০ ক্রোরের কাজ জুটে গেল। ব্রিটিশ মজুর,

কারিগর, ধনিক, বণিক্, ব্যবসাদার সকলেই কিছু কিছু পেল।

লর্ড রেডিং ১৫০ ক্রোর টাকা তোলা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। বোম্বাইএর গভর্ণর আবিষ্কার করলেন, যে, বোম্বাইয়ের গঠন ও বর্দ্ধন প্রয়োজন। ৭ ক্রোর টাকা খরচ হবে স্থির হল এবং আবার অর্ডারের স্রোত ইংলণ্ডের দিকে চল্‌ল। এখন আরও আবিষ্কার হচ্ছে, যে, আরও নানান্ জায়গায় নানা প্রকার 'প্রয়োজন' অসম্পূর্ণ রয়েছে। ভারতের বন্দরগুলির পুনর্গঠন 'দরকার' এবং সেগুলির জন্য নূতন নূতন ডক, ব্রিজ, কল-কব্জা ইত্যাদি 'দরকার'।

খদ্দরের সাহায্যে ম্যান্‌চেষ্টারের পরোপকার-স্পৃহা একটু দমিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু রেল, বন্দর, জাহাজ, বৈদ্যুতিক কলকারখানা ইত্যাদির সাহায্যে ইংলণ্ডের ভারতীয় অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য এখনও অক্ষুণ্ণ এবং বর্দ্ধনশীল রয়েছে।

জন মারলো, বি এ, এফ্-আর-ই-এস, এফ্-এস-এস্, নামক এক ব্যক্তি ফিন্যান্সিয়াল রিভিউ অব্ রিভিউস্ পত্রিকায় বৃটিশ ধনিক ও বণিক্‌দের উপদেশ দিচ্ছেন এবং ভারতীয় স্বরাজপন্থীদের সম্বন্ধে তাদের বল্‌ছেন, "তারা নিজের দেশেই নিজেদের প্রয়োজনীয় সব কিছু উৎপাদন করতে চায়—কারখানাজাত দ্রব্যাদি তারা আমাদের (ইংরেজদের) দেশ থেকে আম্‌দানী করতে চায় না -এবং দেশের শ্রমিকদের নানা প্রকার কাজে লাগিয়ে তারা ভারতবর্ষ থেকে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ দূর করে' দিতে চায়। তা ছাড়া, তারা নিজেদের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য নিজেরাই ব্যবহারে লাগিয়ে ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে উঠ্‌বে বলে' আশা করে এবং ভারতের কয়লা, তেল ও জলশক্তির সাহায্যে স্বদেশেই সব-কিছু উৎপাদন করে' আমাদের উপর নির্ভর ছেড়ে দিতে চায়।

"ভারতের প্রচুর জনশক্তি, কাঁচা-মাল (raw material) ও কল চালাবার জন্য কয়লা, তেল ও বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। কিন্তু তাদের সেগুলি ভাল করে' ব্যবহারে লাগাতে আমাদের সাহায্য নিতে হবে।"

লেখক শুধু বলেন নি, কেন আমাদের ইংরেজের কাছেই যেতে হবে। অন্যজাতীয় আর অনেক লোক আছে, যারা কর্ম্মক্ষমতায়, কলকব্জা-প্রস্তুত-করণে, ইংরেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাদের সাহায্য আমরা হয়ত অনেক সস্তায় পেতে পারি। কাজেই জন মারলো যাই বলুন, এবিষয়ে ইংরেজের আমাদেরকে সাহায্য করবার একচ্ছত্র অধিকার কার্য্যকুশলতার অধিকার নয়, তা অনেক ক্ষেত্রেই রাজশক্তির অপব্যবহার।

মারলো আরও বলেন, "ভারতে ভবিষ্যতে কারখানা ও বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র-নির্ম্মাণ খুবই চল্‌বে এবং তার জন্য টাকাও সেখানেই 'কিছু কিছু' পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের (ব্রিটিশ) টাকা ও 'কর্ম্মশক্তি' ব্যবহারের ক্ষেত্রও অনেক পাওয়া যাবে। সম্পূর্ণ ভারতীয় কোম্পানী ছাড়া, সংরক্ষণ-নৈতিক শুল্কের দেয়াল ভেদ করে' ভারতের জমীতে আমাদের টাকায় ও কর্ম্মশক্তিতে গঠিত বহুসংখ্যক কারখানা গড়ে' উঠ্‌বে, অবশ্য 'চালাকি'র ('policy'র) খাতিরে আমাদের কিছু কিছু ভারতীয় টাকাও ঐ-সব কোম্পানীতে নিতে হবে।"

এই প্রকার চালাকিতে আমরা ভুল্‌ব কি? বাইরের টাকা আমাদের দেশের ব্যবসায়ে লাগ্‌লে আমাদের ক্ষতি নেই, যদি না তাতে চালাকি ও রাজশক্তির অপব্যবহারের ছাপ থাকে। ভারতে বাইরের টাকা লাগাতে হলে তা আমরা বাইরে থেকে ধার করে' আন্‌ব—যেখানে কম সুদে টাকা মেলে সেখানেই ধার করব; ইংলণ্ডেই করব, এমন কোন কথা নেই। বাইরের কর্ম্মশক্তির সাহায্য দরকার হলে আমরা বাইরের লোককে মাইনে দিয়ে রাখ্‌ব—যেখানে সস্তায় কর্ম্মী পাব সে দেশের কর্ম্মীকেই আন্‌ব।

মারলো আরও ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, যে, পুরান বড় বড় ব্রিটিশ কোম্পানীর শাখা-প্রশাখা ভারতে শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়্‌বে; তারা 'নামে' অনেক সময় যদিও স্বাধীন হবে কিন্তু 'কাজে' শাখাই থাক্‌বে। আবার এক চালাকি। সোজাসুজি কাজ না করে' চালাকির দিকে গেলেই লোকে সন্দেহ করে এবং সে সন্দেহ অকারণ নয়।—অ।

উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও সমুদয় ভারতবর্ষ একজন অসামান্য বিদ্যাবান্ ব্যক্তির সেবা হইতে বঞ্চিত হইলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্য ও অন্য সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অধিকার অসাধারণ ছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এরূপ ছিল, যে, তিনি অনায়াসে নানা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রয়োজন-মত ভূরি ভূরি শ্লোক অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারিতেন। এরূপ ক্ষমতা অনেকের থাকে, কিন্তু তাঁহার স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা ও স্বাধীন ভাবে প্রাচীন সাহিত্যের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করিবার শক্তি পণ্ডিতবর্গের মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি নির্ভীক্ ও তেজস্বী লোক ছিলেন; যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, সাংসারিক ক্ষতি বা দৈহিক আঘাতপ্রাপ্তির ভয়ে তাহা বলিতে বিরত হইতেন না। তাঁহার প্রণীত ও প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকাগুলি তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনি আরও যাহা লিখিয়াছিলেন, দারিদ্র্যবশতঃ তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে না হইলে হয় ত তিনি আরও দীর্ঘজীবী হইতে পারিতেন। অনেক শোকও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তাঁহার আরও এক কষ্টের কারণ এই ছিল, যে, তাঁহার এক পুত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্রোধভাজন হওয়ায় আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিতে পারেন নাই। ইহাতে তিনি ক্লেশ পাইতেন বটে, কিন্তু ইহা ভাবিয়া গৌরব অনুভবও করিতেন, যে, পুত্রকে দেশের স্বাধীনতার জন্যই নির্ব্বাসিতের মত জীবনযাপন করিতে হইতেছে।

ললিতচন্দ্র মিত্র

নীলদর্পণের দীনবন্ধুর অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র পিতার প্রতিভার অধিকারী না হইলেও তাঁহার সহৃদয়তা ও বন্ধুপ্রীতির অধিকারী হইয়াছিলেন। ললিতচন্দ্র আমাদের সহাধ্যায়ী ও প্রীতিমান্ বন্ধু ছিলেন। বঙ্গে নীলকরদের অত্যাচার ও নীলকর হাঙ্গামা সম্বন্ধে তিনি ইংরেজীতে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে গান রচনা তাঁহার একটি সখের জিনিষ ছিল। তিনি কতকগুলি কবিতাও লিখিয়াছিলেন। পূর্ণিমা-মিলন তাঁহার অতি প্রিয় বস্তু ছিল। যখন এই উপলক্ষে সাহিত্যিকগণ তাঁহার পৈত্রিক ভবনে সম্মিলিত হইতেন, তিনি সকল দলের সমুদয় ব্যক্তিকে আদর ও যত্নে আপ্যায়িত করিতেন। তিনি কিছুকাল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক ও হিসাবপরীক্ষক ছিলেন।

এই জুলাই মাসে তাঁহার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ হইতে অবসর লইবার কথা ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, চাকরী হইতে অবসর লইয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় কালযাপন করিবেন। কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। পুত্রশোক তাঁহার আয়ুহ্রাসের অন্যতম কারণ।

বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের স্মরণার্থ সভা

এই শ্রাবণ মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে অনেক নগরে ও গ্রামে সভা হইবে। তাহাতে তাঁহার জীবনের নানা ঘটনা বিবৃত হইবে ও তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি এমন কোন কাজ করিতে পারি, যাহা তাঁহার প্রিয় ছিল, তাহা হইলে নানা স্থানে সভার অধিবেশন সার্থক হয়। বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য তিনি যেরূপ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিতে পারিলে তাঁহার প্রকৃত ভক্তের কাজ করা হয়। ন্যায়পরায়ণতা ও দয়া ব্যতীত অন্য কারণেও বালবিধবাদিগের বিবাহ বাঞ্ছনীয়। সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহা আবশ্যক। বিধবাদিগের বিবাহ না হইলে হিন্দুসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বৃদ্ধিও যথেষ্ট হইতে পারে না।

কিন্তু বিধবাবিবাহ চালাইতে গেলে যে সাহস ও সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিবার ক্ষমতার আবশ্যক, তাহা বিরল। ইহা অপেক্ষা সহজ উপায়ে বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ অকপট শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইতে পারে। আমরা গত মাসে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাস-ভবনের ছবি প্রকাশিত করিয়াছিলাম ও লিখিয়াছিলাম, যে, উহা হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানী কিনিয়া রাখিয়াছেন;

যদি কোন জনহিতকর কার্য্যের জন্য কোন সমিতি উহা ক্রয় করেন, কোম্পানী উহা তাঁহাদিগকে বিক্রয় করিবেন। নারী-শিক্ষা-সমিতি "বিদ্যাসাগর বাণীভবন" নাম দিয়া যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য বিধবাদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া যাহাতে তাঁহারা সৎপথে থাকিয়া আত্ম-নির্ভরপরায়ণ হইতে পারেন। এখন ইহা একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে আছে। যদি বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের বাড়ী এই সমিতি ক্রয় করিয়া তাহাতে "বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন" স্থায়ীভাবে স্থাপিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার নামের সহিত বিধবাদের হিতকর একটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত হইয়া থাকে। ৭২০০০ টাকা দিলেই বাড়ীটি পাওয়া যায়। কোটি কোটি বাঙ্গালী অল্প কিছু করিয়া দিলে অনায়াসে এই টাকা উঠিতে পারে। বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের দিনে সমুদয় সংগৃহীত অর্থ নারী-শিক্ষা-সমিতিকে সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অবলা বসু মহাশয়ার নামে কলিকাতায় ১০৫ নং অপার সার্কুলার রোড ভবনে প্রেরণ করিলে জাতীয় কর্ত্তব্য কিয়ৎপরিমাণে সম্পাদিত হইবে।

লালা লাজপৎ রায়ের পীড়া

লালা লাজপৎ রায়

কারাগারে লালা লাজপৎ রায় ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, খবরের কাগজে এই সংবাদ পড়িয়া সর্ব্বসাধারণ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। জেলে তাঁহার আহার ও ঔষধের ব্যবস্থা যতই ভাল হউক না, তাহাতে তাঁহার আরোগ্য লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। মুক্ত বাতাস এবং মনের প্রফুল্লতা-সম্পাদক অবস্থা, আরোগ্য লাভের জন্য একান্ত আবশ্যক। এই কারণে তাঁহাকে এখন ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। ডাক্তার আন্‌সারী জানাইয়াছেন, যে, লালাজীর চিকিৎসকদিগকে তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে দেওয়া হয় না। চিকিৎসকেরা বলেন, অবাধে আবশ্যকমত রোগীকে দেখিতে না পাইলে কেমন করিয়া চিকিৎসা চলিতে পারে ?

তিনি দুটি অভিযোগে কারারুদ্ধ হন। এখন যে অভিযোগের জন্য বন্দী আছেন, তাঁহার দোষ প্রমাণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত সরকারী উকীল নিজেই তৎসম্বন্ধে বলেন, যে, তাহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই; অথচ তাঁহাকে দণ্ডিত করা হয়! দেশের লোক তাঁহার জন্য চিন্তিত নহে, এরূপ মিথ্যা কারণ দেখাইয়া তাঁহাকে মুক্তি দিতে বিলম্ব করা উচিত নহে। পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভা এখন বসিতেছে না; সুতরাং বিষয়টি পঞ্জাবের প্রাদেশিক বিষয়, এরূপ কথা বলিয়াও ইহা টালিয়া দেওয়া অকর্ত্তব্য। তিনি মুক্তি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করেন নাই, এরূপ ওজরে ইহাই বুঝায়, যে, গবর্ণমেণ্ট্ তাঁহাকে হীনতা স্বীকার করাইবার নীচ বাসনা পোষণ করেন। তাঁহার কারাদণ্ড যাহাতে প্রকারান্তরে মৃত্যুদণ্ডে

পরিণত না হয়, কোনপ্রকার ওজর-আপত্তি না করিয়া তাহা করাই গবর্ণ্মেণ্টের কর্ত্তব্য।

—

জাতীয় পতাকা

যাঁহারা মধ্যপ্রদেশে জাতীয়-পতাকা শহরের সকল রাস্তা দিয়া লইয়া যাইবার অধিকার স্থাপন করিতে চাহিতেছেন, শহরের অংশবিশেষবাসী কতকগুলি ইউরোপীয়কে বিরক্ত করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। যদি অবুঝ কোন ইউরোপীয় ইহাতে বিরক্ত হন, তাহার জন্য আমাদের একটা স্বাভাবিক অধিকার হইতে আমরা কেন বঞ্চিত হইব? বিষয়টি মূলে খুব গুরুতর বা

শ্রীযুক্ত রাও গোপালদাস দেশাই ও তাঁহার পত্নী

শেঠ যমুনালাল বজাজ

একান্তপ্রয়োজনীয় নহে, তাহা আমরা গত মাসে দেখাইয়াছি। কিন্তু গবর্ণ্মেণ্টের অন্যায় জিদে ইহা একটি কঠিন সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। যে-সকল স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি জাতীয় পতাকা সম্বন্ধীয় অধিকার স্থাপন ও রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এবং তাহার জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন, এখন তাঁহারা গবর্ণ্মেণ্টের নিগ্রহ-নীতির নিকট পরাজয় স্বীকার করুন, এরূপ ইচ্ছা আমরা করিতে পারি না;—যদিও তাঁহারা এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইলে বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না। গবর্ণ্মেণ্ট নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিগ্রহ বন্ধ করিলে ও শহরের সব রাস্তায় জাতীয় পতাকা লইয়া যাইতে দিলেই সমস্যাটির যথোচিত মীমাংসা হয়।

বাঁকুড়া মেডিক্যাল-স্কুল

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য এত খারাপ এবং এখানে রোগের প্রাদুর্ভাব এত বেশী, যে, এখানে চিকিৎসা শিখাইবার জন্ত যে সামান্ত কয়টি শিক্ষালয় আছে, তাহা অপেক্ষা আরো অনেক বেশী দরকার। আমরা গত মাসের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি, যে, স্বাস্থ্যকর গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারলণ্ডে বাংলাদেশের চেয়ে ঢের বেশী চিকিৎসা-শিক্ষালয় আছে। বঙ্গের যেখানেই চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপিত হউক, সব জেলার ছাত্রই সেখানে পড়িতে পারে।

বাঁকুড়া মেডিক্যাল্ স্কুলের "ম্যানর্" নামক নূতন ছাত্রাবাস

সেই কারণে বাঁকুড়া মেডিক্যাল্ স্কুল বাঁকুড়া শহরে স্থাপিত হইলেও আমরা সর্ব্বসাধারণকে সাহায্য দিতে অনুরোধ করিতেছি।

বাঁকুড়ায় এই বিদ্যালয় স্থাপন করিবার বিশেষ কারণ আছে। এক সময়ে বাঁকুড়া জেলা খুব স্বাস্থ্যকর ছিল। কিন্তু ১৯১১—১৯২১ দশকের সেন্সাসে দেখা যায়, যে, বাংলা দেশের মধ্যে ঐ জেলাতেই সকলের চেয়ে বেশী লোকসংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। দশবৎসরে হাজারে একশত চারিজন লোক সেখানে কমিয়াছে। মন্দের ভাল এই, যে, বাঁকুড়া শহর এখনও অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর আছে। তা-ছাড়া তথায় একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ মেডিক্যাল্ স্কুলের ছাত্রদিগকে তথায় রসায়নীবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা শিখিবার অনুমতি দিয়াছেন, এবং উহার প্রিন্সিপ্যাল ব্রাউন সাহেব মেডিক্যাল্

বাঁকুড়া মেডিক্যাল্ স্কুলের শব-ব্যবচ্ছেদ গৃহ

স্কুলটির অবৈতনিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিতেছেন। বাঁকুড়ায় একটি হাঁসপাতাল ও একটি কুষ্ঠাশ্রম আছে। তাহা ব্যতীত মেডিক্যাল্ স্কুলের সংস্রবেও একটি হাঁসপাতাল স্থাপিত হইবে। তাহাতে অন্যন একশত জন রোগীর স্থান হইবে। এই-সব প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষার সাহায্য হইবে। বাঁকুড়ায় থাকিবার ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম।

বাঁকুড়া সম্মিলনী এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইহার হাঁসপাতাল ও অন্যান্য বন্দোবস্তের জন্য ন্যূনকল্পে পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজন। তাহার জন্য ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্ট-জজ শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, প্রিন্সিপ্যাল্ ব্রাউন, অবসরপ্রাপ্ত জজ রায় বাহাদুর বৈদ্যনাথ ঘটক, বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান রায়সাহেব বামাচরণ

বাঁকুড়া মেডিক্যাল্ স্কুলের "কোহিনুর ছাত্রাবাস" নামক বর্ত্তমান ছাত্রাবাস

রায়, অবসরপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ্ এঞ্জিনীয়ার ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, ব্যারিষ্টার ব্রজকিশোর চৌধুরী, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের ডেপুটিডিরেক্টর জেনারেল রায় বাহাদুর হেমন্তকুমার রাহা, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও হাইকোর্ট-উকীল ঋষীন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া একটি আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন।

বাঁকুড়া মেডিক্যাল্ স্কুলের বর্ত্তমান স্কুল-গৃহ

কলিকাতা ১নং কৌন্সিল্ হাউস্ ষ্ট্রীট্ ঠিকানায় ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনেরাল, বাঁকুড়া সম্মিলনীর অবৈতনিক অর্থসচিব রায় বাহাদুর হেমন্তকুমার রাহা মহাশয়ের নিকট টাকা-কড়ি পাঠাইতে হইবে।

সরকারী ফ্যাক্যাল্টি অব্ মেডিসিন্ (State Faculty of Medicine) যেরূপ শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকাদি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, বাঁকুড়া মেডিক্যাল্ স্কুলে তদনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়।

--

রাজশাহীর অবস্থা

গতবৎসর রাজশাহী জেলার যে অংশ প্লাবিত হইয়াছিল, তাহার অনেক স্থানের অবস্থা এখনও ভাল হয় নাই। আনন্দবাজার পত্রিকা, স্বরাজ, হিন্দুস্থান, প্রভৃতি কাগজে এই সংবাদ বাহির হইয়াছে, যে,

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গত ৭ই জুলাই আত্রাই পৌছিয়াছেন এবং সেখান হইতে নৌকাযোগে তেজনন্দী গিয়াছেন। তেজনন্দী একটি বড় সাহায্য-কেন্দ্র। তিনি পদব্রজে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া গ্রামবাসীদের অবস্থার তদন্ত করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, যে, তাহাদের অবস্থা এখনও খুব খারাপ; তাহাদের মধ্যে অনেকেই দিনে একবারও খাইতে পায় না। বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় ধানভানা-কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে; দিন ভাল থাকিলে কিছু কিছু ধান ভানা হয়। চর্‌কা এবং তাঁতের কাজ চালান হইতেছে। ত্রিশ বৎসর আগে আশে-পাশের সকল গ্রামে তুঁতগাছের আবাদ ছিল, এবং রেশম-শিল্পে শত শত লোকের জীবিকার সংস্থান হইত। এখন তাহারা সকলেই কৃষিজীবী হইয়াছে। ইহা সুখের বিষয়, যে, কোনও কোনও কেন্দ্রে স্থানীয় তুলার গাছ ও চর্‌কার প্রচলন আছে; খদ্দর বয়ন পুনঃপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা হইতেছে। আত্রাইয়ে একটি চর্‌কা ও তাঁতের বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। তাহাতে শিক্ষার্থীগণকে খদ্দর প্রস্তুত করিবার সর্ব্বপ্রকার উপায় শিখান হইতেছে। ইহা খুব আশার কথা, যে, বহু যুবক শিক্ষা দিবার কাজ লইতে ইচ্ছুক এবং কোনও কোনও শিক্ষার্থী প্রত্যহ আটতোলা ১২নং সূতা প্রস্তুত করিতেছে। আত্রাইয়ের আউট ডোর ডাক্তারখানায় প্রত্যহ ৪০ হইতে পঞ্চাশ জন রোগী যাইয়া থাকে। ভ্রমণকারী ডাক্তার নির্দ্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া থাকেন। কয়েকটি লোক কালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে।

রায় মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে যেরূপ কর্ম্মিষ্ঠতা দেখাইতেছেন, তাঁহা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ও অধিক অবসর-বিশিষ্ট লোকেরা দেশহিতকর কার্য্যে সেইরূপ কর্ম্মিষ্ঠতা দেখাইলে দেশের চেহারা ফিরিয়া যায়।

—

রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বেতন

জী আই পী ইউ মাসিক (G. I. P. U. Monthly) নামক পত্রিকাতে রায় সাহেব চন্দ্রিকা প্রসাদ ভারতবর্ষীয় রেলওয়েগুলির উচ্চতমপদস্থ কর্ম্মচারী এবং নিম্নতম কর্ম্মচারীগণের বেতন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। ইহার ভিতর ভাবিয়া দেখিবার মত কথাও আছে। তিনি বলিতেছেন:—

"ইহা কেহ আশা করে না, এবং কেহ ইচ্ছাও করে না, যে, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা একেবারে বিনা বেতনে কাজ করুন। আমরা এইটুকু চাই যে তাঁহাদের বেতন স্থির করার সময় যেন দেশের অবস্থা এবং নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটু সুবিবেচনার সহিত কাজ করা হয়। যাঁহারা ট্যাক্স্ দেন, তাঁহাদিগের দিক্ হইতে বিচার করিলে, ভারতবর্ষের মত দেশে প্রতিমাসে ৩৫০০ টাকা বা ৪০০০ টাকা বেতন দিয়া একজন রেলওয়ে এজেণ্ট বা কর্ম্মাধ্যক্ষ

রাখা একেবারে খাঁটি অপব্যয়। কারণ, জাপানে মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে তথাকার ৬৯৩২ মাইল বিস্তৃত সর্‌কারী রেলওয়েগুলির জন্য একজন সম্পূর্ণ উপযুক্ত লোক এই কাজের জন্য পাওয়া যায়; সুইট্‌জার্‌ল্যাণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বেতন ১·৪২ টাকা; বেল্‌জিয়ম্‌, ডেন্‌মার্ক, নর্‌ওয়ে, ইটালী, চীন প্রভৃতি দেশে রেল্‌ওয়ে-ম্যানেজারের বেতন ১৩৩৩ হইতে ১৬০০ টাকার মধ্যে। ঐ-সব দেশের এই প্রকার বেতনের হার দেখিয়া ভারতবর্ষীয় করদাতা-দিগের নিকট হইতে দেশের রেল্‌ওয়ে-কর্ম্মচারীগণের জন্য অত উচ্চ বেতন আদায় করা অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয়।

"সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং নিম্নতম কর্ম্মীর বেতনের মধ্যে যে কি প্রকার আকাশ-পাতাল প্রভেদ তাহা ভাবিলে অবাক্‌ হইয়া যাইতে হয়। দেশের লোক অন্নবস্ত্রের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু দেশের ধনসম্পদ্‌ যা কিছু তাহা ইউরোপীয়ান্‌রাই ভোগ করিতেছেন, ইহা হইতে তাহাই প্রমাণ হয়। রেল্‌ওয়ে এজেন্ট যিনি, তিনি তাঁহার অধীনস্থ ৩৫০ বা ৪০০ জন কর্ম্মীকে যত টাকা বেতন দেন, নিজে একলাই তাহা গ্রহণ করেন। ৩৫০ জন বা ৪০০ জন ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীর যত টাকার প্রয়োজন, একলা তাঁহার তত টাকার প্রয়োজন বাস্তবিকই আছে কি? ইহার তুলনা জগতের আর কোনো দেশে মেলা ভার। ভারতবর্ষে রেল্‌ওয়ে এজেন্টের ন্যূনতম বেতন একজন নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীর ন্যূনতম বেতনের চারিশত গুণ। অন্যান্য দেশে কি অনুপাতে বেতন দেওয়া হয়, তাহা প্রদত্ত হইল।

	ন্যূনতমবেতন	উচ্চতমবেতন
ডেন্‌মার্ক	১ :	৩
ইটালী	১ :	৬
হল্যাণ্ড্‌	১ :	৭
নর্‌ওয়ে	১ :	৭
বেল্‌জিয়ম্‌	১ :	৮
ফ্রান্স্‌	১ :	১৩
সুইট্‌জার্‌ল্যাণ্ড	১ :	১৪
জাপান	১ :	২২
চীন	১ :	৩২

"নিখিল-ভারতীয়-রেল্‌ওয়ে-কর্ম্মী-সম্মিলন স্থির করিয়াছেন, যে, একজন নিম্নপদস্থকর্ম্মীকে সর্ব্বাপেক্ষা কম যে বেতন দেওয়া হয়, তাহার পঁচিশ গুণ অপেক্ষা অধিক বেতন কোনো কর্ম্মচারীকেই দেওয়া উচিত নয়। এই প্রকার স্থির করিয়া তাঁহারা ভালই করিয়াছেন। অধিকাংশ অন্যান্য দেশে যে অনুপাতে বেতন দেওয়া হয়, ইহা তাহার তুলনায় অনেক অধিক।"

রেলওয়ে বিভাগ সম্বন্ধে রায় সাহেব চন্দ্রিকা প্রসাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা কম-বেশী সকল সর্‌কারী ও বেসর্‌কারী কার্য্যবিভাগ সম্বন্ধে সত্য। শিক্ষাবিভাগ ধরুন। ডিরেক্টর বা শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ বেতন পান মাসে তিন হাজার টাকা, কিন্তু পাঠশালার একজন গুরুমহাশয় পান মাসিক ৫।৭।১০ টাকা। অর্থাৎ ডিরেক্টর গুরুমহাশয় ৬০০।৪০০।৩০০গুণ বেতন পান। শিক্ষামন্ত্রী পান গুরু-মহাশয়ের ১০০০।৭৬২।৫৩৩ গুণ। পুলিস বিভাগের চৌকিদার ও পাহারাওয়ালাদের বেতন এবং ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেলের বেতনে এইরূপ অন্যায় প্রভেদ দেখা যায়। অন্য কোন দেশে এইরূপ প্রভেদ নাই।

—

কাশ্মীরে তাঁত ও চর্‌কা

'ওয়েল্‌ফেয়ার' নামক মাসিক পত্রে রায় সাহেব চন্দ্রিকা প্রসাদ যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পাওয়া যায়:—

"কাশ্মীরে তাঁত ও চর্‌কা এখনও পুরা দমে চলি-তেছে। পশমের লুই ও পট্টু প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী করা হইতেছে, যদিও উহা পূর্ব্বের মত উঁচুদরের জিনিষ হইতেছে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানগুলির কাশ্মীরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত।

"কাশ্মীরের পশমের শিল্প ঐ দেশের কৃষিকর্ম্মেরই একটি অঙ্গ। কৃষকেরা সকলেই কতকগুলি করিয়া মেষ পালন করে, এবং একপ্রকার ছোট আঁশওয়ালা তুলার

চাষ করে। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা অবসর সময়ে এই তূলা ও পশম চর্কায় কাটিয়া সূতা প্রস্তত করে, এবং প্রত্যেক পরিবারের একজন করিয়া পুরুষ তাঁত চালায়। বেশীর ভাগ শীতের সময়ই তাঁতের কাজ করা হয়, কারণ তখন চাষবাসের কোনো কাজ থাকে না।

"এই প্রকারে কাশ্মীরে যত কাপড় প্রস্তত হয়, তাহাতে দেশের অধিবাসীর প্রয়োজন ত মিটিয়া যায়ই, তাহার উপর প্রচুর পশমী কাপড় চালান দেওয়া হয় এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই কাপড় ছড়াইয়া পড়ে। এই শিল্পটির প্রধান গুণ এই, যে, (১) ইহা অবসর কালে করা হয় বলিয়া, ইহার ভিতর ব্যবসাদারী প্রতিযোগিতা নাই, (২) ইহার একটি জাতীয় প্রকৃতি আছে; কারণ প্রায় প্রতি পরিবারেই এই শিল্প প্রচলিত আছে; কাশ্মীরে তাঁতী বা জোলা বলিয়া স্বতন্ত্র কোনো জা'ত নাই।

"আমাদের ভারতীয় সমতলভূমিবাসীরা বলেন, যে, অর্থশাস্ত্রের দিক্ হইতে দেখিলে চর্কার বিশেষ কোনো গুণ নাই। তাঁহারা যদি সমতলের গ্রামবাসীদিগকে কাশ্মীর উপত্যকার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে বলেন, তাহা হইলে চর্কার সাফল্য সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কাহাকেও তাঁত বা চর্কার কাজে সমস্ত সময় ব্যয় করিতে উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু বৃথা আলস্যে যে সময়টা নষ্ট করা হয়, সেই সময়টুকু এই কাজ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

"পুরাকালে ভারতবর্ষ হইতে যখন দেশবিদেশে সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় চালান্ করা হইত, তখনও এই উপায়েই কাজ করা হইত।"

—

"পণনিবারিণী সমিতি"

নীচের লেখাটি আমরা যেরূপ পাইয়াছি সেইরূপই ছাপিলাম।

পণনিবারিণী সমিতি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুতর উচ্চশিক্ষিত যুবকের উৎসাহ ও উদ্যোগে (বহুবাজার) ৩ নং সুতোর পাড়া লেনে Anti-dowry Association নামে একটি পণনিবারিণী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমুতোষ দাশগুপ্ত, এম-এ ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু, এম-এ (অমৃত বাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক) এই সমিতির অবৈতনিক সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের অনেক যুবক এই সমিতির প্রস্তাবিত কার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এবং পণগ্রহণে অসম্মতি জানাইয়া ইহার মেম্বার-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। দেশের যে-সকল সুশিক্ষিত, স্বার্থত্যাগী ও সহৃদয় যুবক এবং অভিভাবকগণ এই সমিতির কার্য্যে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সত্বর অনুগ্রহপূর্ব্বক সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ বা পত্রব্যবহার করুন।

১৯ জুলাই ১৯২৩

শ্রী সুশীলকুমার হার,
University College
of Science.
Calcutta.

বরপণ নিবারণের চেষ্টা আগেও হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বেশী কিছু ফল হয় নাই বলিয়া পুনর্ব্বার চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই, এরূপ কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু যে-সকল অবিবাহিত যুবক প্রতিজ্ঞা করিবেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, যেন তাঁহারা বিশেষ বিবেচনার পর প্রতিজ্ঞা করেন। পরে মিথ্যাবাদী হইতে হইলে তাঁহারা অপরাধী হইবেন ও তাহা লজ্জার কারণ হইবে। অনেকে প্রতিজ্ঞা করিয়া শেষে বলেন, "কি করি মশায়, অমুক জায়গায় বিবাহ না করলে পিতা গৃহত্যাগী ও মাতা আত্মঘাতিনী হবেন বলেছেন।" এরূপ পিতৃমাতৃভক্তি অবশ্য খুবই তারিফের যোগ্য, এবং পুত্রকে অন্যান্য বিষয়েও সৎপথে রাখিবার জন্য এই আদর্শ পিতামাতারা পূর্ব্বোক্তরূপ তোফা ভয়প্রদর্শন নিশ্চয়ই সর্ব্বদা করিয়া থাকেন! সেই কারণেই আমরা বলিতেছি, যে, যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিবেন, তাঁহারা জানিয়া রাখুন, সত্য রক্ষা করা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, এবং সত্য রক্ষার জন্য পিতামাতারও অবাধ্য হওয়া কখন কখন আবশ্যক হয়। ইহা জানিয়া যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিতে চান, তাঁহারা করুন। নতুবা, বুভুক্ষিত দেশে, "কন্যাদায়"-গ্রস্ত দেশে, এরূপ প্রতিজ্ঞা না করাই ভাল।

প্রতিজ্ঞা করার বিরোধী আমরা নহি। কিন্তু বরপণ উঠাইয়া দিবার প্রকৃষ্ট উপায় নারীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি। নারীর সম্মান বাড়াইতে হইলে কন্যা যে "দায়" বা একটা আপদ্, এই ধারণা নির্ম্মূল করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে, প্রত্যেক বালিকাকে বিবাহিত হইতেই

হইবে, এই ধারণা বিনষ্ট হওয়া চাই। সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদিগকে সুশিক্ষিতা করিয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহারা যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলে বিবাহ, অর্থের জন্য না হইয়া, নারীর অমূল্য প্রেমের জন্য হইবার সম্ভাবনা হইবে।

—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস্-কমিটির নির্দ্ধারণ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস্-কমিটি অধিকাংশ সভ্যের মত অনুসারে স্থির করিয়াছেন, যে, কৌন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করা হইবে না। কৌন্সিল-প্রবেশার্থীদের জিদ বজায় হইয়াছে; এখন তাঁহারা কৌন্সিলে প্রবেশ করিবার বা করাইবার জন্য ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করিতে পারেন। ঔচিত্যানৌচিত্য লইয়া আর বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। যাঁহাদেরমত অন্যরূপ, তাঁহারাও "অস্পৃশ্যতা" দূরীকরণ, হিন্দুমুসলমানের মিলন, মদ আফিং গাঁজা প্রভৃতির চলন বন্ধ, কার্পাস বৃক্ষ রোপণ, খদ্দর উৎপাদন ও ব্যবহার, প্রভৃতি যাহাতে হয়, এবং এই-সব কাজ করিবার জন্য যাহাতে কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা খুব বাড়ে, তাহার চেষ্টা করুন।

ইংরেজীতে স্পেড্ ওয়ার্ক্ (spade-work) বা কোদালের কাজ বলিয়া একটি কথা আছে। তাহার মানে এই, যে, যেমন মাটিতে ফল ফুল শস্য কিছু আজাইতে হইলে কোদাল দিয়া মাটিটা খুঁড়িয়া উল্টাইয়া চাষের উপযোগী করিতে হয়, তাহার পর অন্যান্য প্রক্রিয়ানন্তর ফুলফলশস্য পাওয়া যায়, তেমনি অন্য কোন কাজেও সফলতা লাভ করিতে হইলে প্রারম্ভিক এমন অনেক কাজ করিতে হয় যাহাতে ও যাহাতে হুজুক ও উত্তেজনা নাই, হাততালি বা অন্যবিধ বাহবা পাওয়া যায় না। যে-দেশে অজ্ঞাত ও অপ্রশংসিত থাকিয়া এই কোদালের কাজ করিবার লোক যত বেশী আছে, সেদেশের উন্নতির সম্ভাবনা তত বেশী। আমাদের দেশে এখন এই প্রকার কাজের খুব বেশী দরকার! আমরা খবরের কাগজ লিখিয়া থাই। হুজুক ও উত্তেজনা বেশী হইলে, বড় বড় অক্ষরে শিরোনামা লিখিয়া উত্তেজক খবর দিতে পারিলে, কাগজের কাটতি বাড়ে বটে, কিন্তু আমাদের লাভ হইলেও দেশের কল্যাণের তাহা একটি পথ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

তাজমহলের প্রশংসা এখন সবাই করে, কিন্তু যখন উহা নির্ম্মাণ করিবার জন্য উহার ভিৎ খোঁড়া হইতেছিল ও দেওয়ালের মাটির নীচের অংশের গাঁথনী হইতেছিল, তখন উহার প্রশংসায় ভুবন ভরিয়া যায় নাই। আমরা যদি কখন জাতীয় জীবনের সৌধ গড়িয়া তুলিতে পারি, তখন প্রশংসা করিবার লোকের অভাব হইবে না। এখন কিন্তু ভিত্তিটা মজবুত করিয়া গাঁথিবার সময়। এখন হুজুক, উত্তেজনা, প্রশংসালোলুপতা পরিহার করিতে হইবে।

—

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্রাহ্মণ

হিন্দু বলিতে কাহাকে বুঝায়, অর্থাৎ কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা হিন্দুকে হিন্দু বলিয়া চেনা যায়, তাহা ঠিক্ করিয়া বলা কঠিন। তবে, একটা লক্ষণ এই, যে, হিন্দু মাত্রেই ধর্ম্মাচরণ এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বিধান এবং পৌরোহিত্য স্বীকার করিতে বাধ্য। এই সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণ কি না, এবং ইহাতে আপত্তি করা চলে কি না, এখানে সে বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এখানে ইহাই কেবল দেখাইতে চাই, যে, সম্প্রতি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলিও হিন্দুধর্ম্মের সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক আইন কি প্রকার বা তাহা কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ষ্টেট্স্‌ম্যান্ মালকানা রাজপুতদিগের শুদ্ধি বা হিন্দুধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে খুব মুরুব্বিয়ানার সহিত মন্তব্য করিয়াছেন, যে, বিধর্ম্মীর হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া বা পুনর্গৃহীত হওয়ার কোনো বিধি নাই। আমরা এই উক্তিটি সম্বন্ধে বিচার করিতে চাই। অনুমান অপেক্ষা বাস্তব তথ্যের মূল্য অধিক। ইহা একটি এইরূপ তথ্য যে, গত কয়েক বৎসরের

মধ্যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত অনেক হিন্দু, পুনর্ব্বার হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং হিন্দু-সমাজ তাহাদের স্থান-দান করিয়াছে। অবশ্য ইহাদের সংখ্যা অধিক নয়। সত্য বটে, যে, মালকানা রাজপুতদিগের শুদ্ধির পূর্ব্বে, বহুসংখ্যক লোককে দলে দলে এইরূপে হিন্দুধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ করা এত দিন হয় নাই। কিন্তু তাহাতে ইহা অপ্রমাণ হয় না, যে, হিন্দুধর্ম্মে অহিন্দুকে হিন্দুত্বে গ্রহণ করার রীতি আছে।

ইহা ঐতিহাসিক সত্য, যে, পুরাকালে বহুসংখ্যক এমন লোক হিন্দুসমাজে মিশিয়া গিয়াছে যাহারা অহিন্দু-জাতীয়, এবং যাহাদের অনেকের পূর্ব্বপুরুষগণ অহিন্দুদেশে বাস করিত। প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রেরই ইহা জানা উচিত।

এই অহিন্দুকে হিন্দুকরণ এখনও চলিতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় সেন্সস্ রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের ১২১ পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই—

"কোন অসভ্য জাতি যদি এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর আসিয়া পড়ে, যেখানে হিন্দু-সভ্যতার প্রভাব প্রবল, তাহা হইলে তাহারা ক্রমে ক্রমে আপনাদের অজ্ঞাতসারেই হিন্দু ভাব ও কুসংস্কার প্রভৃতি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। তাহারা হিন্দু উৎসব সকলে যোগদান করে, দেবালয়ে বিগ্রহ দর্শনার্থে গমন করে এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তি করিতে আরম্ভ করে। কোনো নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা কোনো বৈষ্ণব গোঁসাই তাঁহাদের গুরুর স্থান অধিকার করিয়া বসেন। ক্রমেই তাঁহাদের ও তাঁহাদিগের হিন্দু প্রতিবাসীবর্গের মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের যা-কিছু প্রভেদ থাকে তাহা লুপ্ত হইয়া আসিতে থাকে, এবং অবশেষে তাহারা নিজেরা এবং প্রতিবেশী হিন্দুরাও তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া ধরিয়া লয়।"

এই সম্বন্ধে অনেকগুলি দৃষ্টান্তও উক্ত পুস্তকের ঐ পৃষ্ঠাতেই পাওয়া যাইবে।

বহু সংখ্যক লোকের একত্রে হিন্দুধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে সেন্সস্ রিপোর্টের পুস্তকের ঐ পৃষ্ঠাতেই বলা হইতেছে—

"মুসলমান বা খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে এমন দুচারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু জাতি আবার হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া গিয়াছে, এইরূপ ঘটনাও স্থানে স্থানে ঘটিতে দেখা গিয়াছে। বোম্বাইয়ের ঠানা জেলার উরাপ এবং বরাপ আগরীগণ প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। ঐ জেলারই কুপাল ভাণ্ডারীগণকে পোর্টুগীজরা বলপূর্ব্বক খৃষ্টিয়ান করে, কিন্তু তাহারা আবার হিন্দুসমাজে গৃহীত হয়। বড়োদারাজ্যে যে মাটিয়া কুন্‌বী এবং শেখাদাগণ বাস করে, তাহাদের বিষয়ে স্থানীয় রাজকর্ম্মচারী লিখিতেছেন, যে, তাহারা প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহারা অনেকেই মুসলমান আচরণ ত্যাগ করিয়াছে এবং সম্প্রতি তাহাদের মধ্যে অনেকে স্বামীনারায়ণ এবং রামানন্দের সংস্থাপিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।"

ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান আক্রমণের বন্যা সিন্ধু দেশের উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছিল। সেই সময় ঐ দেশে অনেককে বলপূর্ব্বক মুসলমান করা হইয়াছিল। সংস্কৃতে দেবল-স্মৃতি বলিয়া একটি গ্রন্থ আছে। উহা সিন্ধুদেশের দেবল নামক সমুদ্রতীরস্থ নগরের নামধারী দেবল ঋষি কর্তৃক প্রণীত বলিয়া কথিত আছে। পুস্তকটি বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত এবং বহু বৎসর পূর্ব্বে পুনার আনন্দাশ্রম গ্রন্থমালায় ছাপা হইয়াছিল, ইহা অল্পমূল্যেই পাওয়া যায়। যে-সকল হিন্দু বা হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষ মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু আবার সনাতন ধর্ম্মে পুনঃপ্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের নানাবিধ বিধান ইহার ভিতর দেখা যায়। ইহা হিন্দুদিগের একটি শাস্ত্রগ্রন্থ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ এবং ধর্ম্মান্তর হইতে হিন্দুধর্ম্মে পুনঃপ্রবেশ ইতিপূর্ব্বেও ঘটিয়াছে এবং এখনও ঘটিতেছে, এবং এ-বিষয়ে শাস্ত্রের বিধানও রহিয়াছে।

—

অর্দ্ধহিন্দু ও অর্দ্ধমুসলমান

বহুপুরুষ ধরিয়া অর্দ্ধেক হিন্দু ও অর্দ্ধেক মুসলমান ভাবে

জীবনযাপন করিয়াছে, এরকম মানুষ ভারতবর্ষে মাল্‌কানা রাজপুতগণ ভিন্নও আরো অনেক আছে।

"গুজরাটে কয়েকটি ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, যাহারা প্রধান প্রধান ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য গ্রহণ করে, কিন্তু তাহারা পিরান সাধু ইমাম্ শাহের দলভুক্ত, এবং মুসলমানদিগের ন্যায় মৃতদেহ কবর দেয়। মাটিয়া কুন্‌বী এইরূপ একটি মণ্ডলী। শেখাদাগণ তাহাদের বিবাহ-ব্যাপারে হিন্দু এবং মুসলমান দুইপ্রকার পুরোহিতই আহ্বান করে, এবং মোম্‌নাগণ গুজরাটী কোরান পাঠ, মৃতদেহ কবরস্থ করা, প্রভৃতি মুসলমান আচারের সহিত হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ ও রীতি অনুসরণ করিয়া থাকে।"—১৯১১ সালের ভারতবর্ষের সেন্সস্, প্রথম খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

—

ইংরেজের জাতিভেদ-প্রশংসা

ইহা বলা যায় না, যে, যখনই কোন ইউরোপীয় জাতিভেদের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার মূলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোনো কারণ নিহিত ছিল। কিন্তু এরূপ সন্দেহ করা যাইতে পারে, যে, ইংরেজদের কৃত জাতিভেদের প্রশংসা সাধারণতঃ কোনো না কোনো স্বার্থবুদ্ধি হইতে প্রসূত। কারণ, আমরা এমন কোনো ইংরেজের নাম জানি না, যিনি জাতিভেদ প্রথার গুণে মুগ্ধ হইয়া স্বজাতিকে ইহা গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন বা স্বদেশে ইহার প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছেন। কোনো জিনিষকে আমরা সত্যই প্রশংসার্হ মনে করি কি না তাহার এই একটি পরীক্ষা আছে। যাহাকে যথার্থ ভাল বলিয়া বুঝি, তাহাকে আমরা আপনার করিয়া গ্রহণ করিতে চাই। যেমন, পোলো খেলা ইংরেজরা মণিপুর হইতে শিখিয়া নিজের করিয়া লইয়াছেন।

সম্প্রতি ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে জাতিভেদ-প্রথার প্রশংসা করিয়া একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ব্যাপারটা এমনই সন্দেহজনক, যে, "আনন্দবাজার পত্রিকা" তৎক্ষণাৎ ইহার ভিতর কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য খুঁজিতে বসিয়াছেন; যদিও "আনন্দবাজার" হিন্দু সংবাদপত্র বলিয়া এই প্রশংসায় খুব তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন। আসল কথা এই, যে, যে-কোনো জিনিষ দেশের লোকের একতার পথে বাধাস্বরূপ, তাহাই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক হিসাবে ভারতবর্ষের পক্ষে অকল্যাণকর এবং এই কারণেই তাহা ইংরেজদের পক্ষে সুবিধাজনক। কারণ, ভারতবর্ষকে অধীন রাখিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। জাতিভেদ-প্রথাটি আমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার একটি কারণ। বর্ত্তমান সময়ে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রশংসা আকাশকুসুমের প্রশংসা ভিন্ন আর কিছু নয়। হিন্দু স্মৃতিতে যে-প্রকার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্ণিত আছে, তাহা বাস্তবপক্ষে ভারতবর্ষে কখনও ছিল কি না, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের চিন্তা বর্ত্তমান লইয়া, অতীতের কথা ভাবিতে আমরা ব্যস্ত নই। বর্ত্তমানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই, এবং সেরূপ কিছু পুনর্ব্বার সৃষ্টি করাও মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। এখন জাতিভেদ যে ভাবে আছে, তাহাকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলা যায় না। এবং মহাত্মা গান্ধীর মত হিন্দুও এই বর্ত্তমান জাতিভেদপ্রথার সমর্থন করেন না।

বংশগত জাতিভেদকে দূর করিতেই হইবে। আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক, শারীরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সব দিক্ দিয়াই ইহা হইতে আমাদের প্রভূত অকল্যাণ হইতেছে। কর্ম্ম, বৃত্তি, ব্যবসা, পেশা আদি হিসাবে শ্রেণীবিভাগের সহিত বর্ত্তমান জাতিভেদের সম্পর্ক বেশী নাই।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী যখন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন, ম্যাডাম্ ব্লাভাট্‌স্কির সহিত তাঁর এবিষয়ে একবার কথা-বার্ত্তা হয়। তৎপ্রসঙ্গে ম্যাডাম্ ব্লাভাট্‌স্কি বলেন, যে, ইংরেজরা যে কেন ভারতবর্ষ হারাইবার ভয় করে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। কারণ জাতিভেদ যতদিন আছে, ইংরেজের ভারতের উপর অধিকার ততদিন অটুট হইয়াই থাকিবে।

—

জাতিভেদের উপকারিতা

হিন্দুসমাজের জাতিভেদ দ্বারা অতীত কালে ইহার উপকার হইয়াছে, তাহা অনেকে বলিয়া থাকেন।

ইহা দ্বারা, যে-সকল শিল্পকার্য্য এক এক জাতির লোক বংশপরম্পরায় করিয়া আসিতেছে, তাহার উন্নতি ও সংরক্ষণ হইয়াছে, হিন্দুসভ্যতা রক্ষিত হইয়াছে, ইত্যাদি নানা উপকার হইয়াছে। এই প্রকার কথার মধ্যে সত্য আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই উপকারিতা লক্ষিত হইতেছে না। বরং এক এক রকম কাজ এক এক শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে, মানবপ্রকৃতির রক্ষণশীলতা-বশতঃ, প্রয়োজনীয় নূতন প্রণালী পদ্ধতি প্রভৃতি গৃহীত হইবার পক্ষে যে বাধা জন্মে, তাহারই দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। নূতন নূতন লোকে কোন কাজে প্রবৃত্ত হইলে স্বাধীনবুদ্ধি তাহাতে প্রযুক্ত হওয়ায় তাহার যে উন্নতি হয়, একই শ্রেণীর লোক তাহাতে লাগিয়া থাকিলে সে উন্নতি হয় না—যদিও যে উন্নতি অতীত কালে হইয়া গিয়াছে, তাহা রক্ষিত হয়।

এই প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যে, মুসলমানদের ও খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে হিন্দুদের মত জাতিভেদ না-থাকা সত্ত্বেও মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদিগের নানা শিল্প ও তাহাদের সভ্যতা কি প্রকারে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে? যদি হিন্দু-সমাজের মত জাতিভেদ না-থাকা সত্ত্বেও মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান দেশসকলের সভ্যতা রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এরূপ মনে করিবার কারণ কি, যে, জাতিভেদ না থাকিলে একমাত্র হিন্দু-সভ্যতাই লুপ্ত হইবে? পঞ্চাশ বৎসর আগে পর্য্যন্ত জাপানে জাতিভেদ ছিল। তাহার পর জাপানীরা উহা উঠাইয়া দিয়াছে (যদিও কোন কোন বিষয়ে এখনও কুসংস্কার আছে)। তাহারা জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-ও সভ্যতা-লোপের আশঙ্কা করে নাই, এবং তাহাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও সভ্যতা লুপ্তও হয় নাই।

—

আমেরিকার গ্রাজুয়েট তুর্ক-মহিলা

তুরস্কের শ্রীমতী সাবিহা জেকেরিয়ার এই বৎসর গত জুন মাসে আমেরিকার কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সমাজতত্ত্ববিদ্যায় উপাধি পাইবার কথা ছিল। ইহার পূর্ব্বে তুরস্কের আর কোন মহিলা আমেরিকার বিশ্ব-

শ্রীমতী সাবিহা জেকেরিয়া ও তাঁহার কন্যা, সেভিম

বিদ্যালয় হইতে উপাধি পান নাই। ইহার স্বামী মহম্মদ জেকেরিয়াও কোলাম্বিয়ার ছাত্র। ইনি সংবাদপত্র-পরিচালন-বিদ্যা শিখিতেছেন। উপাধিলাভের পর ইঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন এবং সেখানে নিজ নিজ কার্য্যে রত হইবেন। ইঁহাদের ছয় বৎসর বয়সের ছোট মেয়েটিও বড় অবহেলার পাত্র নয়। সেভিম্ ফরাসী, ইংরেজী ও তুর্কী ভাষায় অনর্গল কথা বলিয়া যাইতে পারে। এখন গাল্ স্কাউট (Girl Scout) হওয়াই তাহার প্রধান উচ্চাকাঙ্ক্ষা। শ্রীমতী জেকেরিয়া নিউইয়র্কের তুরস্কহিতৈষিণী সভার অধিনেত্রী।

কোলাম্বিয়া আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়।

—

"কর-সেবা"

পঞ্জাবের অমৃতসর নগরটির নাম তথাকার শিখ-স্বর্ণমন্দির-সংলগ্ন "অমৃতসর" (অর্থাৎ অমরত্বের সরোবর) নামক এক জলাশয়ের নাম হইতে উদ্ভূত। বঙ্গে অনেকে সহরটির নাম "অমৃতসহর" লেখেন, তাহা ভুল।

এই সরোবর ও মন্দির শিখেরা অতি পবিত্র মনে করেন। দীর্ঘকাল এই জলাশয়টির পঙ্কোদ্ধার হয় নাই। সম্প্রতি লক্ষ লক্ষ শিখ নানা স্থান হইতে আসিয়া দল বাঁধিয়া ইহার পঙ্কোদ্ধার করিয়াছেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। শিখেরা ইহাকে পুণ্যকর্ম্ম মনে করেন। পাটিয়ালার মহারাজা স্বহস্তে কোদাল দিয়া ঝুড়িতে মাটী তুলিয়া মাথার উপর ঝুড়ি রাখিয়া পঙ্কোদ্ধার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই পঙ্কোদ্ধার-কার্য্যের নাম "কর-সেবা"।

বঙ্গে গ্রীষ্মকালে প্রতিবৎসরই ভীষণ জলকষ্ট হয়। যে-সকল পুষ্করিণী অতীত কালে খনিত হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে যদি তাহার পঙ্কোদ্ধার হইত, তাহা হইলে এই কষ্টের অনেক লাঘব হইত। কিন্তু যাহারা পুণ্যকর্ম্ম ভাবিয়া পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ অনেকে পঙ্কোদ্ধার করায় কোন পুণ্য আছে মনে করেন নাই। অনেকে দারিদ্র্যবশতঃ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন। কোন কোন স্থলে পুকুরগুলি বিক্রয়সূত্রে অন্যলোকের হাতেও গিয়া পড়িয়াছে।

পুকুর-প্রতিষ্ঠা যেমন সত্য সত্যই পুণ্যকর্ম্ম, "করসেবা"-কেও তেমনি পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহা বাংলা-দেশে চালাইতে পারিলে উপকার হয়। আগামী শীতকাল পর্য্যন্ত যেন একথা আমাদের মনে থাকে।

—

"কাসিমুদ্দীনের মার্কা ও নব-পিকুইক্"

বিল্ ষ্টাম্প্স্ নামক একজন প্রায় নিরক্ষর লোক একটা পাথরে

+
B I L S T
U M
P S H I
S. M.
A R K

এইরূপ কয়েকটা অক্ষর খুদিয়া রাখিয়াছিল। আসলে সে খুদিয়াছিল "Bill Stumps His Mark" অর্থাৎ "বিল ষ্টাম্প্সের মার্কা", অশিক্ষিত বলিয়া নিজের নামের একটা এল্ অক্ষর খুদে নাই। ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের পিকুইক পেপার্সে বর্ণিত আছে, যে, এই কল্পিত বিল্ ষ্টাম্প্সের কল্পিত কীর্ত্তি উপন্যাসের নায়ক মিষ্টার পিকুইকের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায়, তিনি কি প্রকার গভীর ও গম্ভীর গবেষণা করিয়াছিলেন, এবং তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে ৯৬ পৃষ্ঠার এক পুস্তিকা লিখিয়া খোদিত অক্ষরগুলির ২৭ রকম পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন, ও তাহার বলে ১৭টা দেশী ও বিদেশী প্রত্নতাত্ত্বিক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। ব্লটন্ নামক একজন বেরসিক লোক সব কথাটা ফাঁস করিয়া দেওয়ায়, পরে কি ঘটিল, তাহাও ঐ উপন্যাসের একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ডিকেন্স্ যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবিক সেইরূপ একটি কাণ্ড ঘটিয়াছে। তাহার বৃত্তান্ত "কাসিমুদ্দীনের মার্কা ও নব পিকুইক্" শীর্ষক প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে। তাহাতে অধ্যাপক দেবদত্ত ভণ্ডারকর পিকুইকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি গত মহাযুদ্ধের সময় একজন জার্ম্যান্ প্রত্নতাত্ত্বিকের আবিষ্ক্রিয়া নিজের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন, এবং তাহা মডার্ন্ রিভিউ ও প্রবাসীতে ধরিয়া দেওয়া হয়।

—

শহরে কুষ্ঠ-চিকিৎসার গৃহ

চালমুগরার তৈল কুষ্ঠ চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশে বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত বাহিরে ক্ষতস্থানে লাগান হইত। এক্ষণে ঐ তৈলের সারপদার্থ শিরার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বেশ ফল পাওয়া যাইতেছে। এই প্রকারে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা করিবার জন্য কলিকাতায় কোলুটোলা ষ্ট্রীটে একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিবার কথা হইয়াছে। এরূপ প্রতিষ্ঠানের খুব প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাহা জনাকীর্ণ শহরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। কারণ, কুষ্ঠ অতি ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি। প্রতিষ্ঠানটি শহরের বাহিরে স্থাপিত হওয়া উচিত। উহা শহরে স্থাপন করিবার বিরুদ্ধে কলিকাতাবাসীদের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। স্যার্ নীলরতন সরকারের

মত বহুদর্শী, অভিজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ইহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কুষ্ঠরোগ সংক্রামক বলিয়া তিনি চিকিৎসালয়টি শহরে স্থাপিত করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। মাড়োয়ারী সমাজের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান প্রভৃতিও সভার কার্য্যে যোগ দিয়া শহরে এই চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রতিবাদ করেন।

—

নাভা ও পাটিয়ালা

নাভা ও পাটিয়ালা পঞ্জাবের দুটি শিখ্‌ রাজ্য। দুটির রাজাই গবর্ণমেণ্টকে গত যুদ্ধের সময় সাহায্য করিয়া ইংরেজ-ভক্তি দেখাইয়াছিলেন। অতএব, সম্প্রতি যে নাভার মহারাজা গদী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা ইংরেজ-ভক্তির অভাববশতঃ নহে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার এই শাস্তির প্রকাশিত কারণ এই, যে, তাঁহার রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারীরা পাটিয়ালা রাজ্যের কতকগুলি নির্দ্দোষ কর্ম্মচারীকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, এবং ইহা নাভার মহারাজার জ্ঞাতসারে হইয়াছিল। দণ্ডিত কর্ম্মচারীদের নামে কি অভিযোগ হইয়াছিল, তাহারা কি শাস্তি পাইয়াছিল, কে কি প্রণালী অনুসারে তাহাদের বিচার করিয়াছিল—ইত্যাদি বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় নাই। একজন ইংরেজ জজ নাভার রাজার বিচার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট্‌ তাঁহার মতে সায় দিয়াছেন। সাধারণ লোকের যখন বিচার হয়, তখন তাহা প্রকাশ্য আদালতে হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে বিচার এসেসর্‌ বা জুরীর সাহায্যে করা হয়। ইংরেজের দেশে যেমন অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার সমান পদবীর লোকদের দ্বারা বিচার (trial by one's peers) চাহিতে পারে, তেমনি আমাদের দেশেও পঞ্চায়েতী বিচারে ঐ অধিকার কার্য্যতঃ স্মরণাতীত কাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সাধারণ লোকে বিচারের সময় যে-সব অধিকার বা সুযোগ পাইয়া থাকেন, নাভার রাজা কেন তাহা পাইলেন না, এবং সাধারণ অভিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রথম বিচারের পর যেরূপ আপীল করিবার সুযোগ পায়, নাভার নৃপতি কেন সেইরূপ সুবিধা পাইলেন না, জানি না। তাঁহার কর্ম্মচারীরা পাটিয়ালার কর্ম্মচারীদের কিরূপ ভীষণ দণ্ড দিয়াছিল, যাহার জন্য রাজ্যচ্যুতি ও নির্ব্বাসন-রূপ অতি গুরুতর সাজা তিনি পাইলেন, তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

তাঁহার সমান পদবীর লোকদের দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারিত। কারণ, কয়েক বৎসর হইল, গবর্ণমেণ্ট্‌ বড় আড়ম্বর সহকারে "নরেন্দ্র-মণ্ডল" (Council of Princes) স্থাপন করিয়াছেন, এবং তাহার একাধিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই নরেন্দ্র-মণ্ডলের সম্মুখে নাভা-পাটিয়ালার মোকদ্দমা পেশ্‌ করা যাইতে পারিত।

গবর্ণমেণ্ট্‌ দেশী রাজাদের রক্ষার জন্য আইন (Protection of Princes Act) জারী করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য, খবরের কাগজের সম্পাদক ও লেখকরা রাজাদের যে-সব বদনাম করে ও তাঁহাদের প্রজাদিগকে বিদ্রোহী হইতে যেরূপ উত্তেজিত করে (করে কি না, তাহার বিচার করিব না), তাহা হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করা। আমরা সরকার বাহাদুরের চক্ষে সর্ব্বদাই দোষী হইয়াই আছি; তাঁহারা যে আমাদিগকে যাবজ্জীবন জেলে রাখেন না, সেটা বোধ হয় কেবল খরচের ভয়ে ও ব্যয়-সংক্ষেপের জন্য! সুতরাং আইনটার অনাবশ্যকতা বা কোন দোষ দেখান মূর্খতা, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু ইহা বলিলে আশা করি কোন নূতনতর গোস্তাকী হইবে না, যে, কোন দেশী লেখক কখন কোন দেশী রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট্‌ তাহা করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস কোন কোন স্থলে সরকার অন্যায় করিয়া এরূপ করিয়াছেন। এরূপ অবিচার হইতে দেশী রাজাদিগকে রক্ষা করিবার কোন আইন থাকা উচিত নয় কি? যদি ইহা ধরিয়া লওয়া যায়, যে, কোন স্থলেই গবর্ণমেণ্ট্‌ জ্ঞাতসারে জুলুম জবরদস্তী বা অন্যায় করেন নাই, তাহা হইলেও, ভুল ত সব মানুষেরই হইতে পারে, এবং গবর্ণমেণ্ট্‌ও কতকগুলি মানুষেরই সমষ্টি। এরূপ ভুলের সংশোধনের জন্য সাধারণ ফৌজদারী আইনে আপীলের

ব্যবস্থা আছে। দেশী রাজারা আপীলের সুযোগ কেন পাইবেন না?

দেশী রাজাদের নাবালকত্বের সময়টা গবর্ণমেণ্টের পলিটিক্যাল অফিসারদের বড় সুযোগের সময়। নাবালক-রাজা সাবালক হইবার পর গদীতে আরোহণ করেন। কিন্তু অনেকবার ইহা দেখা গিয়াছে, যে, নাবালককে গদী দিবার আগে গবর্ণমেণ্ট্ এরূপ নূতন সন্ধি-সর্ত্ত করিয়া লইয়াছেন, যাহার দ্বারা তাহার পূর্ব্বপুরুষদের কোন না কোন ক্ষমতা, অধিকার বা এলাকা হ্রাস পাইয়াছে। এই কারণে ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের নাবালক রাজার অভিভাবকত্ব ভীতি উৎপাদন করে।

নাভার রাজার যে অপরাধ হইয়াছে বলা হইতেছে, সেই অপরাধ স্বাধীন দেশের রাজারা করিলে, তাহারা কি সিংহাসনচ্যুত হয়? নাভার রাজা স্বাধীনচেতা ছিলেন বলিয়া তাঁহার শাস্তির প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে।

জনৈক দেশী রাজার নিন্দা

নাভা ও পাটিয়ালার বিবাদের মূলে কি ও কতটা সত্য আছে, জানি না। সত্য থাকিলে তাহা দুঃখের বিষয়; সত্য না থাকিলে পাটিয়ালা কর্ত্তৃক এরূপ মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন তদপেক্ষাও দুঃখের বিষয় বিবেচিত হইবে, সুতরাং তাহাও অনুমান করা ক্লেশকর। দুঃখের বিষয় বলিতেছি এইজন্য, যে, উভয় রাজাই শিক্ষিত ও বহুলক্ষ মানবের কল্যাণের জন্য দায়ী। তাঁহাদের আচরণ পদ-মর্য্যাদার অনুরূপ হওয়া উচিত; গৃহবিবাদ তাঁহাদের পক্ষে অশোভন—বিশেষতঃ যখন তাঁহারা একই বংশের লোক।

যাহা হউক, আলোচ্য বিষয়ে ইঁহাদের উভয়ের বা কাহারও ব্যক্তিগত দোষ আছে কি না, ঠিক্ না জানিয়া বেশী কিছু লেখা উচিত নয়। অন্য একজন দেশী রাজার নিন্দা আমেরিকার কাগজে ঘোষিত হইয়া ভারতবাসীদের নামে কলঙ্ককালিমা লেপন করিতেছে। ১৯২৩ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখের শিকাগো হেরাল্ড্ এণ্ড্ এগ্‌জামিনার্ (The Chicago *Herald and Examiner*) কাগজে দুটি পুরুষ ও তাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের ছবি বাহির হইয়াছে ও তাহার নীচে লেখা আছে (নাম আমরা বাদ দিলাম):—

A Family Triangle—The Maharanee of—, former Spanish dancer, is suing for divorce from the Maharajah (left) so that she can marry his stepson and heir (right). Honestly, now, can you blame her?

Kadel and Herbert Photo.

প্রকাশ্যভাবে ছবি ছাপিয়া এই কথা লেখা হইয়াছে। অথচ, আমরা যতদূর জানি, ইহার প্রতিবাদ হয় নাই। মিথ্যা হইলে প্রতিবাদ হওয়া উচিত। সত্য হইলে, গবর্ণ-মেণ্ট্ রাজাকে আইন দ্বারা দুর্ণাম হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কি?

বালিকার কৃতিত্ব

আমরা লীডারে দেখিয়া সুখী হইলাম, যে, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমীডিয়েট্ পরীক্ষায় কুমারী শান্তি অধিকারী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বালিকাটি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফণীভূষণ অধিকারী মহাশয়ের কন্যা। তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী আশাও পরীক্ষায় ঐরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর সম্মান

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ স্যার্ প্রমদাচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায় অস্থায়ী ভাবে উহার প্রধান বিচারপতির কাজ করিতেছেন। তাঁহাকে অনেক পূর্ব্বে স্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করিলেও অবিচার হইত না।

স্যার্ বিপিনকৃষ্ণ বসু নাগপুরে নবস্থাপিত বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বিদ্বান্, এবং সার্ব্বজনিক কাজে তাঁহার উৎসাহ আছে। যোগ্য লোকেরই নিয়োগ হইয়াছে।

বঙ্গের বাহিরে আরও দুইজন বাঙালী ভাইস্-চ্যান্সে-লার আছেন—মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

এবৎসর ১৮৮৮১ ছাত্র ও ছাত্রী কলিকাতার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল। তাহার মধ্যে ৭৫৮৪ জন প্রথম বিভাগে, ৫১৮৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে, ও ১০৮১ জন তৃতীয় বিভাগে—মোট ১৩৮৪৯ জন, উত্তীর্ণ হইয়াছে। শতকরা ৭৪·১ জন পাস্ হইয়াছে।

যাহারা প্রথম-বিভাগে পাস্ হইয়াছে, যদি তাহারা সকলেই কলেজে পড়িতে চায়, তাহা হইলে তাহাদেরই স্থান হইবে না। তাহারা সকলে পড়িতে চাহিবে না, কিম্বা, অর্থাভাবে বা অন্য প্রতিবন্ধকে পড়িতে পারিবে না, সত্য; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের বিস্তর ছাত্র পড়িতে চাহিবে। অতএব মোটের উপর বলা যাইতে পারে, যে, ৯।১০হাজার ছেলে কলেজে পড়িতে চাহিবে। কিন্তু এত ছেলের স্থান সাধারণ কলেজে এবং মেডিক্যাল্ ও এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হইবে না; মেডিক্যাল্ স্কুলগুলি সহিতে ধরিলেও হইবে না।

কেবল জ্ঞানের জন্য জ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতা ও তদনুরূপ সংসারিক অবস্থা বা বিষয়বৈরাগ্য অল্পসংখ্যক লোকের থাকে। কিন্তু নিজের নিজের খরচ চলিবার মত রোজ্‌গার করিবার দর্‌কার অধিকাংশ লোকেরই আছে। পৈত্রিক সম্পত্তির প্রসাদে যাঁহাদের রোজ্‌গারের দর্‌কার নাই, তাঁহারাও যদি নিজে উপার্জ্জনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শক্তি বাড়ে এবং স্বাবলম্বনের বলে চারিত্রিক দৃঢ়তা জন্মে।

এই-সকল কারণে, এবং কলিকাতার প্রবেশিকায় ভাল ছেলেরাও যতটুকু জ্ঞান লাভ করে, তাহা সাধারণ ভাবে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইবার পক্ষেও যথেষ্ট নহে বলিয়া, প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের তদতিরিক্ত ও উচ্চতর শিক্ষার এবং কোন না কোন বৃত্তি শিক্ষার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন রকমের আরও শিক্ষালয় স্থাপিত না হইলে এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না।

—

পরীক্ষকবিশেষের উন্নতির কারণ

দুটি ছেলে একবার কলিকাতার প্রবেশিকা পরীক্ষায় কোন বিষয়ে পাস্ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের উভয়ের অভিভাবকদের উপর কোন প্রধান পরীক্ষকের রাগ থাকায় সে উহাদের কাগজ আবার পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ফেল করে। এই-ব্যক্তি পরে বি-এ পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হয়! আমরা শুনিয়াছি, সীণ্ডিকেটের সভ্যেরা (অন্ততঃ কেহ কেহ) ইহা অনবগত নহেন।

—

শিক্ষার ব্যয়সংক্ষেপ

বঙ্গে প্রাদেশিক ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি নিযুক্ত হইবার সময় হইতে আমরা আশঙ্কা করিয়া আসিতেছি, যে, হারাহারি শিক্ষার ব্যয়ই বেশী সংক্ষেপ করিবার প্রস্তাব হইবে; এবং অন্যান্য বিভাগের ব্যয়সংক্ষেপ কার্য্যতঃ যাহাই হউক, শিক্ষার ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে। এইরূপ আশঙ্কা আমরা প্রকাশও করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, এই ভয় ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে না। বাংলা দেশে অন্যান্য বিভাগে ব্যয়সংক্ষেপের কি হইতেছে, না হইতেছে, জানি না; কিন্তু শিক্ষা-বিভাগে খুব জোরে খরচ কমান হইতেছে। সংস্কৃত কলেজের কয়েক জন সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রাদেশিক চাকরী (provincial serviceএ) হইতে নিম্নতর চাকরীতে (subordinate serviceএ) অবনমিত করা হইয়াছে। তাহা না করিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চতম শ্রেণীর চাকরী দিলেই সুবিচার হইত। এক জন অধ্যাপকের কাজ যাইবে বলিয়া নোটিস্ দেওয়া হইয়াছে শুনিতেছি। সংস্কৃত কলেজে কি হইতেছে, তাহার বৃত্তান্ত সঞ্জীবনীতে বাহির হইয়াছে। অন্যান্য শিক্ষালয়ে যাহা হইতেছে, তাহাও তথাকার লোকদের প্রকাশ করিয়া দেওয়া উচিত।

বঙ্গীয়-ব্যয়সংক্ষেপ-কমিটি শিক্ষাবিভাগকে অন্যতম একান্তপ্রয়োজনীয় ("essential") বিভাগ বলিয়া ধরেন নাই। সুতরাং উহা একেবারে নির্মূল করিয়া গ্রামে গ্রামে একজন পুলিস্ ইন্‌স্পেক্টর বসাইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। আমরা গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি, যে, কমিটি যে যে বিভাগকে একান্তপ্রয়োজনীয় বলিয়াছেন, তাহা অনাবশ্যক না হইলেও, সাধারণ এবং বৃত্তি শিক্ষার বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, কৃষিশিল্পবাণিজ্য বিভাগ, এবং যানবাহন

বিভাগ, জাতীয় শক্তিসমৃদ্ধি-বর্দ্ধনের নিমিত্ত একান্ত-প্রয়োজনীয়।

—

বেথুন কলেজের ছাত্রীনিবাস

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে একটি প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানাইয়াছেন, যে, তিনি জানেন, যে, বেথুন কলেজে ছাত্রীদের বাসের যথেষ্ট স্থান নাই। তিনি বলিয়াছেন, ছাত্রীনিবাস নির্ম্মাণের জন্য ১৯১৪-১৫ সালে ১,৭৩,০০০ টাকা দিয়া জমী কেনা হয়, কিন্তু তদবধি গৃহনির্ম্মাণের জন্য টাকা জোটে নাই; গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিয়া ভাড়াটিয়া বাড়ীতে একটি ছাত্রী-নিবাস খোলাইবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টের টাকা থাকা-না-থাকাটা একটা বাজে কথা। সৈনিক বিভাগের জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট কোটি কোটি টাকা ধার করেন। পাঁচ বৎসরে দেড় শত কোটি টাকা রেলওয়ের জন্য খরচ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ধার করিয়াছেন। বলিবেন, এ ত ভারত-গবর্ণমেণ্ট, বাংলা-গবর্ণমেণ্ট নয়। কিন্তু এই ভারত-গবর্ণমেণ্টই বাংলা দেশে ছেলে ছাত্রদের বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য অনেক লক্ষ টাকা দিয়াছেন; ছাত্রীদের জন্য বঙ্গের একমাত্র সরকারী কলেজের ছাত্রীনিবাসের নিমিত্ত কেন দেন নাই? বাংলা-গবর্ণমেণ্ট ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ লক্ষ টাকা দেন, যাহা কেবল বা প্রধানতঃ ছেলেদের কাজে লাগে। মেয়েদের জন্য কেন কিছু দিতে পারেন না? কোন রাজনৈতিক মৎলব থাকিলে, জবরদস্ত লোকে ঝগড়া করিলে, কিম্বা রাজনৈতিক চাপ পড়িলে গবর্ণমেণ্ট ছাত্রী-নিবাসের জন্যও টাকা দিতেন; তাহা না ঘটায়, দেন নাই। শিক্ষার জন্য দানও যে রাজনৈতিক কারণে হয়, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতের আদিম-নিবাসী কোল ভীল সাঁওতাল প্রভৃতিরা ও "অস্পৃশ্য" জাতিরা শিক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে মুসলমানদের শিক্ষার জন্য যে যে বিশেষ চেষ্টা ও ব্যবস্থা হইয়াছে, আদিমনিবাসী ও "অস্পৃশ্য"দের জন্য তাহা হয় নাই। নারীরা নিজে কিম্বা তাঁহাদের জন্য অন্যেরা গবর্ণমেণ্টকে হয়রান পরেশান্ করিতে পারিলে অচিরে ছাত্রীনিবাস নির্ম্মিত হয়।

—

চর মনাইরে অত্যাচারের অভিযোগ

ফরিদপুর জেলার চর মনাইরে পুলিস খুব অত্যাচার করিয়াছে—মানুষ মারিয়াছে, স্ত্রীলোকদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছে,—এই অভিযোগের বিস্তারিত বৃত্তান্ত অনেক কাগজে বাহির হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট অনেক বিলম্বে জ্ঞাপনী (communique) দ্বারা জানাইয়াছেন, যে, ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্তে অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া স্থির হইয়াছে। তাহাতে ইহাও লেখা আছে, যে, যে-সব কাগজে বিস্তারিত বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছিল, তাহাদের কাহারো কাহারো বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা হইবে কি না, গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিতেছেন। অর্থাৎ কিনা, অতঃপর এ বিষয়ে যে কাগজওয়ালা আরও কিছু খবর বাহির করিবে, সে আদালতে অভিযুক্ত হইতে পারে। যাঁহারা স্বয়ং ঘটনাস্থলে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া অত্যাচার নিশ্চয় হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের এই ধমকে নিরস্ত হওয়া উচিত নয়। ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়টি উত্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু কোন সভ্য প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষশ্রোতা না হওয়ায়, তাঁহাদের বক্তৃতায় তেমন জোর হয় নাই। তাঁহাদের কেহ কেহ ঘটনাস্থলে গেলে ভাল হইত।

প্রাদেশিক কংগ্রেস্ কমিটির পক্ষ হইতে অনুসন্ধান হইতেছে শুনিয়াছি। অনুসন্ধাতারা প্রমাণ পাইলে যেন তাহা প্রকাশ করেন। অতীতকালে কোন কোন অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার নিমিত্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল; তাঁহারা সাক্ষ্যও লইয়াছিলেন, কিন্তু কোন রিপোর্ট প্রকাশ করেন নাই। এবার যেন তাহা না হয়।

দেশের লোকে গবর্ণমেণ্টের জ্ঞাপনীতে আস্থা স্থাপন করিতেছে না। সরকারী-বেসরকারী কমিটির দ্বারা প্রকাশ্য অনুসন্ধান হইলে তাহার রিপোর্ট কতকটা

বিশ্বাসযোগ্য হইত। অত্যাচার-কাহিনীর মধ্যে যে যে অংশ স্ত্রীলোকঘটিত তাহা অমূলক হইবার কথা নয়।

—

সংশোধিত ফৌজদারী আইনের কথা

সংশোধিত ফৌজদারী আইনের দ্বারা অনেক নিরপরাধ লোককে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। উহা রদ করিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাব হয়। অমনি সরকারপক্ষ হইতে আপত্তি উঠে, যে, দেশ একেবারে ঠাণ্ডা হয় নাই, "অসহযোগ" মরে নাই, ইত্যাদি। কিন্তু কয়েক দিন আগেই পার্লেমেণ্টে অধস্তন ভারতসচিব আর্ল্ উইণ্টারটন্ বলিয়াছিলেন, যে, ঠাণ্ডা হওয়ার দিকে ভারতের অবস্থার খুব উন্নতি হইয়াছে, ইত্যাদি। তাহার মানে এই, যে, যখন যেরূপ কাজ হাসিল করিতে হয়, বর্ণনা ও তথ্যগুলাও তেমনি আকার ধারণ করে; এবং জবরদস্ত্ হাকিমরা বিরাগভাজন মানুষদিগকে জব্দ করিবার একটা অস্ত্রও হাতছাড়া হইতে দিতে চান না।

সকলের চেয়ে মজার কথা এই, যে, অনেক দেশী সভ্যও আইনটা রদ করিবার বিপক্ষে মত দেন। যদি তাঁদের কিম্বা তাঁদের দলের লোকদের কাহারো উপর পরে আইনটা প্রযুক্ত হয়, তখন ইঁহারাই কিন্তু কেঁউ কেঁউ করিবেন।

সোজা সভ্য সাধারণ আইন দ্বারা যদি দেশ শাসন করা না যায়, তাহা হইলে তাহার জন্য শাসনপ্রণালী ও শাসকেরা দায়ী। যদি স্বীকারও করা যায়, যে, কোন দেশে বেসরকারী জুলুম হইতেছে, তাহা হইলেও, বেআইনী আইন ও সরকারী জুলুম তাহার প্রতিকার নহে। জনগণকে তাহাদের স্বাভাবিক অধিকার, আত্মকর্তৃত্বের অধিকার, দিলে প্রকৃত প্রতিকার হয়; তাহা না দিলে, তাহারা নিজেই তাহা জিনিয়া লয়। নানা দেশের ইতিহাস এই কথাই বলে।

—

জেলে বেত-মারা

সে দিন বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব পাস্ হইয়া গিয়াছে, যে, জেলে কয়েদীকে বেত মারা হইবে না। সরকার-পক্ষ হইতে বলা হয়, যে, দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির বদমায়েস ও যাঁহারা বিদ্রোহ করে (যেমন প্রেসিডেন্সী জেলে হইয়াছিল), তাহাদিগকে বাগ মানাইতে হইলে শেষ উপায়, বেত-মারা, হাতে থাকা চাই, একেবারে চরম উপায় অবশ্য গুলি চালান; কিন্তু সভ্যেরা কি সচরাচর এই উপায় ব্যবহৃত হওয়া চান? দুর্দ্ধর্ষ বদমায়েসদিগকে নিয়মাধীন রাখিতে হইলে বেতের দরকার আছে স্বীকার করিয়া লইলেও ইহা প্রমাণ হয় না, যে, জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ও জেলর বাবুদেরই মত ভদ্রবংশজাত ও শিক্ষিত লোকদিগকে বেত না মারিলে জেল চালান যায় না, বা রাজ্য রক্ষা হয় না। অথচ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ ভদ্র ও শিক্ষিত লোকদিগকে বেত মারা হইয়াছে ও তাহাদের উপর অন্যবিধ নিষ্ঠুর অত্যাচার হইয়াছে, এরূপ বৃত্তান্ত বারবার বিশ্বাসযোগ্য লোকেরা খবরের কাগজে লিখিয়াছেন। ইহার কারণ কি? সরকার-পক্ষ হইতে বেত মারার ব্যবস্থা রাখিবার জন্য যে বক্তৃতা হয়, তাহাতে মিউটিনী বা বিদ্রোহের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা হইতে আম্‌লাতন্ত্রের মনোগত অভিপ্রায় বুঝা যায়। প্রেসিডেন্সী জেলে যেরূপ বিদ্রোহ হইয়াছিল, শুধু তাহাই বিদ্রোহ নহে; যে-কেহ জেলের কোন কর্ম্মচারীর কোন রকমের হুকুম মানিবে না, তাহাকেই বিদ্রোহী মনে করা হইবে, অভিপ্রায় এইরূপ।

বেতের যেরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার হইয়াছে, তাহাতে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা উহা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব ধার্য্য করিয়া ঠিকই করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে কাজ করিতে বাধ্য নহেন, এই যা দুঃখ।

—

গান্ধীর প্রভাব কোন্ দিকে?

সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাব হয়, যে, যে-সকল রাজনৈতিক বন্দীর স্বাস্থ্য খারাপ, যাহারা বার বার পীড়িত হইতেছেন, ও যাঁহাদের পীড়া কঠিন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। তর্কবিতর্ক উপলক্ষে গান্ধী মহাশয়ের কথা উঠে। তাহাতে স্যার্ ম্যাল্কম্ হেলী শ্রীযুক্ত শেষগিরি আইয়ারের এই কথা

অস্বীকার করেন, যে, গান্ধীর প্রভাব সুশৃঙ্খলা ও শান্তির অনুকূল। স্যার্ ম্যাল্কম্‌কে একটা প্রশ্ন করা যাইতে পারে। কয়েক বৎসর আগে এমন সময় ছিল, যখন বড়-লাট মেজোলাট ছোটলাটদিগকে রেলে যাতায়াত করিতে হইলে লাইনের আগাগোড়া দুদিকে কয়েক শত গজ অন্তর অন্তর চৌকিদার মোতায়েন করিতে হইত। রাত্রে তাহারা মশাল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। এখন যে বড়তম হইতে ছোটতম ইংরেজ কর্ম্মচারীর এরূপ কোন পাহারা দরকার হয় না, এখন যে তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে যেখানে-সেখানে যখন-তখন যাইতে পারেন, সেটা প্রধানতঃ কাহার প্রভাবে ঘটিয়াছে, আম্‌লাতন্ত্র তাহার সত্য উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। রক্তপাত দ্বারা দেশকে স্বাধীন করিতে হইবে, এই ধারণা, নির্ম্মূল না হউক, ক্ষীণ হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে।

—

বড় লাটের সার্টিফিকেশ্যন্-ক্ষমতা হ্রাস

ভারত-শাসন আইনের ৬৭ ধা। অনুসারে বড়লাট ব্যবস্থাপক সভার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এমন নিয়ম বা আইন জারী করিতে পারেন, যাহা তিনি ব্রিটিশ-ভারতবর্ষের শান্তি ও নিরাপদতার জন্য (for the safety and tranquillity of British India) এবং ব্রিটিশ-ভারতের স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য (in the interests of British India) একান্ত আবশ্যক (essential) বলিয়া সত্য-বিবৃতি (certify) করেন। এই প্রণালী অনুসারে দেশী রাজাদের রক্ষণ আইন পাস্ হয়, বর্দ্ধিত-লবণশুল্ক ধার্য্য হয়। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ৩৬ জনের মতের বিরুদ্ধে ও ৩৮ জন সভ্যের মত অনুসারে এই প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে, যে, ভারত-শাসন আইনের এই ধারা হইতে "ভারতবর্ষের স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য (in the interests of British India)" কথাগুলি বাদ দিয়া উহা সংশোধিত করা হউক।

ইহা স্বীকার করা যায় না, যে, ভারতের লোকদের প্রতিনিধিরা ভারতের শান্তি, সুশৃঙ্খলা, কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষার জন্য কি দরকার তাহা বড়লাটের চেয়ে কম বুঝেন, এবং যাহা দরকার তাহা তাঁহা অপেক্ষা কম চান।

মন্দের ভাল এই, যে, প্রস্তাবটি অনুসারে আইন সংশোধিত হইলে ইহা কার্য্যতঃ স্বীকৃত হইবে, যে, বড়লাট ভারতের স্বার্থটি আমাদের চেয়ে অন্ততঃ বেশী বুঝেন না বা চান না।

—

কুৎসিত পুস্তক

বিজ্ঞান নাম দিয়া অনেক কুৎসিত পুস্তক বাহির হইতেছে। খবরের কাগজওয়ালাদের এসব বহির বিজ্ঞাপন বন্ধ করা উচিত। বহিগুলা পড়িয়া দেখিয়া পুলিস্-কর্ত্তৃপক্ষ রাস্তার ধারে উহার ইস্তাহার মারা এবং দোকানে বিক্রী বন্ধ করিতে পারেন না কি?

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিমন্ত্রণে নৈহাটিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সভাপতি রূপে যে বক্তৃতা করেন, তাহা নম্রতা ও সুবিবেচনার পরিচায়ক। বার্ষিক পুরস্কার দিয়া বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন শাখার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের লেখকদিগকে উৎসাহিত করিবার প্রস্তাব তাঁহার বক্তৃতায় ছিল, এবং তিনি কিছু দিতেও রাজী আছেন, বলেন। প্রস্তাব ভাল—যদিও নূতন নয়। দুঃখের বিষয় সম্মেলনের অনেক ভাল প্রস্তাব অনুসারে কাজ এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ একদিন গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের কি মহা উপকার করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীতে ভোজনের ব্যবস্থা উত্তম হইয়াছিল ও অতিথিদের আদরযত্ন খুব হইয়াছিল বলিয়া কাগজে পড়িয়াছি।

—

দুমুখো যুক্তি

ইতিপূর্ব্বে আম্‌লাতন্ত্রের দুমুখো যুক্তির একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছি, যাহার অনুসারে আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে ভারতবর্ষ ঠাণ্ডা হইয়াছে ও ঠাণ্ডা হয় নাই। আর একটা দৃষ্টান্ত এই, যে, বড়লাট বলিয়াছেন, যে, জিনিষ-

পত্রের দাম কমিয়া যাওয়ায় লবণশুল্কের সামান্য বৃদ্ধি গরীবদের গায়ে লাগিবে না। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সার্ভিস্-কমিশন বসাইবার কারণ ইহাই বলা হইতেছে, যে, জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের ব্যয়বৃদ্ধি হওয়ায় মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির বড় অসুবিধা হইয়াছে। অর্থাৎ জিনিষপত্রের দাম কমায় গরীবদের সুবিধা ও ধনীদের অসুবিধা হইয়াছে!

এই প্রকারের আরও একটা তথ্য পাওয়া গিয়াছে। আম্‌লাতন্ত্রের ও বণিক্‌সমাজের ইংরেজরা কিছুকাল হইতে বলিয়া আসিতেছেন, যে, এখন ইংরেজরা আর ভারতবর্ষের চাকরীর আকর্ষণ অনুভব করে না। কিন্তু সেদিন আর্ল্‌ উইণ্টারটন্ পার্লেমেণ্টে বলিয়াছেন, ভারতীয়-পুলিস্-বিভাগে এগারটা কাজের জন্য ছয়শত দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে; এবং আবেদকদের যোগ্যতা খুব উচ্চ ("The quality of the candidates was very high")।

ঐ-দিনই বিলাতের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী মিঃ ফিশার পার্লেমেণ্টে বলেন, ভারতের সিভিল সার্ভিস্ প্রভৃতির বেতন অত্যন্ত কম ("The Indian Services were greatly underpaid")! লোকটার অসত্য কথা বলিবার সাহস দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। ভারতবর্ষে ইংরেজরা যেরূপ কাজের জন্য যেমন মোটা বেতন পায়, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সেরূপ কাজের জন্য কেহ তত মাহিনা পায় না, ইহাই হইতেছে খাঁটি সত্য কথা।

অহমিকা ও আত্মশ্লাঘা

ব্রিটিশ-প্রধানমন্ত্রী মিষ্টার বল্‌ডুইন্ রোড্‌স্-বৃত্তির ভোজে বক্তৃতা উপলক্ষ্যে গত ১৭ই জুন অক্স্‌ফর্ডে বলেন, সমস্ত পৃথিবী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পরিত্রাণের জন্য ব্রিটিশসাম্রাজ্য ও আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের দিকে তাকাইয়া আছে ("the whole world was, consciously or unconsciously, looking for salvation to the British Empire and the United States")। সমস্ত পৃথিবী ইংরেজী-ভাষী লোকদের কাছে পরিত্রাণ মাগিতেছে বলিয়াই, ২৭শে জুনের ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের একটি টেলিগ্রাম অনুসারে, ব্রিটেনের আকাশযান ও আকাশসেনা ১৮ স্কোয়াড্রন্ হইতে বাড়াইয়া ৫২ স্কোয়াড্রন্ করা হইবে—প্রায় তিনগুণ বাড়ান হইবে! ব্রিটেনকে আঘাত করিবার মত নিকটে যাহারা আছে, তাহাদিগ হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য ইহা করা হইবে। * যদি সবাই পরিত্রাণ চাহিতেছে, তাহা হইলে কেহ আঘাত করিবে এরূপ ধারণা কেন হইল? ত্রাণকর্ত্তা ত্রাণার্থীকে ভয় করে ও মারিতে চায় ইহা এই প্রথম শুনিলাম। ধন্য আত্মগরিমা ও ভণ্ডামি!

মিষ্টার বল্‌ডুইন্ এমন সর্ব্বজ্ঞ ও অন্তর্দর্শী যে তিনি লোকে নিজেদের জ্ঞাতসারে যাহা চায় তাহা ত জানেনই, অধিকন্তু লোকে যাহা নিজেদের অজ্ঞাতসারে চায়, তাহাও জানেন!

আর্ল্‌ উইণ্টার্টনেরও কতকটা এই রকম ক্ষমতা আছে। তিনি সেদিন পার্লেমেণ্টে বলিয়াছেন, ভারতের বাহিরে এশিয়ার কোটি কোটি লোক তাহাদের দেশের রক্তকলঙ্কিত বর্ব্বরতার পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ পতাকার অধীনস্থ ভারতের শান্তি ও ন্যায়-বিচার পাইবার জন্য তাহাদের সর্ব্বস্ব দিতে লালায়িত ("Millions in Asia, outside India, would give their all to exchange the bloodstained savagery of their own countries for the peace and justice of India under the Union Jack")! আমরা এশিয়ার লোক, আমরা ত কখন কোন এশিয়াবাসী জাতির ব্রিটিশপদানত হইবার মনোবাঞ্ছার কথা শুনি নাই! জাপানের কথা বলাই বাহুল্য। চীনাদের কাছে সব বিদেশীই 'বিদেশী ভূত' (foreign devil)। তিব্বতীয়া এই সেদিনও বৌদ্ধমিশননামধারী কয়েকজন ইংরেজের

* "London, June 26. The Prime Minister announced to-day in the House of Commons that the Government had concluded that British air power must be sufficient to provide protection against the strongest force within striking distance of Britain. The strength of the Royal Air Force would, accordingly, be increased from 18 to 52 squadrons without delay."

তিব্বত-প্রবেশ লইয়া হাঙ্গামা করিয়াছে। পারস্যের লোকেরা সম্প্রতি তাহাদের ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশী কর্ম্মচারীকে বিদায় দেওয়া স্থির করিয়াছে। প্যালেষ্টাইনে ইংরেজপ্রতিষ্ঠিত শাসনবিধি-অনুযায়ী প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন পণ্ড করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা হইয়াছে। আরবেরা নানা প্রকারে বার বার দেখাইয়াছে, যে, তাহারা ইংরেজের প্রভুত্ব বা অভিভাবকত্ব, কিছুই চায় না! কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? কোটি কোটি এশিয়াবাসীর মনের গোপন কথাটি আল্ উইণ্টার্টন্ জানিয়াছেন।

তিনি ইংরেজ-রাজত্বের ন্যায়বিচারের উল্লেখ করিয়াছেন। এত বড় একটা জাতি ও দেশকে আত্মকর্ত্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত রাখা কি ন্যায়সঙ্গত? ইহার যে শিল্পবাণিজ্য ইংরেজশাসনকালে নষ্ট হইয়াছে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার পুনরুজ্জীবন-চেষ্টা না-করা কি ন্যায়সঙ্গত? যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়দিগকে স্বদেশের বড় বড় কাজ করিতে না দেওয়া কি ন্যায়সঙ্গত? ভারতবাসীর অনিষ্টকারী ইংরেজ অপরাধীর ন্যায্য দণ্ড কয়টা মোকদ্দমায় হয়?

দেশে শান্তিস্থাপন ও রক্ষার উদ্দেশ্য এই, যে, মানুষের ধনপ্রাণদেহ নিরাপদ্ থাকিবে। আমরা গত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে ও মার্চ্ মাসের ওয়েল্‌ফেয়ারে দেখাইয়াছি, যে, ভারতে শান্তি থাকা সত্ত্বেও ভারতের অনেক প্রদেশে লোকসংখ্যা কমিতেছে, এবং কোন কোন দেশে যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। তা ছাড়া, নির্ব্বীর্য্য ও মৃতপ্রায় হইয়া শান্তিলাভের মূল্য কি? এশিয়ার কোন দেশ ভারতের মত চিরবুভুক্ষিত নহে। তাহাতে বুঝা যাইতেছে, যে, অন্য দেশের রক্তকলঙ্কিত বর্ব্বরতা সত্ত্বেও তথাকার লোকেরা খাইতে পায়, শান্তি সত্ত্বেও আমরা পাই না।

শান্তির আর-একটা দিক্ দেখুন। ডাকাতী গুণ্ডামি লাগিয়াই আছে; কখন কখন ডায়ারীয় অবদান সংবাদ-পত্রে কীর্ত্তিত হয়, পুলিসের বীরত্বের পরিচয়ও বিরল নহে—এবং ভারতীয় ভারত অপেক্ষা ব্রিটিশ ভারতে হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা বেশী হয়। মোপ্‌লা বিদ্রোহও সুদূর অতীতের কথা নহে।

—

দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা

১৯২১ সনের মাঝামাঝি হইতে প্রধানতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার প্রতিযোগিতায় পশ্চিম ভারতের বন্দর-সকলে, বিশেষতঃ বোম্বাইয়ে, বাংলাদেশের কয়লার কাট্‌তি প্রায় নাই বলিলেও চলে। এতদূর হইতে কয়লা চালান করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা আমাদিগকে হারাইয়া দিতে পারিতেছে, এই কারণে, যে, তথাকার গবর্ণ্‌মেণ্ট্ সস্তায় ভারতে কয়লা লইয়া যাইবার জন্য জাহাজের মালিক-দিগকে টাকা দিতেছে। ইহার প্রথম প্রতিকার ঐসব জাহাজ প্রতি টনে দক্ষিণ-আফ্রিকা-গবর্ণ্‌মেণ্টের নিকট হইতে যত টাকা পাইতেছে, তথাকার কয়লার উপর প্রতি টনে তত টাকা ট্যাক্স্ বসান। ইহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। দ্বিতীয় উপায়, বাংলা হইতে পশ্চিম-ভারতের বন্দরগুলি পর্য্যন্ত কয়লা লইয়া যাইবার জন্য রেল-ভাড়া কমাইয়া দেওয়া। ইহাও ন্যায্য।

—

পারস্যের জাগরণ

পারস্য-দেশের তিহারান্ শহরের মাদ্রাসা মাদারশাহ্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাঃ জনাব ফাজেল্ আমেরিকায় 'বাহাই ধর্ম্ম' বিষয়ে বক্তৃতা করিবার সময় পারস্যের জাগরণ সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"আন্দাজ আশী বৎসর আগে আমাদের দেশে ধর্ম্ম, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে নতন জাগরণের চিহ্ন দেখা যায়। যে দেশের অতীত এত আশ্চর্য্য স্মৃতিমণ্ডিত, যে দেশে অতীত প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা জাতির মনে এত উচ্চ স্থান জুড়িয়া আছে, সে দেশের পক্ষে এই জাগরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলিতেই হইবে।

"পারস্যের স্ত্রী ও পুরুষগণ বহু যুগের বাঁধা পথ ছাড়িয়া অপূর্ব্ব সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। এসিয়া মাইনরের অধিবাসী জাতিকে তাঁহারাই এই নূতন পথ দেখাইলেন। ষাট বৎসর আগে শ্রীমতী গরাহ্-উল-আয়েন প্রথম অব-গুণ্ঠন মোচন করিয়াছিলেন। এই মহিলা অবগুণ্ঠন মোচন করিবার পর অন্যান্য বহু মুসলমান নারী তাঁহার পথ

অনুসরণ করেন। পর্দ্দা-প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম সফল চেষ্টা পারস্য রমণীই করেন, পরে ইঁহাদের কোন কোন ভারতীয় মুসলমান ভগিনী পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া অন্তঃপুরের শৃঙ্খল মোচন করেন।

"ধীরে ধীরে সমস্ত পারস্যদেশের উপর একটা বিশেষ পরিবর্ত্তনের ছাপ পড়িতেছে; কয়েক বৎসরের মধ্যেই পারস্যদেশ এসিয়া মাইনরের সকল জাতির শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিবে। আমাদের জাতি ইউরোপের তথাকথিত 'মহাশক্তি'দের কথায় বিশ্বাস করিয়াছিল। এমন কি ভার্সেইল্‌সের সন্ধিপত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতির নিজ নিজ শাসক ও শাসনপ্রণালী নির্ব্বাচনের অধিকারের যে স্বীকৃতি আছে, তাহাও আমরা কথা ও কাজে একার্থক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম। যখন দেখিলাম, এই স্বীকৃতিটা কার্য্যতঃ কেবল ইউরোপীয়দের জন্যই, এবং অর্দ্ধপ্রাচ্য জাতিদের ঘাড়ে স্বার্থান্বেষী ইউরোপীয়-দিগকে অভিভাবক রূপে চাপানো হইবে, সবেমাত্র তখন আমাদের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। যে-দিন হইতে ইউরোপের শক্তি বিকশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং আমাদের অতীত গৌরব ম্লান হইয়া আসিতেছে, সেইদিন হইতেই ইউরোপের চেষ্টা আমাদিগকে অধীন করিয়া ফেলিবার জন্য, স্বাধীন করিয়া দিবার জন্য নয়; সেই দিন হইতেই তাহার চেষ্টা আমাদের জাতীয় ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারগুলিকে স্বার্থসিদ্ধির উপায় করিয়া তুলিবার জন্য, শিক্ষা ও সাহায্যের দ্বারা আমাদের আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসী করিয়া তুলিবার জন্য নয়।

"যাহা হউক, আমরা ক্রমশঃ সংহত ও দলবদ্ধ হইয়া উঠিতেছি, এবং আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা জাতির মর্ম্মস্থলে বদ্ধমূল হইতেছে। আমাদের যত আভ্যন্তরীণ সমস্যা, সবগুলি আমরা বুদ্ধিমত্তার সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি এবং আমাদের উন্নতির প্রচেষ্টাগুলি বহুমুখী, সর্ব্বদেশব্যাপী ও বিংশ শতাব্দীর উচ্চতম আদর্শ অনুযায়ী করিবার চেষ্টা করিতেছি।

"পাশ্চাত্য জগতের কাছে পারস্যদেশ দুটি জিনিষের জন্য খ্যাত, এক ওমর খৈয়াম ও রুবায়েৎ, আর এক দীর্ঘ-কালস্থায়ী গালিচা। ওমারের অপেক্ষা বড় কবি আমা-দের দেশে জন্মিয়াছেন, অসাধারণ শক্তিশালী গদ্য-লেখকেরও আমাদের দেশে অভাব নাই। আমাদের দেশের গালিচা জগতের প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের এই রকম উচ্চশ্রেণীর গৃহশিল্পের আরো বহু নিদর্শন আছে। যাহা হউক, আমরা আমা-দের গালিচার অন্তর্জ্জাতিক মূল্য বুঝিয়া উহার উৎকর্ষ রক্ষার জন্য সরকারী নিয়ম জারী করিতেছি, এবং গালিচার তাঁতীদিগকে কেবলমাত্র দেশী উদ্ভিজ্জ রং ব্যবহার করিতে লওয়াইবার চেষ্টা হইতেছে।"

চিত্র-পরিচয়

দময়ন্তী ছবিতে চিত্রকর দময়ন্তীর সেই অবস্থা অঙ্কিত করিয়াছেন যখন স্বামীপরিত্যক্তা অর্দ্ধবাসা দময়ন্তী স্বামীশোকে কাতর হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে এক পরম পবিত্র তপোবন দর্শন করিলেন, এবং তাপসেরা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—

"উদর্কস্তব কল্যাণি কল্যাণো ভবিতা শুভে।
বয়ং পশ্যামস্ তপসা ক্ষিপ্রং দ্রক্ষসি নৈষধম্‌॥"

হে কল্যাণি, হে শুভে, তোমার অন্বেষণের ভবিষ্যৎ ফল এই যে তোমার কল্যাণ হইবে। আমরা তপস্যা-প্রভাবে দেখিতে পাইতেছি, তুমি শীঘ্রই নিষধরাজ নলের সাক্ষাৎলাভ করিবে।"

তৎপরক্ষণেই—

"তাপসান্তর্হিতাঃ সর্ব্বে সাগ্নিহোত্রাশ্রমাস্তথা।"—

'তাপস ও অগ্নিহোত্র সহিত আশ্রম ও তপোবন অন্তর্হিত হইয়া গেল।'

"সা দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং বিস্মিতা হ্যভবৎ তদা।

* * *

ধ্যাত্বা চিরং ভীমসুতা দময়ন্তী শুচিস্মিতা।
ভর্ত্তৃশোকপরা দীনা বিবর্ণবদনাভবৎ॥"

—ইহা দেখিয়া দময়ন্তী অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন; স্বামীমিলনের আশায় তিনি শুচিস্মিতা হইয়াও পুনরায় ইহা অসম্ভাব্য বিবেচনায় চিন্তাকুল হইয়া ভর্ত্তৃশোকে দীনা ও বিবর্ণবদনা হইয়া পড়িলেন।

এই হর্ষশোকের দ্বন্দ্বক্ষণটি দময়ন্তীর মুখভাবে চিত্রকর অঙ্কিত করিয়াছেন।

চারু

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ব্যাধ-বধূ

চিত্রকর শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

U. Ray & Sons, Calcutta

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৩০

৫ম সংখ্যা

গান

পূব-হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি !
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী।
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ঐ আসে তোমার সুর-ভরা তরী।

ব্যথা আমার কূল মানে না, বাধা মানে না ;
পরাণ আমার ঘুম জানে না, জাগা জানে না।
মিল্‌বে যে আজ অকূল পানে
তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী ॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ-গগন-অঙ্গনে,
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে
দিক্-হারানো দুঃসাহসে
সকল বাঁধন পড়ুক খসে' ;
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা-লঙ্ঘনে ?
বেদনা তোর বিজুল-শিখা জ্বলুক অন্তরে,
সর্ব্বনাশের করিস্ সাধন বজ্র-মন্তরে।
অজানাতে কর্‌বি গাহন,
ঝড় হবে সে পথের বাহন,
শেষ করে' দিস্ আপ্‌নারে তুই প্রলয়-রাতের
ক্রন্দনে ॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোতম বুদ্ধের আত্ম-চরিত

সাধারণতঃ তিনখানা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া গোতম বুদ্ধের জীবন-চরিত লেখা হয়। সে তিনখানার নাম (১) অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত; (২) ললিত-বিস্তর; এবং (৩) জাতকের উপক্রমণিকা। এই উপক্রমণিকা নিদান-কথা নামে পরিচিত।

বুদ্ধদেবের বহু পরে এই-সমুদায় গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই-সমুদায় পুস্তকে যে-সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার অনেক ঘটনা কল্পিত, অনেক ঘটনা অতিরঞ্জিত, এবং অনেক ঘটনা অতিপ্রাকৃত। এ-সমুদায় পাঠ করিয়া গোতম বুদ্ধের প্রকৃত জীবন-চরিত জানা যায় না।

"ত্রিপিটক" বৌদ্ধধর্ম্মের প্রামাণিক গ্রন্থ। কিন্তু এই ত্রিপিটকেরও বিভিন্ন স্তর আছে—কোন অংশ অতি প্রাচীন, কোন অংশ বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বুদ্ধদেবের জীবন-চরিত জানিতে হইলে এই প্রাচীন অংশেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রাচীন স্তরে তাঁহার জীবন-বিষয়ে অনেক কথা পাওয়া যায় এবং অনেক স্থলে তিনি স্বয়ং ভিক্ষুগণের নিকট আত্ম-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের আত্ম-চরিত বলিয়া যাহা পরিচিত, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহার জীবনের কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করিব।

১। পূর্ব্বপুরুষ

গোতম স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন যে সূর্য্যবংশে তাঁহার জন্ম এবং ইক্ষ্বাকু রাজা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ।

দীঘনিকায় নামক গ্রন্থে 'অম্বষ্ঠসুত্ত' নামক এক অংশ আছে। এই সুত্তে লিখিত আছে যে এক সময়ে অম্বষ্ঠ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত গোতমের অনেক কথা হইয়াছিল। সেই সময়ে গোতম অম্বষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন:—

"হে অম্বষ্ঠ! শাক্যগণ ইক্ষ্বাকু রাজাকে পিতামহ বলিয়া মনে করেন। ইক্ষ্বাকু রাজার এক প্রিয় 'মনাপ' মহিষী ছিলেন। রাজা ইঁহারই পুত্রকে রাজ্য দিবার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্রদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।...তাঁহারা হিমালয়ের পার্শ্বে কোন পুষ্করিণীর তীরে এক মহাশাকবৃক্ষের সমীপে বাসস্থান নিরূপণ করিয়াছিলেন। জাতি-সম্ভেদ-ভয়ে তাঁহারা অন্যত্র বিবাহ না করিয়া নিজ ভগিনীগণের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

হে অম্বষ্ঠ! কিছুকাল পরে রাজা ইক্ষ্বাকু তাঁহার পারিষদ-অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমার কুমারগণ এখন কোথায় বাস করিতেছে?"

অমাত্যগণ বলিয়াছিলেন—"হিমালয়ের পার্শ্বে কোন পুষ্করিণীর তীরে এক মহাশাকবৃক্ষ আছে। সেই স্থলে কুমারগণ বাস করিতেছেন। জাতি-সম্ভেদ-ভয়ে তাঁহারা নিজ ভগিনীগণের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন।"

ইহা শুনিয়া রাজা ইক্ষ্বাকু এই উদান উচ্চারণ করিয়াছিলেন:—"ভো! কুমারগণ শক্য (শাকবৃক্ষবৎ দৃঢ়), কুমারগণ পরম শক্য।"—দীঘ ৩।১৬। এই শাকবৃক্ষের নাম হইতেই শাক্য বংশের নাম হইয়াছে।

সুত্তনিপাত গ্রন্থের একস্থলে (৯৯১) গোতম বুদ্ধকে "ইক্ষ্বাকু বংশের শাক্যপুত্র (ওক্কাকরাজস্স শক্যপুত্ত) বলা হইয়াছে।

ঐ গ্রন্থেরই অপর একস্থলে লিখিত আছে যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার পর গোতম একদিন বিম্বিসারের রাজধানীতে ভিক্ষার জন্য গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজা বিম্বিসার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তোমার জাতি কি?" ইহার উত্তরে গোতম বলিয়াছিলেন—"হিমালয়ের ঠিক পার্শ্বে ধনবীর্য্যসম্পন্ন কোশলবাসী এক জনপদ আছে। 'আদিত্য' তাহাদিগের গোত্র এবং 'শাক্য' তাহাদিগের জাতি। আমি সেই কুল হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি।" মহাবগ্গ, ৪২২।

এখানে দেখা যাইতেছে যে আদিত্য-বংশে অর্থাৎ সূর্য্য-বংশে গোতমের জন্ম।

২। গোতম বুদ্ধের মাতাপিতা

দীঘনিকায় নামক গ্রন্থে 'মহাপদান' নামক একটি সুত্তন্ত আছে (১৪)। এই সুত্তন্তের বক্তা স্বয়ং গোতম বুদ্ধ। বর্ণিত আছে যে তিনি এক সময়ে 'অবিহ' নামক স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া দেবগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং অভিবাদনান্তে একান্তে উপবেশন করিয়া নিজ নিজ পূর্ব্বজন্ম ও প্রাচীন বুদ্ধগণের বিষয় বর্ণনা করিলেন। যাহারা গোতম বুদ্ধের কল্পে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। গোতম তাঁহাদিগের মুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাও মহাপদান সুত্তন্তে বর্ণিত আছে। গোতম ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া সে বিষয়ে এই প্রকার বলিয়াছেন :—

"হে ভিক্ষুগণ! সহস্র সহস্র দেবতা আমার নিকট আগমন করিয়া আমাকে অভিবাদন করিল এবং অভিবাদনান্তে একান্তে উপবেশন করিল। তদনন্তর তাহারা এই প্রকার বলিল :-'হে মারিষ! ভগবান্ এই ভদ্রকল্পে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্হৎ ও সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইয়াছেন। হে মারিষ! ভগবান্ ক্ষত্রিয়জাতীয় এবং ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন। হে মারিষ! ভগবান্ গোতম-গোত্রী। হে মারিষ! ভগবান্ অশ্বত্থমূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছেন। হে মারিষ! সারিপুত্র ও মোগ্গলান ভগবানের শ্রাবকদ্বয়; ইহারা অগ্র্য এবং ভদ্র। হে মারিষ! আনন্দ নামক ভিক্ষু ভগবানের উপস্থায়ক এবং প্রধান উপস্থায়ক। হে মারিষ! রাজা শুদ্ধোদন ভগবানের পিতা (সুদ্ধোদনো রাজা পিতা); মায়াদেবী মাতা ও জনয়িত্রী;' কপিলবস্তু (ইঁহাদিগের) রাজধানী (কপিলবৎথু নগরম্ রাজধানী)।" ১৪।৩।৩০।

উদ্ধৃত অংশের কতটুকু সত্য আর কতটুকু মনঃকল্পিত তাহা নির্ণয় করা কঠিন নহে। বুদ্ধদেব দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন ইহার সত্যাসত্য বিচার আবশ্যক কি না তাহা বিচারের মধ্যেই আসিতেছে না। সমসাময়িক লোকদিগের বিষয়ে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, সে-সমুদায়কে অসত্য বা অতিরঞ্জিত বলিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।

উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারিতেছি যে বুদ্ধদেবের পিতা একজন রাজা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন প্রকৃত পক্ষে শুদ্ধোদন রাজা ছিলেন না, তবে যে তাঁহাকে রাজা বলা হইত, তাহা কেবল সম্মান প্রদর্শনের জন্য। কিন্তু যখন বলা হইয়াছে তাঁহার রাজধানী ছিল, তখন বলিতেই হইবে যে তিনি প্রকৃত পক্ষেই একজন রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বাধীন রাজা ছিলেন এ প্রকার মনে হয় না।

গোতম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার পর এক সময়ে বিম্বিসারের রাজধানীতে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজা বিম্বিসার তাঁহাকে তাঁহার জাতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে গোতম কি বলিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার উত্তর এই :—"হে রাজন্! হিমবন্তের ঠিক পার্শ্বে কোশলনিবাসী ধনবীর্য্যসম্পন্ন এক জাতি আছে। তাহারা আদিত্য-গোত্রী এবং শাক্য জাতীয়। কাম-ভোগ অভিলাষ না করিয়া আমি সেই কুল হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি।" (সুত্ত, ৪২২, ৪২৩)।

এখানে দেখা যাইতেছে শাক্যগণ কোশল রাজার অধীন ছিলেন।

কোশল রাজার সহিত শাক্যবংশের কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল তাহা দীঘ-নিকায়ের অগ্গঞ্ঞ সুত্তন্তে (৮) বর্ণিত আছে। এখানেও বক্তা স্বয়ং গোতম বুদ্ধ। তিনি বসিষ্ঠ নামক এক ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

হে বসিষ্ঠ! শাক্যগণ রাজা প্রসেনজিৎ কোশলের অনুযুক্ত (অধীন)। শাক্যগণ রাজা প্রসেনজিৎ কোশলের অধীনতা স্বীকার করেন (নিপচ্চকারম্ বা নিপচ্চাকারম্), তাঁহাকে অভিবাদন (অভিবাদনম্) করেন, তাঁহাকে দেখিয়া প্রত্যুত্থান (পচ্চুট্ঠানম্) করেন, অঞ্জলিনিবদ্ধ হইয়া নমস্কার (অঞ্জলিকম্মম্) করেন এবং স্তুতিবন্দনাদি (সামীচী কম্মম্) করেন। ৮।

এ অংশেও দেখা যাইতেছে শাক্যগণ কোশল রাজার অধীন ছিলেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে শুদ্ধোদন একজন রাজা ছিলেন ইহা সত্য, কিন্তু তিনি স্বাধীন রাজা ছিলেন

না।—তিনি কোশলরাজার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া নিজরাজ্য শাসন করিতেন।

৩। ভোগবিলাস ও বৈরাগ্য

ভোগবিলাস

বাল্যাবস্থায় গোতম কি প্রকার ভোগবিলাসের মধ্যে বাস করিতেন, তিনি নিজেই তাহা অনেকস্থলে বলিয়া গিয়াছেন। অঙ্গুত্তর নিকায় নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে তিনি এক সময়ে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া এই প্রকার বলিয়াছিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি সুকুমার ছিলাম, পরম সুকুমার ছিলাম, অত্যন্ত সুকুমার ছিলাম। হে ভিক্ষুগণ! আমার জন্য পিতৃগৃহে অনেক পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল। কোন স্থলে উৎপল, কোন স্থলে পদ্ম, এবং কোন স্থলে বা পুণ্ডরীক উৎপন্ন হইত—এ-সমুদায় উৎপাদিত হইত আমারই জন্য। হে ভিক্ষুগণ! কাশীর চন্দন ভিন্ন অন্য কোন চন্দন ধারণ করিতাম না। হে ভিক্ষুগণ! আমার বেষ্টনও * কাশীর, কঞ্চুকও* কাশীর, নিবাসনও * কাশীর এবং উত্তরসঙ্গও* কাশীর। আমার মস্তকে দিবা-রাত্রি ছত্র ধারণ করা হইত। শীত বা গ্রীষ্ম, ধূলি বা তৃণ বা হিম কিছুই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। হে ভিক্ষুগণ! আমার জন্য তিনটি প্রাসাদ ছিল—একটি হৈমন্তিক, একটি গৈগ্রিষ্মিক, আর একটি বার্ষিক (বর্ষাকালের জন্য)। হে ভিক্ষুগণ! বার্ষিক প্রাসাদে বর্ষাকালের চারিমাস তূর্য্যবাদিনী নারীগণ আমাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। তখন আর আমি প্রাসাদ হইতে নিম্নে অবতরণ করিতাম না। অপর গৃহে যখন দাস ও ভৃত্যগণকে বিড়ঙ্গমিশ্রিত কণাজক (কণা অর্থাৎ খুদের ভাত) দেওয়া হইত, তখন পিতার গৃহে দাস ও ভৃত্যগণ শালিমাংসোদন (অর্থাৎ মাংসমিশ্রিত শালি-ধান্যের অন্ন) ভোজন করিত।" (অঙ্গুত্তর নিকায়, দেবদূতবগ্‌গ, ৩।৩৮।১, মজ্‌ঝিম ৭৫ দ্রষ্টব্য)।

বৈরাগ্য

(ক)

উক্ত অংশের ঠিক পরেই গোতম তাঁহার মানসিক ভাবের বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন :—

"হে ভিক্ষুগণ! এই প্রকার ঋদ্ধিসমন্বাগত হইয়াও অত্যন্ত সুকুমার অবস্থাতেই আমার মনে এই-প্রকার চিন্তা আসিল—(১) 'অশিক্ষিত সাধারণ লোক নিজে জরাধর্ম্মের অধীন হইয়া রহিয়াছে। এবং জরাধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাহারাও যদি অপরকে জীর্ণ দর্শন করে, তখন নিজ নিজ অবস্থা ভুলিয়া গিয়া আর্ত্তি লজ্জা ও ঘৃণা অনুভব করে। সেই সময়ে আমিও জরাধর্ম্মের অধীন ছিলাম এবং জরাধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে পারি নাই। জরার অধীন হইয়া এবং জরার অতীত না হইয়াও অপরকে জীর্ণ দর্শন করিলে আমার যদি আর্ত্তি লজ্জা ও ঘৃণা হয়, তাহা আমার প্রতিরূপ হইবে না,—বিশেষভাবে এই-প্রকার চিন্তা করিয়া যৌবনে যৌবন-মদ বিনাশ করিয়াছিলাম।'

(২) 'অশিক্ষিত সাধারণ লোক ব্যাধি-ধর্ম্মের অধীন এবং তাহারা ব্যাধির অতীত নহে। তাহারাও যদি অপরকে ব্যাধিত দর্শন করে, তখন নিজ নিজ অবস্থা ভুলিয়া গিয়া আর্ত্তি লজ্জা ও ঘৃণা অনুভব করে। সেই সময়ে আমিও ব্যাধি-ধর্ম্মের অধীন ছিলাম এবং ব্যাধি-ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে পারি নাই। ব্যাধি-ধর্ম্মের অধীন হইয়া এবং ব্যাধি-ধর্ম্মের অতীত না হইয়াও অপরকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখিলে আমার যদি আর্ত্তি লজ্জা ও ঘৃণা অনুভব হয়, তাহা আমার প্রতিরূপ হইবে না—বিশেষ-ভাবে এইরূপ চিন্তা করিয়া অরোগ অবস্থাতেই আরোগ্য-মদ বিনাশ করিয়াছিলাম।'

(৩) 'অশিক্ষিত সাধারণ লোক নিজে মরণ-ধর্ম্মের অধীন এবং মরণের অতীত নহে। তাহারাও যদি অপরের মৃত্যু দেখে, তখন তাহারা আর্ত্তি লজ্জা ও ঘৃণা অনুভব করে। সেই সময়ে আমিও মরণ-ধর্ম্মের অধীন ছিলাম এবং মরণ-ধর্ম্মের অতীত হইতে পারি নাই। মরণ-ধর্ম্মের অধীন হইয়া এবং মরণ-ধর্ম্মের অতীত না হইয়াও অপরের মৃত্যু দেখিলে আমি যদি আর্ত্তি লজ্জা ও ঘৃণা অনুভব করি তাহা আমার প্রতিরূপ হইবে না—বিশেষভাবে এইরূপ চিন্তা করিয়া জীবিতাবস্থাতেই জীবন-মদ পরিহার করিয়াছিলাম।'"—(অঙ্গুঃ দেবদূতবগ্‌গ, ৩।৩৮।২)।

* বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের নাম।

(খ)

মজ্‌ঝিম-নিকায় নামক গ্রন্থে অরিয়-পরিয়েসনা (আর্য্য পর্য্যেষণা) নামক একটি সুত্ত আছে। ইহা গোতম বুদ্ধের আত্ম-চরিত। শ্রাবস্তীর অন্তর্গত রম্যক নামক ব্রাহ্মণের আশ্রমে তিনি ভিক্ষুগণকে আত্মচরিত-বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই সুত্তে নিবদ্ধ হইয়াছে। কি প্রকারে তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে তিনি এই প্রকার বলিয়াছেন :—

"হে ভিক্ষুগণ! যখন সম্বোধি লাভ করি নাই, যখন অভিসম্বুদ্ধ হই নাই, যখন কেবল বোধিসত্ত্ব ছিলাম, তখন স্বয়ং জাতি-ধর্ম্মের (অর্থাৎ জন্মাদির) অধীন ছিলাম, এবং জাতি-ধর্ম্মই আকাঙ্ক্ষা করিতাম, তখন স্বয়ং জরা-ধর্ম্মের অধীন ছিলাম এবং জরা-ধর্ম্মই অন্বেষণ করিতাম; স্বয়ং ব্যাধি-ধর্ম্মের অধীন ছিলাম এবং ব্যাধি-ধর্ম্মই অন্বেষণ করিতাম; স্বয়ং শোক-ধর্ম্মের অধীন ছিলাম এবং শোক-ধর্ম্মেরই অন্বেষণ করিতাম; স্বয়ং সংক্লেশ-ধর্ম্মের অধীন ছিলাম এবং সংক্লেশ-ধর্ম্মেরই অন্বেষণ করিতাম। তখন আমার মনে এই-প্রকার চিন্তা আসিল—'কেন জাতি-ধর্ম্মের অধীন হইয়া জাতি-ধর্ম্মের অন্বেষণ করিতেছি? কেন জরা-ধর্ম্মের অধীন হইয়া জরা-ধর্ম্মের অন্বেষণ করিতেছি? কেন ব্যাধি-ধর্ম্মের অধীন হইয়া ব্যাধি-ধর্ম্মের অন্বেষণ করিতেছি? কেন শোক-ধর্ম্মের অধীন হইয়া শোক-ধর্ম্মের অন্বেষণ করিতেছি? কেন সংক্লেশ ধর্ম্মের অধীন হইয়া সংক্লেশ-ধর্ম্মের অন্বেষণ করিতেছি? জাতি-ধর্ম্মের অধীন হইয়া যখন জাতি-ধর্ম্মের দুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অজাত, অনুত্তর, যোগক্ষেমরূপ নির্ব্বাণকে অন্বেষণ করিতে হইবে। জরা-ধর্ম্মের অধীন হইয়া যখন জরা-ধর্ম্মের দুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অজর অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্ব্বাণকে লাভ করিতে হইবে। ব্যাধি-ধর্ম্মের অধীন হইয়া যখন ব্যাধি-ধর্ম্মের দুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অ-ব্যাধি অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্ব্বাণকে অন্বেষণ করিতে হইবে। যখন মরণ-ধর্ম্মের অধীন হইয়া মরণ-ধর্ম্মের দুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অমৃত অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্ব্বাণকে অন্বেষণ করিতে হইবে। যখন শোক-ধর্ম্মের অধীন হইয়া শোক-ধর্ম্মের দুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অশোক অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্ব্বাণকে অন্বেষণ করিতে হইবে। যখন সংক্লেশ-ধর্ম্মের অধীন হইয়া সংক্লেশ-ধর্ম্মের দুর্গতি বুঝিতেছি, তখন অসংক্লিষ্ট অনুত্তর যোগক্ষেমরূপ নির্ব্বাণকে অন্বেষণ করিতে হইবে।"

(গ)

ইহার পরেই গোতম বলিতেছেন :—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি তখন দহর এবং শিশুর ন্যায় কৃষ্ণকেশ ছিলাম; তখন আমি প্রথম-যৌবনে উপনীত এবং ভদ্রযৌবনপ্রাপ্ত। মাতাপিতা যদিও বিরোধী ছিলেন, যদিও তাঁহারা অশ্রুমুখ হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, তথাপি আমি কেশ ও শ্মশ্রু ছেদন করাইয়া, কাষায়বস্ত্র দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া অগৃহীরূপে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলাম।"—মজ্‌ঝিম, ২৬।

(ঘ)

মজ্‌ঝিম-নিকায় গ্রন্থ হইতে (গ)-অংশে যাহা উদ্ধৃত হইল, 'দীঘনিকায়' গ্রন্থের সোণদণ্ড নামক সুত্তেও ঠিক সেই কথাই বলা হইয়াছে। পার্থক্য এই, যে, মজ্‌ঝিম-নিকায়ে বক্তা স্বয়ং গোতম, আর দীঘনিকায়ে বক্তা সোণদণ্ড নামক একজন ব্রাহ্মণ। সোণদণ্ড যাহা বলিয়াছেন, তাহার অংশ-বিশেষ এই :—

শ্রমণ গোতম যখন দহর ও শিশুর ন্যায় কৃষ্ণকেশ ছিলেন, যখন তিনি প্রথম-বয়সে উপনীত এবং ভদ্র-যৌবন-প্রাপ্ত, তখনই তিনি গৃহত্যাগ করিয়া অগৃহীরূপে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মাতাপিতা যদিও বিরোধী ছিলেন, যদিও তাঁহারা অশ্রুমুখ হইয়া রোদন করিতেছিলেন, তথাপি তিনি কেশ ও শ্মশ্রু ছেদন করাইয়া, কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া, গৃহত্যাগ করিয়া অগৃহীরূপে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন।—দীঘ, ৬।৬।

(ঙ)

অঙ্গুত্তর-নিকায় এবং মজ্‌ঝিম-নিকায় হইতে যে-সমুদায় অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, সে-সমুদায়ই স্বয়ং গোতম-বুদ্ধের উক্তি। অঙ্গুত্তর-নিকায় হইতে আমরা এই কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি :—

(১) গোতম বাল্যকালে ভোগ-বিলাসের মধ্যে পালিত হইয়াছিলেন।

(২) জরা ব্যাধি ও মৃত্যু এই তিনটি বিষয়ের চিন্তা করিয়া তিনি সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন।

মজ্‌ঝিম-নিকায় হইতে এই কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে :—

(১) জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, সংক্লেশ—এই ছয়টির বিষয় চিন্তা করিয়া গোতম সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন।

(২) তিনি অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করেন নাই। যখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন মাতাপিতা অশ্রুমুখ হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন।

(৩) গোতম গৃহেই কেশ ও শ্মশ্রু ছেদন করাইয়া এবং গৃহেই কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দীঘনিকায় হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও এই শেষ দুইটা সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিতেছে।

৪। প্রচলিত বিশ্বাস

কিন্তু প্রচলিত জীবন-চরিতে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা অন্য-প্রকার।

(ক) চারিটি দৃশ্য

জাতকের নিদান-কথায় লিখিত আছে যে গোতমের জন্মগ্রহণ করিবার পর পঞ্চম দিনে তাঁহার নামকরণ হয়। এই উপলক্ষে ৮ জন ভবিষ্যৎদর্শী ব্রাহ্মণ সেই স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ৭ জন বলিয়াছিলেন যে এই সন্তান হয় রাজচক্রবর্ত্তী হইবে, না হয়, নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইবে। কিন্তু কোণ্ডঞ্ঞ নামক অষ্টম ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, "এ সন্তান বুদ্ধত্ব লাভ করিবেই, কিছুতেই গৃহে থাকিবে না।" তখন শুদ্ধোদন জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার সন্তান কি দেখিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে?" কোণ্ডঞ্ঞ বলিলেন—"চারিটি পূর্ব্ব-নিমিত্ত।" শুদ্ধোদন জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে চারিটি কি?" কোণ্ডঞ্ঞ বলিলেন—"জরাজীর্ণ, ব্যাধিত, মৃত এবং প্রব্রজিত—এই চারি প্রকার পুরুষ।"

ইহা শুনিয়া শুদ্ধোদন এমন ব্যবস্থা করিলেন, যাহাতে সন্তান কোন-প্রকারে ঐ চারি প্রকার মানব দেখিতে না পায়। কিন্তু কৈশোর বয়সে ভাবী বুদ্ধ উদ্যান-ভূমিতে গমন করিবার সময় ঐ চারিটি দৃশ্যই দর্শন করিয়াছিলেন। লিখিত আছে যে উদ্যানে যাইবার পূর্ব্বেই পথ হইতে এ চারি প্রকার লোককে অপসারিত করা হইয়াছিল। কিন্তু দেবগণ চারি দিনে যথাক্রমে ঐ চারিটি দৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই কয়েকটি দৃশ্য দর্শন করিয়াই গোতম সংসারে বীতরাগ হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এই যে ঘটনা বর্ণিত হইল, ইহা দীঘনিকায় নামক গ্রন্থের মহাপদান সুত্তন্ত হইতে গৃহীত। কিন্তু এ ঘটনা ঘটিয়াছিল অন্য লোকের জীবনে। এই সুত্তন্তের বক্তা স্বয়ং গোতম বুদ্ধ। এই অংশে তিনি পুরাকালের ৬ জন বুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বিপশ্বী (পালি—বিপস্‌সি) ইঁহার পিতার নাম বন্ধুমান্ নামক রাজা এবং মাতার নাম বন্ধুমতী।

গোতমবুদ্ধকল্পের এক-নবতি কল্প পূর্ব্বে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। ঐ সময়ে লোকে ৮০,০০০ বৎসর জীবন ধারণ করিত। বিপশ্বীর জন্মগ্রহণ করিবার পরই দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন যে, যদি এই সন্তান সংসারে থাকে, তাহা হইলে রাজচক্রবর্ত্তী হইবে আর যদি সংসার ত্যাগ করে, তাহা হইলে অর্হৎ এবং সম্যক্-সম্বুদ্ধ হইবে। বন্ধুমান্ সন্তানের জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—একটি হৈমন্তিক, একটি গ্রৈষ্মিক এবং একটি বার্ষিক। বিপশ্বী এই ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদে বাস করিতেন। একদিন উদ্যান-ভূমিতে গমন করিবার সময় বিপশ্বী একজন জরাজীর্ণ পুরুষকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহার পর বিভিন্ন সময়ে তিনি আরও তিনবার উদ্যানে গমন করিতেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে একদিন দেখিয়াছিলেন এক ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, একদিন দেখিয়াছিলেন একজন মৃতব্যক্তি এবং অন্য একদিন দেখিয়াছিলেন একজন ভিক্ষু। এই-সমুদায় দেখিবার পরে বিপশ্বীর প্রাণ সংসারের প্রতি বীতরাগ এবং মোক্ষলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। অবশেষে বিপশ্বী গৃহত্যাগ করিয়া অগৃহী-রূপে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন (দীঘ, মহাপদান সুত্তন্ত)।

গোতম বুদ্ধ এ-সমুদায়কে বিপশ্বীর জীবনের ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উত্তর কালে এই-সমুদায় গোতম বুদ্ধের ঘটনা বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে বিপশ্বী নামক এক বোধিসত্ত্ব যে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত, বুদ্ধ-চরিত-লেখকগণ আবার এই মনঃকল্পিত ঘটনা-সমূহকেই গোতম-জীবনের ঘটনা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কল্পনার উপর আবার কল্পনা!

গোতম বুদ্ধ চারিটি দৃশ্য কেবল চারি দিন দর্শন করিলেন আর হঠাৎ তাঁহার প্রাণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, ইহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। জীবনচরিত-লেখকগণ ঘটনাসমূহকে যে ভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহা ঠিক নাটকের দৃশ্য। তবে এ-সমুদায় অমূলক নহে। সাধারণ ঘটনা অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্বোক্ত ঘটনা-সমূহকে নাট্যাকারে সজ্জিত করা হইয়াছে। এই দেহ জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন, জীবন দুঃখপূর্ণ, সংসার অশান্তিময়—এই-সমুদায়কে অতিক্রম করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে হইবে—এই-সমুদায় ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া গোতম প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই-সমুদায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই ললিতবিস্তরাদি গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাসমূহকে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ঘটনাসমূহ সত্য নহে, কিন্তু ঘটনার মূলে যে ভাব, তাহা সত্য।

(খ) যশ ও গোতম

ললিতবিস্তরের পঞ্চদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে নারীগণ নৃত্যগীতবাদ্যাদি দ্বারা গোতমের চিত্তবিনোদন করিত। এক রজনীতে গোতম এই নারীগণকে নিদ্রিতা-বস্থাতে দর্শন করিয়াছিলেন। তাহাদিগের বীভৎস রূপ দর্শন করিয়া তিনি সংসারের উপর বীতরাগ হইয়াছিলেন।

কিন্তু গোতমের জীবনে যে এই-প্রকার ঘটনা ঘটিয়া-ছিল, ত্রিপিটকের কোন অংশে তাহার উল্লেখ নাই। ঠিক এই-প্রকার একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা ঘটিয়াছিল অপর এক ব্যক্তির জীবনে। বিনয়-পিটকের মহাবগ্‌গ নামক অংশের একস্থলে (১।৭।৩) লিখিত আছে যে গোতম বুদ্ধের সময়ে "যশ" নামক একজন শ্রেষ্ঠি-পুত্র বাস করিত। তাহার জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল—একটি হৈমন্তিক, একটি গ্রৈষ্মিক, এবং তৃতীয়টি বার্ষিক। বর্ষাকালের চারিমাস সেই যুবক বার্ষিক প্রাসাদের উপরিভাগে বাস করিত। তাহাকে নিম্নে কখন অবতরণ করিতে হইত না। নারীগণ সর্ব্বদা তাহার পরিচর্য্যা করিত, সে স্থলে অপর পুরুষের কোন গতিবিধি ছিল না। এই ভাবে 'যশ' পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা কাম্য বস্তু উপভোগ করিয়া জীবন যাপন করিতেছিল। একদিন সেই যুবক প্রথম রাত্রিতেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল —অল্পে অল্পে নারীগণও নিদ্রায় আবিষ্ট হইল। ইহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই যুবক জাগ্রৎ হইয়া উঠিল। তখন সে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা এই ভাবে বর্ণিত আছে :—

"কোন নারীর কক্ষে বীণা নিসক্ত, কাহারও কণ্ঠে মৃদঙ্গ সংলগ্ন, কাহারও কক্ষে 'আড়ম্বর' নামক যন্ত্র নিবদ্ধ এবং কাহারও কেশ আলুলায়িত। কাহারও মুখ হইতে লালা নিস্রুত হইতেছে এবং কেহ বা প্রলাপ-বাক্য উচ্চারণ করিতেছে। মনে হইতেছে শ্মশান যেন হস্তগত (অর্থাৎ সমীপবর্ত্তী) হইয়াছে।"

যখন যশ এই-সমুদায় দর্শন করিল, তখন তাহার চিত্তে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন সে বলিতে লাগিল—"কি উপদ্রব! কি উপসর্গ!" ইহার পর যশ গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিল।

বিনয়-পিটকে যশের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, বুদ্ধ-চরিত-লেখকগণ তাহাই বুদ্ধ-জীবনের ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পার্থক্য এই—ললিতবিস্তরের ঘটনা আরও বিস্তৃত ও বীভৎস।

সুতরাং বলা যাইতে পারে—

(১) গোতম বুদ্ধের জীবন-চরিতে যে বলা হইয়াছে তিনি চারি দিন চারিটি দৃশ্য দেখিয়া সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন ইহা গোতম বুদ্ধের জীবনের ঘটনাই নহে। এই ঘটনা গোতম-বর্ণিত বিপশ্বীর জীবন-চরিত হইতে গৃহীত। বিপশ্বীর ঘটনা গোতমে আরোপ করা হইয়াছে।

(২) গোতমের বিষয়ে যে বলা হয় তিনি এক রজনীতে নিদ্রাভিভূতা নারীগণের অশোভন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সংসারে

বীতরাগ হইয়াছিলেন, ইহাও গোতম-জীবনের ঘটনা নহে। এই ঘটনা যশ নামক একজন শ্রেষ্ঠি-পুত্রের জীবন-চরিত হইতে গৃহীত। যশের ঘটনাকে উত্তর-কালে গোতমের ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

এ-সমুদায় ঘটনা গোতম-জীবনের ঘটনা নহে; কিন্তু ইহার মূলে এইটুকু সত্য যে তিনি জরা ব্যাধি মৃত্যু শোকাদি এবং সংসারের নানাপ্রকার বীভৎস রূপ দর্শন এবং চিন্তন করিয়া সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন, এবং মোক্ষার্থী হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। গোতম বুদ্ধ নিজেও এই কথাই বলিয়াছেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি

আষাঢ় মাসে "সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখেছি, যে, সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রধানতঃ কতকগুলি বাস্তব উপকরণের উপর নির্ভর করে। অবশ্য, অবাস্তব কারণেও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে কমে; কিন্তু সাধারণতঃ বাস্তব-ঐশ্বর্য্যলভ্য স্বাচ্ছন্দ্য অথবা পরিমেয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়্‌লে বা কম্‌লে সমগ্র সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়ে বা কমে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি উপায়ে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়? বর্ত্তমান কালে এক মাত্র টাকা বা অর্থ (যার সাহায্যে সমাজে অদল-বদল বা বিনিময়-কার্য্য চলে) দিয়েই সমাজে তৃপ্তিলাভের বাস্তব উপকরণসমষ্টি বা পরিমেয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য মাপা যায়। বাস্তব কথাটি একটু বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু যা ধরাছোঁয়া যায়, তাই বাস্তব নয়; যাকে কেনা বেচা যায়,—যেমন খিদ্‌মত, শিক্ষকতা, থিয়েটারে গান শোনান, বাঁদর-নাচ দেখান,—ইত্যাদিও বাস্তব ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পড়্‌বে।

এখন দেখ্‌তে হবে, টাকার মাপকাঠি দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাপ কিভাবে সম্ভবপর হ'তে পারে। মানবসমাজে যে-সকল তৃপ্তি ও অতৃপ্তিকে (satisfaction and dissatisfactionকে) টাকার ভাষায় প্রকাশ করা যায়, সেইগুলির সমষ্টিকেই পরিমেয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বলা হয়। অবশ্য, অতৃপ্তির সমষ্টি, তৃপ্তির সমষ্টি থেকে বাদ দিয়ে নিতে হবে।*

টাকার ভাষায় তৃপ্তিকে (বা অতৃপ্তিকে) বাস্তবিক সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ করা যায় না। তৃপ্তি একটা মানসিক অবস্থা। মানুষ যখন বলে, 'এক জোড়া কাপড়ের জন্য আমি ১০৲ দেব', তার মানে এ নয়, যে, এক জোড়া কাপড় তাকে যা তৃপ্তি (অথবা সুখস্বাচ্ছন্দ্য) দেবে, সেটার পরিমাণ ১০৲ টাকা। শুধু এইটুকু বলা যায়, যে, তার একজোড়া কাপড়ের জন্য যে ঈপ্সা [desire], তা ১০৲ পরিমিত। আরও বলা যায়, যে, সে যদি একখণ্ড পুস্তকের জন্যও ১০৲ টাকা দিতে রাজি হয়, তা হ'লে তার একজোড়া কাপড়ের জন্য ঈপ্সা তার একখণ্ড পুস্তকের জন্য ঈপ্সার সমান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে, একটা জিনিষের জন্য* একজন যে পরিমাণ টাকা দিতে রাজি, সে টাকাটা, জিনিষটি কতখানি তৃপ্তি দান করবে বা করতে সক্ষম, তা জানাচ্ছে না; জানাচ্ছে ক্রেতার কাছে সে জিনিষটির ঈপ্সিততা বা ব্যবহার্য্যতা [desiredness or utility] কতখানি, তাই। দুটি জিনিসের ঈপ্সিততা সমান হ'তে পারে, কিন্তু সে দুটি জিনিস সমান তৃপ্তি না দিতে পারে। কোন মানসিক বা পারিপার্শ্বিক কারণে একটির ঈপ্সিততা তার তৃপ্তিদানের ক্ষমতার তুলনায় বে-মানান রকম বেশী হ'তে পারে। বিশ্লেষণের দিক থেকে এই-সব কথার মূল্য আছে;

---

* + ক তৃপ্তি
— ক অতৃপ্তি } = পরিমেয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য

পরিমেয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য + (অথবা —) তার অস্তিত্বের জন্য অপরিমেয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য যেটুকু বাড়্‌ল বা কম্‌ল + অপরিমেয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য = মোট সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য।

* অথবা তার সমতুল্য কিছুর, যথা সেবা বা খিদ্‌মৎ, যেগুলি টাকার মাপকাঠিতে মাপা যায়। স্বেচ্ছায় সেবা এর থেকে বাদ পড়বে। আবার শিক্ষা বা স্বাস্থ্য কোন অবাস্তব জিনিষ যার মাপ টাকা দিয়ে হয়, সেগুলিও আমাদের জিনিষের তালিকায় স্থান পাবে।

কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায়, যে, মানব-সমাজে যে-সব বস্তু বা বস্তুতুল্য জিনিষ (যথা সেবা, শিক্ষা, আমোদদান, এমন কি স্বর্গে স্থানদান) সচরাচর বেশী মাত্রায় কেনা-বেচা হ'য়ে থাকে, সেগুলি তৃপ্তি দেবে বলে'ই কেনা-বেচা হয়, এবং শুধু তাই নয়, তারা কি মাত্রায় তৃপ্তি দেবে, তাও সকলে ভাল রকমেই প্রায় জেনে থাকে। কাজেই চুল চিরে বিচার করা ছেড়ে দিলে * বলা যায়, যে, সচরাচর কেউ একটা জিনিসের দাম যা দিতে চায়, তার থেকে সে তৃপ্তি কি পরিমাণ পাবে, তা বেশ বুঝিয়ে দেয়। যথা, যদি একটা জিনিসের জন্য আর-একটার দামের দু'গুণ কেউ দিতে চায়, তা হ'লে বলা যায়, দ্বিতীয় জিনিসটার তৃপ্তি দেবার ক্ষমতা প্রথমটার দুইগুণ। (এইখানে বলে' রাখা দরকার, যে, যে-দাম ক্রেতা দিতে চায়, তা বাজারের দাম অর্থাৎ যে-দামে জিনিসটা বিক্রয় হয়, তার থেকে বিভিন্ন।)

ঈপ্সিততা ও তৃপ্তিদান-ক্ষমতার বিভিন্নতা সম্বন্ধে কেবল একটা কথা বলা দরকার। বর্ত্তমানে-ভোগ্য একটা জিনিসের জন্য মানুষের ঈপ্সা, ভবিষ্যৎ-ভোগ্য সেই একই জিনিসের জন্য ঈপ্সার অপেক্ষা অনেক বেশী। জিনিসটি ভবিষ্যতে যখন ভোগ করা হবে, তখন যে সেটা কম তৃপ্তিদান করবে, তা নয়। মানুষের দূরদর্শিতার অভাবের জন্যই, সে, দূর ভবিষ্যতে যা ঘট্‌বে, তাকে বর্ত্তমানের ঘটনার মত প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তিরিশ বছর পরে কিছু খাব, এই কথা ভেবে মানুষ আনন্দ পায় কমই, এমন কি সে রকম ব্যাপারের প্রতি টান তার খুবই কম। কাজেই বর্ত্তমানে ভোগ্য যা, তার জন্য ঈপ্সা মানুষের ঢের বেশী। সুদূর ভবিষ্যতে ভোগ্য বস্তু আবার অনেক সময় নিজের ভোগ্যও হবে না, এটা মানুষ জানে। তাতে তার প্রতি টান এবং তার মূল্য মানুষের কাছে অত্যন্ত কমে' যায়। ফলে, যে-সকল ত্যাগ স্বীকার করলে ভবিষ্যতে তার ফল ফলে, সে-সব ত্যাগ-স্বীকার মানুষ সহজে করে না। কিন্তু এ-প্রকার ত্যাগ-স্বীকার জাতীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। একটা চলিত উদাহরণ নেওয়া যাক—বৃক্ষ-রোপণ। তালগাছ যে লাগায়, হয় ত তার নাতি করে ফলভোগ। সুতরাং এ-কাজে পিতামহের উৎসাহ বেশী না হ'লে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। ভবিষ্যৎ বংশাবলী যে-সব স্থলে ফলভোগ করবে, সে-সব ক্ষেত্রে সংঘীভূতভাবে কাজ করার প্রয়োজন আছে। সরকারী চেষ্টা এ-সব ক্ষেত্রে খুব দরকার। আরও অনেক কিছু যৌথ কোম্পানীরা করতে পারে। কারণ, তাদের মূলধনের অংশ প্রথমতঃ যারা কেনে, শেষ অবধি তারা তা না রাখতেও পারে; অর্থাৎ যে-ব্যক্তি মাত্র দশ বৎসর তার মূলধনের ফলভোগ না করে' থাকতে পারে, সে দশ বৎসর অংশগুলি রেখে পরে আর-কাউকে বিক্রয় করতে পারে। এই ভাবে কোন কোন মূলধন বহুকাল কোন ফল প্রসব না করে' থাকতে পারে এবং তাতে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য শেষ অবধি যথেষ্ট বাড়ে।

নানান্ লোকের দূরদর্শিতা নানান্ প্রকার। কেউ আজ যার জন্য (ধরা যাক্, কিছু একটা লাভের জন্য) একশত টাকা দিতে রাজি, সেই জিনিসই সে এক বছর পরে পেলে পঁচানব্বই মাত্র দিতে প্রস্তুত হয়; আবার অন্য কেউ মাত্র নব্বই। এ-ক্ষেত্রে বলা যায়, যে, প্রথম ব্যক্তি শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা হারে ভবিষ্যৎকে কমিয়ে দেখে; অর্থাৎ (সাধারণভাবে বলতে গেলে) কুড়ি বৎসর পরে যার ফল ফলে, এর কাছে তার কোনই দাম নেই; এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ভবিষ্যৎকে শতকরা বার্ষিক দশ টাকা কমিয়ে দেখে। ভবিষ্যতে যা পাওয়া যাবে, তাকে যদি ভবিষ্যৎ-ভোগ্য, এবং বর্ত্তমানে যা পাওয়া যাবে, তাকে যদি বর্ত্তমান-ভোগ্য বলা যায়, তা হ'লে মানবসমাজে বর্ত্তমান-ভোগ্যের দাম সাধারণতঃ ভবিষ্যৎ-ভোগ্যের চেয়ে বেশী। সাধারণতঃ বল্‌ছি এইজন্য, যে, অনেক লোক আছেন, যাঁরা অসাধারণ দূরদর্শিতা, বা ভবিষ্যৎ জীবনে একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ের বন্দোবস্ত, বা উত্তরাধিকারীদের প্রতি

---

* তার প্রয়োজনও খুব নেই; কেন না, সামাজিক-স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে-সব কথা বলা হয়, সেগুলি কোন অবস্থার গতি সম্বন্ধে মাত্র। 'চালের দাম কম্‌বার দিকে যাবে', 'শ্রমজীবীদের কাজ করবার ক্ষমতা বাড়্‌বার দিকে যাবে', 'খরচ বেশী হবে বা কম হবে', এই রকম ভাবেই কথা বলা যায়—তাও, কি কি অবস্থা বর্ত্তমান থাকলে হবে, তা বলে' দেওয়া হয়। অভ্রান্ত সত্য, বা ছটাক ও পাই পয়সার ভাষায় কথা বলা হয় না।

মমতা-বশতঃ, বর্ত্তমানে বেশী রকম স্বার্থত্যাগ করেন; এমন কি, বিশেষ বিশেষ স্থলে ভবিষ্যৎ-ভোগ্যের মূল্য তাঁদের কাছে বর্ত্তমান-ভোগ্য অপেক্ষা বেশী। কিন্তু যদি সমগ্র জাতি বা সমাজ সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে হয়, তা হ'লে প্রথম কথাই সত্য; অর্থাৎ, বর্ত্তমান তাদের কাছে ভবিষ্যতের চেয়ে বড়।

যে-সকল কারণ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ায় বা কমায়, সেগুলি সাক্ষাৎভাবে সে কার্য্য করে না। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ একমাত্র সামাজিক আয়-ব্যয়ের সাহায্যেই বুঝা যায়। অর্থাৎ সামাজিক আয়-ব্যয়ের পরিবর্ত্তন দেখে মোটামুটি বলা যায়, যে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যেরও পরিবর্ত্তন হচ্ছে। বিশেষ বিশেষ উদাহরণ ছেড়ে দিয়ে এও বলা যায়, যে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্ত্তনের গতি সামাজিক আয়-ব্যয়ের পরিবর্ত্তনের গতির সঙ্গে একই দিকে যাবে; অর্থাৎ দ্বিতীয়টি বাড়্‌লে প্রথমটি বাড়্‌বে এবং দ্বিতীয়টি কম্‌লে প্রথমটি কম্‌বে। একথা অবশ্য মনে রাখ্‌তে হবে, যে, এই সামাজিক আয়টি হচ্ছে পরিমেয়, অর্থাৎ কিনা একে টাকার মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায়।

এই সময় বলে' রাখা দরকার, যে, টাকা জিনিসটি প্রধানতঃ জিনিস অদল-বদলের সুবিধার জন্যই সৃষ্ট। পুরাকালে, এবং বর্ত্তমানেও পৃথিবীর অনেক ব্যবসাবিরল কোণে, মানুষ নিজের জিনিসের সঙ্গে অন্য কোন জিনিস সোজাসুজি বদল কর্‌ত, এবং এখনও কোথাও কোথাও করে। এক জন যদি দেখ্‌ত, যে, তার অনেক গম আছে যাতে তার প্রয়োজন নেই এবং তার কাপড়ের বড়ই অভাব, এবং অপর এক ব্যক্তি যদি দেখ্‌ত, যে, তার কাপড়ের বাহুল্য থাক্‌লেও গমের অপ্রতুল, তা হ'লে এই দুইজন গম ও কাপড় বদলাবদলি কর্‌ত। কিন্তু এ-রকম বদল কর্‌তে হ'লে, প্রথমতঃ, আমার যে-জিনিসটি বেশী আছে, সেই জিনিসটিই চায় এমন একজন লোক খুঁজে বের করা দরকার এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই লোকটির কাছে আবার আমার যে-জিনিসটি দরকার, সেইটি বহুল পরিমাণে থাকা দরকার। কাজেই এরূপ অবস্থায় বদল ক'রে কাজ চালান একটু কঠিন। এই রকম ভাবে সমাজ চল্‌তে পারে কেবল সেই যুগে বা অবস্থায় যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমষ্টির অধিকাংশই প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে উৎপাদন করে। কিন্তু সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, যে, যদি এক এক জন লোক এক একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে তার সব ক্ষমতা নিযুক্ত করে, তা হ'লে দ্রব্যের পরিমাণ ও উৎকর্ষ দুই দিক্ থেকেই লাভ হয় অনেক। কিন্তু এতে অবস্থা এই দাঁড়াল, যে, প্রত্যেক লোকই তার প্রস্তুত একমাত্র দ্রব্যটির বদলে তার প্রয়োজনীয় অন্য সব জিনিস জোগাড় কর্‌তে বাধ্য হ'ল। এখন, যে-ব্যক্তি শুধু জুতা প্রস্তুত করে, তাকে যদি, জুতার বদলে গম দেবে এমন একটি লোক, জুতার বদলে কাপড় দেবে এমন আর-একটি লোক, তার পর জুতার বদলে চিকিৎসা কর্‌বে এমন একটি কবিরাজ—এই ভাবে নানান্ রকম লোক খুঁজে বেড়াতে হয়, তা হ'লে ফলে জুতা প্রস্তুত করারই তার সময়াভাব হবে। কাজেই এমন একটি জিনিস দরকার হ'ল, যার বদলে সকলেই সব কিছু দেবে। অর্থাৎ, দৃষ্টান্তস্বরূপ, জুতা-প্রস্তুতকারী তার ফাল্‌তু জুতাগুলি এই জিনিসটির বদলে দিতে রাজি হবে, কেন না, তার নিজের দরকার-মত সব জিনিস আবার সে উক্ত জিনিসটির বদলে জোগাড় কর্‌তে পার্‌বে। এ-যেন একটি অদল-বদলের কল। এর সাহায্যে অদল-বদল সহজ হ'য়ে এল; এবং এর সাহায্যে কিছু জোগাড় করার নাম হ'ল কেনা, এবং এর সাহায্যে ফাল্‌তু জিনিস দিয়ে-দেওয়ার নাম হ'ল বেচা। অবশ্য দুটি নাম একই ব্যাপারের। এক দিক্ থেকে দেখ্‌লে ব্যাপারটি কেনা এবং আর এক দিক্ থেকে দেখ্‌লে বেচা।

এই অদল-বদলের বা বিনিময়ের কলই হচ্ছে টাকা (money)। নানান্ প্রকার জিনিস টাকারূপে নানান্ সময় ও স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। গরু, ভেড়া, চাম্‌ড়া, শস্য, হাতীর দাঁত, তামাক, কড়ি, সোনা, রূপা, ইত্যাদি,—কিছুই বাদ যায় নি। প্রথম প্রথম টাকার নিজেরই একটা মূল্য থাকা লোকে অবশ্যপ্রয়োজনীয় মনে কর্‌ত; কিন্তু বহুকাল সংঘবদ্ধ হ'য়ে থাকা ও পরস্পরকে বিশ্বাস কর্‌তে শেখার ফলে মানুষ দেখ্‌লে, যে, অদল-বদলের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত মুদ্রার একটা নিজস্ব মূল্য না থাক্‌লেও চলে;

জিনিসের বদলে সকলেই যদি সে-মুদ্রা নেয়, তা হলেই তার কাজ চল্‌বে। অর্থাৎ কিনা, সেই টাকার কিন্‌বার ক্ষমতার উপর সাধারণের বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। সেই কারণে জনসাধারণের প্রতিনিধির প্রস্তুত টাকার সব-চেয়ে কার্য্যকারিতা বেশী। আজকাল সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই প্রায় কাগজের টাকা চল্‌ছে, এবং তার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিই হয়েছে।

টাকা শুধু একটা অদল-বদলের কল মাত্র নয়। তার অন্য কাজও আছে। টাকার সাহায্যে, জিনিসে জিনিসে মূল্যসংক্রান্ত যে সম্বন্ধ, তা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ সমাজের যদি একটি জিনিসের জন্য ঈপ্সা অপর একটি জিনিসের জন্য ঈপ্সার দুইগুণ হয়, তা হলে সমাজ প্রথম জিনিসটির জন্য দু টাকা দিতে প্রস্তুত হলে দ্বিতীয়টির জন্য মাত্র এক টাকা দিতে প্রস্তুত হবে।

এর অর্থ এ নয়, যে, প্রথম জিনিসটি দ্বিতীয়টির চেয়ে দুইগুণ মূল্যে বিক্রয় হবে। বিক্রয় হবার আগে, যে বিক্রয় করবে, তার দিক্‌টাও দেখ্‌তে হবে, অর্থাৎ সে কি মূল্য চায় তা দেখ্‌তে হবে। টাকার ভাষায় যদি সব জিনিসের মূল্য প্রকাশ করা যায়, তা হলে কোন্‌ জিনিসের বদলে অন্য কোন্‌ জিনিসের কতটা পাওয়া যাবে, তা সহজেই জানা যায়। ক পরিমাণ গমের যদি ১০০৲ মূল্য হয় এবং ক পরিমাণ ধানের যদি ২৫৲ মূল্য হয়, তা হলে ক পরিমাণ গমের বদলে ৪ক পরিমাণ ধান পাওয়া যাবে; এক জোড়া জুতার মূল্য যদি ২৫৲ হয়, তা হলে সিকি-ক পরিমাণ গম বা ক পরিমাণ ধান দিলে এক জোড়া জুতা পাওয়া যাবে; ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া টাকার অন্য ব্যবহারও আছে। টাকা ঋণ করার এবং ঋণ শোধের কলরূপেও ব্যবহৃত হয়। টাকার শুধু জিনিস-বিশেষ ক্রয়ের নয়, সাধারণভাবে জিনিস কিন্‌বার ক্ষমতাও আছে। অর্থাৎ টাকাকে সাধারণভাবে জিনিস-কিন্‌বার-ক্ষমতা বলা চলে। কাহারও কোন জিনিস ঋণ করার দর্‌কার হ'লে, সে, কার সেই জিনিসের বাহুল্য আছে, জান্‌বার চেষ্টা করলে অসুবিধায় পড়্‌বে। টাকা ঋণ করলে, তাব যা দর্‌কার সে তা কিনে নিতে পার্‌বে। আবার, জিনিসটির ঋণশোধের সময় জিনিস-বিশেষ জোগাড় ক'রে শোধ দেওয়ার চেয়ে টাকায় শোধ দেওয়া ঢের সুবিধাজনক।

টাকা, সাধারণ ভাবে কিন্‌বার ক্ষমতা বলে', টাকা জমিয়ে রাখা জিনিস-বিশেষ জমিয়ে রাখার চেয়ে অনেক সুবিধাজনক। ময়রা যদি সন্দেশ জমিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা করে বা গোয়ালা যদি দুধ জমিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা করে, ভবিষ্যৎ জীবনে ভোগ করবে বলে', তার ফলে উভয়েই দুর্গন্ধ ছাড়া আর কিছু ভোগ করবে বলে' আশা হয় না। সমাজে সব সময়েই কেউ না কেউ থাকে, যে বর্ত্তমানে ভোগ করে এবং অতীতে যা ভোগ করেছে ভবিষ্যতে তা ফেরত দেয়। যথা, যে গালিচা বুন্‌ছে, সে যদি ময়রা ও গোয়ালার কাছ থেকে সন্দেশ ও দুধ নেয় এবং গালিচা শেষ হয়ে গেলে তার বদলে অপর কারো কাছ থেকে সন্দেশ ও দুধ এনে তাদের ফেরত দেয়, তা হলে উভয় পক্ষেরই সন্তোষ লাভ হয়। বাস্তব জগতে অবশ্য এ-ভাবে কাজ হয় না। ময়রা ও গোয়ালা টাকার বদলে তাদের জিনিস বিক্রয় করে, আবার দর্‌কার হলে সেই টাকার বদলে তাদের দর্‌কারী জিনিস কিনে নেয়। গালিচা-প্রস্তুতকারক টাকা ধার করে এবং গালিচা বিক্রয় করে' তা শোধ দেয়। সব সময়েই সমাজে কেউ না কেউ টাকা ধার দিচ্ছে এবং শোধ করছে, অর্থাৎ বর্ত্তমানে ভোগ করছে ভবিষ্যতে শোধ দেবে বলে' এবং বর্ত্তমানে শোধ দিচ্ছে পূর্ব্বে ভোগ করেছে বলে'। সমাজ গতিশীল। কাজেই কোনো সময়বিশেষেই সব-কিছু চিরকালের জন্য শোধবোধ হয়ে থাকে না। এ-বিষয় পরে আরও বলা হবে।

টাকা সম্বন্ধে এত কথা বলাব দর্‌কার ছিল এইজন্য, যাতে কেউ না ভাবেন, যে, সামাজিক আয়ব্যয় একটা টাকার আয়ব্যয়, বা সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য টাকার প্রাচুর্য্য বা অপ্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করে। টাকা শুধু নানাবিধ কার্য্যসিদ্ধির কল মাত্র। টাকার ভাষায় সামাজিক আয়-ব্যয় প্রকাশ করা হয় মাত্র; আয়ব্যয়টা হচ্ছে জিনিসের ও জিনিসের সমতুল্য যা-কিছু, তার। "জিনিসের সমতুল্য যা কিছু" অর্থে, যা-কিছু ভোগ্য, তাকেই বোঝায়। আমরা সেবা ভোগ করি, শিক্ষা ভোগ

করি। গান শুনি বা নাচ দেখি বটে, কিন্তু তাও ভোগ। টাকা দিয়ে যে পূজা করাই, তাও ভোগ; তবে সেটা ভবিষ্যতে স্বর্গে হবে, এই আশায় বর্ত্তমানে তার দাম দি। অথবা পূজা দেখে যদি বর্ত্তমানেই তৃপ্তি হয়, ত, এ তারই দাম। যা-কিছু ভোগ করা যায়, তাই ভোগ্য, এবং ভোগ্যটা বাস্তব জিনিস হতে পারে বা অবাস্তবও হতে পারে। আমাদের বিজ্ঞানে অবশ্য সেই ভোগ্যগুলি নিয়েই কারবার, যেগুলির পরিমাণ টাকার ভাষায় প্রকাশ করা যায়। আমরা ধরে' নিয়েছি, যে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য কতটা আছে, তা পরিমেয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ থেকে বুঝা যায়। পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্য আবার সাক্ষাৎভাবে মাপা যায় না। যে সব ভোগ্যের সাহায্যে সেই স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্ট হয়, তাদের মধ্যে যেগুলি টাকার সাহায্যে পরিমেয়, সেগুলি কতটা আছে তাই দিয়ে পরিমেয় স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

কোনো সমাজ বা জনসংঘ বৎসরে ভোগ্য যতটা উৎপাদন করে, তার উপর তার স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। নিজেদের উৎপাদিত ভোগ্যের বদলে অন্য জনসংঘের দ্বারা উৎপাদিত কিছু জোগাড় করলে, তাকেও প্রথম জাতির দ্বারা উৎপাদিত ভোগ্য বলে' ধরা হচ্ছে। অবশ্য বৎসর-বিশেষে উৎপাদন কম করে' ভোগ বেশী করা যায় পরের কাছ থেকে ঋণ করে'; কিন্তু সেটা, বর্ত্তমান-ভোগ্যের পরিবর্ত্তে ভবিষ্যৎ-ভোগ্য দেওয়া হচ্ছে বলে' বিনিময়ের মধ্যে পড়্‌ছে। সমাজের বাৎসরিক আয় অর্থে একটা ভোগ্য-সমষ্টি বুঝায়। তার মধ্যে সমস্তটা পরিমেয় নয়। কিন্তু পরিমেয় যেটুকু, তার প্রকৃতি অপরিমেয়টুকুর প্রকৃতি নির্দ্দেশ করে। প্রতি বৎসর যে-সকল ভোগ্য (বস্তু, সেবা প্রভৃতি) উৎপন্ন হয়, সেইগুলি উৎপাদন উপলক্ষে যে-সব ভোগ্য নষ্ট হয়েছে (যথা যন্ত্রপাতি ক্ষয়ে যাওয়া, ইমারতের অবস্থা খারাপ হওয়া, পূর্ব্বসঞ্চিত কিছু ব্যবহৃত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি), তা বাদ দিলে বাৎসরিক সামাজিক আয় (নেট্ আয়) জানা যায়। এইসবের মধ্যে যেটুকু টাকার বদলে বিক্রয় হয়, সেটুকুই পরিমেয়। সমাজের সব লোকের বাৎসরিক নেট্ আয় (অর্থাৎ বস্তু, সেবা প্রভৃতি সরবরাহ করার দরুন তারা এক বৎসরে যা পেয়েছে) যত টাকা, প্রথমতঃ সেগুলি ধর্‌তে হবে। যে-সব আয়ের পরিবর্ত্তে কোনো বস্তু, সেবা ইত্যাদি বা, এক কথায়, ভোগ্য সরবরাহ করা হয় নি, সেগুলিকে বাদ দিতে হবে, কেন না সে-সব আয়গুলি শুধু সম্ভোগ নির্দ্দেশ করে, উৎপাদন নয়। যথা, যদি কেউ চিকিৎসারূপ সেবা সরবরাহ করে' ১০,০০০৲ টাকা পায় এবং তার মধ্যে ১০০০৲ টাকা নিজের ছেলেকে দেয়, তা হলে ছেলের আয়টা ধর্ত্তব্য নয়; কেন না, সেটা উপহার মাত্র, সামাজিক ভোগ্যসমষ্টির কোনো অংশ চিকিৎসক-পুত্র উৎপাদন করে নি। কিন্তু সেই এক হাজার টাকা যদি কোনো কেরানীকে দেওয়া হয় (মাহিনা হিসাবে), তা হলে সেটা ধরা হবে (কেরানীর আয় হিসাবে); কেন না কেরানী টাকার বদলে কেরানীগিরি সরবরাহ করেছে এবং কেরানীর কাজটা ভোগ্য (সেবা-জাতীয়)।

ব্যক্তিদের আয়সমষ্টির সঙ্গে যে-সব জিনিস সত্য সত্যই টাকায় বিক্রয় হয় নি, অথচ যার মাপ টাকায় খুব সহজেই হয়, সেগুলি যোগ দিতে হবে। যেমন, নিজের বাড়ীতে যদি কেউ থাকে, ত তার আয়ের সঙ্গে তার বাড়ীর ন্যায্য ভাড়া যা তা যোগ দিয়ে নেওয়া যায়। ব্যক্তিদের আয়ের পরে দেখ্‌তে হবে, কোম্পানী, সমবায়, গবর্ণ্‌মেণ্ট ইত্যাদি ব্যক্তিসংঘগুলির আয়। আয় নির্দ্ধারণের সময় সব সময় নেট্ আয়টুকুই ধর্‌তে হবে। অর্থাৎ একই জিনিস দুইবার যেন গণা না হয়। সুতার কার্‌খানাতে ধর্‌লাম ১ লক্ষ টাকার সুতা, আবার কাপড়ের কার্‌খানায় ধর্‌লাম ৪ লক্ষ টাকার কাপড়—এরকম কর্‌লে চল্‌বে না। কাপড়ের কার্‌খানা অপরকে যা-কিছু দাম দিয়েছে উপাদানের জন্য, বা তার যন্ত্রের যেটুকু কাপড় বুন্‌তে মূল্যহানি হয়েছে, সব বাদ দিয়ে কার্‌খানার যা আয় হয়েছে (অর্থাৎ যা কার্‌খানা উৎপন্ন করেছে), সেইটুকু ধর্‌তে হবে। আয় জিনিসটা (টাকায়) ভোগ্য উৎপাদনের বাহ্য নিদর্শন মাত্র (সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য নির্ণয় করার দিক্ থেকে); কাজেই যেখানে আয়টা ভোগ্য উৎপাদনের নিদর্শন নয়, সেখানে সেটাকে বাৎসরিক সামাজিক আয় থেকে বাদ দিতে হবে। জাল

জোচ্চুরী, চুরি, ডাকাতি, পকেট-কাটা ইত্যাদির সাহায্যে উপার্জ্জিত আয় কাজেই আমাদের তালিকা থেকে বাদ পড়্‌বে। এইখানে বলে' রাখা দর্‌কার যে, যে-সব ভোগ্য টাকার বদলে বিক্রি হয়েছে এবং যেগুলি হয় নি, এই দুইএর মধ্যে প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই; কতকগুলি জিনিস কোনো সময় বিক্রি হয়, আবার অন্য সময় হয় না; যথা নার্স্‌ (শুশ্রূষাকারিণী) যতক্ষণ টাকা নিয়ে সেবা করে, ততক্ষণ তার আয়টা আমাদের পরিমেয় সামাজিক আয়ের তালিকার মধ্যে পড়্‌বে। কিন্তু যে-ব্যক্তির সেবা নার্স্‌ কর্‌ছিল, তার সঙ্গে যদি নার্সের বিবাহ হয়ে যায় এবং সে স্বামীর সেবা কর্‌তে থাকে, তা হলে নার্সের আয় বলে' আর কিছু থাক্‌বে না। কাজেই পরিমেয় সামাজিক আয় সেই পরিমাণে কমে' যাবে, যদিও অপরিমেয় সামাজিক আয় বেড়ে যাবে ও সমগ্র সামাজিক আয় সমানই থাক্‌বে। আবার ধরা যাক, যদি হঠাৎ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক ভাইস্‌চ্যান্‌সেলর্‌ বৎসরে ১ লক্ষ টাকা বেতন গ্রহণ সুরু করেন, তা হলে পরিমেয় সামাজিক আয় বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা পরিমাণ বেড়ে যাবে, যদিও অপরিমেয় আয় সেই পরিমাণে কমে' যাবে এবং সমগ্র সামাজিক আয় সমানই থাক্‌বে। নিজের বাড়ীতে আস্‌বাবপত্র রেখে যদি কেউ সম্ভোগ করে, তা হলে আস্‌বাবের ব্যবহার থেকে যেটুকু ভোগ্য প্রতিবৎসর উৎপন্ন হয়, তা অপরিমেয়; কিন্তু হঠাৎ সেই বাড়ী আস্‌বাব সহ ভাড়া দিলে সেই ভোগ্যটুকু পরিমেয় হয়ে দাঁড়ায় এবং পরিমেয় সামাজিক আয় সেই পরিমাণ বেড়ে যায়।

সামাজিক বিজ্ঞানগুলির চর্চ্চা কর্‌তে গেলে এই-জাতীয় গোলমালের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না, এবং তার জন্যে সে চর্চ্চা ছেড়ে দেওয়াও যায় না। পরিমেয় সামাজিক আয়ের এত কম অংশ এই ভাবে কমাবাড়ার ভাণ কর্‌তে পারে, যে, তাতে যায় আসে কম এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেটা ধরা যায়। যথা, ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্টের সভ্যদের বেতন দেওয়া সুরু হওয়ার ফলে পরিমেয় সামাজিক আয় বাৎসরিক প্রায় ৩৭,৫০,০০০৲ টাকা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি ভাবেন নি, যে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সেইজন্য কিছু বাড়্‌ল। কেন না দেশের আইন-কানুন ইত্যাদি ভাল ভাবে রেখে জনসাধারণের যে-সেবা করা হয়, সেই ভোগ্যটুকু পূর্ব্বে বিক্রি হত না, কিন্তু উৎপন্ন হত; সেটুকু এখন বিক্রি সুরু হল। সমাজের বার্ষিক আয় তাতে বাড়্‌ল বা কম্‌ল না।

কাজেই আমরা দেখ্‌ছি, যে, সব-কিছু দেখে শুনে এই কথাই মনে হয়, যে, পরিমেয় সামাজিক আয়ের * পরিমাণ, পরিমেয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করে, এবং দ্বিতীয়টির পরিমাণ সমগ্র সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের (অর্থাৎ পরিমেয় ও অপরিমেয় উভয়বিধ সমগ্র স্বাচ্ছন্দ্যের) প্রকৃতি নির্দ্দেশ করে।

অতঃপর (নেট্‌ অর্থাৎ খরচখর্‌চা বাদ দিয়ে) সামাজিক আয় কথাটি পরিমেয় সামাজিক বার্ষিক আয় অর্থে ব্যবহৃত হবে এবং সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য কথাটি পরিমেয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্থে ব্যবহৃত হবে।

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

* এটা সব সময়ই বার্ষিক আয়।

বর্ষা

চীৎকারি' মহাব্যোম আজি কারে বন্দে
বিদ্যুৎবাতি জ্বালি' পরম আনন্দে?
নির্ম্মল ঢলঢল কার ঐ মু'খানি,
চঞ্চল টলটল কার চোখ দু'খানি,
মঞ্জীর বাজে কার জল-কলছন্দে?

কে ও বলো এল কালো মেঘ-শাড়ী পরিয়া,
কেয়া-কেতকীর ডালা কাঁকালেতে করিয়া?
কে দিল রে ধরণীরে শ্যামলিমা-বৈভব,
কদম্বে শিহরণ, বাদলেতে কলরব?
চঞ্চল বায়ু কার কুন্তল-গন্ধে?

শ্রী গোপেন্দ্রনাথ সরকার

ডঙ্কা-নিশান

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কিরাত-গ্রাম

বৈশালীর সন্থাগারে যখন সংবহুলীকরণের ধুম প'ড়ে গেছে, মগধসেনার অধিনায়ক কুমার চন্দ্রগুপ্ত তখন হিমালয়ের কিরাত-গ্রামে। প্রবল শত্রু বৈশালীকে প্রথমেই দুর্ব্বল করবার অভিপ্রায়ে হস্তিবলের চাপ দিয়ে পিষ্‌তে পিষ্‌তে দুর্গের ভিতর তাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য ক'রে, কালসাপকে সাপের গর্ত্তে বন্দী ক'রে, বৈশালীর অবরোধ অটুট রাখ্‌বার ভার মন্ত্রী শকটার ও সেনানায়ক সিংহবল-দত্তের হাতে স'পে দিয়ে, অল্প মাত্র সৈন্য সঙ্গে তিনি কিরাত-দমনে যাত্রা করেন। পথে পিপ্পলী-বনের গোপরাজ হাজার গোরুর মালিক বন্ধুগোপ আর তার দুই ভাই গোপক ও চণ্ডগোপ গোয়ালা-পল্টন নিয়ে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যোগ দেয় ও বনপথে তাঁর পথপ্রদর্শক হয়। গোরু-চোর কিরাতদের সঙ্গে এদের চিরশত্রুতা, জঙ্গলের রাস্তা এদের নখদর্পণে। কিছু দিন পূর্ব্বে মৃগয়ায় এসে এদের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের প্রথম পরিচয় হয়। কিরাতেরা গোয়ালাদের একপাল গোরু ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, চন্দ্রগুপ্তের অনুগ্রহে গোয়ালার গোরু গোয়াল-ঘরেই ফিরে আসে এবং কিরাতেরাও রীতিমতই শিক্ষা পায়। তাই গোপরাজ বন্ধুগোপ বনচরের শ্রেষ্ঠ উপহার একটি আস্ত মৃগনাভি আর দশটি সবৎস গাভী দিয়ে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যর্থনা করে। তার বদলে চন্দ্রগুপ্ত নিজের নামলেখা একখানি তলোয়ার আর একটি সিন্ধুদেশের ঘোড়া বন্ধুগোপকে উপহার দ্যান। এবার কিরাত-দমনে এসে এই গোয়ালাদের সহৃদয় সাহায্যে পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় সেনা-গুল্ম স্থাপন ক'রে, পাহাড়ীদের আকস্মিক আক্রমণের রাস্তা একদম বন্ধ ক'রে দিয়ে তিনি দুর্গম পাহাড়ের নৈসর্গিক দুর্গে নিজের অধিকার প্রতিপদে পাকা ক'রে অগ্রসর হ'তে থাকেন। পাহাড়ী-সর্দ্দার কলাবু আজ বন্দী। হিমালয়ে মগধের ধ্বজা রোপণ ক'রে মগধ-সেনা ও গোয়ালা-পল্টন আজ জয়পান কর্‌বে। কুমারের কাছেও অনুমতি পেয়েছে। সন্ধির সর্ত্ত সমস্ত স্থির হ'য়ে গেছে—পাহাড়ীরা মগধ-সম্রাট্‌কে বছরে অন্তত বারোটা চমরী গোরু দেবে, অভাবে প্রত্যেক গোরুর বদলে দশটা ক'রে চামর দেবে; তা ছাড়া মগধ-বণিক্‌দের মহাচীনে ও স্বর্ণ-পিপীলিকার দেশে যাবার রাস্তা ছেড়ে দেবে, সে-রাস্তায় মগধের সেনাগুল্ম বস্‌বে; আর রোহিণীনদীর উৎস পর্য্যন্ত মগধের অধিকার ব'লে পুরুষানুক্রমে স্বীকার করবে; বিনিময়ে মগধের তরফ থেকে, বন্দী সর্দ্দার কলাবুকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং কুড়ি-খানা তলোয়ার ও কুড়ি দ্রোণ লবণ পাহাড়ীরা বছর বছর পেতে থাক্‌বে। বিদ্রোহী-সর্দ্দার কলাবুর বড় ছেলে জটামস্তক আজ তার পাথরের টাঙি ও শিঙের তৈরী ফলাওয়ালা শড়্‌কী চন্দ্রগুপ্তের সাম্‌নে রেখে সন্ধির সমস্ত সর্ত্ত পালন করবে ব'লে আগুন ছুঁয়ে অস্ত্র ছুঁয়ে বাঘের নখ ছুঁয়ে শপথ ক'রে গেল। কলাবুও ছেলের মাথায় হাত দিয়ে শপথ কর্‌লে। সঙ্গে সঙ্গে কিরাতদের দ্বাদশ গ্রামের বারোজন চাঁইও শিলাজতু, ধূপকাঠ আর রাশীকৃত চমরীর দুধের পিণ্ডক্ষীর উপহার দিয়ে সন্ধিপালনের শপথ ক'রে বিদায় নিলে। পাহাড়ীরা চ'লে গেলে চন্দ্রগুপ্ত বন্ধুগোপকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন—"আচ্ছা, পাহাড়ীরা নিজেদের ভাষায় নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছিল, মুখচোখের ভাবে মনে হয় ভারি যেন বিস্মিত হয়েছে। তুমি ওদের কথা কিছু বুঝ্‌লে ?··· আমার ভারি কৌতূহল হচ্ছিল।"

বন্ধুগোপ বল্‌লে—"হুঁ, কিছু কিছু বুঝেছি,···ওরা আপনাকে দেখে বিস্মিত হয়েছে।"

"কেন ? আমার তো তিনটে চোখ বা চারটে হাত নেই, আমায় দেখে বিস্মিত হ'ল কিসে ?"

"ওরা বল্‌ছিল—এই বালক, এর কাছে আমরা হেরে' গেলুম! এর এত বিক্রম! এত সাহস!···এই ওদের বিস্ময়ের কারণ।···সত্যি কথা বল্‌তে কি, ও-বিস্ময় ওদের

একলার নয়।··আপনি মাঝে মাঝে এমন এক-একটা দুঃসাহসিক কাজ করেন যে আমি-সুদ্ধ চম্‌কে যাই।··· একটা কথা বল্‌ব ?"

"কি ? বলো।"

"আমার মনে হয় ও-রকম ক'রে বিপদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়া সাহসী সৈনিকের উপযুক্ত হ'তে পারে কিন্তু বিচক্ষণ সেনানায়কের পক্ষে বিবেচনার কাজ নয়। ওতে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা আছে।"

"থাকলই বা। বিপদের ভয় আমার মাথায় আসে না। হাতী ক্ষেপ্‌লে, আমারও মনটা ক্ষেপে' ওঠে তাকে বশ করতে। আমি বিপদ্ দেখ্‌তে পাইনে, আমি দেখ্‌তে পাই আমার কর্ত্তব্য। দ্রোণাচার্য্য যখন তাঁর শিষ্যদের লক্ষ্যবেধ শেখাচ্ছিলেন তখন অর্জ্জুন যেমন লক্ষ্যের চক্ষু ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তে পান্‌নি, আমার মনে হয়, যাকে তুমি বিপদ্ বল্‌ছ সে অবস্থায় আমিও আমার লক্ষ্য ভিন্ন আর কিছু দেখ্‌তে পাইনে।"

"কিন্তু আপনি মগধ-সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র, শুধু জ্যেষ্ঠ নয়—শ্রেষ্ঠ পুত্র, মগধ-সাম্রাজ্যের আশা-ভরসা। কাজেই আপনার নিজের জীবন সম্বন্ধে অতটা ঔদাসীন্য ভালো নয়, তাতে শুধু আপনার ক্ষতি নয়, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের ক্ষতি।"

হঠাৎ চন্দ্রগুপ্তের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ল, তিনি বল্‌লেন—'বিপদের অগ্নিপরীক্ষায় যে পুড়ে' ছাই হ'য়ে যায়, সাম্রাজ্য তার জন্যে নয়। ছেলেবেলা থেকে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়লাভ করতে শিখেছি, তাই আজ বাঘের চেয়ে ভীষণ এই কিরাতদের যুদ্ধেও জয়লাভ সম্ভব হয়েছে। তা' ছাড়া, বন্ধু, আমি দুয়োরাণীর ছেলে, স্তন্যের চেয়ে অশ্রুই পান করেছি বেশী। আমার কাছে মৃত্যুও খুব ভয়ঙ্কর নয়। মানুষের চরম বিপদ্ কি ? মৃত্যু। সেই মৃত্যুকেও আমি ভয় করতে শিখিনি।···আমার মা রাজকন্যা নন, সেই অপরাধে মন্ত্রীরা আমার সিংহাসন লাভের প্রতিকূল। সেই প্রতিকূলতার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যাকে যুঝতে হবে, বিপদের ভয় তার পক্ষে নিশ্চিত পরাজয়ের নামান্তর।"

"কিন্তু মহারাজের আপনার উপর স্নেহ-পক্ষপাত আছে ব'লে শুনেছি।"

"হাঁ। কিন্তু মহারাজ বৃদ্ধ, পাড়া··· মহারাজ হচ্ছেন মহারাণী ধনশ্রী, আমার বিমাতা আর···"

বন্ধুগোপের কৌতূহলী দৃষ্টি হঠাৎ চন্দ্রগুপ্তের চোখে পড়্‌তেই তিনি কথা উল্‌টে নিয়ে বল্‌লেন—"আর··· কি জানো বন্ধু, আমার একটা ভারি মজার ধারণা আছে···"

"কি রকম ?"

"আমার ধারণা, তুমি হাস্‌বে না ?"

"না।"

"আমার ধারণা এই যে যারা যুদ্ধ করে, তারা যুদ্ধে মরে না। বিপদকে যারা বরণ করে, বিপদ্ তাদের কেশ-স্পর্শ করতে পারে না··"

"হাস্‌ব না বলেছিলুম, কিন্তু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা আপনি কঠিন ক'রে তুল্‌ছেন।"

"কেন ? যারা যুদ্ধ করে তারা যুদ্ধে মরে না, এতে হাস্‌বার কথা কি আছে ? রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ, বলরাম, ভীম, অর্জ্জুন,—এঁরা সবাই পৃথিবীর আর-সকলের চাইতে বেশী যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু কেউ যুদ্ধে মরেননি। আমিও যুদ্ধ করি, সুতরাং আমিও যুদ্ধে মরব না। বিপদে আমার ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার।"

বন্ধুগোপ হেসে বল্‌লে—"অবাক্ করলেন আপনি, অবাক্ করলেন। দুঃসাহসী ব'লে আমারও একটা অখ্যাতি আছে। কিন্তু আপনি আমাকেও হার মানিয়েছেন। এই বয়সে আপনি যে মনে মনে দুঃসাহসিকতার একটা দর্শন-শাস্ত্র খাড়া ক'রে তুলেছেন তা' জান্‌তুম না।"

"মন যার ক্রমাগত দুঃখ পেয়ে এসেছে ভাবনা তার নিত্যসঙ্গী। দুয়োরাণীর ছেলে যে ভেবে ভেবে দুঃসাহসিকতাটাকে দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবে এ আর বিচিত্র কি।"

আলাপের বিষয়টা ঘুরে ঘুরে খুব একটা জায়গাতেই ফিরে আস্‌ছে দেখে' বন্ধুগোপ বল্‌লে—"যাক সে কথা, তর্কে আপনার সঙ্গে পার্‌বার জো নেই।···ভালো কথা··· পাহাড়ীরা আর কি বল্‌ছিল জানেন ?"

"কি ?"

"বল্‌ছিল সন্ধি হ'ল বটে, কিন্তু এ-সন্ধি তেমন পাকা

... গেল, তারাই বিরুদ্ধতা করবে না। তারা ম'রে গেলে আবার যুদ্ধ হ'তে পারবে..."

"তা হ'লে ?"

"সন্ধি চিরস্থায়ী করতে হ'লে সীমান্তে দুই তরফের সীমা-সাক্ষী পোঁতা আবশ্যক। তা হ'লে আর কেউ সীমা লঙ্ঘন করতে সাহস করবে না।"

"সীমা-সাক্ষী, সে আবার কি ?"

"সীমা-সাক্ষী জানেন না ? যাদের মধ্যে সন্ধি পাকা হবে তাদের দুই তরফের দু'জন জীয়ন্ত লোককে দুটো গর্ত্ত কেটে পিঠোপিঠিভাবে পুঁতে ফেলা হয়। পাহাড়ীদের বিশ্বাস এরা ম'রে ভূত হ'য়ে নিজের নিজের স্বদেশের সীমা রক্ষা করে। জীয়ন্ত বিদেশী বা বিদেশীর ভূত কাউকে নিজের এলাকায় ঢুকতে দেয় না। এদেরি বলে সীমা-সাক্ষী। পাহাড়ীরা এদের প্রাণান্তে চটায় না। এ-কথা আমি পাহাড়ীদের মুখে অনেকবার শুনেছি। আমার বিবেচনায় এরূপ একটা অনুষ্ঠান ক'রে রাখা মন্দ নয়। পরে অনেক উৎপাতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারবে।"

চন্দ্রগুপ্ত সবেগে মাথা নেড়ে বল্লেন—"না, না, না; সে হ'তে পারবে না! তুমি বল কি গোপরাজ, যুদ্ধের উত্তেজনায় প্রাণের হানি অনেক ক'রে ফেলা যায়, তাই ব'লে সুস্থচিত্তে হত্যা তো আর করতে পারিনে।"

"আমিই কি হত্যা করতে বল্‌ছি ?...তবে দণ্ডনীয় কেউ থাকলে, তাকে দণ্ডও দেওয়া যেত অথচ পাহাড়ীদের মনের উপরে সীমা-সাক্ষীর স্বাক্ষরটাও উজ্জ্বল হ'য়ে থাকত। কারণ, সন্ধির সর্ত্ত ওদের দিয়ে মানাতে হ'লে, ওরা মানে এমনি ধারা মন্তরই ত চাই..."

বন্ধুগোপ আরো কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার কথা শেষ না হ'তেই প্রহরী এসে সংবাদ দিলে, মন্ত্রী শকটারের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে দূত এসেছে, এখনি দেখা করতে চায়, প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে। চন্দ্রগুপ্ত ইঙ্গিতে তাকে নিয়ে আসতে বল্লেন।

দূত এসে অভিবাদন ক'রে কুমারের হাতে চিঠি দিলে। চিঠি খুলে চন্দ্রগুপ্ত পড়্‌লেন, "মহামাত্য শকটার-শর্ম্মার নিবেদন এই যে পত্রপাঠ মহানুভব মহারাজ-কুমার যেন বৈশালীর অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজধানীর সংবাদ আছে। বিলম্বে ক্ষতির সম্ভাবনা। অলমিতি।" পাঠশেষে গোপরাজকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখে' চন্দ্রগুপ্ত বল্লেন—"বৈশালীতে ফিরে' যাবার জন্যে তাগিদ এসেছে বন্ধু। হপ্তা খানেক পরে হ'লে এখানকার সব ব্যবস্থা পাকা ক'রেই যাওয়া যেত। তা যখন হ'ল না, তখন আমার অনুপস্থিতিতে সে-কাজ তোমাকেই করতে হবে। সে ভার তোমার উপর রইল।..."

গোপরাজ একগাল হেসে বল্লে,—"গোয়ালার বুদ্ধিতে যতদূর সম্ভব তা করব। মগধের ধ্বজা একবার যখন হিমালয়ের মাথায় স্থাপিত হয়েছে, প্রাণ থাকতে তা' আর নাবাতে দিচ্ছিনে।"

"পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় যে-সব সেনাগুল্ম স্থাপন করা গেছে, সেগুলো বজায় রাখবার কি ব্যবস্থা ?"

"গোয়ালা-পল্টনের কিছু আপনি সঙ্গে নিন্, বনের পথে সেথোর কাজ করবে। আর তার বদলে আপনার শিক্ষিত সেনার কিছু অংশ আমাকে দিয়ে যান, তাদের দিয়ে আমার বাকী গোয়ালাগুলোকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেব, তারাই এইসব সীমান্ত-দুর্গ রক্ষা করবে। আমরা পিপল-বনের বুনো, আমরাই এই পাহাড়ী বুনো কুকুরদের মুগুর। তারপর কিছুদিন বাদে ঐ কিরাতদের আস্তে আস্তে তৈরী ক'রে নেওয়া যাবে। ওদের দিয়েই ওদের বশে রাখা যাবে। যেমন বেল দিয়ে বেল ভাঙা—ভাঙো আর খাও।"

চন্দ্রগুপ্ত হেসে বল্লেন,—"বন্ধু, তুমি নিজেকে বুনো ব'লে পরিচয় দিচ্ছ, কিন্তু তোমার কথা শুনে' মনে হচ্ছে তুমি মগধের মন্ত্রী-পরিষদেরই একজন সদস্য। তোমার কুশাগ্রবুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে নির্ভাবনায় আমি বিদায় নিচ্ছি।"

প্রশংসার গর্ব্বে গোপবন্ধুর সরল মুখের চেহারা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল—"ভবিষ্যৎ-সম্রাটের জয় হোক। তিনি যে এই বুনোকে বন্ধু ব'লে সম্বোধন করেন, বুনোর পক্ষে এ পরম গৌরবের সামগ্রী। এ গৌরবের যোগ্য হবার চেষ্টাই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রমূর্ত্তি

প্রভাতে হাত-মুখ ধুয়ে মগধরাজের সন্নিধাতা-অমাত্য ইন্দ্রমূর্ত্তি চোখে কাজল ও ঠোঁটে আল্‌তা দিয়ে রূপোর দর্পণে মুখ দেখ্‌ছিলেন। আমরা যে কালের কথা বল্‌ছি, সে কালে মেয়েদের মতন, ঠোঁটে আল্‌তা ও চোখে কাজল দেওয়াটা পুরুষদেরও নিত্যকর্ম্মের মধ্যেই ছিল।

ইন্দ্রমূর্ত্তির বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যে। লোকটার বাড়ী অন্ধ্রদেশে। মগধে এসে প্রথমে সে রাজার নহাপিত বা নাইবার ঘরের চাকরের কাজে ভর্ত্তি হয়। সে আজ প্রায় পঁচিশ বছরের কথা। অন্ধ্রদেশীয় অঙ্গসংবাহনের নূতনত্বে ও সুখদ বৈচিত্র্যে মহারাজ ক্রমশ তাকে স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তে সুরু করেন। লোকটার আর-এক বিদ্যা ছিল, সে চমৎকার কেশ-বিন্যাস কর্‌তে পার্‌ত। চাপাই-চুড়ো, জোড়-চামর, ত্রিধম্মিল্ল, চতুঃশৃঙ্গ, পঞ্চফণা প্রভৃতি নানারকমের খোঁপা সে বাঁধ্‌তে জান্‌ত। মহারাজ তার এই নূতন বিদ্যার কথা জান্‌তে পেরে' প্রিয়তমা মহিষী ধনশ্রীর বেণী-রচনার কাজেও তাকে বাহাল করেন। এম্‌নি ক'রে রাজান্তঃপুরেও লোকটা অবাধপ্রবেশের অধিকার লাভ করে। ক্রমে এম্‌নি হ'য়ে উঠ্‌ল, যে, ইন্দ্রমূর্ত্তি না হ'লে রাজার স্নান হয় না; ওদিকে সে না চুল বাঁধ্‌তে এলে রাণীর মুক্তকেশ মুক্তই থেকে যায়।

একবার অবন্তীর সঙ্গে মগধের যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাজের কণ্ঠে একটা তীর এসে বিঁধে' গিয়ে ভিতরে রক্তস্রাব হ'য়ে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। সে-সময়ে ইন্দ্রমূর্ত্তি ক্ষতের মুখ থেকে রক্ত চুষে নিয়ে মহারাজের যন্ত্রণার উপশম ও একরকম জীবনরক্ষাই করে। সেই থেকে সে মগধ-সম্রাটের সন্নিধাতা-অমাত্য হয়। কি অন্তঃপুরে, কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি মন্ত্রী-পরিষদে,—সর্ব্বত্রই ইন্দ্রমূর্ত্তিকে মহারাজের সান্নিধ্যে থাকৃতে হ'ত। রাজ্যের কোনো কথা, কোনো গুপ্ত মন্ত্রণা তার অজ্ঞাত রইত না। তার কান-ভাঙানির ভয় করে না এমন লোক পাটলিপুত্রে বিরল। কখন সে কার সম্বন্ধে মহারাজের কান ভারি ক'রে দ্যায়, সেই ভয়ে মন্ত্রীরা থেকে আরম্ভ ক'রে, সেনাপতি, নগরশ্রেষ্ঠী, প্রশাস্তা, সমাহর্ত্তা, এমন কি স্নানের ঘরের স্নাপক এবং শয়ন-ঘরের আস্তরক পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত! বলা বাহুল্য, এখন আর সে স্নানের ঘরের ভৃত্য নয়, মন্ত্রী-পরিষদের সদস্য। এই অযোগ্য লোকটার ভাগ্যোদয়ে সবাই মনে মনে বিরক্ত, কিন্তু বাইরে সবাই এর চাটুবাদ ক'রেই চল্‌ত। মহামাত্যেরা পর্য্যন্ত এর সঙ্গে সসম্ভ্রমে কথা কন। দম্ভে লোকটার মাটিতে আর পা পড়ে না।—

"দাসীর ছেলে দশার ফেরে মন্ত্রী হয়েছে,
হেঁটে যেতে হোঁচট লাগে, পাল্কী চেয়েছে!"

ইন্দ্রমূর্ত্তির হ'ল সেই রকম। একদিন একসরা ছাতুর পরিবর্ত্তে তার মা তাকে পাটলিপুত্রের হাটে বেচে যায়; আর আজ সে সুবিপুল মগধ-সাম্রাজ্যের গুপ্ত-কর্ণধার, রাজার কান তার জিম্মায়, রাণীর ষড়যন্ত্রের সে প্রধান যন্ত্র।

বেশবিন্যাস শেষ ক'রে, বুড়ো আঙুলের ঠেলায় এক-সঙ্গে গোটা-চার-পাঁচ পান মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে রেশমের মতন মসৃণ একখানা চিত্রকম্বলী কাঁধে ফেলে' দুধে-চামড়ার তৈরী ফুলদার চটিজোড়ার ভিতর পায়ের ডগা গলিয়ে দিতে দিতে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঘরের সাম্‌নে খাঁচার ভিতরে টিয়ে-পাখীটা তার চটির শব্দে চট্‌কা ভেঙে ঘাড় কাত ক'রে ইন্দ্রমূর্ত্তিকে একবার দেখে' নিয়ে চোখ দুটো আবার শাদা পর্দ্দায় ঢেকে' ফেলে' যেন ঠাট্টার সুরে বলে উঠ্‌ল "টর্‌র্‌র্‌।" ইন্দ্রমূর্ত্তি তার দিকে একবার কট্‌মটিয়ে চেয়ে সোজা সদরে গিয়ে হাজির হ'ল। চন্দন-কাঠের নক্‌সাদার দরজার বাইরে মকরমুখো ডাণ্ডীওয়ালা দোলা তৈরী ছিল। তাতে উঠেই যুক্তপাণি বাহকদের সর্দ্দারকে হাঁকার দিয়ে বল্‌লে—"কোষাগার, কায়স্থ-নিবেশ।"

বাহকেরা দোলা কাঁধে তুলে রাজনিবেশের অগ্নিকোণে মসীপর্ণিক কায়স্থ-পল্লীর দিকেই যাচ্ছিল, হঠাৎ অর্দ্ধপথে ইন্দ্রমূর্ত্তি চেঁচিয়ে বল্‌লে—"ফেরা, ফেরা,...বণিক্‌-নিবেশ, শ্রীবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠীর বাড়ী।"

বাহকেরা কাঁধ বদ্‌লে উত্তর মুখে চল্‌তে লাগ্‌ল।

দোলা যখন শ্রীবর্দ্ধনের দরজায়, শেঠজী তখন খাতায় মগ্ন। ইন্দ্রমূর্ত্তি ঘরে ঢুকতে তার চমক ভাঙ্‌ল। তুব্‌ড়ির

শেষ ছুটো স্ফুলিঙ্গের মতন তার চোখের তারা ছুটো যেন উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে আবার তখনি যথাস্থানে ফিরে এল। শুভ্র-আস্তরণে-ঢাকা মাল্যভূষিত সুখাসনখানা এগিয়ে দিয়ে বণিক্-সুলভ অতিশিষ্টতায় হাত জোড় ক'রে, ভয় কৌতুক তোষামোদ ও তৎসঙ্গে অতিপরিচয়ের অবজ্ঞার খাদমেশানো মস্কাহাসি হেসে শ্রেষ্ঠী বল্‌লেন—"মন্ত্রী-মশায় যে! কি আজ্ঞা হয়?"

ইন্দ্রমূর্ত্তি তার হাসিতে কেমন একটু অস্বস্তি বোধ কর্‌ছিল। চরিত্র যে হারিয়েছে তার নরকের পথের সহযাত্রিণী যে অবজ্ঞার হাসি হাসে, ইন্দ্রমূর্ত্তির মনে হ'ল এ হাসি অনেকটা সেই রকমের। তাই একটা তীব্র কটাক্ষে সেই হাসিটাকে নস্যাৎ কর্‌তে চেষ্টা ক'রে যখন রোষকটাক্ষ ব্যর্থ হ'ল, তখন ঈষৎ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মুখখানা আরো কঠিন, আরো গম্ভীর ও আরো অন্ধকার ক'রে সে বল্‌লে—"ওহে শ্রীবর্দ্ধন, কিরাত-গ্রামে পল্টনের জন্যে পঁচাত্তর লক্ষ কার্ষাপণ মূল্যের সৈন্যভোজ্য, যা তুমি কাল পাঠিয়েছ, বুঝ্‌লে, ভুলে যেয়োনা, পঁচাত্তর-লক্ষ; আর পঁচিশ-লক্ষ কার্ষাপণ মূল্যের তাঁবু-সরঞ্জাম……মোট কোটি কাহন,……আজ কোষা-গার থেকে আদায় কর্‌তে চাও। বুঝ্‌লে? আর এই কোটি কাহন আজ সূর্য্যাস্তের তিন দণ্ডের মধ্যে আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া চাই। এই নাও মহারাজের দণ্ড-মুদ্রা-যুক্ত নির্দেশ-পত্র।…এরই মূল্য কোটি মুদ্রা। বুঝ্‌লে?"

"হাঁ, তা আর বুঝিনি? বুঝেছি। আর আমার প্রাপ্য?"

"তোমার প্রাপ্য? হাঁ, শতকরা এক পণ…কেটে রাখ্‌তে পার।"

"বড় অল্প,…বিবেচনা করুন যদি কোনো গোলযোগ হয় তো সমূহ বিপদ, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।"

"তোমার অত ভয় হয় তুমি ছেড়ে দাও। ইন্দ্রমূর্ত্তি ভীরুর সহায়তা চায় না। তুমি ছাড়া ঢের বেণে এ নগরে আছে। আমাকে খুসী কর্‌বার জন্যে তারা শতকরা আধ পণে রাজী হবে।"

"না না, অরাজীর কথা আমিও তো বলি নি। তবে কিনা বড় অল্প।"

"বড় অল্প, সত্তর ক্রোরে শতকরা এক পণ ক'রে হ'লে বড় অল্প হয়, না? তোমার ক্ষুধা কিছু বেশী দেখ্‌ছি। সৈন্য-ভোজ্য জোগান্ দেওয়ার নামে বস্তা বস্তা ভুসি আর মাটি গাড়ী-বোঝাই ক'রে নগরের দরজার বাইরে ফেল্‌ছ আর ফর্দ্দ পাঠাচ্ছ। ঘরে ব'সে ব'সে লাভ কর্‌বার সুবিধা ক'রে দিয়েছি, তবু তোমার খুঁৎ-খুঁৎ মিট্‌ল না। ফর্দ্দ মহারাজের মুদ্রাযুক্ত ক'রে দেওয়া হচ্ছে, তুমি খালি কোষাগারে দাখিল কর্‌ছ, এতে তোমার ধুক্‌পুকুনিটা কিসের শুনি? আমায় তুমি হাবা ঠাওরেছ, না? তুমি শুধু মুখের কথাটা খসাবে, আর আমি তোমার এই কোষাগারে চিঠি বইবার বেতন দ্বিগুণ ক'রে দেব? তেমন মূর্খ ইন্দ্রমূর্ত্তি নয়।"

"আপনি রাগ কর্‌ছেন, তা যাক, যা নিচ্ছি তাই নেব।"

"হুঁ, তাই নেবে, এক কড়াও বেশী নয়, আমি সমস্ত গুণে নিই, তা যেন মনে থাকে।"

"যে আজ্ঞে। তবে ঘিয়ের মট্‌কিতেই টাকাটা পাঠাব।"

"হুঁ, কিছু ঘিয়ের মট্‌কিতে, কিছু বা গুড়ের নাগ্‌রীতে।"

"গুড়ের নাগ্‌রী?…কোথায় রাখ্‌বেন? দেখ্‌বেন যেন পিঁপ্‌ড়ে না টের পায়।"

"ঠাট্টা রাখো, যেমন যেমন বলি, সব ঠিকঠিক করা চাই।…বুড়োর একটা গতিগঙ্গা হ'য়ে গেলে, নতুন রাজা সিংহাসনে একবার বস্‌লে হয়। তখন নামে রাজা হবে ধননন্দ, প্রকৃত রাজা এই ইন্দ্রমূর্ত্তি। বুঝ্‌লে?"

"আমায় রাজশ্রেষ্ঠী কর্‌বার কথাটা ভুল্‌বেন না যেন। আপনার চরণই আমার ভরসা। ভুল্‌বেন না।"

আসন ছেড়ে ইন্দ্রমূর্ত্তি দাঁড়িয়ে উঠে' বক্রহাসি হেসে' প্রকাশ্যে বল্‌লে,—"ভোল্‌বার ছেলে ইন্দ্রমূর্ত্তি নয়।" মনে মনে বল্‌লে, "কাঁটাল-বীচি তো তোলো আগুন থেকে। হাত পোড়ে তোমার পুড়বে, খাব কিন্তু আমি। তার পর তুলসীর মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠাবার ব্যবস্থা করা যাবে।" (ক্রমশঃ)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পর্জ্জন্য-পূজা

[ঋগ্‌বেদ ৫ মণ্ডল ৮৩ সূক্ত। পর্জ্জন্য দেবতা। আত্র ঋষি।]

পুণ্য নির্ম্মল সরল সুন্দর
স্তব যা আছে তব উচ্চে গাও,
গাও পর্জ্জন্যের সমুখে আঁখি রাখি'
দাও হে দাও তারে প্রণতি দাও,
বৃষের মত সেই আরাবে হুঙ্কারি'
ছুটিয়া ধেয়ে যায় বরষি' জল,
সে জল শক্তির আধার ও মূর্ত্তি
গর্ভ লভে তায় ওষধিদল।

বৃক্ষ উপাড়িয়া হনন করি' ধান
রাক্ষসেরে হানি' নিঠুর নাশ
দেখি' পর্জ্জন্যের নবীন উল্লাস
বিশ্বজগতের লাগে ত্রাস,
পাপী যে দুরাশয় তাহারে হানি' যান
তীব্র আপনার বজ্রবাণ,
তা দেখি' নিষ্পাপ জনও সত্রাস—
পলায়ে রক্ষা করিছে প্রাণ।

রথী সে কশাঘাতে যেমন প্রশাসিয়া
অশ্বে দ্রুত পথে চালায়ে ধায়,
এই এ নভোদেব তেমনি লয়ে যান
সলিলদায়ী দূতে প্রবল বায়,
আকাশ আবরিয়া যখন তিনি ঘন
করেন বর্ষার অন্ধকার,
তখন চৌদিকে ফুকারি' উঠে যেন
সিংহ-গর্জ্জন বারম্বার।

মাতিয়া উঠে বায়ু প্রবল উদ্দাম,
বিজলি জ্বলি' পড়ে বজ্র-সাথ,
ওষধি অঙ্কুরে জাগিয়া মাথা তুলে,
আকাশ গলে যেন সলিলপাত,
সে জল দিকে দিকে ছুটিয়া ঢেকে ফেলে
জগৎ ও বিশ্ব সর্ব্বদেশ,
ধরণী তরুলতা-তৃণে ও গুল্মে
শোভনা হয়ে ওঠে মুক্তক্লেশ।
যেই পর্জ্জন্যের সলিলদান লভি'
ধরণী অবনত তৃপ্ত রয়,
যাহার জলদানে চতুষ্পদ আর
সকল প্রাণী নিতি পুষ্ট হয়,
যাহার জলদান ওষধি মাঝে প্রাণ
দিতেছে,—ধরে তারা বহুল রূপ,
সেই সে নভোরাজ মোদের মাঝে আজ
খুলিয়া দিন শীতসলিলকূপ।

মরুৎ নভোবাসী! দ্যুলোক হতে আজি
কর হে কর ঘন বৃষ্টি-দান,
মেঘ যে ঘোড়া তব, তাদের জলধারা
গলায়ে ঢালি' ঢালি' তোল হে বান,
এস হে এস ভাসি' গরজি' উচ্ছ্বসি'
এস হে আঁখি 'পরে মোদের পাশ,
হে পিতা প্রাণদাতা! সলিল সিঞ্চিয়া
এস হে এস হেথা, মিটাও আশ।

শব্দ করো মেঘ, তোল হে হুঙ্কার,
ধরার গর্ভে জাগুক্ প্রাণ,
চড়িয়া জলরথে এস হে ঘুরি' ফিরি',
বেড়াও চৌদিকে শক্তিমান্,
সলিল-ভরা যেই মোশক রহে তব,—
বাঁধন খুলি' কর নিম্নমুখ,
অঝোর জলধারে সমান করি' দাও
উচ্চ নীচ সব, হে জলমুক্!

হে মেঘ সুমহান্ ! জলের কোশা তব
উপুড় করি' দাও ধরণী প'র,
নদী ও খাল বিল সলিলে ভরি' ভরি'
উছসি' ছুটে যাক্ উত্তরতর,
কর হে সিঞ্চন তোমার শীত স্নেহ—
ঘৃতের সাথে তাহা মিশিয়া যাক্।
যে গাভী বৎসহীন, তাদের তরে আজ
সুপেয় জলাশয় ভরিয়া থাক্।

হে মেঘ মহীয়ান্ ! যখন হুঙ্কারে
ভরিয়া তোল তুমি সকল দেশ,
গরজি' গরজিয়া বজ্র বিকাশিয়া
যখন পাপী-জনে কর হে শেষ,

অখিল বিশ্ব এ তখন সুখে হাসে
হরষে হয়ে ওঠে সে পরিপূর,
ধরণী পরে যত তৃণ ও তরু লতা
জীবের হয় সব দুঃখ দূর।

করেছ বর্ষণ, হে মেঘ সদাশয় !
থামায়ে দাও এবে জলের ধার,
সুগম করি' দিলে মরুভূ-মাঝে পথ
সিক্ত করি' জলে বক্ষ তার,
ওষধি যত কিছু ভোজন-উপযোগী
করিয়া দিলে তুমি, সলিলধর !
সকল লোকে তাই তোমার স্তুতি করে
স্মরিয়া তব কাজ শুভঙ্কর।

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

রাজপথ

[৮]

জন্মদিনের বিষয়ে সুরেশ্বর এইপ্রকার একটা বিপ্লব লইয়া উপস্থিত হওয়ায় প্রমদাচরণ ভিন্ন অপর সকলেই ঈষৎ পীড়িত বোধ করিতে লাগিল। সুরেশ্বরের এই আচরণকে অনধিকার উপদ্রব মনে করিয়া জয়ন্তী মনে মনে বিরক্ত হইলেন; বিমান ইহাকে স্বদেশীতার সীমাতিরিক্ত আতিশয্য বলিয়া বিবেচনা করিল; সুরমা ভাবিতে লাগিল যে এই অনাবশ্যক দ্বন্দ্বের কোনো প্রয়োজন ছিল না; সজনীকান্ত বিশেষ কিছু না ভাবিয়াই সুরেশ্বরের প্রতি বিমুখ হইয়া রহিল; এবং শিষ্টাচারের অনুরোধে মুখে সুরেশ্বরের পক্ষ গ্রহণ করিলেও সুমিত্রার মনের মধ্যে বিরোধেরই মত একটা কোন বৃত্তি জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

শুধু অনাহত প্রমদাচরণ সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশান্তমুখে কহিলেন, "তা হ'লে এবার দেখ্‌ছি তোমার জন্মদিন মতান্তরে দুদিন পড়্‌ছে।" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

সজনীকান্ত মুখখানা অদ্ভুত ভঙ্গীতে বক্র করিয়া কহিল, "গোস্বামী-মতে আজ।"

এই সবিদ্রূপ মন্তব্যে একটা মৃদু হাস্যতরঙ্গ বহিয়া গেল। ইহার দংশন ও আঘাতের দিকে কোন প্রকার মনোযোগ না দিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন, "আর ভূস্বামী-মতে পরশু।" বলিয়া অপরিমিত হাসিতে লাগিলেন।

প্রমদাচরণের হাস্যধ্বনির মধ্যে কথা কহিয়া কোন ফল ছিল না। হাসি থামিলে জয়ন্তী কহিলেন, "যে মতে যে দিনই হোক, কালকের জন্যে যখন সব উয্‌যুগ হয়েছে তখন বাকিটুকুর জন্যে সুরেশ্বরকে কাল আস্‌তেই হবে।"

একবার সুমিত্রার প্রতি চাহিয়া জয়ন্তীর দিকে ফিরিয়া সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "কিন্তু আমি ত কালকের জন্যে কিছুই বাকি রাখি নি। তা ছাড়া আপনারাও যখন আমাকে আজ একেবারে নামঞ্জুর কর্‌লেন না, তখন আপনাদের দিক্ থেকে যোগ দেওয়ারও ত কিছু বাকি থাকল না।"

যদিও এই কথার দ্বারা সুরেশ্বর পরদিন আসিবার

পক্ষে স্পষ্টভাবে কোনও আপত্তি প্রকাশ করিল না, তথাপি তদ্বিষয়ে একটা প্রচ্ছন্ন অনিচ্ছার আভাস উপলব্ধি করিয়া সুমিত্রা মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। স্বদেশী-বিদেশীর এই অন্ধ ও বধির বিচারনিষ্ঠাকে তাহার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইল। তাই সে নিজেকে সংযত রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া আরক্তমুখে কহিল, "অত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাই বল্‌তে চান ত যে কাল আস্‌বেন না ?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "না, ঠিক তা বল্‌তে চাইনে। বল্‌তে চাই যে কাল না এলেও চলে।"

সুমিত্রার মুখ আরও একটু আরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "কার চলে ?—আপনার, না আমাদের ?"

সুরেশ্বর শান্তকণ্ঠে কহিল, "আমার ত মনে হয় উভয় পক্ষেরই।"

সুমিত্রা-কোন প্রকার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বিমান কহিল, "কিন্তু এ পক্ষের অধিকারটা এ পক্ষের উপর ছাড়্‌লেই ভাল হয় না কি ? আপনার কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে বিচারও যদি আপনিই করেন তা হ'লে ত আপনি সব রকম বিচারের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান।"

সুরেশ্বর মৃদু হাস্যের সহিত উত্তর দিল, "বিচার ত আমি কর্‌ছিলাম না, আমি কর্‌ছিলাম নিবেদন।" তাহার পর সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "বিচার কর্‌বার অধিকার সম্পূর্ণ আপনাদেরই। আপনারা যদি বিচার করেন যে কাল আমাকে আস্‌তে হবে, তা হ'লে আস্‌ব।"

কিন্তু এই নির্ব্বিকল্প অধিকার-স্বীকারের সুবিধা গ্রহণ করিতে সুমিত্রার অভিমান-চকিত চিত্তে একেবারেই প্রবৃত্তি হইল না। একমাত্র তাহারই ইচ্ছা ও অনুরোধের উপর যে-বস্তু সুলভ হইয়া উঠিল, এত সহজ প্রণালীর প্রয়োগে তাহা লাভ করিতে সে মনের মধ্যে একটা হীনতা বোধ করিল। অথচ সুরেশ্বরের পক্ষ হইতে এই অকুণ্ঠিত অধিকার বর্জ্জনের পর বিবাদ করিবার মতও আর বিশেষ কিছু রহিল না। তাই সুরেশ্বর যখন নির্ব্বিকারের সহিত কহিল, 'আপনারা যদি বিচার করেন যে কাল আমাকে আস্‌তে হবে তা হ'লে আস্‌ব,' তখন সুমিত্রা কিছুতেই বলিতে পারিল না যে 'আস্‌বেন'।

সুমিত্রার মানসিক সঙ্কট কতকটা উপলব্ধি করিয়া বিমান সহাস্যে কহিল, "এ-সব বিষয়ে বিচার প্রার্থনা করাও আবার একরকম অবিচার করা। কারণ এ যদি অজীর্ণতার বড়ি খাওয়াবার জন্যে আহ্বান হ'ত তা হ'লে জোর করে' বলা যেত যে আস্‌বেন। কিন্তু এ যখন ঠিক তা নয়, তখন এ রকম নিমন্ত্রণের প্রথা হচ্ছে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে' নির্ব্বিবাদে উপস্থিত হওয়া।"—বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "নির্ব্বিচারে গ্রহণ ত করে'ই-ছিলাম, নির্ব্বিবাদে কাল আস্‌ব। অতএব এ আলোচনার এইখানে শেষ হোক।"

এ মীমাংসাও কিন্তু সুমিত্রার মনঃপূত হইল না। তাহার মনে হইল এ আত্মোৎসর্গের দ্বারা সুরেশ্বর নিজেকে একটুও বঞ্চিত না করিয়া মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাই সে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে কহিতে লাগিল, "কিন্তু আপনার যদি কাল আস্‌তে বিশেষ কিছু অসুবিধা হয়, বিশেষ কোন আপত্তি থাকে, তা হ'লে না হয় আজকেই—"

সুমিত্রাকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া সুরেশ্বর সহাস্যে কহিল, "তা হ'লে আজকেই শাক-চচ্চড়ি দিয়ে আমাকে সেরে দেন ত ? না, আমি তাতে রাজি নই।"

অভিমান-পীড়িত সুমিত্রাকে একটু সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই সুরেশ্বর এ কথা বলিল, নহিলে বিশেষ কোন শ্রেণীর আহারের প্রতি তাহার যে বিশেষ লোভ ছিল এমন নহে।

নানা কারণে সুরেশ্বরের প্রতি সজনীকান্তর মন প্রসন্ন ছিল না। এতক্ষণ সে সবিশেষ মনোযোগের সহিত সুরেশ্বরের কথোপকথন শুনিতেছিল, এবার সুযোগ পাইয়া ওষ্ঠাধর ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল—"এ তোমার কি রকম আচরণ বাপু ?—স্বদেশী তারিখ জারি কর্‌তে এসেছ, কিন্তু স্বদেশী শাক-চচ্চড়ি খাবে না ? কাল ত বিলিতি খাবার চপ কাট্‌লেট্‌ হবে। বোশেখ-জষ্টি পছন্দ কর, আর শাক-চচ্চড়ি পছন্দ কর না ?"

একজন অভ্যাগতের প্রতি এরূপ সম্ভাষণ সুরুচি-বিরুদ্ধ বোধ করিলেও কেহই হাস্যসম্বরণ করিতে পারিল না, ব্যাপারটার মধ্যে এমনই কৌতুকজনক একটা কিছু মিশ্রিত ছিল।

সুরেশ্বর নিজেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, সে স্মিতমুখে কহিল, "তা হ'লে বুঝ্‌তে হবে যে আমার মনে আর মুখে যথেষ্ট বিরোধ রয়েছে।"

সজনীকান্ত গম্ভীরমুখে কহিল, "তাই ত মনে হচ্ছে।"

যেটুকু আঘাত সজনীকান্তর নিকট হইতে সুরেশ্বর পাইল তাহাতেই সুমিত্রার মন হইতে বিরোধটুকু কাটিয়া গেল। উপরন্তু মনে মনে একটু সন্তুষ্ট হইয়া কতকটা সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রসন্নমুখে বলিল, "তা হ'লে, সুরেশ্বর-বাবু, স্থির হ'য়ে রইল কাল আপনি আস্‌বেন। দেখ্‌বেন আর যেন কোন ওজর-আপত্তি কর্‌বেন না।" তাহার পর সজনীকান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিত-মুখে কহিল, "সুরেশ্বর-বাবুর চপ-কাট্‌লেট্ খাওয়ায় তোমার যদি আপত্তি থাকে মামা-বাবু, তা হ'লে কাল চপ-কাট্‌লেটের বদলে কোপ্তা-কাবাব রাঁধ্‌লেই হবে। বিলিতী খাবারে আপত্তি আছে, কিন্তু মোগ্‌লাই খাবারে ত কোন আপত্তি থাক্‌তে পারে না?"

সুমিত্রার এই পরিহাস-বাণী শুনিয়া আবার একটা হাস্য-তরঙ্গ বহিয়া গেল।

কিন্তু ইহার পরেই একটা নূতন সূত্র অবলম্বন করিয়া নিম্নোক্তরূপে আলোচনাটা একেবারে সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবেশ করিল।

বিমান কহিল, "মোগ্‌লাই কোপ্তা-কাবাবে রাজ-নৈতিক আপত্তি না থাক্‌লেও অন্য আপত্তি আছে—অতিশয় ঘি লাগে, আর সেইজন্যে জিনিষটা অতিশয় গুরুপাক হয়।"

এই মন্তব্যে প্রমদাচরণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "গুরুপাক হয় তা ঘির দোষে নয়, ঘির নামে তোমরা যে পদার্থ খাও তার দোষে। খাঁটি যদি হয় তা হ'লে এক পো কাঁচা ঘি চুমুক দিয়ে খেলেও অম্বল হয় না।"

প্রমদাচরণের বিশ্বাস বিশুদ্ধ ঘৃত ও দুগ্ধের অভাবেই বর্ত্তমান ভারতের এই অবনত অবস্থা। ঘৃত ও দুগ্ধ যথেষ্ট সুলভ হইলে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট এমন কি প্লেগ ম্যালেরিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া চীনা জাপানী পর্য্যন্ত কিছুই ভারতবর্ষে থাকে না। এই প্রসঙ্গ হইতে অচিরাৎ গো-সমস্যা ও তাহার প্রতিকারের কথা আসিয়া পড়িল। এতদ্বিষয়ে অপর-পক্ষের আগ্রহ এবং ঔৎসুক্যের কোন বিচার বা বিবেচনা না করিয়া প্রমদাচরণ উৎসাহভরে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ফলে অপর-পক্ষের ধৈর্য্য-চ্যুতি হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। অবশেষে দেখা গেল কোন-না-কোন ছলে একে একে সকলেই উঠিয়া গিয়াছে, শুধু একমাত্র নিরুপায় সুরেশ্বর বসিয়া আছে। সে বেচারীর প্রতি প্রথম হইতেই প্রমদাচরণ এমন নিরবচ্ছিন্নভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন যে উঠিয়া পলাইবার কোন ফাঁকই সে খুঁজিয়া পায় নাই।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন সুমিত্রা দয়াপরবশ হইয়া সুরেশের উদ্ধারের জন্য উপস্থিত হইল, গো-প্রসঙ্গ তখনও সবেগে চলিতেছিল। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যাহ্রাসে উৎসাহ-হ্রাস কিছুমাত্র হয় নাই। তখন বিপন্ন সুরেশ্বর অনন্যো-পায় হইয়া প্রতিশ্রুত হইতেছিল যে নন্‌কো-অপারেশনের বিবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে গো-সমস্যাকেও অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সে একবার বিধিমত চেষ্টা করিবে।

সুমিত্রা কহিল, "বাবা সুরেশ্বর-বাবুকে আর ছেড়ে না দিলে এইখানেই ওঁর স্নানাহারের ব্যবস্থা কর্‌তে হয়।"

সুরেশ্বর সকৃতজ্ঞনেত্রে সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই একেবারে উঠিয়া পড়িল, এবং প্রমদাচরণকে নমস্কার করিয়া কহিল, "আমিও অনেকক্ষণ আপনাকে আট্‌কে রেখেছি, এখন তা হ'লে চল্‌লাম।"

ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন, "তাই ত। বেলা যে প্রায় বারটা বাজে। তা হ'লে এই-খানেই যা হয় চারটি খেয়ে নিলে হয় না?"

সুরেশ্বর সবিনয়ে জানাইল তাহার কোন প্রয়োজন নাই, যে-হেতু প্রতিদিনই আহারাদি সারিতে তাহার এমনি বিলম্ব হইয়া যায়। তাহা ছাড়া যতক্ষণ সে গৃহে উপস্থিত না হইবে সকলে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবেন।

সুরেশ্বরকে আগাইয়া দিতে সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হইয়া সুমিত্রা স্মিতমুখে কহিল, "মামা-বাবু এখন কিছু-দিন এখানে থাকবেন, কিন্তু তাঁর কথায় মনে কিছু করবেন না, সুরেশ্বর-বাবু। তাঁর কথার ধরণই ঐ রকম।"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "কথা আমাদের অনেক রকম শোনা অভ্যাস আছে, আপনার মামা-বাবুর কথা সে হিসাবে কিছুই গুরুতর নয়। আমি কিছু মনে করিনি, আর আপনি যখন বলছেন, ভবিষ্যতেও কিছু মনে করব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।"

হাস্যপ্রফুল্লমুখে সুমিত্রা কহিল, "আপনার উপহারের জন্য আর-একবার ধন্যবাদ দিচ্ছি। রুমালগুলি আমার ভারি ভাল লেগেছে।"

সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওগুলো রেখে দেবেন, এবার আমার হাত কাটলে কাজে লাগবে।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রা হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তা সত্যি।"

তাহার পর বিশেষ কিছু না ভাবিয়া-চিন্তিয়া অসতর্ক-মনে বলিয়া বসিল, "শুধু আপনার কেন, আমারও হাত কাটলে কাজে লাগবে।" কথাটা বলিয়াই কিন্তু তাহার মুখখানা প্রভাত-আকাশের মত টক্‌টকে হইয়া উঠিল।

সুরেশ্বর শান্তস্মিতমুখে কহিল, "না, না, আমার রুমালের সে সৌভাগ্যে দরকার নেই, আপনার অক্ষত হাতে স্থান পেলেই সে সার্থক হবে।" বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া করজোড়ে সুমিত্রাকে নমস্কার করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

পথে বাহির হইয়া মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রেও সুরেশ্বরের মনে হইল আকাশ যেন রক্তিম এবং বায়ু সুশীতল!

—

[৯]

সুরেশ্বর চলিয়া গেলে সুমিত্রা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া চিন্তিতমনে সিঁড়ির প্রান্তেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর তাহার কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সুরেশ্বরের-দেওয়া রুমাল তিনখানা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া তুলিয়া রাখিল।

সন্ধ্যার পর সুরমা, সুমিত্রা ও বিমান ড্রয়িংরুমে বসিয়া গল্প করিতেছিল, কথায় কথায় সুরেশ্বরের কথা উঠিল।

সুরমা কহিল, "সুরেশ্বর-বাবু একেবারে খাঁটি স্বদেশী, একটুও অনাচার সহ্য করতে পারেন না।"

বিমান কহিল, "কিন্তু একেবারে খাঁটি হ'লে অনেক জিনিষ আবার অকেজো হ'য়ে পড়ে। তাই সোনাকে প্রচলিত করবার জন্যে খাদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনাচার নিশ্চয়ই মন্দ জিনিষ, কিন্তু আচার অতিমাত্রায় বেড়ে উঠলে অত্যাচারে দাঁড়ায়। মুকুজ্জেদের ছোট গিন্নী দিনে একবার স্নান করেন বলে', দেবসেবার আয়োজন তাঁর দ্বারাই সম্ভব হয়; বড় গিন্নী পঞ্চাশবার স্নান করেন বলে' দেব-মন্দিরে ঢোকবারই সময় পান না।"

সুরেশ্বরের বিরুদ্ধে এইটুকু প্রতিকূল আলোচনাতে সুমিত্রা মনের মধ্যে কোথায় একটু আঘাত পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল, "আপনি কি তা হ'লে বলেন যে অনাচার কতকটা সহ্য করা উচিত?"

বিমান কহিল, "উচিত বলিনে, তবে অবস্থা-বিশেষে সহ্য করা দরকার হ'তে পারে।"

সুরমার দিকে একবার চাহিয়া সুমিত্রা কহিল, "কি রকম অবস্থায়, একটা উদাহরণ দিতে পারেন কি?"

মৃদু হাসিয়া বিমান কহিল, "পারি। বোটানিক্যাল গার্ডেনে সুরেশ্বর-বাবুর হাত বাঁধবার জন্যে তুমি যখন তোমার রুমাল দিতে উদ্যত হয়েছিলে, তখন অবস্থার অনুরোধে সেটা যদি তিনি গ্রহণ করতেন তাতে সাধারণ অবস্থায় বিলিতী রুমাল ব্যবহার করার অনাচার তাঁর হ'ত না।"

সুরেশ্বরের রুমাল-প্রত্যাখ্যান-সম্বন্ধে একদিন সুরমা সুমিত্রা ও বিমানের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল, এবং স্বদেশী-বিদেশী-বিচার-বিষয়ে সুরেশ্বরের ঐকান্তিক নিষ্ঠার কথা হিসাব করিয়া প্রত্যেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে রুমালটি বিলাতী ছিল বলিয়াই সুরেশ্বর গ্রহণ করে নাই। আজ সকালে যখন সুরেশ্বর সুমিত্রাকে বলিয়াছিল, "রুমাল-গুলো রেখে দেবেন, এবার আমার হাত কাটলে কাজে লাগবে" তখন সে বিষয়ে সুমিত্রার আর কোন সন্দেহ ছিল না। তাই অন্য দিক্ হইতে সুরেশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সে বলিল, "নিজের কাছে খদ্দর না থাকলে তিনি হয় ত আমার রুমালই নিতেন।"

সুরমা কহিল, "তা ছাড়া বিলিতী বলে'ই যে রুমাল ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তা নাও হ'তে পারে। সেটা ত আমাদের আন্দাজ!"

আজ সকালে যে-কথা বিমানের মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করিতে সে মনের মধ্যে কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল, পাছে তদ্দ্বারা সুরেশ্বরের প্রতি কোন রূপে অবিচার করা হয়। কিন্তু কথাটা যখন এমন মুখ্যভাবে উপস্থিত হইল তখন আর সে তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। একটু দ্বিধাভরে একবার সুমিত্রার দিকে ও একবার সুরমার দিকে চাহিয়া বিমান কহিল, "এতদিন আন্দাজই ছিল, কিন্তু আজ সকালে সুমিত্রাকে খদ্দরের রুমাল উপহার দেওয়ার পর থেকে আন্দাজ বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে—"

সুরমা সবিস্ময়ে বলিল, "কেন?"

বিমান হাসিয়া কহিল, "আমার ত মনে হয় উপহারের ছলে আজ সুরেশ্বর-বাবু উপদেশই দিয়ে গেলেন।"

বিমানের কথা শুনিয়া সুরমা সনির্ব্বন্ধে কহিল, "না, না, ওরকম করে' কথাটা ধর্‌ছ কেন ঠাকুরপো? সুরেশ্বর-বাবু হয়ত তাঁর দিক্ থেকে যা উপযুক্ত মনে করেছেন তাই দিয়েছেন। উপদেশ কেন দেবেন?"

বিমান হাসিয়া কহিল, "তাঁর দিক্ থেকে উপযুক্ত, খদ্দরের শাড়ীও দিতে পার্‌তেন, চর্‌কাও দিতে পার্‌তেন। কিন্তু এতরকম স্বদেশী জিনিষ থাক্‌তে রুমাল, যা মেয়েরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে না, দিলেন কেন?"

একথা সুমিত্রা নিজেও কয়েকবারই ভাবিয়াছে, কিন্তু ঠিক এমন করিয়া ভাবে নাই। বাক্স খুলিয়া রুমাল দেখিবামাত্র বোটানিকাল গার্ডেনে রুমাল-প্রত্যাখ্যানের কথা তাহার মনে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তন্মধ্যে অপমানের এমন দংশন বা গ্লানি ছিল না যেমন বিমানের মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়া এখন সে অনুভব করিল। এই রুমাল উপহার দেওয়া অপর একজনেরও চক্ষে কিপ্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে জানিবামাত্র, সুরেশ্বরের প্রতি তাহার চিত্ত বিদ্বেষ ও বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। হয় ত বিমান-বর্ত্তমানীর অনুমানই ঠিক, এই সংশয় তাহার অভিমান-পীড়িত হৃদয়কে বারংবার তীক্ষ্ণভাবে দংশন করিতে লাগিল; উপহার দিবার ছলনায় তাহার জন্মদিনে এমন করিয়া তাহাকে শিক্ষা ও লজ্জা দিবার কি অধিকার সুরেশ্বরের আছে? তাহা ছাড়া, তাহাদের পারিবারিক মত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ জানিয়াও কোন্ বিবেচনায় সুরেশ্বর এমন জোর করিয়া তাহার নিজ মত তাহাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে চাহে? সমস্ত বাংলাদেশ একটি পাঠশালা এবং সে তাহার গুরুমহাশয় ত নহে। একবার এমনও মনে হইল যে অবাঞ্ছনীয় সামগ্রী বলিয়া রুমাল তিনখানা ফিরাইয়া দিবে; কিন্তু সুরেশ্বরের প্রতি রোষপ্রয়োগ করিবার উপস্থিত কোন সুবিধা ছিল না বলিয়া রোষটা অদ্ভুত প্রণালীতে কতকটা বিমানবিহারীর উপরই আসিয়া পড়িল। অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আরক্তমুখে সুমিত্রা কহিল, "মেয়েরা সাধারণতঃ রুমাল ব্যবহার না কর্‌লেও, আমি যে করি তা' ত সুরেশ্বর-বাবু জানেন।"

বিমান কহিল, "এমন ত তুমি আরো কত জিনিষ ব্যবহার কর যা তিনি জানেন। সে-সব ছেড়ে তিনখানা স্বদেশী রুমাল দেবার কারণ কি?"

এবার ঈষৎ কঠিনভাবে সুমিত্রা কহিল, "একটা কিছু দেবার ইচ্ছা হয়েছিল, রুমাল মনে হওয়ায় রুমাল দিয়েছেন, এই কারণ। এ ছাড়া অন্য কোন রকম মনে হচ্ছে কেন?"

বিমান শান্তভাবে স্মিতমুখে কহিল, "কিন্তু রুমালের যখন এমন একটা ইতিহাস রয়েছে তখন মনে হ'তে পারে না কি, যে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্যেই রুমালগুলো দেওয়া হয়েছে?"

এবার সুমিত্রাকে নীরব থাকিতে হইল। মনে যে হইতে পারে না তাহা সে কিছুতেই বলিতে পারিল না, কারণ এ কথা বহুবার তাহার নিজেরই মনে হইয়াছে।

তর্কে পরাজিত হইয়া সুমিত্রা নিরুত্তর হইল ভাবিয়া বিমান ব্যথিত হইল। কতকটা সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে সে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "তা হ'লেও এ কথাটা আন্দাজ বই আর কিছুই নয়। শুধু আন্দাজের উপর নির্ভর করে' কোন কথাই জোর করে' বলা চলে না।"

কিন্তু এ প্রবোধবাক্যের পরও সুমিত্রা যখন নিরুত্তর

রহিল তখন বিমান মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সুমিত্রাকে কোনপ্রকারে ক্ষুব্ধ করিয়া সুস্থ থাকিবার মত শক্তি তাহার প্রকৃতির মধ্যে ছিল না, তাই কোন কার্য্যানুরোধে সুরমা কক্ষ ত্যাগ করিবা মাত্র সে অনুতপ্ত-কণ্ঠে কহিল, "বিনা প্রমাণে সুরেশ্বর-বাবুর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা আমার হয় ত অন্যায় হয়েছে সুমিত্রা; কিন্তু যখনি আমার মনে হচ্ছে যে তোমাকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে এ কাজ করা হয়েছে, যুক্তিবিচার তখন আর আমার মনে স্থান পাচ্ছে না! আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু তোমার প্রতি অশিষ্ট আচরণ সহ্য করতে পারিনে! প্রত্যক্ষ ত নয়-ই! সন্দেহের ওপরও পারিনে!"

নির্জ্জন কক্ষে এই প্রণয়-গত সমুদ্বেল বাণী শুনিয়া সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে যাহা সহজভাবে প্রকাশ পায়, ইঙ্গিতের দ্বারা অনেক সময়ে তাহা বৈশিষ্ট্য লাভ করে। তাই মেঘের মধ্যে বৃষ্টিকণিকার মত, এই রস-গভীর বাক্যের মধ্যে প্রণয়ের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে সুমিত্রার বিলম্ব ঘটিল না। সে অন্যদিকে চাহিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

"আমার কথা বুঝ্‌তে পারছ সুমিত্রা?"

সুমিত্রা চঞ্চল হইয়া একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ রাখিয়াই মৃদুকণ্ঠে কহিল, "পারছি।"

এই কবুল জবাবের পরে আলোচনা বন্ধ হইতে পারিত, কিন্তু ঝটিকা প্রশমিত হইলেই উচ্ছলিত সিন্ধু স্তব্ধ হয় না।

কম্পিত-মৃদুকণ্ঠে বিমান কহিল, "তা হ'লে বুঝ্‌তে পারছ ত কি অধীর হৃদয়ে মাঘ মাসের অপেক্ষায় দিন যাপন করছি!"

এ-কথার উত্তরে সুমিত্রা একবার মাত্র তাহার সলজ্জ নেত্র বিমানবিহারীর প্রতি উত্থিত করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, "এ-সব কথা আমাকে কেন বলছেন?'

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিমান বলিল, "কোন দিনই ত তোমাকে কিছু বলিনি, শুধু আশায়-আশায় আছি। কিন্তু আজ যেন কেমন মনে-মনে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছি, মনটা কিছুতেই সুস্থির হ'তে পারছে না।"

সুমিত্রা উৎসুকনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কেন?"

ক্ষীণ হাস্য হাসিয়া বিমান কহিল, "তা কিছুতেই ধরতে পারছিনে, অথচ সব-তাতেই মনটা অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ছে। এই দেখ না সুরেশ্বর-বাবুর মত লোকের উপরও মনটা মাঝে মাঝে বিগড়ে উঠ্‌ছে।"

একটু নীরব থাকিয়া সুমিত্রা কহিল, "সুরেশ্বর-বাবুকে রুমালগুলো ফেরত দেব কি? আমারও মনে হচ্ছে রুমাল উপহার দেওয়া তাঁর অন্যায় হয়েছে।"

শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া বিমান কহিল, "না না, কখন তা কোরো না সুমিত্রা, সেটা আরও গুরুতর অন্যায় করা হবে। প্রথমতঃ সুরেশ্বর-বাবু তোমাদের একজন বিশেষ উপকারী বন্ধু; দ্বিতীয়তঃ তিনি যদি তোমাদের নিজ দল-ভুক্ত করবার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে থাকেন তা হ'লে তোমাদের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ আছে ব'লেই বুঝ্‌তে হবে। নিজেদের দল আর মতই যে ঠিক দল আর মত, এ কথা আমরাও ত প্রত্যেকে মনে-মনে বিশ্বাস আর জাহির করি; তবে সুরেশ্বর-বাবুরই বা দোষ কোথায়?"

জয়ন্তী ও সজনীকান্তকে লইয়া প্রমদাচরণ ভবানীপুরে একজন আত্মীয়ের বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন; সিঁড়িতে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর ও পদধ্বনি শুনা গেল।

বিমানবিহারী তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি যদি তোমাকে অন্যায় কোন কথা ব'লে থাকি ত আমাকে ক্ষমা কোরো সুমিত্রা। তবে এইটুকু জেনে রেখো যে, যা বলিনি তার তুলনায় যা বলেছি তা কিছুই নয়!"

পর মুহূর্ত্তেই সজনীকান্ত, জয়ন্তী ও প্রমদাচরণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

হারামণি

গান

[সংগ্রাহক—শ্রী প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রী অনাথনাথ বসু। গানটি রঘুনাথ দাসের নিকট হইতে শুনিয়া লেখা। রঘুনাথ দাসের বয়স বর্ত্তমানে প্রায় ৪৫ বৎসর; বাস—মাটিয়াড়া গ্রাম, [illegible] পোষ্ট আফিস, জেলা মুর্শিদাবাদ।]

এখন আমি কি করি তাই বল না,
ছুঁচোর জ্বালায় বসত হল না;—
দশটা ইন্দুর, ছয় ছুঁচো ক্যাঁচর ম্যাচর করে,—
ঘরে দেয় না দাঁড়াতে;
তারা ষোল জনা যুক্তি করে
ঘর ফেলাবার বাসনা।
একে আমার চোদ্দ পাঁচিল ঘর—
তার নয়টা যে দুয়ার,—
কপাট আঁটা, নাইক বাতাস;
ঢুকছে নিরন্তর—
আমার গোরট * কেটে করলে আলগা—
ঘর বুঝি আর টেকে না।
একটা আঁটি পের নেই হাতে,—
উঠলাম ঘর যে ছাওয়াতে,
ভাঙল রুয়ো মড়াং করি'—
আমি পড়লাম ছাঞ্চেতে;
আমি ভাটোর গো(র)টি যেমন-তেমন
উজানের গোর জানি না।
গোঁসাই গণেশ দাসে কয় যদি মহৎ-সঙ্গ হয়—
মহৎ-সঙ্গ হলে ছুঁচোর গন্ধ দূরে যায়;
আমি অহঙ্কারে মত্ত হয়ে গুরু কেমন
জান্‌লাম না।

—

[সংগ্রাহক—জসীম উদ্দীন। গানটি প্রসিদ্ধ লালন ফকীরের রচনা। ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের রহিম মল্লিকের কাছ হইতে শুনিয়া লেখা। গানের মধ্যের খানিকটা গায়কের মনে নাই।]

যে পথে সাঁই চলে ফিরে
তার অন্বেষণ কে করে?
বিষম কাল নাগিনীর ভয়,
যদি কেউ আজগুবি যায়,
অমনি উঠে ছোঁ মারে।
পলক বাড়ে বিষ ধায়্যা যায়,
ওঠে ব্রহ্ম-অন্তরে॥
সেহি তো অধর-ধরা,
ধরিতে চায় যারা;
চৈতন্য গুনীন্ তারা,
গুণ শেখ তাদের ধারে;
সামান্যে কি যেতে পারে,
সেই কুকাপের ভিতরে॥
সে জানে উল্টা মন্ত্র,
কাটিয়া সেহি তন্ত্র;
গুরুরূপ ধেয়ান কৈর‍্যা,
বিষ খৈর‍্যা ভক্ষণ করে;
করম নিধি সাঁই দোরদী,
দরশন দিবেন যারে॥
ভবপারে জন্মাবধি,
সে পথে না যায় যদি;
হবে না তার সাধন সিদ্ধি,
তাই দেখে তার মন ঝরে;
লালন বলে যা করে সাঁই,
থাক্‌তে হবে সেই পথ ধরে'॥

—

[সংগ্রাহক—শ্রী বন্দে আলী মিয়া। পাবনা জেলার একটি পল্লী হইতে সংগৃহীত।]

আমার এই দেহনদী যতই বাঁধি
বাঁধলে বাঁধাল ঠিক থাকে না।
নদীটি শুকাইল, চর পড়িল
তবু নদীর বেগ ম'ল না।
নদীটি যৌতি ছিল, নৌকা চল্‌ত
ঝড়-তুফানের ভয় ছিল না॥
যেতে চায় উজান রোখে
ভাটি বাঁকে
হাল ছেড়ে মন হোস্‌নে হারা॥
আমার এই জীর্ণতরী
মহাজন ভিন্ন ওরে
অন্যের হাতে দিস্‌নে মারা॥
ইঁদুরে গর্ত্ত করে মাটি তুলে
নয় দরজার পথ ভূ'ল না॥
মনির্ মোহন্ত বলে
আমার এ নদীর কূলে
বাস করা হ'ল না॥

—

[সংগ্রাহক—মোহাম্মদ মনসুর উদ্দিন।]

হাজার হাজার সেলাম জানাই মুরশিদ তোমারে।
ঐ যে মুরশিদ হ'ল মালেক মওলা
আর জানে সেই রছুল ইল্লা—
মাস্তু হ'ল জগতের ছিল্লা,—
চরণ দাও মোরে।
হাজার হাজার সেলাম জানাই মুরশিদ তোমারে॥
ইমাম হোসেন হজরত আলি
তাদের চরণ আমরা নাহি ভুলি,
জেন্দেগি ভর দরুদ ভেজি
আমি তাদের পায়।
ওমা তোমার চরণ পাব বলে'
ডাকছি দুই বাহু তুলে,
ওমা তবে কেন র'লি ভুলে—
এস এই সময়।

—

* গোরট=পিতৃবন্ত।

আমেরিকার নারী

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আজও প্রকৃতপক্ষে নারীরা আইনতঃ সমস্ত অধিকার দাবী করিতে পারেন না। আলাবামা প্রদেশে নারীরা সন্তানের অভিভাবিকা হইতে পারেন না। পুরুষেরাই আইনতঃ অভিভাবক হন। আর্কান্সাস্ প্রদেশে নারীরা পিতামাতার সম্পত্তিতে পুরুষের সমান অধিকার প্রাপ্ত হন না—কন্যা অপেক্ষা পুত্রের এক্তিয়ার এবং ভোগস্বত্ব অধিক। ফ্লোরিডা প্রদেশে সন্তানদের উপার্জ্জনের উপর পিতার সম্পূর্ণ অধিকার। মাতা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এ-প্রদেশে সন্তানেরা কি উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিবে সে-বিষয়েও পিতার মতই গ্রাহ্য—মাতার মত উপেক্ষা করা সম্ভবপর। লুইসিয়ানা প্রদেশে বিবাহিতা নারীকে আইনের চক্ষে নাবালক বা উন্মাদের সামিল গণ্য করা হয়। এখানকার নারীরা কারবারে চুক্তি করিতে পারেন না। ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশে নারীরা জুরীর আসনে বসিতে পারেন না। ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে বিবাহিতা-নারীর শ্রমলব্ধ আয় পুরাপুরি স্বামীর তহবিলে জমা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে এই-সকল অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে। বক্তারা ও লেখকেরা বলিতেছেন যে, যতদিন এ-সমস্ত আইন আমেরিকা হইতে উঠিয়া না যাইবে ততদিন মার্কিন নারীরা বুঝিবেন যে, তাঁহারা বহু-পুরাতন বিলাতী আইনের অধীনেই জীবনযাপন করিতেছেন।

—

বিলাতে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন

বিলাতের বিবাহবিচ্ছেদ আইন সংশোধিত হইয়া পার্লামেণ্ট্ মহাসভায় পাশ হইয়া গেল। এই আইনের বলে স্বামীরা যদি ব্যভিচারী হয় তাহা হইলে তাহাদের স্ত্রীরা তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিবেন।

—

বরোদায় স্ত্রীশিক্ষা

বর্ত্তমানে বরোদায় ৩৭২টি বালিকা-বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে ৩০৩৩১ বালিকা শিক্ষালাভ করে। ইহা ভিন্ন অন্য স্কুলেও ৩১৫৭৮ জন স্ত্রীলোক লেখাপড়া করেন। বরোদায় স্ত্রীলোকদের জন্য একটি ট্রেনিং কলেজও আছে।

—

পুনায় নারী-কলেজ

স্যার্ হরমুস্‌জি ওয়াদিয়া 'নাথীবাই দামোদর ঠাকরসে কলেজের' নূতন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই কলেজটি স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্থাপিত হইয়াছে এবং ভারতীয় নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কলেজটি সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। বোম্বাইনিবাসী শ্রীযুক্ত মুলরাজ খাতন এই কলেজের সংলগ্ন একটি ছাত্রী-নিবাস তৈয়ার করিবার জন্য ৩৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত ছাত্রী-নিবাসটিতে ৫০টি ছাত্রীর থাকিবার স্থান হইবে।

পরলোকগত দানবীর স্যার্ বিঠলদাস ঠাকর্সে'র প্রদত্ত ১৫ লক্ষ টাকা দ্বারা ভারতীয় নারী-বিশ্ববিদ্যালয় এই-সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় নারী-সমাজের জন্য স্যার্ বিঠলদাস ও অধ্যাপক কার্বে যে অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

স্ত্রীশিক্ষায় বাংলার স্থান কোথায়? বাংলার লক্ষপতিরা কি বেথুন-কলেজের সংলগ্ন একটি স্থায়ী ছাত্রীনিবাস নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া বাংলার স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দিবেন না?

—

মিশর মহিলা ডেলিগেশন

নিখিল বিশ্ব-মহিলা সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য যে মহিলা-ডেলিগেশন সম্প্রতি ইতালী যাত্রা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া বহু

মুসলমান মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। অনেক পদস্থ ভদ্রলোকেও এই সভাতে যোগদান করিয়াছিলেন। মহিলা ডেলিগেশনের সভানেত্রী খাতুন হুদা শয়রা, সৈয়দা-নবুই মুসা ও সৈয়দা জীজনবুই ও তাঁহাদের মহিলা-সহচরগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য মিশরের অন্যতম মন্ত্রী মহমুদ পাশাও উপস্থিত ছিলেন। "আল্ আখ্‌বার" সংবাদপত্রের একজন মহিলা প্রতিনিধি ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ সম্পাদকগণের পক্ষ হইতে ইঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মিশরের সকল সম্পাদকই এই সাধু উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। উক্ত সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট খাতুন হুদা বলিয়াছেন—

"স্বদেশের পদদলিতা, লাঞ্ছিতা নারীদের এইরূপভাবে সেবা করা আমাদের উদ্দেশ্য যাহাতে তাঁহারা ন্যায্য সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারিণী হইতে পারেন ও জাতীয় আন্দোলনের সাহায্যকারিণী হইয়া দেশের বন্ধন মোচন করিতে পারেন।"

তিনি সম্মিলনীতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। মোস্‌লেম রমণীরা পূর্ব্বে স্বাধীনতা ও সর্ব্বপ্রকার অধিকারে অধিকারিণী হইয়াও কিরূপে সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন এই প্রবন্ধে তাহাই বিশদরূপে আলোচিত হইবে।

—

আমেরিকায় পাঞ্জাবী মহিলা

শ্রীযুক্তা সুশীলা দেবী পাঞ্জাবের একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের পত্নী। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিধবাদের সাহায্যের জন্য একটি শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সেই বিদ্যালয়ের উৎপন্ন শিল্প-দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ও ভারতীয় নারীদের কথা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকায় গিয়াছেন। শ্রীযুক্তা সুশীলা দেবী সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আমেরিকায় গিয়াছেন। তিনি ভারতীয় নারীসমাজের গৌরব, তাঁহার শুভচেষ্টা সফল হউক।

—

আমেরিকার বার জন শ্রেষ্ঠ নারী

আমেরিকার মহিলা সম্মিলনী নিম্নলিখিত বার জন মহিলাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন পাইবার অধিকারিণী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন—

(১) জেন এডাম্‌স্ ... পরহিতে
(২) সিসিলিয়া বো ... চিত্রবিদ্যায়
(৩) য্যানি ক্যানন্ ... জ্যোতিষশাস্ত্রে
(৪) কেরী ক্যাট ... রাজনীতিতে
(৫) য়্যানা কমষ্টক্ ... জীব-বিজ্ঞানে
(৬) মিনি ফিস্কে ... অভিনয়ে
(৭) লুইস্ হোমার ... সঙ্গীতে
(৮) জুলিয়া লেথ্রোপ ... শিশু-মঙ্গল কার্য্যে
(৯) কেরী টমাস্ ... শিক্ষাদানে
(১০) ফ্লোরেন্স্ রেনাসেবিন্ ... শারীরস্থান-বিজ্ঞানে
(১১) মার্থা রেন্‌সেলার ... গৃহশিল্পে
(১২) এডিথ্ হোয়ার্টন্ ... সাহিত্যে

—

বাংলার মহিলা-শিক্ষয়িত্রী ডেপুটেশন

বেথুন-কলেজের মহিলা-অধ্যক্ষ শ্রীমতী রাজকুমারী দাসের নেতৃত্বে একটি মহিলা ডেপুটেশন মন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহারা নিবেদন করেন যে, মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হউক এবং এ-জন্য একটি সেস্ (কর) ধার্য্য করা হউক। তাঁহারা বলেন যে ১০ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদিগকে একত্রে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হউক। তাঁহারা আরও প্রার্থনা করেন যে, মেয়েদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব-বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য ডাক্তার নিযুক্ত করা প্রয়োজন। মন্ত্রী-মহাশয় মামুলি প্রথা অনুযায়ী বলেন যে, এসম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগ যাহা হয় করিবেন।

তৎপরে ডেপুটেশন প্রার্থনা করেন যে, মিউনিসিপ্যালিটিতে তাঁহাদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হউক। উত্তরে মন্ত্রী-মহাশয় বলেন যে, বাংলার সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা সমান নহে। এ-জন্য প্রার্থিত প্রকারের

কোন নিয়ম হইতে পারে না। তবে নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনে নারীদিগকে ভোটাধিকার প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা যাইবে।

—

একটি শুভ অনুষ্ঠান

সম্প্রতি কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা স্যার্ আশুতোষ চৌধুরীর কলিকাতাস্থ বাটীতে সমবেত হইয়া শিশু ও নারী রক্ষাকল্পে একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। পরিত্যক্ত শিশু, নিরাশ্রয় বালক এবং যে-সমস্ত স্ত্রীলোক নীতি-বিগর্হিত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সৎপথে চলিতে বাসনা করে তাহাদের রক্ষাকল্পে এই সমিতি একটি আশ্রম স্থাপন করিবেন। এই আশ্রমে যাহারা বাস করিবে তাহাদিগকে গৃহ-শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থাও করিয়া দিবার বিধান করা হইবে।

আমরা সমিতির এই শুভ ইচ্ছার সাফল্য কামনা করিতেছি। মুহূর্ত্তের ভুলে বা দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচারে পদস্খলন হইয়াছে এরূপ রমণীর অভাব কোন দেশেই নাই। সুযোগ পাইলে ইহাদের অনেকে আবার জীবনের গতি ফিরাইতে পারে। সুতরাং এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যে আছে তাহা বলাই বাহুল্য।

—

চীনে নারী-জাগরণ

চীনদেশের নারী-সমাজে জাগরণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। ক্যাণ্টনে একজন মহিলা রাজনৈতিক বিপ্লবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অপর একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা ঐ সহরের সহকারী শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিস্ পিনস্থ-লী নামক একজন তরুণী কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পী এইচ্-ডি উপাধি গ্রহণ করিয়া একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী-বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

বঙ্গ মহিলার ডিগ্রীপ্রাপ্তি

চব্বিশ পরগণা জেলার অধিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসুর কন্যা শ্রীমতী সুজাতা বসু লিড্স্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাষ্টার অব্ এডুকেশন ডিগ্রী পাইয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজীতে এম্-এ পাশ করিয়া বিলাত গিয়াছিলেন। তিনি স্যার্ মাইকেল স্যাড্লারের শিক্ষাধীনে থাকিয়া "ভারতের শিক্ষার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব" নামক একটি গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

—

মুসলমান ছাত্রীর কৃতিত্ব

বর্ত্তমান বর্ষে বি-এ পরীক্ষায় অনেকগুলি ছাত্রী বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মিস্ সৈয়দ খাওয়ের সুল্তান নাম্নী জনৈকা মুসলমান ছাত্রী ইতিহাসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি মুসলমান সমাজের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত আগা ময়ায়িদ ইস্লামের তৃতীয়া কন্যা। ইঁহার অপর দুই সহোদরাও সুশিক্ষিতা। সমাজের এত বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও এই মুসলমান ছাত্রীটি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন সে-জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

—

নারী সদস্য

রেঙ্গুনের জনপ্রিয় মহিলা-চিকিৎসক ডাক্তার মিস্ কিংস্লী বিনা প্রতিযোগিতায় রেঙ্গুন কর্পোরেশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ব্রহ্মদেশে তিনিই প্রথম নারী মিউনিসিপ্যাল সদস্য।

মিস্ বেইন দিল্লী-বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

[এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(৮২)

পাতকুয়ার জলে কষায় স্বাদ

ঢাকাজেলার পাতকুয়া খনন করিলে তাহার জল কষায় লাগে; কিন্তু উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে ঐ-স্বাদ লাগে না। ইহার কারণ কি? এই কষায় স্বাদ কোনো উপায়ে দূর করা যাইতে পারে কি না?

শ্রী শচীকান্ত ভৌমিক

(৮৩)

রাজিয়া ও চাঁদসুলতানার জীবনী

সম্রাজ্ঞী রাজিয়ার ও চাঁদ সুলতানার কোন জীবনী বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে কি?

"সুফি"।

(৮৪)

হিপ্নটিজ্‌ম্ শিক্ষা

হিপ্নটিজ্‌ম্ ও মেসমেরিজ্‌ম্ বিদ্যা শিক্ষা দিবার স্থান কোথায় ও শিক্ষকের নাম কি?

শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য

(৮৫)

কলিকাতা হইতে আমেরিকা

কলিকাতা হইতে প্রশান্ত-মহাসাগর দিয়া আমেরিকা যাইতে হইলে ঠিক কতদিন ও কত ভাড়া লাগে?

শ্রী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত

(৮৬)

বঙ্গলিপির উৎপত্তি

বঙ্গলিপির উৎপত্তি কতদিন হইয়াছে? দেবনাগর ও বঙ্গাক্ষরের মধ্যে অধিক প্রাচীন কোন্‌গুলি? উড়িয়া, গুজরাটী, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি বর্ণমালার মধ্যে কোন্‌গুলি বেশী পুরাতন ও তাহাদের ক্রম কি? এইরূপ বিকাশের ইতিহাস কি? প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থসকল কি প্রাদেশিক অক্ষরে লিখিত হইত?—এবং তজ্জন্য ভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীগণ কি বিভিন্ন লিপি আয়ত্ত করিতেন?

শ্রী সুধাংশু মুখোপাধ্যায়

(৮৭)

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা কোন্ ক্ষেত্রে, কি কারণে প্রয়োগ হইয়াছিল?

বিষ্ণুচরণ শাস্ত্রী

(৮৮)

হিন্দুদিগের দেবতা

এরূপ কোন পুস্তক আছে কি যাহাতে হিন্দুগণের তেত্রিশকোটি দেবতার নাম ও বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে? যদি একাধিক পুস্তক হইতে তাঁহাদের বিবরণী সংগৃহীত হইতে পারে তবে ঐ পুস্তকগুলির নাম কি কি এবং প্রাপ্তিস্থান কোথায়?

রহিমদাদ খাঁ

(৮৯)

আয়ুক্ষয়

প্রদীপের ছায়ায় বসিলে আয়ুক্ষয় হয় এই প্রবাদের মূলে কোন যুক্তি আছে কি না?

শ্রীমতী শরৎকুমারী মজুমদার

(৯০)

আবিরের লাল রং

আবির ও আবিরের লাল রং কি দিয়ে ও কি রকমে তৈয়ারী করা যায়?

শ্রী গোলক চন্দ্র

(৯১)

ভাদ্র মাসে কলা গাছ

"ভাদ্রমাসে পুতে' কলা।
রাবণ নির্ব্বংশ হ'লা॥"

এই প্রবচনটি এখানকার লোকের মুখে-মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার কোন পৌরাণিক ইতিহাস আছে কি?

শ্রী দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী

(৯২)

বঙ্গভাষায় পশুপালন সম্বন্ধীয় পুস্তক

ব্যবসায়ের জন্য নানাবিধ পশুপালন সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় ভাল কি কি বই আছে এবং কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রী কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(৯৩)

মুর্শিদকুলী খাঁ

মুর্শিদকুলী খাঁ যে তাঁহার একমাত্র পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন তাহা কি ঐতিহাসিক সত্য না কাহিনী?

মোহাম্মদ মোসলেহর রহমান আনোয়ারা

(৯৪)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

অনেক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যাণ্ডে গঠিত হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ভারতপরিচয়ে' দেখিলাম যে ১৬০০ খৃঃ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর উক্ত কোম্পানি এলিজাবেথের নিকট চার্টার গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য?

শ্রী শিবনারায়ণ বাগুলি

(৯৫)

পেঁপের ফুল

পেঁপে গাছে ফুল বা ফল হবার মত বড় না হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে ফল জন্মিবে কিনা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় আছে কি?

দীনেশ ঘোষ

(৯৬)

ভারতবর্ষে কৃষিবিদ্যালয়

ভারতবর্ষে কোথায় কোথায় কৃষিবিদ্যালয় আছে? তাহাতে পড়িতে হইলে কি পাস্ হওয়া চাই ও কত খরচ পড়ে?

কামিনী চক্রবর্ত্তী

(৯৭)

টাকার কুমীর

"টাকার-কুমীর" কথার প্রকৃত অর্থ কি? এবং এই কথার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল?

শ্রী হেমচন্দ্র সেন

(৯৮)

ব্রাহ্মণ বালকের সূর্য্যদর্শন

ব্রাহ্মণবালক যে তিন দিন দণ্ডীঘরে থাকে সে কয়দিন সে সূর্য্য বা শূদ্রের মুখ দর্শন করে না কেন?

শ্রী কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

(৯৯)

বাংলার অনাথাশ্রম

আমাদের বাংলাদেশে কোথায় এবং কয়টি অনাথাশ্রম আছে? তাহার মধ্যে কয়টি বিদেশী-পরিচালিত?

শ্রী রামগোবিন্দ দেবশর্ম্মা

(১০০)

শ্মশান বাস

রাত্রে শব-দাহ করিতে গেলে রাত্রে ফিরিতে নাই, এবং দিবসে গেলে রাত্রি না হওয়া পর্য্যন্ত ফিরিতে নাই কেন? ইহার কোনও শাস্ত্রোক্ত কারণ আছে কি?

শ্রী মণিভূষণ ভট্টাচার্য্য

(১০১)

প্রবাসীর কোন পাঠক বা পাঠিকা এই কয়টি ইংরেজী শব্দের অনুবাদ লিখিয়া জানাইলে বাধিত হইব।

১। Marginal Productivity
২। Law of demand and supply
৩। Scope of Economics
৪। Laissez faire theory
৫। Law of diminishing utility
৬। Law of diminishing return
৭। Industrialism
৮। Corporation
৯। Monopolies; Trusts; Kartels.
১০। Derived function and contingent functiou of money
১১। Quantity theory of money
১২। Discount; Cheque; Balance of trade.
১৩। Bill of exchange.
১৪। Dividend
১৫। Quasi Rent
১৬। Nationalisation of industry
১৭। Iron law of wages
১৮। Mobility of labour
১৯। Profit-sharing: gain-sharing; sliding scale.
২০। Commission; Committee
২১। Consumers' surplus
২২। Faculty theory,
২৩। Socialism; Collectivism; Communism and Bolshevism.
২৪। Animal monad; human monad.

শ্রী সন্তোষকুমার দে

(১০২)

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পাঠাগার

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পাঠাগারের নাম কি? ইহা কোথায় কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল?

শ্রী শৈলেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

—

মীমাংসা

(২)

রাজা গৌরগোবিন্দের রাজধানী

বর্ত্তমান শ্রীহট্টসহরাদি সহ উত্তর শ্রীহট্ট এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণে অনেক দূর ব্যাপিয়া গৌড় রাজ্য ছিল। রাজা গৌড়ের অধিপতি বলিয়া গৌড়-গোবিন্দ বা গৌরগোবিন্দ বলিয়া কথিত হন।

সহরের উত্তরাংশে (বর্ত্তমান মজুমদারির মধ্যে) গড়দুয়ার মহল্লা বলিয়া যে একটি স্থান আছে, তথায় এখনও অনেক ইষ্টক দৃষ্ট হয়, ঐ ইষ্টকরাশি রাজবাটিকার ভগ্নাবশেষের নিদর্শন। গড়দুয়ার মহল্লায় গৌড়গোবিন্দ রাজার গড় অর্থাৎ দুর্গ ছিল। সহরের উত্তরে -টিলাগড়ে জয়ন্তিয়াবাসী অসভ্য জাতিদের আক্রমণ রোধার্থে আর-একটি গড় বা দুর্গ ছিল, তাহাও ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী কৃত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে পাওয়া যাইবে।

শ্রী লক্ষ্মী দেবী

(৮)

অ্যালুমিনিয়মের বাসন মেরামত

গত বৈশাখ মাসের প্রবাসীর বেতালের বৈঠকে শ্রী বলাইচরণ যে অ্যালুমিনিয়মের বাসন-মেরামত সম্বন্ধে যে ৮নং প্রশ্ন করিয়াছিলেন ও যাহার উত্তরে শ্রী ইলারাণী গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে লিখিয়াছেন যে অ্যালুমিনিয়মের তৈজসাদি ফুটা হইয়া গেলে মেরামত করা যায় না, তাহা ঠিক নহে। সম্প্রতি বিলাত হইতে Alumend নামক এক-প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে যাহা দ্বারা অতি সহজে অ্যালুমিনিয়মের জিনিস মেরামত করা যায়; উহা একটি শক্ত জিনিষ যাহা সামান্য অগ্নির তাপে গলিয়া যায় ও তৎপরে ফুটা স্থান তাহা দ্বারা ঝালা যায়। ইহার সম্বন্ধে কলিকাতা S. C. Bose & Sons, 81, Clive Street, ঠিকানায় খোঁজ করিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রী কালিদাস রায় চৌধুরী

(২৬)

হিন্দুনারী ও স্বামীর নাম

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী—উভয়ে এক। মানুষ পরকেই নাম ধরিয়া ডাকে; নিজেকে কেহ নাম ধরিয়া ডাকে না। স্বামী ও স্ত্রী এক বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর নাম লয় না। কারণ নাম লইলে স্বামী স্ত্রী হইতে পৃথক্ হইয়া যান। এই কারণেই বোধ হয়, হিন্দু-নারীগণ স্বামীর নাম লন না।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(৩৮)

এক গাছে ভিন্ন স্বাদের ফল

জোড়কলমের আমগাছেই সাধারণতঃ ঐরূপ বিভিন্ন স্বাদের আম ফলে। জোড়-কলম বাঁধিতে হইলে যে একটি আঁটির চারার প্রয়োজন হয় তাহা সকলেই জানেন। খুব টক্ আমের আঁটির চারায় কলম বাঁধিলে, কলমের আম খুব মিষ্ট হয়।

কলমের চারা মাটিতে পুঁতিলে অনেক সময় আঁটির চারা হইতে (অর্থাৎ যে টক্ আমগাছের চারার সহিত জোড় বাঁধা হইয়াছে তাহা হইতে) দুই একটি শাখা বাহির হয়। এই শাখাগুলি শৈশবাবস্থায় সতর্কভাবে (যাহাতে গাছ খুব বেশী নাড়া না পায় এইরূপভাবে) কাটিয়া লইতে হয়। নচেৎ এই ডালে যে আম হয় তাহা টক্ এবং অন্যটিতে মিষ্ট আম ফলে। সময় সময় এই দুই ডালের আমের আকৃতির পার্থক্য ঘটিতেও দেখা যায়।

সুবেদার শ্রী অসিতনাথ রায় চৌধুরী

আমের বীজ রোপণ করিবার সময় একই গর্ত্তে দুই প্রকার (যেমন টক্ ও মিষ্ট) আমের দুইটি বীজ রোপণ করিতে হয়। কয়েক দিবস পরে যখন বীজ অঙ্কুরিত হইয়া দুই অথবা তিন ফুট্ লম্বা হয় সেই সময় গাছ দুইটির গোড়াদ্বয়কে একটি দড়ি দিয়া একত্র করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। ক্রমেই গাছ বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, গাছের গোড়া দুইটি পরস্পর একত্র হইয়া মিশিয়া যায়। কয়েক বৎসর পরে গাছ দুইটিকে একটি গাছ বলিয়া ধারণা হয়। এবং প্রকৃতপক্ষে একটি গাছই হয়। এইরূপ গাছেই দুই প্রকার স্বাদের ফল হয়।

মহ্ ফুজার রহ্ মান খাঁ

বিক্রমপুরী

(৪৪)

দেবীগণের প্রতিকৃতি

পরব্রহ্মের এই প্রতীকোপাসনা বহুপুরাতন, ইহার সময় নির্দ্দেশ হয় না। পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে পূর্ব্বকালেও ইহার প্রচার ছিল। বাংলা দেশ তন্ত্রের দেশ। আগমবাগীশের সময় হইতেই এ-দেশে দেবদেবীগণের প্রতিকৃতি-উপাসনা বহুলভাবে প্রচারিত হয়।

শ্রী মৃগাঙ্কনাথ রায়

(৪৫)

মৌমাছি-পালন

মৌমাছি-পালন—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

এগ্রিকাল্চারেল্ রিসার্চ্ ইন্ষ্টিটিউট্, পুষা, মূল্য চৌদ্দ আনা।

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম, প্রতিভা ও সুধাংশুমোহন সেন

(৪৬)

বিবাহিতা কন্যার বাড়ী অন্নগ্রহণ

পিতা কন্যাদান করিয়াছেন এবং তৎসহ আরও অন্যান্য দ্রব্য দিয়াছেন। কন্যার বাটীতে অন্নগ্রহণ করিলে পাছে দত্তাপহারী হন এইজন্য অন্নগ্রহণ ব্যবহারতঃ নিষিদ্ধ। দানের ফল অর্থাৎ দৌহিত্রাদি হইলে উক্ত ভয় থাকে না।

শ্রী মৃগাঙ্কনাথ রায়, ও নিরুপমা দত্ত

আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রমতে দেখা যায় বিবাহের পর স্ত্রী ও পুরুষ এক হইয়া যায়:—

"জায়াপত্যোর্ণ বিভাগো বিদ্যতে॥ পাণিগ্রহণাদ্ধিসহত্বং কর্ম্মসু॥ তথাপুণ্যফলেষু॥ দ্রব্যপরিগ্রহেষু চ॥

যাহা দান করা হইয়াছে তাহা প্রতিগ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয়। বিবাহে কন্যাকে জামাতাকে সম্প্রদান করা হয় এবং কন্যা এবং জামাতার অভিন্নতায় তাহাদের কিছু গ্রহণ করা এইজন্যই নিষিদ্ধ। তজ্জন্য বিবাহিতা কন্যার গৃহে ভোজন নিষিদ্ধ। এই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাটুকু লোকাচারের পশ্চাতে রহিয়াছে।

মিতাক্ষরা-মতে দেখা যায়:—

"ভূর্যা পিতামহোপাত্তা নিবন্ধো দ্রব্যম্ এব বা॥
তত্র স্যাৎ সদৃশং স্বাম্যং পিতুঃ পুত্রস্য চোভয়োঃ॥
মণিমুক্তাপ্রবালানাং সর্ব্বস্যৈব পিতা প্রভুঃ।
স্থাবরস্য সমস্তস্য ন পিতা ন পিতামহঃ॥
স্থাবরং দ্বিপদঞ্চৈব যদ্যপি স্বয়ম্ অর্জ্জিতম্।
অসম্ভুয় সুতান্ সর্ব্বান্ ন দানং ন চ বিক্রয়ঃ॥
যে জাতা যেঽপ্যজাতাশ্চ যে চ গর্ভেব্যবস্থিতাঃ।
বৃত্তিং তেঽপ্যভিকাঙ্ক্ষন্তি বৃত্তিলোপো বিগর্হিতঃ॥

সুতরাং দেখা যায় দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করামাত্র সে তাহার পিতার ধনসম্পত্তির অংশের মালিক হয়। সুতরাং সেই সময়ে জামাতার গৃহে ভোজন করিলে তাহাতে দান প্রতিগ্রহণ দোষ হইতে পারে না—কারণ সেই গৃহে তাহার পিতার ন্যায় দৌহিত্রেরও সমান অধিকার রহিয়াছে।

শ্রী শিশিরেন্দ্রকিশোর দত্ত রায়

নিজের কন্যা সন্তানবতী না হইলে তার গৃহে (মেয়ের বাড়ী) তার পিতা আহার করিবে না, মায়াপরবশ হইয়া যে অন্ন গ্রহণ করা হয় তাহা পুঁজতুল্য, সেই পুঁজতুল্য অন্ন ভোজন করিয়া নরকে যাইতে হয়।

"অমৃতা অপ্রজাতা চ নাশ্নীয়াৎ তদ্ গৃহে পিতা।
অন্নং ভুঙ্ক্তে তু মায়ায়াং পূয়ং স নরকং ব্রজেৎ॥"

শ্রী প্রভাময়ী দেবী

(৪৮)

ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও রাজর্ষি জনক বৃহদারণ্যকের ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও রামায়ণের রাজর্ষি জনক অভিন্ন ব্যক্তি নহে, উভয়েই বিভিন্ন ব্যক্তি।

যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণে দ্রষ্টব্য।

শ্রী বামনদাস গোস্বামী
ও
শ্রী প্রভাময়ী দেবী

(৫৫)

(ক) I rise to a point of order—আমি একথা তুলিতে নিষেধ করিতেছি (কোনও বক্তার বক্তৃতার কোনও বাক্যে, বাক্যাংশে বা পদে আপত্তি বুঝাইতে)।

(খ) I rule you out of order—আমি আপনাকে, কোনও কথা বলিতে, নিষেধ করিতেছি—(কোনও বক্তৃতাকারীর ব্যবহার উত্তেজিত বা উদ্ধত বোধ হইলে সভাপতি একথা বলিয়া থাকেন)।

(গ) I am in possession of the House—এই সভা আমার মতের পোষকতা করেন।

(ঘ) I press for division—(এ বিষয়ে) কত জনের মত আছে ও কত জনের অমত আছে, তাহা দেখিতে চাই।

(ঙ) Ex-officio—কার্য্যকারক-অধিকারে (কোনও পদে যিনি নিযুক্ত আছেন ; পরবলাৎ-রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়)।

(চ) Secretary—পরিচারক ; Joint Secretary—যুক্ত-পরিচারক, সহপরিচারক, সমপরিচারক। (এইরূপ, Private Secretary—নর্ম্ম পরিচারক ; Secretary of State—রাষ্ট্র-পরিচারক ; ইত্যাদি)।

(ছ) President—অধিনায়ক ; সভানায়ক।
Chairman—প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা।

(জ) Executive Committee—নির্ব্বাহক-পরিষৎ।
Cabinet—মন্ত্রণা-সংসৎ।

(ঝ) Vote—মত বা সম্মতিদান।

(ঞ) Whip—(১) ব্যবস্থা-সভার সদস্যগণকে নির্দ্দিষ্ট সভা-সময়ে সভার কার্য্যে যোগ দিবার আহ্বান।

(২) ব্যবস্থা-সভার স্বমতাবলম্বী সদস্যগণকে যিনি, কোন গুরুতর বিষয়ের ব্যবস্থাকালে, সংগ্রহ করিয়া রাখেন। (এক কথায় বুঝাইবার মত উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা নাই)।

(ট) Debating Meeting—বিতর্ক সভা।

(ঠ) Mover—প্রস্তাব-কারক। (ড) Opposer—বিরোধী

(ঢ) To second—সমর্থন করা। To support—পরিপোষণ করা। To amend a Resolution—কোনও সঙ্কল্পিত প্রস্তাবের সংশোধন করা।

(ণ) Motion—প্রস্তাব ; Resolution—দৃঢ়সঙ্কল্পিত-প্রস্তাব ; Bill—বিধি বা নিয়মের পাণ্ডুলিপি (স্থিরীকৃত হওয়ার পূর্ব্বে)। Act—বিধি বা নিয়ম (স্থিরীকৃত হওয়ার পরে)।

শ্রী নরেন্দ্রনাথ কর

(৫৬)

দালানে বটের চারা

বাটীর ছাদে বা আলিসায় বট বা অশ্বথ গাছ হইলে তাহা প্রথম অবস্থাতেই উৎপাটিত করিয়া ঐ বৃক্ষমূলে নিশাদল ও হিং, পাথুরিয়া চূনের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইয়া দিবে। এইরূপ কয়েকবার লাগাইলে সে স্থানে ঐ বৃক্ষ আর জন্মাইতে পারিবে না।

শ্রীমতী ঈলারাণী দত্ত

দালানে গাছ উত্তমরূপে কর্ত্তন করিয়া উহার মূলে একতোলা পরিমাণ হিং বা দুই চারি ফোঁটা পারদ দিয়া স্থানটি বেশ করিয়া আস্তর করিয়া দিবে।

শ্রী শৈলেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(৫৭)

মেঘের রং

মেঘ বলিতে যাহা বুঝায় অর্থাৎ জলধারাপ্রসবী মেঘের বর্ণ হস্তী, মহিষ ও শূকরের বর্ণের ন্যায়। যে মেঘ হইতে জলবর্ষণ হয় না তাহার রং সাদাটে। শরৎ ও বসন্তকালেই মেঘে সূর্য্যকিরণ উদয়াস্ত-সময়ে পতিত হইয়া নানা রংএ রঞ্জিত হয়। বরাহাচার্য্যের বৃহৎ-সংহিতায় মেঘের অনেক বিষয় আছে।

শ্রী মৃগাঙ্কনাথ রায়

(৫৯)

বাতাবী লেবু সুমিষ্ট করিবার উপায়

রসহীন ফলকে রসযুক্ত করা যায় কি না জানি না, কিন্তু ফল যদি অম্ল হয় তাহা হইলে তাহাকে অতি সহজেই মিষ্ট করা যায়। খানিকটা জায়গায় কিছু পাথুরে-চূন কয়েকমাস ফেলিয়া রাখিতে হইবে। ক্রমশঃ সেই চূন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। যে গাছের ফলকে মিষ্ট করিতে হইবে তাহার গোড়ার চারিপাশ হইতে আধ-হাত পর্য্যন্ত মাটি খুঁড়িয়া ফেলিয়া ঐ স্থানে সেই চূন-মিশ্রিত মাটি দিতে হয়। এক বৎসরের মধ্যে—কোন কোন সময়ে ছয় মাসের মধ্যে এইরূপে ফলের অম্লত্ব নষ্ট করা যায়।

শ্রীমতী পারুলবালা সেন
শ্রী অমিয়প্রভা সেন

(৬৩)

৺কাশীর পোড়া মাটির জিনিস

কাশীর মাটি সোনা। এজন্য কাশী হইতে মাটি বা মাটির জিনিস অন্যত্র লইলে সোনাচুরির অপরাধ হয়। এই ভয়ে কেহ কাশীর মাটি লইয়া অন্যস্থানে যায় না। অনেকে ৺কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমন-কালে ট্রেনে উঠিবার আগে পায়ের ধূলা পর্য্যন্ত গামছা দিয়া ঝাড়িয়া ফেলেন।

শ্রী মৃগাঙ্কনাথ রায়

(৬৯)

হলুদ-চাষ

(ক) পাবনা, বাঁকুড়া, নদীয়া, বিহার, মাদ্রাজ, বোম্বাই, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে হলুদ উৎপন্ন হয়। মাদ্রাজ প্রদেশেই সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয়। এই প্রদেশে বৎসরে একহাজার টন হলুদ উৎপন্ন হয়।

(খ) কর্মোজা দ্বীপে হলুদের চাষ হয়। এই হলুদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

(গ) জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সিংহল, রুশিয়া, প্রভৃতি দেশে হলুদ রপ্তানি হয়।

(ঘ) রংএর কার্য্যে হলুদ ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) ভারতবর্ষে একলক্ষ একর জমিতে হলুদ চাষ হয়।

শ্রী রামানুজ কর

(৭৫)

আরসলা নিবারণের উপায়

যে ঘরে আরসলার উপদ্রব সেই ঘরে পরে পরে তিনদিন ফিট্‌কারির গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে উপদ্রব কমিতে পারে। 'লতিকা'

ফ্র্যাঙ্ক রস কোম্পানীর (চৌরঙ্গী, কলিকাতা) ঔষধের দোকানে Blatta Cockroach নামক একরকম গুঁড়া ঔষধ পাওয়া যায়; তাহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭৬)

কলের লাঙ্গলে কৃষিকার্য্য

অধরচন্দ্র লস্কর মহাশয় ১৭ বৎসর আমেরিকায় কৃষিবিদ্যা ও যন্ত্রাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া কলিকাতার দক্ষিণে ই, বি, রেলের পার্শ্বে শতাধিক বিঘা জমিতে এক আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উন্নত প্রণালীতে স্বীয় উদ্ভাবিত লাঙ্গলে কার্য্য করিতেছেন। বাহিরের লোকের জানিবার সম্পূর্ণ সুযোগ আছে। তাঁহার ঠিকানা—শ্রী অধরচন্দ্র লস্কর, ইঞ্জিনিয়ার; পোঃ—ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা।

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

(৭৭)

নীল চাষ

আলিগড়, আজমগড়, ভাগলপুর, বুলন্দশহর, শারন, চাম্পারন, পূর্ণিয়া, মুজফরপুর, মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, মানভূম, রাঁচী, সিংহভূম, সাহাবাদ, সুলতানপুর, খেরী, গোরখপুর, মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, সুলতানপুর, বিমলিপটম, রাজামন্ত্রী প্রভৃতি জেলায় নীলচাষ হয়।

শ্রী রামানুজ কর

মিলন

(কবীর)

জীবের মহলে এসেছেন শিব,
কোথা তুই, উন্মাদ ?
রাতি বয়ে যায়, দেবতারে পেয়ে
সেবা করি' মিটা সাধ !
যুগ-যুগ ধরি' করি' প্রতীক্ষা
রয়েছেন মোর প্রভু,
চিত্ত তাঁহার মগ্ন আমাতে,
ভুলিতে কি পারি কভু !
সে সুখ-সাগর প্রেম-বৈরাগ্
বিনা কে দেখিবে আর ;
কবীর কহিছে— অচল আয়ত *
মিলিয়াছে যে আমার !

বলিহারি যাই আজিকার দিনে
এসেছেন প্রিয়তম ;
গৃহ-অঙ্গন ধরেছে কি শোভা,
চিত্ত ভরেছে মম !
সব তৃষা মোর তৃপ্তি লভিয়া
গাহে মঙ্গল গান ;
হেরি' মনোহরে ভাবিয়া না পাই
কোথায় ডুবেছে প্রাণ !
ধোয়াব চরণ, হেরিব বদন,
দিব তনু, মন, ধন ;
লেগে গেছে প্রেম, সত্য নামের—
আশায় আকুল মন।

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

* পতিসোহাগিনী সীমন্তিনীর সিন্দূর, লোহা প্রভৃতি সধবার চিহ্ন। কবীর উহাকে "সোহাগ" বলিয়াছেন।

মৃত্যু-বর

১

পাটনার এক্‌সিকিউটিভ্‌ এঞ্জিনিয়ার্‌ মিষ্টার দাস টুরে বাহির হইয়াছেন। মিষ্টার দাসের পুরা নাম অবনীমোহন দাস। এবারের টুর্‌টা অনেকটা family excursion বা পারিবারিক ভ্রমণ গোছের। সঙ্গে গৃহিণী সাবিত্রী, সস্ত্রীক জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধাময়, কনিষ্ঠ শান্তিময়।

সুধাময় ব্যারিষ্টার, পাটনা হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস্‌ করে। বয়স ২৬ বৎসর। বলিষ্ঠ, উন্নত দেহ। শিকার ও খেলা-ধূলায় অসীম অনুরাগ। সরল স্নেহশীল স্বভাব। সকলের সহিত যাচিয়া আলাপ পরিচয় করিতে ব্যগ্র। পূজার বন্ধ, তাই পিতার সঙ্গে বাহির হইয়াছে। একটা রাইফল বন্দুক সঙ্গে আছে। উদ্দেশ্য—স্থানে স্থানে বন-ভোজনের আনন্দ লাভ করা; আর যদি মিলিয়া যায় কিছু শিকারও করা।

সুধাময়ের স্ত্রী মাধবী সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। শিকারে আদৌ রুচি নাই। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে আসিবার লোভটুকু ছাড়িতে পারে নাই।

অবনীমোহন-বাবুর বয়স ৫০ বৎসর। হৃদয়ের নবীনতা ও প্রফুল্লতা এখনও প্রচুর আছে। তিনি রিচার্ড্‌সন সাহেবের ছাত্র ছিলেন। সাহিত্য-রস তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট। যৌবনে ঠিক সুধাময়ের মত স্বভাব ছিল। শিকারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পাঁচ বৎসর আগেও সুধাময়কে সঙ্গে লইয়া শিকারে যাইতেন ও শিকার করা শিখাইতেন। পিতা-পুত্রে মিলিয়া অনেক বাঘ ভালুক শিকার করিয়াছেন। সেগুলির চামড়া কার্টবার্‌সন্‌ কোম্পানীর দোকান হইতে ট্যান্‌ করান হইয়াছে এবং এখনও তাহারা তাঁহার ড্রয়িংরুমের যুগপৎ শোভা ও ভীতি বর্দ্ধন করিতেছে। এখন আর নিজ হাতে বড় একটা শিকার করেন না। তবে ছেলেরা যে শিকার করে এটুকু খুব ইচ্ছা।

"সাত কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গ-জননি !
রেখেছ বাঙালী করি, মানুষ করনি !"—

এ কবিতাটি তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন ও বলিতেন, শুধু চশ্‌মা চোখে দিয়া দিন রাত পড়িবে ও বন্দুকের শব্দে palpitation (হৃৎকম্প) সুরু হইবে এরকম ছেলের বাংলা দেশের দরকার নাই। তাহারা শিকার করিবে, কুস্তি লড়িবে, দৌড়াইবে, লাফাইবে, সাহেবের চড়-ঘুসি ফিরাইয়া দিতে পারিবে, এমন চাই।

সাবিত্রী লেখাপড়া বেশী জানিতেন না; কিন্তু সেবা ও হৃদয়ের গুণে স্বামীকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিয়াছিলেন। হৃদয় মমতা ও করুণায় ভরা। নিজে মাংস কখন খান না। কিন্তু স্বামীর শিকারের বিরুদ্ধে কখন কিছু বলেন নাই।

কনিষ্ঠ শান্তিময় ইংরেজীতে এম্‌-এ পাশ করিয়া দিন রাত পড়া আর লেখা লইয়া আছে। বয়স ২২ বৎসর। পাছে পড়া-শুনার ব্যাঘাত হয় সেজন্য কোন চাকরির দিকে যায় নাই। পিতার কাছে অনুমতি লইয়াছে এই বৎসরটা সে শুধু বেড়ানো ও লেখা-পড়া লইয়া থাকিবে। তাহারই অনুরোধে বিবাহও এক বৎসর স্থগিত আছে। বন্দুক ছোড়া অভ্যাস আছে, হাতের লক্ষ্যও বেশ, পিতার সঙ্গে শিকারও করিয়াছে। বন্দুক ছোড়া শুধু আত্মরক্ষা বা দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজন—শেষটা এই বলিয়া শিকার করা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে।

সুধাময় যেমন বাপের স্বভাব বেশী বেশী পাইয়াছে, শান্তিময় তেম্‌নি মায়ের স্বভাব লাভ করিয়াছে।

সকলে ভোরে বারুণ হইতে বাহির হইয়া রাণীগঞ্জ বাংলোয় সামান্য ক্ষণের জন্য নামিয়া বেলা ৯টার মধ্যে ডোভী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জিনিষপত্র উঠাইয়া বাংলোর বারান্দায় মোটর-কার তুলিয়া রাখা হইল।

আশ্বিনের শেষ। রৌদ্র বেশ মিষ্ট লাগিতেছে। বস্ত্রাদি সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া সকলে খানিকটা বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় মাধবী দুই পেয়ালা চা আনিয়া স্বামী এবং দেবরের সম্মুখে রাখিয়া শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিল—বাবা, আপনাকে এক পেয়ালা এনে দেব ?

অবনী-বাবু হাসিয়া বলিলেন—না, মা, তোমার

অনুরোধে বারুণে এক পেয়ালা খেয়েছি। পেটের মধ্যে তারি ক্রিয়া এখনো চল্‌ছে। আর নয়। কিন্তু এসেই কেন চা কর্‌তে যাওয়া? একটু জিরুতে হয়। তুই বুঝি বৌমাকে চায়ের কথা বলেছিলি সুধা?

সুধাময় বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া বলিল—আমি তো এখানে এসে পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে একটি কথাও কইনি বাবা!

অবনী-বাবু সস্নেহ তিরস্কারের সুরে বলিলেন—তুই, সুধা, ব্যারিষ্টারি সুরু করে' অবধি art of concealing truth বেশ আয়ত্ত করেছিস্।

সুধাময় মৃদু হাসিয়া বলিল—না, বাবা, আমি মিথ্যা বল্‌ছিনে।

শান্তিময় আসিয়াই একখানা বই খুলিয়া বসিয়াছিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া সে বলিল—দাদা, তুমি মিথ্যা বলনি, কিন্তু সত্য গোপন করেছ।

সুধাময় বলিল—কিসে?

শান্তিময় হাসিয়া বলিল—তুমি এসেই ওই পাশের আরাম-কুর্সিটায় ব'সে খুব ক'রে আলস্য ভেঙে বৌদির পানে চেয়ে বলেছিলে—ভারি ব্যথা হয়েছে হাত-পায়। কিসে সারে বলো তো শান্তি? সে কথাটি তো বাবাকে বলনি!

সুধাময় ও মাধবী দুই জনেই লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিল। অন্যের অলক্ষ্যে উভয়েরই মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

অবনীমোহন-বাবু ও সাবিত্রী সস্নেহে পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূর পানে চাহিয়া অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করিলেন।

২

ঘড়ি দেখিয়া সুধাময় বলিল—এবার চলুন, বাবা, ৩টা বেজেছে।

শান্তিময় জিজ্ঞাসা করিল—এবার কোথায় যাওয়া হবে?

সুধাময় বলিল—কাউদগ। জায়গাটা তোমার ভাষায় প্রকৃতির লীলাভূমি! বাঘ, ভালুক, হরিণ, ঘুঘু, তিতির, যা শিকার কর্‌তে চাইবে তাই পাবে। নয় বাবা?

অবনী-বাবুর কোন কথা বলিবার আগেই শান্তিময় বলিল—প্রকৃতির লীলাভূমির খুব সম্মান রাখ্‌লে বটে! আমি কিন্তু তোমার শিকারের মধ্যে নই দাদা!" আমি ডাক-বাংলোয় ব'সে থাকব।

সুধাময় বলিল—আচ্ছা চল ত সবাই। তার পর বাবা যা বলেন তাই হবে। কেমন বাবা?

পিতাকে দলে টানিবার চেষ্টা দেখিয়া পিতা-মাতা দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন।

মিনিট দশেকের মধ্যে সকলে প্রস্তুত হইয়া মোটর-কারে আসিয়া উঠিলেন।

ষ্টার্ট্ দেওয়া হইবে এখন সময় ডাক-বাংলোর চৌকিদার সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—গরীব-পরবর, বান্দার আর্জ্জি আছে।

'কি'—জিজ্ঞাসা করিতেই চৌকিদার বলিল—হুজুর, এক রাজা-সাহেবের উজীর, না কি কে এসেছিলেন। তিনি এক রাত্রির ঘর-ভাড়া বারো আনা দিয়ে গেছেন। আমার উপর ছোট-বাবু হুকুম দিয়েছেন তুমি যদি তার কাছ থেকে আর চার আনা আদায় করে' না আন্‌তে পার, তোমাকেই সে চার আনা দিতে হবে। হুজুর, আমি আট টাকা মাহিনা পাই, তাতে নিজে খাই ছেলেদের খাওয়াই। এর উপর জরিমানা দিতে হলে কি করে' বাচ্‌ব?

অবনী-বাবু ভিজিটার্‌স্ বুক্ আনিতে বলিলেন। দেখা গেল ঐ মাসের দুই তারিখে কে একজন লিখিয়াছেন—Mister Ramaprasad Singha. 20. 10. 22. ¾ Roopy. লেখকের বানানের বাহাদুরী, অঙ্কলেখার মৌলিকতা, ও তারিখের বিশুদ্ধতা দেখিয়া অবনী-বাবু হাসিয়া সকলকে দেখাইলেন। সিংহজীর ভুলের ধারা বরাবর বজায় আছে, কারণ সেপ্টেম্বর মাস হিসাবে মাসের স্থানে ৯ লেখা উচিত। সেখানেও ১০ লেখা হইয়াছে। সেক্‌শনাল্ অফিসার—যাঁহাকে কুলি ও চৌকিদারেরা ছোট-বাবু বলিয়া থাকে—সেখানে মন্তব্য লিখিয়াছেন, চৌকিদার সম্ভবতঃ বক্‌শিস্ চাহিয়াছিল, সেজন্য তাহাকে চার আনা বক্‌শিস্ দিয়া ঘর-ভাড়া বারো আনা দেওয়া হইয়াছে; বাকি চার আনা হয় আদায় করিতে হইবে, নয় তো চৌকিদারকে দণ্ড দিতে হইবে।

অবনী-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি সেই উজীর-সাহেবের কাছে যাওনি ?

চৌকিদার হাত জোড় করিয়া বলিল—কি ক'রে যাব হুজুর ! কোথায় যেতে হবে তাও যে জানি না। সেদিন এক পুলিশ সাহেব এসেছিলেন। তাঁর আরদালি একটা কাঁচের গ্লাস ভেঙে ভাঙা টুকরোটা জোড়া দিয়ে রেখেছিল। পুলিশ-সাহেবকে তা দেখিয়ে বললাম, হুজুরের আরদালি গ্লাস ভেঙেছে, মেহেরবানি করে' দাম দিন। সাহেব 'ড্যাম' বলে' ঘুসি ওঠালেন। আমাকে পালাতে হল। বড়-বাবুর হুকুমে আমার কাছ থেকে গেলাসের দাম এক টাকা কেটে নেওয়া হল।

অবনী-বাবু তাঁহার নিয়মমত মোটর-কারে উঠিবার আগে চৌকিদারকে বক্‌শিস্ দিয়াছিলেন। এবার পকেট হইতে একটা সিকি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—উজীর-সাহেবের দরুন্ এই চার আনা।

মাধবী নিম্নস্বরে শান্তিময়কে বলিল—ঠাকুরপো, ওকে একটা টাকা দাওনা ! আহা, এই গরীবদের কাছ থেকে এরকম ক'রে দাম কেটে নিলে কি ক'রে চল্‌বে এদের !

শান্তিময় চৌকিদারের হাতে একটি টাকা দিয়া বলিল—তোমার ভাঙা গেলাসের দাম এই মাইজী দিলেন।

চৌকিদার মাটি পর্য্যন্ত হাত নোয়াইয়া সকলকে সেলাম করিল ও সাহেব ও মাইজীর উন্নতির প্রচুর ভবিষ্যদ্বাণী করিল।

মোটর ষ্টার্ট্ করা হইল।

চৌকিদার মনে মনে ভাবিল—যদি মাসে অন্ততঃ একজন করিয়া এই রকম অপ্‌সার জুটিয়া যায় তো এইরূপ দণ্ড দিয়াও কোন রকমে চাকরি বজায় রাখিতে পারিবে।

(৩)

কাউদগে পৌঁছিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া শান্তিময় বলিল—আচ্ছা বাবা, চৌকিদারের ওপর আপনারা এত অকরুণ কেন ?

অবনী-বাবু বলিলেন—তুই বুঝি এতক্ষণ এই কথাই ভাব্‌ছিলি ?

—ভাব্‌বারই কথা যে ! কত দিকে কত অপব্যয় হচ্ছে, চুরি হচ্ছে; আর চাষাভুষো চৌকিদারের হাত থেকে যদি একটা কাঁচের গেলাস বা বাটি ভেঙে গেল, অমনি তার কাছ থেকে দাম কেটে নিতে হবে। এ কিন্তু বড় অবিচার।

—চুরির কথা ছেড়ে দাও। চোর চিরকালই ধরা পড়্‌লে সাজা পায়; নইলে রাজা ! অপব্যয় তুমি কিসের বল্‌ছ ?

—ধরুন আপনাদের মত অফিসার বা আপনাদের চেয়ে বড় যারা এই রকম ভাসা-ভাসা টুর ক'রে যান্ তাতে কতটুকু বা লাভ হয়; সেই তুলনায় কত খরচ হয় বলুন। এ-সব খরচ সরকার বহন করেন। কিন্তু অজ্ঞ চৌকিদারেরা অনিচ্ছায় যদি একটা গ্লাস ভেঙে ফেলে বা অন্য কেউ যদি তাদের অজ্ঞাতসারে ভাঙে তা হ'লে সে ক্ষতিটা কেন আপনাদের ডিপার্ট্‌মেণ্ট্ সহ্য করবেন না ? উচ্চ শ্রেণীর উপর এই অত্যধিক সুবিচার এবং নিম্ন শ্রেণীর উপর অবিচার—এ অন্যায় নয় কি ?

অবনীমোহন-বাবু পুত্রের এই উদারতা ও সত্যপ্রিয়তায় মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—সাম্য জিনিষটা এখনও অনেককাল আদর্শের মধ্যেই থাক্‌বে। বাস্তবের ভিতর আস্‌তে তার এখনও ঢের দেরী—কখনও আস্‌বে কি না তাও ঠিক বলা যায় না। এর জন্যে তোমার মন খারাপ করায় কোন লাভ নেই শান্ত !

একটু পরেই বন্দুক টোটা সব ঠিক করিয়া লইয়া সুধাময় বলিল—তা হ'লে এবার বেরুনো যাক্ বাবা !

শান্তিময় বলিল—আমি যাব না দাদা। তোমরা ঘুরে এস।

মাধবী বলিল—আমিও তা হ'লে থেকে যাই। ফাউষ্টের কোন্‌খান্‌টা প'ড়ে শোনাবে বলেছিলে ঠাকুরপো ? তাই শোনাও না।

সাবিত্রী বলিলেন—তা হ'লে তোমরা দুজনে যাবে। আমিও থাকব না কি ?

অবনী-বাবু বলিলেন—আমার কিছুতেই আপত্তি নেই।

সুধাময় আপত্তি তুলিল—না শান্ত ভাই, তোমরা

এখানে থাক্‌লে আমাদের তৃপ্তি হবে না। এখান থেকে মাইল দুই মোটে যেতে হবে। তোমাদের সুন্দর জায়গায় মোটর-সুদ্ধ রেখে আমরা দুজনে জঙ্গলের মধ্যে যাব। তোমরা না হয় সেখানেই ব'সে পড়া-শুনা কোরো।

ইহার পরে আর শান্তিময় আপত্তি করিল না। সকলে মিলিয়া মোটরে উঠিলেন।

মাইল খানেক গিয়া ডানদিকে কাঁচাপথে মোটর নামিল। দুইধারে ছোট ছোট গাছের জঙ্গল। বাংলা দেশের জঙ্গল বলিলে যে ধারণা জন্মে ইহার সহিত তাহার কোনই সাদৃশ্য নাই। সে ছায়া নাই, সে গাঢ় বর্ণ নাই, সে গম্ভীরতা নাই।

আরও খানিক অগ্রসর হওয়ায় একটা প্রশস্ত স্থান দেখিয়া সেখানে মোটর ছাড়িয়া অবনী-বাবু ও সুধাময় দুজনে দুইটি বন্দুক লইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইঁহারা ৩ জনে মোটরে উঠিলেন।

৫টার কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা ফিরিলেন। ৪টি তিতির, ২টি ঘুঘু, একটি বন্য মোরগ ও একজোড়া খরগোস ইঁহারা হত্যা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুদ্ধি করিয়া সেগুলি একটা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া লওয়া হইয়াছিল।

মোটরে উঠিতে শান্ত জিজ্ঞাসা করিল—কি মারলে দাদা?

—সে কথা এখন থাক্।—বলিয়া সুধাময় কথাটা গোপন করিল।

অবনী-বাবুই মোটর চালনা করিতেছিলেন। সুধাময় রাইফল হাতে লইয়া এধার ওধার দেখিতেছিল। ঠিক যেখানটিতে পাকা রাস্তায় উঠিতে হইবে সেখানে আসিয়াই সুধাময় চুপিচুপি তাহার পিতাকে বলিল—থামান্—থামান্। ঐ বাঁ দিকে একটা—না না—দুটো হরিণ—শীগ্‌গির!

ক্ষিপ্রহস্তে অবনী-বাবু মোটরের ক্লাচ্ চাপিয়া ধরিলেন। যেন চমকিয়া একটা মৃদু আর্ত্তনাদ করিয়া মোটর স্তব্ধ হইল। অদূরের হরিণ-দুটি ভীতচক্ষে একবার চাহিল। কোন্ দিক্ হইতে শব্দ আসিল অনুমান করিয়া তাহাদের চঞ্চল ক্ষিপ্র চরণ বায়ুবেগে ছুটাইয়া দিবার জন্য তুলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বনভূমি শব্দিত করিয়া গুলি ছুটিল। গুলি গিয়া একটি হরিণকে আঘাত করিল! আহত হরিণটি একবার মাত্র পাশের হরিণটির দিকে চাহিয়া সম্মুখের দিকে লাফ দিল। অপরটিকে আর গুলি করা হইল না।

সুধাময় ক্ষিপ্রবেগে আহত হরিণটিকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। যেখানে আঘাত লাগিয়াছিল সেখান হইতে প্রায় হাত পনর দূরে আসিয়াই বনের হরিণ বনের মধ্যেই তাহার শেষ শয্যা পাতিয়াছিল। মরিয়াও সে তাহার আয়ত মনোহর চক্ষু দুটিতে চাহিয়া ছিল। যেন বলিতেছিল—আমরা দুজনে খেলা করিতেছিলাম, তোমাদের ত কোন ক্ষতি করি নাই। কেন তোমরা আমাকে মারিলে?

সুধাময় হরিণটিকে একবার পরম আনন্দে লক্ষ্য করিয়া দেখিল। তাহার চিত্রিত দেহ, শাখা-প্রশাখা-যুক্ত শৃঙ্গ। আপনার অব্যর্থ লক্ষ্যের নিশ্চিত ফল দেখিয়া সুধাময় পরম তৃপ্তি লাভ করিল। তার পর দুই হাতে তাহাকে উঠাইয়া টানিতে টানিতে মোটরের সম্মুখে লইয়া আসিল। অপরটির কথা তখন তাহার মনে ছিল না।

মাধবী বলিল—আহা, কি সুন্দর হরিণটি!

সুধাময় বলিল—এটা পুরুষ। এর ঠিক বুকের মধ্য দিয়ে গুলি চলে গিয়েছে।

বলিয়া সুধাময় হরিণের বক্ষঃস্থলের রক্তাক্ত স্থানটির দিকে সগর্ব্বে লক্ষ্য করিল।

মাধবী শিহরিয়া ব্যথাভরা চক্ষে স্বামীর পানে চাহিল।

শান্তিময় একবার দাদার দৃপ্ত আনন্দোৎফুল্ল মুখের দিকে আর-একবার প্রাণহীন দীর্ণবক্ষ হরিণের পানে চক্ষু রাখিয়া ভাবিল, মানুষের মধ্যে এখনও কতখানি হিংস্রভাব বাঁচিয়া আছে।

(৪)

জ্যোৎস্নায় চারিদিক্ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। কাউদগের বাংলোখানিকে ঠিক একখানি সুন্দর সুসজ্জিত ছবির মত দেখাইতেছে। দুই পাশে প্রসারিত ক্ষেত্র জ্যোৎস্নাবসনে সজ্জিত হইয়া যেন অনন্তের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে।

যুগ যুগ ধরিয়া এই তুষার-ধবল জ্যোৎস্নাধারা আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িয়া পৃথিবীকে নন্দনের সৌন্দর্য্যে সিঞ্চিত

বিকশিত করিয়া তুলিতেছে। ফুলের গন্ধ, পত্র-কিশলয়ের বর্ণ, ফলের পরিপূর্ণ শ্রী ও সম্পদ, সমস্ত দিয়াও প্রকৃতি তাঁহার এই অশান্ত বিদ্রোহী মানবশিশুকে শান্ত করিতে পারিতেছে না। হত্যা করিবার মত নখ দন্ত তাহাকে দেওয়া হয় নাই, তাই যেন তাহার এই চির অসন্তোষ—অনন্ত বিদ্রোহ। আক্রোশে সে প্রকৃতির অসহায় বাক্‌হীন সন্তানগুলিকে হত্যা করিয়া তবে বুঝি শান্ত হইবে।

আজিকার রাত্রের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রকৃতির এই ব্যথা যেন বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সেই ব্যথা বেশী করিয়া বাজিতেছিল মাধবী ও শান্তিময়ের বুকে।

সন্ধ্যার পর দু'জনে আজ ফাউষ্টের গ্রেশেন্ আখ্যায়িকা চোখের জলে শেষ করিয়াছে।

বাংলোর মধ্যে দুয়ার জানালা খুলিয়া সকলে শুইয়াছে। বাহিরে বারান্দার শেষ প্রান্তে মৃত হরিণটিকে রাখা হইয়াছে। একজন চৌকিদার সেখানে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হরিণের দেহ পাহারা দিতেছে।

জ্যোৎস্না শেষ হইয়া মৃদু-শান্ত প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। শান্তিময় একবার বাহিরে আসিল। পার্শ্বের দিকে প্রসারিত হরিণের পানে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর ঘরের মধ্যে আসিয়া বন্দুকটিতে টোটা ভরিয়া হাতে লইল। আসিবার সময় সুধাময়কে ডাকিল—দাদা, একটিবার বাইরে দেখ্‌বে এস।

বন্দুক হাতে ভাইকে দেখিয়া সুধাময় একলাফে শয্যা ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে শান্ত?

সকলে জাগিয়া উঠিলেন। ইঙ্গিতে ভ্রাতাকে গোলমাল করিতে নিষেধ করিয়া শান্তিময় বলিল—বাইরে দেখ্‌বে এস।

সকলেই একসঙ্গে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শান্তিময় মৃত হরিণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

হরিণের প্রসারিত প্রাণহীন দেহের কাছে তাহার হরিণীটি দাঁড়াইয়া। এক-একবার তাহার দয়িতের আহত স্থানটি জিহ্বা দিয়া লেহন করিয়া বুঝি তাহার বেদনার উপশম করিবার চেষ্টা করিতেছে। বুকের রক্তের দাগটি মুছিয়া দিয়াছে। কখন যে সে পথ চিনিয়া চিনিয়া আসিয়া তাহার জীবন-মরণের সঙ্গীর কাছে দাঁড়াইয়াছে, কতক্ষণ ধরিয়া সে যে এই মতে প্রিয়ের দেহ আগুলিয়া আছে, তাহা কেহই জানে না।

সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে ইতর প্রাণীর মধ্যে এই প্রেমের নিদর্শন দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হরিণীটি সম্মুখে এতগুলি লোককে দেখিয়াও ভয় পাইল না। তাহার আয়ত শান্ত চক্ষু মেলিয়া যেন বলিল—এবার আমাকেও লও। প্রিয়ের কাছে আমাকে মরিতে দাও। বাঁচাইয়া রাখিয়া আমাকে মরণ-যন্ত্রণা দিও না।

এ দৃশ্য সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। সাবিত্রী বলিলেন—আহা! একে যেন মের না। আমি আর কখ্‌খনো তোমাদের সঙ্গে আস্‌ব না।

সুধাময় হরিণীকে মারিবার কোন আগ্রহ দেখাইল না।

শান্তিময় বলিল—মা, দেখ্‌ছ না, ও মর্‌বার প্রার্থনা কর্‌তে এসেছে। এখন ওকে মর্‌তে না দেওয়াই নিষ্ঠুরতা। তুমি রাগ কোরো না—আমি ওকে নিষ্কৃতি দেবো।

শান্তিময় হরিণীর উপর লক্ষ্য ঠিক করিয়া লইল। হরিণী স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া যেন প্রার্থিত মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। সশব্দে গুলি ছুটিল। মুহূর্ত্তে হরিণীর প্রাণহীন দেহ হরিণের প্রসারিত দেহের উপর লুটাইয়া পড়িল। হরিণী মরিয়া বাঁচিল।

শান্তিময়ের চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ করিতে মাধবী দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

শ্রী মাণিক ভট্টাচার্য্য

কঙ্গো স্বাধীন (?) রাজ্য

পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ নাবিক ডিয়েগোকেও প্রথম কঙ্গো নদী আবিষ্কার করেন। তিনি নদীর মোহানা ছাড়িয়া বেশী উপর দিকে যান নাই। তাঁহার কিছুকাল পরে লিভিংষ্টোন নারানউই নামক স্থানে এই নদীতে পৌছান, তিনি কঙ্গো নদীকে নাইল নদ বলিয়া মনে করেন। তাহার পর স্যার্ এইচ্ এম্ ষ্ট্যান্‌লি সমস্ত কঙ্গো নদী আবিষ্কার করেন—তিনি নূতন করিয়া কঙ্গো নদীর নাম 'লিভিংষ্টোন' দেন। কিন্তু এই নাম এখন লোপ পাইয়াছে। কঙ্গো রাজ্য বেল্‌জিয়ান্ রাজা লিয়োপোল্ড্ স্থাপন করেন। রাজ্য ৮০০,০০০ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া আছে এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১২০০০০০০ হইবে।

এই দেশের লোকসংখ্যা ক্রমাগত কমিয়া আসিতেছে। কমিবার কারণ, এই প্রদেশের ভীষণ ব্যাধি sleeping sickness (ঘুম রোগ)। এই ভীষণ ব্যাধি পূর্ব্বপশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকাকে ধ্বংস করিতেছে। বর্ত্তমানে জার্মানি এই রোগের ঔষধ বাহির করিয়াছে, কিন্তু তাহার যথার্থ মূল্য গ্রহণ না করিয়া সে ঐ ঔষধ কাহাকেও দান করিবে না। ১৮৯২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কঙ্গো দেশের অনেক অংশ আরবদের অধীন ছিল। ঐ-বৎসর একদল কঙ্গো পল্টন বেল্‌জিয়ান্ এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্ নায়কের অধীনে যুদ্ধ করিয়া আরবদের তাড়াইয়া দেয়। তাহাতে তাহাদের পরম লাভ হইল। শ্বেতাঙ্গ-শাসনের সভ্য-নিষ্ঠুরতায় তাহারা এখন পেষিত হইতেছে। কঙ্গোর শাসনকর্ত্তা বোমা নামক সহরে থাকেন। বেল্‌জিয়ামের ব্রুসেল্‌স্ সহর হইতে সমস্ত শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়। হয়ত ক্রমে কঙ্গো প্রদেশ বেল্‌জিয়ামের একটি উপনিবেশে পরিণত হইবে।

কঙ্গোদেশে অনেকগুলি জাতি বাস করে—তাহাদের আচার-ব্যবহার নানা প্রকারের। সমস্ত প্রকারের আচার-ব্যবহারের তালিকা বড় হইবে এবং তাহা সকলের ভাল লাগিবে না। কাজেই কঙ্গো প্রদেশের লোকদের কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করিয়া তাহাদের মোটামুটি জীবনধারণের সকল কথাই বলা হইবে।

পুরাকালে তাহাদের জাতি এবং গোষ্ঠীভাগ কেমন করিয়া হইল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। নিগ্রোজাতির কোন বিষয়ে গোঁড়ামি নাই। তাহারা যে-দেশে এবং যে-জাতির সঙ্গে বাস করে অনেক অংশে সেই জাতির আচার-ব্যবহার একেবারে আপন করিয়া লয়। নিগ্রোজাতির লেখা ইতিহাস কিছুই নাই, কাজেই তাহার পূর্ব্বকথা যাহা কিছু তাহা অনেকটা আন্দাজ করিয়াই বলিতে হয়।

আদিমকালে কাঙ্গোদেশে এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় জাতি বাস করিত। কিছুদিন পূর্ব্বে গুনে ইহাদের নমুনা দু-একটি দেখা যায়। ইহাদের খুব কমই আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের একটি জাতি এখনো চাষবাস করিতে জানে না। বন্য পশু শিকার এবং প্রকৃতির স্নেহের দান বনের ফলমূল খাইয়াই ইহারা জীবনধারণ করে। তবে কেহ কেহ শিকার-লব্ধ জন্তুর সঙ্গে শস্যাদির অদলবদলও করে। এই বামনেরা গড়ে চার ফুট লম্বা হয়। তাহাদের মস্তক অতি ক্ষুদ্র, তবে দেহের তুলনায় তাহা বেশ বড় বলিয়া মনে হয়। গায়ের রং ময়লা, হল্‌দে এবং তাম্রবর্ণ হয়। মাথার চুল অতি কম। তাহাদের সব সময় বনজঙ্গলে দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় বলিয়াই যেন বিধাতা তাহাদের শরীর অতি কৃশ করিয়া গঠন করিয়াছেন। তাহাদের শরীরের সব হাড়গুলি চামড়ার মধ্য দিয়া যেন দেখা যায়। তাহাদের দেহে অতি তীব্র একরকম বদ গন্ধ আছে—তাহা তাহাদের অপরিষ্কারভাবে থাকার জন্যই হয়।

অনেক পণ্ডিত এই বামনদের অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের জাতি বলিয়া মনে করেন, কিন্তু শরীরের নানা প্রকার তারতম্য দেখিয়া এই বিশ্বাস ভুল বলিয়াই মনে হয়।

কঙ্গোদেশে আর যে-সমস্ত লোক আছে, তাহারা সকলেই অন্য দেশ হইতে আগত। ইহাদের প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তরবাসী—ইহাদের নিগ্রোদের সহিত খুব নিকট সম্বন্ধ আছে। দক্ষিণবাসী—ইহাদের শরীরে "হ্যামিটিক্" (Hamitic) রক্ত আছে।

কিন্তু বর্ত্তমান কঙ্গোকে লোক হিসাবে ভাগ করিতে হইলে নিম্নলিখিত দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করাই শ্রেয় বলিয়া মনে হয়। (১) নিগ্রো এবং (২) আরব, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি এবং নিগ্রো সংমিশ্রণে যে জাতি। বর্ত্তমান কঙ্গোদেশে এই দুই মিশ্র জাতি বাস করে বলিয়াই মনে হয়। তাহা ছাড়া আর যাহারা আছে তাহারা কঙ্গোদেশের অধিবাসী নয়—বিদেশ হইতে দুই দিনের জন্য আসিয়াছে, পরে হয়ত থাকিয়া যাইতে পারে।

কঙ্গোর আদিম অধিবাসীরা এই-সমস্ত বিদেশীদের নিকট হইতে অনেক উপকার পাইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু যে অপকার ইহার সঙ্গে তাহাদের হইয়াছে তাহার সীমা নাই। দাস-ব্যবসায়ীর অত্যাচারে ইহাদের হাজার হাজার পরিবার নষ্ট হইয়াছে। পরিবারের কর্ত্তারা তাহাদের পরিবারের লোকজনদের মানুষ বলিয়া মনে করে না—পণ্যদ্রব্য বলিয়াই গ্রহণ করে এবং কোন প্রকার মায়া মমতা না করিয়াই তাহাদের পর্ত্তুগীজ বা আরব দাস-ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে। দাস-ব্যবসায় বহুকাল হইতেই এখানে প্রচলিত, কিন্তু পূর্ব্বে দেশের ধনী-লোকেরাই দাস ক্রয় করিত এবং দাসদের নিজের সন্তানদের মতই পালন করিত। শ্বেতাঙ্গদের খনি এবং কারখানায় যে-সমস্ত দাস থাকে তাহাদের অপেক্ষা পূর্ব্বেকার ক্রীতদাসেরা হাজার গুণে ভাল অবস্থায় থাকিত। এখনকার মত তখন দাসের স্ত্রীপুত্রদের পণ্যদ্রব্য বলিয়া কেহই মনে করিত না।

সভ্য কঙ্গো এবং অসভ্য কঙ্গো (সেখানে এখনো লোকে মানুষ খায়) উভয় প্রদেশের লোকেদের অবস্থার তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে অসভ্যদের অবস্থা ঢের ভাল এবং তাহারা অনেক সুখে থাকে।

কঙ্গোর যে প্রদেশে দাস-ব্যবসায় বেশী পরিমাণে চলিয়াছিল সেই স্থানের নারীদের বিষয় সামান্য কিছু বলিব, কারণ তাহাদের দুঃখের কথার শেষ নাই। তার পর কঙ্গোর অসভ্য এবং সুখী নারীদের কথা বলিব।

সুখের বিষয় কঙ্গোর ভিতরের প্রদেশগুলিতে কোন সময়েই দাস-ব্যবসায় প্রবেশলাভ করে নাই—অথবা করিয়া থাকিলেও খুবই সামান্যভাবে করিয়াছিল।

কঙ্গোর পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ দিকে দাস-ব্যবসায় কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভয়ানকভাবে চলিয়াছিল। পূর্ব্ব প্রদেশ আরব দাস-ব্যবসায়ীদের অধিকারে এবং দক্ষিণ-পর্ত্তুগীজ দাস-ব্যবসায়ীদের অধীন ছিল। পর্ত্তুগীজেরা ইউরোপের লোক, তাহারা এসিয়াবাসীদের অপেক্ষা বেশী সভ্য এবং তাহারা শ্বেতাঙ্গ, সেইজন্যই তাহারা কঙ্গো দাসদের উপর পশুর মতন অত্যাচার করিত—সে রকম অত্যাচার আমাদের দেশে কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। কঙ্গোর লোকেরা তাহাদের নিকট হইতে কিছুই লাভ করে নাই। আরবরা যদিও কোন দেশ আক্রমণ করিবার সময় অনেক প্রকার অত্যাচার করিত, কিন্তু তাহারা একবার কোন দেশে বসবাস আরম্ভ করিলে, সেই দেশের অধিবাসীদের অনেক কল্যাণ সাধন করিত। তাহাদের চাষ-আবাদ, আইন-কানুন, পশুপালন ইত্যাদি অনেক কিছুই শিক্ষা দিত।

এই দাস-ব্যবসায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করিয়াছে নারীদের। দেশের লোকেরা তাহাদের পরিবারের নারীদের সামান্য সামান্য দ্রব্যের জন্য বিক্রয় এবং বদল করিত। নারীদের কেহ মানুষ বলিয়া মনে করিত না।

আরব আক্রমণকারীরা যোদ্ধা এবং বণিক্ ছিল। তাহাদের অসীম সাহসের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। তাহারা জন-কয়েক সাহসী বীর দেশের কোন সাহায্য না লইয়া ইংলণ্ডের সমান বড় একটি দেশ জয় করে এবং অনেক কাল ধরিয়া তাহা শাসন করে। তাহারা তলোয়ারের জোরে দেশ জয় করে। পর্ত্তুগীজ কঙ্গো-আগমনকারীরা ছিল ঠিক উল্টা, তাহারা দেশের কলঙ্ক ছিল এবং দেশের কল্যাণের জন্যই তাহারা দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তাহারা মদের সাহায্যে দেশ জয় করিয়াছিল। আফ্রিকার লোকেরা তলোয়ারের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিত, কিন্তু সভ্য শ্বেতাঙ্গের ব্রহ্মাস্ত্র মদের সঙ্গে তাহারা পারিয়া উঠে নাই। আরবদের অধীনে কঙ্গোর যে-প্রদেশ ছিল তাহা ক্রমে ভাল অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে এবং পর্ত্তুগীজ-কবলে যে-অংশ ছিল তাহা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যাইতেছে!

এইবার আমরা কঙ্গোদেশের অসভ্য নারীদের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাহাদের সাধারণ-গ্রাহ্য আইন কানুন বিশেষ কিছুই নাই—প্রত্যেকের যাহা ভাল বলিয়া মনে হয় তাহাই তাহারা করে—এবং তাহাতে দেখা গিয়াছে তাহারা অনেক সভ্যদেশের লোকদের অপেক্ষা খারাপভাবে থাকে না।

কাহারো সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সন্তানের পিতামাতাকে শুভ ইচ্ছা জানাইতে আসে। পুরুষেরা ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া পিতার সঙ্গে গম্ভীরভাবে কথা-বার্ত্তা বলে এবং নারীরা সকলে সন্তানের জননীর চারিদিকে ভীড় করিয়া বসে। সকলেই একবাক্যে বলে এমন সন্তান—সবল এবং সুন্দর—পূর্ব্বে আর কাহারো হয় নাই। সন্তানের পিতা অভ্যাগতদের তাড়ী পান করিতে দেয়। অন্য গ্রামের লোকেরাও নবাগত শিশুকে দেখিতে আসে। যাহাদের অবস্থা খারাপ, তাহারা কেবল শিশুকে দেখিয়াই যায়, আর যাহাদের অবস্থা কিছু ভাল, তাহারা শিশুকে একটু করিয়া কোলে লয়। শিশুকে কোলে করিলে, তাহার মাতাকে কিছু উপহার দিতে হয়। শিশুর মাতা যদি ক্রীতদাসী হয়, তবে তাহার মালিক তাহাকে সব সময় নানা রকমের খাবার কাপড়চোপড় ইত্যাদি আনিয়া দেয়। শিশুর নাম কোন একজন প্রসিদ্ধ লোকের নামে রাখা হয়। নাম-করণের সময় শিশু নানা প্রকার উপহার লাভ করে।

শিশু জন্মাইবার দুই দিন পরেই মাতা কুটীর ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে পায়। এই সময় তাহারা দেখিতে বড়ই সুন্দর হয়। মাতৃত্ব যেন তাহাদের রূপকে দশগুণ বাড়াইয়া দেয়।

এই সময় শিশু আর মায়ের কাছ-ছাড়া হয় না। এক প্রকার ঝোলাতে করিয়া মাতা শিশুকে মাঠে-ঘাটে সর্ব্বত্র লইয়া যায়। মাঝে মাঝে পিতা তাহার শিশুকে বহন করে, এবং অনেক সময় পিতার দোষেই শিশু অত্যধিক আদর পাইয়া নষ্ট হয়। অনেক জাতির পুরুষেরাই শিশুবহনের কার্য্য করে। এ সম্বন্ধে বায়াকা জাতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিশু যতদিন পর্য্যন্ত না চলিতে ফিরিতে পারে, ততদিন পর্য্যন্ত পিতা স্নান করে না। অবশ্য বায়াকা জাতির লোকেরা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নারীরা অলঙ্কার ইত্যাদি পরিতে খুব ভালবাসে, কিন্তু সন্তানের জন্য তাহারা সব ত্যাগ করিতে পারে। শিশু হাঁটিতে না পারা পর্য্যন্ত তাহারা অলঙ্কার পরে না এবং গায়ে রং মাখে না। শিশু একটু বড় হইলে তাহার ভাই বোন ইত্যাদিরা তার ভার এক রকম সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করে। তাহারা তাহাকে পুতুলের মতন যত্ন করে। শিশু এক রকম মন্দ থাকে না, কেবল মাঝে মাঝে তাহাকে অত্যধিক আদরের বেগ পোহাইতে হয়।

কঙ্গোদেশে শিশুকে কখনও শাস্তি দেওয়া হয় না বা তিরস্কার করা হয় না। মানুষ খুন করিয়া ক্ষমা লাভ করা যায় কিন্তু কোন শিশুর প্রতি রূঢ় ভাব প্রকাশ করিলে সে-দোষের ক্ষমা নাই।

বালুবা জাতির ডাইনিরা (witch doctor) চিকিৎ-সক বলিয়া খ্যাত। কোন শিশুর প্রথম দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে তাহারা তাহাকে দেবতার কাছে বলি দিবার জন্য গ্রহণ করিতে পারে। সেইজন্য প্রথম দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত শিশুর মাতারা বড়ই শঙ্কাকুলচিত্তে থাকে। আর সেই কারণেই প্রথম দাঁত উঠিবামাত্র তাহারা বেশ একটা আনন্দ-ভোজ দেয়।

দুর্ব্বল এবং কাণা-খোঁড়া ছেলে-মেয়ে ইহাদের দেশে দেখা যায় না। পূর্ব্বকালে স্পার্টা দেশের মত ইহারা দুর্ব্বল এবং বিকৃতাঙ্গ শিশুদের হত্যা করে। কেবল বায়াকা জাতির লোকেরা কোন কারণেই কখনও শিশুহত্যা করে না। তাহাদের কাছে সবল এবং দুর্ব্বল সকল শিশুরই সমান আদর।

সকল দেশের শিশুই দেখিতে বেশ সুন্দর হয়। কঙ্গোদেশের শিশুরাও এই নিয়মের বাহিরে যায় না।

তাহাদের চোখ এবং দাঁত বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

কঙ্গোদেশের কতকগুলি খেলার সঙ্গে আমাদের এবং অন্যান্য দেশের খেলার মিল আছে। যেমন কাণা-মাছি। গাম্বে বলিয়া এক রকম খেলা ইহারা খেলে, তাহাকে অনেকটা লন্‌টেনিস্ খেলা বলিলেও চলে। টাঙ্গানিকো হ্রদের চারিপার্শ্বের দেশের ছেলেরা বায়ো নামে এক প্রকার খেলা খেলে। এই খেলাতে যথেষ্ট বুদ্ধির দরকার হয়। একটা কথা বলিলে কেহ কেহ হয় ত অবাক্ হইবেন—নিগ্রো ছেলে-মেয়েরা প্রায় ক্ষেত্রেই শ্বেতাঙ্গ ছেলে-মেয়েদের অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান্।

অনেক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী বলেন যে কঙ্গোর লোকেরা নাকি কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে তাহা জানে না। ইহার মত অসত্য কথা আর নাই। ইহাদের যে-সব প্রদেশের লোকেরা এখনো মানুষ খায় তাহারাও এত বেশী কৃতজ্ঞ যে অনেক সভ্য দেশেও তাহার তুলনা মিলে না। খেলার বয়সে থাকিতে থাকিতেই বালিকা শিশুদের তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশ তৈরী করিয়া দেওয়া হয়।

দুইজন পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারী বলিয়াছেন—কঙ্গো-নারীর হৃদয়ে প্রেম বা ভালবাসা কখনো জন্মাইতে বা থাকিতে পারে না। সমাজে নারীর স্থান বড়ই খারাপ, কারণ সব সময় তাহাকে তাহার স্বামীর অধীনে পশুর মতন থাকিতে হয়। ঘরের গরু-বাছুরের অপেক্ষা তাহার অবস্থা কোন অংশেই ভাল নয়। স্বামীর অনুমতি বিনা সে কোন কাজই করিতে পারে না—স্বামীর সঙ্গে বসিয়া খাওয়া বা গল্প করা ত তাহার স্বপ্নেও আসিতে পারে না। এই-সমস্ত কথা খুবই সত্য—কিন্তু কঙ্গোর যে-অংশে দাস-ব্যবসায় চলিত কেবল সেই অংশেই ইহা খাটে। কঙ্গোর যে-সব প্রদেশে এখনো শ্বেত-সভ্যতা বিস্তারলাভ করে নাই সেইসব দেশের নারী অন্য সব দেশের নারীর মত প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে জানে।

নিগ্রোদের একটি গ্রামে গিয়া প্রথমেই দেখা যায়, কয়েকটি বালিকা অন্য সকল বালিকা অপেক্ষা ভাল করিয়া পোষাক এবং সাজগোজ করে। ইহার কারণ যদি

কঙ্গোর বাটেকে নারী

গ্রামের কোন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে সে বলিবে—"আহা! বেচারী প্রেমে পড়েছে, তাই সুন্দরী হ'তে চায়, যাতে সে সহজে তার প্রিয়ের মন হরণ কর্‌তে পারে।" এমন অনেক সময় দেখা যায় যে বড় বড় সর্দ্দারের দুহিতারা সামান্য দাসকে বিবাহ করে—কেবল প্রেমের জন্য সে পিতার সমস্ত ধনদৌলত ত্যাগ করিয়া প্রিয়ের জন্য চিরদারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লয়।

ইহাও দেখা যায়—কন্যা পিতার আদেশ অমান্য করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ বিবাহ করে। তাহাতে হয় ত পিতার সর্ব্বনাশ হয়। অনেক সময় পতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা জীবিত অবস্থায় কবরে সহমরণে গমন করে। তাহাতে তাহারা মরণের পরপারেও পতির সঙ্গী থাকে। স্বামী যদি যুদ্ধে নিহত হয়, তবে স্ত্রী অনেক সময় স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য শত্রুদলের মধ্যে প্রবেশ

করে। শত্রুর সংখ্যা বেশী বা শত্রু বলবান্ হইলেও সে গ্রাহ্য করে না।

মানুষের অন্তর বোধ হয় সব দেশে একই রকম। সেইজন্যই অসভ্য এবং সভ্য নারীর প্রেমও প্রায় একই রকম—তাহার মধ্যে তফাৎ বিশেষ কোথাও নাই।

নারীরা রূপ বৃদ্ধি করিবার জন্য অঙ্গে নানাপ্রকার ক্ষত করে। ইহাতে তাহাদের যথেষ্ট কষ্টও ভোগ করিতে হয়। এক এক জাতির ক্ষতের দাগ এক এক বিশেষ প্রকারের হয়। কাহারো কপালে লম্বা লম্বা কাটার দাগ থাকে, কাহারো বা তাহা গোল গোল হয়। কাহারো বা কপাল হইতে নাক পর্য্যন্ত দাগ কাটা থাকে। কাহারো

কঙ্গোর বাজাকো নারী—কপালের উল্কী দেখুন

দাগ খুব গভীর হয়, কাহারো বা কম গভীর হয়। ইহার বিশেষ বর্ণনা সকলের ভাল লাগিবে না বলিয়া করিলাম না। তবে সকল জাতির নারীই পিঠে খুব লম্বা লম্বা দাগ কাটে।

সকলেই শরীর রং করে। লাল রং ইহাদের খুবই প্রিয়—টুকুলা নামক বৃক্ষ হইতে এই জল্‌জলে লাল রং পাওয়া যায়। অন্যান্য আরো নানাপ্রকার গাছ গাছড়া হইতেও রং বাহির করা হয়। শোক প্রকাশ করিবার জন্য শাদা রং ব্যবহার করা হয়। শাদা রং মাখিয়া সমস্ত দেহ শুভ্র করিয়া ফেলা হয়।

ইহাদের পোষাকের আপদ্ বালাই নাই। সামান্য একটা কিছু কোমরে জড়াইয়া লইলেই সভ্য সমাজে যাইবার মত পোষাক হইল। ধনী রমণীর পোষাক আর-একটু বেশী, তাহার মাথায় কিছু পালক গোঁজা থাকে। উৎসবাদির সময়ে ইহারা পোষাকের সামান্য কিছু বাহুল্য করে। তবে বাহুল্য যতই হউক, দর্জির কোন দর্কার কোন সময়েই হয় না।

তবে সব জাতির পোষাক সমান নয়। বাকোঙ্গ জাতির বিবাহিতা রমণী তিন খণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করে, সাম্‌নে, পিছনে এবং বক্ষ-দেশে। 'বাঙ্গালা' জাতির নারীরা কোমরে এক-প্রকার বস্ত্র পরে, তাহা অনেকটা নর্ত্তকীদের ছোট ঘাঘ্‌রার মত। ইহাকে বস্ত্র বলা ভুল, কারণ এই ঘাঘ্‌রা শুক্‌নো তাল-পাতার তৈরী। যে বালিকা যত সুন্দরী—তাহার ঘাঘ্‌রা তত ছোট হয়। বেশীর ভাগ নারীরা পিছনের দিকে কোন আবরণ রাখে না।

ইহাদের বস্ত্রের বহর যতই কম হউক না কেন—অলঙ্কারের প্রতি ইহাদের বেশ টান আছে। উবাঙ্গি নারীরা কানে ছিদ্র করিয়া ভার ঝুলাইয়া দেয়, তাহাতে কান ক্রমে ১০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া যায়। অনেকে নাকে ছিদ্র করিয়া হাড় পরে। বাকুম্ এবং বান্‌জিরি মেয়েরা উপরের ঠোঁট বিদ্ধ করিয়া কাঠের বা হাতীর দাঁতের চাক্‌তি পরে। অনেকের আবার একটা ছিদ্রে হয় না, গোটা-কয়েক ছিদ্র করিতে হয়। বেশীর ভাগ মেয়েরা দাঁত উখা দিয়া ঘসিয়া লয়। কঙ্গোদেশের যে নারী যত কম বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহার গয়নার আড়ম্বর তত বেশী।

বুড্‌জা নারীরা কোনপ্রকার বস্ত্র ব্যবহার করে না, তাহাদের গয়নার ফর্দ্দও তেম্‌নি বেশ বড় গোছের। তাহারা গলায় পিতলের যে হাঁসুলি পরে, তাহার ওজন ১৫ সেরের কম হয় না; পায়ের মলের ওজনও পায়ের চেয়ে বেশী হয়। বালা প্রায় সকল জাতির মেয়েরাই পরে। অনেকে গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত মল পরে।

অনেকে আবার পিতলের তার হাতে এবং পায়ে জড়াইয়া রাখে। সব আঙুলেই পিতলের, লোহার, বা হাতীর দাঁতের আংটি পরে। অনেকে পায়ের বুড়ো আঙুলে আঙোট পরে। বানজা জাতির নারীরা নাকে নথ্ পরে। গলার হার সকলপ্রকার দ্রব্যেই তৈয়ারী হয়। মানুষের এবং অন্যান্য সকলপ্রকার জন্তুর দাঁত, শামুক, পুঁতি ইত্যাদি সকল জিনিস দিয়াই গলার হার তৈয়ারী করা যায়।

কঙ্গো দেশ-বাসীদের মধ্যে কেবলমাত্র বাকুম্ জাতির লোকেরা পাখার ব্যবহার জানে। ইহারা তালপাতার হাত-পাখা ব্যবহার করে।

বেশবিন্যাসের দিকে কঙ্গো নারীর খুব প্রখর নজর আছে। অনেকে ভ্রু এবং চোখের পাতার লোম তুলিয়া ফেলে। এক-এক জাতির চুল বাঁধিবার এবং রাখিবার ধরণ এক-এক রকম। নীচু কঙ্গোর নারীরা চুল ছোট করিয়া ছাটে, একপ্রকার খেজুরের তেল চুলে মাখে এবং লাল রং করে। উচ্চ কঙ্গোর এক এক জাতির চুল বাঁধিবার পদ্ধতি এক-এক প্রকার। 'বাঙ্গালা' নারী সাম্নের এবং কানের পাশের চুল কামাইয়া দেয়। সাঙ্গো নারীরা লম্বা লম্বা চুল রাখে, তাহা ছাড়া শত্রুদের এবং মৃত ব্যক্তিদের চুল লইয়া তাহারা চুলে জড়াইয়া আরো লম্বা করে। সাকারা জাতির নারীরা পুঁতি দিয়া মুড়িয়া খোঁপা বাঁধে। এই পুঁতি দিয়া মোড়া খোঁপা অনেকটা ওলন্দাজ মেয়েদের টুপীর মত। অনেকের খোঁপা বাঁধিতে বেশ কয়েক দিন লাগে, তবে একবার চুল বাঁধিলে, তাহা থাকেও বেশ কিছু দিন। এই ধরণের নানা প্রকারের চুল বাঁধিবার রীতি আছে। একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—আজাণ্ডি জাতির নারীরা মাথা ন্যাড়া করে এবং পুরুষেরা চুল রাখে।

কঙ্গো দেশে বিবাহের পদ্ধতি নানা রকমের। এই জন্য সমগ্র কঙ্গো দেশের বিবাহ-পদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে কোন কথাই বলা চলে না। তবে বানজা জাতি ছাড়া অন্য সকল জাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। অনেক সর্দ্দারের কয়েক শত করিয়া স্ত্রী আছে। বানজা জাতির লোকেরা এক বিবাহ করে। কোন লোকের দুই স্ত্রী নাই

সাঙ্গো নারী

ছবিতে এই জাতীয় নারীর কেশ-প্রসাধনের ধরণ বুঝা যাইতেছে। স্বাভাবিক কেশগুচ্ছের সহিত শত্রুদের মস্তক হইতে বা পরজাদের মস্তক হইতে কাটা চুল বা তালের কালো রংকরা ছোবড়া জোড়া দিয়া বেণী করা হয়।

মুসারঙ্গো জাতির কোন বালিকার বিবাহের দিনের তিন মাস পূর্ব্বে তাহাকে গ্রামের বাহিরে একটি কুটীরে গিয়া বাস করিতে হয়। তাহার পর বর, কন্যার পিতাকে কন্যার দাম দেয়। কিন্তু এই দাম দিলেই কন্যা বরের দাসী হইয়া যাইবে না। কন্যার অকালমৃত্যু বা বিবাহ-ভঙ্গে, কন্যার পিতাকে সমস্ত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে হয়। কন্যার পিতা, কন্যার দাম পাইলে পর, গ্রামের পুরোহিতের কাছে যায়। পুরোহিত পূজা করিয়া ভূত-দেবতার কাছে বর-কন্যার জন্য আশীর্ব্বাদ আদায় করিয়া দেয়। বিবাহের দিন কন্যা গ্রামের অপর বালিকাদের সঙ্গে গান করিতে করিতে স্বামীর গৃহে উপস্থিত হয়। পরের দিন বর খুব ধুমধাম করিয়া ভোজ দেয়। এই ভোজে বন্ধু-বান্ধব সকলেই যোগদান করে।

বাকঙ্গো জাতির মধ্যে বিবাহের বহু পূর্ব্ব হইতেই বিবাহ স্থির হইয়া থাকে। অনেক সময় মেয়ের চার বছর বয়সেই বিবাহ স্থির হইয়া যায়। ইহাতে বরের খরচ বড়ই বাড়িয়া যায়, কারণ যে-কোন সময় সে কন্যার গৃহে যাক্ না কেন তখনই তাহাকে সঙ্গে নানা প্রকার উপহার লইয়া যাইতে হয়।

আজাণ্ডি জাতির স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ সর্দ্দারের ইচ্ছানুসারে হয়। বরের-কন্যা নির্ব্বাচনে কোন হাত নাই। তবে ইহারা বিবাহে বিশেষ অসুখী হয় না। স্বামী তাহার স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসে, এবং স্ত্রীও তাহার প্রতিদান দেয়। কিন্তু মাঙ্‌বেটু জাতির ব্যাপার একেবারে অন্য রকম। তাহারা বড়ই স্ত্রৈণ হয়। স্ত্রীরাই তাহাদের শাসন করে। তবে স্ত্রীদের শাসন খুব চমৎকার হয়। তাহাদের বিচারের বিরুদ্ধে কাহারো কিছু বলিবার থাকে না। এই জাতির মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখা যায়।

কেবল মম্ভ জাতির পুরুষেরাই চাষের সকল কাজ দেখে। নারীরা কেবল ঘরসংসার লইয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার, তাহারা এক থালায় আহার করে। এই-সব কারণে অন্য জাতিরা ইহাদের ছোট-লোক বলিয়া মনে করে।

বামন জাতির পুরুষেরা তিন-চারটি ধনুকের তীরের বদলে স্ত্রী ক্রয় করে।

মোগওয়াণ্ডি জাতির নারীর সংখ্যা কম। বেশী সময়েই দেখা যায় ঐ জাতির পুরুষেরা একটি মাত্র বিবাহ করে। পাছে বড় বয়সে স্ত্রী না পায় এই ভয়ে তাহারা, খুব ছোট কোন বালিকাও যদি ভবিষ্যতে সুন্দরী হইবার প্রতিজ্ঞা করে, তবে তাহাকে বাগ্‌দত্তা স্ত্রী করিয়া রাখে! সেজন্য কন্যার পিতা দাম পায় এবং মাঝে মাঝে তাহাকে উপহারাদিও প্রেরণ করিবার প্রথা আছে। এইজন্য যে পরিবারে কয়েকটি কন্যা থাকে, তাহার কর্ত্তা বেশ দুপয়সা করিয়া লয়। তবে বিবাহের পর কন্যার যদি কোন সন্তান না হয় তবে তাহাকে অর্থের কিছু অংশ ফেরত দিতে হয়।

কুইলু জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ আছে। যে-কোন বালক যে-কোন বালিকাকে তাহার ভবিষ্যৎ স্ত্রী বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিতে পারে। তাহার পর সেই বালিকা বড় হইলে সে তাহাকে বিবাহ করে। তবে বালিকা যদি তাহাকে বিবাহ না করিয়া অন্য কোন লোককে বিবাহ করিতে চায়, তবে সেই লোককে পূর্ব্ব বাগ্‌দত্ত স্বামীকে অর্থদণ্ড দিতে হয়। কুইলু অঞ্চলের লোকদের শাশুড়ীর মুখ দেখিতে নাই। শাশুড়ীকে দেখিলে লোকে ঝোপে লুকাইয়া পড়ে।

বাটেটেলা প্রদেশে বিবাহের একটি অদ্ভুত পদ্ধতি আছে। কন্যা সন্তান জন্মাইবার পর কোন লোক যদি সেই শিশুর গা-ধোওয়া জলে একটা লোহার বালা ফেলিয়া দিয়া, শিশুর মাতাকে একটা মুরগী উপহার দেয়, তবে সেই ব্যক্তি পরে সেই কন্যাকে বিবাহ করিবার অধিকার পায়। যমজ কন্যা হইলেও সেই ব্যক্তি দুই-জনকেই বিবাহ করে।

স্বামী বা স্ত্রী কেহ কাহারো বিশ্বাস ভঙ্গ করিলে তাহাকে কঠিন শাস্তিভোগ করিতে হয়। অনেকে অবিশ্বাসী স্ত্রীকে হত্যাও করে। স্বামী অবিশ্বাসী হইলে তাহাকে স্ত্রীর দাস হইয়া থাকিতে হয়।

সাময়িক বিবাহও কঙ্গো দেশে চলিত আছে। কোনও লোক একজন নারীকে চুরি করিয়া বনে-জঙ্গলে পলায়ন করে এবং একটি সন্তান হইলে পর সেই গ্রামে ফিরিয়া যায়। তাহার পর সন্তান একটু বড় হইলেই মাতা সন্তানকে ত্যাগ করিয়া তাহার পিতার কাছে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এইখানেই বিবাহ বাতিল হইয়া গেল। তাহার পর সেই নারীকে অন্য কোন লোক চুরি করিতে পারে।

অনেক জাতির সর্দ্দার নারী। নারীই তাহাদের শাসন করে। আবার অনেক জাতির নারী এবং পুরুষ ভাগাভাগি করিয়া রাজত্ব করে।

কেহ মরিয়া গেলে, নারীদের তাহার জন্য শোক করিতে হয়। পুরুষদের শোক প্রকাশ করিবার বালাই নাই। সব দেশের মৃত-সৎকার-প্রথা এক রকম নয়। নীচু কঙ্গোতে মৃতদেহকে বেশ করিয়া কাপড়ে জড়াইয়া আগুনের ধোঁয়াতে শুকান হয়। তাহার পর তাহাকে আরো

কাপড় জড়াইয়া একটা কুটীরে কয়েকমাস ধরিয়া ফেলিয়া রাখা হয়। তৎপরে তাহাকে কবরে দিবার দিন দেশের সকল লোক আসিয়া সেই গ্রামে জমা হয়, এবং ঢাক-ঢোল বাজাইয়া তাহাকে কবরে পুঁতিয়া ফেলা হয়। কবরের উপরে মৃত ব্যক্তির তৈজসপত্রাদি রাখিয়া দেওয়া হয়। পরলোকে যাইবার পথে এই-সমস্ত তাহার কাজে লাগিতে পারে। তার পর নাচগান ও ভোজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চলে।

সাকারা জাতির লোকদের মৃতসংকার-প্রথা সবচেয়ে ভয়ানক। কোন লোক মরিয়া গেলে একটা প্রকাণ্ড কবর খোঁড়া হয়। তাহার মধ্যে মৃত ব্যক্তি খুব জমকাল পোষাকে সজ্জিত হইয়া তাহার সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রীর কোলে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকে। আশে পাশে তাহার অন্যান্য স্ত্রী এবং ক্রীতদাসের মৃতদেহ পড়িয়া পচে। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও আত্মহত্যা করে। অতিথিরা কয়েকদিন পরে এই-সব মৃতদেহের মাংসে ভোজ লাগায়। এইরকম আরো নানাপ্রকারের বীভৎস এবং অদ্ভুত সংকার-পদ্ধতি কঙ্গো-দেশে প্রচলিত আছে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ সকলের ভালো লাগিবে না।

কঙ্গোর অনেক লোক এখনো নরমাংস খায়। তবে এই-সব নরমাংসের ভোজ কেবল পুরুষেরাই করে—স্ত্রী-লোকেরা বড় একটা ইহাতে যোগদান করে না। নরমাংস খাইবার দুইটি প্রধান কারণ—অনেক স্থানে শিকার মেলে না। এবং ইহাদের একটা বিশ্বাস আছে যে যাহার মাংস ইহারা খায়, তাহার ভাল গুণগুলি ভোক্তারা লাভ করে, তাহার বদ্‌গুণগুলি হাওয়াতে উড়িয়া যায়। অনেকে মৃতব্যক্তির মাংস ভক্ষণকে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করে। এখন অবশ্য ইহা গোপনে চলে। কিছুকাল পূর্ব্বে ইহা বেশ সকলের সাম্‌নেই হইত, এমন কি যে-সমস্ত শ্বেতাঙ্গেরা ইহাদের দেশে প্রথম আসে, তাহাদের সাম্‌নেই এই নর-মাংস-ভক্ষণ-ব্যাপার চলিত। 'বাজালা' এবং বাপুটু জাতির লোকেরা খুব বেশী নরমাংস খায়। তবে তাহারা নারী-মাংস ভক্ষণ করে না। তাহাতে নাকি খরচ বেশী পড়ে।

কঙ্গো নারীরা সুন্দরী কি না বলা শক্ত—কারণ সকল দেশের সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি একরকম নয়। কঙ্গো-

ব্যাপোটো নারী পূজার উৎসবের বেশে—মাঝখানে ভূতপ্রেত-পূজারী

বাসীদের চোখে তাহাদের দেশীয় নারীরা নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী। আমরা যদি হঠাৎ কঙ্গোদেশে যাই, তবে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিশেষ তফাৎ বুঝিতে পারিব না। কঙ্গো-নারীরা বিশেষ মোটাসোটা হয় না, তাহারা সাধারণতঃ পাতলা ছিপ্‌ছিপে হয়। তাহাদের অঙ্গের গড়ন নেহাৎ মন্দ নয়। হাত পা ইত্যাদি বেশ নিটোল সমান সমান। কোনটাই বেখাপ্পা নয়। তাহাদের নাক চোখও বেশ ভাল। বিশেষত, কঙ্গো-নারীর চোখের গড়ন খুবই চমৎকার।

অনেকে বলেন কঙ্গোনারী পোসামোদ খুব ভালবাসে—এ-সম্বন্ধে স্থির করিয়া কিছু বলা শক্ত, কারণ সকল নারীর চরিত্র এবং মন একরকম নয়। এই-স্থানের মেয়েরা সাধারণতঃ খুবই অতিথিপরায়ণ হয় এবং নিজেরা অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াও অতিথির সেবা করে। নদীর ধারে যে-সমস্ত জাতিরা বাস করে তাহারা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দিনের মধ্যে তাহারা বারকয়েক স্নান করে। অনেকের মতে নিগ্রোদের গায়ে বদ গন্ধ আছে—তাহা খাঁটি সত্য নহে। কিছুদিন তাহাদের মধ্যে বাস করিলে সে-গন্ধ আর বোঝা যায় না। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির লোকেরই দেহে গন্ধ আছে এবং এক জাতির গন্ধ অন্য জাতি সহ্য করিতে পারে না। ইউরোপীয়দের গায়ের বোঁট্‌কা গন্ধ আমাদের অনেকের কাছে অসহ্য। মেয়েদের দাঁতগুলি মুক্তার মত, তবে অনেকে তাহা উখা দিয়া ঘসিয়া খারাপ করে। তাহারা প্রায় সব সময়েই দাঁতন করে।

খাদ্য পাক করার সমস্ত কাজই মেয়েদের করিতে হয়। এই সব বিষয়ে ইহারা অতি পরিষ্কার। রান্না করিবার সময় হাত দিয়া কোন্ জিনিস প্রায় নাড়ে না বা ঘাঁটে না। পরিবেষণের সব কাজও হাতা দিয়া করা হয়। অনেক জাতির স্ত্রী এবং পুরুষ একই খাবার খায়। অনেক জাতির মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষের খাবারের বিভিন্নতা আছে। স্ত্রীলোকেরা সব রকম খাবার খাইতে পায় না।

কঙ্গোদেশের লোকদের ধর্ম্ম বলিয়া বিশেষ কিছুই নাই, তবে সকলেই ভূতের সেবা করে। তাহাও কেবল তাহাকে লোকের অনিষ্ট করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য। ভূতকে তাহারা ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে, তবে ভূত যদি নেহাৎ গরম হইয়া উঠে তবে তাহার বুকে ছোরা মারিয়া তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য মনে করাইয়া দেয়।

কঙ্গোবাসীরা কুঁড়ে-ঘরে বাস করে। তাহা গোলাকার, চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ—সব রকমেরই হয়। প্রত্যেক বিবাহিতা নারীর নিজের নিজের ঘর আছে। স্বামী প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে এক একদিন করিয়া বাস করে এবং যে দিন যাহার ঘরে থাকিবে সেইদিন সেই স্ত্রীকে স্বামীর খাবার যোগাইতে হইবে। স্ত্রীলোকেরা নাচ গান খুবই ভালবাসে এবং ইহাই তাহাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ। তাহাদের গলার জোর বেশী নয়। অনেকে তামাক খায়, অনেকে আবার গাঁজা চরস ইত্যাদি খায়—গাজা টানাকে অনেকে ধর্ম্মাচরণ বলিয়া মনে করে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্

নির্ম্মল জলদঘটা! অম্বরে তিলেক ঠাঁই নাহি,
আতঙ্ক ধরণীতল কি শঙ্কায় ঊর্দ্ধপানে চাহি'!
দিবসে লেগেছে অমা!—তারাকুল ভয়ে অপ্রকাশ,
কানাকানি চরাচরে!—গণে পল নিরুদ্ধ নিশ্বাস।
নিস্পন্দ প্রান্তরখানি ঢাকি' নব শ্যামল দুকূলে
চুপিচুপি মাগিছে আশীস লুটায়ে দিগন্ত-পদমূলে।
যমুনায় কালো ছায়া! শোকাতুরা বালুকার বেলা,
রাখাল ফিরিছে ঘরে, তরুতলে গোধনের মেলা।
আজি আর কাজ নাই হে কৃষাণ! ঘরে যাও ফিরে,
শঙ্কিতা ঘরণী তব চাহে পথ সুদূর কুটীরে!
নিরাশ্রয় হে পথিক! এখনো আশ্রয় লহ মাগি,
আতুর ভিখারী ওরে পথিপাশে ত্বরা ওঠ্ জাগি'।
রাতির প্রতীক্ষা নাহি দিবসেই আজি অভিসার,—
কোন্ বনে বিনোদিনী গাঁথে বসি' মালতীর হার!
অদূরে কদম-শাখে ফুলে-ঘেরা লতার ঝুলনা,
সৌরভে আকুল বন, পুলকের নাহিক তুলনা!
হরিণী ছেড়েছে তৃণ, কলাপিনী ফুকারিছে কেকা,
এলানো অঞ্চলে বসি' গোপবালা শিহরিছে একা!
গৃহকর্ম্ম সারো ত্বরা আজি, ওগো চতুরা ললনা,
নীল সাড়ীখানি পর, কবরীর কথাটি ভুলো না!
বাতায়ন-পাশে বসি' বিরহিনী, চাহ নভপানে,
আঁখিজলে স্মৃতি-মাঝে অতীত মিলন আনো প্রাণে!

শ্রী নন্দনন্দন ব্রহ্মচারী

প্রবাসীর আত্মকথা

৫

এখনকার আকাশের ভাবটা খুব একটু বিশেষ রকমের ; অতীব নির্ম্মল ; উত্তাপ মৃদুমধুর। 'শুন্-আন্'-প্রদেশের অন্ধিসন্ধি জানিবার জন্য তিমি-নৌকা করিয়া যাত্রা করিলাম। উপসাগরের অপর পারে, এবং যাহাকে আনামবাসীরা "মেদ'ষার" বলে, সেই উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর সংকীর্ণ শৈলপথের পাদদেশে এই 'শুন্-আন্' অবস্থিত। সেখানে দীনদশাগ্রস্ত ধীবরদিগের একটি মাত্র কুটীর ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু অতি সুন্দর একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তাহাতে পলাস্তারা ও চীনা-মাটির সূক্ষ্ম চিকনের কাজ। দুর্গম্য খাড়া ও গম্ভীর বড় বড় গাছের নীচে, ছায়াময় গভীর প্রদেশে এই মন্দিরটি অবস্থিত। এই গাছগুলা "মন্দির-তরু" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত আর্দ্র অঞ্চলে, সুকুমার ও দুর্লভ পাতাবাহার, পুরানো প্রাচীরের গায়ে যেন গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে।

লোকগুলা কুৎসিৎ ও ভয়-তরাসে।

গ্রামের প্রবেশ-পথে, একটা বড় পাথরের পর্দ্দার উপর ব্যাঘ্র-মহাশয়ের ঈষদ্-উদ্‌গত মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

স্বাভাবিক রং-এ রং-করা ; বালাঞ্চি দিয়া ওষ্ঠ রচিত, চোখ কাচের ; সম্পূর্ণ চীনা-ধরণের মুখভঙ্গী। উহার পদতলে সুগন্ধী লাল মোমবাতি জ্বলিতেছে। লোকেরা বলিল, ব্যাঘ্রমহাশয়কে ঠাণ্ডা করিবার জন্য এইরূপ করা হইতেছে। কারণ তিনি 'ম্যাও ম্যাও' করিবার উদ্দেশে আসিয়াছেন—তাঁহার ডাক রাস্তা হইতেও শুনা যায়।

ধানের ক্ষেতের মধ্যে ঐ-ওদিকে মান্দারীনের একটি গৃহ। এই ধানের রং আমাদের এপ্রিল মাসের গমের সবুজ রং অপেক্ষা আরও কোমল। জলপ্লাবিত ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া যে-সব সরু সরু আলের পথ গিয়াছে—সেই আল্ পথের উপর দিয়া আমরা সেখানে উপনীত হইলাম। এই-সব অ'ল আমাদের ফ্রান্সের লোনা জলা ভূমির তোলা-মাটির মত. গৃহের দরজা বন্ধ, সম্ভবতঃ সম্প্রতি অতিবৃদ্ধ মান্দারীনের মৃত্যু হইয়াছে। উহার বিধবা স্ত্রী, শোকগ্রস্তা এক বৃদ্ধা বানরী, দ্বার খুলিয়া দিল ; আমরা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঘরটা নীচু, খুব পুরাতন। ঘরের সমস্ত ভারী ভারী কড়িগুলায় শোণিতপায়ী বাদুড় ও বিকটাকার নানা প্রকার জীবের ছবি চিত্রিত রহিয়াছে। বৃদ্ধা তাহার বল্লম, তাহার থালা-বাসন, তাহার সমস্ত কৃত্রিম সামগ্রী, তাহার ছত্রাদি বিক্রয় করিতে চাহিল।

আমাদের নাবিকেরা, মৃত মান্দারীনের এইসমস্ত ধনসম্পত্তি উঠাইয়া লইয়া আমাদের তিমি-নৌকা বোঝাই করিল।

সূর্য্যাস্তে, আমাদের ফিরিবার সময়, চৈনিক সাগর হইতে একটা পরিস্ফীত তরঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে দোলাইতে দোলাইতে লইয়া গেল। এই তরঙ্গ ধীরে ধীরে আইসে এবং এই উপসাগরে আসিয়া মরিয়া যায়।

সায়াহ্নের সঙ্গে সঙ্গে, শরৎকালসুলভ বেশ একটা তাজা ও ও জীবনপ্রদ মৃদুমধুর শৈত্য এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণবর্ণের গোধূলি আসিয়া আবির্ভূত হইল।

আমরা পাল তুলিয়া শান্তভাবে যাত্রা করিতেছি এমন সময়ে ঐ অদূরে দিগন্ত-দেশে, আমাদের জাহাজের জন্য চিঠিপত্র লইয়া ডাক-জাহাজ আসিয়া উপস্থিত। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের আজিকার এই সুদিনের সুখের মাত্রা পূর্ণ হইল। আমাদের খুব আমোদ হইবে। কেবল, পরশ্বদিন আমাদের সঙ্গীরা কোন এক অজ্ঞাত দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে, এই স্মৃতিটি আমাদের মন হইতে কিছুতেই মুছিয়া যাইবে না।

হায়! কেন, আমরা উহাদের সহিত যাইতে চাহিলাম না?

এই কথা যখন ভাবি, তখন আমরা এখানে বেশ নিরাপদে আছি বলিয়া যেন লজ্জা বোধ হয়।

অবরোধ-রক্ষকের কাজ যতই প্রয়োজনীয় হোক্ না কেন, পরিশেষে ইহা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে…

৬

আমার নাবিক সিল্‌ভেষ্টার মোয়াঁকে আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। তখন সে ছোট Cabin boy বা ক্যাবিনের ছোক্‌রা-চাকর ছিল এবং "Islande"-এ মাছ ধরিত।

সে একটা বোঝার মত একটু বেশী জায়গা জুড়িয়া থাকে শুধু এই-জন্যই আমি তাহাকে তিরস্কার করি। কিন্তু ইহা তাহার অপরাধ নহে ; আমার ক্যাবিনের দরজার পক্ষে সে বেশী লম্বা ও কাঁধে চওড়া। তার বাহু দুইটা ভীষণাকার ; তাহার দাড়ির চুল খুব কালো। দূর হইতে, ভীষণ দেখিতে ; নিকট হইতে—মুখখানি সুন্দর শান্ত মধুর ও সরল ; বয়স ১৯ বৎসর, নীল চোখ একেবারেই তরুণ ; রকম-সকম, কণ্ঠস্বর, সবলতায় ঠিক শিশুর মত।

সিল্‌ভেষ্টার ও জাহাজের পোষা বিড়াল তু-তুক্ (ইহাকে আল্‌জিরিয়া হইতে চুরী করিয়া আনা হয়) এই দুজন আমাকে খুব ভালবাসে। তু তুকের গাত্রাবরণ ধূসরবর্ণ ও কালো কালো ফুটকি-দেওয়া, লেজের প্রান্তদেশ ও ঘাড়ের নীচের দিক্‌টা (সাদা) সূক্ষ্ম লোমে ঢাকা। দৈহিক আয়তনের পার্থক্য সত্ত্বেও সিল্‌ভেষ্টার ও তু-তুকের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে ; একই রকম চাল-চলন, একই রকম আদুরে রকমের হেলে-দুলে চলা ; উভয়েরই মানস-ক্ষেত্র স্বল্প-কর্ষিত ; উভয়ই সম্পূর্ণরূপে প্রত্যুৎপন্নমতি। আমার মুসকার কাঠের দোলা হইতে আমি উভয়কেই দেখিতেছি ; উভয়ই নিঃশব্দ চটুলতার সহিত, এক সঙ্গে আসিতেছে কিংবা বাহির হইয়া যাইতেছে। আমার কামরায় সজ্জিত বুদ্ধ মূর্ত্তি ও পুষ্পগুচ্ছের মধ্যে আসিয়া উভয়ই নিজনিজ ছোটখাটো কাজে ব্যাপৃত হইতেছে। হাত বাড়াইয়া দিলেই তু তুক্-লাফ দিয়া আসে, সিল্‌ভেষ্টার তাহা পারে না। কিন্তু সে তার ঠাকুরমাকে চিঠি লিখিতে বসে ; এ কাজটা আরও শক্ত হইবার কথা।

এখন আমাদের তুরাণে বেশী গরম নাই ; ভরা দিনের বেলা যা একটু গরম, কিন্তু সন্ধ্যার সময় শীতের নৈকট্য বেশ অনুভব করা যায়। এই হরিৎ ভূখণ্ডটি অনেকটা হৃতপল্লব হইয়াছে এবং চারিদিক্‌কার জল ঠাণ্ডা হইয়া পড়িয়াছে। ব্রেতাইঞ্-এর শরৎ দিবসের মত সৃষ্টি হইতেছে ; দিনগুলা অন্ধকারে ও ছোট।

এমন একটা বিষণ্ণ সময় আসিবে তাহা পূর্ব্বে কখনো ভাবি নাই। নিশাগমে, একেবারে নভেম্বরের ভাব মনে আনিয়া দেয়। ফ্রান্সের সহৃদয় বৃদ্ধাদের কথা মনে পড়ে, গৃহস্থের অন্তঃপুরস্থ অগ্নিকুণ্ড সমুত্থিত হর্ষোৎফুল্ল অগ্নিশিখার কথা মনে পড়ে।

আমাদের নিজের অবিবেচনার ফলে, নানা জিনিসের অভাবে

অনর্থক কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। যে-সকল ছোট খাটো জিনিস সচরাচর ফ্রান্স হইতে আনা হইয়া থাকে তাহা হইতে আমরা একেবারেই বঞ্চিত ; এই-সকল জিনিস নিঃশেষ হইয়া গেলে, তাহার স্থান আর কিছুতেই পূরণ করা যায় না। বহির্জগতের সহিত গতিবিধির অভাবে, আমাদের মনি-ব্যাগের ভিতর একটি পয়সাও নাই। জাহাজে সাবানও আর নাই ; আমাদের কাপড় আমাদের নাবিকেরা লোনা জলে ধুইয়া থাকে এবং তাহা হইতে একটা চীনা চীনা গন্ধ বাহির হয়।

আমাদের জাহাজ ঘটনাচক্রে, নানা প্রকার লোকের আবাসস্থান হইয়া পড়িয়াছে। আহত, সদ্য-রোগ-মুক্ত, দোভাষা, আনামবাসী "মাটা", হাইনানের জলদস্যু। উত্তরোত্তর বেশী বেশী করিয়া পীত উপাদানে আমরা আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। এইবার দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু আমাদের নাবিকেরা যেরূপ সহজ-শোভন-ভাবে উহাদের সহিত ব্যবহার করে, তাহা দেখিয়া খুব আমোদ বোধ হয়।

৭

এই দশ দিনের মধ্যে অনেক ব্যাপার হইয়া গিয়াছে—বীভৎস ব্যাপার—অদ্ভুত রকমের ব্যাপার, আমোদজনক ব্যাপার অথবা নির্বুদ্ধিতার ব্যাপার। কিন্তু উহা এত কম গভীর যে তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বদিনের ধারণা তাহার পরদিন আর মনে থাকে না। ঘটনাগুলা তাহার চিহ্ন মাত্রও রাখিয়া যায় না।

একটা ছোটখাটো টাইফুন-ঝড় উঠিয়া আমাদের হাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছে। তার পর কত বাজে লোক মরিল, তাহাদের সমাধি হইল, কত নূতন তরঙ্গ আসিল, আমাদের জাহাজ হইতে যাহারা চলিয়া গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কয়েক জন ফিরিয়া আসিল। আমাদের রাষ্ট্র হইতে আনাম রাজ্যের নামে, সখ্য-নিদর্শনস্বরূপ দৃঢ়-সমভিব্যাহারে কতকগুলা উপঢৌকন আসিয়াছে। (যাত্রা পথে পথ হারাইয়া যাওয়ায় এখন গ্রামে গ্রামে তাহাদের পশ্চাতে ছুটিতে হইতেছে)।

আজ বেশ সমুদ্রের শান্ত—থম্‌থমে ভাব। আজ শনিবার, জাহাজ ধুইবার দিন ; দ্বিপ্রহর দিবানিদ্রার সময় ; কিন্তু দৈবক্রমে আজ ঘুমাই নাই। আমার কামরায় চীনা-চীনা গন্ধ ; এই গন্ধে ক্রমশঃ আমাদের কাপড়চোপড়, আমাদের টুকিটাকি জিনিসগুলাও পরিষিক্ত হইয়াছে। আমার বুদ্ধ, আমার হাতি, আমার "তান্ত্রিক" বক-পক্ষী—এইসব মূর্ত্তি, আমার নাবিক তাকের উপর এমনভাবে গুছাইয়া রাখিয়াছে—যেন এখনই কেহ আসিয়া উহা পরিদর্শন করিবে।

আমার সন্নিকটে, "বড়ো খোকা" সিলুভেয়ার মন্দিরের একটা প্রদীপ খুব মন দিয়া ঘসামাজা করিতেছে ; যে জায়গা ঘসামাজা শক্ত, সেই জায়গায় একটু জিব বাহির করিয়া কাজ করিতেছে। আমার কামরায় কামান ছিদ্র পথ হইতে, কিয়েনচা-র উত্তুঙ্গ কোণালু পর্ব্বতগুলা দেখা যাইতেছে—বরাবর একই রকম ; সেই চীনা খেলনার ভাব।

সমুদ্রের নীল আস্তরণের উপর শুভ্র সূর্য্য প্রতিভাত হইয়াছে। এবং এই দর্পণের উপর, লোকাকীর্ণ "জোঙ্ক" নৌকাগুলা, কদাকার মরা মাছির মত আজ নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। যে-জাহাজে পূর্ব্বে একটু কিছু শব্দ হইলেই বড় গীতার-যন্ত্রের মত অনুরণিত হইত—আজ সেই জাহাজে কোন শব্দ নাই। আমার কামরায় কামান-রন্ধ্র পথ দিয়া আমার ভীব প্রদেশে নিমজ্জিত। চীনা-চীনা গন্ধ আরও যেন বেশী পাওয়া যাইতেছে, জমির উপর কতকগুলা অদ্ভুত পদার্থ, অসঙ্গত পদার্থ, গুরু দিবানিদ্রায় সব মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। সৈনিকদিগের থলিয়া, চাউলের বস্তা, কতকগুলা কটোরা, কতকগুলা পা'ল ; একটা "গং"-ঘণ্টার ভিতর "তু-তুক্" বিড়াল ঘুমাইতেছে। কয়েকজন নগ্ন নাবিক স্বীয় পেশীবহুল বাহুর উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে ; কতকগুলা চীনা, ফকীরের মত শীর্ণকায়, কালো রেশমী পরিচ্ছদ পরিয়া, সোজা সটানভাবে ঘুমাইতেছে ; কয়েক জন তরুণ আনামবাসী গুলি-বাজ—নারী সুলভ স্থিতিভঙ্গী, বন্ধনী আকারে মাথায় চিরুণী গোঁজা, গ্রীবাদেশে "অ্যাপলো" ধরণে ঝুঁটি বাঁধা ; মাথায় একটা রাখালী টুপী, ঝুঁটির নীচে একটা লাল ফিতা দিয়া বাঁধা ; হিনান্ দ্বীপের কয়েকজন জলদস্যু হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছে, উহাদের সাদা দাঁত দেখা যাইতেছে,—ইহারা এশিয়াবাসীর সুন্দর আদর্শ—উহাদের কালো দীর্ঘ কেশগুচ্ছ উহাদের মাথায়, পাগড়ীর মত জড়ান রহিয়াছে,—তাহার পর, বেচারা কতকগুলি সৈনিক, বন্দুকের গুলিতে আহত, কিংবা আমাশয় রোগে নিতান্ত ক্ষীণ বেচারী কতকগুলি গোলন্দাজ জ্বরের ঘুম ঘোরে হাঁপাইতেছে…

এই-সব লোকই জাহাজে কাজ করে ; অবশ্য পীড়িত লোক ছাড়া—আমাদের অর্দ্ধেক নাবিকের অভাব উহাদের দ্বারাই পূরণ হইয়া থাকে। আজ প্রাতে আমার হুকুমে, উহারা আমার পদতলস্থ নোঙ্গর তুলিবার চক্রযন্ত্র ঘুরাইবার জন্য সমবেত হইয়াছে।—এই যন্ত্রটা যেন একটা প্রকাণ্ড লাটাই ;—মেলার কাঠের ঘোড়াগুলার মত ইহাকে ঘুরাণো হইয়া থাকে। ইহাকে ঘুরাইতে লাগিল নাবিকেরা, ঘুরাইতে লাগিল রাখালী টুপীধারীরা ; ঘুরাইতে লাগিল বেণীঝোলানো চীনারা ; ঘুরাইতে লাগিল 'মাটারা', কয়েদীরা, জলদস্যুরা ! এই মানব খিচুড়ী যাহা ডাঙ্গার উপর একেবারেই অনির্দ্দেশ্য ও একাকার বলিয়া মনে হয়—প্রাচ্য-এশিয়ায় এই সাগর-পৃষ্ঠে সেই মানব খিচুড়ীর বেশ একটা ছবি পাওয়া যায়।

৮

এই উপসাগরের একটা অধ্যুষিত অঞ্চলে, একটি বিষাদময় ময়দান আছে, আমরা সন্ধ্যার সময় মাঝে-মাঝে ঐখানে যাই। ঐখানে ১৮৬৩ অব্দের মৃতেরা নিদ্রা যাইতেছে এই লোহিতাভ ভূখণ্ডে ১২।১৪ জন ফরাসী নাবিক কিংবা সৈনিক অন্তিম শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। যখন এই দেশ দখলের প্রথম চেষ্টা আরম্ভ হয়, সেই সময় সান্নিপাতিক জ্বরে, উহারা ভবধাম হইতে অপসৃত হইয়াছিল। এখনও কাঁটা গাছের ঝোপঝাড়ের নীচে উহাদের গরীবী রকমের ছোট-ছোট ক্রুশ পড়িয়া আছে—অতিকষ্টে লক্ষ্য করা যায়। উষ্ণ বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে এইসমস্ত এখানে শীঘ্রই বিনষ্ট হয় ; এখানকার হরিৎ প্রকৃতি অন্যস্থান অপেক্ষা বেশী সর্ব্বগ্রাসী।

ভূখণ্ডের লোকদিগের সহিত আমাদের ব্যবহারে বাহ্যত বেশ একটা সখ্যভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাতে, বাজারের জনতার মধ্যে গিয়া যদি কখন দৈবক্রমে আমরা ক্রুদ্ধ হই, উহারা তাড়াতাড়ি "চিন্‌চিন্" করিয়া অতি বিনীতভাবে আমাদিগকে অভিবাদন করে। তখন না হাসিয়া থাকা যায় না ;—তখন আমাদিগকেই হার মানিতে হয়। এরূপ বুড়াটে ধরণের ও শিশু প্রকৃতির লোকদিগের উপর আমরা সত্যকারভাবে কখনও রাগ করিতে পারি না।

সময়ে সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী উপসাগরে আমরা সন্ধান লইতে যাই ; অথবা ডিঙ্গিতে করিয়া কোন সন্দেহজনক জোঙ্কনৌকার পশ্চাতে ছুটিয়া চলি। ইহা ছাড়া এই অবরোধ রক্ষার দিনগুলায় একটুও সজীবতা লক্ষিত হয় না। আমাদের সকলেরই মধ্যে একটা যেন অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছে ; এখন আমাদের নাবিকদিগের গানও প্রায় শোনা যায় না।

৯

এখানকার স্বপ্নগুলা বড়ই অদ্ভুত, বিশেষতঃ দ্বিপ্রহরে যখন গভীর দিবানিদ্রায় আমরা মগ্ন হই। সেই স্বপ্নের পর, নিতান্ত বিসদৃশ, অসংলগ্ন, গূঢ়রহস্যময় কতকগুলা ছবি পশ্চাতে থাকিয়া যায়। সেই-সব ছবি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদিগকে অনুসরণ করে।

আজ এক প্রাচীন পল্লীভবনস্থ অলিন্দের স্বপ্ন দেখিলাম ; আমি যখন শিশু ছিলাম সেই জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগিত। স্বপ্নে দেখিলাম, রাত্রিটা খুব গরম গ্রীষ্মরাত্রি ; অলিন্দ হইতে, দূরস্থ ঝোপঝাড়ের মাঠ দেখা যাইতেছে। আমার নিকটে কতকগুলি তরুণী রহিয়াছে। সকলেই সমবয়স্কা হইলেও, উহারা বিভিন্নযুগের পরিচ্ছদ পরিয়াছে। একটু ইতস্ততঃ না করিয়াই বেশ চিনিতে পারা গেল উহারা আমার মা, আমার পিতামহী, আমার খুল্লপিতামহী ; তাহাদের বয়স ১৬ বৎসরের মধ্যে ; যদিও তাহাদের পরিচ্ছদ সেকেলে ধরণের। এমন কি উহাদের মধ্যে আমাদের পরিবারের শেষাগত অভ্যাগতটিও ছিল —আসলে খুবই ছোট্ট। লম্বা লম্বা কটা চুল। একসঙ্গে থাকার দরুন্ কিংবা আমাকে তাহাদের মধ্যে দেখিয়া তাহার কিছুমাত্র বিস্ময় হয় নাই—সে খুব উল্লাসের সহিত সেকালের গল্প করিতেছিল।

সুদীর্ঘ-পদ কণ্ঠ ফ্ল্যামিঙ্গো নামক রক্তবর্ণ জলচর পাখীর ঝাঁক প্রায় ভাস্বর উচ্চ আকাশে উড়িতেছে, তখন আকাশ ঘনঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গ্রীষ্মসুলভ অতিমধুর সুগন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যাইতেছে। এই অলিন্দের পাথরগুলা অসংলগ্ন হইয়া পড়িতেছে, ভগ্নাবশেষের ন্যায় উহাতে শেওলা ধরিয়াছে, জুঁইগাছের ডালপালা চারিদিক্ হইতে বাহির হইয়াছে। সেকালে মহিলারা এই জুঁই এর ডাল তাহাদের আঙ্গিনায় পুঁতিয়া রাখিত—এ ঢংটা এখন বাতিল হইয়া গিয়াছে।

সুগভীর ও অন্ধকারময়, গুল্মপূর্ণ খোলা মাঠের উপর আকাশটা নিছক কৃষ্ণবর্ণ শোকবস্ত্রের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এখন, কি-একটা বদরকমের জিনিস, একরকম পাণ্ডুবর্ণ চাক্তি, দিগন্তের প্রান্ত দেশ হইতে ধীরে ধীরে উত্থিত হইল। ঐসব মেয়েরা বলিল—"ওটা চাঁদ ; আমরা ওরই প্রতীক্ষায় ছিলাম' এই বলিয়া উহারা খুব হাসিতে লাগিল, এ হাসিটা বেশ তাজা রকমের হাসি - উপচ্ছায়ার মত হাসি নহে। কিন্তু আমার মনটা এই চাঁদ দেখিয়া বিচলিত হইল, কৃষ্ণবর্ণ আকাশে উঠিয়া চাঁদটা বে-পরিমাণ বর্দ্ধিত হইল, এবং ক্রমাগত ম্লান হইতে লাগিল ; তারপর একটা স্বচ্ছ বৃহৎ প্রভামণ্ডলের আকারে বলয়-রেখার আকারে, আস্তে আস্তে আকাশে মিলাইয়া গেল।

তারপর ঐ রকম আর একটা চাঁদ ভূতল হইতে যেন বাহির হইয়া, ঐ একই জায়গায় উত্থিত হইল। তখন আমার ভয় হইল। মনে হইল যেন আমি জগতের মহাপ্রলয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। উহারা সকলেই বলিল—

—"না তা নয়! জ্যোতিষীদের পঞ্জিকায় এটা পূর্ব্বেই ঠুকে' বলা হয়েছিল ; এইরকম আরও দুইটা চাঁদ উঠবে।"

ফলতঃ আর দুইটা চাঁদ একসঙ্গে উদয় হইল এবং উহারাও বড় বড় প্রভামণ্ডলের আকারে আকাশে মিলাইয়া গেল ; পশ্চাতে শুধু একটা কম্পমান ম্লান আলোকচ্ছটা রাখিয়া গেল। আমার সত্যই খুব ভয় হইল।

উহারা আমার ভাব দেখিয়া হাসিতে লাগিল :—"চল এখান থেকে যাওয়া যাক্—ওর ভাল লাগ্‌ছে না। কিন্তু ছি! পুরুষ মানুষের এত ভয়!" তার পর আমরা একটা সরু পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। পথের মাথাটা উচ্চ লতামণ্ডপে আচ্ছাদিত! জায়গাটা ক্রমশঃই গরম ও অন্ধকার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যতটা দেখিতে পাওয়া গেল তাহাতে মনে হইল যেন বৈশাখ মাসের মত অজস্র "হর্ষণ" ফুটিয়া আছে।

মেয়েরা আগে আগে চলিয়াছে।সবাই—সেইরকম তরুণবয়স্কা। সব-চেয়ে যে ছোট তার কটা চুলের গুচ্ছ হঠাৎ কাঁটাগাছে আটকাইয়া গেল।

উহাকে সাহায্য করিবার জন্য আর সকলেই দাঁড়াইল। কোঁকড়া চুলগুলা কতকগুলা ডালপালার গায়ে সাপের মত জড়াইয়া গেছে। চুল এত লম্বা যে কাঁটাগাছ হইতে ছাড়ানো মুস্কিল। আমরা পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম তব কোন ফল হইল না। আরও গরম বোধ হইতে লাগিল। এই অন্ধকারের মধ্যে চুলের জট্ কিছুতেই ছাড়ান গেল না—যতই ছাড়ান হয়, আবার ততই নূতন করিয়া জট পাকাইয়া যায়। পরিশেষে সকলে বন্দুকের মত একটা আওয়াজ করিয়া কোথায় কে জানে—একটা নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

অদ্ভুত রকমের এক তরুণী বলিল :—

—"কাট্‌তে হবে, কাট্‌তে হবে, নৈলে আবার গজিয়ে উঠ্‌বে। (আমার খুল্লপিতামহী—যাহাকে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধা বলিয়া জানিতাম—তাঁরই এখন এইরূপ চটুলতা।)

তিনি গাছটা মুড়াইয়া কাটিলেন, - কচাৎ, কচাৎ, কচাৎ! তাঁর কোমরের সিক্‌লিতে একটা বড় কাঁচি ঝোলান ছিল—সেই কাঁচি দিয়া কাটিলেন। তার পর সমস্ত দলকে দল আবার লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল, এবং বলিল :—"আর আমরা বনে যাব না।"

আমরা উদ্যানের প্রান্ত-দেশে, একটা পুরাতন চতুষ্ক গৃহে (kiosque) আসিয়া পৌঁছিলাম—দেওয়ালের জাফ্রির উপর যেন গোলাপের গালিচা বিছানো রহিয়াছে। তরুণীরা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে মাত্র দুই তিন খানা কেদারা ছিল ; অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের মেয়েরা, একটু ভদ্রতার কথা বলিয়া ঐ কেদারায় বসিয়া পড়িল।

গ্রাম্য-গোধূলিসুলভ সেই একই উত্তাপ, সেই একই ঘাসের সুগন্ধ, সেই একই ফুলের সৌরভ। কিন্তু ঐ তরুণীরা আর গান গাহিতেছে না ; হঠাৎ যেন তাহারা গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে।

যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহারা একটা আলমারি খুলিল ; আলমারিটা দেওয়ালের ভিতর প্রচ্ছন্ন ছিল, সেই-আলমারি হইতে একটা শিশুর পরিচ্ছদ টানিয়া বাহির করিল…মৃত্যুর অবশেষ, না জীবনের পূর্ব্বসূচনা?…রহস্য-ময় ও নীরব হাস্য সহকারে, ঐ ছোট পোষাকটি উহারা আমাকে দান করিল ; আর আমিও যেন সব বুঝিতে পারিলাম। ঐ পোষাকটি যখন দেখিতেছিলাম, তখন একটি মধুর কোমল ভাব অন্তরে অনুভব করিতেছিলাম—সেই অনুভূতিটা এত তীব্র ও প্রবল যে আমি জাগিয়া উঠিলাম…

সব শেষ হইয়া গেল ; মন্ত্র-মোহ ছুটিয়া গেল ; স্বপ্ন ভাঙ্গিল—আবার তাহাকে ধরা অসম্ভব…সেই গ্রীষ্মসুলভ গোধূলি, সেইসব তরুণী, সেই পুরাকালের গন্ধ, সেইসমস্ত এক মিনিটের মধ্যেই, অস্থায়ী তমসাচ্ছন্ন স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে বিলীন হইল। আবার দিবা দ্বিপ্রহরে আসিয়া পড়িলাম—আবার আমার সেই জাহাজের কামরায়, সেই প্রবাস দেশে আসিয়া পড়িলাম।

'তু-তুক্' বিড়ালটা আমার পদতলে ঘুমাইতেছে, আরও দেখিলাম সিলুভেষ্টার তাহার চওড়া কাঁধ দিয়া আমার জানালা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। "চাঁদের" নিকট হইতে এইমাত্র সে কতকগুলা কদলী সওদা করিয়াছে। "চাঁদ" তাহার ডিঙ্গাতে দাঁড়াইয়া আছে ; তাহার গোল-গাল ট্যাবাটোবা মুখখানা দেখা যাইতেছে। এই চাঁদ (আমার সেই স্বপ্নের চাঁদ নহে) একজন আনামবাসী দোকানদার রমণী, বয়স ১৮ কিম্বা ২০ বৎসর, প্রতিদিন সে আমাদের জাহাজের ধারে

আসিয়া ফল বিক্রয় করে; "চাঁদ" বলিয়া ডাকিলে সে উত্তর দেয়, নিছক গোলাকৃতি বলিয়া নাবিকেরা তাহার এই নাম দিয়াছে।

একটু ভাবুনেপনার সহিত সে তাহার স্থূল বাহু তাহার হলুদে হাত বাড়াইয়া দিল এবং সিল্‌ভেষ্টারের কষ্ট বাঁচাইবার জন্য যেন সে নিজেই একশো মুদ্রা গুণিয়া লইতে চাহিল। কিন্তু সিল্‌ভেষ্টার পাছে আমার ঘুম ভাঙ্গে এই ভয়ে সে নিম্নস্বরে তাহাকে উত্তর করিল —"না, না, না; আমি জানি তুই ভারি বজ্জাত, তুই চোর, তোর গুণ্‌তে হবে না..." এই কথা বলিয়া সিল্‌ভেষ্টার, যে শেনগুন্‌সি-সূত্রে তাম্রমুদ্রা গাঁথা ছিল, সেই সূত্র হইতে অতি কষ্টের সহিত কতকগুলা মুদ্রা খুলিয়া লইল—কারণ উহাই এখন আমার যথা সর্ব্বস্ব।

উহাদের পশ্চাতে, দূর দৃশ্যটি অতি সুন্দর। শুভ্রস্বচ্ছ আলোকের মধ্যে ঐ উচ্চ পর্ব্বতটা দেখা যাইতেছে। উহাই হুয়ের যাত্রাপথ উহারই নাম "মেঘদ্বার"; লোকলোচনের অগোচর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হুয়ে নগর আসিতে হইলে ঐ পর্ব্বত লঙ্ঘন করা আবশ্যক; তাহার পর, আবিল সমুদ্রের উপর, "জোঙ্ক" নৌকার ভীড়...

...সেই ক্ষুদ্র শিশুর পরিচ্ছদ দেখিয়া আমার মনে যে মধুর, গভীর ব্যাখ্যাতীত, অনির্ব্বচনীয় একটা ভাব আসিয়াছিল তাহা রাত্রি পর্য্যন্ত ছিল... (ক্রমশঃ)

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

নায়্যা

নতুন জলে নাও ভাসায়্যা দিয়া নতুন ছৈ,
নায়্যা আমার গেছে চল্যা কৈ,
আষাঢ় গেলো শাওণ গেলো আল্য ভাদ্র মাস,
দিন গণ্যা মোর মন যে রে উদাস।
কল্‌য্যা-কাটা এ দুখ আমার কইমো কারে হায়,
বুকের মাঝে তুফান বয়্যা যায়।
যে দিগে চাই—জলের পাথার, গাওখানি তায় ভাসে,
নিলখ পারের যত নাওই আসে;—
চম্‌ক্যা যে রে ফির্যা তাকাই, আমারি মুখ চায়্যা
ঐ বুঝি ঐ আল্যো আমার নায়্যা।

আন্ধার রাইতে চোখ যে আমার তারার মত জ্বলে,
পথিার-পারের অঠাই দিয়া চলে।
আন্ধের ঘোরে ভুল যদি হয় ঘাটখানি এ তার—
ঘরের বাতি জ্বালাই ঘাটের পার।
জোচ্‌না-রাইতে জল-বিথারে কাপে চান্দের জিলা,
বয়্যা আসে বাতাস—নিলা নিলা,
ইচ্ছা করে বাদাম টান্যা আচলটারি—এই
বুকটা আমার ভাসায়্যা আইজ দেই।
এত যে মন উথাল-পাথাল—পথের দিগে চায়—
নায়্যা আমার নায়্যা সে কোথায়!

ভোর বিহানে সারা রাইতের জাগন-ভরা আখি—
শেষ নিলখে উরা দুইটা পাখী,
বুজায়্যা পাখ টল্যা পল্য নিদ্-নিভাজের তলে,
স্বপ্নেরি দীপ ঘুমের ফাশে জ্বলে,
রোস্‌নাইয়ে তার চায়্যা দেখি— আমারি যে নায়্যা
নতুন ছৈয়ের নাওখানি সেই বায়্যা
ই-ফাশ থিকা ও-ফাশ ফিরে নিয়া চরণ্‌দার—
তামান দিনে জিরানি নাই তার।
এক হাতে হাইল, আরক হাতে পালের দড়ি ধর',
সারাটা গায় ঘামেরি জল ঝরা,
তারি পরে ছুক্‌র্যা রৈদ ঝিলিক্ দিয়া জ্বলে,—
ভরা গাঙ্‌ সে পারি দিয়া চলে।

ওপারের ঐ গেরামখানির গাছের ফাকে ফাকে
সাঝের বাতি জ্বল্যা উঠার আগে,
নাওখানি তার ভিড়ে আস্যা এই ঘাটেরি পারে,
পলকে বুক কাপে সুখের ভারে,
পরাণ আমার চম্‌ক্যা উঠে, ঘুম-চেরা চোখ হায়
আথে পাথে চাইর দিগে তাকায়,—
কোথায় নায়্যা কোথায় নায়্যা শূন্যা ঘরের তল,
রৈদের আলোয় করে রে ঝলমল!
স্বপন-ভাঙা এক ফোটা সুখ হাজারো দুখ হয়্যা
কান্দন তুলে পাজর-তলে রয়্যা,
পথে পথে চায়্যাই কি এ জীবন হৈবো পার
ওরে নায়্যা নায়্যা রে আমার!

শ্রী সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

বিয়ের ক'নের বেশ

বিবাহের মত বড় সংস্কার জগতের মধ্যে বোধ হয় আর কিছু নাই। এই ব্যাপারটি সর্ব্বদেশেই একটি আনন্দের বিষয়, সুতরাং সর্ব্বত্রই অবস্থাভেদে ইহা অল্পবিস্তর উৎসবের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই বিবাহ-উৎসবে বর ও কন্যা উভয়েই তাহাদের দেশীয় বা সামাজিক প্রথানুযায়ী বিশিষ্ট পোষাক ও নির্দ্দিষ্ট অলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত হইয়া থাকে। বর অপেক্ষা ক'নের পোষাক সকল স্থানেই মূল্যবান্ ও মনোরম দেখা যায়। প্রায় সকল জাতিদের মধ্যেই বিবাহের পোষাকের একটা বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশের মেয়েদের বিবাহের বিশিষ্ট পোষাক সম্বন্ধে পুরাতন লণ্ডন ম্যাগাজিনে একটি সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে সংক্ষেপে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।
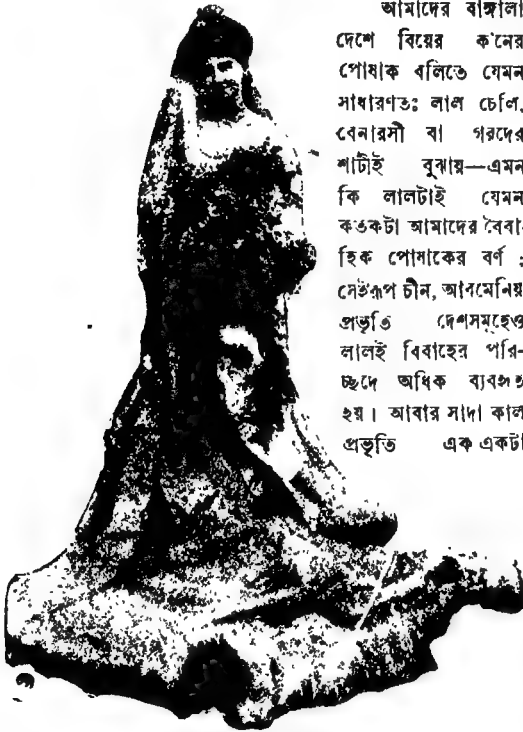
আমাদের বাঙ্গালা দেশে বিয়ের ক'নের পোষাক বলিতে যেমন সাধারণতঃ লাল চেলি, বেনারসী বা গরদের শাটীই বুঝায়—এমন কি লালটাই যেমন কতকটা আমাদের বৈবাহিক পোষাকের বর্ণ ; সেইরূপ চীন, আরমেনিয়া প্রভৃতি দেশসমূহেও লালই বিবাহের পরিচ্ছদে অধিক ব্যবহৃত হয়। আবার সাদা কাল প্রভৃতি এক একটা

ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত-ঘরের ক'নে

নির্দ্দিষ্ট বর্ণও কোন কোন জাতির পোষাকের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এতদ্ভিন্ন আমাদের দেশের ক'নের মস্তকাবরণও পাতি মউরের ন্যায়। অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে।

ইংলণ্ডে বিয়ের ক'নের পোষাক সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণের এবং মাথায় সামান্য ঘোমটার মত একটা আচ্ছাদন থাকে। সেখানে অলঙ্কারের বাহুল্য না থাকিলেও পরিচ্ছদের পারিপাট্য যথেষ্ট আছে। অবস্থাসম্পন্ন লোকের ঘরে প্রায় তুষারধবল শাটীনের সুদৃশ্য পোষাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাউনের দৈর্ঘ্য সাধারণ অপেক্ষা লম্বা আকারের হইয়া থাকে।

আর্মেনিয়া, লিবেনন পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানেও ঘোমটা দিবার ব্যবস্থা আছে। ঘোমটা ছাড়া টুপি ও মুকুট প্রভৃতির মত রকমারি মস্তকাভরণ ও অনেক দেশের কিশোরীর বিবাহকালে শিরঃশোভা বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। নরওয়ে, এস্কিমো ও ড্যানিশ্ ক'নের মস্তকাবরণ কিছু বিচিত্র আকারের। আবার নরওয়ে দেশের কন্যা-সজ্জার মধ্যে আড়ম্বর-পূর্ণ মুকুটই প্রধান উল্লেখযোগ্য। ইহা সাধারণতঃ গীর্জ্জা হইতে ভাড়া করিয়া আনা হয়। ইউরোপের বহু স্থানে বিবাহের সময় যুবতীদের

ইংলণ্ডের নব বধূর মস্তকাবরণ

নরওয়ের ক'নের বিচিত্র মুকুট

লিবেনন দেশের বিচিত্র বিয়ের পোষাক

এসকিমো ক'নে

দিনেমার ক'নের শিরোভূষণ

মুকুট পরিবার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু নরওয়ের মত বিচিত্র গঠিত মুকুট অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। রত্নাদি মণ্ডিত এই মুকুট দেখিতেও যেমন আড়ম্বরপূর্ণ, তথায় উহার সম্মানও তেমনই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেখানে উহাকে 'সতীত্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুকুট' নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

নরওয়ে দেশে যেমন অদ্ভুত মুকুট ব্যবহার হয় পোষাক ও তদুপযোগী চাকচিক্যশালী দেখা যায়। সাদা বা অন্য বর্ণের পরিচ্ছদের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের পোষাকই অধিক ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র বর্ণের ফিতা ও রৌপ্য নির্ম্মিত হার বিয়ের পোষাকের অঙ্গ। তারের পরিবর্ত্তে মদা-গ্রথিত মালাও তাহারা পরিয়া থাকে।

বিবাহার্থে বর কন্যার বাটীতে যাইয়া থাকে। ইহাই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু লিবেনন দেশের প্রথা বিভিন্ন প্রকারের। সেখানে ক'নে তাহার আত্মীয় বন্ধু ও স্বজন সমভিব্যাহারে বরের বাটীতে যাইয়া থাকে। ক'নের দল বরের বাটীর সান্নিধ্যে পৌঁছিলে মাত্র বর পাত্রমিত্র সহ বাটীর বাহিরে আসিয়া তাহাদের সমীপবর্ত্তী হয়। ক'নেদের দলকে অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে নয়, তাহাদের সহিত যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বলিতে পারা যায়। অবশ্য ইহা কপট যুদ্ধ এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই ক'নে জয়লাভ করিয়া বরের বাটীতে প্রবেশ করিয়া থাকে। তৎপরে ক'নেকে সর্ব্বপ্রকারে আদর-যত্নের আর কোন ত্রুটি হয় না।

লিবেননে পাত্রীর বেশভূষা ভালরূপই থাকে। অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য যথেষ্টই দেখা যায়। এখানে যে চিত্র দেওয়া হইল তাহা একটি ক'নের ছবি, কেবল ঘোম্‌টাটি মাথায় নাই।

অধিকাংশ প্রাচ্য দেশ সমূহের ন্যায় মরক্কো দেশে বিবাহের পূর্ব্বে বরের ক'নের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা নাই। অবরোধের প্রথা তথায় এত বেশী, যে শুধু ঘোমটাই ক'নের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সেখানে বিবাহের সময় একপ্রকার বড় বাক্সের মধ্যে করিয়া তাহারা

সুইট্জারল্যাণ্ডের ক'নের বিবাহ-সজ্জা

ইটালি দেশের ক'নের মাথার সাজ

সুইডেনের বা বিহের জাতীয় পোষাক

বরের বাটীতে নীত হইয়া থাকে। সুতরাং বৈবাহিক পোষাকের বৈচিত্র্য দেখিবার সুযোগ সেখানে অপরের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না।

সুইট্জারল্যাণ্ডে সামাজিক ও উৎসবাদির রীতি-নীতির যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা নাই, বিবাহের পোষাক সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপ। তাহা হইলেও সেখানে মেয়েদের বিয়ের পোষাক যে পরিষ্কার তাহা বলিতেই হইবে।

রুমেনিয়া দেশে ক'নের পোষাকের চাকচিক্য কম নহে। তথায় ফুলের মুকুট ও মাথায় ফুলের সাজ; কণ্ঠে রৌপ্যমুদ্রাগ্রথিত মালা অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ড্যানিশ-বধূর পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু না থাকিলেও, তাহার মাথায় শ্বেত বর্ণের অদ্ভুত গঠনের লম্বা টুপি আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। এস্কিমোদের মাথার পোষাকও কিছু স্বতন্ত্রাকারের। ইটালিতেও ক'নের মাথায় অলঙ্কার কিছু রকমারি, নচেৎ অন্যান্য পরিচ্ছদ পরিষ্কার হইলেও তাহাতে নূতনত্ব কিছু থাকে

আল্‌সেস্‌ ও লোরেনের বিবাহ-বেশে কৃষক কন্যা

না। তবে এখানকার মত ইউরোপের অন্য কোথাও মূল্যবান্ ও প্রচুর অলঙ্কারের ব্যবহার দেখা যায় না।

রুশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পোষাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং তাহা তাহাদের সাধারণ নিত্য ব্যবহার্য্য পোষাক অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট এই পর্য্যন্ত। লাল ও সাদা রংটাই তাহারা বিবাহের সময় অধিক পছন্দ করিয়া থাকে।

তুর্কি, ইজিপ্ট, আরব প্রভৃতি যে-সকল দেশে মুসলমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত, সে-সব স্থানে ক'নেকে প্রায় পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একখানি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। অবস্থানুযায়ী সিল্কের পোষাকই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তুর্কিতে ক'নের যাহা কিছু সাজ-সজ্জা বরেরাই দিয়া থাকে।

আরমেনিয়াতে ক'নের পোষাকের মধ্যে রক্তবর্ণ ঘোমটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তথায় একটি বিচিত্রতা আছে। মাথার উপর একখানি রৌপ্যপাত চাপান থাকে, তাহার দুই দিকে পাখীর পালক আচ্ছাদিত দুইখানি পক্ষাকৃতি পেষ্টবোর্ড বিলম্বিত থাকে। চীনদেশেও লালই বৈবাহিক বর্ণ।

ফ্রান্সে বিবাহের সময় যুবতীদের পোষাক প্রায় কৃষ্ণবর্ণের হইয়া থাকে। অন্য বর্ণেরও হইতে পারে তবে তাহা ঘোরাল না হইলেই হইল। জার্ম্মানিতেও কাল সিল্কের পোষাকই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহাকে কুসংস্কার বলে, তাহাদের দেশেও তাহার অভাব নাই। বিবাহের সময় লাল বর্ণের চর্ম্মপাদুকা ক'নের সাজের অন্তর্ভুক্ত। ঐ জুতার মধ্যে যুবতীর পিতামাতা কর্ত্তৃক কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পক্ষীর পালক ও ভিন্ন ভিন্ন পশুর লোম দেওয়া হয়। তাহাদের বিশ্বাস ইহার দ্বারা কয়েক বৎসরের মধ্যে কন্যার সৌভাগ্য উদিত হইয়া থাকে।

ব্যাভেরিয়া প্রদেশে ক'নের কোমরে জার্ম্মান দেশের টালার নামক মুদ্রার মালা পরাইয়া দেওয়া হয়। ইহা মাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে তাহারা পাইয়া থাকে। সুইডেনে জুতার ভিতর একটি রৌপ্য মুদ্রা দেওয়া হয়। ইহার দ্বারা তাহার বিবাহিত জীবনে কখনও অর্থাভাব হয় না, ইহাই তাহাদের ধারণা। ইংলণ্ডে যেমন একটি কথা আছে, যে মেয়ের বিবাহকালে আকাশে সূর্য্য দেখা গেলে, সে সুখী হয়, সেইরূপ সুইডেনে একটি প্রবচন আছে, যে ক'নের মাথার মুকুটে বৃষ্টির জল পড়িলে তাহার সুখ-সৌভাগ্য সূচিত হইয়া থাকে।

শ্রী হরিহর শেঠ

কবীর

কেমন করিয়া স্বরূপ তাঁহার
বুঝাব তোমারে আমি;
রূপ নাই তার বলিব কেমনে,
তিনি যে আমার স্বামী।

'বাহিরের নন'— বলি যদি আমি,
জগৎ লজ্জা পাবে,
'ভিতরে আছেন' বলিলে সে কথা,
কেবা প্রত্যয় যাবে!

ভিতর, বাহির, অচির ও চির—
পাদ ও শীর্ষ তার;
তিনি অগোচর, তিনিই গোচর,
বাক্য মেনেছে হা'র।

জলভরা ঘট জলেতে ডুবায়ে
রেখেছেন যেন তিনি,
ভিতর বাহির জলময় তাঁর,
ভেদ তাই নাহি চিনি।

তিনিই বিশ্ব, তিনিই আবার
বিশ্ব-অধীশ্বর;
নাম ধরি তাঁর ভিন্ন করিয়া,
কে করিবে তাঁরে পর?

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

উপক্রমণিকা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অসির বর্ণনা :—

অসি কিম্বা লাঠি শিক্ষার্থীগণের প্রত্যেকের নিজের দুই হাত আট অঙ্গুলী পরিমাণ লম্বা হইবে। ইহার অধিক বড় হইলে ঘুরাইতে-ফিরাইতে অসুবিধা হইবে এবং সময়ে-সময়ে মাটিতে ঠেকিয়া যাইবে। আবার প্রমাণ অপেক্ষা ছোট হইলেও বিশেষ কার্য্যকারী হইবে না। সুতরাং দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তির পক্ষে যে অসি কিম্বা লাঠি প্রমাণানুরূপ হইবে, তাহা খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে না।

অসির আকৃতি ঠিক্ সরল নহে, কিঞ্চিৎ বক্র; ঠিক্ সরলভাবে দাঁড়াইলে মুষ্টি সহ অসি লম্বভাবে ভূমি হইতে নাভি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হওয়া দরকার। কিন্তু অসির ধারের দিকের বক্রাকৃতি দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করিলে, অসিধারী-গণের নিজ নিজ হাতের দুই হস্ত তের অঙ্গুলী হইবে।

লাঠি কিম্বা অসি মুঠা করিয়া ধরিলে হাতের কানার সঙ্গে অঙ্গুষ্ঠ ব্যতিরেকে চারিটি অঙ্গুলীর যে প্রথম সন্ধি-রেখা হইবে, তাহার পরবর্ত্তী সন্ধিরেখা বরাবর, অর্থাৎ ঐ অঙ্গুলীগুলির তিনটি সন্ধি-রেখার ঠিক্ মধ্য সন্ধিরেখা বরাবর অসির ধারের পিঠ কল্পনা করিতে হইবে, এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্য বরাবর উল্টা পিঠ কল্পনা করিতে হইবে। আঘাত করিবার সময়ে, বিশেষতঃ শিক্ষালাভকালে, আততায়ী কিম্বা প্রতিপক্ষের শরীরে ধারের পিঠ ঠিক্ লক্ষ্য স্থানে পড়িতেছে কি না, সে-বিষয়ে প্রথম হইতেই সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

অসি কিম্বা লাঠি মুঠা করিয়া ধরিলে মুষ্টি ব্যতিরেকে যে-অংশ বাকী থাকিবে, তাহার মুষ্টির দিকে প্রথম অর্দ্ধাংশ শত্রুর আঘাত আটকাইবার নিমিত্ত ব্যবহার করিতে হইবে, যেন শত্রুর আঘাত নিজ লাঠির কিম্বা অসির ঐ অংশ মধ্যেই পতিত হয়। তবে হাঁটুর নীচের দিকের আঘাতগুলি সম্বন্ধে কদাচিৎ বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

মুষ্টির নিকটবর্ত্তী অংশের আঘাত বিশেষ কার্য্যকারী হয় না, সুতরাং ঐ অংশের ধার নষ্ট হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না; আবার ঐ অংশের প্রতিবন্ধকতা দেওয়ার ক্ষমতাও অনেক অধিক,—মুষ্টির নিকটবর্ত্তী অংশে অতি-গুরু আঘাত পতিত হইলেও হাতের মুঠা ঠিক্ ভাবে ধরা থাকিলে নিজ লাঠি বিশেষ কিছুই বিচলিত হয় না।

অসির পূর্ব্বকথিত অর্দ্ধাংশের পরবর্ত্তী যে-অংশ বাকী রহিল, তাহার প্রথম অর্দ্ধাংশ, অর্থাৎ মুষ্টি ব্যতিরেকে অসির অগ্রভাগের চতুর্থাংশ ও মুষ্টির নিকটবর্ত্তী অর্দ্ধাংশের মধ্যবর্ত্তী যে-চতুর্থাংশ, তাহা দ্বারাই প্রতিপক্ষ কিম্বা আততায়ীকে আঘাত করিতে হইবে; কারণ ঐ-অংশটুকুরই কার্য্যকারী আঘাত করিবার ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

যেরূপ ক্রিকেট্ কিম্বা ডাংগুলী খেলার সময় দেখা যায় যে-আঘাত ব্যাট্ কিম্বা দণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা সম্পন্ন হয় তাহার ফলে সাধারণত আহত পদার্থ ঊর্দ্ধে উঠিয়া নিকটেই পতিত হয় (কট্ উঠে ও অধিক দূরে যায় না), সেইরূপ, যে-আঘাত মুষ্টির নিকটবর্ত্তী অংশ দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহার ফলে হাতে ঝাঁঝ লাগে এবং আহত পদার্থ একেবারেই দূরে যায় না। কিন্তু পূর্ব্বকথিত মধ্যবর্ত্তী চতুর্থাংশ দ্বারা যে-আঘাত সম্পন্ন হয়, তাহার ফলে অল্প আয়াসেই আহত পদার্থ বহু দূরে চলিয়া যায়। যে কোনও বিশিষ্ট সরল দণ্ডের ঐ নিরূপিত মধ্যবর্ত্তী চতুর্থাংশের কোন বিশেষ স্থানকেই পদার্থ-বিজ্ঞানে "দোলনকেন্দ্র" (centre of oscillation) বলিয়া থাকে। ঐ স্থানের কার্য্যকারিতা বিজ্ঞানে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

প্রতিপক্ষকে আঘাত করিবার সময়, সে (প্রতিপক্ষ) তাহার লাঠি কিম্বা অসি কিভাবে ধারণ করিবে শিক্ষার্থী-আঘাতকারী তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিবে না; প্রতিপক্ষ ঠিক্‌ভাবে তাহার লাঠি কিম্বা অসি ধারণ না করিলে, কিম্বা আঘাতকারীর আঘাত আট্‌কাইতে না পারিলে, আঘাতকারীর অসির কিম্বা লাঠির ঐ নিরূপিত মধ্যবর্ত্তী চতুর্থাংশ ও ধারের পিঠ ঠিক্ যেন প্রতিপক্ষের শরীরের প্রকৃত লক্ষ্য স্থানে পতিত হয়। আঘাত ঠিক্-ঠিক্-ভাবে পতিত হইলে এবং প্রতিপক্ষ ঠিক্-ভাবে আট্‌কাইতে পারিলে, উভয়ের লাঠি কিম্বা অসির, পরস্পরে উভয়ের মুষ্টির সন্নিকটবর্ত্তী অংশেই সংঘর্ষ হইবে; সুতরাং কাহারও ধারের অংশ নষ্ট হইবে না।

অসির আকৃতি সম্পূর্ণ সরল নয়, মুষ্টির দিকের অর্দ্ধাংশ অতি সামান্য রকমে ক্রমে বক্র হইয়া থাকে, মধ্যবর্ত্তী চতুর্থাংশ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিক বক্র এবং অগ্রভাগের চতুর্থাংশ আরও কিঞ্চিৎ অধিক বক্র। অগ্রভাগের চতুর্থাংশের উভয় দিকেই ধার থাকে; এই অংশ দ্বারা "হুল্", "চির্" প্রভৃতির আঘাত করিতে হয়, এবং আততায়ীর শরীরের মধ্যে অসি ঢুকাইয়া দিতে সুবিধা হয়, অথবা উল্টা পিঠ দিয়া পায়ুমূলের মধ্য বরাবর উপরদিকে আততায়ীর শরীর চিরিয়া ফেলা যায়, কিম্বা সম্মুখ হইতেই আততায়ীর গলার পিছন দিক্ কাটিয়া ফেলা যায়। নিম্নে মুষ্টি সহ অসির এক চিত্র দেওয়া গেল :—মুষ্টির নিকটবর্ত্তী অংশের স্থূলতা ও প্রস্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে এবং অগ্রভাগের দিকে ক্রমেই সরু হইয়া আসিবে। অসিটি এরূপভাবে নির্ম্মিত হইবে যেন মুষ্টি সহ অসির ভারকেন্দ্র (centre of gravity) মুষ্টির নিকটবর্ত্তী অর্দ্ধাংশের ঠিক্ মধ্যদেশে পতিত হয়।
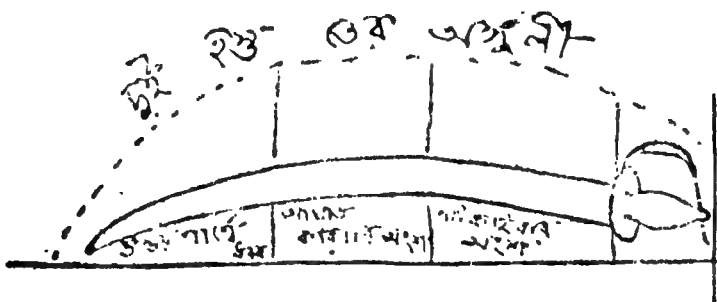
দুই হাত আট অঙ্গুলী
অসি

অসিমুষ্টি :—

অসিমুষ্টির আকৃতির উপরেও অসির কার্য্যকারিতা যথেষ্ট নির্ভর করে। মুষ্টিও অসিধারীর হস্তের ঠিক্ পরিমাপ অনুযায়ীই হওয়া দরকার। সাধারণতঃ অসিমুষ্টি ছয় অঙ্গুলী দীর্ঘ হইয়া থাকে। মুষ্টির ধরিবার স্থানটি দৈর্ঘ্যে তর্জ্জনীর হস্ত-সন্ধির উপরের দিক্ হইতে কনিষ্ঠার হস্ত-সন্ধির নিম্ন পর্য্যন্ত হইবে; এবং ঐ-স্থানটি আকৃতিতে প্রায় বাদামের মত হইবে। যে-অংশটি কনিষ্ঠাঙ্গুলী-সংলগ্ন থাকিবে, তাহার স্থূলতা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইবে, যে-অংশ তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলী-সংলগ্ন থাকিবে তাহা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক স্থূল হইবে, যে-অংশ মধ্যাঙ্গুলী-সংলগ্ন থাকিবে তাহার স্থূলতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ব্যতিরেকে অন্য চারিটি অঙ্গুলী এক সঙ্গে বক্র করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের হস্তসন্ধিস্থলের নিম্নাংশে সংলগ্ন করিলে, ঐ-স্থানে প্রত্যেক অঙ্গুলী-সংলগ্ন স্থান হইতে সেই-সেই অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যের পরিমাপ লইয়াই, বিভিন্ন অসিধারী ব্যক্তির নিজ নিজ অসিমুষ্টির বিভিন্ন স্থানের স্থূলতার নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে। বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে এবং বিশুদ্ধ পরিমাপ অনুসারে অসি ও অসিমুষ্টি প্রস্তুত হইলে এবং ভারকেন্দ্র ও দোলনকেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে পতিত হইলে অসিধারী ব্যক্তির অসিচালনাতে আয়াস না হইয়া বরং আরাম ও আনন্দ অনুভব হইবে, এবং ক্রমে অসিমুষ্টি হস্তের সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হইয়া থাকিবে যে অসিকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া মনে না হইয়া হস্তেরই অংশ বলিয়া মনে হইবে।

দ্রবীভূত লাক্ষার সঙ্গে সূক্ষ্ম বালুকা কিম্বা সূক্ষ্ম প্রস্তর চূর্ণ উত্তমরূপে মিলিত করিয়া অসিমুষ্টির শূন্যগর্ভে প্রবেশ করাইয়া অসির গোড়ার অতিরিক্ত অংশটুকু ঢুকাইয়া ভাল করিয়া আঁটিয়া দিলেই অসি ও মুষ্টি অনেক দিন পর্য্যন্ত পরস্পর দৃঢ়-সংলগ্ন থাকে। অসির দৃঢ়তা-সম্পর্কে উৎকর্ষ

সম্পন্ন করিয়া অসিকে ওজনে যত লঘু করা যাইবে, অসিধারী ব্যক্তির পক্ষে অসি ততই আনন্দদায়ক হইবে।

অসির গতি :—

হস্তের বিভিন্নরূপ গতি হইতেই অসি কিম্বা লাঠির বিভিন্নরূপ গতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লাঠি কিম্বা অসির যে-গতি হস্তের কব্জির মণিবন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে "গর্‌দেশ" (বৃত্তগতি) বলে। গর্‌দেশের আঘাতে কব্জিকে কেন্দ্র করিয়া লাঠি কিম্বা অসি চক্রাকারে ঘুরিয়া আইসে। এইরূপ আঘাতে হস্তের অন্য দুই সন্ধির বিশেষ ক্রিয়া হয় না।

লাঠি কিম্বা অসির যে-গতি কনুইএর সন্ধি হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে "জার্ব্ব" (জোর-জবর) বলে ; জার্ব্বের আঘাতের গুরুত্ব সাধারণতঃ জোর ও ভারের উপরেই নির্ভর করে, গতির উপরে ততটা নয়।

লাঠি কিম্বা অসির যে-গতি স্কন্ধদেশ হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে "তরাস" (ত্রাস) বলে। তরাসের আঘাতে সাপ্‌টা ও টানা বাড়ি উৎপন্ন হয় (sweeping stroke)।

ক্রীড়াকালে, কিম্বা আততায়ী-সংঘর্ষে এইরূপ খুব কমই হইয়া থাকে যে, শুধু একটি মাত্র সন্ধির ক্রিয়া হয় ও অপর দুইটি সন্ধি নিষ্ক্রিয় থাকে ; তবে আঘাতটি প্রধানতঃ হস্তের যে-সন্ধি হইতে উৎপন্ন হয়, তদনুযায়ীই আঘাতটির নাম হইয়া থাকে। যেমন মাথার উপর সাপ্‌টা বাড়ি মারিবার সময় হস্তকে উচ্চে তুলিবার ও নিম্নে নামাইবার নিমিত্ত স্কন্ধদেশের সন্ধির ক্রিয়া হইলেও কনুইদেশের সন্ধি হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আঘাতটি সম্পন্ন হয় বলিয়া উহাকে জার্ব্বের বাড়িই বলা হয়।

শিক্ষার সময় প্রত্যেকটি আঘাত প্রয়োগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ মনোযোগ-সহকারে লক্ষ্য করিয়া, কোন্‌টি গর্‌দেশের, কোনটি জার্ব্বের ও কোনটি তরাসের বাড়ি তাহার নির্ণয়, পর্য্যালোচনা ও অনুশীলন করিয়া যাইতে হইবে। এ-বিষয়ে প্রথম হইতে সম্যক্ জ্ঞান না জন্মিলে, "ছুট্‌" খেলিবার সময় কিম্বা প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রকৃত-শক্তি-পরীক্ষায়, অথবা প্রকৃত আততায়ীর সঙ্গে সংঘর্ষকালে নিঃশঙ্করূপে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ করিতে পারা যাইবে না।

যেমন অসির আঘাত তিন প্রকার,—যথা, গর্‌দেশ, জার্ব্ব ও তরাস, সেইরূপ সর্পের দংশনও তিন প্রকার,—যথা, ছোল্, টিপ্ ও টান্। আবার সর্পের বিষ-দাঁতের সঙ্গে শরীরের সংস্পর্শ হইলে সাধারণতঃ যেরূপ আর রক্ষা থাকে না, সেইরূপ বিশেষভাবে অসির তীক্ষ্ণ ধারের সঙ্গে শরীরের সংস্পর্শ হইলেও সাধারণতঃ ত্রাণ পাওয়া যায় না। সেইজন্যই সর্পদংশনের সঙ্গে অসির আঘাতের তুলনা হইয়া থাকে।

সর্পের বিষ-দাঁত অন্যান্য দন্তগুলি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। অধিকাংশ সর্পেরই বিষ-দাঁতের মধ্যভাগের উভয় পার্শ্বে দুইটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, সেই হেতুই ফণাধারী বিষাক্ত সর্পগণ আঘাত করিবার কালে মস্তক পার্শ্বের দিকে হেলাইয়া দেয় ; তাহাতে বিষ বিষরন্ধ্র হইতে নির্গত হইয়া দাঁত বাহিয়া পড়িতে থাকে।

সর্পের বিষ-দাঁতের অগ্রভাগের সঙ্গে সংস্পর্শ হওয়া মাত্রই যদি তাড়াতাড়ি শরীর সরাইয়া লওয়া যায়, তবে শরীরে সামান্য একটি আঁচড় লাগিবে মাত্র, এবং সাধারণতঃ বিষরন্ধ্র হইতে বিষ গড়াইয়া আসিয়া রক্তের সঙ্গে মিশিতে অবসর পাইবে না। এরূপ আঘাত সাধারণতঃ সাংঘাতিক হয় না।

সর্পের যে-দংশনে বিষ-দাঁতটি সম্পূর্ণ শরীরের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে "টিপ্" বলে। এইপ্রকার দংশনে সাধারণতঃ রক্ষা পাওয়া যায় না। কারণ, এরূপ দংশনে ক্ষতও অধিক হয় এবং বিষও অধিক পরিমাণে শরীরে প্রবিষ্ট হয়।

যে-প্রকার দংশনে বিষ-দাঁতের কিয়দংশ মাত্র শরীরে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু বিষরন্ধ্র প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই কোনরূপে সর্পের মস্তক কিম্বা শরীর অপসারিত করা যায়, সে-প্রকার দংশনকে "টান্" বলে তাহাতে শরীরে একটি দাগ পড়ে মাত্র ও সামান্য রক্ত বাহির হয়। এইপ্রকার দংশনে কোন কোন অবস্থায় মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, আবার কখনও কখনও পাওয়া যায় না।

সর্পের যে-দংশন সর্ব্বাপেক্ষা কম সাংঘাতিক অর্থাৎ "ছোল্", তৎসদৃশ অসির আঘাত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

গুরুতর, কারণ গরদেশের আঘাতে অসি যেরূপ বিদ্যুৎ-গতিতে ধাবিত হইয়া থাকে, অন্য দুইপ্রকার আঘাতে সেরূপ হয় না। অসির আঘাতের তীব্রতা দ্রুতগতির উপরেই অধিক নির্ভর করে।

তীক্ষ্ণ অসির দ্রুতগতি দ্বারাই অতীব গুরুতর ও আপাত-অসম্ভব কর্ম্মও সাধিত হইয়া থাকে, শারীরিক শক্তির অধিক প্রয়োজন হয় না। অসিখানা আরামের সহিত উঠাইতে-নামাইতে ও নাড়িতে-চাড়িতে যে সামান্য শক্তির প্রয়োজন, তাহাই যথেষ্ট; তবে শারীরিক দৃঢ়তা, কষ্টসহিষ্ণুতা, স্থৈর্য্য ও ক্ষিপ্রকারিতারও যথেষ্ট প্রয়োজন।

প্রবল ঝটিকার দ্রুতগতির ব্যতিরেকে অন্য কোনও শক্তি নাই, তথাপি উহা বড় বড় গৃহবৃক্ষাদিও ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে সমর্থ হয়। শুনা গিয়াছে কোনও ঘূর্ণীপাক প্রবল ঝটিকাতে দীর্ঘ একটি বংশ-শলাকা একটি প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষকে ভেদ করিয়া এপিঠ-ওপিঠ হইয়া গিয়াছিল। শলাকাটির অগ্রমুখ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় থাকিলে ইহা অসম্ভব নয়, কারণ আম্রবৃক্ষের ভিতরে জোর করিয়া শলাকাটিকে বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে উহা আম্রবৃক্ষকে যে-আঘাত করিবে, ঘাত-প্রতিঘাতের নিয়মানুসারে আম্রবৃক্ষও সমশক্তি দ্বারা শলাকাটিকে বিপরীত দিকে আঘাত করিবে। সে-আঘাতের ফলেই সাধারণ অবস্থায় আম্রবৃক্ষকে ভেদ করিতে যে-সময় লাগিবে, সে-সময়ের মধ্যে শলাকাটি বাঁকিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু ঝটিকার প্রবল দ্রুতগতি হেতু শলাকাটি এত বিদ্যুৎ-বেগে চলিয়াছিল, যে, আম্রবৃক্ষ শলাকাটিকে বাঁকাইয়া ভাঙ্গিবার অবসর পাওয়ার পূর্ব্বেই শলাকাটি বৃক্ষকে ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। শলাকাটির কোনও অংশ অবসন্ন হওয়ার পূর্ব্বেই দ্রুতগতিনিবন্ধন অন্যান্য অংশের দৃঢ়তা আসিয়া উপর্য্যুপরিভাবে সেই-অংশকে সাহায্য করিয়াছিল। পদার্থবিজ্ঞানে এই-ব্যাপারকে ক্ষুদ্র শক্তির সমবায় (superposition of small effects) কহিয়া থাকে। গরদেশের আঘাতের কার্য্যকারিতাও এইরূপ।

সর্পের যে-দংশন সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক, অর্থাৎ "টিপ্", তৎসদৃশ অসির আঘাত, অর্থাৎ "জার্ব্ব", অন্য দুইপ্রকার আঘাত হইতে অপেক্ষাকৃত কম সাংঘাতিক, কারণ জার্ব্বের আঘাতে সাধারণতঃ হাতের জোর ও অসির ভারে যতদূর সম্ভব, ততদূরই প্রতিপক্ষের শরীরে অসি প্রবিষ্ট হইবে, পরন্তু প্রতিপক্ষের শরীর হইতে অসি আপনা হইতে মুক্ত হইয়াও আসিবে না; মুক্ত করিতেও অতিরিক্ত জোরের প্রয়োজন হইবে। সেই হেতু, এবং প্রতিপক্ষ জার্ব্বের আঘাত আট্‌কাইয়া ফেলিলে, পুনরায় অপর আঘাত করিতে কিম্বা প্রতিপক্ষের আঘাত আট্‌কাইতে অনেক বিলম্ব হইবে।

বহুলোকের মধ্যে পতিত হইয়া সংগ্রাম কিম্বা আত্মরক্ষা করিতে হইলে "তরাসের" আঘাত বিশেষ কার্য্যকারী ও প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। ঐ-অবস্থায় যখনই যাহাকে যে-আঘাত করিতে হইবে, তাহা অবস্থানুসারে "গরদেশ" কিম্বা "জার্ব্বে" আরম্ভ করিয়া "তরাসে" টানিয়া আনিয়া তৎক্ষণাৎই অপর একটি আঘাতের আয়োজনসহকারে সংগ্রামে রত থাকিতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়।

আততায়ীর সঙ্গে ক্রীড়াকালে আততায়ীকে কত অধিক আঘাত করা হইল, সে-বিষয়ে অধিক মনোযোগ অপেক্ষা আততায়ীর সমস্ত আঘাতই প্রতিহত করিতে পারা গেল কি না, সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ ঠিক্ রাখিয়া সুযোগ-অনুসারে আততায়ীকে আঘাতের চেষ্টা দেখাই শ্রেয়স্কর। আক্রমণ অপেক্ষা আত্মরক্ষাই অধিক প্রয়োজনীয়; কারণ আততায়ীকে সহস্র আঘাত করিয়াও যদি তাহার একটি বিশেষ আঘাত সাম্‌লাইতে না পারা যায়, তবেই সর্ব্বনাশ হইবে। তবে শিক্ষায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে অনেক সময়েই আত্মরক্ষা-হেতুই আক্রমণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তথাপি শিক্ষালাভকালে আক্রমণের কৌশল অপেক্ষা আত্মরক্ষার কৌশলের প্রতিই বিশেষ গুরুতর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সমস্ত বিষয় ব্যাপার ও সমস্ত কার্য্যকর্ম্মেই আত্মরক্ষার ক্ষমতা না থাকিলে আপদ্-বিপদ্ ও ভয়-বাধা-বিঘ্ন হেতু অচিরকাল মধ্যেই বিনাশ-প্রাপ্ত কিম্বা অপরের নিগ্রহানুগ্রহভাজন হইয়া থাকিতে হয়।

আত্মরক্ষা হেতু প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার :—

প্রথমতঃ—হাতের মুঠি হইতে অসির অর্দ্ধাংশের ঠিক্ মধ্যভাগ দ্বারাই প্রতিপক্ষের আঘাত আট্‌কাইতে হইবে। এবিষয়ের আবশ্যকতা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—প্রতিপক্ষের আঘাত আট্‌কাইবার জন্য নিজ অসি কিম্বা লাঠি সর্ব্বদা শরীর হইতে অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে রাখিতে হইবে, অর্থাৎ নাসিকাগ্র ও পুরোবর্ত্তী পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ সংলগ্ন করিলে যে-সরলরেখা হইবে, বক্ষস্থলের সমান্তরালভাবে, দক্ষিণে, বামে, উর্দ্ধে কিম্বা সম্মুখে সেই-রেখার সমসূত্রের অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে অসি কিম্বা লাঠির মুষ্টি ধারণ করিতে হইবে, এবং অসি কিম্বা লাঠি সর্ব্বদা বক্ষস্থলের সমান্তরাল থাকিবে।

প্রতিপক্ষের আঘাত উর্দ্ধদিক্ হইতে আসিতে থাকিলে যে-স্থান লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, অসি কিম্বা লাঠির মুষ্টির দিকের অর্দ্ধাংশের মধ্যবিন্দু সেই স্থানের অর্দ্ধহস্ত উর্দ্ধে থাকিবে, এবং মুষ্টি ও সমগ্র অসি কিম্বা লাঠি পূর্ব্বকথিত রেখার সমসূত্রের অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে বক্ষের সমান্তরালভাবে থাকিবে।

এইরূপ নিম্ন হইতে আঘাত আসিতে থাকিলে, পূর্ব্ব কথিত মধ্যবিন্দু লক্ষ্যস্থানের অর্দ্ধহস্ত নিম্নে ও সমগ্র অসি পূর্ব্বকথিত রেখার সমসূত্রের অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে বক্ষের সমান্তরালভাবে থাকিবে।

ঐরূপ কোনও পার্শ্ব হইতে আঘাত আসিতে থাকিলে, পূর্ব্বকথিত মধ্যবিন্দু লক্ষ্যস্থানের সেই-পার্শ্বের দিকে অর্দ্ধহস্ত দূরে এবং সমগ্র অসি পূর্ব্বকথিত রেখার সমসূত্রের অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে বক্ষের সমান্তরালভাবে থাকিবে।

কারণ, প্রতিপক্ষের আঘাত আট্‌কাইবার নিমিত্ত অসি কিম্বা লাঠি এইভাবে ধরিলে ইচ্ছানুসারে হস্তকে জোরে সম্মুখে ঠেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং প্রয়োজন মত সঙ্কুচিতও করা যাইতে পারে। কিন্তু হস্ত সম্পূর্ণ বিস্তৃত করিয়া অসি কিম্বা লাঠি ধরিতে গেলে হস্তের সমস্ত শক্তি পূর্ব্বেই প্রযুক্ত হইয়া যায়, আর ইচ্ছানুসারে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা থাকে না, কেবলমাত্র ভিতরের দিকে সঙ্কুচিত করা যায়; এইরূপে সঙ্কুচিত করিলে অধিকাংশ সময়েই শত্রুর আঘাতের তীব্রতা হেতু নিজ হস্তের অসি কিম্বা লাঠি নিজ শরীরেই পতিত হয়; আবার একেবারে শরীরের সহিত সংলগ্ন করিয়া ধরিলেও প্রতিপক্ষের আঘাত অতি সামান্যমাত্রই প্রতিহত হইবে।

তৃতীয়তঃ—প্রতিপক্ষ কোনও স্থান লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিতে আরম্ভ করিলে, সেই-লক্ষ্যস্থান ও প্রতিপক্ষের লাঠির কিম্বা অসির মধ্যে যে-কোনরূপে নিজ লাঠি কিম্বা অসি ধারণ করিলে প্রতিপক্ষের আঘাত আট্‌কাইবে বটে, কিন্তু ঠিক্ ভাবে ধারণ না করিলে, প্রতিপক্ষের আঘাত ঠিক্ লক্ষ্যস্থানে পতিত না হইলেও ফস্‌কাইয়া যাইয়া অন্য কোনও স্থানে পতিত হইতে পারে; তাহাতে কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা হইবে না। সুতরাং অসি কিম্বা লাঠি এমনভাবে ধরিতে হইবে, যে, প্রতিপক্ষের আঘাত কোনরূপেই নিজ-শরীরের কোনও স্থানে পতিত হইতে না পারে। এইরূপ করিতে হইলে একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

যেমন রবারের কিম্বা অন্য কোনও জিনিসের গোলা (ball) ঠিক্ লম্বভাবে উর্দ্ধ দিক হইতে ভূমিতে আঘাত করিলে প্রতিঘাত হেতু ঠিক্ লম্বভাবেই যে-পথে পড়িয়াছিল সে পথেই ফিরিয়া উঠিবে, কিন্তু একটু বক্রভাবে ভূমিতে পড়িলে বক্রভাবেই বিপরীত দিক্ বরাবর চলিয়া যাইবে, সেইরূপ প্রতিপক্ষের আঘাত যে দিক্ বরাবর আসিতেছে, সেই দিকের সহিত নিজ লাঠি কিম্বা অসি ঠিক "সমকোণ" করিয়া ধরিলে প্রতিপক্ষের অসি কিম্বা লাঠি কোন দিকেই ফস্‌কাইতে পারিবে না। নিজের হাত ও অসি কিম্বা লাঠি ঠিক্‌ভাবে ধারণ করিয়া থাকিতে পারিলে, প্রতিপক্ষের অসি কিম্বা লাঠি যে-পথে আসিতেছিল প্রতিঘাত-হেতু, হয় সে-পথেই ফিরিয়া যাইবে, নতুবা নিজ লাঠির যে-স্থানে প্রতিপক্ষের আঘাত পতিত হইবে, সেই স্থানেই ঠিক্ থাকিবে।

প্রতিপক্ষের লাঠি কিম্বা অসির সহিত সমকোণ করিয়া ধরিলে অনেক সময়েই নিজ লাঠি কিম্বা অসি নিম্নমুখ হইয়া থাকিবে, এমতাবস্থায় প্রশ্ন হইতে পারে

যে নিজ লাঠি কিম্বা অসি ঢালু থাকার গতিকে তদুপরি প্রতিপক্ষের অসি কিম্বা লাঠি পড়িয়া ঐ ঢাল দিয়া গড়াইয়া শরীরের অন্য স্থানে যাইয়া লাগিতে পারে;—কিন্তু এরূপ হইতে পারে না। কারণ মুক্ত ও ভারী পদার্থই কোনও ঢালুর উপর লম্বভাবে পতিত হইয়াও গড়াইয়া পড়িয়া যায়; ক্রীড়াকালে অসি কিম্বা লাঠি হস্তের সঙ্গে দৃঢ়রূপে সংযুক্ত থাকে, কাজেই মুক্ত পদার্থের ন্যায় গড়াইয়া পড়িতে পারে না; আবার লাঠি কিম্বা অসির আঘাত এত দ্রুতগতিতে চলিয়া থাকে, যে, তাহার তুলনায় লাঠি কিম্বা অসির ওজন হেতু বেগ এত ক্ষুদ্র যে, তাহাতে নিম্নদিকে ফস্‌কাইয়া যাইবারও ভাব একেবারে থাকিতে পারে না।

এইসমস্ত বিষয়গুলি প্রথমশিক্ষার্থীগণকে শিক্ষকগণের লাঠি ইত্যাদি সহযোগে প্রত্যক্ষভাবে কার্য্যতঃ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া দরকার।

ঠাট্‌ (দাঁড়াইবার ভঙ্গী)

শিক্ষালাভকালে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সম্মুখভাবে প্রমাণ এক লাঠির দূরত্বে, অর্থাৎ দুই হস্ত আট অঙ্গুলী দূরে দাঁড়াইতে হইবে। একটি প্রমাণ লাঠি ভূমিতে রাখিয়া ঐ-লাঠির প্রান্তদ্বয়ে উভয়ের দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দিকের পার্শ্বদেশ ঐ-লাঠির সঙ্গে এক সরলরেখাতে রাখিতে হইবে; তৎপরে উভয়ের বাম পদ দক্ষিণ পদের সমান্তরালভাবে দক্ষিণ পদ হইতে চারি অঙ্গুলী ব্যবধানে রাখিয়া বাম পদ সরলভাবে পিছন দিকে লইয়া যাইয়া, দক্ষিণ হাটু এমনভাবে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, যেন, দক্ষিণ জঙ্ঘা ভূমির উপর ঠিক লম্বভাবে থাকে। তৎপর উভয়ের বক্ষস্থল ঠিক্ সমান্তরালভাবে অগ্রসর করাইয়া দিতে হইবে, যেন নিজ নিজ দক্ষিণ স্কন্ধ ও দক্ষিণ হাটু লম্বভাবে এক সরলরেখাতে থাকে। তৎপর বাম পদ পিছন দিকে এমন ভাবে স্থাপন করিতে হইবে যেন মস্তক, সমস্ত শরীর ও সমগ্র বাম উরু, জানু ও জঙ্ঘা এক সরলরেখাতে থাকে এবং বাম জঙ্ঘা ভূমির সঙ্গে উপর দিকে এক সমকোণের আনুমানিক ১/২ অংশ কোণ করিয়া থাকে। তৎপর কোমরের উপর ভর করিয়া বক্ষস্থল ও গ্রীবাদেশ দৃঢ় করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। সে-অবস্থায় বাম পদ সহ শরীরটি সম্মুখের দিকে ধনুকের ন্যায় ঈষৎ বক্রাকৃতি হইবে এবং দক্ষিণ জঙ্ঘা সম্মুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িবে. তখন দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী, দক্ষিণ হাটু ও নাসিকাগ্র লম্বভাবে এক সরলরেখাতে থাকিবে। সে সময়ে নিজ পদদ্বয়ের পাতার বৃদ্ধাঙ্গুলীর দিকের পার্শ্ব বরাবর দুইটি সরলরেখা কল্পনা করিয়া বর্দ্ধিত করিলে ঐ সরলরেখাদ্বয় অর্দ্ধ-সমকোণ-ব্যবধানে মিলিত হইবে; সেইহেতু বামপদের অগ্রভাগ ঈষৎ বাম দিকে ঘুরিয়া যাইবে।

চক্ষু সর্ব্বদা প্রতিপক্ষের চক্ষুর উপরে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিয়া রাখিতে হইবে, তবেই উভয়ের সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপ চক্ষুতে-চক্ষুতে প্রতিফলিত হইয়া মন ও বুদ্ধিকে সতর্ক করিয়া দিবে।

ক্রীড়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বাম হস্ত কনুই হইতে পিছন দিকে কোমরে সংলগ্ন থাকিবে, তাহাতে বাম স্কন্ধ বক্রভাবে দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে ঈষৎমাত্র পিছনে থাকিবে। দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে ভূমিতে লম্বরেখার সমসূত্রে কোমরের অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখে থাকিবে, এবং লাঠি কিম্বা অসি বক্ষস্থলের সমান্তরালভাবে থাকিবে, ও অসির অগ্রবিন্দু বামকর্ণের সমসূত্রে বাম দিকে অর্দ্ধ হস্ত দূরে থাকিবে।

এইভাবে লাঠি কিম্বা অসি ধরাকে একাঙ্গের "কেল্লাবন্দী" বলে। এইভাবে অসি কিম্বা লাঠি ধরিলে সকল দিকেই সমানভাবে চালনা করিবার সমান সুবিধা থাকে।

এই পদ্ধতিতে দাঁড়াইবার ভঙ্গীকে "একাঙ্গের ঠাটু" বলে।

বাম হস্তে অভ্যাস করিবার সময় বাম পদ অগ্রে থাকিবে এবং উল্লিখিত বর্ণনা মধ্যে "বাম" শব্দ স্থলে "দক্ষিণ" এবং "দক্ষিণ' শব্দস্থলে "বাম" ধরিয়া লইলেই হইবে।

ক্রীড়াকালে কদাপি যেন মুখ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস চালিত না হয়, পরিধেয় বসন (প্যাণ্ট্‌, ল্যাঙ্গোট, ধুতি, যাহাই হউক না কেন) যেন সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে, অথচ

যেন অতি দৃঢ় না হয়; যেন অণ্ডকোষ ও মূত্রনালী দৃঢ়ভাবে অবস্থিত থাকে, অথচ যেন কোনরূপ আবদ্ধতা কিম্বা বন্ধনের তীব্রতা অনুভূত না হয়।

নিম্নে "একাঙ্গ ঠাটের" একটি চিত্র দেওয়া গেল।

একাঙ্গের ঠাট

এইরূপ দাঁড়াইতে প্রথমতঃ একটু কষ্ট বোধ হইবে বটে, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা এরূপ করিতে হইবে যেন, সমস্ত দিন এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলেও কষ্ট অনুভব না হয়।—

"শরীরের নাম মহাশয়,
যা সহাবে তাই সয়।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

যেমন ঘর বাড়ী দালান প্রভৃতির ভিত্তি দৃঢ় না হইলে তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, সেইরূপ দাঁড়াইবার পদ্ধতি দৃঢ় ও শুদ্ধ না হইলে অধিক সময় প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা যায় না। সেই হেতু প্রথম হইতেই দাঁড়াইবার পদ্ধতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্তই দরকার।

দাঁড়াইবার পদ্ধতি সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার, যথা—একাঙ্গ, দোয়াঙ্গ, পাখ্‌রী, রাউটী ও গোমুখ্‌। এতৎ-সম্পর্কে একটি চিত্র দেওয়া গেল। **"একাঙ্গ ঠাটে"** দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ ও বাম পদের গোড়ালীর দূরত্ব পিছন দিকে লম্বভাবে প্রায় দুই হস্ত, এবং পার্শ্বের দিকে লম্বভাবে চারি অঙ্গুলী হইবে।

এক হস্তে অসি কিম্বা লাঠি ও অপর হস্ত নিষ্ক্রিয় থাকিলে "একাঙ্গ্‌ ঠাট" প্রশস্ত।

"দোয়াঙ্গ ঠাটে" দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ ও বামপদের গোড়ালীর দূরত্ব পিছন দিকে লম্বভাবে এক হস্ত বিশ অঙ্গুলীর এবং পার্শ্বের দিকে লম্বভাবে অর্দ্ধহস্ত হইবে।

এক হস্তে অসি কিম্বা লাঠি এবং অপর হস্তে শৃঙ্গ লইয়া ক্রীড়া কালে "দোয়াঙ্গ্‌ ঠাট্‌" প্রশস্ত।

"পাখ্‌রী ঠাটে" উভয় পদের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের দূরত্ব পিছন দিকে লম্বভাবে সাধারণতঃ এক হস্ত, এবং পার্শ্বের দিকে এক হস্ত চারি অঙ্গুলী হইয়া থাকে। পাখ্‌রী ঠাটে বাম পদ অঙ্গুলীর উপরে ভর করিয়া থাকে এবং প্রয়োজনমত বাম পদ স্থান পরিবর্ত্তনও করিয়া থাকে, সময় সময় পিছন দিক্‌ দিয়া দক্ষিণ পদেরও দক্ষিণে চলিয়া যায়।

উভয় হস্তে লাঠি কিম্বা অসি লইয়া ক্রীড়াকালে "পাখ্‌রী ঠাট্‌"ই প্রশস্ত।

"রাউটী ঠাটে" উভয় পদের অঙ্গুষ্ঠ দ্বয়ের দূরত্ব পিছন দিকে লম্বভাবে অর্দ্ধ হস্ত হইয়া থাকে এবং পার্শ্বের দিকে এক হস্ত দশ অঙ্গুলী হইয়া থাকে।

"রাউটী ঠাটে" বাম পদের স্থান নির্দ্দেশ অবস্থানুসারে পিছন দিকে ও দক্ষিণ পদের স্থান নির্দ্দেশ সম্মুখের দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রীড়ায় রত হইতে হইলে, "রাউটী ঠাট্‌"ই প্রশস্ত।

"গোমুখ্‌ ঠাটে" উভয় পদের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংযোগ করিলে যে সরলরেখা হইবে, তাহা নিজ বক্ষস্থলের সম-সূত্রের সমান্তরাল হইবে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের দূরত্ব দেড় হস্ত দুই অঙ্গুলী হইবে।

বহু আততায়ীর মধ্যে পতিত হইলে, এবং চতুর্দ্দিকে

বিভিন্ন ঠাট

ধারণ করিলে অসিধারীর ক্ষিপ্রকারিতা বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়, এই কারণে দস্যুগণ ও ঠগগণ প্রথমতঃ অরণ্য মধ্যে সহজলব্ধ কৃষ্ণসার মৃগের (antelope) মোড়ান শৃঙ্গ দুইটিকে বিপরীতভাবে সংলগ্ন করিয়া তাহা দ্বারাই ঢালের কাজ করিত; কিন্তু তাহাও অসির আঘাতে কাটিয়া যাইত, সেইহেতু অসিধারীগণ ঐরূপ শৃঙ্গের সম্মুখে চারি অঙ্গুলী ব্যাসের একটি ক্ষুদ্রকার লৌহঢাল সংলগ্ন করিয়া লইত এবং অভ্যাস দ্বারা প্রতিপক্ষের সমস্ত আঘাতই ঐ ক্ষুদ্র ঢাল দ্বারা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইত। অধিকন্তু শৃঙ্গ দুইটির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দ্বারা সময়ে সময়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করিতেও পারিত। পরিশেষে কৃষ্ণসার মৃগের শৃঙ্গের অনুরূপ ইস্পাৎনির্ম্মিত কৃত্রিম শৃঙ্গ প্রস্তুত করিয়াও অসিধারীগণ ঢালের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিত।

অগ্রসর হইয়া আত্মরক্ষা ও আক্রমণ করিতে হইলে "গোমুখ্ ঠাট্"ই প্রশস্ত।

সর্ব্বপ্রকার ঠাটেই পাদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকের পার্শ্ব বরাবর সরলরেখা কল্পনা করিয়া বর্দ্ধিত করিলে রেখাদ্বয় অর্দ্ধ সমকোণ ব্যবধানে মিলিত হইবে।

হস্ত পদ শরীর প্রভৃতির দৈর্ঘ্য সকল ব্যক্তির সমান অনুপাতে হয় না, তাই বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে পূর্ব্বোল্লিখিত ঠাটগুলি সম্পর্কে পদ প্রভৃতির দূরত্বেরও কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

ঢাল ও শৃঙ্গ

চর্ম্ম, বেত্র, কিম্বা দারুময় ঢাল যতই দৃঢ় হউক না কেন, সুশিক্ষিত অসিধারী ব্যক্তির তীক্ষ্ণধার অসির আঘাত কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না; আবার লৌহময় ঢালও অত্যন্ত গুরুভার হইয়া পড়ে বলিয়া, তৎসহ অসি পরিচালনা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়ে; লৌহময় ঢাল

যে-পদ্ধতির লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা বর্ণনা করিতে যাইতেছি, তাহাতে ঢালের পরিবর্ত্তে "শৃঙ্গ"ই উল্লিখিত হইবে। শৃঙ্গের আকৃতি পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :—

সাধারণ হিত-বাক্য

১। যে-কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হওয়া যাউক না কেন, এবং শক্তিসামর্থ্য যতই প্রবল থাকুক না কেন, সামান্য নির্বুদ্ধিতা কিম্বা অসতর্কতা হেতু সমস্তই পণ্ড হইয়া যায়, সুতরাং বুদ্ধির প্রাধান্য সর্ব্ব রকমেই শ্রেষ্ঠ। যে-কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহা সম্পন্ন করিবার উপযোগী বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান ও সতর্কতার অর্জ্জন ও অর্চ্চনা না করিয়া, সেই কর্ম্মে অগ্রসর হইয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করা কদাপি কল্যাণকর নহে। বিনয়, ঐকান্তিকতা ও সদ্‌গুরুতে ভক্তি না থাকিলে কদাপি বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সতর্কতা লাভ করিতে পারা যায় না।
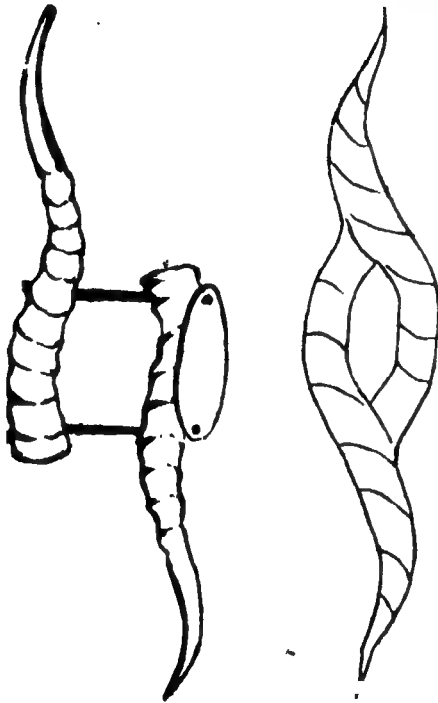
শৃঙ্গ (কৃষ্ণসার-শৃঙ্গ-নির্ম্মিত) শৃঙ্গ (ইস্পাত-নির্ম্মিত)

বিপদ্ নিত্য উপস্থিত হয় না বটে, কিন্তু মূর্খতা কিম্বা অসতর্কতা নিবন্ধন বিপদ্ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া একদিনেই সমস্ত সর্ব্বনাশ করিয়া দিতে পারে।

২। সাহসে বুক বাঁধিতে না পারিলে কদাচ কোনও গুরুতর কিম্বা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মই সম্পন্ন করিতে পারা যায় না। সাহসে ভর করিয়া অনুশীলন সহকারে কর্ম্মে অগ্রসর না হইলে কদাচ অপরিজ্ঞাত কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কোনও রূপ জ্ঞান কিম্বা বুদ্ধিই পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে না। সুতরাং বুদ্ধির পরবর্ত্তী অবলম্বনীয় বিষয়ই সাহস। অভ্যাসের দ্বারাই, অর্থাৎ জ্ঞান-বিচার-পরিচালনা সহকারে সাহসিক কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইতেই সাহস বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

৩। বুদ্ধি এবং সাহস বর্ত্তমান থাকিলেও তৎপরবর্ত্তী প্রয়োজনীয় বিষয়—কৌশল। কৌশলী হইতে হইলে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত বিনীতভাবে ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে সেই বিষয়ে সর্ব্বদা গুরুবাক্যে মনোযোগী হইয়া গুরু-উপদেশ-অনুযায়ী কর্ম্মে রত থাকিতে হয়। যাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নাই, তাহারা কদাপি কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

৪। বুদ্ধি, সাহস এবং কৌশল বর্ত্তমান থাকিলেও তৎপরবর্ত্তী প্রয়োজনীয় বিষয় ক্ষিপ্রকারিতা। দীর্ঘসূত্রতা এবং আলস্য ও জড়তা দূর করাই ক্ষিপ্রকারিতা লাভের প্রধান উপায়। কোনও একটি কৌশল শিখিয়া, আর তাহার অভ্যাস ও আলোচনা না রাখিয়া নিজ মনে নিজকে কৌশলী জ্ঞান করিলেই কোন সুফল পাওয়া যায় না। কার্য্যকালে ঐ কৌশল প্রয়োগ করিতেও পারা যায় না; বারম্বার ঐ কৌশলটির আলোচনা ও অনুশীলন দ্বারা ক্ষিপ্রকারী হইলে, তবে ক্রমে উপযুক্তরূপে কৌশল প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। মন চক্ষু হস্ত পদ ও শরীর সম্পর্কিত ক্ষিপ্রকারিতা পর্য্যায়-ক্রমে শেষের দিক্ হইতে ক্রমান্বয়ে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজনীয়।

মনের ক্ষিপ্রকারিতার নাম "স্ফুরৎ" (স্ফূর্ত্তি); চক্ষুর ক্ষিপ্রকারিতার নাম "ত্বরৎ" (ত্বরন্ত); এবং হস্ত পদ ও শরীরের ক্ষিপ্রকারিতার নাম "জড়ৎ" (জড়তার অভাব)।

৫। বুদ্ধি, সাহস, কৌশল এবং ক্ষিপ্রকারিতা থাকিলেও তৎপরবর্ত্তী প্রয়োজনীয় বিষয় বল। বললাভের প্রধান উপায় ব্রহ্মচর্য্য, সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ, সদ্‌সংসর্গ, সৎবিষয়ের আলোচনা, দুষ্ট-সংসর্গ পরিত্যাগ, গুরুজনগণের প্রতি ভক্তি, সত্যানুরক্তি, পরিমিত আহার-বিহার ও বাক্য-প্রয়োগ, ব্যায়ামচর্চ্চা, পরিশ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা, শীত, বাত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র, বৃষ্টি ও অনাহারাদির কঠোরতা সহ্য করিবার অভ্যাস, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মপালন, মানসিক প্রফুল্লতা, তুষ্টি, ইত্যাদি।

৬। এই পাঁচটি বিষয়ের উপর সমভাবে ধৈর্য্যের প্রাধান্য; সাধারণতঃ যাহা "দম" (শম দম) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মানবের ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে, অর্থাৎ "দম"-হারা হইলে বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণই ব্যর্থ হইয়া যায়, এবং মানব প্রমাদগ্রস্ত হইয়া হিতে বিপরীত করিয়া ফেলে। ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও দম বৃদ্ধি করিবার প্রধান উপায় মনের দৃঢ়তা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও অধ্যবসায়। চঞ্চলতা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

যদিও বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের উপরে ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও দমের প্রাধান্য রহিয়াছে, তথাপি বুদ্ধি প্রভৃতি গুণাবলী না থাকি-

শুধু ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও দমের সাহায্যে কোন ফলই লাভ হয় না।

যদিও বল অপেক্ষা ক্ষিপ্রকারিতা কৌশল প্রভৃতিরই প্রাধান্য অধিক, তথাপিও কিঞ্চিৎ বল না থাকিলে শুধু ক্ষিপ্রকারিতা কিম্বা কৌশলে কোন ফলই হয় না, এবং বলের অভাবে সময় সময় কৌশলও যথাযোগ্যরূপে প্রয়োগ করা যায় না; এমন কি, বলের অভাব হেতু কোন কোন কৌশল অভ্যাস করিয়া আয়ত্ত করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেইহেতুই শিশুগণের অস্থি ও মাংস দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ বৈজ্ঞানিক কৌশল অভ্যাস করা সঙ্গত নয়। শিশুকালে জটিল ব্যায়াম-কৌশলের অভ্যাস আরম্ভ করিলে অনেক স্থলেই শিশুগণের অস্থি প্রভৃতি সম্যকরূপে পরিপুষ্ট হইতে পারে না এবং অধিক বয়স হইলেও খর্ব্বাকৃতি কিম্বা পঙ্গু হইয়া থাকিবারই সম্ভাবনা অধিক।

যদিও ক্ষিপ্রকারিতা অপেক্ষা কৌশলেরই প্রাধান্য অধিক, তথাপিও ক্ষিপ্রকারিতার অভাবে অনেক সময়েই কৌশল ব্যর্থ হইয়া যায়।

যদিও বল কৌশল প্রভৃতি হইতে সাহসেরই প্রাধান্য অধিক, তথাপিও বল, ক্ষিপ্রকারিতা, কৌশল প্রভৃতি কোনরূপ গুণ না থাকিলে সাহস করিতে যাওয়া বৃথা ও বিপজ্জনক মাত্র।

আবার বুদ্ধির প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও সাহস, বল, কৌশল, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি গুণ দ্বারা ভূষিত হইতে না পারিলে, মানব হস্তপদবিহীন মস্তকের ন্যায় অকর্ম্মণ্য এবং অধিকাংশ স্থলেই জগতের উৎপাতস্বরূপ হইয়া থাকে।

চলিত কথায় এরূপ প্রবাদ রহিয়াছে যে, "যুদ্ধের চাই তিনটি, যথা,—সময়, সুবিধা ও সহিষ্ণুতা"। তাই এই জীবন-যুদ্ধে কদাপি সময় হারাইতে নাই; কোনও সুযোগ সুবিধাই নিষ্ফলে ছাড়িয়া দিতে নাই; কদাপি অধীর হইতে নাই; এবং সর্ব্বদাই ভবিষ্যৎ-কল্যাণ-লাভ হেতু যত্নবান্ থাকিতে হয়।

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

ঠাক্‌মার দুঃখ

ওটি আমার বিয়ের কাজলনতা—
অমন করে' রাখিস্ নে গো ফেলে,
মনে পড়ে অনেক দিনের কথা
একটিবারও উহারে দেখা পেলে।

মনে পড়ে এলুনদেয়া বাড়ী,
মনে পড়ে গায়ে হলুদ মাখা,
সেই সে রাঙা কল্‌কাপেড়ে শাড়ী—
খুঁটে বেঁধে কাজলনতা রাখা।

মনে পড়ে ভোরে সানাই-বাঁশী,
সারা দিবস উপোস করে' থাকা,
মনে পড়ে মধুর ব্রীড়া-হাসি,—
সুখের সে-দিন আলোছায়ায় মাখা।

মনে পড়ে সুদূর বোমের ধ্বনি,
বেহারাদের পাল্‌কি বহার সাড়া,
রায়বেঁশেদের বিপুল রণরণি,
আতসবাজি গ্রামটি আলো-করা।

বাড়ীতে সেই শঙ্খ বেজে ওঠা,
হুলুধ্বনির হয় না যেন শেস,
হসালাপে ছাতের উপর ওঠা—
লুকিয়ে দেখা তাঁর সে বরবেশ।

মনে পড়ায় এই সে কাজলনতা—
খোকার চোখে রাতে কাজল দেয়া,
ভাবি সে-দিন আজকে আহা কোথা,—
ঘাটে এল পারের তরীর খেয়া।

তোদের পিসি তোদের বাবা কাকা
এর কাজলের দরদ জানে সবে,
তোদের কাছে বক্‌ছি আমি ফাঁকা—
আমার কথা রূপকথা যে হবে।

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক

তিন শিং-ওয়ালা বন্যমহিষ—

সম্প্রতি ধুবড়ী সহর হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী কলাপাকানী গ্রামে তিনটি বন্য মহিষ শিকারীগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের

তিন-শিংওয়ালা বন্যমহিষ

বিষয় উহাদের মধ্যে একটি মহিষের তিনটি শিং। মৃত জন্তুটির মাথা বর্ত্তমানে ধুবড়ীর সরকারী ডাক্তারের নিকট আছে। জন্তুটি লম্বায় ১৪ ফুট ও ৭ ফুট উচ্চ।

দেওয়ান সমশের আলী আহম্মদ

—

একগাছে ৪২ কাঁদি—

পাবনা জেলার ভাটিবেড়া গ্রামে একটি কলা-গাছে ৪২টি কলার কাঁদি বা মোচা হইয়াছিল। ইহা খুব কমই দেখা যায়।

শ্রী হরিপদ নন্দী

—

নকল মুক্তা—

জাপানে একপ্রকার মুক্তা তৈয়ার করা হইয়াছে। প্যারিসের ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি অব্ সায়ান্স বহু পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে এই মুক্তার সহিত আসল মুক্তার কোনই প্রভেদ নাই। একদিন পরে অনেক নারীর সোনার স্বপ্ন সফল হইবে তাঁহারা সামান্য অর্থব্যয়ে এখন বহু অলঙ্কারে সজ্জিতা হইতে পারিবেন। রুশিয়ার রাজ-বংশের মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার বর্ত্তমানে সোভিয়েট সরকারের হাতে,—তাহার মূল্য কম করিয়া ২,০০০,০০০,০০০,, টাকা। এখন অনেকে বলিতেছেন বিজ্ঞানের বলে এই সব মণি-মাণিক্যের সমকক্ষ মণিমাণিক্য তৈয়ার করা যাইতে পারে।

বিজ্ঞান এপর্য্যন্ত হীরা, চুণি, নীলা এবং মুক্তা কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করিতে সক্ষম হইয়াছে। কৃত্রিম পান্না এখনো কেহ করিতে পারে নাই। ইহাকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে, কিন্তু কেহ ইহার প্রস্তুতি-দ্রব্য নিচয়ের কোন সন্ধান পান নাই।

যে জাপানী বৈজ্ঞানিক নকল মুক্তা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার নাম মিকিমোটো।

—

অভিনব টেবিল-বাতি—

আমেরিকায় একপ্রকার টেবিল-ল্যাম্প বাজারে আসিয়াছে। ইহাতে একটি রেডিও-সেট এবং একটি ফোনোগ্রাফ যুক্ত আছে। ইচ্ছামত তিনটিকেই একসঙ্গে ব্যবহার করা চলিবে।

এক গাছে ৪২ কাঁদি

বন্ধু পোকামাকড় এবং পশু-পক্ষী—

যে ব্যাংটির ছবি দেওয়া হইল—উহা পোকামাকড় ভক্ষণ করিয়া মানুষের অশেষ কল্যাণসাধন করে। এইসমস্ত পোকা-মাকড় মানুষের এবং বাগানের গাছপালার ভীষণ অনিষ্ট করে। অথচ মানুষ এমনি অকৃতজ্ঞ যে খেলার ছলে এই উপকারী ব্যাংকে অনেক সময়ে হত্যা করে।

কীট-খাদক ব্যাং

বাদুড়ও পোকামাকড় হত্যা করিয়া খায়, মানুষ সুবিধা পাইলে তাহাকেও বধ করে। বাদুড় পাখী নয়, যদিও সে উড়িতে পারে। বাদুড় স্তন্যপায়ী জীব।

প্যাঁচাকে দেখিলেই ঘুমন্ত জীব বলিয়া মনে হইবে—কিন্তু ঐ প্যাঁচাই ইন্দুরের যম। চাষীরা যদি একজোড়া প্যাঁচাকে তাহাদের গোলাঘর এবং চাষের জমির কাছাকাছি কোন গাছে বা কোটরে বাস করিতে দেয়, তবে সে মাসে প্রায় দুইশত করিয়া ইন্দুর হত্যা করিতে পারে। চাষার পক্ষে ইহা কম লাভের কথা নয়।

সিংওয়ালা গিরগিটি

আবার ঐ একদল শিংওয়ালা গিরগিটি দেখুন। অনেকে ইহাদের ভুল করিয়া শিংওয়ালা ব্যাং বলে। ইহাদিগকে মানুষের শত্রু বলিয়া মনে করা হয়—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। পোষ মানাইলে ইহারা বেশ শান্ত হইয়া মানুষের সঙ্গে বসবাস করে। ইহাদের খাদ্যও পোকামাকড়।

লাল-ঠোঁট কাঠঠোক্‌রা

ঐ লাল-ঠোঁটওয়ালা কাঠঠোক্‌রা পাখী বৃক্ষ-বন্ধু। ইহারা না থাকিলে, জঙ্গলের এবং লোকালয়ের বৃক্ষকুল পোকামাকড়ে ধ্বংস করিয়া ফেলিত। এইসমস্ত পোকা-মাকড় এই কাঠঠোক্‌রাদের প্রিয়তম খাদ্য।
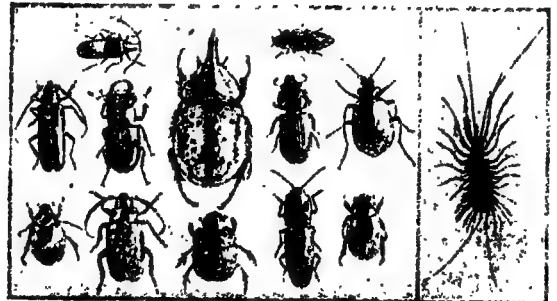
নিরীহ পোকামাকড়

সমস্ত জগতে প্রায় ৮০,০০০ রকমের পোকামাকড় আছে। তাহার মধ্যে ১৭টির ছবি দেওয়া হইল। ইহারা মানুষের কোন অনিষ্টই করে না। আপন মনে বসবাস করে। তবে খোঁচাইলে হয় ত কিছু অনিষ্ট করিতেও পারে। উহার পাশে যে বহু-পা-ওয়ালা পোকার চিত্র দেওয়া হইল, উহাকে অনেকে বিষাক্ত বলিয়া মনে করেন। ইহা অমূলক। ঘরের মধ্যে ইহাদের প্রায়ই দেখা যায় এবং হত্যা করা হয়। ইহারা কিন্তু মানুষের উপকারই করে। আরসলা, মাছি এবং অন্যান্য গৃহবাসী পোকামাকড়ই ইহাদের খাদ্য।

সবচেয়ে অদ্ভুত বাঁদরের ছবি—

যে বাঁদরটির ছবি দেওয়া হইল, তাহা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত। ইহারা বোর্নিয়ো দ্বীপে বাস করে। মানুষের অগম্য স্থানে

সবচেয়ে অদ্ভুত বাঁদর

ইহারা বাস করে বলিয়া ইহাদের ধরা বড় শক্ত, একরকম অসম্ভব বলিলেই হয়। কারণ এপর্য্যন্ত মাত্র একটিকে ধরিতে পারা গিয়াছে। তাহারই ঐ ছবি। এই বাঁদরের নাকটি দেখিবার জিনিস।

খোসা-ছাড়ান কল—

একপ্রকার তরকারীর খোসা-ছাড়ান কলের আবিষ্কার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হইয়াছে, তাহাতে ৭ সের আলু-পটোল ইত্যাদি দুই মিনিটের মধ্যে বেশ ভাল করিয়া খোসা-ছাড়ান চলিবে। ইহার দামও খুব বেশী নয়। হোটেলে এই কলের খুব বেশী ব্যবহার হইতেছে। আমাদের দেশে ইহার আমদানী এখনো হয় নাই।

বৃক্ষের দেহ হইতে নির্গত ঝরণা—

সুইট্জারল্যাণ্ডের বার্ণ নামক স্থানের নিকটে একটি বৃক্ষকাণ্ড হইতে একটি ঝরণা নির্গত হইয়াছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় ইহা কৃত্রিম—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। গাছটির বাল্যাবস্থায় ঝরণার বিশেষ কোন

বৃক্ষ হইতে অবিরাম জল ঝরিতেছে

চিহ্ন দেখা যায় নাই—তাহার পর সেটি বড় হইলে তাহার একটি ছিদ্র দিয়া ক্রমাগত জল পড়িতে থাকে। ইহার বিশেষ কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না, তবে মনে হয় যে ইহার কোন শিকড় মাটির তলায় কোন জল স্রোতের উপর গিয়া পড়ে, এবং ঐ জলধারা সর্ব্বাপেক্ষা কম বাধা পাইয়া ঐ শিকড় বাহিয়া গাছের বিশেষ কোন ছিদ্র দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। ঐ ঝরণার তলায় একটি টব রাখিয়া গোরুবাছুরের জল পান করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

সুয়েজ খাল—

সুয়েজ খাল ৩১ ফুট গভীর। সম্প্রতি উহা ৩২ ফুট করা হইবে এবং কিছুদিনের মধ্যে প্রায় ৩৫ ফুট হইবে। এই কার্য্যের জন্য ২০,০০০,০০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৮০,০০০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। ইহা ১৫০ ফুট চওড়া ছিল, ২০০ ফুট হইবে।

জীবন-রক্ষী বয়া—

ফিন্‌ল্যাণ্ডের একজন মৎসজীবী এবপ্রকার নূতন ধরণের জীবন-রক্ষী বয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বয়ার মধ্যে একটি লোক দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। বয়াটি একটি দুইহাতওয়ালা ওয়াটার টাইট্ ব্যাগের তৈরী। ওয়াটার টাইট অর্থাৎ যাহা হইতে জল বাহিরে আসিতে পারে না কিম্বা যাহাতে জল প্রবেশ করিতে পারে না। এই থলের নীচে একটি বালতি আটকান আছে। ব্যাগের উপরে একটি জানালা আছে—তাহা দিয়া মধ্যস্থ ব্যক্তি বাহিরের জিনিস দেখিতে পায়। বয়াটি যখন জলে থাকে তখন নীচের বালতি জলে ভরিয়া যায় এবং এই জলের ভার সমস্ত বয়াটিকে সোজা করিয়া রাখে। ব্যাগটি রব'রের তৈরী বলিয়া তাহা পরিয়া আস্তে আস্তে সাঁতার-কাটাও যায়। বয়ার মাথায় একটি নল আছে তাহা সব সময় জলের উপরে থাকে, সেইজন্য

দেখিতে অদ্ভুত জীবন-রক্ষী বয়া। ইহার মধ্যে লোক সোজা ভাসিতে পারে

বয়ামধ্যস্থ ব্যক্তির নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কোনপ্রকার কষ্ট হয় না। নলের মাথায় একটি গাঢ় লাল বা অন্য কোন উজ্জ্বল বর্ণের বলের মত থাকে—তাহা দেখিয়া সাহায্যকারীর দল জলমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধার সাধন করিতে পারে।

—

পুরান খবরের কাগজ কাজে লাগান—

পুরাতন খবরের কাগজ পড়িয়া আমরা ফেলিয়া দিই কিম্বা সের দরে বিক্রয় করি। ইহার দ্বারা আরো অনেক রকম কাজ পাওয়া যাইতে পারে। কাগজ পড়া হইয়া গেলে পর তাহা জলে ডুবাইয়া বেশ করিয়া নিংড়াইয়া গোল পাকাইয়া, শুকাইয়া, ঘুঁটের কাজে লাগান যাইতে পারে। ইহাতে আগুন অনেকক্ষণ বেশ তাজা থাকে।

ভেজা খবরের কাগজে সার্সি খুব ভাল পরিষ্কার হয়। ন্যাকড়ার অপেক্ষা কোন অংশে কম ভাল হয় না। পলিতা কাঁচি দিয়া না কাটিয়া কাগজ দিয়া পোড়া অংশ আস্তে আস্তে ঘসিলে তাহা বেশ সমান হইয়া যায়, কোন খোঁচ থাকে না।

মেঝের কার্পেটের তলায় যদি দুই-তিন খানা করিয়া কাগজ বিছাইয়া দেওয়া যায় তবে কার্পেট দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, কার্পেটের উপর পায়ের শব্দ প্রায় মিলাইয়া যায় এবং কার্পেট অধিকতর নরম বলিয়া মনে হয়। কার্পেট ঝাঁট দিবার পূর্ব্বে যদি কিছু কাগজ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া জলে ভিজাইয়া কার্পেটের উপর ছড়াইয়া দেওয়া যায় তবে ঝাঁট দিবার সময় ধূলাবালি খুব ভাল করিয়া নির্ম্মল কার্পেট হইতে উঠিয়া আসিবে।

রান্নাঘরে যদি কাহারো টেবিল থাকে তবে তিনি তাহার কাগজ বিছাইয়া রাখিতে পারেন—তাহাতে টেবিল নষ্ট হইবে এবং দীর্ঘকাল স্থায়ীও হইবে। টেবিলের উপর ময়লা জমিবার আশ কম হইবে। ঘরের তাক, আলমারীর তাক ইত্যাদি সবই কা ঢাকিয়া রাখা উচিত।

নূতন খবরের কাগজের গন্ধ পোকারা সহ্য করিতে পারে গরম কাপড় বাক্সে রাখিবার পূর্ব্বে যদি খবরের কাগজে মুড়িয়া যায় তবে তাহা পোকায় আক্রমণ করিবে না। অবশ্য মাঝে ম কাগজ বদলাইতে হইবে।

দুইখানা কাপড়ের ওয়াড়ের মধ্যে যদি কাগজ বেশ ভাল ক (দুই তিন প্রস্থ) বিছাইয়া লওয়া যায় তবে তাহাতে লেপের মত নিবারণ করিবে।

তৈজসপত্রাদি প্যাক করিবার সময় কাগজ জড়াইয়া দি তাহাতে দাগ পড়ে না।

—

উচ্চতম দমকল—

এই দমকলটি ৫৫ ফুট উচ্চ। নিউইয়র্কের রাস্তায় কোন ২২তল ২৩তলা বাড়ীতে আগুন লাগিলে ইহার প্রয়োজন হয়। বাড়ীর ৯ত

৫৫ ফুট দমকল

পর্য্যন্ত ইহার জল খুব জোরে ওঠে। নিউইয়র্ক সহরের বাড়ীগুলির উপযুক্ত দমকল।

—

মেক্সিকোর পুরাতত্ত্ব—

মেক্সিকোতে মাটি খুঁড়িয়া কয়েক হাজার বছর পুর্ব্বেকার অনেক কিছুই বাহির করা হইতেছে। মেক্সিকোও যে ইজিপ্ট এবং ভারতের মত বহুকাল পূর্ব্বে সভ্য দেশ ছিল, বর্ত্তমানের এই সমস্ত আবিষ্কার তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মাটির তলায় "সূর্য্য পিরামিডের" এক অংশের একটি ছবি দেওয়া হইল। এই সমস্তর দেওয়ালে নানা-

মেক্সিকোতে মাটির তলায় পাওয়া ঘর বাড়ী, দেওয়ালের গায়ে খোদাই ছবি দেখিবার জিনিস

প্রকার লেখা আছে—এই লেখা যখন পড়িতে পারা যাইবে, তখন হয় ত আর একটি অতি প্রাচীন সভ্যতার অনেক নব নব তথ্য জানিতে পারা যাইবে। এই পিরামিডের গায়ের কারুকার্য্য লক্ষ্য করিবার জিনিস।

মঙ্গোলিয়ার আবিষ্কার—

তৃতীয় এশিয়াটিক এক্সপিডিশনের চেষ্টাতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে পূর্ব্বে আমেরিকা এবং এশিয়া একই মহাদেশ ছিল। এই দল মঙ্গোলিয়াতে একটি জন্তুর মাথার খুলি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা
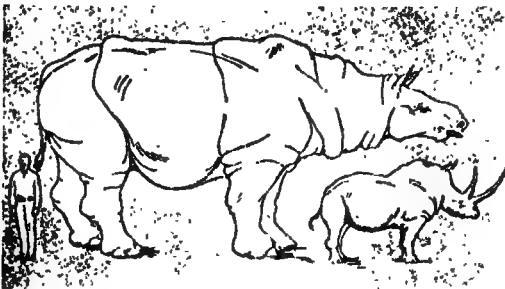
মঙ্গোলিয়ার মাটির তলায় পাওয়া অতিকায় জন্তুর কঙ্কাল

দেখিতে অনেকটা গণ্ডারের মত। পুরাকালের এই জন্তুটি নাকি স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সব চেয়ে বড়দের মধ্যে একজন ছিল। ইহা কমপক্ষে ১২ ফুট উঁচু এবং ২৪ ফুট লম্বা ছিল। এই জন্তুটিকে ইংরেজিতে Giant Baluchitherium" বলে। মানুষ এবং আফ্রিকার গণ্ডারের সহিত ইহার একটি তুলনামূলক ছবি দেওয়া হইল।

অভিনব ফায়ার-ব্রিগেড গাড়ী—

আমাদের দেশে যে সমস্ত ফায়ার ইঞ্জিন দেখা যায় তাহা আগুনের বেশী নিকটে যাইতে পারে না কারণ আগুনের তাপ অসহ্য হইয়া পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে একপ্রকার নূতন আগুন নিভাইবার গাড়ীর চলন হইয়াছে, তাহাতে গাড়ীকে আগুনের খুব কাছে লইয়া যাওয়া যায়। গাড়ীর গায়ে পিছনের দিকে একটা পাইপ লাগান থাকে—তাহা হইতে
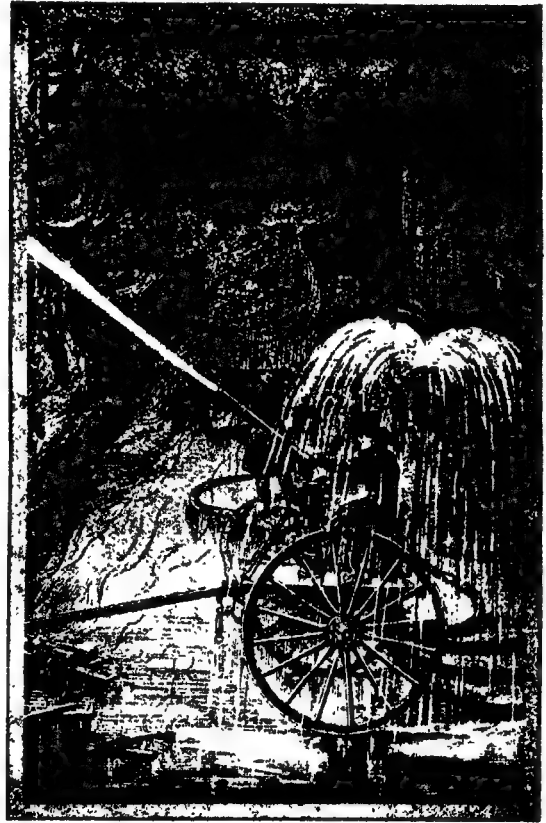
নূতন-ধরণের ফায়ারব্রিগেড

জল বাহির হইয়া গাড়ীর চারিদিকে ছাতার মত হইয়া পড়ে। তাহাতে একটি জলের গোল পর্দ্দা সৃষ্টি হয়। এই জল-পর্দ্দার জন্য আগুনের তাপ চালকের দেহে লাগিতে পারে না, সে অনায়াসে গাড়ীকে আগুনের খুব কাছে লইয়া গিয়া দমকলের মুখ যেদিকে ইচ্ছা ফিরাইতে পারে। এই দমকলে ১২৫ ফুট পর্য্যন্ত জল ছোড়া যায়।

গুঞ্জনকারী পক্ষী—

ছবিতে দেখুন একটি ছোট পাখী একটা চা চামচের মধ্যে বসিয়া আছে। এইরকম পাখী প্রায় ৪০০ ভিন্নভিন্ন প্রকারের আছে। ইহারা দেখিতে যেমন ক্ষুদ্র তেমনি সুন্দর। ইহাদের মধ্যে যাহারা সব চেয়ে বড়, তাহারা বড় জোর সাড়ে আট ইঞ্চি লম্বা হয়। ইহারা পোকামাকড় এবং ফুলের মধু পান করিয়া জীবনধারণ করে। পোকা-

গুঞ্জনকারী পক্ষী একটা চা-চামচের ভিতর আরামে বসিতে পারে

মাকড় বধ করে বলিয়া ইহারা মানুষের বন্ধু। কিন্তু ইহাদের লেজ এবং পালক খুব সুন্দর এবং দামী—সেইজন্য মনুষ্যের কৃপায় ইহাদের বংশ ক্রমশ লোপ পাইতেছে।

তক্‌রারের টাকা—

কেহ বাজির টাকা হারিয়া না দিলে তাহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা হয় না, কিন্তু লোকের কাছে তাহার নাম ঠাট্টা এবং পরিহাসের বিষয় হইয়া ওঠে। ইংলণ্ডেও বর্ত্তমান সময়ে বাজি (অর্থাৎ জুয়া) খেলা বেশ চলে, কিন্তু তৎসংক্রান্ত কোন ব্যাপারের মোকদ্দমা আদালতে হইতে পারে না। আইনত জুয়া খেলা বন্ধ, যদিও কার্য্যত রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া কুলিমজুরেরাও আজকাল ঘোড়-দৌড়ে পয়সা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় করে। ইংলণ্ডে কিন্তু রাজা তৃতীয় জর্জ্জের কিছুকাল পর পর্য্যন্ত আদালতের সাহায্যে জুয়ায় জেতা টাকা আদায় করা চলিত। ঐ সময় পিগট্‌ নামে এক ভদ্রলোক লর্ড্‌ মার্চের সহিত একটা অদ্ভুত বাজি রাখেন—পিগটের পিতার সহিত লর্ড মার্চের দৌড় হইবে। তাহাতে যে জিতিবে সে ১৬০০ গিনি পাইবে। দৌড়ের দিন স্থির হইল, কিন্তু সেইদিন সকালে পিগটের পিতা উক্ত বাজির কথা কিছু জানিতেন না বলিয়া হঠাৎ মরিয়া গেলেন। লর্ড মার্চ্‌ তখন বলিলেন "হয় তোমার বাবাকে দৌড়ে আন, নয় টাকা দাও।" পিগট কোনটাই করিলেন না। আদালতে মোকদ্দমা হইল। লর্ড্‌ মার্চ্‌ জয়লাভ করিয়া বাজির টাকা আদায় করিয়া লইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই পার্লামেণ্টে আইন পাশ হইল যে বাজির টাকা কেহ না দিলে তাহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা হইবে না. কারণ টাকা দিতে সে আইনত বাধ্য নয়। যদিও এখন কোন লোক যদি বাজির টাকা না দেয় তবে "ভদ্রসমাজের কোন বাবে" তাহার যোগ-দান অসম্ভব হইয়া ওঠে।

মধ্য-আফ্রিকার বারকোষ-ঠোঁটী নারী—

আফ্রিকার এক অঞ্চলের লোকেরা তাহাদের বাগদত্তা পত্নীর ওষ্ঠ কাটিয়া দিয়া বিবাহের কথা পাকা করে। সারাস-জিঙ্গেস্‌ প্রদেশের কোন যুবক যখন কোন কৃষ্ণবর্ণা সুন্দরীর প্রেমে পড়িয়া অস্থির হয় তখন সে নিম্নলিখিতভাবে তাহার বিবাহ স্থির করে। সুন্দরীর দুইটি ওষ্ঠকে সমানভাবে ধার বরাবর আধ ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া করিয়া ফুঁড়িয়া দেওয়া হয়। এই ফোঁড়ার কাজ কোন গাছের কাঁটা বা ধারাল অস্ত্রের দ্বারা হয়। তাহার পর এই দুইটি ছিদ্রের মধ্যে দুই বড় খড় (১/১৬ ইঞ্চি ব্যাসওয়ালা) পুরিয়া দেওয়া হয়। কয়েক সপ্তাহ পরে একটু বড় মাপের দুইটি টুক্‌রা কাঠ এই খড়ের বদলে দেওয়া হয়। এই কাঠের টুক্‌রাগুলি ওষ্ঠের অপেক্ষা লম্বা নয়, এবং তাহার মাঝের দাঁতগুলির মাড়ি স্পর্শ করে। এই কার্য্য হইয়া গেলে পর নারী গ্রামের সুন্দরীদের মধ্যে একজন হইয়া উঠে।

এই কার্য্য যখন করা হয় তখন ঐ নারীর বয়স অতি অল্প থাকে—তাহাকে তখন বালিকা বলাই উচিত। আফ্রিকার অনেক জাতি লোকেরা খুব কম বয়সের মেয়েকে তাহাদের ভাবী পত্নী স্থির করিয়া রাখে। ভাবী পত্নীর বয়স তিন চার হইতে কয়েক মাস পর্য্যন্তও হয়। বালিকার পাঁচ হইতে দশ বছর বয়সের মধ্যে তাহার ওষ্ঠ ফোঁড়া হয়।

এই সারাস-জিঙ্গেস জাতিকে অনেকে ভুল করিয়া সারাস কাবাস বলে। ইহারা চাদ হ্রদের দক্ষিণে, সাহ্‌রি নদীর দক্ষিণ তীর এবং আরবদের শালামাত্‌ প্রদেশের মাঝে বাস করে। ইহারা ভূতপ্রেতের পূজা করে, পুরুষেরা নিজেদের বোনা এক রকম তুলার কাপড় পরে, মেয়েরা পাতার বোনা ছোট দুখানা বস্ত্র মাত্র পরে। এই প্রদেশের জমি যদিও খুবই উর্ব্বরা তথাপি লোকেরা খুবই গরীব। এই জাতের লোকেরা কুঁড়েমির জন্য দু-একটা নেহাত দর্‌কারী ফসল ছাড়া আর কোন কিছুর চাষ করে না।

ফরাসীরা এই খানে আসিবার পূর্ব্বে এই প্রদেশ ওয়ডাই এবং বাগুইরমির সুলতানদের ক্রীতদাস সংগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র ছিল। বছরে অন্তত একবার করিয়া সুলতানের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া এই জিঙ্গেস্‌ জাতিদের আক্রমণ করিত এবং লুটপাট করিয়া লোকসান করিয়া যাইত। এইসমস্ত আক্রমণের পর ইহাদিগকে উত্তর এবং সময়-সময় পূর্ব্বদিকেও

বারকোষ-ঠোঁটী নারী জল পান করিতেছে

তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইত। পথের কষ্ট ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ইহারা অবশেষে বশ মানিতে বাধ্য হইত। যাহারা এত কষ্ট সহ্য করিয়াও বশ মানিত না তাহাদিগকে মিশরে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। ট্রিপলি এবং তুরস্কেও সময়-সময় ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। এই জন্য সারাস-জিঙ্গেস্‌ জাতি সব সময় এই সকল আক্রমণকারীদের ভয়ে বাস করিত। অনেকে মনে করেন এই ঠোঁট-কাটার প্রথা এই সময়েই প্রথম আরম্ভ হয়। ইহারা বোধ হয় মনে করিয়াছিল এই রকম করিয়া নারীদের বিকৃতরূপ করিয়া দিলে তাহাদের আর কেহ ধরিয়া লইয়া যাইবে না। এবং তাহা হইলে আক্রমণের বেগও বহু পরিমাণে কমিয়া আসিবে। এই মত অবশ্য দু-এক জনের।

ফরাসীরা এই দেশ দখল করিয়াই এই ওষ্ঠচ্ছেদন প্রথা রদ করিয়া

রূপের জন্য নারীরা সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারে

দিল। একজন বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে এই ওষ্ঠ-ছেদন-প্রথা দাসত্ব হইতে নারীদিগকে বাঁচাইবার জন্য হয় নাই—ঐ দেশের নারীদের সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্যই নাকি এইরূপ করা হইত। তাহার এই মতের পক্ষে তিনি বলেন,—"দাসত্ব হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই যদি এই ভীষণ প্রথার জন্ম হয়, তবে পুরুষেরাও ত এইরূপ করিতে পারিত," তাহা হইলে তাহারাও দাসত্ব হইতে রক্ষা পাইতে পারিত। তাহা ছাড়া আফ্রিকার প্রায় সকল অংশের অসভ্য নারীরা তাহাদের রূপের বৃদ্ধির জন্য নানাপ্রকার কষ্টজনক অঙ্গচ্ছেদন এবং ফোঁড়ন সহ্য করিত। তাহার পর বহু অনুসন্ধানের ফলে ডাঃ মুরাজ (Dr. Muraz) আবিষ্কার করেন যে বালিকাদের বিবাহের কথা পাকাপাকি স্থির হইবার পরেই এই ওষ্ঠ ফোঁড়ার ব্যাপার করা হইত। তাহা ছাড়া এই জাতি এই প্রথাকে জাতীয় সম্মান বলিয়া মনে করে।

এই প্রথার কারণ যাহাই হউক ইহার ফল অতি ভয়ানক হইত। ঠোঁটের কাঠের টুকরার আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হইত। এইপ্রকারে কয়েক বৎসর পরে ঠোঁটের মাংসের পরিধি এত বাড়িয়া উঠিত যে দুইটি ঠোঁটকে দুখানি বড় বড় রেকাবি বলিয়া মনে হইত। নীচের ঠোঁটের মাংসের স্থূল এবং পরিধি উপরের ঠোঁট অপেক্ষা বড় হইত। প্রথম প্রথম এই দুইটি ওষ্ঠ রেকাবি সোজা হইয়া থাকিত—কিন্তু ক্রমে তাহার মাংসের ওজন বৃদ্ধি পাইলে রেকাবি দুইটি ঝুলিয়া পড়িত। কিছু পান বা আহার করিবার সময় এই মাংস রেকাবি দুইটিকে সুবিধামত তুলিয়া ধরিতে হইত। নারীরা এই রকম অবস্থায় কথাবার্ত্তা বিশেষ কহিতে পারিত না—কতকগুলা বিভিন্ন প্রকারের গোঙানির দ্বারাই কথাবার্ত্তার কাজ সারিতে হইত। ইহারা একপ্রকার কাদার পাইপের সাহায্যে ধূমপান করিত। ওষ্ঠ ছাড়া বুকে পিঠে নাকে এবং অন্যান্য স্থানে নানা রকমের উল্কি পরিত। ওষ্ঠ রেকাবির উপরেও অনেকে কাঠ পোড়াইয়া ছেঁকা দিয়া নানা প্রকার আঁকজোক কাটিত। যাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ দেখিতে হইত, তাহারাই তাহাদের পুরুষদের চোখে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলিয়া গণ্য হইত।

বর্ত্তমানে ফরাসীরা কঙ্গো রাজ্যের উত্তরে একটি প্রদেশের শাসনভার এবং প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের ফলেই এই প্রদেশের এই অপূর্ব্ব সুযোগ এবং মহা সৌভাগ্যলাভ হইয়াছে। এই প্রদেশ হইতে নরমাংস খাইবার প্রথার উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আশা করা যায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উহা দূর করিতে পারা যাইবে। আফ্রিকায় এক প্রকার অসভ্যজাতি আছে, তাহারা মাংসের জন্য মানুষ হত্যা করে। তাহারা নররক্তের বড়ই ভক্ত। ইহাদিগকে "Black Panthers অর্থাৎ "কাল চিতা" বলা হয়। বর্ত্তমান ফরাসী-সরকার এই-সমস্ত ভীষণ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া আফ্রিকার অসভ্য লোকদের বাঁচাইবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

নূতন ধরণের মোটরকার—

মোটরকার যখন দৌড়ায় তখন বাতাসের প্রতিবন্ধকতায় তাহার বেগ অনেকখানি কমিয়া যায়। বহুকাল হইতেই মোটর-মিস্ত্রীরা এমনভাবে গাড়ী তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে বাতাসের
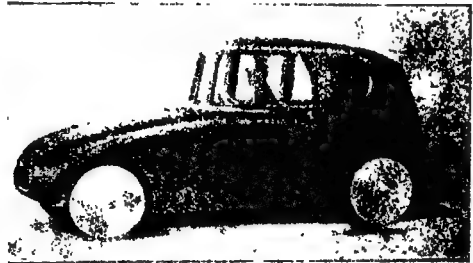
এই মোটরকারে হাওয়ার বাধা খুব কমই লাগিবে

প্রতিবন্ধকতা সবচেয়ে কম হয়। একজন জার্ম্মান মিস্ত্রী একখানি মোটরকার নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা দেখিতে একটা বন্দুকের টোটার মত। এই গাড়ীতে নাকি বাতাসের প্রতিবন্ধকতা খুব কমই লাগিবে, সেইজন্য ইহার গতিও সাধারণ গাড়ী অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে।

ছুটির ব্যবহার—

পূজার ছুটি আসিতেছে—নানা লোকে নানা ভাবে এই ছুটি কাটাইয়া দিবে। কেহ বা ইহার ভাল ব্যবহার করিবে, আর কেহ বা মন্দ ব্যবহার করিবে। প্রত্যেক কাজের লোকেরই ছুটির প্রয়োজন আছে। এই ছুটির সময়ে সে তাহার দেহমনকে আবার কয়েক মাসের মত মেরামত এবং কাজের উপযুক্ত করিয়া লইবে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই ছুটির ব্যবহার কেমন করিয়া করিতে হয় জানেন না। যে ভাল ছেলে সে ছুটির দিনগুলিকে ১৮ ঘণ্টা করিয়া পড়িয়া নষ্ট করিবে। বাদ-বাকি তাস খেলিয়া এবং গোষ্ঠীসুখ অনুভব

ছুটির সময় ক্যাম্পে যাইবার ঠিক ধরণ

ভোরের বেলায় নদীর জলে লাফ

নিজেদের হাতে রান্না—মাছ ভাত ইত্যাদি ভক্ষণ

নীল আকাশের তলায় আরামের নিদ্রা

করিয়া ছেঁড়া মাদুরে গড়াইয়া ছুটির দিনগুলি পার করিয়া দিবে। ছুটি শেষ হইলে পর হাই তুলিতে তুলিতে ক্লান্ত এবং ক্লিষ্ট দেহমন লইয়া আবার কাজে লাগিবে। এইরূপে ছুটিও বাজে খরচ হইবে, কাজও সম্পূর্ণ এবং সুন্দর হইবে না।

কয়েকদিনের ছুটি কাটাইবার একটি সুন্দর এবং সহজ উপায় আছে। ছুটি হইবামাত্র গাঁটরা-গাঁটরি বাঁধিয়া সহর হইতে দূরে কোন জঙ্গলী-স্থানে চলিয়া যাওয়া। সেখানে জঙ্গলের ধারে ক্যাম্প্ করিবার মত

ছুটির সময় বাইরে যাবার ভুল ধরণ

সমুদ্রের তীরে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ

ঘরে বসিয়া যা-তা গেলা

বহু রাত্রি পর্য্যন্ত নৃত্য গীত

একটু জায়গা সাফ করিয়া লইতে হইবে। কাছের গ্রাম হইতে খাবার বেশ পাওয়া যাইবে—সহরের মত বাজারের 'খাবার' অবশ্য পাওয়া যাইবে না, এ কথা ঠিক, তবে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা শরীরের পক্ষে অতিশয় উপযোগী হইবে। সঙ্গে একটা মশারি রাখা সব সময় দরকার—তাঁবু জোগাড় করিতে পারিলে আরো ভাল। তবে পূজা এবং বড়দিনের ছুটিতে বৃষ্টির ভয় নাই। পাতার ছাউনি ঘর তৈরী করা খুবই সহজ। ভোরে উঠিয়া কিছু খাইয়া মাঠে বনে বাদাড়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরিয়া আসিয়া কিছু রান্নার জোগাড় করিয়া লইয়া কাছাকাছি নদীতে বা ঝিলে স্নান করিতে পারা যায়। সম্ভব হইলে পুকুরের জলে স্নান বা রান্না না করাই ভাল। নদীর জলই ভাল। পাহাড়ে-জায়গায় ঝরণার অভাব নাই, এবং ঝরণার জল অতি পরিষ্কার। ম্যালেরিয়াপূর্ণ কোন স্থানে অবশ্য কেহ চেঞ্জে যায় না।

ছুটির পরে নতুন মানুষ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

নিজের রান্না নিজেকেই করিতে হইবে—তাহাতে যথেষ্ট আমোদ আছে। বরাবর স্বপাক আহার অবশ্য চলে না, এবং তাহা ভালও লাগে না। দুপুরের আহার শেষ করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বেড়াইতে বাহির হইতে হইবে। রোদ কড়া হইলে কাছের জঙ্গলে ঘোরাই ভাল। জঙ্গলে ঘুরিয়া দেখিবার জিনিস প্রচুর আছে। বিকালে "ক্যাম্পে" ফিরিয়া আসিয়া আবার জলখাবার খাইয়া মাঠে মাঠে ঘুরিবার পালা। তাহার পর রাত্রের আহার। জঙ্গলে শিকার করাও চলিতে পারে—শিকার-লব্ধ মাংস বড় মিষ্ট লাগে—নুন কম হইলেও ভাল লাগে—মশলা না থাকিলেও খারাপ লাগে না। তাহার পর তারাভরা আকাশের তলায় এবং মাঠের বিশুদ্ধ হাওয়ার মধ্যে কয়েক ঘণ্টা সুনিদ্রা। একলা থাকিতে যাহাদের ভাল লাগে না, তাহারা কয়েক জন একসঙ্গে ক্যাম্প্ করিতে পারে। এইরূপে কয়েকদিন কাটাইয়া সহরে ফিরিবার সময় দেহমন চারগুণ সুস্থ এবং সবল হইয়া আসে। ইহাতে খরচও কম, আনন্দও প্রচুর।

ছুটির সময় অনেকে সমুদ্রের ধারে যায়—তাহারা প্রায়ই বালির উপর ছাতা মাথায় দিয়া সমুদ্রের নীল জলের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে। তাহাতে গায়ে ঘামাচি হয়, শরীর বিশেষ ভাল হয় না। অবশ্য সমুদ্রের ধারের সহরে চেঞ্জে গেলেই যে শরীর ভাল হইবে না এমন কথা বলিতেছি না। ছুটির ব্যবহার নিয়মিত দৌড় লাফ-ঝাঁপ এবং মাঠে-ঘাটে অনাবশ্যক ঘুরিয়া বেড়াইলে যেমন হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না।

নূতন ধরণের চশ্‌মা তৈরী—

নিউইয়র্কের ডাঃ নেল্‌সন্ ওয়াই হাল্ তাঁহার রোগীদের জন্য এক অভিনব উপায়ে চশ্‌মা তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ছুটির পরেও ক্লান্ত দেহ-মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

সাধারণতঃ চশ্‌মা-নির্ম্মাতারা নাকের মাপ লইয়া লোককে চশ্‌মা তৈয়ার করিয়া দেয়। তাহাতে প্রায় ক্ষেত্রেই চশ্‌মা একেবারে ঠিক হইয়া নাকের উপর বসে না এবং যে চশ্‌মা ব্যবহার করে, তাহার নাকের উপর একটা দাগ পড়িয়া যায়। অনেক সময় অসমান চশ্‌মা পরিলে নাকে ব্যথাও হয়। ডাঃ হাল্‌ প্ল্যাষ্টার অব্‌ প্যারিস দিয়া নাকের হুবহু ছাপ তুলিয়া লন, এবং সেই ছাপের সাহায্যে চশমার দাঁড় তৈয়ার করেন। ইহাতে চশ্‌মা, ব্যবহারকারীর নাকে, একেবারে খাপে খাপে বসিয়া যায়, নাকের উপর দাগ পড়ে না এবং ব্যথা হয় না। এইপ্রকার ব্যবস্থায় আরো একটি সুবিধা আছে যে, কোন ব্যক্তি ডাক্তারের কাছে না আসিয়াও নাকের মাপ প্ল্যাষ্টারে তুলিয়া পাঠাইয়া দিতে পারে। আমাদের দেশে অনেক পর্দ্দানশীন নারীর চোখ খারাপ, কিন্তু তাঁহারা ইজ্জৎ হারাইবার ভয়ে চশ্‌মাওয়ালার সাহায্য লইতে দ্বিধা বোধ করেন। উক্তপ্রকার উপায় অবলম্বনে দ্বিধা খানিকটা দূর হইতে পারে। অবশ্য ডাক্তার দেখাইবার সমস্যাটা প্রায় একই-প্রকার থাকিয়া যাইবে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

মনো-রমা

আমার মনের গহন বনে
পা' টিপে' বেড়ায় কোন্‌ উদাসিনী
নারী-অপ্সরী সঙ্গোপনে!
ফুলেরি ছায়ায় বসে তার দুই চরণ মেলি,
বিজন-নিভৃতে মাথা হ'তে দেয় ঘোম্‌টা ফেলি,
শুধু একটুকু হেসে চায় কভূ
নয়ন-কোণে,
আমারি মনের গহন বনে!

সেথা সুখ নাই, দুখ নাই সেথা—
দিবা কি নিশা!
সন্ধ্যা-চাঁদের পাণ্ডু কিরণ
দেখায় দিশা।
নিঃশ্বাসে যদি একবার তার বুকটি দোলে,
কত ফুলকলি অমনি মাটিতে মুখটি তোলে!
ভুলে-যাওয়া কোন্‌ ব্যথার সলিলে
মিটায় তৃষা!
সেথা সুখ নাই, দুখ নাই সেথা—
দিবা কি নিশা!

কত বিরহের বেদনা-তিমির
ঘনায় চুলে!
কত মিলনের রাঙা-উৎসব
অধর-কূলে!
তবু তার সেই আঁখি-পল্লব শিশির-হারা,
উদাস-গভীর চাহনিতে ভরা নয়ন-তারা!

কবে যে কেঁদেছে, হেসেছে কখন—
গিয়েছে ভুলে'!
কত যামিনীর জমাট আঁধার
জড়ায় চুলে!
ছিল কি একদা এই ভুবনেই
জীবন-সাথী?—
কত জনমের মত মরণের
দিবস-রাতি!
কতবার তার ভস্ম ভাসায়ে দিয়েছি জলে!
কভূ সে আমারি চিতায় বসেছে চরণ-তলে,
অজানা-আঁধারে যতনে জ্বালায়ে
বাসর-বাতি!
একদা আছিল এই ভুবনেই
জীবন-সাথী!

আর কি কখনো এই বাহুপাশে
দিবে না ধরা?
হৃদয়-সায়রে হ'য়ে গেছে তার
কলস-ভরা?
এ-আলোকে যবে না হেরি তাহারে পরাণ কাঁদে—
মনো-বাতায়নে গোধূলি-বেলায় বেণী সে বাঁধে!
গানের আড়ালে সাড়া দেয় শুধু
সে অপ্সরা,
বাহির-ভুবনে এই বাহুপাশে
দিবে না ধরা!

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

প্রাচীন ভারতে পল্লীজীবন

অনেকেরই বিশ্বাস যে প্রাচীনকালে আমাদের দেশে সহরের সংখ্যা খুব কমই ছিল—পল্লীতেই সাধারণতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। প্রাচীন ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা আমাদের মনে বিনা বিচারে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে এটি তাদেরই অন্যতম। বস্তুতঃ এরূপ ধারণা যে ভুল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। অবশ্য সকল দেশেই চিরকাল সহরের সংখ্যা কম এবং পল্লীর সংখ্যা বেশী। কিন্তু ভারতবর্ষে যে বিশেষ করিয়া পল্লীকেই কেন্দ্র করিয়া সভ্যতা ও সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, নগরীর সহিত তাহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না, ইহার সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। অপরপক্ষে এ-দেশে যে সহরের সংখ্যা বড় কম ছিল না তাহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান। প্রাচীন সাহিত্য ও বিদেশী পর্য্যটকগণের বিবরণ পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

কিন্তু তাহা বলিয়া পল্লীজীবন যে সমাজের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল না তাহা বলি না। সকল দেশেই পল্লীসমূহ সাধারণ লোকের জীবন-যাত্রার বিশিষ্ট কেন্দ্র—ভারতবর্ষেও এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই। ভারতবর্ষের পল্লীজীবনে বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্য ছিল। সমাজ ও সভ্যতার একদিক্ যেমন নগরীর বিলাস ও বিভবের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিত, ইহার আর একদিক্ তেমনি প্রকৃতির লীলাভূমি শান্ত পল্লীভবনের সাহায্যে পরিপুষ্ট হইত।

কোন কোন গ্রামে কেবলমাত্র একশ্রেণীর লোক বাস করিত, যেমন, কামার-গ্রাম, কুমার গ্রাম, ছুতার গ্রাম। এই-সমুদয় গ্রাম যে ছোট ছিল তাহা নহে। জাতকগ্রন্থে উল্লিখিত এক 'মহা বড়্‌চকি' গ্রামে এক সহস্র কাষ্ঠব্যবসায়ী পরিবার বাস করিত, আর এক কর্ম্মকার-গ্রামেও ঐপরিমাণ বাড়ী ছিল। এই-সমুদায় গ্রাম কোন বিশেষ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু সাধারণতঃ গ্রামে সকল শ্রেণীর লোকই বাস করিত।

গ্রামের বাড়ীগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট করিয়া নির্ম্মিত হইত। মাঝে মাঝে সরু গলি আঁকিয়া বাঁকিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া যাইয়া এই বাড়ীগুলির শ্রেণী বিভক্ত করিত। গ্রামের বাহিরেই এক বা একাধিক বৃক্ষ অথবা বৃক্ষকুঞ্জ গ্রামের লোকের নিকট চৈত্যবৃক্ষরূপে পূজিত হইত এবং গ্রামের লোকের মিলনক্ষেত্র ছিল। গ্রামের বাহিরেই বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র নানা রঙের শস্যে বিচিত্র শোভা ধারণ করিত। কোন প্রাচীন কবি ইহাকে নানা রঙের টুক্‌রা টুক্‌রা কাপড়ে নির্ম্মিত ভিখারীর জামার সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রত্যেক গ্রামের স্বতন্ত্র গোচারণভূমিও থাকিত, সেখানে সকলেরই গরু চরিত। অনেক সময় গ্রামের চারিপাশে কাঁচা বা পাকা দেওয়াল থাকিত। মাটির মধ্যে বাঁশ বা অন্যান্য কাঠের খোঁজা পুঁতিয়া কাঁচা দেওয়াল তৈরী হইত। চোর ও দস্যুভয়েই এইরূপ করিতে হইত।

কৃষিকার্য্য ব্যতীত নানারূপ কারু ও সাধারণ শিল্পের দ্বারা গ্রামবাসীদের জীবন-যাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইত। লোকসংখ্যা বেশী হইলে নিকটেই জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া অন্য গ্রামের পত্তন হইত, কারণ তখন জায়গার কোন অভাব ছিল না। এইসমুদয় কারণে দারিদ্র্যদুঃখ একরকম অজ্ঞাত ছিল। অবশ্য দৈবদুর্ব্বিপাকে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি দেখা দিত।

গ্রামে নানারূপ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। গ্রামবাসীর সকলে মিলিয়া তাহার ব্যবস্থা করিত। যদি কেহ এ-বিষয়ে সাহায্য করিতে বিমুখ হইত তাহা হইলে সে সপরিবারে ইহাতে যোগদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইত।* সহরের অনুকরণে গ্রামে গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা হইত। গোষ্ঠী অনেকটা আজকালকার ক্লাবের ন্যায়। ইহাতে সকলে সাধারণতঃ অপরাহ্ণে, কি সন্ধ্যার পর একত্র হইয়া গল্পগুজব, সাহিত্যালোচনা, সংগীত, নৃত্য, বাদ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতেন। কখনও কখনও নাটকাদির অভিনয় হইত। আবার এইসকল গোষ্ঠী নানাপ্রকার লোকহিতকর কার্য্যও করিত।+ এই বিষয়ে কুলাবক-জাতকে একটি সুন্দর বর্ণনা আছে—মগধের মচল গ্রামে ত্রিশটি পরিবার বাস করিত। ত্রিশটি পরিবারের ত্রিশটি যুবক একটি দল গঠন করিল—স্থির করিল, তাহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মভাবে জীবন-যাপন করিবে ও পরহিত সাধন করিবে। তাহারা প্রাতঃকালে উঠিয়া দা কুড়াল লাঠি লইয়া বাহির হইত। লাঠি দিয়া গ্রামের রাস্তার সমস্ত ইট পাথর সরাইয়া দিত। রাস্তার পার্শ্বে যে-সমুদয় গাছের সহিত গাড়ীর সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা তাহা কুড়াল দিয়া কাটিয়া ফেলিত, উচ্চনীচ জায়গা তাহারা সমতল করিত, খাল ও নালার উপর তাহারা সাঁকো বাঁধিয়া দিত, পানীয় জলের নিমিত্ত তাহারা পুষ্করিণী খনন করিত, সাধারণের বসিবার জন্য ঘর তৈয়ার করিত ও দীন-দুঃখীকে নানা প্রকারে সাহায্য করিত।

বহুসংখ্যক প্রাচীন শিলালিপি হইতে জানা যায় যে যাহারা গ্রামের হিতের জন্য বিশেষ কোন কার্য্য করিত তাহারা চিরকাল গ্রামের লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইত। একবার কোন গ্রাম ভিন্ন-গ্রামের লোক কর্তৃক আক্রান্ত হয়—কোন ব্যক্তির বিশেষ চেষ্টাতেই গ্রামরক্ষা হয়। এই-কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে একখানি গ্রাম দান করা হয়। ৯৬৬ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি এইরূপ আর-এক গ্রাম্য-বীরের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। অন্য কয়েক-খানি শিলালিপিতে যে-সমুদায় গ্রাম্য-বীর গ্রামের রক্ষার্থে রক্তপাত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে নিষ্কর ভূমিদানের বিষয় উল্লেখ আছে। আর-একখানি শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে একব্যক্তি নিজের গ্রাম রক্ষার্থে জীবন বিসর্জ্জন করে, গ্রামবাসীরা এই-মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার্থ ও তাঁহার পারত্রিক মঙ্গলের জন্য স্থানীয় দেব-মন্দিরে একটি চিরস্থায়ী প্রদীপের প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ এই-প্রদীপটি প্রতি সন্ধ্যায় মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জ্বালান হইত, মন্দিরাধিকারীর হস্তে কিছু টাকা দেওয়া হইত, তাহার সুদ হইতে প্রদীপ জ্বালিবার খরচ নির্ব্বাহ হইত।

আর-একবার গ্রামবাসীরা এক তেঁতুলগাছের তলায় সভা করিয়া স্থির করিল যে তাহারা গ্রামের স্বার্থের বিরুদ্ধে অথবা গ্রামের মন্দির বা অন্য কোন অনুষ্ঠানের অনিষ্ট হয় এরূপ কোন কার্য্য করিবে না, যদি কেহ করে তাহা হইলে সে "গ্রামদ্রোহী" বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং

* অর্থশাস্ত্র, ১৭৩ পৃঃ।

\+ বাৎস্যায়ন প্রণীত কামশাস্ত্র, ৫৭ পৃঃ।

তদনুযায়ী শাস্তি পাইবে—সে শিবের মন্দিরে যাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, ইত্যাদি।

খুব প্রাচীনকাল হইতেই গ্রামের লোকের ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামে মন্দির থাকিত, সেখানে গ্রামবাসীরা একত্র হইয়া দেবতার পূজা করিত। প্রত্যেক গ্রামে একটি সাধারণ ঘর থাকিত, সাধু-সন্ন্যাসী আসিলে তথায় তাঁহাকে থাকিবার জায়গা দেওয়া হইত—গ্রামবাসীরা সেখানে যাইয়া তাঁহার উপদেশ শুনিত। গৌতম বুদ্ধের জীবনী হইতে দেখা যায় তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় এই-সমুদয় ঘরে আশ্রয় লাভ করিতেন। কোন কোন বর্দ্ধিষ্ণুগ্রামে এই-সমুদয় ঘর ইষ্টক দিয়া নির্ম্মিত হইত—গৌতম বুদ্ধের সময় নাদিক গ্রামে এইরূপ একটি ইষ্টকালয় ছিল।*

গ্রামের একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী থাকিতেন—তাঁহার উদ্দেশ্যে মন্দিরাদি তৈরী হইত। মহারাজ কনিষ্কের রাজত্বের দশম বৎসরে এইরূপ একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, প্রতিষ্ঠাতা একখানি শিলালিপিতে উক্ত মন্দিরের কথা লিখিয়া পরিশেষে প্রার্থনা করিয়াছেন "প্রিয়তাং দেবী গ্রামস্য" "গ্রাম দেবী প্রীত হউন"।‡

গ্রামের পুরুষ ও স্ত্রীলোক পুণ্যলাভার্থ দূর দেশে তীর্থযাত্রা করিতেন। প্রাচীনকালের বহু শিলালিপিতে এই-সমুদয় তীর্থস্থলে তাঁহাদের দান ও নানাবিধ পুণ্যপ্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লিখিত আছে। এই-সমুদয় তীর্থযাত্রার ফলে গ্রাম্য সংকীর্ণতা অনেকটা দূর হইত। এই সংকীর্ণতা দূর হওয়ার আর-একটি উপায় ছিল যুবকগণের পাঠোদ্দেশ্যে সুদূর বিদেশে গমন। অনেক জাতক গল্পে ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চল হইতে ছাত্রগণ পাঠোদ্দেশ্যে সুদূর তক্ষশিলায় গমন করিত এইরূপ বর্ণিত আছে। ইহা হইতে অনুমিত হয়, যে তৎকালে গ্রামে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ছাত্রগণ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপকদের নিকট জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য দূর-দূরান্তরে গমন করিত।

গ্রামের শাসনসংরক্ষণের ভার গ্রামবাসীদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। গ্রামের মাতব্বর লোক লইয়া সভা হইত—এই সভাই গ্রাম সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রত্যেক গ্রামেই একজন মোড়ল থাকিতেন, তিনি সভার মতানুসারে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ভিন্ন-ভিন্ন যুগে ভিন্ন-ভিন্ন দেশে এই মোড়লের ভিন্ন-ভিন্ন নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে তাঁহার নাম গ্রামণী—তিনি রাজ-কর্ত্তৃগণের অন্যতম ছিলেন অর্থাৎ রাজার নির্ব্বাচনে তাঁহার হাত ছিল। ঋগ্বেদে গ্রাম্য সভারও অনেক উল্লেখ আছে। এখানে ধনী দরিদ্র সকলেই সমবেত হইতেন। এই-সভা যে কেবল গ্রাম শাসন করিতেন তাহা নহে, ইহার বিচার করিবারও ক্ষমতা ছিল। বৌদ্ধ-জাতকে গ্রামণীর নাম 'গ্রাম-ভোজক'। তিনি রাজস্ব আদায় করিতেন এবং গ্রামবাসীর সাহায্যে দস্যু-তস্করের হাত হইতে গ্রাম রক্ষা করিতেন। কুলাবক-জাতকে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, গ্রামবাসীগণই গ্রামের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিতেন। আর-একটি জাতকে দেখিতে পাই যে গ্রাম-ভোজক অপরাধীর বিচার করিতেন। গহপতি-জাতকে বর্ণিত হইয়াছে যে একবার দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামবাসীগণ গ্রামভোজকের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিল—তিনি তাহাদিগকে এই সর্ত্তে খাদ্যদ্রব্যাদি দিলেন যে দুই মাস পরে যখন নূতন ফসল হইবে, তখন তাহারা উক্ত খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য শোধ করিবে। কৌটিল্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্রেও 'গ্রামিকের' কথা দেখিতে পাই। গ্রামিক ও গ্রামবাসীরা অপরাধীকে দণ্ড দিতে পারিবে, কিন্তু অন্যায় রকম দণ্ড দিলে তাহারা দণ্ডনীয় হইবে। মনু, বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রেও এবং সমসাময়িক শিলালিপিতে 'গ্রামিক' ও গ্রাম্য সংঘের পরিচয় পাই। বৃহস্পতি-ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং বহু শিলালিপিতে গ্রাম্য-সংঘের রীতিমত বিচার করিবার ক্ষমতার উল্লেখ আছে।

কতকগুলি প্রাচীন শিলালিপিতে 'পঞ্চমণ্ডলী', 'পাঞ্চালী' এবং 'পাঞ্চালিক' প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অনুমান হয় যে, এগুলি বর্ত্তমান পঞ্চায়েতেরই অনুরূপ। এখনকার মিউনিসিপালিটি ও জেলাবোর্ড যে-সমুদয় কার্য্য করেন অথবা যাহা তাঁহাদের করিবার কথা অথচ করেন না, পুরাকালে গ্রাম্য-সংঘই সে-সমুদয় নির্ব্বাহ করিতেন। বৃহস্পতি-ধর্ম্মশাস্ত্রে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি গ্রাম্য-সংঘের করণীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—"গ্রাম্য-সংঘের অধিবেশনের জন্য সভা-মণ্ডপ, পান্থশালা, জলসত্র, মন্দির ও প্রমোদোদ্যান নির্ম্মাণ, শাস্ত্রোক্ত সংস্কারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য দরিদ্র ও অসহায় গ্রামবাসীদিগকে সাহায্য করা, কূপ ও তড়াগাদি খনন, প্রভৃতি।" প্রত্যেক গ্রাম্য-সংঘেরই ভূসম্পত্তি ছিল, তাঁহারা গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কর আদায় করিতে পারিতেন, অপরাধীর নিকট জরিমানা আদায় হইত, এই-সমুদয় উপায়ে যে অর্থলাভ হইত তদ্দ্বারা গ্রাম্য-সংঘ উল্লিখিত কার্য্যগুলি নির্ব্বাহ করিতেন।

দাক্ষিণাত্যের বহুসংখ্যক শিলালিপি হইতে তত্রত্য গ্রাম্য সংঘের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক গ্রাম্য-সংঘের কর্ত্তৃত্ব একটি সভা বা মহাসভার হস্তে ন্যস্ত থাকিত। এই মহাসভার গঠন ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের ছিল। কোথাও গ্রামের পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেই এই সভার সভ্য হইতে পারিতেন। অন্য কোথাও গ্রামবাসীগণের প্রতিনিধিরাই মহাসভা গঠন করিতেন। চারিটি বিভিন্ন শিলালিপিতে চারিটি গ্রামের সভার সভ্যসংখ্যা যথাক্রমে ৩০০, ৪০০, ৫১২ ও ১,০০০ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এত অধিকসংখ্যক সভ্য একত্রে মিলিয়া সকল কাজ করিতে পারিতেন না। এইজন্য প্রত্যেক সভাই কতকগুলি ছোট ছোট কমিটি গঠন করিতেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পর্য্যবেক্ষণের জন্য 'কমিটি' নিয়োগের কথা শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়—১। দান, ২। পুষ্করিণী, ৩। বাগান, ৪। বার্ষিক তদন্ত, ৫। বিচার, ৬। স্বর্ণ, ৭। নাবালকের রক্ষণাবেক্ষণ, ৮। শস্যক্ষেত্র, ৯। সন্ন্যাসী, ১০। মন্দির, ১১। জমিজরীপ, ১২। বিবিধ ও সাধারণ, ইত্যাদি। এই-সমুদয় কমিটির মধ্যে স্ত্রীলোকও থাকিতেন।

কমিটি-নিয়োগের সম্বন্ধে নানারূপ বিধান ছিল। প্রথমতঃ গ্রামটি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত হইত। প্রত্যেক বিভাগের লোকেরা একত্র হইয়া কমিটির উপযুক্ত ব্যক্তির নামের তালিকা করিত। যাহাদের গ্রামে বাড়ী আছে, যাহাদের বয়স ৩৫ হইতে ৭০-এর মধ্যে, যে বেদবিৎ, যাহার কিছু-পরিমাণ জমি আছে, যাহারা কার্য্যে অভিজ্ঞ এবং সাধু উপায়ে ধন উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহারাই উপযুক্ত বিবেচিত হইত। যাহারা অথবা যাহাদের নিকট আত্মীয় সাধারণের কোন তহবিল খরচ করিয়া তাহার হিসাব দেয় নাই, যাহারা মহাপাতকের অপরাধে অভিযুক্ত অথবা তাহাদের সহকারী এবং নিকট আত্মীয়, যাহারা চৌর্য্য বা পরস্বাপহরণে অভিযুক্ত, যাহারা জাতিচ্যুত বা নিষিদ্ধদ্রব্য-ভক্ষণকারী, তাহারা এই তালিকাভুক্ত হইতে পারিত না। এইরূপে নামের তালিকা প্রস্তুত হইলে প্রত্যেক নাম একখানি টিকেটে লেখা হইত। পরে জনসাধারণ গ্রাম্য মন্দিরে সভা করিতেন। মন্দিরের পুরোহিত একটি শূন্য পাত্র উপুড় করিয়া দেখাইয়া তাহার মধ্যে টিকেটগুলি রাখিতেন। পরে একটি বালককে ডাকিয়া আনিয়া তাহার দ্বারা টিকেট উঠাইতেন। এইরূপে যাহাদের নাম উঠিত তাহারা কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইত।

গ্রাম্য-সভা গ্রামস্থিত সমুদয় জমির মালিক ছিল এবং ঐ গ্রামের

---

* মহাপরিনিব্বান সুত্ত ২। ৪-৫

‡ Ep. Ind., IX. P. 240.

মোট রাজকরের জন্যও তাহারা দায়ী থাকিত। সভার বা কমিটির কোন সভ্য সাধারণ সম্পত্তির অপব্যবহার করিলে রাজা তাহাকে দণ্ড দিতেন। রাজা গ্রামের কোন জমি সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিলে গ্রাম্য সভাকে তাহা জানাইতে হইত—রাজকর্ম্মচারী ও সভায় মিলিয়া রাজাজ্ঞা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতেন। সভা প্রয়োজনানুযায়ী সম্পত্তি বিক্রয় করিতে অথবা কর ধার্য্য করিতে পারিতেন—কোন জমির মালিক রাজস্ব না দিলে তাহা অন্য ব্যক্তিকে দান করিতে পারিতেন। ব্যক্তিবিশেষ সভার হস্তে টাকা, জমী অথবা শস্যাদি দান করিত, ইহার সুদ হইতে সভা উক্ত-ব্যক্তিকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সৎকার্য্যাদি করিতেন। এক ব্যক্তি সভার হস্তে এই সর্ত্তে টাকা দিলেন যে তাহার সুদ হইতে প্রত্যহ দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইবে। আর-এক ব্যক্তি জমি দিলেন যে তদুৎপন্ন শস্য দ্বারা তাঁহার নামে গ্রাম্য-দেবতার ভোগ দেওয়া হইবে। আর-একজন সভার নিকট হইতে কতকটা জমি ক্রয় করিয়া, গ্রামে একটি সাধারণের বাগান নির্ম্মাণের জন্য তাহা পুনরায় প্রত্যর্পণ করিলেন। আর-একজন গ্রাম্য পুষ্করিণীতে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী দুইখানা নৌকা রাখিবার জন্য কতকটা জমি দিলেন। এইরূপে সভা সাধারণের জন্য সম্পত্তির আয় হইতে নির্দ্দিষ্ট সৎকার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিতেন। কোন লোক-হিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহারা অতিরিক্ত করও ধার্য্য করিতে পারিতেন। গ্রামের একটি পুষ্করিণীর দরকার, পান-বিক্রেতাদিগের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য হইল। দরকার হইলে সাধারণের হিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহারা গ্রামবাসীদিগকে কায়িক পরিশ্রম করিতে বাধ্য করিতেন। দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে সভা টাকা কর্জ্জ করিয়া তদ্দ্বারা গ্রামবাসীদিগকে সহায়তা করিতেন এবং রাজার নিকট হইতে আংশিক অথবা সম্পূর্ণ রাজস্ব মাপ করাইয়া লইতেন। গ্রাম্য মন্দিরাদির সংস্কার এবং যাহাতে মন্দিরের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। গ্রামে মন্দিরের সম্পর্কে শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা ছিল। একখানি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, কোন গ্রাম্য-সভা মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে জমি দান করিলেন, এই জমির উপস্বত্ব হইতে নিম্নলিখিত ছাত্রদিগকে আহার ও বাসস্থান প্রদান করা হইত—ঋগ্বেদের ছাত্র ৭৫, যজুর্ব্বেদ ৭৫, ছান্দোগ্য-সাম ২০, তলবকার-সাম ২০, বাজসনেয় ২০, অথর্ব্ব ১০, বৌধায়ন গৃহ্য, কল্প ও গণ ১০, ব্যাকরণ ২৫, প্রভাকর ৩৫, বেদান্ত ১০, রূপাবতার ৪০, মোট ৩৪০ জন। ইঁহাদের পড়াইবার জন্য নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণের বেতনও উক্ত জমির উপস্বত্ব হইতে নির্ব্বাহ হইত। ঋগ্বেদ ৩, যজু ৩, ছান্দোগ্য ১, তলবকার-সাম ১, বাজসনেয় ১, বৌধায়নীয় গৃহ্য, কল্প ও কাঠক ১। কখনও কখনও ব্যক্তিবিশেষ সভার হস্তে জমি অথবা ধন দান করিয়া এইপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। একটি শিলালিপিতে দেখিতে পাই যে, একটি সভা এইরূপ গচ্ছিত ধনের সাহায্যে বারো জন বৈদিক অধ্যাপক ও সাত জন অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপকের এবং ১৯০ জন বৈদিক ছাত্র এবং ৭০ জন অন্যান্য বিষয়ের ছাত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সাধুসন্ন্যাসীর ভোজন, নিত্যপূজা ও নানারূপ নৈমিত্তিক উৎসবের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ সভা ব্যবস্থা করিতেন।

(প্রাচী, আষাঢ়) শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার

—

গবেষণার পরিচয়

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" লিখিয়া খ্যাতনামা হইয়াছেন। আজকাল যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা বা সাহিত্য সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করেন তাঁহাদের অনেকেই ইঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে নানাস্থল উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকারের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ দেখা যায়। আমিও দীনেশ-বাবুর গবেষণার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিবার স্পৃহা দমন করিতে পারিলাম না। আমি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" প্রথম সংস্করণ দেখি নাই। তবে দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে এ পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্করণগুলিই দেখিয়াছি। তিনি অসমীয়া ভাষা জানেন বলিয়া মনে হয় না; তাই অনন্ত-রামায়ণখানিকে বাঙ্গালাভাষার গ্রন্থ মনে করিয়া "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র মধ্যে উহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ঐ-পুস্তকখানির পরিচয় সম্বন্ধে দ্বিতীয় সংস্করণে যাহা লিখিত ছিল, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রথম সংস্করণ দেখি নাই, হয়তো তাহাতেও এইরূপই ছিল :—

"অনন্ত-রামায়ণ"

"কৃত্তিবাসের পরে যাঁহারা রামায়ণ রচনা করেন তন্মধ্যে 'অনন্ত রামায়ণ'খানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুক্ত করুণানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়াছেন; ইহা বঙ্কলে লিখিত, অবস্থা অতি জীর্ণশীর্ণ, পশ্চাতের কয়েকখানি পত্র নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং সময় নির্দ্ধারণের উপায় নাই; বঙ্কলে লিখিত ও 'দেখিতে অতি প্রাচীন', ইহাই এই পুস্তকের প্রাচীনত্বের প্রমাণ, ইহা ছাড়া আর-একটি বিশেষ প্রমাণ ভাষা। শেষোক্ত বিষয়ে অনুমান বড় নিরাপদ নহে, অন্য প্রমাণাভাবেই গ্রন্থের ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সময় নিরূপণের চেষ্টা দেখিতে হয়, কিন্তু নিতান্ত মফঃস্বলের ভাষা এখনও প্রাচীন শব্দপরম্পরায় এরূপ জটিল রহিয়া গিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়েও যদি বঙ্গের কোন সীমান্তপল্লী-প্রচলিত ভাষা লিখিত আকারে উপস্থিত হয়, তবে অদ্ভুত গবেষণা সাহায্যে আমরা তাহা প্রাকৃতিক যুগে কি বৌদ্ধাধিকারে লইয়া পৌঁছাইতে পারি। তবে অন্যান্য প্রমাণের অভাব হইলে ভাষা পরীক্ষা ভিন্ন সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে গত্যন্তর নাই; অনন্ত রামায়ণের ভাষা অত্যন্ত জটিল ও প্রাচীন, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে, কত প্রাচীন সে-সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, এই পর্য্যন্ত; আমরা ইহা ন্যূনপক্ষে ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি। গ্রন্থকারের বাসস্থান কি তৎসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ের বিবরণই অবলম্বিত পুঁথিখানিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কতকগুলি শব্দদৃষ্টে একবার বোধ হয়, গ্রন্থকার শ্রীহট্ট কিংবা তৎসন্নিহিত কোন জনপদের অধিবাসী; 'চ' স্থলে 'ছ' ব্যবহারের জন্য আমরা চিরকাল শ্রীহট্ট-বাসী বন্ধুগণের সহিত আমোদ করিয়া আসিয়াছি, এই পুঁথিতে 'চরণ' স্থলে 'ছরণ,' 'বচন' স্থলে 'বছন', 'চাস' (চাহিস) স্থলে 'ছাষ' প্রভৃতিরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, অন্যান্য শব্দও শ্রীহট্ট-প্রচলিত ভাষার সহিত সান্নিকট্যের পরিচয় দেয়; তবে একথাও একবার মনে উদয় হয়, যে, কবি না হইয়া প্রতিলেখকও শব্দের এবম্বিধ রূপান্তর করিয়া থাকিতে পারেন; প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে তদ্রূপ বিকৃতির উদাহরণও আমরা বিলক্ষণ পাইয়াছি।

এদিকে হিন্দী শব্দের সঙ্গেও এই পুঁথির ভাষার বিলক্ষণ নৈকট্য দৃষ্ট হয়, সুতরাং শ্রীহট্ট না হইয়া বঙ্গের পশ্চিমোত্তর প্রান্ত হইতে এই কবির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র হইবে না। আমরা এই পুস্তকের প্রণেতাকে বঙ্গের পূর্ব্বোত্তর কি পশ্চিমোত্তর সীমান্তস্থিত কোন পল্লীর অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত করুণানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুঁথি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা একেবারে উল্লেখ করেন নাই।"

অতঃপর গৌহাটি কটন কলেজের প্রফেসার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্‌-এ, মহাশয় দীনেশ-বাবুকে

চিঠি দিয়া "অনন্ত রামায়ণ" এবং ইহার কবি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানাইয়া দিয়াছিলেন, তাই "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের তৃতীয় (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত) সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণের ঐ লেখাটা অব্যাহত রাখিয়া উহার নীচে একটি ফুট-নোট দিয়া লিখিয়াছেন :—

"সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, এই অনন্ত আসাম-বাসী। ইনি অনন্ত কন্দলী নামে আসাম-বাসীগণের নিকট পরিচিত। ইঁহার রচিত রামায়ণের অংশ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত আছে। সুতরাং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' হইতে ইঁহাকে বাদ দেওয়ার জন্য আমাদের নিকট অনুরোধ আসিয়াছে। কিন্তু যে-যুগের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আমি লিখিতেছি, তখন আসামী ভাষা বাঙ্গলা ভাষা হইতে পৃথক্ ছিল না। আজ যদি ত্রিপুরায় কিংবা শ্রীহট্টে তদ্দেশীয় প্রাদেশিক ভাষার আধিপত্য হয়, তবে সঞ্জয়, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি লেখকগণকে আমরা কখনই কি বঙ্গ-সাহিত্য হইতে বাদ দিতে পারি? অথচ, প্রাদেশিকত্ব ধরিলে তাঁহাদের রচনাও অনন্ত রামায়ণ হইতে কম দুরূহ নহে। আসামের প্রাচীন কবিগণের বিষয় আমরা সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহি। তাঁহাদের বিবরণ পাইলে আমরা এ-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। আসামে অল্পদিন হইল বঙ্গাক্ষর এবং বঙ্গভাষার গৌরব নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আসামের ভাষাকে আমরা বঙ্গভাষার প্রাদেশিকভেদ ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া স্বীকার করি না।

"কবি অনন্তের আপন নাম রাম সরস্বতী ; ইনি কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন।" ১৪৩ পৃষ্ঠা।

পাঠকগণ দেখুন, তিনি অনন্ত-রামায়ণের কবির নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় পাইয়াছেন, অথচ দ্বিতীয় সংস্করণে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এই সংশোধিত" সংস্করণেও রাখিয়াছিলেন। এইরূপ ঠিক্ সংবাদ পাইবার পরেও কিরূপে তিনি অনন্ত রামায়ণের কবিকে একবার শ্রীহট্টের আবার "বঙ্গের পশ্চিমোত্তর" প্রান্তের "অধিবাসী" বলিয়া অনুমান করিতেছেন? তিনি ঐ ফুটনোটে লিখিতেছেন—"কিন্তু আসামের ভাষাকে আমরা বঙ্গভাষার প্রাদেশিকভেদ ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া স্বীকার করি না।" ভাল কথা, যদি তাহাই হয়, তবে আসামের ভাষায় যে-সকল অন্যান্য গ্রন্থ আছে, সেগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের বিবরণীও "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র অন্তর্নিবিষ্ট করিলেন না কেন? এ-সম্বন্ধে তো দেখা যায় অধ্যাপক পদ্মনাথ-বাবু তাঁহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই যেন সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন—তাঁহার নিকট হইতেও তো অনেক কথা জানিতে পারিতেন। তাঁহার যদি গবেষণায় ঔৎসুক্য থাকিত তবে তিনি অনন্ত-রামায়ণ হইতেই "শঙ্কর" নামক কবির নাম দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিতেন। পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন, হয়তো তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হইবার সময়ে পদ্মনাথ-বাবু হইতে ঐ তথ্যটুকু পাইয়া পরিবর্ত্তনাদির অবকাশ পান নাই। বেশ কথা। সম্প্রতি ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভূমিকায় আছে "এবার পুস্তকখানি আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল।" কৌতুহলী পাঠকবর্গ একবার অনুগ্রহ করিয়া এই সংস্করণের ১৩১ ও ৩২ পৃষ্ঠা দেখিবেন। তাহাতেও ২য় সংস্করণের (এবং তৃতীয় সংস্করণেরও) অনন্তরামায়ণ-কবির বাসস্থান শ্রীহট্ট কি বঙ্গের উত্তর-পশ্চিম কোনও স্থানে ছিল, ইত্যাদি রহিয়াছে—এবং তৃতীয় সংস্করণের ফুটনোটটি—যাহাতে অনন্ত-রামায়ণের কবি যে কামরূপবাসী তাহাও রহিয়াছে! আসামীয়া ভাষা যে "বঙ্গভাষার প্রাদেশিকভেদ" মাত্র, স্বতন্ত্র ভাষা নহে, তাহাও অবশ্যই এই ফুটনোটে—এই চতুর্থ সংস্করণেও বিদ্যমান। কিন্তু এই চতুর্থ সংস্করণেরই ভূমিকায় আছে :—"আমাদের বঙ্গসাহিত্যের আশ্রয়-মহীরুহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ কক্ষের দ্বার বঙ্গভাষার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। অসমীয়া, উড়িয়া, হিন্দী, তেলেগু, গুজরাটী, কেনারিজ, মালবীর, প্রভৃতি দ্বাদশটি প্রাদেশিক ভাষা বঙ্গভাষার সঙ্গে পাঠ করিবার সুবিধা তিনি করিয়া দিয়াছেন।" ইহাতে দীনেশ-বাবু অসমীয়া ভাষাকে বঙ্গভাষার ন্যায় একটি স্বতন্ত্র প্রাদেশিক ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন না কি?

(নব্যভারত, কার্ত্তিক ১৩২৯) জনৈক আসামবাসী

—

প্রাচী

জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!
ঢেকেছে তোমারে নিবিড় তিমির
যুগ-যুগব্যাপী অমা-রজনীর ;
মিলেছে তোমার সুপ্তির তীর
লুপ্তির কাছাকাছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

জীবনের যত বিচিত্র গান
ঝিল্লিমন্দ্রে হ'ল অবসান ;
কবে আলোকের শুভ আহ্বান
নাড়ীতে উঠিবে নাচি'?
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

স'পিবে তোমারে নবীন বাণী কে?
নব প্রভাতের পরশ-মাণিকে
সোনা করি দিবে ভুবনখানিকে
তারি লাগি' বসি' আছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

জরার জড়িমা-আবরণ টুটে'
নবীন রবির জ্যোতির মুকুটে
নব রূপ তব উঠুক্ না ফুটে'
করপুটে এই যাচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

"খোলো খোলো দ্বার, ঘুচুক আঁধার,"
নবযুগ আসি' ডাকে বারবার,
দুঃখ-আঘাতে দীপ্ত তোমার
সহসা উঠুক্ বাঁচি'।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

ভৈরব রাগে উঠিয়াছে তান,
ঈশানের বুঝি বাজিল বিষাণ,
নবীনের হাতে লহ তব মান
জ্বালাময় মালাগাছি।

(প্রাচী, আষাঢ়) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

শিল্প

মানুষের সৃষ্টিকরা যাকিছু এবং যে সৃষ্টির মধ্যে মানুষটাই রয়েছে এই দুই আর্টের প্রকৃতির তফাৎটা ঠিক ধরা না পড়ার দরুন্ আমরা দুটোর মধ্যে তুলনা করে' দেখ্‌তে বলি এবং সেই কারণেই অনেক সময়ে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়, দুই সৃষ্টিকেই বোঝা শক্ত হ'য়ে ওঠে। এই যে সকালের ছবি, সন্ধ্যার ছবি, ফুল পাতা ইত্যাদি নানা সৃষ্টি দেখ্‌তে পাচ্ছি, এরা রচনা হ'য়েই চলেছে, দিনে-দিনে পলে-পলে বিচিত্র শোভা ও ভাব নিয়ে আসা-যাওয়া কর্‌ছে। আলো-অন্ধকারে, মানুষ এদের দেখ্‌লে কি না-দেখ্‌লে তার কোন অপেক্ষাই রাখে না এরা! মানুষ যখন আসেনি তখনও এরা রচনা হ'য়ে চলেছিল, মানুষ যখন এল তখনও রচনা হ'য়ে চল্‌ল, মানুষ যখন থাক্‌বে না তখনও রচনা হ'তে চল্‌বে। কারও মনে ধরা না-ধরার অপেক্ষা নেই বিশ্বরচনায়, এই যে বিধাতার সৃষ্ট সমস্ত দৃশ্য ও বস্তু এরা রাজার মতো আপনার ঐশ্বর্য্য বিস্তার করে' শোভা সৌন্দর্য্য বিলিয়ে চলেছে, মানুষ কিছু নিলে না-নিলে তাতে কিছু এল-গেল না। স্রষ্টা মানুষের অপেক্ষা না রেখেই সৃষ্টি হ'য়ে চলেছে বিশ্বকর্ম্মার রচনা সমস্ত, কিন্তু মানুষের সৃষ্টি সে মানুষের মন থেকে বেরিয়ে যখন আসে তখন সে বিশ্ব রচনার মতো এমন স্বাধীন নিঃসঙ্কোচভাবে আসে না, কেননা সে অপেক্ষা রাখে আর-একটি মানুষের মনে-ধরার, না হ'লে সে নিজেই ব্যর্থ হ'য়ে যায়, এইজন্যে মানুষের সৃষ্টির মধ্যে সঙ্কোচ বলে' একটা জিনিস থাকে, সে ভিখারীর মতো আসে মনের দ্বারে দ্বারে হাত পেতে। রাজবৎ উদ্ধতদ্যুতিঃ—হ'ল বিশ্বরচনা, তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মানুষ নিজের হাত পাতে, মাথা নত করে, মন বিস্তৃত করে। আর এই মানুষের সৃষ্টি—এ আসে নববধূর মতো সসঙ্কোচে মিলনের মালা হাতে আর-একটি মনকে বরণ কর্‌তে চায় সে। দুই আর্টের গতিবিধির এই পার্থক্যটাই হচ্ছে দুই আর্টের বিশেষত্ব। দরদের অপেক্ষা রাখে মানুষের সৃষ্টি, আর বিশ্বসৃষ্টি সে তোমার-আমার দরদের অপেক্ষা রাখে না, সে বুক ফুলিয়ে আসে যায় ময়ূরের মতো চিত্রবিচিত্র কলাপ বিস্তার করে', নিজের সৌন্দর্য্যে নিজেই মগ্ন হ'য়ে নেচে চলে, পলে পলে কালে কালে অফুরন্ত রসের ঐশ্বর্য্য নিয়ে, স্বাধীনা প্রকৃতি তার।

(প্রাচী, আষাঢ়) শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা

আদিযুগ বা বৌদ্ধযুগ

সে দিন বাঙ্গালার অতি স্মরণীয় সুপ্রভাত যে দিন বঙ্গবাণী সাহিত্যের বিস্তীর্ণ আসরে দেখা দিল। সে দিন তাহার আকৃতি শুধুই কবিতাময়ী। প্রথমে উচ্চবর্ণেরা বলিয়া উঠিলেন, "ভ্রষ্টা, অস্পৃশ্যা"। কিন্তু আবার এমন দিন আসিল, সে-দিন ব্রাহ্মণ তাঁহার সংস্কৃত আভিজাত্য ভুলিয়া বঙ্গবাণীর লালিত্য-ভরা রাঙা পায়ে বিকাইতে চাহিলেন।

যাঁহারা বলিয়াছিলেন—"অষ্টাদশ-পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ" নিশ্চয় তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে আহ্বান করিয়া আনেন নাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিপক্ষেরাই সনাতনপন্থীগণকে বিমোহিত করিয়া বেদমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্যই এই মোহিনী বঙ্গবাণীর সাধনা করিয়াছিল। পরে স্বার্থের খাতিরে লৌকিক দেবতার পূজকেরাও তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল।

ধর্ম্মের দলাদলিতে লৌকিক ভাষায় সাহিত্যে সৃষ্টি বা পুষ্টি পৃথিবী সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন কথা নহে। নূতন ধর্ম্মপ্রচারকগণ নিজেদে মত সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য প্রচলিত ভাষার আ গ্রহণ করে। প্রাচীন দল সাধারণের উপর নিজেদের সাবেক দখল বজা রাখিবার জন্য চলিত ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে প্রতি দ্বন্দ্বী ধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল।

বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের পূর্ব্বে সহজিয়া বৌ তান্ত্রিকগণ তাঁহাদের মত প্রচার করেন। বঙ্গের তীর্থিক ও বৌদ্ধগণে ধর্ম্মবিতণ্ডার ফলে উভয় ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টায় কিংবা প্রতি বেশিতা-সূত্রে উভয়ের সংমিশ্রণে পশ্চিম বঙ্গে সদ্ধর্ম্মের এবং পূর্ব্বব নাথ-মার্গের উৎপত্তি হয়। পরে নাথপন্থ সমস্ত ভারতে ছড়াই পড়িয়াছিল। বোধ হয় এই সময়েই ব্রাহ্মণ্য সমাজের গণ্ডীর বাহি বিষহরী, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পূজার বহু প্রচারের জন্য চেষ্টা হইতে থাকে।

চুরাশি জন সহজিয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে মীননাথ, কানুপ লুয়ীপা, বিরুবা, ধামপা প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালী। শাস্ত্রী মহাশয়ে মতে লুয়ী "আদি সিদ্ধাচার্য্য"। তাঁহার সময় ৯৫০ হইতে ১০৫০ খৃঃ অব্দে মধ্যে। কিন্তু নানা কারণে মীননাথকে সর্ব্ব প্রথম সিদ্ধাচার্য্য বলিয় মনে হয়। শাস্ত্রী মহাশয় একখানি প্রাচীন পুঁথির প্রমাণে তাঁহাকে চন্দ্রদ্বীপের লোক ও জাতিতে কৈবর্ত্ত মনে করেন। কথি আছে তিনি মৎস্যের উদরে থাকিয়া জলের নীচে হইতে হর-পার্ব্বতী রহস্য কথা শুনিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। নেপালীদিগের মতে তিনি ৩৬২৩ কল্যব্দে (=৫২২ খৃঃ অব্দে) নেপালে আসেন।

রামাই পণ্ডিত নিজে ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধ উভয়ের মিলন ইচ্ছায় সদ্ধর্ম্মের প্রচার করেন। পরবর্ত্তী কালের নানক কবীরের মত তাঁহাকে একজন মিলনকামী ধর্ম্ম সংস্কারক বলা যাইতে পারে। "যাত্রাসিদ্ধি ঠাকুরের পদ্ধতি"তে তাঁহার পরিচয় আছে।

রামাই পণ্ডিত সুদীর্ঘজীবী ছিলেন। সম্ভবতঃ সমস্ত ত্রয়োদশ শতকে তিনি বিদ্যমান ছিলেন এবং মুসলমান আক্রমণ দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান অন্যায় হইবে না। শূন্য-পুরাণে মুসলমানী শব্দ আছে, গৌড়ের মুসলমান বাদ্‌শার উল্লেখ আছে।

গোরক্ষনাথ এক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য। তাঁহার শিষ্যেরাই নাথ-সম্প্রদায়-রূপে অভিহিত হইয়াছে। গোরক্ষনাথ মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি পশ্চিমাঞ্চলের লোক।

মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী, শীতলা প্রভৃতি লৌকিক দেবতাগণের পূজা মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বেই খুব সম্ভবতঃ ব্রতকথা-রূপে মুখে-মুখে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য পরবর্ত্তী কালের মঙ্গলগানের মত কোন পুস্তক সেই-সময় রচিত হইয়া থাকিলেও আমরা তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত নহি।

বর্ত্তমানে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বলা যাইতে পারে যে মীননাথই বঙ্গের আদি কবি।

নূতন-ধর্ম্ম-প্রচারকগণ নবীনত্বের বিপুল উৎসাহে তাঁহাদের মত প্রচার করিতে লাগিলেন এবং অনেকে তাঁহাদের দলভুক্ত হইতে লাগিল। বৌদ্ধ সহজিয়াগণ পটমঞ্জরী বঙ্গাল প্রভৃতি লোকপ্রিয় রাগে গান করিয়া তাঁহাদের মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—

কিং তো মন্তে কিং তো তন্তে কিং তো ধ্যাণবাখানে।

(বৌদ্ধগান, ৫৩ পৃঃ)

"তোর তন্ত্রে কি কাজ? তোর মন্ত্রে কি কাজ? তোর ধ্যানে ব্যাখ্যানে কি কাজ?" এস সহজ ধর্ম্মে এস।

সহজ এক পর আথে তহি ফুল্ল কাহ্ন পরজই।
শাথ আগম বহু পঠই বঠ কিং পি ন জানই।

(ঐ, ১২৭ পৃঃ)

"সহজ এক পরম তত্ব। কাহ্ন তাহা স্পষ্ট জানে। মূর্খ শাস্ত্র আগম বহু পড়ে, কিছুই জানিতে পারে না।" কিন্তু সহজ কি? তাঁহারা বুঝাইলেন—

ভণ কইসে সহজ বোলবা জায়
কাঅ বাক্ চিঅ জসু ণ সমায়॥

(ঐ, ৬১ পৃঃ)

"বল সহজ কেমনে বলা যায়? যাহাতে কায়বাক্ চিত্ত প্রবেশ করিতে পারে না।" তবে উপায় কি? উপায় গুরু।

লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।

(ঐ, ১ পৃঃ)

"লুই বলেন, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জান!"

"বৌদ্ধগান ও দোহায়" একুশ জন সহজিয়া সিদ্ধার গান ও দোহা সংগৃহীত হইয়াছে। বৌদ্ধগানগুলিই পরবর্ত্তী কালের মহাজন-পদাবলী ও মুসলমানী মারফতী গানের পূর্ব্বরূপ (proto-type)। পরবর্ত্তী কালে হিন্দী ভাষায় দোহা রচনা তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতি দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে ডাক ও খনার বচনে দোহার কিছু লক্ষণ দেখা যায়।

এই-সময়ে গোরক্ষনাথের চেলারা গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা প্রভৃতি সিদ্ধাচার্য্যগণের অপূর্ব্ব যোগশক্তি খ্যাপন করিয়া দলে দলে লোকদিগকে নাথমার্গে আনিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী কালের "গোরক্ষ-বিজয়", "ময়নামতীর গান", "মাণিকচন্দ্র রাজার গান" প্রভৃতি নাথগীতিকাগুলির আদিরূপ এই-সময়েই প্রচারিত হইয়াছিল। এই-সময়েই লৌকিক দেবতাগুলির পূজা ধীরপদসঞ্চারে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আসর জমাইতেছিল।

কিন্তু এই-সময়ে সনাতনপন্থীগণ আপনাদের প্রাচীন মত রক্ষার জন্য কি করিতেছিলেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না।

এই-সময়ে ধর্ম্ম-কোলাহলের ঘূর্ণাবর্ত্তের বাহিরে বাঙ্গলা সাহিত্যের কয়েকটি স্থির শান্ত ধারা বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনকে সরস করিতেছিল। তন্মধ্যে একটি কথা-সাহিত্য। আমরা মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বের কোন লিখিত উপকথা পাই নাই সত্য, কিন্তু অনেক উপকথা যেমন বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং হিন্দু মুসলমান উচ্চ নীচ সর্ব্বশ্রেণীর নিরক্ষর স্ত্রীপুরুষের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহাতে এইগুলির উৎপত্তি যে মুসলমান আমলের পূর্ব্বে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। এ-দেশের অধিকাংশ মুসলমান যে পূর্ব্বে হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল, তাহা নিশ্চিত। বাঙ্গালী হিন্দু যে-সূত্রে এই উপকথাগুলি পাইয়াছে, বাঙ্গালী মুসলমানও সেই-সূত্রে পাইয়াছে। মুসলমানেরা হিন্দুদের নিকট হইতে ধার করিয়া লইয়াছে, বলা সঙ্গত হইবে না। পরবর্ত্তীকালে এই-সকল উপকথার কয়েকটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখনও অনেক উপকথা মুখে-মুখেই প্রচলিত রহিয়াছে। যদি আমরা এখনও সেগুলিকে সংগ্রহ না করি, হয়ত সেগুলি চিরতরে কালের বিস্মৃতিগর্ভে ডুবিয়া যাইবে।

ডাক ও খনার বচনগুলিও এই লোক-সাহিত্যের মধ্যে। ডাক বৌদ্ধদের জ্ঞানী পুরুষ, তাহার স্ত্রীলিঙ্গে ডাকিনী। "বৌদ্ধগান ও দোহার" অন্তর্নিবিষ্ট "ডাকার্ণব" ডাকের বৌদ্ধত্বের প্রমাণ করিতেছে। যেমন বৌদ্ধ সমাজে ডাকের বচনের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইরূপ হিন্দুসমাজে খনার বচনের সৃষ্টি হইয়াছিল। খনার বচনগুলি খনা নাম্নী কোন বিদুষীর একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল না; সেগুলি হিন্দু বাঙ্গালী গৃহস্থের পুঞ্জীভূত ভূয়োদর্শনের সংক্ষিপ্তসার। পরবর্ত্তী কালে ডাক ও খনার বচন যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হিসাবে তাহা তত প্রাচীন না হইলেও তাহাদের অনেকেরই কুরছিনামা মুসলমান আমলের পূর্ব্বে পৌঁছিবে।

প্রবাদবাক্যগুলিকে (proverbs) এই-যুগের সাহিত্যের অমৃতবিন্দু বলা যাইতে পারে। "শূন্য গোয়াল ভাল, দুষ্ট গরু ভাল নয়" এই প্রবাদবাক্যটি বৌদ্ধ গানে "বর সুণ গোহালী কিমু দুঠ্যা বলন্দে" (৩০ পৃষ্ঠা) এইরূপে দর্শন দিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের "আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী" (৮৮ পৃষ্ঠা) বৌদ্ধগানের "অপণা মাংসে হরিণা বৈরী" বাক্যেরই প্রতিধ্বনি।* এখনও এই-সকল প্রবাদ-বাক্য মুখে-মুখেই প্রচলিত রহিয়াছে। সমস্তগুলি কাগজে-কলমে করিবার কোন চেষ্টা হইতেছে না।

মুসলমান কর্ত্তৃক বাঙ্গলা আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা এইরূপ ছিল।

(প্রাচী, আষাঢ়) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

—

ছন্দ

কবিতার বিশেষত্ব হচ্চে তার গতিশীলতা। সে শেষ হ'য়েও শেষ হয় না। গদ্যে যখন বলি "একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল" তখন এই বলার মধ্যে এই খবরটা ফুরিয়ে যায়; কিন্তু কবি যখন বল্লেন—

রজনী শাঙনঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে—

তখন কথা থেমে গেলেও বলা থামে না।

এ বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পঞ্জিকা-আশ্রিত কোনো দিন-ক্ষণের মধ্যে বদ্ধ হ'য়ে এ বৃষ্টি শুরু হ'য়ে যায়নি। এই-খবরটির উপর ছন্দ যে-দোলা সৃষ্টি ক'রে দেয় সে দোলা ঐ-খবরটিকে প্রবহমান ক'রে রাখে।

অণুপরমাণু থেকে আরম্ভ করে', নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই নিরন্তর গতিবেগের মধ্যে ছন্দ রয়েচে। বস্তুত এই ছন্দই রূপ। উপাদানকে ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত করলেই সৃষ্টি রূপ ধারণ করে। ছন্দের বৈচিত্র্যই রূপের বৈচিত্র্য। বাতাস যখন ছন্দে কাঁপে তখনি সে সুর হ'য়ে ওঠে। ভাবকে কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা কবিতা হয়। সেই ছন্দ থেকে ছাড়িয়ে নিলেই সে হয় সংবাদ, সেই সংবাদে প্রাণ নেই, নিত্যতা নেই।

মেঘদূতের কথা ভেবে দেখ। মনীব্ একজন চাকরকে নির্ব্বাসিত করলে—গদ্যে এই গল্পের মত এমন গল্প তো আমরা সর্ব্বদা পড়্‌ছি—কেবল তফাৎ এই যে রামগিরি অলকার বদলে হয়তো আমরা আধুনিক রামপুরহাট, হাটখোলার নাম পাচ্ছি। কিন্তু "মেঘদূত" কেন লোকে বছর বছর পড়্‌ছে? কারণ মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের মধ্যে বিশ্বের গতি নৃত্য করছে। তাই এই কাব্য চিরকালের সজীব বস্তু। গতিচাঞ্চল্যের ভিতরকার কথা হচ্ছে—'আমি আছি' এই সত্যটির বিচিত্র অনুভূতি। 'আমি আছি', এই অনুভূতিটা তো বদ্ধ নয়, এ যে সংসরণে চলায়-ফেরায় আপনাকে জানা। যতদিন পর্য্যন্ত আমার সত্তা স্পন্দিত, নন্দিত হচ্ছে, ততদিন 'আমি

* কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে হরিণের মুখে ইহার অনুরূপ বাক্য আছে—"জগৎ হইল বৈরী আপনার মাংসে।"—প্রবাসীর সম্পাদক।

আছি'র বেগের সঙ্গে সৃষ্টির সকল বস্তু বলছে, "তুমি যেমন আছ, আমিও তেমনি আছি।" "আমি আছি" এই সত্যটি কেবলি প্রকাশিত হচ্ছে, "আমি চল্‌চি"র দ্বারা। চলাটি যখন বাধাহীন হয়, চারিদিকের সঙ্গে যখন সুসঙ্গত হয়, সুন্দর হয়, তখনই আনন্দ। ছন্দোময় চলমানতার মধ্যেই সত্যের আনন্দরূপ। আর্টে, কাব্যে, গানে প্রকাশের সেই আনন্দমূর্ত্তি ছন্দের দ্বারা ব্যক্ত হয়।

(শান্তিনিকেতন, আষাঢ়) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

গান

তোমার বীণায় গান ছিল, আর
আমার ডালায় ফুল ছিল গো।
একই দখিন হাওয়ায় সেদিন
দোঁহায় মোদের দুল দিল গো।

সেদিন সে ত জানেনা কেউ
আকাশ ভরে' কিসের সে ঢেউ,
তোমার সুরের তরী আমার
রঙীন ফুলে কূল নিল গো॥
সেদিন আমার মনে হ'ল
তোমার তানের তাল ধরে'
আমার প্রাণে ফুল ফোটানো
রইবে চিরকাল ধরে'॥

গান তবু ত গেল ভেসে
ফুল ফুরালো দিনের শেষে,
ফাগুন-বেলায় মধুর খেলায়
কোন্‌খানে হায় ভুল ছিল গো॥

(শান্তিনিকেতন, আষাঢ়) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

ব্রহ্ম ও চীনপ্রবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামলাল সরকার

"প্রবাসী" ও "মডার্ণ্‌ রিভিউ" পত্রের পাঠকপাঠিকা-গণের নিকট ডাক্তার রামলাল সরকার মহাশয়ের নাম নূতন নহে। প্রবাসীতে তাঁহার লিখিত "চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব", "পেকিন রাজপুরী","চীনে হিন্দুবাজত্ব', তিব্বতে নিকল্‌ সাহেব" প্রভৃতি বাঙ্গালা প্রবন্ধ এবং মডার্ণ্‌ রিভিউ পত্রে লিখিত "Secret Societies in China", "My Little Experience in China", "China and Her Medical Science" প্রভৃতি ইংরেজী প্রবন্ধাবলী যেমন বহু-তথ্যপূর্ণ এবং সুখপাঠ্য, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষা-প্রদ। এইসকল সাময়িক প্রবন্ধ ব্যতীত তিনি "চীন-দেশে সন্তান-চুরি", "সন্তান-শিক্ষা", "নব্যবঙ্গের কর্ত্তব্য", "আমার জীবনের লক্ষ্য" প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বর্ম্মীভাষায় "ধাত্রী-শিক্ষা" নামক চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার করিয়া সমগ্র ব্রহ্মদেশে তেমনি সুপরিচিত হইয়াছেন। ডাক্তার সরকার বহু বৎসর ব্রহ্মদেশে ও চীনে স্বীয় গৌরব-ময় জীবন অতিবাহিত করিয়া কয়েক বৎসর হইল দেশে ফিরিয়াছেন। তিনি একজন আত্মগঠিত পুরুষ।

ডাক্তার সরকার ১২৬০ বঙ্গাব্দে জেলা যশোহরের এলাকাধীন মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত আমলসার গ্রামে মাতুলালয়ে প্রসিদ্ধ বাগ্‌চি-বাটীতে বরেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক বাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোয়ালন্দ মহকুমার অধীন গাজনা গ্রাম। পিতা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র সরকার। উপনয়নের পর তিনি গাজনা হইতে পাঁচ মাইল দূরে থানাকুল গ্রামের মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি হন। বঙ্গের স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার সহপাঠী, এবং অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার ভ্রাতা পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের নিম্নশ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮৭১ অব্দে এখান হইতে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রামলাল-বাবু দিনাজপুর গবর্ণমেণ্ট্‌ স্কুলে প্রবেশ করেন। দুই বৎসর পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি-গ্রহণ উপলক্ষে দিনাজ-পুরের রাজা একটি ব্যায়াম-বিদ্যালয় স্থাপন করিলে রামলাল-বাবু তাহাতে ব্যায়াম ও কুস্তি শিক্ষা করিতে থাকেন। সেই সময় বাড়ী আসিবার পর পনেরো দিনের মধ্যে তাঁহার জনকজননী উভয়েই পরলোক গমন

করেন। তিনি বিক্রমপুর কালীকিশোর স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হন।

দারিদ্র্যের পেষণে অতিসামান্য বেতনে রামলাল-বাবু গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষকতা করিতে বাধ্য হন। পরে তাঁহার অভিভাবকস্বরূপ বিক্রমপুর-নিবাসী বাবু আনন্দমোহন দাস ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ফ্রিশিপ লইয়া তাঁহাকে পড়িবার পরামর্শ দেন এবং সাধ্যমত খরচপত্র চালাইবার প্রতিশ্রুতি দান করেন। রামলাল-বাবু ফরিদপুরের সিবিল্ সার্জ্জন্ ডাক্তার বি বসুর সুপারিশে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে প্রবেশ করেন। এখানে বৃত্তিলাভ করিয়া এবং প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এনাটমীর মেডেল প্রাপ্ত হন। পীড়িত থাকায় তিনি তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া Certificate of Honour মাত্র প্রাপ্ত হন। তখন নিয়ম ছিল—উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথম দশজন চাকরি পাইবে। রামলাল-বাবু শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মেজর ক্রম্বী, এই-নিয়ম অনুসারে তাঁহাকে চাকরি দিতে চাহিলে, তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া বলেন যে, তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায় শিক্ষা করিবার জন্যই স্কুলে আসিয়াছিলেন।

রামলাল-বাবু বাড়ীতে ডিস্পেন্সারী করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তাঁহার পসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। পরে নানা দুর্ব্বিপাকে চাকরি গ্রহণ ভিন্ন তাঁহার আর গত্যন্তর থাকে না। তিনি তাঁহার অর্জ্জিত পদকগুলি এবং প্রশংসাপত্রের তাড়া সম্বলস্বরূপ লইয়া চাকরীর অন্বেষণে কলিকাতা রওনা হন। অতি কষ্টে তিনি কালীঘাটে এক ডাক্তার বন্ধুর নিকট একমাস চাকরি করিয়া দশটাকা মাত্র পাইয়া কোন বড় ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারি করিবার আশায় জনৈক প্রসিদ্ধ এসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জনের নিকট উমেদার স্বরূপ গিয়া উপস্থিত হন এবং অন্য চাকরিরও সন্ধান করিতে থাকেন।

এই-সময়ে আসামের জয়পুর ও ধুবড়ির চা বাগানে দুইজন ডাক্তারের কাজ খালি আছে শুনিয়া তিনি আবেদন করেন ও মনোনীত হন। ঘটনাক্রমে এই সময়েই রেঙ্গুনেও তিনি একটি চাকরি পান ও ১৮৮৯ অব্দের নভেম্বর মাসে ব্রহ্মদেশে যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে বাঁকুড়া-নিবাসী ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও চাকরি করিতে বর্ম্মা যাত্রা করেন।

রেঙ্গুনে পৌঁছিয়া রামলাল-বাবু ও যোগেন্দ্র-বাবু তথাকার ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বাসায় গিয়া উঠেন। তিনি একখানি চুক্তিপত্রে দস্তখত করিতে বাধ্য হন, তাহার সর্ত্ত ছিল পাঁচ বৎসর ব্রহ্মদেশে চাকরি করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ করিলে পাঁচশত টাকা দণ্ড দিতে হইবে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর তিনি পোকুকু সহরের সিবিল হস্পিটালে যাইতে আদিষ্ট হন। পোকুকু পৌঁছিবামাত্র কাপ্তেন মরিস্ সাহেব তৎক্ষণাৎ

ডাক্তার রামলাল সরকার

তাঁহাকে লেসে (Lessey) নামক পার্ব্বত্য কেল্লায় যাইতে আদেশ করেন। লেসের পথ অতি দুর্গম, তথাকার কেল্লায় তখন ৫০ জন সিপাহী ছিল, সকলেই মুসলমান। কম্পাউণ্ডারটি খৃষ্টান। এখানে তিনি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে জ্বরে আক্রান্ত হন। এই আত্মীয়বান্ধবহীন চিকিৎসক-ও পথ্যহীন স্থানে এরূপ অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া অবিলম্বে তিনি বদ্‌লির দরখাস্ত দেন।

একমাস পরে এখান হইতে বদ্‌লি হইয়া তিনি প্রথমে পোকুকু পরে মনিওয়াতে গমন করেন, এখানে ডাক্তার সরকার বর্ম্মার কথ্য ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং পরে Lower Standard পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া দুইশত টাকা পুরস্কার পান। এইস্থানে তিনি জনৈক মাদ্রাজী এপথিকারী সিবিল্ সার্জ্জনের অধীনে কার্য্য আরম্ভ করেন। এই ব্যক্তি ঘোর বাঙ্গালী-বিদ্বেষী ও দুর্ম্মুখ ছিলেন। ডাক্তার সরকারকে প্রায় প্রত্যহই এই মাদ্রাজীর দুর্ব্ব্যবহারের জন্য অশ্রুবর্ষণ করিতে হইত। ছয় মাস পরে এপথিকারী সাহেব বদ্‌লি হইয়া অন্যত্র গমন করিলে ডাক্তার সরকার হাঁফ ছাড়িবার অবসর পান এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে দেশ হইতে আনয়ন করেন। এখানে তিন বৎসর কার্য্য করিবার পর তিনি শোয়েবো সহরে বদ্‌লি হন। রামলাল-বাবুর শরীর এখানে ক্রমে সুস্থ হইতে থাকে। তিনি মনেওয়া প্রবাসকালে তথাকার ডেপুটি কমিশনর ও এসিষ্টাণ্ট্ এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের অর্থ-সাহায্যে একটি ক্লাবের সূত্রপাত করেন এবং কোর্ট্ হাউসের নিকট একখণ্ড জমি লইয়া ক্লাব-গৃহও নির্ম্মাণ করান; কিন্তু তিনি শোয়েবোতে চলিয়া আসিলে সে-ক্লাব ও নবনির্ম্মিত গৃহও লোপ পায়।

শোয়েবো হইতে য়েমেথেন এবং তথা হইতে বদ্‌লি হইয়া রামলাল-বাবু ভামোতে আগমন করেন। এখানে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে যাহাতে ডাক্তার সরকারের উন্নতির পথ মুক্ত হয়। ১৮৯৭-৯৮ অব্দে যখন চীনব্রহ্ম সীমান্তে অভিযান প্রেরিত হয়, তখন "Her Majesty's Commissioner" মিষ্টার থাকেল্ হোয়াইট্ (পরে ব্রহ্মদেশের ছোটলাট সার্ হার্ব্বার্ট্ হোয়াইট্) মহাশয় সেই সীমান্ত-কমিশনের জন্য একজন "আই-এম-এস," অফিসার চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতগবর্ণমেণ্ট্ তখন উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশীয় যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় উক্ত পদের কর্ম্মচারী দিতে অস্বীকৃত হইয়া ডাক্তার সরকারকে সম্পূর্ণ উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকেই অভিযানের মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। এই-কমিশনে আট জন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী ছিলেন এবং পাঞ্জাবী ডোগ্‌রা সিপাহীরা অভিযানের রক্ষক ছিল। এখানকার কার্য্যে ডাক্তার সরকার বিশেষ প্রশংসা ও খ্যাতি অর্জ্জন করেন। কমিশনের কার্য্য শেষ হইলে পর তিনি শোয়েবোতে ও পরে থার্‌রাওয়াডীতে কর্ম্ম করেন। থার্‌রাওয়াডী প্রবাসকালে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি "সন্তান-শিক্ষা" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। শোয়েবো হইতে যাইবার কালে স্থানীয় য়ুরোপীয় এবং দেশীয় জনসাধারণ সকলেই তাঁহাকে বিদায় দান করিতে কষ্টবোধ করিয়াছিলেন। থার্‌রাওয়াডী হইতে পুনরায় তিনি ভামো সহরে বদ্‌লি হন। এখানে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার যোগ্যতার প্রমাণ পাইয়া ভামোর সিভিল্ সার্জ্জেন্ কাপ্তেন লেথ্‌ব্রিজ্ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মন্তব্য-পুস্তকে লেখেন—"The work he has done has always been excellent and he has a thorough knowledge of his profession. He is a very well-read man and knows the routine of office work as thoroughly as any I have come across Character and bearing exemplary."

ভামোতে অবস্থানকালে ডাক্তার সরকার তথায় "Indo-Burman Reading and Tennis Club" নামে এক সমিতি স্থাপন করেন ও তাহার সেক্রেটারী হন। তিনি তথাকার বাঙ্গালী ও বর্ম্মী ভদ্রলোকদিগকে প্রত্যহ ডাকিয়া আনিয়া একস্থানে মিলিত হইতে এবং ক্রীড়াদিতে যোগদান করিয়া ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ হইতে অভ্যস্ত করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যোগ ও উৎসাহে ক্লাবের কার্য্য সুন্দর ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। শিক্ষিত দেশীয়গণের মধ্যে একটি উৎসাহ ও নবজীবনের সাড়া পড়িয়াছিল। কিন্তু রামলাল বাবু ভামো ত্যাগ করিলে পর ধীরে ধীরে প্রবাসে বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত ও বহুসভ্যগঠিত মিলনস্থানটি লোপ পায়। তিনি যে যে স্থানে অবস্থান করিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই এক-একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি জাতীয় ও জনহিতকর যে-কোন

কাশ্মীরের মাঝিয়ান্
চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল

U. Ray & Sons, Calcutta

অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। ব্রহ্মবাসীদের মধ্যে য়ুরোপীয় চিকিৎসানুরাগ বিস্তার বিষয়ে তিনি কম সাহায্য করেন নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মধ্য-ভারতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইলে তিনি প্রভূত চেষ্টায় ব্রহ্মদেশ হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে দক্ষিণ চীনের অন্তর্গত টেঙ্গিয়ের ব্রিটিশ কন্‌সাল ম্যাকিনন্ সাহেব ভামোর ডেপুটী কমিশনার সাহেবের নিকট একজন ভাল ডাক্তারের জন্য পত্র লেখেন। রামলাল-বাবু তাঁহার দীর্ঘকাল সুনামের সহিত কার্য্য করার পুরস্কারস্বরূপ ঐ পদ প্রার্থনা করেন। সিবিল্ সার্জ্জন্ কাপ্তেন প্রিডমোর এবং অন্যান্য অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী তাঁহার জন্য খুব প্রশংসার সহিত সুপারিশ করেন। একজন য়ুরোপীয় মিলিটারি এসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জন্ ঐ পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের সেক্রেটারি কাপ্তেন হামণ্ড্ কন্‌সাল্ সাহেবকে যখন জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কাহাকে চান, তখন তিনি বলেন, "I want Ram Lall Sircar. He is the best man I can appoint." ফলে ডাক্তার সরকারই ঐ পদ লাভ করেন। কিন্তু চীন যাইবার কথা শুনিয়া তাঁহার পত্নী ও অনেক বন্ধুবান্ধব অমত করেন। কিন্তু সরকার-মহাশয় কিছুতেই বিমুখ হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি জীবনের একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইলেন। চীনদেশে গিয়া তথাকার নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া, নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, নূতন নূতন বিষয় স্বদেশবাসীকে শুনাইবেন এই ইচ্ছা হইল। পরিবারবর্গকে রেঙ্গুনে রাখিয়া তিনি চীন যাত্রা করেন। চীনে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই কন্‌সল্, কাষ্টম্ কমিশনার ও ডাক্তার সরকার এই তিন জনের মধ্যে এক চুক্তিপত্র (agreement) দস্তখত করা হয়। এই চুক্তি অনুসারে ডাক্তার মহাশয়ের মাসিক বেতন একশত "তেল" অর্থাৎ ৫০৲ ধার্য্য হয়, তিনি ফ্রী কোয়ার্টার্স্ ও প্রাইভেট্ প্রাক্‌টিসেরও সুবিধা পান। তাহা ছাড়া বার্ষিক ৩১০৲ টাকা করিয়া তাঁহার ভাতা নির্দ্ধারিত হয়। তাঁহার পদের নাম হয় "Medical Officer to His Britannic Majesty's Consulate and the Chinese Maritime Customs, Teng-Yueh, China."

টেঙ্গিয়ে আসিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য ও আহার-প্রণালী, সামাজিক রীতিনীতি ও দুর্ব্বোধ্য ভাষা এবং স্বতন্ত্র সংস্কারের মধ্যে রামলাল-বাবু যেন নূতন জগতে আসিয়া পড়েন। কিন্তু স্বাধীন দেশের স্বাধীন হাওয়ায় এবং কর্ম্মক্ষেত্রেও স্বাধীনতা পাইয়া তাঁহার মনের স্ফূর্ত্তি, স্বাধীনচিত্ততা, উদ্যম-অধ্যবসায় ও কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এদিকে স্বীয় কার্য্যকুশলতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ফলে, রোগীগণের প্রতি সদয় আচরণে এবং সাধারণের সহিত উদার ও অমায়িক ব্যবহারে তাঁহার সম্মান প্রসার প্রতিপত্তি ও যশ ক্রমেই বাড়িতে থাকে। রামলাল-বাবু এখানে চীনা ভাষা শিক্ষা করেন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি চীনা ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্ম্মা গবর্ণ্‌মেণ্ট্ হইতে দুই শত টাকা পুরস্কার পান। রামলাল-বাবু তাঁহার চীনদেশের অভিজ্ঞতার ফল প্রথমে সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন এবং পরে প্রবাসী পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধাকারে লিখিতে আরম্ভ করেন। টেঙ্গিয়ে আসিবার কিছুকাল পরে তিনি "চীন-দেশে সন্তানচুরি" নামক পুস্তক রচনা করেন; পরে "নব্য বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য" "আমার জীবনের লক্ষ্য" এবং "বিদ্যারম্ভ" নামে পুস্তক লেখেন।

টেঙ্গিয়ে অবস্থানকালে ডাক্তার সরকার ফটোগ্রাফী শিক্ষা করেন। প্রবাসী ও মডার্ণ্ রিভিউ পত্রে যে-সকল ছবি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সমস্তই তাঁহার স্বহস্তে তোলা। তিনি ব্রহ্মদেশের যাবতীয় দৃশ্য ফটোতে আবদ্ধ করিয়া বড় বড় তিনখানি আল্‌বাম্ (album) পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, উহা একটি দর্শনীয় বস্তু। সাহেব-মহলে তাঁহার সম্মানও যথেষ্ট ছিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড্ রোনাল্ড্‌শে বাহাদুর দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে যখন টেঙ্গিয়ে সহরে গিয়া উপস্থিত হন, তখন তিনি চক্ষুর পীড়ার জন্য রামলাল-বাবুর চিকিৎসাধীন হন।

এই-সূত্রে তাঁহার সহিত এই প্রবাসী বাঙ্গালীর পরিচয় হয়। ডাক্তার সরকার রোনাল্ড্‌শে সাহেবের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন এবং তিনি ডাক্তারের স্মারক বহিতে স্বীয় ভ্রমণ-কাহিনী সংক্ষেপে স্বহস্তে লিখিয়া দেন। মডার্ণ্‌ রিভিউ এবং প্রবাসীর পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। ইনিই পরে বঙ্গদেশের গবর্ণর পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কালে ডাক্তার মহাশয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সেই-সময় (১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ্‌ তারিখে) গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ ব্রহ্ম ও চীনে প্রশংসিত কার্য্যের জন্য রামলাল-বাবুকে সম্মানপত্র ও স্বর্ণঘড়ী উপহার দেন। লর্ড্‌ রোনাল্ড্‌শে বাহাদুর সেই উপহার দিবার কালে রামলাল-বাবুর যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

টেঙ্গিয়ে হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ছুটি লইয়া রামলাল-বাবু দেশে যান। ছুটি ফুরাইলে, তিনি চীন যাইবার পথে এক বৎসর মান্দালেতে কার্য্য করেন এবং কন্‌সাল সাহেবের অনুরোধে বর্ম্মা গবর্ণ্‌মেণ্টের খরচে রেঙ্গুনে গিয়া বিশেষ দন্ত-চিকিৎসা শিক্ষা করেন। তিনি এখানকার হাঁসপাতালে কার্য্য করিবার কালে জানিতে পারেন যে, হাঁসপাতালে যত হিন্দু রোগী মারা যায়, তাহাদের সৎকার হয় না। তাহাদের শবদেহ লইয়া গিয়া মেথররা পুঁতিয়া ফেলে। অথচ মুসলমান, বর্ম্মী ও খৃষ্টানগণ তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মের লোক মারা গেলে দলবদ্ধ হইয়া মৃতদেহের যথারীতি সমাধি দেয়। তিনি ইহার প্রতিকারার্থ চাঁদা তুলিয়া একটি এম্বুল্যান্স্‌ কার্ট্‌ প্রস্তুত করান এবং একজন চাপরাশি ও চারিজন গুর্খা কুলি মাসিক বেতনে নিযুক্ত করেন। তদবধি এখানে হিন্দু রোগী মরিলে এম্বুল্যান্স্‌ কার্ট্‌ করিয়া দাহস্থানে লইয়া গিয়া তাহাদের যথারীতি সৎকার হইতে থাকে। কিন্তু সরকার মহাশয় মান্দালে হইতে চলিয়া গেলে যে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের হস্তে কার্য্যভার দিয়া যান তিনি উহা বজায় রাখিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়বার টেঙ্গিয়ে আসিবার তিন বৎসর পরে ডাক্তার সরকার যখন রেঙ্গুন হইতে তাঁহার পরিবারবর্গকে আনাইবার প্রস্তাব করেন, তখন তাঁহার জনৈক চীনা বন্ধু ও তাঁহার পত্নী গোপনে জানান্‌ যে, তথায় গোলমালের আশঙ্কা আছে; প্রজাগণ গবর্ণ্‌মেণ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। এই বিদ্রোহ কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহার ধারাবাহিক বিবরণ প্রবাসীর পাঠকগণের অবিদিত নাই। ডাক্তার সরকার-প্রেরিত তারের সংবাদ ও কাহিনী পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ-পত্রে তারযোগে প্রেরিত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের মধ্যে রামলাল-বাবু শান্তভাবে কাল অতিবাহিত করেন।

টেঙ্গিয়ে অবস্থানকালে বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ (Veterinary Assistant), তাঁহার জামাতা বাবু সতীশচন্দ্র রায় এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু নিকুঞ্জলাল সরকার তাঁহার নিকটে ছিলেন।

যে দশ বৎসরাধিক কাল তিনি চীনপ্রবাসে ছিলেন, তাহার মধ্যে স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, লোক-চরিত্রজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যায় অভিজ্ঞতা, কার্য্যকুশলতা, সকলের সহিত সদ্ব্যবহার ও পরহিতৈষণা দ্বারা তিনি কি য়ুরোপীয় সমাজ কি চীনা জনসাধারণ সকলেরই শ্রদ্ধা ভালবাসা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। ডাক্তার সরকারের জনহিতৈষণার একটি চিরস্মরণীয় নিদর্শন টেঙ্গিয়ে সহরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি সাধারণের হাঁসপাতাল। তিনি শুদ্ধ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দরিদ্র দুঃস্থ রোগীগণের ঔষধপথ্যাদির ব্যবস্থা করেন। চীন দেশের এ-অঞ্চলে ইহা এক অভিনব ব্যাপার। তিনি প্রভূত পরিশ্রম ও স্বকীয় অর্থ ব্যয়ে যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন প্রথমে চীনারা তাহা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে। বিদেশী লোক ঘরের খাইয়া পরের উপকার কেন করে ইহা তাহাদের বোধগম্য হয় নাই। অবশ্যই ইহাতে কোন দুরভিসন্ধি আছে—এ-দেশটা ইংরেজ গ্রাস করিতে চায়, এইরূপ ভাব মনের মধ্যে পোষণ করিয়া চীনারা ইহা ব্যর্থ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয় এবং চীনা চিকিৎসক রাখিয়া আর-একটি বেসরকারী চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রলোক ও চীনা রাজকর্ম্মচারীগণ এই প্রবাসী বাঙ্গালীর সাধু উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া রামলাল-বাবুর পক্ষেই ছিলেন। ফলে রামলাল-বাবুর প্রতিষ্ঠিত হাঁসপাতাল ধীরে ধীরে লোকপ্রিয় হইয়া উঠে। ডাক্তার সরকারের

পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে, যে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রক্ষণশীল ও সন্দিগ্ধচিত্ত জাতিও বহুযুগের সংস্কার বর্জ্জন করিয়া তাঁহার চিকিৎসার পক্ষপাতী হইয়াছিল। যে হাঁসপাতালে চিকিৎসা করাইতে সহসা কেহ অগ্রসর হইত না, তথায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্থানের (seat) একটিও শূন্য থাকিত না। হাঁসপাতালের বাহিরেও এই বিদেশী ডাক্তারের প্রসার-প্রতিপত্তিও বড় অল্প হয় নাই। টেঙ্গিয়ের ব্রিটিশ কন্সাল ম্যাকিনন্ সাহেব রামলাল-বাবুর কার্য্যের প্রশংসা করেন। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় টেঙ্গিয়ে সহরে "Patriotic League of Britons Overseas" নামে যে-সমিতি ও "Oversea Club" নামে যে সম্মিলনী গঠিত হয়, ডাক্তার রামলাল সরকার তদুভয়ের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক টেঙ্গিয়ে প্রবাসে তাঁহার একটি বাসনা অসম্পূর্ণ রাখিয়া চীন হইতে তাঁহাকে পুনরায় ব্রহ্মদেশে আসিতে হয়। তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল, তিনি এখান হইতে টানিফু সহরের হিন্দুকীর্ত্তি ও হিন্দুরাজবংশের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তীর্থস্থানসমূহের ফটো তুলিয়া ও চীন দেশে বিস্তৃত ভ্রমণ করিয়া তাহার ইতিহাস লিখিবেন। এজন্য তিনি কয়েক জন ধনী ব্যক্তির নিকট অর্থসাহায্য চাহিয়া পত্র লেখেন এবং বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টের নিকট পনেরো মাসের ছুটির দরখাস্ত করেন। কিন্তু বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট্ তাঁহাকে ছুটি না দিয়া পুনরায় ব্রহ্মদেশে বদ্‌লি করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ছুটি লইয়া তিনি দেশে যান। পরে ছুটি হইতে ফিরিয়া হেনজাদা জেলায় মিয়ানাং মহকুমার ডিষ্ট্রীক্ট্ জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ হাঁসপাতালের মেডিকেল অফিসর এবং মিউনিসিপ্যালিটির হেল্থ্ অফিসার নিযুক্ত হন। ইতি-পূর্ব্বে টেঙ্গিয়ে প্রবাসে তিনি ইংরেজী ভাষায় কথোপ-কথনচ্ছলে "ধাত্রীশিক্ষা" নামে যে-পুস্তক লিখিয়া-ছিলেন, এক্ষণে তাহা বর্ম্মীভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ঐ-পুস্তক বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট্ অনুমোদন করিয়া সমস্ত হাঁসপাতালে খরিদ করিবার জন্য আদেশ জারি করেন। তদ্দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মদেশে ডাক্তার সরকারের নাম বিস্তার লাভ করে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর ডাক্তার সরকার কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া এক্ষণে দেশেই অবস্থান করিতেছেন। তিনি ব্রহ্মদেশে ও চীনে যে কর্ম্মময় জীবনের গৌরবময় স্মৃতি তদ্দেশবাসীর হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বঙ্গমাতার সুসন্তান বলিয়া যেমন স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন, তাঁহার স্বদেশবাসীও তদ্রূপ গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

অপরিচিত প্রবাসে যাইতে ভীত হইয়া যে-সমস্ত যুবক স্বীয় উজ্জল ভবিষ্যৎ নষ্ট করেন, তাঁহারা অধ্যবসায়ী স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ ডাক্তার রামলাল সরকার মহাশয়ের জীবন হইতে আশার আলোক দেখিতে পাইবেন।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

কালো-আঁখি

আনমিত চারু অরুণ-বয়ানে
　　কালো আঁখি ছলছল,—
গোলাপ-গুচ্ছে অপরাজিতায়
　　ঊষার শিশির-জল ;
পান্নায় ঘিরি' মুকুতার পাঁতি,
আকাশের নীলে তারকার ভাতি,
কালো ভ্রমরীর ধূসর পাখায়
　　কমলের পরিমল।

নীল সাগরে কি শীকর-কণার
　　কুহেলির আবরণ ?
কনকপাত্রে বনতুলসীর
　　চন্দন-আলেপন ?
অন্তর বুঝি গলিয়া গলিয়া
অশ্রুধারায় এল উছলিয়া ?
আঁখি সে কি নীলপর্দ্দা-আড়ালে
　　মর্ম্মের বাতায়ন ?

শ্রী পরিমলকুমার ঘোষ

দিল্লীশ্বরী — শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। আট আনা সংস্করণ। ১১৮+৪ পৃষ্ঠা; ২খানি চিত্র। ১৩৩০।

এই গ্রন্থখানিতে রাজিয়া ও নূরজহানের সম্পূর্ণ ও সত্য ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। এই উভয় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাণী সম্বন্ধে কত নভেল নাটক রচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ রাজিয়াকে রঙ্গমঞ্চে নামাইয়া কতই না রসিকতা ও আজগুবী গল্পের সৃষ্টি করা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্যগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচার করিয়া কেবলমাত্র সেই উপাদানের সাহায্যে ব্রজেন্দ্রনাথ ইঁহাদের চরিত্র ও জীবন-কাহিনী আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি অসত্যের, মন-গড়া প্রবাদের আপাত মধুর কাহিনী নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এই কঠোর ইতিহাস-সাধনার ফল বেশ মনোরম হইয়াছে। সত্য রাজিয়া ও সত্য নূরজহান এই সত্য-সেবীর গ্রন্থে আমাদের নিকট থিয়েটারী রাজিয়া ও নূরজাহান অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ও মনোযোগ আকর্ষণ করে। এটা বঙ্গভাষার কম গৌরবের বিষয় নহে যে, নূরজহানের সম্পূর্ণ ও ইতিহাস-সঙ্গত জীবনী প্রথমে এই ভাষাতে লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই পারসীক উপকরণগুলি অথবা ইউরোপীয় ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত পাদটীকায় বিশুদ্ধভাবে সূচিত হইয়াছে। এই-গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ হওয়া আবশ্যক।

বৃথা বাগাড়ম্বরে ফেনাইয়া তুলিলে অথবা বাজার-গুজবের বুকনী দিলে বইখানি আরও অনেক বড় করা যাইত। কিন্তু সত্য অলঙ্কারের অপেক্ষা করে না। গ্রন্থশেষে আলোচনা-পূর্ণ প্রমাণপঞ্জী (list of authorities) আছে। অপর লেখকেরাও যেন এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। [আরবীতে রাজিযার নামে 'র'তে আকার নাই।]

যদুনাথ সরকার

জন্মান্তরে—শ্রীমতী বিভা দেবী প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, কলিকাতা।

শিক্ষিত হিন্দু যুবকের সাধারণ জ্ঞান, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও ভব্যতাহীনতার ও এক ব্রাহ্ম যুবতীর বিকারগ্রস্ত ভাবপ্রবণতার এক দীর্ঘ, নীরস ও অনাবশ্যক কাহিনী। এ-গ্রন্থ যাঁর রচনা তাঁকে ছদ্মবেশী পুরুষ বলেই মনে হয়, কারণ ওরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবককে কোন শিক্ষিতা আত্মসম্মানবিশিষ্টা মেয়ের ভালবাসা দূরে থাক, তার সঙ্গে মুখের পরিচয় রাখতেও স্বীকৃত হবেন না; অথচ বিনা কারণে যুবকের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে পুস্তক শেষ করার সার্থকতা একা বাঙ্গালী পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। না গল্পে, না চরিত্রে, না প্রবন্ধ-গাম্ভীর্য্যে, না রচনা-রীতিতে, না ভাষায়, কোনো দিক্ থেকেই এর মূল্য নেই; অথচ বাংলা সাহিত্যের হাটে এ কাঁচকে কাঞ্চনের মূল্য পেতে দেখেছি!

শুকতারা—শ্রী সরসীবালা বসু প্রণীত। অন্নদা বুকষ্টল, কলিকাতা। মূল্য ১৷০।

রেখা—শ্রী সরসীবালা বসু প্রণীত। অন্নদা বুকষ্টল, কলিকাতা। মূল্য ১৷০।

শ্রীমতী সরসীবালা খুব কমদিনের মধ্যে বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের দরবারে একটা আসন অধিকার করেছেন, তবে good-will (বাজারে নাম) বজায় রাখবার খাতিরে তিনি যে-গতিতে পুস্তক-প্রণয়ন আরম্ভ করেছেন তাতে তাঁর প্রতিষ্ঠা বেশী দিন স্থায়ী হবে কি না সন্দেহ; তবে ধারের চেয়ে ভারেও অনেকে কাটে (তা ত নিত্য দেখ্‌ছি) এই যা সান্ত্বনা।

লেখিকার হাতে ভাষা এক-এক সময়ে খেলে বেশ; সর্ব্বত্রই বেশ ঝরঝরে হাল্কা, কিন্তু সময়-বিশেষে এই গুরুত্বহীনতা ভাবকে কিছু খর্ব্ব করে বলে আমার ধারণা, এবং বহুস্থলে অনায়াসলভ্য সরসতা কথার অযত্নগ্রন্থনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকার পক্ষে তা আদৌ প্রশংসার্হ নয়।

সমাজে নারীর স্থান নির্ণয় করতে ও স্বজাতির সম্মান গৌরব ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর হয়ে যে সব মহিলা বঙ্গসাহিত্যের আসরে নেমেছেন তাঁদের মধ্যে খুব কম নারীই পুরুষকে গালাগালি না দিয়ে তাঁদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে পেরেছেন; সুখের বিষয় লেখিকা সেই কমের দলেই।

শুকতারায় নারীর আর্থিক স্বাধীনতার কারণ ও উপায় নির্দ্দেশের মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নেই, বাংলা দেশের চিরপুরাতন ঐ সমস্যা ও তার সমাধানের গল্পটাকে তিনি বিশেষ কোনো রূপই দিতে পারেন নি।

রেখাতেও ঠিক এইটি লক্ষ্য করেছি। গল্প বা চরিত্র বা ঘটনা-সমাবেশের মধ্যে সব সময়ে যে নূতনত্ব থাকবে তা না হতে পারে, কিন্তু একশ' জনের মধ্যে প্রায় একই রকম অবস্থায় একই রকম ব্যবহার করা জীবন্ত প্রাণীর পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নয় এবং মানবজীবনের সমস্ত বিচিত্র সম্ভাবনাকে রূপ দেবার প্রবোচনাই গ্রন্থরচনার বা সাহিত্যসৃষ্টির একটা বিশেষ কারণ; অথচ মামুলি গল্পবিবৃতির চেষ্টা ছাড়া এ-গ্রন্থে আর-কিছুই দেখ্‌ছি না।

যুবক যুবতীর প্রেম-কাহিনী ছাড়া অনেক ঘটনা জীবনে সম্ভব এবং বহু বিদেশী গ্রন্থকর্তা সে-সম্ভাবনাকে সুন্দর রূপ দিয়েছেন। কিন্তু যে-দেশে ভালবাসার সম্ভাবনা খুবই কম, সে-দেশে প্রতি-উপন্যাসে তার বৈচিত্র্যহীন বিকার মনকে নীরস করে মাত্র, কারণ ওবস্তু কাব্য বা মনের অভিজ্ঞতালব্ধ ফল নয়, বিদেশীভাবপ্রবণতার সুলভ অনুকরণ বা নিরর্থক উদ্গিরণ।

রেখায় গ্রন্থকর্ত্রী বারনারী-সমস্যার আলোচনা করবার প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সমাধানের পন্থানির্দ্দেশের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় দিয়েছেন,—তাঁর চিন্তাশীলতার পরিচয় যে খুবই কম

পেয়েছি একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না। উপন্যাস জীবনের কাহিনী, সমস্যা-সমাধান-সম্বলিত নীতি-পুস্তিকা নয়, তা জানি, কিন্তু সমস্যার অভ্যুদয়, সম্যক্ আলোচনার অপেক্ষা রাখে এবং চিন্তাশীল লেখকের কাছে পন্থা-নির্দ্দেশ আশা করাও অন্যায় নয়।

পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও বর্ত্তমান সভ্যতা—শ্রী সুকুমার হালদার প্রণীত। প্রকাশক—শ্রী সনৎকুমার হালদার, রাঁচি।

"কর্ম্মজীবনে খ্রীষ্টান্ জাতি যে যীশুখ্রীষ্টের 'Sermon on the Mount'-এর দিক্ দিয়াও চলেন না" বরং "হিংসা ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হয়ে চলেছেন" ও "তাঁদের এইসব প্রবৃত্তি তাঁদের ধর্ম্মশিক্ষার (?) ফল" গ্রন্থকার প্রসঙ্গত এইসব কথার আলোচনা করেছেন এবং য়ুরোপীয় বহু চিন্তাশীল লেখকের রচনা থেকে বহু নজীর উদ্ধার করে' তাঁর কথার সারবত্তা প্রমাণ করেছেন। তাঁর স্বার্থহীন উদ্দেশ্য যে, উক্ত ধর্ম্মের ভিতরকার গলদ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া—যাতে দেশী লোক পাদ্রীর মিষ্টি কথায় ভুলে' নিজের ও দেশের সর্ব্বনাশ আর না করে। দেশের অবশ্যকর্ত্তব্য দশটা সংস্কারের আলোচনায় হালদার-মশায়কে কলম ধরতে দেখলে আশান্বিত হব, কারণ তাঁর হাতে ভাবা আছে এবং ভাব্‌বার কথা গুছিয়ে বল্‌বার শক্তিও তাঁর অভাব নেই।

শ্রী আনন্দসুন্দর ঠাকুর

স্বাধীনতার সপ্ত সূর্য্য—শ্রী হেমন্তকুমার সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম আট আনা। ১৩৩০।

বইখানিতে 'স্বাধীনতার সপ্ত সূর্য্য' অর্থাৎ সান্ ইয়াৎ সেন, কামাল পাশা, জগ্‌লুল্ পাশা, লেনিন, গ্রিফিথ্স্, কলিন্স্, ডি ভ্যালেরা—এই সাত জন বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাকামীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। কয়েকটি পরিচয় প্রকাশকের নিজের লেখা এবং কয়েকটি প্রবাসী, বিজলী প্রভৃতি পত্রিকা হইতে সংগৃহীত। প্রকাশকের উদ্যম প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান জগতের নানা স্থানের স্বাধীনতার আন্দোলনের আভাস ইহাতে পাওয়া যাইবে।

ভারতের স্বরাজ-সাধক—(প্রথম খণ্ড)—শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। যুগবার্ত্তা সাহিত্য ভাণ্ডার, ৪ নং ছক্ খানসামা লেন, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা। ১৩৩০।

ইংরেজ আমলে, বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে, ভারতবর্ষে যে-সমস্ত মহৎ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম্মের দ্বারা দরিদ্র ও দলিত ভারতবর্ষকে অগ্রসর ও উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এমন বাইশ জন কৃতী ভারত-সন্তানের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা এই পুস্তকে আছে। এই সংগ্রহকার্য্যের জন্য গ্রন্থকার দেশহিতৈষী সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার ভাষা ভালো। আশা করি এই পুস্তক সাধারণের আদর লাভ করিবে।

রোগবিজ্ঞান—শ্রী সিদ্ধেশ্বর রায়, এম-বি, কাব্যতীর্থ, ইত্যাদি। প্রকাশক—গ্রন্থকার, ৮৫ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। ১৩২৯।

মূলত আয়ুর্ব্বেদ অবলম্বন করিয়া ও স্থানে স্থানে পাশ্চাত্যমতবাদের তুলনা করিয়া, রোগ উৎপত্তির কারণ, রোগ-সহায়ক জীবাণুর কাজ, রোগের প্রকৃতি ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বইখানিতে একটি গল্পের ধরণে বিবৃত করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার পরিস্ফুট হইয়াছে, সাধারণের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। আকারের অনুপাতে বইটির দাম বেশী হইয়াছে।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ-কথামৃত—পদ্যানুবাদ—শ্রী অক্ষয়কুমার গুপ্ত কবিরত্ন। প্রকাশক শ্রী নলিনীকান্ত ঘোষ, বি-এ, রায়পুরা, ঢাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম, ৭।২ বিডন রো, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। ১৩৩০।

'শ্রী ম'-লিখিত রামকৃষ্ণ-কথামৃতের পদ্যে অনুবাদ। বইখানির পদ্য-অনুবাদ মন্দ হয় নাই বটে, কিন্তু মূলের সে সরলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য অনেক জায়গায় বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুখের বিষয়, বইখানির সমস্ত আয় "শ্রীশ্রী গৌরীমাতা-পরিচালিত শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম ও আদর্শ-হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়ের সাহায্য-কল্পে অর্পিত।"

গুপ্ত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পদ্যে অনুবাদিত। প্রকাশক শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, ২০ নম্বর মে-ফেয়ার, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। ৪০২+৭৮ পৃষ্ঠা। শক্ত কাগজের মলাট। মুখপাতে পার্থসারথির ছবি ও গ্রন্থকারের বিভিন্ন বয়সের দুখানি ছবি আছে। মূল্য আড়াই টাকা।

গ্রন্থারম্ভে ১১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ উপক্রমণিকায় গীতার কালনির্ণয়, ধর্ম্মতত্ত্ব—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, পরকাল ও মুক্তি, গীতার দর্শন—সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনের সহিত গীতার দর্শনের সম্বন্ধ, গীতার ব্রহ্মবাদ প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণামূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে।

প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে একটু করিয়া প্রবেশক ও শেষে কিছু টিপ্পনী আছে। জোড় পৃষ্ঠায় গীতার মূল ও বিজোড় পৃষ্ঠায় বাংলা পদ্যানুবাদ আছে। অনুবাদ সরল ও মূলানুগত; পদ্যে হওয়াতে পাঠকের চিত্তাকর্ষক।

গীতা হিন্দুর সম্মানিত গ্রন্থ; সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর সম্মানযোগ্য। সুতরাং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল বাঙালী পাঠকপাঠিকার নিকট গীতার এই সংস্করণ সমাদর লাভ করিবার যোগ্য। গীতার আন্তরিক গভীর তত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে এই সংস্করণ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইবে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম—শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, ২০ নম্বর মে-ফেয়ার, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। ৩২৭ পৃষ্ঠা। প্রকাশকের ভূমিকা ২১ পৃষ্ঠা। মুখপাতে বুদ্ধদেবের একখানি ও গ্রন্থকারের দুই সময়ের দুই খানি ছবি আছে। শক্ত কাগজের মলাট। দাম দুই টাকা।

এই প্রসিদ্ধ পুস্তকের ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ। এই পুস্তকে বৌদ্ধধর্ম্ম কি, বুদ্ধদেবচরিত, বৌদ্ধ-ইতিহাসের কালনির্ণয়, বৌদ্ধধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, বৌদ্ধ সঙ্ঘ, সঙ্ঘের নিয়মাবলী, বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র কি কি, বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর ও বিকৃতি, বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি অবনতি ও পতন, অশোক, সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, রাজা কণিষ্ক, চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম, মার্কিন দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম লোপের কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব, জগন্নাথ-ক্ষেত্র প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ তীর্থ, ইত্যাদি বহু বিষয় নয়টি পরিচ্ছেদে ও পরিশিষ্টে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।

ভূমিকায় প্রকাশক মহাশয় বৌদ্ধধর্ম্মের স্বরূপ ও বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সম্পর্ক বুঝাইয়া বলিয়াছেন—"পূজ্যপাদ ৺ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'বৌদ্ধধর্ম্ম' ব্যতীত বাংলা ভাষায় আর একখানিও এমন বই নেই, যার থেকে বুদ্ধের জীবনচরিত, তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্র এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।"

"আমি শুধু পণ্ডিত-সমাজের নয়, দেশশুদ্ধ লোকের পক্ষে বুদ্ধ

ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করি। আর আমার বিশ্বাস সাধারণ পাঠক-সমাজ এই গ্রন্থ থেকে অনায়াসে বিনা ক্লেশে সে জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারবেন।" আমরা এই উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করি। ইংরেজীতে বহু গ্রন্থে বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম আলোচিত হইয়াছে; সেই-সকল গ্রন্থের বিবরণ এই একখানি গ্রন্থে সংগৃহীত পাওয়া যায় এবং সে গ্রন্থ বাঙালীর মাতৃভাষায় প্রাঞ্জল করিয়া লেখা। বুদ্ধদেব জগতের ইতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ; তাঁর পুণ্যচরিতের ও তাঁর প্রবর্ত্তিত সদ্ধর্ম্মের আলোচনা করা প্রত্যেক নর-নারীর অবশ্যকর্ত্তব্য। সুতরাং এই অমূল্য গ্রন্থের সমাদর অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতে অধিকতর হইবে বলিয়া আশা করি। অন্য দেশ হইলে এতদিনে এই পুস্তকের কত সংস্করণ হইয়া যাইত; বাংলাদেশে এতদিনে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইল। ইহা বাঙালীর লজ্জা ও পরিতাপের কথা।

উচ্ছ্বাস-পঞ্চক—শ্রী জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত ও প্রকাশিত। ৭৭। ১ হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বারো আনা।

পাঁচটি উচ্ছ্বাসে বিশ্বসমস্যা, হিন্দুসাধনা, হিন্দুর পূজা, ব্যাসদেব ও ওঁকারমন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট ইহা সমাদর লাভ করিয়াছে।

ভক্তের পত্র—প্রকাশক—সপ্তমী লাইব্রেরী, ৩এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। রেশমী কাপড়ে বাঁধা। এক টাকা। ১৬৪ পৃষ্ঠা।

কতকগুলি চিঠির সংগ্রহ। চিঠিগুলি ভক্তিপ্রবণ বিনয়ভূষিত কোনো সাধু মুসলমানের লেখা। চিঠিগুলিতে ভক্ত-সাধু-হৃদয়ের প্রাণময়তা পাঠকের চিত্তকেও স্পর্শ করে, অনেক সৎ প্রবৃত্তি ও সাধু চিন্তা প্রবুদ্ধ করে।

ম্যাক্‌বেথ—শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ কর। ওরিয়েণ্টাল প্রেস, ১০৭ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

শেক্সপীয়ারের প্রসিদ্ধ নাটকের বাংলায় অনুবাদ। চরিত্রদের কথা মিত্রাক্ষরে, অন্যান্য অংশ অমিত্রাক্ষর পদ্যে লিখিত। গদ্যও অল্প অল্প স্থানে স্থানে আছে। অনুবাদ ভালোই হইয়াছে।

মেদিনীপুরের ইতিহাস—শ্রী যোগেশচন্দ্র বসু। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ৪০০ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। সচিত্র। আড়াই টাকা।

দশ অধ্যায়ে পুস্তক বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ভৌগোলিক অবস্থান—সুদূর অতীতকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জেলার প্রাকৃতিক বিবরণ ও ভূতত্ত্ব—জেলার ভূমিপ্রকৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, নদ নদী ও তাহাদের পূর্ব্বাপর নাম অবস্থান ও ইতিহাস, পশুপক্ষী সরীসৃপাদি, প্রসিদ্ধ গ্রাম নগর ও তাহাদের প্রসিদ্ধির ইতিহাস ও কারণ, ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন কালের ইতিহাস আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে হিন্দু তাম্রলিপ্ত রাজ্যের ইতিহাস ও পঞ্চম অধ্যায়ে হিন্দু উৎকল-রাজত্বের ইতিহাস, রাজা লাউসেন ও ধর্ম্মমঙ্গল ও ধর্ম্মপূজা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আগমন, হোসেন সাহের উড়িষ্যা আক্রমণ ও মেদিনীপুরে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি বহু কৌতূহলোদ্দীপক চিত্তাকর্ষক বিষয়ের বিবরণ আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুসলমান অধিকার—পাঠান রাজত্ব, সপ্তম অধ্যায়ে মোগল-রাজত্ব, অষ্টম অধ্যায়ে বর্গীর হাঙ্গামা, নবম অধ্যায়ে ইংরেজ অধিকার ও স্বদেশের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বহু বিদ্রোহের বিবরণ আছে। দশম অধ্যায়ে জেলার প্রাচীন কীর্ত্তি ও কাহিনী, তীর্থস্থান, দেবদেবী, মহাপুরুষ প্রভৃতির বিচিত্র বিবরণ আছে। পরিশিষ্টে লোকসংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

সব শুদ্ধ ১৫ খানি ছবি আছে। কিন্তু ছবিগুলির অধিকাংশই ভালো ছাপা হয় নাই।

মেদিনীপুরের সহিত সমগ্র বাংলার ইতিহাস ও মধ্যযুগের সাহিত্য হইতে বর্ত্তমান সাহিত্য পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে জড়িত। তাম্রলিপ্ত প্রাচীন হিন্দু বাংলার প্রধান বন্দর ও তামিল জাতির অধিকারের সাক্ষী ছিল; মেদিনীপুর বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল; ধর্ম্মমঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের ঘটনাস্থল মেদিনীপুর; মেদিনীপুর হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের প্রধান আশ্রয়স্থল; মেদিনীপুর ছুটি কবিদের আশ্রয়দাতা; মেদিনীপুর পুরী-শ্রীক্ষেত্র যাইবার পথ বলিয়া চৈতন্যদেবের পদধূলিতে পবিত্র; মেদিনীপুরের কপিশা বা কাঁসাই নদী পর্য্যন্ত রঘুর দিগ্বিজয়ী সেনা আসিয়াছিল; পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি বলিয়া মেদিনীপুর গর্ব্বিত; বঙ্কিমের উপন্যাসের ঘটনাস্থান মেদিনীপুর।

এহেন মেদিনীপুরের ইতিহাস বঙ্গবাসী সকল নরনারীর আগ্রহ ও সমাদরের বস্তু। বইখানি শৃঙ্খলায় লিখিত বহু বিবরণের ভাণ্ডার। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হইতে আরো তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারিত—গ্রন্থকার সেদিকে বিশেষ কিছু চেষ্টা করেন নাই। যাহাই হোক এই ইতিহাসের শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণ হইবে আশা করি, তখন ইহার সৌষ্ঠব আরো বর্দ্ধিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ পালের লেখা মেদিনীপুরের ইতিহাস আছে। তাহার উল্লেখ এই পুস্তকে দেখিতে পাইলাম না।

গৃহবৈদ্য—এস রায় এণ্ড কোং, ৯০।৩এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ছয় আনা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এম-এ বিদ্যাবিনোদ সিদ্ধান্তবাচস্পতি মহাশয় বিদ্যাসাগর কলেজের গণিতের বিজ্ঞ অধ্যাপক হইয়া সংস্কৃত পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি যে আবার চিকিৎসা-বিদ্যাবিশারদও এ খবর অল্প লোকেই জানেন। এই বহুবিদ্য অধ্যাপকের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ওলাউঠা-চিকিৎসার হোমিওপ্যাথিক ঔষধপ্রয়োগ সম্বন্ধীয় নির্দ্দেশ এই পুস্তিকায় সংগৃহীত হইয়াছে। চিকিৎসকহীন দেশের অনেকেরই ইহা কাজে লাগিবে—বিশেষত মফস্বলের লোকের। এই পুস্তিকা ছোট হইলেও ইহাতে প্রচুর তথ্য সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে; ইহাতে অচিকিৎসকদিগের বিশেষ সুবিধাই হইবে—অরণ্যে পথহারা হইতে হইবে না।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম-গৃহপঞ্জিকা—স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত। ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা। সম্পাদক ডাক্তার শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র বসু ও শ্রী নৃপেন্দ্রকুমার বসু। বিনামূল্যে বিতরিত।

ইহাতে সংক্ষিপ্ত দৈনিক পঞ্জিকা ও পদ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও টোটকা ঔষধ আছে।

বর্ত্তমান জগৎ—শ্রী বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। গৃহস্থ পাব লিশিং হাউস, ২৪ মিডেল রোড, ইটালী, কলিকাতা। ৮০৮ পৃষ্ঠা। ছয় টাকা।

ইহা গৃহস্থ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত বর্ত্তমান জগৎ নামক পুস্তকাবলীর চতুর্থ ভাগ। লেখক এক বৎসর আমেরিকা-প্রবাস করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহাই এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন। আমেরিকার দেশ রাষ্ট্র সমাজ প্রভৃতি বহুদিকের নিগূঢ় পরিচয় এই গ্রন্থ হইতে পাওয়া যাইবে। বহু চিত্র আছে। লেখক মনীষী সূক্ষ্মদর্শী ; বইখানি তথ্যের ভাণ্ডার।

মুদ্রারাক্ষস

শান্তা সতী—(উপন্যাস) শ্রী লোকনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রী পঙ্কজাক্ষ সিদ্ধান্ত, কর মজুমদার এণ্ড কোং, কলিকাতা। ২২২ পৃ. মূল্য একটাকা। ১৩৩০।

এখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। উপন্যাসখানি আমাদের ভাল লাগে নাই। ছোট ছোট ছেলেদের মুখ দিয়া লেখক প্রবীণের মত দার্শনিক আলোচনা করাইয়াছেন। নবম পরিচ্ছেদে আবার থিয়েটারী ঢংএ এক অঙ্ক অভিনয় হইয়াছে। সাধারণ গৃহস্থ-ঘরে একপ অভিনয় হয় না। বইখানিতে ছাপার ভুলও যথেষ্ট।

গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য—শ্রী নারায়ণ হরি বটব্যাল, বি-এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রী যতীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, মজিলপুর, সৎসঙ্গ, ২৪ পরগণা। পৃঃ ৩১। মূল্য দুই আনা। ১৩৩০।

সাধারণতঃ ব্রহ্মচর্য্য বলিতে দৈহিক বীর্য্য রক্ষা বুঝায়। গ্রন্থকারের মতে সেটি সঙ্কীর্ণ অর্থ। গৃহীও সমাজের মধ্যে বাস করিয়া, কিরূপে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারে সে সম্বন্ধে লেখক কিছু নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তিকাখানির ভাষা বেশ সরল।

মুক্তিপথ বা রামায়ণ রহস্য (নাটক)—শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত ও প্রকাশিত। পৃঃ ৮০+৩৪১। মূল্য ১৷৵০। ১৩২০।

ইহা একখানি সপ্তাঙ্ক নাটক—শেষে পরিশিষ্টও আছে। লেখক প্রথমেই বলিয়াছেন যে নাটকখানি বালকবালিকাদিগের উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু বইখানি সরল-রচনা বলা যায় না—ভাষা বড় আড়ষ্ট। বালকবালিকারা ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের রামায়ণ পড়িয়া যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিবে—এই সুবৃহৎ নাটক পাঠ করা ত দূরে থাকুক, অভিনয় দেখিয়াও সেরূপ সন্তুষ্ট হইবে না। নাটকখানি অভিনয় করিতে হইলে ৫০ জন পাত্র পাত্রী প্রয়োজন—সখের নাট্যসম্প্রদায়ে এত অভিনেতা পাওয়া দুষ্কর।

জীবনের-শান্তি (গল্প)—শ্রী অমল্যরতন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুদাস চ্যাটার্জ্জি এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ১৩৯। মূল্য ১৷০। ১৩৩০।

গ্রন্থখানিতে চারিটি ছোট গল্প আছে। (১) জীবনের শান্তি। (২) প্রেমেই মানুষ অমর, (৩) সম্পাদকের ছুটি, (৪) অন্ধ প্রেম। শেষের গল্প দুটি মন্দ নয়। অপর গল্প দুটি আমাদের ভাল লাগে নাই। প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই ছাপার ভুল চোখে পড়ে। বইখানির বাঁধাই চমৎকার।

কানাইলাল (সচিত্র)—শ্রী মতিলাল রায় প্রণীত। চন্দননগর প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রী রামেশ্বর দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৭৫। মূল্য পাঁচসিকা। ১৩৩০।

এখানি বাংলার বিপ্লব-যুগের সুপরিচিত কর্ম্মী ৺কানাইলাল দত্তের জীবনকাহিনী। কানাইলাল কিরূপ অকুতোভয়ে নিজের জীবন বিপ্লব-যজ্ঞে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এই গ্রন্থে সুললিত ভাষায় তাহাই বিবৃত হইয়াছে। যাহার নির্ভীকতায় বিদেশী-পরিচালিত সংবাদপত্র পাইওনিয়ার পর্য্যন্ত লিখিয়াছিল—"যদিও ইহা হত্যা কিন্তু কখনই হীন, কাপুরুষোচিত কর্ম্ম নহে, আত্মত্যাগের গৌরবে ইহা সমুজ্জ্বল।" তাঁহার জীবন-কথা সমস্ত দেশবাসীরই জানা উচিত। যদিও যতদিন বাংলা থাকিবে ও বাঙালী থাকিবে ততদিন কানাইলাল মরিয়াও অমর, তথাপি লেখক সাধারণের নিকট ৺কানাইলালের জীবনবৃত্তান্ত উপহার দিয়া সুদৃঢ়রূপে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

লেখকের ভাষা চিত্তগ্রাহী। সুপরিচিত চিত্রকর চারুচন্দ্র রায়ের অঙ্কিত মলাটটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে অনেকগুলি ছবি আছে ও উপেন-বাবুর লিখিত পরিশিষ্ট আছে।

প্রভাত

সৌন্দরনন্দ কাব্য—শ্রী বিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

গত বৎসর আষাঢ় মাসে ইহার প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়াছিল, আর ছয় মাসেরই মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, এরূপ সৌভাগ্য অত্যন্ত দুর্লভ।

প্রথম সংস্করণের সমালোচনায় (কার্ত্তিক, ১৩২৯) লিখিয়াছিলাম সৌন্দরনন্দের "দীপো যথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো" ইত্যাদি শ্লোক দুইটি কোন জৈন পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাহা উল্লেখ করিলে ভাল করিতেন। ইহা লিখিবার পরেই আমার পুরাতন স্মারক বহি হইতে জানিতে পারিয়াছি, শ্লোক দুইটি জৈন কবি সোমদেবের যশস্তিলকচম্পূকাব্যে [নির্ণয়সাগর, উত্তর খণ্ড, পৃ ২৭০] রহিয়াছে। প্রথম সংস্করণের সমালোচনা পড়িয়া শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রবাসীতেই আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁহার লেখা পড়িয়া আমি নিজের মত পরিবর্ত্তন করিবার কারণ দেখিতে পাই নাই। তিনি যাহা চান তাহার জন্য কেবল উপাখ্যানটা সঙ্কলন করিয়া দিলেই চলিত, অনুবাদের কোন প্রয়োজন ছিল না। বিমলা-বাবুর এই দ্বিতীয় সংস্করণের সম্বন্ধে আমাকে দুঃখের সহিত পূর্ব্ব সমালোচনারই প্রায় অবিকলভাবে পুনরুক্তি করিতে হইল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যে সকল মারাত্মক দোষ আমি দেখাইয়া দিয়াছিলাম, তাহারও অধিকাংশই শোধিত হয় নাই। হয় তো তিনি এগুলিকে দোষ বলিয়াই মনে করেন নাই। এ সম্বন্ধে একটা আলোচনা চলিতে পারিত। হয় তো আমারই কথায়, এবার কয়েকটি স্থানে একটু একটু ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু এখানেও কিছু কিছু ভুল ও মুদ্রাকরের প্রমাদ থাকিয়া গিয়াছে [দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৪০, ১৬০, ১৬১]। এই দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়া বিমলা-বাবু নিজের প্রতি সুবিচার করেন নাই।

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

চরিত্র-চিত্র বা সমাজ-সেবার আদর্শ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক শ্রী সুনীতিবালা চন্দ, বি-এ ও শ্রী যোগেশচন্দ্র দত্ত, এম্-এ, বি-টি প্রণীত। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্ রায় বাহাদুর লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রাপ্তিস্থান চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। ১৩৩০।

ইহাতে স্বদেশ-বিদেশের কতিপয় সমাজ-সেবকের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। কতকগুলি মহাপুরুষকে সাদিক দিয়া বিচার করা হইয়াছে তাহা বড়ই খামখেয়ালি বলিয়া বোধ হইবে, যথা—বিদ্যাসাগর

মহাশয়কে শুধুমাত্র উচ্চ-শিক্ষা-বিস্তারেই সমাজ-সেবক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। অথচ তিনি নিজে এই কাজকেই তাঁহার সর্ব্বোচ্চ কাজ বা জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করেন নাই। বস্তুতঃ লেখিকা ও লেখক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ও শিক্ষা-ব্যবসায়ী বলিয়া বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে একটা অযথা প্রাধান্ত দিয়াছেন। সেইজন্ত এই বইখানির অনেক জায়গাতেই শিক্ষাদানের দ্বারা সমাজ-সেবাকেই বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। এই সংস্কারের জন্ত অনেক প্রবন্ধে তাল-মান রক্ষা হয় নাই। "বিদ্যাসাগর" শীর্ষক প্রবন্ধটির প্রায় আট আনা অবান্তর (এবং অনেক স্থলে অযথা) কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিমাগানে পরিপূর্ণ। ধান ভানিতে শিবের গীতের কি প্রয়োজন ছিল তাহা বুঝিতে পারা শক্ত। রামমোহন রায়ের জীবন আলোচনাতেও এইরূপ একদেশদর্শিতার পরিচয় আছে। বিবেকানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতিতেও সমস্ত মানুষটিকে ফুটাইয়া তোলা হয় নাই। অথচ ভূমিকালেখক সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় লিখিতেছেন—"রবীন্দ্র-বাবুর বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গটি যে ভাবের, এই উপাদেয় আখ্যানগুলি কতকটা সেই ভাবের।" কি গভীর রসবোধ ও সাহিত্যজ্ঞান!

বিদেশী চরিত্রগুলির চিত্র পাঠ করিয়া অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকারা উপকার লাভ করিবে, কেবল এই হিসাবেই পুস্তকখানি মূল্যবান্। পুস্তকের ভাষা মোটের উপর ঝরঝরে, বর্ণনাও অনেক স্থলে সরস। এই গ্রন্থে সাতখানি ছবি দেওয়া হইয়াছে।

সমদর্শী

পথের বাঁশী

গরমের ছুটি হ'লে পর বোর্ডিং থেকে বাড়ী এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লুম। বৌদিও আমার সমবয়সী, আর আমারই সঙ্গে পড়্‌ত, মাত্র দুমাস হ'ল বিয়ে হয়েছে। ক্লাসের সব মেয়েদের ভিতর তার সঙ্গেই ছিল আমার সবচেয়ে ভাব। ফোর্থ্ ক্লাস থেকে এই থার্ড্ ইয়ার ক্লাস পর্য্যন্ত বরাবরই একসঙ্গে পড়ে' এসেছি আমরা। তখন থেকেই ইচ্ছে ছিল দাদার সঙ্গে যদি তার বিয়ে হয় তো বেশ হয়। ভারী সুন্দর আর লক্ষ্মী মেয়ে সে।

দাদা আমার চেয়ে বছর চারেকের বড়। ছোট বেলায় আমার মা মারা গেলে পর আমি আমার মামার বাড়ীতেই মানুষ হই। তার পর আমার বয়স যখন ন'বছর তখন বাবাও মারা গেলেন। মামা আর মামীমা আমাকে ঠিক নিজের মেয়ের মতন করে' মানুষ করে' তুলেছিলেন। দাদা মামীমার একমাত্র ছেলে, তার সঙ্গে আমার ছেলেবেলা থেকেই খুব ভাব; সেও আমাকে ঠিক নিজের ছোট বোনটির মতন ভালবাস্‌ত।

দাদার বিয়ের ঘটকালীও আমিই করি। এখন ছুটিতে বাড়ী এসে আমি ত বাঁচ্‌লুম, বৌদিও বাঁচ্‌ল।

ছুটির প্রথম দিন-কয়েক কেবল বোটানিক্যাল গার্ডেন্‌স্, বায়স্কোপ আর থিয়েটার দেখেই কাট্‌ল। একদিন রবিবার, সন্ধ্যাবেলা ইডেন গার্ডেনে আমরা তিনজনে বেড়াতে গিয়েছিলাম, ফের্‌বার সময় দাদা বললে—"চল, কাল আমরা হাজারিবাগ রওনা হ'য়ে পড়ি।" দাদা চিরকালই হুজুগে। মামীরা কিছুদিন আগে হাজারিবাগ গিয়েছিলেন, আমরাও তাঁদের অবাক্ করে' দেবার কল্পনায় রাজী হলাম।

৩০শে এপ্রিল বম্বে মেলে আমরা রওনা হ'য়ে পড়্‌লাম, মামীদের কোন খবর দেওয়া হ'ল না। গাড়ীতে মোটেই ভীড় ছিল না, তা ছাড়া আমাদের তিনজনের জন্ত আগেই "বাৰ্থ্ রিজার্ভ্" করা ছিল। সন্ধ্যা-বেলাটা গল্প করে' কাটিয়ে খানিক পরে আমরা তিন জনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার; উঠে দেখি চারিদিক্ চাঁদের আলোয় ভেসে যাবার জোগাড়। চমৎকার পূর্ণিমা রাত ছিল সেদিন। মুখ বাড়িয়ে ষ্টেশনটার নাম দেখ্‌লাম "ইশ্রি"। তার পাশ দিয়ে সাদা ধব্‌ধবে রাস্তা রেল-লাইন পার হ'য়ে চলে' গেছে। এখানে গাড়ী দাঁড়াবার কথা নয়; দাদাকে তুলে দিলাম, সে উঠে খানিকক্ষণ বসে' রইল, তার পর নেমে গাড়ী সেখানে দাঁড়াবার কারণ জান্‌তে গেল। দাদা ফিরে এসে বল্‌লে—"হাজারিবাগ-রোড ষ্টেশনের একটু আগে দুখানা মালগাড়ীতে ভয়ানক কলিশন হ'য়ে গেছে সন্ধ্যার ঠিক আগে। কতকক্ষণ যে দাঁড়াতে হবে জানা গেল না।" বৌদিও ইতিমধ্যে উঠে পড়েছিল, খবর শুনে আমরা সকলেই বেশ একটু দমে' গেলাম।

রাত প্রায় বারোটা বেজেছে। চুপ করে' বসে' আছি। চাঁদ্‌নী রাতটা ভারি সুন্দর। পাশেই পরেশনাথ পাহাড়, আর এপাশ দিয়ে সাদা রাস্তা চলে' গিয়েছে। সাদা কাঁকরগুলি চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করছে। খুব ভাল লাগ্‌ছিল। দাদা বল্‌লে এইটেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোড। রাস্তার দিকে তাকালে অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, মনটাও যেন ওর সঙ্গে অনেকদূর চলে' যায়। ইচ্ছে করছিল সেই-খানে নেমে ঐ রাস্তা ধরে' অনেকদূর পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসি। কত কালের এই রাস্তা, কত লোক এই পথে যাওয়া আসা করেছে। আমার মনে পড়ে' গেল একটি গানের কয়েক লাইন :—

"এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্ পানে—
তা কে জানে, তা কে জানে!
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে—
তা কে জানে, তা কে জানে।"

তার পর অনেকক্ষণ চুপ করে' বসে' ছিলাম। দাদা ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ শুন্‌তে পেলাম বেহাগ সুরে চমৎকার বাঁশী বাজ্‌ছে। ঠিক মনে হ'ল

"আজি নিভৃত নিদ্রিত ভুবনে কে জাগে"

গানটাই বুঝি কে বাজাচ্ছে! এত সুন্দর বাঁশী শুনিনি কখনো। মুখ বাড়িয়ে কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না, বোধ হ'ল ওয়েটিংরুমের পিছন থেকে আওয়াজ আস্‌ছে। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বাঁশী থেমে গেল। মনে হ'ল আর-একটু বাজ্‌লে বেশ হ'ত। বৌদি বল্‌লে—"কে ভাই এমন মিষ্টি বাঁশী বাজাচ্ছে? ভারি ভাল লাগ্‌ছে।"

খানিক পরে আবার বেজে উঠ্‌ল বাঁশীতে......গানটা আমার ভারি প্রিয় :—

"বিরহ মধুর হ'ল আজি
মধুরাতে!
গভীর রাগিণী উঠে বাজি
বেদনাতে।"

মনটা হঠাৎ কেন জানিনে ভারি খারাপ হ'য়ে গেল। আমার মুখে চাঁদের আলো এসে পড়্‌ছিল, বৌদির বার্থ্ ছিল অন্ধকারে, আমি জান্‌তাম না বৌদি জেগে আছে তখনো, আমি চোখ মুছ্‌ছি দেখে বৌদি উঠে এসে আমার পাশে বসল, আমার হাত ধ'রে বল্‌লে—"কি হয়েছে ভাই?" আমি বল্‌লাম—"কি জানি কেন হঠাৎ বাঁশী শুনে মনটা বড় খারাপ লাগ্‌ছে।"

বাঁশী বেজেই চলেছে। উঠে' বস্‌লাম। মনে হ'ল বাঁশী যেন আমার জন্যেই বাজ্‌ছে। কিন্তু যে বাজাচ্ছে তাঁকে তো দেখ্‌তে পেলাম না। কোথায় যে বাজ্‌ছে তাও ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। হয়তো এই-ট্রেনেই কেউ বাজাচ্ছে। আমরা তো নেমে যাবো খানিক পরে, কিন্তু যে বাঁশী বাজাচ্ছে সে হয়তো আরও অনেক-দূর চলে' যাবে, তাকে দেখাও হবে না।

অনেকক্ষণ পরে বাঁশী থাম্‌ল। শুয়ে পড়্‌লাম চুপ করে', চোখে ঘুম আর এল না। বৌদি কিছুক্ষণ পরে আমি ঘুমিয়েছি ভেবে আমায় আদর করে' উঠে গেল তার বার্থে।

কখন আর কেমন করে' যে ভোর হ'য়ে এল কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। চাঁদ তখন পশ্চিমদিকে ডোব্‌বার জন্যে ঝুঁকে পড়েছে, আর পূব্‌দিক্ একটু একটু ফর্সা হ'তে সবে সুরু হয়েছে।

দাদা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বল্‌লে—"ঐ যা! কোথায় এসে পড়েছি? আমাদের যে সাড়ে বারোটার সময় নাম্‌বার কথা।" আমি বল্‌লাম—"আমরা তো সেই রাত থেকেই এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি।" দাদা মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌লে সত্যিই তাই। সে নেমে খবর আন্‌তে গেল কখন গাড়ী ছাড়্‌বে। বৌদিকে তুল্‌লাম।

দাদা ফিরে এসে বল্‌লে—"আপ লাইন এখনো ব্লক্‌ড্ রয়েছে, ডাউন লাইন ক্লিয়ার হয়েছে। আমাদের গাড়ী বেলা আন্দাজ দুটোয় ছাড়্‌বে, তিনটের সময় হাজারিবাগ-রোডে পৌছবে। মোটর ধর্‌তে পারা যাবে না হয়তো। বরং এক কাজ করা যাক, এখনি একটা ডাউন ট্রেন আস্‌বে, তাতে নিমিয়াঘাট ষ্টেশনে নেমে পরেশনাথ-পাহাড়টা বেড়িয়ে আসা যাক। আজকের চাঁদনী রাতটা পাহাড়ের উপরের ডাকবাংলোয় থেকে কাল হাজারি-বাগ রওনা হওয়া যাবে সকালের প্যাসেঞ্জারে।"—বলে'ই সে কুলি ডেকে তাড়াতাড়ি জিনিস নামিয়ে ডাউন ট্রেন ধর্‌বার জন্যে ওপাশে পাঠিয়ে দিয়ে আমাদেরও নামিয়ে নিয়ে গেল।

রাত্রের প্যাসেঞ্জার-ট্রেনখানা প্রায় এগার ঘণ্টা লেট হ'য়ে এল, আমরা উঠে পড়্‌লাম তাতে। মিনিট পনর পরে নিমিয়াঘাটে নাম্‌লাম। সেখানে দেখি একদল আমেরিকান ভ্রমণকারী ঐ গাড়ীতে চড়্‌ল। শুন্‌লাম তারা পরেশনাথ পাহাড় থেকেই ফির্‌ছে, রাত্রে ডাক-বাংলোয় ছিল।

আমরা হাঁট্‌তে সুরু কর্‌লাম, ষ্টেশন থেকে ডাক-বাংলো প্রায় মাইল খানেক হবে। অনেকটা এসেছি, হঠাৎ আবার সেই-বাঁশীতে আসোয়ারী সুর বেজে উঠ্‌ল। আমি চম্‌কে উঠে বৌদির হাতখানা ধরে' চল্‌তে লাগ্‌লাম।

প্রায় এসে পৌচেছি, হঠাৎ বাঁশী থেমে গেল, আর চমৎকার গম্ভীর গলায় কে গান গেয়ে উঠ্‌ল :—

"এখন আমার সময় হ'ল
যাবার দুয়ার খোল, খোল।
হ'ল দেখা, হ'ল মেলা,
আলো-ছায়ায় হ'ল খেলা,
স্বপন যে সে ভোলো, ভোলো।

গান শুনে, আমরা দাঁড়ালাম, বুঝ্‌লাম ডাকবাংলো থেকেই গান ভেসে আস্‌ছে। আবার গান চল্‌ল :—

"আকাশ ভরে দূরের গানে,
অলখ্‌ দেশে হৃদয় টানে,
ওগো সুদূর, ওগো মধুর,
পথ বলে' দাও পরাণ-বঁধুর,
সব আবরণ তোলো, তোলো।"

একটা বড় গাছ পেরিয়েই ডাকবাংলো। আমরা এগিয়ে চল্‌লাম। আমার বুকের ভিতরটা কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। বুঝ্‌লাম, কাল রাত্তে যার বাঁশী শুনেছি, এ তারই বাঁশী, তারই গান। কিন্তু দেখা না হ'তেই যাবার কথা কেন? মনটা বড় দমে' গেল, যদি গিয়ে তাকে দেখ্‌তে না পাই?

এসে পৌচেছি। বারাণ্ডার সাম্‌নে একখানা মোটর-বাইক রয়েছে, ধূলোয় তার রংটা প্রায় ঢাকা হ'য়ে এসেছে, তাতে একটা বাস্‌কেট আর হোল্‌ড্‌-অল্‌ বাঁধা রয়েছে। আমি আর বৌদি ঘরে ঢুকলাম, দাদা জিনিস নামাতে লাগ্‌ল।

ঘরে ঢুকে ওপাশের বারাণ্ডায় দেখ্‌লাম পূব্‌দিকে তাকিয়ে একজন চুপ করে' বসে' রয়েছে, তার হাতে বাঁশী। তার মাথায় বড় বড় চুল, রং বেশ কালো, গড়নটি চমৎকার। পূবের আকাশ তখন সোনালি হ'য়ে উঠেছে। তার গায় তাকে মনে হ'ল—কে যেন পাথর কেটে এ মূর্ত্তি গড়ে' সোনার চালচিত্রের সাম্‌নে রেখেছে।

হঠাৎ জুতার শব্দ পেয়ে সে আমাদের দিকে চাইল, সে যে কি রকম চাওয়া বুঝ্‌লাম না, মনে হ'ল সে-চাউনী আমার মনের মধ্যে বসে' গেল। কি সুন্দর চোখ দুটি! সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের মনে একবার হাস্‌ল, তার পর সাম্‌নের বারাণ্ডার দিকে চলে' গেল।

বৌদি বল্‌লে—"কি চমৎকার বাঁশী বাজান ইনি, আর কি সুন্দর দেখ্‌তে!" আমিও ইজি-চেয়ারে বসে' ঠিক সেই কথাই ভাব্‌ছিলাম। আমরা ঘর থেকেই শুন্‌তে পেলাম সে দাদার সঙ্গে আলাপ সুরু করেছে; সে একেবারেই বলে' গেল—"আমার নাম হিরণ্ময় সেন, বাড়ী কল্‌কাতায়, ব্যবসা ঘুরে-বেড়ান, সঙ্গী এই মোটর-বাইক আর বাঁশী, কাল সন্ধ্যায় এখানে এসেছিলাম, কিন্তু এখানে জায়গা না পাওয়ায় রাতটা ইশ্রি ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে ছিলাম, একটু আগে এসে পৌচেছি। আজ পাহাড়ে উঠে রাতটা উপরেই ডাকবাংলোয় থেকে কাল বেনারস রওনা হব। আপনারা কোথা থেকে আস্‌ছেন? কোথায় যাবেন? একসঙ্গে এতগুলি কথা বলে' গেলাম, আর প্রশ্ন কর্‌লাম, কিছু মনে কর্‌বেন না।"

দাদাও ঠিক ঐ সুরে হেসে উত্তর দিলে—"আমরা আস্‌ছি কল্‌কাতা থেকে, পথে ট্রেন বন্ধ, আজ এই সুযোগে পরেশনাথ পাহাড়টা দেখে' কাল হাজারিবাগ যাব। সঙ্গে আমার স্ত্রী কমলা আর বোন লীলা আছেন।"—বলে'ই দাদা আমায় ডাক্‌লে—"লীলা, তোমার বৌদিকে নিয়ে বাইরে এস তো, আমার মনের মতন একটি লোক পেয়েছি এই জঙ্গলে এসে, তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে' দিই। সকলেই আমরা পরেশনাথ-যাত্রী, পথে আলাপ হবেই, যত আগে হয় ততই লাভ।" এই কথায় দুজনেই হেসে উঠ্‌ল। আমরা বাইরে গেলাম। বৌদিকে সে নমস্কার কর্‌লে, বৌদিও কর্‌লে, আমিও তাকে নমস্কার কর্‌লাম, সে ছোট্ট একটি নমস্কার করে' বল্‌লে—"ভাগ্যে

কাল রাত্রে এখান থেকে ফিরে গিয়ে ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে থাকতে হয়েছিল, নইলে তো এতক্ষণে অর্দ্ধেক পথ উঠে যেতাম, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করাও হ'ত না, আর একসঙ্গে যাওয়াও হ'ত না।"

বেশ ভাব হ'য়ে গেল অল্পক্ষণের মধ্যেই। মনে হ'ল এর সঙ্গে তো আমার আজকের আলাপ নয়, কিন্তু সে যে কবেকার তাও ভেবে বার করতে পারলাম না।

দাদা এসে বল্‌লে—"লীলা, চায়ের জোগাড় করতে পার?" সে চট করে উঠে তার বাস্‌কেট থেকে ষ্টোভ এনে জালিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিলে। বৌদিকে বল্‌লে "আপনারও কিছু করা উচিত।"—বলে' আমাদের টিফিন-বাস্‌কেট থেকে একখানা প্লেট, ছুরি আর রুটি বার করে' তাকে দিয়ে বল্‌লে—"রুটিই কাটুন।" আমি চায়ের বাসন বার করছিলাম। সে এসে বল্‌লে—"আপনি চা করতে জানেন তো? না, আমি সাহায্য করব?"—বলে' উত্তরের অপেক্ষা না করে'ই নিজে চায়ের বাসন সব বার করে' নিয়ে চা করতে বসে' গেল। বৌদি রুটি কাটতে কাটতে হাসতে লাগল।

দাদা এবারে এসে হেসেই অস্থির, বললে—"লীলাকে না চা করতে বল্‌লাম? ইনি কি তোমার A. D. C.? আগেই এখানে এসে অপেক্ষা করছিলেন তোমাদের কাজ করবার জন্যে?"

চায়ের পর্ব্ব শেষ হ'লে পর আমরা স্নান করে' মোটা চালের ভাত আর আলু-ভাতে দিয়েই খাওয়া সেরে নিয়ে দুপুরে পাহাড়ে উঠতে সুরু করলাম।

কাল যারা পাহাড়ে এসেছিল তারা ডুলিতে নেমেছিল, সেই-ডুলি রাত্রে এখানেই ছিল। আমরা দুখানা ডুলি নিলাম, বৌদি আর আমি উঠ্‌লাম ডুলিতে, আর দাদারা চল্‌ল হেঁটে। ডুলিও নাকি বিশেষ নিরাপদ্ নয়, তাই দাদা গেল বৌদির ডুলির সঙ্গে সঙ্গে আর সে রইল আমার পাশে পাশে। ছয় মাইল রাস্তা উঠ্‌তে হয়, দাদারা মাঝে মাঝে বেশ এগিয়ে যাচ্ছিল; আমার বুকটা কাঁপ্‌ছিল, বরাবরই সে আমার সঙ্গে চলেছে।

তার সঙ্গে গল্প করবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। মাঝে মাঝে তার দিকে তাকিয়ে দেখি সেও তাকিয়ে আছে আমার দিকে, সেই হাসি-হাসি চোখ। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

অনেকক্ষণ পরে সেই কথা বল্‌তে সুরু করলে—"ছেলেবেলায় মা আর বাবা দুজনেই মারা গেলে পর কাকা-বাবু আমায় বোলপুরে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে গান নিয়েই থাকতাম সারাদিন। হঠাৎ একবার টাইফয়েডে ভুগে বোলপুর ছেড়ে দিলাম। অবিশ্যি এখনও মাঝে মাঝে যাই সেখানে। তখন আমার বয়স পনর বৎসর। তার প্রায় বছর তিন পরে কাকাবাবুও হঠাৎ মারা গেলেন দিল্লীতে, সেখানে তিনি খুব বড় কাজ করতেন। এইবার আমি সত্যি-সত্যিই একলা পড়্‌লাম। বাবা চা-বাগানের শেয়ার রেখে গেছেন, তাতে যা পাই তা আমার পক্ষে যথেষ্ট। একমাত্র সখ দেশ বেড়ান, এবারে মোটর-সাইকেলে বেরিয়েছি। বেনারস পর্য্যন্ত যাবার ইচ্ছা আছে। সেখানে মাস খানেক থেকে কল্‌কাতা ফিরব।"

আমি বল্‌লাম—"মোটর-সাইকেল ভয়ানক বিপজ্জনক।"

সে আবার আমার দিকে তাকালে, তার পর বল্‌লে—"আমার ভয় করে না, আমার জন্যে ভাব্‌বার তো কেউ নেই?"—বলে'ই সে গুনগুন্ করে' গেয়ে উঠ্‌ল:—

"আমি একলা চলেছি এ ভবে—
আমার পথের সন্ধান কে করে।"

আমি প্রায় বলে' ফেলেছিলাম—"আমার যে বড্ড ভয় করে।" কিন্তু সাম্‌লিয়ে নিলাম।

পাহাড়ের উপর এসে পৌঁচেছি। সূর্য্য অস্ত যায়-যায় হয়েছে। আমি ডুলি থেকে নেমে বাকী রাস্তাটুকু হেঁটেই চল্‌লাম। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলেছি, সেও আমার সঙ্গে চলেছে আমার ছাতাটা নিয়ে। দাদারা একটু আগেই পৌঁচেছে, দেখি তারা সিঁড়িতে বসে' আছে। আমরাও গিয়ে তাদের পাশে বস্‌লাম। তখনি সে উঠে একটু দূরে একটা বড় পাথরের উপর গিয়ে দাঁড়াল, সূর্য্যের লাল আলোয় তাকে চমৎকার দেখাচ্ছিল, চুলগুলি উড়ে এসে তার মুখের উপর পড়্‌ছিল। হঠাৎ সে গেয়ে উঠ্‌ল:—

"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে !
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।"

সূর্য্য অস্ত গেল। আমরাও গিয়ে ডাকবাংলোয় উঠ্‌লাম। রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা বৌদিই করলেন। সবই সঙ্গে আন্‌তে হয়েছিল, এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। রাত্রে আমার আর বৌদির একঘরে, আর দাদাদের অন্য ঘরে শোবার বন্দোবস্ত করা গেল।

তখন বোধ হয় রাত নটা হবে, চমৎকার চাঁদের আলো হয়েছে, কি সুন্দর যে হয়েছিল চারিদিক্‌ ! আমরা সবাই বাইরে এসে বস্‌লাম। সে তার গম্ভীর গলায় গান গেয়ে উঠ্‌ল :—

"তুমি র'বে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা-নিশীথিনী সম ॥"

মনটা বড্ড খারাপ হ'য়ে গেল, তাড়াতাড়ি উঠে ঘরে চলে' গেলাম। শুয়ে ভাব্‌ছিলাম—"এর সঙ্গে দেখা না হ'লেই ছিল ভাল।" বাইরে তখনো গান চল্‌ছে :—

"মম দুঃখে বেদন
মম সফল স্বপন,
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী সম ॥"

তার পর গান থেমে গেল। কিন্তু আমার কানে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই-গানের সুর বাজ্‌তে লাগ্‌ল।... ভোরের বেলায় আবার তার বাঁশী বেজে উঠ্‌ল। প্রায় আধঘণ্টা বাঁশী বাজিয়ে সে গেয়ে উঠ্‌ল :—

"আমার নয়ন-ভুলান এলে,
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।"

আমরা তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে গেলাম। গিয়ে দেখি সূর্য্য উঠ্‌ছে ! চমৎকার ! সেদিনের কথা কখনো ভুল্‌ব না। সে পাথরের সিঁড়ির উপর বসে' গান গাইছিল।

হঠাৎ গান থামিয়ে সে হেসে উঠে বল্‌লে—"কাল আমি চা করেছি, আজ লীলা করবেন অজয়-দা।"

আমি চা করতে গেলাম। গিয়ে দেখি ষ্টোভের তেল ফুরিয়ে গেছে। চৌকীদার কাঠের উনান জেলে' দিলে। চায়ের জল চড়িয়ে রুটি কাট্‌তে বস্‌লাম। বাইরে বাঁশী বেজে উঠ্‌ল, একটুক্ষণ বাজিয়েই সে গান ধর্‌লে :—

"আমার একটি কথা বাঁশী জানে
বাঁশীই জানে।"

চুপ করে' শুন্‌ছিলাম। হঠাৎ সে থেমে গেল। একটা গানও তাকে শেষ পর্য্যন্ত ভাল করে' গাইতে শুন্‌লাম না। আবার বাঁশী বেজে উঠ্‌ল।

সত্যিই সে মুখে কিছু বলেনি, কিন্তু তার চোখ যে কথা বলে। হঠাৎ বাঁশী থেমে গেল। উপর দিকে তাকিয়ে দেখি সে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উনানের আলো আমার মুখে এসে পড়েছিল। কি দেখ্‌লে জানি না, আবার বাইরে গিয়ে সে এক লাইন গান বাজালে :—

"কেবল বলে' গেলেম বাঁশীর কানে-কানে।"

চা-পর্ব্ব শেষ করে' আমরা তাড়াতাড়ি নাম্‌তে সুরু করলাম,—এবারে আর ডুলিতে নয়, সবাই হেঁটে। আমার আর পেছিয়ে পড়্‌তে সাহস হচ্ছিল না, বরাবর বৌদির হাত ধরে'ই চল্‌লাম।

নীচে নেমে ডাকবাংলোয় অল্পক্ষণই ছিলাম। বুঝ্‌তে পার্‌লাম একটু পরেই যে যার পথে চলে' যাব। আমি জলখাবারের ঝুড়িটা ঠিক করে' গুছোতে বসেছি, বারাণ্ডায় গান শুন্‌তে পেলাম :—

"খেলার সাথী, বিদায়, দ্বার খোলো,
গেল যে খেলার বেলা ;
ডাকিল পথিকে দিকে বিদিকে
ভাঙিল রে এ সুখ-মেলা।"

তার পর ঐ-সুরটা খানিকক্ষণ বাজালে। আমার মনে হ'ল এ যে আমারই মনের কথা।

হঠাৎ সে উঠে এসে আমার হাত থেকে চায়ের বাসনগুলি নিয়ে বল্‌লে—"আমি গুছিয়ে দিই, আপনি বসুন।"

প্যাক করা হ'য়ে গেছে। এবার যাবার পালা। ও তার মোটর-বাইকে ওর জিনিসপত্র বেঁধে নিয়েছে,—ওকেও যেতে হবে। আমার ছাতাটা পড়ে' গিয়েছিল, সেটা আমার হাতে তুলে' দিয়ে সে আমার দিকে চাইলে, আবার সেই চাউনি, প্রথম দেখে' যেমন করে' চেয়েছিল। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। সে বল্‌লে—"তোমাদের গাড়ী চ'লে গেলে আমিও আমার পথে চলে' যাব।"—বলে'ই তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে দাদাকে বল্‌লে—"অজয়-দা, তুমি

এদের নিয়ে এস আস্তে আস্তে, আমি ষ্টেশনে জিনিসগুলি নিয়ে চল্‌লাম।"

মোটর-বাইকটা ষ্টার্ট্ করবার সময় ওর পকেট থেকে কি-একটা পড়ে' গেল মাটিতে। আমি কুড়িয়ে নিয়ে দিতে যেতে-যেতেই সে রওনা হ'য়ে পড়ল, আমার ডাক শুনতেও পেলে না। দেখ্‌লাম, সেটা ওর নোট্‌বুক। কি সুন্দর হাতের লেখা! ব্লাউসের ভিতর পূরে ফেল্‌লাম তাড়াতাড়ি। ঘরে এসে দেখি দাদাদের তখনো হয়নি, পাশের ঘরে জান্‌লার কাছে গিয়ে সেখানা খুলে' দেখ্‌লাম।—

"৩০এ এপ্রিল ১৯২...ইশ্রি ওয়েটিং-রুম্...আজ বেজায় একলা লাগ্‌ছে, একেবারেই একলা। কেমন আছি এক-একবার ভাবি। সত্যই কি বেশ ভাল আছি? ভাগ্যিস আমার বাঁশীটা আছে, নইলে বোধ হয় পাগল হ'য়ে যেতাম। এইটিই আমার সুখ-দুঃখের সাথী। আমার মনের সঙ্গে 'মিছে তুই ভাবিস্ মন, তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন' গানটা বেশ মেলে দেখ্‌ছি। গানের শেষ লাইনটা মেলে কি না দেখা যাক্—'হয়তো তাহার পাবি দেখা তোর গানটি হ'লে সমাপন'। গান সমাপনের আগেই তার দেখা পাব এই আশা নিয়েই তো ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছি।

"এ-জায়গাটা চমৎকার। কিন্তু একলা ঠিক উপভোগ করা যায় না। নিমিয়াঘাট-ডাকবাংলোটা আরও সুন্দর। কিন্তু আগেই এক দল আমেরিকান গিয়ে তা দখল করেছে, কাজেই এখানে এসে আশ্রয় নিতে হ'ল।

"রাত বারোটা বেজে গেছে। বম্বে-মেলখানা আট্‌কে দাঁড়িয়ে আছে। একটু আগে কোথায় গাড়ীতে-গাড়ীতে ঠোক্কর লেগেছে। কে জানে, হয়তো এই গাড়ীতে সে আছে, যার জন্যে দেশ বিদেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। ভারি সুন্দর চাঁদের আলো হয়েছে, আজ পূর্ণিমা। বাইরে গিয়ে একটু বাঁশী বাজান যাক:—

"১লা মে ১৯২......পরেশনাথ-ডাকবাংলা। বিলাতে প্রতিগ্রামে প্রতিবৎসর মে মাসে এক ফুলের মেলা হয়, তাতে সেই গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে ফুল দিয়ে 'মে কুইন' করা হয়, তাকে নিয়েই উৎসব।

"আমি আজ এই পাহাড়ের ফুলপাতার ভিতর এসে 'মে কুইন'-এর দেখা পেলাম। লীলা, তোমাকে সত্যি ভারি ভাল লেগেছে। তোমার দাদা আলাপ করিয়ে দিলেন, কিন্তু কৈ আমার তো একবারও মনে হচ্ছে না যে তোমার সঙ্গে নতুন আলাপ কর্‌লাম? তোমায় যেন কতকাল থেকে চিনি। আমি যেন তোমারই অপেক্ষায় এখানে এসে বসে' ছিলাম। তুমিও কি তাই দিন দেখে বেরিয়েছিলে? তোমায় যদি আজ মুখে বল্‌তে পার্‌তাম যে তোমায় কত ভাল লেগেছে,—না, থাক, আজ নয়, আর-একদিন বল্‌ব। আর মুখে বল্‌বারই বা কি আছে? তোমার কি শক্তি নেই বোঝ্‌বার?

"আবার যখন দেখা হবে বল্‌ব। কবে দেখা হবে? তা জানিনে, তবে দেখা হ'বে নিশ্চয়ই, আমি অপেক্ষা করে' থাক্‌ব। তুমিও কি থাক্‌বে না?"

আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু তবু সে মুখে একবার বল্‌লে না কেন? আমারও যে বল্‌বার ছিল...নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে' থাক্‌ব।

এই পাতা-দুখানা ছিঁড়ে নিয়ে নোটবুকখানা দাদাকে গিয়ে দিলাম, বল্‌লাম—"ওকে দিও তো, ওর পকেট থেকে পড়ে' গিয়েছিল।"

ষ্টেশনে এসে দেখি চুপ করে' সে বসে' আছে দূরে ডাকবাংলোর দিকে তাকিয়ে—মুখখানা বৃষ্টির আগের মেঘের মত গম্ভীর করে'। আমিও তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ফির্‌লাম, পাছে নিজেকে সাম্‌লাতে না পারি।

দাদা ওর নোটবুকখানা ওকে দিয়ে বল্‌লে—"লীলা আস্‌বার সময় পথে কুড়িয়ে পেয়েছিল।" সেখানা হাতে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে পাতাগুলো উল্‌টিয়ে গেল, হঠাৎ চেয়ে দেখ্‌লে দু-তিনখানা পাতা নেই। কি ভেবে নিজের মনে একটু হেসে আমার দিকে চাইলে। আবার সেই চাউনি!

গাড়ী এসেছে। সে আমাদের তুলে দিয়ে দাদার হাতখানা ধরে' খুব এক ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌লে—"কল্‌কাতা ফিরে খবর দিও অজয়-দা, আমিও মাসখানেকের ভিতর ফির্‌ছি, যাব একদিন তোমাদের বাড়ী।" দাদা বল্‌লে—"নিশ্চয়।" দাদা তাড়াতাড়ি জিনিস গোছাতে গেল

ওপাশে। সে এবার বৌদিকে নমস্কার করে' বল্‌লে—"বৌদি, এই জঙ্গলে পাওয়া লক্ষ্মণটিকে ভুল্‌বেন না তো!"

বৌদি হেসে উত্তর দিল—"কল্‌কাতা ফিরে মাঝে মাঝে দেখা দিলেই ভুল্‌ব না।"

তার পর আমার কাছে এগিয়ে এসে সে বল্‌লে—"লীলা, আশা করি আবার দেখা হবে।" আমি কিছু বল্‌তে পার্‌লাম না, চুপ করে' রইলাম। ও আবার বল্‌লে—"দেখা নিশ্চয়ই হবে, তবে কবে তা জানিনে।"

গাড়ী ছেড়ে দিলে। আমার দিকে চেয়ে রইল সে। আমি আর চোখের জল থামিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লাম না। দাদা বল্‌লে—"এরি মধ্যে চোখে কয়লা ঢোকাতে পারুলে।" বৌদি আমায় তার কোলে টেনে নিলে।

উঠে বস্‌লাম। যতক্ষণ পরেশনাথ পাহাড় দেখা গেল, তাকিয়ে রইলাম তার দিকে—জৈনদের মন্দির আমারও তীর্থস্থান হ'য়ে উঠ্‌ল। সেখান থেকে সংগ্রহ করে' আন্‌লাম তার হাতের ছ্‌চত্র লেখা আর তার বাঁশীর সুরটি।...

ঠিক একমাস পরে কল্‌কাতা ফির্‌ছি সন্ধ্যের প্যাসেঞ্জারে। আবার ইস্রি ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়েছে, সেই গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোডের ক্রসিংএর মুখে। লাইন ক্লিয়ার না থাকায় প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়াতে হয়েছিল। কাল পূর্ণিমা গেছে। অল্পক্ষণ হ'ল চাঁদ উঠেছে। দাদা বৌদি দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সারাদিনের মোটরের ঝাঁকুনির পর। চাঁদের আলোয় চারিদিক্ ভরে' গেছে। আমার সেদিনকার কথা মনে পড়্‌ছিল। হঠাৎ অনেক দূরে বাঁশী শুন্‌তে পেলাম:—

"এখন আমার সময় হ'ল
যাবার দুয়ার খোল, খোল।
হ'ল দেখা, হ'ল মেলা,
আলো-ছায়ায় হ'ল খেলা,
স্বপন যে সে ভোলো, ভোলো।"

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌লাম যদি তাকে দেখ্‌তে পাই এই আশায়। তার পর আরও দূরে গান শুন্‌তে পেলাম:—

"আকাশ ভরে দূরের গানে,
অলখ্ দেশে হৃদয় টানে,
ওগো সুদূর, ওগো মধুর,
পথ বলে' দাও পরাণ-বঁধুর,
সব আবরণ তোলো, তোলো॥"

বৌদিকে তাড়াতাড়ি তুলে বল্‌লাম—"বৌদি, শুন্‌তে পাচ্ছ?" সে বল্‌লে—"কি ভাই?" আমি বল্‌লাম—"ঐ যে সে গান কর্‌ছে।" বৌদি হেসে বল্‌লে—"সে কি আর এবারেও তোমার জন্যে বসে' আছে এখানে এসে? স্বপ্ন দেখ্‌ছ নাকি জেগে জেগে!" আমি তখনও শুন্‌তে পাচ্ছি গান থেমে গিয়ে বাঁশীতে বেজে উঠ্‌ল আবার সেই গানের সুরটা:—

"খেলার সাথী, বিদায়, দ্বার খোলো,
গেল যে খেলার বেলা......"

গাড়ী ছাড়্‌ল। বাঁশীর সুরও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। আমার আর ঘুম এল না।

বাড়ী এসে পৌঁচেছি। বেলা প্রায় ন'টা। স্নান করে' চা খেতে বসেছি। কাল রাত্রের কথা মনে পড়ে' মনটা কি রকম খারাপ লাগ্‌ছিল। দাদা এসে "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"-খানা আমার হাতে দিয়ে বল্‌লে—"একটা বড় খারাপ খবর আছে। আমাদের সেই পথের বন্ধুটি একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন—পরশু রাত্রে।"

আমি তাড়াতাড়ি কাগজখানা খুল্‌লাম।—

Isri,
31st. May, 192—.

Terrible accident at Isri station. 198 miles from Howrah on the Grand Chord line. An Indian gentleman while crossing the railway lines on his motor cycle was run over and killed instantaneously by 22 down passenger yesterday night at 19 hours.

The level crossing gate was found open. The chowkidar has been arrested and sent up for trial to Dhanbad.

The District Traffic Superintendent accompanied by the S. D. O. inspected the spot this morning,......

আর পড়্‌তে পার্‌লাম না, মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল। উঠে' গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়্‌লাম। দাদা গিয়ে বৌদিকে পাঠিয়ে দিলে। বৌদি জিজ্ঞাসা করলে—"কি হয়েছে ভাই? মাথা ধরেছে?" আমি কিছু বল্‌তে পার্‌লাম না, কাগজখানা এগিয়ে দিলাম তার হাতে।

কাগজখানা পড়ে' সে আমার পাশে চুপ করে' বস্‌ল আমাকে কোলে টেনে নিয়ে। একটু পরে বল্‌লে—"তাই বুঝি তুমি কাল রাত্রে আস্‌বার সময় তার গান শুন্‌তে পেয়েছিলে?" আমার চোখ জলে ভরে' এল, কিছু বল্‌তে পার্‌লাম না, বৌদির হাতখানা জড়িয়ে ধর্‌লাম।

তার পর থেকে প্রত্যেক পূর্ণিমার শেষ রাত্রেই শুন্‌তে পাই দূরে বাঁশী বাজ্‌ছে :—

"এখন আমার সময় হ'ল,
যাবার দুয়ার খোল, খোল॥"

কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যৌবন-বোধন

(পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ)

প্রাণে মনে মহা-মুক্তি-পণ জাগুক আজ,
বুকে বুকে অগ্নিশিখার কেতন উড়ুক হায়,
অপমানে নত শীর্ষ 'পর পড়ুক বাজ,
ললাটেতে মৃত্যু-তিলক জ্বলুক আগুন প্রায়।

আঘাতে আহত বক্ষ 'পর শোণিত লাল
দিকে দিকে শঙ্খ জাগাক মরণ-সমুদ্রের,
মরণে মরণে ত্রস্ত হোক মহান্ কাল,
লোকে লোকে দুঃখ-ব্যথার রোদন উঠুক ঢের।

মুখরিত করি' বিশ্ব-লোক প্রলয়-গান
পলে পলে ছিন্ন করুক জগৎ-বীণার তার,
তারকা-তপনে বিদ্রোহের বিষম বান
অবিরত ধ্বংস আনুক ভীষণ চমৎকার!

সহে না সহে না আর যে ভাই, চোখের জল,
অপমানে খিন্ন মলিন জীবন-ফাগুন-কাল;
আজিকে পুড়িয়া হোক না ছাই সুখের ছল,
চারিদিকে হিংস্র ভীষণ লাগুক আগুন লাল।

বৃথা এ গুমরি' কান্না তোর, বৃথাই হায়,
কে শুনিবে আর্ত্তনাদের হৃদয়-বিদার-রব?
শিখাতে শিখাতে বহ্নি ঘোর গগন ছায়,
শোন না কি অত্যাচারের নিদয় জয়োৎসব?

রেখে' দে আজিকে অশ্রুপাত, হৃদয় বাঁধ,
জীবনেরে দৃপ্ত তেজের কঠিন আধার কর্;
জাগা রে বুকেতে যৌবনের প্রলয়-সাধ,
শত কোটি ঝঞ্ঝা তুফান নাচুক বুকের 'পর।

কাঁপায়ে ধরণী তাণ্ডবের চলুক নাচ,
দে উড়ায়ে দীর্ণ অযুত ভুবন-কমল-দল;
কোটি রাঙা শিখা খাণ্ডবের জ্বলুক আজ,
শিখে নে রে ধ্বংস বিনাশ, তরুণ পাগল-দল!

ঝলকে ঝলকে রক্ত-স্রোত মরণ-জয়
পথে পথে মৃত্যু-রাক্ষেব বিষাণ বাজাক হায়;
পলকে পলকে খড়্গাঘাত কিরণময়
দিকে দিকে মুক্তি-রথের কেতন উড়াক বায়!

আজিকে আসনে যৌবনের বসুক দুখ,
তারি তরে শঙ্খ-নিনাদ জাগাক মরণ-গান;
ছিঁড়িয়া আনিয়া হৃৎ-কমল দে সুখটুক,
তারি পায়ে অঞ্জলি হায় তরুণ-জীবন-দান।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গুরু কোন্ রঘুনাথ?

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলার সহায় ছয়জন গোস্বামী। তন্মধ্যে রঘুনাথ নামধেয় দুইজন গোস্বামী ছিলেন। একজন রঘুনাথ দাস গোস্বামী, অপর রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই দুইজনের মধ্যে কাঁহার কৃপাপাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদের সমাপ্তিস্থলে

"শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস॥"

এই ভণিতা দৃষ্ট হয়। ভণিতায় উল্লিখিত রঘুনাথ, কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের গুরুদেব বলিয়া সকলেই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে শ্রীরূপ গোস্বামীর নাম ভণিতায় কেন উল্লেখ আছে। এই প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণব মহাজনগণ বলেন যে, গোস্বামী পর্য্যায়ে

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥"

এই শৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিনয়ের অবতার কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীরূপ হইতে স্বীয় গুরুদেব রঘুনাথ পর্য্যন্ত সমস্ত গোস্বামীগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। স্থানান্তরে অন্ত্যখণ্ডে বিংশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থসমর্পণ অবসরে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় অভীষ্টসিদ্ধির অপূর্ব্ব আনন্দে লিখিয়াছেন—

"শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীব চরণ॥
নিজ শিরে ধরি এই সভার চরণ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত পূরণ॥"

বর্ণিত ভণিতাসমূহে "রঘুনাথ" এই উক্তিতে ইনি দাস রঘুনাথ কি ভট্ট রঘুনাথ তাহা স্থির করা যায় না। কিন্তু শ্রীচরিতামৃতের আদি লীলায় দশম পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে—

"মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস।
সর্ব্বত্যাগী কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাথে।
প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া॥
এই ত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে।
আসি রূপ-সনাতনের বন্দিলা চরণে॥
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥
অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥
রাত্রি-দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে॥
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার॥"

বর্ণনার শেষ চরণ হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় মহাত্মা রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের গুরু। আমরাও দীর্ঘদিন যাবৎ এই ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আমাদের মান্য বৈষ্ণব সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তদীয় মধুর গ্রন্থ শ্রীঅমিয়নিমাইচরিতের ৫ম খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীপাদ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর চরিত্র আস্বাদন উপলক্ষে লিখিয়াছেন—"অনেকের বিশ্বাস, আমাদেরও ছিল, যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গুরু রঘুনাথ দাস; কিন্তু একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিলাম— প্রভু হইতে রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট হইতে কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণদাস হইতে মুকুন্দদাস।" মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় কোন্ গ্রন্থ হইতে এই প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা উল্লেখ করেন নাই।

এক্ষণে এই সংশয়ের মীমাংসা কোথায়?

শ্রী চিন্তাহরণ দে

"সাঁওতাল জাতি"

শ্রাবণের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ "সাঁওতাল জাতি" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তার দুএকটা জায়গায় দুএকটা ভুল চোখে পড়ল। যেমন, সাঁওতালেরা নাকি দামোদর নদীকে বলে গঙ্গা! সাঁওতালেরা অবশ্য দামোদরকে হিন্দুদের গঙ্গার মত পবিত্র ও মুক্তি-দায়িনী মনে করে, কিন্তু ওর নাম গঙ্গা নয়, তোপন নাই। হিন্দুর

গঙ্গাজলেরই মত ওদের তোপন-দাঃ অতি পবিত্র। সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে সাঁওতালরা মৃত পিতামাতার অস্থি এনে "তোপন-নাইরে' অর্পণ করে' থাকে। পূর্ব্বে তিনটি মাত্র ঘাট ছিল, এখন অনেক ঘাট হয়েছে। তোপন নাই পার হ'য়ে গেলে জাতি থাকে না বলে' শাস্ত্রের আদেশ ছিল। কিন্তু কালক্রমে 'নাই' পার হ'য়ে নিয়ম ভঙ্গ করে' অনেকে দূর দেশে যাতায়াত করে,—তার ফলে সকলে সভা করে' বহু তর্ক-বিতর্কের পর নাকি স্থির করেছে যে এই নিয়মটি লঙ্ঘন করা যেতে পারে।

সাঁওতালদের গণনাতে কুড়ির বেশী নেই এমন নয়; কুড়ি পর্য্যন্ত গণে'ই সাধারণতঃ তারা কাজ চালায়—এবং বেশী হ'লে, এককুড়ি এক (বার গেল মিৎ) এককুড়ি দুই (বার গেল বারে) অথবা মিৎ ইষি মিৎ, মিৎ ইসি বার, প্রভৃতি করে' বলে। এমনি করে ত্রিশ = পেগেল; চল্লিশ = পোন্ গেল, একশ = শায়; দুইশ = বার শায়: হাজার = গেল শায়।

সাঁওতালদের সামাজিক রীতি নীতি, নৃত্য সঙ্গীত প্রভৃতি সম্বন্ধে আরো যথেষ্ট কথা বলা যায়। সাধারণ পাঠকের জন্য এর কোন আবশ্যকতা নেই মনে করে'ই হয়ত লোক আর অধিক লেখেন না। কিন্তু এই সদানন্দ হাস্যপ্রফুল্ল জাতির সঙ্গীত সম্বন্ধে আরো দু'একটা কথা না বল্‌লে ওদের স্ফূর্ত্তি-প্রিয়তার ঠিক্ পরিচয় দেওয়া হয় না। প্রাণের আনন্দে এরা সর্ব্বদাই এমন ভরপুর যে এদের প্রত্যেকটি দেহের ভঙ্গীকে যেন নাচের তাল বলে ভ্রম হয়, এদের হাসিকৌতুকে ভরা প্রত্যেকটি কথাকে গানের সুর বলে' মনে হয়। নৃত্য সম্বন্ধে লেখকের কথিত সাগরের ঢেউয়ের মত এদের গানের বেশ একটা বাঁধা পর্দ্দা আছে, বেশীক্ষণ শুন্‌লে এই একই সুরকে যদিও খানিকটা একঘেয়ে বলে' মনে হয়, কিন্তু গানের বিষয়-বৈচিত্র্য বুঝ্‌লে সেটুকু বোধ হয় না। এদের অনেক রকমের গান আছে, তার মধ্যে এই কয়টি প্রধান :—

বাপলা সেরিং = বিবাহের গান।
লাগড়ে সেরিং = সকল সময়ে গাহিবার গান।
বীর সেরিং = অশ্লীল গান।
তোতোাংৎ সেরিং = বীজ ভাষার গান।
রহয় সেরিং = ধান্য রোপণের বা বর্ষাকালের গান।
হাড়হাৎ সেরিং = নিড়ানের গান।
কারাম সেরিং = আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের গান।
সহরায় সেরিং = কালীপূজার সময়ের গান।
বাহা সেরিং = বসন্তকালের গান

কতকটা নিজ অভিজ্ঞতা এবং কতকটা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সাঁওতালীভাষার একখানি পুস্তক থেকে উপরিউক্ত কথাগুলি বল্‌লাম।

শ্রী প্রফুল্লকুমার ঘোষ

—

ভূঞা উপাধি

বঙ্গে মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে প্রতাপান্বিত রাজগণ ভূঞা উপাধি গ্রহণ করিতেন। তাম্রলিপ্তাধিপতি কাষুরায় লুপ্তগৌরব কিয়ৎপরিমাণে উদ্ধার করিয়া ভূঞা উপাধি গ্রহণ করেন।

মাদলাপঞ্জীতে উৎকলাধিপতি অনঙ্গভীম দেবের বিজয়কাহিনীতে বাঙ্গালার প্রত্যন্ত প্রদেশের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে ভূঞা-উপাধিধারী রাজগণের উল্লেখ আছে।

"By the grace of Lord Jagannath, by the blessings of Brahmans and through faith in God Bishnu conquering with sword the Bhuyas, I have extended my kingdom on the north from Kasobas to the river Danai Burha" (old Damodar).—J. A. S. B.—New Series, vol. XII. 1916, No. 1., p. 31.

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

—

'হিজ্‌লীর ভূঞা'

দ্বাদশ ভৌমিকের নামপ্রসঙ্গে শ্রাবণের প্রবাসীতে শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার মহাশয় উড়িষ্যা ও হিজলীর ঈশাখাঁ লোহানী ও ওস্‌মান খাঁর নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঈশাখাঁ লোহানী বা ওসমান হিজলীর অধিপতি ছিলেন না। সুজামুঠা রাজ্যের রাজগণের পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ব্বে এইস্থানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের অধঃপতনের সুযোগে সম্ভবতঃ উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্র দেবের মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধরের সহায়তায় তাজখাঁ মসনদ্ ই-আলি নামক জনেক আফগান ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিজলীতে ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের মেদিনীপুরের কালেক্‌টার ক্রোম্‌লীন সাহেব বলেন—বাদ্‌সাহী সৈন্য রাজ্য অধিকার করিতে আসিলে তাজখাঁ তাঁহাদের হস্তে নিগৃহীত হইবার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে স্বাধীনতার লীলাভূমি এই সমাধিস্থানে পৌষসংক্রান্তিতে প্রতিবৎসর মেলা বসে। মিঃ ক্রোম্‌লীন তাজখাঁর সমাধিমসজিদের সেবকদিগের নিকট রক্ষিত প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ দেখিয়া ইঁহার বংশবিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন। তাজখাঁর পরে বাহাদুর খাঁ, তৎপরে ১৫৬৪ খৃঃ জইলখাঁ, তৎপরে পুনরায় ১৫৭৪ খৃঃ বাহাদুর খাঁ ঈশাখাঁ মসনদ্ ই-আলি নাম গ্রহণ করিয়া হিজলী-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে উড়িষ্যায় ঈশাখাঁ লোহানি ও খিজিরপুরে ঈশাখাঁ ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য গুলতাতবন্ধু হিজলার এই ঈশাখাঁ মস্‌নদ-ই-আলিকে ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে যুদ্ধে নিহত করেন। ইঁহার পর এই রাজ্য সুজামুঠা মাজনামুঠা ও জলামুঠা নামক তিনটি ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্যে বিভক্ত হইয়া মোগলের অধীন হইয়া পড়ে। দাউদের পুত্র ওস্‌মান একবার উড়িষ্যা অধিকার করেন বটে, কিন্তু হিজলী নহে। হিজলীর আফগান-রাজবংশের মধ্যে ওসমান ত কেহই নাই। মস্‌নদ-ই-আলি বংশ বার ভূঞার অন্যতম। (প্রতাপাদিত্য পারিষদ গ্রন্থাবলী)

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ.

—

বাংলা

বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষা—

মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা

সাল	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
১৯১৯-২০	৭৪১৫৭৫	১৭৭৪০৮	৯১৮৯৮৩
১৯২০-২১	৭৩৭৭৯৯	১৮৮০৪৫	৯২৫৮৪৪

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার কত শীঘ্র বৃদ্ধি হইতেছে অর্থাৎ এক বৎসরে প্রায় ১০॥০ হাজার নূতন ছাত্রী শিক্ষার জন্য স্কুলে যোগদান করিয়াছে।

বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা

সাল	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
১৯২১	১৩২০৪২০৭	১২৩৮১৮১৭	২৫৪৮৬১২৪

বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা।

১৯২১	১০৮০৮৯২০	৯৯৫০৮২৫	২০৮০৯০৪৮

হিন্দু শিক্ষার্থীর সংখ্যা

সাল	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
১৯১৯-২০	৮৩৮৪৭৬	১৫২১৬৭	৯৮৮৬৪০
১৯২০-২১	৮১৬৯০৮	১৫৫৩৮৮	৯৭২২৯৬

ঐ এক বৎসরে হিন্দু বালিকা কেবল তিন সহস্র বাড়িয়াছে। ইহা ছাড়া হিন্দু বালিকা ছাত্রীর সংখ্যাও মুসলমান ছাত্রী অপেক্ষা কম। হিন্দুদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বেশী হইতেছে না এবং এবিষয়ে মুসলমানগণ (যাহারা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এত পিছাইয়া ছিলেন) দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন।

মাদ্রাসা

সাল	মাদ্রাসা	ছাত্রের সংখ্যা
১৯১৯-২০	৩১৬	২০৮৭১
১৯২০-২১	৩৮৯	২৭২৩১

—বাঁকুড়াদর্পণ

শিক্ষার ব্যয়—

বঙ্গদেশে শিক্ষার জন্য প্রতিবৎসর ১০৩২২৩৭৭৲ টাকা খরচ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে গবর্ণমেন্টের তহবিল হইতে খরচ হইয়া থাকে ৫৫৭৭০১৪৲ টাকা মাত্র। কলেজের ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকারে মোট ব্যয় হইয়া থাকে ২৫৬৯৬৩৪৲ টাকা এবং মেয়েদের জন্য ব্যয় হইয়া থাকে ৯২০০৮৲ টাকা। তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট দিয়া থাকেন যথাক্রমে ১১৭০৩৬৲ ও ৫৯০৬৫৲ টাকা।—যশোহর

পৃথিবীর লোকের শিক্ষা ও আমাদের শিক্ষা—

পৃথিবীর শিক্ষিত লোকের সংখ্যা—আমেরিকায় শতকরা ৯৯, ইংলণ্ডে ৯৯, সুইডেনে ৯৯, সুইজারল্যাণ্ডে ৯৯, অষ্ট্রিয়ায় ৯১, হল্যাণ্ডে ৯০, বেলজিয়ামে ৮০, আয়র্ল্যাণ্ডে ৭১, ইটালীতে ৫৬, রুশিয়ায় ২৮, ভারতবর্ষে ৫, বঙ্গদেশে ৭। শিক্ষা-বিষয়ে ভারতবাসী প্রতিজনের জন্য বার্ষিক এক আনা এবং মার্কিণ দেশে ১২৲ টাকা করিয়া ব্যয়িত হইয়া থাকে।—সম্মিলনী

স্ত্রীশিক্ষার প্রসার—

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সমভাবে চলিতেছে। নানাপ্রকার 'বিপদ-আপদের মধ্যেও উন্নতির স্রোত প্রতিহত হয় নাই। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি জনসাধারণের পূর্ব্বে যে বিরাগ ছিল ক্রমে ক্রমে তাহা দূর হইতেছে। এখন স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে সকলেই উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকে। ১৯২০-২১ সনের তুলনায় ১৯২১-২২ সনে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ববৎসর ইহার সংখ্যা ছিল ১২১৯৯, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে হইয়াছে ১২২৮০। স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রী-সংখ্যা বর্দ্ধিত না হইয়া বরং হ্রাস পাইয়াছে। ছাত্রী-সংখ্যা ৩৪০৫৩৬ স্থলে ৩৩৩৮৭০ হইয়াছে।—সম্মিলনী

বাংলা সরকারের অনুকরণীয় আইন—

চরস বন্ধ।—প্রকাশ—উড়িষ্যা ও বিহার হইতে তত্রত্য গবর্ণমেন্ট চরস বিক্রয় বন্ধের আদেশ দিয়াছেন।—বীরভূমবার্ত্তা

বাংলার স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতি—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় বলেন, বাংলা দেশে বর্ত্তমানে ১৪০ লক্ষ লোক নানাপ্রকার জ্বরে ভুগিতেছে। এই ব্যাধির প্রতিকার করা যাইতে পারে। "বাংলা দেশে ৪ হাজার চিকিৎসাব্যবসায়ী আছেন, তাঁহারা সকলে একযোগে কার্য্য করিলে এইসব ব্যাধির প্রতিকার করা যাইতে পারে।" এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে "বঙ্গীয় স্বাস্থ্য সমিতি" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।—সাধক

"বঙ্গীয় স্বাস্থ্য সমিতি" হইতে ব্যাক্‌টেরিওলজিকেল লেবরেটারীর ডাক্তার এন ভট্টাচার্য্যকে চাঁদপুরে জ্বরমড়কের কারণ ও তৎপ্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ জন্য চাঁদপুর পাঠান হইয়াছিল।—আনন্দবাজার পত্রিকা

বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা—

বাঙ্গালাদেশে ১৮৭২ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির সংখ্যা কিরূপ বাড়িতেছে, ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি তাহার এক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে; সাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে ঐ হিসাব উদ্ধৃত হইল:—

হিন্দু	মুসলমান
১৮৭২—১,৭০,৫১৫৩৩	১,৬৬,১৯,১৯১
১৮৮১—১,৮০,৬৭,৮১৬	১,৮৩,৯৫,৪২৪
১৮৯১—১,৮৯,৭৪,৫৭৪	২,০০,৭৩,২০২
১৯০১—২,০৯,৫২,৯০১	২,১৯,৫১,৮১৮

হিন্দু	মুসলমান
১৯১১—২,০৯,৪৫,৩৭৯	২,৪২,৩৬,৭৬৬
১৯২১—২,০৮,৭৯,১৪৮	২ ৪৪,৮৬,১২৪
খৃষ্টান	**অসভ্য**
১৮৭২—৬৩,৪৮২	————
১৮৮১—৭২,২৮৯	৩,১৩,০৮০
১৮৯১—৮২,৩৩৯	৩,৬৪,৮২০
১৯০১—১,০৩,৫৯৬	৪,৪৩,৫৮৫
১৯১১—১,২৯,৭৪৬	৭,৩ ৯৭৮০
১৯২১—১,৪৯,০৭৫	৮,৪০,০৬৪
বৌদ্ধ	**অন্যান্য**
১৮৭২—৮৪,৮৯১	২,৪৪,৬৬৯
১৮৮১—১,৫৫,১০৬	১০,৮৯৭
১৮৯১—১,৯১,৬৬৪	১৬,৯৪৮
১৯০১—২,৯৬৫,৬৯	১০৮৫১
১৯১১—২,৪৬,৮৪৪	১৬,৬৪৩
১৯২১—২,৭৫,৬৪৯	২০,৩১৪

এই তালিকায় দেখা যায়, ১৮৭২ সালে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা প্রায় ৪॥০ লক্ষ বেশী ছিল ; ৫০ বৎসর পরে ১৯২১ সনে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৪৬॥০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৭২ সালে খৃষ্টানের সংখ্যা ছিল ৬৩,৪৮২ ; ১৯২১ সালে হইয়াছে ১,৪৯,০৭৫ ; ১৮৭২ সালে বৌদ্ধের সংখ্যা ৮৪,৮৯১ ছিল ; ১৯২১ সালে ২,৭৫,৬৪৯ হইয়াছে।

১৯১১ হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বীর লোকসংখ্যাই বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা ১,৩৬,২৩১ কমিয়াছে।—ঢাকা গেজেট

হুগলী জেল—

সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে, বরিশালের সতীন্দ্রনাথ সেন আর গড়বেতার রামসুন্দর সিং আবার অনশনে আছেন। হুগলী জেলের সুপার-সাহেব সতীন্দ্রকে শিষ্টতা শিক্ষা দেবার জন্যেই দুমাস জেলে আটক করে' রাখেন। সতীন্দ্র সুপার-সাহেবের যথেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদকল্পে অন্ন ত্যাগ করেন। সুপার-সাহেবও তার 'স্বেচ্ছাচার' দমন করবার জন্যে তাকে ওই অবস্থায়ই দাঁড়-হাতকড়া পরিয়ে রাখেন।

এই অমানুষিকতার প্রতিবাদকল্পে রামসুন্দর বাবু-আবার অন্ন ত্যাগ করেন। তাঁরা বাব দিনই অনশনে আছেন ; আর যথারীতি তাঁদের নাক দিয়ে নল চালিয়ে তাঁদের পেটে খাবার পুরে দেওয়া হচ্ছে। রামসুন্দর-বাবু ওজনে তেরো পাউণ্ড কমে' গেছেন।—বিজলী

[সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে শ্রীমান্ সতীন্দ্রনাথ অনেকের অনুরোধে অন্নগ্রহণ করিয়াছেন। প্রঃ সঃ]

ভীষণ ডাকাতির উৎপাত—

গুণ্ডা আইন হইয়াও ত চুরি-ডাকাতি-গুণ্ডামির কমতি নাই। এতদিন শোনা যাইত, পুলিশ অক্ষম, আইনের হাত আটকা, কাজেই তাহারা কিছু করিতে পারে না ; এখন ত সে-কথা বলা চলে না ; সরকার ত ক্ষমতা দিয়াছেনই, এখনও যদি তাহারা অক্ষম হয় তবে দোষ তাহাদেরই।—স্বরাজ

গত জুন মাসে ৯১টি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহার পূর্ব্ব মাসে ৯৯টি ডাকাতি হইয়াছিল এবং গত বৎসর জুন মাসে ৯০টি ডাকাতি হইয়াছিল।—স্বরাজ

চতুর্দ্দিকে ডাকাতি আরম্ভ হইয়াছে। লোকে পেটের জ্বালা নিবারণের জন্যই এ পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জনসাধারণ একেবারে অসহায় অবস্থায় পতিত। ডাকাতগণ অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ডাকাতি করিতে আসে, ফলে নিরস্ত্র গ্রামবাসীগণ তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট যদি অস্ত্র আইন একটু শিথিল করিয়া প্রত্যেক গ্রামবাসী যাহাতে ২।১টি আগ্নেয়াস্ত্র রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে দুর্দ্দান্তগণ যে ভয়ে লেজ গুটাইতে বাধ্য হইবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অন্যদিকে যুবকগণকে লইয়া গ্রামে গ্রামে দল গঠন করিতে পারিলে যে তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।—যশোহর

দান ও সৎ অনুষ্ঠান—

টাঙ্গাইল মহকুমার নাগরপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী ইতিপূর্ব্বে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়া তাঁহার স্বগ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা ঐ চিকিৎসালয়ের উন্নতিকল্পে দান করিয়াছেন। এরূপ একটি বৃহৎ হাঁসপাতাল বঙ্গদেশের আর কোন পল্লীগ্রামে আছে বলিয়া অবগত নহি।

—বঙ্গরত্ন

কলিকাতা ৯৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট-নিবাসী কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহা বাহাদুর সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘের সদস্যগণের অনুপ্রেরণায় কলিকাতা ১৮নং বলাই সিংহ লেনে একটি দাতব্য ঔষধালয় খুলিয়াছেন। এখানে সমাগত রোগীগণ বিনামূল্যে ঔষধাদি পাইবেন।

—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

স্বাধীন ব্যবসায়ের পথ—

গালার ব্যবসা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ল্যাক কোম্পানী লিমিটেড্ সম্প্রতি গালা সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। গালা সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য এই পুস্তকে লিখিত আছে। আমরা সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করি।

গত ১৩২৯ সালের মোটামুটি হিসাব করিলে দেখা যায় যে, সওয়া দশ কোটি টাকার উপর মূল্যের গালা ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়াছে। বৈদেশিক শিল্পীগণ সেইসকল গালা হইতে খেল্না চুড়ি প্রভৃতি বিবিধ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আবার ভারতে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিবে। ক্রমে দেশের লোক যত শিল্পশিক্ষায় মনোযোগ দিবে, ভারতবাসী তত লাভবান্ হইতে পারিবে।

বাঁকুড়া জেলায় কয়েকটি গালার কুঠি আছে। যদিও এখানে অনেক কাচামাল প্রস্তুত হয় কিন্তু গালা হইতে বিবিধ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবসা নাই। বাঁকুড়া ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি জেলায় কুসুম, পলাশ ও কুল প্রভৃতি বৃক্ষে লাক্ষা উৎপন্ন করা হয়। লাক্ষা একটি লাভজনক পণ্যদ্রব্য; এই অন্নসমস্যার দিনে এই ব্যবসার দ্বারা যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। এ জেলায় সর্ব্বত্রই বহু পতিত জমি দেখিতে পাওয়া যায় ; সেইসকল স্থানে অতি অল্পব্যয়ে কুসুম, পলাশ ও কুল গাছ লাগান যাইতে পারে। অতি অল্প চেষ্টাতেই ঐসকল পতিত ভূমিতে এইসকল বৃক্ষ লাগাইয়া "লা" উৎপন্ন করিতে পারা যায়।

অনেক স্থানে অড়হর বৃক্ষ হইতেও লা উৎপন্ন করা হয়। অড়হর বৃক্ষগুলি একহাত কি দেড়হাত উচ্চ হইলেই তাহাতে লা এর বীজ লাগাইয়া দিতে হয়। অড়হর গাছ লাগাইবার সময় হইয়াছে ;

জেলার অনেক স্থানে অড়হর গাছ লাগান হইয়াছে এবং কোন কোন স্থানে বীজ ছড়ান হইতেছে। অড়হর চাষও ব্যয়সাধ্য নয়। এই সময়ে কৃষককুলের সুযোগ ছাড়া উচিত নয় বলিয়া আমরা এই কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। প্রতিবৎসরই অড়হর গাছ লাগাইয়া প্রতিবৎসরই লা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। অন্যান্য বৃক্ষ লাগাইয়া তাহাতে লা উৎপন্ন করিতে অনেক সময় লাগে।

—বাঁকুড়া-দর্পণ

রেশমের চাষ

গাভা হইতে বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—রেশম-পোকা পালন ভদ্রলোকের করার উপযুক্ত কাজ। উহা প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরেই পালন করা যায়। আমি বহুবার পালন করিয়া দেখিয়াছি বেশ গুটি হয়; তাহাদ্বারা ১০৲ সের সুতা প্রস্তুত হইতে পারে। আমি ১৯০৭ সালে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রেশমের চাষ ও পোকাপালন বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে ভাওয়ালের রাজবাগানে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলাম। উহার মাসিক খরচ ৮৫৲ টাকা মাত্র লাগিত। উহাতে ৩০ জন গ্রামের লোক শিক্ষা করিত। যদি ঐরূপ একটি বিদ্যালয় গ্রামে হয় তবে দু বৎসরের মধ্যে ১০০ ছাত্র রেশমের চাষ শিখিয়া ঘরে বসিয়া মাসিক ২০৲ টাকা রোজগার করিতে পারে। ঐরূপ স্কুল করিতে এককালীন ব্যয় তিন হাজার টাকা মাত্র। এই জুলাই মাসেই একটি বিদ্যালয় খুলিতে পারা যায়; ৯ বৎসরে আসল টাকা ফিরাইয়া দেওয়া যায়। যাঁহারা ২০০৲ দিবেন তাঁহাদের একটি ছাত্র বিনা বেতনে ২বৎসর কাজ শিখিবে। ঐরূপ ১৫জন মাত্র হৃদয়বান্ লোক অগ্রসর হউন, দেখিবেন কত বিধবার অন্নবস্ত্রের সমস্যা পূরণ হয়। মেয়েরা ২।৩ বৎসরে এই কাজ ভালরূপ শিখিতে পারিবেন। আশা করি লোকে উৎসাহী হইয়া এই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠাকল্পে চেষ্টা করিবেন।

—বরিশাল-হিতৈষী

শিমুলের ব্যবসায়

বাংলাদেশের সর্ব্বত্রই শিমুল তুলার ব্যবহার হয়; কিন্তু ইহার ব্যবসায় কিরূপ লাভজনক তাহা অনেকেই অবগত নহেন।

শিমুল গাছ যেখানে সেখানে পতিত অনুর্ব্বর জমিতে বিনা চেষ্টায় জন্মে। কাঁটা থাকায় গরু ছাগলে গাছ নষ্ট করিতে পারে না।

শিমুল দুই রকমের দেখিতে পাওয়া যায়—লাল ও শাদা। জাভার শিমুল ভারতীয় শিমুল হইতে অধিক শাদা হইলেও ভারতীয় শিমুলের গুণ বেশী। কিন্তু এখানকার ব্যবসায়ীগণের অসাধুতার জন্য বিদেশীয়েরা ভারতীয় শিমুল বেশী দামে কিনিতে চাহে না।

শিমুলের অনেক গুণ। গাছের ছাল হইতে একপ্রকার আঠা পাওয়া যায়, তাহা ঔষধে ও কাঠ ও চামড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। শিমুলের বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়, তাহা কার্পাস তৈল অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে এ তৈল ব্যবহৃত হয়। ইহার খোল কার্পাস খোল অপেক্ষা বেশী পুষ্টিকর এবং গরু ইত্যাদিকে খাওয়াইতে পারা যায়।

শিমুল তুলা যে কেবল বালিশ তোষকেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে; ইহা হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া কাপড় তৈয়ার হইতেছে। পশম ও রেশমে মিশাল দিবার জন্যও ইহার ব্যবহার আছে। ত্রিপুরাতে এই তুলা হইতে তোয়ালে গলাবন্ধ ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। জাপানে ইহার দ্বারা একরূপ ফেল্ট্ প্রস্তুত হইতেছে। রবার এবং asbestos-এর সহিত boiler packing ও ইলেক্‌ট্রিক তারের খোলাও তৈয়ার হয়। খোলা হইতে হাল্কা, নরম ও সস্তা বলিয়া ইহার দ্বারা লাইফ্‌ বেল্ট ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহা সহজে জলে ভিজে না, ইহার উপর জল গড়াইয়া যায়। ইহা সহজে পোকার দ্বারা নষ্ট হয় না এবং বাষ্পে দুই তিন বার sterilize করিলেও নষ্ট হয় না। রোগীর বিছানার পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যবহার্য্য। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক হাঁসপাতালে বিছানায় শিমুল তুলা দেখিতে পাওয়া যায়।

সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম জেলায়, মোকামা, দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুর গোরক্ষপুর ইত্যাদি স্থান হইতে এই তুলার আমদানী হয়। চারি আনা আট আনায় খুচরা গাছ বন্দোবস্ত পাওয়া যায়। ২০০।৩০০৲ টাকা খরচ করিলে ছোট জঙ্গল ঠিকা পাওয়া যায়। প্রত্যেক গাছে দশ হইতে কুড়ি সের পর্য্যন্ত বীজ সমেত তুলা পাওয়া যায়। বাজারে ৬৲ টাকা হইতে ৯৲ টাকা পর্য্যন্ত, মোকামে ৯৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত এবং কলিকাতায় ১৮।২০ টাকা দরে মণ বিক্রয় হইয়া থাকে।

চালানী কারবার করিতে গেলে তুলা পরিষ্কার করিবার ও বীচি ছাড়াইবার জন্য শালিখার কলে পাঠাইতে হয়। সওয়া দুইমণ তুলায় ১ মণ পরিষ্কার তুলা, ১ মণ বীজ ও দশ সের ময়লা থাকে। সাফাই কার্য্যের জন্য প্রতি সওয়া দুই মণ তুলায় ৫৲ টাকা খরচ পড়ে। গাঁট বাঁধিতে দুই মণে ২৲ টাকা খরচ। এখনকার গাটের দর ৫৫৲ টাকা মণ। বিলাতে পাঠাইবার জন্য জাহাজ মাশুল, দালালী বীমা, এজেন্টের কমিশন ইত্যাদিতে মোট ৫৲ টাকা আন্দাজ পড়ে। বিলাতের দর এখন প্রতি পাউণ্ড ১১ পেনি হইতে ১ শিলিং। কলিকাতার শিমুল তুলার দালালের, খরিদ্দারের ও কলওয়ালার Jute press-এর নাম ঠিকানা, সম্পাদক, সোনার বাংলা, ৩১ মুসলমানপাড়া লেন কলিকাতা এই ঠিকানায় রিপ্লাই কার্ড অথবা ডাক টিকিট পাঠাইলেই জানান হইবে।

যদি শিমুলের চাষ করা যায় তবে আরও অধিক লাভ হইবে। গাছ পুঁতিবার ৩ বৎসরের মধ্যেই ফল ধরে। গাছের পরমায়ু ৪০ বৎসরের কম নয়। ১ বিঘা জমিতে ৪০টি গাছ অতিসুন্দররূপে পুঁতিতে পারা যায়। ফসলের প্রথম বৎসর গাছপ্রতি দুই সের তুলা, আধসের তেল ও দেড় সের খোল পাওয়া যায়। শিমুল বীচি ২॥০ টাকা মণ বিক্রয় হয়।

গাছ হইতে তুলা পাড়িবার পর যত শীঘ্র সম্ভব তাহা শুকাইয়া পাতা আলাদা ও বীজ ছাড়াইয়া লওয়া উচিত; কেননা দেরী করিলে তুলায় একরকম গন্ধ হয় এবং দর সেজন্য কম হইয়া যায়।

(সোনার বাংলা হইতে সঙ্কলিত)—সত্যবাদী

ত্রিপুরা রাজ্যের বন হইতে কাঠের ব্যবসায় আজকাল জালানী কাঠের চালান খুব বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু উহা অশিক্ষিত লোকের হাতে পড়ায় সেরূপ উন্নত প্রণালীতেও হইতেছে না এবং বিশেষ লাভজনকও হইতেছে না। এই ব্যবসায়ে বিশেষ কষ্ট করিতে হয় না। কারণ এখানকার কোন সহরে থাকিয়া পাহাড়িয়া প্রজাদের কিছু কিছু অগ্রিম মূল্য দিয়া চুক্তি করিলে তাহারা নির্দ্ধারিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কাঠগুলি পৌঁছাইয়া দেয়। এবং তথা হইতে কলিকাতা, ঢাকা ইত্যাদি স্থানে চালান করিয়া দিলে বেশ লাভ পাওয়া যায়। আজকাল ঐপ্রকার কাঠ জাহাজে চালান হইয়া বহু দূর দেশেও যাইতেছে। এখানে সহরে যে-পরিমাণ কাঠ ১॥০ কিম্বা ২৲ টাকায় পাওয়া যায় তাহা কলিকাতায় ১০৲ টাকার নীচে কিছুতেই পাওয়া যায় না। এখান হইতে নৌকা ও রেলে মাল চালাইবার বেশ সুবিধা আছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রকার ভাল ভাল কাঠও খুব

সস্তায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এখানকার পাহাড়ে পাওয়া যায়। তবে ঐ সকল কাঠের কারবারে মূলধন কিছু বেশী আবশ্যক। এরাজ্যের বনকর বিভাগের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিলে এই সম্বন্ধে সকলপ্রকার সংবাদ পাওয়া যাইবে।

শ্রীমুক্তিদাকুমার বসু
আগরতলা (ত্রিপুরা রাজ্য)

শ্রমশিল্প বিদ্যালয়—

বিষ্ণুপুরের সুযোগ্য মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ঘোষ মহাশয়ের আন্তরিক যত্নে বিষ্ণুপুরে একটি শ্রমশিল্প বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। ছুতার, তেলী, করগা, লোহার, মাজী, সাঁওতাল, সদ্‌গোপ, মুসলমান প্রভৃতি শ্রমজীবী শ্রেণীর ছাত্রগণকে দৈনিক দুই তিন আনা করিয়া খোরাকও দেওয়া হইতেছে। তাহারা বাসস্থানও পাইতেছে। এক বৎসর শিক্ষার পর ছাত্রগণকে শিল্পকার্য্য চালাইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য এককালীন ১০০৲ টাকা মূলধন দেওয়া হইবে, অথবা মূলধনের পরিবর্ত্তে ১০০৲ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি খরিদ করিয়া দিবারও ব্যবস্থা আছে। যে-সকল ব্যক্তি শিল্প-কার্য্য শিক্ষা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে চায়, তাহাদের এই সুযোগ ত্যাগ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।—বাঁকুড়া-দর্পণ

সাহিত্যিকের সম্মান—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় সাহিত্যচর্চ্চার জন্য আসাম সরকার হইতে মাসিক ২৫৲ হারে একটি বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।—জনশক্তি

নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—

আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তার না হইলে দেশের কোনপ্রকার উন্নতির আশা করা যায় না। এজন্য মহিলাদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার বহুল আবশ্যক এবং সেই শিক্ষা আমাদের দেশোপযোগী হওয়া উচিত। যাহাতে এদেশের প্রত্যেক নারী শিক্ষালাভ করিয়া আদর্শ মাতা ও সুগৃহিণী হইতে পারেন সে-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। শিক্ষাবিস্তার করিতে হইলে প্রথমে সর্ব্ববিষয়ে সুনিপুণা শিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন, এবং সেই উদ্দেশ্যে এই "মহিলা-শিক্ষা-সদন" শিক্ষয়িত্রী বিভাগ প্রথম স্থাপন করিতেছি। ইহাতে সধবা বিধবা ও কুমারীকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। দুঃস্থ ভদ্রপরিবারের মহিলাদিগকেও আশ্রয় ও যথোচিত শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী শিক্ষাও প্রদত্ত হইবে। এই অর্থকরী শিক্ষার ফলে তাঁহারা আত্মীয়স্বজনের গলগ্রহ না হইয়া স্বাধীনভাবে ঘরে বসিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ভরণপোষণোপযোগী অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবেন।

এখানে নানারূপ কলের কাজ অর্থাৎ কুটীর-শিল্প-কার্য্যের জন্য যে-কোন কলের কাজ শিক্ষার আবশ্যক তাহা শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং তৎসহ হিন্দী, বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

উপস্থিত আমার বাটীতে কয়েকটি মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছি।

আমাদের এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি আবশ্যক। আশা করি সহৃদয় মহিলাশিক্ষাপ্রয়াসী ব্যক্তি মাত্রেই, সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আমাদের উৎসাহবর্দ্ধন করিবেন।

শ্রীকমলা দেবী
১৫৮।৩ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

বিধবা-বিবাহ—

মেদিনীপুরে একটি বিধবা-বিবাহ-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির উদ্যোগে গত ২৩শে জুলাই তারিখে একটি সদ্‌গোপজাতীয়া বালবিধবার হিন্দুমতে বিবাহ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় প্রায় ২০০ ভদ্রলোক বিবাহ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিবাহান্তে সকলে আহারাদি করিয়াছেন। কন্যার পিতা মেদিনীপুরের মোক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন মাশুল। কন্যার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সত্যেশ্বর মাশুল বি-এ, বি-টি ; বরের নাম শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মল্লিক।—স্বরাজ

বিধবা-বিবাহ - ত্রিপুরা ফুলতলী গ্রামে ২১শে তারিখে চারিটি বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহ শুধু এক শ্রেণীতে আবদ্ধ নয়, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতেই এই কয়টি বিবাহ হইয়াছে। আশা করা যায় ইহাদের দৃষ্টান্তে অনেকেরই এ বিষয়ের সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইবে।—ত্রিপুরা-হিতৈষী

নারী-নিগ্রহ—

প্রতিদিনই নারীর উপর অমানুষিক অত্যাচারের সংবাদ আসিতেছে। আমরা নিম্নে সামান্য কয়টি উদাহরণ দিতেছি :—

(১) বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পাত্রসায়ার গ্রামে একটি বিধবা স্বামীর আত্মীয়গণের দুর্ব্যবহারে অস্থির হইয়া এক বৃক্ষশাখায় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

(২) নোয়াখালিতে এক মামলা হইতেছে, তাহাতে অভিযোগ যে, জনৈক রাসবিহারী দাসের পত্নীকে তাহার শ্বশুর ও স্বামী ও ভাগিনেয় হত্যা করিয়া গাছে লট্‌কাইয়া রাখিয়াছিল।

(৩) হাওড়া পুলিশ আদালতে সুশীলা দাসী ও লক্ষ্মী দাসী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিবার চেষ্টায় অভিযুক্ত হয়। প্রকাশ—তাহারা আদালতে বলিয়াছে যে, তাহাদিগের স্বামীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাহারা এইরূপ করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত নারীর অমর্য্যাদা ও সতীত্বনাশের অভিযোগ আমরা প্রতিদিনই শুনিতেছি। এইসব লাঞ্ছনার কি প্রতিকার নাই ?

সমাজের নির্ম্মমতা—

সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর কলেজে পড়্‌ত। তার বয়স ছিল একুশ বছর। সত্যকিঙ্কর আফিম খেয়ে আত্ম-হত্যা করেচে। মৃত্যুর পর তার বাক্সের মধ্যে একখানা চিঠি পাওয়া যায়, সে-চিঠিতে লেখা ছিল :—

"গুণবতী ভগ্নীকে ৬৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করায় এই জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে সুতরাং আত্মহত্যা করাই সমীচীন বলিয়া মনে করি।"

সত্যকিঙ্কর যে ব্যথা সইতে না পেরে শান্তির সন্ধানে গিয়েচে, বাঙালীর সমাজ প্রতিদিনই বাঙালীর বুকে সেই নির্ম্মম বেদনার শেল বিঁধিয়ে দিচ্ছে। অথচ নিজের গড়া এই সমাজের নিষ্ঠুরতা বাঙালী সয়েই চলেচে! নিতান্ত যাদের পক্ষে অসহ্য হচ্চে, সেই স্নেহলতা আর সত্যকিঙ্করের দল—বাংলার তরুণ আর তরুণীরা—প্রতিকারের কোন চেষ্টা না ক'রে আত্মঘাতী হচ্চে। এর চেয়ে ব্যথার কথা আর কিছুই হ'তে পারে না।

এদেশের ছেলেরা আর মেয়েরা আজ একেবারে শক্তিহীন হ'য়ে প'ড়েচে ব'লেই না সমাজের চাপে এমনি ক'রে তাদের মরতে হচ্চে। সত্যকিঙ্করের শক্তি ছিল না তার ভগ্নীও শক্তি-হীনা, তাই সমাজ তাদের বলি দিয়েচে। তাদের শক্তি যদি থাকত, তা হ'লে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে ওই সমাজকেই তারা ভাঙ্‌তে পারত।

বাংলার তরুণ আর তরুণীরা যদি আজ এই বিদ্রোহের শক্তি অর্জ্জন করতে না পারে, তা হ'লে অনেক সত্যকিঙ্কর প্রাণ দেবে, অনেক সত্যকিঙ্করের বোন বৃদ্ধের লালসার আগুনে পুড়ে মরবে।

তাই বাংলার ভাই-বোনদের আমরা বলি, অত্যাচার উৎপীড়নের সামনে মাথা নতকোরো না, তাকে বাধা দাও।—বিজলী

উৎকট ছুঁৎমার্গ—

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ, কলেজের ছাত্রাবাসের পুষ্করিণীতে নমঃশূদ্র ছাত্রগণের স্নান করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র ঘাট তৈয়ারীর প্রস্তাব করিয়া কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের মঞ্জুরী প্রার্থনা করেন;—কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই ব্যাপারে কলেজের 'তথাকথিত ভদ্র' ছাত্রবৃন্দের যে লজ্জাকর মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহার জন্য নমঃশূদ্র সমাজের মুখপত্র 'সাধক' দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালী-সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়েরা ঝুটা আভিজাত্যের অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া আভিজাত্যের মার্কাহীন জাতিদিগের প্রতি একান্ত নির্লজ্জ অযৌক্তিক অপমানসূচক ব্যবহার করিয়া থাকেন;—অতীব দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয়, ইহা এখনো পল্লী-জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। হাজার বৎসরের জমাট কুসংস্কারের উপর, জাতির জরাগ্রস্ত অভ্যস্ত চিন্তার উপর স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দীর প্রথম প্রত্যূষে এক অতি নির্ম্মম আঘাত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার তীব্র কশাঘাতে ব্যষ্টি-চৈতন্য জাগ্রত হইলেও, সমষ্টি-চৈতন্য পূর্ব্ববৎ অসাড়। এম্নি করিয়া ব্যভিচার, কদাচার, হীনাচারে,—সমাজ ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। সমাজ-দেহের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য মহাত্মা গান্ধিও 'ছুঁৎমার্গ' ব্যাধির প্রতীকারের পরামর্শ দিয়াছেন।—আনন্দবাজার পত্রিকা

—সেবক

বিদেশ

তুরস্ক সন্ধি—

লোজান বৈঠকে ইস্মৎ পাশার সহিত চালবাজীতে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া লর্ড কার্জ্জন লোজান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াতে সন্ধি-সর্ত্তের আলোচনা থামিয়া যায় এবং পশ্চিমে সাজ সাজ রব উঠে। কিন্তু রণক্লান্ত ইউরোপ সহজে আবার যুদ্ধে মাতিয়া উঠিতে রাজী হইবে না ইহা বুঝিয়া অ্যাঙ্গোরা-সরকার খুব দৃঢ়তার সহিত আপনার দাবী জানাইয়া ইংরেজের অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়। তুরস্কের দৃঢ়তা দেখিয়া ইংরেজ স্তম্ভিত হইয়া যুদ্ধের কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া আবার সন্ধি-সর্ত্তের আলোচনা আরম্ভ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর পুনরায় লোজান সহরে বৈঠক বসিবার আয়োজন হইল। ফলে বিগত ২৪শে জুলাই তুরস্কের সহিত মিত্রশক্তিবর্গের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ৩১শে জানুয়ারিতে ইংরেজের যে সন্ধি-সর্ত্ত তুরস্ক প্রত্যাখ্যান করেন তাহার সহিত এই সন্ধি-সূত্রে যে-সব স্থানে প্রভেদ আছে তাহা মোটামুটি এইরূপ—

(১) যুদ্ধের পূর্ব্বে তুরস্ক-সরকারের যে ঋণ ছিল তাহার অংশ তুরস্ক হইতে বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলিকেও গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) তুরস্কে বিদেশীয় (ইউরোপীয় শক্তিবর্গের) ডাকঘরগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

(৩) তুরস্কে যে স্থানে ইংরেজের ঔপনিবেশিক সৈন্য দলের নিহত সৈন্যের কবর আছে সেই অ্যান্‌জ্যাক (Anzac) মহলে ইংরেজগণ শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য যাতায়াতের অধিকার পাইবেন এবং যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে তুরস্ক-সরকার প্রস্তুত থাকিবেন।

(৪) মিত্রশক্তিবর্গ তুরস্ক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া না আসা পর্য্যন্ত মুদিয়ানা চুক্তি-পত্র বাহাল থাকিবে।

(৫) দার্দ্দেনালিস্-প্রণালী সম্বন্ধে যে চুক্তি-পত্র পূর্ব্বেই স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহা বাহাল হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিত্রশক্তিবর্গের প্রত্যেকের একখানি ক্রুজার ও দুইখানি করিয়া টর্পেডোবোট প্রণালীতে রাখিবার অধিকার থাকিবে।

এইরূপ আরও কয়েকটি ছোট ছোট বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সন্ধিপত্রে হইয়া যাওয়াতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

যেরূপ দেখা যাইতেছে রাজনৈতিক চালবাজিতে অ্যাঙ্গোরা-সরকারই জয়লাভ করিয়াছেন।

ইংরেজ জেনারেল হ্যারিংটন তুরস্ক ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার সময় তুরস্কের প্রধান সেনাপতির নিকট বিদায় লইবার কালে বলিয়াছেন—"তুরস্কভূমিতে গ্রেট্‌ব্রিটেন ও উপনিবেশের বহু বীরের শেষ শয্যা রচিত হইয়াছে। তাঁহাদের দেহ আমরা আপনাদের নিকট রাখিয়া যাইতেছি এই ভরসায় যে আপনারা আপনাদের চিরাচরিত প্রকৃতি অনুসারে তাহার সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন এবং মৃতের স্মৃতিরক্ষা করিবার যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।"

লোজানে মূল-সন্ধিপত্র ব্যতীত আরও আঠারোখানি চুক্তিপত্র সহি হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রণালীসংক্রান্ত চুক্তি, ব্যবসায়-সংক্রান্ত চুক্তি, বিদেশীয়ের বিচার সম্বন্ধে চুক্তি, ও প্লেগ সম্বন্ধে চুক্তিই প্রধান। এই-সব চুক্তিপত্রে তুরস্কের দাবীকেই মূলতঃ মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এক যুগোস্লাভিয়া ব্যতীত মিত্রশক্তিবর্গের সকলেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। যুগোস্লাভিয়া দরবার বলেন যে তুরস্কের যে প্রদেশগুলি যুগোস্লাভিয়া লাভ করিয়াছেন তাহার উপর তুরস্কের যুদ্ধের পূর্ব্বের ঋণের অংশ এত অধিক ধরা হইয়াছে যে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যুগোস্লাভিয়ার পক্ষে সম্ভব নহে। এই বিষয়টি এতই গুরুতর যে ইহার সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্তে আসিবার জন্য আরও তিনমাসকাল সময় যুগোস্লাভিয়া চাহিয়া লইয়াছেন।

যুদ্ধাবসানে ইউরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলি হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্য সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাই ভার্সাই হইতে এপর্য্যন্ত যে-সব সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহাতে যুক্তরাজ্য যোগ দেন নাই এবং সেই-সব সন্ধিসূত্রের মীমাংসাগুলিকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলিয়া যুক্তরাজ্য স্বীকার করিয়া লন নাই। তাই যুক্তরাজ্যের সহিত আর-একটি ভিন্ন সন্ধি তুরস্কের হইয়া গিয়াছে এবং চেষ্টর্ চুক্তিপত্র অনুসারে আমেরিকা হইতে চাষবাসের উপযোগী যন্ত্রপাতি বহুল পরিমাণে অ্যাঙ্গোরায় রপ্তানি হইয়াছে। এই-সব যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য একটি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টর্ সাহেব চেষ্টা করিতেছেন। খনিজ সম্পত্তিগুলি যাহাতে অ্যাঙ্গোরার সম্পদবৃদ্ধির সহায়তা করে তাহার জন্যও উপযুক্ত আয়োজন হইতেছে।

কামালপাশা বীরত্বের পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; চতুর রাষ্ট্রনীতিকের ন্যায় তিনি এখন অ্যাঙ্গোরা-সরকারের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের জন্য যত্নবান্। তাঁহার ন্যায় প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে যে অ্যাঙ্গোরা-সরকার অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হার্ডিঙ্গের তিরোভাব—

যুদ্ধের সময় যখন লোভ ও হিংসা মাথা তুলিয়াছিল তখন

কয়েকজন শক্তিধর পুরুষ আদর্শের ইন্দ্রজাল রচনা করিবার অথবা আশু জয়লাভের প্রলোভনে দেশবাসীগণকে প্রলুব্ধ করিবার বাঙ নৈপুণ্য থাকাতে মিত্রশক্তিবর্গের ভাগ্যানিয়ন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ক্ষমতা-প্রিয় ও উন্মাদনালোলুপ এই-সকল রাষ্ট্রীয় নেতার হস্তে প্রলুব্ধ দেশবাসী স্বেচ্ছায় সমস্ত শাসনের ভার অর্পণ করিয়াছিল। স্বেচ্ছাচারী দেশনায়কের ক্ষমতার খেয়াল রোধ করে এমন কেহই ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে যখন শক্তির মোহ কাটিয়া গেল, জয়লাভ করিয়াও যখন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ ঘটিয়া উঠিল না, তখন দেশময় একটা প্রতিক্রিয়া পড়িয়া গেল। এই প্রতিক্রিয়ার গতি রোধ করিতে না পারিয়া প্রায় সকল দেশের রাষ্ট্রীয় নেতার পতন হইয়াছে; হয় নাই কেবল ফ্রান্সে। কারণ ফ্রান্সের লোকের জার্ম্মানীর প্রতি যে হিংসা জাগিয়াছিল তাহা আজও নিবৃত্তি লাভ করে নাই; আজও জিঘাংসু ফ্রান্স জার্ম্মানীকে পদদলিত করিবার প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছে। শক্তিমত্ত ফ্রান্সে তাই আজিও প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় নাই।

যুদ্ধাবসানে কিন্তু মার্কিন ও ইংরেজ দেখিতে পাইলেন তাঁহাদের ভাগ্যনিয়ন্তারূপে যাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল তাঁহাদের বাসনা জাতিকে শক্তির যে-পথে লইয়া গিয়াছে সে-পথে চলিবার সামর্থ্য জাতির নাই এবং সেই-পথে চলিবার প্রয়াসে যে-শক্তির অপচয় ঘটিয়াছে তাহা হইতে বাঁচিতে হইলে ধীর স্থির রাষ্ট্রনায়কের হস্তে দেশ-শাসনের ভার অর্পণ করা উচিত। শক্তিধর পুরুষের ব্যক্তিগত খামখেয়ালি অনুসারে চলার চেয়েও দক্ষ দলপতির দলীয়মতে চলা জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক বোধ হওয়াতে ইংরেজ জাতি রক্ষণশীল দলপতি বোনার্‌ল'র হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। লয়েড জর্জ্জের পতন হইল। মার্কিন জাতিও উড্রো উইল্‌সনের ছেঁদো কথায় বিশ্বাস হারাইয়া সাধারণতন্ত্রী নেতা হার্ডিংএর হস্তে আপনাদের ভাগ্য সঁপিয়া দিলেন। মার্কিনজাতি মনরোনীতির পোষকতাই চিরকাল করিয়া আসিয়াছেন। ইউরোপের রাষ্ট্রধারার ঘূর্ণাবর্ত্তে পাক খাইতে মার্কিনের অভিরুচি কোনও দিনই ছিল না। উড্রো উইল্‌সনের বাগ্‌বিভূতিতে ভুলিয়া বিশ্বশান্তি স্থাপন করিবার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া মার্কিন ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির আবর্ত্তে পতিত হয়। কিন্তু ভার্সাই সন্ধিসূত্রে যখন উইল্‌সনের চৌদ্দদফার দফারফা হইয়া গেল তখন মার্কিনের সে মোহ ভাঙ্গিয়া যায়। উড্রো উইল্‌সন যে আদর্শের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কতদূর অলীক তাহা বুঝিতে পারিয়া মার্কিনজাতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রধারা হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য যে প্রয়াস করেন সেই প্রয়াসের ফলে হার্ডিং যুক্তরাজ্যের সভাপতি নিযুক্ত হন।

শান্তির ছায়াতে ইংলণ্ডের গার্হস্থ্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য ফিরাইয়া দিবার প্রয়াস বোনার্‌ল'র লক্ষ্য হইল। হার্ডিং মার্কিনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে চাহিলেন। বোনার্‌ল'র বাণী হইল শান্তি (Tranquillity), হার্ডিংএর বাণী স্বাভাবিকতা (Normalcy)। এই দুইজন ভাগ্যধর পুরুষ জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়াই ব্যয়সঙ্কোচে মনোনিবেশ করিলেন। মার্কিনজাতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে মুক্তি চাহে বুঝিতে পারিয়া হার্ডিং জাতিসমূহের সংঘে যোগ দিলেন না; কিন্তু আন্তর্জাতিক কলহসমূহের সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক বিচারমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। যুদ্ধব্যয় হ্রাসের জন্য ওয়াশিংটন-বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়া হার্ডিং ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। মার্কিনের নিকট ইংরেজের যে ঋণ ছিল তাহার সুদের হার ইংরেজ খুব বেশী মনে করিলেও দায়ে পড়িয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধাবসানে ইহা লইয়া ইংরেজে মার্কিনে মন-কষাকষি চলিতে থাকে। হার্ডিং ইংরেজপ্রীতি অক্ষুন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে ঋণের হার শতকরা চারি টাকা হইতে ৩॥০ টাকায় কমাইয়াছেন এবং ঋণশোধের সময় পঁচিশ বৎসরের কড়ারের পরিবর্ত্তে ৬২ বৎসর পর্য্যন্ত সময় বাড়াইয়াছেন। কিন্তু মার্কিনে মদ্য আমদানি রহিত করিবার জন্য যে-সব চেষ্টা মার্কিন-সরকার করেন তাহাতে মার্কিনের সহিত ইংলণ্ডের সদ্ভাব টুটিয়া যায়। হার্ডিং কানাডার সহিত মিলনের বন্ধন আরও দৃঢ় করিবার জন্য সম্প্রতি কানাডা গমন করিয়াছিলেন। কানাডা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। অল্প কয়েকদিনের অসুখের পর বিগত ৩রা আগষ্ট সন্ন্যাস-রোগে হার্ডিংএর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে মিত্রশক্তিবর্গের অধিবাসীরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন। হার্ডিং কোমল ধীর এবং শান্ত স্বভাবের জন্য অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সহকারী সভাপতি কাল্‌ভিন কুলিজ যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রীয় প্রথা-অনুসারে নবনির্ব্বাচন পর্য্যন্ত সভাপতি হইলেন। ইঁহার কার্য্যকাল ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত। তাহার পর নির্ব্বাচনে যিনি জয়লাভ করিবেন তিনি যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি হইবেন।

কুলিজ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ভারমণ্ট প্রদেশে একটি গ্রাম্য কৃষিক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেন এবং ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশের নর্থাম্পটন সহরে ওকালতী ব্যবসায়ে রত হইয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন। এই প্রদেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিয়া ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি লাভ করিতে করিতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হন। বিগত নির্ব্বাচনে ইনি যুক্তরাজ্যের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

সিঙ্গাপুরে নৌবহরের নূতন আস্তানা

ঋণভার-প্রপীড়িত ইউরোপের যুদ্ধোদ্যমের ভার বহন করা অসম্ভব হইয়া পড়া সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার ও লৌহ, তৈল এবং খনিজ সম্পত্তির মালিকানা লইয়া রেষা-রেষি থাকাতে যুদ্ধোদ্যম স্থগিত রাখা সম্ভবপর হইতেছিল না। অথচ মন্ত্রীবর্গ খসড়াহিসাবে আয়-ব্যয়ের সাম্য-সাধনের বৃথা চেষ্টা করিয়া কূল পাইতেছিলেন না। প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে গেলে যে অসম্ভব ব্যয় বাড়িয়া উঠে তাহা জোগান দিতে হইলে করভার এমনই বাড়িয়া উঠে যে করভারপ্রপীড়িত দেশ তাহা সহ্য করিতে পারে না। ব্যয়-সঙ্কোচের চেষ্টায় গঠনমূলক কার্য্যও অনেক দেশে স্থগিত রাখিতে হইয়াছে; ফলে জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভাগ অর্থাভাবে যথোচিত কার্য্য করিতে পারিতেছে না। এই সমস্যার প্রতিবিধানের জন্য ওয়াশিংটন সহরে নিরস্ত্রীকরণ-দরবারের বৈঠক বসে। অনেক তর্কবিতর্কের পর বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে শক্তিবর্গ আপন আপন যুদ্ধোদ্যমের বিপুল আয়োজন অনেকটা হ্রাস করিতে স্বীকৃত হন এবং প্রত্যেকেই বৈঠকের নির্দ্দেশ অনুসারে নৌবহরের কতকগুলি জাহাজের যুদ্ধসজ্জা মোচন করেন। বাহিরের চাপে এই যে ব্যয়সঙ্কোচ তাহা স্থায়ী হইতে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্তরেরও পরিবর্ত্তন যদি না ঘটে। যুদ্ধের অবসানে কিন্তু শক্তিবর্গের সাম্রাজ্য-লিপ্সা ও শক্তির পিপাসা কিছুমাত্র কমে নাই। রোগের উপশম না হইলে নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হইতে বেশী সময় যায় না।

প্রশান্ত মহাসাগরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় ইংরেজ, জাপান ও মার্কিনের বিরোধ বহুদিনের। যুদ্ধাবসানে এই বিরোধ আরও তীক্ষ্ণ হইয়াছে। যুদ্ধে জাপানের কোনও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। মার্কিনের ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক, বহুল-পরিমাণে শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

ব্যয়বাহুল্যে ইংরেজের কিন্তু দুর্গতি হইয়াছে অসীম। তাই ইংরেজ উপনিবেশগুলিকে রক্ষা করিবার একটা বিধি ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়াতে

জাপান যেরূপ দ্রুতগতিতে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছে তাহাতে যে অদূর ভবিষ্যতে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধিয়া উঠা খুবই সম্ভবপর ইহা বুঝিতে পারিয়া আপনার শক্তি সংহত করিবার জন্য ইংরেজ প্রশান্ত মহাসাগরের সন্নিকটে একটি নৌশক্তির কেন্দ্র খুঁজিতেছিলেন। মলয় উপদ্বীপের সিঙ্গাপুর বন্দরকে এইরূপ কেন্দ্রে পরিণত করিতে পারিলেই ইংরেজের নৌশক্তি প্রবল হইয়া উঠে। তাই সিঙ্গাপুরকে নৌবহরের আস্তানা করিবার জন্য ইংরেজ-সরকার একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। এই আস্তানাটি নির্মাণের আনুমানিক ব্যয় ১৫ কোটি টাকা। এতদ্‌ব্যতীত ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাৎসরিক ব্যয়ও বড় কম হইবে না। এই ব্যয়বহন করিতে হইলে ইংলণ্ডের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার সঙ্কোচ ঘটাইতে হইবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্য-বিভাগের ব্যয় ইতিপূর্ব্বেই গেডিস-ব্যয়-সঙ্কোচ-কমিটির নির্দ্ধারণ-অনুসারে বহুলপরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে; আরও কমাইলে ইংরেজের জাতীয় দক্ষতা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য কমন্স সভার শ্রমিক দলপতি র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ বলিতেছেন—"জাতি-সেবা-বিভাগগুলির যে দুরবস্থা তাহাতে তাহার ব্যয়সঙ্কোচ ঘটিলে জাতির মৃত্যু অনিবার্য্য; সেইজন্য যুদ্ধোদ্যমের প্রতিযোগিতা নিবারণের উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; এজন্য একটি সার্ব্বজাতিক বৈঠক ডাকা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। জাতিসমূহের সংঘের দ্বারা প্রতিবিধান সম্ভবপর নহে; কেননা মার্কিন সে সভার সভ্য নহেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে মার্কিন রাজী নহেন। জানি না কাহার দোষে উড়োজাহাজের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। কিন্তু সিঙ্গাপুর-আস্তানা গড়িয়া যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইতেছে তাহার জন্য ইংরেজই দায়ী। বর্ত্তমানে সিঙ্গাপুরের সন্নিকটে কোনও শত্রু নাই, এবং সিঙ্গাপুর আক্রমণের কোনও সম্ভাবনা নাই। ইংরেজ-সরকার হয় ত বলিবেন যে কোনও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য তাঁহাদের নাই এবং তাঁহারা কাহাকেও ভয় দেখাইতেছেন না। কিন্তু জাপান সরকার কি সে কথায় বিশ্বাস করিবেন?"

উদারনৈতিক নেতা অ্যাসকুইথ সাহেব শ্রমিক নেতাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন যে "১৫ কোটি টাকা ব্যয় করিবার সামর্থ্য ইংরেজের নাই এবং ১৫ কোটি টাকার মধ্যে যে কার্য্যটি সুসম্পন্ন হইবে তাহার সম্ভাবনাও অল্প। সাম্রাজ্যসমূহের কন্‌ফারেন্সের বৈঠকে এই ব্যাপারটির মীমাংসা হওয়া উচিত; অতএব বৈঠক বসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার আলোচনা স্থগিত থাকুক।" তাহার পর প্রধানমন্ত্রী বল্ড্‌উইন সরকার-পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দেন। কার্য্যটি স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব মহাসভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই।

লর্ড্ মহাসভায় প্রস্তাবটির বিচারকালে কিন্তু এই ব্যবস্থার একটি কারণ পাওয়া গিয়াছে। লর্ড্ উইম্‌বোর্ন্ লর্ড-সভাতে সিঙ্গাপুর-আস্তানা গড়িবার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তদুত্তরে সরকার তরফে লর্ড্ লিন্‌লিথ্‌গো বলেন যে "বর্ত্তমান কালে পৃথিবীতে যে খনিজ তৈলের প্রতিযোগিতা চলিতেছে তাহাতে খনিজ সম্পত্তিগুলির রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইলে চলে না। ব্রহ্মের তৈলখনিগুলি ইংরেজের অমূল্য সম্পত্তি। উত্তর বোর্ণিওর সারাওয়াল প্রদেশে যে তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা আরও মূল্যবান্। সারাওলা খনির কথা এতদিন পর্য্যন্ত প্রকাশ করা হয় নাই এজন্য যে তাহা রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত সংবাদ প্রচারিত হইলে বিদেশীর সঙ্গে মালিকানা লইয়া বিরোধের সম্ভাবনা। সরকার-পক্ষ তৈল-খনির স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য নৌবহরের আস্তানা সিঙ্গাপুরে গড়িতে চাহেন। এবং এই কার্য্যে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের পূর্ণ সমর্থন সরকার-পক্ষ পাইবেন। নিউজিল্যাণ্ড্-সরকার কিছু অর্থ-সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন। মালয়রাজ্যসমূহ প্রয়োজনীয় জমি বিনামূল্যে দিতে প্রস্তুত আছেন। অন্যান্য উপনিবেশগুলিও সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না বলিয়া সরকারপক্ষের বিশ্বাস। লর্ড্ হল্‌ডেন, লর্ড্ গ্রে, লর্ড্ বার্কেন্‌হেড প্রভৃতি কিন্তু সরকার-পক্ষের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন যে "গৃহনির্ম্মাণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য যখন অর্থ সঙ্কুলান হইতেছে না, তখন এইরূপ ব্যয়বহুল একটি ব্যবস্থা ইংরেজ-সরকার ভবিষ্য ভয়ের আশঙ্কায় করিলে দেশবাসীর নিকট সরকার-পক্ষ কি জবাবদিহি করিবেন?"

তৈলের মালিকানার লোভে কিন্তু মহাসভা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ফলে জাপানের সহিত মনোমালিন্য হইবার সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহের জন্য শক্তিবর্গের এই যে উৎকণ্ঠা ইহার ফল যে বিষময় তাহা বুঝিয়াও ক্ষান্ত হইবার উপায় নাই। আত্মম্ভরিতার এমনই উন্মাদনা যে গঠনমূলক কার্য্য ও জাতীয় সুখ-সুবিধাকে খর্ব্ব করিয়াও বল সঞ্চয় করিতে হইবে। এই শক্তিপিপাসার নিবৃত্তি কোথায়? যুদ্ধের চির অবসানের জন্যই নাকি বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়াছিল! কিন্তু সে যুদ্ধের অবসানে যুদ্ধোদ্যম আরও প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। জয়লাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষা শক্তিবর্গকে কোন্ ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে কে জানে?

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

—

ভারতবর্ষ

ওড়িয়া মহিলার কৃতিত্ব—

কটকের কুমারী দেবী চেনাপা নাম্নী এক লেখিকা ইংরেজী ভাষায় ছোট গল্প লিখিয়া লণ্ডন হইতে সাত গিনি পুরস্কার পাইয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় বহু উপন্যাস লিখিয়া ইনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এইসকল উপন্যাস শীঘ্রই ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রকাশিত হইবে।

উদয়পুরে প্রজাবিদ্রোহ—

উদয়পুরের রাজসৈন্যের সহিত প্রজাদের একটা ছোটখাট যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রায় দুই হাজার প্রজা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। এসম্বন্ধে উদয়পুরের রাজসরকারের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহার চুম্বক এখানে প্রদান করা গেল।—

"জায়গীরদারদের সঙ্গে মনোমালিন্য-হেতু 'ধাকর' জাতির লোকেরা ট্যাক্স্ বন্ধের আন্দোলন করে। কিছুদিন পরে তাহারা মহাজনদের ঋণও অস্বীকার করে এবং নিজেরাই আদালত স্থাপন করিয়া মামলা-মোকদ্দমার বিচার সুরু করিয়া দেয়। তাহাদের দলে যে-সব লোক যোগদান করিতে অস্বীকার করে 'ধাকর'-সম্প্রদায় তাহাদের উপর উৎপীড়ন করিতেও কসুর করে না। ফলে বেগুন-রাজ্যের ব্যবসায়ীগণ বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন।

গত মে মাসে এই ব্যাপারের তদন্ত করিবার জন্য উদয়পুররাজ্য হইতে একটি কমিটি প্রেরিত হয়। কিন্তু 'ধাকরেরা' এই তদন্ত-কমিটি বয়কট করে। ইহার পর কমিটির কর্ত্তৃপক্ষ যাহারা খাজনা দেয় নাই এরূপ কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন।

গত ১৩ই জুলাই প্রাতঃকালে একদল সরকারী সৈন্য ধাকরদের একটি গ্রাম অবরোধ করে। বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ধাকরগণ লাঠি বন্দুক তরবারি ইত্যাদি লইয়া সৈন্যদলের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ চালায়। কিন্তু

চাণক্য।

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

U. RAY & SONS, CALCUTTA.
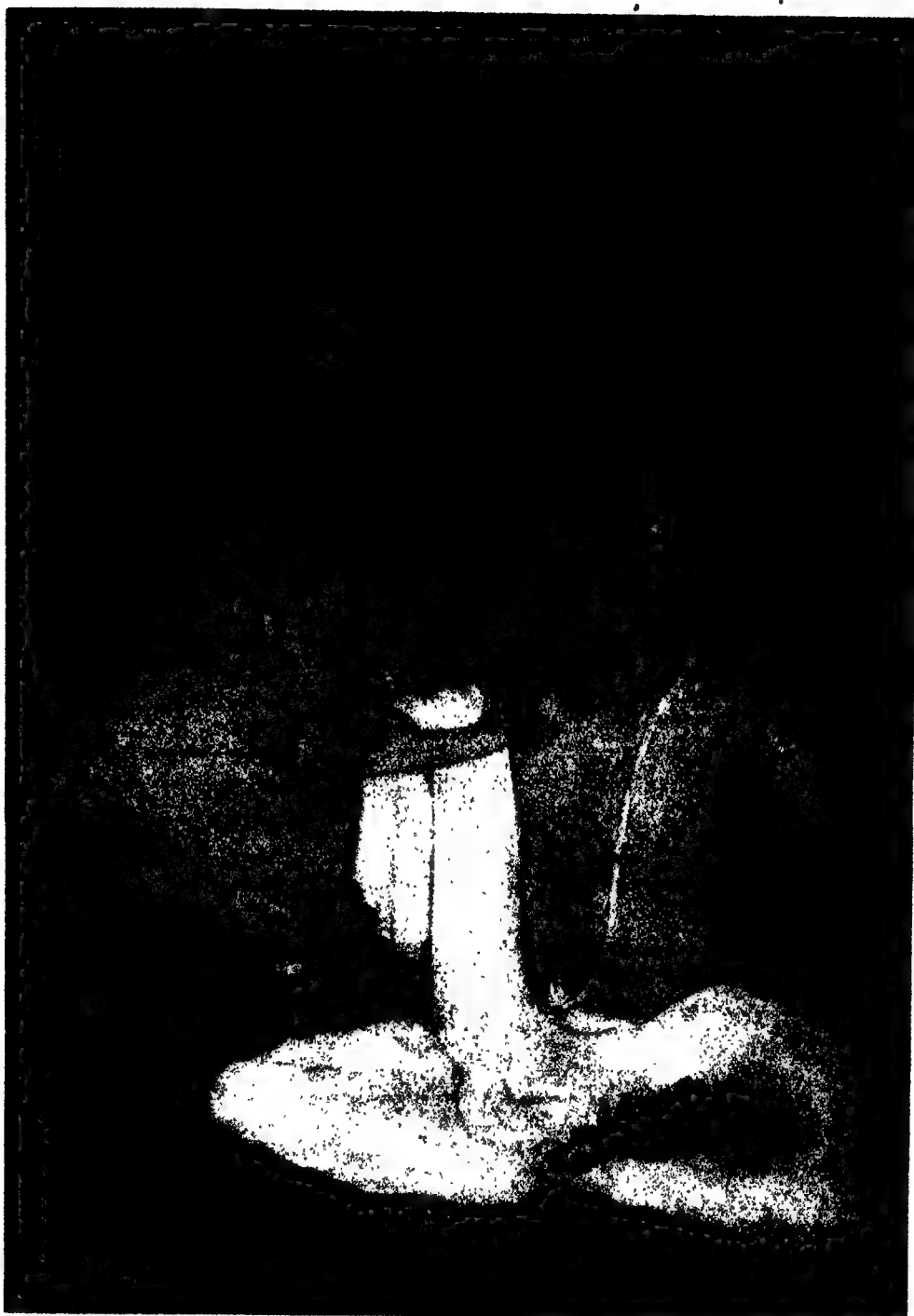
অবশেষে সৈন্যদলের হাতে বিদ্রোহীদের প্রায় পাঁচ শত বন্দী হইয়াছে। প্রায় ৪০টি গ্রামের লোক এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। পুলিশের গুলি চালানোতে ১ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও লাঠি-হস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তবে স্ত্রীলোকের ভিতর কেহ হতাহত হয় নাই। আহত ব্যক্তিগণ সরকারী চিকিৎসকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে।"

এই তো সরকারী ইস্তাহার। বলা বাহুল্য জন-সাধারণের অভিযোগের সহিত কোনোখানে ইহার এতটুকুও মিল নাই। জনসাধারণের অভিযোগের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া মেওয়ারের কৃষাণ-পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী রাজপুতানার বড়লাটের এজেন্টের কাছে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পত্রখানি সুদীর্ঘ, এখানে তাহার কতকগুলি অংশমাত্র তর্জমা করিয়া দেওয়া গেল।

"আমাদের প্রতি পুনঃ পুনঃ অত্যাচার হওয়ায় আমরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করি। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের কাছে ন্যায্য যাহা পাওনা তাহা দিতে আমরা কখনো অস্বীকার করি নাই। ন্যায্য পাওনা ছাড়া আমাদের উপর অতিরিক্ত দুইটি করভার চাপানো হয়।

"সমস্ত ব্যাপার তদন্তের জন্য একটি কমিশন বসানো হইয়াছিল। কমিশনের কর্তা নিযুক্ত হন ঠাকুর রাজসিং ও সেটেল্‌মেন্ট অফিসার মিঃ ট্রেঞ্চ। কমিশন কৃষাণ প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করেন। কিন্তু প্রতিনিধিরা উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রতি অযথা অভদ্রোচিত ব্যবহার করা হয়। একজন লেখক প্রতিনিধিরা কি বলে তাহা লিখিয়া আনিবার জন্য গিয়াছিলেন, কিন্তু কমিশন তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। কৃষাণদের পক্ষের কোনো অভিযোগে কমিশন কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহাদের রিপোর্ট একদেশদর্শিতাপূর্ণ। এমন কি কমিশনের রিপোর্টের নকল চাহিলেও তাহা পাওয়া যায় নাই। উপরন্তু কমিশন ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, যদি কমিশনের তদন্ত মাথা পাতিয়া লওয়া না হয় তবে সমস্ত গ্রাম নষ্ট করা হইবে।

"ইত্যবসরে অমৃতলাল কায়স্থ নামে একজন ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া আসেন। এই ম্যানেজারের নিয়োগপত্র দেখিতে চাওয়ায় গত ১৩ই ম্যানেজার এবং কমিশন সমস্ত কৃষাণকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দেন। ইহার পূর্ব্বদিন রাওর্দ্ধার ঠাকুর সাহেব পঞ্চায়েৎ-অফিসে সংবাদ দিয়াছেন তাঁহার বাগান হইতে শত শত বাঁশের লাঠি কাটাইয়া বেগুন দুর্গে লইয়া যাইবার হুকুম আসিয়াছে। উদ্দেশ্য গবর্ণর-জেনারেলের এজেন্ট যদি ব্যাপারটা দেখিতে আসেন তবে ঐ-সব লাঠি দেখাইয়া তাঁহাকে বুঝান হইবে যে কৃষাণেরাই আগে লাঠি লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল; কাজেই তাহাদের গুলি চালাইয়া শান্তি রক্ষা করিতে হইয়াছে। ইহার পর অত্যাচার সুরু হইয়া যায়। সৈন্যসামন্তেরা স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যাচার করিতে থাকে। কমিশনারদিগকে অনেক অনুরোধ করা হইয়াছিল তাহারা যেন গ্রামে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার না করে। কিন্তু সে অনুরোধে কেহই কর্ণপাত করে নাই। কয়েকটি বালিকা ও স্ত্রীলোককে শত শত কৃষাণের সম্মুখে সৈনিকেরা বে-ইজ্জত করে। কিন্তু কৃষাণেরা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটিও কথা বলে নাই। ১৩ই জুলাই ভোর ৫ টার সময় সৈনিকেরা হঠাৎ গোবিন্দপুর গ্রামখানি বেষ্টন করে। সেই গ্রামে কৃষাণদের একটি কন্‌ফারেন্স বসিয়াছিল। গ্রামে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই—প্রবেশ করিতে চেষ্টা করায় কয়েকজন লোক এমন ভাবেই প্রহৃত হয় যে তাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। তখন গ্রামের লোকেরা তাহাদের সাহায্যের জন্য আসিতেই গুলি চলিতে থাকে। গুলির আওয়াজ শুনিয়া অন্য গ্রামের যাহারা আহতদের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয় তাহাদের উপরেও গুলি চলে। ফলে ভিন্ন গ্রামের অনেকেও আহত হইয়াছে। ইহার পর পড়ে গ্রেপ্তারের ধুম। সৈন্যেরা যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছে তাহাকেই গ্রেপ্তার করিয়াছে। ৪৮০ জন লোক সৈন্যদের হাতে বন্দী হইয়াছে। বন্দীদের প্রতি ইহাদের অত্যাচারও অমানুষিক। বন্দীদের উষ্ণীষ কাড়িয়া লইয়া তাহাই দিয়া তাহাদিগকে জোড়ায় জোড়ায় বাঁধিয়া গরুর মত করিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। কুৎসিত গালি-গালাজ তো ছোট কথা, অনেককে পাদুকা-প্রহার সহ্য করিতে হইয়াছে। সারাদিন বেচারাদিগকে কিছু খাইতে দেওয়া হয় নাই। সারা রাত্রি তাহারা বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে। তাহাদেরই উষ্ণীষ কাড়িয়া লইয়া সৈনিকেরা বহ্ন্যুৎসব করিয়াছিল।

"সৈন্যেরা চলিয়া গেলে আহতদিগকে গ্রামে লইয়া আসা হয়। ১৯ জন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোকের আঘাতই বিশেষ গুরুতর। ইহা ছাড়া গুলির দ্বারা প্রায় ৪০ জন লোক আহত হইয়াছে। মোট আহত ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় দুই শত। জয়নগর গ্রামের রূপরাম ধাকর নামক একব্যক্তি গুলির আওয়াজ শুনিয়া গোবিন্দপুরে দৌড়াইয়া আসিতেছিল, রাওর্দ্ধার জায়গীরদার তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।

"জায়গীরদার এবং ভূমিয়ারা ঘোড়ায় চড়িয়া গোবিন্দপুর হইতে দুই মাইল দূরে বেড়াইতেছে এবং যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে তাহাকেই প্রহার করিতেছে, স্ত্রী পুরুষ কেহই বাদ যাইতেছে না। অনেক বাড়ীর পুরুষ গ্রেপ্তার হওয়ায় স্ত্রীলোকেরা মহামুস্কিলে পড়িয়াছে—গরু বাছুর রক্ষা করা বা অন্নের সংস্থান করা তাহাদের পক্ষে ভীষণ কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জনরব, সৈনিকেরা বাকী কৃষাণদিগকেও বন্দী করিবে এবং তাহাদের ঘর বাড়ী লুণ্ঠন করিবে।"

উপসংহারে কৃষাণ-পঞ্চায়েতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দৌলতরাম বড়লাটের এজেন্টকে জানাইয়াছেন—"আমি নির্য্যাতিত ভ্রাতাভগ্নীদের পক্ষ হইতে নিবেদন করিতেছি যে আপনি অবিলম্বে ঘটনাস্থলে আসিয়া সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। বিলম্বে সত্য আবিষ্কারের পথে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।"

নাভার মহারাজার গদী ত্যাগ—

পাতিয়ালা ও নাভা এই দুইটি রাজ্যের ভিতর নানারূপ বিবাদ চলিতেছিল। এই-সব বিবাদের বিচারের জন্য মাননীয় বিচারপতি মিঃ ষ্টুয়ার্ট স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ফলে নাভার মহারাজাকে গদী ত্যাগ করিতে হইয়াছে। গদী ত্যাগের সর্ত্ত—রাজ্য-শাসনের ভার ভারতগবর্মেণ্টের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। মহারাজার ৪ বৎসর-বয়স্ক পুত্র রাজা হইবেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতগবর্মেণ্টের হাতেই রাজ্যশাসনের সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে। মহারাজাকে তাঁহার রাজ্যের সীমানার বাহিরে অবস্থান করিতে হইবে। দরবার হইতে তাঁহাকে উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হইবে। পাতিয়ালার দরবার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ পাইবে। মহারাজাকে কোনো স্থলে যাইতে হইলে ভারত-সরকারের আদেশ লইতে হইবে। মহারাজের উপাধি ও সম্মান অব্যাহত থাকিবে।

এই ব্যাপার লইয়া শিখ-সম্প্রদায়ের ভিতর রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, কেবল নাভা-পাতিয়ালার বিবাদই এই গদী ত্যাগের কারণ নহে। মহারাজা ইচ্ছাপূর্ব্বকও গদী ত্যাগ করেন নাই—তাঁহাকে জোর করিয়া গদী ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। 'অকালী তে পরদেশী' নামক শিখ সংবাদপত্রখানিই এসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা

বেশী আলোচনা করিতেছেন। গত ১৬ই জুলাই হইতে এই পত্রিকাখানির ডাকে পাঠানো বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সংবাদপত্র-সম্পর্কিত কোনো চিঠিপত্রও বিলি করা হইতেছে না। ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, ভারত-গবর্মেণ্টের আদেশ অনুসারেই এ-ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পত্রিকাখানির কর্তৃপক্ষ মনে করিতেছেন, নাভার মহারাজার সম্পর্কে তাঁহারা যে তীব্র আলোচনা করিয়াছেন তাহারই ফলে এ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

'আকালী'তে পরদেশী'তে মহারাজার বিদায়-দৃশ্যের যে বিবরণটা বাহির হইয়াছে তাহা যেমন করুণ তেমনি শোচনীয়। আমরা এখানে বিবরণটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"৮ই জুলাই রবিবার নাভার পোলিটিক্যাল্ এজেণ্ট্ একজন ইংরেজ কর্ণেল, কয়েকজন বৃটিশ কর্ম্মচারী, আড়াইশত সৈন্য ও তিনটি কলের কামান লইয়া নাভা সহরে অতি প্রত্যুষে উপস্থিত হন। তাঁহারা সহরের রক্ষীসেনাগণের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া 'হীরা মহল' প্রাসাদে প্রবেশ করেন। প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াই কয়েকজন ব্রিটিশ কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করেন 'সেই অকালীটা কোথায়?' এ দিকে কলের কামান লইয়া ব্রিটিশ সেনা প্রাসাদ ঘিরিয়া রহিল। তাহারা নাভা দুর্গও হস্তগত করিয়া লয়। বেলা সাতটার সময় দুর্গের ভিতর দরবার বসে। দরবারে বলা হয়, নাভার মহারাজা রিপুদমন সিংহের রাজত্বকাল শেষ হইল এবং ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ ঐ দিবস হইতে তাঁহার শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন। যতদিন না টীকা-সাহেব (নাভার মহারাজার চারি-বৎসর-বয়স্ক পুত্র) ২১ বৎসরে পদার্পণ করেন ততদিন এই-ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে। বেলা ১০টার সময় মহারাজা ও মহারাণী দুইজন মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া এক মোটরকারে এক অজ্ঞানাস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। চোখের জলে রাজার মুখমণ্ডল ভাসিয়া যাইতেছিল। ব্যর্থ ক্রোধে ক্ষোভে তিনি যে নিজের কেশোৎপাটন করিয়াছিলেন তাহার চিহ্ন স্পষ্ট বিদ্যমান ছিল।"

এই নিরুদ্দেশ যাত্রা যে কোথায় শেষ হইয়াছে তাহার খবর পরে অবশ্য পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু নির্ব্বাসন যে মহারাজার স্বেচ্ছাকৃত তাহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। তিনি যে স্বেচ্ছায় গদী-ত্যাগ করিয়াছেন সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে।

বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব—

রুড়কী ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের এ-সি-মিত্র নামক জনৈক বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব এবার নানাদিক্ দিয়া পুরস্কারের বোঝায় ভারি হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া প্রাইজের বাবদ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন। টমসন্ প্রাইজের ২৫০ টাকাও তাঁহার করতলগত। এই পুরস্কারটি ভারতীয় বিশেষ কৃতী ছাত্রকেই প্রদান করা হয়। ইহা ছাড়া কলেজের আরো সাতটি পুরস্কার তিনি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এ তো গেল তাঁহার লেখা-পড়ার কৃতিত্বের পুরস্কার। খেলোয়াড় হিসাবে এবং ব্যায়ামের ওস্তাদ হিসাবে তিনি যে সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহাও বিস্ময়কর। তিনি 'ভিজিয়ানা-গ্রাম চ্যালেঞ্জ্ কাপ' লাভ করিয়াছেন। এই কাপটি ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবীরকেই দেওয়া হয়। 'হারকোর্ট্ বাট্‌লার চ্যালেঞ্জ কাপ'ও তিনি জয় করিয়া লইয়াছেন। এই পুরস্কারটি কেবল মাত্র তাঁহাকেই দেওয়া হয় যে-ছাত্র তাঁহার বৎসরে পাঠে ও খেলায় সমান ওস্তাদ।

দেহ-মনের চর্চ্চায় এমন আটপিঠে যুবকের নমুনা বাংলা দেশে কোটিতে একটি মিলে না। দেহচর্চ্চায় আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অনেক দুঃখের—অনেক অপমানের মূল কারণ। এই যুবকটির কৃতিত্বে আজ বাংলাদেশ গৌরব অনুভব করিতেছে।

খৃষ্টিয়ানের হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ—

বোম্বাইএর হিন্দুমিশনারী সোসাইটি সম্প্রতি ১০ জন খৃষ্টিয়ানকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। 'হিন্দুমিশনারী' পত্রের সম্পাদক রাও বৈদ্য আচার্য্য এবং 'সঞ্জীবম্' পত্রের সম্পাদক দেবরাও নায়ক অগ্নিহোত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এত দীর্ঘদিনের নিশ্চেষ্টতার পর হিন্দুসমাজের ভিতর যে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া জাগিয়াছে এটা শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলিয়াছেন—'হিন্দুরা অভিমন্যুর ঠিক উল্টা।—অভিমন্যু ব্যূহে প্রবেশ করিতে জানিত, বাহির হইতে জানিত না। কিন্তু হিন্দুরা কেবল সমাজব্যূহ হইতে বাহির হইতেই জানে, প্রবেশ করিতে জানে না।'—এই প্রবেশের সন্ধান জানার দিকে যে হিন্দুদের নজর পড়িয়াছে উপরের ঘটনাটিই তাহার প্রমাণ।

স্যার্ বেসিল ব্লেকেটের সাফ কথা—

শিমলার ১৬ই জুলাইএর খবরে প্রকাশ—স্যার্ বেসিল ব্লেকেট বলিয়াছেন যে, গবমেণ্ট্ সমস্ত ব্যাপারে ব্যয়সঙ্কোচ কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিতে পারিবেন না। তিনি সাফ বলিয়া দিয়াছেন—নিম্নলিখিত বিষয়ে ব্যয়সঙ্কোচ করা হইবে না—

এডুকেশন্যাল কমিশনারের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইবে না।

শিক্ষার জন্য খরচ কিছুমাত্র কমাইয়া দেওয়া হইবে না।

জলপ্রণালী ইত্যাদি খনন বিভাগের ইন্‌স্পেক্টরের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইবে না।

স্বাস্থ্য-বিভাগের কমিশনারের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইবে না।

কীটাণুতত্ত্বানুসন্ধান-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীগণ সকলেই থাকিবেন।'

ষ্টোর বিভাগের কোনো খরচ কমাইয়া দেওয়া হইবে না।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মুখ বন্ধ—

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মোরাদাবাদে শুদ্ধি সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে গমন করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁহার উপর ১৪৪ ধারা জারী করিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তিনি মোরাদাবাদের ৫ মাইলের ভিতর বক্তৃতা দিতে পারিবেন না। হিন্দু মুসলমানের বিরোধের আশঙ্কাই নাকি মোরাদাবাদ-কর্তৃপক্ষের এই অতিসাবধানতার কারণ।

নাগপুর-সত্যাগ্রহ—

জাতীয় পতাকা-আন্দোলন সম্পর্কে নাগপুরে শেঠ যমুনালাল বাজাজ, শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রাও দেশমুখ্য, শ্রীযুক্ত ভগবান্‌দীন এবং মিঃ আবেদালীর বিরুদ্ধে যে মামলা চলিতেছিল তাহার বিচার শেষ হইয়াছে। বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি ১৮ মাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শেঠ বাজাজকে ৩০০০ টাকা, শ্রীযুক্ত দেশমুখ্যকে ১৫০০ টাকা, মিঃ আবেদালীকে ১৫০ টাকা এবং শ্রীযুক্ত ভগবান্‌দীনকে ৭৫ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। জরিমানার টাকা না দিলে অতিরিক্ত আরো সাড়ে চারি মাসের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা।

সম্প্রতি শোনা গিয়াছে, শেঠ যমুনালাল বাজাজের উপর যে তিন সহস্র টাকার অর্থদণ্ড করা হইয়াছিল তাহা আদায় করিবার জন্য তাহার দুইখানি মোটর-গাড়ী এবং ৫০০ টাকা সমেত একটি বাক্স ক্রোক করা হইয়াছে। কিন্তু নিলাম ডাকিবার লোক মিলিতেছে না।

এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন যাহাতে জাগাইয়া রাখা যায় তাহার জন্য বিশেষ ভাবেই চেষ্টা চলিতেছে। নানা প্রদেশ হইতে স্বেচ্ছা-সেবকেরা দলে দলে আসিয়া স্বেচ্ছায় কারা বরণ করিয়া লইতেছেন।

যে-পর্য্যন্ত পতাকা-আন্দোলন চলিবে কংগ্রেসের কার্য্যপরিচালক সমিতির প্রতিনিধিরূপে মিঃ বল্লভভাই পটেল নাগপুরে থাকিয়া তাহা সুনিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ইঁহাকেও শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হইবে এমনি ধারা একটা গুজব ইতিমধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই আন্দোলনটা নারীদের ভিতরেও যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার পরিচয় শ্রীমতী সুভদ্রা দেবীই প্রদান করিয়াছেন। পরলোকগত দাদাভাই নৌরজীর পৌত্রী শ্রীমতী নৌরজীও সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য একটি মহিলাদল গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। উপযুক্ত-সংখ্যক মহিলা পাওয়া গেলেই তিনি সংগ্রামের আসরে আসিয়া হাজির হইবেন। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছেন তাঁহাদিগকে তিনি বোম্বাই, মালাবার হিল—৩০ নং নেপিয়ার সি রোডে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধীও গুজরাট হইতে একদল মহিলা স্বেচ্ছা-সেবিকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা আগামী গান্ধীপুণ্যাহে নাগপুরে গিয়া সত্যাগ্রহে যোগদান করিবেন। গত ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত নাগপুরে মোটের উপর ১৪৪৮ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

নাগপুরে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন-সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষ কেবল মাত্র যে সত্যাগ্রহীদের উপরেই জুলুম করিয়াছেন তাহা নহে, অনেক নির্দ্দোষীর উপরেও নাকি বেশ জুলুম চলিতেছে। এ-সম্বন্ধে সংবাদপত্রসমূহে যে-সব অভিযোগ বাহির হইয়াছে তাহার কয়েকটার নমুনা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

(১) যাহারা খদ্দর পরিয়া নাগপুর ষ্টেশনে নামিতেছে তাহাদের মধ্যে যাহারা স্বেচ্ছাসেবক নহে তাহাদেরও অনেককে গ্রেপ্তার করিয়া দণ্ডিত করা হইতেছে। ইহাদের দণ্ডের পরিমাণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাকি শোভাযাত্রায় লিপ্ত লোকদের দণ্ডকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

(২) বোম্বাইএর ছয়জন স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে ২০ জন পথিককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। উহাদের ভিতর ১৭ জন ক্ষমা চাহিয়া মুক্তি পাইয়াছে—বাকী তিন জন বালককে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। তাহাদের অপরাধ তাহারা বলিয়াছে—শোভাযাত্রার সঙ্গে তাহাদের কোনোরূপ সংস্রব ছিল না—সুতরাং তাহারা দোষও করে নাই, ক্ষমাও চাহিবে না।

(৩) স্বেচ্ছাসেবকদের দলপতি শ্রীযুক্ত শিবম্ বলিয়াছেন, পুলিশ পথে যাহাকেই পাইতেছে তাহাকেই ধরিতেছে। শুনা যায় পুলিশের লোকাভাব ছিল বলিয়া আদালতের পিয়নদিগকে আনিয়া লোক ধরার ব্যবস্থা করা হয়। শেষে এমন গোলযোগ হয় যে, আদালতের এই পিয়নদেরও কোনো কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া একশত গজ দূরে দূরে থাকিয়া পতাকা লইয়া চলিয়াছিল—কোনোরূপই অবৈধ জনতা করে নাই, কাহারো শান্তিভঙ্গ করে নাই, এমন লোককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এই-সমস্ত অভিযোগ সত্য কি না বলা কঠিন। তবে গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ এখনো দেখি নাই। গত ৮ই আগষ্ট মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভা অধিক সংখ্যক সভ্যের ভোটে স্থির করিয়াছেন যে, যে-সমস্ত সত্যাগ্রহীর বিরুদ্ধে আইন অমান্য করার জন্য মামলা করা হইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধের মামলা প্রত্যাহার করা হউক ও যাঁহারা কারাক্লেশ ভোগ করিতেছেন তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক। গবর্ণমেণ্ট এই-প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন কি?

মহাত্মার মুক্তির প্রস্তাব—

শ্রীযুক্ত শেষগিরি আয়ার ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মহাত্মা গান্ধী-প্রমুখ বন্দীগণের মুক্তির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—যে-সকল দেশ-ভক্ত অসহযোগব্রত অবলম্বন করিয়া দেশ-সেবায় ব্রতী, তাঁহারা কারাগারে বন্দী থাকিবার উপযুক্ত নহেন। তাঁহাদের অনেকের ভুল হইয়াছে সত্য, কিন্তু আগামী নির্ব্বাচনে তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত হইবার অবকাশ দেওয়া উচিত। তাঁহাদিগকে অতঃপর কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা ভুল হইবে। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মিঃ হেলী বলিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তি চাহেন না, মুক্তির জন্য তাঁহারা আবেদনও করেন নাই। এ অবস্থায় তাঁহাদিগকে মুক্তি দিলে দেশের বিশৃঙ্খলা আরো বাড়িবে। কাজেই উহা হইতে পারে না।

মহাত্মার প্রভাবই যে দেশের দুর্দ্দিনে উন্মত্ত জনসঙ্ঘকে শান্ত সংযত করিয়া একটা বিপ্লবের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছে, একথা গবর্মেণ্ট ভাল করিয়াই জানেন।

সৈন্য-বিভাগে ব্যয়সঙ্কোচ—

ইঞ্চকেপ কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে সৈন্য-বিভাগের কতকগুলি ব্যয়ের ব্যবস্থা ছাঁটিয়া ফেলা হইতেছে। এই সঙ্কোচের দ্বারা ভারত-গবর্মেণ্টের বাৎসরিক আড়াই কোটী টাকার খরচ সম্ভবতঃ কমিয়া যাইবে। সঙ্কোচের ব্যবস্থাগুলি নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) ভারতে ব্রিটিশ পদাতিক সৈন্যের যে ৪৫টি দল আছে তাহার প্রত্যেকটিতে ১৩০ জন করিয়া লোক কমাইয়া দেওয়া হইবে।

(২) অশ্বারোহী সৈন্যের একটি দল ও তাহার সংগ্রামবাহী লোক-জন কমানো হইবে।

(৩) আর-এফ-এ ব্রিগেডের একটি পূর্ণদল উঠাইয়া দিলে যে-পরিমাণ খরচ কমিত সকল দল হইতে সেই পরিমাণ খরচ কমানো হইবে।

(৪) একদল অশ্বারোহী ব্রিগেড কমানো হইবে।

(৫) 'স্যাপার' ও 'মাইনর' দলের একটি পূর্ণ দল কমানো হইবে।

(৬) ভারতীয় সৈন্যদলের প্রত্যেক পাওনিয়ার ব্যাটালিয়ান ও প্রত্যেক পদাতিক দলের ৬৪ জন করিয়া লোক কমানো হইবে।

(৭) দুই দল ব্রিটিশ অশ্বারোহী সৈন্য ভারত হইতে বিলাতে লইয়া যাওয়া হইবে।

ব্যয়হ্রাস-কমিটি ও ভারতগবর্মেণ্ট একটি তৃতীয় অশ্বারোহী দল ভারত হইতে সরাইয়া লইতে পরামর্শ দিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে এখনো শেষ সিদ্ধান্ত হয় নাই।

জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা—

সুরাট মিউনিসিপ্যালিটিতে মেয়েদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রচলিত হইয়াছে। নিমচাঁদ নামক একব্যক্তি তাঁহার মেয়েকে লেখাপড়া না শিখাইবার জন্য সুরাট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। নিমচাঁদ কিন্তু তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি তাঁহার মেয়েকে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি জাতীয় বিদ্যালয়কে উপযুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লইতে রাজি হন নাই। হাইকোর্টে আপীল দায়ের হইলে চিফ্ জাষ্টিস্ ও বিচারপতি মিঃ কয়াজী মিউনিসিপ্যালিটির এই-যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া মেয়ের পিতা নিমচাঁদকে অর্থদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার। কিন্তু যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া থাকে তাঁহারা যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন

তবে আইন তৈরীর দ্বারা জনসাধারণেকে অনর্থক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। সুরাট মিউনিসিপ্যালিটি তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন। জাতীয় বিদ্যালয়ে সাহায্য করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া তাঁহারা ঐ-ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করিতেই চেষ্টা করিয়া নিজেদের অযোগ্যতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

মিশনরী স্কুলে বিপদ্—

মাদ্রাজের বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত নাগাপ্পার জনৈক আত্মীয়া মাদ্রাজের 'চার্চ্চ্ অব ইণ্ডিয়া জেনানা মিশনে' অধ্যয়ন করিতেন। হঠাৎ তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাওয়ায় অভিভাবকেরা পুলিশে খবর দেন। তখন জানা গেল যে, বালিকাটি জেনানা মিশন স্কুলে আছেন। শ্রীযুক্ত নাগাপ্পা এবং তাঁহার স্ত্রী মিশন-হাউসে বালিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান, কিন্তু তাঁহাদিগকে ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই। বালিকাটি আইন অনুসারে নাবালিকা-বয়স অতিক্রম করিয়াছেন। অতএব আইনের আশ্রয় লইয়াও কোন লাভ নাই।

এরূপ ব্যাপার এই একটি নহে—ইতিপূর্ব্বে আরো অনেক ঘটিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার মিশনারীদের ধর্ম্মের একটি অঙ্গ। সুতরাং ইহার জন্য মিশনারীদের দোষ দেওয়াও চলে না। তথাপি যদি ইহার প্রতিকার করিতে হয় তবে বালকাদের স্কুল নিজেদের ব্যবস্থায় এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যে, শিক্ষার জন্য আর কাহাকেও ভিন্ন-ধর্ম্মীদের দ্বারস্থ হইতে না হয়।

ছাত্রে-পুলিশে দাঙ্গা -

আলিগড়ে ছাত্রদের সহিত পুলিশের একটা বড় রকমের দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গার কারণ—বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট একজন পুলিশ-কনেষ্টবল একজন গাড়োয়ানকে নিয়মের অতিরিক্ত যাত্রী লওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করে। কলেজের ছাত্রেরা এই গাড়ীর যাত্রী ছিল। এই ব্যাপার লইয়া ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের বচসা উপস্থিত হয় এবং এই বচসাই ক্রমে ছাত্র-পুলিশের মারামারিতে পরিণত হয়। এই গোলমাল মিটাইতে আসিয়া কলেজের অধ্যাপকেরা পর্য্যন্ত পুলিশের হাতে মার খাইয়াছেন। উভয়পক্ষের কর্তাদের চেষ্টায় 'ব্যাপারটি আদালতে না গড়াইয়া আপোষে মিটিয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে উভয় পক্ষের যে পত্রব্যবহার চলিয়াছিল তাহার ভিতর দিয়া পুলিশের নির্লজ্জ অত্যাচারের ছবি সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুলিশ এদেশে শান্তি-রক্ষা অপেক্ষা শান্তির হানিই করে বেশী। দায়িত্ববোধ ত তাহাদের নাই-ই, সাধারণ ভদ্রতারও খাতির করিয়া তাহারা চলিতে জানে না। কর্ত্তাদের পুলিশের সংখ্যা এবং ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইবার দিকে যেমন ঝোঁক, পুলিশের দক্ষতাবৃদ্ধির দিকে যদি তেমন নজর থাকিত তবে অপরাধের সংখ্যা এতদিনে যে অর্দ্ধেকের বেশী নামিয়া আসিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক আলিগড়ের পুলিশ হাঙ্গামায় ভাইস্-চ্যান্সেলার পুলিশের কর্ত্তাদিগকে মিটমাটের যে-সব সর্ত্ত প্রদান করিয়াছিলেন কর্ত্তারা বিনা প্রতিবাদে সেগুলি মানিয়া লইয়াছেন। সর্ত্তগুলি নিম্নে দেওয়া গেল। কত গুরুতর অপরাধ করিলে এই-সব সর্ত্ত যে মানিয়া লওয়া যায় তাহা সর্ত্তগুলির দিকে নজর দিলেই বোঝা যায়।

১। পুলিশ-সোয়ারদিগকে জবাব দেওয়া হইয়াছে।

২। যে-সমস্ত কনেষ্টবল উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহাদিগকে বদলী করা হইয়াছে।

৩। ভাইস্-চ্যান্সেলার যদি আর কাহারো বিরুদ্ধ রিপোর্ট করেন তাহাকেও বদলী করা হইবে।

৪। সুবিদারদের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদিগকে আগ্রা পাঠান হইয়াছে।

৫। কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন কনেষ্টবল পুলিশ লাইনের বাহিরে আসিতে পারিবে না।

৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে 'প্রক্টর' এবং তাঁহার সহকারীদ্বয় সমস্ত ব্যাপার পরিদর্শন করিবেন।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে পুলিশ-লাইন যথাসম্ভব সত্বর সরাইয়া লওয়া হইবে।

৮। পুলিশ ছাত্রদের স্বাধীনতায় হাত দিবে না এবং ছাত্র সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপোর্ট্ করিবে।

৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং কর্ম্মচারীদের বিচার করিবার জন্য তাহাদের নিজেদের বিচারক থাকিবে।

পরলোকে পণ্ডিত রামভজ দত্ত—

পণ্ডিত রামভজ দত্ত গত ৬ই আগষ্ট মুসৌরীতে মারা গিয়াছেন। তিনি কার্ব্বঙ্কল রোগে ভুগিতেছিলেন। হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া

পণ্ডিত রামভজ দত্ত ও শ্রীযুক্তা সরলা দেবী

ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। পণ্ডিত রামভজ শ্রীমতী সরলা দেবীর স্বামী। দেশ ইঁহার নিকট হইতে নানা দিক্ দিয়া নানারকমের উপকার লাভ করিয়াছে। ইঁহার মৃত্যু ত যে একটা দেশের ক্ষতি হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই

হিন্দু-মুসলমানে বিবাহ—

পঞ্জাব-সরকারের কৃষিমন্ত্রী লালা হরকিষণ লালের জ্যেষ্ঠপুত্র মিঃ কানাইয়ালাল লাহোরের ব্যারিষ্টার মিঃ আজিজ আহম্মদের কন্যা হাসনারা আহমদকে বিবাহ করিয়াছেন। বিবাহ-কালে পাত্রীর পিতামাতা উপস্থিত ছিলেন। বিবাহ-রেজিষ্ট্রার মিঃ চুনিলাল এই বিবাহোৎসব সম্পন্ন করাইয়াছেন। পঞ্জাবে এজাতীয় বিবাহ এই প্রথম।

জেলে দুর্ব্যবহারের প্রতিকার—

বিজাপুরে জেল-কয়েদীদের প্রতি নানাপ্রকার দুর্ব্যবহার করা হয় বলিয়া ইতিপূর্ব্বে এক সংবাদ বাহির হইয়াছিল। বোম্বাই-গবর্মেণ্ট্ নাকি এই অত্যাচারের প্রতিকার করিয়াছেন। এই সম্পর্কে 'জেলার' ও জেল-ডাক্তারকে দণ্ডিত করা হইয়াছে। 'জেলারের' শাস্তি এক বৎসরের জন্ম তাহার প্রমোশন বন্ধ; জেল-দারোগার শাস্তি—তিন মাসের জন্ম তিনি জেলের ভাতা পাইবেন না।

বোম্বাই-কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থা প্রশংসার্হ।

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসঙ্কট—

বারাণসীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল নহে। তাহার ছাত্রাবাসে নাকি স্থানাভাব দেখা দিয়াছে। নূতন হোষ্টেল তৈরী করা দরকার অথচ তৈরী করিবার অর্থ মিলিতেছে না। বারাণসীর এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অনেকগুলি বাঙ্গালী ছাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করিতেছে—এমন কি কলেজটিতে শতকরা ৬৫ জন ছাত্রই বাঙ্গালী। সুতরাং এই কলেজটি সম্বন্ধে বাঙ্গালীর পক্ষে উদাসীন থাকা কোনো ক্রমেই সঙ্গত নহে। পণ্ডিত মদনমোহন এই-সমস্তর ব্যবস্থার জন্ম অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন—কলেজের বাঙ্গালী ছাত্রেরাও ভিক্ষার ঝুলি বহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছেন। আমরা আশা করি বাংলা হইতে ইঁহাদিগকে বেশ মুক্ত হস্তেই সাহায্য করা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা সদস্য—

বোম্বাইয়ের ডাক্তার শ্রীমতী কাশীবাঈ গৌরাঙ্গে বি-এ বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। বোম্বাই প্রায় সমস্ত বিষয়েই নারীদের ন্যায্য অধিকারের দাবী মানিয়া লইতেছে। তাহার এই-সমস্ত আদর্শ বাংলার অনুকরণের যোগ্য।

হিন্দু-মহাসভা—

আগামী ১৯শে এবং ২০শে আগষ্ট্ কাশীধামে নিখিল-ভারতীয়-হিন্দু-মহাসভার অধিবেশন হইবে। যাহাতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক সহর হইতে এই সভায় প্রতিনিধি উপস্থিত হন সেজন্য উক্ত মহাসভার অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি রাজা মোতিচাঁদ এবং অন্যান্য কয়েক জন গণ্যমান্য সদস্য একটি আবেদনপত্র প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রতিনিধির ফি ৫ টাকা এবং দর্শকদের ফি ৩ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নাম অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নিখিল-ভারতীয়-হিন্দু-মহাসভা—কাশী—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সমিতি প্রতিনিধিগণের আবাস-স্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবেন। এই মহাসভা শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে সভায় যোগদান করিবার জন্ম আহ্বান করিয়াছেন, হিন্দু অর্থে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অথবা ভারতজাত কোনো ধর্ম্মসম্প্রদায়-ভুক্ত সমস্ত নরনারীকেই বুঝাইবে।

এই মহাসভার উদ্দেশ্য—

(১) হিন্দুসমাজের বিভিন্ন অংশ ও শাখার মধ্যে ঐক্য ও প্রীতি সংস্থাপন।

(২) হিন্দু-সমাজ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভিতর সদ্ভাব সংস্থাপন।

(৩) অবনত ও অন্যান্য সর্ব্বজাতীয় হিন্দুদের উন্নতিবিধান।

(৪) হিন্দুদিগের স্বার্থ-সংরক্ষণ। ইত্যাদি।

সভার আগামী অধিবেশনে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করিবেন:—

(১) অস্পৃশ্য জাতিদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইতেছে এবং উহারা বিরাট্ হিন্দুসমাজের অঙ্গ, তজ্জন্য এই সভা প্রস্তাব করিতেছেন—

(ক) নীচ জাতিকে এক কূয়া হইতে জল উঠাইবার অধিকার দিতে হইবে।

(খ) এক পুকুর হইতে সব শ্রেণীর লোক জল লইতে পারিবে।

(গ) সভাতে এবং উৎসবাদিতে সর্ব্বশ্রেণীর লোক এক আসনে বসিতে পারিবে।

(ঘ) নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের ছেলে-মেয়েকে সরকারী বে-সরকারী স্কুল-কলেজসমূহে পড়িতে দিতে হইবে।

(২) যে-সমস্ত মালকানা রাজপুত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের আত্মীয়স্বজনকে সভা অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের নবাগত ভ্রাতাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

(৩) ভারতীয় মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদের অধিকাংশ পূর্ব্বে হিন্দু ছিল এবং উদার হিন্দু সমাজ পূর্ব্বে অনার্য্যদিগকেও হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করিতেন। সুতরাং সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, যদি কোনো অহিন্দুকে হিন্দুদের কোনো প্রতিনিধিসভা প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদির দ্বারা হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করেন তবে সমগ্র হিন্দুসমাজ তাহাকে হিন্দু বলিয়া জ্ঞান করিবে।

হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা—

এলাহাবাদের গারুজুয়ানে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটি দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা ঈদপর্ব্ব উপলক্ষে গরু জবাই করিতে চায়। হিন্দুরা গোরুর পরিবর্ত্তে সাতটি খাসী দেওয়ার প্রস্তাব করে। নবাবগঞ্জ থানার দারোগা দাঙ্গার উপক্রম দেখিয়া গ্রামের প্রধানদিগকে ডাকিয়া দাঙ্গা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত মালবীয় ও মৌলবী জহুর আহম্মদ সেই স্থানে পৌঁছিয়া ব্যাপার মিটাইয়া দেন। গত ২৭শে জুলাই প্রায় ৩০০ মুসলমান সৈয়দ সারোয়ান গ্রাম হইতে গারুজুয়ানে পৌঁছে, কিন্তু তাহাদিগকে গ্রামে ঢুকিতে দেওয়া হয় না। তাহারা যাইবার পথে কয়েকজন হিন্দুকে মারধর করে। হিন্দুরা সংবাদ পাইয়া দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার পর দুইদলে মারামারি বাধে। দাঙ্গায় দুইজন মুসলমানের মৃত্যু হইয়াছে এবং বারজন লোক আহত হইয়াছে।

এই ধরণের দুই একটা ছোটখাট দাঙ্গা ছাড়া এবারকার ঈদ পর্ব্ব একরূপ নির্ব্বিবাদেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। এটা শুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

ট্রেনে সর্পাঘাতে মৃত্যু—

কয়েকদিন পূর্ব্বে গয়া হইতে একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাটনার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের একজন জমিদার আসিতে-ছিলেন। হঠাৎ পথিমধ্যে তিনি শিকল টানিলে গার্ড্ গাড়ী থামাইয়া

তাঁহার কামরায় গমন করিয়া দেখিতে পান, লোকটি মৃতের মত পড়িয়া আছেন। গার্ড্ তখন গাড়ী পূর্ণবেগে পাটনায় লইয়া আসেন। পাটনা ষ্টেশনে সকলে ঐ-গাড়িতে গমন করেন এবং একটি কুলি মৃত-দেহ উঠাইতে যায়। তখন গদির নীচ হইতে একটি গোক্ষুরা সাপ ফণা তুলিয়া উঠে। সর্পটিকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলা হইয়াছে। শোনা যায়, কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ-গাড়ীতে নাকি আরো দুইজন লোক মরিয়াছে এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইবার নিমিত্তই তাহাদের মৃত্যু সাব্যস্ত হইয়াছিল।

বন্যার প্রকোপ—

বোম্বাইএর কোলাবা জেলায় সম্প্রতি ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। কোলাপুরের বৈদ্যুতিক কারখানার ৯জন লোক বন্যার তোড়ে ভাসিয়া গিয়াছে। এই বন্যায় নাগোসা অঞ্চলের প্রায় ৮০০০০ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। যাহাতে ৫জন স্ত্রীলোক এবং তিনটি শিশু বন্যার জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে এবং এই অঞ্চলে প্রায় দুইলক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

মাদ্রাজের দক্ষিণ কানাড়াতেও বন্যার তোড়ে বহু গ্রাম ধ্বংস হইয়াছে। লোক এবং গৃহপালিত পশুও মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ব্রহ্মদেশেও বন্যার প্রকোপ এবার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কলেরা বসন্ত প্রভৃতি নানা দেবতা ভারতবর্ষের স্কন্ধে ভর করিয়াই আছেন। তাহার উপর পর্জ্জন্য দেবের অনুগ্রহও বাৎসরিক ব্যাপার হইয়া উঠিল। অবশ্য তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবার কিছু নাই। তেত্রিশ কোটি দেবতার মার খাইয়া যদি হজম করা যায় তবে একটা দেবতার মার এমনই কি আর বদহজমের সৃষ্টি করিবে।

তিলকের মৃত্যুতিথি—

গত ৩০শে জুলাইএর সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি কানপুর মিউনিসিপালিটির এক সভায় অধিকাংশ সভ্যের মতে স্থির হইয়াছে, অতঃপর লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতিথি উপলক্ষ প্রতি বৎসর ১লা আগষ্ট্ মিউনিসিপ্যালিটির ছুটি থাকিবে।

সুক্কুরের মিউনিসিপ্যালিটিতেও একটি অনুরূপ প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা সাধারণ সভার অধিবেশন করিয়া স্থির করিয়াছেন, লোকমান্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য প্রতি বৎসর তাঁহার বাৎসরিক মৃত্যুদিনে মিউনিসিপ্যালিটি বন্ধ থাকিবে এবং মিউনিসিপ্যালিটির স্কুলগুলিতেও ছুটি দেওয়া হইবে।

মহাত্মার নামে ছুরি ব্যবহার—

ত্রিবন্দ্রমে জাতীয় পতাকা উৎসব উপলক্ষ্যে একটি সভায় কয়েক জন ছাত্রের ভিতর মহাত্মা গান্ধীর দোষগুণ আলোচনা ছুরি হানাহানিতে নিঃশেষ হইয়াছে। ছুরি চালানোর ফলে একজন ছাত্র ঘটনাস্থলেই মারা গিয়াছে, আর-একজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে আছে। মহাত্মার অহিংস-মতবাদের প্রতি তাহাদের অসীম শ্রদ্ধা।

ডাঃ নাইডুর কারাদণ্ড—

ডাঃ বরদারাজুলু নাইডুর উপর ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছিল। সেই আদেশ অমান্য করিয়া তিনি পেরিয়াকুলাম তালুক কন্‌ফারেন্সের সভাপতি-রূপে বক্তৃতা করিয়াছিলেন—এই অপরাধে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহার বিচারও শেষ হইয়াছে। বিচারে তাঁহার প্রতি ছয় মাস কারাদণ্ড এবং ৩০০ টাকা জরিমানা দেওয়ার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ডাঃ নাইডু বিচারের সময় যে-বর্ণনাপত্র দাখিল করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন- "আমি নিজেকে দোষী বা নির্দ্দোষী কিছুই বলি না। বক্তৃতার বা চলা-ফেরার স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের জন্মগত অধিকার বলিয়াই আমি মনে করি। আমার প্রতি জেলাকর্ত্তৃপক্ষ যে আদেশ জারি করিয়াছেন তাহা অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারমূলক। তাহাতে নাগরিকের জন্মগত অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। এই অধিকার-সংরক্ষণের জন্যই আমি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া বক্তৃতা দিয়াছি। কন্‌ফারেন্স্‌কে সাধারণ জন-সভা বলা যাইতে পারে না। সাধারণ সভায় সমস্ত শ্রেণীর লোকই অবাধে যাইতে পারে। কিন্তু এই বৈঠকে কেবলমাত্র কংগ্রেস কর্ম্মী ও কংগ্রেসের পক্ষাবলম্বীরাই প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছিলেন। সভায় লোক প্রবেশ সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। এমন কি পুলিশের লোককেও পাশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয়। ইহা সত্ত্বেও সরকারী কর্ম্মচারীরা বলিতেছেন—আমার বক্তৃতায় দাঙ্গাহাঙ্গামার সম্ভাবনা ছিল।"

কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট্—

আগামী কংগ্রেসে কাহাকে প্রেসিডেণ্ট্ নির্ব্বাচিত করা হইবে তাহা লইয়া আলোচনা সুরু হইয়া গিয়াছে। কোন্ প্রদেশের কংগ্রেসকমিটি কাহাকে মনোনীত করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি	মনোনীত ব্যক্তি
অন্ধ্র আসাম আজমীর মাড়োয়ারা বর্ম্মা বাংলা উৎকল সিন্ধুপ্রদেশ তামিল নাড়ু যুক্ত প্রদেশ পাঞ্জাব	মৌলানা মহম্মদ আলি
বোম্বাই	মহাত্মা গান্ধী। তিনি যদি অসমর্থ হন তবে মৌলানা মহম্মদ আলি
মহারাষ্ট্র	১। মৌলানা মহম্মদ আলি ২। শ্রীযুক্ত এন সি কেল্‌কার ৩। „ গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে ৪। „ রাজগোপাল-আচারিয়ার ৫। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু
গুজরাট	১। মৌলানা শওকত আলি ২। মৌলানা মহম্মদ আলি
কর্ণাট	১। মৌলানা মহম্মদ আলি ২। লালা লাজপত রায়
নাগপুর (মধ্যপ্রদেশ—মারহাট্টা)	১। লালা লাজপত রায় ২। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ

আজমীরের দাঙ্গা—

গত ২৩শে জুলাই আজমীরে হিন্দুমুসলমানের ভিতর একটা দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। হিন্দুদের ঠাকুর মুসলমানেরা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং

তাহাদের একটি দেবমন্দিরও লুণ্ঠিত হইয়াছে। দাঙ্গার ফলে পাঁচজন নিহত এবং ১২ জন আহত হইয়াছে। কংগ্রেসের হিন্দুনেতা অর্জ্জুনলাল শেঠী, প্রকাশম্ প্রভৃতি বিবাদ মিটাইতে গিয়া গুরুতর রকমে আহত হইয়াছেন।

যাহাদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই তাহাদের এইরূপ ভাবেই মার খাইতে হয়। সেইজন্য সকলের আগে গায়ে জোর করা, আত্মরক্ষার শক্তি অর্জ্জন করা হিন্দুদের কর্ত্তব্য। মার খাইয়া মার ফিরাইয়া দিবার জন্যই যে এটা দরকার তাহা নহে—শক্তি থাকিলে অত্যাচারীও অত্যাচার করিতে সাহস পায় না। অত্যাচারী যাহাতে অত্যাচার করিতে সাহস না পায় সেইজন্যই এই শক্তি অর্জ্জন করা দরকার।

মিরাট আন্তর্জাতিক ভোজ -

মিরাটে সম্প্রতি একদল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য কতকগুলি অন্ত্যজকে লইয়া পান ভোজন করিয়াছেন। এই অন্ত্যজদের ভিতর চামার ঝাড়ুদার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকও ছিল। ভোজন-আসরে সহরের বিশিষ্ট লোকও অনেক যোগদান করিয়াছিলেন। দিল্লীর কেশবদাস শাস্ত্রী এই উৎসব ব্যাপারে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদল মুসলমান ও হিন্দু এই উৎসব পণ্ড করিতে চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই।

হিন্দু জাতিকে যাহারা জাতিভেদের "অক্টোপাশ" হইতে মুক্তি দিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদিগকে হয়তো অনেক দুঃখ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে—হয়তো একান্ত আপনার জনও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। সুতরাং এজন্য সুস্থ সবল শিরদাঁড়া-ওয়ালা লোক চাই।

মিউনিসিপ্যালিটিতে মদ বিক্রয় বন্ধের প্রস্তাব—

গত ১৭ই জুলাই বেজওয়াদার মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জি এম শর্ম্মা প্রস্তাব করিয়াছিলেন—মদ্য পানের ফলে সহরের অধিবাসীদের যেরূপ শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া মিউনিসিপ্যাল হদ্দার ভিতর মদের বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

প্রস্তাবটি সামান্য একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছে।

জেলে বেত্রাঘাত—

বোম্বাইএর ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী জেলে বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—নিয়মভঙ্গের জন্য কয়েদীদের উপর বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা নিতান্ত বর্ব্বরোচিত এবং মনুষ্যত্বহীনতার পরিচায়ক। বিশেষতঃ ইউরোপীয়-অপরাধীকে যখন ঐ দণ্ড দেওয়া হয় না তখন দেশীয় অপরাধীদিগকেই বা কেন ঐ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। রাজনৈতিক অপরাধীদের প্রতি এ শাস্তির প্রয়োগ আরো অসঙ্গত। কারণ তাঁহারা সকলেই প্রায় সদ্বংশজাত ও সুশিক্ষিত।

দণ্ডটি তুলিয়া দেওয়ার পক্ষে ২৩ এবং বিপক্ষে ৪৬টি ভোট হওয়ায় শ্রীযুক্ত ত্রিবেদীর প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়াছে। যে-সব সদস্য এই সৎ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন, ভোটদাতাদের তাঁহাদিগকে চিনিয়া রাখা দরকার।

মোপলাদের হিসাব নিকাশ—

স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ ম্যাল্‌কম্ হেলি ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন মোপলা বিদ্রোহের ফলে ২৩২৯ জন মোপলা হত, ১৬৫২ জন আহত, ৫৯৫৫ জন ধৃত হইয়াছে।

তিনি একটা হিসাব খতাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন—সমস্ত দেশটায় আর কতজন মোপলা অবশিষ্ট আছে। সেই খবরটা দিলেই তালিকা সম্পূর্ণ হইত। মোপলাদেশে তবু মাত্র ছয় মাস কাল সময়-আইন প্রচলিত ছিল।

ভারতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা—

ভারতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায় তাহাই লইয়া আলোচনা করিবার জন্য ভারত-গবমেণ্ট এক কমিটি নিযুক্ত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে উকীল ও ব্যারিষ্টারদের অধিকার সমান করিবার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই কমিটি নিয়োগের ব্যবস্থায় তিনি সে বিল প্রত্যাহার করিয়াছেন।

ওলিম্পিক খেলা—

১৯২৪ সনে প্যারিসে ওলিম্পিক খেলার বৈঠক বসিবে। এই খেলায় ভারতের শক্তিমান্ খেলোয়াড়দিগকে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য প্রেরণ করার প্রস্তাব হইয়াছে। স্যার দোরাব তাতা ইহার উদ্যোগী। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন প্রত্যেক প্রদেশের খেলোয়াড়গণ প্রথমে স্ব স্ব প্রদেশে প্রতিযোগিতা করিবেন। যাঁহারা প্রাদেশিক খেলায় শ্রেষ্ঠ হইবেন তাঁহাদিগকে ১৯২৪ সনের প্রারম্ভে দিল্লীতে পাঠানো হইবে। সেখানে সমস্ত ভারতের নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়দের ভিতর প্রতিযোগিতা হইবে। সেখানে যাঁহারা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন তাঁহাদিগকেই প্যারিসের ওলিম্পিক ক্রীড়ায় প্রতিযোগিতা করিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের সম্ভবতঃ ইহা অপেক্ষা ভালো আর কোনো উপায় হইতে পারে না।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

বেনো-জল

আট

ইদানীং গুরুতর পরিশ্রমে বিনয়-বাবুর শরীর বড় কাহিল হয়ে পড়েছিল। সব কাজেই ছুটি আছে, কিন্তু ডাক্তারীতে যিনি নাম কেনেন অবকাশ তাঁর পক্ষে দুরাশা মাত্র। রোগী দেখা এবং দক্ষিণার লোভ ছেড়ে, মরিয়া হয়ে পলায়ন ভিন্ন ডাক্তারের আর মুক্তির দ্বিতীয় উপায় নেই।

বিনয়-বাবু ঠিক করেছেন, বায়ু পরিবর্ত্তনে যাবেন। কিন্তু কোথায় যাওয়া উচিত, তাই নিয়ে আজ সকাল থেকেই বাদানুবাদ হচ্ছে।

সুনীতি বল্‌লে, "বাবা, দার্জ্জিলিং চল।"

বিনয়-বাবু প্রবলভাবে মস্তক আন্দোলন ক'রে বল্‌লেন, "ওরে বাস্‌রে, এই শীতকালে দার্জ্জিলিং গেলে আমরাও সজীব বরফে পরিণত হয়ে যাব—শীত আমি মোটেই ভালোবাসি না।"

সেন-গিন্নী বল্‌লেন, "আমার বড় সাধ, একবার কাশী বেড়িয়ে আসি।"

বিনয়-বাবু হেসে বল্‌লেন, "আমার মতন ম্লেচ্ছের সঙ্গে থেকেও বাবা বিশ্বনাথের ওপরে তোমার এখনো ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে? শুনে আশ্চর্য্য হলুম।"

সেন-গিন্নী মুখ ভার ক'রে বল্‌লেন, "কেন, বাবা বিশ্বনাথের ওপরে ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা কি অপরাধ?"

—"অপরাধ নয় মা, কুসংস্কার!" বল্‌তে বল্‌তে সন্তোষ এসে ঘরের ভিতরে ঢুক্‌ল—পিছনে পিছনে এলেন কুমার বাহাদুর। আজকাল এরা দুটিতে যেন মাণিক-যোড় হয়ে দাঁড়িয়েছে—কেউ কারুকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না।

সেন-গিন্নী আরো বেশী চ'টে বল্‌লেন, "সন্তোষ, তোর কাছে আমি ধর্ম্মশিক্ষা চাই না—দিন-কে-দিন তুই বড় জ্যাঠা হয়ে উঠ্‌ছিস্!"

কুমার-বাহাদুর সেন-গিন্নীর পক্ষ অবলম্বন ক'রে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, মায়ের সঙ্গে তোমার এমন ভাবে কথা কওয়া উচিত নয় সন্তোষ!"

সেন-গিন্নী খুসি হয়ে কুমার-বাহাদুরের দিকে চাইলেন।

সন্তোষ বল্‌লে, "বেশ, উচিত যদি না হয় তো আমি এই চুপ কর্‌লুম।"

সুমিত্রা এতক্ষণ নীরবে সব শুন্‌ছিল। এখন সে বিনয়-বাবুর কাছে গিয়ে বল্‌লে, "তাহলে কোথায় যাবে ঠিক কর্‌লে বাবা?"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "ঠিক আর কৈ হোলো মা, এখন তো খালি ঝগ্‌ড়াই হচ্ছে!"

সুমিত্রা বল্‌লে, "বাবা, রবি-বাবুর কবিতায় আমি সমুদ্রের চমৎকার বর্ণনা পড়েচি, কিন্তু সমুদ্র কখনো চোখে দেখি-নি। তুমি পুরীতে বেড়াতে যাও তো বেশ হয়।"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "ঠিক বলেচিস্! পুরী জায়গাও ভালো, সেখানে শীতের অত্যাচারও নেই। হ্যাগা, তোমার কি মত্?"—বিনয়-বাবু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন—কারণ ঐ শ্রীমুখ থেকে হুকুম না নিয়ে কোন কিছু স্থির করা তাঁর অভ্যাস নয়।

সেন-গিন্নী বল্‌লেন, "আমার মত্ আর নেওয়া কেন? আমি যদি বলি পুরী যাব, অম্‌নি তুমি বল্‌বে জগন্নাথ নিশ্চয়ই আমার ইষ্টদেবতা, আর তোমার ছেলেও বল্‌বে তা কুসংস্কার, কাজেই আমি আর কোন মতামতই দিতে চাই না।"

বিনয়-বাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "আমি আর কিছু বল্‌ব না, তুমি ক্রোধ সংবরণ ক'রে মত্ দাও। পুরীতে যেতে তোমার আপত্তি নেই তো?"

সেন-গিন্নী তখনো যে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন নি, সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন, "যেতে চাও যাও, আমার আর আপত্তি কি?"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "বেশ, তোমার কোন আপত্তি না থাক্‌লেই হোলো। তাহ'লে আমরা পুরীতেই যাব।"

সুমিত্রা পুলকিত হয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "ওহো, কি মজা।

দিদি, এইবারে আমরা সমুদ্র দেখ্‌ব! হ্যাঁ বাবা, সমুদ্রের ঢেউ কত উঁচু?"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "তা সাত-আট ফুট উঁচু হবে।"

সুমিত্রা কেতাবে পড়েছিল, সমুদ্রের তরঙ্গ পর্ব্বত-প্রমাণ। সে ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্‌লে, "মোটে সাত-আট ফুট? পুরীর সমুদ্র তাহ'লে খুব ছোট বুঝি?"

—"জিওগ্রাফিতে পড়নি, পুরীর সমুদ্রকে 'বে-অফ বেঙ্গল' বলে? বড় বড় সমুদ্রের তুলনায় পুরীর সমুদ্র ছোট বৈকি! কিন্তু খালি চোখে তুমি পুরীর সমুদ্রকেও ছোট ব'লে বুঝ্‌তে পারবে না। আর ছোট হ'লেও পুরীর সমুদ্রের মত ঢেউ অনেক বড় বড় সমুদ্রেও নেই। ঝড় হ'লে তার ঢেউ আবার আরো ঢের বেশী উঁচু হয়ে ওঠে।"

সুমিত্রা কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বল্‌লে, "তাহ'লে আমরা কবে যাব বাবা?"

—"আগে বাড়ী ঠিক হোক্, তবে তো যাওয়ার কথা।'

এমন সময়ে চাকর এসে খবর দিলে, মাষ্টার-বাবু এসে ব'সে আছেন।

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "কে? রতন-বাবু? আচ্ছা, বাবুকে এইখানে নিয়ে আয়, আমার দর্‌কার আছে।"

খানিক পরে রতন এসে ঘরে ঢুকে সকলকে অভিবাদন কর্‌লে।

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "রতন, দয়া ক'রে আমার একটা উপকার কর্‌বে?"

রতন বল্‌লে, "কি, বলুন।"

—"আমার শরীরটা বড় খারাপ হয়ে পড়েচে, মনে কর্‌চি কিছুদিন পুরীতে গিয়ে হাওয়া বদলে আস্‌ব। কিন্তু সমুদ্রের ঠিক ধারেই একখানা বেশ ভালো বাড়ী চাই। তুমি গিয়ে দেখে-শুনে একখানা বাড়ী ঠিক ক'রে আস্‌তে পার্‌বে? অবশ্য, তোমার যদি অসুবিধে হয়, তাহ'লে আমি—"

—"না, না, এতে আর আমার অসুবিধে কি? কবে যেতে হবে, বলুন।"

সুমিত্রা বল্‌লে, "রতন-বাবু, দয়া ক'রে আজকেই যান, —সমুদ্রের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে আমার প্রাণটা যেন আন্‌চান্ ক'রে উঠ্‌চে, আর একটুও তর্ সইচে না!"

সেন-গিন্নী বিরক্ত স্বরে বল্‌লেন, "সুমি, তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাকো! সব-তাতে হা-দ্যাখ্‌লাপনা আমার ভালো লাগে না।"

মায়ের কাছে ধমক খেয়ে সুমিত্রার মুখ কাঁচুমাচু হয়ে গেল। সে আস্তে আস্তে বিনয়-বাবুর কাছে ঘেঁসে গিয়ে বস্‌ল।

রতন সুমিত্রার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "বেশ, আমি আজকেই যাব।"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "আচ্ছা, তাহ'লে ষ্টেশনে যাবার আগে আমার বাড়ী হয়ে যেও। আজ এইখানেই তোমার খাওয়ার নিমন্ত্রণ। ইতিমধ্যে তোমার জন্যে আমি একখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটও আনিয়ে রাখ্‌ব।"

রতন বল্‌লে, "আপনার নিমন্ত্রণ আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ কর্‌লুম—কিন্তু মাপ কর্‌বেন, টিকিট আমি নিতে পার্‌ব না!"

—"কেন রতন?"

—"টিকিট আমি নিজেই কিন্‌ব—তবে সেকেণ্ড্ ক্লাসের নয়, থার্ড্ ক্লাসের।"

বিনয়-বাবু হাসি-হাসি মুখে খানিকক্ষণ রতনের মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বল্‌লেন, "আচ্ছা রতন, টিকিট তুমি নিজেই কিনো।"

রতন চ'লে গেলে পর সন্তোষ বল্‌লে, "বাবা, লোকটার জাঁক দেখেচ! আমার তো আর সহ্য হচ্ছিল না!"

বিনয়-বাবু ভুরু কুঁচ্‌কে বল্‌লেন, "জাঁক? রতনের জাঁক আবার কিসে দেখ্‌লে?"

কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "আপনি ওকে নিজে সেকেণ্ড্ ক্লাসের টিকিট কিনে দিতে চাইলেন, ও কিন্তু তা নিতে রাজি হোলো না। আবার জাঁক জানিয়ে বলা হোলো, আমি নিজে থার্ড্ ক্লাসের টিকিট কিনে যাব!"

সন্তোষ বল্‌লে, "চাকর হয়ে মনিবের মুখের ওপরে কথা!"

বিনয়-বাবু অসন্তুষ্ট স্বরে বল্‌লেন, "সন্তোষ, এমন

অন্যায় কথা আর কখনো বোলো না। রতন আমার চাকর নয়, আমিও ওর মনিব নই।”

কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, “কি-রকম, রতন কি আপনার মাইনে খায় না?”

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, “আমি যেমন রতনকে টাকা দি, তেম্‌নি তার বদলে রতনের শক্তির দানও কি আমি গ্রহণ করি না? এ তো বিনিময় মাত্র! আর, রতন যে বিনামূল্যে সেকেণ্ড্ ক্লাসে যাবার লোভও ত্যাগ করলে, এতে তো বরং তার মনুষ্যত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এ যদি জাঁক হয়, তবে আমার মতে এমন জাঁক প্রত্যেক মানুষেরই থাকা উচিত।”

কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, “কি জানি, এ ব্যাপারে মনুষ্যত্বের পরিচয় আমি তো কিছুই পেলুম না।”

বিনয়-বাবু অল্প-একটু হেসে বল্‌লেন, “তা যদি না পেয়ে থাকেন, তাহ'লে আপনাকে আর বুঝিয়েও কোন ফল নেই।”

সেন-গিন্নী লক্ষ্য করলেন, তাঁর স্বামীর কথা শুনে কুমার-বাহাদুরের মুখ কেমন ভার-ভার হয়ে এল।

তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দেবার জন্যে, স্বামীর দিকে চেয়ে তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, “আচ্ছা, পুরীতে আমরা কে কে যাব?”

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, ‘আমরা সকলেই।...আচ্ছা, রতনকেও যদি আমি সঙ্গে যাবার জন্যে অনুরোধ করি, তাতে তোমার অমত নেই তো? ছেলেটিকে আমার বড় ভালো লাগে।”

সেন-গিন্নী বল্‌লেন, “কিন্তু রতন তোমার অনুরোধ হয় তো রাখ্‌বে না। ছেলেটির সব ভালো, কিন্তু কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া ভাব, আমাদের সঙ্গে যেন ভালো ক'রে মিশ্‌তে রাজি নয়।”

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, “সেজন্যে আমরাই হয় তো দায়ী, আমাদের মধ্যে রতন হয় তো সমযোগ্যের মত মেশ্‌বার সুযোগ পায় না, সেও তাই তফাতে তফাতে থাকে! অথচ আনন্দের মুখে শুনেচি, তার বাড়ীতে রতন মাস-খানেকের মধ্যেই ঘরের ছেলের মত হয়ে পড়েচে। আনন্দের বাড়ীতে সে যখন অমন মন খুলে মেলামেশা করে, তখন এখানেও তা পারে না কেন? এর নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।”

সকলে কিছুক্ষণ নীরবে ব'সে রইলেন।

কুমার-বাহাদুর স্তব্ধভাবে সুনীতির মুখের পানে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর তিনি বল্‌লেন, “বিনয়-বাবু, আপনারা তাহ'লে সত্যি-সত্যিই পুরীতে চল্‌লেন?”

—“তা চল্‌লুম বৈকি! দিন-রাত রোগ আর মৃত্যু দেখে দেখে মন একেবারে জীর্ণ হয়ে পড়েচে!”

—“কতদিন থাক্‌বেন?”

—“মাস-দুয়েক—অবশ্য মন যদি টেঁকে।”

—“তাহ'লে এই মাস-দুয়েক আমাকে এখানে একলা প'ড়ে থাক্‌তে হবে?”

—“কেন, আপনিও আমাদের সঙ্গী হোন না!”

বিনয়-বাবুর মুখ থেকে ঠিক কথাটি বার করবার জন্যেই কুমার-বাহাদুর পুরী যাওয়ার প্রসঙ্গটি তুলেছিলেন। মনে মনে নিজের সাফল্যে অত্যন্ত খুসি হয়ে তিনি বল্‌লেন, “আমার তাতে বিশেষ-কিছু অমত নেই।”

নয়

বৈকালে চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুকটি দিয়েই আনন্দ-বাবু পরমানন্দে উচ্চারণ করলেন একটি সুদীর্ঘ আঃ!

—সঙ্গে সঙ্গে রতন এসে দরজার সাম্‌নে আবির্ভূত হোলো।

আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, “আরে, রতন যে! পুরী থেকে কবে ফির্‌লে?”

—“আজ সকালে।”

—“বিনয়ের জন্যে বাড়ী ঠিক্ করেচ?”

—“হ্যাঁ, একেবারে সমুদ্রের ওপরে।”

—“বোসো, বোসো! ক'দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়-নি! পূর্ণিমা, রতনের জন্যে—”

—“এক কাপ্ চা চাই তো বাবা? এই এনেচি”—বল্‌তে বল্‌তে হাসি-মুখে পূর্ণিমা ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

রতন আশ্চর্য্য স্বরে বল্‌লে,—"একি ভোজবাজি! আমি আস্‌তে না আস্‌তেই আমার জন্যে চা প্রস্তুত!"

পূর্ণিমা হেসে বল্‌লে, "ভোজবাজি নয় রতন-বাবু! আপনি যখন রাস্তা দিয়ে আস্‌ছিলেন, আমি জান্‌লা দিয়ে আপনাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলুম যে।"

—"নাঃ! আপনারা দুজনে মিলে আমাকে জোর ক'রে প্রথম শ্রেণীর 'চা'তাল ক'রে তুল্‌লেন দেখ্‌চি! এখন চা না খেলে মন আমার উস্‌খুস্‌ কর্‌তে থাকে।"

আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "ক্ষতি কি? এর জন্যে তোমাকে যখন অর্থ ব্যয় কর্‌তে হচ্ছে না, তখন বাক্য ব্যয় কর্‌বারও প্রয়োজন নেই।"

—"কিন্তু আনন্দ-বাবু, আপাততঃ মাস-দুয়েকের জন্যে পূর্ণিমা দেবীর স্বহস্তে প্রস্তুত তপ্তকাঞ্চনবর্ণ মধুমধুর চায়ের আস্বাদ থেকে আমাকে বঞ্চিত থাক্‌তে হবে।"

—"কেন রতন, তোমার এ কথার মানে কি?"

—"বিনয়-বাবু আমাকে নিমন্ত্রণ করেচেন, তাঁর সঙ্গে পুরী যাবার জন্যে।"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "আপনি তো ভারি স্বার্থপর রতন-বাবু! কল্‌কাতার এই ধুলো ধোঁয়া আর গণ্ডগোলের ভেতরে আমাদের ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে আপনার লজ্জা হবে না?"

রতন বল্‌লে, "আমি এখানে থাক্‌লেও কল্‌কাতার ধুলো ধোঁয়া আর গণ্ডগোল তো কিছুমাত্র কম্‌বে না!"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "কিন্তু আপনার গান গল্প আর কবিতা-আবৃত্তি শুনতে শুনতে কল্‌কাতার ঐ আপদ-গুলিকে আমরা যে অনায়াসেই ভুলে যেতে পারি!"

আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "রতন, পূর্ণিমার হাতের চা থেকে তোমাকেও বঞ্চিত হ'তে হবে না, তোমার সঙ্গ থেকে আমরাও বঞ্চিত হব না। আমি এক উপায় আবিষ্কার করেচি।"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "কি উপায় বাবা? রতন-বাবুকে বন্দী ক'রে রাখ্‌বেন?"

—"উঁহু, আমরাও পুরী যাত্রা কর্‌ব।"

পূর্ণিমা সানন্দে বাবার একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে নিয়ে বল্‌লে, "বাবা, তাহ'লে আমি যে কি খুসিই হব! আমি কখনো কল্‌কাতার বাইরে যাই-নি!"

—"বিনয়ও আমাকে পুরী যাবার জন্যে ক'দিন ধ'রে অনুরোধ কর্‌চে। আমি যাব শুন্‌লে সেও খুব খুসি হবে। কিন্তু রতন, বিনয়ের জন্যে যেখানে বাড়ী ঠিক ক'রে এসেচ, তার কাছাকাছি সমুদ্রের ধারে আর কোন ভালো বাড়ী ভাড়া পাওয়া যাবে তো?"

—"তা কেন যাবে না? পুরীতে গিয়ে এক ভদ্র-লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েচে, বলেন তো তাঁকে চিঠি লিখে এখনি সব ঠিক ক'রে ফেলি।"

—"বেশ, তাই কর—আমরা সকলে একসঙ্গেই যাব।"

—"কিন্তু আপনাদের মতন দু দুজন বড় ডাক্তার একসঙ্গে কল্‌কাতা ত্যাগ কর্‌লে রোগী-সমাজে আর্ত্তনাদ প'ড়ে যাবে যে!"

—"সে আর্ত্তনাদ শোন্‌বার জন্যে এখনো ঢের লোক সাগ্রহে অপেক্ষা কর্‌চে। আমরা চ'লে গেলে তারা দুদিন আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌বে।"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "রতন-বাবু, আপনার হাতে ওখানা কি বই?"

—"মুলারের 'My System for Ladies,'—আপনার জন্যেই এনেচি।"

—"আমার জন্যে? কৈ, দেখি!" রতনের হাত থেকে বইখানি নিয়ে, খানকয়েক পাতা উল্টে পূর্ণিমা বল্‌লে, "এই বই আপনি আমার জন্যে এনেচেন? এ তো দেখ্‌চি ব্যায়ামের বই!"

—"হ্যাঁ, মেয়েদের ব্যায়ামের বই।"

—"এ বই প'ড়ে আমার কি লাভ হবে?"

—"খালি প'ড়ে কোন লাভ নেই, কিন্তু ঐ বইয়ের কথা-মত ব্যায়াম কর্‌লে আপনি যথেষ্ট উপকার পাবেন।"

পূর্ণিমা কৌতুক-ভরে হেসে উঠে বল্‌লে, "ব্যায়াম? আমি ব্যায়াম কর্‌ব? কেন রতন-বাবু, আমি তো কোনদিন আপনার কাছে পালোয়ান হবার জন্যে লোভ প্রকাশ করিনি!"

—"ব্যায়াম তো খালি পালোয়ানেরই জন্যে নয়। ব্যায়ামের আসল উদ্দেশ্য, স্বাস্থ্যের উন্নতি। প্রতিদিনকার

জীবনযাত্রায় আমাদের দেহ-যন্ত্রে যে ক্ষয় হয়, ব্যায়াম তা পূরণ করে। এতে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার।"

—"কিন্তু রতন-বাবু, ব্যায়াম না ক'রেও তো আমি বেশ সুস্থ আছি।"

—"এখন হয়তো আছেন, কিন্তু দুদিন পরেই আপনাকে অকাল-জরা আক্রমণ করতে পারে। আর, আপনার ও-সুস্থতা হয়তো মনের ভ্রম। আপনার দেহের পরিপূর্ণতা লাভে আরো যে কতটা অভাব আছে, কিছুদিন ব্যায়াম করলেই সেটি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারবেন।"

আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "রতন, তুমি যা বলচ তা যুক্তিপূর্ণ বটে। কিন্তু যে-দেশে পুরুষরাই ব্যায়ামের কথা হেসে উড়িয়ে দেয়, সে-দেশে মেয়েরা তোমার কথার মানে ঠিক বুঝ্‌তে পারবে না।"

রতন বল্‌লে, "য়ুরোপ-আমেরিকার মেয়েরা নিয়মিত-রূপে পথে-ঘাটে বিচরণ করে। কিন্তু বাংলাদেশে খুব স্বাধীন পরিবারেও মেয়েদের সেটুকু অঙ্গসঞ্চালনের বা আলো-হাওয়া উপভোগের সুযোগ নেই। তাই এদেশেই মেয়েদের সর্ব্বাগ্রে ব্যায়াম করা উচিত। আমাদের সহরে শিক্ষিত মেয়েদের দেহগুলি দেখেছেন তো? নাকে চশ্‌মা, চোখ নিষ্প্রভ, রং পাণ্ডু, দেহ জীর্ণ-শীর্ণ, কোলকুঁজো—সবাই যেন এক-একটি মূর্ত্তিমান কেতাব-পড়া যন্ত্র! এঁরা কখনোই আদর্শ মাতাও হ'তে পারবেন না, আর সন্তানের জননী হবার জন্যে যে বিপুল জীবনী-শক্তির দরকার, তাও এঁদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সম্ভব নয়। হিসাব নিলে দেখ্‌বেন, মাতৃত্ব লাভের সময়ে শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যেই রোগ আর মৃত্যুর সংখ্যা হয় বেশী। দেহের দিকে মন না দেওয়ার দরুন্, লেখাপড়ার চাপে তাঁদের স্বাস্থ্য আরো শীঘ্র ভেঙে যায়।"

পূর্ণিমা মন দিয়ে রতনের কথা শুন্‌ছিল। সে বল্‌লে, "আচ্ছা রতন-বাবু, আপনি কি সত্যি-সত্যিই আমাকে ব্যায়াম করতে বলেন?"

রতন পরিপূর্ণ স্বরে বল্‌লে, "খালি আপনাকে নয়, আমি নিখিল বঙ্গের নারী-সমাজে এই আবেদন জানাতে চাই। কিন্তু আমি একাকী, আমার ক্ষীণ স্বর অতদূর পৌঁচচ্ছে না! য়ুরোপ আমেরিকা আজ এই সত্য বুঝ্‌তে পেরেচে, তারা জেনেচে যে, নারীত্বকে সবল ক'রে তুল্‌তে না পারলে দেশের পুরুষত্বও সবল হ'তে পারে না। দুর্ব্বল মায়ের ছেলে রুগ্ন ছাড়া আর কি হবে? বিশেষ ক'রে জার্ম্মানীতে আজকাল নারী-বিদ্যালয়ে দেহ-চর্চ্চার উৎসাহ জেগে উঠেচে। কেবল জাতি-গঠনের দিক্ দিয়ে নয়, সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়েও ব্যায়ামের একটা মস্ত উপযোগিতা আছে। বাঙালীর মেয়েদের মধ্যে ভালো গড়ন চোখে পড়ে খুব কম। ব্যায়াম এই কদর্য্যতা দুদিনেই দূর ক'রে দেবে—স্বাস্থ্য আর শক্তির সঙ্গে এই সৌন্দর্য্য লাভের সম্ভাবনাও বড় একটা কম কথা নয়!"

আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "পূর্ণিমা, রতন তোকে প্রলোভন দেখাচ্চে, কিন্তু এ প্রলোভনে পড়্‌লে কিছুমাত্র অপকারের ভয় নেই। তুই কিছুদিন পরীক্ষা ক'রে দেখ্ না!"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "আচ্ছা বাবা।"

ক্রমশঃ

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতীয় রাসায়নিকগণের গবেষণা

১৯২২ সালে ভারতীয় রাসায়নিকগণ গবেষণা করিয়া রাসায়নিক পত্রিকাসমূহে কত মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার একটি তালিকা নীচে মুদ্রিত করিলাম। ইউরোপীয় রাসায়নিকগণের সহযোগে যে যে গবেষণা করা হইয়াছে, তালিকায় তাহাও ধরিয়াছি।

রাসায়নিকগণের নাম	কর্ম্মস্থান	প্রবন্ধসংখ্যা
এ আর্ সিং এবং দীন্শা রতন্জী নান্জী		পাঁচ
এ এল্ নারায়ণ এবং ডি গুন্নায়া		এক
এ এল্ নারায়ণ এবং জি সুব্রহ্মণ্যম		এক
কানাইলাল গাঙ্গুলী		এক
কিশোরীলাল মৌদ্গিল্	ত্রিবন্দ্রম	তিন
কিশোরীলাল মৌদ্গিল্ এবং কে আর কৃষ্ণ আয়ার	ত্রিবন্দ্রম্	এক
কিশোরীলাল মৌদ্গিল্ এবং পি এন বৃদ্ধাচলম্	ত্রিবন্দ্রম	এক
কুবেরজী গোসাই নাইক্ এবং মহাদেব দত্তাত্রেয় অবসরে	বড়োদা	এক
ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়		এক
গোপাল সিং	লাহোর	এক
জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত	গাজীপুর	এক
জুলিয়াস্ হয়েব্নার ও জে এন্ সিং		এক
জে এফ্ থর্প্, জে পি সি চন্দ্রসেন এবং সি কে ইন্গোল্ড্		এক
জে এফ্ থর্প্ এবং বিরাজমোহন গুপ্ত		এক
জে এফ্ থর্প্ এবং শঙ্কর শ্রীধর দেশপাণ্ডে		এক
জে জে সাড্বরো এবং আর্ সি শাহ	বাঙ্গালোর্	এক
জে জে সাড্বরো এবং ডি ডি কার্বে	বাঙ্গালোর	দুই
জে পি সি চন্দ্রসেন এবং সি কে ইন্গোল্ড্		দুই
জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	ঢাকা	এক
জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	দুই
জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বি সি পাপাকন্স-টান্টিনো	কলিকাতা	এক
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ঢাকা	দুই
নীলরতন ধর	এলাহাবাদ	পাঁচ
নীলরতন ধর ও আর্ এম্ পুরকায়স্থ	এলাহাবাদ	এক
নীলরতন ধর ও এন্ এন্ মিত্র	এলাহাবাদ	এক
নীলরতন ধর ও নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়	এলাহাবাদ	দুই
নীলরতন ধর ও পি বি সরকার	এলাহাবাদ	এক
নীলরতন ধর ও ফণীভূষণ গাঙ্গুলী	এলাহাবাদ	দুই
নীলরতন ধর ও বি সি বন্দ্যোপাধ্যায়	এলাহাবাদ	এক
প্রফুল্লচন্দ্র গুহ	কলিকাতা ও ঢাকা	দুই
(স্যার্) প্রফুল্লচন্দ্র রায়	কলিকাতা	এক
(স্যার্) প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং রাধাকিষেন্ দাস	কলিকাতা	এক
প্রিয়দারঞ্জন রায় ও পুলিনবিহারী সরকার	কলিকাতা	এক
ফণীভূষণ গাঙ্গুলী ও বি সি বন্দ্যোপাধ্যায়	এলাহাবাদ	এক
বাবা কর্তার্ সিং	কটক	এক
বাবা কর্তার্ সিং, রঘুনাথ রায়, এবং রতনলাল	কটক	এক
মদ্যার্ গোপাল রাউ এবং জে এল্ সাইমন্সেন্	ডেরাডুন	এক
মেঘনাদ সাহা	কলিকাতা	এক
রমেশচন্দ্র রায়		দুই
রসিকলাল দত্ত ও বিভুচরণ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	এক
রামবেঙ্কটসুব্বা বেঙ্কটেশ্বরন্		এক
শান্তিস্বরূপ ভটনাগর	বারাণসী	দুই
শিখীভূষণ দত্ত	ঢাকা	দুই
শিখীভূষণ দত্ত ও অনুকুলচন্দ্র সরকার	ঢাকা	দুই
শিখীভূষণ দত্ত ও এড্উইন্ রয় ওয়াট্সন্	ঢাকা	দুই
শিখীভূষণ দত্ত ও নির্ম্মলকুমার সেন	ঢাকা	এক
শ্রীকৃষ্ণ		এক
শ্রীকৃষ্ণ এবং এফ্ জি পোপ		এক
সি ভি রামন্	কলিকাতা	চারি
স্নেহময় দত্ত	কলিকাতা	দুই
হরিদাস সাহা এবং কুমুদনাথ চৌধুরী	ঢাকা	এক
হাওআর্ড্ জেমস্ উইঙ্ক্ এবং ভি এল্ চন্দ্রাত্রেয়		এক
হারল্ড্ এড্ওয়ার্ড্ য়্যানেট্ এবং এম্ এন্ বসু	কানপুর	এক
হেমেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত এবং ষ্টান্লী হর্উড্ টাকার্		এক

সকল রাসায়নিকের কর্ম্মস্থান আমরা জানিতে পারি নাই ; যাহা লিখিত নাই, পরে কেহ তাহা জানাইলে ছাপিব। যাহা ছাপিলাম, তাহা হইতে দেখা যায়, কলিকাতা ভিন্ন ভারতবর্ষের, আরও অনেক স্থানে রাসায়নিক গবেষণা হইতেছে। আরম্ভ অবশ্য কলিকাতায় হইয়াছিল। কলিকাতায় যে-সব গবেষণা হইয়াছিল, সেইগুলিরই গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কি না জানি না।

এত ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন জাতির লোক দ্বারা গবেষণা হওয়া সুখের বিষয়। কারণ, তাহা হইতে বুঝা যায়, গবেষণার ক্ষমতা বাঙালীর মধ্যেই আবদ্ধ নহে।

সম্প্রতি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের এক সভায় এই মর্ম্মের বড়াই করা হইয়াছিল, যেন "বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা" নামের উপযুক্ত কাজ কলিকাতাতেই হয়, আর কোথাও হয় না।

কলিকাতায় বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের গবেষণাতে যে খাঁটির সঙ্গে মেকি আছে (এমন কি চুরিও আছে) তাহা আমরা অনেক বার দেখাইয়াছি। বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের গবেষণা কলিকাতা ব্যতীত অন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে (যথা মান্দ্রাজ, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, প্রভৃতিতে) হইতেছে। কলিকাতার সাহিত্যিক গবেষণা যে নিভুর্ল নয়, নব্যভারত হইতে অন্যত্র উদ্ধৃত একটি প্রবন্ধে তাহা দৃষ্ট হইবে।

বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের দ্বারা অনেক খাঁটি গবেষণাও হইয়াছে, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য; কিন্তু বড়াই করা ও নিজেই নিজের ঢাক পিটান ভাল নয়।

—

মুসলমানী নাম

ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে এখনও কোন হিন্দু খৃষ্টিয়ান্ হইলে তাহার নাম আগাগোড়া এমনভাবে বদ্‌লাইয়া দেওয়া হয়, যে, কেবল মাত্র নাম দেখিয়া তাহাকে ইউরোপীয় বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। এই রীতি পরিত্যক্ত হইতেছে। মানুষ যে-দেশে জন্মে, তাহার নাম সেই দেশের ভাষায় হওয়াই স্বাভাবিক।

মুসলমানদের নাম প্রধানতঃ আরবী ভাষা হইতে গৃহীত হয়। কোন বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহার নাম এমন পরিবর্ত্তিত হয়, যে, তাহার নাম হইতে জন্মস্থান, বংশ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন অনুমান করা যায় না। অবশ্য এ দেশের মুসলমানী অনেক নামেও ভারতীয় শব্দ থাকে; যথা—নবাব আলী চৌধুরী, আলীভাই জীবনজী, মহম্মদ কালাচাঁদ, প্রভৃতি নামে চৌধুরী, ভাই, জীবনজী ও কালাচাঁদ, কথাগুলি ভারতীয়। অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানদের নামে কিন্তু এরূপ ভারতীয়ত্ব থাকে না।

কিন্তু কোন ইংরেজ মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহার নাম বেমালুম বদ্‌লিয়া যাইবেই, এমন কোন নিয়ম দেখা যায় না। বোম্বাই ক্রনিক্লের সম্পাদক মিষ্টার্ মার্মাডিউক পিক্‌থল (Mr. Marmaduke Pickthall) মুসলমান, কিন্তু তাঁহার নামটি ইংরেজীই আছে। লাহোরের দৈনিক নেশ্যনের সম্পাদক ও এলাহাবাদের দৈনিক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিষ্টার ডি জি আপ্‌সন (Mr. D. G. Upson) একজন ইঙ্গ-ভারতীয় মুসলমান। তাঁহার নামটাও ইংরেজীই আছে। সুতরাং অনুমান হয়, যে, মুসলমান মাত্রেরই নাম আরবী হইতে হইবে, এরূপ কোন ইস্‌লামিক ধর্ম্মবিধি নাই। যদি থাকে, তাহা হইলে তাহা ইংরেজ ও ইঙ্গ-ভারতীয়ের প্রতি কেন প্রযুক্ত হয় না, বলিতে পারি না। যদি না থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় মুসলমানদেরও ভারতীয় ভাষা অনুযায়ী নাম রাখায় কোন বাধা নাই; এবং তাহা হইলে ইংরেজ যেমন নিজেকে ইংলণ্ডীয় ভাবিয়া গৌরব বোধ করেন, ভারতীয় মুসলমানেরা যখন আপনাদিগকে ভারতীয় ভাবিয়া সেইরূপ গৌরব বোধ করিবেন, তখন তাঁহাদেরও নাম ভারতীয় ভাষা হইতে গৃহীত হইবে।

—

কলিকাতায় পাপের ব্যবসা

কেবল আইন দ্বারা কোন পাপ নির্ম্মূল করা যায় না, ইহা সত্য কথা; কিন্তু পাপ নিবারণ ও বিনাশের পক্ষে আইন অনেকটা কাজে লাগিতে পারে, ইহাও সত্য। সেইজন্য অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় পাপের ব্যবসা বন্ধ করিবার জন্য যে আইন করাইতে ইচ্ছুক, আমরা তাহার উদ্দেশ্যের সমর্থন করি।

এই ব্যবসা নির্ম্মূল করিতে হইলে, তিন শ্রেণীর লোকের বিষয় ভাবিতে হইবে; (১) যে-সব স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হয়, (২) যে-সব পুরুষের জন্য এই সর্ব্বনাশ হয়, (৩) অন্য যে-সব স্ত্রীলোক ও পুরুষ পতিতা নারীদের উপার্জ্জন দ্বারা লাভবান্ হয়। যে-সব বালিকা ও যুবতীর সর্ব্বনাশ হয়, তাহারা কেন এ-পথে আসে, নিজে না

আসিলে কি কি প্রলোভন দেখাইয়া বা কি কি উপায়ে তাহাদিগকে সংগ্রহ করা হয়, এসব জানা দরকার; জানিতে পারিলে সব পথঘাট বাঁধিবার চেষ্টা করা যায়। বাল্য-বিবাহের ও চিরবৈধব্যের সহিত এই সামাজিক কলুষের সম্বন্ধ কি, শহরে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের অত্যন্ত সংখ্যাধিক্যের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ, এই সংখ্যাধিক্য নিবারণের বা হ্রাসের উপায় কি, ইত্যাদি প্রশ্নেরও আলোচনা আবশ্যক আলোচনার ফলে যে জ্ঞানলাভ হইবে, তাহাতে প্রতিকারের সুবিধা হইবে।

পতিতা স্ত্রীলোকদের মত তাহাদের সংসর্গী পুরুষেরাও পতিত। ইহাদের সামাজিক শাসন ও সংশোধনের ব্যবস্থা না হইলে কেবল পতিতা স্ত্রীলোকদিগকে শাসাইলে ও তাহাদিগকে ঘৃণা করিলে কোন ফল হইবে না। ধর্ম্ম-নৈতিক নিয়ম পুরুষস্ত্রীনির্ব্বিশেষে সমানভাবে প্রযুক্ত হওয়া চাই।

যত দিন পতিতা নারীদের দ্বারা সামাজিক কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা কুপ্রয়োজন হইলেও, তত দিন এই সামাজিক কলুষ থাকিবে। বাই-নাচের ও তাহাদের গানের আদর এখনও হিন্দু ও মুসলমান সমাজে আছে। সুতরাং পতিতা নারীদেরও একপ্রকারের আদর ঐ হিসাবে আছে। কারণ বাইরা ভদ্রমহিলা নহে। পতিতা নারীদের দ্বারা অভিনীত নাটকের ও তৎসংসৃষ্ট নাচ-গানের আদরও খুব আছে। সুতরাং সে হিসাবে পতিতা নারীদেরও এক-প্রকারের আদর আছে। কেন না থিয়েটারের পেশাদার অভিনেত্রীরা ভদ্রমহিলা নহে। এই দুরকম প্রয়োজন থাকিতে সামাজিক কলুষ অপনয়ন করা দুঃসাধ্য। ইহার প্রতিকার দুরকমে হইতে পারে। (১) পতিতা স্ত্রীলোকদের নাচ-গান দেখিবার শুনিবার সখ্ ত্যাগ করা ও তাহাদের নাচ গান বন্ধ করা; এবং থিয়েটারে পতিতা নারীদের অভিনয়, নাচ, গান, দেখিবার শুনিবার সখ্ ত্যাগ করা, এবং তদ্রূপ অভিনয়াদি বন্ধ করা। (২) যদি অভিনয় ও নৃত্যগীত সামাজিক স্থিতি ও কল্যাণের জন্য আবশ্যক বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ভদ্র-মহিলাদের দ্বারা ভদ্ররকমের অভিনয় নৃত্যগীত প্রবর্ত্তিত করা।

ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

পতিতা নারীদের অভিনয় নৃত্য-গীতের আমোদ ছাড়িব না, অথচ সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিব, এরূপ ভণ্ডামি চলিবে না; তাহাতে কোন ফল হইবে না।

পতিতা নারীদের পাপে লাভবান্ পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের ব্যবসা আইন দ্বারা বন্ধ করা যাইতে পারে।

বাই-নাচ যাহারা দেখে, কিম্বা বেশ্যাভিনীত নাটক যাহারা দেখে শোনে, তাহাতে তাহাদের অর্থাৎ দ্রষ্টা ও শ্রোতাদের অধোগতি হয় কি না, সচরাচর তর্ক ইহা লইয়াই হয়। সে তর্কের উত্থাপন এখানে করিতেছি না। আমরা বলিতেছি এই কথা, যে, বাই-নাচের প্রথা এবং বর্ত্তমানরকমের থিয়েটারের অভিনয় রাখিতে হইলে কতকগুলি নর্ত্তকী ও অভিনেত্রী চাই, এবং তাহারা পতিতা রমণী। "আমাদের চোখ-কানের তৃপ্তির জন্য কতকগুলি নারী চরিত্রহীনা হউক ও থাকুক, নতুবা আমরা নাচ গান অভিনয় দেখিতে শুনিতে পাইব না," এইরূপ ইচ্ছা কোন ভদ্র পুরুষ ও মহিলার পোষণ করা উচিত নয়।

পতিতাদিগকে শহরের মধ্যে বা বাহিরে কোথাও একটা জায়গায় একত্র রাখিবার প্রস্তাব কেহ কেহ করেন। কিন্তু তাহা হইলে যে-সব পুরুষের জন্য ইহারা পতিতা, তাহাদিগকেও আলাদা রাখিবার বন্দোবস্ত করা উচিত নয় কি?

—

ভারতীয় ফৌজ

ভারতীয়েরা ফৌজের পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ, আকাশযোদ্ধা, সব শাখাতেই যাহাতে ইংরেজের মত প্রবেশাধিকার ও শিক্ষা পায়, এবং যাহাতে ভারতেই বিলাতী স্যাণ্ডহার্ষ্টের মত সামরিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তৎপক্ষে অনেকদিন হইল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু উহার জুলাই মাসের অধিবেশনে সরকারী সামরিক অফিসারদের বক্তৃতায় বুঝা গিয়াছে, যে, গবর্ণমেণ্ট ওরকম কোন প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিবেন না; অর্থাৎ তাহারা ভারতে ইংরেজের সামরিক প্রাধান্য ছাড়িবেন না, কমাইবেন না।

কয়েকটি ছোট ছোট সৈন্যদলে কেবল ভারতীয় অফিসার রাখিবার কথা হয়। ভারতীয় অফিসারেরা তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণে রাজী নন; কেননা, এই চা'লের আসল মৎলব, ইংরেজ-ভারতীয়ের সাম্যসাধন নহে, ভারতীয় অফিসারদিগকে পৃথক্ ও নিকৃষ্ট করিয়া রাখা। তাই এখন গবর্ণমেণ্ট্ এই সঙ্কল্প করিয়াছেন, যে, সাণ্ডহার্ষ্ট হইতে যে অল্পসংখ্যক ভারতীয় অফিসার পাস্ হইয়া ক্রমশঃ বাহির হইবে, তাহাদিগকে একাইক ঐ পৃথক্কৃত সৈন্যদল-গুলিতে নিযুক্ত করা হইবে। অর্থাৎ যেমন এক সময়ে ষ্ট্যাট্যুটারী সিবিলিয়ান্ হইয়াছিল, কতকটা সেইরূপ।

চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না। চালাকি বুঝিবার ক্ষমতাও যে আমাদের নাই, তা নয়।

—

কৃষি ও ব্যাবসা শিক্ষা

"প্রবাসী"র কোন পাঠক নিজের নাম না দিয়া একটি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি বলেন, পল্লীগ্রাম অঞ্চলে উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন যে-সব জমী আছে, উহাতে ছাত্রদিগের দ্বারা আলু, বেগুন, লাউ, কুমড়া, শিম ইত্যাদি এবং কলাই প্রভৃতির চাষ করাইয়া উহাদের দ্বারা স্থানীয় হাটে বা বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিলে, এবং বিদ্যালয়-ফণ্ড্ হইতে পাইকারী দরে কাপড় কিনিয়া সাপ্তাহিক ছুটির দিন বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিলে, ও এই উভয়প্রকার কার্য্যের লভ্যাংশ যাহার যেরূপ প্রাপ্য সেই ছাত্রকে তদ্রূপ দিলে উহাদের চাষ ও ব্যবসা শিক্ষা হইবে, এবং কৃষিবাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিবে। এইজন্য রবিবারে বিদ্যালয় বন্ধ না দিয়া তিনি স্থানীয় হাটের দিনে ছুটি দিতে বলেন।

প্রস্তাবটি ভাল। বিদ্যালয়ের ফণ্ড্ এরূপ কাজের জন্য ব্যবহারে কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আপত্তি থাকিলে ইহার জন্য স্বতন্ত্র কিছু টাকা তোলা যাইতে পারে।

—

বিধবা-বিবাহ

শ্রাবণ মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু হয়। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নানাস্থানে সভা হয়। কিন্তু তিনি যাহাকে তাঁহার জীবনের প্রধান কাজ মনে করিতেন, এবং যাহাতে তাঁহার সাহস দয়া ও ন্যায়পরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেই বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা বাংলাদেশে সফল হয় নাই; যদিও দয়া ও ন্যায়পরায়ণতা এবং সামাজিক পবিত্রতা-রক্ষা ব্যতীত অন্য একটি কারণেও বাংলা দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। অন্যান্য অনেক প্রদেশের ন্যায় বাংলা দেশেও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। তা ছাড়া, এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এবং হিন্দুদের এক জাতির সহিত অন্য অন্য জাতির, এক উপজাতির সহিত অন্য উপজাতির, এক শাখা বা প্রশাখার সহিত অন্য শাখা বা প্রশাখার বৈবাহিক আদান-প্রদান হয় না। এই কারণে, পাত্রীর অভাবে অনেক পুরুষের বিবাহ হয় না, কিম্বা প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সে বালিকার সহিত বিবাহ হয়, কন্যাপণ-রূপ দূষিত প্রথা প্রচলিত থাকিয়া প্রশ্রয় পায়, এবং লোকসংখ্যা যথেষ্ট-রূপ না বাড়িয়া উহা হ্রাস পায়। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকিলে এই সকলের প্রতিকার সহজে হইতে পারে।

পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে একটি বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা আছে। এই সভা ১৯২২ সালে চারিশত তিপ্পান্নটি বিধবার বিবাহ দিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ঐ সালের রিপোর্টে সভা দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, যে, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে,

"The total number of widows is 5,11,809, and those of marriageable ages, viz. under 25 years, are 32,877, against which there have been 453 marriages. This is not even a drop in the ocean."

"বিধবাদের মোট সংখ্যা ৫,১১,৮০৯, এবং বিবাহযোগ্য বয়সের অর্থাৎ ২৫ বৎসরের নীচের বিধবাদের সংখ্যা ৩২,৮৭৭; তাহার মধ্যে ৪৫৩ জনের বিবাহ হইয়াছে। ইহা সমুদ্রে এক বিন্দুও নয়।"

বাংলা দেশ সম্বন্ধে সভা বলিতেছেন:—

"The society specially tried to push the work in Bengal, the home of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, the pioneer of the movement of widow remarriage in India; but it has failed owing to no response."

"সভা বাংলাদেশে কাজটি চালাইবার বিশেষ চেষ্টা করেন—বাংলা দেশ বিধবাদের পুনর্বিবাহ-দান-প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের
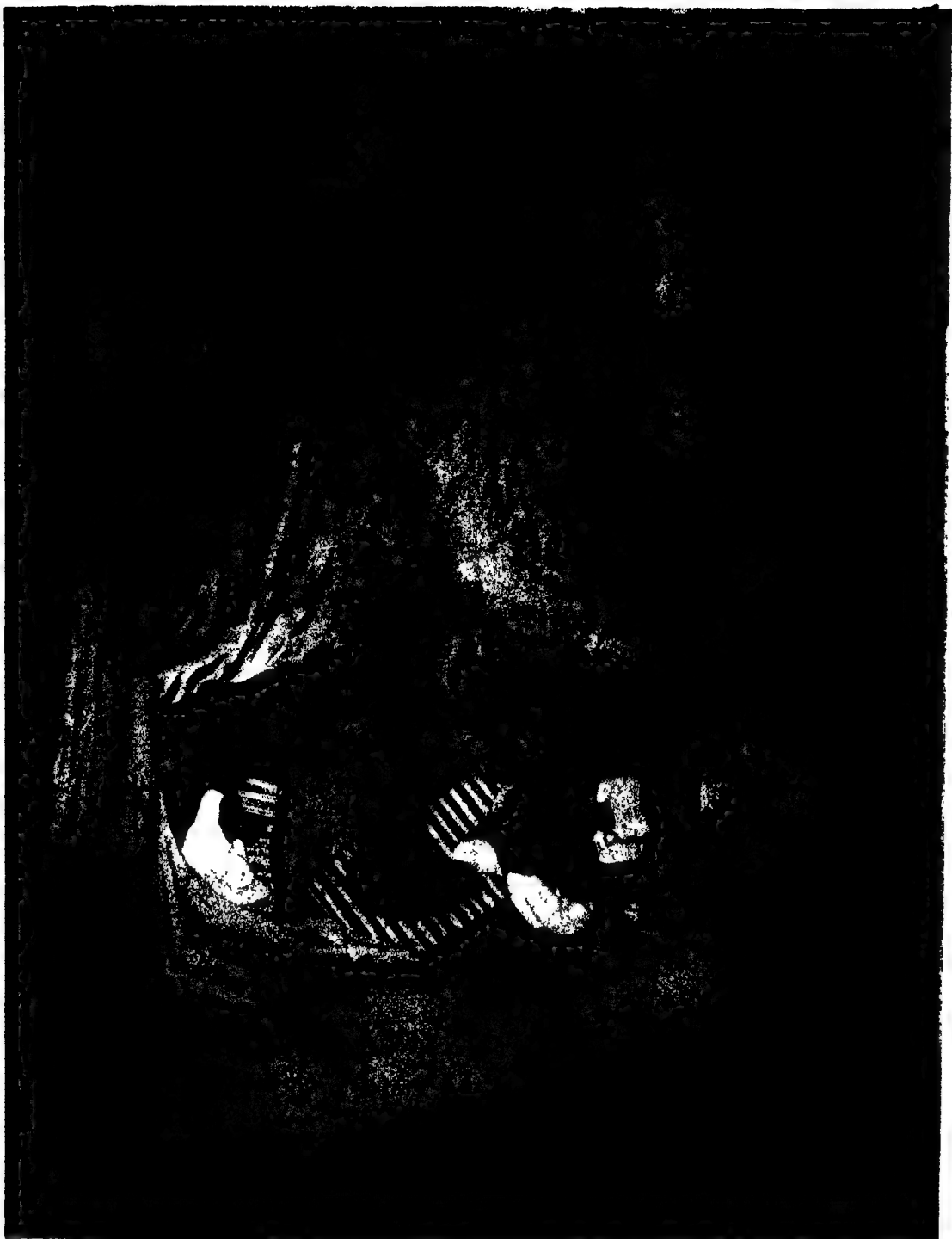
জয়দেবের মেলা—কেন্দুলী
চিত্রকর শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত।

U. RAY & SONS CALCUTTA

জন্মভূমি ; কিন্তু সভা কোন সাড়া না পাওয়ায় বাংলাদেশে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

এহেন বাংলা দেশে যদি কোন বৎসর একটি বিধবা-বিবাহও হয়, তাহাও উল্লেখযোগ্য এই কারণে, যে, তাহাতে প্রমাণ হয়, বাংলা দেশের মৃত্যু এখনও হয় নাই। সেইজন্য ইহা শুভসংবাদ, যে, মেদিনীপুরে একটি বিধবা-বিবাহ-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, এবং এই সমিতি সম্প্রতি একটি সদ্‌গোপজাতীয়া হিন্দু বালবিধবার বিবাহ দিয়াছেন। গত ৭ই শ্রাবণ তারিখে মেদিনীপুর শহরে বিশুদ্ধ হিন্দু মতে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ-সময়ে ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদ্‌গোপ ইত্যাদি জাতির অন্যূন দুইশত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। বিবাহান্তে সকলে আহারাদি করিয়াছিলেন। কন্যার পিতার নাম শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন মণ্ডল। তিনি মোক্তারী করেন। কন্যার ভ্রাতার নাম শ্রীযুক্ত সত্যেশ্বর মণ্ডল, বি এ, বি টি। তিনি ঘাটাল হাই স্কুলের সহকারী হেড্‌মাষ্টার। বরের নাম শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র মল্লিক, সাকিম সাঁকোটি।

এই বিধবাবিবাহ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভাগবত-চন্দ্র দাস, বি-এল, এই সংবাদ দিয়াছেন। সমিতির শুভ চেষ্টা সফল হইলে এবং উহার মত আরও সমিতি বাংলা দেশের সর্ব্বত্র স্থাপিত হইলে সমাজের কল্যাণ হইবে।

লাহোরের বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভা ১৯১৪-১৫ সালে স্থাপিত হয়। সে বৎসর ১২টি বিধবার বিবাহ হয়। তাহার পরবর্ত্তী সাত বৎসরে ক্রমান্বয়ে ১৩, ৩১, ৪০, ৯০, ২২০, ৩০৭, ও ৪৫৩টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে ;—মোট ১১৭৬। ইহার মধ্যে জাতিতে ব্রাহ্মণ ২১৪, ক্ষত্রিয় ২৭৯, অরোরা ২৭৫, আগরওয়াল ১৬৫, কায়স্থ ৫৩, রাজপুত ৪৮, শিখ ৩৬, বিবিধ ১০৬।

বর্ত্তমানে লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা মাসিক এক হাজার টাকা সাহায্য পাইয়া থাকেন। রায়-বাহাদুর স্যার্ গঙ্গারাম, সি আই ই, এই টাকা দেন। তিনি এপর্য্যন্ত বিধবাবিবাহের জন্য ৪২৬০০ টাকা দিয়াছেন। তা ছাড়া তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে একটি নিয়মিত ট্রষ্ট ফণ্ড্ স্থাপনার্থ দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন। ইহার বার্ষিক আয় আনুমানিক ৬০,০০০ টাকা হইবে, এবং ন্যূনকল্পে তাহার চতুর্থাংশ বিধবা-বিবাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। স্যার্ গঙ্গারাম ভারত-বর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত বা ধনী ব্যক্তি নহেন ; কিন্তু তিনি অতি মহৎ কাজ করিতেছেন।

—

স্ত্রীশিক্ষার জন্য দান

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দুবালিকা-বিদ্যালয়ের স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ-কল্পে আসামের গৌরীপুরের রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আশ্রমের একতলা নির্ম্মাণের সমগ্র ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কার্য্যারম্ভের জন্য আপাততঃ দশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

—

সংস্কৃত কলেজের কথা

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা এমনভাবে সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত হয়, যেন উহা কেবল গবর্ণ্মেণ্ট্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটা ঝগ্‌ড়ার বিষয়, যেন সাধারণের হিতাহিতের সহিত কিম্বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ন্যায়বিচারের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। আলোচনা এইভাবে হওয়ার ফল এই হয়, যে, লোকের মন সচরাচর গবর্ণ্মেণ্টের প্রতি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন থাকায় লোকে সকল সময়ে ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক-সংখ্যা গবর্ণ্মেণ্ট্ কমাইয়া দিবার আদেশ দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় উহার অধ্যক্ষকে, ঐ কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক কেন লুপ্ত হইবে না, তাহার কারণ দেখাইতে বলিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটি কোথায় দাঁড়ায়, দেখা যাক। আমাদের মনে হয়, গবর্ণ্মেণ্ট্ সংস্কৃত কলেজের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য উহার অধ্যাপক-সংখ্যা কমাইয়া না দিয়া, অপেক্ষাকৃত কম বেতনের লোকদিগকে উহাতে রাখিয়া বেশী বেতনের লোকদিগকে শিক্ষাবিভাগের অন্যত্র চালান করিয়া দিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আপত্তি খণ্ডিত হইতে পারে।

গবর্ণ্মেণ্ট্ যাহা করিতেছেন, তাহাতে অনেকগুলি

অধ্যাপকের প্রতি অত্যন্ত অবিচার হইতেছে। ইহাঁদের নাম- পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ; ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্ এ, পিএইচ্ ডি; শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ; শ্রীযুক্ত ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, এবং পণ্ডিত ধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ, পি আর্ এস্।

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রাচ্য বিভাগে (Oriental Departmentএ) কাব্য শ্রেণীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন, এবং তাহাতে গড়ে একজন ছাত্রও উপস্থিত হইত না বটে, কিন্তু তিনি আই এ ও বি এ ক্লাসও পড়াইতেন। তিনি কুড়ি বৎসর চাকরী করিতেছেন। তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিবার হুকুম যদি ব্যয়সংক্ষেপের জন্য হইয়া থাকে, তাহা হইল ঠিক ন্যায়বিচার হইয়াছে মনে হয় না; অন্য কোন কারণে হইয়া থাকিলে, তাহা না জানা পর্য্যন্ত কিছু বলিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ও ধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রীকে ১৯২০ সালে প্রাদেশিক সার্ভিসে লওয়া হয়। ইহার চাকুরিয়ারা দুই বৎসর পরীক্ষাধীন থাকেন। ১৯২৩এর জানুয়ারী পর্য্যন্ত সংশোধিত সিবিল্ লিষ্টে ইহাঁদের নামের পাশে পরীক্ষাধীন কর্ম্মচারী (probationer) বলিয়া লেখা নাই। নির্দ্দিষ্টকাল পরীক্ষাধীন থাকিবার পর ইহাঁরা ২৫০ হইতে ৩০০ টাকার শ্রেণীতে উন্নীতও হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাদিগকে কি প্রকারে পরীক্ষাধীন বলা যাইতে পারে, এবং সেই ওজুহাতে তাঁহাদিগকে নিম্নশিক্ষা সার্ব্বিসে (subordinate educational serviceএ) কেমন করিয়া অবনত করা যায়? পণ্ডিত ধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রীর মত যোগ্য লোককে ৭৫ টাকা বেতনের কাজে অবনত করা বড় অবিচার। এই তিন জনের সংস্কৃত কলেজের পদগুলি উঠাইয়া দিলেও, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সার্ভিসে ইহাঁদের যে যে স্থান ছিল, সেই স্থানগুলি বজায় থাকা উচিত। তাহা না হওয়ায়, ব্যাপারটি এখন এইরূপ দাঁড়াইতেছে, যে, যেহেতু ইহাঁরা (স্ব-ইচ্ছায় নহে) গবর্ণ্মেণ্ট্ কর্তৃক সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য ইহাঁরা অবনমিত হইতেছেন, অথচ ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের নীচের একুশ জন কর্ম্মচারীর এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের নীচের বার জন কর্ম্মচারীর পদ, শ্রেণী ও বেতন ঠিক থাকিতেছে! গবর্ণ্মেণ্টের সব বিভাগে এইরূপ নিয়মই আছে, যে, কোন কারণে কোন সার্বিসের কয়েকজনের অবনমন প্রয়োজন হইলে নিম্নতম কয়েকজনকেই নীচের সার্বিসে যাইতে হয়; কিন্তু শিক্ষাবিভাগ দেখিতেছি কতকটা উল্টা রাজার দেশ! এখানে কাটা ছাঁটা উপরের দিক্ হইতেই আরম্ভ হয়! শ্রীযুক্ত ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কুচবিহারের যে চাকরী করিতেন, তাহাতে পেন্সান্ আছে। তাঁহাকে এখানে কাজ দিবার সময় বলা হইয়াছিল, যে, তাঁহার কাজ স্থায়ী হইবে। সে কথা এখন কেন ভুলিয়া যাওয়া হইতেছে? ইহাঁদের সকলের প্রতি ন্যায়বিচার প্রার্থনীয়।

গবর্ণ্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী বিভাগ রাখিবেন কি না, তাহা বিবেচনা করিবার সময় যেন ইহা মনে রাখেন, যে, কেবল মাত্র সংস্কৃত কলেজেই পণ্ডিত শ্রেণীর লোকদের ছেলেরা মাসিক দুই টাকা বেতনে উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা পাইয়া আসিতেছেন, আর কোথাও এই সুবিধা নাই। অবৈতনিক শিক্ষাদান ও প্রাপ্তি আমাদের দেশের একটি চিরন্তন রীতি। সংস্কৃত কলেজের রীতি ইহার সদৃশ ছিল। তাহা রদ্ করা ঠিক হইবে না।

—

নব নব পত্রিকা

প্রতিবৎসরই দেখা যায়, বাংলা দেশে কতকগুলি নূতন খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব হয়। তাহার মধ্যে সকলগুলি বেশী দিন টিকিয়া থাকে না। বাংলাদেশেই যে এইরূপ দেখা যায়, তাহা নহে; ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও এইরূপ হয়, বিদেশেও হয়।

যাঁহাদের নূতন কিছু বলিবার আছে, চিন্তার উন্মেষ করিতে, মানুষকে নূতন প্রেরণা দিতে, নূতন পথে চালিত করিতে, যাঁহারা ইচ্ছুক ও সমর্থ, নূতন আনন্দ যাঁহারা মানুষকে দিতে চান, তাঁহারা যদি পুরাতন খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রিকাগুলির দ্বারা তাহা করিবার অবাধ বা যথেষ্ট সুযোগ না পান, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে নিজেদের কাগজ বা মাসিক পত্র বাহির করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক।

সমাজসংস্কার, ধর্ম্মসংস্কার, নৈতিক সংস্কার, প্রভৃতির

জন্মও কখন কখন নূতন কাগজ বাহির করা দরকার হয়।

পুরাতন রাষ্ট্রনৈতিক দল কিম্বা কোন নবগঠিত রাষ্ট্রনৈতিক দল নিজেদের মত প্রচার এবং মত ও দলকে প্রবল করিবার জন্মও কখন কখন নূতন কাগজ বাহির করা আবশ্যক মনে করেন।

খবরের কাগজ ও মাসিক পত্র পরিচালন একটি ব্যবসাও বটে। ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেকে এই ব্যবসা করিয়া লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইয়াছেন। আমাদের দেশে দেশী কোন লোক এই ব্যবসা করিয়া অত টাকা লাভ ও সঞ্চয় করিতে না পারিলেও, কেহ কেহ যে ধনশালী হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন প্রকার দুর্নীতি, ব্যসন, অপকৃষ্ট রুচি, প্রভৃতির সহায়তা না করিয়া, বা তাহাকে প্রশ্রয় না দিয়া, এই ব্যবসার দ্বারা যদি কেহ অর্থশালী হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহা কখনই দোষের বিষয় নহে।

প্রধানতঃ যে-যে কারণে নূতন নূতন কাগজের আবির্ভাব হয়, তাহা উপরে লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে-কোন কারণে বা উদ্দেশ্যেই কেহ কাগজ বাহির করুন, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকা উচিত নয়। কিন্তু যাঁহারা কাগজ বাহির করেন, তাঁহাদের ভাবিবার কথা অনেক আছে।

যাঁহারা নূতন কথা শুনাইতে, নূতন আলোক প্রেরণা আনন্দ দিতে উৎসুক, তাঁহাদের ভাবা উচিত, যে, তাঁহাদের চিন্তা ভাব ও মানসী সৃষ্টি এত অধিক কি না, যে, তাহার জন্ম একখানি নূতন মাসিক পত্রের দরকার। যদি অধিক না হয়, তাহা হইলে একখানি বা একাধিক পুস্তিকা বা পুস্তক লিখিলে চলে না কি? যদি নূতন কিছু দিবার জন্মই কোন পত্রিকার আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে লেখার জন্ম পরিচালকদের প্রধানতঃ নিজেদের উপর নির্ভরই স্বাভাবিক। অতএব যদি দেখা যায়, যে, কোন পত্রিকা বাহির হইবার পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনে লেখকদের নামের মধ্যে প্রধানতঃ তাঁহাদেরই নাম সর্ব্বাগ্রে ঘটা করিয়া লিখিত হইতেছে, যাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহাদের লেখা প্রকাশ করিবার জন্ম পত্রিকার অভাব নাই, বরং পত্রিকা-সম্পাদকরাই তাঁহাদের লেখা পাইতে উৎসুক—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে, প্রধানতঃ নূতন কিছু দিবার জন্ম পত্রিকাখানি বাহির করা হয় নাই, অন্য কারণ বা উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে। অবশ্য সেই কারণ বা উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ বৈধ ও নির্দ্দোষ হইতে পারে।

ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, নৈতিক সংস্কার প্রভৃতির জন্ম যে-সব কাগজ বাহির করা হয়, তাহার প্রতিষ্ঠাতারা প্রধানতঃ নিজেদের উপরই নির্ভর করেন,—যদিও তাঁহারা সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন শিল্প কলকারখানা বাণিজ্য যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কৃতী ও বিখ্যাত লোকদের নিকট হইতে স্ব স্ব সংস্কারের পোষক লেখা পাইতে চেষ্টা করেন এবং পাইলে সাদরে প্রকাশ করেন।

পুরাতন বা নূতন রাজনৈতিক মত ও দলকে পুষ্ট করিবার জন্ম যে-সব কাগজের আবির্ভাব হয়, তাঁহারাও লেখার জন্ম প্রধানতঃ নিজেদের উপরই নির্ভর করেন;—যদিও তাঁহারাও মানবজীবনের নানা বিভাগে বিখ্যাত লোকদের লেখা দ্বারা বা বক্তৃতার অনুলেখন দ্বারা নিজেদের মত সমর্থিত করিতে পারিলে আহ্লাদিত হন।

ব্যবসা হিসাবে যে-সব খবরের কাগজ ও মাসিক পত্র পরিচালিত হয়, তাহার পরিচালকেরা প্রসিদ্ধ ও লোকপ্রিয় লেখকদের রচনা পাইবার জন্ম স্বভাবতই ব্যগ্র হইয়া থাকেন।

কাগজ যে উদ্দেশ্যে বা যে কারণেই প্রচারিত হউক, তাহার একটা আর্থিক বা বৈষয়িক দিক্ আছে। উহাকে যদি নিজের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে মুদ্রাযন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের দাম দিতে হইবে, বাড়ী ভাড়া বা নির্ম্মাণ করিতে হইবে, মুদ্রাকর প্রভৃতি কর্ম্মচারীর বেতন দিতে হইবে, কালী শিরিশ্ প্রভৃতি কিনিতে হইবে। অপরের ছাপাখানায় ছাপাইতে হইলে ছাপাইবার খরচ দিতে হইবে। দপ্তরীর খরচও আছে। তা ছাড়া, কাগজ পাঠান, হিসাব রাখা, চিঠি লেখালেখি করা, প্রভৃতির জন্ম ও সম্পাদকীয় কাজের জন্ম, একটি আফিস চাই। তাহার খরচ আছে। যাঁহারা কাগজ চালাইবেন, তাঁহাদের ভাবা উচিত, যে, এই-সব

খরচ অন্ততঃ দুই এক বৎসর চালাইবার মত পুঁজি তাঁহাদের আছে কি না। আজকাল সভ্য দেশ মাত্রেই দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক ত্রৈমাসিক কাগজ আছে। যখন কোন কাগজ ছিল না, সবে মাত্র একটি কাগজ নূতন বাহির হইল, তখন সেই কাগজটির প্রতিষ্ঠাতাকে কি ভাবিতে হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই; আমরা বর্ত্তমান অবস্থারই আলোচনা করিব, এবং বাংলাদেশের অবস্থার বিষয় ভাবিব।

বঙ্গে বাংলা হিন্দি উর্দ্দু ও ইংরেজী ভাষায় নানা রকমের কাগজ আছে। বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজ আছে। সুতরাং এখানে কোন রকমের একটি কোন কাগজ বাহির করিবা মাত্র তাহা নিজের ব্যয়নির্ব্বাহে সমর্থ হইয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যায় না। সেইজন্য কিছুকাল ক্ষতি সহ্য করিয়াও কাগজ চালাইবার ক্ষমতা প্রবর্ত্তকদের থাকা দরকার।

নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার সামর্থ্য কাহাকে বলে, তাহা বুঝা আবশ্যক। কাগজ বাহির করিবার আগে প্রবর্ত্তকগণ বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহারা সাধারণতঃ ভাবী ক্রেতা ও গ্রাহকদিগকে অনেক আশা দেন, এবং নানাবিধ অঙ্গীকার করেন। এমন কোন কাগজ বোধ হয় নাই, যাহার সমুদয় গ্রাহক উহার সব রকম মত ও লেখার উপর সন্তুষ্ট। সুতরাং যখন পুরাতন কাগজের অসন্তুষ্ট গ্রাহকেরা নূতন কোন কাগজের বিজ্ঞাপন পড়েন, তখন তাঁহারা মনে করেন, এই কাগজখানা মনের মত হইবে—অথচ অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন,—আশা দেওয়া যত সোজা, আশা পূর্ণ করা তত সোজা নয়; অঙ্গীকার করা যত সোজা, অঙ্গীকার রক্ষা করা তত সোজা নয়, মানুষ যাহা করিতে ইচ্ছা করে ও করিতে পারিবে মনে করে, কাজে তাহা করিতে পারে না। তথাপি অতীত ও বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যৎকে বড়, ভাল ও মনোরম করিয়া ভাবিবার ও বিশ্বাস করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের আছে। এই প্রবৃত্তির বশে এবং বিজ্ঞাপনের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রথম প্রথম নূতন কাগজের এমন কতকগুলি গ্রাহক জুটে, যাঁহারা পুরাতন কোন না কোন কাগজের অসন্তুষ্ট গ্রাহক ছিলেন। ইঁহাদের প্রদত্ত চাঁদা হইতে কয়েক মাসের খরচ চলিতে পারে। কিন্তু তাহা হইতেই তাড়াতাড়ি এই সিদ্ধান্ত করা ভুল, যে, কাগজখানা দাঁড়াইয়া গেল বা যাইবে। কাগজখানি এক বৎসর চলিবার পর যদি দ্বিতীয় বৎসরের গোড়ায় দেখা যায়, যে, স্বত্বাধিকারী প্রথম বৎসরের দরুন ছাপাখানা, কাগজওয়ালা, দপ্তরী, কর্ম্মচারী, বাড়ীওয়ালা প্রভৃতি কাহারও নিকট ঋণী নাই, সকলকেই তাঁহাদের প্রাপ্য দেওয়া হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে, কাগজখানির অবস্থা আশাপ্রদ। কিন্তু যদি দেখা যায়, যে, কাগজখানির নূতন বৎসরের জন্য যে চাঁদা আদায় হইতেছে তাহার সমস্ত বা কিয়দংশ পুরাতন বৎসরের দেনা শোধ করিবার জন্য ব্যয়িত হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে, উহার স্থায়িত্ব এখনও অনিশ্চিত।

অনেক গ্রাহক বৎসরের মধ্যে কোন মাসে গ্রাহক হইয়া পরবর্ত্তী বৎসরের সেই সময় পর্য্যন্ত চাঁদা দেন। এইজন্য নূতন বৎসর আরম্ভ করিবার সময় দেখা উচিত, যে, এই-প্রকার সমুদয় গ্রাহকের আরও যতদিন কাগজ পাওনা আছে, ততদিনের মূল্য, পুরাতন বৎসরের সমুদয় দেনা শোধ করিয়া, উদ্বৃত্ত আছে কি না। যদি না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, কাগজটি এখনও স্বব্যয়নির্ব্বাহক্ষম হয় নাই, উহা এখনও ঋণী আছে।

আমাদের নিজের কাগজ ছাড়া আগেকার কিম্বা বর্ত্তমান কোন কাগজের আর্থিক অবস্থা ঠিক অবগত নহি; কিন্তু আমরা যাহা জানি, তাহাতে প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেও কোন খবরের কাগজ বা মাসিক পত্র স্বব্যয়নির্ব্বাহক্ষম হইয়াছে, এ ধারণা আমাদের নাই।

এই-সব কারণে আমরা বলি, যখন কেহ কোন কাগজ বাহির করিবেন, তখন তাঁহাদের আর্থিক বা অন্তবিধ সামর্থ্য এরূপ থাকিলে ভাল হয়, যাহাতে তাঁহারা কয়েক বৎসর কাগজ চালাইতে পারেন।

নতুবা ফল এই হয়, যে, কাগজ বন্ধ হইয়া যায়, এবং পরিচালকগণ গ্রাহক ছাপাখানা কাগজওয়ালা দপ্তরী প্রভৃতির নিকট ঋণী থাকিয়া যান। এমন দৃষ্টান্ত আছে,

যে, কাগজ বন্ধ হইবার বা করিবার সময় উহার স্বত্বাধিকারী গ্রাহকদের প্রদত্ত চাঁদা বা চাঁদার অবশিষ্ট অংশ ও অন্যান্য লোকের পাওনা আপনা হইতেই শোধ করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু সাধারণতঃ স্বত্বাধিকারীরা ঋণ শোধ করিতে সমর্থ হন না। কাগজ বাহির করিবার সময়ই তাঁহাদের লোককে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায় ছিল, সাধারণতঃ ইহা মনে করিবার কারণ নাই—কোন কোন স্থলে যদিও ইহা সত্য।

ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, বা অন্য কিছুর সংস্কারের জন্য যে-সব কাগজ বাহির হয়, গ্রাহকদের চাঁদা হইতে বা নগদ বিক্রী হইতে তাহাদের খরচ (অন্ততঃ সদ্য সদ্য) চলিবার সম্ভাবনা খুব কম। এইজন্য প্রবর্ত্তকেরা নিজে খুব কষ্টে থাকিয়াও উহা চালাইতে পারিবেন কি না, কিম্বা কোন ফণ্ড্ বা সভা হইতে, বা চাঁদা করিয়া উহা চলিবে কি না, বিশেষ বিবেচনা করিয়া তবে উহা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। অবস্থার বিপাকে যাহাতে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, প্রবঞ্চক হইতে না হয়, সেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা সকলেরই কর্ত্তব্য, এই কর্ত্তব্য তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যাঁহারা জীবনের কোন বিভাগে মানুষকে উচ্চতর অবস্থায় লইয়া যাইতে ব্যগ্র।

খবরের কাগজ ও মাসিক পত্র যাঁহারা ব্যবসা-হিসাবে চালাইতে চান, তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যে, অন্যান্য ব্যবসার মত ইহাতেও মূলধনের প্রয়োজন। পাশ্চাত্য দেশ-সকলে অনেক কাগজ কোন না কোন ধনিকের (capitalistএর) সম্পত্তি ও মুখপত্র। বাংলা দেশেও এরূপ খবরের কাগজ ও মাসিক পত্র আছে। অতএব, যাঁহারা ব্যবসা-হিসাবে কাগজ চালাইতে চান, তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যে, তাঁহারা ধনিকদের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিলেন। যখন বঙ্গদর্শন, আর্য্য-দর্শন, সাধনা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেগুলি ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ও চালিত হয় নাই। এখন সে-দিন নাই। এইসব কথা বিশেষ করিয়া বলিবার কারণ এই, যে, শিক্ষিত ও যোগ্য লোকদের মধ্যে অনেকে বেকার অবস্থায় আছেন, শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে বেকার-সমস্যা গুরুতর হইয়াছে; এখন এই শ্রেণীর লোকদের অনেকেই পত্রিকা-পরিচালন উপার্জ্জনের উপায় মনে করিয়া হয় ত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। ইহা উপার্জ্জনের পথ নহে, বলিতেছি না; আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি, যে, অগ্রপশ্চাৎ বুঝিয়া কাজ করা ভাল, যাহাতে বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা ভবিষ্যৎ অবস্থা আরও খারাপ না হয়।

পাশ্চাত্য দেশসকলে লোকে যেমন উপার্জ্জনের জন্য আর দশ রকম কাজ করে, তেমনই অনেকে সাংবাদিকও (journalist) হয়; সাংবাদিক্য (journalism) তথাকার একটি প্রতিষ্ঠিত পেশা। এই কারণে তথায় এত সাংবাদিক আছেন, যে, পেশাদার সাংবাদিকদিগের মধ্যে নানা রাষ্ট্রনৈতিক মতের অকপট-অনুসারী লোক পাওয়া যায় (অবশ্য টাকার খাতিরে, কখন একমত কখনও অন্যমতের সমর্থক কাগজে কাজ করিবার লোক তথায় নাই, বলিতেছি না)। সেইজন্য কোন ধনিক যে-দলের লোক ও যে মতের সমর্থক, তাহার পোষণ ও প্রচার করিবার জন্য অকপটবিশ্বাসী লোক পাইতে পারেন। আমাদের দেশে সাংবাদিক্য (journalism) এখনও পাশ্চাত্য দেশের মত একটি প্রতিষ্ঠিত পেশা হয় নাই। এইজন্য এরূপ দেখা যায়, যে, হয় ত কোন সাংবাদিক এক সময়ে যে-দলের কাগজ চালাইতেন, পরে তাহার বিরোধী দলের কাগজ চালাইতেছেন, কিম্বা একই সময়ে পরস্পর বিরোধীদলের কাগজে লিখিতেছেন। সত্য সত্য মত পরিবর্ত্তনবশতঃ এরূপ হইলে ইহা দোষের কথা নহে। এমনও দেখা গিয়াছে, যে, একই ব্যক্তি একখানা কাগজে যাহা লিখিতেছেন, আর-একখানা কাগজে তাহার প্রতিবাদ বা খণ্ডন করিতেছেন। ইহা জানা কথা, যে, আন্তরিক বিশ্বাসবশতঃ মানুষ যখন লেখে, তখন তাহার লেখার যেমন জোর হয়, শুধু বা প্রধানতঃ উপার্জ্জনের জন্য লিখিলে তেমন জোর হয় না—মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইবার ক্ষমতা সে-লেখার বেশী থাকে না। এইজন্য আমাদের দেশের ধনিকদের মধ্যে যদি কেহ কাগজ বাহির করিয়া বেতনভোগী সম্পাদকদের দ্বারা তাহা চালাইতে চান, তাহা হইলে সম্পাদক-নির্ব্বাচন-কালে তাঁহাকে এমন লোক বাছিতে হইবে, যাঁহার লিপিচাতুর্য্য ত

আছেই, অধিকন্তু যাঁহার অকপট পূর্ব্ব মত নূতন কাগজটির মতের সঙ্গে এক। অকপট দেশসেবক বেতনভোগী সম্পাদক পাওয়া যায়; বেতন লইয়া কাজ করিলেই কোন চারিত্রিক হানি হয় না। কিন্তু ভাড়াটিয়া মত ও ভাড়াটিয়া লেখা দ্বারা দেশের কল্যাণ ত হয়ই না, কাগজও ব্যবসা হিসাবে এদেশে দাঁড়ায় কিনা সন্দেহ। "এদেশে" বলিবার কারণ এই, যে, আমাদের নানা দুর্গতিসত্বেও এখনও লোকের এই বিশ্বাস আছে ও বিশ্বাস করিবার কিঞ্চিৎ কারণও আছে, যে, সংবাদপত্রসকল দেশের কল্যাণের জন্য অকপট স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় ফরমাইস্ অনুযায়ী ভাড়াটিয়া মত ও ভাড়াটিয়া লেখা এদেশেও চলিতেছে; কিন্তু পাশ্চাত্য নানাদেশে যতটা চলিতেছে, এখনও এদেশে ততটা চলে নাই। এইজন্য দেশী ধনিকদের কাগজ এদেশে সব সময়ে ভাল না চলিতেও পারে। কেবল বেতনভোগী লোকদের দ্বারা চলে, মালিক লেখেন না, বা লিখিতে পারেন না, এমন কাগজ কলিকাতাতেই আছে; এবং ব্যবসাহিসাবেও ভাল দাঁড়ায় নাই, এই শ্রেণীর এরূপ কাগজের দৃষ্টান্তও কলিকাতা শহরে আছে।

—

ভীলদিগের সমাজ-সংস্কার

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের "ভারতের মানুষ" (Man in India) নামক নৃতত্ত্ব-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রে শ্রীযুক্ত এ ভি ঠাক্কর ভীলদিগের সমাজ-সংস্কার বিষয়ে একটি বহুতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শিক্ষিত ভারত-বাসী ইহা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন বলিয়া নিম্নে উহার অনুবাদ দেওয়া গেল।

"পাঁচ মহলের ভীল অধিবাসীগণ সমাজসংস্কার বিষয়ে সুরাটের বা বড়োদাব নবসারি প্রান্তের কালিপরজগণ অপেক্ষা কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহারা ঝালোদ তালুকের অন্তর্বর্ত্তী একটি গ্রামে অনেকে সমবেত হন। প্রায় পঞ্চাশখানি গ্রাম হইতে গ্রামের দলপতি এবং পাটেলগণ প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হন এবং বিবাহসংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং খরচাদি স্থির করেন। তাঁহারা আরো স্থির করেন, যে, উৎসব-সময়েও মদ্যপান করা হইবে না এবং পশুবধ করা হইবে না, প্রত্যহ স্নান করা হইবে, এবং নারীগণকে অসুবিধাজনক অলঙ্কার পরান হইবে না। তাঁহারা এই যে সকল বিষয়ে সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা একেবারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, বাহির হইতে কেহ তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করে নাই। মদ্যপানই তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর শত্রু।

"প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে গুরু গোবিন্দের প্রভাবে ইহাদের মধ্যে মদ্যপান পরিত্যাগের আদর্শ এবং অন্যান্য বহুপ্রকার সংস্কারের আদর্শ দেখা দেয়। ভীলদিগের ভিতর শত শত মানুষ এখনও তাঁহার শিষ্য। দলে দলে ভীল এখন এইসকল ভক্তদিগের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেছে এবং শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ বিষয়ক নিয়মাদি ও আহার বিহার প্রভৃতির সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছে। দক্ষিণ গুজরাটের কালিপরজদিগের মত ইহাদের সংস্কারের মূলে কোন দেবদেবীর আবির্ভাব ও আদেশ নাই। কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং প্রভাবশালী পাটেলই আপনাদের সম্প্রদায়গুলিকে যথার্থ হিতকর সমাজ-সংস্কারে নিয়োজিত করিয়াছেন।

"খোলা মাঠে গাছতলায় প্রায় এক হাজার ব্যক্তি সমবেত হয়। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

"(১) কন্যার পিতা বরের পিতার নিকট হইতে ১০১ টাকার বেশী পণ লইতে পারিবেন না। তাহার ভিতর ৫০৲ টাকা কন্যার অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যয় করিতে হইবে। যদি কেহ অধিক পণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দণ্ড স্বরূপ, যত টাকা অধিক গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করিতে হইবে। (২) বাগ্দানের সময় মদ্যের পরিবর্ত্তে গুড় বিতরণ করা হইবে। (৩) যুবক-যুবতী গোপনে পলায়ন করিলে তাহা আর বিবাহ বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। এবং কেহ যদি এইরূপ পলায়নে সাহায্য করে পঞ্চায়েত তাহাকে দণ্ডিত করিবেন। (৪) কেহ যদি অপরের বিবাহিতা পত্নীকে (যাহাকে পঞ্চায়েতের অনুমতি

অনুসারে তাহার স্বামী ত্যাগ করে নাই) আপন পত্নীরূপে রাখে, তাহাকে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করা হইবে, এবং স্ত্রীলোকটিকে তাহার পূর্ব্ব পতির নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। (৫) পঞ্চায়েৎ যদি মনে করেন, যে, বিবাহ-বিচ্ছেদের উপযুক্ত কারণ আছে, তাহা হইলে তাঁহারা কোন স্ত্রীলোকের আবেদনে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি দিতে পারেন। স্ত্রীলোকটির দ্বিতীয় স্বামী যদি কেহ থাকে, তাহা হইলে সে প্রথম স্বামীকে ১০০৲ টাকা এবং অন্যান্য খরচের টাকা দিবে। (৬) ঘরজামাই-গণকে সাত বৎসরের পরিবর্ত্তে পাঁচ বৎসর শ্বশুরের গৃহে বাস করিতে হইবে। (৭) বিবাহ এবং শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য ভোজের সময় মদ্যপান করা হইবে না। যদি কেহ এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, গ্রামের পাটেল বা ভগত (ভক্ত) তাহা উপরওয়ালাকে জ্ঞাত করিবেন। (৮) শ্রাদ্ধের সময়, রোগের সময় বা অন্য কোন সময়েই ছাগল বা গাভী বধ করা হইবে না। (৯) স্ত্রীপুরুষ সকলেই প্রত্যহ স্নান করিবে এবং শৌচাদির পর জল ব্যবহার করিবে। (১০) স্ত্রী-লোকগণ পায়ে 'ঝাঁঝরিয়া' নামক অলঙ্কার পরিবে না। (এইগুলি গোলাকার পিতলের চোঙ্গা হাঁটু হইতে গোড়ালী অবধি ঢাকিয়া রাখে। ইহা পরিলে চলাফেরা এবং ক্ষেতে কাজ করার ভয়ানক অসুবিধা হয়।) (১১) প্রধান প্রধান পাটেলগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইবে। ইঁহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া সকলকে এইসব নিয়ম শুনাইবেন এবং স্থানে স্থানে শাখাসমিতি স্থাপন করিবেন। এই শাখাসমিতিগুলি নিয়মাবলী ঠিক মত পালন করা হইতেছে কি না দেখিবেন এবং নিয়মভঙ্গের দণ্ডবিধান করিবেন।"

"অসভ্য" লোকেরা "সভ্য" "শিক্ষিত" লোকদের চেয়ে, সামাজিক প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্দ্ধারিত নিয়ম অধিকতর নিষ্ঠার সহিত পালন করে। এই কারণে, আমাদের বাংলার বরপণ-নিবারণী সভাসকলের প্রতিজ্ঞা অপেক্ষা ভীলদের নির্দ্ধারণগুলির অধিক মূল্য আছে মনে করি।

ভারতীয় করদ ও মিত্ররাজ্যে সুরাপান নিবারণ।

"আবকারী" পত্রে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মদ্যপান-নিবারিণী সমিতির ১৯২২-১৯২৩ সালের যে কার্য্যবিবরণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে, মিত্র ও করদ রাজ্যগুলিতে কি-প্রকার কাজ হইয়াছে, তাহার চুম্বক দেওয়া আছে।

"বেশীর ভাগ দেশী রাজ্যগুলিতেই পার্শ্বস্থিত ইংরাজ-শাসিত স্থানের অনুরূপ করিয়াই আবকারী বিভাগ পরিচালন করা হয়। আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি, যে, এই বৎসর কয়েক জায়গায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রচার করা হয়, যে, ভুপালের বেগম মহোদয়া তাঁহার রাজ্যে মদ্যব্যবসায় একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ভুপালের অধিবাসীর সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশী এবং ইহা হায়দ্রাবাদের পরেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মুসলমান রাজ্য। এতদিন ভুপালে প্রতিবৎসর আবকারী বিভাগ হইতে ৫০,০০,০০০ টাকা রাজস্ব লাভ হইয়াছে। এই টাকা আর পাওয়া যাইবে না, কিন্তু প্রজাদিগের অবস্থার উন্নতিই যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ বলিয়া গণিত হইবে, আশা করা যায়।

"বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ভাবনগর রাজ্যে ১৯২২ হইতে মদ্য প্রস্তুত এবং বিক্রয় করা একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে, এইপ্রকার আইন করিলে কিরূপ ফল হয়, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ঐপ্রকার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হয়, তাহাতে দেখা যায় যে লোকের সুখসম্পদ্ যথেষ্ট বাড়িয়াছে। ইহার পার্শ্বস্থ রাজ্য পালিটানাতেও এইপ্রকার নিষেধাত্মক আইন করা হইয়াছে। বড় বড় রাজ্যগুলি কিছু অল্প দৃঢ়তাসহকারে কাজ করিতেছেন। কিন্তু বিগত সেপ্টেম্বরে আমাদের সম্পাদক মহারাজ গায়কোয়াড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানেন যে এই আন্দোলনে তাঁহার পরিপূর্ণ সহানুভূতি আছে, এবং বড়োদাতে স্থানিক অধিবাসীবর্গের ইচ্ছার উপর মদের দোকান রাখা বা বন্ধ করা ছাড়িয়া দেওয়াতে সুফলই ফলিয়াছে। ইহা ভিন্ন শুনা যাইতেছে, যে, নিজামের রাজধানী হায়দ্রাবাদ হইতে মদ্যের দোকান একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

বিজ্ঞাপনের বাহন

খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রসমূহে সংবাদ থাকে, জ্ঞানপ্রদ লেখা থাকে, পড়িয়া সুখ হয় এরূপ গল্প থাকে, কবিতা থাকে, নানামতের বিবৃতি ও আলোচনা থাকে, ইত্যাদি। তা ছাড়া, তাহাদের দ্বারা আর-একটি কাজ হয়, এবং সেই কাজ নির্ব্বাহ হয় বিজ্ঞাপনের দ্বারা। বিজ্ঞাপনের দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। যাঁহাদের বিক্রী করিবার কিছু আছে, তাঁহারা জিনিষের নাম বর্ণনা, দাম, ও প্রাপ্তিস্থান লিখিয়া বিজ্ঞাপন দেন; এবং অনেক সময় যাঁহারা কোন রকমের মাল প্রচুর পরিমাণে চান, তাহা কে কি দরে দিতে পারেন, তাহা জানিবার জন্য বিজ্ঞাপন দেন। যাঁহারা কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে চান, শ্রমিক চান, তাঁহারাও বেতন প্রভৃতি সর্ত্তের উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপন দেন। আবার যিনি বেকার বসিয়া আছেন, তিনিও নিজের কিরূপ কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া কর্ম্ম-প্রার্থী হন। পাত্র বা পাত্রী বিবাহার্থী হইয়া স্বয়ং বিজ্ঞাপন দিতেছেন, পাশ্চাত্য দেশে ইহা দেখা যায়। আমাদের দেশেও বিবাহসম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন দেখা যায়, কিন্তু সাধারণতঃ তাহা পাত্রপাত্রী দেন না—বিশেষতঃ পাত্রী।

বিজ্ঞাপন কেমন করিয়া দিতে হয়, সে-বিষয়ে কিছু বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কোন্ কাগজে কিরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া কোন লাভ নাই, তাহাও বুদ্ধিমান্ বিজ্ঞাপনদাতারা ভাল করিয়া জানেন—নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর বা নিষ্ঠাবান্ মুসলমানের কাগজে কেহ বেকন্ ও হ্যামের বিজ্ঞাপন দেয় না, মেম্‌সাহেবদের কাগজে কেহ মল্ বা নোলকের বিজ্ঞাপন দেয় না। এগুলা খুব সহজ দৃষ্টান্ত। কিন্তু এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার সম্বন্ধে বলা সহজ নহে, যে কোন্ কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে জিনিষের কাট্‌তি বেশী হইবে। বাংলা কোন্ কোন্ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলে গহনা বেশী বিক্রী হয়, বা পুরুষোচিত খেলা ও ব্যায়ামের সরঞ্জাম বেশী বিক্রী হয়, কিম্বা ভাল বহি বেশী বিক্রী হয়, অথবা জঘন্য বহি বেশী কাটে, তাহা বলা সহজ নহে; কিন্তু ঐ ঐ জিনিষের বিজ্ঞাপন-দাতারা বোধ হয় অভিজ্ঞতার দ্বারা এবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। তবে, একটা বিষয় সহজেই চোখে পড়ে—এদেশের কাগজপত্রে ঔষধের বিজ্ঞাপন, বিশেষতঃ কুৎসিত রোগের বিজ্ঞাপন, বেশী। তাহার দ্বারা প্রমাণ হয়, যে, দেশ অস্বাস্থ্যকর, এবং দেশের নৈতিক অবস্থা ভারতভূমির আধ্যাত্মিকতার অনুরূপ নহে। ফলিত জ্যোতিষ, কোষ্ঠি, কবচ, প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন হইতেও দেশের লোকদের বিশ্বাস সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মে।

কোন্ কাগজে কোন্ জিনিষের বিজ্ঞাপন দিলে সুবিধা হইবে, তাহা ব্যবসাদারেরা নিজে পরীক্ষা দ্বারা বা অন্যের অভিজ্ঞতা হইতে স্থির করিতে পারেন বটে; কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ কাগজের কাট্‌তি অনুসারেই নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন—যে কাগজের কাট্‌তি যত বেশী, তাহাতে বিজ্ঞাপন দেওয়া তাঁহারা তত বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কিন্তু এখানে তাঁহারা একটু মুস্কিলে পড়েন। কাহার কাট্‌তি কত, তাহা কেমন করিয়া জানিবেন? বিজ্ঞাপনের অনেক এজেন্ট, নিজেরা যে-কাগজের এজেন্ট, তাহার কাট্‌তি বেশী করিয়া বলে, ও অন্য কাগজের কাট্‌তি কমাইয়া বলে; এবং কাগজের স্বত্বাধিকারী বা প্রকাশকেরাও সব সময়ে ঠিক্ খবর দেন না। বিলাতে ও আমেরিকায় কোন্ কাগজের কাট্‌তি কত, তাহা সর্ব্ব-সাধারণের জানিবার কি উপায় আছে বলিতে পারি না; কিন্তু তথাকার প্রধান প্রধান কাগজের কাট্‌তির কথা কোন কোন বহিতে দেখা যায়। যাহা হউক, আমাদের দেশেও, কোন্ কাগজের কাট্‌তি ঠিক্ কত, এবং কাহার কাট্‌তি নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা জানিতে না পারিলেও, বেশী রকম কাট্‌তি কোন্ কোন্ কাগজের আছে, তাহা চেষ্টা করিলে জানিতে পারা যায়।

কিন্তু যে-সব দেশের লোকে ব্যবসা বুঝে এবং বিজ্ঞাপনে কোটি কোটি টাকা খরচ করে, তাহারা শুধু কাট্‌তি দেখিয়াই কোন কাগজের বিজ্ঞাপনের বাহন হইবার যোগ্যতার পরিমাণ নির্ণয় করে না। তাহারা আরও কিছু দেখে। এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্বজ্ঞান-ভাণ্ডার। ইহার একাদশ সংস্করণে যে তিনটি নূতন ভলুম যোগ করিয়া দ্বাদশ সংস্করণ করা

হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয়টিতে খবরের কাগজ (News-papers) সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটিতে লিখিত হইয়াছে :—

In 1914, according to the Government census figures, the total amount derived by American newspapers from subscriptions and sales was 99,541,860 dollars, while the advertising revenues were nearly double this amount, the exact figure being 184,047,106 dollars. One of the clearest evidences of the actual influence of advertising was in the changing attitude towards circulation. Mr. Whitelaw Reid, for many years editor-in chief of the New York *Tribune*, wrote in 1900 that a great circulation, no matter among what classes, was then regarded as the only evidence of success and the only way to make a newspaper sold below cost ultimately a source of profit That was perhaps a natural theory to adopt in the days when the potency of advertising on a large scale was first being tested and exploited. Its fallacy was discerned even then by farsighted publishers and advertisers That the interests of advertising did not lie exclusively in a large circulation was perceived as early as 1891 by Mr. Adolph Ochs, who not only profited greatly by his discovery, but in his administration of the New York *Times* set an example which was of salutary effect throughout the country. In a speech delivered before the National Educational Association, Mr. Ochs, then the proprietor of a newspaper in Chattanooga (Tenn.), said: "It is not alone the circulation that the newspaper has that fixes its value as an advertising medium. It is more the character and standing of its readers, the appearance of the paper, its news features, its editorial ability and its general standing in the community." That was in 1891, the very moment when the "yellow" press was making its first success. Five years later Mr. Ochs acquired the New York *Times*, and set about to rebuild it, a task of formidable proportions, for the *Times*, inspite of an honourable history, was then struggling along with a circulation of hardly more than 10,000. Within 20 years the *Times* had built up a circulation of 325,000 (1916) and its total annual revenue was in the neighborhood of 5,000,000 dollars, two-thirds from advertising.

The encouraging example of the New York *Times* and a few other newspapers, notably the Chicago *Daily News* and the Kansas City *Star*, was coincident with an advance in the theory and practice of advertising which had widespread results. It came to be seen that the effect of an advertisement was influenced to a large degree by the character of the newspaper in which it appeared, and that an incredulous reader of the news columns was likely to be an incredulous reader of the advertisements. Experience also showed that the character of the circulation was quite as vital as its extent.

Thus the influence of advertising, coupled with a natural desire for prestige and authority, served to act as a corrective for some of the worst evils that had been noted in the American press. Towards the end of the decade there mas a marked improvement in the accuracy and impartiality of the news columns.

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহার সমস্তটির ঠিক অনুবাদ দেওয়া অনাবশ্যক। আমেরিকার লোকেরা খুব ব্যবসা বুঝে এবং তাহাদের ব্যবসাও বহুবিস্তৃত ও অনেক টাকার। ১৯১৪ সালে তাহারা শুধু বিজ্ঞাপনেই প্রায় ৬০ কোটি টাকা খরচ করিয়াছিল, এখন আরও বেশী করে। ইহা হইতেই তাহাদের ব্যবসার পরিমাণ বুঝা যায়। খবরের-কাগজ-ওয়ালারা ১৯১৪ সালে বিজ্ঞাপন হইতে ৬০ কোটি টাকা পাইয়াছিল, কিন্তু গ্রাহক ও নগদ ক্রেতাদের নিকট হইতে ৩০ কোটি টাকা পাইয়াছিল। আমাদের দেশী কাগজগুলির বিজ্ঞাপনের আয় গ্রাহক ও ক্রেতাদের প্রদত্ত টাকার দ্বিগুণ নহে। আমেরিকার ব্যবসাদারেরা কাগজের কি কি গুণ দেখিয়া তাহাতে বিজ্ঞাপন দেন, তাহা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য নীচে দিতেছি।

"কোনও সংবাদপত্রের কেবলমাত্র কাটতিই উহার বিজ্ঞাপনের বাহন হইবার যোগ্যতা নির্দ্ধারণের একমাত্র উপায় নহে। এই যোগ্যতা অধিকতর পরিমাণে নির্ভর করে, ইহার পাঠকগণ কিরূপ স্বভাবের, কি দরের, সামাজিক কি মর্য্যাদা ও অবস্থার মানুষ, তাহার উপর; কাগজখানার চেহারা কিরূপ, তাহার উপর; ইহাতে কত বিচিত্র রকমের পাঠ্য জিনিষ থাকে তাহার উপর; ইহার সম্পাদকের যোগ্যতার উপর; এবং দেশের লোকদের মধ্যে ইহার মর্য্যাদা কিরূপ তাহার উপর। এইরূপ ধারণা অনুসারে কাজ করিয়া নিউইয়র্ক টাইম্‌সের পরিচালক মিষ্টার অক্‌স্ উহার গ্রাহকসংখ্যা দশ হাজার হইতে সওয়া তিন লক্ষে পরিণত করেন, এবং ১৯১৬ সালে উহার আয় দেড় কোটি টাকা হয়, তন্মধ্যে বিজ্ঞাপন হইতেই এক কোটি।

"নিউইয়র্ক টাইম্‌স্ ও অন্য কয়েকটি কাগজের দৃষ্টান্ত হইতে ব্যবসাদারেরা বুঝিতে পারে, যে, কোন কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে তাহার ফল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে কাগজটির 'চরিত্রে'র উপর, অর্থাৎ কাগজখানির উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতির উপর; যদি কোন

কাগজের সংবাদ মন্তব্য প্রবন্ধাদিতে পাঠকেরা আস্থা স্থাপন করিতে না পারে, যদি তাহারা কাগজখানাকে অবিশ্বাস করে, তাহা হইলে উহাতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলিকেও অবিশ্বাস করিবে। অভিজ্ঞতা হইলে ইহাও প্রতীত হয়, যে, কি রকম লোকদের মধ্যে পত্রিকা-বিশেষের কাট্‌তি হয়, তাহাও বিশেষভাবে বিবেচ্য।

"এইরূপ বিশ্বাসবশতঃ আমেরিকার অনেক কাগজের অনেক নিন্দনীয় বিশেষত্ব তিরোহিত হইয়াছে. এবং তাহাদের লিখিত বিষয়সকলে নিরপেক্ষতা, ভ্রমশূন্যতা, অত্যুক্তিহীনতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

—

বালিকার কৃতিত্ব

কুমারী বাণী চট্টোপাধ্যায় এ বৎসর ইণ্টারমীডিয়েট্ পরীক্ষায় উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় সারদাপ্রসাদ পুরস্কার পাইবেন এবং প্রিন্সিপ্যাল্ গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রদত্ত বৃত্তি পাইবেন। শ্রীমতী বাণী এই পরীক্ষায় সকল ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে পারদর্শিতা অনুসারে একাদশ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

—

বঙ্গ-মহিলার উচ্চ উপাধি-প্রাপ্তি

কুমারী সুজাতা বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এখানকার এম্-এ উপাধি লাভ করিয়া তিনি স্যার্ মাইকেল স্যাড্‌লারের শিক্ষাধীন থাকিয়া দুই বৎসর বিলাতের লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তাহার পর দেশে ফিরিয়া আসিয়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনার জন্য একটি স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা প্রসূত প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। তাহা অনুমোদিত হওয়ায় শ্রীমতী সুজাতা লীড্‌সের মাষ্টার অব্ এডুকেশ্যান্ (M. Ed.) উপাধি পাইয়াছেন।

ইহাতে শিক্ষাদান বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা সূচিত হইতেছে।

—

শাঁখারীটোলার পোষ্ট্‌মাষ্টারের প্রাণবধ

গুণ্ডার হাতে শাঁখারীটোলার পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায় মহাশয়ের প্রাণ গিয়াছে। কয়েকজন গুণ্ডা রিভল্‌ভার বন্দুক হাতে ডাকঘরে গিয়া তাঁহার কাছে সেদিনকার মৌজুদ টাকা চায়। তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করায়, তাঁহাকে তাহারা গুলি করে। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর ঐ ডাকঘরের প্যাকার হরিপদ দাস এবং অমৃত-বাবুর বালক পুত্র হন্তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। অন্য কয়েকজন পলাইয়া যায়, কেবল একজনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহারা যাইতে থাকে। সে কয়েকবার গুলি করে। তথাপি ঐ দুইজন এবং অনেক ছাত্র তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে, এবং হরিপদ তাহাকে গ্রেফ্‌তার করে। মোকদ্দমার সময়

"সরকারী উকীল বলেন, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি সৈন্যদলের নির্ম্মলচন্দ্র সেন আসামীকে গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে দৌড়াইতে দেখে এবং অত্যন্ত সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত অগ্রসর হইয়া পলাতককে লাথি দিয়া ফেলিয়া দেয়। আসামী উঠিয়া আবার দৌড়াইতে থাকে। তাহার সমস্ত কার্ত্তুজ খালি হইয়া যাওয়াতে সে আর গুলি ছুড়িতে পারে না। তখন প্যাকার হরিপদ দৌড়াইয়া গিয়া উহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া ফেলে।" --হিন্দুস্থান

অমৃত-বাবুর কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও সাহস বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। কোন পুরস্কার তাঁহার মাতা, পত্নী ও সন্তানদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারে না; কিন্তু তথাপি তাঁহার চরিত্রের স্মৃতি তাঁহাদের শোকের মধ্যেও কিঞ্চিৎ তৃপ্তির কারণ হইবে। তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ, সন্তানদের শিক্ষা ও কন্যাদের বিবাহের জন্য যথেষ্ট আর্থিক বরাদ্দ করা গবর্ণ্‌মেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন ও প্যাকার হরিপদ দাসের বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব শ্লাঘনীয়। সর্ব্বসাধারণের এবং গবর্ণ্‌মেণ্টের পক্ষ হইতে তাহাদের বীরত্বের প্রকৃত আদর হইয়াছে, যাহাতে ইহা বুঝা যায়, তাহার স্থায়ী কিছু নিদর্শন চাই।

অমৃত-বাবুর পুত্র ও স্কুলের ছাত্রেরাও প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছে। কোন হন্তা বন্দুক বা ছোরা হাতে পলাইতেছে দেখিয়াই যদি দর্শকেরা পলায়ন করে বা নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহা হইলে গুণ্ডামির আত্যন্তিক বৃদ্ধি ও জয় সুনিশ্চিত। ভয় না পাইয়া প্রতিবেশীরা চোর ডাকাত হন্তাদিগকে গ্রেফ্‌তার করিলে বুঝা যায়, জাতির মধ্যে এখনও জীবন আছে।

গুণ্ডা গুলি চালাইলেই তাহা একেবারে অব্যর্থ মনে করা ভুল। যুদ্ধে সৈনিকেরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুলি চালায়, কিন্তু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক ত মরে না।

শতকরা খুব কম গুলিই সাংঘাতিক হয়। বন্দুক হাতে পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব-যুদ্ধেও (duelএও), প্রত্যেক যুদ্ধেই কোন না কোন পক্ষ মরিয়াছে, এরূপ কোথাও লেখা নাই।

—

আধুনিক বানপ্রস্থ

হিন্দুরা জানেন, যে, মানবজীবনের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য, তাহার পর বিবাহান্তে গার্হস্থ্য বা সংসারীর জীবন-যাপন। গার্হস্থ্য আশ্রমের পর বানপ্রস্থ এবং সর্ব্বশেষে সন্ন্যাস। শেষের দুই আশ্রমে সাধনা ও পরোপকারে জীবন অতিবাহিত করাই আদর্শ।

একজন বিখ্যাত আমেরিকান্ সম্পাদক স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া প্রায় এইরূপ আদর্শই আপনার জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা সেঞ্চুরী পত্রিকায় দেখিতে পাই :—

"শারীরিক ও মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিতে থাকিতেই মিষ্টার্ বক্ লেডিজ্ হোম জর্ন্যাল্ পত্রিকার সম্পাদকতা এবং কার্টিস্ পাব্লিশিং কোম্পানীর কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিবার জন্য তিনি এইপ্রকার করেন নাই, দেশের কাজ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কি কারণে তিনি পদত্যাগ করিলেন, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য তিনি সংসার-ত্যাগের একটি আদর্শ সকলের সম্মুখে উপস্থিত করেন। তিনি বলেন, প্রতিমানুষের জীবনকেই দুই ভাগে বিভক্ত করা উচিত। এক ভাগে তিনি সকল দিক্ দিয়া অর্জ্জন করিবেন, অন্য ভাগে তিনি দেশের হিতার্থে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন।"

মিঃ বক্ এই বিষয়ে উক্ত পত্রিকাতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিতেছেন,—

"না, আমি মনে করি না যে আমার মত ভুল। [তাঁহার এক সমালোচক] মিঃ ফ্রাঙ্ক বলেন, দেশহিতৈষণায় কেবলমাত্র প্রীতি-উপহার লাভ হয়; তাহা নয়। অবশ্য তাহাও পরে জুটিতে পারে। কিন্তু উহা পার্থিব খেলনা মাত্র। ইহা অপেক্ষা গভীরতর এবং উচ্চতর পুরস্কার তাঁহার জন্য আছে, যিনি বিষয়কর্ম্মে অতৃপ্ত হইয়া নিজেকে কায়মনপ্রাণে জনসেবায় নিয়োজিত করেন। তিনি আপনার কথা ভুলিয়া যান, এবং পুরস্কারের প্রত্যাশা করেন না। তিনি যে-কাজ করিতেছেন, তার ফল পাইবেন, এ আশাও তাঁহার থাকে না। নিঃস্বার্থ পরোপকারের ফলে যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি, তাহাই তাঁহার পুরস্কার। কিন্তু নিজে অনুভব না করিলে, ইহা যে কি, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। এবং বোধ হয় এই খানেই আমার এবং মিঃ ফ্রাঙ্কের ভিতর পার্থক্য। তিনি কেবল মতামতের দিক্ হইতে কথা বলিতেছেন, আমি অভিজ্ঞতা-লব্ধ কথা বলিতেছি।"

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেবল রোজগারের চেষ্টাই করা, কোন দেশেরই আদর্শ হওয়া উচিত নয়। অবশ্য অনেক লোক দারিদ্র্য ও সঞ্চয়ের অভাববশতঃ তাহা করিতে বাধ্য হন; কিন্তু যাঁহারা খরচ চলিবার মত সঞ্চয় করিয়াছেন, জনসেবায় তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োগ করা উচিত।

উত্তরাধিকার দুই-প্রকার, বংশানুক্রমিক ও সামাজিক। অর্থাৎ আমরা কতকগুলি গুণ ও শক্তি পিতামাতা ও অন্য পূর্ব্বজগণের নিকট হইতে পাই, এবং অন্য অনেক জ্ঞান, গুণ ও শক্তির জন্য আমরা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সমাজের নিকট ঋণী। যাঁহারা সভ্যদেশে জন্মিয়া প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর কৃতী ও যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যদি জন্মের পরই কোন অসভ্য দেশে অসভ্য জাতির মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাঁহারা খুব প্রতিভাশালী বংশে জন্মিলেও, যেরূপ কৃতী ও যশস্বী হইয়াছেন, তাহা হইতে পারিতেন না। প্রতিভার স্ফুরণ জন্য শিক্ষা চাই, যোগ্য লোকদের সংসর্গ চাই, মনের সহিত মনের সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ চাই, জ্ঞানলাভের ও আহরণের জন্য পুস্তকসংগ্রহ, বিজ্ঞানমন্দির, ইত্যাদি চাই। এই সকলের জন্য আমরা সমাজের নিকট ঋণী। আমরণ রোজগার করিতে থাকিলে, কিম্বা সুখের লালসায় ঘুরিয়া বেড়াইলে, এই ঋণ শোধ করা যায় না। যাঁহারা এই ঋণ শোধের চেষ্টা করেন এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণেও শোধ করিতে পারেন, তাঁহারা নরোত্তম।

রাজশাহীতে চর্‌খা ও খদ্দর।

গতমাসে আত্রাই হইতে প্রাপ্ত একটি টেলিগ্রাম হইতে অবগত হইয়া সুখী হইলাম, যে, স্যার্ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় গত বৎসরের বন্যায় বিপন্ন লোকদের সাহায্যের জন্য রাজশাহীর বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে তখন পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। অন্যের দয়ার দানের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা নিজের সামান্য রোজগারও ভাল; এই সত্য ধারণা অনুসারে কমিটি দ্বারা প্রদত্ত ৩৫০টি চর্‌খা এখনই চলিতেছে। তিন হাজার চর্‌খা বিতরণ করিবার সঙ্কল্প আছে। তাহা হইলে মাসে ষাট মণ সুতা উৎপন্ন হইবে। ঐ-অঞ্চলে বহু সহস্র লোকের কৌলিক কাজ তাঁত চালান। সুতরাং ৬০ মণ সুতার কাপড় বুনাইতে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। ইতিমধ্যেই দুই হাজার গজ খদ্দর স্থানীয় সুতা হইতে বোনা হইয়াছে। এই কাপড়ের টানা ও পোড়েন উভয় দিকের সুতাই চর্‌খায় কাটা। সুতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে শিখাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। শীঘ্র কলিকাতায় এই খাঁটি খদ্দর বিক্রীর জন্য দোকান খোলা হইবে। তাহা হইলে খুব ভাল হয়। যাঁহারা খাঁটি খদ্দর চান তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে ঐ-দোকান হইতে কিনিতে পারিবেন, এবং যে-সব গরীব লোক সুতা কাটিতেছে ও কাপড় বুনিতেছে, তাহাদের অন্নের সংস্থান হইবে।

—

শ্রীমতী মনোরমা বন্দ্যোপাধ্যায়

এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের পত্নী এবং অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তথাকার প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত স্যার্ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীমতী মনোরমা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ার অকাল মৃত্যুতে প্রবাসী বাঙালী সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার পিতা লাহোরের বিচারপতি স্যার্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু আগেই হইয়াছিল। তাঁহার পিতাকে কন্যাশোক পাইতে হয় নাই; কিন্তু শ্বশুর ও স্বামীকে শোক পাইতে হইল।

তিনি সাহিত্যানুরাগিনী ছিলেন, এবং তাঁহার নিজেরও লিপি-নৈপুণ্য ছিল। তিনি নিজের মত বেশ গুছাইয়া বলিতে পারিতেন। তাঁহার লিখিত চারিখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে; যথা—"হেমলতা", "সমাজ বা দেশাচার" (নাটক), স্কট্ প্রণীত সার্জ্জেন্স্ ডটারের বঙ্গানুবাদ, এবং "জীবন-দর্পণ" (নাটক)। ইহার মধ্যে, কয়েকবৎসর পূর্ব্বে এলাহাবাদের পরলোকগত মনীষী ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রবাসীতে" একখানি পুস্তকের (যতদূর মনে পড়িতেছে "সমাজ বা দেশাচার" নাটকের) সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বহিখানির বেশ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর একখানি নাটক অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িবার সুযোগ আমরা পাইয়াছিলাম। তাহাতে লেখিকার নিজের মত দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত বিশদভাবে অভিব্যক্ত করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি স্কটের সার্জ্জেন্স্ ডটারের অনুবাদ করিয়াছিলেন; ইহা হইতে তাঁহার ইংরেজীজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা যদি না করিতেন, তাহা হইলেও উক্ত অমুদ্রিত বহি হইতেও তাঁহার ইংরেজীজ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যাইত; যদিও তাহাতে তিনি কোথাও অকারণ অশোভন-ভাবে ইংরেজী কথাবার্ত্তার অবতারণা করেন নাই।

চিত্রাঙ্কণে তাঁহার অনুরাগ ছিল। জল-রং ও তৈল-রং দিয়া তিনি অনেক ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে "বসন্ত," "গ্রীষ্ম," "বর্ষা," "শরৎ," এবং কাশ্মীরের কয়েকটি দৃশ্য গত বৎসর সিমলা শিল্প প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৯২১ সালের মসুরী শিল্পপ্রদর্শনীতে তাঁহার আঁকা কয়েকটি ছবি প্রদর্শিত হয়। ১৯১০-১১ সালে এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে তিনি সূচিকার্য্যখচিত পর্দ্দার জন্য রৌপ্যপদক পাইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বের লাহোর প্রদর্শনীতে মাছের আঁশের ফুলের তোড়ার জন্য রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন।

এলাহাবাদ অঞ্চলে নারীশিক্ষার সহিত তাঁহার যোগ ছিল। এলাহাবাদের ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল তাঁহারই উদ্যোগে স্থাপিত হয়। তিনি উহার সম্পাদিকা ছিলেন। তিনি এলাহাবাদের অবৈতনিক ভারতীয় বালিকা বিদ্যালয়ের জয়েণ্ট সেক্রেটারী, মহিলাদের পর্দ্দা ক্লাবের
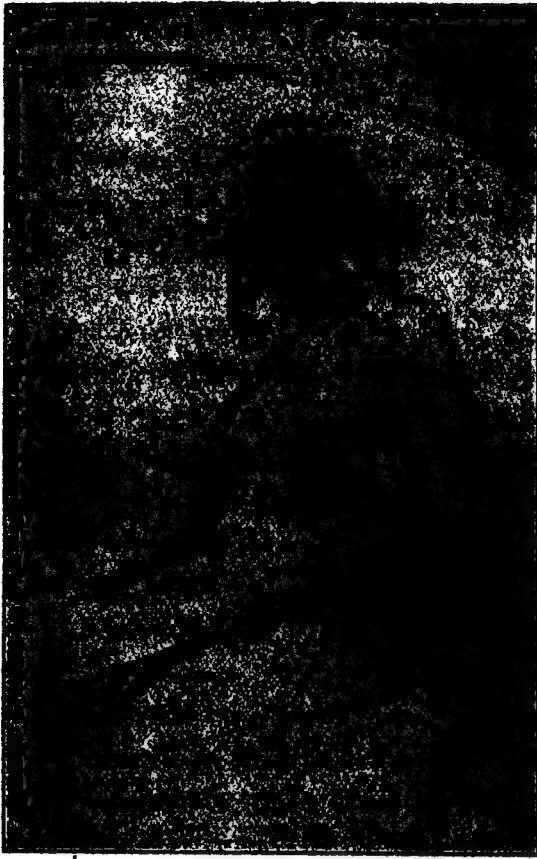
শ্রীমতী মনোরমা বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ, এবং লেডী ডফারিন্ নারী হাঁসপাতালের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির মেম্বর ছিলেন। বর্ত্তমান বৎসর মে মাসে তিনি জগৎ-তারণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং ইতিমধ্যেই তাহার জন্য কিছু কিছু কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের কুলবধূ ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজন হইলে অন্তঃপুর ও অবরোধের বাহিরের উন্মুক্ত কার্য্যক্ষেত্রেও তাঁহাকে কাজ করিতে দেখা যাইত। তদুপযুক্ত শিক্ষা ঔদার্য্য ও দৃঢ়তা তাঁহার ছিল।

—

"কাসিমুদ্দিনের মার্কা"

কাসিমুদ্দিনের মার্কাযুক্ত পাথরটির চিহ্নগুলি বস্তুতঃ একটি ইংরেজী তারিখ; কিন্তু তাহাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতীয় লিপি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার প্রধান অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকর বাহাদুরী লইয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ আসল কথাটা ফাঁস করিয়া দেওয়ায় এখন অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের চেলা গোসায়েব ও অনুগ্রহপ্রার্থীরা এই অদ্ভুত গবেষণার দোষটা শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্রের উপর আরোপ করিতেছেন। বাহাদুরী লইবার বেলা ভাণ্ডারকর মহোদয় পনের আনা তিন পাই লইয়াছিলেন, অপযশের বেলায় পনের আনা সাড়ে তিন পাই পঞ্চানন বাবুকে দিতে চান। এ-প্রকার ব্যবহার ডাক্তার স্যার্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের পুত্রের উপযুক্ত নহে।

—

বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইস্‌লামিক দেহ

"প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, যে, প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছিলেন :—

"For our own Motherland a junction of the two great systems—Hinduism and Islam—Vedanta brain and Islam body—is the only hope. I see in my mind's eye the future perfect India rising out of this chaos and strife, glorious and invincible, with Vedantic brain and Islam body."

তাৎপর্য্য। "আমাদের নিজের মাতৃভূমির একমাত্র ভরসা হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম এই দুই মহা ধর্ম্মপ্রণালীর সংযোগে, বেদান্ত মস্তিষ্ক ও ইস্‌লাম শরীরের যোগে। আমি আমার মানসনেত্রে ভবিষ্যতের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ভারতকে এখনকার বিবাদবিসংবাদ ও বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে, মহিমামণ্ডিত ও অজেয় হইয়া, বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইস্‌লামিক দেহ লইয়া পুনরুত্থিত হইতে দেখিতেছি।"

মুসলমানদিগের মধ্যে যেরূপ সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যেও তাহা নাই। শাদা খ্রীষ্টিয়ান ও কাল খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য আলাদা আলাদা গির্জ্জা আছে—যদিও এখনও শাদা ও কাল পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বরের বিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু মুসলমানরা জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে একই মস্‌জিদে নমাজ করেন। যখন আফ্‌গানীস্তানের আমীর কলিকাতার প্রদর্শনী দেখিতে আসেন, তখন নমাজের সময় উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার জন্য বহুমূল্য গালিচা বিছান হয়, এবং কতকগুলি গণ্যমান্য মুসলমানকে

তাঁহার সহিত উপাসনা করিতে ডাকা হয়। কিন্তু তিনি মুসলমান সইস্, গাড়োয়ান, ঝাড়ুদার, খানসামা, সবাইকে ডাকিতে বলিলেন এবং সকলের সহিত একত্র ভগবানের আরাধনা করিলেন। তা ছাড়া, আহার ব্যবহার এবং ঔদ্বাহিক সম্বন্ধও সকল মুসলমানের সহিত সকল মুসলমানের হইতে পারে। ইস্লামিক শরীরের মানে আমরা এইরূপ বুঝি। স্বামী বিবেকানন্দ কথাগুলি অন্য কোন অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকিলে, তাহা তাঁহার সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যেরা বলিতে পারিবেন।

—

কেনিয়ার কথা

পূর্ব্ব আফ্রিকার কেনিয়ায় ভারতীয়েরা যাতায়াত ও বাণিজ্য কয়েক শত বৎসর আগে হইতে করিয়া আসিতেছে। তখন ইংরেজরা সেখানে যায় নাই, ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বও স্থাপিত হয় নাই। ভারতীয়েরা ঐ দেশকে সভ্য লোকদের বসবাসের উপযোগী করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছে। অবশ্য লাভ ও রোজগারের জন্য করিয়াছে, নিঃস্বার্থ নর-সেবার জন্য করে নাই। তাহার পর ইংরেজ জাতির প্রভুত্ব তথায় স্থাপিত করিবার জন্যও ভারতীয়েরা নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছে। তাহার পুরস্কার স্বরূপ এখন ইংরেজরা কেনিয়াতে ভারতীয়দিগকে নিকৃষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখিতে, নিকৃষ্ট পদবী দিতে এবং পরে সেখান হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। ইহাই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যিক নীতি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তরফ হইতে প্রকাশিত একটি দলিলে লেখা হইয়াছে, "কেনিয়া একটি আফ্রিকার দেশ, এখানে আফ্রিকানদের স্বার্থই সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে। ব্রিটেনের বিধিনির্দ্দিষ্ট কাজ ("mission") হইতেছে আফ্রিকান্দিগকে রক্ষা করা ও তাহাদের উন্নতি সাধন করা। আমরা (ইংরেজরা) উহাদের ট্রাষ্টি, তাহাদের মঙ্গলসাধনের ভার আর কাহারও উপর দিতে পারি না।"

এই কথাগুলি ভণ্ডামির চূড়ান্ত। তাহার প্রমাণ দিতেছি। কেনিয়ার ইউরোপীয় অধিবাসীর সংখ্যা ৯৬৫১ এবং আফ্রিকানদের সংখ্যা পঁচিশ লক্ষেরও উপর। অথচ, ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের কথায়, এক হাজারেরও কম ইউরোপীয়েরা তথায় ১১০০০ বর্গ মাইল জমি পাইয়াছে, কিন্তু কোন আফ্রিকানেরই এক বিঘা জমিরও মালিক হইবার জো নাই। তাহাদিগকে ক্রীতদাসের মত পূর্ব্বে মজুরী করিতে বাধ্য করা হইত। তাহাতে তাহাদের লোকসংখ্যা শতকরা ২১ জন কমিয়া যায়। ইহার মানে যে কিরূপ অত্যাচার তাহা পাঠকেরা অনুমান করিয়া লউন। এখন জোর করিয়া তাহাদিগকে খাটাইবার আইন নাই বটে, কিন্তু অন্যপ্রকার আইন দ্বারা তাহাদিগকে শাদা লোকদের মজুরী করিতে বাধ্য করা হয়, এবং মজুরীর বেতনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তাহারা ট্যাক্স-রূপে দিতে বাধ্য হয়। কালা আদমীদের শাদা আদমীর গোলামী ছাড়িয়া পলাইবার জো নাই। একটা আইন করা হইয়াছে, যাহার জোরে পলাতককে ধরিয়া ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা যায়, এবং যে শাদা আদমী কোন কালা আদমীকে ধরিয়া আদালতের হাতে দেয়, সে তাহার মোকদ্দমা আদির খরচটা আদালত হইতে পায়! প্রত্যেক আফ্রিকান্ পুরুষকে আইন দ্বারা রেজিষ্ট্রী-ভুক্ত করা হইয়াছে; সুতরাং কাহারও নিষ্কৃতি নাই। প্রত্যেক পুরুষকে রেজিষ্ট্রির চিহ্নস্বরূপ একটি ছোট ডিবা মাদুলীর মত করিয়া পরিতে হয়। তাহাতে একখানি কাগজে তাহার রেজিষ্ট্রিভুক্ত হওয়ার নমুনস্বরূপ একটি কাগজ থাকে। তাহাকে পাস্ বলা হয়। এই পাসে লেখা থাকে, যে, সে কয়বার কোন্ শাদা মনিবের মজুরী ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। ইহার সহিত ক্রীতদাস-রাখা প্রথার তফাৎটা বুঝিতে হইলে সূক্ষ্ম গবেষণার প্রয়োজন। যাহা হউক, এই প্রকারে ব্রিটিশজাতি আফ্রিকান্দিগকে উচ্চতর মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক স্তরে উন্নীত করিবার নিমিত্ত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত তাঁহাদের বিধি-নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতেছেন ("the mission of Britain is to work continuously for the training and education of Africans towards a higher intellectual, moral and economic level")। ব্রিটিশজাতির এই

বিধিনির্দ্দিষ্ট কাজে (অর্থাৎ কেনিয়া হইতে ও কেনিয়ার আফ্রিকান্‌দিগের পরিশ্রম হইতে যতটা লাভ হইতে পারে, তাহা সম্পূর্ণরূপে আদায়ে) ভারতীয়েরা বোধ হয় ভয়ানক বিঘ্ন জন্মাইতেছিল, সেই জন্য তাহাদের উপর কেনিয়ার শাদা মনুষ্যেরা এত বিরূপ হইয়াছে।

—

নেটালে ভারতীয়

দক্ষিণ আফ্রিকায় নেটালে ভারতীয়দিগকে থাকিবার ও দোকান-পাট করিবার জন্য সব শহরে আলাদা জায়গা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। তাহারা অন্যত্র থাকিতে বা দোকান করিতে পারিবে না। তথাকার প্রধান মন্ত্রী বলিতেছেন, যে, তথাকার শাদা মনুষ্যেরা আত্মরক্ষা করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের রক্ষার জন্য এইরূপ আইন করা দরকার। ইহার মানে এ নয়, যে, ভারতীয়েরা শাদা মনুষ্য শিকার করিয়া বেড়াইতেছে। মানে এই, যে, শাদা মনুষ্যেরা স্থানীয় ব্যবসাতে ভারতীয়দের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইতেছে। সেইজন্য ভারতীয়দিগকে এমন জায়গায় রাখা দরকার, যেখানে তাহাদের খরিদদার কম জোটে। এইজন্য রসিক প্রধানমন্ত্রী জেনারেল স্মাট্‌স্ বলিতেছেন—"if after the passing of such a law our people in South Africa prefer to go and buy in the Indian bazar it will not be the fault of Government", "এরূপ আইন পাস করার পরেও যদি আমাদের জাতভাইয়েরা ভারতীয়দের বাজারে গিয়া জিনিষ কেনা পছন্দ করে, তাহা হইলে সেটা গবর্ণ্‌মেণ্টের দোষ বলা চলিবে না।" অর্থাৎ ভারতীয় দোকানদারদের ব্যবসা মাটি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি সস্তা দরের জন্য শাদা মনুষ্যেরা অতটা হাঁটিয়া গিয়া কদর্য্য স্থানে জিনিষ কেনে, তাহা হইলে নাচার। স্মাট্‌সের মতে ভারতবর্ষে সাম্য নাই, এবং জাতিভেদ থাকার জন্য সবাই আলাদা আলাদা থাকে, সামাজিক বা ব্যবসাঘটিত মেলা-মেশা নাই। সুতরাং নেটালে ঐরূপ আইন করায় ভারতীয়দের আপত্তি করা উচিত নহে। একটু কোন খুঁত থাকিলে শত্রুরা কেমন তাহার অপব্যবহার করে ইহা তাহার প্রমাণ। "অস্পৃশ্যতা"র সমর্থন আমরা কোন কালে করি নাই, বরং ইহার শত্রুতাই বরাবর করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহা থাকার জন্য ভারতবর্ষের কোথাও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের, ভিন্ন ভিন্ন জাতির (raceএর), ও বিভিন্ন জা'তের (casteএর) আলাদা আলাদা ব্যবসার জায়গা নির্দ্দিষ্ট নাই, এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী ছাড়া আর কোথাও "অস্পৃশ্যেরা" ব্রাহ্মণাদি "পবিত্র" জা'তের বাসস্থানে যাতায়াত করিতে বাধা পায় না। কিন্তু যেহেতু ভারতবর্ষের ঐ পাপটা একটা অংশেও আছে, সেইজন্য ভারতীয়দের এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। অবশ্য আমেরিকা আফ্রিকায় শাদারা কালাদিগকে অস্পৃশ্যের মতই দেখে বটে। কিন্তু অন্য অনেকে অধর্ম্ম করে বলিয়া আমাদের অধর্ম্মটা ধর্ম্মসঙ্গত হইয়া যাইতে পারে না। তবে, স্মাট্‌সকেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমেরিকার শাদারা নিগ্রোদিগকে জীবনের প্রধান প্রধান বিভাগে আলাদা করিয়া রাখে, এমন কি কখন কখন বিনা বিচারে পুড়াইয়া ও অন্য প্রকারে মারিয়া ফেলে। তাহার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী আমেরিকান্‌দিগকে তিনি ভারতীয়দের মত আলাদা জায়গায় রাখিতে সাহস করিবেন কি ?

—

"কোম্পানীর কাগজের" মূল্য-মাহাত্ম্য

"কোম্পানীর কাগজের" মানে কি ?

মানে এই, যে, গভর্ণ্‌মেণ্টের অর্থের প্রয়োজন হইলে, সাধারণের নিকট হইতে অর্থ ধার লওয়া হয়, এবং তাহার জন্য রসিদ বা উক্ত অর্থ শোধ করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। গৃহীত অর্থের জন্য কি পরিমাণ সুদ দেওয়া হইবে, এবং উহা শোধ করা হইলে, তাহাও, ঐ দলিলে লিখিত থাকে। ইহাই গভর্ণ্‌মেণ্ট্ কাগজ বা চলিত ভাষায় কোম্পানীর কাগজ।

সাধারণে গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে অর্থ দেয় কেন ?

সুদের আশায়। এবং গভর্ণ্‌মেণ্ট্ কাগজের মূল্য সুদের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। বাজারে ১০০৲ টাকা খাটাইয়া যদি বাৎসরিক ৬৲ টাকা সুদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের জন্য কেহই ১০০৲ টাকা

দিতে চাহিবে না। হয়ত মাত্র ৫০৲ টাকাই দিবে। অবশ্য টাকা ধার দেওয়া যেখানে যত নিরাপদ, সেখানেই লোকে টাকা তত কম সুদে দিতে প্রস্তুত হয়। গভর্ণমেণ্ট ও যখন অর্থ ঋণ করে, তখন তাহাকে বাজারের অবস্থা দেখিয়া কার্য্য করিতে হয়। অর্থাৎ বাজার হার যদি শতকরা ৬৲ হয়, তাহা হইলে ১০০৲ টাকার প্রয়োজন হইলে, বাৎসরিক ৬৲ টাকার কম সুদ দিলে তাহা পাওয়া যাইবে না। বাৎসরিক ৮৲ টাকা দিলে ১০০৲ অপেক্ষা অধিকই পাওয়া যাইবে। সুদের পরিমাণ ও ঋণকারকের ঋণ শোধ করিবার সদভিপ্রায় ও ক্ষমতার উপর আস্থা, এই দুইএর উপরই অর্থ ধার পাওয়া নির্ভর করে। অন্যভাবে বলিতে গেলে বলা যায়, যে, কোন ঋণের দলিলের মূল্য, তাহা হইতে যে বাৎসরিক সুদ নিশ্চিত পাওয়া যাইবে, তাহারই মূল্য। ইহার প্রমাণ আমরা যুদ্ধের সময়ে পাইয়াছি। শতকরা ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য তখন বাজারে খুবই কমিয়া গেল, কারণ নানা কারণে বাৎসরিক ৩৲ টাকার জন্য লোকে আর ১০০৲ টাকা দিতে চাহিল না।

আগেই বলিয়াছি, যে ঋণকারকের উপর আস্থা যত প্রগাঢ় হয়, তাঁহাকে লোকে ততই কম সুদে টাকা দিতে প্রস্তুত হয়। গভর্ণমেণ্টের উপর এই আস্থা লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বাপেক্ষা সহজে অর্থ ঋণ পায়। অপরকে (অন্যান্য কোম্পানী, যথা চা-বাগান, পাটের কল, তেলের কল, লোহার কারখানা, মিউনিসিপ্যালিটি, প্রভৃতিকে) যদি শতকরা ৭৲ টাকা সুদের জন্য লোকে ১০০৲ টাকা দেয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে হয়ত শতকরা ৬॥০ সুদের জন্যই ১০০৲ দিতে রাজি হইবে।

এ ত গেল সাধারণ কথা। কিন্তু অসাধারণ কথা এই, যে, আমাদের বিদেশী গভর্ণমেণ্ট প্রায়ই প্রচুর ঋণ "আমাদের উপকারার্থে" বিলাতে করিয়া থাকে এবং সেই সব ঋণের সুদের হার অসাধারণ রকম উচ্চ। যথা, অপর লোকে যদি ১০০৲ শত টাকা ধার করিবার জন্য বাৎসরিক ৭৲ টাকা দিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে এই দেশের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সাধারণভাবে দেখিলে ইহা অপেক্ষা অল্পহারে সুদ দিয়া টাকা পাইতে পারে। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমরা দেখি, সুদের হার সমানই থাকে। বাৎসরিক ৭৲ টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ ১০০৲ টাকায় বিক্রয় করা হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই দেখা যায় সেই কাগজ ১১৬৷১২০ মূল্যে বাজারে বিক্রয় হইতেছে। অর্থাৎ বেশী দামের জিনিষ অল্প দামে নিলাম করিলে যাহা হয়, তাহাই এই ক্ষেত্রে ঘটিতে দেখা যায়।

গভর্ণমেণ্টের শতকরা ৭৲ টাকা সুদের ১৯৩১ সালে শোধ্য কাগজ বাজারে ১১৬৷১২০ টাকায় বিক্রয় হয়। অর্থাৎ ভারতের লোকেরা পাইল ১০০ টাকা এবং তাহার পরিবর্ত্তে দিল ১১৬৷১২০ টাকা! লাভ করিল প্রথম ক্রেতা! প্রথম ক্রেতা কাহারা? অধিকাংশস্থলে ইংরেজ। গবর্ণমেণ্টের আর একটি কাগজ (শতকরা ৬৲ টাকা সুদের) ১০০৲তে বিক্রীত হইয়া পরে ১১২৷১১৩ তে বাজারে চলিতেছে। এদিকে শতকরা ৭৲ টাকা সুদের কলিকাতা বন্দরের (১৯৩১ সালে শোধ্য) কাগজের বাজার দাম ১০৮ (গভর্ণমেণ্টের কাগজ অপেক্ষা ১২৲ কম)। তাতার লৌহ কারখানার ৭৲ টাকা সুদের কাগজও ১০৮৲ দামে বিক্রয় হয়। বেঙ্গল টেলিফোনের ৭৲ টাকা সুদের কাগজ বিক্রয় হয় ১০১॥০ তে। কলিকাতা ট্রামওয়ের ৭৲ টাকা সুদের কাগজ বিক্রয় হয় ১০১৲ টাকায়। এবং হোয়াইটওয়ে-লেডলর ৭৲ টাকা সুদের কাগজ বিক্রয় হয় ৯০৲ টাকায়। ব্রিটিশ বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর শতকরা ৬৲ টাকা সুদের কাগজ ৯৯৲ টাকায় বিক্রয় হয়। আর আমাদের ইংরেজ প্রভুরা শতকরা ৬৲ টাকা সুদের কাগজ বিক্রয় করিয়া প্রথমতঃ পাইলেন ১০০৲ টাকা; কিন্তু ক্রেতারা তাহা আজ বাজারে ১১২৷১১৩৲ টাকায় বিক্রয় করিতেছে!

যেখানে আমরা ১১২৷১২০ টাকা পাইতে পারি, সেখানে আমরা সুদক্ষ গভর্ণমেণ্টের গুণে পাইতেছি মাত্র ১০০৲ টাকা। বাকিটা যাইতেছে প্রথম ক্রেতার পকেটে। প্রথম ক্রেতারা সচরাচর কাহারা? কাহাদের লাভের জন্য, অথবা কোন্ নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে গভর্ণমেণ্ট অধিক মূল্যের কাগজ অল্প মূল্যে বিক্রয় করেন?

ভারতের টাকা বিলাতে খরচ

ভারত গবর্ণমেণ্ট যত বেশী সুদ দিয়া বিলাতে টাকা ধার করেন, তার চেয়ে কম সুদে টাকা পাওয়া যাইতে পারে, উপরে তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু ইহাই ভারতবর্ষের একমাত্র ক্ষতি নহে। "ভারতবর্ষের জন্য" যে টাকাটা ধার করা হয়, তাহা দ্বারা তাঁহার দরকারী জিনিষ যদি ভারত পৃথিবীর সব বাজার যাচাই করিয়া উৎকৃষ্টতম জিনিষ যেখানে ন্যূনতম মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায় সেখানে কিনিতে পান, তাহা হইলেও অনেক সাশ্রয় হয়। কিন্তু তাহা হয় না; অধিকাংশ টাকার জিনিষ ভারত গবর্ণমেণ্ট "ভারতের জন্য" বিলাতেই কিনিয়া থাকেন। কিছু দিন আগে এই ব্যাপার লইয়া বিলাতী পার্লেমেণ্টে একটা প্রহসন-গোছ অভিনয় হইয়া গিয়াছে। তাহার বর্ণনা সংক্ষেপে করিবার আগে বলিয়া রাখি, যে, কিছুকাল আগে যখন মণ্টেগু ভারত-সচিব ছিলেন, তখন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা একটা প্রস্তাব ধার্য্য করেন, যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় মাল তাঁহাকে, জিনিষ সমান সরেস হইলে, পৃথিবীর যেখানে সস্তা পাইবেন, সেইখানে কিনিবার অধিকার দেওয়া হউক। মণ্টেগু ইহাতে আপত্তি করেন নাই।

ভারত গবর্ণমেণ্টকে বিলাতে ধার করিতে হইলে পার্লেমেণ্টের অনুমতি লইতে হয়। কিছু দিন আগে এইরূপ অনুমতি লইবার সময় হাচিন্সন্ নামক এক সভ্য প্রস্তাব করেন, যে, ভারতবর্ষ যত টাকা ঋণ লইবেন, তাহার শতকরা ৭৫৲ টাকা বিলাতে খরচ করিতে হইবে, এইরূপ একটা সর্ত্ত করা হউক। উহার সমর্থন করিতে গিয়া চেম্বারলেন্ বলেন, যে, রেলওয়ের উপকরণ বিলাতে কিনিতে যদি অন্যত্র কেনার চেয়ে একটু বেশী দামও লাগে, তাহা হইলেও, টাকা বিলাতেই ঐরূপ ক্রয়ার্থ খরচ করা উচিত, কেন না "আমরা একেবারে বেকার না থাকি, তাহা দেখা আমাদের কর্ত্তব্য!" ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জের আস্পর্দ্ধা, অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য স্বভাবত বেশী হইবারই কথা। সুতরাং তিনি বলিলেন, সুলভতম দরে জিনিষ কিনিবার অধিকার দাবী করিয়া ভারতবর্ষই ত আগে আমাদিগকে যুদ্ধং দেহি বলিয়াছে ("The challenge came from India") অর্থাৎ লয়েড্ জর্জ বলিতে চান, "গোলাম হইয়া তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা, যে, তুমি বলিতে চাও যেখানে ইচ্ছা সেখানে জিনিষ কিনিবে! আচ্ছা, আমরা তোমার যুদ্ধং দেহি'র উত্তরে বলিতেছি, বেশী দাম দিয়াও তোমাকে আমাদেরই দোকানে জিনিষ কিনিতে হইবে।"

সহকারী ভারতসচিব আর্ল্ উইণ্টার্টন্ বলিলেন, "ভায়ারা সব চট কেন? আমার কথাটা শোন। ভারতীয়েরা সুলভতম দরে জিনিষ কিনিবার প্রস্তাব করিয়াছে বটে, কিন্তু আমি দেখাইতেছি, যে, তাহা সত্ত্বেও শতকরা ৯৫৲ (পঁচানব্বই) টাকার জিনিষ বিলাতেই কেনা হইয়াছে ও হইতেছে। (তিনি এখানে ক্রীত মালের দাম উল্লেখ করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন।) তোমরা চাও ভারত-বর্ষকে শতকরা ৭৫ টাকার জিনিষ বিলাতে কিনিতে বাধ্য করিতে। আমি দেখাইলাম, যে, এক দিকে ভারতীয়েরা মনে করিতেছে তাহারা সস্তা হাটে কিনিবার অধিকার ভোগ করিতেছে, অন্যদিকে কিন্তু বাস্তবিক তাহারা আমাদেরই হাটে শতকরা ৯৫ টাকার মাল কিনিতেছে—তা আমাদের জিনিষ সস্তা হউক বা না হউক। তাহারা যদি ঐ অধিকার ভোগের স্বপ্ন দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে শতকরা ৭৫ টাকার জিনিষ আমাদের দোকানে কিনিতে তাহারা বাধ্য, এরূপ একটা প্রস্তাব ধার্য্য করিয়া তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ?"

হাচিন্সন্ চালাক লোক! তিনি বলিলেন, "আমি যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি। অতএব আমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে চাই।"

ইংলণ্ডে যে টাকাটা ভারত গবর্ণমেণ্টকে ঋণ করিতে হয়, তাহার শতকরা ৭৫ টাকা তথায় খরচ করা হউক, কি ৯৫ করা হউক, কথাটার মানে বুঝা দরকার। ধরুন, ভারত গবর্ণমেণ্ট ২০ বৎসর পরে শোধ দিব বলিয়া শতকরা ৭টাকা সুদে বিলাতে ১০০ টাকা ধার করিলেন। তাহা হইলে দেখা যাক ইংলণ্ড কি পাইল। যদি এই ঋণের শতকরা ৭৫ টাকা বিলাতে খরচ করিতে হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ড ১০০ টাকা ধার দিয়া পাইল, কুড়ি বৎসর পরে

শোধিত ১০০ টাকা+কুড়ি বৎসরের সুদ ১৪০ টাকা+ বিক্রীত জিনিষ বা শ্রমের মূল্য ৭৫, একুনে ৩১৫ টাকা। যদি শতকরা ৯৫ বিলাতে খরচ করিতে হয় তাহা হইলে ইংলণ্ড পায়, আসল ১০০+সুদ ১৪০+বিক্রীত জিনিষ বা শ্রমের মূল্য ৯৫, একুনে ৩৩৫। চক্রবৃদ্ধি ধরিলে আরও বেশী হয়, তাহা ধরিলাম না। অবশ্য ইংলণ্ড ৭৫ বা ৯৫ টাকার বদলে কিছু জিনিষ ও শ্রম দেয় বটে, কিন্তু ঐ জিনিষের বাজার দর তার চেয়ে কম, এবং যে কাঁচা মাল বা উপাদান হইতে উহা প্রস্তুত তাহার দাম আরও কম। শ্রমের দাম সম্বন্ধে কি আর বলিব, ইংলণ্ডে লক্ষ লক্ষ বেকার লোক বসিয়া আছে; বিলাতী গবর্ণমেণ্টকে তাহাদিগকে ভাতা দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। সুতরাং তাহাদের শ্রম করিবার সুযোগ লাভ পরম সৌভাগ্য। এই সৌভাগ্যের কারণ ভারতবর্ষ—সেই ভারতবর্ষ, যেখানে কোথাও না কোথাও দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে এবং যাহা এরূপ অতিথিবৎসল দেশ, যে, প্লেগ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আদি কোন বন্ধু একবার আসিলে আর নড়িতে চায় না।

"জোর যার মুলুক তার" নীতির উপর জগতের রাষ্ট্র-নীতির ভিত্তি স্থাপিত। "জোর যার ব্যবসা তার" ইহা ঐ নীতিরই আর একটা রূপ। সুতরাং ন্যায় অন্যায়ের কথা তোলা বেকুবী। তথাপি অভ্যাসদোষে ন্যায় অন্যায়ের কথাটা তুলিতে হইতেছে। ন্যায়তঃ ইংলণ্ড বলিতে পারেন, "তোমরা যদি আমাদের প্রদত্ত ঋণের প্রায় সবটাই ইংলণ্ডে খরচ না কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে টাকা ধার দিব না!" তাহার উত্তরে ভারতবর্ষও ন্যায়তঃ বলিতে পারেন; "তাহাতে আমি রাজি আছি। আমি যেখানে কম সুদে টাকা পাইব সেই খানেই ধার করিব; এবং সেই ধার করা টাকা হইতে যে খানে সরেস মাল সস্তায় পাইব সেই খানেই কিনিব। ইহাতে রাজি আছ ত? কি বল?"

—

প্রতিশোধ, না আত্মরক্ষা ও আত্মসম্মান রক্ষা?

এখন পর্য্যন্ত জগতে এইরূপ ধারণা চলিয়া আসিতেছে, যে, ব্যক্তির পক্ষে যাহা দুর্নীতি, জাতির পক্ষে তাহা বৈধ। যথা, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির সম্পত্তি কাড়িয়া লইলে সেটা হয় ডাকাতি; কিন্তু এক জাতি আর এক জাতির দেশ কাড়িয়া লইলে তাহা হয় বৈধ বীরত্ব। কিন্তু, কাজে না হইলেও, মানুষের বিচার এখন ক্রমশঃ, ধর্ম্মনীতি, ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য, এই সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ ধর্ম্মসংগত নহে। মহাভারতে আছে:—"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং, অসাধুং সাধুনা জয়েৎ, জয়েৎ কদর্য্যং দানেন, জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্।" ধম্মপদে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে:—"অকোধেন জিনে কোধং, অসাধুং সাধুনা জিনে, জিনে কদরিয়ং দানেন, সচ্চেনালীকবাদিনম্।" উভয়েরই তাৎপর্য্য এই, যে, ক্রোধকে প্রেম দ্বারা, অহিতকে হিত দ্বারা, লোভীকে দান দ্বারা, মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করিবে। খৃষ্টীয় শাস্ত্রেও শত্রুকে ভালবাসিবার, যাহারা দ্বেষ করে, তাহাদের হিত করিবার, উপদেশ আছে। অবশ্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই অধিকাংশ লোক এই উচ্চ উপদেশ-অনুসারে কাজ করে না। তাহা হইলেও মহাজনদের উপদেশ মানিলে ইহা বলিতে হয়, যে, ব্যক্তি বা জাতি কাহারো পক্ষে প্রতিহিংসার নীতি অবলম্বনীয় নহে।

এই কারণে, আমেরিকা, কেনিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের লাঞ্ছনা ও তাহাদের প্রতি অবিচার হইয়াছে বলিয়া যে প্রতিশোধ দিবার (retaliation এর) কথা উঠিয়াছে, আমরা সেভাবে কাজ করিবার সমর্থন করি না। কিন্তু যে তিনটি কার্য্য করিবার কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেকে বলিতেছেন, তাহার সমর্থন আমরা করিতেছি এই জন্য, যে, উহার সবগুলিই একটুও ক্রুদ্ধ না হইয়া করা যায়। প্রথমতঃ, কথা উঠিয়াছে, দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লার উপর শুল্ক বসাইবার। দক্ষিণ-আফ্রিকা বা পূর্ব্ব আফ্রিকা কোথাও আমাদের জাত-ভাইদের উপর কোন প্রকার দুর্ব্যবহার না হইলেও আমরা এই ব্যবস্থার সমর্থন করিতাম। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট্ তথাকার জাহাজের মালিকদিগকে টাকা (bonus) দিয়া তথাকার কয়লা সামান্য ভাড়ায় পশ্চিম ভারতীয় বন্দরে পৌঁছাইয়া-দিতেছে। ইহাতে বঙ্গের কয়লা দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার সহিত প্রতিযোগিতার দরুন বিক্রী হইতেছে না।

অতএব, দক্ষিণ আফ্রিকার এই অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য তথাকার কয়লার উপর যথোচিত শুল্ক বসান উচিত, এবং ভারতবর্ষের রেলগুলির কয়লা বহিবার ভাড়াও কমাইয়া দেওয়া উচিত।

যেখানে পরস্পরের প্রতি সম্মান নাই, সেখানে প্রকৃত সহযোগিতা থাকিতে পারে না। মুখে বলা হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব অংশের মর্য্যাদা সমান, কিন্তু ভারতবর্ষের লাঞ্ছনা ও অপমান সর্ব্বত্র হয়। সুতরাং বাস্তবিক অন্য অংশদের কেহ যে আমাদের নিকট হইতে প্রকৃত "সহ-" যোগিতা চায়, তাহা নহে; তাহারা চায় অনুবর্ত্তিতা বা বাধ্যতা। কিন্তু এরূপ গোলামী করিতে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, এবং ইহাকে সহযোগিতা বলিলে বা সহ-যোগিতা বলিয়া মানিয়া লইলে সত্যের অপলাপ ও অব-মাননা হয়। এই কারণে, আমরা ইম্পীরিয়্যাল্ কন্‌ফারেন্সে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে যোগ দেওয়ার বিরোধী।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির গবর্ণ্‌মেণ্ট্ বা আমাদের অপমান, অনাদর বা লাঞ্ছনা করে বলিয়া আমরা "একঘরে" হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিব, ইহাও সুযুক্তি নয়। ভারত-বর্ষের প্রাচীন অবিনশ্বর কীর্ত্তি ও ধন যাহা, ভারতের আধুনিক কৃতিত্ব ও সম্পদ্ যাহা, তাহার আদর মানুষের মত মানুষে সব দেশে ও মহাদেশে করে। ভারতবর্ষের প্রকৃত সম্পদ্ যাহা তাহাকে বাদ দিয়া জগৎ অগ্রসর হইতে পারে না। সেই সম্পদ্ বৃদ্ধিতে আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে।

—

মুসলমান রাজত্ব ও গোবধ

কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির সেক্রেটারী ডাক্তার সৈয়দ মাহ্‌মুদ, পি-এইচ্-ডি, সার্চেন্ট্ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দেখাইয়াছেন, যে, পাঠান ও মোগল রাজত্বকালে হিন্দুদের ধর্ম্মমূলক সংস্কারে আঘাত না দিবার জন্য গোবধ হ্রাস বা নিবারণের নিমিত্ত অনেক বাদশাহ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

—

ভারতীয় জাহাজ

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত টি ভি শেষগিরি আয়ার এই মর্ম্মের একটি আইন পাস্ করাইতে চান, যে, ভারতসাম্রাজ্যের উপকূলস্থ কোন বন্দর হইতে ঐরূপ অন্য কোন বন্দর পর্য্যন্ত মাল বা যাত্রী বহনের কাজ ভারতীয় জাহাজ ভিন্ন অন্য কোন জাহাজ করিতে পারিবে না। ভারতীয় জাহাজ বলিতে কি বুঝিতে হইবে, আইনের খসড়াটিতে তাহা পরিষ্কার করিয়া দেখান হইয়াছে। জাহাজগুলির মূলধনের অন্যূন শতকরা ৭৫৲ টাকা ব্রিটিশভারতীয় প্রজাদের হওয়া চাই, উহাদের কার্য্যাধ্যক্ষ কোম্পানীর অন্যূন শতকরা ৫ জন সভ্য ব্রিটিশভারতীয় প্রজা হওয়া চাই, ডিরেক্টরদের অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ব্রিটিশভারতীয় হওয়া চাই, অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ভোট ব্রিটিশভারতীয়দের হওয়া চাই। এইরূপ আইনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। অষ্ট্রিয়া, বেল্‌জিয়ম্, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, পোর্টুগ্যাল, রুশিয়া, জাপান এবং অষ্ট্রেলিয়ায় এইরূপ আইন বলবৎ আছে।

—

জাতীয় পতাকা-সম্পর্কীয় "সত্যাগ্রহ"

নাগপুরে জাতীয় পতাকা লইয়া গবর্ণ্‌মেণ্টের সহিত বিরোধ এখনও চলিতেছে। এখনও প্রত্যহ দূরাগত বহু স্বেচ্ছাসেবকের গ্রেফ্‌তারের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যাহা করা হইতেছে, তাহা অন্যায় নহে, এবং তাহাতে কোন নৈতিক দোষও নাই। তবে, কংগ্রেস্ পক্ষের লোকেরা ব্যাপারটিতে যতটা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, আমরা উহা তত আবশ্যক মনে করি নাই—মতের এই পার্থক্য আছে। কিন্তু ইহাও আমরা বলিয়াছি, যে, কংগ্রেস্ যখন ইহাতে লাগিয়াছেন, তখন পরাস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। তাঁহারা এপর্য্যন্ত পরাস্ত হন নাই। নাগপুরের যে-অংশে ইংরেজরা থাকে, তাহার রাস্তা দিয়া জাতীয় পতাকার মিছিল লইয়া কেহ যাইতে পারিবে না, সরকারী এই হুকুম অমান্য করায় স্বেচ্ছাসেবক-দিগকে জেলে যাইতে হইতেছে। এই হুকুম ১৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবার কথা। তাহার পর উহা যদি নূতন করিয়া জারী না করা হয়, তাহা হইলে ভাল হয়। মধ্য-প্রদেশের অধিবাসীদের পক্ষ হইতে তথাকার ব্যবস্থাপক সভাতেও এই প্রস্তাব, গবর্ণ্‌মেণ্টের বিরোধিতা সত্ত্বেও, ধার্য্য হইয়াছে, যে, ঐ হুকুম যেন আর নূতন করিয়া জারী করা না হয়।

—

কলিকাতায় ধরপাকড়

কলিকাতায় ও বঙ্গের মফস্বলের পুলিশ যে খুব স্বকার্য্যদক্ষ, একথা কেহ বলিতে পারিবে না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ডাকাতি খুন গুণ্ডামি বৃদ্ধির সময় পুলিশ রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া রাজনৈতিক ডাকাত ধরিতে কখন কখন এত ব্যস্ত হইয়াছিল, যে, তাহাতে সাধারণ দস্যুদের খুব সুবিধা হইয়াছিল। সম্প্রতি

কলিকাতায় অনেকগুলি খুন ও গুণ্ডামির কাজের দ্বারা পুলিশের অসামর্থ্য প্রমাণিত হওয়ায়, আবার এই সকলের সহিত রাজনীতির সংস্রবের ধুয়া উঠিয়াছে। রাজনীতির সম্পর্ক যে থাকিতে পারে না, তাহা বলিবার মত খবর আমরা রাখি না, কারণ আমাদের গুপ্তচর নাই; কিন্তু এক চক্ষু হরিণের মত পুলিশ কেবল এই দিক্ হইতেই শত্রুর উদ্ভব ও আবির্ভাব কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে বিপদ্ আছে। ইতিমধ্যেই শুনিয়াছি, এমন লোকও ধৃত হইয়াছে, যাহার পক্ষে খুন গুণ্ডামি করা অসম্ভব।

কোন কোন এংলো-ইণ্ডিয়ান্ কাগজে চীৎকার আরম্ভ হইয়াছে, যে, পুলিশের সংখ্যা বাড়ান দরকার। কিন্তু সংখ্যা বাড়াইবার কোনই প্রয়োজন নাই; পুলিশের লোকদের কার্য্যদক্ষতা ও সাহস বাড়াইবার এবং তাহাদের চারিত্রিক উন্নতির বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত আছে, যে, গুণ্ডা এবং আবকারী আইনভঙ্গকারীরা অনেক স্থলে একই ব্যক্তি এবং তাহারা পুলিশকে একটি লাইসেন্স্ ট্যাক্স্ দেয় যাহার উল্লেখ কোন আইনে নাই।

দৈনিক "হিন্দুস্থান" কাগজের স্বত্বাধিকারী পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ছিলেন, স্বেচ্ছায় ইস্তফা দেন। তাঁহারও মত এই। "হিন্দুস্থান" বলেন, কলিকাতার সমান অধিবাসীযুক্ত গ্লাস্‌গো শহরের পুলিশের সংখ্যা কলিকাতা অপেক্ষা ঢের কম; অথচ সেখানকার লোকেরা অহিংসাবাদী বৈষ্ণব না হইলেও, সেই ন্যূনসংখ্যক পুলিশ দ্বারাই বেশ কাজ চলে।

পুলিশ যখন রাজনৈতিক গন্ধের অনুসরণ করিতে থাকে, তখন চতুর গুণ্ডারা কিছুদিন এই উদ্দেশ্যে গা ঢাকা দিয়া অলস থাকিতেও পারে, যে, সকলের যেন এই ধারণা জন্মে, যে, যেহেতু রাজনৈতিক সন্দেহভাজন লোকদের ধরপাকড় আরম্ভ করায় গুণ্ডামি কমিয়াছে বা থামিয়াছে, অতএব ঐ-ব্যক্তিরাই গুণ্ডামি করিত। অতএব গবর্ণমেণ্টের ও পুলিশের বড়কর্ত্তাদের দুইটা চোখই খোলা থাকা দরকার।

ডাক্তার বরদারাজুলু নাইডু

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেমের ডাক্তার বরদারাজুলু নাইডু এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, মহাত্মা গান্ধীকে যতদিন কয়েদ করিয়া রাখা হইবে, ততদিন তিনি কোন ট্যাক্স্ দিবেন না। তাঁহার অনেক জিনিষপত্র ট্যাক্সের দায়ে নীলাম হওয়া সত্ত্বেও তিনি এতদিন এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি একটি রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। উহার সমস্ত বন্দোবস্ত হইবার পর এবং তিনি যখন কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনের শহরে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার উপর এই হুকুম জারী হয়, যে, তিনি কোন বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। এই হুকুম অমান্য করায় তাঁহার সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। এই হুকুমটাই বেআইনী হইয়াছিল। কারণ কন্‌ফারেন্সটিতে বিনা টিকিটে যাইবার অধিকার কাহারও ছিল না, এবং তথায় শান্তিভঙ্গ হইবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার বক্তৃতাটিতে রাজদ্রোহসূচক বা উত্তেজক কিছু ছিল, এই অভিযোগও সরকার পক্ষ হইতে করা হয় নাই। অতএব, স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করিবার সর্ব্বসাধারণের যে অধিকার আছে, গবর্ণমেণ্ট্ তাহার উপর হস্তক্ষেপ করায় ডাক্তার নাইডু হুকুম অমান্য করিয়া ঠিক কাজই করিয়াছেন।

নারীর উপর অত্যাচার

বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচারের সংবাদ প্রতিনিয়তই কাগজে পড়িতেছি। ইহাতে একদিকে যেমন দেশে দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব সূচিত হয়, অন্য দিকে তেমনি নারীদের আত্মরক্ষায় অসামর্থ্য ও পুরুষদের কাপুরুষতারও আধিক্য প্রমাণিত হয়। অনেক স্থলে পুলিশের লোকে কোন বা সমস্ত অপরাধীকে চালান দেয় না। কখন কখন এরূপ অভিযোগও শুনা যায়, অত্যাচারিত স্ত্রীলোকটির উপর পুলিশ আবার অত্যাচার করিয়াছে। রংপুর জেলায় যে-স্ত্রীলোকটিকে তাহার স্বামীর সম্মুখ হইতে দুর্বৃত্ত লোকে ধরিয়া লইয়া গিয়া অত্যাচার করে, তদন্তকারী পুলিশের একজন কর্ম্মচারী পুনর্ব্বার তাহার সতীত্ব নাশ করিয়াছে বলিয়া কাগজে খবর বাহির হইয়াছে। তাহাকে নাকি বদলী করা হইয়াছে। খবর সত্য হইলে সাধারণ আসামীর মত তাহাকে কেন ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হইল না?

এইসব অপরাধে সাধারণ আসামীর পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড হইলে পুলিশের আসামীর দশ বৎসর জেল হওয়া উচিত। স্ত্রীলোকের উপর যাহারা অত্যাচার করে, তাহাদের পৈশাচিক ব্যবহার সমুদয় জাতির কলঙ্ক। বঙ্গের নারীদেরও আত্মরক্ষার সামর্থ্য খুব বাড়া উচিত।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৩০

৬ষ্ঠ সংখ্যা

গোতমের তপস্যা

বাল্যকাল হইতেই গোতমের প্রাণ ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। এক স্থলে তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে গার্হস্থ্য অবস্থাতেই তিনি অনেক সময়ে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন (মজ্‌ঝিম-নিকায়, ৩৬, মহাসচ্চক সুত্র)।

গৃহ ত্যাগ করিবার পরে তিনি কি ভীষণ তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা মজ্‌ঝিম-নিকায় নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তাঁহার বয়স যখন ৮০ বৎসর তখন সেই বিষয়ে তিনি সারিপুত্রকে নিজ তপস্যার বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তাহারই অংশবিশেষ নিম্নে অনূদিত হইল।

চতুরঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য

গোতম সারিপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"হে সারিপুত্র! আমি স্বীকার করিতেছি যে আমি চতুরঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়াছি। আমি তপস্বী ছিলাম এবং পরম তপস্বীই ছিলাম। আমি রুক্ষ ছিলাম এবং পরম রুক্ষ ছিলাম। আমি জুগুপ্সিত ছিলাম এবং পরম জুগুপ্সিত ছিলাম। আমি প্রবিবিক্ত ছিলাম এবং পরম প্রবিবিক্ত ছিলাম।"

তপস্বী

"হে সারিপুত্র! আমার তপস্যা এইপ্রকার ছিল:—

"আমি বিবস্ত্র, মুক্তচার এবং হস্তাবলেহক (যে হস্ত অবলেহন করে) ছিলাম। ভিক্ষাকালে যদি কেহ বলিত 'হে ভদন্ত এস', 'হে ভদন্ত দাঁড়াও', আমি তাহা শুনিতাম না। যদি কেহ আমার নিকট আহার্য্য লইয়া আসিত, বা আমার উদ্দেশে আহার প্রস্তুত করিত, বা আমাকে নিমন্ত্রণ করিত, তাহা আমি গ্রহণ করিতাম না। কুম্ভমুখ বা কলোপীমুখ হইতে কখন ভিক্ষাগ্রহণ করিতাম না; এড়কা বা দণ্ড বা মুসলের নিম্ন হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতাম না। দুজন ভোজন করিতেছে এমন স্থল হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতাম না, গর্ভিণী বা স্তন্যদাত্রীর নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতাম না। অভ্যাগত লোকের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতাম না। যে স্থলে কুকুর রহিয়াছে, যে স্থলে মক্ষিকা ভন্‌ভন্ করিতেছে, সে-স্থল হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতাম না।

"আমি মৎস্য বা মাংস বা সুরা বা মৈরেয় বা তুষোদক গ্রহণ করিতাম না।

"এক গৃহে এক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিতাম, দুই গৃহে দুই গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিতাম, সপ্ত গৃহে সপ্ত গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিতাম। এক স্থানের দানে জীবনযাপন করিয়াছি, দুই স্থানের দানে জীবনযাপন করিয়াছি। সপ্তস্থানের দানের উপর জীবনযাপন করিয়াছি। দিনে একবার আহার করিয়াছি, দুই দিনে একবার আহার করিয়াছি, সাত দিনে একবার আহার করিয়াছি; এইরূপ অর্দ্ধমাসে একবার মাত্র ভোজন করিয়া বিহার করিয়াছি।

"শাক ভক্ষণ করিতাম, শ্যামাক ভক্ষণ করিতাম, নীবার ভক্ষণ করিতাম, দর্দ্দুল ভক্ষণ করিতাম, 'হট' ভক্ষণ করিতাম, ফেন ভক্ষণ করিতাম, পিণ্যাক-খৈল ভক্ষণ করিতাম, তৃণ ভক্ষণ করিতাম, গোময় ভক্ষণ করিতাম। বন্য মূল ও ফল আহার করিতাম। বৃক্ষপতিত ফল আহার করিতাম।

"শোণ বস্ত্র ধারণ করিতাম; শ্মশানের বস্ত্র, শবদূষিত বস্ত্র, পাংশুকূলস্থ-বস্ত্র ধারণ করিতাম। তিরটী-বল্কল ধারণ করিতাম। অজিন ধারণ করিতাম, অজিন হইতে প্রস্তুত বল্কল ধারণ করিতাম। কুশচীর, বল্কলচীর, ফলকচীর, কেশ-কম্বল, বাল-কম্বল ও উলূক-পক্ষ ধারণ করিতাম। কেশ-শ্মশ্রু নির্ম্মূলকারী ছিলাম—কেশ ও শ্মশ্রু তুলিয়া ফেলিতাম।

"সমুদায় আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতাম, উৎকুটাসনে উপবেশন করিয়া 'উৎকুটক' তপস্যা করিতাম। কণ্টকশয্যাশায়ী ছিলাম, কণ্টকশয্যায় শয়ন করিতাম। তৃতীয়বার স্নান করিবার জন্য সায়াহ্নে উদকে অবগাহন করিতাম। এইরূপে নানাপ্রকারে দেহকে তাপসন্তপ্ত করিয়া বিহার করিতাম। আমার তপস্যা এইপ্রকার ছিল।"

পরম রুক্ষ

"আমি 'রুক্ষ' আচরণ করিতাম। বহু বৎসরের ধূলি ও মলা দেহে সঞ্চিত হইয়া খসিয়া পড়িত—যেমন তিন্দুক-বৃক্ষের স্থাণু হইতে সঞ্চিত মলা ও বল্কলাদি নিপতিত হয়। তখন ইহা মনে হইত না যে আমি নিজে এই ধূলি ও মলা পরিমার্জ্জন করিতে পারি, কিংবা অপর কেহও ইহা পরিমার্জ্জন করিয়া দিতে পারে—হে সারিপুত্র! আমার মনে এ-প্রকার কোন ভাবই আসিত না। হে সারিপুত্র! আমি এইপ্রকার রুক্ষ আচরণ করিতাম।"

পরম জুগুপ্সা

"হে সারিপুত্র! আমি এইরূপে জুগুপ্সাপরায়ণও ছিলাম। অভিক্রমণ ও প্রতিক্রমণের সময়ে আমি স্মৃতিমান্ হইয়া থাকিতাম। উদকবিন্দু দেখিলেও আমার প্রাণে দয়ার উদ্রেক হইত, মনে হইত ইহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী রহিয়াছে, তাহাদিগের যেন কোন অনিষ্ট না করি। হে সারিপুত্র! আমি এইরূপ জুগুপ্সাপরায়ণ ছিলাম।"

সম্ভবতঃ এস্থলে "জুগুপ্সা" শব্দের অর্থ "দয়া"।

পরম প্রবিবিক্তি

"হে সারিপুত্র! আমি এইপ্রকারে বিবিক্ত-দেশ-সেবী ছিলাম। হে সারিপুত্র! আমি বনভূমিতে প্রবেশ করিয়া বিহার করিতাম। হে সারিপুত্র! যেমন অরণ্যচর মৃগ মনুষ্য দর্শন করিয়া, বন হইতে বনে, গহন হইতে গহনে, নিম্ন হইতে নিম্নতর স্থানে, উচ্চ স্থল হইতে উচ্চতর স্থলে গমন করে, হে সারিপুত্র! আমিও তেমনি গোপালক বা পশুপালক বা তৃণহারক, বা কাষ্ঠহারক বা বনকর্ম্মী দর্শন করিয়া, বন হইতে বনে, গহন হইতে গহনে, নিম্ন স্থল হইতে নিম্নতর স্থলে এবং উচ্চ স্থল হইতে উচ্চতর স্থলে গমন করিতাম। এ-প্রকার কেন করিতাম? এইজন্য, যে তাহারা যেন আমাকে দর্শন না করে এবং আমিও যেন তাহাদিগকে দর্শন না করি। আমি এই-প্রকারে বিবিক্ত প্রদেশ সেবা করিতাম।"

ভক্ষণ

"হে সারিপুত্র! যখন গোষ্ঠ হইতে গাভী ও গোপালক-গণ চলিয়া যাইত, তখন পাত্রহস্তে গমন করিয়া দুগ্ধপায়ী তরুণ বৎসগণের গোময় আহরণ করিতাম। ইহাতে আমার যে মূত্র ও পুরীষ উৎপন্ন হইত, তাহাও ভোজন করিতাম। হে সারিপুত্র! আমি এইরূপ মহা বিকট ভোজন করিতাম।"

আবাস

"হে সারিপুত্র ! আমি ভীষণ বনভূমিতে গমন করিয়া বিহার করিতাম। হে সারিপুত্র ! সেই বনভূমিতে বিষম ভীতির উদ্রেক হয় ; যাহারা বীতরাগ হয় নাই, সেই বনভূমিতে প্রবেশ করিলে তাহাদিগের লোমহর্ষণ হয়।

"হে সারিপুত্র ! যখন হেমন্তকালে রাত্রিতে হিমপাত হইত, সেই-প্রকার রজনীতে উন্মুক্ত স্থানে বিহার করিতাম, আর দিবাভাগে বনে প্রবেশ করিতাম। ইহার পরে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে উন্মুক্ত স্থানে থাকিতাম এবং রাত্রিকালে থাকিতাম বনভূমিতে। তখন অশ্রু পূর্ব্ব এই গাথা আমার মনে প্রতিভাত হইয়াছিল—

" 'তিনি (গ্রীষ্মকালে) উত্তপ্ত, (শীতকালে) শীতার্ত্ত, তিনি একাকী ভীষণ বনে বাস করেন ; তিনি নগ্ন, অনগ্নি, আসীন ; তাঁহার মন সুপ্রতিষ্ঠিত ; তিনিই মুনি।' "

উপেক্ষা-সাধন

" হে সারিপুত্র ! শ্মশানে শবাস্থিসমূহের উপরে শয়ন করিতাম। গোপাল বালকগণ সেই স্থলে আসিয়া আমার দেহে নিষ্ঠীবন ও মূত্র ত্যাগ করিত, ধূলি নিক্ষেপ করিত এবং কর্ণবিবরে শলাকা প্রবেশ করাইয়া দিত। হে সারিপুত্র ! তখনও তাহাদিগের বিরুদ্ধে আমার মনে পাপচিন্তা আসিত না। হে সারিপুত্র ! আমি এইরূপে উপেক্ষা-ভাব সাধন করিতাম।"

দেহক্ষয়

"হে সারিপুত্র ! অনেক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এই মত পোষণ করে এবং এই-প্রকার বলিয়া থাকে— 'আহারেই শুদ্ধিলাভ।' তাহারা বলিয়া থাকে— 'একমাত্র কোল-ফল দ্বারাই জীবন ধারণ করিব' এবং তাহারা কোল-ফলই ভক্ষণ করে, কোল-চূর্ণই ভক্ষণ, কোলোদকই পান করে এবং নানা-প্রকার কোলময় খাদ্য গ্রহণ করে। হে সারিপুত্র ! আমিও একটিমাত্র কোল-ফল আহার করিতাম। হে সারিপুত্র ! তোমার মনে এই-প্রকার চিন্তা আসিতে পারে, যে, সে-সময়ের কোল-ফল প্রকাণ্ড ছিল। হে সারিপুত্র ! তাহা নহে, এখন কোল-ফল যে-প্রকার, সে-সময়ের কোল-ফলও সেই-প্রকার ছিল। আমি এই-প্রকার একটি কোল-ফল আহার করিতাম।"

এস্থলে গোতম কোল-ফলের বিষয়ে যে-প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার পরে মুদ্গ, তিল, ও তণ্ডুল-কণা বিষয়েও ঠিক সেই-প্রকার বলিয়াছেন। এক সময়ে কেবল মুগই ভক্ষণ করিতেন, কিছুদিন কেবল তিলই ভক্ষণ করিতেন এবং কখন বা ভক্ষণ করিতেন কেবল তণ্ডুল। তিনি যে ভক্ষণ করিতেন, তাহাও কেবল একটি কণা।

এই-প্রকার বর্ণনা করিবার পরে তিনি সারিপুত্রকে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"এই-প্রকার আহারে আমার দেহ অত্যধিক শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অল্পাহারে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ— 'আসীতিক' পর্ব্ব বা 'কাল' পর্ব্বের ন্যায় (অর্থাৎ নল-জাতীয় উদ্ভিদের ন্যায়) বিশুষ্ক হইয়াছিল। অল্পাহারে আমার নিতম্ব উষ্ট্রক্ষুরের ন্যায় কঠিন হইয়াছিল। অল্পাহারে পৃষ্ঠদণ্ড রজ্জুর ন্যায় উন্নতাবনত হইয়াছিল। যেমন জীর্ণ গৃহের 'গোপানসী'সমূহ (অর্থাৎ আড়কাঠা-গুলি) 'ওলুগ্‌গা প্লিলুগ্‌গা" অবস্থায় (অর্থাৎ ভগ্ন অবস্থায়) পরিদৃষ্ট হয়, অল্পাহারের জন্য আমার দেহের পার্শ্বাস্থি-সমূহও তেমনি পরিদৃষ্ট হইত।

"যেমন গভীর কূপে নিম্নগত জল কচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়, অল্পাহারের জন্য তেমনি আমার অক্ষিকূপের অক্ষিতারকা কোটরগত হইয়া প্রায় অদৃশ্যই হইয়া গিয়াছিল। 'আম-অলাবু' (কাঁচা লাউ) ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে যেমন বায়ু ও আতপে শুষ্ক ও সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তেমনি অল্পাহারে আমার মস্তকের চর্ম্ম শুষ্ক ও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। আমি যখন উদরের চর্ম্ম স্পর্শ করিতাম, তখন পৃষ্ঠদেশের অস্থি হস্তসংলগ্ন হইত। আবার যখন পৃষ্ঠদেশের অস্থি স্পর্শ করিতাম যখন উদরের চর্ম্ম হস্তসংলগ্ন হইত। অল্পাহারে উদরের চর্ম্ম পৃষ্ঠদেশের অস্থিতে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল। যখন মল-মূত্র ত্যাগ করিতে যাইতাম, তখন অল্পাহার-বশতঃ কুব্জ হইয়া পড়িয়া যাইতাম। সেই বেদনা প্রশমনের জন্য যখন সেই অঙ্গে হস্ত সঞ্চালন করিতাম তখন সেই

স্পর্শে পূতি-মূল লোমসমূহ (অর্থাৎ যে লোমের গোড়া পচিয়া গিয়াছিল, সেই লোমগুলি) দেহ হইতে উৎপাটিত হইয়া পড়িত। অল্পাহারের জন্যই এই-প্রকার ঘটিয়াছিল।"

অন্যত্র

মজ্‌ঝিম-নিকায় গ্রন্থের মহা-সচ্চক সুত্তেও এই তপস্যার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত অংশ কেবল সেই সুত্তেই পাওয়া যায়। এই অংশও গৌতমের উক্তি। তিনি বলিতেছেন:—

"লোকে আমাকে দেখিয়া এই-প্রকার আলোচনা করিত—শ্রমণ গোতম কৃষ্ণবর্ণ, কেহ এই-প্রকার বলিত, কেহ বলিত শ্রমণ গোতম কৃষ্ণবর্ণ নহে, শ্রমণ গোতম শ্যামবর্ণ। কেহ বলিত শ্রমণ গোতম কৃষ্ণবর্ণও নহে, শ্যামবর্ণও নহে, শ্রমণ গোতমের বর্ণ মুদ্‌গর-মৎস্যের বর্ণের ন্যায়। আমার ত্বকের পরিশুদ্ধ নির্ম্মল বর্ণ অল্পাহারে এমনই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল।"

বিফল তপস্যা

মহা সীহনাদ সুত্তে গোতম সারিপুত্রকে দেহ-ক্ষয়ের বিষয়ে যতদূর বলিয়াছিলেন তাহার পরে এই-প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—

"হে সারিপুত্র! এই-প্রকার আচরণ করিয়াও, এই-প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াও, এই-প্রকার দুষ্কর সাধন করিয়াও মানবধর্ম্মের অতীত পরম আর্য্যজ্ঞান ও দর্শন লাভ করিতে পারি নাই। যে আর্য্যপ্রজ্ঞা লাভ করিলে সমুদায় দুঃখ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এই তপস্যা দ্বারা আমি সেই আর্য্যপ্রজ্ঞা লাভ করিতে পারি নাই।" (মজ্‌ঝিম-নিকায় গ্রন্থে মহাসীহনাদ সুত্ত।)

অন্য একস্থলে গোতম এই-প্রকার বলিয়াছেন—

"সেই সময়ে আমার মনে এই-প্রকার ভাব হইল—অতীত কালের শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ তপস্যায় যে-প্রকার তীব্র ও কঠিন দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন তাহা অপেক্ষাও আমার তপস্যা ভীষণতর। ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুঃখ, বেদনা কেহই অনুভব করে নাই। ভবিষ্যৎ কালে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ তপস্যায় যে-প্রকার তীব্র ও কঠিন দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভব করিবে, তাহা অপেক্ষা এই সাধনা ভীষণতর, ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুঃখ-কষ্ট কেহই অনুভব করিবে না। বর্ত্তমান কালে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ-গণ তপস্যায় যে-প্রকার তীব্র ও কঠিন দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে, তাহা অপেক্ষা এই তপস্যা ভীষণতর, ইহা অপেক্ষা কেহই গুরুতর দুঃখ-কষ্ট অনুভব করিতেছে না। কিন্তু এই-প্রকার তীব্র তপস্যা করিয়াও মানবধর্ম্মের অতীত আর্য্যজ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে পারি নাই। বুদ্ধত্ব লাভ করিবার অন্য পথ থাকিতে পারে।...... আমার মনে হইল পিতা শাক্য যখন লাঙ্গল* দ্বারা চাষ করিতেন তখন আমি জম্বুচ্ছায়ায় নিসিন্ন হইয়া, সমুদায় কামনা বিসর্জ্জন করিয়া, সমুদায় অকুশল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেক-জ ও প্রীতি-সুখ-পূর্ণ প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন হইতাম। ইহাই ত বুদ্ধত্বলাভের মার্গ হইতে পারে।......কিন্তু এই-প্রকার একান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহে এই-প্রকার সুখময় অবস্থা লাভ করা সুকর নহে। সুতরাং স্থূল খাদ্য ও দধিমিশ্রিত অন্ন গ্রহণ করা যাউক। ইহার পরে আমি স্থূল খাদ্য ও দধিমিশ্রিত অন্ন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলাম।" (মজ্‌ঝিম-নিকায়, মহা-সচ্চক সুত্ত।)

মানুষ ধর্ম্মের জন্য কি না করিতে পারে। গোতমের ভীষণ তপস্যার কথা মনে হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে। কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে, এ-প্রকার তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব নহে, তখন তিনি অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। এই পথেই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সে কথা পরে আলোচিত হইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

* অতি প্রাচীন কালে জনকাদি রাজগণও স্বহস্তে লাঙ্গল চালাইতেন। (রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৬৬।১৩)।

বৌদির মৃত্যু

(১)

দাদার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি খুব ছোটবেলা হইতেই। দাদা থাকিতেন দেশে, আমি থাকিতাম কলিকাতায়—কাকার বাসায়।

বাবা যেবার মারা যান, কাকা সেবার কলিকাতায় নূতন ওকালতির পসার খুলিয়া বসিয়াছেন। বাবার মৃত্যুতে আমার বিধবা জননী কাকাকে আমাদের সংসারের একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যাইতে লিখিয়া পাঠাইলেন। কাকা আসিয়া তাঁহার নূতন ওকালতি বুদ্ধি ফলাইয়া যে-বন্দোবস্ত করিলেন, তাহাতে মামা হইলেন সংসারের বড়-কর্ত্তা, আর লেখাপড়া খতম দিয়া দাদা হইলেন ছোট-কর্ত্তা। অবশ্য এই 'লেখাপড়া খতম দেওয়া' বিষয়ে মা'র খুব আপত্তি ছিল; কিন্তু যিনি লেখাপড়া ক'রিবেন তাঁহার ইহাতে পূর্ণ সহানুভূতিই ছিল। আমার দাদা লোকটার নাকি এতটুকু বয়স হইতেই, লেখাপড়া হইতে সংসারের কাজেই বেশী উৎসাহ দেখা যাইত। তাঁহার নাকি পড়াশুনা করিতে গিয়া মাথা ধরিয়া উঠিত, কিন্তু লাউগাছের জাংলা দিতে, মাটি খুঁড়িয়া বেগুনের চারা বুনিতে, বাজার থেকে অল্প পয়সায় বেশী জিনিষ আনিতে, বঁড়শী দিয়া পুকুরের মাছ ধরিতে মাথা বেশ হাল্কা ও পাৎলা হইয়া পড়িত। দাদার সম্বন্ধে এখবর কাকার অজানা ছিল না। সুতরাং মাকে বুঝাইয়া ও তাঁহার আপত্তি জানাইয়া তিনি দাদাকে সংসারের কাজে লাগাইয়া দিলেন। দাদা এইরূপে সংসারের ছোট-কর্ত্তা হইয়া বসিলেন।

আমার সম্বন্ধে কিন্তু কাকার খুব উঁচু ধারণা ছিল। আমি যে একজন তোখোড় ছেলে এবং বাঁচিয়া থাকিলে আমি যে একটা মানুষ হইব, একথা তাঁহার মুখে প্রায়ই শোনা যাইত। সুতরাং মামা ও দাদাকে সংসারের কর্ত্তৃত্বপদে অভিষিক্ত করার পর তিনি আমার হাত ধরিয়া মায়ের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন—"দেখুন বৌ-ঠাকুরুণ, অমলকে কিন্তু আমি আমার কাছে রাখ্‌ব, ও ওখানে থেকে লেখা-পড়া করবে।"

তাহাই হইল। তিনি আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া আসিয়া "সাউথ সুবার্বান্ স্কুলে"র নবম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। আমি মনোযোগ দিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলাম।

সেই সময় হইতে দাদা দেশে, আমি কলিকাতায়।

(২)

তার পর চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমার বয়স এখন বার বৎসর এবং আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতেছি।

সেদিন আমাদের স্কুল বন্ধ। আমি পড়িবার ঘরে একলা বসিয়া কি ভাবিতেছিলাম মনে নাই। এমন সময় কাকীমা একখানা চিঠি-হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—"তোর দাদার বিয়ে রে অমল! এই চিঠি এয়েছে।"—বলিয়া চিঠিখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন। সংবাদটার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আমার ছোট বুকটাতে একরাশ আনন্দ পুরিয়া দিল। চিঠিখানা লইয়া পড়িতে লাগিলাম। চিঠি মা লিখিয়াছেন। বিবাহের আর ৩।৪ দিন বাকী, আমাদের সকলকে যাইতে লিখিয়াছেন। অধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কবে রওয়ানা হবে কাকীমা?"

কাকীমা বলিলেন—"তোর কাকা-বাবু আসুন, শুন্‌বো এখন।"—বলিয়া কাকীমা চলিয়া গেলেন।

তখন সেই বিজন ঘরে চিঠি-হাতে বসিয়া আমি নূতন বৌদির কথা ভাবিতে লাগিলাম।

"নূতন বৌদি হয়ত ও-বাসার মণিমালার মত এতটুকু মেয়ে। চাঁদের মত মুখ, মেঘের মত চোখ, ফুলের মত রং। তাঁকে আমার খুবই ভাল লাগ্‌বে। আমি তাঁর চেয়ে বড় হ'য়েও তাকে ছেলের মত প্রণাম করব; তিনি আমার চেয়ে ছোট হয়েও আমাকে মায়ের মত বুকের কাছে টেনে নিয়ে আশীর্ব্বাদ করবেন।

ওঃ! কত মিষ্টি হ'বে আমার এই একফোঁটা বৌদির ভালোবাসা।

"দাদার সাম্‌নে ঘোমটা দিয়ে তিনি যখন বসে' থাক্‌বেন, আমি তখন দূর থেকে মুচ্‌কি হেসে' ঘোম্‌টার ফাঁক দিয়ে তাঁর মুখপানে চাইব। তিনি যখন আপনাকে একলা পেয়ে মাথার কাপড় ফেলে চুলগুলো এলিয়ে আপন মনে একটা কিছু ভাব্‌তে থাক্‌বেন, আমি তখন পিছন থেকে চুপিচুপি পা ফেলে এসে দুহাত দিয়ে খপ্‌ ক'রে তাঁর নীল চোখ দুটো ধরে' ফেল্‌বো। যখন রায়-বাড়ীর মোক্ষিমাসী, বোস-বাড়ীর বিন্দি পিসি, সেন-বাড়ীর কাজ্‌লী মামী—এঁরা সব্বাই এসে আমার নতুন বৌদিকে ঘিরে ধ'রে তাঁকে নানান্‌ কথা জিজ্ঞেস্‌ করবেন—আর বৌদি ঘোম্‌টার তলে মুখ নীচু ক'রে কেবল মাথা নেড়ে কথার উত্তর দিতে থাক্‌বেন—আমি তখন ডাকাতের মতন হঠাৎ কোত্থেকে এসে' ঘোমটা খুলে' সব্বার সাম্‌নে তাঁর মুখ তুলে' ধরব। তার পর আড়ালে এসে যখন বৌদি বল্‌বেন—'যাও ঠাকুরপো! তুমি বড় দুষ্টু'—আমি তখন সাঁ করে' বৌদিকে কাঁধে তুলে ছুটে গিয়ে একবারে মায়ের কাছে হাজির হ'ব, বল্‌বো—'দেখ ত মা! বৌদি আমায় দুষ্টু বলে।'" বৌদির সম্বন্ধে এমনি ধারার শত সহস্র আনন্দ-কম্পিত নিঃশব্দ ভাবনা প্রাণ-মনে পুলক লাগাইয়া সারাবেলা ভরিয়া আমার বুকের মধ্যে আনোগোনা করিতে লাগিল।

বড় সুখেই সারাটা দিন কাটিল।

সন্ধ্যাবেলায় কাকা বাসায় ফিরিলেন। তাঁহাকে চিঠি দেখাইলাম। তিনি পত্র-পাঠান্তে বলিলেন—"আচ্ছা পশু'দিন রওয়ানা হওয়া যাক্‌।"

সারারাত্রি আমার ঘুম হইল না। খোলা জানালার মধ্য দিয়া জ্যোৎস্নালোকিত আকাশ দেখা যাইতেছিল। তাহার পানে চাহিয়া মনে হইতেছিল বিবাহের রাত্রে এমনি পরিপূর্ণ আকাশের তলে মিলনের সিংহাসনের উপর দাদা ও বৌদি বসিবেন আর ঠিক এমনি জ্যোৎস্নার মতই স্নিগ্ধ চাহনিতে সুন্দর শুভদৃষ্টি ভরিয়া বৌদি দাদার পানে চাহিবেন। কি সুন্দর হইবে সেই দৃশ্য!

(৩)

মানুষ যাহা খুব বেশী করিয়া চায় তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতেই হইবে—এ বোধ হয় ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় নিয়ম।

দাদা-বৌদির মিলন দেখিতে আমার প্রাণে বড় সাধই জাগিয়াছিল, কিন্তু জানি না ভগবান্‌ কেন আমার সে সাধ পূর্ণ হইতে দিলেন না। যেদিন রওয়ানা হইব, কাকা সেদিন হঠাৎ জ্বরে পড়িলেন। কাজেই আর যাওয়া হইল না।

কাকা যখন ভালো হইলেন, তখন বিবাহের দিন চলিয়া গিয়াছে। তথাপি আমি নিরস্ত হইলাম না। শুধু বৌদির মুখখানিই দেখিতে আমাদের দেশের এক ভদ্রলোকের সহিত বাড়ী রওয়ানা হইলাম। সারাপথ ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম—বাড়ী পৌঁছিয়া ঘরের পানে চাহিতেই দেখিব—বৌদি আমার ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া কিন্তু আমার মনটা ভয়ানক খারাপ হইয়া গেল। আমাদের বাড়ীটা লোক-জনের কোলাহল ও আনন্দোৎসবে সততই পূর্ণ থাকিত। কিন্তু তখন বাড়ীর দিকে চাহিয়া মনে হইল যেন সেখানে কিসের একটা নিরানন্দ পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। সমস্ত বাড়ীময় যেন শ্রীহীনতা মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া রহিয়াছে।

বাড়ী আসিলাম। উঠানে পা দিতেই আমার দিকে চাহিয়া মা আকুলস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি কিছু না-জানিয়া না-শুনিয়াই অবশ হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলামন।

তার পর যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার সমস্ত অন্তরে ক্রন্দন ফুকারিয়া উঠিল। শুনিলাম—আমার নূতন বৌদি পদ্মার জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

আমার বৌদির বাড়ী পদ্মাপারে। বৌদির থাকার মধ্যে ছিলেন, এক মা। তাঁর মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের ছেলেবেলাতে খুব ভাব ছিল। বৌদির মা কিছুদিন হইল ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলেন। মেয়ের কি গতি হইবে ভাবিয়া-চিন্তিয়া কোনো কূল-কিনারা না পাইয়া, তিনি অবশেষে আমার মাকে চিঠি লিখিয়া

সকল কথা জানান। মা চিঠি পাইয়া মামার সঙ্গে পদ্মাপারে বাল্য-সখীর গৃহে চলিয়া যান এবং তাঁর পাঁচ বৎসরের এক ফোঁটা মেয়ের বেদনা-মাখা গোলাপের মত রাঙা মুখখানির পানে চাহিয়া ঠিক করিয়া আসেন তার সঙ্গে দাদার বিবাহ দিবেন।

কয়েকদিন পরে আবার সেখানে গিয়া ভাবী-পুত্রবধূরূপে সেই মেয়েকে ঘরে লইয়া আসেন। তার পর এই সে-দিন তার সঙ্গেই দাদার বিবাহ দিলেন।

বিবাহের পর দুই দিন না যাইতেই সংবাদ আসিল, সেই অনাথা বিধবার অসুখ ভয়ঙ্কর বাড়িয়াছে। বাঁচেন কি না সন্দেহ তাই মরিবার আগে মেয়েকে একবার দেখিতে চান।

বৌদিকে লইয়া মা, মামা-বাবু ও দাদা আবার পদ্মা-পারে যাত্রা করিলেন। বুড়ী, মেয়ে দেখার শেষ-আনন্দ-টুকু বুকে লইয়া, মৃত্যুর শান্তিতে লুটাইয়া পড়িল।

ফিরিয়া আসিবার সময়, নদীর মাঝখানে হঠাৎ ঝড় উঠিয়া নৌকা ডুবিয়া যায়। অতি কষ্টে কোনো না কোনো উপায়ে দুটি প্রাণী ছাড়া জলমগ্নদিগের মধ্যে আর-সকলেই কূল পাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন। যে দুইজন আসিল না তাহাদের মধ্যে—একটি এক বৃদ্ধ মাঝি, অন্যটি আমার পাঁচ বৎসরের নূতন বৌদি!

সমস্ত শুনিয়া বেদনায় ও অবসাদে আমার অন্তর ভরিয়া গেল। আর আমার বার বৎসরের ছোট বুক ভরিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মে অবিশ্বাস জাগিয়া উঠিল।

আমি যে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম বৌদিকে দেখিতে! আমার যে বড় সাধ ছিল বৌদিকে প্রণাম করিতে! আমার এ আশা এ সাধ ছোট প্রাণের ছোট জিনিব হইলেও তার মধ্যে যে কত বড় একটা সত্য লুকাইয়া ছিল সে ত তোমার অজানা ছিল না ভগবান্! তবে কেন এমন হইল? কেন আমার বৌদির সঙ্গে দেখা হইল না? আমি যে না দেখিতেই তাঁকে কত ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম!

(৪)

তার পর বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে আমাদের সংসারের উপর দিয়া—আমার প্রাণের উপর দিয়া একটা প্রলয় বহাইয়া আমার দাদা—আমার একমাত্র দাদা—পরপারের সুগভীর শান্তিতে মিলিয়া গিয়াছেন।

এ বৎসর আমি এম্-এ পড়িতেছি। আমার কাজের মধ্যে এখন—পড়াশুনা, গল্প লেখা ও একটা প্রাইভেট টিউসনি করা।

শক্তিশালী সুলেখক উদয়কৃষ্ণ রায় একজন অবসর-প্রাপ্ত বৃদ্ধ ডাক্তার। তাঁর মেয়েকে আমি পড়াই।

উদয়কৃষ্ণ-বাবুর সঙ্গে আমার প্রথমতঃ জানা শোনা হয় "চন্দ্রলেখা" পত্রিকায় লেখার মধ্য দিয়া। তার পর একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয়। সেদিন উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ের আলাপ হইয়াছিল এবং তাঁর সঙ্গে আলাপে সেদিন বড় সুখই পাইয়াছিলাম। সেই হইতে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই মিশিতাম এবং তিনিও তাঁর অবসর-কাল আমার সংসর্গে আসিয়াই কাটাইতেন। এই মেশামেশি ক্রমে আমাদের উভয়ের মধ্যে একটি স্নিগ্ধ-সরস-সুমধুর আত্মীয়তা জাগাইয়া দিয়াছিল।

একদিন উদয়-বাবু কথায় কথায় বলিলেন—"দেখুন অমল-বাবু, আপনাকে আমার একটা উপকার কর্‌তে হবে। আমার শেষ বয়সের সম্বল এক মেয়ে আছে। তার পড়াবার ভারটা আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে নিতেন তবে বড়ই উপকৃত হতাম। আমি নিজেই এদ্দিন পড়াতাম, কিন্তু এ বুড়ো বয়সে এখন আর ওসব হাঙ্গামা সয় না। বহুদিন থেকেই তার জন্যে একজন প্রাইভেট টিউটর খুঁজছিলাম। পেয়েছিলাম অনেককেই—কিন্তু পছন্দ হয়নি কাউকেও। আপনাকে দেখে মনে হয় আপনিই তার উপযুক্ত মাষ্টার হ'তে পার্‌বেন।"

মেয়ে পড়াইতে হইবে! জীবনে একাজ কখনো করি নাই। বুকের মধ্য দিয়া একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। আমি সম্মত হইলাম।

সেই দিন হইতে আমি উদয়-বাবুর মেয়ে সন্ধ্যা-তারাকে পড়াই।

আমার দ্বারা সন্ধ্যার শিক্ষা কতখানি হইয়াছে জানি না—কিন্তু পড়াইবার মধ্য দিয়া তার সঙ্গে যে আমার প্রণয়-প্রভাতের প্রথম শুভদৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, আর-

সকলের কাছে গোপন থাকিলেও, এ সংবাদ আমি আমার অন্তরতম অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলাম। সন্ধ্যা-তারার চোখের দিকে চাহিয়া আমার চোখ নত হইয়া যাইত, মুখের দিকে চাহিয়া বুক ভরিয়া উঠিত। হাসির পানে চাহিয়া মনে হইত সংসারে আমার চাহিয়া দেখিবার সকল সুন্দর দৃশ্য ঐ হাসির মধ্যে জমা হইয়া রহিয়াছে।

তাহার সম্মুখে বসিয়া যখন তাহাকে পড়াইতে থাকিতাম তখন মনে হইত স্বর্গ তার সকল সুখ-সম্পদ্-সৌন্দর্য্য লইয়া আমার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া শূন্য ঘরের শূন্য বিছানায় যখন দেহটিকে এলাইয়া দিতাম, আমার চোখের কাছে তারই ছবিখানি চকিতে ভাসিয়া উঠিত। আমি নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বিহ্বল হইয়া পড়িতাম। ধীরে ধীরে আমার আঁখির পাতা মুদিয়া যাইত। তার পর দৃষ্টি আমার পরিপূর্ণ হৃদয়ের মধ্যে তলাইয়া যাইত। যতদূর দেখা যায় দেখিতাম আমার মন-প্রাণের ততদূর পর্য্যন্ত 'সন্ধ্যাতারার' কনক-দীধিতির কম্পিত চুম্বনে শিহরিয়া উঠিয়াছে।

যাহাকে সমস্ত বুক দিয়া এমন করিয়া ভালোবাসিয়াছি তাহারও প্রণয়-সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে যে আমার রাগিণীই গোপন ঝঙ্কার তুলিয়া আনন্দে কাঁপিয়া উঠিয়াছে এ বারতাও হৃদয়ের মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। সেই পাওয়াই আমার প্রেমের বেদনাকে আরও অধীর আরও মধুর আরও আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছিল।

(৫)

কিন্তু যাহাকে ভালবাসি—তাহাকে পাইব কি না—এটা ভাবিতে গিয়া নিরাশ হইয়াই পড়িয়াছি। অবশ্য নিরাশ হওয়ার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। তবুও কেন যেন আশা করিতে পারি নাই।

হয়ত ইহাই প্রেমিকের স্বভাব—সে যাহাকে ভালো-বাসে, তাহাকে পাওয়ার অতবড় একটা সুখ তাহার ধাতে কিছুতেই সহিবে না—আশা থাক বা না থাক—সর্ব্বস্থলেই ইহাই সে ভাবিয়া বসিবে।

আমিও প্রেমিকের এই রীতি অনুসারে আগা-গোড়া নৈরাশ্যেই ভাসিয়া চলিতেছিলাম। কিন্তু স্রোত হঠাৎ উজান বহিল। আমি সন্ধ্যাতারাকে অভাবনীয় রূপে পাইয়া গেলাম।

সেদিন আকাশ জুড়িয়া মেঘ করিয়াছিল। বৃষ্টিও মাঝে মাঝে হইতেছিল। এমন দিনে নেহাৎ দায়ে না পড়িলে কেহ ঘর ছাড়িয়া বাহির হয় না। আমি বাহির হইলাম কারণ আমি প্রেমের দায়ে পড়িয়াছিলাম। বিশেষতঃ জ্বরে পড়িয়া থাকার দরুন কয়েক দিন পড়াইতে যাওয়া হয় নাই।

গিয়া দেখি ছাত্রী তখনও অনুপস্থিত। পথ চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। অনতিকাল পরে একজন ঘরে ঢুকিলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া বুক জুড়াইল না, কারণ ইনি তিনি নন যাঁর প্রতীক্ষা আমার দুনয়নের কানায় কানায় জাগিয়া রহিয়াছে। ইনি পাশের বাড়ীর সাত বছরের "কনকচাঁপা"। সন্ধ্যাকে দিদি বলিয়া ডাকেন এবং দিদির পড়াইবার সময় রোজই একবার করিয়া এঘরে হাজিরা দিয়া যান।

কনকচাঁপা ম্লান মুখে বলিল—"সন্ধ্যাদির জ্বর হয়েছে!" মনে মনে বলিলাম—"হবেই ত, প্রেমিকের হয়েছিল, প্রেমিকা বাদ যাবেন কেন? বাদ গেলে প্রেম জমবে কি ক'রে?" প্রকাশ্যে বলিলাম—"জ্বর হয়েছে? এখন কেমন?"

"এখনও পাঁচ ডিগ্রী জ্বর।"

"চল একবার দেখে আসি।"

দেখিতে যাইবার জন্য চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেছি, দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখি স্বয়ং তিনিই উপস্থিত, যাঁকে দেখিতে যাইব।

মুখ-চোখ জবাফুলের মত লালে লাল হইয়া উঠিয়াছে, লুকাইয়া রাখার প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সর্ব্ব দেহে জ্বরের কাঁপুনি শিহরিয়া উঠিতেছে! চমকিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ কি! আপনি এলেন কেন?"

"আমি পড়্‌ব" দৃঢ়কণ্ঠে এই জবাব দিয়া সে সাম্‌নের একখানা চেয়ার টানিয়া বসিতে গিয়াই ধড়াস্ করিয়া নীচের কঠিন পাষাণের উপর হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া গিয়া তাকে তুলিয়া ধরিয়া পাশের বিছানায় শোয়াইলাম।

চাহিয়া দেখি সংজ্ঞা নাই। উদয়-বাবুকে ডাকিয়া আনিতে কনককে পাঠাইয়া চোখে-মুখে জলের ঝাপ্টা দিতে সুরু করিলাম।

উদয়-বাবু আসিলেন। তিনি অধীর আগ্রহে মেয়েকে কোলের উপর শোয়াইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

জল ও বাতাসের গুণে মূর্চ্ছা ভাঙিল। সন্ধ্যা চোখ মেলিয়া চাহিয়া আর্ত্তস্বরে কহিল—"উঃ!"

উদয়-বাবু মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিলেন—"মা!"

মায়ের কানে সে আহ্বান পৌছিল কিনা সন্দেহ, সে সেই ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মাষ্টারমশাই কোথায়?—আমি পড়্‌বো।"

উদয়-বাবু মেয়ের পানে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়াছিলেন; এইবার দৃষ্টি ফিরাইয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন, ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। মুখরেখা একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে উদ্ভাসিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ ঐরূপে চাহিয়া থাকার পর শেষে বলিলেন—"আচ্ছা কনক, তুই মাষ্টার-বাবুর সঙ্গে সন্ধ্যার পাশে একটু বোস্। আমি দেখিগে আজকে আবার কোন্ ওষুধের ব্যবস্থা করা যায়। কালকে যে ওষুধ দিলাম তাতে ত কোন ফলই হ'ল না।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমি একটু বিব্রত একটু বিপদ্‌গ্রস্ত একটু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

(৬)

বলিতে ভুল হইয়াছে যে উদয়-বাবুর সংসারে কেবল তিনি ও তাঁর মেয়ে ছাড়া আর কেহই ছিল না। উদয়-বাবুর স্ত্রীর অনেক দিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। ঠাকুরেরা পাক করিত, চাকরেরা কাজ করিত, উদয়-বাবু মেয়েকে ভালোবাসিয়া ও লিখিয়া পড়িয়া দিন কাটাইতেন।

সেদিন মেয়ের ভার আমার উপর দিয়া তিনি সেই যে অন্তর্হিত হইলেন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর তাঁর দেখা পাওয়া গেল না।

অগত্যা দ্বিধা সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া সন্ধ্যার শুশ্রূষায় লাগিয়া গেলাম।

বেলা এগারটার সময় তিনি কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—"মাষ্টার-বাবুকে অনেক কষ্টই দেওয়া হ'ল। আচ্ছা আসুন, এখন স্নান করে' খেয়ে নেওয়া যাক। আর কনক তুই ততক্ষণ তোর দিদির পাশে বোস্, তোর খাওয়া হয়ে গেছে? না?"

কনকচাঁপার আহার পূর্ব্বেই সমাপন হইয়াছিল, সে বলিল—"হুঁ।"

"তবে তুই ভুলুর সঙ্গে ওর কাছে থাক্।" "ভুলু" এ বাসার এক বৃদ্ধ ভৃত্য।

স্নানাহার-শেষে দুজনে বিশ্রামের ঘরে আসিয়া বসিলাম।

পান চিবাইতে চিবাইতে আমি বলিলাম—"ওঁর জর ত অনেকটা কমে' গেছে!"

"হাঁ কম্‌বেই ত—আজ ওষুধ যে ঠিক্ পড়েছে।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওষুধ! আজ আবার ওষুধ কখন দিলেন?"

"কেন, আমি যখন ওর কাছ থেকে চলে' আসি তখনি ত ওষুধ দিয়ে এসেছিলাম অমল-বাবু!"

আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলিয়া উদয়-বাবুর মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহসা আমার নয়নে স্থির নয়ন রাখিয়া উদয়-বাবু বলিয়া উঠিলেন—"সন্ধ্যার এ রোগের ওষুধ তুমিই যে অমল!"

আমি তখনও ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছি। কথাটা বুঝার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল ও আমার উত্থিত দৃষ্টি নামিয়া গেল। চোর ধরা পড়িলে তাহার যেমন অবস্থা হয় আমার অবস্থাও তখন ঠিক তেম্‌নি হইল।

উদয়বাবু বলিতে লাগিলেন—"অমল, তুমিই তার এ রোগের ওষুধ। আর তখন আমি তোমাকেই সন্ধ্যাকে দিয়ে এসেছি।" একটু থামিয়া আবার বলিলেন—"সন্ধ্যা যে তোমাতেই আত্মসমর্পণ করেছে এটা আমি বহুদিন পূর্ব্বেই জেনেছি। এমন কি, ও যে তোমাকে ভালোবাসে এটা ও নিজে জানে না, কিন্তু আমি জানি। ও জানে না বলে'ই আমি সেটা সহজেই জান্‌তে পেরেছি।" এই

পর্য্যন্ত বলিয়া একটু মৌন রহিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আজকের ঘটনাতে আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি তোমাকে না পেলে সন্ধ্যা এ-জীবনে সুখী হবে না। আর বোধ হয় তুমিও এটা বুঝ্‌তে পেরেছ। ও তোমাকে ভালোবাসে, আর মনে হয় তুমিও ওকে ভালোবাস। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে'ই আমি তোমাকে আমার মেয়ের স্বামীরূপে ভেবে নেবার অধিকার পেয়েছি। আশা করি আমার এ অধিকার চিরদিন অক্ষুন্ন রইবে।"

আমি নতমস্তকে সকল কথা শুনিয়া যাইতেছিলাম, এবং একটা আনন্দাতিশয্যের শিহরণে বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিতেছিলাম।

উদয়-বাবু আবার বলিতে লাগিলেন—"ও যে আমার কত আদরের মেয়ে তা কেউ বুঝ্‌তে পারবে না। আমার বড় সাধ ওকে আমি ওর মনের মত পাত্রের হাতে দি। আমি জেনেছি তুমিই ওর মনোমত স্বামী। তাই আমি তোমাকে ওর স্বামীরূপে চাই। এখন তোমার কথার উপরে আমার এ-চাওয়া নির্ভর করে।" বলিয়া তিনি মৌন হইলেন।

তাঁহার কথা শেষ হইলে আমি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম।

(৭)

সন্ধ্যাতারার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা ক্রমে আত্মীয়-পর সকলেই শুনিলেন। বাড়ী বসিয়া মাও শুনিলেন। শুনিয়া চিঠি দিলেন—"বাব', যখন তোর মেয়ে পছন্দ হয়েছে তখন আর আমার কোনই আপত্তি নেই। তবে আমার বড় সাধ তোর বিয়েটা আমার সাম্‌নে এখানে হয়। আমার এ বুড়ো বয়সের সাধ পূরোতে ভুলিস্‌নে বাবা।"

উদয়-বাবুকে চিঠি দেখাইলে তিনি প্রথমে অনেক আপত্তি করিলেন। শেষে যখন তাঁহাকে জানাইলাম মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করা আমার দুঃসাধ্য, তখন তিনি সম্মত হইলেন।

বিবাহ বৈশাখ মাসে হইবে। এটা ফাল্গুন মাস। কিছু দিনের মধ্যেই আমাকে এম-এ দিতে হইবে।

ক্রমে পরীক্ষা দেওয়ার তারিখ আসিয়া পৌঁছিল। বুক বাঁধিয়া পরীক্ষা দিলাম। শেষ পরীক্ষা দিয়া যে-দিন ইউনিভার্সিটির হল হইতে চিরতরে বাহির হইয়া আসিলাম, সে-দিনের একটা ঘটনা আমার বুকের উপর দিয়া লোহার চাকা চালাইয়া লইয়া আমার বুকটাকে চাপিয়া পিষিয়া ভাঙিয়া দিয়া গেল। সেদিন হঠাৎ আমার কাকার মৃত্যু হইল। ডাক্তারেরা বলিলেন—সন্ন্যাস রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

এই উদারহৃদয় নিঃসন্তান ভদ্রলোক চিরদিন আমাকেই পুত্ররূপে পালন করিয়া আসিয়াছেন। আমাকে এ-মএ পড়াইবেন, এ তাঁহার একটা বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল। জগদীশ্বরের এমনি রহস্য—যেদিনই তাঁর প্রাণের এই সত্যিকার ইচ্ছাটি পূর্ণ হইল, সেদিনই তিনি তাঁকে ইহজগৎ হইতে টানিয়া লইলেন। বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব্বে আমরা সকলে মিলিয়া বাড়ীতে রওয়ানা হইলাম। বাড়ীর উঠানে পা দিতেই হুলুধ্বনি ও শঙ্খরব উঠিয়া আমাদিগকে মঙ্গল অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিল।

পাত্রীর পাল্কী উঠানে নামানো হইলে পাড়ার ছেলে, মেয়ে, কাকী, মামী, মাসী, পিসী, দিদি প্রভৃতিরা জুটিয়া আসিয়া মেয়েকে রীতিমত ঘেরাও করিয়া লইলেন।

আমি অদূরে বসিয়া সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম।

মা সম্মুখে আসিয়া সন্ধ্যাতারাকে ডাকিলেন—"এসো মা!"

সন্ধ্যা মাকে প্রণাম করিল। মা আশীর্ব্বাদ করিলেন—"চিরদিন সিঁথির সিঁদুর বজায় থাক মা!"

প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে সন্ধ্যাতারাকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইয়া হুলুধ্বনি দিতে দিতে জননী ঘরের পানে চলিলেন। সমবেত দর্শকবৃন্দও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

মুহূর্ত্তকাল পরেই ঘরের মধ্যে একটা রব উঠিল—"কি হ'ল! কি হ'ল!" সে-রব না মিশিতে মিশিতে আমার ভগ্নী শতদল ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"দাদা! দাদা! মা ফিট হ'য়ে পড়েছেন!"

ঝড়ের বেগে ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম—মা মেজের উপর পড়িয়া আছেন। সন্ধ্যা মায়ের পায়ের দিকে ও ও-পাড়ার আর-একটি কোন্ মেয়ে মায়ের মাথা কোলে করিয়া বসিয়া আছে। রমণী-দিগের মধ্যে একজন বাতাস করিতেছিলেন; একজন চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিতেছিলেন। আর সকলেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া শঙ্কিত নিষ্পলক-নয়নে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

সভয়ে শুধাইলাম—"হঠাৎ এরকম হ'ল কেন?"

রমণীবৃন্দের একজন বলিলেন—"কি জানি ঘোম্টা খুলে' বো'র মুখ দেখলেন,—হঠাৎ দুপা পিছিয়ে গিয়ে ঘূর্ণী খেয়ে পড়ে' গেলেন।"

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। নিশ্চল নির্ব্বাক্ হইয়া মায়ের মুখ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ক্রমে জননীর চৈতন্ত হইল। ক্রমে তিনি নয়ন মেলিয়া চাহিলেন।

মায়ের মুখ চাহিয়া রমণীদিগের একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদি, তোমার কি হয়েছে?"

জননী আর্ত্ত ও কম্পিত গাঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন —"ওলো তোরা দেখ্—আমার কম্লী ফিরে এসেছে!"

কম্লী, ওরফে কমলমালা, আমার বৌদির নাম।

ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

মুহূর্ত্তমধ্যে তখন মাকে ছাড়িয়া সকলেই সন্ধ্যাতারার মুখ দেখিতে লাগিয়া গেল।

"ওমা! তাইত! তাইত! এ যে আমাদের কম্লী! ওমা কি হবে গো!"

এই ভয়বিস্ময়জড়িত ধ্বনিতে অনতিবিলম্বে সমস্ত ঘর ভরিয়া গেল। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজন সন্ধ্যাতারাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি বাছা?"

"সন্ধ্যাতারা।"

"না, বিশ্বেস হয় না। তুমি আমাদের কম্লী। ঐ ত সেই মুখ, চোখ, সেই চাউনি, সেই ঠোঁট দুটি, সেই জোড়া ভ্রু, সেই গড়ন, সেই পেটন। না গো, তুমি আমাদের কম্লীই।"

এক বৃদ্ধা বলিলেন—"ওমা তাইতো লো! ঐ ন কপালের উপর সেই তিলটা এখনো লেগে আছে!"

মা সকল কথা শুনিতেছিলেন; এইবার বলিলেন,— "ওলো তোরা এখনো সন্দ করিস্, ও যে আমার কম্লী না, এ যে দেবতা এসে বুঝোলেও আমাকে বুঝোতে পারবে না। ও আমার সইয়ের মেয়ে—আমি ওকে চিনি না? আমি ওকে নিজের হাতে নাইয়েছি খাইয়েছি ধুইয়েছি মুছিয়েছি, আমি ওকে চিনি না?" আমার দিকে ফিরিয়া মা বলিলেন—"ওর বাবা কোথায়?"

উদয়-বাবুকে আমার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে পুকুরে স্নানে পাঠাইয়াছিলাম। বলিলাম—"তিনি স্নানে গেছেন।"

বলা বাহুল্য মামা পূর্ব্ব হইতেই এখানে উপস্থিত ছিলেন ও সমস্তই দেখিতে শুনিতেছিলেন। সংসারে কতকগুলি লোক দেখা যায়, যাহারা তাহাদের সম্মুখে কোন একটা গোলমাল ব্যাপার উপস্থিত হইলে, প্রথমেই খুঁজিতে আরম্ভ করে কাহার দ্বারা উক্ত ব্যাপার ঘটিল এবং যাহার দ্বারা ঘটিল তাহাকে তাহাদের "উচিত কথা" শুনাইয়া দিতে অতিমাত্রায় অধীর হইয়া উঠে।

আমার এই মাতুলটি ঠিক্ সেই ধরণের লোক। তিনি সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না কাহার দোষে এরূপ হইল। কিন্তু মা যখন বলিলেন— "ওর বাবা কোথায় রে?" তখন তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল তিনি উক্ত কথার মধ্যে আলোক দেখিতে পাইয়াছেন অর্থাৎ দোষী এতক্ষণে ধরা পড়িয়াছে।

অনতিবিলম্বেই মাতুলের মুখ দিয়া খই ফোটার মত কথা ফুটিতে আরম্ভ করিল—"ও! তাই বল! সেই বুড়োটাই দেখ্ছি তা হ'লে এসব গোলমালের মূল! আমি সেইদিনই বলেছিলাম যে কম্লী কখনো ডুবে মরেনি, মরতে পারে না, অতটুকু কচি বয়সে কি লোকে মরে? নিশ্চয়ই সে বেঁচে আছে। এখন দেখ্ছো ত তাই হ'ল। (কিন্তু শুনিয়াছি বৌদির ডুবিয়া যাওয়ার পর, অন্য সকলে তাঁহাকে যখন বলিয়াছিল 'হয়ত বেঁচে আছে,

একবার খোঁজ কর্‌লে ভালো হ'ত তখন তিনি বলিয়াছিলেন—হ্যাঃ! আর ও বেঁচে আছে! এ ত যে-সে নদী না—পদ্মা! আর ঐ একফোঁটা মেয়ে!) কিন্তু আমি ভেবে অবাক্ হচ্চি সেই বুড়োর আক্কেলটা দেখে! আরে, পেলে বাবা, পরের মেয়ে, একটা খোঁজ কর্‌লে না, খবর কর্‌লে না—দিব্যি নিজের মেয়ে করে' নিলে—একটু ভয় হ'ল না, ভাবনা হ'ল না—।"

ইতিমধ্যে বোস-মহাশয় ঘোষ-মহাশয় সোম-মহাশয়, নাগ-মহাশয় সেন-মহাশয় রায়-মহাশয় ভট্‌চায-মহাশয় প্রভৃতি পাড়ার সকল মহাশয়ই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেন-মহাশয় মাতুলের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"আচ্ছা নীলু ভায়া, ঐ মেয়েই যে তোমাদের বৌ তারই বা প্রমাণ কি? মিছামিছি এত চেঁচাও কেন? আগে ভদ্রলোকের কাছে শুনে'ই নাও।"

মাতুল উত্তেজিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"প্রমাণ! দিদির কথার উপর আবার প্রমাণ! শুন্‌লেনই তো—দিদি যা বল্‌লেন। তিনি তাকে নিজের হাতে—"

সেন-মহাশয় কথার মাঝখানে আবার বলিয়া উঠিলেন—"ভুলও তো হ'তে পারে। হয়ত তোমাদের সেই বৌ'র সঙ্গে এ মেয়ের চেহারার সাদৃশ্য আছে।"

মামা চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—"আপনি কি বল্‌ছেন কাকা? দিদির ভুল হবে? মেয়ের মুখ দেখেই ফিট হ'য়ে পড়ে গেলেন, আবার ভুল! এমন ভুল কি কাকা হ'তে পারে? কখ্‌খনো না—সেই বুড়োই যত গোলমালের মূল। আমাদের বড় ঠকান্ ঠকিয়েছে সে! আসুক আগে বুড়ো, দেখি কি সাহসে পরের মেয়ে লুকিয়ে রেখেছিল।"

মা মামাকে জানিতেন। মামা যখন রাগিয়া যান তখন পাত্রাপাত্র জ্ঞান না করিয়াই যাকে-তাকে অপমান করিয়া বসেন। তাই বাধা দিয়া বলিলেন—"এই নীলু! খবরদার, তুই তাঁকে কিছু বলিস্‌নে।"

নীলু গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"কি! বল্‌ব না? আমি কি ভয় করি? উচিত কথা শুনিয়ে দেবো তার আবার ভয় কি?"

আমার নিকট মাতুলের গর্জ্জন বড় প্রীতিকর বোধ হইতেছিল না। অধিকন্তু মায়ের আদেশ ডিঙাইয়া তিনি যখন আস্ফালন করিয়া উঠিলেন, তখন আমি ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলাম—"না, আপনি কিছু বল্‌তে পার্‌বেন না।"

মাতুল তথাপি কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় উঠানের উপর উদয়-বাবুদের দেখা গেল। আমি মৃদু অথচ তীব্র কণ্ঠে হাঁকিলাম—"চুপ!" মাতুল হইলেও মামা আমাকে ভয় করিতেন। তিনি স্তব্ধ হইলেন।

বলা বাহুল্য উদয়-বাবুরা গোলমালটি শুনিতে শুনিতেই আসিতেছিলেন। কাছে আসিয়া সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে?"

সেন-মহাশয় বলিলেন—"আসুন রায়-মশাই, বসুন। আমরা ত একটা গোলমালে পড়ে' গেছি—"

উদয়-বাবু বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি?"

সেন-মহাশয় বলিলেন—"সবই বল্‌ছি। তবে বল্‌বার আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এই মেয়ে কি আপনার নিজের মেয়ে?"

সেন-মহাশয়ের প্রশ্নে যে উদয়-বাবুর হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল তাহা উপস্থিত সকলেই লক্ষ্য করিল।

বিস্মিত অধীরকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসিলেন—"কেন? কেন?"

সেন-মহাশয় বলিলেন—"দেখুন, প্রায় বার বৎসর হ'ল এই অমলের দাদার এক পাঁচ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়, কিন্তু দৈবাৎ সে মেয়ে পদ্মার জলে ডুবে' যায়। আর তার কোন খোঁজ হয়নি। কিন্তু আপনার এই মেয়েকে সকলেই বল্‌ছেন, যে, এ সেই মেয়ে।"

উদয়-বাবু রুদ্ধশ্বাসে সেন-মহাশয়ের কথা শুনিতেছিলেন। উক্তিশেষে অভিভূতের মত নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন। প্রত্যেকেই উদয়-বাবুর মুখপানে নিষ্পলক জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিয়া রহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত ঐরূপ অবস্থায় কাটিয়া গেলে উদয়-বাবু ধীরে শুষ্কস্বরে বলিলেন—"সম্ভবতঃ আপনাদের অনুমান সত্য।" ক্ষণকাল ধরিয়া স্থানটিতে একটা গুরুতা বিরাজ করিল। পরে উদয়-বাবুই আবার বলিয়া উঠিলেন—"অমলের সে দাদা কোথায়?"

সেন-মহাশয় মৃদু আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন—"তিনি ত মারা গেছেন।"

উদয়-বাবু শিহরিয়া উঠিয়াই বিহ্বলের মত সেন-মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে সহসা একটা তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া মাটির উপর এলাইয়া পড়িলেন।

(৮)

কতখানি সময় যে তিনি ঐরূপে পড়িয়া রহিলেন তাহা কেহ অনুভব করিতে পারিল না। ঘরের প্রত্তিটি প্রাণীই আচ্ছন্নের মত নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। সকলেই আবার মাথা তুলিয়া চাহিল তখন, যখন মাতুল মহাশয় উদয়-বাবুকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—"তা হ'লে মশাই কোথায় একে পেলেন?"

উদয়-বাবু প্রশ্নের কিছুকাল পরে মাথা তুলিয়া বেদনারক্তিম দৃষ্টিতে মাতুলের মুখের দিকে চাহিয়া করুণ কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ? কি বল্‌ছেন? কোথায় পেলুম? হাঁ সবই বল্‌ছি। তবে আমায় বুক বেঁধে নেবার আর-একটু সময় দিন।" বলিয়া মৌন হইলেন।

মাতুল আবার আক্রমণ করিলেন—"নিজের দুঃখ নিজে সৃষ্টি করে' নিলেন মশাই, এ দুঃখে ত কারো প্রাণ গল্‌বে না। মশাই, যখন এ মেয়েকে পেলেন তখন কার মেয়ে খোঁজ না নিয়েই একে নিজের মেয়ে করে' বস্‌লেন কেন? তখন যদিআমাদের মেয়ে আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে যেতেন তাহ'লে এত গোল হ'তে পার্‌ত না—মশাই ত তা করেন নি—এখন একটু ভুগ্‌তে হবে বই কি?" উদয়-বাবু মামার দিকে মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া বোধ হয় বুঝিতে চেষ্টা করিলেন—এ লোকটা মানুষ না আর-কিছু। তার পর সেন-মহাশয়ের দিকে চাহিয়া কম্পিত গাঢ়-স্বরে বলিতে লাগিলেন—"আর সম্ভবতঃ নয়, আপনাদের অনুমান নিশ্চয়ই সত্য। এ আমার বুকের মধ্যে থেকে কে যেন বলে' দিচ্ছে, আমি কিছুতেই মনস্থির কর্‌তে পার্‌ছিনে। যাক্, তবু সমস্তই খুলে বল্‌ছি—আপনারা শুনুন।" বলিয়া একটুখানি থামিয়া আরম্ভ করিলেন—"আমার বাড়ী পদ্মাপারে বাণহাটী গ্রামে। আমি কল্‌কাতায় থেকে ডাক্তারি কর্‌তাম, মাঝে মাঝে বাড়ী যেতাম। প্রায় বার বৎসর হ'ল একবার বাড়ী গিয়েছিলাম। সেবার আমাদের গ্রামে ঘরে-ঘরে বসন্ত দেখা দিয়েছিল। হঠাৎ এক দিন রাত্রে আমার স্ত্রী সেই রোগে মারা গেলেন। যে রাত্রে তিনি মারা গেলেন সে এক ঝড়ের রাত্রি। ঝড়ের শেষে আমার স্ত্রীর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেলাম। স্ত্রীর দাহকার্য্য সমাধা করে' ফিরে যাচ্ছি হঠাৎ জ্যোৎস্নালোকে অদূরে বালির উপর দৃষ্টি পড়্‌ল। মনে হ'ল দুটো মানুষের মত কি যেন পড়ে' আছে। কাছে গিয়ে দেখি মানুষই বটে। একটা কচি মেয়ে আর একটা বুড়ো লোক। মেয়েটাকে নেড়েচেড়ে বুঝ্‌লাম মেয়েটার জীবন তখনো আছে। কিন্তু বুড়োটি মরে' গেছে। মেয়েটিকে বুকে করে' বাড়ী এসে সেবাযত্নে বাঁচিয়ে তুল্‌লাম—এই সেই মেয়ে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মামার দিকে ফিরিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"কিন্তু আপনি যে বল্‌ছেন খোঁজ নিই নি, খবর নিই নি—এ আপনার ভুল ধারণা। ওকে বাঁচিয়ে তুলে'ই ওর কে আছে না-আছে—ও কার মেয়ে, এ সংবাদ জান্‌তে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম, এমন কি খবরের কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। যখন ওর বাপ-মা-আত্মীয়-স্বজনের কোনো সন্ধান হ'ল না, তখন অগত্যা ওকে নিজের মেয়েরূপে গ্রহণ কর্‌লুম। সংসারে আমার এক স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না—সে স্ত্রীও যখন মারা গেল—তখন ভাবনা হয়েছিল—ভগবান্ আমায় কেন বাঁচিয়ে রাখ্‌লেন। এম্‌নি সময় অভাবনীয়রূপে ওকে পেয়ে গেলাম। তখন মনে হ'ল ভগবান্ হয়ত ওর জন্যই আমায় বাঁচিয়ে রাখ্‌লেন—তাই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে' আমি ওকে নিজের মেয়ের জায়গায় স্থান দিলাম। ও আমার জীবনের সন্ধ্যাবেলায় আলো দিতে এসেছিল তাই নাম রাখ্‌লাম—"সন্ধ্যাতারা"। সেই থেকে এক-ফোঁটা সন্ধ্যাতারা আমার স্নেহ-যত্নেই এত বড় হয়ে' উঠেছে।" বলিয়া একটু থামিয়া থামিয়া ক্রন্দনজড়িত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু আমি যে ওর সর্ব্বনাশ কর্‌তেই ওকে বাঁচিয়ে রাখ্‌ছি—এ ত আমার স্বপ্নেও মনে হয়নি!"

তখন আর কোনো সন্দেহই রহিল না। বুঝিলাম সন্ধ্যাতারা কিরূপে বাঁচিয়াছে। বুঝিলাম সেই বৃদ্ধ মাঝিটিই সন্ধ্যাকে বাঁচাইয়াছে। সে বৃদ্ধ বাঁচাইয়াছে—কিন্তু বাঁচিতে পারে নাই। আপনার বার্দ্ধক্যদুর্ব্বল প্রাণে মনে যে কি উচ্ছৃঙ্খল আগ্রহ জাগাইয়া তুলিয়া জীর্ণ শীর্ণ শিথিল দেহে যে কি শক্তিমান্ যৌবন ফিরাইয়া আনিয়া এই মহৎপ্রাণ স্থবির পাঁচ বৎসরের শিশুকে কূলে বাহিয়া আনিয়াছিল তাহা কল্পনা করিয়া আমি অন্তরে চমকিয়া উঠিলাম।

এই সময় মাতুল উদয়-বাবুকে আবার জেরা করিয়া বসিলেন—"অমলকে এ-সমস্ত আপনি খুলে' বলেন নি কেন ?"

"বলি বলি করে'ও মুখ খুলতে পারিনি। যাকে চিরদিন বুকের ভালোবাসা দিয়ে মানুষ ক'রে তুল্লাম, বিলিয়ে দেবার দিন সে যে আমার নয়—সে যে পরের জিনিষ একথা মুখে আন্তে আমি বাহিরে যতখানি এগিয়ে এসেছি ভিতরে ততখানি পেছিয়ে গেছি।" একটু দম লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"বিশেষতঃ যখন দেখ্লাম অমল আর ওর মধ্যে বেশ একটুখানি স্নেহ জন্মে গেছে, তখন মনে হ'ল এসব খুলে' বল্লে কি জানি কোন্ অমঙ্গল জেগে উঠে এদের সেই সত্যিকার ভালোবাসাটিকে ব্যথিত করে' তুলবে। তাই বলিনি।"

মাতুল বলিলেন—"তাই বলেননি ? তাই অতবড় একটা মিথ্যা বুকের মধ্যে চেপে রাখ্লেন ? আপনি ত মশাই, ভয়ঙ্কর লোক !"

আমি মাতুলের দিকে চোখ রাঙাইয়া চাহিলাম। আমার একটি বন্ধু মাতুলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"মিথ্যা হ'লেও—এ মিথ্যা খুব অপরাধ নয় ! এক দিক্ দিয়ে দেখ্তে গেলে এ মিথ্যাকে প্রশংসা না করে' থাকা যায় না। এ মিথ্যার স্থান সেই বুকের মধ্যে—যে বুক স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসায় কানায় কানায় ভরে' আছে। আর এ মিথ্যা যে বলে সে ভয়ঙ্কর লোক হ'লেও, একদিকে সংসারের শ্রদ্ধার পাত্র।" ইত্যবসরে আর-একটি বন্ধু প্রশ্ন করিলেন—"ও যখন ডুবে যায় তখন আপনারা ও বেঁচে আছে কি না জান্তে চেষ্টা করেছিলেন ?"

মাতুল নিরুত্তর ; সেন-মহাশয় তাহার কথার জবাব দিলেন—"তখন ত সকলেরই বিশ্বাস হয়েছিল—ও ডুবেই মরেছে। কাজেই কোনো খোঁজ নেওয়া হয়নি।"

"এই যদি হয় তবে আমি বল্‌ছি উদয়-বাবুর কাছে আপনাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। না চাইলেও তিনি আপনাদের হারানিধি ফিরিয়ে এনেছেন। তা না হ'য়ে অধিকন্তু আপনারা তাঁর স্নেহ-ভালোবাসাকে আহত করে' তুলছেন !"

অনেকক্ষণ আর কোনো কথাই হইল না। তার পর সোম-মহাশয় একটা হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে বলিয়া উঠিলেন—"ভগবানের কি আশ্চর্য্য লীলা ! ঘর করুলে না—সংসার করুলে না—স্বামী কি জান্‌লে না—অথচ এল বৈধব্য ভুগ্‌তে !"

এই সময় আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি বলিলেন—"এইখানে আপনাদের কাছে আমরা একটা কথা বলি। এ মেয়ের ত পাঁচ বছরে বিয়ে হয়—তখন ছিল না জ্ঞান, ছিল না বোধ—আমরা তাই বলি সে বিয়ে বিয়েই নয়।"

নাগ-মহাশয় বন্ধুর কথায় প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন—"তবে কি তোমরা একে আর-একটা বিয়ে করুতে বল ?"

"হাঁ বলিই ত ! এটা কি খুব দোষের হয় ? মনে করুন যখন—"

ইতিমধ্যে নাগ-মহাশয় সোম-মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—"শুনুন একবার ? আমরা মরে' গেলে দেখ্‌চি এরা সমাজকে একেবারে অধঃপাতে দেবে !"

সোম-মহাশয় বলিলেন—"দেখ বাবারা, জানি না তোমরা কি ক'রে অমন অপভাষা মুখে আন। দুপাতা ইংরেজী প'ড়ে গুরুজনের সাম্‌নে এমন অশ্লীল কথা মুখে এনে তাঁদের অপমান করুতে তোমাদের ভয় হয় না ?"

বন্ধুবর আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন। আমি ইঙ্গিতে "ভায়া হে, তোমার যুক্তিতর্ক এখানে কোন কাজ করুবে না, এঁদের শাস্ত্র-পাকা মাথায় শাস্ত্রবচন ছাড়া কস্মিন্ কালেও আর কোনো বচন ঢুকুবে না। অযথা তা নিয়ে আর গোলমাল কোরো না"—ইহাই বুঝাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম।

আমি নির্জীবের মত মাটির উপর বসিয়া ছিলাম, আর ভাবিয়া যাইতেছিলাম—শুধু তাহারই কথা যাহাকে লইয়া এত বড় কাণ্ড হইতেছিল। জানি না তাহার বুকে এতক্ষণ কি ঝড় উঠিয়াছে, অন্তরের পরতে পরতে কি প্রলয় গর্জ্জিয়া ফিরিতেছে, মর্ম্মে মর্ম্মে কি বজ্রজ্বালা গুমরিয়া মরিতেছে। জানি না তাহার ঘোম্‌টা-ঢাকা মুখের উপর কি করুণ বেদনা নিরুপায় অশ্রুজলে বহিয়া যাইতেছে। জানি না তাহার সমস্ত সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া তাহাকে কেহ সুদূর অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীর কঠিন মাটির উপর আছ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া, কি নির্ম্মম পেষণে তার বক্ষপঞ্জরের অস্থিগুলি ছেঁচিয়া দিতেছে। জানি না লজ্জা-দুঃখ-অপমানে মরিয়া হইয়া কত কাতর প্রার্থনায় সে বিধাতার পাশে মৃত্যুর আশ্রয় যাচিয়া লইতেছে!

(৯)

পাঁচ সাত দিন কাটিয়া যাওয়ার পর, সেদিন সন্ধ্যায় আকাশ ফাটিয়া জ্যোৎস্না ঝরিয়া জলস্থল চরাচর সব ভাসাইয়া দিতেছিল। বিশ্বপ্রাণীর মনপ্রাণের সকল বিধাদ্বন্দ্ব সকল গ্লানি সকল অভিযোগ সেই জ্যোৎস্নার অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

ঘরের মধ্যে বিছানার উপর মৃতবৎ পড়িয়া ছিলাম। খোলা জানালা দিয়া বিশ্বের আনন্দবার্ত্তা বহিয়া একরাশ চাঁদের আলো আমার গায়ের উপর লুটিয়া পড়িয়াছিল। জ্যোৎস্নার সে অলস স্পর্শে আমার বুকের প্রলয় তীব্রতর হইয়া রুখিয়া ফিরিতেছিল।

মা বাহির হইতে ডাকিলেন—"অমল, ঘরে আছিস্ বাবা?"

"হাঁ।"

উত্তরের সঙ্গে-সঙ্গে মা ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন, আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই ভর্ সন্ধ্যেয় শুয়ে' আছিস্! যা বাবা, বাহির থেকে একটু ঘুরে, আয়। এমন করে' কদিন বাঁচ্‌বি!"

জননীর শেষ কথাটি অতি সত্য। এই কয়েকটা দিন্ যে কিরূপে কাটিয়া গেল সে-বিষয়ে আমার জ্ঞান ছিল না, কিন্তু এইটুকু জানা ছিল—যদি আর কিছুদিন সেইরূপে কাটিতে থাকে, তবে বেশীদিন বাঁচিব না।

মা একটু থামিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"এ মেয়েটার সঙ্গে আর পারা গেল না। রাতদিন পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে' বেড়াবে—এতখানি রাত হ'ল কোনো উদ্দিশ নেই। যাই দেখিগে—কোথায় গিয়ে পড়ে' মরেছে—" বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মা'র কথিত মেয়ে—আমার ভগ্নী শতদল।

বাহিরে আসিলাম। বারান্দায় দাঁড়াইয়া চাহিতেই জ্যোৎস্নালোকে ও-ঘরের বারান্দার উপর সন্ধ্যাতারাকে দেখিলাম। অন্যদিন হইলে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতাম, কিন্তু আজ কি মনে করিয়া চাহিয়া দেখিলাম।

সন্ধ্যাকে বিধবার বেশে এই ভালো করিয়া দেখিলাম। অন্যদিন দেখিতে সাহস করি নাই। আগুন লাগিয়া ঘর পুড়িয়া যাওয়ার পর গৃহী যেই বিষাদ-শান্ত মূর্ত্তিতে দগ্ধ গৃহের ভস্মের উপর বসিয়া থাকে, ঠিক্ সেই মূর্ত্তিতে সন্ধ্যাতারাকে দেখিলাম। সর্ব্বস্ব লুট হইয়া গেল, উদ্ধারের কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, দুঃখ-বেদনার যন্ত্রণার অবসাদে মানুষ যেমন সৌম্য হইয়া যায়, সেই সৌম্য মূর্ত্তিতে সন্ধ্যাকে দেখিলাম।

সমস্ত বুক জুড়িয়া একটা প্রশ্ন—শুধু একটা প্রশ্ন উঠিল—আমার বৌদি কেন মরে নাই—পদ্মার আবর্ত্তোন্মত্ত সলিল-সমাধি হইতে কেন ফিরিয়া আসিয়াছে? কেহ উত্তর দিল না। বুকের প্রশ্ন বুকে গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

মনে পড়িল একদিন এই বৌদির মৃত্যুর জন্য ঈশ্বরের উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলাম। আজ আবার তার জীবনের জন্য বুকের মধ্যে সেই বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু আর না। আর এমন করিয়া জ্বলিয়া মরিব না। সন্ধ্যা ত এখন আর আমার সন্ধ্যা নয়—সে যে আমার বৌদি। এ আমার সেই বৌদি—যাকে না দেখিতেই বুকের মধ্যে শুধু ছবি আঁকিয়াই ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম। সে-দিন সে বৌদি ছিল—আজ কেন থাকিবে না? ঐ ত সারাগায়ের শুভ্র বসনে বৌদির নীরব মহিমা জড়াইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আজ সে আমার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে।

তার চোখে বৌদির করুণা, মুখে বৌদির আহ্বান, বুকে বৌদির ভালোবাসা!

আমি নিষ্পলক-নয়নে সন্ধ্যার মাঝে বৌদির মূর্ত্তি দেখিলাম। দেখিতে দেখিতে বিহ্বলের মত হঠাৎ কখন কাছে গিয়া বলিয়া ফেলিলাম,—"বৌদি, আমি তোমায় প্রণাম কর্‌ছি।"

পদপ্রান্তে মাথা নত করিতেই সন্ধ্যা—নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ সন্ধ্যা—চকিতে পা সরাইয়া লইয়া কয়েক পদ পিছাইয়া গেল। অদূরে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আমি সম্মুখ হইতে সরিয়া আসিলাম।

(১০)

পাঁচ মাস হইল কলিকাতায় আসিয়াছি। কাকা নাই—কিন্তু আমার কাকীমা আছেন। তাঁর বুকের মাঝে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনেকখানি জুড়াইয়া গিয়াছি।

উদয়-বাবু মারা গিয়াছেন। সেইদিনের সেই ঘটনা হইতে তিনি উন্মাদের মত হইয়া পড়েন। হঠাৎ একদিন হার্ট ফেল করিয়া মারা যান। সমস্ত বুক দিয়া আমার এই বন্ধুর মত, ভাইয়ের মত, পিতার মত, গুরুর মত ভদ্রলোককে ভালোবাসিয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যুতে আমার সবই প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে।

দুপুর বেলায় কাকীমার পাশে বসিয়া ছিলাম। এমন সময় পিয়ন হাঁকিল "চিঠ্ ঠি"। পত্র লইয়া আসিয়া পড়িতে বসিলাম। মা লিখিয়াছেন—"সন্ধ্যাতারা মর্‌তে বসেছে একবার আসিস্।"

যখন বাড়ীর উঠানে পা দিয়াছি, তখন সন্ধ্যাতারার মৃতদেহ দুয়ারে নামানো হইয়াছে। মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম—হাসিমাখা মুখ—ক্ষোভ নাই—দুঃখ নাই—ব্যথা নাই। পৃথিবীর সমস্ত তৃপ্তি সে মুখের উপর কে যেন ঢালিয়া দিয়াছে।

গলার উপর চোখ পড়িতেই দেখিলাম একটা শুষ্ক জীর্ণ মালা। মালা চিনিতে পারিলাম। বিবাহের প্রস্তাব হইলে কলিকাতায় পড়িবার ঘরে আমি তাহাঁকে সে মালা পরাইয়া দিয়াছিলাম।

চারিদিকের ক্রন্দন-কোলাহলের মাঝে দাঁড়াইয়া মৃত্যুদীপ্ত মুখের পানে নিষ্পলক নয়নে চাহিয়া থাকিলাম। হঠাৎ সেই জ্যোৎস্নারাতের—বৌদি কেন মরে নাই—এ প্রশ্নের উত্তর—আজ এই মৃত্যুর অন্ধকারে পাইয়া গেলাম। কে যেন বলিল তোর বৌদি তোর জন্য মরিবে বলিয়াই মরে নাই। আমি জানিলাম—আমার বৌদি আমার জন্য মরিবে বলিয়াই মরে নাই।

শ্রী হেমন্তকুমার বসু

নিদ্রা-হারা

রূপার থালে জ্বালিয়ে থুয়ে
কর্পূরেরি বাতি,
কাহার লাগি' নিদ্রা-হারা
তুমি নীরব রাতি?
নীলাম্বরীর আঁচল-'পরে
সাজাও, নারী, কাহার তরে
অমন করে' থরে-থরে
মোতির মালা গাঁথি'?

ওই সু-দূরের ছায়া-পথে
ওই অসীমের গায়
আসচে কি সে তোমার প্রিয়
নূপুর-পরা পায়?

সেই নূপুরের আভাস পেয়ে
আছ বুঝি আকুল চেয়ে,
ব্যাকুল বুকের কাঁপন লেগে
বাতাস কাঁপে হায়!

রূপার থালে জ্বালিয়ে থুয়ে
কর্পূরেরি বাতি,
কাহার লাগি' নিদ্রা-হারা
তুমি নীরব রাতি?
শাদা মেঘের মতন দূরে
উত্তরী ও কাহার উড়ে;
নীহার-ভরা নয়ন তোমার
হর্ষাবেগে কাঁদি'!

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

বিনিময় ও টাকার বাজারে বিনিময়-হার

য়ুরোপের 'কুরুক্ষেত্র' শেষ হইল কিন্তু আমাদের গরীবের কষ্ট যাহা তাহা রহিয়াই গেল। যুদ্ধের কয় বৎসর জিনিষ-পত্রের দর যেরকম বাড়িয়াছিল তাহার যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া আমরা সকলেই মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যুদ্ধ শেষ হইলেই জিনিষপত্র আবার সস্তা হইবে, দুই বেলা সকলে পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পারিব; আবার বুঝি আমাদের গরীবের ঘরের মায়ের বোনের গায়ে কাপড় তুলিয়া দিয়া তাঁহাদের লজ্জা নিবারণ করিতে পারিব। কিন্তু হায়, আজও বাজারে গেলে 'চড়া দরের কড়া কথা' শুনিলে মনের সাধ মনেই থাকিয়া যায়। দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে জবাব দেয় "টাকার বাজার খারাপ, মহাশয়, বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে সুবিধা নাই। সস্তায় সওদা দিব কি করিয়া?" সাধারণ গৃহস্থ অত কথা না বুঝিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়।

কিন্তু অন্ধের মতো 'অচলায়তনে' বসিয়া কেবল অদৃষ্টের দোহাই দিলে আর চলিবে না। 'অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্' বলিয়া আর্থিক অবস্থার প্রতি বিমুখ হইলে আর্থিক কষ্ট বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। অর্থ না হইলে যখন চলিবে না, পার্থিব অভাব যখন পূরণ করিতেই হইবে, তখন আমাদের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া, চারিদিকে যাহা নিত্য ঘটিতেছে তাহার ভিতরকার কারণটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া সত্য ও মঙ্গলময় পথটি আবিষ্কার করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

(২)

আর্থিক সমস্যার কথা আলোচনা করিতে গেলে আগেই মনে পড়ে বর্ত্তমান কালের সামাজিক গঠনের কথা। এখন কেবল আমাদের সমাজ নয়, সকল সভ্য সমাজেরই ভিত্তি স্থাপিত বিনিময়ের উপরে। সমাজে বিনিময়ের রীতি চলিত আছে বলিয়াই এখন কাহাকেও তাহার নিজের অভাব পূরণের জন্য নিজে পরিশ্রম করিয়া সকল জিনিষ উৎপন্ন করিতে হয় না। তাহার এক একটি অভাব পূরণ করিবার জন্য দেশের কত লোক খাটিতেছে। সেও হয়ত যাহা উৎপন্ন করিতেছে তাহা প্রধানতঃ অন্যের অভাবই পূরণ করিবে। কৃষক যে পরিশ্রম করিয়া শস্য উৎপন্ন করিতেছে, কাপড়ের কল-ওয়ালা যে কাপড় প্রস্তুত করিয়া স্তূপাকার করিতেছে, এ-সকল কিসের জন্য? এই সকল কি তাহারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য তৈয়ার করিতেছে? তাহা নয়। অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, দেখিবেন যে তাহারা হয়তো ইহার কিছুই ব্যবহার করিবে না; আর যদি ব্যবহার করে, তাহা হইলেও উহার অতি অল্প অংশই ব্যবহার করিবে। বাকি সকলই বিনিময়ের জন্য উৎপাদিত হয়। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, প্রতিভা ও ক্ষমতা যে খাটাই তাহাও বেশী সময়ই অপরের অভাব পূরণের নিমিত্ত। উকীল যে দিনের পর দিন ওকালতি করিয়া মোকদ্দমা জয় করিতেছেন তাহার মধ্যে কয়টা তাঁহার নিজের মোকদ্দমা? ডাক্তার তাঁহার ডাক্তারী বিদ্যার সাহায্যে রোগ আরোগ্য করেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশই অন্যের পীড়া, নিজের নহে। এই যে উকীল ও ডাক্তারের কথা বলিলাম ইঁহারা স্ব স্ব গুণ ও কার্য্যতৎপরতার বিনিময়ে অন্য জিনিষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরকম প্রায় সকলেই।

বিনিময় আছে বলিয়া অনেক জিনিষ মানুষের উপকারে লাগিতেছে, বিনিময়-অভাবে সেগুলি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া থাকিত।

বিনিময়ের আর-একটি উপকারিতা এই যে, ইহার জন্যই অনেক উৎপাদিকা শক্তির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি, ইহার অভাবে সেগুলি অকেজো হইয়া থাকিত। যদি বিনিময় না থকিত তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষকে তাহার অভাব পূরণের জন্য সকল জিনিষ তৈয়ার করিয়া লইতে হইত। একজন লোকের যদি দশটি অভাব থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে দশরকম দ্রব্য-প্রস্তুতির কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইত। কাজেই তখন সে অভাবের তাড়নায় চালিত হইয়াই দ্রব্য প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু বিনিময় এই বিষয়ে মানুষকে অনেকটা স্বাধীনতা দিয়াছে।

এখন যে যে-কাজে পারদর্শী সে সেই কাজই করে; অথচ সকলেই জানে যে তাহারা তাহাদের কাজের অথবা প্রস্তুত দ্রব্যের বিনিময়ে তাহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(৩)

বিনিময় এখন যেভাবে চলিতেছে চিরকালই যে ঠিক এমনিভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহা নহে। মানুষ যখন আদিম অবস্থায় একক জীবন যাপন করিত, সমাজ যখন মোটেই গড়িয়া উঠে নাই, তখন বিনিময় ছিল না। তাহার পর মানুষ ক্রমশঃ সমাজ-জীবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ধীরে ধীরে সমাজের সৃষ্টি করিল। সভ্যতার সেই অনুন্নত অবস্থায়, যখন মানুষের জীবন সাদাসিধে ছিল, সমাজও এখনকার মতো এমন জটিল ছিল না। তখন বিনিময়ের সুরু হইল। কিন্তু তখন বিনিময় ছিল জিনিষের বদলে জিনিষ লওয়া। কলু হয়তো চাষীকে তেল দিত, চাষী তাহার বিনিময়ে কলুকে ধান অথবা চাউল দিত। আজও বাংলার অনেক পল্লীতে গরীবদিগের মধ্যে এই ধরণের বিনিময়ের চল্‌তি আছে।

এই-প্রকার বিনিময়ের অসুবিধা আছে। আমার এমন একজন লোককে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যে আমার জিনিষটি চায় এবং তদ্বিনিময়ে আমার প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমাকে দিতে পারে—সেটা বড় অসুবিধার কথা। ইহা ছাড়া আরো একটি অসুবিধা আছে। বিনিময়-সাধ্য দুইটি জিনিষ পরস্পর সমান মূল্যের হওয়া চাই; তাহা না হইলে বিনিময় অসম্ভব হইবে। জিনিষের বিনিময়ে জিনিষ লওয়ার নিয়ম থাকিলে প্রত্যেক লোককে কত কষ্ট ভোগ করিতে হয় ও অযথা সময় নষ্ট করিতে হয়।

এই-সকল অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত মানুষ তৃতীয় একটি জিনিষের আবিষ্কার করিল। তাহার প্রয়োজন—বিনিময়ে মধ্যবর্ত্তী হইয়া কাজ করা। ইহাকেই লোকে অর্থ (money) বলে। এক এক জাতি এক-একটি জিনিষকে বিনিময়ে 'মধ্যবর্ত্তী' স্থির করিল। যে জাতিতে যে জিনিষটি অর্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, সে জাতির প্রত্যেকেই উহার সহিত স্ব স্ব দ্রব্য বিনিময় করিতে স্বীকার করে। মনে করুন, সকল মানুষ স্থির করিল যে, স্বর্ণ বিনিময়ে মধ্যবর্ত্তীর কাজ করিবে অর্থাৎ স্বর্ণ অর্থ (money) বলিয়া গৃহীত হইবে। তখন আর তেলী চাউলের প্রয়োজন হইলে চাউলওয়ালার বাড়ী, কাপড়ের দরকার হইলে তাঁতীর বাড়ী দৌড়াদৌড়ি করিয়া পূর্ব্বের মতো ক্লেশ ভোগ করিবে না। সে তখন তেলের বদলে কতকটা সোনা লইবে। সে জানে যে তাহার সোনার কোন প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন তাহার চাউলের, তবু সে তেলের বদলে সোনা কেন গ্রহণ করে? সে গ্রহণ করে এই জন্য, যে, নূতন ধরণের বিনিময়ের নিয়মে সে যখন চাউল আনিতে যাইবে, তখন চাউলওয়ালাও এই স্বর্ণের পরিবর্ত্তেই তাহাকে চাউল দিবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল সময়েই অর্থের বিনিময়ে মিলে বলিয়া সকল উৎপাদকই স্ব স্ব বিনিময়সাধ্য দ্রব্য অথবা গুণ ও কার্য্য-তৎপরতা অর্থের সহিত বিনিময় করে।

অর্থের (money) আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের বদলে জিনিষের বিনিময় ভাঙিয়া বিক্রয় ও ক্রয়ের উৎপত্তি হইল। তেলী এই নূতন নিয়মে তেলের পরিবর্ত্তে সোজাসুজিভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ না করিয়া প্রথমে স্বর্ণের বদলে তেল বিক্রয় করে, তার পর স্বর্ণের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ ক্রয় করে। অর্থের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়-ব্যাপারটা একটু জটিলও হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ইহাতে অশেষ কষ্ট ও বহু সময় নষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া এই জটিলতাও শ্রেয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

অর্থের আবিষ্কারের ফলে বিনিময়-কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে, এবং সর্ব্বত্রই শ্রমবিভাগ আরম্ভ হইয়াছে। এখন সকল সমাজেই যাহার দ্বারা যে কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হইতে পারে সে তাহাই করে। যে দেশে অল্প আয়াসে যে জিনিষ ভালভাবে উৎপন্ন হইতে পারে, সে দেশে তাহাই উৎপাদিত হইতেছে। ইহাতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং একই দেশে বিভিন্ন লোকের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা বাড়িয়াছে। আগে যে-সব পল্লীবাসী নিজেদের অভাব নিজেরাই পূরণ করিত, নিজেদের জেলার বাহিরে কোন দেশের খবর রাখিত না, কাহারো ধার ধারিত না, আজ শ্রমবিভাগ ও বিনিময়ের ফলে তাহারাও

অভাব পূরণের জন্য সাত সমুদ্র তের নদীর পারে কোন্ দেশ আছে তাহার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। এই রকম পরস্পর নির্ভরতার জন্যই প্রত্যেক দেশে উচ্চ সামাজিকতা ও জাতীয় একতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক ঐক্যের কথাও শুনিতে পাই। বাণিজ্য-জগতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তো আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা ভারতবাসী শিশুর খেলনা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবার কাপড়খানার জন্য পর্য্যন্ত বিদেশের দিকে তাকাইয়া থাকি; আবার বিলাতের লোক খাদ্যের জন্য ভারতের ও অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করে। এই রকম প্রায় সকল দেশেই।

(৪)

বিনিময়ে অর্থের প্রচলন ও শ্রমবিভাগের ফলে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিতেছে তাহাতে সুবিধা আছে অনেক, কিন্তু অসুবিধাও আছে ঢের। এই-সব অসুবিধার মধ্যে একটা অসুবিধার কথা একটু সবিস্তারে বলিব, কারণ আজ কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের দেশে উহা একটি মস্ত সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তজ্জন্য আমাদের ক্ষতিও যে না হইতেছে তাহা নহে।

পৃথিবীময় আজকাল অর্থের প্রচলন হইয়াছে বটে, কিন্তু সকল দেশেই একই রকম অর্থ চলে না। একদেশে ব্যবহৃত অর্থ অন্যদেশে অর্থরূপে ব্যবহৃত হয় না। আমাদের দেশে চলে রূপার টাকা, বিলাতে প্রচলন স্বর্ণমুদ্রার। আমাদের দেশে জিনিষের দাম হিসাব করি টাকা আনা পয়সায়; আর বিলাতে জিনিষের দাম হিসাব হয় পাউণ্ড্ শিলিং পেন্সে। কাজেই ইংলণ্ড্ হইতে যদি আমরা কোন জিনিষ ক্রয় করি, তাহা হইলে উহার বিক্রেতা দাম চাহিবে পাউণ্ড্ শিলিং পেন্সে। কারণ সে আমাদের দেশের টাকা আনা পয়সা মূল্যস্বরূপ গ্রহণ করিবে না। আমাদিগকে বাধ্য হইয়া আমাদের দেশের টাকা দিয়া ইংলণ্ডের অর্থ কিনিয়া ক্রীত জিনিষের দাম পরিশোধ করিতে হয়। তাহারাও যখন ভারতবর্ষ হইতে মাল ক্রয় করে তখন তাহাদের দেশের অর্থ দিয়া আমাদের দেশের রূপার টাকা কিনিয়া তবে মালের দাম শোধ দেয়। কিন্তু কয়টি টাকার বিনিময়ে ইংলণ্ডীয় মুদ্রা (সভারেন্ ইত্যাদি) কয়টি পাওয়া যাইবে তাহা সব সময় ঠিক থাকে না। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৫ টাকায় এক পাউণ্ড পাইতাম, যুদ্ধের পরে এক সময় পাউণ্ডের দাম ৬৸৵০ ছিল। এখন প্রায় ১৫টি টাকা দিলে তবে এক পাউণ্ড পাওয়া যায়। বিনিময়ের হার (rate of exchange) বলিলে এক দেশের অর্থের দ্বারা অপর দেশের কি পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইবে তাহাই বুঝায়। আমাদের দেশের টাকার বিনিময়ে অপর দেশের অর্থ কি পরিমাণ পাওয়া যাইবে তাহা নিরূপণ করিলে টাকার বিনিময়ের হার অথবা টাকার বিনিময়-মূল্য কত তাহা বুঝা যায়। গত কয়েক বৎসর যাবৎ দেখিতেছি টাকার বিনিময়-মূল্য অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহাতে বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। এই যে টাকার বিনিময়-মূল্য (অথবা সংক্ষেপে টাকার মূল্য) বাড়ে কমে, ইহার কারণ কি, তাহাই এখন বিশদ-ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

(৫)

যুদ্ধের আগে আমাদের এক আনা ছিল বিলাতের এক পেনির সমান, অর্থাৎ ১৫ টাকাতে এক পাউণ্ড্ হইত। আমাদের টাকা হইল রূপার তৈয়ারী। আর যুদ্ধের পর বিলাতে এক পাউণ্ড মূল্যের যে মুদ্রা চলিত তাহার নাম সভারেন্, এবং উহা সোনার তৈয়ারী। সুতরাং যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৫টি টাকা দিয়া একটি সোনার সভারেন পাওয়া যাইত। কিন্তু ১৫টি টাকা গলাইলে যে রূপা হয় তাহাতে তখন একটি সোনার সভারেন্ পাওয়া যাইত না। ঐ পরিমাণ রূপার মূল্য সভারেনের ¾এর সমান হইত। একটি টাকা সভারেনের পনের ভাগের এক ভাগের সমান অর্থাৎ ১৬ পেনির সমান হইত; কিন্তু টাকাটি গলাইয়া যে রূপা পাওয়া যায় তাহা সভারেনের ১/২০এর সমান অর্থাৎ ১২ পেনির সমান হইত। ইহার কারণ কি?

দশটাকার একখানা নোট লইয়া বাজারে ভাঙাইতে গেলে দোকানী হয়ত তাহার বদলে ১০টি রূপার টাকা দিতে স্বীকৃত হইবে; কিন্তু সেই নোটখানা ছিঁড়িয়া কাগজ হিসাবে বিক্রয় করিতে গেলে কেহই উহার মূল্যস্বরূপ আধ পয়সাও দিতে স্বীকার করিবে না। আধপয়সাও যাহার মূল্য নহে এমন একখানা কাগজের বদলে দোকানী ১০

টাকা দিতে রাজী হয় কেন? কারণ সে জানে যে গভর্ণমেণ্টের ট্রেজারীতে ওই ১০ টাকার নোটখানা হাজির করিলে সেও উহার বদলে ১০ টাকা পাইবে। ১২ পেনি যে রূপাটুকুর মূল্য তাহা দিয়া টাকা তৈয়ার হইলে, সেই টাকা দিয়া যে ব্যাঙ্কে ১৬ পেনি কিনিতে পারা যায়, তাহার কারণও আর কিছুই নহে, গভর্ণমেণ্ট্ এমনি বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, বিলাতের সওদাগর আমাদের দেশের প্রত্যেকটি টাকার বিনিময়ে ১৬ পেনি দিতে রাজী হয়। গবর্ণমেণ্ট্ এই বন্দোবস্ত কি করিয়া করিলেন?

বিলাতের সওদাগরগণ প্রতিবৎসর ভারতবর্ষ হইতে তুলা পাট প্রভৃতি অনেক জিনিষ ক্রয় করিয়া বিলাতে লইয়া যায়। ভারতবর্ষে জিনিষ কিনিতে হইলে কৃষক বা বিক্রেতাকে আমাদের দেশী টাকায় দাম দিতে হয়। বিলাতের সওদাগরগণ ভারতবর্ষীয় মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য পাউণ্ড্ বা সভারেনের বিনিময়ে আমাদের দেশের টাকা ক্রয় করে। তাহারা প্রয়োজনীয় টাকা ক্রয় করিবার জন্য লণ্ডনে ভারতসচিবের নিকট সভারেন বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করে। ভারতসচিব টাকার বিনিময়-হার অনুসারে গণনা করিয়া "এত টাকা পাইবে" বলিয়া লেখা বিল্ ঐ সভারেনের বিনিময়ে বিক্রয় করেন। এই 'বিল্‌কে' "কাউন্সিল্ বিল' বলে। বিলাতের সওদাগরগণ এইসব কাউন্সিল 'বিল'' ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষে মহাজনদিগের নিকট পাঠাইয়া দেয়। এদেশী মহাজন গভর্ণমেণ্টের ট্রেজারীতে ঐ বিল ভাঙাইয়া টাকা পায়।

এখন মনে করুন, বিলাতের বহু ব্যবসাদার যদি এদেশ হইতে অনেক পরিমাণে তুলা পাট ইত্যাদি ক্রয় করে, তাহা হইলে সেই-সব জিনিষের দাম দিবার জন্য তাহাদের বেশী পরিমাণে ভারতবর্ষীয় টাকাও কিনিতে হইবে। টাকার টান যেমন বাড়িল গভর্ণমেণ্ট যদি সেই অনুপাতে টাকা তৈয়ার করিতে স্বীকার না করেন, তাহা হইলে অনেক ব্যবসাদার ক্রীত জিনিষের মূল্য পরিশোধ করিবার সময় মুস্কিলে পড়িবে, কারণ সভারেনের বিনিময়ে যথেষ্ট টাকা ক্রয় করিতে পাওয়া যাইবে না। সকল পণ্য দ্রব্যেরই টানের চেয়ে যদি যোগান্ কম হয়, তবে মূল্য বাড়িয়া যায়। টাকার বাজারেও টান যদি বাড়ে আর গভর্ণমেণ্ট্ যদি তদনুসারে যোগান্ বৃদ্ধি না করেন তবে টাকার মূল্যও বাড়ে। যুদ্ধের অনেক পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট্ এইরূপভাবে টাকার যোগান্ বৃদ্ধি না করাতে টাকার মূল্য বাড়িয়া ১৬ পেনি হইয়াছিল; কিন্তু তখন টাকায় যতটা রূপা থাকিত তাহা গলাইয়া বিক্রয় করিতে গেলে তাহার মূল্য পাওয়া যাইত মাত্র ১২ পেনি। গভর্ণমেণ্ট্ বহুকাল যাবৎ টাকার বিনিময়-মূল্য ১৬ পেনিতে (অর্থাৎ ১৫ টাকায় ১ পাউণ্ড্) ঠিক রাখিয়াছিলেন।

এখানে একটা প্রশ্ন মনে উঠিতে পারে যে, টাকার ভিতরে রূপা যতখানি আছে তাহা গলাইয়া বিক্রয় করিলে যখন ১২ পেনি পাওয়া যায়, তখন টাকার বিনিময়-মূল্য বাড়াইয়া ১৬ পেনিতে চিরস্থির রাখিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের এত চেষ্টা কেন? টাকার বিনিময়হার অনবরত পরিবর্ত্তিত হইলে কি অসুবিধা হয়, এবং উহা চিরকাল একই রকম রাখিতে পারিলে কি লাভ হয় তাহা বলিতেছি।

গভর্ণমেণ্ট্ টাকার মূল্য বাঁধিয়া দিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশের যে-কেহ টাঁকশালে রূপা দিয়া টাকা তৈয়ার করিয়া আনিতে পারিত। তখন টাকার ভিতরে যতটা রূপা থাকিত তাহার মূল্য আর টাকার বিনিময়-মূল্য একই ছিল। সুতরাং রূপার দাম বাড়িলে টাকার বিনিময়মূল্যও বাড়িত, আবার রূপার দাম যখন কমিত তখন টাকার বিনিময়-মূল্যও কমিত। সেই সময়ে কয়েক বৎসর যাবৎ ক্রমান্বয়ে রূপার দামের অত্যন্ত বেশী পরিবর্ত্তন হইতেছিল। বৎসরের প্রথমে রূপার যে দর থাকিত শেষের দিকে হয়ত তাহা হইতে ঢের বাড়িয়া বা কমিয়া যাইত। রূপার দামের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে টাকার বিনিময়-মূল্যের পরিবর্ত্তন হওয়াতে ভারতবর্ষীয় ব্যবসাদারের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছিল। মনে করুন, কোন এক মার্কা মোটর-গাড়ী এই দেশে বিক্রয় করিতে গেলে ৭৫০০ টাকা পর্য্যন্ত দাম পাওয়া যাইতে পারে। বিলাতের কোম্পানী সেই মোটর-গাড়ীর দাম

কৰ্ম্মাবসানে

চিত্রকর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

RAY & SONS, CALCUTTA

চাহিল হয়ত ৪০০ পাউণ্ড। তখন যদি ১৫ টাকার বিনিময়ে ১ পাউণ্ড্ পাওয়া যায়, তাহা হইলে এ দেশের সওদাগর ঐ মোটর-গাড়ী ৬০০০ টাকায় কিনিয়া আনিয়া ৭৫০০ টাকায় বিক্রয় করিতে পারে। ইহাতে তাহার সরঞ্জামি (establishment) ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়াও লাভ থাকে যথেষ্ট। কিন্তু মোটর-গাড়ী ক্রয় করিয়া উহার মূল্য পরিশোধ করিবার পূর্ব্বেই যদি রূপার মূল্য কমিয়া যায় এবং তজ্জন্য টাকার বিনিময়-মূল্যও কমিয়া ২০ টাকায় ১ পাউণ্ড্ হয় তাহা হইলে সওদাগরকে ঐ মোটর-গাড়ীর মূল্যস্বরূপ ৮০০০ টাকা দিতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ গাড়ীর খরিদ্দার ৭৫০০ টাকার বেশী দিতে রাজী হইবে না। সুতরাং এই দেশে মোটর-গাড়ীর ব্যবসাদারের লোকসান হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, রূপার মূল্য যদি অনবরত পরিবর্ত্তিত হয়, এবং তজ্জন্য টাকার বিনিময় মূল্যেরও যদি স্থিরতা না থাকে, তাহা হইলে এ-দেশী সওদাগর, আর বিদেশ হইতে জিনিষপত্র আম্‌দানী করিতে সাহস পাইবে না। আর, যদি আম্‌দানী করেও, তাহা হইলে সাবধানতার খাতিরে অত্যন্ত চড়াদরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে।

টাকার মূল্য কমিলে যেমন ভারবর্ষে আম্‌দানী ব্যবসায় লোক্‌সান হয়, তেমনই টাকার মূল্য হঠাৎ বাড়িয়া গেলে বিদেশের যে-সব ব্যবসাদার এই দেশ হইতে তুলা চামড়া ইত্যাদি কিনিয়া লইয়া যায় তাহাদের লোক্‌সান দিতে হয়। যখন ১৫ টাকার বিনিময়ে ১ পাউণ্ড্ পাওয়া যায়, তখন তুলার দাম যদি মণ প্রতি ১৫ টাকা হয়, তাহা হইলে এদেশের তুলার বিলাতী গ্রাহক ১ পাউণ্ড্ দিয়া ১৫টি টাকা কিনিয়া একমণ তুলার দাম শোধ দিতে পারে। কিন্তু তুলা কিনিবার পরও দাম শোধ দিবার আগে টাকার মূল্য হঠাৎ বাড়িয়া যদি ১০ টাকায় এক পাউণ্ড্ হয় তাহা হইলে একমণ তুলার দাম অর্থাৎ ১৫ টাকা শোধ দিতে হইলে বিলাতের ব্যবসাদারকে ১॥০ পাউণ্ড্ ব্যয় করিয়া ১৫ টাকা কিনিতে হইবে। সুতরাং হয় তাহার লোকসান্ হইবে, নচেৎ বিলাতে তুলা চড়া দরে বিক্রয় করিতে হইবে। কাজেই টাকার মূল্য বাড়িলে বিলাতের ব্যবসাদারগণ সাধারণতঃ আমাদের দেশ হইতে জিনিষপত্র কিনিতে রাজী হয় না। তাহারা তখন সেই-সব দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সুরু করে যেখানে রূপার মূল্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দেয় মূল্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সে অবস্থায় আমাদের দেশের রপ্তানি কমিয়া যায়। টাকার মূল্য কমিলে বা বাড়িলে কেবল যে সওদাগরের ক্ষতি হয় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাধারণ লোকেরও ক্ষতি হয়। কারণ, সওদাগর যাহা আম্‌দানী করে তাহা আমরা দশজনে কিনি, আর দেশবাসী যাহা বিক্রয় করে তাহাই তো রপ্তানি হয়।

এই পরিবর্ত্তনে গবর্ণ্‌মেণ্টের কার্য্যেও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। গভর্ণ্‌মেণ্ট্ প্রতিবৎসর রেলের ইঞ্জিন, রেলগাড়ী, পুল তৈয়ার করিবার সাজ সরঞ্জাম এবং জলের কলের বড় বড় পাইপ ইত্যাদি বহু জিনিষ বিলাত হইতে ক্রয় করিয়া আনেন। এই-সকল জিনিষের দাম পাউণ্ডে শোধ দিতে হয়। গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে এইজন্য টাকা দিয়া পাউণ্ড্ ক্রয় করিতে হয়। গভর্ণ্‌মেণ্ট্ টাকা পায় কোথায়? দেশবাসীর প্রদত্ত করই তাহার প্রধান আয়। বৎসরের প্রথমেই কোন্ বিষয়ে কত খরচ হইবে তাহা হিসাব করিয়া গভর্ণ্‌মেণ্ট্ একটা খস্‌ড়া বজেট তৈয়ার করেন, এবং সেই অনুসারে দেশবাসীর নিকট হইতে কর আদায় করেন। টাকার মূল্যের যদি অনবরত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত খরচ মিটাইবার জন্য গভর্ণ্‌মেণ্টের কত টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা পূর্ব্বেই হিসাব করিয়া তদনুসারে কর আদায় করা অসাধ্য হইয়া উঠে। ইহাতে গভর্ণ্‌মেণ্টের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

টাকার মূল্যের অনবরত পরিবর্ত্তন হইলে গভর্ণ্‌মেণ্টের, সওদাগরদিগের এবং ভারতবাসীর যে কি অসুবিধা হয় তাহা আমরা একে একে দেখিলাম। এই-সব অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত গভর্ণ্‌মেণ্ট্ টাকার মূল্য চিরস্থির রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন।

টাকার মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া তো ঠিক হইল, কিন্তু কি হারে তাহা করা যায়? টাকার মূল্য টাকায় যে রূপা আছে তাহার দরের চেয়ে ঢের বেশী হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে টাকার মূল্য ঠিক রাখা অসাধ্য। গভর্ণ্‌মেণ্ট্

যদি টাকার মূল্য একটাকায় ১৪ পেনি হারে বাঁধিয়া দেন, আর টাকায় যতটা রূপা আছে তাহার দর চড়িয়া যদি ১৫ পেনি হয়, তাহা হইলে সকলেরই টাকা গলাইয়া রূপা হিসাবে বিক্রয় করিবার লোভ হইবে; কারণ তাহাতে টাকা প্রতি ১ পেনি করিয়া লাভ থাকিবে। যখনকার কথা বলিতেছি তখন একটাকায় যতটা রূপা থাকিত তাহার মূল্য ছিল ১২ পেনি। গভর্ণমেণ্ট্ মনে করিলেন, রূপার দাম যতই বৃদ্ধি হউক না কেন অতটা রূপার দর ১৬ পেনির বেশী কখনও হইবে না। সেই বিশ্বাসে গভর্ণমেণ্ট্ একটাকায় ১৬ পেনি এই বিনিময়-হার বাঁধিয়া দিলেন। কি করিয়া তাহা হইল বলিতেছি। তখন বিলাতী সওদাগরদিগের টাকার টান যতটা ছিল গভর্ণমেণ্ট্ টাকার যোগান্ তাহার চেয়ে কমাইয়া দিলেন। সুতরাং টাকার মূল্য বাড়িতে লাগিল। বাড়িতে বাড়িতে যখন ১৬ পেনিতে উঠিল, তখন গভর্ণমেণ্ট্ রূপা কিনিয়া নূতন টাকা তৈয়ার করিয়া টাকার যোগান্ বাড়াইলেন। বিলাতে ভারতসচিব যথেষ্ট কাউন্সিল বিল বিক্রী করাতে তথায় সকল সওদাগরই ভারতীয় মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিবার সুযোগ পাইল। টাকা কিনিবার জন্য বিলাতী সওদাগরদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস হওয়াতে টাকার মূল্য আর না বাড়িয়া ১৬ পেনিতে ঠিক রহিয়া গেল।

আমাদের দেশে একটা কথা আছে 'খোদার মার ঠেকায় কার সাধ্য!' এই ব্যাপারেও তাহাই ঘটিল। গভর্ণমেণ্ট্ তো টাকার মূল্য বাঁধিয়া দিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন; কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই একবার এই দেশে মরশুম ভাল না হওয়ায় তুলা ও গম ভাল রকম ফলিল না। সুতরাং ভারতের রপ্তানি অনেক কমিয়া গেল। কাজেই বিলাতের আম্‌দানীকারীদিগের টাকার চাহিদা যখন কমিয়া গেল, তখন গভর্ণমেণ্টের ভয় হইল, টাকার মূল্য আবার বুঝি টাকায় ১৬ পেনি হারের চেয়েও কমিয়া যায়।

কিন্তু এক উপায়ে গভর্ণমেণ্ট্ তাহা থামাইলেন। গভর্ণমেণ্ট্ যে রূপা কিনিয়া টাকা তৈয়ার করেন তাহাতে কিছু লাভ হয়। এই লাভের টাকাটা দিয়া গভর্ণমেণ্ট্ পাউণ্ড্ কিনিয়া লণ্ডনে তাহা মজুত রাখেন। টাকার মূল্য কমিবার সম্ভাবনা যখন দেখা গেল তখন গভর্ণমেণ্ট্ এই মজুত পাউণ্ড্ ব্যয় করিয়া ভারতের বণিক্‌দিগের ও ব্যাঙ্ক্‌গুলির নিকট যত টাকা ছিল তাহা কিনিয়া সরকারী ট্রেজারীতে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। গভর্ণমেণ্ট্ এই দেশে টাকার বিনিময়ে 'বিল' বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ইহাকে 'রিভার্স্ কাউন্সিল বিল্' বলে। এই-সব বিলের খরিদ্দার বিলাতে মহাজনের দেনা শোধ করিবার জন্য, অথবা তথায় ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার জন্য এদেশে টাকা দিয়া এই-সব বিল কিনিয়া বিলাতে স্ব স্ব মহাজন অথবা ব্যাঙ্কের নিকট উহা পাঠাইয়া দিল। তাহারা তথায় এই-সব বিল ভাঙাইয়া পাউণ্ড্ সংগ্রহ করিল। এই যে ভারতে টাকার বিনিময়ে বিলাতে পাউণ্ড্ বিক্রী হইতে লাগিল ইহাতে আমাদের দেশে চল্‌তি টাকার (money in circulation) পরিমাণ কমিয়া গেল, অর্থাৎ বাজারে টাকার পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় টাকার বদলে 'জিনিষ' অপেক্ষাকৃত বেশী পাওয়া যাইতে লাগিল। তাহার মানে জিনিষের দাম কমিয়া গেল। কাজেই অন্য দেশের লোক এদেশে বেশী করিয়া জিনিষ কিনিতে সুরু করিল। রপ্তানি বাড়িতে লাগিল কাজেই অন্য দেশে টাকার চাহিদা বাড়িতেই তাহার মূল্য বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সকল জিনিষেরই টানের চেয়ে যোগান কমিয়া গেলে দর বাড়ে। বাজারে টাকার পরিমাণ কমিয়া যাওয়াতে উহার মূল্য ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল।

এই উপায়ে যুদ্ধের আগে টাকার মূল্য ১৫ টাকায় ১ পাউণ্ড্ হারে একরকম চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ যেই আরম্ভ হইল, অমনি টাকার বাজারে ওলটপালট উপস্থিত হইল। যুদ্ধের আগে আমাদের দেশ হইতে তুলা পাট গম ইত্যাদি বহু জিনিষ বিলাতে রপ্তানি হইত। আবার বিলাত হইতে রেলের গাড়ী লোহার জিনিষ কাপড় ইত্যাদি বহু জিনিষ আমাদের দেশে আম্‌দানি হইত। ভারত ও বিলাতের আম্‌দানি রপ্তানি অর্থাৎ লেনাদেনার হিসাব করিয়া দেখা যাইত যে শেষে বিলাতের বণিক্‌দিগকে ভারতে কিছু টাকা পাঠাইতে হইত। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে বিলাতের লোক আমাদের দেশ হইতে বেশী দর দিয়া অধিক পরিমাণে জিনিষ কিনিয়া

লইতে আরম্ভ করিল। আর বিলাত হইতে আমরা যাহা যাহা আম্‌দানি করিতাম তাহার পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া গেল, কারণ তাহারা তখন বাণিজ্য ছাড়িয়া যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত। লেনাদেনার হিসাবে ভারতের নিকট বিলাতের ঋণ শান্তির সময়ে যাহা হইত তাহার চেয়ে অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়িল। কাজেই সকল বিলাতী বণিক্‌ই ভারতীয় মহাজনের দেনা শোধ করিবার জন্য এদেশী টাকা কিনিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িল। ইহার ফলে টাকার মূল্য ১৬ পেনির চেয়ে চড়িয়া গেল। ইহা থামাইবার জন্য গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌ পৃথিবীর নানান্ দেশ হইতে রূপা কিনিয়া আনিয়া টাকা তৈয়ার করিয়া টাকার যোগান্ বাড়াইতে সচেষ্ট হইলেন। পৃথিবীর অধিকাংশ রূপাই সর্‌বরাহ্ হয় মেক্‌সিকো হইতে। মেক্‌সিকোতে তখন আবার আরম্ভ হইল ঘরোয়া যুদ্ধ। কাজেই রূপার চালান্ কমিয়া গেল। রূপার দরও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। শেষে এমন হইল যে, টাকায় যতটা রূপা আছে তাহার দর চড়িয়া ১৬ পেনিরও বেশী হইয়া গেল। তখন টাকার বিনিময়-মূল্যের হার প্রতিদিনই পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌ আর কোন উপায়ে তাহা ঠিক রাখিতে পারিলেন না। বণিক্‌দিগের ক্ষতি হইতে লাগিল বলিয়া তাহারা টাকার বিনিময়হার স্থির করিয়া দিবার জন্য গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে অনুরোধ করিল। ইহার ফলে, বিশেষজ্ঞদিগের এক বৈঠকে এই স্থির হইল যে, আগে রূপার মূল্য অত্যন্ত কম ছিল বলিয়া টাকার ভিতরে যতটা রূপা আছে তাহার মূল্য ১৬ পেনির চেয়ে বেশী হইবে না এই বিশ্বাসে গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌ টাকার মূল্য এক টাকায় ১৬ পেনি হারে ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন যখন রূপার দর বাড়িয়া টাকায় যতটা রূপা আছে তাহার মূল্যও ১৬ পেনির চেয়ে বেশী হইয়া গিয়াছে,—তখন গভর্ণ্‌মেণ্টের উচিত টাকার মূল্য ১০ টাকায় ১ পাউণ্ড্‌ হারে ঠিক করিয়া দেওয়া। তাঁহারা বলেন যে রূপার দাম এরূপ কখনই বাড়িবে না যে এই নূতন বিনিময়-হারও বদ্‌লাইতে হইবে। গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌ও এই মতানুসরণ করিয়া ঠিক করিয়াছেন যে, বিনিময়-হার ১০ টাকায় ১ পাউণ্ড হিসাবেই ঠিক করিতে হইবে।

টাকার মূল্য ১২ পেনি হইতে ১৬ পেনি করিবার সময় গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌ যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এই বেলাও তাহাই করিলেন। গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌ নূতন টাকা অথবা নূতন নোট তৈয়ার করা বন্ধ করিয়া দিলেন। টাকার যোগান্ কমিয়া যাওয়ায় উহার মূল্যও বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এই মূল্য বৃদ্ধি যতটা তাড়াতাড়ি দর্‌কার তাহা হইল না। গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌ সেইজন্য "রিভার্স্‌ কাউন্সিল্ বিল্" বিক্রয় আরম্ভ করিলেন; অর্থাৎ বিলাতে মজুত পাউণ্ডের বিনিময়ে ভারতে সওদাগর ও ব্যাঙ্ক্‌গুলির নিকট হইতে টাকা ও নোট্ ক্রয় করিয়া সর্‌কারী ট্রেজারীতে বন্ধ করিয়া রাখা হইল। গভর্ণ্‌মেণ্টের বিশ্বাস ছিল এই উপায়ে টাকার যোগান্ আরো কমিলে উহার মূল্য নিশ্চয়ই বাড়িবে। কিন্তু গত বৎসর ভারতে মর্‌সুম ভাল হয় নাই বলিয়া ফসলও ভাল ফলে নাই। কতকটা গভর্ণ্‌মেণ্টের হুকুমে এবং কতকটা অন্যান্য কারণে গত বৎসর এই দেশ হইতে ধান গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের রপ্তানি অনেক কম হইয়াছে। কাজেই বিলাতী বণিক্‌দিগের ভারতীয় টাকা কিনিবার জন্য তেমন আগ্রহ ছিল না। এদিকে যুদ্ধ থামিয়া যাওয়াতে য়ুরোপে নানান্ রাজ্যে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য যে-সব চাম্‌ড়া মজুত ছিল তাহা ভারতবর্ষে বিক্রী হইতে লাগিল। ভারত হইতে চাম্‌ড়ার রপ্তানিও কমিয়া গেল। এমনি করিয়া ভারতীয় তুলা পাট ও চায়ের বাজারেও মন্দা পড়িল। মোটের উপর ভারতের রপ্তানি কমিয়া যাওয়াতে বিলাতী বণিক্‌দের ভারতীয় টাকা কিনিবার আগ্রহ থাকিল না। কাজেই টাকার টান কমিয়া গেল। যুদ্ধের কয়বৎসর ভারতবাসী বিলাত হইতে জিনিষ ইচ্ছামত আম্‌দানি করিবার সুবিধা পায় নাই। এখন মোটরগাড়ী সাইকেল রং ইত্যাদি বহুজিনিষ য়ুরোপ হইতে ভারতে আম্‌দানি হইতেছে। ভারতের রপ্তানি কমিয়া যাইয়া আম্‌দানি বাড়িয়া যাওয়াতে বিলাতের সওদাগরদিগের নিকট ভারতীয় বণিক্‌দের দেনা বাড়িয়া গিয়াছে। এই দেনা শোধ দিবার জন্য ভারতীয় বণিক্ চাহে টাকার বিনিময়ে পাউণ্ড্‌ কিনিতে। ইহার ফলে টাকার মূল্য আরো কমিয়া যাইতে লাগিল। যে টাকার মূল্য

৩২ পেনি পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল তাহা কমিতে কমিতে এখন ১৮ পেনিরও কম হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট্ এখন "রিভার্স কাউন্সিল বিল্" বিক্রয় করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষের রপ্তানি আবার যখন বাড়িবে, বিলাতের বণিক্ যখন আবার ভারতের তুলা পাট চাম্ড়া ইত্যাদি কিনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িবে, তখনই টাকার মূল্য বাড়িবার সম্ভাবনা, তাহার আগে নহে। গবর্ণমেণ্টের কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতের রপ্তানি বাড়িবার ফলে বিলাতী বণিক্‌দিগের ভারতীয় টাকার জন্য টান যখন বাড়িবে, তখন গবর্ণমেণ্ট্ টাকার যোগান্ কমাইয়া টাকার মূল্য ১০ টাকায় ১ পাউণ্ড্ হারে বাড়াইয়া ঠিক রাখিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা যে কবে হইবে কে জানে!

টাকার মূল্য বাড়িবার ও কমিবার ফলে আমাদের দেশের বাস্তবিক লাভ-লোকসান্ কি হইয়াছে সে হিসাব খতিয়ান্ করিবার ইচ্ছা রহিল বারান্তরে।

শ্রী নরেন্দ্রনাথ রায়

রাজপথ

[১০]

রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে। কর্ম্মক্লান্ত কলিকাতা সহর সমস্ত দিনের কোলাহল ও উদ্দীপনার পর সুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। রাজপথে ট্রামের ঘড়ঘড় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঘোড়ার গাড়ী বিরল হইয়া আসিয়াছে, পথ-চারীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, শুধু মন্দগতি রিক্স গাড়ীর টুং টুং ধ্বনি এবং দ্রুতগামী মোটার্‌কারের উদ্দাম নিনাদ এখনও মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে। অন্যদিন এতক্ষণ কালীতলার মন্দির বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু পূজার সময় বলিয়া এখনও মন্দিরের ঘণ্টা ভক্তকরাহত হইয়া এক এক বার বাজিয়া উঠিতেছে।

নিদ্রোৎসুক সুমিত্রা তাহার শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রার আরাধনা করিতেছিল, কিন্তু অভীষ্ট দেবতার পরিবর্ত্তে আসিতেছিল চিন্তা। পরদিন অতি প্রত্যুষে তাহাকে শয্যাত্যাগ করিতে হইবে; সেইজন্য সে নিদ্রার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু চিন্তা সে পথে বাধা দিতেছিল। সুমিত্রা ভাবিতেছিল বিমানবিহারীর কথা। আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিমানবিহারী তাহার চক্ষে সহজ সাধারণ ছিল। বিবাহের বিপণিতে সে একজন বরেণ্য পাত্র, অনেকেরই পক্ষে দুর্লভ, কিন্তু তাহাদের পক্ষে হয়ত সুলভ, বিমানবিহারীর বিষয়ে কতকটা এইরূপই তাহার ধারণা ছিল। আজ সহসা সেই বিবাহ-বিপণির সংপাত্র প্রেমমন্দিরের প্রণয়ীরূপে দেখা দিয়াছে। সে আর শুধু অভিভাবকদের চিন্তার বস্তু নহে, তাই সুমিত্রা মনের মধ্যে আজ এই প্রথম তাহার কথা আলোচনা করিয়া দেখিতেছিল।

প্রমদাচরণ প্রভৃতির আকস্মিক আগমনে বিমূঢ় হইয়া বিমান বলিয়াছিল, 'এ কথা মনে রেখো যে যা বলিনি তার তুলনায় যা বলেছি তা কিছুই নয়!' সুমিত্রা সেই কথা স্মরণ করিয়া, প্রমদাচরণ প্রভৃতি আরও অর্দ্ধঘণ্টা বিলম্ব করিয়া আসিলে বিমানবিহারী যে-সকল কথা বলিবার সময় পাইত, মনে মনে তাহাই কল্পনা করিতেছিল। বলিতে পারে নাই বলিয়া এমন কোন কথাই তাহার মনে হইতেছিল না, যাহা বিমানবিহারী বলিতে পারিত না। সে নিজেকে দয়িতার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কল্পনার কর্ণে নানাপ্রকার স্তবস্তুতি শুনিতে লাগিল।

কিন্তু এই মানসিক আরাধনা ও প্রার্থনায় আপত্তি করিবার কোন প্রত্যক্ষ কারণ না পাইলেও মনের কোন নিভৃত প্রদেশে কেন একটু বাধিতেছিল তাহা সুমিত্রা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। বিমান-বিহারীর আনুগত্য সহজ হিসাবে লাভের খাতায় পড়িলেও মনে হইতেছিল তাহার সহিত কোন্‌দিক্ হইতে কোথায়

যেন একটা কি ক্ষতি হইয়া যাইতেছে। রোগ প্রকাশ পাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দেহে যেমন একটা অনির্দ্দেশ্য অসুস্থতা উপস্থিত হয়, সুমিত্রা মনের মধ্যে তদনুরূপ একটা অস্থিরতা ভোগ করিতেছিল। একটা সূক্ষ্ম বেদনা অনুভূত হইতেছিল, কিন্তু তাহার যথাস্থানটি ঠিক করা হইতেছিল না। এমন সময়ে সহসা মনে পড়িল সুরেশ্বরের কথা; কিন্তু স্বপ্নে যেমন অনেক জিনিষ অকারণ অসংলগ্ন সূত্রে আবির্ভূত হয়, সুরেশ্বরের আবির্ভাবও ঠিক তেমনি অলীক অর্থহীন বলিয়া সুমিত্রার মনে হইল। সিঁড়ির নিকট উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথনটুকু হইয়াছিল, যতদূর সম্ভব স্মরণ করিয়া, সুমিত্রা মনে মনে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিল; কিন্তু তাহার মধ্যেও অসামান্য এমন কিছুই পাইল না যাহা আশঙ্কাজনক বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। মনে মনে একটু কৌতুক অনুভব করিয়া সুমিত্রা সুরেশ্বরের চিন্তা মন হইতে বিদায় করিল।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যাবেলা সুরেশ্বর যখন নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত হইয়া সুমিত্রাকে সম্মুখে পাইয়া সহাস্যে কহিল, "দেখুন, আজও আমার উৎসাহ কারুর চেয়ে কম নয়, সকলের আগে আমিই এসেছি!" তখন একটা অজ্ঞাত অকারণ সম্ভাবনার ত্রাসে সুমিত্রার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বিহ্বলতা হইতে মুক্ত হইয়া সে সস্মিতমুখে কহিল, "সকলের আগে এলেই হবে না, সকলের পরে গেলে তবে বুঝ্‌ব আপনার উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশী।"

সুরেশ্বর সহাস্যমুখে কহিল, "অতখানি উৎসাহের প্রমাণ দেওয়া শক্ত, তবে চেষ্টা কর্‌তে কোন বাধা নেই।"

কথাটা সুমিত্রার মনে বিশেষ আনন্দদায়ক বোধ হইল না, কিন্তু সে কথার আর কোন উত্তর না দিয়া কহিল, "আসুন সুরেশ্বর-বাবু, ভিতরে বসবেন আসুন।"

হল-ঘরটি আজ একটু যত্নের সহিতই সাজান হইয়াছিল। প্রবেশ করিয়া সদ্য-আহৃত পুষ্পের শোভা ও গন্ধে সুরেশ্বরের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন স্থানে সজ্জিত পুষ্পগুলি দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সুরেশ্বরের অনুবর্ত্তিনী হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সুমিত্রা বিস্ময়ের সুরে কহিল, "সুরেশ্বর-বাবু, আপনি ফুল এত ভাল বাসেন?"

সুমিত্রার প্রশ্নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরেশ্বর সকৌতুকে কহিল, "বাসি বই কি! আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন?"

সুমিত্রা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ।"

"কেন বলুন ত?"

"আপনার মত কাজের লোকদের, ছবি দেখা, ফুল শোঁকা, গান শোনা, এই-সব অ-দরকারি কাজ করতে দেখ্‌লে আমার কেমন আশ্চর্য্য বোধ হয়।"

সুমিত্রার মন্তব্যে যথেষ্ট পুলকিত হইয়া সুরেশ্বর কহিল, "আমার আরও আশ্চর্য্য বোধ হয় যখন আমার মত এক জন বাজে লোককে কাজের লোক বলে', ভুল করে', মানুষ ভয় পায়। আমাকে একজন কঠোর কাজের লোক বলে, কেন ঠাউরেছেন বলুন দেখি?"

সুমিত্রা হাসিমুখে কহিল, "কঠোর কাজের লোক তা বল্‌ছিনে, কিন্তু আপনি যে কাজের লোক, তা এম্‌নিই বোঝা যায়।"

সুরেশ্বর কহিল, "পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিষ আছে যা দেখে' লোকে ঠিক বিপরীত বোঝে। তার প্রমাণ দেখুন পাশের ঘরে আল্‌মারীতে কৃষ্ণনগরের ফল-গুলি; দেখ্‌তে আসলের চেয়েও সরস, কিন্তু হাতুড়ি দিয়ে পিটলেও এক ফোঁটা রস বেরোবে না, ধুলো হ'য়ে উড়ে' যাবে। মানুষের মধ্যেও এমন অনেক কৃষ্ণনগরের মানুষ আছে।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিতে শুনিতে সুমিত্রার চক্ষুদুটি পুলকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, "আপনি কিন্তু কৃষ্ণনগরের মানুষ নন। আপনি ঢাকার মানুষ।"

সুরেশ্বর সৌৎসুক্যে কহিল, "কেন বলুন ত?"

হাসিতে হাসিতে সুমিত্রা কহিল, "আপনি নিজেকে সব সময়ে ঢেকে রাখ্‌তেই চান।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া সুরেশ্বর উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার পর কহিল, "তা যদি হয় ত কাজের মানুষ বলে' কি করে' আমাকে বুঝ্‌লেন?"

সুমিত্রা স্মিতমুখে কহিল, "কাজের মানুষরাই নিজেদের

ঢাকা দিয়ে রাখে। আপনি নিজেকে ঢাক্‌বার জন্যে এত চেষ্টা করেন বলে'ই বুঝ্‌তে পারি যে আপনি কাজের মানুষ।"

সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে কহিল, "কিন্তু আমি যে কাজের মানুষ নই, আপনাদের মতে তার একটা প্রমাণ ত দিয়েছি স্কুলের প্রতি মনোযোগী হ'য়ে। আপনার দ্বিতীয় প্রমাণও আজ এমনভাবে দেব যে আপনি স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হবেন যে আমি একজন নিতান্ত অকেজো লোক।"

দ্বিতীয় প্রমাণের দ্বারা সুরেশ্বর কি ব্যক্ত করিতে চাহিতেছে তাহা ক্ষণকাল বুঝিতে চেষ্টা করিয়া সুরেশ্বরের প্রতি উৎসুক নেত্র স্থাপিত করিয়া স্মিতমুখে সুমিত্রা বলিল, "দ্বিতীয় প্রমাণ কি বলুন ত?"

সুরেশ্বর কহিল, "দ্বিতীয় প্রমাণ গান শোনা। আজ সমস্ত কাজ ভুলে' আপনার অনেকগুলি গান শুনব।

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রার মুখ নিমেষের জন্য রঞ্জিত হইয়া উঠিল। এই দুই মাসের পরিচয়ের মধ্যে সুরেশ্বর কোন দিনই তাহাকে গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করে নাই, অথবা তাহার গান শুনিবার জন্য আগ্রহও প্রকাশ করে নাই। আজ সহসা তাহাকে সে বিষয়ে এতটা আগ্রহের সহিত ইচ্ছা প্রকাশ করিতে দেখিয়া সুমিত্রার মনে বিস্ময়ের অপেক্ষা সঙ্কোচই বেশী দেখা দিল। কিন্তু পরক্ষণেই সহাস্যমুখে কহিল, "আমি যে গান গাইতে পারি তা আপনাকে কে বল্‌লে?"

সুরেশ্বর কহিল, "কেউ বলেনি। আমি অনুমান করছি আপনি গাইতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে আপনি গাইতে পারেন না, তা হ'লে বুঝ্‌ব যে আমার অনুমান ভুল হয়েছিল।"

কিন্তু এ কথার উত্তর দিবার সময় হইল না; কক্ষে জয়ন্তী প্রবেশ করিলেন এবং সুরেশ্বরকে দেখিয়া একটু বিস্ময়ের সুরে কহিলেন, "এই যে সুরেশ্বর! বেশ সকাল-সকাল এসেছ দেখ্‌ছি।"

সুমিত্রার সহিত সুরেশ্বরকে কক্ষ-মধ্যে একা দেখিয়া জয়ন্তী মনে মনে প্রসন্ন হন নাই। উপকার-প্রাপ্তি এবং তৎপ্রসূত কৃতজ্ঞতার ভিতর দিয়া সুরেশ্বরের সহিত পরিচয় হইলেও প্রথম দিন হইতেই জয়ন্তী সুরেশ্বরের প্রতি একটু বিমুখ ছিলেন। সুরেশ্বর একজন নন-কো-অপারেটার জানিয়া এই বিরূপতা প্রথম উপস্থিত হয়। তাহার পর উত্তরোত্তর সুরেশ্বরের দৃঢ়তা ও শক্তি উপলব্ধি করিয়া ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জয়ন্তী সুরেশ্বরকে মনে মনে একটু ভয় করিতেন, এবং অগ্নির সহিত ধূম্রের মত, এই ভীতির সহিত বিদ্বেষও আসিয়া জুটিয়াছিল। যুক্তি-প্রমাণের মধ্যে এপর্য্যন্ত যাহার কোন অস্তিত্ব ছিল না, বুদ্ধির অতীত কোন শক্তির সাহায্যে তাহারই আশঙ্কায় জয়ন্তী সময়ে সময়ে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। তাঁহার ভয় হইত বিমান ও সুমিত্রার মধ্যে মিলনের যে পথটি তিনি গড়িয়া তুলিতেছিলেন তাহার মধ্যে বিঘ্নস্বরূপ সুরেশ্বর হঠাৎ না আসিয়া দাঁড়ায়। তাই বিমানের অনুপস্থিতিতে সুরেশ্বর ও সুমিত্রা একত্র থাকে তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না।

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "সময় ঠিক আন্দাজ করতে পারিনি। ভেবেছিলাম আমারই সকলের চেয়ে দেরী হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু এসে দেখি আমিই সকলের আগে এসে পড়েছি।"

এ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইয়া অতি সংক্ষেপে জয়ন্তী কহিলেন, "তা ভালই ত," তাহার পর সুমিত্রার প্রতি ঈষৎ শুষ্কভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "যাও না সুমিত্রা, সুরেশ্বর এসেছেন, তোমার মামা-বাবুকে ডেকে দাও না।"

সজনীকান্ত দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বিবিধ কার্য্য লইয়া বহির্গত হইয়াছিল, বলিয়া গিয়াছিল সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিতে পারিবে না। তাহাকে ডাকিবার কথা শুনিয়া সুমিত্রা কহিল, "মামা-বাবু ফিরেছেন?"

"হ্যাঁ, এইমাত্র এসেছে।"

সুরেশ্বর সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গিয়েছিলেন তিনি?"

সুমিত্রা কহিল, "এক জায়গায় যাননি ত, অনেক জায়গায় গিয়েছিলেন। দুপুরবেলা বেরিয়েছিলেন আর এইমাত্র এলেন।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া সুরেশ্বর ব্যস্ত হইয়া জয়ন্তীকে

কহিল, "না, না, তাঁর তাড়াতাড়ি আস্‌বার কোন দরকার নেই; তিনি এখন একটু বিশ্রাম করুন।" তাহার পর হঠাৎ মনে হওয়ায়, যে, বিশেষ কোন প্রয়োজনের জন্য হয়ত জয়ন্তী সুমিত্রাকে অন্তঃপুরে পাঠাইতে চাহেন, সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "আপনার যদি কোনও দরকার থাকে ত অনায়াসে যেতে পারেন। আমি না হয় ততক্ষণ বিমান-বাবুকে ধরে' নিয়ে আসি।"

সুমিত্রা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, না, আপনার কোথাও যেতে হবে না। তিনি কখন্ আস্‌বেন, কোন্ দিক্ দিয়ে আস্‌বেন, তার ঠিক কি? আমার কোনো দরকার নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

জয়ন্তী সুরেশ্বরের দিকে পিছন ফিরিয়া চক্ষের এক দুর্বোধ্য কটাক্ষে কন্যাকে কি ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "কিন্তু বাড়ীর ভিতর তোমার একটু দরকার আছে সুমিত্রা।"

সুমিত্রা সে ইঙ্গিতের মর্ম্মভেদ করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া বলিল, "কি দরকার মা?"

কন্যা যে সহসা এ প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিবে তাহা জয়ন্তী একেবারেই আশঙ্কা করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন ইঙ্গিতের সহিত দরকার আছে বলিলেই সুমিত্রা গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া যাইবে। তাই কোন্ প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিবেন সত্বর স্থির করিতে না পারিয়া বিমূঢ়ভাবে কহিলেন, "কাপড়টা বদ্‌লে' আস্‌বে।"

সুমিত্রা সবিস্ময়ে কহিল, "কেন?"

"আষাঢ় মাসে নর্ম্মানের বাড়ী থেকে তোমার ইংলিশ্ ক্রেপের যে শাড়ী আর ব্লাউস্ ত'য়ের হ'য়ে এসেছিল সেইটে পরে' এস। এ কাপড়টায় তোমাকে তেমন মানাচ্ছে না।"

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। একজন বাহিরের লোকের সম্মুখে পরিধেয় বস্ত্র ও তাহার শোভনশীলতা সম্বন্ধে এরূপ আলোচনা সুরীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া ত ঠেকিলই, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক বেশী অন্যায় মনে হইল সুরেশ্বরের সমস্ত পরিচয় এবং প্রবৃত্তি বিশেষরূপে অবগত হইয়া এবং তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী লইয়া আসিয়া, তাহার সম্মুখে অকারণ উচ্ছ্বাসের সহিত নর্ম্মানের বাড়ীর ইংলিশ ক্রেপের পোষাকের উল্লেখ করা! ইহার দ্বারা যে শুধু সুরেশ্বরকেই আহত করা হইয়াছে তাহা নহে, সে নিজেও বিশেষরূপ অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করিল। কিন্তু কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিলে পাছে আলোচনাটা আরও আপত্তিকর অবস্থায় উপনীত হয় এই আশঙ্কায় সে জোর করিয়া সহজভাব ধারণ করিয়া কহিল, "তা হ'লে তুমি সুরেশ্বর-বাবুর কাছে থাক মা, আমি কাপড়টা বদ্‌লে আসি। আমার কিন্তু একটু দেরী হবে।"

জয়ন্তী প্রসন্ন-কণ্ঠে কহিলেন, "তা হোক, আমি সুরেশ্বরের কাছে আছি।"

নর্ম্মানের বাড়ীর পোষাকের উল্লেখে সুরেশ্বর আহত বা অপমানিত বোধ করে নাই, কারণ জয়ন্তীর প্রকৃতির ধারা তাহার অজ্ঞাত ছিল না; তাই সে এই কৌতুক-প্রদ আত্ম-প্রচার দেখিয়া একটু পুলকিতই হইয়াছিল। কিন্তু জয়ন্তীর নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া সুমিত্রা যখন নির্ব্বিবাদে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্থান করিল তখন সে বাস্তবিকই মনের মধ্যে একটা আঘাত অনুভব করিল। মনে হইল, মন শূন্য দেহকে এত সহজে ও এত অবলীলা-ক্রমে বিদেশী আবরণে আচ্ছাদিত করিতে যাহার কিছুমাত্র বাধিল না, মাধবীর নিষ্ঠা-পূত সূতার রুমাল তৈয়ারী করিয়া তাহাকে উপহার দেওয়া পণ্ডশ্রম হইয়াছে। পূর্ব্বদিন হইতে মনের মধ্যে একটা কোন্ দিকে যে রশ্মি-রেখা দেখা দিয়াছিল তাহা নিমেষের মধ্যে সরিয়া গেল, এবং কিছু পূর্ব্বে শরীর ও মন ব্যাপিয়া যে উদ্যম এবং উদ্দীপনা সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছিল তাহা অপসৃত হইয়া গেল। একবার মনে হইল সুমিত্রা ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু ধৈর্য্যশীল চিকিৎসক যেমন আশাহীন অবস্থাতেও রোগীকে পরিত্যাগ করে না ঠিক সেই হিসাবে সুরেশ্বর অপেক্ষা করিয়া রহিল।

জয়ন্তী কহিলেন, "মেয়েটা এমন নি-সেখো যে কখনো কোন ভাল জিনিষ পর্‌তে যদি চায়! দেখো না, শুট্‌টা কেমন সুন্দর ইংলিশ্ মভ্ ক্রেপের। কিন্তু হ'য়ে পর্য্যন্ত

বোধ হয় ছুদিনও পরেনি। অথচ খরচ কত পড়েছিল জান সুরেশ্বর ?"

এরূপ সনির্ব্বন্ধ আহ্বানেও বিমনা সুরেশ্বরের ঔৎসুক্য জাগ্রত হইল না। সে কোন কথা না বলিয়া স্পৃহাহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ সুরেশ্বরের প্রশ্নের জন্য বৃথা অপেক্ষা করিয়া বিস্ময় উদ্রেককর ভঙ্গীতে জয়ন্তী কহিলেন, "একশ কুড়ি টাকা !"

[১১]

কিছুক্ষণের মধ্যে একে একে সজনীকান্ত, সুরমা, বিমলা, বিমানবিহারী ও তাহার দুইটি ভাগিনেয় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কথায় কথায় সাময়িক প্রসঙ্গ, নন্‌কোঅপারেশনের কথা, উঠিল। কংগ্রেসে স্বেচ্ছা-সেবক গ্রহণের বিষয় আলোচনা হইতেছিল।

বিমানবিহারী কহিল, "কিন্তু যাই বলুন সুরেশ্বর-বাবু, নির্ব্বিচারে এত লোক ভর্ত্তি করে' নেওয়া হচ্ছে যে আর কিছুর জন্যে না হ'লেও শুধু এই দোষেই আপনাদের আন্দোলনটা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে বলে' মনে হয়। অশিক্ষিত সৈন্য শুধু আক্রমণের পক্ষেই বেকার নয়, আত্ম-রক্ষার পক্ষেও বিপজ্জনক। জার্ম্মান যুদ্ধটা এরি মধ্যে আমরা ভুলিনি ত—অসংখ্য জার্ম্মান সৈন্য যখন প্রবল বন্যার মত বেলজিয়মের উপর এসে পড়্‌ল তখন ইংল্যাণ্ড্‌ থেকে কেরাণী আর ছাত্রের দল, আর ভারতবর্ষ থেকে ভোজপুরী দারবানদের নিয়ে গিয়ে ফেল্‌লে কোন সুবিধা হ'ত কি ? অত বড় প্রয়োজন আর তাড়াতাড়ির মধ্যেও অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করে' নেবার জন্যে যতটুকু সময়ের দরকার, তা অপেক্ষা করতেই হয়েছিল। তা না করলে অযথা লোকক্ষয় হ'ত, ফল কিছুই হ'ত না।"

বিমানের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অল্প হাসিয়া সুরেশ্বর কহিল, "দেখুন, কোন কথাই সকল সময় আর সকল অবস্থার উপযোগী করে, বলা যায় না। যে কথাটা আপনি বললেন জার্ম্মান যুদ্ধের পক্ষে তা বেশ খাটে, কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষেও যে তা ঠিক তেমনি খাটবে তার কি মানে আছে ? দুই একটা উদাহরণ দিয়ে দেখুন। ঘরে আগুন লেগেছে, মটকা জলে' উঠেছে। সে-সময়ে যদি গৃহবাসী সদলে কোন নদীতীরে উপস্থিত হ'য়ে জল তোলা আর জল ঢালা অভ্যাস করতে আরম্ভ করেন তা হ'লে গৃহ রক্ষা হয় কি ? ধরুন, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে, লুট আরম্ভ হয়েছে। সে সময়ে গৃহস্বামী যদি তাঁর পুত্র-পৌত্রগণ নিয়ে একটা স্বতন্ত্র ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে শক্তি-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ওঠ-বোস অথবা পাঞ্জা-লড়ালড়ি আরম্ভ করেন তা হ'লে ব্যাপারটা কি রকম হয় ?"

সুরেশ্বরের উদাহরণ দুইটি শুনিয়া কেহ কেহ হাসিয়া উঠিল। বিমান স্মিতমুখে কহিল, "এদের হাসি থেকেই বুঝ্‌তে পারছেন হাস্যকর হয়। কিন্তু তাই বলে' ডাকাত পড়লে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে' নির্ব্বিচারে লোক সংগ্রহ করলেই সুবিধা হয় না।' তাতে গোলযোগটা আরও বেড়ে ওঠে, আর সেই সুযোগে ডাকাতিটা বেশ ভাল রকমে হ'য়ে যায়। বাড়ীতে আগুন লাগ্‌লে প্রতিবেশীরা এসে কি করে জানেন ?—সযত্নে জিনিসগুলা আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিজ নিজ বাড়ী নিয়ে গিয়ে হেফাজতের সঙ্গে রেখে দেন। পুড়ে গেলে ছাইটুকুও পড়ে' থাকৃত, এদের সহায়তায় তাও থাকে না।"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া সজনীকান্ত উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বলিহারি বাবা ! বেশ বলেছ ! এ ক্ষেত্রে আবার আগুন লাগেওনি ; আগুন লাগার ভয় দেখিয়েই এঁরা গৃহস্থের গৃহ শূন্য করে' নিচ্ছেন ! দেশের লোককে কলে কৌশলে ভুলিয়ে চাঁদা তুলে', দশ লাখ বিশ লাখ জমিয়ে নিয়ে বস্‌ তারপর মৌনী-বাবা ! হিসেব চাও, মুখে আর কথাটি নেই।"

সুরেশ্বরের মনটা তিক্ত হইয়াই ছিল, তাহার উপর সজনীকান্তের এই কদর্য্য অভিযোগ শুনিয়া তাহার স্বভাবশান্ত প্রকৃতির মধ্যে সহসা মনটা রুদ্র তেজে জলিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। কিন্তু সজনীকান্তের কথা উপেক্ষা করিবার বিষয়ে তাহার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া, বসুন্ধরা যেরূপে অন্তরের মধ্যে স্ফুটনোদ্যত আগ্নেয়গিরি চাপিয়া রাখেন ঠিক সেইরূপ সহনশীলতার সহিত মনের মধ্যে প্রজ্বলিত কোপানল অবরুদ্ধ রাখিয়া

সুরেশ্বর আরক্তস্মিতমুখে কহিল, "আপনি কখনো হিসেব চেয়েছিলেন না কি ?"

প্রশ্ন শুনিয়া ক্ষণকাল সজনীকান্তর মুখে বাক্য সরিল না। তাহার পর গভীর বিস্ময় ও বিরক্তির সহিত নেত্রদ্বয় কপালে তুলিয়া উচ্চস্বরে কহিল, "আমি হিসেব চাব ? কি বল্‌ছ হে তুমি ? আমি কি কখনও একপয়সা দিয়েছি নাকি যে হিসেব চাব ? তুমি মনে কর কি ? আমি গবর্মেণ্টের একজন অফিসার, আমার দায়িত্ব জ্ঞান নেই ?"

সুরেশ্বর দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "ধর্‌লাম আছে। কিন্তু এক পয়সা চাঁদা না দিয়ে আপনি হিসেবের কথা তোলেন কি করে' ?"

সজনীকান্ত হঠাৎ চতুগুর্ণ রাগিয়া উঠিয়া কলহ-কঠোর কণ্ঠে কহিল, "কেন তুল্‌ব না ? আল্‌বাৎ তুল্‌ব, পাঁচশো বার তুল্‌ব! আমি দিইনি বলে' কি দেশের টাকার হিসেব তলব কর্‌বার অধিকার আমার নেই ?"

সুরেশ্বর তেম্‌নি দৃঢ়ভাবে কহিল, "আমি ত বলি সে অধিকার আপনার আছে। কিন্তু হিসেব তলব মানে ত এই যে, যে-উদ্দেশ্যে টাকা তোলা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে খরচ হচ্ছে কি না, আর বাকিটা চুরি না হয়ে মজুত আছে কি না দেখা ? গবর্মেণ্টের একজন অফিসার হ'য়ে আপনি কি এখনও বল্‌তে চান যে টাকাটা চুরি না হ'য়ে যে-উদ্দেশ্যে তোলা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যে খরচ হচ্ছে জান্‌লেই আপনি খুসী হন ?"

সুরেশ্বরের এই প্রশ্নে বিমূঢ়ভাবে একবার বিমানের দিকে ও আর-একবার জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া চক্ষুদ্বয় গোলাকার করিয়া সজনীকান্ত বলিয়া উঠিল, "তা আমি কখ্‌খনো বল্‌ব না! তোমার শওয়ালের উত্তুর দিতে আমি বাধ্য নই, তা তুমি জেনো!" বলিয়া পুনরায় একবার জয়ন্তীর দিকে ও একবার বিমানের দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল।

এবার সুরেশ্বরের হাসি পাইল। সে নরম হইয়া স্মিতমুখে কহিল, "না, না, আপনি বাধ্য কেন হবেন, ইচ্ছা হ'লে আপনি উত্তুর দেবেন, না হ'লে দেবেন না।" তাহার পর বিমানের দিকে ফিরিয়া বলিল, "বিচার করে' লোক নিতে হ'লে বিচারকদের মধ্যেই অনেককে বেরিয়ে আস্‌তে হয়—দেশের এমনই দুর্দ্দশা! আর, সকলের চেয়ে আশাহীন হ'তে হয় কাদের দেখ্‌লে জানেন ? দেশের শিক্ষিত লোকদের। অনেক দুঃখেই গান্ধী তাদের আশা ত্যাগ করেছেন।"

বিমান কহিল, "কিন্তু আমার মনে হয় সুরেশ্বর-বাবু, দেশের শিক্ষিত লোক যদি আপনাদের এ আন্দোলনটা তাদের জীবনের মধ্যে না নিয়ে থাকে তা হ'লে সেটা এ আন্দোলনের উপযোগিতা-সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ প্রমাণ বলে'ই ধর্‌তে হবে। মাথার সঙ্গে একমত না হ'য়ে পা দুটো ইচ্ছামত একদিকে ছুটে' চল্‌তে পারে; তাতে দেহটা নিশ্চয়ই খানিকটা এগিয়ে যাবে, কিন্তু তা সর্ব্বনাশের পথেও ত হ'তে পারে। আর-একটা কথা আমার মনে হয় যে, আপনাদের এই অসহযোগ-প্রণালীটা ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ আমাদের বাংলা দেশের, প্রাণধারার বিরুদ্ধ জিনিস। ভারতবর্ষের মাটিতে এ বীজ ফলপ্রদ হবে না। আমাদের অনুরাগের দেশে বিরাগ নিশ্চয়ই ফেল্‌ কর্‌বে। আমরা মানুষের সহিত ঝগ্‌ড়া করে'ও থাক্‌তে পারি, কিন্তু মানুষকে ছেড়ে থাক্‌তে পারিনে। সেটা আমাদের ধর্ম্মের বাহিরে।"

এবার সুরমা কথা কহিল। বলিল, "দোহাই ঠাকুরপো, তোমাদের এ কূট তর্কও আমাদের সহ্যের বাইরে হয়েছে। আর যদি বেশীক্ষণ চালাও ত আমরা কিন্তু তোমাদের ছেড়ে পালাব।"

জয়ন্তী এতক্ষণ কোনও কথা কহেন নাই। অতিশয় অসন্তোষের সহিত তিনি এই বাদ-প্রতিবাদ শুনিতে-ছিলেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, যিনি মাসে মাসে মোটা টাকা পেন্সন পাইতেছেন, তাঁহার গৃহে অপর একজন ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট, যিনি অচিরে এই গৃহের জামাতা হইবেন, তাঁহার সহিত একজন নাম-লেখান নন্‌কোঅপারেটার নন্‌কোঅপারেশনের স্বপক্ষে আলোচনা করিতেছে ইহা তাঁহার অতিশয় অসমীচীন বলিয়া মনে হইতেছিল এবং তজ্জন্য সুরেশ্বরের প্রতি উত্তরোত্তর ক্রোধ বর্দ্ধিত হইলেও সে আজ অভ্যাগত বলিয়া প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না। সুরমার কথায় কথা বলার সুযোগ পাইয়া জয়ন্তী কহিলেন,

'আর তা ছাড়া আজকের দিনে এ-সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা-কাটাকাটি না করে' একটু আমোদ আহ্লাদ কর।"

বিমান হাসিয়া বলিল, "তুচ্ছ বিষয় ঠিক বলা যায় না, এই নিয়ে দেশের মধ্যে যখন এতটা আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে। তবে আজকের মত এ কথা থাক। গাও বিমলা, তোমার সেই গানটা গাও—'আলসে বাড়িল অলস দিবস'—"

তাহার পর সুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বিমান কহিল, "সুরেশ্বর-বাবু, আপনি বোধ হয় একদিনও বিমলার গান শোনেন নি?"

গান শুনিবার বিশেষ আগ্রহ লইয়াই সুরেশ্বর আজ আসিয়াছিল, কিন্তু এখন আর তাহার উৎসাহহীন চিত্তে সে আগ্রহ একটুও ছিল না। তাই সে অনুৎসুকভাবে শুধু কহিল, "না।"

"তা হ'লে শুনুন; বিমলা ভারি চমৎকার গান গায়।"

বিমলা লজ্জিত হইয়া কহিল, "আপনি বিমান-দাদার কথা শুনবেন না সুরেশ্বর-বাবু। আমি একটুও ভাল গান গাইতে পারিনে।"

সুরেশ্বর তেমনি উদাসভাবে কহিল, "ভাল কি মন্দ তা শুনলেই বুঝতে পারব!"

সজনীকান্ত মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে সুরেশ্বরের সহিত সহজে কথা কহিবে না; কিন্তু সহসা তাহা বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার আবার বোঝা-বুঝিটা কি হে? রাগরাগিণীর ধার দিয়ে ত যাবে না, বন্দে মাতরম্ গাইলেই ভাল লাগবে।"

সুরেশ্বর পুলকিত হইয়া সাহাস্যমুখে কহিল, "বন্দে মাতরম্ গাইলে আপনারই কি ভাল লাগবে না?"

সুরেশ্বরের প্রশ্ন শুনিয়া সজনীকান্ত ক্ষণকাল অপলক নেত্রে নির্ব্বাক্ হইয়া সুরেশ্বরের প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পর দন্তে দন্ত চাপিয়া নিরুদ্ধকণ্ঠে উত্তেজিতভাবে কহিল, "না, ভাল লাগবে না! খালি জেরা! খালি জেরা! আমি কি সাক্ষীর কাটরায় দাঁড়িয়েছি না কি! তোমার সঙ্গে কথা কওয়াই দেখছি বিপদ!"

সজনীকান্তর কথা শুনিয়া সকলে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সুরেশ্বর শান্তভাবে স্মিতমুখে কহিল, "সে বিপদে আপনি যদি ইচ্ছে করে' বারংবার পড়েন ত আমার কি অপরাধ বলুন?"

সজনীকান্ত তীব্রকণ্ঠে কহিল, "তুমি যে কথা দিয়ে কথা টেনে বার করে' উল্টো কথা বলিয়ে নিতে চাও! ল পড় বুঝি?"

আবার একটা হাসির কল্লোল উঠিল।

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "আমাকে ত আপনি নন্‌কো-অপারেটার বলেন; তা হ'লে ল পড়া কি করে' আর চলে?

বিমান সুরেশ্বরের কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিল, "যে প্রহসনটা উপভোগ করালেন তার জন্যে ধন্যবাদ। এবার কিন্তু গান আরম্ভ হোক।"

সুরেশ্বর মৃদুকণ্ঠে কহিল, "হোক।"

তখন বিমান বিমলার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "আর সময় নষ্ট করা নয়। গান আরম্ভ করো বিমলা।"

বিমলা একটু সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "মেজদি আসুন, তিনি গাইবেন এখন।"

সুমিত্রার কথা উঠায়, সে যে অনেকক্ষণ অনুপস্থিত রহিয়াছে তাহা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। জয়ন্তী একটু বিস্ময়ের সুরে কহিলেন, "কি করছে সে এতক্ষণ ধরে'? গেছে ত এক ঘণ্টা! যা' ত বিমলা, একবার দেখে' আয় ত কেন এত দেরী করছে।"

গান গাওয়া হইতে অব্যাহতি পাইলেই বিমলা বাঁচে। সে মাতৃআদেশ পালনের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তাহার যাইবার প্রয়োজন হইল না, তখনি কক্ষের মধ্যে সুমিত্রা আসিয়া দাঁড়াইল।

উজ্জ্বল তাড়িতালোকের নিম্নে সুসজ্জিতা সুমিত্রার প্রসন্ন মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল, শুধু দুইটি প্রাণীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না!

জয়ন্তী বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন, "একি সুমিত্রা!"

সুরেশ্বর ততোধিক বিস্ময়ের সহিত কহিল, "সত্যি, এ কি ব্যাপার!"

সুমিত্রা একটু তরল মিষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল, "কেন?—কি আর এমন অদ্ভুত ব্যাপার?"

ক্রমশঃ

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

জার্ম্মান্ সাহিত্যের নয়া ক্লাসিক

(১)

জার্ম্মান্ সাহিত্যের গ্যে'টে এবং শিলার ভারতবর্ষে সুপরিচিত। কিন্তু এ-সব সাহিত্য ১৮৩০ সালের আগে-কার কথা। অর্থাৎ এই-সকল কাব্য-নাট্য-উপন্যাসে জার্ম্মানির "সত্য যুগের" বাণী শুনিতে পাই। এইগুলিকে বলে জার্ম্মান্ "ক্লাসিক"।

ভারতবাসী আর-কোনো জার্ম্মান্ সাহিত্য-বীরের নাম শুনিয়াছেন কি? বোধ হয় হাউপ্‌ট্‌মানের নাম ভারতে অপরিচিত নয়। ইঁহার "হ্বেবার" (তাঁতী) নামক নাট্য জগৎ-প্রসিদ্ধ। রচনায় ঝাঁজ আছে। ১৮৯২ সালের লেখা। বর্ত্তমান জগৎ, বর্ত্তমান সমাজ, সমসাময়িক সওয়াল—এই সবই কবিবরের নাট্যে প্রধান স্থান পাইয়াছে। "রোজে ব্রাণ্ড্" নামক নাটকে সিলেশিয়া জেলার এক কিষাণকন্যার "সামাজিক সমস্যা" আলোচিত দেখিতে পাই। হাউপ্‌ট্‌মানের বয়স ষাট পার হইয়াছে। এই উপলক্ষে সমগ্র জার্ম্মানি ভরিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আর-একজন জার্ম্মান্ সাহিত্যসেবীর নাম লড়াইয়ের যুগে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শক্তি-যোগের প্রচারক নীট্‌শে (১৮৪৪-১৯০০) ছিলেন সন্দর্ভ-লেখক। ইঁহাকে জোর-জবরদস্তি করিয়া "কবি" অথবা দার্শনিক বলা হয়। কিন্তু দুঃখবাদী দার্শনিক শোপেন্‌হাওয়ারের রচনার মতন নীট্‌শের রচনাও জার্ম্মান গদ্য সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ্। "ষ্টাইল" বা লিখিবার কায়দার জন্য দুই জনই জার্ম্মানিতে বহুকাল বাঁচিয়া যাইবেন। নীট্‌শের "আল্‌জ্ স্প্রাখ্ ৎসারাথুস্ত্রা" (জরথুস্ত্রের বাণী) জার্ম্মান্ ভাষার এক ক্লাসিকরূপে ভারতবর্ষেও সুপরিচিত থাকিবে। আজকাল অবশ্য ইংরেজি তর্জ্জমায় মাত্র জানা আছে। কিন্তু মূল জার্ম্মান্ গ্রন্থটার দিকে শীঘ্রই ঝোঁক পড়িবে।

(২)

জার্ম্মান্-ভাষা আমাদের জানা ছিল না। কাজেই এতদিন ভারতবর্ষে একখানি ইংরেজি তর্জ্জমার সাহায্যে জার্ম্মান্ গদ্য ও পদ্যের সঙ্গে পরিচয় সাধিত হইত। কিন্তু বিশাল জার্ম্মান্ এবং অষ্ট্রিয়ান সাহিত্যের অতি সামান্য অংশই ইংরেজিতে অনূদিত।

অষ্ট্রিয়ার গ্যেটে-স্বরূপ কবিবর গ্রিল্‌পার্‌ৎসার এই কারণে আজও উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় সমাজে অপরিচিত। ইঁহার গল্পগুলা অষ্ট্রিয়ার জার্ম্মান্ সাহিত্যের রত্ন-বিশেষ। "ড্যর আর্মে স্পীল্‌মান" নামক আখ্যায়িকায় গ্রিল্‌পার্‌ৎসার এক দরিদ্র সঙ্গীত-শিল্পীর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রীক্ এবং রোমান কথাবস্তু লইয়া তাঁহার কতকগুলা নাটক রচিত।

জার্ম্মানি ও অষ্ট্রিয়ায় বহুকাল ধরিয়া রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক আড়াআড়ি চলিয়াছিল বলিয়া গ্রিল্‌পার্‌ৎসারকে "জার্ম্মান" সাহিত্যে ঠাঁই দেওয়া হইত না। এইরূপ বিদ্বেষ বহুদিন পর্য্যন্ত ইংরেজ-মার্কিনেও দেখা গিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যকে "ইংরেজি" সাহিত্যের আসরে ঠাঁই দেওয়া বৃটিশ জাতির অভিপ্রেত নয়।

ভাষায় দখল থাকিলে এতদিনে ভারতবাসী লিলিয়েন ক্রোন্‌কে (১৮৪৪-১৯০৯) আপনার করিয়া ফেলিতে পারিত। কবিহিসাবে জার্ম্মানরা ইঁহাকে বর্ত্তমান জার্ম্মানির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া থাকে। শব্দলালিত্য ইঁহার কাব্যের বিশেষত্ব নয়। সোজাসুজি জোরের সহিত স্পষ্ট কথা বলিয়া ফেলা লিলিয়েন ক্রোনের স্বভাব। হয়ত কালে ইনি জার্ম্মানির হ্বিটম্যান্-রূপে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইতে পারিবেন। শক্তিপূজার যুগে ইঁহার তলব পড়া অতি স্বাভাবিক।

(৩)

নিবেলুঙ্-গাথা জার্ম্মান "পুরাণ" সাহিত্যের নিজস্ব। এই গাথায় বিবৃত পুরুষ-নারীর জীবনকে জার্ম্মানরা তাহাদের প্রাচীনতম মান্ধাতার আমলের জীবনরূপে আদর করিয়া থাকে। তখন জার্ম্মানির লোকেরা প্রকৃতিপূজক দেবদেবীপূজক শক্তিসাধক নরনারীর আদর্শ

প্রচারিত করিয়াছিল। বলা বাহুল্য তাহা খৃষ্ট-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অনেক যুগ পূর্ব্বেকার কথা।

উনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মান সাহিত্যে সেই "প্রাগ্-ঐতিহাসিক" যুগের "খাঁটি স্বদেশী" জার্ম্মান আদর্শের আলোচনা প্রবলভাবে দেখা দেয়। প্রাচীনে প্রীতি, ইতিহাস-নিষ্ঠা ইত্যাদি রোমান্টিক সাহিত্য-শিল্পের এক বিশেষ লক্ষণ।

নিবেলুঙ্‌দিগের বীরত্বকাহিনী সঙ্গীত-নাট্যে প্রচার করিবার ভার লইয়াছিলেন হ্বাগ্নার (১৮১৩-৮৩)। নাট্যকারের জীগ্‌ফ্রীড্ ("বিজিগীষু") চরিত্র জার্ম্মান সাহিত্যে অমরতা লাভ করিবে। যাঁহারা অপেরায় বসিয়া গানগুলি শুনিবার সুযোগ পাইবেন না তাঁহারা কাব্য হিসাবে হ্বাগ্নারের রচনাগুলি পড়িয়া দেখিতে পারেন।

এই-সকল গাথাই আর-এক সাহিত্য-বীরের রচনায় বিশেষ স্থান পাইয়াছে। তাঁহার নাম হেব্বেল (১৮১৩-৬৩)। কাব্য-সাহিত্যে লিলিয়েন ক্রোনের যে ঠাঁই, নাট্য-সাহিত্যে জার্ম্মানরা হেব্বেলকে সেই ঠাঁই দিয়া থাকে। অর্থাৎ গ্যেটে-শিলারের পরবর্ত্তী যুগে এই দুই কবি জার্ম্মানির দুই নয়া "ক্লাসিক"।

(৪)

উনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মান গদ্যে এইরূপ দুই অমর লেখকের সন্ধান পাইতেছি। কিন্তু ইঁহাদিগকে জার্ম্মানির বাহিরে কেহ জানে না। একজনের নাম ফ্রাইটাগ (১৮১৬-৯৫),অপর জনের নাম ফোন্‌টানে (১৮১৯-৯৮)। ফ্রাইটাগ্‌কে জার্ম্মান সাহিত্যের ডিকেন্‌স্ বলা যাইতে পারে। জার্ম্মানির সমাজ-কথা নানা চরিত্রের ও ঘটনার ভিতর দিয়া বর্ণনা করিয়া যাওয়া ইঁহার রচনার বিশেষত্ব। উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস, রোমান্টিকতা, ভাবুকতা ইত্যাদির ধার ইনি ধারেন না। ভাষা প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক। জার্ম্মান হাতে-খড়ি হইবার পরই ফ্রাইটাগের গল্পগুচ্ছ ধরা যাইতে পারে।

কোন গল্পে আছে ব্যবসায়ীর ধরণ-ধারণ বিবৃত। কোন গল্পে পণ্ডিত লোকজনের জীবন-কথা আলোচিত দেখিতে পাই। "জোল উণ্ড্ হাবেন" (অর্থাৎ দেনা পাওনা) গল্প বেশ সরস।

ফ্রাইটাগের "আনেন" (বা পূর্ব্ব-পুরুষ) নামক গল্প-ধারায় জার্ম্মান নর-নারীর যুগ-পরম্পরা বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থ পাঁচ-সাত খণ্ডে বিভক্ত। এই কেতাবে গ্রন্থকার তাঁহার স্বজাতিকে তাহাদের স্বদেশী আদর্শ পুরুষানুক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিলাতী কার্লাইলের "হিরো-ওয়ার্শিপ্" বা বীরপূজার ধর্ম্ম ফ্রাইটাগের গল্প-সাহিত্যে মূর্ত্তি পাইয়াছে।

ফোন্‌টানের আখ্যায়িকা উপন্যাসগুলি ফ্রাইটাগ্-পন্থী অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ। উদ্দীপনা-উন্মাদনার ছড়াছড়ি এই সাহিত্যে নাই। ইনি ভ্রমণ-কাহিনীও লিখিয়াছেন। নাট্যসমালোচনায়, চিঠি-সাহিত্যে এবং আত্মকাহিনীর সাহিত্যেও ফোন্‌টানের কলম চলিয়াছে।

(৫)

জার্ম্মান্ সাহিত্যের 'নয়া ক্লাসিকগুলির ভিতরও নানা রসেরই স্বাদ পাওয়া যায়। "প্রকৃতি-পূজা"র ভক্তিরসটা বাদ পড়ে নাই।

প্রকৃতির বাণী—পাহাড়ের বাণী—বন-উপবনের বাণী জার্ম্মান শিল্পে প্রচুর। বস্তুতঃ জার্ম্মান্ নরনারী নিজেকে খোলা মাঠের ভক্ত প্রকৃতি-সেবক পল্লীপ্রিয়রূপে বর্ণনা করিতে ভালবাসে। ইহাদের বিবেচনায় ইহাদের সমান প্রকৃতি-নিষ্ঠ জাতি দুনিয়ায় নাই।

এই দাবী পরখ করিবার মতলবে ভারতবাসী ষ্টিফ্-টারের রচনা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে পারেন। ইঁহার "হোখ্‌হ্বাল্ড্" (পাহাড়ী-বন) নামক গল্পে এই ধরণের অনেক কিছু পাওয়া যাইবে।

কিন্তু এই হিসাবে বোধ হয় জগতের এক শ্রেষ্ঠ কবি ব্যাহ্বেরিয়ার কার্ল্ টীলার (১৮[illegible]-৮৫)। ব্যাহ্বেরিয়ার পাহাড়ী পল্লীর কিষাণ মেষপালকেরা যে উপভাষায় কথা বলে সেই উপভাষায় গান রচনা করিয়া টীলার অশেষ যশ লাভ করিয়াছিলেন।

তাহা ছাড়া সাহিত্যের ভাষায় ও বহু উচ্চ শ্রেণীর কবিতা ইঁহার সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিতেছে। সরল সুললিত জার্ম্মান্ কবিতা উপভোগ করিবার জন্য টীলারের রচনা ঘাঁটিতে হইবে। জীবনের আদর্শে, রচনার আদর্শে ইঁহাকে হাইনে শিলার ইত্যাদির সমকক্ষ অথবা এক-

গোষ্ঠীভুক্ত বলা যাইতে পারে। হাইনের প্রভাব ষ্টীলার-কাব্যে অনেক।

কার্ল্ ষ্টীলারের গদ্য-সাহিত্যে পল্লী-মাহাত্ম্য ও কিষাণ-মাহাত্ম্য লেখকের নিবিড় "ভক্তিযোগের" সাক্ষ্য দিতেছে। প্রকৃতি-পরায়ণতা, পর্ব্বত-প্রভাব ইত্যাদির ছাপ এই সাহিত্যবীরের জীবনে ও রচনায় বিশেষ পরিস্ফুট। স্বাধীনতা এবং জনসাধারণ ষ্টীলারের পরম প্রিয় বস্তু ছিল।

তখনকার দিনে প্রুশিয়ার এবং ব্যাভেরিয়ার আড়া-আড়ি এবং পরস্পর হিংসা যার-পর-নাই প্রবল ছিল। ব্যাভেরিয়ার সমাজ, সভ্যতা, শিল্প ইত্যাদি উত্তর-জার্ম্মানিতে সুপরিচিত করিবার জন্য ষ্টীলার বক্তৃতা করিয়াছেন এবং প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেইগুলি "হোগ লাণ্ডস্ বিল্ডার" (বা পর্ব্বত-চিত্র) নামে একত্র প্রচারিত। এই-সকল লেখায় ব্যাভেরিয়ার গৌরব-কথা অতি সহজ জার্ম্মানে জানিতে পারা যায়।

(৬)

"পাহাড়ী গীতাবলীর" প্রণেতা হিসাবে জার্ম্মানির ষ্টিফ্টার এবং ষ্টীলারের মতন অষ্ট্রিয়ার হোফেন্স্ঠাল্ এবং পিথ্লারও জার্ম্মান্ সাহিত্যের ক্লাসিক। এই দুই অষ্ট্রিয়ান্ লেখকই টিরোলের লোক।

বলা বাহুল্য টিরোলের প্রত্যেক কবি এবং গল্পলেখকই আল্প্স্-প্রেমিক, প্রকৃতি-পূজক, বন-ভক্ত। হোফেন্স্-ঠালের গল্পে টিরোলের পল্লীগুলি জার্ম্মান্ সমাজে অমর হইয়া রহিয়াছে।

পিথ্লার (১৮১৯-১৯০০) ছিলেন ষ্টীলারের মতন স্বাধীনতার কবি, জনসাধারণের কবি। জার্ম্মান্-ভাষী যে-কোন জনপদের জন্য লড়াই করিবার জন্য ইনি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। "যুঙ্ টিরোল্" নামক সঙ্ঘ কায়েম করিয়া পিথ্লার আল্প্স্ পাহাড়ের জার্ম্মান্ সমাজে "বৃহত্তর জার্ম্মানির" রাজপথ তৈয়ারি করিতে প্রবৃত্ত হন। আজ-কালকার জার্ম্মানিতে এবং অষ্ট্রিয়ায় বিস্মার্ক-পন্থী "ডয়েচ নাট্সিওনাল" দল যে রাষ্ট্রীয় মত পোষণ করিয়া থাকে ষ্টীলার এবং পিথ্লার উভয়েই সেই মতের প্রচারক ছিলেন।

পিথ্লারের কাব্য "মার্কষ্টাইনে" নামে প্রচারিত। ষ্টীলারের "হ্বিণ্টার ইডিল" (শীতের গান) অথবা "হোখ্লাণ্ডস্ লীডার" (পাহাড়ী গান) ইত্যাদির সঙ্গে এই-সকল কবিতা প্রকৃতি-প্রেমিকের সমাদর পাইবার যোগ্য। পিথ্লারের "ৎসু মাইনার ৎসাইট্" নামক জীবন-স্মৃতি বিষয়ক গদ্য-রচনায় উনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মান্ (অষ্ট্রিয়ান) জীবন-প্রথা চিত্রিত রহিয়াছে।

ষ্টীলার ছিলেন ঐতিহাসিক। পিথ্লার ছিলেন চিকিৎসক, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের সেবক, ভূতাত্ত্বিক।

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

ডঙ্কা-নিশান

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধনশ্রী

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা, পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদের রাণীর মহলে আসন-ঘরের জোড়া জোড়া কুলুঙ্গিতে, ময়ূরের মাথায়, সাপের মাথায়, দীপলক্ষীর হাতে মাথায় এবং দীপবৃক্ষের ডালে ডালে জোনাক-পোকার মত অসংখ্য প্রদীপ যখন জ্বলে' উঠ্ল, তখন ভিত্তিগাত্রের নাগদন্তের অবলম্বনে বীণাটা ঝুলিয়ে রেখে মগধ-রাজের সুয়োরাণী অষ্টোত্তরশতশ্রীযুক্তা মহামহিমাময়ী মহারাণী ধনশ্রী ডাক্‌লেন—"বলিবিষ্ণু!" ডাকামাত্রেই হংস-গতিতে একটা দেড়হাত উঁচু বামন এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াল। স্বাভাবিক রুক্ষ স্বর আরো রুক্ষ ক'রে লোকটার দিকে না চেয়েই গোরা গায়ের উগ্র গর্ব্বে ধনশ্রী বল্লেন—"ওরে বলিবিষ্ণু! ইন্দ্রমূর্তিকে ব'লে আয়, আমার সঙ্গে যেন এখনি সে দেখা করে।"

"আজ্ঞে।"—ব'লে বামনটা তার ছোট ছোট পা দুটো জোরে জোরে ফেলে' দরজার বাইরে এসেই একটা

অদ্ভুত রকমের চাপাহাসি নাসারন্ধ্রের পথে বার ক'রে দিয়ে হাল্কা হ'ল। অনেকে নাকে কাঁদে, বলিবিষ্ণু নাকে হাস্‌ত।

পুণ্ড্রক-নগরের রাজা পদ্মরথের মেয়ে ব'লে ধনশ্রীর গর্ব্বের সীমা ছিল না। কারণ বড়রাণী মুরা রূপে-গুণে ধনশ্রীর চেয়ে অনেক বড় হ'লেও কেবল রাজার মেয়ে নন ব'লেই দুয়োরাণী হয়েছেন। দুয়োরাণীর ছেলে চন্দ্রগুপ্ত সুয়োরাণীর ছেলে ধননন্দের চেয়ে বয়সে প্রায় বছর-খানেকের বড়; শুধু বয়সে বড় নয়, শৌর্য্যে বড়, সাহসে বড়, উদারতায় বড়, রণনৈপুণ্যে বড়, বিচার-বিচক্ষণায় বড়। কিন্তু তৎসত্বেও, মন্ত্রী-পরিষদের অধিকাংশের ইচ্ছা ধননন্দকে সিংহাসন দেওয়া। কারণ তার শরীর নাকি ষোল-আনা রাজরক্তে তৈরী, বাপের দিক্ থেকেও বটে, মায়ের দিক্ থেকেও বটে। মগধের এইসব বিজ্ঞ বিদ্বান্ বিচক্ষণ মন্ত্রীরা জগতের চক্ষে মস্ত বড় হ'লেও ভিতরে ভিতরে রাজোপাধির মণিমণ্ডিত পাদপীঠের পীঠমর্দ্দ মাত্র ছিলেন। এঁরা জান্‌তেন ধননন্দ ভীরু, নিষ্ঠুর, নিষ্করুণ; কিন্তু জান্‌লে কি হয়, কৌলীন্যের মোহ এঁদের পেয়ে বসেছিল। রক্তশুদ্ধির বন্ধ্যা যুক্তির গালবাদ্যে বিচার-বুদ্ধি আজ বধির।

বেণীবন্ধনের বন্ধু ইন্দ্রমূর্ত্তির কল্যাণে মন্ত্রীদের মনোভাব ধনশ্রীর অজ্ঞাত ছিল না। তাঁর ছেলেই যে ভবিষ্যতে মগধসাম্রাজ্যের সম্রাট্ হবে এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিছুদিন থেকে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সম্রাটের ব্যাভারে' তাঁর স্থির-বিশ্বাসের শিকড়গুলো ক্রমেই যেন শুকিয়ে উঠ্‌ছিল। যে-দিন রাজার ক্ষ্যাপা হাতী গজভীম মাহুতকে মেরে সমস্ত সহর তোলপাড় ক'রে শেষে চন্দ্রগুপ্তের ইঙ্গিতে বাগ মান্‌লে, এবং সম্রাট্ সেজন্য চন্দ্রগুপ্তকে ছত্র দিয়ে পুরস্কৃত করলেন, সেইদিন থেকে সুয়োরাণী রাজার উপর বিরক্ত হলেন। তার পর যে-দিন বামন বলিবিষ্ণুর মুখে শুন্‌লেন যে, ময়ূর-নগরের শাসন-ভারের সঙ্গে সম্রাট্ নিজের গলার দশলাখ দামের ইন্দ্রচ্ছন্দ মালা দুয়োরাণীর ছেলেকে দান করেছেন, সেইদিন সম্রাজ্ঞী মনে মনে সম্রাটের মৃত্যু কামনা করলেন। রাণীর ষড়যন্ত্রের প্রধান যন্ত্র হল অদ্ভুতজ্ঞ ইন্দ্রমূর্ত্তি—অধুনা মহারাজের সন্নিধাতা মন্ত্রী। কার্য্য-সিদ্ধির জন্যে যত রকমে মানুষকে মানুষ প্রলুব্ধ করতে পারে ধনশ্রী তার একটিও বাকী রাখেন নি। এরূপ করায় বিপদ্ আছে বিশেষ, যেখানে এক পক্ষ স্ত্রীলোক আর অপর পক্ষ পুরুষ। কাজেই অপযশের অন্ত ছিল না। বামন বলিবিষ্ণুর বিদ্রূপ-হাসির ভিতর একটু আগে এই কুৎসাই কুৎসিত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছিল। লোকে যাই ভাবুক আর যাই কানাঘুষা করুক, ধনশ্রী সে-দিকে কর্ণপাত বা দৃষ্টিপাত করতেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অপদার্থ ধননন্দকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে রাজ্য করা। আর ইন্দ্রমূর্ত্তির উদ্দেশ্য ছিল নিজে রাজা হওয়া। নাইবার ঘরের চাকর নহাপিত থেকে সে রাজার সন্নিধাতা মন্ত্রী হয়েছে, রাজাই বা হবে না কেন? বাধা কি? বাধা রাজা এবং রাজপুত্রেরা। রাজা তার হিতকারী। রাজার অনুগ্রহে সে এত বড় হয়েছে। কিন্তু সে রাজার জীবন-রক্ষক; যুদ্ধে আহত হ'য়ে রক্তে যখন রাজার শ্বাসরোধ হচ্ছিল তখন রাজাকে কে বাঁচিয়েছিল? ইন্দ্রমূর্ত্তি। সেই ইন্দ্রমূর্ত্তি, তার নিজের দেওয়া জিনিস যদি ফিরিয়ে নেয়—যদি সে রাজার জীবনই নেয়, তাতে এমনই কি দোষ? ইন্দ্রমূর্ত্তির এই হ'ল যুক্তি। সে রসায়ন-প্রয়োগের দ্বারা রাজার যক্ষ্মা-রোগ জন্মিয়ে দিয়ে দিন গুন্‌তে লাগ্‌ল। রাণীর ভাব-ভঙ্গীতে সে ঠাওরালে যে রাণী তার রূপে মুগ্ধ। এটা সে সুলক্ষণ ব'লেই মনে করলে, পরে ধননন্দকেও সরানো সহজ হবে। এইজন্যে সেও ভালোবাসার অভিনয় সুরু করলে। তাই তার সর্ব্বদা চোখে কাজল, ঠোঁটে আল্‌তা। অভিনয় করতে করতে তার মনটা কিন্তু রাণীর দিকে সত্যই একটু ঝুঁকে পড়ল।

ওদিকে রাণী কিন্তু প্রলুব্ধই করতে থাকলেন, ধরা-ছোঁয়া মোটেই দিলেন না। ইন্দ্রমূর্ত্তি মনে করলে নারী-সুলভ লজ্জা। সুতরাং সে সর্ব্বস্ব পণ ক'রে রাণীর ষড়যন্ত্রের প্রধান যন্ত্র হ'তে দ্বিধা মাত্র করলে না।

প্রজাদের মন ভাঙাবার জন্যে ইন্দ্রমূর্ত্তির দল তলে-তলে আভাসে ইঙ্গিতে চন্দ্রগুপ্তকে দাসীপুত্র ব'লে বর্ণনা করতে সুরু করলে এবং তার জবাবে চন্দ্রগুপ্তের গুণের

পক্ষপাতী মন্ত্রী শকটারের দল নাপিতের সঙ্গে মহারাণীর এই অতিঘনিষ্ঠতাকে ভিত্তি ক'রে ধননন্দের ভীরুতা নীচতা ও নিষ্ঠুরতার হেতু আবিষ্কারের অছিলায় নানারকম অপমানসূচক গল্পের সৃষ্টি করতে লাগল।

ধনশ্রীর কানে যখন ইন্দ্রমূর্ত্তিরই মারফতে এইসব গল্প এসে পৌছতে লাগল, তখন তিনি তারই সঙ্গে পরামর্শ ক'রে শকটারের সাত ছেলেরই পদোন্নতির ব্যবস্থা করলেন। নগরের অনেক মানী লোক শকটার-পরিবারের এই আকস্মিক উন্নতিতে ঈর্ষ্যা অনুভব করলে। কিন্তু যারা বিচক্ষণ তারা শুধু মাথা নাড়লে, কোনো মত প্রকাশ করলে না।

গোপনে প্রত্যহ আহারের সঙ্গে হরিতাল প্রয়োগে সম্রাট্ দর্শসিদ্ধিকের শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়ছিল, সুতরাং আহার পরীক্ষার ভার পড়েছিল ইন্দ্রমূর্ত্তির উপর। সে তো তাই চায়। এখন আর রাজার খাদ্য পরীক্ষার জন্যে ক্রৌঞ্চ বা শুককে রাজার সাম্‌নেই দেওয়ার দরকার হয় না। ইন্দ্রমূর্ত্তি বলে—"দেওয়া হয়েছে", রাজা তাই বিশ্বাস করেন। তাঁর শরীরও পঙ্গু হ'য়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে মনের দৃঢ়তাও ক্ষয় পাচ্ছে। ইন্দ্রমূর্ত্তি ও ধনশ্রীর ইষ্টসিদ্ধির আর অধিক বিলম্ব নেই। এমন সময় খবর এল পাহাড়ীদের সঙ্গে একজোট হ'য়ে বৈশালীর কুলসঙ্ঘ মগধের সীমান্ত গ্রামগুলো লুটতে সুরু করেছে। রোগশয্যায় শুয়ে সম্রাট্ দর্শসিদ্ধিক নন্দ, নিজের হাতে পরন্তপ নামক মগধের রাজখড়্গ চন্দ্রগুপ্তের খড়্গবন্ধে বেঁধে' দিয়ে তাকে বিদ্রোহ-দমনে পাঠালেন। ধনশ্রী দেখলেন এইবার এক চালে কিস্তিমাৎ করবার সময় এসেছে। ইন্দ্রমূর্ত্তির পরামর্শে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে অল্প মাত্র সৈন্য দেওয়া হ'ল। উদ্দেশ্য—একদিকে রণপণ্ডিত বৈশালীর কুলসঙ্ঘ, অন্যদিকে কূটযোদ্ধা কষ্টসহিষ্ণু কিরাতের দঙ্গল, এই দুই আগুনের মাঝে ফেলে তরুণ চন্দ্রগুপ্তকে একরকম হত্যা করা,—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সৈন্য যে কত পাঠান হ'ল, তার হিসাব, গোড়াতে, সম্রাট্‌কে জানতে দেওয়া হয়নি। পরে, মন্ত্রী শকটার যখন সে-কথা মহারাজকে জানালেন, তখন আরো কিছু সৈন্য সঙ্গে মহামাত্য শকটার ও সেনানায়ক সিংহবলদত্তকে চন্দ্রগুপ্তের সাহায্যার্থে পাঠান হ'ল। কোষাগারের ভার রইল শকটারের জ্যেষ্ঠপুত্র সুনক্ষত্রের হাতে।

ধনশ্রীর প্রধান দুই শত্রু পাটলিপুত্রের বাইরে প্রেরিত হ'ল। এইবার একদিকে রসায়ন-প্রয়োগের মাত্রা বেড়ে গেল, অন্যদিকে রাজার দণ্ডমুদ্রা চুরি ক'রে সৈন্য-ভোজ্যের মিথ্যাস্ফীত ফর্দ্দ রাজমুদ্রাঙ্কিত ক'রে বৈশালী-যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহের নামে ক্রোর ক্রোর টাকা কোষা-গার থেকে প্রতিদিন ইন্দ্রমূর্ত্তি ও ধনশ্রীর হাতে এসে জমা হ'তে লাগল। গল্পের বানরের মতন অমাত্য ইন্দ্রমূর্ত্তি শ্রেষ্ঠী শ্রীবর্দ্ধনকে বিড়াল বানিয়ে রাজকর্ম্মচারীদের রক্ত-চক্ষুর গনগনে আগুনের আওতার মাঝখান থেকে রাজরূপাঙ্কিত স্বর্ণরূপক রূপ কাঁঠাল-বীচি তুলিয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিজের ভাঁড়ার ভরতি করতে লাগলেন। কিন্তু বেশীদিন এই চোরাই টাকা নিজের ঘরে রাখাটা ইন্দ্রমূর্ত্তির তেমন মনঃপূত হ'ল না। কারণ শত্রু শকটার পাটলিপুত্রে স্বয়ং না থাকলেও নগরে তাঁর স্বপক্ষের চরের অভাব ছিল না। কাজেই টাকাটা এসে জমল শেষে ধনশ্রীর মহলে। ধনশ্রীও তাই চাইছিলেন। কারণ সত্যিকার ক্ষমতার একবিন্দুও ইন্দ্রমূর্ত্তিকে দেওয়া তাঁর অভিপ্রায় নয়। তাকে দিয়ে কার্য্যসিদ্ধি ক'রে শেষে দূরে পরিহার করাই উদ্দেশ্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্র

বলিবিষ্ণুকে ইন্দ্রমূর্ত্তির কাছে পাঠিয়ে রাণী ধনশ্রী জালিকাটা পাথরের ফাক্‌ফোর পর্দ্দার পাশ থেকে জ্যোৎস্নায়-জুড়োনো কর্পূর-ভুরভুরে একপাত্র মহিষের দুধ এনে জলচৌকীর মতন একটা চন্দনকাঠের মঞ্চকের উপর রাখলেন। করঙ্কবাহিনী তাম্বুল রেখে গেল। মঞ্চকের পাশে একটা হাতীর দাঁতের পেটিকা ডালাখোলা অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে, তার ভিতর থেকে একটা পাশাখেলার ছক উঁকি দিচ্ছে। আটকোণা ঘরের আটকোণে পাথরে-খোদা ইন্দ্র কুবের প্রভৃতি দিক্‌পালদের মূর্ত্তি। মূর্ত্তির হাতে গলায় ফুলের মালা,

আর পায়ের গোড়ায় অগুরু-বর্ত্তিকা ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে দিক্‌পালদের উপবীত রচনা ক'রে দিচ্ছে।

রাণী অন্যমনে ফুলের পাখায় একটা বাঁকা রজনীগন্ধাকে সিধে করবার চেষ্টায় সেটাকে মলিন ক'রে শেষে ছিঁড়ে' ফেললেন। এমন সময় অন্তঃপুরের প্রধানা প্রহরিণী অন্তঃপুরবংশিকার বাঁশী মৃদুস্বরে ব'লে উঠ্‌ল—"সতর্ক! সতর্ক!" অর্থাৎ মেয়ে-মহলে পুরুষ ঢুকছে, মেয়েরা সম্বৃত হও। পরমুহূর্ত্তেই দাসী এসে খবর দিলে অমাত্য ইন্দ্রমূর্ত্তি রাণীর চরণদর্শনের প্রার্থী। রাণী ভিতরে আস্‌তে আজ্ঞা করলেন। ইন্দ্রমূর্ত্তি ডগমগ হাস্য ও গদগদ চক্ষু নিয়ে বুকের কাছে হাত দুটো একত্র ক'রে ঘরে প্রবেশ করলে। তার চোখে কি হাসিতে শ্রদ্ধার চিহ্ন মাত্র ছিল না, ছিল গর্ভ-চাটুকারের কৃত্রিম সম্ভ্রমের ধৃষ্ট অভিনয়। প্রভুর সাম্‌নে পোষা কুকুরের কান যেমন ক'রে লুটিয়ে পড়ে তার ড্যাবডেবে চোখের প্রান্ত দুটো তার আকর্ণ মুখব্যাদানের সঙ্গে তাল রাখ্‌তে গিয়ে তেম্‌নি ক'রে ঝুলে পড়েছে।

"মহারাণীর জয় হোক" ব'লে ইন্দ্রমূর্ত্তি রাণীর পায়ের কাছে একটা রক্তকম্বলের আসনে ধপাৎ ক'রে ব'সে পড়্‌ল। ফুলের পাখাখানা তার দিকে ফেলে দিয়ে রাণী জিজ্ঞাসা করলেন—"আজকে ক্রোরের কি খবর?"

"ক্রোর ক্রোড়স্থ! হিঃ!"

ইন্দ্রমূর্ত্তির উচ্চারিত শেষ অক্ষরটা হাসি কি হেঁচ্‌কি কি ঢেঁকির ঢ্যাকচ্‌ তা বিশেষজ্ঞ ছাড়া বল্‌তে পারে না।

রাণী ভুরু কুঁচ্‌কে বল্‌লেন—"আমি তোমার অনুপ্রাস শুন্‌তে তোমায় ডাকিনি।"

"হিঃ! তবে? বেণী রচনা করতে হবে?"

"না, তোমার মাথা মুড়িয়ে .."

"হিঃ! ঘোল ঢেলে..."

"শীতলার আস্তাবল থেকে তাঁর নিজস্ব ঘোড়াটি আনিয়ে..."

"তাতে চড়িয়ে রাজকোষের পাতাল-ঘরে সিঁধ কাটতে পাঠাতে হবে।"

"সাবধান, ইন্দ্রমূর্ত্তি! রাজপুরীর ইঁট-কাঠেরও কান আছে।"

"কিন্তু হাত দিয়ে ধরা যায় না, ধর্‌তে পার্‌লে ম'লে দিতাম।"

"ইন্দ্রমূর্ত্তি!"

"আচ্ছা, ইঁট-কাঠে রসায়ন প্রয়োগ করা যাবে। কান থাকলই বা, মুখ জন্মের মত বন্ধ হবে।"

"ইন্দ্রমূর্ত্তি!...তোমার দুঃসাহস ভয়ানক বেড়ে যাচ্ছে...তোমার মরণ ঘনিয়েছে।"

ধনশ্রীর সাম্‌নে এলে ইন্দ্রমূর্ত্তির আজকাল রসিকতা করবার শক্তিটা কেমন যেন হঠাৎ ফেঁপে ওঠে, সে বল্‌লে,—"মরণ ঘনিয়েছে?...কেন, মরণ কি মোষের দুধ—?...যে থাম্‌কা ঘন হ'য়ে উঠ্‌ল?"

"না, মোষের দুধ নয়, মোষের মালিক যম! তুমি মরবে।"

"মহারাণী ভবিষ্যৎ বল্‌তে পারেন দেখ্‌ছি, আমি মরব। কিন্তু সেজন্যে কিছুমাত্র ভাব্‌বেন না। তার আগেই টাকার কলসীগুলো আপনার দরজায় পৌঁছে দিয়ে যাব। কোনো ভয় নেই।"

"ভরসাই বা কি?"

"আচ্ছা, আজ রাত্রেই পৌঁছে দেব।...এত সন্দেহ করেন?"

"সন্দেহ নয়,...তোমারই ভালোর জন্যে। টাকা আমার ঘরে থাক্‌লে, মুখ ফুটে কেউ কিছু বল্‌তে পার্‌বে না। ও আমার স্ত্রীধন যৌতুকের টাকা, স্নানাগারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বাপের বাড়ী থেকে পেয়েছি। আর তোমার ঘরে যদি অত টাকা ধরা পড়ে, মারা যাবে যে। শকটারের ছেলে শকটারের চেয়ে কম ভয়ানক মনে ক'র' না।"

"কি করতে বলেন?"

"শ্রীমান্ সিংহাসন পেলেই, ওদের বন্দী করতে বলি।...সেনাভোজ্যের নাম ক'রে রাজকোষে চুরির অপরাধে।"

"মহারাজের দণ্ডমুদ্রাঙ্কিত শ্রীবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠীর ফর্দ্দগুলো যে শকটারের ছেলের হাতে; সেগুলো যদি হস্তগত না করা যায়, তা হ'লে?"

"বন্দী ক'রেই মসীপর্ণিকদের পর্ণ-স্থাপন-ঘরে আগুন দেওয়া যাবে।"

"লোকে সন্দেহ করবে।"

"সন্দেহ? আমাদের করবে না, ওদেরই করবে; বলবে, পাছে হিসাবনিকাশের দায়ে পড়তে হয় তাই আগেভাগে আগুন লাগিয়ে খাতাপত্র পুড়িয়ে ফেলেছে।"

"হিঃ! মহারাণীর মগজে কুস্তির আখড়া, কত প্যাঁচই আসে।"

"কিন্তু শকটার ফিরে না এলে হবে না। পিতা পুত্র সকলকেই এই বিরাট্ চুরির ষড়যন্ত্রে ফেলে' পাতাল-ঘরের বন্দীশালায় পাঠাতে হবে।"

"বাস্! সেইখানেই সমাধা, সেইখানেই সমাধি!"

"জীবন্তে।"

"আর যদি যুদ্ধে মারা যায়?"

"তা' হ'লে ত আপদ্ই গেল।"

"কলঙ্কী সম্বন্ধে?"

ধনশ্রীর অনুকরণে ইন্দ্রমূর্ত্তি চন্দ্রগুপ্তকে কলঙ্কী বলত। এটা তাদের সঙ্কেতের বুলি।

রাণী বল্লেন,—"কলঙ্কী সম্বন্ধে? তুমি বল।"

"তীক্ষ্ণ চরের দ্বারা পথে হত্যা।"

"মূর্খ! লোকে সন্দেহ করবে যে!"

"তবে?"

"যুদ্ধশেষের কত বিলম্ব?"

"ধরুন যদি শীঘ্রই শেষ হয়?"

"তার পূর্ব্বে শ্রীমান্কে সিংহাসনে বসাতে হবে। তা হ'লে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনের জন্যে নিশ্চয় বিদ্রোহ সৃষ্টি করবে। তখন তাকে বিদ্রোহীর শাস্তি দেওয়া যাবে।"

"কিন্তু তার তাঁবে পল্টন রয়েছে, সে বিদ্রোহ ক'রে জয়লাভও করতে পারে। তা ছাড়া সৈনিকেরা তার প্রতি অনুরক্ত।"

"তা' হ'লে তাকে পূর্ব্বাহ্নেই পল্টন থেকে তফাৎ করা আবশ্যক।"

"তা' হ'লে রাজযক্ষ্মা মহারাজের রাজপদ খসিয়ে নিলেই চিঠি লেখা।"

"কি মর্ম্মে?"

"মর্ম্ম আর কি?...মহারাজ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন, প্রিয়পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে শেষ দ্যাখা দেখ্তে চান। অতএব পল্টন সিংহবলদত্তের হাতে দিয়ে, ঘোড়ার ডাক বসিয়ে কুমার চন্দ্রগুপ্ত যেন নগরে ফিরে আসেন।"

"হুঁ! তোমার বুদ্ধি হচ্ছে, একটু একটু। তার পর?"

"নির্ব্বাসন।"

"গর্দ্দভ!"

"নিমকাঠের শূল।"

"না, জীবন্ত দগ্ধ করা হবে। সতীন-কাঁটার শেষ রাখ্তে নেই।"

"হুঁ! তা হ'লে, এখন কর্ত্তব্য?"

কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে রাণী বল্লেন—"তুমি বল।"

"রসায়নপ্রয়োগের মাত্রা একটু বাড়িয়ে দেওয়া।"

রাণী নীরব অনুমোদনের দৃষ্টিতে ইন্দ্রমূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইলেন।

"আর মহামাত্য ও পল্টনের মহানায়ককে কোনো ব্রতের নাম ক'রে—"

"হুঁ! গুপ্তধন ব্রত।"

"বেশ! ওই নাম ক'রে প্রত্যেকের বাড়ী মোদকের ভিতর কিছু মোহর প্রেরণ।"

"তুমি বুদ্ধিমান্।"

রাণীর প্রসন্ন দৃষ্টিতে ইন্দ্রমূর্ত্তি আনন্দে ডগমগ হ'য়ে উঠে, একমাত্রিক হাসি হেসে বল্লে—"হিঃ! হিঃ! তা হ'লে বুদ্ধির পুরস্কার?"

ধনশ্রী আঙুল দিয়ে দুধ-ভরা বর্ত্তুলিকা দেখিয়ে দিলেন। ইন্দ্রমূর্ত্তির মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল, সে ঢোক গিলে বল্লে—"কি? বুদ্ধিমানের ভাগ্যে শেষে ঘোল নাকি?"

বক্রকটাক্ষে কৌতুক-হাসি মিশিয়ে ধনশ্রী বল্লেন—"না, না, দুধ; খেয়ে দেখ।" এই ব'লে মহারাণী স্বয়ং তার হাতে সোনার তৈরী তণ্ডুল-নালিকা বা ফাঁপা খড়ের টুক্রোর মতন একটা নল এগিয়ে দিলেন, এবং গলার মালা থেকে গোটাকয়েক জুঁইফুল খসিয়ে ইন্দ্রমূর্ত্তির দুধের বাটিতে ভাসিয়ে দিয়ে বল্লেন—"মনে-মনে কিছু একটা ভেবেছি,

একটা পরীক্ষা কর্‌ব। নাও তো, নল দিয়ে দুধ খানিকটা মুখের ভিতর জোরে টেনে নাও তো।"

মুগ্ধ ইন্দ্রমূর্ত্তি কর্পূরগন্ধি সেই দুধ আরামে সোনার নল দিয়ে মুখে টান্‌তেই একটামাত্র ফুল তার নলের গায়ে ভিড়্‌ল। ধনশ্রীর মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেল।

ইন্দ্রমূর্ত্তি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কি? কি?...গম্ভীর হ'য়ে গেলেন যে?"

ধনশ্রী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লেন,—"কিছু না

(আগামী বারেই ছেদ পড়িবে)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রবাসীর আত্মকথা

১০

রাত্রি ১টা। আগষ্ট্ মাসে যেখানে আমরা প্রখর উত্তাপে দগ্ধ হইয়াছিলাম সেই খুয়ান্-আনের সম্মুখে হুয়ে-নদীর প্রবেশ-পথে আমরা নোঙর করিয়া আছি। সেই চিরন্তন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা তরঙ্গের উপর দিয়া দুর্গরক্ষী সৈন্যদলের নিকট খাদ্যসামগ্রী পাঠাইবার জন্য, আমরা দুই দিন ধরিয়া শান্ত সমুদ্রের অপেক্ষায় আছি।

কিন্তু সেই নিস্তব্ধ শান্ত সমুদ্র আর আসেই না! যাই হোক, সমুদ্র একটু শান্ত হইয়াছে, নৈশ গগনে তারা উঠিয়াছে; কিন্তু সেই একই রকম মন্থরগামী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গ ক্রমাগত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, উহাদের ক্লান্তি নাই। আমরা জাহাজের উপর দোল খাইতেছি, অবিরাম দোল খাইতেছি। এবং বেলাভূমির দিক্ হইতে বীচিভঙ্গের গর্জ্জন ক্রমাগত শুনা যাইতেছে।

এই হুয়ে নগরের ভিতর - এখন এই নগরটা আমাদের খুবই কাছে—আজ রাত্রে একটা শোক-নাট্যের অভিনয় হইতেছে;—প্রাসাদ-প্রাচীরের শেষ বেষ্টনের মধ্যে এখনই তাহা হইতেছে। যে রাজদর্‌বার দর্শন নিষিদ্ধ, যাহা দেখিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, সেই রাজদর্‌বারের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাহাদের উপর-তোলা ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ ভীষণ রোষে বিস্ফারিত করিতেছে। যে রাজা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিল, সেই রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইতেছে—খুব সম্ভব উহারা তাহার শিরশ্ছেদ করিতেছে...

আজ সায়াহ্নে রাজপ্রাসাদের নহবৎখানা আমরা দূর হইতে দেখিতেছিলাম। উহা অস্তমান সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত। ঐ দুষ্প্রবেশ্য গৃহে ঐ-সব লোক-লোচনের অগোচর দৃশ্যের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইতে আমাদের খুবই কৌতূহল হইল।

যাহারা যুদ্ধের পক্ষপাতী তাহাদেরই জয় হইয়াছে; শেষ খবর পাওয়া গেল,—বিশপ্‌কে, ফরাসী দূতকে রাস্তার লোকেরা শাসাইতেছে। এই-সব গভীর তরঙ্গের উপর দিয়া এখন ডাঙ্গায় একটি লোকও পাঠাইবার জো নাই। এই-সমস্ত জনতার মধ্যে—যেখানে আমাদের লোকেরাও আছে—জাহাজ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে গোলাবর্ষণ করিবারও জো নাই। তাই আমরা চুপ্ করিয়া এখানে বসিয়া আছি—অবসাদক্লান্ত ও শক্তিহীন।

১১

আবার সমস্তই নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে; নূতন রাজার সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীর-বেষ্টিত নগরে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। আমরাও আমাদের গৃহে—সেই প্রবাসের উপসাগরে প্রত্যাগমন করিয়াছি।

আজ তুরাণে ফরাসী তাহার লেখা একটা সাইন্-বোর্ড্ এই প্রথম খাড়া করা হইয়াছে:—"শাংহ, সামুদ্রিক দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহকারী।" একটা লম্বা ছড়ির আগায় লাগানো একটা তক্তির উপর এই কথাগুলি লেখা আছে। ইহা প্রায় নগণ্য। মন্দির ও ধূলায় আচ্ছন্ন এই ক্ষুদ্র নগরটির মাঝখানে এই জিনিষটা ইহারই মধ্যে বেসুরা বলিয়া মনে হইতেছে।

আমাদের জাহাজে, আমাদের নাবিকেরা শাংহর নাম দিয়াছে—"সবুজ চীনা"; কারণ শাংহ সচরাচর সবুজ পরিচ্ছদ পরিধান করে। আমাদের অধিষ্ঠানে আকৃষ্ট হইয়া শাংহ তাহার শোভন ভাবভঙ্গীর অলক্ষিত প্রভাবে ক্রমশঃ আমাদের অপরিহার্য্য অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। সে সব-জিনিষেরই জোগান দিয়া থাকে, লোকের সুবিধা করিয়া দিতে খুব তৎপর, খুব চতুর, খুব তরুণবয়স্ক, খুব মজার ধরণের লোক; তাহার শরীরের উপর, তাহার বাহারে বেণীর উপর তার খুবই যত্ন; সে বাঁশের মত সরু ও তার গায়ে চন্দনের গন্ধ।

উপস্থিত-মত কাজ চালাইবার জন্য এই-সব দোকান-ঘর—কতকগুলা খাগড়ার চালা, নদীর ধারে উঠানো হইয়াছে। রেশমী কোমল বেণী ঝোলানো, খুব স্থূলকায়, খুব লম্বা-মোজা-পরা, নগ্নোদর দোকানীরা বেশ প্রসন্নবদনে তাহাদের পুত্তলী-সদৃশ দেহের স্থূলতা সকলের সমক্ষে অনাবৃত করিয়া দেখাইতেছে। দেওয়ালের একটা বুদ্ধমূর্ত্তি—মূর্ত্তিটিও লম্বোদর—ক্রয়বিক্রয়ের অধ্যক্ষতা করিতেছে। উহারা কয়লা বিক্রয় করিতেছে, জীবন্ত গরু বিক্রয় করিতেছে, পয়সার মালা বিক্রয় করিতেছে, বস্তা-ভরা চাউল বিক্রয় করিতেছে, সাম চৌর বুয়েম বিক্রয় করিতেছে। আমাদের নাবিকেরা যেরূপ বলিয়া থাকে—উহার ভিতর "চীনা চীনা" গন্ধ খুবই পাওয়া যাইতেছে। শীর্ণপত্রপল্লবভূষিত বাঁশ-ঝাড় ইতস্ততঃ হেলিতেছে দুলিতেছে;—এই বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে মশার ঝাঁক নৃত্য করিতেছে।

মাদাম্ শাংহ সম্প্রতি ক্যাণ্টন হইতে আসিয়াছেন। তাঁর খাতির-নদারদ ভাব; ভাবুনেপনাও আছে; তাঁহার চোখ এতটা উপর দিকে তোলা যে, চোখের তারা—যাহা তাঁহার হাতপাখার মতনই চঞ্চল—মনে হইতেছে যেন উপর হইতে নীচে ক্রমাগত ঘুর-পাক দিতেছে। মাদাম্ তাঁহার পুতুল-পায়ের উপর ভর দিয়া হেলিয়া-দুলিয়া বেড়াইতেছেন।

উহাদের দুই মুখের যোগাযোগে, ক্ষুদে শাংহর মুখখানি না-জানি কিরূপ আকার ধারণ করিবে। আগামী মাসে নব অভ্যাগত পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন, এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে।

১২

...এক বর্ষার দিনে, কোন এক পর্ব্বতের চূড়ায়। খানিকটা ফাঁকা

আকাশ, খানিকটা নিস্তব্ধতা। আমার পায়ের নীচে হরিদ্বর্ণ ঢালু ভূমি গভীর সমুদ্রের দিকে নামিয়া গিয়াছে।

ঐ গিরিশিখরের উপর আমি একটা কাজে নিয়োজিত হইয়াছিলাম। জাহাজের প্রধানাধ্যক্ষ ত্রিকোণমিতি-সংক্রান্ত জরিপ করিবার জন্য, একটা উপসাগরের দিক্‌ নির্ণয় করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের ঘড়ি ফিরাইবার মিস্ত্রী এই কাজে আমার সাহায্য করিয়াছিল। একটা শৈলখণ্ডের উপর আমাদের তাম্র-যন্ত্রগুলা সযত্নে বসাইয়াছিলাম—শৈল-পাত্র শুল্ম পাতাবাহার গুল্মে আচ্ছাদিত—যেন গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। আরও কতকগুলা উচ্চতর পাহাড়, তাহাদের উদ্ভিজ্জপূর্ণ তমসাচ্ছন্ন গুরুভার দেহপিণ্ড লইয়া, আমাদের মাথার উপরে ঝুলিয়া র'হিয়াছে। কখন কখন ধূসর মেঘ নামিয়া আমাদিগকে প্লাবিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। বর্ষণের সময় নিস্তব্ধ হইয়া নিশ্চলভাবে মাথা নীচু করিয়া, কখন্ দিগন্ত আবার আলোকে উদ্ভাসিত হইবে, দুরন্ত অন্তরীপগুলা আবার দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি। এই অন্তরীপগুলা প্রায়ই কুয়াসায় আচ্ছন্ন থাকে।

যখন আমরা এইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তখন আমাদের মন সুদূরে চলিয়া যাইত। একজন "Lande"-বাসী নিশ্চয়ই তাহার দেবদারু-বনের কল্পনায় বিভোর হইত। আর আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি কল্পনা করিতাম যেন আমি দাল্‌মাসিয়ায় আছি। এইসব উচ্চ পর্ব্বতের চম্‌চমে হাওয়া, এইসব তরুময় বিশাল ঢালুভূমি, আর এই দুরন্ত সমুদ্র,—এই সমস্ত হইতেই, একটা মায়াবিভ্রম স্বতই উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

কাত্তারো-প্রদেশের সহিত, এড্রিয়াটিকের ঢালু দেশের সহিত, এসিয়ার এই কোণটুকুর বাস্তবিকই একটা সাদৃশ্য আছে।

একটা অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া দেখিবার জন্য, আধো চোখ বুজিয়া, সেই গভীর স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে আস্তে আস্তে ক্রমশঃ আপনাকে নিমজ্জিত করিলাম। ঐ-সব দেশের খুব স্পষ্ট, খুব জটিল, খুব জীবন্ত ধারণা আমার মনে আবার জাগিয়া উঠিল। যে-সব জিনিষ চলিয়া গিয়াছে তৎসম্বন্ধে সুতীব্র একটা বিষাদের ভাব—নিষ্ঠুর বলিলেও হয়—আবার আমার মনকে অধিকার করিল। সেই-সব অতীতের জিনিষ আর কখন ফিরিয়া আসিবে না…আহা কাত্তারোর সেই উপসাগর—একটু বিষাদময় সেই কবোষ্ণ শরৎকাল—সেই বন-প্রান্তে বসিয়া ধ্যান-চিন্তায় মগ্ন থাকা—সেই মেদী-গাছের তলায় নিয়া যাওয়া—আর,—হের্জেগোভিনিয়ের একটি ক্ষুদ্র বালিকা, ঐ শান্ত বিজন দেশে ভেড়া চরাইবার জন্য যে প্রতিদিন আসিত, তাহাকে দেখা…

এই পর্ব্বত ও আকাশের নিস্তব্ধতার মধ্যে, হঠাৎ একটা সর্-সর্ শব্দ! সরু সরু হাত যেন ধূসর-রংএর দস্তানা পরা—সেই হাত দিয়া ডালপালা সরাইয়া দিয়া আমাদিগকে দেখিতেছে:—দুইটা বড় বানর! …বনমানুষ জাতীয়; মানুষের মত মুখ—সমস্তটাই গোলাপী রংএর; দাড়ীর চুল সাদা। উহারা নিশ্চয়ই আমাদের পিছনে অনেকক্ষণ ধরিয়া ছিল; যখন দেখিল আমরা কোনও অনিষ্টকর কাজে লিপ্ত নই, তখন উহারা বানর-সুলভ তীব্র কৌতূহল সহকারে উহাদের স্বচ্ছ চোখ খুব দ্রুতভাবে মিট্‌মিট্ করিতে করিতে আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এক নাবিক গম্ভীরভাবে উহাদিগকে অভিবাদন করিল এবং হাত নাড়িয়া বন্ধুত্বের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিল—সকল ভাবাতেই যাহার অর্থ এই:—"মহাশয়গণ, একটু কষ্ট করিয়া যদি…ইত্যাদি…আমরা তাহা হইলে খুবই খুসী হইব…"

এই হস্তভঙ্গীতে উহারা ভয় পাইল। তখন উহারা সাধারণ পশুর মত চার-পায়ের উপর ভর দিয়া ছুটিয়া পলাইল। উহাদের পলায়নের সময়, আমাদের চক্ষু, জুঁই-গাছ ও অন্যান্য হরিৎ গুল্মের মধ্য দিয়া, উহাদিগকে অনুসরণ করিল।

ছুটিয়া যাইবার সময়, উহাদিগকে বড় খরগোসের মত দেখাইতেছিল। মানুষের মত মাথা ও বৃদ্ধলোকের মত শ্মশ্রু ছাড়া, মানুষের সাদৃশ্য আর তাহাদের কিছুই ছিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ষা-গান

ঝড় আসে ঐ বাদল আসে
গগন জুড়ে হু হু শ্বাসে!
সুদূর পারের মাঠের শেষে
আকুল পায়ে নেমেছে সে,—
এপারে তার খবর এসে
　　ব্যাকুল করে শ্যামল ঘাসে!

ভিজে হাওয়ার গন্ধখানি
কি যে পাওয়ায় মনে মনে—
বাদলনাচের ছন্দখানি
কি সুর তোলে বনে বনে!

বেরিয়েছে কে অভিসারে,—
কটাক্ষ তার ঝিলিক্ মারে,
নূপুর বাজে গগন-পারে
　　ঘুমো জাগে নীল আকাশে!

কত কি যে হারিয়ে গেল
ঝোড়ো হাওয়ার দম্‌কা বাতে!
কত কি যে হঠাৎ এল
কোন্ অতিথির সাথে সাথে!
কাজল-কালো তাহার আঁখি
উদাস হ'য়ে আস্‌চে নাকি,
অশ্রু ঝরে থাকি' থাকি'
　　না জানি কার পায়ের পাশে!

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

রক্ষিত ফল ও অন্যান্য ব্যবসায়

জগতে বড় বড় ব্যবসায়ের মধ্যে রক্ষিত খাদ্যের ব্যবসায় যে একটা খুব বড় তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। কোটী কোটী টাকার রক্ষিত ফল ও শাক-সব্‌জী মাছ-মাংস প্রতিবৎসর জগতে ব্যবহৃত হইতেছে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকেই কিছু না কিছু এই ব্যবসায় করিয়া নিজেদের ধনবৃদ্ধি করিতেছে। কেবল ভারতবর্ষের স্থান এ ব্যবসায়ে বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও সুফলা সুজলা শস্যশ্যামলা ভারতের স্থান অন্ততঃ আমেরিকার পরেই হওয়া উচিত ছিল।

ফল-রক্ষণ-শিল্পের দ্বারা এদেশের কতটা উন্নতি হইতে পারে তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এ-শিল্প এ-দেশে এতদিন কেন প্রসারিত হয় নাই সে বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা দর্‌কার। কেননা আমাদের দেশের লোকের একটা বদ্ধমূল ধারণাই এই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে নূতন শিল্প যে এ দেশে প্রসারিত হয় নাই তাহার মূলে নিশ্চয়ই একটা অনতিক্রমণীয় বাধা আছে। এই জুজুর ভয় হৃদয়ে পোষণ করিয়াই সকলে উদাসীন। কেহই প্রকৃত কারণটা খুঁজিয়া দেখিবার ক্লেশটুকু পর্য্যন্ত লইতে ইচ্ছুক নয়; কেহই সন্ধান করিতে চায় না যে যদি কিছু বাধা থাকে তবে তাহা বাস্তবিকই অনতিক্রমণীয়, না, দুরতিক্রমণীয় বা সহজাতিক্রমণীয়।

শিল্প বাণিজ্য বিস্তৃতির অন্তরায় প্রধাণতঃ তিনটি—

১। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যাঁহারা ব্যবসায়ে রত আছেন তাঁহাদের নূতন শিল্পের উপযোগী শিক্ষা নাই। পরের দেশের লোক আসিয়া এদেশে যে-সব শিল্প-বাণিজ্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছে আমাদের দেশের বর্ত্তমান ব্যবসায়ীরা তাহাদেরই পদানুসরণ করিতেছেন মাত্র। তাই নূতন শিল্পের দিকে অগ্রসর হইতে তাঁহাদের সাহস হয় না।

২। যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা শিল্প-বাণিজ্যের শিক্ষা অনায়াসেই গ্রহণ করিয়া নূতন নূতন শিল্পের প্রসারণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা সর্‌কারী চাকরী ওকালতী এবং ডাক্তারী করার নেশায় বিভোর হইয়া সবজান্তা ভাবকে হৃদয়ে পোষণ করতঃ দেশে শুধু মোড়লী করিয়া বেড়াইতেছেন।

৩। অন্যান্য দেশে গভর্ণ্‌মেণ্টের সাহায্যে ও উৎসাহে সে দেশের বড় বড় অনেক শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের এ হতভাগ্য দেশে কাহার বা গরু আর কে বা দেয় ধোঁয়া?

এই-সব গেল প্রথম স্তরের অন্তরায়। বর্ত্তমান সময়ে আর-এক স্তরের অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

১। কালের চাবুকে অনেক ডিগ্রীধারী শিক্ষিত যুবকের সর্‌কারী চাকরীর বা ওকালতীর নেশা ছুটিয়াছে বটে, কিন্তু সবজান্তা ভাবের নেশা ছুটে নাই। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা গত্যন্তর নাই দেখিয়া শিল্প-বাণিজ্যের দিকে নজর দিয়াছেন। কিন্তু সে নজর শনির নজরে পরিণত হইতেছে। ব্যবসাক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা—যাঁহারা পনর বৎসর কাল নিজেদের স্বাস্থ্য অর্থ ও সময় নষ্ট করিয়া তোতাপাখীর মত শুধু ইংরেজী বুলি শিখিয়াছেন এবং ইহকাল-পরকালের কাল্পনিক পরিত্রাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষাকবচ কপালে ধারণ করিয়া সর্ব্বজয়ী হইয়াছেন মনে করেন, তাঁহারা—কতবড় আনাড়ি। ফল যে কি হইতেছে তাহা সকলেই দেখিতেছেন। শিক্ষিত যুবকেরা একবার অকৃতকার্য্য হইয়াই—ইহা ভদ্রলোকের কাজ নয় বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছেন। ইঁহারা যে শুধু নিজেদের অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিতেছেন তাহা নহে, অন্যান্য লোক ভবিষ্যতে যে এ পথে আসিবে তাহারও রাস্তা বন্ধ করিতেছেন। কেননা সাধারণের এই ধারণা জন্মিতেছে যে যখন অমুক হাইকোর্টের বারিষ্টার উকীল বা অমুক বড় ডাক্তার অমুক এম্‌-এ এম্‌-এস্‌সি একাজ করিতে পারিলেন না তখন ও-কাজে হাত দেওয়া বিড়ম্বনা। তাই নূতন কাজের নামে সকলেই শিহরিয়া উঠিতেছে। এবং নূতন কাজের প্রসারণ না হওয়াতে এক কাজে অনেকে

আসিয়া অনিবার্য্য রেষারেষির সৃষ্টি করিয়া প্রচলিত শিল্প বাণিজ্যেরও ক্ষতি করিতেছেন।

২। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সমিতির সাহায্যে অনেক ছেলে বিদেশে গিয়া শিল্প শিক্ষা করিয়া এদেশে আসিতেছেন। তাঁহারা হয়ত নিজেদের সাধ্যমত জিনিস প্রস্তুত করা শিখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু জিনিস প্রস্তুত করা এবং তাহা বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হওয়া এক-কথা নহে। ব্যবসায়ের দিকে দেখিবার বা শিখিবার হয়ত তাঁহাদের সুবিধাই হয় নাই। একজনের নিকট সব কাজ আশা করাও সুবিবেচনার কাজ নহে। অথচ এক বিশেষজ্ঞের উপরেই আমাদের সব নির্ভর করিতে হইতেছে। তাই আশানুরূপ ফল খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া যাইতেছে। সেজন্য দেশেরও ধনীলোক আর ঘরের টাকা বাহির করিয়া কোনও শিল্প-বাণিজ্যের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতে বিমুখ হইতেছেন।

৩। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের স্তম্ভে দেখিতে পাই, ও লোকের মুখেও শুনিতে পাই, একদল লোক নাকি লোক ঠকাইবার মতলবে লিমিটেড কোম্পানীর ফাঁদ পাতিয়া অনেক লোকের অনেক অর্থ আত্মসাৎ করিতেছে, তজ্জন্য দেশের লোক আর শিল্প-বাণিজ্যের নামে টাকা দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে এবং শঠতার প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নয়।

শিল্প-বাণিজ্য-বিস্তৃতির অন্তরায়ের যে-সব কারণ দেখিতে পাওয়া গেল, ইহার কোনটাই সহজাতিক্রমণীয় না হইলেও অনতিক্রমণীয় নহে, কেননা মূল কারণ দেখিতে পাইতেছি একটা—তাহা শিল্প-বাণিজ্যের শিক্ষার অভাব। এখানে শিক্ষার মানে শুধু পুঁথিগত শিক্ষা আমি মনে করিতেছি না। মূল সংশোধন করিতে পারিলে শাখা-প্রশাখাগুলি আপনা হইতেই সংশোধিত হইবে। দেশের কতিপয় লোক যাঁহারা অনেক ত্যাগস্বীকার করিয়া দুঃখ-দৈন্যকে বরণ করিয়া লইয়া স্বদেশ উদ্ধারের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, শুধু তাঁহারাই যদি শিল্প-বাণিজ্য বিস্তৃতির মূল অন্তরায়কে দূর করা কার্য্যতঃ তাঁহাদের ব্রতের একটা মুখ্য পর্ব্ব বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও যে ইহার কিছু প্রতিকার হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্যই সর্ব্বসাধারণের চেষ্টার যে ফল তাহা মুষ্টিমেয় লোকের চেষ্টার ফল অপেক্ষা অনেক বেশী, তাহা বলাই বাহুল্য।

শেষোক্ত অন্তরায় অর্থাৎ একদল লোকের লিমিটেড কোম্পানী করিয়া লোক ঠকাইবার ফন্দী অত্যন্তই ভয়াবহ। কিন্তু সে-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে উহা একান্তই কাল্পনিক। লোক ঠকাইবার মতলবে লিমিটেড কোম্পানীরূপ ফাঁদ পাতার মতন নীচতা এখনও দেশে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এক্ষেত্রেও কর্ম্ম-কর্ত্তাদের ব্যবসায়-বুদ্ধির ও শিক্ষার অভাবই লিমিটেড কোম্পানীর অকৃতকার্য্য হইবার কারণ। কেননা ইহা বড় দেখা যায় না যে অমুক ব্যক্তি লিমিটেড কোম্পানীর কল্যাণে লোক ঠকাইয়া নিজে খুব সুখ সুবিধা ভোগ করিতেছে। তবে লোকেরা যে তাহাদিগকে ওরূপ আখ্যা দিতেছেন তাহার কারণ ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার দরুন্ রাগ ও দুঃখ। তবে দু একজন যদি এরূপ নীচ প্রবৃত্তির লোক থাকিয়াও থাকে তাহা হইলেও যাহাতে সমস্ত দেশের কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জীবন নির্ভর করিতেছে এরূপ যে শিল্প বাণিজ্য তাহাতে দেশের লোক উৎসাহ দিতে নিরস্ত থাকিলে পরিণামে তাহাদের নিজেদেরও অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণ হইবে না। আর আমরা এই যে উকীল-বারিষ্টারের ফাঁদে পড়িয়া যত লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, অনেকের ভিটা মাটি পর্য্যন্ত বিকাইয়া যাইতেছে, তাহার তুলনায় ব্যবসায়ী শঠদের হাতে ক্ষতিটা অতিশয় নগণ্য। সকলেই জানেন ওকালতী বা বারিষ্টারীও এক-একটা ব্যবসায়। বর্ত্তমান লিমিটেড কোম্পানীর সহিত ইহার খুব সৌসাদৃশ্যও আছে। ধরুন, এক-একজন উকীল বা কৌন্সিলী যেন ছোট বড় এক-একটা লিমিটেড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। গভর্ণমেণ্টের সনদ যেন ইহাদের আর্টিকেল অব্ এসোসিয়েশন। ওথ্ লওয়া অর্থাৎ সাধারণের উপকারার্থ সুবিচারের জন্য বিচারপতিকে সহায়তা করা যেন মেমোরেণ্ডাম অব্ এসোসিয়েশন। যদিও এ-ক্ষেত্রে মেমোরেণ্ডাম পরিবর্ত্তন করিতে হইলে হাইকোর্টের

পার্মিশনের বা আজ্ঞার দরকার হয় না। এটর্নী ও উকীল বাবুদের কেরানীগণ ইহার প্রস্পেক্টাস, বার্‌লাইব্রেরী ইহার রেজিষ্টার্ড্ অফিস। মকদ্দমায় জয়যুক্ত হওয়া ইহার ডিভিডেণ্ড্। এপ্লিকেশন মনি অগ্রিম দেয়। কল মনি যে কত দিতে হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণ যখন যাহা চাহিবেন তৎক্ষণাৎ তাহা পে করিতে হইবে, নতুবা অমনি শেয়ার ফর্‌ফিটেড হইবে। অন্ততঃ অর্দ্ধেক ক্ষেত্রে যে ডিভিডেণ্ড্ পাওয়া যাইবে না তাহা সুনিশ্চিত। তজ্জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের নিকট কৈফিয়ত চাওয়া ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইবে। শেষ ফল—ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের মোটরের ধূলিকণায় ডিভিডেণ্ড্ প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত শেয়ার-হোল্ডারদের চোখের জল মুছিতে মুছিতে মাথায় হাত দিয়া বাড়ী প্রত্যাগমন।

আমাদের ছানিপড়া চোখে যদিও এ-সমস্তটা বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের ক্ষতির কিছুই তারতম্য হইতেছে না। অনেকে বলিবেন দেশে উকীল-বারিষ্টার থাকা নিতান্তই দরকার; তাঁহারা না থাকিলে অনেক নির্দ্দোষী ব্যক্তি শাস্তি পাইত, অনেকের ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায় হইত না। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে উকীল-বারিষ্টারের কল্যাণে যত নির্দ্দোষী লোক শাস্তি ভোগ করিতেছে, যত দোষী ব্যক্তি অনায়াসে পরিত্রাণ পাইতেছে এবং যত উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়িতেছে, শুধু বিচারকের উপর নির্ভর করিলে তাহার ফল ইহা অপেক্ষা কোনও অংশে খারাপ হইত না। অথচ এই পরাসক্ত জীবদের উদর পূর্ণ করিবার জন্য যে কত কোটী কোটী টাকা অপব্যয় হইতেছে এবং ইহাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ যোগাইবার জন্য যে কত লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে প্রতি-বৎসর রপ্তানি হইতেছে তাহার হিসাব নিকাশ করিতে কেহই মাথা ঘামায় না। এমনই মন্ত্রমুগ্ধ আমরা!

ওকালতী-বারিষ্টারীর ফাঁদে পড়িয়া শুধু যে আমরা টাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি তাহা নয়, একদল দেশের রত্ন যাঁহারা শিল্প-বাণিজ্যের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অনেক নূতন শিল্পের প্রসারণ করতঃ এই হতভাগ্য দেশের অনেক ধন-বৃদ্ধি করিতে পারিতেন এবং লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকা অর্জ্জনের রাস্তা প্রশস্ত করিয়া দিয়া দেশকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন, তাঁহাদিগকেও আমরা হারাইয়াছি। এইসব কোহিনুর হারাইয়া দেশ যত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে রৌপ্যের ক্ষতি তাহার তুলনায় খুবই নগণ্য। এত ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াও কি আমরা ও-ব্যবসায়কে উৎসাহ দিতে নিরস্ত হইয়াছি? লোকে বলিবে প্রাণের দায়ে। কিন্তু প্রাণের দায় যে কোথায় বেশী তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন না, তাই আমাদের আজ এই দশা। অনাহারে, রোগে সমস্ত দেশ মৃত্যুমুখে ধাবিত হইতেছে। যদি অচিরে ইহার প্রতিবিধান না হয় তবে মৃত্যু অনিবার্য্য। ভারত এক সময় সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং তখনই ধন ঐশ্বর্য্যে বড় ছিল যখন তাহার শিল্প-বাণিজ্য ছিল। সে-সময়ের ইতিহাসের যদিও আমাদের পাঠ্যপুস্তকের আল্‌মারীতে স্থান নাই, তথাপি সেকালের শিল্প-বাণিজ্যের আদর্শ যে-শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছিল—'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'—তাহার ক্ষীণ স্বর এখনও আমাদের নিকট তখনকার লোকের শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি ভালবাসার সাক্ষ্য দান করিতেছে। প্রবাদ আছে যে ঝিনুক দিয়া মাপিয়া খাইলেও রাজার গোলা ফুরাইয়া যায়। তাই আয়ের অভাবে দেশের সাধারণের যে পয়সা ছিল ক্রমশঃ তাহা শেষ হইয়া আসিতেছে। অনেকে নিষ্কর্ম্মা হইয়া অনাহারে মরিতেছে। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার না করিতে পারিলে তাহাদিগকে বাঁচান অসম্ভব। তাহাদের মৃত্যুতে জমিদারের মৃত্যু, কে খাজনা দিবে? উকীল-বারিষ্টারের মৃত্যু, কে মোকদ্দমা করিতে আসিয়া তাহাদের উদর পূর্ণ করিবে? ডাক্তারের মৃত্যু, কে তাহাদিগকে ডাকিবে? ইহার সূচনা এখনই আরম্ভ হইয়াছে; যত দিন যাইবে তত বেশী অনুভূত হইবে। তাই এই সমস্যায় কাহারও নিস্তার নাই। ভারাক্রান্ত নৌকা ডুবিতে বসিয়াছে, এখন কোনও আরোহীকেই আমি অত বড় জমীদার, আমি অত বড় হাকিম, আমি অত বড় কৌন্‌সিলী, আমি অত বড় ডাক্তার ভাবিয়া দাঁড়ি-মাঝির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, সকলকেই সেচনী লইয়া জল সেচন করিয়া নৌকা বাঁচাইতে হইবে। নতুবা নৌকা ডুবিলে,

নীচের মাঝিরা হয়ত আগে মরিবে, কিন্তু ছইয়ের উপরের বাবুদেরও নিস্তার নাই।

শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য যে-সমস্ত বাধা-বিপত্তির কথা আলোচনা করা হইল তাহা ছাড়াও হয়ত অনেক নূতন নূতন বাধা বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের নিরাশ হইলে চলিবে না। জগতের শিল্পবাণিজ্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে কোন শিল্পই একদিনে বড় হয় নাই। শত শত জীবন ক্ষয়, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, বার বার অকৃতকার্য্য, এক সময় সকলকেই হইতে হইয়াছিল। বিদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমাদের দেশের ভিতরেই দেখা যায়—যেমন বাঙ্গালীর গৌরব করিবার জিনিস বেঙ্গল কেমিক্যাল, যাহার কার্য্যক্ষেত্র এখনও শুধু ভারতেই আবদ্ধ, তাহাকেও দাঁড় করাইতে ত্যাগের অবতার প্রাতঃস্মরণীয় প্রফুল্লচন্দ্রকে —যিনি বিষ দিলেও লোকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাকেও—কত পরিশ্রম, কত নিদ্রাহীন রাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল এবং তখনকার যাঁহারা ? সহকর্মী ছিলেন তাঁহাদিগকেও কত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, কত হাবুডুবু খাইতে হইয়াছিল, কত লোক-নিন্দা অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইতে হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস যাঁহারা জানেন না তাঁহারা একবার আচার্য্য-দেবের নিকট শুনিবেন, তাহা উপন্যাস হইতেও মনোমুগ্ধকর। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা বেঙ্গল কেমিক্যাল চালাইতেছেন তাঁহারা ত স্রোতের মুখে হাল ধরিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু যখনই ঝড়-ঝাপ্‌টা আসে তখনই তাঁহাদিগকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয় এবং কত লোকনিন্দা, কত লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। তাই আমাদিগকে বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে, যে, ব্যবসায়ক্ষেত্র সরকারী চাকরী ওকালতী বা ডাক্তারীর মত সুগম বা শুধু লাভের নয়, ইহা কণ্টকময় এবং লাভ ও ক্ষতি দুইকেই এখানে বরণ করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু একথা নিশ্চয় যে এ ক্ষেত্রে একবার কৃতকার্য্য হইতে পারিলে তাহার যে ফল তাহা অপরিসীম এবং অফুরন্ত।

রক্ষিত আনারস প্রভৃতি ফল

অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার সাধ্যা-তীত। আমি নিজে যে শিল্পকে আজ তের বৎসর কাল কত ঝড়-ঝঞ্ঝার ভিতরে কত হাবুডুবু খাইয়াও আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে এখনও একাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি, তাহা দ্বারা দেশের কতদূর কি হইতে পারে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

সম্প্রতি আমাকে পুনরায় বিদেশে যাইতে হইয়াছিল। এবার ফলরক্ষণ শিক্ষা করিবার জন্য নয়, আমাদের রক্ষিত ফল ওদেশে কিরূপে কাট্‌তি হইতে পারে তাহা দেখিবার ও জানিবার জন্য। যাহা দেখিলাম ও বুঝিলাম তাহাতে আশা হইতেছে যে যদি এ ব্যবসায় আমরা সুচারুরূপে চালাইতে পারি তবে বাঙ্গলার অন্নসমস্যার অন্ততঃ কিছুভাগ প্রতিকার করা যাইতে পারে। চালাইতে পারিলে শুধু রক্ষিত আনারসের ব্যবসায়ই বাঙ্গলার চা ও পাটের সমকক্ষ হইতে পারে।

গ্রীষ্মকালেই বিলাতে রক্ষিত ফলের কাট্‌তি হইবার সময়। যে বৎসর যত বেশী গরম পড়ে তত বেশী রক্ষিত ফলের কাট্‌তি হয়। গত বৎসর গরম বেশী পড়ে নাই, মে মাসের শেষেও দারজিলিঙে নভেম্বর মাসের মত শীত ছিল। তৎপি এক ইংলণ্ডের বাজারেই আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপের আনারসের কাট্‌তি হইয়াছিল এক কোটি সত্তর লক্ষ বাক্স (প্রত্যেক বাক্সে দুই ডজন করিয়া আড়াই পাউণ্ড ওজনের আনারসের টিন থাকে)। ইহা ছাড়া সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আনারসে বাজার ভর্ত্তি ছিল। একটা সময় ছিল যখন বিলাতের বাজারে সিঙ্গাপুরের রক্ষিত আনারসেরই একাধিপত্য দেখা যাইত; কিন্তু সিঙ্গাপুরের অশিক্ষিত চীন-দেশীয় ফলরক্ষকগণ ক্রমাগত নিকৃষ্ট ফল সে বাজারে পাঠাইয়া নিজেদের ব্যবসায়টি মাটি করিতে বসিয়াছে। একবার বাজারে বদনাম রটিলে ফল যাহা হয় তাহাদের অদৃষ্টেও তাহা ঘটিয়াছে। তাহাদের রক্ষিত আনারসের মূল্য হাওয়াই দ্বীপের রক্ষিত ফলের সিকি দামে নামিয়া গিয়াছে।

বিলাতের অনেক বড় বড় রক্ষিত-ফল-ব্যবসায়ীদের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। দেখিলাম আজকাল বিলাতের ইংরেজেরা বৃটিশ-সাম্রাজ্য-জাত জিনিসের আদর করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, অবশ্য জিনিসটা

যদি বিলাতে উৎপন্ন হইত, তবে হয়ত, এ আদর অন্ততঃ আমরা প্রত্যাশা করিতে পারিতাম না। বিদেশী আমেরিকা এখন আনারসের কারবার প্রায় একচেটিয়া করিয়া সমস্ত পয়সা সাম্রাজ্যের বাহিরে লইয়া যাইতেছে; ইহা ইংরেজ পছন্দ করে না। কেননা এখন জীবন-মৃত্যু সমস্যা। এখন আর শুধু সাদা চাম্‌ড়ার খাতির করিলে চলিবে না। সাম্রাজ্যের মধ্যে পয়সা থাকিলে তাহা কালার নিকটেই থাকুক আর সাদার নিকটেই থাকুক তাহা ইংরেজের কোনও না কোনও সময়ে উপকারে আসিতে পারে। কিন্তু সাম্রাজ্যের বাহিরে চলিয়া গেলে আর সে ভরসা নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরেজ যখন ধনৈশ্বর্য্যের গর্ব্বে মত্ত ছিল, তখন এই মোটা কথাটা তলাইয়া দেখিবার তাহাদের সময় হয় নাই এবং দরকারও হয়ত বোধ করে নাই। তখন তাহারা বিদেশী রাজ্যের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখিতেই ব্যস্ত ছিল। এখনও মুখে যাহাই বলুক আজ দুঃখের দিনে দৈন্যের দিনে অন্তরে বেশ বুঝিতে পারিতেছে প্রকৃত বন্ধু কাহারা। তাই আজ ইণ্টারন্যাশানাল একজিবিশনের পরিবর্ত্তে এম্পায়ার একজিবিশনের সূচনা করা হইয়াছে।

অনেক ব্যবসায়ী আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের রক্ষিত আনারসের টিন পাশাপাশি খুলিয়া তাঁহাদের যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই—"স্বাদে গন্ধে ও বর্ণে ভারতীয় আনারস বাজারের সকল আনারস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কিন্তু হাওয়াই আনারসের টিন যেমন সুন্দর ভাবে টিনের অভ্যন্তরস্থ ব্যাসের প্রায় সমান মাপের গোল গোল টুক্‌রায় সাজান, আমাদের আনারস তাহা নয়। আমাদের টুকরাগুলি ছোট ছোট ও তাহা ছাড়া সব সমান-মাপের নয়।

বর্ত্তমান সভ্যতার একটা ধারাই এই যে যাহার সাজগোজ সুন্দর তাহার আদর বেশী, গুণ তাহার তত থাকুক বা না থাকুক। অবশ্য গুণও আছে আবার সাজগোজও সুন্দর এরূপ জিনিসের আদর সবচেয়ে বেশী তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের আনারসের দোষ দূর করিতে হইলে অর্থাৎ সাজগোজ ভাল করিতে ইচ্ছা হইলে আমাদিগকে বড় বড় আনারস পাইতে হইবে এবং প্রচুর পরিমাণে আনারস জন্মাইতে হইবে। আমরা গত চার বৎসর কাল নিয়ম-মত ব্যবস্থা-হিসাবে রক্ষিত-আনারসের কারবার করিয়া আসিতেছি। প্রতিবৎসরেই পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বেশী ফলের দরকার হইয়াছে। ফলে এইরূপ হইয়াছে যে প্রথম বৎসর আমরা যে দরে আনারস খরিদ করিতে পারিয়াছিলাম প্রতিবৎসর তাহার মূল্য ক্রমশঃ বাড়িয়া আজ চতুর্থ বৎসরে তাহার দাম তিনগুণ দিতে হইতেছে। কারণ এই চার বৎসরের মধ্যে ফলের ফসল বেশী করিবার পক্ষে কোনও চেষ্টাই হয় নাই। সাধারণের মুখের আনারস কাড়িয়া আনা হইতেছে, তাই মূল্য বৃদ্ধি হওয়া অনিবার্য্য হইয়াছে। যে মূল্য দিয়া প্রথম বৎসর আমরা আনারস খরিদ করিয়াছিলাম যদি সেই মূল্যেও বরাবর পাওয়া যাইত, তবে আমরা অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় অনায়াসে সমকক্ষ হইতে পারিতাম। কিন্তু এখন যে মূল্যে ছোট ছোট আনারস খরিদ করিতে হইতেছে সে মূল্য দিয়া প্রতিযোগিতায় দাঁড়ান কষ্টসাধ্য।

ফল-উৎপাদন

ফলের আয়তন বৃদ্ধি করিতে এবং প্রচুর ফল জন্মাইতে হইলে নিয়মমত চাষের দরকার। বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশে তাহার কোন বন্দোবস্তই নাই। আনারসের চাষ করা যে খুব শক্ত ব্যাপার তাহাও নয়। সকলেই জানেন, এদেশে যেখানে-সেখানে আনারস জন্মে। এখানকার জমি ইহার পক্ষে খুবই উপযোগী। কলিকাতার নিকট-বর্ত্তী যশোহর প্রভৃতি স্থান আনারসের জন্য অতি প্রশস্ত। সেখানে জমিরও অভাব নাই। কর্ম্মিষ্ঠ উৎসাহী ও কষ্টসহিষ্ণু যুবকেরা সেখানে গিয়া সামান্য মূলধনে স্থানীয় কৃষকের সাহায্যে অনায়াসেই আনারসের চাষ আরম্ভ করিয়া লাভবান্ হইতে পারেন। হাওয়াই দ্বীপে আমেরিকান্‌রা যে প্রণালীতে আনারসের চাষ করে তাহাতে দেখিতে পাই যে প্রতি-বিঘায় তিন হাজার করিয়া আনারস উৎপন্ন হয়। যদি সু-জাতের আনারস লাগান যায় এবং নিয়মিত জল দিবার বন্দোবস্ত করা হয় তবে অনায়াসেই খুব বড় ফল উৎপাদন করা যাইতে পারে। বড় ফলের মূল্য শতকরা কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত আশা করা

যাইতে পারে। গড়পড়্তা যদি আমরা পনর টাকা দরেও হিসাব করি, তাহাতে দেখিতে পাই, যে, প্রতি-বিঘায় শুধু আনারসেই গড়ে চারিশত টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আনারসের পাতা দ্বারা সূত্র প্রস্তুত করিতে পারিলে আরও একটা অতিরিক্ত আয়ের বন্দোবস্ত হয়। অথচ খরচ হয়ত প্রতি-বিঘায় চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার বেশী পড়িবে না। দুইজন যুবক একশত বিঘার জমির পরিদর্শন-কার্য্য অনায়াসেই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন।

জমি ও সার

মাটি-মিশ্রিত বালি-জমিই আনারসের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহার পরেই বালি-জমি বা পাথর-কুচির জমি প্রশস্ত। আঠালে মাটির জমি আনারসের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয়। জমিতে জলসেচনের সুবন্দোবস্ত থাকা বিশেষরূপে দরকার। ছায়ার মধ্যে যে-সকল আনারস জন্মে তাহার স্বাদ ও গন্ধ তত ভাল হয় না। পচা পাতা ও খুব পচা গোবরের সারে প্রস্তুত জমিতে খুব বড় বড় অত্যুৎকৃষ্ট আনারস জন্মে।

আমাদের নিজেদের সীমাবদ্ধ শক্তি, অর্থ ও সময় ফলরক্ষণ-কার্য্যে ও তাহার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেই আবদ্ধ, তাই আমাদের চাষের দিকে যাওয়ার উপায় নাই, তবে পরামর্শ দিয়া বা অন্যান্য যে-কোনওপ্রকারে উৎসাহী যুবকদিগকে সাহায্য করিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। আমরা আমাদের কোম্পানীর তরফ হইতে এরূপ কন্ট্রাক্ট্ বা চুক্তি করিতে পারি যে তাঁহারা যত আনারস উৎপাদন করিতে পারিবেন আমরা তাহা সমস্তই খরিদ করিতে বাধ্য থাকিব। আনারসের চাষ আরম্ভ হইলে সঙ্গে-সঙ্গে আরও অনেক নূতন-নূতন রক্ষিত ফলের কারখানা যে খোলা সহজ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। আমি দুই তিনটা ইংরেজী দৈনিক পত্রে গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কিছু বিশেষ ফল পাইব এরূপ ভরসা পাইতেছি না। তাই আমার দেশের লোকের নিকট বিশেষ নিবেদন যেন এমন একটা সুযোগকে তাঁহারা উপেক্ষা না করেন।

শ্রী অনাথবন্ধু সরকার

সন্ধ্যায়

দিনশেষে নদীতীরে বসে' আছি চুপ্‌চাপ্‌,—
দূরে মাঝি তরী বায়, দাঁড় ফেলে ঝুপ্‌ঝাপ্‌।
আকাশেতে খেলে রং পিঙ্গল-জর্দ্দায়,
ঢেকে আসে ধরাখানি আঁধারের পর্দ্দায়।
নদীজল ছুটে' চলে ছপ্ ছপ্ কুল্ কুল্ ;
শূন্যেতে পাড়ি দেয় ঘরমুখো বুল্‌বুল্‌।
ঝুরু ঝুরু বায়ু বয়— নাহি তার ফুরসৎ ;
মাঝি ডাকে—আয় আয় যাবি যারা দূর পথ।
সাড়া নাই পথিকের—নাহি লোক তীরে হায়,
নিরাকুল মাঝি ঐ আন্‌মনে ফিরে যায়।
চখাচখী ডাকে কোথা—ওপারের বন্‌গাঁয়—
ঐ খানে—ঐ খানে যেতে মোর মন চায়।
বাঁশ বনে শাঁই শাঁই—ঘূর্ণির আলোড়ন,
শন্ শন্ নাড়ে মাথা ওপারের শালবন্।

ঘাটখানি জলহীন—পড়ে' আছে অমনি
জল নিয়ে ফিরে' গেছে পল্লীর রমণী।
থেমে গেছে কলরব—মৃদু চুড়ি শিঞ্জন্
নূপুরের ঝন্ ঝন্—কাঁকণের রন্ ঝন্।
থেমে গেছে থেমে গেছে বালকের কোলাহল—
শেষ হ'ল রাস্তায় পথিকের চলাচল।
দূর বনে শিবা ডাকে ঐ—ঐ বহুবার,—
পেঁচা করে চেঁচামেচি ডালে বসে' মহুয়ার।
হেনকালে ওঠে চাঁদ—উজ্জল জল্‌জল্‌—
জ্যোৎস্নার রোশনায়ে চারিদিক্ ঝল্‌মল্‌।
আস্‌মানে শিহরণ গ্রহতারা উল্কায় ;—
নেশাঘোর আঁখি মোর অকারণ ঢুল খায়।

শ্রী সুনির্ম্মল বসু

বিদায়-বরণ

স্বামী-গৃহের সহিত পরিচিতা হইবার পূর্ব্বেই একদিন স্বামী একটা ট্রাঙ্ক্ ও একটি হাত-বাক্স দেখাইয়া বলিলেন —"এ সব এখন তোমারই। হাত-বাক্সের উপর যে নামটা লেখা আছে,—সেটা তুলে' ফেলে' তোমার নাম লিখিয়ে দেবো।"

উত্তরে আমার অন্তরাত্মা নীরবে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল,—"তোমরা এম্‌নি পাষাণই বটে। যাহাকে একদিন আদরে আহ্লাদে বোধ হয় মাথায় তুলিতেও দ্বিধা কর নাই, বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্মৃতিটাকেও তোমরা এম্‌নি করিয়াই তোমাদের কঠিন বুক হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া দ্যাও। নহিলে মাত্র দুই মাস হইল যাহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, আমি আজ তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।"

শ্রাবণের নিঃস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে সারা বাড়ীখানা যেন কর্ম্মক্লান্ত হইয়া আলস্যে বিশ্রাম করিতেছিল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া থামিয়া গিয়াছিল। একটা ভাঙ্গা টিনের কৌটার উপর ছাদের নালি হইতে তালে তালে বিন্দু বিন্দু জল পড়ার শব্দ ঠিক দূরাগত বাদ্যের মতই শুনাইতেছিল। নিঃসঙ্গ গৃহে আমি তখন ভাবিতেছিলাম—নিজের অদৃষ্টের কথা।

প্রথম যেদিন রৌদ্রদগ্ধ শুষ্ক মলিনমুখে আমার দরিদ্র পিতা গৃহ-প্রবেশ করিয়া একটা হতাশের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, সেই প্রথম বুঝিলাম— আমি সে বাড়ীর কত বড় একটা গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছি। গ্রামসুদ্ধ ইতর ভদ্র স্ত্রী-পুরুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল,— আমার বিবাহের জন্য আমার বাবাকে কিঞ্চিৎমাত্র বেগ পাইতে হইবে না; এবং সকলেই একবাক্যে প্রচার করিতেও ভুলিত না, যে, সে বিবাহে এক কপর্দ্দক ব্যয়ও হইবে না,—আমি নাকি এমনই সুন্দরী। এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বাবা নিশ্চিন্ত ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু আমার বিবাহের বয়স প্রায় উত্তীর্ণ হইতে চলিল, অথচ উপযাচক হইয়া কেহই আমার 'রূপ' ভিক্ষা করিল না দেখিয়া অগত্যা তিনি একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াই আমার জন্য পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সন্ধানের ফলে তিনি বুঝিলেন —দেশ কেবল মাত্র রূপের মর্য্যাদা রাখিতে স্বীকৃত নহে, যদি তৎসঙ্গে বেশ কিঞ্চিৎ রূপার দক্ষিণার ব্যবস্থা না থাকে।

পনর বৎসরে পদার্পণ করিলাম। বাবা কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা সত্ত্বেও মা অষ্টপ্রহর তাঁহাকে উৎপীড়ন উদ্ব্যস্ত করিতে লাগিলেন। একদিন সামান্য কথান্তরে বাবা মার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া অসময়ে অনাহারে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন—'আমাকে পার করার ব্যবস্থা না করিয়া তিনি গৃহে ফিরিবেন না।' ক্ষণকালের জন্য সমস্ত বাড়ীখানা নীরব স্তব্ধ হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে অণুপরমাণু যেন ঘৃণায় বিরক্তিতে বিদ্রূপ-দৃষ্টিতে আমাকেই লক্ষ্য করিতে লাগিল,—এ অশান্তি উদ্বেগের একমাত্র কারণ এই কালামুখী। মা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিতে লাগিলেন— "কি অশুভক্ষণে মেয়ের জন্ম হয়েছিল, পোড়াকপালীর জালায় জলে' ম'লাম।"

আমি যে পিতামাতার কতবড় গুরুভার জঞ্জাল, তাহা ভাবিতেও আমার দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। সকলের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে নিজেকে গোপন রাখিবার জন্য নির্জ্জন গৃহে চলিয়া গেলাম।

দেশের উপর অভিমান করিয়া, সমাজকে বিদ্রূপ করিয়া "স্নেহলতা দিদি" যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আমিও কেন সেই পথ অনুসরণ করিয়া পিতামাতাকে এ দায় হইতে মুক্ত করিয়া দিই না! এ চিন্তাতেও আমি শিহরিয়া উঠিলাম। অনাহারে দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কেহ আমার সন্ধানও লইল না। উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া অভিমানে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিলাম। কাহার স্নেহ-কোমল করস্পর্শে মুখ তুলিলাম। মা

অশ্রুসিক্তচক্ষে—করুণার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন—"আর আমায় জ্বালাস্‌নে মা! থাবি আয়, উঠে আয়।" আমার আবেগ-উদ্বেলিত অন্তরের আর্ত্তনাদ হাহাকার করিয়া মাতৃক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমি মার হাতের মধ্যে মুখ চাপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—"তোমার পায়ে পড়ি মা! আমি যদি তোমাদের জঞ্জাল হ'য়ে থাকি, আমায় এক ভরি—"

"ছি! ওকি কথা মা!"—মা আমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন।

বাবা তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন, তিনি আমার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

আজ বাবা দায়মুক্ত,—আজ আর আমি পিতৃগৃহের জঞ্জাল নহি। উঃ! বাবা যে কতখানি নিরুপায় হইয়া আমাকে এই,—নাঃ, থাক্—আজ আর সে চিন্তা করিয়া লাভ কি!

পুনরায় তখন প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতেছিল। বজ্রধ্বনিতে চমকিত হইয়া চিন্তামুক্ত হইলাম। বহুক্ষণ নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে মনপ্রাণ অস্থির হইতে লাগিল। কোন একটা কিছু করিবার জন্য ইতস্তত অনুসন্ধান করিতে করিতে আমার মৃতা সপত্নীর হাত-বাক্সটির প্রতি দৃষ্টি পড়িল। ইচ্ছা হইল—আমার অ-দৃষ্টা, অপরিচিতা 'দিদিটির' কোন্ স্মৃতিচিহ্ন তাহার মধ্যে আবদ্ধ আছে একবার দেখি। বাক্স উন্মুক্ত করিয়া তাহার প্রতি দ্রব্যটি সযত্নে দেখিতে লাগিলাম। বাক্সের সর্ব্ব নিম্নতলে দেখিলাম—একখানি খাতা। তাহার উপর লেখা আছে—'শ্রীলক্ষ্মী দেবী'। অকস্মাৎ বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল,—না-জানি ইহার মধ্যে তাঁহার প্রাণের কোন্ গোপন কথা লুক্কায়িত আছে। ক্ষিপ্রহস্তে খাতার পাতা উল্টাইয়া তাহাতে লিখিত প্রথম ছত্র পাঠ করিয়াই আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। বাহিরে তখন অবিশ্রান্ত ধারাপাতে একটা প্রবল প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছিল। আমি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া একাগ্র চিত্তে পড়িতে লাগিলাম।—

"অশ্রু"

প্রথম বিন্দু

"—তবে মানুষের মূর্ত্তি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলে কেন নিষ্ঠুর ঠাকুর! আজ জীবনের অকাল-সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার আমাকে পূর্ণগ্রাস কর্‌তে চতুর্দ্দিক্ থেকে ঘনিয়ে আস্‌ছে। এখনি কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে জীবনের শেষ আলোকরশ্মিটুকু একটা ফুৎকারে জন্মের মত নিভে যাবে,—বরদাতা, তবে কোন্ উদ্দেশ্যে এই ব্যর্থ জীবনের ভার বইতে মনুষ্যগর্ভে স্থান দিয়েছিলে? এ তুচ্ছ জীবনের আদি অন্ত একি নিষ্ফল রহস্যে পূর্ণ ক'রে দিলে ভগবান্! আমার জন্ম,—যেন একটা বিশ্বব্যাপী উল্কা-পাতের পূর্ব্ব আয়োজন। আজ বুঝি পৃথিবীর একাংশ বিষের আগুনে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে—পরপারের কোন্ নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হ'তে চলেছি। তাই হোক্ দয়াল! তোমার এ কৌতুক-ক্রীড়ার নিবৃত্তি করে তোমার রাজ্যের সুশাসনের সুবিচারের অবসান করে' এ অপ-রাধিনীকে জন্মের মত জন্মান্তরে নির্ব্বাসিত করে' দাও ধর্ম্মরাজ! নইলে এ গুরুভার বুঝি আর বইতে পারব না।

জীবনের এ-পারে ত বিচার হ'ল না। বিচার করবে কে? মানুষ? মানুষের সে ক্ষমতা, সে বিচার-বুদ্ধিই যদি থাক্‌বে, তবে আর দুঃখ কি? যারা নিজের চক্ষুকে, নিজের অঙ্গকে বিশ্বাস করে না, যারা সত্যকে সন্দেহ করে,—নিজের নীচতা, সঙ্কীর্ণতাকে অসত্যের আবরণে আবৃত করে', নিজের মহত্ত্বের মহিমা গেয়ে, নিজেই বড় হ'তে চায়—বিচার করবে সেই মানুষ? বিশেষতঃ এদেশের পুরুষ? তা আজ পর্য্যন্ত হয়নি, আজও হ'ল না, আর হবেও না। হয়নি বলে'ই ত' আমার মত কত অভাগী নিজের বিচার নিজেই করে' শাস্তি দিয়েছে নিজের পাষাণ প্রাণকে, প্রতিশোধ নিয়েছে নিজের উপরই। কিন্তু কলঙ্ক রটেছে কেরো-সিনের নামে, দোষারোপ হয়েছে সময় ও শিক্ষার উপর।

বলিহারি বিচার আমাদের কর্ত্তাদের! প্রাণ নিয়ে অবজ্ঞায় এমন তুচ্ছ ছিনিমিনি খেলা আর কোন দেশে আছে কিনা খুবই সন্দেহ হয়। বাবুরা বল্‌ছেন,—"তোমরা বেরিয়ে এস, তোমরা স্বাধীন, তোমরা আমাদের সমকক্ষ, কেননা তোমরাও মানুষ।" চোখ রাঙিয়ে কর্ত্তারা বল্‌ছেন—"খবরদার, এক পাও

এগিও না। পর্দ্দার উপর পর্দ্দা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে থাক', তোমরা দেবী।" কেউ দয়া করে' বল্‌ছেন—"তোমরা ওঠো, জাগো, তোমরাই শক্তি।" আর একদল বল্‌ছেন—"ওদিকে চেও না, ঘোমটার বহর বাড়িয়ে দাও, লজ্জাই তোমাদের ভূষণ।" আমরা যেন এক একটা নির্জ্জীব জড় পদার্থ। আমাদের নিজস্ব যেন কিছুই নেই। পরের হাতের খেলার পুতুল মাত্র।

তবুও সব মান্‌তে রাজি আছি, কিন্তু চাই—সুবিচার। শাসনের পূর্ণ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে এমন ভণ্ডামি আর সহ্য হয় না। সারা জীবনব্যাপী অত্যাচার-অবিচারের ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করে', মানুষের শরীর নিয়েও বেঁচে আছি যেন একটা পাথরের পাহাড়। জানি, এর বিচারকর্ত্তা নেই, তাই কোনদিন নালিশ কর্‌বার প্রবৃত্তি হয়নি। নালিশ শুন্‌বে কে? যারা শুন্‌বে, তাদের শুনে শুনে এসব সয়ে' গেছে। বলিদান কর্‌তে কর্‌তে তাদের প্রাণ হয়েছে ঘাতক; মন হয়েছে মাতাল। বল্‌তে গেলেই উপেক্ষায় উড়িয়ে দেবে,—সেই পুরোণো কান্না, ও আর ভাল লাগে না। তাই ত বলিনি। কিন্তু মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এর প্রতিশোধ আমি নেবো—নেবো—নেবো।

দর্পহারী আমার ডাক শুনেছেন, আজ আমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'তে চলেছে। কিন্তু এ-প্রতিশোধে প্রতিহিংসা নেই, প্রবঞ্চনা নেই। আছে—অভিমানের পূর্ণ তৃপ্তি, সহ্য-শক্তির শীতল সান্ত্বনা, এ আমার সারা জীবনের সাধনা। কতদিনের সঞ্চিত আমার ক্ষুব্ধ চিত্তের বেদনার ভার নিয়ে ত ওপারে যেতে পার্‌বো না। এ পারের এ আবর্জ্জনা, এ অশ্রু, এ পারেই রেখে যাবো। যদি কোন দিন কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর প্রতিকার হয়, তবে তার ফলভোগ করে যেন আমার অভাগী ভগ্নীগণ। আমি সে ফলের প্রত্যাশা করি না,—আর কর্‌লেই বা পাবো কোথা!

বলো ত সমাজ! ভূমিষ্ঠ হ'য়েই যে মাতৃহীনা হ'য়ে 'রাক্ষসী' নাম লাভ করেছিলাম, সেটা কি আমার ন্যায্য প্রাপ্তি? আর যে যাই বলুক,—বাবা কিন্তু আমায় ডেকেছিলেন—"লক্ষ্মী"। বাবার এ ভ্রম সংশোধন হয়েছে আজ। আজ বোধ হয় তিনি বুঝেছেন,—'লক্ষ্মী' নয় গো 'অলক্ষ্মী'। তখন এও বুঝ্‌তে পারেন-নি। তাই তিনি তাঁর মাতৃহারা কন্যাকে মাতাপিতার মিলিত স্নেহ দান করেছিলেন—তাঁর চিন্তাধারের সমস্ত সোহাগ অগাধ আদর আহ্লাদ দিয়ে। বারো বৎসর বুকে করে' বাঁচিয়ে রেখে, একদিন বাবা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমায় বিদায় করে' দিলেন। যাবার সময় কানে কানে বলে' দিলেন—"মা! এতদিন তোমার পরের জন্য পাহারা দিয়ে রেখেছিলাম, আজ যেখানে চল্‌লে,—সেইটাই তোমার আপনার বাড়ী, সেইখানেই আছে তোমার সত্যিকার 'মা'।" বল্‌তে বল্‌তে বাবা আবার কেঁদেছিলেন। আমার মা থাক্‌লে তিনিও নিশ্চয়ই বাবার মত কাঁদ্‌তেন। কিন্তু সে কান্নাও কেঁদেছিলেন আমার বাবা,—আমার স্নেহময় বাবা।

মাতৃহীনার স্নেহতৃষিত চিত্তে মনপ্রাণে শাশুড়ীকে সাদরে আহ্বান করে' নিলাম,—এই ত আমার 'সত্যিকারের মা'। নিঃস্ব ভিখারিণীর লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে ব্যর্থ আশায় চার বৎসর কাটিয়ে দিলাম,—ওগো! আমি মাতৃহারা, বড় অভাগী, স্নেহ-বঞ্চিতা। কিন্তু কি হ'ল? শাশুড়ীর বুঝি পরের মেয়ের সে অন্যায় আব্দার বেশী দিন সহ্য হ'ল না। একদিন কোন্ অশুভ মুহূর্ত্তে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। স্নেহের ক্ষুধার তীব্র বেদনা বুকে নিয়ে আরও একবৎসর কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু, এই বৎসরের প্রতিদিনে যা পেয়েছি, তা ভাব্‌তেও যে আজ আত্মসম্বরণ কর্‌তে পার্‌ছি না।

একদিন দ্বিপ্রহরে নিঃসঙ্গ সময় অতিবাহিত কর্‌বার জন্য নিজের ঘরে গিয়ে বাক্স খুলে' বস্‌লাম। আমার বিবাহের সময় পাওয়া, আত্মীয়-কুটুম্বদের দানের কাপড়গুলি তখনও আমার বাক্সে সাজান-গোছান ছিল। আমি তা ব্যবহার করে' তত আনন্দ পেতাম না,—যত পেতাম সময়ে-সময়ে দর্শন ও স্পর্শ করে'। তাই সেদিনও সেগুলি ঘরের মেঝেয় কেবল ছড়িয়ে নিইছি, এমন সময় শাশুড়ী ঘরের সম্মুখ দিয়ে চলে' গেলেন। অপাঙ্গে গৃহাভ্যন্তরের সমস্তই তিনি দেখে' নিলেন; এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সারামুখখানায় একটা গাম্ভীর্য্যের

ছায়া এসে পড়্‌ল। আমার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠ্‌ল।

পরদিন শুন্‌লাম, শাশুড়ী এক প্রতিবেশিনীর নিকট বল্‌ছেন—"কলিকাল মা, কলিকাল! নইলে আমরা দিন কাটাই ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া পরে', আর বোয়ের বাক্সে কাপড় ধরে না। হাঁরে হতভাগা! তুই যে এই খেয়ে না খেয়ে যা পাচ্ছিস্ সব এনে ঐ-শ্রীচরণে সমর্পণ কর্‌ছিস্, একটু লজ্জাও কি করে না?" সেই যে প্রথম আমার অলক্ষ্যে পৃথিবীর কোন্ প্রদীপটা চিরতরে নিভে গেল, তা তো আর জ্বালাতে পার্‌লাম না। জীবনের শেষ কটা দিন অন্ধের মত পথ খুঁজে' বেড়ালাম, কই,—কেউ তো আমায় সে-পথ আর নির্দ্দেশ করে' দিলে না? সে-পথ দেখালে শেষে আমার 'খোকাবাবু'। খোকাবাবু আজ আমার হাত ধরে' নিয়ে চলেছে—ঐ দুঃখ-দৈন্যের, সুখ-শান্তির শেষ সীমানার দিকে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ীর পার্শ্বের পথ দিয়ে ছোট-ছোট ছেলেরা শোভাযাত্রা করে' গান গেয়ে যাচ্ছিল,—শুন্‌লাম 'দরিদ্র-ভাণ্ডারের' জন্য ভিক্ষা কর্‌ছে। তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে' সমস্ত পোষাকী জামা-কাপড়গুলি একটা পোঁট্‌লা করে' বেঁধে ঝিয়ের হাতে দিয়ে বল্‌লাম—"দিয়ে আয়।" যার জন্য আমার স্বামীর নামে একটা মিথ্যা কথার সৃষ্টি হয়, সে আপদ্ বিদায় করে' দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ কর্‌লাম।

পৌষের কন্‌কনে শীত। সন্ধ্যার সময় গা ধুয়ে রান্না-ঘরে যাব। কাপড় ছাড়্‌তে গিয়ে দেখি অন্য কাপড়খানিও ভিজে। শাশুড়ীকে বল্‌লাম—"মা! একখানা যার-তার কাপড় আমায় একবারটি দিন্ না।" শ্লেষের সহিত শাশুড়ী বল্‌লেন—"তোমার আর কাপড়ের ভাবনা কি? বাক্স খুল্‌লেই কাপড়। বড়মানুষের মেয়ে তুমি,—দান-খয়রাতে দাতাকর্ণ, তোমার আবার কাপড়ের ভাবনা?"—শেষ পর্য্যন্ত শুন্‌বার অপেক্ষা না করে' কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে রান্নঘরে চলে' গেলাম। না গিয়েই বা কর্‌ব কি? ও-কথার কোন উত্তর আছে কি না, সে কথাটাও ভাব্‌তে পারিনি। শুধু ভেবেছিলাম,—তবুও আমাদের বাঁচ্‌তে হবে, আমাদের জন্য নয়—অপরের জন্য!

আগুনের আঁচে পরনের কাপড় প্রায় শুকিয়ে গেল। শুকুল না শুধু এই চোখের জল।

চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম—অন্ধকার। ভুলের উপর ভুল করে' রান্না শেষ কর্‌লাম। ছোট দেবর আহার কর্‌ছিল,—আর আমি পরিবেষণ কর্‌ছিলাম—দেবর আব্দার করে' বল্‌লে—"বউদি! আমায় আর-একখানা মাছ দাও না।" আমি দেবার পূর্ব্বেই শাশুড়ী এসে আমার হাত থেকে মাছের ঝোলের কাঁসিখানা কেড়ে নিয়ে বল্‌লেন—"দাও, তোমাকে দিতে হবে না। আমি নিজে হাতে করে' না দিলে—ও হতভাগার ভাগ্যে ত কিছু জোটে না।"

বাক্য-বাণের বজ্রাঘাত বুকে নিয়ে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লাম। শাশুড়ী আরও জানালেন,—সেই দিন থেকে আমার পাকশালে প্রবেশ নিষেধ। এমন কি,—সংসারের কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ কর্‌বার অধিকার আমার থাক্‌ল না।

কর্ত্তব্যবিচার ভুলে গিয়ে ওই অন্যায়' আদেশের বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল। আমি শয়নকক্ষে গিয়ে অদৃষ্টের উপর অভিসম্পাত করে' নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌তে লাগলাম। তা ছাড়া আর কোন উপায়ান্তর আছে কিনা—এ-বিচার কর্‌বার শক্তিও তখন আমার ছিল না। সে-রাত্রি অনাহারে গত হ'ল।

পরদিন প্রাতে আর শয্যাত্যাগ কর্‌তে পার্‌লাম না। প্রবল জ্বরে আমার উত্থানশক্তি লোপ করে' দিলে। মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত দিন নির্জ্জন কক্ষে একাকী পড়ে' থাক্‌লাম,—কেউ একবার আমার সন্ধানও নিলে না।

কিসের ছুটিতে সন্ধ্যার সময় সদানন্দ স্বামী আমার বাড়ী এলেন। প্রায় একঘণ্টা পরে তিনি আমার অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে' হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—"কি গো, মার সঙ্গে 'অসহযোগ' করে' 'হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক্' করে' পড়ে' আছ নাকি?"

আমার মাথার মধ্যে কেমন করে' উঠ্‌ল। দুই হাতে মাথা টিপে' উপুড় হ'য়ে পড়ে' থাক্‌লাম। কোন উত্তর দিলাম না। আমার মর্ম্মবেদনাকে যে এমন

রহস্য-বিদ্রূপে উপেক্ষা কর্‌তে পারে, তাকে আর কি উত্তর দেব'! আমি নীরব থাকায় স্বামী পুনরায় বল্‌লেন—"কি, উত্তর দিচ্ছ না যে! অন্ধকারে পড়ে' আছ কেন?"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার মুখ থেকে বের হ'য়ে গেল—"এখানে আমার আর স্থান নেই,—এ-সংসারে আমার আর কোন অধিকার নেই।"

স্বামী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—"তা কি হবে, তুমি যেমন 'আইন্ অমান্য' করেছ, মাও তেম্‌নি তোমার উপর ১৪৪ ধারা জারি করেছেন।" বল্‌তে বল্‌তে তিনি চলে' গেলেন। আমি আমার ঘৃণিত, নির্লজ্জ মুখখানাকে প্রাণপণ শক্তিতে উপাধানে চেপে হাঁপাতে লাগ্‌লাম। হায় রে! যে-দেশ নারীর জীবন নিয়ে এম্‌নি করে'ই ক্রীড়া করে, নারীর মর্য্যাদাকে এমনি করে'ই পদাঘাতে ভেঙে দেয়, সে-দেশের সমাজপতিদের কি সভ্যতার গর্ব্ব কর্‌তে একটু লজ্জাবোধও হয় না!

দ্বিতীয় বিন্দু

ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে কিসের আশায় যে বেঁচে রইলাম, তা ভগবান্‌ই জানেন। বিচারাধীন অপরাধীর মত প্রতিদিন একটা দণ্ডাজ্ঞার আশা নিয়ে আরও এক বৎসর কাটিয়ে দিলাম। এ দুর্যোগভরা জীবনে প্রাতঃ-সূর্য্যের ক্ষণিক রৌদ্র-রেখার মতই আমার অশ্রু-অন্ধ দৃষ্টির সম্মুখে কুড়িয়ে পেলাম—একদিন—আমার ননীর-পুতুল, মোমের ছবি খোকা-বাবুকে। আমার উৎপীড়ন-ক্ষত দেহে খোকাবাবুর কোমল স্পর্শকে নিবিড়ভাবে অবলম্বন করে' দিন কাটাতে লাগ্‌লাম। কিন্তু আমার ভবিষ্যতের আশার আলো প্রতিদিনের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারের অন্ধকারে মসি-মলিন হ'তে থাক্‌ল। বুঝ্‌লাম—অপরাধ কারও নয়;—এটা ঈশ্বরের অভিসম্পাত, বিধাতার বিড়ম্বনা। শাশুড়ীর মাতৃহৃদয়ের বদ্ধ ধারণা, আমি তাঁর পুত্রকে কোন্ যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ করে', মাতৃস্নেহের গণ্ডীর বাইরে এনে তাঁর সম্পূর্ণ পর করে' ফেলেছি; তাই তাঁর এই হিংসা, এই বিদ্বেষ। কিন্তু ওগো মা! তাও কি কখনও হয়। জগতে কি এমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি আছে, যাতে সন্তানকে মাতৃস্নেহের গণ্ডীর বাইরে আন্‌তে পারে? লৌকিক ও সমাজ-বন্ধন যত পবিত্র যত দৃঢ়ই হোক্—তা জন্ম-সম্বন্ধ মাতাপুত্রের স্বর্গীয় বন্ধনকে কস্মিন্ কালেও শিথিল কর্‌তে পারে না। তথাপি এই মাতৃহৃদয়ের মিথ্যা সন্দেহ কত জীবনের সুখ-শান্তিকে স্বপ্নের মত লুপ্ত করে' দেয়;—তখন কোন যুক্তিতর্ক সে স্নেহান্ধ চিত্তে স্থান পায় না। আর তার উপলক্ষ ও অন্তরায় হয় আমারই মত অসহায় অভাগীরা। যাদের হাসি-কান্নার সমান আদর, সুখ-দুঃখের মূল্য এক।

বড়দিনের ছুটিতে একঝুড়ি কোপি ও কমলা নিয়ে স্বামী বাড়ী এলেন। শাশুড়ীর মুখখানা কেন যে অস্বাভাবিক গম্ভীর হ'য়ে গেল বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। প্রতিমুহূর্ত্তেই একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার বুকের মধ্যে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।

বৈকালে শাশুড়ী কোপি কমলার ঝুড়িটাকে উদ্দেশ করে' এক প্রতিবেশিনীর নিকট বল্‌ছিলেন,—"ছেলের জিনিস আমি ছুঁতে চাইনে। তাঁর ছেলে বউ তিনি সাম্‌লান্, তাঁর পয়সা-প্রত্যাশী হবার আগেই যেন আমার মরণ হয়।"

কথাগুলো আমার স্বামীকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলা হচ্ছিল। স্বামী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে' বারান্দার অপর প্রান্ত হ'তে ধীরে ধীরে চলে' গেলেন। সেই দিন নিভে গেল আমার জীবনের প্রধান প্রদীপটা। তার পর স্বামীর মুখে আর হাসি দেখিনি। বাক্যে ব্যবহারে সময়-সময় তিনি আমাকে মর্ম্মান্তিক আঘাত দিতেও লাগ্‌লেন। তাঁর সদানন্দ স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হ'য়ে তাঁকে উদাস গম্ভীর করে' দিলে। এ-সকলের জন্যই দায়ী হলাম আমি। প্রতিবাদ কর্‌বার উপায় নেই,—আমাদের সে সৎ-সাহসটাকে সমাজ সহ্য কর্‌তে পারেন না। তাই আমাদের গলা টিপে সে-ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করে' রেখেছেন; পার, নীরবে সহ্য কর, না-পার, নিজের পথ নিজে দেখে নাও।

দিবারাত্র কায়মনোবাক্যে ডাক্‌তে লাগ্‌লাম,—হে মুক্তিদাতা! আমার এ-বন্ধন থেকে মুক্ত করে' দাও। এ-বিপদ্ থেকে উদ্ধার করে' দাও বিপদ্‌ভঞ্জন!—

কিন্তু খোকাবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেল্‌ত। আমি তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে' সব ভুলে যেতাম। মনের মধ্যে কত আশা-আকাঙ্ক্ষার উদয় হ'য়ে আমাকে উৎফুল্ল করে' ফেল্‌ত। ক্ষণিকের জন্যও সংসার সুশ্রী দেখ্‌তাম।

প্রতিদিন একটু একটু জ্বর হ'তে লাগ্‌ল। একটু একটু কাশি ও বুকে ব্যথা। শরীরে বল পাই না, সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি, সামান্য শব্দে চম্‌কে উঠি, বুকের মধ্যে কাঁপ্‌তে থাকে। অন্যে আমার সন্ধান না নিলেও অন্ততঃ আমি বুঝ্‌লাম—আমার কি হয়েছে। শারীরিক যতটুকু পরিশ্রম কর্‌বার ক্ষমতা ছিল তার দ্বিগুণ পরিশ্রম করে' সাংসারিক কাজ কর্ম্ম কর্‌তে হ'ত শুধু 'অসুখের ভাণ করে' দিন রাত শুয়ে থাকি'—এই বাক্যবাণের হাত হ'তে নিজেকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে।

সে-দিন বৈকালে ঝি খোকাকে নিয়ে বেড়াতে গেছে। আমি রাস্তার দিকের জানালায় দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে বাইরে চেয়ে ছিলাম। সহসা স্বামী এসে দৃঢ়স্বরে বল্‌লেন,—"ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তুমি বড় নির্লজ্জ।"—আমার শরীরের রক্তপ্রবাহ যেন বন্ধ হ'য়ে গেল,—বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হ'য়ে গেল। স্বামী আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে'ই চলে' গেলেন। যে সত্যকথাটা বল্‌লেও অন্ততঃ তখন তিনি তা বিশ্বাস করতেন না, আমি লজ্জায় তা বল্‌বারও চেষ্টা কর্‌লাম না। কিন্তু ওগো অন্তর্যামী! তুমি ত সাক্ষী। আমি দেখ্‌ছিলাম,—যা সহস্রবার দেখেও আমার তৃপ্তি হয় না, প্রতিদৃষ্টিতে যাতে নূতন সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে পাই,—ঝি খোকাকে কোলে নিয়ে রাস্তার অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল,—আমি দেখ্‌ছিলাম—খোকার মুখখানি।

সে-দিন থেকে স্বামী আমার সহিত বাক্যব্যয় কর্‌তেও বিরক্তবোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

আর একদিন প্রাতে বাধ্য হ'য়ে স্বামীর আল্‌নায় টাঙ্গান জামার পকেটে হাত দিলাম—গোটা কতক পয়সার জন্যে। স্বামী সেটা দূর থেকে লক্ষ্য কর্‌লেন, কিন্তু কিছু বল্‌লেন না। কিছুক্ষণ পরে আমিও দেখ্‌লাম—তিনি তাঁর জামার পকেট্ থেকে মানিব্যাগ্‌টি নিয়ে গেলেন, বোধ হয় আমার অজ্ঞাত কোনো স্থানে রাখ্‌বার জন্যে। পূর্ব্বে ভেবেছিলাম—স্বামীর অজ্ঞাতে একার্য্য করার আমার অধিকার আছে কি না;—অধিকার না থাকলেও,—যে কারণে স্বামীর অর্থে হস্তক্ষেপ কর্‌বার স্পর্দ্ধা করেছি,—তা তাঁকে পরে জানাব। কিন্তু বুঝ্‌লাম—এতটুকুতেও আমার অধিকার নেই,—সে স্পর্দ্ধার ফলে হ'লাম—অবিশ্বাসিনী! এ অপমানের ব্যথাটাও অম্লানবদনে মাথা পেতে নিলাম। কেন না-নেব? অভিশপ্ত জীবনের মান অপমান,—তাতে কোনো প্রভেদ আছে?

সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারে আমি রাস্তার দিকের জানালায় দাঁড়িয়ে অপর একজনের সঙ্গে গোপনে কথা বল্‌ছিলাম ও পয়সা গুনে দিচ্ছিলাম। অকস্মাৎ কোথা থেকে ঝড়বেগে স্বামী এসে দৃঢ়মুষ্টিতে আমার একখানা হাত চেপে ধরে' পরুষ কণ্ঠে বল্‌লেন,—"সত্য বল—ও কার সঙ্গে কথা বল্‌ছিলে?"

স্পর্শে বুঝ্‌লাম তাঁর সর্ব্বশরীর থরথর করে' কাঁপ্‌ছে। তাঁর মুখের দিকে তাকাতে আমার সাহস হ'ল না। আমি কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে জানালায় বসে' পড়্‌লাম। তার পর হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লাম,—"বিশ্বাস কর্‌বে কি যদি বলি কার সঙ্গে কথা বল্‌ছিলাম?"

মুষ্টিমধ্যে আমার হাতখানাকে সজোরে একবার পিষ্ট করে' একটা ঝাঁকানি দিয়ে স্বামী বল্‌লেন,—"ভণিতা শুনতে চাই নে,—শীঘ্র বল।"

আমি বল্‌লাম—"যা বিশ্বাস কর্‌বে না, তা বলে' লাভ কি?"

ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে বিরক্তিভরে আমার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে দৃঢ়স্বরে স্বামী বল্‌লেন,—"বটে!" তার পর গৃহত্যাগ করে' চলে' গেলেন। আমার বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগ্‌ল। আমি আমার অবসন্ন দেহটাকে জানালার কবাটে রক্ষা করে' ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, স্বামী অবিশ্বাস কর্‌লেও তুমি ত তা পার্‌বে না বিশ্ব-স্বামী! তোমার দৃষ্টিকে আড়াল করে' ত কারও কিছু কর্‌বার ক্ষমতা নেই পরমেশ্বর! বাড়ীতে কদিন থেকে দুধ আসা বন্ধ হয়েছে। অন্যায় বুঝেও, আমি বাধ্য হ'য়ে খোকার

জন্ম গোয়ালা-বুড়ির কাছে গোপনে একটু দুধ নিয়েছিলাম। জানালা থেকে তারই দাম দিচ্ছিলাম;—আর সেইজন্যেই স্বামীর অর্থে হাত দিয়েছিলাম। কিন্তু এ অপরাধের কঠোর শাস্তি কি আমায় সারা-জীবন ব্যেপে' ভোগ করতে হবে? দাও প্রভু, তোমার গুরুদণ্ড,—আর বিনিময়ে—ত্রাণ করে' দাও এ মিথ্যা কলঙ্কের হাত থেকে।

খোকার অসুখ,—কঠিন ব্যাধি,—রক্ত-আমাশয়। একদণ্ড তার কাছ ছাড়ার উপায় নেই। রাত্রি জাগরণ করে' করে' আমার নিজের শরীরের ভারই বহন করবার শক্তি লোপ পেতে লাগল। সংসারের কাজকর্ম্ম নিয়মিত করতে পারিনে। সেজন্যে বাড়ীর ঝির সঙ্গেও অপরাধিনীর মত শঙ্কিত চিত্তে কথা বলতে হয়। সে-দিন সকালে খোকার রোগশীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে হ'ল,—আর সঙ্গে সঙ্গে আমার অবাধ্য অশ্রুকে কোনমতে দমন করতে পারলাম না। ঠিক সেই সময় শুনলাম শাশুড়ী ঝিকে বলছেন—"আর কতকাল বাপু বোয়ের সেবা করব? যাঁর বৌ তিনি এর ব্যবস্থা করুন।"

কাশতে কাশতে বুকের ব্যথা হাতে চেপে উপুড় হ'য়ে পড়লাম,—শ্লেষ্মার সঙ্গে যা দেখলাম, তাতে বেশ বুঝলাম,—আমার ব্যবস্থা আর কারও করতে হবে না ঠাকরুণ,—ভগবান্ আমার ব্যবস্থা করেছেন। তবে আমাকে এস্থান থেকে যত শীঘ্র হয় বিদায় হ'তে হবে।

সন্ধ্যার সময় বসে' বসে' অতিকষ্টে ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলাম। কারণ, ঝিয়ের উপর হুকুম ছিল যেন সে আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরখানি ঝাঁট না দেয়। দুই একবার হাত নাড়তেই ক্লান্ত হ'য়ে জানলার সম্মুখে মাথা রেখে হাঁপাতে লাগলাম। বারান্দা থেকে শাশুড়ী বললেন,—"এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড,—মা'গো! বাবার জন্মেও দেখিনি! ঘোর সন্ধ্যেবেলা গেরস্তবাড়ী ঝাঁটা নাড়তে আছে?"—আমার বুকের স্পন্দন-শব্দ যেন আমি সুস্পষ্ট শুনতে পেলাম। দারুণ শীতেও আমার আপাদমস্তক ঘেমে উঠল। মনে মনে বললাম,—"দোহাই তোমাদের, দয়া করে' আমায় বিদায় করে' দাও!"

স্বামী বোধ হয় আমার মনের কথা জানতে পারলেন। না পারবেনই বা কেন? তিনিই ত আমার বিধাতা, তিনিই ত আমার দেবতা। কিছুক্ষণ পরেই শুনলাম স্বামী শাশুড়ীকে বলছেন,—"মা! কিছুদিনের জন্যে ওদের এখান থেকে পাঠিয়ে দিই। দিনরাত আর এ বকাবকি ভাল লাগে না।"

শাশুড়ী বললেন—"সে তোমার খুসি! তোমার বোয়ের এখানে কষ্ট হয়, তুমি তাঁকে হিল্লী রাখ দিল্লী রাখ,—তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

স্তব্ধ হ'য়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে—"বেশ, তবে তাই হবে"—বলেই' স্বামী দ্রুতপদে আমার কক্ষে প্রবেশ করে' বললেন—"তোমার জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখ,—কালই তোমায় রেখে আসব।"

আজ নিজের প্রাণকে ধিক্কার দিচ্ছি,—কেন তখন ক্ষণিকের জন্যে প্রাণের দুর্ব্বলতা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করেছিলাম? কেন আমি আত্মসম্বরণ করতে পারিনি! আমি দুই হাতে স্বামীর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললাম—"আমার অপরাধ?"

দুই হাত পেছিয়ে গিয়ে তিনি বললেন,—"একহাতে তালি বাজে না। কেন আমি তোমার জন্যে এত অশান্তি ভোগ করব!"

চোখ মুছে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,—"ওগো—দোহাই তোমার—তুমি তাই কর। আমাকে জন্মের মত এখান থেকে বিদায় করে' দাও। তোমার জন্য আমি সারা-জীবনের অশান্তি বুক পেতে নেব,—সেটা আমার নারী-ধর্ম্মের কর্ত্তব্য,—না নেওয়াই মহাপাপ। কিন্তু তুমি কেন আমার জন্যে এ অশান্তি ভোগ করবে!"

স্বামী দ্বিরুক্তি না করে' করুণ দৃষ্টিতে আমাকে একবার লক্ষ্য করে' অস্থিরভাবে গৃহত্যাগ করে' চলে' গেলেন।

তৃতীয় বিন্দু

কঙ্কালসার রুগ্ন খোকাকে বুকে করে' আমার আজন্ম-পরিচিত পিতৃস্নেহ-বেষ্টিত শৈশবের খেলাঘরে ফিরে' এলাম। কিন্তু, অন্তরের অশান্তির আগুন দ্বিগুণ হ'য়েই জ্বলতে থাকল,—তার কণামাত্রও উপশম হ'ল না।

বাবার মুখ সর্ব্বদাই বিষণ্ণ,—কিসের চিন্তায় দিবারাত্রি অন্যমনস্ক! তাঁর স্বভাব আমি জীবনে কখনও এরূপ দে'খ নি। মনে মনে স্থির করলাম,—এর কারণও বুঝি বা আমিই।

বাবা খোকার ও আমার যথাসাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। স্বামী-গৃহের পরিত্যক্তা জঞ্জাল, পিত্রালয়ের গলগ্রহের দিন আর যায় না;—কিন্তু তিন মাস চ'লে গেল। খোকার অসুখ মধ্যে একটু কম প'ড়ে আবার যে বৃদ্ধি হল সে আর কম্‌ল না,—ভুগে ভুগে মাণিক আমার এখন-তখন হল। আমিও শয্যা নিলাম,—আমার আর উত্থানশক্তি থাকল না। তার পর একদিন যা হল,—তা যে আর ভাব্‌বারও শক্তি আমার নেই। হে ঠাকুর! সেইদিনের ঘুমটাই যদি আমার শেষ ঘুম হত!

খোকার শেষ অবস্থা। কাশ্‌তে কাশ্‌তে আমার গলা দিয়ে অনেকটা রক্ত পড়্‌ল। সর্ব্বশরীর ঘেমে উঠে অবসাদে কখন ঘুমিয়ে পড়্‌লাম। সে কাল-ঘুম ভাঙ্‌বার পূর্ব্বেই আমার পোষা-পাখী আমায় ফাঁকি দিয়ে উড়ে গেল। আঘাতের উপর আঘাত খেয়ে খেয়ে প্রাণ হয়েছিল বজ্রকঠিন। তবুও একটা বুকফাটা আর্ত্ত-স্বরে সারা বাড়ীখানাকে চম্‌কে দিলাম। বাবা আমার মাথাটাকে দুই হাতে চেপে শ্লেষ্মা-রুদ্ধ-স্বরে বল্‌লেন —"চুপ কর মা,—সে যদি তোমার হ'ত তবে তোমারই থাকৃত।"

সে-দিন সকালে উঠেই বাবা সহরে চ'লে গেলেন,—ব'লে গেলেন—একটা মোকর্দ্দমা আছে। নিয়মিত ঔষধ খাবার জন্যে আমাকে বারম্বার ব'লে গেলেন। হায় রে! এখনও নাকি ঔষধ খেয়ে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে!—আমার প্রাণ যে তখন চিকিৎসা,—ঔষধের অনেক দূর ব্যবধানে গিয়ে পড়েছে। আমি সারাদিনের ঔষধ গোপনে নালির মুখে ঢেলে দিলাম।

সন্ধ্যার সময় বাবা উন্মত্তের মত, বিচলিত পদে এসেই আমার শয্যার একপার্শ্বে ব'সে পড়্‌লেন। মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লেন—"আচ্ছা মা! তোমার গহনাগুলো সব এনেছ কি?" এ প্রশ্নের কারণ চিন্তা করবারও অবসর আমাকে না দিয়ে তিনি পুনরায় বল্‌লেন,—"আচ্ছা এখন থাক্। তুমি আজ কেমন আছ?"

কেমন আছি তা ভগবান্ জানেন। বাবা আমার উত্তর না শুনেই উঠে যাচ্ছিলেন। আমি বল্‌লাম—"ভালো না।"

তিনি আমার ললাট স্পর্শ ক'রে বল্‌লেন,—"আজ যেন জরটা বেশী হয়েছে মনে হচ্ছে।"

আমি বল্‌লাম,—"কিসের মোকদ্দমা ছিল, বাবা?"

"সে আর শুনে কি করবে মা!"—ব'লেই তিনি তাঁর শুষ্ক মলিন মুখখানা ফিরিয়ে চ'লে গেলেন।

পরদিন আমাদের গ্রামের 'বড়লোক' বেণী দত্ত আমাদের বাড়ীর পাশের পথে দাঁড়িয়ে বাবাকে লক্ষ্য ক'রে চীৎকার ক'রে ব'লে গেল,—"কি হে মাধব ঠাকুর! ভালয় ভালয় টাকা দেবে, না বাপের ভিটে নিলেমে চড়াবে? বড় না ঘটা ক'রে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলে! তখন মনে ছিল না,—যে, দেনা শোধ করতে হবে?"

মুহূর্ত্তের জন্যে একবার ভূমিকম্প হ'য়ে গেল। তার পর বেশ বুঝ্‌লাম—বাবার কিসের মোকর্দ্দমা, কেন তিনি আমার গহনার সন্ধান নিচ্ছিলেন। কিন্তু, সে গহনায় ত বাবার কোন দাবী দাওয়া নেই। তবুও যদি সে-গুলো আজ থাকৃত! তাও যে সব ননদের বিয়েতে বন্ধক পড়েছে। এখন উপায়? ভগবান্! এখনও কি আমাকে বাঁচ্‌তে হবে? এখনও কি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নি? ভাব্‌তে পার্‌লাম না। কাশ্‌তে কাশ্‌তে অস্ফুটস্বরে ডাক্‌লাম,—"বাবা—"।

আকাশ ঘোর-মেঘাচ্ছন্ন; স্তব্ধ প্রকৃতির উদাসগাম্ভীর্য্য প্রতি মুহূর্ত্তেই একটা প্রলয়ঝঞ্ঝার ভয় দেখাচ্ছে। এস কাল-বৈশাখী! তোমার ধ্বংসোন্মুখী রুদ্রমূর্ত্তি নিয়ে;—তাণ্ডব নৃত্যে ধ্বংস ক'রে দাও এ রাক্ষসীর অভিশপ্ত জীবন! দাও প্রভঞ্জন! তোমার ভীম পরাক্রমে ভেঙে চুরে লুপ্ত ক'রে দাও—এ কলঙ্কিত অস্তিত্ব। এস বারিধারা! তোমার অবিশ্রান্ত পতনপ্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যাও এ অস্পৃশ্য দেহ! ও কোন্ শয়তানীর শেষ-বিদায়ের বরণ-বাদ্য বাজাচ্ছ বজ্রধ্বনি?

তোমার গুরু গর্জ্জনে আর হৃৎকম্প হয় না, ইচ্ছা হচ্ছে—তোমারই প্রতিধ্বনির সঙ্গে মিশে চ'লে যাই, ওপারের ঐ মায়া-মুক্তির খেয়া-ঘাটে। যেখানে আমার খোকা-বাবু আমারই জন্যে অপেক্ষা করছে—এই পাপ-পুরের পঙ্কিল পথ চেয়ে।. যাই রে আমার মাণিক!—

বাবা একখানা চিঠি হাতে নিয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমার নিকটে এসেই কি যেন বল্‌তে গিয়েই গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। তার পর আমার অবাধ-অশ্রু মুছিয়ে দিতে দিতে বল্লেন,—"ছি মা! মরতে চলেছ,—এখন একটু শান্ত হও!"

বাবার একখানা হাত আমার দুই হাতের তালুতে চেপে বল্লাম,—"এ তুমি কি করেছ বাবা? আমার জন্যে শেষে ফকির সাজ্‌লে?"

একটু অনুযোগের স্বরেই বাবা বল্লেন,—"তোমার সব কথায় কান দেবার দরকার কি লক্ষ্মী?"

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লাম,—"ও কার চিঠি বাবা?"

বাবা চিঠিখানাকে একবার লক্ষ্য ক'রে বল্লেন,—"হ্যাঁ,—তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণ লিখেছেন;—তাঁর একলা বড় কষ্ট হচ্ছে;—বিজয় তোমাকে শীঘ্রই নিতে আস্‌বে।" ব'লেই তিনি একটা নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে ধীরে ধীরে চ'লে গেলেন। আমি সশব্দে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগ্‌লাম!

মৃত্যুপথের যাত্রী আমি,—এখনও আমার ডাক আস্‌ছে—স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। মানুষ এমনি অন্ধ বটে। আজ আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে। যে-দিন নির্য্যাতিত লাঞ্ছিত হ'য়ে নির্ব্বাসিত হয়েছিলাম,—তখন আমি বেশ জান্‌তাম,—আর-একদিন শেষ-যাত্রার বিদায়-ক্ষণে আমার আর-একবার পিছু থেকে ডাক পড়্‌বে। কিন্তু আমাকে আর কেউ ফেরাতে পারবে না। অনুগতকে অবজ্ঞায় লাঞ্ছিত ক'রে, পরে অনুশোচনায় তাকেই আহ্বান ক'রে না পাওয়ার ব্যথা বড় মর্ম্মান্তিক। আর এই না-পাওয়ার ব্যথার অনুভূতিই—আমার প্রতিশোধ। সে প্রতিশোধ আমার নেওয়া হ'ল। স্বামী আমাকে নিতে আস্‌ছেন—তাঁর অশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু মহাসিন্ধুর ওপারের আহ্বানে আমাকে আকুল ক'রে আকর্ষণ করছে—এ পারের ডাকে ত আমাকে আর ফেরাতে পারবে না। অপরাধ নিও না স্বামী; ক্ষমা কর মা ঠাকরুণ!

ঐ পশ্চিমাকাশে আমার সূর্য্য বুঝি জন্মের মত ডুবে গেল। ভুবন-ভরা আঁধারের পরপারে ও কার মুখখানি তার রূপের আলো জেলে ধ্রুবতারার মত আমারই পথ নির্দ্দেশ করছে—ভবসিন্ধুর জল-তরঙ্গের তালে তালে মিশে যাচ্ছে—মরণ-সঙ্গীতের করুণ মূর্চ্ছনা; আর তারই সঙ্গে লয় হচ্ছে,—ও বুঝি কোন্ দানবীর বিসর্জ্জনের উলুধ্বনি। এস কাণ্ডারী! তোমার তরী নিয়ে,—আমায় পার ক'রে দাও। ফেলো, স্বামী, এই জন্ম-অভাগিনীর শূন্য শয্যার শিয়রে দাঁড়িয়ে, এই উপেক্ষিতার উদ্দেশ্যে তোমার পাষাণ-প্রাণের একবিন্দু অশ্রুজল! তাতেই ভ'রে যাবে এ রূপা-কাঙ্গালিনীর শূন্য অঞ্জলি; আর তাই হবে আমার পথের সম্বল, তাই হবে আমার পরকালের সাথী!

শ্রী মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বেনো-জল

দশ

সমুদ্র!

সমুদ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, সে কি বিচিত্র!

সুমিত্রার মনে হোলো, এ যেন এক বিরাট বিস্ময় তার চোখের সাম্‌নে মূর্ত্তিমান হয়ে বিশ্ব জুড়ে থৈ থৈ করছে! সে যেন সৃষ্টিকে গ্রাস করতে চায়, পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিতে চায়! তার এ মূর্ত্তিও যেমন কল্পনাতীত, তার এ ধ্বনিও তেমনি ধারণাতীত,—সব দিক্ দিয়েই সে অপূর্ব্ব, তুলনারহিত!

সুমিত্রাও আজ সমুদ্রকে দেখে খানিকক্ষণের জন্যে তার বাচালতা ভুলে গেল। অবাক আর তন্ময় হয়ে নিস্পলক নেত্রে সেই সীমাহীন কৃষ্ণাভ-নীল জলরাশির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ যেন একটা নূতন জল-জগৎ,—সৃষ্টির প্রথম দিনের কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যে, স্বপ্নের মত আচম্বিতে জেগে উঠ্‌ল!

রতন সুধোলে, "সমুদ্রকে কেমন লাগ্‌চে, সুমিত্রা দেবী?'

বিহ্বল স্বরে সুমিত্রা বল্‌লে, "জানি না! আমার মনে আনন্দ হচ্চে আবার ভয়ও হচ্চে!"

সন্ধ্যার আকাশ যতক্ষণ না তিমিরের প্রলেপে চারিদিক ঢেকে দিলে, সুমিত্রা সে-দিন অভিভূতের মত ততক্ষণ সেখানে বসে' রইল। বাড়ীতে ফিরে এসেও অনেক রাত পর্য্যন্ত তার কানের কাছে একটা অশ্রান্ত, অপূর্ব্ব-গম্ভীর ধ্বনি বাজ্‌তে লাগ্‌ল—যেন জলধির বিপুল আলিঙ্গনে আবদ্ধ পৃথিবীর অব্যক্ত আর্ত্ত ভাষা!

সকালে বিনয়-বাবু বাড়ীর সকলকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে বেড়াতে বেরুলেন। বিনয়-বাবু ও সেন-গিন্নী আগে আগে, তারপরে সন্তোষ, কুমার-বাহাদুর ও সুনীতি এবং সর্ব্বশেষে রতন ও সুমিত্রা।

খানিক পরেই আনন্দবাবু ও পূর্ণিমার সঙ্গে দেখা,—তাঁরাও বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। আনন্দবাবু, বিনয়-বাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে হাসতে হাসতে বল্‌লেন, "ওহে, আজ সকালে রোগীও নেই দক্ষিণাও নেই!"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "কিন্তু সমুদ্রের সাদর সম্ভাষণ আছে!"

পূর্ণিমা এসে প্রথমে সুনীতি তারপর সুমিত্রার সঙ্গে কথা কইলে। সুনীতি তার সঙ্গে কুমার-বাহাদুরের পরিচয় করিয়ে দিলে। তারপর রতনের কাছে গিয়ে অনুযোগের স্বরে পূর্ণিমা বল্‌লে, "আজ সকালে আমাদের ওখানে যাবেন ব'লেও গেলেন না যে?"

রতন বল্‌লে, "সকাল তো এখনো উত্তীর্ণ হয়ে যায়-নি, পূর্ণিমা দেবী! বেড়িয়ে ফিরে যেতুম।"

কুমার-বাহাদুর চুপিচুপি সন্তোষের কানে কানে বল্‌লেন, "মিঃ ঘোষের মেয়ে যে এত সুন্দরী, তা জান্‌তুম না!'

সন্তোষ বল্‌লে, "খালি সুন্দরী নয়, মিঃ ঘোষের সমস্ত টাকা ঐ পূর্ণিমাই পাবে।"

প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে পূর্ণিমার দিকে আর-একবার চেয়ে দেখে কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "পূর্ণিমার সঙ্গে তোমাদের রতনের খুব ঘনিষ্ঠতা আছে দেখ্‌চি। ও-লোকটাকে তোমার বাবা কেন যে আমাদের সঙ্গে টেনে আনেন, তা জানি না! ও কি আমাদের সঙ্গে মিশ্‌বার উপযুক্ত'?"

সন্তোষ বল্‌লে, "ঐ তো বাবার দুর্ব্বলতা! যাকে পছন্দ হবে, তাকে একেবারে মাথায় তুল্‌বেন!"

সকলে ক্রমে স্বর্গদ্বারের কাছে এসে পড়্‌লেন। সেখানে খুব জনতা। তীর্থযাত্রীরা দলে দলে সমুদ্রের জলে গিয়ে নাম্‌ছে এবং প্রবল তরঙ্গের ধাক্কায় বার বার ওলট-পালট খেয়ে পড়্‌ছে।

পূর্ণিমা বল্‌লে, "রতনবাবু, এখানে ভারি ভিড়! কল্‌কাতা থেকে এসে এখনি আবার জনতার ভিতরে গিয়ে পড়্‌তে ভালো লাগ্‌চে না—চলুন, যে-দিকে লোক-জন নেই সেইদিকে বেড়িয়ে আসি!"

রতন বল্‌লে, "চলুন।"

তারা দুজনে একদিকে চ'লে গেল—সুমিত্রা নীরবে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুনীতি বল্‌লে, "তুইও যা না ওদের সঙ্গে!"

সুমিত্রা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, "না!" ব'লেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে সে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

সুনীতি অবাক হয়ে গেল সুমিত্রার ভাব-গতিক দেখে, এবং কুমার-বাহাদুর নিজের মনেই একটুখানি মুখ টিপে হাস্‌লেন।.........

পরদিন বৈকালে বাড়ীর সাম্‌নের চাতালে বিনয়-বাবুদের চায়ের বৈঠক বসেছে। রতন ছাড়া আর সবাই সেখানে উপস্থিত ছিল।

কথা হচ্ছিল সমুদ্র-স্নানের এবং কবে সমুদ্র স্নান কর্‌তে নেমে কুমার-বাহাদুর একবার একজন জলমগ্ন লোককে ডাঙায় টেনে তুলেছিলেন, সেই গল্পটা তিনি বেশ রসিয়ে সবিস্তারে বর্ণন কর্‌ছিলেন।

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "লোকটা কতদূর ভেসে গিয়েছিল?"

কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "ঢেউএর ওপারে। একরকম তলিয়ে গিয়েছিল বল্‌লেই হয়।"

সুনীতি বিস্মিত হয়ে বল্‌লে, "ওখানে যেতে আপনার ভয় হোলো না?"

কুমার-বাহাদুর গর্ব্বিতভাবে বল্‌লেন, "ভয়? ভয় কাকে বলে আমি জানি না—বিপদের মুখে যেতে আমার আনন্দ হয়!"

কুমার-বাহাদুর তাঁর বীরত্ব ও সাহসের নমুনা দেবার জন্যে আর-এক নূতন গল্প ফেঁদে বস্‌লেন—লাঠি চালিয়ে কবে তিনি একবার বাঘ তাড়িয়েছিলেন, গল্পটা তারই। সেন-গিন্নী তাঁর বীরত্বে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, সন্তোষ বার বার তাঁকে তারিফ কর্‌তে লাগ্‌ল, বিনয়বাবু শুন্‌তে শুন্‌তে চোখ মুদে বেতের চেয়ারের উপরে আড় হয়ে পড়্‌লেন। সুমিত্রার কিন্তু আর সহ্য হোলো না, সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল এবং উৎসাহিত কুমার-বাহাদুর যখন আবার একটা বাহাদুরির ইতিহাসের গৌরচন্দ্রিকা সুরু কর্‌লেন, সেও অম্‌নি সেই ফাঁকে সকলের অজ্ঞাতসারে সেখান থেকে স'রে পড়্‌ল।

সুমিত্রা একেবারে সমুদ্রের ধার ঘেঁসে দাঁড়াল। সমুদ্রের ফুৎকারে তার দুই পা ভিজে গেল। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ নীলের বুকে চঞ্চল কৃষ্ণবিন্দুর মত জেলে-ডিঙিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নিজের মনে ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে সমুদ্রের ধার ধ'রে এগিয়ে চল্‌ল।

অনেকক্ষণ পরে তার আঁচল যখন নানা আকারের ছোট-বড় ঝিনুকে ভ'রে উঠ্‌ল, তখন সে আবার বাড়ীর দিকে ফির্‌লে। কিন্তু হঠাৎ দুটি লোককে দেখে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল! তার দিকে পিছন ফিরে, সমুদ্রের তীরে ব'সে ব'সে গল্প কর্‌ছে রতন আর পূর্ণিমা।

সুমিত্রা তাদের ডাক্‌তে গেল, কিন্তু কি ভেবে আর না ডেকেই তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চ'লে এল। বাড়ীতে এসে দেখ্‌লে, সবাই বেড়াতে চ'লে গেছেন। বাইরের ঘরে ঢুকে, ঝিনুকগুলো একটা টেবিলের উপরে রেখে, সে শ্রান্তভাবে একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে শুয়ে পড়্‌ল এবং দুই চোখ মুদে চুপ ক'রে রইল।... ... ...

প্রায় আধঘণ্টা পরে রতন যখন ফিরে এল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। সুমিত্রাকে একলা ঐ ভাবে শুয়ে থাক্‌তে দেখে একটু বিস্মিত হয়ে সে বল্‌লে, "এমন সময়ে তুমি শুয়ে যে?"—সুমিত্রার অনুরোধেই আজকাল সে তাকে আর 'আপনি' বলা ছেড়ে দিয়েছে!

রতনের গলা পেয়ে সুমিত্রা চোখ খুল্‌লে। মৃদুস্বরে শুধু বল্‌লে, "হুঁ।"

—"আর সবাই কোথায়?"

—"বেড়াতে গেছেন।"

—"তুমি যাও-নি কেন?"

—"আমি আগেই বেড়িয়ে ফিরেচি।"

—"একলা?"

—"হুঁ। দোক্‌লা কোথায় পাব বলুন!"

—"তোমার বাবার সঙ্গে যাওনা কেন?"

—"কুমার-বাহাদুর ব'কে ব'কে মাথা ধরিয়ে দেন।"

—"বেশ, এবার থেকে তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যেও।"

—"আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যেতে আপনার ভালো লাগ্‌বে কি ?"

—"তার মানে ?"

—"তার মানে, আমি তো পূর্ণিমা নই।"

রতন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে সুমিত্রার মুখের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে রইল। তার পর আস্তে আস্তে বল্‌লে, "তুমি যে পূর্ণিমা নও, আমি তা জানি। কিন্তু তোমার বেড়াতে যাওয়ার সঙ্গে ও নামটির সম্পর্ক কি ?"

—"আপনি পূর্ণিমার সঙ্গে যখন বেড়াতে যান, তখন আমাকে ডাকেন কি ?"

রতন হেসে ফেলে' বল্‌লে, "ও, এইজন্যে তোমার বুঝি অভিমান হয়েচে ? তোমার বুদ্ধি দেখ্‌চি এখনো পাঁচ-বছরের মেয়ের মত কাঁচা, নইলে এত সহজে অভিমান কর ! আচ্ছা, আচ্ছা, কাল থেকে বেড়াতে যাবার সময়ে তোমাকেও ডেকে নিয়ে যাব। কেমন, তা হ'লেই হবে তো ?"

সুমিত্রা অধীরভাবে ব'লে উঠ্‌ল, "না, না, না ! আপনাকে আর অতটা দয়া কর্‌তে হবে না, আমি বেড়াতে যেতে চাই না !"

রতন একটু হতভম্ব হ'য়ে বল্‌লে, "সুমিত্রা, আমি তোমার কথার তো কোন হদিস্ পাচ্ছি না !"

সুমিত্রা মাথা নেড়ে বল্‌লে, "আমি আর ছবি আঁকাও শিখ্‌ব না !"

—"কেন ?"

—"আমার ভালো লাগে না।"

রতন হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে, "বেশ, তা হ'লে কালকেই আমি কল্‌কাতায় চ'লে যাব।"

সুমিত্রা মুখ শুকিয়ে বল্‌লে, "কেন, আপনি চ'লে যাবেন কেন ?"

—"আমি তো তোমাদের ঘরের লোক নই, যেজন্যে তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, সে-সম্পর্ক উঠে গেলে আমার আর এখানে থাক্‌বার দর্‌কার কি ?"

সুমিত্রা স্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইল। রতন টেবিলের উপরের ঝিনুকগুলো নিয়ে আন্‌মনে নেড়েচেড়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

হঠাৎ চাতালের উপরে গলার সাড়া পেয়ে সুমিত্রা দেখ্‌লে, বাড়ীর সকলে বেড়িয়ে ফির্‌ছেন। সে ব্যস্ত-ভাবে বল্‌লে, "রতনবাবু !"

রতন মুখ তুলে' বল্‌লে, "বল।"

—"বাবার কাছে যেন আর যাবার কথা বল্‌বেন না !"

—"না বল্‌লে যাব কি ক'রে ?"

—"যাবেন আবার কোথায়, যেতে দিলে তো ! আমি ছবি-আঁকা শিখ্‌ব।"

রতন না হেসে থাক্‌তে পার্‌লে না !

এগারো

পরদিন বৈকালে রতন সুমিত্রাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুল। আগে আনন্দবাবুর ওখানে পূর্ণিমার খোঁজ নিতে গেল। সুমিত্রা বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, কিছুতেই ভিতরে যেতে রাজি হোলো না।

রতন বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দেখ্‌লে, আনন্দবাবু একলা ব'সে ব'সে কি লিখ্‌ছেন। তাকে দেখে আনন্দ বাবু লেখা বন্ধ ক'রে বল্‌লেন, "একটু বোসো রতন, হাতের কাজটা সেরে নিই।"

রতন বল্‌লে, "আপনি কাজ করুন, আমি আপনাকে ব্যস্ত করব না। আমি বেড়াতে যাচ্চি, পূর্ণিমা দেবীকে ডাক্‌তে এসেচি।"

আনন্দবাবু বল্‌লেন, "পূর্ণিমা যে অনেক আগে বেরিয়ে গেছে !"

—"একলা ?"

—"না, সন্তোষ আর কুমার-বাহাদুর আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলেন। শুন্‌লুম, তাঁরা পুরীর ভেতরটা দেখ্‌তে যাচ্চেন। পূর্ণিমাও যেতে চাওয়াতে তাঁরা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন। আমাকে কতকগুলো জরুরি চিঠি লিখ্‌তে হবে ব'লে আমি আর যেতে পার্‌লুম না।"

—"তা হ'লে এখন আমি আসি, বাইরে সুমিত্রা দাঁড়িয়ে আছেন" এই ব'লে রতন চ'লে এল।

তাকে একলা ফির্‌তে দেখে সুমিত্রা বল্‌লে, "পূর্ণিমা কৈ ?"

—"পূর্ণিমাকে নিয়ে তোমার দাদা আর কুমার-বাহাদুর সহর দেখতে গেছেন।"

সুমিত্রা একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে, "কুমার-বাহাদুর! তিনি এখানেও এসে জুটেচেন নাকি?"

রতন কোন জবাব দিলে না। তারও মনের ভিতরে কেমন একটা বিরক্তির আভাস জেগে উঠ্‌ছিল। কেন, সে কি পূর্ণিমাকে সহর দেখিয়ে আন্‌তে পার্‌ত না, কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে যাওয়া কেন? এই কথাই বার বার তার মনে হ'তে লাগ্‌ল। এদিকে পথ চল্‌তে চল্‌তে সুমিত্রা তার সঙ্গে অনর্গল কথা কয়ে যাচ্ছে, সে কিন্তু কিছুই শুন্‌ছিল না—কেবল মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক-ভাবে এক-একটা হাঁ বা না বল্‌ছিল মাত্র!

শেষটা তার মনে হোলো, পূর্ণিমার উপরে সে অন্যায় অভিমান করছে! কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে বেড়াতে গেছে ব'লে পূর্ণিমার উপরে তার রাগ করবার কি অধিকার আছে? পূর্ণিমার সঙ্গে সে বেড়াতে যায় ব'লে সুমিত্রাও কাল তার উপরে রাগ ক'রেছিল, আর এই লঘুচিত্ততা দেখে' সে খুব কৌতুকের হাসি হেসেছিল। অথচ আজ কিনা সে নিজেই ঠিক তেম্‌নি ছেলেমানুষীর পরিচয় দিচ্ছে! মানুষ কি যুক্তিহীন জীব! রতন এবার নিজের উপরেই চ'টে গেল!

রতনের ভাবগতিক দেখে সুমিত্রা শেষে বল্‌লে, "আচ্ছা রতনবাবু, আজ আপনি এমন মুখভার ক'রে আছেন কেন বলুন দেখি? আমার সঙ্গে বেড়াতে বুঝি ভালো লাগ্‌চে না?"

রতন একটু থতমত খেয়ে বল্‌লে, "এ আবার কি কথা! তোমার সঙ্গে বেড়াতে ভালো লাগ্‌বে না কেন?"

সুমিত্রা দুষ্টুমির হাসি হেসে বল্‌লে, "ভালো না লাগ্‌বার কারণ আছে রতনবাবু! পূর্ণিমা আমাদের সঙ্গে নেই!"

সুমিত্রা যে-রকম মুখফোঁড় মেয়ে, হয়ত এখনি আরো কি ব'লে বস্‌বে, এই ভেবে রতন সে প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বল্‌লে, "আঃ! আবার পাগ্‌লামি সুরু কর্‌লে?"..... ঐ দেখ, জেলেরা ডাঙায় জাল তুলেচে! চল, কি ধরেচে দেখে আসি।"

জেলেরা হরেক-রকমের সামুদ্রিক মাছ তুলে বাছাই কর্‌ছিল,—এমন রকম-বেরকমের মাছ সুমিত্রা আর কখনো চোখেও দেখেনি। এক-একটা মাছের আকার আবার এম্‌নি বেয়াড়া ও অদ্ভুত যে, সুমিত্রার ভারি হাসি পেতে লাগ্‌ল।... ...একটা রাঙা, পিণ্ডাকার পদার্থ দেখে সে বল্‌লে, "এটা কি রতনবাবু?"

—"জেলি ফিস্‌। এরা এখনো সৃষ্টির প্রায় প্রথম স্তরেই আছে। সমুদ্রের ঢেউ ওদের যেদিকে খুসি ব'য়ে নিয়ে যায়, ওদের নিজেদের মধ্যে গতিশক্তি কিছুই নেই।"

—"ওমা, এ আবার কি মাছ—মুখের ডগায় এত-বড় করাত!

—"ও হচ্ছে খাঁড়া-মাছ। আকারে ওরা আরো ঢের বড় হয় আর ঐ খাঁড়া দিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে। ওদের দলবদ্ধ আক্রমণে তিমিমাছ পর্য্যন্ত ভয় পায়।"—বল্‌তে বল্‌তে রতনের চোখ হঠাৎ একটু দূরে আকৃষ্ট হোলো।

সেখানটা হচ্ছে ইংরেজদের স্নানের জায়গা। রতন দেখ্‌লে, তীরের উপরে স্নানের পোষাকে দুইজন শ্বেতাঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর তাদেরই সুমুখ দিয়ে আস্‌ছে আগে আগে পূর্ণিমা, পিছনে কুমার-বাহাদুর ও সন্তোষ। হঠাৎ একজন সাহেব পূর্ণিমার দিকে ফিরে কি যেন বল্‌লে—কি বল্‌লে রতন তা দূর থেকে শুন্‌তে পেলে না বটে, কিন্তু পূর্ণিমার ভাবভঙ্গি দেখে বেশ বোঝা গেল, কথাটার অর্থ নিশ্চয়ই ভদ্র নয়।

কুমার-বাহাদুরও আপত্তি জানিয়ে কি-একটা কথা বল্‌লেন—কিন্তু সাহেব মুখ খিঁচিয়ে একটা হুম্‌কি দিতেই তিনি ঘাড় হেঁট্‌ করে' পূর্ণিমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন। সন্তোষ সাহেবটার সামনে গিয়ে বোধ হয় আবার তার ব্যবহারের প্রতিবাদ কর্‌লে, সঙ্গে সঙ্গে সাহেবটা পা তুলে তাকে এক লাথি মার্‌লে—সন্তোষ দু-হাতে পেট চেপে মাটির উপরে ব'সে পড়্‌ল।

রতন আর দাঁড়াল না—তীরের মত ঘটনাস্থলে ছুটে' গেল। তারপর কোন কথা বল্‌বার আগেই যে লোকটা সন্তোষকে পদাঘাত করেছিল, ঠিক তার নাকের উপরে

এমন এক প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিলে যে, গোড়া-কাটা কলাগাছের মত সে মাটির উপরে সটান লম্বা হোলো। দ্বিতীয় সাহেবটা পিছন থেকে রতনকে চেপে ধরলে। রতন কিন্তু এত সহজে কাবু হবার ছেলে নয়,—সেও চোখের নিমেষে নিজের পিছনে দুই হাত চালিয়ে লোকটার ঘাড় ও মাথা সজোরে চেপে ধ'রে, হঠাৎ এক হ্যাঁচ্‌কা দিয়ে সাম্‌নের দিকে এমন কৌশলে হেঁট হোলো যে, সাহেবের দেহটা রতনের দেহের উপরে শূন্যে ডিগ্‌বাজী খেয়ে, পিছন থেকে একেবারে সাম্‌নে এসে ধপাস্ ক'রে মাটির উপরে গিয়ে পড়ল!

সমুদ্র-তীরে মহা হৈ চৈ প'ড়ে গেল! আরো জন দশ-বারো সাহেব জলে নেমে স্নান করছিল—তারা বেগে ডাঙার দিকে উঠে আস্‌তে লাগল।

সুমিত্রাও এই-ব্যাপারটা এতক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল। কিন্তু যখন সে দেখ্‌লে জলের সাহেবরাও ডাঙার দিকে আস্‌চে, তখন সে বুঝ্‌লে এখনি একটা ভয়ানক খুনোখুনি কাণ্ড বাধ্‌বে। তাদের বাড়ী এখান থেকে খুব কাছে—সে বিদ্যুতের মতন বাড়ীর দিকে ছুটল।

বিনয়বাবু স্ত্রী ও সুনীতিকে নিয়ে বেরুবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময়ে সুমিত্রা ছুটতে ছুটতে এসে বল্‌লে, "বাবা, বাবা—শীগ্‌গির চাকর-দরোয়ান নিয়ে আমার সঙ্গে এস!"

—"কেন, কেন, কি হয়েচে?"

—"পরে সব শুনো—শীগ্‌গির চল, শীগ্‌গির! নইলে সায়েবরা দাদা আর রতনবাবুকে এখনি মেরে ফেল্‌বে! এই! দরোয়ান—দরোয়ান!"

সেন-গিন্নী হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌লেন—বাড়ীতে প্রায় বারো-চৌদ্দ জন দ্বারবান ও চাকর ছিল, তারা সবাই তখনি বিনয়বাবুর হুকুমে লাঠিসোটা নিয়ে সমুদ্রের ধারে ছুটল—সঙ্গে সঙ্গে বিনয়বাবু, সুমিত্রা ও সুনীতি। সেন-গিন্নী ধপাস্ ক'রে সেইখানেই ব'সে প'ড়ে বারংবার হাতজোড় করতে লাগ্‌লেন—

"হে বাবা জগন্নাথ, রক্ষে কর—তোমাকে পাঁচশো টাকার পুজো দেব, হে বাবা জগন্নাথ!" আজ বহু—বহু বৎসর পরে সেন-গিন্নী দেবতাকে পূজার লোভ দেখালেন—অন্ততঃ প্রকাশ্যে!

এদিকে প্রাণপণে ছুটে গিয়ে খানিক তফাৎ থেকেই বিনয়বাবু দেখ্‌লেন, সমুদ্রের ধারে বিষম জনতা! একদিকে একদল সাহেব দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সাম্‌নে ভিড় ক'রে আছে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন 'নুলিয়া'। সাহেবরা এগিয়ে আস্‌তে চাইছে, কিন্তু নুলিয়ারা তাদের বাধা দিচ্ছে। লাঠিসোটা নিয়ে হঠাৎ এতগুলো লোককে ছুটে আস্‌তে দেখে, সাহেবরা বেগতিক বুঝে হঠাৎ অন্তর্হিত হোলো।

ভিড়ের ভিতরে গিয়ে বিনয়বাবু দেখ্‌লেন, বালির উপরে রক্তাক্ত দেহে রতন ব'সে আছে, আর তার দুই পাশে সন্তোষ ও পূর্ণিমা। রতনের মাথা ও নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, সন্তোষ ও পূর্ণিমা সেই রক্ত বন্ধ করবার চেষ্টা করছে!

বিনয়বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলেন, "রতন, একি কাণ্ড! দেখি, কোথায় লেগেচে?"

রতন হেসে বল্‌লে, "না, এমন কিছু লাগেনি। একটা সায়েব নৌকোর দাঁড় দিয়ে আমাকে মেরেছিল, তাইতেই দু-এক জায়গায় একটু কেটে গিয়েচে!"

বিনয়বাবু বল্‌লেন, "কেন এমন ব্যাপার হোলো?"

রতন বল্‌লে, "সে-সব বাড়ীতে গিয়ে শুন্‌বেন অখন। চারদিকে ক্রমেই ভিড় বেড়ে উঠ্‌চে, এখানে আর ব'সে থাক্‌বার দর্‌কার নেই।"

বিনয়বাবু বললেন, "হ্যাঁ, আগে তোমার কাটা জায়গাগুলো দেখ্‌তে হবে, তার পর অন্য কথা। ওরে, তোরা রতনকে কোলে ক'রে বাড়ীতে নিয়ে চল্ তো।"

বিনয়বাবুর লোকজনরা এগিয়ে এল। কিন্তু রতন মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না, না, আমি এখনো এতটা কাবু হ'য়ে পড়িনি! চলুন, আমি নিজেই হেঁটে যেতে পারব" এই ব'লে সে উঠে' দাঁড়াল। সকলে বাড়ীর দিকে এগুলেন।

রতনের মাথা ও নাকে ওষুধ ও ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিয়ে, বিনয়বাবু বল্‌লেন, "তুমি খুব বেঁচে গেছ রতন! মাথার চোটটা আর একটু হ'লেই সাংঘাতিক হ'ত।"

রতন বল্‌লে, "তাতে দুঃখ কিছুই ছিল না। মান রাখ্‌তে না হয় প্রাণটাই যেত।"

বিনয়বাবু বল্‌লেন, "কিন্তু আমি যে এখনো ব্যাপারটা শুনিনি।"

সন্তোষ বল্‌লে, "আমরা ওখান দিয়ে আস্‌ছিলুম—আমাদের সঙ্গে ছিলেন পূর্ণিমা। একটা সায়েব পূর্ণিমাকে লক্ষ্য ক'রে অভদ্র ঠাট্টা করে। কুমার-বাহাদুর আর আমি প্রতিবাদ কর্‌তেই সায়েবটা হঠাৎ আমাকে লাথি মারে, আমি প'ড়ে যাই। রতনবাবু কোথায় ছিলেন জানি না, কিন্তু তিনি এই ব্যাপার দেখে ছুটে এসে দুটো সায়েবকে একলাই মেরে একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।"

বিনয়বাবু বিস্মিতস্বরে বল্‌লেন, "অ্যাঃ, রতনের গায়ে যে এত জোর, আমি তো তা জান্‌তুম না!"

সন্তোষ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বল্‌লে, "জোর ব'লে জোর, তুমি দেখ্‌লে অবাক্ হ'য়ে যেতে বাবা! তার পর দশ বারোটা সায়েব এসে রতনবাবুকে আক্রমণ ক'রেও সহজে কাবু করতে পারেনি। তিনিও মার খাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু যাকে একবার ধর্‌ছিলেন, তাকেই তুলে' আছাড় না দিয়ে ছাড়েননি। আমার বোধ হয় উনি বক্সিংও জানেন, যুযুৎসুও জানেন। কেমন, নয় কি রতনবাবু?"

রতন মৃদুস্বরে বল্‌লে, "ভালো জানি না, তবে কিছু কিছু শিখেচি বটে।"

সন্তোষ বল্‌লে, "রতনবাবু যে-রকম আশ্চর্য্য কায়দায় বার বার তাদের মার এড়িয়ে স'রে আস্‌ছিলেন, সে এক দেখবার ব্যাপার। কিন্তু অতগুলো লোকের সঙ্গে একটা মানুষ আর কতক্ষণ যুঝ্‌তে পারে! রতনবাবু ক্রমেই কাহিল হ'য়ে পড়্‌তে লাগ্‌লেন, তিনি তখন পালালেও কেউ তাঁকে নিন্দে কর্‌তে পার্‌ত না,—কিন্তু তবু তিনি পালালেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে লাগ্‌লেন।"

বিনয়বাবু অসন্তুষ্ট হ'য়ে বল্‌লেন, "তুমি কেন তখন রতনকে সাহায্য করলে না? তোমাকে বাঁচাতে গিয়েই তো রতনের এই বিপদ্!"

সন্তোষ বল্‌লে, "বাবা, সায়েবটা আমার পেটে লাথি মেরেছিল, পেটের ব্যথায় আমি তখন উঠ্‌তে পার্‌ছিলুম না!"

—"কুমার-বাহাদুর?"

—"তিনি কোথায় ছিলেন আমি দেখিনি।"

কুমার-বাহাদুর এতক্ষণ চুপচাপ ব'সে ব'সে সব শুন্‌ছিলেন। এখন নিজের মুখরক্ষার জন্যে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লেন, "আমার সঙ্গে ছিলেন পূর্ণিমা, সে-সময়ে আমি তাঁকে একলা ফেলে' এগিয়ে যাওয়া উচিত মনে করিনি!"

বিনয়বাবু সে-কথা কানে না তুলে' বল্‌লেন, "আচ্ছা সন্তোষ, তার পর কি হোলো?"

—"যে সায়েবটার জন্যে এই বিপদ্, সে হঠাৎ সমুদ্রের ধার থেকে জেলে-ডিঙির একখানা দাঁড় তুলে' এনে রতন বাবুর মাথার ওপরে মার্‌লে—সঙ্গে সঙ্গে তিনিও প'ড়ে গেলেন। সায়েবগুলো তখনি বোধ হয় রতনবাবুকে মেরে ফেল্‌ত—কেবল পূর্ণিমার জন্যে তা পার্‌লে না।"

সবিস্ময়ে বিনয়বাবু বল্‌লেন, "পূর্ণিমার জন্যে?"

"হ্যাঁ। রতনবাবু পড়ে' যাবা মাত্র সায়েবগুলো তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। এমন সময়ে পূর্ণিমা বিদ্যুতের মত ছুটে' এসে দু-হাতে রতনবাবুর দেহ আগ্‌লে ধর্‌লে—ইংরেজীতে চেঁচিয়ে বল্‌লে, 'তোমরা এমন কাপুরুষ যে, এতজনে মিলে' একজনকে মারচ?' একটা সায়েব পূর্ণিমাকে হাত ধ'রে টেনে সরিয়ে দিতে গেল। মুলিয়ারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখ্‌ছিল। কিন্তু পূর্ণিমাকে ধ'রে টানটানি করবামাত্র তারা সবাই ছুটে গিয়ে বাধা দিলে। তারপরেই তোমরা গিয়ে পড়্‌লে।"

বিনয়বাবু বল্‌লেন, "রতন আর পূর্ণিমার সাহস ধন্য! কিন্তু এই সায়েবগুলো কি কাপুরুষ! বাস্তবিক, এদের লজ্জা হোলো না?"

রতন বল্‌লে, "বিনয়বাবু, বিশ-পঁচিশজন মানুষ মিলে একটা মাত্র বন্য জন্তু মারাও সঙ্গত ব'লে মনে করে। সায়েবদের চোখে আমরা—কালা আদমিরা বুনো পশু ছাড়া আর কিছু নই। তাই মানুষে মানুষে প্রতি-যোগিতায় সভ্যসমাজে যে বিধি-নিষেধ বাঁধা আছে, সামান্য 'পশু' বধের সময়ে শ্বেতাঙ্গরা সে-সব মানা কিছুমাত্র দর্‌কার মনে করে না। খবরের কাগজে বিলিতী মনস্তত্ত্বের এম্‌নি দৃষ্টান্ত হামেসাই দেখ্‌বেন।"

চীন সম্রাট্

চিত্রকর শ্রীঅর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

U. Ray & Sons, Calcutta

কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "এ সত্যটা আমি বিলক্ষণই মানি। সেইজন্তেই গোড়াতেই আমি বেগতিক বুঝে সাবধান হবার চেষ্টা করেছিলুম। যদিও রতন-বাবুর সাহস প্রশংসার যোগ্য, তবু আমার মতে, এক্ষেত্রে কতকগুলো অভদ্র কাপুরুষের হাতে নিজের জীবনকে এমন ভাবে বিপন্ন করা তাঁর পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি।"

—"হ্যাঁ, বুদ্ধিমানের কাজ যে হয় নি, সে কথা ঠিক !"

সবাই ফিরে দেখ্‌লেন, আনন্দ-বাবু ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে কুমার-বাহাদুরের সামনে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "কিন্তু কুমার-বাহাদুর, রতন যদি তখন নারীর প্রতি অপমানও গায়ে মেখে শান্তভাবে চলে আস্‌ত, তবে সে ব্যাপারে বাঙালী-সুলভ চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও, মনুষ্যোচিত বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যেত না একটুও। এত বুদ্ধিমান হয়েও বাঙালী তবু সায়েবের বুট থেকে নিজের প্লীহাকে রক্ষা করতে পারে না কেন বলুন দেখি ?"

এই আকস্মিক আক্রমণে কুমার-বাহাদুর একেবারে বোবা হয়ে গেলেন।

আনন্দ-বাবু গাঢ় স্বরে বল্‌লেন, "রতন ! প্রার্থনা করি, তুমি যেন কখনো আমাদের আর দশ জনের মত বুদ্ধিমান না হও ! আজ তুমি মার খেয়েচ, তোমার মারা পড়্‌বার সম্ভাবনাও ছিল সম্পূর্ণ। অন্যায়-অপমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারাই হচ্চে খাঁটি মানুষের কাজ—মার খেলে বা মারা গেলেও সে মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয় না। আমি আগেই চিনেছিলুম তোমাকে মানুষ ব'লে। আমার ধারণা যে ভুল নয়, আজ তা ভালো ক'রেই বুঝ্‌তে পার্‌লুম। তাই আমি তোমাকে আমার শ্রদ্ধা জানাতে এসেচি"—এই ব'লে তিনি রতনের দুখানি হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকের উপরে চেপে ধর্‌লেন, তাঁর দুই চোখ প্রাণের আবেগে ও আনন্দে সজল হয়ে উঠ্‌ল !

(ক্রমশঃ)

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

নীলকণ্ঠ

ওরে মহাসমুদ্রমন্থনে আজি উঠেছে কেবলি বিষ,
ওরে বুভুক্ষু, ওরে ও পিয়াসী, আয় যেথা যে আছিস;
দ্বন্দ্ব ভুলিয়া আয় তোরা তাই নে রে অঞ্জলি ভরি',
বক্ষের জ্বালা ঘুচিবে তোদের, দুঃখের শর্ব্বরী।
আজ মন্থদণ্ড দণ্ডই শুধু, মন্দার আর নাই,
শেষের বদলে অশেষ দুঃখ বরণ করিয়া তাই
দেবতাদানব অভাবে মানব মিলেছি পরস্পরে,—
লক্ষ্মী উঠে নি তাইত এবার লক্ষ্মীছাড়ার করে;
নাই সুধাশশী নাই কৌস্তভ, নাই সে হস্তী, হয়,
এবারে কেবল বিষের ভাণ্ড—সর্ব্বনাশের জয়!

আজ ভারতসাগরমন্থনে তাই মিলিয়াছে শুধু বিষ,
আয় উপবাসী, আয় রে পিপাসী, পীড়িত অহর্নিশ,—
কে আছে কোথায় শিবের মতন অশেষদুঃখভাগী,
আয় ছুটে' আয় বিষের নেশায়, আয় রে সর্ব্বত্যাগী;
শ্মশানে করিবি আসন আয় রে শবেরে করিবি সাথী,
কে কোথা আছিস অস্থির মালা নে রে নে কণ্ঠ পাতি',
নীলকণ্ঠের মত হলাহল নিঃশেষে করি' পান
অ-পাওয়া অমৃতে নিখিলের হিতে করে'যা রে আত্মদান
ভয় নাই, ওরে নিঃস্ব, তোদেরি পিতা মৃত্যুঞ্জয়
মৃত্যুরে দলি' চরণে বিশ্ব করিয়া গিয়াছে জয়।

শ্রী যতীন্দ্রমোহন বাগচী

[এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১০৩)
ঘাটু গান

কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নিম্নশ্রেণীদের মধ্যে 'ঘাটু' গান নামক একপ্রকার গান দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ গান সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণের বিষয় লইয়া রচিত। অন্যকোনও স্থানে এই গান আছে কিনা? কে সর্ব্বপ্রথম এই গান প্রচলিত করেন?

শ্রী ফণীন্দ্রকুমার অধিকারী

(১০৪)
বোধিদ্রুম

ইতিহাসে দেখা যায় গৌড় সম্রাট্ শশাঙ্ক দেব ৬৩০ খৃষ্টাব্দে গয়া-ক্ষেত্রে বোধিদ্রুম উন্মূলিত করিয়াছিলেন। বোধগয়ার বুদ্ধমন্দিরের পার্শ্বে যে বটবৃক্ষটি আছে, উহা কোন্ বোধিদ্রুম? উহার বয়সই বা কত?

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য

(১০৫)
রাজা দেবরক্ষিত

বঙ্গবাসী সংস্করণ বিষ্ণুপুরাণে রাজা দেবরক্ষিতের নাম পাওয়া যায়। ইনি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ইঁহার রাজধানী কোথায় ছিল?

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

(১০৬)
"দ্রাবিড়-বৈদিক ব্রাহ্মণ"

পশ্চিমবঙ্গে (গৌড় দেশে) "দ্রাবিড়-বৈদিক ব্রাহ্মণ" বলিয়া যে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায় উঁহারা কোন সময়ে কেমনভাবে গৌড়ে আসিলেন? ইহার মূলে কোনও ঐতিহাসিক কিম্বা পৌরাণিক তত্ত্ব আছে কি না।

শ্রী নীরদবরণ ভট্টাচার্য্য

(১০৭)
একাদশী

একাদশীর উপবাস ঠিক তিথিমানানুযায়ী হয় না কেন? পরাহ্নে কতিপয় পল একাদশী থাকিলে বা না থাকিলেও শুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাসের বিধান। ঐরূপ অমাবস্যা বা পূর্ণিমার উপবাসও সব সময় তিথিমান-ব্যাপী না হওয়ার কারণ কি?

শ্রী কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত

(১০৮)
সাগু গাছ

গাছের মজ্জার পালো হইতে সাগু-দানা প্রস্তুত হয়। উহা বাহির করিবার প্রক্রিয়া কি? গাছের কিরূপ অবস্থায় মজ্জা গ্রহণীয়? প্রতিগাছে কত পরিমাণ সাগু হইতে পারে?

শ্রী মহেন্দ্রনাথ করণ

(১০৯)
এলাচের গাছ

আমাদের বাড়ীতে অনেকদিন যাবৎ কতকগুলি বড়-এলাচের গাছ আছে। এলাচও যথেষ্ট হয়। কিন্তু তাহা রক্ষা করিবার উপায় না জানায় প্রতি বৎসরই বহু ফল নষ্ট হইয়া যায়। যদি কোন বিশেষজ্ঞ বড়-এলাচ রক্ষা করিবার সহজ উপায় জানাইতে পারেন তাহা হইলে বাধিত হইব।

শ্রীমতী পারুলবালা সেন
শ্রী অমিয়প্রভা সেন

(১১০)

কাশীজোড়া পাটীপরা অতিবিচক্ষণ।
রামতুল্য রাজা তথা রাজ-নারায়ণ॥
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ।
শীতলা-মঙ্গল রচে প্রাপগুরু মত॥

(শীতলা-মঙ্গল)

(ক) কাশীজোড়ার ভৌগোলিক অবস্থান কোথায় ?

(খ) মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার যে কাশীজোড়া নামক স্থান আছে তাহা ইহা হইতে বিভিন্ন, কি একই ?

(গ) রাজনারায়ণ নামে তথায় কোন রাজা ছিলেন কি না ? থাকিলে তিনি কত শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহার বংশ-পরিচয় ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত কি ?

(ঘ) নিত্যানন্দের বাসস্থান কোথায় ? কোন্ সময়ে শীতলা-মঙ্গল প্রথম রচিত হয় ?

শ্রী শ্রীনিবাসচন্দ্র মিত্র

(১১১)
ডিম ফুটাইবার যন্ত্র

Incubating machine দ্বারা ডিম ফুটান যায়। ঐ কল কোথায় পাওয়া যায়, মূল্য কত, ইত্যাদি বিষয় কলিকাতার কোন্ ঠিকানায় লিখিলে জানিতে পারা যাইবে ?

সম্পাদক, সুরদীয়া সাধারণ পুস্তকাগার

(১১২)
দুগ্ধে লবণ খাওয়া নিষেধ কেন ?

হিন্দুরা দুধের সঙ্গে লবণ খায় না ; কারণ দুধে লবণ মিশ্রিত হইলে গো-মাংসের তুল্য হয়। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই বিনা নুনে দুধ খায় না। দুধে লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে স্বাস্থ্যের কোন অনিষ্ট হয় কি না ?

শ্রী শৈলেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

(১১৩)
মুতাক্ষরীন

সুবিখ্যাত গোলাম হোসেন প্রণীত মুতাক্ষরীন ইতিহাসের ইংরেজি অনুবাদ আছে। তাহা কোথায় কত মূল্যে পাওয়া যায় ?

শ্রী শৈলজাপ্রসাদ বসু

(১১৪)
পরলোক-তত্ত্ব-বিষয়ক সংবাদপত্র

বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় পরলোকতত্ত্ববিষয়ে কি কি সংবাদ পত্র পত্রিকা বাহির হয় দয়া করিয়া কেহ তাহাদের নাম ও ঠিকানা লিখিলে বাধিত হইব।

শ্রী—

(১১৫)

অমর কবি হেমচন্দ্রের একটি জাতীয়তাপূর্ণ কবিতায় দেখিলাম

"এই আর্য্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল,
ধরিয়া কৃপাণ কামিনী-সকল,
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে,
নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে ছুটিত সমরে,
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া
ধনুর্দ্দণ্ডে ছিলা হাসিয়া হাসিয়া,
সমর-উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে।"

ভারতের কামিনী-সকল কোন্ সময়ে কেশ-পাশ খুলিয়া ধনুর্দ্দণ্ডে ছিলা পরাইয়া দিত ; ঐ পঙ্ক্তিদ্বয়ের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি ?

শ্রী হরিসাধন পাইন

(১১৬)
জাপানে শিক্ষা

জাপানে ভারতবাসী ছাত্রেরা কি কি শিক্ষা লাভ করিতে পারে ? স্বাবলম্বী হইয়া কেহ কোন শিল্প শিক্ষা করিতে পারে কি না ?

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক

(১১৭)

ব্রাহ্মণেতর কাহাকেও 'ওঁ' শব্দ উচ্চারণ করিতে নাই কেন ? কোন মহাবাক্য অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা উচ্চারিত হওয়ার নিষেধ-বাণীর সারবত্তা কি ? এরূপ যোগ্য ব্যক্তিরই বা পরিচয় ও লক্ষণ কি ?

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ নাগ

মনোবিজ্ঞানের পারিভাষিক
(১১৮)

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির কোন সংস্কৃত বা বাঙ্গালা প্রতিশব্দ আছে কি না। না থাকিলে তাহাদের বাঙ্গালা পরিভাষা প্রস্তুত করিয়া "প্রবাসী"র পাঠকগণ জানাইলে বাধিত হইব।

Sub-liminal Consciousness
Supra-liminal Consciousness
Supra Consciousness
Sub-conscious Mind
Unconscious Mind
Fore-conscious
Conscious Mind
Censor
Multiple Personality
Complex
Psycho-analysis
Suggestion
Affirmation
Positive
Negative
Overtone

শ্রী অপর্ণাচরণ সোম

(১১৯)
বক্সিং শিক্ষা

বাংলা ভাষায় লিখিত বক্সিং খেলা শিখিবার পুস্তক কোথাও পাওয়া যায় কি ? কোন্ ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে পুস্তকখানি পাওয়া যাইতে পারে ?

শ্রী দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী

(১২০)
নীলনদের ইতিহাস

প্রাচীন হিন্দুগণ যে নীলনদের অস্তিত্বের বিষয় বিশেষরূপে অবগত ছিলেন তাহার প্রমাণ কোন্ পুরাণের কোথায় পাওয়া যায় ?

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী

মীমাংসা

(৮)

এ্যালুমিনিয়মের বাসন মেরামত ও বদল

সম্প্রতি একখানি পুস্তকে দেখা গিয়াছে যে ফরাসীদেশে এ্যালুমিনিয়মের বাসন ঝাল দিবার মসলা প্রস্তুত হইয়াছে। ফরাসীরা যে পাঁচ প্রকার ঝালাইবার মসলা প্রস্তুত করিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটির উপাদান দস্তা, তাম্র, ও এ্যালুমিনিয়ম—ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত। সে অনুপাতগুলি ওজন হিসাবে এইরূপ—

১। দস্তা ৮০ ভাগ, তাম্র ৮ ভাগ, এ্যালুমিনিয়ম ১২ ভাগ
২। দস্তা ৮৫ ভাগ, তাম্র ৬ ভাগ, এ্যালুমিনিয়ম ৯ ভাগ
৩। দস্তা ৮৮ ভাগ, তাম্র ৫ ভাগ, এ্যালুমিনিয়ম ৭ ভাগ
৪। দস্তা ৯০ ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ, এ্যালুমিনিয়ম ৬ ভাগ
৫। দস্তা ৯৪ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ, এ্যালুমিনিয়ম ৪ ভাগ

প্রথমে তাম্র গলাইয়া তাহার সহিত এ্যালুমিনিয়মের অংশটুকু তিন চার বারে মিশাইতে হইবে। সর্ব্বশেষে দস্তা মিশাইতে হইবে। কারণ তাম্র গলাইতে যে পরিমাণ তাপ যতক্ষণ প্রয়োগ করিতে হয়, দস্তা গলাইতে তাহা অপেক্ষা কম তাপ কম সময় প্রয়োগ করিতে হয়। দস্তা কিয়ৎক্ষণ আগুনের উপর থাকিলে তাহার কিয়দংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে। সুতরাং অনুপাত ঠিক থাকিবে না। তামার সঙ্গে এ্যালুমিনিয়ম মিশাইবার সময় একটা লোহার কাঠি দিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে হইবে; নচেৎ মিশ্রণ ভাল হইবে না। কেন না তামা ও এ্যালুমিনিয়মের ঘনত্ব (density) সমান নহে। এ্যালুমিনিয়মের শেষ অংশটুকু দিবার অব্যবহিত পরেই সবটুকু দস্তা দিতে হইবে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে কিছু চর্ব্বি বা রজন দ্রবীভূত মিশ্রণে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে তিনটি জিনিষ উত্তমরূপে মিলিত হইয়া যাইবে। এবং যত শীঘ্র সম্ভব মিশ্র ধাতুটিকে আগুন হইতে নামাইয়া, লোহার ছাঁচে ঢালিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে লোহার ছাঁচটিতে কিছু কয়লার তৈল বা বেন্‌জাইন মাখাইয়া রাখিতে হইবে। দস্তা মিশাইবার পর কাজটি যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। নহিলে মিশ্রণটি ঠিক কাজের উপযুক্ত হইবে না। দস্তাটি খুব বিশুদ্ধ হওয়া দরকার; উহাতে যেন লৌহের অংশ আদৌ না থাকে। মিশ্রণের সঙ্গে চর্ব্বি বা রজন দিবার কারণ এই যে, দ্রবীভূত দস্তা বড় শীঘ্র বায়ু হইতে অম্লজান আকর্ষণ করিয়া রূপান্তরিত হইয়া যায়।

বিক্রয় কিংবা বদল সম্বন্ধে এবং এই প্রক্রিয়া বিশদরূপে জ্ঞাত হইতে হইলে, ১৩২৯ সালের পৌষ মাসের ভারতবর্ষের 'ইঙ্গিত' দেখিবেন।

শ্রী শৈলেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

(১৫)

শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্র ও সরযূপারী ব্রাহ্মণ

আষাঢ়ের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত আদিত্যচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বেতালের বৈঠকে যে উত্তরটি দিয়াছেন তাহাতে কয়েকটি অশুদ্ধি পাইলাম। ব্রহ্মযামলের ১৪শ অধ্যায় হইতে যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার প্রথম চরণের—"শাকদ্বীপে চ বেদাগ্নিঃ" না হইয়া "শরদ্বীপে চ বেদাগ্নিঃ" হইবে এবং শেষ চরণের 'ভালবিপ্রঃ স্মৃতঃ' না হইয়া "জ্ঞান নামা চ" হইবে।

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য

(১৯)

বৈশাখ ১৩৩০-এর বেতালের বৈঠকে ১৯ নং প্রশ্নে "হাঁসের ডিম লবালঙ্কি ভাজা" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল দত্ত যে প্রশ্ন করিয়াছেন, মীমাংসা বহুপূর্ব্বে আমেরিকায় হইয়া গিয়াছে। গত ১৩২৩ সনের "প্রবাসীতে" (চৈত্র সংখ্যায় ৫৬৭ পৃষ্ঠায়) "পঞ্চশস্য" বিভাগে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত এই বিষয় অতি বিশদভাবে লিখিয়াছেন।

শ্রী অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী

(২৯)

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে, ২৯ নং মীমাংসায় দেখিলাম শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বাগ্‌চী মহাশয় লিখিতেছেন—

"পৃথিবীর সর্ব্বদেশে, সর্ব্বভাষায়, সর্ব্বজাতির ভিতরেই "মা" কথাটি 'ম' অক্ষর দিয়া আরম্ভ।" বাগচী-মহাশয় ২০টি উদাহরণ দিয়া তাহা কিয়ৎ অংশে সপ্রমাণও করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশে নির্ভুল নহে। অন্তত দু'টি জাতির মধ্যে এই সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম দেখা যায়। মহারাষ্ট্রীয় জাতি মাতাকে "আই," মধ্যপ্রদেশস্থ নিম্নজাতীয় হিন্দুস্থানীগণ মাতাকে "বউ" (বধূ নহে) বলিয়া সম্বোধন করে।

কল্যাণী

(৪৭)

রাত্রে কেশবিন্যাস

আমাদের পার্ব্বত্য ট্রিগ্রামে চাকমা জাতির মধ্যে এই কথা প্রচলিত আছে যে রাত্রে আয়নাতে মুখ দেখিলে শত্রুর মুখ উজ্জ্বল হয়। এযাবৎ পাশ্চাত্য শিক্ষিতাভিমানী ভদ্রলোক ভিন্ন এই নিয়মটি সাধারণের নিকট প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। আমার বিশ্বাস এস্থলে শত্রু অর্থে বিলাস-বাসনা। তাই বলিয়া ঔষধ-প্রয়োগার্থেও আয়নাতে রাত্রে মুখ দেখিবে না বা হঠাৎ কোন কারণে চুল অপরিষ্কার হইলেও সমস্ত রাত্রি কেশবিন্যাস না হউক অন্ততঃ আঁচ্‌ড়াইয়া পরিষ্কৃত করা হইবে না, এরূপ নিষেধের কোন মূল্য নাই।

শ্রী ব্রজকিশোর রায়

(৫২)

জন্ম ও মৃত্যু অশৌচ

অন্তরে সদাসর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করাই প্রত্যেক হিন্দুর কর্ত্তব্য। কোন কারণে কোন সময় এই কার্য্য না করিলে দেহ অশুচি বা অপবিত্র হয়। বংশে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু হইলে অত্যধিক আনন্দে বা শোকে অভিভূত হইয়া লোকে সাময়িক ভাবে ভগবান্‌কে ভুলিয়া যায় ও সেই সময়ের জন্য তাহাদের শরীর অশুচি হয়। ইহাকেই অশৌচ বলে। যে জাতির যতদিন ভুলিয়া থাকা সম্ভব সে জাতির ততদিন অশৌচ-কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাত্ত্বিকভাবাপন্ন। এজন্য মাত্র ১০ দিন পরেই তাঁহারা পুনরায় প্রকৃতিস্থ হন, অর্থাৎ তাঁহাদের অশৌচ-কাল শেষ হয়। এইরূপে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়ের ১২ দিনে, বৈশ্যের ১৫ দিনে ও শূদ্রের ৩০ দিনে অশৌচান্ত হইয়া থাকে। ক্ষৌরকর্ম্ম, নূতন বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি কেবল মরণাশৌচেই বন্ধ থাকে এবং এগুলি শোকচিহ্ন ও মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মানজ্ঞাপক বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রী রমেশচন্দ্র তালুকদার

(৬৪)

যুগ-কল্পনার সামঞ্জস্য

মানাদিক্ দিয়া দেখান যাইতে পারে যে বৈজ্ঞানিক এবং পৌরাণিক যুগবিভাগের ধারা বা system এক নহে। ধারা এক হইলে এইরূপ দাঁড়ায়:—

Archean Era—সত্যযুগ
Palæozoic Era—ত্রেতাযুগ
Mesozoic Era—দ্বাপর যুগ
Cainozoic Era—কলিযুগ

যুগসমষ্টির পরিমাণ (duration) বিষয় বৈজ্ঞানিক এবং পৌরাণিক মত এক নহে। পৌরাণিক মতে চারি যুগের পরিমাণ তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসর; ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মত, কেবলমাত্র Palæozoic Eraর পরিমাণই অন্যূন ৩৬ ছত্রিশ কোটি বৎসর। সুতরাং যুগের পরিমাণ বিষয়ে যথেষ্ট অনৈক্য রহিয়াছে। তাহার পর, পৌরাণিক মতে সত্য ত্রেতা এবং দ্বাপর—যুগত্রয়ের প্রতি-যুগেই মানুষ ছিল (মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভূতত্ত্ব অনুসারে Archean, Palœozoic এবং Mesozoic যুগের কোন যুগেই মানুষ ছিল না। কারণ সম্ভবতঃ পৃথিবী তখনও মানুষের বাসের উপযুক্ত হয় নাই।

প্রতি পৌরাণিক যুগের শেষে প্রলয় বা সৃষ্টিধ্বংসের কথা আছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এ-বিষয়ে সকলে একমত নহেন—গেইকী-প্রমুখ পণ্ডিত-গণ এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ["At one time it was supposed, breaks in the continuity of the (Geological) record marked terrestrial convulsions which cause the destruction of the plants and animals of the globe and were followed by the creation of new tribes of living things But evidence has every year been augmenting that no such general destruction and fresh creation ever took place. The gaps in the record mark no real interruption of the life of the globe. They are rather to be looked upon as chapters that have been torn out of the annals or which never were written."—Sir A. Geikie in his "Class-Book of Geology, Chapter XV.] তাঁহাদিগের মতে পৃথিবী-সৃষ্টির পর এরূপ প্রলয় মোটেই ঘটে নাই; তবে তাঁহারা স্বীকার করেন যে সৃষ্টির পর হইতে পৃথিবীর অবস্থা ঠিক একভাবেই নাই। Physical Geography বা নৈসর্গিক ভূগোলের যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে; কিন্তু এই পরিবর্তন হইয়াছে অতি ধীরে; হঠাৎ প্রলয় হইয়া সৃষ্টি নষ্ট এবং পরে পুনরায় নূতন সৃষ্টি—এরূপ ঘটনা মোটেই ঘটে নাই। কিন্তু এবিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ক্রমপরিবর্তনবাদের (Theory of Evolution) দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আমরা বুঝিতে পারি মানুষের সৃষ্টি পৃথিবীর বয়সের অনুপাতে অতি অল্প দিন হইল হইয়াছে। পৃথিবী প্রাণী-বাসের উপযুক্ত হইলে প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল—মেরুদণ্ড-অস্থি প্রভৃতি-বর্জ্জিত এক-কোষবিশিষ্ট Protozoa বা প্রাথমিক জীবের। এখন পৃথিবীতে যে-সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেখা যায় তাহারা পৃথিবী-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হয় নাই; তাহারা প্রাথমিক উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীগণের বংশধর মাত্র। প্রাণী জন্মের পর বাল্য কৈশোর প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া পরিশেষে পরিণতবয়স্ক হয়, অর্থাৎ বৃদ্ধে পরিণত হয়—জাতি (অর্থাৎ Race) সম্বন্ধেও একথা খাটে। জাতি-সৃষ্টির পর হইতে নানা অবস্থার মধ্য দিয়া পূর্ণপরিণতির (Development) দিকে অগ্রসর হয়। প্রাণীর বাল্যের এবং পরিণত বয়সের আকৃতির মধ্যে যেরূপ যথেষ্ট অসামঞ্জস্য থাকে, প্রাথমিক সৃষ্ট জীব ও তাহাদের আধুনিক বংশধরগণের মধ্যেও সেইরূপ আকৃতিগত সামঞ্জস্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাই। Theory of Evolution বলে :—

"* * * The present plants and animals of the globe were not the first inhabitants of the earth but they have appeared only as the descendants of a vast ancestry as the latest comers in a majestic procession which has been marching through an unknown series of ages. At the head of this procession we ourselves stand—heir of all the progress of the past and moving forward into the future wherein progress towards something higher and nobler must be for us, as it has been for all creation, the guiding law."—Sir A. Geikie. অর্থাৎ বিবর্তনবাদ অনুসারে বলিতে হয়, জীব ক্রমশঃ পূর্ণপরিণতির দিকে চলিয়াছে এবং মানুষ সৃষ্টপ্রাণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমাদিগের পুরাণকার-গণের মত ঠিক ইহার বিপরীত। তাঁহারা মানুষকে জীবজগতে শ্রেষ্ঠ আসন দিলেও ("ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধি-জীবিনঃ। বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ...." মনু, প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ৯৬) তাঁহারা বলিয়া আসিতেছেন যে মানুষ ক্রমশঃ অবনতির দিকে চলিয়াছে। এবিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

নানারূপ প্রমাণ হইতে ইহা এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ (অর্থাৎ বানরাকৃতি নর বা নরাকৃতি বানর) এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন Cainozoic যুগের মধ্যভাগ Miocene ageএ; এবং প্রকৃত মানুষের (True man—Homo-sapiens) সৃষ্টি হয় অনধিক ২২ বাইশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে মানুষ-সৃষ্টির পর আর যুগান্তর বা মহাপ্রলয় ঘটে নাই। কিন্তু পৌরাণিক মতে, প্রতিযুগেই মানুষের অস্তিত্ব ছিল এবং প্রতি যুগান্তরের পর আবার মানুষের সৃষ্টি হইয়াছিল।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে পৌরাণিক এবং বৈজ্ঞানিক উভয় মতের যুগের সংখ্যা সমান হইলেও তাহাদের মধ্যে অন্য কোনরূপ সামঞ্জস্য নাই। যাঁহারা এবিষয়ে সম্যক্ জানিতে উৎসুক তাঁহাদিগকে Lyell প্রণীত "Principles of Geology" এবং "Antiquity of Man" নামক গ্রন্থদ্বয় পড়িতে অনুরোধ করি।

শ্রী অবিনাশচন্দ্র বাগ্‌চী

(৬৭)

"মেবার পতন"

বাপ্পার পূর্ব্বপুরুষ কনকসেন ১৪৪ খৃঃ অঃ লাহোর হইতে সৌরাষ্ট্রে গিয়া রাজ্যস্থাপন করেন। ইঁহার রাজধানী ছিল বল্লভীপুর। ৫২৪ খৃঃ অঃ একটি অনার্য্যজাতি—অনুমান শক বা Scythians—কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কনকসেনের বংশধর রাজা শীলাদিত্য বল্লভীপুর হইতে গায়নিতে—অপর নাম গজনি—পলায়ন করেন। এই গজনিই ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের গর্জনী।

"......The Mss. give Gayni as the last refuge of the family when expelled from Saurashtra."

[Tod's, Rajasthan, Vol I., page 202]

অধুনা ইহা কম্বে নামে অভিহিত।

"Gayni or Gajni is one of the ancient names of Cambay (the port of Ballabhipur), the ruins of which are three miles from the modern city."

[Ibid, pages 202—203, foot note]

উত্তর কালে বিদেশী শত্রু কর্ত্তৃক চিতোর আক্রান্ত হইলে বাপ্পা তাহাদের পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দেন এবং গজনি অভিমুখে

অভিযান করেন। সেখানকার ম্লেচ্ছ রাজা সেলিমকে রাজ্যচ্যুত ও বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

"The foe was defeated and driven out of the country ; but instead of returning to Cheetore, Bappa continued his course to the ancient seat of his family, Gajni, expelled the barbarian, called Selim... Bappa on this occasion is said to have married the daughter of his enemy."

[Ibid, p. 212].

গানের গর্জ্জনী আফগানিস্থানের গজনী কি না এই লইয়া প্রশ্নকর্তার মনে বোধ হয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। বাস্তবিক বাপ্‌পা খোরাসান তুর্কিস্থান প্রভৃতি স্থানে অভিযান করেন—এবং তথাকার রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া প্রত্যেকের কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু এই বিজয়-যাত্রার পর আর তিনি চিতোরে প্রত্যাগমন করেন নাই। শেষ বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

"Advanced in years he abandoned his children and his country, carried his arms west to Khorasan and there established himself, and married new wives from among barbarians by whom he had a numerous offspring An old volume of historical anecdotes......states that he became an ascetic at the foot of Meru, where he was buried alive after having overcome all the kings of the west, as in Ispahan, Kandahar, Cashmere, Irak, Iran, Turan and Caffiristhan ; all of whose daughters he married and by whom he had one hundred and thirty sons."

[Ibid, pp. 212–213]

বিজিত দেশগুলির তালিকা বড় হইলেও লক্ষিত হইবে যে ইহাতে গজনীর উল্লেখ নাই। রাজস্থানের ২১২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত অংশে "Continued his course" কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব বুঝা যায় যে চিতোরের আততায়ী গুজরাটের দিক্ হইতে আসিয়াছিল। সেলিমের কন্যাকে বিবাহ করিয়া চিতোরে প্রত্যাগমন করিয়াই বাপ্‌পা রাজদণ্ড ধারণ করেন।

শ্রী মনোরঞ্জন অধিকারী

"চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে ম্লেচ্ছ রাজা গর্জনীর,
হরিয়ে আনিল কন্যা তাহার, বিজয়-গর্ব্বে বাপ্পাবীর।"

টড্ তাঁহার রাজস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন যে গেলোট্ বা গোহিলোট্ বংশের নাগাদিত্য যখন ভীলদের দ্বারা নিহত হন, তখন তাঁহার শিশুপুত্র বাপ্পা অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানেই তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় ; পরে তিনি চিতোর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথীয় সামন্ত-শ্রেণীভুক্ত হন। চিতোর তখন পরমার বংশের অধীন ছিল। এই সময় কোনও বৈদেশিক শত্রু চিতোর আক্রমণ করে। বাপ্পা এই আক্রমণ ব্যর্থ করেন, ও শত্রুর অনুসরণ করিয়া তাঁহার পিতৃ-পুরুষের আদি আবাসস্থান গজনী হইতে (টডের মতে গজনী বর্ত্তমান কাম্বের এক প্রাচীন নাম) সেলিম নামক যবনকে বিতাড়িত করেন, এবং তাহার কন্যাকে বিবাহ করেন। চিতোরে ফিরিয়া তিনি নিজেই সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময় হইতে চিতোর গেলোট্ বংশের বাসস্থান হইল। ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদের আবাস ছিল ঈদরে।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল এই কাহিনীর উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। এ-বিষয়ে কোনও ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না জানিবার পূর্ব্বে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে "বাপ্পা" কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নাম নহে। টড নিজেই ইহা বলিয়াছেন। আজিও রাজস্থানের সম্ভ্রান্ত পুরুষগণ "বাপ্পা" বা "বাপু" বলিয়া সম্বোধিত হইয়া থাকেন। উদয়পুরের নিকট আটপুরে যে শিলালিপি (তারিখ বিক্রম সম্বৎ ১০৩৪) পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে গেলোট বংশের প্রথম পুরুষ গুহদত্ত হইতে বিংশ পুরুষ শক্তিকুমার পর্য্যন্ত সকল রাজার নামই আছে। কিন্তু বাপ্পা বলিয়া কোনও নাম নাই। ইহার কারণ আর কোথায়ও অনুসন্ধান করিতে হইবে না।

আটপুর-লিপিতে একজন পরাক্রান্ত নৃপতির নাম পাওয়া যায়। তাঁহার নাম খোমন (প্রথম খোমন)। অনেকের মতে এই খোমন ও বাপ্পা একই ব্যক্তি। পরমার বংশের যে রাজার সময় চিতোর গেলোট্ বংশের অধীনে আসে বলিয়া প্রবাদ তাঁহার নাম ছিল মান। তাঁহার সময়কার একখানি প্রশস্তি টড পাইয়াছিলেন, তাহাতে তারিখ ছিল বিক্রমাব্দ ৭৭০। একলিঙ্গ মাহাত্ম্য নামক প্রাচীন পুঁথিতে উল্লেখ আছে যে ৮১০ বিক্রমাব্দে বাপ্পা রাজ্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। রাজস্থানে প্রাপ্ত গেলোট্ বংশের প্রাচীন দু'একজন নৃপতির তারিখের সাহায্যে আমরা প্রমাণ করিতে পারি যে আটপুর-লিপির খোমনের রাজত্ব-কাল এই সময়ে পড়িবে।

সমসাময়িক কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই যাহা দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে বাপ্পা চিতোর জয় করেন। এসম্বন্ধে আমাদের প্রবাদ ও আখ্যানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। বিদেশী শত্রুগণ কাহারা, বা বাপ্পা যবন-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, সে-সম্বন্ধে খুব সত্য ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

শ্রী অনুকূলচন্দ্র সেন

বাপ্পাবীর—বাপ্পারাওল।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় বাপ্পারাওল চিতোরের রাণা বংশের আদিপুরুষ। ইঁহার তিন বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ইঁহার পিতা নিহত হইলে ইনি কোনক্রমে পলায়ন করেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ইনি চিতোরে প্রত্যাগমন করেন এবং কালক্রমে তদানীন্তন চিতোর-অধিপতি কর্ত্তৃক ইনি সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। কাসিমের অধিনায়কত্বে মুসলমানগণ চিতোর আক্রমণ করিলে ইনি তাহাদিগকে রণে পরাভূত করেন এবং গজনীনগর পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করেন। তথায় পুনরায় মুসলমানগণকে তিনি পরাস্ত করিয়া গজনী অধিকার করেন এবং জনৈক রাজপুতবীরকে গজনীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর ভারতবর্ষ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। রাজপুতগণ এই-সমুদয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। গিহ্লট রাজপুতগণ কর্ত্তৃক এই সময়েই মেবার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিলাদিত্যের মহিষী পুষ্পবতী পর্ব্বতের গুহা-মধ্যে এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। সেই অনুসারে সেই পুত্রের নাম "গুহ" রাখা হয়। ভীলগণ কর্ত্তৃক গুহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার নামানুসারেই "গিহ্লট" শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে।

এই গুহের অষ্টম অধস্তন পুরুষ নাগাদিত্যের রাজত্ব-সময়ে ভীলগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার প্রাণ-সংহার করে। তদীয় তিন-বৎসর-বয়স্ক শিশুসন্তান "বাপ্পা" কমলাবতীর (যে ব্রাহ্মণী গুহকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন) বংশধর কর্ত্তৃক রক্ষিত হন।

বাপ্পার শিশুকালের বৃত্তান্ত বিশেষ কিছুই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। তিনি সাধারণ কৃষক বালকের ন্যায় গোচারণ করিতেন।

এই সময়ে চিতোর প্রমর-বংশীয় রাজপুতগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। ইঁহারা বাপ্পার মাতুল বংশ। বাপ্পা চিতোর যাইবার পর

তিনি একজন সামন্তস্বরূপে গৃহীত হইলেন এবং সেই পদোপযুক্ত ভূসম্পত্তি তাঁহাকে প্রদান করা হইল।

চিতোরে এই অবস্থায় অবস্থান-কালে তিনি ভূপতির নিরতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন। ইহাতে অপরাপর সামন্তগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়েন। এই সময়ে যবনগণ চিতোর আক্রমণ করে। যদিও অন্যান্য সামন্তগণ বাপ্পাকে সুনজরে দেখিতেন না, তবুও এই সময়ে জাতীয় মান মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত যাবতীয় মনোবিবাদ ভুলিয়া তাঁহারা তাঁহার সহিত যোগদান করেন এবং তাঁহার অধিনায়কত্বে রণে যবনদিগকে পরাভূত করেন। বাপ্পা এই স্থানেই নিবৃত্ত না হইয়া গজনী নগর পর্য্যন্ত যবনদিগের পশ্চাদ্ধাবন করেন। সেই স্থানে সেলিমকে রাজ্যচ্যুত করিয়া একজন রাজপুত বীরকে গজনীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অনুচরগণ সহ প্রত্যাগমনের সময় তিনি সেলিমের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসেন অতঃপর তিনি "হিন্দুসূর্য্য" ও "রাজগুরু" উপাধিতে ভূষিত হইয়া চিতোরের সিংহাসন অধিকার করেন।

বাপ্পা-রাও ইস্পাহান, কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাক, তুরাণ, ইরান, এবং কাফিরস্থান প্রভৃতি দেশের ভূপতিগণকে পরাভূত করিয়া তাহাদের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক খোরাসানের পশ্চিম দিকে চলিয়া যান এবং সেই স্থানে কতিপয় যবনকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাদের গর্ভে তাঁহার বহু সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

শ্রী শিশিরেন্দ্রকিশোর রায়
শ্রী বলাইচাঁদ আঢ্য
শ্রী গিরিজাশঙ্কর জোয়ার্দ্দার
শ্রী ধীরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী

"Bappa undertook the conduct of the war and the chiefs, though dispossessed of thier estates, accompanied him from a feeling of shame. The foe was defeated and driven out of the country. But instead of returning to Cheetore, Bappa continued his course to the ancient seat of his family, Gajni, expelled the 'barbarian' called Selim, placed on the throne a chief of the Shawura tribe and returned with the discontented nobles. Bappa, on this occasion, is said to have married the daughter of his enemy.

(Tod's Rajsthan, Vol. I, page 236.)

শ্রী পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

(৭০)

"মহাস্থান গড়"

বগুড়ার ৭ মাইল দক্ষিণে যে "মহাস্থান গড়" আছে ও উক্ত গড়ের পাদদেশে "শীলাদেবীর ঘাট" আছে তাহার পৌরাণিক কাহিনী এই যে পরশুরাম যখন মাতৃহত্যা করিয়া হাতের কুঠার ফেলিতে পারিতেছিলেন না তখন তিনি নিরুপায় হইয়া পিতার নিকট বলিলেন যে "আমি আপনারই আদেশে মাতৃহত্যা করিয়াছি ও তাহার দরুন্ পাপ হওয়ায় আমার হস্ত হইতে কুঠার পড়িতেছে না, এখন আপনি ইহার একটা বিধান করুন। পিতা পরশুরামকে ৫২টি তীর্থ ঘুরিতে বলিলেন। তদনুসারে পরশুরাম ৫২টি তীর্থ ঘুরিয়া যখন আসিয়া এই "শীলাদেবীর ঘাটে" স্নান করিলেন তখন তাঁহার হস্ত হইতে কুঠার পড়িয়া গেল।

শ্রী জ্যোৎস্নানাথ চন্দ
শ্রী হরগোপাল দাস কুণ্ডু
শ্রী গিরিজাশঙ্কর জোয়ার্দ্দার

(৭১)

তারহীন বার্ত্তাবহ

তারহীন বার্ত্তাবহ (Wireless Telegraphy) শিক্ষার জন্য এখানে সাধারণের কোন শিক্ষাগার নাই। তার কারণ Wireless Telegraph এখনও আমাদের দেশের সাধারণের কোন কাজে আসে নাই। এখানে যে-সব বিদেশী shipping company আছে, তাহাদের জাহাজে wireless telepraph watcherএর কাজ চালাইবার জন্য তাহারা বছরে ২।৩ বার করিয়া কতক কতক লোক লয় এবং প্রথমে কিছুদিন শিক্ষা দেওয়ার পর জাহাজে কাজ দেয়। শিখিবার পর কাজ না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। Mackinnon Mackenzie, Graham, Andrew Yule, Turner Morrison, Cox Co. র আফিসে অনুসন্ধান করিলে এ-বিষয়ে সকল খবর জানা যায়। করাচীতে সরকারী একটি বিদ্যালয় আছে।

Dy. Director General (wireless branch) of Post and Telegraph, Simla এই ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম ও শ্রী গোপেশ্বর দাস

(৭৩)

সাদা পাথরের বাসন পরিষ্কার

সাদা পাথরের বাসন অনেক দিন ব্যবহারের পর ময়লা হইলে উহা লেবুর রসে ঘসিয়া তাহার পরে সাবান-জলে ধুইলে পরিষ্কার হইয়া যায়।

শ্রী সুধীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

(৭৬)

কলের লাঙ্গলে কৃষিকার্য্য

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এখন কলের লাঙ্গলের দ্বারা কৃষিকার্য্য চলিতেছে। হায়দরাবাদ, মহীশুর, গোয়ালিয়র, পাটিয়ালা ইত্যাদি রাজ্যে ইহা চালান হইতেছে। গভর্মেণ্ট্ পুষা কৃষিক্ষেত্রের জন্য একখানা খরিদ করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ কাগজে দেখিতে পাই। ১৯২১ ইংরেজী সালে আমারই বিশেষ অনুরোধে Fordson Tractor নামক কলের লাঙ্গল একখানা চালাইয়া দেখাইবার জন্য চট্টগ্রাম কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনীতে আনা হয়। ধান্য-ক্ষেত্রে extension ribs দেওয়া সত্ত্বেও ট্র্যাক্টার লাঙ্গলের কার্য্য ভাল চলে নাই, যদিও আমার বন্ধুদের দ্বারা পরীক্ষার জন্যই খারাপ জলা জমিতে চাষ দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের নিজেরই জমিতে যাহা প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ পতিত অবস্থায় ছিল, তাহাতে বেশ সুচারুরূপেই চাষ ও মই দেওয়া হয়। বিভাগীয় কমিশনারও উপস্থিত ছিলেন। ঐ ট্র্যাক্টার অনায়াসে একটি পাহাড়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠে ও নামিয়া আসে এবং আমার বিশ্বাস, উৎকৃষ্ট সোয়ার না হইলে ঘোড়ার পিঠেও ঐ-পাহাড় হইতে নামা কষ্টকর, হাতীতে চড়িয়া নামিতেও অতি সতর্কতার সহিত নামিতে হইত। বাঙ্গালার কোন স্থানে ট্র্যাক্টার ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে কৃষি-অধ্যক্ষের সহিত আলাপ করিয়া ইহাই বুঝিতে পারি যে খুব বেশী মূলধন সংগ্রহ ভিন্ন পাড়াগাঁয়ে ঐ-লাঙ্গল ব্যবহার করা উচিত হইবে না। অনেক কারণে কল মেরামত করা আবশ্যক হইতে পারে, তখন মিস্ত্রি ইত্যাদি কাছে পাওয়া না গেলে অনর্থক কলটি বসিয়া থাকিবে। টাকা অনর্থক বসিয়া থাকিলেই বিশেষ ক্ষতি। ঠিক সময়ে বীজবপনে বিলম্ব ঘটিলেই ফসল ভাল হইবে না। বহু কারিগরের তৈরী কল আছে, সেই সম্বন্ধে বিবরণ কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ঠিক উল্টাদিকে যে বহির দোকান আছে

তথায় খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে। সম্প্রতি আমার বহিটি অন্যত্র থাকার নাম ইত্যাদি জানাইতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসু কলিকাতার প্রসিদ্ধ ফোর্ড্-মোটরকার-ব্যবসায়ীর নিকট পত্র লিখিলেই অনায়াসে ঐ-বিষয়ের তথ্য জানিতে পারিবেন। কলিকাতার হেয়ার ষ্ট্রীটে ম্যাক্‌বেথ ব্রাদার্সের নিকটও বহুপ্রকারের লাঙ্গল আছে। এরূপ লাঙ্গলের দ্বারা অনায়াসে ধান ভানা, তুলা ধুনা, জল তোলার কাজ সম্পাদিত হইতে পারে। আমার খুব বিশ্বাস আজকাল মজুরের বেতন যেরূপ অসম্ভব বাড়িয়াছে তাহাতে এই-প্রকার কলের লাঙ্গল ১খানা দ্বারা বিস্তৃত পরিমাণে চাষ করিতে পারিলে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে, যদিও আমি ছোট ছোট ক্ষেত স্বতন্ত্রভাবে চাষ করারই পক্ষপাতী। ফোর্ড্ কোম্পানী আমার বিশেষ অনুরোধে তাঁহাদের'কল ১খানা খরিদ করিলে আমার চালককে কলের যাবতীয় বিষয় বিনা খরচে শিখাইয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। হয়ত অন্যান্য কোম্পানীরাও চলনসই শিক্ষা দিতে অস্বীকৃত হইবেন না। আমেরিকা হইতে Case Tractor বিষয়ে আমার নিকট পুস্তিকা আসিয়াছে যদিও আমি ঐ-গড়নের বিক্রেতাকে জানি না। প্রশ্নকর্তা তাঁহার ঠিকানা দিলে ঐ পুস্তিকা তাঁহার নিকট পাঠাইতে পারি।

কুমার শ্রী রমণীমোহন রায়
রাঙ্গামাটী রাজবাটী, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম।

বাংলার ভিতরে কোথাও কলের লাঙ্গলে চাষ একরকম হয় না বলিলেও চলে। কারণ, কলের লাঙ্গলে (Motor Tractor) চাষের জন্য, এক জায়গায় খুব বেশী পরিমাণে জমির প্রয়োজন। অল্প জমিতে কলের লাঙ্গল চালান যেমন অসুবিধা, তেমন খরচও বেশী পড়িয়া যায়। বাংলায় একজন কৃষকের এক জায়গায় ১।২ হাজার বিঘা জমি খুব কমই আছে। আর্থিক অবস্থার কথা ত সর্ব্বজনবিদিত। দেওঘরের কাছে Deoghur Agriculture Settlement Co.র এক ফার্ম্মে কলের লাঙ্গলে চাষ হয়। বিহারে সাবুর কৃষি কলেজে নানারকম কলের লাঙ্গল আছে। শিক্ষার বিষয় প্রিন্সিপালকে লিখিয়া সব জানা যায়। পুষার কলেজে বিস্তর জমি চাষ কলের লাঙ্গলে হয়। শিক্ষার্থী ওখানে গিয়া নিজ খরচে লাঙ্গল চালান শিখিয়া আসিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন, পঞ্জাবের লায়লপুরে, পুণা কৃষিকলেজে, নাগপুর কৃষিকলেজে কলের লাঙ্গলে চাষ হয়। ঢাকার সরকারী কৃষিক্ষেত্রের সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট্‌কে লিখিয়া সমস্ত অবগত হওয়া যায়।

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

(৭৭)
নীল-চাষ

ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশে (বঙ্গদেশের মধ্যে একমাত্র নদীয়া-জিলায়), বিহার (গঙ্গাতীরে) ও মাদ্রাজের কর্ণাট উপকূলে প্রচুর পরিমাণে নীলের আবাদ হইয়া থাকে।

সরকার বাহাদুর কৃষির উন্নতির জন্য কৃষিবিভাগ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য গভর্ণমেণ্ট্ স্থানে স্থানে কৃষি-কলেজ (ভাগলপুর-জিলায় সাবোর, বিহারের মধ্যে পুষা, বোম্বাইতে পুনা) কৃষিক্ষেত্র ও বীজাগার স্থাপন করিয়াছেন। তৎস্থান হইতে বীজ ও আবাদ সম্বন্ধীয় সবিশেষ বিবরণ জানা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙ্গালার কথা ধরা যাউক। বঙ্গের অধিকাংশ জিলায় কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধীয় কৃষিসমিতি এবং তৎসঙ্গে বীজাগার (মালদহ, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রাজসাহী বাখরগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ২৪শ পরগনা প্রভৃতি জিলা) স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত যে-কোন স্থানে অনুসন্ধান করিলে, যাবতীয় ফসলের বীজ ও আবাদ সম্বন্ধীয় বিবরণ জানা যাইবে।

(ক) বর্দ্ধমান বিভাগীয় বীজাগার (শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, কৃষি-পরিদর্শক, এবং কানেন প্রেস্; হাওড়া । (খ) প্রেসিডেন্সী বিভাগীয় বীজাগার (পরিদর্শক শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মিত্র, ২৭নং অপার সারকুলার রোড্, কলিকাতা)। (গ) ঢাকা বিভাগীয় বীজাগার (পরিদর্শক শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর দাসগুপ্ত, ঢাকা)। (ঘ) রাজসাহী বিভাগীয় বীজাগারের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি-এ, রাজসাহী। (ঙ) চট্টগ্রাম বিভাগীয় বীজাগারের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত বিজদাস দত্ত, চট্টগ্রাম। (চ) মালদহ জিলায় কৃষিকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বিনোদলাল মুখোপাধ্যায়; মালদহ। (ছ) ফরিদপুরের কৃষিকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, ফরিদপুর ইত্যাদি।

উল্লিখিত স্থানে নীলের বীজ পাওয়া না গেলে, পুষা কৃষি-কলেজের অধ্যক্ষের নিকট চিঠি লিখিলে নীলের বীজ পাওয়া যাইবে।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিলে নীলচাষ সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ জানা যায়।

(১) A Study of the Indigo Soils of Behar,
by W. A. Davis, B.Sc.
(২) The Future Prospects of Indigo Industry,
by W.A. Davis, B.Sc.
(৩) An Improved Method of Preparing
Indigo, by Bhailal M. Amim, M.A.

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

(৭৮)
"দশচক্রে ভগবান্ ভূত"

"দশচক্রে ভগবান্ ভূত" এই বাঙ্গালা প্রবচনটি আমার বিশ্বাস যে নিম্নলিখিত সংস্কৃত উক্তি হইতে আসিয়াছে। উক্তিটি—এই

চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যো ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ।
অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যাৎ ভগবান্ ভূততাং গতঃ॥

এই সম্বন্ধে যে এক ইতিবৃত্ত আমার জানা আছে তাহা নিম্নে দিলাম।

এক দেশে ভগবান্ নামক এক ব্রাহ্মণ বসতি করিতেন। তিনি সেবা-ধর্ম্মে এমন নিপুণ ছিলেন যে তদ্দেশীয় রাজার নিকটে ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞা মাত্রেই কর্ম্ম সাধন করিতেন। তাহাতে তিনি ঐ রাজার অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। এই-কারণে ভগবান্ রাজসভাসদ্ কি অন্যান্য রাজকীয় কার্য্যসম্পাদক সকলকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেন। তাহাতে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া পরামর্শ স্থির করিল যে যাহাতে ঐ-ব্রাহ্মণ আর রাজসভায় আসিতে না পারে এইরূপ কাজ করিতে হইবে। পরে সকলের বিবেচনায় স্থির হইল যে দৌবারিককে বলা যাউক যে মহারাজ আমাদের সাক্ষাতে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন—"দৌবারিক যেন আর ভগবান্‌কে আমাদের সভায় প্রবেশ করিতে না দেয়"। দৌবারিকও তাহা রাজাজ্ঞা মনে করিয়া ঐ-ব্রাহ্মণকে আর রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিল না। ভগবান্‌ও ভগবানের ইচ্ছায় এইরূপ ঘটিয়াছে মনে করিয়া হতাশ হইয়া বাড়ী বসিয়া রহিলেন। রাজাও তাঁহার প্রিয়পাত্র ভগবান্ পণ্ডিতকে অনেকদিন যাবৎ দেখিতে না পাইয়া তাঁহার সভাসদ্‌গণকে ঐ ব্রাহ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা সকলে একবাক্যে উত্তর করিলেন যে মহারাজ! তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। রাজবৈদ্যও কহিলেন মহারাজ! আমি স্বয়ং চিকিৎসা করিয়াছি, পরমায়ু না থাকায় তাহার পঞ্চত্ব লাভ হইয়াছে। এই সংবাদে মহারাজ অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস

পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান্ পণ্ডিতের জন্ম যথেষ্ট আক্ষেপ করিলেন। অনন্তর এক দিবস রাজা নগর-ভ্রমণার্থ সভাসদাদি ও সৈন্যসামন্ত সমভি-ব্যাহারে বহির্গত হইলেন। এই সংবাদ শ্রবণে রাজদর্শনে বঞ্চিত চিন্তাক্লিষ্ট শ্রীহীন ভগবান্ পণ্ডিতও রাজ-দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় বাহিরে আসিলেন। কিন্তু সৈন্যসামন্ত অতিক্রম করিয়া রাজ-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিবেন না এই আশঙ্কায় রাজার গন্তব্য পথের পার্শ্বস্থিত কোন এক উচ্চবৃক্ষে তিনি আরোহণ করিলেন। রাজা বৃক্ষের অনতিদূরবর্ত্তী হইলে ভগবান্ পণ্ডিত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ আমিই আপনার ভগবান্ পণ্ডিত।" রাজার পার্শ্বচরেরাও এই শব্দ শ্রবণে মহারাজকে বলিতে লাগিল—"মহারাজ এই দেখুন ভগবান্ পণ্ডিতের প্রেতদেহ আপনাকে আহ্বান করিতেছে।" রাজাও তদ্দর্শনে সভাসদ্‌গণের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া পথান্তরে গমন করিয়া স্বগৃহে ফিরিলেন। তাহাতে ভগবান্ পণ্ডিত উপরোক্ত শ্লোক বলিয়াছিলেন—রাজা ও চক্র উভয়েরই সেবা করিবে, কি আশ্চর্য্য চক্রের মাহাত্ম্যে আজ ভগবান্ পণ্ডিত ভূত হইলেন। তাই দশচক্রে (দশের চক্রে) ভগবান ভূত।

শ্রী অমরাচরণ ভট্টাচার্য্য
শ্রী বিধুভূষণ শীল
শ্রী সুধীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
শ্রী হেমন্তকুমার মজুমদার
শ্রী গগনচন্দ্র দে
শ্রী ঈশানী কুণ্ডু
শ্রী উমানাথ ভট্টাচার্য্য
শ্রী হরেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত
শ্রী তপোধীরকৃষ্ণ রায় দস্তিদার
শ্রী তারাপদ ঘোষ
শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রী হরিধন ভট্টাচার্য্য
শ্রী ইন্দিরা দেবী শাস্ত্রী
শ্রী অমিয়কান্ত দত্ত

(৮১)

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হয়,—এক দল বলেন, তিনি পূর্ণ ভগবান্; অন্য দল বলেন, তিনি অংশ; অপর দল বলেন, তিনি ভগবদ্ভক্ত।

সুতরাং তাৎকালিক প্রথানুসারে একটি পাঁচ বৎসরের বালককে মন্ত্রপূত করিয়া, উক্ত প্রশ্নের মীমাংসার ভার তাহার উপর দেওয়া হয়। (বলা বাহুল্য উক্ত বালক সংস্কৃত জানিত না এবং তিনদলের লোকই উক্ত পরীক্ষায় আহ্বাবান্ ছিলেন।) সেই বালক "গৌরাঙ্গ ভগবদ্ভক্তঃ ন চ পূর্ণঃ নচাংশকঃ" এই শ্লোকার্দ্ধ লিখিয়া দেয়। ইহার অর্থ—গৌরাঙ্গ ভগবানের ভক্ত, তিনি অংশও না, পূর্ণও না। তাহাতেই বিবাদের মীমাংসা হয়। কিন্তু আধুনিক অনেক পণ্ডিত ইহার উল্টা অর্থ করিয়া থাকেন,—গৌরাঙ্গঃ পূর্ণঃ, ন চ ভগবদ্ভক্তঃ, নচাংশকঃ। অর্থাৎ—গৌরাঙ্গ পূর্ণাবতার, তিনি কেবল ভক্তও না, কেবল অংশ ও না।

শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রী সুধীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
শ্রী সুকুমার সেন

আশ্বাস

আজি এই স্তব্ধনিশি সুকৃষ্ণ অম্বরে
ঢেকেছে আননখানি, বিশ্বচরাচরে
বিথারিয়া মৌনমায়া; বিহগ-কূজন
থামিয়াছে বহুক্ষণ; উদার গগন
অসীম বিস্তৃতি আর তমসা অপার
প্রকাশিছে নয়ন-সম্মুখে; অন্ধকার
পশিছে হৃদয়-কক্ষে, যেথা নিশি-দিন
জ্বলে নিত্যদীপ, সেথা বিরামবিহীন
উৎসবের আয়োজন হতেছে সঞ্চয়,
সেই মোর আলোকিত উজ্জ্বল হৃদয়
বাহিরের অন্ধকারে অন্তরে হেরিয়া
চেয়ে আছে মূক নেত্রে; নয়ন ভরিয়া
দেখিছে তামসীরূপ, ভাবিতেছে বসি,
ফুরাল জীবন-পথে আলোকের রাশি,
আঁধার আসিছে ঘিরে; মুগ্ধ প্রাণ, ওরে,
আঁধার রয়েছে—তাই ধরণীর-'পরে
আলোর মর্য্যাদা জানি, তাই তো এ প্রাণে
তমসা নেহারি যদি, ভাবি মনে মনে,
কৃষ্ণমেঘ-চিত্রপটে পূর্ণচন্দ্র সম
তিমিরের কৃষ্ণ-পটে আলোরাশি মম
ফুটিবে নবীনরূপে, নাহি তোর ভয়,
আঁধারের কাছে নাহি হবে পরাজয়।

অমিয়া চৌধুরী

হারামণি

গান

[কিছুদিন আগে বর্দ্ধমান জেলার একটি গ্রামে গিয়া এই গানগুলি পাইয়াছিলাম। প্রথম দুইটি মতিলাল দফাদার নামে একটি মুসলমান শিকারীর (আমবাগান-রক্ষকের) নিকটে শুনি। তাহার বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পাটুলি গ্রামে। লোকটা অর্দ্ধউন্মাদ, ও গানগুলি কাহার রচনা জিজ্ঞাসা করায় একবার বলিয়াছিল এগুলি সে-ই বাঁধিয়াছে, কিন্তু পরে একবার সে কথাটা অস্বীকার করিয়াছিল।

তৃতীয় গানটি একজন ব্রাহ্মণের কাছে শুনি। রচয়িতা ৺যাদুবেন্দু গোস্বামী, গুরু কুবের গোঁসাই, গ্রাম পাঁচরথি, পোঃ নাদনঘাটা, জেলা বর্দ্ধমান।—শ্রী অনাথনাথ বসু ও শ্রী প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত—সংগ্রাহক।]

(১)

(ওরে) দিল্‌দরিয়ার খবর জান্‌ রে মন॥
মিথ্যে দেহ, মিথ্যে এ সংসার,
ও মন ভেবে দেখ্‌ রে সকল ফাঁকি,
মুদ্‌লে আঁখি হবে অন্ধকার।
গুরু তোমা বিনে এ ভবে,
আমায় কে তরাবে?
(ওগো) একা যেতে হ'বে
তাই ভেবো রে মন।

(২)

কোন্ বনের গাছ কাটুলি শিউলি।
জ্বলে' গেল তোর গাছের কপালি।
(ও) তোর মনকে করলি দড়া,
গাছে বাঁধ্‌লি ঘড়া,
(ও) তোর অন্তর কেটে বসালি নলি।
(ও) তোর রসে হ'ল মন
গুড়ে হ'ল কম,
দেনার জ্বালায় মহল ফেলে পালালি।

(৩)

(ও) মন ঠিক্ হয়েছে যার।
(ও) সে মর্ম্ম কিছু বোঝে তার।
একা ব্রহ্ম বস্তু জানে
সব করেছে একাকার॥
জগেতে জগতের পতি,
সকলি তার জাতি জাতি,
হিন্দু যবন নাই কিছুর বিচার॥
এবার আস্‌তে হ'লে যেতে হ'বে,
জাতটা কেবল ভুষে পাড়॥
কারুর অন্ন কারুর খানা
ভেবে দেখ একই দানা,
আনাগোনা এক পথে সবার॥
ও তার জন্ম যাবে গোলেমালে
কালের হাতে পাবে না নিস্তার;
দেহ শোধন হ'বে
তবে সে ধন পাবে
ঘুচিবে মনের বিকার॥
গোঁসাই কুবের বলে বিন্দু যাদু,
রাধার চরণ কর সার॥

—

[লালন ফকীরের এক শিষ্যের নাম ছিল তিনু। অনেক গানে তিনু ও লালন উভয়েরই ভণিতা পাওয়া যায়। এই গানটি তিনুর রচনা। —সংগ্রাহক জসীম উদ্দীন।]

দৈর‍্যাবাজ ঘোড়া ফিরছে সদাই
ভবের বাজারে।
দিবানিশি ঘোরে ফিরে
ধৈর্য্য নয় রে মানে॥
সপ্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে,
এল ঘোড়া শোন্য ভরে;
হায়াৎ মমুত জানা যাবে
সেই ঘোড়ার সামনে॥
সাধন ক'রে পাবি তারে,
তার জোরে ব্রহ্মাণ্ড ঘোরে;
তিনটি মায়ের একটি ছেলে,
হৈল কি প্রকারে?
সেই ঘোড়া হৈল খোড়া
এইড্যা দিল বত্রিশ জোড়া,
তিনু বলে খাড়াকখাড়া
যাবি কোন্ বাজারে?

—

[সংগ্রাহক মোহাম্মদ মনসুর উদ্দীন।]

বাকীর কাগজ মন তোর গেল হে জুড়ে।
যখন ভিটায় হও বসতি
ও মন দিয়েছিলে খোস্ কবুলতী—
ও আমি হরদমে নাম রাখ্‌বো স্মৃতি
এখন ভুলেছ তারে।
আইন মাফিক নিরিখ দেনা
ও মন তাতে কেন করিস অলসপনা,
যাবে রে মন যাবে জানা
জানা যাবে আখেরে॥
সুখ পা'লে হও সুখ-ভোলা,
ও মন দুখ পা'লে হও দুখ-উতলা,
লালন কয় সাধনের খেলা
মন তোর কিসে "জুৎ" ধরে॥

দরিদ্রের জাগরণ

গরীবের ছেলে, গরীবের ছেলে,
ছেঁড়া কাঁথা তোর ফেলে দে ছুঁড়ে,
চেয়ে ছাখ্ আজ মেলি শতদল
সোনালী কমল উদয়-চূড়ে!
ভুবনের মাঝে দুই জাতি আছে,
নাই নাই আর জাতির পাঁতি,—
ধনী ও গরীব ;—যারা লাথি মারে,
আর যারা খায় তাদের লাথি!
চিরকাল ধ'রে ধূলো মেখে গায়,
লাথিতে হোলো না অরুচি কি রে?
বাঙালী-ঘরের কাঙালী বেচারা!
উঠে ব'সে মোছ্ নয়ন-নীরে!
জগতে জেগেছে গরীব আজ!
গরীবের ভাতে হাত দ্যায় যারা,
তাদের মাথায় পড়ুক বাজ্!

গরীবের কি গো নেই ভগবান্,
চিত্ত কি তার আত্মা-হারা?
ধনীর মতই বক্ষে কি নেই
তপ্ত-লোহিত রক্ত-ধারা?
নাই কি তাদের ভালোবাসা-প্রেম,
নাই কি হৃদয়ে কামনা শত?
এই ধরণীর রসধারা পিয়ে
ফোটেনি কি তারা ফুলের মত?
রোগে মরে তারা, অনাহারে মরে,
বেঁচে ম'রে থাকে জড়ের প্রায়,
দারিদ্র্য যেন মহাপাপ ওরে—
যৌবনে তারা মৃত্যু চায়!
ধনী কেন বলে 'আমারি সব'?
দীন কেন হায় ভিখারীর মত
করে জোড়করে আর্ত্ত-রব?

রুশিয়ায় ছাখ্ জেগেছে গরীব,
কোথা জমিদার, কোথায় প্রজা?
রাজা-প্রজা সব একসা হয়েছে,
মাঝে সীমা-রেখা যায় না বোঝা!
কত শতাব্দী করেছে সহ্য
ধনীর চাবুকে কত-না মার,
আজ তারা সবে ধনীর সমান,
নেই ভেদাভেদ যাতনা আর!
নী দ্যায় নাই নিজে কিছু ছেড়ে,
ভালোবেসে দীনে বলেনি 'মিতা',
তোর চোটেতে হ'য়ে গেছে ঢিট্,
গরীবের জোর বুঝেছে কি তা!
জাগো বাংলার দুঃখী ছেলে!
ন্ধুতে যদি বন্যা জাগে রে,
সাধ্য কাহার পিছনে ঠেলে!

ধনীর অন্ন কারা পেটে আনে?
সে ওই ক্ষেতের গরীব চাষা!
কর্ম্মী কাহারা, শিল্পী কাহারা,
শ্রমিক কাহারা,—দেশের আশা?
দীন গড়ে বাড়ী, ধনী বাস করে;
দীন বোনে বাস, ধনীরা পরে;
অজন্মাতেও দীন প্রজা তবু
কেঁদে টাকা ঢালে রাজার ঘরে!
প্রকৃতির দান সকলে সমান,
পৃথিবীর এই সবুজ মাটি,—
কার অধিকারে ধনী দাবি করে,
কার ক্ষমতায় আগুনে ঘাঁটি?
অকেজো, নিঠুর, গর্ব্বী ধনী!
দীন যদি বসে কাজ ছেড়ে দিয়ে,
ম'রে যাবি তোরা প্রমাদ গণি'!

ঘুমপুরে আজ ভেঙে গেছে ঘুম,
ছোঁয়া দিয়ে গেছে সোনার কাটি ;
যুগে যুগে জমা প্রাণের আবেগ
বোমারি মতন গিয়েছে ফাটি' !
গরীবের জোর বুঝেছে গরীব,
মিছে ভয়ে পিছে যাবে না স'রে,
ভোরের আলোতে খোলা রাজপথে,
মুখোমুখি দেখি সাধু ও চোরে !
দীনে বলে ডেকে -'কর্ম্মী যে-জন,
কর্ম্মফলেতে দাবি তো তারি !
কার কত বল দ্যাখা যাক্ যুঝে,
দেখি ধনী-সনে পারি কি হারি !'
হাতে হাতে ধার শুধিতে হবে !
যা আছে পাওনা দিলে ষোলোআনা,
ধনী পাবে আজ ছাড়ান্ তবে !

শোনো, শোনো হো-হো ! বিশ্ব জুড়িয়া
ক্ষুব্ধ দীনের যুদ্ধগান !
জাগো বাংলার দুঃখী গরীব !
ধর, ধর ত্বরা ঐক্যতান !
কেবা জমিদার, কেবা প্রজা তার,
কেবা প্রভু আর গোলাম কেবা ?
তোরা যে মানুষ, তোরা যে শ্রমিক,
কেন অলসের করিবি সেবা ?
কপালের ঘাম চরণে ফেলিয়া
যা পাবি সে তোর,- ধনীর নয়,
ধনী যদি পারে নিজে খেটে খাক,—
যোগ্য হবে যে, তাহারি জয় ॥
বিশ্ব-সভায় জিতেছে দীন !
বাঙালী গরীব ! তুমিও সজীব,
থেক না থেক না বাক্যহীন !

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

অজন্তার পথে

যেখানে খান্দেশের সমতলভূমি হইতে হঠাৎ দাক্ষিণাপথ উপত্যকার উদ্ভব হইয়াছে সেইখানেই নিজাম রাজ্যের আরম্ভ। যখনই সেই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ হয় তখনই হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। যে-পথ দিয়া আর্য্যেরা দক্ষিণাপথে প্রবেশ করেন সেই পথেই বর্ত্তমানে গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলার রেলওয়ের উপরস্থ জলগাঁ হইতে মোটর-যোগে যাতায়াতের সুবিধা আছে। এই পথ দিয়া মুসলমানেরাও নিশ্চয়ই দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কারণ নিজাম বাহাদুরের ফর্দ্দাপুরের অতিথিশালার সম্মুখস্থ পর্ব্বতের উপর দাঁড়াইলেই মুসলমান স্থাপত্যবিদ্যার অনুকরণে নির্ম্মিত এক বিরাট্ বিজয়-তোরণ দৃষ্ট হয়। এই বিজয়-তোরণ দেওগড়ের (বর্ত্তমান দৌলতাবাদের) হিন্দুরাজাকে পরাজিত করিয়া সেই বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ মুসলমানেরা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থান কেবল যে মুসলমানদের জয় ঘোষণা করিতেছে তাহা নহে, এই প্রদেশে এমন প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ উচ্চভূমি আর দ্বিতীয় নাই। পাহাড়ের উপর দাঁড়াইলে ১৫০ ফুট নিম্নে অপর পার্শ্বে এক বিস্তীর্ণ সমতলভূমি দৃষ্ট হয় ;—ঐ সমতল ক্ষেত্র বিলিয়ার্ড-টেবিলের মত মসৃণ—খান্দেশের মত সমতল। ঐ ক্ষেত্রটি দক্ষিণদিকে প্রায় শত শত মাইল বিস্তীর্ণ। আবার কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই বন্ধুর পর্ব্বত দৃষ্টিপথে পতিত হয়। হাঁটিতে হাঁটিতে আকাঙ্ক্ষা আর ফুরায় না—ইচ্ছা হয় দেখা যাক্ কোথায় ঐ সমতল ভূমি শেষ সীমায় পৌছিয়াছে। বিজয়-তোরণের পার্শ্বে দাঁড়াইলে উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সমতলভূমি ও দক্ষিণের উপত্যকা ছাড়াও আরো কতকগুলি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। দাক্ষিণাত্যের কৃষক বৎসরে দুইটি ফসল উৎপাদন করে—খান্দেশের কৃষাণ একটির বেশী ফসল পায় না। কারণ সূর্য্যোত্তাপ সমান পাইলেও

ফর্দ্দাপুরের অতিথিশালা
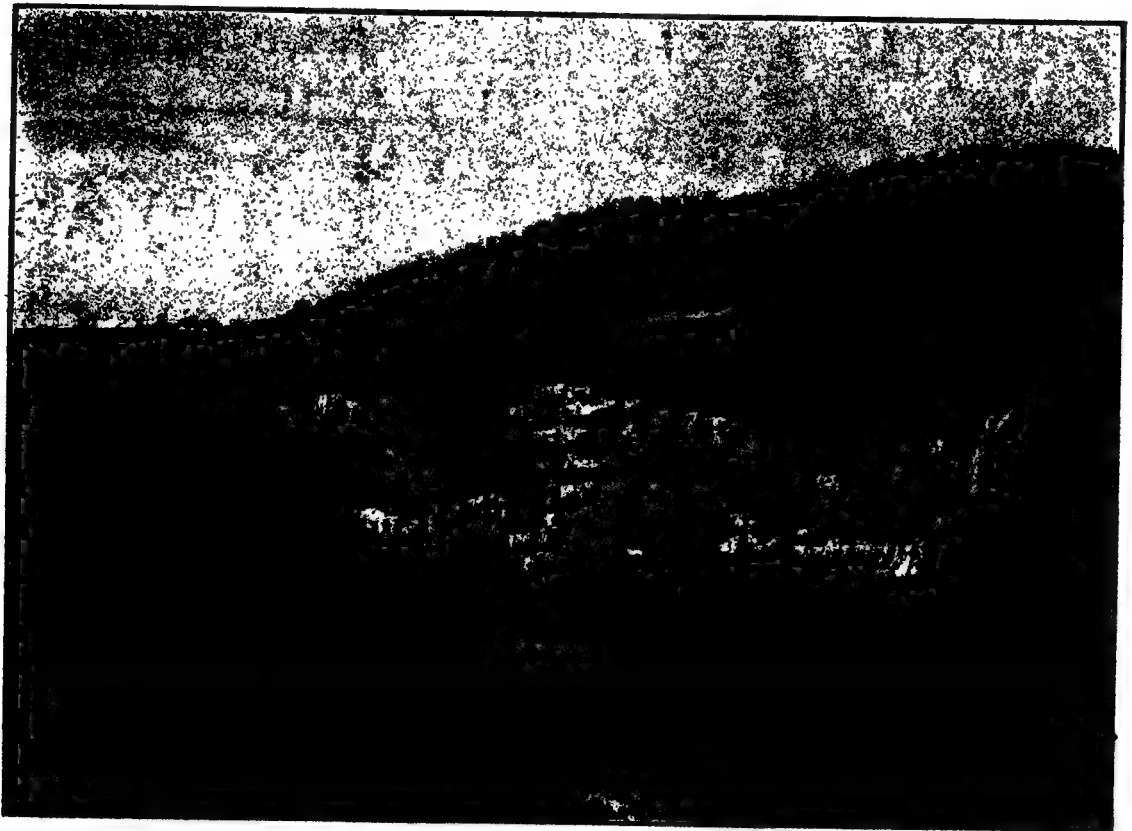
অজন্তা উপত্যকা ও গুহাসমূহের সাধারণ দৃশ্য

খান্দেশের জমি দাক্ষিণাত্যের জমির মত শিশিরপুষ্ট হয় না।

প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে একের পর এক যে-সমস্ত আক্রমণকারী এই পথ দিয়া দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের কথা মনে পড়ে। আর একটি চিন্তা মনে স্বতঃই উদিত হয় যে দ্রাবিড়েরা দাক্ষিণাত্যের আদিম অধিবাসী, না আর্য্যদের মতই উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। শব্দের

অজন্তার ১৯ নং গুহার বহির্ভাগের দৃশ্য

ক্রমোৎপত্তির সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা করা হইতেছে যে দ্রাবিড়েরা আর্য্যদেরই অগ্রগামী একদল ভারতের আগন্তুক। নিজাম রাজ্যে, সেকান্দ্রাবাদে, হান্ট্‌ নামক একজন চিকিৎসক অবসর-সময়ে প্রস্তরাদির সাহায্যে প্রত্নতত্ত্বালোচনা করেন এবং তাঁহার বিশ্বাস যে দ্রাবিড়দের পূর্ব্বে অন্য এক জাতি দাক্ষিণাত্যে বসবাস করিত এবং দ্রাবিড়েরা তাহাদের জমাজমি কাড়িয়া লইয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে।

এখানে আসিলে এই-সব দ্রাবিড় ও আর্য্যদের, খিলিজী, তোগলক অথবা মোগলের রাজ্যাদি জয়-বিজয়ের কথা অপেক্ষা একটা চিন্তা মনে আসে, যে, কি গভীর জ্ঞানের ও ধর্ম্মের আধিপত্য একদিন এই দেশে ছিল। উত্তরাগত জ্ঞান ও ধর্ম্মের সহিত দক্ষিণের যোগ ঘটিয়া এক মহাবিপ্লব সৃজন করিয়াছিল। অজন্তার কৃষকের কর্ষিত ভূমির উপর দাঁড়াইয়া সেই সম্মিলিত জ্ঞানের পরিচয়-স্বরূপ চৈত্য বিহার ও মঠ দেখিয়া দর্শকের নয়ন তৃপ্ত হয়।

এই-সকল মন্দিরে যাইতে পর্ব্বত বাহিয়া খুব নিম্নে অসমতল ও বন্ধুর পথ ধরিতে হয়। একটি ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী সর্পগতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, তাহার পাশ দিয়া পথ চলিয়াছে।

জীবন-সমস্যার সমাধানের আশায় ও মৃত্যুর পরে অসীম শান্তির উপায় চিন্তার জন্য বৌদ্ধেরা নিশ্চয়ই এই নির্জ্জন প্রদেশে তাঁহাদের কর্ম্মস্থান নির্ব্বাচন করেন। সেই মহান্‌ দৃশ্য দেখিয়া মন বিভোর হইয়া যায়। এই

চতুর্দ্দিকে পাহাড়ে বেষ্টিত স্থানে দণ্ডায়মান হইলে পশ্চাতে দেখা যায় বৃক্ষলতাদিপূর্ণ এক দীর্ঘ পর্ব্বত, ও সম্মুখে একটি স্রোতস্বিনী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। এই অগভীর স্রোতস্বিনী বর্ষার সময় ভীম গর্জ্জনে প্রবাহিত হয়। কিছু দূরে একটি হ্রদ, তাহার পার্শ্বে পর্ব্বত। পর্ব্বত-গাত্রে দূরে যে প্রকোষ্ঠ দৃষ্ট হয় উহা জলের আঘাতে নির্ম্মিত পর্ব্বতগুহা নয়—উহা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ অজন্তার প্রকোষ্ঠ, আর তার পার্শ্বে কারুকার্য্যশোভিত স্তম্ভাবলী। দৃষ্টি মাত্রেই বোঝা যায় প্রতি গৃহই দ্বিতল।

নদী পার হইলেই স্থানে স্থানে সংস্কারযোগ্য ভগ্ন বিহার ও মন্দির দৃষ্ট হয়। কি অসীম ধৈর্য্য ছিল এই শিল্পীদের, যাঁহারা পাহাড় কাটিয়া এই বিরাট্ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যখন ডিনামাইট ছিল না তখন হাজার হাজার মন পাথর কাটিয়া এই শিল্পীদের চৈত্যের ছাদ ও মনোহর স্তম্ভ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। পাথরকে কাঠের বর্গার মত কাটিয়া কাটিয়া গোলাকারে ছাদ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। প্রাচীরগাত্রে প্রস্তর-খোদিত অসংখ্য প্রতিমূর্ত্তি। স্তূপগুলি বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তিতে শোভিত হইয়া প্রকোষ্ঠের শেষভাগে বিদ্যমান। ঘরের মেঝে সমতল। গৃহতলে বর্ত্তমানে যে-সমস্ত দাগ দেখা যায় উহা হয় কালের নয় কোন শত্রুর কুকীর্ত্তি; নির্ম্মাতারা নিশ্চয়ই এমন ভাবে খুঁৎ রাখিয়া এইসব সুন্দর গুহাগৃহ নির্ম্মাণ করেন নাই। স্থানে স্থানে যে-সব গর্ত্ত আছে—হয় সেগুলি বিধর্ম্মীরা বিদ্বেষবশে করিয়াছে, না হয় প্রাচীন শিল্পীরা রং পিষিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যে-সকল গৃহ সভাসমিতির জন্য ব্যবহৃত হইত তাহার ছাদের নিম্নভাগ সমতল। ছাদের নিম্নভাগ এবং দেওয়ালগুলি প্রথমে সমতল করা হইত, তৎপরে কাদার দ্বারা আবৃত হইত এবং শেষে গোময় অথবা ঐরূপ কোনো আঠাযুক্ত দ্রব্যের প্রলেপের সাহায্যে পাহাড়ের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হইত। দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, পলস্তারা ভিজা থাকিতে থাকিতে চিত্রগুলি খোদিত করা হইয়াছে। রংএর প্রাচুর্য্য দেখিয়া মনে হয় সেগুলি ঐস্থানেই পাওয়া যাইত। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অজন্তার পথের একপ্রকার পাথর হইতে সবুজ রং হইত। কাল রং নিশ্চয়ই প্রদীপের ধূমোদ্গীর্ণ কালির সহিত অল্প ঈষৎ তরল রংএর সাহায্যে প্রস্তুত করা হইত।
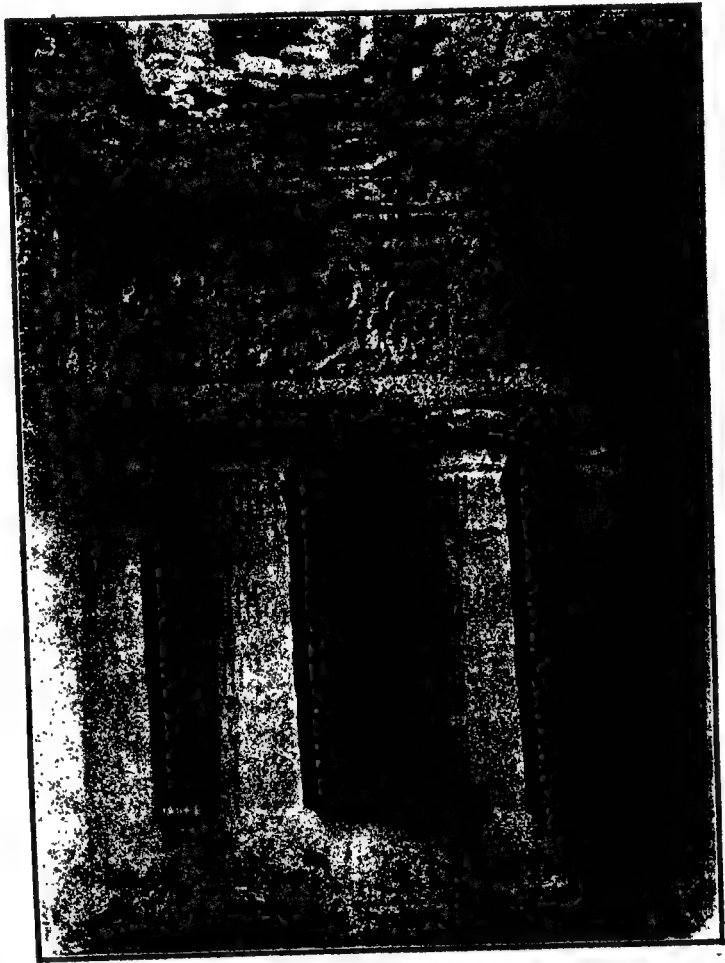
অজন্তার ২ নং গুহার বারান্দার স্তম্ভসমূহ

অজন্তার ১ নং গুহার ছাদতল ও স্তম্ভ
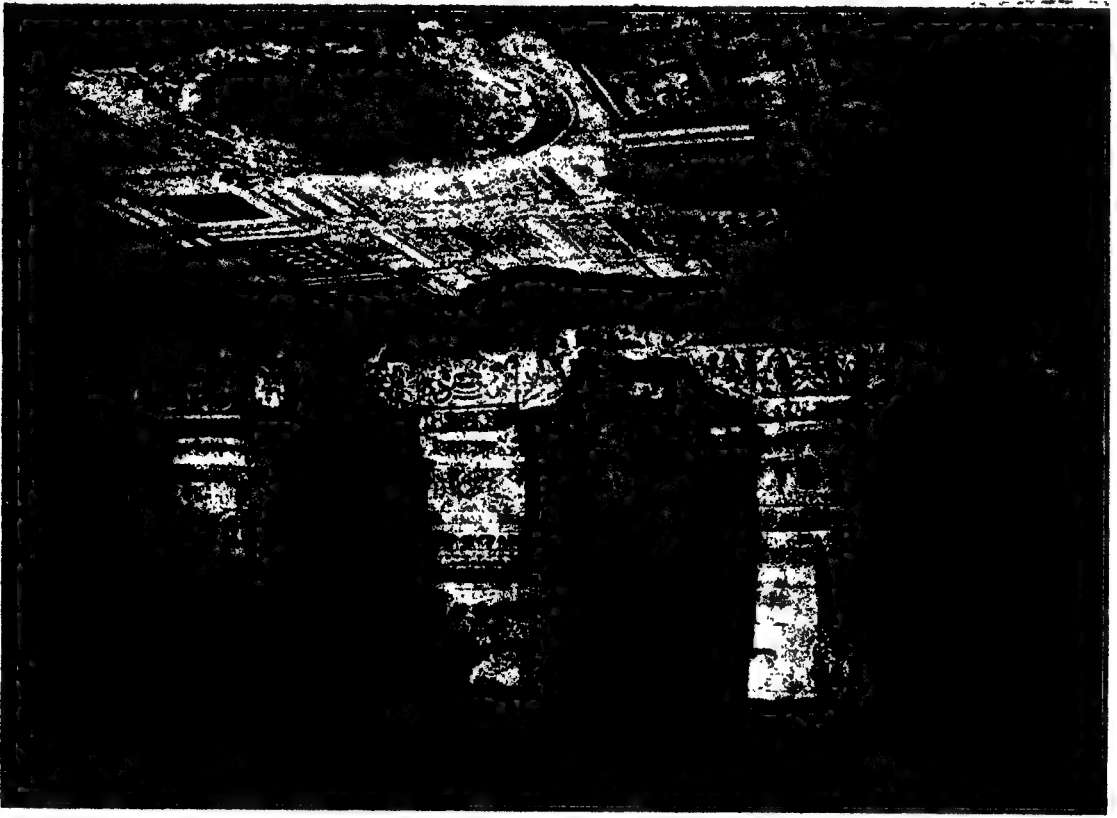
যে তিনটি অথবা চারিটি গৃহে চিত্র নাই সেগুলি বোধ হয় সভাসমিতির জন্য ব্যবহৃত হইত। একটি গৃহ দেখিয়া মনে হয় যে ইহা হয়ত চিত্রিত হইয়াছিল কিন্তু কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে অগ্নিতে পুড়িয়া এখন ধূম্রবর্ণ হইয়াছে। দুই তিনটি স্থানে যেন দেওয়াল ও উপরের ছাদ কেবল প্রস্তুত করা হইয়াছে, কিন্তু চিত্রের কাজ অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কেন এমন হইল—প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে অথবা কোন ভয়ে কি এই শিল্পোপাসকেরা এমন সৃষ্টি অসম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন? কারণ যাহাই হউক না কেন, এই অসম্পূর্ণ গুহাগুলি দেখিয়া আমরা প্রাচীন কালের শিল্পের রীতিনীতি জানিতে পারি এবং এই শিল্পীদের অসীম ধৈর্য্যের প্রমাণ পাই।

যে-সকল গৃহে সন্ন্যাসীরা বা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বাস করিতেন সেগুলি আকারে ক্ষুদ্র। মেঝের এবং দেওয়ালের ছিদ্র দেখিয়া মনে হয় ঐ-সব স্থানে কাঠের দরজা ছিল। অন্য ছিদ্রগুলির আকার দেখিয়া মনে হয় সেগুলি কাপড়-চোপড় ঝুলাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

এই সকল চিত্রশিল্প অন্যূন ৯০০ অথবা ১০০০ বৎসর সময়ের শিল্পধারার নমুনা সংগ্রহ। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনটি বোধ হয় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে চিত্রিত হইয়াছিল।

নির্ম্মাণ-সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে প্রকোষ্ঠগুলি ধারাবাহিক রূপে সজ্জিত হয় নাই। মধ্যস্থিতটি ঘোড়ার খুরের মত আকারের এক পাহাড়ে অবস্থিত; ইহা অতি প্রাচীন কালের। আবার সর্ব্বশেষ প্রকোষ্ঠটি কিন্তু নিতান্ত আধুনিক।

নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে, এই শিল্প-রচনার প্রণালী নিশ্চয়ই উত্তর দেশ হইতে প্রাপ্ত এবং গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্মমত ও এই শিল্পরীতি একই সময়ে প্রাধান্য লাভ

করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্য যে উত্তরাগত এই শিল্প দক্ষিণের সংস্পর্শে আসিয়া এই বিরাট্ রূপ ধারণ করিয়াছে। দক্ষিণের সাজসজ্জার বাহুল্য দেখিয়া এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। যে চৈত্যে (২৬নং) বুদ্ধদেবের মহাপ্রস্থান দেখান হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বেও এদেশের লোকেরা কি চমৎকাররূপে পাষাণের বুকে ভাবকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিতে পারিতেন। যে-আসনে প্রভু বুদ্ধ সমাসীন, তাহার দণ্ডগুলি দেখিতে, এখনও পাঞ্জাবে যে-প্রকার দণ্ড খাটে ব্যবহৃত হয় ঠিক তাহারই মত। বালিশটি ঠিক আমাদের বালিশেরই মত। বুদ্ধের মুখের নির্ব্বিকার শান্ত ভাব দেখিয়া মনে হয় তিনি প্রবৃত্তিকে জয় করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। বুদ্ধের পদ-নিম্নে ম্রিয়মাণ সন্ন্যাসী-দল—কি বিষাদ সে মুখগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে! রংও চমৎকার ফুটিয়াছে। ১৬নং গুহায় মৃত্যুযাত্রী রাজকন্যার ছবি। প্রতি বর্ণে ও রেখায় মৃত্যুযন্ত্রণা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অজন্তার ২৬ নং গুহার ভিতরের দৃশ্য

যে-ছবিখানিতে এক রাজপুত্রের সন্ন্যাসগ্রহণ দেখান হইয়াছে সে-চিত্রেও বিষাদের ভাব অঙ্কনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখা যায়। প্রেম কাম ঈর্ষা ঘৃণা লোভ মোহ মাৎসর্য্য সুখ দুঃখ—এমন একটি ভাব নাই যাহা এই শিল্পীরা দক্ষতার সহিত ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই।

দানগ্রাহী এক ব্রাহ্মণের ছবি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। কি চমৎকার অভিব্যক্তি। এক চক্ষু আনন্দে বন্ধ, গালের হাড়গুলি দেখা যাইতেছে; মুখে একটা লোভের তীব্র ছটা, প্রতি অঙ্গে দান প্রাপ্তির জন্য উল্লাস।

অপর চিত্রে গবাক্ষ-পথে দুইটি ভাব-বিভোরা রমণীর ছবি;—নীচে সব দেখিতেছেন অথচ কিছুই দেখিতেছেন না—কথা বলিতেছেন অথচ তার অর্থ নাই, এমনই ভাবের প্রাবল্য। কোথাও বা একটি বানরের ছবি, আবার কোথাও বানর কাকের পিঠে চাপিয়া বসিয়া আছে। এসব দৃশ্য দেখিয়া শিল্পীদের যথেষ্ট রসজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়া যায়।
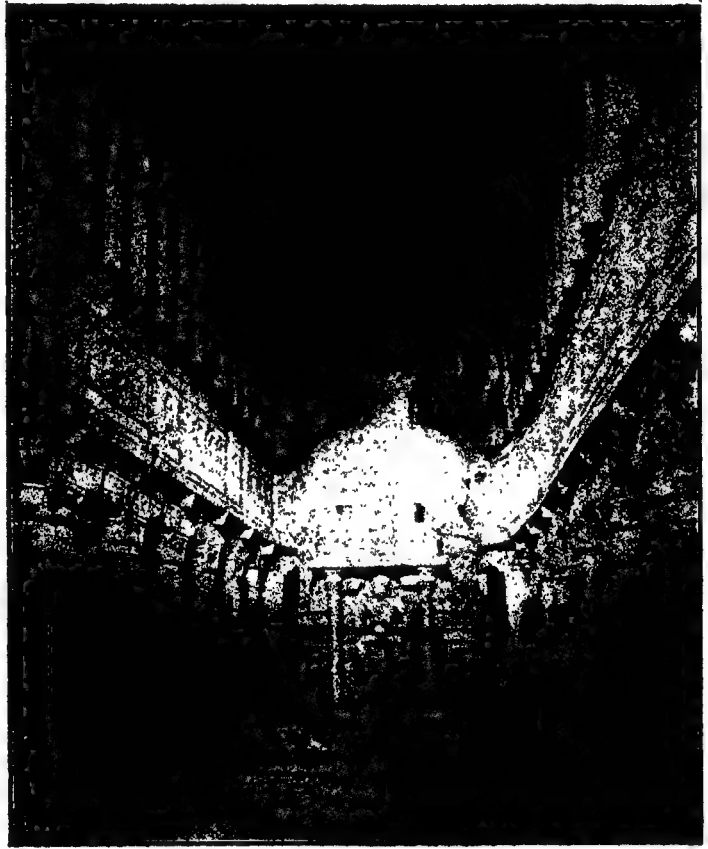
শিল্প ও আধ্যাত্মিকতার ভাব ছাড়া এই-চিত্রগুলির আর-একটা দিক্ আছে। ইতিহাস ও সমাজতথ্যে পূর্ণ এই চিত্রাবলীতে সমসাময়িক বহু ঘটনার সমাবেশ আছে। সেই সময়ের বেশভূষা, আস্বাবপত্র, আহার্য্য, পানীয়, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি বহু বিষয় এই চিত্রের সাহায্যে জানা যায়।

গুহাগুলিতে গমনের পূর্ব্বে সাধারণের ধারণা হয় যে গুহার মধ্যে নিশ্চয়ই আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, কৃত্রিম আলোকের সাহায্যে চিত্রগুলি দেখিতে হইবে।

অজন্তার ১ নং গুহার চিত্র—বুদ্ধদেব

কিন্তু এমন আশ্চর্য্যভাবে এই প্রকোষ্ঠাবলী নির্ম্মিত হইয়াছে, যে, আলোকের কোন অপ্রাচুর্য্য নাই। যে-চিত্রগুলি ঈষৎ অস্পষ্ট অথবা উঠিয়া গিয়াছে সেগুলি ভিন্ন আর সবগুলিরই আলোক-চিত্র লইতে কোন অসুবিধা হয় না।

একটি প্রশ্ন পাঠকের মনে স্বতঃই উদিত হয়, যে, এই শিল্পরক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা হইতেছে। অতি অল্প দিন হইল এ-বিষয়ে মনোযোগ দেখা দিয়াছে। ১৮২৯ সালে রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটি ইহার একটি বিবরণ দেন। এগার বৎসর পরে মিঃ জেম্স্ ফারগুসন্ এ-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং ফলে তৎকালীন প্রধান শিল্পী মেজর গিল্ এগুলি নকল করিয়া বিলাতের ক্রিষ্টাল্ প্যালেস এগ্‌জিবিশনে পাঠান। সে চিত্রগুলি দেখিয়া সকলেই খুব উৎসাহিত হন কিন্তু অগ্ন্যুৎপাতে তার প্রায় সবই নষ্ট হইয়া যায়।

প্রায় ২৫ বৎসর পরে বোম্বাই আর্ট্‌স্কুলের চিত্রকর মিঃ গ্রিফিথ্‌স্ কতকগুলি ছবি নকল করেন। তাঁহারা দীর্ঘকাল সেখানে থাকিয়া ছবিগুলির নকল প্রস্তুত করেন। কিন্তু যিনিই অজন্তার আসল চিত্রগুলি দেখিয়াছেন, তিনিই বলিলেন যে এ-ছবিগুলি কিছুই হয় নাই—এগুলি অস্পষ্ট, ও মূলের সহিত সম্পর্কশূন্য—ভাবের কোন ব্যঞ্জনা তাহাতে প্রকাশ পায় নাই।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে মিসেস্ (পরে লেডী) হেরিংহাম্ প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার ও শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়দিগকে লইয়া অজন্তার ছবির প্রতিকৃতি লইতে আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে বসু-মহাশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বসু-মহাশয়ের সঙ্গে মিঃ সৈয়দ আহমদ গমন করেন। মিঃ সৈয়দ আহমদ এক্ষণে অজন্তার পরিদর্শকরূপে নিজাম সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই চিত্রগুলি গ্রিফিথ্‌সের চিত্রাবলী অপেক্ষা ঢের বেশী ভাল। ইহার অধিকাংশই ছাপা হইয়াছে, এবং ১৯১১ সালের এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে এই চিত্রগুলি প্রদর্শিত হয় ও বিশেষরূপে সমাদৃত হয়।

বড়লাট কার্জ্জনের শুভাগমনে অজন্তার ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। লর্ড্ কার্জ্জন রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমাদের সম্মানকে আঘাত দিয়াছিলেন বলিয়াই

তাঁহার এই প্রাচীন-মন্দির-সংরক্ষণ মহাকার্য্যের জন্য প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা আমাদের নিকট হইতে পান না। তিনি ভারতীয় কলাবিদদের এই কার্য্য দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন।

লর্ড্ কার্জ্জনের শিল্প-কলা ও প্রাচীন কীর্ত্তির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি এই প্রাচীন সম্পদের হতশ্রী অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত তীব্র ভাবায় মন্তব্য প্রকাশ করেন। ঝড়-বাদল পশু পাখী ও মানুষের অত্যাচার হইতে গুহাগুলির রক্ষার কোন উপায় এতাবৎ ছিল না। যে-সমস্ত সিঁড়ি গুহার মধ্যে যাইবার পথ হিসাবে পাহাড় কাটিয়া বাহির করা হয় কালক্রমে তাহা নষ্ট হইয়াছিল;

অজন্তার ১৭ নং গুহার দ্বারোপরিস্থ চিত্রমালার একটি অংশ

অজন্তার ১৭ নং গুহার দ্বারোপরিস্থ চিত্রমালা

স্তম্ভগুলিও অনেক পড়িয়া গিয়াছিল। ছাদ দিয়া সর্ব্বদা জল পড়িত। গৃহের মধ্যে বাদুড় ও পাখী নির্ভয়ে বিচরণ করিত। ইহা ছাড়া পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রকরেরা অস্পষ্ট রংকে স্পষ্ট করিতে যাইয়া সস্তা বার্ণিশ ব্যবহার করিয়া মহা অপকার করিয়াছেন। ফকিরেরাও অগ্নি জালিয়া অনেক দেওয়াল ও ছাদ নষ্ট করিয়াছে। লর্ড্ কার্জ্জনের আন্তরিক চেষ্টায়, মানুষ ও পশুর হাত হইতে অজন্তা রক্ষা পাইয়াছে। সিঁড়ি, দেওয়াল ও স্তম্ভগুলির সংস্কার করা হইয়াছে এবং জাল দিয়া দরজাগুলি আবৃত করার ফলে বাদুড় ও পাখীর পথ বন্ধ হইয়াছে।

অজন্তার সংরক্ষণ ব্যাপার স্থায়ী হইতে পারে নাই, কারণ এতদিন বাহির হইতে চেষ্টা হইয়াছে; যাঁহার রাজ্যে অজন্তা অবস্থিত তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। স্থানটি হায়দরাবাদের জনৈক জায়গীরদারের।
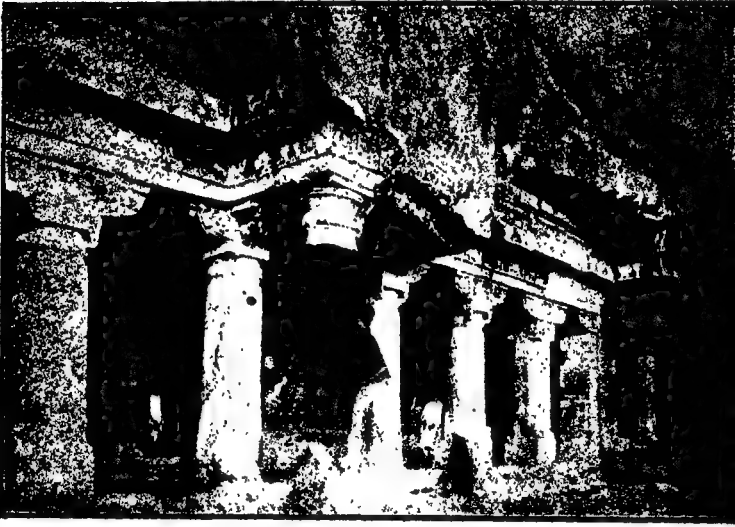
অজন্তার ১ নং গুহার বহির্ভাগের দৃশ্য

জমিদার নবাব স্যার্ সালাবাং জং নাবালক। কোন সময়ে তাঁহার অভিভাবককে অজন্তার বিষয় অবহিত হইতে বলিলে তিনি পত্রোত্তরে জানান যে অজন্তার সব জিনিস যেন ভাল করিয়া ব্যাগ্ ও বাক্সবন্দী করিয়া রাখা হয়। এই উপাখ্যানটি অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতেই দেশের লোকের বিরাট্ অজ্ঞতার পরিচয় বেশ পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান নিজামের রাজ্যপ্রাপ্তির পর মিঃ হায়দারী শিক্ষাসচিবরূপে গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে এসব সংস্কারের কথা লিখেন। প্রত্যুত্তরে গভর্ণ্‌মেণ্ট্ তাঁহাকে একখানি রিপোর্ট্ দাখিল করিতে আদেশ করেন। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার্ জন্ মার্শাল্ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যথাযথ উপদেশ দেন। কার্য্য চলিতে থাকে। অবশেষে স্যার্ জন্ মার্শালের ছাত্র ও রাজসাহী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক গোলাম ইয়াজ-দানীকে সভাপতি করিয়া এক প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ হায়দরাবাদ সরকার কর্ত্তৃক গঠিত হওয়াতে এই সম্পদাবলীকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই মুসলমান রাজ-সরকারের প্রধান দ্রষ্টব্য একটি বৌদ্ধযুগের পুণ্যস্থানের সংস্কার। দীর্ঘকাল অবহেলার ফলে ছাদ বাহিয়া জল পড়িত, বাদুড়ের বিষ্ঠায় প্রকোষ্ঠটি একেবারে পূর্ণ—এমন কি গমনাগমনের পথও এই স্তূপীকৃত দুর্গন্ধ বিষ্ঠায় বন্ধ ছিল। শোনা যায়, লেডী হেরিংহামের দল এই দুর্গন্ধ বাসহেতু কয়েকদিন আহার পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। অবশেষে তারের জাল দ্বারা বাদুড়ের যাতায়াত বন্ধ করা হইয়াছে, বিষ্ঠার স্তূপ অপসৃত করা হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত, ঘর্ষণের ফলে যতটা সম্ভব, রং নষ্ট না করিয়া এই প্রাচীন গৌরবটুকু রক্ষা করা হইয়াছে।

অবশেষে দেওয়াল ও ছাদগুলি পরিষ্কার করায় বহু চিত্র লোক-চক্ষের গোচরীভূত হইয়াছে। এখনও মিঃ গ্রিফিথস্ যে

অজন্তার সংস্কার কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিঃ গোলাম নবী
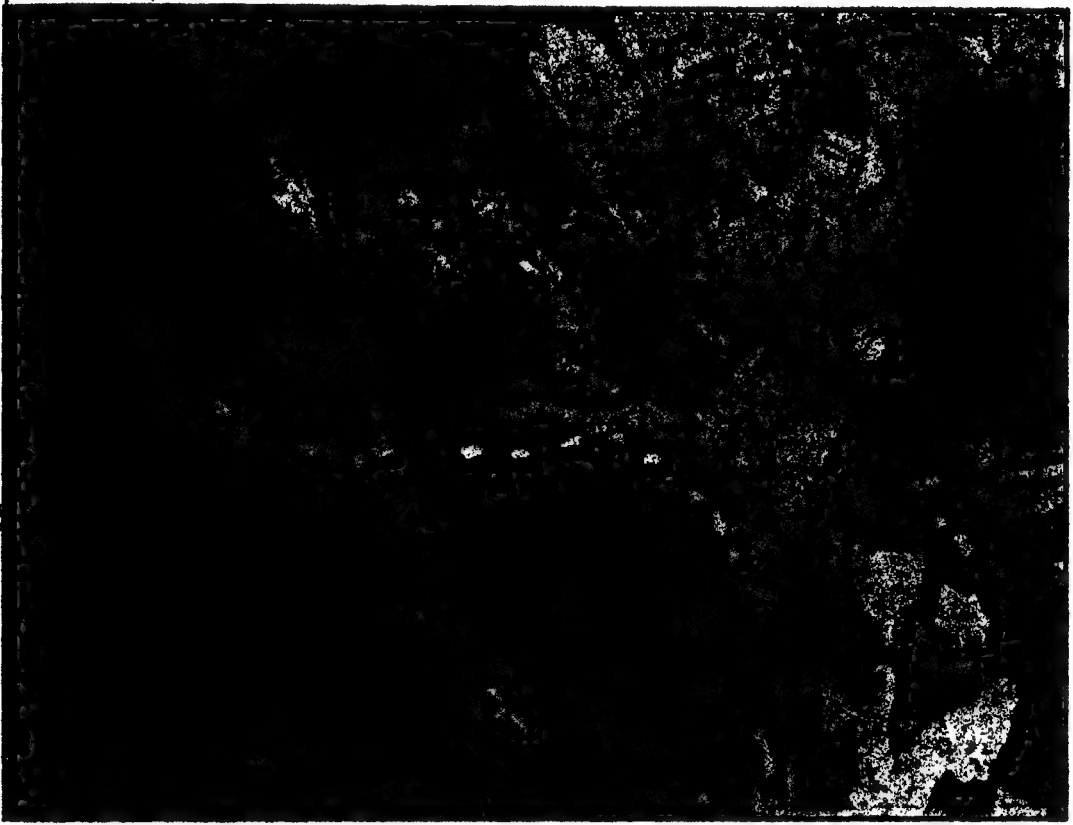
অজন্তার ১৭ নং গুহার ভিতরের দেওয়ালগাত্রের চিত্রাবলী

কালো ও সস্তা বার্ণিশ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা আছে। পরিষ্কার করিবার সময় দেখা গিয়াছে পলস্তারা কাঁপিয়া কতকগুলি ছবি শীঘ্রই পড়িয়া যাইবে এমন আশঙ্কা হইয়াছে এবং সেগুলি রক্ষার চেষ্টা হইতেছে। বর্ত্তমানে মিঃ সোনাউল্লা নামক এক পাঞ্জাবী রাসায়নিককে পলস্তারা ও ছবিগুলির উপকরণ বিশ্লেষণ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। যে পোকাতে পলাস্তারা নষ্ট করিয়া দিতেছে তাহার ধ্বংসের উপায়ও তিনি অনুসন্ধান করিতেছেন।

নিজাম-সরকারের খরচায় প্রাচীর চিত্র সংরক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ দুজন ইতালীয়কে আনা হয়। তাঁহারা কিছুদিন সেখানে থাকিয়া মিঃ গোলাম নবী নামক একজন ভারতীয়কে প্রাচীর চিত্র সংরক্ষণের উপায় শিক্ষা দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

১৭নং গুহার অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছিল। সম্প্রতি নিজাম-সরকারের তত্ত্বাবধানে মিঃ গোলাম নবী এই গুহার সংস্কারসাধনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি অত্যন্ত সতর্কতা ও নিপুণতার সহিত তাঁহার কার্য্য শেষ করিতেছেন।

১৭নং গুহার অপর একটি ভিতের গাত্রেও একটি সুন্দর চিত্র আছে। এসকল চিত্রের অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ। নিজাম বাহাদুরের আজ্ঞাধীনে সুদক্ষ পটুয়ারা এই-সকল ছবির নকল লইতেছেন। নিজামের ইচ্ছা যে অজন্তার চিত্রগুলি লইয়া নিজাম-সরকার কর্ত্তৃক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইবে। কালে যখন এই বহু পুরাতন কীর্ত্তি ধ্বংস হইবে, ইহার সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে—তখন নিশ্চয়ই এই বহুমূল্য চিত্রপুস্তক অতীতের শিল্পগৌরবের সাক্ষী দিবে।
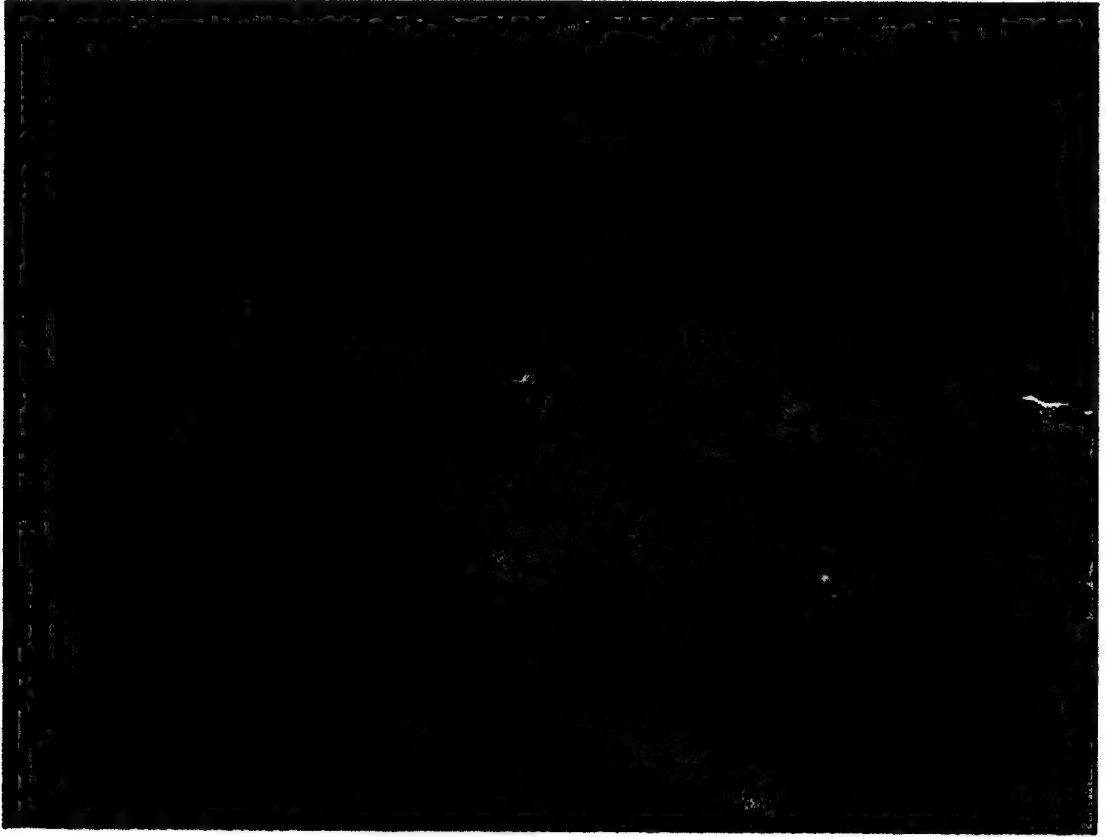
অজন্তার ১৭ নং গুহার চিত্রাবলী

যদিও নিজাম-সরকার এই প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না—তথাপি সাধারণ দর্শকের পক্ষে এখনও কয়েকটি অভাব অভিযোগ রহিয়া গিয়াছে। গুহাগুলিতে প্রবেশ-পথের সোপানগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এসকল স্থান অত্যন্ত অন্ধকার ও প্রাচীর-গাত্রে- অনেকগুলি মৌমাছির চাক আছে। সুতরাং এই-সকল সোপানের উপর অগ্রসর হওয়া সুকঠিন। ফর্দ্দাপুরের বিশ্রামশালা হইতে যে-পথটি গুহা পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহার অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। বর্ষাকালে এ-পথে যাতায়াত করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না। তবে আশা করা যায় যে এসকল অভিযোগ শীঘ্রই নিজাম বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

যদি এই-মন্দির ও গুহাগুলি আমেরিকায় অথবা ইউরোপে হইত তবে তাহা এমনভাবে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করা হইত যে প্রতিবৎসর হাজার হাজার লোক এই-স্থানে সমবেত হইত। যে-সমস্ত লোক সমবেত হইতেন তাঁহাদের সুখসুবিধার জন্ত হোটেল ও বিশ্রামগৃহও প্রস্তুত হইত। নানা প্রকার যান-বাহন পাওয়া যাইত—মোটর হইতে আরম্ভ করিয়া গাধা এবং দর্শকদের রুচি ও সৌখীনতা অনুসারে হাতী অথবা উটও পাওয়া যাইত; সকল ঋতুতে গমনাগমনোপযোগী রাস্তা ঘাটও নির্ম্মিত হইত। বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা হইলে তীব্র আলোকে এই-গুহাবলী আরো সুন্দরভাবে দেখিবার সুবিধা হইত। লিফ্‌টের ব্যবস্থা হইলে আরামে ও নির্ব্বিঘ্নে পর্ব্বতারোহণেরও ব্যবস্থা হইতে পারিত।

প্রত্যেক ভারতবাসীর এবং ভারতীয় দর্শন শিল্প অথবা

জ্ঞানচর্চ্চার সহিত যিনি পরিচিত হইতে চান্ তাঁহার, একবার এই পুণ্যতীর্থে আসা অবশ্যকর্ত্তব্য; এখানে না আসিলে তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলওয়ের অন্ততঃ পাহুর হইতে অজন্তা পর্য্যন্ত ১৩ মাইল পথ রেল-লাইন বিস্তৃত করা উচিত এবং সেখানে যদি তাঁহারা একটি হোটেল করেন, ব্যবসার হিসাবে উহাতেও বেশ লাভ হইবে। শিল্পাগার (art gallery) স্থাপনের ইহা অপেক্ষা আদর্শ স্থান আর নাই। নিজাম বাহাদুর শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তিনি যদি শিল্পাগার স্থাপন করেন তাহা হইলে প্রত্যেক ভারতবাসী এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত বিদেশীরাও তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

পিঁপুলের চাষ

বাংলা-দেশে পিঁপুলের চাষ বড় একটা দেখা যায় না, কচিৎ দু-এক স্থানে থাকিলেও বিশেষ তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। ইহার চাষে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না; অল্প পরিশ্রমেই যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে। আমাদের কৃষকগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। ইহার লাভ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই উদাসীনতার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত পিঁপুল রোপণের সময়। দোরসা মৃত্তিকা-যুক্ত জমিই ভাল ফসল প্রদান করিয়া থাকে। যে-জমিতে পিঁপুল রোপণ করা হইবে, তাহাতে এক বৎসর অন্য কোন ফসল রোপণ না করিয়া প্রতিমাসে ২।৩ বার চাষ দিলে ভাল হয়। পিঁপুল-রোপণের সময় জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়া মই দ্বারা মাটি চূর্ণ করিতে হয়। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে, আলি বাঁধিয়া অর্দ্ধ হস্ত অন্তর এক-একটি গ্রন্থিযুক্ত পিঁপুলের লতা রোপণ করিয়া, যতদিন পর্য্যন্ত লতাগুলি সতেজ না হয় ততদিন গোড়ায় জল দিতে হয়; ২।১ দিন জল দিলেই সতেজ হইয়া উঠিবে। যাহাতে আগাছা প্রভৃতি না জন্মিতে পারে তজ্জন্য নিড়াইয়া, কোদালী দ্বারা গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়।

এইরূপে মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া এবং কোদালী দ্বারা খুঁড়িয়া দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ পাইট নাই। তবে ক্ষেত্রে ধঞ্চের বীজ বপন করিয়া দিলে, বীজোৎপন্ন গাছসমূহ পিঁপুল-পাতাকে ছায়া এবং আশ্রয় উভয়ই প্রদান করিয়া থাকে।

পল্লীর বনে-জঙ্গলে পিঁপুলের লতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা রোপণ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে আবার দুই জাতীয় পিঁপুল আছে। এক জাতীয় লম্বা ও সরু, অন্য জাতীয় অপেক্ষাকৃত বেঁটে ও মোটা। শেষোক্ত জাতীয় পিঁপুলই রোপণ করা বিধেয়, কারণ সে-গুলিই অধিক মূল্যবান্।

মাঘ ফাল্গুন মাসে পিঁপুল পাকিয়া উঠে। এই-সময় পক্ক পিঁপুল-গুলি সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। এইরূপে সমস্ত পিঁপুল সংগৃহীত হইলে, গাছের মূল রাখিয়া লতা কাটিয়া ফেলা দরকার। পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় নিড়ানী ও কোদালী দ্বারা জমি খুঁড়িয়া পাইট করিতে হয়। পিঁপুল-লতা একবার রোপণ করিলে তাহাতে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর ফসল পাওয়া যায়। আবার পিঁপুল রোপণ করিতে হইলে অন্য কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে রোপণ করা দরকার। একই ক্ষেত্রে বারংবার রোপণ করিলে উত্তম ফসল লাভ হইবে না। পিঁপুলের ক্ষেত্রে আম কিংবা কাঁঠালের চারা রোপণ করিলে অত্যল্প কাল মধ্যেই গাছ বৃদ্ধি পাইয়া ফলবন্ত হইয়া উঠে। প্রতিক্ষেত্রে নিম্নলিখিত রূপে পিঁপুল পাওয়া যায়:—

প্রতি বিঘা

	উত্তম ক্ষেত্র	অধম ক্ষেত্র
১ম বৎসর	এক মন ও তদূর্দ্ধ, দেড় মনের কম	অর্দ্ধ মন ও তদূর্দ্ধ, এক মনের কম
২য় বৎসর	দেড় মন হইতে আড়াই মন পর্য্যন্ত	এক মন ও তদূর্দ্ধ, দুই মনের কম।
৩য় বৎসর	দুই মন ও তদূর্দ্ধ, আড়াই মনের কম	এক মন ও তদূর্দ্ধ, (দেড় মন ও পৌনে দুই মনের মধ্যে)

শুষ্ক পিঁপুল প্রতিমন পঞ্চাশ ষাট টাকা করিয়া বিক্রয় হয়। আমাদের দেশবাসী অনেকে পিঁপুলের চাষ লাভজনক জানিয়াও এদিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না।

নরেন্দ্রনাথ পাল

গার্শিব্রত

গত বৈশাখ ও আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে "গার্শি" ব্রত সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে চলিত 'গার্শি' ব্রতের একটু বিশেষত্ব আছে। কোনো কোনো স্থানের গার্শি ব্রতকে লক্ষ্মীর ব্রত বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু এ-অঞ্চলের গার্শি ব্রত মৃত শাশুড়ীর উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেইজন্যই; যাঁহাদের শাশুড়ী জীবিত তাঁহারা এই ব্রত করিবার অধিকারিণী নহেন। এখানে গার্শি' ব্রতকে 'গারশি' বা কোনো কোনো স্থলে 'গারই' ব্রত বলিয়া থাকে। এই ব্রতের অনুষ্ঠানের ভিতরও একটু বিশেষত্ব আছে। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিন এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাড়ীর উঠানে একটি ছোট্ট পুকুর কাটিয়া তাহার পূর্ব্ব পাড়ে একটি ধান ও একটি মান-কচুর গাছ পুঁতিয়া দেওয়া হয়। পুকুরের চারকোণে চালের গুঁড়া দ্বারা নির্ম্মিত চারটি কাক ও চার পাড়ে চারটি চিল বসাইয়া দেওয়া হয়। পশ্চিম পাড়ে একটি শূকরের মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। তার পর চালের গুঁড়া দ্বারা কোলে একটি সন্তান সহ একটি স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি তৈরি করিয়া তাহাকে সেই ধান ও মানকচু-গাছের নীচে বসাইয়া দেওয়া হয়। এইটিকে শাশুড়ীর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া কল্পনা করা হয়। তার পর একটি বড় ডালায় আট রকমের শাকসব্জী কুটিয়া ও সমস্ত জাতের ডাল সাজাইয়া রন্ধনের সব উপকরণ সহ সেই মূর্ত্তির সম্মুখে রাখা হয়। তাহার সহিত একটি নৈবেদ্যও দেওয়া হয়। তার পর ব্রতকারিণী পুকুর হইতে জল তুলিয়া নিজহাতে সেই শাশুড়ীর প্রতিমূর্ত্তিকে পান করান। অতঃপর ব্রতের কথা সমাপন করিয়া শূকরের মূর্ত্তিটাকে বলি দিয়া শাশুড়ীর মূর্ত্তি সহ সমস্ত কাকচিলের মূর্ত্তিগুলি পুকুরের গর্ত্তে পুঁতিয়া ফেলেন। পূজার ডালার আট রকমের শাকসব্জী ও ডাল একত্রে রাঁধিয়া 'চিনার' বা 'ঝরা' ঘাসের চালের ভাত খাইয়া ব্রতকারিণীকে সেই দিন কাটাইতে হয়। 'মেয়েলি ব্রতকথাতে" এই ব্রতের কথার উল্লেখ আছে। অন্য কোনো স্থানে এই ব্রতে শাশুড়ীকে পূজা করিবার রীতি আছে কি না জানি না; কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলে এই একটি মাত্র অনুষ্ঠানেই শুধু মৃতা শাশুড়ীকে পূজা করিবার রেওয়াজ দেখা যায়।

শ্রী শৈলেন রায়

—

জার্ম্মানীতে ভারতীয় ছাত্র

আমি গত ফাল্গুন মাসের "প্রবাসীতে" "জার্ম্মানীতে শিক্ষা" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা প্রায় সমস্তই ভুল বলিয়া গত আষাঢ় মাসের "প্রবাসীতে" শ্রী জ্ঞানচন্দ্র বসু মহাশয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ মাসিক খরচ সম্বন্ধে—আমি লিখিয়াছিলাম মাসিক ৪০, ৫০ টাকাতে বেশ থাকা যায়। তিনি এই "থাকা" কথাটার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনটাকেও ধরিয়াছেন। কিন্তু আমার এই "থাকা" শব্দটাতে পাঠের বেতনের কোন উল্লেখ নাই। এই "থাকা" শব্দে এখানে বাসাভাড়া ও খাওয়ার খরচ বোঝায়। এ-সব দেশে আমাদের দেশের মতন মাসে মাসে বেতন দিতে হয় না। বৎসরের প্রথমেই সারা বৎসরের বেতন একবারে দিয়া দিতে হয়। বেতন দিয়া দিলে পর প্রতিমাসে খালি বাসা ভাড়া, খাওয়ার খরচ ও হাত-খরচ লাগে। আমি যে-সময় লিখিয়াছিলাম সে-সময় ৪০, ৫০, টাকাতে বেশ ভাল ভাবেই থাকা যাইত। তবে খরচ ইচ্ছানুযায়ী হয় এ-কথা বোধ হয় বসু-মহাশয় স্বীকার করিবেন। আজকাল মার্কের (জার্ম্মান মুদ্রার) মূল্য ক্রমশই কমিতেছে। বর্ত্তমানে ১৫৲ টাকায় তিন কোটি মার্ক পাওয়া যায়। সুতরাং আজকাল আমার পূর্ব্বলিখিত খরচ হইতে কম খরচে জার্ম্মানিতে থাকা যায়।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বে ভর্ত্তি হওয়া সম্বন্ধে—ভারতীয় ছাত্রের ভিড় আমি বুরো হইতেই জানিয়াছিলাম এবং সেই জন্যই পূর্ব্বে ভর্ত্তি ঠিক করিয়া যাইবার জন্য লিখিয়াছিলাম।

সেদিন এক ভদ্রলোক গ্লাস্‌গো হইতে জার্ম্মানীতে পড়িতে যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি পাস্ পান নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে এই পাস্ পাওয়া অত্যন্ত শক্ত ছিল, কিন্তু আজকাল পাওয়া যাইতেছে।

শ্রী শিশিরেন্দ্রকিশোর দত্ত রায়

ভিখারী

(কবীর)

আমার দুয়ারে এসেছে ভিখারী,
চাহে সে আমারি দান;
কোন সম্বল নাহি যে আমার
কেমনে রাখিব মান?
ভিখারী সে, ফিরে দুয়ারে-দুয়ারে,
আমি যে চিনিতে নারিনু তাহারে,
কি চাহে সে-জন, বুঝিব কেমনে,
এসেছে কি অভিলাষে?

সব নিয়ে মোর, করেছে ভিখারী,
কেন সে আবার এসেছে আমারি
দুয়ারে কিসের আশে!
যুগ-যুগ ধরি' জীবন-দুয়ারে
সে আছে দাঁড়ায়ে,—ফিরাব কি তারে?
সঁপিব আপন প্রাণ।

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
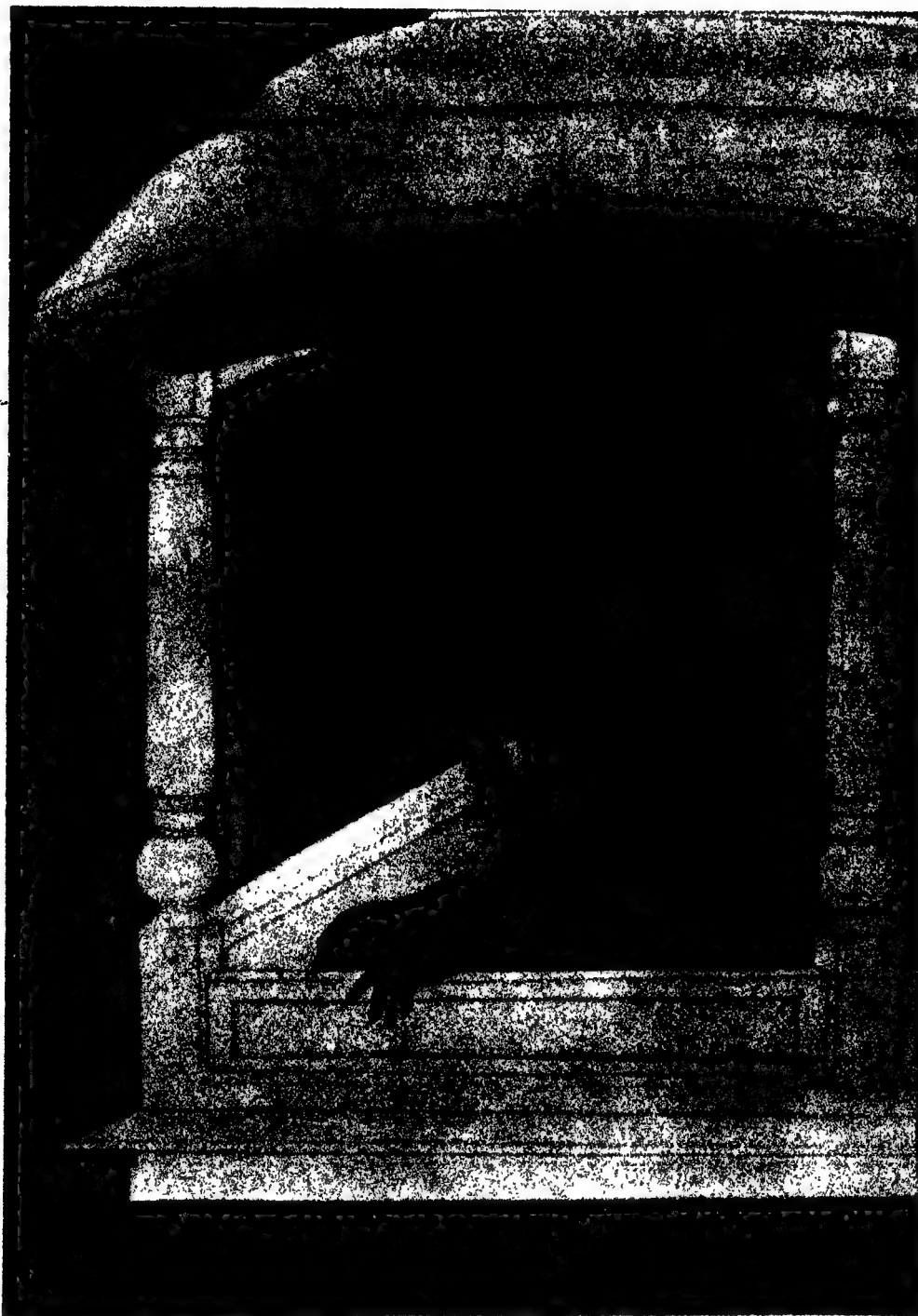
সখী

চিত্রকর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

U. Ray & Sons, Calcutta

নূতন গান

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে
তাই সাহস করে, দিলেম বিদায়।
তুমি গেলে' ভাসি নয়ন-নীরে,
এখন কেন মরি দ্বিধায়?
এখন একলা সাঁঝের অন্ধকারে
আপনি কাঁদাই আপনারে,
কেবল ভেবে মরি বারে বারে
ওগো, কি ডাকে ফিরাব তোমায়!
যখন থাক আঁখির কাছে
তখন দেখি ভিতর বাহির
সব ভরে' আছে।
সেই ভরা দিনের ভরসাতে
চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে,
তবু তোমা-হারা বিজন রাতে
কেবল হারাই হারাই বাজে হিয়ায়॥

(প্রাচী, শ্রাবণ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

ডাক ও খনা

আমাদের দেশে লোকের ধারণা খনা বরাহমিহিরের পুত্র-বধূ। বরাহ-মিহির ৪৭৬ শাকে জন্মান এবং ২৩ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রধান বই লেখেন। তিনি আপনাকে আবন্তক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আবন্তক বলিলে অবন্তী দেশের লোক অথবা এক জাতীয় ব্রাত্য ব্রাহ্মণ, বুঝায় তিনি অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন—শেষকালে গঙ্গাতীরে কান্তকুব্জে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম পৃথুযশ। তিনিও একজন বড় জ্যোতিষী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম বরাহমিহির। আমাদের খনার শ্বশুরের নাম বরাহ, স্বামীর নাম মিহির।—"ব'লে গেছে বরাহের বৌ।" "ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী শুনহ পতির পিতা।" অবন্তীর বরাহমিহিরের সহিত খনার সম্পর্কটা ঠিক নয়। তিনি বাঙ্গালা দেশেরই মেয়ে। কোন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী জ্যোতিষী আচার্য্যের স্ত্রী ও আচার্য্যের বৌ। এই বচনগুলি বেশী দিনের যে পুরাণ নয় তাহার কারণ এই যে ইহাতে অনেকগুলি আরবী পারসী শব্দ আছে।

খনা বাঙ্গালীর মেয়েও বটে আর মুসলমান আমলের মেয়েও বটে। কিন্তু হিন্দুর মেয়ে, বৌদ্ধের নয়। নহিলে তিনি কেবল মাত্র হিন্দুর উপবাসের কথা লিখিতেন না।

ডাকিনীর পুংলিঙ্গ ডাক। নেপালে বামাচারে যাহারা সিদ্ধ হয় তাহাদিগকে বীর বলে। বড় বড় বীরের নাম বীরেশ্বর বা ডাক। তা' তিনি হিন্দুই হউন আর বৌদ্ধই হউন। বৌদ্ধদের ভিতর ডাকার্ণব বলিয়া এক তন্ত্র আছে। বজ্রডাক তন্ত্র নামেও এক তন্ত্র আছে। ডাকার্ণবের মাঝে মাঝে সংস্কৃতের ভিতর চলিত ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে। সে ভাষাটা বাঙ্গালা একেবারেই নয়।

আর এক ডাক আছেন, তিনি বৌদ্ধদের। বৌদ্ধদের হেরুক বলিয়া এক দেবতা আছেন। তিনি সকলের অপেক্ষা বড় দেবতা। তাঁহার শক্তি বজ্রবারাহী। তিনি যখন বজ্রবারাহীর সঙ্গে যুগনদ্ধ ভাবে থাকেন তখন তাঁহাকে ডাক বলে। বজ্রডাক হেরুকতন্ত্র প্রভৃতি বৌদ্ধদের তন্ত্রের মধ্যে মাঝে মাঝে চলিত ভাষায় গান ও ছড়া পাওয়া যায়। সে গান ও ছড়া পুরাণ বাঙ্গালা, বৌদ্ধ গান ও দোঁহার বাঙ্গালা। কিন্তু তাহাতে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্মের কথা ছাড়া আর কিছুই নাই।

ডাকের বচন যতদূর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বড় কিছু পাইলাম না। বরং যাহা পাইলাম তাহা হিন্দুর কথা।

হিন্দুর নানা প্রকার সংস্কার আছে; তাহাতে জ্যোতিষের দরকারটা বড় বেশী। কিন্তু সেটা কি পাঠানদের সময় অত ছিল? সেটা যেন মোগল আমলেই বেশী হইয়া আসিয়াছিল। সেই সময়ই আরবী হইতে সংস্কৃতে ফলিত-জ্যোতিষের অনেক বই তর্জ্জমা হয়। সে বইগুলিকে "তজিক" বলিত। "হিল্লাজ"ও বলিত। গণেশ দৈবজ্ঞ ও তাঁহার বংশধরেরা সেই আরবী জিনিসগুলি খুব ছড়াইয়া দেন। সে সময়ে বোধ হয় খনার জ্যোতিষের বচনগুলি অনেক তৈরী হয়। আমাদের দেশে অর্থাৎ বাঙ্গালায় সেই পুরাণ কালের জ্যোতিষই চলিতেছিল। গণেশ দৈবজ্ঞের ঢেউ যেন খনার বচনের মধ্যে অনেক প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং ডাককে বৌদ্ধ যুগের লোক বলা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। ডাক যে মুসলমান আমলের লোক তাহার প্রমাণ এই,—আদালতের পারসী শব্দ যাহাতে আছে সে জিনিসটিকে প্রাচীন বলিতে ভরসা হয় না।

আমার এক একবার বোধ হয় ডাক পূর্ব্বদেশের লোক। কারণ তিনি যে-সকল ব্যঞ্জনের কথা বলিয়াছেন সেগুলি পূর্ব্ববঙ্গেই পাওয়া যায়।

ডাক ও খনার বচন বৌদ্ধদের নয়, হিন্দুর। তাও খুব পুরাণ নয়। মুসলমান আমলের বটে, কিন্তু কত পুরাণ বলা যায় না। বোধ হয় পাঠান আমল হইতেই আরম্ভ; মোগল আমলে শেষ। খনার বচন অধিকাংশই চাষের কথা এবং জ্যোতিষের কথা।

ডাকের বচন শুধু জ্যোতিষ ও চাষ লইয়া নয়। ইহাতে আরও অনেক কথা আছে। ছেলে মানুষকরা, গৃহিণীর দোষ, গৃহিণীর গুণ, সতীর লক্ষণ, অসতীর লক্ষণ, ব্যঞ্জন রাঁধা, বর্ষার লক্ষণ, ওষুধ এবং আরও অনেক কথা আছে। উপদেশ অনেক রকম আছে। ভাল লোক হইতে গেলে কি কি পরিহার করিতে হয় তাহার একটা তালিকা আছে।

ডাক-চরিত নামে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে একখানি পুঁথি আছে। ঐ পুঁথিখানি ১০৯০ শালে লেখা।

(প্রাচী, শ্রাবণ) শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

—

যজ্ঞোপবীত

অনেকে অনুমান করেন, আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়া এখানকার আদিম অধিবাসী অনার্য্যদিগের সহিত একত্র বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন অনার্য্যদিগের সহিত নিজেদের একটা স্বাতন্ত্র্য

রক্ষা করিবার জন্য, তাঁহাদের উপবীত ধারণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

আর্য্যগণ যজ্ঞার্থই উপবীত ধারণ করিতেন। সুতরাং অধুনা ইহা ব্রাহ্মণ শূদ্র চিনিবার উপায় স্বরূপ হইয়া পড়িলেও, ইহা বর্ণাশ্রম-বিভাগের চিহ্নস্বরূপে কল্পিত হইয়াছিল বলাটা বোধ হয় সমীচীন হয় না।

যজ্ঞোপবীত শব্দের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে,—যজ্ঞের জন্য উপবীত এবং যজ্ঞের উপবীত।

উপবীত ধারণের মন্ত্র স্মার্ত্তগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে ইহা যজ্ঞেরই উপবীত। যদিও আর্য্য ঋষিগণ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য উপবীত ধারণ করিতেন, উহা যজ্ঞপুরুষেরই উপবীত,—যজ্ঞপুরুষের উপবীত হইতেই আমাদের এই উপবীত কল্পিত।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় যজ্ঞের এক নাম প্রজাপতি এবং সম্বৎসরের নামও প্রজাপতি। বৈদিক গ্রন্থাদিতে যজ্ঞ, সম্বৎসর ও প্রজাপতি এই তিনটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত। মৃগশিরা নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থান-কালীন দিবা ও রাত্রি সমান হইত বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ এই নক্ষত্র হইতে বৎসরাদি গণনা ও যজ্ঞাদি সম্পাদনের কাল নিরূপণ করিতেন। একারণ এই মৃগশিরা নক্ষত্রই সম্বৎসর; ইহাই যজ্ঞপুরুষ; এবং যেহেতু ইহা যজ্ঞপুরুষ ও সম্বৎসর, সেজন্য ইহা প্রজাপতি নামে অভিহিত।

বেদের ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রসংহার বা নমুচি বধ অথবা সংহিতার রুদ্র কর্ত্তৃক প্রজাপতির শরবিদ্ধ হওয়া প্রভৃতি উপাখ্যান এই মৃগশিরা বা যজ্ঞপুরুষ নক্ষত্র সম্বন্ধে রচিত। পুরাণের দক্ষ একজন প্রজাপতি, তাঁহার ছাগমুণ্ড; অপর পক্ষে মৃগশিরা নক্ষত্রও প্রজাপতি, তাহার আকার মৃগের মস্তকের মত; ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে।

যজ্ঞপুরুষের কটিদেশে সমসূত্রপাতে তিনটি উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই যজ্ঞপুরুষের মেখলা। এই মেখলার পার্শ্ব হইতে লম্বমান কতকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জ দেখা যায়। উহাই যজ্ঞপুরুষের দণ্ড।

কেবল যে হিন্দুরাই আকাশে এইরূপ যজ্ঞপুরুষ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা নহে; গ্রীক, ইরাণী প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্য জাতির মধ্যেও এরূপ কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই যজ্ঞপুরুষকে গ্রীকভাষায় ওরায়ন (Orion) বলে। 'ওরায়ন' (Orion) শব্দ অগ্রহায়ণ শব্দের অনুরূপ। মৃগশিরা নক্ষত্রের অপর নাম অগ্রহায়ণ। "মার্গশীর্ষো মহামার্গ আগ্রহায়ণিকশ্চ সঃ"—অমরকোষ। গ্রীকদিগের ওরায়নের মূর্ত্তি প্রায় আমাদের যজ্ঞপুরুষেরই মত। গ্রীক পুরাণ-মতে ওরায়নের মূর্ত্তি রাক্ষস-সদৃশ,—কটিদেশে মেখলা, ও তৎসঙ্গে অসি লম্বমান, হস্তে গদা এবং পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম। আমাদেরও যজ্ঞপুরুষের কটিদেশে মেখলা, হস্তে দণ্ড এবং পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্মের পরিবর্ত্তে মৃগচর্ম্ম, মৃগের শির ত আছেই। ইরাণীরা যজ্ঞপুরুষকে হওম (Haoma) বলে। মৃগশিরার অধিপতি চন্দ্র, হওমেরও অধিপতি চন্দ্র। ইরাণীদের ধর্ম্ম-পুস্তক 'হওম ইয়াস্ত' গ্রন্থে কথিত আছে, ঈশ্বর হওমকে 'কস্তি' (মেখলা) প্রদান করিয়াছেন। এই 'কস্তি' অতি পবিত্র; একারণ আমাদের যজ্ঞোপবীত ধারণের ন্যায় পারসীরা কটিদেশে 'কস্তি' (মেখলা) ধারণ করিয়া থাকে।

'হওম' শব্দ আমাদের 'হোম' শব্দের অনুরূপ। যজ্ঞের সঙ্গে হোমের সম্বন্ধ আছে। পারসীরা 'স'কে 'হ' বলে; এ কারণ 'সোম' শব্দ হইতেও 'হওম' শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে। হওমের অধিপতি চন্দ্র।

যজ্ঞপুরুষের কটিদেশস্থ এই মেখলা হইতেই আমাদের যজ্ঞোপবীতও পারসীদের 'কস্তি' কল্পিত। বৈদিক গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়, পূর্ব্ব-কালে ঋষিগণ যজ্ঞাদি সম্পাদন করিবার সময় কটিদেশে বস্ত্রখণ্ড বন্ধন করিয়াই উপবীত ধারণ করিতেন; এখনকার মত গলদেশে সূত্র-নির্ম্মিত উপবীত ধারণ করিবার প্রথা তখন ছিল না। তৈত্তিরীয় সংহিতায় তিন প্রকার উপবীত ধারণের কথা উল্লেখ আছে,—উপবীত, প্রাচীনাবীত ও নিবীত। মনু এই তিন প্রকারের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন (মনুসংহিতা ২।৬৩)—যজ্ঞসূত্র বা বস্ত্র বাম স্কন্ধে ধারণ করিয়া তন্মধ্য দিয়া দক্ষিণ বাহু নিষ্ক্রান্ত হইলে উপবীতী, দক্ষিণ স্কন্ধে ধারণ করিয়া তন্মধ্য দিয়া বাম বাহু নিষ্ক্রান্ত হইলে প্রাচীনাবীতী, এবং উভয় স্কন্ধে ধারণ করিয়া মালার ন্যায় দোলায়মান থাকিলে নিবীতী বলা হইয়া থাকে। যদিও এখন আমরা শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি-ক্রিয়া-বিশেষে মনুর এই তিন প্রকারই উপবীত ধারণ করিয়া থাকি, স্মৃতিতে এমন কয়েকটি বচন দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে যজ্ঞোপবীতের সহিত কটিদেশের সম্বন্ধ আছে। এই স্মৃতির বচন অনুসারে আজকাল ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ গলদেশ হইতে কটির ঊর্দ্ধ ও স্তনের নিম্ন পর্য্যন্ত উপবীত ধারণ করিয়া প্রাচীন ও আধুনিক উভয় প্রথাকে বজায় রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

আর্য্যগণ যজ্ঞপুরুষের মেখলা হইতে যেমন যজ্ঞোপবীত কল্পনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ যজ্ঞপুরুষের শরীর মৃগের মত দেখিয়া অথবা উহার মৃগশির দেখিয়া, মৃগচর্ম্মের উত্তরীয়ও ধারণ করিতেন। উপবীত, প্রাচীনাবীত ও নিবীত এই উত্তরীয় সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। মনু নিবীতকে কণ্ঠে মালার মত করিয়া ধারণ করিতে বলিয়াছেন; সুতরাং ইহাও এক প্রকার উত্তরীয়। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন এই নিবীতকে কেহ উত্তরীয় হিসাবে গলদেশে, আবার কেহ বা যজ্ঞোপবীত হিসাবে কটিদেশে ধারণ করিতেন (কুমারিল ভট্ট, কাত্যায়ন, দেবল)। যদিও আমরা উপবীত প্রাচীনাবীত ও নিবীত কর্ম্মবিশেষে ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু প্রাচীন কালে উহা কতকটা লোকের সুবিধা-অসুবিধার উপর নির্ভর করিত।

আমরা এখন সর্ব্বদা সূত্র-নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধে উপবীতী হইয়া ধারণ করি এবং কর্ম্মবিশেষে প্রাচীনাবীতী ও নিবীতী হইয়া থাকি; কিন্তু বৈদিক গ্রন্থাদির কুত্রাপি সূত্র-নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীতের উল্লেখ পাওয়া যায় না; বা গলদেশে ধারণ করিবার ব্যবস্থাও নাই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যে বলা হইয়াছে, 'অজিন বা বস্ত্র উত্তরীয় হিসাবে দক্ষিণ দিকে পরিধান করিবে' ইহা হইতে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে নিবীতাদি বস্ত্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সূত্র সম্বন্ধে নহে, যেহেতু সূত্র অপেক্ষা বস্ত্রখণ্ড কটিদেশে বন্ধন করা সুবিধাজনক।' সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বৈদিক অজিন বা মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় কালে বস্ত্রখণ্ডে পরিণত হইয়া কখন বাম স্কন্ধে কখন দক্ষিণ স্কন্ধে আবার কখন বা উভয় স্কন্ধে অথবা কটিদেশে স্থান লাভ করিত। ইহা যজ্ঞপুরুষের মেখলা নয়,—তাঁহারই অজিন বা উত্তরীয়,—সৌকর্য্যার্থে কালে এইরূপ রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। যখন প্রাচীন মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় সুবিধার জন্য কালে বস্ত্রখণ্ডে পরিণত হইল, তখন এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, এই বস্ত্রখণ্ড পরবর্ত্তী কালে যে সূত্রে পরিণত হইয়াছে তাহাও ন্যায়মালার উক্তি অনুসারে 'সৌকর্য্যায় প্রাপ্তম্'—সুবিধার জন্য করা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের আধুনিক সূত্র-নির্ম্মিত উপবীত প্রাচীন যজ্ঞোপবীত নয়,—উহা প্রাচীন উত্তরীয়। আমাদের উপবীতের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, আমরা প্রাচীন প্রথাকে একেবারে পরিত্যাগ করি নাই। আমাদের উপনয়ন-সংস্কার-কালে আমরা কটিদেশে মুঞ্জ-মেখলা, গলদেশে অজিন বা মৃগচর্ম্মখণ্ড এবং হস্তে দণ্ড ধারণ করিয়া থাকি। কেবল ইহাই নহে, মধ্য যুগে যে মৃগচর্ম্ম বস্ত্রখণ্ডে পরিণত হইয়াছিল তাহাও আমরা পরিত্যাগ করি নাই,—আমরা সূত্র-নির্ম্মিত উপবীত ধারণ করা সত্ত্বেও পূজা-পাঠাদি-কালে বস্ত্রের উত্তরীয় ধারণ করিয়া থাকি।

আর্য্য ঋষিগণ যজ্ঞাদি-সম্পাদন-কালে কটিদেশে বস্ত্রখণ্ড, গাত্রে

মৃগচর্ম্ম এবং হস্তে দণ্ড ধারণ করিতেন। আমরা যজ্ঞপুরুষ বা মৃগশিরা নক্ষত্রের অবিকল এইরূপ আকৃতি দেখিতে পাই। সুতরাং মনে হয়, যজ্ঞের সহিত প্রজাপতির সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, বৈদিক যুগে যজ্ঞের জন্য যজ্ঞপুরুষের বেশ ধারণের প্রয়োজন হইয়াছিল; এবং সেই কারণে আজও পর্য্যন্ত আমরা উপনয়ন-সংস্কার-কালে ব্রহ্মচারীকে মৃঞ্জমেখলা অজিন ও দণ্ড ধারণ করাইয়া অবিকল যজ্ঞপুরুষই সাজাইয়া থাকি। মৃগশিরার শিরদেশস্থ তিনটি উজ্জ্বল তারা যজ্ঞপুরুষের মেখলা, এবং উহা হইতেই প্রাচীন আর্য্যদের ত্রিবৃত যজ্ঞোপবীত কল্পনা; যজ্ঞপুরুষ মৃগরূপী, সেকারণ আর্য্যদের মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় পরিধান; এবং যজ্ঞপুরুষের কটিদেশ হইতে লম্বমান নক্ষত্রপুঞ্জকে উহার দণ্ড কল্পনা করিয়া তদনুসারে আর্য্যদের মধ্যে বিল্ব বা পলাশের দণ্ড-ধারণ-প্রথা প্রচলিত।

মৃগশিরা বা যজ্ঞপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের আকৃতি অনুসারে যখন আমাদের এই যজ্ঞোপবীত পরিকল্পিত, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, যে সময় মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুববিন্দু থাকিত অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি সমান হইত, সেই সময় হইতেই এই যজ্ঞোপবীত ধারণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অধুনা বিষুববিন্দু অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে প্রায় ২২ অংশ পশ্চিমে উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রে অবস্থিত। অশ্বিনী হইতে মৃগশিরার দূরতা প্রায় চারি নক্ষত্র অর্থাৎ ৪×১৩⅓=৫৩⅓ অংশ এবং বর্ত্তমান বিষুববিন্দু হইতে ইহার দূরতা প্রায় ৫৩⅓+২২=৭৫⅓ অংশ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে বিষুববিন্দু ৬৬⅔ বৎসরে এক অংশ করিয়া পশ্চিমে সরিয়া যায়। সুতরাং এই ৭৫⅓ অংশ সরিয়া আসিতে উহার প্রায় ৭৫⅓×৬৬⅔=৫০২২⅑ বৎসর সময় লাগিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই যজ্ঞোপবীত ধারণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের বিষুববিন্দু প্রায় ৭১ বৎসর অন্তর এক অংশ করিয়া পিছাইয়া পড়ে। এই হিসাবে মৃগশিরা যুগের কাল খ্রীঃ পূঃ প্রায় ৩৫০০ বৎসর পাওয়া যায়।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে যে উপনয়নের বিস্তারিত পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দেখা যায় মাত্র মেখলা অজিন ও দণ্ড সম্বন্ধেই ব্যবস্থা করা হইয়াছে;—সূত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীতের কথা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। অধুনা সামবেদী ব্রাহ্মণগণের উপনয়ন ভবদেব-লিখিত পদ্ধতি অনুসারে হইয়া থাকে। ভবদেব তাঁহার পদ্ধতিতে মেখলা ধারণের পর যজ্ঞোপবীত ধারণের কথা বলিয়াছেন বটে; কিন্তু উহা সূত্রনির্ম্মিত অথবা বস্ত্রের উত্তরীয় হইবে তাহা বিশেষ করিয়া কিছু বলেন নাই। গোভিলও যজ্ঞোপবীতের কথা কিছু উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অতি প্রাচীন কালে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীতের ব্যবহার ছিল না। আমরা মনুসংহিতায় সূত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীতের কথার উল্লেখ পাই। মনু বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাস সূত্রে তিন গাছি সূতায় ঊর্দ্ধাধোভাবে অবলম্বিত থাকিবে। পৌরাণিক যুগের প্রথমেই মনুসংহিতা রচিত হইয়াছিল। একারণ মনে হয়, পৌরাণিক যুগ হইতেই আমাদের এই সূত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণের প্রথা চলিয়া আসিতেছে। অনার্য্যদের সঙ্গে আর্য্যদের একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য সদা সর্ব্বদা তাঁহাদের উপবীত ধারণের প্রয়োজন হয়। সর্ব্বদা বস্ত্রখণ্ড ধারণ করা অসুবিধাজনক; এবং এই কারণেই বোধ হয় সূত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীতের পরিকল্পনা। স্মৃতিতেও বস্ত্রাভাবে সূত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতিতে এইরূপ আছে,—"তৃতীয়মুত্তরীয়ং বা বস্ত্রাভাবে তদিষ্যতে।" অর্থাৎ তৃতীয় উপবীত বস্ত্রাভাবে উত্তরীয় হিসাবে ধারণ করিবে। অধুনা আমরা তিন গাছি সূত্রের উপবীত ধারণ করিলেও উপরন্তু ব্রতপূজাদি-অনুষ্ঠান-কালে বস্ত্রের উত্তরীয় ধারণ করিয়া থাকি। এই বস্ত্রের উত্তরীয়ই আমাদের বৈদিক মৃগচর্ম্মের অজিন বা যজ্ঞোপবীত।

আমাদের বর্ত্তমান আচার বিকৃত হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে আজকাল মুঞ্জমেখলার অভাবে শণের পৈতা করিয়া ব্রহ্মচারীর গলদেশে ধারণ করান হইয়া থাকে। ভবদেব-পদ্ধতিতে স্পষ্টাক্ষরে "ত্রিবৃতাং মৌঞ্জমেখলাং পরিধাপয়ন্" কথার উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ভট্টাচার্য্যগণ কেন বা মেখলা গলদেশে ধারণ করিতে নির্দ্দেশ করেন, জানি না। কোমরে হার পরার ন্যায় গলায় মেখলা পরা বাস্তবিকই অসঙ্গত ব্যাপার। ভারতের অন্যত্র এরূপ গলায় মেখলা পরার ব্যবস্থা নাই। তারপর মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় ধারণের কথা। আমরা উপনয়ন-কালে কোনরূপ চর্ম্মের উত্তরীয় ধারণ করা ত দূরে থাক্, বস্ত্রখণ্ডও মন্ত্রপাঠের সঙ্গে ধারণ করি না; মাত্র একগাছি পৈতার সঙ্গে অতি সামান্য একখণ্ড মৃগচর্ম্ম বাঁধিয়া দিয়া থাকি। কিরূপে যে আচার-ব্যবহার বিভিন্নাকার ধারণ করে, ইহাই তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই প্রবন্ধের মূল উপকরণ স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক প্রণীত ওরায়ন (Orion) গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।*

(অর্চ্চনা, ভাদ্র)   শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

* অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত শ্রী বিধুশেখর শাস্ত্রীর লেখা "Sacred Thread of the Hindus" নামক ইংরেজী প্রবন্ধ "বিশ্বভারতী" পত্রের বর্ত্তমান বর্ষের দ্বিতীয় (জুলাই, শ্রাবণ) সংখ্যায় পাঠ করিয়া দেখিবেন।— প্রবাসীর সম্পাদক।

রামায়ণী যুগের চিত্রশিল্প,

চিত্র যে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের দিক্ দিয়া সৌখিন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় রামায়ণে গৃহাদির ও চিত্রভবনাদির বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়।

অযোধ্যায় রামের গৃহ চিত্র ভূষিত ছিল। কৈকেয়ীর ভবনেও একটি চিত্রগৃহ ছিল (২।১০।১৩)। লঙ্কার বর্ণনায়ও চিত্র এবং চিত্রশালার উল্লেখ আছে।—

"লতাগৃহাণি চিত্রাণি চিত্রশালা গৃহাণি চ।"—৫।৬।৩৬

বালির যে শিবিকার কথা কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ২৫ সর্গে উল্লেখ আছে, ঐ শিবিকা পক্ষী ও বৃক্ষলতাদির চিত্রে চিত্রিত ছিল।

"দিব্যং ভদ্রাসনযুতাং শিবিকাং স্যন্দনোপমাম্।
পক্ষিকর্ম্মভিরাচিত্রা-দ্রুমকর্ম্ম-বিভূষিতাম্॥ ২২

রামায়ণে ভাস্করের নির্ম্মিত মূর্ত্তির কথা থাকিলেও কোন চিত্রিত মনুষ্যমূর্ত্তির উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

সুন্দরাকাণ্ডের সপ্তম সর্গে একটি লক্ষ্মীমূর্ত্তির কল্পনা প্রদত্ত হইয়াছে। পদ্মসরোবরে পদ্ম-হস্তে লক্ষ্মীমূর্ত্তি, হস্তীসমূহ সেই মূর্ত্তিকে অভিষেক করিতেছে; এ কল্পনা বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরের—খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর। ইহাকে বৌদ্ধ শ্রীমূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। এই শ্রীমূর্ত্তির চিত্র সাঞ্চিস্তূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শ্রীই নাকি পৌরাণিক যুগে লক্ষ্মী ও সরস্বতীরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন।

রামায়ণীযুগে আর্য্য ভারতে দেবদেবীর কোন মূর্ত্তি কল্পিত হয় নাই। সুতরাং দেব-দেবীর কোন মূর্ত্তি তখন চিত্রের বিষয় ছিল না।

পাণিনির একটি সূত্রে আছে "ইবে প্রতিকৃতৌ" ৫।৩।৯৬

রামায়ণে ভাস্কর্য্য-নির্দ্দেশক 'প্রতিমা' শব্দ আছে, কিন্তু চিত্রশিল্পের আভাস-দ্যোতক প্রতিকৃতি বা এইরূপ-অর্থনির্দ্দেশক কোন শব্দ নাই। সেই সুপ্রাচীন যুগে চিত্রশিল্পে লতা পাতা ফুল পক্ষী ও নানারূপ আলিম্পন ব্যতীত মনুষ্যচিত্র অঙ্কনের নিয়ম ছিল না।

"বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" গ্রন্থেও কতকটা এই ভাবের আভাস আছে। অতি প্রাচীন কালে আর্য্য জাতির মধ্যে মনুষ্যমূর্ত্তি-চিত্রণ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। পরে মনুষ্যমূর্ত্তি-অঙ্কন-বিধি প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু তখনও মূর্ত্তির চক্ষুদান-বিধি শাস্ত্রবিরুদ্ধ ছিল। ক্রমে প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইত বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যে-কোন মূর্ত্তি বা চিত্র অঙ্কিত হইতে পারিত না। বাস-গৃহে যাহা অঙ্কিত হইতে পারিত, রাজ-সভা-গৃহে তাহা পারিত না; রাজ-সভা-গৃহে যাহা অঙ্কিত হইতে পারিত, চৈত্য-গৃহে তাহা রাখা যাইতে পারিত না। এইরূপ ক্রমবিকাশের পথে আসিয়া অন্যান্য যাবতীয় চিত্রের ন্যায় মনুষ্যচিত্রও উন্নত পর্য্যায়ে পঁহুছিয়াছিল। ইহার পর বৌদ্ধ যুগে পাশ্চাত্য প্রভাবের সংস্পর্শে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের গতি পরিবর্ত্তিত হয়।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে কিন্তু তাহা নহে।

রামায়ণের রচনাকাল যে পাণিনি রচনারও বহু পূর্ব্বের, পরন্তু পাশ্চাত্যশিল্পপ্রভাবে সমুন্নত বৌদ্ধ যুগের নয়, রামায়ণে ভাস্কর্য্যের প্রভাব ও প্রতিকৃতি-চিত্রণ নৈপুণ্যের অভাব—তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

চিত্র সম্বন্ধে সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে যে নিষেধ-বিধি ছিল, তাহাই যে ভারতীয় শিল্পকে মনুষ্যপ্রতিকৃতি-চিত্রাঙ্কণ-বিষয়ে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাহাই যে বাল্মীকির ন্যায় মহাকবির কল্পনাকেও মূক করিয়া দিয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায়।

চিত্রলিপি পৃথিবীর অতি প্রাচীন লিপি। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় ভারতীয় আর্য্যেরাও এই লিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রামায়ণে চিত্র লিপির আভাস আছে।

(সৌরভ, শ্রাবণ) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার

—

সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস

(আচার্য্য উইণ্টারনিট্‌জ্‌এর বক্তৃতা)

অথর্ববেদের নানান্ রকম মন্ত্রতন্ত্রের মধ্যে দু'একটি এমন চমৎকার মন্ত্র আছে যা ঋক্‌বেদেও দুর্ল্লভ। সেই-সব মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে (৪, ১৬) ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। আর শেষার্দ্ধে মিথ্যাবাদীদের গালি দেওয়া হয়েছে। এই মন্ত্রগুলির উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে ব্লুম্‌ফীল্ড্ বলেন যে আসলে এগুলি যাদুবিদ্যার মন্ত্র। আমার কিন্তু তা ঠিক বলে' মনে হয় না। রোটের মতন আমি মনে করি যে আগে এগুলি বরুণের স্তোত্র ছিল, পরে এগুলি মন্ত্রে পরিবর্ত্তিত করা হয়েছে।

এরকম আরও স্তোত্র আছে যা পরে যাদুমন্ত্রে পরিবর্ত্তিত করে' অথর্ববেদে যোগ করা হয়েছে, বিশেষত রাজকর্ম্ম-স্তোত্রগুলি যাতে রাজার জীবনের যাদুমন্ত্রের কথার উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতে প্রত্যেক রাজার একটি করে' পুরোহিত থাকৃত, তাঁরা রাজকর্ম্মের মন্ত্রতন্ত্র খুব ভাল করে' জান্‌তেন। পুরোহিত রাগ্‌লে অনর্থ ঘটাতেন, কিন্তু তুষ্ট থাকলে রাজাকে নানাভাবে রক্ষা করতেন। পুরোহিতকে ব্রাহ্মণ বলা হত বলে' পরবর্ত্তী সাহিত্যে অথর্ববেদকে ব্রহ্মবেদ বলা হত। অথর্ববেদে রাজার অভিষেকের কথা, সে-সময়ে তাঁর যশ দীর্ঘায়ু কামনা করে' নানা মন্ত্র লেখা আছে। একটি শ্লোকে (৩, ৪) রাজার নির্ব্বাচনের কথা আছে। আর-একটি শ্লোকে (৩, ৩) কতকগুলি মন্ত্র আছে যার দ্বারা নির্ব্বাসিত রাজা নিজের রাজ্য ফিরিয়ে পেতে পারেন। আর কতকগুলি আছে যুদ্ধের মন্ত্র, আমার বোধ হয় সেগুলি প্রথমে যুদ্ধের গান ছিল, পরে সেগুলিতে মন্ত্র যোগ করা হয়েছে (৫,২০ ও ২১)। "রাজকর্ম্মাণি"র মধ্যে অপর শ্লোকগুলিতে রাজার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা হয় নি, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধেই অনেক কথা আছে। তাতে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করা মহাপাপ, তাদের দক্ষিণা ও উপহারাদি দেওয়া পুণ্যের কাজ। যারা ব্রাহ্মণের জীবন বা সম্পত্তি নষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অভিশাপ এই শ্লোকগুলিতে বর্ষণ করা হয়েছে।

যজ্ঞ সম্বন্ধে অনেক শ্লোক অথর্ববেদে স্থান পেয়েছে, শুধু অন্য বেদের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য দেখাবার জন্য; কারণ সেগুলি হয় ঋগ্বেদ বা যজুর্ব্বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে।

এর চেয়েও পুরাণ কবিতা হচ্ছে—অথর্ববেদের "আয়ুষাণি" শ্লোক, যাতে দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যলাভের প্রার্থনা আছে। এগুলি প্রায়ই উপনয়ন বা অন্য কোন পারিবারিক উৎসবে ব্যবহার করা হত। আর কতকগুলি শ্লোক আছে যার দ্বারা কৃষক মেষপালক ও ব্যবসায়ী নিজেদের মঙ্গল প্রার্থনা করত, যেমন, চাষের সময়, বীজবপনের সময়, কিংবা গৃহনির্ম্মাণের সময়। এসব শ্লোক সাহিত্যহিসাবে খুব উঁচু না হ'লেও, দু'-একটি খুব সুন্দর আছে। যেমন, ৪, ১৫তে ঋক্‌বেদের বেঙের গানটি নেওয়া হয়েছে, কিন্তু পর্জ্জন্য সম্বন্ধে তার সঙ্গে আর-একটি চমৎকার শ্লোক যোগ করা হয়েছে।

আর-একরকম শ্লোককে আমরা প্রায়শ্চিত্তের শ্লোক বল্‌তে পারি। নানা অন্যায়ের জন্য প্রাচীন আর্য্যদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, যেমন—ঋণ শোধ না-করার জন্য—বিশেষত জুয়ার দেনা ও অন্যায় বিবাহ ইত্যাদি করার জন্য। সমস্ত রোগ ও অন্যায় কাজ নাকি দৈত্যদের দ্বারাই কৃত হত। তারাই আবার নাকি পারিবারিক কলহ ঘটাত। তাই অথর্ববেদে কতক শ্লোক দেখা যায় যার দ্বারা পারিবারিক জীবনে আগেকার সদ্ভাব ফিরিয়ে আন্‌তে পারা যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মন্ত্র হচ্ছে, অথর্ববেদের ৩, ৩০।

এই-সব মন্ত্র-তন্ত্র, অভিশাপ আশীর্ব্বাদ ছাড়া, আর কতকগুলি শ্লোক অথর্ববেদে আছে যাকে আমরা দার্শনিক শ্লোক বল্‌তে পারি। যে-বইখানি মন্ত্র ও যাদুবিদ্যায় ভরা তাতে এ রকম দার্শনিক শ্লোক থাকা খুব আশ্চর্য্য বলে' মনে হয়। কিন্তু ভাল করে' এগুলো পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে তেমন গভীর ভাব নেই, শুধু সামান্য একটা ভাবকে খুব বড় করে' দেখান হয়েছে। এগুলি ঐ যাদুকরদেরই কাজ, যারা কেবল নিজেদের বিদ্যা প্রচার করার চেষ্টা করেছে। যে সময় এগুলি রচিত হয় তখন ভারতীয় দর্শন অনেকটা উন্নত হয়েছিল, তখন ব্রহ্ম, প্রাণ ও মন সম্বন্ধে ভাবগুলি একটা নির্দ্দিষ্ট আকার পেয়েছিল। অথর্ববেদের দার্শনিক কবিরা সেই ভাবগুলি নিজেদের রচনার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে সেগুলিকে একটা mystic আবরণে ঢেকে দিয়েছিলেন। অনেক সময় যখন দু'-একটি সুন্দর ভাবের সঙ্গে পরিচয় হত, তখন অথর্ববেদের কবিদের সেই ভাবগুলি ধার করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

সাহিত্য হিসাবে খুব সুন্দর কবিতা অথর্ববেদের মধ্যে হচ্ছে—১২, ১, যেখানে পৃথিবীকে সব জিনিষের রক্ষক বলা হয়েছে, আর সকলের সুখের দিকে দৃষ্টি রাখ্‌বার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এগুলি অনেকটা প্রার্থনা-স্তোত্রের মত। এ শ্লোকগুলি এত চমৎকার যে এদের স্থান ঋক্‌বেদে হওয়া উচিত ছিল। তবেই দেখা যাচ্ছে যে—অথর্ববেদের অনেক শ্লোক সাহিত্যের মাপকাঠিতে নিকৃষ্ট বলে' গণ্য হলেও, তার মধ্যে এমন কতকগুলি শ্লোক আছে যা থেকে বাস্তবিকই আমরা প্রাচীন ভারতীয় কাব্যসাহিত্যের কিছু পরিচয় পেতে পারি। ঋক্‌বেদ ও অথর্ববেদ এক সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের পূর্ণ পরিচয় আমাদের দিতে পারে।

সামবেদের অনেক সংহিতা ছিল, কিন্তু এখন মাত্র একখানা

সামবেদ-সংহিতা আছে। এর দুটি অংশ আছে, আর্চিক বা শ্লোকসংগ্রহ ও উত্তরার্চিক। দুই অংশতে এমন অনেক শ্লোক আছে যা, ঋক্‌বেদ থেকে নেওয়া। সুর শেখ্‌বার জন্তই এই-সব শ্লোক ব্যবহৃত হ'ত। উদ্গাতাকে আর্চিকের ৫৮৫ শ্লোক শিখ্‌তে হ'ত যজ্ঞে বিভিন্ন সুরে গান কর্‌বার জন্তে। এ-সব শ্লোককে 'যোনি' বলা হ'ত—যা থেকে সাম উদ্ভূত হয়েছে। উত্তরার্চিকে ৪০০ স্তোত্র আছে, এগুলিতে ৩টি ক'রে শ্লোক থাকে।

সংহিতার এই দুই অংশে কেবল মূল শ্লোক আছে, সেগুলির সুর মুখে মুখে যত্নসহযোগে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তখনও গানের স্বর-লিপিযুক্ত বই রচিত হয়নি। তা পরের যুগে হয়েছিল।

তখন সুরের সংখ্যা খুব বেশী ছিল। খুব প্রাচীন বইতে ৪০০০ সুরের উল্লেখ পাই। এ-সব সুরের ভিন্ন-ভিন্ন নাম ছিল। বৃহৎ ও রথন্তর সুর খুব প্রচলিত ছিল এবং ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদে প্রায় দেখা যায়। পরবর্ত্তী যুগে এগুলি মাঙ্গিকে খুব ব্যবহৃত হ'ত। সাম-বিধান-ব্রাহ্মণ সামবেদেরই এক অংশ. এটিতে ডাইনীদের সম্বন্ধে বেশী আলোচনা আছে।

এটা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কিভাবে সামবেদের গানগুলি গাওয়া হ'ত তা আমরা জানি না। যদি সুরগুলি আমরা ঠিক জান্‌তাম তা হ'লে সামবেদটি ভারতীয় গানের ইতিহাসের পক্ষে খুব মূল্যবান্ হ'ত। সাহিত্য হিসাবে সামবেদের কোন মূল্য নেই, কারণ এর শ্লোক সব ঋক্‌বেদ থেকে নেওয়া। তার চেয়ে যজুর্বেদ সংহিতা বেশি মূল্যবান্। যজুর্বেদসংহিতা অধ্বর্য্যু পুরোহিতদের প্রার্থনার বই। পতঞ্জলি অধ্বর্য্যুদের ১০১ খানি বেদের উল্লেখ করেছেন, আমরা কিন্তু ৫ খানি সংহিতার কথা জানি :—

(১) কাঠক—কঠমতবাদীদের যজুর্বেদ-সংহিতা।

(২) কপিষ্ঠল—কঠসংহিতা—এর কিছু অংশ পুঁথিতে রক্ষিত।

(৩) মৈত্রায়ণি-সংহিতা।

(৪) তৈত্তিরীয় বা আপস্তম্ব সংহিতা।

এই চারখানি সংহিতা কৃষ্ণযজুর্বেদের অংশ এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ-যুক্ত।

(৫) বাজসনেয়ী সংহিতা—এটি শুক্লযজুর্বেদের সংহিতা। কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদের মধ্যে প্রভেদ এই যে শুক্লযজুর্বেদে কেবল মন্ত্র আছে, আর কৃষ্ণযজুর্বেদে মন্ত্র ছাড়া যজ্ঞের অনেক নিয়মাদি আছে।

যজুর্বেদে শ্লোক ও গদ্য দুই আছে। যজু বলাতে আমরা গদ্যে লেখা নিয়মাদি বুঝি। এ ছাড়া যে-সব মন্ত্র শ্লোকে রচিত হয়েছে সেগুলি প্রায় ঋক্‌বেদ থেকে নেওয়া। কখন-কখন ঋকবেদের শ্লোকের ভাষা একটু বদ্‌লান হয়েছে। তবেই দেখা যাচ্ছে যে, এই গদ্যাংশ যজুর্বেদের প্রধান অংশ।

সাহিত্য-হিসাবে যজুর্বেদ খুব দামী, কারণ এটি ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীন গদ্যের নিদর্শন. তা ছাড়া ধর্মের ইতিহাসেও এর মূল্য অনেক, কারণ এতে আমরা প্রার্থনার প্রথম ক্রমোন্নতি দেখ্‌তে পাই।

যজুর্বেদে এমন প্রার্থনার মন্ত্র অনেক আছে, যা উচ্চারণ ক'রে দেবতাকে আহ্বান করা হয় যজ্ঞের দান গ্রহণ কর্‌বার জন্ত। সকালে ও সন্ধ্যায় অগ্নিহোত্রের প্রার্থনার মন্ত্রের চেয়ে ছোট প্রার্থনার মন্ত্র প্রায়ই দেখা যায় না।

অনেক সময় যজুর্বেদে কতকগুলি প্রার্থনা দেখা যায় যা সাধারণতঃ খুব দীর্ঘ। যজুর্বেদ ২২।২২এর অশ্বমেধের প্রার্থনাটি সেই রকম একটু দীর্ঘ কিন্তু বেশ সুন্দর।

অথর্ব্ববেদের মত যজুর্বেদে এমন অনেক শ্লোক আছে যা অভিশাপ বা মন্ত্র (charm) হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। এমন অনেক যজ্ঞীয় কাজ আছে যার দ্বারা শত্রুদের সহজে বিনাশ করা যেতে পারে। মৈত্রায়ণি সংহিতাতে এইরকম মন্ত্র আছে—"হে অগ্নি, আপনার তেজের দ্বারা যাকে আমরা ঘৃণা করি তাকে দগ্ধ করুন। হে অগ্নি, যে আমাদের ঘৃণা করে ও যাকে আমরা ঘৃণা করি তাকে আপনার সমস্ত ক্ষমতা দ্বারা আক্রমণ করুন।"

ঋক্ ও অথর্ব্ববেদের মত যজুর্বেদেও কতকগুলি হেঁয়ালি (riddles) আছে। এর মধ্যে কতকগুলি ধর্মসংক্রান্ত, তাদের "ব্রহ্মোদ্য" বলে। অশ্বমেধের সময় এগুলি পুরোহিতদের খেলার বিষয় ছিল। আর কতকগুলি আছে যা সাধারণের কাছে খুব পরিচিত, এমন কি, তাদের দেখে ছেলেদের হেঁয়ালির কথা মনে পড়ে। এর কতকগুলি উদাহরণ বাজসনেয়ীসংহিতার ২৩শ অংশে আছে। এগুলি আবার মন বা প্রার্থনার মতও দেবপূজার অংশ ব'লে' পরিগণিত হ'ত। যজুর্বেদে ঠিক দেবতাদের পূজার ব্যবস্থা করা হয়নি, তার চেয়ে যাতে তাঁদের বাধ্য ক'রে' যজ্ঞ-কর্ত্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করান যেতে পারে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেইজন্ত দেবতাদের কেবল প্রার্থনা বা পূজার নৈবেদ্য যে চাই তা নয়, তাদের আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থার প্রয়োজন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪, ২, ২) বলা হয়েছে—"পরোক্ষপ্রিয়াইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ।" যা পরোক্ষভাবে বলা হয় দেবতারা তাই পছন্দ করেন, আর যা প্রত্যক্ষভাবে বলা হয় তা তাঁরা ঘৃণা করেন।

দেবতাদের তুষ্ট কর্‌বার জন্ত আর-একটা উপায় যজুর্বেদে আমরা দেখ্‌তে পাই। সেটি পরবর্ত্তী যুগে বড় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সেটি হচ্ছে--দেবতাদের নাম নানাভাবে পুনরাবৃত্তি করা। যেমন পুরাণে বিষ্ণুর বা শিবের সহস্রনামের কথা পাই—যা আবৃত্তি কর্‌লে অক্ষয় পুণ্য-লাভ হয়। যজুর্বেদে "শতরুদ্রীয়" বা রুদ্রের শতনাম পাই (বাজসনেয়ীসংহিতা, ১৬ ও তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৪, ৫)

এ-ছাড়া আর কতকগুলি শব্দ আছে যার কোন অর্থ নেই বা নষ্ট হ'য়ে গেছে। যেমন—স্বাহা, স্বধা, ওঁ। ছান্দোগ্য-উপনিষদে স্পষ্ট বলা হয়েছে (১, ১.৪) যে ওঁ সম্মতি জানাতে ব্যবহৃত হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও ওঁ "হাঁ" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু উপনিষদে এই ওঁকেই ব্রহ্ম বলা হয়েছে। এবং ধ্যানে ব্যবহার কর্‌বার জন্ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে (কঠোপনিষদ, ২, ১৬)।

বহু শতাব্দী পরে তন্ত্রেতেও এইরকম অনেক অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে ওঁ, হুং, হ্রীং, ফট্ ইত্যাদি।

যজুর্বেদ সাহিত্য-হিসাবে খুব সুন্দর না হ'লেও, ধর্ম্মের ইতিহাস হিসাবে খুব মূল্যবান্। যে-কেউ প্রার্থনার উৎপত্তি, পরিণতি ও ধর্ম্মের ইতিহাসে প্রার্থনার স্থানের কথা আলোচনা কর্‌তে চান, তাঁদের কাছে যজুর্বেদ-সংহিতা খুব আদরণীয় হবে।

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, শ্রাবণ)

—

গান

তোমায় গান শোনাব তাই ত আমায়
জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া,
বুকে চমক দিয়ে তাই ত ডাক
ওগো দুখ-জাগানিয়া।

এল আঁধার ঘিরে'
পাখী এল নীড়ে,
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় না কো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া।
আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাহাসির দোলা তুমি
থামতে দিলে না যে।
আমায় পরশ করে'
প্রাণ সুধায় ভরে'
তুমি যাও যে সরে,'
বুঝি আমার সুরের আড়ালেতে
দাঁড়িয়ে থাক,
ওগো দুখ-জাগানিয়া।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, শ্রাবণ)

—

গান

যুগে যুগে বুঝি আমায়
চেয়েছিল সে,
তাই যেন মোর পথের ধারে
রয়েছে বসে'।
আজ কেন মোর পড়ে মনে
কখন তারে চোখের কোণে
দেখেছিলেম একটু প্রদোষে।
সেই যেন মোর পথের ধারে
রয়েছে বসে'।

আজ ঐ চাঁদের বরণ হবে
আলোর সঙ্গীতে,
রাতের মুখের আঁধারখানি
খুল্‌বে ইঙ্গিতে।
শুক্লরাতে সেই আলোকে
দেখা হবে—
এক পলকে সব-আবরণ
যাবে যে খসে'।
সেই যেন মোর পথের ধারে
রয়েছে বসে'।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, শ্রাবণ)

রবারের কথা

ছোটখাট জিনিষ বহুবার জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। এখন যে ছোট জিনিষটির কথা বলিব সেটি হইতেছে রবার। ইউরোপ-আমেরিকার কথা ছাড়িয়া দিই, ভারতবর্ষেও রবার দেখে নাই অথবা রবারের নাম শুনে নাই এমন লোক আজকাল খুবই বিরল। রবার এখন আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। জুতার তলায় রবার, বাইসিকেলের চাকায় রবার, মোটর-গাড়ীর মোটা মোটা চাকাগুলিতে রবার, পেন্সিলের দাগ তোলার জন্ম রবার—সর্ব্বত্রই রবারের অবাধ ব্যবহার। জিনিষটিও বেশ সুবিধাজনক। যত উঁচু থেকেই পড়ুক না কেন কখন ভাঙিবে না, জলে পচিবে না, বাতাসে শুকাইবে না, সামান্ত এক আধটুকু রোদের তাপেও কিছুই হইবে না। ভয় কেবল আগুনকে, একটুকু আগুন ধরিলে আর রক্ষা নাই-যে পর্য্যন্ত সমস্তখানি না পুড়িবে ততক্ষণ নিবিবে না।

রবারের আদি জন্মস্থান আমেরিকা। সেখানকার আদিম অধিবাসীরা বহুদিন হইতেই রবার ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু ব্যবহারের তেমন কোন প্রকৃষ্ট প্রণালী জানিত না। গাছ হইতে আপনা-আপনি যে আঠা বাহির হইত তাহাই উহারা রোদে শুকাইয়া কাজ-চালান গোছের করিয়া লইত মাত্র। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আট্‌লান্টিক মহাসাগরের এ-পারের লোকেরা রবার দেখা দূরের কথা ইহার নামও জানিত না। সম্ভবতঃ এ-পারের লোকের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে রবার দেখিয়াছিলেন কলম্বাস এবং তাঁহার সঙ্গে যাহারা আমেরিকা আবিষ্কার করিতে গিয়াছিল তাহারা। ইউরোপে সকলের আগে রবারের ব্যবহার আরম্ভ হয় স্পেনে। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্বিসের ওভারকোটের উপর স্পেনবাসীরাই সর্ব্বপ্রথমে ধুনার গন্ধবিশিষ্ট আঠার মত একরকমের প্রলেপ জলনিবারণের জন্ম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। উহাই রবার। তার পরে ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে লাকনড্যামিন্ নামক এক ব্যক্তি বিষুব-রেখার নিকটবর্ত্তী দেশসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসার সময় দুর্গন্ধযুক্ত কাল রংয়ের একপ্রকার রবার লইয়া আসেন এবং প্যারী একাডেমীর সমীপে প্রকাশ করেন যে পেরু এবং ব্রেজিলের লোকেরা উহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। জলকাদায় বেড়াইবার জন্ম তাহারা উহা দ্বারা জুতা তৈরী করিয়া লয় এবং আগুনে গলাইয়া গায়ের কাপড়ের উপরও বেশ মোটা করিয়া এক এক পোঁচ দিয়া বৃষ্টিতে বেড়াইবার উপযোগী করিয়া লইয়া থাকে।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার প্রিষ্ট্‌লি কাগজের উপর হইতে পেন্সিলের দাগ তুলিবার জন্ম প্রথমে রবারের টুক্‌রা ব্যবহার করেন। সে-সময় ইহার দামও বড় কম ছিল না। দুই ইঞ্চি লম্বা এবং এক ইঞ্চি চওড়া একখানি রবারের টুক্‌রার দাম ছিল তিন শিলিং অর্থাৎ এখনকার হিসাবে প্রায় তিন টাকা। সে সময় চিত্রকর ভিন্ন সাধারণ লোকে উহা খরিদ করিত না। রবারকে শিল্পকার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা সকল দিক্ হইতেই প্রথম আরম্ভ হয় ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে এবং প্রথম পথ দেখান সামুয়েল পীল্ নামক একজন ইংরেজ। তার্পিন তৈলে গলান রবারের প্রলেপ দিয়া পীল্ কাপড় জামা প্রভৃতি ওয়াটারপ্রুফ করিয়া লইতে আরম্ভ করেন। যদিও এইভাবে ওয়াটারপ্রুফ-করা কাপড়জামায় একটা বিশ্রী গন্ধ হইত এবং সেগুলি সর্ব্বদার জন্ম চটচটে আঠাযুক্ত থাকিত, তবুও তখনকার লোকে তাহাই সাগ্রহে ব্যবহার করিতে

ছাড়িত না। ওয়াটারপ্রুফ কাপড় নির্ম্মাণে পীল্ কৃতকার্য্য না হইলেও সকলকে নূতন একটি পথ দেখাইয়া দিলেন এবং তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া বহু লোকে বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ ম্যাকিন্টশ্ নামে স্কটল্যাণ্ড দেশীয় একজন ভদ্রলোক উন্নত ধরণের ওয়াটারপ্রুফ কাপড় তৈয়ারী করিয়া রবারের প্রয়োজনীয়তা সকলকে আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার কাপড়ও একেবারে নির্দ্দোষ হইল না। রোদের উত্তাপে চট্‌চটে হওয়া এবং শীতের সময় অত্যন্ত শক্ত হওয়া দোষ দুইটি রহিয়াই গেল, কেবল থাকিল না দুর্গন্ধ। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকানিবাসী চার্লস্ গুড্ইয়ার সমপরিমাণে গন্ধক এবং রবার আগুনের উত্তাপে গলাইয়া তদ্দ্বারা কাপড় ওয়াটারপ্রুফ করিতে লাগিলেন। এ কাপড় হইল সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। গুড্ইয়ারের ওয়াটারপ্রুফ কাপড় ইউরোপে স্বর্ণমূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। মানুষ এইবার ভালরূপে রবার চিনিবার সুযোগ পাইল। ইহার কিছু দিন পরেই ভাল্‌ক্যানাইট্ আবিষ্কার করিয়া গুড্ইয়ার রবার-শিল্পে নবযুগ আনয়ন করিলেন। রবারের বহু পরীক্ষা করিয়া এবং একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তিনি প্রমাণ করিলেন যে রবারের অপেক্ষা গন্ধকের ভাগ বেশী দিয়া প্রখর অগ্নিতাপে অনেকক্ষণ ধরিয়া গলাইয়া লইলে যে কাল-রংয়ের শক্ত জিনিষটি পাওয়া যাইবে তাহাই হইবে ভাল্‌ক্যানাইট্। মোটরটায়ার, বাইসিকেলের টায়ার প্রভৃতি এই ভাল্‌ক্যানাইটেই তৈয়ার হইয়া থাকে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে রবার্ট্ উইলিয়াম্ টম্‌সন্ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভাল্‌কানাইটে নির্ম্মিত টায়ারের পেটেণ্ট্ লইলেন। রবারের কাটতি বিশগুণ বাড়িয়া গেল।

যে ডান্‌লপ-টায়ারের বিজ্ঞাপন আজকাল কলিকাতার অলিতে-গলিতে, গাছের গায়ে ট্রাম গাড়ীর ছাদে দেখিতে পাওয়া যায় সেই ডানলপ্ টায়ারের উদ্ভাবক জে বি ডান্‌লপ্ ছিলেন পশুচিকিৎসক। তাঁহার বাড়ী ছিল আয়ার্‌ল্যাণ্ডের বেল্‌ফাষ্ট্ শহরে। চারিদিকে লোক যখন রবার লইয়া নানা পরীক্ষায় ব্যস্ত—রবারকে মানুষের প্রয়োজনীয় কাজে লাগাইবার জন্য যখন ইউরোপের সকলেই কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিল, তিনিও তখন নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। বাইসিকেলের চাকা আগে ছিল নিরেট। তাহার ফলে চলাফেরা করাও ছিল অত্যন্ত অসুবিধাজনক। অনবরত ঝাঁকুনিতে আরোহীর প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইত। বহুদিন হইতেই ডান্‌লপ্ ইহার প্রতিবিধানে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ভাবিলেন বায়ুপরিপূর্ণ একটি নল যদি চাকা এবং টায়ারের মাঝখানে বসান যায় এবং উক্ত নলটি যদি নরম এবং নমনশীল হয় অর্থাৎ চাপ লাগিলেই স্প্রিংয়ের গদীর মতন দোলে, তবেই এ-কষ্টের লাঘব হইতে পারে, নতুবা নয়। যাহা হউক, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে ডান্‌লপ্ সাহেব রবারকেই এই কাজে লাগাইতে মনস্থ করিলেন। আগুনের তাপে রবার এবং গন্ধক গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া তদ্দ্বারা প্রথম বাইসিকেলের টিউব প্রস্তুত হইল এবং সেই টিউব নিজের বাইসিকেলে লাগাইয়া ডান্‌লপ্ বাড়ীর উঠানে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। পরীক্ষার ফলও খুব সন্তোষজনক হইল। কিছুদিন পরেই ডান্‌লপের পুত্র এই-রকম টিউবওয়ালা বাইসিকেল লইয়া এক বাইসিকেল রেসে প্রথম হইলেন। এই অত্যাবশ্যক আবিষ্কারে সকলের চোখ ফুটিয়া গেল। রবারের প্রয়োজনীয়তাও শতগুণে বাড়িয়া উঠিল।

রবারের কথা সম্পূর্ণভাবে বলিতে হইলে এইচ এ উইকেন্‌হ্যামের নাম না করিলে চলে না। এই বিখ্যাত পদার্থবিদ্ পণ্ডিতের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই আজ পৃথিবীর সকল দেশে প্রচুর পরিমাণে রবার জন্মিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে রবারের গাছ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কোন গাছ নাই। বিভিন্নপ্রকারের প্রায় বিশ রকম গাছের সাদা আঠা হইতে রবার তৈয়ারী হইয়া থাকে। এই-সব গাছের মধ্যে হিভিয়া জাতীয় গাছই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গাছের আঠায় যে-রবার প্রস্তুত হয় তাহাকে প্যারা রবার বলে। প্যারা ব্রেজিলের একটি শহর। এখানে তৈয়ারী বলিয়াই প্যারা নাম দেওয়া হয়। প্যারা বাদে সিয়েরা এবং ম্যানায়োস্ নামে ব্রেজিলের যে আরও দুইটি শহর আছে সেখানেও উৎকৃষ্ট রবার জন্মে। তবে বাজারে প্যারা রবারের দামই সবচেয়ে বেশী।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রবারের অসম্ভব কাট্‌তি দেখিয়া এবং প্যারা রবার অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয় জানিয়া, ব্রেজিল গভর্ণমেণ্ট্ রবারের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লইতে মনস্থ করিলেন। তাহার ফলে অন্য দেশের কথা দূরে থাকুক, আমেরিকারও এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে হিভিয়া-গাছের বীজ এবং চারা সরকারী অনুমতি ব্যতীত লইয়া যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। উইকেন্‌হ্যাম্ তখন ব্রেজিলে ছিলেন এবং ব্রেজিল ভিন্ন অন্য দেশে হিভিয়া-গাছ জন্মিতে পারে কি না এবং জন্মিলে তাহা হইতে প্যারা-রবারের মতন উচ্চ শ্রেণীর রবার উৎপন্ন হইবে কি না তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন। পরীক্ষায় যখন জানিতে পারিলেন যে হেভিয়া-গাছ সবদেশেই জন্মিতে পারে এবং তাহা হইতে উৎকৃষ্ট রবারও পাওয়া যাইতে পারে, তখন তিনি হিভিয়ার বীজ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। লণ্ডনের বোটানিক্যাল-গার্ডেনের তখনকার অধ্যক্ষ জোসেফ্ হুকার তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। উইকেন্‌হ্যাম্ নিজের মতলব সবিস্তারে তাঁহাকে লিখিয়া জানিতে চাহিলেন যে বীজ পাইলে হুকার তাঁহার বাগানে রবারের চাষ করাইতে পারেন কি না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া হুকার সাগ্রহে তাঁহাকে বীজ পাঠাইতে লিখিলেন। ডাক-যোগে বীজ পাঠাইবার কোনই উপায় ছিল না, এমনকি গোপনে লোকমারফতে এক আধসের পাঠানও অসম্ভব ছিল। ব্রেজিল-পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া কেহই বীজ অথবা চারা লইয়া বিদেশে যাইতে পারিত না। ধরা পড়িলে সাত বৎসর সশ্রম কারাবাস অনিবার্য। উইকেন্‌হ্যাম্ বিষম বিপদে পড়িলেন। স্থির সঙ্কল্প এবং ঐকান্তিক চেষ্টা কখনই বিফল হয় না—শীঘ্রই সুযোগ মিলিল। এই সময়ে ব্রেজিল্ গভর্ণমেণ্ট্ আমাজন নদীর মোহানায় নূতন একখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে-ছিলেন। জাহাজখানি তৈয়ারী শেষ হওয়া মাত্রই উইকেন্‌হ্যাম্ ভারত-গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে সেখানি ভাড়া লওয়ার জন্য আবেদন করিলেন। ভারত-গভর্ণমেণ্ট্ কিন্তু জাহাজ ভাড়া লওয়ার কথা কিছুই জানিতে পারিলেন না—কাজটি হইল একেবারে ছাঁকা জুয়াচুরি। যাহা হউক আবেদন-পত্র দাখিল করিয়াই সেই রাত্রে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর সহ সেই জাহাজে গিয়া রবারের বীজগুলি অতি গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া আসিলেন। এদিকে যথাসময়ে আবেদন মঞ্জুর হইল। উইকেন্‌হ্যাম্ কালমাত্র বিলম্ব না করিয়াই জাহাজ লইয়া স্বদেশাভিমুখে রওনা হইলেন। রবারের বীজ সহ যেদিন তিনি লণ্ডনে পৌঁছিলেন সেদিন চারিদিকে আনন্দের ধুম পড়িয়া গেল। অনতিবিলম্বে বোটানিক্যাল-গার্ডেনের একপ্রান্তে কাচের ঘর নির্ম্মিত হইল এবং তাহার মধ্যে রবারের বীজ বুনিয়া দেওয়া হইল। অল্পদিনের মধ্যেই বীজ হইতে ছোট ছোট চারা-গাছ জন্মিয়া ঘর ভরিয়া গেল এবং ইংলণ্ডের দারুণ শীতে রবারের গাছ ভাল জন্মিবে না বলিয়া চারাগুলি যথাসময়ে মালয় ভারতবর্ষ সিঙ্গাপুর এবং সিংহলদ্বীপে রোপণের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই-সব দেশে আজকাল যত হিভিয়া-গাছ আছে তাহার সবগুলি উইকেন্‌হ্যামের আনীত চারাগাছগুলির বংশধর।

এইবার রবারের চাষ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা লিখিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যে জমিতে বর্ষায় জল না ওঠে এবং বৃষ্টি হইলে জল জমিয়া না থাকে, রবারের চাষের জন্য সেইরূপ জমিই নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। দো-আঁশ মাটিতে রবার জন্মে ভাল। জমি উত্তমরূপে পাট করিতে হয়। কোন রকমের আগাছা পাথর কিম্বা অন্য কোন আবর্জ্জনা থাকিলে চলিবে না। শুধু একবার আগাছা মারিয়া নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নাই, মাসে অন্ততঃ-পক্ষে দুইবার পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এই ভাবে জমি পাট করিতেও যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জমি পাট হওয়ার পূর্ব্বে বড় গামলায় অথবা বালতিতে কিম্বা ঐ-রকমের কোন চওড়া-মুখওয়ালা পাত্রে ঝুরা মাটি ভরিয়া তাহাতে বীজ বুনিতে হয়। দিনের মধ্যে অন্ততঃ-পক্ষে দুইবার জল ঢালিয়া মাটি তাজা রাখা দরকার। লাল পিঁপড়া রবার-বীজের একটি বড় শত্রু। একটু অসাবধান হইলেই উহারা দল বাঁধিয়া আসিয়া বীজের ভিতরকার শাঁসগুলি খাইয়া যায়। বীজ হইতে চারা গজাইতে সাধারণতঃ ৭।৮ দিন সময় লাগে। চারাগুলি ৫।৬ আঙুল লম্বা হইলে তুলিয়া লইয়া গিয়া পাট-করা জমিতে রোপণ করিতে হয়। এক একর জমিতে এক হইতে দেড়শত পর্য্যন্ত চারা রোপণ করা যাইতে পারে। রবারের গাছের শত্রু অনেক। গামলায় থাকিবার সময় যেমন সর্ব্বদা পিঁপড়ার ভয়ে সাবধান থাকিতে হয়, ক্ষেতেও চারাগুলি একটু বড় না হওয়া পর্য্যন্ত তেমনি সূর্য্যের উত্তাপকেও ভয় করিয়া চলিতে হয়। বহুদিন পর্য্যন্ত চারাগুলিকে এক-একটা আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়, নতুবা রোদের তেজে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। রবারের ক্ষেতে আগাছা জন্মিলেও রবার ভাল হয় না। জমির উর্ব্বরতার কমিবেশীতে গাছের আকারেরও তারতম্য হইয়া থাকে। গাছের বেড় সাধারণতঃ আঠার হইতে চব্বিশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। উচ্চতার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই।

গাছের গায়ে ছিদ্র করিয়া আঠা বাহির করাকে ট্যাপ্ করা বলে। গাছের বয়স চারি বৎসরের কম থাকিলে ট্যাপ্ করিতে নাই। ট্যাপ্ করা দুইপ্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ গাছের গায়ে ১০।১২ আঙুল পরিমাণ ছালের উপর হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়া খুব পাতলা এক স্তর ছাল তুলিয়া লওয়া হয়। তার পরে ঐ-পরিষ্কৃত জায়গায় নীচে ছুরির ডগা দিয়া আধ ইঞ্চি চওড়া একটি লম্বা নালা কাটিয়া, নালার মাথায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কৌটা কেলার কাঁচের নলের মতন কাঠের নল আঁটিয়া দেওয়া হয়। নলের নীচে বালতি থাকে। দুধের মতন সাদা আঠা ঐ-নল দিয়া আসিয়া বালতিতে জমে। দ্বিতীয় প্রকারের ট্যাপ্ করা সোজাসুজি ধরণের। গাছের গায়ে উপর-নীচু লম্বা একটি খাঁজ কাটিয়া ঐ-খাঁজের মাথায় নল বসাইয়া দেওয়া হয় মাত্র—নীচে বালতি থাকে, আঠা নল দিয়া আসিয়া বালতিতে পড়ে।

রবারের আঠার পারিভাষিক নাম ল্যাটেক্স্। ল্যাটেক্স্ ধরার জন্য রবারের ক্ষেতের ট্যাপ্-করা সমস্তগুলি গাছের নীচে সন্ধ্যাকালে এক একটি বালতি রাখা হয়। প্রাতঃকালে বালতিগুলি ফ্যাক্টারিতে আনিয়া পরিষ্কার কাপড়ে ল্যাটেক্স্ ছাঁকিয়া খুব বড় একটা পাত্রে ঢালা হয়। ল্যাটেক্স্ শুকাইবার জন্য একপ্রকার কল ব্যবহৃত হয়। ঐ-কলটির আকার মোটর-কারের পেট্রোল রাখার গোল টিনের মত, কিন্তু ওর চেয়ে অনেকখানি লম্বা এবং বেশী মোটা। উহার ভিতরে তাল অথবা খেজুর-কাঠের কয়লার আগুন করিয়া সেই আগুনের উপর বুড় রেকাবীর মতন লোহার একখানা পাত্র বসাইয়া দেওয়া হয়। ঐ-পাত্রখানিতে অল্প অল্প ল্যাটেক্স্ ঢালিয়া আস্তে আস্তে নাড়িতে হয়। নীচের আগুনের তাপে ক্রমে ল্যাটেক্স্ শুকাইয়া কটাশে রংয়ের বড় একখানি স্পঞ্জের আকার ধারণ করিলে নামাইয়া অন্য একটি কল দেওয়া হয়। এখানে উহার ভিতরকার জলীয় অংশ চাপ দিয়া বাহির করা হইয়া থাকে। জলীয় অংশ বাহির হইয়া গেলে রবারখানি চ্যাপ্টা এবং পাতলা হয়। এইরকমের রবারকে ক্রেপ্ বলা হয়। ল্যাটেক্স্ হইতে ক্রেপ্ তৈয়ারী হইলেই রবার প্রস্তুত শেষ হইল। সেগুলি পরে ঐ-অবস্থাতেই বিক্রীর জন্য দোকানে দোকানে চালান হইয়া যায়।

ব্রেজিলের অধিবাসীরা প্যারা রবার অতি সহজে প্রস্তুত করিয়া থাকে। উহাদের কোন কল নাই। অবশ্য বড় বড় ফ্যাক্টরীর কথা স্বতন্ত্র—সেখানে যাবতীয় কাজ কলেই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যে সব গৃহস্থের দুই চারিটা মাত্র রবারের গাছ আছে—তাহারা ল্যাটেক্স্ সংগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত উপায়ে প্যারা-রবার তৈয়ারী করে। একখানা চোকা লোহার পাত্রে তালের কাঠের আগুন জ্বালিয়া ঐ-পাত্রের উপর সরুমুখবিশিষ্ট একটি চিম্নি পরাইয়া দেয়। পরে চিম্নির ঐ সরু মুখের উপর বড় একখানি চামচে উপুড় করিয়া ধরিয়া অন্য একখানি চামচে দ্বারা অল্প অল্প করিয়া ল্যাটেক্স্ আগের চামচেখানির উল্টা পিঠে ঢালিয়া দেয়। আগুনের তাপে ল্যাটেক্স্ সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া গেলে নামাইয়া শীতল করিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট প্যারা রবার তৈয়ারী হয়। এইরকম রবারকে বোলাচা-রবার বলে। বোলাচা শব্দের অর্থ বিস্কুট। বাজারে বোলাচা-রবারের দাম খুব বেশী।

বিগত মহাযুদ্ধে রবারের দাম এবং ব্যবহার অসম্ভব রকমে বাড়িয়াছিল। এরোপ্লেন, মোটর-অ্যাম্বুলেন্স্, মোটর-লরী, মোটর-সাইকেল, সাধারণ বাইসাইকেল, প্রভৃতির টায়ার প্রস্তুত করিতে হাজার হাজার টন রবার ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা বাদে জুতা, বিষাক্ত-গ্যাস-নিবারক কোট এবং মুখোস্, বর্ষাতি ওভারকোট, ভিজা মাটিতে পাতার জন্য মোটা চাদর এবং ডাক্তারদের ব্যবহারের জন্য ও হস্পিটালের আহত রোগীদের জন্য নানারকমের জিনিষপত্র রবারে তৈয়ারী হইয়াছে। যুদ্ধের সময় রবারের দাম বাড়িয়া ডবল হইয়াছিল। আজকাল অনেক কমিয়া গিয়াছে। তবুও সকল দেশেই প্রতিবৎসর রবারের চাষ বাড়িতেছে। ভারতবর্ষে, সিংহলে এবং সিঙ্গাপুরে উৎকৃষ্ট রবার জন্মে। এখনও রবার লইয়া নানাপ্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। কাগজ, সিমেন্ট্, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য রবার হইতে প্রস্তুত করার চেষ্টা হইতেছে। বিগত ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রেজিল এবং আফ্রিকা সমগ্র পৃথিবীকে রবার সরবরাহ করিয়াছে। ঐ-বৎসর ব্রেজিল হইতে ৪১ হাজার টন এবং আফ্রিকা হইতে ২১ হাজার টন রবার পাওয়া গিয়াছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ ষাট হাজার টন রবার উৎপন্ন হইয়াছিল, তন্মধ্যে কেবলমাত্র ৫০ হাজার টন ব্রেজিল মেক্সিকো এবং আফ্রিকায় উৎপন্ন হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র পৃথিবীতে সতের লক্ষ একর জমিতে রবারের চাষ হয়, তাহাতে রবার জন্মিয়াছিল তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন। যদিও আমেরিকাই রবারের আদি জন্মস্থান, তবুও রবারের গাছে আজ পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে। ভবিষ্যতে বোধ হয় রবার লোহা অপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

শ্রী বীরেশ্বর বাগচী

নব্য তুরস্কে নারী-জাগরণ

তুরস্কের নারী-সমাজ বহুকাল অন্তঃপুরে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন তুরস্ক মহিলারা পর্দার আড়াল হইতে বাহির হইয়া সমাজের নানা কাজের ভার গ্রহণ করিতেছেন। নারীজাতির শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কনস্তান্তিনোপ্‌ল্‌ ও অন্যান্য সহরে প্রাথমিক ও উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কনস্তান্তিনোপ্‌ল্‌-বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী-শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হইয়াছে। সরকারী ব্যয়ে শতাধিক মহিলা শিক্ষালাভের নিমিত্ত ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছেন।

তুরস্কের নারী-হিতসাধনের প্রধান কর্ম্মী শ্রীমতী হালিদে অদিব্‌ হানুম। পাশ্চাত্য দেশে তাঁহাকে "তুরস্কের জোয়ান অব্‌ আর্ক্‌" নামে অভিহিত করা হয়। কারণ তুর্কী জাতির পুনরুত্থানের মূলে তাঁহারও হাত আছে। তিনি কামাল পাশার বিশেষ বান্ধবী—রাজ্য-সংক্রান্ত গুরুতর বিষয়েও কামাল পাশা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীমতী হানুমের পিতা ছিলেন রাজ্যচ্যুত সুল্‌তান আব্দুল হামিদের কোষাধ্যক্ষ। তিনি উদার-মতের লোক ছিলেন, কাজেই নিজের কন্যাকে পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ফলে তুরস্কের মত রক্ষণশীল দেশে জন্মিয়াও হানুম গ্রাজুয়েট হইয়াছিলেন।

আব্দুল হামিদের নির্ব্বাসনের পর হইতে তিনি স্বদেশের নারী-সমাজের নেত্রীরূপে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি ইংরেজদের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি পাশ্চাত্য জাতিদের এরূপ শত্রু হইয়া দাঁড়ান যে ইংরেজরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়া সে যাত্রা রক্ষা পান।

এই অপূর্ব্ব নারী একাধারে কবি, লেখিকা, শিক্ষক, কূটরাজনীতিক ও সৈনিক। যথার্থ শিক্ষা লাভ করিলে, রক্ষণশীল দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও নারী যে কিরূপে নিজের পথ সুগম করিয়া লইতে পারেন, শ্রীমতী হানুম তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

—

নারী কর্ম্মী-সঙ্ঘ

কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতায় নারী কর্ম্মী-সঙ্ঘ (League of Women Workers) নামক একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরেজ, বাঙালী, পার্শী ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের মহিলারা এই অনুষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা নানাদিকে ইঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

এই নব-প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘটি তাঁহাদের উদ্দেশ্যের যে পরিচয়-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। কিন্তু নিজেদের মুক্তির জন্য ধীরতা ও সংযমের যে তাঁহাদের অভাব হইবে না এ পরিচয়ও তাঁহারা প্রদান করিয়াছেন। পুরুষদের সহিত তাঁহারা, পাশ্চাত্য মহিলাদের অনুকরণে, বিরোধ বাধাইতে চাহেন না, অথচ নারীদের অধিকার সম্বন্ধেও তাঁহারা বেশ সচেতন। সুতরাং ভরসা হয় যে এই সঙ্ঘটি নারী-সমাজের এবং সঙ্গে-সঙ্গে দেশের উপকার করিতে সক্ষম হইবে। আমরা এই শুভ অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

—

পররাষ্ট্র-বিভাগে নারী

ডেলিমেল পত্রিকার রুশিয়াস্থ সংবাদদাতা মিঃ রিচার্ড্‌ এটন্‌ সম্প্রতি রুশিয়ার কয়েদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রুশিয়ার পররাষ্ট্র-বিভাগের

কর্ত্তৃত্ব প্রধানতঃ একজন রুশরমণীর হাতে। ইঁহার নাম সিমানোভা। সিমানোভার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। তাঁহার চক্ষু-দুইটি সারল্য-ব্যঞ্জক, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র। সাজা দিবার বেলায় সিমানোভা নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম। তাঁহার আদেশে অনেক লোককে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে; গত ৬ মাসের মধ্যে কুড়ি হাজার রুশ এই রমণীর আদেশানুযায়ী আর্কেঞ্জেলে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সিমানোভার নাম রুশিয়ায় সর্ব্বজন-বিদিত।

—

মহিলা উকিল

কটকের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক ও বিহারের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মাননীয় মধুসূদন দাসের আত্মীয়া কুমারী সুধাংশুবালা হাজরা। ইনি সম্প্রতি পাটনা হাইকোর্টের উকীলদিগের তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। কুমারী হাজরা গতবৎসর বি-এল পাশ করেন। কিন্তু তখন পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতিরা তাঁহাকে ওকালতি করিবার আদেশ দিতে অস্বীকার করেন। ফলে তিনি প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল দায়ের করেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় আইন-মজলিসে মহিলাদিগের আইন ব্যবসা করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কাজেই তিনি এই আইনের বলেই পুনরায় তাঁহার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা উকিল।

—

দেশ-বিদেশের নারী

চীন—

মধ্যচীনের মহিলারা ২০ বৎসর আন্দোলনের পর সম্প্রতি ভোটাধিকার পাইয়াছেন। বর্ত্তমানে উয়াং চুাং-কু নাম্নী একজন নারী তথাকার আইন-সভার সভ্য হইয়াছেন। দক্ষিণ চীনের মহিলারাও তাঁহাদের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন।

আমেরিকা—

ডাক্তার শ্রীমতী লুইস্ পিয়ার্স, রকফেলার শিক্ষাগারের একজন মহিলা অধ্যাপক। তিনি সম্প্রতি ঘুমরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আফ্রিকার কঙ্গোদেশে গিয়া ৬ মাসকাল এই ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

শ্রীমতী সারা ফারলে সম্প্রতি বৃদ্ধ বয়সে পেন্সিল্‌-ভেনিয়া সরকারী বিদ্যালয় হইতে উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার দুইটি উপাধিধারী পুত্র ও ত্রয়োদশটি নাতি বর্ত্তমান। উক্ত কলেজ হইতে শ্রীমতী সুশান পোটারফিল্ড্‌ নাম্নী আর-একজন বর্ষীয়সী মহিলাও উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহারও দুইটি পুত্র উপাধিধারী। ইঁহারা আমেরিকার নারী-সমাজের জ্ঞানতৃষ্ণার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব দেশনায়ক উইল্‌সনের কন্যা কুমারী মার্গারেট উইলসন্‌ ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি একটি বড়দরের বিজ্ঞাপনের কারবার খুলিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ানার শ্রীমতী ওয়ারিংটন্‌ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান আদালতে আইন ব্যবসা করিবার অধিকার পাইয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বে আর-একজন মাত্র মহিলার এই আদালতে ব্যবসা করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

শ্রীমতী উইলা সিবার্ট্‌ ক্যাথার এ-বৎসর পুলিট্‌জার প্রাইজ পাইয়াছেন। তাঁহার নভেলখানির নাম "আমাদের একজন"। এই পুরস্কারের পরিমাণ ৩০০০ টাকার উপর। এই পুরস্কার প্রত্যেক বৎসর সেই বৎসরের সেই নভেল-রচয়িতাকে দেওয়া হয় যাহাতে আমেরিকার সামাজিক পারিবারিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের উচ্চ আদর্শ ভব্যতা পৌরুষ প্রভৃতি উত্তমরূপে চিত্রিত হয়।

আইস্‌ল্যাণ্ড—

কুমারী বিয়ার্ণাসন্‌ আইস্‌ল্যাণ্ডের আইন-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এই তুষার-মণ্ডিত দেশের মহিলারা ভোটাধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

ভারতবর্ষ—

এই বৎসর কুমারী সি, এইচ, বসু বর্ত্তমান ও মধ্যযুগের ভাষা সম্বন্ধে পরীক্ষা দিয়া অক্সফোর্ড্‌ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

প্রাচীন ভারতের অলঙ্কার

মনুষ্যজাতির মধ্যে একটা স্বাভাবিকী ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছাটি হইতেছে এই—কিরূপে আমাদিগকে ভাল দেখাইবে বা কিরূপে আমাদিগকে ভাল শুনাইবে। এই ইচ্ছা কেবল মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে—পশুপক্ষীগণের মধ্যেও এই ইচ্ছা বলবতী দেখা যায়। সুতরাং যাহা পশুপক্ষীর মধ্যে বলবতী, তাহা যে আমাদের মধ্যে আরও অধিক পরিমাণে বলবতী হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

মনুষ্যজাতির এই স্বাভাবিকী ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত আমরা সকলেই চেষ্টা করি। অলঙ্কারই এই চেষ্টার মূল। অলঙ্কার জিনিষটি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। রামায়ণ-মহাভারতের যুগ হইতেই আমাদের দেশে স্বর্ণকার ও মণিকারের কথার উল্লেখ আছে। এমন কি প্রাচীন ঋগ্বেদের মধ্যেও দেবতাদের অলঙ্কারপ্রিয়তার উল্লেখ পাওয়া যায়। বরুণ-দেবতাকে উজ্জ্বল সুবর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত দেখিতে পাই। মরুৎগণের মধ্যেও নানা অলঙ্কারের সমাবেশ দেখি। কাহারও বক্ষঃস্থল হারে সুশোভিত। আবার কোনও স্থানে সুবর্ণময় শিরস্ত্রাণের উল্লেখ দেখা যায়। অনুসন্ধান করিলে এরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুতরাং প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে নানাপ্রকার অলঙ্কারের নাম ও বিবরণ পাওয়া যায়। এস্থলে কতকগুলি অলঙ্কারের নাম এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করিতেছি।

মস্তক—মাথার অলঙ্কারের মধ্যে স্রক, ঝাঁপা, হংসতিলক, ললামক, মুকুট, গর্ভক, বালপাশ্যা, পারিতথ্যা বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। স্রক-অলঙ্কার ও ঝাঁপা কবরীতে (খোঁপায়) পরিধান করা হইত। হংসতিলক অনেকটা অশ্বত্থ-পাতার মত। উহা সীঁথিতে পরিধান করিত। ললামক মস্তকের সম্মুখভাগে পরিধান করা হইত। গর্ভক অলঙ্কার স্রক-জাতীয়ের স্থায়। বালপাশ্যা বোধ হয় সীঁথিতে পরিত। পারিতথ্যার এক নাম সীঁথি। এই-সমুদয় অলঙ্কারের মধ্যে মুকুট এবং পারিতথ্যা বা সীঁথি এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত আছে।

কণ্ঠালঙ্কার—কণ্ঠালঙ্কারের মধ্যে একাবলী, বক্ষঃসূত্রিকা, প্রালম্বিকা, বর্ণসার, গুচ্ছ, হার প্রভৃতি গলদেশ হইতে বিলম্বিত হইত। প্রাচীন-কালীন কণ্ঠালঙ্কারের মধ্যে পদকই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কর্ণালঙ্কার—প্রাচীন কালে যে-সকল কর্ণালঙ্কার ব্যবহৃত হইত, বোধ হয় বঙ্গদেশে সেগুলির প্রচলন নাই। কেননা, চলিত থাকিলে মণিকারদের মূল্যতালিকায় ঐ-সমুদয় অলঙ্কারের নাম দৃষ্ট হইত। প্রাচীনকালের কর্ণালঙ্কারের মধ্যে ত্রিরাজিক, কুণ্ডল, মুক্তাকণ্টক, বজ্রগর্ভ, দ্বিরাজিক, স্বর্ণমধ্য—এই কয়টি সমধিক উল্লেখযোগ্য। উহাদের মধ্যে ২।১টি এখনও বিহার প্রদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে শুনিতে পাই।

বাহুর অলঙ্কার—বাহুর অলঙ্কারের মধ্যে এই কয়েকটি প্রধান—অঙ্গদ, বলয়, চূড়, কেয়ূর, রতনচূড়, কণ্টক, পঞ্চকা। ইদানীং আমাদের দেশে বলয়-ব্যবহার ক্রমশঃ রহিত হইতেছে। কিন্তু কেয়ূর বা বাজুর ব্যবহার এখনও কতক কতক স্থানে প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানে রতনচূড়ের ব্যবহারও ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে।

অঙ্গুলীর অলঙ্কার—অঙ্গুলীর অলঙ্কারের মধ্যে অঙ্গুরী বা আংটি আবহমানকাল হইতে চলিত আছে।

নাসিকার অলঙ্কার—নাসিকার অলঙ্কারের মধ্যে সুবর্ণের নথ ও তাড় ব্যবহৃত হইত। আজকাল তাড়ের প্রচলন নাই। নথের চলনও বিরল।

কটিবন্ধ—কটিবন্ধের অলঙ্কারের মধ্যে কাঞ্চীদাম, মেখলা, বরানা, কলাপ প্রভৃতি প্রধান।

পায়ের অলঙ্কার—পায়ের অলঙ্কার-শ্রেণীর মধ্যে কিঙ্কিণী, পাদচূড়, পাদপদ্ম, পাদকণ্টকই উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে কিঙ্কিণী ও পাদপদ্ম যে সমধিক প্রসিদ্ধ, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। কিঙ্কিণীর রুণুঝুণু মধুর শব্দে কে না বিমুগ্ধ হন? পাদপদ্মও তদ্রূপ।

উপরি উক্ত অলঙ্কার ব্যতিরেকে আরও কয়েকটি অলঙ্কারের প্রচলন দেখিতে পাই। গুল্‌ফের উপরে গোটামল, কটিদেশে ঘাঘরের উপরে ঘণ্টা, বুকে কর্ণাটী কাঁচুলী, দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দর্পণের ছাব, পদচাকির উপরে বউলীই উল্লেখযোগ্য।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মরম-কথা

তোমার মনে তিলেক ঠাঁই
আমার তরে কোথাও নাই—
এ কথা জানি, তবুও যাই
কেন যে হেন ছুটিয়া পাছে পাছে,
কি আশে আসি, পিয়াসী কি যে—
সে কথা আমি জানি নি নিজে ;
জানি গো শুধু তোমার দেখা নিয়ত আঁখি যাচে !

শুধায়েছিলে যে-দিন মোরে
এমন ক'রে বিহানে ভোরে
নীরবে এসে দাঁড়ায়ে দোরে
অবাক হ'য়ে কি দেখ মুখপানে ?
সেদিন আমি বলিনি কিছু,
নিলাজ আঁখি করিয়া নীচু
জীবন-ব্যাপী ক্রটি শুধু শুনায়েছিনু গানে !

তোমার মুখে একটি কথা
শুনিতে ও গো কি ব্যাকুলতা !
তবুও বহি' যে নীরবতা
নিয়ত আসি হতাশে ফিরে ঘরে,
সে কাঁটা নিতি অসহ দুখে
ব্যথার মতো বাজে এ বুকে,
নয়ন মম শয়ন-হারা গোপনে শুধু ঝরে !

তোমার দুটি চোখের আলো
কেন যে লাগে এতই ভাল,
চিকণ-চারু কবরী কালো
আকুল ক'রে কেন যে মোরে তোলে,
কি লাগি তব দরশ-কামী,
পরশ-লোভে পাগল আমি—
এ কথা যে গো বলিনি শুধু জানিনে কেন ব'লে !

কেশের তব সুবাস-বায়
নেশার মতো আবেশে ছায়,
কাঁকন করে কী সুর গায়—
মনের বনে ফাগুন যেন জাগে !
তরুণ তব তনুর লীলা
চরণ চারু নৃত্য-শীলা
মাতায়ে তোলে উতল হিয়া বিপুল অনুরাগে।

কি নব তব রাগিণী গানে
চমকে কোটি নাগিনী প্রাণে,
শোণিতে মম তড়িৎ হানে
দুলিয়া ওঠে আবেগে দেহ মন !
মদির তব অধর-সুধা
জেলেছে একি গরল-ক্ষুধা ?
নিদয় বিষে হৃদয় যে গো দহিছে অনুখন !

রঙীন তব বসনখানি
নয়নে বোনে স্বপন, রাণী !
তোমার প্রিয় অমিয় বাণী
শ্রবণে মনে জীবনে সদা বাজে।
কেবলি ভাবি মনে যা আছে
বলিয়া ফেলি তোমার কাছে,
কি জানি কেন কেমন যেন বলিতে বাধে লাজে !

তোমারে করি' নিকটতম
ধরিতে চাহে দু'বাহু মম—
জোয়ারে ঠেলি গোঁয়ার সম
সাঁতারি' তবু চলেছি অবিরত !
আমার প্রতি দিবস নিশি
ফুরাতে চাহে তোমাতে মিশি !
তোমারি প্রেমে বরণ করি মরণ তৃষা-হত !

শ্রী নরেন্দ্র দেব

জোড়া আম—

জোড়া আমটি (দুইটি?) এক আমওয়ালার কাছে পাইয়াছি। এরূপ জোড়া আম কদাচিৎ দেখা যায়।

শ্রী শোভনা বসু

জোড়া আম

আনা পাব্লোভা

কুবেলিক্

সোনার অঙ্গ—

এতকাল লোকে "সোনার অঙ্গ", শুধু শুনিয়াই আসিতেছিল এবার এই প্রবাদ-বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে যাঁহারা নিজেদের অঙ্গের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় ঐ-সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিমা করিয়া নিশ্চিন্ত হন। প্রসিদ্ধ নর্ত্তকী বা বাদকেরা তাঁহাদের পায়ের গোড়ালি বা হাতের অঙ্গুলী অনেক টাকায় বিমা করিয়া রাখেন। কারণ হঠাৎ কোন অঙ্গ বিকল হইলে তাঁহাদের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হয়।

প্রসিদ্ধ বাদক পাডেরেওস্কি তাঁহার হাত বিমা করিয়াছিলেন লক্ষ ৮০ হাজার টাকায়। তাঁহাকে প্রতিবৎসর ১২ হাজার টাকা প্রিমিয়াম দিতে হইত। ইহা ভিন্ন তাঁহার হাতের প্রত্যেকটি অঙ্গুলীও বিমা করা ছিল। একবার হঠাৎ একটি নখাগ্রে আঘাত পাওয়ায় তিনি বিমা-কোম্পানীর নিকট হইতে ১৫ হাজার টাকা আদায় করিয়াছিলেন।

বেহালা-বাদক কুবেলিক্ হঠাৎ আঘাতের আশঙ্কায় তাঁহার হাত ৩০ হাজার টাকায় বিমা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া সম্পূর্ণরূপে বিকলাঙ্গ হইবার ভয়ে তিনি ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বিমা করিয়াছিলেন।

স্তার্ হার্ব্বার্ট বার্কার

সুপরিচিত রুশ-নর্ত্তকী আনা পাব্‌লোভার নাম সকলেই অবগত আছেন। গত পৌষ মাসে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার পায়ের একটি অঙ্গুলী ৯০ হাজার টাকার বিমা করা আছে। নাপিয়েরকাওস্কা নাম্নী অপর একজন রুশ-নর্ত্তকী তাঁহার পদদ্বয় ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকার বিমা করিয়াছেন।

মানুষের হঠাৎ স্বরভঙ্গ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় গায়িকা মাডাম পাটি ১৫ হাজার টাকায় তাঁহার স্বর বিমা করিয়াছেন। ইঁহার পরে অনেকেই স্বর বিমা করিয়াছেন।

স্বর্গীয় অধ্যাপক হাক্‌স্‌লি অনেক টাকায় তাঁহার চক্ষুদুটি বিমা করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ এরূপ বিমা করে নাই। তিনি অন্ধ হইলে বিমা কোম্পানীকে ৭৫ হাজার টাকা দণ্ড দিতে হইত। প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক স্তার্ হার্ব্বার্ট্ বার্কার অনেক টাকায় তাঁহার হস্তদ্বয় বিমা করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রভাত সান্যাল
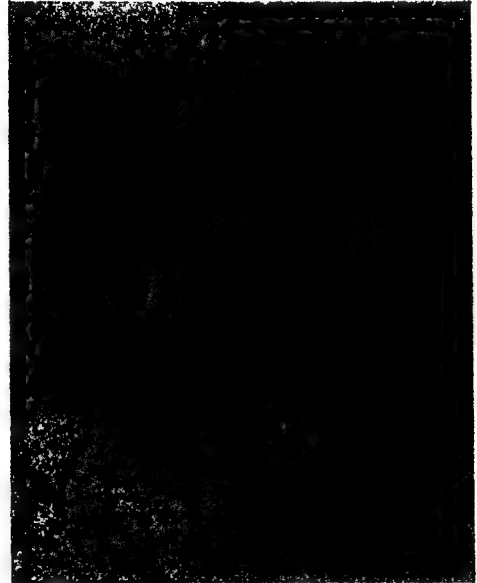
পায়াওয়ালা কাপড়ের ঝুড়ি—

একজন ভদ্রলোক কাপড় রাখিবার ঝুড়িতে চারিটি পায়া এ রকম-ভাবে লাগাইয়াছেন, যে, মাটি হইতে তুলিবামাত্র এই পায়া চারিটি স্প্রিংএর সাহায্যে গুটাইয়া যায়। আবার মাটির উপর রাখিবার পূর্ব্বে হাতলের কাছে স্প্রিং টিপিবামাত্র পায়া খুলিয়া যায়। এইপ্রকারে ঝুড়ির মধ্যের কাপড় ময়লা এবং স্যাঁৎসেঁতে হয় না।

—

মাথায় করিয়া ছেলে বওয়া—

আফ্রিকার এক জাতির নারীরা মাথায় একপ্রকার ঝুড়িতে করিয়া ছেলে বয়। কাজের সময়েও তাহারা ছেলেকে মাথার উপর ঝুড়িতে বসাইয়া রাখে, ইহাতে তাহাদের হাতদুটি সব সময়েই খালি থাকে। ঝুড়ির আকার এমন ও ঝুড়ি এমন-ভাবে মাথায় বসায়, যে, তাহাতে ঝুড়ি পড়িবার কোন ভয় থাকে না।

পায়াযুক্ত ঝুড়ি—বাঁদিকে পায়া মোড়া অবস্থায় দেখুন

আফ্রিকার নারীরা মাথায় সন্তান বহন করে

মৃত্যুর মুখে নৌকা—

কয়েকজন লোক একটা নৌকায় করিয়া নায়াগ্রা নদীতে বেড়াইতেছিল। পাড়ের লোকেরা হঠাৎ দেখিল নৌকাখানা নায়াগ্রা-প্রপাতের মুখের দিকে তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। নায়াগ্রা-প্রপাতের মুখে নৌকা গিয়া পড়িলে প্রপাতের নীচে পড়িয়া নৌকা চূর্ণ হইয়া যাইবে। তীরের লোকেরা নানাপ্রকার সঙ্কেত এবং শব্দ করিয়া নৌকার লোকদের সাবধান করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নৌকার লোকেরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া হাত নাড়িয়া তাহাদের উল্লাস জানাইতে লাগিল। নৌকাখানা হঠাৎ দুইটা পাথরের মাঝে পড়িয়া আট্‌কাইয়া গেল—তাহার পর তীর হইতে অন্য একটা নৌকায় শক্ত দড়ি বাঁধিয়া তাহাদের উদ্ধার করা হয়।
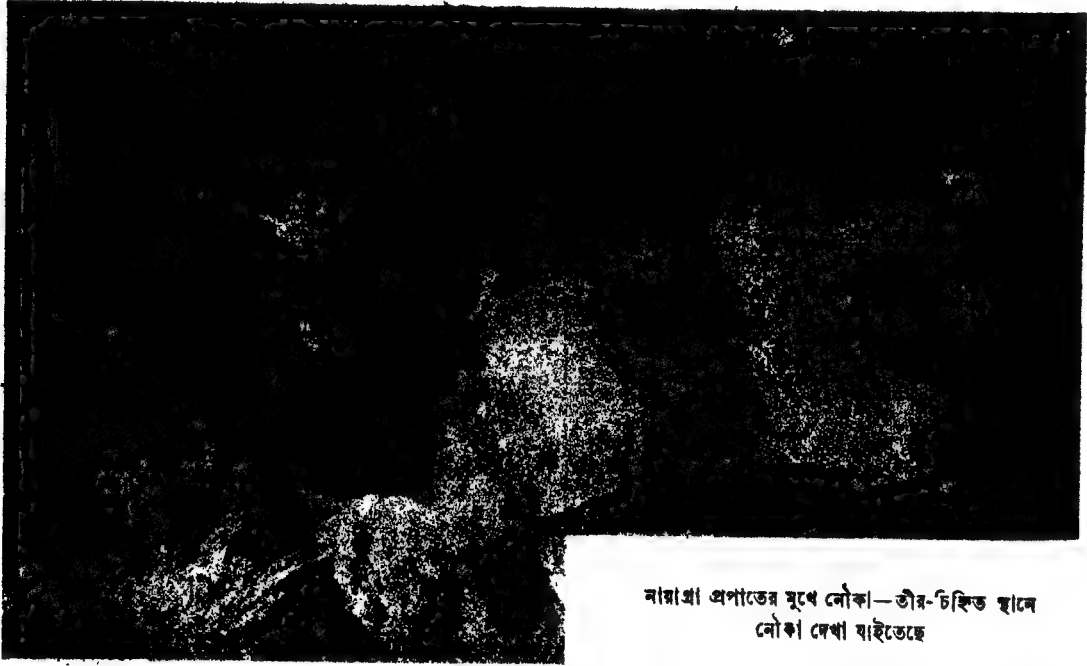
নায়াগ্রা প্রপাতের মুখে নৌকা—তীর-চিহ্নিত স্থানে নৌকা দেখা যাইতেছে

ছাতা-বাতি—

ঝড়-বাদ্‌লার রাতে অন্ধকারে আর হোঁচট্ খাইয়া পড়িতে হইবে না। ছাতার হাতলের নীচে এক-প্রকার বাতি (ইলেক্‌ট্রিক্) আবিষ্কার

ছাতাবাতি—ঝড়বাদলের রাতের পরম বন্ধু

হইয়াছে। সুইচ টিপিবামাত্র বাতি জ্বলিয়া উঠিবে—আলো পায়ের দিকে গিয়া পড়িবে, চোখে অনাবশ্যক আলো লাগিয়া কোন রকম অসুবিধা হইবে না। ব্যাটারি ছাতার মধ্যেই বসান থাকিবে।

—

ভূতের ডাক্তার—

প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক দ্বীপের লোকেরা এখনও তাদের ভূতের ডাক্তারদের অধীনেই চলাফেরা করে। এইসব অসভ্যদের বিশ্বাস বড় অদ্ভুত। তাহারা মনে করে যে এই ওঝারা সকলরকম রোগ শোক ভূত প্রেত তাড়াইতে পারে। পাদ্রীরা এখন পর্য্যন্ত নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও তাহাদের এই বিশ্বাস দূর করিতে পারে নাই। এই ভূতের ডাক্তারেরা নানারকমের অদ্ভুত এবং ভীষণ-দর্শন

দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপবাসী ভূতের ওঝা

দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপের ভূতের ওঝাদের নৃত্যসজ্জা
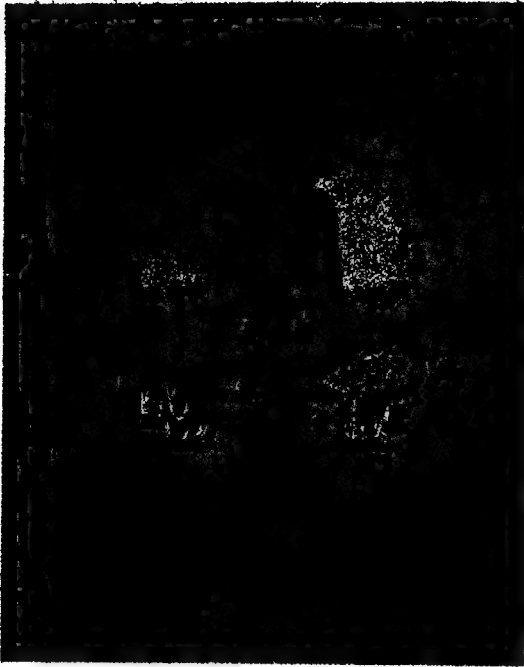
মুখোস পরিয়া, নাচিয়া, ভূতপ্রেত দৈত্যদানা ইত্যাদি তাড়াইতে চেষ্টা করে। অনেক ওঝা আবার নাকে ফুটো করিয়া হাড় পরে। যুবকেরা হাতের এবং পায়ের সব আঙুলেই আংটি পরে।

গলিত লোহা হাত পোড়ায় না—

দু-তিন শ বছর পূর্ব্বে অপরাধীদের জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়া হাঁটান হইত। লোকের বিশ্বাস ছিল যে—সে যদি সত্যই অপরাধী হয় তবে তাহার পা পুড়িয়া যাইবে, এবং যদি দোষী না হয় তবে তাহার পা পুড়িবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে, একজন বৈজ্ঞানিক একটা ফুলঝুরির মুখে হাত রাখেন। এই ফুলঝুরি অবশ্য বাজারের সাধারণ ফুলঝুরির মত নয়—একটা চোঙার মধ্য দিয়া খুব জোরে হাওয়া চালাইয়া গলান লোহা ফুলঝুরির মত ঝরানো হইতেছিল। তাঁহার হাত কিন্তু এই গলান লোহার ছোঁয়া লাগিয়া দগ্ধ হয় নাই।

গলিত লোহার ফুলঝুরির মুখে হাত—অসংখ্য লোহার বিন্দুগুলি এত সূক্ষ্ম যে হাতের ছোঁয়াচ লাগিবামাত্র তাহা ঠাণ্ডা হইয়া যায় কাজেই হাত পোড়ে না

বৃহস্পতির আকাশে চাঁদের হাট—

আমরা যেমন আকাশে একটি মাত্র চাঁদ দেখিতে পাই—তেমনি বৃহস্পতির লোকেরা (যদি সেখানে লোক থাকে) ছয়টি চাঁদ দেখিতে পায়। এই চাঁদের সবগুলিকে মাঝে মাঝে একই সময় দেখিতে পাওয়া যায়—মাঝে মাঝে আবার পাওয়া যায় না। এই দেখিতে না-পাওয়ার কারণ—ঐ সবগুলির প্রায়ই গ্রহণ হয়। বৃহস্পতি হইতে চাঁদের হাট এবং তারার মালা কেমন দেখিতে হয়, তাহা পার্শ্বস্থ ছবি হইতে সামান্য বুঝা যাইবে।
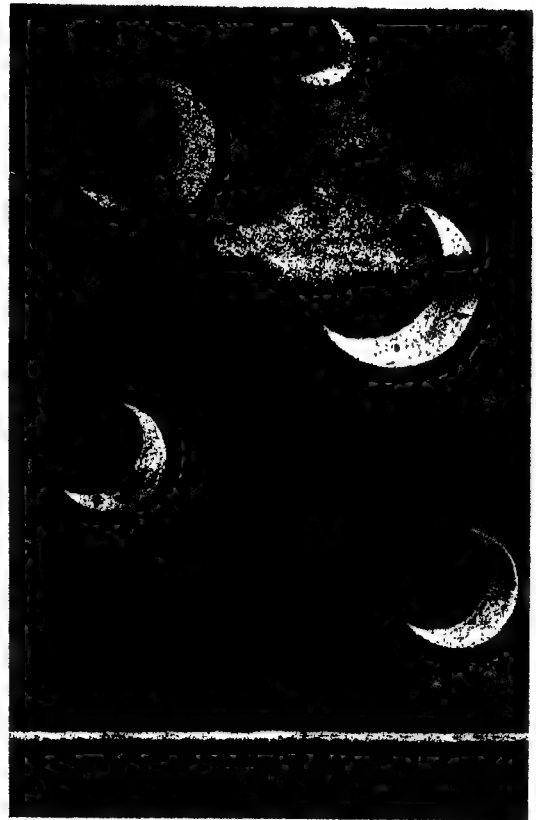
বৃহস্পতির আকাশে চাঁদের হাট—বৃহস্পতিতে যদি লোক থাকে তবে তাহারা প্রায় দেড় গণ্ডা চাঁদ দেখিতে পায়

ইচ্ছামত হেলান গাছ—

একজন ফরাসী মালী তাহার বাগানের ফলের গাছগুলিকে ইচ্ছামত তৈয়ার করিয়াছে। ডালগুলি যখন কচি থাকে, তখন তাহাদিগকে তার এবং খোঁটার সাহায্যে বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া গাছগুলিকে আঁকা ছবির মত করা হয়। ইহাতে ফল ফলিবার কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। এই বাগানটিতে প্রবেশ করিলে মনে হয় এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। এই প্রকারে গাছগুলিকে তাহার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক পরিমাণে ক্ষুদ্র করা হইয়াছে। ছবি দেখিলে বাগানটির সামান্য পরিচয় পাইবেন।

ঝুড়ির আকারে ফলের গাছ—ফরাসী মালির বাহাদুরী

গাছকে ইচ্ছামত বাঁকাইবার উপায় (খোঁটার সাহায্যে)

ঘড়ির কথা—

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে ঘড়ির ব্যবহার প্রায় সকল দেশের সকল লোকেই জানে। এমন কি আমাদের দেশের 'অসভ্য' সাঁওতালেরাও পথে ঘাটে বাবুদের দেখা পাইলে জিজ্ঞাসা করে—"এ বাবু, দ্যাখ তো কটা বাজেছে?" কিন্তু এই ঘড়ির জন্মকথা হয়ত বেশীর ভাগ লোকেই জানে না, যদিও ঘড়ি মানুষের সৃষ্টির সবচেয়ে দরকারী এবং আশ্চর্য্যজনক জিনিসের মধ্যে পড়ে।

হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে গুহাবাসীরা গাঁটবাঁধা দড়ি পোড়াইয়া সময় নিরূপণ করিত

মানুষ যখন বনে জঙ্গলে শিকার করিয়া আহার সংগ্রহ করিত, এবং পাহাড়পর্ব্বতের গুহার মধ্যে বাস করিত, তখনও তাহারা তাহাদের কাজ-কর্ম্মের সুবিধার জন্য দিন-রাত্রিকে একরকম করিয়া ভাগ করিয়া লইয়াছিল। একটা প্রকাণ্ড ঘাসের দড়িতে সমান অন্তরে একটা করিয়া গাঁট বাঁধিয়া দড়ির এক প্রান্তে আগুন লাগাইয়া
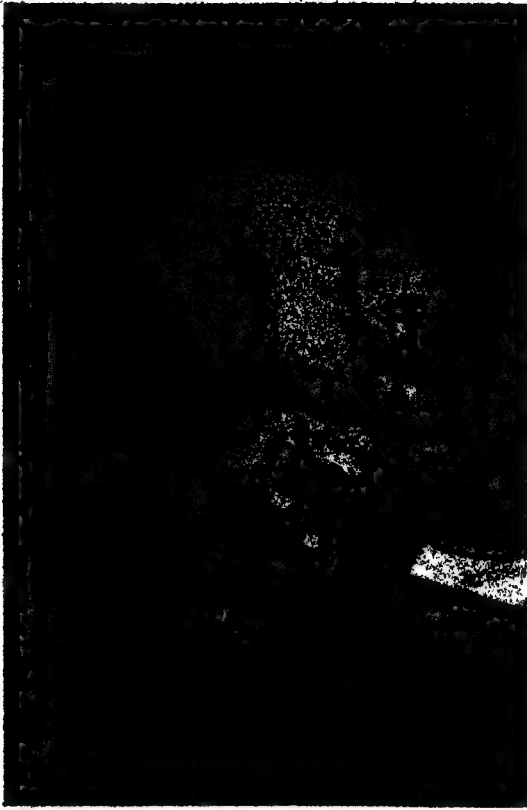
মধ্যযুগের পূর্ব্বে লোকেরা মোমবাতি পোড়াইয়া সময় ভাগ করিত

দিত। একটা গাঁট হইতে অপর গাঁট পর্য্যন্ত দড়ি পুড়িয়া গেলেই তাহাদের এক এক ঘণ্টা বা এমনি-কিছু-একটা শেষ হইত। তাহারা মিনিট বা সেকেণ্ডের কোন দরকার বোধ করে নাই, তাই সময়কে তেমনভাবে ভাগ করিবার কোন প্রয়োজনও মনে করে নাই। আমাদের দেশেও বহুযুগ পূর্ব্বে লোকে ঘটিকাযন্ত্র, সূর্য্য-ঘড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করিত। অনেক দেশের লোকেরা মোমবাতির গায়ে দাগ দিয়া রাখিত—মোমবাতি পুড়িয়া পুড়িয়া এক-একটা দাগে আসিলেই তাহাদের সময়ের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে পারিত।

তের শতাব্দীতে বর্ত্তমান সময়ের ঘড়ির প্রথম জন্ম হয়। কিন্তু এই ঘড়ি আধুনিক ঘড়ির সামান্ত আভাসমাত্র সূচনা করে। ইহার তিনশত বৎসর পরে আমাদের এখন-কার ঘড়ির মত একটি ঘড়ি প্রথম তৈয়ার হয়। এই ঘড়িটি আয়তনে একখানা রেকাবির মত ছিল, এবং দিনে ১।। দেড় ঘণ্টা সময়ের কম বেশী হইত। ইহার দাম ছিল প্রায় ৬০০০৲ টাকা।

তাহার পর কয়েক শত বৎসর পরে শূয়োর-কুঁচির দ্বারা এক রকম হেয়ার-স্প্রিং তৈয়ার হয়। প্রথম প্রথম এই হেয়ার-স্প্রিং বেশ মোটা মোটা হইত। কিন্তু এখন এই হেয়ার স্প্রিং সরু চুলের চেয়েও সরু। একটুকরা হীরার মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্য দিয়া ইস্পাতের তার টানিয়া হেয়ার-স্প্রিং তৈয়ার করা হইয়া থাকে। আধসের ইস্পাতের মোটা তারের দাম বড় জোর ২০৲ টাকা। কিন্তু ইহা হইতে যে হেয়ার-স্প্রিং প্রস্তুত হয়, তাহার দাম হয় প্রায় ২ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা এবং এই হেয়ার-স্প্রিং প্রায় আট মাইল লম্বা হয়।

একটি ঘড়ির ২১১টি অংশ আছে। ইহাদের প্রস্তুত করিবার জন্ত ৩৭৭৩ রকমের বিভিন্ন কার্য্যপ্রণালী আছে। ঘড়ির কলকব্জার ½ অংশ কেবল স্ক্রু—কতকগুলি স্ক্রু এত ক্ষুদ্র যে একটা আঙুস্তানার মধ্যে প্রায় ২০,০০০ ধরিতে পারে। একটা কাগজের উপর রাখিলে এই স্ক্রুগুলিকে স্বর্ণধূলি বলিয়া মনে হয়, এবং ইহাদের ৫ লক্ষের ওজন আধ সেরও হয় কি না সন্দেহ। একটি একটি স্ক্রুর ওজনও এত সামান্ত যে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। রুবি বা চুনী পাথরকে কাগজের মত পাতলা করিয়া কাটিয়া গোল গোল করিয়া ঘড়ির মধ্যে স্থানে স্থানে বসান হয়। এই রুবির চাকতি একটা আলপিনের মাথার চেয়ে বড় হয় না। ইহার মধ্যে আবার একটি ছিদ্র থাকে, এই ছিদ্রের মধ্যে ঘড়ির চাকার সরু ডাণ্ডা ঘোরে।

ঘড়ি তাহার মেন-স্প্রিংএর সাহায্যে চলে। মেন-স্প্রিং দুফুট লম্বা হয়। কিন্তু তাহা এমন শক্ত করিয়া গুটান থাকে যে হঠাৎ খুলিয়া গিয়া চোখে লাগিলে চোখ দুটিকে তুলিয়া ফেলিতে পারে। মেন-স্প্রিং ছিঁড়িয়া গেলে ঘড়ি বন্ধ হইয়া যায়। ঘড়ি যত ভাল হইবে, তাহার স্প্রিং ততই সহজ-ভঙ্গুর হইবে। খারাপ ঘড়ির স্প্রিং বেশী আঁট হয় না বলিয়া সময়ও ঠিকমত দেয় না।

আদিম ঘড়ি

ঘড়ি সম্বন্ধে অনেকের নানা রকম অদ্ভুত ধারণা আছে। একদল লোকে মনে করে যে ঘড়ির কাঁটা উল্‌টা দিকে ঘুরাইলে ঘড়ি খারাপ হইয়া যায়। এই ধারণা, ঘণ্টা-ওয়ালা ঘড়ি ব্যতীত, অন্ত ঘড়ি সম্বন্ধে খাটে না। উল্‌টা মুখে কাঁটা ঘুরাইলে ওয়াচ-ঘড়ির কোন অনিষ্ট হয় না।

একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য মাছের তেলের দ্বারা ঘড়ির কলকব্জায় তেল দেওয়া হয়, এই তেলকে নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া তার পর ঘড়িতে দেওয়া হয়। এই তেলের এক ফোঁটাতে একটা ঘড়ির সারা বছরের কাজ হয়। বহু বৎসরের চেষ্টা এবং পরীক্ষার পর এই তেল আবিষ্কার হয়। প্রথমে এই তেল বাতিতে ব্যবহার হইত।

আমেরিকার এক ঘড়ির কারখানায় দুইটি বড় বড় ঘড়িতে সময় রাখা হয়। দুইটি বায়ুশূন্ত প্রকোষ্ঠে এই ঘড়ি দুটি রক্ষিত আছে। কংক্রিটের থামের উপর এই প্রকোষ্ঠ-দুইটি দাঁড়াইয়া আছে—তাহাতে ঘড়িতে কোনপ্রকার নড়ন-চড়ন লাগে না। হাজার বছরে এক সেকেণ্ডের গোলমালও এই ঘড়ি-দুটিতে হয় না। জ্যোতির্ব্বিদেরা এই ঘড়ি ঠিক রাখেন।

সুইট্‌জারল্যাণ্ড বহুকাল হইতেই জগতের ঘড়িনির্ম্মাণ-কেন্দ্র বলিয়া খ্যাত। এইখানে এক-এক পরিবার ঘড়ির এক অংশ নির্ম্মাণ করিত। তাহার পর ঘড়ির বিভিন্ন অংশ এবং কলকব্জা একটি কারখানাতে আসিয়া জড় হইত, এবং এই কারখানাতে সম্পূর্ণ ঘড়িটি প্রস্তুত হইত। যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমানে আটটি বড় বড় ঘড়ির কারখানা আছে। তাহাদের মধ্যে একটি বছরে ১ লক্ষ ঘড়ি নির্ম্মাণ করে—অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক দিন ৮ হাজার করিয়া প্রস্তুত হয়। সমস্ত বছরে এই কারখানা হইতে ৬ কোটি টাকার ঘড়ি তৈয়ার হয়।

আধুনিক কালের ঘড়ির সবচেয়ে আশ্চর্য্যের জিনিষ—তাহার ব্যাল্যান্স অর্থাৎ তারের সমতা। এই ব্যাল্যান্সই ঘড়ির এক রকম প্রাণ। ঘড়ির ব্যাল্যান্স-হুইল এবং তাহার মধ্যের হেয়ার স্প্রিং ঠিক-মত থাকিলে ঘড়ি ঠিক সময় দেয়। ঘড়ির প্রায় সব রকমের গোলমাল এই ব্যাল্যান্স-হুইলের জন্যই হয়।

এই ব্যাল্যান্স-হুইল এবং তাহার মধ্যস্থিত হেয়ার-স্প্রিং কেমন করিয়া কি কি প্রণালীতে ঠিকমত যথাস্থানে বসাইতে হয় তাহার অনেক নিয়ম কানুন আছে। সেই-সমস্ত নিয়ম কানুন সাধারণ পাঠকের কাছে প্রীতিকর না হইয়া বিরক্তিকরই হইতে পারে বলিয়া তাহার বর্ণনা করিলাম না। হেয়ারস্প্রিং সম্বন্ধে কেবল একটা কথা বলা যায় যে ইহা তাপে এবং শীতে যাহাতে একইভাবে চলে, সেইরকম করিয়া নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নির্ম্মাণ করা হয়।
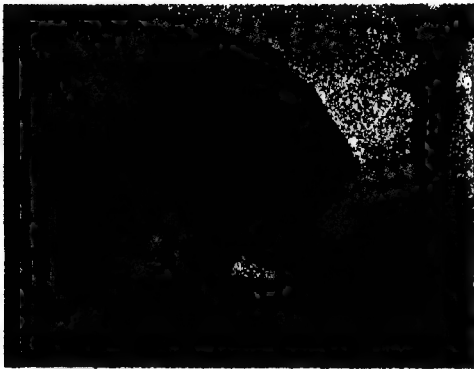
গাছের গুঁড়ি খুদিয়া তৈরী ভালুক—একেবারে আসল জন্তুটির মত

কাঠের তৈরী ভল্লুক—

আমেরিকার একজন আদিম নিবাসী একটা গাছের গুঁড়িকে খুদিয়া খুদিয়া একটা ভালুকের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়াছে। একটা বড় ছুরি ছাড়া অন্য কোনপ্রকার যন্ত্র সে এই কার্য্য করিতে ব্যবহার করে নাই। এই খোদাই ভালুকটি দেখিতে অবিকল একটা সত্যকার ভালুকের মতন হইয়াছে এবং যাহারা দেখিয়াছে সকলেই মুক্তকণ্ঠে ইহার নির্ম্মাতার প্রশংসা করিয়াছে।

—

তেলের পুকুর—

যুক্ত রাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে অসংখ্য তেলের খনি খনন করা হইতেছে। এই-সমস্ত তেলের কূপ হইতে এত অধিক পরিমাণে তেল নির্গত হইতেছে যে নির্দ্দিষ্ট আধারে তাহার স্থান কুলাইতেছে না। সেইজন্য কূপের মালিকেরা মাটিতে পুকুর কাটিয়া এই তেল রক্ষা করিতেছে।

দিগন্ত প্রসারিত অসংখ্য তেল-পুকুর

এই তেল মোটরকার এবং মোটর-ইঞ্জিনের প্রাণস্বরূপ। এই তেল রক্ষা করিবার জন্য পুকুর নির্ম্মাণ হইতেছে; জলের পাইপের মতন পাইপ বসাইয়া ইহা চালান করিয়া দিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। ছবিতে দেখুন—তেলের পুকুরগুলির সংখ্যা কিরূপ। সমস্ত তৈল-ক্ষেত্রের অতি সামান্য এক অংশ ছবিতে আছে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

আমরা

(শেখ সাদী)

আনন্দেরি অংশ মোরা; একতারারই সুরে
সবাই বাঁধা প্রাণে প্রাণে, চল্‌ছি ঘুরে ঘুরে;

পরের দুখে বক্ষে যদি বেদন্ নাহি পাই—
'অমৃতেরি পুত্র'—এ-নাম বৃথাই তবে ভাই।

শ্রী সুরেশচন্দ্র নন্দী

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাঠারম্ভ

প্রথম পাঠগুলি কেবলমাত্র সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের—বিশেষতঃ মন চক্ষু ও হস্তসন্ধিগুলির—জড়ত্ব দূর করিয়া লঘুত্বসাধনের নিমিত্ত; এবং বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন স্থানীয় আঘাতগুলিকে ক্ষেপণ (প্রয়োগ করা), প্রত্যাহরণ (ফিরাইয়া লওয়া), সংহরণ (সংযত করিয়া রাখিয়া দেওয়া) সম্পর্কে পূর্ণশিক্ষালাভ ও আয়ত্ত করার নিমিত্ত; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের সর্ব্বপ্রকার আঘাতই কর্ত্তন করিবার (প্রতিহত কিম্বা নিষ্ফল করিবার) নিমিত্ত বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ক্ষিপ্রকারিতা প্রজ্ঞা ও দিব্যজ্ঞান (instinctive intuition) লাভের জন্যই বুঝিতে হইবে।

প্রথম শিক্ষার্থীগণ যেন কদাচ এরূপ মনে না করেন, যে, প্রকৃত আততায়ীর সঙ্গে প্রকৃত সংঘর্ষ-কালে প্রথম-পাঠানুযায়ী নিয়ম ও ভঙ্গীগুলির অনুকরণ করিয়াই আততায়ীকে আঘাত প্রতিঘাতাদি করিতে হইবে। এরূপ করিতে গেলে নিতান্তই অপদস্থ হইতে হইবে।

আততায়ীর সঙ্গে সংঘর্ষ-কালে অর্জ্জিত ও সঞ্চিত দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে মন চক্ষু হস্ত পদ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির বিভিন্ন কর্ম্মচেষ্টাগুলি ক্ষিপ্রকারিতা সহ আপনা-আপনিই যথাযোগ্য স্থানে ও যথাযোগ্য রূপে প্রযুক্ত হইয়া অভীষ্ট ফল সাধন করিয়া থাকে। তবে, সংঘর্ষ-কালে সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই জয় লাভ করিয়া থাকে।

ক্ষিপ্রকারিতা-নিবন্ধন অধিকাংশ স্থলেই প্রয়োগকর্ত্তা নিজেই নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টিভূত কর্ম্মচেষ্টাগুলির অনুসরণ করিতে সমর্থ হয় না।

এতদনুরূপ দিব্যজ্ঞান লাভে সাহায্য হেতুই বিভিন্ন পাঠগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বহু পরীক্ষার ফলেই পাঠগুলির বিভিন্ন সমাবেশ ও সমন্বয় এরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যেন শিক্ষার্থীগণ প্রকৃত নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া শিক্ষায় অগ্রসর হইতে থাকিলে তাহাদের পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্রকারিতা ও দিব্যজ্ঞান লাভের পথ যথেষ্ট সুগম হইয়া পড়ে। ধৈর্য্যের সহিত প্রথম পাঠগুলি ধীরে ধীরেই অভ্যাস করিতে হইবে। কখন্, কি ভাবে, কত পরিমাণে দ্রুত চালনার অভ্যাস আরম্ভ করিতে হইবে তাহা যথাস্থানেই নির্দ্দিষ্ট হইবে। সেই সম্বন্ধে উপযুক্ততা অনুসারেই শিক্ষকগণ যথাসময়ে উপদেশ দিবেন। কিন্তু সর্ব্বদাই সমস্ত আঘাত কর্ত্তন (শত্রুর আঘাত আটকান), দাঁড়াইবার ভঙ্গী প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সবিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। শিক্ষা-সম্পর্কে বিশুদ্ধতা ও নিষ্ঠা না থাকিলে (বিশেষতঃ প্রাথমিক-শিক্ষা-সম্পর্কে) শিক্ষার্থীগণ কখন উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হয় না।

প্রতিবারেই ক্রীড়ারম্ভ-কালে ও ক্রীড়া-সমাপ্তিকালে পরস্পর অভিবাদন (সেলামী) করিয়া লইতে হইবে। শিক্ষালাভ-কালে যাঁহারা উভয়ে পরস্পর ক্রীড়া করিতে থাকেন, তাঁহারা কেহই প্রকৃত আততায়ী নহেন; কিন্তু আঘাত ও প্রতিঘাতাদি-সম্পর্কে শিক্ষালাভ-হেতু একে অন্যকে আততায়ী কল্পনা করিয়াই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে আঘাত প্রতিঘাতাদি করিতে হয়; তাই, যাহাতে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতির তীব্রতা অনুসরণ করিতে যাইয়া সাময়িক ভাবেও প্রকৃত আততায়ী-ভাব না জন্মিতে পারে, সেই হেতুই অন্তরে সখ্য-ভাবের বীজ ও অঙ্কুর স্থায়ী রাখিবার নিমিত্ত ক্রীড়ারম্ভকালে ও ক্রীড়াসমাপ্তিকালে অভিবাদন-প্রথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পাঠ-পর্য্যায় মূলতঃ ছয় অঙ্কে বিভক্ত, যথা,—(১) ঘাত, (২) সমঘাত (শ্যামঘাত), (৩) বিষম ঘাত (মিলবাটু), (৪) চতুর্ম্মুখী (চৌমুখী), (৫) মিশ্রঘাত (বালাদস্তি) ও (৬) নির্ঘাত (ছুট)।

"বিনোট" ও "জুজুৎসুর" যতটুকু অসিশিক্ষা-সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তাহা পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে।

ঘাত :—শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন পদ্ধতির বিভিন্ন আঘাত ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে শিক্ষালাভ ও তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন অঙ্গচালনা আয়ত্ত করাই "ঘাত"-পর্য্যায়ের প্রধান লক্ষ্য। "ঘাত" শিক্ষাকালে ধীরে ধীরে অভ্যাস করাই শ্রেয়স্কর। প্রথম প্রথম তাড়াতাড়ি করিতে গেলে আঘাত ও প্রতিকার-সম্পর্কে বিশুদ্ধতা জন্মিতে পারে না। বিশুদ্ধতা-সম্পন্ন "ঘাত" অভ্যাসে সম্পূর্ণ দক্ষতা না জন্মিলে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষায় উৎকর্ষ লাভ অসম্ভব।

সমঘাত :—সমঘাত-পর্য্যায়ে ক্রীড়ারত উভয় ব্যক্তিকেই সমান ভাবে পর্য্যায়ক্রমে এক-একটি আঘাতের প্রয়োগ ও প্রতিকারের (কর্ত্তনের) অভ্যাস করিতে হয়। "ঘাত" শিক্ষা বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে পরিসমাপ্ত হইলে "সমঘাত"-পর্য্যায়েই দ্রুত ও অতিদ্রুত চালনার অভ্যাসে কৃতিত্ব জন্মিয়া থাকে।

বিরুদ্ধগতিতে দুই মেঘের সংস্পর্শে যেরূপ বিদ্যুতের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ "সমঘাত"-ক্রীড়াকালে দ্রুতচালনায় উভয় পক্ষীয় লাঠির ঘাত-প্রতিঘাতে বিদ্যুৎবৎ প্রত্যক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই হেতুই "সমঘাতের" অপর এক নাম "শ্যামঘাত"। মেঘের এক নাম "শ্যাম"। "শ্যামঘাত" ক্রীড়াকালে লাঠির ঘাতপ্রতিঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে ক্রীড়ারত উভয়েরই "শ্যামঘাত" পর্য্যায়ে কৃতিত্ব জন্মিয়াছে। হস্ত চালনায় ক্ষিপ্রকারিতা সাধনই "সমঘাত" পর্য্যায়ের প্রধান লক্ষ্য।

বিষমঘাত :—বিষমঘাত-পর্য্যায়ে ক্রীড়ারত ব্যক্তিদ্বয়কে নিয়ম-পদ্ধতি-অনুসারে অসমান ভাবে পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন আঘাতের প্রয়োগ ও প্রতিকারের (কর্ত্তনের) অভ্যাস করিতে হয়। মন ও চক্ষুর ক্ষিপ্রকারিতা সাধনই "বিষমঘাত"-পর্য্যায়ের প্রধান লক্ষ্য। "বিষমঘাত"-পর্য্যায়ে আঘাত-সমাবেশের বিভিন্ন আঘাতগুলি শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে বণ্টন করিয়া মিলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এই পর্য্যায়ের অপর এক নাম "মিলবাট"।

চতুর্ম্মুখী :—"চতুর্ম্মুখী"-পর্য্যায়ে ক্রীড়ারত উভয় ব্যক্তিকেই এক হস্তে লাঠি ও অপর হস্তে শৃঙ্গ লইয়া সমানভাবে এক সঙ্গে প্রতিপক্ষকে লাঠি দ্বারা আঘাত ও শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিপক্ষের আঘাতের প্রতিকার করিতে হয়। "চতুর্ম্মুখী"-পর্য্যায় হইতেই শৃঙ্গ চালনার প্রকৃত অভ্যাস আরম্ভ হইয়া থাকে। দুই লাঠি, ও দুই শৃঙ্গ, এই চারিটি একত্রে প্রযুক্ত হয় বলিয়াই এই পর্য্যায়ের নাম "চতুর্ম্মুখী"।

মিশ্রঘাত :—পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ পর্য্যায়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্নরূপ সংমিশ্রণেই "মিশ্রঘাত"-পর্য্যায়ের বিভিন্ন সমাবেশগুলির উদ্ভব হইয়াছে। "মিশ্রঘাত"-গুলির অভ্যাস হইতেই ক্রমে "নির্ঘাত" খেলিবার, অর্থাৎ আততায়ী সহ প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা জন্মিয়া থাকে। "মিশ্রঘাতের" অপর এক নাম "বালাদস্তি"।

নির্ঘাত :—"নির্ঘাত"-শিক্ষাকালে আততায়ীকে প্রতিহত করিবার নিমিত্ত নির্দ্দয়ভাবে বিষম ও অমোঘ আঘাত করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইতে হয় বলিয়াই এই পর্য্যায়ের নাম "নির্ঘাত"। "নির্ঘাতের" অপর নাম "ছুট"; কারণ এই পর্য্যায়ে পূর্ব্বোক্ত পর্য্যায়গুলির বিধি-নির্দ্দিষ্ট (বিধি-স্থির) নিয়ম-শাসনগুলির তীব্রতা সম্পর্কে সবিশেষ মনোযোগী হওয়ার দরকার হয় না।

পাদচালনার বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসারে "নির্ঘাত" মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, যথা— ১। হনুমন্তী, ২। শম্ভাসুরী (রুস্তমখানি), ও ৩। শূরসেনী (আলিমদ্)। পাদচালনার প্রাকৃত নাম "পায়তারা" (পাইতারা)।

হনুমন্তী :—"হনুমন্তী"-পদ্ধতিতে অত্যধিক লম্ফ-ঝম্প সহকারে ঘুরিতে ফিরিতে হয়, এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া কখনও অগ্রে কখনও পশ্চাতে ধাবিত হইয়া সুকৌশলে ও উপযুক্ত অবসরে আততায়ীকে আঘাত করিতে ও আততায়ীর আঘাতকে প্রতিহত করিতে কিম্বা এড়াইতে হয়। কথিত আছে যে, উরুভঙ্গ-কালে ভীম ও দুর্য্যোধন এই পদ্ধতিতেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

শম্ভাসুরী :—"শম্ভাসুরী" পদ্ধতিতে তীব্রবেগে শত্রুর ও শত্রু-আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হয়, এবং শত্রুকে আহত প্রতিহত কিম্বা বশীভূত না করিয়া কদাচ ফিরিতে হয় না। কদাচ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে

নাই। কৌশল ও ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে পৃষ্ঠদেশ ও পার্শ্বদেশদ্বয়ের সংরক্ষা সাধন করিতে করিতেই অগ্রসর হইতে হয়। শম্ব নামে কোনও বিখ্যাত অসুর এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিত বলিয়াই এই পদ্ধতির নাম "শম্বাসুরী"।

শূরসেনী:—"শূরসেনী" পদ্ধতিতে দ্রুতগতিই সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। ভূমিতে পতিত হইলেও দ্রুত-গতির তীব্রতার অভ্যাস নিবন্ধন যোদ্ধা কখনও চিৎ হইয়া পতিত হয় না। এই পদ্ধতিতে দ্রুতগতি সহকারেই বহু আততায়ীকেও একাকী বেষ্টন করিয়া আঘাত করিতে হয়, অপেক্ষাকৃত হীনবল আততায়ীগণ সর্ব্বদাই গতির বেষ্টনের মধ্যে পতিত হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে, এবং কোনক্রমেই আক্রমণকারীর পার্শ্ব কিম্বা পৃষ্ঠদেশ আক্রমণের অবসর পায় না। এই পদ্ধতিতেই সুকৌশলে অতিদ্রুত বেগে বিভিন্ন গতিতে ধাবিত হইয়া শত্রুব্যূহকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলা সম্ভব হয়; তাহারই ফলে শত্রুপক্ষীয়গণ প্রমাদগ্রস্ত হইয়া স্বপক্ষীয়গণকেই প্রহার করিতে থাকে। কেবল মাত্র শূরশ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণই এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে সমর্থ হন। কথিত আছে, বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন গোহরণকারী কৌরব পক্ষীয়গণকে রথারূঢ় হইলেও এই পদ্ধতিতেই প্রতিহত করিয়া পরিশেষে সংমোহন অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

সমস্ত পাঠগুলিই দক্ষিণ ও বাম, উভয় হস্তেই সমানভাবে অভ্যাস করিতে হইবে। দক্ষিণ হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া অভ্যাস-কালে দক্ষিণ পদ সম্মুখে ও বাম পদ পিছনে থাকিবে; সেইরূপ বাম হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া অভ্যাসকালে বাম পদ সম্মুখে ও দক্ষিণ পদ পিছনে থাকিবে।

ঘাত

অভিবাদন (সেলামী):—ক্রীড়াকারী উভয় ব্যক্তি পরস্পর সম্মুখীন হইয়া, এক লাঠির ব্যবধানে (দুই হস্ত আট অঙ্গুলি) একাঙ্গের ঠাটে কেল্লাবন্দী হইয়া দাঁড়াইবে; পরে যে-ভঙ্গীতে অসি কোষ-মধ্যে কোমরে আবদ্ধ থাকে, লাঠিকে সেই-ভাবে রাখিয়া দক্ষিণ মুষ্টির নিম্নে বাম হস্ত দ্বারা মুঠা করিয়া ধরিবে, এবং বাম হস্তের মুঠের ভিতর দিয়া সমগ্র লাঠি টানিয়া তুলিয়া উভয়ে অপরের বাম কর্ণরন্ধ্র হইতে দক্ষিণ কর্ণের নিম্নমূল বরাবরে আঘাত করিবে; তাহাতেই মধ্যস্থলে উভয়ের লাঠি পরস্পরে প্রতিহত হইবে। তৎপরে বাম হস্ত দ্বারা লাঠি ধরিয়া লাঠিকে বক্ষের সমান্তরাল ভাবে রাখিয়া ও অগ্রবিন্দু দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া দিয়া উভয়ে উভয়ের দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারাই নিজ নিজ ললাট ও মস্তক স্পর্শ দ্বারা অভিবাদন করিবে। ইহার নাম "তামেচার অভিবাদন"।

বাম হস্তে অভ্যাসকালে বাম পদ অগ্রে রাখিয়া একাঙ্গের ঠাটে কেল্লাবন্দী হইয়া দাঁড়াইবে এবং অভিবাদনাদি দক্ষিণ হস্তের সমস্ত ক্রিয়া বাম হস্ত দ্বারাই করিবে।

অভিবাদনানন্তর পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিবে, এবং দক্ষিণ হস্তের ক্রীড়া সমাপ্ত হইলে পুনরায় দক্ষিণ হস্তের অভিবাদন করিয়া ক্ষান্ত হইবে। ঐরূপ বাম হস্তের ক্রীড়া সমাপ্ত হইলে পুনরায় বামহস্তের অভিবাদন করিয়া ক্ষান্ত হইবে।

পরবর্ত্তী বর্ণনা সমস্তই দক্ষিণ-হস্ত-সম্পর্কে দেওয়া হইল, বাম-হস্ত-সম্পর্কে বর্ণনা প্রায় তদনুরূপই ধরিয়া লইতে হইবে, বিশেষ বিভিন্নতাগুলি ও সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব যথাস্থানেই উক্ত হইবে। তবে সাধারণতঃ দক্ষিণ অঙ্গের বিভিন্ন আঘাতগুলির প্রতিকার-কল্পে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা যে যে ভঙ্গীতে লাঠি ধরিতে হইবে, বাম অঙ্গের তৎতৎ সদৃশ আঘাতগুলির প্রতিকার-কল্পে বাম হস্ত দ্বারা সেই সেই অনুরূপ ভঙ্গীতেই লাঠি ধরিতে হইবে। আবার বাম অঙ্গের বিভিন্ন আঘাতগুলির প্রতিকার-কল্পে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা যে যে ভঙ্গীতে লাঠি ধরিতে হইবে, দক্ষিণ অঙ্গের তৎতৎ সদৃশ আঘাতগুলির প্রতিকার-কল্পে বাম হস্ত দ্বারা সেই সেই অনুরূপ ভঙ্গীতেই লাঠি ধরিতে হইবে।

দুইএর বাড়ি—

১। ///শির, ///মোঢ়া।
২। //অন্তর, ///কুচ।

শির—মস্তকের ঠিক মধ্যদেশ বরাবরে সিঁথির দুই

অঙ্গুলী বাম হইতে আরম্ভ করিয়া, বাম ভ্রু, বাম চক্ষু, নাসিকার অগ্রভাগ ও দক্ষিণ কোমর বরাবরে ভেদ করিয়া অসি বাহির হইয়া যাইবে।

মোঢ়া—দক্ষিণ স্কন্ধের মোঢ় হইতে আরম্ভ করিয়া বাম স্তনের বোঁটার দুই অঙ্গুলী নিম্ন বরাবরে বাম বক্ষ-পার্শ্ব ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইবে।

অন্তর—দক্ষিণ কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক ও গলদেশের ঠিক সন্ধিস্থল ভেদ করিয়া বাম কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন দিয়া বাহির হইয়া যাইবে।

কুচ্—দক্ষিণ পদের কব্জির ভিতর দিকের গিরুটি ব্যাপিয়া চারি অঙ্গুলীর মধ্যে আঘাত করিয়া একটু নিম্নমুখে বক্র ভাবে ঐ-সন্ধিস্থল বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে।

(যে আঘাতগুলির সঙ্গে /// এই চিহ্ন সংযুক্ত থাকিবে তাহা "তরাসে" প্রয়োগ করিতে হইবে; যে আঘাতগুলির সঙ্গে // এই চিহ্ন সংযুক্ত থাকিবে তাহা "জার্ব্বে" প্রয়োগ করিতে হইবে; যে আঘাতগুলির সঙ্গে / এই চিহ্ন সংযুক্ত থাকিবে তাহা গবৃদেশে প্রয়োগ করিতে হইবে। যে আঘাতগুলির সঙ্গে কোন চিহ্নই থাকিবে না তাহাও মূলতঃ গবৃদেশেই প্রয়োগ করিতে হইবে, তবে "জার্ব্ব" এবং "তরাসের"ও সামান্য সংযোগ থাকিবে।

বর্ণনা :—

১ম। লাঠি পিঠের সমান্তরাল ভাবে পিছন দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া হাতের মুঠ দক্ষিণ স্কন্ধের উপরে আসিলে লাঠির অগ্র-বিন্দু ক্রমে উপরে তুলিয়া হস্ত সম্পূর্ণ সরল করিয়া স্থির লক্ষ্যে "শির" মারিয়া প্রতিপক্ষের দক্ষিণ কোমর বরাবরে টানিয়া আনিয়া দক্ষিণ হস্ত নিজ বাম পার্শ্বে আসিলে ক্রমে কনুই ভাঙ্গিয়া লাঠি উপরে তুলিয়া হাতের মুঠ বাম স্কন্ধদেশের উপরে আসিলে লাঠি ফিরাইয়া হস্ত সরল করিয়া স্থির লক্ষ্যে "মোঢ়া" মারিয়া তরাসে টানিয়া আনিয়া কনুই ভাঙ্গিয়া লাঠি পিছন দিক্ দিয়া সামান্য গবৃদেশে ঘুরাইয়া মাথার উপরে আনিয়া প্রতিপক্ষের "শিরের" আঘাত আট্কাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইবে।

(প্রতিপক্ষের আঘাত আট্কাইবার বিভিন্ন নাম, যথা,—রোখা, কর্ত্তন করা, প্রতিহত করা, ফিরান, প্রতিকার করা প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।)

শির আট্কাইবার সময় লাঠি ঠিক্‌ভাবে ধরিলে হাতের মুঠের বৃদ্ধাঙ্গুলী নিজ মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্ব বরাবরে প্রায় অর্দ্ধ হস্ত ঊর্দ্ধে ও সম্মুখে থাকিবে, এবং লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া বাম স্কন্ধ হইতে বামে প্রায় অর্দ্ধ হস্ত দূর বরাবরে থাকিবে। লাঠি বক্ষের সমান্তরাল থাকিবে।

নিম্নে ছবিতে শির আট্কাইবার পদ্ধতি প্রদর্শিত হইল। শরীরের উপরে অঙ্কিত রেখাটি বরাবরে আঘাতের গতি কল্পনা করিতে হইবে।

শির
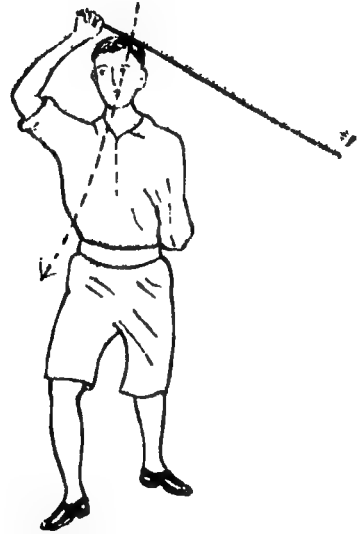
মোঢ়া আট্কাইবার সময় লাঠি ঠিক ভাবে ধরিলে হাতের মুঠের বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ স্কন্ধ-মোঢ়ের প্রায় চারি অঙ্গুলী দক্ষিণে ও নিম্নে এবং অর্দ্ধহস্ত সম্মুখ বরাবরে দূরে থাকিবে। লাঠির অগ্রবিন্দু বাম স্কন্ধ-মোঢ় হইতে অর্দ্ধহস্ত সম্মুখ বরাবরে ঊর্দ্ধে থাকিবে। লাঠি বক্ষের সমান্তরাল থাকিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আট্কাইবার সময় সর্ব্বদাই নিজ লাঠি দ্বারা প্রতিপক্ষের লাঠিকে তাহার লাঠির গতির

মোঢ়া

অন্তর

বিপরীত দিক্ বরাবরে সামান্য একটু ঠেলিয়া দিতে হইবে।

২য়। হাতের মুঠ বাম স্কন্ধদেশের উপরে আনিয়া লাঠিকে প্রায় ভূমির সমান্তরাল ভাবে চালনা করিয়া স্থির লক্ষ্যে আর্দ্ধে "অন্তর" মারিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিতে নিজ লাঠি প্রতিহত হইলে, বিপরীত গতিতে মাথার উপর দিয়া বামাবর্ত্তে ঘুরাইয়া আনিয়া দক্ষিণ হাঁটু একটু অবনত করিয়া, ঠাটের ভঙ্গী প্রায় ঠিক রাখিয়াই সমগ্র শরীর সম্মুখে সামান্য ঝুঁকাইয়া "কুচ" মারিয়া তরাসে টানিয়া আনিয়া বাম দিক্ দিয়া লাঠি তুলিয়া প্রতিপক্ষের "অন্তরের" আঘাত আট্‌কাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

"অন্তর" আট্‌কাইবার সময় লাঠি ঠিক লম্ব ভাবে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া থাকিবে, হাতের মুঠের বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ স্কন্ধের প্রায় চারি অঙ্গুলী নিম্ন ও দক্ষিণ এবং প্রায় অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখ বরাবরে থাকিবে।

অন্তর আট্‌কাইয়া লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ দিক্ বরাবরে হেলাইয়া দিয়া লাঠিকে নিম্নমুখ করিয়া চালনা করিতে করিতে হাতের মুঠ নাভি বরাবরে আসিলে লাঠি ভূমির উপরে লম্ব ভাবে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী হইতে অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখে ও বামে আসিবে; প্রতি-পক্ষের লাঠির গতির অনুযায়ী নিজ লাঠিকে এরূপভাবে চালনা করিতে হইবে, যে, লাঠি যেন চালিত অবস্থাতেই পূর্ব্বোক্ত বর্ণিত স্থানে প্রতিপক্ষের "কুচের" আঘাত আট্‌কাইয়া তাহার লাঠিকে সরাইয়া দিয়া অব্যাহত গতিতে বাম পার্শ্ব দিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বক্ষদেশের সমান্তরালভাবে ঘুরিয়া আইসে। পরে হাতের মুঠ বাম স্কন্ধের উপরে লইয়া পুনরায় "অন্তর" মারিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—দক্ষিণ পদ অগ্রে স্থাপিত অবস্থায় একাঙ্কের ঠাট্ কল্পনা করিয়াই সমস্ত আঘাতগুলি কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু বামহস্তে ক্রীড়াকালে বামপদ অগ্রে থাকিবে; সুতরাং "কুচ" প্রভৃতি আঘাতের স্থানগুলি যথাস্থানে থাকিবে না, তাই ঐ-সমস্ত আঘাতগুলির বাম

কুচ

হস্তে প্রয়োগ ও প্রতিকার-কালে, প্রকৃত দক্ষিণ পদকেই বাম পদের স্থানে কল্পনা করিয়া লইতে হইবে।

সাধারণতঃ সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে, আঘাত-গুলির প্রয়োগকালে হস্ত যেন সম্পূর্ণ সরল থাকে।

তিনের বাড়ি

১।	তামেচা,	বাহেরা,	শির।
২।	বাহেরা,	তামেচা,	শির।
৩।	শির,	তামেচা,	বাহেরা।
৪।	তামেচা,	শির,	বাহেরা।
৫।	বাহেরা,	শির,	তামেচা।
৬।	শির,	বাহেরা,	তামেচা।
৭।	তামেচা,	কোমর,	শির।

তামেচা = বাম কর্ণরন্ধ্র হইতে নাসিকার অগ্রভাগ ও দক্ষিণ কর্ণমূল বরাবরে।

বাহেরা = দক্ষিণ কর্ণরন্ধ্র হইতে নাসিকার অগ্রভাগ ও বাম কর্ণমূল বরাবরে।

কোমর = দক্ষিণ কোমর-পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ঠিক্ সরল ভাবে বাম কোমর-পার্শ্ব ভেদ করিয়া যাইবে।

বর্ণনা :—

১। লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ করিয়া বাম পার্শ্ব হইতে লাঠি পিঠের সমান্তরালভাবে পিছন দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া লাঠির অগ্রবিন্দু ক্রমে উপরে তুলিয়া হস্ত সরল করিয়া "তামেচা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া আনিয়া জার্ব্বের ক্রিয়ায় হাতের মুঠ বাম কর্ণের ঈষৎ উপরে গেলে "বাহেরার" আঘাত করিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া আনিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে লাঠি ঈষৎ গর্দ্দেশে ঘুরাইয়া হস্ত একটু উঁচু করিয়া "শির" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া আনিয়া প্রতিপক্ষের "তামেচার" আঘাত আট্‌কাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

তামেচা

"তামেচা" আট্‌কাইবার সময় হাতের মুঠের বৃদ্ধাঙ্গুলী বাম স্কন্ধের প্রায় চারি অঙ্গুলী ঊর্দ্ধ বরাবরে অর্দ্ধ হস্ত

সম্মুখে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ স্কন্ধ-মোড়ের প্রায় চারি অঙ্গুলী দক্ষিণে ও অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখ বরাবরে উর্দ্ধে থাকিবে।

"বাহেরা" আট্‌কাইবার সময় হাতের মুঠের বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ স্কন্ধের প্রায় চারি অঙ্গুলী উর্দ্ধ বরাবরে অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে থাকিবে। এবং লাঠির অগ্রবিন্দু প্রায় বাম স্কন্ধ-মোড়ের চারি অঙ্গুলী বামে ও অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখ বরাবরে উর্দ্ধে থাকিবে।

বাহেরা

২। হাতের মুঠ তুলিয়া বাম কর্ণের ঈষৎ উপরে উঠিলে "বাহেরা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া লইয়া হাতের মুঠ দক্ষিণ কর্ণের ঈষৎ উপরে উঠিলে "তামেচা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া লইয়া নিম্নমুখ ভাবে পিছন দিক দিয়া ঘুরাইয়া তুলিয়া হাতের মুঠ মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের উপর বরাবরে আসিলে "শির" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া লইয়া হাতের মুঠ বাম কোমর বরাবরে আসিলে, লাঠির অগ্রবিন্দু উপরে তুলিয়া প্রতি-পক্ষের "বাহেরার" আঘাত আট্‌কাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

৩য়। "শির" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া আনিয়া লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ ভাবে রাখিয়া বাম পার্শ্ব ও পিছন দিক্ দিয়া লাঠি ঘুরাইয়া আনিয়া ক্রমে লাঠির অগ্রবিন্দু উপরে তুলিয়া হাতের মুঠ দক্ষিণ কর্ণের ঈষৎ উপরে উঠিলে "তামেচা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া লইয়া জার্ব্বের ক্রিয়ায় হাতের মুঠ বাম কর্ণের ঈষৎ উপরে গেলে "বাহেরা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া লইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে হস্ত ও লাঠি নিম্নমুখ ভাবে এক সরল রেখায় হইলে, ক্রমে পিছন দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া প্রতিপক্ষের "শিরের" আঘাত আট্‌কাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

৪র্থ। "তামেচা" মারিয়া স্থির লক্ষ্য তরাসে টানিয়া আনিয়া লাঠি নিম্নমুখ ভাবে বাম পার্শ্ব ও পিছন দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া হাতের মুঠ মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের উপর বরাবরে আসিলে "শির" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া আনিয়া হাতের মুঠ বাম কোমর-পার্শ্বে আসিলে জার্ব্বের ক্রিয়ায় বাম পার্শ্ব দিয়া লাঠির অগ্রবিন্দু ক্রমে উপরে তুলিয়া হাতের মুঠ বাম কর্ণের ঈষৎ উপরে উঠিলে "বাহেরা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া লইয়া পিছন দিক্ দিয়া লাঠি ঘুরাইয়া উপরে তুলিয়া প্রতিপক্ষের "তামেচার" আঘাত আট্‌কাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

৫ম। "বাহেরা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া লইয়া "শির" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া লইয়া "তামেচা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া লইয়া বাম পার্শ্বে লাঠির অগ্রবিন্দু ক্রমে উপরে তুলিয়া প্রতিপক্ষের "বাহেরার" আঘাত আট্‌কাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

৬ষ্ঠ। "শির" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া লইয়া "বাহেরা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া লইয়া "তামেচা" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া লইয়া ক্রমে হাতের মুঠ উপরে তুলিয়া প্রতিপক্ষের "শিরের" আঘাত আট্‌কাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

৭ম। "তামেচা" মারিয়া নিজ লাঠি প্রতিপক্ষের লাঠিতে প্রতিহত হইলে গর্দেশে লাঠি ফিরাইয়া মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া "কোমর" মারিয়া লাঠি প্রতিহত হইলে, হাতের মুঠ চিৎ করিয়া লাঠিকে নিম্নমুখভাবে গর্দেশে ঘুরাইয়া আনিয়া হাতের মুঠ উপরে তুলিয়া "শির" মারিয়া স্থির লক্ষ্যে তরাসে টানিয়া আনিয়া প্রতিপক্ষের "তামেচার" আঘাত আট্‌কাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

কোমর আট্‌কাইবার সময় হাতের মুঠ দক্ষিণ বক্ষপার্শ্বের ঈষৎ নিম্ন বরাবরে প্রায় অর্দ্ধ হস্ত দক্ষিণে ও শরীর হইতে সম্মুখের দিকে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী দূরে থাকিবে; লাঠি ভূমির উপরে লম্ব ভাবে থাকিবে।
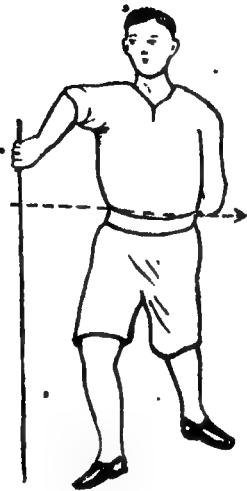
কোমর

তিনের সপ্তম বাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ বাড়ি পর্য্যন্ত সমস্তই প্রধানতঃ গর্দেশে খেলিতে হইবে; স্বাভাবিক গতিতে কোন কোন স্থলে আপনা হইতেই জার্ব্ব কিম্বা তরাসের ক্রিয়া হইয়া পড়িবে; তবে "চির", "হুল", "আনি", "ইয়কৃমা", "হঞ্জুর", প্রভৃতি যে-সমস্ত আঘাতে অসির অগ্রবিন্দু প্রতিপক্ষের শরীরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে হয়, সেগুলির ঠিক পূর্ব্বে যে-কোন বাড়িই থাকুক না কেন, তাহা প্রয়োগ করিয়া সাধারণতঃ সেই টানিয়া আনিতে হইবে।

চা'রের বাড়ি

১। শির, হাতকাটি, তামেচা, কোমর।

২। তামেচা, বাহেরা, চির, শির।

৩। তামেচা, কোমর, চির, শির।

৪। শির, তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার।

৫। তামেচা, পালট, ভাণ্ডার, শির।

৬। গ্রীবাপ, হাতকাটি, কোমর, শির।

হাতকাটি—প্রতিপক্ষের হস্তের কনুই ও কব্জির মাঝামাঝি, তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব বরাবরে ঈষৎ নিম্নমুখে অসি হেলাইয়া বক্রভাবে আঘাত করিয়া, ঐ হস্তাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে।

চির—অসির উল্টাপিঠ দ্বারা প্রতিপক্ষের পায়ুমূল হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিতে হইবে।

ভাণ্ডার—বাম কোমর-পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ঠিক সরলভাবে দক্ষিণ কোমর-পার্শ্ব ভেদ করিয়া যাইবে।
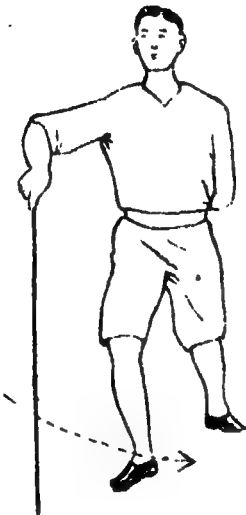
পালট

পালট—দক্ষিণ পদের দক্ষিণ দিকের গিরার মধ্যভাগ হইতে চারি অঙ্গুলী উপর পর্য্যন্ত অংশে আঘাত করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

গ্রীবাণ—বাম স্কন্ধ ও গ্রীবার সন্ধিমূল হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ কোমর পার্শ্ব ভেদ করিয়া যাইবে।

বর্ণনা—সাধারণতঃ সমস্ত আঘাতই গর্দেশে প্রয়োগ করিতে হইবে।

১ম। "কোমর" মারিয়া তরাসে টানিয়া আনিয়া প্রতিপক্ষের "শির" আট্‌কাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। "শির" আট্‌কাইয়া লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখে রাখিয়াই বদ্ধমুষ্টি ঈষৎ খুলিয়া হাতের মুঠ চিৎ করিয়া ঈষৎ নিম্নে নামাইতে নামাইতে হাতের কব্জি ঘুরাইয়া গর্দেশের ক্রিয়ায় লাঠি হাতের নালার সম্মুখে আনিয়া হাতের মুঠ বক্ষ ও গ্রীবার সম্মুখ বরাবরে তুলিয়া হাতকাটি আট্‌কাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইবে, এবং প্রতিপক্ষের আঘাতকে একটু উপরে ঠেলিয়া দিতে হইবে। হাতকাটি আট্‌কাইবার সময় লাঠি কেবল মাত্র মধ্যমা তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারাই ধৃত থাকিবে। পরে গর্দেশের ক্রিয়ায় লাঠির অগ্রবিন্দু উপর দিকে তুলিয়া "তামেচা" আট্‌কাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, পরে যথানিয়মে "কোমর" আট্‌কাইতে হইবে।
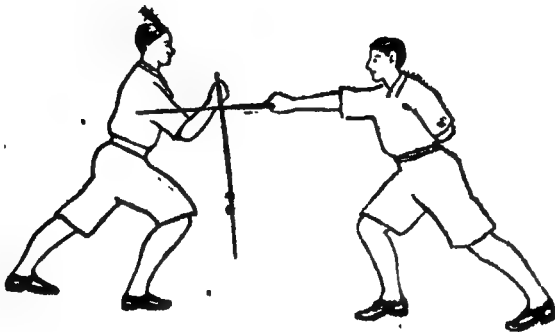
হাতকাটি

২য়, ৩য়। যথানিয়মে "তামেচা" ও "বাহেরা" কিম্বা "কোমরের" আঘাত প্রয়োগ করিয়া তরাসে টানিয়া আনিয়া লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখে রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে পিছনে লাঠি লইয়া, মণিবন্ধ বাঁকাইয়া মুষ্টির কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকের পার্শ্ব ঈষৎ উপরে তুলিয়া হস্ত অগ্রসর করিতে করিতে গর্দেশের ক্রিয়ায় উল্টাপিঠ দিয়া "চিরের" আঘাত প্রয়োগ করিতে হইবে, এবং প্রতিপক্ষের আঘাতে লাঠি প্রতিহত হইলে হাতের মুঠ চিৎ করিয়া লাঠি নিম্নমুখে রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া গর্দেশে ঘুরাইয়া, হাতের মুঠ ও লাঠি উপরে তুলিয়া যথানিয়মে "শিরের" আঘাত প্রয়োগ করিয়া যথানিয়মে প্রতিপক্ষের "তামেচার" আঘাত আট্‌কাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

প্রতিপক্ষের "চিরের" আঘাত প্রতিহত করিবার নিমিত্ত নিজ লাঠি উপর হইতে হাঁকিয়া ক্রমে বক্ষ ও ভূমির সমান্তরালভাবে নীচে নামাইতে নামাইতে প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিম্নের দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।
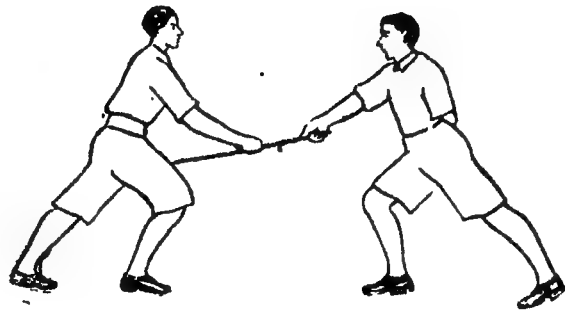
চির

[আট্‌কাইবার লাঠি বাম দিকের ব্যক্তির হস্তের অন্তরালে রহিয়াছে]
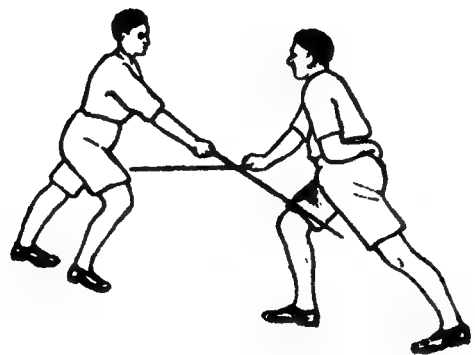
চির—অপর পার্শ্ব হইতে

৪র্থ। ডাণ্ডার আট্‌কাইবার সময় হাতের মুঠ বাম বক্ষ-পার্শ্বের ঈষৎ নিম্ন বরাবরে প্রায় অর্দ্ধহস্ত বামে ও শরীর হইতে সম্মুখের দিকে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী দূরে থাকিবে, লাঠি ভূমির উপর লম্ব ভাবে থাকিবে।
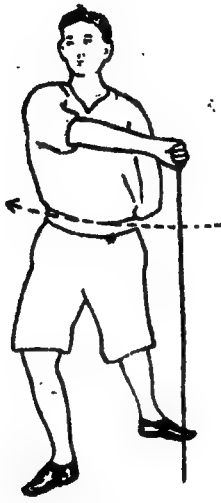
ভাণ্ডার

৫ম। যথানিয়মে "তামেচা" আট্‌কাইয়া বাম পার্শ্বের দিক দিয়া লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ করিয়া গর্‌দেশে চালিত অবস্থায় লাঠি দ্বারা প্রতিপক্ষের "পালটের" আঘাতকে আঘাত করিয়া দক্ষিণ দিকে দূর করিয়া দিয়া নিম্নমুখ ভাবেই লাঠিকে ফিরাইয়া আনিয়া যথানিয়মে "ভাণ্ডার" আট্‌কাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। ভাণ্ডার আট্‌কাইয়া যথানিয়মে "শির" আট্‌কাইতে হইবে।

৬ষ্ঠ। গ্রীবাণ আট্‌কাইয়া যথানিয়মে "হাতকাটির" প্রতিকার করিয়া লাঠি নিম্নমুখভাবেই রাখিয়া মুঠ্‌ ঘুরাইয়া হাতের পিঠের দিক্‌ ক্রমে উপরে সম্মুখে ও বাম দিক্‌ বরাবরে করিয়া যথানিয়মে "কোমর" আট্‌কাইতে হইবে; পরে যথানিয়মে "শির" আট্‌কাইতে হইবে।

"গ্রীবাণ" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠের বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্রহ্মধ্যের প্রায় অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বামস্কন্ধের প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী বাম বরাবরে সম্মুখে থাকিবে। লাঠি বক্ষের সমান্তরাল থাকিবে।

গ্রীবাণ

ক্রমশঃ

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

জার্ম্মাণীতে ভারতীয় ক্ল।*
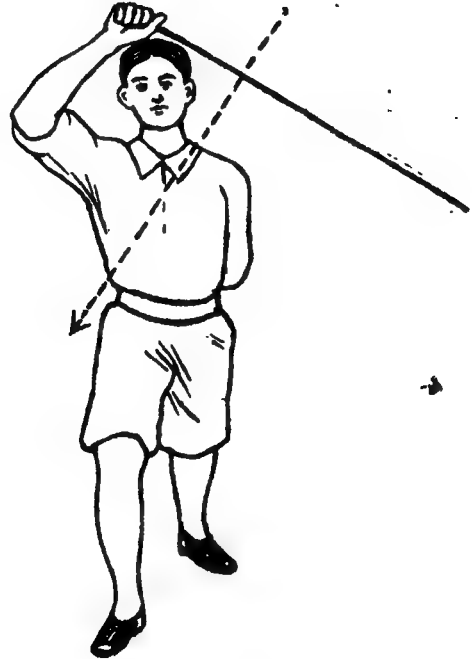
গত দেড় বৎসর যাবৎ বহুসংখ্যক ভারতবাসী জার্ম্মানীতে আসিয়াছেন, তন্মধ্যে ছাত্রসংখ্যাই অধিক। সম্প্রতি জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিন সহরে প্রায় ১৫০ জন ভারতীয় ছাত্র বাস করিতেছেন। তাঁহারা কিছুদিন হইল বার্লিন সহরে একটি ভারতীয় ক্লাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজেদের একটি খেলিবার মাঠ আছে, সেখানে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ও টেনিস খেলা হয়। মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রচারক প্রফেসর খেরী ও বঙ্গদেশের কয়েকটি ছাত্রের উদ্যোগে এই ক্লাবটি গঠিত হয়। সম্প্রতি ভারতীয় ক্লাবটির খেলোয়াড়গণ দ্বিতীয় বিভাগে খেলিতেছেন, তাঁহারা যদি এই বৎসর খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন তাহা হইলে প্রথম বিভাগে খেলা খেলিতে পারিবেন, কারণ এখানে নূতন কোনও ক্লাব গঠিত হইলে প্রথমতঃ তাহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীতেই খেলিতে হয়। কিন্তু ভারতীয় ক্লাব এমন কৃতিত্বের সহিত খেলিতেছে যে প্রথম শ্রেণীর ক্লাবগুলিও তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছে না।

তাহাদিগকে প্রথমতঃ ফুটবল খেলিতে হয়; খেলোয়াড়দের মধ্যে বঙ্গদেশের লোক ৭ জন। বঙ্গদেশে ফুটবল খেলা শুধু-পায়েই হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা এখানেও শুধু-পায়ে খেলিয়া জার্ম্মান দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়াছেন। অধিকাংশ খেলাতেই তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছেন, কিন্তু যে-দিবস অধিক পরিমাণ শীত পড়ে সে-দিবস তাঁহারা হারিয়া যান। প্রথমতঃ বার্লিনের খেলার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে শুধু-পায়ে খেলিতে নিষেধ করেন; কিন্তু পরে তাঁহাদের কৃতিত্ব দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়াই তাঁহাদিগকে শুধু-পায়ে খেলিতে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শীতের দিনে যখন তাঁহাদিগকে বরফের উপরে খেলিতে হইবে, তখন তাঁহাদিগকে বুট পায়ে না দিয়া খেলিলে চলিবে না। ইতিমধ্যে বার্লিনের একটি ভাল ক্লাবের সঙ্গে খেলা হয়; ভারতীয় ক্লাবের খেলা দেখিয়া তাহারা উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত ক্লাব হইতে ভারতীয় ক্লাবকে সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রিত করিয়া একটি মেডেল প্রদান করতঃ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে।

*সম্প্রতি এখানে ক্রিকেট খেলা হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এখানে দুপুর ১টা হইতে বিকাল ৮॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ক্রিকেট খেলা হয়। কারণ এখানে ভোর হয় ৩॥০ টার সময় আর রাত্রি হয় প্রায় ৯॥০ টার সময়। ক্রিকেট খেলাতে ভারতীয় ক্লাব সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এ-পর্য্যন্ত যতগুলি খেলা হইয়াছে, তন্মধ্যে সব খেলাতেই ভারতীয় ক্লাব বিশেষ কৃতিত্বের সহিত জিতিয়াছে। হলাণ্ড হইতে একটি দল এখানে বার্লিনক্লাবের সঙ্গে খেলিতে আসে; প্রথম দুই দিন তাহারা বার্লিনের সঙ্গে খেলিয়াছে এবং তন্মধ্যে দুইজন খেলোয়াড় ভারতীয় ক্লাব হইতে বার্লিন সহরের ক্লাবে খেলিয়াছিলেন। হলাণ্ড টিম্ ভারতীয় ক্লাবের কৃতিত্বের কথা শ্রবণ করিয়া একদিন তাঁহাদের সঙ্গে খেলিয়াছে। কিন্তু হলাণ্ড টিম্ বার্লিনের প্রথম শ্রেণীর ক্লাব হইতে ৫ জন বিশেষ ভাল ভাল খেলোয়াড় ধার করিয়া খেলিয়াছিল। প্রথমে হলাণ্ড ১১১ মার্ক্ করে, পরে ভারতীয় ক্লাব ৫ জন খেলিয়া ১২০ মার্ক্ করে। ইতিমধ্যে সমস্ত বার্লিন সহরের ক্লাবের ভাল ভাল খেলোয়াড় মিলিয়া খেলিবার কথা ছিল; কিন্তু হলাণ্ড ক্লাবের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহারা পশ্চাদ্‌পদ হইয়াছে।

বার্লিন সহরের ভারতীয় ছাত্রদের দেখিয়া প্রথমতঃ জার্ম্মানগণ খোঁজ করিত না, তাহারা কোন্ দেশবাসী। কিন্তু আজকাল এই খেলার দরুন তাহারা সকলের সহিত সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মানীর সকল সংবাদপত্র তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছে ও উৎসাহিত করিয়া লিখিতেছে। কিন্তু টাকার অভাবে তাঁহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিগণ নানাভাবে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাঁহারা যদি প্রবাসী ভারতবাসীদের এই সৎ চেষ্টায় উৎসাহিত করিয়া অর্থ সাহায্য করেন তাহা হইলে হয়ত খেলোয়াড় হিসাবে ভারতবাসীর নাম ইউরোপে সুপ্রচারিত হইতে পারে। এখানে যদি ভারতীয় ক্লাব ভাল ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃতিত্ব দেখাইতে পারে তাহা হইলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের ছাত্রদের এখানকার ফ্যাক্টরী ও কলেজে ভর্ত্তি হইতে বিশেষ সুবিধা হইবে এবং শীঘ্রই হয় ত ইউরোপে খেলাতেও ভারতবাসী একটু স্থান অধিকার করিতে পারিবে। বড়োদার মহারাজা এই উদ্দেশ্যে ২০ পাউণ্ড চাঁদা দিয়াছেন এবং নিজেও বিশেষ উৎসাহিত করিয়া ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার এই সহৃদয়তার গুণে আজ ইউরোপে ভারতীয় ক্লাব একটি স্থান অধিকার করিয়া প্রশংসার্হ হইয়াছে। ভারতবাসী আজ ইউরোপকে দেখাইতেছে যে তাহারা যদি সে-রকম সুযোগ পায় তাহা হইলে তাহারা কাহারও হইতে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না।

বার্লিন। শ্রী শৈলেন্দ্রমোহন বসু ঠাকুর

ইতালী ও গ্রীসের বিবাদ—

পূর্ব্বতন রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের কথা ইতালী কোনও দিন ভুলে নাই। তাই ম্যাট্‌সিনির সাধনায় অষ্ট্রীয়ার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়াই ইতালী আপনার হৃত সাম্রাজ্য ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। রোমক সাম্রাজ্যের পূর্ব্বগৌরবে আপনাকে অধিষ্ঠিত দেখিবার অধীর আকাঙ্ক্ষা ইতালীকে এমনই সাম্রাজ্যলোলুপ করিয়া তুলিয়াছিল যে, বিগত যুগে ইতালী অন্যায় করিয়া অপরের রাজ্য হরণের যতগুলি চেষ্টা করিয়াছে ইউরোপের অন্য কোনও শক্তি অন্তত বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সেরূপ কোনও চেষ্টা করে নাই। ত্রিপোলী ও অ্যাবি-সিনিয়ার যুদ্ধ ইতালীর উৎকট সাম্রাজ্য-পিপাসার নিদর্শন। তুরস্কের দাবীর প্রতি ইতালী যেরূপ তাচ্ছিল্য দেখাইয়া আপনার বাহুবলে অন্যায় করিয়া ত্রিপোলী দখল করিয়াছিল কোনও প্রবল ইউরোপীয় শক্তির মর্য্যাদাকে এপর্য্যন্ত সেরূপভাবে ক্ষুণ্ণ করিতে কেহ সাহস পায় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির স্বার্থরক্ষার অজুহাতে মিত্রশক্তিবর্গ বিগত

বিশ্বযুদ্ধে জার্ম্মানীর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু ত্রিপোলী-যুদ্ধের দরুণ ইংরেজ ও ফরাসীর তরফ হইতে তেমন কোনও প্রতিবাদ হয় নাই। তুরস্কের সহিত ইংরেজ ইতিপূর্ব্বে বরাবরই মিতালী করিয়া আসিতেছিল এবং অন্য শক্তির আক্রমণ হইতে তুরস্ককে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তুরস্ক ইতালী কর্ত্তৃক এরূপ অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ কিছুই বলিল না।

আপনার স্বার্থের প্রতি একান্ত দৃষ্টি থাকাতে ইতালী ত্রিমিত্র-মিলন (Triple Alliance) ছিন্ন করিয়া আপনার পূর্ব্বমিত্র জার্ম্মানীর বিপক্ষে মিত্রশক্তিবর্গের সহিত যুদ্ধে যোগ দিল। যুদ্ধাবসানে আপনার সাম্রাজ্য-ক্ষুধা মিটিবার সুযোগ ঘটিবে আশা করিয়াই ইতালী আপনার পুরাতন বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু টাইরল, ইষ্ট্রিয়া ও ডারিজিয়া প্রদেশ ভিন্ন যখন অন্য কোনও রাজ্য ইতালীর ভাগ্যে জুটিল না, তখন ইতালী মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল। জার্ম্মান শক্তিকে খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে যখন মিত্রশক্তিবর্গ পশ্চিম প্রান্তিক এসিয়া ও জার্ম্মান-অধ্যুষিত রাজ্যসমূহের মধ্যে একটি ব্যবধান রচনা করিবার চেষ্টায় রাজনৈতিক সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অন্যায়ভাবে সীমা-রেখা-সকল নির্দ্দেশ করিতে লাগিল, তখন পূর্ব্ব শত্রু অষ্ট্রিয়াকে জব্দ করিবার উল্লাসে ফলাফল বিচার না করিয়া ইতালী উৎসাহের ঝোঁকে যে-সব মীমাংসায় রাজী হইয়াছিল, পরে যখন সেইসব মীমাংসা নিজের রাষ্ট্রীয় উন্নতির কতখানি অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে বুঝিতে পারিল, তখন মিত্রশক্তিবর্গের প্রতি অনুরাগ রাখা ইতালীর পক্ষে সম্ভব হইল না। গুপ্ত সন্ধি ও গোপন ষড়যন্ত্র বন্ধ করিবার জন্যই মিত্রশক্তিবর্গ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ইহা মিত্রশক্তিবর্গ বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন এবং সোজাসুজি ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করাই মিত্রশক্তিবর্গের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম হইতেই আপনার স্বার্থটিকে পুরাপুরী বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রথম হইতেই গোপন সন্ধি ও রাজনৈতিক চালবাজি মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে বেশ চলিয়া আসিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরে ইংরেজের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। যুদ্ধাবসানে অষ্ট্রিয়ার নিকট হইতে ইতালী আপনার হৃতরাজ্যগুলি উদ্ধার করিয়া লইলে আড্রিয়াটিক উপকূলে ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতে পারে বুঝিতে পারিয়া ইতালীর বিপক্ষ শক্তিকে প্রবল করিয়া ইতালীর বিরুদ্ধে নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করিতে ইংরেজ চেষ্টা পাইতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে ইংরেজ ইতালীর শত্রু গ্রীসকে প্রবল করিয়া তুলিয়া ভূমধ্যসাগরে ইতালীর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। যুগোস্লাভিয়া রাজ্যও তলায় তলায় মিত্র-শক্তিবর্গের প্ররোচনা লাভ করিয়া ড্যালমেসিয়া প্রদেশ লইয়া ইতালীর সহিত বিবাদ বাধাইয়া দিল।

ইতালীর রাষ্ট্রনীতিবেত্তা পণ্ডিতগণ মিত্রশক্তিবর্গের চালবাজী বুঝিতে পারিয়া যুগোস্লাভিয়ার সহিত একটা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিল। এই নিষ্পত্তি র‍্যাপেলো সন্ধিসর্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এইরূপ বিপরীত স্বার্থধারার আবর্ত্তে তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসকে উত্তেজিত করিতে ইংরেজকে বাধ্য করে। ইতালীও আপন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তুরস্ককে গ্রীসের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে লাগিল। লোজান সন্ধিসূত্রে যখন তুরস্কের দাবীই মূলত বজায় রহিল তখন প্রকৃত পক্ষে ইতালীর চালবাজী জয়লাভ করিল। ভাগ্য প্রসন্ন হওয়াতে ইতালীর সাহসও অসীম বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঘটনা-চক্রে ইতালীর সুযোগও হঠাৎ মিলিয়া গেল। অ্যালবেনিয়া প্রদেশের গ্রীক-অধিকারভুক্ত কাকাডিয়া সহরে ইতালী-সরকার কর্ত্তৃক অ্যাল-বেনিয়াতে প্রেরিত পাঁচজন প্রতিনিধি গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছেন। এই হত্যার দায়িত্ব গ্রীক-সরকারের প্রতি আরোপ করিয়া ইতালীর প্রধানমন্ত্রী মুসোলিনি গ্রীক-সরকারকে একটি চরমপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ইতালী সরকার জানাইয়াছেন যে গ্রীক-সরকারকে অবিলম্বে নিম্নলিখিতরূপে হীনতা স্বীকার করিয়া অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে হইবে।

(১) চার কোটি ইতালীয় মুদ্রা খেসারৎ দিতে হইবে।

(২) গ্রীক প্রধান-সেনাপতি দায়িত্ব স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন।

(৩) এথেন্স সহরে এক সরকারী শ্রাদ্ধ-বাসরে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ সমবেত হইয়া হত ব্যক্তিগণের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনায় যোগ দিবেন।

(৪) গ্রীসের পিরিয়াস বন্দরে ইতালীর পতাকার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য সমগ্র গ্রীক নৌবহর সমবেত হইবে।

ইতালীর এই-সকল দাবী রক্ষা করা স্বাধীন জাতির মর্য্যাদার পক্ষে অত্যন্ত গ্লানিকর মনে করিয়া গ্রীক-সরকার আপত্তি জানাইয়াছেন।

গ্রীক-সরকার বলেন যে মৃত ব্যক্তিবর্গের পরিবারের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ ন্যায্য টাকা দিতে গ্রীক-সরকার প্রস্তুত আছেন এবং এই ঘটনাটি গ্রীক-সরকারের অজ্ঞাতে ঘটিয়া যাওয়া সত্ত্বেও ইহার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতে তাঁহারা স্বীকৃত। এমন কি রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া ইতালীর যে সকল সর্ত্ত পালন করা সম্ভব, গ্রীস তাহা পালন করিতে সম্মতি প্রকাশ করেন।

ইতালীর চরমপত্রের সর্ত্ত পালন না হওয়াতে ইতালী গ্রীস-অধিকার-ভুক্ত কর্ফু দ্বীপে অবতরণ করিয়া উহা দখল করিয়া বসিয়াছে ও নৌবহরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়াছে। অষ্ট্রিয়ার অনুরূপ ব্যবহারের জন্য ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া উঠে। সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধের জন্য অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়াকে আক্রমণ করাতেই মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। আজ কিন্তু ইতালীর এই ব্যবহারে মিত্রশক্তিবর্গ কোনও বিশেষ ভয় দেখাইতে সাহস পায় নাই। ঝগড়াটি মিটাইয়া দিবার জন্য জাতিসমূহের সংঘের নিকট উপস্থিত হইতে ইতালীকে ইংরেজ অনুরোধ করে। ইতালী সে-অনুরোধ গ্রাহ্য করে নাই। কারণ জাতিসমূহের সংঘের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ইতালীর ধারণা মুসোলিনি অনেকদিন পূর্ব্বেই এক বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ফ্লরেন্স সহরে প্রথম ফ্যাসিস্তি বৈঠকে মুসোলিনি বলেন, Fascism does not believe in the vitality or principles of the so-called League of Nations. On this league, the nations are not really on a footing of equality; it is a kind of Holy Alliance between the plutocratic nations of the Anglo Saxon Group to guarantee for themselves the exploitation of the greater part of the world.

কাজে-কাজেই লিগের বিচার স্বীকার করিতে ইতালীর প্রস্তুত না হইবারই কথা। এই ব্যাপার লইয়া একটা মহাযুদ্ধ বাধিয়া উঠাও কিছু বিচিত্র নহে। তবে ইউরোপের রণক্লান্তি এখনও দূর হয় নাই এই যা ভরসা।

জাপানের খণ্ডপ্রলয়—

প্রকৃতির মৃত্যুবাণটিকে কাড়িয়া লইয়া জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য মানুষ তাহার জন্মকাল হইতে চেষ্টা পাইয়া আসিয়াছে। মানুষ পাঞ্চভৌতিক শক্তিকে যে কতকপরিমাণে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আপনার কাজে লাগাইয়াছে, মৃত্যুর উপায়কে অমৃতের সোপান করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রকৃতি এখনও অপরাজেয়।

জীবনমৃত্যুর রহস্য ভেদ করা মানুষের সাধ্যাতীত। যুগে যুগে অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ও মহামারী মৃত্যুর দূতরূপে দেখা দিয়া মানুষকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ খণ্ড-প্রলয়ের তাণ্ডবলীলার পরিচয় অনেক বারই পাওয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির এই প্রলয়লীলার কাছে মানুষের শক্তি স্তব্ধ, জ্ঞানবুদ্ধি পরাজিত ও বিজ্ঞান প্রতিহত হইয়া বারবার হার মানিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইরূপে বার বার পরাজিত হইয়াও মানুষ আপনার দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া রুদ্রের নিকট মস্তক অবনত করে নাই। বরং বার বার যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়া রুদ্রকেই আবাহন করিয়া সমাজের শান্তি নষ্ট ও আপনার শক্তি ক্ষয় করিয়াছে। সম্প্রতি জাপানে যেরূপ বিরাট্ প্রাকৃতিক বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে তাহা হইতে মানুষ কত অসহায় তাহা বুঝা যায়।

বহুদিন এরূপ বিরাট্ ধ্বংসের কাহিনী শুনা যায় নাই। একসঙ্গে ভূমিকম্প, ঘটিকাবর্ত্ত, জলপ্লাবন ও অগ্নিকাণ্ড দেখা দেওয়াতে জাপানের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। জাপানের রাজধানী তোকিও ও ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্র ইয়োকোহামা নগরী বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। প্রকৃতির এই সংহার-লীলায় ঠিক কত লোক মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইয়াছে তাহা আজও ঠিক জানা যায় নাই। তবে অনুমান যে অন্যূন পাঁচলক্ষ লোক ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে। কত গৃহহারা লোক পথের ভিখারী হইয়াছে এবং কতশত লোক খাদ্যাভাবে মৃত্যুর ছায়াতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা কল্পনা করাও সম্ভব নহে। ভূমিকম্পে যখন প্রায় সমস্ত গৃহ পড়িয়া যায় সেই সময় সমুদ্রতরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হইয়া সহরে প্রবেশ করাতে সহরের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। এমন সময় অস্ত্রাগার বিদীর্ণ হইয়া যাওয়াতে অগ্নি আপনার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া সংহার-লীলায় ভূমিকম্প ও জলপ্লাবনের সহায় হইয়া দাঁড়ায়। কত রকমে যে লোকক্ষয় হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আশ্রয়হীন লোক খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য লুট-তরাজ আরম্ভ করিয়াছে। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের সর্ব্বত্রই সামরিক আইন জারি করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। জাপানের সরকারী ও বে-সরকারী বহু সেবাপ্রতিষ্ঠান লোকসেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কামাকুরা, ইয়াকোস্‌হকো ও হাকোন সহরের চিহ্নমাত্র নাই। দুই জন মন্ত্রীর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। প্রিন্স মাৎসুকাতা ও ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ভাইকাউণ্ট তাকাহাসি নিহত হইয়াছেন। টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ, রাজপথ ও রেলপথ ভাঙ্গিয়া যে বিরাট্ ভগ্নস্তূপের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয় কোন পুরাকালের পরিত্যক্ত ভগ্নগরী আজ হঠাৎ প্রেতপুরীর ন্যায় লোকলোচনে আবির্ভূত হইয়াছে। জাপানের এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ দুস্থ নরনারীর দুঃখে আজ বিশ্বের হৃদয় সমবেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। বিপন্ন নরনারীর সাহায্যের জন্য চারিদিক্ হইতে লোক ছুটিয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট কুলিজ আমেরিকার সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিয়া মার্কিন-বাসীকে জাপানের বিপদে অর্থসাহায্য করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এসিয়াতে যে-সব মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ছিল তাহা উদ্ধারকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য জাপানের নৌবিভাগের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে এবং অনেক জাহাজ-বোঝাই ঔষধ পথ্য প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে। লণ্ডনের লর্ড মেয়রও সাহায্য-তহবিল খুলিয়াছেন। লর্ড রেডিং ভারত-সরকারের পক্ষ হইতেও একটি সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। যে-সকল বিদেশী এই ব্যাপারে বিপন্ন হইয়াছেন তাঁহাদের জন্য তাঁহাদের দেশবাসীগণ আপন আপন কর্ত্তব্য সাধনে প্রয়াস পাইতেছেন। জাপানে বহু ভারতীয় শিক্ষার্থী ও বণিকের বাস ছিল। ইঁহাদের সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোনও ব্যবস্থা হয় নাই; এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া এখনই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নতুবা বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীকে অত্যন্ত হেয় হইতে হইবে।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

—

ভারতবর্ষ

হিন্দু মহাসভা—

এবার বারাণসীতে হিন্দুমহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় সভাপতির আসন অধিকার করিয়াছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে:—

(১) সভা পরলোকগত রামভজ দত্ত চৌধুরীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছেন।

(২) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর ঐক্য স্থাপিত না হইলে স্বরাজ লাভ সম্ভবপর হইবে না। হিন্দুসমাজের এই ঐক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আত্মরক্ষার উপায় অন্বেষণ করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক প্রদেশেই হিন্দু-মহাসভার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

(৪) প্রত্যেক সহরে সামাজিক হিতসাধনের কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিতে হইবে। এই দল হিন্দুদের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিবে, আবশ্যক হইলে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবে, এবং যেখানে সম্ভব হইবে সেখানে অন্যান্য সমাজের সহিত মিশিয়া শান্তি সংস্থাপনে রত থাকিবে।

(৫) হিন্দু মহাসভা নাভার মহারাজের সিংহাসনচ্যুতি সমর্থন করেন না। নরেন্দ্র মণ্ডলের দরবারে তাঁহার আবার বিচার হওয়া সঙ্গত। এই নরেন্দ্র মণ্ডলের বিচার ছাড়া কোনো সামন্ত রাজাকেই অতঃপর পদচ্যুত করিতে পারা যাইবে না এরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত।

(৬) হিন্দুজাতির উন্নতির জন্য বালক-বালিকার কৌমার্য্য, ব্যায়াম এবং অধ্যয়ন একান্ত ভাবেই অপরিহার্য্য।

(৭) ভারতের ভিতরে এবং বাহিরে যে-সমস্ত হিন্দু বাস করে তাহাদের ভিতর ঐক্যবিধানের জন্য হিন্দিভাষাকে সাধারণ ভাষা রূপে গ্রহণ করা আবশ্যক।

(৮) ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য স্বদেশজাত বস্ত্র—বিশেষ করিয়া চর্‌কার সূতার বোনা তাঁতের কাপড়—ব্যবহার করিতে হইবে।

(৯) দেশের গরু যাহাতে কসাইদের হাতে না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রস্তাবটির মীমাংসা না হওয়ায় বিচার-ভার একটি কমিটির হাতে প্রদান করা হইয়াছে।

(১০) আজমীরে যে-সব মুসলমান হিন্দুদের মন্দির অপবিত্র করিয়াছে, দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া হিন্দুদিগকে মারধর করিয়াছে, তাহাদের কাজ অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে।

(১১) পানিপথের হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কেই অনুরোধ করা হইয়াছে—তাহারা যেন পরস্পরের ধর্ম্মমন্দির এবং উপাসনার সময়ের প্রতি অশ্রদ্ধা বা উপেক্ষা প্রদর্শন না করেন।

(১২) যে-সব মাল্‌কানা রাজপুত হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছুক এবং হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম ও আচার-পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ তাহাদিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা সঙ্গত।

(১৩) হিন্দুনেতা ও পণ্ডিতগণের সমবায়ে একটি সমিতি গঠন করিতে হইবে। অহিন্দুগণ যদি হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে চায় তবে তাহাদের জন্য দ্বার খোলা রাখাই এই সমিতির বিশেষ কার্য্য হইবে।

মিঃ বড়ুয়ার দান—

মিঃ এস পি বড়ুয়া এম্ এল্ সি জোড়হাটে ডিস্পেন্সারী ও দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের জন্ত ২০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই-সব ডিস্পেন্সারীর নাম দাতার পিতা রায় বিষ্ণুরাম বড়ুয়া বাহাদুরের নাম অনুসারে হইবে। আসাম-গবর্মেণ্ট মিঃ বড়ুয়াকে সাহায্য করিবার জন্ত সরকারী ইঞ্জিনিয়ারকে আদেশ দিয়াছেন। গত বৎসর ব্যবহারিক শিক্ষার জন্ত মিঃ বড়ুয়া তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

মিঃ কামাতের প্রস্তাব—

সম্প্রতি কেনিয়া ডেপুটেশনের সদস্য মিঃ কামাত পুনা সহরে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। সভায় ডাঃ পরাঞ্জপ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মিঃ কামাত বলিয়াছেন—কেনিয়া-সিদ্ধান্তের প্রতিবাদকল্পে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা করা দর্‌কা্র। তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা-গুলি অবলম্বন করা সঙ্গত মনে করেন :—

(১) ভারতীয় সামরিক ও অসামরিক কাজে কোনো ঔপনিবেশিককে নিযুক্ত না করা।

(২) উপনিবেশসমূহে ভারতীয় শ্রমজীবী প্রেরণ না করা।

(৩) সাম্রাজ্যের সমস্ত কাজ হইতে হাত গুটান।

(৪) উপনিবেশ হইতে আম্‌দানী মালের উপর বেশী শুল্ক বসান।

ডাক্তারের কাজ—

লাহোরের একটি সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি মণ্টগোমারী জেলের জেল-ডাক্তার উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, যে-সকল কয়েদীর প্রতি দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছিল তাহাদের শরীরে ইন্‌জেক্‌শন করিয়া যক্ষ্মা রোগের জীবাণু প্রবেশ করাইয়া দেন এবং এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, তাহারা যক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদিগকে আন্দামানে প্রেরণ না করিয়া সাহপুরের যক্ষ্মারোগাক্রান্ত কয়েদীদের জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হোক। ব্যাপারটা কর্ত্তৃপক্ষের কানে ওঠায় তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। মণ্টগোমারীর জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ডাক্তারটির প্রতি ৫ বৎসরের কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি এই আদেশের বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন।

গোহত্যার প্রতিকার—

সম্প্রতি নিখিল ভারত গো-রক্ষা সমিতির প্রতিনিধিগণ ভারত-গবর্মেণ্টের রাজস্ব ও কৃষি-সচিব স্যার নরসিংহ শর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন—"ভারতসর্‌কার অল্পবয়স্ক দুগ্ধবতী গাভী হত্যা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেক সহরের বাহিরে যাহাতে গোশালা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্তও তিনি চেষ্টা করিবেন।"

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটিতে সম্প্রতি এই মর্ম্মেই একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের তরফ হইতে ইহার প্রতিবাদও পেশ করা হইয়াছে। হিন্দুমুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক সংস্কার এই সমস্যাটার সমাধান যে জটিল করিয়া তুলিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সত্যাগ্রহের বন্দী—

মধ্যপ্রদেশের গবর্মেণ্ট নাগপুরে সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম-সম্পর্কে কারাদণ্ড-প্রাপ্ত সমস্ত বন্দীকে বিনাসর্ত্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কেবল মাত্র যে-সব বন্দী জেলখানার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া শাস্তি পাইয়াছেন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। নাগপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে ৩৪৮ জন বন্দীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাঁদের ভিতর শেঠ যমুনালাল বাজাজ, শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ রাও দেশমুখ, শ্রীযুক্ত নারায়ণ রাও, ডাক্তার, এবং চণ্ডুলাল দেশাই আছেন। অন্যান্য জেলের কয়েদীদিগকেও ছাড়িয়া দিবার জন্ত টেলিগ্রামে আদেশ প্রেরিত হইয়াছে।
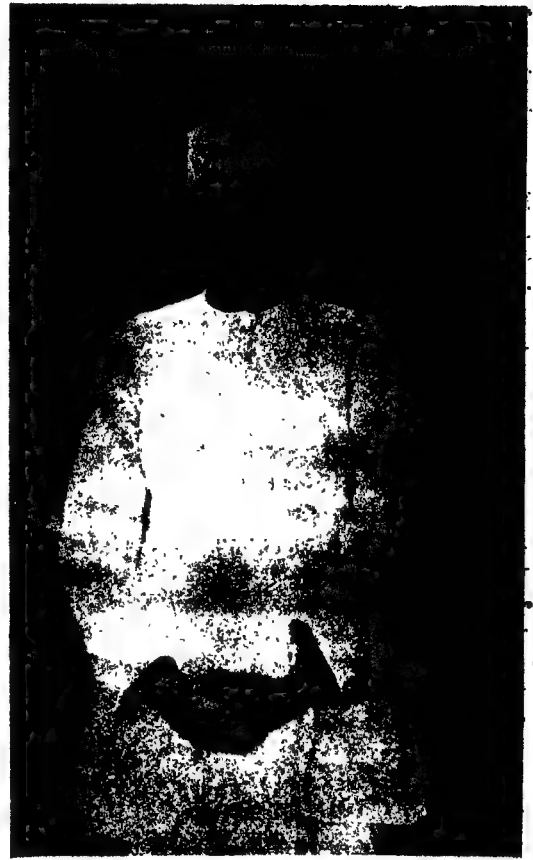
শেঠ যমুনালাল বজাজ

(ইনি নাগপুরের জাতীয় পতাকা সংগ্রামের নেতা ছিলেন)

মহরমে দাঙ্গা—

মহরম উপলক্ষ্যে সাহারানপুরে হিন্দু-মুসলমানে একটি ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। কোনো হিন্দু-মন্দির-সংলগ্ন পিপুল-গাছে তাজিয়া বাধিয়া যাওয়ার আশঙ্কা করিয়া মুসলমানেরা গাছটির কয়েকখানি ডাল কাটিয়া ফেলিতে চায়, হিন্দুরা তাহাতে বাধা দেয়। এই ব্যাপার লইয়া দাঙ্গার উদ্ভব। ব্যাপারটি কিরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল বারাণসীর 'আজ' পত্রিকার সংবাদদাতা শ্রীযুক্ত সের সিংহ কাঙ্গপের বর্ণনা হইতে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল :—

"আমি মজঃফরনগরের কতিপয় ভদ্রলোকের উপদেশে ২৬শে আগষ্ট সাহারানপুরে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা কখনো দেখি নাই, যাহা

শুনিলাম তাহাও জীবনে কখনো শুনি নাই। সাহারানপুরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমি এমন একখানি দোকান দেখি নাই যাহা মুসলমানের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছে। মদের দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্ণালঙ্কারের দোকান পর্য্যন্ত সমস্ত-প্রকার দোকানই মুসলমানেরা লুট করিয়াছে, স্থানে স্থানে হিন্দুদের আলমারী ও লোহার সিন্দুক ভাঙা অবস্থায় পড়িয়া আছে। হিন্দুদের গৃহে এক-খানা বাসন বা আহারের একটি দানাও নাই। প্রায় প্রতিগৃহেরই এইরূপ অবস্থা। হিন্দুদের পুঁথি পুস্তক দলিলাদি মুসলমানেরা জ্বালাইয়া দিয়াছে। সহস্রাধিক হিন্দু আহত হইয়া ঘরে পড়িয়া আছে, তাহাদের তদারক করিবার লোক নাই। কত জন হিন্দু নিহত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণীত হয় নাই। কেননা লাসগুলি মুসল-মানেরা লইয়া গিয়াছে। অনেক লোকের খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। অগ্নিকুণ্ডের ভিতর হইতে দুইটি এবং কূপের ভিতর হইতে চারিটি হিন্দু-শিশুর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।"

মহরমে দাঙ্গা আরো অনেক যায়গায় হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ হইতে প্রায় ৪০ ক্রোশ দূরে গোণ্ডা নামে একটি ছোট সহর আছে। স্থানটির লোকসংখ্যা ১৫ হাজার। শতকরা ৭০ জন হিন্দু। এই স্থানটিতেও মহরমের সময় একটা বড় রকমের দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গার ফলে বিস্তর লোক জখম হইয়াছে। প্রায় দুই শত মুসলমান একটি হিন্দুর মন্দিরে ঢুকিয়া মন্দিরটা ভাঙিয়া তচনচ করিয়া দিয়াছে। হিন্দুরাও মুসলমানদের দুইটি তাজিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। পুলিস এখানেও গুলি চালাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

আগ্রা হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, মহরমে আগ্রা সহরেও হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এই দাঙ্গার ফলে কয়েক দিন ধরিয়া হাট বাজার দোকান পসার সব বন্ধ ছিল। পোষ্টাফিসের পিয়নেরাও চিঠি পত্র বিলি করিতে পারে নাই। কর্ত্তৃপক্ষকে এরূপ আদেশ জারী করিতে হইয়াছিল যে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর কেহ গৃহের বাহির হইতে পারিবে না। এখানেও প্রথমে পুলিসের গুলি চলে, তাহার পরে গোরা সৈন্যদের হাতে সহরের শান্তি রক্ষার ভার ছাড়িয়া দিতে হয়।

ছোটখাট দাঙ্গা হিন্দুমুসলমানে আরো অনেকগুলি এই মহরম উপলক্ষ্যে হইয়া গিয়াছে। এত আন্দোলন-আলোচনার পর হিন্দু-মুসলমানের মনোভাব যে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবারকার মুহরমের পর তাহা বুঝিতে আর কিছু মাত্র বেগ পাইতে হয় না।

বিহারে বন্যা—

বিহার এবার বন্যার তোড়ে ভাসিয়া গিয়াছে। একসঙ্গে গঙ্গা, শোণ ও সরযূ এই তিন নদীতেই বান ডাকে। ফলে শাহাবাদ, পাটনা, গয়া, সারণ, আরা এবং মুঙ্গের জেলার বহু স্থান জলের তলে ডুবিয়া গিয়াছিল। বহু লোক গৃহহীন হইয়াছে। অধিকাংশ লোকেই ঘরে যে-সব খাদ্যদ্রব্য ও শস্য ছিল তাহা রক্ষা করিতে পারে নাই। সুতরাং স্থানীয় জনসাধারণ যে দুর্দ্দশার একেবারে শেষ সীমাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। বন্যায় মারা গিয়াছে এরূপ লোক এবং গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে।

এই-সব স্থানে সাহায্যের প্রয়োজন খুব বেশী। প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি, রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, আর্য্য-সমাজ প্রমুখ সেবা-প্রতিষ্ঠান বন্যা-পীড়িত লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বিহারের নানা কেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে মুক্ত হস্তে অর্থের দ্বারা সাহায্য করা দরকার। প্রতিদিন এই-সব বন্যাপীড়িত অঞ্চল হইতে দুঃখ-দুর্দ্দশা অনশনের করুণ কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। সে-সব সংবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহাদের অর্থের প্রয়োজন যে কত বেশী তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। অর্থ সাহায্যে সাময়িক প্রতিকার হইবে। দেশের এইসব দৈব উপদ্রব স্থায়ীভাবে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করা গভর্ণমেণ্টের ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেশে এরূপ দৈব উপদ্রবের স্থায়ী প্রতিকার হইতেছে।

মহম্মদ আলীর মুক্তি—

গত ২৯ শে জুলাই ঝাঁসী জেল হইতে মহম্মদ আলী মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কন্যার অসুখের সংবাদ পাইয়া তিনি ঝাঁসী হইতে সোজা ভাওয়ালীতে চলিয়া গিয়াছেন। মৌলানা সাহেবকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য জেলের ফটকে বিপুল আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু
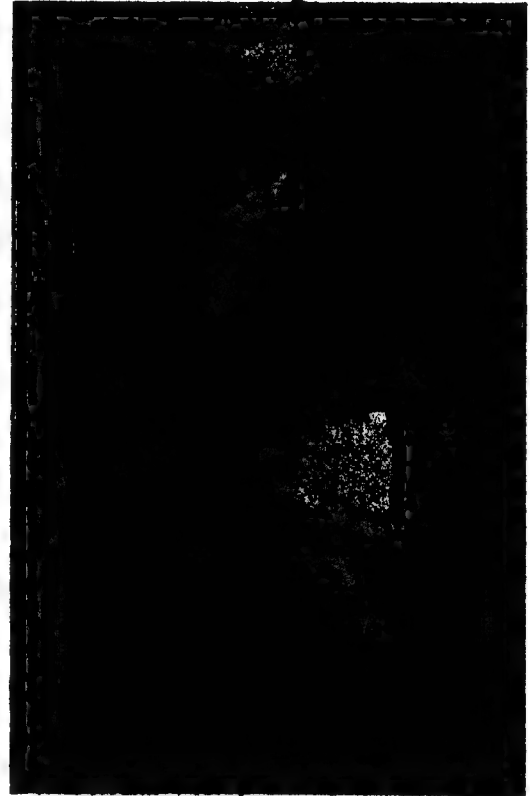
মৌলানা মহম্মদ আলী
(ইনি সম্প্রতি ঝাঁসী জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন)

ব্যাণ্ডের বাজনা বাজিয়া উঠিতেই তিনি তাহা থামাইয়া দিতে আদেশ দিয়া বলেন "মহাত্মা গান্ধী এখনো কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছেন। এ-অবস্থায় আমার অভ্যর্থনায় আনন্দ প্রকাশের জন্য এরূপ আয়োজন আমি পছন্দ করি না।"

ডাক্তার নাইডুর প্রায়োপবেশন—

মান্দ্রাজের দেশভক্ত ডাক্তার বরদারাজলু নাইডু মাদুরা জেলে প্রায়োপবেশন করিয়াছেন। জেলে তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার হয়, ইহাই নাকি তাঁহার প্রায়োপবেশনের কারণ। শ্রীমতী বরদারাজলু নাইডু

সংবাদ পাইয়াই জেলের ইনস্পেক্টর জেনারেলকে তার করিয়া জানাইয়াছেন, তাঁহার স্বামী সাধারণতঃ সবল ও সুস্থ নহেন। তাহার উপর এরূপ হইলে তাঁহার পক্ষে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। তিনি স্বামীর সম্পর্কে কোনোরূপ অনুগ্রহ চান না। কিন্তু অনর্থক অত্যাচারও তিনি সহ্য করিবেন না।

চিঠিখানির ভিতর দিয়া শ্রীমতী নাইডুর স্বামীর প্রতি মমতা এবং তেজস্বিতা এই দুইটি জিনিষই চমৎকাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মদ বন্ধের ব্যবস্থা—

মাদ্রাজ গবমের্ণ্ট পরীক্ষা-স্বরূপ তাঞ্জোর, রামনাদ, তিনেভেলি ও সালেম জেলার কয়েকটি তালুকে আগামী ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাস হইতে তিন বৎসরের জন্ম সমুদয় দেশী মদের দোকান তুলিয়া দিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার ফলে গবমের্ণ্টের আয় বাৎসরিক প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা কমিয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত চোলাই ফি বাবদ গবমের্ণ্টের যে আয় হইত তাহাও বন্ধ হইবে। মোট ৬৭টি 'আরকের' দোকান বন্ধ হইবে। এই ব্যবস্থার ফল কিরূপ হয় তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্ম নির্দ্দিষ্ট এলাকার বাহিরে পাঁচ মাইলের ভিতর কোনো 'আরকের' দোকানও খুলিতে দেওয়া হইবে না। 'আরকের' দোকান তুলিয়া দেওয়ার ফলে তাড়ি ও বিলাতী মদের কাট্‌তি কিরূপ হয় তাহাও লক্ষ্য করা হইবে।

আজান বন্ধে কয়েদীদের অনশন—

নবজীবন পত্রে প্রকাশ বোম্বাই সবরমতী জেলের কর্ত্তৃপক্ষ প্রথম প্রথম মুসলমান কয়েদীদের আজান আবৃত্তিতে কোনো আপত্তি করিতেন না, কিন্তু পরে তাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন আজান অমুচ্চস্বরে পঠিত হইবে। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ-মতই কার্য্য হইতে থাকে। ইহাতেও খুসী না হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ আজান পাঠ একেবারে বন্ধ করিবারই হুকুম জারী করেন। মুসলমান কয়েদীগণ এই ব্যাপারে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। মৌলানা আমেদ হোসেন নামক একজন রাজনৈতিক কয়েদী জেল-কর্ত্তৃপক্ষকে আদেশের অবৈধতা এবং গুরুত্ব বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। তখন তাঁহারা এ-ব্যবস্থার প্রতিবাদ-স্বরূপ অনশন ও ধর্ম্মঘট সুরু করেন। মুসলমানদের সহিত এই ব্যাপারে হিন্দু কয়েদীরাও যোগদান করিয়াছিলেন। ফলে কর্ত্তৃপক্ষ আজান পাঠ বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন।

বিড়্‌লার দান—

শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর বিড়্‌লা বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্ম ১৫ টাকা হিসাবে ১০০ টি মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ২৫টি ব্রাহ্মণ এবং ২৫টি অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রদের জন্ম নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, দুইটি শিখ ও দুইটি জৈন ছাত্রের জন্ম থাকিবে। অবশিষ্ট কয়টি সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা পাইবে।

সনাতন হিন্দুসভা—

হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের পূর্ব্বে বারাণসীতে সনাতন হিন্দু সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ঘোর আপত্তির জন্ম সভায় অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে দেওয়া হয় নাই, বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যেও পরস্পরের সহিত আহারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া বালিকাদের বিবাহের বয়স ৮ হইতে পুষ্পিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং পুরুষদের বিবাহের বয়স ১৮ হইতে ৪০ বৎসরের ভিতর ধার্য্য করিয়া আর-একটি প্রস্তাবও পাশ হইয়াছে।

সনাতন হিন্দুসভা যে সনাতনের বেজায় গোঁড়া সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার আর কিছুমাত্র অবকাশ রাখেন নাই।

যমুনাদাস দ্বারকাদাসের ও দেবকীপ্রসাদ সিংহের পদত্যাগ—

মিঃ যমুনাদাস দ্বারকাদাস কেনিয়া-ডেপুটেশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। কেনিয়া-সিদ্ধান্তের প্রতিবাদকল্পে তিনি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীর কেন্দ্রীয় পরামর্শ-কমিটি ও স্থানীয় কমিটির সদস্যের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বোম্বাইএর কোনো সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, ভারতীয় প্রতিনিধিদলের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষী জেনারেল স্মাট্‌সের নীতিই মানিয়া লইয়াছেন। একমাত্র প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থার দ্বারাই উহার প্রতিকার সম্ভব।

লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্ব্লীর বিহারের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত দেবকীপ্রসাদ সিংহও কিছুদিন পূর্ব্বে এই কারণেই সাম্রাজ্যপ্রদর্শনী-সমিতির সদস্যের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মৌলানা হসরৎ মোহানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ—

যারবেদা জেলের বাহিরে গোপনে একখানি চিঠি পাঠানো ও সংবাদপত্র আমদানী করিতে চেষ্টা করার অভিযোগে মৌলানা হসরৎ মোহানী ও একজন জেল-ওয়ার্ডার অভিযুক্ত হইয়াছেন। পুনার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজ্‌লাসে উক্ত মামলার একদফা শুনানি হইয়া গিয়াছে। মৌলনা হসরৎ মোহানী জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মিঃ জোন্‌স্‌কে জেরা করেন। তিনি এই মামলা পরিচালনা করিতে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত সময় গ্রহণ করিয়াছেন। জেলে যে কিরূপ ব্যভিচার ঘুষ প্রভৃতি চলে তিনি নাকি তাহাই প্রমাণ করিবেন। মামলাটি স্থানান্তরিত করিবারও চেষ্টা চলিতেছে।

স্যাণ্ডহার্ষ্ট্ কলেজে প্রবেশার্থী—

স্যাণ্ডহার্ষ্ট্ কলেজে এবার ৫জন ভারতীয় ছাত্রকে গ্রহণ করা হইবে। দেরাদুনের প্রিন্স্ অফ ওয়েল্‌স্ রয়াল ইণ্ডিয়ান মিলিটারী কলেজ হইতে ৪জন এবং অন্যান্য স্থান হইতে ২১ জন—মোটের উপর এই ২৫ জন ছাত্র উক্ত কলেজে প্রবেশার্থী হইয়া আবেদন করিয়াছেন।

শিক্ষানবিশের পরীক্ষা—

সিম্‌লার সরকারী সংবাদে প্রকাশ, আগামী ১৯২৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর এলাহাবাদ সহরে ভারতীয় অডিট ও একাউণ্টেণ্ট্ বিভাগে শিক্ষা-নবিশ লইবার জন্ম পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে। কাষ্টম্‌স্ বিভাগের একজন শিক্ষানবিশ লইবার পরীক্ষাও ঐ-সঙ্গেই গৃহীত হইবে।

সালেম মিউনিশিপ্যালিটির প্রস্তাব—

সালেম মিউনিসিপ্যালিটিতে গত ২৭শে আগষ্ট্ হরতাল রক্ষা করিবার জন্ম এবং এম্পায়ার ডে উপলক্ষে মিউনিসিপ্যালিটির ছুটি বন্ধ করিয়া দিবার জন্ম এক প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল। সেই প্রস্তাবের ভিতর কেনিয়া-সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ-স্বরূপ সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীতে জনসাধারণ যোগদান না করে তাহারও প্রস্তাব ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির সভায় প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে।

নিজামের দান—

নিজাম বাহাদুর মোপ্‌লা-সাহায্য-ভাণ্ডারে ৫০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকা মোপ্‌লা অনাথ বালক বালিকা ও বিধবাদের জন্ম অনাথ-আশ্রম ও কারখানা স্থাপনে ব্যয়িত হইবে।

শ্রমিক সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি—

আগামী অক্টোবর মাসে সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা সহরে যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সভার অধিবেশন হইবে তাহাতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইয়া যাইবেন—গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে হাই-কমিশনার শ্রীযুক্ত দালাল এবং ভারত-সচিবের আফিসের স্যার এল্.কার্ণা; কল প্রভৃতির মালিকদের পক্ষ হইতে মিঃ জে এ রায়, শ্রমিকদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী। শিল্প ও শ্রমিক বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারী মিঃ প্র জি ক্লো সরকারী প্রতিনিধিদের পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

বাংলা

ধানের কথা—

১৯২২-২৩ সালে বঙ্গদেশে ৫১৬০০০০ একর জমিতে আউশ ধান্য, ১৬১১০০০০ একর জমিতে আমন এবং ৬৮৩০০০ একর জমিতে বোরো ধান্য হইয়াছে। এ বৎসর ১৫৮৯০০০ টন আউশ, ৭২৯০০০ টন আমন এবং ১৫৮০০ টন বোরো ধান্য জন্মিয়াছে। উহা হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, প্রতি একর জমিতে ৮ মন ২৫ সের আউশ, ১২ মন ২৪ সের আমন এবং ১১ মন ২২ সের বোরো ধান্য জন্মিয়াছে। গত বৎসর ৫৬০৭০০০ একর জমিতে আউশ, ১৫৮৫০০০ একর জমিতে আমন এবং ৬৭৬০০০ একর জমিতে বোরো ধান্য হইয়াছিল, তাহাতে ১৮৬৮০০০ টন আউশ, ৭২৭৮০০০ টন আমন এবং ১৫২০০০ বোরো ধান্য হইয়াছিল। ইহা হইতে হিসাবে দেখা যায় যে, প্রতি একর জমিতে ৯ মন ৭ সের আউশ, ১২ মন ৩০ সের আমন এবং ১১ মন ২৮ সের বোরো ধান্য হইয়াছে। আসামে ৭২৭০০০ একর জমিতে আউশ, ৩৩৭০০০০ একর জমিতে আমন এবং ২২৩০০০ একর জমিতে বোরো ধান্য হয়, তাহাতে ১৮১ ০০ টন আউশ, ১২২৭০০০ টন আমন ও বোরো ধান্য জন্মে। তাহা হইতে দেখা যায় যে প্রতি একর জমি হইতে আসামে ৬ মন ৩৯ সের আউশ, ১০ মন ৮ সের আমন এবং ১০ মন ৩২ সের বোরো ধান্য জন্মিয়াছে।০

—আনন্দবাজার পত্রিকা

তমলুকের বন্যা—

বন্যার অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতেছে। ৬০ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া ১২৫টি গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে। অনেক ঘরবাড়ী পড়িতেছে। প্রায় শতকরা ৫০টি ঘর পড়িয়াছে এবং ২৫টি পতনোন্মুখ। গৃহহারা লোকদিগকে স্বেচ্ছা-সেবকেরা উদ্ধার করিতেছেন। গত ২৫।৮।২৩এ একদিনেই আমাদের পূর্ব্বকোলা কেন্দ্র হইতে ১২২টি লোক, ১০২টি জন্তু ও ২৬।/ মন মাল উদ্ধার করা হইয়াছে। কাজ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। উদ্ধার-করা লোকদিগের জন্য গৃহের সংস্থান ও অন্নবস্ত্রাদির সাহায্য করা হইতেছে। দৈনিক খরচ ক্রমশঃই বাড়িতেছে।

বাঁধটি সম্প্রতি জলসই করিয়া বাঁধা হইয়াছে। এখনও উহাকে ৬।৭ ফুট উচ্চ করিতে হইবে। বাঁধ বাঁধা হইলেও জল বাহির হইবার বিশেষ কোন সুবিধা না থাকায় লোকের দুর্দ্দশা মোটেই কমে নাই, বরং ঘরবাড়ী পড়িয়া যাওয়ার ও জর ইত্যাদির জন্য এবং অন্নাভাবে লোকের কষ্ট ভীষণ বাড়িয়াছে। দানশীল সহৃদয় দেশবাসীর উপর নির্ভর করিয়াই আমরা রিক্ত-হস্তে এই কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, মোটামুটি প্রায় ২৫০০০৲ টাকা আবশ্যক হইবে। টাকার বড়ই অভাব, বন্যার কার্য্যে অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী নিঃস্বার্থ উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবক যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাবে কার্য্য চালান দুষ্কর হইয়া পড়িতেছে। গৃহহীন নিরন্ন বন্যাপীড়িতদের পক্ষে আমরা আজ দেশবাসীর দ্বারে ভিক্ষার্থ উপস্থিত। দেশের এই নবজাগরণের দিনে, আশা করি, পুরুষানুক্রমে যাহারা দেশের অন্ন যোগাইতেছে দেশের সেই মেরুদণ্ড-স্বরূপ দরিদ্র নিরন্ন কৃষকদিগের মুখে দুর্দ্দিনে এক মুষ্টি অন্ন দিবার জন্য অর্থাভাব হইবে না। আমাদের ইহাই ভরসা। চাল, ডাল, টাকা, কাপড়, জামা (নূতন বা পুরাতন), ঔষধ সর্ব্বপ্রকার সাহায্য শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় দাস সম্পাদক, বেসরকারী বন্যা সাহায্য সমিতি সেবাশ্রম, তমলুক, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সাহায্য যত সামান্য হউক না কেন, দুঃস্থ ভাইবোনদের দুঃখে কাতর প্রাণের প্রীতি ও শ্রদ্ধার দান সানন্দে গৃহীত হইবে।

শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এল, সি
সহকারী সভাপতি, তমলুক

—মোস্‌লেম জগৎ

বাঁকুড়া জেলায় কুটীর-শিল্প-জীবীর সংখ্যা—

	১৯১১ সন	১৯২১ সন	+বৃদ্ধি,—হ্রাস
১। সুতার কাপড় বুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে	২০৩২৮	১৯২০৬	—১১২২
২। রেশমের কাপড়	৪৮০০	৩২৪০	—১৫৬০
৩। শাঁখা, হাড় ও শিংএর কার্য্য	১১১১	১৩৯৪	+২৮৩
৪। ঝুড়ি ইত্যাদি	৮৯৫৮	৭৫১০	—১৪৪৮
৫। পিতল কাঁসার বাসন	৬১৭০	৭৮২১	+১৬৫১
মোট	৪১৩৬৭	৩৯১৭১	+২১৯৬
শতকরা কত জন কুটীর-শিল্পে জীবিকা নির্ব্বাহ করে	৩·৬৩	৩·৮৪	

শ্রীরামানুজ কর।

—সারথি

চর্‌কা ও তাঁতে স্বাধীন জীবিকা—

তাঁতে তাত—শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক ভদ্রযুবককে চাকরীর চেষ্টায় ঘুরিতে দেখা যায়, কিন্তু সকলের চাকরী জুটে না। অধ্যবসায় থাকিলে এখনও স্বাধীন ভাবে জীবনযাত্রার উপায় রহিয়াছে। একজন ব্রাহ্মণ যুবক ২।৩ বৎসরের বহু চেষ্টার ফলে এখন তাঁতে কাপড় প্রস্তুত করিয়া মাসিক প্রায় ৪০৲।৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। ক্রমশঃ আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। অধ্যবসায়ের অভাবই অকৃতকার্য্য হইবার একমাত্র কারণ। ব্রাহ্মণ যুবকের ন্যায় যাঁহাদের অধ্যবসায় আছে তাঁহারা অল্প মূলধনে তাঁত চালাইয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারেন।

—জনশক্তি

নূতন মেডিক্যাল কলেজ—

ইষ্টার্‌ন্ মেডিক্যাল কলেজ—লর্ড সিংহের ভ্রাতা কর্ণেল এস, পি, সিংহ, কর্ণেল এস, সি, নন্দী প্রভৃতি ২২ জন ডাক্তারের চেষ্টায় ৭০এ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় ইষ্টার্‌ন্ মেডিক্যাল কলেজ নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ও কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের ন্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত এম-বি ষ্ট্যাণ্ডার্ড পড়াইবার বন্দোবস্ত করতঃ উদ্যোগীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অ্যাফিলিয়েশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কলেজের পড়া আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা এই নব-প্রতিষ্ঠিত কলেজের স্থায়িত্ব ও সাফল্য কামনা করিতেছি এবং দেশবাসীকে এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

—স্বরাজ

দান—

কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক দারিদ্র্য কিংবা বার্দ্ধক্যবশতঃ যাহারা বিপন্ন, এরূপ নরনারীকে সাহায্য করিবার জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

—স্বরাজ

বাংলার বন্দী ছেলে—

বিপ্লববাদী বলিয়া দণ্ডিত নিম্নলিখিত বন্দীরা এখনও ভারতের বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ আছেন :—

আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল

১। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী,—১৫ বৎসর, বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় দশ বৎসর। ২। অমৃতলাল হাজরা,—১৫ বৎসর, রাজাবাজার বোমার মামলা। ৩। প্রফুল্লরঞ্জন রায়,—১২ বৎসর, ঢাকা ষ্টেশনের মামলা। ৪। অতুলচন্দ্র দত্ত,—১০ বৎসর, ঢাকা আসক লেন মামলা। ৫। মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী,—১০ বৎসর, ঢাকা আসক লেন মামলা। ৬। নিকুঞ্জবিহারী পাল,—১৪ বৎসর, সিয়াজগঞ্জ মামলা। ৭। মহেন্দ্রনাথ দাস,—যাবজ্জীবন, মালদহ হেডমাষ্টার হত্যা। ৮। নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী,—১০ বৎসর, বারাণসী ষড়যন্ত্র মামলা। ৯। মোহিনীমোহন ঘোষ,—৭ বৎসর, সালকিয়া মামলা। ১০। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ,—যাবজ্জীবন, শিবপুর ডাকাতী মামলা। ১১। নরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী,—যাবজ্জীবন, শিবপুর ডাকাতী। ১২। সত্যরঞ্জন বসু—যাবজ্জীবন, শিবপুর ডাকাতী। ১৩। যতীন্দ্রনাথ নন্দী,—যাবজ্জীবন, শিবপুর ডাকাতী। ১৪। অনুকূলচন্দ্র চাটার্জ্জী,—যাবজ্জীবন, শিবপুর ডাকাতী।

বহরমপুর পাগলা গারদে

১৫। ক্ষিতীশচন্দ্র পাল,—যাবজ্জীবন, বালেশ্বর যুদ্ধের মামলা। ১৬। হরেন্দ্রচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ,—১০ বৎসর, শিবপুর ডাকাতী।

বাঙ্গলার বাহিরে

১৭। নলিনীকান্ত ঘোষ,—৭ বৎসর, গৌহাটি মামলা। ১৮। সুরেশচন্দ্র সেন,—যাবজ্জীবন, রাজেন্দ্রপুর ট্রেন ডাকাতী। ১৯। শচীন্দ্রনাথ দত্ত,—যাবজ্জীবন, শিবপুর ডাকাতী। ২০। নিখিলরঞ্জন গুহরায়—যাবজ্জীবন, শিবপুর ডাকাতী। —"সার্ভেণ্ট"

—সারথি

অপঘাত-মৃত্যুর সংখ্যা—

গত ১৯২২ সালে একমাত্র ব্রিটিশ ভারতেই ৩২৭৩ জন লোক হিংস্র জন্তুর কবলে প্রাণ হারাইয়াছে। উহা ছাড়া সাপের কামড়ে ২০০৯০ জন লোক ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। বাঙ্গলায় সাপের কামড়ে মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মোট ২৩২৬৮টি হিংস্রপ্রাণী মানুষের হাতে প্রাণ হারাইয়াছে। ৫৭২৬৫টি সাপও মানুষের হাতে আলোচ্য বর্ষে প্রাণ হারাইয়াছে।

—বন্দেমাতরম্

বাংলা সরকারের অনুকরণযোগ্য অনুষ্ঠান—

কাবুলে মাদক নিবারণ—আফগানিস্থানের রাজবিধানে সম্প্রতি মাদক দ্রব্য—এমন কি তামাক ব্যবহারও—নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেহ মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিলে তাহার ৫০০ শত হইতে ১০০০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করা হইবে এবং যদি কাহারও গৃহে কোনও মাদক দ্রব্য পাওয়া যায় তৎসমুদয় সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

—আত্মশক্তি

অন্ধের উপাধি লাভ—

কলিকাতা সেণ্ট্ পল্‌স্ কলেজ হইতে এ বৎসর শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নামে এক অন্ধ যুবক বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

—আত্মশক্তি

নারীর অপমান—

আজ ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গলায় নারীর সম্মান রক্ষা করা এক-প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিক্ হইতে অসংখ্য অসহায়া দুর্ব্বলা নারীর সতীত্ব নাশের সংবাদ আমরা প্রত্যহ পাইতেছি। ইহার কারণ কি? কেন এমন হইল? বাঙ্গালী কি আজ মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুতে পরিণত হইয়াছে? নহিলে নারীজাতির উপর এই অভাবনীয় অত্যাচার করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইবে কেন? দিকে দিকে অত্যাচারিতা নারীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বরে আজ বঙ্গলক্ষ্মী চঞ্চলা। ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? সর্ব্বগ্রাসী উদ্দাম লালসার বশে যে-সমস্ত পশু এইসব মহাপাপে লিপ্ত হয়, শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ বা সমাজের নেতৃবর্গ তাহাদের দমনের জন্য কি উপায় করিতেছেন?

বাঙ্গালী সবলের কাছে মেষবৎ নিরীহ, দুর্ব্বলের সম্মুখে সিংহ।

—মোস্লেম জগৎ

সামাজিক প্রসঙ্গ -

পণপ্রথার শোচনীয় পরিণাম—গত ২৩শে শ্রাবণ নদীয়া জিলার কুষ্টিয়া মহকুমার বহুবয়ড়া গ্রামে একটি মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এই গ্রামের শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মৈত্র মহাশয় সম্প্রতি কার্য্যস্থল হইতে বাটী আসিয়াছেন। বারেন্দ্র কুলীন সমাজের পণপ্রথা অনুযায়ী অধিক পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দিতে না পারিয়া তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। পিতাকে এই বিষম দায় ও সর্ব্বনাশী চিন্তা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কন্যাটি উদ্বন্ধনে মরণকে বরণ করিয়া লইয়াছে।

—কাশীপুর-নিবাসী

বিনাপণে বিবাহ :—কেপুত গ্রামের ব্রাহ্মণগণ ৺শ্যামাপদ গাঙ্গুলীর পরিজনগণকে একঘরে করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার কারণ তাঁহারা দারিদ্র্য বশতঃ গাঙ্গুলী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ প্রদান করিতে সমর্থ হয়েন নাই। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে সহরের মিরবাজার-পল্লীনিবাসী স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির স্বেচ্ছাসেবক শ্রীমান্ হরগৌরী বটব্যাল এই দুঃস্থা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিনাপণে বিবাহ করিয়াছেন। বর বিবাহসংক্রান্ত যাবতীয় খরচও কন্যাপক্ষকে প্রদান করিয়া তাহার পিতৃকুলের জাতি রক্ষা করিয়াছেন। আমরা এই নবীন যুবকের সৎসাহস ও সহৃদয়তার প্রশংসা করি।

—সত্যবাদী

সেবক

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র মিত্র এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র। ইঁহাদের নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রামে।

শ্রী অখিলচন্দ্র মিত্র

অখিলচন্দ্রের জন্ম ও শিক্ষা এলাহাবাদেই। ইঁহার অন্য সহোদরদিগের মত ইনিও এলাহাবাদের এংলো-বেঙ্গলী স্কুল হইতে ম্যাট্রিক্যুলেশন পাশ করিয়া মিওর কলেজে অধ্যয়ন করেন। ম্যাট্রিক্যুলেশন, আই-এস্‌সী ও বি-এস্‌সী পরীক্ষায় অখিলচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করেন। রুড়কী এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রবেশিকা, প্রথম বার্ষিক, দ্বিতীয় বার্ষিক, তৃতীয় বার্ষিক ও শেষ পরীক্ষায় অখিলচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করেন। রুড়কীর শেষ পরীক্ষায় তাঁহাতে এবং পরবর্ত্তী যে দুইটি যুবক দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় দেড় শত নম্বরের তফাৎ ছিল। যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণর স্যার্ উইলিয়ম ম্যারিস্ উপাধি বিতরণ সভায় অখিলচন্দ্রকে অভিনন্দন দিয়া পরবর্ত্তী যুবক দুইটির প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া বলিয়াছিলেন, যে, তাঁহাদিগকে এমন এক ছাত্রের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইয়াছে, যিনি জীবনে কখনও প্রথম বই দ্বিতীয় হন নাই। ম্যারিস্ মহোদয় ইহাও বলিয়াছিলেন, যে, যত দিন রুড়কী-কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, অখিলচন্দ্রের মত কৃতিত্ব আর কোনও ছাত্র পূর্ব্বে কখনও প্রদর্শন করেন নাই।

শুনা যায়, প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বিদ্যান্ত রুড়কীতে তাঁহার পূর্ব্বেকার সব ছাত্রদের কৃতিত্বকে ম্লান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিদ্যান্ত মহাশয়ও ছাত্রাবস্থায় লেখাপড়ার কৃতিত্ব ছাড়া ব্যায়ামেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যান্ত মহাশয় এক্ষণে যুক্ত প্রদেশের পূর্ত্ত-বিভাগে সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়র। ভারত-গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের মেম্বর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বিলাতে সিবিল-সর্ব্বিস পরীক্ষায় পূর্ব্বতন সকল ছাত্রের কৃতিত্বকে ম্লান করিয়াছিলেন।

এতদঞ্চলে খুব কম লোকই আছেন যিনি অখিল-বাবুর তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীমান্ অনিলচন্দ্রকে চেনেন না। এ-প্রসঙ্গ অখিলচন্দ্রের ; সুতরাং অনিলচন্দ্র সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা অশোভন হইবে। কেবল এইটুকু মাত্র বলিয়া শেষ করি, যে, অনিলচন্দ্র কয়েক বৎসর এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া যুদ্ধের পর আমেরিকায় যান। সেখানে পরিশ্রম করিয়া নিজের সম্পূর্ণ ব্যয় ত নির্ব্বাহ করিয়াছেনই, সময়ে-সময়ে অপর সঙ্গীদিগকেও সাহায্য করিয়াছেন এবং শেষে কিছু অর্থও সঞ্চয় করিয়া দক্ষ মোটর ইঞ্জিনীয়ার হইয়া আজ কয়েক মাস হইল ফিরিয়াছেন। ইনি সম্প্রতি কলিকাতায় একটি মোটর টায়ার প্রস্তুত করিবার কারখানা-স্থাপন-কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। অনিলচন্দ্রের আমেরিকায় গমন, সেখানে স্বাবলম্বী হইয়া অবস্থান ও শিক্ষালাভ, এবং প্রত্যাবর্ত্তন—এই তিন ব্যাপারই যেমন একদিকে কৌতুকপূর্ণ ও আমোদদায়ক অপরদিকে তেমনই উৎসাহব্যঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ।

দেহ-মনের চর্চ্চায় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র মিত্রের ন্যায় আটপিঠে যুবকের নমুনা বাংলাদেশে বিরল। বঙ্গের বাহিরে এই বাঙ্গালী যুবকটির কৃতিত্বে আজ বাংলা দেশ গৌরব অনুভব করিতেছে।

শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন

শ্রীশ্রী গীতাতত্ত্ব-সমাহার—শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন প্রণীত ও প্রকাশিত। পৃ ১৮+৭০+১১৬। মূল্য ৬০।

গ্রন্থকারের বিশ্বাস—"গীতার শ্লোকগুলি পরপর যে ভাবে সন্নিবেশিত আছে, তাহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনসহকারে সাজাইলে যেন গীতার তত্ত্বগুলি বুঝিবার পক্ষে কতকাংশে সুবিধা হয়।" এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অন্যভাবে শ্লোকগুলিকে গ্রথিত করিয়াছেন।

গীতার শ্লোকসংখ্যা ৭৭০; গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ানুসারে ইহার ৪২৭টি শ্লোককে ২১ অধ্যায়ে বিভাগ করিয়াছেন। পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে ৬৬ শ্লোক এবং পরিত্যক্ত হইয়াছে ২০৭টি শ্লোক।

গ্রন্থে মূল ও অনুবাদ উভয়ই আছে।

ধর্ম্মের ভিত্তি—শ্রী অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী, বি-এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রী হরিনারায়ণ সেন, বাঙ্গলা বাজার, ঢাকা। পৃঃ ৬+২০০+২। মূল্য ১।০।

গ্রন্থের ছয়টি অধ্যায় এবং একটা পরিশিষ্ট। প্রথম অধ্যায়ের নাম—ঈশ্বর ও জগৎ; আলোচ্য বিষয়—জগৎ, দেশ ও কাল, ঈশ্বর, ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ শক্তি ও বিশ্বাত্মার স্বরূপ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম—মানবসৃষ্টি; আলোচ্য বিষয়—মানবপ্রকৃতি। সৃষ্টির বিভিন্ন ব্যাখ্যা, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ, মানবসৃষ্টির কারণ প্রেম, কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর। তৃতীয় অধ্যায়ের নাম—পুণ্য মানব-সৃষ্টির অপর কারণ; আলোচ্য বিষয়—পুণ্যের স্বরূপ এবং ঈশ্বর পুণ্যময় এবং পুণ্য-মানব-সৃষ্টির অপর কারণ। চতুর্থ অধ্যায়ের নাম—'প্রেম ও পুণ্যে বিশ্বের একত্ব;—আলোচ্য বিষয়-মানবে ঈশ্বত্ব, মানবে মানবে ভেদ, জড়বাদের ফল, প্রেম ও পুণ্যে বিশ্বের একত্ব। পঞ্চম অধ্যায়ের নাম বিশ্ব ও মানবাত্মার সম্বন্ধ; আলোচ্য বিষয়—বিশ্বের উদ্দেশ্য, মানবের আনন্দ, সৌন্দর্য্য—মানবের কল্যাণ। ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম—ধর্ম্মজীবন; আলোচ্য বিষয়—উপমা, ধর্ম্মের পথে ত্যাগ ও লাভ, ঈশ্বরের সহিত একত্ব, মানবের আদর্শ কি, একত্বের প্রকৃতি।

পরিশিষ্টে দেশ ও কাল বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ধর্ম্মকে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ে মতভেদ থাকিবেই। আমরাও গ্রন্থকারের সহিত সব বিষয়ে একমত হইতে পারি নাই। কিন্তু গ্রন্থকার এই পুস্তকে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই যে উপকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধ ভারত—শ্রী শরৎকুমার রায় বিদ্যারত্ন, সাহিত্যভূষণ প্রণীত। প্রকাশক শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায়, বি-এ, ১৬ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৮৪। মূল্য ২৲।

এই গ্রন্থে ১১টি অধ্যায়; আলোচ্য বিষয় (১) বুদ্ধ ও বৌদ্ধশাস্ত্র, (২) বুদ্ধ ও সঙ্ঘ, (৩) বৌদ্ধবিধি এবং সঙ্ঘের প্রকৃতি, (৪) বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও জনসাধারণ, (৫) বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় ও বিস্তার, (৬) বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, (৭) জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ, (৮) বুদ্ধ ও বৌদ্ধ জাতক, (৯) আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, (১০) বৌদ্ধশিল্প এবং (১১) বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি।

বৌদ্ধ ভারত গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে। নানা গ্রন্থ ও রচনা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। প্রত্যেক অধ্যায়ই সুলিখিত। আশা করি ইহার বিশেষ সমাদর হইবে।

বেদান্ত ভাস্কর—স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ প্রণীত। নরোত্তমপুর (বরিশাল) রামকৃষ্ণ নিত্যানন্দ আশ্রম হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ১৩৯+১+৩। মূল্য ১॥০।

হিন্দী—"বিচার সাগর" নামক পুস্তকের অনুকরণে এই গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে। বক্তব্য বিষয় বাঙ্গলা কবিতায় লিখিত। মোট ১২০টি শ্লোক। টীকাতে অধিকাংশ শ্লোকেরই ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে নববৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য অনেক স্থলে অনেক জটিল যুক্তিতর্কেরও অবতারণা করিতে হইয়াছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

ক্ষুদকুঁড়'—শ্রী কালিদাস রায় প্রণীত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান্ বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ৯৪ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। উৎকৃষ্ট বাঁধাই তেরো আনা।

কবিতার বই। কালিদাস-বাবুর কবিতার পরিচয় অনাবশ্যক। তাঁর কবিতার ছন্দ নিপুঁত, ভাষা উত্তম; কিন্তু ভাবের গভীরতাও নূতনত্ব না থাকাতে কবিতাগুলি প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—"বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজ আজকাল উৎকৃষ্টতর কাব্যরসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে—এসকল কবিতায় আর তাহাদের মনোরঞ্জন হইবে না—ইহাদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা বা যশ বিন্দুমাত্রও বাড়িবে না, সে-বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।" ইহা সম্পূর্ণ সত্য, ইহার মধ্যে বিনয় বা অভিমানের অত্যুক্তি এতটুকু নাই। বাংলাদেশের পরম সৌভাগ্য যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজ সরেস কাব্যের রসাস্বাদ পাইয়া আর রাবিশ জিনিষে তৃপ্তি পায় না। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হইলে, হেম-নবীনের পর কালিদাস-বাবু ওগয়রহ নিশ্চয়ই মহাকবির উচ্চাসন

পাইতেন; কিন্তু তাঁহাদের দুর্ভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সেই উচ্চাসন দুরারোহ ও প্রতিভালভ্য করিয়া রাখিয়াছে।

মুদ্রারাক্ষস

শান্তিজল—(উপন্যাস)—শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বৈশাখ ১৩৩০। শরৎ-সাহিত্য-কুঞ্জ, ৮ রাধামাধব গোস্বামী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। এক টাকা।

বইখানি আগাগোড়া পড়িতে বেশ লাগিয়াছে। প্রত্যেকটি চরিত্র বেশ সহজে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রাম্য চিত্রগুলির মধ্যে বেশ একটি ঝরঝরে সরল ভাব আছে। তবে বইখানির মধ্যে দু-একটি চরিত্র বড় একধরণের হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মাঝে-মাঝে একটু একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়। তবে ইহাতে পুস্তকের সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানি হয় নাই। আশা করা যায়, বইখানি পড়িতে সাধারণ পাঠকের ভালই লাগিবে। বইখানির বাঁধাই এবং ছাপা বেশ তকতকে ঝরঝরে। দামও বেশী হয় নাই।

আঁধারের শিউলি—শ্রী পাঁচুলাল ঘোষ প্রণীত। ১৩২৮। গুরুদাস-বাবুর দোকান, ২০৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা।

প্লট যখন বেশ জমাট বাঁধিয়া আসিতেছে, তখন হঠাৎ পুস্তক সমাপ্ত হইয়া গেল। ইহাতে বইখানি অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল বলিয়া মনে হয়। বইখানির প্লট একেবারে নূতন না হইলেও, একঘেয়ে নয়। বইখানি শেষপর্য্যন্ত পড়া যায়। বাঁধাই এবং ছাপা ভাল।

সত্যরক্ষা—শ্রী কৃত্তিবাস সাহা, বি-এ। সামাজিক উপন্যাস। বৈশাখ ১৩৩০। সারস্বত লাইব্রেরী, ১২৫।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা; আরো নানা দোকানে পাওয়া যায়। বোর্ড-বাঁধাই পাঁচসিকা, সিল্ক বাঁধাই দেড় টাকা।

মুখপাতে গ্রন্থকারের ছবি;—কোন দরকার ছিল না। পাঠকেরা লেখকের ছবি দেখিবার জন্য মোটেই ব্যস্ত থাকে না। বইখানির মধ্যে না আছে কোন প্লট, না আছে কোন ভাষার বাঁধন। এরকম বই ছাপান কেবল টাকা নষ্ট বলিয়া মনে হয়। বইখানির কয়েক পাতা পড়িয়াই আর পড়িবার ধৈর্য্য থাকে না। মধ্যে মধ্যে রসিকতার ব্যর্থ চেষ্টা করা হইয়াছে। ২২৮ পৃষ্ঠা এমনভাবে লেখা লেখকের অক্লান্ত চেষ্টার পরিচায়ক।

মিলিতোনা—শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক Theophile Gautierএর ফরাসী হইতে অনূদিত। বৈশাখ ১৩৩০। গুরুদাস-বাবুর দোকান, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। পাঁচ সিকা।

সমালোচনা করিবার মত কিছুই নাই—অনুবাদ যতদূর ভাল হইবার তাহা হইয়াছে। একবার আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া পারা যায় না। বাঁধাই এবং ছাপা বেশ ভাল। তবে দাম আর-একটু কম হইলে ভাল হইত।

গ্রন্থকীট

মহারাজ ছত্রসাল (?)—শ্রী যোগেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। ২৮।১০ অখিল মিস্ত্রীর লেন হইতে শ্রী বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। পৃঃ ১৮। ১৩৩০।

মহারাজ ছত্রশাল স্বাধীন বুন্দেলখণ্ডের অধিপতি ছিলেন। মোগলেরা তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যটুকুও দখল করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু এই বীর নৃপতি তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন। একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইলেও মহারাজা ছত্রশাল স্বদেশের স্বাধীনতা অটুট রাখিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই বীরের স্মৃতি অতীতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গ্রন্থকার পুরাতন পুঁথিপত্র হইতে এই স্বাধীন নৃপতির জীবন-উদ্ধার করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

ভক্তি-লীলা (নাটক ,—৺ গুণময় গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রী শিবপ্রসাদ ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মাহেশ হইতে প্রকাশিত। মূল্য বার আনা। ১৩৩০। পৃ ১৫২।

ইহা একখানি বড়ক পৌরাণিক নাটক। প্রকাশকগণ ভূমিকাতে লিখিয়াছেন, "আজ কালকার নাটকে মার্জ্জিত হাস্যরসের নিতান্ত অভাব।" আমরা তাঁহাদের এই উক্তি সমর্থন করি না। লেখক বেশ সরল ভাষাতে নাটকখানি লিখিয়াছেন। এই নাটকখানিতে কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের রচিত তিনটি সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রভাত

কিশোরী—শ্রী যতীন্দ্রলাল দাস, বি-এল। প্রকাশক শ্রী নরেন্দ্র নাথ দত্ত, জন্মভূমি কার্য্যালয়, ৩৯ মাণিক বসু ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিতার বই। ভাবে ছন্দে ও ভাষায় সব কবিতাগুলি সুসঙ্গত না হইলেও বইটির মধ্যে কয়েকটি ভালো কবিতা আছে। "দিবাশেষ" ও "সিন্ধুর প্রতি" নামে কবিতা-দুইটি আমাদের বিশেষ করিয়া ভালো লাগিয়াছে।

সপ্তপর্ণী—শ্রী ভূদেব শোভাকর, বি-এ, বি-ই। হরিপুর, নদীয়া। দাম এক টাকা।

কবিতার বই। কয়েকটি কবিতা আমাদের ভালো লাগিয়াছে। সেগুলিতে গতানুগতিকতা হইতে কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। কিন্তু ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে লেখকের অমনোযোগিতা বিশেষভাবে পীড়াদায়ক। শিখি ও সুখী, কোথা ও সেথা, বাসে ও মিশে—এই জাতীয় মিল কবিতায় অমার্জ্জনীয়। কতকগুলি কবিতা অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে; ছোট হইলে পাঠকের ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিত।

গুপ্ত

বিবিধ প্রসঙ্গ

নারীর স্থাপত্য

মেয়েরা জীবনের যতখানি সময় বাড়ীতে কাটাইয়া থাকেন, পুরুষ তাহা কাটান না। বাসগৃহ মন্দ হইলে মেয়েদের যতখানি দুঃখ পাইতে হয়, পুরুষকে ততখানি হয় না। সুতরাং পুরুষদের মধ্যে যত জন স্থপতি হন, স্বভাবতঃ মেয়েদের মধ্যে তাহা অপেক্ষা বেশী জনের স্থপতি হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে তাহা দেখা যায় না। আমেরিকার "ওয়্যান সিটিজেন" পত্রে শ্রীমতী মার্জ্জরি শূলার তাই লিখিয়াছেন,

"যে-সকল মহিলার স্থপতি হওয়া উচিত, তাঁহাদের দেখা পাওয়া যায় না কেন? স্থাপত্যবিদ্যা মহিলাদের ব্যবসায়রূপে পরিগণিত হইলে দোষ কি? আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে স্থপতিদের মধ্যে শতকরা একজন মাত্র মহিলা কেন?

"মেয়েরাই ঘরসংসার পাতিয়া গৃহধর্ম্ম করেন, অথচ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে তাঁহাদের বিশেষ দেখা যায় না; এই তথ্যটি আবিষ্কার করিয়া অবধি এই-সব প্রশ্ন আমার মনে সর্ব্বদা জাগিয়া উঠিতেছে। মেয়েরাই ঘরসংসারের তত্ত্বাবধান করেন, অথচ বাড়ীর নক্সা করিতে তাঁহাদের বড় একটা দেখা যায় না। জিনিষটা অদ্ভুত নয় কি? যাহা হউক আমার প্রশ্নের উত্তররূপে আজ আমার সম্মুখেই কুমারী এলিনর ম্যানিংকে উপবিষ্ট দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। এ দেশের সুবিখ্যাত মহিলা স্থপতিদের মধ্যে ইনি অন্যতম।"

ভারতবর্ষে মহিলারা চিকিৎসক, উকীল ব্যারিষ্টার, ও শিক্ষয়িত্রী হইয়াছেন; স্থপতিও হউন না। কবে হইবেন?

—

মহিলা ডাক্তারের আবিষ্ক্রিয়া

ডাক্তার শ্রীমতী লুইস্ পিয়াস্, জন্স্ হপকিন্স্ কলেজের গ্র্যাজুয়েট এবং রক্‌ফেলার ইনষ্টিটিউটে দশ বৎসর কাজ করিতেছেন। ইনি সম্প্রতি পক্ষাঘাত ও নিদ্রারোগের একটি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ডাক্তার পিয়াস্ এই ঔষধটি লইয়া বেল্‌জিয়ান্ কঙ্গোতে গিয়াছেন। সেখানে বিগত চারমাস ধরিয়া তিনি উক্ত রোগের চিকিৎসা করিতেছেন; চিকিৎসা সফলও হইতেছে।

—

ঠাকুরমা ও গ্রাজুয়েটের জননী ছাত্রী

ঠাকুরমা কলেজে যাইতেছেন, এমন ঘটনাও কি জগতে ঘটে? দেখা যাইতেছে ঘটে। শ্রীমতী সারা সুমেকার ফার্লি পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া ষ্টেট কলেজের কৃষি-বিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় ডিগ্রী পাইয়াছেন। ইঁহার দুই পুত্রই কলেজের গ্র্যাজুয়েট, ইঁহার নাতি নাতনীও বারটি আছে। অবশ্য ইনি একলাই যে এই সম্মানের অধিকারিণী, তাহা মনে করিবার কোনো কারণ নাই। শ্রীমতী সুসান এ পোর্টার্‌ফিল্‌ডের ছেলেরাও কলেজের গ্র্যাজুয়েট; এই গ্র্যাজুয়েট-জননীও সম্প্রতি এই কলেজ হইতেই আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যে ডিগ্রী পাইয়াছেন।

—

'হিন্দু" নাম

"হিন্দু" নামটির একটি ভৌগোলিক অর্থ আছে। উহাই উহার সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক অর্থ। আমেরিকায় ভারতবর্ষের সকল লোককেই জাতিধর্ম্মবর্ণনির্বিশেষে হিন্দু বলা হইয়া থাকে। শুনিয়াছি, ভারতবর্ষের যে-সকল মুসলমান আরবদেশে হজ্ করিতে যান, তাঁহাদিগকেও ঐ দেশের লোকেরা "হিন্দু" বলিয়া থাকে। বিদেশে "হিন্দু" শব্দের এই প্রয়োগ ধর্ম্মবাচক নহে। উহার অর্থ কেবল ভারতীয়। এই অর্থে নামটির প্রয়োগ ভারতবর্ষে প্রচলিত নাই। ভারতে হিন্দু বলিতে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকেই বুঝায়। কিন্তু সকল হিন্দুর

হিন্দুধর্ম ঠিক্ এক নহে বলিয়া "হিন্দু" নামটির সর্ব্ববাদী-সম্মত সংজ্ঞা এপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সেইজন্য, মোটামুটি বলা হইয়া থাকে, যে, যে কেহ আপনাকে হিন্দু বলেন, তিনিই হিন্দু।

বিবাহের সময় জাতিভেদ মানিয়া চলিলে ও ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিলে, তাহা এ পর্য্যন্ত হিন্দুত্বের একটি লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বিবাহে জাতিভেদ না মানিয়াও ভবিষ্যতে হিন্দুসমাজে থাকা চলিবে।

সব হিন্দু-জা'তের লোকেরা ব্রাহ্মণের প্রদত্ত জল পান বা তাঁহার রাঁধা অন্ন ভোজন করিবেন, যদিও ব্রাহ্মণ ইহাদের কাহারও রাঁধা অন্ন ভোজন এবং কোন কোন জাতির প্রদত্ত জল পান করেন না, হিন্দুসমাজের ইহা একটি রীতি। কিন্তু এই নিয়ম কেবল সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে পালিত হয়; অন্য সময়ে, বিশেষতঃ ইংরেজীশিক্ষিত লোকদের মধ্যে, ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। তা ছাড়া, যাহারা ইংরেজী শিক্ষার কোনই ধার ধারে না, নিম্নশ্রেণীর এরূপ অনেক হিন্দু জা'তের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মধ্য প্রদেশের ঘাসিয়ারা কায়স্থদের দেওয়া লবণ গ্রহণ করে না, তাহা অপবিত্র মনে করে। মেথরেরা কায়স্থদের বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করে না। ব্রাহ্মণদের নৈকট্য ভুঞ্জিয়াদিগকে অপবিত্র করে। যদি কোন ব্রাহ্মণ কোন ভুঞ্জিয়ার কুঁড়ে-ঘর ছোঁয়, তাহা হইলে সে ঘরটিতে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া ফেলে; কারণ তাহার বিবেচনায় উহা এত অপবিত্র হইয়া যায়, যে, আর উহাকে কোন উপায়ে শুদ্ধ করিবার সম্ভাবনা থাকে না। বেতুলের তেলি ব্রাহ্মণের দেওয়া জল খায় না, যদিও গোঁড়ের দেওয়া জল খায়। *

জৈনদের মধ্যে অনেকে আপনাদিগকে হিন্দু মনে করেন না, কেহ কেহ হয়ত হিন্দু নামে আপত্তি করেন না। পরেশনাথ পাহাড়ের জৈন মন্দিরে ব্রাহ্মণ পূজারী দেখিয়াছি। বৌদ্ধদের মধ্যেও বোধ হয় অনেকে হিন্দুনামে আপত্তি করেন না। শুনিয়াছি, নেপালের অধিবাসীরা "হিন্দু" সকলের সাধারণ নাম বলিয়া গ্রহণ করেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা বৌদ্ধ, কেহ বা শৈব, ইত্যাদি। শিখদের মধ্যেও এইরূপ অনেকে হিন্দুনামে আপত্তি করেন, অনেকে করেন না। ব্রাহ্মদের মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজ কখনও হিন্দুনাম ত্যাগ করেন নাই। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় একসময়ে ইহার সভাপতি ছিলেন। তিনি "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব" নামক পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম বলিতে তিনি ব্রহ্মোপাসনা বুঝিতেন। ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য শাখার কেহ কেহ আপনাদিগকে হিন্দু মনে করেন, অনেকে করেন না। আর্য্যসমাজের লোকেরা কার্য্যতঃ বরাবরই হিন্দু আছেন, যদিও আজকাল তাঁহারা হিন্দুনামের প্রতি যতটা অনুরাগ প্রদর্শন করেন, আগে ততটা করিতেন না।

হিন্দু মহাসভা

হিন্দু মহাসভা হিন্দুর যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হয়ত ইতিপূর্ব্বে কথায় কেহ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত ভাবটি অস্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। মহাসভার মতে যে-কেহ ভারতবর্ষে উদ্ভূত কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তিনিই আপনাকে হিন্দু বলিবার অধিকারী। হিন্দু বা "সনাতন" ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, শিখ ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, ও আর্য্য সমাজের ধর্ম্ম, এইগুলি ভারতবর্ষে উদ্ভূত প্রধান ধর্ম্ম। আমরা উপরে হিন্দুনাম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে, যে, এই-সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই কতকগুলি লোক আপনাদিগকে হিন্দু মনে করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি কাশীতে হিন্দুমহাসভার যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে জি কে নারিম্যান্ নামক একজন বিদ্বান্ পারসী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, যে, পারসীদের ধর্ম্ম অর্থাৎ জরথুস্ত্রের প্রচারিত ধর্ম্ম ভারতবর্ষে উদ্ভূত না হইলেও উহা এক্ষণে ভারতবর্ষেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যমান আছে; অতএব, তাঁহার মতে পারসীদেরও হিন্দু মহাসভায় যোগ দেওয়া উচিত, এবং হিন্দুমহাসভারও

* *Man in India*, March and June, 1923, p. 72.

পারসীদিগকে যোগ দিবার অধিকার দেওয়া উচিত। তাঁহার মতে ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম এবং ইরানীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম ঠিক্ সেইরূপ আর্য্য সভ্যতা ও ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা, যেমন ভারতীয় লোকেরা ও ইরানীরা (অর্থাৎ পারসীরা) আর্য্য জাতির দুই শাখা। নারিমান্ মহাশয়ের মত অনুসারে কাজ করিতে হইলে মহাসভার নাম আর্য্য মহাসভা করিলে ঠিক্ হইবে।

বারাণসীতে হিন্দু মহাসভার যে অধিবেশন সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, তাহা উহার সপ্তম অধিবেশন; সুতরাং মহাসভা নূতন করিয়া স্থাপিত হয় নাই। মুসলমানদের মনে মহাসভার বিরুদ্ধে যে-সব আপত্তি উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে ইহার নূতনত্ব সম্ভবতঃ একটি। কিন্তু ইহা নূতন নহে। তা ছাড়া, মুসলমানদের যদি স্বতন্ত্র সভাসমিতি থাকিতে পারে, তাহা হইলে হিন্দুদের সেরূপ স্বতন্ত্র সভাসমিতি স্থাপনে তাঁহারা আপত্তি করিতে পারেন না। মুসলমানরা যখন কংগ্রেসে যোগ দেন নাই, তখন তাঁহাদের মুসলমান শিক্ষা কন্‌ফারেন্স্ (Muhammadan Educational Conference) ছিল এবং এখনও আছে। উহার নাম শিক্ষাসম্বন্ধীয় হইলেও উহা আংশিকভাবে রাজনৈতিক সমিতিও বটে। মুসলমানেরা কংগ্রেসে যোগ দিবার পরেও স্বতন্ত্র মোস্লেম লীগ্ আছে। যে সব প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম, কেবল সেই-সকল প্রদেশেই যদি মুসলমানদের স্বতন্ত্র সভাসমিতি থাকিত, তাহা হইলে বলা যাইতে পারিত, যে, তাঁহারা সংখ্যায় ন্যূন সম্প্রদায় (minority) বলিয়া এরূপ সম্প্রদায়সকলের স্বার্থরক্ষার অধিকার অনুসারে কাজ করিতেছেন। কিন্তু বঙ্গে ও পঞ্জাবে মুসলমানেরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এই দুই প্রদেশেও তাঁহাদের স্বতন্ত্র সভাসমিতি ও প্রচেষ্টা আছে।

হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে যাহার বা যে উদ্দেশ্যগুলির সহিত রাজনীতির সম্পর্ক আছে, তৎ-সাধনকল্পে হিন্দুদের চেষ্টায়, আর যিনিই আপত্তি করুন বা তাহার দোষ প্রদর্শন করুন, মুসলমানেরা তাহা করিতে পারেন না। ইহা সত্য কথা, জাতিবর্ণসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সমুদয় ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বার্থ এক। এই সত্যটি সকলে উপলব্ধি করিয়া একযোগে কাজ করিলে তাহাই আদর্শ-অনুযায়ী কাজ হয়; এবং সেই-ভাবে সেইরূপ কাজ করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্যও বটে। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা ইহা বুঝেন নাই। মুসলমানেরাই বিশেষ করিয়া, যে-যে প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যায় বেশী সেখানেও, ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিতে কেবল মাত্র মুসলমানদের দ্বারাই নির্ব্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধির দাবী এই ওজুহাতে করিয়া আসিতেছেন, যে, তাহা না হইলে তাঁহাদের স্বার্থরক্ষা হইবে না। অতএব, তাঁহারা যদি মনে করেন, যে, তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ দেশের অন্যান্য অধিবাসীদিগের হইতে আলাদা এবং তাহা রক্ষার জন্য তাঁহাদের আলাদা সভা-সমিতি প্রচেষ্টা প্রতিনিধি চাই, তাহা হইলে হিন্দুরাও যদি মনে করেন, যে, তাঁহাদেরও স্বার্থ আলাদা এবং তাহা রক্ষার নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিন্দু সভা-সমিতি প্রচেষ্টা আদির দর্‌কার আছে, তাহাতে মুসলমানদের আপত্তি করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ বা অধিকার নাই। আপত্তি ও দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন কেবল তাঁহারা, যাঁহারা বিশ্বাস করেন, যে, সমুদয় ভারতীয়ের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও লক্ষ্য এক, ও সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার জন্য সমবেত চেষ্টা চাই, এবং এই বিশ্বাস অনুসারে কাজ করেন। কিন্তু এই আদর্শবাদীরা হিন্দুকে যেমন দোষ দিবেন, মুসলমানকেও তেমনি দোষ দিবেন। তাঁহারা মুসলমানদের দোষের উল্লেখই আগে করিবেন, কারণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থবাদের উল্লেখ ও তদনুযায়ী আচরণ মুসলমানেরাই আগে করিয়াছেন। কিন্তু ঐ আদর্শবাদীরাও হিন্দুকে ততদিন বিশেষভাবে দুষিতে পারিবেন না, যতদিন মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ক্রিয়মান থাকিবে।

হিন্দু মহাসভার সামাজিক উদ্দেশ্য

হিন্দুমহাসভার মতে হিন্দু সমাজে যে-সব দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা ঢুকিয়াছে, তাহার সংস্কার সাধনও উহার উদ্দেশ্য। ইহাতে কোন ন্যায়বান্ বিবেচক অহিন্দুর আপত্তি হওয়া উচিত নহে; বরং জগতের সকলেই

নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে আত্মসংশোধন দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধন করিলে সমগ্র মানবজাতির আনন্দিত হওয়াই উচিত। কারণ, যতদিন সকলের কল্যাণ না হইতেছে, ততদিন কাহারও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইতে পারে না। কিন্তু কোন অহিন্দু যদি মনে করেন, "হিন্দুসমাজে যত দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা থাকিবে, ততই অনেক হিন্দু নিজের সমাজ ছাড়িয়া আমার সম্প্রদায়ে আসিয়া যোগ দিবে, এবং হিন্দুসমাজ যত দুর্ব্বল থাকিবে, তুলনায় আমার সমাজ ততই প্রবল থাকিবে; অতএব হিন্দুসমাজের সংস্কার বাঞ্ছনীয় নহে", তাহা হইলে এরূপ লোকের হৃদয়ের ও বুদ্ধি-বিবেচনার প্রশংসা করিতে পারি না।'

—

হিন্দু মহাসভার ধার্ম্মিক উদ্দেশ্য

হিন্দু মহাসভা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম মনে করেন, তদনুসারে যাহাতে সকল হিন্দু নিজ নিজ জীবন নিয়মিত করেন, তাহার চেষ্টা করিবার অধিকার উঁহার আছে। সকল ধর্ম্মেরই লোকদের নিজের নিজের সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঐ অধিকার আছে। অবশ্য কেহ যদি মনে করেন, যে, হিন্দু মহাসভা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম মনে করিতেছেন, তাহা হিন্দুশাস্ত্রকথিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নহে, হিন্দুশাস্ত্রেই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব ও জীবনের উপদেশ আছে; তাহা হইলে বক্তৃতায়, কথোপকথনে, পত্রিকায়, পুস্তিকায়, পুস্তকে, এরূপ মত ব্যক্ত করিবার অধিকার তাঁহার আছে। হিন্দু মহাসভা প্রকারান্তরে এই অধিকার মানিয়াও লইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা, অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের মত, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রেও যাহা ব্রহ্মোপাসনা-প্রতিপাদক তাহাই মানেন, বহুদেববাদ মানেন না; কিন্তু মহাসভার মতে ব্রাহ্মেরাও হিন্দু। আর্য্যসমাজীরা তাঁহাদের ব্যাখ্যা-অনুযায়ী বৈদিক ধর্ম্ম মানেন, পৌরাণিক ধর্ম্ম মানেন না, কিন্তু মহাসভার মতে তাঁহারাও হিন্দু।

অহিন্দুরা বা কোন অহিন্দু যদি মনে করেন, যে, মোটের উপর হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্রসমূহ অসার ও অপকৃষ্ট, তাহা হইলে তাহা বলিবার লিখিবার এবং হিন্দুকে কোন অ-হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অধিকারেও মহাসভা আপত্তি করিতেছেন না, বাধা দিতেছেন না। বরং আধুনিক কালে এ পর্য্যন্ত অহিন্দুরাই সাধারণতঃ হিন্দুকে অ-হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন; হিন্দুরা সে পরিমাণে অহিন্দুকে হিন্দু করেন নাই।

হিন্দু মহাসভার ধার্ম্মিক অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অপর একটি উদ্দেশ্যের বিষয়ও কিছু বলা দরকার। যাঁহারা বা যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা ইচ্ছুক হইলে তাঁহাদিগকে পুনরায় হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া লওয়া মহাসভার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহাতেও কোন অহিন্দুর ন্যায়সঙ্গত আপত্তি থাকিতে পারে না। অহিন্দুরা যদি হিন্দুকে নিজ নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন, তাহা হইলে হিন্দুরা কেন অহিন্দুকে হিন্দু করিতে পারিবেন না? যদি এই ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ও বাংলা সন ১৩৩০ সালে মহাসভা প্রথম এইরূপ কার্য্যের সূচনা করিতেন, তাহা হইলেও কাহারও কিছু বলিবার অধিকার থাকিত না; কারণ, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই যে-কোন সময়ে বৈধ কোন নূতন চেষ্টা করিবার অধিকার আছে। 'কিন্তু অহিন্দুকে হিন্দু করা নূতন নহে। ব্রিটিশ শাসনকালেই ভারতবর্ষে অনেক স্থলে ইহা করা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। মুসলমান শাসনকালেও হইয়াছিল। মুসলমান শাসন-কালের পূর্ব্বেও বহু "অনার্য্য" জাতির অগণিত লোককে হিন্দুসমাজভুক্ত করা হইয়াছিল। ইহা হিন্দুপক্ষের হিন্দুর কথা নহে। ইউরোপীয়দের লিখিত ইতিহাস, সেন্সস্ রিপোর্ট, জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তকেও ইহার উল্লেখ আছে। তাহা আমরা প্রবাসীর আগের এক সংখ্যায় দেখাইয়াছি। যাহারা নিজে বা যাহা-দের পূর্ব্বপুরুষেরা আগে হিন্দু ছিল, কেবল তাহা-দিগকেই যে পুনরায় হিন্দু করার অধিকার আছে, তাহা নহে; কোন পুরুষে যাহাদের কেহ হিন্দু ছিল না, তাহাদিগকেও হিন্দু করার অধিকার হিন্দুদের আছে। এরূপ লোককে হিন্দু বরাবরই করা হইয়া আসিতেছে। "শুদ্ধি" কথাটি এবং তদনুযায়ী ক্রিয়াকলাপও নূতন প্রচলিত হয় নাই। অনেক বৎসর হইতে এই কথা ও অনুষ্ঠান আর্য্যসমাজে প্রচলিত আছে। তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত "দেবল-স্মৃতি"তে মুসলমানকে

হিন্দু করিবার প্রায়শ্চিত্তবিধি আছে। অবশ্য একথা ঠিক, যে, কয়েক মাস হইতে যেরূপ দলে দলে মাল্‌কানা রাজপুতদিগকে পুনর্ব্বার "শুদ্ধি" দ্বারা তাহাদের সাবেক রাজপুত সমাজে লওয়া হইতেছে, গত বৎসরও তাহা হয় নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যে, গ্রামকে গ্রাম খৃষ্টিয়ান্ করিবার ও দেশকে দেশ বা জাতিকে জাতি মুসলমান করিবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। প্রাচীন ভারতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের সমষ্টি বহু অনার্য্য জাতিকে হিন্দুসমাজভুক্ত করা হইয়াছিল। তা ছাড়া খৃষ্টিয়ান্ মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায় যুগপৎ বা কত সময়ের মধ্যে কত লোককে নিজ নিজ দলে গ্রহণ করিবেন, যখন তাহার কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই, তখন হিন্দুদের বেলাই বা কেন তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে?

এক ধর্ম্ম হইতে মানুষকে অন্য ধর্ম্মে লইয়া যাইবার উপায় সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার। শ্রেষ্ঠ ও বৈধ উপায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশ ও যুক্তিপ্রয়োগ। মাল্‌কানা রাজপুতদের "শুদ্ধি" সম্বন্ধে কোন কোন মুসলমান ইহা বলিয়াছেন বটে, যে, জোর করিয়া বা অন্য অবৈধ উপায়ে কোন কোন স্থলে তাহাদের "শুদ্ধি" হইতেছে। তাহা হইয়া থাকিলে উহা অবশ্যই অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয়। কিন্তু প্রধানতঃ, "শুদ্ধি" যে মাল্‌কানাদের স্বেচ্ছা ও সম্মতি-অনুসারে হইতেছে, তাহা মৌলবী আজাদ সুভানী এবং বাবু পুরুষোত্তমদাস টাণ্ডনের রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে। তা ছাড়া, ইহা সকলেই জানেন, যে, সামাজিক বা আর্থিক কারণে অনেকে খৃষ্টিয়ান্ বা মুসলমান হয়, এবং, অতীত কালে মুসলমানেরা প্রাণবধের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও মুসলমান করিয়াছিলেন কি না সে তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া, ইহা বলা যাইতে পারে, যে, কিছু দিন আগে মোপ্‌লারা ঠিক ঐ উপায়ে অনেককে মুসলমান করিয়াছিল। কোন সম্প্রদায়ের কোন কোন লোক একটা খারাপ কাজ করিলে অপরের কৃত তদ্রূপ খারাপ কাজ ভাল হইয়া যায় না, ইহা খুবই সত্য কথা। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, নিজের সম্প্রদায়ের সমুচিত শাসন ও সংশোধনের পূর্ব্বে অপরের কৃত তদ্রূপ খারাপ কাজের উল্লেখ করিলে লোকে হাসিয়া থাকে।

এখন ভারতবর্ষে খৃষ্টিয়ানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত, এবং যুক্ত-প্রদেশের আগ্রা ও মথুরায় যুদ্ধও চলিতেছে না। এখন মাল্‌কানা রাজপুতদিগকে কেহ প্রাণের ভয় বা অন্য ভয় দেখাইয়া হিন্দু করিতে চাহিলে খৃষ্টিয়ান্ ইংরেজ তাহাকে রেহাই দিবে, ইহা অবিশ্বাস্য। ইংরেজ আর কাহারও বন্ধু বটে কি না, জানি না; কিন্তু হিন্দুর পক্ষপাতী নিশ্চয়ই নহে। বস্তুতঃ, ইংরেজ যাহা যাহা বলিয়া ভারতে নিজের প্রভুত্বের আবশ্যকতা প্রতিপাদন ও সমর্থন করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে একটা প্রধান যুক্তি এই, যে, "আমি না থাকিলে তোমরা হিন্দুমুসলমান মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিবে, মধ্যস্থ ও শান্তিরক্ষক-রূপে আমার থাকা দরকার।"

মাল্‌কানারা পুরা মুসলমান নহেও। তাহা আগে-কার একমাসের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি। তাহাদিগকে পুরা মুসলমান না করিয়া অর্দ্ধহিন্দু অবস্থায় রাখিয়া দিবার জন্য মুসলমানেরাই দায়ী। এখন মুসলমানেরা তাহাদিগকে পুরা মুসলমান করিবার চেষ্টা করুন, তাহাতে কেহ বাধা দিবে না। হিন্দুরাও তাহাদিগকে এতদিন আধাহিন্দু আধামুসলমান অবস্থায় থাকিতে দিয়া অপরাধী হইয়াছেন। সেই দোষ সংশোধন করিবার অধিকার তাঁহাদেরও আছে।

অহিন্দু কেহ যদি মনে করেন, যে, "হিন্দুরা আগে প্রধানতঃ বর্জ্জন করিতেই জানিত; তাহাতে আমাদের এই সুবিধা ছিল, যে, আমরা নিজের দল পুষ্ট করিতে পারিতাম। এখন তাহারা বর্জ্জিতকে পুনর্গ্রহণ এবং বাহিরের নূতন মানুষকেও নিজের দলে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে। ইহাতে আমাদের অসুবিধা হইবে।", তাহা হইলে তাঁহাদের আশঙ্কায় সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমরা প্রত্যেকে যে অধিকার মূল্যবান্ ও আবশ্যক বলিয়া মনে করি, অপরকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিবার ইচ্ছা করাও গর্হিত।

মহাসভার শারীরিক লক্ষ্য

মহাসভার কার্য্য-বিবরণে দেখা যায়, যে, বালক ও বালিকাদিগকে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়া

ব্যায়াম দ্বারা তাহাদের দৈহিক উন্নতি সাধন মহাসভার অন্যতম উদ্দেশ্য। তদ্ভিন্ন, অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক লোকদের জন্যও আখাড়া আদি স্থাপন করিয়া হিন্দু-সমাজকে বলিষ্ঠ লোকদের সমাজ করিয়া তুলিবার ইচ্ছাও মহাসভার আছে। কোন সম্প্রদায়ের সুস্থ সবল কার্য্যক্ষম হইবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। ইহাতে অন্য কোন সম্প্রদায়ের আপত্তির কারণ কিছুই নাই। বলিষ্ঠ হইবার অধিকার মানবের সাধারণ অধিকার।

অবশ্য বর্ত্তমানে হিন্দুদের বলিষ্ঠ হইবার ইচ্ছার কারণ সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা অনুমান হইতে পারে। অহিন্দু কোন সম্প্রদায় মনে করিতে পারেন, যে, তাঁহাদের সহিত বিরোধ করিবার জন্য, তাঁহাদের সহিত লড়িয়া তাঁহাদিগকে জব্দ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত, এই চেষ্টা হইতেছে। মহাসভার নেতারা বলিয়াছেন, তাঁহাদের এরূপ কোন কু-অভিপ্রায় নাই; এবং তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। ইহা বাঁচিয়া থাকিবার ও আত্মরক্ষার চেষ্টা মাত্র।

কোন হিন্দু বা হিন্দুদের কোন দল বা জাতি কস্মিন্‌কালেও গায়ে পড়িয়া প্রথমেই আততায়ী হইয়া কোন অহিন্দু ব্যক্তি, দল বা জাতিকে আক্রমণ করে নাই, এরূপ অসত্য কথা বলিতেছি না; কিন্তু সাধারণভাবে এই উক্তি সত্য, যে, হিন্দুরা সাম্রাজ্যস্থাপক (imperializing) জাতি নহে, তাহারা বিজাতি ও বিদেশীকে নিজের অধীন করিবার চেষ্টা করে নাই। তাহারা খুব সাধু নির্লোভ জাতি বলিয়া ইহা করে নাই, দুর্ব্বল বা সাহসহীন বলিয়া করে নাই, কিম্বা অন্য কোন কারণে করে নাই, সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না। বিদেশীকে অধীন করিবার চেষ্টা তাহারা করে নাই, কেবল ইহাই বলিতেছি। কারণ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না। ভারতীয়দের প্রভাব মধ্য-এসিয়ায় তিব্বতে চীনে জাপানে ব্রহ্ম শ্যাম আসাম কাম্বোডিয়া প্রভৃতিতে লক্ষিত হয়। জাভা প্রভৃতি দ্বীপেও লক্ষিত হয়। কিন্তু বিস্তৃত হিন্দু সাম্রাজ্যের রাজধানী রহিল ভারতবর্ষে, আর মধ্য এশিয়া তিব্বত চীন জাপান প্রভৃতি দেশ অথবা জাভা প্রভৃতি ভারত-মহাসাগরের দ্বীপ সেই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও অধীন রহিল, ইতিহাসে এরূপ রাষ্ট্রীয় অবস্থার কোন বর্ণনা বা প্রমাণ নাই। কোন কোন দ্বীপে হিন্দুরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথাকার আদিম অধিবাসীদের সহিত মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে, এইরূপ দেখা যায়। ঔপনিবেশিকরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার সময় হয়ত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এরূপ কোন বর্ণনা বা ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, যে, হিন্দুরা বিদেশে গিয়া তথাকার অধিবাসীদিগের হইতে স্বতন্ত্র বিজেতা একটি জাতিরূপে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া আছে।

আমরা যাহা লিখিলাম, তাহার কোন কথারই ব্যতিক্রমস্থল বাহির করা যাইবে না, এরূপ বলিবার মত ঐতিহাসিক জ্ঞান আমাদের নাই। কিন্তু আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, বিদেশী, বিধর্ম্মী ও বিজাতি সম্বন্ধে হিন্দুরা সাধারণতঃ প্রথমেই গায়ে পড়িয়া আততায়িতা করে নাই। কেন এরূপ ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না; কিন্তু আমাদের ধারণা এই, যে, হিন্দুর জাতীয় প্রকৃতির এই বর্ণনা সাধারণভাবে সত্য।

হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাসে ইহা যেমন সাধারণ ভাবে সত্য, মুসলমান রাজত্বকালেও সাধারণভাবে ইহা তেমনি সত্য। মুসলমানেরা বাহির হইতে যখন এদেশ আক্রমণ করেন, তখন তাঁহারা কেন আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন আলোচনা এখানে করিব না। অনেকে কেবল হয়ত তাঁহাদের ধর্ম্মবিস্তারের জন্যই করিয়াছিলেন। কারণ যাহাই হউক, আজকালকার মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা বিজেতাদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন তাঁহারা তদ্দ্বারা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন; ইহা দেখিয়া বুঝা যায়, যে, ভারত আক্রমণ তাঁহারা দোষের বিষয় হইয়াছিল মনে করেন না। প্রথম ঢিল বিদেশী মুসলমানেরাই ছুড়িয়াছিলেন, আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই; হইতে পারে, যে, তাঁহাদের বিশ্বাস অনুসারে মহৎ উদ্দেশ্যে ছুড়িয়াছিলেন। তাহার পর মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুমুসলমানে যত যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার সবগুলির জন্য মুসলমানরাই দায়ী, ইহা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। কিন্তু সাধারণভাবে ইহা সত্য, যে, হিন্দুরা লড়িয়াছে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, স্বাধীনতারক্ষা ও

আত্মরক্ষার জন্য। মুসলমান-রাজত্বকালে যে দুই ভারতীয় শক্তি প্রবল হইয়াছিল, অর্থাৎ মরাঠা ও শিখ শক্তি, স্বাধীনতা লাভ ও আত্মরক্ষাই তাহাদের মূল মন্ত্র ছিল।

মুসলমান রাজত্বের শেষদিকে ইউরোপীয় নানা জাতি অর্থলোভে ভারতবর্ষে আসে। ভারতীয় মুসলমান বা হিন্দু তাহাদের সহিত প্রথম বিরোধের জন্য দায়ী নহে। হিন্দু ও মুসলমান তাহাদের বাণিজ্যের সুবিধাই করিয়া দিয়াছিল। বিরোধের সূত্রপাত ইউরোপীয় জাতিরাই করে।

আধুনিক কালে যত দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই হিন্দুরা প্রথমে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করে নাই, ইহা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। এরূপ আক্রমণের দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু মোটের উপর, অধিকাংশ স্থলে, সাধারণভাবে, ইহা সত্য, যে, এই-সব দাঙ্গার কারণ মুসলমানেরা। অন্য প্রদেশের ঠিক্ খবর আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু বঙ্গে নারীর উপর আক্রমণও অধিকাংশ স্থলে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা করিয়া থাকে।

মুসলমানদিগকে দোষ দিবার জন্য আমরা এসব কথা লিখিতেছি না। আমরা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব প্রার্থনা করি। অনাবশ্যক সমালোচনার দ্বারা সে সদ্ভাবের পথে বাধা জন্মাইতে আমরা সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। আমরা কেবল ইহাই দেখাইতে চাই, যে, যে-যে-কারণেই হউক, হিন্দুর প্রকৃতি যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা আক্রমণশীল (aggressive) নহে। যে-সকল প্রদেশে হিন্দুরা দৈহিকবলসম্পন্ন, সেখানেও সাধারণতঃ তাহারা প্রথমেই আক্রমণশীল নহে।

অতএব, ইহা সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠার সহিত বলা যাইতে পারে, যে, এখন যদি হিন্দুরা বলিষ্ঠ ও সংঘবদ্ধ হইতে চায়, তাহা কাহাকেও আক্রমণ করিবার জন্য নহে। তাহা নারীর মান-ইজ্জৎ রক্ষা, আত্মরক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য। কেননা, ইহা সত্য নহে, ও সত্য হইতে পারে না, যে, বিধাতা হিন্দুদিগকে মার খাইবার জন্য, অপমানিত হইবার জন্য, হৃতসর্ব্বস্ব হইবার জন্য, এবং তাহাদের অসহায়া নারীদিগকে মরণাধিক দুঃখ ভোগ করিবার জন্য, সৃষ্টি করিয়াছেন। অহিন্দুদের কাহারও এরূপ ধারণা থাকিলে, তাহা ভুল। হিন্দুরা কাপুরুষবৎ আচরণ দ্বারা ইহা মানিয়া লইলে, ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাঁহাদের লুপ্ত হওয়া উচিত, এবং হয় তাঁহারা লুপ্ত হইবেন, নয় ভারবাহী পশুর মত হইয়া থাকিবেন;—তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।

হইতে পারে, যে, আমরা যাহাই লিখি, বা অন্য সম্পাদকেরা যাহাই লিখুন, মুসলমানেরা মনে করিবেন, যে, মহাসভার চেষ্টা তাঁহাদের বিরুদ্ধে কিছু করিবার জন্য। হইতে পারে, যে, ইংরেজরাও মনে করিবে, হিন্দুদের কোন রাষ্ট্রীয় মৎলব আছে। কিন্তু যিনি যাহাই মনে করুন, তাহা সত্ত্বেও আত্মসংশোধন, আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার চেষ্টা হিন্দুদিগকে করিতেই হইবে।

এই চেষ্টাকে পর-আক্রমণ-চেষ্টা বলিয়া মনে করা কেন ঠিক্ হইবে না, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা হিন্দুপ্রকৃতিকে সাধারণতঃ যেরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি না। কিন্তু এরূপ আশা করা যাইতে পারে, যে, সকলেই স্বীকার করিবেন, যে, খৃষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী ও মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী জাতিরা যে-পরিমাণে পর-আক্রমণশীল (আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতেছি না), হিন্দুরা সে-পরিমাণে নহে ও ছিল না। বলিষ্ঠ ও সংঘবদ্ধ থাকিবার বা হইবার চেষ্টা পৃথিবীতে সকলেই করিতেছে। কেবলমাত্র হিন্দুরাই তাহা করিলে তাহা দোষের বিষয় হইবে, এরূপ মনে করিতে পারি না।

—

মহাসভা ও হিন্দুমুসলমানের মিলন

অনেকে মনে করেন এবং কেহ কেহ বলিতেছেন, যে, হিন্দুমহাসভার কার্য্য দ্বারা হিন্দুমুসলমানের মিলনে ব্যাঘাত হইবে, বা মিলন ভাঙিয়া যাইবে। মুসলমানেরা বরাবর যে-সব বৈধ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, হিন্দুরা তাহা করিলেই যদি মিলন না হয়, তাহা হইলে সে মিলনের কোন মূল্য নাই। মুসলমানেরা অমুসলমানকে মুসলমান করিতে কখন বিরত

থাকিবেন না, এবং পূর্ব্বেও কখন ছিলেন না। যে নীতি তাঁহারা অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, সেই নীতি অন্যে অবলম্বন করিলে তাঁহাদের সঙ্গে মিলন না ভাঙাই উচিত। মুসলমান সমাজকে কেহ কখনও বলে নাই, "আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে আপনারা চলিলে, আপনাদের সমাজের দোষগুলির সংস্কার করিলে, কিম্বা ব্যায়ামাদি দ্বারা আপনারা দৈহিক উন্নতি করিলে, আমাদের সঙ্গে আপনাদের মিলন ভাঙিয়া যাইবে।" অতএব তাঁহারাও অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদিগকে এরূপ কথা বলিবেন না, ইহা আশা করা অন্যায় নহে। কোনও আপত্তিকারী বলিতে পারেন, যে, মানুষ (বিশেষতঃ সাধারণ মানুষের সমষ্টি) সকল সময়ে কেবলমাত্র যুক্তি বা ন্যায়ের দ্বারা চালিত হয় না; অতএব যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায়সঙ্গত আচরণ বা মনের ভাব যাহাই হউক, মুসলমানেরা হিন্দুমহাসভাকে সন্দেহের চক্ষেই দেখিবে। ইহার উত্তরে কেবল ইহাই বলিতে হয়, যে, তাহা হইলে নাচার। মুসলমানদিগকে খুসি রাখিবার জন্য হিন্দুরা নিজ রাষ্ট্রীয়, ধার্ম্মিক, সামাজিক ও দৈহিক উন্নতিসাধন হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে না।

আপত্তিকারী বলিতে পারেন, "এই দেখুন, মহাসভার কাজ ও শুদ্ধি-প্রচেষ্টা-বশতঃ মুসলমানেরা সাহারানপুরে কিরূপ লুটপাট ও অত্যাচার করিল।" উত্তরে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে, মোপ্‌লাদের নৃশংস অত্যাচার মহাসভার কাজ বা শুদ্ধি প্রচেষ্টার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ফল, ইহা কেহ কষ্টকল্পনা করিয়াও বলেন নাই বা ভাবেন নাই। তখন ত হিন্দুরা মুসলমানদিগকে যথাসম্ভব খুসি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং তাহাদের খিলাফৎ আন্দোলনে সম্পূর্ণ যোগ দিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আরা জেলায় যে ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার সঙ্গেও মহাসভার বা মাল্‌কানাদের শুদ্ধির সম্পর্ক স্থাপন অসম্ভব। তা ছাড়া, প্রতি-বৎসরই কোন কোন মুসলমান-পর্ব্ব-উপলক্ষে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া থাকে, খিলাফৎ-আন্দোলনে হিন্দুদের যোগদান সময়ের মধ্যেও হইয়াছে; সেগুলি, হিন্দুমুসলমান উভয়পক্ষের লোক গোঁড়ামি কুসংস্কার ও জিদ্ ত্যাগ না করিলে, নিবারণ করা দুঃসাধ্য; অসাধ্য নহে, যদি রাজশক্তি তাহা নিবারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

হইতে পারে, যে, মহাসভার চেষ্টা এবং মাল্‌কানাদের শুদ্ধি এই দুটি ঘটনা বিদ্যমান না থাকিলে সাহারানপুরে অত্যাচার হইত না, কিম্বা কিছু কম হইত। কিন্তু ইহা বিবেচনার মধ্যে আনিয়াও আমরা বলিতে পারি না, যে, হিন্দুরা পৃথিবীর অন্য সব জনসংঘ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বাভাবিক অধিকার হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত রাখুন। বরং ইহাই বলিব, তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য অধিকতর প্রস্তুত থাকুন। তাঁহারা যদি অধিকতর অত্যাচারের ভয়ে নিজের কর্ত্তব্য না করেন, তাহা হইলে অন্য যে-কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহাদিগকে জানাইতে পারেন, "তোমরা যেমন্‌টি আছ তেমনি থাক, তাহা হইলে কেবলমাত্র দস্তুরমত প্রহার লুণ্ঠনাদি করিব; কিন্তু যদি উন্নত, সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইতে চেষ্টা কর তাহা হইলে দস্তুরের মাত্রা অতিক্রম করিয়া আরো কিছু করিব।"

অনেকে এমন কথাও বলিয়াছেন, যে, এখন মহাসভার চেষ্টা ও মাল্‌কানাদের শুদ্ধি না করিলে ভাল হইত। আমাদের বিশ্বাস এই, যে, যে-কোন সময়েই হিন্দুরা অন্য সব সম্প্রদায়ের সাধারণ অধিকার অনুযায়ী কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তখনই এই আপত্তি হইবে, এবং আপত্তির সমর্থক ঘটনা ঘটাইবার লোকেরও অভাব হইবে না। অতএব, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হওয়া কোন সময়েই উচিত নয়। দুর্ব্বল ও অসংঘবদ্ধ থাকিয়া, কাহাকেও খুসি রাখিয়া, হিন্দুরা কখনও নিরাপদে নির্ভয়ে আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া জীবনযাপন করিতে পারিবেন না; মনুষ্যত্বের দ্বারা পারিবেন।

—

মিলনের ভিত্তি

যাহারা পরস্পরের মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধা করিতে পারে, আন্তরিক স্থায়ী মিলন কেবল তাহাদের মধ্যেই সম্ভব। ইহার মানে এ নয়, যে, পরস্পরকে ভয় করিলে তাহা হইতেই শ্রদ্ধা জন্মিবে, এবং সেই শ্রদ্ধার উপর মিলনের ভিত্তি স্থাপিত হইবে। ভয় হইতে শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়

না; কিন্তু আবার অন্য দিকে অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ থাকিলেও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় না। যাঁহারা পরস্পরের শক্তি ও সাহসে বিশ্বাসী, অথচ জানেন যে এই শক্তি ও সাহস মূলতঃ ও প্রধানতঃ পরস্পরের অনিষ্টের জন্য প্রযুক্ত হইবার নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে, তাঁহাদের পরস্পর শ্রদ্ধা জন্মে, প্রীতি জন্মে, যথার্থ মিলনের উদ্ভব হয়। সাময়িক প্রয়োজন বা স্বার্থসিদ্ধি, উভয়পক্ষের সাধারণ শত্রু তৃতীয় পক্ষের বিদ্যমানতা, ইত্যাদি কারণেও আপাতঃ মিলন হইতে পারে, কিন্তু তাহা পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধা-প্রীতি না থাকিলে, গভীর, স্থায়ী ও আন্তরিক হয় না।

কোন মহৎ রাষ্ট্রীয় আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে যদি সকল পক্ষ একযোগে চেষ্টা করেন, এবং তজ্জন্য একত্র আত্মোৎসর্গ এবং দুঃখ স্বীকার ও ভোগ করেন, তাহা হইলে তাহা হইতেও মিলনের উদ্ভব হইতে পারে। আবার, সেরূপ আচরণ মিলনসাপেক্ষও বটে। কিন্তু এ বিষয়েও হিন্দুমুসলমানের একলক্ষ্যতা ও ঐকমত্য ঠিক্ এক রকমের কি না, তাহা স্থিরচিত্তে গভীরভাবে চিন্তা করিবার বিষয়। অর্থাৎ কোন মুসলমান-শক্তি যদি প্রস্তাব করেন, যে, তিনি ভারত আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া ভারতীয় মুসলমানদের রাজত্ব এখানে স্থাপন করিয়া দিবেন, তাহাতে হিন্দুর ও মুসলমানের জবাব এক রকম হইবে কি না বিবেচ্য। পক্ষান্তরে, ভারতের বাহিরে এরূপ কোন হিন্দু-শক্তি নাই, যিনি ভারত আক্রমণ করিয়া ইংরেজের প্রভুত্ব নষ্ট করিয়া এদেশে হিন্দুর রাজত্ব স্থাপনের প্রস্তাব করিতে পারেন।

আমাদের বিবেচনায়, ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শে হিন্দু বা মুসলমান কাহারও রাজত্ব বা প্রভুত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে না। ভবিষ্যৎ স্বরাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির পৃথক্ পৃথক্ রাষ্ট্রীয় স্বার্থ থাকিবে না; এরূপ পৃথক্ স্বার্থের কল্পনা বিদ্যমান থাকিতে স্বরাজ্য স্থাপিত হইবে না। পৃথিবীর প্রকৃত স্বাধীন দেশ-সকলে যেমন ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্বিশেষে রাষ্ট্রীয় অধিকার ও কর্ত্তব্য সকলের আছে, ভারতীয় স্বরাজ্যেও তাহাই হইবে; তাহা না হইলে প্রকৃত স্বরাজ্য স্থাপিত হইবে না।

মিলনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি

আমরা বলিয়াছি, পরস্পরের মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে আন্তরিক মিলনের উৎপত্তি হয়। রফা বা চুক্তি হইতে প্রকৃত মিলন হয় না; কেন না, রফা ও চুক্তির সম্বন্ধে কোন না কোন পক্ষের বা পক্ষীয় কতকগুলি ব্যক্তির, "আমাদিগকে বেশী ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে", এইরূপ ধারণা থাকায়, অসন্তোষের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে।

মনুষ্যত্ব আত্মিক বস্তু। আত্মার গভীরতম চিরন্তন সত্য বস্তু হইতে ইহার উদ্ভব। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে-সব লোকে গভীরভাবে ইহা উপলব্ধি করেন, যে, ধর্ম্মমতের নাম যাহাই হউক, বিশ্বের আদি কারণ বিশ্বের আত্মার সহিত সকল মানুষের সম্বন্ধ এক, এবং এই অর্থে সকল মানুষ সমান, সেই-সব লোকের মধ্যে গভীর মিলন হয়। সাম্প্রদায়িক নামের, সাম্প্রদায়িক মতের, সাম্প্রদায়িক নানা অনুষ্ঠানের পার্থক্যে এই মিলনে ব্যাঘাত জন্মে না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বদর্শী লোকেরা এই-সব নাম-মত-অনুষ্ঠানাদিকে অবান্তর ও অপ্রধান মনে করেন, পরমাত্মার সহিত সকল মানুষের সাধারণ সম্বন্ধটিকে মূল, সার, ও প্রধান বস্তু মনে করেন। এইপ্রকার লোকের সংখ্যা যত বাড়িবে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবও তত বৃদ্ধি পাইবে।

যতদিন কোন এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদিগকে নিজ ধর্ম্মে আনিবার চেষ্টা করিবে, ততদিন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কেই এই অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতে বলা চলিবে না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, মানুষের সাম্প্রদায়িক নাম বদ্‌লান অপেক্ষা তাহার আত্মার নির্ম্মলতা-সাধন ও হৃদয়ের পরিবর্ত্তন অধিক দরকার;—"অধিক দরকার" বলাও ঠিক্ নয়, বরং বলা উচিত, যে, ধর্ম্মবিষয়ে আত্মার বিশুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিবর্ত্তনই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিষ। কেহ অন্য সম্প্রদায় ছাড়িয়া হিন্দু, খৃষ্টিয়ান্ বা মুসলমান হইলেন, কিন্তু আগেকার মতই পাপাসক্ত, সাংসারিক বা স্বার্থপর রহিয়া গেলেন, তাহাতে কি লাভ? অবশ্য নূতন ধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের আন্তরিক সুপরিবর্ত্তনও হয়, তাহা আমরা জানি। কিন্তু তাহা হইলেও, এপর্য্যন্ত নিজের

নিজের ধর্ম্মদল বাড়াইবার প্রবৃত্তিই মানুষের খুব প্রবল আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কি, তৎসম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, সেইরূপ মতের প্রভাব পৃথিবীতে ক্রমশঃ বাড়িতেছে। তাহার দুটি প্রমাণ দিতেছি। আমেরিকায় একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার নাম খৃষ্টীয়-ইহুদী-মোস্লেম সমিতি। এই সমিতি বলেন, "ঐ তিন ধর্ম্ম মূলতঃ এক; অতএব আমরা পরস্পরের মধ্যে একধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্মে কাহাকেও লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব না।" সমিতির স্থাপক ও সভ্যেরা সাধারণ সত্যের উপরই জোর দিতেছেন। ভারতবর্ষেও বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান্ সোশ্যাল্ রিফর্ম্মার কাগজে কোন কোন খৃষ্টিয়ান্ পাদ্‌রি লিখিয়াছেন, যে, তাঁহারা বাপ্তাইজ করার উপর ঝোঁক্ ছাড়িয়া বা কমাইয়া মানুষের আন্তরিক পরিবর্ত্তনের সমধিক চেষ্টাই শ্রেয় মনে করেন।

—

মনুষ্যত্ব ও সংখ্যা

নিজের নিজের সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির উপর ঝোঁক থাকা মোটেই ভাল নয়, এমন কথা আমরা বলি না। বৈধ উপায়ে সংখ্যাবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়। কারণ সংখ্যার মূল্য আছে। দশ জন খাঁটি মানুষের চেয়ে ষোল জন খাঁটি মানুষ বেশী কাজ করিতে পারে। দশ জন দক্ষ একমত মানুষের চেয়ে কুড়ি জন ঐরূপ মানুষের দ্বারা কাজ বেশী হয়; কিন্তু শুধু সংখ্যায় বেশী কিছু হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে প্রচুর রহিয়াছে। যখন ফ্রান্স্ হইতে নর্ম্যান্‌রা আসিয়া ইংলণ্ড জয় করিয়া ইংলণ্ডে রাজত্ব স্থাপন করে, তখন তাহারা ইংলণ্ডের তাৎকালিক অধিবাসীদের চেয়ে সংখ্যায় খুব কম ছিল। বিদেশ হইতে মুসলমানেরা অসিয়া যখন ভারতের কোন কোন প্রদেশ জয় করে, তখনও আগন্তুকেরা ভারতীয়দের চেয়ে সংখ্যায় কম ছিল। তাহার পরও মুসলমানেরা কখনও ভারতে সংখ্যায় অধিকতম না হওয়া সত্ত্বেও বহুশতাব্দী প্রভুত্ব করিয়াছিল। ইংরেজরা মুসলমান বিজেতাদের চেয়েও সংখ্যায় কম থাকা সত্ত্বেও ভারত জয় করিয়াছে, এবং এখনও প্রভুত্ব করিতেছে।

কেবল দেশ-জয় ও শাসনেই যে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় তাহা নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা যায়। খৃষ্টীয় মিশনারী ও খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ভারতের অন্যান্য পুরোহিত উপদেষ্টা ও সম্প্রদায় অপেক্ষা সংখ্যায় কম। কিন্তু তাহাদের বিদ্যালয় কলেজ ও নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সংখ্যায় উৎকর্ষে ও সুপরিচালনে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানসকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অতএব, হিন্দুমহাসভা অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে মানুষকে স্বধর্ম্মে গ্রহণ করুন, তাহাতে আমরা কোন দোষ দেখিতেছি না ও আপত্তি করিতেছি না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মহাসভা, মানুষ কেমন করিয়া খাঁটি হয়, নির্ম্মলাত্মা বিশুদ্ধহৃদয় শক্তিশালী হয়, তাহাও গভীরভাবে চিন্তা করুন। এখনও ত ভারতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী; মালাবারেও বেশী ছিল। তথাপি, মোপ্‌লাদের ও অন্য মুসলমানদের হাতে অধিকাংশ স্থলে হিন্দুরাই কেন লাঞ্ছিত হয়? ইহার প্রতিকার সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা হইবে না।

আমরা কেবল দাঙ্গাহাঙ্গামা লুটপাট মারামারির কথা ভাবিয়াই মানুষ হইবার চিন্তা করিতেছি না। আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিতে হইয়াছে। এই সাম্রাজ্যে শাদা মানুষের চেয়ে অন্য রঙের মানুষের সংখ্যা খুব বেশী, ভারতীয়দের সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু আমরা যে শুধু পরাধীন হইয়াই আছি, তাহা নহে; প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের দীনতা বেশী। শুধু কলকারখানা, বাণিজ্য, বাণিজ্য-জাহাজে নয়; চারিত্রিক ও মানসিক সম্পদেও আমরা হীন। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন শিল্প জনহিতৈষণা, কোন ক্ষেত্রেই আমরা শাদা মানুষের সমকক্ষ নহি। তাহারা উন্নতি করিতেছে; নিজেদের দোষ যাহা আছে ও হইয়াছে, তাহার উদ্‌ঘাটন ও সংশোধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহারা স্থিতিশীল নহে, গতিশীল; এবং এই গতিটার মুখ তাহারা অগ্রসর হইবার দিকে রাখিতে সচেষ্ট। আমরা কি তাই? তাহা ত নয়। আমরা পূর্ব্ব গৌরব লইয়া ব্যস্ত, সে গৌরব-কাহিনীও আবার শাদা মানুষরাই আমাদিগকে প্রথমে শুনাইয়াছে। আধুনিক কালের এক আধজন ভারতীয়ের

কৃতিত্বের আমরা এমন বড়াই করি, যে, তাহা শুনিয়া বিদেশের লোকেরা হাসে।

"আমরা"র অর্থ শুধু হিন্দু নহে। মুসলমান বৌদ্ধ প্রভৃতি সকলেই এই আমরার অন্তর্গত। মুসলমানরাও পূর্ব্বগৌরব লইয়া মুগ্ধ; এই পূর্ব্বগৌরবের কথা তাঁহারাও শাদা মানুষদের কেতাবে প্রথম পড়িয়াছেন। বর্ত্তমানে কমাল পাশার অবদানে তাঁহারা গৌরবান্বিত। সে সুখভোগ তাঁহারা করুন। কমাল পাশার সত্যই বাহাদুরী আছে। কিন্তু ইহাও ভাবিয়া দেখুন, যে, ইউরোপীয় মিত্রশক্তিদের পরস্পর ঈর্ষ্যাবিবাদ এবং ফ্রান্সের সাহায্য ব্যতিরেকে কমাল পাশা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। তা ছাড়া, কমাল পাশা আগেকার বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যের সামান্য একটু অংশে মাত্র মুসলমান অধিকার স্থাপন করিয়াছেন। মুসলমানেরা ভাবিয়া দেখুন, আগে মুসলমানেরা কত দেশে স্বাধীন ও কত দেশে প্রভু ছিলেন; ক্রমশঃ তাহা সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর সীমায় আবদ্ধ কেন হইল? শুধু বাহুবলের অভাবে নয়, চারিত্রিক, নৈতিক, মানসিক অবনতিতে ইহা ঘটিয়াছে। মুসলমানেরা যখন ইউরোপের বহুদেশ জয় করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা শুধু বাহুবলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। জ্ঞানেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন,—জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে নূতন কিছু দিবার, শিল্পে সাহিত্যে ইতিহাসে বিজ্ঞানে দর্শনে নূতন কিছু করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল। এখন নাই। এখন ব্যবস্থাপক সভা আদিতে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি, বেশীসংখ্যক চাকরী, ইত্যাদির দ্বারা সে নষ্ট গৌরবের উদ্ধার হইবে না; নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের দ্বারা ঈদ্ বকরীদ্ মহরমের সময় দাঙ্গা লুট প্রভৃতির দ্বারা ত নহেই। শুধু বাহুবলের দিন আর নাই, তাহা প্রবল খৃষ্টিয়ান্ জাতিরাও বুঝিয়াছে। মনুষ্যত্বের আদর্শই বদলাইয়া গিয়াছে।

এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষকে ও এসিয়াকে নানা ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ্ দিয়াছিল। এখন মহাবোধি-সোসাইটির পত্রিকায় খৃষ্টিয়ান্ ও মুসলমানদের উদ্দেশে আক্রোশ প্রকাশ দ্বারা সে অবস্থার পুনরুদ্ধার হইবে না।

—

স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার প্রয়োজন কি?

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আদর্শ যে স্বরাজ্য তাহার সিদ্ধির জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৃথক্ পৃথক্ সমিতির প্রয়োজন নাই; কিন্তু কোন সম্প্রদায় নিজের স্বার্থ বা আদর্শ স্বতন্ত্র মনে করিয়া তাহার সাধনায় ব্যাপৃত থাকিলে তাহাতে বাধা দেওয়া বা আপত্তি করা উচিত নহে। অথচ কোন একটি সম্প্রদায় এরূপ স্বতন্ত্রপন্থী হইলে, অন্যেরাও সেইরূপ পথের পথিক হইতে চাহিলে তাহাতেও কিছু বলা চলে না। তথাপি, আমরা বলি, যাঁহারা শিক্ষায় জ্ঞানে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানের আলোচনায় সমধিক অগ্রসর, তাঁহারা স্বতন্ত্রপন্থীদের চেষ্টায় কিছু মনে না করিয়া, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের সম্মিলিত রাষ্ট্রীয় সাধনাকেই পুষ্ট করিতে থাকুন। কিন্তু সামাজিক বিষয়ে এবং ধার্ম্মিক কোন কোন দিকে মুসলমানদের যেমন, তেমনি হিন্দুদেরও স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। মুসলমান ধর্ম্ম ও সভ্যতার একটি বিশেষ প্রকৃতি আছে, যাহার নিকট জগৎ ঋণী আছে; এবং ভবিষ্যতে এই ঋণ আরও বাড়িতে পারে, যদি মুসলমানেরা তাঁহাদের ধর্ম্মের ও সভ্যতার বাহ্য ব্যাপারগুলিতে আবদ্ধ না থাকিয়া তাহার প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা কথায় ও কাজে জগতের সমক্ষে ধরিতে পারেন। ভারতবর্ষে উদ্ভূত ধর্ম্ম ও সভ্যতারও একটি বিশেষ প্রকৃতি আছে। ভারতবর্ষীয় সমাজেরও একটি বিশেষ আদর্শ আছে। এই সকলের প্রভাব জগতের উপর ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে, এবং আরও হইবে, যদি আমরা কেবল বাহিরের জিনিষগুলি লইয়া আত্মবিস্মৃত না হই। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সমাজের আদর্শ জগৎ হইতে লুপ্ত হইলে জগতের ক্ষতি হইবে। ব্যাপক অর্থে একটি হিন্দুসমাজ না থাকিলে ঐ আদর্শ লুপ্ত হইতে পারে।

—

ইংরেজ রাজত্ব ও আত্মরক্ষার উপায়

হিন্দুমহাসভার সভাপতির বক্তৃতা ও নির্দ্ধারিত কোন্ কোন প্রস্তাব পড়িলে কোন সন্দেহ থাকে না, যে, আত্মরক্ষা মহাসভার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা গোপন করা হয় নাই, করা উচিতও হইত না।

কথা উঠিতে পারে, যে, ইংরেজরাজশক্তি থাকিতে আত্মরক্ষার উপায় ভাবিবার আবশ্যক কি? প্রশ্নটা অদ্ভুত। অতীতে আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়াই ত ইংরেজের আবির্ভাব। বর্ত্তমানে আত্মরক্ষা করিতে পারি না বলিয়াই ত ইংরেজ এদেশে স্থায়ী ভাবে প্রভুত্ব করিবার দাবী করে। যাহা হউক, এসব বড় কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম।

স্বাধীন দেশসকলে লোকে নিরাপদে থাকিবার জন্য রাজশক্তির সাহায্যের উপর, পুলিশের সাহায্যের উপর, সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে না। তাহারা আত্মরক্ষাতেও অভ্যস্ত। আমরা যদি স্বাধীন হইতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকেও আত্মরক্ষায় সমর্থ ও অভ্যস্ত হইতে হইবে।

"প্যাক্স্ ব্রিটানিকা"র অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শান্তির বড়াই ইংরেজরা খুব করিয়া থাকেন। কিন্তু ডাকাত ও গুণ্ডার অত্যাচারও খুব চলিতেছে। ব্রিটিশ শক্তির দ্বারা ইহার প্রতিকার কই হইতেছে?

তাহার পর, দাঙ্গা হাঙ্গামা লুটপাট, মোপ্‌লা বিদ্রোহ ও উপদ্রব, পুলিশের ও সৈনিকদের উপদ্রব, অত্যাচার ও গুলিবর্ষণ, এসব আছে। পুলিশের ও সৈনিকদের গুলি বর্ষণ হইতে আত্মরক্ষার কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দিতেছি। সেরূপ আত্মরক্ষার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহার দ্বারা জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব বা স্বাধীনতা পর্য্যন্ত লাভ করা যায়। কিন্তু বেসরকারী লোকদের দ্বারা দাঙ্গা হাঙ্গামা লুটপাট অত্যাচার হইতে, ডাকাত ও গুণ্ডার হাত হইতে, আমাদের আত্মরক্ষার সামর্থ্য লাভে ইংরেজদের কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়।

আত্মরক্ষার জন্য অপর কাহারও উপর নির্ভর করাতেই মনুষ্যত্বের অবমাননা আছে। সেই জন্য আমরা আত্মরক্ষায় সমর্থ হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

তা ছাড়া, বেসরকারী লোকদের অত্যাচার উপদ্রব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য উভয়ই যদি ইংরেজ প্রভুদের থাকে, তাহা হইলে আমরা রক্ষিত হই না কেন? ইচ্ছা ও সামর্থ্য এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি আছে কোন্‌টি নাই, বলিতে পারি না; কিন্তু কোন্‌টির বা উভয়ের অভাব বা ন্যূনতা আছে বলিয়াই যে আমাদিগকে দুঃখ ও অপমান ভোগ করিতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু, অত্যাচার উপদ্রব হইয়া যাইবার পর ইংরেজ স্বয়ং ও তাহার তরফের লোক আসিয়া, "শান্তি ও শৃঙ্খলা" স্থাপন করেন, এবং কখন স্পষ্ট করিয়া কখন প্রকারান্তরে বলেন, "ভাগ্যে আমরা ছিলাম, নতুবা তোমাদের কি দশা হইত? অতএব আমরা তোমাদের জন্য বরাবরই এদেশে থাকিব।" এও কম দুঃখ ও অপমান নহে।

বেসরকারী যে-সব লোক অত্যাচার করে, তাহারাই যদি প্রভু হয়, তাহা হইলে হয় ত বা তাহাদের একটা দায়িত্ব-বোধ আসিতে পারে, কিম্বা তাহাদের সঙ্গে বুঝা-পড়া চলিতে পারে, অথবা তাহাদেরই দাস হইতে হয়, হয়ত বা যুদ্ধ দ্বারা আত্মকর্ত্তৃত্বও লব্ধ হইতে পারে। কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান অবস্থাকে উভয়সঙ্কট বলা যাইতে পারে। এ অবস্থায় সরকারী গুঁতো আছে, আবার বেসরকারী গুঁতোও আছে। বেসরকারী ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের মিত্রতা রফা ও আপোসে নিষ্পত্তিতে ইংরেজ রাজী নহে; কারণ, তাহাতে (১) তাহার ভেদনীতি বাধা পায় ও ব্যর্থ হয়, (২) শান্তিরক্ষক ও নিরপেক্ষ বিচারকরূপে তাহার অস্তিত্ব অনাবশ্যক বলিয়া প্রমাণিত হয়, এবং (৩) তাহার প্রভুত্ব অস্বীকৃত হয়। বেসরকারী ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের গুঁতোগুঁতি চরম সীমায় পৌঁছিয়া কোন এক পক্ষ গোলাম ও অপর পক্ষ প্রভু হইবারও জো নাই; কারণ, শেষ পর্য্যন্ত দেশের সকল পক্ষকেই ঠ্যাঙাইয়া ঠাণ্ডা করিবার জন্য, সকলের মাথায় ইংরেজ আছেন। অতএব, দেশের যে-কোন সম্প্রদায় আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিবেন, তাঁহাদিগকে ইংরেজের সন্দেহভাজন হইতে হইবে, ও অন্য কোন না কোন সম্প্রদায়-বিশেষেরও সন্দেহভাজন হইতে হইবে, এবং হয়ত এই উভয়ের নিকট হইতে বাধা পাইতে হইবে। তথাপি মহাসভা যে কাজে হাত দিয়াছেন, তাহা হইতে নিরস্ত হইতে পারেন না। যদি নিরস্ত হন, ত, বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের মনুষ্যত্ব লুপ্ত হইয়াছে, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি এবং সংঘবদ্ধতা

ভারতীয় হিন্দুরা যুদ্ধের জন্য কিম্বা কাহাকেও অধীন করিয়া প্রভু হইবার জন্য সংঘবদ্ধ হইতে চাহিতেছেন না; শান্তভাবে নিজেদের কল্যাণসাধন ও স্বার্থরক্ষা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের জন্য কিম্বা অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপন ও রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া যাহাতে সহজ হয়, অন্য কোন উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইতে হইলেও তাহার প্রয়োজন আছে। এক এক প্রকারের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমত, এক এক প্রকারের ধর্ম্মনীতি ও চারিত্রিকগুণ মানুষকে সংঘবদ্ধ হইতে সাহায্য করে। সন্দর্ভ-লেখক ও সাংবাদিক ওয়াল্‌টার্ ব্যাজট্ (Walter Bagehot) তৎপ্রণীত ফিজিক্স্ এণ্ড্ পলিটিক্স্ (Physics and Politics) নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে লিখিয়াছেন :—

"Those kinds of morals and that kind of religion which tend to make the firmest and most effectual character are sure to prevail, all else being the same; and creeds and systems that conduce to a soft limp mind tend to perish, except some hard extrinsic force keep them alive. Thus epicureanism never prospered at Rome, but stoicism did; the stiff serious character of the great prevailing nation was attracted by what seemed a confirming creed, and deterred by what looked like a relaxing creed. The inspiriting doctrines fell upon the ardent character, and so confirmed its energy. Strong beliefs win strong men and then make them stronger. Such is no doubt one cause why Monotheism tends to prevail over Polytheism; it produces a higher, steadier character, calmed and concentrated by a great single object; it is not confused by competing rites, or distracted by miscellaneous deities. Polytheism is religion *in commission*, and it is weak accordingly. But it will be said, the Jews, who were monotheist, were conquered by the Romans, who were polytheist. Yes, it must be answered, because the Romans had other gifts; they had a capacity for politics, a habit of discipline, and of these the Jews had not the least. The religious advantage *was* an advantage, but it was counter-weighed." Pp. 76-77.

হিন্দু মহাসভার নেতা ও প্রধান প্রধান সভ্যগণকে ব্যাজটের এই মন্তব্যগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

—

জাতির জাতীয়তা

জাতির জাতীয়তা অথবা জাতির প্রাণ বলিতে কি বুঝায়? জাতির বাহ্য-প্রকৃতি অথবা দেহ বলিতেই বা কি বুঝায়? কেহ বলিবেন, কিছুই বুঝায় না। কেননা, জাতি একটা ধারণা বা সংস্কার মাত্র, তার প্রাণবত্তা কিম্বা বাহ্য-আকৃতি বলিয়া কিছু নাই। জাতির স্বভাব, জাতির শোক দুঃখ, জাতির আকাঙ্ক্ষা বলিতে কতকগুলি ব্যক্তির স্বভাব ও মানসিক অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না। ব্যক্তিকে ছাড়া জাতি কোথায়? কেবল এক একটি ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র বোধশক্তি ও অন্যান্য মনোবৃত্তি আছে; এক একটি জাতির স্বতন্ত্র এরূপ কিছু নাই। অনেকগুলি ব্যক্তির স্বভাবই জাতীয় স্বভাব, তাহাদের আকাঙ্ক্ষাই জাতীয় আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের আদর্শই জাতীয় আদর্শ, ইত্যাদি।

ভাল কথা, কিন্তু সেই ব্যক্তিসংঘের ব্যক্তিদের স্বভাব কোন এক বিশেষ প্রকার কেন? তাহাদের আকাঙ্ক্ষার গতিই বা কোন বিশেষ দিকে কেন? এবং তাহারা বিশেষ এক আদর্শকেই বা অবলম্বন করিয়া আছে কেন? কোন্ শক্তির প্রভাবে ভারতের হিন্দু জাতির ব্যক্তিগণ দয়া ধর্ম্ম পাপ পুণ্য, উচিত অনুচিত ইত্যাদি বিষয়ে মোটের উপর একভাবাপন্ন? কেনই বা আজ ভারতের সকল ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা একাভিমুখ? অকারণে কি এরূপ হয়?

ব্যক্তির মনোবৃত্তিগুলি যে কোন বিশেষ প্রকারের হয়, তাহার কারণ ব্যক্তির শরীর মন, তাহার বংশগত গুণ এবং নানাপ্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল মাত্র। বংশগত গুণাবলীর ফলেই মানুষ অনেকাংশে একপ্রকার আকৃতি এবং প্রকৃতি লাভ করে—কিন্তু মাতৃগর্ভে অবস্থান-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার পারিপার্শ্বিক যাহা কিছু, সকলই তাহার আকৃতি ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। পারিবারিক এবং তৎসঙ্গে সামাজিক শিক্ষা ও উদাহরণ মানুষকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করে। বাহ্য অর্থনৈতিক কারণও এইরূপ শক্তিশালী।

এখন যদি কোন দেশে এক অথবা সম্পর্কিত বংশের অনেকগুলি মানুষ একত্র বাস করে, যদি একত্র বাস ও পরস্পরকে সাহায্য করিয়া তাহাদের এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, এক প্রকার আচার ব্যবহার, এক প্রকার চাষ বাস, এক রকম ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রথা প্রভৃতি গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে সেই দেশে, সেই ব্যক্তিসংঘের ব্যক্তিগণের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বিশেষরূপে দেখা যাইবে। এক-ভাবাপন্ন ও এক-অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ যদি একাভিমুখ হয়, তাহাও স্বাভাবিক। কিন্তু আদর্শ

ও আকাঙ্ক্ষা অল্পে অল্পে গড়িয়া উঠে। যে আকাঙ্ক্ষা, যে আদর্শ আজ কোন মহাপ্রাণ পুরুষের মধ্যে রহিয়াছে, তাহাই ক্রমশঃ এক হইতে দুইএ, এক পরিবার হইতে আর-এক পরিবারে, গ্রামে, এইরূপে দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। তাহার পর, শিক্ষার মধ্য দিয়া, উদাহরণের মধ্য দিয়া, বীরপূজার মধ্য দিয়া, সেই মহৎ আদর্শ অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা যুগে যুগে সেই দেশের মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতে থাকে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, নানা প্রকার আনুরূপ্যের ফলেই জাতির জাতীয়তা গড়িয়া উঠে। দেশ, ভাষা, ধর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য, বর্ণ, সৌন্দর্য্য, আচার ব্যবহার, ইত্যাদি বিষয়ে সদৃশতাই অনেকগুলি ব্যক্তিকে জাতিতে পরিণত করে। সেই সদৃশতার অভাবেই কোন বন্দরের বাসিন্দা ইংরেজ কাফ্রি ইহুদি আরব মালয় ইত্যাদির কোন একজাতীয়তা নাই। নানা বিষয়ে সদৃশতা থাকা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন সাদৃশ্যের প্রগাঢ়তা; অর্থাৎ নানা বিষয়ে আনুরূপ্য না থাকিলেও, যদি কোন এক বিষয়ে অতি প্রগাঢ় সাদৃশ্য বা ঐক্য থাকে, তাহা হইলে ফলে জাতীয়তা গড়িয়া উঠিতে পারে। যথা, ইস্‌লামের প্রভাবে নানা প্রকারের লোকের একজাতি হইয়া উঠিবার চেষ্টা, অথবা নানা প্রকার, নানাধর্ম্মাবলম্বী, নানাভাষী ভারতবাসীগণের শুধু রাজনৈতিক আদর্শের প্রগাঢ় সদৃশতার জন্য একজাতীয়তায় অনুপ্রাণিত হওয়া। অথবা হিন্দুধর্ম্মের বা আদর্শের ফলে নানা বংশীয় এবং নানা-ভাষাভাষী ব্যক্তিগণের জাতীয়তা গড়িয়া উঠা। তাহা হইলে দেখিতেছি, যে, জাতীয়তা অল্পে অল্পে গড়িয়া উঠে এবং সদৃশতার নানাত্ব অথবা প্রগাঢ়তাই ইহার মূলে। জাতীয়তা গঠনের উপর মহাপুরুষদিগের প্রভাব বিশেষ-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার ফলে দেখা যায়, যে, যদিও জাতি বলিয়া কোন স্বতন্ত্র চৈতন্যবান্ প্রাণী নাই, তথাপি ব্যক্তিগণ জন্মাবধি তাহার প্রভাবে বাড়িয়া উঠে। জন্মাবধি তাহারা যে ভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিতে শিখে, তাহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের (বা তাহাদের নিজেদের) ইচ্ছানুসারে নহে। বহুযুগব্যাপী ক্রমবিকাশের ফলে ব্যক্তিসংঘের মধ্যে আদর্শ আকাঙ্ক্ষা পাপ পুণ্য ইত্যাদি বিষয়ে একটি একত্ব গড়িয়া উঠে। শিশুর শিক্ষা সেই-সকল ধারণার প্রভাবেই হইয়া থাকে; পিতা মাতা শিক্ষক বন্ধু সেই জাতীয়তার প্রতিনিধি মাত্র। এই জাতীয়তা বয়সের সহিত ক্রমশঃ দুর্ব্বল না হইয়া উত্তরোত্তর শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। নূতন নূতন প্রভাব তাহার উপর আসিতে পারে, কিন্তু তাহার ফলে জাতীয়তা নব শক্তি লাভ করে। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে জাতীয় আদর্শ যাহা ছিল, আজ তাহা না থাকিতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র চারার সহিত বৃহৎ বৃক্ষের যে সম্বন্ধ, অতীত আদর্শের সহিত বর্ত্তমান আদর্শের সেই সম্বন্ধ। আদর্শের পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই হইতেছে; ব্যক্তিই সেই পরিবর্ত্তনের কারণ। আবার ব্যক্তিই সেই পরিবর্ত্তিত আদর্শকে আপনার বলিয়া নিজের প্রাণশক্তি দিয়া রক্ষণ ও পোষণ করিতেছে। নিজের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে মানুষ দুর্ব্বলতা বলিয়া জাতীয়তার নিকট বলিদান দিতেছে; তাহার কারণ জাতীয়তার প্রচণ্ড শক্তি। পুরাতন ঈজিপ্টের বিশাল মন্দির, রহস্যময় পিরামিড, আচার ব্যবহার, দুর্ব্বোধ স্ফীংক্স্ (Sphinx) এবং নিদর্শনাত্মক মণ্ডন প্রভৃতি লইয়া যে প্রহেলিকা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটি প্রস্তর ব্যক্তির হস্তেই গঠিত। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি মন্ত্রমুগ্ধের মত জাতীয়তা অনুসরণ করিয়া সেই স্বপ্নরাজ্য গঠন করিয়াছিল।

যখন জাতীয়তা সজাগ থাকে, তখন জাতির সকল ব্যক্তিই স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সঙ্গে সংঘের আদর্শকে আপনার করিয়া লয়। কিন্তু কখন কখন এমন দিন আসে, যখন আদর্শে আদর্শে সংঘাত উপস্থিত হয়। বাহিরের কোন ব্যক্তিসংঘের প্রভুত্বে দাস জাতির জাতীয় আদর্শ অবহেলার বিষে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। দুর্ব্বল-চিত্ত মানুষ যেমন নিজের গৃহ অবহেলা করিয়া উত্তেজনার সন্ধানে অন্যত্র গমন করে, তেমনই দুর্ব্বল ব্যক্তি তাহার নিজের জাতীয় আদর্শ, নিজের মনোবৃত্তিকে তাচ্ছিল্য করিয়া নূতনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। প্রবল প্রভু যদি কাছে থাকে, তাহা হইলে তাহার আদর্শকে জোর করিয়া নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, "তুমি সত্য" বলিয়া গ্রহণ করিয়া, মানুষ তাহার দুর্ব্বলতা ভুলিতে চেষ্টা করে। তখন এক ভীষণ আদর্শসংঘাতের সূচনা হয়। তাহার ফল আদর্শের প্রগাঢ়তার উপর নির্ভর করে। প্রগাঢ় বহুকালস্থায়ী পারিপার্শ্বিকের সহিত সঙ্গতিবিশিষ্ট আদর্শ অল্পকালের জন্য শক্তিহীন হইতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই তাহা পুনর্ব্বার আপন আধিপত্য ফিরিয়া পায়।

এতক্ষণ আমরা জাতির প্রাণের কথা বলিয়াছি। এখন দেখা যাউক জাতির দেহ কি প্রকার। অন্তরের প্রেরণাই মানুষের কার্য্যের মূল। মানুষ কার্য্য করে অবশ্য দেহ দিয়া। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে যাহা হয়, অস্বাভাবিক উপায়ে তাহার উল্টা কার্য্যও সম্ভব। প্রাণ-শক্তি বা মনোবৃত্তি দেহকে প্রভাবিত করে; ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক উপায়ে দেহকে দিয়া ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ কার্য্য যদি বহুকাল ধরিয়া করান যায়, তাহা হইলে সেইরূপ ব্যবহার প্রাণশক্তি বা মনো-বৃত্তিগুলিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। সর্ব্বক্ষেত্রে জাতীয়

আদর্শ যেরূপ জাতীয়তার প্রাণ, সেইরূপ সর্ব্বক্ষেত্রে জাতির কার্য্য ও ব্যবহার তাহার দেহের প্রকাশ। জাতি কার্য্য করে রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া। স্থতরাং রাষ্ট্রকে জাতির দেহ বলা চলে। এইজন্য যেরূপ স্বাভাবিক অবস্থায় জাতীয় আদর্শের প্রভাবে রাষ্ট্র কার্য্য করে, সেইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থাতেও রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপের পক্ষে জাতির আদর্শ বা প্রাণকে প্রভাবিত করাও সম্ভব। রাষ্ট্র অর্থাৎ জাতীয় দেহ পারমার্থিক অথবা বৈষয়িক, অভিজাততান্ত্রিক অথবা সাধারণতান্ত্রিক, অসামরিক অথবা সামরিক, ইত্যাদি কোন না কোন প্রকারের হইতে পারে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবহারে উপরোক্ত যে-কোন প্রকার ভাব বা চিন্তার ধারা ব্যক্ত হইতে পারে। কিন্তু যদি তাহা জাতীয় প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে উদ্ভূত হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল; নতুবা তাহা অস্বাভাবিক এবং অমঙ্গলজনক। রাষ্ট্র ক্রমাগত যদি বৈষয়িক ভাবে ব্যবহার করে এবং জাতীয় আদর্শ যদি পারমার্থিক হয়, তাহা হইলে আদর্শসংঘাতে জোর করিয়া বৈষয়িকতাকে বড় করিয়া ধরা হইবে। জাতীয় আদর্শ যদি সাধারণতন্ত্র হয় এবং রাষ্ট্র যদি বিজাতীয় শক্তি ব্যবহার করিয়া অভিজাত্য-পূজা আরম্ভ করে, তাহা হইলেও অমঙ্গল। অমঙ্গল,—কেন না, যে আদর্শ নানান্ সংঘাতের ভিতর দিয়া পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজকে মানাইয়া লইয়া, বহু স্বজাতীয় মহাপুরুষের আজন্মের সাধনার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বাহিরের সঙ্গীনের খোঁচায় দূর করিয়া দেওয়া হইতেছে। এ যেন স্বভাবপুণ্যবানের বাধ্য হইয়া দুরাচরণ। অমঙ্গল,—কেননা স্বভাবপুণ্যবান্ অথবা সাধকও যদি পাপাচরণ করিতে বাধ্য হন এবং বহুকাল ধরিয়া বাধ্য হন, তাহা হইলে তাঁহার মনোবৃত্তি, তাঁহার প্রাণের উপর সেই পাপাচরণের, সেই প্রাণশক্তিবিরুদ্ধ কার্য্যের ছাপ থাকিয়া যাইবে। রাষ্ট্রের কুব্যবহারে জাতীয় প্রাণ, জাতীয় আদর্শ কলুষিত হইবে। অ।

শ্রীযুক্ত স্থকুমার রায়

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত স্থকুমার রায় আড়াই বৎসর কালাজ্বরে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার জীবনীশক্তি এত দীর্ঘকাল রোগের সহিত সংগ্রাম করিতেছিল, এবং তাঁহার মন দমে নাই, প্রফুল্ল ছিল,—রোগশয্যাতেও তিনি চিত্র অঙ্কন ও কবিতা রচনা আদি করিতেছিলেন—দেখিয়া বরাবরই আমাদের আশা ছিল, যে, তাঁহার জীবনীশক্তিরই জয় হইবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। তিনি মাতা, পত্নী, শিশু পুত্র, ভগিনী, ভ্রাতা এবং সমুদয় গুরুজনকে, স্নেহভাজন সকলকে, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে, শোকে নিমগ্ন করিয়া অমর ধামে যাত্রা করিলেন।

বাল্যকাল হইতে স্থকুমার সাতিশয় প্রতিভাশালী ছিলেন, এবং এই প্রতিভা নানা দিকে প্রকাশ পাইত। তিনি দুই বিষয়ে সম্মানের সহিত বি-এস্‌সি পাস্ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ পরিচায়ক নহে। পাস্ করিবার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি লাভ করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টার-

শ্রীযুক্ত স্থকুমার রায়
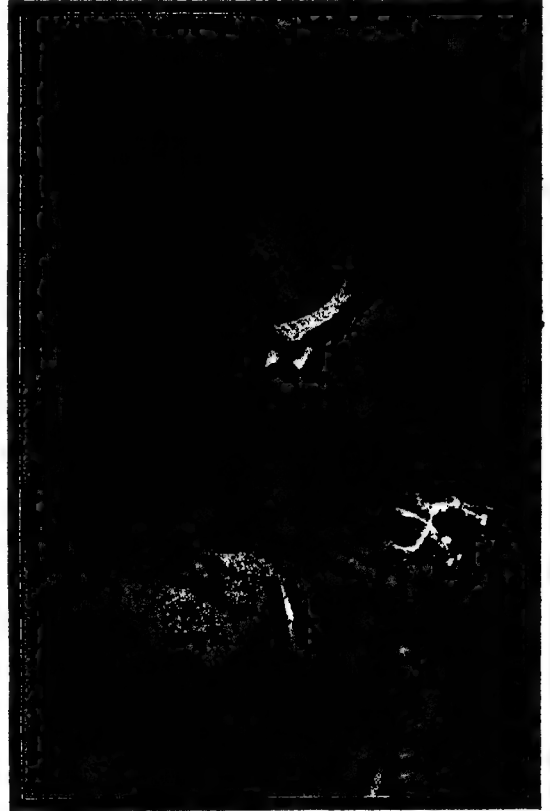
শিল্প-কলেজে ফোটোগ্রাফী এবং ফোটোগ্রাফিক প্রক্রিয়া অনুসারে ছবির ব্লক প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে নিজ জ্ঞানবৃদ্ধি ও গবেষণা করিতে গমন করেন। তিনি এদেশে থাকিতেই তাঁহার পিতার নিকট হইতে এই-সকল বিষয়ে বিস্তর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ও দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ম্যাঞ্চেষ্টারে গিয়া গবেষণায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। এই-সকল বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কোন সমসাময়িক ভারতীয় লোক ছিলেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ ফোটোগ্রাফিক শিল্পবিষয়ক বার্ষিক কোন কোন বিখ্যাত কাগজে

বাহির হইয়াছিল, এবং তাঁহার গবেষণার বলে তিনি রয়্যাল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। বিলাত হইতে এখানে ফিরিয়া আসিয়া ব্লক প্রস্তুত করিবার ও ছবি ছাপিবার ব্যবসার নানাদিকে উন্নতি ও বিস্তৃতির সঙ্কল্প ও চেষ্টা করিতে-ছিলেন। এমন সময়ে তিনি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হন।

সুকুমারের স্বভাবে গাম্ভীর্য্য বিনয় ও সৌজন্যের একত্র সমাবেশ লক্ষিত হইত। তিনি খুব দৃঢ়চিত্ত, স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী পুরুষও ছিলেন। স্বাধীন-চিন্তা ও তেজস্বিতা বিষয়ে, মনে হয়, তাঁহার পিতার ও মাতামহের গুণ তিনি পাইয়াছিলেন। তাঁহার সৌজন্যও তাঁহার পিতার মত স্বভাবসিদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ তিনি নানা দিকে তাঁহার পিতার প্রতিভার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

সুকুমার বিমল হাসির কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি, যাহাকে ইংরেজীতে nonsense rhymes (নন্‌সেন্‌স্ রাইম্‌স্) বলে, 'আবোল্ তাবোল্' নাম দিয়া বাংলায় তাহার একরূপ প্রবর্ত্তক ও সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন বলিলেও চলে। হাস্যকৌতুকের অভিনয়ে ও গানে তাঁহার খুব দক্ষতা ছিল। দ্বেষবিদ্রূপহীন হাসির কবিতা লিখিতে তিনি যেমন পারিতেন, তেমনি দ্বেষ-বিদ্রূপহীন কৌতুকর ছবি আঁকিতেও তিনি সুনিপুণ ছিলেন।

এই তাঁহার চরিত্রের ও প্রতিভার এক দিক্; আবার অন্যদিকে তিনি গম্ভীর বিষয়ে প্রগাঢ় ভাব ও গভীর চিন্তাপূর্ণ বাংলা ও ইংরেজী গদ্য রচনাও বেশ করিতে পারিতেন। বিলাতী ত্রৈমাসিক কোয়েষ্ট (The Quest) কাগজে তিনি একবার একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের নিকট উহার খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। ওজনকরা ও সুপ্রযুক্ত অল্প-সংখ্যক কথার মধ্যে প্রগাঢ় ভাব ও গভীর চিন্তা সন্নিবিষ্ট করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

তিনি গম্ভীর বিষয়েও কবিতা লিখিতে পারিতেন। রোগশয্যায় এইরূপ একটি দীর্ঘ উৎকৃষ্ট কবিতা তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহা ছাপাইয়া অনেককে উপহার দিয়াছিলেন, এবং তাহা তাঁহার সম্পাদিত তাঁহার অতি প্রিয় "সন্দেশে" ছাপা হইয়াছিল।

নাচার হইয়া বিষণ্ণ চিত্তে ভগবানের বিধান কেহ কেহ মানিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু রোগশয্যায় সুকুমার যে সর্ব্বদা ইহপরলোক উভয়ের জন্যই প্রফুল্লচিত্তে সমান প্রস্তুত ছিলেন, তাহা সে-জাতীয় নহে। তাহা তাঁহার গভীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তি হইতে উদ্ভূত। এই হাস্যরসিক যুবকের চরিত্রকে ভগবদ্ভক্তি অনুপম সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছিল। সুকুমার নানাগুণ-সন্নিবেশে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবকদের স্বভাবনেতা ছিলেন। যুবকেরা কি হারাইলেন, সমাজ কি হারাইলেন, দেশ কি হারাইলেন, মানবসমাজ কি হারাইলেন, তাহা পরে স্থিরচিত্তে বিচার করিলে বুঝা যাইবে। এখন লিখিতে পারিলাম না।

—

জনৈক বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব

এলাহাবাদের শ্রীমান্ অখিলচন্দ্র মিত্রের পরিচায়ক অন্যত্র মুদ্রিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি হইতে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাঠকেরা পাইবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, এরূপ ছাত্রের সংখ্যা বেশী না হইলেও, এমন ছাত্রের নাম আরও করা যায়। কিন্তু পড়াশুনার সকল পরীক্ষাতেই প্রথমস্থানীয় এবং ব্যায়াম ও খেলাধূলাতেও প্রথমস্থানীয়, এমন অন্য কোন বাঙালী বা ভারতীয় ছাত্রের বিষয় আমরা অবগত নহি। দৈহিক উৎকর্ষ ও নৈপুণ্য এবং মানসিক উৎকর্ষ ও দক্ষতা অখিলচন্দ্রকে ছাত্রদের আদর্শস্থানীয় করিয়াছে। সাধারণতঃ ছাত্রদের ও অন্য লোকদের মধ্যে একটা ধারণা আছে, যে, পড়া-শুনায় উৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা যায় না; আবার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে জ্ঞানলাভ ও পরীক্ষায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করা যায় না। কিন্তু তাহা যে ঠিক নহে, অখিলচন্দ্রের দৃষ্টান্ত হইতে তাহা ভাল করিয়া বুঝা যায়। অবশ্য সব ছাত্রই তাঁহার মত সবদিকে প্রথমস্থানীয় হইতে পারেন না, কিন্তু দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে, ইচ্ছা করিলে, সকলেই পারেন।

অখিলচন্দ্রের দৃষ্টান্ত হইতে অনেক বাঙালী আরও একটি বিষয়ে আশান্বিত হইতে পারেন। তিনি বাঙালী ছেলে, তাঁহার পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙালী। কিন্তু দৈহিক উৎকর্ষে তিনি যাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া প্রথমস্থান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বা অধিকাংশ অন্যান্য প্রদেশের লোক—যাঁহাদের বাঙালী অপেক্ষা বলিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইল না, যে, বাঙালীরা সকলেই অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা তাহাদের সমকক্ষ; কিন্তু ইহা প্রমাণিত হইল, যে, বাঙালীদের দৈহিক উৎকর্ষলাভ অসম্ভব নহে। অবশ্য ইহার প্রমাণ আগেও অন্য অনেকে দিয়াছেন।

নিজের জাতির অতিরিক্ত প্রশংসা যেমন ভাল নয়, অতিরিক্ত নিন্দাও তেমনি ভাল নয়।

হিন্দুমহাসভার সভাপতির অভিভাষণ

হিন্দু মহাসভা যে কাজে হাত দিয়াছেন, তাহা বিশাল ও অতিশয় আবশ্যক। এইজন্য উহার সম্বন্ধে এবার অনেক লিখিয়াছি। আরও অনেক লেখা দরকার। অল্প কিছু লিখিতেছি।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়* শাস্ত্রীয় আচার, দেশাচার ও লোকাচার মানিয়া চলেন। তাঁহার মত হিন্দু-আচারনিষ্ঠ লোক সভাপতির অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নৈরাশ্যজনক নহে, আশাজনক; কিন্তু আরও অগ্রসর না হইলে হিন্দুরা খুব প্রাণশক্তিমান্, বলিষ্ঠ ও সংঘবদ্ধ সম্প্রদায় হইতে পারিবেন না।

হিন্দুরাও যে মুসলমানদের উপর কখন কখন অত্যাচার করিয়াছে, বক্তা তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি হিন্দুর উপর মুসলমানের অত্যাচারের জন্য সমুদয় মুসলমান সম্প্রদায়কে দায়ী করেন নাই, কেবল দুর্বৃত্তদিগকে দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের সংখ্যা বড় বেশী।

কুমারী এলিস্‌কে পাঠানেরা হরণ করিয়া ভারতের বাহিরে লইয়া যাইবার পর যেমন সমুদয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাদা মানুষদের টনক নড়িয়াছিল ও তাহাদের সমবেত শক্তি তাঁহার উদ্ধারে প্রযুক্ত হইয়াছিল, পণ্ডিতজী হিন্দুদের নারীরও মানইজ্জৎ এবং দেবমন্দির রক্ষার জন্য তেমনি ভাব দেখিতে চান। আমরাও চাই। কিন্তু তাহার জন্য আবশ্যক হিন্দুদের সেইরূপ রাষ্ট্রীয় সংহতি (solidarity) ও শক্তি এবং সেইরূপ সামাজিক একতা ও সংঘবদ্ধতা যেমন ইংরেজদের আছে। রাষ্ট্রীয় সংহতি ও শক্তির কথা এখন আলোচনা করিব না। উহা কেমন করিয়া জন্মিতে পারে, তাহা বহু বৎসর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি। সামাজিক একতা ও সংঘবদ্ধতা ইংরেজদের মত বা মুসলমানদের মত হিন্দুদেরও হইতে পারে, যদি হিন্দুর সামাজিক গঠন ইংরেজ বা মুসলমানদের মত কতকটা গণতান্ত্রিক হয়। মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সাম্য যতটা আছে (অবশ্য সম্পূর্ণ সামাজিক সাম্য তাহাদের মধ্যেও নাই), হিন্দুদের মধ্যে ততটা না হইলে হিন্দুরা তাহাদের মত একপ্রাণ ও সংঘবদ্ধ হইতে পারিবে না। অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হইলে এবং জাতিভেদের উচ্ছেদ না হইলে, শ্রেণীভেদ থাকিলেও কেহ কাহারও চেয়ে উচ্চ বা নীচ—পবিত্র বা অপবিত্র—এই ধারণা ও তদনুযায়ী আচরণ বিদূরিত না হইলে হিন্দুরা সংঘবদ্ধ ও এক প্রাণ হইতে পারিবেন না।

পণ্ডিতজী বলেন, হিন্দুরা কেমন করিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া আপনাদের আত্মসম্মান রক্ষা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের একত্র মন্ত্রণা করা উচিত। ঠিক কথা। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুর কোন সামাজিক প্রথা রীতি বা আচার আচরণ একটি শ্রেণীকেও অবজ্ঞা করিয়া তাহার আত্মসম্মানে আঘাত করে, বা আত্মসম্মান জন্মিতে না দেয়, ততদিন পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দুজাতির আত্মসম্মান জন্মিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিব না, এবং আত্মসম্মান রক্ষা করিতে তাহারা পারিবে না। "অস্পৃশ্য" বা "অনাচরণীয়" কোন লোক যতদিন হিন্দু থাকিবে, ততদিন মানুষের স্বাভাবিক সম্মান ও অধিকার সে "উচ্চ" শ্রেণীর হিন্দুর নিকট হইতে পাইবে না, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান্ বা মুসলমান হইলে পাইবে, ইহা কিরূপ আত্মসম্মান ?

পণ্ডিতজীর বক্তৃতার যে চুম্বক "লীডারে" বাহির হইয়াছিল, তাহাতে আছে, যে, তিনি বিবাহিত হইবার পূর্ব্বে বালকদের পূর্ণ দৈহিক শক্তি লাভ ও বুদ্ধির পরিপক্বতা চান। বালিকাদের শিক্ষার সমর্থন তিনি করেন। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদেরও শরীরের পূর্ণবিকাশ এবং বুদ্ধির পক্বতা চান কি না, [illegible] তাহা লেখা নাই। কিন্তু বালক ও বালিকা উভয়েরই দেহমনের সমান বিকাশ জাতির উন্নতি ও শক্তিমত্তার জন্য আবশ্যক।

"অস্পৃশ্য"দিগের সম্বন্ধে মালবীয় মহাশয় [illegible] অনেক মর্ম্মস্পর্শী কথা বলেন। তিনি বলেন, যে, ঐ-সব শ্রেণীর এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদিগকে তিনি অসঙ্কোচে প্রণাম করিতে পারেন। মেথরেরা ময়লা ছুঁইলে ঘাঁটিলে তাহাদের দৈহিক অশুদ্ধি ঘটে, তাহা প্রক্ষালনে দূর হয়। "কিন্তু অন্তরের যে অশুচিতা পাপচিন্তা ও কল্পনা হইতে ঘটে, যাহা [illegible] শ্রেণীর লোকেরা (আমিও তাহার মধ্যে [illegible]) [illegible] তাহার জন্য কি করা হয়?" তিনি 'অস্পৃশ্য' শ্রেণীর লোকদিগকে অন্যান্য হিন্দুদের সহিত এক [illegible] ও উপবেশন, এক বিদ্যালয়ে পুত্রকন্যাদিগকে [illegible] জন্য প্রেরণ, এক কূপ হইতে জল উত্তোলন, এবং এক মন্দিরে দেবদর্শনের অধিকার প্রদানের সমর্থন করেন।

ইহা অবশ্য ন্যূনতম অধিকার, যাহা ব্যতিরেকে হিন্দুদের সংঘবদ্ধতা, সামাজিক ন্যায্য আচরণ ও সাম্য একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আরো অগ্রসর হইতে হইবে।

মালবীয় মহাশয় অস্পৃশ্যদের সম্বন্ধে বলেন, "আমরা

---

* অনেক বাংলা কাগজে পদবীটি 'মালব্য' লেখা হয়। তাহা ভুল। মালব হইতে মালব্য হয় না, মালবীয় হয়। পণ্ডিতজীও মালবীয়ই লেখেন। বঙ্গ হইতে বঙ্গ্য হয় না, বঙ্গীয় হয়, মহারাষ্ট্র হইতে মহারাষ্ট্র্য হয় না, মহারাষ্ট্রীয় হয়।

আমাদের রক্তমাংসের সম্পর্কের লোকদিগকে বর্জন না করি ("let us not boycott our own flesh and blood")। ইহা এখন রূপক কথা। ইহা যখন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইবে, তখন জাতীয় একপ্রাণতা, সংঘবদ্ধতা, ও সংহতি পূর্ণ হইবে।

মহাসভার সভাপতির অভিভাষণে এবং তাহাতে নির্দ্ধারিত প্রস্তাবগুলিতে অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন নাই। কিন্তু মহাসভার সম্বন্ধে ন্যায্য কথা বলিতে হইলে ইহাও বলা উচিত, যে, উহার নির্দ্দিষ্ট "হিন্দু" নামটির সংজ্ঞার মধ্যে তাহারাও অন্তর্ভুক্ত যাহাদের মধ্যে (যেমন ব্রাহ্মদের মধ্যে) অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে; অতএব মহাসভা পরোক্ষভাবে মানিতেছেন, যে, অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা মানুষের হিন্দুত্ব লুপ্ত হয় না।

অভিভাষণের শেষ অংশে মালবীয় মহাশয়, হিন্দুসমাজ হইতে যাহারা বা যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভিন্ন সমাজে গিয়াছিল; তাহাদিগকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, এমন কি যে-সব মুসলমান বা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ কখনও হিন্দু ছিল না, তাহারাও [illegible] হইলে তাহাদিগকে [illegible] সমাজে লওয়া [illegible] নক অনার্য্য [illegible]

[illegible] কয়েকটি [illegible] হিন্দুর শাস্ত্র [illegible] রা একেশ্বর- [illegible] ক্ত দুই ধর্ম্ম [illegible] প্রচলিত হিন্দু [illegible] না সন্দেহ। [illegible] আছে, তাহা [illegible] বচন [illegible] তাহাই [illegible] পূর্ব্বপুরুষেরা [illegible] রা পুনরা- [illegible] ভুক্ত হইতে [illegible] কে জাতিতে [illegible] মান সমাজে [illegible] অধিকার ভোগ করিয়া কেহ হিন্দুসমাজে আসিয়া আবার অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় হইতে রাজী হইবেন না। অনাচরণীয়তা ও অস্পৃশ্যতা দূর করিলে ইহার প্রতিকার হইবে। যাঁহারা বা যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কখনও হিন্দু ছিলেন না, তাঁহারা কোন্ জাতিভুক্ত হইবেন, তাহাও স্থির করিতে হইবে। যাহাতে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এমন কোন শ্রেণীতে স্থাপিত হইতে তাঁহারা চাহিবেন না।

মহাসভার কয়েকটি নির্দ্ধারণ

মহাসভা যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, হিন্দুরা তাহাই মানিয়া লইবে, তাহা নহে; তথাপি নির্দ্ধারণগুলি দ্বারা লোকদের শিক্ষা ও লোকমতগঠনে সাহায্য হইবে।

একটি প্রস্তাবে বালকবালিকা উভয়েরই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা ও ব্যায়ামের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিবৃত হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে বালকদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৮ ও বালিকাদের ১২ নির্দ্ধারিত হয়। ইহা মন্দের ভাল মাত্র। কিন্তু ১৮ বৎসরে বালকদের দেহ ও মনের যথোচিত বিকাশ হয় না। বালিকাদের ১২ বৎসরে হয়ই না। ঐ বয়সে শিক্ষাই বা কতটুকু হয়? দৈহিক পূর্ণতা ত অসম্ভব। বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী আসিয়া বালিকার শিক্ষালাভ, একটা বাজে কথা। মাষ্টারী ও প্রণয়ীত্ব এবং স্ত্রীত্ব ও ছাত্রীত্ব একসঙ্গে চলে না। চালাইলেও সন্তানসম্ভাবনা হইবামাত্র উহা থামিয়া যায়। বাল্যপিতৃত্ব ও বাল্যমাতৃত্ব হিন্দুদের অবনতির একটি প্রধান কারণ। কেহ কেহ বাল্যবিবাহের সমর্থনার্থ বলেন, অমুক অমুক বাল্যবিবাহের সন্তান কিন্তু ৬০।৭০।৮০ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। এখানে বক্তব্য, ২।৪টা দৃষ্টান্তের দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কথা হইতেছে এই, যে-সব দেশে বাল্যবিবাহ নাই, তথাকার লোকদের মধ্যে শতকরা যত লোক অনেক বেশী বয়স পর্য্যন্ত (শুধু বাঁচিয়া থাকে নহে) দেহ ও মনকে সবল ও কার্য্যক্ষম রাখে, সেই-সব দেশের জাতি মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতেছে, আমাদের দেশে কি তেমন কিছু দেখা যায়? আমাদের দেশের যে-সব লোকদের নাম করা হয়, অন্য দেশের কৃতী লোকদের তুলনায় তাঁহাদের স্থানই বা কোথায়?

তা ছাড়া, বাল্যবিবাহ এবং বাল্যপিতৃত্ব ও মাতৃত্বের মধ্যে প্রভেদ আছে। বাল্যে বিবাহিত লোকদের পূর্ণ বয়সের সন্তানদিগকে বাল্যমাতৃত্ব বা বাল্যপিতৃত্বের ফল বলা যায় না। পিতা ও মাতা উভয়েই পূর্ণবয়স্ক হইলে ফল একরকম হয়, পিতা পূর্ণবয়স্ক ও মাতা বালিকা হইলে ফল আর-একরকম হয়, উভয়েই বালকবালিকা হইলে ফল সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হয়।

বালিকাদিগকে কেবল কুস্তি করাইলে তাহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে না। মহারাষ্ট্রের মত স্বাধীনতা দিয়া, তাহাদিগকে বহির্জগতের সহিত সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে অভ্যস্ত করিলে তাহাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিপদে সাহস ও ধৈর্য্য এবং সঙ্কট অবস্থায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব জন্মিয়া তাহাদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিবে।